উদ্বোধন
॥১০১॥
১৪০৫▫১ম সংখ্যা

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত

সর্বজনীন উপাসনালয়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে **স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের** দ্বারা স্থাপিত হয় **শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, চেন্নাই**। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ **শতবর্ষ** পূর্ণ করেছে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত **এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল** এবং মন্দিরের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটির সম্ভাব্য **নির্মাণব্যয় দাঁড়াবে সাড়ে ছয় কোটি টাকা**।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ **শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ** মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী শতাব্দীর প্রারম্ভেই মন্দিরের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন হবে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল চিন্তাশীল মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। **এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত**। আপনার সহৃদয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯
ই. মেল ঠিকানা : srkmath@giasmd01.vsnl.net.in

আপনার কাছে আপনার পরিবার কত গুরুত্বপূর্ণ

ওঁদের দিন আরো এক আধার...

দিয়ে দিন এলআইসি-র নানান পলিসির রামধনু উপহার।

আপনার পরিবার-ঘনিষ্ঠতা, প্রীতি আর স্নেহ যত্নের প্রতীক। এখন এল আই সি র নানান পলিসির সুরক্ষার এক রামধনু উপহার দিয়ে ওঁদের জীবনে সুখ-শান্তি সুনিশ্চিত করুন।

জীবন স্নেহ, আজকের মহিলাদের জন্যে এক বিশেষভাবে তৈরী পলিসি। এটি লেখাপড়া, বিবাহ, অসুখবিসুখ ইত্যাদির জন্যে সময়মতো পুঁজি যুগিয়ে আজকের মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান করে।

জীবন সঞ্চয়, এক নতুন মানি ব্যাক যোজনা যা বিবাহ, লেখাপড়া ইত্যাদি অথবা কোনো আকস্মিক খরচখরচার জন্যে সময়মত পুঁজি জুগিয়ে আপনাকে ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে।

আশা দীপ (II), একটি ... পলিসি, যার আওতাভুক্ত হ'ল ক্যান্সার (ম্যালিগন্যান্ট), উভয় কিডনীর অকেজোতা, বাই পাস সার্জারি হওয়ার করনারি ধমনীর রোগ এবং প্যারালাইটিক স্ট্রোকের মতো চারটি মুখ্য বিষয়।

জীবন শ্রী, বিত্তায় ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণকে বীমার সুরক্ষা প্রদান করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কর্মক্ষেত্রে বহাল রাখতে নিয়োগকর্তাকে সুযোগ দেয়।

জীবন সুরভী, হচ্ছে বৃদ্ধিশীল বীমা সুরক্ষাযুক্ত একটি মানি ব্যাক পলিসি। এতে জীবনোত্তর এবং মেয়াদ শেষের সুবিধাসমূহের পাশাপাশি সীমিত প্রিমিয়াম দেওয়ার মেয়াদী সুবিধা।

জীবন মিত্র, হ'ল দ্বিগুণ লাভদায়ক বন্দোবস্ত যোজনা, যাতে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, মূল বীমাকৃত রাশি দ্বিগুণ হ'য়ে যায়।

বীমা কিরণ, হচ্ছে কমবয়সী ব্যক্তির জন্যে একটি অনন্য কম ব্যয়ী, উচ্চ-বীমা যোজনা।

এল আই সি পলিসি। আপনারই জন্যে, চিরকাল আত্মবিশ্বাস নিয়ে জীবনধারনের জন্যে।

বিশদ বিবরণের জন্যে আপনার নিকটবর্তী এল আই সি এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

জনগণের সেবায়
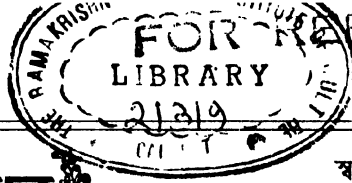
INTERPUB/LIC/17/98 Ben

উদ্বোধন ॥১০১॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
একশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র ১০১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা মাঘ ১৪০৫ জানুয়ারি ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ১
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
ধন্য 'উদ্বোধন' ২
❑ সঙ্কলন ❑
'কথামৃতে' না-বলা স্বামীজী-প্রসঙ্গ—শ্রীম ৫
❑ ভাষণ ❑
স্বামী বিবেকানন্দের ভাবমূর্তি—স্বামী ভূতেশানন্দ ৯
❑ ধারাবাহিক প্রবন্ধ ❑
অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ—স্বামী প্রভানন্দ ২৯
❑ নিবন্ধ ❑
১০০ অতিক্রান্ত 'উদ্বোধন' ঃ দৃষ্টিপাত—
জলধিকুমার সরকার ১৩
❑ পরিক্রমা ❑
কিয়োটো আর তপস্বী আজারি সান—
রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৩৬
❑ ক্রীড়াজগৎ ❑
ক্রিকেট—ঐতিহ্য ও আধুনিকীকরণ—
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ (১)—কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত ২৫
❑ বিজ্ঞান ❑
মানুষের কল্যাণে আকুপাংচার—মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত ৪১
❑ পরমপদকমলে ❑
চির নবীন, চির নূতন, ভাস্বর বৈশাখ—
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩৯
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
প্রসঙ্গ ঃ 'বাঁশবেড়িয়ার রাজা মহাশয়েরা' ৩৩
শারদীয় 'উদ্বোধন' ঃ ১৪০৫ ৩৪
❑ কবিতা ❑
'উদ্বোধন'—সন্তোষকুমার দে ২৬
ভারত আবিষ্কার—বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
ভগিনী নিবেদিতা—সি. এফ. এণ্ড্রুজ ২৬
❑ বিশেষ প্রতিবেদন ❑
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের
শতবর্ষজয়ন্তী উদ্‌যাপন ২৭
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ • নরভুক মানুষ ৪৪
গ্রন্থ-পরিচয় • বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের আলোকে
মনুষ্যত্বের সন্ধান—গৌতম নিয়োগী ৪৫
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৪৮
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৪৯
বিবিধ সংবাদ ৫০
❑ অন্যান্য ❑
অনুষ্ঠান-সূচী (মাঘ-ফাল্গুন ১৪০৫) ৮
❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ ঃ ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র ঃ অদ্বৈত আশ্রম

বর্তমান বর্ষের (১৪০৫-১৪০৬/১৯৯৯) সাধারণ গ্রাহকমূল্য ঃ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য কিস্তিতেও প্রদেয়)

'উদ্বোধন'-গ্রাহকদের জ্ঞাতব্য ঃ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ, সংগ্রহ ও অন্যান্য

❑ 'উদ্বোধন' পত্রিকার আগামী বর্ষের (১০১তম বর্ষ ঃ মাঘ ১৪০৫—পৌষ ১৪০৬, জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৯) গ্রাহকমূল্য—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে ঃ ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); ৭২০ টাকা (বিমানডাক); বাংলাদেশ ঃ ১৪০ টাকা।

❑ শতবর্ষে পদার্পণ সংখ্যাটি (মাঘ ১৪০৪) এবং গত ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা (১৪০৪) দুবার মুদ্রণের পরেও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য বছরের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

❑ ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট/পোস্টাল অর্ডার যোগে গ্রাহকমূল্য পাঠালে **"Udbodhan Office, Calcutta"**—এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়।

❑ পত্রোত্তরের জন্য এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার প্রধান ডাকঘরে (G.P.O.) এবং কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণতঃ ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ঠিকমত পৌঁছায় না বলে গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে। এই বিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে পত্রিকা ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা এক মাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। এক মাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট' বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে সংশ্লিষ্ট ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে।

❑ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় (একমাস) অতিক্রান্ত হলে তবেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহক-সংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক।

❑ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। যাঁরা ডাকে পত্রিকা নেন, তাঁরা সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে **(By Hand)** অথবা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণের সময় অথবা ১লা জুন থেকে ২৪শে আগস্টের মধ্যে কার্যালয়ে জানাতে হয়।

❑ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে **(By Hand)** পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র সংখ্যায় পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে।

❑ ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নতুন ঠিকানা পিন কোড সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে, যাতে পরবর্তী সংখ্যাটি পুরনো ঠিকানায় না চলে যায়।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হলে 'উদ্বোধন'-এ ব্যক্তির/কেন্দ্রের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হবে।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদনপত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বা প্রাইভেট কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ সভাপতিকে আবেদন করতে হবে।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/**Editor**, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

১৫ জানুয়ারি ১৯৯৯ — সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

উদ্বোধন

মাঘ ১৪০৫ জানুয়ারি ১৯৯৯

দিব্য বাণী

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়, পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়, প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে। ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারংবার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।...

এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্রধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে। এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতে, বিশেষত ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান।...

হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্য নির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি।... বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এ স্বামী বিবেকানন্দের জীবদ্দশায় শেষ লেখা 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধ হইতে নবজাগরণের আবাহনী সঙ্গীতসদৃশ উপরের কথাগুলি সঙ্কলিত। 'উদ্বোধন'-এর চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যায় (১ আষাঢ় ১৩০৯) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। স্বামীজী মহাসমাধিতে লীন হন ২০ আষাঢ়।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ধন্য 'উদ্বোধন'

'উদ্বোধন'-এর ১০১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে নিবেদিত

অবশেষে আসিল সেই পরম প্রতীক্ষিত প্রহর। স্বামী বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন' শতবর্ষ অতিক্রম করিয়া ১০১তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ভারতবর্ষের দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে শতবর্ষব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্য একমাত্র 'উদ্বোধন'ই অক্ষুণ্ণ রাখিবার কৃতিত্ব অর্জন করিল। এই গৌরবের অনন্য অধিকারী 'উদ্বোধন' আজ ভারতের গর্ব, ভারতের অহঙ্কার। তবে এই কৃতিত্বের মূলে রহিয়াছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি, জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবীর শক্তি, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শক্তি—যাঁহাদের ভাব ও বাণী-শরীর 'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন'-এর কাজ আর শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ অভিন্ন বলিয়া স্বামীজী স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন। (দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ১৭৫) শ্রীমা সারদাদেবীও স্বয়ং ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, 'উদ্বোধন' তাঁহারই অপর তনু। বরিশালের অসুস্থ ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়কে লেখা শ্রীমায়ের পত্রটিতে সেই ইঙ্গিতই ছিল। (দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৫৬৮) শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং 'উদ্বোধন'-এর কর্মী চন্দ্রমোহন দত্ত একদিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে করজোড়ে আবদার করেন ঃ "মা, আমি আপনার সেবা করতে চাই।". মা বলিলেন ঃ "এখানে যেসব কাজ করছ সেসব তো আমারই সেবা, চন্দু।" চন্দ্রমোহন বলিলেন ঃ "মা, ওসব কাজ করেও আমি আপনার সামান্য কোন সেবাও করতে চাই।" শ্রীমা শান্তভাবে বলিলেন ঃ "না বাবা, তুমি 'উদ্বোধন'-এর যে কাজ করছ, সেই কাজই কর। ওটি যেমন আমার সেবা, তেমনি ঠাকুরেরও সেবা।" (শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৩৩) চন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্ত আমাদের জানাইয়াছেন ঃ " 'উদ্বোধন'-এর প্যাকেট কাঁধে করে বাবা কলকাতার গ্রাহকদের বাড়িতে বাড়িতে বিলি করতেন। একাজ যথেষ্টই কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু বাবা কোন কষ্টবোধ করতেন না। তাঁর ভাব ছিল তিনি মাকেই যেন বাড়ি বাড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।" চন্দ্রমোহন নিজেও লিখিয়াছেন ঃ "['উদ্বোধন'-এর] প্যাকেট কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার সময় মনে হতো, আমি মায়ের চরণ কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" (ঐ, পৃঃ ১১৯) 'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু যথার্থই বলিয়াছিলেন ঃ " 'উদ্বোধন'-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা-সরস্বতীর প্রসাদপুষ্ট মহাপুঁথির নাম 'উদ্বোধন'!"

'উদ্বোধন' আবার স্বামী বিবেকানন্দও। 'উদ্বোধন' তাঁহার পাঞ্চজন্য-শঙ্খ। 'উদ্বোধন' তাঁহার কণ্ঠস্বর। 'উদ্বোধন' তাঁহার হৃদয়োৎসারিত ক্ষাত্রশক্তি। 'উদ্বোধন'-এর পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছিলেন ঃ "হে পাঠক! 'উদ্বোধন' পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্ত্ব বা ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষাত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরকল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিতেছে। সেজন্য আপাতত শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিত
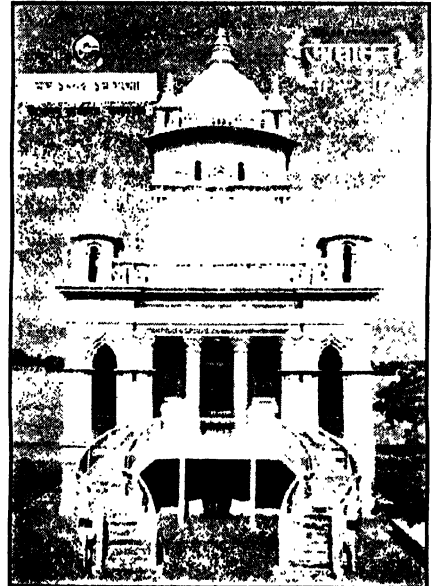
বলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর।"

'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক, স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম গুরুভ্রাতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'উদ্বোধন'-এর জন্য যেভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। প্রত্যক্ষদর্শীদের মর্মস্পর্শী বিবরণ হইতে জানা যায়, কিভাবে দিনের পর দিন কখনো না খাইয়া, কখনো নামমাত্র খাইয়া, নামমাত্র ঘুমাইয়া অমানুষিক পরিশ্রমে তিনি 'উদ্বোধন'-এর জন্য দধীচির মতো আত্মদান করিয়াছিলেন। তাহার উপরে ছিল সামান্য মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য অথবা অপর কোন সাধারণ 'গাফিলতি'র জন্য স্বামীজীর নির্মম তিরস্কার। কোন 'কারণ' তিনি শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না। 'উদ্বোধন'-এর উচ্চ মান সম্পর্কে স্বামীজী ছিলেন এতটাই আপসহীন। (দ্রঃ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, ১ম সং, ১৯৯০, পৃঃ ১৮২-১৮৩; পৃঃ ২০১-২০২) শুধু মুদ্রণ-প্রমাদ নয়, 'উদ্বোধন'কে সামান্যভাবেও সুনির্দিষ্ট ধারা হইতে বহির্ভূত দেখিলে 'উদ্বোধন'-সম্পাদক তাঁহার তীব্র ভর্ৎসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। একবার ভর্ৎসনার পরিমাণ এমনই হইয়াছিল যে, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাতে গুরুভ্রাতা-অন্তপ্রাণ স্বামীজীর কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইলেও মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না, তবে তাঁহার হাতে প্রসাদ দিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিয়াছেনঃ "তখন দেখা গেল ত্রিগুণাতীতের এক চোখে জল, আরেক চোখে হাসি!" (দ্রঃ Swami Trigunatita : His Life and Work, 1997, p. 58)

শুধু স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দই নহেন, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী শুদ্ধানন্দও 'উদ্বোধন'-এর জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। যেন বুকের পাঁজর দিয়া তাঁহারা 'উদ্বোধন'কে গড়িয়াছেন। পরবর্তী কালে যাঁহারাই 'উদ্বোধন'-এর দায়িত্ব বহন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সেবাব্রতের সাধনায় 'উদ্বোধন' শতবর্ষ ধরিয়া পথ চলিয়াছে। এই চলায় ক্লান্তি আসিয়াছে, নানা প্রতিবন্ধক ও সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর চলা কখনো বন্ধ হয় নাই। না, একদিনের জন্যও নয়। 'উদ্বোধন' যেন সেই বিখ্যাত বৈদিক মন্ত্রের সচল বিগ্রহঃ

"চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রায়তে চরণ্।
চরৈবেতি, চরৈবেতি।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।৩।১৫)

—চলাই মধু অর্থাৎ অমৃতত্বস্বরূপ, চলাই তাহার সুমিষ্ট ফল। ঐ দেখ সূর্যের আলোর ঐশ্বর্য। চলিতে চলিতে সে কখনো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় নাই। অতএব চল, চল।

শ্রীরামকৃষ্ণেরও এক মহান বাণী—"এগিয়ে পড়।" (দ্রঃ 'কথামৃত', উদ্বোধন সং, ১৯৯৬, পৃঃ ২৪৫, ৮৭৪, ৯৭৩, ১০২০) থামিতে তিনি জানিতেন না। সেজন্য একবার জগন্মাতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই—বারবার দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। নানা ভাবে, নানা পথে, নানা মতে 'মা' কিভাবে ভক্তদের দর্শন দেন তাহা দেখিবার জন্য কত ধরনের সাধনা তিনি করিয়াছেন! হিন্দুর সব সাধনা করিয়াও তাঁহার সাধনা থামে নাই! মুসলমানের সাধনা, খ্রীস্টানের সাধনাও তিনি করিয়াছেন। তাহার পরেও যেন তিনি তৃপ্ত নহেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁহার সাধনার রথচক্র ছুটাইয়াছেন। শরীরে শক্তি নাই, চলিবার ক্ষমতা নাই, পাশ ফিরিবার সাধ্য নাই। তখনো তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মানুষের ঘরে ঘরে, মানুষের দ্বারে দ্বারে ঈশ্বরের নাম বিলাইবার। গিরিশচন্দ্র দেখিয়াছেন, অন্তিম শয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে তাঁহার ঘরে নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন। তবে কি শরীরের কষ্ট অসহনীয় হইয়াছে? গিরিশচন্দ্র অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহার এভাবে ক্রন্দনের কারণ কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেনঃ "যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে একজনকেও উদ্ধার করতে পারি তাতেও জীবন সার্থক মনে করব।" তাঁহার ইচ্ছা মানুষের ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে ভগবানের নাম বিলাইতে; কিন্তু এমন জীর্ণ শরীর লইয়া তাহা হইবার নয়। এজন্যই তাঁহার গভীর বেদনা। বস্তুত, যে অপরিমেয় গতিতে তিনি চলিতে চাহিতেন, তাঁহার ব্যাধিদীর্ণ শরীর তাহাতে বাধ সাধিত। কাশীপুরে যখন তাঁহার অন্তিমমুহূর্ত ক্রমশই সন্নিকট হইতেছে, কালব্যাধির যন্ত্রণা যখন তীব্রতার শিখর স্পর্শ করিয়াছে, সেসময় একদিন নরেন্দ্রনাথকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি চাহেন? নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ। নির্বিকল্প সমাধি ভারতের জ্ঞানের সাধকদের চূড়ান্ত উপলব্ধির ভূমি। উহার পরে সাধকের আকাঙ্ক্ষার আর কিছু থাকে না। আমাদের সকল শাস্ত্রের মতে, জ্ঞানের সেখানেই সমাপ্তি। সুতরাং প্রিয়তম শিষ্যের ঐ উত্তরে গুরুর পরম সন্তুষ্ট হওয়া ছিল একান্তই প্রত্যাশিত; কিন্তু সন্তুষ্ট তো তিনি হইলেনই না, উপরন্তু তাঁহার কণ্ঠে ঝলসিয়া উঠিল কঠোর ভর্ৎসনাঃ ছি ছি! তুই এত হীনবুদ্ধি! এত ছোট নজর তোর! আমি ভাবিয়াছিলাম তুই এত বড় আধার, তুই হইবি এক বিশাল বটবৃক্ষ! হাজার হাজার পীড়িত মানুষ, আর্ত মানুষ, জীবনযন্ত্রণায় দগ্ধ মানুষ তোর ছায়ায় আসিয়া শীতল হইবে, তৃপ্ত হইবে! আর সেই তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাহিস—শুধু নিজের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক আনন্দ চাহিস! না রে, এত ছোট নজর করিস না। নির্বিকল্প সমাধির চাহিতেও উঁচু অবস্থা আছে। তুই যে গান গাহিস—'যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।' নরেন্দ্রনাথ গুরুর কথায় স্তম্ভিত। নির্বিকল্প সমাধির চাহিতেও উচ্চতর কোন অবস্থার কথা কি কখনো কেহ শুনিয়াছে? শাস্ত্রেও তো তাহার কোন উল্লেখ নাই। তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতে চাহিলেন তাঁহাকে? তিনি যেন বলিলেন, বেদ-বেদান্ত জ্ঞানের উপলব্ধিতে শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উপলব্ধি সেখানেই শেষ হয় নাই। তাঁহার উপলব্ধি বেদ-বেদান্তের সর্বোচ্চ উপলব্ধিকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। 'জ্ঞান'কে

অতিক্রম করিয়া সেই উপলব্ধি 'বিজ্ঞান'-এ উত্তরিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র সাধনা, বিচিত্র তাঁহার সিদ্ধি! জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তিনি নতুনতর উপলব্ধির আলো ছড়াইয়া চলিয়াছেন। উপলব্ধির অভিযাত্রায় তাঁহার যাত্রা যেন চিরন্তন। গুরুর নিকট হইতে এই চিরন্তন অভিযাত্রার বাণী যেমন নরেন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন, তেমনি দেখিয়াছিলেন সেই চিরন্তন অভিযাত্রার মূর্ত বিগ্রহ-রূপে তিনি স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন তাঁহার সম্মুখে।

স্বামী বিবেকানন্দেরও অন্যতম প্রধান বাণী—"Onward, onward!" অগ্রসর হও, অগ্রসর হও—সম্মুখে সম্মুখে! পিছনে তাকাইও না। (দ্রঃ পত্রাবলী, ৫ম সং, পৃঃ ৮০, ১৬৪) —এই বাণীর জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি স্বয়ং। তিনি যে আক্ষরিক অর্থেই ভারতের ও বিশ্বের পথপরিক্রমা করিয়াছেন তাহা শুধু নয়, তাঁহার সমগ্র জীবনটিই ছিল শুধুই পরিক্রমা। কী দুরন্ত গতিময় তাঁহার বাণী—কী দুরন্ত গতিময় তাঁহার জীবন! সেই বাণী ও জীবনকে তিনি ঢালিয়া দিয়াছিলেন 'উদ্বোধন'-এর সমগ্র অবয়বে। 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, অক্ষরে অক্ষরে সেই প্রচণ্ড কর্মশক্তিকে, সেই দুর্মদ উদ্যমকে, সেই দুর্নিবার চলার তৃষ্ণাকে উজাড় করিয়া দিয়া উহা তিনি সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছিলেন সমগ্র বাঙালীর জীবনে। 'উদ্বোধন'কে তিনি তাঁহার মাধ্যমরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ঃ 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে জাতির ধমনীতে নূতন প্রাণস্পন্দন তুলিতে হইবে। কিভাবে? স্বামীজী স্বয়ং 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সংখ্যায় তাঁহার 'প্রস্তাবনা'য় লিখিলেন ঃ "যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন। সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই —আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

শক্তি এবং গতির এই অগ্নিময় আদর্শকে স্বামী বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন' বিগত শতবর্ষ ধরিয়া অক্লান্তভাবে বাঙালীর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল মানুষের সার্বিক মুক্তি। এই স্বপ্ন ছিল তাঁহার জীবনের কেন্দ্রীয় ভাবনা, তাঁহার সত্তার কেন্দ্রীয় প্রেরণা, তাঁহার আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রীয় চেতনা এবং তাঁহার জীবনের কেন্দ্রীয় বেদনা। একটি অসাধারণ নামকরণ করিয়া পত্রিকাটিকে তিনি তাঁহার স্বপ্ন, ভাবনা, চেতনা এবং বেদনার বাণীরূপ দিয়াছেন—'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন'-এর আগে স্বামীজীর প্রেরণায় মাদ্রাজ হইতে তাঁহার অনুগামীরা দুটি ইংরেজী পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। স্বামীজী উহাদের নামকরণ করিয়াছিলেন 'ব্রহ্মবাদিন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত'। দুটি পত্রিকার ক্ষেত্রেই স্বামীজী যেন তাহাদের পরিধিকে ভারতকেন্দ্রিক

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

করিয়াছিলেন। পত্রিকাদুটির বিষয়বস্তু ও আলোচনার সীমা ভারত এবং বেদান্তদর্শন-কেন্দ্রিক হইবে, যেন এমন একটি গণ্ডি তিনি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর নামকরণের মাধ্যমে স্বামীজী তাঁহার বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন ভাবনাকে বাণীরূপ দিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার কোন সীমা নির্দিষ্ট ছিল না, ছিল না পরিধির নির্ধারিত গণ্ডি। 'উদ্বোধন' যেন তাঁহার সমগ্র জীবনসাধনার মর্মবাণী—'উদ্বোধন, উত্তোলন ও উত্তরণ'-এর বাঙ্ময় রূপ। আমাদের প্রতি ক্ষণ, প্রতি মুহূর্ত, প্রতি দিন উদ্বোধন, উত্তোলন ও উত্তরণ ঘটাইয়া চলিবে 'উদ্বোধন'—যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইব। এই বার্তাই তো স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনের প্রধান বার্তা। ইহা তাঁহার জীবনস্বপ্নও। 'উদ্বোধন'-এর রেখায় রেখায় সেই স্বপ্ন নিহিত, সেই বার্তা ধ্বনিত। এই বার্তা যেন ছান্দোগ্য উপনিষদের (৩।১৭।৭) ঋষির সেই মহাবার্তারই দিব্য প্রতিধ্বনি ঃ

"উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি।"

—অজ্ঞান অন্ধকারের অতীত আদিত্যমণ্ডলস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে দর্শন করিয়া আমরা সেই পরম জ্যোতিকে লাভ করিয়াছি। যিনি সমস্ত জ্যোতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমরা সর্ব দেবতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়াছি।

বাস্তবিক, 'উদ্বোধন' না থাকিলে বাঙালী দরিদ্রতর হইয়া যাইত। বাংলা ও বাঙালীর ঐশ্বর্য, 'মহাযুগচক্র পরিবর্তন'-এর বাহন 'উদ্বোধন'কে নমস্কার। ধন্য 'উদ্বোধন'! ❑

'কথামৃতে' না-বলা স্বামীজী-প্রসঙ্গ

শ্রীম

স্বামীজী কত জানতেন—গান, বাজনা, কুস্তি, বিভিন্ন শাস্ত্র, বিভিন্ন ভাষা, বক্তৃতা, সায়েন্স, আর্ট, সাহিত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, রন্ধন প্রভৃতি কত কি! বেদে আছে নানা বিদ্যার নাম। নারদ সব বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন—দেববিদ্যা, গন্ধর্ববিদ্যা, ভূততত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব কত কি! স্বামীজী সর্ববিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন। তার কোনটাই নষ্ট হয়নি, সব কাজে লেগেছে। আহা, ওঁর শরীরটা আরো থাকত কিছুকাল, যদি কেউ ধরে নিয়ে যেত rest (বিশ্রামের)-এর জন্য হিমালয়ে, আমেরিকা থেকে আসার পর। কত বকুনি, আর কি খাটুনি—অবিরত—বিরাম নেই। অতিরিক্ত খেটে খেটে শরীর গেল। (১ম ভাগ, পৃঃ ২৬)

স্বামীজী যখন রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন ঃ "আমি কি রোগ বা মৃত্যুকে ডরাই! আমি যে ঠাকুরের পা ছুঁয়েছি। কি ভয় আমার?" (ঐ, পৃঃ ৭৫)

স্বামীজীকে পেয়ে ম্যাক্সমূলার কত আহ্লাদ, কত আদর করলেন তাঁকে। আর কি মহৎ—সাউদাম্পটন লন্ডন স্টেশনে বুঝি স্বামীজীর মাথার ওপর ছাতা খুলে ধরলেন। তিনি আপত্তি করলে বললেন ঃ "It is not everyday that the son of Sri Ramakrishna can be seen." ("শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানকে রোজ দেখতে পাওয়া যায় না।") দেখ, কি উদার হৃদয়, কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি! অত বড় মানী পণ্ডিত, আর ঐ রাজসিক দেশে জন্ম, কিন্তু কি নিরভিমান! এ সবই মহাপুরুষের লক্ষণ।...

কেশব সেনকে ম্যাক্সমূলার watch (পর্যবেক্ষণ) করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে মিলনের পর কেশববাবুর অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। ম্যাক্সমূলার এটা notice (লক্ষ্য) করেছিলেন। কিন্তু কি করে পরিবর্তন হলো তখনো তিনি ভাল করে বুঝতে পারেননি। তারপর যখন স্বামীজীর সঙ্গে মিলন হলো আর ঠাকুরের সব কথা শুনলেন, তখন বুঝতে পেরেছিলেন। শেষে ঠাকুরের জীবনচরিত লিখলেন। (ঐ, পৃঃ ৩১৫-৩১৬)

আমেরিকাতে স্বামীজীর কি কম কষ্ট গেছে! আহার নেই, বাসস্থান নেই, বস্ত্র নেই—শীত সম্মুখে। কেউ জানাও নেই, আবার পকেট শূন্য। সীতাপতিকে (স্বামী রাঘবানন্দ) বলে দিয়েছি—স্বামীজীর সময়কার তাঁর ফ্রেন্ডস যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কে কে আছে দেখো আর আলাপ করো। ওঁরা আমাদের অতি প্রিয়। বরাবর watch (লক্ষ্য) করেছি কিনা তাঁদের। বস্টন, নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলস, স্যান ফ্রান্সিস্কো, শিকাগো প্রভৃতি স্থানে তাঁরা ছিলেন। কত সেবা করেছেন স্বামীজীর! তাই তাঁরা আমাদের পরম আত্মীয়।

আমেরিকার থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস পার্কে কেউ কেউ তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিল। তারা বলেছিল ঃ "We have come to you with the same regards with which we would have gone to Christ if He would be living today." ("যীশু আজ জীবিত থাকলে তাঁর কাছে যে-শ্রদ্ধা নিয়ে যেতাম, সেই শ্রদ্ধা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি।") অর্থাৎ আপনিই আমাদের যীশু—"You are the Christ to us!" স্বামীজী আর আপত্তি করতে পারলেন না। কী গভীর শ্রদ্ধা!...

একসময়ে ভারতের লোক মনে করত, ইংরেজদের সবই ভাল। What Shakespeare says—সেক্সপীয়র কী বলছেন? মিল, জেমস—এঁদের সব দোহাই পাড়ত। স্বামীজী সেটা ভেঙে দিয়েছেন। জেমসই বুঝি বলেছিলেন শেষে—life-এর problem solved (জীবনের সমস্যা সমাধান) করেছে একমাত্র বেদান্ত, আর কেউ নয়। আহা! কি শক্তিশালী ভাষা স্বামীজীর! প্রাণসঞ্চার করে দেয় মৃত শরীরে! কার্লাইলের ভাষাও তার কাছে দাঁড়ায় না। ভারতের দৃষ্টিশক্তিকে নিজের অতুল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের দিকে আকৃষ্ট করে গেছেন স্বামীজী—এই স্বামীজীর অবদান। (৩য় ভাগ, পৃঃ ২০০-২০১)

যেসব ভক্তরা স্বামীজীকে দর্শন করেছেন তাঁরা ধন্য। তাঁকে যাঁরা ভালবেসেছেন, আদর করেছেন, শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়েছেন—তাঁরা আমাদের পরমাত্মীয়। আমরা তাঁদের নিকট ঋণবদ্ধ কেন? না, স্বামীজী আর ঠাকুর অভেদ। শুনেছি, ঠাকুর সর্বদা ছায়ার মতো স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন ঐ দেশে। এক-একবার স্বামীজী কর্মক্লান্ত হয়ে যেই সমাধিস্থ হতে চেষ্টা করেছেন অমনি ঠাকুর এসে সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মানে, তাঁকে সমাধিস্থ হতে দিলে কে তাঁর নাম প্রচার করবে? আর নাম প্রচার না হলে ভক্তদের শান্তিলাভ হয় কি করে? স্বামীজীর এইসব কাজ একটা master plan (বৃহৎ পরিকল্পনা)-এর অঙ্গ। ঠাকুর অবতার কিনা! তাঁর ভাবনা জগতের জন্য—পাশ্চাত্য জগতের জন্য বিশেষ করে। কারণ, তারা বিজ্ঞানের সহায়ে জাগতিক বিষয়ে খুব অগ্রসর হয়ে গেছে। ঐশ্বর্যে ভগবানকে ভুলে যাচ্ছে। তাই তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে ভগবানের কাছে। এই কাজে স্বামীজীকে লাগিয়েছেন।

আহা! কি ভালবাসা এদের স্বামীজীর ওপর। অনেকে দেশ, আত্মীয়-কুটুম্ব, রাজসুখ ছেড়েছে। স্ত্রী-পুরুষ ভক্তগণ কতভাবে ভালবেসেছে। অজ্ঞাতকুলশীল স্বামীজী, কিন্তু ঠাকুর তাদের

হৃদয়ে থেকে ভালবাসার প্রেরণা দিয়েছেন। কেউ ভাই বলে ভালবাসত, কেউ বন্ধু, কেউ পিতা, আবার গুরু—নানাভাবে এরা ভালবেসেছে। 'ধর্ম ধর্ম' করে লোক, মিশনারীরা কতই ব্যাখ্যা করে, কিন্তু ধর্মের রূপটি কি, তা তারা দেখাতে পারেনি। সেই রূপ দেখেছিল স্বামীজীতে। আজও ভগিনীরা বলে, তাঁর snow-white purity (তুষারধবল পবিত্রতা), আর dynamic spirituality অর্থাৎ তাঁকে ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ দেখে তারা স্বামীজীর ওপর আকৃষ্ট হয়। কত কোটিপতির বাড়িতে তাঁকে পরম আত্মীয়ের মতো সেবা করেছে। অবতারলীলায় ওরাও অঙ্গ। এসব আগে থেকে ঠিক করা ছিল। (৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৫৭-১৫৮)

স্বামীজী সারা ভারতময় বেড়ালেন একা একা। নির্জন-বাসের ইচ্ছা অতি প্রবল হওয়ায় তিন বছর এইভাবে বেড়ালেন। (ঐ, পৃঃ ৫৫)

ভাগলপুরে একবার তিনদিন না খেয়ে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ)। একটি লোক আসছে দেখে বললেনঃ "লোকটি ভাল। ও আমাদের খাওয়াবে।" লোকটি এসে নমস্কার করে বলল ঃ "মহারাজ, আজ কোথায় ভিক্ষা হবে?" স্বামীজী বললেন ঃ "এই হবে একখানে।" সে বলল ঃ "আমাদের বাড়ি চলুন।" স্বামীজী বললেন ঃ "আচ্ছা, তবে চল।" আরেকবার আলমোড়ার কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনদিন আহার জোটেনি। একজন শেষে একটি শসা খেতে দিলেন। তা খেয়ে প্রাণরক্ষা হয়। এত সব কষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়েছেন। (১০ম ভাগ, পৃঃ ২১৫-২১৬)

কখনো গুরুভাইদের সঙ্গে দেখা হতো; গুজরাটে হয়েছিল। এরা ছাড়তে চায় না। তখন খুব কঠোর হয়ে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর আমেরিকা। সেখানেও কি কম কষ্ট? খেটে খেটে কত অসুখ। ফিরে এলেন, কিন্তু কিডনিতে রোগ হলো, তাতেই দেহ গেল।

তার আগেও কত বিপদ! বিপদের অন্ত নেই। বাপ ছিলেন অ্যাটর্নি। অনেক আয় ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন খুব খরচে লোক। যত্র আয় তত্র ব্যয়। ধার করেও দান করতেন। হঠাৎ মারা গেলেন বাপ। বাড়ির লোক তখন খেতে পায় না।...

ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষ কি করে বুঝবে? তাঁকে এনেছেন বড় কাজের জন্য। বিপদে ফেলে অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিয়ে নির্মল করে তবে কাজে লাগালেন। জগৎকে যখন শিক্ষা দিলেন তখন জগতের লোক শুনে স্তম্ভিত হলো। জগতের বহির্মুখী চিন্তাধারাকে যেন মুচড়ে দিয়ে মোড় ফিরিয়ে দিলেন ভিতরের দিকে। পাশ্চাত্যকে বললেন ঃ "সাবধান, তোমরা ধ্বংসের মুখে বসে আছ। সাবধান হও, নইলে সব যাবে। বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে সমগ্র জগৎকে কুক্ষিগত করে রেখেছ, কিন্তু নিজের soul-কে হারিয়ে ফেলেছ। 'Ye are divinities'—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—তোমরা এটা ভুলে গিয়েছ। জাগ্রত হও, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন কর। তাঁর সন্তান মানুষ—এই মহাসত্যের ওপর সভ্যতা স্থাপন কর, তবেই কল্যাণ।" (ঐ, পৃঃ ৫৫-৫৭)

তাঁদের (স্বামীজীদের) তপস্যা করিয়ে নিয়েছেন লোকশিক্ষার জন্য। স্বামীজীরা কত তপস্যা করেছেন! কেন এসব? ঐ experience (অভিজ্ঞতা)-গুলো apply (প্রয়োগ) করতে পারবে। গৃহীরা একটুখানি amateur religion (শখের ধর্ম) নিয়ে আছে। গৃহীদের লোকশিক্ষা দেবার অধিকার নেই। কেন? কামিনী-কাঞ্চন-এর ভিতর যে রয়েছে! সাধুরা অন্য থাকের। তাঁরা লোকশিক্ষা দেবেন। তাঁদের তাই সব ত্যাগ করিয়ে নিয়েছেন। আবার তপস্যা করিয়েছেন। বিবেকানন্দ কত কষ্ট করেছেন! পাকা pilot (পথপ্রদর্শক) বানাবেন বলে। তবে তো জগৎগুরু হতে পারবেন। লোকের অন্নাভাবে কি কষ্ট তা বুঝতে পারবেন। তাই তো সেবাশ্রম, রিলিফ কত কী করলেন দরিদ্রের সেবার জন্য। (বেলুড়) মঠটি করলেন কেন? না, যারা সংসার ছাড়বে তাদের জিরোবার স্থান হবে বলে। যেমন পাখি উড়তে উড়তে পরিশ্রান্ত হলে বৃক্ষের ডালে এসে ওঠে। সাধুরা তেমনি এখানে বিশ্রাম করবেন। (স্বামীজী) বলতেনঃ "এরপর ছেলেরা আসবে। তারা এত কষ্ট সইতে পারবে না নিরাশ্রয় জীবনের। এখানে একমুঠো অন্ন পাবে আর মাথা গুঁজবার স্থান মিলবে। আমাদের মতো কষ্ট সহ্য করতে পারবে না ওরা। তাই মঠ করা।" (১০ম ভাগ, পৃঃ ২১৫-২১৬)

স্বামীজী বরানগর মঠে থাকতেন। আবার মাঝে মাঝে বাড়িতেও আসতেন। তখন বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁকে খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হতেন। তিনি বলতেন ঃ "আমি খেয়ে এসেছি।" এদিকে কিন্তু উপোস। পাছে বাড়ির লোকেরা তাঁদের সামান্য খাদ্য তাঁকে খাইয়ে দেন, তাই এই কথা বলতেন। কত রাত কলকাতার রাস্তায়, বাড়ির রোয়াকে বসে কাটিয়ে দিয়েছেন ঐসময়! অতসব দুঃখ-কষ্ট নিজের জীবনে দেখেছেন! তবেই সেবাশ্রমগুলি করেছেন। দারিদ্র্য-দুঃখ কত বড় দুঃখ তা তাঁর জীবনে পূর্ণভাবে অনুভব করেছেন। তাই চিরকাল দরিদ্রের ওপর দয়াবান ছিলেন। (ঐ, পৃঃ ৫৭)

কর্ম করতে হলে নিষ্কাম কর্ম করতে হয়। যেমন, আশ্রম করলাম subscription (চাঁদা) তুলে কিন্তু নিজে ভিক্ষা করে খাব। বিবেকানন্দ বলতেন বাবা কালী কমলিওয়ালার কথা। বলতেন ঃ "ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম ঐ একটি সাধুকে করতে দেখেছি।" চাঁদা করে লাখ লাখ টাকা তুললেন। তা দিয়ে উত্তরাখণ্ডের সব রাস্তাঘাট করালেন। মাঝে মাঝে ধর্মশালা আর সদাব্রত। হৃষিকেশে সাধুদের জন্য অন্নসত্র।

তিনি নিজে জল তুলতেন, আটা ঠাসতেন, রুটি সেঁকতেন। সঙ্গে অন্য লোকও কেউ কেউ সাহায্য করত। সাধুদের সেই রুটি দিচ্ছেন। নিজেও বাইরে এসে সাধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেই রুটি ভিক্ষা নিচ্ছেন। এদিকে আবার ন্যাংটা। একটা কালো কম্বল মাত্র গায়ে। যেই কাজকর্ম সব ঠিক ঠিক মতো চলতে লাগল, ও মা, তিনি উধাও হয়ে গেলেন—একেবারে ডুব মারলেন—disappear (অদৃশ্য) হয়ে গেলেন! আজও কেউ তাঁর খবর জানে না। এর নাম নিষ্কাম কর্ম। (ঐ, পৃঃ ১১১-১১২)

বিবেকানন্দ নিজেও তাই করলেন। West-এ এত সব মান পেলেন, কিন্তু এদেশে ফিরে এসে একটিমাত্র কৌপীন পরে আছেন। সব দিয়ে দিলেন গুরুভাইদের। ভক্তদের কাছে চিঠি লিখে পাঠাতেন ঃ "আপনারা আমার খাওয়া-পরার যোগাড় করে দিন। আমি এখন ভিক্ষে করে খাচ্ছি।" পূর্বের ন্যায় শেয়ারের গাড়িতে পাঁচ পয়সা দিয়ে বরানগর যাতায়াতও করলেন। খালি পা, হট্‌হট্‌ করে চলছেন।

ঠাকুর বিবেকানন্দকে (তখন নরেন্দ্র) বলেছিলেন—1885 এর দোলযাত্রার দিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—"বাবা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিছু হবে না।" স্বামীজী যা করলেন, একে বলে 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ'।

শোনা যায়, বাবা কালী কমলিওয়ালা স্বামীজীকে চিনতে পেরেছিলেন। তখনো তিনি আমেরিকায় যাননি। হৃষিকেশে ছিলেন। বলেছিলেন নাকি ঐ সত্রের ভার নিতে। কিন্তু ভগবান তাঁর জন্য জগৎসিংহাসন রচনা করে রেখেছেন। তিনি কেন যাবেন এখানে কর্ম করতে? তিনি যে জগৎকে শিক্ষা দেবেন! (ঐ, পৃঃ ১১২)

কাপ্তেনের গাড়িতে উঠেছেন স্বামীজী। সামনের সিটে বসে পড়লেন। কত অনুরোধ পেছনের সিটে বসতে। ভ্রূক্ষেপও নেই—'সমঃ মানাপমানয়োঃ'। (গীতা, ১২।১৮)

যাদের মন নিচের দিকে, তারা ঐ নিয়ে মরে। কে একটু মান দিল, না দিল সেদিকে লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য নিজ আদর্শে। তা বলে স্বামীজী মান অপমান বুঝতেন না—তা নয়। ওসব তুচ্ছ জিনিসে লক্ষ্য নেই। ঠাকুর বলতেন কিনা—নরেন অখণ্ডের ঘর, নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এই মানের জন্য সাধারণ মানুষের জিভের লাল পড়ছে! (৭ম ভাগ, পৃঃ ২০৬)

আহা, কি ভালবাসাই [তাঁকে] বাসতেন! বিবেকানন্দকে দেখলেই ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠতেন। আবার কখনো কখনো সমাধি। হাস্য করে জনাইয়ের (প্রাণকৃষ্ণ) মুখুজ্যে ঠাকুরকে বলতেন ঃ "আপনি এই কায়েতের ছেলেটাকে নিয়ে এত করছেন কেন? পড়াশোনাও তো তেমন নয়, মাত্র ফার্স্ট আর্টস পড়ছে। তা তাকে নিয়ে এত নাচানাচি কেন?"

মুখুয্যে মশায় তো জানেন না, ঠাকুর কি ভালবাসাই এঁদের বাসেন। আপনার লোক যে! ইনি দেখছেন কায়স্থ। ঠাকুর তো তা দেখছেন না। তিনি দেখছেন ভিতরটা। আপনার লোক। (ঐ, পৃঃ ৮৯)

ঠাকুর পড়া সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতেন না—তুমি পড়, কি ছাড়। এসম্বন্ধে silent (নীরব) থাকতেন। কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের অসুখ। বিবেকানন্দ সেখানে যেতে পারতেন না, Law examination-এর (আইন পরীক্ষার) জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। শেষ অবধি আর থাকতে পারলেন না। একদিন দৌড়ে গিয়ে হাজির। পায়ে চটি, পরনে ময়লা একখানা কাপড় আর গায়ে চাদর। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি রে, তুই যে এলি; তোর তো এগজামিন?" বিবেকানন্দ তখনি বলেছিলেন ঃ "আর এগজামিন! যা সব শিখেছি সেগুলি ভুলতে পারলে বাঁচি!"

ঠাকুর লেখাপড়া সম্বন্ধে কিছু বলতেন না বটে, কিন্তু ভিতর ফাঁক করে দিতেন। বিবেকানন্দের আর এগজামিন দেওয়া হলো না; চৈতন্য হলো—"ছিঃ, এঁর এই অবস্থা আর আমি এগজামিন দিচ্ছি!" তখন সব ছেড়ে দিনরাত ঠাকুরের সেবায় লেগে গেলেন। (ঐ, পৃঃ ৮৮-৮৯)

স্বামীজী কত কর্ম করলেন—বক্তৃতা, প্রচার, মঠস্থাপন—কত কি। কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ হননি। কেন? পরমাত্মাকে, ঠাকুরকে জেনে করেছেন তাই। তাঁকে ঠাকুর জানিয়েছিলেন, পরমাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। তবেই তো স্তব করলেন ঠাকুরকে 'খণ্ডন ভববন্ধন' বলে। ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "চাবিকাঠি আমার হাতে রইল। সময় হলে খুলে দেব। এখন যা, মার কাজ কর।" দেখ কি কাণ্ড! আত্মদ্রষ্টাকেও ঈশ্বর ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারেন। এ-রহস্য কেবল বিচার করে বোঝা যায় না।... নরেন্দ্র যদি সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতেন তবে মায়ের কাজ করত কে? ভারত ও জগতের কল্যাণের জন্যই সমাধিবান নরেন্দ্রকেও কাজে লাগালেন। (ঐ, পৃঃ ৭২)

বিবেকানন্দ থিয়েটার দেখতেন না। কেন? এতে মন অনেক নিচে নামিয়ে দেয় তাই। নাম-রূপের influence (প্রভাব) বড্ড বেশি। একটা রূপ দেখ। যদি ভাল হয়, মন ঈশ্বরের দিকে যাবে। যদি অন্যরূপ হয় তবে ভোগের দিকে যাবে। এদিকে গেলেই মন ফেঁসে গেল। তাকে তুলতে আবার কত পরিশ্রম! তাই সাধকের অবস্থায় অত বাছবিচার। (৮ম ভাগ, পৃঃ ৫৯)

একদিন কাশীপুরে ঠাকুর কাগজে লিখেছিলেন—"নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে।"... লোকশিক্ষার জন্য সংসারে এসেছে।

স্বামীজী বললেন ঃ "আমি কিংবা আমার গুরুভাইগণ যদি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝবার চেষ্টা করি, তাহলেও তিনি স্বরূপত যা (ঈশ্বর) ছিলেন, তার লক্ষ লক্ষাংশের এক অংশও বুঝতে পারবে না।" শ্রীরামকৃষ্ণ—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের সকল ধর্মাচার্যগণের সমষ্টিমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ ম্লান ধর্মকে পুনর্জীবন দান করতে এসেছেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মিলনমন্দিরে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশ ও প্রচার-বিগ্রহ। (৯ম ভাগ, পৃঃ ৯-১০)

বৌদ্ধমতে জ্ঞানমার্গের ওপর জোর ছিল। শঙ্কর তাই ওদের জ্ঞানবিচার নিয়ে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বৌদ্ধরা জগৎ মিথ্যার ওপর জোর দিয়েছেন। শঙ্কর ব্রহ্মের ওপর জোর দেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি'। ঠাকুরে এই দুই-ই আছে। স্বামীজী তাই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম করলেন west-র জ্ঞানমার্গীদের জন্য। ওখানে দ্বৈতভাবের পূজাদি নেই। তারপর স্বামীজীকে দিয়ে ঠাকুর জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—এসবই প্রচার করিয়েছেন। ঠাকুরের ভক্তরা কেউ কেউ ভক্তিপথ দিয়ে জ্ঞানপথে গেছেন। কেউ বা জ্ঞানপথ দিয়ে গিয়ে পরে ভক্তিপথে গেছেন। (১১শ ভাগ, পৃঃ ৪০)

ভাস্করানন্দ স্বামীজীকে বলেছিলেন ঃ "বের করে দাও

ছোকরাকে।" ভাস্করানন্দ উপদেশ দিচ্ছিলেন—"কামিনী ছাড়া চলে, কিন্তু কাঞ্চন ছাড়া চলে না।" স্বামীজী বললেন ঃ "আমি একজনকে দেখেছি, কাঞ্চন ছুঁলে হাত আড়ষ্ট হয়ে যায়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।" আমেরিকা বিজয়ের পর তাঁকে ভাস্করানন্দ দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজী যেতে পারেননি। নিরঞ্জনানন্দ আর শুদ্ধানন্দকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। (১৩শ ভাগ, পৃঃ ১৯-২০)

ভারত সম্পর্কে স্বামীজীর কথা শেষকথা। ভারতের স্বাধীনতা, নানা দিকের উন্নতি, বিদ্যা, ধন আদি সর্ব বিষয়ের directive (নির্দেশ) তিনি দিয়ে গেছেন। স্বামীজী নিজেকে নিজে জানতেন। তাই অত জোরে বলতেন ঃ "এখন দাগা বুলুক যা করে গেলাম তাতে।" ঠাকুর এসেছেন ভারতকে তুলতে। ভারতের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে গেছেন। স্বামীজী অগ্রদূত। তাই তিনি west-এ গিয়ে ভারতের শান্তিসুখের মহাবাণী west-কে দিয়ে এলেন। West আসবে ভারতের কাছে—একটু পরে। West-এ শান্তি নেই। ভারত উঠলে জগৎ উঠবে। ঠাকুরের আগমন তাই ভারতে।

স্বামীজীর কথার যত আলোচনা হবে দেশের ততই কল্যাণ। বিদেশেরও কল্যাণ। বহুকাল ধরে পরাধীন থাকায় ভারত নিজের পরিচয় ভুলে গিয়েছিল। ঠাকুর এসে সেটি জাগ্রত করেছেন। তুমি ঈশ্বরের সন্তান—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—এসম্পর্ক ধরে সংসারে থাক।... মানুষ ঈশ্বরের সন্তান—এটিকে আরো জোরে প্রচার করলেন স্বামীজী। বলেছিলেন ঃ "তুমি ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর আপনার জন—এ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর অপরকে সহায়তা কর এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে।" শুধু কি দেশের লোককেই বলবে একথা? না, তা নয়। বিদেশের লোককে বলবে। স্বামীজী তাই আমেরিকা ও ইউরোপের ওদেরকেও বলেছিলেন এই কথা। আমেরিকানদের বলেছিলেন সাবধান করে—"তোমরা ঈশ্বরকে ধর, নইলে ধ্বংস হবে।" (ঐ, পৃঃ ১২১-১২২)

কি বীর স্বামীজী! ঠাকুর বলেছেন—'নিত্যসিদ্ধ', 'ঈশ্বরকোটি', 'সপ্তর্ষির এক ঋষি', 'অখণ্ডের ঘর', 'আমার শ্বশুরঘর'। দেখ তাঁর জীবন—আগেও সমাধিবান পুরুষ, পরেও তাই। মাঝখানটা কয়েকদিন ঐ করলেন কর্ম। তাঁর কর্মে আসক্তি নেই, প্রত্যাদিষ্ট কর্ম—লোকশিক্ষার জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য। কর্ম তো উদ্দেশ্য নয়—উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। (১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫)❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১ম ভাগের ২য় এবং ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ এবং ১৫শ ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলক ❑ জলধিকুমার সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

অনুষ্ঠান-সূচী (মাঘ-ফাল্গুন ১৪০৫)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	৫ মাঘ	মঙ্গলবার	১৯ জানুয়ারি	১৯৯৯
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	৭ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২১ জানুয়ারি	১৯৯৯
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	১৭ মাঘ	রবিবার	৩১ জানুয়ারি	১৯৯৯
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	৫ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	১৮ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৯
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		৮ ফাল্গুন	রবিবার	২১ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৯
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	১৭ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	২ মার্চ	১৯৯৯
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২১ ফাল্গুন	শনিবার	৬ মার্চ	১৯৯৯

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	৮ মাঘ	শুক্রবার	২২ জানুয়ারি	১৯৯৯
শিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১ ফাল্গুন	রবিবার	১৪ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৯

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

১৪, ২৯ মাঘ	বৃহস্পতিবার,	শুক্রবার	২৮ জানুয়ারি,	১২ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৯
১৩, ২৯ ফাল্গুন	শুক্রবার,	রবিবার	২৬ ফেব্রুয়ারি,	১৪ মার্চ	১৯৯৯

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবমূর্তি

স্বামী ভূতেশানন্দ

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই ভাষণটি দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, একদল ত্যাগী যুবক তাঁর চরণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এদেশের অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং জগৎকল্যাণে তাঁর অভিনব ভাবপ্রচারের তাঁরাই ছিলেন তাঁর উপযুক্ত যন্ত্র। তাঁকে কেন্দ্র করে অধ্যাত্মশক্তির যে-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছিল শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে বাদ দিলে তার শীর্ষদেশে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবের যোগ্যতম বার্তাবহ, তাঁর সন্তানদের অগ্রগণ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের মহান ব্যক্তিত্ব বিশ্বের সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁর অবদান অতুলনীয়—বিশেষত মানুষের আধ্যাত্মিক নব-জাগরণের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় আগ্রহ। অবশ্য সেই অধ্যাত্ম আদর্শ জীবনের কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না—তা ছিল সমগ্র মানবজাতিকে পরিবর্তিত করার সাধনা।

স্বামীজী ভারতে জন্মেছেন, আমরা তাই সঙ্গত কারণেই গর্ববোধ করতে পারি যে, তিনি আমাদেরই ছিলেন। ভারতবাসী মাত্রেই তাঁকে জানে দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ বলে। শুধু অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার নয়, ভারতকে তিনি এমনভাবে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন যাতে ভাবী ভারত তার অতীত মহিমাকেও অতিক্রম করে যায়। তবে তাঁর কর্মক্ষেত্র শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বলেছিলেন, ভারতে যে তিনি জন্মেছেন—এ এক আকস্মিক ঘটনামাত্র। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও তাঁর পক্ষে কোনরকম বিশেষ দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব ছিল। সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্যই তাঁর আবির্ভাব।

তরুণ শিক্ষার্থিরূপে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বামীজী উপস্থিত হন, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী—"নরেন শিক্ষে দিবে।" নরেন্দ্রনাথ সহ অনেকেই সেই সময়ে ঐ কথার গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি। নরেন্দ্রনাথ তখন কলকাতার ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের অন্যতমমাত্র। তাঁর মধ্যে যে বিশ্বাচার্যের মহান সম্ভাবনা নিহিত, সেকথা কেই বা বুঝবে! শ্রীরামকৃষ্ণের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ভাবী জীবন উদ্ভাসিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁর অপরিসীম ভালবাসার পাত্র নরেন্দ্রের মহত্ত্বের যথার্থ পরিচয় তাঁর অবিদিত ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের অব্যবহিত পরেই যে অধ্যাত্ম-ভাবান্দোলনের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হবে তার পরিচালনার জন্য যুবক নরেন্দ্রনাথকে তিনি স্বয়ং নেতৃপদে নির্বাচন করে যান। শ্রীগুরুর অভিপ্রেত ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য নরেন্দ্রনাথও নিজের জীবন উৎসর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প হন। তাঁর অন্তঃকরণ এত মহৎ ছিল যে, পরবর্তী কালে তিনি নিজের মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চিন্তাও আর মনে স্থান দেননি। একসময় তিনি বলেছিলেন, যতক্ষণ না জগতের প্রতিটি মানুষ মুক্ত হয়, ততক্ষণ তিনি নিজের মুক্তিও কামনা করেন না।

স্বামীজীর জীবনকাল ছিল সীমিত। স্থূলশরীরে তিনি পূর্ণ চল্লিশ বছরও ছিলেন না। ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য যা দিয়ে গেছেন—আমরা তা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছি। তবে তাঁর মহত্ত্বের কোন প্রান্তই এখনো স্পর্শ করতে পারিনি। তাঁর অভিনব বার্তা কিভাবে বর্তমান পরিস্থিতিকে সমুন্নত এবং মানুষের জীবনকে অর্থবহ করতে চলেছে—সেসম্বন্ধেও আমরা এখনো সম্পূর্ণ অবহিত নই। বিশ্বের দিগন্তে সেই জ্যোতিষ্মান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করবে ভাবী কাল।

জীবনের প্রথম পর্বে স্বামীজী ছিলেন ব্যাকুল জিজ্ঞাসু—চারপাশে সবকিছু সম্পর্কেই তিনি আগ্রহী ছিলেন। জগৎকে গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে চাইতেন। সেই তীব্র সত্যানুসন্ধিৎসা কখনো কখনো তাঁকে অন্যের অপ্রিয় করে তুলত। আবার অনেকেই এই যুবককে উদ্ধত ভেবে পছন্দ করতেন না। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই বুঝেছিলেন, তেজস্বী নরেন্দ্রনাথের আপাত অহঙ্কারের অন্তরালে কোন্ গভীর জিজ্ঞাসা আছে। জ্ঞানস্পৃহা ছিল স্বামীজীর সহজাত। শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি নানা বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করতেন। বিরক্ত না হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বরং তাঁকে ঐ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন, যাতে তিনি কোন বস্তুকে সত্য বলে গ্রহণ করার আগে যাচাই করে নেন।

স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম পর্যায়ে বিশদভাবে শিক্ষাদানে অগ্রসর হননি। কারণ তিনি জানতেন তাঁর প্রিয় শিষ্যের অন্তরে সঞ্চিত আছে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার—তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানঘনমূর্তি। স্বামীজীও ধীরে ধীরে নিজের শক্তি এবং ভাবী কালে তাঁকে যে বিরাট ভূমিকা পালন করতে হবে সেসম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তবে একথাও বলতে হবে—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যকে দিয়ে নানাপ্রকার কঠোর তপশ্চর্যা ও গভীর অধ্যাত্মসাধনা করিয়ে নিয়েছিলেন। এই সাধনার বিষয়ে তিনি শিষ্যের প্রতি উত্তম বৈদ্যের মতোই কঠোর ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন, যে মহান আদর্শ তিনি জগতের কল্যাণের জন্য রেখে যাবেন, নরেন্দ্রনাথ তা

জগদ্ধিতায় বিতরণ করার আগে নিজে যোগ্যতা অর্জন করুক। যতদিন গুরু স্থূলদেহে ছিলেন, শিষ্য প্রতিপদেই তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন। ক্রমে শ্রীগুরু-প্রদত্ত মহান কর্তব্য সম্পাদনকেই নরেন্দ্র জীবনের ব্রতরূপে অঙ্গীকার করেন। শুধু নিজেই নয়, গুরুভাইদেরও তিনি ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও একত্রিত করতে অগ্রসর হন। এইভাবে আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে ভিত্তি করে তিনি গড়ে তুললেন এক বিরাট সঙ্ঘ।

জগতে জানবার বিষয় অসংখ্য। সেই বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পথে শিক্ষকতাকে অন্যতম সহায়রূপে গণ্য করা যায়। স্বামীজী শিক্ষার এক অভিনব ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর মতে শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে দেওয়া। তাই শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করে বললেন ঃ "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।" প্রতিটি মানুষ পূর্ণ, কিন্তু সেই পূর্ণতা সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। শিক্ষকের কাজ ছাত্রকে তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। সাধারণ শিক্ষকের ধারণা, ছাত্রের মনটি যেন সাদা কাগজের মতো—যার ওপর শিক্ষক যা উপযুক্ত মনে করেন, লিখে দেবেন। অথবা ভাবেন, ছাত্রেরা মাটির তাল—যাকে তিনি মনের মতন আকার দিতে পারেন। এটাই অধিকাংশ মানুষের ধারণা। স্বামীজী কিন্তু এবিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত আছে। শিক্ষকের কাজ হলো শিশুটি যাতে আপন অন্তরের সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে তার পথ সুগম করে দেওয়া। স্বামীজীর বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির এটাই মূলকথা। তিনি বলেছেন ঃ "যাতে চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে—এইরকম শিক্ষা চাই।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "মাথায় কতগুলি তথ্য ভরে দেওয়ার নাম শিক্ষা নয়, যা আয়ত্ত না হয়ে সারাজীবন অসম্বদ্ধভাবে মাথার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে।" শিক্ষকই ছাত্রকে সব শিখিয়ে দেবে—এই গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে স্বামীজীর ভাবনা কত পৃথক ছিল, উপরি উক্ত আলোচনা থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়। স্বামীজী যে সমগ্র মানবজাতির আচার্য—এবিষয়ে তিনি নিজেও হয়তো সর্বদা সচেতন থাকতেন না। কিন্তু যেখানেই তিনি গিয়েছেন, মানুষ তাঁকে আচার্যরূপেই বরণ করে নিয়েছে। মানুষ তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে অসীম জ্ঞানের ঐশ্বর্য, ভগবদুপলব্ধি-সঞ্জাত প্রজ্ঞার দিব্য প্রকাশ। তাঁর সারাজীবন সেই পরম সত্যের প্রচারেই উৎসর্গীকৃত—যে-সত্যকে জানলে সবই জানা হয়, সকল সমস্যার সমাধান ঘটে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর অন্যান্য গুরুভাইদের মতো স্বামীজীও সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণকালে তিনি যেমন রাজপ্রাসাদে রাজরাজড়াদের সংস্পর্শে আসেন, তেমনি পরিচিত হন কুটীরবাসী দীনদরিদ্রের সঙ্গে। ভারতের জনজীবনকে তিনি গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছিলেন তাদের বিচিত্র প্রথা, বদ্ধমূল কতকগুলি ধারণা কিভাবে তাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। এদেশের দুর্দশার কারণগুলি নিয়েও তিনি চিন্তাভাবনা করেন। তাঁর ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হয় জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির চিত্র। সুদূর দাক্ষিণাত্যের শেষপ্রান্তে কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে বসে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তখন ধীরে ধীরে তাঁর সম্মুখে ভেসে ওঠে ভারতবর্ষের অতীত মহিমা, বর্তমান অবনতি ও আগামী দিনের গৌরবোজ্জ্বল দৃশ্য। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, ভারতের পুনর্গঠনের কাজটি সম্পন্ন করবেন ত্যাগব্রতধারী সন্ন্যাসীরা এবং আরো দেখলেন, ভবিষ্যৎ ভারত তার অতীত গৌরবকে অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু কেবলমাত্র সেই পুনরুজ্জীবনের কথা চিন্তা করে এবং পথনির্দেশ দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ তাঁর গুরু চেয়েছিলেন, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন। তাঁর মহান হৃদয়বত্তা ও গভীর সহানুভূতি তাঁকে কোন ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাকে তা অতিক্রম করে গিয়েছিল। দেশপ্রেমও তাঁর দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করেনি। ভারতের দুঃখ যেমন তাঁকে বিচলিত করেছে, তেমনি পীড়িত করেছে জগতের অন্যত্র মানুষের দুঃখও। বস্তুত, সমগ্র জগৎই হয়েছিল তাঁর সেবার ক্ষেত্র।

সেইজন্যই সাগর পেরিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন অপর এক মহাদেশে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় সমগ্র জগতের সামনে হিন্দুধর্মের যথার্থ পরিচয় উপস্থাপিত করার অভিপ্রায়ে তাঁর আমেরিকা যাত্রা। সেদেশে কাউকেও তিনি চিনতেন না। প্রথম দিকে আহার ও আশ্রয়ের কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় নিঃসম্বল সাধুর মতনই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। পরে তিনি বহু মানুষের সান্নিধ্যে এলেন, দেখলেন আমেরিকার জনসঙ্ঘকে। ওদেশের বহু বিখ্যাত মনীষী ও বিদ্বৎসমাজের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল। ধর্ম বিষয়ে তাঁদের ধারণা ও মতামত সম্বন্ধেও তিনি অবহিত হলেন। এইভাবে তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত হলো সমগ্র মানবজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র, একটি সমন্বিত রূপ।

ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্র হিসাবে নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। সুতরাং আমেরিকায় যাওয়ার পর সেদেশের প্রভূত অর্থ ও প্রাচুর্যের পাশাপাশি নিজের দেশের শোচনীয় দারিদ্র্যের তুলনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে গরিব দেশ, কিন্তু তার দারিদ্র্য অর্থের। অপরদিকে পাশ্চাত্য দেশ ঐহিক উন্নতির শীর্ষে অবস্থিত হলেও সেখানে আধ্যাত্মিকতার একান্ত অভাব। তিনি অনুভব করলেন, শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎই তাঁর সেবাধর্মের ক্ষেত্র। ঐসময় নিখিল মানবসমাজের জন্য এক বিশেষ বাণী তাঁর মনে নির্দিষ্ট

রূপ নিতে শুরু করে। তিনি বুঝলেন, জগতের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সেই বিশেষ বাণী বিতরণই তাঁর ব্রত এবং ঐ মহাব্রত সাধনের উদ্দেশ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে রেখে গেছেন। এরপর প্রবল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি উচ্চারণ করলেন ঃ "বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের জন্য, তেমনি আমার পাশ্চাত্যের জন্য একটি বিশেষ বাণী আছে।" বাস্তবিক, জগতের জন্য তাঁর একটি বাণী ছিল, কিন্তু তার প্রচারের জন্য তাঁর সময় ছিল খুবই অল্প।

এভাবেই তাঁর ভাবী কার্যক্রমের সূত্রপাত হলো। যেখানেই তিনি গেছেন, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ "বস্তুত, আমার আদর্শকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণীপ্রচার এবং প্রতি কার্যে সেই দেবত্ববিকাশের পন্থানির্ধারণ।" শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। স্বামীজীর মতো আর কেউ সে-শিক্ষার তাৎপর্য এত গভীরভাবে তলিয়ে দেখেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন— ভগবানকে মাটির প্রতিমা, কাঠের প্রতিমায় পূজা করা যায়, আর মানুষের মধ্যে করা যায় না? মানুষেই তো তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ। এই অভিনব বার্তা স্বামীজী তাঁর অন্তরে দীর্ঘদিন পোষণ করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সেই বাণী ছড়িয়ে দেন।

তাঁর দৃষ্টিতে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে কোন বৈষম্য নেই। সকলেই সমান। সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়—সেই এক ঐশী সত্তাই সর্বত্র ওতপ্রোত। তবে বিভিন্ন স্থানে মানবদেবতার পূজোপহার ভিন্নপ্রকার। ভারত দরিদ্র, সুতরাং তাঁর শিক্ষা এবং জাগতিক অভ্যুদয় প্রয়োজন। সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার কাম্য। তিনি দেখেছিলেন—ঐতিহ্যময় প্রাচীন ভারত তখন গভীর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। কুসংস্কার ও অজ্ঞতার নিগড় থেকে মানুষের মনগুলিকে অবিলম্বে মুক্ত করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্যে ঐহিক সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু সেখানে আধ্যাত্মিকতার একান্ত অভাব। সেখানে কায়িক শ্রমের মূল্য আছে, কিন্তু অন্তর্নিহিত দেবত্বের কোন মূল্য নেই। সামাজিক আইনকানুনের প্রতি তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আমেরিকা প্রথম থেকেই মানুষের জাগতিক সুখসুবিধার প্রতি সচেতন এক সমাজহিতৈষী রাষ্ট্র। কিন্তু সে-দেশ মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখতে শেখেনি। তাই অজ্ঞান থেকে মুক্তির জন্য মানুষের যে সাহায্যের প্রয়োজন—এ-তত্ত্বও তাদের অজ্ঞাত।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলনে একটা নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠুক। দুটি সংস্কৃতির মিলনই শুধু কাম্য নয়—পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার সৃষ্টি হোক, যাতে উভয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তিপ্রয়োগে জাগতিক অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র আধ্যাত্মিক উন্নতিও আনতে পারে। স্বামীজীর এই প্রজ্ঞাদৃষ্টিই তাঁকে বিশ্বাচার্যে পরিণত করেছে। স্বামীজী বেদান্তের শিক্ষার ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কারণ বেদান্ত মানুষের দেবত্বের কথা, জীবে-জীবে একাত্মতার কথাই ঘোষণা করে।

'বেদান্ত' বলতে স্বামীজী পণ্ডিতদের কূটতর্কযুক্তির বিষয়কে বোঝাননি। মানবসমাজের সামগ্রিক গঠনে সেই বেদান্তের কোন ভূমিকা নেই। স্বামীজী প্রচার করেছিলেন কার্যে পরিণত বেদান্তের বাণী। আত্মা সর্বব্যাপী এবং সকলেই স্বরূপত ব্রহ্ম। ব্যবহারিক জগতেও সে-ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, যাতে মানুষের মন ক্রমে সেই একত্বানুভূতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্বামীজী বলেছেন ঃ বেদান্ত প্রচারের দ্বারা এদেশে ও অন্যান্য দেশে যথেষ্ট লোকহিতকর কাজের প্রবর্তন করা যায়। এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মানবজাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব তত্ত্ব প্রচার করতে হবে। এই তত্ত্ব বেদেই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়। কিন্তু স্বামীজীর মতন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নের ওপর আর কেউ এমনভাবে গুরুত্ব দেননি। এই আদর্শে যদি আমরা যথার্থই উদ্বুদ্ধ হই তবে সমগ্র বিশ্বেই বিরাট পরিবর্তন আসবে।

বাস্তবিক, আমরা যতদিন আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকব, ততদিনই নিজেদের দৈবী সত্তাকে অনুভব করতে পারব না এবং মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে বিভেদের প্রাচীরকে দৃঢ়তর করে তুলব। এই বৈষম্যবোধ থেকেই পরস্পরের মধ্যে যত দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও বিবাদের সূত্রপাত। আর এই কারণেই সুস্থ মানুষের পক্ষে এই পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। স্বামীজী এসেছিলেন এই বিভেদ-বৈষম্যের অবসান ঘটাতে। কেবলমাত্র বুদ্ধি বা তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। স্বামীজী কার্যে পরিণত বেদান্তের মাধ্যমে এই ভেদবুদ্ধি দূর করতে চেয়েছিলেন।

এই বৈরিতা ও বুদ্ধির মারপ্যাঁচ, উচ্চ দার্শনিক আলোচনা এবং আইনসম্মত সমিতি গড়েও দূর করা যাবে না। রোগটা মনের, মনটাই অজ্ঞান ও দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজেদের আমরা ভুলিয়ে রাখলেও কোনদিনই পরস্পরের প্রতি বৈরিতা থেকে নিষ্কৃতি পাব না। মনরূপ যন্ত্রটিকেই প্রথমে আমাদের পরিমার্জিত করতে হবে। স্বামীজী তাই সাময়িক ভাসাভাসা সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি চাইতেন 'আমূল সংস্কার'। কার্যে পরিণত বেদান্তের ভাবনাই মনে ঐপ্রকার আমূল পরিবর্তন আনতে পারে।

এই ছিল স্বামীজীর ভাবাদর্শ। স্বামীজীকে আজ আমাদের লোকশিক্ষক বা আচার্যরূপেই গ্রহণ করতে হবে। কোন বিশেষ ধর্ম বা গোষ্ঠী তাঁকে নিজের বলে দাবি করতে পারে না। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের চাপরাশ-প্রাপ্ত আচার্য—যিনি সমস্ত মানুষেরই আমূল রূপান্তর ঘটাতে এসেছিলেন।

তাঁর স্বপ্নের মানবসমাজে মানুষ হবে ভালবাসায় পরিপূর্ণ, সকলের প্রতি ক্ষমাশীল এবং সহানুভূতিতে আর্দ্র। প্রতিবেশীর

প্রতি ভালবাসা বা পরস্পরকে মেনে নেওয়াই নয়, অনুভব করতে হবে সকলের সঙ্গে একাত্মতা।

এই মহান আদর্শ প্রচারের জন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশকে স্থায়ী করতে তিনি যখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তার আদর্শ বা মূলমন্ত্ররূপে "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—আত্মার মুক্তি ও জগতের কল্যাণকেই গ্রহণ করলেন। তাঁর নিজের শিষ্যদের এবং সঙ্ঘের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকলকেই তিনি পরার্থে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁকে আমরা সাধারণ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ্ বা সমাজসেবী—এসবের কোনরূপেই সীমিত করতে পারি না। তিনি ছিলেন এসবের বহু উর্ধ্বে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে ঐক্য বিদ্যমান—মানবজাতির আচার্যরূপে তিনি সেই সত্যই ঘোষণা করেন। জগতের ভিতরেই সেই সর্বময় ঈশ্বর রয়েছেন, তাঁকে সর্বত্র দেখে সেবা করাই মূলকথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তাঁর প্রিয় শিষ্যকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "তুই কি চাস?" স্বামীজী বললেন ঃ "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচ-ছয় দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বললেন ঃ "ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা!"

স্বামীজী এই ভর্ৎসনা জীবনে ভোলেননি। একথার গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে তিনি তিলে তিলে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন জগতের কল্যাণে। দেশ-বিদেশে আচার্যের ভূমিকা পালন করে আক্ষরিকভাবে সত্য করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণীকে। বলেছিলেন ঃ "যতদিন জগতে একজনও বদ্ধ থাকবে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকবে, আমি নিজের মুক্তি চাই না। আমি বারবার জন্মগ্রহণ করে তাদের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব।"

এই ভাবকেই তিনি শিষ্যপরম্পরায় সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। সনাতন ধর্মের যে আলোকবর্তিকা এবার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রোজ্জ্বল করেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে তা চির অম্লান হয়ে থাকবে। স্বামীজী তো নিজেই বলেছেন ঃ "তাঁর কাজ আগামী দেড় হাজার বছর ধরে চলতেই থাকবে।"

স্বামীজীর বাণীর এই দিব্য জ্যোতি আমাদের গতিপথকে যুগ যুগ ধরে আলোকিত করুক—এই প্রার্থনা।* ❑

* পূজ্যপাদ দ্বাদশ সঙ্ঘগুরুর এই ভাষণটির স্থান এবং কাল আমরা জানতে পারিনি।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

১০০ অতিক্রান্ত 'উদ্বোধন' : দৃষ্টিপাত

জলধিকুমার সরকার

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর প্রাক্তন ডাইরেক্টর ডঃ জলধিকুমার সরকার গত ২১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী রূপে সংযুক্ত। ১৯৭৭ সালে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর ভাইরোলজি বিভাগের প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহণের পর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ থেকে 'এমারিটাস মেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট' রূপে তিনি সম্মানিত হন। তখন থেকে তিনি 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে বিজ্ঞান-বিষয়ক উপদেষ্টা রূপে কাজ করছেন। দুই দশকের বেশি সময় ধরে 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান আলোচনাটিকে একটি বিশেষ মাত্রা দান করেছে।—**সম্পাদক, 'উদ্বোধন'**

কোন মাসিক পত্রিকার শতবর্ষের জীবন অধ্যয়নের সুযোগ সত্যিই দুর্লভ--শুধু এদেশে নয়, বিশ্বের যেকোন দেশেও। ১০০ অতিক্রান্ত 'উদ্বোধন'-পাঠকদের এখন জানতে ইচ্ছা করা স্বাভাবিক—এই স্বনামধন্য পত্রিকার জন্মকালের ইতিহাস, তার শৈশবকাল, কালের সঙ্গে তার ক্রমপরিবর্তনের ধারা। পাঠকরা পরিচিত হতে চান পুরনো দিনের লেখকদের সঙ্গে এবং অতীতের লেখাগুলির সঙ্গে। তাঁদের এই ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা শুরু হয়েছিল কয়েক বছর আগেই, অর্থাৎ ৯০তম বর্ষের মাঘ সংখ্যায় 'উদ্বোধন পত্রিকার ৯০তম বর্ষে পদার্পণ : কিছু সংবাদ' প্রবন্ধে। তাতে বলা হয়েছিল : "পুরাতন সংখ্যাগুলি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করলে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ও তৎকালীন বাঙালী সমাজের অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।" উক্ত অধ্যয়নের ফলশ্রুতি বর্তমান নিবন্ধ। আনন্দের বিষয়, ১ম বর্ষ থেকে ১০০তম বর্ষ পর্যন্ত লেখক-ভিত্তিক ও শিরোনাম-ভিত্তিক নির্দেশিকা বর্তমান সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। বিষয়-ভিত্তিক নির্দেশিকাও প্রায়-সম্পূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ও তাগিদে তাঁর গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ যে কী কঠিন পরিস্থিতিতে 'উদ্বোধন' পত্রিকা চালু করেছিলেন তা অনেকেই জানেন। দুহাজার টাকা (স্বামীজী-প্রদত্ত এক হাজার এবং গৃহিভক্ত হরমোহন মিত্রের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ঋণ) সম্বল করে নিজস্ব প্রেস থেকে পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' আত্মপ্রকাশ করেছিল ১ মাঘ ১৩০৫ সালে (১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯)। নানা কারণে স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই সেই প্রেস বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। পত্রিকার তৎকালীন আর্থিক অনটন সম্বন্ধে স্বামী নির্লেপানন্দ ৪২তম বর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন : "তিনি অপচয় ভালবাসতেন না। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। তাঁকে রোজ সকালে ১ পয়সার মুড়ি জলখাওয়া দিতেন ও রাত্রে বরাদ্দ ছিল ৬ পয়সা। রাত্রে ওখানে রান্নার পাট ছিল না।... 'উদ্বোধন'-এর কাজ করতেন অনেক রাত জেগে। পাছে ঘুম পায়, দাঁড়িয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত লেখাপড়া করতেন।... রাত্রে এক ঘণ্টা মাত্র ঘুমাতেন। রাতভোর প্রুফ দেখতেন।"

প্রথম নয় বছর 'উদ্বোধন' ছিল পাক্ষিক পত্রিকা, আয়তন ছিল ছোট, ডিমাই ১/৮। তারপর থেকে ঐ সাইজের মাসিক পত্রিকা হয়ে চলার পর ৩৩তম বর্ষে প্রায় বর্তমান সংখ্যার মতো এবং ৯১তম বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে বর্তমান 'উদ্বোধন'-এর আকার নেয়। ১ম ও ২য় সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর 'বাণী' (Motto) ছিল "তত্ত্বমসি", তারপর থেকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। 'দিব্য বাণী' দিয়ে পত্রিকা আরম্ভ হয়েছে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের (৫৪তম বর্ষ) সম্পাদনার সময় থেকে, যদিও শিরোনামায় 'দিব্য বাণী' কথাটি থাকত না। শিরোনামায় কথাটি আরম্ভ করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (৫৭তম বর্ষ)। অবশ্য ৫৪তম বর্ষের আগেও মাঝে মাঝে 'দিব্য বাণী' কোন কোন সংখ্যায় দেখা গিয়েছে। 'কথাপ্রসঙ্গে' কথাটি মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও সম্পাদকীয় হিসাবে এই নাম পাওয়া যায় ২২তম বর্ষ থেকে। তার আগে অনেক সংখ্যায় নাম-না-দেওয়া প্রবন্ধগুলি মনে হয় সম্পাদকের লেখা। কয়েকটি শিরোনাম (যেমন 'সৎকথা', 'পাঁচকথা', 'সমাজসংস্কার', 'পথ ও পথিক' প্রভৃতি) কয়েক বছর দেখা গিয়েছিল, তারপরে আর পাওয়া যায়নি। 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ' ও 'বিবিধ সংবাদ'-এর পরিবেশন শুরু হয়েছিল 'সংবাদ ও মন্তব্য' নাম দিয়ে। পরে নাম বদল হয়ে 'সংবাদ', 'সঙ্ঘবার্তা', 'শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘবার্তা' (৩৯তম বর্ষ), 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ' (৪৩তম বর্ষ) হয়েছিল। 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ' নাম ব্যবহৃত হচ্ছে ৭৫তম বর্ষ থেকে। 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ' পরিবেশিত হচ্ছে ৮০তম বর্ষ থেকে। এছাড়া 'বিজ্ঞান-সংবাদ', 'বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ' নিয়মিতভাবে এবং 'আনন্দের সন্তান', 'সংস্কৃতি-সংবাদ', 'বিশেষ সংবাদ', 'ধর্মাচার', 'বাতায়ন' প্রভৃতি বিভাগগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সম্পাদনাকালে। 'মাধুকরী' বিভাগটি ২৪তম বর্ষ থেকে শুরু হলেও অনিয়মিত হয়ে যায় এবং নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ৯০তম বর্ষ থেকে। বর্তমানে 'উদ্বোধন'-এর বিষয়বস্তুগুলি একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় পরিবেশিত হচ্ছে।

'সম্পাদক' পদ শুরু থেকেই আছে। 'যুগ্ম সম্পাদক' পদ পাওয়া যায় ২৪তম বর্ষ থেকে ৩৮তম বর্ষ পর্যন্ত। ৭৬তম বর্ষে

'সংযুক্ত সম্পাদক' পদটির সৃষ্টি হয়। তখন থেকে বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ তথা 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'র অধ্যক্ষের নাম 'সম্পাদক' বলে লেখা হতো। কিন্তু প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন সংযুক্ত সম্পাদক। পদাধিকার সূত্রে অধ্যক্ষ ছিলেন সম্পাদক। ৯২তম বর্ষ থেকে সংযুক্ত সম্পাদক-এর স্থলে 'যুগ্ম সম্পাদক' ব্যবহৃত হতে থাকে। ৯৫তম বর্ষে 'যুগ্ম সম্পাদক' পদটি বিলুপ্ত হয়ে 'সম্পাদক' পদটি বেলুড় মঠের নির্দেশে ফিরে আসে এবং মায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ পদাধিকার সূত্রে 'ব্যবস্থাপক সম্পাদক' বলে অভিহিত হন।

পুরনো দিনের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই পত্রিকার লেখকদের কথা মনে পড়ে। কোন নতুন পত্রিকার জন্য রচনা যোগাড় করা সহজসাধ্য নয়। আমরা ধরে নিতে পারি যে, নবজাতককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সামান্য কয়েকজন অনুপ্রাণিত সাধু ও গৃহীকে একাধিক লেখা দিতে হয়েছিল। প্রথম ৩ বছরে প্রধানত যাঁদের রচনায় পত্রিকা পুষ্ট হয়েছিল তাঁদের লেখার সংখ্যা সারণি—১-এ দেখানো হচ্ছে।

সারণি—১

(প্রথম ৩ বছরে লেখক ও তাঁদের লেখার সংখ্যা)

লেখক	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	মন্তব্য
স্বামী বিবেকানন্দ	২৭	১৯	৩৬	—
স্বামী শুদ্ধানন্দ	১৪	১০	২৮	অনেকগুলিই স্বামীজীর বক্তৃতা বা লেখার অনুবাদ
প্রমথনাথ তর্কভূষণ	২৭	২২	১১	—
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	১৮	৫	০	সবগুলিই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	১২	৯	৭	—
শ্রীম	—	৫	১৫	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮	—	১	—

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই নিবন্ধে 'লেখা' বলতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গল্প-কবিতা (ছদ্মনামে অথবা অনামে প্রকাশিত হলেও) ভিন্ন অনুবাদ, সম্পাদকীয়, ভাষণ, সঙ্কলন, 'উদ্বোধন' বা 'বাণী ও রচনা' থেকে কোন অংশের পুনঃপ্রকাশ ও 'অপ্রকাশিত' পত্রকেও ধরা হয়েছে এবং ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রত্যেকটিকে ও কোন লেখার পুনঃপ্রকাশকে 'লেখা' হিসাবে ধরা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আদি লেখক ও অনুবাদক—উভয়কেই গণনায় আনা হয়েছে।

একশ বছরের পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলির কথা মনে হলেই জানতে ইচ্ছা করে, কোন্ কোন্ লেখকের লেখার সংখ্যা একশ-র বেশি (সারণি—২) এবং কার কার লেখা দীর্ঘ দিন (৩০ বছরের বেশি) ধরে (সারণি—৩) প্রকাশিত হয়েছে।

সারণি—২

(যেসব লেখকের লেখার সংখ্যা একশর বেশি)

লেখক	লেখার সংখ্যা
স্বামী বিবেকানন্দ	৩৬০
স্বামী বাসুদেবানন্দ	২৫৬
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ	১৯০
স্বামী সুন্দরানন্দ	১৮১
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	১৩৯
প্রণবরঞ্জন ঘোষ	১৩৬
স্বামী সারদানন্দ	১২৩
কালিদাস রায়	১১৩
স্বামী ধ্যানানন্দ	১১১
শান্তশীল দাশ	১০৫
জলধিকুমার সরকার	১০৫

উপরি উক্ত ১১ জন লেখকের মধ্যে ৬ জন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বা আছেন। তাঁদের সম্পাদকীয়গুলি তাঁদের লেখার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

সারণি—৩

(যাঁদের লেখা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে)

লেখক	প্রকাশকাল
স্বামী বিবেকানন্দ	১ম—১০০তম বর্ষ
স্বামী সারদানন্দ	২য়—৮৭তম বর্ষ
স্বামী বাসুদেবানন্দ	২০তম—১০০তম বর্ষ
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	৪২তম—৯৮তম বর্ষ
শিবশম্ভু সরকার	৩৭তম—৯৩তম বর্ষ
দিলীপকুমার রায়	৩৮তম—৮৩তম বর্ষ
শান্তশীল দাশ	৪৭তম—৯৯তম বর্ষ
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৫৯তম—১০০তম বর্ষ
প্রণবরঞ্জন ঘোষ	৪৯তম—৮৭তম বর্ষ
স্বামী প্রভানন্দ	৬৪তম—১০০তম বর্ষ
কালিদাস রায়	৪৩তম—৭৩তম বর্ষ

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বামীজী ভিন্ন আর কারো লেখা প্রকাশনকালের প্রতি বছর বের হয়নি। অন্যদের লেখা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে, কখনো কখনো কারো আবার বেশ কয়েক বছর ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছে।

সাধু-ব্রহ্মচারী ও গৃহীদের লেখা

আগেই বলা হয়েছে যে, শুরুতে প্রয়োজনের তাগিদে সাধুদের একাধিক লেখা পত্রিকায় দিতে হয়েছে। দিন দিন যত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর অনুরাগী ও ভক্ত-সংখ্যা বাড়তে লাগল, গৃহীদের লেখার সংখ্যাও বাড়তে লাগল। ১০০ বছরের 'উদ্বোধন'-এ গৃহীদের ও সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের প্রকাশিত লেখার অনুপাত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করার জন্য সারণি—৪-এ ১ম থেকে ৫ম বর্ষে, ৫০তম থেকে ৫৪তম বর্ষে এবং ৯৬তম থেকে ১০০তম বর্ষে গৃহীদের ও সাধু-ব্রহ্মচারীদের লেখার মোট সংখ্যা ও সেগুলির অনুপাত দেখানো হচ্ছে।

সারণি—৪

(গৃহী ও সাধু-ব্রহ্মচারীর লেখার সংখ্যা)

	বর্ষ	গৃহীদের লেখার সংখ্যা	সাধু-ব্রহ্মচারীর লেখার সংখ্যা	অনুপাত
(ক)	১ম	৭৩	৬১	
	২য়	৪৭	৪০	
	৩য়	৫৮	৫৩	
	৪র্থ	৪০	৫৭	২৬১
	৫ম	৪৩	৪১	২৫২
	মোট	২৬১	২৫২	= ১.০৩

(খ)	৫০তম	১৫৫	৪০	
	৫১তম	১৩৮	৪০	
	৫২তম	১৫৫	৪৬	
	৫৩তম	১৫৪	৪৫	৭৬৪
	৫৪তম	১৬২	৪০	২১১
	মোট	৭৬৪	২১১	= ৩.৬
(গ)	৯৬তম	৩২২	৪৯	
	৯৭তম	৩৩৫	৪৯	
	৯৮তম	১৬২	৭২	
	৯৯তম	১৩৯	৫২	১১৩৪
	১০০তম	১৭৬	৬৮	২৯০
	মোট	১১৩৪	২৯০	= ৩.৯

সারণি থেকে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, শুরুতে গৃহী ও সাধু-ব্রহ্মচারীদের লেখার সংখ্যা প্রায় সমান সমান, মাঝে গৃহীদের লেখা সাধু-ব্রহ্মচারীদের লেখার প্রায় সাড়ে তিনগুণ এবং বর্তমানে ঐ অনুপাত প্রায় ৪ গুণ। মনে হয় এইরকম অনুপাতই এখন চলবে।

বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা

অনেকের মতে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা থাকা অযৌক্তিক এবং অবাঞ্ছনীয়। তাঁদের মতে, এটি একটি ধর্মীয় পত্রিকা, যাতে কেবল ধর্মসম্বন্ধীয় লেখা থাকবে। অতীতে জনৈক পাঠক কোন একটি সংখ্যায় আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের পরেই বিজ্ঞান-প্রবন্ধ দেখে রাগান্বিত হয়ে সম্পাদককে চিঠি লিখে পত্রিকা নেওয়া বন্ধ করেছিলেন। তাঁরা জানেন না যে, 'উদ্বোধন' পত্রিকায় স্বামীজী স্বয়ং যেসব আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করে গেছেন তার মধ্যে বিজ্ঞানও আছে। শুধু তাই নয়, ১ম ও ২য় বর্ষের পত্রিকায় (যেগুলির প্রকাশনকালে স্বামীজী জীবিত ছিলেন) বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার সংখ্যা ছিল ৩ এবং ৪। গোড়ার দিকে কোন কোন বিজ্ঞান-প্রবন্ধে ছবিও থাকত। অবশ্য এটা ঠিক যে, অতীতে কোন কোন বর্ষের (এমনকি একটানা কয়েক বর্ষের) পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ে কোন লেখা ছিল না; তবে সেরূপ ঘটনার সংখ্যা খুব কম। বর্তমানে পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসাবে বিজ্ঞানের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অপরিহার্যভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। তবে সম্পাদকের বিজ্ঞান-মানসিকতার ওপর হয়তো পত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার সংখ্যা খানিকটা নির্ভরশীল। শুরু থেকে শতবর্ষ পর্যন্ত বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার সংখ্যা (মোট ৩৩১) রেখচিত্রের (graph—গ্রাফ) সাহায্যে দেখানো হলো রেখচিত্র—১-এ। 'বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা'র গণনায় বিজ্ঞান-প্রবন্ধ, বিজ্ঞান-সংবাদ ও অন্যান্য বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ বিবেচিত হয়েছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। **নিচের ও পরবর্তী ৩টি রেখচিত্র আঁকার সময় স্থান সঙ্কুলানের জন্য প্রতি বছরের সংখ্যা না দিয়ে ৫ বছরের গড় সংখ্যাকে স্থানাঙ্ক (co-ordinate) করা হয়েছে। গড় সংখ্যা না দিয়ে যদি প্রতি বছরে প্রকাশিত লেখার সংখ্যা দেওয়া হতো, তাহলে রেখচিত্রটি অত্যন্ত বড় হতো।**

রেখচিত্রের ডানদিক বরাবর (abscissa-এ বা ভুজ-এ)

রেখচিত্র—১

(বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার সংখ্যা—প্রতি ৫ বছরের গড় সংখ্যা অনুযায়ী)

অঙ্কন ঃ অর্জুন ঘোষ

'০' থেকে ক্রমবর্ধমান 'উদ্বোধন' বর্ষসংখ্যা (বর্তমান ক্ষেত্রে ৫ বছরের গড় সংখ্যা) এবং ওপরের দিকে (ordinate-এ বা কোটি-তে) '০' থেকে ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার প্রকাশন সংখ্যা দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে—'উদ্বোধন'-এর ৫০তম—৫৫তম বর্ষে বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা কয়টি প্রকাশিত হয়েছিল জানতে চাইলে ভুজ-এ ৫০তম—৫৫তম সংখ্যার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ওপরের দিকে যদি একটি খাড়া লাইন টানা হয়, দেখা যাবে যে সেটি লম্বের '৩' সংখ্যার সমান উঁচু হয়েছে। তাতে বুঝতে হবে যে, 'উদ্বোধন'-এর ৫০তম, ৫১তম, ৫২তম, ৫৩তম, ৫৪তম ও ৫৫তম বর্ষে যেকয়টি বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা বের হয়েছিল তাদের গড় সংখ্যা হচ্ছে '৩'।

এই রেখচিত্রে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, (ক) ৯০তম বর্ষ থেকে বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, (খ) শুরুর কয়েক বছরেও বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার উপস্থিতি লক্ষণীয় এবং (গ) গত ১০০ বছরে পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা একেবারেই বাদ পড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে রচনার হিসাব

পত্রিকার একশ বছরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে লেখার হিসাবনিকাশ করা হয়েছে। এই গণনায় 'কথামৃতে'র ধারাবাহিক লেখাগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় লেখা, স্বামীজীর নিজের লেখাগুলিকেও স্বামীজী-সম্বন্ধীয় এবং শ্রীমা ও স্বামীজীর অপ্রকাশিত পত্রগুলিকে যথাক্রমে শ্রীমা-সম্বন্ধীয় ও স্বামীজী-সম্বন্ধীয় লেখা বলে ধরা হয়েছে। রেখচিত্র—২-তে তাঁদের সম্বন্ধে লেখার সংখ্যা প্রতি ৫ বছরে গড় অনুযায়ী দেখানো হয়েছে।

রেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, (ক) শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখা (মোট ১১৫৪) শুরু থেকেই আছে এবং তার সংখ্যা মোটামুটিভাবে বেড়েই চলেছে। কেবল ২২তম বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন লেখাই বের হয়নি, কিন্তু ৫ বছরের গড় সংখ্যাকে স্থানাঙ্ক করায় রেখচিত্রে ২২তম বর্ষের শূন্য সংখ্যাকে দেখানো যায়নি। (খ) স্বামীজী সম্বন্ধে লেখা সর্বাধিক (মোট ৩৫০২) এবং সব বর্ষেই আছে। (গ) শ্রীমা সম্বন্ধে লেখা (মোট ৪২৬) ১ম থেকে ২১তম বর্ষ পর্যন্ত নেই; ২২তম বর্ষে (তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ সহ) তাঁর সম্বন্ধে প্রথম লেখা বের হয়েছে। প্রথম ২১ বছরের 'উদ্বোধন'-এ কেন শ্রীমা সম্বন্ধে লেখা বের হয়নি এবং ২২তম বর্ষে শ্রীমা সম্বন্ধে লেখার প্রথম আবির্ভাব ও কেবল ঐ বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রকাশনের অভাব—এই বিচিত্র যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি 'নিবোধত' পত্রিকার পৌষ ১৪০৩ সংখ্যায়—"শ্রীমাকে কি

রেখচিত্র—২

(শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে রচনার সংখ্যা—প্রতি ৫ বছরের গড় অনুযায়ী)

আমরা ভুলে গিয়েছিলাম?'' প্রবন্ধে। ঐ প[illegible]কা থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরা হচ্ছে ঃ ''শ্রীমা নশ্বর দেহ[illegible]াগ করেন ১৯২০ সালের ৪ শ্রাবণ। 'উদ্বোধন'-এর ঐ শ্রাবণ সংখ্যায় (দ্বাবিংশতি বর্ষে) শ্রীমার মহাপ্রয়াণের সংবাদ এবং ঐ বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায় সরলাবালা দাসীর 'মায়ের কথা' প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্মের পর দীর্ঘ একুশ বছর যাবৎ কোন সন্ন্যাসী বা গৃহিভক্ত সঙ্ঘজননী শ্রীমা সম্বন্ধে কোন কিছু লেখার কথা ভাবেননি। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক না হলেও আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার একশ বছরের জীবনে এমন কোন বছর নেই যাতে শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কোন লেখা বের হয়নি, ব্যতিক্রম কেবল দেখা গেছে ঐ দ্বাবিংশতি বর্ষে, যখন শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কোন লেখা প্রকাশিত হয়নি। শ্রীমা সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশনের বছরে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কোন লেখা বের না হওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকতে পারে কিনা অথবা এরূপ যোগাযোগ কাকতালীয়বৎ কিনা, তা বলা মুশকিল।''

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' শ্রীমা সম্বন্ধে উল্লেখ অপ্রত্যাশিতভাবে কম থাকায় 'অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে স্বামী প্রভানন্দ যেসব সম্ভাব্য কারণগুলি বলেছেন, সেগুলি মনে হয় 'উদ্বোধন' পত্রিকার গোড়ার দিকে শ্রীমা সম্বন্ধে লেখার অনুপস্থিতির কারণ হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে। গ্রন্থকারের মতে সম্ভাব্য কারণগুলি হলো—(ক) দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে শ্রীমা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকাতে এমন অভ্যস্ত হয়েছিলেন যে, ভক্তগোষ্ঠীর অনেকেই তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পেতেন না। (খ) স্বামী সারদানন্দের কথায়—শ্রীমা মায়ার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখায় তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন ছিলেন না; মাস্টারমশাই পর্যন্ত এই আবরণ অনাবৃত করতে সক্ষম হননি। (গ) শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক বিভিন্ন দৃশ্যপট নিয়েই 'কথামৃত', সেসকল দৃশ্যপটে পর্দানশীন শ্রীমা অনুপস্থিত। সেজন্য সঙ্গত কারণেই এই গ্রন্থে শ্রীমার উল্লেখ অত্যন্ত সীমিত। (ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলশরীর থাকাকালে এবং অব্যবহিত পরে শ্রীমা সম্বন্ধে গড়ে উঠেছিল একটা 'শ্রদ্ধাবিজড়িত গোপনীয়তা অবলম্বনের পরম্পরা' এবং কথামৃত-লেখক সেই পরম্পরাকেই অনুসরণ করেছিলেন।

রেখচিত্রে বর্তমানে শ্রীমা সম্বন্ধে লেখার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা লক্ষণীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর পঞ্চবর্ষগুলিতে তাঁদের সম্বন্ধে লেখার সংখ্যা সঙ্গত কারণেই বেশি হয়েছে।

অ-হিন্দুর লেখা

'উদ্বোধন' পত্রিকার লেখকরা অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের হলেও অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের লেখাও যথেষ্ট সংখ্যক বের

রেখচিত্র—৩

(অ-হিন্দু লেখকের লেখা)

'০' থেকে ক্রমবর্ধমান 'উদ্বোধন' বর্ষসংখ্যা (বর্তমান ক্ষেত্রে ৫ বছরের গড় সংখ্যা) এবং ওপরের দিকে (ordinate-এ বা কোটি-তে) '০' থেকে ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার প্রকাশন সংখ্যা দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে—'উদ্বোধন'-এর ৫০তম—৫৫তম বর্ষে বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা কয়টি প্রকাশিত হয়েছিল জানতে চাইলে ভুজ-এ ৫০তম—৫৫তম সংখ্যার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ওপরের দিকে যদি একটি খাড়া লাইন টানা হয়, দেখা যাবে যে সেটি লম্বের '৩' সংখ্যার সমান উঁচু হয়েছে। তাতে বুঝতে হবে যে, 'উদ্বোধন'-এর ৫০তম, ৫১তম, ৫২তম, ৫৩তম, ৫৪তম ও ৫৫তম বর্ষে যেকয়টি বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা বের হয়েছিল তাদের গড় সংখ্যা হচ্ছে '৩'।

এই রেখচিত্রে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, (ক) ৯০তম বর্ষ থেকে বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, (খ) শুরুর কয়েক বছরেও বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার উপস্থিতি লক্ষণীয় এবং (গ) গত ১০০ বছরে পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা একেবারেই বাদ পড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে রচনার হিসাব

পত্রিকার একশ বছরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে লেখার হিসাবনিকাশ করা হয়েছে। এই গণনায় 'কথামৃতে'র ধারাবাহিক লেখাগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় লেখা, স্বামীজীর নিজের লেখাগুলিকেও স্বামীজী-সম্বন্ধীয় এবং শ্রীমা ও স্বামীজীর অপ্রকাশিত পত্রগুলিকে যথাক্রমে শ্রীমা-সম্বন্ধীয় ও স্বামীজী-সম্বন্ধীয় লেখা বলে ধরা হয়েছে। রেখচিত্র—২-তে তাঁদের সম্বন্ধে লেখার সংখ্যা প্রতি ৫ বছরে গড় অনুযায়ী দেখানো হয়েছে।

রেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, (ক) শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখা (মোট ১১৫৪) শুরু থেকেই আছে এবং তার সংখ্যা মোটামুটিভাবে বেড়েই চলেছে। কেবল ২২তম বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন লেখাই বের হয়নি, কিন্তু ৫ বছরের গড় সংখ্যাকে স্থানাঙ্ক করায় রেখচিত্রে ২২তম বর্ষের শূন্য সংখ্যাকে দেখানো যায়নি। (খ) স্বামীজী সম্বন্ধে লেখা সর্বাধিক (মোট ৩৫০২) এবং সব বর্ষেই আছে। (গ) শ্রীমা সম্বন্ধে লেখা (মোট ৪২৬) ১ম থেকে ২১তম বর্ষ পর্যন্ত নেই; ২২তম বর্ষে (তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ সহ) তাঁর সম্বন্ধে প্রথম লেখা বের হয়েছে। প্রথম ২১ বছরের 'উদ্বোধন'-এ কেন শ্রীমা সম্বন্ধে লেখা বের হয়নি এবং ২২তম বর্ষে শ্রীমা সম্বন্ধে লেখার প্রথম আবির্ভাব ও কেবল ঐ বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রকাশনের অভাব—এই বিচিত্র যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি 'নিবোধত' পত্রিকার পৌষ ১৪০৩ সংখ্যায়—"শ্রীমাকে কি

রেখচিত্র—২

(শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে রচনার সংখ্যা—প্রতি ৫ বছরের গড় অনুযায়ী)

আমরা ভুলে গিয়েছিলাম?" প্রবন্ধে। ঐ প[ত্রি]কা থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরা হচ্ছে ঃ "শ্রীমা নশ্বর দেহ [ত্য]াগ করেন ১৯২০ সালের ৪ শ্রাবণ। 'উদ্বোধন'-এর ঐ শ্রাবণ সংখ্যায় (দ্বাবিংশতি বর্ষে) শ্রীমার মহাপ্রয়াণের সংবাদ এবং ঐ বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায় সরলাবালা দাসীর 'মায়ের কথা' প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্মের পর দীর্ঘ একুশ বছর যাবৎ কোন সন্ন্যাসী বা গৃহিভক্ত সঙ্ঘজননী শ্রীমা সম্বন্ধে কোন কিছু লেখার কথা ভাবেননি। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক না হলেও আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার একশ বছরের জীবনে এমন কোন বছর নেই যাতে শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কোন লেখা বের হয়নি, ব্যতিক্রম কেবল দেখা গেছে ঐ দ্বাবিংশতি বর্ষে, যখন শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কোন লেখা প্রকাশিত হয়নি। শ্রীমা সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশনের বছরে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কোন লেখা বের না হওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকতে পারে কিনা অথবা এরূপ যোগাযোগ কাকতালীয়বৎ কিনা, তা বলা মুশকিল।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' শ্রীমা সম্বন্ধে উল্লেখ অপ্রত্যাশিতভাবে কম থাকায় 'অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে স্বামী প্রভানন্দ যেসব সম্ভাব্য কারণগুলি বলেছেন, সেগুলি মনে হয় 'উদ্বোধন' পত্রিকার গোড়ার দিকে শ্রীমা সম্বন্ধে লেখার অনুপস্থিতির কারণ হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে। গ্রন্থকারের মতে সম্ভাব্য কারণগুলি হলো—(ক) দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে শ্রীমা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকাতে এমন অভ্যস্ত হয়েছিলেন যে, ভক্তগোষ্ঠীর অনেকেই তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পেতেন না। (খ) স্বামী সারদানন্দের কথায় —শ্রীমা মায়ার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখায় তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন ছিলেন না; মাস্টারমশাই পর্যন্ত এই আবরণ অনাবৃত করতে সক্ষম হননি। (গ) শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক বিভিন্ন দৃশ্যপট নিয়েই 'কথামৃত', সেসকল দৃশ্যপটে পর্দানশীন শ্রীমা অনুপস্থিত। সেজন্য সঙ্গত কারণেই এই গ্রন্থে শ্রীমার উল্লেখ অত্যন্ত সীমিত। (ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলশরীর থাকাকালে এবং অব্যবহিত পরে শ্রীমা সম্বন্ধে গড়ে উঠেছিল একটা 'শ্রদ্ধাবিজড়িত গোপনীয়তা অবলম্বনের পরম্পরা' এবং কথামৃত-লেখক সেই পরম্পরাকেই অনুসরণ করেছিলেন।

রেখচিত্রে বর্তমানে শ্রীমা সম্বন্ধে লেখার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা লক্ষণীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর পঞ্চবর্ষ-গুলিতে তাঁদের সম্বন্ধে লেখার সংখ্যা সঙ্গত কারণেই বেশি হয়েছে।

অ-হিন্দুর লেখা

'উদ্বোধন' পত্রিকার লেখকরা অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের হলেও অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের লেখাও যথেষ্ট সংখ্যক বের

রেখচিত্র—৩

(অ-হিন্দু লেখকের লেখা)

হয়েছে। অ-হিন্দু লেখকদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি, তবে খ্রীস্টধর্মীয়ের সংখ্যাও খুব কম নয়। হিন্দু লেখকদের মধ্যে তফসিল এবং উপজাতিও (যেমন ভুঁইয়া, দলুই, হীরা, বাগদি) আছে। রেখচিত্র—৩-এ অ-হিন্দু লেখকদের (মোট ২৫৮) লেখার ৫ বছরের গড় সংখ্যা দেখানো হয়েছে। ৮ম বর্ষে প্রথম অ-হিন্দু লেখকের (এস. ই. ওয়াল্ডো) লেখা বের হয়েছিল। প্রথম মুসলমানের (মহম্মদ ইসমাইল) লেখা বের হয়েছিল ২৪তম বর্ষে। বলা বাহুল্য, এই হিসাব করার সময় নাম দেখেই লেখকের ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে অনুমান করা হয়েছে।

রেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, অতীতে কোন কোন বর্ষে অ-হিন্দু লেখকের লেখা না থাকলেও সাম্প্রতিক কালে তাঁদের লেখার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের প্রচার নয়, উদ্দেশ্য সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের পুষ্টিবিধান। হয়তো এটা উপলব্ধি হওয়ার জন্য বেশিসংখ্যক অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের লেখক 'উদ্বোধন'-এ লিখতে এগিয়ে আসছেন।

মহিলাদের লেখা

'উদ্বোধন'-এ মহিলাদের লেখা প্রথম পাওয়া যায় ৬ষ্ঠ বর্ষে (চন্দ্রাননী বসু—কবিতা)। এসম্বন্ধে পূর্বপ্রকাশিত ('উদ্বোধন'-এর মাঘ ১৩৯৪ সংখ্যায় দেওয়া) তথ্যটি সংশোধিতব্য। মহিলাদের লেখাগুলির মধ্যে কবিতার সংখ্যাই বেশি। রেখচিত্রে—৪-এ মহিলাদের লেখার (মোট ১৪৬৮) পাঁচ বছরের গড় সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

রেখচিত্রে মহিলাদের লেখার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা লক্ষণীয়।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের আয়ু

সাধু-সন্ন্যাসীর আয়ু সম্বন্ধে অনেক ভাসাভাসা কথা শোনা যায়। জনসাধারণের ধারণা—'সাধুরা দীর্ঘকাল বাঁচেন'। জনসাধারণের আয়ুর সঙ্গে সাধুদের আয়ুর তথ্যভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনা পূর্বে কোনদিন কোন দেশী বা বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় সাধু-ব্রহ্মচারীদের দেহত্যাগের খবরের সঙ্গে তাঁদের বয়সের উল্লেখ থাকায় এবং ভারতীয়দের 'প্রত্যাশিত আয়ু' (Expectation of life) সম্বন্ধে 'সেন্ট্রাল ব্যুরো অব হেলথ ইনটেলিজেন্স' থেকে তথ্য পাওয়ায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ৩৩৯ জন প্রয়াত সাধু-ব্রহ্মচারীর আয়ুর সঙ্গে

রেখচিত্র—৪

(মহিলাদের লেখা—৫ বছরের গড় সংখ্যা হিসাবে।)
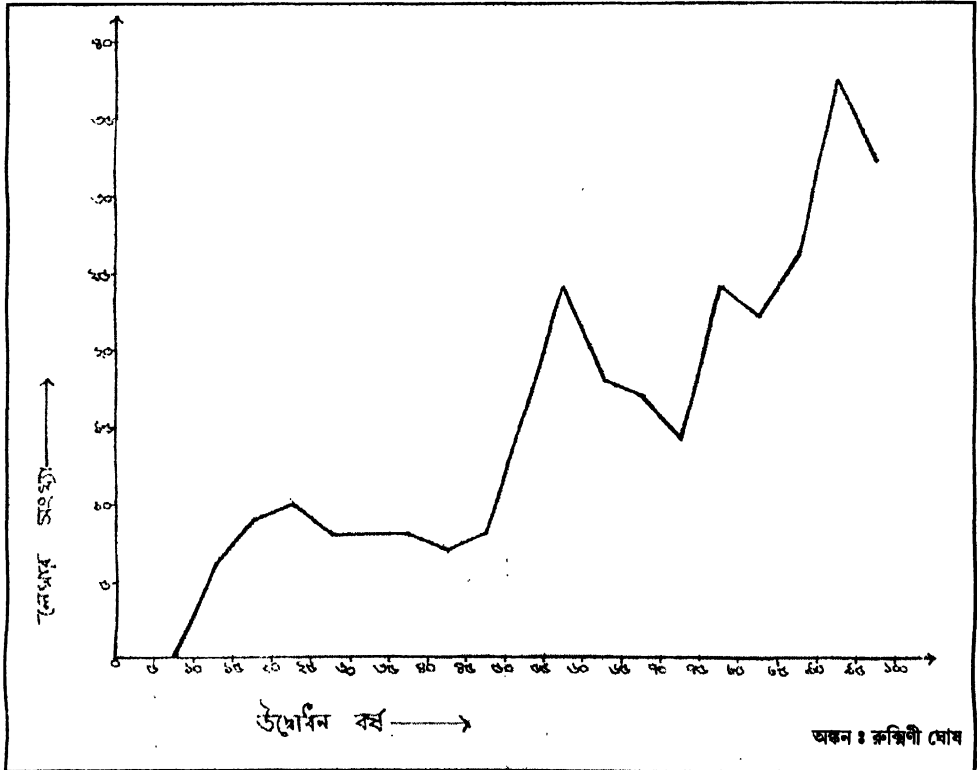
জনসাধারণের প্রত্যাশিত আয়ুর একটি তুলনামূলক সমীক্ষা করা হয়েছিল 'উদ্বোধন'-এর অগ্রহায়ণ ১৯৯২ সংখ্যায়। তাতে দেখানো হয়েছিল—(ক) ২৯ জন সাধু-ব্রহ্মচারীর (৮.৫ শতাংশ) প্রত্যাশিত আয়ু গৃহীদের আয়ুর চেয়ে কম, ৩ জনের (০.৮ শতাংশ) প্রত্যাশিত আয়ুর গৃহীদের সমান এবং ৩০৭ জনের (৯০.৫ শতাংশ) গৃহীদের তুলনায় বেশি। (খ) 'উদ্বোধন'-এর ৯২তম বর্ষ পর্যন্ত সাধু-ব্রহ্মচারীর আয়ু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সর্বাপেক্ষা বেশি বয়সে (১০০ বছর) দেহত্যাগ করেছেন স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ)। (গ) হিসাবমত স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাশিত আয়ু দাঁড়ায় ৫৬ বছর; অর্থাৎ স্বামীজী সমসাময়িক কালের মাপকাঠিতে, প্রত্যাশিত জীবিতকালের ১৭ বছর আগে দেহত্যাগ করেছিলেন।

পত্রিকার ক্রমবর্ধমান গ্রাহকসংখ্যা

বিগত এক দশক ধরে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকসংখ্যা ও জনপ্রিয়তা বেড়েছে অভাবনীয়ভাবে। এবিষয়ে গত কয়েক বছরে সংগঠিত কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, বাংলাদেশ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর অন্যত্র 'উদ্বোধন'-এর ১৮০টি গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বহু অনুরাগী 'উদ্বোধন'-এর প্রচারের কাজে ব্যাপৃত। মঠ-মিশনের ভক্তসাধারণের বাইরের বহু মানুষ এখন 'উদ্বোধন'-এর পাঠক। বাঙলায় ধর্মীয় সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে 'উদ্বোধন'-এর প্রচারসংখ্যা সর্বাধিক শুধু নয়, বাঙলায় কোন 'সিরিয়াস' সাময়িকপত্রেরই এত প্রচারসংখ্যা নেই। তাছাড়া 'উদ্বোধন' এখন জনপ্রিয় পারিবারিক পত্রিকা রূপেও সফল। 'উদ্বোধন'-এর এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণ হিসাবে কয়েকটি বিভাগের বিশেষ অবদান অনস্বীকার্য। 'আনন্দের সন্তান' বিভাগটি শুরু হয়েছিল ৯০তম বর্ষ থেকে, 'সৎসঙ্গ-রত্নাবলী' শুরু হয়েছিল ৯১তম বর্ষ থেকে। 'উদ্বোধন'-এর সাম্প্রতিক কালের অত্যন্ত জনপ্রিয় বিভাগ 'প্রাসঙ্গিকী' বা পাঠক-পাঠিকাদের ভাব-বিনিময় বিভাগটি শুরু হয়েছে ৯৪তম বর্ষ থেকে। 'উদ্বোধন'-এর আরেকটি জনপ্রিয় বিভাগ 'পরমপদকমলে' (লেখক—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়) শুরু হয়েছে ৯১তম বর্ষ থেকে। জনপ্রিয় 'সঙ্কলন' ('কথামৃতে না-বলা প্রসঙ্গ') বিভাগটি শুরু হয় ৯৮তম বর্ষ থেকে। নিয়মিতভাবে 'পরিক্রমা' ও 'স্মৃতিকথা' বিভাগও নতুন সংযোজন। গত কয়েক বছরে প্রতি সংখ্যায় দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দের ভাষণ/রচনা প্রকাশ 'উদ্বোধন'-এর জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ। ইদানীং আরেকটি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন শিশু ও কিশোরদের জন্য 'চিরন্তনী' বিভাগ—যেটি শুরু হয়েছে ৯৭তম বর্ষ থেকে। 'ক্রীড়াজগৎ' বিভাগটির শুরু ১০০তম বর্ষে। 'লোকসংস্কৃতি' বিভাগের সূচনা ৯৬তম বর্ষ থেকে। মঠ ও মিশনের সমস্ত কেন্দ্রে প্রতি দুমাসের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সমস্ত পূজা ও তিথিকৃত্য 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে ভক্ত ও পাঠক সাধারণকে আগাম অবহিত করার জন্য 'অনুষ্ঠানসূচী' প্রকাশ শুরু হয়েছে ৯৬তম বর্ষ থেকে।

গত কয়েক বছর যেমন গ্রাহকসংখ্যা নথিভুক্ত করা হচ্ছে, আগে তেমন হতো না। সেজন্য আগের গ্রাহকসংখ্যা জানার জন্য কিছুটা পুরনো 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি থেকে অনুমান করতে হয়েছে, কিছুটা 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাচীন কর্মীদের ও একজন প্রাক্তন সংযুক্ত সম্পাদকের স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত সংবাদ এবং বাকিটা নথিভুক্ত বিবরণের সাহায্য নিয়ে সারণি—৫-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি—৫

('উদ্বোধন'-এর গ্রাহকসংখ্যা)

বর্ষ	গ্রাহকসংখ্যা	মন্তব্য
১ম	জানা যায়নি	
১৩শ	৩০০-র কম	ঐ বর্ষের ২য় সংখ্যার বিজ্ঞাপনে আছে—"যদি মুদ্রণ-ব্যয় মাত্র নির্বাহোপযোগী ৩০০ গ্রাহক পাওয়া যায়..."
৩০তম	১,০০০	
৬৪তম	৩,৫০০	
৮৪তম	৫,৫০০	
৮৮তম	৮,০০০	
৮৯তম	৯,৬৩১	নথিভুক্ত
৯০তম	১৫,০৮৮	,,
৯১তম	২০,০০০	,,
৯৪তম	২৩,০০০	,,
৯৭তম	২৭,৮৩৪	,,
৯৯তম	৩১,২০০	,,
১০০তম	৪০,০০০	,,

'উদ্বোধন' পত্রিকায় তথাকথিত আকর্ষণীয় ও বিনোদনমূলক বিষয়বস্তু (চলচ্চিত্র, রাজনীতি ইত্যাদি) না থেকেও তার এরূপ গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

পুরনো সংখ্যাগুলিতে কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয়

(১) 'উদ্বোধন'-এর পুরনো পত্রিকাগুলি ঘাঁটলে পুরনো ও বর্তমান কালের পত্রিকার মধ্যে একটি পার্থক্য নজরে পড়ে। গোড়ার দিকে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যায় গল্প, উপন্যাস বা রম্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো সেসময় পত্রিকাকে জনপ্রিয় করার জন্য অথবা বিষয়বস্তুর একঘেয়েমি কাটানোর জন্য এরূপ করা হয়েছিল। ৯ম বর্ষে 'রানাঘাটের কেষ্ট পান্তি', ১৬শ বর্ষে 'বিচিত্র প্রতিদান', ২২শ বর্ষে 'সুশীল মাস্টার', ২৪শ বর্ষে 'মোহন্ত', ২৮শ বর্ষে ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী 'বিচিত্র প্রতিদান'—এর মধ্যে কয়েকটি।

(২) ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যার বিজ্ঞাপনে আছে যে, ৫ জন গ্রাহক করলে ১ম বর্ষের 'উদ্বোধন' বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

(৩) ৩য় বর্ষের ৮ম সংখ্যার নিয়মাবলীতে আছেঃ "কাগজ আমাদের সামনে প্যাক করা হয়; আমরা স্বয়ং

গ্রাহকবই ধরিয়া প্রত্যেকের নামের সহিত চেক করিয়া দিই, এবং আমাদের অতি বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা অতি সাবধানতার সহিত পোস্ট করানো হয়; ইহাতেও কাগজ না পৌঁছালে আমরা কোনমতে সম্পূর্ণ দায়ী হইব না।... এরূপস্থলে গ্রাহক মহাশয়কে উহা পৃথক ক্রয় করিতে হইবে; তবে অর্ধমূল্যে (অর্থাৎ প্রতি সংখ্যা এক আনা মূল্যে) দিব স্বীকৃত রহিলাম।"

(৪) ৭ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় আছে ঃ "বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক এক সভা আহূত হয়। প্রায় ২৫০/৩০০ ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোকের সমাগম হয়। অধ্যাপক জগদীশ বসু, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।... সিস্টার নিবেদিতা ইংরাজী ভাষায় 'স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচার' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।"

(৫) ২০তম বর্ষে দেখা যাচ্ছে, বেলুড় মঠে সদ্য অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে ৩০/৩৫ হাজার লোকের আগমন হয় ও ৮/১০ হাজার পঙ্ক্তিতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেছিল। আহিরীটোলার সতীশবাবুর উদ্যোগে সরবত দানের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তামাকসেবনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এসম্পর্কে 'উদ্বোধন'-এ মন্তব্য করা হয়েছিল ঃ "তাঁহারা যে কতলোকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন তাহা বলা যায় না।"

(৬) ২৭তম বর্ষে আছে, বেলুড়ে স্বামীজীর জন্মোৎসবে স্বামী অভেদানন্দ সভাপতি ছিলেন এবং তিনজন বক্তার মধ্যে একজন ছিলেন স্বর্ণলতা দেবী।

(৭) ২৯তম বর্ষে একটি বিজ্ঞাপনে আছে, 'উদ্বোধন'-এর দরিদ্র গ্রাহকগণকে 'কিঞ্চিৎ অল্পমূল্যে' গ্রাহক করা হবে।

(৮) ৩৩তম বর্ষে আছে, স্বামীজীর জন্মতিথিতে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র নিজে স্বামীজীর জীবন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

(৯) ৫৪তম বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে অর্ধদিবস ছুটি দিয়েছিলেন।

(১০) ৫০তম বর্ষে 'কোরান' সম্বন্ধে ৩টি লেখা আছে; তার একটি হচ্ছে 'তল্লাক্ব' ('তালাক' বা বিবাহবিচ্ছেদ)।

'উদ্বোধন'-এর পুরনো সংখ্যাগুলি অনুসন্ধান করে এই প্রবন্ধ এবং পূর্বে উল্লেখিত ৯০তম বর্ষে প্রকাশিত আরেকটি প্রবন্ধ—কেবল এই দুটিই 'উদ্বোধন'-গর্ভে নিহিত মণিমুক্তা সম্বন্ধে শেষকথা নয়। গত ১০০ বছরের 'উদ্বোধন'-সমুদ্র মন্থন করলে কত যে রত্নরাজি পাওয়া যাবে, তা ধারণা করা কঠিন। মনে রাখা দরকার, স্বামীজী এই পত্রিকাকে চিত্তবিনোদনের বা সাহিত্যচর্চার বাহন করতে চাননি, চেয়েছিলেন এই পত্রিকায় বেদান্ত, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে ইতিবাচক আলোচনার মাধ্যমে এক বলিষ্ঠ জাতি গঠন করতে। 'উদ্বোধন'-এর জন্য স্বামীজী নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর গুরুভাইদের মধ্যেও সেই প্রেরণা সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। বিগত ১০০ বছরে যেসব গৃহী 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন তাঁদের অনেকেই স্বামীজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখেছেন, তাঁদের যাকিছু সর্বশ্রেষ্ঠ তা এই পত্রিকাকে দিয়েছেন এবং দিয়েছেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে—অর্থের বিনিময়ে নয়। বলা প্রয়োজন, 'উদ্বোধন'-এ রচনা প্রকাশের জন্য লেখক-লেখিকাদের কোন অর্থ-দক্ষিণা দেওয়া হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন'-এ রচনা প্রকাশ এক মহাসৌভাগ্য এবং মহামর্যাদা—স্বামীজীর আদর্শ ও স্বপ্নকে সামনে রেখে এই বিবেচনাতেই তাঁরা 'উদ্বোধন'-এ লেখেন। ক্রমবর্ধিষ্ণু 'উদ্বোধন' অতীত ও বর্তমান কালের মতো আগামী দিনেও জাতিগঠনের কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে যাবে। তবে মাঝে মাঝে আমাদের পিছনের দিকে তাকানোর দরকার হবেই যাতে 'উদ্বোধন'-এর প্রবর্তক, পূর্বতন সম্পাদকবৃন্দ, প্রাচীন সাধু ও মনীষীদের অমূল্য অবদানগুলিকে আমরা ভুলে না যাই এবং পত্রিকার মূল ধারা ও ঐতিহ্য থেকে যেন বিচ্যুত না হই। ❑

এই লেখায় সংখ্যা হিসাব করতে সাহায্য পেয়েছি অভিজিৎ ঘোষ-এর কাছে।

ক্রীড়াজগৎ

ক্রিকেট—ঐতিহ্য ও আধুনিকীকরণ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের কি প্রয়োজন?... আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ।... দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যা কি—কাঁটা কোথায় বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনি তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবনের সব ক্ষেত্রের মতো খেলার মাঠে—বিশেষ করে ক্রিকেট মাঠেও অগ্রগণ্য পুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ছেলেবেলা থেকেই ক্রিকেট খেলতেন স্বামীজী। তখন অবশ্য তিনি নরেন্দ্রনাথ, বন্ধুবান্ধবদের কাছে 'বিলে' ('বীরেশ্বর'-এর অপভ্রংশ)। সেটা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ কিংবা সত্তরের দশকের প্রথম। ক্রিকেটকে তখন বলা হতো 'ব্যাটবল' বা 'ব্যাটম্বল'। সেসময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় ক্রিকেট খেলা কিরকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং নরেন্দ্রনাথ এই খেলাটি কেমন খেলতেন তার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "এখন যাহাকে ক্রিকেট খেলা বলা হয়, তখন ব্যাটবল—চলিত কথায় 'ব্যাটম্বল' বলিত। খানকতক ইটের উপর ইট দিয়া একটি উঁচু ঢিপি করা হইত। তার পাশে একজন ব্যাট হাতে করিয়া দাঁড়াইত, তখন দূর থেকে একজন বল দিত। ওঁদিককার লোক বল লুফিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইত। বল যদি ইটে ঠেকিত তো 'আউট' হইত। আবার যে বল দিতেছে তাহার পায়ের কাছে ব্যাটটা ছুঁইয়া আনিতে হইত। ইতিমধ্যে সেও যদি বল ছুঁড়িয়া ইটে মারিত, তাহা হইলে তাহার খেলা শেষ হইত। এই ব্যাটম্বল খেলা বেশ চারিদিকে নজর রাখিয়া সতর্ক হইয়া খেলিতে হইত। হাতের টিপ, ইহাতে জোর চাই। কোন্দিকে কে বল লুফিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেদিকে নজর রাখা চাই। মোটামুটি বেশ খেলা। বীরেশ্বরের এই খেলাতে বেশ উৎসাহ ছিল। সে বল ঠিক মারিতে পারিত। লাটিম খেলার মতো এটা বোকা খেলা নয়। বীরেশ্বর ব্যাটম্বল বেশ ভাল রকম খেলিতে পারিত। পাড়ার অনেক ছেলে বাহিরের উঠানে জড় হইত এবং বৈকালে ব্যাটম্বল খেলা খুব চলিত। বীরেশ্বর এই খেলার সর্দার বা মোড়ল হইয়া সব হুকুম-হাকাম করিত।... বীরেশ্বর বা বিলে যতক্ষণ না খেলায় নামিত, খেলাটা বেশ জমিত না।" (দ্রঃ ১ম সং, ১৩৬৬, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, পৃঃ ৩১-৩২)

কলেজ জীবনে তিনি কলকাতার সুপ্রাচীন ক্রিকেট ক্লাব টাউন ক্লাবের হয়ে একবার ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে কুড়ি রানে সাত উইকেট নিয়ে একাই জিতিয়ে দিয়েছিলেন দলকে।[১] সেসময়ে ক্যালকাটা, ডালহৌসি, রেঞ্জার্স—এসব ক্রিকেট ক্লাবগুলি ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ঐতিহ্য ও আভিজাত্যের ধ্বজাধারী ছিল। এসব দলের খেলোয়াড়রা ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করত। ফুটবলে যেমন মোহনবাগান, এরিয়ান, শোভাবাজার, কুমারটুলির মতো দল ব্রিটিশ সামরিক, আধাসামরিক ও সিভিলিয়ান ক্লাবগুলির বিরুদ্ধে প্রধান ভারতীয় প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিগণিত হতো, ক্রিকেটে তেমনি ছিল টাউন, স্পোর্টিং ইউনিয়ন। ক্যালকাটা বনাম টাউন, ক্যালকাটা বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন ম্যাচগুলি আক্ষরিক অর্থেই বাঙালীদের জাতীয়তাবোধকে উসকে দিত। এরকমই একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে স্বামীজী ক্যালকাটা ক্লাবের বিরুদ্ধে একাই টাউন ক্লাবকে জিতিয়ে শুধু ট্রফি দেওয়াই নয়, খেলার মাঠে ইংরেজদের পর্যুদস্ত করার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনেও পরাধীন ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করেছিলেন।

আধুনিক সভ্যতার যাকিছু ভাল, ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক ও গ্রহণযোগ্য, তাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন স্বামীজী। যেমন ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও ক্রিকেট। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মতো ক্রিকেট খেলাটিও নানা দেশে জাতীয় চরিত্র

১ টাউন ক্লাবের ৯৭তম বর্ষের (১৯৮১) স্মরণিকায় জয়ন্ত দত্তের 'ক্রিকেটার স্বামীজী' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ''ক্রিকেট তো জীবনকেই শেখায়''—উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ মনীষার এই মননলব্ধ অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন স্বামীজীও। বর্তমান নিবন্ধে ক্রিকেটের আন্তর্জাতিকতাবাদের উৎস, বিবর্তন, আধুনিকীকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ক্রিকেট খেলার উৎপত্তি সম্পর্কে ক্রিকেট ঐতিহাসিকরাও ঠিক নিশ্চিত নন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন জনাকয়েক ক্রিকেট ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক। তার ফলে খানিকটা হলেও খেলাটির জন্মলগ্ন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডে যখন টিউডরতন্ত্র চলছে, কথিত আছে সেসময়ে নাকি ক্রিকেটের মতো একধরনের খেলার প্রচলন ছিল। অ্যান্ড্রু লং বলেছেন ঃ ''আসলে ক্রিকেট খেলাটি কারুর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। আর পাঁচটা খেলার মতো ক্রিকেটও বিশেষ ঘটনাক্রমের ফলশ্রুতি।'' আরেক ঐতিহাসিক যোসেফ স্ট্রাট বলেন ঃ ''শান্ত, স্নিগ্ধ ও পুরুষকারের প্রতীক ক্রিকেট আসলে ক্লাব বলেরই পরিবর্তিত সংস্করণ।''

যাহোক, পরস্পরবিরোধী চাপান-উতোর বাদ দিয়ে সরাসরি বলে ফেলা যাক, ইংল্যান্ডের হ্যাম্বেলডন বা অধুনা হ্যাম্পশায়ারই হলো আধুনিক ক্রিকেটের সূতিকাগার। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৭৫০ সালে হ্যাম্বেলডন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এর প্রায় একশ বছর পরে ক্লাবের নাম পালটে হয় 'হ্যাম্পশায়ার ক্রিকেট ক্লাব'। হ্যাম্বেলডন যুগে ছোট কান্ট্রি সাইড মাঠে খেলা হতো। যোগাযোগের ক্ষেত্রে হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আশপাশের গ্রাম থেকে নিয়মিত প্রচুর লোক হ্যাম্বেলডন ক্লাবে আসতেন খেলা দেখতে। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের বহু সদস্যও এই ক্লাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এরপর আস্তে আস্তে ক্লাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র ইংল্যান্ডে খেলাটি ছড়িয়ে পড়ল।

১৭৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব বা সংক্ষেপে এম. সি. সি.। এম. সি. সি.-ই ইংল্যান্ড তথা বিশ্ব ক্রিকেটের সামাজিক, নৈতিক ও আইন-কানুন সংক্রান্ত দিকচক্রের রূপকার। এম. সি. সি. প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রিকেট আন্দোলন সমগ্র ইংল্যান্ডে জীবনমুখী হয়ে উঠল। ১৮০৫ সালে প্রথম প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচটি হলো ইটন ও হ্যারো কলেজের মধ্যে। পরের বছর জেন্টলম্যান বনাম প্লেয়ার্স ম্যাচটিও বিশেষ মাত্রার সূচনা করে। ১৮২৭ সালে শুরু হলো অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক ম্যাচটি। এসবই এম. সি. সি. প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর ফলশ্রুতি।

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে এম. সি. সি.-র সদর দপ্তর। এখান থেকেই নেওয়া হয়েছে ক্রিকেটের যাবতীয় নীতি ও পরিকল্পনা। এসময় থেকেই অনেক বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে ক্রিকেটে ইংল্যান্ড তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলা প্রধানত দুটি ধারায় প্রসারলাভ করে। প্রথমত অভিজাত ও বিত্তবান আর্ল ও জমিদারদের সহায়তায় ক্লাব প্রতিষ্ঠা, আর অন্য পথটি হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে পেশাদার খেলোয়াড় তৈরি করে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ও প্রসার বৃদ্ধি। ইংল্যান্ডে সেসময় এই দুটি ধারাই অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আর এই দুটি ধারার সুচারু মেলবন্ধন করে ক্রিকেটের সাংগঠনিক গঠনতন্ত্রটি রূপায়িত করে এম. সি. সি.। ১৮১৩-১৪ সালে লর্ডস মাঠে উঠে আসে এম. সি. সি.-র সদর দপ্তর। এই মাঠে প্রথম খেলাটি হয়েছিল এম. সি. সি. ও হার্ডফোর্ডশায়ারের মধ্যে।

ইতিমধ্যে ইংরেজদের স্কুলগুলিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে খেলাটি। ইটন, হ্যারো, ওয়েস্ট মিনিস্টার, উইনচেস্টার প্রভৃতি স্কুলগুলি নিজেদের মধ্যে ম্যাচ খেলতে শুরু করে। তারপর ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কাউন্টি দলগুলিকে নিয়ে শুরু হয়ে যায় কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ। এই কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপই ইংল্যান্ডের জাতীয় জীবনে ক্রিকেটের বীজটি দৃঢ়সন্নিবদ্ধ করে।

প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচটি হয়েছিল অবশ্য ইংল্যান্ডের বাইরে আমেরিকা ও কানাডাতে। ১৮৫৯ সালে ১২ জন পেশাদার খেলোয়াড়-সম্বলিত একটি ইংলিশ দল মন্ট্রিল ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে ক্রিকেটের আন্তর্জাতিকতাবাদের সূচনা করে। ১৮৬১ সালে স্টিফেনসনের নেতৃত্বে একটি ইংলিশ দল বেসরকারিভাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। ১৮৭৩-৭৪ সালে জর্জ পারের নেতৃত্বাধীন আরেকটি ইংলিশ দল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে যায়। প্রকৃতপক্ষে বেসরকারি পর্যায়ে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই ধরনের সফরের আদানপ্রদানই জন্ম দেয় সরকারি টেস্ট ক্রিকেটের। দুদেশের ক্রিকেট সংস্থা ও পার্লামেন্টের যৌথ প্রয়াস ও ঐকান্তিক ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটে ১৮৭৬-৭৭ সালে। দুদেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট সিরিজটি খেলা হয় ইংল্যান্ডে। এভাবেই সূচনা হয় পাঁচদিনের টেস্ট ক্রিকেটের। জেমস লিলি হোয়াইটের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ও ডেভিড গ্রেগরীর নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া উভয়েই একটি করে টেস্টে জয়লাভ করায় প্রথম সিরিজটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এরপর থেকে প্রতি দুবছর অন্তর দুদেশের মধ্যে টেস্ট সিরিজ অনুষ্ঠিত হতে থাকে, একবার ইংল্যান্ডে, পরেরবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।

১৮৮২ সাল টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে আরেকটি মাহেন্দ্রক্ষণ। ঐবছর থেকে দুদেশের মধ্যে সিরিজ 'অ্যাসেজ সিরিজ' হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। ডব্লু. এল. মারডকের অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের ওভালে ইংল্যান্ড দলকে পরাজিত করে 'অ্যাসেজ'-এর ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। 'স্পোর্টিং টাইমস' নামক সংবাদপত্রে সেই পরাজয়কে ইংল্যান্ডের জাতীয় জীবনে চরম শোকের দিন বলে উল্লেখ করে বলা হয়—ইংলিশ ক্রিকেটের পবিত্র চিতাভস্ম অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে গিয়ে যথাযথ সম্মান

সহকারে কবর দেওয়া হবে। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য সেই অ্যাসেজ পুনরুদ্ধার করে ইংল্যান্ড ইভো ব্লাইয়ের নেতৃত্বে। এরপর ১৮৯৪-১৯১৪ সালের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটের আঙ্গিকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হয়। খেলার যাবতীয় আধুনিকীকরণ এই সময়ের মধ্যেই সাধিত হয়। ছয় বলের ওভার, ইচ্ছাকৃত ফলো-অন, ফলো-অনের সীমাবৃদ্ধি, নতুন বল-সংক্রান্ত প্রাথমিক নিয়ম, ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট এবং ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক সফর নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন—সবই এসময়ের ফসল।

এসময়ের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাও টেস্ট ক্রিকেট ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করে। ফলে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে নিয়মিত টেস্ট সিরিজ এই খেলাটিকে আরো জীবনমুখী করে তোলে এবং ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে খেলাটি ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট-খেলিয়ে দেশের মর্যাদা পেয়ে যায়। ১৯৩২ সালে ভারত টেস্ট ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করে। ঐবছর সি. কে. নাইডুর নেতৃত্বে ভারত লর্ডসে একমাত্র টেস্টটি খেলে ডগলাস জার্ডিনের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এরপর ভারত নিয়মিত ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট খেলতে শুরু করে। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হলে পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে শুরু করে। তার প্রায় দীর্ঘ তিরিশ বছর পর শ্রীলঙ্কাও টেস্ট স্ট্যাটাসের মর্যাদা লাভ করে। যদিও সরকারিভাবে ১৯৮২ সালে টেস্ট খেলার আগে শ্রীলঙ্কা দুই যুগ ধরে রীতিমত দক্ষতার সঙ্গেই বেসরকারি টেস্ট সিরিজ খেলে এসেছে বিভিন্ন সরকারি টেস্ট টিমের সঙ্গে। এসময় অবশ্য বর্ণবৈষম্যজনিত কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ক্রিকেট থেকে বহিষ্কৃত ছিল। ১৯৭০-১৯৯১—এই দীর্ঘ ২১ বছর নির্বাসনে থাকার পর ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আই. সি. সি. তাদের টেস্ট ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক সংসারে ফিরিয়ে আনে '৯১-এর জুলাই মাসে। ইতিমধ্যে অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে আসা জিম্বাবোয়েও টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে ঐ বছরই। মোটামুটি এই নয়টি দেশকে নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের বর্তমান গঠনতন্ত্র। প্রায় একশ বাইশ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম পাঁচ টেস্টের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিরিজ খেলা হয়েছিল ১৮৮৪ সালে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। আর ১৯৭০-৭১ সালে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সাত টেস্টের সিরিজ প্রথম ও শেষবারের মতো খেলা হয়েছিল। যদিও এরপরে ছয় টেস্টের সিরিজ খেলা হয়েছে বহুবার। শুধু ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়াই নয়, ছয় টেস্টের সিরিজ অন্যান্য দেশের মধ্যেও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে আরো তিনটি স্মরণীয় ঘটনা হলো—১৯৩৮-৩৯ সালে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে ডারবান টেস্ট, ১৯৬১ সালে ব্রিসবেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া এবং ১৯৮৬ সালে মাদ্রাজে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টাই টেস্ট। ডারবান টেস্টটি প্রায় দশদিন ধরে খেলা হওয়ার পরও কোন সম্মানজনক ফলাফল হয়নি। ক্রিকেট ইতিহাসে ডারবান টেস্টকে 'এন্ডলেস টেস্ট' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর টাই টেস্ট দুটি নাটকীয় উত্তেজনা ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে ক্রিকেটের মহান চারিত্রিক মাধুর্য ও গৌরবময় অনিশ্চয়তাকেই তুলে ধরেছিল।

একদিনের ক্রিকেটের উদ্ভব ও সর্বজনীনতা

১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা এম. সি. সি. প্রথম চিন্তাভাবনা করে একদিনের সীমিত ওভার ক্রিকেটের ব্যাপারে। একদিনের ক্রিকেট খেলা যদিও বেসরকারি বা প্রদর্শনী ম্যাচের মধ্যেই তখন সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এম. সি. সি.-র পরিকল্পনা ছিল—ইংল্যান্ডে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে কাউন্টি ক্রিকেটে একদিনের টুর্নামেন্ট শুরু করা। আসলে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কাউন্টি ম্যাচে দর্শকদের উপস্থিতি ভয়ানক কমে যাওয়ায় কাউন্টি দলগুলো খুবই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছিল। ভাটার টান দেখা গিয়েছিল টেস্টম্যাচেও। তাই উত্তেজনার খোরাক জোগাতে দর্শকদের মাঠমুখো করতেই ভাবা হয়েছিল এই ব্যবস্থার কথা। তবে এম. সি. সি.-র এই প্রস্তাব কার্যকরী হতে লেগেছিল আরো সাত বছর।

১৯৬৩ সালে ইংল্যান্ডে বিভিন্ন কাউন্টি দলগুলোর মধ্যে জিলেট কাপ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হলো একদিনের সীমিত ওভারের ম্যাচ। শুরু হলো ক্রিকেটের এক নতুন যুগের। ইংল্যান্ডের দেখাদেখি অস্ট্রেলিয়াতেও চালু হয়ে গেল বেনসন অ্যান্ড হেজেস সীমিত ওভারের খেলা। টেস্ট ক্রিকেটের মতো একদিনের ক্রিকেটেও ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়াই যাবতীয় চিন্তা ও পরিকল্পনার পথিকৃৎ। দু-দেশের বোর্ডই স্থির করে, শুধু ঘরোয়া পর্যায়ে একদিনের ক্রিকেটকে আটকে না রেখে এর আন্তর্জাতিকরণ দরকার। সেই ভাবনার ফলশ্রুতি মিলল ১৯৭০-৭১-এ অ্যাসেজ সিরিজে। দুদেশের মধ্যে প্রথম একদিনের (বিশ্বেরও প্রথম) আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলা হলো মেলবোর্নে। ঐ ম্যাচে বিল লরির অস্ট্রেলিয়া রে ইলিংওয়ার্থের ইংল্যান্ডকে পাঁচ উইকেটে পরাজিত করে। এই ম্যাচটি ঘিরে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল জনমানসে। এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলে এল ক্রিকেট রণাঙ্গনে। পরবর্তী পর্যায়ে একদিনের ক্রিকেট বা ইনস্ট্যান্ট ক্রিকেট পাকাপাকি জায়গা করে নিল দুদেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেস্ট সিরিজে। ১৯৭২ সালে লন্ডনের প্রুডেনশিয়াল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী দুদেশের মধ্যে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলি স্পনসর করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, আর পালটা ব্যবস্থা হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় বেনসন অ্যান্ড হেজেস কোম্পানী সেদেশের মাটিতে অনুষ্ঠেয় একদিনের ম্যাচগুলি স্পনসর করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

তবে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ আয়োজনে প্রুডেনশিয়াল কোম্পানীই অগ্রদূত। ১৯৭৫-এ ইংল্যান্ডে প্রথম বিশ্বকাপটি অনুষ্ঠিত হয় এদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আই. সি. সি. বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স ও প্রুডেনশিয়াল কোম্পানী ২৫-২৬ জুন ১৯৭৩ লর্ডসে এক

যৌথ সম্মেলনে স্থির করেন, একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ আয়োজন করে ক্রিকেট-খেলিয়ে সমস্ত দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই বিশ্বকাপ প্রতি চারবছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়। আই. সি. সি.-র পূর্ণ সদস্য দেশগুলি ছাড়াও আরো দুটি দেশ—যারা অ্যাসোসিয়েট সদস্য, তাদেরও স্থান দেওয়া হবে বলে অনুমোদিত হয় বিশ্বকাপের খসড়া প্রস্তাবটি। ১৯৭৫-এ প্রথম বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ১৭ রানে হারিয়ে। ভারত গ্রুপ ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে যায় এবং হারায় দুর্বল পূর্ব আফ্রিকাকে। ১৯৭৯-তে দ্বিতীয় প্রুডেনশিয়াল বিশ্বকাপেও খেতাব ধরে রাখে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবার ফাইনালে বিধ্বস্ত হয় ইংল্যান্ড। ভারত গ্রুপ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে সর্বনিম্ন স্থান পেয়ে ফিরে আসে। এর পরের প্রুডেনশিয়াল বিশ্বকাপটি (১৯৮৩) অবশ্য জয় করে ভারত। এই জয় ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায়। কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারত হ্যাটট্রিক অভিলাষী শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৪৩ রানে হারিয়ে দেয়। এই জয়ই ভারতে একদিনের ক্রিকেটে তথা সার্বিকভাবে বলতে গেলে ক্রিকেট আন্দোলন ও জনপ্রিয়তায় বিশেষ মাত্রা সংযোজিত করে। চারবছর বাদে বিশ্বকাপ আয়োজিত হয় ভারত ও পাকিস্তানে রিলায়েন্স কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায়। কলকাতার ইডেনে অনুষ্ঠিত ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়। পরবর্তী বিশ্বকাপটি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। নামকরণ হয় বেনসন অ্যান্ড হেজেস বিশ্বকাপ। উপমহাদেশীয় ক্রিকেট আরো একবার গর্বিত হয় পাকিস্তানের বিশ্বজয়ে। ইমরান খানের নেতৃত্বে পাকিস্থান ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হারিয়ে দেয়। এর পরের বিশ্বকাপটি আবার অনুষ্ঠিত হয় এই উপমহাদেশে, সঙ্গে তৃতীয় দেশ হিসেবে ছিল শ্রীলঙ্কাও। এই বিশ্বকাপের নামকরণ করা হয় উইলস বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কা সাত উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে উপমহাদেশীয় ক্রিকেট আভিজাত্য ও ঐতিহ্যকে অটুট রাখে। ভারত সেমিফাইনালে (ইডেনে) শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যায় সেবার। ১৯৯৯-এ পরবর্তী বিশ্বকাপের উদ্যোক্তা ইংল্যান্ড।

বিশ্বকাপ ছাড়াও আরো বেশ কিছু একদিনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন ১৯৮৫ সালে ভিক্টোরিয়া ক্রিকেট সংস্থার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বেনসন অ্যান্ড হেজেস মিনি বিশ্বকাপ (যাতে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়), ভারতে নেহেরু কাপ, শারজায় বার্ষিক ত্রি-চতুর্দেশীয় প্রতিযোগিতা কিংবা হালের ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে ইনডিপেন্ডেন্স কাপ ইত্যাদি। এরকম বহু একদিনের টুর্নামেন্ট ক্রিকেট-খেলিয়ে প্রতিটি দেশে সময়ে সময়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এই যে একদিনের ক্রিকেটের তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক সাফল্য, তার জন্য কিন্তু সর্বাত্মক কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন এক অস্ট্রেলিয়ান ধনকুবের কেরি প্যাকার।

কেরি প্যাকার নামটি এখনো ক্রিকেটের বাণিজ্যিক বিপণন ও বিনোদনের জগতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ১৯৭৭-এ প্যাকার ক্রিকেট জগতে নিয়ে এলেন এক নতুন মোড়কে বিনোদনের প্যাকেজ। 'প্যাকার সিরিজ' নামে তিন বছর চলা ঐ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় ভারত ছাড়া প্রতিটি টেস্ট-খেলিয়ে দেশের (দক্ষিণ আফ্রিকা সহ) তারকা ক্রিকেটাররা যোগ দিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্যাকার সিরিজের একদিনের খেলাগুলিতে এইসব তারকাদের ঝলমলে ক্রীড়াদ্যুতি ও সৌকর্য দেখে টেস্ট ক্রিকেটের ধ্বজাধারীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটের সমান্তরাল আন্দোলন হিসেবে একদিনের ক্রিকেট প্রকৃতপক্ষে এইসময় থেকেই প্রতিটি দেশে ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্যাকারই একদিনের ক্রিকেটে নিয়ে আসেন রঙের ফুলঝুরি। রঙিন পোশাক, প্যাড, গ্লাভস, কালো সাইট স্ক্রিন, সাদা বল, সর্বোপরি ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোকসম্পাত—ক্রিকেট সব অর্থেই ভিক্টোরিয় রোম্যান্টিসিজম থেকে বেরিয়ে অত্যাধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় ঢুকে পড়ে বিনোদনসর্বস্ব ভোগবাদী পণ্য হিসেবে। আর টেলিভিশন কভারেজ ও বাণিজ্যিক সংস্থার অর্থানুকূল্যে ধনী ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ড ও খেলোয়াড়রা।

যদিও সরকারিভাবে কোন দেশের ক্রিকেট সংস্থাই প্যাকার সিরিজের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি, কারণ সিরিজটি সম্পূর্ণভাবেই কেরি প্যাকার ও তাঁর বিশ্বস্ত কতিপয় তারকা ক্রিকেটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ছিল। তবে এই সিরিজটি বন্ধ হয়ে গেলেও কিন্তু সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে যায় ক্রিকেট দুনিয়ায়। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকেই একদিনের ক্রিকেট টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক রূপকল্প হয়ে দাঁড়ায়। আর নব্বই দশকে এসে দেখা যাচ্ছে সমসাময়িক ক্রিকেট প্রজন্ম ক্রিকেট বলতে একদিনের ইনস্ট্যান্ট ক্রিকেটকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। স্যাটেলাইট ও মিডিয়া-শাসিত যুগে একদিনের ক্রিকেট ক্রিকেট-খেলিয়ে প্রতিটি দেশে—বিশেষ করে উপমহাদেশে বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আট থেকে আশি—সব বয়সের মানুষ এই ধরনের ক্রিকেটে এতটাই মোহগ্রস্ত যে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে খেলা হলে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সর্বৈব আশঙ্কায় তটস্থ থাকতে হয় দুদেশের প্রশাসনকে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা—সর্বত্র একই চিত্র, তবে ভারত-পাকিস্তানের মতো এতটা উন্মাদনা হয়তো নেই। মিডিয়া, স্পনসর, বিজ্ঞাপনদাতার ত্র্যহস্পর্শে একদিনের ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের পাশে পুরনো পাঁচদিনের টেস্ট ক্রিকেট আর কয়দিনের মধ্যেই হয়তো 'ফসিল' হয়ে মিউজিয়ামে স্থান পাবে।❑
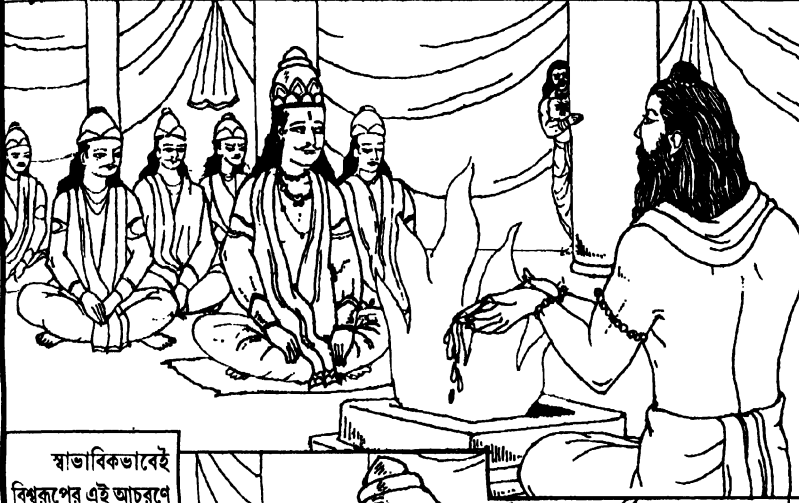
চিরন্তনী
দধীচির আত্মদান ও
বৃত্রাসুর বধ ①
❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑
কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত
পুরাকালে ঋষি ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবতাদের যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন। বিশ্বরূপের মাতুলবংশ ছিল অসুরকুল। তিনি দেবতাদের জন্য যজ্ঞ করবার সময় দেবতাদের যজ্ঞভাগ দিতেন, আবার লুকিয়ে অসুরদেরও যজ্ঞ-ভাগ দিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর এই কপটাচরণ একদিন ধরে ফেললেন।
স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বরূপের এই আচরণে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কারণ, দেবতা-দের লুকিয়ে অসুরদের যজ্ঞভাগ দিয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করা হচ্ছিল। সুতরাং দেবরাজের বিচলিত হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করে তাঁকে হত্যা করলেন।
পুত্রহত্যার খবর পেয়ে ঋষি ত্বষ্টা শোকে উন্মাদ হয়ে গেলেন। ইন্দ্রের ওপর তাঁর ক্রোধের সীমা রইল না। অস্থির হয়ে দিবারাত্র তিনি প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। [ক্রমশ]

'উদ্বোধন'

সন্তোষকুমার দে

'উদ্বোধন'-এর ১০১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে নিবেদিত

কী মহামুহূর্তে তুমি ফুকারিয়া শুভ শঙ্খধ্বনি
উদ্বোধিত করেছিলে, জীবন্মৃত জাগিল তখনি।
'উদ্বোধন' পত্রিকায় তোমার সে উদাত্ত আহ্বান
দীর্ঘ শতবর্ষ ধরি প্রতিধ্বনি করে অফুরান।

সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে 'উদ্বোধন' জাগাল জাতিকে
জ্ঞানের সে মহাকোষ শক্তি বিচ্ছুরিছে দিকে দিকে।
অমৃতের রস-উৎস, প্রজ্ঞানের পরম প্রকাশে
অদ্বিতীয় অভিযান সুদূর অতীত হতে আসে।
প্লাবিত করেছে বঙ্গভারতীর পবিত্র প্রাঙ্গণ,
অতন্দ্র একক সেই মহাভারতীর 'উদ্বোধন'।

জাতির গৌরবস্তম্ভ, 'উদ্বোধন' কালের প্রহরী
হিমালয় মহীয়ান হলো 'উদ্বোধন' শিরে ধরি।
'উদ্বোধন' বক্ষে বহি পুণ্যধারা হলো ভাগীরথী
ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন' বেদান্তের যোগায় আরতি।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—ঠাকুরের উদার আহ্বান
সন্ন্যাসীর সংসারীর সকলের মাতাইল প্রাণ।
'যত মত তত পথ'—জগতের উদ্ধারের বাণী
'উদ্বোধন' উদ্‌ঘোষিল ছন্দোবন্ধে, কি প্রবন্ধে আনি।
বুঝাইল জনে জনে কী আশ্চর্য পরম নিষ্ঠাতে,
ইতিহাস সৃষ্টি হলো দীর্ঘ শতবর্ষের চেষ্টাতে।

নিপুণ মুদ্রণ, তার পারিপাট্য অতি অপরূপ
রামধনু রঙ ছানি প্রচ্ছদের পরিচ্ছন্ন রূপ।
বয়সে প্রবীণ কিন্তু শক্তি তার যৌবনে উদ্দাম
জাতির বিজয়ধ্বজা বহন করিছে অবিরাম।
বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের ধন
জীবন জুড়িয়া জাগে নবীন সে দৃপ্ত 'উদ্বোধন'।

মহান সে পদাতিক চলিয়াছে, সঙ্গে চলে দেশ,
উজ্জ্বল ভবিষ্য লক্ষ্যে স্বামীজীর পথের নির্দেশ।
সেই মহাযাত্রা-পথে আমরাও জয়গান গাহি,
'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আনন্দে উৎসাহী।

ভারত আবিষ্কার

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচশ বছর আগে
ভারত আবিষ্কার করতে গিয়ে
স্পেনের রাজা-রানীর প্রেরিত নাবিক কলম্বাস
করেছিলেন ভুল ভারত-আবিষ্কার—
যার ফল আজকার আমেরিকা।

একশ বছর আগে
সেই 'আবিষ্কার'-এর স্মরণে
আমেরিকার শিকাগোতে হয়েছিল ধর্মমহাসম্মেলন।

চারশ বছর পর ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে
লক্ষ হৃদয়ের রাজা-রানীর প্রেরিত নাবিক
ঠাকুর আর মায়ের নির্দেশে তিনি গেলেন সেই সম্মেলনে।
বিশ্বকে 'শিক্ষে' দিয়ে হলেন বিশ্বগুরু বিবেকানন্দ।

এবার বিশ্ব আবিষ্কার করল ভারতবর্ষকে।
অবাক হয়ে দেখল
তাঁর দুটি করুণাঘন বিশাল চোখের দূরবীনে—
যাকে অন্ধ সংস্কারের তমসাবৃত দেশ বলে জানত তারা
সেই অমর মহান ভারতবর্ষকে
বেদান্তের আলোয় উদ্ভাসিত—সনাতন ভারতবর্ষকে।

কলম্বাসের আত্মা তৃপ্ত হলো বুঝি এতদিনে
সনাতন ভারতের সত্য আবিষ্কারে।

ভগিনী নিবেদিতা

সি. এফ. এন্ড্রুজ

কার আছে ভালবাসা প্রাণভরা?—গুরুর জিজ্ঞাসা।
কে ভালবাসিতে পার, নয় শুধু বিমূঢ় বিশ্বাসে
নয় শুধু কর্মহীন সমব্যথা ব্যথিতের শ্বাসে
কাজে, শুধু কাজে কার প্রকাশিত হবে ভালবাসা?

মুক্তিদাতা দেখালেন প্রেমের অমর কর্মপথ
সঙ্কীর্ণ সে এক পথে নিত্য চলে পুণ্য জয়রথ
ত্রাণ কর ক্ষুধিত অপরিচিত যারা বেদনায়
যারা রুগ্ন, ক্লান্ত, জীর্ণ, যারা বন্দী আঁধার কারায়।

সেই প্রেম-নিবেদিতা, যদিও সে বাহির আঙন
ছেড়েছে খ্রীস্টেরে তবু, তাঁরই বাণী প্রাণে জ্যোতির্ময়
ছেড়ে নিজগ্রহ, দূর অজানারে করেছে আপন
খ্রীস্টের প্রকৃত কাজ, মনে তেজ ছিল যে দুর্জয়।

ভালবাসিবার, দুঃখ সহিবার, মৃত্যু যতক্ষণ
না করে আহ্বান শান্ত হিমালয়ে শুভ্র চিরন্তন।

অনুবাদ ঃ শিশিরকুমার দাশ

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৫ সেপ্টেম্বর '৯৮ জাতীয় শিক্ষাদিবসে বিদ্যালয়ের শতবর্ষজয়ন্তীর প্রথম অনুষ্ঠান গিরিশ মঞ্চ-এ উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনায় যোগদান করেছিলেন। আলোচনাসভা পরিচালনা করেছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। ঐদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সম্পাদিকা এবং বর্তমানে শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। নিবেদিতার প্রিয় প্রাচীন ভারতের কয়েকটি নারীচরিত্র অবলম্বনে মনোজ্ঞ শ্রুতিনাটক নিবেদন করেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষয়িত্রীগণ।

সভায় পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। বহু চিত্রসমৃদ্ধ অ্যালবামটিও তিনি প্রকাশ করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, সমাজসেবী রাখি সরকার এবং শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা মঞ্চে শিল্পীদের হাতে নিবেদিতার প্রিয় বজ্রচিহ্নের ব্রোঞ্জ-রিলিফ তুলে দেন। সর্বসাধারণের জন্য ৩ অক্টোবর পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল।

৬ নভেম্বর ছিল 'ছাত্রীদিবস'। সেদিন কলকাতার সায়েন্স সিটির হল-এ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ডঃ কে. আর. নারায়ণনের উপস্থিতিতে একটি বিশেষ সভার আয়োজন

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ শিল্প প্রদর্শনী

৬ নভেম্বর 'ছাত্রীদিবস'-এর উদ্বোধন করছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন। তাঁর ডান দিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এ. আর. কিদোয়াই এবং নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা

ভগিনী নিবেদিতা শুধু শিক্ষয়িত্রীই ছিলেন না, ছিলেন যথার্থ শিল্পবেত্তাও। ভারতশিল্পের জাগরণ ও তার মৌলিকতা রক্ষায় নিবেদিতার অনন্য ভূমিকার কথা স্মরণ করে গত ২৮ অক্টোবর কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ চারটি গ্যালারি জুড়ে একটি বড় মাপের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী। প্রদর্শনীর একাংশে ছিল শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের বহুমুখী কর্মধারার আলোকচিত্র-সহ বিবরণ, অপরাংশে ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণায় জাতীয় শিল্পাদর্শে উদ্বুদ্ধ অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা দুর্লভ চিত্র, ঐসব চিত্র বিষয়ে নিবেদিতার মূল্যবান সমালোচনা এবং নিবেদিতার নিজের আঁকা কিছু ছবি। তৃতীয় অংশে ছিল নিবেদিতার শিল্পচেতনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এযুগের ৬৭ জন বিশিষ্ট শিল্পীর বর্ণাঢ্য চিত্রসম্ভার। ঐদিন সকাল ১০টায় রবীন্দ্রসদন-এ আমন্ত্রিত শিল্পীদের সংবর্ধনা-

করা হয়। রাষ্ট্রপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের শতবর্ষব্যাপী সাধনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা তিনিই প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এ. আর. কিদোয়াই এবং প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ভাষণ দেন। স্বাগত-ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা।

১৩ নভেম্বর ছিল বিদ্যালয়ের 'প্রতিষ্ঠাদিবস'। ঐদিন সকালে বিদ্যালয়ের প্রধান ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, ঠাকুরদালানে সন্ন্যাসিনীদের সমবেত হোম, শিল্পবিভাগের প্রদর্শনী এবং স্থানীয় নিবেদিতা ক্লাবের মাঠে সুসজ্জিত মঞ্চে সঙ্গীতানুষ্ঠান অগণিত ভক্তকে আনন্দ দান করে। আদি বিদ্যালয়-ভবনটি (১৬ নং বোসপাড়া লেনে) আজও বর্তমান, যদিও তা অতি জীর্ণ এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অধীনে নয়। ঐদিন সকালে সেই আদি বিদ্যালয়ের

⇑

১৩ নভেম্বর ১৬ নং বোসপাড়া লেন থেকে
বর্তমান বিদ্যালয় ভবনের দিকে শোভাযাত্রা

⇑
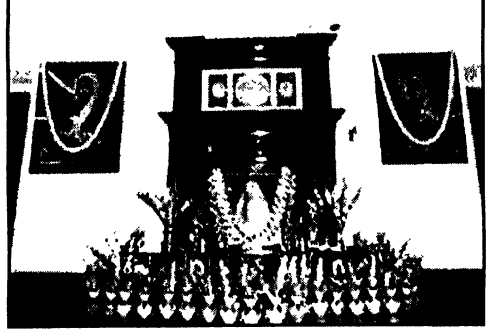
১৩ নভেম্বর 'প্রতিষ্ঠাদিবস'-এ
বিদ্যালয়ের উৎসবসজ্জা

১৬ নভেম্বর নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম-এ বিশেষ সভায় শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। তাঁর ডান দিকে প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা, প্রব্রাজিকা অজয়প্রাণা; বাঁদিকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং ডঃ উমা দাশগুপ্ত

⇓
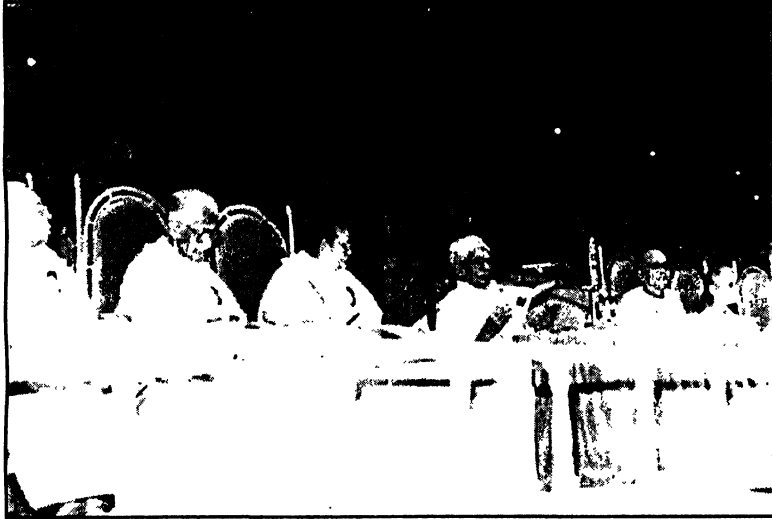
সামনে প্রদীপ জ্বালান অতি বৃদ্ধা এক প্রাক্তন ছাত্রী। সেখান থেকে মঙ্গল-কলস হাতে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীদের শোভাযাত্রা নিবেদিতা লেনের বিদ্যালয়-ভবনে প্রবেশ করে।

১৬ নভেম্বর অপরাহ্ণ ৪টায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম-এ অনুষ্ঠিত জনসভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থেকে আশীর্বাণী দান করেন। সভায় বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, উমা দাশগুপ্ত ও প্রব্রাজিকা অজয়প্রাণা। সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা। ঐদিন ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁর দু-ঘণ্টাব্যাপী সরোদবাদন শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

২২ ও ২৪ নভেম্বর ১৬০০ জন দরিদ্রনারায়ণকে হাতে হাতে খিচুড়ি ও একটি করে কাপড় দেওয়া হয়। ১২ ডিসেম্বর গিরিশ মঞ্চ-এ অনুষ্ঠিত শিল্পবিভাগের ছাত্রীদের নাট্যানুষ্ঠান ছিল উপভোগ্য।

২৬ ডিসেম্বর বিদ্যালয়-ভবনে এবং ২৭ ডিসেম্বর গিরিশ মঞ্চ-এ আয়োজিত মহিলা-সম্মেলনে নিবেদিতার চিন্তালোকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সেবা, ত্রাণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত প্রতিনিধিবৃন্দ। ২৯ ডিসেম্বর প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণার সভানেত্রীত্বে রবীন্দ্র সদন-এ দিবসব্যাপী প্রাক্তন ছাত্রী-সম্মেলন, আলোচনা ও আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শতবর্ষজয়ন্তী সম্পূর্ণ হয়। ❑

অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[অগ্রহায়ণ ১৪০৫ সংখ্যার পর]

বরানগর মঠ, আলমবাজার মঠ ও নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে অবস্থিত মঠের মতো বেলুড় গ্রামে সংস্থাপিত নতুন মঠের জীবনধারা আবর্তিত হতে থাকে নতুন তৈরি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরকে কেন্দ্র করে। এ-মন্দিরের বর্তমান পরিচয় মঠের আদি মন্দির বা ঠাকুরঘর। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-আদর্শের প্রতিভূ, যা তাঁর জীবন ও বাণীতে প্রতিভাত সে-আদর্শের রশ্মিকেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। চিরপ্রেরণাপ্রদ সে-আদর্শ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-জীবনে রূপায়িত করবার জন্য মঠবাসিগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সমগ্র মঠজীবন এই লক্ষ্যের অভিমুখী।

কয়েক মাসের মধ্যে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (সেসময়ে তিনি ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানানন্দ) মঠের নিজস্ব জমিতে একটি দোতলা সাধুনিবাস ও তার পিছনে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঠাকুরবাড়ি তৈরি করেছিলেন। স্বয়ং সঙ্ঘজননী শ্রীমা সাধুনিবাসটি উৎসর্গ করেছিলেন ১২ নভেম্বর ১৮৯৮। আর নতুন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যপূজার প্রবর্তন হয়েছিল ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮।

নতুন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নিচতলায় ছিল রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, খাওয়ার ঘর ইত্যাদি। পুবের সিঁড়ি দিয়ে উঠে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ঢাকা বারান্দা বা নাটমন্দির। তার দক্ষিণদিকে ২০'×১১' মাপের ঘরটি গর্ভমন্দির বা ঠাকুরঘর, আর তার পাশে উত্তরদিকের ঘরটি ছিল ঠাকুরের শয়নঘর। এ-দুটি ঘরের পিছনে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত লম্বা একটি ঘর সাধারণত সাধু ব্রহ্মচারীদের ধ্যানজপের জন্য ব্যবহৃত হতো। দোতলার পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে লম্বা বারান্দা।

গর্ভমন্দিরের পশ্চিম দেওয়াল ঘেঁষে ছিল শ্বেতপাথরের বেদি। বেদির ওপরে দেওয়ালে ছিল সুন্দর পঙ্খের কাজ। বেদির ওপর চাঁদোয়া ও কাঠের সিংহাসনের ওপর ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পট। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত সোনার কবচ[২৭] বেদির ওপর একটি কৌটার মধ্যে রাখা হতো। বেদির মধ্যে ছিল 'আত্মারামের কৌটা', যা বিশেষ বিশেষ দিনে বের করে পূজা করা হতো। বেদির সম্মুখে একটি কাঁচের বাক্সের মধ্যে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত পাদুকা। স্বামীজী, শ্রীমা ও মহারাজের মহাসমাধির পর পরই তাঁদের প্রতিকৃতি তিনটি পৃথক কাঠের সিংহাসনে স্থাপন করে বেদির পাশে রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন সেখানে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হতো।

এই ঠাকুরবাড়িতেই নিত্যপূজা ও বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে একনাগাড়ে প্রায় চল্লিশ বছর। এখান থেকে 'আত্মারামের কৌটা' সরিয়ে নিয়ে মঠের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্থাপত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত করেন ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৮। সেসময় থেকে পূজাদি এখানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মঠবাসিগণের গভীর বিশ্বাস—'আত্মারামের কৌটা'তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত উপস্থিতি অনুভববেদ্য। একদিন স্বামীজীর ইচ্ছা হয় এই বিশ্বাসের সত্যতা যাচাই করা। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেন: "ঠাকুর, তুমি যদি সত্য সত্যই থাক, তবে তিনদিনের মধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজকে আকর্ষণ করে আন।" মহারাজা তখন কলকাতায়। কিন্তু তাঁর বেলুড় মঠে আসার কোন কথা ছিল না। স্বামীজী পরদিন কোন কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন। মঠে ফিরে শুনতে পেলেন যে, গোয়ালিয়রের মহারাজা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে থেমে তিনি নিজের ভাইকে মঠে পাঠিয়েছিলেন স্বামীজী মঠে আছেন কিনা জানবার জন্য। স্বামীজী মঠে নেই জানতে পেরে মহারাজা চলে যান। স্বামীজী এ-খবর শুনে চমকে ওঠেন। তিনি তড়িৎগতিতে ঠাকুরঘরে গিয়ে 'আত্মারামের কৌটা'তে মাথা ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন: "ঠাকুর, তুমি সত্যি, তুমি সত্যি, তুমি সত্যি।"[২৮]

আলোচ্য ঠাকুরঘর সম্পর্কিত একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন বিবেকানন্দ-শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর রচনার একাংশ: "ঠাকুরের নামে পাছে কোন সম্প্রদায় গড়িয়া ওঠে, এইজন্য স্বামীজী বেলুড় মঠ নির্মিত হওয়ার পর ঠাকুরের বর্তমান আসনে ঠাকুরের ছবি বসাইয়া পূজা করিতে দেন নাই। তখন রেশমী রুমালে অঙ্কিত একটি ওঁকার টাঙ্গাইয়া রাখা হইত এবং তাহার পূজা হইত। পরে স্বামীজী একদিন রাত্রে কি একটা vision দেখিয়া পরদিন নিজ হস্তে আসনে ঠাকুরের ছবি বসাইয়া দেন। তদবধি অদ্য পর্যন্ত সেই ছবিই পূজা হইতেছে।"[২৯] বলা বাহুল্য, এধরনের ঘটনার মাধ্যমে মঠবাসীদের বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে মন্দিরে নিয়মিত পূজা করেছেন স্বামী প্রেমানন্দ বা স্বামী সুবোধানন্দ। কখনো কখনো পূজা করেছেন স্বামী ধীরানন্দ, ব্রহ্মচারী জ্ঞান, স্বামী সারদানন্দ, এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ। এ-মন্দিরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা ও বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "যেখানে অনেক লোকে অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ জপ ধ্যান ধারণা প্রার্থনা উপাসনা করেছে, সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয়ই আছে জানবি। তাঁদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়।"[৩০] একথা মঠের এই ঠাকুরঘর সম্বন্ধে আক্ষরিকভাবে সত্য। এখানে সকালে

---

২৭ এই ইষ্টকবচ-সহ আরো কয়েকটি জিনিস পুরনো ঠাকুরঘর থেকে চুরি যায় ১২ মার্চ ১৯৩১।

২৮ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৪০১

২৯ ১৩৩০ সালে লেখা। দ্রঃ 'উদ্বোধন', ২৫তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৩০, পৃঃ ৭৩১

৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ ভাগ, ১৩৯০, পৃঃ ১০৬

সন্ধ্যায় অপরাহ্ণে, কখনো সারারাত ধরে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ প্রাণভরে শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন করেছেন, কেউ কেউ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, কেউবা সমাধিস্থ হয়েছেন। আজো এ-সাধনার ধারা অব্যাহত।

স্বামী অচলানন্দের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় একটি চমৎকার ঘটনা। প্রতিদিনকার মতো স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরঘরে এসে পূজার আসনে বসেছেন। অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছেন স্বামীজী। স্বামী প্রেমানন্দকে উঠিয়ে দিয়ে তিনি নিজে পূজকের আসনে বসলেন। পূজা আরম্ভ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে নিজের মাথার ওপর অর্ঘ্য স্থাপন করলেন। তারপরই তিনি গভীর ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। দীর্ঘ সময় পরে তাঁর ধ্যান ভাঙল। আসন ছেড়ে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, তাঁর আরক্তিম মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে তাঁকে দেখাচ্ছিল অপরূপ। উপস্থিত সকলে স্বামীজীকে প্রণাম করলেন।

স্বামী প্রেমানন্দের সেবা-পূজাও ছিল 'আত্মবৎ'। একদিন তিনি একখানি নতুন কাপড় শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করে পরতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ভাবচক্ষে দেখেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলছেন : "হ্যাঁরে বাবুরাম, তুই নতুন কাপড় পরছিস, আর আমার জামা যে কেটে দিয়েছে। আমায় তুই কি আর ভালবাসিস না?" তিনি ঠাকুরঘরে যান, সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী। তাঁরা অবাক হয়ে দেখেন, ছবিতে পরানো শ্রীশ্রীঠাকুরের কাপড় কখন ইঁদুরে কেটে দিয়েছে![৩১]

এই আদি ঠাকুরঘর তড়িঘড়ি তৈরি করতে হয়েছিল, আর শ্রীরামকৃষ্ণের স্থায়ী মন্দির হয়েছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী। স্বামীজীর চিন্তাভাবনা যথাসম্ভব অনুসরণ করে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরকারি স্থপতি শ্রীগাইথারের সাহায্যে নকশা তৈরি করেছিলেন। শোনা যায়, তিনটি নকশা তৈরি হয়েছিল, তাদের একটি স্বামীজী অনুমোদন করেছিলেন।

তাছাড়াও দুটি সূত্র থেকে ভাবী মন্দির সম্পর্কে স্বামীজীর চিন্তাভাবনার কিছু আভাস পাওয়া যায়। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' সূত্রে জানা যায় যে, স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকলার সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন এই মন্দিরে। তিনি বলেছিলেন : "বহুসংখ্যক জড়িত-স্তম্ভের ওপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরি হবে। তার দেওয়ালে শত-সহস্র প্রফুল্ল-কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমনভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক 'ওঙ্কার' বলে ধারণা হবে। মন্দির-মধ্যে একটি রাজহংসের ওপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে...।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর একখানি মূল্যবান চিঠিতে লিখেছেন স্বামীজী মঠের জমির ওপর দাঁড়িয়ে ভাবী মন্দির সম্বন্ধে তাঁকে যা বলেছিলেন। সে-চিঠির একাংশ : "আমি তাঁহার কাছে ভাবী মঠের 'নকশা'র কথা পাড়িলাম, তাহা শুনিয়া স্বামীজী... কিরকমে, কোথায় তাঁহার সেই 'অর্ধচন্দ্রাকার' মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মন্দিরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় কুলুঙ্গিতে যেরূপে যত দেবদেবী ও পৃথিবীর যাবতীয় মহাপুরুষ ও মহাজনগণের বিগ্রহ স্থাপিত হইবে এবং যেরূপে মন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদির ওপরে হীরা, চুনী, পান্না-খচিত সদাসমুজ্জ্বল একটি ওঙ্কার থাকিবে তাহাই তিনি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন।"[৩২]

স্বামীজীর এসব চিন্তাভাবনা ও তাঁর অনুমোদিত মন্দিরের নকশা সম্মুখে রেখে গড়ে উঠেছে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্প—এসবকিছুর সমন্বয়ের পাদপীঠ। পৃথিবীর সব জাতির মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম এ-মন্দির। বেলুড় মঠ কালে হয়ে উঠবে মানবের মহামিলনের তীর্থস্থল—এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন।

প্রাচীন এ-মন্দিরেই সন্ধ্যারতির পদ্ধতি ও তার সহযোগী স্তোত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি বিবর্তিত হতে হতে বর্তমানের স্থায়ী রূপটি ধারণ করেছে। মাদ্রাজে যাওয়ার পূর্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সন্ধ্যারতির যে পরম্পরা গড়ে তুলেছিলেন, তা-ই অনুসরণ করা হচ্ছিল নীলাম্বরবাবুর বাগানে মঠ স্থানান্তরের পর। ঠাকুরের তিথিপূজার দিন (২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮) স্বামীজী একটি স্বরচিত গান উপস্থাপন করেন। এবিষয়ে স্বামী প্রেমানন্দ গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখে জানান : "নরেন্দ্রনাথ একটি সুন্দর আরতির গান রচনা করিয়াছে—

'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়,
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়।।
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জন হার
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার।।'

সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হয়েছিল।"[৩৩] সেদিন থেকেই যে অতীতের আরতির স্তবস্তুতিগুলি বর্জন করা হয়েছিল এবং এই নতুন গানটি চালু হয়েছিল তা মনে হয় না। কিন্তু যখন গানটি নিয়মিত চালু হলো তখন একটি সমস্যা দেখা দিল। ঐ নতুন রচিত গান দুবার গাইলেও আরতি সম্পূর্ণ হয় না। এবিষয়ে স্বামীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা

---

৩১ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫০-৫১

৩২ 'উদ্বোধন', ৩১তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, পৃঃ ২৬৬

৩৩ স্বামী প্রেমানন্দের ৬।৩।১৮৯৮ তারিখে লেখা চিঠির একাংশ। (স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী, ২য় সং, ১৩৮৬, পৃঃ ১৭১) আরাত্রিক ভজনটি তিথিপূজার দিন নীলাম্বরবাবুর বাগানে দুপুরে ভোগারতির পর প্রথম গাওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার আরেক টুকরো স্মৃতি : "স্বামীজী এইসময় নিজে পাখোয়াজ বাজিয়ে স্বরচিত 'খণ্ডন ভববন্ধন' ভজনটি সম্যক গাইলেন। হরি মহারাজ ঘণ্টা বাজালেন, কেউ বা কাঁসর—ইত্যাদি। খুব চমৎকার জমল।" দ্রঃ স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন—স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ৮০

হয়। স্বামীজী তখন বেলুড়ে নতুন মঠবাড়িতে বাস করছিলেন। স্বামীজী আরো সাতটি শ্লোক রচনা করে প্রথম শ্লোকটির (খণ্ডন ভববন্ধন...গুণময়) সঙ্গে জুড়ে দিলেন।[৩৪] এবার আরতির গান জমে উঠল। আশ্চর্যের বিষয়, এই গানে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত নেই। চারটি যোগের সমন্বয়মূর্তি এক মহান ঈশ্বরাবতারের স্তুতি এই গানে প্রকটিত হয়েছে।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' সূত্রে জানা যায় যে, মঠ নীলাম্বরবাবুর বাগানে থাকাকালীন নভেম্বর ১৮৯৮-এ স্বামীজী 'ওঁ হ্রীং ঋতং' স্তবটি রচনা করে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখাটি দিয়ে বলেছিলেনঃ "দেখিস এতে কিছু ছন্দপতনাদি দোষ আছে কিনা।" শিষ্য স্তবটি একটি কাগজে নকল করে নেন।[৩৫] চার-পাঁচদিন পরে স্বামীজী শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেনঃ "সে-স্তবটায় কোনরূপ সংশোধন দরকার দেখলি কি?" শিষ্য জানান যে, তখনো পর্যন্ত তিনি স্তবটি ভাল করে পড়ে দেখেননি। দুঃখের বিষয়, স্তবের মূল কপি হারিয়ে যায়। স্বামীজীর মহাসমাধির প্রায় চারবছর পরে শিষ্যের নিকট যে নকলখানি ছিল সেটি খুঁজে পাওয়া যায় এবং স্তবটি 'উদ্বোধন'-এ প্রথম ছাপা হয়, কিন্তু তার আগে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ প্রকাশিত 'বীরবাণী'তে স্থান পায় এই স্তবটি। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, স্তবটি ১৯০৪-এর প্রথম দিকে মঠের সন্ধ্যারতিতে যুক্ত হয়েছিল। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ মাঘী পূর্ণিমার দিন হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের পট-প্রতিষ্ঠাকালে পূজার ঘরে বসে বসেই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের সুপ্রসিদ্ধ প্রণামমন্ত্র 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য...' রচনা করেছিলেন। 'ওঁ হ্রীং ঋতং' স্তবটির শেষে স্বামীজী-রচিত প্রণামমন্ত্রটিও যুক্ত হয়ে আরাত্রিক ভজনে স্থানলাভ করে। তবে প্রণামমন্ত্রটি স্তবটির সঙ্গে কবে প্রথম যুক্ত হয়ে গীত হতে শুরু করে তা এখনো জানা যায়নি। শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির পর তাঁর আলোকচিত্র পুরনো ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সিংহাসনের বাঁপাশে স্থাপিত হয় এবং সেসময় থেকে প্রতি সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর দেবীপ্রণাম 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' গাওয়া হতে থাকে।[৩৬]

আবির্ভাব-উৎসব

ঠাকুরঘরে যে-দেবতার পূজা হতো, তাঁরই বার্ষিক আবির্ভাবতিথিতে জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হতো। পরবর্তী রবিবারে সর্বসাধারণের জন্য জনপ্রিয় মহোৎসব উদ্‌যাপিত হতো। আলোচ্য কালে মঠের নিজস্ব জমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। সোমবার ১৩ মার্চ জন্মতিথি পালিত হয় এবং রবিবার ১৯ মার্চ সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ উৎসবের বৈকালিক সভার প্রধান আকর্ষণ ছিল স্বামীজীর উপস্থিতিতে ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা।[৩৭] ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তিথিপূজা ও সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ২০ ফাল্গুন ও ২৮ ফাল্গুন। সাধারণ উৎসবের দিন দেড়শ সঙ্কীর্তন সম্প্রদায় মঠপ্রাঙ্গণকে উৎসবমুখর করে তুলেছিল। কয়েকটি সম্প্রদায় নিজেরা পৃথক পৃথক স্টীমার ভাড়া করে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে উৎসব-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছিল। কমবেশি পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল সে-উৎসবে।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে তিথিপূজা ও সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে ১২ মার্চ, বুধবার ও ১৬ মার্চ (২ চৈত্র), রবিবার। সাধারণ উৎসবের দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত একটি বড় চিত্রপটের সম্মুখে বিভিন্ন সঙ্কীর্তন সম্প্রদায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে বিশেষ বিশেষ গান রচনা করে সে-গান গেয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছিল। এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের উপস্থিতি।

মঠের আবির্ভাব-উৎসবাদির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-মহোৎসবের পরই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব। স্বামীজীর মহাসমাধির পর এদেশের যুবকদের মধ্যে স্বামীজীর স্মরণে এক আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। এ-ঘটনা দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল।

সাড়ম্বরে প্রথম স্বামীজী-জন্মোৎসব মঠে উদ্‌যাপিত হয় ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে। শনিবার ৯ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সকালে গুরুপূজা ও রাত্রে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন রবিবার সাধারণ উৎসবের আয়োজন হয়। পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী বেদ এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পুলিনবিহারী মিত্র প্রমুখ সঙ্গীত-শিল্পীদের কণ্ঠসঙ্গীত ও কনসার্ট শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। মধ্যাহ্নে ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা যুবকদের সচেতন করে তোলে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে। উৎসব-প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীর ফটো লিথো প্রভৃতি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। এদিন দরিদ্রনারায়ণের সেবায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটির সভ্যগণ ও বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ছাত্রগণ।

পরের বছর ২৭ জানুয়ারি বিগত বছরের মতো স্বামীজীর জন্মতিথি-উৎসব এবং ২৯ জানুয়ারি (১৯০৫) রবিবার সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উপরন্তু, পরবর্তী রবিবার ৫ ফেব্রুয়ারি মঠ-প্রাঙ্গণে কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটি এক বৃহৎ জনসভার আয়োজন করে। সেদিন ছাত্র ও অন্যান্যদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশ। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চুনিলাল বসু, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। স্বামীজী-বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক' ও 'সমাধি' বিষয়ক গান করেন পুলিনবিহারী মিত্র। স্বামীজীর রচনাবলীর বিভিন্ন অংশ থেকে পাঠ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের

---

৩৪ স্বামী শুদ্ধানন্দের নোট

৩৫ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পূর্বকাণ্ড, ১৩১৯, পৃঃ ১৬০, পাদটীকা

৩৬ দেবলোকে—স্বামী অপূর্বানন্দ, ১৯৯২, পৃঃ ৫৯

৩৭ 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা অনুসারে এই তথ্য। কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা অনুসারে দেখা যায়, স্বামীজীর উপস্থিতিতে স্বামী অভয়ানন্দ ও 'বসুমতী'-এর সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ' পাঠ করা হয়। তাছাড়াও স্বামী শুদ্ধানন্দ 'স্বামীজীর শিক্ষাপ্রণালী' ও ভগিনী নিবেদিতা 'স্বামীজীর পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচার' শীর্ষক বক্তৃতা করেন। সভার পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এবছর ঠাকুরের জন্মতিথি পড়েছিল বুধবার ৭ মার্চ, ২৪ ফাল্গুন ১৩১১। কোন বিশেষ কারণে পরবর্তী রবিবারের পরিবর্তে তার পরের রবিবার ১৮ মার্চ, ৬ চৈত্র সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হোরমিলার কোম্পানীর স্টীমার অন্যান্য বছরের মতো আহিরীটোলা থেকে যাত্রীদের নিয়ে মঠে যাওয়া-আসা করে। প্রশস্ত ময়দানে সামিয়ানার নিচে ঠাকুর ও স্বামীজীর তৈলচিত্র সাজানো হয়। নীরদবরণ (পরে স্বামী অম্বিকানন্দ) ও সঙ্গীতাচার্য রামলাল দত্ত বেশ কয়েকটি গান করেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা', শ্রীম-র 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যস্নেহ' প্রবন্ধগুলি পাঠ করা হয়। সভাপতি স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোচন'[৩৮] শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। যুবকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা কয়েক বছর পরে ক্ষীণ হতে থাকলে স্বামীজীর জন্মোৎসব বেলুড় মঠে একদিনের সমারোহে সীমিত হয়।

আলমবাজারে মঠ থাকাকালীন শেষ বছরে শ্রীমায়ের জন্মতিথিতে পূজা ও হোমের প্রবর্তন হয়েছিল স্বামী যোগানন্দের উদ্যোগে। শ্রীমায়ের জন্মতিথিতে বিশেষ পূজা ও ঘনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আলোচ্য সময়ের মধ্যে ঠাকুরের অন্য কোন সন্ন্যাসী শিষ্য, এমনকি স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দের মহাসমাধির পর তাঁদের আবির্ভাব-উৎসব প্রবর্তিত হয়নি।

অন্যান্য উৎসব

শ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর শুভ আবির্ভাব-উৎসব ব্যতীত যীশু খ্রীস্টের শুভ আবির্ভাব স্মরণ করে মঠবাসিগণ প্রতিবছর নিজস্ব পদ্ধতিতে খ্রীস্টসন্ধ্যা উদ্‌যাপন করত। ক্রমে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের শুভ আবির্ভাব-উৎসব বাৎসরিক উৎসবের তালিকায় যুক্ত হয়।

অবশ্য এসময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে। শোনা ঘটনাদি যা বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা পড়ে মনে হয়, সেবার মঠবাসিগণের পূজা গ্রহণ করবার জন্যই যেন স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ—এ-দুজনকে মা দুর্গা আগাম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রায় একই সময়ে। প্রতিমাতে জগন্মাতার পূজা হবে—এই সিদ্ধান্ত হতেই মঠবাসিগণ সবাই আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল শ্রীমা ও মহিলা ভক্তদের জন্য। শ্রীমায়ের নামেই পূজার সঙ্কল্প করা হয়েছিল। পূজক ছিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল। তন্ত্রধারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বয়ং শ্রীমায়ের উপস্থিতি মঠবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজী শ্রীমায়ের হাত দিয়ে তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্রকে পঁচিশ টাকা প্রণামী দিয়েছিলেন। পূজার মধ্যে স্বামীজীর বেশ জ্বর হয়েছিল।[৩৯] নবমীর দিন জ্বরের প্রকোপ কিছুটা কম হলে স্বামীজী দুর্গামণ্ডপে কয়েকটি গান গেয়েছিলেন।[৪০] পূজা, হোম, আরতি, জপধ্যান, প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসব সমাপ্ত হয়।

কয়েকদিন পর প্রতিমাতে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। পরবর্তী অমাবস্যার রাত্রে প্রতিমাতে শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ছাগবলিও হয়। খুব সম্ভবত শ্রীমায়ের নিষেধাজ্ঞায় মঠে অনুষ্ঠিত পূজাদিতে এরপর পশুবলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাসাধিক কাল মঠের আকাশ-বাতাস উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। এই মহোৎসবের সুন্দর একটি বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের একটি ইংরেজী চিঠির মধ্যে। সে-চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশঃ "We had grand pujas (worships) here in our Math this year. The biggest of our pujas is the Mother worship, lasting nearly four days and nights. We brought a clay image of Mother with ten hands, standing with one foot on a lion, the other on a demon. Her two daughters—the Goddess of Wealth and the Goddess of Learning and Music—on either side on lotuses; beneath her two sons—the God of War and that of Wisdom.

"Thousands of people were entertained, but I could not see the puja, alas! I was down with high fever all the time. Day before yesterday, however, came the puja of Kali. We had an image, too, and sacrificed a goat and burned a lot of fireworks. This night every Hindu home is illuminated, and the boys go crazy over fireworks.... We had less fireworks but more puja, recitation of Mantras, offering of flowers, food and songs. It lasted only one night."[৪১]

এদিকে মঠে বিধিপূর্বক সন্ন্যাসীদের পূজানুষ্ঠানাদি দেখে স্থানীয় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দীর্ঘকাল লালিত মঠের প্রতি বিদ্বেষভাব অনেকটা কমে যায়। [ক্রমশ]

---

৩৮ এ-প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন'-এর সপ্তম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়। প্রবন্ধের নতুন নাম হয়—'ঠাকুরের মানুষভাব'।

৩৯ শ্রীমায়ের মুখেই শোনা যায় ঘটনাটিঃ "পূজার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা খাটছে। নরেন এসে বলে কি, 'মা, আমার জ্বর করে দাও।' ওমা! বলতে না বলতে খানিকবাদেই হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি, 'ওমা, একি হলো, এখন কি হবে?' নরেন বললে, 'কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এই জন্য যে ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবুও কোথায় ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসব, তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বললুমঃ 'ও নরেন, এখন তাহলে ওঠ।' নরেন বললে, 'হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি!' এই বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল।"

৪০ ব্রহ্মানন্দচরিত, ২য় সং, পৃঃ ১৩৫ ৪১ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IX, p. 169

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ ঃ 'বাঁশবেড়িয়ার রাজা মহাশয়েরা'

'উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষের অগ্রহায়ণ ১৪০৫ সংখ্যায় নিরঞ্জন চক্রবর্তীর 'বাঁশবেড়িয়ার রাজা মহাশয়েরা' প্রবন্ধটি পাঠ করে আনন্দ পেলাম। 'উদ্বোধন'-এর গত ৯৮তম বর্ষের প্রতিটি সংখ্যার প্রচ্ছদে হংসেশ্বরী-মন্দিরের আলোকচিত্র ও প্রচ্ছদ-পরিচিতি আমার এবং লেখকের মতো বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাটির জন্যও একদিকে চক্রবর্তী মহাশয়, অপরদিকে 'উদ্বোধন'-সম্পাদক মহারাজের প্রতি আমার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জানিয়ে উক্ত প্রবন্ধে কয়েকটি তথ্যগত ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১) সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সনদ অনুসারে রাজা রামেশ্বরদেব 'রায় মহাশয়' খেতাব লাভ করেন ১০ শফর ১০৯০ হিজরী অর্থাৎ ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে—লেখকের মত অনুসারে '১০৬৬ হিজরীর ১২ই রুবি' অর্থাৎ '১৬৪৯' খ্রীস্টাব্দ নয়। ঐসময় রাজা রামেশ্বরদেবের পিতা রাঘব রায় সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে 'চৌধুরী' উপাধি লাভ করেছিলেন।

(২) লেখক বলেছেন, ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে রাঘব রায় বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই তথ্যটিও ঠিক নয়। রাঘব রায় নয়, তাঁর পুত্র রাজা রামেশ্বরদেব রায় বিষ্ণুমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। বিষ্ণুমন্দিরে একটি প্রস্তরফলকে (যা আজো বর্তমান) স্পষ্ট উৎকীর্ণ আছে—

"মহীব্যোমাঙ্গ শীতাংশু গণিতে শক বৎসরে
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরং। ১৬০১ [শক]"

১৬০১ শকাব্দ হলো ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দ। শকাব্দের সঙ্গে '৭৮' যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়।

(৩) লেখক বলেছেন, ১৭৮৮-৮৯ খ্রীস্টাব্দে রাজা নৃসিংহদেব ছোট কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হলো—মন্দিরটি কালীমন্দির নয়, নৃসিংহদেবের স্বপ্নদৃষ্ট অষ্টভুজা দুর্গার মন্দির বা মহিষমর্দিনীর মন্দির। স্বপ্নদর্শনের পর নৃসিংহদেব রাজবাড়ির সংলগ্ন বাগানে একটি পুকুর কাটান এবং মাটির তলা থেকে স্বপ্নে প্রাপ্ত দৈবাদেশ অনুসারে মহিষমর্দিনীর শ্বেতপাথরের মূর্তি উদ্ধার করেন। স্বয়ং উদ্ভবা বলে দেবীর নাম হয় 'স্বয়ম্ভবা'। উক্ত মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পাথরের প্রতিমা অক্ষত অবস্থায় আজও হংসেশ্বরী-মন্দিরে বর্তমান। মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৭১০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিন। এ-সম্পর্কে মূল মন্দিরের দরজায় একটি শ্লোক উৎকীর্ণ ছিল।

(৪) নৃসিংহদেব ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে উড়িষ্যার মানচিত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটি উড়িষ্যার মানচিত্র ছিল না, ছিল বঙ্গদেশের মানচিত্র। উক্ত কাজের জন্য হেস্টিংস অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং নৃসিংহদেবকে বড় অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার প্রদান করেন। হেস্টিংস-এর পারসী ভাষার শিক্ষক এবং পরবর্তী কালে তাঁর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (যিনি ছিলেন পাইকপাড়া রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা) সেই পুরস্কারের অর্থের বিনিময়ে 'ধানঘাটা' নামে একটি পরগনা, যা অধুনা ডায়মন্ডহারবারের কাছাকাছি ছিল, নৃসিংহদেবকে লিখে দেন। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পরগনাটি বাঁশবেড়িয়ার দেবরায় পরিবারের অধিকারে ছিল।

(৫) লেখক বলেছেন, 'উড়িষ্যা-তন্ত্র' গ্রন্থটির বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন নৃসিংহদেব। কিন্তু নৃসিংহদেব-অনূদিত গ্রন্থটির নাম 'উদ্দীশতন্ত্র'। এটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ওপর একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি নৃসিংহদেব বাঙলা পদ্যে অনুবাদ করেন। শম্ভুচন্দ্র দে তাঁর বিখ্যাত 'The Bansberia Raj' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "Even the medical science of the day had received his attention and he translated a book on the subject named *Uddish-Tantra* into Bengali verse, so as to familiarise it with general public." [p. 45]

সম্প্রতি কাশীর ওপর গবেষক এবং 'বারাণসীর ইতিকথা' গ্রন্থের লেখক ডঃ তপন ঘোষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে মনে হয়, গ্রন্থটি অনুবাদগ্রন্থ নয়, ওটি ছিল নৃসিংহদেবের অন্যতম মৌলিক রচনা। মূলত গ্রন্থটি ছিল তন্ত্রের ওপর লিখিত এবং দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি ছিল তন্ত্রের প্রবৃত্তিমার্গের ওপর রচিত, যা শারীরতত্ত্ব-কেন্দ্রিক (Anatomical and Physiological Science) এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি ছিল নিবৃত্তিমার্গের ওপর, যা একান্তভাবেই তন্ত্রমতে যোগসাধনার বিষয়।

(৬) লেখক জানিয়েছেন, দেবী হংসেশ্বরীর মূর্তি নির্মিত হয়েছিল নৃসিংহদেবের পরিকল্পনা অনুসারে। কথাটি ঠিক নয়। মায়ের ঐ রূপ তাঁর কল্পনাসৃষ্ট ছিল না, ছিল ধ্যানলব্ধ। জগজ্জননী তাঁকে ধ্যানে ঐরূপেই দর্শনদান করেছিলেন।

(৭) লেখক রাজা মহাশয়দের যে বংশতালিকা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক নয়।

(৮) লেখক বলেছেন, নৃসিংহদেব ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে হংসেশ্বরী-মন্দিরের কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হলো—তিনি মন্দিরের কাজ আরম্ভ করেছিলেন ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে।

লেখকের আরেকটি ভুল প্রবন্ধের ৪ নং পাদটীকায় সংশোধন করে দিয়েছেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক। মহাদেবের নাভিপদ্ম থেকে নয়, হৃদ্‌পদ্ম থেকে দেবী হংসেশ্বরী উত্থিত হয়েছেন।

(৯) নিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ "সিংহদ্বার থেকে বকুলবীথিতে সুসজ্জিত পাঁচটি প্রশস্ত পথ মন্দির ও প্রাসাদে

পৌঁছেছে।" বকুলবীথিতে সুসজ্জিত এবং প্রশস্ত পথ একটিমাত্রই ছিল এবং এখনো আছে বড় রাস্তা থেকে সিংহদ্বার পর্যন্ত। বকুলবীথি দিয়ে ঐ পথ সাজিয়েছিলেন নৃসিংহদেব স্বয়ং। সে-পথ আজও আছে, তবে বকুলবীথি সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে ১৯৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে। আর সিংহদ্বার থেকে পাঁচটি পথ নয়, দুটি পথের একটি প্রবেশ করেছে মন্দিরের দিকে, অপরটি রাজপ্রাসাদের দিকে। বাকি সবদিক পরিখা দিয়ে ঘেরা।

তপন চট্টোপাধ্যায়
পুরোহিত, হংসেশ্বরী-মন্দির
বাঁশবেড়িয়া, জেলা—হুগলী
পিন ঃ ৭১২৫০২

শারদীয় 'উদ্বোধন' ঃ ১৪০৫

শারদীয় 'উদ্বোধন' ঃ ১৪০৫ এককথায় অনবদ্য। প্রবন্ধ, কবিতা, শ্রুতিনাটক, সমাজদর্শন, বিজ্ঞান, বিশেষ নিবন্ধ—প্রতিটি বিভাগ বিষয়বৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য, সুনির্বাচিত। দেবী দুর্গা সম্পর্কিত রচনাগুলি, 'ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে' এবং 'নতুন গবেষণা' বিভাগের রচনা পাঠকমাত্রকেই প্রেরণা প্রদান করবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মহাসমাধিতে দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্তের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্যই প্রতিফলিত হয়েছে সম্পাদকের প্রারম্ভিক প্রবন্ধে। তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলি সম্বন্ধে নানা কথা মনে আসছে। সংক্ষেপ করার জন্য কয়েকটি বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছি। লেখকদের অনেকেই সুপরিচিত—বাঙলা ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনে তাঁদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

প্রথমে কবিতা প্রসঙ্গে আসা যাক। সবগুলিই ভাষা, ভাব ও ছন্দে হৃদয়গ্রাহী। মনে দাগ কেটে রেখেছে রতন রায়ের—"তোমার নীরব উপস্থিতি/আমার শুভ কামনায়"; সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সতর্কবাণী—"শান্তিকে পাবে না খুঁজে হৃদয়ের কালোবাজারেতে"; নচিকেতা ভরদ্বাজ নির্দেশ দিয়েছেন—"ফুল ফোটাতেই হবে আমাদের সমৃদ্ধ বাগানে"; শিখা বসু রায় আঁখি মুছে নিতে বলে বলেছেন—"বিশ্বাস আর ভালবাসার ডানাদুটো হারিও না কখনো"; নিমাই মুখোপাধ্যায়ের উপলব্ধি—"যেদিন স্থির হতে পারব/সত্যের সন্ধান পাব"। এককথায় বলতে পারি, কবিতাগুলি সত্যিই অভিনবত্বের দাবি রাখে।

নিবন্ধ-প্রবন্ধরাজির মধ্যে প্রথমে বলতে হয় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নিমাইসাধন বসুর 'শতবর্ষ পূর্বে ও পরে স্বামী বিবেকানন্দ' নিবন্ধটির কথা। তাঁর মতে—"একবিংশ শতাব্দীর ভারতকে নতুন করে স্বামীজীকে আবিষ্কার করতে হবে।" আশা রাখি, বর্তমান ভারতের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা এই বক্তব্য অনুধাবন করতে বিশেষভাবে প্রয়াসী হবেন। একইসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় 'সমাজদর্শন' বিভাগে ঐতিহাসিক হোসেনুর রহমানের 'সমাজ, সংস্কৃতি, সংহতি' শীর্ষক নিবন্ধটির। নিবন্ধের উপসংহারে তাঁর মননগভীর মন্তব্য—"একটা কীর্তি, একটা চিহ্ন, একটা দাগ রেখে যাওয়া চাই—এই হলো আধুনিক মানুষের আধুনিক প্রার্থনা।" স্বামীজীর কথার প্রতিধ্বনি করেই তিনি আমাদের সচেতন করেছেন।

স্বামীজীর কুমারীপূজা করার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন স্বামী অচ্যুতানন্দ। তাঁর লেখাতেই জানতে পারি, স্বামীজী নিজে যে কয়েকজন কুমারীকে পূজা করেছেন, তার প্রথমজন (১৮৯০) কুমারী মণিকা রায়—যিনি পরবর্তী কালে সর্বজনপরিচিতা হয়েছিলেন সাধিকা 'যশোদা মা' নামে। আবার বারমুল্লার এক মুসলমানের ছোট্ট মেয়েকেও তিনি কুমারীরূপে পূজা করেছিলেন। একটি কথা—১৯০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে বেলুড় মঠে শ-খানেক কুমারী পূজিতা হয়েছেন। পরবর্তী কালে তাঁদের জীবনধারা কিভাবে কেটেছে—সেবিষয়ে একটি তথ্যমূলক সমীক্ষা মূল্যবান গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

বিজ্ঞান বিষয়ে দীপঙ্কর দাশগুপ্তের 'পেটেন্ট, বায়োপাইরেসি ও নয়া আগ্রাসনবাদ' একটি অসাধারণ আলোচনা। পেটেন্ট ও বায়োপাইরেসি সত্যিই সাম্প্রতিক কালের এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, যা বাস্তবিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীদাশগুপ্তের সময়োচিত সাবধানবাণীর জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। পেটেন্ট নেওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অনীহার কথা আমাদের জানা। বিশেষ করে মনে আসে জগদীশচন্দ্রের কথা—আধুনিক যুগে ভারতের বিজ্ঞান-গবেষণার পথিকৃৎ হিসাবেই যাঁর বিশ্বখ্যাতি। ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে তিনি বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ (বর্তমানে 'মাইক্রোওয়েভ' নামে পরিচিত) প্রথম আবিষ্কার করেন। এই তরঙ্গের প্রকৃতি এবং ব্যবহার নিয়েও তিনি গবেষণা করেন। টাউন হল-এ তৎকালীন গভর্নরের উপস্থিতিতে এক ঘর থেকে অপর ঘরে বেতারে একটি পিস্তলকে সক্রিয় করে দেখান। বেতারে সঙ্কেত পাঠানোর প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই। অনেকেই তাঁকে পেটেন্টের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল—আমার আবিষ্কারকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে ব্যবহার করতে চাই না। জানা যায়, কয়েক বছর বাদে তাঁর অন্য একটি আবিষ্কার পেটেন্ট করা হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার প্রচেষ্টায়। কালের সঙ্গে সঙ্গে এখন অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গি পালটাচ্ছে—আমাদের বিজ্ঞানীরা পেটেন্ট নিচ্ছেন। দীপঙ্করবাবু বায়োপাইরেসি ও নয়া আগ্রাসনবাদ সম্বন্ধে আমাদের সামনে যে-তথ্য তুলে ধরেছেন তা অতি ভয়ঙ্কর। অতীতে বিদেশীরা ভারতে এসেছিল আমাদের নানাবিধ সম্পদ আহরণ করতে। এখন দেখছি, তারা ঘরে বসেই আমাদেরই

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে পেটেন্ট করে নিচ্ছেন নিজেদের নামে। এসব ঘটনার তীব্র প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ ভারতবাসী হিসেবে আমাদের বিরাট দায়িত্বের কথা লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে উত্থাপন করেছেন। এপ্রসঙ্গে ডক্টর মাশেলকারের সাম্প্রতিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এটা জাতীয় সমস্যা—একক প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, চাই সম্মিলিত আন্দোলন। Medicinal Plants ভারতের এক অমূল্য সম্পদ—বৈদিক যুগ থেকেই এদের ব্যবহার চলে আসছে। সাম্প্রতিক কালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ অসীমা চ্যাটার্জীর সম্পাদনায় Council of Scientific & Industrial Research (C.S.I.R) ছয়টি সুবৃহৎ খণ্ডে বেশ কয়েক হাজার ওষধির ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়েছে। উপরন্তু National Institute of Science Communication (NISCOM-CSIR) বিস্তৃত বিবরণ সমৃদ্ধ The Treatise on Indian Medicinal Plants (5 vols.) এবং Compendium of Indian Medicinal Plants (4 vols.) দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে (edited by Drs. R. P. Rastogi & B. N. Mehrotra)।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাতেও প্রকাশিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। ভাবতেও অবাক লাগে, আমাদের এতসব থাকা সত্ত্বেও কি করে 'নয়া আগ্রাসনবাদ' সম্ভব হচ্ছে! স্বামীজীর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধটির সমাপ্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের লেখা 'কথাপ্রসঙ্গে' ('উদ্বোধন', আষাঢ় ১৪০৫)। বিষয়—'পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারত বিশ্বে প্রথম সারিতে'। ভারতের সাম্প্রতিক পরমাণু বোমা (ফিশন এবং ফিউশন) বিস্ফোরণ-পরীক্ষার সাফল্যে দেশে ও বিদেশে তর্কবিতর্কের ঝড় উঠল—অনেকেই গর্জে উঠল তীব্র প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে দীক্ষিত, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর হৃদয় ব্যথিত হলো। বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে লিখলেনঃ "প্রয়োজন ছিল সেই সাহসী মনোভাব ও পদক্ষেপের, যাহাতে বৃহৎ শক্তিবর্গ ভারতের উপর সর্ববিষয়ে মাতব্বরির মানসিকতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং ভারতকে তাহার আপন কৃতিত্বেই তাহাদের সমগোত্রীয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।" স্মরণ করিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—"কামড়াইবে না, কিন্তু ফোঁস করিবে।" নয়া আগ্রাসনবাদ রুখতে ভারতবাসী হিসাবে আমাদের আশু কর্তব্য তীব্রভাবে 'ফোঁস' করে উঠে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করে তোলা।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণের মথুর', শ্যামলী মহাপাত্রের 'রানী রাসমণিঃ বিস্মৃত এক মহীয়সী', বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কথামৃতের কবি শ্রীম' প্রভৃতি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। কিষাণচাঁদ ভকতের 'নতুন গবেষণা'—'আনন্দমঠ—স্থান কাল পাত্র' এবং তাপস বসুর গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'উদ্বোধন বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা'—সত্যিই আমাদের ভাবায়। দুটি লেখাই দুটি ঐতিহাসিক দলিল।

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক
ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া ১৪০৫ সংখ্যা সর্বার্থে একটি অনবদ্য সঙ্কলন। প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, কবিতা, গবেষণাধর্মী নিবন্ধ, আলোচনা ইত্যাদি নানাবিষয়ক উপাদানে সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি আমাদের কাছে একটি অতি মূল্যবান উপহার।

'কথাপ্রসঙ্গে' সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভারতের পূজা-উপাসনার মূলতত্ত্ব যা আত্মজাগরণ ও আত্মোপলব্ধির বাণীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ 'স্বারাজ্য প্রাপ্তি' বা 'স্বারাজ্য সিদ্ধি'—এই তত্ত্বটি অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যথার্থ সময়োপযোগী হয়েছে। আজকের দিনে যেখানে পূজার নামে আধ্যাত্মিকতাবর্জিত নানাবিধ বাহ্য আড়ম্বরে বেশির ভাগ বারোয়ারি পূজামণ্ডপ সজ্জিত তাতে পূজার মূল উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ব্যাহত। দুর্গোৎসব পরিণত হয়েছে শারদোৎসবে। পূজা গৌণ। শারদোৎসব প্রতিযোগিতার নামে চালু হয়েছে 'শারদসম্মান' পুরস্কার। বাহ্য আড়ম্বর যথা—মণ্ডপ ও আলোকসজ্জা, প্রতিমার প্রথাবহির্ভূত নব নব রূপায়ণ এবং অলঙ্করণ ইত্যাদি বিষয়ে এই প্রতিযোগিতা। 'শারদসম্মান' পাওয়ার আশায় এইসব বাহ্য আড়ম্বর নিয়েই যুবসম্প্রদায় আজ মত্ত, বিভ্রান্ত। বারোয়ারি পূজা বা শারদোৎসবে চাঁদার জুলুম বন্ধ করার একদিকে আছে কড়া সরকারি নির্দেশ, অপরদিকে আছে মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যয়বহুল প্রতিযোগিতার প্রশ্রয়দান। কেবলমাত্র স্বেচ্ছাদানের ওপর নির্ভর করে এতসব আয়োজন করা সম্ভব কি?

পূজার আসল উদ্দেশ্য—'স্বারাজ্য প্রাপ্তি' বা 'স্বারাজ্য সিদ্ধি'। এসব নিয়ে চিন্তা করবে কে? মা দুর্গাকে আরাধনা করা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা—মা আমায় মানুষ কর—এ-ভাব আসবে কোথা থেকে? যাতে সে-ভাব না আসে সেই অশুভ চেষ্টাই তো মনে হয়, নানাদিক থেকে নানা উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে! ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ রূপান্তরিত হয়েছে ধর্ম-উপেক্ষায় এবং নাস্তিক্যবাদে তথা নৈরাজ্যে।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেনঃ "আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য, এমনকি জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ বা সতেজ হয় তবে সকল বিষয়ে কল্যাণ হইবে।" স্বামীজী আরো বলেছেনঃ "ভারতের পক্ষে কাজ করিবার ইহাই (ধর্ম) একমাত্র উপায়—প্রথমে ধর্মের দিকটা দৃঢ় না করিয়া এখানে অন্য কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টা করিতে গেলে সর্বনাশ হইবে।"

আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীন ভারতে স্বামীজীর বাণী আজও উপেক্ষিত। দেশের অভ্যন্তরে সর্বনাশ আজ সর্বব্যাপী।

তবে স্বামীজী এও বলে গেছেন যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পঞ্চাশ বছর সমাজে চরম অবক্ষয় চলবে। তারপর ঘটবে গৌরবময় পুনরুত্থান। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের দিন ফুরিয়ে এসেছে। স্বামীজীর বাণী নিষ্ফল হয়নি। হবে না। হতে পারে না।

আজকের এই অবক্ষয়ের দিনে 'উদ্বোধন'-এর বলিষ্ঠ কণ্ঠ আরো শক্তিশালী হোক—এই আমাদের প্রার্থনা। সর্বপ্রকার বিভ্রান্তি এবং কুটচক্রজাল ছিন্ন করে ভারতীয় ঐতিহ্য-সচেতন এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় যুবসমাজ এইভাবেই গড়ে উঠবে, এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা
সল্ট লেক
কলকাতা-৭০০ ০৬৪

কিয়োটো আর তপস্বী আজারি সান

রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

চৈত্র-বৈশাখের কিয়োটো। এই সময় সারা শহর সাকুরা ফুলে ভর্তি থাকে। খুবই স্বল্পায়ু এই ফুল। বৈশাখের মাঝামাঝি সব শেষ হয়ে যায়। নিপ্পন বা জাপানকে বলা হয় 'প্রভাত সূর্যের দেশ'। এ হলো বিজ্ঞানের কথা, ভুগোলের কথা। কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ যখন 'চেরি ব্লসম' দেখে মুগ্ধ হয়, রাত্রে

আরাশিয়ামায় বেন তেন সামা (দেবী সরস্বতী)

চাঁদের আলোর সঙ্গে সাকুরা ফুলের সৌন্দর্য দেখে, সে মনে মনে বলে ওঠে—নিপ্পন হলো নিশীথের আলোকবর্তিকা। সারা গাছ জুড়ে তাদের ভালবাসার লীলা। তবে কিয়োটোতে শুধু সাকুরা আর সবুজের সমারোহ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেলে অন্য অনেক কিছুই বলা হবে না। চেরি ফুলের আয়ু তো সপ্তাহ তিনেক। তারপর সব শেষ! মাটিতে যখন বিছিয়ে থাকে, 'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন' গেয়ে উঠতে হয় মনে মনে। কিন্তু সারা বছর তাহলে কি নিয়ে থাকে মানুষ? সবুজ পাতা শুকিয়ে গিয়ে লাল হলো শীতে, সেও অপরূপ। তবে বসন্তের বিলাপ করব না সাকুরা বিদায় নিলেও। সারা কিয়োটোকে ঘিরে রয়েছে পাহাড়। ঘন সবুজ বন দুপাশে, আর রয়েছে বিশাল বিশাল গগনচুম্বী যত আদিম মহা দ্রুম। অদ্ভুত শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য। কোন কোন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রয়েছে সুপ্রাচীন সব বুদ্ধমন্দির। নিন্নাজি পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই আর ৮৮ মন্দির, আরাশিয়ামায় দেবী সরস্বতীর মূর্তি (বেন তেন সামা) সত্যই মুগ্ধকর। আবার কিয়োটো থেকে বেশি দূরে নয় বুক্কাকুজি মঠ। জেন (Zen)-গুরু রোজি সামা এখানেই থাকেন। 'Zen' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'ধ্যান' থেকে। রোজি সামার বয়স এখন ৭৫, কিন্তু শরীর অত্যন্ত সুঠাম এবং আকৃতি খুবই দৃপ্ত। দেশ-বিদেশ থেকে বহু মানুষ তাঁর কাছে আসে মনঃসংযোগ আর ধ্যান শিক্ষা করতে। এরকম অসীম প্রশান্তি মনে হবে আর কোথাও নেই। বুক্কাকুজি যাওয়ার রাস্তাটিও খুব চমৎকার। রাস্তার দুধারে পাহাড় আর বৃক্ষরাজি।

মঠে বুদ্ধের নানারকম মূর্তি রয়েছে। এক জায়গায় পাথরের ছোট্ট ফলকে লেখা রয়েছে তিন লাইনের ছোট্ট কবিতা। এইরকম তিন লাইনের কবিতাকে বলে 'হাইকু'। অদ্ভুত সংযম অথচ গভীর ব্যাপ্তি আর জীবনবোধের পরিচয় পাই এরকম কবিতায়। দার্শনিক উপলব্ধির সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন কবিরা। বুক্কাকুজির স্বপ্নের জগৎ আরো স্বপ্নময় করে তুলেছিল হায়েজান (HIÉZÃN) পাহাড়ের স্মৃতি। সেখানে গিয়েছিলাম ১৯ এপ্রিল ১৯৯৮, রবিবার। জাপানের অন্যতম প্রাচীন বুদ্ধমন্দির রয়েছে এখানে। নিপ্পনের রাজা এই মন্দিরকেই প্রথম পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। সুবিশাল সুপ্রাচীন এই মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র অদ্ভুত সুন্দর সুবাসে মন ভরে ওঠে। বহু পুরনো কাঠের গন্ধ

বুক্কাকুজি মঠ

আর ধূপের গন্ধ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই স্বর্গীয় আঘ্রাণ। আলো-আঁধারি গর্ভমন্দিরের সামনে বসে অনুভবের মধ্যে আনতে রোমাঞ্চ লাগে পুরনো সেই দিনের কথা—যেদিন এখানে ভিক্ষুরা সারিবদ্ধ হয়ে বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। আজও মনোযোগ সহকারে পাঠ, ব্যাখ্যা করে থাকেন তরুণ ও প্রবীণ ভিক্ষুবৃন্দ। বুদ্ধমূর্তির সামনে হালকা মোমবাতির আলো আর সামান্য কিছু ফল। ধূপের নম্র গন্ধে রচিত এক অপার্থিব পরিবেশ। মন্দির-চত্বরে কোথাও ছবি তোলা যাবে না। এক প্রবীণ সন্ন্যাসী এই মন্দিরের ইতিহাস বলে চলেছিলেন। যতক্ষণ মন্দির পরিক্রমা করেছি, সেই পুরনো কাঠের মনমাতানো সুবাস নাকে এসেছে। কিছু বই, মালা, হোমের কাঠ ইত্যাদি রয়েছে। যাঁরা কিনতে চান কিনতে পারেন। মন্দির-চত্বরের বাইরে রয়েছে পাথরের ফলক, তাতে বুদ্ধের বাণী খোদাই করা। কিছুদূরে আরেকটি ঘরের মধ্যে রয়েছে স্বর্ণাভ বুদ্ধমূর্তি আর তার নিচে ১০৮টি গোলাকৃতি বল। সবগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বুদ্ধমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করছেন সবাই। এই ঘর এবং বুদ্ধমূর্তি প্রাচীন নয়, নতুন। পাহাড়ের প্রবেশদ্বারের কাছে রয়েছে সুবিশাল ঘণ্টা। অতিকায় একটি কাঠের গুঁড়ি দিয়ে সেই ঘণ্টাকে আঘাত করলে গুরুগম্ভীর আওয়াজ হয়। আরো একটি মন্দিরকক্ষ রয়েছে এই বিশাল ঘণ্টা থেকে খানিক দূরে। অনেক ছবি টাঙানো রয়েছে প্রবীণ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের, বুদ্ধের শিষ্যদের। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সারিপুত্ত, আনন্দ প্রমুখ। আরেকজন রয়েছেন যিনি শুধু গান গেয়ে বুদ্ধের ভজনা করেছেন। এখানে একটা কথা বলা দরকার, এই পাহাড়ের প্রবেশদ্বারে পয়সা দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি শুনে প্রবেশ-নিয়ন্ত্রক হাসিমুখে আমাকে এবং আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন প্রত্যেককেই প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন বিনামূল্যে। যিনি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, ঐ অঞ্চলে তাঁর পরিচিতি থাকায় আমরা হয়তো এই সুবিধা পেয়েছিলাম।

এরপর ধীরে ধীরে আমরা নেমে এসেছিলাম পাহাড়ের ঢালু পথে, বিশাল বৃক্ষরাজির প্রাচীনত্ব অনুমান করতে করতে। শুনলাম, সাঁইত্রিশ বছরের তরুণ তপস্বী ব্রহ্মচারী আজারি সান থাকেন নিভৃতে, পাহাড়ের উপত্যকায়। বেশি লোকজন পছন্দ করেন না। আমরা তাঁর দর্শন প্রার্থনা করেছিলাম। ভারত থেকে আসছি জানতে পেরে আপত্তি করেননি। পরে খুব খুশি হয়েছিলেন আমাদের দেখে, নিজের হাতে সবুজ চা করে খাওয়ালেন। সাথে ছিল সামান্য মিষ্টি এবং শক্ত মিষ্টি কেটে খাওয়ার জন্য চীনেমাটির প্লেটে ছোট্ট বাঁশের ছুরি। বেশ মজার দেখতে। পরিবেশনের মধ্যে ছিল পরিপূর্ণ আন্তরিকতা। আজারি সান অত্যন্ত বিনয়ী। হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন, সামনে কাঠের কমণ্ডলু। শুনেছি, পাহাড়ের অরণ্যে নয়দিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে শুধু তপস্যা করেছেন। এইরকম তপস্যার শেষে তিনি 'আজারি' উপাধি লাভ করেছেন। হাজার রকমের তপস্যার মধ্যে এ হলো শুধু একরকম। আরো কত রকমের তপস্যা রয়েছে! উনি একদিনেই চল্লিশ মাইল হেঁটে শহরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। নানান অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে তিনি সিগারেট ধরালেন, বললেন আরো অনেক কথা—যখন রাত্রে জঙ্গলে চলাফেরা করেন তখন অদ্ভুত অনুভূতি হয় তাঁর। অন্ধকার একেবারে নিশ্ছিদ্র হলেও নিঃশব্দ নয়। রাত্রের নানারকম আওয়াজ রয়েছে—জীবজন্তুর ডাক, পোকামাকড়ের চলাফেরা সবই কিরকম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিন গভীর রাতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পায়ে কিছু লেগে চমকে উঠেছিলেন তিনি। দেখেন মানুষের দেহ, তবে মৃত নয়—কেউ পাহাড়ে উঠেছিল, ক্লান্ত হয়ে শুয়েই পড়েছে। তবে উনি না দেখলেও কোন কোন

পর্বতগাত্রে 'হাইকু'

সন্ন্যাসী মরদেহ দেখেছেন বললেন। রাতের সৌন্দর্য যেমন গভীর তেমনি কুহকী। জঙ্গলে ঘোরাফেরার জন্য এক বিশেষ ধরনের চটি তৈরি হয়। দেখে মনে হবে শুকনো খড়জাতীয় কিছু। দেখলাম এক জায়গায় এরকম বেশ কিছু ব্যবহৃত চটি টাঙানো রয়েছে। ইচ্ছা ছিল পরে দেখি, কিন্তু সঙ্কোচ হলো। তাই আর পরা হয়ে ওঠেনি।

আজারি সান চাইছিলেন ওঁকে প্রশ্ন করি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, জাপানীরা সম্বোধন অর্থে 'সান' ব্যবহার করে, অনেকটা আমরা যেমন 'বাবু' বলি তেমনি। তবে তফাৎ একটাই—'বাবু' মেয়েদেরকে বলা যায় না, কিন্তু 'সান' ছেলে বা মেয়ে উভয়কেই বলা যেতে পারে। সবাই নানারকম কথাবার্তা বলছিল। মাঝেমধ্যে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কিছুটা ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করি ঃ "শান্তি চাইলে অন্যায় মেনে নেওয়া ভাল, না যেকোনরকম অবস্থাতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত?" আমার প্রশ্ন শুনে খুব বিনয়ের সঙ্গে উনি হাসলেন। তারপর বললেন ঃ "এত শক্ত প্রশ্ন আমি আশা করিনি। সংসার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। পাহাড়ের কোলে বুদ্ধ-মন্দিরেই আমার জন্ম। ছোট থেকে সংসার কোনদিন দেখিনি। তাই অশান্তির স্বরূপ সম্পর্কে ঠিকমত জানি না। বহু শাস্ত্র পাঠ করলেও আরো অনেক পড়াশুনা বাকি রয়েছে। তারপর এক-সময় হয়তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি দিতে পারব। তবে কোনকিছু না ভেবে একদম ব্যক্তিগত ধারণা থেকে বললে বলা যায়, যেকোন অবস্থাতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাকেই সঠিক কর্তব্য বলে আমি মনে করি।" ওঁর কথা শুনে আমার তখন মনে পড়ছিল সত্তর দশকের রাজনৈতিক স্লোগানের কথা। সাদা দেওয়ালে লাল রং দিয়ে লেখা থাকত সুকান্তর কবিতার সেই বিখ্যাত পঙ্ক্তি ঃ "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।" ঐ অসীম শান্ত বৌদ্ধিক পরিবেশে এসব চিন্তা মাথায় আসা একেবারেই অবান্তর। কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল ওঁর উত্তর শুনে। প্রতিবাদী চেতনা একজন সন্ন্যাসীর বুকেও সম্যক্‌ভাবে বিদ্যমান, তার জন্য রুশ বিপ্লব জানার দরকার হয় না, মানুষ হলেই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, 'মান' আর 'হুঁশ' থাকলেই হয়। পরে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলাম ঃ "জানার নেশা, জ্ঞান-পিপাসা—এর তো শেষ নেই, কিন্তু একসময় এসব থামিয়ে ঈশ্বরের প্রতি শরণাগত হওয়াই কাম্য, কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, স্থানকালের অতীত। কিন্তু আমার অন্তরের এই সৎ নেশাকে আমি থামাবই বা কেন? যদিও সৎ অসৎ চিন্তারও অতীত তিনি, তবুও এ-প্রশ্ন রয়ে যায়।" খুব শান্ত-ভাবে আজারি সান উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "যতক্ষণ আপনার জানার নেশা রয়েছে, ততক্ষণ আপনি তাকে অবদমিত করে রাখবেন না। কিন্তু আপনার ইচ্ছা যখন করবে না, তখন জানতেই হবে এই দায়বোধ থেকে জানার চেষ্টা না করে শরণাগত হওয়াই কাম্য।" আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আমি তখনো জানতাম না ওঁর বয়স সাঁইত্রিশ বছর। চেহারা এতটাই দীপ্ত যে, আন্দাজ করেছিলাম সাতাশ-আঠাশ বছর হবে। ছবি তুলতে চেয়েছিলাম। জানালেন, বিশেষ উৎসাহ নেই। চলে আসার সময় তিনি উপহার দিয়েছিলেন সুগন্ধি ধূপ আর একখানা বই। বই ভর্তি ওঁর ছবিগুলি দেখে বুঝলাম প্রচারও পেয়েছেন যথেষ্ট। তবে ঐটুকুই। কোন আত্মম্ভরিতা নেই। বেশি লোকজনের আনাগোনাও নেই। শুধু অনাবিল প্রশান্তি রয়েছে ওঁকে এবং ওঁর আশ্রমকে ঘিরে। তাই আশ্রম থেকে ফিরে আসতে মন চাইছিল না। আসার পথে কয়েকটা পাহাড়ী বাঁদর চোখে পড়ল। মনটা ভারি হয়ে ছিল। ভাবছিলাম, কিছুদিন পরে নেমে আসব অনেক নিচু জমিতে, ধুলো ধোঁয়া আর কোলাহলমুখর কলকাতায়। প্রচণ্ড গরমে গলদঘর্ম হয়ে কাজ করব আর মনে করব 'প্রভাত সূর্যের দেশ'-এ ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে পাহাড়ী উপত্যকায় অরণ্যের কোলে অনাবিল প্রশান্তিতে জ্বলজ্বল করছেন আজারি সান। প্রতিনিয়ত যুদ্ধের মাঝে এইটুকুই শুধু শান্তি। ❑

নিম্নাজি পাহাড়ে পাথরের ফলক

চির নবীন, চির নূতন, ভাস্বর বৈশাখ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার যখন খুব মন খারাপ হয় আমি তখন স্বামীজীর জীবনী পড়ি। বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়। তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি দিনের ইতিহাস। কারণ, আমি কাঁদতে চাই, আমি তাঁর কাছে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি চাই। তিনি যে ক্রুশ বহন করেছিলেন, আমি সেইটিকে বহন করতে চাই। আমরা চোখ উলটে, হাত নেড়ে খুব বলি—স্ট্রাগল, ফাইট, সাফারিং। স্বামীজীর মতো 'সাফার' কে করেছিলেন! বাগবাজার থেকে প্রমদাবাবুকে লিখছেন : "ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫।৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট, বিশেষ কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না।" স্বামীজী কখন লিখছেন? শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসান হয়েছে। কাশীপুর উদ্যানবাটীর পাট উঠে গেছে। গৃহী ভক্তরা সব সরে গেছেন। বরানগরের এক প্রাচীন গৃহে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ কয়েকজন নরেন্দ্রনাথকে নেতা করে দানা বাঁধার চেষ্টা করছেন। অনেকের মধ্যেই বিষণ্ণতা, হতাশা। আর কি হবে! এবার না হয় ফিরেই যাই পূর্বাশ্রমের পরিচিত পেটানো জীবনে! সেইসব দিনের শূন্যতার বিবরণ মাস্টারমশাই লিখে গেছেন তাঁর নিজের হৃদয়ের শূন্যতা সহায়ে—"কয়মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। অবিবাহিত ও বিবাহিত ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকালে যে স্নেহসূত্রে বাঁধা হইয়াছেন তাহা আর ছিন্ন হইবার নহে। হঠাৎ কর্ণধারের অদর্শনে আরোহিগণ ভয় পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই যে এক প্রাণ, পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন।"

এখন কর্ণধার হবেন নরেন্দ্রনাথ। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ গভীর আধারে ঢেলে দিয়ে গেছেন শক্তি। ধর্মের ওপর কর্মের প্রতিষ্ঠা। এক নতুন সত্যযুগের উদ্বোধন করবেন নরেন্দ্রনাথ। সংশয়ান্বিত গুরুভ্রাতাদের বললেন : "পক্ষহীন শোনো বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার।" "রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর করতে হবে; আর ছেলেপুলের বাপ হতে হবে!" একথা তিনিই বলতে পারেন, যাঁর জীবনদর্শন হলো—

"ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।"

মঠের ভাইদের নিজের জীবনের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা বলতে চাইতেন না। কেউ কদাচিৎ প্রশ্ন করলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলতেন : সে-খবরে তোর কি প্রয়োজন! আমাদের কথা অন্য। সংসার আমাদের পদতলে।

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।"

কোন্ জীবনে আসীন হয়ে তিনি এই কথা বলছেন, তার একটি ঝলক প্রকাশিত প্রমদাবাবুকে লেখা চিঠিটিতে—"কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় নেই। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট। ইঁহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমনকি কখনো কখনো উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল; হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যেপ্রকার মকদ্দমার দস্তুর।"

নরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন ধনী অ্যাটর্নি। ইংরেজের কলকাতার এক নামী মানুষ। সঙ্গীতপ্রিয়, ভোজনবিলাসী, বন্ধুবৎসল, মজলিসী এক মানুষ। এই পরিবারের এক মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। ভক্তিমতী নরেন্দ্রনাথের মাতা শিবের কাছে প্রার্থনা করে 'বিলে'কে পেয়েছিলেন। কৈশোর থেকে যৌবন—মানুষ হলেন জমিদারপুত্রের ধারায়। শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সঙ্গীত, স্বাস্থ্যচর্চা, জিমন্যাস্টিক, দর্শনচর্চা, মিস্টিসিজমের চর্চা, ধর্মের আধুনিক জিজ্ঞাসার অনুশীলন, যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে ঈশ্বরের অন্বেষণ। মুক্ত চিন্তায়, উচ্চ শিক্ষায়, মানসিক স্বাধীনতায়, পরিপালনের উদারতায় নরেন্দ্রনাথ এক নব্য যুবক। তিনি সন্ন্যাসী হবেন, দক্ষিণেশ্বরের মজার ঠাকুর তাঁকে ধরবেন—এমন কোন ভবিষ্যতের জন্যে তাঁর পিতামাতা প্রস্তুত ছিলেন না। হ্যাঁ, ছেলেটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। অত্যন্ত রূপবান, স্বাস্থ্যবান, মেধাবী। অতিশয় বেপরোয়া, রাগী। তর্কাতীত বস্তু মানতে চায় না। ঘোরতর সংস্কারবিরোধী। যুক্তি যেখানে নেই, নরেন্দ্রনাথ সেখানে নেই। সেই অর্থে সে নাস্তিক, কিন্তু সর্বথা তার অন্বেষণের বস্তু ঈশ্বর। সে ব্রাহ্মসমাজে ছুটে যায়, কেশবের বক্তৃতা শোনে, অসাধারণ কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত করে, তার গানে মানুষ আত্মহারা হয়। সে সরাসরি দেবেন ঠাকুরকে প্রশ্ন করে—"আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" সে শুধু সমাজে নয়, বড়লোকের বাগানবাড়িতেও মজলিস করে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারে, রঙ্গ-রসিকতা করে, কিন্তু অসাধারণ চরিত্রবান। বদলোকের সঙ্গে মিশলে ফল হয় বিপরীতই, নরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয় না, বদলোকটাই ভাল হয়ে যায়। সিমুলিয়ার পরশপাথরের এমনই ভেলকি!

সংসারপথে বিশ্বনাথ দত্তের কৃতী পুত্র নরেন্দ্রনাথ অর্থে, বিত্তে, প্রাচুর্যে, ক্ষমতায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী হবেন—এই ভবিষ্যদর্শনে তাঁর পিতামাতার কোন সংশয় থাকার কথা নয়। অ্যাটর্নির ছেলে অ্যাটর্নি হতে পারে, অধ্যাপনায় বিপুল খ্যাতি—সেও তো অসম্ভব নয়! বিবাহের জন্য ধনীর কন্যা অবশ্যই দুর্লভ হতো না। কিন্তু!

এই 'কিন্তু'তেই আছে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের খেলা। নরেন্দ্রনাথ কে, তাঁর পিতামাতা জানতেন না। যেমন মাতা যশোদা জানতেন কি কৃষ্ণ কে? কয়েকজন ঋষি ছাড়া রামকে কে জানতেন? স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকেই কি জানতেন তাঁর পিতামাতা, আত্মীয়, পরিজন? শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীতে প্রবেশের প্রাক্কালে গলা জড়িয়ে ধরে বলে এসেছিলেন—আমি যাচ্ছি, তুমি এস।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের সেই প্রধান ঋষি এলেন কলকাতার সিমুলিয়ায়। কামারপুকুরের গদাধর এগিয়ে এলেন রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বরও তো মহাকাল ও মহাকালীর এক অদৃশ্য অলৌকিক খেলা। এক ধনী মহিলা, কিন্তু তেজস্বিনী এবং অলৌকিক এক মনের অধিকারিণী রাসমণি। আক্ষরিক অর্থে বিদুষী নন অথচ দক্ষ প্রশাসক, আইন ও বাণিজ্যিক বুদ্ধিতে বাঘা ইংরেজকে ল্যাজে গোবরে করে দিতে পারেন। অত্যন্ত সাহসী, মরণকেও ভয় পান না। সময়ের ঠিক এই পাদে কেন তাঁর আবির্ভাব হলো! মহাকালের মহাসচিব এর উত্তর দিতে পারেন। পরবর্তী কালের আমরা এই যোগাযোগে অদৃশ্য শক্তি'র উপস্থিতি অনুমান করে নিতে পারি।

রাসমণির নৌবহর প্রস্তুত। বিশাল তীর্থযাত্রা। যাবেন তিনি কাশী। পূর্ব রাতের শেষ প্রহরে স্বপ্নাদেশ—কেন কাশী যাওয়া রে মেয়ে? আমাকে প্রতিষ্ঠা কর, আমি তোমার পূজা নেব, সেবা নেব। গঙ্গার তীরে স্থাপন কর আমার মন্দির। খুলে দাও বহর। গোশালায় ফিরিয়ে দাও গরু। বিলিয়ে দাও সব দ্রব্যাদি। ঐ অর্থে হবে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, তৈরি হবে অভূতপূর্ব এক জাগরণের ইতিহাস। শুধু রানী একা নন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন সুযোগ্য জামাতা মথুরামোহন। সেখানেও আবার এক অদ্ভুত খেলা, মথুরামোহন পরপর দুটি কন্যাকেই বিবাহ করলেন। প্রথমজনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়টিকে, অর্থাৎ সেজ বা ছোট মেয়ে জগদম্বাকে। এই মথুর এবং জগদম্বা চোদ্দ বছর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করবেন! তিনি আসছেন কামারপুকুর-লীলা সমাপ্ত করে। যে অদৃশ্য হস্ত এই ঘুঁটি সাজাচ্ছেন, সেই হাতেই হাত ধরা আছে শ্রীরামকৃষ্ণের। তিনিই দেখিয়ে দেন কে কী! নরেন্দ্রনাথ সপ্তঋষির প্রধান ঋষি। রাসমণি মা ভবতারিণীর অষ্টসখীর এক সখী, মথুরামোহন অন্যতম রসদদার, রাখাল—ব্রজের রাখাল, শ্রীম চৈতন্যপার্ষদ।

এই ছকে নরেন্দ্রনাথ। তাঁকে তো ঠাকুর কিঞ্চিৎ ঘোল খাওয়াবেনই। আধ্যাত্মিক পথ যে বড় নিষ্ঠুর পথ! মায়ের কোল থেকে ছেলে তুলে নিয়ে যায়। স্ত্রীর পাশ থেকে স্বামীকে সরিয়ে নেয়। ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তার তরে, নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ। নরেন্দ্রনাথের সব হৃত হবে—রিক্ততার অলৌকিক অলঙ্কারে ভূষিত হবেন বলে! দুঃখ চেনো, তাহলেই ঈশ্বরকে চিনতে পারবে। তাঁর সপ্তসিন্ধুতে অগাধ জল, কিন্তু তিনি প্রেমিক ভক্তের দু-ফোঁটা চোখের জলের বড়ই প্রত্যাশী।

নরেন্দ্রনাথ অতঃপর লিখছেন ঃ "কখনো কখনো কলিকাতার নিকট থাকিলে তাঁহাদের (মাতা এবং ভ্রাতা) দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম (প্রমদাবাবুকে), মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া, তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মতো বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্বাদ করুন।"

"আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
"তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।"
(গীতা, ২।৭০)

[বিবিধ নদনদীর জলে পরিপূর্ণ সমুদ্রে যেমন অপর জলরাশি প্রবেশ করে তাতে বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু সাগরের প্রশান্তি তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, তেমনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যে যোগীর অন্তরে বিষয়চিন্তাসকল প্রবেশ করেও কোনপ্রকার চিত্ত-বিক্ষোভ সৃষ্টি করে না, তিনিই আত্যন্তিক শান্তিলাভ করেন।]

'চিরদিনের মতো বিদায়' নয় নরেন্দ্রনাথ, চির উদয়! ঐ যে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর গামছা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন—"তুই না এলে বুকের ভেতর গামছা নিংড়োয়।" তখন এই অদৃশ্য গামছা যায় নরেন্দ্রনাথের গলায়, পালাবে কোথায় প্রভু!

"কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই,
মনে সন্ধ হয়, পাছে তোমাধনে হারাই, হা-রাই!
আমি জানি যে মন তোর, দিলাম তোরে সেই মন্তর,
(এখন মন তোর)
(আমার) যে-মন্ত্রে বিপদেতে তরী তরাই।।"

এই চিঠি নরেন্দ্রনাথ সমাপ্ত করেছেন "Imitation of Christ" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ঃ "আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকলপ্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়—

"For We have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen."

'ক্রশ'! স্বামীজী সেটি দিয়ে গেছেন জাতিকে, সেই রিক্ত সম্রাট। তাঁর দুটি চিত্র—ধর্মমহাসভায় বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন গৈরিক মহারাজ। মানুষের আবেগ উচ্ছ্বাসের তরঙ্গশীর্ষে। তিন মিনিটে তিনি বিশ্বমানব, লোকহৃদয়ের অধীশ্বর—স্বোয়ামী ভিভেকানন্দ। 'ইন্ডিয়ান সোয়ান' পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দুয়ার ভেঙে উড়ে গেলেন 'স্পিরিট ইটার্নাল' স্বামী বিবেকানন্দের ডানায় ভর করে। [দ্রঃ রোমাঁ রোলাঁ]

দ্বিতীয় চিত্র, কৌপীনধারী স্বামীজী লাঠিতে দেহভার রেখে ভবভোলা সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়িয়ে আছেন সাঁওতাল কর্মীদের মধ্যে, পার্শ্বে প্রবাহিত গঙ্গা, নির্মীয়মান স্বপ্নের বেলুড় মঠ-মন্দিরের প্রলম্বিত ছায়ায়। দিন শেষ হয়ে আসছে। কণ্ঠে তাঁর সেই অমোঘ আদেশ—

"আমার ভিতরে যে-আগুন জ্বলছে, তা জ্বলে উঠুক তোমাদের মধ্যে—তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে মরতে পার বীরের মতো। ভাঙনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়—তাকে ভরাট কর নিজের জীবন দিয়ে। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। এগিয়ে যাও, প্রভু আমাদের নেতা।"

আমি স্বামীজীর কাছে ঐ ক্রুশটি চাই। ওটি মা কালী। ঠাকুর দিয়েছিলেন স্বামীজীকে। আমি চাইছি তাঁর কাছ থেকে। নরেন্দ্রনাথের কালী—"আমি ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলে ভালবাসি। নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য বলে ভালবাসি, দুঃখকে দুঃখ বলে ভালবাসি। সংগ্রাম কর, অবিরাম সংগ্রাম কর। প্রতি পদে পরাজয়, তবু সংগ্রাম কর। উপাসনা কর মৃত্যুর। শক্তিমানের মৃত্যু আবাহন।"

স্বামীজীকে আমি দুঃখে, হতাশায়, নৈরাশ্যে, নৈরাজ্যে খুঁজব। সেই আমাদের জীবন।

'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী,
সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।।"

সেই কারণে শতবর্ষ বয়সী 'উদ্বোধন'-এ আমি স্বামীজীর প্রাণস্পন্দন শুনতে পাই। চির নবীন, চির নূতন, ভাস্বর বৈশাখ। ❑

মানুষের কল্যাণে আকুপাংচার

মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত

'আকুপাংচার' কথাটি অনেকেই শুনেছেন, তবে স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নেই। আকুপাংচার হলো কার্যকরী অথচ খুবই কম খরচের একটি চিকিৎসাপদ্ধতি। এই চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

'আকুপাংচার' ইংরেজী শব্দ। ল্যাটিন 'আকুস' মানে সূচ আর 'পাংচুরা' মানে ফোটানো। চীনা ভাষায় বলা হয় 'চেন'। চীনের কয়েক হাজার বছরের পুরনো এই চিকিৎসাপদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছিল ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। প্রাচীনকালে যুদ্ধবিগ্রহের সময় ধারালো পাথর বা তীরের আঘাতে শরীরে যে ক্ষত হতো তার ফলে শরীরের পুরনো কিছু রোগ ভাল হয়ে যেত। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাচীন চীনা চিকিৎসকরা দেহের বিভিন্ন স্থানে কৃত্রিমভাবে ধারালো পাথর, মাছের কাঁটা ইত্যাদি সূচালো বস্তু ফুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করত কোন্ কোন্ রোগে কেমন উপশম হচ্ছে। এভাবেই দেহের মধ্যে বিভিন্ন বিন্দু আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে সারা দেহে আকুপাংচার-বিন্দুর সংখ্যা সাতশর বেশি। সভ্যতার ক্রমাগ্রগতিতে ধাতুর আবিষ্কারের সাথে ধাতুনির্মিত সূচের ব্যবহার শুরু হয়। ব্রোঞ্জ, রূপা, সোনা ইত্যাদি ধাতুর সূচ বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে স্টেনলেস স্টীলের সূচ ব্যবহৃত হয়।

আকুপাংচার চিকিৎসাপদ্ধতি খুবই সরল। আধ ইঞ্চি থেকে শুরু করে চার ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা সরু সূচ দেহের বিভিন্ন জায়গায় ফুটিয়ে দেওয়া হয়। দেহের কোষকলার গভীরতা অনুযায়ী সূচের দৈর্ঘ্য ঠিক করা হয়। সূচ ফোটানোর আগে চামড়ায় স্পিরিট দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া হয়। রোগ অনুযায়ী কখনো চার-পাঁচটি বা আট-দশটি সূচ ফোটানো হয়। সূচ ফোটাতে খুব সামান্য লাগে। কারণ সূচগুলো খুব সরু, এর ভিতরে সাধারণ ইঞ্জেকশন সূচের মতো কোন ফাঁপা অংশ থাকে না। সূচের ভিতর দিয়ে কোন ওষুধ ঢোকানো হয় না। নির্দিষ্ট গভীরতায় সূচ পৌঁছালে রোগী একধরনের চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে। তখনই বোঝা যায় যে, সঠিক বিন্দুতে সূচ পৌঁছেছে। আকুপাংচার চিকিৎসার জন্য এই অনুভূতি (যাকে চীনা পরিভাষায় 'তেছি' বলা হয়) অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর পরে কখনো প্রয়োজনে সূচের সাথে ইলেক্ট্রোস্টিমুলেটর যন্ত্রের সাহায্যে সামান্য বিদ্যুৎপ্রবাহ দেওয়া হয়। ইলেক্ট্রোস্টিমুলেটর ছোট একটা যন্ত্র, যা ইলেকট্রিক বা ব্যাটারিতে চালানো যায়। সূচ ফুটিয়ে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট রোগীকে সাধারণত শুইয়ে রাখা হয়। তারপরে সূচগুলো তুলে নেওয়া হয়। রোগী আবার স্বচ্ছন্দে বাড়ি

হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস-এর আকুপাংচার চিকিৎসা করা হচ্ছে

ফিরে যেতে পারে। সূচ নেওয়ার সময় একদম খালি পেটে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

বর্তমানে প্রতি রোগীর জন্য আলাদা সূচের সেট ব্যবহৃত হয়। এর ফলে এইডস, হেপাটাইটিস ইত্যাদি সংক্রামক রোগের সম্ভাবনা থাকে না। সূচগুলো বাজারে পাওয়া যায়। সরকারি ক্লিনিকে এখনো বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

আকুপাংচার পদ্ধতিতে অনেক রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব। চিকিৎসাযোগ্য রোগের তালিকা ক্রমশই বাড়ছে। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা ১৯৭৮ সালে ৪৩টি রোগের জন্য আকুপাংচার চিকিৎসার সুপারিশ করেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, যেকোন ব্যথা-যন্ত্রণায় আকুপাংচার চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়। যেমন আর্থ্রাইটিস, অস্টিও আর্থ্রাইটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস, স্পন্ডিলোসিস, অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস, ফ্রোজেন শোলডার, কোমরে ব্যথা, সায়াটিকা, নিউরালজিয়া, হারপিস জোস্টার, ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া, মাথার যন্ত্রণা, মাইগ্রেন, পক্ষাঘাত, মুখের পেশীর প্যারালিসিস, পোলিও, দীর্ঘদিনের হাঁচি, ফ্যারিনজাইটিস, ক্রনিক সাইনুসাইটিস, ক্রনিক টনসিলাইটিস, হাঁপানি, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, মাসিকের যন্ত্রণা, পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিস, কোলাইটিস, খেলোয়াড়দের আঘাত, মচকানো ব্যথা, অনিদ্রা, মাদকাসক্তি, মায়োপিয়া ইত্যাদি নানা রোগ। চীনে ছোট ছোট পিত্তপাথর আকুপাংচার দিয়ে পায়খানার সঙ্গে বের করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। হৃদ্‌যন্ত্রের রক্তচলাচল কম হলেও আকুপাংচার করে তা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

আকুপাংচার অ্যানেস্থেসিয়ার নাম অনেকেই শুনেছেন। কয়েকটা আকুপাংচার-সূচ ফুটিয়ে বেশ কিছু অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। যেমন সিজারিয়ান সেকশন, নিউমোনেক্টমী, মস্তিষ্কের অপারেশন, হৃদ্‌যন্ত্রের অপারেশন মাইট্রাল ভালভোটমি ইত্যাদি। চীনে এধরনের কয়েক লক্ষ অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে। রোগী জেগে থাকে, অপারেশন চলে, রোগীর যন্ত্রণার অনুভূতিটা কমে যায়। এই পদ্ধতিতে অজ্ঞানকারী ওষুধের খারাপ প্রতিক্রিয়াগুলো হয় না, তাই খারাপ যকৃত বা কিডনির রোগীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই সহায়ক।

আকুপাংচার করলে রোগ কতটা সারে? প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, কোষকলায় স্থায়ী পরিবর্তন হয়ে গেলে অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতির মতনই আকুপাংচার চিকিৎসাতেও সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয়। তবে রোগের কষ্টের উপশম হতে পারে। যেমন অস্টিও আর্থ্রাইটিস রোগে হাঁটুর হাড়ের মধ্যে যদি স্থায়ী ক্ষয় হয় এবং নতুন হাড় (অস্টিওফাইট) গজিয়ে যায়, তাহলে আকুপাংচার করে সেই বাড়তি হাড়কে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। আবার সাইনুসাইটিস হলে সম্পূর্ণ সেরে যাওয়া সম্ভব। অনেক রোগ সম্পূর্ণ সেরে না গেলেও আকুপাংচার করে রোগ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব।

সাইনুসাইটিস রোগের আকুপাংচার চিকিৎসা

অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগী যেসব ওষুধ খায় সেগুলির মাত্রা অনেক কমিয়ে ফেলা যায় আকুপাংচার করলে। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের খারাপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো এভাবেই কমিয়ে ফেলা সম্ভব। আকুপাংচার চিকিৎসার সুবিধা হলো—এই পদ্ধতিতে কোন খারাপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না। কারণ এই পদ্ধতিতে ওষুধ নামক কোন রাসায়নিক পদার্থ বাইরে থেকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় না। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আকুপাংচারে বিশেষ উপশম হলো না—কিন্তু আকুপাংচার করে কোন খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। আকুপাংচার করলে আর কোন চিকিৎসায় কাজ হবে না—এধরনের কিছু ভ্রান্ত ধারণাও মানুষের মধ্যে আছে। ব্যাপারটা আদৌ সত্যি নয়। সাধারণত দেখা যায় যে, অন্যান্য পদ্ধতিতে বিশেষ কোন ফললাভ না হলেই মানুষ আকুপাংচার চিকিৎসা করাতে আসেন। আকুপাংচার করাবার আগে ফল হয়নি, তাই পরেও ফল নাও হতে পারে। তার সাথে আকুপাংচার চিকিৎসার কোন সম্পর্ক নেই।

কোন ওষুধ নেই, শুধু কয়েকটা সূচ ফুটিয়ে দিলেই রোগ কমে যাচ্ছে—এটা কি করে সম্ভব? এরকম প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগে। উত্তরটা দেওয়া যাক। আকুপাংচারের সূচগুলো দেহের মধ্যে গিয়ে সূক্ষ্ম নার্ভপ্রান্তগুলোকে ছোঁয়। তার ফলেই চিনচিনে ব্যথা অনুভূত হয়। নার্ভপ্রান্তের এই উত্তেজনার ফলে শরীরের মধ্যে বেশ কিছু জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া সঙ্ঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দেহের কোথাও নখের আঁচড় দিলে জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে যায়, চুলকায়। কারণ আঁচড়ের ফলে স্থানীয় নার্ভের উত্তেজনার মাধ্যমে জৈব রাসায়নিক পদার্থ যেমন হিস্টামিন, ব্রাডিকাইনিন ইত্যাদি নিঃসৃত হয়; এর ফলেই জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে যায়। তেমনি আকুপাংচার সূচের উত্তেজনায় শরীরের মধ্যে এন্ডরফিন নিঃসৃত হয়, তাই যন্ত্রণা কমে; 'ইন্টারলিউকিন ১০' নিঃসৃত হয় তাই বাতের প্রদাহ কমে। অর্থাৎ মানুষের শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রকৃতিই দিয়েছে। এই রোগ-প্রতিরোধ প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করতে পারলে বাইরে থেকে আর ওষুধ নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যোগব্যায়াম, ফিজিক্যাল মেডিসিন এভাবেই দেহের আভ্যন্তরীণ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে রোগ উপশম করে। শরীরের আভ্যন্তরীণ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তাকে উদ্দীপিত করা সম্ভব হয় না।

আকুপাংচার কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন চিকিৎসা হলেও ভারতে এসেছে সম্প্রতি। ১৯৫৯ সালে ডাঃ বিজয়কুমার বসু চীন থেকে শিখে এসে ভারতে আকুপাংচার চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মধ্যে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে ভারতের অনেক প্রদেশেই আকুপাংচার চিকিৎসা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৭ সালে প্রথম সরকারি আকুপাংচার ইউনিট চালু করেন। এই ইউনিটই পরে বিস্তৃতিলাভ করে ডাঃ বি. কে. বসু মেমোরিয়াল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অব আকুপাংচার-এ পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করেন ১৯৯০ সালে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৬ সালে আইন করে আকুপাংচার চিকিৎসার স্বীকৃতি দিয়েছে। এটিও ভারতে প্রথম পদক্ষেপ। সরকারি ইনস্টিটিউট ছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আকুপাংচার পড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতেও ক্রমশ আকুপাংচার চিকিৎসার প্রসার ঘটছে।

আকুপাংচার চিকিৎসার খরচ প্রায় নেই বললেই চলে। সূচগুলির দাম কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাত্র। এই সূচে কয়েক মাসের চিকিৎসা সম্ভব। শুধু তুলো আর স্পিরিটের খরচ। তাই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এইরকম কম খরচের চিকিৎসা খুবই উপযোগী। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় দেড়শ দেশে আকুপাংচার চিকিৎসার প্রচলন আছে—যাদের মধ্যে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, কানাডা, জাপান, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিও রয়েছে।

প্রাচীন এশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্যে ভারতের যোগব্যায়াম, আয়ুর্বেদ এবং চীনের আকুপাংচার ও গাছগাছড়ার ওষুধ খুবই উল্লেখযোগ্য। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এইসব পদ্ধতির আপাত চমক কম, কিন্তু চিকিৎসাজগৎ ক্রমশ এইসব প্রাচীন পদ্ধতির শরণাপন্ন হচ্ছে। আমাদের দেশেও এইসব চিকিৎসার যত বেশি প্রসার হবে ততই সাধারণ মানুষের মঙ্গল। ❑

নরভুক মানুষ

১৯৬৭ সালে নৃবিদ্যাবিশারদ্ (anthropologist) ক্রিস্টি টার্নার বিদেশের এক বিখ্যাত যাদুঘরের পিছনদিকের একটি ঘরে একটি কার্ডবোর্ড বাক্সে ভরা মানুষের কয়েকটি হাড় দেখতে পেলেন। হাড়গুলি ছিল দক্ষিণ আমেরিকার আরিজোনা অঞ্চলের পোলাকাওয়ালস সম্প্রদায়ের লোকেদের, যারা ৪০০ বছর আগে এক গ্রাম্যযুদ্ধে মারা গিয়েছিল। একজন গবেষকের মতে, লোকগুলি শুধু গ্রাম্যযুদ্ধে নিহত হয়নি, তাদের হাড়গুলি কেটে পোড়ানোও হয়েছিল। এথেকে একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায় এবং তা হলো—ঐ লোকগুলিকে হত্যা করে তাদের মাংস খাওয়া হয়েছে। এর পরের কয়েক মাসে টার্নার হাড়গুলিকে আরো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং অন্য জন্তুর হাড়কেও পুড়িয়ে পরীক্ষা করে মতপ্রকাশ করলেন যে, মানুষের উক্ত হাড়গুলি নরমাংস ভোজনের শেষে পরিত্যক্ত হাড়। সোসাইটি অব আমেরিকান আর্কিওলজির বার্ষিক সভায়ও তিনি এই কথা বললেন। "তখন কেউ আমার কথা গ্রাহ্য করেনি"—বললেন টার্নার। শীঘ্রই তাঁর গবেষণাফল প্রকাশিত হবে। ঘটনার তিন দশক পরে এখন অভিমত বদলে যাচ্ছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলতেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা পশুবৎ ছিল এবং তাদের অনেকেরই জীবন রান্নার হাঁড়িতে শেষ হয়েছে। ষাটের দশকের শেষে বিশ্বাস করার ফ্যাসান দাঁড়িয়েছিল যে, ওসব হাড় ও মাথার খুলির দাগগুলি অনেকদিন রাখার জন্য হয়েছে এবং এর দ্বারা নরমাংস ভক্ষণের প্রমাণ হয় না। কিন্তু এখন মত বদলে যাচ্ছে, নরমাংস ভোজনের কথা উঠছে; পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে নর-অস্থি যোগাড় করে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ্ টিম হোয়াইট, যিনি আরিজোনায় খননকার্যে ব্যাপৃত আছেন, বলেন ঃ "সারা মেক্সিকোতে এবং উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, মানুষকে ধরা হতো এবং হত্যা করে খাওয়া হতো। উরু ও হাতের হাড়কে মজ্জা পাওয়ার জন্য ভাঙা হতো এবং ছোট হাড়গুলিকে ছোট ছোট টুকরো করা হতো তার ভিতরের চর্বিটুকু পাওয়ার জন্য।" হোয়াইটের মতে, পুষ্টির জন্য নরমাংস ভোজন করা হতো না; প্রধান উদ্দেশ্য হলো বশে আনা—পোলাকাওয়ালস জাতির মনে মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভয় ঢোকানো। পোলাকাওয়ালসের ঘটনা তো বলা যায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। যাঁরা জীবনসৃষ্টির ও জীবসৃষ্টির উপাদান সংগ্রহণে রত (palaeontologists), তাঁরা স্পেনের একটি আট লক্ষ বছর আগেকার বসতি পরীক্ষা করে প্রমাণ পেয়েছেন যে, তখনকার লোকেরা নরমাংস আনন্দের সঙ্গে খেত। সাম্প্রতিককালেও মানুষের মাংস খাওয়ার যথেষ্ট খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্ট্যালিনের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকার বহু কাহিনী শোনা যায়। গত বছর ঐ দেশে পুলিস ৮২ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির অর্ধভুক্ত দেহ পাওয়ার পর তার ৭৩ বছরের স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার তিন মাস পরে তিন জন ইউক্রেনিয়ান বন্দী তাদের সহবন্দীকে খেয়েছিল; দুজন রাশিয়ান সৈনিক তাদের সহকর্মীকে খেয়েছিল। এইসব ঘটনার ভয়াবহ বিবরণ ব্রিটেন ও আমেরিকার কাগজে বেরিয়েছিল, তবে রাশিয়ার খবরের কাগজে এসম্বন্ধে বিশেষ খবর বের হয়নি। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ্ জারেভ ডায়মন্ড তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে, ১৮৩৫ সালে মাওড়ি যোদ্ধারা নিউজিল্যান্ডের ৫০০ মাইল উত্তরে চ্যাথাম দ্বীপে নেমে সেখানকার শত শত মরিওড়ি উপজাতিকে হত্যা করে তাদের মাংস রান্না করে খেয়েছিল। ব্রিটেনের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ (archaelogist) পল বান স্বীকার করেন যে, মানুষের মধ্যে নরমাংস ভোজনে বিশ্বাস অন্তর্নিহিত আছে, এমনকি গ্রীক উপকথায় আছে যে, স্যাটার্ন তার ছেলেদের খেয়েছিল এবং সাইক্লপস ওডিসের নাবিকদের খেয়েছিল। তিনি বলেন ঃ "মাথা খারাপ লোক অনেক কিছু ভয়ঙ্কর কাজ করতে পারে, বিশেষত যখন অনাহারে থাকে।" ১৯৭২ সালে অ্যান্ডিসে যে উড়োজাহাজ ধ্বংস হয়েছিল, তাতে যারা বেঁচেছিল তারা মৃতদের মাংস খেয়েছিল—এটা তো সেদিনের ঘটনা। অনেক সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মৃত আত্মীয়ের মাংস খেয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হতো। নিউগিনিতে আগে যে মৃত আত্মীয়ের মস্তিষ্ক খাওয়ার প্রথা ছিল, তার ফলে 'ফোরে' সম্প্রদায়ের 'কুরু' নামক অসুখ হতো। অস্ট্রেলিয়ান সরকার ঐ অঞ্চল দখল করার পর আইন করে ঐ প্রথা রদ করলে ঐ অসুখ বন্ধ হয়। কার্লটন গ্যাডজুসেখ মানুষের মাংস খেয়ে 'কুরু' অসুখের সম্পর্ক প্রমাণিত করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। অবশ্য গ্যাডজুসেখের এই তথ্য অনেকে বিশ্বাস করেন না। অ্যারেনস এও বলেছেন ঃ "আমার মনে হয়, নিউগিনিতে গ্যাডজুসেখ নিজে কখনো নরমাংস ভোজন করতে কাউকে দেখেননি।" আমেরিকায় এবিষয়ে টার্নার এবং হোয়াইট যেসব গবেষণা করেছেন, সেগুলি সম্বন্ধে কেউ অবিশ্বাস করে না। তাঁরা ৮০০ বছরের পুরনো হাড় ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, নৃশংসভাবে হত্যা করা এবং জন্তুজানোয়ারের খাওয়া মানুষের হাড়ের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। উপসংহারে তাঁরা বলেছেন যে, আগে মুণ্ডচ্ছেদ করে পরে তাদের সিদ্ধ করা হয়েছে। তারপরে তাদের হাড়গুলো ভেঙে হাড়ের মজ্জা খাওয়া হয়েছে। হোয়াইটের মতে—"ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের নরমাংস খাওয়ার ঝোঁক আছে বা ছিল—এটা অস্বীকার করার অর্থ 'ক্লিন্টন সিগারেট ধরিয়েছিলেন, কিন্তু টানেননি' বলা।" **[New Scientist, 14 March 1998]** ❑

বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের আলোকে মনুষ্যত্বের সন্ধান

গৌতম নিয়োগী

নতুন মানুষের সন্ধানে—হোসেনুর রহমান। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। পৃষ্ঠা : ২১৬। মূল্য : ৮০ টাকা।

নিজের জীবনের উদ্দেশ্য এবং ব্রত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন : "Man-making is my mission." প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সন্ধানী বঙ্গীয় রেনেশাঁসের এই উজ্জ্বল প্রতিভূর স্বকীয়তা মনীষার দীপ্তিতে যেমন ভাস্বর, তেমনি কর্মতৎপরতায়ও তিনি স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। উনিশ-বিশ শতকের বিবর্তন-প্রক্রিয়ার, ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার টানাপোড়েনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী; তাঁর মানসলোক গঠনের অন্যতম উপাদান মানবতাবাদ, তাই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি আদৌ পশ্চাদ্‌পন্থী বা পুনরভ্যুত্থানবাদী নন। শশধর তর্কচূড়ামণি বা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তো বটেই এমনকি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বকেও, আমাদের বিবেচনায়, তাঁর সঙ্গে একত্র বন্ধনীভুক্ত করা চলে না। ভাবুক এবং কর্মী রূপে স্বামীজীর যে-চিত্র উদ্ভাসিত এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে তাঁর যে-মূল্যায়ন স্বীকৃত, তাতে তাঁকে এক আশ্চর্যরকম উদার, আধুনিক এবং গোঁড়ামি-মুক্ত মানুষ হিসেবেই দেখতে পাই।

'নতুন মানুষের সন্ধানে' গ্রন্থে লেখক ডঃ হোসেনুর রহমানের লেখা সাম্প্রতিকতম নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি পড়ে মনে হলো, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত। জীর্ণ পুরাতনকে ছেড়ে ফেলে, 'আধমরাদের' 'ঘা দিয়ে' বাঁচিয়ে তুলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অভীষ্ট পথে তিনি মনুষ্যত্বের সন্ধানী। এটি যে শুধু গ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট তা নয়, বহু রচনা পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, মানবতাবাদের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ। তাঁর এই সাম্প্রতিকতম গ্রন্থে মানুষ, ধর্ম এবং সমাজের বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করার আগে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্গীয় রেনেশাঁসের অনেক প্রথম সারির ঋত্বিকদের ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি যে, তাঁদের মানসলোকের অন্যতম প্রেরণা মানবতাবাদ। মানবতাবাদ তাঁদের দিয়েছিল স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং সামাজিক চেতনা। আমাদের মনে পড়ে, মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে যে আধুনিক যুগের সূচনা হচ্ছিল পঞ্চদশ শতক থেকে, তাতে ভৌগোলিক আবিষ্কার, নবজাগরণ আন্দোলন, ধর্মসংস্কার, সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং পুঁজিবাদে উত্তরণ ইত্যাদি নানা তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনার সমাবেশ ঘটেছিল। এই নবজাগরণ আন্দোলন বা রেনেশাঁসের অন্যতম লক্ষণ ছিল হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ, যা মধ্যযুগীয় অন্ধকার দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। আমাদের দেশেও, উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে, দেশীয় প্রেরণায় ও বিদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে যে সমাজসংস্কার ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হয়—যাকে চলতি কথায় 'বাংলার নবজাগরণ' বলে জনপ্রিয় অভিধায় ভূষিত করা হয়—তার মধ্যেও অন্যতম মৌলপ্রেরণা ছিল মানবতাবাদ।

রামমোহন রায়ের মতন ব্যক্তি, যিনি ধর্মসংস্কারকরূপে সক্রিয় ছিলেন, তাঁর সমাজসংস্কারের উদ্যোগের পিছনে যেমন মানবতাবাদী প্রেরণা ছিল, তেমনি ধর্মবিষয়ে বিশেষ মাথা না ঘামিয়েও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-প্রগতির পদক্ষেপে অংশীদার হওয়ার পিছনেও কাজ করেছে মানবতাবাদ বা হিউম্যানিস্ট চেতনা। আর শতাব্দীর শেষে উপনীত হয়ে আমরা যখন স্বামীজীর কণ্ঠে মূর্খ দরিদ্র চণ্ডাল ভারতবাসীকে 'ভাই' বলে ডাকতে শুনি এবং সেই আহ্বান যখন আপামর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে দেখি, তখন এক গোঁড়ামি-মুক্ত হিউম্যানিস্ট কর্মি-পুরুষ আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হন। তিনি মানুষ তৈরির ব্রত নিয়েছিলেন এবং তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ না করলে 'মানুষ' হওয়া যায় না। সঙ্কীর্ণতা সহজে যাওয়ার নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন : "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, / রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।" যুগের বদল হচ্ছে ক্রমে ক্রমে, তবু মনুষ্যত্বের সন্ধান করে যেতেই হয়। যেমন করেছেন ডঃ হোসেনুর রহমান।

ডঃ হোসেনুর রহমান ইতিহাসবিদ্, পেশায় অধ্যাপক। মুক্তমনা বুদ্ধিজীবী হিসেবে বাঙালী সমাজে তিনি সুপরিচিত। বাগ্মী এবং লেখক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর সমস্ত লেখার সঙ্গেই বর্তমান সমালোচকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। সেই সূত্রে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি সদা-সচেতন এক মানুষ। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর অন্যতম হাতিয়ার মানবতাবাদ এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁর কাছে জ্বলন্ত প্রেরণা। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পূর্বেকার দুটি গ্রন্থ—'ইসলাম : মৌলবাদ ও মৌলবিবাদ' এবং 'বিবেকানন্দ বেদান্ত ও ইসলাম' পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন।

আলোচ্য **'নতুন মানুষের সন্ধানে'** গ্রন্থটির 'বিবেকানন্দ, বাংলাদেশ ও মানবতাবাদ' শীর্ষক রচনাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। লেখক স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ

করেছেনঃ "সংবেদনশীল, যুক্তিপন্থী, মানবতাবাদী বিবেকানন্দ চিন্তার ও ভাবের প্রতিষ্ঠা চাই এই উপ-মহাদেশে।" কেন চাই? কারণ, "মানুষের যেমন বহুবিধ রূপান্তর চারিদিকে দেখা যাচ্ছে, তেমনই যে-ধর্ম মানুষকে ধারণ করে থাকে, তার স্বভাবকে প্রকাশ করে—তারও রূপান্তর অনিবার্য। ধর্মের বিকাশ মাঠে ময়দানে রণক্ষেত্রে হওয়ার নয়, তা হবে মানুষের অন্তরের অন্তরতম জগতে। তার একান্ত মনোনিকেতনে।" এ কাজ কি হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক আগ্রাসন বা বিজ্ঞানবিরোধী ইসলামী মৌলবাদী চেতনার দ্বারা সম্ভব? আমাদের তা মনে হয় না। এজন্য প্রয়োজন নিজ ধর্ম বজায় রেখেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুসংহত, মানবিক মূল্যবোধ। বিবেকানন্দ ১৮৯৮-তে লিখেছিলেনঃ

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম-ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

"আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।"

আমাদের দুর্ভাগ্য, বিবেকানন্দের সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। তাই এখনো চলছে সঙ্কীর্ণতা, হানাহানি। ডঃ হোসেনুর রহমান মন্তব্য করেছেনঃ "ভাবতে ইচ্ছে করে, বিবেকানন্দ কি বাবরি মসজিদ ধ্বংসের স্তূপের দিকে তাকিয়ে এমন সতর্ক, সাবলীল, মহত্তম বাণী হিমালয় থেকে ঘোষণা করছেন? কিন্তু আমরা জানি, কতদিন আগে এই ভবিষ্যদ্বাণী মানবতাবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। আজ এই দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষিত যুবসমাজ বিভ্রান্ত, মানবিভ্রান্তির যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, ধর্ম ও রাজনীতির খেলায়, মনুষ্যত্ব-হীনতার যন্ত্রণায়, সর্বাত্মক দুর্নীতির প্রকোপে, যারপরনাই আশাভঙ্গের বেদনায় কাতর।" (পৃঃ ১৯২) তবু অন্তরের মনোনিকেতনে ধর্মের প্রকাশ ঘটাতে গেলে ধর্মান্ধতা নয়, চাই ঔদার্য। পূর্বোক্ত চিঠিতে, ১৮৯৮-তে—ঠিক একশ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ কি লিখছেন তা ভাবলে শ্রদ্ধাবনত হতে হয়। স্বামীজীর বক্তব্য ঃ

"আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম একত্বরূপ সেই এক ধর্মেরই বিবিধ প্রকাশমাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে।..." লেখক অবশ্য হুবহু উদ্ধৃতিটি দেননি। নিজের ভাষায় বিবেকানন্দের মূল ভাবটি ব্যাখ্যা করেছেন। বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছিলেন, মনুষ্যজাতিকে বোঝাতে হবে যে, জগতের ধর্মগুলি একটিমাত্র 'Religion'-এর বহু বিচিত্র প্রকাশ, যা হলো 'Oneness'—একমেব অদ্বিতীয়ম্। এ-কাজ করতে হবে নানা ধর্মকে 'সুসংহত' করে। (দ্রঃ পৃঃ ১৯১-১৯২)

ডঃ রহমানের পূর্ববর্তী 'ইসলামঃ মৌলবাদ ও মৌলবিবাদ' এবং 'বিবেকানন্দ বেদান্ত ও ইসলাম' গ্রন্থ-দুটির মতন এই **'নতুন মানুষের সন্ধানে'** গ্রন্থটিও প্রকাশ করেছেন সুখ্যাত প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ। আজকের পটভূমিকায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমরা প্রকাশকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। তবে গ্রন্থগুলির যেহেতু বহুল প্রচার দরকার, সেজন্য আমার প্রস্তাব—'পেপারব্যাক' অর্থাৎ কাগজের মলাটে সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করা হোক। প্রকাশকরা ভেবে দেখবেন। লেখক তাঁর 'নিবেদন' অংশে লিখেছেন ঃ

"আমার বিনীত নিবেদন—আমি সমাজবিজ্ঞানের এবং ইতিহাসের সামান্য কর্মী হিসেবে—মানুষ, ধর্ম, সমাজ বিচার ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধগুলিতে। দুঃখের কথা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়গুলিকে এখনো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে না। কিন্তু উত্তর-আধুনিক পৃথিবীতে 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা চাই' একটা নতুন শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। এখনো যুক্তি মানবপ্রীতি বিশ্বচেতনা 'বিশ্বায়ন' নামক শ্লোগানের অন্তর্গত হয়ে উঠতে পারছে না।"

বর্তমানকালের সামাজিক সঙ্কটের টানাপোড়েনে লেখাগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পুস্তকাকারে সংগৃহীত হওয়ার আগে এর অনেকগুলিই বর্তমান সমালোচক নানা পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন। এখন সমালোচনা-সূত্রে দ্বিতীয় পাঠের পর আবার মনে হলো, লেখক সৎ এবং আন্তরিক। আসলে 'বিশ্বব্যবস্থা চাই' বললেই তো হয় না, কোথায় ক্ষুদ্রতার উত্তরণ ঘটিয়ে আন্তর্জাতিকতায় মিশে যেতে হয় তা বোঝা দরকার। এব্যাপারে লেখক এক নৈর্ব্যক্তিক অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন এই গ্রন্থের অনেক রচনায়। পিছনের মলাটে বলা হয়েছে—"সমাজ-সচেতন এক লেখকের রচিত এই গ্রন্থ সমাজ-সচেতন মনস্ক পাঠকের জন্যই।" আমরা এবিষয়ে একমত।

মোট ৩৬টি রচনা বর্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। লেখক সেগুলিকে ৭টি উপবিভাগে ভাগ করে বিন্যস্ত করেছেন। উপবিভাগগুলির নাম হলো যথাক্রমে 'নতুন মানুষের সন্ধানে', 'সমাজ', 'বাঙালীর আত্মকথা', 'ধর্ম', 'নারী ও ইসলাম', 'নতুন পৃথিবী যাঁরা চেয়েছিলেন' এবং 'সঙ্কট'। বিভাগগুলি, বলা বাহুল্য, বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। পূর্বে যে 'বিবেকানন্দ, বাংলাদেশ ও মানবতাবাদ' শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা হয়েছে, তা 'নতুন পৃথিবী যাঁরা চেয়েছিলেন' উপবিভাগের অন্তর্গত। এই পর্যায়ে লেখক যে-কয়জনের কথা লিখেছেন তাঁদের সকলের দ্বারা তিনি প্রভাবিত। এঁরা হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং লেখকের মাস্টারমশাই তথা গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি ঃ

"আজকের এই যুদ্ধপ্রবণ পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মানুষ তার দম্ভ ও বিশেষ সুবিধা ও পদমর্যাদার অভিমানকে বর্জন করে যদি সকলের কল্যাণচিন্তায় মগ্ন না হতে পারে তাহলে আমরা এই পৃথিবীকে আরো বেশি করে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে পারব না। ইতিমধ্যে বহুলাংশেই এই পৃথিবী আর মানুষের বাসযোগ্য থাকতে পারছে না। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল উপদেশ আমাদের সাহায্য করবে।" (পৃঃ ১৫৯) বস্তুত, 'যত মত তত পথ' কিংবা 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি' যিনি বলতে পারেন, তাঁর মতন মানুষের প্রয়োজন কখনো ফুরোবার নয়। বর্তমানে তা আরো প্রাসঙ্গিক। জীবনতরঙ্গের বাইরে তো তিনি ধর্মকে ধরতে চাননি। লেখক সেকথা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, লেখকের মতে, এক 'সম্পূর্ণ সার্থক সমুজ্জ্বল একটি মহাজীবন'। ধর্ম তাঁর কাছে 'মানুষের ধর্ম'। লেখক রবীন্দ্র-ভাবনার মূল সুরটি তুলে ধরেছেন তাঁর ভাষায় ঃ

'দর্শন ও বিবিধ বিষয়ে তাঁকে প্রখর দৃষ্টি দিতেই হয়। কারণ তিনি পূর্ণ মানুষ নির্মাণের দিকে প্রখর দৃষ্টি দিতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর মানুষের মুক্তি, শান্তি, মৈত্রী, স্বাধীনতা তাঁর বিশেষ চিন্তার জিনিস ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, ছবি সভ্য এই বিশ্বচেতনার অন্তর্গত। বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ মানুষকে দেখতে চেয়েছেন সঙ্ঘাত সঙ্ঘর্ষ পেরিয়ে সান্নিধ্য, সংমিশ্রণ, সমন্বয়ের মধ্যে। মানুষ কোন্ পথে গেলে সামাজিক 'হারমনি' সৃষ্টি করতে পারবে, কোন্ পথে গেলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থিতির অর্থটি ধরতে পারবে—এই জীবনদর্শনের প্রতি কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে এই কথাই পৃথিবীকে বোঝাতে চেয়েছেন।" (পৃঃ ১৭৫)

একইভাবে গান্ধী ও বিবেকানন্দ লেখকের কাছে দুই দিশারী। গান্ধীর কাছ থেকে লেখক শিখেছেন, "হিংসা, ভয়াবহ প্রতিযোগিতা, যন্ত্রদেবতার পূজা মানুষকে খর্ব করে, খর্ব করে তার মানবিকতাকে।" আবার বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলায় 'বিবেকানন্দ হিউম্যান সোসাইটি' যখন গঠন করেন অধ্যাপক মাসাদুল হক, কৃষ্ণেন্দুকুমার দেব প্রমুখ, তাতে লেখক উল্লসিত। কারণ লেখকের মতে, প্রতিবেশী "বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানবতাবাদী বিবেকানন্দের জীবনকর্ম তুলে ধরা সমীচীন।" লেখকের উচ্চাশা—আজ ও আগামীকাল বাংলাদেশের যুবসমাজ দিনাজপুর বিবেকানন্দ-চর্চা কেন্দ্রের মানবপন্থাচর্চার উদ্যোগ, সংবাদ ও প্রেরণা থেকে নবজীবন লাভ করবে। গান্ধীবাদী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুকে স্মরণ করে লেখক রচনা করেছেন 'মাস্টারমশাইকে একটি নমস্কারে' শীর্ষক স্বীকারোক্তিটি। রচনাটি শেষ করছেন এই বলে ঃ "মাস্টারমশাই আমার মতো সাধারণ ছাত্রকে অসাধারণ জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন। জীবন এবং জীবনসাধনা উচ্চমার্গে নিয়ে যেতে হলে চাই কেবলই জীবনতৃষ্ণা এবং চোখ খুলে দেখতে পাওয়ার উদগ্র বাসনা এবং যত্রতত্র জীবন ও জ্ঞান, প্রেম ও প্রত্যয় সংগ্রহ করা। এ-সংগ্রহ সঞ্চয় নয়—সম্প্রসারণ, সম্প্রদান। নির্মলকুমার ভারতীয় ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শনের, জিজ্ঞাসার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। এই দুই সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি সংসর্গ করেছেন আজীবন। অথচ থেকেছেন একেবারে নিবিড় ভারতীয়, আগামীকালের দিকে তাকিয়ে।" **'নতুন মানুষের সন্ধানে'** গ্রন্থটি যে দুজনের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত তার একজন হলেন কলকাতার প্রাক্তন বিশপ লাকডাসা ডি মেল এবং অন্যজন লেখকের 'গুরু' অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। অনেকে হয়তো জানেন না, প্রয়াত ডি মেল ছিলেন একজন সিংহলী এবং ইতিহাসে তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর।

'নতুন মানুষের সন্ধানে' গ্রন্থে নাম পর্যায়ে আছে ৯টি রচনা। সেগুলি হলো ঃ 'নতুন মানুষের সন্ধানে', 'মানুষ বনাম টেকনোলজি', 'প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা', 'নতুন পথের সন্ধানে', 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা', 'মানুষ বনাম ভোগ্যপণ্যবাদ', 'মানবতা বনাম সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক চেতনা', 'সভ্যতার রূপান্তর' এবং 'পথের শেষ কোথায়'। প্রত্যেকটি রচনা নিয়ে মতামত দেওয়ার স্থানাভাব, তবে লেখক মানব-সম্পর্কের উৎস বিচার করেছেন সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে। নাম-প্রবন্ধে লেখক মন্তব্য করছেন ঃ "মানুষকে সাহায্য ও সেবা করার উদ্যোগ একটা কিছু নতুন সৃষ্টির মতো কালজয়ী ক্ষমতা। এই ক্ষমতাই গোঁড়ামি, জাত্যাভিমান, দারিদ্র্যকে জয় করতে যত সাহায্য করবে, কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তত করবে না।" (পৃঃ ১২) প্রযুক্তিগত কৌশল অতি বৃদ্ধি হলে মানুষ যে যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ে, সেবিষয়ে লেখক সচেতন। 'মানুষ বনাম টেকনলজি' রচনায় তা স্পষ্ট। রাজনৈতিক সমাজ নয়, সিভিল সোসাইটি আমাদের নতুন পথে নিয়ে যেতে পারে। আমরা লেখকের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলতে পারি—"মানুষ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই তো মানুষের মুক্তি। ভারতবর্ষ ও সমগ্র এশিয়া এবিষয়ে পাশ্চাত্য জগৎকে ধারণা বোধকরি আজো দিতে পারে। বিশ্বায়নের চেয়ে বেশি মূল্যবান বিশ্বচেতনা। এই সংবাদটি ভারতবর্ষ পশ্চিমকে নিশ্চয়ই ভাল করে দিতে পারে।" (পৃঃ ২৯) এখানেই স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আবার আমাদের শরণ নিতে হবে ঃ "কাম্য হলো প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী চিন্তার সুষম সংমিশ্রণ।"

'বিকল্প সমাজ' এবং 'বিকল্প সমাজের সন্ধানে' শীর্ষক রচনা-দুটি যথেষ্ট ভাবনার খোরাক যোগায়। একই কথা প্রযোজ্য 'ধর্ম' শিরোনামের অন্তর্গত 'ধর্ম ও রাজনীতি', 'জীবন ও ধর্ম' এবং 'নারী ও ইসলাম' রচনার ক্ষেত্রে। প্রতিটি রচনায় আদ্যন্ত বিবেকানন্দ-অনুরাগী এক চিন্তাবিদের পরিচয় পাঠকেরা পাবেন। এমন গ্রন্থ যত লেখা হয় ততই মঙ্গল।❑

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ রবিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৮৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির ১৯৯৭-১৯৯৮ সালের কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। এই কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে ঃ

সারা দেশে এবং বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের শতবার্ষিকী উৎসব যথোচিত মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১লা মে ১৯৯৭ কলকাতার নজরুল মঞ্চ-এ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ঐ শতবর্ষজয়ন্তীর সমাপ্তি উৎসবের অঙ্গরূপে গত ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ বেলুড় মঠে একটি সর্বভারতীয় যুবসম্মেলন এবং একটি অন্তর্দেশীয় ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে যথাক্রমে ৭,০০০ যুবপ্রতিনিধি এবং ১০,০০০ ভক্ত যোগদান করেন।

আলোচ্য বর্ষে গুজরাটের পোরবন্দরে মিশনের একটি নতুন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। মিশনের জয়পুর কেন্দ্রে একটি নতুন ডিস্পেনসারী ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়েছে। এছাড়া বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম ও কাটিহার কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে। ভারত সরকার নরেন্দ্রপুর কেন্দ্রকে সৌরশক্তি প্রকল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার এবং বায়ো-গ্যাস প্রকল্পের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেছেন।

বিগত বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় মোট ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিশনের ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিচালিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রায় ৬ লক্ষ বিপন্ন মানুষ উপকৃত হয়েছেন। মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত লাতুর জেলায় গত দুবছর যাবৎ যে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রয়েছে সেটিকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলায় তিনটি আশ্রয়শিবির তথা বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। ঐ জেলাতেই বৃদ্ধগৌতমী নদীর ওপর নির্মীয়মাণ একটি সেতুর শিলান্যাস করা হয়েছে।

দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুঃস্থ মানুষদের আর্থিক সাহায্যাদির জন্য দেড় কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

মিশনের ৯টি হাসপাতাল এবং ৯৯টি ডিস্পেনসারী তথা ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ রোগীর চিকিৎসার জন্য ১৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শিশুবিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যে ১,৭৩,৫০৫ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা হলো ৪৬,২৯২। শিক্ষাখাতে মোট খরচের পরিমাণ ৪৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা।

মিশন ৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি গ্রামীণ ও উপজাতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণ করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোচ্য বর্ষে (১৯৯৭-১৯৯৮) স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত মঠ ও মিশনের বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' শতবর্ষে পদার্পণ করেছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

মেদিনীপুর মিশন আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ) স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তন ও রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তি স্মরণে বর্ষব্যাপী (১৯৯৭-১৯৯৮) নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের সমাবেশ, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ যুবকদের মধ্যে রচনা, আবৃত্তি, ক্যুইজ ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানসমূহের বিশেষ অঙ্গ। বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীর সমাপ্তি পর্যায়ে গত ৮ নভেম্বর ৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৬০০ ছাত্রছাত্রী ও যুবকদের নিয়ে এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী এবং 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের মনোজ্ঞ আলোচনায় প্রতিনিধিগণ অনুপ্রাণিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রত্যেককে 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-প্রত্যাবর্তন' ও 'রামকৃষ্ণ মিশনের নীতি ও কর্মরীতি' পুস্তিকা উপহার এবং লাঞ্চ-প্যাকেট দেওয়া হয়। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সারদাত্মানন্দ।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

মালদা আশ্রম সদুল্লপুর, মিল্কি, ভূতনি, ইংলিশবাজার, রতুয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ৩০টি গ্রামের বন্যাকবলিত পরিবারের মধ্যে ১০০০ ধুতি, ১৬৫০টি শাড়ি, ৮৯০টি লুঙ্গি, ১৬৯০টি শিশু-পোশাক ও ১০৪৫টি কম্বল বিতরণ করেছে।

নরেন্দ্রপুর আশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা, ভগবানগোলা প্রভৃতি অঞ্চলের ৩৬টি গ্রামের ৬,০০০ বন্যাক্লিষ্ট পরিবারের মধ্যে ২,৪৮,০০০ কিলোঃ চাল, ২১,১৫০ কিলোঃ ডাল ও ২০০০ কিলোঃ রান্নার তেল বিতরণ করেছে।

জলপাইগুড়ি আশ্রম কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার প্রেমারডাঙ্গা, চৌধুরীহাট প্রভৃতি অঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ৮৪৬টি শাড়ি, ৫৮৪টি ধুতি, ৩০০টি লুঙ্গি, ৮২৫টি শিশু-পোশাক ও ৩,২১০টি কম্বল বিতরণ করেছে।

মুর্শিদাবাদের সুটি ১ ও ২নং ব্লকের বন্যার্ত পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য **বেলুড় মঠ** থেকে ২,০০০ শাড়ি, ১,০০০ ধুতি, ১,০০০ লুঙ্গি, ১,০০০ চাদর, ১,০০০ শিশু-পোশাক ও ৪,০০০ ব্যবহৃত পোশাক **সারগাছি আশ্রমে** প্রেরিত হয়েছে।

উড়িষ্যা বন্যাত্রাণ

পুরী মিশন আশ্রম মঠসাহি ও পুরী সদরের ৮টি অঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৩৯টি পরিবারের মধ্যে ২০০ শাড়ি, ২০০ ধুতি, ২০০ চাদর এবং ১১৭টি পুরনো জামাকাপড় বিতরণ করেছে।

পুনর্বাসন

মহারাষ্ট্রের লাতুরে পুনর্বাসনের পর **নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা**

পরিষদ ও মুম্বাইয়ের একসেল ইন্ডাস্ট্রিজের সহযোগিতায় গত কয়েক মাসে বহু উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এখনো চলছে। গত ৭ নভেম্বর লাতুরের কাওয়ালিতে একটি মহিলা উদ্যোগ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী। তাছাড়া গত মাসে ২১টি ধোঁয়াহীন চুল্লী, ৪০টি স্বল্পমূল্যে পায়খানা, ১৪৪টি সবজি বাগান প্রভৃতি নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

চক্ষু-চিকিৎসা শিবির

বাঁকুড়া মঠ গত ৫ ও ৯ নভেম্বর চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৩৮ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৯ নভেম্বর একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ২২৫ জন দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা করা হয়। তন্মধ্যে ৫০ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী শিক্ষানন্দ (কুড়ুয়া মহারাজ) ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৯ নভেম্বর '৯৮ দুপুর ২টায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। গত ২৯ অক্টোবর তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৪৬ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। তিনি কর্মী হিসেবে ২০ বছর সারদাপীঠে (বেলুড়), ১৮ বছর আচার্যরূপে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং ৬ বছর উটকামণ্ড আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে সঙ্ঘের সেবা করেছেন।

আলসূর আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর ও বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে তিনি ১৯৯০ সাল থেকে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর সরল ব্যবহার, শাস্ত্রানুরাগ ও তপস্বী জীবনের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

স্বামী ধীরেশানন্দজী (গিরিজা মহারাজ) গত ১২ নভেম্বর '৯৮ রাত ১০.৪০ মিনিটে কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগছিলেন। তাছাড়া চার বছর ধরে মূত্রাশয়-অকর্মণ্যতার জন্য তাঁকে কনখল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রায় ১০ মাস তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৫ সালে কাশী সেবাশ্রমে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৩২ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়া তিনি দেওঘর, বরিশাল, কিষাণপুর, রাজকোট, মহীশূর ও কনখলে কর্মী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে তিনি কনখল সেবাশ্রমে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। বেদান্ত-দর্শনে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তপস্যাপূত জীবন ও অমায়িক স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

স্বামী বিকাশানন্দ (চিত্তরঞ্জন) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৮ নভেম্বর '৯৮ রাত ১০.৫০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবিটিস ও উচ্চ রক্তচাপ রোগে ভুগছিলেন। সেজন্য গত ২৬ নভেম্বর তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ার পর তিনি ১৯৫৬ সালে কামারপুকুর মঠে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসমন্ত্র লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়া তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠান, চেরাপুঞ্জি, বাগবাজার কেন্দ্রে কর্মী হিসাবে এবং কাটিহারে ৮ বছর ও মনসাদ্বীপে শেষ ১০ বছর অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত ছিলেন। সহজ, সরল ও শান্ত স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব : গত ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ মহাসমারোহে শ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৬তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এদিন ভোরে মঙ্গলারতি, বেদ ও স্তোত্রাদি পাঠ, সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় উদ্বোধন কার্যালয়ের সারদানন্দ হল-এ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর ১০টায় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ কালীকীর্তন পরিবেশন করেন। বিকেল সাড়ে ৩টায় আয়োজিত হয় ধর্মসভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ এবং বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দ। বিষয় ছিল—শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী। সভার প্রারম্ভে স্বাগত-ভাষণ ও সমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এরপর সন্ধ্যায় 'দুর্গতিনাশিনী দুর্গা' যাত্রাভিনয় পরিবেশন করে হাওড়ার বীণাপাণি সমিতি। এদিন ভোর ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত হাজার হাজার ভক্ত নরনারী শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। আগত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১৪ ডিসেম্বর **শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে** তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দ।

গত ২৪ ডিসেম্বর **শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি** পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, স্তোত্রপাঠ এবং সকালে বিশেষ পূজা, হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

ক্রিসমাস ইভ : গত ২৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ যীশুখ্রীস্টের প্রতিকৃতিতে আরতি করেন স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দ। ঐদিন স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পড়ায় তাঁর জীবনী আলোচনার আগে বাইবেল-পাঠ ও 'বেদান্তের আলোকে যীশুর শৈলোপদেশ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। আলোচনার শেষে সমাগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ডিব্রুগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে (আসাম) গত ২৯ অক্টোবর '৯৮ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কয়েকজন শিল্পী ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন এবং প্রায় ২০০০ ভক্ত ও দর্শনার্থীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বেড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৯ অক্টোবর '৯৮ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সকালে বিশেষ পূজা, কুমারীপূজা, দুপুরে নরনারায়ণ সেবা এবং সন্ধ্যায় কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-প্রত্যাবর্তন ও রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ স্মরণে **ধুচনীখালী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা)** গত ১ নভেম্বর '৯৮ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় একটি যুব-সম্মেলনের আয়োজন করে আতাপুর কেনারাম উচ্চবিদ্যালয়ে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'স্বামীজীর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা', 'সমাজসেবা' এবং 'ধর্ম—জীবনযাপনের পক্ষে সহায়ক না অন্তরায়' বিতর্ক প্রতিযোগিতা। প্রায় ২৫০ যুব-প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রহড়া বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ ও ডঃ নির্মলেন্দু দাস। এরপর বিকেলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দ।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ)ঃ গত ৩ নভেম্বর '৯৮ নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে হোম, বিশেষ পূজা, ভজন-কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৮০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ভাষণদান করেন স্বামী জ্যোতির্ধনানন্দ, স্বামী হিতকামানন্দ, স্বামী কাশীনাথানন্দ ও স্বামী লোকনাথানন্দ। অনুষ্ঠানে বহু সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ৬ নভেম্বর পূজ্যপাদ মহারাজের উপস্থিতিতে একটি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

চন্দননগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ)ঃ গত ৪ নভেম্বর নবনির্মিত ধ্যানমন্দিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ। এরপর তিনি ও স্বামী ঋতানন্দ সমবেত ভক্তবৃন্দের কাছে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। এছাড়া সকালে বেদ, 'চণ্ডী' ও 'গীতা' পাঠ এবং কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম করেন স্বামী সাংখ্যানন্দ। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দ এবং 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করেন স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দ। দুপুরে প্রায় ১৫০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। এরপর স্বামী নিস্পৃহানন্দজীর পরিচালনায় সমবেতভাবে রামনাম-সঙ্কীর্তন পরিবেশিত হয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী সনাতনানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ, স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দ ও চন্দননগরের মহকুমা-শাসক শ্রীকুমার মণ্ডল। স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঙ্ঘের সম্পাদক দুলালচন্দ্র নায়েক। এরপর সন্ধ্যায় 'রাসলীলা' পরিবেশন করেন নবব্রত ব্রহ্মচারী।

স্যাণ্ডেলের বিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ৭ নভেম্বর '৯৮ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের দ্বিতীয় আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের তাৎপর্য, ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত আশ্রমগুলির কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয় ছিল সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী হিতকামানন্দ। অনুষ্ঠানে ১৯টি আশ্রম থেকে ৬৮ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। গত ৮ নভেম্বর এই আশ্রমের পরিচালনায় ও হিঙ্গলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ বিষয়ে একটি শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বেদপাঠ, সঙ্গীত, গোষ্ঠী আলোচনা ও ভাষণাদি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বামী মুক্তিকামানন্দ ও স্বামী হিতকামানন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১০৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রসাদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত কুটীর (জেলা—হুগলী) গত ১০ নভেম্বর '৯৮ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব স্মরণে এক উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবে অনুষ্ঠিত বিষয় ছিল বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং ধর্মসভা। সভায় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দের পৌরোহিত্যে ভাষণ দেন আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বরানন্দ, স্বামী সাংখ্যানন্দ ও ডঃ অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিকেলে স্বামী দেবদেবানন্দের পরিচালনায় 'গানে গানে কথামৃত' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

দক্ষিণ কলিকাতা বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র (কলকাতা-৭০০ ০২৭)ঃ গত ১৪-১৫ নভেম্বর '৯৮ বার্ষিক উৎসব আয়োজিত হয় স্থানীয় কৈলাস বিদ্যামন্দিরে। শিবপুর প্রফুল্লতীর্থের গীতিনাট্য, কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক অভিনীত 'জাগরণের জনক স্বামী বিবেকানন্দ' নাটক এবং পুরস্কার-বিতরণ ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। প্রথম দিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণানন্দ এবং দ্বিতীয় দিন ভাষণ দেন সারদা মঠের প্রব্রাজিকা শুদ্ধপ্রাণা। দুদিনের সভাতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের সভাপতি প্রণবেশ চক্রবর্তী।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন গত ৫ ও ৬ ডিসেম্বর '৯৮ **ঘাটাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (পশ্চিমবঙ্গ)** অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ২৭টি প্রাইভেট

আশ্রমের ৪৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী এবং ত্যাগ ও সেবা বিষয়ে আলোচনা করেন সর্বভারতীয় ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী সুবিজ্ঞানানন্দ, স্বামী অকল্মষানন্দ এবং গড়বেতা রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শান্তিদানন্দ।

কোন্নগরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাগমন স্মরণে গত ৬ ডিসেম্বর '৯৮ ১১৬তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় **গোপীনাথ জিউর মন্দির-প্রাঙ্গণে (এ. এন. ব্যানার্জী স্ট্রীট, জেলা—হুগলী)**। এই উপলক্ষ্যে সকালে গোপীনাথ জিউ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের (বেলুড়) সন্ন্যাসিগণ। সকালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলরাম-মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দ ও 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তিনাথানন্দ ও আদ্যাপীঠের সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। সভান্তে ভক্তিগীতি নিবেদন করেন স্বামী ক্ষেমানন্দ, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিষ্ঠা ঘোষ।

সুধীর ইনস্টিটিউট (হলদিয়া, জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৬ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব স্মরণে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল বৈদিক মন্ত্র পাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, আলোচনা এবং ধর্মসভা। সকালে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী শরণ্যানন্দ এবং সকাল ও বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস বসু। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকেলে 'মায়ের কথা' ও স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে স্বামী অকল্মষানন্দ ও স্বামী শ্যামানন্দ এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শিবাণী মণ্ডল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দেবপ্রসাদ মণ্ডল।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসব পালন

সাঁইথিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের ১৪৬তম জন্মতিথি উদ্‌যাপন করে। মঙ্গলারতি, বেদ ও গীতা পাঠ, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা এবং আলোচনা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। বিকেলে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ও 'সারদা-পুঁথি' পাঠ এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতিতে (কলকাতা-৭০০ ০৩৬) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ভজন পরিবেশনের পর শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিধানানন্দ।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (জেলা—বীরভূম) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, শোভাযাত্রা ও ধর্মসভার মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। অনুষ্ঠানে ভজন ও ভক্তিগীতি নিবেদন করেন সৌমিত্র গাঙ্গুলী ও দীপিকা রায়। সকালে বিশেষ পূজা এবং সন্ধ্যায় 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী দেবাত্মানন্দ। সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (জেলা—কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, ভক্তিগীতি এবং 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ও 'উদ্বোধন' থেকে পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বহির্ভারত

সুনামগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রমে (বাংলাদেশ) গত ৭ নভেম্বর '৯৮ একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আশ্রমের সভাপতি ডাঃ ধীরেন্দ্রকুমার দেবচৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণদান করেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দজী মহারাজ এবং বক্তৃতাদান করেন স্বামী স্থিরাত্মানন্দ, উপাধ্যক্ষ ননীগোপাল দাস, স্বামী বিজিতাত্মানন্দ ও অধ্যাপক বিজিতলাল দে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আশ্রম-সম্পাদক যোগেশ্বর দাস। সভাশেষে হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর ওপর এক চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ) গত ১ ডিসেম্বর '৯৮ পরিষদের নবম বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করে। প্রার্থনা, নবীনবরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ হল-এর প্রাধ্যক্ষ ও পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ভূমি প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব রাশেদ মোশাররফ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ফণীন্দ্রকুমার ঘোষ** গত ১৬ জুলাই '৯৮ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা ১৭ মিনিটে কলকাতার এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ইষ্টনাম উচ্চারণ করতে করতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। ১৯০৯ সালের ১২ ডিসেম্বর বরিশাল জেলার বাণারিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান নিবাস ছিল বাঘা যতীনের স্বামী বিবেকানন্দ রোড এক্সটেনশনে। প্রায় ৫৩ বছর ধরে বেলুড় মঠ, 'মায়ের বাড়ী', যোগোদ্যান, শিকড়াকুলীন ও বামুনমুড়া আশ্রমে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মঠের বহু প্রবীণ সাধু, বিশেষ করে স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ, স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ, ভরত মহারাজ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের তিনি বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি ৩০ বছর মিশনের সাধারণ সদস্য এবং 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। অন্যদেরকে এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহও

দিতেন। তিনি সর্বতোভাবে গৃহী-সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন। মৃত্যুর ৫ মিনিট পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর শেষ আকুতি ছিল ঃ "ঠাকুর, আমাকে তোমার কাছে নাও।"

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **স্বামী কেশবানন্দ** ৮৮ বছর বয়সে গত ৮ আগস্ট '৯৮ কাশী সেবাশ্রমের হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক স্বামী সৌম্যানন্দের প্রেরণায় তিনি ১৯৫৭ সালে শিলং আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অবস্থান করেন। সম্পাদক মহারাজের নির্দেশে তাঁকে পাণ্ডু আশ্রমের (প্রাইভেট) সেবাকাজে নিযুক্ত হতে হয়েছিল। তারপর তিনি কামাখ্যায় স্বামী ভূমানন্দের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পাণ্ডু আশ্রম ছাড়া তিনি সারদাপীঠ (বেলুড়), রামকৃষ্ণ মিশন মাথাভাঙ্গা (উত্তরবঙ্গ) প্রভৃতি আশ্রমে ছিলেন। এরপর ১৯৯০ সালে তিনি কাশী সেবাশ্রমে আসেন। সেখানে তিনি শেষদিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। বিনয়-নম্র ব্যবহার, সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **চন্দ্রশেখর চৌধুরী** ৯২ বছর বয়সে গত ১৮ আগস্ট '৯৮ কাশী সেবাশ্রম হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। যৌবনে তিনি বিপ্লবী সূর্য সেনের (মাস্টারদা) দলভুক্ত ছিলেন। পরে চাকরি পেয়ে তিনি রেঙ্গুনে যান। সেখানে তৎকালীন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি উক্ত সোসাইটিতে স্বেচ্ছাসেবকরূপে বিভিন্ন সেবাকাজ করেন। এরপর তিনি ১৯৫৫ সাল থেকে বেলুড় মঠে স্বেচ্ছাসেবকরূপে বহুদিন ছিলেন। শাস্ত্রাদি পাঠে এবং আধ্যাত্মিক ও দেশাত্মবোধক সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য **ডাঃ যশোদাকান্ত বড়ুয়া** ৯৩ বছর বয়সে গত ২১ আগস্ট '৯৮ সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন হোজাই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও একনিষ্ঠ কর্মী এবং দরদী ও অমায়িক স্বভাবের।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **অজয়কুমার সেন** ৬৫ বছর বয়সে গত ২৯ আগস্ট '৯৮ ভোর ৪.০৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে বিশেষ করে মালদা মঠের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। পরোপকারিতা, সেবা ও সহজ-সরল ব্যবহার ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **সুকুমার সাহা** ৫৮ বছর বয়সে গত ২৬ আগস্ট '৯৮ পরলোকগমন করেন। তিনি ফলাকাটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সভাপতি ছিলেন। তাঁর সরল ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করত।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **জগদীন্দ্রনাথ ঘোষ** ৬৭ বছর বয়সে গত ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৮ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও শ্যামপুকুরবাটীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **বিমলেন্দু দাস** গত ২০ সেপ্টেম্বর '৯৮ রাত ৯.০৫ মিনিটে ৫৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি নাহারলগন কালীমন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অছি পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি অরুণাচল প্রদেশ সরকারের পূর্ত বিভাগের নির্বাহী ইঞ্জিনীয়ার, স্থানীয় বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেলের সভাপতি এবং ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্যা **বীণা দাশগুপ্তা** মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে গত ২২ সেপ্টেম্বর '৯৮ রাত ১.০৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু প্রয়াণের পূর্বদিনে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি ছিলেন সেবাপরায়ণ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত। সহজ-সরল ও সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য পরিচিতজনের কাছে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **সঞ্চিতা পালচৌধুরী** বহুমূত্ররোগে ভুগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর '৯৮ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে তাঁর যাতায়াত ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আজীবন গ্রাহিকা ছিলেন। সৎ ও বিনয়ী স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **শান্তিলতা বিশ্বাস** গত ২৪ সেপ্টেম্বর ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন উদারমনা, তাঁর ব্যবহার ছিল ভদ্র ও মধুর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **সত্যব্রত চৌধুরী** গত ৩ অক্টোবর '৯৮ সন্ধ্যা ৫.৩৫ মিনিটে ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ডিব্রুগড় রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির নিরলস ও নীরব স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **নিমাইলাল বোস** ৭৬ বছর বয়সে গত ৯ অক্টোবর '৯৮ সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি কটক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতির একজন কর্মঠ সদস্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত লেকগার্ডেন্স নিবাসিনী **গৌরীরানী সান্যাল** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১২ অক্টোবর '৯৮ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ছিলেন দানশীলা ও নানা গুণের অধিকারিণী। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে তিনি নিয়মিতভাবে অর্থদান করতেন। এছাড়া নানাভাবে তিনি অনেককে অর্থসাহায্য করতেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **বাচ্চু বর্ধন** ৫৬ বছর বয়সে গত ১৮ অক্টোবর '৯৮ বিকাল ৪.১০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি স্থানীয় সোনামুড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের একজন নিষ্ঠাবতী কর্মী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **রমারানী শীল** গত ২৫ অক্টোবর ৫৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। সহজ-সরল ব্যবহার ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত। ❑

UDBODHAN
Phone 554-2248
554-2403

Vol. 101 ❏ No. 1 ❏ JANUARY 1999

Licence No.
WB/NC/CL-3

ISSN 0971-4316
R N 8793/57
Postal Reg. No. WB/NC 19

উদ্বোধন

১০১তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

❏ **উদ্বোধন** এবার **১০১তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০০ বছর অতিক্রম এই প্রথম** ❏

❏ **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

❏ **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত** হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❏ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি পারিবারিক পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

❏ **উদ্বোধন** বাঙলা ভাষায় শুধু **সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ** সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।

❏ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন **সাম্প্রদায়িক ধর্মীয়** আদর্শের মুখপত্র নয়। **উদ্বোধন** তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র **শতবর্ষ** ধরে অটুট রেখেছে।

❏ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ** ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❏ উদ্বোধন একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ**, **শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের** ভাব ও বাণী-শরীর।

❏ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে** উদ্বোধন যেন থাকে। **উদ্বোধন**-এর প্রত্যেক গ্রাহক [illegible] করলেই এখনি **উদ্বোধন** এর গ্রাহকসংখ্যা **এক লক্ষ** হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, [illegible] আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।

❏ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অনুরাগী ও ভক্তেরা উদ্বোধন-এর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এই আশা রাখি।

❏ **উদ্বোধন এর শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় [illegible] এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের** থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না। শারদীয়া সংখ্যার জন্য গ্রাহক-পিছু আমাদের [illegible] দাঁড়ায় গ্রাহকমূল্যের প্রায় আড়াই গুণ। এই ঘাটতির জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের [illegible] ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।

❏ **উদ্বোধন** পত্রিকার সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি '**উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল**', অন্য দুটি [illegible] '**স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল**' এবং '**স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল**'। শেষের দুটি তহবিলের অর্থানুকূল্যে [illegible] 'উদ্বোধন' এর প্রতি সংখ্যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা চিহ্নিত হচ্ছে। **উদ্বোধন এর জন্য সকল আর্থিক** দান আয়কর আইনের [illegible] **ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar,' এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** [illegible] '**উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়**' অথবা '**স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল**' অথবা '**স্বামী বীরেশ্বরানন্দ** স্মৃতি তহবিল'-এর [illegible] থাকে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি দান পাঠালে '**স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি** তহবিলের জন্য' অথবা '**স্বামী বীরেশ্বরানন্দ** স্মৃতি তহবিলের জন্য' পাঠানো হচ্ছে **সেই মর্মে দাতার চিঠি থাকা বাঞ্ছনীয়।**

❏ **'উদ্বোধন'-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষ থেকে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' সম্প্রতি নিবেদিত হয়েছে। **১৯৯৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায়** প্রথম ২০ জন **স্থানাধিকারী 'উদ্বোধন'** প্রবর্তিত **এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের সঙ্গে** যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ   সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

১৪০৫ □ ২য় সংখ্যা
উদ্বোধন
১০১
2 0 MAR 1999

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত

সর্বজনীন উপাসনালয়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে **স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের** দ্বারা স্থাপিত হয় **শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, চেন্নাই**। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ **শতবর্ষ** পূর্ণ করেছে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত **এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল** এবং মন্দিরের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটির সম্ভাব্য **নির্মাণব্যয় দাঁড়াবে সাড়ে ছয় কোটি টাকা।**

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ **শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ** মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী শতাব্দীর প্রারম্ভেই মন্দিরের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন হবে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল চিন্তাশীল মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফ্‌টে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। **এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।** আপনার সহৃদয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯
ই. মেল ঠিকানা : srkmath@giasmd01.vsnl.net.in

উদ্বোধন ॥১০১॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
একশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০১তম বর্ষ ২য় সংখ্যা ফাল্গুন ১৪০৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ৫৩
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৪
❑ অপ্রকাশিত পত্র ❑ স্বামী সারদানন্দ ৫৭
❑ সঙ্কলন ❑
'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা—শ্রীম ৫৮
❑ ভাষণ ❑
অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী ভূতেশানন্দ ৬১
❑ স্মৃতিকথা ❑
কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের পুণ্যস্মৃতি—স্বামী নির্মুক্তানন্দ ৮৭
❑ ধারাবাহিক প্রবন্ধ ❑
অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ—স্বামী প্রভানন্দ ৬৮
❑ নিবন্ধ ❑
শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম জ্ঞানের উৎস সন্ধানে—
জলধিকুমার সরকার ৭৭
❑ ক্রীড়াজগৎ ❑
ক্রিকেট ও তার নিয়মকানুন—জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২
❑ পরিক্রমা ❑
মহারাষ্ট্র ও গোয়ায়—মঞ্জুষা দাস ৮৯
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ②—কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত ৭৩
❑ বিজ্ঞান ❑
প্রসঙ্গ আঁশযুক্ত খাদ্য—তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩
❑ পরমপদকমলে ❑
"আমি দেখব"—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৮৫
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
প্রসঙ্গ : 'ব্রিটিশ রাজরোষে রামকৃষ্ণ মিশন' ৭৪
প্রসঙ্গ : 'নতুন গবেষণা' ৭৫ সংশোধন ৭৬
প্রসঙ্গ : শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের
কর্তব্য ও দায়িত্ব ৭৬
❑ কবিতা ❑
আবির্ভাব—সৌমিত্র সেন ৮০
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ—দীপককুমার দাশ ৮০
শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ—নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৮০
হে প্রভু! তুমি ছিলে, তুমি থেক—শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী ৮১
তাঁর নাম রামকৃষ্ণ—অনীতা দত্ত ৮১
তুমি তো তাই প্রাণের ঠাকুর—বিজয়কুমার দাস ৮১
❑ বিশেষ প্রতিবেদন ❑
'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ৯৫
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ • পাশ্চাত্যে মদ্যপান—
অতীতে ও বর্তমানে ৯৭
গ্রন্থ-পরিচয় • 'কথামৃত' মানুষের শাশ্বত প্রেরণা—
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ৯৮
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৯৯
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ১০১ বিবিধ সংবাদ ১০২
❑ অন্যান্য ❑
অনুষ্ঠান-সূচী (ফাল্গুন-চৈত্র ১৪০৫) ৬০
'উদ্বোধন'-গ্রাহকদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ৭৯
'উদ্বোধন'-এ রচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ৮৬
❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র : অদ্বৈত আশ্রম

বর্তমান বর্ষের (১৪০৫-১৪০৬/১৯৯৯) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

'উদ্বোধন'-গ্রাহকদের জ্ঞাতব্য ঃ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ, সংগ্রহ ও অন্যান্য

❑ 'উদ্বোধন' পত্রিকার বর্তমান বর্ষের (১০১তম বর্ষ ঃ মাঘ ১৪০৫—পৌষ ১৪০৬, জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৯) গ্রাহকমূল্য—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে ঃ ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); ৭২০ টাকা (বিমানডাক); বাংলাদেশ ঃ ১৪০ টাকা।

❑ গত বছরের (১৯৯৮/১৪০৪-১৪০৫) মাঘ (শতবর্ষে পদার্পণ সংখ্যা), ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা দুবার মুদ্রণের পরেও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য বছরের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

❑ ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট/পোস্টাল অর্ডার যোগে গ্রাহকমূল্য পাঠালে **"Udbodhan Office, Calcutta"**—এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়।

❑ কলকাতা বা নিকটবর্তী অঞ্চলে যাঁরা থাকেন, তাঁরা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য জমা দিলে সুবিধা হয়। কেননা মানি অর্ডারে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে যদি দেরি হয় এবং ততদিনে যদি প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাহলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও ঐ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে-কারণে সম্ভব হলে মানি অর্ডার না করে গ্রাহকমূল্য আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়াই ভাল।

❑ পত্রোত্তরের জন্য এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ প্রতি বাঙলা মাসের ১ তারিখ (ইংরেজী ১৪-১৮) 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়। ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার প্রধান ডাকঘরে (G.P.O.) এবং কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণত ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ঠিকমত পৌঁছায় না বলে গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে। এই বিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে পত্রিকা ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা এক মাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। এক মাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট' বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে সংশ্লিষ্ট ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে।

❑ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় (একমাস) অতিক্রান্ত হলে তবেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহক-সংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক।

❑ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। যাঁরা ডাকে পত্রিকা নেন, তাঁরা সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) অথবা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণের সময় অথবা ১লা জুন থেকে ২৪শে আগস্টের মধ্যে কার্যালয়ে জানাতে হয়।

❑ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র সংখ্যায় পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/ আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে।

❑ ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নতুন ঠিকানা পিন কোড সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে, যাতে পরবর্তী সংখ্যাটি পুরনো ঠিকানায় না চলে যায়।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হলে 'উদ্বোধন'-এ ব্যক্তির/ কেন্দ্রের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হবে।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদনপত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বা প্রাইভেট কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ সভাপতিকে আবেদন করতে হবে।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/**Editor**, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ — সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

উদ্বোধন
১০১
ফাল্গুন ১৪০৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

দিব্য বাণী

❑ আমি বলি, সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক। যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের ভুল [—এই বুদ্ধি]। কবীর বলত ঃ "সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।"

❑ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী [অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা]—সকলেই এক বস্তুকে চাইছে। কি জান? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়।

❑ আমি চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলুম, এমন করলে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন করলে (চক্ষু খুললে) কি ঈশ্বর নাই? চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য মধ্যে, জলে, স্থলে—সর্বভূতে তিনি আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগিনী নিবেদিতার ভারত-আগমনের শতবর্ষ এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁহার নবজন্মের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই সম্পাদকীয়টি নিবেদিত।

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ভারতে আসার পর গুরুর চরণপ্রান্তে ঘটিল তাঁহার জন্মান্তর। মার্গারেট হইলেন ভগিনী নিবেদিতা। তখন হইতে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ব্রতধারিণী। তখন হইতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণে একান্তভাবে আত্মনিবেদিত। তিনি তখন তাঁহার পরিচয় লিখিতেন— 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নিবেদিতা' ('Nivedita of the Ramakrishna Order')। স্বামীজীর দেহান্তের পর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডি হইতে নিজের কার্যাবলীকে পৃথক করিয়া লইতে হইয়াছিল তাঁহাকে। সেসময় প্রথমে 'রামকৃষ্ণের নিবেদিতা' ('Nivedita of Ramakrishna') বলিয়া তিনি তাঁহার পরিচয় জ্ঞাপন করিতেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার নূতনতর পরিচয় হইল—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' ('Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda')। বস্তুত, এই পরিচয়কেই তিনি আমৃত্যু তাঁহার যথার্থ পরিচয় বলিয়া মনে করিতেন এবং ঐভাবেই তাঁহার পরিচয় জ্ঞাপন করিতেন। বাস্তবিকই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদিত ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, স্বামীজীর দেহান্তের পর নিবেদিতা যেসকল কাজে নিজেকে যুক্ত করিয়াছিলেন, সেগুলি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবানুগ নয়। নিবেদিতা কিন্তু এই বিশ্বাসেই সেইসমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন যে, উহাদের মাধ্যমে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাজই করিতেছেন। এবিষয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন : "তোমার সহযাত্রী অনেকেই তোমার মন ভাঙিয়া দিতে চাহিবে। বলিবে, তোমার একাজ শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের কাজ নয়। তাহাদের কথায় কান দিও না। সমগ্র জগৎ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছ তাহা ছাড়িও না।" (দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬৮, পৃঃ ২২৫) 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' বলিতে তিনি দুই পৃথক ব্যক্তি বা আদর্শকে বুঝিতেন না, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে তিনি এক অখণ্ড ব্যক্তিত্ব, এক অখণ্ড আদর্শ জ্ঞান করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন : "Often it appears to me... that there has been with us a soul named Ramakrishna-Vivekananda." (আমার প্রায়ই মনে হয়,... আমাদের মধ্যে একটিই আত্মা বিরাজমান, যাঁহার নাম—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'। দ্রঃ Master as I saw Him, 9th Edn. 1963, p. 85) সুভাষচন্দ্র বসু নিবেদিতার এই উপলব্ধিকে তাঁহারও অন্তরের উপলব্ধি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন : "নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ।" (দ্রঃ 'উদ্বোধন', ৪৯তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫৯) প্রসঙ্গত, যে-রাত্রিতে স্বামীজী দেহত্যাগ করেন সে-রাত্রিতে নিবেদিতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দেহত্যাগ করিয়াছেন! প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে শুনিলেন, গৃহদ্বারে সংবাদদাতা স্বামীজীর মহাসমাধির মর্মান্তিক সংবাদ লইয়া উপস্থিত!

একথা সত্য যে, নিবেদিতার রামকৃষ্ণ-দৃষ্টি তাঁহার গুরুর নিকট হইতে বহুলাংশে প্রাপ্ত। কিন্তু মর্মানুভূতির গভীরতায় এবং পরমপুরুষের অসাধারণ জীবন ও সাধনার তাৎপর্যের গভীরে প্রবেশের সামর্থ্যে তাঁহার মৌলিকতা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। তাঁহার চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিভাত হইয়াছেন স্বয়ং কালীরূপে, আবার শিবরূপেও। মনস্বিনী নিবেদিতা যথার্থই বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে না দেখিলে বিবেকানন্দকে বুঝা অসম্ভব। তিনি লিখিয়াছেন, বিবেকানন্দ-প্রচারিত মতসমূহকে সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহার তেজস্বী ও অভিনব দর্শনচিন্তা নির্মিত হইয়াছিল তাঁহার আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপলব্ধির আলোকে। নিবেদিতার নিজের ভাষায় : "ধর্মগ্রন্থসকল তাঁহার (স্বামীজীর) নিকট জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই; পরন্তু উহারা এক মহান জীবনের টীকা ও ব্যাখ্যা-স্বরূপ ছিল, ঐসকল গ্রন্থের কোনরূপ সহায়তা ভিন্ন যে-জীবনের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা তাঁহার চোখকে ধাঁধাইয়া দিত এবং তাঁহার বিশ্লেষণশক্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলিত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনই তাঁহার মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দেয় যে, শঙ্করাচার্য-ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদই —যে-মত বলে দুই নয়, শুধু একই বিদ্যমান—শেষপর্যন্ত একমাত্র সত্য। পরমহংসদেবের জীবনই তাঁহার নিজস্ব অনুভূতির দ্বারা দৃঢ় হইয়া তাঁহার প্রত্যয়কে অভ্রান্ত করাইয়া দিয়াছিল যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ সেই 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্' অবস্থায় উপনীত হইতে না পারিলেও উহারা অদ্বৈত রূপ সর্বোচ্চ উপলব্ধির বিভিন্ন স্তর বলিয়া প্রমাণিত।" (দ্রঃ 'The Master', pp. 225-226)

স্বামীজীর কাছেই নিবেদিতা শুনিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—ঈশ্বরলাভ তথা পরম সত্যলাভের জন্য উদ্দিষ্ট কোন আন্তরিক বিশ্বাসই মিথ্যা নয়। নিবেদিতা লিখিয়াছেন : "শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, যেখানে সবাই উপাসনা করে সেখানে নতশির হইবে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। কারণ, মানুষ যে-রূপে তাঁহাকে চায়, তিনি সেইরূপেই আবির্ভূত হন। সূর্যের দিকে যাওয়ার পথে আমরা প্রতি পদক্ষেপেই সূর্যের ছবি তুলিয়া

চলিলে যেকোন দুটি ছবির একটি অবিকল অন্যটির মতো হইবে না, কিন্তু কোনটিকেই কি অসত্য বলা যাইবে? ইহার তাৎপর্য এই যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে যে বিরোধ, তাহাদের সমন্বয় সম্ভব।" (দ্রঃ ঐ, p. 226) শুধু তাহাই নয়, গুরুর কাছে নিবেদিতা শুনিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও জীবন শিখাইয়াছিল অপরের সত্তার মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করাইয়া অপরের মতকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা তিনি স্বয়ং তাঁহার জীবনে অনুশীলন করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ঐ প্রণালী তাঁহার নিজস্ব।

নিবেদিতা তাঁহার গুরুর কাছে প্রায়ই শুনিতেন দুটি শব্দ—"নারী ও জনগণ" ("Woman and the People")। বস্তুত, নারী ও জনগণের উন্নতির জন্য স্বামীজীর আগ্রহ ও প্রয়াসের অন্ত ছিল না। নিবেদিতা বলিতেন: "আমাদের আচার্যদেব মনে করিতেন, তিনি যে-সঙ্ঘভুক্ত তাহার সর্বক্ষণের ব্রত হইল নারী ও জনগণের উন্নতিবিধান।" (দ্রঃ ঐ, p. 280) বিদেশে যখনই তাঁহার মনে হইত তিনি মৃত্যুর সমীপবর্তী, তখন ঐ এক চিন্তাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিত এবং নিকটে উপস্থিত শিষ্যকে বলিতেন: "Never forget! the word is 'Woman and the People'." (ভুলিও না, আমাদের মূলমন্ত্র—'নারী এবং জনগণ!' দ্রঃ ঐ) নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে শুনিয়াছিলেন, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষারই ফল। কারণ, নিবেদিতা লিখিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরের আচার্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, নারীও পুরুষের মতো সর্বোচ্চ সত্যলাভে সমর্থ (দ্রঃ ঐ, p. 226)। শুধু তাহাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষের সমানাধিকার ঘোষণা করিয়াছে। (ঐ, p. 280)

নিবেদিতা মনে করিতেন, রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের এক সর্বপ্রধান অবদান ঐহিক ও পারত্রিকের—কর্ম ও ধর্মের সমীকরণ। সংসারের সমস্ত কর্ম, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত প্রয়াস পূজা বা উপাসনার সমার্থক হইয়া যায়, প্রতিদিনের জীবনকে প্রতিমুহূর্তে পূজায় পরিণত করা যায়। এই অভিনব আদর্শকে 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' বা 'কর্মপরিণত বেদান্ত'-রূপে স্বামীজী জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। স্বামীজী এবং তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতার সূত্রে নিবেদিতা জানিয়াছিলেন—এই আদর্শকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার জীবনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন: 'ইহা প্রদর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরকালে তাঁহার মহান শিষ্যের জীবনে এক মুখ্য চিন্তাধারার ভিত্তি ও প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।" (দ্রঃ ঐ, p. 227)

তাঁহার বিখ্যাত 'কালী দ্য মাদার' পুস্তিকায় 'কালীর দুই সাধক' অধ্যায়ে নিবেদিতা রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের কথা লিখিয়াছেন। রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন: "জাতি-জীবন হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন ঈশ্বরের মাতৃভাবের বাঙালী মহাকবি রামপ্রসাদ। তাঁহার বাণী সরাসরি প্রবেশ করিয়াছে জাতির অন্তর্লোকে।" আর রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখিয়াছেন: "রামপ্রসাদের মতো ঈশ্বরের জন্য মানুষের আকৃতির কবিরূপে নয়, মানবসন্তানের জন্য স্বয়ং বিশ্বমাতার ভালবাসার অবতার-রূপে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব।... তিনি প্রতি মানুষের মনের সমস্যার কথা বুঝিতে পারিতেন, যেন সেগুলি ছিল তাঁহার নিজেরই সমস্যা। আধুনিক কালে সম্ভবত তিনিই যথার্থ বিশ্বমানব—সর্বাত্মক সর্বজনীন মনের অধিকারী। সবকিছুই সেখানে এমন এক ঐক্যে পরিণতি পাইয়াছিল যে, তাহার প্রশান্তি আজও সেই ছোট্ট ঘরটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, যে-ঘরটিতে একদা তিনি বাস করিতেন এবং সেই বিরাট ধ্যানতরুর নিচে আজও তাহা বিরাজ করিতেছে এক পরাক্রান্ত উপস্থিতির মতো।" অর্থাৎ রামকৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বমাতৃত্ব ও বিশ্বজনীনতাকে মূর্ত হইতে দেখিয়াছিলেন নিবেদিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নিবেদিতা দেখিয়াছিলেন আধ্যাত্মিকতার সর্বাপেক্ষা সার্থক পূর্ণতার বিগ্রহকে। 'কালী দ্য মাদার'-এ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন: "ধর্মসংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যে-কল্পনা করা সম্ভব তিনি ছিলেন তাহার পূর্ণ সিদ্ধি। 'বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরের নিকটে পৌঁছাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র'—এই মতবাদ সাধারণভাবে ভারতবর্ষে নূতন নয়; কিন্তু তিনি যেভাবে এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই দৃঢ় ধারণা—নিজের ধর্ম অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত কর্তব্য, কারণ বহু ভাবকেন্দ্র থাকিলে পৃথিবীর মঙ্গল; তাঁহার সুগভীর প্রত্যয়—'ঈশ্বরকে যে-নামে বা যে-আকারেই জানতে চাও না কেন, সেই নামে বা আকারেই তুমি তাঁহার দর্শন পাইবে'; তাঁহার সেই আশ্বাস—ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আছে আধ্যাত্মিকতার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, যেমন খোসার মধ্যে লুকাইয়া থাকে বীজ; সর্বোপরি, একান্ত প্রেমের সঙ্গে সর্বধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ঘোষণা—'অন্যেরা যেখানে নতজানু হইয়া ভক্তি নিবেদন করিতেছে সেখানে তুমিও নত হও, নমস্কার কর, কারণ যেখানে অনেকের উপাসনা মিলিত হয় সেখানে ঈশ্বর প্রকাশিত করেন নিজেকে' (এই কথাগুলি, আমরা দেখিয়াছি, 'মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থেও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন)—পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার কোন তুলনা পাওয়া যায় না।

"ধর্মীয় অনুভূতির সত্যতা সম্বন্ধে যাহার সামান্য জ্ঞানও হইয়াছে, বুদ্ধির সাহায্যে তাহার পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন নয় যে, বিভিন্ন ভাষায় যেমন একই বক্তব্য বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সেই এক চৈতন্যময় সত্তাকেই নানাভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের রামকৃষ্ণ আরো বেশি কিছু দিলেন। তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তাহার নিজের ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং সিদ্ধিতে পৌঁছাইবার পথ দেখাইবার মহান প্রেরণার পরম মূর্তিস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ভালবাসায় কোথাও কোন সীমারেখা ছিল না।... সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের আত্মার মুক্তিই ছিল তাঁহার কাম্য। সে-বিশ্ব হইতে একটি প্রাণীও বাদ পড়িবে, যতই অকিঞ্চন সে হোক না কেন, সেই বিশ্ব তাঁহার কাছে অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইত।...

একমাত্র এহেন ভালবাসাই 'মাতৃরূপিণী ঈশ্বর' নামের যোগ্য। এই মহান ভালবাসার আবেগে তিনি ছিলেন আত্মহারা।"

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শৈশবাবধিই ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের মাধুর্য উপভোগের চরম আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য তিনি শুরু করিয়াছিলেন এক দারুণ ও সর্বগ্রাসী সাধন-সংগ্রাম। দীর্ঘ দ্বাদশ বছরের সেই আত্মার সংগ্রামে অবশেষে সিদ্ধি আসিল একদিন। নিবেদিতার অনুপম ভাষায়ঃ "মা উন্মোচিত করিলেন নিজেকে। সেই ক্ষণ হইতে তিনি হইয়া গেলেন একেবারেই এক শিশু—সর্বদা জননীর হাত ধরিয়া তিনি রহিয়াছেন।... তাহার পর শাশ্বত মিলনের আনন্দলোক হইতে ধীরে ধীরে তিনি নামিয়া আসিলেন। দেখিলেন বিশ্বের অনু-পরমাণু পরমেরই অঙ্গ; তখনই তাঁহার প্রখর অনুভূতিতে মানবজীবনের বহু জিনিসই ধরা পড়িল, যাহার পথ-পরিক্রমণ তিনি করেন নাই।" এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ শুরু করিলেন কৃষ্ণ-উপাসনা এবং পরিণতিতে উপলব্ধি করিলেন কৃষ্ণ ও কালী একই। "এইভাবেই", নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "মুসলমান ধর্ম ও খ্রীস্ট ধর্মের সাধনার পথও তিনি অতিক্রম করিলেন। না, এসব তিনি করেন নাই, করিয়াছিল সেই মহাপ্রেম, যাহাকে তিনি বলিতেন—'মা'!

"এখানেই নিহিত তাঁহার জীবনের সার।... বিশ্বমাতৃত্বের মূর্ত বিগ্রহ এই মানুষটি সমগ্র জীবলোককে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জীবনের পরিপূর্ণ ঐকতানের মধ্যে প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বপ্লাবী বিশ্ববীক্ষার মধ্যে নিবেদিতা দেখিয়াছিলেন এক অসাধারণ ইতিবাচক জীবনদর্শনের মর্মস্পর্শী রূপ। জগতের কোন মানুষকে, মানুষের কোন অভিজ্ঞতাকে, কোন অবস্থাকে—কোন স্খলন অথবা পতনকে শ্রীরামকৃষ্ণ উপেক্ষা করেন নাই। যাহার যেখানেই অবস্থান সেখান হইতেই তিনি তাহাকে উত্তরণের আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যতই নগণ্যই হউক না কেন, অনন্তের সিংহতোরণে প্রবেশের অধিকার প্রত্যেকের। নিবেদিতা অনবদ্য ভাষায় লিখিয়াছেনঃ "ইহা কি একটি সুমহান মতবাদ নয় যে, প্রতিটি মানুষের ক্ষুদ্র গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইয়া আছে অনন্তের রাজপথের দিকে? এই আহ্বান কি অপরিসীম সান্ত্বনার কারণ হয় না—যখন শোনা যায়, 'যে যেখানে আছ, সেখান হইতেই, যাহা তোমার আছে তাহাই লইয়া, তোমার প্রভুর জন্য, তোমার ঈশ্বরের জন্য হৃদয়কে মুক্ত রাখ, আর দৃষ্টি উন্মুক্ত রাখ সত্যের দিকে?'

"শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার নির্দিষ্ট মুদ্রাঙ্কন হইল—পরবর্তী কালে তাঁহার কাছে যিনিই আসিয়াছেন, ফিরিয়া যাইবার সময় অনুভব করিয়াছেন এক গভীর সাহস, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের শক্তির উৎসকে জাগাইয়া দিতেন, যাহার ফলে স্পর্শপ্রাপ্ত মানুষটি সীমাবদ্ধতাকে ছিন্ন করিয়া পাখা মেলিয়া দিত ঊর্ধ্বাকাশে।

"কোন সামাজিক প্রথা বা সাধারণ রীতির ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যের মূলোৎপাটন করেন নাই। মানুষ যাহাতে অন্তরে বলীয়ান হইতে পারে সেজন্য সবকিছুই করিয়াছেন। সংস্কারপন্থী নেতাদের তিনি বিনা দ্বিধায় সঙ্গ দিতেন এবং তেমনই আগ্রহে দিতেন রঙ্গমঞ্চের ধিক্কৃত শিল্পীদেরও; অথচ তৎসত্ত্বেও রক্ষণশীলরা পর্যন্ত তাঁহাকে পূজা করিতেন।"

কিন্তু এসমস্ত কি তিনি সচেতনভাবে করিয়াছিলেন? নিবেদিতা বলিয়াছেনঃ "রামকৃষ্ণ যাহা কিছু করিয়াছেন সবই অসচেতনভাবে। তিনি দিব্য প্রেরণায় কাজ করিতেন, শিশুর মতোই এবং শিশুর মতোই তিনি অপূর্ব ও অভ্রান্ত। নিজ অস্তিত্বেই তিনি পরিতৃপ্ত, পূর্ণ—সে-অস্তিত্বের ব্যাখ্যার দায়িত্ব অন্যের।... তিনি কাউকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চান নাই, পরবর্তী জীবনে নিজেকে গুরুরূপে কল্পনা করিতে পারিতেন না, তিনি তাঁহার জ্ঞানরাশি চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, যে যেমন পারিয়াছে কুড়াইয়া লইয়াছে।...

"প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা যে বৃথাবস্তু নয়, জগতের কাছে সেই সত্যের তিনি ছিলেন সাক্ষিস্বরূপ। একথা অবশ্য সত্য, আর কোন দেশেই তাঁহার জন্মগ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু একথাও ঠিক নয় যে, তিনি প্রধানত বা একমাত্র ভারতের আত্মাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে সমগ্র মানবজাতির অনুভূতি ও চিন্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছিল এবং কালীগতপ্রাণ সেই রামকৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন মানবতার প্রতিনিধি।" (নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬-১৫৫) রামকৃষ্ণের এই বিশ্বজনীনতার দিকটি নিবেদিতা 'স্টেটসম্যান'-এ (১৮.২.১৮৯৯) ম্যাক্সমূলারের রামকৃষ্ণ-জীবনীর আলোচনাতেও উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদিতা কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার কিছুটা আভাস আমরা নিশ্চয় পাইয়াছি। উহার সহিত যুক্ত করা যাইতে পারে একটি ঘটনা। সরলাবালা সরকার, যিনি নিবেদিতাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, ঘটনাটি তাঁহার 'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি' গ্রন্থে (১৪শ সং, ১৩৭৪, পৃঃ ৩৬) উল্লেখ করিয়াছেনঃ "মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল। তাহার অপরদিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র টাঙানো থাকিত। নিবেদিতা একদিন ঐ মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নিচে টাঙাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'রামকৃষ্ণদেব জগদ্‌গুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকাই উচিত।' "

নিবেদিতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন দেহধারী ভগবান—জগন্মাতা স্বয়ং, আবার জগদম্বার বালকও। ৫ মার্চ ১৯০৫ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মিসেস ওলি বুলকে নিবেদিতা লিখিয়াছিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ আজ শিশু। শিশুর কাছে কেহ কি কিছু চায়! দিতে হয় সবকিছু তাহাকে।" সেই শিশু ভগবান ও জগন্মাতা-রূপী শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিবেদিতা নিজেকে উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। ❑

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র
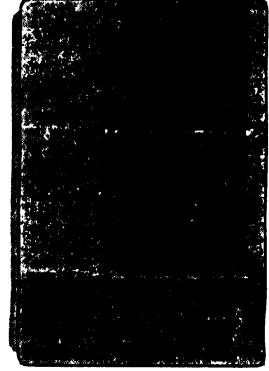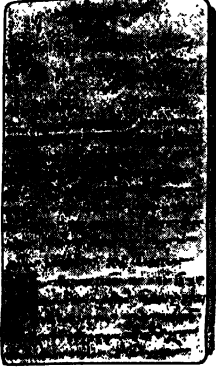
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

উদ্বোধন অফিস
বাগবাজার, কলিকাতা
২৬ মাঘ, ১৩২০

শ্রীমান কেদার,[১]

গত বৎসরে তোমরা কোয়ালপাড়ার আশ্রম মিশনভুক্ত করিবার জন্য অনেক লেখাপড়া করিয়াছিলে। এখনো তোমার ঐরূপ অভিপ্রায় আছে কি? মিশনভুক্ত হইলে কিন্তু এখন যেরূপে আশ্রমের সম্পত্তি-সকল বিক্রয়াদি করিতেছ, তাহা বন্ধ করিতে হইবে এবং মিশন ইচ্ছা করিলে (অর্থাৎ আশ্রমের কল্যাণ বুঝিলে) অপরের হস্তে আশ্রমের কার্যভার দিবেন। এসকল কথা চিন্তা করিয়া তবে ঐরূপ করিতে অগ্রসর হইও। যেরূপ সংবাদ শুনিতে পাইতেছি তাহাতে বোধ হইতেছে, শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবার জন্য যাহারা ঐ আশ্রমে সম্পত্তি দিয়াছে তাহারা তোমার উপর আশ্রমের ভার দিয়া কেহই সন্তুষ্ট নহে। সকলেই ভাবিতেছে, তুমি আশ্রমের সম্পত্তি নানাভাবে নষ্ট করিয়া আশ্রমে ভবিষ্যতে ঠাকুরসেবার পথ রুদ্ধ করিতেছ। আমি যতদূর জানিতে পারিতেছি, সম্পত্তি বিক্রয় করাতেই তাহাদিগের তোমার উপর অবিশ্বাস হইতেছে। অতএব কেন বিক্রয় করিতেছ, বাপু? ঐ সম্পত্তি হইতে যাহা আয় হয় তাহা হইতেই আশ্রম চালাইবার চেষ্টা কর না কেন? তুমি বলিবে, তাহাতে আশ্রমের খরচ চলে না। তাহার উত্তরে বলি, চলে না মনে করিলে চলিবে না। মনে স্থির সঙ্কল্প করিতে হইবে, ঐ আয়ের ভিতর আশ্রম চালাইবই চালাইব—তবে ঐরূপ করিতে পারিবে। আমাদিগের যখন কিছুই ছিল না তখন আমরা বরানগর মঠ কি করিয়া চালাইতাম, তাহা তুমি জান না। কোনদিন চাল নাই, ভিক্ষা করিয়া খাইলাম—এক-সন্ধ্যা নুন ভাত খাইয়া কতদিন গিয়াছে—কতদিন নুনও জোটে নাই, তরকারির কথা দূরে থাক। ঐরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিলে এবং ঈশ্বরলাভ করাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিলে তবে ঐরূপ করিতে পারিবে। নতুবা এই দুইদিনের নশ্বর জীবনে 'চোর' বদনাম লইয়া যাইতে হইবে—ঈশ্বরলাভ ও শান্তি পাওয়া তো দূরের কথা। তোমাকে আমি বাস্তবিক স্নেহের চক্ষে দেখি এবং তোমাতে বাস্তবিকই অনেক সদ্‌গুণ আছে, তজ্জন্যই তোমাকে এত কথা লিখিতেছি। বিষয়ের এমনি মোহ যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও মোহিত করিয়া ফেলে। দেখিও যেন তোমার ঐরূপ না হয়। তোমার ঐরূপ হইলে আমার মনে বিশেষ কষ্ট হইবে জানিবে। যদি বুঝ, বিষয় দিন দিন তোমায় জড়াইয়া ফেলিতেছে, তাহা হইলে আশ্রমের কাজ হইতে সরিয়া দাঁড়াও। যে-কার্য ঈশ্বরলাভের পথ রুদ্ধ করে ও দিন দিন অশান্তি বৃদ্ধি করে তাহা অকার্য, তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। দিবাকর ব্রহ্মচারী লিখিয়াছে, সে যে ভূমি-সম্পত্তি ঠাকুরের উদ্দেশে দিয়াছিল তাহা ১০ শন পণে বিক্রয় হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে। ....* বোধ হয় সত্য নহে। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি যেন আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া, ঠাকুরসেবার নিমিত্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বদনামের ভাগী না হও। অধিক আর কি লিখিব? আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং আশ্রমের সকলকে জানাইবে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আশীর্বাদ জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। সম্পত্তি-সকল যদি ঐরূপে বিক্রয় কর তাহা হইলে অল্পসময়ে মিশনভুক্ত করিতে চাহা বৃথা। কারণ, মিশন উহার ভার লইয়া চালাইতে পারিবে না এবং তজ্জন্য ঐ ভার লইবে না। ইতি—

সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসারদানন্দ
শ্রীসারদানন্দ

পুনঃ আগামী উৎসবের একখানি পত্র পাঠাইলাম।

১ তখন কেদারনাথ দত্ত। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। কোয়ালপাড়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। এই আশ্রমটিকে শ্রীশ্রীমা তাঁর 'বৈঠকখানা' বলতেন। পরবর্তী কালে কেদারনাথ সঙ্ঘে যোগদান করেন। তাঁর সন্ন্যাস-নাম হয় স্বামী কেশবানন্দ। ১৯১৮ সালে আশ্রমটি মঠের অধীনে আসে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

* মূল চিঠিতে এখানে চারটি শব্দ প্রায় মুছে গিয়েছে। একেবারেই পাঠোদ্ধার করতে পারা গেল না।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

পূর্বে দক্ষিণেশ্বরের কুটীরটি (সাধনকুটীর) ছিল মৃন্ময়। তখনি এই ঘরে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হয়। পরে হয় ইঁটের ঘর; ঐ ঘরে তখন কিছুই ছিল না। এখন শিবমূর্তি স্থাপন করেছে। কালে কত কিছু হবে, আর ঠাকুরের নামে চালাবে! সর্বত্রই এইরূপ হয়। Pure (শুদ্ধ) জিনিসটি থাকে না—খাদ এসে মিলিত হয়। (৮ম ভাগ, পৃঃ ২২)

ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধিতে তিনদিন বসা ছিলেন। আরেকবার ছয় মাস কাটিয়েছিলেন জড় সমাধিতে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে। (ঐ, পৃঃ ১০৫)

অবতার এলে খুব সুবিধা। তখন ধ্যান-চিন্তার যেন জোয়ার এসে যায়, চারদিকে হৈচৈ—যেমন উৎসব আর কি, যেমন রাজা এলে রাজ্যময় সাড়া পড়ে। ঠাকুর আসাতে কত ভাল ভাল সাধু দেখা যাচ্ছে। এই বাংলাদেশে কোথায় ছিল এইসব সাধু, আশ্রম, মঠ? নেড়ানেড়িতে দেশ ছেয়ে গেছিল! এখন কত আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

আমরা 'শকুন্তলা' প্রভৃতি কাব্যে আশ্রমের কথা কত পড়তাম আর কল্পনা করতাম। এখন আর কল্পনা করতে হয় না—চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে আশ্রম, সাধু এইসব। খুব ভাল ভাল সাধু এঁরা। কত বিদ্যা, কত গুণ—এসব ছেড়ে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। এই সাধুদের দিয়েই দেশ উদ্ধার করবেন আর ধর্মের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবেন, তাই এঁদের আগমন। (ঐ, পৃঃ ৫৩)

তাঁর plan (পরিকল্পনা) কি মানুষ বুঝতে পারে? লোকে মনে করে politician-রা (রাজনীতিবিদরা) সব করছে। তা নয়। এর পিছনে ঈশ্বরের একটা সুকল্পিত plan রয়েছে। এই ভারতের পতন, পাশ্চাত্যের উত্থান—এর পশ্চাতে একটা বলিষ্ঠ পরিকল্পনা রয়েছে। অনন্তকাল বসে বসে এই করছেন—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। আবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগ। ভারত এখন কলির কবলে। ঠাকুর এসে সত্যযুগের সূচনা করে গেলেন। স্বামীজী দেখেছিলেন 'শূদ্রযুগ' আসছে। তাই ঠাকুর পূর্বাহ্নেই ব্রহ্মযুগ বা সত্যযুগের বীজ ফেলে গেছেন। এই সাধুরা সত্যযুগের—ব্রহ্মযুগের অগ্রদূত। একদিকে এই পশুর ন্যায় ভোগ, অন্যদিকে এই বিরাট ত্যাগ। ভাঙন ও গড়ন—এই তাঁর কাজ। তিনিই 'নররূপধর', আবার 'নির্গুণ গুণময়'। (ঐ, পৃঃ ৫৪)

"সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই"—ঠাকুর বলেছিলেন। সব দ্বৈতভাব বিদূরিত হয়। বাইরের জগৎ সব রয়েছে, কিন্তু যোগীদের কাছে তার কোন বোধ নেই। সব সচ্চিদানন্দ। এক বৈ দুই নেই সেখানে। তাই বেদে বলেছেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এমন 'এক', যার 'দুই' নেই। তখনি 'মদ্গতান্তরাত্মা'।

এইসব অবস্থাই ঠাকুরের জীবনে দেখা গেছে। শরীরটা একটা কাঠের মতো পড়ে আছে—মন কোথায় বিলীন হয়ে গেছে। অনেক নিচে নেমে এসে জগতের সীমাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখতেন এই নাম-রূপ সব। কিন্তু তখনো সচ্চিদানন্দে মনকে এত টেনে রেখেছে যে দেখতেন, সচ্চিদানন্দই নাম-রূপে বাইরে প্রকাশিত। সচ্চিদানন্দের এই অলৌকিক খেলা। মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, ঘরবাড়ি সব সচ্চিদানন্দে মোড়া। সব সচ্চিদানন্দ। সেই অবস্থাতেই ভোগের লুচি বিড়ালকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। (ঐ, পৃঃ ৫৫)

ঠাকুর যার সঙ্গে মিশতেন তারই হয়ে যেতেন। একবার কামারপুকুরে গেলেন। পাড়ার যত মেয়েরা এসে ঘিরে থাকত। ঠাকুর বলেছিলেনঃ "আমি যেন তোদের সঙ্গে dilute (বিগলিত) হয়ে গেছি, না গা?" (সকলের হাস্য) শেষ অসুখের সময় বলেছিলেনঃ "মা আমায় আর রাখবেন না। আমার বালকের স্বভাব। সব বলে দিচ্ছি। তাই মা এখানে আর রাখবেন না।" সকলেরই যদি চৈতন্য হয়ে যাবে তবে এই কাণ্ডটা (সংসার) যে ফেঁদেছেন, এটা চলে কি করে? তাই বলতেনঃ "মা নিয়ে যাচ্ছেন।" বলেছিলেনঃ "আরো কিছুদিন থাকলে জনকতক লোকের চৈতন্য হতো।" (ঐ, পৃঃ ৭৪)

তাই তো ঠাকুর অন্তরঙ্গদের জন্য অত ব্যাকুল হতেন। দক্ষিণেশ্বর বাগানে পড়ে আছেন। কে খবর করত? তা আবার কর্মচারীরা সব অন্য রকমের লোক। সাত টাকা মাইনে। আত্মীয়-কুটুম্ব সব গরিব, খেতে পায় না। ম্যালেরিয়ায় মর মর। তারপর সকলে ঠাউরেছে পাগল। এখন সেই লোককে যারা ভালবেসেছিল ঐ অবস্থায়, তারা কে গো? তাদেরই বলে 'অন্তরঙ্গ'—আপনার লোক। অসুখই হোক আর ভালই থাকুক, তারা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আপনার লোককে কি কেউ ছেড়ে দেয় অসুখ হলে?

আহা, কি আদর্শ দেখিয়ে গেছেন! 'মা মা' বলে পাগল। বাহ্যজ্ঞান নেই। এ-অবস্থা মানুষের হয় কি? মানুষের এক আধবার হতেও পারে। কিন্তু এঁর সারাজীবন এক ভাব। কামিনীকাঞ্চনের কথা হলে দম বন্ধ হয়ে যেত। কোথায় পাবে এ-আদর্শ?

অন্য সাধুদের কি ছিল? অণিমা-লঘিমা আদি অষ্টসিদ্ধি লাভই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঠাকুর এসে ওদিক মাড়ালেনই না। (ঐ, পৃঃ ৮৯)

একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল—ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার? ঠাকুর বললেনঃ "আমি মাকে দুই ভাবেই দেখেছি। এখনো সর্বদা দেখি। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আবার তিনিই ভক্তের জন্য নানা রূপ ধারণ করেন।" বললেনঃ "কালীঘাটে মাকে দেখলাম ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলছেন, ফড়িং ধরছেন। আরেকদিন দেখলাম, কালীঘাটে আদি গঙ্গার ওপর বেড়াচ্ছেন।" আরেকদিন বলেছিলেনঃ "এই যে মা এসেছেন লালপেড়ে শাড়ি পরে। আবার কাপড়ের খুঁটে চাবির ছড়া বেঁধেছেন।"

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে একঘর লোক বসা। কেশব সেনও ছিলেন, তখন বলেছিলেন এই কথা। আবার কথা কইছেন মায়ের সঙ্গে সকলের সামনে। একপক্ষের কথা সকলে শুনছেন—ঠাকুরের কথা। মায়ের কথা কেবল ঠাকুর শুনছেন। একদিন বলছেন ঃ "মা মন্দিরে ওঠানামা করছেন, আলুথালু কেশ, পায়ের নুপুর ঝুনঝুন করছে।" আরেকদিন কাশীপুর বাগানে বলেছিলেন ঃ "মাকে আজ দেখলুম বীণা বাজাচ্ছেন।" সাধনের সময় মায়ের নিরাকার রূপে মগ্ন হয়ে ঠাকুর একটানা ছয় মাস ছিলেন।

ঠাকুরের সব declarations (মহাবাণী) রয়েছে। এতে আর কিন্তু কি! যারা বিশ্বাস করবে তাদের হয়ে যাবে, যারা এখন ধরতে পারবে না তাদের কোন জন্মেও হবে না। তারা পিছনে পড়ে যাবে। এখন বড্ড chance (সুযোগ)। সবেমাত্র এসেছেন, সব ছড়ানো রয়েছে হেথায় সেথায়। তাঁর কথার ধ্বনি এখনো কানে বাজছে। আসর এই সবে ভাঙল। হৈহৈ আওয়াজ এখনো সম্পূর্ণ মেটেনি। খুব chance (সুযোগ), গা ঢেলে দিলেই হলো। অনুকূল পবনে টেনে নিয়ে যাবে নৌকা। আর বিচার-টিচার নয়। এখন বিশ্বাস, তারপর কাজ। ঠাকুর যা বলে গেছেন তার একটি কথার অর্থ সারাজীবন তপস্যা করলে তবে বোঝা যায়। একি নভেল নাটক যে হড়হড় করে পড়ে গেলাম! (ঐ, পৃঃ ১৬৬)

জীবের অন্নবস্ত্রের কষ্ট দেখে মায়ের কাছে কাঁদতেন ঠাকুর। বলতেন, অন্নবস্ত্রের চিন্তা থাকলে মন বসে না ভগবানে। তাই ভক্তদের কারো কর্ম না থাকলে অপর ভক্তদের বলতেন কর্ম সংগ্রহ করে দিতে।

এই highest ideal (শ্রেষ্ঠ আদর্শ) দেখাতে এসেছিলেন। তাড়াতাড়ি জনকয়েক লোককে সেটি দেখিয়ে তৈরি করে দিয়ে চলে গেলেন। দুঃখ-দুর্দশা দূর করার উপায় ঈশ্বরদর্শন বা নিজের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করা। মানুষ আনন্দময়ীর সন্তান, এটা জানতে পারলে সব দুঃখ দূর হয়। একটা শরীরের দুঃখ তো অল্প, কিন্তু জন্মমরণ চক্রের দুঃখ অনন্ত। সে বড় দুঃখটা দূরের পথ দেখানো তাঁর প্রধান কাজ। তাই দেখিয়ে চলে গেছেন। অন্নবস্ত্রের দুঃখের উপায় দেখিয়েছেন আরো নিচু শ্রেণীর লোকের ভিতর দিয়ে। এরা deal (ব্যবস্থা) করবে অন্নবস্ত্রের দুঃখ দূর করার! দয়া-টয়া এদের ভিতর প্রকাশিত হবে। কিন্তু ঠাকুরের আসার প্রধান কাজ অনন্ত কালের জন্য দুঃখ দূর করে সুখ শান্তি আনন্দের বিধান করা। এ যেন ঠেলেঠুলে ভক্তদের জগতের বাইরে নিয়ে নিজের স্বরূপ দেখিয়ে, তাদের আচার্য বানিয়ে, বীর বানিয়ে ফস্ করে চলে গেলেন। তারা বুঝেছে, আগে ঈশ্বর পরে জগৎ। (ঐ, পৃঃ ১৬৭)

ঠাকুরকে ধরতে পারলে আর ভয় নেই। নিজে বলেছেন কিনা—"আমার চিন্তা করলেই হবে।" কিন্তু তাঁকে ধরা কঠিন। কোন ঐশ্বর্য নেই। একেবারে ঢেকে এসেছেন।

অনেকে বিবেকানন্দকে বড় বলত কিনা। তারা বলত—"অত বড় লোক চেলা, তাই রামকৃষ্ণের নাম"! ঠাকুর দীনভাবে থাকতেন। ওরা তাঁকে ধরতে পারত না। ঠাকুর সকলকেই মান দিতেন। কেশব সেনকে বলেছিলেন ঃ "বাহাদুরী কাঠ তোমরা। আমরা হাবাতে কাঠ।" ওঁর ভক্তরা মনে করল, রামকৃষ্ণ ছোট, কেশব সেন বড়। তাই ব্রাহ্মসমাজের লোক নজির দিত ঠাকুরের এই কথা। বলত, এই দেখ, তিনিই বলেছেন নিজ মুখে—আমরা হাবাতে কাঠ আর কেশব বাহাদুরী কাঠ। (ঐ, পৃঃ ১৬৯)

কেন যাওয়া পেনেটির চিঁড়া মহোৎসবে? এর মানে আছে। পুরনো তীর্থ উদ্ধার করতে যাওয়া। সাধারণ মানুষ তো ঈশ্বরকে ধরতে পারে না! তাই ঋষি ও মহাপুরুষগণ তীর্থ, দেবালয়, মহোৎসবাদির ব্যবস্থা করেছেন। সারা ভারত জুড়ে এই ব্যবস্থা। অন্য দেশেও এসব আছে। জনগণ এসে অন্তত বছরে একদিন ঈশ্বরের নাম করবে, দেখবে, ভক্তসঙ্গে আনন্দ করবে। সংসারের চাপে সব ভুল হয়ে যায়। তীর্থাদিতে এলে ঈশ্বরের স্মরণ হয়, সৎসঙ্গ হয়। তখন স্বরূপের সন্ধান হয়—অল্প সময়ের জন্য হলেও। তাতে মনে বল আসবে, শান্তি সুখ আনন্দ লাভ হবে।

অবতার আসেন not to destroy but to fulfil (বিনাশের জন্য নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ করার জন্য)। চৈতন্য-নিত্যানন্দ এসে ঐখানে তীর্থ করেছেন পাঁচশ বছর পূর্বে। তাঁদের অন্তরঙ্গ ভক্ত রাঘব পণ্ডিত, রঘুনাথ দাস ওখানে ছিলেন। এঁরা পার্ষদ। এই পেনেটিতে ঠাকুর গিয়ে নতুন করে আবার জ্বালিয়ে দিলেন আগুন। নিভু নিভু হয়ে যায় কিনা। ভগবানের ভাব চাপা পড়ে যায়। ওটাকে উসকে দিলেন। এখন চলবে আবার কয়েকশ বছর ধরে। তিনি নিজে বলেছেন ঃ "আমি চৈতন্য।" তাই পেনেটিতে গিয়ে পাঁচশ বছরের ব্যবধানরূপ আবরণটি ভেঙে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হবে এই করে। এই প্রকারে ধর্মের শিখা জাগ্রত ও জ্বলন্ত করেন ভগবান।

আবার ঐসময় ইংরেজীপনা ঢুকেছিল সমাজে। ঐসব তীর্থ মানত না লোক। ঈশ্বরের নামে লজ্জা ছেড়ে দিয়ে নৃত্য করা, উচ্চৈঃস্বরে নামসঙ্কীর্তন করা ইংরেজীনবীশ লোক পছন্দ করত না। এই মোহ ভেঙে দিলেন। ঠাকুরের সাঙ্গপাঙ্গ সবই ইংরেজ-ঘেঁষা লোক। নরেন্দ্র নৃত্য করছে ঠাকুরের সঙ্গে!

আরেকটা দিকও আছে। জনসাধারণের সঙ্গে এক না হতে পারলে সত্যিকার ধর্ম হয় না। সকলের সঙ্গে দীনভাবে ঈশ্বরের ভজনকীর্তন হয়। আমি পণ্ডিত, আমি মানী, আমি ধনী, আমি কুলীন—এসব অভিমান চূর্ণ করতে নিজে গিয়েছিলেন ভক্তদের নিয়ে ওখানে। আর নিজে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য ও কীর্তন করেছিলেন ওখানে। বললে তো যাবে না ভক্তরা! তাই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে। (ঐ, পৃঃ ১৯০-১৯২)

ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "চুম্বক ছুঁচকে টানে। ছুঁচও আবার চুম্বককে টানে।" হরিতকীবাগানে একটি ভক্তের বাড়িতে

গিয়ে উপস্থিত ঠাকুর। কোন সংবাদ দেননি পূর্বে। ভক্ত তাঁকে দেখেই বললেন : "কোথায় আমি যাব, তা আপনি এসেছেন!" তখনি বলেছিলেন ঐকথা। (ঐ, পৃঃ ২২৬)

ঠাকুরকে গিরিশের 'পূর্ণব্রহ্ম' বলা তাঁর নিজের বিশ্বাস বলেই তো মনে হয়। ঠাকুর নিজেই বললেন : "তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি!"

ঢং করে বললে ধোপে টেকে না। গিরিশবাবুর এই বিশ্বাস বাকি জীবন ছিল। এদিকে সিংহরাশি পুরুষ। কিন্তু ঠাকুরের কাছে, ভক্তদের কাছে যেন শিশু। তিনিই তো প্রথম অবতার বলে প্রচার করেন। (ঐ, পৃঃ ২৬০)

তাঁর কাছে এলে গেলেই হয়ে যেত। জলে নাইলে যেমন শরীরের ময়লা যায়, তেমনি ইঙ্গিতে বলতেন : "এখানে এলে গেলেই মনের ময়লা দূর হবে।" জপতপ করতে বলতেন, কিন্তু তত জোর দিতেন না। কিন্তু আনাগোনা করতে খুব জোরে বলতেন। (ঐ, পৃঃ ২৮১)

'চণ্ডী'তে 'দেবীসূক্তে' বলেছেন—"যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।"—আমি যাকে যাকে ইচ্ছা করি তাকে তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি; কাউকে ব্রহ্মা করি, কাউকে ঋষি করি এবং কাউকে বা অতি প্রজ্ঞাশালী করি।

এই যা বলছেন, তার দৃষ্টান্ত দেখ—স্বামীজীকে জগৎগুরু করলেন। আর দু-একজনকে নিচে নামিয়ে দিলেন। একজনের পরমহংস অবস্থা—বলতেন। আবার পড়ে গেল। অনেকদিন আসেনি দেখে ঠাকুর বললেন : "জান কেন আসে না? যা বারণ করেছি তাই করবে—মেয়েদের সঙ্গে পড়েছে।" আরেকজনকে বলতেন 'ঈশ্বরকোটি'। শেষের দিকে বললেন : "কে তো কে!" মানে ছেড়ে দিলেন। নিচে পড়ে গেল। (ঐ, পৃঃ ৩০৩)

ঠাকুরের বলবার কি মনোমুগ্ধকর বিলাস দেখ।... বলরামবাবু একদিন পাঁচ সিকে দিয়ে গাড়ি করে দিলেন। ঠাকুর বললেন : "অত কম?" তিনি বেণী শার গাড়ি আনেন, আর তিন টাকা দু আনা দেন। বলরামবাবু বললেন : "ও অমন হয়।" যেতে যেতে ঐ গাড়ি আর চলে না! বেদম মারছে। ঘোড়া তবুও চলে না। ঠাকুর বললেন : "কিরে, কি হলো?" গাড়োয়ান বললে : "ঘোড়া দম নিচ্ছে কর্তা!" (হাস্য)। ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া—প্রাণপণ টানছে, তবুও গাড়ি নড়ছে না! চলে কি করে, বল! ঐ ঘোড়ার যে এখন তখন! (৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ৮ম এবং ৯ম ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলক ❑ জলধিকুমার সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

অনুষ্ঠান-সূচী (ফাল্গুন-চৈত্র ১৪০৫)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	৫ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	১৮ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৯
শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব		৮ ফাল্গুন	রবিবার	২১ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৯
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	১৭ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	২ মার্চ	১৯৯৯
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২১ ফাল্গুন	শনিবার	৬ মার্চ	১৯৯৯
রামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	১০ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	২৫ মার্চ	১৯৯৯

পূজাতিথি-কৃত্য

শিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১ ফাল্গুন	রবিবার	১৪ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৯

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

১৩, ২৯ ফাল্গুন	শুক্রবার,	রবিবার	২৬ ফেব্রুয়ারি,	১৪ মার্চ	১৯৯৯
১২, ২৮ চৈত্র	শনিবার,	সোমবার	২৭ মার্চ,	১২ এপ্রিল	১৯৯৯

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই ভাষণটি দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অগণিত পত্র, অজস্র ভাষণ এবং কিছু মৌলিক রচনায় ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়ে এমন গভীর আলোচনা করেছেন যে, তার তুলনা মেলা ভার। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, যিনি তাঁর অন্তরে নিত্যজাগ্রত, যাঁর চিন্তায় তাঁর প্রতিক্ষণ অতিবাহিত হতো, যিনি তাঁর জীবনে ওতপ্রোত হয়ে ছিলেন—তাঁর সেই আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি কত কম কথা বলেছেন! স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শিষ্যকে বলছেন ঃ "তিনি যে কি, কত কত পূর্বগ অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তপস্যা করেও একচুল বুঝতে পারলুম না! তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়। যে যেমন আধার, তাঁকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন। তাঁর ভাবসমুদ্রের উচ্ছ্বাসের একবিন্দু ধারণা করতে পারলে মানুষ তখনি দেবতা হয়ে যায়। সর্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকেই বোঝ তিনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন? 'অবতার' বললে তাঁকে ছোট করা হয়।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৫২) বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গেলে স্বামীজী ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। দেখা গিয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম স্মরণমাত্রেই তাঁর চক্ষু সজল হয়ে উঠেছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলছেন ঃ "তিনি যা করেছেন, তা কি তুই আমি করতে পারব? তিনি যে কে ও কত বড়, তা আমরা কেউই এখনো বুঝতে পারিনি! এজন্যই আমি তাঁর কথা যেখানে-সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জানতেন; তাঁর দেহটাই কেবল মানুষের মতো ছিল, কিন্তু চালচলনে সব স্বতন্ত্র অমানুষিক ছিল!" (ঐ, পৃঃ ১৪৫-১৪৬)

শিষ্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করছেন, তিনি ঠাকুরকে 'অবতার' বলে মানেন কিনা। স্বামীজী বলছেন ঃ "তোর 'অবতার' কথাটির মানে কি তা আগে বল।" শিষ্য বললেন ঃ "কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের ন্যায় পুরুষ।"

স্বামীজী বললেন ঃ "তুই যাঁদের নাম করলি, আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা তো ছোট কথা।"

স্বামীজীর এই মনোভাব তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত। তিনি তাঁর ভক্তি, ভালবাসা, গভীর বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেছেন সেই বিখ্যাত প্রণামমন্ত্রে ঃ

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।"

—তিনি ধর্মসংস্থাপক, সর্বধর্মস্বরূপ, পূর্ব পূর্ব যুগে অবতার-রূপে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে 'বরিষ্ঠ' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ।

সূত্রাকারে রচিত এই প্রণামমন্ত্রটির ভাষ্য করতে হলে প্রথমে অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। তারপর আলোচনা করা যাবে স্বামীজী কেন ঠাকুরকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলেছেন।

'অবতার' শব্দটি পুরাণে পাওয়া যায়, শ্রুতিতে অবতারের সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। "সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।" অথবা "তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।৬)—সেই পরমাত্মা কামনা করলেন, আমি বহু হব এবং এই সৃষ্টির মধ্যে তিনি প্রবেশ করলেন। এইসকল শ্রুতিবাক্যে অবতারতত্ত্বের ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়। টীকাকাররা তাই 'অবতার' শব্দের অর্থ করেছেন ঃ "অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চে অবতরণং অবতারঃ।" 'অপ্রপঞ্চ' অর্থাৎ মায়ার বাইরে অবস্থিত চিন্ময়ধাম থেকে মায়িক জগতে আত্মপ্রকাশের নামই 'অবতার'। কার 'আত্মপ্রকাশ'? শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে স্বামীজীকে বলেছিলেন ঃ "যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই-ই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" অদ্বৈতবেদান্ত-মতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু, জগৎ মিথ্যা। নির্বিকল্প নিরাকার নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুর অবতরণ সম্ভব নয়। কিন্তু লৌকিক বা ব্যবহারিক আপাতসত্য যে জগৎ, সেখানে জীবও আছে, জীবোদ্ধারের জন্য অবতারের অবতরণও আছে। এ অবতরণ ব্রহ্মেরই অথবা ব্রহ্মাভিন্না মহাশক্তি পরমাপ্রকৃতির। তিনি ব্রহ্মলীনা নির্গুণা তুরীয়া হয়েও সৃজন ইচ্ছায় সগুণ সাকাররূপ পরিগ্রহকারিণী।

"নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ।
নামান্তরৈর্নিরূপ্যৈষা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ।।"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, প্রাধানিক রহস্য, ২৯)

—[পরমা প্রকৃতি] নিরাকারা নির্গুণা হয়েও সাকারা (সগুণা)। সাকার অবস্থায় তিনি বিভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ
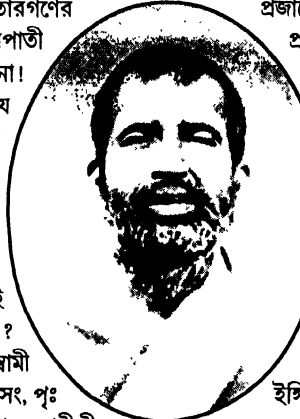
করেন। নির্গুণ-রূপে তিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ দ্বারা লক্ষণীয়া, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা বোধগম্য নন। মায়া-সম্বলিত হয়েও মায়াধীশ ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত পুরুষোত্তম 'ভগবান' শব্দবাচ্য। তিনিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ভাগবতে (১।৩।১) আছে ঃ

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।।"

—এই মহাশক্তির প্রথম প্রকাশ মহৎ তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্রা থেকে সৃষ্ট একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত অর্থাৎ এই ষোড়শকলাযুক্ত অপ্রাকৃত পুরুষরূপে। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় বস্তুতে অনুস্যূত-রূপে। প্রথম পুরুষে তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা এবং তাঁতে মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি লীন থাকে। দ্বিতীয় পুরুষে তিনি ব্রহ্মাণ্ডসমূহের নিয়ামক ও তাঁতে তখন চতুর্দশ ভুবন লীন থাকে। আর তৃতীয় পুরুষ-রূপে তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবহৃদয়ে অবস্থিত। কিন্তু এ তিনটিই তাঁর সূক্ষ্মশরীর। স্থূলশরীরে প্রত্যক্ষরূপে তিনি আবির্ভূত হন যুগাবতাররূপে, লীলা-অবতাররূপে। মীন, কূর্ম, বরাহাদি বা সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার বা নর-নারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয় অথবা রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—এঁরা সকলেই সেই মহাশক্তিরূপ "শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং" বিশেষ। সেইজন্য ভাগবতে (১।৩।২৬-২৭) বলা হচ্ছে ঃ

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।।
ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ।।"

—বিশুদ্ধ সত্ত্বে পরিপূর্ণ হরির অবতার অসংখ্য। যেমন যে-জলাশয়ের জল শেষ হয় না, সেই জলাশয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জলধারা নির্গত হয়, সেরকম ভগবান হরি থেকেই সমস্ত অবতার আবির্ভূত হন। প্রজাপতিগণের সঙ্গে মহাতেজস্বী ঋষিগণ, মনুগণ, দেবগণ ও মনুপুত্রগণ সকলেই ভগবান হরিরই অংশ।

এই পুরাণ-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ একদিন অর্জুনকে একটি ফলপূর্ণ জামগাছের তলায় নিয়ে এসে বললেন ঃ কি দেখছ? অর্জুন উত্তর দিলেন ঃ থোলো থোলো কালোজাম। শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ ও কালোজাম নয়। আরেকটু এগিয়ে দেখ। তখন অর্জুন দেখলেন, ওঁরা সব অবতার। (দ্রঃ পৃঃ ১০৩০-১০৩১) এর অর্থ এই—অনাদি সৃষ্টিতে অনাদি কাল থেকে অসংখ্য অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন, করছেন, করবেন। তাহলে এই অবতার-পুরুষগণের মধ্যে তুলনার মাপকাঠি কি হতে পারে? সকলেই তো সেই পরমতত্ত্বেরই মূর্ত বিগ্রহ! তত্ত্বত সত্যিই কোন ভেদ নেই। কিন্তু শক্তিপ্রকাশের তারতম্য অনুযায়ীই শাস্ত্রে 'অংশাবতার', 'পূর্ণাবতার' বলা হয়। শক্তির তারতম্য যে ঘটে তা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতেই পাই। গীতায় (১০।৪১) আছে ঃ

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।"

—যাকিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা উৎসাহশালী সেই সকলই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে।

সমস্ত অবতারের মধ্যেই কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে। তিনটি বিশেষ কারণে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। তিনি স্বয়ং গীতায় (৪।৭-৮) স্বীকার করেছেন ঃ

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

—যখন প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কারণ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন স্বীয় মায়াবলে আমি দেহবান হই, জাত হই। সাধুদের রক্ষা, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে নরাদিরূপে অবতীর্ণ হই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (১১।৫৪-৫৫) অনুরূপ শ্লোক আছে ঃ

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।"

(১১।৫৪-৫৫)

—যখনি দানবগণের প্রাদুর্ভাববশত বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তখনি আমি আবির্ভূতা হয়ে দেবশত্রু অসুরদের বিনাশ করব।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় পাই, মা বলছেন ঃ "মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে, তাই যখন যখন দরকার তিনি নিজে এক-একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন।" (১ম সং, পৃঃ ২৬১)

সুতরাং অবতারপুরুষদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে প্রথমত দেখতে হবে এই তিনটি কাজ তাঁদের দ্বারা কতটা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত, দিব্যভাবে ভাবিত হয়েছে। তৃতীয়ত, দেখতে হবে, তাঁর প্রভাব কি কোন বিশেষ দেশ-কাল বা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমিত, না কি তা সর্বজনীন? এই প্রভাবের স্থায়িত্ব ও প্রসার কতটা? চতুর্থত, তাঁর প্রচারিত উপদেশ অনুশাসনের যুগোপযোগিতাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য। সর্বশেষে, তাঁর দিব্য জন্ম কর্ম ও নরলীলার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান কতটা সার্থক—এও আলোচনার বিষয়।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেছেন "স্থাপকায় চ ধর্মস্য" অর্থাৎ ধর্মসংস্থাপক বিশেষণে বিশেষিত করে। এটি লক্ষণীয়। তিনি কোন নবধর্মের প্রবর্তক নন। বেদান্তের ধর্ম যা সনাতন ও শাশ্বত, তাই-ই দেশ ও কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে বিশ্বজনীন ধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম ঈশ্বরভাবনা পূজা-উপাসনা পাপ-পুণ্য স্বর্গ-মোক্ষ ইত্যাদির

মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অনেক ব্যাপক। "দুর্গতিপ্রপতৎ জন্তু ধারণাৎ ধর্ম উচ্যতে।"—যে-শিক্ষা ও আচরণ জীবকে দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করে, তাই ধর্ম। প্রাচীন ঋষিরা জগৎকে অস্বীকার তো করেনইনি, বরং তাকে ব্রহ্মরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলছেন—"জীবো ব্রহ্মৈব"। (ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা, ২৯) জীবকে তাঁরা ব্রহ্মরূপে দেখেছেন। তাই জন্মের পূর্ব থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত জীবের জীবনকে সার্থক করার দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল প্রখর। আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ" (শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্, ২।৫)—অমৃতের পুত্র, আমরা অমৃতলোকেই প্রত্যাবর্তন করব। স্ব-স্বরূপ উপলব্ধিই জীবনের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে আমাদের নিয়ে যেতে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করতে অবতারগণ যে-উপদেশ করেছেন তাই-ই ধর্ম বা আমাদের সাধনসূত্র।

এই ধর্ম প্রেমধর্ম বা সার্বিক মানবধর্ম। ভারতের সাধনার মূল কথা—জীবনের পূর্ণতা জ্ঞানে এবং জ্ঞানের পূর্ণতা প্রেমে। ধর্মের সাড়ম্বর বাহ্য অনুষ্ঠান ও অজস্র বিধিনিষেধ, যা পরবর্তী কালে চালকলাবাঁধা পুরোহিততন্ত্রে পরিণত, তা ঔপনিষদিক ধর্ম নয়। ভারতের ধর্ম আধ্যাত্মিকতা, আত্মবস্তুকে কেন্দ্র করেই তার জীবন, অদ্বৈত-ভাবনাই তার মূল আদর্শ। কিন্তু এ অদ্বৈত শূন্যতা নয়। "নেদং ব্রহ্ম" বোধে "উজিয়ে" নিয়ে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১), "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" (ঈশ উপনিষদ্, ১) বোধে "ভাটিয়ে" নিয়ে আসা। মোক্ষই শেষকথা নয়। পঞ্চম পুরুষার্থকে প্রেমের স্বরূপ জেনে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"।

কালের প্রভাবে এই সনাতন ধর্মকে বিস্মৃত হয়ে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ভোগবিলাসী মানুষ যখন অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠে তখনি শুরু হয় অধর্মের অভ্যুত্থান। গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়—গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা যার বৈশিষ্ট্য। পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত আর্ত মানুষ তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে বেড়ায় একজন দিশারী বা পথপ্রদর্শককে, আকুলভাবে আহ্বান করে ঈশ্বরের কৃপাশক্তির অবতরণের জন্য। তখনি হয় যুগাবতারের আবির্ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবও এইরকম এক যুগসন্ধিক্ষণে। সমস্যা মানুষের চিরকালই আছে। সে-সমস্যা ব্যক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত, দেশগত। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্যের সময়ে এই সমস্যা ছিল একটি নির্দিষ্ট দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আমাদের পৃথিবী 'এক পরিবারে'র মতো হয়েছে। তাই আজকের যুগের সমস্যা কোন একটা বিশেষ দেশের নয়। যেকোন সমস্যা ও তার সমাধান আজ সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। বিশ্ব জুড়ে আজ আমরা যে দুঃখপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সেই তুলনায় পূর্বের অবস্থাকে স্বামীজী বলেছেন 'গোষ্পদ' মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ আপাতদৃষ্টিতে কোন বিশ্ব-সমস্যায় হাত দেওয়া তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের তৎকালীন উত্তাল আবর্ত, সামাজিক শোষণ, জাতিভেদজনিত নিপীড়ন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা দেখা দিয়েছিল সেসব বিষয়ে কোন প্রতিবিধানের প্রয়াস করেননি, এমনকি কোন মন্তব্যও করেননি। পূর্বসূরিদের মতো কোন সাম্রাজ্যশক্তি বা ধর্মীয় শক্তির সঙ্গে তিনি প্রকাশ্য বিরোধে লিপ্ত হননি। দক্ষিণেশ্বরের ঐ ঘরটি ছেড়ে পরিব্রাজক বা প্রচারক হতে হয়নি তাঁকে। এমনকি ঘরে বসেও কোন প্রবচন তিনি দেননি। কেবলমাত্র নিজের সুকঠোর সাধন দ্বারা উপলব্ধ সত্যকে স্বীয় জীবনে আচরণ করে, সেই সত্যকে অতি সহজ গ্রাম্য ভাষায় কথাচ্ছলে প্রকাশ করে তৎকালীন ইঙ্গবঙ্গ সমাজের জ্ঞানপিপাসু উচ্চশিক্ষিত অথচ দিশাহারা উদ্‌ভ্রান্ত যুবকদের এবং অধ্যাত্মপিপাসু অথচ বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের মনগুলিকে কাদার তালের মতো দুমড়ে-মুচড়ে যেভাবে নিজের ইচ্ছামত গড়ে তুলেছিলেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন তাঁদের হৃদয়ে যে আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন—তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। এর থেকে বড় 'মিরাকল' বা অলৌকিক কীর্তি আর কি হতে পারে!

তাঁর জীবন ও বাণীর দ্বারা প্রভাবিত সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সনাতন ধর্মের বিস্মৃত আদর্শ পুনরুজ্জীবিত হলো। সেই ধর্মকে তাঁরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে—তাঁর দেহাবসানের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। অন্যান্য অবতারের তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে এটিই বৈশিষ্ট্য ও বরিষ্ঠতা। তাঁর সাধকভাব, গুরুভাব ও তাঁর 'কথামৃত' অতি অনায়াসে ও অতি নিঃশব্দে এক মহাবিপ্লব ঘটিয়ে দিল বিশ্বচেতনায়। 'আপনি আচরি' তিনি অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বৈদান্তিক মতবাদ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাদের বহুবিধ শাখার মধ্যে যে বিরোধ তার সমন্বয়সাধন করলেন। এদিকে সদ্য উদীয়মান ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ, ওদিকে সহজিয়া, কর্তাভজা সম্প্রদায়, এমনকি বামাচারী—সকলকেই সমান শ্রদ্ধায় স্বীকার করে পূর্বের ও ইদানীং কালের ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম জানিয়ে অসীম সাহসে ঘোষণা করলেন—"যত মত তত পথ"। স্বামীজীর ভাষায় "অনন্তভাবময়" তিনি। বলছেন ঃ "ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয়, কিন্তু প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা হয় না।" তাই স্বামীজী তাঁকে বলছেন ঃ "অবতারবরিষ্ঠ" বা সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার।

স্বামীজী বলছেন ঃ "উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করলে কি হবে? যে-দেশেই যাই, দেখি—উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে; উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন।... দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকলে আত্মার প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার

বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শঙ্করও বলেছেন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?' অতএব মূল কথা হচ্ছে—অনুভূতি। তাই জানবি goal (লক্ষ্য); মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জানবি উন্নতির test (পরীক্ষা), কষ্টিপাথর।" ('বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬-১৯৭)

ঈশ্বর বা ব্রহ্মবস্তুকে পূর্ণভাবে জানা অসম্ভব, তিনি চির অবর্ণনীয়, তাঁর 'ইতি' করা যায় না। সুতরাং সাধকদের আধার অনুযায়ী "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি" হয়। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু, চিৎ ও আনন্দই তাঁর স্বরূপ। মানবজীবনের লক্ষ্য সেই ব্রহ্মোপলব্ধি। কিন্তু সে-সাধন তো দীর্ঘ ও নিরন্তর এবং প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী পথও ভিন্ন ভিন্ন। যার যেমন রুচি বা প্রবণতা, সেই অনুযায়ী তার পথ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কোন মত বা পথকেই হেয় বলেননি। কোন্ পথে, কোন্ যানবাহনের সাহায্যে গন্তব্যে পৌঁছাবে তা নির্ভর করে যে যাবে তার প্রবণতার ওপর। তাই তিনি 'মতুয়ার বুদ্ধি' করতে বারণ করেছেন, নিষেধ করেছেন কারো ভাব নষ্ট করতে। বিভিন্ন মত ও পথ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব নয়, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ নয়, অধ্যাত্মপথে সবাই সহযাত্রী। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলে, 'তিন টান' একত্র হলে সকল পথে সকল মতে তাঁকে পাওয়া যায়। 'গীতা'য় (৪।১১) শ্রীভগবান বলেছেনঃ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" সুতরাং নিষ্ঠাভরে যে-পথ ধরেই চলুন না কেন, সাধকের কখনো কোন দুর্গতি হয় না—"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" (গীতা, ৬।৪০) প্রয়োজন হলে মতের পরিশুদ্ধি ও সত্যপথের নির্দেশ তিনিই দেবেন। এইজন্যই তিনি বলেছেন, অন্নপূর্ণার রাজত্বে খেতে সবাই পাবে—কেউ হয়তো সকালে, কেউ বা সন্ধ্যায়। এই সর্বমত সর্বপথের প্রতি শ্রদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণের কথার কথা মাত্র নয়। বিভিন্ন পথে বিভিন্ন মতে জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। সকল শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব তাঁর সাধনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনে তা উপলব্ধ। আজ পর্যন্ত আমরা যত অবতারপুরুষের জীবনী পড়েছি এত সাধন-বৈচিত্র্য আর কোন অবতারে দেখা যায় না। এটিও শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্রুতি বলেছেনঃ "একম্ সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" (ঋগ্বেদ) বৈদিক ধর্মে অদ্বৈতবাদই চরমতত্ত্ব। কিন্তু যতক্ষণ জীবের আমিত্ব থাকে ততক্ষণ দ্বৈতকে অস্বীকার করা যায় না। তাই শ্রুতিতে অধিকারিভেদ বিবেচনা করে দ্বৈত এবং অদ্বৈত—উভয় তত্ত্বকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও আমরা দেখি, তিনি অদ্বৈতভূমির প্রান্তে দীর্ঘ ছয়মাস বাস করেও জগৎকল্যাণের জন্য আবার মনকে নামিয়ে এনেছেন। বলছেন—জগৎকে বাদ দেওয়া যায় না, তাহলে "ওজনে কম পড়ে"। যেমন খোলা বিচি শাঁস সব নিয়েই বেলের ওজন। নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ হয়েই জীবনটা অতিবাহিত করতে চান জেনে তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। বলেছেনঃ "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে।"

ভারতের ঋষিরা শুধু আত্মমোক্ষই চাননি, তাঁরা চেয়েছিলেন "জগদ্ধিতায়" জীবনকে উৎসর্গ করতে। সনাতন বৈদিক ধর্মের এই-ই ছিল আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণকেও ভাবাবস্থায় বলতে শুনি—"জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" এই একটি বাক্যই নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দে রূপান্তরিত করার বীজস্বরূপ ছিল। শ্রীগুরুর নামাঙ্কিত সঙ্ঘের তাই মূলমন্ত্রঃ "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" যন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্রস্বরূপ তাঁর পার্ষদগণ নিজেদের মুক্তি বা নির্বাণকে উপেক্ষা করে আবহমান কাল থেকে চলে আসা সনাতন ভারতের মানবধর্মকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কোন রক্তপাত, কোন অত্যাচার, কোন দ্বন্দ্ব-কলহ বিরোধিতা নয়, কেবলমাত্র তাঁর শুদ্ধ জীবন ও শ্রবণমঙ্গল 'কথামৃতে' বিধৃত তাঁর কিছু সহজ সরল বাণী তাঁর দেহাবসানের শতাধিক বছর পরেও বিশ্বজোড়া বিচ্ছিন্নতাবাদকে দূরে সরিয়ে এক প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে সকলকে মিলিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করছে। এ কি পরমাশ্চর্য নয়? বিনা তর্ক বা অস্ত্রযুদ্ধে বিশ্বের এক বৃহত্তর জনসমষ্টির হৃদয়ের এই যে আমূল পরিবর্তন, একে কি আমরা 'গৌরবময় বিপ্লব' বলতে পারি না? এই বিপ্লবের যিনি প্রবর্তক তাঁকে কি আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বলব না?

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর সাধকভাব। অবতারপুরুষেরা বা পূর্বাচার্যগণ, মহর্ষি, তপস্বী—এঁরা সকলেই কোন এক বিশেষ ধারা অবলম্বন করে স্ব-স্ব সাধনপথে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁদের অনুগামী শিষ্য-প্রশিষ্যরাও সেই পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। এইভাবে খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি কত সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা কোন বিশেষ সম্প্রদায় হয়ে ওঠেননি, কারণ তাঁদের গুরু ছিলেন সর্বধর্মস্বরূপ। সব ধর্মই তাঁর ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা" তিনি আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাধনায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—কোন ভাবটিই বাদ দেননি। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—প্রতিটি সাধনার সময় যেমন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও তেমনি দৃঢ় অবিচলিত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন কোন লোকাপেক্ষা না রেখে। সেই যুগে কালীমন্দিরে বসে কি দুঃসাহসিক সাধন! নিশীথে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সান্নিধ্যে তন্ত্রসাধন, আপন সহধর্মিণীকে জগদম্বারূপে পূজা করতে করতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাওয়া—এসমস্তই এই অবতারপুরুষের বরিষ্ঠতাসূচক। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই অসাধ্য সাধন অতীতে কখনো হয়নি।

সর্বশেষে, তাঁর অদ্বৈতসাধন। উপনিষদ্ বলেছেন, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু। এই সত্যকে দৃঢ় করার জন্য বলেছেন 'অদ্বয়ম্'। তাঁকে উপলব্ধি করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধিতে সেই সত্য উপলব্ধি করলেন। কিন্তু বৈদিক ঋষিদের মতো তিনি শুধু সত্যে উপনীত হয়েই ক্ষান্ত হলেন না, নেমে এলেন বিলোমের পথ ধরে। জানলেন, সেই পরমাত্মাই "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" (কঠ উপনিষদ্, ২।২।৯) "সর্বাণি ভূতানি আত্মনি" ও "সর্বভূতেষু চ আত্মানম্" (ঈশ উপনিষদ্, ৬) এবং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৫।১৯)—এই তিনটি স্তরকে অতিক্রম করে যে 'ঋতম্' তাকে "প্রতিবোধবিদিতম্" (কেন উপনিষদ্, ২।৪) করতে হবে জীবনে। এই আশ্চর্য পুরুষ সেটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই এই "ভবরোগবৈদ্য"কে আমরা দেখি, একই আধারে তিনি অদ্বৈততত্ত্বে "সমাহিত-চিত্ত", ভক্তিরসে আপ্লুত, "কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং" এবং "দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিত রঙ্গং"।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনজীবনে তিনবার ইষ্টদেবীর কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলেন ঃ "ভাবমুখে থাক।" এই ভাবমুখে থাকার রহস্যার্থ দুটি। একটি হলো ঃ Transcendental (জগদাতীত) এবং Immanent (জগৎমধ্যস্থ)—এই দুই-প্রান্তের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানটিতে অবস্থান। মহাজাগতিক শক্তিকে জগতে নামিয়ে আনা ও জাগতিক শক্তির ঊর্ধ্বে উত্তরণ। যিনি জগৎকল্যাণকৃৎ, তাঁর পক্ষেই এটি সম্ভব। দ্বিতীয় অর্থটি আরো ব্যাপক। যিনি জগৎগুরু হওয়ার চাপরাশপ্রাপ্ত, তাঁর তো সকলের মনোভাব জানতে হবে তাদের সাধনপথে সাহায্য করার জন্য। প্রারব্ধ, অভীপ্সা, মনের প্রবণতা, রুচিবৈচিত্র্য, ইষ্টনির্বাচন ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে সাধকের সাধনা। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাব। একজনের হৃদয়ান্তর্গত ভাব সুস্পষ্টভাবে জানা যায় একমাত্র তার সঙ্গে তাদাত্ম্য হলে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "মানুষগুলোর ভিতর কি আছে তা সব দেখতে পাই। যেমন কাঁচের আলমারির ভিতর যা যা জিনিস সব দেখা যায় সেইরকম।"

ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর প্রত্যেক ভক্তের নিজ নিজ প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক ভাবটি সঠিক ধরতে পারতেন ও সেটি বুঝে নিয়ে তাদের সঙ্গে সেই ভাব অনুযায়ী সর্বকালের জন্য একটা সপ্রেম সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। সেই ভাবসম্বন্ধকে আশ্রয় করে তাদের ভগবদ্দর্শনের পথে অগ্রসর করে দিতেন। বিভিন্ন মার্গে সাধন করেছিলেন বলে প্রত্যেকটি সাধনপথ ও তার সুবিধা-অসুবিধা সুস্পষ্টভাবে জানা ছিল তাঁর। তিনি সাধন করেছেন একেবারে তদ্গতভাবে। সেই ভাবেই তিনি সম্পূর্ণ ভাবিত হয়ে যেতেন। রামচন্দ্রের উপাসনার সময় তিনি শুধু মনে মহাবীর হনুমানজীর সঙ্গে একাত্ম হননি, তাঁর দেহেও পরিবর্তন ঘটেছিল। সখীভাবে বা দাসীভাবে যখন সাধন করেছেন তখন তাঁর হাবভাব এমনই নারীজনোচিত হতো যে, স্বয়ং মথুরানাথ তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়েও তাঁকে চিনতে পারেননি। গোপালের মাকে দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি গোপালের মতোই হয়ে গেলেন। অথচ এর কোনটাই 'ঢং' বা অভিনয় নয়। অসাধারণ একাত্মতা, যা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর মধ্যে সকলে নিজ নিজ ইষ্টকে দর্শন করে ধন্য হয়েছেন। আবার ত্রিগুণাতীত পুরুষোত্তম বা পূর্ণব্রহ্ম-রূপেও তাঁকে স্বহৃদয়ে দর্শন করেছেন কত যোগী, জ্ঞানী। এই অনন্তভাবময় ঠাকুর সত্যসত্যই বেদ-বেদান্তে যা আছে তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। একই আধারে তিনি "প্রেম-অর্ণব, ব্রহ্ম বেদ প্রণব, বিরিঞ্চি বিষ্ণু শঙ্কর।" জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম সবেরই তিনি মূর্ত প্রতীক। সকলের সব সমস্যার সমাধান তাঁর ভিতর দিয়ে। কোন পূর্বাচার্যের মধ্যে এত অনন্ত ভাব, এত ব্যাপকতা আমরা দেখিনি। ভাবসমূহের এক উজ্জ্বল ঘনীভূত মূর্তি—"ভাস্বর ভাবসাগর" বলেই তো তিনি "অবতারবরিষ্ঠ"-রূপে পূজিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বাদশবর্ষব্যাপী সুকঠোর সাধনা, মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি, তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়, তাঁর অপার্থিব প্রেমঘন রূপ—সব ছাপিয়েও কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের একটি উক্তি আমাদের বিশেষ মনোযোগের বিষয়। অন্যান্য অবতারের তুলনায় যা তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। মা বলেছেন ঃ "ঠাকুর যে সমন্বয়ভাব প্রচার করার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। এই যুগে ত্যাগই হলো তাঁর বিশেষত্ব।"

এযুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ ভোগবিলাস। আত্মকেন্দ্রিকতা, অহং-সর্বস্বতা, আত্মাভিমান আমাদের অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে রেখেছে। আগেই বলেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন প্রবচন দেননি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা জীবনে করে দেখিয়েছেন। Practical demonstration বা 'আপনি আচরি' শিক্ষা দিয়েছেন। ত্যাগের ক্ষেত্রেও সেই একই দৃষ্টান্ত। স্বামীজীর ভাষায়, তিনি ছিলেন "ত্যাগের বাদশা"। বিষয়ভোগের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বস্তুও তিনি ব্যবহার করতেন না। "বঞ্চন কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ"-এর পরিচয় তাঁর জীবনে বহুবার পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু জীবনের প্রথম দিন থেকে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কোথাও কোন অভিমান তাঁকে স্পর্শ করল না, অহং-বুদ্ধিকে কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে দিলেন না। সর্বক্ষণের জন্য এমনভাবে অহংতার বিসর্জন ইতিহাসে দুর্লভ। বলছেন ঃ "মাইরি বলছি, আমার একটুও অহং নেই।" সত্যব্রত পুরুষের স্বমুখের উক্তি। দেহ মন প্রাণ তিনি এমনভাবেই জগন্মাতাকে সমর্পণ করেছেন যে, শারীরিক সুস্থতার প্রার্থনাও তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

তিনি মহাবিপ্লবীও। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণত্বের অভিমানকে তুচ্ছ করে এক কামারনীর কাছে ভিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন।

কাঙালীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছিলেন। আবার অন্তিমে বলছেন, যে-মন মাকে দিয়েছি তাকে আবার তুলে এনে কি করে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করা যায়?

দেহবুদ্ধির পরিপূর্ণ বিলোপ ঘটেছিল বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ দ্রষ্টারূপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেন—গলার ঘা একপাশে পড়ে আছে। হালদার পুরোহিতের পদাঘাতও তাঁর মনে বিক্ষেপ তুলল না, হৃদয়ের নির্মম ব্যবহারও মনকে বিরূপ করল না, মথুরবাবুর দেওয়া মহামূল্যবান শালও পদদলিত করতে দ্বিধা হলো না। মনের কোথাও অতি সূক্ষ্ম বাসনার নিদর্শন তাঁর সমগ্র জীবনে একটিবারও দেখা গেল না—না সাধক অবস্থায়, না সিদ্ধ অবস্থায়। জগন্মাতা যে-'আমি'টুকু তাঁর মধ্যে রেখেছিলেন, তা 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি'। সেও জগন্মাতার লীলা আস্বাদনের জন্য ও জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য। পদ্মলোচন প্রমুখ বিদ্বজ্জনের প্রশংসাতে নির্বিকার থেকে একপাশে বসে তাঁর মিটিমিটি হাসা নিরভিমানের অপূর্ব একটি চিত্র। 'সত্য' ছাড়া তিনি সত্যিই আর সবকিছুই মাকে 'এই নাও' বলে সমর্পণ করেছিলেন। আর সত্য তো সেই প্রেম বা আনন্দেরই নামান্তর, যা দিয়ে এই ত্যাগীশ্বর দেবমানবের হৃদয় নিরন্তর পূর্ণ ছিল।

দেবমানব ভাব সমস্ত অবতারপুরুষেরই বৈশিষ্ট্য। শ্রীভগবান যখন তাঁর ঐশ্বরিক মায়াকে আশ্রয় করে নররূপে অবতীর্ণ হন, তখন নরশরীরের অনেক ধর্মই তিনি স্বীকার করে নেন। তাঁর জন্ম কর্ম দিব্য হলেও অতি বিরল জ্ঞানী বা ভক্ত সাধকের পক্ষে তাঁকে নিঃসংশয়ে চেনা দুষ্কর। শ্রীরামচন্দ্র থেকে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৯।১১) বলেছেন ঃ

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।"

—আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব এবং সকলের অন্তরাত্মা হলেও মনুষ্যদেহ আশ্রয় করে ব্যবহার করি বলে মূঢ়গণ আমার পরমাত্মতত্ত্ব না জেনে আমাকে অবজ্ঞা করে।

"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" ('কথামৃত', পৃঃ ২২৩) যেখানে দেবতাদেরও সংশয় হয়, সীমিত বুদ্ধি মানুষের কি কথা? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও এর ব্যতিক্রম নন, বরং তাঁর জীবনে এই দেবমানব ভাবের প্রকাশ আমরা প্রথমাবধিই লক্ষ্য করি। চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্দশার কথা বলে বলছেন, এই তিনটি অবস্থা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অতি বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে এই দেবভাবের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। আনুড়ে বিশালাক্ষি দেবীর মন্দিরে যাওয়ার পথে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, আবার দেবীর নামগুণকীর্তন করায় তাঁর জ্ঞান ফিরে আসা, শিবের অভিনয় করতে গিয়ে ধ্যানস্থ হওয়া, আকাশে বলাকাশ্রেণী দেখে ভাবাকুল হওয়া—এসমস্তই তাঁর দিব্য ভাবের দ্যোতক।

পরবর্তী কালে সাধকজীবনেও শেষ চার-পাঁচ বছরের যে-ইতিহাস আমরা পাই তাতে দেখি, তিনি কিভাবে প্রায় অধিকাংশ সময়ই অর্ধবাহ্যদশা বা অন্তর্দশাতে অবস্থান করতেন। তাঁর দেহটি ছিল সাধারণ মানুষের মতো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি ভাগবতী তনুই হয়ে গিয়েছিল। মন-প্রাণও ছিল সর্বক্ষণ ঈশ্বরে ওতপ্রোত। কিন্তু পরমাশ্চর্য যে, যখন তিনি সাধারণ অবস্থায় বা বাহ্যদশায় থাকতেন তখন কারো পক্ষে ধারণায় আনা সম্ভব হতো না যে, এই ব্যক্তিটিই কিছুক্ষণ আগে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করছিলেন!

মানবলীলায় তাঁর ব্যবহার সর্বাঙ্গসুন্দর, সেখানেও তিনি তাঁর আচরণ ও ব্যবহারে আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন। শৈশবে বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহারে, ক্রীড়াকৌতুকে, প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আচরণে, বালসুলভ কৌতূহলে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। রঙ্গরসের দ্বারা সকলের আনন্দবিধান করতে শৈশব থেকেই তাঁর জুড়ি ছিল না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন ঃ "ফচকিমিতেও আপনার সঙ্গে পারলাম না!" যেকোন বিষয়ে তাঁর সকল ইন্দ্রিয় ছিল সজাগ, যা তাঁকে পরবর্তী কালে অপরের মনকে 'কাঁচের মধ্য দিয়ে' দেখতে সাহায্য করেছিল। সাংসারিক যাবতীয় খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি ছিল বলেই অতি সাধারণ ঘরোয়া উপমার সাহায্যে তিনি বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমাকে তিনি শিখিয়েছিলেন—সংসারের সকলের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়, এমনকি পান সাজা বা সলতেটি কেমন করে পাকাতে হয় তাও। আবার তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল মায়ের সঙ্ঘজননীর রূপ। তাই সবার অলক্ষ্যে তিনি মাকে নিঃশব্দে সে-শিক্ষাও দিয়ে যাচ্ছিলেন। কামগন্ধরহিত হয়েও তিনি আদর্শ পতি, বৃদ্ধা চন্দ্রমণির সেবাযত্নের ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ পুত্র। শিষ্যদের সঙ্গে গুরুবৎ, পিতৃবৎ, বন্ধুবৎ ব্যবহার করে পরমতত্ত্বের সন্ধানও যেমন দিয়েছেন, তেমনি তাদের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও নৈতিক আচরণের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। আবার কত সময়ে লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। দিব্যভূমিতে যে-রস তিনি আস্বাদন করেছেন, লৌকিক আচরণেও সেই আনন্দের ধারা বর্ষণ করেছেন জীবনভোর। জগন্মাতার কাছে তাঁর প্রার্থনা ছিল—মা, আমায় শুকনো সাধু করিস না, রসেবশে রাখিস। মা তাঁর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করে তাঁর মধ্যে দিব্য ও মানব ভাবের এমন এক সমন্বয় দেখিয়েছেন, যার আভাস আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের জীবনে পাই। তাঁর দিব্যভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ 'কল্পতরু দিবসে'। আত্মপ্রকাশ ও অভয়দানের যে-চিত্র আমরা পেয়েছি, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সহস্র সূর্যের দীপ্তির মতো সে-রূপ সংবরণ করতে প্রার্থনা করেন। খ্রীস্ট, বুদ্ধ, চৈতন্যের কৃপা কোন কোন

ভাগ্যবান কচিৎ লাভ করেছিলেন, কিন্তু একসঙ্গে এতজন ভক্তের প্রতি কৃপাবর্ষণ, স্পর্শমাত্র তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন আনা জগতের ইতিহাসে বিরল।

কেবলমাত্র সেই কল্পতরু দিবস বা শ্যামপুকুরে কালীপূজার রাত্রে বা দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন সময়ে ভক্ত ও শিষ্যদের জীবনে পরিবর্তন আনয়নের জন্য নয়, শতবর্ষ অতিক্রম করে তাঁর প্রভাব আজও কিভাবে বিশ্বের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এটিই লক্ষণীয়। পূর্ব পূর্ব অবতারের তুলনায় দেশে-বিদেশে বহু ব্যক্তি তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এই বিস্তৃতি অন্যান্য অবতারে দুর্লভ। সত্য কথা, এই প্রভাববিস্তারের অনেকখানি কৃতিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের এবং কথামৃতকার শ্রীম বা মাস্টার-মশায়ের। কিন্তু তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের হাতেরই যন্ত্রমাত্র নয় কি? শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজনীন মানবধর্ম তথা ভারতের সনাতন ধর্মের মর্মবাণীই তো তাঁরা পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ দুই গোলার্ধেই বহন করে নিয়ে গিয়েছেন ও আজও যাচ্ছেন। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে কখনো কোন ধর্মের এরকম নির্বাধ প্রসারের কথা শোনা যায় না।

স্বামীজী বলছেন ঃ "বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করে দিচ্ছে, পরন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সর্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রদর্শন করে লোকের ঐহিক অভাব এককালে দূর করতে না পারলেও নিঃসন্দেহে অনেকটা কমাতে সমর্থ হয়েছিল। ইদানীন্তন কালে ঐ উভয় সভ্যতার একত্র সংযোগ করতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেছেন।" ('বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২০)

শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল বাণীর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্য আছে তা চিরন্তন। সর্বদেশের সর্বকালের বিশেষত আজকের এই গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ভোগবিলাসে নিমগ্ন, বিচ্ছিন্নতাবাদে ক্লিষ্ট, সর্বতোভাবে অতৃপ্ত জীবনে এনে দিয়েছে এক আশার আলো। নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, কর্মী-ত্যাগী, সমাজের অধঃপতিত স্তর থেকে সম্ভ্রান্ততম ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেরই তিনি পরম আশ্রয়। আর কেবলমাত্র ব্যক্তিজীবনে নয়—সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে, এককথায় বিশ্বচেতনায় অতি নীরবে এক রূপান্তর শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁর অনুগামীদের মধ্য দিয়ে। ধর্মে ধর্মে যে-বিরোধের ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবিষ ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষে মানুষে যে-ভেদবুদ্ধির জন্য জগৎ আজ উৎপীড়িত, তার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেছেন ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করে এবং অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করে। তাই তো ভগবতী দাসী, রসিক মেথর, দস্যু আমজাদ ও জয়রামবাটীর দরিদ্র দুলে-বাগদী সম্প্রদায়ও যেমন ঠাকুর ও মায়ের আশ্রয়ে ধন্য, তেমনি সাগরপারের বিদেশিনীরাও মায়ের কাছে এসে তাঁর কথা শুনে তাঁর ভালবাসায় কৃতকৃতার্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাতীরে ঐ ছোট্ট ঘরটিতে বসে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় যে পরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রভাব সবে শুরু হয়েছে এবং তা চলবে আরো দীর্ঘকাল ধরে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত উৎসর্গীকৃত বহু ব্যক্তির মিলিত সাধনায় জগতে নেমে আসবে মহাজাগতিক রূপান্তর, এই পৃথিবী হবে দিব্যভূমি। পুনর্বার সত্যযুগ নেমে আসবে এই পৃথিবীতে। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন ঃ "সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস।" স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সাধনদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট যুগ-সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন আবির্ভূত হয়েছেন, সেদিন থেকেই সত্য-যুগের সূচনা হয়েছে।" সত্যযুগের সেই মহা ঋষির উদ্দেশে তাই তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়েছিল এই অসাধারণ প্রণামমন্ত্রটি ঃ

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।" ❑

* পরম পূজ্যপাদ দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের এই ভাষণটির স্থান ও কাল আমরা জানতে পারিনি।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ

আলোচ্য কালের প্রথম ভাগে মঠবাসীদের শিরোমণি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মঠবাসী স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলতেন, মঠে স্বামীজী উপস্থিত থাকলে তা মঠের গেট থেকেই টের পাওয়া যেত। স্বামী যোগানন্দ নতুন মঠে বাস করেননি। স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত প্রচার করছিলেন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করবার জন্য মঠ থেকে যাত্রা করেছিলেন ২০ জুন ১৮৯৯ এবং ফিরে এসেছিলেন ২৯ জুলাই ১৯০২। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২। স্বামীজীর অবর্তমানে ৯ আগস্ট ১৮৯৯ তারিখে হরিপ্রসন্ন (ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানানন্দ) বেলুড় মঠে আত্মসন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আলোচ্য কালে স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাইগণ অল্পকাল বা বেশিকালের জন্য মঠে বাস করেছিলেন।

সঙ্ঘের প্রথম শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ মরদেহ ত্যাগ করেছিলেন ২৮ মার্চ ১৮৯৯ তারিখে ১০/২ বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে। শোকে কাতর শ্রীমা বলেছিলেনঃ "বাড়ির একখানি ইট খসল, এবার সব যাবে।" ৪ জুলাই ১৯০২ তারিখে স্বামীজীর মহাসমাধির পরে মঠজীবনে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল। স্বামী সারদানন্দের ২ জুন ১৯০৪ তারিখের চিঠি থেকে জানা যায় যে, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ হরিদ্বারে কলেরাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের ২২ জানুয়ারি ১৮৯৮ তারিখের চিঠি থেকে জানা যায়, ঐদিন মঠে ১৩ জন, কলকাতায় ৪ জন এবং কলকাতার বাইরে দেশে ও বিদেশে কয়েকজন মঠভুক্ত সাধু ছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবের পর বেলুড় মঠে বাস করছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের ৭ জন সন্ন্যাসী শিষ্য। অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী সোমানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী সত্যকাম, স্বামী সদানন্দ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল ও ব্রহ্মচারী নন্দলাল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দও ছিলেন কলকাতায়। আমেরিকাতে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ। কিষেণগড়ের অস্থায়ী অনাথাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত স্বামী কল্যাণানন্দ অসুস্থ হওয়াতে সেখানে যান স্বামী নির্মলানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ। স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ কেদার-বদরী দর্শনে গিয়েছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও কেদার-বদরী থেকে প্রত্যাবৃত্ত স্বামী প্রকাশানন্দ এলাহাবাদের ব্রহ্মবাদিন ক্লাবে ছিলেন বেশ কিছুকাল। আলমোড়ায় কিছুদিনের জন্য তপস্যা করেছিলেন স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ। মাদ্রাজ কেন্দ্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে ছিলেন স্বামী সচ্চিদানন্দ (প্রায় ছয় মাস), স্বামী পরমানন্দ প্রমুখ। মুর্শিদাবাদের শিবনগরে সেসময়ে অনাথাশ্রম পরিচালনা করছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। তাঁকে সাহায্য করছিলেন স্বামী সুরেশ্বরানন্দ ও অন্য দু-একজন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। তাঁকে সাহায্য করছিলেন স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়োবাবা), স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামীজীর ভাগনে হরেন্দ্র (নাদু)।

সঙ্ঘে যোগদানেচ্ছুদের সম্বন্ধে প্রথম দিকে কয়েকটি চিন্তাভাবনা কাজ করেছিল। ২৭ এপ্রিল ১৮৯৬ তারিখে লেখা স্বামীজীর চিঠিতে নির্দেশিত হয়েছিল যে, একবছর মঠে ও একবছর মঠের বাইরে তপস্যাদি করার পর একজন যোগ্য ব্যক্তি সন্ন্যাসী হতে পারবে। স্বামী শুদ্ধানন্দ এই নিয়ম মেনেছিলেন। এদিকে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে দেখা যায় যে, মঠের অন্নসত্রে পাঁচবছর সেবা করে, তারপর আরো পাঁচবছর শাস্ত্রাদির চর্চা করে একজন সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পারবে। এ-নিয়ম কখনো চালু হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। আবার দেখা যায়, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে রেঙ্গুনে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেনঃ "মঠের সন্ন্যাসী হতে গেলে প্রথম তিনবছর শিক্ষানবীশ থাকতে হয়, তারপর তিনবছর ব্রহ্মচর্যব্রত। এই ছবছর পরে মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসের উপযুক্ত বিবেচনা করলে সন্ন্যাস দিবেন। মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সংযমী ও আদর্শ ভক্ত হতে হবে।"[৪২] পরে চারবছরের শিক্ষানবিশী ও চারবছরের ব্রহ্মচর্যব্রত নিয়মটি চালু হয়।

বর্তমানে প্রচলিত মঠের নিয়মাবলী ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই নিয়মানুযায়ী মঠের অঙ্গগণ হবেন দুভাগে বিভক্ত—সন্ন্যাসী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আলোচ্য কালে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্রহ্মচারী জ্ঞান। স্বামীজী মার্গারেট নোবলকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁর নাম হয়েছিল 'নিবেদিতা'। বলা বাহুল্য, তিনি সন্ন্যাসী সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সেসময়ে সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ চালু করা সম্ভব হয়নি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচর্যব্রতের মন্ত্রসকল রচনা করেছিলেন ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে।

স্বামীজীর শিষ্য স্বামী অচলানন্দ তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেনঃ "কোন নতুন ব্রহ্মচারী মঠে প্রথম এলে তিনি (স্বামীজী) তাকে বেলুড় গ্রাম ও তার নিকটবর্তী স্থানে ভিক্ষা করতে পাঠাতেন। তাকে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল নিজে পাক করে

৪২ ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র—গিরীন্দ্রনাথ সরকার, ১৯৩৯, পৃঃ ৪৪-৪৫

ঠাকুরকে ভোগ দিতে হতো এবং পরে তা প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে হতো। সন্ন্যাসীদেরও মাঝে মাঝে তিনি মাধুকরী অন্নগ্রহণ করতে বলতেন।... শরীরত্যাগের একমাস পূর্বে তিনি পূজনীয় রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতিকে মাধুকরী করে আনতে বলেছিলেন। তাঁরা মাধুকরী করে আনলে স্বামীজী তা থেকে একটু অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। সেই সময় স্বামীজী পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে বলেছিলেন, 'মাধুকরী-বৃত্তি ত্যাগ করবেন না, সহ্য হোক আর নাই হোক।'... আমরা যে সাধু—এই ভাবটি জাগিয়ে রাখাই স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল।"[৪৩] আলোচ্য কালে এ-ভাবটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন মঠবাসিগণ।

মঠের অন্যান্য বাসিন্দা ও অতিথিবৃন্দ

সংসারজীবনে বীতস্পৃহ কেউ কেউ সন্ন্যাসী সঙ্ঘে যোগদানের সুযোগ না পেলেও মঠে থেকে গিয়েছিলেন। যেমন, হুটকো গোপালের বড় ভাই মঠে থাকতেন এবং ফুলবাগান ও তরিতরকারির বাগান দেখাশুনা করতেন। তিনি ছিলেন সবারই 'বড়দা'। তার আগে ছিলেন জনৈক চাটুজ্যে। স্বামী প্রেমানন্দ 'এপ্রিল ১৯০০' তারিখে চিঠিতে লিখেছেনঃ "আজ আটদিন হলো গোপাল-দা ঢাকায় গিয়েছে। চাটুজ্যে এখন একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

মঠে বাসস্থানের অভাব বরাবরই, তবে আলোচ্য সময়ে সে-সমস্যা ছিল খুবই বেশি। কলকাতার ভক্তদের অধিকাংশই দিনে এসে প্রসাদ গ্রহণ করে চলে যেতেন। শ্রীম-র মতো দু-একজন কষ্টেসৃষ্টে রাত্রিবাস করতেন। বিশেষ সমস্যা দেখা দিত বিদেশী অতিথিদের নিয়ে—যাঁরা কোন-না-কোন কারণে মঠবাস করতে চাইতেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মিসেস সেভিয়ার মায়াবতী থেকে মঠে এসে পৌঁছেছিলেন। ২৭ মার্চ ১৯০১ তারিখে তিনি মায়াবতীর জমির উইল সম্পাদন করেন এবং ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি ও মিস বেল মঙ্গলবার ১০ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখে মঠে এসে পৌঁছান।[৪৪] দুবারই তাঁরা মঠের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে বাস করেছিলেন। মিসেস বুল কলকাতায় দ্বিতীয়বার এসেছিলেন সম্ভবত ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারিতে। কলকাতার একটি হোটেলে কয়েকদিন থেকে বেলুড় মঠে এসে বাস করেছিলেন তাঁবু খাটিয়ে।[৪৫] তাঁর সঙ্গী ছিলেন নিবেদিতা।

মায়াবতী আশ্রমের জমিজমার আইনমাফিক একটা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য মিসেস সেভিয়ার কলকাতায় এসেছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দের সঙ্গে। মঠের মাঠের ওপর তাঁবু খাটিয়ে মিসেস সেভিয়ার ও সিস্টার ক্রিস্টিন কিছুদিন মঠবাস করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দেখে মিসেস সেভিয়ার মায়াবতীর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন ১ এপ্রিল ১৯০৩।

মঠের দক্ষিণে এক ফার্লং দূরে ছিল নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ি। আলোচ্য কালে এ-বাড়ি কয়েকবারই ভাড়া নিতে হয়েছিল। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মঠে দুর্গাপূজার সময় শ্রীমা তাঁর কয়েকজন সঙ্গিনীকে নিয়ে সেখানে বাস করেছিলেন। দার্জিলিঙের উকিল মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর স্ত্রী কাশীশ্বরী দেবী ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে চার মাস[৪৬] বাস করেছিলেন। তাছাড়াও অতীতে বিদেশী অতিথিদের জন্য 'বালি হাউস' ভাড়া নিতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, স্বামীজী মঠে উপস্থিত থাকলে অতিথিদের ভিড় লেগে যেত।

মঠে ছাত্রাবাস

বেলুড়ে নিজস্ব বাড়িতে মঠ উঠে আসবার আগেই নীলাম্বরবাবুর বাগানে মঠবাসীদের সঙ্গে দু-একজন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থাকবার সুযোগ পেয়েছিল। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১১ মার্চ মঠে এধরনের আবাসিকদের মধ্যে ছিলেনঃ (১) বলেন ব্যানার্জী, (২) শৈলেন ব্যানার্জী, (৩) নরেশচন্দ্র ঘোষ (বালীর Sir Rivers Thomson বিদ্যালয়ের[৪৭] থার্ড ক্লাসের ছাত্র), (৪) প্রবোধকুমার চন্দ্র (ঐ বিদ্যালয়ের ফোর্থ ক্লাস), (৫) অব্জকুমার চন্দ্র (ঐ, এইটথ ক্লাস), (৬) খগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (ঐ, সিক্সথ ক্লাস)।

দার্জিলিঙের সরকারি উকিল মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পাঁচ ছেলের মধ্যে বলেন্দ্র ছিলেন প্রথম পুত্র এবং শৈলেন্দ্র তৃতীয় পুত্র। স্বামী প্রেমানন্দের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, বলেন্দ্র এবং শৈলেন্দ্র মঠবাড়ির দোতলায় বাস করতেন। গঙ্গা পেরিয়ে তাঁরা কলকাতায় স্কুলে বা কলেজে পড়তে যেতেন।

এই ছাত্রাবাস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর আরেকটি বিবরণ পাওয়া যায় স্বামী প্রেমানন্দের 'এপ্রিল ১৯০০' তারিখে লেখা একটি চিঠিতে। সে-চিঠির একাংশঃ "তার (দমদম মাস্টারের) দুটি ছেলে এই মঠে থাকে। বালীর স্কুলে পড়তে যায় আর থাকে। আর থাকে poor শরৎ সরকারের[৪৮] মাসতুতো ভাই গৌর।[৪৯] সে সকল কাজে দড়, পড়ায় ফাঁকি মারে। আর স্বামীজীর দূরসম্পর্কীয় একটি ছেলে থাকে। ওপরে চাটুজ্যে সাহেবের দুটি ছেলে থাকে।"

মঠের এই ছাত্রাবাস কতদিন চলেছিল জানা নেই। ছাত্রাবাসের দেখাশোনা করতেন প্রথমদিকে স্বামী শুদ্ধানন্দ, পরে স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়োবাবা)। সেসময়ে মঠে স্থানাভাব ও

---

৪৩ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ৫৯

৪৪ স্বামী সারদানন্দের ১২।১২।১৯০১ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য

৪৫ স্বামী সারদানন্দের ২৯।৩।১৯০২ তারিখের চিঠির একাংশঃ "Mrs. Bull is with us for a short visit."

৪৬ স্বামীজীর স্মৃতিসঞ্চয়ন—স্বামী নির্লেপানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ১১৪

৪৭ বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের নাম শান্তিরাম বিদ্যালয়।

৪৮ ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতা শাখার অন্যতম 'আন্ডার সেক্রেটারী' ছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে প্লেগরোগে মারা যান।

৪৯ এঁরই ভাল নাম নরেশচন্দ্র ঘোষ।

অর্থাভাব প্রকট। এসব অসুবিধা অগ্রাহ্য করেও ছাত্রাবাস মনে হয় দু-বছরের বেশি এবং স্বামীজীর মহাসমাধির সময়ও[৫০] চালু ছিল। জনশ্রুতি, একটি ছাত্রের বিছানায় মূত্রত্যাগ করার বদভ্যাসের জন্য ছাত্রাবাস বন্ধ ত্বরান্বিত হয়েছিল।

এপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে যে, স্বামীজীর মহাসমাধির পর স্বামী সারদানন্দের উদ্যোগে ৬৪/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে কলেজের ছাত্রদের জন্য 'বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির' নামে একটি ছাত্রাবাসের শুভারম্ভ হয়েছিল ১৮ জুন ১৯০৩। ছাত্রাবাসের সাফল্যে উৎসাহিত সারদানন্দজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "I am sure its influence will grow with time." কিন্তু ইংরেজ সরকারের ভয়ে বাড়ির মালিকগণ যুবকদের ছাত্রাবাসের জন্য বাড়ি দিতে অস্বীকার করায় এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটির বছর খানেক পরে অকালমৃত্যু হয়েছিল। অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যে রামকৃষ্ণানন্দজীর উৎসাহে মাদ্রাজে গড়ে উঠেছিল স্কুলের ছেলেদের জন্য একটি অবৈতনিক ছাত্রাবাস। বিশের দশক থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মঠ-মিশন কেন্দ্রে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সঙ্ঘ তথা ভাবান্দোলনের সংহতি সাধন

নিজস্ব জমিতে মঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই ঘণ্টা ধরে মঠের দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত হচ্ছিল, মঠের নিয়মাবলীও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া নিয়মিত পূজা, পঠন-পাঠন, বিভিন্ন স্থানে আর্তত্রাণ ও শিক্ষামূলক সেবার কর্মসূচী চালু হয়েছিল। মঠ নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরের পরে মঠজীবনের কিছুটা পুনর্বিন্যাস করতে হয়েছিল। নিজস্ব জমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব, স্বামীজীর জন্মোৎসব ও দুর্গাপূজাদি আরম্ভ হয়েছিল। ঠাকুরঘরে সন্ধ্যারতির গান পরিবর্তিত আকারে চালু হয়েছিল। মঠ ও মিশনের প্রতীক বা emblem রচিত হয়েছিল। সঙ্ঘের লক্ষ্য যে আদর্শবাণী বা motto-তে বিধৃত, তা ঘোষিত হয়েছিল। একটি ইংরেজী ও একটি বাঙলা মুখপত্র যথাক্রমে 'Prabuddha Bharata' এবং 'উদ্বোধন' নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়া প্রধানত আলাসিঙ্গা পেরুমলের নেতৃত্বে ভক্তদের দ্বারা মাদ্রাজ থেকে স্বামীজীর প্রেরণায় 'Brahmavadin' নামে ইংরেজী পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছিল। এইভাবে দেশে-বিদেশে ধীরে ধীরে প্রচারকার্য বিস্তারলাভ করতে থাকে, নতুন নতুন কেন্দ্র সংযোজিত হতে থাকে।

এসব দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও সঙ্ঘের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজী সর্বদাই উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতির জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে বলেছিলেন ঃ "এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্তত ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমব।"[৫১] একই ব্যক্তিকে স্বামীজী ৩০ অক্টোবর ১৮৯৯ তারিখে লিখেছেন ঃ "আমরা এক নতুন ভারতের সূচনা করেছি—যথার্থ উন্নত ভারত, পরের দৃশ্যটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি।" ইতিমধ্যে স্বামীজীর নেতৃত্বে "দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মশিক্ষার জন্য এবং কর্মকেন্দ্ররূপে" বেলুড়ে একটি মঠ গড়ে উঠেছিল। বেলুড় মঠকে তিনি প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন, মৃত্যু তাঁর দ্বারে। তাঁর পরিকল্পনার রূপায়ণ যথেষ্ট দ্রুতগতিতে হতে থাকলেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে প্রচার শেষ করে দেশে ফিরেই তিনি উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করে বেলুড় মঠের সম্পত্তি ইত্যাদি নিয়ে একটি দেবোত্তর ট্রাস্ট করে দেন ৩০ জানুয়ারি ১৯০১ এবং তিনি নিজেকে দায়দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে এসে তাঁর এগার জন সন্ন্যাসী গুরুভাইকে অছি নিযুক্ত করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ অধ্যক্ষ-পদে নির্বাচিত হন। স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। অন্যান্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধর্ম আন্দোলনের বিকাশ ও পরিণতি আলোচনা করে তদানীন্তন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ রূপ কি হবে—এটাই ছিল স্বামীজীর নিয়ত চিন্তা। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "আমার কেবল ভয় এই যে, এখন তো একরকম খাড়া করা গেল, অতঃপর আমরা চলে গেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায় তাই দিনরাত আমার চিন্তা।" স্বামীজীর এই চিন্তার পরিণতিতে দেখা গেল, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন স্বামীজী স্থূলশরীরে থাকতে থাকতেই দুর্দম গতিতে অগ্রসর হয়েছে; আর স্বামীজী লোকচক্ষুর অন্তরালে যেতে সঙ্ঘের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি স্ফুরিত হয়ে স্বামীজীর স্বপ্নকে রূপায়ণ করতে অগ্রসর হয়েছে।

মঠজীবন ও শ্রীমা

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজী শ্রীমাকে সঙ্ঘজননীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মিশনের তহবিল থেকে তিনি প্রতি মাসে শ্রীমায়ের জন্য ২৫ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আলোচ্য সময়ে সঙ্ঘজীবনে শ্রীমায়ের প্রভাব নীরবে অথচ সুনিশ্চিতভাবে কিরূপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তা দেখবার মতো।

শ্রীমা বরানগর ও আলমবাজার মঠে কখনো যাননি। মঠ যখন নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানে, সেসময়ে ৯ এপ্রিল ১৮৯৮ তিনি মঠে প্রথম পদার্পণ করেন। মঠবাসিগণ শঙ্খধ্বনি করে সঙ্ঘজননীকে অভ্যর্থনা করেন, তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করেন। নতুন কেনা জমিতে মঠ স্থানান্তরের আগেই শ্রীমা অন্তত

৫০ স্বামীজীর স্মৃতিসঞ্চয়ন, পৃঃ ৪৪

৫১ মেরি হেলকে লেখা স্বামীজীর ৯।৭।১৮৯৭ তারিখের চিঠি।

তিনদিন সেই জমি ও নতুন তৈরি বাড়িঘর দেখতে যান। ১২ নভেম্বর ১৮৯৮ শ্রীমা নিজে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সুসম্পন্ন করে প্রথম মঠবাড়িখানি উৎসর্গ করেন। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন ঃ "এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজার জায়গা হলো।" সেদিনই সন্তানগণ শ্রীমায়ের পদরজ সংগ্রহ করে একটি কৌটায় রাখেন। সেটি শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের একটি কুলুঙ্গিতে স্থাপিত হয়েছে।

এর পরদিন ১৩ নভেম্বর কালীপূজার দিন ১৬ বোসপাড়া লেনে শ্রীমা ঠাকুরের পূজা করে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনের ইতিহাসে শ্রীমায়ের আশীর্বাদপূত নারীশিক্ষার শুভারম্ভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মা সেসময়ে ১০/২ বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। মিসেস বুলের একান্ত প্রার্থনায় শ্রীমায়ের প্রথম ফটো তোলেন জনৈক মিঃ হ্যারিংটন। পরবর্তী কালে মা বলেছিলেন ঃ "সারা মেম এসে এইটি ওঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, 'মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব।' তাই শেষে এই ছবি ওঠায়।" প্রথমে গোপনভাবে, পরে প্রকাশ্যে ভক্তদের বাড়িতে ও আশ্রমগুলিতে এই চিত্র ছড়িয়ে পড়ে, যদিও মঠের ঠাকুরঘরে শ্রীমায়ের আলোকচিত্র স্থাপিত হয় শ্রীমায়ের মহাসমাধির পর।

সেবক স্বামী যোগানন্দের অকালমৃত্যুতে মা শোকাভিভূত হন। দুদিন পরে নিবেদিতা তাঁর ৩০ মার্চ ১৮৯৯ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন ঃ "I went to see the Mother who was in tears." ২০ জুন স্বামীজী শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। সেদিনই মধ্যাহ্নে শ্রীমা তাঁদের এবং মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ভোজনে আপ্যায়িত করেন। প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘের যাবতীয় কাজকর্মে শ্রীমায়ের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে অনুভূত হতে থাকে।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি রাধারানী বা রাধুর জন্ম। অতঃপর শ্রীমায়ের জীবনে দেখা যায় রাধারানীর দীর্ঘ প্রচ্ছায়া। রাধারানীকে অবলম্বন করে মায়ের জীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল, তার ফলে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কাজকর্ম ও বিকাশের সঙ্গে শ্রীমা যেন অনেক বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন। সন্ন্যাসী সঙ্ঘে মায়ের প্রভাব স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। নিজের সম্বন্ধে তো বটেই, সঙ্ঘ সম্বন্ধেও শ্রীমায়ের ইচ্ছাই ছিল শেষ-কথা। স্বামীজীরও সেই এক সিদ্ধান্ত। স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—আমি তো এইটুকুই বুঝি।"[৫২]

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে প্রথম প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমায়ের সক্রিয় যোগদান যে ভাবমাধুর্য সৃষ্টি করেছিল, তার স্মৃতি ভক্তচিত্তের সম্পদ। সাক্ষাৎ জগজ্জননী-জ্ঞানে মঠবাসিগণ শ্রীমায়ের শ্রীচরণপূজা করে নিজেদের ধন্যজ্ঞান করেছিলেন। দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তদানীন্তন মঠবাড়ি ও ঠাকুরবাড়ির মধ্যেকার উঠানে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দুর্গাপূজা হয়েছিল ঐস্থানেই। প্রথমদিকে হোগলার ছাউনি করে পূজামণ্ডপ তৈরি করা হতো।

শ্রীশ্রীঠাকুরই স্বামীজীর মধ্য দিয়ে কাজ করছিলেন—শ্রীমায়ের এই অভিমত সঙ্ঘের অঙ্গদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ১৯০২-এর জুলাই মাসে স্বামীজীর মহাসমাধির পর মঠ যেন এক হতাশার অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। শ্রীমা তখন দেশের বাড়িতে। তাঁর কাছে এই দুঃসংবাদ পৌঁছাবার পর তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে সেসময়কার তাঁর চিঠিপত্র[৫৩] থেকে মায়ের মনের অবস্থা অনুমান করা যায়। শ্রীমা ১৫ ভাদ্র ১৩০৯ (৩১ আগস্ট) স্বামীজীর শিষ্য বিমলানন্দকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সাবধান করে দিয়ে লিখেছিলেন ঃ "মঠে সাবধানে থাকিবে। আর স্বামীজীর জোর নাই।" দ্বিতীয়ত, তিনি নিজের শোক সামলে নিয়ে শোকাহত সঙ্ঘের অঙ্গদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। যেমন উপরি উক্ত চিঠিতে শ্রীমা লিখেছিলেন ঃ "শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জন্য যে কষ্ট হইতেছে লিখিয়া কি জানাই।" আবার দেখা যায়, তিনি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২ তারিখে জয়রামবাটী থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন ঃ "স্বামীজীর জন্য আর চিন্তা করিবে নাই।" এভাবে দেখা যায়, শ্রীমা স্বামীজীর তিরোধানে শোককাতর সাধু-ব্রহ্মচারীদের সামলেছেন।

সঙ্ঘের বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীমায়ের সিদ্ধান্তই যে চূড়ান্ত ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আলোচ্য কালেই। স্বামীজী, মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখের মতে, মা ছিলেন তাঁদের 'হাইকোর্ট'। দুটি ঘটনা এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাক। হিমালয়ে অদ্বৈত আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সরাসরি অদ্বৈতবেদান্ত মতে সাধনের জন্য। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে স্বামীজী মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে প্রায় দুসপ্তাহ গিয়ে বাস করেছিলেন। একদিন তিনি দেখতে পান, আশ্রমবাসীদের কয়েকজন একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ফুল দিয়ে সাজিয়ে ধূপধুনা জ্বালিয়ে পূজা করছেন। স্বামীজী দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হন। স্বামীজীর অভিমত অনুযায়ী ঐ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের বা অন্য দেবদেবীর পূজাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু স্বামীজীর সিদ্ধান্তে অখুশি হয়ে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ শ্রীমাকে পত্র লেখেন। উত্তরে শ্রীমা স্বামীজীর অভিমত সমর্থন করে লিখে পাঠালেন ঃ "তোমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত—তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।"

---

৫২ ২৯।৮।১৯০১ তারিখে মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে লেখা স্বামীজীর চিঠি।

৫৩ শ্রীমায়ের চিঠির অল্পসংখ্যকই পাওয়া গিয়েছে।

'হাইকোর্টের রায়' জানতে পেরে অদ্বৈতাশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নেন।

অপর একটি দৃষ্টান্ত। বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে দুর্গাপূজার পর মঠে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সে-পূজাতে পাঁঠাবলি[৫৪] দেওয়া হয়। অনুমান করতে দ্বিধা নেই, শ্রীমায়ের আদেশেই তার পর থেকে চিরতরে মঠে পাঁঠাবলি বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীমায়ের যুক্তি ছিল—সন্ন্যাসী সর্বভূতে অভয়দান করবে, সন্ন্যাসীদের মঠে পশুবলি দিয়ে পূজা করা অনুচিত।

বেলুড় মঠ ছাড়াও কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রীমায়ের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিল। আলোচ্য কালে মা কলকাতায় যেসব ভাড়াবাড়িতে বাস করেছিলেন সেগুলি নিবেদিতা স্কুলের কাছেই ছিল। মা স্কুলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের নিয়মিত খবরাদি নিতেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে রথযাত্রার দিন মা এন্টালির শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের উৎসবে যোগদান করেন এবং জন্মাষ্টমীর দিন কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে 'নিত্য আবির্ভাব' উৎসবে সারাদিন থাকেন এবং ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করেন।

স্বামী সারদানন্দ মায়ের প্রধান সেবকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে মায়ের সঙ্গে মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ আরো বেড়ে যায়। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ টাইফয়েড রোগে দীর্ঘদিন ভোগার পর মঠ-মিশনের দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে হাত গুটিয়ে নেন। স্বামীজীর মহাসমাধির পর স্বামী সারদানন্দের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। শ্রীমায়ের সেবা এবং মঠ-মিশনের ক্রমবর্ধমান কাজকর্ম ছাড়াও স্বামীজীর মহাসমাধির পর যুবকদের মধ্যে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, তাতে উপযুক্তভাবে সাড়া দিতে গিয়ে স্বামী সারদানন্দকে অনেক বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাজকর্ম থেকে সরে যাওয়ার পর তাঁর দায়দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। এদিকে স্বামী তুরীয়ানন্দ হয়তো তাঁর দায়দায়িত্বের কিছুটা অংশীদার হবেন আশা করে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে বিব্রত ও কিছুটা হতাশাগ্রস্ত স্বামী সারদানন্দকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে চাঙ্গা করেছিলেন শ্রীমা।

সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ের মধ্যে মঠবাসীদের জীবনে শ্রীমায়ের স্নিগ্ধ বিমল প্রভাব বেশ বিস্তারলাভ করেছিল। [ক্রমশ]

৫৪ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IX, p. 169

দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ②

❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑

কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত

প্রিয় পুত্রের হত্যাকারী ইন্দ্রের তীব্র বিরোধিতা কামনা করে পুত্রশোকাতুর ঋষি ত্বষ্টা এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেই যজ্ঞের ফলে আবির্ভূত হলো এক ভীষণদর্শন বিশালকায় অসুর। তার নাম 'বৃত্রাসুর'।

বৃত্রাসুরের অত্যাচারে ত্রিভুবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বিরাট হাঁ করে মাটি কাঁপিয়ে সে যখন এগিয়ে আসত তখন মনে হতো, জগৎসংসার যেন সে গ্রাস করে ফেলবে! অসুরের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ত্রিলোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। দেবতারা বৃত্রাসুরকে বিনাশ করবার জন্য সকলে মিলে তাকে আক্রমণ করলেন। নিজের নিজের দিব্য অস্ত্র তাঁরা বৃত্রাসুরের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। বৃত্রাসুর অক্লেশে সেই অস্ত্রগুলি তৎক্ষণাৎ গিলে ফেলতে লাগল।

দেখতে দেখতে দেবতাদের সমস্ত অস্ত্র ফুরিয়ে গেল। তাঁদের তেজও কমে যেতে লাগল। তাঁরা বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন না হলে বৃত্রাসুরের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। তিনি নিশ্চয়ই বৃত্র-সংহারের উপায় বের করে দেবেন। [ক্রমশ]

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ ঃ 'ব্রিটিশ রাজরোষে রামকৃষ্ণ মিশন'

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র (১৪০৫) সংখ্যায় তাপস বসুর 'ব্রিটিশ রাজরোষে রামকৃষ্ণ মিশন' প্রবন্ধটি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পড়লাম। খুবই তথ্যভিত্তিক পরিবেশন। ভাল লাগল। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের স্রষ্টা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অন্যতম বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ ও বীরাঙ্গনা সরলাদেবীর কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি।

স্বামীজী তাঁর কম্বুকণ্ঠে ভারতবাসীকে 'মানুষ' হয়ে ওঠার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। সমস্ত জড়তার অবসান ঘটিয়ে জাতিকে 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষা তিনিই দিয়েছিলেন। কিন্তু অগণিত ভারতবাসীর মধ্যে কয়েকটি তরুণকেই তিনি সেদিন বেছে নিয়েছিলেন, একান্ত খোলাখুলিভাবে এই কথাটি বলার জন্য যে, "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া।" সেই তরুণদের নেতা ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। ঢাকায় ১৯০১ এর এপ্রিল মাসে পর পর দুদিন স্বামীজীর মুখে এই বাণী শুনেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন রাজেন গুহ, শ্রীশ পাল, সৈয়দ আলিমুদ্দিন আহমেদ, যোগেন্দ্র দত্ত ও তাঁর সহোদর বালক হরিদাস দত্ত। এঁরা সবাই ছিলেন হেমচন্দ্র-অনুগামী তরুণ বিপ্লবী—তখনো চলার পথ খুঁজছেন। 'মুক্তি সঙ্ঘ' তথা পরবর্তী কালের Bengal Volunteers বা 'B.V.'-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র জীবনের শেষপ্রান্তে স্বামীজী সম্বন্ধে যে-মন্তব্য করে গেছেন তা স্মরণীয় ঃ "১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই স্বামীজীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। সেই হইতে আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যও আমি মনে করিতে পারি না যে, স্বামীজী আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার সেই অমোঘ বাণী আমাদের কানে প্রতিনিয়ত ধ্বনি দিতেছে —'সাহস অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব কর্ম করিয়া যাও, জয় তোমাদের অনিবার্য।' আমার বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই বুঝিতে পারিলাম, স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই আমাদের একমাত্র অবলম্বন এবং একমাত্র সম্বল।

"সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের হৃদয়ের মানুষ, সমগ্র চৈতন্যের সাথী। স্বামী বিবেকানন্দ যত বড় মহাপুরুষই হউন না কেন—বাংলার বিপ্লবীরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন বন্ধুরূপে, পথদ্রষ্টা অগ্রজরূপে। তাঁহাকে বিপ্লবীরা পটে বসাইয়া, দেবতার আসনে স্থাপিত করিয়া পূজা করেন নাই। তাঁহারা স্বামীজীকে অন্তরে স্থাপন করিয়া, সকল কর্মের সঙ্গী করিয়া পথ চলিয়াছেন। তাই বিবেকানন্দ বিপ্লবীদের রক্তের আত্মীয়, পথের বন্ধু, আদর্শ-সাধনার গুরু, সর্বসময়ে তাঁহাদের নিকটতম জন—দূরের মানুষ নহেন। তাঁহাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।" (দ্রঃ 'রাখাল বেণু', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮৬, পৃঃ ২৯২)

স্বামীজী সম্বন্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র-সহ বাংলা তথা ভারতের সমস্ত বিপ্লবীদেরই এই একই অভিমত।

এবারে বীরাষ্টমী উৎসবের প্রবক্তা সরলাদেবীর কথা উল্লেখ করছি। প্রথম জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্ব তাঁকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। সরলাদেবী তাঁর আত্মজীবনীতে ('জীবনের ঝরাপাতা') লিখেছেন ঃ "তারপর এলেন এক dynamic personality—স্বামী বিবেকানন্দ। Dynamic সেই, যার ভিতরে বারুদের ধর্ম আছে, প্রচণ্ড তেজ, প্রচণ্ড ভাঙাগড়ার শক্তি। সেই বারুদের আগুন থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ আমার ভিতরে এসে পড়েছিল—আমাকে ভেঙে গড়েছিল।"

স্বামীজীর স্নেহধন্যা সরলাদেবী তাই তো 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে সেদিনকার ভীরু বাঙালীকে প্রথমেই 'মৃত্যুচর্চা'য় আহ্বান জানালেন। তিনি লিখলেন ঃ "মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না।"

তিনি আরো লিখলেন ঃ "এর জন্য শুধু শরীরগত দৌর্বল্য হটালেই হবে না—মন থেকে ভীরুতাও অপসারিত করতে হবে। দেখা যায় পশ্চিম ও পাঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানরাও সাহেব ভীতিতে ভরা—এই সাদা চামড়ার ভয় সরাতে হবে।"

কিন্তু কি করে?

বেশি ভাবতে হলো না। 'ভারতী'তে সরলাদেবীর নতুন প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো—'বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল'।

"পাঠকমণ্ডলীর মনে লুকানো আগুন ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে।" এর পর গড়ে উঠল পাড়ায় পাড়ায় ছেলেদের ক্লাব—সেখানে ব্যায়ামচর্চা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ড্রিল সব শুরু হয়ে গেল। হলো প্রতি মহাষ্টমীতে বীরাষ্টমীর উৎসব।

ঢাকা থেকে অনুশীলনের বিখ্যাত নেতা লাঠিয়াল পুলিন দাসও এলেন। সরলাদেবীর এই প্রচেষ্টায় দেশের বিপ্লবী দলগুলির প্রচেষ্টা যুক্ত হয়ে সেদিন বিপ্লবী বাংলার গোড়াপত্তনটি ভালভাবেই হয়েছিল।

তরুণ সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রভাব দেখেই তাঁর সৃষ্ট রামকৃষ্ণ মিশনকেও যে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার সন্দেহের চোখেই দেখবে—এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে এত চোখে চোখে রেখেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিষ্ঠানটি কেন যে তুলে দিল না বা দিতে পারল না, তাপসবাবু তাঁর লেখায় তা পরিষ্কার করেই বলেছেন।

তবে এই পরিপ্রেক্ষিতে ভগিনী নিবেদিতাকে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। তিনি তাঁর গুরুর স্থাপিত প্রতিষ্ঠান থেকে বাহ্যত সম্পর্ক ছেদ করেও গুরুর তথা স্বাধীনতা-সংগ্রামের চৈতন্যদাতা গুরুর বিশেষ কাজটি অতি সঙ্গোপনে যেমন একদিকে অব্যাহত রেখেছেন বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ অরবিন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে, তেমনি রামকৃষ্ণ মিশনের মতো মানবকল্যাণব্রতী একটি মহান সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান যাতে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে থাকে সেজন্যও তিনি আমৃত্যু চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁকেও আমাদের ভক্তিনত প্রণাম।

অমলেন্দু ঘোষ
স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কুষ্টিয়া সরকারি আবাসন, কলকাতা-৩৯

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত তাপস বসুর 'ব্রিটিশ রাজরোষে রামকৃষ্ণ মিশন' প্রবন্ধটি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন। প্রথম যুগের বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বহু সংগঠনকে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং তার ফলে রামকৃষ্ণ মিশনকে ব্রিটিশের রোষে পড়তে হয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই সম্পর্কিত একটি বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক দলিল। শুধুমাত্র সামান্য কয়েকটি সংশোধনী পেশ করার তাগিদে এই পত্র।

প্রথমত, রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর ব্রিটিশ রাজরোষের কারণ

আরো অর্থবহ হয়ে উঠতে পারত যদি প্রবন্ধকার ব্রহ্মচারিণী হওয়ার আগে এবং পরের জীবনে ভগিনী নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কতটা গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন—তা যথার্থভাবে অনুধাবন করতেন। দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের অংশবিশেষ হিসাবে চলেছিল। ইতিহাসের সাল-তারিখের হিসাব অনুযায়ী এই প্রবন্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ ১৮৯৭-১৯১৫/১৬ আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনামে কিন্তু তার উল্লেখ নেই। আমার তৃতীয় বা শেষ সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে—প্রবন্ধটিতে তথ্যের যথেষ্ট যোগান থাকলেও তথ্যগুলিকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণের আরো প্রয়োজনীয়তা আছে। নিবেদিতা জীবনের শেষদিকে (১৮৯৮-১৯১১ খ্রীস্টাব্দ) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অসারতা উপলব্ধি করতে শুরু করেন। নিবেদিতার জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা উল্লেখ করেছেন, নিবেদিতার মৃত্যুর পূর্বেই প্রাক্তন বিপ্লবীদের একটি দল ভারতের মুক্তি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নিতান্তই মনগড়া বলে ব্যাপকভাবে প্রচার চালিয়েছিলেন। এখানে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠভাবে বলা যায়, প্রথম পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ১৯১৪/১৫ সাল থেকেই ভাটা পড়তে শুরু করে। এই পর্যায়ে এসে সন্ত্রাসবাদীদের একটা অংশ তৃণমূলের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে তা না করতে পেরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এই অংশই পরে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) অংশগ্রহণ করেন। বিশের দশকের শেষভাগে এঁদের একটা অংশকে নিয়ে বিবেকানন্দের ভাই এবং নিবেদিতার স্নেহভাজন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলায় মার্ক্সীয় গোষ্ঠী গঠন করেন। সন্ত্রাসবাদীদের যে-অংশ রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন, তাঁরা কি সন্ত্রাসের কাজে নিজেদের আর যুক্ত রেখেছিলেন? যদি তা না হয় তবে "ঔপনিবেশিক সরকার শুধুমাত্র জনপ্রিয়তার কারণে রামকৃষ্ণ মিশনকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেননি"—প্রবন্ধকারের এই সরলীকৃত ব্যাখ্যার পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

ডঃ ইরা মিত্র
(প্রাক্তন অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা)
গল্ফ গ্রীন, কলকাতা-৭০০ ০৯৫

প্রসঙ্গ ঃ 'নতুন গবেষণা'

'উদ্বোধন'-এর গত শারদীয়া ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দমঠ—স্থান কাল পাত্র' প্রবন্ধে 'নতুন গবেষণা'র যে-তথ্যাবলী গবেষক কিষাণচাঁদ ভকত পরিবেশন করেছেন, তা পড়ে চলতি শতাব্দীর তিনের দশকের অনেক স্মৃতিই বিস্মৃতির কুহেলী ভেদ করে একে একে মানসপটে উদিত হলো। গবেষক বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে যেসব অজানা তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন তা সত্যিই মনোরম ও কৌতূহলোদ্দীপক। এজন্য তিনি সর্বতোভাবে প্রশংসা ও অভিনন্দনের যোগ্য।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আমি লালগোলা এম. এন. অ্যাকাডেমীর ছাত্র ছিলাম। প্রধান শিক্ষক মহাযোগী মহাত্মা বরদাচরণ মজুমদারের ছাত্র হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে এখনো আমার বুক গর্বে ভরে যায়। আমার সেই সওয়া চার বছর লালগোলায় অবস্থানকালে লালগোলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু অবগত আছি। এখনো ঐ অঞ্চলে আমার বহু আত্মীয়স্বজন থাকার ফলে আমার যাতায়াত আছে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে। সেকারণে লেখক প্রদত্ত তথ্যাবলীর মধ্যে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছি এবং কিছু ঘটনা সংশয় সৃষ্টি করেছে। যেসব প্রশ্ন আমার মনে জাগছে, তার যথাযথ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

(১) লেখক 'উপাদান ১' পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লিখেছেন ঃ "প্রথম দুই-তিন মাস... বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক বিশেষ পরিস্থিতিতে সন্ন্যাসীর বেশে... বনে বনে ঘুরে... 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।" 'উপাদান ২'-এর তৃতীয় অনুচ্ছেদে শ্রীভকত লিখেছেন ঃ "নহবতখানায়... দু-তিন মাসের মতো অবস্থান করেছিলেন।"

এখন জিজ্ঞাস্য—(ক) এই 'বিশেষ পরিস্থিতি'টা কি? (খ) বঙ্কিমবাবু প্রশাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল রাজ কর্মচারী হয়ে এজলাস ছেড়ে গেরুয়া ধারণ করে দু-তিন মাস বনে বনে ঘুরে ও দু-তিন মাস রাজ-অতিথি হিসাবে লালগোলায় অবস্থান করে তৎকালীন 'ঠ্যাঙাড়ে' ও 'উগ্রবিপ্লবী তান্ত্রিক সাধুদের' কার্যকলাপ হাতে-নাতে ধরবার জন্য কি গোয়েন্দার দায়িত্ব পেয়েছিলেন?

(২) 'উপাদান ১'-এর তৃতীয় অনুচ্ছেদে শ্রীভকত লিখেছেন ঃ "যোগিবর বরদাচরণ মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ... অরণ্যে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন।" আমার বক্তব্য—আমাদের হেডমাস্টার মশায় ও নজরুল ইসলাম কোনদিন অরণ্যে তন্ত্রসাধনা করেননি। তাঁরা ছিলেন সর্বতোভাবে গৃহী যোগী। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারে থেকেই সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থন পাই এই সংখ্যাতেই 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ শতবর্ষের প্রেক্ষিতে' শীর্ষক সুদীপ বসুর মনোজ্ঞ প্রবন্ধের অষ্টম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে। আরো সমর্থন মেলে ১৯৭২ সালে 'বেতারজগৎ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (৪৩ বর্ষ, ২০ সংখ্যা) নলিনীকান্ত সরকারের লেখা 'নজরুলের গুরু' শীর্ষক প্রবন্ধের নবম অনুচ্ছেদে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমরা তখন শুনতাম আমাদের শ্রদ্ধেয় হেডমাস্টার মশায় ধ্যানাবস্থায় নাকি আসন ছেড়ে সওয়া হাত ওপরে উঠে যেতে পারেন। আমরা যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি ক্লাসে যোগশক্তি ও 'ফোর্থ ডাইমেনশান' সম্বন্ধে অনেক কথা বলতেন, যার অধিকাংশই আমাদের নিকট দুর্বোধ্য ছিল। আর কাজী নজরুল ইসলামের লালগোলার অরণ্যে তন্ত্রসাধনার কথা কারো কাছে শুনিনি।

(৩) আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণিত স্থানগুলির অবস্থান সম্পর্কে লেখক যা বলেছেন, তা কতখানি গ্রহণযোগ্য সেবিষয়ে লালগোলার বয়স্ক অধিবাসীরা বলতে পারবেন। তবে কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করছি, যেমন—

(ক) 'উপাদান ৫' ও '৬' পরিচ্ছেদে লেখক বলেছেন ঃ "ভাগীরথী-সংলগ্ন মহীপাল ও রামপাল ডাঙ্গাপাড়া", তার "অদূরে পূর্বপ্রান্তে রয়েছে নাটোর ও রাজশাহী" এবং "লালগোলার পাশেই রয়েছে নাটোর"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মহীপাল এবং রামপাল লালগোলা থেকে ১৪-১৫ কিলোমিটার

দূরে। লালগোলা থেকে পদ্মার উত্তর তীরে রাজশাহী গোদাগাড়ি হয়ে অন্তত ৩৫ মাইল। আর নাটোর গোদাগাড়ি রাজশাহী হয়ে ৬৫ মাইলের কম নয়।

(খ) 'উপাদান ৭'-এ 'আনন্দমঠ' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ঃ "মহেন্দ্র পদচিহ্ন হইতে নগরে যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন।" অতএব মুর্শিদাবাদের উত্তরে পদচিহ্নের অবস্থান হতে পারে না, দক্ষিণেই ছিল। বর্তমান দেওয়ান সরাই গ্রাম লালগোলা থেকে ৫-৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ও মুর্শিদাবাদ থেকে অনেক উত্তরে। " 'দেওয়ান সরাই' গ্রামই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের 'পদচিহ্ন গ্রাম'।"—এই তথ্য বিভ্রান্তিকর।

(গ) 'উপাদান ৮'-এর অষ্টম অনুচ্ছেদে লেখক উল্লেখ করেছেন ঃ "লালগোলার পূর্বদিকে অনতিদূরে রয়েছে নবাব-নির্মিত বাঁধপুল রাজপথ। এই বাঁধপুলের অদূরেই ছিল গঙ্গা-সংলগ্ন প্রাচীন শ্মশানক্ষেত্র 'বাসুমাটি'।"

বর্তমান বাসুমাটি লালগোলা থেকে পশ্চিমে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে। এখান থেকে গঙ্গা বেশ দূরে।

(ঘ) 'উপাদান ৯'-এর পঞ্চম অনুচ্ছেদে রয়েছে—"ভৈরবীপুরের অদূরে... চাকলার পুল।" পদ্মার ওপরে পুল বলতে গবেষক কি বোঝাতে চেয়েছেন? বাঁধপুল না সেতু? অবশ্য লালগোলার নিকটে ভৈরবী নদীর ওপর 'রেল সেতু' ছিল। এর পূর্বদিকে ছিল চাকলা গ্রাম। এখন এসবই পদ্মাগর্ভে।

(ঙ) 'উপাদান ১'-এ গবেষকের বর্ণনায় দেখা যায়, এখনো "বনভূমিতে ক্রোশের পর ক্রোশ রয়েছে বট, পাকুড়... তাল-জাতীয় অসংখ্য বৃক্ষ।" কিন্তু বাস্তবে এখানে ঝোপঝাড়ও নেই!

(চ) 'উপাদান ২'-এ 'রাজপথ'-এর কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাজবাড়ির উত্তরে কলকলি (নদী?) দীঘিকে বামে ও রাজার ফলবাগানকে ডানদিকে রেখে একটা রাস্তা আছে রাজবাড়ি থেকে রাজার দৌহিত্রদের বাড়ি হয়ে বাদুড়তলা পর্যন্ত। সেটাকে 'রাজপথ' না বলে 'রাজাদের পথ' বলাই সমীচীন।

(৪) 'উপাদান ৬'-এর চতুর্থ অনুচ্ছেদে "১১৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস" স্পষ্টতই ছাপার ভুল। 'উপাদান ৮'-এর ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের শুরুতে 'বঙ্কিমচন্দ্র'-এর স্থলে 'বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু' হবে।

'উপাদান ১০'-এর সপ্তম অনুচ্ছেদে লেখক জানিয়েছেন, মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র "উগ্র স্বভাবের তান্ত্রিক" ছিলেন। এই আখ্যা দিয়ে তাঁদের চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন হয় কি? আমরা দেখেছি, দানশীল সঙ্গীতরসিক মহারাজাকে কীর্তন বা গানের আসরে হাতে তাল দিতে। তার সঙ্গে লেখকের মন্তব্যের সঙ্গতি দেখছি না। তবে গবেষক মশায়ের একটা সিদ্ধান্ত মনকে উল্লসিত করে যে, আমার সুপরিচিত লালগোলায় বসেই 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

ধরণীধর মণ্ডল

শনিহাটা, পোঃ কুতুবশহর (পাণ্ডুয়া), জেলা ঃ মালদা

সংশোধন

গত মাঘ ১৪০৫ সংখ্যায় 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত আমার চিঠিতে অনবধানতাবশত দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'রায় মহাশয়' লেখা হয়েছে। হবে 'রাজা মহাশয়'।

তপন চট্টোপাধ্যায়

হংসেশ্বরী-মন্দির, বাঁশবেড়িয়া

প্রসঙ্গ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব

গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫ সংখ্যার 'উদ্বোধন' আমাদের প্রত্যেক সাপ্তাহিক পাঠচক্রে পঠিত হয়। এই সংখ্যার সম্পাদকীয়টি এখন আমাদের অঞ্চলে দীক্ষিত ভক্তদের কাছে 'গাইড বুক'-এ পরিণত হয়েছে। গত ভাদ্র ১৪০৫ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'-তে এবিষয়ে আরো কিছু মূল্যবান নির্দেশিকা পেয়েছি। সেই প্রসঙ্গে আমার প্রস্তাব-চতুষ্টয় 'উদ্বোধন'-এর 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে স্থান পেলে বাধিত হব।

(১) প্রত্যেক ভক্তের উচিত প্রতিদিন সকালে সামর্থ্য অনুসারে কিছু পয়সা জমা রেখে মাসের শেষে নিকটবর্তী মঠে গুরুপ্রণামী হিসাবে পাঠানো। তাছাড়া বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, জন্মদিন, পূজাপার্বণ উপলক্ষ্যে গুরুপ্রণামী মঠে পাঠানো উচিত। খ্রীস্টানরা তাঁদের আয়ের এক-দশমাংশ সদাপ্রভুকে উৎসর্গ করেন। আমাদের ধর্মেও কোন কোন সম্প্রদায় এরকম করেন।

(২) প্রত্যেক দীক্ষিত ভক্তের উচিত প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় পারিবারিকভাবে এবং সপ্তাহে একদিন এলাকার সকলকে নিয়ে প্রার্থনাসভা ও পাঠচক্রে মিলিত হওয়া। এভাবে 'রামকৃষ্ণতুতো ভাইবোন'-দের সম্পর্ক দৃঢ় হবে। কেবলমাত্র 'জল শুদ্ধ' করা বা 'স্ট্যাটাস' বৃদ্ধির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা নয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ সমাজজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আমরা এমন সব গুরুর শিষ্য-শিষ্যা, যাঁরা আদর্শের জন্য তাঁদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা সপ্তাহে অন্তত একটা সন্ধ্যা সব কাজ উপেক্ষা করে একত্র মিলিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো সময় বের করতে চেষ্টা করব না কেন?

(৩) আমরা সামাজিক জীব। সমাজটা যখন 'কাজলের ঘর', তখন যতই সেয়ানা হই না কেন, 'থোড়া দাগ' লাগবেই। হচ্ছেও তাই। "এ সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভাঙতে হবে, নতুন সমাজ গড়তে হবে"—এটাই সামাজিক দায়বদ্ধতা। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শানুগ একটি সমাজ গঠনের জন্য সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে সকলকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। প্রত্যেক এলাকায় একদল যুবককে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশমতো ম্যাপ, গ্লোব প্রভৃতি নিয়ে নিরক্ষর পল্লীবাসীদের কাছে গিয়ে শিক্ষাদান করতে হবে। শুধু ধর্মকথা নয়, তাদের কর্মসংস্থান ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টির শিক্ষাও দিতে হবে।

(৪) রামকৃষ্ণ-ভক্তকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বেলুড় মঠ-মুখী হতে হবে। বেলুড় মঠের বিধি-নিষেধ মানতে হবে। বেলুড়ে ঠিক যেসময় প্রার্থনার ঘণ্টা বাজবে ঠিক একই সময়ে আমাদেরও প্রার্থনায় বসতে হবে। বেলুড় মঠ যে-পঞ্জিকা মানে—আমাদেরও তাই মানতে হবে। বেলুড়ে যেভাবে পূজাপার্বণ হয়—আমাদেরও সেভাবে করতে হবে। এরই নাম 'ইষ্টনিষ্ঠা'।

নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি, বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ

অভয়নগর থানা শাখা

নওয়াপাড়া, যশোর

বাংলাদেশ

শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম জ্ঞানের উৎস সন্ধানে

জলধিকুমার সরকার

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবদ্দশায় যেসব গুণাবলীর জন্য বহু মনীষীকে আকৃষ্ট করেছিলেন (এবং আজও সারা পৃথিবীর জ্ঞানিগুণীকে আকৃষ্ট করে চলেছেন), তাদের অন্যতম হলো তাঁর সীমাহীন জ্ঞান। তাঁর কথার মধ্যে নিহিত যুক্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্র মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা শ্রীমকে প্রথম সাক্ষাতেই আকৃষ্ট করেছিল, তৎকালীন যুবসম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় আকর্ষণ বাগ্মিপ্রবর কেশব সেনের মন হরণ করেছিল তাঁর জ্ঞান, আবার 'আঠারটি শক্তি'র অধিকারী জ্ঞানসূর্য বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের যুক্তিবিচারের কাছে শুধু বারে বারে মাথা নতই করেননি—পরবর্তী কালে না বলে পারেননি ঃ "যদি আমার জীবনে একটিও তত্ত্বকথা বলিয়া থাকি, তবে তাহা তাঁহার—তাঁহারই বাক্য; আর যদি এমন কথা বলিয়া থাকি যেগুলি অসত্য ও ভ্রমাত্মক, যেগুলি মানবজাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সব আমার।" শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় জ্ঞানের দ্যুতি বিদ্যাসাগরকেও স্তম্ভিত করেছিল; বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী পাণ্ডিত্যের উন্নাসিকতায় প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখলেও শেষে তাঁর কথায় পর পর যুক্তির অবতারণা দেখে হতবাক হয়েছিলেন। সেযুগের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অগ্রণী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দক্ষিণেশ্বরে কয়েক ঘণ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কাটানোর পর স্বীকার করেছিলেন, তার আগে তিনি "দৈহিক ও নৈতিক সত্য সম্বন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত" ছিলেন। অন্যদিকে তৎকালীন কত নামী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধক—পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ও তাঁর সীমাহীন জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজেদের তাঁর তুলনায় ক্ষুদ্র মনে করেছিলেন। ব্রহ্ম, শক্তি, ঈশ্বর, আত্মা, জীব, জগৎ, বেদ, তন্ত্র, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি, বিচার, মুক্তি, বিবেক, সংসার, সংস্কার, কামিনী, কাঞ্চন, ত্যাগ, ভোগ, বিভিন্ন সাধনপথ, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ, অষ্টপাশ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব—সব বিষয়ই শুধু যে তাঁর নখদর্পণে ছিল তা নয়, সবকটিতেই পূর্ণ দখল থাকায় নিখুঁতভাবে তিনি জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের সমাধান করতে পারতেন। এইসব দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—লেখাপড়া না-জানা শ্রীরামকৃষ্ণ এত জ্ঞান আহরণ করলেন কখন, কোথায়, কিভাবে ও কার কাছ থেকে?

অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলেন, অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাধার, সর্বজ্ঞানাধার ঈশ্বরের মনুষ্যরূপ। তাঁদের মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করাই স্বাভাবিক এবং সেক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের উৎসসন্ধান নিরর্থক। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে অবতার সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, অবতারপুরুষে দেবভাব ও মানবভাবের একত্র সম্মিলিত থাকে, তবে তাঁদের পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি অন্তরে বিদ্যমান থাকলেও শৈশবে তার প্রকাশ থাকে না বা তাঁরা অনেক সময় তা বুঝতে পারেন না। তিনি আরো বলেছেন যে, অবতারদেরও আমাদের ন্যায় দুর্বার ইন্দ্রিয়সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় এবং সংগ্রামে জয়ী হয়ে গন্তব্যপথে অগ্রসর হতে হয়। মনে হয়, অবতারগণের মধ্যে সুপ্তজ্ঞানকে প্রকাশের ক্ষেত্রেও ঐ কথা প্রযোজ্য, অর্থাৎ এর জন্য উদ্দীপক হেতু (exciting cause) দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব গুণাবলীর বিবরণ 'কথামৃতে'র মাধ্যমে পাই, তার অনেকগুলির বিকাশ ও বিকাশের হেতু তাঁর বাল্যজীবনে দেখা গিয়েছিল। লীলাপ্রসঙ্গকার জানিয়েছেন, পিতা ক্ষুদিরাম বালককে কোলে নিয়ে নিজ নিজ পূর্বপুরুষের নামাবলী, দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তোত্র ও প্রণাম-মন্ত্রাদি অথবা রামায়ণ মহাভারত থেকে বিচিত্র উপাখ্যান যখন তাকে শোনাতে বসতেন, তখন দেখতেন যে একবার মাত্র শুনেই সে তার অধিকাংশ আয়ত্ত করেছে। বালক মিথ্যাসহায়ে নিজকৃত কোন কর্ম কখনো ঢাকতে প্রয়াস পেত না এবং সর্বোপরি তার প্রেমিক হৃদয় কখনো কারো অনিষ্ট সাধন করতে প্রবৃত্ত হতো না। পিতা আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে, হৃদয় স্পর্শ করে এমনভাবে কোন কথা না বলে যদি কেবল বাধানিষেধ করা হয়, বালক তার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সর্বদা তার বিপরীত করে থাকে। পুকুরে স্নানরতা মেয়েদের ঘাটে বালক গদাধরের থাকা অবাঞ্ছনীয়—এটা তিরস্কারের দ্বারা বালককে নিবৃত্ত করা যায়নি; চন্দ্রাদেবী মিষ্ট বাক্যে বোঝালে বালক তৎক্ষণাৎ ঘাটে যাওয়া বন্ধ করেছিল। বাল্যে কুমোরদের মূর্তি গঠন দেখে শেখা বা পট-ব্যবসায়ীদের দেখে চিত্র অঙ্কন করতে শেখা, যাত্রাগান শুনে তা নকল করা, সদানন্দ বালকের রঙ্গরস-প্রিয়তা ও অনুকরণশক্তি সহায়ে নরনারীর বিশেষ বিশেষ হাবভাব অনুকরণ করা, মাতার সরলতা মনে গেঁথে যাওয়া, পিতার ভগবৎপ্রীতি ও দানগ্রহণে অনীহায় মুগ্ধ হওয়া, পুরাণকথা শ্রবণ, যাত্রাগান নকল করা—এগুলির সবই শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তী জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখা গিয়েছিল। স্বপ্নাদেশ পেয়ে পিতা রঘুবীরের বিগ্রহ কামারপুকুরের কুটিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার পর থেকে

সংসারের অভাব দূরীভূত হয়েছে—একথা শুনে বালক গৃহদেবতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। উপনয়নের পর সেই দেবতাকে এবং তৎসহ রামেশ্বর শিব ও শীতলামাতাকে পূজা করার অধিকার পাওয়ায় কৃতার্থ বোধ করে একাগ্র মনে পূজা করার স্বল্পকালের মধ্যেই বালককে ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধির অধিকারী করে তুলেছিল। এর পরেই শিবের অভিনয় করতে গিয়ে বালকের ভাবসমাধি। অবশ্য এর আগেই, ছয় বছর বয়সকালে কামারপুকুরের মাঠে বলাকাশ্রেণী দেখে এবং আট বছর বয়সে আনুড়ে বিশালাক্ষি-মন্দিরে যাওয়ার কালে বালক ভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন হয়েছিল। কামারপুকুরে আগত সাধু-বৈরাগীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় বালকের মনে সাধুজীবনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কৈশোরে গ্রামে সন্ধ্যায় সঙ্কীর্তনকালে তাঁর নৃত্য ও ভাবোন্মত্ততা এবং ভাবপূর্ণ আখর দেওয়ার শক্তি, রঙ্গ-পরিহাস ও নরনারীর সকলপ্রকার আচরণ অনুকরণ করা গদাধরকে সকলের প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। কেবল ভণ্ড ও ধূর্তরা গদাধরকে দেখতে পারত না। কারণ, গদাধরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের ওপরের মোহনীয় আবরণ ভেদ করে গোপন উদ্দেশ্য ধরে ফেলত। স্পষ্টবাদী বালক অনেক সময় সকলের নিকট কীর্তন করে তাদের অপদস্থ করত। গদাধর কখনো কখনো রমণীর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে নারীচরিত্রের অভিনয় করত। অসাধারণ অনুভূতিসম্পন্ন বালকের বিচারশীল বুদ্ধি তাকে মাঝে মাঝে সংসারত্যাগের ইঙ্গিত করত, তবে গ্রামের নরনারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাদের আপনার জন করে তোলার ফলে এইসময় তার এই ভাব ফুটে উঠত—নিজের জন্য সংসার ত্যাগ করা—সে তো স্বার্থপরতা! যাতে এরা সকলে উপকৃত হয়, এমন কিছু কর।

এখন প্রশ্ন—শ্রীরামকৃষ্ণের যে বহুমুখী অসীম জ্ঞানের কথা নিবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে, তার উৎস হিসাবে বা সুপ্ত জ্ঞানরাশিকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে কি কোন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা যায়? কামারপুকুরে গদাধর যেসকল সাধু-বৈরাগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা বালককে অনেক পৌরাণিক গল্প হয়তো বলে থাকতে পারেন, কিন্তু সেগুলি তাঁর বহুমুখী জ্ঞানলাভে যে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল সেরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় না। লাহাবাবুদের শ্রাদ্ধবাসরে পণ্ডিতসভাতে কোন জটিল প্রশ্নের সমাধানে বালকের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তা থেকে বালকের পরবর্তী কালে প্রকাশিত জ্ঞানরাশির কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরী বা ব্রাহ্মণীর কাছে সাধন বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা নিলেও তাঁরা যে তাঁকে নানা বিষয়ে জ্ঞানদান করেছিলেন তারো কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যেসব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—পদ্মলোচন, শশধর, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা সেখানে এসে পাণ্ডিত্য বিষয়ে দাতা না হয়ে গ্রহীতা হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে 'অবতার' বলে মেনে নিয়েছিলেন। এইসব বিবেচনা করে মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানরাশির উৎস তিনি স্বয়ং, যেমন অবতারগণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই যেমন বলেছেন: "নরলীলায় সমস্ত কার্যই নরের ন্যায় হয়, নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিতে হয়।" আগেই বলা হয়েছে, সুপ্ত জ্ঞানরাশিকে উদ্বুদ্ধ বা প্রকাশিত করতে উদ্দীপক কিছু দরকার এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সম্ভাব্য তথ্যগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে—

(ক) বিচারশীল সূক্ষ্ম দৃষ্টি—লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন: "গদাধরের সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাহাকে এই অল্প বয়সেই প্রত্যেক ব্যক্তির ও কার্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতে শিখাইয়াছিল। সুতরাং অর্থলাভে সহায়তা হইবে বলিয়াই যে পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস, তা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। বিষয়-সম্পত্তি লইয়া পরস্পরের বিবাদ ও মামলা-মকদ্দমা উত্থাপনপূর্বক ক্ষেত্রাদিতে দড়ি ফেলিয়া 'এ দিকটা আমার, ঐ দিকটা উহার' ইত্যাদি অদ্য নিরূপণ করিয়া লইয়া কয়েকদিন বিষয়ভোগ করিতে না করিতেই শমনসদনে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বালক বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল, অর্থ ও ভোগলালসা অনর্থ উপস্থিত করে। সুতরাং অর্থকরী বিদ্যার্জনে সে যে এখন দিন দিন উদাসীন হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।" এই সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকার জন্য কোন কোন সাধারণ ঘটনা তাঁর কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠত এবং তাঁর জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত করে দিত। "আগে কই মাছ জিইয়ে রাখা দেখে মনে করতুম, এরা কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা করবে! অবস্থা যখন বদলাতে লাগল, তখন দেখি যে শরীরগুলো খোলমাত্র! থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না।"—বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একবার তাঁর বিচারশীল দৃষ্টি সম্বন্ধে বলেছিলেন: "আর কি অবজারভেশন! ফসিল দেখে সাধুর সঙ্গে উপমা!" এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ দৈনন্দিন জীবনের সকল দ্রব্য ও ঘটনাকে দেখতেন। চিল, শকুনি, মাছধরার সটকা কল, নিক্তির কাঁটা, জাল, চুনসুরকি, অফিসের বড়বাবু, গাভী, বড় মানুষ, ঝি, হাসপাতাল, ঢেঁকি প্রভৃতি সাধারণ দ্রব্য বা ঘটনা দ্বারা তাঁর গভীর চিন্তারাশিকে আলোড়ন করার উদাহরণ 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায় ছড়ানো।

(খ) অসার বাদ দিয়ে সারাংশ গ্রহণের ক্ষমতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরমহংস। তিনি সকল ব্যক্তি বা ঘটনা থেকে সারাংশ গ্রহণ করতে পারতেন। শ্রীভাগবতের অবধূত ক্রমে ক্রমে চব্বিশজন উপগুরুর কাছে বিশেষ বিশেষ শিক্ষালাভ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও বিশেষ বিশেষ সাধনোপায় ও সত্যোপলব্ধির জন্য একাধিক উপগুরু বা শিক্ষাগুরুকে গ্রহণ করেছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি বহু জায়গায় ও

বহু লোকের কাছে যেতেন ও তাঁদের কথা শুনতেন। ডাক্তার সরকার একবার যখন তাঁর সম্বন্ধে বললেন ঃ "ইনি কি শাস্ত্র দেখে বিদ্বান হয়েছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উত্তরে বললেন ঃ "ওগো, আমি শুনেছি কত!" ডাক্তার—"তুমি শুধু শোন নাই।" মনে হয় ডাক্তার বলতে চেয়েছেন—'তুমি সব শোনা কথার সারাংশটি নিতে পেরেছ।'

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণ কারো (সে সামান্য লোক হলেও) কাছে কোন মূল্যবান কথা শুনলে তা চিরকাল মনে রাখতেন এবং যথাকালে ও যথাস্থানে তা উল্লেখ করতে দ্বিধা করতেন না। এর অনেক উদাহরণ 'কথামৃতে' আছে। মনে হয় কথাগুলি তাঁর ভাবপুষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। যেমন, তাঁরই কথায়—(১) শিখরা বলেছিল ঃ "পাতাটি নড়ছে, তাও ঈশ্বরের ইচ্ছা।" (২) একজন শিখ সিপাহি বলেছিল ঃ "ঈশ্বর দয়াময়।" আমি বললাম ঃ "সে কি আশ্চর্য? ঈশ্বর সকলের বাপ, বাপ ছেলেকে দেখবে না তো কে দেখবে?" (৩) শিব বড় না ব্রহ্মা বড়—একথায় পদ্মলোচন বলেছিল ঃ "আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নাই, ব্রহ্মারও আলাপ নাই।" (৪) (নরেন্দ্র কায়েতের ছেলে, তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা হওয়ায়) ভোলানাথ বললে ঃ "এর মানে 'ভারতে' আছে। সমাধিস্থ লোকের মন নিচে আসলে সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তার মন ঠাণ্ডা হয়।" (৫) অমৃত বললে ঃ "একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়।" (৬) রামকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের ছেলে গল্প করেছিল ঃ "একজনের প্রতি আদেশ হলো—'দেখ, এই ভেড়াতেই তোর ইষ্ট দেখিস।' সে তাই বিশ্বাস করলে।" সর্বভূতে যে তিনিই আছেন। (৭) কৃষ্ণকিশোর বলত ঃ "ওঁ কৃষ্ণ! ওঁ রাম!—এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়।" (৮) বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বলল ঃ "যে যাকে ভালবাসে, তাকে ইষ্ট বলে জানলে ভগবানে শীঘ্র মন হয়।" (৯) নারাণ শাস্ত্রী বলত ঃ "শাস্ত্র পড়ার দোষ—তর্ক বিচার এইসব এনে ফেলে।" (১০) (জগন্মাতার কাছে জোর করার ব্যাপারে) ত্রৈলোক্য বলেছিল ঃ "আমি যেখানে ওদের ঘরে জন্মেছি, তখন আমার হিস্যে আছে।"

(ঘ) ভাবমুখে থাকা অবস্থায় অনুভব ও দর্শন—কথামৃতকার বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার কাছে ভাবমুখে থাকবার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, ভাবমুখে থাকার অর্থ—মনে সর্বতোভাবে ধারণা বা বোধ করা যে আমি সেই 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'। ঐ অবস্থাতে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 'ভগবানের অংশ আমি'—এই ভাবটিও লীন হয়ে 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা জগন্মাতার আমিত্বই তাঁর ভিতর দিয়ে গুরুরূপে প্রকাশিত হতো। স্বামী নির্বেদানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি ইন্দ্রিয়ের অগম্য প্রদেশ থেকে তথ্য আহরণ করে এনে বুদ্ধির কাছে তা ন্যস্ত করে দিত; বুদ্ধি সেগুলি ভালভাবে যাচাই করে নিয়ে তার ভিতর থেকে সর্ববিধ প্রকাশের পশ্চাতে অবস্থিত মূলগত একত্বকে আবিষ্কার করে নিত, যে-একত্বে মিলিত হওয়ার জন্য সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত দর্শন ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।" মনে হয়, এই একত্ব দর্শনের পর জ্ঞানলাভের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন ঃ "জ্ঞান অর্থে এই একত্ব আবিষ্কার।"

এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানের উৎস হিসাবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করা যায় না। তাঁর অবতারত্বের মধ্যেই তাঁর বহুমুখী জ্ঞান নিহিত ছিল। এই জ্ঞানকে ধীরে ধীরে জাগরিত বা উদ্দীপিত করেছে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, যেকোন উক্তি বা ঘটনা থেকে সারাংশ গ্রহণ ও তা মনে ধারণ করে রাখা এবং সর্বশেষে তাঁর ভাবমুখে থাকাকালীন ইন্দ্রিয়ের অগম্য প্রদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করা। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ, ১৩৬২
(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড)
(৩) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১৯৭৫
(৪) যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, ১৩৭৪
(৫) বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, ১৯৮৭
(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ, ১৯৭৭

আবির্ভাব

সৌমিত্র সেন

রাঁচিতে এক ভক্ত ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে এসে দেখলেন, ঠাকুর রাস্তায় দাঁড়িয়ে—গেরুয়া পরা, খড়ম পায়ে, চিমটে হাতে! জ্যোৎস্না রাতে!

স্বামী অরূপানন্দ (শ্রীমাকে)—"খড়ম পায়ে, চিমটা হাতে কেন?"

শ্রীমা—"সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউলবেশে আসবেন বলেছেন। বাউলবেশ—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানা দাড়ি।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ১১শ সং, পৃঃ ২৪৮)

আলোর মানুষ আসবে আবার প্রাণের পথে।
জমুক যত আঁধার আছে বিশ্বপ্রাণের কাছে কাছে
পুড়বে সবই সে-আবির্ভাবের লগ্ন হতে।
ওগো, আলোর মানুষ আসছে আবার প্রাণের পথে।
বাউল-রাজা—ঘুরবে সে যে ঘরছাড়া
তার বাজবে হাতে নিত্যকালের একতারা
সে যে উঠবে ফুটে অমরাবতীর আলোর রথে,
ওগো, আলোর মানুষ আসছে আবার প্রাণের পথে।

শ্রীমা—"বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাবে।... ভাঙা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে। যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, খাচ্ছেন তো খাচ্ছেন—কোন দিগ্‌বিদিক খেয়ালই নেই।" (ঐ)

বাউল, তুমি আসবে যবে একতারাটি নিয়ে হাতে
মোদের প্রাণ কি তখন উঠবে বেজে তেমন করে তোমার সাথে!
ধুলায় ঢাকা মলিন বেশে তুমি যখন উঠবে হেসে
বিশ্বপ্রাণের সকল আশা তোমার মাঝে পাবে ভাষা
পারব তোমায় চিনে নিতে বহুদিনের সেই চেনাতে,
মরার বুকে অমর জীবন উঠবে ফুটে চরণপাতে।

শ্রীমা—"তাঁর কি জান, সব খেলা, সব খেয়াল!"
স্বামী অরূপানন্দ—"কোন্ গ্রামে জন্ম নেবেন?"
শ্রীমা—"কি জানি, জানি নে।" (ঐ)

তোমারি আশায় রইব বসে পথের ধারে
বেদনা দিয়ে বাজাব গান বীণার তারে।
তুমি যখন আসবে নাথ
করব তোমায় প্রণিপাত
দেখব কেমন আমায় ঠেলে চরণ তোমার যেতে পারে।
তখন, অশ্রু মোর না নামে যদি নয়ন হতে
আঘাত করে ভাসিও মোরে গহন স্রোতে—
করুণা তোমার পাবই যখন আসবে তুমি দ্বারে দ্বারে,
তাই তোমার আশায় রইনু বসে পথের ধারে।

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ

দীপককুমার দাশ

বৃক্ষ সতত উৎসারী—
সতত মহিমার দিকে চৈতন্য জীবিত।
বীজ থেকে অঙ্কুর—ক্রমে সঞ্চার, সত্তার সঞ্চার—
কেবলি নীলিমার টানে, রৌদ্রগন্ধী মায়ার বিলাসে—
ছড়িয়ে পড়া;
আত্ম-উন্মোচনের টানে ক্রমান্বয় ধৈবতপ্রসারণ কেবল
ডালে পাতায় ফুলে ফলে—চক্রাবর্তে বীজে—
সমায়ত নির্বিরোধ সুচেতনার দিকে।
উন্মুখ চেয়ে থাকা মহিমার মতো
কল্পতরু পরমপুরুষের শরীরী উপমা।
অনন্ত প্রতীক্ষা জানে বলেই অন্তরঙ্গ প্রবাস
সততই চৈতন্যের দ্বিতীয় উদ্ধারে
মহাবলী চৈতন্যপ্রতীক কল্পবৃক্ষ তুমি,
তোমাকে প্রণাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তোমার চোখের দিকে চেয়ে থাকা যেন পরম অবগাহন।
কী যে এক আন্তরিক আকর্ষণে আকর্ষণ কর!
আমার সমস্ত সত্তার, বুদ্ধিবৃত্তির, আমার আমি-র সব মালিন্য
সব ধুয়ে মুছে যায় শুধু ঐ চোখের দিকে চেয়ে।

ঐ অর্ধনিমীলিত দুটি চোখে কী যে দেখ তুমি!
করুণায় উদ্ভাসিত, শুচিস্মিত প্রসন্ন আনন
আমাদের সব পাপ, সব তাপ, দুঃখ-যন্ত্রণাকে
একা তুমি বুকে নিয়ে কেমন প্রশান্ত বসে আছ!

ঘনীভূত ভালবাসা! সেই ভালবাসাই তো
মূর্তিপরিগ্রহ করে আমাদের চোখের সম্মুখে!
তার প্রসন্ন দৃষ্টি যখন যেখানে এসে পড়ে
সহস্র বর্ষের ঘন অন্ধকার পলকে মিলায়।

সে-আলোর স্পর্শ লেগে প্রাণের কমল ফুটে ওঠে
নীরবে সহস্রদল মেলে দিয়ে আকাশের দিকে
সাগ্রহে অপেক্ষা করে, সমস্ত হৃদয় মন নিয়ে
তোমার ও পদপ্রান্তে কখন সে নিবেদিত হবে!

হে প্রভু! তুমি ছিলে, তুমি থেক

শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী

কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে;
দুরাশায় বুক দুরুদুরু,
যারা ছিল অতি আপন—
তাদের কাছ থেকে শঠতা, প্রবঞ্চনা পেয়ে
যখন রিক্ত আমি, সর্বস্বান্ত আমি।
জীবন যখন শুধুই বোঝা,
তখন আমার জীবনে এলে তুমি।
শুধু তুমি, হে প্রভু,
অসহায় আমার দিকে
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে।
যখন নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন
বেঁচে থাকাটাই ছিল স্বপ্ন
ভালবাসা মমতা—এগুলি হয়েছিল নিছকই শব্দ,
পরিচিত মুখেরা কেমন অচেনা হয়ে গিয়েছিল,
তখন তুমি এলে হে প্রভু,
তোমার অপার করুণাধারা বর্ষণ করেছিলে।
তুমি বলেছিলেঃ "টাকা মাটি, মাটি টাকা",
সেই মাটি আর টাকার জন্যই
আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে গেল—
আমি হয়ে গেলাম একা,
আমার সেই চরম একাকিত্বের মুহূর্তে
শুধু তুমি ছিলে হে প্রভু,
বাস্তবকে সওয়ার শক্তি দিলে আমাকে।
আজো আমি আছি, তোমার দয়ায় আছি;
তবে আজ আমি পরিপূর্ণ,
আমার দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই।
আমার জীবনে একমাত্র সত্য তুমি—
হে প্রভু! তুমি সাথে ছিলে
তুমি সাথে থেক।

তাঁর নাম রামকৃষ্ণ

অনীতা দত্ত

সুপ্ত হৃদয়দল গেল খুলি! শ্রীরামকৃষ্ণ!
নামটি যেন বিকশিত ব্রহ্মকমল!
'রাম' আর 'কৃষ্ণ' দুটি শব্দের মাঝে
দুলে ওঠে প্রেমসরসী অতল।

আলোক-আঁধার! রামকৃষ্ণ যেন
ভোরের নিসর্গ কিরণে নয়নে সিঞ্চিত হিম,
বিরহ বেদনায় রাধাময় দিন
কৃষ্ণ-কাজল নিশীথ চরণে
মিলন সুধায় লীন।

সগুণ নির্গুণ সাকার নিরাকার
যদি হয় সাধক সাধনা সাধ্য-প্রতীক
একই স্তরে একই সরলরেখায়
পরমেষ্ঠীর কাছে কে কার অলঙ্কার?

যখন তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধাঝড়, নয়নে অশ্রুধার,
বিস্ময়ে দেবী মহাকালীর বুকে
কেঁপে ওঠে দিব্য প্রেমের অফুরান নির্ঝরিণী
পড়ে থাকে সব তন্ত্র মন্ত্র অজস্র উপচার।
জগজ্জননী দর্শন দিলেন তাঁকে!
যেন আরেক অকালবোধন! শ্রীরামের পূজায়
তাঁর দৃঢ়পণ নিষ্ঠায় বিমুগ্ধ মা দশভুজা
হলেন স্বয়ং আবির্ভূতা!

জীবনের পলে পলে তাঁর কথামৃত
গীতার পবিত্র বাণীর মতো, সুধানির্ঝরিণী,
দুর্ভেদ্য তত্ত্বের অন্বেষণে
শুধুই নিয়ত ব্যর্থ প্রয়াস নয়,
আলোর স্রোতস্বিনী।

তুমি তো তাই প্রাণের ঠাকুর

বিজয়কুমার দাস

তোমার আসন পাতা আছে আমার হৃদয় মাঝে
আশার প্রদীপ জ্বাল তুমি আমার সকল কাজে।

হৃদয় যখন দুঃখ-শোকে আকুল হয়ে ওঠে
তোমার আশিস বুকের মাঝে পুষ্প হয়ে ফোটে।

পথ হারালে অন্ধকারে তুমিই ধর হাত
আসে সকাল বন্ধ ঘরে, থাকে না আর রাত।

তোমার কৃপায় অন্ধ আতুর বাঁচার মন্ত্র পায়
বুকের ভিতর সুখের পাখি খুশিতে গান গায়।

তুমি তো তাই প্রাণের ঠাকুর ঘোচাও সকল কালো
তুমি তো তাই বুকের ভিতর জ্বালাও সুখের আলো।

ক্রিকেট ও তার নিয়মকানুন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবসভ্যতায় ইংরেজদের অবদান তার সুললিত ভাষা, সাহিত্য এবং রোম্যান্টিক ক্রিকেট। প্রায় দুশ বছর ধরে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি প্রান্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য গেছে ইংরেজ, আর সেখানকার মানুষকে আবেগমথিত করেছে ক্রিকেটের যাদুস্পর্শে। ইংল্যান্ডের মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব (এম. সি. সি.) বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সংস্থা, যারা আধুনিক ক্রিকেট আইনের প্রণয়ন করে। সেই আইনই ক্রিকেট-খেলিয়ে প্রতিটি দেশে মেনে নেওয়া হয়েছে সর্বসম্মতভাবে। আজ পর্যন্ত এই রীতিই মেনে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা হচ্ছে সব দেশে।

ক্রিকেট খেলা হয় দুটি দলের মধ্যে। প্রতি দলে এগার জন খেলোয়াড় থাকে। দুই দলই পালা অনুযায়ী ব্যাটিং, ফিল্ডিং করে। 'টস' করে ঠিক করে নেওয়া হয় কোন্ দল প্রথম ব্যাটিং এবং কোন্ দল ফিল্ডিং করবে। এবারে ক্রিকেটের (প্রথম শ্রেণীর) প্রতিটি রূপকল্পের প্রসঙ্গে আসা যাক।

বল ঃ বলের পরিধি ৮$\frac{১৩}{১৬}$ ইঞ্চির কম বা ৯ ইঞ্চির বেশি হয় না এবং ওজন ৫$\frac{১}{২}$ আউন্সের কম বা ৫$\frac{৩}{৪}$ আউন্সের বেশি হয় না। বল খেলার অযোগ্য মনে হলে অধিনায়ক নতুন বল প্রতি ইনিংস শুরুর পূর্বে দাবি করতে পারে। বল পরিবর্তনের সময় অবশ্যই ব্যাটসম্যানকে জানাতে হবে।

ব্যাট ঃ ব্যাট ৩৮ ইঞ্চির বেশি লম্বা হবে না এবং ব্যাটের সবচেয়ে চওড়া অংশ ৪$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চির বেশি হবে না। তবে ব্যাটের ওজনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বিধিনিষেধ নেই। আধুনিক ক্রিকেটে এক-একজন ব্যাটসম্যান তাদের নিজেদের পছন্দ ও চাহিদামত ওজনের ব্যাট ব্যবহার করে থাকে।

স্টাম্প ঃ মাটির ওপর থেকে প্রতিটি স্টাম্পের উচ্চতা ২৮ ইঞ্চি। স্টাম্পের মাথায় থাকা অবস্থায় বেল স্টাম্প ছাড়িয়ে $\frac{১}{২}$ ইঞ্চির বেশি হবে না। স্টাম্পগুলি একই গঠন ও আকৃতির হওয়া চাই এবং রঙেরও সাদৃশ্য থাকা চাই। স্টাম্পের মধ্য দিয়ে যাতে বল গলে না যায়, সেভাবে স্টাম্পগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গা ফাঁকা রেখে পুঁততে হয়। মাঠের মাঝখানে 'পিচ' তৈরি করে তার দুই প্রান্তে মুখোমুখি স্টাম্পগুলি পুঁততে হয়।

পিচ ঃ দুদিকের উইকেটের মধ্যবর্তী ২২ গজ লম্বা ও ৩.৩৩ গজ চওড়া অংশটিকে 'পিচ' বলা হয়। স্টাম্পের সামনে ৪ ফুট দূরত্বে সমান্তরালভাবে একটি রেখা টানা থাকে। স্টাম্প ও রেখার মধ্যবর্তী এই অংশটিকে বলা হয় 'ক্রিজ'। তার মধ্যে পা রেখেই বোলারদের বল ডেলিভারি করতে হয়, আর উলটোদিকের ব্যাটসম্যান অনুরূপ আরেকটি ক্রিজের মধ্যে দাঁড়িয়েই ব্যাট করে। যদি পিচ কোন কারণে খেলার অযোগ্য বলে মনে হয়, তবে দুদলের অধিনায়ক আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা করে, তাঁর সম্মতি নিয়ে খেলা বন্ধ করতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি পাশের পিচটি তৈরি থাকে, তাতে খেলাটি স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

মাঠ ঃ বিশ্বের অধিকাংশ ক্রিকেট-খেলিয়ে দেশের মাঠগুলি সাধারণত গোলাকৃতি কিংবা ওভাল ধরনের হয়। তবে অস্ট্রেলিয়াতে চৌকো ধরনের মাঠেও প্রথম শ্রেণীর খেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। প্রত্যেকটি মাঠই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের বশবর্তী। গ্যালারির ফেন্সিং থেকে বাউন্ডারি লাইন বা মাঠের সীমারেখার মধ্যেও একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাঠ মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া), যেখানে লক্ষাধিক দর্শক বসে খেলা দেখতে পারে। তবে ঐতিহ্য ও আভিজাত্যে অনন্য লর্ডস (ইংল্যান্ড), যেখানে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার (আই. সি. সি.) সদর দপ্তর।

খেলার সময় ঃ সাধারণত পাঁচদিন ও তিনদিনের খেলায় দৈনিক ছয় ঘণ্টা করে বরাদ্দ থাকে। এছাড়াও আরো এক ঘণ্টা মধ্যাহ্নভোজ ও চা-পানের বিরতির জন্য বরাদ্দ। আর সারাদিনে তিনটি জল-পানের বিরতি হয় পাঁচ মিনিটের জন্য। ছয় ঘণ্টায় কমপক্ষে নব্বই ওভার করে বোলিং করতে হয় ফিল্ডিং সাইডকে। আর আশি ওভারের মাথায় ফিল্ডিং সাইডের অধিনায়ক পুনরায় নতুন বল নিয়ে আক্রমণ শানাতে পারে। একদিনের ক্রিকেটে দুপক্ষকে সাধারণত পঞ্চাশ ওভার সাড়ে তিন ঘণ্টায় করতে হয়। দুই অর্ধের খেলার মধ্যে চল্লিশ মিনিটের বিরতি দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রতি পনের ওভার পর পর হয় পাঁচ মিনিটের জন্য জল-পান।

খেলার নিয়ম ঃ খেলা শুরুর আগে দুই অধিনায়কের উপস্থিতিতে আম্পায়ার-দ্বয় 'টস' করেন, অর্থাৎ একটি কয়েনকে শূন্যে ছুঁড়ে দেন তিনি। মাটিতে পড়বার আগে যেকোন একজন অধিনায়ককে 'হেড' অথবা 'টেল' বলতে হয়। তারপর যার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, সে-ই ঠিক করে ব্যাটিং না ফিল্ডিং নেবে। এভাবেই খেলা শুরু হয়।

পিচের দুদিকের উইকেটে দুজন ব্যাটসম্যান দাঁড়ায়—একজন স্ট্রাইকার, অপরজন নন-স্ট্রাইকার। স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে উলটোদিক থেকে অর্থাৎ নন-স্ট্রাইকার যেখানে দাঁড়িয়ে, সেদিক থেকে বোলার বল করে। পিচের দুই প্রান্ত থেকে দুজন বোলারকে ক্রমান্বয়ে ছয়টি করে বা এক 'ওভার' করে বল করে যেতে হয়। কোন বোলার পর পর দুটি ওভার বল করতে পারে না। বোলার পরিবর্তন করে দলের অধিনায়ক। টেস্ট বা তিনদিনের ম্যাচে বোলারদের ওভার-সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকলেও একদিনের ম্যাচে বোলাররা দশ ওভার পর্যন্ত বল করার সুযোগ পায়। বোলারের দিকে তিনটি স্টাম্পের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকেন আম্পায়ার। স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যানের পিছনে অর্থাৎ তার স্টাম্পের পিছনে থাকে উইকেটকিপার। এই দুজনের ভূমিকা ও অবস্থান নির্দিষ্ট। ফিল্ডিং পক্ষের বোলার ও উইকেটকিপার ছাড়া বাকি নয়জন মাঠের যেকোন জায়গায় দাঁড়াতে পারে। তবে ক্রিকেটের পরিভাষায় ফিল্ডিংকে দুভাগে বিন্যাস করা হয়—(১) ক্লোজ-ইন ফিল্ডিং ও (২) আউট ফিল্ডিং। ফিল্ডিং পক্ষের অধিনায়ক বোলারের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ব্যাটসম্যানের খেলার খুঁটিনাটি দেখে সেই অনুযায়ী ফিল্ডিং সাজায় অর্থাৎ ক্লোজে কজন আর দূরে কজন

থাকবে। তবে একদিনের ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রথম পনের ওভার ফিল্ডিং সাইডের দুজন ফিল্ডার উইকেটের পনের গজের বাইরে থাকে। বলা বাহুল্য, খেলাটিকে আরো আকর্ষণীয় করাই এর উদ্দেশ্য।

ম্যান্ডেটারি ওভার ঃ পাঁচদিনের টেস্ট ও তিনদিনের প্রথম শ্রেণীর ম্যাচের শেষ দিন শেষ ঘণ্টায় বাধ্যতামূলক কুড়ি ওভার বোলিং করতে হয় ফিল্ডিং সাইডকে। এই কুড়ি ওভারের স্পেলটিকে 'ম্যান্ডেটারি ওভার' বলা হয়ে থাকে। তবে ম্যাচের নিষ্পত্তির সম্ভাবনা না থাকলে দুই দলের অধিনায়ক ন্যূনতম দশ ওভার খেলা হয়ে গেলেই পারস্পরিক সম্মতিতে আম্পায়ার-দ্বয়ের অনুমতি নিয়ে খেলার ওপর যবনিকা টেনে দিতে পারে।

বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি ঃ ব্যাটসম্যানের হিট করা বল যদি মাটি স্পর্শ করে সীমানা পার হয়ে যায়, তাহলে সেই শটে

একস্ট্রা রান ঃ বোলারের ছোঁড়া বা ঝাঁকুনি দিয়ে ডেলিভারি করা বলকে আম্পায়ার 'নো বল' ডাকেন। আবার বোলারের কোন পা যদি বোলিং ক্রিজের বাইরে পড়ে, সেক্ষেত্রেও আম্পায়ার 'নো' ডাকেন। প্রতিটি নো বলের ক্ষেত্রে ব্যাটিং সাইড এক রান করে 'অতিরিক্ত' বা 'একস্ট্রা' হিসাবে পায়। একদিনের ম্যাচে নো বলে ব্যাটসম্যান দৌড়ে রান নিলে সেই রান ব্যাটসম্যানের রানের সঙ্গে যোগ হয় এবং নো বলের জন্য একটি রান ব্যাটিং সাইড পায়। আবার বল যদি ব্যাটসম্যানের ব্যাটের নাগালের (নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনে) বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায় কিংবা মাথার অনেক ওপর দিয়ে যায়, তাহলে সেই বলকে আম্পায়ার 'ওয়াইড' ডাকেন। এক্ষেত্রেও ব্যাটিং সাইড এক রান পায়।

আবার বোলারের ডেলিভারি করা বল যদি উইকেটকিপার ধরতে না পারে, সেক্ষেত্রে ব্যাটিং সাইড 'বাই রান' পেয়ে যায়।
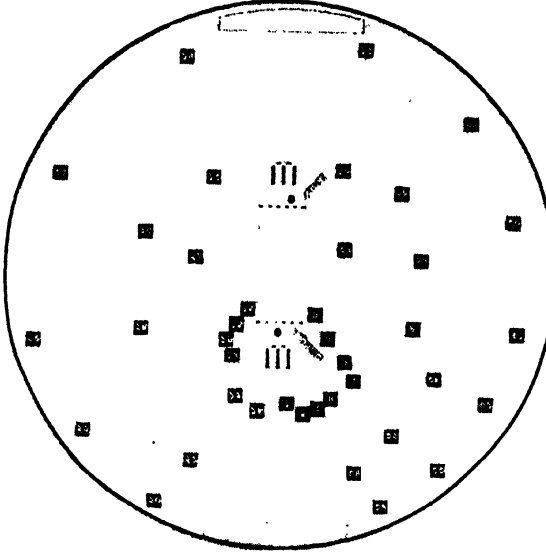
ক্রিকেট মাঠে খেলোয়াড়দের অবস্থান

সৌজন্যে ঃ নিলয় সামন্ত

'বাউন্ডারি' বা চার রান হবে। আর যদি বল মাটি স্পর্শ না করে সীমারেখার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তাহলে সেই শটে 'ওভার বাউন্ডারি' বা ছয় রান পাবে ব্যাটসম্যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুদিকের উইকেট থেকে বাউন্ডারি সীমানার দূরত্ব ৭৫ গজ। এছাড়াও দুই উইকেটের মধ্যে দৌড়ে 'শর্ট রান' নেওয়ার ব্যাপার আছে। স্ট্রোক নেওয়ার পর সেই বল ফিল্ডার ছুঁড়ে উইকেটে ফেরত পাঠানোর মধ্যে স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের সঙ্গে দ্রুত জায়গা বদল করে এক, দুই বা তিন রান নিতে পারে। যদি সিঙ্গলস বা এক রান হওয়ার পর ফিল্ডারের ছোঁড়া বল 'ওভার থ্রো' হয়ে বাউন্ডারিতে চলে যায়, সেক্ষেত্রে এক + চার = পাঁচ রান পেয়ে যায় ব্যাটসম্যান।

যদি বল বাউন্ডারি লাইন পেরিয়ে যায় তাহলে চার রান বাই, আর মাঝপথে ফিল্ডার ধরে ফেললে তার হাত ঘুরে উইকেটকিপারের কাছে আসা পর্যন্ত যত রান নিতে পারবে ব্যাটসম্যান-দ্বয়, সেটাই গণ্য হবে 'বাই রান' হিসেবে। ঠিক সেরকম ব্যাটসম্যানের প্যাডে লাগা বল থেকেও 'লেগ বাই' রান পেয়ে যায় ব্যাটিং সাইড। এক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। তবে ব্যাটসম্যান যদি ইচ্ছাকৃত 'প্যাডিং' করে, তাহলে আম্পায়ার কোন রান দেন না। কোন বল নো, ওয়াইড বা বাই হলে ব্যাটিং সাইড যেমন একটি অতিরিক্ত রান পায়, তেমনি বোলারকে একটি করে বেশি বল করতে হয়।

আউট করার নিয়ম ঃ যদি বোলারের ডেলিভারি করা বল

ব্যাটসম্যানকে পরাস্ত করে সরাসরি উইকেটে লাগে, তাহলে ব্যাটসম্যান 'বোল্ড আউট'। আর বল যদি ব্যাটসম্যানের পায়ে লাগে (উইকেট গার্ড করা অবস্থায়) তাহলে 'লেগ বিফোর উইকেট' (এল. বি. ডব্লিউ)। তবে ব্যাটসম্যান যদি অনেকটা পা বাড়িয়ে খেলে, সেক্ষেত্রে 'বেনিফিট অব ডাউট' ব্যাটসম্যানের পক্ষেই যায়। কিংবা আম্পায়ার যদি বোঝেন, বল সুইং কিংবা স্পিন করে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রেও ব্যাটসম্যান নট আউট। এছাড়া ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লাগা কোন বল মাটি স্পর্শ করার আগে মাঠের যেকোন অঞ্চলে দাঁড়ানো ফিল্ডারের হাতে জমা পড়লে ব্যাটসম্যান 'ক্যাচ আউট'। যদি বোলারের হাতে সেই ক্যাচ যায় তাহলে 'কট অ্যান্ড বোল্ড', আর উইকেটকিপার ধরলে 'কট বিহাইন্ড'। আরো চার ধরনের আউট আছে। বল খেলতে গিয়ে যদি ব্যাটসম্যান তার নিজের জায়গা অর্থাৎ পপিং ক্রিজ থেকে বেরিয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় কোন ফিল্ডার কিংবা উইকেটকিপার সেই বল ধরে উইকেটে মারে, তাহলে ব্যাটসম্যান 'স্টাম্পড আউট'। স্ট্রোক খেলার পর স্ট্রাইকার কিংবা নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান যদি শর্ট রান নিতে গিয়ে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে আসার আগে ফিল্ডার-নিক্ষিপ্ত বল উইকেটে লাগে, তাহলে সেই উইকেটের ব্যাটসম্যান 'রান আউট' বলে গণ্য হবে। আর কোন কারণে ব্যাটসম্যানের ব্যাট বা পা উইকেটে লাগলে 'হিট উইকেট' হয় ব্যাটসম্যান। আবার বোলার-নিক্ষিপ্ত বল ব্যাটসম্যান হাত দিয়ে ধরলে আম্পায়ার তাকে আউট ('হ্যান্ডলড দ্য বল বিফোর উইকেট') দিতে পারেন।

আম্পায়ার ঃ মাঠে দুজন আম্পায়ার থাকেন। একজন বোলারের দিকে থাকেন, আরেকজন থাকেন স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের পিঠের সমান্তরাল অঞ্চলে অর্থাৎ যাকে ফিল্ডিংয়ের পরিভাষায় 'স্কোয়ার লেগ' অঞ্চল বলে। দুই আম্পায়ার ক্রমান্বয়ে এক-এক ওভার করে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে খেলা পরিচালনা করেন। ওভার গোনা, বোলারের বল ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা (বিধিসম্মতভাবে) বা বোলার কিংবা ব্যাটসম্যান সময় নষ্ট করছে কিনা, বাই কিংবা লেগ বাই, বোল্ড আউট, এল. বি. ডব্লিউ, রান আউট ইত্যাদি দেওয়া তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত। বিভিন্ন সঙ্কেতের সাহায্যে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন মাঠের সকলকে। স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের আম্পায়ারের দায়িত্ব বোলার বল ছুঁড়ছে কিনা, ব্যাটসম্যানের পা বা ব্যাট উইকেটে লাগল কিনা (হিট উইকেট), তাঁর দিকের উইকেটে রান আউট ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আর খেলা শুরুর আগে আম্পায়ার-দ্বয় দুই দলের অধিনায়কের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাদের কাজ থেকে টিম লিস্ট জমা নেন। খেলার কোন বিষয়ে আলোচনা থাকলে তা উভয় অধিনায়কের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করে ঠিক করে নেন। কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে সে-ব্যাপারে পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যাবতীয় ক্ষমতা আম্পায়ার-দ্বয়ের ওপর ন্যস্ত। অর্থাৎ খেলা শুরুর আগে টস করা থেকে শুরু করে খেলা চলাকালীন যেকোন সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং খেলার শেষে পরিচালকদের নিকট ম্যাচের রিপোর্ট জমা দেওয়া পর্যন্ত এক দীর্ঘসূত্রতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় আম্পায়ারদের। আধুনিক ক্রিকেটে অবশ্য 'ম্যাচ রেফারি' এবং তৃতীয় আম্পায়ারের চল হয়েছে। ম্যাচ রেফারি খেলোয়াড়দের 'কোড অব কন্ডাক্ট' অর্থাৎ আচরণবিধির ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। আর মাঠের দুই আম্পায়ার আউটের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে যদি সংশয়াপন্ন হন, তখন সে-ব্যাপারে তৃতীয় আম্পায়ারের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

দ্বাদশ ব্যক্তি, কোচ, ম্যানেজার ঃ দুদলেই একজন করে দ্বাদশ ব্যক্তি থাকে, সে দরকারে ফিল্ডিং করতে পারে কিন্তু ব্যাটিং-বোলিং কখনো নয়। তাছাড়া জল-পানের বিরতিতে তারা মাঠে আসে নিজ দলের খেলোয়াড়দের পরিচর্যা ও অধিনায়কের নির্দেশ জানাতে। আর আধুনিক পেশাদার ক্রিকেটে ফুটবলের মতোই কোচ ও ম্যানেজার রাখার প্রচলন হয়েছে। কোচ সাধারণত খেলার টেকনিক্যাল ও ট্যাকটিক্যাল ব্যাপারগুলিই সামলান, আর ম্যানেজার মাঠের বাইরে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালন করেন।

খেলার নিষ্পত্তি ঃ টেস্ট বা তিনদিনের ম্যাচে প্রত্যেক দলকে দুটি করে ইনিংস খেলতে হয়। তবে দলের অধিনায়ক তাদের রানসংখ্যাকে পর্যাপ্ত মনে করলে দশটি উইকেট পড়ার আগেই ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ('ডিক্লেয়ার') করতে পারে। কোন দল প্রথমে ব্যাট করে পাঁচদিনের টেস্টে দুশোর বেশি রানে এবং তিনদিনের ম্যাচে দেড়শর বেশি রানে বিপক্ষের তুলনায় এগিয়ে থাকলে—সেই দল বিপক্ষকে 'ফলো অন' করিয়ে আবার ব্যাট করাতে পারে। সেক্ষেত্রে ফলো অনে পড়া দলটি দুই ইনিংস মিলিয়েও বিপক্ষ দলের প্রথম ইনিংসের রানের চেয়ে পিছিয়ে থাকলে তাকে 'ইনিংসে পরাজিত' গণ্য করা হয়। আর সাধারণভাবে দুই ইনিংস মিলিয়ে যে-পক্ষ বিপক্ষের তুলনায় অধিক রান করে তারাই ম্যাচে জয়ী ঘোষিত হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই জয়ী দলকে পরাজিত দলের দুই ইনিংসের সবকটি উইকেট ফেলতে হবে। আবার কোন দল যদি তার দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেট হাতে থাকতে বিপক্ষ দলের দুই ইনিংসের মোট রানকে অতিক্রম করে যায়, তাহলে সেই দলকে 'উইকেটে' জয়ী ধরা হয়। আর কোন দলের দুই ইনিংস শেষ না হলে খেলা 'ড্র' হয়। একদিনের ম্যাচে অবশ্য প্রতিটি দল একটি করে ইনিংস খেলে এবং প্রত্যেকে পঞ্চাশ ওভার পর্যন্ত ব্যাট করার সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য, এতে 'ফলো অন'-এর ব্যাপার নেই। কোন কারণে খেলার সময় কম থাকলে আম্পায়ার-দ্বয় দুই দলের অধিনায়ক ও ম্যাচ রেফারির সঙ্গে পরামর্শ করে খেলার ওভার-সংখ্যা কমিয়েও দিতে পারেন।

টাই ঃ পাঁচদিনের টেস্ট কিংবা তিনদিনের প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে দু-দলের দুই ইনিংসের মিলিত রানসংখ্যা সমান হয়ে গেলে সেই ম্যাচটি 'টাই ম্যাচ' হিসেবে গণ্য হয়। টেস্টের একশ বাইশ বছরের ইতিহাসে দুটি টেস্টে এই ধরনের ঘটনার নজির রয়েছে। ১৯৬০-৬১ মরসুমে ব্রিসবেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট আর ১৯৮৬-তে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটি 'টাই টেস্ট' হিসেবে ক্রিকেটের 'বাইবেল' উইজডেনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ❑

"আমি দেখব"

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শোন, আমি যা বলছি, ভাল করে শোন। রাতে রাখালকে দেবে ছখানা রুটি, লাটুকে পাঁচখানা, বুড়ো গোপাল আর বাবুরামকে চারখানা করে। এই যা বললুম, এর যেন অন্যথা না হয়। চাইলেও দেবে না।

কড়া নিয়ম! দুপুরে বারুদঠাসা, রাতে সামান্য। ভরপেট খেলে জপধ্যান করবে কি করে, বসে বসে ঢুলবে!

ঠাকুর নহবতের সামনে দাঁড়িয়ে মাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আর মা আটা ঠেসতে ঠেসতে শুনে যাচ্ছেন। সাধক, আত্মভোলা, ভাবমুখী শ্রীরামকৃষ্ণ এখন ভয়ঙ্কর এক গুরু। আধ্যাত্মিক জগতের অনমনীয় এক অধ্যক্ষ। নিজের একটি ব্রিগেড তৈরি করছেন অভিজ্ঞ মেজর জেনারেলের দক্ষতায়। আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নির্দোষ একটি জমায়েত। সাধন হয়, তাও বড় রকমের কিছু নয়। ঢাক নেই, ঢোল নেই, হোম নেই, আহুতি নেই, মন্ত্রোচ্চারণের রাজকীয়তা নেই। ছোট্ট ঘরখানির এক কোণে কয়েকজন, কয়েকজন পঞ্চবটীতে। অনর্গল ধর্মপ্রসঙ্গ, অবিরল গান, কখনো-সখনো নৃত্য। ধর্ম কোন একটি বিশেষ ধর্ম নয়, সর্বধর্মের সারতত্ত্বের সরল আলোচনা। পণ্ডিতে পণ্ডিতে জ্ঞানের অসিযুদ্ধ নয়। উপলব্ধিই ধর্ম। বোঝানো যায় না, বোঝা যায়। উপমার রাজা উপমাটি কেমন দিলেন—স্বামীর সোহাগ কেমন, সে কি বলে বোঝানো যায়! বিয়ে হোক তখন বুঝবে!

ছোট্ট ঐ ঘরখানি একটি ল্যাবরেটরি। বৈজ্ঞানিক শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে ভবরোগের একটি টিকা তৈরির কাজে ব্যস্ত। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে মানুষের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করলেন ধর্ম। সে আবার কি কথা! ধর্ম আবিষ্কার করলেন মানে? আগে ধর্ম ছিল না? অবশ্যই ছিল, ঠাকুর আমাদের জীবনে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। স্বামীজী বললেন ঃ "স্থাপকায় চ ধর্মস্য"—ধর্মকে স্থাপন করলেন। আরেকটু সাহস করলে বলা যায়, ধর্মের শেষ জীবনের শুরু। ধর্মজীবন আর গার্হস্থ্যজীবনের যে বিরাট ব্যবধান ছিল, এই অবাক-করা অবতার তা ঘুচিয়ে দিলেন। সংস্যার ত্যাগ করে গুহাবাসী হতে হবে না। নির্জলা উপবাসের প্রয়োজন নেই। শিখা, তিলক ধারণ করে, গলায় আড়াই মণ রুদ্রাক্ষ, তুলসী, স্ফটিকের মালা ঝুলিয়ে বাঘছালে বসার প্রয়োজন নেই। সাধন হবে মনে, বনে, কোণে। গেরুয়া ভিতরে ধারণ, বৈরাগ্য অন্তরে সাধন। ইষ্টের প্রতিষ্ঠা হৃদয়মন্দিরে—'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা'। কোন ভড়ং, পাঁজি-পুঁথির প্রয়োজন নেই; বেদ-বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ্—তাও না। শুধু একটু বিশ্বাস, একটু সত্যের ওপর আঁট, একটু ব্যাকুলতা, একটু জ্ঞান—ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। পুরোমাত্রায় সংসারী, কেবল মাঝে মাঝে নির্জনে সরে গিয়ে দেখে নেওয়া—বিশ্বাস ধরা আছে কিনা। নিক্তির নিচের কাঁটা আর ওপরের কাঁটা এক হয়ে আছে কিনা! তাহলেই হবে। কারণ, "চাঁদামামা সকলের মামা।" যে যা আছ তাই থাক, যেখানে আছ সেখানেই থাক। যেটাকে চুরমার করতে হবে সেটা হলো অহঙ্কার। 'কাঁচা আমি'কে 'পাকা আমি' করতে হবে। 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।'

শুধু জীবন নয়, ধর্মজীবন। সংসার নয়, সংসারধর্ম। ধর্মকে ধারণ করে সংসারী হওয়া যায়, সন্ন্যাসীও হওয়া যায়। সন্ন্যাসীর ধর্ম হলো বহুজনহিতায়। স্বামীজী তীব্র ভাষায় বললেন ঃ "ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু প্রভু' বলে চিৎকার করে সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক।" এইবার ধার্মিকের চরিত্র বলছেন স্বামীজী ঃ "পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ।"

এই পরিবর্তন আসবে কিভাবে? আয় বললেই তো আসবে না! ঠাকুর বলছেন, আগে অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধ, তারপরে নামো সংসারে। তোমার 'গেল গেল, মলুম মলুম' আর্তনাদ থেমে যাবে। তোমার বোধ হবে—'এই সংসার মজার কুঠি'। ঠাকুর তাঁর ছোট্ট পরীক্ষাগারে তৈরি করছিলেন ভবরোগের *পেনিসিলিন—বিবেক-হলদি,* আর ট্রেনিং দিচ্ছিলেন তাঁর বাছাই করা যুবকদের, যাঁরা বেয়ারফুট ডকটর্সদের মতো জনজীবনে ছড়িয়ে পড়বেন শুধু ধর্ম নয়—জীবনধর্ম, সংসারধর্ম শেখাতে। সন্ন্যাসী আর গৃহী উভয়েরই প্রয়োজন আছে। তা না হলে কোথায় আসবেন ব্যাস, বাল্মীকি, গৌতম বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, নরেন্দ্রনাথ? সৎ পিতা-মাতা ছাড়া মহা মহা সন্ন্যাসীরা কোথায় অবতীর্ণ হবেন?

ঠাকুরের বিবেক-হলদি এক মহামলম। সংসার-জলধিতে হাঙর-কুমির অনেক, সেখানে ক্ষতবিক্ষত না হতে চাইলে সাঁতরাতে হবে বিবেক-হলদি গায়ে মেখে। অন্তরে বিবেকের প্রতিষ্ঠাই হলো ইষ্ট প্রতিষ্ঠা। বিবেকই গুরু। তিনি লণ্ঠনধারী গার্ডসাহেব। সকলের ওপর আলো ফেলেন, সেই আলোতে সব দেখা যায়, চেনা যায়, কিন্তু গার্ডসাহেবের মুখ দেখা যায় না। তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে মানতে একসময় মন থেকে ভেদবুদ্ধিটা চলে যায়, তখন তুমি আর আমি এক। এরই নাম অদ্বৈতজ্ঞান। হনুমানের সেই দর্শন, রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি আমাকে কী চোখে দেখ? হনুমান বললেন ঃ যখন আমার দেহবোধ থাকে তখন দেখি তুমি প্রভু

আর আমি দাস, আর যখন জীববুদ্ধি থাকে তখন দেখি তুমি পূর্ণ আর আমি অংশ, আর যখন আমার আত্মবোধ থাকে, তখন দেখি তুমি আর আমি এক। এই একত্বের বোধ দেহধারী মানুষে সহজে আসবে না, তাই ঠাকুর বলছেন ঃ থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।

ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসীকে যেভাবেই হোক যো সো করে উপলব্ধিতে যেতেই হবে। ব্রহ্মানুভূতি। চাপরাশ তাকে পেতেই হবে, তা না হলে সে শিক্ষা দেবে কেমন করে? ঠাকুরের মুখে তো কিছু আটকাত না! উপলব্ধি না হয়েই শিক্ষাদান! বললেন, সে কেমন? না, 'হেগো গুরুর পেদো শিষ্য।' শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরানা অতি কঠোর। কৃচ্ছ্রসাধনে নয়, মননে। ধ্যানে এবং ধারণায়। এই হলো 'মডার্ন রিলিজনের' সূত্রপাত। দক্ষিণেশ্বরের সেই ছোট্ট ঘরখানি। উনবিংশ শতক। ভোগবাদ আর নাস্তিকতার ঢেউ। প্রচ্ছন্ন, একক, অজ্ঞাত এক মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তৈরি করলেন ধর্মের আধুনিক রূপ। সনাতন ধর্মই থাকবে, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের পথে সাধনটা হবে অন্যরকম। কেউ জানবে না, ধীরে ধীরে ন্যাবা, জন্ডিস, বি হেপাটাইটিস ভেতরে ভেতরে চারিয়ে যাবে। ১লা জানুয়ারি বলতেই তো পারতেন—তোমাদের ইষ্টলাভ হোক। তোমাদের ধর্ম হোক। বললেন ঃ "তোমাদের চৈতন্য হোক"। অন্তরের আলোয় নিজেকে আগে চেন। দেবতা হতে না পার, নরপশু হয়ে যেয়ো না। সে-সম্ভাবনা কিন্তু অতি প্রবল! কাম আর কাঞ্চন কলির মায়া। সাবধান! যাওয়ার নয়, 'মোড় ঘুরিয়ে দাও'।

ঠাকুর রুটির কোটা বেঁধে দিলেন। এইবার আমাদের মা কি করলেন? তিনি যে অবতারের শক্তি, তিনি তো কারো পরোয়া করেন না, তিনি যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জননী হবেন! ঠাকুরের শাসন যতটা কড়া, মায়ের মাতৃত্ব ঠিক ততটাই কোমল। ছখানা, চারখানার হিসেব ভেসে গেল! যার যেমন খিদে সে সেইরকমই খেতে লাগল। ঠাকুর হলেন উত্তম বৈদ্য। আদেশ পালিত হচ্ছে, না হচ্ছে না—খোঁজ নিলেন কয়েকদিন পরেই। বাবুরামকে ধরলেন ঃ রাতে কখানা? চারখানা?—আজ্ঞে না, বেশি।—সে কী, বেশি কেন?—মা বলেছেন, ভরপেট। খিদে না মেটা পর্যন্ত গরম গরম।

ঠাকুর চটি গলিয়ে ছুটলেন মায়ের দরবারে—কী ব্যাপার, তুমি যে বড় আমার কথা শুনলে না, তোমার স্নেহের চোটে আমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে বসেছে!

ঘোমটার আড়াল থেকে মায়ের স্পষ্ট উত্তর ঃ ও দুখানা বেশি রুটি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।

ঠাকুরের মুখে কোন কথা নেই। থতমত খেয়ে গেলেন। সারদা-শক্তি উদিত হচ্ছে।—ঠাকুর, তুমি গোখরো সাপ হতে পার, সেই সাপকে খেলাবার মন্ত্র কিন্তু আমার মায়ের হাতে! নরেন্দ্রনাথ সেটি জানতেন। ❑

'উদ্বোধন'-এ রচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

❑ ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়ে সুখপাঠ্য, ইতিবাচক, বিশ্লেষণমূলক এবং তথ্যভিত্তিক বাঙলা রচনা বিবেচিত হয়। রচনাটিকে অবশ্যই 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উপরি উক্ত যেকোন বিষয়ে রচনাটি কমপক্ষে ২৫০০ শব্দের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। ছদ্মনামে পাঠানো রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ আক্রমণাত্মক রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ কবিতা, সংবাদ, চিঠিপত্র নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

❑ শারদীয়া সংখ্যার (আশ্বিন/সেপ্টেম্বর) জন্য রচনা পাঠালে তা ১৫ চৈত্র/৩১ মার্চ-এর মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন।

❑ ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনায় আলোকচিত্র (গ্লসি প্রিন্ট) পাঠানো আবশ্যিক।

❑ যেকোন তথ্যভিত্তিক রচনা এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবি (গ্লসি প্রিন্ট), রেখাচিত্র ইত্যাদি পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিলে বা সাহায্য নিলে যথাযথ সূত্রনির্দেশ (গ্রন্থের/পত্রিকার নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশকাল, সংস্করণ এবং পৃষ্ঠা) আবশ্যিক।

❑ ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে যথেষ্ট মার্জিন দিয়ে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি না পাঠালে বিবেচিত হবে না। বাঙলায় টাইপ করা পাণ্ডুলিপি পাঠানো যেতে পারে।

❑ রচনার কার্বন বা জেরক্স কপি গ্রহণযোগ্য নয়।

❑ অন্যত্র প্রকাশিত কোন রচনা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। এর ব্যতিক্রম হয় শুধু 'মাধুকরী' বিভাগের রচনাগুলির ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রেও রচনাটিকে 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

❑ উপন্যাস বিবেচিত হবে না।

❑ অমনোনীত রচনা ফেরতযোগ্য নয়। রচনার সঙ্গে প্রেরিত নথিপত্র বা ছবি সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং রচনা/ নথিপত্র/ছবির কপি রেখে পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ সাধারণত কোন রচনা পাঠানোর একবছরের মধ্যে এবং কোন গ্রন্থের আলোচনা গ্রন্থ পাঠানোর দুবছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে বুঝতে হবে, সংশ্লিষ্ট রচনাটি অথবা গ্রন্থটি মনোনীত হয়নি।

❑ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য পাঠানো রচনা অন্তত একবছরের মধ্যে যেন অন্যত্র প্রকাশের জন্য প্রেরিত না হয়। একবছরের মধ্যে 'উদ্বোধন'-এ কোন রচনা প্রকাশিত না হলে অন্যত্র প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে পাঠানোর আগে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়।

❑ 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে আলোচনার জন্য 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থই বিবেচ্য। আলোচনার জন্য প্রতি গ্রন্থের দুখানি কপি জমা দেওয়া আবশ্যিক।

❑ পরলোক-সংবাদ ও অনুষ্ঠান-সংবাদ পরলোকপ্রাপ্তি বা অনুষ্ঠানের পনের দিনের মধ্যে অবশ্যই আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন। অন্যথায় সে-সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

❑ লেখক-লেখিকাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আমরা স্বীকার করি। তবে তাঁদের মতামত আমাদের অনুমোদিত—এটা ভাবা ভুল। মতামতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকাদের।

❑ রচনাদি নির্বাচন ও প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

❑ পত্রোত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট/পোস্টকার্ড/ইনল্যান্ড/ খাম পাঠাতে হবে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ — সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী নির্মুক্তানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসহায়ক ও তাঁর সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের অন্যতম, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ (সঙ্ঘে যিনি 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে পরিচিত) আমার দীক্ষাগুরু ও ধর্মজীবনের পথপ্রদর্শক।

১৯২৮ সালের শারদীয় উৎসবের কাল। সেসময় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘর থেকে ছাদের ওপর দিয়ে পুরনো মন্দিরে যেতে পারতেন। যতটা স্মরণ হয়, দুর্গোৎসবের কয়েক দিন পূর্বে আমাকে ও আরো চার-পাঁচজনকে একসঙ্গে পুরাতন ঠাকুর-মন্দিরে তিনি দীক্ষাদান করেন। দীক্ষার পর তিনি বললেনঃ "এই তোমাদের দীক্ষা হলো। মন্ত্র গোপন রাখবে। নির্দিষ্ট সংখ্যা জপ করবে, বেশি পার তো ভাল।" আমার কাছে মাত্র একটি টাকা ছিল। তা থেকে চার আনা প্রণামী দিলাম এবং ছয় আনা দিয়ে তাঁর চেয়ারে বসা অবস্থার একখানা ছবি কিনলাম। দীক্ষার পর কলকাতা থেকে মঠে এসে কয়েকদিন তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করেছি। এরপর প্রায় তিন বছরের ওপর তাঁর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি। তাঁর আদেশমতো জপ করতাম।

স্বামী শিবানন্দ

১৯৩১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি দিনটি আমার স্মৃতিপটে গাঁথা আছে। এই দিনটিতে আমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করি। একবছর সাত-আট মাস পর বেলুড় মঠে আসি।

আমি বারাণসীতে থাকাকালীন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ একবার এলাহাবাদ থেকে সেখানে অতি অল্পদিনের জন্য আগমন করেন। সাধু ও ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে আমিও তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে যাই। প্রণাম করার পর সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ আত্মপ্রকাশানন্দজী আমাকে লক্ষ্য করে বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে বলেনঃ "এই ছেলেটির মাথায় যন্ত্রণা হয় এবং রাত্রে ঘুম হয় না।" বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ নিজের সম্বন্ধে বললেনঃ "আমি রাত্রে শোবার সময় মনকে চিন্তাশূন্য করি, তারপরই ঘুমিয়ে পড়ি।" আমি কাশীতে অনেকদিন মাথার যন্ত্রণা ও অনিদ্রায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। অতঃপর বেলুড় মঠে আসার পর চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে পরীক্ষা করাই এবং তাঁর ব্যবস্থামতো চশমা ব্যবহার করায় ঐ কষ্ট আস্তে আস্তে চলে যায়।

কাশী থেকে দুর্গাপূজার কাছাকাছি সময়ে বেলুড় মঠে আসি। সময়টা ছিল ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাস। মঠে আনন্দে আমার দিনগুলি কাটছিল। কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো বিভিন্ন কাজকর্ম করতাম এবং সাধুদের বস্ত্রাদি স্বেচ্ছায় পরিষ্কার করে দিতাম। সাধ্যমতো নিত্য জপ, ধ্যান, পাঠ করতাম। সর্বোপরি স্বামী শিবানন্দজী মহারাজকে নিত্য সকালে দর্শন ও প্রণাম করতাম। কোন দিন কোন কারণে তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে না পারলে অন্তরে একটা অব্যক্ত অভাব ও শূন্যতা বোধ করতাম। মহাপুরুষ মহারাজের একে বৃদ্ধ শরীর, তার ওপর হাঁপানি ছিল। রাত্রে হাঁপানির দরুন খুব কষ্ট হতো, ঘুম হতো না। তা সত্ত্বেও পরদিন সকালে সকলের প্রণাম গ্রহণ করতেন, সকলের শুভাশুভের খবর নিতেন—যেন রাত্রে তাঁর কোন কষ্টই হয়নি! চোখ-মুখে অপূর্ব প্রশান্তি ও ঔজ্জ্বল্য বিরাজ করত।

কাশীতে থাকার সময় মনে মনে ঠাকুরের একজন সন্ন্যাসি-শিষ্যের সেবা করার ইচ্ছা হতো। মঠে আসায় সেই ইচ্ছাও পূর্ণ হয়। মাথার যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ, শ্রীগুরুর নিত্য দর্শন ও প্রণাম এবং ঠাকুরের সন্ন্যাসি-শিষ্যের সেবা—এইসমস্ত ইচ্ছার পরিপূর্ণতা দেখে সুপরিচিত সঙ্গীতের এই অংশটি স্মরণ হয়ঃ

> "করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
> কোথা নিয়ে যায় কাহারে—
> সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
> এনেছ তোমার দুয়ারে!"

দীক্ষাগ্রহণের প্রায় চারবছর পর মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন ও প্রণাম করবার সুযোগ পাই ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৩-এর নভেম্বর পর্যন্ত। এই একবছর দু-মাস কাল আমার কাছে অবিস্মরণীয় প্রোজ্জ্বল স্মৃতিস্বরূপ। দীর্ঘ কালের ব্যবধান এই স্মৃতিকে ম্লান করতে পারেনি।

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর দীর্ঘ ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল। তাঁর গলায় একখানা সরু সোনার হার মাঝেমধ্যে দেখতাম। গলদেশে সোনার হার থাকলে তাঁকে আরো উজ্জ্বল দেখাত। তাঁর ঘরেই আমরা তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে যেতাম। কোনদিন অপরাহ্নে তাঁর ঘরের পশ্চিমপার্শ্বের বারান্দায় পুরনো মন্দিরের ঠাকুরের দিকে তিনি হাতজোড় করে চেয়ারে বসতেন। ১৯৩২-১৯৩৩ সালের কথা বলছি। ঐসময় নিজের ঘর থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের বারান্দা ভিন্ন তিনি অন্যত্র যেতে পারতেন না।

এখন যেখানে ঠাকুরের বড় মন্দিরের সম্মুখে মিউজিয়াম, তার দোতলার মাঝের ঘরে তখন লাইব্রেরী ছিল। একদিন মহাপুরুষ মহারাজ লাইব্রেরী দেখার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। একটি চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে কয়েকজন শক্ত-সবল সাধু তাঁকে বহন করে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে আসেন। আরেকদিন তাঁর দোতলার ঘর থেকে নিচে নামবার ইচ্ছা হয়। অতি সাবধানে তাঁকে নামিয়ে এনে পুরনো মন্দিরের সিঁড়ি থেকে চার-পাঁচ হাত দক্ষিণে একটি চেয়ারে বসানো হয়। চরণদ্বয়ের নিচে একখানা নরম আসন

রাখা হয়। তিনি মন্দিরে ঠাকুরের দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বসেছিলেন। সেই দৃশ্যটি আমার স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আরেকটা ঘটনাও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমার মতো অকিঞ্চনের সেই মহাসৌভাগ্যের কথা যখন মনে পড়ে তখন সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেদিন সকালে মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম করতে যেতে পারিনি। বেলা সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে গিয়েছি প্রণাম করতে। তিনি তখন পূর্বদিকের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে হাতজোড় করে চেয়ারে বসে আছেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বললামঃ "আমার যেন ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস-ভক্তি দৃঢ় হয়।" উত্তরে ভাবময় কণ্ঠে তিনি বললেনঃ "হবে।" তাঁর "হবে" কথাটির মর্মোপলব্ধির জন্য বেশ চিন্তা করেছি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

ভগবান শঙ্করাচার্য 'বিবেকচূড়ামণি'-র তৃতীয় শ্লোকে বলেছেনঃ

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।।"

—মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি, সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আগ্রহ এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ বা আশ্রয় লাভ—এই তিনটি জগতে দুর্লভ। কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহেই এগুলি পাওয়া সম্ভব হয়।

'বিবেকচূড়ামণি'-র ৪৬তম শ্লোকে মুক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে শঙ্করাচার্য বলেছেনঃ

"শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্ মুমুক্ষো-
র্মুক্তের্হেতূন্ বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ।।"

—শ্রুতি বলেন, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ধ্যান—এই তিনটি যোগ মুমুক্ষুর মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ হেতু।

'কথামৃত' গ্রন্থে দেখা যায়, ঠাকুর বিভিন্ন জায়গায় 'ভক্তি' বা 'শুদ্ধাভক্তির' ওপর খুব জোর দিয়েছেন।

'নারদীয় ভক্তিসূত্রে' (৩৮) বলা হয়েছে, "মুখ্যতস্তু মহৎ-কৃপয়ৈব" (ভগবৎকৃপালেশাৎ বা)—প্রধানত মহাপুরুষের কৃপায় ভক্তিলাভ হয়। "মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ"। (৩৯) কিন্তু উন্নত মহাপুরুষ দুর্লভ। মহতের সঙ্গলাভ হলেও তাঁদের বুঝতে পারা, চিনতে পারা সুকঠিন। কিন্তু তাঁদের লাভ হলে তার ফল অব্যর্থ। "লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব" (৪০)—একমাত্র ভগবৎকৃপাতেই মহাপুরুষ-সঙ্গ লাভ করা যায়।

প্রাচীন সাধুদের বলতে শুনেছি, মহাপুরুষ মহারাজের তিনবার নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়েছিল। মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেনঃ "ঠাকুর এবার তাঁকে ঈশ্বরকোটির (নিত্যসিদ্ধের) স্তরে তুলে নিয়েছেন।" এমন মহাপুরুষের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না।

আমার মঠে কিছুদিন থাকার পর পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ অল্প কয়েকদিনের জন্য মঠে আসেন। মহাপুরুষ মহারাজের সচিব স্বামী গঙ্গেশানন্দ মহারাজ আমাকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁর ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা গুছিয়ে রাখা, সকালে জলযোগের ব্যবস্থা করা, দুপুরে খাবার দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতে হতো। একদিন সকালে মহারাজ জলযোগে বসেছেন। তিনি দুই পেয়ালা চা খেতেন, অন্য কিছু খাবারও সঙ্গে খেতেন। একদিন চা পান করতে করতে প্রসঙ্গক্রমে "কেন সাধু হয়েছ?" —এই কথাটা উঠল। প্রশ্নটা আমারই ওপর পড়ল। প্রাচীন সাধুরা মহারাজকে প্রণাম করে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা রয়েছেন, ফলে উত্তর গুছিয়ে বলা আমার সাহস ও শক্তিতে কুলোল না। আমি নির্বাক স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন মহারাজজী নিজেই চক্ষু অর্ধনিমীলিত করে বললেনঃ "ঠাকুর বলতেন, 'যে হাত-পা ছেড়ে তালগাছ হতে লাফিয়ে পড়তে পারে, সেই সাধু হতে পারে।' " এই উক্তির তাৎপর্য চিন্তা করেছি এইভাবে—পরমেশ্বরে পূর্ণ শরণাগত ব্যক্তিই বিপজ্জনক এই দুঃসাহসিক ঝম্পপ্রদানে সক্ষম। সনাতন গোস্বামী সংস্কৃত শ্লোকাকারে ষড়্‌বিধ ঈশ্বর-শরণাগতির কথা বলেছেন। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে তিনি বলেছেনঃ

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যো ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।।"

—ভগবদ্ভজনের অনুকূলতার সঙ্কল্প অর্থাৎ ভগবদ্ভজন কর্তব্যরূপে নিয়ম, ভগবদ্ভজন বিষয়ে প্রতিকূল অর্থাৎ তাঁর বিপরীত ভাবনার বর্জন, ভগবান রক্ষা করবেন—এই বিশ্বাস, তাঁর রক্ষকের শক্তিতে আস্থা, ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং 'কার্পণ্য' অর্থাৎ 'হে ভগবান, রক্ষা কর, রক্ষা কর' ইত্যাদি প্রকারে আর্তত্ব। শরণাগতি এই ছয় প্রকার। ঈশ্বরে এরূপ পূর্ণ শরণাগত ভক্তজনই নিঃশঙ্কচিত্তে ঈশ্বরের জন্য বৈরাগ্যের পথ গ্রহণে উপযুক্ত বা ঐ পথে অগ্রসর হতে সক্ষম। অপরের পক্ষে তা প্রাণঘাতী হঠকারিতা মাত্র।

দিন চলতে চলতে ১৯৩৩-এর ২৫ এপ্রিল এল। ঐদিন মহাপুরুষ মহারাজ দ্বিপ্রহরের আহার প্রায় শেষ করেছেন, এমন সময় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর দক্ষিণাঙ্গ অবশ হয়ে গেল ও বাক্‌শক্তিরহিত হলেন। এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ তাঁকে দর্শন করতে এলেন। তাঁর ঘরের উত্তরদিকের ছাদ থেকে নিত্য দলে দলে লোক তাঁকে দর্শন করে যেতে লাগল।

পরের বছর [১৯৩৪ সাল] ২০ ফেব্রুয়ারি মহাপুরুষ মহারাজ মহাসমাধিতে লীন হন [ক্রমশ]

মহারাষ্ট্র ও গোয়ায়

মঞ্জুষা দাস

সেবার মার্চ মাসে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে হাওড়া থেকে রাত ৮টা ১৫ মিনিটের 'বম্বে মেল' ভায়া নাগপুর হয়ে রওনা দিয়েছিলাম মহারাষ্ট্র ও গোয়া দর্শনের উদ্দেশে। ট্রেন রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ আমাদের পৌঁছে দিল 'জলগাঁও'। জলগাঁও-এর ওয়েটিং রুমে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে স্নানপর্ব সমাধা করে অটোর সাহায্যে বাসস্ট্যান্ডে এলাম। ৭টা ৩৫ মিনিটে বাস ছেড়ে ৯টা ১০ মিনিটে অজন্তা পৌঁছাল। ক্লোকরুমে মালপত্র রেখে আমরা 'অজন্তা কেভ'-এর রূপময় জগতে প্রবেশ করলাম। শুনেছিলাম, অজন্তার অনেক ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যিই তাই। তবু এখনো যা আছে, তা যেন জীবন্ত! খুব সুন্দর। পদ্মপাণি, মায়াদেবী, রাহুল-যশোধরা—এমনটি আর দেখিনি, এমনটি সম্ভব বলেও জানা ছিল না। অজন্তায় শুধু চিত্রসম্ভারই নেই, অনেক পাথরের মূর্তি, পাথরের ওপর কাজও আছে। বুদ্ধের মহা-পরিনির্বাণের শায়িত একটি বিশাল মূর্তি আছে। পাথরে যে এমন কোমলতা আনা সম্ভব তা না দেখলে বিশ্বাস হতো না।

বিকাল ৪টায় অজন্তা থেকে বাস ধরে 'আওরঙ্গাবাদ' পৌঁছাই রাত সোয়া ৮টায়। দুপুরে আমরা অজন্তা কেভ-এর ভিতরেই খেয়ে নিয়েছিলাম। আওরঙ্গাবাদে 'শকুন্তলা লজ'-এ উঠলাম। রুটি, ভাত সবরকম ব্যবস্থাই আছে। চার বেডের একটা বড় ঘর, সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ। চার্জ ১১০ টাকা। পরদিন লজের মারুতিতে আওরঙ্গাবাদ পরিক্রমা। 'দৌলতাবাদ ফোর্ট', 'চাঁদমিনার' ইত্যাদি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখলাম। গাইড জানালেন ফোর্টের ইতিহাস আর এর সুরক্ষাব্যবস্থা। 'খুলদাবাদ'-এ দেখলাম প্রবল পরাক্রান্ত আওরঙ্গজেবের উন্মুক্ত সমাধি।
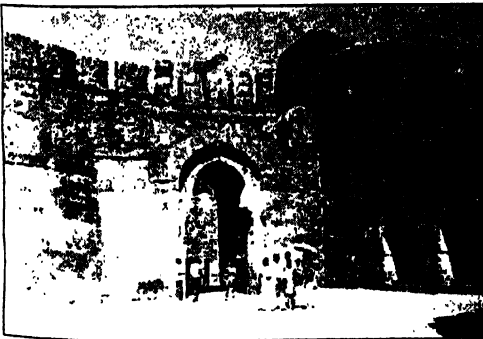
দৌলতাবাদ ফোর্ট, আওরঙ্গাবাদ

এরপর ইলোরা। প্রাচীন নাম ইলুপুর। শত শতাব্দীর প্রাচীন পাথরের আলেখ্যগুলো যেন কথা কয়ে উঠল! কমলেকামিনী, হরপার্বতীর বিবাহ, মহাদেবের পার্বতীকে তর্জনী তুলে অনুরোধের সুরে যেন বলা—'একটা কথা শোন।' কৈলাস-মন্দিরের গায়ে গায়ে খোদিত কত যে অপরূপের সমারোহ!
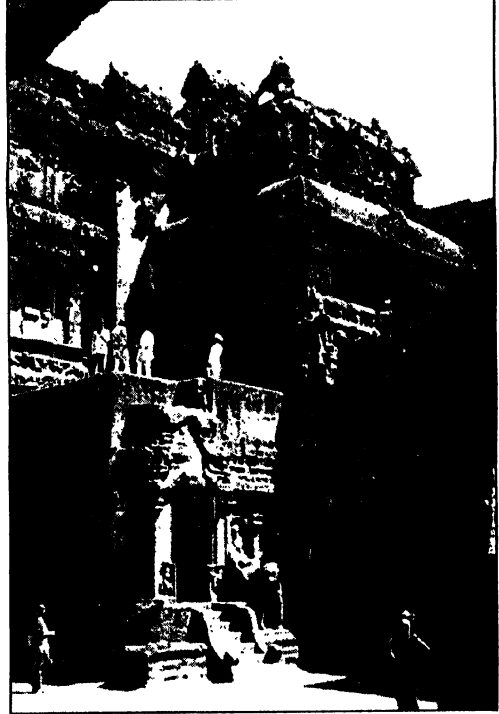
কৈলাস-মন্দির, ইলোরা

এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ঘৃষ্ণেশ্বর-মন্দির আছে। দেবতাকে প্রণাম, মন্দির ঘুরে দেখা ও ছবি নেওয়া হলো।
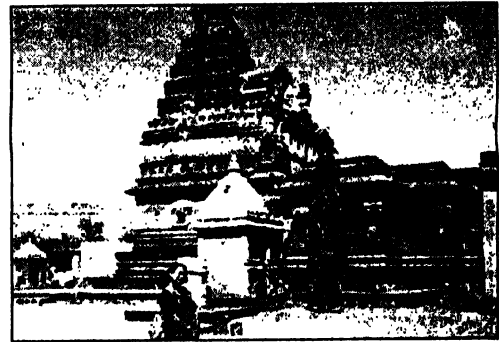
ঘৃষ্ণেশ্বর-মন্দির, আওরঙ্গাবাদ

এরপর তাজমহলের আদলে তৈরি 'বিবি কা মকবরা' দেখে গেলাম আওরঙ্গাবাদ কেভ দেখতে। নির্জন, নিরিবিলি, তবে মূর্তি কমই আছে। লজে ফেরার পথে পড়ল 'পানিচাক্কী'। জলের সাহায্যে এখানে চাকী ঘুরিয়ে গম পেষাই হতো। তাই এমন নাম। সারাদিনের জন্য মারুতি ভাড়া নিল ৩০০ টাকা।

বিবি কা মকবরা, আওরঙ্গাবাদ

রাতটা শকুন্তলা লজ-এ থেকে পরদিন সকালে আমরা বেরিয়ে পড়ি 'আয়ুধা নাগনাথ' আর 'পারালী বৈজনাথ'-এর উদ্দেশে। আওরঙ্গাবাদ স্টেশন থেকে ট্রেনে 'পারবানী'। পারাবানী থেকে বাসে করে আয়ুধা নাগনাথ। সুন্দর প্রাচীন মন্দির। মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে অনেক নিচে নেমে দেবতার

আয়ুধা নাগনাথ

দর্শন। এখানে আমরা বেশি সময় দিতে পারিনি, কেননা সেদিনই আমাদের পারালী বৈজনাথে পৌঁছাতে হবে। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। অনেক কষ্টে একজন স্থানীয় লোকের সাহায্যে বাসে ওঠা এবং বসার জায়গা পাই। রাত প্রায় ৮টায় পারালী বৈজনাথ-এ পৌঁছাই। তখন সবাই শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন। কেননা সারাদিন পেটে দানাপানি বিশেষ কিছুই পড়েনি। এ-দোকান সে-দোকানে টুকটাক খাওয়া আর কয়েক গ্লাস আখের রস আর আঙুর। তাছাড়া ছিল প্রচণ্ড গরম। এই প্রসঙ্গে জানাই, সারা মহারাষ্ট্রে চায়ের চেয়ে আখের রসের প্রচলন বেশি। মিষ্টি স্বাদ, দামেও সস্তা। আর সস্তা আঙুর। সারাদিন বাসে বাসে চলা আর টুপটাপ আঙুর মুখে পোরা।

পারালী বৈজনাথ বেশ জমজমাট শহর। কিন্তু কোন হোটেলেই ঠাঁই পাচ্ছি না। আমাদের দেখেই 'না' বলে দিচ্ছে। এমনও হতে পারে, আমরা কজন মহিলা বলে আমাদের জায়গা দেওয়া হচ্ছিল না। অবশেষে 'গুরু নানক' হোটেলে বেশ বড় ঘর অ্যাটাচড বাথ-সহ পাওয়া গেল। ঘরেই খাবার দিয়ে গেল। সারাদিনের ধকলের পর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে ঘুমোলাম। পরদিন ভোরবেলায় স্নান সেরে অটোয় করে মন্দিরে পৌঁছাই পূজা দিতে। পারালী বৈজনাথও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। সারাদিনই ভক্তদের আগমনে জমজমাট থাকে। এখানে বিবাহপর্বও সম্পন্ন হয়। আমরা পূজা দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। এখানে চা ফোটায় দুধে।

পারালী বৈজনাথ

একজন চা খাবে না বলায় তাকে শুধু দুধটাই দিয়ে গেল। আবার বাসে পারবানী। পারবানী থেকে ট্রেনে আওরঙ্গাবাদ।

পরদিন বাসে গেলাম 'সিরডি'। এখানে সিরডি সাঁইবাবার মন্দির, ধুনিস্থান ইত্যাদি আছে। লোকের বিশ্বাস, উনি খুবই জাগ্রত। হাজার হাজার মানুষ এখানে আসে। হিন্দু, মুসলমান, গরিব, মধ্যবিত্ত, বড়লোক সবারই ঠাঁই এখানে। ভাল হোটেল আছে। তাছাড়া কম টাকায় যাত্রীদের জন্য এদের নিজস্ব আবাসও আছে। আমরা এদের 'শান্তিনিবাস'-এ ছিলাম। প্রসাদ পাওয়ার জন্য বিশাল হলঘর আছে। সুন্দর ব্যবস্থা। লাইন দিতে হয়, তবে দাঁড়িয়ে নয়—বসার জন্য বেঞ্চ আছে। প্রসাদের জন্য টিকিট নিতে হয়। দু টাকা, আড়াই টাকা, তিন টাকা—যে যেমন পারে। প্রসাদ কিন্তু একই। ভাত, দুটো তরকারি, ডাল ও আচার। রুটিও দেয়। সেই বিশাল হলঘরে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে আগত তীর্থযাত্রীরা একই প্রসাদ পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে। সিরডি আমাদের সবারই খুব ভাল লেগেছিল।

এরপর আমাদের যাত্রা শুরু হলো 'নাসিকে'র উদ্দেশে। সিরডি থেকে বেলা ১টায় বাসে চেপে দু-ঘণ্টায় এসে গেলাম

নাসিক। 'হোটেল বসেরা'য় ওঠা হলো। এখানে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখাবার জন্য সরকারি বাসের ব্যবস্থা আছে।

পাণ্ডবগুহা, নাসিক

বাসে করে পাণ্ডবগুহা, পঞ্চবটী, সীতাগুম্ফা, তপোবন, ভক্তিধাম, মুক্তিধাম, কালারামের মন্দির এবং দ্বাদশ

কালারামের মন্দির, নাসিক

জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ত্র্যম্বকেশ্বর শিব দর্শন করা গেল। পরের দিন আমাদের এ-যাত্রার অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ 'সপ্তশৃঙ্গী'র উদ্দেশে রওনা হলাম। সবারই মনে আশঙ্কা—সেখানে পৌঁছাতে পারব তো? ভোরের আলো তখনো ফোটেনি। সকলে স্নান সেরে বাসে চেপে চলি 'নান্দুরি'। পথে ক্রমে আলোর প্রকাশ এবং তারও বেশ পরে সূর্যদেবের

ত্র্যম্বকেশ্বর, নাসিক

রক্তিম আবির্ভাব! কি যে অপূর্ব এই যাত্রা—না গেলে বোঝার উপায় নেই। নান্দুরি পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম। বাসস্ট্যান্ড

তো নয়—যেন একটা খেলার মাঠ। চারদিক ফাঁকা। দূরে দূরে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। দু-একটা দোকানঘর। সবে ঝাঁপ খুলতে শুরু করেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া আর মিঠে আলোয় শরীর-মন জুড়িয়ে গেল। সবে একটা দোকানে চায়ের খোঁজখবর করছি, দেখি একটা মিনিবাস হৈহৈ করে এসে গেল। রইল পড়ে চা, সবাই মিনিবাসে চেপে বসলাম। মিনিবাসটিতে মাত্র বারটি সীট। এইরকম দুটো মিনিবাস সারাদিন নান্দুরি ও সপ্তশৃঙ্গীর মধ্যে যাতায়াত করে। মনোরম আবহাওয়ায়, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে পাহাড়ী পথে বাসে আমাদের সপ্তশৃঙ্গী-যাত্রা শুরু হলো। কয়েক বছর আগেও যাত্রীদের পায়ে হেঁটেই বুকফাটা চড়াই অতিক্রম করতে করতে সেই দুর্গম পথে যেতে হতো। সেই হাঁটা-পথ এখনো আছে। আছে সেই চড়াই, যার নাম 'রোদনতুপ্তি'—রোদন না করে যা পেরোবার উপায় নেই। তবে সেই পথে আজ আর জানাল। খাবারের সন্ধানে এরা প্রায়ই তীর্থযাত্রীদের ওপর হামলা করে। সপ্তশৃঙ্গীতে আছে মা চণ্ডিকার মূর্তি। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা বিরাট দেবীমূর্তি। দেবীর আঠার হাত। কথিত আছে—দেবী মহিষাসুরকে বধ করার পর যখন এই সপ্তশৃঙ্গী পাহাড়ে বিশ্রাম করছিলেন তখন ভীমাসুর এসে দেবীকে আক্রমণ করে। দেবী তখন আঠার হাতে ভীমাসুরকে বধ করেন। আমরা সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। একদম ভিড় ছিল না। সবাই ভালভাবে পূজা দিলাম। পুরোহিতেরা বেশ বিনয়ী। আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ৯টার পরে 'অভিষেক' আরম্ভ হবে। আমরা 'অভিষেক' দেখে যাব ঠিক করলাম। আস্তে আস্তে জনসমাগম শুরু হলো। এরই মধ্যে এক মহিলার প্রসাদের পুঁটলী এক বেপরোয়া বাঁদরের কবলে! কিছুক্ষণ পর আরেক মহিলা পূজা দিয়ে সবাইকে প্রসাদী পেঁড়া বিতরণ করলেন।
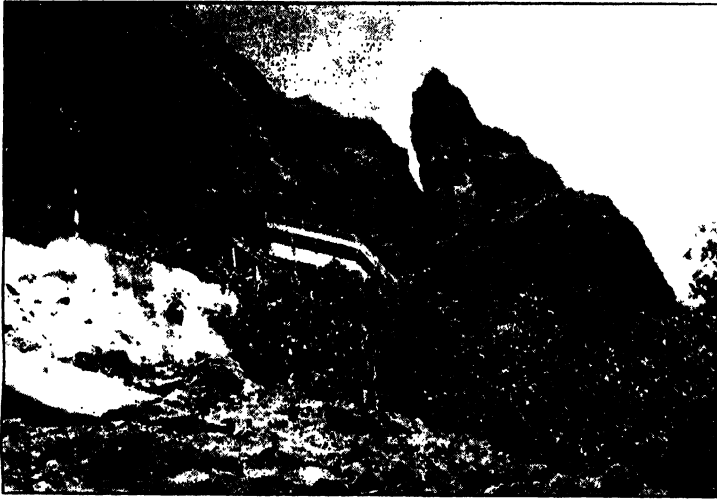
সপ্তশৃঙ্গী, নাসিক

বিশেষ কেউ যায় না। এখনকার বাসরাস্তাও বেশি যাত্রী নিয়ে যান-চলাচলের উপযোগী নয় বলেই এই ছোট বাসের ব্যবস্থা। যাইহোক, এ-পাহাড় ও-পাহাড় ঘুরে ঘুরে বাস আমাদের মিনিট চল্লিশের মধ্যে সপ্তশৃঙ্গী পৌঁছে দিল। এখান থেকে মায়ের মন্দির সাড়ে চারশ সিঁড়ি ওপরে অবস্থিত। দোকানে চা খেয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে, ফুলের মালা (বেশ মোটা আর বড় টাটকা গাঁদাফুলের মালা পেলাম), ধূপকাঠি, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে আরম্ভ করলাম। পাথরের বাঁধানো সিঁড়ি। হাতে ধরার মতো সিঁড়ির মাঝখানে লোহার রড আছে। এক পা, এক পা করে উঠছি, দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আবার উঠছি। অবশেষে সিঁড়ি শেষ হলো। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আর গুটিকয়েক বাঁদর আমাদের অভ্যর্থনা আমাদের সহযাত্রী শ্বেতা কয়েকটি ভক্তিগীতি গাইল। ইতিমধ্যে সময় হয়ে গিয়েছে। চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে দেবীর অভিষেক আরম্ভ হলো। মধু, গব্যঘৃত, দুধ ইত্যাদি দিয়ে দেবীকে স্নান করানো হলো। বাসী বস্ত্র সরিয়ে মাকে নতুন বস্ত্র পরানো হলো। কাজলে, কুঙ্কুমে, গহনায় সজ্জিত হয়ে দেবী ঝলমল করতে লাগলেন। আমাদের আসা সার্থক হলো। এবার পরিপূর্ণ চিত্তে ফিরে চললাম নাসিকে—'হোটেল বসেরা'য়। বিকালে নন্দীবিহীন কপালেশ্বর শিব দর্শন করে গেলাম গোদাবরী ঘাটে। পুণ্য গোদাবরীর জলে আরতি দর্শন করে (হরিদ্বারের মতো এখানেও সন্ধ্যাবেলায় জলে নেমে পুরোহিতেরা আরতি করেন) এবং সেই জলে স্নান করে ঘরে ফিরলাম। [ক্রমশ]

প্রসঙ্গ আঁশযুক্ত খাদ্য

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খাদ্যাখাদ্যের বিচার খুবই প্রাচীন। জীবজগতে সে-বিচার বহমান, মনুষ্যসমাজেও সে-বিচারের কমতি নেই। অখাদ্য, সুখাদ্য, সুষম খাদ্য, আধুনিক খাদ্য—এমন বহু বিশেষণই খাদ্যতালিকায় আরোপিত হয়ে থাকে। প্রাচ্যদেশীয় খাদ্যতালিকা থেকে পাশ্চাত্য খাদ্যতালিকার ভিন্নতা শিক্ষিত মহলের জানা। আবার এও ঠিক যে, গ্রামীণ খাদ্যতালিকা শহুরে খাদ্যতালিকার সঙ্গে সমতা রাখে না। সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুর পরিবর্তনের মতো খাদ্যতালিকারও পরিবর্তন ঘটছে। প্রথানুগ তত্ত্ব অনেক সময় আধুনিক বিশ্লেষণী প্রত্যয়ের সঙ্গে মেলে না। সাধারণভাবে পরিকল্পিত খাদ্য-তালিকায় ত্রিশ বছর বয়স্ক ও ষাট কিলোগ্রাম ওজনের এক ব্যক্তির ২৪২৪ কিলো ক্যালরি (Caloric—তাপের মাত্রা বিশেষ) তাপশক্তির আবশ্যক হয় এবং এই শক্তিপূরণের জন্য সেই ব্যক্তির প্রয়োজন হয় ৬০ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য (২৪৬ কিলো ক্যালরি), ৬০ গ্রাম স্নেহজাতীয় খাদ্য (৫৫৮ কিলো ক্যালরি) এবং ৪০৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট খাদ্য (১৬৬০ কিলো ক্যালরি)। এর সঙ্গে দরকার স্বল্পমাত্রার ভিটামিন ও খনিজ ধাতু। ভিটামিনের মধ্যে B_1 (১.২ মিলি গ্রাম), B_2 (১.৩ মিলি গ্রাম) ও C (৫০ মিলি গ্রাম) এবং খনিজ ধাতুর মধ্যে বিশেষ জরুরী ক্যালসিয়াম (০.৫ গ্রাম) ও লোহা (২০ মিলি গ্রাম)। কার্বোহাইড্রেট খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য নির্ধারিত মাত্রার গম, চাল, ডাল, সবুজ শাকপাতা, ফল উল্লেখ করা হয়ে থাকে; প্রোটিনের জন্য মাছ, মাংস ও ডিম এবং স্নেহজাতীয় খাদ্যের জন্য আছে তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি।

আধুনিক পুষ্টিবিশেষজ্ঞদের ধারণা যে, প্রথানুগ পুষ্টি-তালিকার পরিবর্তন জরুরী, কারণ ঐ পুষ্টিতালিকা প্রয়োজনীয় ক্যালরি উৎপাদনে সক্ষম হলেও শরীর সুরক্ষায় তারা অক্ষম। খাদ্যে প্রাণী-প্রোটিনের আধিক্যজনিত কুফল সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে জাপানী বিজ্ঞানী সুজুকি ও মিওসুওকা জানিয়েছেন যে, এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাপানে পাশ্চাত্য খাদ্যতালিকা খুবই জনপ্রিয় হয় এবং সেই তালিকায় থাকে শতকরা ৬০ ভাগ প্রোটিন ও ৩০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট; অথচ এর আগে ঐ চিত্র ছিল পুরো বিপরীত। জাপানে দেশীয় খাদ্যতালিকায় শতকরা ৬০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন খাদ্য শতকরা ৩০ ভাগেরও কম ছিল। বিজ্ঞানিগণ আরো দেখেছেন যে, জাপানে আগে কোলন-ক্যান্সার প্রায় ছিলই না; অথচ অধুনা সেদেশে কোলন-ক্যান্সারের হার ক্রমবর্ধমান।

কেবল প্রোটিনের আধিক্যই যে অসুবিধার সৃষ্টি করছে তা নয়, প্রথানুগ তালিকায় সাধারণত আঁশযুক্ত (fibrous) বা তন্তুখাদ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না, যেহেতু ঐজাতীয় খাদ্য অধিক ক্যালরি উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। আঁশযুক্ত খাদ্য প্রসঙ্গে উন্নাসিকতার ভাব ছিল দীর্ঘদিন। গত দুই দশক ধরে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের গবেষণা এপ্রসঙ্গে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তাঁরা দেখেছেন, আঁশযুক্ত খাদ্য বর্জন বা কম করলে মানুষের নানা ব্যাধি দেখা দিচ্ছে। এইসব ব্যাধির মধ্যে রয়েছে ইস্কিমিক হার্ট, ডায়াবিটিস, ওবেসিটি (মেদবাহুল্য), অ্যাপেন্ডিসাইটিস, পাইলস (অর্শ), ফিসার (ভগন্দর), হার্নিয়া, ভ্যারিকোসা ভেন, গলস্টোন (পিত্ত-পাথুরি), অ্যাথেরিওস্ক্লেরোসিস (রক্তনালীর গাত্রে কোলেস্টেরলের সঞ্চারণ), কোলন-ক্যান্সার ইত্যাদি। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে, যেখানে নিরামিষ খাদ্য বিশেষ চালু সেসমস্ত জায়গার তুলনায় পাশ্চাত্য দেশে—যেখানে আমিষ-প্রধান খাদ্যতালিকা বেশি চালু, সেখানে উল্লিখিত ব্যাধি-গুলির প্রকোপ বেশি। আধুনিক চিকিৎসা ও উন্নত ওষুধ আবিষ্কারের কারণে পাশ্চাত্যদেশগুলি জীবাণুঘটিত ব্যাধির মোকাবিলায় সক্ষম হলেও অন্যান্য ব্যাধির বিস্তার সেখানে যথেষ্টই। তার প্রধান কারণ—আঁশযুক্তখাদ্য-বিহীন, আমিষ-প্রধান খাদ্যতালিকা নির্বাচন! এটি বিজ্ঞানীদের অভিমত।

'ইউনাইটেড স্টেটস ডেভেলপমেন্ট অফ এগ্রিকালচার' (USDA)-এর 'ফুড কোয়ালিটি ইউনিট' (FQU)-এর গবেষকগণ মন্তব্য করেছেন যে, চালের খুদ (rice bran), গমের খোসা (wheat bran) ও জই-খোসা (Oat bran) রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সক্ষম। অস্ট্রেলিয়ার 'কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অর্গানাইজেশন'-এর 'ফুড রিসার্চ ইউনিট' মন্তব্য করেছে যে, রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরলযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রত্যহ একশ গ্রাম করে জই গুঁড়ো খায় তাহলে তার দেহে ছয়মাসের মধ্যে তেইশ শতাংশ কোলেস্টেরল কমে যাবে। সংশ্লিষ্ট গবেষণা কেবল আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়—অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরাও আঁশযুক্ত খাদ্যের ওপর বিশেষ জোর দেন। প্রতি ১০০ গ্রাম চাল, গম ও জই ভুসিতে আঁশযুক্ত খাদ্য থাকে যথাক্রমে ২৫.৫ গ্রাম, ২২.২ গ্রাম ও ৪২.৭ গ্রাম। এইসমস্ত খাদ্যোপাদান পূর্বে তেমন মর্যাদায় গৃহীত হয়নি, বরং অখাদ্য হিসাবেই নিন্দিত ছিল। বর্তমানে ঐসমস্ত খাদ্যে আঁশযুক্ত উপাদান থাকার জন্য এগুলি স্বাস্থ্য-সুরক্ষক ও রোগ-নিরাময়ক হিসাবে চিহ্নিত।

আঁশযুক্ত খাদ্য সম্পর্কে অজ্ঞতাই এতদিন মানুষের মনে এক ভ্রান্ত ধারণা গড়ে তুলেছিল। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, তন্তুখাদ্য অপাচ্য এবং অধিক ক্যালরি-দানে অক্ষম। আধুনিক গবেষণা সেসমস্ত ধারণার অসারতা প্রমাণ করেছে। তন্তু-খাদ্যে রাসায়নিক উপাদান হিসাবে থাকে সেলুলোজ, হেমি-সেলুলোজ, লিগনিন, পেকটিন, বিটাগ্লুকান ইত্যাদি। এদের মধ্যে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও লিগনিন জলে দ্রাব্য।

গম, ভুট্টা ও চালের দানায় থাকে সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজ; মটর, বরবটি প্রভৃতি শিম্বজাতীয় সবজিতে থাকে লিগনিন উপাদান। পেকটিন ও বিটাগ্লুকান জলে অদ্রাব্য। পেকটিন থাকে পেয়ারা, আপেল ও নাশপাতিতে; বিটাগ্লুকান জই ও সোয়াবিনের দানায়। আঁশযুক্ত খাদ্যের ঐসমস্ত রাসায়নিক উপাদান নানাভাবে শারীরযন্ত্রের স্বাভাবিকতা বজায় রাখে এবং নানা রোগ থেকে দেহকে রক্ষা করে। সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজ ব্যক্তির খাদ্যাকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, সেইসঙ্গে অবাঞ্ছিত গ্লুকোজের অনুপ্রবেশও রদ করে। সেলুলোজ-আধিক্যযুক্ত খাদ্যকে স্বাভাবিকভাবে বলে 'র‍্যাফেজ'। ঐ খাদ্য বৃহদন্ত্র থেকে মলের স্বাভাবিক নির্গমন ঘটিয়ে নানা কোলন-ব্যাধি প্রতিরোধ করে। পেকটিন ও লিগনিন কেবল অন্ত্রে গ্লুকোজ-শোষণকেই প্রতিহত করে না, পিত্ত-লবণ ও কোলেস্টেরল-সংগঠক অবাঞ্ছিত ফ্যাটি অ্যাসিডকে শোষণ ও প্রতিহত করে।

সামগ্রিকভাবে আঁশযুক্ত খাদ্য নানা রোগপ্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি বহন করে চলেছে। রক্তে গ্লুকোজ-আধিক্য (হাই ব্লাডসুগার) ও কোলেস্টেরল-আধিক্য হৃদ্‌ব্যাধির কারণ বলেই ঘোষিত। খাদ্যের মধ্যে অতিরিক্ত তন্তু উপাদান থাকলে তারা যেমন অন্ত্রে গ্লুকোজ-শোষণের মাত্রা কমায়, তেমনই কোলেস্টেরল ও পিত্ত-লবণ উৎপাদক ফ্যাটি অ্যাসিডের শোষণেও বাধা দেয়। অতিরিক্ত কোলেস্টেরল রক্তে না যাওয়ার অর্থ হৃদ্‌যন্ত্রকে সুস্থ রাখা। পিত্ত-লবণের ঘনত্ব না বাড়ার অর্থ পিত্ত-পাথুরি বা গলস্টোন থেকে পিত্তাশয়কে সুরক্ষিত করা। এইসব ব্যাপারে সাহায্য করে একমাত্র তন্তুখাদ্য। দেহে মেদবাহুল্য ও তজ্জনিত নানা ব্যাধির কথা আজ প্রায় সকলেরই জানা। দেহে অবাঞ্ছিত মেদ দূর করার কোন ওষুধ নেই; ব্যায়াম ও ভ্রমণই এই অসুস্থতার সম্ভাব্য মোকাবিলা। সেক্ষেত্রে বিকল্প চিকিৎসা হলো পর্যাপ্ত তন্তুখাদ্য গ্রহণ—যা দেহে অতিরিক্ত মেদ সংযোজন প্রতিরোধ করতে পারে। বৃহদন্ত্র বা কোলনে বা মলদ্বারে পাইলস ও ফিসার ঘটে কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে। তন্তুখাদ্য সেক্ষেত্রেও বড় দাওয়াই। তারা অন্ত্রের বিচলনকে স্বাভাবিক রেখে দেহের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মন্তব্য হলো ঃ তন্তুখাদ্য বৃহদন্ত্রে ক্যানসার-সংগঠক (কার্সিনোজেনিক এলিমেন্ট) বহু দ্রব্যের শোষণ রদ করে কোলন-ক্যান্সার প্রতিবিধানে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

ভারতের 'ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন' (হায়দ্রাবাদ) প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় যে, ভারতীয় খাদ্যতালিকায় গৃহীত প্রতি ১০০ গ্রাম চাল, ডাল, আপেল, কলা, আঙুর, বীন, মটর, শাক ও আলুর মধ্যে তন্তুখাদ্য থাকে যথাক্রমে ০.১০ গ্রাম, ৫ গ্রাম, ১ গ্রাম, ০.৪০ গ্রাম, ২.৮ গ্রাম, ১.৮ গ্রাম, ৪ গ্রাম, ১ গ্রাম এবং ০.৪ গ্রাম। এই তালিকায় আরো বলা হয়েছে যে, অধিক তন্তু-সমৃদ্ধ খাদ্য হলো ডাল, বিশেষ করে মটর। বিভিন্ন সবজির মধ্যে ঢেঁড়শ, সোয়াবিন, শশা, বেগুন, বরবটি, পেয়াঁজ, বাঁধাকপি, মুলা প্রভৃতি তন্তু-উপাদান সরবরাহে সক্ষম। তাই পুষ্টিবিশেষজ্ঞদের বক্তব্য—খাদ্যোপাদানে যতখানি সম্ভব তন্তুখাদ্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটানো দরকার। 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগ্যানাইজেশন' (WHO) প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতি হাজার কিলো ক্যালরি তাপ-উৎপাদক খাদ্যের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে ২২-২৩ গ্রাম তন্তুখাদ্য থাকা জরুরী। ঐ সরকারি সংস্থা বিশেষ নির্দেশনামায় জানায় যে, দৈনিক খাদ্যতালিকায় কমপক্ষে ৪০-৫০ গ্রাম তন্তুখাদ্য যেন থাকে এবং বিজ্ঞানসম্মত পুষ্টিতালিকায় এটি আবশ্যিক।

তন্তুখাদ্যের বিস্ময়কর কার্যকারিতা ক্রমশই বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ছে। গম ও জই-এর ভুসির প্রসঙ্গ আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আমেরিকার 'জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন' ইসুবগুলের (সাইলিয়াম উদ্ভিদের বীজের খোসা) কার্যকারিতার ওপর নতুন আলোকপাত করেছে। এই তন্তু-প্রধান দ্রব্য কেবল রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণই করে না, এর মাত্রা কমাতেও তার জুড়ি নেই। তাই ঐ ভুসি রুটির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখেছেন, ইসুবগুল-ভুসি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ৮-২০ শতাংশ কমাতে পারে ৬ মাসের মধ্যে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, বাঁচার জন্য খাদ্যভক্ষণ জরুরী হলেও খাদ্যের মাধ্যমেই ঘটছে নানা মারাত্মক ব্যাধির বিস্তার। তাই সঠিক পথ্যতালিকা নির্বাচন সকলের ক্ষেত্রেই জরুরী। সেখানে অবশ্যই যেন তন্তুখাদ্য থাকে, কারণ তন্তুখাদ্য আজ আর কেবল নিছক খাদ্যোপাদান নয়—সে একাধারে রোগ-প্রতিরোধক ও স্বাস্থ্য-সুরক্ষক। ❑

'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

বিশেষ প্রতিনিধি : আধুনিক ভারতবর্ষের নবজাগরণের অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ জাতির উদ্বোধনকল্পে প্রবর্তন করেছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকা। দীর্ঘ শতবর্ষের পথ অতিক্রম করে স্বামী বিবেকানন্দের মানসসন্তান 'উদ্বোধন' দ্বিতীয় শতকে পদার্পণ করল। ভারতবর্ষের সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে এটা সর্বকালের রেকর্ড। বলা বাহুল্য, শতবর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের যে অনন্য কীর্তি 'উদ্বোধন' রচনা করল, দূর ভবিষ্যতে অন্য কোন পত্রিকা তা স্পর্শ করলেও প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব শুধুই 'উদ্বোধন'-এর। ভারতবর্ষের সাময়িক পত্র-পত্রিকার মহাকাশে 'উদ্বোধন' এক ও অনন্য ধ্রুবতারার মতো চির-উজ্জ্বল।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির স্মরণে গত ১লা মাঘ ১৪০৫ (১৫ই জানুয়ারি ১৯৯৯) উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হল'-এ এক মহতী আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি-রূপে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক এবং 'দেশ' পত্রিকার প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী।

১০১তম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা ৬টায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আলোচনাসভার সূচনা হয়। 'উদ্বোধন'-এর ১০১তম বর্ষে পদার্পণ-সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। প্রথম আলোচক তরুণ গোস্বামী দৃঢ় ও প্রাঞ্জল ভাষায় 'উদ্বোধন'কে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন, আশা ও চিন্তার উজ্জ্বল বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন : 'উদ্বোধন' পত্রিকা নিয়ে স্বামীজীর গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গুরুভাইদের কাছে লেখা প্রায় ২০টি চিঠির মধ্যে। তিনি পত্রিকাটিকে জনমুখী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করতে। আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাববিনিময়ের এক সুদৃঢ় সেতু নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যকে যেমন দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের মহান অধ্যাত্মবাদের আদর্শ, তেমনি ভারতবাসীকে শুনিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের প্রচণ্ড
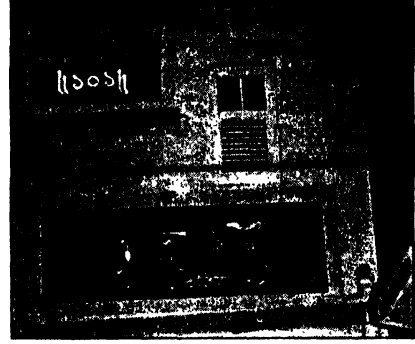
উৎসব-সন্ধ্যায় উদ্বোধন কার্যালয়ের প্রবেশদ্বার

কর্মোদ্যম ও বীর্যবত্তার বাণী। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার মধ্যেও সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন উভয় আদর্শকে—যা মানবজাতিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সত্ত্বগুণের ধুয়ো ধরে এদেশের মানুষ ক্রমশ তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। তাই তাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন রজোগুণের উদ্দীপন এবং সেই উদ্দীপনকে জাতির শিরায় শিরায় বহমান করার জন্য এক সুদৃঢ় হাতিয়ার। বলা বাহুল্য, 'উদ্বোধন'ই ছিল তাঁর সেই অমোঘ হাতিয়ার—তাঁর বজ্র।

'উদ্বোধন'-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তরুণ গোস্বামী বলেন : 'উদ্বোধন'-এর এই গ্রাহকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির পিছনে রয়েছে 'উদ্বোধন'-এর প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ভালবাসা। কাউকে জোর করে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক করা হয় না। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে দীক্ষা নিলে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হতে হবে—এমনও কোন নিয়ম নেই। সম্ভবত গ্রাহকবৃন্দের বৃহত্তর অংশই অদীক্ষিত। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় মানুষ 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হয়। দ্বিতীয়ত, 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান ৪০,০০০ গ্রাহকের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা কার্যালয়ে নথিভুক্ত রয়েছে। (এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় গ্রাহকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫,০০০।) সংবাদপত্র-এজেন্টের মাধ্যমে 'উদ্বোধন' বিতরিত হয় না এবং আজকের বিনোদন ও প্রলোভন-সর্বস্ব পত্র-পত্রিকার যুগে 'উদ্বোধন'-এর জনপ্রিয়তা এক অনন্য ব্যতিক্রম।

পরিশেষে তরুণ গোস্বামী বলেন : স্বামীজী তাঁর প্রিয় 'উদ্বোধন'কে আদর করে বলতেন 'উদ্বন্ধন' অর্থাৎ 'ফাঁস'। বলা

আলোচনাসভায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং তরুণ গোস্বামী

আলোকচিত্র : দাসানুদাস সাহা

বাহুল্য, এই 'ফাঁস' তাঁর ভালবাসার 'ফাঁস'। 'উদ্বোধন' একবার পড়লেই এই 'ফাঁস'-এর 'গ্রাস'-এ পাঠককে পড়তেই হবে!

এরপর শ্রীসারদা-সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুশান্ত দত্ত। তারপর সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিমায় 'উদ্বোধন'-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন : বর্তমান যুগ পত্র-পত্রিকার মড়কের যুগ। চারদিকে আমরা বহু পত্র-পত্রিকাকে একে একে উঠে যেতে দেখেছি ও দেখছি। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে 'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশ ও ক্রমাগত গ্রাহকসংখ্যার বৃদ্ধি স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়—মানুষ কেন 'উদ্বোধন'কে গ্রহণ করছে? এর একটাই কারণ—'উদ্বোধন' মানুষকে দিচ্ছে চেতনা, শোনাচ্ছে আত্মার অমর সঙ্গীত, দেখাচ্ছে উত্তরণের পথ। আজকালকার প্রায় সব পত্রিকাকেই রঙচঙে করে নানা সস্তার বিনোদনের উপকরণ দিয়ে মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও পত্রিকাগুলির গ্রাহকসংখ্যার ক্রমাবনতি রোধ করা যাচ্ছে না। অথচ এর পাশে 'উদ্বোধন' এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। অন্যান্য বিনোদন-সর্বস্ব পত্রিকাগুলির মতো 'উদ্বোধন'কে লুকিয়ে পড়তে হয় না, ৮ থেকে ৯৮—পরিবারের সব বয়সের সদস্য একসঙ্গে এই পত্রিকা পড়ে। আমার খুব আনন্দ হয়, যখন দেখি—ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এবং তরুণ-তরুণীরাও খুব আগ্রহের সঙ্গে 'উদ্বোধন' পড়ছে।

আলোচনাসভায় শ্রোতৃসমাবেশের একাংশ

তিনি আরো বলেন : স্বামীজী ধর্মকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে বলেছিলেন। তাঁর মহান আচার্য সমাধির উপকূলে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের চৈতন্য হোক"। তিনি বলতে পারতেন—তোমাদের ভগবানলাভ হোক। তা কিন্তু তিনি বলেননি। কারণ, 'ভগবান' ওপর থেকে পড়েন না—সমাজ থেকেই জন্মান। এজন্যই প্রয়োজন ধর্মের সঙ্গে সমাজের সুগভীর মেলবন্ধন। বলা বাহুল্য, এই ধর্ম জাতি-বর্ণ-দেশের মধ্যে আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ আচারসর্বস্ব ধর্ম নয়, এই ধর্ম সমগ্র বিশ্বমানবকে আত্মচেতনায় উদ্বোধিত করার ধর্ম। আজকের ভোগক্লান্ত, হতাশাগ্রস্ত জাতির সঙ্কটমুহূর্তে এই চেতনার জাগরণের পবিত্র ভূমিকা পালন করে চলেছে স্বামীজীর 'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন'-এর বাণী তাই দেশ-বর্ণ-কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়—এর ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। মানুষ সঙ্কটে পড়ে কিভাবে নিজেকে উদ্বোধিত করবে—শতবর্ষ ধরে তারই দিঙ্‌নির্দেশ করে চলেছে 'উদ্বোধন'।

এরপর সভাপতির ভাষণে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বলেন : 'উদ্বোধন' ১০০ বছর অতিক্রম করে পদার্পণ করল নতুন শতাব্দীতে। এটি একটি প্রতীকী ঘটনা। আবার 'উদ্বোধন'-এর পরের জন্মবর্ষে সূচনা হবে এক নতুন শতাব্দীর। সেটিও হবে আরেক প্রতীকী ঘটনা। 'উদ্বোধন' বিগত শতাব্দীর বার্তা বহন করেছে, আবার তার পরবর্তী শতাব্দীর এবং ইতিহাসের নতুন শতাব্দীরও ইতিবাচক বার্তা বহন করে চলবে 'উদ্বোধন'। সুতরাং 'উদ্বোধন'-এর নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ দুটি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ১০০ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পরবর্তী ১০০ বছরে নতুন বার্তা দেওয়ার জন্য সে উদ্‌গ্রীব। আবার ইতিহাসের আগামী শতাব্দীতেও যুগোপযোগী বার্তা দেওয়ার জন্যও সে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যকে বহন করে 'উদ্বোধন' একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে 'উদ্বোধন' যেন বলছে, একবিংশ শতাব্দীর জন্য ইতিবাচক বার্তা বহনেও সে দায়বদ্ধ।

'উদ্বোধন' পত্রিকার পরিচালনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন : আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে আমি যখন 'উদ্বোধন' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ আমাকে বলেছিলেন—'উদ্বোধন' পত্রিকাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তা যেন সর্বার্থে একটি পারিবারিক পত্রিকায় পরিণত হয়। এই পত্রিকায় এমন উপাদান ও উপকরণের সমাবেশ ঘটাতে হবে যাতে পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ থেকে সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্য পড়ার মতো বিষয় পায়। আবার মাঝামাঝি যারা থাকবে তারাও যেন তাতে আগ্রহের উপাদান পায়। তাঁর নির্দেশ স্মরণ রেখে ছোটদের জন্য একটি আলাদা বিভাগ 'উদ্বোধন'-এ খোলা হয়েছে এবং তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের জন্য 'যুবভাবনা' ও 'ক্রীড়াজগৎ' বিভাগ চালু হয়েছে। এছাড়া আরো নানা বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে 'উদ্বোধন'কে নিত্য-নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা চলেছে—যে বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা 'উদ্বোধন'-এর মহান প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং পত্রিকার জন্মলগ্নেই ঘোষণা করেছিলেন। স্বামীজী একটি ব্যাপারে তৎকালীন সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে সতর্ক থাকতে বলতেন। সেটি হলো নির্ভুল প্রকাশনা। পত্রিকায় কোন মুদ্রণ-প্রমাদ বা ভাবের হানি দেখলে স্বামীজী কিরকম অসন্তুষ্ট হতেন তা অনেকেই জানেন। আমরা তাই চেষ্টা করি পত্রিকাকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার। 'উদ্বোধন'-এর কর্মীরা জানেন, প্রতি মাসে পত্রিকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন স্বামীজী স্বয়ং। 'উদ্বোধন' একটা পত্রিকা মাত্র নয়, 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ। দেহ শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীরও। এর শিরায় শিরায় প্রবাহিত স্বামী বিবেকানন্দের শোনিত। তাই ১০০ বছর অতিক্রম করলেও 'উদ্বোধন'-এর শরীরে স্থবিরতা নেই, নেই বার্ধক্যের লক্ষণ। 'উদ্বোধন'-এর ওপর রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ শক্তি ও আশীর্বাদ। যতদিন জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী থাকবেন, ততদিন থাকবে 'উদ্বোধন'। গণ্ডিহীন 'উদ্বোধন' আমাদের প্রতি মুহূর্তে আশার বাণী শুনিয়ে যাবে : ভয় নেই, আমি আছি। আমি থাকব। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তাবহনে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি বিবেকানন্দের শঙ্খ—আমি বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর।

এরপর সুশান্ত দত্তের বিবেকানন্দ-সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সমাগত প্রায় ৯০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদের প্যাকেট দেওয়া হয়। 'স্টেটসম্যান', 'বর্তমান', আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান-সংবাদ সুপ্রচারিত হয়। ❑

পাশ্চাত্যে মদ্যপান—অতীতে ও বর্তমানে

আমেরিকায় বর্তমানে মদ্যপানের ফলে ১ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুহার পরিহার্য মৃত্যুসংখ্যার তৃতীয় বৃহত্তম—প্রথম দুটি হলো ধূমপান এবং যে-অসুখগুলি খাদ্যাভাবে ও বসে সময় কাটানোর ফলে হয় (sedentary way of life)। ঠিক হিসাব না দিতে পারলেও আমেরিকায় এখন দেড় থেকে দুই কোটি লোকের জীবনে মদ্যপান নানা সমস্যা এনেছে। সেদেশে এখন ৪০ শতাংশ লোক পরিবারে একজনের অত্যধিক মদ্যপানের কুফল ভোগ করছে। প্রতি বছর মদ্যপানাসক্ত মায়ের ১২,০০০ শিশুসন্তান তাদের জীবনের ভাবী সম্ভাবনা (potential) থেকে বঞ্চিত হচ্ছে—শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা নিয়ে বা পূর্ণ 'ভ্রূণের মদ্যপান-চিহ্ন' (foetal alcohol syndrome) নিয়ে। মদ্যাভ্যাস ছাড়ানোর জন্য কোন ভাল ওষুধ নেই, থাকলেও তা পুরোপুরি রোগ ভাল করতে পারে না। মদ্যপান থেকে সম্পূর্ণ বিরত হওয়াই একমাত্র কার্যকরী পথ। অত্যধিক পানাসক্তি (alcoholism) যে একটি অসুখ, তা সবেমাত্র স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং সম্প্রতি বাজারে ঘন মদের (concentrated alcohol) উপস্থিতি আরো অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অত্যধিক মদ্যপানে আমাদের শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা উদ্ভাবনে আমাদের গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

অনেক ধরনের অ্যালকোহল আছে, তার মধ্যে মদ হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল। এটি বহুমুখী দ্রব্য—সামাজিক মেলামেশার প্রাঙ্গিক (social lubricant), বড়লোকদের খানাপিনার সঙ্গী, হৃৎপিণ্ডের কাজে সহায়ক অথবা সর্বাত্মক ধ্বংসের কারণ। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, সুরামিশ্রিত পানীয়ের (alcoholic beverages) কাজ ছিল অন্য ধরনের। গত ১০,০০০ বছরের অধিকাংশ সময়ে এই ধরনের পানীয় প্রতিদিন ব্যবহৃত হতো এবং শরীরে তাপ ও জলীয় পদার্থ (fluid) দান করার অপরিহার্য উৎস ছিল। সর্বত্র সংক্রামিত ও বিপজ্জনক জল থাকায় মধ্যযুগে অ্যালকোহলের নামকরণ হয়েছিল 'জীবনীশক্তির পানীয়' ('aqua vitae' বা 'water of life')।

কোটি কোটি বছর ধরে খাদ্যে অ্যালকোহল বর্তমান থেকেছে। ঈস্ট (yeast) জীবাণু শর্করাকে ভেঙে শক্তি আহরণের সময় বর্জিত বস্তু (by-product) হিসাবে অ্যালকোহল তৈরি হয়। পচা ফলে থাকা অ্যালকোহল খেয়ে পাখি বা স্তন্যপায়ী জন্তুর মত্ততা লক্ষ্য করা গেছে। কোটি কোটি বছরে মানবশরীরে অ্যালকোহল ভাঙার 'জিন' (gene—বংশগতির নিয়ন্ত্রক উপাদান) সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো অতীতে প্রস্তরযুগের মানুষ দীর্ঘদিন পড়ে থাকা মধুতে অ্যালকোহলের স্বাদ পেয়েছিল। শস্যদানা থেকে বিয়ার তৈরি হতো মিশর ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে—যেখানে গম উৎপাদন হতো প্রচুর। ফলের রস থেকে 'ওয়াইন' তৈরি হয়েছিল পরে। সাধারণ ফলে শর্করা থাকে কম। ওয়াইন তৈরি করার জন্য আঙুর-চাষ বাড়ানো হলো এবং বোধহয় খ্রীস্টপূর্ব ৬,০০০ বছর আগে আর্মেনিয়াতে প্রথম ওয়াইন তৈরি হয়। সেখানে অনেক শহরে বা গ্রামে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ লোককে পরিশ্রুত পানীয় দিতে পারছিল না। কত হাজার হাজার মানুষ তখন দূষিত জল পান করে মারা গেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাছাড়া দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রায় নিরাপদ পানীয় জল পাওয়াও কঠিন ছিল। ক্রিস্টোফার কলম্বাস তাঁর নৌযানে ওয়াইন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এ জলপানের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। হিপোক্রেটিস ঝরনার জল এবং গভীর কূপের জলকে অথবা চৌবাচ্ছায় ধরা বৃষ্টির জলকে নিরাপদ পানীয় বলেছেন। প্রাচীনকালের মানুষেরা তাঁদের অভিজ্ঞতায় বেশির ভাগ স্থানের জলকেই মানুষের পানের অযোগ্য বলে গেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সদ্যজাত পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে ইথাইল অ্যালকোহল মাতৃদুগ্ধ হয়ে দাঁড়াল। অ্যালকোহলের জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতা থাকায় ময়লা জলের সঙ্গে অ্যালকোহল মিশালে তা পানীয় জলে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্য পাশ্চাত্যে মদ তৈরি করার যুগ থেকে ছোট-বড় সকলে জলের বদলে বিয়ার বা ওয়াইন পান করতে শুরু করল। ব্যাবিলনের ৬০০০ বছর পুরনো মৃত্তিকাস্তম্ভেও প্রাতরাশে অবিমিশ্র ওয়াইন পান করার নির্দেশ আছে। প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম। অন্তত গত ২,০০০ বছর ধরে ফুটানো জল, বিশেষত চা করার জন্য, অ্যালকোহল-শূন্য পানীয় তৈরি হয়ে আসছে। তাছাড়া এশিয়ায় অ্যালকোহল ব্যবহার না হওয়ার অন্যতম কারণ জিন-সংক্রান্ত। অর্ধেক এশিয়াবাসীর শরীরে অ্যালকোহল হজমের জিন নেই এবং সেজন্য মদ্যপান তাদের ঠিক সহ্য হয় না। সেজন্য পাশ্চাত্য সমাজেই বিয়ার ও ওয়াইন প্রধান পানীয় হয়ে রয়ে গেল।

প্রাচীন যুগের সুরামিশ্রিত পানীয়তে এখনকার মতো বেশি পরিমাণে অ্যালকোহল থাকত না এবং সে-যুগের লোকেরা মদ্যপানের কুফল সম্বন্ধেও অবগত ছিল। সেজন্য হিব্রু, গ্রীক ও রোমান কৃষ্টির গোড়া থেকেই এসম্বন্ধে সংযমের কথা বলা আছে। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ মাতাল হওয়ার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করা আছে। 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এ যীশুখ্রীস্ট জলকে সুরাতে পরিণত করেছিলেন। এর মানে হলো—নোংরা জলের চেয়ে মদ ভাল। যীশুপন্থীরা মদ্যপান করা এবং না করার মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন, তবে মদ্যপান কখনো নিষিদ্ধ করেননি।

প্রথাগতভাবে জনসাধারণ বিয়ার এবং ধনীরা ওয়াইন পান করে। প্রায় ১৩০০ বছর ধরে গির্জার কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে বড় ও ভাল জাতীয় আঙুরের চাষ করত এবং বিরাট পরিমাণে অর্থও এ থেকে রোজগার করত। মদ্যপানের বিরুদ্ধে কেউ কেউ বললেও জনসাধারণকে তার নিরাপদ বিকল্প কিছু দিতে পারেনি। ৯০০ বছর ধরে কম পরিমাণ অ্যালকোহল-থাকা বিয়ার ও ওয়াইন চালু থাকার পরে পাতনপ্রথা (distillation) জানা গেল এবং তখন ঘনীভূত অ্যালকোহল থাকা মদ তৈরি হলো। এটা হয়েছিল ৭০০ খ্রীস্টাব্দে আরবদেশে। যদিও ঈস্ট জীবাণু অ্যালকোহল তৈরি করে, তারা ১৬ শতাংশের বেশি অ্যালকোহল হলে বাঁচে না। ঘনীভূত অ্যালকোহল তৈরির প্রথা ইউরোপে এল ১১০০ খ্রীস্টাব্দে।

উনবিংশতি শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অধিক মদ্যপানের কুফল সম্বন্ধে প্রথম জানা গেল। আজ আমরা জানি যে, আমেরিকা ও সারা জগতে মদ্যপান স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে। **[Scientific American, June 1998, pp. 80-85]** ❑

'কথামৃত' মানুষের শাশ্বত প্রেরণা

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

শ্রবণমঙ্গল—বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : তপনকুমার ঘোষ, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। পৃষ্ঠা : ৬৪। মূল্য : ২৫ টাকা।

একটি বহুজাতিক সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজারের কাছে শুনেছিলাম, আধুনিক ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণও একশ বছর আগের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর ব্যবহারিক জ্ঞানের চেয়ে এক কদম এগতে পারেনি। ম্যানেজমেন্টে জোর দেওয়া হয় চারটি বিষয়ের ওপর—মোটিভেশন, ডেলিগেশন, লিডারশিপ ও কমিউনিকেশন। এসবেরই শেষকথা ঐ 'কথামৃত'। অভিধান বলছে, মোটিভেশন হলো একটা চালিকাশক্তি, কিছুর মধ্যে যেন বিদ্যুৎসঞ্চার, কিছু করার জন্য কারো ভিতরে উদ্দীপন জাগানো—that which causes somebody to act। সেদিক দিয়ে দুনিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে বড় 'মোটিভেটর' আর কে কখন হয়েছেন? জীবনমুখী ও জগৎপ্রেমী শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মানুষের একটিই লক্ষ্য—ঈশ্বরলাভ। একমাত্র উপায়—ব্যাকুলতা। আর সেই পথে যাবতীয় বিঘ্ন কাটাতে চাই শারীরিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক বল। 'ম্যাদাটে' ভাব ঘুচিয়ে সকলের মধ্যে অনিবার্য-ভাবে চেতনার স্ফুলিঙ্গ সঞ্চারই শ্রীরামকৃষ্ণের মোটিভেশনের দৃষ্টান্ত—আজকের পরিভাষায় 'হিউম্যান ম্যানেজমেন্ট'।

সন্ন্যাসী-সংসারী, উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, সৎ-অসৎ সকলের উদ্বোধন ঘটিয়ে সত্য ও ঈশ্বরের পথে পরিচালনা করার 'দায়' গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর সেই ভাব ও আদর্শকে দেশে বিদেশে "সংসারের সর্বত্র" ছড়িয়ে দেওয়ার 'মিশন' তিনি 'ডেলিগেট' করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ-সহ তাঁর ত্যাগী পার্ষদবৃন্দকে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে একদিন দুঃসহ রোগযন্ত্রণার সময় নিজের সবটুকু আধ্যাত্মিক শক্তি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : "আজ তোকে সব দিয়ে ফকির হলুম!"

এই 'ডেলিগেশন'-এর আগে উনিশ শতকের রেনেশাঁসে আত্মা-জাগানিয়া (self-awakening) আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে-ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে। শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে দিয়েছিলেন এক কালাতীত, বিশ্বজনীন, সমন্বয়ী আদর্শ। তিনি বললেন : ধর্ম হলো ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথ। এগিয়ে যাও পথের শেষ প্রান্তে। গিয়ে দেখ তাঁকে, যিনি অশেষ। তাঁর কাছে গেলে সব গোলমাল মিটে যায়। আজ গোটা বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পরমত-সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের পথই যে প্রধানতম অবলম্বন তা ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝতে পারছে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের নেতৃত্ব হয়ে উঠছে এখন এক অমোঘ সত্য।

অধ্যাত্মসাধনার শীর্ষমার্গে আরোহণ করে 'মূর্খোত্তম' শ্রীরামকৃষ্ণের যে জীবনাতীত অনুভূতি হয়েছে তাই 'কথামৃত' হয়ে ঝরে পড়েছে "অনর্গল আধ্যাত্মিক বাক্যধারায়"। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কিন্তু তার আগে তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু ইশারা-ইঙ্গিত তো চাই। ঈশ্বরভূমির এইসব প্রাথমিক খুঁটিনাটি বিষয়ে সমকালীন ও অনাগত কালের মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এটাই তাঁর 'কমিউনিকেশন'-এর জাদু। ছোট ছোট কথায়, উপকথায়, কথাচ্ছলে গল্পের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অতি সহজ, সরল, সরস সংলাপ সমগ্র বিশ্বের অগণিত মানুষের চিন্তা ও চেতনায় 'মোড় ফিরিয়ে' দিয়েছে। 'কথামৃত'-এ সন্ন্যাসীরা পেয়েছেন তাঁদের সাধনপথের উচ্চতম আদর্শ এবং সংসারী, গৃহী মানুষেরা পেয়েছে দ্বন্দ্বপূর্ণ জীবনপথে নিঃসংশয়ে এগিয়ে চলার উজ্জ্বলতম নিশানা। জীবনকে চরিতার্থ করার প্রণালী ও পদ্ধতির টানে সর্বস্তরের মানুষ ক্রমাগত আরো বেশি করে আকৃষ্ট হচ্ছে 'কথামৃত'-এর প্রতি। ক্রিস্টোফার ইশারউড 'কথামৃত'কে বলেছেন "Eternal now"—নিত্য নবীন। কারণ অতীত বা ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। তিনি নিত্য বর্তমান। আর 'কথামৃত'-এর ছত্রে ছত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য সাহচর্য পাঠককে সেই ঈশ্বরানুভূতির সঙ্গেই সম্যক পরিচয় করিয়ে দেয়। সাধারণ কথ্য ভাষায় ধর্মজীবনের অতি উচ্চ তত্ত্বের সাবলীল ব্যাখ্যা, গার্হস্থ্য জীবনের কেল্লার ভিতরে থেকে যুদ্ধ করার যে-কৌশল শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথোপকথনের মাধ্যমে শিখিয়ে গেলেন, আজকের দিনে mass communication বা গণজ্ঞাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তা ছাড়া আর কী হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণীগুলিই 'লঘুলিপির মতো বিশ্বস্ততার সঙ্গে' লিখে গেছেন মাস্টারমশায়—'শ্রীম'। কিন্তু গ্রন্থে তাঁর উপস্থিতি অন্তরালে। তাই 'কথামৃত' হয়ে উঠেছে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।

বার বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিদিন যে-গ্রন্থ পড়লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় বলে রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর বিশ্বাস, তাঁদের কাছে 'কথামৃত'-এর মাহাত্ম্য অনস্বীকার্য। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ ভক্তমণ্ডলীর বাইরেও যে বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের জন্য সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্পগুলি চলিত গদ্যে পরম্পরা অনুযায়ী সকলের উপযোগী করে পরিবেশনের প্রয়োজন ছিল। বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক সেই কাজটিই অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে করেছেন তাঁর **'শ্রবণমঙ্গল'** গ্রন্থে। উপলক্ষ্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শতবর্ষপূর্তি। লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের বলা পঞ্চাশটি গল্প 'কথামৃত' থেকে চয়ন করে স্থান-কাল-পাত্র-প্রসঙ্গ সহযোগে নতুন করে শুনিয়েছেন। কৌতূহল হয়—শতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ৫০টির বদলে ১০০টি গল্প তিনি উপহার দিলেন না কেন? বাকি ৫০টি গল্প কি গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে পাওয়া যাবে? কারণ, প্রবৃত্তি-তাড়িত ভোগবাদী ও সমস্যা-সঙ্কুল সমাজে 'কথামৃত'-এর প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আজকের দিনে 'ওয়ার্ক কালচার'-এর পরাকাষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ লিখছেন : "কুঁড়েমি তাঁর ধাতে ছিল না। এই ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, এই আবার বাগানের খুঁটিনাটি করছেন। সর্বদাই একটা না একটা কাজ নিয়ে আছেন। কাজের মধ্যে কোন ফাঁকি, কোন ঢিলেমি তিনি বরদাস্ত করতেন না।" এই কর্ম-সংস্কৃতির সার্থক প্রতিফলনও 'কথামৃত'।

'কথামৃত'-এর প্রতিটি ছত্রে প্রখর যুক্তি ও বাস্তববোধের অজস্র হদিস ছড়িয়ে রয়েছে। কাজেই 'কথামৃত' থেকে আহরণ করা পঞ্চাশটি গল্পে সমৃদ্ধ **'শ্রবণমঙ্গল'**ও হয়ে উঠেছে জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার সুলুক-সন্ধানের এক আশ্চর্য খনি। শুধু তাই নয়, এই গল্পগুলির ইশারায় পাঠকবৃন্দও মূল 'কথামৃত'-এর উৎসারিত আলোয় তাঁদের মনের কালো ঘোচানোর প্রেরণা পাবেন। সত্যিই 'কথামৃত' সকল মানুষের সর্বকালের শাশ্বত প্রেরণা। ❑

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমায়ের ১৪৬তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। এদিন সারাদিন ধরে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। দুপুরে প্রায় ৩০,০০০ ভক্তের মধ্যে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

বারাসত রামকৃষ্ণ মঠে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০-১৪ ডিসেম্বর '৯৮ মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, শোভাযাত্রা, সেতার ও সরোদ বাদন, ভক্তিগীতি, কালীকীর্তন, চলচ্চিত্রানুষ্ঠান এবং ধর্মসভার মাধ্যমে যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও মহাপুরুষ মহারাজের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সেতার ও সরোদ বাদন পরিবেশন করেন যথাক্রমে তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ শীল। বিভিন্ন দিন বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী বন্দনানন্দজী, স্বামী গোপেশানন্দ, স্বামী অচ্যুতানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ, স্বামী সৎপ্রভানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দ, স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দ এবং স্বামী ঋতানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অরূপ মুখার্জী, দেবানন্দ চ্যাটার্জী, রাহুল চ্যাটার্জী, নলিনী ঘোষ, তারক পাল, শ্যামাপদ হালদার, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ এবং শঙ্কর ঘোষাল। কালীকীর্তন পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ। চতুর্থ দিন (১৩ ডিসেম্বর) এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। কয়দিনের ধর্মসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন বারাসত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ।

আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮ নভেম্বর '৯৮ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে অপরাহ্নে ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, বক্তা ছিলেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভজন, কীর্তন ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীমা সারদাদেবীর শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ। ভাষণ দেন ডাঃ অমিয়কুমার বিশ্বাস। বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভজন, কীর্তন ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। গত ২৪-২৬ ডিসেম্বর '৯৮ তিনদিনব্যাপী 'ত্যাগব্রত সঙ্কল্প দিবস' উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, কীর্তন, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা, রক্তদান-শিবির, নাট্যাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। এই উপলক্ষ্যে সাতদিনব্যাপী বিশেষ মেলাও বসে। ২৪ ডিসেম্বর অপরাহ্নের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ, ভাষণ দেন অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সম্পাদক নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। বাইবেল পাঠ করেন স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ (ইংরেজী) এবং স্বামী ঋতানন্দ (বাঙলা)। ধ্বনি প্রজ্বলন করেন স্বামী শান্তাত্মানন্দ।

২৫ ডিসেম্বর ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী পুরাণানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী ঋতানন্দ এবং অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক।

২৬ ডিসেম্বর '৯৮ 'নারায়ণসেবা দিবস' উপলক্ষ্যে সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের প্রতিকৃতি-সহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। দুপুরে প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। অপরাহ্নের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী শান্তিদানন্দ, ভাষণ দেন ডঃ পবিত্র গুপ্ত।

হায়দ্রাবাদ মঠ (অন্ধ্রপ্রদেশ) গত ১৮ ডিসেম্বর '৯৮ মঠ-প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উৎসব উদ্বোধন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। তারপর দুদিন ধরে অন্ধ্রপ্রদেশ ভাবপ্রচার পরিষদের দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয় এবং উদ্বোধন করা হয় 'নাগমহাশয় ধাম' নামে একটি কর্মিভবন। উল্লেখ্য, গত ১৭ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার পরিচালিত যুবকল্যাণ বিভাগের সহায়তায় একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ২৫০০ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যোগদান করে।

দিল্লী আশ্রম গত ২১ ডিসেম্বর '৯৮ রামকৃষ্ণ মিশন টি.বি. ক্লিনিক-এর হীরকজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করে। টি.বি. ক্লিনিক-এর একটি মোবাইল মেডিকেল বিভাগের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। এদিন টি.বি. ক্লিনিক ও মেডিকেল কেন্দ্রের কার্যাবলীর ওপর লিখিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন দিল্লীর উপ-রাজ্যপাল বিজয় কাপুর। পরদিন অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। গত ২৩ ডিসেম্বর তিনমূর্তি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'টি.বি.-র সমস্যা ও সমাধান' বিষয়ক একটি সেমিনারেরও উদ্বোধন করেন তিনি।

গত ২৭ ডিসেম্বর **চেন্নাই স্টুডেন্টস হোমের** কর্মিভবনের একটি বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী স্মরণানন্দজী।

কাশীপুর মঠে (কলকাতা-৭০০ ০০২) গত ১-৩ জানুয়ারি ১৯৯৯ মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, পাঠ, অর্কেস্ট্রা-বাদন, গীতি-আলেখ্য, যাত্রাভিনয় ও ধর্মসভার মাধ্যমে 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারি সারাদিনে লক্ষাধিক ভক্ত নরনারীর সমাগম হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী রমানন্দ ও স্বামী শিবময়ানন্দ এবং ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক দীপককুমার গুপ্ত, স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী সর্বলোকানন্দ এবং

হর্ষ দত্ত। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বামী একব্রতানন্দ, স্বামী অনিমেষানন্দ, সঞ্জীব সরকার, দেবাশিস দত্ত, পরিতোষ পাল, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃষকেতু সূত্রধর এবং রুদ্র রায়। 'কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে মোহিত মুখোপাধ্যায় এবং তপন সিনহা ও সম্প্রদায়। অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করে নরেন্দ্রপুর দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ। 'কথামৃত' ও 'ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন যথাক্রমে স্বামী গোপেশানন্দ ও স্বামী ঋদ্ধানন্দ। হাওড়া সমাজ-এর শিল্পিবৃন্দ 'নদের নিমাই' এবং সালকিয়ার রূপ ও রঙ-এর সদস্যবৃন্দ 'ভক্ত প্রহ্লাদ' যাত্রাপালা পরিবেশন করেন। প্রতিদিন ধর্মসভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দজী। তিনদিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী পরেশাত্মানন্দ।

জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন

গত ১২ জানুয়ারি ১৯৯৯ **বেলুড় মঠে** শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, আবৃত্তি, ভজন-সহ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী সমাবেশে সমবেত হয়েছিল।

এদিন **বেলুড় মঠ** কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর জন্মস্থান তথা পৈতৃক বাসস্থানের ভূমিখণ্ডে **সিমলা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার-এ (কলকাতা-৭০০ ০০৬)** স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৭তম জন্মদিবস তথা জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনাসভার আয়োজন করেছিলেন। সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের অনুষ্ঠান। পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তপন সিকদার, বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জয় বক্সী, স্থানীয় পুরপিতা পুলক দাস এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ও সাধারণ নাগরিক এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

সকাল ৯টায় শুরু হয় আলোচনাসভা। সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন আশিস সরকার। স্বাগত-ভাষণে স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ বলেন ঃ দেশ এবং পৃথিবী আজ নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। সবচেয়ে বড় সঙ্কট হলো চরিত্রের সঙ্কট, মূল্যবোধের সঙ্কট। স্বামীজী দিয়েছিলেন চরিত্রগঠনের আদর্শ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শাশ্বত আদর্শ। স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণ করে দেশ এবং পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এরপর চারজন যুব-প্রতিনিধি ভাষণ দেয়—মীনাক্ষী বাটরা (ইংরেজী ঃ মাহেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়) এবং অজিতা চক্রবর্তী, বিপাশা দাস ও ঋতুপর্ণা গাঙ্গুলী (নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়)।

প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক ডঃ অসীম দাশগুপ্ত বলেন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে আপসহীন জাতীয়তাবাদের ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন, যার সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। স্বামীজী ভারতবর্ষের যুবক ও তরুণদের কাছে আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের অগ্নিবাণী দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পিছনে তাঁর বাণী এবং প্রেরণা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেকালের গোয়েন্দা পুলিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিক চার্লস টেগার্ট সরকারের কাছে প্রদত্ত তাঁর গোপন রিপোর্টে ভারতবর্ষের বিপ্লব আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছিলেন। আজকের দিনে ভারতবর্ষের এক বিরাট সমস্যা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শের কথা বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। জাতপাতের ভিত্তিতে বিভেদের মতলবকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং আমাদেরও ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন। বস্তুত, তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার এক প্রধান প্রবক্তা। ধর্মীয় মৌলবাদ ও জাতপাতের ভিত্তিতে ব্যবধান সৃষ্টির প্রয়াসের বিরুদ্ধে এবং মেহনতী মানুষের সপক্ষে এমন উচ্চকণ্ঠ তাঁর আগে ভারতবর্ষে আর কে তুলেছিলেন? তিনি শূদ্র-জাগরণের কথা বলেছেন এবং দেশের জন্য নিজেকে ও নিজের স্বার্থকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ এবং অন্যান্য ভাষণ ও রচনায়। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে তিনি সমাজতন্ত্র এবং শূদ্রজাগরণের কথা বলেছেন।

ডঃ দাশগুপ্ত বলেন ঃ স্বামীজীর জন্মস্থানে রামকৃষ্ণ মিশন পরিকল্পিত স্মৃতিমন্দির এবং সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলা শুধু তাঁদেরই দায়িত্ব নয়, আমাদের সকলেরও পবিত্র দায়িত্ব। একাজে জনসাধারণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন—এই আবেদন সকলের কাছে রাখছি। স্বামীজীর বাড়ির যে-অংশটি 'স্বামীজীর জন্মস্থান'-রূপে চিহ্নিত, সেই অংশটি এখনো রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে আসেনি। আমার অনুরোধ—সংশ্লিষ্ট অংশে যাঁরা বাস করছেন, তাঁরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এই জাতীয় পবিত্র ব্রতে রামকৃষ্ণ মিশনকে সাহায্য করুন। রামকৃষ্ণ মিশন সূত্রে আমি শুনেছি, প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে আরো ৮ কোটি টাকার প্রয়োজন। আমাদের সরকারের সাধ্য সীমিত, তবুও আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—এই টাকা আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দিয়ে আমাদের জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করব।

সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ বলেন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শুধু ভারতবর্ষের মানুষের নয়, গোটা পৃথিবীর সব মানুষের—সব যুগের মানুষের সবথেকে নির্ভরযোগ্য বন্ধু। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠার আহ্বান তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্র' স্বয়ং আবৃত্তি করেন এবং সমবেত সকলকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। মোনালিসা সেন সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষ হয় সকাল সাড়ে ১০টায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠান-শেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১২ জানুয়ারি '৯৯ **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০২৫)** হরিশ পার্কে জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্থানীয় চব্বিশটি বিদ্যালয় ও সংস্থা এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২,০০০। ভাষণ, আবৃত্তি, নাটক ও গান ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। অনুষ্ঠান-শেষে সকলকে খাবার প্যাকেট দেওয়া হয়।

চক্ষুশিবির

গত ১-৫ জানুয়ারি '৯৯ **করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসমিতি (আসাম)** এক চক্ষুশিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ১০২ জন রোগীর অস্ত্রোপচার হয়। গত ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁদের চশমা দেওয়া হয়েছে। শিবিরে মোট ৬৩০ জন রোগীর চক্ষু-পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী শ্রীবৎসানন্দ (গৌর) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে গত ৬ ডিসেম্বর '৯৮ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। উচ্চ ডায়াবিটিস ও পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রায় ১৬ বছর ধরে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি মুম্বাই আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ সালে গুরুর কাছে থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়া তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠান, মায়াবতী, কানপুর, কাশী সেবাশ্রমে কর্মী হিসেবে সঙ্ঘের সেবা করেছেন। তাঁর স্বভাব ছিল সরল ও সদানন্দময়।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী (কানাই মহারাজ) গত ৩১ ডিসেম্বর '৯৮ কলকাতার কোঠারী মেডিকেল সেন্টারে সকাল ৭.২৫ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। ভেন্ট্রাল হার্নিয়ার অবস্ট্রাকশনজনিত ব্যথার জন্য তাঁকে গত ২৮ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় কোঠারী মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়। রাত ১০টার দিকে হঠাৎ তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে এবং ভেন্টিলেটারের মাধ্যমে তাঁর কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। অচৈতন্য অবস্থায় মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাটালেও ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ক্রমশ সুস্থতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর ভোর ৫টা নাগাদ রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। অবশেষে সকাল ৭.২৫ মিনিটে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৩ সালে তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন। পরে তিনি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক হন। ১৯৪৪ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়া মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কর্মিরূপে, চেরাপুঞ্জি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে এবং তদানীন্তন বর্মা ও পূর্ববঙ্গে ত্রাণকার্য পরিচালনা করে তিনি প্রথম জীবনে সঙ্ঘের সেবা করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে পাথুরিয়াঘাটা আশ্রম ১৯৫৭ সালে বর্তমান নরেন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে নরেন্দ্রপুর এক বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র-রূপে বর্তমান পরিণতি লাভ করে। ১৯৭৩ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য পড়াশোনা ছিল। বক্তা হিসেবেও ছিলেন খুব জনপ্রিয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান ছাড়া পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং সিঙ্গাপুর, জাপান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা-সহ পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি ইংরেজী ও বাঙলায় কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন এবং কয়েকটি প্রধান প্রধান উপনিষদ্ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর স্নেহশীল স্বভাব, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং প্রচণ্ড কর্মশক্তির জন্য দেশ ও বিদেশের বহু মানুষ তাঁকে ভালবাসত।

স্বামী দিব্যরূপানন্দ (সমীর) গত ১ জানুয়ারি ১৯৯৯ সকাল ৭.২৫ মিনিটে গোলপার্ক ইনস্টিটিউট অব কালচারে জপরত অবস্থায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগ-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। মাত্র ৫ মাস আগে তিনি চেরাপুঞ্জি আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেহত্যাগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চেরাপুঞ্জি আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। আশ্রমের কাজে তিনি কলকাতায় এসে ইনস্টিটিউটে অবস্থান করছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৭২ সালে রহড়া বালকাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়া তিনি আলং, ইটানগর আশ্রমে কর্মী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুগায়ক, প্রফুল্ল স্বভাব, স্নেহশীল এবং কঠোরকর্মা সন্ন্যাসী। তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছে, আপন স্বভাববৈশিষ্ট্যে তিনি তাদের মন জয় করেছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ৮ জানুয়ারি '৯৯ **স্বামীজীর জন্মতিথি** উপলক্ষ্যে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গত ১৯ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ ও গত ২১ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী সনকানন্দ।

যুবদিবস উদ্‌যাপন : গত ১২ জানুয়ারি **স্বামীজীর জন্মদিন** উপলক্ষ্যে সারদানন্দ হল-এ একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। বেদপাঠের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। তারপর স্বামী সনকানন্দের স্বাগত-ভাষণান্তে 'মনঃসংযম' বিষয়ে সোমনাথ বাগচী, 'চরিত্রগঠন' বিষয়ে সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং 'আদর্শ ভারত গঠনে আমাদের পরিকল্পনা' বিষয়ে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ আলোচনা করেন। বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দ প্রমুখ। দুপুরে উপস্থিত সকলকে মধ্যাহ্নভোজনের প্যাকেট দেওয়া হয়। এরপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা গীতি-আলেখ্য নিবেদন করে। তারপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তরের আসর, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও লিখিত প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা। প্রশ্নোত্তর আসরটি স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ এবং ডঃ কমল নন্দী পরিচালনা করেন। বিকেলে 'বর্তমান যুবসম্প্রদায়ের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে সমাপ্তি-ভাষণ এবং সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক শঙ্কর রায়। ❑

বিবিধ সংবাদ

ভগিনী নিবেদিতার ভারত-আগমন এবং তাঁর বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

গত ১৩ নভেম্বর '৯৮ কলকাতার **সুতানুটি পরিষদ** ১৬নং বোসপাড়া লেনের যে-বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয় প্রথম শুরু করেছিলেন এবং ১৭নং বোসপাড়া লেনের যে-বাড়িতে তিনি ও ভগিনী ক্রিস্টিন বাস করতেন, সেই বাড়ি-দুটির সামনে বোসপাড়া লেনের চৌরাস্তার সংযোগস্থলে এক সুদৃশ্য মঞ্চ নির্মাণ করে বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করে। বিকাল ৫টায় বেদগানের মাধ্যমে আলোচনাসভার সূচনা হয়। সভার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এ. আর. কিদোয়াই। স্বাগত-ভাষণ দান করেন পরিষদের সভাপতি কমল বসু। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, বিচারপতি শ্যামল সেন, অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমান এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্বে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রী এবং আনন্দম কলাকেন্দ্রের শিল্পীরা নিবেদিতার জীবন ও কর্ম অবলম্বনে রচিত দুটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের দুটি পর্বই পরিচালনা করেন পরিষদের অন্যতর যুগ্ম-সম্পাদক গোপীনাথ ঘোষ।

মন্দির ও প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন

সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দিরের উদ্যোগে গত ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৮ বাঁকুড়া জেলার **সোমসার গ্রামে** রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মভিটায় এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে নবনির্মিত মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় সার্বিক গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে সেবামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। মন্দির ও প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উষাকীর্তন, পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, সারাদিনব্যাপী ভজন, বাউল-গান, সাধু-ভক্তসেবা, ধর্মসভা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছিল। অপরাহ্নের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। সারাদিন-ব্যাপী অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতাধিক সাধু ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া ও স্থানীয় অঞ্চলের কয়েক হাজার ভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সোমসার গ্রামের সকল অধিবাসী-সহ ১৫ হাজার ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে সোমসারের অধিবাসীরা সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেন। দামোদরের তীরবর্তী সোমসার গ্রাম উৎসবের আনন্দে প্লাবিত হয়ে যায়।

সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দিরের বহুবিধ গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর এটি সূচনা মাত্র। ক্রমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরশীল প্রকল্প অনতিবিলম্বেই শুরু হতে চলেছে।

প্রসঙ্গত, গত ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে পূজ্যপাদ দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের উদ্দেশে এক স্মরণ-শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও সেদিন ঐ সমাবেশে অন্তত ২,০০০ ভক্ত নরনারী যোগদান করেছিলেন। সমাবেশে পূজ্যপাদ মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ডাঃ সুকুমার মুখার্জী, ডাঃ নিরঞ্জন ব্যানার্জী, সুনীলকুমার রায়, ডঃ সুব্রতা সেন প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পামেলা চক্রবর্তী, সৌম্যকান্তি ঘোষ ও সুশান্ত দত্ত। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবামন্দিরের সম্পাদক ডাঃ গৌর দাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবামন্দিরের সভাপতি করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য।

উৎসব-অনুষ্ঠান

সোদপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৫ ডিসেম্বর '৯৮ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে জয়া চ্যাটার্জী ও লাবনী চক্রবর্তী ভক্তিগীতি নিবেদন করেন এবং স্বদেশরঞ্জন দাস ও সম্প্রদায় 'ভক্ত হরিদাস' পালাকীর্তন পরিবেশন করেন। তারপর সুধীন্দ্রমাধব মুখার্জীর সারদা-সঙ্গীত পরিবেশনের পর স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে ভাষণ দান করেন।

শিবপুর সারদা সেবা সঙ্ঘ (জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও 'কথামৃত' পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন তারাকালী বসু। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে গত ২০ ডিসেম্বর শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাণানন্দ। সভান্তে তিনি ১০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে মশারি বিতরণ করেন।

মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (জেলা—হাওড়া) গত ১০, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর '৯৮ তিনদিন ধরে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব পালন করে। প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বেদ, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি ও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৫০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত ধর্মসভায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা সোমপ্রাণা এবং শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা। তৃতীয় দিন সকালে পল্লী পরিক্রমা এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও স্বামী সোমাত্মানন্দ। সভান্তে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কথকতা ও নৃত্য পরিবেশন করেন শৌভিক চক্রবর্তী ও শেলী সেনগুপ্ত।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (জেলা—হাওড়া) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, ভক্তিগীতি এবং পাঠাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করে। দুপুরে প্রায় ১০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর 'শ্রীশ্রীসারদাপুঁথি' ও 'শতরূপে সারদা' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে সবিতা সাহা ও ভবেশ বিশ্বাস। পাঠের পর ভক্তিগীতি নিবেদন করেন সঙ্ঘের শিল্পিবৃন্দ।

মালকানগিরি রামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (উড়িষ্যা) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভজন, কালীকীর্তন, 'চণ্ডী' ও 'মায়ের কথা' পাঠ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান শেষে প্রায় ২৫০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হারাজাজাও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘের (আসাম) উদ্যোগে গত ১০ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয় স্থানীয় ভক্ত গোলাপসিং বর্মনের বাসভবনে। এই উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে ভজন, বিশেষ পূজা, হোম এবং 'মাতৃসান্নিধ্যে', 'পরমার্থ প্রসঙ্গ' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা' গ্রন্থ থেকে পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে সমাগত ভক্তদের বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রীতিরঞ্জন শর্মার পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন এম. সি. ডাউলা গুপ্ত জুনিয়র কলেজের অধ্যাপিকা বিউটি মজুমদার। ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন গোলাপসিং বর্মন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত উপস্থিত ছিল।

পাঁশকুড়া শ্রীসারদা সঙ্ঘের (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) পরিচালনায় গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে। বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও গীতি-আলেখ্য ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গোয়াবাগান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘে (কলকাতা-৭০০ ০০৬) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক মদন নন্দী। এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠের সাহায্যে ২৫ জন দুঃস্থ মহিলার মধ্যে শাড়ি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (কলকাতা-৭০০ ০২৬) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার আয়োজন করে। সভায় বিষ্ণু চক্রবর্তীর মঙ্গলাচরণান্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন তালুকদারের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন প্রধান অতিথি প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা। সভাশেষে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

বারুইপুর মাঙ্গলিক সংস্থা (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারারানী চক্রবর্তী। এরপর সংস্থার সভ্যেরা 'জগজ্জননী সারদা মা' শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ ভক্ত সমাগত হয়েছিল।

কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, ও পাঠের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অঞ্জলি দাশ, পুলক পোদ্দার প্রমুখ এবং 'চণ্ডী' ও 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সম্বলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (উড়িষ্যা) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে স্থানীয় কনক গুহের বাসভবনে। এই উপলক্ষ্যে গত ২০ ডিসেম্বর স্থানীয় কালীবাড়ি-প্রাঙ্গণে মঙ্গলারতি, পূজা ও পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ। অনুষ্ঠানের শেষে প্রায় ২০০ জন নরনারায়ণের সেবা করা হয়।

রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা সঙ্ঘ (জেলা—নদীয়া) গত ১০, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর '৯৮ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম ও আলোচনাসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। ১২ ডিসেম্বর আয়োজিত যুব-ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ এবং আলোচনা করেন বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সুরেশ্বরানন্দ। ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভক্তসম্মেলনে সভ্যগণ 'মা সারদা' গীতি-আলেখ্য নিবেদন করেন। বিকেলে ভাষণ দেন জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ ও সচ্চিদানন্দ ধর। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী বীরেশানন্দ।

বিরাটী রামকৃষ্ণ কুটীর (কলকাতা-৭০০ ০৫১) গত ১৩ ডিসেম্বর '৯৮ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় বার্ষিক উৎসব ও বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুব-সম্মেলনের আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, সানাই বাদন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজাদি করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ। কীর্তন ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। যুবসম্মেলনে প্রায় ১০০ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী একব্রতানন্দ এবং আলোচনা করেন বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ ও স্বামী সত্যবোধানন্দ। সম্মেলন-শেষে স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ সমাগত সকল ছাত্রছাত্রীকে একটি করে স্বামীজীর বই উপহার দেন।

ভাণ্ডারা শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতিতে (বিদর্ভ, মহারাষ্ট্র) গত ১৮ ও ২০ ডিসেম্বর '৯৮ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন ও সমিতির নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুম্বাই রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দজী এবং ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন পুনা মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভৌমানন্দ ও নাগপুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মস্থানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন সমিতির সভাপতি উমাশঙ্কর দাশ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক ডাঃ বি. টি. আদবানী। বৈকালিক ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও যুগধর্ম' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বাগীশানন্দজী ও স্বামী ব্রহ্মস্থানন্দ। ২০ ডিসেম্বর সমিতির নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট প্রতিষ্ঠা করেন যথাক্রমে স্বামী বাগীশানন্দজী, স্বামী ভৌমানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মস্থানন্দ। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, ভজন ও স্তোত্রপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ট্রাস্ট (কলকাতা-৭০০ ০৭৮) গত ২০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার আয়োজন করে। বিশেষ পূজা ও স্তোত্রপাঠে অরবিন্দ রায়, ভক্তিগীতিতে রশ্মিতা পাঠক প্রমুখ এবং আলোচনায় স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও ডঃ কমল নন্দী অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ২৫ ডিসেম্বর '৯৮ সারাদিনব্যাপী ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে ভজন, ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন পাঠচক্রের সহ-সম্পাদক বলরাম পাল। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' এবং 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে পাঠচক্রের সম্পাদক শঙ্কর মণ্ডল, প্রণতি নস্কর ও অজিতকুমার নস্কর। সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যীশুখ্রীস্ট ও স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন

স্বামী মুক্তরূপানন্দ। সম্মেলন পরিচালনা করেন কৃষ্ণগোপাল নস্কর ও অজিতকুমার নস্কর। সম্মেলনে ৬০ জন ভক্ত, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকার সমাগম হয়েছিল।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২৫-২৭ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিনে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তনের পর অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় প্রায় ৬০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শনী'-র উদ্বোধন করেন বিকাশকলি বসু। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে বিকেলে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৩৫১টি কম্বল ও ১০টি চাদর বিতরণ করা হয় এবং একটি রক্তদান-শিবিরের আয়োজন করা হয়। উৎসবের তৃতীয় দিনে একটি শিক্ষা-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ২৬৩ জন ছাত্র ও কয়েকজন শিক্ষক যোগদান করেন। উৎসবের বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম অছি স্বামী প্রভানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ, স্বামী মুক্তিকামানন্দ, স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা, প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণা, উপাচার্য বাসুদেব বর্মন প্রমুখ। প্রতিদিন নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় 'বিবেকানন্দ ভারতের পথে পথে' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শিত হয় বিজ্ঞানী ডঃ এস. কে. চক্রবর্তী ও সি. কে. ভি. কৃষ্ণমূর্তির অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের চিত্রও।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (আখরাবাড়ি, বরগুনা, বাংলাদেশ) গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সারাদিন-ব্যাপী এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা ও ভক্তিগীতি ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। সন্ধ্যায় বিশ্বশান্তি কামনায় বিশ্বজননীর কাছে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছিল।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য চট্টগ্রামের (বাংলাদেশ) গোয়ালপাড়া নিবাসী **তেজেন্দ্রলাল ঘোষ** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৩০ অক্টোবর '৯৮ ৭৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি চট্টগ্রামের স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্কের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও সমন্বয় কেন্দ্রের তিনি আজীবন সদস্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **বীথি সেনগুপ্তা** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৮ নভেম্বর '৯৮ বেলা ২.৩০ মিনিটে ৬২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চাকরী-জীবনে তিনি প্রথমে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে এবং পরে পাইকপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন ও শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সুমধুর ব্যবহারের জন্য সকলে তাঁকে ভালবাসত।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **হরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী** সামান্য রোগভোগের পর গত ১২ নভেম্বর '৯৮ বেলা ২.১৫ মিনিটে করজপরত অবস্থায় প্রয়াণ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে কর্মিরূপে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করেন। কর্মজীবনের শেষে তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রয়াত হরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী একজন নির্লোভ, সংযমী ও দরদী মানুষ হিসেবে পরিচিতজনের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **কুসুমকুমারী সাহা** গত ১২ নভেম্বর '৯৮ সন্ধ্যা ৬.১০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **মায়া গুপ্তা** গত ১৪ নভেম্বর '৯৮ রাত ১১.০৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৪৫ সালে পূজ্যপাদ মহারাজের কাছে তাঁর দীক্ষা হয়।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **গিরিন্দ্রনাথ দাস** গত ২২ নভেম্বর '৯৮ সকাল ৭.১০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও অনুরাগী পাঠক ছিলেন। চাপড়া বাঙ্গালঝির শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **বীরেন্দ্রকিশোর দাস** গত ২৫ নভেম্বর '৯৮ রাত ১১.৪৫ মিনিটে গুয়াহাটীতে পরলোকগমন করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সাধুর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **শ্যামলাল রায়** ৭৯ বছর বয়সে গত ১ ডিসেম্বর '৯৮ রাত ২.৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। কর্মজীবনে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনে পাসপোর্ট অফিসার হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য দমদম-নিবাসী **সুরেশচন্দ্র দত্ত** গত ৩ ডিসেম্বর '৯৮ ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সঙ্ঘ ও করুণাময়ী আশ্রমের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য **জ্যোতির্ময় বসুরায়** গত ৬ ডিসেম্বর '৯৮ সকাল প্রায় ১০টায় করজপরত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। অতি শৈশব থেকে বেলুড় মঠে যাতায়াতের ফলে নিজ গুরুদেব ভিন্ন স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের দর্শন ও প্রণাম করার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি ২৫ বছর যাবৎ আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক-রূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে প্রায় ১২ বছর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের প্রকাশন বিভাগে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থের সম্পাদনা ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থের রচনা করেন তিনি। তাছাড়া 'উদ্বোধন', 'নিবোধত' প্রভৃতি পত্রিকায় এবং 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রদীক্ষিত **দীননাথ মুখোপাধ্যায়** গত ৬ ডিসেম্বর '৯৮ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের সঙ্গে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রতি বছর খড়দহের শ্যামসুন্দর জীউর দর্শনার্থী বেলুড় মঠের প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ব্রহ্মচারী ও অন্য সাধুদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করতেন তিনি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ওপর তাঁর ছিল অটল বিশ্বাস। ❑

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ
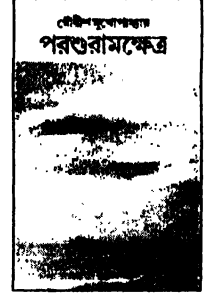
একটি আবেদন

ফোন ঃ ০৩৫২২ ৫৫০২৩
০৩৫২২ ৫৫৯০৬

বালুরঘাট সারদা সংঘ

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন ঃ ৭৩৩ ১০১

সবিনয় নিবেদন,

উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত মহিলা সংস্থা, ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বালুরঘাট সারদা সংঘ (রেজিঃ নং—এস. ৬৮২৮৬, ৯১-৯২)-এর জন্ম ১৯৮৫ সালের ১২ই জানুয়ারি। সাহেবকাছারী শালবাগান সারদাপল্লীতে বনবিভাগ-প্রদত্ত নিজস্ব জমিতে কিছু সেবা ও উন্নয়ন-মূলক কাজে ব্রতী হয়েছে স্থানীয় স্কুল-কলেজ ও অফিসে কর্মরতা মহিলাবৃন্দ, গৃহবধূ এবং বেকার মেয়েরা।

আমাদের পরিকল্পনাতে আছে একটি বাঙলামাধ্যম নার্সারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি ছাত্রীনিবাস, যা রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের শিক্ষাদর্শে ও ভাবধারায় পরিচালিত হবে। গ্রামগঞ্জ থেকে আগত ছাত্রীরা শহরের যেকোন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করলে এই ছাত্রীনিবাসে আশ্রমিক নিয়মকানুন মেনে থাকতে পারবে। আর এখানকার বৃদ্ধাবাসে থাকবেন সেইসব মায়েরা, যাঁরা আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও সন্তান-সন্ততিদের সংসারে নানা অসুবিধার কারণে থাকতে পারেন না। মায়েদের আদরে, যত্নে ও শান্তিতে রাখবার ব্যবস্থা থাকবে। সবকিছুর কেন্দ্রে থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ। সেখানে সন্ধ্যারতির সঙ্গে ভজন-কীর্তন, রামনাম-সঙ্কীর্তন ও ভাগবত, কথামৃত পাঠাদির ব্যবস্থা থাকবে।

এইসমস্ত কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকারের কাছে নিয়মানুযায়ী অর্থের জন্য আবেদন-নিবেদন করে যাচ্ছি, কিন্তু অর্থাভাবে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে আছে। স্থানীয় পৌরসভা থেকে প্ল্যান পাশ করিয়ে বৃদ্ধাশ্রমের ভিত পর্যন্ত করে রাখা হয়েছে, সমস্ত জমিতে প্রাচীর দেওয়া হয়েছে।

আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, আপনারা কৃপা করে সহৃদয়তার সঙ্গে এগিয়ে এসে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করুন এবং যথাসাধ্য দান করে এই প্রচেষ্টা ও সাধনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করুন।

'BALURGHAT SARADA SANGHA'—এই নামে **State Bank of India**-র বালুরঘাট শাখায় ও **'United Bank of India'**-র বালুরঘাট শাখায় চেক বা ড্রাফট পাঠালে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতার প্রত্যাশায়—

বিনীতা

মমতা ঘোষ

সাধারণ সম্পাদিকা, বালুরঘাট সারদা সংঘ

বালুরঘাট, জেলা—দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন ঃ ৭৩৩ ১০১

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বিবিধ নতুন বই

ঐক্য ও সমন্বয় সাধন	স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	৪.০০
ভারতীয় দৃষ্টিতে নারী	স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	৫.০০
গীতা (ছোট)		৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবত-সার	স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	৬.০০
অন্তর্বিজ্ঞান ও বহির্বিজ্ঞান	স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	৬.০০
মহাভারত-কথা	স্বামী তথাগতানন্দ	১০.০০
রামায়ণ-কথা	স্বামী তথাগতানন্দ	১০.০০
স্তুতি	স্বামী ভাবঘনানন্দ	১৫.০০
বেদান্তসার	স্বামী অমৃতত্বানন্দ	১৫.০০
গীতা-সার-সংগ্রহ	স্বামী প্রেমেশানন্দ	১৫.০০
শ্রীরামকৃষ্ণের অষ্টাঙ্গিক মার্গ	স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ	১৫.০০
শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ ভাবগঙ্গা	স্বামী প্রভানন্দ	১৫.০০
মায়ের মহিমায় উদ্ভাসিত দক্ষিণাপথ	স্বামী প্রভানন্দ	২০.০০
স্মৃতি সঞ্চয়ন	স্বামী তেজসানন্দ	২০.০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রূপরেখা	স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	২০.০০
চণ্ডী (পুঁথি)		২৫.০০
কথামৃতের বিলীয়মান দৃশ্যাবলী	জলধিকুমার সরকার	৩০.০০
নবযুগধর্ম	স্বামী গম্ভীরানন্দ	৫০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি	স্বামী চেতনানন্দ	৫৫.০০
যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ	৬৫.০০
ভাগবত-কথা	স্বামী গীতানন্দ	১০০.০০
উপনিষদের সন্দেশ	স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	১০০.০০

ধ্যানের বই

দৈনন্দিন জীবনে দিব্যানন্দ		২.০০
মন নিয়ে কথা		৩.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়—জপধ্যান	স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	৪.০০
মনের শক্তি বৃদ্ধির উপায়		৪.০০
শক্তিদায়ী ভাবনা		৫.০০
মন ও তার শক্তি	স্বামী বিবেকানন্দ	৬.০০
দৈনন্দিন সমস্যা ও তার সমাধান	স্বামী সোমেশ্বরানন্দ	৬.০০
আত্মপ্রভুত্ব	স্বামী পরমানন্দ	৮.০০
ধ্যান	স্বামী ধ্যানানন্দ	৮.০০
ইচ্ছাশক্তি ও তার বিকাশ	স্বামী বুধানন্দ	৮.০০
ধ্যান ও মনের শক্তি	স্বামী বিবেকানন্দ	১০.০০
ধ্যানের গভীরে		১০.০০
দেবত্বের সন্ধানে	স্বামী অশোকানন্দ	১০.০০
মন ও ধ্যান	স্বামী পরমানন্দ	১২.০০
ধ্যান শান্তি আনন্দ	রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ	১২.০০
মন ও তার নিয়ন্ত্রণ	স্বামী বুধানন্দ	১২.০০
পরমলক্ষ্যের পথনির্দেশ	স্বামী গোকুলানন্দ	১৫.০০
ধ্যান ও আনন্দময় জীবন	স্বামী যতীশ্বরানন্দ	১৭.০০
ধ্যান ও প্রার্থনা (সঙ্কলন)		২০.০০
দুঃসাহসিক অভিযান	স্বামী যতীশ্বরানন্দ	২৫.০০
ধ্যান সাধনা সিদ্ধি	স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ	২৫.০০
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা	স্বামী পরমানন্দ	৫০.০০

ভ্রমণ বিষয়ক বই

পরিব্রাজক	স্বামী বিবেকানন্দ	১২.০০
তিব্বতের পথে হিমালয়ে	স্বামী অখণ্ডানন্দ	১৫.০০
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে	ভগিনী নিবেদিতা	১৫.০০
কৈলাস ও মানসতীর্থ		২২.৫০

সুলভ মূল্যের বই

দেবলোকের কথা	স্বামী নির্বাণানন্দ	১৫.০০
বাণী ও রচনা (সঙ্কলন)		২৫.০০

গানের বই

আরতি স্তব ও রামনামসঙ্কীর্তনম্		৪.০০
যুবশক্তির জাগরণ		৭.৫০
স্তব প্রার্থনা সঙ্গীত	(সঙ্কলক) স্বামী শান্তরূপানন্দ	১৫.০০
পাঞ্চজন্য	স্বামী চণ্ডিকানন্দ	১৬.০০
আনন্দ লহরী		৩০.০০

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ শোক তাপ—এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

এক হাতে কর্ম কর, আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

✸

মনে ভাববে—আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন ।

শ্রীমা সারদাদেবী

✸

ধর্ম এমন একটি ভাব, যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

বড় হইতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ
১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব।
৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ

Purity, Patience and Perseverance are the three essentials to success and above all—love.

Swami Vivekananda

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বহির্ভারত

বাংলাদেশ ❑ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া-৯৪৫১৮, টেলি : ৯২৫-৮২৫৯৪৩৩

দিল্লী

- **রামকৃষ্ণ মিশন**
  রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লী-১১০০৫৫
- **পারমিতা ঘোষাল**
  ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী-১১০০১৯
- **মঞ্জুলা ঘোষ**
  সি-৫৩৬, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী-১১০০১৯

আসাম

- **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**, শিলচর
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, করিমগঞ্জ
- **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বঙ্গাইগাঁও
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, জি. এন. বি. রোড
  পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- **পরিমলকৃষ্ণ পাল**
  প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট
  পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়, পিন-৭৮৩৩৭০
- **এম. কে. বুক সেলার্স**
  পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর, আসাম

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম**
  পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫

নাগাল্যান্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিনহা রায়**
  সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল
  নাহারলগন, ইটানগর

উড়িষ্যা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, চক্রতীর্থ, পুরী
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি**
  খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

বিহার

- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- **রীতা ভট্টাচার্য**
  'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর-৮২৩৬৮৮

মধ্যপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি
  জেলা : বস্তার

মহারাষ্ট্র

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার
  মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**
  'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮,
  বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**
  ৮-এ/১১ বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**
  সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র
  ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর
  বরোদা-৩৯১৩২০
- **মোহিতরঞ্জন দাস**
  ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  পোঃ অঙ্কলেশ্বর, পিন : ৩৯৩০১০

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

"নিয়মিত তিল তিল
করিলে সঞ্চয়
ভবিষ্যৎ সুখের হবে
জানিবে নিশ্চয়।"

ESTD.—1932

Peerless Group

UDBODHAN Phone : 554-2248 554-2403 Vol. 101 ◻ No. 2 ◻ FEBRUARY 1999 Licence No. WB/NC/CL-3 ISSN 0971-431 R N. 8793/57 Postal Reg No. WB/N

উদ্বোধন

১০১তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

❑ **উদ্বোধন** এবার **১০১তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০০ বছর অতিক্রম এই প্রথম** ❑

❑ **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

❑ **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি পারিবারিক পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

❑ **উদ্বোধন** বাঙলা ভাষায় শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ **ধর্মপত্রিকা** নয়, **উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ** সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন **সাম্প্রদায়িক ধর্মীয়** আদর্শের মুখপত্র নয়। **উদ্বোধন** তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র **শতবর্ষ** ধরে অটুট রেখেছে।

❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের** ভাব ও বাণী-শরীর।

❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে** উদ্বোধন যেন থাকে। **উদ্বোধন**-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন**-এর গ্রাহকসংখ্যা **এক লক্ষ** হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করা আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের পবিত্র দায়িত্ব আমাদের সকলের।

❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ উদ্বোধন-এর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন—এই আশা রাখি।

❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ** সংখ্যা হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও বেশি হয়। এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের** থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না। শারদীয়া সংখ্যার জন্য গ্রাহক পিছু আমাদের খরচ দাঁড়ায় গ্রাহকমূল্যের প্রায় আড়াই গুণ। এই ঘাটতির জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।

❑ উদ্বোধন পত্রিকার সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য দুটি যথাক্রমে '**স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল**' এবং '**স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল**'। শেষের দুটি তহবিলের অর্থানুকূল্যে ১০১তম বর্ষে 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা চিহ্নিত হচ্ছে। **উদ্বোধন এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর** আইনের ৮০জি **ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'** **এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** চিঠিতে বা M.O কুপনে '**উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়**' অথবা '**স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল**' অথবা '**স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল**'-এর জন্য লেখা থাকে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি দান পাঠালে '**স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য**' অথবা '**স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য**' পাঠানো হচ্ছে **সেই মর্মে দাতার চিঠি থাকা বাঞ্ছনীয়।**

❑ **'উদ্বোধন'-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষ থেকে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' সম্প্রতি নিবেদিত হয়েছে। **১৯৯৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম** ২০ জন **স্থানাধিকারী 'উদ্বোধন'**-প্রবর্তিত **এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে** 'উদ্বোধন' সম্পাদকের **সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ   সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন
।।১০১।।
চৈত্র ১৪০৫ ▫ ৩য় সংখ্যা

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত

বিবেকানন্দ ইল্লম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

বিবেকানন্দ ইল্লম একটি পবিত্র ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই ভবনটি একটি তীর্থক্ষেত্র। স্বামীজী পূর্ণ নয়দিন এখানে অবস্থান করেছেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, উপদেশ দান করেছেন, ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেছেন। তাঁর অদৃশ্য, দিব্য উপস্থিতিতে স্থানটি এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে, শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী চেন্নাইয়ের এই বাংলোয় উঠেছিলেন। তখন বাড়িটির নাম ছিল 'আইস হাউস' বা 'ক্যাসল কার্নন'। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় ভারতের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে তেজোদীপ্ত বাণী প্রদান করেছিলেন তা ইংরেজীতে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বা বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা, আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে এই বাড়িটিতেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত স্বামীজীর বাণীর ঐতিহাসিক পীঠভূমি।

আমরা এখানে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে চাইছি, যেখানে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত হবে। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্রসমূহ, অন্যান্য সুন্দর চিত্র, মডেল, ভিডিওগ্রাফ, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রাণপ্রদ বাণীর প্রচারকেন্দ্র-রূপে এই বাড়িটিকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করছি।

১৮৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই বাড়িটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই পবিত্র কাজটি শুরু করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে এবং স্বামীজীর সকল অনুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের উদার দাক্ষিণ্যে আমরা এই মহান কাজ সম্পন্ন করার আশা রাখি।

এবাবদ সমস্ত আর্থিক দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে দান পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯
ই. মেল : srkmath@vsnl.com
ওয়েবসাইট : www.sriramakrishnamath.org

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
একশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

উদ্বোধন

॥ ১০১ ॥

সূচীপত্র

১০১তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা চৈত্র ১৪০৫ মার্চ ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ১০৫
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
তত্ত্ব ও প্রয়োগের চিরন্তন সমস্যা ১০৬
❑ সঙ্কলন ❑
'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা—শ্রীম ১০৯
❑ ভাষণ ❑
স্বামী যোগানন্দ—স্বামী ভূতেশানন্দ ১১০
❑ নিবন্ধ ❑
শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ১১৬
❑ স্মৃতিকথা ❑
কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের পুণ্যস্মৃতি—স্বামী নির্মুক্তানন্দ ১২০
❑ ধারাবাহিক প্রবন্ধ ❑
অবশেষে বেলুড়ে স্বামী রামকৃষ্ণ মঠ—স্বামী প্রভানন্দ ১১৩
❑ ইতিহাস ❑
সাম্প্রদায়িকতা ও গ্রামের সাধারণ মানুষ—স্নেহময় সিংহ রায় ১২৮
❑ সাহিত্য ❑
ফাল্গুনের দুই কবি : শ্রীরামকৃষ্ণ ও জীবনানন্দ—নিভা দে ১৩৫
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ৩—কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত ১২৩
❑ ক্রীড়াজগৎ ❑
জাতীয় লিগ—প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও ভবিষ্যৎ—
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৬
❑ বিজ্ঞান ❑
ব্লাডপ্রেসার ও অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সংগঠনকারী হেতুগুলি—
শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় ১৪৩
❑ সুস্বাস্থ্য ❑
স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—সত্যানন্দ চক্রবর্তী ১৪৮
❑ পরিক্রমা ❑
মহারাষ্ট্র ও গোয়ায়—মঞ্জুষা দাস ১৩৮
❑ পরমপদকমলে ❑
কুরুক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১৪১
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
রানী রাসমণির জন্মভূমি হালিশহর ১২৪
নব 'পথশীল' ১২৪ উপাধি 'গুপ্ত' নয়, 'গুহ' ১২৫
প্রসঙ্গ : 'উদ্বোধন' ১২৫ টৌটকা ১২৫
❑ কবিতা ❑
নীলকণ্ঠ মহাদেব—বিবেকের আনন্দস্বরূপ—
স্বামী জিতাত্মানন্দ ১১৮
❑ বিশেষ প্রতিবেদন ❑
রামকৃষ্ণ মিশনকে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' প্রদান ১৪৯
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
গ্রন্থ-পরিচয় ● আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-কথা—শান্তি সিংহ ১৫০
আমেরিকার গাইড বুক—সুকান্ত বসু ১৫০
প্রাপ্তিস্বীকার ১৫১
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১৫২
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ১৫৩ বিবিধ সংবাদ ১৫৪
❑ অন্যান্য ❑
অনুষ্ঠান-সূচী (চৈত্র ১৪০৫) ১২২
'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ১৩৭
'উদ্বোধন'-এ রচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ১৪২
❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র : অদ্বৈত আশ্রম
বর্তমান বর্ষের (১৪০৫-১৪০৬/১৯৯৯) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

Statement about Ownership and Other Particulars of

UDBODHAN

FORM IV

Place of Publication :	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700 003	
Periodicity of its Publication :	Monthly	
Printer's Name	Swami Satyavratananda	
Nationality	Indian	
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700 003	
Publisher's Name	Swami Satyavratananda	
Nationality	Indian	
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700 003	
Editor's Name	Swami Purnatmananda	
Nationality	Indian	
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700 003	
Name & Address of Individuals who own the Newspaper	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal	
Swami Ranganathananda	*President*	do
Swami Gahanananda	*Vice-President*	do
Swami Atmasthananda	*Vice-President*	do
Swami Smaranananda	*General Secretary*	do
Swami Shivamayananda	*Asstt. Secretary*	do
Swami Suhitananda	,, ,,	do
Swami Bhajanananda	,, ,,	do
Swami Srikarananda	,, ,,	do
Swami Prameyananda	*Treasurer*	do
Swami Atmaramananda		do
Swami Gautamananda		do
Swami Gitananda		do
Swami Hiranmayananda		do
Swami Mumukshananda		do
Swami Prabhananda		do
Swami Satyaghanananda		do
Swami Tattwabodhananda		do
Swami Vagishananda		do
Swami Vandanananda		do

I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI SATYAVRATANANDA
Signature of Publisher

Date : 1. 3. 1999

Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956
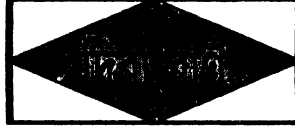
শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে নিবেদিত

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্।। ১

যা চিত্তদর্পণকে নির্মল করে, সংসাররূপ মহা দাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে ও মুক্তিরূপ শ্বেতপদ্মের ওপর জ্যোৎস্না বর্ষণ করে, যা পরাবিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসাগরের স্ফীতি-সম্পাদক, প্রতি পদে পূর্ণামৃত-আস্বাদক এবং সকল আত্মার অবগাহনস্নান-সম্পাদক, সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন বিশেষ জয়যুক্ত হয়। ১

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।। ২

তোমার নামাবলী বহুপ্রকারে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তোমার সকল শক্তি অর্পিত হয়েছে, নামস্মরণ বিষয়ে কোন সময়ের বিধিও নেই, হে ভগবান, তোমার এমনই করুণা; কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে এই জন্মে অনুরাগ জন্মাল না! ২

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।। ৩

তৃণ থেকেও অবনত এবং বৃক্ষ থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, নিজের অভিমান ত্যাগ করে এবং অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে সর্বদা শ্রীহরির কীর্তন করা উচিত। ৩

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।। ৪

হে জগদীশ, আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা সর্বজ্ঞত্ব কামনা করি না; হে ভগবান, তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়। ৪

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়।। ৫

হে নন্দসুত, দুস্পার ভবসিন্ধুতে পতিত দাস আমাকে কৃপাপূর্বক তোমার চরণকমলের ধূলির সমান মনে কর। ৫

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।। ৬

তোমার নাম গ্রহণে কখন আমার নয়ন গলদশ্রুধারায়, বদন বাষ্পরুদ্ধ বাক্যে এবং শরীর রোমাঞ্চে পূর্ণ হবে? ৬

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।। ৭

গোবিন্দের বিরহে আমার সকাশে নিমেষ যুগযুগান্তরের ন্যায় মনে হয়, নয়নে বর্ষাধারার ন্যায় অশ্রুর সমাগম হয় এবং নিখিল বিশ্ব শূন্যে মিলিয়ে যায়। ৭

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।। ৮

সেই রসরাজ পদানুরক্ত আমাকে আলিঙ্গনপূর্বক পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়ে মর্মে বিদ্ধই করুন, কিংবা আমায় যথেচ্ছ ব্যবহার করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেউ নন। ৮

শ্রীচৈতন্যদেব

তত্ত্ব ও প্রয়োগের চিরন্তন সমস্যা

নিখিল বিশ্বের চিরদিনের এক প্রধান সমস্যা তত্ত্ব এবং প্রয়োগের সমস্যা। প্রচারিত আদর্শ এবং আচরিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্যবধানের সমস্যা। উচ্চারিত বাণী এবং যাপিত জীবনের মধ্যে পার্থক্যের সমস্যা। জগতের মহান আচার্যগণের জীবন ও বাণী যুগ যুগ ধরিয়া, শত-সহস্র বছর ধরিয়া কেন মানুষকে প্রেরণা যোগায়? তাহার কারণ, তাঁহারা যাহা বলিতেন তাহাই করিতেন। যে-তত্ত্ব বা যে-আদর্শকে তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন প্রত্যেকে স্বয়ং ছিলেন সেই তত্ত্ব বা আদর্শের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁহাদের বাণীই ছিল তাঁহাদের জীবন। তাঁহাদের জীবনই ছিল তাঁহাদের বাণী। তত্ত্ব বা আদর্শের কথা বলা কঠিন নয়, বরং খুবই সহজ। কিন্তু তত্ত্ব বা আদর্শকে জীবনে ফলিত রূপদান করা কঠিন। তত্ত্বকথা বলা সহজ, কিন্তু তত্ত্বকে জীবনে প্রতিষ্ঠা দান করা কঠিন। উপদেশ ভাল, কিন্তু যথার্থ ভাল উপদেশের উদাহরণ। বস্তুত আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি তত্ত্ব, আদর্শ ও উপদেশ পাইয়া থাকি, কিন্তু সে-তুলনায় তত্ত্ব, আদর্শ ও উপদেশের ব্যবহারিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত নগণ্য। আমাদের ধর্ম এবং আমাদের বেদ-বেদান্ত, সাংখ্য-যোগ, গীতা-ভাগবত, পুরাণ-তন্ত্র উচ্চরবে সর্বজনীন সাম্যের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সাম্য থাকিয়া গিয়াছে মরুভূমির বুকে মরুদ্যানের মতোই অধরা।

শুধু আমাদের ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেই যে একথা প্রযোজ্য তাহা নয়, সকল ধর্ম এবং সমস্ত ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেই একথা একইভাবে সত্য। আদর্শ এবং আচরণ, অঙ্গীকার এবং অনুশীলন, প্রবচন এবং প্রয়োগের মধ্যে এই অমিলের বিষয়টি উচ্চ আদর্শ এবং মহান তত্ত্বের যাথার্থ্য সম্পর্কে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া দেয়, সংশয়ী করিয়া তোলে। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে শাস্ত্র ও আচার্যদের বাণীতে সমুচ্চ সাম্যাদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শাস্ত্রকথিত ও আচার্যগণের দ্বারা প্রচারিত এবং তাঁহাদের জীবনে আচরিত সেই মহান সাম্য ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে রূপলাভ করে নাই। শাস্ত্র ও আচার্যগণের বাণীতে নিবদ্ধ প্রেম, সংযম, পবিত্রতা, পরার্থপরতা, লোককল্যাণ ও অনুভূতির দৃষ্টান্ত বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিতে সাধারণ মানুষ সমর্থ হয় নাই এবং উহার প্রতিফলন অসম্ভব বলিয়া বহু ক্ষেত্রেই সে-সম্পর্কে অনাগ্রহী হইয়াছে। এইভাবে পারমার্থিক ক্ষেত্রের সাম্য, প্রেম, বৈরাগ্য ও অনুভূতির আদর্শকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেকে 'ধাপ্পা' বলিয়া অপপ্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছে। আবার, আদর্শ ও তত্ত্ব গ্রন্থে ভাল, বাণীতে ভাল, শুনিতে ভাল; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে, সাধারণ মানুষের পক্ষে, সাধারণ সন্ন্যাসী এবং সাধারণ গৃহীর পক্ষে উহাদের অনুশীলন করা কঠিন অথবা অসম্ভব—এই সহজ মানসিকতা ও সরলীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষও এইভাবে নিজেদের 'ধাপ্পা' দিয়াছে। এই উভয় 'ধাপ্পা'কে এক এক যুগে বিরাট ধাক্কা দিয়াছিলেন বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ। অগণিত মানুষ তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছে। কেহ কেহ সন্ন্যাসের পথ লইয়াছে, অধিকাংশই গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াছে। বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ নূতন জীবন যাপনের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে। একথা ইতিহাসস্বীকৃত যে, সন্ন্যাসী এবং গৃহী উভয়ের কাছে তাঁহারা এমন জ্বলন্ত ও জীবন্ত আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহাতে সন্ন্যাস ও সংসার আশ্রমে আদর্শ রূপায়ণের নূতন 'মার্গ' উন্মোচিত হইয়াছে।

কিন্তু ইহার পরেও প্রশ্ন থাকিয়া গিয়াছে। বুদ্ধ, খ্রীস্ট এবং চৈতন্য ছিলেন সন্ন্যাসী। কঠোর সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের আদর্শকে জ্বলন্ত ও জীবন্ত রাখিতে যে-জীবন তাঁহারা দেখাইয়াছেন তাহা ইতিহাসে অতুলনীয়। সন্ন্যাসের আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া যে-দৃষ্টান্ত তাঁহারা দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের জীবন এক অনন্য মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা হইয়াছে, তাঁহাদের সমকালে অথবা পরবর্তী কালে আর কেহই ঐ মহিমার অধিকারী হইতে পারে নাই। সন্ন্যাসীরাও ঐ জ্বলন্ত জীবনকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নয়, পূর্ণভাবে অনুসরণ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ফলে সন্ন্যাসীদের কাছেও তাঁহাদের জীবন ও আদর্শের শতাংশের কিয়দংশ রূপায়ণও সাধ্যাতীত হইয়াছে। অপর দিকে গৃহীদের জন্য যে-আদর্শ তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে গৃহকে স্বর্গে পরিণত করিবার প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু সন্ন্যাসীদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হওয়ায় এবং ক্রমে ক্রমে অনুষ্ঠানসর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইবার ফলে গৃহীদের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনে সেই আদর্শের সার্থক প্রতিফলন ঘটানো অসম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধ, খ্রীস্ট এবং চৈতন্য অনন্ত প্রেম ও অসীম উদারতার জীবনাদর্শ উপস্থাপন করিলেও সার্বিক বিচারে উহাতে পুরুষরাই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, নারীর গুরুত্ব ও মর্যাদা সেখানে উপেক্ষিতই বলা যায়। নারীও যে পুরুষের মতোই মুক্তি ও মর্যাদার সমান অধিকারী এবং সর্বোচ্চ সত্যলাভে পূর্ণভাবে সমর্থ, সেই ভাবনার প্রকাশ সেখানে সেভাবে দেখা যায় নাই।

ইহার সমাধান পাওয়া গেল রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে। রামকৃষ্ণ একই সঙ্গে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য উভয় জীবনের চূড়ান্ত আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একদিকে সন্ন্যাসি-চূড়ামণি,

আবার অন্যদিকে আদর্শ গৃহস্থাশ্রমী। একজীবনে একই সঙ্গে উভয় আদর্শের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নাই। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ গুরু-প্রদর্শিত সন্ন্যাসাদর্শকে সার্থকভাবে জীবনে রূপায়িত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা স্বামী বিবেকানন্দ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্ঘ ভারতের সন্ন্যাসের ঐতিহ্যে নূতন শক্তি, গতি ও মাত্রা সংযুক্ত করিয়াছে। অপরদিকে সস্ত্রীক নাগ মহাশয় (দুর্গাচরণ নাগ), বলরাম বসু, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) প্রমুখ এবং গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রমুখ গার্হস্থ্য জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে রূপদান করিয়া গৃহী ভক্তদের সামনে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু সন্ন্যাসী ও গৃহীর জন্যই আসেন নাই, তিনি আসিয়াছিলেন সন্ন্যাস তথা মুক্তির পথে নারীর পূর্ণ অধিকার ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যও। তাঁহার সহধর্মিণী সারদাদেবীও তাঁহার মতোই ছিলেন একইসঙ্গে গৃহবধূ এবং সন্ন্যাসিনী, যদিও স্বামীর মতো আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস তিনি গ্রহণ করেন নাই। আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসিনী না হইলেও সন্ন্যাসের মূল শর্ত কৌমার্য ও বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরপ্রাণতার তিনি ছিলেন শিখাময়ী প্রতিমা। পৃথিবীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন একইসঙ্গে গৃহী এবং সন্ন্যাসীর চরম আদর্শকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সহধর্মিণী সারদাদেবীও তেমনি একই সঙ্গে ঐ যুগ্ম আদর্শ রূপায়ণের একক নজির সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যাও ছিলেন সারদাদেবী। আবার তাঁহার পদতলে তাঁহার সাধনার সমগ্র ফল সমর্পণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অভূতপূর্ব সাধনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নারীকে তাঁহার অপরিমেয় সাধনসিদ্ধির প্রথম অংশভাক্ করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষান্ত হন নাই, নারীকে পূজা করিয়া, তাহাকে আরাধ্যা দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সমগ্র সাধনসিদ্ধি সমর্পণ করিয়া নারীর উত্তুঙ্গ মহিমার দিকে তিনি সমগ্র পুরুষজাতি তথা সমগ্র মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে সারদাদেবীর মধ্যে যে অতুলনীয় সাধনপ্রজ্ঞা ও সাধনসিদ্ধি পৃথিবী লক্ষ্য করিয়াছিল তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছিল, তিনি সর্বাংশে শ্রীরামকৃষ্ণের সমতুল্য এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। সিদ্ধার্থ-সহধর্মিণী দেবী যশোধরা, যীশুজননী মহীয়সী মেরী এবং গৌরাঙ্গ-সহধর্মিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যেও নিশ্চিত-ভাবে সেই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জগতের সমক্ষে তাঁহাদের সেই মহাপ্রকাশের উদ্ভাসন ঘটে নাই। নারীকে সমুচ্চ সম্মান দান করিয়া, অধ্যাত্মবিষয়ে নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীর মধ্যে সেই মহাপ্রকাশকে সম্ভবায়িত করিয়াছিলেন।

শুধু অধ্যাত্মবিষয়েই নয়, ঐহিক ও লৌকিক বিষয়েও 'সহজ সমাধিবান' শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নীকে পূর্ণ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ফলে সাংসারিক ক্ষেত্রেও বৈরাগ্য ও নিরাসক্তিকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সারদাদেবী অনন্যসাধারণ বাস্তববুদ্ধি ও কার্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে সকল সংসারী নারী ও পুরুষের জন্য জীবন্ত এক নির্দেশিকা-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সারদাদেবীকে গঠন করিয়া দিয়াছিলেন।

নারী আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসের জীবন কেমনভাবে যাপন করিবে, আত্মমুক্তি এবং জগৎকল্যাণে নারী কিভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিবে তাহার কথাও শ্রীরামকৃষ্ণ আন্তরিকভাবে ভাবিয়াছিলেন। গৌরী-মাকে যখন তিনি বারেবারে বলিতেন ঃ "আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা", তখন গৌরী-মাও প্রথমে তাঁহার সেই কথার তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই। পরে করিয়াছিলেন এবং নিজের জীবন সেই মহাব্রতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসের পথে নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজটি শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরী-মাকে দিয়া করিয়াছিলেন। গৌরী-মার নেতৃত্বে সংগঠিত সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদাদেবীর নামে উহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ইহার মাধ্যমে পুরুষের কর্তৃত্ব বর্জিত এক স্বতন্ত্র সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘ পৃথিবীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম কৃতিত্ব অবশ্যই বুদ্ধদেবের। তাঁহার পর সেই গৌরবের অধিকারী খ্রীস্ট-প্রবর্তিত ধর্মের অধীন রোমান ক্যাথলিক চার্চ। ইতিহাসের নিরিখে খ্রীস্টীয় নারীমঠ বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রত্যক্ষ প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। উভয় ক্ষেত্রেই সন্ন্যাসিনী-মঠ ছিল সম্পূর্ণভাবে সন্ন্যাসীদের পরিচালনা ও কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু গৌরী-মার 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' ছিল সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাসিনীদের কর্তৃত্ব এবং পরিচালনাধীন। বস্তুত, শুধু ভারতেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর সন্ন্যাসের ঐতিহ্যে পুরুষের কর্তৃত্ব বর্জিত সন্ন্যাসিনী-পরিচালিত নারীমঠের প্রথম নেত্রীরূপে গৌরী-মা চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন। হিন্দুধর্মের প্রথম এবং স্বতন্ত্র এই নারীমঠকে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়া সারদাদেবী গৌরী-মাকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুপ্রাণিত নারীমঠের পরিধিকে বিশ্ববিস্তৃত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। নিজ জীবনে তিনি সেই পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে না পারিলেও তাঁহার গুরুভাইদের কাছে তাঁহার এই পরিকল্পনার কথা তিনি বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া সেই নারীমঠ সংগঠিত হইবে এবং "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আদর্শকে অনুসরণ করিয়া নারীরাও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত নবযুগধর্মকে জীবনে অনুশীলন করিবে—একথা তিনি বারংবার বলিয়াছিলেন। শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর 'শ্রীসারদা মঠ' প্রতিষ্ঠা করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরিচালকমণ্ডলী স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিয়াছেন।

শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছে, আত্মায় নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সত্যদ্রষ্টা নারীঋষি বাক্, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী এবং

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মৈত্রেয়ী প্রমাণ করিয়াছিলেন পুরুষরা যাহা পারে, পুরুষরা যাহা করিতে সমর্থ নারীরাও তাহা পারে, তাহা করিতে সমর্থ। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছিলেন, শ্রুতির ঘোষণা বর্ণে বর্ণে সত্য; আত্মায় নারী-পুরুষের ভেদের প্রশ্নটি অবান্তরই শুধু নয়, অবাস্তবও। বাক্, গার্গী এবং মৈত্রেয়ী সত্য-উপলব্ধির ক্ষেত্রে নূতন কোন ঐতিহ্যের সূচনা করেন নাই, তাঁহারা ছিলেন প্রচলিত ঐতিহ্যের এক-একজন প্রতিনিধিমাত্র। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহ্যধারা দুর্বল হইতে হইতে অতি ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ যখন নারীকে উপেক্ষা ও অবহেলার নিম্নতম গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার মানবসত্তাকে চরম অমর্যাদায় লাঞ্ছিত করা হইয়াছিল তখন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ নারীর শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা করিয়া, নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করিয়া সমাজে নারীর আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারত এবং বিশ্বের সর্বত্র নারীমুক্তির যে ধ্বজা উঠিয়াছে তাহার পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা ও অনুষ্ঠানের যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রহিয়াছে, ইতিহাসের সন্ধানী ছাত্রদের কাছে তাহা ধরা পড়িতে বাধ্য।

অবশ্য নারীমুক্তির যে ধ্বজা আজ আমরা দেখিতেছি, সর্বক্ষেত্রে যে উহা নারীমুক্তির বাঞ্ছিত প্রকাশে সমর্থ, তাহা নহে। নারীমুক্তির নামে স্বেচ্ছাচারিতা, ভ্রষ্টাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, লজ্জাহীনতা, শ্রদ্ধাহীনতা ও উন্নাসিকতার বহিঃপ্রকাশ কখনো কখনো বা কোথাও কোথাও প্রকট হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহাতে কোন অস্বাভাবিকতা নাই। সুদীর্ঘকাল আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনের পর মুক্তির আস্বাদ লাভ করিলে এমন মত্ততা থাকেই। কিন্তু জাগরণের এই পথ বাহিয়াই সমাজে একদিন নারীমুক্তির চরিতার্থতা আসিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে সেজন্যই জগতের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়াই জগতে নারীশক্তির বাঞ্ছিত বিকাশের মহাপ্রক্রিয়ার সূচনা হইয়াছে। আগামী তিন হাজার বছর ধরিয়া তাঁহার জীবন ও বাণী ভারত ও পৃথিবীর নারীকে পথ দেখাইবে। প্রথম একটি-দুটি শতাব্দীর নৈরাজ্য সেই মহাপ্রকাশের স্বাভাবিক পরিবৃত্তিকাল মাত্র ('ট্রানজিশন পিরিয়ড')। স্বামী বিবেকানন্দ গভীর প্রত্যয়ের সহিত সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বারবার বলিয়াছেন, সারদাদেবীর জীবন ও বাণীই আজ ও আগামী দিনের নারীর পথের দিশারী। ত্যাগ, সেবা, বীর্য, প্রজ্ঞা, পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগ এবং বাস্তববাদিতার যে অসাধারণ সমন্বয় নিজ জীবনে সারদাদেবী করিয়াছিলেন সেই দৃষ্টান্ত নারীকে যুগ যুগ ধরিয়া অনুপ্রাণিত করিবে। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, দুটি ডানা সমান সবল না হইলে পাখি যেমন আকাশে উড়িতে পারে না, তেমনি নারী ও পুরুষ দুটি অঙ্গ সমানভাবে উন্নত না হইলে সমাজরূপ পাখিরও সুস্থ ও সুসমঞ্জস বিকাশ সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন পুরুষের সার্বিক জাগরণকে রূপদান করিতে স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে জাতিকে নূতন চিন্তা, চেতনা ও শক্তি দান করিয়াছেন, তেমনি নারীর সর্বাত্মক জাগরণের নূতন চিন্তা, চেতনা ও শক্তি তিনি জাতিকে দান করিয়াছেন সারদাদেবীর মাধ্যমে।

ভারতবর্ষের বেদ-বেদান্ত এবং আচার্যবৃন্দ ভারতের সকল মানুষের জাগরণ চাহিয়াছেন। সেই জাগরণ যেমন সন্ন্যাসীর, তেমনি সংসারীর, যেমন পুরুষের, তেমনি নারীর, যেমন ধনীর, তেমনি দরিদ্রের। সাধারণ মানুষের জাগরণের ব্যাপারটির উপর ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধ এবং মধ্যযুগে চৈতন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছিলেন। গণমানুষের উত্থান ছিল উভয়ের প্রধান লক্ষ্য। গণমানুষের ভাষায় তাঁহারা কথা বলিয়াছেন, গণমানুষকে জীবনের পরম লক্ষ্যের পথ দেখাইয়াছেন। বুদ্ধ-পরবর্তী কালে এবং চৈতন্য-পরবর্তী কালে সাধারণ মানুষের উন্নতির প্রশ্নটি ভারতবর্ষে উপেক্ষিত হইয়াছে। বুদ্ধ-পরবর্তী কালে এবং চৈতন্য-পরবর্তী কালে যে অন্ধকার ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়াছিল, ভারতবর্ষকে অধঃপতনের গভীরতম স্তরে নামাইয়া দিয়াছিল তাহার একটি প্রধান কারণ নারীর অমর্যাদা, আরেকটি গণমানুষের প্রতি উপেক্ষা। বুদ্ধ ও খ্রীস্ট নারীর উন্নতির বিষয়টিতে কিছুটা গুরুত্ব দান করিলেও চৈতন্যের সময় বিষয়টি তেমন গুরুত্ব লাভ করে নাই। তবে গণমানুষের উন্নতির বিষয়টির উপর তাঁহারা সত্যই প্রচণ্ড গুরুত্ব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে 'পাখির একপক্ষ' শক্তিশালী হইলেও 'অপর পক্ষ'টি উপেক্ষিত হইয়াছিল।

নারী ও জনগণ-রূপ জাতির উভয় 'পক্ষ'কে সমান শক্তিশালী করিবার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের প্রথম সচেতন করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিবেকানন্দ জোরালো ভাষায় নারী ও জনগণের অবহেলার 'জাতীয় মহাপাপ' সম্পর্কে এবং উহাদের কুফল ভারতবর্ষকে পতনের কোন্ গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছে সেবিষয়ে জাতিকে অবহিত করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র ও উপেক্ষিত মানুষের জন্য কতখানি দরদ অনুভব করিতেন তাহার প্রমাণ দেওঘরের কাছে একটি গ্রামের ঘটনায় এবং মথুরবাবুর জমিদারির অন্তর্গত কলাইঘাটার ঘটনায় আমরা পাইয়াছি। পাইয়াছি রসিক মেথর, নটী বিনোদিনী প্রমুখের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের নিরিখে। স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ সহানুভূতি এবং তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি। বস্তুত, রামকৃষ্ণের দুটি আদর্শ 'নারী এবং জনগণ'-এর উন্নতিবিধানকে রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে বিবেকানন্দ বাস্তবায়িত করিয়াছেন। প্রধানত সন্ন্যাসীদের সেবাকর্মের মধ্যে এই দুই মন্ত্রসাধনার বিষয়টি রূপলাভ করিয়াছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উহার রূপদান কিভাবে সম্ভব, তাহার সার্থক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁহার জীবন ও বাণীতে যেমন নারীর করণীয় সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন নির্দেশিকা রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে গণমানুষের জীবনযাত্রার পথনির্দেশিকা। রহিয়াছে উচ্চ-নীচ সকল মানুষের চৈতন্যে প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট স্বরলিপি এবং সার্থক রূপায়ণের দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার। □

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর]

ঠাকুরের লীলা আগাগোড়া কঠোর মায়ার বর্মাবৃত। প্রায় নিরক্ষর, দরিদ্র, সাত টাকা মাইনের পূজারী, আত্মীয়-কুটুম্বও এইরূপ—দশ টাকার বেশি মাইনে কারো নেই; এদিকে আবার প্রচার হয়েছে 'পাগল' বলে। কখনো ন্যাংটা হয়ে ঘুরছেন, কখনো কাঁধে একটা বাঁশ, পেছনে একটা ল্যাজ বাঁধা—কাপড়ের, আর লম্বা লম্বা ধাপে চলছেন।

এই আবরণ ও আচরণের ভিতর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি বাক্যমনের অতীত। ভক্তদের এক-একবার এই রূপ দেখিয়ে ধাঁধায় ফেলে দিতেন। প্রথম প্রথম কারোকে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ "আমায় তোমার কিরূপ বোধ হয়?" "অচেনা গাছের কথা শুনেছ? দিগন্তব্যাপী একটা মাঠ, তাতে দেয়াল, তাতে একটা ফুটো?" একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বল দেখি এটা কি?" ভক্তটি উত্তর করলেন ঃ "ওটা আপনি। আপনার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যাচ্ছে।" খুশি হয়ে বললেন ঃ "হ্যাঁ একেবারে দু-তিন ক্রোশ—অনেকটা দেখা যাচ্ছে।"

অজ্ঞানের পর্দাটা থাকলে কারো সাধ্য নেই অবতারকে বোঝে। (৯ম ভাগ, পৃঃ ১২)

ঠাকুর তাই বলতেন কলকাতার লোককে ঃ "সব ত্যাগ কর—একথা বলবার জো নাই। তাহলে আর আসবেই না। তাই বলি, তোমরা এ-ও কর ও-ও কর। এক হাতে ঈশ্বরকে ধর, এক হাতে সংসার কর। বলি, তোমরা মনে ত্যাগ কর। তারপর আমাগোনাতে যখন বুঝতে পারবে নিজে, এসব কিছু নয়—স্ত্রী, পুত্র, পরিজন; তখন আপনিই ছেড়ে দেবে।" (ঐ, পৃঃ ২৪)

আমাকে পরীক্ষার জন্য এক-একবার জিজ্ঞাসা করতেন তাঁর দাম। দেখছেন কতদূর হলো। ভক্তরা কতটা তাঁকে বুঝতে পারছে। এক-একবার ইঙ্গিত করতেন কিনা—আমি ঈশ্বর এসেছি অবতার হয়ে। দেখতেন ভক্তরা ধরতে পারছে কিনা।

একদিন বললেন ঃ "আচ্ছা, কেশব সেনের দলটল টিকবে কি? কি বল!" আমিও তেমনি। উত্তর করলাম ঃ "টিকত যদি এখানে বেশি আনাগোনা করতেন।" ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কেন, ওখানে তো অনেক লোক যায়। এখানে আর কয়জন আসে?" আমি উত্তর করলাম ঃ "তেমনি লোক যায়।" শুনেই খুব হাসলেন। বললাম ঃ "যারা কেবল ঈশ্বরকে চায় তারাই এখানে আসে।"

এক-একটা procedure adopt (প্রণালী গ্রহণ) করতেন। যদি দেখতেন যে হলো না এটায়, অমনি আরেকটা ধরতেন।

এত তো জ্বালাতন আমরা করেছি, কিন্তু একটুও রাগ বা বিরক্ত হননি। তিনি জানতেন কিনা human weakness (মানুষের দুর্বলতা)! এই upbringing, environments (লালন-পালন, পরিবেশ) যাবে কোথায়!

কত জ্বালাতন করেছে ভক্তরা! তাঁদের শিক্ষার জন্য তাঁকে কত নামা নামতে হয়েছে! একদিন রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে হাঁটু গেড়ে নমস্কার করলেন। এই তো কোমল শরীর! বড্ড সুকোমল ছিল তাঁর শরীর। 'ইংলিশম্যান'দের শিক্ষার জন্যেই এটা করলেন। তারা হাত-জোড়ে নমস্কার করে। কিন্তু ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হয়। 'ইংলিশম্যান'রা কালীঘরে বসে জপধ্যান করছে শুনলে বড় আহ্লাদ করতেন ঠাকুর।

একদিন বললেন ঃ "একবার এ-গাঁ থেকে ও-গাঁ যাচ্ছি। সঙ্গে হৃদু। নদীর তীরে একটা মস্ত বড় পাথর দেখলুম। ওমা! যতই এগুচ্ছি, দেখছি পাথরটাও চলছে। হঠাৎ ধপ করে জলে পড়ে গেল।" এই শুনেই তো আমি হোহো করে হেসে উঠলাম। পাথর আবার হাঁটতে পারে! জলে পড়ে! Rationalist (যুক্তিবাদী) কিনা ভক্তরা! তিনি তখন হাসতে হাসতে বললেন ঃ "মথুর কিন্তু বলেছিল, বাবা অন্যে বললে বিশ্বাস করতুম না। তুমি বলছ তাই বিশ্বাস করছি।" (ঐ, পৃঃ ৩৮)

ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "আমার ধ্যান করলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না।"... ঠাকুর সকলকে বলতেন না একথা, যাদের বুঝতেন এ-ঘরের লোক (ঠাকুরের ভক্ত), তাদেরই বলতেন। অপর লোকদের, যেমন ব্রাহ্মসমাজের ভক্তদের বলতেন ঃ "মিছরির রুটি যেভাবেই খাও মিষ্টি লাগবে। কিন্তু খাওয়া চাই এই মিছরির রুটি।" 'মিছরির রুটি' মানে ভগবান।

"আমার ধ্যান করলেই হবে"—এতে যার বিশ্বাস হয়, সে বেঁচে গেল। জন্ম-জন্ম দুঃখভোগ তাকে আর করতে হবে না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় এসেছে, বুঝতে হবে। জন্মমরণ-চক্রের অবসান হবে শীঘ্র। "তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।" (গীতা, ১৮।৬২) এটি মানুষের চরম লক্ষ্য।

শেষ জন্ম তার, যার ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস অবিচলিত। ঠাকুর এসেছিলেন এই জন্য, এই কথা বলতে। বলেছিলেন ঃ "মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, সুখ, প্রেম, সমাধি—আমার ঐশ্বর্য।" কিন্তু তাঁকে চেনা বড় কঠিন।... যাদের পূর্বজন্মের চেষ্টায় সঞ্চয় আছে, তারা অজ্ঞাতভাবেই তাঁর দিকে অগ্রসর হবে। (ঐ, পৃঃ ৭২-৭৩) [ক্রমশ]

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ৯ম ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলক ❑ জলধিকুমার সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

স্বামী যোগানন্দ

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামী যোগানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি (৬ মার্চ ১৯৯৯) উপলক্ষ্যে নিবেদিত।

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই ভাষণটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ভগবান যখন দেহধারণ করে অবতীর্ণ হন তখন তাঁর লীলাসহচররাও আসেন। তাঁরা তাঁরই বিভূতি। পার্ষদরা সকলে অবতারপুরুষের বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্যের প্রকাশ। সূর্যের অসংখ্য কিরণের মতো এঁরা অবতারের কিরণ-স্বরূপ। তাঁদের আসার উদ্দেশ্য অবতারের লীলার সহায়ক হওয়া। তাঁদের ভিতর দিয়ে যেন আমরা অবতারের এক-একটি বিশেষ দিক দেখতে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের অন্যতম লীলাসহায়ক স্বামী যোগানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অতি উচ্চে স্থান দিতেন। তাঁকে 'ঈশ্বরকোটি' বলে তিনি নির্দেশ করেছিলেন। 'ঈশ্বরকোটি' মানে একটি গোষ্ঠী (group), যাঁদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বিশেষভাবে প্রকট হয়। স্বামী যোগানন্দ মহারাজকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। আমার জন্মের আগেই তাঁর শরীর গিয়েছে। তাই বিভিন্ন ব্যক্তি বা গ্রন্থ থেকে যা শোনা যায়, সে-কথাই আমার পক্ষে পরিবেশন করা সম্ভব।

স্বামী যোগানন্দ দক্ষিণেশ্বরের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলেন, তাঁদের উপাধি সাবর্ণ চৌধুরী। উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মানোর জন্য তাঁর একটু জাত্যাভিমানও ছিল। সেই অভিমান তাঁকে অবনত না করে উন্নতই করেছিল। 'চণ্ডী'তে (৪।৫) আছেঃ "কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা"—দেবী সৎকুলজাত ব্যক্তিগণের মধ্যে লজ্জারূপে থাকেন অর্থাৎ এমন ব্যক্তির মনোগত ভাবটি হলো—আমার এরকম কুলে জন্ম, আমার দ্বারা এমন কোন কাজ হওয়া উচিত নয় যাতে আমার কুল অপবিত্র হয়, নিন্দনীয় হয়। এই অভিমান সৎকুলজাত ব্যক্তিদের স্খলন থেকে রক্ষা করে।

স্বামী যোগানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'যোগীন মহারাজ' নামে সুবিখ্যাত। বাল্যকালে তিনি আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতেন, এ আমি কোথায় এসেছি! অন্য সমবয়সীরা খেলাধুলা করছে, কিন্তু তিনি উদাসীন হয়ে ভাবতেন—আমি তো এখানকার লোক নই! তাঁর মনে হতো, তিনি ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে তারার মালা পরে বসে আছেন, তাঁর খেলার সাথীরা ঐখানে আছে, এখানে নয়। মাঝে মাঝে সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হতো। তিনি পূজা, পাঠ, ধ্যানে অনেক সময় কাটাতেন। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন, ভাগবত পাঠ শুনতেন, তাতে মনে ধর্মবোধ প্রবল হতো। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরের কাছেই ছিল তাঁদের বাড়ি। সেজন্য মাঝে মাঝে মন্দিরে যেতেন। মন্দিরের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই সম্বন্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনেছিলেন, তাঁকে দেখবার ইচ্ছা হতো, কিন্তু লাজুক প্রকৃতির ছিলেন বলে ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারতেন না। আবার যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, তাদের কাছ থেকে শুনে ঠাকুরের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাও তাঁর তখন হয়নি।

এরপর কেশবচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ পড়ে তিনি ঠাকুরকে দেখতে এলেন। তিনি তখন বাগানে, সাধারণ পোশাক পরা। তাঁকে মালী মনে করে একটি ফুল তুলে দিতে বললেন। ঠাকুর তা দিলেন। তারপর দেখলেন, যাঁকে মালী ভেবেছিলেন তিনি একটি ঘরে বসে অবিরাম উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, আর বহু ভদ্রলোক বসে তাঁর কথা শুনছেন। দেখে তিনি বিস্মিত এবং খুব লজ্জিতও হলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ঠাকুর বললেনঃ "বাইরে যারা আছে তাদের ভিতরে নিয়ে এস।" যোগীন মহারাজ ছাড়া বাইরে কেউ ছিলেন না। তিনি ভিতরে এসে বসলেন। ভক্তরা চলে গেলে ঠাকুর তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় পেয়ে তিনি বললেনঃ "তবে তো তুমি আমাদের চেনা ঘর গো! তোমাদের বাড়িতে আমি কত যেতুম, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি শুনতুম।" "বেশ হলো, এখানে যাওয়া-আসা করো। মহৎ বংশে জন্ম তোমার—লক্ষণ বেশ ভাল। বেশ আধার, খুব হবে (অর্থাৎ খুব ভগবৎ ভক্তি হবে)।"

এইভাবে অল্প বয়স থেকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছেন। প্রথমে একজন সাধুকে দর্শন করার উদ্দেশেই হয়তো এসেছিলেন, তারপর বিরাট চুম্বকরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা এমন মুমুক্ষু জীবনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সকলেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হতো তা নয়, কিন্তু যাঁদের ভিতরে ধর্মানুরাগ আছে তাঁরা তাঁর প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করতেন। দক্ষিণেশ্বরে তো আরো কত লোক ছিল। কালীবাড়ির পুরোহিত, ঠাকুর, চাকর—এরা তো সবসময়ই তাঁকে দেখত, তারা যে তাঁর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করত তা নয়। বস্তুত, অবতারের আকর্ষণও সকলের অনুভব হয় না।

তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সকলে 'পাগলা বামুন' বলে জানত, যিনি জাতবিচার মানেন না। তখনকার দিনে খুব জাতবিচার মানা হতো। ঠাকুরের কাছে যাতায়াতে যোগীন

মহারাজ কারো কথা শুনতেন না এবং বাপ-মাও যখন জানলেন যে, ছেলে ঠাকুরের কাছে যায়, তাঁরা বাধা দিলেন না। প্রথমে কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই এসেছেন। ঠাকুর তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেন না। উচ্চবংশের ছেলে, সুঠাম, সুন্দর, অতি নম্র। ঠাকুরও তখনই তাঁকে 'অন্তরঙ্গ' বলে গ্রহণ করলেন। বয়স অল্প, তখনো পড়াশোনা করছেন। কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে পড়াশোনার আগ্রহ ধীরে ধীরে চলে গেল। এমন আকর্ষণের বস্তু যেখানে, সেখানে অন্য আকর্ষণ থাকে না। মনে তীব্র বৈরাগ্য। পড়াশোনায় মন বসে না। ঠাকুর যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন তাতে সংসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না। ঠাকুরের কাছে শুনেছেন, কামকাঞ্চন ত্যাগ ছাড়া ঈশ্বরলাভের আশা দুরাশা মাত্র।

ঠাকুর তাঁকে প্রস্তুত করার জন্য গোড়া থেকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন যাতে কোন খুঁত না থাকে। একদিন ঠাকুর বললেন ঃ "এই আরশোলাটা বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল।" ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কিরে, আরশোলাটাকে মেরে ফেলেছিস তো?" যোগীন মহারাজ বললেন ঃ "না মশাই, ছেড়ে দিয়েছি।" ঠাকুর অমনি বললেন ঃ "আমি তোকে মেরে ফেলতে বললুম, তুই কিনা সেটাকে ছেড়ে দিলি! যেমনটি করতে বলব, ঠিক তেমনটি করবি। নতুবা ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয়সকলেও নিজের মতে চলে পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হবে।" সাবধান করে দিলেন। বিশেষ করে তাঁকে বলতে হলো এইজন্য যে, তিনি অতিশয় নরম প্রকৃতির ছিলেন।

তারপর যখন বড় হয়েছেন, সংসারে তখন অভাব। ধনসম্পদ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সকলে বলল, এখন বিয়ে কর আর চাকরি করে সংসারের ভরণপোষণ কর। অবসর সময়ে সাধন-ভজন করতে পার। চাকরির জন্য তিনি মেসোর বাড়ি গেলেন, কিন্তু কোন কাজ জুটল না। সেখানেও জপধ্যানেই বেশি সময় কাটাতে লাগলেন। ঈশ্বরসাধনে যতই ডুবে যেতে লাগলেন, ততই তাঁর মধ্যে গাম্ভীর্য আর উদাস ভাব বাড়তে লাগল। মেসো বাবাকে সব জানালেন। ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে না দিলে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। তারপর বাড়ি থেকে চিঠি গেল—যেন তিনি ফিরে আসেন, বাড়িতে অসুখ। খবর পেয়ে ভাবলেন, হয়তো মা অসুস্থ; তাই অবিলম্বে বাড়ি এলেন। কিন্তু এসে যা দেখলেন তাতে অবাক। অসুখ কোথায়! এতো উৎসবের আয়োজন! দুদিন পরে তাঁর বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। তিনি রাজি হলেন না। তখন মা ছেলের হাত ধরে "আমার জন্য বিয়ে কর" বলে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্কল্পে স্থির। মা বললেন ঃ "বিয়ে না করলে আমি আত্মহত্যা করব।" শৈশব থেকে যোগেন মহারাজ খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের এই কথা শুনে তিনি আর তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলেন না। বিয়ে করলেন, কিন্তু সংসারে মন বসল না। যে-মন ঠাকুরের কাছে চলে গিয়েছে সেই মনকে সংসারে আনা আর সম্ভব নয়। পারলেনও না। তখন মা অনুযোগ করলেন ঃ "বিয়ে থা করেছিস, এখন সংসারের দিকে মন দিতে হবে না? পরিবার প্রতিপালনাদি কর্তব্য তো আছে। তা যদি না করবি তো বিয়ে করলি কেন?" তিনি বললেন ঃ "আমি তো ঐসময় তোমাদের বারবার বলেছিলাম, বিয়ে করব না! তোমার কান্না সহ্য করতে না পেরেই তো শেষে ঐকাজে রাজি হলাম।" মা বললেন ঃ "ওটা আবার একটা কথা! ভেতরে না ইচ্ছে হলে, তুই আমার জন্য বে করেছিস—একি সম্ভব?" ছেলে শুনে অন্তরে খুব আঘাত পেলেন। মনে দারুণ লজ্জাও হলো। ভাবলেন, পরম ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা অনুসারে তো আমার সংসারজীবনে যাওয়ার কথা নয়, কিন্তু মায়ের কথায় বিয়ে করলাম, এখন আবার মা এরকম বলছেন! লজ্জায় অনুশোচনায় তাঁর ঠাকুরের কাছে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকে ঠাকুর একে ওকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "যোগীন আসে না কেন?" সকলে বলে, সে বিয়ে করেছে বলে লজ্জায় আসে না। তখন তিনি একটু কৌশল অবলম্বন করলেন। কিছুদিন আগে তিনি যোগীনকে একটি কড়াই কিনতে পাঠিয়েছিলেন। কড়াই কেনার পর বাকি পয়সা ফেরত আসেনি। ঠাকুর একজনকে দিয়ে বলে পাঠালেন ঃ "বলিস, সে পয়সা নিয়ে গেল, তার হিসাব তো দিল না।" একে মায়ের কথায় আঘাত পেয়েছেন, তারপর ঠাকুরের কথায় আরো কষ্ট পেলেন—শেষকালে উনিও কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন? ঠিক আছে, একবার গিয়ে হিসাব দিয়ে আসব, আর ও-মুখো হব না। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন ঃ "কড়াইয়ের দাম এত, আর এই পয়সা বাকি আছে।" কিন্তু ঠাকুর ও-সম্বন্ধে কোন কথাই বললেন না, অন্য কথার অবতারণা করলেন ঃ "বিয়ে করেছিস তো কি হয়েছে! একশটা বিয়ে করলেও কোন ক্ষতি হবে না তোর। আর যদি কোন ভয় থাকে তো স্ত্রীকে নিয়ে আসিস, তার মায়া আমি খেয়ে দেব।" তারপর তিনি সস্ত্রীক গিয়েছিলেন। 'মায়া খাওয়ার' ব্যাপার তিনিই জানেন। স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ তিনি কোনদিনই অনুভব করেননি। সুতরাং 'মায়া খাওয়া' ঠিকঠিকই হয়েছিল। যখন তাঁর শরীর ত্যাগ হবে তখন শ্রীশ্রীমা পরামর্শ দিলেন স্ত্রীকে একবার ডেকে আনতে। তিনি বললেন ঃ "না, তা হবে না।" শেষজীবন পর্যন্ত এত কঠোর! ঠাকুরের সন্তানেরা বলতেন, যোগীনের মতো এমন দৃঢ় সংযমী বোধহয় আমাদের মধ্যে কেউ নেই।

যোগীন মহারাজ একবার ঠাকুরকে বললেন ঃ "মশাই, কি করে কামজয়ী হওয়া যায়?" ঠাকুর হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে বললেন। তিনি শুনে অবাক! এ আবার কি উপদেশ! এতো সবাই করে। কিন্তু ঠাকুর বলছেন যখন, তখন করতে হবে। তারপর দেখলেন—সত্যিই তো, অন্য কোনরকম চিন্তাই মনে ওঠে না। তাই ঠাকুরের সন্তানেরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, যোগীন আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ কামজয়ী। তাঁর জীবনের মধ্যে পূর্ণভাবে তা প্রকাশিত।

মা যখন নহবতে, তখন তাঁকে কোন খবর দেওয়া বা

কাজ করার দরকার হলে ঠাকুর যোগেন মহারাজকে পাঠাতেন। অন্য ভক্তদের নয়। আরেকজন ছিলেন লাটু মহারাজ। এই দুজন ছিলেন মায়ের একেবারে কাছের লোক, যাঁদের দিয়ে তিনি সব কাজ করাতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মায়ের সেবার সম্পূর্ণ ভার তিনি নিয়েছিলেন, আর মা-ও যোগীন মহারাজের জন্য আলাদা করে সব রেখে দিতেন, বলতেন ঃ "এটি যোগীনের জন্য।"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পরের কথা। শরৎ মহারাজ বলছেন ঃ "স্বামীজী যে কি বলেন বোঝা যায় না। একবার একটা কথা এত জোর দিয়ে বলেন যে, সে-কথা ছাড়া আর কিছু যেন সত্য নয়। আবার একসময় অন্য কথা সেইরকম জোর দিয়ে বলেন। বিভ্রান্ত হয়ে যেতে হয়।" যোগীন মহারাজ বললেন ঃ "যদি নিশ্চিত হয়ে তত্ত্বকথা জানতে হয় তাহলে মাকে ধর। তাহলে আর বিভ্রান্তি আসবে না।" মায়ের ওপরে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস! মায়ের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা কিংবদন্তীতুল্য। সঙ্ঘের অন্য কাজ যে তিনি খুব করেছেন তা নয়, কিন্তু মায়ের সেবায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। এটি তাঁর বিশেষত্ব।

আগেই বলেছি, লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না। কাজেই বিদ্যাচর্চা বেশিদূর এগয়নি। কিন্তু তবু তিনি মহাজ্ঞানী, সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অভ্রান্ত। জীবনে কোন সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে কখনো ইতস্তত করতে দেখা যায়নি। তাঁর সমস্ত জীবনটি ছিল ঠাকুর ও মায়ের ভাবে যেন ছকবাঁধা। যেমন তাঁর ঠাকুর-মায়ের ওপর অটুট বিশ্বাস ছিল, তেমনই ছিল মনের ওপর অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ। সাধুজীবনে তাঁকে বিন্দুমাত্র ইতস্তত বা আপস করতে দেখা যায়নি।

তাঁর শরীরত্যাগের অনেক পরেও তাঁর পত্নী বেঁচে ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে মঠে আসতেন। এতখানি ঘোমটা দেওয়া, আমরা তাঁর মুখ কখনো দেখিনি। মঠের উঠানে আমগাছতলায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁকে আমরা সম্মান করতাম। যোগীন মহারাজের উপযুক্তই বটে। মায়ের মতোই লজ্জাশীলা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। এত গুণবতী পত্নীকে তিনি কখনো মৌখিক সম্ভাষণও করেননি!

যোগীন মহারাজের ছিল অপূর্ব ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা। খুব সরল ছিলেন তিনি। ঠাকুর কড়াই কিনতে দিয়েছিলেন। দেখা গেল কড়াইটা ফাটা। তিনি বললেন ঃ "এরকম কড়া নিয়ে এলি? " যোগীন মহারাজ বললেন ঃ "আমি তো বলেছিলাম দোকানদারকে ভাল করে দেখে দিতে।" ঠাকুর হেসে বলছেন ঃ "সে কি ধর্ম করতে বসেছে? সে ব্যবসাদার, ব্যবসা করছে। তুই কিনবি, তুই দেখে নিবি না? যাচিয়ে বাজিয়ে নিতে হয়। তার ওপর ছেড়ে দিলি? ভক্ত হবি, কিন্তু বোকা হবি কেন?" এমনই ছিল তাঁর শিক্ষা। কিন্তু যোগীন মহারাজের এমন সরল বিশ্বাস যে, ভাবতেই পারতেন না কেউ তাঁকে ঠকাবে। আমাদের মনে যেমন অবিশ্বাস সংশয় থাকে, তাঁর সেসব ছিল না। ধোয়া-মোছা মন একেবারে।

আরেকটি কথা তাঁর সম্বন্ধে জানা যায়। একবার ফলহারিণী কালীপূজার পরের দিন ঠাকুর দেখলেন মন্দির থেকে প্রসাদ আসছে না। নিয়ম ছিল, ঠাকুরের জন্য একথালা করে প্রসাদ পাঠানো হবে। প্রসাদ আসছে না বলে ঠাকুর কেবলই ব্যস্ত হচ্ছেন—"দেখ তো এখনো প্রসাদ এল না কেন? যা নিয়ম তা রাখা উচিত। যা গিয়ে খাজাঞ্চীকে জিজ্ঞাসা কর কেন এল না।" যোগীন মহারাজ বললেন ঃ "নাই বা এল প্রসাদ, কি হয়েছে?" তারপর মনে মনে ভাবছেন, বাবা! অবতার হলে কি হবে, পূজারী বংশে জন্ম তাই একটু প্রসাদের জন্য এত চিন্তা! উনি কি খেতে পান না, 'প্রসাদ প্রসাদ' করে এত ব্যস্ত হচ্ছেন? মুখে তিনি কিছু বলেননি, কিন্তু ঠাকুর অন্তর্যামী। বলছেন ঃ "কেন করি জানিস? রানী রাসমণি তাঁর ধনসম্পদ এভাবে দিয়ে গিয়েছেন, ঠাকুরসেবার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। ঠাকুরের প্রসাদ সাধুভক্তদের সেবায় লাগালে তাঁর দান সার্থক হবে। তাই এত ব্যস্ত হই। এ-প্রসাদ বামুন ঠাকুরদের কাছে গেলে তো যেখানে সেখানে যাবে, অপব্যয় হবে। এখানে যা আসবে, সাধুভক্তরা পাবে।" তখন যোগীন মহারাজ বুঝলেন যে, ঠাকুর লোভের বশে এরকম ব্যস্ত হচ্ছিলেন না। তাঁর প্রত্যেকটি কর্মের গূঢ় রহস্য আছে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন, তাঁরাই বুঝতেন।

স্বামীজীর সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর ভালবাসার সম্পর্ক। তাঁর শেষ অসুখের সময় বিষাদগ্রস্ত স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন ঃ "যোগীন, তুই বেঁচে ওঠ, আমি মরি!" তবে যোগীন মহারাজ ছিলেন মা-অন্ত প্রাণ। মায়ের সেবায় তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। মায়ের সঙ্গে যোগীন মহারাজ তীর্থে তীর্থে ঘুরেছেন। মা যেখানে গিয়েছেন, মায়ের সেবার সব বন্দোবস্ত তিনি করেছেন। আর মায়ের সেবা মানে তো মায়ের বিরাট সংসারের সেবা। তাই মা বলেছিলেন ঃ "আমার ঝক্কি সবাই বইতে পারে না, যোগীন পারত আর শরৎ পারে।" ঠাকুর বিশেষ করে তাঁকে এই সেবার ভার দিয়েছেন, তাঁর শুদ্ধ মনের জন্য। যেসব সাধুরা যোগীন মহারাজের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তাঁর ব্যবহারের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন এবং শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর জীবন কর্মবহুল ছিল না, কিন্তু খুব শিক্ষাপ্রদ ছিল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন 'ঈশ্বরকোটি'। আর মা বলতেন ঃ "যোগীন আমার মাথার মণি!"* ❑

*** কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ('যোগোদ্যান') থাকাকালীন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের ভাষণ। শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তিনি এই ভাষণটি দিয়েছিলেন। তারিখ ও সাল জানা যায়নি।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'**

অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রাচীন সাধুদের মুখে শুনেছি, আমাদের সন্ন্যাসিগোষ্ঠী হচ্ছে 'ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়'। বিদ্যার চর্চা এই সম্প্রদায়ের সাধনার অঙ্গ এবং পরা ও আদর্শের অনুকূল অপরাবিদ্যার চর্চায় নিয়োজিত এ-সম্প্রদায়ের অঙ্গগণ। স্বামীজী সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে, অঙ্গগণকে নিয়মিত বিদ্যাচর্চা করতে হবে, নতুবা "বিদ্যার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নীচদশা প্রাপ্ত" হওয়ার আশঙ্কা। স্বামীজী শুধুমাত্র নির্দেশ দেননি, তিনি অসাধারণ মাত্রায় বিদ্যাচর্চা করে সন্ন্যাসীদের নিকট চিরকালের আদর্শ হয়ে রয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরেই তিনি আলমবাজার মঠে মঠবাসীদের, বিশেষত নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের, সুশৃঙ্খলভাবে বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থা নীলাম্বরবাবুর বাগানে অবস্থিত ও বেলুড়ে স্থাপিত স্থায়ী মঠে বেশ কয়েক বছর চালু ছিল।

স্বামীজী ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, মঠের দক্ষিণপ্রান্তের জমির ওপর স্থাপিত হবে প্রাচীন টোলের ধরনে একটি বিদ্যামন্দির। সেখানে শেখানো হবে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ভক্তিশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইংরেজী।

বিদ্যার্থীদের অগ্রসর ও অনগ্রসর—এই দুই গোষ্ঠীতে ভাগ করে শাস্ত্রাদি পঠন-পাঠনের আয়োজন করা হয়েছিল। বেদ-উপনিষদাদি গ্রন্থের মুখ্য আচার্য ছিলেন স্বয়ং স্বামীজী। স্বামী তুরীয়ানন্দও বিদেশযাত্রার পূর্বে কয়েক বছর শাস্ত্র পড়িয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ পড়িয়েছিলেন দীর্ঘকাল, স্বামী নির্মলানন্দও কিছুকাল পড়িয়েছিলেন। তবে বেলুড়ে মঠ স্থানান্তরের পর স্বামী শুদ্ধানন্দ অনগ্রসর বিদ্যার্থীদের পাঠ দিয়েছেন এবং নিজে অগ্রসর বিদ্যার্থীদের দলে যোগদান করে শাস্ত্রাদির পাঠ গ্রহণ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতা উদ্ভিদবিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছেন। ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ ও ডাঃ নিতাই হালদার শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার অব্যবহিত পরে নিয়মিত পঠন-পাঠন সাময়িকভাবে স্থগিত ছিল এবং পুনরায় চালু হয়েছিল ৩০ জুন থেকে। সেসময়ে প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত দুটো ক্লাস নিতেন স্বামী সারদানন্দ। পাঠ্য বিষয় ছিল—প্রথম ক্লাসে দর্শনের ইতিহাস[৫৫] এবং দ্বিতীয় ক্লাসে পাণিনীয় ব্যাকরণ। ছাত্র ছিলেন স্বামী বোধানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র ও আশু।[৫৬] অনগ্রসরদের জন্য প্রথম ক্লাসটিতে স্বামী বোধানন্দ পড়াতেন প্রাথমিক শারীরবৃত্ত (physiology primer)। দ্বিতীয় ক্লাসটি নিতেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। তিনি একদিন পড়াতেন গীতা, অন্যদিন সংস্কৃত ব্যাকরণ। ক্লাস হতো বেলা একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত। নিয়মিত ছাত্র ছিলেন ব্রজেন্দ্র ও আশু।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে দেখা যায় সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সাংখ্য, ভাগবত ও 'Imitation of Christ' ('ঈশানুসরণ') পাঠ ও আলোচনা করছেন। ভাগবতপাঠ অনেকদিন ধরে চলেছিল। প্রথমদিকে ভাগবত পঠন-পাঠনে যোগ দিয়েছিলেন স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ।

বেলুড় মঠে সেসময় বিদ্যাচর্চার যে চমৎকার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশেষ লক্ষণীয়। প্রত্যক্ষদর্শী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ "কোনদিন গীতা, কোনদিন ভাগবত, কোনদিন বা উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের আলোচনা হইতেছে। স্বামীজীও প্রায় নিত্যই তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। স্বামীজীর আদেশে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মপূর্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, অপরদিকে তেমনি শাস্ত্রালোচনার জন্য ঐ ক্লাসের প্রাত্যহিক অধিবেশন হইতেছে। তাঁহার শাসন সর্বদা শিরোধার্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবর্তিত নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, পাঠ, ধ্যান—সকলই এখন কঠোর নিয়মবদ্ধ।"[৫৭]

পঠন-পাঠনের পরিমণ্ডল প্রেরণাপ্রদ হয়ে উঠত স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ যোগদানে। স্বামীজী কর্তৃক গীতাপাঠ ও আলোচনা সম্পর্কে বিদ্যার্থী স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁর 'অস্ফুট স্মৃতি'তে মনোরম একটি চিত্র উপহার দিয়েছেন। স্বামীজী কৃষ্ণ, অর্জুন, ব্যাস, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করে গীতার মূলতত্ত্বস্বরূপ সর্বমত-সমন্বয় ও নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা করেন। শ্লোক ধরে পাঠ আরম্ভ করে স্বামীজী দেখালেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ..." শ্লোকটির মধ্যেই সমগ্র গীতার সার বক্তব্য নিহিত রয়েছে। শ্রোতা স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখেছেন ঃ "প্রফেটের মতো ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর হইতে যেন তেজ বাহির হইতে লাগিল।"[৫৮]

স্বামীজী কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রের পাঠ ও আলোচনার একটি স্বতন্ত্র চিত্র স্বামী শুদ্ধানন্দ উপহার দিয়েছেন। স্বামীজীর

---

৫৫ সেসময়ে পি. এন. বোসের লেখা 'History of Philosophy' পড়ানো হতো।

৫৬ অগ্রসর শ্রেণীতে ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র ও ব্রহ্মচারী আশুর যোগদান ছিল ঐচ্ছিক।

৫৭ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৫

৫৮ ঐ, পৃঃ ৩৪৮

নির্দেশ—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য অন্ধভাবে অনুসরণ না করে স্বাধীনভাবে সূত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। সূত্রের প্রত্যেকটি শব্দের অক্ষরার্থ কিভাবে করা যায় তার পদ্ধতি তিনি শিখিয়ে দিলেন। বিদ্যার্থীদের নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে বিকশিত করবার দিকে দৃষ্টি দিতে বললেন। আচার্যগণের ভাষ্যের একান্তভাবে মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাধীনভাবে শাস্ত্রধারণা করার ওপর গুরুত্ব দিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখেছেন, স্বামীজী বললেনঃ "সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈতমতেরই পোষক, একথা কে বললে? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্টা করবি, ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি- বোঝবার চেষ্টা করবি। উদাহরণস্বরূপ দেখ, 'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি' (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৯)—এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হয়েছে।"[৫৯]

কিন্তু বোধকরি মঠের বিদ্যাচর্চার যাবতীয় কর্মসূচীর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল প্রশ্নোত্তরের আসর, বিশেষত স্বামীজী স্বয়ং যখন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। গীতামুখে স্বয়ং শ্রীভগবানও আত্মজ্ঞান লাভের উপায়সকলের মধ্যে 'পরিপ্রশ্ন'র ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর মতো আচার্যের কাছ থেকে প্রশ্নের মীমাংসালাভের সৌভাগ্য দুর্লভ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। গীতা সম্বন্ধে স্বামীজীর ভাষণ সমাপ্ত হওয়ার পর স্বামীজী বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করেন। অন্যতম শ্রোতার প্রশ্নঃ "প্রকৃত গুরু কে, আর প্রকৃত শিষ্যই বা কে?"

স্বামীজীর উত্তরের সারাংশঃ "প্রকৃত গুরু সময়ে সময়ে আবির্ভূত হন। এধরনের গুরু হলেন বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির ভাণ্ডার। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তিনি পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করে থাকেন। এই আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারণের ধারা কখনো কখনো চলার পথে গতি পরিবর্তন করে থাকে, যেমন একটি প্রবল নদীস্রোত প্রবাহিত হতে হতে নতুন এক খাতে বইতে থাকে, ফলে পুরনো স্রোতোধারা ক্রমে শুকিয়ে যায়। পরিণতিতে দেখা যায়, প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়সকল প্রাণহীনপ্রায় হয়ে পড়েছে এবং সেস্থান পূরণের জন্য নতুন নতুন সম্প্রদায় প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে। স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই ঐ প্রাণবন্ত জীবনস্রোত যেসব সম্প্রদায়ের মাধ্যমে স্ফুরিত হয় তার সেবাতে আত্মনিয়োগ করে থাকেন।... মানুষের মনে যতক্ষণ অহঙ্কারের সামান্যতম ছায়াটুকু থেকে যায়, ততক্ষণ তার কাছে সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মন থেকে অহঙ্কাররূপ এই শয়তানকে দূর করবার জন্য তোমরা প্রত্যেকে আপ্রাণ প্রয়াস কর। জেনো যে, পূর্ণ শরণাগতিই হৃদয়ে উন্মোচিত করবে আধ্যাত্মিক উদ্ভাসের দ্বার।"[৬০]

৯ মে ১৮৯৯। সান্ধ্য প্রশ্নোত্তরের আসরে দেদীপ্যমান স্বামীজী একটির পর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন। উপস্থিত একজনের প্রশ্নঃ "কাঞ্চন ত্যাগ বলতে আমরা সঠিক কি বুঝব?"

স্বামীজীর উত্তরের সারাংশঃ "একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমরা কোন কোন পন্থা অবলম্বন করে থাকি। স্থান কাল ও ব্যক্তি ভেদে পন্থা বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য চিরকালই অপরিবর্তিত থাকে। সন্ন্যাসী মাত্রেরই লক্ষ্য নিজের আত্যন্তিক মুক্তিলাভ ও জগতের কল্যাণসাধন এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে কাম ও কাঞ্চনের ত্যাগ। কিন্তু মনে রেখো, ত্যাগের অর্থ যাবতীয় স্বার্থপর অনুপ্রাণনার সার্বিক ত্যাগ; শুধুমাত্র বিষয়ের সঙ্গে বহির্যোগশূন্যতা নয়।

"সুখভোগের উদ্দেশে এবং ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমার হয়তো প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে; সময়ে সময়ে হয়তো আমি সেই ধনসম্পদ নিজে স্পর্শ না করে তোমাদের কারোর জিম্মায় রাখতে পারি। এটাকে কি তোমরা সত্যিকারের সম্পদ-ত্যাগ বলবে?

"'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষাচর্যা অবলম্বন খুবই হিতকর। কিন্তু প্রব্রজ্যা, মাধুকরী বৃত্তি ইত্যাদি তখনি সহজসাধ্য ছিল যখন গৃহস্থগণ মনু ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকারগণের নির্দেশ সুচারুরূপে অনুশীলন করে প্রতিদিন নিজ নিজ অন্নের একাংশ সাধু-অতিথিদের জন্য ভিন্ন করে রাখত। এখন সমাজে বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছে। বিশেষত বঙ্গদেশে মাধুকরী প্রায় অপ্রচলিত। বঙ্গদেশে বর্তমানে একজন সন্ন্যাসীর গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে আহার্য সংগ্রহের চেষ্টা অনর্থক শক্তিক্ষয় করা বৈ তো নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ভিক্ষাবৃত্তি ও মুদ্রাস্পর্শত্যাগের ব্রত অবলম্বন করে তোমরা কোন সুফল পাবে না। সন্ন্যাসীর মাধুকরী বৃত্তি সম্বন্ধে যেসব বিধান রয়েছে তা তার জীবনলক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায়মাত্র। বর্তমান অবস্থায় মাধুকরীর বিধিনিষেধ আঁকড়ে ধরে থাকা তোমাদের সন্ন্যাসের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একজন সন্ন্যাসীর প্রয়োজনীয় খাওয়া-পরার সুব্যবস্থা করে দিতে পারলে সে-সন্ন্যাসী তার জীবনলক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যই তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে পারবে। আরো কথা! উপায় বা পন্থার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে আমরা

৫৯ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯ ৬০ মঠের ডায়েরী থেকে অনূদিত।

প্রায়ই চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকি। আমাদের সজাগ দৃষ্টি যেন সর্বদাই জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকে।"[৬১]

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০১। মায়াবতী থেকে ফিরে স্বামীজী কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে কতকটা সুস্থ বোধ করছেন। মঠবাড়ির নিচতলায় ভিজিটর্স রুমে প্রশ্নোত্তরের আসর বসেছে। স্বামী সচ্চিদানন্দ (মতি) প্রশ্ন করেন ঃ "কোথায় ধ্যান করব—দেহের ভিতরে কোন স্থানে অথবা বাইরে?"

স্বামীজীর উত্তরের সারকথা ঃ "প্রাথমিক পর্যায়ে দৈহিক স্তরেই ধ্যানাভ্যাস করা প্রয়োজন। মন যতক্ষণ এখানে সেখানে ছোটাছুটি করছে ততক্ষণ দৈহিক স্তর অতিক্রম করে মানসিক স্তরে পৌঁছানো কঠিন। সাধককে প্রথম অবস্থায় তার দেহের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করতে হয়। একমাত্র আসনসিদ্ধি আয়ত্তের পর সাধক তার মনের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করতে পারে। আসনসিদ্ধির অবস্থায় সাধকের হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনা থেকে স্থির হয়ে যায়। সাধক যতক্ষণ ইচ্ছা একাসনে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে।"[৬২]

স্বামীজীর উপস্থিতিতে মঠে প্রশ্নোত্তরের আসরে ভিড় জমত, এমনকি এদেশের ও বিদেশের অতিথিগণও কেউ কেউ উপস্থিত থাকতেন। এই আসরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ছোট-বড় প্রত্যেকেই নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করে তাদের সন্দেহ মেটাতেন। বলা বাহুল্য, নবীন মঠবাসীদের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তাদের প্রতি স্বামীজীর ছিল অপরিসীম করুণা। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে তাদের সাধনজীবন সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর এখানে উল্লেখ করা যাক।

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০১ ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্রর প্রশ্ন ঃ "শুধুমাত্র জীবসেবা চরম মুক্তির লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে কি?"

স্বামীজীর উত্তরের সারাংশ ঃ "শুধুমাত্র জীবসেবা পরম মুক্তি দিতে পারে না। তবে পরম মুক্তি অবশ্যই এনে দিতে পারে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে। একটি কথা মনে রাখতে হবে—যদি কোন পন্থা তুমি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে চাও, সেসময়কার জন্য এই বিশ্বাস নিয়ে এগোতে হবে যে তোমার অনুসৃত ঐ পন্থাই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

"একদিক থেকে বলা যেতে পারে যে, আমাদের সম্প্রদায়ের একটি বিপজ্জনক ত্রুটি হচ্ছে এই যে আমাদের মধ্যে অন্ধ গোঁড়ামির অভাব। (এই কারণে আমাদের আরো হুঁশিয়ার হতে হবে।) নিষ্ঠার অভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। এসব কারণ ছাড়াও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কর্মের ওপর গুরুত্ব দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।"[৬৩]

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০১ জিজ্ঞাসু স্বামী শুদ্ধানন্দের কয়েকটি প্রশ্ন ছিল সাধকগণের নিত্যকার কিছু সমস্যা-সংক্রান্ত। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ঃ "কেউ কেউ জপ করতে করতে সময়ে সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেসময়েও কি তার জপ করা কর্তব্য, না কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা বিধেয়?"

স্বামীজীর উত্তরের সংক্ষিপ্তসার—"একজন জপ করতে করতে ক্লান্ত হতে পারে দুটি কারণে। প্রথম, কখনো কখনো জাপকের মস্তিষ্ক পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়, জাপকের কুঁড়েমি বা আলস্য থেকেও এধরনের ক্লান্তির ভাব আসতে পারে। জাপকের ক্লান্তিবোধের পশ্চাতে প্রথম কারণটি ধরা পড়লে, সেসময়কার জন্য তার জপ বন্ধ করা দরকার। কারণ, ঐ অবস্থাতেও জপ করতে থাকলে নানারকমের কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যাদি দেখা, মস্তিষ্কবিকৃতি হয়ে যাওয়া ইত্যাদির সম্ভাবনা। কিন্তু দ্বিতীয় কারণের ক্ষেত্রে মনে জোর এনে জপ করা দরকার।"

স্বামী শুদ্ধানন্দের পরবর্তী প্রশ্ন ঃ "কখনো কখনো জপ করতে করতে বেশ আনন্দের স্ফুরণ হয়, তারপর কিন্তু ঐ আনন্দের আবেশে আর জপ করতে ইচ্ছা করে না, এরূপ অবস্থাতে জপ করায় নিযুক্ত থাকা উচিত কি?"

স্বামীজীর উত্তর ঃ "হ্যাঁ, সাধকের জপ করতে থাকা উচিত। ঐধরনের আনন্দ সাধনপথের বিঘ্ন বৈ তো নয়। একে বলে রসাস্বাদন। সাধককে কিন্তু এই বাধা উত্তরণ করতে হবেই। (নতুবা সাধনপথে তার অগ্রগতি স্তব্ধ বা শ্লথ হয়ে যাবে।)"

স্বামী শুদ্ধানন্দের পরবর্তী প্রশ্ন ঃ "কারোর মন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকলেও তার অনেকক্ষণ ধরে জপ করা উচিত কিনা?"

স্বামীজী বলেন ঃ "হ্যাঁ, করা উচিত। একজন ঘোড়-সওয়ার দুরন্ত ঘোড়াকে বাগে আনবার জন্য যেমন ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে থাকে, তেমনি জপের আসনে দীর্ঘকাল বসে মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার।"[৬৪]

বলা বাহুল্য, প্রশ্নোত্তরের আসরে স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে অন্যান্য প্রবীণেরা, কখনো বা অনুরুদ্ধ হয়ে দু-একজন নবীনও প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

স্বামীজীর মহাসমাধির পর যেন একটা হতাশার অন্ধকার মঠজীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল, এবিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। স্বাভাবিক কারণে এর প্রভাব পড়েছিল মঠের বিদ্যাচর্চার ওপর। কয়েকমাস পরে পঠন-পাঠন ক্রমে আবার চালু হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। স্বামী সারদানন্দের অন্যান্য কাজকর্মে ব্যস্ততা, ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের অসুস্থতা, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের বিদেশে গমনের জন্য স্বামী শুদ্ধানন্দের 'উদ্বোধন' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি বিবিধ কারণে মঠবাসীদের নিয়মবদ্ধ পঠন-পাঠন বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। [ক্রমশ]

---

৬১ মঠের ডায়েরী থেকে অনূদিত। ৬২ ঐ ৬৩ ঐ, বন্ধনীযুক্ত অংশ লেখকের। ৬৪ ঐ

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই-এ এক, একে দুই। দুই দেহ, কিন্তু এক আত্মা। যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ "নবাবী আমলের টাকা বাদশাই আমলে চলে না।" অর্থাৎ যুগের প্রয়োজন মানতে হবে। একই সত্য, তবু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পৃথক ব্যাখ্যা। তাই গীতায় (৪।৮) শ্রীকৃষ্ণ বলছেনঃ "সম্ভবামি যুগে যুগে"। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "যুগে যুগে অবতার।" শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই আজ অবতার বলে পূজিত। জীবদ্দশাতেই তাঁরা এই পূজা পেয়েছেন ঘনিষ্ঠ ভক্তদের কাছ থেকে। আজ তা সর্বজনস্বীকৃত।

তাঁদের মধ্যে • অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে অনেকে বলাবলি করতেনঃ "শ্রীচৈতন্য আবার ফিরে এসেছেন।" ভৈরবী ব্রাহ্মণী শাস্ত্রজ্ঞা, আবার সাধিকা। তিনি বলতেন—শ্রীরামকৃষ্ণ "নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব"। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দুই-ই একসঙ্গে। বাইরে নিত্যানন্দের মতো। গৃহী না, সন্ন্যাসীও না। দুই-এর ঊর্ধ্বে পরমহংস। কিন্তু ভিতরে সন্ন্যাসী। শ্রীচৈতন্যের মতো। শ্রীচৈতন্যকে বলা হতো—'ন্যাসি-চূড়ামণি'। 'ন্যাস' মানে ত্যাগ, অর্থাৎ ত্যাগি-চূড়ামণি। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামী বিবেকানন্দ নাম দিয়েছিলেন—'ত্যাগীশ্বর'। শ্রীচৈতন্য দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই। শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ছিলেন ঈশ্বরপুরী, আর সন্ন্যাসগুরু ছিলেন কেশবভারতী। উভয়েই দশনামী সম্প্রদায়ের। শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু কেনারাম ভট্টাচার্য—তন্ত্রসাধক। সন্ন্যাসগুরু তোতাপুরী—দশনামী সম্প্রদায়ের। উভয়ের আবির্ভাব এক যুগ-সন্ধিক্ষণে। শ্রীচৈতন্যের জন্মকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। মাঝখানে ব্যবধান প্রায় সাড়ে তিনশ বছর। উভয় কালেই ধর্মের বিকৃতি ঘটেছিল। ধর্মের নামে যত রকমের অনাচার! ধর্ম মানে সংযম, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান—মানুষ তা ভুলে গিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের যুগে শক্তিপূজার নামে শুধু মদ্য ও মাংস! ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ নেই। শ্রীচৈতন্য সেই অনুরাগ ফিরিয়ে আনলেন। নাম দিলেন—প্রেমাভক্তি।

"রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।"

শ্রীরামকৃষ্ণও এলেন এক সঙ্কট-মুহূর্তে। ইংরেজ-শাসন তখন। পাশ্চাত্য প্রভাবে ভারতের সবকিছুর প্রতি মানুষের বিরূপ মনোভাব। ঈশ্বর মানে না। যত রকমের অনাচারে তাদের আনন্দ। তারা নাকি যুক্তিবাদী! তারা চায় পাশ্চাত্যের ছাঁচে ধর্ম ও সমাজকে সাজাতে। তা না হলে নাকি 'সভ্য' হওয়া সম্ভব নয়! সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। ঠিক এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি ইংরেজী কিছু শিখলেন না। 'ভেরি গুড', 'থ্যাঙ্ক ইউ' এরকম দু-চারটে ইংরেজী শব্দ ছাড়া ইংরেজীর কিছুই জানতেন না। বস্তুত, বই-পড়া বিদ্যাকে তিনি বিদ্যা বলেই মনে করতেন না। যে-বিদ্যার দ্বারা মানুষ সত্য কি জানতে পারে অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ করতে পারে, সেই বিদ্যাই বিদ্যা। অন্য সব বিদ্যাকে তিনি 'চাল-কলা-বাঁধা' বিদ্যা বলতেন। তার দ্বারা অর্থোপার্জন হয়, কিন্তু সত্য কি তা জানা যায় না। তাই তিনি পাঠশালায় যেতে চাইতেন না। তার চেয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন—প্রকৃতির টানে। আর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে শখের যাত্রাগান করতেন। খুব শ্রুতিধর ছিলেন। ছোটবেলায় বাবার কোলে বসে স্তব-স্তুতি, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, পুরাণ-কাহিনী শিখেছিলেন। সেসময় বহু সাধু পুরীর পথে কামারপুকুরে রাত কাটিয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গ করতেন, সেবা করতেন। তাঁদের কাছে ধর্মতত্ত্ব শুনতেন। যাঁরা 'কথামৃত' পড়েন, তাঁরা অবাক হয়ে যান শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানের ব্যাপ্তি দেখে। দর্শনশাস্ত্রের এমন কোন শাখা নেই যে-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পারঙ্গম ছিলেন না। এত বই তিনি কবে পড়লেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেনঃ "আমি শুনেছি কত!" অদ্ভুত বিচারশক্তি!

সব জিনিসের সার অংশটি তাড়াতাড়ি ধরে নিতে পারতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এমন মেধা আর কোথাও তিনি দেখেননি।

শ্রীচৈতন্য কিন্তু পড়াশোনায় মনোযোগী ছিলেন। ব্যাকরণ ভালভাবে শিখেছিলেন। একটু বড় হতেই টোল খুললেন। ছাত্রও অনেক আসতে শুরু করল। তাঁর অধ্যাপনায় সবাই মুগ্ধ। 'নিমাই পণ্ডিত' নামে তিনি খ্যাত হলেন। শীঘ্র দেখা গেল, শুধু ব্যাকরণ নয়—ন্যায়, সাংখ্য ইত্যাদি দর্শনের সব শাখাই তিনি আয়ত্ত করেছেন। অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধ হতো, সবাই তাঁর কাছে পরাস্ত হতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কারোর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছেন বলে শোনা যায় না। তবে এটা লক্ষ্য করা যায়, পণ্ডিতেরা তাঁর কাছে নীরব। নীরব এই কারণে—তাঁর জ্ঞান বই-পড়া থেকে নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে। সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবক্তা, আর সবাই শ্রোতা। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও তাঁর কাছে নীরব শ্রোতা। তেমনই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কেশব সেন প্রমুখ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ—যাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণ 'ইংলিশ-ম্যান' বলতেন।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই ছোটবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। দুরন্ত, কিন্তু মাতৃভক্ত। মার অবাধ্য কখনো হতেন না। উভয়েই মাঝে মাঝে ভাবস্থ হতেন। লোকে বলত ঃ "বায়ুরোগ, না হয় ভূতে পেয়েছে।" কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধক, তাঁরা বললেন ঃ "এ যোগজ ব্যাধি।" অর্থাৎ যোগাভ্যাসের ফল, শ্রীচৈতন্য দীক্ষার পর আর অধ্যাপনায় মন দিতে পারতেন না। সবসময় ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকতেন, শেষে টোল বন্ধ করে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন ভবতারিণীর পূজার পর ঈশ্বরচিন্তায় এমন মত্ত হলেন যে, আর বিধিমতো পূজা করতে পারতেন না। দিনরাত শুধু 'মা মা' বুলি, আহার-নিদ্রা নেই। মাটিতে মুখ ঘষতেন, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ত, লোকে ভাবত 'মাতৃশোক'। শ্রীচৈতন্যও দিনরাত কৃষ্ণ-নাম করতেন। মুহুর্মুহু তাঁর ভাব হতো, মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তেন। তিনি নিজেকে রাধা মনে করতেন। রাধার যে শুদ্ধ প্রেম, তাঁরও সেই প্রেম ছিল। "এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে"। কিন্তু তাঁর মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই ছিল। জ্ঞান ভিতরে, বাইরে প্রেম। এই জ্ঞান থেকেই প্রেম। সর্বত্র কৃষ্ণ-দর্শন। "কৃষ্ণময়ং জগৎ"। "স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্তি। সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি।।" তাই আচণ্ডালে প্রেম। সর্বসাধারণের জন্য তিনি শুধু নামমন্ত্র প্রচার করলেন। কারণ নাম ও নামী এক। কোন তত্ত্বকথা নয়, শুধু নাম। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীরামকৃষ্ণেরও ভিতরে জ্ঞান, বাইরে প্রেম। তিনি অদ্বৈতবাদী, 'একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, আর সব মিথ্যা'—এই মতে বিশ্বাসী। নির্বিকল্প সমাধিতে এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই জ্ঞানের পর বিজ্ঞান, যখন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন হয়। বেদান্তের ভাষায়—"জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। তখন—"ব্রহ্মময়ং জগৎ"। তখন জীবই শিব। তখন জীবে দয়া নয়, সেবা। স্বামী বিবেকানন্দ নির্বিকল্প সমাধি চেয়েছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। বলেছিলেন—তার চেয়েও উচ্চ অবস্থা আছে। ঈশ্বরই যে জীব-জগৎ হয়েছেন—এই উপলব্ধি করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবনিতার মধ্যে জগজ্জননীকে দেখে-ছিলেন। একটা গাছ কাটা হচ্ছে দেখে বলেছিলেন ঃ "এর মধ্যে যে আমার মা আছেন!" বলতেন ঃ "এক দেখা জ্ঞান, দুই দেখা অজ্ঞান।" সর্বত্র এক দেখেছিলেন বলেই তিনি 'প্রেমপাথার' হতে পেরেছিলেন। পায়ে হেঁটে দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলাতে পারছিলেন না বলে তিনি কেঁদেছিলেন। ভাবস্থ হয়ে শ্রীচৈতন্যের আসনে বসেছিলেন বলে বৈষ্ণবপ্রধান ভগবান দাস বাবাজী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার পর বুঝেছিলেন, উপযুক্ত ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের আসনে বসেছেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন ঃ "আমিই অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ—একাধারে তিন।" ❑

নীলকণ্ঠ মহাদেব—বিবেকের আনন্দস্বরূপ

স্বামী জিতাত্মানন্দ

।।১।।

নীলকণ্ঠ মহাদেব! তাপদগ্ধ জগতের বিষপানশেষে, ধ্যানে তুমি চলে গেলে কাল।
পিছে ফেলে অমৃতের অগ্নিভরা বাণী, আনিতে মানবদেহে দেবজাগরণ।
কেহ বা দেখেছে তোমা বীরেশ্বর শিব, কেহ বা ভৈরব, জ্ঞানের ত্রিশূল হাতে রুদ্র-মহাকাল,
কেহ বা ফকির, বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু; কেহ নব অবধূত ঘর যার বিশ্বভুবন।

।।২।।

কেহ বা দেখেছে তোমা ধ্যানী মহাযোগী, কেহ ত্যাগী, দণ্ডী সন্ন্যাসী,
কেহ জ্ঞানী মহাগুণী, রামদাস মহাবীর, মহাভাবময় প্রেমী ভক্তশ্রেষ্ঠবর,
ত্রিনেত্র ললাট হতে বহুরূপে উৎসারিত যার বহুযুগ-সঞ্চিত মহাজ্ঞানরাশি।
শুদ্ধমুক্ত, ভয়হীন, ক্রান্তদর্শী, যুদ্ধবীর, দরিদ্রের চিরবন্ধু রাজরাজেশ্বর।

।।৩।।

গুরু দেখেছিল তোমা মহাধ্যানে রত, অখণ্ড ঘরের সপ্ত ঋষিদের ঋষি।
কেহ দেখেছিল তোমা ঈশপুত্র যীশু, কেহ বা ধ্যানেতে বুদ্ধ প্রজ্ঞা যার নির্বাণবৈভব।
সেই তুমি উচ্চারিলে পশ্চিম সমুদ্রতটে বজ্রনাদে ভারতের বেদমন্ত্ররাশি।
'জন্মগত পাপী' ভাবে অন্ধজনে শুনাইলে আদি মহাবাণী—"অমৃতের পুত্র মোরা সব"।

।।৪।।

তুমি নব ভগীরথ! সিঞ্চন করিলে রামকৃষ্ণকৃপাবারি অগণন মুমূর্ষুর মাথে
দেখাইলে—জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তি-সেবা সমন্বয়, মহাশক্তিময় দেবমানবের বেশে।
প্রাচ্যের মহাধ্যান যুক্ত করি পশ্চিমের মহাবীর্য, মহাতেজ, মহাকর্ম সাথে
নব প্রাণ সঞ্চারিলে সর্বব্যাপী তমসায় ভরা মৃত্যুজরাজীর্ণ মহাদেশে।

।।৫।।

নিদ্রাতুর দেশমাতা, কোটি কোটি মৃতপ্রায় সন্তানের সাথে, শুনেছিল জাগরণ-গান—
"শতাব্দীর নিদ্রা ভাঙ", "উঠ জাগ", "জগতের হও গুরু সভ্যতারে বাঁচাবার তরে"।
উচ্চারিলে বজ্রকণ্ঠে—"জাগিবে ভারতমাতা মহাশক্তি সাথে, কেড়ে লবে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আসন,
মহাত্যাগ, মহাসেবা, মহাপ্রেম—বিরাটের পূজা—এই মাত্র মহামার্গ ধরে।"

।।৬।।

আঁধারে আলোক এল। শতাব্দীর মৃত্যুঘোর ভেঙে এল জীবনের মহান প্লাবন।
মুক্তির স্বপন এল যৌবনের উচ্ছলিত প্রাণে। ক্ষুধিতেরা অন্ন পেল, নিরক্ষর জ্ঞান।
"অভীরভীঃ" মন্ত্রে এল মহাজাগরণ! শতাব্দীর উপেক্ষিতা নারী পেল দেবীর আসন।
দলিত, দরিদ্র হলো নরনারায়ণ। "যত্র জীব তত্র শিব"—নররূপে দেবতাপূজন।

।।৭।।

অবহেলা, অবজ্ঞায় অগণিত মানুষের দেবত্ব-স্বরূপ ডুবেছিল পশুপ্রায় জীবনের তলে
তুমি এলে ত্রাতারূপে, সন্ন্যাসের গর্ব ছেড়ে ফিরে এলে গণিকার গানে, পতিতের দুঃখ অপমানে
আনিতে অভয়বাণী। কায়রোর পথভ্রষ্টা কন্যানারীগণে 'দেবদূত পিতা' হয়ে করুণা-পরশ দিলে।
নিগ্রো শিশু, সাঁওতাল পেল তব প্রেম। কেঁদেছিলে উচ্চরবে আদিয়ার সমুদ্রের তীরে নিরন্নের আর্তরব শুনে।

।।৮।।

"সেই দেবতার পূজা করে থাকি আমি যাহারে 'মানুষ' শুধু বলে অন্ধজনে"—এই বাণী
সত্য করি, দেশে দেশে, দ্বারে দ্বারে ঘুরি, সেবাযোগ নবধর্ম বিশ্বমাঝে প্রচারিলে তুমি।
কন্যাকুমারীর শেষ শিলাখণ্ডে বসি মহাধ্যানে দেখেছিলে ঈশ্বরের দুঃখীরূপ কোটি কোটি প্রাণী,
উঠেছিল বজ্রবাণী কণ্ঠে তাই—"আনো অন্ন শিক্ষা ধর্ম" সর্বহারা ঈশপদে নমি'।

।।৯।।

জন্মগত ধর্মে কঠিন বন্ধন, দেবদেবী, পূজা পাঠ, কভু তোমা পারেনি বাঁধিতে।
কখনো গির্জায় ধ্যান, কভু বৃক্ষতলে, কভু অরণ্যে গিরিগুহা মন্দিরে
কখনো ইসলাম বন্দন, কখনো বুদ্ধের দাস, মহানন্দে অবনত চিতে।
তবু সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল তব পূজা—ঈশ্বরের সেবা-জাগরণ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে মনুষ্যশরীরে।

॥১০॥

বলেছিল পশ্চিমের জড়বিজ্ঞান—"জড়ই সত্য, ধর্ম, শাস্ত্র, মত, ঈশ্বরাদি সব—বাক্যমাত্রসার।"
সেই সিংহগুহাতেই গিয়েছিলে তুমি, শুনাইতে সনাতন শাশ্বতবাণী—"জড় নহে, চিৎ চিরন্তন",
মানুষে মানুষে ভেদ, ধর্মদ্বন্দ্ব যত অসহিষ্ণু পরধর্মদ্বেষীদের নিষ্পাপ মনুষ্য শিকার।
বিজ্ঞান মেনেছে আজ শতবর্ষ পরে—'জগতের একত্ব', আর 'জীবে জড়ে মহাশক্তির একক স্পন্দন'।

॥১১॥

ভারতই ছিল তব প্রাণ—কৈশোরের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, সাধনভবন
মহাতপোক্ষেত্র, মহাপুণ্যভূমি তব। প্রতি কণা ধূলি যার হয়েছিল তোমা ধ্যানে অমৃতসমান।
তবু শেষে পূর্ণরূপে দেখা দিলে—দেশকাল জাতিধর্ম ঊর্ধ্বে এক সুমহাজীবন,
সর্বদেশে বাস, সর্বলোকে প্রেম, গণ্ডিভাঙা ব্রহ্মদর্শী, অনন্তের পুরুষ মহান।

॥১২॥

অনিকেত চিরন্তন পথচারী তুমি, কভু তৃণশয্যা তব, কভু রাজপালঙ্কে শয়ন,
"ঝঞ্ঝাময় হিন্দুযোগী" ধর্মরাজ্যে নেপোলিয়ঁ, "জন্মগত রাজার কুমার"
"গগনসঞ্চারী জ্ঞানী", "ক্রুশবাহী", "আত্মসুখী", শান্তিময় কমলাক্ষ শিশুর আনন
ব্রহ্মঋষি শুকদেব তুমি, জ্যোতির্ময়, যৌবনের পূর্ণতম রূপ, জ্ঞানরূপী শঙ্করের নব অবতার।

॥১৩॥

কেবা চিনেছিল তোমা? মহাভাগ্যবান, মহাপুণ্যস্নাত তারা দেখেছিল যারা
তোমার মানবরূপে "যুগস্রষ্টা পথদর্শী", "পতিতপাবন", "ত্রাতা", জন্মে স্বরাট
বিশ্ব যার কর্মক্ষেত্র। আসমুদ্রহিমাচল ত্রিভুবন ভ্রমি' প্রভুকাজ করেছিলে সারা।
আত্মজয়ী! তাই নব রামকৃষ্ণরূপ—বিশ্বজয়ী, যুগাচার্য নরেন্দ্র সম্রাট।

॥১৪॥

"তুই ঠিক থাক। আজ তোকে চিনিবে না কেহ"—বলেছিল রামকৃষ্ণ ঈশ্বর তোমার
ভিক্ষুকের বেশে রাজা তুমি তাই ভ্রম হেথা-সেথা, নিঃস্বজনের তরে ভিক্ষাপাত্র হাতে।
কশ্চিৎ দিয়েছ ধরা, কৃপাময়! স্নেহভরে, অজ্ঞানী, প্রভুভক্ত, সর্বত্যাগী শিশুরে ধরার।
বিবেকই চিনিবে তোমারে—রামকৃষ্ণময় শুদ্ধদিব্যরূপ শিবমুরতিতে।

॥১৫॥

কোথা তারা সব যারা গঙ্গার পশ্চিম তটে বেলুড়ের মঠ-প্রাঙ্গণ
রেখেছিল ভরে সযতনে তোমারই বহ্নিশিখা মহাত্যাগ তপস্যায় অচঞ্চল প্রেমে
রাখাল যোগেন খোকা শশী গঙ্গাধর শরৎ প্রসন্ন লাটু গোপাল নিরঞ্জন
সারদা তারক হরি বাবুরাম কালী—যারা তব মহাকার্যে এসেছিল নেমে?

॥১৬॥

কোথা যারা গুরুপ্রেমে চিরবদ্ধ, বহেছিল দধীচির ত্যাগে তোমারই পতাকাখানি,
শেষবিন্দু রক্ত দিয়ে নবযুগসৃষ্টিকার্যে সযত্নে বর্ধিত করি তোমারই মিশন;
নিবেদিতা ক্রিস্টিন ধীরামাতা জোসেফিন ক্যাপ্টেন মাদার, তব মাতৃস্বরূপিণী
আলাসিঙ্গা গুডউইন কল্যাণ নিশ্চয় স্বরূপ খগেন শুকুল সদানন্দ বীরগণ?

॥১৭॥

কোথা তারা গেল যারা তোমার বিদ্যুৎস্পর্শে, শুনে তব কম্বুকণ্ঠে মহা আহ্বান
পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলমোচন—এই মাত্র পণ করি, পিছে ফেলে সুখের সংসার,
গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে কারাগারে দ্বীপান্তরে ফাঁসিমঞ্চে সঁপে দিল যৌবনের প্রাণ,
কোথা সেই শহীদের দল—সূর্য সেন প্রীতিলতা কানাই ক্ষুদিরাম বাঘা যতীন্দ্রকুমার?

॥১৮॥

হিমালয় গিরিশৃঙ্গে দেখেছ কি প্রোজ্জ্বল মহাশ্বেত, মহামৌন রজতকাঞ্চনস্তূপ
অথবা নিস্তব্ধ গঙ্গা প্রবাহিত পাবনের শক্তি নিয়ে অন্তহীন সাগরে অপার?
তুমি সেই সুমহান! জীবোদ্ধারে এসেছিলে নামি সমাধির রাজ্য ছেড়ে নিয়ে নবরূপ
রামকৃষ্ণ-বাণী বহি' বীণাকণ্ঠ তুমি, ব্রহ্মনাদ বাজে কণ্ঠে যার।

॥১৯॥

নীলকণ্ঠ মহাদেব! বলেছিলে তুমি—"আবার আসিব ফিরে, মানুষের প্রেমে বদ্ধ আমি।"
দেবত্বের স্পর্শ লাগি' কাতর পৃথিবী আজ। ভোগমরুদেশে চলে নিত্য মৃত্যুহোম।
বিবেকের আনন্দস্বরূপ! নিত্যমুক্ত! অনন্ত অহম্! প্রেমে এস নামি
মহাসুরধ্বনি তানে গাও আজ, গাও সেই গান—"চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্"॥
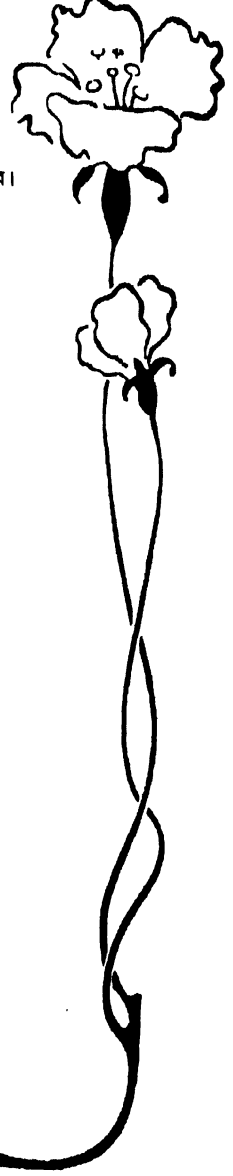
কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী নির্মুক্তানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ ১৯৩০-এর শেষে অথবা ১৯৩১-এর প্রথমে ক্ষয়কাশ বা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। তিনি ঠাকুরের মন্দিরের সম্মুখস্থ বর্তমান মিউজিয়াম-বাড়ির (পূর্বতন 'মিশন অফিস') দোতলায় পূর্বদিকের ঘরে থাকতেন। তাঁর সেবার জন্য সেবকগণ দীর্ঘদিন রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আরো একজন সেবকের প্রয়োজন হয়। তাঁর প্রধান সেবক স্বামী পরব্রহ্মানন্দ (অভয় মহারাজ) আমাকে পছন্দ করেন। মহারাজজীর শরীরত্যাগ করার আগে শেষ পনের দিন আমি তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। মহারাজের প্রধান সেবকের নির্দেশমত কাজ করতাম। পূজনীয় স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের দেহ ছিল গৌরবর্ণ। তাঁর কাশির সঙ্গে কফ উঠত। পিকদানে রাখা ঐ কফ আমাকে পরিষ্কার করতে হতো। তাঁর কিরূপ কষ্ট-যন্ত্রণা হতো তা বুঝতাম না। কারণ, কোনদিন তাঁকে বিমর্ষ বা বিষণ্ণ দেখিনি। শারীরিক যন্ত্রণায় তাঁর কোনদিন অস্থিরতা বা কাতরোক্তির প্রকাশও দেখিনি। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর বিকেল তিনটা পাঁচ মিনিটে তিনি দেহত্যাগ করেন।

স্বামী সুবোধানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের প্রথমে মহাপুরুষ মহারাজের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সারগাছি আশ্রম থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে আসেন। তাঁর সেবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়। আমি তাঁর সেবার সব কাজ করতাম। সন্ধ্যার পর তাঁর গা-হাত-পা মাসাজ করে দিতাম। এতে তিনি খুব আরাম বোধ করতেন এবং প্রসন্ন হতেন। এইসময় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও মহাপুরুষ মহারাজকে দেখার জন্য মঠে আসতেন। তাঁর উন্নত ও সুগঠিত দেহ, দীর্ঘ বাহু, উজ্জ্বল প্রশান্ত বদন আমাকে খুব আকর্ষণ করত। তাঁর শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল। তাঁকে দর্শন করে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। অভেদানন্দজী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গেও দেখা করতেন। দুই গুরুভ্রাতার মিলন উভয়ের কাছেই খুবই আনন্দদায়ক ছিল। মঠের সাধুরা দুই গুরুভ্রাতার মধ্যে অপূর্ব প্রীতির ভাব লক্ষ্য করে মুগ্ধ হতেন। অখণ্ডানন্দজী মঠে কিঞ্চিদধিক ছয় মাস থেকে মহাপুরুষজীকে কিছু সুস্থ দেখে দুর্গাপূজার পরে সারগাছি রওনা হন। দুর্গাপূজার সময় দেখেছি, তিনি কুমারীপূজার পর কুমারীকে প্রণাম করে একটাকা প্রণামী দেন। আমার পরিষ্কার স্মরণ আছে যে, সারগাছি রওনা হওয়ার আগে তিনি মঠ-কর্তৃপক্ষকে বলেন: "দাদার (মহাপুরুষ মহারাজকে অখণ্ডানন্দজী 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন) শরীরের এই অবস্থা, তোমরা এবার ঠাকুরের সাধারণ উৎসব করো না। কিন্তু মঠ-কর্তৃপক্ষ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি সাধারণ মহোৎসবের আয়োজন করেন। অন্যদের মুখে শুনেছি, সেদিন বিকেল দুটা-আড়াইটা হবে। উৎসব খুব জমেছে, এমন সময় বড় বড় শিলাবৃষ্টি হয়ে উৎসব পণ্ড হয়ে যায়। শিলাতে কারো মাথা ফাটে, কারো বা হাত জখম হয়। গোটা উৎসবটাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য-গণের কথার প্রভাব কী অমোঘ!

অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর সেবকরূপে আমিও সারগাছি যাই। সেজন্য মহাপুরুষ মহারাজের শরীর-ত্যাগের সময় তাঁর কাছে আমি থাকতে পারিনি। সারগাছির আশ্রমবাসীরা এবং আশ্রম-সংলগ্ন গ্রামবাসীরা সকলে অখণ্ডানন্দজীকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। আমি আড়াই বছর একটানা তাঁর সেবায় ছিলাম, আর ছয় মাস সারগাছি আশ্রমে অন্য কাজ করেছি। মোট তাঁর কাছে তিন বছর ছিলাম। বহু স্মৃতি মনে জাগে। কয়েকটা ঘটনা মনে পড়ছে, যা কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি এবং অপরের অজ্ঞাত।

বাবা অন্ধকার থাকতে শয্যাত্যাগ করতেন। অতঃপর এক গ্লাস জল পান করতেন। তাঁর ঘরের দরজার ডানদিকের দেওয়ালে একখানা কাঁচে বাঁধানো শিবের ছবি টাঙানো থাকত। দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে তিনি শিবকে প্রণাম করতেন। অতঃপর শৌচে যেতেন হাততালি দিতে দিতে; হাততালি দেওয়ার কারণ, যে-পথ দিয়ে যেতেন তার দুই পাশেই গাছ-গাছড়া, ঝোপ-জঙ্গল। বিষধর সাপ ঐদিকে চলাফেরা করত। আমি লণ্ঠন নিয়ে পিছনে পিছনে যেতাম। ঘরে ফিরে মহারাজ ধ্যানে বসতেন। ধ্যানান্তে তিনি কিছু স্তব আবৃত্তি করতেন। 'হরগৌর্যষ্টক' স্তবটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। স্তবটি এইরূপ—

"কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।।"

মহারাজ যখন স্তবটি আবৃত্তি করতেন তখন খুব ভাল লাগত শুনতে। সকালে শয্যাত্যাগের পর আমি তাঁকে প্রণাম করতাম। একদিন প্রণাম করবার সময় তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর ডান হাত প্রসারিত করে আমার মাথায় বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন। এই আশীর্বাদ আমার পরমপ্রাপ্তি। দুপুরে স্নানের সময় বাবা বাল্মীকি-রচিত 'গঙ্গাস্তোত্র'-এর দুই পঙ্‌ক্তি রোজ আবৃত্তি করতেনঃ "মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গার-হারাবলি / স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথি প্রার্থয়ে।।"

একদিন কোন বিশেষ পর্বোপলক্ষ্যে বাবা আমাকে চণ্ডীপাঠ করতে বলেন। আমি বললামঃ "বাবা, আমার এখনো চণ্ডীপাঠ সড়গড় হয়নি।" তিনি বললেনঃ "ঠাকুরের সামনে চশমা পরে পাঠ করতে আমার লজ্জা বোধ হয়।" একথার তাৎপর্য এই বুঝেছিলাম, তিনি যখন ঠাকুরের কাছে যেতেন তখন চশমা ব্যবহার করতেন না। তাঁর শরীর স্থূল হওয়ায় সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠাও বেশ কষ্টকর ছিল। তবে সেদিন দোতলার বারান্দায় তিনি চণ্ডীপাঠ করেন। যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে ঠাকুরের দর্শন হয় না।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

দ্বিপ্রহরের আহারের শেষে বাবা ঠাকুরের প্রসাদ সামান্য মাত্রায় গ্রহণ করতেন। একদিন ফলপ্রসাদ দিয়েছি, তাতে আপেলের টুকরো খুব ছোট করে কাটা দেখে তিনি কে পূজা করেছে জানতে চাইলেন। পূজকের নাম বলাতে তাকে ডাকতে বললেন। পূজারী আসলে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আপেল এত ছোট করে কেটেছিস কেন?" পূজারী বললেনঃ "প্রসাদ বিতরণ করতে সুবিধা হবে বলে ছোট করে কেটেছি।" এই কথা শুনে তিনি খুব বিরক্তি প্রকাশ করে বললেনঃ "ঠাকুর গ্রহণ করবেন—একথা না ভেবে অন্যদের প্রসাদ বিলি করতে সুবিধার কথা ভাবছ কেন?"

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের জন্মাষ্টমীতে সারারাত তন্ময় হয়ে বাবা শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক গান করেন। যতটা মনে পড়ে, তিনি নিজেও কিছু পদাবলী সঙ্গে সঙ্গে রচনা করে গেয়েছিলেন। তখন আশ্রমে বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। মোমবাতি একটার পর একটা জ্বলছে, আর এদিকে মা যশোদার নয়নের মণি বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনও চলছে। মহারাজ ৭০/৭১ বছর বয়সে অসুস্থ শরীরে এইরূপ ভজন গেয়েছেন! কতটা গভীর ঈশ্বরানুরাগ থাকলে এটা সম্ভব এথেকে তার কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলাম। তাঁর মুখে শুনেছিলাম, তিনি প্রথমদিকে নিরাকার পরব্রহ্মে বিশ্বাস ও অনুরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন, মা যশোদা ক্ষীর ননী প্রভৃতি খাবার নিয়ে কৃষ্ণকে ডাকছেন। এমন সময় (স্বপ্নাবস্থাতেই) ঠাকুর বলছেনঃ "দেখলি, কি সুন্দর ভাব!" ঠাকুরের এইকথা সমস্ত জীবন বাবার মনে ছিল।

বাবার সেবাকালে দেখেছি, সারগাছি আশ্রম ঋষিদের তপোবনের মতো ছিল। লোকালয় থেকে দূরে, বহুবিধ ফলফুলের বৃক্ষ ও লতাগুল্ম-আচ্ছাদিত, নির্জন নৈসর্গিক সৌন্দর্যে পূর্ণ ছিল আশ্রমটি। আমার বেশ স্মরণ আছে, একদিন বাবা আমাকে বলেনঃ "আমরাই তো ঋষি!" একদিন বাবা বিকেলবেলায় সবুজ মাঠে উত্তর-পশ্চিম কোণে ক্যাম্প খাটে বসেছেন। পিছনে ডালিম, বকুল, লতাবিতান আর উত্তর-দিকে ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। শুধু আমিই তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই পরিবেশে তিনি মধুর কণ্ঠে গান ধরলেনঃ

"তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব-মানব বন্দে চরণ—
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁর জগতমন্দিরে।"

গানের এই কয়টি চরণ তন্ময় হয়ে প্রাণের আবেগে এমন সুমধুরভাবে গাইলেন যে, এখনো সেই সুরলহরী স্মরণে রোমাঞ্চিত হই।

১৯৩৪ সালে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শরীর-ত্যাগের পর অখণ্ডানন্দজী মহারাজ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিহারে ভূমিকম্প হয়। বহুলোকের প্রাণহানি ও নিদারুণ কষ্টের কথা শুনে তিনি মর্মাহত হন এবং সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মুঙ্গেরে যান। সঙ্গে আমি, শ্রীনাথ মহারাজ (স্বামী দিব্যাত্মানন্দ) এবং আরেকজন সাধু (নাম মনে নেই)—এই তিনজন ছিলাম। মুঙ্গেরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল হেমচন্দ্র বসুর বাড়ির নিচতলায় থাকার বন্দোবস্ত হয়। মুঙ্গেরে পৌঁছে বাবা মোটরে করে সমস্ত শহর ও মানুষের দুর্দশা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে প্রাণে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করেন। মুঙ্গেরের 'বার অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্যরা ক্রিসমাস ইভ উদ্‌যাপন সভায় স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে পৌরোহিত্য করতে অনুরোধ করেন। তিনি রাজি হন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেনঃ "যারা ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁকে প্রাণবধের চেষ্টা করেছিল, তাদের উদ্দেশে যীশু বলেছিলেন, 'Father forgive them, for they know not what they do'—'হে পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ তারা জানে না তারা কি করছে।' ঈশ্বরের কাছে

তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা খ্রীস্টের জীবনকে অধিকতর মহিমান্বিত করেছে।" মহারাজের কথাগুলি শ্রোতৃবৃন্দকে অভিভূত করে। কয়েকদিন মুঙ্গের ও ভাগলপুরে অবস্থানের পর বাবা মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

বেলুড় মঠে সন্ধ্যারতির পর 'জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি জয়' বলে যে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়—এটি বাবাই প্রবর্তন করেন। যতটা মনে পড়ে, এটি প্রবর্তিত হয় তাঁর মঠাধ্যক্ষ হওয়ার পর। স্বাস্থ্যের কারণ ভিন্ন সকলেই যেন সন্ধ্যারতিতে যোগদান করে—তাঁর এই নির্দেশ আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

সন্ধ্যার পর আমি বাবাকে মাসাজ করতাম। ঐসময়ে তিনি ঠাকুরের কথা এবং তাঁর পরিব্রাজক জীবনের অনেক ঘটনা বলতেন। যখন স্বামীজীর কথা হতো তখন তিনি ভাবের আবেগে ও উৎসাহে ভরপুর হতেন। উল্লসিত হয়ে অনর্গল স্বামীজীর উচ্চ প্রশংসা করে তাঁর মহিমা বর্ণনা করতেন। একদিন আশ্রমের অনাথ বালকদের সম্বন্ধে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। স্বামীজী বাবাকে বলেছিলেন ঃ "তোর কাছে যারা আছে তারা 'অনাথ' নয়, তারা 'সনাথ'।"

বেলুড় মঠে সংঘটিত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদিন বাবা মঠের বাইরে কোথাও যাবেন। আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। বাবা ঠাকুরের উদ্দেশে পুরনো মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। সেসময় এক পণ্ডিত সাধু রসিকতার সুরেই তাঁকে একটু কটাক্ষ করলে বাবা অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন ঃ "তুই বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে গেছিস! স্বামীজী অত বড় বেদান্তবাদী, যখন খোলে চাঁটি মেরে 'জয় রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়, জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র জয়' বলে গান ধরতেন তখন ভক্তিভাবে অভিভূত হতেন।" অন্য সময়ে স্বামীজীর মহত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বাবা বলতেন, স্বামীজী ছিলেন "অক্রোধপরমানন্দ।"

সারগাছি আশ্রমে দেখেছি, কোন জিনিস নষ্ট বা অপচয় করলে বাবা অসন্তুষ্ট হতেন। ঠাকুরের মুখে তাঁরা শুনেছিলেন ঃ "গৃহস্থরা কত কষ্ট করে অর্থোপার্জন করে। সেই কষ্টার্জিত অর্থের অংশ তারা ঠাকুরসেবা, সাধুসেবায় দিয়ে থাকে। তার সদ্ব্যবহার করতে হয়। নষ্ট করা ঠিক নয়।" সেজন্য অবচয় বা অপব্যয় তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের পবিত্র সান্নিধ্যে তিন বছর ছিলাম। এই সময়ে তাঁর মুখে তাঁর পরিব্রাজক জীবনের বহু ঘটনা শুনবার সুযোগ লাভ করেছি। মঠ-মিশনের দ্বিতীয় পর্ব—আলমবাজার মঠ-পর্ব থেকে বেলুড় মঠ এবং সারগাছি আশ্রম সম্পর্কিত অনেক বিষয় তাঁর কাছে জানতে পেরেছি। তার ফলে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, স্বামী অখণ্ডানন্দজী শুধু ধ্যানযোগী ঈশ্বরপরায়ণ মহাত্মাই ছিলেন না, পরদুঃখ-কাতরতা এবং অপরের দুঃখমোচনে সচেষ্ট হওয়াও তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। অনগ্রসর জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-কার্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী ও উদ্যোগী। ধৈর্য, ক্ষমা, স্পষ্টবাদিতা এবং নির্ভীকতার সংযোগে তাঁর চরিত্র ছিল সমৃদ্ধ। তাঁর চরণে এবং আমার দেখা অপর তিনজন শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। [সমাপ্ত] ❑

অনুষ্ঠান-সূচী (চৈত্র ১৪০৫)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

শ্রীরামচন্দ্র (রামনবমী)	চৈত্র শুক্লা নবমী	১০ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	২৫ মার্চ	১৯৯৯

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা	চৈত্র শুক্লা অষ্টমী	৯ চৈত্র	বুধবার	২৪ মার্চ	১৯৯৯

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

১২, ২৮ চৈত্র	শনিবার,	সোমবার	২৭ মার্চ,	১২ এপ্রিল	১৯৯৯

দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ③

❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑

কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত

সে-অনুসারে দেবতারা চিত্ত সংযত করার সঙ্কল্প নিয়ে ধ্যানে বসলেন। সমস্ত চিন্তাকে মন থেকে দূর করে, মনপ্রাণ ঢেলে একাগ্রচিত্তে তাঁরা অন্তর্যামী ভগবান বিষ্ণুকে আহ্বান করতে লাগলেন।

দেবতাদের কাতর, আন্তরিক আহ্বান ও প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু প্রসন্নমূর্তিতে তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা নিজেদের মহাবিপদের কথা বিষ্ণুকে জানালেন এবং কাতরভাবে প্রার্থনা করলেন এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে তাঁদের উদ্ধার করতে। দেবতারা ভগবান বিষ্ণুকে বৃত্রাসুরের বিনাশের উপায় বের করে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানালেন।

ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের অভয় দিয়ে বললেন ঃ "বৃত্রাসুর বিনাশের উপায় নিশ্চয়ই আছে। এমন একজন মহাপ্রাণ ঋষির অস্থি দিয়ে অমোঘ অস্ত্র বজ্র নির্মাণ করতে হবে যাঁর দেহ অসাধারণ ত্যাগ ও তপস্যায় দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়েছে। এমন একজনই আছেন। তাঁর নাম মহর্ষি দধীচি। শ্রীভগবানের তেজে শক্তিমান হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র সেই অমোঘ বজ্রের দ্বারা ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরকে বধ করতে সমর্থ হবেন।" [ক্রমশ]

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রানী রাসমণির জন্মভূমি হালিশহর

গত শারদীয় 'উদ্বোধন' (আশ্বিন ১৪০৫)-এ অন্যান্যবারের থেকেও বিশেষ মাত্রা যোগ হয়েছে। শতবর্ষের শারদীয়া সংখ্যা হিসাবে এ এক অনন্য প্রকাশনা। প্রতিটি লেখার রসমাধুর্য, প্রাসঙ্গিকতা এবং সাহিত্যগুণ আমাদের সকলের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। সেইসব অমূল্য রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম শ্যামলী মহাপাত্রের 'রানী রাসমণি ঃ বিস্মৃত এক মহীয়সী'।

রাসমণির ওপরে এই লেখাটির অসাধারণত্ব স্বীকার করে ও লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করতে চাই। উল্লিখিত প্রবন্ধে অনুপস্থিত বিষয়টি হলো, লোকমাতা রানী রাসমণির জন্ম ও অনুপ্রেরণা-ভূমি হালিশহর—যে পবিত্রভূমি রাসমণি ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়কেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। হালিশহরের অন্তর্গত 'কোনা' পাড়ায় মামার বাড়িতে রাসমণির জন্ম হয়। তাঁর পিতৃভিটা এই হালিশহরেরই 'গোলাবাড়ি' পাড়ায়। দুটি পাড়াই হালিশহরের দক্ষিণ ও উত্তর সীমান্তের প্রান্তিক পাড়া। মাঝখানে বিশাল হাবেলীশহর পরগনার অন্তর্গত কুমারহট্ট বা হালিশহর গ্রাম। 'হাবেলী' কথার অর্থ অট্টালিকা। সুতরাং হাবেলীশহর হচ্ছে 'অট্টালিকাপূর্ণ শহর'। এখনো এই প্রাচীন শহরে অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়—পোড়োবাড়ি, ছোট ছোট ইঁটের গাঁথনি আর চুনসুরকির দেবদেউল। সেসময় রাসমণির পিতৃভিটার জমির নিশানা ছিল—"খতিয়ান নং ২৬১৮, তৌজি নং ২৫০১, মৌজা নন্দনবাটী হাবেলীশহর পরগনা, দাগ নং ২৪৩ ও ২৪৪ ভূমিখণ্ডের দখলদার স্বত্বাধিকারী রানী রাসমণির বংশীয় (?) অনাথনাথ বিশ্বাস সাং ৭১নং ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা।" তবে জমিটি আজ সঠিকভাবে খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ (অন্যতর সহাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন) আমাকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন ঃ "ভারতের ইতিহাসে হালিশহরের অবদান অপরিসীম।" সত্যিই, হালিশহরের প্রাচীন ঐতিহ্য সর্বধর্মসমন্বয়ক্ষেত্র-রূপে। এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ও বৈষ্ণবধর্মের আদিসূত্রধর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীচৈতন্যের বাঙলাভাষায় সর্বপ্রথম জীবনী 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-রচয়িতা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, বাসুদেব আচার্য প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যগণ, শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি ও সাধকপ্রবর কবি রামপ্রসাদ সেন, সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় মহাসাধক ও বহু সাধকের অনুপ্রেরণাদাতা রামকৃষ্ণ রায় এবং বিদ্যাধর রায়চৌধুরী—যিনি শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব সমন্বয়ের মানসে একটি কষ্টিপাথরের ত্রিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনটি মন্দিরে। আবার শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্য-বিরহে হালিশহরে বসবাস করতে চলে আসেন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য গুরুগৃহ দর্শন-মানসে হালিশহরে এসে ভাবাপ্লুত হয়ে গুরুভূমির মাটি সারাদেহে মাখেন ও ভক্ষণ করেন। তারপর ঐ মাটি ঝুলিতে ভরতে থাকেন। দেখাদেখি উপস্থিত ভক্ত এবং পার্ষদরাও তাই করতে থাকেন। এভাবে সৃষ্টি হয় এক গর্তের। পরে বিভিন্ন সময় বৈষ্ণব দর্শনার্থীরা তদ্রূপ করায় তা পরিণত হয় একটি ছোট্ট ডোবায়—যা আজ 'চৈতন্যডোবা' নামে বিখ্যাত। এঘটনা ঘটেছিল ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের কার্তিক ত্রয়োদশী তিথিতে। এছাড়া রয়েছে শিবের গলির শিব, বলদেঘাটার সিদ্ধেশ্বরী কালী (নতুন রূপে), তিনশ বছরের চৌধুরীপাড়ার দোলতলার কৃষ্ণরায় মন্দিরের দোলমণ্ডপ, শ্যামাসুন্দরীতলার মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবদেউল। রয়েছে বাগেরমোড়ের মসজিদ, ঘোষপাড়া রোডের ধারে মানিকপীরের দরগা (হিন্দু-মুসলিম একত্রে পুজো দিয়ে থাকে এখানে) প্রভৃতি। এছাড়াও সন্নিকটবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন গির্জা ব্যান্ডেল চার্চ।

ইংরেজ-পর্তুগীজ প্রভৃতি খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরাও হালিশহরে আনাগোনা করতে থাকে। এইভাবে হালিশহর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সমন্বয়ভূমিতে পরিণত হয়। এর প্রভাব রাসমণির ওপরে পড়ে, যার ফলশ্রুতি বোধ করি, সর্বধর্মসমন্বয়ের মিলনভূমি 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির' নির্মাণ। তবে সর্বপ্রথমে তিনি স্বপ্নের মন্দিরটি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন হালিশহরে। কিন্তু তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের তীব্র বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। (দ্রঃ 'বাণী ও বিচার'—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, বেদান্ত মঠ, কলকাতা, পৃঃ ২০) এটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, হালিশহরবাসী তাঁদের অতীতগৌরব সম্পর্কে অসচেতন। যাই হোক, 'রানী' হওয়ার পরে রাসমণি হালিশহরে তাঁর মামার বাড়ির নিকটবর্তী গঙ্গায় 'কোনা রামপ্রিয়াঘাট' নির্মাণ করেন এবং গরিব গ্রামবাসীদের প্রচুর দানধ্যান করেন। সেসময় পিতৃভিটা গোলাবাড়িতে রাসমণিঘাট রোডের দুধারে তিনি বহু বৃক্ষরোপণ করেন, যা আজও সেই স্মৃতি বহন করে রয়েছে। শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও স্বয়ং নৌকাপথে তীর্থে যাওয়ার সময় হালিশহরে নেমে রাসমণি ও রামপ্রসাদের ভিটা এবং বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী-মন্দির দর্শন করেন। যাই হোক, শ্যামলী মহাপাত্রের রাসমণির ওপর একটি তথ্যবহুল ও মননঋদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করায় লেখিকা ও 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শিবসৌম্য বিশ্বাস
হালিশহর স্টেশন রোড, পূর্বাচল
পোঃ নবনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

নব 'পঞ্চশীল'

আমার পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের এক লক্ষ একুশ হাজারেরও বেশি আশ্রিতের মধ্যে আমি অন্যতম। পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদের পাঁচটি উপদেশ দিয়েছিলেন। উপদেশগুলি তিনি আমাদের কাছে বললেও আমার মনে হয় এগুলি সকলেরই পালনীয়। পূজ্যপাদ মহারাজ বলেছিলেন ঃ

(১) কখনো কারো অনিষ্ট করো না। (২) সত্যকে কখনো ত্যাগ করবে না। (৩) কাউকে কোন কথা দিলে অবশ্যই রাখবে, কখনোই প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেবে না। (৪) ইন্দ্রিয়সমূহকে তোমার বশবর্তী করতে হবে। (৫) যতটা সম্ভব বিলাসিতা বর্জন করে সাধারণ জীবন যাপন করবে।

এই পাঁচটি উপদেশ আমাদের জীবনে 'পঞ্চশীল' হয়ে রয়েছে।

অলোককুমার চৌধুরী
অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ
আই. আই. টি, খড়্গপুর
মেদিনীপুর-৭২১৩০২

উপাধি 'গুপ্ত' নয়, 'গুহ'

উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৫ সংখ্যায় তাপস বসুর লেখা 'ব্রিটিশ রাজরোষে রামকৃষ্ণ মিশন' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে ভাল লেগেছে। শ্রীবসু তাঁর নিবন্ধের এক জায়গায় (পৃঃ ৫০৪) কতিপয় পূজনীয় প্রাচীন সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের ও সন্ন্যাস-নামের তালিকা দিয়েছেন। ঐ তালিকায় স্বামী অভয়ানন্দের (ভরত মহারাজের) পূর্বাশ্রমের ও সন্ন্যাস-নাম উল্লিখিত হয়েছে—'অতুলচন্দ্র গুপ্ত (স্বামী অভয়ানন্দ)'। আমি জানি, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগদান করবার পূর্বে তাঁর উপাধি ছিল 'গুহ'—'গুপ্ত' নয়। স্বামী অভয়ানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল 'অতুল'—'ভরত' নয়। অতএব প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁর প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ছিল 'স্বামী অভয়ানন্দ (অতুল মহারাজ)'। কিন্তু মঠ ও মিশনের সাধু, ব্রহ্মচারী ও অগণিত ভক্তদের কাছে তিনি 'অতুল মহারাজ' না হয়ে 'ভরত মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন সন্ন্যাসীদের কাছে শুনেছি, সেসময়ে মঠে চারজন 'অতুল' ছিলেন। সেজন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁদের নামকরণ করেছিলেন—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। তখন থেকে স্বামী অভয়ানন্দ হয়ে যান 'ভরত মহারাজ'।

পীযূষকান্তি রায়
চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লী-১১০০১৯

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

গত অগ্রহায়ণ ১৪০৫ সংখ্যার 'উদ্বোধন' পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি, অবশ্য প্রত্যেক সংখ্যা পড়েই পেয়ে থাকি। তবে ভগিনী নিবেদিতার ভারত-আগমনের শতবর্ষ এবং নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নিবেদিত গত অগ্রহায়ণ সংখ্যাটির সম্পাদকীয় আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছে। 'উদ্বোধন' পেলে আমি প্রথমেই 'কথাপ্রসঙ্গে' পড়ি। এবার অগ্রহায়ণ সংখ্যাটি পেয়েই একনিঃশ্বাসে 'ভারততীর্থে ভগিনী নিবেদিতা' পড়ে শেষ করেছি। ভারী সুন্দর লাগল। যেমন তথ্যপূর্ণ, তেমনি আবেগসমৃদ্ধ এবং রসপূর্ণ। গভীর ভাব এবং অনুভূতির সঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্য সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়েছে। শেষ পঙ্‌ক্তি-কয়টি সত্যিই অপূর্বঃ "অপরিসীম শান্তি ও আনন্দ, আবার অবর্ণনীয় মানসিক সঙ্ঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যে-নিবেদিতা বাহির হইয়া আসিলেন তিনি আর কোনভাবেই আগের ব্যক্তিটি নহেন। এখন তাঁহার সত্যসত্যই নবজন্ম লাভ হইয়াছে। জ্যোতিষ্মতী নিবেদিতা অগ্নিশুদ্ধা হইয়া উঠিয়াছেন।... এখন হইতে ভারতই হইয়া উঠিল তাঁহার নূতন জন্মভূমি, ভারতবাসী হইয়া উঠিল তাঁহার স্বজাতি, ভারতের দুঃখ তাঁহার দুঃখ, ভারতের কল্যাণ তাঁহার কল্যাণ। তাঁহার নিজের লেখায় বাঙ্ময় হইয়া উঠিল তাঁহার অন্তর্লীন সেই গভীর অনুভূতি—'এ-বৎসর দিনগুলি কি সুন্দরভাবেই না কাটিয়াছে! এই সময়েই যে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে! প্রথমে নদীতীরে বেলুড়ের কুটিরে, তাহার পর হিমালয়-বক্ষে নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, পরিশেষে কাশ্মীরে নানা স্থানে পরিভ্রমণকালে—সর্বত্রই এমন সব সময় আসিয়াছিল, যাহা কখনো ভুলিবার নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি, যাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।'

"অবিস্মরণীয় সেই অভিজ্ঞতার দীপ্তি নিবেদিতার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনপথকে চিরতরে আলোকিত করিয়াছিল। তাঁহাকে ভারত-তীর্থে প্রকৃত পূজারিণীতে রূপান্তরিত করিয়াছিল, যিনি আমৃত্যু জপ করিতেন—'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!' "

স্বামী প্রমথানন্দ
বেদান্ত সোসাইটি অফ টরন্টো
এস্ম্যাট অ্যাভেনিউ, টরন্টো
অন্টারিও, কানাডা

টোটকা

বর্তমান বিস্ময়কর বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে আমরা ডাক্তার, অ্যান্টিবায়োটিক, অপারেশন, দামী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া রোগ নিরাময়ের কথা ভাবতে পারি না। অনেকের সচ্ছল অবস্থা হওয়াতে অন্য কিছু ভাববার সময় বা ইচ্ছাও নেই। কিন্তু আমাদের দিদিমা-ঠাকুমা, মা, জেঠিমাদের সময়ে কিছু টোটকা ছিল যেসব ব্যবহারে অনেক দিক দিয়ে সাশ্রয় হতো, আবার অসুখ-বিসুখে উপকারও হতো। কয়েকটির কথা এখানে বলছি।

(১) দামী কাপড়ে যদি আয়োডিন (iodine) লেগে যায়, তবে কি কাপড়টা ফেলে দেবেন? একটা বাটিতে কিছু দুধ ঢেলে ঐ জায়গাটায় ঘষে দেখুন ম্যাজিকের মতো কেমন দাগ উঠে যায়।

(২) হঠাৎ যদি গরম জলে বা আগুনের তাপে আঙুল বা শরীরের বেশ খানিকটা জায়গা পুড়ে যায়, তাহলে দেরি না করে তৎক্ষণাৎ একটা পাত্রে বেশ কিছুটা ঠাণ্ডা জলে নুন ফেলে দিন। তারপর ঐ জায়গাটা ডুবিয়ে রাখুন অথবা একটা ছোট কাপড় চুবিয়ে ক্রমাগত অন্তত আধঘণ্টা লাগাতে থাকুন।

(৩) লোহার মরচে যদি জামা-কাপড়ে লাগে, তাহলে প্রথম অবস্থায় পাতিলেবু ও পরে সাবান ঘষে ধুয়ে দিলে জামা-কাপড়ের ঐ দাগ উঠে যাবে।

(৪) ঘুম থেকে উঠে রোজ সকালে যদি খালি পেটে ৩/৪ গ্লাস ঠাণ্ডা জল (মুখ না ধুয়ে খেলেই ভাল, নতুবা ধুয়ে) খেতে পারেন ও তার কিছুক্ষণ পর প্রাতরাশ বা জলখাবার খান তাহলে যেসব রোগের হাত থেকে অন্তত শতকরা ৮০ ভাগ নিরাময় হতে পারেন সেগুলো হলো—রক্তচাপ, সর্দিকাশি, বায়ু, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি। একে বলে 'water therapy' বা জল-চিকিৎসা।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ডোভার টেরেস, কলকাতা-৭০০ ০১৯

জাতীয় লিগ—প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও ভবিষ্যৎ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের কি প্রয়োজন?... আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ।... দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যা কি—কাঁটা কোথায় বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনি তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

দেখতে দেখতে তিন বছর পার করতে চলল জাতীয় ফুটবল লিগ। ১৯৯৬ মরসুমে যাত্রা শুরু ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ফুটবল প্রতিযোগিতার। ভাবনাচিন্তাটা ছিল অনেকদিন ধরেই। ১৯৮৮-তে ভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এ. আই. এফ. এফ-এর সভাপতি হওয়ার পর প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দশবছরের মধ্যেই ভারতবর্ষে পেশাদারী ফুটবলের পরিকাঠামো গড়ে জাপান ও কোরিয়ার ঢঙে জাতীয় লিগ চালু করে দেবেন।

ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকাতে এধরনের পেশাদারী আঙ্গিকে জাতীয় ক্লাব ও রাজ্যভিত্তিক লিগ চালু হয়েছে বহুদিন আগেই। তাই বিশ্ব ফুটবলে দাপট ও মর্যাদাও বেশি এই দুই মহাদেশের। কিন্তু ফুটবলে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের (আফ্রিকা, এশিয়া) মধ্যে এধরনের পরিকল্পনাপ্রসূত প্রয়াস বাস্তবায়িত হয় জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও খানিকটা মালয়েশিয়াতে। দেখাদেখি এগিয়ে আসে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডের মতো অর্থনীতি ও বিশ্ববাণিজ্যে উন্নতিকামী দেশসমূহও। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো সফল না হলেও সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার পেশাদার জাতীয় লিগ সেদেশের ফুটবল মানকে খানিকটা হলেও উন্নত করেছে। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্তারা এসব দেখেই বোধহয় উৎসাহিত হন জাতীয় লিগ চালু করতে, বিশেষত মুক্ত অর্থনীতি ও বাণিজ্যের যুগে ভারতবর্ষ যেখানে শিল্পপতিদের নেকনজরে রয়েছে। স্বভাবতই স্পনসর ও ফুটবলকে পণ্য করে বিপণনের অভাব হবে না—এই ধারণা থেকেই ফেডারেশনের কর্মকর্তারা জাতীয় লিগ, অর্থাৎ দেশের সেরা আট-দশটি দলকে নিয়ে 'হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে' ভিত্তিক প্রতিযোগিতার উদ্ভব ঘটালেন।

বিশ্ব ফুটবলের 'পেরেন্ট বডি' ফিফা বহুদিন ধরেই ফেডারেশন কর্তাদের বুঝিয়ে আসছিলেন যে, আন্তর্জাতিক ফুটবলের মূলস্রোতে ফিরতে গেলে জাতীয় লিগ চালু করাটাই হবে প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপ। ফিফার নির্দেশিকা ও পরামর্শ মেনেই ফেডারেশন জাতীয় লিগ চালু করে। লক্ষ্য ছিল—এদেশের ফুটবলারদের ক্রিকেটারদের মতো সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তোলা। দ্বিতীয়ত, ক্রিকেট ও টেনিসের মতো ফুটবলকেও উপযুক্ত বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে আমজনতার কাছে 'সেলেবল' করে তোলা। তৃতীয়ত, ফুটবলের হৃত গৌরব ও জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি এশীয় ফুটবলে নিজেদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া। প্রথম বছরে তাই স্বভাবতই প্রচারের ঢক্কানিনাদে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল বাংলা, গোয়া, কেরালার জনমানসে। সারা দেশে মূলত এই তিনটি প্রদেশেই ফুটবল সমধিক জনপ্রিয়। মোহনবাগান অবশ্য জাতীয় ক্লাব হওয়া সত্ত্বেও প্রথম বছর জাতীয় লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। বাছাই পর্বের খেলা থেকে উঠে আসা দেশের সেরা আটটি দল নিয়ে জাতীয় লিগ শুরু হয় '৯৬-র ডিসেম্বরে। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পসংস্থা 'ফিলিপস' জাতীয় লিগের স্পনসর হয় এবং স্টার টিভি এর সরাসরি সম্প্রচার-স্বত্ব কিনে নেয় ফেডারেশনের কাছ থেকে। দেশের সেরা আটটি দলের ফুটবলারদের মধ্যেও সাড়া পড়ে যায় জাতীয় লিগে খেলার জন্য। সেবার বিজয়ন, বাইচুং, আনচেরি, চ্যাপম্যান, স্টিফেন, তেজিন্দার কুমারদের নিয়ে গড়া পাঞ্জাবের জেসিটি তাদের শক্তি ও সুনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চ্যাম্পিয়ন হয় তিন মাস ধরে চলা ম্যারাথন লড়াইয়ে। ইস্টবেঙ্গল লিগের মাঝপর্ব পর্যন্ত সমানে সমানে থেকেও চূড়ান্ত পর্বে গোয়ার চার্চিল ব্রাদার্সের কাছে অ্যাওয়ে ম্যাচটি হেরে শেষপর্যন্ত তৃতীয় স্থান পেয়ে অভিযান শেষ করে। চার্চিলও সেবার দারুণ টিম গড়েছিল, কিন্তু জেসিটিকে টেক্কা দিতে পারেনি।

যাই হোক, প্রথম বছরে লিগের উন্মাদনা ও বাণিজ্যিক

সাফল্য ভারতবর্ষের ফুটবলার, কর্মকর্তা, সাধারণ ফুটবল-প্রেমীদের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা উসকে দেয় সোনালী ভবিষ্যতের লক্ষ্যে। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন বা 'এ. এফ. সি'-র প্রধান কর্ণধার পিটার ভেলাপ্পান পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ফুটবলে পিছিয়ে থাকা দেশগুলির ফুটবলকর্তারা ভারতবর্ষের জাতীয় লিগ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারেন। এই জাতীয় লিগই আজ না হোক কাল ভারতীয় ফুটবলকে আবার এশিয়ার ফুটবল মানচিত্রে ফিরিয়ে আনবে। সর্ব অর্থেই বলা যায়, সম্পূর্ণ পেশাদারী প্রথায় না হলেও খেলার দৃষ্টিভঙ্গি, সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রচারের গুণে প্রথম বছরেই জাতীয় লিগ এদেশের ফুটবলে প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছিল। হতাশা ও ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার কাটিয়ে উজ্জ্বল আলোকবিন্দু ফুটে ওঠার ইঙ্গিত ছিল উদ্বোধনী জাতীয় লিগে। এধরনের একটা ফুটবল বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল জাতীয় স্তরে—চিন্তা ও চেতনার উত্তরণের জন্য। তার জন্য অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয় সর্ব-ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাদের।

কিন্তু দ্বিতীয় বছরে এসেই জাতীয় লিগকে ঘিরে তৈরি হওয়া যাবতীয় প্রত্যাশা ও স্বপ্ন ধাক্কা খায়। ফেডারেশনের কর্তাদের অদূরদর্শিতার কারণে স্পনসর ফিলিপস ও স্টার টিভি বেঁকে বসে। ফিলিপস তাদের বিজ্ঞাপন মাঠ ও দূরদর্শনে ঠিকভাবে হচ্ছে না বলে ওয়াক আউট করবে বলে স্থির করে। শেষপর্যন্ত ফেডারেশন-কর্তাদের অনুনয়-বিনয় ও যাবতীয় শর্তপূরণের প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা জাতীয় লিগের সঙ্গে গাঁটছড়া ছিন্ন করেনি, তবে স্টার টিভির পরিবর্তে ফেডারেশন চুক্তিবদ্ধ হয় 'ই. এস. পি. এন'-এর সঙ্গে। সব মিলিয়ে প্রথম বছরে যে উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল ফুটবলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মহলে, তা কিছুটা হলেও ব্যাহত হয় '৯৭-'৯৮ মরসুমে।

দ্বিতীয়বারের জাতীয় লিগে বলার মতো ব্যাপার হলো—নবগঠিত কোচি এফ. সি. ও মোহনবাগানকে সরাসরি মূলপর্বে খেলার সুযোগ দেওয়া হয় সারাবছরের পারফরমেন্সের নিরিখে। কেরালার কোচি এফ. সি.-ই হলো এদেশে প্রথম পেশাদারী গঠনতন্ত্র মেনে পরিচালিত ফুটবল ক্লাব। আগের বছরে সফল জেসিটির অধিকাংশ তারকা ফুটবলারদের নিয়ে দল তৈরি করেও কিন্তু জেসিটির পদাঙ্ক অনুসরণে ব্যর্থ হয় কোচি এফ. সি.। কতিপয় তারকা ফুটবলারের সঙ্গে ক্লাবের স্কটিশ কোচ জর্জ ব্লুজের বনিবনা না হওয়ায় পুরো দলটা ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছিল জাতীয় লিগে। শৃঙ্খলা ও টিম স্পিরিটের অভাবেই দেশের সেরা দল হয়েও প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি তারা। অন্যদিকে মোহনবাগান তাদের সরাসরি সুযোগ দেওয়ার যৌক্তিকতার প্রমাণ ও প্রতিফলন দিতে পেরেছিল প্রতিটি ম্যাচেই। সেবার অমল দত্তের বিখ্যাত 'ডায়মন্ড সিস্টেম'-এ খেলে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় ফুটবল উপহার দিয়েছিল ভারতবাসীকে। জাতীয় লিগ শুরু হওয়ার আগে অমল দত্তের পরিবর্তে কেরালার টি. কে. চাটুনি কোচিঙের দায়িত্ব নেওয়ায় সেই ছন্দ খানিক ব্যাহত হলেও তেল-খাওয়া মেশিনের মতো শাণিত ও বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল খেলেছিল মোহনবাগান। দুই প্রবীণ তারকা চিমা ও সত্যজিৎ চ্যাটার্জীর ক্রীড়াকুশলতা এবং তার সঙ্গে তরুণ ফুটবলারদের আবেগ ও পরিশ্রমকে মূলধন করে মোহনবাগান প্রথম আবির্ভাবেই বাজিমাত করে। ইস্টবেঙ্গল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর সামান্য পিছনে থেকে দ্বিতীয় স্থান পায়।

আর এবার তৃতীয় বছরে এসেই জাতীয় লিগ আর পাঁচটা সাধারণ সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টের মতো বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে এশিয়ান গেমস, তারপর ফিলিপসের সরে দাঁড়ানো, ক্লাবগুলোর হুমকি—সব মিলিয়ে জাতীয় লিগের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। আসলে আধা-পেশাদারী কাঠামোয় জাতীয় লিগ চালু করা এবং দূরদর্শিতার অভাবই এর অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার প্রধান কারণ। এবছর 'কোকাকোলা' জাতীয় লিগের স্পনসর। এবার বারটি দলকে দুটো গ্রুপে ভাগ করে 'হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে' ভিত্তিতে খেলানো হয়েছে। তারপর দুই গ্রুপের সেরা তিনটি দল নিয়ে অর্থাৎ ছয়টি দলের মধ্যে 'হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে' ভিত্তিক ম্যাচ। এই প্রথায় প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, জেসিটি, কোচি এফ. সি.-র কর্মকর্তা, কোচ ও ফুটবলারদের। তাঁদের বক্তব্য—এর ফলে জাতীয় লিগের উদ্দেশ্যটাই ব্যাহত হচ্ছে। অধিকাংশ ম্যাচ দূরদর্শনে সম্প্রচারিত না হওয়ায় ফুটবল-প্রেমীরাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন ক্রমশ। গোয়া, কেরালায় জনপ্রিয়তা মোটামুটি বজায় থাকলেও ফুটবলের তীর্থক্ষেত্র কলকাতাতে কিন্তু জনপ্রিয়তা ক্রমহ্রাসমান।

অনেক আশা ও সদর্থক চিন্তাভাবনা নিয়ে জাতীয় লিগের জন্ম হয়েছিল। এদেশের ফুটবলের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের গঠনমূলক কর্মপ্রয়াস এবং প্রচারমাধ্যমের সর্বাত্মক সহযোগিতা না পেলে কিন্তু বিকশিত হওয়ার আগেই ঝরে পড়বে মুকুলিত পুষ্পটি। প্রতিযোগিতাসর্বস্ব যান্ত্রিক জগতে টিকে থাকতে গেলে আপাদমস্তক পেশাদারী আঙ্গিকে, বাস্তবানুগ পরিকল্পনা নিয়ে চলতে হবে 'এ. আই. এফ. এফ'-কে। তাঁদের সাধ্য ও সঙ্গতি দুইই আছে, দরকার শুধু ইতিবাচক মানসিকতা। জাপান, কোরিয়া শিল্প, অর্থনীতি ও ফুটবলে অনেক উন্নত, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলেও সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার সমকক্ষতা অর্জনে সক্ষম ভারতীয় ফুটবল। এদেশের ফুটবলে যে প্রতিভার অভাব নেই তা অনস্বীকার্য। চেষ্টা করলে ভারতীয় ফুটবলাররাও যে ভাল পারফরমেন্স করতে পারে তা সদ্যসমাপ্ত ব্যাঙ্কক এশিয়াডে দেখা গেছে। ব্যর্থ হলেও ভারতীয়দের লড়াই সেখানে উচ্চ-প্রশংসিত। তার ওপর এখনো এদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে ক্রিকেটের ঠিক পরেই ফুটবল। এই সর্বজনীন আবেদনকে কাজে লাগিয়ে ফিফার গাইডলাইন অনুযায়ী উদ্যোগ নিলে জাতীয় লিগের মতো জাতীয় দল—সর্বোপরি ভারতীয় ফুটবল নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে। ❑

সাম্প্রদায়িকতা ও গ্রামের সাধারণ মানুষ

স্নেহময় সিংহ রায়

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহ এবং ধর্মগুরুদের জীবন ও বাণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেগুলি সমগ্র মানবসমাজের শান্তি, কল্যাণ ও ঐক্য, মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবেদনার কথাই যুগ যুগ ধরে প্রকাশ করে চলেছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিভিন্ন ধর্মমতের ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থা অবলম্বন করে এবং সেসমস্ত পন্থায় সিদ্ধিলাভ করে এই চরম সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে, নানা ধর্ম মূলত ঈশ্বরলাভের নানা উপায় মাত্র, আর তাই তিনি বলেছিলেন ঃ "যত মত তত পথ"।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দু প্রত্যহ যে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করে, তা অন্তরে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধেরই উদ্বোধন ঘটাতে আহ্বান করে। বিশ্ববাসী যে একই মহত্তম সত্তা থেকে উদ্ভূত—এই সত্য-উপলব্ধি হিন্দুর মনে বিশ্বাত্মীয়তা-বোধের জন্ম দেয়। আবার ইসলাম ধর্মের বিশিষ্টতা বিনয় ও নম্রতা অনুশীলনের মধ্যেই নিহিত। বিনা কারণে যে অপরের রক্তপাত করে, সে প্রকৃত মুসলমান নয়। সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তির মধ্যে ঘটেছে ঈশ্বরের অপরিসীম দয়ার বিকাশ—যা বুদ্ধদেবের কর্ম, বাণী ও জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত। তাঁর ব্রহ্মবিহারের আদর্শই বিশ্ববিহারের প্রকৃত পথ—কিংবা এও বলা চলে, সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। যীশুখ্রীস্টের বাণী—তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতো করে ভালবাস এবং স্বর্গস্থ পিতাকে ভালবাস—বিশ্বশান্তির পথকে সুগম করেছে।

আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে, বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে পৃথক দুটি ধারণা রয়েছে। প্রথম হলো, সৃষ্টি হচ্ছে মানবনির্ভর একটি সংহতি। দ্বিতীয় হলো, সৃষ্টির একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে—যা মানব-অতিরিক্ত। তিনি আরো বলেছিলেন, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তাঁর পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, মানুষকে বাদ দিয়েও সত্যতা থাকে—তবু তারই অনুকূলে তাঁর সুদৃঢ় ঐকান্তিক বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিশেষ সুচিন্তিত মন্তব্য—সত্যে মানব-অতিরিক্ত বাস্তবতা মানুষ অবশ্যই কল্পনা করে। মানুষের অস্তিত্ব, মানুষের অভিজ্ঞতা, মানুষের মন—এসবের অতীত একটি সত্য বস্তু না হলে আমাদের চলেই না।

মহাবৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন মানব-অতিরিক্ত যে স্বতন্ত্র সত্তার বিদ্যমানতায় আস্থা স্থাপন করেছেন তা-ই হিন্দুদের কাছে পরব্রহ্ম কিংবা কৃষ্ণ বা শিব বা দুর্গা বা কালী, মুসলমানদের কাছে আল্লা ও খ্রীস্টানদের কাছে গড।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির মূল আদর্শ নিহিত আছে এই নীতিগুলির মধ্যে—ঈশ্বর কিংবা কোন পরম তত্ত্বকে অব্যয় অক্ষয় ও চিরন্তন সত্য বলে জানা, অহিংসা দয়া তথা করুণার পথ অবলম্বন করা, মানবসমাজকে আত্মীয়তাবন্ধনে বাঁধার প্রচেষ্টা (যা হবে মানসিক সুসঙ্গতি ও সংহতির পথ ধরে অগ্রসর) এবং বিশ্বে শান্তি, প্রীতি ও কল্যাণপূর্ণ পরিবেশ রচনা করা।

তাহলে এক ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে অপর ধর্মাবলম্বীর বিরোধ আসে কোথা থেকে? বিরোধ আসে, নিত্যধর্মের প্রতি আস্থাশীল না থেকে আচার-ধর্মের প্রতি আস্থা স্থাপন করার ফলে। মানুষ তার ধর্মকে অন্তরের মহৎ সম্পদ না করে যদি শাস্ত্রমত ও বাইরের আচারকেই তার ধর্ম বলে গণ্য করতে থাকে, তবে সেই ধর্মই যে বেশি অশান্তির কারণ হয়, তেমন আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথ এপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "ধর্ম বলে জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয়, সে আত্মাকেই হনন করে।" আর পুরোহিততন্ত্র মূলত আচারের অত্যাচার, ধর্ম সম্পর্কে তাতে কোন বোধের প্রকাশই নেই। পুরোহিততন্ত্র বলে ঃ "যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলে দেয় সে পাপকে লালন করে।"

ধর্মীয় চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল। সমস্ত ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন সমানভাবেই শ্রদ্ধাবনত। তাই তিনি বলেছিলেন ঃ "মুসলমানের সঙ্গে আমি মসজিদে যাব; খ্রীস্টানের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে ক্রুশচিহ্নের সামনে নতজানু হব; বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে প্রভু বুদ্ধের চরণাশ্রয় নেব; আমি অরণ্যে গিয়ে সেইসব হিন্দুর পাশে ধ্যানলীন হয়ে সেই আলোকদর্শন করবার চেষ্টা করব, যা তাঁদের হৃদয়কে আলোকিত করেছে।"

ম্যাক্সমুলারও তাঁর 'India—What Can It Teach Us?' গ্রন্থে ভারতের চিরন্তন আদর্শ থেকে যে ইউরোপীয় জনসাধারণের কিছু গ্রহণযোগ্য বিষয় আছে তা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন ঃ "India for the future belongs to Europe, it has its place in the Indo-European world, it has its place in our own history, and in what is the very life of history, the history of the human mind." বিরুদ্ধ প্রশ্ন হলেও এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, সমাজের উচ্চবর্ণের আচার ও সংস্কারান্ধতা, অহঙ্কার, লোভ ও ক্ষমতালিপ্সা দেখে স্বামী বিবেকানন্দ তাদের ধ্বংসকামনা করে লিখেছেন যে, 'নূতন ভারত' শীঘ্রই প্রকাশ পাবে। তাঁর ভাষায় আবহমান প্রথাবদ্ধতার বিরোধিতাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে,

জেলে মালা মুচি মেথররের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" বলা বাহুল্য, স্বামীজীর এই 'নূতন ভারত' সঙ্কীর্ণতামুক্ত এবং অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত। মনে রাখতে হবে, আদি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া ব্রাহ্মধর্মের আর দুই শাখা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের প্রবেশ অনুমোদিত ছিল। স্মরণীয়, বিবেকানন্দও ভারতীয় ধর্মের সাহায্যে ইউরোপীয় সমাজ-গঠনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে বলেছেন ঃ "Can you not make a European Society with Indian religion? I believe it is possible and it must be." রবীন্দ্রনাথও সর্বমানবের অন্তরাত্মার সঙ্গে নিজ আত্মার ঐক্য উপলব্ধি করে লিখেছেন ঃ "যথার্থ পুরাতন ভারত, যে ভারত চির-নূতন—যে ভারতের বাণী 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি'—তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি।... আমার চিত্ত মহা-ভারতের অধিবাসী—এই মহা-ভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।"

ভারতমনীষীদের চিন্তায় বিশ্বধর্মসমন্বয়বোধ ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ—প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। প্রতিটি দেশের, প্রতিটি কালের সকল ধর্মের ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষই ঈশ্বরকে বা তার আরাধ্য পরম অধ্যাত্মসত্তাকে এই নম্রতা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, ব্রতপালনের সমস্ত ফল নিবেদনের মধ্য দিয়ে চরম আত্মোপলব্ধির ভূমিতে উপনীত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই লিখেছেন ঃ

"প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামি, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।।
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।।"

গৌরগোবিন্দ রায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থের মধ্য-বিবরণে পাওয়া যায় ঃ "যদি সমগ্র ধর্মজীবন গ্রহণ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে কোন জাতি বা ঈশ্বরের পরিবারের কোন শাখাকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না।... ঈশ্বরেতে যে সার্বভৌমিক ধর্ম অবস্থান করিতেছে তৎপ্রতি আমরা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি না।"

এপ্রসঙ্গে একথা বলতেই হবে, রামমোহন-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ যে সমাজ-সংহতির কথা বলে গিয়েছিলেন, পূর্বোক্ত বার্তার মধ্যেই সেকথা ধ্বনিত হয়েছে। কোরানও একথা বলছে। কোরানে আছেঃ "মানবমণ্ডলী মূলে এক।" তাই নবী মহম্মদ (দঃ) বিশ্বমানবকে আলিঙ্গন করে সৎশীল হওয়ার এক সুন্দর সংজ্ঞা দান করেছেন। তাঁর মতে, "মানুষের কল্যাণকারীই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"

"মনুষ্যত্বের মহান রূপই ধর্মে যাদের লক্ষ্যস্থল,
সত্যজয়ী-স্বরূপজয়ী তারাই ধরার ধর্মবল।
ধর্মে যদি স্বাদ পেল কেউ সেই মহাপুরুষ সেই হৃদয়,
এক ধর্মের দীক্ষা মাঝে সব ধর্মের সত্য বয়।"

ইসলামী জীবনের মূলকথাই এখানে আলোচিত হয়েছে। ইসলাম অখণ্ড মানবতায় আস্থাশীল। ইসলামী জীবনদর্শনে অন্যান্য ধর্ম-অবতারদের স্বীকৃতি আছে। কেবল তাই নয়, তাঁদের সম্মানিত আসনও আছে।

প্রশ্ন এই যে, হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের মূল আদর্শের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শের পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানে এত বিরোধ কেন? তার কারণ, মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জীবনধারার প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা। কেবল মুসলমান কেন, তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতিও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যবহারে ঐ একই ধরনের অবজ্ঞা কিংবা ঘৃণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় যে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে গেছে তার একটি প্রধান কারণ, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই শ্রেণীর লোকেদের হৃদয়ের বন্ধনে আপন করে রাখতে পারেনি। জাতীয় জীবনের পক্ষে এ এক চরম ব্যর্থতা। হিন্দুরা এই বিধান প্রচলিত করেছে যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকলেও এক চালের নিচে হিন্দু-মুসলমান আহার করতে পারবে না। যদি সেই আহারে হিন্দু বা মুসলমানের নিষিদ্ধ কোন আহার্য নাও থাকে, তবুও! যাঁরা এরকম বিধান দেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ পোষণ করেন যে, বিদেশী কর্তৃপক্ষ ঐ বিরোধ ঘটাবার মূলে আছেন! আমাদের আত্মঘাতী বুদ্ধি থেকে আমরা অনায়াসেই এই ভ্রান্তিতে পৌঁছাই যে, নিজের দেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধানকে আমরা পাকা করে রাখব, কিন্তু বিদেশী শাসক সম্প্রদায় তার সুযোগ নিয়ে নিজের ব্যবহারে কাজে লাগালে সেটাকে অধর্ম ও অন্যায় বলব!

আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনও যে যথাসময়ে সাফল্য লাভ করতে পারেনি, তার অগ্রগতি বিলম্বিত হয়েছে, তার কারণও ঐ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। কলেজে পাশ করা শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁর অতিথি রাজার বিদায়কালে কাপড় ধরে তাঁকে গাড়ি থেকে নামালেন এবং বললেন যে, তাঁর মুখে পান থাকা ঠিক নয়, কারণ গাড়ির চালক মুসলমান! রাজা দায়ে পড়ে মুখের পান ফেলে দিলেন। ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধিতে কোথাও পান খাওয়া আটকানো উচিত নয়। তবু যে-দেশের মানুষ সামান্য প্রতিবন্ধকতাতেই সেই অধিকার অনায়াসে বর্জন করতে পারে, সে-দেশের মানুষের স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্যতার যথেষ্ট অভাব ছিল। কিন্তু তথাপি একথা বলতেই হবে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার দুটি ভিন্ন পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়—এদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধ প্রবল। দ্বিতীয় পর্যায়—ঐ সমস্যা অনেকটাই কাল্পনিক। দুই প্রতিবেশীর আত্মীয়তার রূপও প্রকট।

দেশের সামনে আজ যেটি জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা তা হলো, কেন হিন্দু ও মুসলমান বহু শতাব্দী ধরে পাশাপাশি বাস করেও পরস্পরের সঙ্গে মিলে গিয়ে একাত্মতা অর্জন করতে পারেনি এবং কেনই বা তারা একটি প্রকৃত অখণ্ড জাতীয় সত্তা গড়ে তুলতে পারেনি? বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। কারণ, তাঁদের মতে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব নয় এবং তা নিয়ে চিন্তার কোন প্রয়োজনই নেই। কিন্তু এটিই সত্য যে, ভারতের প্রত্যেক ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বিশেষত্বকে রক্ষা করে, ভারতের নানা জাতি, উপজাতি, বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষার বৈশিষ্ট্যকে বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিয়ে এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ বহু বিচিত্রতাকে রক্ষা করেই একটি অখণ্ড ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করা সম্ভব।

কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি-মৈত্রীর ক্ষেত্রে কখনো আচার, কখনো ধর্ম যেমন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি বাধা স্বার্থের প্রতিবন্ধকতাও। উভয় সম্প্রদায়ের সমস্যা কখনো ধর্মীয়, কখনো-বা সামাজিক। আর যে-সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে, তা হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। অর্থনৈতিক সমস্যারই অপর পিঠ রাজনৈতিক অধিকার বণ্টনের দ্বন্দ্ব-সঙ্কট এবং সেজন্য উদ্ভূত সমস্যা। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-বিতর্ককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাড়িয়ে এবং তাকে নানাভাবে জিইয়ে রেখেছিল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী ব্রিটিশ শাসক।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ওপরতলায়—যেখানে স্বার্থের সংঘাত, সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিরোধ আর রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতার লড়াই, সেখানে মিল হয়নি। সমাজের সাধারণ স্তরে কিংবা গ্রামীণ লোকজীবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সংস্কৃতি, সাহিত্য, অ-প্রাতিষ্ঠানিক সাধনা ও বিভিন্ন বিদ্যার ক্ষেত্রে মিল হয়েছে। মিল লক্ষ্য করা গেছে উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গীতে ও নৃত্যধারায়, স্থাপত্যে ও চিত্রকলায়, গণসাধনা, গণসঙ্গীত ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পারস্পরিক সংযোগে যে উভয় ধর্মা-বলম্বীদেরই জীবন-বিকাশ সার্থক হয়ে উঠবে—এমন কথা আস্থার সঙ্গে বলেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

এপ্রসঙ্গে একটি কথা একান্তভাবেই স্মরণযোগ্য। বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এই জাতি তার সর্বসমন্বয়ী প্রতিভায় এমন এক সংস্কৃতি তৈরি করে এসেছে, যাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কেবলমাত্র এক 'বাঙালিয়ানা' গড়ে উঠেছে—তার মধ্যে না আছে সাম্প্রদায়িকতা, না আছে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও মুসলমানের পার্থক্য। তা কেবলই বঙ্গীয় ভাবরসপুষ্ট জীবনচর্যা, জীবনশিল্প, এমনকি জীবনসাধনাও। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেছেন: "The basic religion of the Bengali people for thousands of years has remained Bengalicism. Among the Hindus of Bengal, both masses and classes—the fundamental religion in Bengalicism and not the so-called Hinduism." কেবল বাংলা বা বাঙালীর ক্ষেত্রেই যে একথা একান্তভাবে প্রযোজ্য তা নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে এ এক সর্বজনীন সত্য।

বৌদ্ধযুগে অশোকের মতো মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের যুগে আকবর কেবল সাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথাও চিন্তা করেছিলেন। এই কারণে সেই যুগে ও তার পরবর্তী যুগে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফী সাধকের অভ্যুদয় হয়েছিল। তাঁরা হিন্দু ও ইসলামের মিলনক্ষেত্রে এক বিশ্বদেবতার পূজার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে বাইরের দিক থেকে যেখানে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে বৈপরীত্য ও আপাতবিরুদ্ধতা ছিল, সেখানে অন্তরের দিক থেকে পরম সত্যের আলোকে উভয় ধর্মের মূলগত ঐক্য কী—তা আবিষ্কৃত হচ্ছিল।

বর্তমান ভারতে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর ক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, অসমকক্ষতা থাকলে কখনো বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। ভারতের কল্যাণ কামনা করলে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত কেবলমাত্র দুই সম্প্রদায়ের মিলন নয়, সমকক্ষতাও। আর সেই সমকক্ষতা হবে উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তি ও মর্যাদার সমকক্ষতা।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। কিন্তু সেসময় এমন সব মুসলমান সাধক পুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁরা মানবের মধ্যে আত্মীয়তার সত্যসম্বন্ধের দ্বারা সেই ধর্মবিরোধের মধ্যেও সেতুবন্ধ রচনা করতে পেরেছিলেন। তাঁদের বাণী থেকে আমরা যদি প্রেরণা নিতে পারি তাহলে এক সত্যবোধের প্রাণস্পন্দনে আমাদের কর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি নতুনভাবে জেগে উঠবে।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও মানস-সুসঙ্গতি ছিল। চণ্ডীদাসের যুগে হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান বাদশার প্রতি কোন বিদ্রোহের ভাব ছিল না। কারণ, বাদশাও হিন্দুধর্মের ওপর কোনরকম হস্তক্ষেপ করতেন না।

হুসেন শার আমলে এক ঘটনা ঘটে। এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে বিশেষ আঘাত লাগে। যবন হরিদাস মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করেন। এ-সংবাদ পেয়ে হুসেন শা "ধরি আনিল তানে অতি শীঘ্র গতি।" হরিদাস এলে বাদশা তাঁকে "পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান।" তারপর—"আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের পতি।/ কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি।।/ কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।/ তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।।"

বাদশার প্রশ্নের উত্তরে হরিদাস বললেন: "এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।/ পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার

হৃদয়।।" তারপর—"হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।/ শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন।।"

এপ্রসঙ্গে এই কথাটা সকলের কাছে 'সুসত্য' বলে মনে হয়—

"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর।।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে।।" (বৃন্দাবন দাস)

সেকালের 'মুলুকপতি' ও তাঁর সম্প্রদায়ের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি যদি তেমন কোন বিদ্বেষ থাকত, তাহলে চৈতনদেব তাঁর ধর্ম বাংলায় অবাধে প্রচার করতে পারতেন না। পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ধর্মবিরোধ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে, সুখের বিষয়, সে-বিরোধ একালের বাঙালী উত্তরাধিকারী হিসেবে লাভ করেনি।

দ্বিজ হরিরাম এবং কবিকঙ্কণের বর্ণনায় দেখতে পাই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানের মধ্যে বিশেষভাবেই জাতিভেদ ছিল। কবিকঙ্কণ এইসব জাতির উল্লেখ করেছেন—(১) জোলা, (২) গোলা, (৩) মুফেরি, (৪) পীঠারি, (৫) কাবারি, (৬) সানাকর, (৭) পটুয়া, (৮) তীরকর, (৯) কাগতি, (১০) কলন্দর, (১১) রঙ্গরেজ, (১২) হাজাম, (১৩) কসাই। এরা সকলেই ছিল নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। এদের বিভিন্ন বৃত্তি ছিল, যেমন—কাপড় বোনা, গরু মারা, সানা বাঁধা, তীর গড়া, পীঠে বেচা, মাছ মারা, কাগজ তৈরি করা, পট আঁকা, কাপড় রাঙানো ও বলদ চালানো। এছাড়া 'পয়মাল' নামে এক জাতি ছিল—যারা 'হিন্দু হয়ে মুসলমান'। এরকম হওয়ার কারণ মনে হয়, যেসকল হিন্দু মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেছিল কিংবা "রোজা নমাজ না করিয়া" মুসলমান—তারা অবশ্যই হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিল, কিন্তু নিজের নিজের জাতব্যবসা ছাড়েনি, ফলে জাতও ছাড়েনি। তাতেই হিন্দুর অনুরূপ জাত মুসলমানদের মধ্যেও তৈরি হয়ে ওঠে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অনেকেরই পূর্বপুরুষ যে হিন্দু—এ-সত্য নতুন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পরবর্তী কালে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মবিরোধ যদি একটা জাতীয় মহাসমস্যা হয়ে ওঠে তাহলে সে-সমস্যা আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিনি। প্রাচীন বাংলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমগ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 'cow-killing riot'-এর নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। বরং একথাই বলা চলে যে, বহুকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মনোভাব পরস্পরের মতামত সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা লাভ করেছিল।

চৈতন্যদেবের সমকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছ আচার সযত্নে পরিহার করতেন বটে, কিন্তু গ্রামের মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। শ্রীচৈতন্য যখন ক্রুদ্ধ হয়ে দলবল নিয়ে কাজীর ঘরে চড়াও হয়েছিলেন, তখন কাজী তাঁকে শান্ত করবার জন্য শ্রীচৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে তার প্রীতির সম্বন্ধ স্মরণ করিয়েছিল—

"গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা,
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা,
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।"

কোন কোন বৃত্তি মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল। তাদের কাছে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমেত সকলকেই আসতে হতো। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তন-উৎসব হতো। সেই সময় শ্রীবাসের পরিজন, দাসদাসী সকলেই শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করেছিল। শ্রীবাসের দরজিও তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। "শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজি যবন,/ প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন।"

প্রাচীন পাঠান সেনাপতিরা যুদ্ধে মারা পড়লে গাজী পীর-রূপে পুজো পেতেন। মুসলমান সাধুরা তো সম্মান পেতেনই। ক্রমশ এইসব পীরস্থানের মাহাত্ম্য সর্বসাধারণ স্বীকার করে নেয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পীর ও পীরস্থানের উল্লেখ পাই মনসা-চণ্ডী-ধর্মমঙ্গলের দিগ্‌-বন্দনায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সীতারাম দাসের বর্ণনায় পাই—"বন্দো পীর ইসমালি (অর্থাৎ ইসমাইল) গড় মান্দারনে।/... দারাবেগ ফকীর বন্দিব নিগাঞ্রে,/ জোড়হাথে বন্দিব পাঁড়ুয়ার সুফী খাঞ্রে।/ বড় পঁতরায় বন্দ পীর কুতুব আলম,/ তাহার দরগা দিয়া নাহি চলে যম।/ রাইপুরের গোরাচান্দ নানপুরে নাল,/ বন্দিব সাহেব-দুল্লা শিরে বান্ধ্যা শাল।"—এরকম দীর্ঘ বর্ণনা চলার পর কবি লিখছেন : "পেকাম্বর মদার আউল্যা শাহাজির,/ নতিমান হইয়া বন্দিব সত্যপীর।" বিশেষ অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, উত্তর এবং পশ্চিমবঙ্গেই এইরকম পীরস্থানের আধিক্য, আর সেজন্যে এই দুই অঞ্চলে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের উদ্ভব।

মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির আরেক নিদর্শন বৃন্দাবন দাসের কাব্য থেকে পাওয়া যায়। রামলীলা শ্রবণ-দর্শনে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সমভাবে প্রীতিলাভ করত।

বাংলার মুসলমান জনসমাজকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা চলে। ব্রাহ্মণদের অহমিকা এবং হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি অবিচার-অত্যাচার মুসলমানদের ইসলাম ধর্মপ্রচারে সাহায্য করেছিল। অনেককে বলপূর্বক ধর্মান্তরিতও করা হয়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অনেকেই ইসলাম ধর্মের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমান হতো। দ্বিতীয়ত, অনেকে হিন্দু দেবদেবী অপেক্ষা বিশেষভাবে পীর, ফকির ও মুসলমান সাধুসন্তদের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। তৃতীয়ত, ধর্ষিতা, লুণ্ঠিতা, অপহৃতা ও পদস্খলিতা নারীদের হিন্দুসমাজে কোন স্থান ছিল না। কিন্তু তারা মুসলমান হয়ে গেলে ঐ

সমাজে বিবাহিতা নারীর মর্যাদা পাওয়ার সুযোগ পেত।

বাংলার মুসলমান বাঙালী, কেবলমাত্র ধর্মে ধর্মে পার্থক্য। যেহেতু বাংলা গ্রামপ্রধান দেশ এবং গ্রামের মুসলমানরা ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান, সেজন্যে তারা ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তাদের পূর্বে গৃহীত হিন্দু সমাজজীবনের সনাতনী সংস্কার ও লোকাচারসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করত। যেমন, তারা জন্মের পর জ্যোতিষীকে দিয়ে পুত্রের কোষ্ঠী তৈরি করাত এবং বিয়ের সময় জ্যোতিষীকে দিয়ে শুভদিন বিচার করিয়ে নিত। এছাড়া মুসলমানরা শীতলা, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি দেবতার স্থানে পুজো দিত এবং হিন্দুদের বহু পুজো আর শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিত। অনেক হিন্দু ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও হিন্দু নাম পরিহার করত না। মুসলমানদের মধ্যে সচরাচর কালু শেখ, হারু শেখ ইত্যাদি নাম দেখতে পাওয়া যেত। গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পারস্পরিক সম্ভাবেই বসবাস করত। পরস্পর পরস্পরকে 'চাচা', 'চাচি' প্রভৃতি সম্ভাষণে সম্বোধন করত।

হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে সত্যপীর, বনবিবি, গাজী সাহেব, ঘোড় সাহেব ইত্যাদি দেবদেবীর পুজো করা কিংবা তাদের স্থানে অর্ঘ্যদান করা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেছিল। আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নানা স্থানে, এমনকি কালীমন্দিরেও বনবিবির অধিষ্ঠান ও পূজানুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের মিলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কথিত আছে যে, পনের শতকের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ পীর জাহান আলি দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর তাঁর নাম হয় তাহের আলি। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। একজন হিন্দু ও আরেকজন মুসলমান। হিন্দু স্ত্রীর ছেলেরা 'পীরালী ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত। আর মুসলমান স্ত্রীর পুত্ররা নিজেদের 'তাহেরিয়া' নামে অভিহিত করে। যে-পীর (জাহান আলি) তাহের আলিকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, তিনি নিজেও সোনামণি নামে এক হিন্দু কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। মেয়েটি স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মঘাতী হয়েছিল। মুসলমানকে বিয়ে করার পর হিন্দু মেয়েরা অনেক সময়ই তাঁদের ঐকান্তিক পতিভক্তির জন্য প্রসিদ্ধা হয়ে রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পরম বৈষ্ণব আনন্দময়ীর উল্লেখ করা যেতে পারে। আনন্দময়ী মুর্শিদাবাদের মুর্তাজা খানকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর পতিভক্তির বিবরণ বহু ছড়াগানের মাধ্যমে লোকমানসে এখনো জাগরূক হয়ে রয়েছে।

মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের মতো জাতিভেদ মানত না। তবে বাংলায় আসার পর এখানে চার শ্রেণীর মুসলমানের উদ্ভব ঘটেছিল। এই শ্রেণীগুলি হচ্ছে—(১) বহিরাগত আমীর-ওমরাহরা, যারা সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে আসত। এরা থাকত রাজধানী কিংবা নগরসমূহের আশপাশে। (২) আগন্তুক মুসলমান, যারা স্ত্রী আনত না এবং বাংলায় এসে বিয়ে করত। (৩) এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমান। (৪) মিশ্র মুসলমান—যাদের মাতা কিংবা পিতার কেউ হিন্দু হতো।

হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা তাদের পূর্বের হিন্দু সনাতনী আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করতে পারত না। অনেক মিশ্র মুসলমান—যাদের মাতা কিংবা পিতার মধ্যে কেউ হিন্দু ব্রাহ্মণ হতো, সেসকল মুসলমান নিজেদের 'ব্রাহ্মণ মুসলমান' বলে পরিচয় দিত এবং সেজন্য গর্বও অনুভব করত। তাছাড়া ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্ববর্তী কৌলিকবৃত্তি পরিত্যাগ করত না। মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা মূলত কৌলিকবৃত্তি অবলম্বনে গড়ে উঠত। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কৌলিকবৃত্তি পরিহার না করার মধ্যে আমরা মুসলমান সমাজের ওপর হিন্দু সমাজেরই প্রভাব লক্ষ্য করি। অপরপক্ষে, মধ্যযুগের শেষভাগে আমরা হিন্দুসমাজের ওপর মুসলমান পীর, ফকির, সাধু-সন্ত এবং সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাবও লক্ষ্য করি। একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সৎপ্রকৃতির মুসলমানেরা কখনো হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-আচরণের ওপর হস্তক্ষেপ করত না। কথিত আছে যে, মুক্ত তথা অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের পরিবারের জমিদারির মধ্য দিয়ে যেসব ব্রাহ্মণ প্রভৃতি হিন্দুরা গ্রামান্তরে যেত, তাদের হক-পরিবার কখনো অভুক্ত অবস্থায় যেতে দিতেন না। তাদের স্নানাহারের জন্য ঐ পরিবার হিন্দু ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচালিত অতিথিশালা রক্ষা করতেন। এছাড়া গ্রামে হিন্দুদের জন্য মুসলমানরা আলাদা আলাদা হুঁকো রাখত।

হিন্দুদের 'বঙ্গাব্দ' নামে পরিচিত সাল গণনা সম্রাট আকবরের সময় থেকেই শুরু হয়। ৯৬৯ হিজিরা অব্দে সম্রাট আকবর ঘোষণা করেন যে, অতঃপর চান্দ্রমতে বৎসর গণনা না করে সৌরমতে বৎসর গণনা করা হবে। সেই হেতু ৯৬৯ হিজিরার পর থেকে সৌরমতে গণনা করায় বর্তমান বাঙলা সন বা 'বঙ্গাব্দ' প্রচলিত হয়েছে।[১]

কিন্তু বহু শত বছরের একত্র অবস্থান ও প্রতিবেশের সমতা হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারেনি। এই মত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করেছেন। এই মত

১ এই মতটি বিতর্কিত এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সম্প্রতি সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তথ্যনিষ্ঠ গবেষণায় প্রমাণ করেছেন, বঙ্গাব্দের প্রবর্তক আকবর নন—মহারাজ শশাঙ্ক। (দ্রঃ বঙ্গাব্দের উৎসকথা—সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশিকা—রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবরডাঙা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, আশ্বিন ১৪০৪)।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

নির্মম সত্যের মতো মনে হলেও আসলে প্রকৃত সত্য অন্যরকম। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁর 'Creative India' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "From Rammohun to Gandhi it is impossible to find any movement or institution of somewhat large size and substantial importance which is not Janus-like in its orientations, i.e., nationalist, traditionalist or revivalist on the one hand and at the same time internationalist, modernist and reformist on the other."

এই উক্তির মধ্যে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের প্রকাশ্যে অথবা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের ইঙ্গিত কি নেই? এমনকি অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিও কি তা নয়? অলৌকিক কোন ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় সম্মোহিত হয়ে নয়, গ্রামের যে-কৃষক হিন্দু আর যে-কৃষক মুসলমান—তারা কর্মের ঐক্যে, মাটির সংস্পর্শে, একই দুঃখসুখের জীবনছন্দে আন্দোলিত হতে হতে এক মনপ্রাণ ও একই রাগ-অনুরাগে বহু শতাব্দী ধরে একাত্মতা অর্জন করেছে।

মধ্যযুগের কিছু কথা এখনো বলা হয়নি। পীরপাঁচালীতে বৌদ্ধ ধর্মঠাকুর, মুসলমানদের পীর ও হিন্দু নারায়ণের সংমিশ্রণ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বাংলাদেশে মুসলমান অধিকারের শেষ পর্বে হিন্দু ও মুসলমান—দু-পক্ষ থেকেই প্রথম ধর্মের মিলনের চেষ্টা হয়েছিল সত্যপীর, সত্য-নারায়ণের কাহিনীর মধ্য দিয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর সর্বজনস্বীকৃত ও মাহাত্ম্যপূর্ণ কাহিনীগুলিকে মুসলমান পীর-পীরানীর মাহাত্ম্যগাথায় রূপায়ণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সঙ্গে সাহিত্যের এই ধারার বেশ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। সামঞ্জস্য তথা সমন্বয়ের দিক থেকে আমরা পাই তিন ধারা—(ক) মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দু দেবদেবীর প্রতিরূপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। যেমন—অনাথ ফকির রচিত মানিকপীরের গীতে মানিকপীর যেন শিবেরই প্রতিরূপ। বন-বিবি যেন বন-দুর্গারই রূপান্তর এবং বন-বিবির মাহাত্ম্য-মূলক পাঁচালী (জহুরা-নামা) মঙ্গলচণ্ডীরই অনুরূপ। (খ) একই কুম্ভীর দেবতা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত—হিন্দুদের কালু রায় এবং মুসলমানদের মগরপীর কালু সাহা। (গ) হিন্দুদের ঠাকুর মুসলমান পীর হয়েও পূর্বের হিন্দু-নামেই পরিচিত। এর উদাহরণ—বর্ধমান ও চব্বিশ পরগনার পীর গোরাচাঁদ। মুসলমান কবিরা এইসব নতুন দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক পাঁচালী লিখে "জনসাধারণের ধর্মপিপাসা ও কাব্যজিজ্ঞাসা" মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে, বিশেষত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের আলোচনার ক্ষেত্রে, এসমস্ত রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ যা-ই থাকুক না কেন, ঐতিহাসিক অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যযুগে (বিশেষত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে) বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন কয়েকজন মুসলমান কবির কবিতাও ধর্মসমন্বয় এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বাণী বহন করে। এঁরা ছিলেন প্রধানত শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং ময়মনসিংহের অধিবাসী এবং পদকর্তা। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এরকম ১২১ জন কবির ৬০০-র কিছু বেশি পদসংখ্যার উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে এই সমস্ত কবির অধিকাংশই উনিশ ও বিশ শতকের লোক। পূর্ব বা পরবর্তী যে-কালেরই হোক—এই সমস্ত কবিতা বাঙালী জাতির অখণ্ডতা ও তার মনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবন করতে বিশেষ সহায়তা করে। এইসব মুসলমান বৈষ্ণব যে রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কাব্যরচনা করেছেন তা অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও বাংলার মাটিতে ও তার আবহাওয়া-পরিমণ্ডলের সংস্পর্শে প্রায় অসাধ্য সাধনের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এর কারণ, অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানই হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অন্তরে প্রাচীন সংস্কার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো সময়ে সময়ে প্রকাশ পেত। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পক্ষে হিন্দু ধর্মসাধনার সহজ দিকটি অবলম্বন করা একেবারে কঠিন হয়ে ওঠেনি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী তথা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জুনের দিব্যবৈভব হয়তো তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বের শাশ্বত প্রেমপ্রতীক রাধাকৃষ্ণের অমৃতচ্ছবি তাঁদের স্মরণপটে চিরমুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক ভগবৎপ্রেম ও দিব্যাশ্রু কেবল হিন্দু-হৃদয়কেই প্লাবিত করেনি, মুসলমান-মানসকেও আবেগাপ্লুত করেছিল। বাংলার সুফী ভাবাশ্রিত কবিগণ পরমাত্মা বা ঈশ্বর (মাশুক) এবং জীবাত্মা বা ভক্তের (আশেক) সম্পর্ককে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থাপন করে কৃষ্ণ (প্রেমিক) এবং রাধার (প্রেমিকা) সম্পর্ককে তাঁদের কাব্যে উপস্থাপিত করেন এজন্য যে, এতে হিন্দু গায়ক ও শ্রোতা উভয়েরই সহজে বোধগম্য হয়। লাল মামুদ বলছেন ঃ

"হিন্দু কিম্বা হৌক মুসলমান।
তোমার পক্ষে সবাই সমান।।
আপন সন্তান জাতির কি বিচার।
ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ চণ্ডাল কি চামার।।
কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী।
কেহ খোদা আল্লা বলি তোমায় ডাকে সারাৎসার।।"

এসমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমানদের কণ্ঠ থেকে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর বাণী ধ্বনিত হয়েছিল, আর এই বাণীর পশ্চাতে ছিল এক ঐকান্তিক আকুলতা।

আধুনিক যুগে (উনিশ-বিশ শতকে) মুসলমান সম্প্রদায়ের

জীবনধারার ওপরে যেসমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনার প্রভাব প্রবল হয়ে দেখা দেয় সেগুলি হচ্ছে—(১) আরব দেশের ওয়াহাবী আন্দোলন। (২) ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ। (৩) বাংলার নবজাগরণ। (৪) সৈয়দ আমীর আলির নেতৃত্বে মুসলিম রাজনৈতিক চেতনা এবং নবজাগরণ। (৫) বাংলায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা। (৬) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। (৭) বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। (৮) ফজলুল হক ও তাঁর কৃষকপ্রজা পার্টি। (৯) খিলাফৎ আন্দোলন, গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন এবং তাঁর দ্বারা কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায়ের খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থনের আশ্বাস। (১০) প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 'রাউন্ড টেবল কনফারেন্স'। (১১) ১৯৩৫-এর 'দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া' অ্যাক্ট। (১২) 'ন্যাশনাল হোমল্যান্ডস'-এর জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ রাজশক্তি ও কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং মুসলিম লীগের সংগ্রাম। (১৩) লাহোর রেজলিউশন (১৯৪০-১৯৪৩)। (১৪) ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব। (১৫) পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহুসংখ্যক হিন্দুর সাম্প্রদায়িক কারণে ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসা। (১৬) ভারতের নানা স্থানে ১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা। (১৭) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)।

বলা বাহুল্য, হিন্দু সমাজের ওপরও এসমস্ত ঘটনার প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু বিস্তারিতভাবে সেসব কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যাঁরা বিশেষ আগ্রহী তাঁরা মহম্মদ আবদুর রহিম প্রণীত 'The Muslim Society and Politics in Bengal, A.D. 1757-1947' (Published by The University of Dacca) গ্রন্থখানি পড়ে দেখতে পারেন। তবু এসব সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে, এসমস্ত ঘটনা প্রধানত উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজসেবামূলক কর্মে নিরত হিন্দু ও মুসলমান জনসমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন নিয়ে তেমন ভাবতে অভ্যস্ত নয়। তবু যে গ্রামাঞ্চলেও বারংবার (সে বিহারে হোক কিংবা নোয়াখালিতে হোক) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দিয়েছে, সেটা ঘটেছে রাজনৈতিক কারণে। রাজনৈতিক নেতারাই এজন্য দায়ী।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ জনজীবনে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক কিরকম তা জানতেন এবং তা তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন। গোরা চরঘোষপুরে গিয়ে হিন্দু নাপিতের ঘরে মুসলমান ফরু সর্দারের ছেলে তমিজের লালন-পালনের ব্যাপার দেখে। পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের অবাধ মিলনের পরিস্থিতি দেখে বিস্মিত হওয়া এবং পরে জাতের গোঁড়ামি ও পবিত্রতা সম্পর্কে তার ধারণার পরিবর্তন তার সমাজ-চেতনার বিবর্তনে প্রথম পদক্ষেপ। গ্রামের দরিদ্র জনসমাজে—তথাকথিত অশিক্ষিত জনজীবনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সহজ স্বাভাবিক উদার ভ্রাতৃত্ববোধ আছে তার মূল্য কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, সহানুভূতি ও সমবেদনার বহু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। 'নীলদর্পণ'-এর তোরাপ ছিল বলিষ্ঠ নির্ভীক এক মুসলমান নীল চাষী। সে হিন্দু ঘরের বধূকে ইংরেজ সাহেবের লালসাগ্নি থেকে উদ্ধার করেছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে মৌলবাদ কিংবা সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধ ছিল না। তেভাগা আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক একসঙ্গে যোগ দিয়েছে। অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' (৫ খণ্ডে) গ্রন্থের মূল সুর হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সেখানকার অধিবাসীদের কাছে নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ সমান গুরুত্ব পেয়েছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পরিব্যাপ্ত মানবতাবাদ এবং নজরুলগীতিতে বিদ্রোহাত্মক ভাবধারা—উভয়ই বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামীদের অন্তরে গভীর প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' রবীন্দ্রসঙ্গীতটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।

গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে চিরস্থায়ী মৈত্রী, প্রীতি ও শান্তি স্থাপন করতে হলে এবং সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি প্রতিরোধ করতে হলে কতকগুলি কর্মসূচী অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সেগুলি হচ্ছে—(১) সর্বধর্মের মূল লক্ষ্য যে একই, সর্বধর্মের মৌলিক ভাবাদর্শ যে একই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত—এই কথা কথকতা, যাত্রা ও নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রচার। (২) রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত থেকে উত্থিত ধর্মবিদ্বেষকে পরিহার করার চেষ্টা। (৩) ধর্মীয় ভাবাবেশের আধিক্য কিংবা গোঁড়ামিকে পরিত্যাগ করে মানুষমাত্রকেই ভাই কিংবা বোন হিসেবে দেখতে চেষ্টা। (৪) গ্রামের মানুষ যে সরল জীবনাদর্শে বিশ্বাসী, তার সাহায্যে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের অনাবশ্যক সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত বিভেদপন্থা পরিহার করা কঠিন নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই চিরস্থায়ী সুমধুর ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে যেন কোন স্বার্থপ্রসূত বিদ্বেষবুদ্ধি প্রবেশ করতে না পারে। (৫) গ্রামের শিক্ষিত মানুষের প্রধান কর্তব্য হবে গ্রামের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও অনুন্নত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। তাতে সর্বধর্মের সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবেই গ্রামে গ্রামে জাগবে আনন্দের আশ্বাস, প্রাণের সুখ ও আত্মার শান্তি। তখন হরিনাম সঙ্কীর্তনের সুর, আজানের শান্ত গম্ভীর ছন্দ এবং গির্জার ঘণ্টাধ্বনির মাধুর্য একই মানবজীবন-লীলারসে নন্দিত ও স্পন্দিত হতে থাকবে। ❑

ফাল্গুনের দুই কবি ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও জীবনানন্দ

নিভা দে

'কবি' শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ফাল্গুন মাসে। আবার শতবর্ষের কবি জীবনানন্দের জন্মও ফাল্গুন মাসে। কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষ (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯—১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) উপলক্ষ্যে একালের বিশিষ্ট কবি নিভা দে-র এই নিবন্ধটি নিবেদিত।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

'উদ্বোধন' পত্রিকার শতবর্ষপূর্তির সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মের শতবর্ষও পূর্ণ হলো। 'উদ্বোধন'-এর গত শারদ (১৪০৫/১৯৯৮) সংখ্যায় আরেক শতবর্ষের কবি নজরুলকে নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কোন্ সূত্রে 'উদ্বোধন' আর কবি জীবনানন্দ এক সূত্রে বাঁধা পড়তে পারেন?

'উদ্বোধন'-এর প্রথম প্রকাশ ১৮৯৯ সালের ১৪ জানুয়ারি (১ মাঘ ১৩০৫)। জীবনানন্দের জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি (৬ ফাল্গুন ১৩০৫)। 'উদ্বোধন' জন্মলগ্ন থেকেই 'কবি' শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও ভাব প্রচারে নিরত। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ (৬ ফাল্গুন ১২৪২)। দু-তিনটি মতের মধ্যে এইটিই শেষপর্যন্ত গ্রাহ্য (দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উপক্রমণিকা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ৫ম অধ্যায়)। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম বুধবার, ব্রাহ্মমুহূর্তে। জীবনানন্দের জন্ম শুক্রবার। সময় জানা যায় না। অবশ্য দুজনের জন্মতারিখ নিয়ে মতদ্বৈধও আছে। 'বিশ্বকোষ'-এ আছে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। তেমনি কোথাও কোথাও আছে, জীবনানন্দের জন্মতারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি। মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়, দুজনের জন্মতারিখ এক। হয়তো দুজনেই শুক্লপক্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তো অবশ্যই। আর, দুজনেই বসন্তের জাতক।

জন্মতারিখ ও জন্মমাস ছাড়া আর কিসে মিল দুজনের? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি—চলতি কথায় 'ভাবাবেশ' হতো। ঈশ্বরচিন্তা বা মা ভবতারিণীর চিন্তায় তিনি ভাবাবিষ্ট থাকতেন সর্বদা। কবি জীবনানন্দের কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, তিনিও একটি ভাবাবেশের মধ্যে—একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে থাকতেন, চলতেন, ফিরতেন। তাঁর কবিতা পাঠকের মনেও সেই আবেশ সঞ্চারিত করে। তিনি তাঁর 'কবি' কবিতায় লিখেছেন ঃ

"ভ্রমরীর মতো চুপে সজনের ছায়াধূপে ঘুরে মরে মন
আমি নিদালির আঁখি, নেশাখোর চোখের স্বপন!
নিরালায় সুর সাধি,—বাঁধি মোর মানসীর বেণী,
মানুষ দেখেনি মোরে কোনদিন—আমারে চেনেনি!"
('ঝরা পালক')

এই আচ্ছন্নতা খুব কম কবির কাব্যপাঠে বোঝা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি কেমন? তাঁর এক-এক সময় অমাবস্যা-পূর্ণিমার জ্ঞান থাকত না, দিনক্ষণ ভুল হয়ে যেত। তাঁর নিজের কথায়—"ঈশ্বরের ওপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছে করে। যে যাকে ভালবাসে তার কথা শুনতে ও বলতে ভাল লাগে।" তিনি ছিলেন চূড়ান্ত ঈশ্বরপ্রেমী, ভাবে উন্মাদ, আত্মমগ্ন। কবি জীবনানন্দও ছিলেন চূড়ান্ত কবি—স্বভাবে আচ্ছন্ন, মগ্ন, ব্যাপ্ত। তাই না বহু গদ্য লিখেও প্রকাশের কোন তাড়না বোধ করেননি! তাই না সেই আচ্ছন্নতাহেতু ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে ট্রামের তলায় পিষ্ট, আহত হয়ে পরে ২২ অক্টোবর মারা গেলেন! এ এক অস্বাভাবিক ঘটনা। ধীরগতি ট্রামের তলায় চাপা পড়া—বারবার ঘণ্টি দিচ্ছে ট্রামচালক, জীবনানন্দ কোন্ কবিতার কোন্ লাইন ভাবছিলেন তখন?

"কখন মরণ আসে কেবা জানে—
কালীদহে কখন যে ঝড়
ফসলের নাম ভাঙ্গে—
ছিঁড়ে ফেলে গাঙচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো—" ('রূপসী বাংলা')

২২ অক্টোবর মৃত্যুমুহূর্তেও কবি আচ্ছন্ন ছিলেন কবিতার পঙ্‌ক্তিতে। তাঁর শেষ কথা—"ধূসর পাণ্ডুলিপি সারা আকাশ জুড়ে"। তাঁর প্রিয়তম ও উজ্জ্বলতম কাব্যগ্রন্থের নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর যথার্থ কবিসত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—

"কেউ যাহা জানে নাই—কোন এক বাণী
আমি বহে আনি,
একদিন শুনেছ যে সুর—
ফুরায়েছে, পুরনো তা—কোন এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি—আমার মতন
আর নাই কেউ!" ('ধূসর পাণ্ডুলিপি')
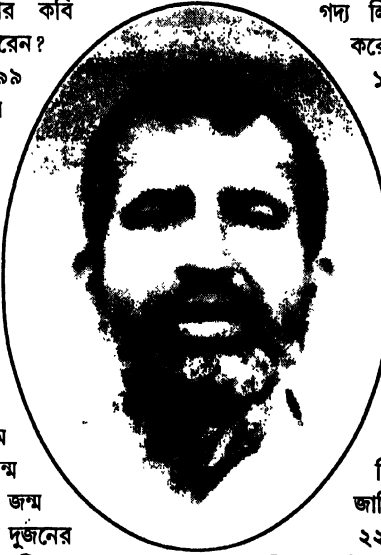
তাঁর ঘোষণা মিথ্যা হয়ে যায়নি। আজ একথা সর্বজন-স্বীকৃত যে, রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যজগতে তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। আর শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে স্বামীজীর প্রণামমন্ত্র ঃ

"ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।"

ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণই অবতারবরিষ্ঠ।

একজন আত্মমগ্ন হয়ে কবিতা লিখে গেছেন—কবিতার ঈশ্বরপ্রাপ্তিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আরেকজন ঈশ্বর-তন্ময়তায় লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন—অসাধারণ উপমা ও চিত্রকল্পে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—ধ্যান করবে মনে, বনে, কোণে। অর্থাৎ একাকী নির্জনতায়। বলতেন ঃ "ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক-একবার নির্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিনদিনও কাঁদা যায় সেও ভাল।" একা একা ঈশ্বরচিন্তায় তিনি থাকতে চাইতেন। পরবর্তী কালে শিষ্য-পরিমণ্ডলেও যখন থাকতেন, তখন তারই মধ্যে দিব্য আবেশে স্থির সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। আর জীবনানন্দের কবিতায় নির্জনতার গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাঁকে একসময় 'নির্জনতার কবি'—এই অভিধায় ভূষিত করেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। যদিও বর্তমানে তা আর এতটা গ্রাহ্য নয়। মানুষের মুখ, ব্যথা, কথাও তাঁর কাব্যে বহুবার বহুভাবে এসেছে। ব্যক্তিজীবনেও তিনি নির্জনতার সাধক ছিলেন। খড়্গপুর কলেজের (১৯৫০-১৯৫১) স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে কামরুজ্জামান লিখেছেন ঃ "(জীবনানন্দ) রাত্রি ও সকালের ক্লাস নিতেন। ঠিক সময়ে ক্লাসে যেতেন। ক্লাস করার সময়টুকু ছাড়া সবসময়ই এই ঘরটাতে (হস্টেলের আবাসঘর) বসে থাকতেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে। পড়তেন, লিখতেন, বেশিটা সময় উদাস হয়ে কী যেন ভাবতেন। কেউ দেখা করতে এসে কড়া নাড়লেও প্রায়শ দরজা খুলতেন না। পুলিনবাবু এলে অবশ্য দরজা খুলতেন। পরিচালক (হস্টেলের) হিসেবে তিনি কবিকে জিজ্ঞাসা করতেন, কোন অসুবিধে কিনা! জীবনানন্দ শুধু 'না' বলতেন। 'হ্যাঁ', 'না' ছাড়া তেমন কিছু কথাই বলতেন না। পুলিনবাবু চলে গেলে আবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন।" (সাহিত্য সমাজ, জীবনানন্দ সংখ্যা, ১৪০৫) জীবনে তিনি যেমন নির্জনতার সাধক ছিলেন, কবিতায় 'নির্জন স্বাক্ষর', 'নগ্ন নির্জন হাত'কে তিনি অনুসন্ধান করেছেন বহুবার—বহুভাবে।

আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধনারীশ্বর চেতনা ছিল। তিনি একসময় রাধাভাবে সাধনা করেছেন, আবার তাঁর কৃষ্ণসত্তা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। জীবনানন্দের কবিতাতেও আমরা খুঁজে পাই একধরনের অর্ধনারীশ্বর চেতনা—

"—তবু যেন মরি আমি এই মাঠঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনায় নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।"
('রূপসী বাংলা')

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রকৃতিপ্রীতি ছিল প্রবল। তিনি দেখতেন, এই বিশ্বপ্রকৃতি—সৃষ্টি সবই পরমপুরুষ আর ভবতারিণীর লীলাভূমি। তাই অতি বালক বয়সেই কৃষ্ণকালো মেঘের পটে সাদা বকের উড়ে যাওয়ার দৃশ্যে তিনি এক অব্যক্ত ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারান। ছেলেবেলায় তিনি বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। পরবর্তী কালে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর বনে তিনি আচ্ছন্ন আবেশে ঘুরতেন, সমাধিস্থ হতেন। গাছে ফুটে থাকা ফুলের পাপড়িতে তিনি দেখেছেন ঈশ্বরের লীলা। মথুরামোহন বিশ্বাসকে তিনি দেখিয়েছেন—ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই একই জবা গাছে লাল ও সাদা ফুল!

জীবনানন্দের কবিতায় ইতিহাসচেতনা, নির্জনতা, দেশপ্রেম ইত্যাদি যেমন আছে, যেমন আছে আধুনিক সময়ের হৃদয়চেরা যন্ত্রণার উদ্ভাস—যা অনেকটা শেলীর সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটিকে মনে করিয়ে দেয়—"I fall upon the thorns of life, I bleed."; তেমনি তাঁর কবিতায় আরেকটি প্রধান সুর—প্রকৃতিচেতনা তথা প্রকৃতিপ্রেম। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—'রূপসী বাংলা'। গোটা কাব্যগ্রন্থটির ষাটটি কবিতাই জন্মভূমির প্রতি প্রেম ও প্রকৃতিপ্রেমকে ঘোষণা করছে। অন্য সব কাব্যগ্রন্থেও ('বনলতা সেন', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'ঝরা পালক') প্রকৃতি-আবহ ছড়ানো। যেমন—

"শুয়েছে ভোরের রোদ, ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান।"
('ধূসর পাণ্ডুলিপি')

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে বিদ্যা অবিদ্যা দুইই আছে। উপলব্ধির শেষধাপে পৌঁছালে ব্রহ্মজ্ঞান—তখন ত্যাজ্য গ্রাহ্য জ্ঞান থাকে না। "কারু ওপর রাগ করবার যো থাকে না। গাড়ি করে যাচ্ছি—বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম—সাক্ষাৎ ভগবতী! দেখে প্রণাম করলাম।" নটী বিনোদিনীকে তিনি কিভাবে গ্রহণ ও উদ্ধার করেছিলেন তা আমরা জানি।

'পতিতা' কবিতায় জীবনানন্দের আর্ত স্বীকারোক্তি—"মানুষ তবু সে,—তার চেয়ে বড়, সে যে নারী, সে যে নারী।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল এক অসাধারণ সংবেদনশীল মন। তৃণের ওপর দিয়ে হাঁটলে তাঁর কষ্ট হতো। ফড়িং ধরে পীড়া দিলে তিনি যন্ত্রণা অনুভব করতেন। জীবনানন্দের কবিতাতেও সেই চেতনার প্রকাশ দেখতে পাই—

"নিখিল আমার ভাই
কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে
বেদনা পাই।"

তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতাতেও পাই শ্রীরামকৃষ্ণের মহামৈত্রীর বাণী।

উপমায়, কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন আদ্যন্ত নির্ভেজাল এক কবি। তাঁর চিত্রকল্পের ব্যবহারের কত সুন্দর নজির আছে 'কথামৃত'র পাতায় পাতায়। "মলয় পর্বতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয়, কেবল শিমুল, অশ্বত্থ, বট আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না।" বা "মন স্থির না হলে যোগ হয় না, সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করে।" ঐ দীপটি যদি না আদপে নড়ে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়। আর এইখানেই তো কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তাঁর আরো বেশি মিল। একদা উপমায় কালিদাস, তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ সবার সেরা। উপমায় রবীন্দ্রনাথও এক সম্রাট। তাঁর পরে উপমা ও চিত্রকল্পের এক রাজা জীবনানন্দ।

এক্ষেত্রেও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কত মিল তাঁর! লোকায়ত জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে কথা বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। চাতক, দুধ, মাখন, পায়রা, আতা, ইঁদুর, বাবলা, অশ্বত্থ গাছ, বাঁশ, নক্ষত্র—এরকম অসংখ্য চিত্রকল্প যা তিনি ব্যবহার করেছেন, তারও সুপ্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দের কবিতায়। অনুপুঙ্খ পাঠে আরো কত মিল খুঁজে পাওয়া যায় দুজনের মধ্যে!

দুজনের মিল পরম শেষেও। ১৮৮৬ সালে সার্ধ-পঞ্চাশ হয়েই মহাসমাধিতে চলে যান শ্রীরামকৃষ্ণ, আর ১৯৫৪ সালে পঞ্চাশের মধ্য কোঠায় চলে যান জীবনানন্দ শিশির-নীরব নক্ষত্রের দেশে। ❑

শারদীয় 'উদ্বোধন' ১৪০৫

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন'-এর যেসব গ্রাহক গত শারদীয় 'উদ্বোধন'—১৪০৫ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করবেন বলে কার্যালয়ে জানিয়েছিলেন অথচ এখনো সংগ্রহ করেননি, তাঁদের জানানো হচ্ছে, তাঁরা যেন ঐ সংখ্যাটি আগামী ৩০ এপ্রিল ১৯৯৯-এর মধ্যে অনুগ্রহ করে সংগ্রহ করে নেন। সংগ্রহ করার সময় গত বছরের (১৯৯৮) গ্রাহকভুক্তি অথবা নবীকরণের ক্যাশমেমোটি দেখাতে হবে। ক্যাশমেমোটি হারিয়ে ফেললে গত বছরের যেকোন সংখ্যার একটি র‍্যাপার নিয়ে আসতে হবে। বর্তমান বছরের নবীকরণের ক্যাশমেমো অথবা মাঘ/ফাল্গুন সংখ্যার র‍্যাপার আনলেও চলবে। স্থানাভাবের জন্য আগামী ৩০ এপ্রিল ১৯৯৯-এর পর শারদীয় 'উদ্বোধন'—১৪০৫ সংখ্যাগুলি কার্যালয়ে রাখা সম্ভব হবে না। আশা করি, সংশ্লিষ্ট গ্রাহকেরা এবিষয়ে আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করবেন।

প্রসঙ্গত জানাই যে, অনেক নতুন ও পুরনো গ্রাহকের গত ডিসেম্বর '৯৮/জানুয়ারি '৯৯ মাসে পাঠানো মানি অর্ডার (গ্রাহকমূল্য—১৯৯৯) কার্যালয়ে এখনো এসে পৌঁছায়নি। ফলে মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যা পেতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের দেরি হয়েছে বা হবে। পত্রিকা না পেয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই খোঁজ নিচ্ছেন। সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মানি অর্ডার কার্যালয়ে পৌঁছালেই আমরা পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

১৫ মার্চ ১৯৯৯ — সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

মহারাষ্ট্র ও গোয়ায়

মঞ্জুষা দাস

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরদিন নাসিক থেকে বাসে গেলাম 'ভীমাশঙ্কর'। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে বাস ছেড়ে ভীমাশঙ্কর পৌঁছাল রাত ৯টায়। বাসে ভীমাশঙ্কর-মন্দিরের এক পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে MTDC-র বাংলোর খোঁজ পাওয়া গেল। বড় বড় দুটো ঘর, অ্যাটাচড বাথ—তবে জলের অসুবিধে আছে। কারণ, প্রাকৃতিক জলের উৎস এখানে বিশেষ নেই। বৃষ্টির জলের ওপর ভরসা। তাই গ্রীষ্মকালে জলের একেবারে হাহাকার পড়ে যায়। ঘর-ভাড়া দৈনিক ১২৫ টাকা। বেশ সস্তা বলা চলে।

ভীমাশঙ্কর

ভীমাশঙ্করের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। গাছগাছালী আর অসংখ্য পাখির রাজত্ব এখানে। এদের সুরে সুর মিলিয়ে আছে আদিবাসীরা। শহুরেপনা একেবারেই নেই। ভীমাশঙ্কর প্রাচীন তীর্থ। সারাদিনই বাসে ট্রাকে চেপে তীর্থযাত্রীরা আসছে—পুজোপাঠ সেরে সন্ধ্যায় আবার ফিরে যাচ্ছে। অনেক সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলে তবে মন্দির। সিঁড়ি বেশ চওড়া। মন্দিরচত্বরও বেশ প্রশস্ত। এই জায়গাটা দেখলে 'পাঁচমারী'র কথা মনে পড়ে যায়। অনেকটা জটাশঙ্করের মতো। তবে জটাশঙ্কর যেমন একেবারে পাতালে অবস্থান করছেন—চারিদিক জলমগ্ন, এখানে তেমন নয়। আমরা সকালে গিয়ে পুজো দিয়ে অনেকক্ষণ ওখানে কাটালাম। ভীমাশঙ্করের অপূর্ব সূর্যাস্তের কথা উল্লেখ না করলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে এক অপূর্ব মন-মাতানো দৃশ্য। সূর্য ডুবছে, আর এক অপার্থিব আলোয় আকাশ, মাটি, গাছপালা, পশুপাখি আর মানুষের মন যেন কি এক অজানা রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে!

ভীমাশঙ্কর থেকে 'পুণে'। পুণেতে হোটেলের ভাড়া বড্ড বেশি। আমরা শেঠ গোকুলদাস ধরমশালায় উঠলাম। এটা নামেই ধর্মশালা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট বড় একটা প্রাসাদের মতো এর অবস্থিতি। আমরা পেলাম বিরাট বড় বড় তিনটি ঘর; খাট, গদি সবই আছে। অ্যাটাচড বাথ, অফুরন্ত জল। সামনেই বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন। সারাদিন এবং প্রায় সারারাত ধরে লোকজনের আনাগোনা আর জমজমাট বেচাকেনা। সকালে বা রাতে যখনি সময় পেতাম বারান্দায় দাঁড়াতাম। প্রাণচঞ্চল এই শহরের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতাম।

পুণে থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনার বাসে 'মহাবালেশ্বর' যাই। সারাদিন ঘুরিয়ে রাতে ফিরিয়ে আনে। কন্ডাক্টরই গাইডের কাজ করেন। মহাবালেশ্বর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে বাস উঠছে আর চোখের সামনে যেন এক-একটি চিত্র ভেসে উঠছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যময় পটভূমিতে মানুষের তৈরি বাগান, ঘরবাড়ি যেন একটা অপূর্ব রূপলাভ করেছে।

গাইড কয়েকটি পয়েন্ট দেখালেন। প্রথমেই 'ভেন্না লেক'। বিশাল এর পরিধি। লেক-এর কাজল-কালো জলে নৌকাবিহার করা গেল মিনিট কুড়ি। গাইড আমাদের একটা পাহাড় দেখালেন—যেন একটা হাতি, শুঁড়টাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এরই নাম 'হাতিপাহাড়'। এখানেও 'ইকো পয়েন্ট' আছে। নিচে পাহাড়ের গায়ে দূরে দূরে অনেক মূর্তি ও মন্দির। নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, প্রাকৃতিক ঝড়-বাতাস কার নির্দেশে এমন অপরূপ সৌন্দর্য গড়ে তুলল। এ যে অভাবনীয়! একটা মাটির কলসি নিয়ে একজন লোককে বসে থাকতে দেখলাম। বেশ ভিড় সেখানে। কৌতূহলে এগিয়ে যাই। দেখি ধরিত্রীর ভিতর থেকে একটা জলের ধারা বেরিয়ে আসছে—স্বচ্ছ কাচের মতো পরিষ্কার জল। তাই সংগ্রহ করে লোককে দিচ্ছে। আমিও এক গ্লাস খাই। অপূর্ব সেই জলের স্বাদ। এমন মিষ্টি স্বাদু জল পূর্বে একবার খেয়েছিলাম যমুনোত্রী থেকে ফেরার পথে জানকী চটির কাছে। মহাবালেশ্বরের বাজার বেশ জমজমাট। দেশীবিদেশী অতিথিরা সৌখিন জিনিসপত্র প্রচুর পরিমাণে কেনাকাটা করেন। এরপর মহাবালেশ্বর-মন্দির দেখতে যাই। এখানে যে শিবলিঙ্গ আছে তা দেখতে অনেকটা থকথকে কালো কাদার মতো, কিন্তু তা নিরেট পাথর। এর ভিতরে বোধহয় জলের কোন উৎস আছে, যার জন্য তিরতির করে জল ওপরে উঠে আসে আর শিবলিঙ্গ ভেজা থাকে। সারাদিন আনন্দ করে ধর্মশালা ফিরতে বেশ রাত হলো।

পরদিনও পুণে দর্শন। কেলকারের একক প্রচেষ্টায় যে মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে, একান্ত আগ্রহে তা দেখি। তবে মিউজিয়াম তো আর কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখে শেষ করা যায় না। তবুও ঐ অসংখ্য সংগ্রহের মধ্যে চোখে পড়ল একটা

চিরুণীর গায়ে বাঙলায় লেখা 'রাধারানী'। মস্তানী মহলের সংগ্রহ করা জিনিসপত্র, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সাজানো একটা আলাদা ঘর আছে। কেলকার তখনো বেঁচেছিলেন, তবে মাস দুয়েকের ভিতর মারা যান। 'শনিবার বারা'য় আছে পেশোয়া রাজত্বের স্মৃতিচিহ্ন। গাইডের মুখে শুনি, মস্তানীর কাহিনী আর ইংরেজের অত্যাচারের বিবরণ।
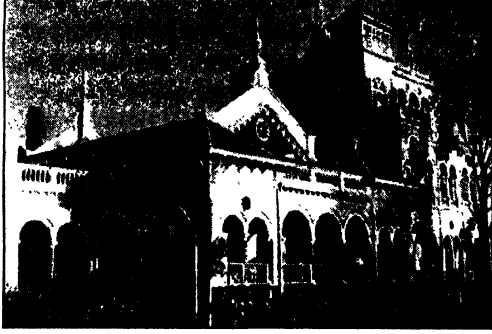
আগা খাঁ প্যালেস, পুণে

আগা খাঁ প্যালেস সম্বন্ধে বেশ কৌতূহল ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় লোককে কাজ দেওয়ার জন্য এই প্রাসাদের সৃষ্টি। অপূর্ব সৌষ্ঠব! লতাবাগিচায় কত যে ফুলের সমারোহ! এখন এ প্রাসাদটি জাতীয় স্মারক সৌধ হিসাবে চিহ্নিত। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখানে নেওয়া হয়েছিল। এই বাড়িতে কস্তুরবা গান্ধীর জীবনাবসান হয়। তাঁর সমাধি এখানে আছে। আমরা সবাই শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে সেখানে দুদণ্ড দাঁড়ালাম, প্রণাম জানালাম সেই মহিয়সী নারীকে।

এরপর 'লোনাভেলা'। ধর্মশালার লাগোয়া একটা ক্লোকরুম-এ মালপত্র রেখে বেলা সাড়ে ১২টার ট্রেন ধরে লোনাভেলায় পৌঁছে যাই দুপুর ২টায়। হোটেল 'উদিপি'তে একটা ঘর নিয়ে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। শুনি এখানে
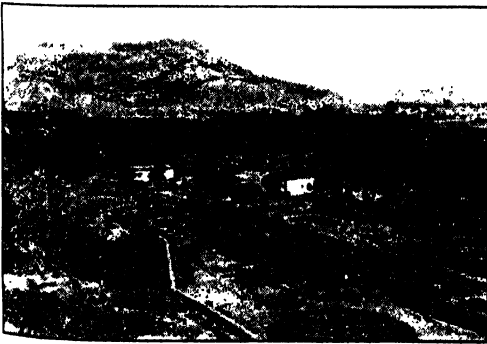
লোনাভেলা উদ্যান (মুম্বাই থেকে পুণে যাওয়ার পথে)

'ওয়ানওয়ালা ড্যাম' আছে দেখার মতো, হেঁটেই যাওয়া যায়। হাঁটছি তো হাঁটছি, রাস্তা আর শেষ হয় না! যাও বা এসে পৌঁছালাম—ভাবছি আর হাঁটতে হবে না, এবার বাগানের বেঞ্চে বসেই লেকের শোভা দেখতে পাব, কিন্তু তা তো হওয়ার নয়! পিচঢালা মসৃণ রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেই চলেছে। হাঁটার কষ্ট ভুলে যাই যখন দেখি সযত্নলালিত উদ্যানশোভা, ঘাসের পুরু গালিচা আর রঙ-বেরঙের ফুলের শোভা। ড্যাম দেখার জন্য অনুমতির দরকার। সে-ব্যবস্থাও হয়। ভিতরে গিয়ে ড্যাম আর লেক ভালভাবে দেখে আসি।

পরদিন সকালে লোনাভেলা বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস ধরে 'কারলা কেভ' দেখতে যাই। কেভ দেখতে শ-পাঁচেক সিঁড়ি উঠতে হয়। শুনেছি এখানেই এশিয়ার বৃহত্তম 'চৈত্য' আছে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এখানে আসে। এরা কেভ-এর দর্শক নয়। ওপরে আছে একবীরা মায়ের মন্দির। এই মায়ের পুজো দেওয়ার জন্য দূরদূরান্ত থেকে বাসভর্তি হয়ে লোক আসে। মনে হয়, মায়ের কাছে বলি দেওয়ার প্রথা আছে। কারো কারোকে কাঁধে কুচকুচে কালো ছাগল নিয়ে যেতে দেখেছি।

কারলা কেভ, লোনাভেলা

কেভের বিশালতা, দেওয়ালের গায়ে মূর্তি, বাইরের দিকে জোড়া হাতি (একটা ভাঙা) আমাদের যেমন বিস্ময় বিমুগ্ধ করে, তেমনি চিত্ত বেদনায় মথিত হয় যখন দেখি এগুলির কোন দেখভাল হয় না—নোংরা, দুর্গন্ধে বেশিক্ষণ কেভের ভিতর দাঁড়ানো যায় না। এত অবহেলা সত্ত্বেও অনেক দেখার মতো মূর্তি এখানে আছে। কেভের ভিতরে চৈত্যের অবস্থান এমন যে, চৈত্যের গা সূর্যের আলোয় আলোকিত থাকে। কেভের সামনেটা ভেঙেচুরে গেছে। বিরাট অশোকস্তম্ভ আছে এখানে—অবশ্য খানিকটা ভাঙা। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি যখন ভাবি, কারা ছিল এইসব ঈশ্বরের বরপুত্র, যারা সারাজীবন অপূর্ব কারুকৃতির মাধ্যমে ঈশ্বরেরই আরাধনায় নিজেদের যুগযুগান্ত ধরে ব্যাপৃত রেখেছে! নিরেট পাথরকে যেন কাদায় রূপান্তরিত করে ইচ্ছেমত রূপ দিয়েছে! মনে

মনে প্রণাম জানালাম তাদের উদ্দেশে। একবীরা মায়ের মন্দিরে প্রসাদ পেলাম নারকেল। এরপর ট্রেনে চেপে পুণেতে প্রত্যাবর্তন। 'লোনাভেলা'—সুন্দর নাম আর ছিমছাম সৌন্দর্যের জন্য আমাদের মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সন্ধ্যা ৭টায় পুণে থেকে ডিলাক্স বাসে করে গোয়ার উদ্দেশে রওনা দিলাম। সূর্যোদয় দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম গোয়ায়। কদম্বা বাসস্ট্যান্ড থেকে ফেরী পার হয়ে 'পানাজী'। ট্যুরিস্ট হোমে আমাদের জন্য ঘর বুক করা ছিল। বাসে পর পর দুদিন সাউথ গোয়া আর নর্থ গোয়ায় বেড়ালাম। প্রথম দর্শনে গোয়া দেখে অভিভূত হওয়ার মতো কিছু নজরে পড়ল না। দারিদ্র্যপীড়িত, ভাঙাচোরা, নতুন উদ্যমও কিছু চোখে পড়ে না। এখানে 'দোনা পাওলা' একটি

দোনা পাওলা লেক, গোয়া

ভারি সুন্দর লেক! লেকের জলে বোটিং খুবই আকর্ষণীয়। আমরাও খানিকক্ষণ বোটিঙের আনন্দ উপভোগ করলাম। গোয়ার প্রধান আকর্ষণ সী-বীচ। গোয়া থেকে প্রাচীন তীর্থ 'গোকরণ' যাওয়ার বাস আছে। কিন্তু প্রথমে জানা না থাকায় আমাদের যাওয়া হয়নি। গোয়ায় কাঁঠাল খুব পাওয়া যায়। 'ভাগাটো'র সী-বীচে কাঁঠালের কোয়া বিক্রি হচ্ছিল। শক্ত খাজা কাঁঠাল। বেশ মিষ্টি। মঙ্গেশ টেম্পলের সামনে দেখি পাকা কামরাঙা বিক্রি হচ্ছে। টক-মিস্টি রসে মুখ ভরে গেল। গোয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কাজু আর নারকেল। নারকেলের ছোবড়াজাত শিল্পসামগ্রী আর শুকনো মাছের বাণিজ্যও ভাল চলে। গোয়ার মানুষেরা শান্ত স্বভাবের আর অত্যন্ত ভদ্র। পানাজীতে যে ফেরী-সার্ভিস ছিল তাতে টিকিটের কোন ব্যাপার ছিল না। সময় সুযোগ পেলেই আমরা মাণ্ডবী নদী পারাপার করতাম। সূর্যাস্ত দেখতাম।

এবার আমরা পানাজী থেকে এলাম 'মারগাঁও'। বিকালে আবার একবার বাসে করে গেলাম 'কোলভা বীচে'। সমুদ্র দেখে তো আর আশ মেটে না! গরম, রোদ্দুরে তেতে ওঠা বালি—কিছুই আমাদের সমুদ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। মারগাঁও থেকে সাড়ে ১২টার ট্রেন ধরে 'মীরাজ' পৌঁছালাম রাত ১০টা ৪০ মিনিটে। পথে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। পথে গোটা চারেক ঝরনাও দেখলাম। পাহাড়ের বুক চিরে বনের মধ্য দিয়ে একলাইনের ট্রেন চলার পথ। ধীর গতি। যেন বেড়াতে বেরিয়েছে! ফলে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে কোন অসুবিধা হয়নি। মাঝে মাঝে চমক ছিল টানেল পার হওয়ার। ষোলটা টানেল গুনেছিলাম, মনে আছে। মীরাজ থেকে রাত ১১টায় মুম্বাইয়ের ট্রেন ধরে 'দাদার' স্টেশনে নেমে ওখানেই ট্রেন ধরে 'ভিটি' আসি। স্টেশনের কাছেই মানামা হোটেলে উঠি। কেননা পরদিন কলকাতা যাওয়ার জন্য 'গীতাঞ্জলি' ধরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে স্নানটান সেরে একটা রেস্তোঁরায় মাছের

আনজানা বীচ, গোয়া

ঝোল ভাত খেয়ে নিই। তারপর গেটওয়ে দেখতে যাওয়ার জন্য বাসের প্রতীক্ষা। উদ্দেশ্য 'এলিফ্যান্টা'। গেটওয়ে পৌঁছে টিকিট কেটে বোটে করে মনোরম সমুদ্রযাত্রা! আবার সেই সিঁড়ি ওঠা। বছর কয়েক আগে একবার এলিফ্যান্টা ঘুরে গেছি। প্রথমবারের মতোই শিহরণ অনুভব করছিলাম। কেভের ভিতরে ঘুরে ঘুরে দেখি। গাইডের কাজ করছিলেন এক মারাঠি মহিলা। ভারী সুন্দর করে বলছিলেন নানা কাহিনী, নানা ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন ইত্যাদি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। জীব এবং জগৎ, সৃষ্টি আর ধ্বংসের সেই মহানমূর্তি আমাদের সম্মুখে বিরাজমান—কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে যা আজো ভাস্বর। প্রণাম জানালাম সেই মহান শিল্পীকে। বোটে করে ফিরে চললাম। সমুদ্র এবার কিছুটা উত্তাল। বেশ দুলছিল বোট। মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম—"দে দোল দোল, এ মহাসাগরে তুফান তোল।"

এবার বিদায়ের পালা। পরদিন ভোরবেলা স্টেশনে পৌঁছালাম। গীতাঞ্জলি ৬টা ১৫-এ। হাওড়ায় পৌঁছালাম পরদিন সন্ধ্যা ৬টায়। আঃ! কলকাতা—কলকাতা! ❑

কুরুক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না।" স্বামীজী বলছেনঃ "প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণ-চিকীর্ষবঃ"—প্রাণ বিসর্জন দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। এই হলো রামকৃষ্ণধর্মের মূলকথা। নিজের মোক্ষ চাইছ, না কর্তব্য থেকে পালাতে চাইছ? ভাল করে ভেবে দেখ। কর্ম ছাড়া ধর্ম থাকে কি করে! দেহ যখন ধরেছ, শ্বাসপ্রশ্বাস আছে। নাকটা টিপে ধরলে 'গেল গেল' অবস্থা। ইন্দ্রিয়ের ফোকর দিয়ে সংসার, জগৎজীবন দেখছ। হাসছ, কাঁদছ, ক্ষেপছ, ক্ষেপাচ্ছ! 'আমি, আমার' বলে সব আঁকড়ে আঁকড়ে ধরছ! কোন্ আক্কেলে তুমি পনের মিনিট জপের মালা ঘুরিয়ে 'পরমহংস' হয়ে গেলে ভাব! অতই সহজ! আষ্টেপৃষ্ঠে তিলকসেবা করে, গলায় কেজি দশেক হরেকরকম মালা পরে, হরিণের ছালে বসে থাকলেই হিরণ্যগর্ভ সহাস্যে এসে যাবেন, কি দু-চ্যাপ্টার 'গীতা' পড়লেই তাঁর আলোয় আলোকময় হয়ে যাব—এমন কোন আশা নেই। স্বামীজী বলেছেনঃ "ধর্ম মানে শাস্ত্রপাঠ, তত্ত্বকথা কিংবা মতবাদ নয়। ধর্ম মানে 'হওয়ার' চেষ্টা করা এবং 'হয়ে যাওয়া'। It is being and becoming."

এ যে তাঁর গুরু পরমহংসদেবেরই শিক্ষা। তিনি বলতেনঃ "পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে। কিন্তু পাঁজি নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না, তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্মকথা লেখা আছে, শুধু পড়লে ধর্ম হয় না—সাধন চাই।"

কেশবচন্দ্র সেন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাঁদের জ্ঞানলাভ হয় না কেন?" ঠাকুর বললেনঃ "যেমন চিল, শকুন অনেক উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গোভাগাড়ে। তেমনি অনেক শাস্ত্রপাঠ করলে কি হবে?"

দুটো কীটকে যে আগে পোড়াতে হবে—কাম আর কাঞ্চনে আসক্তি। রাম আর কাম, দিন আর রাত একসঙ্গে থাকে কি করে! ঐ দুটি 'প্যারাসাইট'-এর জায়গায় আনতে হবে বিবেক আর বৈরাগ্য। মা বললে—ভাল ভাল জিনিস খাচ্ছে-দাচ্ছে, ছেলেটার গায়ে গত্তি লাগছে না কেন? কেবল পেটটাই বড় হয়ে যাচ্ছে! বৈদ্য এসে বললেঃ লাগবে কি করে, এর যে পেটজোড়া পিলে! পিলেতেই সব খেয়ে নিলে! পিলের স্বাস্থ্যই ভাল হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন—গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি—গাঁট। বিবেক-বৈরাগ্যের সঙ্গে বই না পড়লে পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা আর অহঙ্কারের গাঁট বেড়ে যায় মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মিলনে তৈরি হলো ভয়ঙ্কর এক ধর্ম—'মরণ ধর্ম'। 'আমি'টা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অনেকটা—নিজেকে চিতায় চড়ানো। গোখরোর ছোবল। 'কাঁচা আমি' বৈরাগ্যের আগুনে পুড়ে 'পাকা আমি' হবে। কাঁচা সোনাকে পাকা করা। উপাধি পোড়ার পড়পড় শব্দ নিজের কানেই শোনা যাবে।

গঙ্গার ধারের নিরালা এক উদ্যান, জানবাজারের রানীর দেবালয়, জমিদার মথুরামোহনের সাত টাকা মাসোহারা। জপ, ধ্যান, পূজা, শাস্ত্রকথা, সঙ্গীতের গতানুগতিক পথে ধর্মজীবন কাটানো নয়। কী অসম্ভব রোখ! কে রাসমণি, কে মথুর! কলকাতার মাথাওলা জ্ঞানী, গুণী, ধর্মপ্রচারক, লেখক, আমলা, মুৎসুদ্দি, ব্যবসায়ী, ধনী ব্যক্তিরাই বা কে! দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ বেপরোয়া। একবার করে বাজান আর বাতিল করে দেন। তোমার পুঁথিপড়া জ্ঞানের অহঙ্কার নিয়ে এস, তোমাকে আমি চুপসে দেব। 'জ্ঞান' কাকে বলে? ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সেমিনার, বক্তৃতা, মামলা, মকদ্দমা, চালবাজি, ফেরেব্বাজি, ভেকধারণ, শাস্ত্র আলোচনা সব ফুঃ! ক্ষণকালের ফুৎকার। অজ্ঞানের অন্ধকারে ভূতের নৃত্য! জ্ঞান হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। ধর্মের পথ ঈশ্বরের দিকেই গেছে। সে-পথ বাইরে নেই—ভিতরে। নিজের দিকে এগনোর নামই সাধনা। তারই নাম তীর্থযাত্রা। স্বামীজীকে দিয়ে বলালেনঃ "ভগবানের দিকে যাওয়ার পথ সাংসারিক পথের ঠিক বিপরীত। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।"

যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান, জপ, আরতি, চর্চা—যা আছে সব চলুক, সব সাধনই একবার করে হোক। আসল সাধনা হবে মানুষ নিয়ে। কামারপুকুর নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের আক্রমণস্থল খাস কলকাতা। ইংরেজের কলকাতা, বুদ্ধিজীবীর কলকাতা, এলিটদের কলকাতা, বাবুদের কলকাতা, নক্ষত্রখচিত কলকাতা! কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, শিবনাথ। কী দুঃসাহস এই বিত্তহীন রিক্ত ব্রাহ্মণটির! 'চাল-কলা বাঁধা' বিদ্যা আমি শিখব না। পেটের জন্য দাসত্ব আমি করব না। "অজগর না করে নোকরি, পঞ্ছি না করে কাম।" রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না। আমি এসেছি যাঁর ইচ্ছায়—তিনিই আমাকে দেখবেন। প্রথমে আমি ভক্ত। আমি সাকার-বিশ্বাসী। আমার সন্তানভাব। পরে আমি নিরাকারবাদী জ্ঞানী। সব ভাবের সাধন আমি করে দেখাব। দেখাব শাস্ত্র সত্য, ভগবান সত্য। "যত মত তত পথ"। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"।

শ্রীরামকৃষ্ণের আক্রমণে কলকাতার সংসারীদের জগতে হাহাকার। গেল গেল, সব গেল! হ্যামলিনের বাঁশি শুনে কলেজের ইংরেজী-জানা টাটকা তরুণরা সব দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছুটছে। ব্রাহ্মসমাজ চুরমার! কেশবচন্দ্র সেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস বলতে অজ্ঞান, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পায়ের কাছে বসে থাকেন হাতজোড় করে। অ্যাটর্নি-পুত্র নরেন্দ্রনাথের যাবতীয় অধীত বিদ্যা, জ্ঞান, অহঙ্কার, অন্বেষণ, সংশয় আলুর পুতুলের মতো চুরচুর করে চুরমার করে দিয়েছেন। কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ক্লাস নিতে নিতে ডিরোজিওর কলকাতার ছাত্রদের বলছেনঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় যে 'একস্ট্যাসি'র কথা আছে, তা যদি দেখতে চাও দক্ষিণেশ্বরের সাধকের কাছে যাও।

স্টেজ থেকে টেনে আনলেন গিরিশ ঘোষকে। পণ্ডিতমহল থেকে উৎপাটিত করে আনলেন বৈষ্ণবচরণ, পদ্মলোচনকে।

মহামহোপাধ্যায়দের শাস্ত্রবিচার হোঁচট খেল। সকলেরই বিস্মিত প্রশ্ন ঃ তুমি কে? ব্রহ্মজ্ঞানী তোতাপুরী গুরু হতে গিয়ে বিস্ময়ে বলে উঠলেন ঃ এ কেয়া! দৈবী মায়া! ভৈরবী ব্রাহ্মণী এসেছিলেন তন্ত্রশিক্ষা দিতে। শিষ্যের সিদ্ধির প্রভাবে জীবনসায়াহ্নে তাঁকে পাওয়া গেল বৃন্দাবনে—প্রেম সাধছেন।

তিনি যে এই ঘৃণার পৃথিবী, নিষ্ঠুর পৃথিবীকে প্রেম দিতে এসেছিলেন! চৈতন্য দিতে এসেছিলেন। 'হেথা'য় থাক, কিন্তু 'হোথা'র সঙ্গে তোমার যোগটি যেন থাকে। হেথা সব শূন্য, ঐ 'এক'-কে এনে শূন্যের আগে বসাও, জীবনের মূল্য খুঁজে পাবে। বহুর মধ্যে সেই 'এক'কে প্রত্যক্ষ কর। ত্রৈলঙ্গস্বামী তখন মৌনী। একটি আঙুল আকাশের দিকে তুলে ধ্যানস্থভাবে ঠাকুরকে দেখালেন, সবই এক-এর খেলা। ঠাকুর যখন সমাধিতে লীন হতেন, তখন তাঁর যে-ভঙ্গিটি হতো সেটি একটি অপূর্ব, অদ্বিতীয় 'সিম্বল'। মুখমণ্ডলে চৈতন্যের আলো। ডান হাতের আঙুলে সেই সর্বোর্ধ্ব এক-এর ইঙ্গিত। বুকের কাছে হাতের আঙুলে প্রস্ফুটিত পদ্মমুদ্রা। সূর্যকিরণেই পদ্ম পাপড়ি মেলে। হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ঘুচে।

জন্ম, জায়া, জরা, জন্মান্তরের ছকে বাঁধা চক্রান্ত থেকে নরেন্দ্রনাথকে টেনে বের করে আনলেন। দেখিয়ে দিলেন তার আগে—কি বিষাক্ত এই মানবসংসার! তাঁকে মৃত্যু দেখালেন, অভাব দেখালেন, জ্ঞাতিদের শত্রুতা দেখালেন, মামলা দেখালেন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের স্বরূপ চেনালেন। এক ঝটিকায় 'জ'-এর জগৎ থেকে নরেন্দ্রনাথকে মুক্ত করে সমস্ত সংশয় ধুয়ে মুছে চৈতন্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে মোক্ষের চাবিটি কেড়ে নিলেন। ভগবান মৃদু হেসে বললেন ঃ সবই হয়ে রইল নরেন। ঘর চিনলে। জগৎ-প্রপঞ্চ, স্বস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপকে তুমি চিনলে। যদু মল্লিকের বাগানবাড়িতে তোমাকে স্পর্শ করে চৈতন্যলোকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলুম এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই মায়া। এদিক থেকে দেখলে এটা সত্য, ওদিক থেকে দেখলে নেই, নেই কিছু নেই।

এস, এইবার দুজনে মিলে তৈরি করি নতুন বেদ—নতুন গীতা। এবারের পার্থসারথি শ্রীরামকৃষ্ণ, এবারের অর্জুন নরেন্দ্রনাথ। সেবার তুমি গাণ্ডীব ধরেছিলে, এবার ধর আমার দেওয়া প্রেম। বিশ্বরূপ তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছি। এবারের কুরুক্ষেত্র অন্যরকম। মেরে নয়—মরে গিয়ে প্রেমের চাদরে আচ্ছাদিত কর ওদের, যারা কৌরবের স্বার্থপরতা, নৃশংসতা, উদাসীনতার শিকার। এই কৌরবপক্ষে আছে ধর্মগুরু, পুরোহিত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন; আছে জমিদার, ব্যবসাদার, শিক্ষক, রাষ্ট্রপতি, শিল্পপতি। আছে সেইসব পামরপুরুষ যারা শত-সহস্র দ্রৌপদীর মর্যাদাহানি করছে। এস, মন্দির থেকে ভগবান নয়, এই প্রাচীন ভারত থেকে নতুন এক ভারত বের করি। সেই নতুন ভারত বেরুক "লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।" নেই, নেই নয়, আছে, আছে। মানুষ চাই—মানুষ, পশু নয়। এখানে যা আছে ত্রৈলোক্যেও তা নেই। ❑

'উদ্বোধন'-এ রচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

❑ ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়ে সুখপাঠ্য, ইতিবাচক, বিশ্লেষণমূলক এবং তথ্যভিত্তিক বাঙলা রচনা বিবেচিত হয়। রচনাটিকে অবশ্যই 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উপরি উক্ত যেকোন বিষয়ে রচনাটি কমপক্ষে ২৫০০ শব্দের হওয়া প্রয়োজন। ছদ্মনামে পাঠানো রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ আক্রমণাত্মক রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ কবিতা, সংবাদ, চিঠিপত্র নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

❑ শারদীয়া সংখ্যার (আশ্বিন/সেপ্টেম্বর) জন্য রচনা পাঠালে তা ১৫ চৈত্র/৩১ মার্চ-এর মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন।

❑ ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনায় আলোকচিত্র (গ্লসি প্রিন্ট) পাঠানো আবশ্যিক।

❑ যেকোন তথ্যভিত্তিক রচনা এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবি (গ্লসি প্রিন্ট), রেখাচিত্র ইত্যাদি পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিলে বা সাহায্য নিলে যথাযথ সূত্রনির্দেশ (গ্রন্থের/পত্রিকার নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশকাল, সংস্করণ এবং পৃষ্ঠা) আবশ্যিক।

❑ ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে যথেষ্ট মার্জিন দিয়ে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি না পাঠালে বিবেচিত হবে না। বাঙলায় টাইপ করা পাণ্ডুলিপি পাঠানো যেতে পারে।

❑ রচনার কার্বন বা জেরক্স কপি গ্রহণযোগ্য নয়।

❑ অন্যত্র প্রকাশিত কোন রচনা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। এর ব্যতিক্রম হয় শুধু 'মাধুকরী' বিভাগের রচনাগুলির ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রেও রচনাটিকে 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

❑ উপন্যাস বিবেচিত হবে না।

❑ অমনোনীত রচনা ফেরতযোগ্য নয়। রচনার সঙ্গে প্রেরিত নথিপত্র বা ছবি সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং রচনা/ নথিপত্র/ছবির কপি রেখে পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ সাধারণত কোন রচনা পাঠানোর একবছরের মধ্যে এবং কোন গ্রন্থের আলোচনা গ্রন্থ পাঠানোর দুবছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে বুঝতে হবে, সংশ্লিষ্ট রচনাটি অথবা গ্রন্থটি মনোনীত হয়নি।

❑ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য পাঠানো রচনা অন্তত একবছরের মধ্যে যেন অন্যত্র প্রকাশের জন্য প্রেরিত না হয়। একবছরের মধ্যে 'উদ্বোধন'-এ কোন রচনা প্রকাশিত না হলে অন্যত্র প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে পাঠানোর আগে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়।

❑ 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে আলোচনার জন্য 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থই বিবেচ্য। আলোচনার জন্য প্রতি গ্রন্থের দুখানি কপি জমা দেওয়া আবশ্যিক।

❑ পরলোক-সংবাদ ও অনুষ্ঠান-সংবাদ পরলোকপ্রাপ্তি বা অনুষ্ঠানের পনের দিনের মধ্যে অবশ্যই আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন। অন্যথায় সে-সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

❑ লেখক-লেখিকাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আমরা স্বীকার করি। তবে তাঁদের মতামত আমাদের অনুমোদিত—এটা ভাবা ভুল। মতামতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকাদের।

❑ রচনাদি নির্বাচন ও প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

❑ পত্রোত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট/পোস্টকার্ড/ইনল্যান্ড/ খাম পাঠাতে হবে।

১৬ মার্চ ১৯৯৯ — সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ব্লাডপ্রেসার ও অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সংগঠনকারী হেতুগুলি

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

লেখক আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অব মেডিসিন এবং নিউ ইয়র্কের সিরাকিউজস্থ ভেটারান্‌ অ্যাফেয়ার্স মেডিক্যাল সেন্টারের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রক্তের উচ্চচাপ বা হাইপারটেনশন (Hypertension) শরীরের পক্ষে কত যে ক্ষতিকারক, সেসম্বন্ধে আজ অনেকেই ওয়াকিবহাল। শুধু যে মস্তিষ্কের ধমনী ছিঁড়ে রক্তপাতের ফলে স্ট্রোক (stroke) বা মারাত্মক সন্ন্যাস রোগ হতে পারে তাই নয়, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস (cerebral thrombosis—মস্তিষ্কের ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাটবাঁধা) হয়ে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। ব্লাডপ্রেসারের অসুখে মস্তিষ্ক ছাড়া হার্ট ও কিডনীও আক্রান্ত হয়। তার জন্য ক্রমশ হার্ট ফেলিওর হয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড তার সঙ্কোচন ও প্রসারণের কাজ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে না। ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, শরীরে জল জমা, হজমের গণ্ডগোল প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয় ও কিডনীর গণ্ডগোল হয়। পরে কিডনী ফেলিওর অর্থাৎ শরীর থেকে দূষিত পদার্থসমূহ প্রস্রাবের সঙ্গে না বেরিয়ে সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। রক্তের উচ্চচাপের জটিলতা (complication) হলো হার্ট-পাম্প, ধমনীসমূহ ও রক্তপরিশ্রুতকারী কিডনীর কর্মক্ষমতার ক্রমাবনতি—যার ফলে অকালমৃত্যু অবধারিত। আজকাল চিকিৎসাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে এবং সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় সমস্যাগুলি আয়ত্তে আনা বহুলাংশেই সম্ভব হয়েছে। তাই হতাশ হওয়ার কারণ নেই।

ব্লাড প্রেসার (Blood Pressure) ও স্বাস্থ্যসমস্যা

ভারতের মতো জনবহুল দেশে সুযোগ-সুবিধার অভাবে আজও সম্যগ্‌ভাবে আমরা জানি না এই ব্লাডপ্রেসার সমস্যার পরিব্যাপ্তি কতদূর। আমেরিকার মতো সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে এর প্রকোপ খুবই বেশি—বিশেষ করে মধ্যবয়সীদের প্রায় ২৫ শতাংশ লোকের এই অসুখ আছে বলে ধরা হয়, কিন্তু তার প্রায় অর্ধেক মানুষ জানেই না যে তাদের এই অসুখ আছে। আবার ৬৫ বছরের ওপর যাদের বয়স তাদের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের ব্লাডপ্রেসারের সমস্যা আছে। সুচিকিৎসার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও যেহেতু বেশ কিছুদিন বা কয়েক বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপের কোন লক্ষণই প্রায় থাকে না, তাই লোকে ব্লাডপ্রেসার বেড়ে আছে জানা সত্ত্বেও ঠিকমত ওষুধ ব্যবহার করতে উৎসাহী হয় না। তার ওপর ওষুধের পার্শ্বফল (side effects) কিছু তো থাকেই। সেজন্য 'সুস্থ শরীর'কে অহেতুক 'ব্যস্ত' করতে কেউই বিশেষ রাজি হয় না। ফলে অনেক সময় রোগ যখন পাকাপাকিভাবে তার লক্ষণসমেত ধরা পড়ে, তখন বেশ দেরি হয়ে যায় এবং আনুষঙ্গিক নানা জটিলতার জন্য অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণকায় আমেরিকানদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষ করে সত্য। এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কমই এবং ব্লাডপ্রেসারের প্রকোপও এদের মধ্যে খুবই বেশি। বস্তুত, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অজ্ঞতাই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। আমাদের দেশে ব্লাডপ্রেসারে বহু লোক ভুগছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সুব্যবস্থার অভাবে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাপদ্ধতি দীর্ঘকাল অনুসরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তার ওপর অজ্ঞতা বা অল্পবিদ্যা তো আছেই।

উচ্চ রক্তচাপ যে 'নিঃশব্দে বিনাশকারী'র (silent killer) অন্যতম তা আজ সকলেরই জানা প্রয়োজন এবং সেইসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, আধুনিক সুচিকিৎসায় ব্লাড-প্রেসার ভালভাবেই আয়ত্তে আনা যায় ও তার ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জটিলতাসমূহ প্রতিরোধ করা সম্ভব। সময়মত রোগনির্ণয় ও সুচিকিৎসার এটাই সর্বাঙ্গীণ সুফল। ব্লাড-প্রেসার আয়ত্তে আনায় অসুখের প্রকোপ কিছু কমে ঠিকই, কিন্তু স্ট্রোক (cerebral stroke) বা বৃক্কের কর্মক্ষমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমার মতো অতদূর সুফল লাভ হতে দেখা যায় না। হার্টের করোনারি অসুখের ব্যাপারে পরিসংখ্যায় জানা যায় যে, ব্লাডপ্রেসারের সুচিকিৎসার ফলে শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ স্ট্রোক আজ কম হচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় করোনারি অসুখের বা হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমছে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ। এখন সেটি নিয়েই আলোচনা করা যাক।

অ্যাথেরোজেনিক ক্লাস্টার (Atherogenic Cluster) কি?

করোনারি ধমনীর ভিতর দেওয়ালে যে সূক্ষ্ম এককোষী (single layer) আস্তরণ আছে—যাকে বলা হয় 'এন্ডোথিলিয়াম', উচ্চ রক্তচাপ তার ক্ষতি করে। সেইসঙ্গে যদি রক্তে কোলেস্টেরল বা ট্রাইগ্লিসারাইডস বেশি থাকে কিংবা রোগীর ডায়াবিটিস থাকে (শতকরা ৫০ ভাগ ডায়াবিটিস-রোগীর ব্লাডপ্রেসারের সমস্যা দেখা যায়) তাহলে তো কথাই নেই! ঐ সূক্ষ্ম অন্তর্দেওয়ালে জমে ওঠে কোলেস্টেরল ও অন্যান্য ক্ষতিকারক বস্তু এবং ক্রমে তা বর্ধিত আকার ধারণ করে ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত করে। তার ওপর আবার রক্তের প্লেটলেট (platelet) বা অনুচক্রিকা জমে রক্তপ্রবাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে হার্ট অ্যাটাক ও তার সঙ্গে আরো মারাত্মক নানা জটিলতার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ধমনীর অন্তর্দেওয়ালে জমে

ওঠা ফলককে (plaque) বলা হয় 'অ্যাথেরোসক্লেরোটিক প্লাক' (atherosclerotic plaque) এবং ঐ অবস্থাকে বলে 'অ্যাথেরোসক্লেরোসিস' (atherosclerosis)। চিকিৎসার দ্বারা রক্তের উচ্চচাপ ভালভাবে আয়ত্তে আনা সত্ত্বেও যদি অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সঙ্ঘটনকারী গোষ্ঠীকে (atherogenic cluster) সুনিয়ন্ত্রিত না করা হয়, তাহলে কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই ক্ষতিকর গোষ্ঠীতে আছে কারা? ডায়াবিটিস, রক্তে বেশি কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডস, ধূমপান, মেদবাহুল্য—বিশেষ করে ঔদরিক চর্বির প্রবণতা, জীবনযাত্রায় শ্রমবিমুখতা ও বেশি সময় বসে থাকার অভ্যাস (sedentary life style) প্রভৃতি।

দেহে অ্যাথেরোসক্লেরোসিস প্রবণতার ঝোঁক (atherosclerotic phenotype) ও লক্ষণ

বংশগত প্রবণতা (genetic predisposition) অনেক ক্ষেত্রে এই অসুখে বেশ প্রকট দেখা যায় এবং এদের ঔদরিক চর্বিবহুল দেহে কটিরেখার মাপ ৯০ সেন্টিমিটারের বেশি হয়। কটিরেখা ও নিতম্বের অনুপাত (waist-hip ratio) থাকে ০.৮-এর বেশি। এদের ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থা (insulin resistant state) এবং সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবিটিস প্রতীয়মান নাও থাকতে পারে; এদের রক্তের উচ্চচাপ, রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডস প্রতি ডেসিলিটারে ১৫০ মিলিগ্রামের বেশি এবং HDL কোলেস্টেরলের ('Good' cholestrol) মান রক্তে প্রতি ডেসিলিটারে ৩৫ মিলিগ্রামেরও কম—এসমস্তই অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সঙ্ঘটনকারী বিপদজ্ঞাপক হেতুগুলির পরিচায়ক। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ঐ সামগ্রিক দেহমূর্তির (Phenotype) বর্ণনায় LDL কোলেস্টেরল বা 'ব্যাড' কোলেস্টেরলের কথা আলাদা করে বলা হয়নি। এই বাহ্যমূর্তি বা ফিনোটাইপ যাদের আছে, তাদের রক্তে LDL কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি নাও থাকতে পারে। অথচ আমরা জানি যে, LDL কোলেস্টেরল না থাকলে অ্যাথেরোসক্লেরোসিস হতে পারবে না। তাহলে ব্যাপারটা ঘটছে কিভাবে? ধমনীর অন্তর্দেওয়াল বা এন্ডোথিলিয়ামের স্বাভাবিক সুস্থতায় বিঘ্ন ঘটলে LDL কোলেস্টেরল সহজেই পরিবর্তিত হয়ে এন্ডোথিলিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। আবার ডায়াবিটিস থাকলে তার জন্য সুগার বাহুল্যের ফলে LDL কোলেস্টেরল গ্লাইকেটেড অবস্থাতেও রূপান্তরিত হয়। এই ধরনের অবস্থায় LDL কোলেস্টেরলের অণুগুলি আরো ক্ষুদ্র আকারের হয় ও তাদের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সেই অবস্থায় এন্ডোথিলিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করলে অ্যাথেরোস-ক্লেরোসিস ত্বরান্বিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টরা অর্থাৎ LDL কোলেস্টেরলের অক্সিডাইজ-এ যারা বাধাদান করে, তারা পরোক্ষভাবে শরীরের অনেক উপকারই করে।

অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট (antioxidants) কারা?

(১) HDL কোলেস্টেরল বা 'গুড' কোলেস্টেরলের আধিক্য অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের কাজ করে। এই কোলেস্টেরল প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ৪৫ মিলিগ্রাম বা তার বেশি থাকা ভাল। স্ত্রীলোকদের জন্য প্রতি ডেসিলিটারে আরো ১০ মিলিগ্রাম যোগ করতে হবে। রক্তে HDL কোলেস্টেরল যদি প্রতি ডেসিলিটারে ৬৫ মিলিগ্রাম বা তার বেশি থাকে তাহলে সেটিকে একটি 'নেগেটিভ রিস্ক ফ্যাক্টর' হিসাবে ধরা হয়। ওজন কমানো, পরিশ্রম করা, এরোবিক শরীরচর্চা (aerobic, dynamic exercises) যেমন জোরে হাঁটা, দৌড়ানো বা সাঁতারকাটা, ধূমপান বর্জন—এসবই HDL কোলেস্টেরল বাড়ানোর পক্ষে অনুকূল। ঔদরিক চর্বি যত কম হবে (খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ও শরীর সঞ্চালন করে) তত HDL কোলেস্টেরল বাড়বে, ট্রাইগ্লিসারাইডস কমবে এবং LDL কোলেস্টেরলের আকৃতি প্রকৃতিও স্বাভাবিক হতে পারবে। কণিকাগুলি তখন ক্ষুদ্র ও ঘন না হয়ে অপেক্ষাকৃত বড় ও হালকা ধরনের আকৃতিতে আসবে, যা আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

(২) খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে তাজা শাকসবজি, বিশেষ করে রঙিন সবজি যেমন রাঙা আলু, বীট, গাজর, টমাটো, লাল বা হলদে বড় লঙ্কা; ফলের মধ্যে আপেল, লাল আঙুর, ফুটি এবং সবরকমের বাদাম বিশেষ করে আখরোট (কাজুবাদাম নয়); উগ্রগন্ধী আনাজের মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন এবং পানীয়ের মধ্যে চা—এসবই ধমনীর অন্তর্দেওয়ালের এককোষী আস্তরণকে অ্যাথেরোসক্লেরোসিসের হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে।

(৩) শাকসবজি, ফলমূল ও আখরোট-জাতীয় বাদাম ছাড়াও প্রতিদিন ভিটামিন-E ৪০০ ইউনিট এবং ভিটামিন-C ৫০০ মিলিগ্রাম অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হিসাবে ভাল কাজ করে।

নাইট্রিক অক্সাইড কি করে?

সুস্থ অবস্থায় ধমনীর অন্তর্দেওয়াল বা এন্ডোথিলিয়াম নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে এবং তার পরিমাণ স্বাভাবিক থাকলে অ্যাথেরোসক্লেরোসিসের সূত্রপাতেই বাধা আসে। নাইট্রিক অক্সাইড কেবল যে ধমনীর প্রসারণ ঘটায় তাই নয়, স্বাভাবিক অবস্থায় এন্ডোথিলিয়ামের ওপর প্লেটলেট বা অনুচক্রিকাদের জমাট-বাঁধাও প্রতিহত করে এবং রক্তের শ্বেতকণিকাদের এন্ডোথিলিয়াম থেকে দূরে রাখে। এই বিশেষ ধরনের রক্তজাত শ্বেতকণিকাদের নাম মনোসাইটস (Monocytes)। এন্ডোথিলিয়ামের স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষুণ্ণ হলে নাইট্রিক অক্সাইডের বদলে ধমনী-সঙ্কোচনকারী 'এন্ডোথিলিন' নামক রস ক্ষরিত হয়। এতে ধমনী যে কেবল সঙ্কুচিত হয় তাই নয়, তখন মনোসাইটগুলিও অন্তর্দেওয়ালে আঠার মতো আটকে যায়। অনুচক্রিকারাও জড়ো হয়ে

এন্ডোথিলিয়ামের ওপর জমাট বাঁধার চেষ্টা করে। ধমনীর দেওয়ালের মসৃণ পেশীকোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এবং LDL কোলেস্টেরলের অক্সিডাইজড হওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়ে অ্যাথেরোসক্লেরোসিস হওয়া সহজতর করে তোলে। যথেষ্ট নাইট্রিক অক্সাইড থাকলে কিন্তু এসমস্ত সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভবপর নয়। এন্ডোথিলিয়ামের সুস্থতা বজায় থাকলে নাইট্রিক অক্সাইডের আনুকূল্যের অভাব হয় না, কিন্তু তা ব্যাহত হলেই নাইট্রিক অক্সাইডের ক্ষরণ সীমিত হয়ে পড়ে এবং বিপদের সৃষ্টি হয়। যেসমস্ত ক্ষতিকারক পারিপার্শ্বিক অবস্থা এন্ডোথিলিয়ামকে আহত করে তারা হলো উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল বৃদ্ধি—বিশেষ করে LDL কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি, ডায়াবিটিস, HDL কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ্রাস, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধূমপান (active or passive smoking), সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাধিক্য (over activity of the sympathetic nervous system)—যেমন দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের দেহমনে প্রতিফলন, রক্তে হোমেসিস্টেইনের আধিক্য এবং কতকগুলি জীবাণুজাত প্রদাহ (bacterial or viral inflammation of the arterial endothelium)।

অ্যাথেরোসক্লেরোটিক প্লাক ও তার ক্রমবিবর্তন

প্লাকগুলি জন্মায় এন্ডোথিলিয়ামের নিচে। তাদের ভিতরে থাকে কোলেস্টেরল, চারপাশে থাকে মনোসাইট কোষ—যারা অক্সিডাইজড LDL কোলেস্টেরল গিলে ফোলা 'ফোম কোষ'-এ (foam cells) পরিবর্তিত হয়। প্লাকটি উঁচু হয়ে ওঠে। প্লাকটির মাথা থাকে রক্তস্নাত দেওয়ালের দিকে এবং তা তন্তু দিয়ে আবৃত থাকে। প্লাকটির তন্তুজাত ঢাকনি (fibrous cap) যদি ফেটে বা ছিঁড়ে যায় তখন তার ওপর প্লেটলেট-সহ অন্যান্য অনেক রক্ত জমাট বাঁধানো প্রক্রিয়া (clotting factors) সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হার্ট অ্যাটাকের সূত্রপাত হয়। রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হলে প্রকৃত হার্ট অ্যাটাক হয় এবং আংশিকভাবে ব্যাহত হলে ঘন ঘন বুকের ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। আংশিক থেকে অবশ্যই পুরোপুরি হার্ট অ্যাটাক ঘটতে পারে যদি না শীঘ্র উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

কি কি কারণে প্লাকটি ভঙ্গুর হয়?

যদি প্লাকটির ভিতরে জমা কোলেস্টেরলের পরিমাণ খুব বেশি হয় এবং প্লাকটি অপেক্ষাকৃত নরম থাকে, যদি মনোসাইটদের সংখ্যা বেশি থাকে—যারা 'মেটালো-প্রোটিনেজেস' নামে এঞ্জাইম বা উৎসেচক ক্ষরণ করে, তাহলে তার প্রভাবে প্লাকটির ঢাকনির ধারগুলো ক্রমশ গলে গিয়ে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং তার ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সম্প্রতি জানা গেছে যে, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা প্লাকটি কত বড় তার ওপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ যে-প্লাকটি ধমনীর রক্তপ্রবাহ প্রায় শতকরা ৭০ বা ৯০ ভাগও সীমিত করেছে—কেবল সেই ধরনের প্লাকই যে হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সত্য নয়। যে-প্লাক থেকে হার্ট অ্যাটাকের সূত্রপাত হচ্ছে, শতকরা ৬০ ভাগ বা তারও বেশি সময় দেখা যাচ্ছে যে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, নরম ও ভঙ্গুর। এই প্লাক ছিঁড়ে বা ফেটে গিয়ে অনুচক্রিকাদের ও অন্যান্য রক্ত জমাট বাঁধানো প্রক্রিয়াগুলোর কর্মক্ষেত্র তৈরি করে এবং তার ওপর রক্ত জমাট বাঁধায় রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়ে হার্ট অ্যাটাকের পথ প্রশস্ত হয়। তাই বাইপাস সার্জারি করে বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে (যাতে রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি হয় এবং বুকের ব্যথার উপশম হয়) ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা দূর করা নাও যেতে পারে। কারণ, ঐ যেসব অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কোলেস্টেরলে ভরা ভঙ্গুর প্লাকের কথা বলা হলো (তাদের বাইপাস করার প্রয়োজনই হয় না), তাদের ওপর রক্ত জমে রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েই বেশির ভাগ হার্ট অ্যাটাক ঘটে। পুরনো বড় প্লাকগুলির ঢাকনি শক্ত তন্তু ও মসৃণ পেশীকোষ দিয়ে গঠিত; তাদের ভিতরে কোলেস্টেরলের ভাণ্ডার (cholesterol pool) হয় ছোট এবং ঐ প্রদাহকারী মনোসাইটদের সংখ্যাও থাকে কম। প্লাকগুলি অনেকসময় শক্ত ক্যালসিয়ামে আবৃত থাকে। তাই এরা সহজে ছেঁড়ে না এবং এদের ওপর অনুচক্রিকা-সহ অন্যান্য প্রক্রিয়া সহজে রক্ত জমাট বাঁধাতেও পারে না। এরা ক্ষতি করে এদের বড় আকৃতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী রক্তপ্রবাহ কমিয়ে বুকের ব্যথা বা হৃৎপেশীর কর্মক্ষমতার ক্রমাবনতি ঘটিয়ে (chronic ischemic heart disease)। এক্ষেত্রে স্ট্যাটিন-জাতীয় কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধগুলি খুব ভাল কাজ করে প্লাকের ভঙ্গুরতা কমিয়ে ও এন্ডোথিলিয়ামের অবস্থার উন্নতি করে। ফলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা এবং মৃত্যুর হার প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ভাগ হ্রাস পায়।

অ্যাসপিরিন প্লেটলেটদের বিরুদ্ধে কাজ করে, কোলেস্টেরলের চিকিৎসায় প্লাকের ভঙ্গুরতা হ্রাস পায় এবং ব্লাড প্রেসার ও ক্ষেত্রবিশেষ ডায়াবিটিস আয়ত্তে থাকলে প্লাক ছেঁড়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। বিভিন্ন গবেষকরা আজকাল দেখাচ্ছেন যে, অ্যাথেরোসক্লেরোসিস আংশিকভাবে জীবাণু বা ভাইরাস-জাত প্রদাহ থেকেও সঙ্ঘটিত হতে পারে। এইসব জীবাণুদের মধ্যে ক্ল্যামিডিয়া, সাইটোমেগালো ভাইরাস ও হিলিকোব্যাকটার উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসায় অ্যাথেরোসক্লেরোসিস আয়ত্তে আনা যাবে কিনা সেই নিয়ে আজকাল গবেষণা চলছে। যাই হোক, এযাবৎ সুপরীক্ষিত ও সময়োপযোগী চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্লাক ছেঁড়ার ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা আয়ত্তে আনা যেতে পারে। এন্ডোথিলিয়ামের সুস্থতা তখন ফিরে আসে এবং

যথারীতি মঙ্গলকারী নাইট্রিক অক্সাইড ক্ষরিত হয় ও অন্যান্য অনেক কিছুই স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে। অধুনা আরো দেখা যাচ্ছে যে, অ্যামিনো অ্যাসিড এল-আরজিনিন অন্তত ৯ গ্রাম করে রোজ ব্যবহার করলে তা এন্ডোথিলিয়াম থেকে নাইট্রিক অক্সাইড বেরোতে সাহায্য করে। যে-উৎসেচকটি এন্ডোথিলিয়াম থেকে ক্ষরিত হয়ে এল-আরজিনিন থেকে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে, তার নাম 'নাইট্রিক অক্সাইড সিন্থেজ'। যথেষ্ট পরিমাণে এল-আরজিনিন সরবরাহ করলে নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদন বেশি হয়। নানা ধরনের বাদামে, বিশেষ করে আখরোটে এল-আরজিনিন বেশি থাকে এবং তার জন্যই সম্ভবত করোনারি অসুখে বাদামের উপকারিতা দেখা যায়।

হোমোসিস্টেইন কি?

আমিষ বা প্রোটিন খাদ্যে থাকে অ্যামিনো অ্যাসিড মিথিয়োনিন। যাদের বংশগত খুবই বিরল অসুখ হোমো-সিস্টেইনিউরিয়া আছে, তারা শরীরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে মিথিয়োনিনকে ব্যবহার করতে পারে না। ফলে রক্তে জমে ওঠে হোমোসিস্টেইন। হোমোসিস্টেইন ধমনী ও শিরার অন্তর্দেওয়ালের ক্ষতি করে এবং তার ওপর রক্ত সহজেই জমাট বাঁধতে পারে। তাই এই ধরনের রোগী ধমনী ও শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধের ফলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদি অসুখে অকালে মৃত্যুবরণ করে। কোলেস্টেরল সমস্যা বা অন্যান্য সুপরিচিত অ্যাথেরোস-ক্লেরোসিসের হেতুগুলি (risk factors) সম্যক না থাকলেও কারো যদি হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হতে দেখা যায়, তখন অন্যান্য কারণের সঙ্গে হোমোসিস্টেইনের কথা ভাবতে হয়। আজকাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, কোলেস্টেরল সমস্যা একা ৫৫ শতাংশের মতো করোনারি রোগের কারণ। হোমোসিস্টেইন নাকি আরো ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে এককভাবে দায়ী। হোমোসিস্টিনিউরিয়ার কথা বাদ দিলেও যাদের শরীরে ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-B_{12} বা ভিটামিন-B_6 বা পিরিডক্সিন-এর অভাব থাকে তাদের রক্তে হোমোসিস্টেইনের পরিমাণ বাড়ে এবং তার জন্য করোনারি বা অন্যান্য ধমনীর অসুখ হতে পারে। আজকাল তাই বলা হচ্ছে, রক্তে মোট হোমোসিস্টেইনের পরিমাণ মাপতে এবং তা বেশি থাকলে ঐসব ভিটামিন দিয়ে চিকিৎসা করাতে। সুখের কথা যে, ফোলিক অ্যাসিড এবং অন্য দুটি পূর্বোক্ত ভিটামিন রক্তে হোমোসিস্টেইনের পরিমাণ সত্যিই কমায়, কিন্তু তার ফলে হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা কমে কিনা আজো তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। এর উত্তর পাওয়ার জন্য প্রচুর গবেষণা চলছে। তবে এইসব ভিটামিন শরীরের পক্ষে ভাল এবং যাদের পরিবারে অল্পবয়সে করোনারি বা স্ট্রোক হতে দেখা যায়, তাদের পক্ষে রক্তে হোমোসিস্টেইন মাপা সম্ভব না হলেও অন্যান্য চিকিৎসার সঙ্গে প্রত্যহ ভিটামিন-E ৪০০ ইউনিট, ভিটামিন-C ৫০০ মিলিগ্রাম এবং ফোলিক অ্যাসিড ৮০০ মাইক্রোগ্রাম বা ১ মিলিগ্রাম যোগ করা ভাল।

যেসব কারণে হোমোসিস্টেইনের আধিক্য দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে ধূমপান, মদ্যপান, বার্ধক্য, থাইরয়েড গ্রন্থির কর্মহ্রাস, দীর্ঘমেয়াদী কিডনীর অসুখ, ক্যান্সার ও তার জন্য নানা ধরনের কিমোথেরাপি ও বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্বফল উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই উপদেশ দিচ্ছেন যে, বার্ধক্যে রোজ ১ মিলিগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড, ১০০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন-B_{12} এবং ১০ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম ভিটামিন-B_6 সেবন করা বিধেয়।

করোনারি বা অন্যান্য ধমনীর অসুখের প্রতিরোধব্যবস্থা

দুই ধরনের মানুষের কথা এই প্রসঙ্গে ভাবতে হবে। প্রথম দলের মানুষ, যাদের করোনারি রোগ ধরা পড়েনি, তবে তা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি (আগে এবিষয়ে আলোচনা করলেও পুনরুল্লেখের প্রয়োজন আছে) —(১) যাদের পরিবারে হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস আছে, বিশেষ করে অল্প বা মধ্যবয়সে (৬০।৬৫ বছরের নিচে)। (২) যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবিটিস আছে। আজকাল জানা যাচ্ছে যে, রক্তে সুগারের পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদী সুচিকিৎসার দ্বারা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে পারলে ডায়াবিটিস রোগীদের ধমনীজাত অসুখ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায়। (৩) যাদের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি। ভারতীয়দের পক্ষে প্রতি ডেসিলিটারে ১৮০ মিলিগ্রামের বেশি থাকা বিপজ্জনক। প্রতি ডেসিলিটারে ১৫০ থেকে ১৭৯ মিলিগ্রাম থাকলে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন এবং ১৫০ মিলিগ্রামের নিচে থাকা অনেকটা নিরাপদ। 'গুড' কোলেস্টেরল বা HDL কোলেস্টেরল প্রতি ডেসিলিটারে ৩৫ মিলিগ্রামের যত ওপরে থাকে ততই মঙ্গল। ট্রাইগ্লিসারাইডস (মাপার জন্য ১২ ঘণ্টা উপবাসের প্রয়োজন) রক্তে প্রতি ডেসিলিটারে ১৫০ মিলিগ্রামের নিচে থাকাই বাঞ্ছনীয়। মোট কোলেস্টেরল বা HDL কোলেস্টেরল মাপার জন্য উপবাসের দরকার হয় না। কিন্তু রক্তে 'ব্যাড' কোলেস্টেরল বা LDL কোলেস্টেরল নির্ণয় করার জন্য ট্রাইগ্লিসারাইডসের পরিমাণ মাপতে হয়, তাই উপবাসের প্রয়োজন হয়। যাদের করোনারি অসুখের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, তাদের LDL কোলেস্টেরল প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ১২৫ মিলিগ্রাম বা তার নিচে রাখা যুক্তিযুক্ত। তার জন্য খাদ্যনিয়ন্ত্রণ এবং ব্যায়ামের সঙ্গে প্রয়োজন হলে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ সেবন করা দরকার। (৪) যারা ধূমপানে আসক্ত তাদের এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কেবল যারা ধূমপান করে তারাই নয়, যারা তাদের কাছাকাছি থেকে বিড়ি বা সিগারেটের ধোঁয়া মেশানো বাতাসে শ্বাস নেয়,

তাদের শরীরের পক্ষেও এটি ক্ষতিকর। দেখা গেছে, যেসব বাড়িতে বয়স্করা ধূমপান করে সেইসব বাড়ির ছেলেমেয়েদের রক্তে HDL কোলেস্টেরল প্রায় ১২ শতাংশ কম হয়। চিন্তার কথা সন্দেহ নেই। তাই কোন অজুহাতেই ধূমপানকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। ধূমপান ধমনীর এন্ডোথিলিয়ামের ক্ষতি করে, LDL কোলেস্টেরলকে অক্সিডাইজড অবস্থায় পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে অ্যাথেরোসক্লেরোসিসের পথ প্রশস্ত করে এবং রক্তের জমাট বাঁধার সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে দেয়। (৫) যাদের ঔদরিক চর্বির বাহুল্য আছে এবং কোমরের মাপ ৯০-৯৫ সেন্টিমিটারের বেশি, তাদের এই মাপ ৯০ সেন্টিমিটারের নিচে রাখাই ভাল। নিয়মিত হাঁটাচলা, খাদ্যের পরিমাণ সংযত করা অর্থাৎ খাদ্য-ক্যালোরি নিয়ন্ত্রিত খাবার খাওয়া, ডায়াবিটিস থাকলে তার সুষ্ঠু চিকিৎসা করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যায়াম করা ও মেদবাহুল্য আয়ত্তে আনা নিয়ে আজ পশ্চিম জগতে খুবই আন্দোলন চলছে।

এবার দ্বিতীয় দলের কথায় আসা যাক—যাদের করোনারির অসুখ পুরোপুরি ধরা পড়েছে, যেমন লক্ষণ রয়েছে বুকের ব্যথা ও তার সঙ্গে পরিবর্তনশীল ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম বা ইতিমধ্যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে অথবা বাইপাস অপারেশন বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়েছে, কিংবা যাদের দ্রুত চলাফেরা করলে পায়ের মাংসপেশীতে মোচড় লাগে (intermittent claudication) ও নিশ্চল অবস্থায় তার দ্রুত উপশম হয় অথবা যাদের স্ট্রোক হয়ে গেছে। এইসব মানুষদের ভবিষ্যতে যাতে করোনারী বা দেহের অন্যান্য ধমনীতে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ার ফলে রোগের পুনরাবৃত্তি না হয় (secondary prevention)—সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

বহু ধরনের গবেষণা আজ প্রমাণ করেছে যে, অ্যাথেরোসক্লেরোসিসের পূর্বোক্ত বিপদজ্ঞাপক হেতুগুলি—বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল সমস্যা সুষ্ঠুভাবে ও দীর্ঘমেয়াদে আয়ত্তে রাখলে করোনারি ও অন্যান্য ধমনীর অসুখ এবং তার জন্য হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা আনুষঙ্গিক শল্যচিকিৎসার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা শুধু কমায় না, এদের থেকে অকালমৃত্যুর হারও প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমে যায়। এর জন্য LDL কোলেস্টেরলকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও ওষুধের সাহায্যে প্রতি ডেসিলিটারে ১০০ মিলিগ্রাম বা তারও নিচে রাখা বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, সুচিকিৎসকের পরামর্শমত নিয়মিত রক্তপরীক্ষা ও যথাযথ ঔষধসেবন এবং সেইসঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এই প্রসঙ্গে কতগুলি ভুল ধারণা দুর করারও প্রয়োজন আছে। অনেকে মনে করেন, বাইপাস সার্জারি বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করে এবং তারপর আর কিছু সাবধানতার প্রয়োজন নেই! এমনকি কোলেস্টেরল বেশি থাকার জন্য চিকিৎসকের উপদেশ সত্ত্বেও অনেক তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ওষুধ খেতে আপত্তি করেন। অনেকবার শুনেছি যে, কোলেস্টেরলের পরিমাণ তেমন বেশি নয় আর সেটা কমানোর জন্য ওষুধ খেলে লিভার খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে—তাই তা না খাওয়াই ভাল! এঁদের অবগতির জন্য জোর দিয়ে বলতে হয় যে, আকস্মিক দুর্ঘটনার ভয়ে যদি কেউ যানবাহন ব্যবহার না করেন, তাহলে তাঁর সুবুদ্ধির অভাব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ২ শতাংশেরও কম দেখা গেছে স্ট্যাটিন-জাতীয় কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধের পার্শ্বফলস্বরূপ লিভারের বা শরীরের মাংসপেশীর গণ্ডগোল। তার ভয়ে যদি কেউ ঐ অত্যাবশ্যক ওষুধগুলি ব্যবহার না করে এবং কোলেস্টেরল সমস্যা আয়ত্তে রাখায় গাফিলতি করে বা ধূমপান চালিয়ে যায় কিংবা মেদবাহুল্যের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করে, তাহলে 'পুনর্মুষিক ভব' হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই বহুলাংশে থেকে যায়। বাইপাস বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বাড়াতে অন্য যেসব শল্যচিকিৎসার সুযোগ আজ হয়েছে তা সবই কিন্তু সময়োচিত বিধান (temporising measure)। এগুলি আসল সমস্যাটিকে অর্থাৎ অ্যাথেরোসক্লেরোসিসকে স্পর্শই করে না। সমস্যাটি যে আবার সময়মত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে বিপদ ঘটাবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই সক্রিয়ভাবে সুপরীক্ষিত প্রতিরোধব্যবস্থাগুলি দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করা উচিত।

পূর্বেই উল্লিখিত সুস্বাস্থ্য-প্রণালীগুলি অবলম্বনের সঙ্গে (তার বদলে নয়) যেসমস্ত ওষুধগুলি আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের তালিকার মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করা যাক :

অ্যাসপিরিন প্লেটলেটদের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়। প্রতিদিন ৮০ থেকে ৩২৫ মিলিগ্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। এনটেরিক কোটেড অ্যাসপিরিন পেটের গণ্ডগোল বা অম্লরোগ থাকলে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

বিটাব্লকার্স যেমন মেটোপ্রলল (৫০০-১০০ মিলিগ্রাম দিনে দুবার) অথবা এটেনলল (৫০-১০০ মিলিগ্রাম দিনে একবার অথবা তার কম-বেশি ব্যক্তি বিশেষে)—এরা হার্টের মিত্র-পর্যায়ের ওষুধ। হার্ট অ্যাটাক—বিশেষ করে তার পুনরাবৃত্তি, রক্তের উচ্চচাপ এবং হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা এতে হ্রাস পায়।

অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এঞ্জাইম ইনহিবিটার্স (ACEI) যেমন এনালাপ্রিল (২.৫-২০ মিলিগ্রাম দিনে দুবার), লাইসিনোপ্রিল (১০-২০, এমনকি ৪০ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার) ও ক্যাপটোপ্রিল (৬.২৫ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার) জাতীয় ওষুধ রক্তের উচ্চচাপ, ধমনীর

অ্যাথেরোসক্লেরোসিস ও হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ফেলিওর-জাত হার্টের দুরবস্থায় পরীক্ষিত সহায়ক।

স্ট্যাটিন-জাতীয় কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধগুলি—যেমন সিম্ভাস্ট্যাটিন (১০-৪০ মিলিগ্রাম রাত্রে), প্রাভাস্ট্যাটিন (২০-৬০ মিলিগ্রাম শোয়ার সময়) ইত্যাদি ধমনীর এন্ডোথিলিয়ামের সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

অন্যান্য ওষুধগুলির মধ্যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স—যেমন অ্যামলোডিপিন (৫-১০ মিলিগ্রাম দিনে একবার), ভেরাপ্যামিল (এস. আর. ৮০-৩৬০ মিলিগ্রাম দৈনিক) এবং ডিলটায়াজেম (সি.ডি. ১২০-৩৬০ মিলিগ্রাম দৈনিক) উল্লেখযোগ্য। এরা রক্তের উচ্চচাপ ও বুকের ব্যথা বিটাব্লকার্সের সঙ্গে বা এককভাবে অনেকসময় উপশম করতে সাহায্য করে। কিন্তু উপরি উক্ত ওষুধগুলির মতো এগুলি রোগের মূলে আঘাত করে দীর্ঘস্থায়ী উপকার সাধন করতে পারে কিনা জানা যায়নি।

নাইট্রেট-জাতীয় ওষুধগুলি, যেমন নাইট্রোগ্লিসারিন, আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট (২০-৪০ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার) বা আইসোসরবাইড মনোনাইট্রেট (২০-৪০ মিলিগ্রাম দিনে একবার)—এরাও ঐ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারদের মতো লক্ষণ উপশম করতে সাহায্য করে। এছাড়া ভিটামিন-E ও C, ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-B_{12} ও B_6 এবং এল-আরজিনিনের কথা আগেই বলা হয়েছে।

ওষুধের সংখ্যা অনেক হলেও 'যে-ঠাকুরের যে-ফুলে পূজা'—এই কথা মনে রেখে সেগুলির যথোপযুক্ত নিয়মিত ব্যবহার করাই শুভবুদ্ধির পরিচায়ক। রক্তের উচ্চচাপ ও অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সঙ্ঘটনকারী হেতুগোষ্ঠী আজ কিন্তু বহুলাংশেই নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষ। চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে, সবকিছু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নিয়ে ও ওয়াকিবহাল হয়ে চিকিৎসাপদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদে পালন করলে সুফলের আশা সুনিশ্চিত। এই প্রসঙ্গে এখানে LP (a) সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি। এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে ('কোলেস্টেরল ও করোনারিঃ আমাদের করণীয়', 'উদ্বোধন', ৯৮তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০৩) প্রকাশিত হয়েছে। আজও সন্দেহ রয়ে গেছে, LP (a) ও করোনারি অসুখের কার্যকারণ সম্পর্কের যথার্থ মূল্য নিয়ে। আরেকটি কথাও এই প্রসঙ্গে অবান্তর হবে না। নতুন চিকিৎসাব্যবস্থায় যাতে বিপদের সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্যই এই সতর্কবাণী। যারা নাইট্রেট-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করে, তা সে যে-ধরনের ওষুধই হোক না কেন, তাদের জন্য ধ্বজভঙ্গের নতুন ওষুধ সেলডেনাফিল বা ভায়াগ্রা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে সেবন করা উচিত। বেশ কয়েকটি অকালমৃত্যুর খবর ইতিমধ্যে আমাদের কাছে এসেছে। সেজন্য ওষুধটি নাইট্রেট-ব্যবহারকারীদের পক্ষে বর্জনীয় ভাবা উচিত। ❑

> **শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।**
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

'A Text of Book Homoeopathic Materia Medica Elaborated with Illustrations' গ্রন্থের লেখক, পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে দশ বছর অধ্যাপনা এবং ত্রিশ বছর চিকিৎসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা জানাতে ধারাবাহিক লিখছেন। তাঁর ধারণা, এতে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

❑ ভোরবেলা যত শীঘ্র সম্ভব শয্যাত্যাগ করে মুখ ধুয়ে (অথবা না ধুয়ে) কমপক্ষে তিন/চার গ্লাস শীতল জল পান করার অভ্যাস করা প্রয়োজন।

❑ শয্যাত্যাগের পর মলত্যাগ একটি ভাল অভ্যাস। তবে বেগ হলে মলত্যাগ করা উচিত। বেগ না হলে জোর দিয়ে মলত্যাগ না করাই বাঞ্ছনীয়। মলত্যাগের সময় কোঁত না দেওয়া উচিত। দাস্ত পরিষ্কার হলে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকে। মলত্যাগের সময়ে কোন ভাল ঘটনার স্মৃতি মনে আনার চেষ্টা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

❑ প্রত্যহ অন্তত আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা প্রাতর্ভ্রমণ করা খুব দরকার। প্রাতর্ভ্রমণের আগে দু-গ্লাস শীতল জল পান করলে ভাল। প্রাতর্ভ্রমণের সময় নিজের স্বাভাবিক গতিতে* হাঁটা উচিত। প্রাতর্ভ্রমণের সময় মনে সাংসারিক বা বৈষয়িক কোন চিন্তা না আনার চেষ্টা করতে হবে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ভ্রমণের সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করলে মন ভাল থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা ভ্রমণের অবকাশে গতদিনের পড়াশুনো মনে মনে মন্থন করার অভ্যাস করতে পারে।

❑ সকাল অথবা বিকালে সুবিধামতো হালকা ব্যায়াম করা প্রয়োজন। যাঁদের বয়স পঞ্চাশের বেশি তাঁদের ভারী ব্যায়াম না করাই উচিত।

---

* এবিষয়ে স্বাস্থ্যবিশারদদের মধ্যে অবশ্য মতদ্বৈধ আছে। কেউ কেউ দ্রুত হাঁটার পরামর্শ দেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রামকৃষ্ণ মিশনকে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' প্রদান

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শান্তি, ভ্রাতৃত্ব-বোধ প্রসার ও মানবসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালের ভারত সরকারের 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' পেল রামকৃষ্ণ মিশন। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ কলকাতার রাজভবনের 'থ্রোন রুম'-এ এক সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের হাতে এই পুরস্কার তুলে দিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ কোটি টাকা, তৎসহ একটি অভিজ্ঞান-পত্র এবং গান্ধীজীর প্রতিকৃতি-সম্বলিত একটি স্মারক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারায় বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৫ সাল থেকে এই পুরস্কারের প্রবর্তন করে। এবারই প্রথম কোন প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ পুরস্কারটি দেওয়া হলো। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ডঃ আর. ভি. বৈদ্যনাথ আয়ার। এরপর পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীকে মঞ্চে আসতে আহ্বান করা হয়। তিনি মঞ্চে এলে রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন তাঁর হাতে অভিজ্ঞানপত্র, গান্ধীজীর প্রতিকৃতি-সম্বলিত একটি স্মারক এবং ১ কোটি টাকার চেক তুলে দেন। এইসময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডঃ মুরলী মনোহর যোশী। তিনি গোটানো অভিজ্ঞানপত্রটি খুলে দর্শকদের দেখান। মঞ্চের ওপরেই রাষ্ট্রপতি অধ্যক্ষ মহারাজজীকে জানান, এই পুরস্কার তিনি মহারাজজীর হাতে তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ ও গর্ব বোধ করছেন। পনের মিনিটের মধ্যেই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

পুরস্কার-প্রদান পর্ব শেষ হতে পাশের ঘরে চা-পানের আসরে পূজ্যপাদ মহারাজজী, রাষ্ট্রপতি, সহাধ্যক্ষদ্বয়, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ যোশী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মিলিত হন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রামকৃষ্ণ মিশনের এই পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টিকে 'এক্সেলেন্ট' বলে মন্তব্য করে বলেন ঃ "অসাধারণ নির্বাচন। অত্যন্ত সময়োপযোগী। একেবারে আদর্শ সংস্থাই এই পুরস্কার পেয়েছে।"

'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে (বাঁদিক থেকে) শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ, রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন এবং ডঃ মুরলী মনোহর যোশী।

আলোকচিত্র ঃ সৌজন্যে 'বর্তমান'

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সকাল ১০টায়। পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজী, সহাধ্যক্ষদ্বয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ-সহ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রায় ৩০ জন সন্ন্যাসী, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এ. আর. কিদোয়াই, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী, ত্রিপুরার রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে হল-এ প্রবেশ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি আসন গ্রহণ করার পর পুলিস ব্যান্ডে বেজে ওঠে জাতীয় সঙ্গীতের সুর। জাতীয় সঙ্গীত শেষ হতেই রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রদত্ত অভিজ্ঞানপত্রটি পাঠ করে শোনান ভারত সরকারের

এদিন বেলুড় মঠে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের হাতে ৭০ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেন। ভারত সরকারের প্রতিশ্রুত ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার এটি প্রথম কিস্তি। উত্তর কলকাতার সিমলায় রামকৃষ্ণ মিশন অধিগৃহীত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটার সংস্কারের কাজে এই অর্থ ব্যবহৃত হবে। □

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-কথা

শান্তি সিংহ

চিকিৎসা বিধানে তন্ত্রশাস্ত্র (তৃতীয় খণ্ড)—আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ। প্রকাশক : এইচ. রায়চৌধুরী। প্রাচী পাবলিকেশন্স, ৩/৪ হেয়ার স্ট্রীট, কলকাতা-১। পৃষ্ঠা : ১২+১৭৬। মূল্য : ৫০ টাকা।

প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আচার্য চরক, সুশ্রুত প্রমুখের লোকমান্যতা আজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্বজন-বন্দিত। সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য মাধব কর 'রুগ্বিনিশ্চয়ঃ' গ্রন্থে প্রায় ষাট হাজার রোগের কথা বলেছেন। একাদশ শতাব্দীতে আচার্য চক্রপাণি দত্ত 'চক্রদত্ত-সংগ্রহ' নামে আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী কালে কবিরাজ বঙ্গ সেন, শিবদাস সেন প্রমুখের লোকমান্যতার সঙ্গে আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রীর নামও সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হয়। জন্মসূত্রে বাঁকুড়ার শ্রুতকীর্তি এই মানুষটি কাশীধামে নিরলস চিত্তে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ মনীষীর কাছে সাংখ্য-বেদান্ত-ব্যাকরণ-পুরাণ পাঠের সঙ্গে বিশিষ্ট আয়ুর্বেদাচার্যদের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পাঠ নিয়েছিলেন।

আধুনিক জীবনের বিচিত্রমুখী জটিল উদ্ব্যস্ততায় আমরা সুস্থ থাকার জন্য কী খাব, কী না-খাব সেই ভাবনায় অস্থির। কোন্ রোগের কী চিকিৎসা তাই নিয়েও বিব্রত। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর আলোচ্য গ্রন্থের সাঁইত্রিশটি অধ্যায়ে নরনারীর বিচিত্র রোগের লক্ষণ এবং তার সুচিকিৎসার পথ্যাপথ্য নির্দেশ করেছেন। লেখকের মনীষার সঙ্গে সুদীর্ঘকালের চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা যুক্ত হওয়ায় তাঁর **'চিকিৎসা বিধানে তন্ত্রশাস্ত্র'** রচনা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হবে।

বর্তমানে আয়ুর্বেদ বা কবিরাজী চিকিৎসা আবার জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। গাছ-গাছড়া বা লতাপাতা থেকে তৈরি ওষুধ এবং তন্ত্র-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত রোগলক্ষণ ও নিরাময়ের বিধান আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এই পদ্ধতি ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি এবং চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করলে সুফল সুনিশ্চিত। উপরন্তু, এতে কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। গ্রন্থটি যে প্রামাণিক সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এমন ধরনের গ্রন্থ বাজারে খুব বেশি নেই।

আমেরিকার গাইড বুক

সুকান্ত বসু

লিঙ্কনের দেশে—গৌরীশ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : গৌরীশ মুখোপাধ্যায়। মধুমিতা প্রকাশন, ৪/এইচ-২/১৩৩ হো চি মিন সরণী, কলকাতা-৬১। পৃষ্ঠা : ১৩০। মূল্য : ৬০ টাকা।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, সঞ্চয় করেছেন যে দুর্লভ অভিজ্ঞতা—সেসবের ভিত্তিতেই **'লিঙ্কনের দেশে'** গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করেছেন গৌরীশ মুখোপাধ্যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে আমেরিকা ভ্রমণের এক মূল্যবান গাইড বুক। এটি ভ্রমণপিপাসু সাহিত্য রসিকদের যেমন ভাল লাগবে, তেমনি ভাল লাগবে যাঁরা ইতিহাসকে জানতে, বুঝতে ও চর্চা করতে চান। এককথায় গ্রন্থটি জুড়ে রয়েছে ইতিহাস ও সাহিত্যের পাশাপাশি সহাবস্থান। এপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর নিজের ইতিহাস-সংক্রান্ত রচনাবলীকে সাহিত্যকর্মই বলেছেন। তাই সেদিক থেকে গৌরীশবাবুর এই গ্রন্থ সম্পর্কে এমন বক্তব্য করা মোটেই ভুল হবে না।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, গ্রন্থটি কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং অনুসন্ধিৎসু মনের ফল। বিষয়বস্তুর প্রতি গভীর ভালবাসা ও সর্বোপরি ঐতিহাসিক কৌতূহল মোচনের লক্ষ্যেই এই ভ্রমণ-রচনায় লেখক উদ্যোগী হয়েছেন।

এবারে আসা যাক গ্রন্থের বিষয়বস্তুর কথায়। লেখক 'আটলান্টায় দুর্গাপূজা'র বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্যের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি আমেরিকার বিভিন্ন নগরগুলিতে কোন্ মনোভাব থেকে প্রবাসী বাঙালীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন তার বিবরণ যেমন দিয়েছেন, অন্যদিকে তিনি দেখিয়েছেন এ-পূজায় কিভাবে আমেরিকানরাও আনন্দের বর্ণচ্ছটায় নিজেদের রঙিন করে তোলেন। কিন্তু লেখক এই লেখায় বহু তথ্যের মাঝে ছোট এই তথ্যটি দিলে বোধহয় ভাল হতো। সেটি হলো—আমেরিকায় প্রথম দুর্গাপূজা হয় ১৯৭৩ সালে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শোলার প্রতিমা নিয়ে গিয়ে এই পূজা হয়। প্রতিমার শিল্পী ছিলেন অনন্ত মালাকার। পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন 'ইস্ট কোস্ট দুর্গাপূজা ফেস্টিভ্যাল কমিটি'। নানান বছরে অনন্তবাবুর তৈরি মূর্তি গেছে নিউ ইয়র্ক,

নিউ জার্সি, টরন্টো, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি নগরগুলিতে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'ছোটদের সন্ত-উৎসব হ্যালোঈন'-এর উৎস সম্পর্কে অধ্যাপক বিল যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন, তা লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, যা ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগবে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'নক্সভিল-এর পথে' লেখায় লেখক উল্লেখ করেছেন উত্তর আমেরিকার প্রাচীন তাল্লুলা গিরিখাতের কথা, যার ভূতাত্ত্বিক বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে 'শিকাগোতীর্থে (১)'-এ আলোচিত হয়েছে বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও ক্রমাগ্রগতির ইতিবৃত্ত। নবম পরিচ্ছেদে 'শিকাগোতীর্থে (২)'-এ স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মমহাসম্মেলনে যে-ভবনে বক্তৃতা করেছিলেন সেই অ্যালারটন বিল্ডিং-এর গঠনশৈলী ও আমেরিকার আর্ট গ্যালারির বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন লেখক হাজির করেছেন কৌতূহলী পাঠকের কাছে।

এই ভ্রমণ-রচনায় স্থান পেয়েছে আমেরিকার 'শ্রম ও শ্রমিক সমস্যা', 'দি কিং সেন্টার', 'আটলান্টার হিন্দুমন্দির এবং ওয়ার্ল্ড ফরমার্স মার্কেট', 'ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়া', 'এথেন্স', আমেরিকার রাস্তা ও গাড়ি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। এছাড়া আটলান্টার এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সমরেন্দ্রনাথ মিত্র ও আমেরিকার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া'র প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ ডেভিড পোর্টার-এর সঙ্গে লেখকের দুটি দীর্ঘ খোলামেলা সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থে সন্নিহিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারদুটিতে উঠে এসেছে অনেক না-জানা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য।

৪৪ (খ) পাতায় 'Art Institute of Chicago'-র ড্রয়িংটি ছাপার ফলে পুস্তকটির মান ও গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে গেছে। কিন্তু ড্রয়িংটি কার তা জানা হলো না শিল্পীর নাম না থাকায়। সমগ্র পুস্তকটি জুড়ে রয়েছে মোট ৪২টি সাদা-কালো ফটোগ্রাফ। এর মধ্যে ১১টি ফটোগ্রাফ ঝাপসা ও অস্পষ্ট। তবে কিছু কিছু ফটো সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, লেখক ফটোর তলায় আলোকচিত্রীর নাম উল্লেখ করেননি।

শ্রীমুখোপাধ্যায় এই লেখায় যে-গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রকাশকাল জানাননি। এই ধরনের 'ডকুমেন্টারি' গ্রন্থে 'নির্ঘন্ট' না থাকলে এব্যাপারে ভবিষ্যতে গবেষণাকারীরা অসুবিধায় পড়বেন।

গ্রন্থটির ছাপা ঝরঝরে। বাঁধাই উন্নতমানের। শিল্পী পূর্ণেন্দু রায়ের প্রচ্ছদ সুন্দর। লেখক বইপত্র ঘেঁটে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে যে-তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। পরিশেষে একথা বলতে পারি, যাঁরা পরিব্রাজক তাঁদের দেশভ্রমণ ও আবিষ্কারের ফলে আমরা যেমন অনেক না-জানা বিষয় জানতে পেরেছি, তেমনিভাবেই গৌরীশবাবুর এই রচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি গতিমুখর সৃষ্টির মর্মরহস্য। ❑

প্রাপ্তিস্বীকার

○ **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য : শ্রীরামকৃষ্ণ**—তারকনাথ ঘোষ। প্রকাশক : রাহুল সাহা, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা : ১৪+১৩১। মূল্য : ৪৫ টাকা।

○ **অমৃত কথামালা**—সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা। প্রকাশক : পশুপতি মাহাতো, বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র, ডিডি-৪৪ সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪। পৃষ্ঠা : ১০+৩৭। মূল্য : ১৮ টাকা।

○ **কে বলে ঈশ্বর নেই?**—মনোরঞ্জন চন্দ্র। প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা : ৮০। মূল্য : ২৫ টাকা।

○ **শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন**—তাপস বসু। প্রকাশিকা : আরতি চক্রবর্তী, ৩৭/৯ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। পৃষ্ঠা : ২০+৫৫৬। মূল্য : ১৫০ টাকা।

○ **বনের বেদান্ত ঘরে এলো**—পরশুরাম চক্রবর্তী। প্রকাশক : সি. রায়, টিচার্স বুক এজেন্সী, ১৩সি কলেজ রো, কলকাতা-৯। পৃষ্ঠা : ১০০। মূল্য : ৩২ টাকা।

○ **স্মৃতিপট**—হারাধন দত্ত, প্রিয়ব্রত দাঁ (সম্পাদক)। প্রকাশক : প্রণবচন্দ্র দাঁ, সেবাইত, শিবকৃষ্ণ দেবোত্তর এস্টেট, ১২ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো, কলকাতা-৭। পৃষ্ঠা : ১০১। মূল্য : অনুল্লিখিত।

○ **একান্নপীঠ**—পূর্বা সেনগুপ্ত। প্রকাশক : এস. এন. রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা : ১৭৪। মূল্য : ৬৫ টাকা।

○ **দুর্গা : রূপে রূপান্তরে**—পূর্বা সেনগুপ্ত। প্রকাশক : এস. এন. রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা : ১৩০। মূল্য : ৪০ টাকা।

○ **যা দেখেছি দুচোখ ভরে**—পুলককুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : মৈনাক প্রকাশন, ১৮১ আন্দুল রোড, হাওড়া-৭১১১০৩ পৃষ্ঠা : ১০১। মূল্য : ২০ টাকা।

○ **Meditation on Swami Vivekananda**—Swami Tathagatananda. Publisher: Miss Jeanne Genêt, Secretary, The Vedanta Society of New York, 34 West 71 Street, New York, N.Y. 10023. Page: 18+302. Price: Rs. 50.

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ৮ জানুয়ারি ১৯৯৯ স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৭তম জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সারাদিন ধরে হাজার হাজার ভক্তসমাগম হয়। দুপুরে প্রায় ২৩,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম অছি ও পরিচালন পর্ষদের সদস্য স্বামী প্রভানন্দজী।

ম্যাঙ্গালোর মিশন আশ্রমে (কর্নাটক) গত ৮ জানুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর নবপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং একটি পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন চেন্নাই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজী। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম অছি ও পরিচালন পর্ষদের সদস্য স্বামী আত্মারামানন্দ-সহ বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী এবং ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলকে দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ইছাপুর মঠ (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৯-১২ জানুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন আবৃত্তি, ক্যুইজ, বিতর্ক ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ২৭টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় দিন মঠ পরিচালিত কোচিং সেন্টারের ছাত্ররা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন অবলম্বনে একটি নাটক অভিনয় করে। চতুর্থ দিন বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বামীজীর বিষয়ে মঠাধ্যক্ষ স্বামী নির্লিপ্তানন্দ প্রমুখ আলোচনা করেন।

হায়দ্রাবাদ মঠ (অন্ধ্রপ্রদেশ) গত ৯, ১০ ও ১২ জানুয়ারি '৯৯ তিনদিন ধরে একটি যুবসম্মেলন পরিচালনা করে। সম্মেলনে প্রায় ১,০০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। ভাষণ দান করেন ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রমোদ মহাজন এবং নগর-উন্নয়ন মন্ত্রী বন্দারু দত্তাত্রেয়। এছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় যুবদিবস পালন

গত ১০ জানুয়ারি '৯৯ **রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (বেলুড় মঠ)**, বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে কল্যাণীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ-প্রাঙ্গণে মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবোধের বিকাশের লক্ষ্যে ধর্মসভা, যুবসম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। এতে সহযোগিতা করে ভারত সরকারের যুবকল্যাণ, ক্রীড়া ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। যুবসম্মেলনে ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলী পরিচালিত ছাত্রছাত্রীদের স্বামীজী-বিষয়ক প্রশ্নোত্তরপর্বটি খুবই আকর্ষণীয় হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত ছিলেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ, স্বামী ত্যাগরূপানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, ডঃ বিশ্বনাথ দাস, ডঃ দীপককুমার দত্ত, বিশ্বপতি দে, অমিয় চক্রবর্তী, রামনারায়ণ ঘোষ, অসিতবরণ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান-শেষে স্বামী সর্বগানন্দের ভক্তিগীতি ও প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তি উপস্থিত প্রায় ১,৫০০ বিবেকানন্দ-অনুরাগী শ্রোতাকে আনন্দ দান করে।

ভুবনেশ্বর মঠ (উড়িষ্যা) নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস, ১৬-১৮ জানুয়ারি সাধারণ উৎসব এবং ১৯ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন সারাদিনব্যাপী একটি যুবশিবির আয়োজিত হয়। এতে উড়িষ্যার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় ২০০ যুব-প্রতিনিধি যোগদান করে। শিবিরের আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ ও মানবসেবা'। এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীত, বক্তৃতা ও যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতাও। শিবিরের সূচনা করেন 'নালকো'-র ডায়রেক্টর কে. এল. মিশ্র এবং সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার এম. সি. সাহা। শিবিরে স্বাগত-ভাষণ দেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ।

গত ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারি '৯৯ তিনদিনব্যাপী সাধারণ উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় সারাদিনব্যাপী ভক্তসম্মেলন। এতে ৩০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। ১৯ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি; সকালে বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি; বিকালে ধর্মসভা এবং সন্ধ্যারতির পর রামনামসঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। চারদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দজী এবং বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরী মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দীনেশানন্দ, গজপতি মহারাজ দিব্যসিং দেব, 'সমাজ' সংবাদপত্রের সম্পাদিকা মনোরমা মহাপাত্র, অধ্যাপক গণেশ্বর মিশ্র, সুরেশচন্দ্র পণ্ডা (আই. এ. এস), রাজলক্ষ্মী মিএ, সাংবাদিক সৌরীবন্ধু কর প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত-ভাষণ দান এবং সমাপ্তিতে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ।

রামহরিপুর আশ্রম (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে গত ১২, ১৪, ১৫ ও ১৭ জানুয়ারি '৯৯ চারদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে যুবশিবিরের উদ্বোধন করেন বেলুড় মঠের স্বামী মুক্তিনাথানন্দ। শিবিরে স্থানীয় ২৮টি যুব-সঙ্ঘ ও বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ৩২৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করে। শিবিরের আলোচ্য বিষয় ছিল—'জাতির নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা'। যুব-প্রতিনিধিরা ভক্তিমূলক সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি পরিবেশন করে। প্রতিনিধিদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী মুক্তিনাথানন্দ। পরে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যে নিহিত আত্মশক্তির স্ফুরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা। তিনি স্বামীজীর "শ্রদ্ধাবান হও, বীর্যবান হও, আত্মজ্ঞান লাভ কর ও পরহিতে

জীবনপাত কর'' মহাবাণীর কথা উল্লেখ করে সকলকে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। এছাড়া ১৪ জানুয়ারি ছোটদের ক্যুইজ প্রতিযোগিতা; ১৫ জানুয়ারি সঙ্গীত, অঙ্কন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং ১৭ জানুয়ারি বড়দের ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের বিশেষ পুরস্কার এবং সকল প্রতিযোগীকে একটি করে 'মনীষীদের চোখে বিবেকানন্দ' ও 'বিবেকানন্দের ভারত-প্রত্যাবর্তন' পুস্তিকা উপহার দেওয়া হয়।

মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়ঃ আলং (অরুণাচল প্রদেশ), দিল্লী, জামতাড়া (বিহার), লিমডি (গুজরাট), মালদা (পশ্চিমবঙ্গ), নারাণপুর (মধ্যপ্রদেশ), পোরবন্দর (গুজরাট), পুরী মিশন আশ্রম (উড়িষ্যা) এবং রাঁচি স্যানাটোরিয়াম (বিহার)।

চক্ষু-চিকিৎসা শিবির

রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গলের পরিচালনায় গত ১৬-২১ অক্টোবর '৯৮ কামারপুকুরে ১৯৩ জন দুঃস্থ মানুষের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। গত ১৭ জানুয়ারি '৯৯ তাদের মধ্যে চশমা বিতরণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রাণ

বাগবাজার মঠ ও অদ্বৈত আশ্রমের মাধ্যমে কলকাতার নারকেলডাঙার খালপট্টী অঞ্চলের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১,৩০০ পরিবারের মধ্যে ছোট ছোট শিশু ও মায়েদের জন্য দুধ বিতরণ করা হয়। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারি তাদের জামাকাপড় ও বাসনপত্র দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

নরেন্দ্রপুর আশ্রম লোকশিক্ষা পরিষদ (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী, রানীনগর, লালগোলা প্রভৃতি অঞ্চলের বন্যাকবলিত ৩১,৬৪৩ পরিবারের মধ্যে ৭,০১৪টি শাড়ি, ৩,০০০ ধুতি, ৫,৩০১টি লুঙ্গি, ১৪,৩০৭ সেট শিশু পোশাক ও ৪,০৬০টি কম্বল বিতরণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ শৈত্যত্রাণ

রামহরিপুর আশ্রম বাঁকুড়া জেলার শহরজোড়া, বেলেশোলা, মুক্তাতোর প্রভৃতি ৪২টি গ্রামের ১,৫০০ গরিব মানুষের মধ্যে ৫০০ কম্বল, ৫০০ শাল, ৫০০ সোয়েটার ও ১০০ কিলোগ্রাম চাল বিতরণ করেছে।

শিকরা-কুলীনগ্রাম আশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) মাধ্যমে লালপল্লী ও অন্য ৩টি গ্রামের ১৮৮টি দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে ২০০ সোয়েটার ও ৩০টি কম্বল বিতরণ করেছে।

গঙ্গাসাগর মেলা চিকিৎসা-ত্রাণ

মনসাদ্বীপ আশ্রম (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান ও সরিষা আশ্রমের সহযোগিতায় ৪,৮৯৯ জন রোগীর চিকিৎসা করে এবং গরিব মানুষের মধ্যে ৬০টি কম্বল ও ২০টি পুরনো জামা-কাপড় বিতরণ করে। এছাড়া ১৯০ জন তীর্থযাত্রীকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে।

বিহার শৈত্যত্রাণ

রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ডুঙ্গি গ্রামের দুঃস্থ শিশুদের মধ্যে ৪৩৪টি সোয়েটার বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস (আমেরিকা)ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য দিন আলোচনা ছাড়া গত ১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড (আমেরিকা)ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় আলোচনা, প্রতি মঙ্গলবার 'দ্য গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' ও তিনটি বৃহস্পতিবার 'বেদান্তসারঃ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী শান্তরূপানন্দ। এছাড়া শিবচতুর্দশী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (আমেরিকা)ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা এবং তিনটি বুধবার 'গীতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রপন্নানন্দ। প্রতি বুধবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া শিবরাত্রি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালন করা হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা)ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতি রবি ও শনিবার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (আমেরিকা)ঃ তিনটি রবিবার ও চারটি বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা এবং দুটি শনিবার 'শিবানন্দ-বাণী' পাঠ ও আলোচনা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অফ নিউ ইয়র্ক (আমেরিকা)ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ। এছাড়া তিনি একটি শুক্রবার গীতা এবং একটি মঙ্গলবার 'দ্য গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ৩১ জানুয়ারি '৯৯ **শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের** জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দ।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি **ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের** ১৬৪তম জন্মতিথি পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

গৌহাটী শ্রীসারদা সঙ্ঘ (আসাম) গত ২৫-২৮ ডিসেম্বর '৯৮ তিনদিনব্যাপী কয়েকটি অধিবেশনের মাধ্যমে সঙ্ঘের ৩৫তম সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে ৩৫টি প্রাইভেট আশ্রম ও সঙ্ঘ থেকে ১৬১ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব পরিষদ (কলকাতা-৭০০০৩৩) গত ২৬ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতার স্মরণে একটি জনসভার আয়োজন করে পুরনো কলাবাগান বাজারে। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সোমাত্মানন্দ, প্রাক্তন পৌরপিতা প্রণব মুখার্জী, সমাজসেবী মাধবলাল মুখোপাধ্যায়, ভারোত্তোলক ভারতী দত্ত ও শিক্ষক গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিষদের সভাপতি প্রণবেশ চক্রবর্তী।

ঘাটাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৬ ডিসেম্বর '৯৮ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। সকালের সভায় ভাষণ দেন স্বামী অকল্মষানন্দ এবং সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এদিন দুপুরে প্রায় ৫,৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিন ২৭ ডিসেম্বর স্থানীয় বিদ্যাসাগর উচ্চবিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর মঞ্চ-এ সারাদিনব্যাপী একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও স্বামী অকল্মষানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাশ্রমের সম্পাদক অজিতকুমার সাঁতরা। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ করেন মিতা বসু কর্মকার, স্তোত্র আবৃত্তি করে অরুণার্ক ভট্টাচার্য এবং ভক্তিনৃত্য পরিবেশন করে কৌশিকী শেঠ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেবাশ্রমের সহ-সভাপতি জীবানন্দ ঘোষ।

কৃষ্ণনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৭ ডিসেম্বর '৯৮ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বেদ ও গীতা পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, 'কথামৃত', 'পুঁথি' ও 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বেদপাঠাদি করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ প্রমুখ। 'কথামৃত' থেকে সুজন দত্ত, 'মায়ের কথা' থেকে পদ্ম সরকার এবং 'পুঁথি' থেকে দেবশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শান্তি দত্ত, ইলা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা সেন প্রমুখ। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ এবং স্বামীজী বিষয়ে সুমিত দাশগুপ্ত ও রামতনু চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করেন।

ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৭ ডিসেম্বর '৯৮ একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। প্রায় ৭০০ যুব-প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ নিয়ে আলোচনা ছিল সম্মেলনের উদ্দেশ্য। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী অঘোরেশানন্দ, স্বামী ত্যাগরূপানন্দ ও মুকুল মুখার্জী। দুপুরে সকল প্রতিনিধিকে দ্বিপ্রাহরিক আহার এবং অনুষ্ঠান-শেষে একটি করে 'ভারতের নিবেদিতা' পুস্তিকা উপহার দেওয়া হয়। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী।

ভাঙ্গড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘে (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১লা জানুয়ারি '৯৯ ২১তম কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি, সানাইবাদন; সকালে 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, নগর পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, পদাবলী কীর্তন, চিত্রপ্রদর্শনী; বিকেলে গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা, হরবোলা এবং সন্ধ্যায় নাটক অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী প্রাণারামানন্দ এবং পদাবলী কীর্তন পরিবেশন করেন শচীনন্দন সরকার। হরবোলা ও গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে শিবব্রত মণ্ডল, সঞ্জয় মণ্ডল ও সম্প্রদায়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দ, স্বামী ঋতানন্দ ও স্বামী প্রাণারামানন্দ। সারাদিনব্যাপী উৎসবে ৩০,০০০ ভক্তকে বসিয়ে এবং ১২,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

উত্তর কলকাতার নাগভবনে (১৩৮ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬) গত ১লা জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ৯১তম 'কল্পতরু' উৎসবের আয়োজন করা হয়। 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, কীর্তন, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভা ছিল উৎসবের অনুষ্ঠিত বিষয়। সকালে মলয় সাহা ভক্তিগীতি, বিকালে নবনীতা চক্রবর্তী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং সন্ধ্যায় স্বামী সর্বগানন্দ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। সকালে কালীকীর্তন ও বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তন পরিবেশন করেন যথাক্রমে নিমাই কোনার এবং স্বদেশরঞ্জন দাস ও সম্প্রদায়। বিকালে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন নির্মাল্য বসু। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ধ্রুবরূপানন্দ, স্বামী প্রমুক্তানন্দ এবং স্বামী গোবিন্দানন্দ। অনুষ্ঠানে কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সমীরকুমার মুখার্জী, বিচারপতি পিনাকী ঘোষ ও কলকাতার শেরিফ ডাঃ আই. এস. রায় ছাড়া বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে গত ৩ জানুয়ারি সাধুসেবার আয়োজন করা হয়। এতে বেলুড় মঠ, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী, বলরাম-মন্দির, রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যান, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহু সাধু অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজু দাস ও সম্প্রদায়।

হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (রাউরকেলা, উড়িষ্যা) গত ১লা জানুয়ারি '৯৯ ভজন, ভক্তিগীতি, সঙ্কীর্তন, 'গীতা' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠাদির মাধ্যমে 'কল্পতরু' উৎসব পালন করে। 'গীতা' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে পাঠ করেন রহড়া বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ। এদিন দুপুরে উপস্থিত প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে ৩ জানুয়ারি এক ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনে 'কথামৃত' এবং 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী দিব্যানন্দ। 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন দেবযানী পাঠক। ভক্তিগীতি নিবেদন করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় ১৫০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর) গত ১লা জানুয়ারি '৯৯ 'কল্পতরু' উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠাদি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন জগত্তারণ আচার্য, সুভাষচন্দ্র মান্না প্রমুখ। সভাশেষে সকল ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গত ১০ জানুয়ারি 'জীবন গঠনে স্বামীজীর আদর্শ' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অকল্মষানন্দ। শিশুদের চরিত্র গঠনের উপযোগী আবৃত্তি, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, স্বামীজীর আদর্শে শিশু ও যুবকদের জীবন গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশে রত্নেশ্বর মান্না সেবাশ্রমে ৫,০০১ টাকা দান করেন।

বাগবাজার কল্পতরু সংস্থা (৫৩/৪ বোসপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩) গত ১লা ও ২রা জানুয়ারি 'কল্পতরু' উৎসবের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ধর্মালোচনা করেন স্বামী আত্মবোধানন্দ ও নচিকেতা ভরদ্বাজ, সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সারদা মাতৃসঙ্ঘ-এর শিল্পিবৃন্দ এবং আবৃত্তি করেন অধ্যাপক রাজা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিমাই ঘোষ। এই সংস্থার সদস্যরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু' গীতিনাট্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (বিহার) গত ১-৩ জানুয়ারি '৯৯ মোরাবাদি রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় 'কল্পতরু' উৎসবের আয়োজন করে। বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্যামল রায়। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও কল্পতরু উৎসব' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন মোরাবাদি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শশাঙ্কানন্দ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে (জেলা—মেদিনীপুর) গত ৩ জানুয়ারি '৯৯ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী সৎপ্রভানন্দ। সম্মেলনে 'লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে পাঠ করেন স্বামী অকল্মষানন্দ। 'শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ধ্রুবরূপানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সৌজন্যে 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেলা—নদীয়া) গত ৮ জানুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ তাপস বসু। সভায় স্বাগত ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ডঃ শতঞ্জীব রাহা। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বহু অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা উপস্থিত ছিলেন।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে (জেলা—হাওড়া) গত ৮ জানুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' এবং 'বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে প্রফুল্ল আচার্য ও ভবেশচন্দ্র বিশ্বাস। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সঙ্ঘের শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ৮০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

চাকদহ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (জেলা—নদীয়া) গত ৮ জানুয়ারি '৯৯ বিশেষ পূজা, হোম, ভজনাদি এবং দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করে। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩,৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি (কলকাতা-৭০০ ০৩৬) গত ৮ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথিতে মঙ্গলারতি, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও আলোচনাসভার আয়োজন করে। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দ।

কদমতলা শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির (জেলা—হাওড়া) গত ৯-১০ জানুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুশান্ত মুখোপাধ্যায়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। সভান্তে ভক্তিগীতি নিবেদন করেন শিখা কাঞ্জিলাল। পরদিন বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অচলপ্রাণা। আলোচনাশেষে পাঠমন্দিরের সদস্যারা 'তাপসী গোপালের মা' শ্রুতিনাট্য পরিবেশন করেন।

আড়িয়াদহ বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক চক্র (কলকাতা-৭০০ ০৫৭) গত ১০ জানুয়ারি '৯৯ বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ করেন নির্মল রায়চৌধুরী, স্বামীজী বিষয়ক স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অলোক চক্রবর্তী প্রমুখ। তারপর আয়োজিত আলোচনাসভায় 'বর্তমান সমাজে স্বামীজীর ভাবাদর্শ' বিষয়ে আলোচনা করেন সুনীল রুদ্র, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ১৪০ জন দুঃস্থ মানুষকে শীতের পোশাক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও চক্রের সম্পাদক প্রদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাসবাজার বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্র (জেলা—মেদিনীপুর) গত ১০ জানুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর জন্মতিথিতে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, কঠোপনিষদ্ ও স্বামীজীর জীবনী পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। কঠোপনিষদ্ পাঠ করেন শান্তিনাথ চক্রবর্তী। দুপুরের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী শশধরানন্দ ও ডাঃ কালীপদ চক্রবর্তী এবং সান্ধ্য ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ইষ্টানন্দ ও সুখেন্দুশেখর জানা। দুটি সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন যথাক্রমে পাঠচক্রের সম্পাদক নির্মল চট্টোপাধ্যায় ও কালীপদ মণ্ডল। এছাড়া অঙ্কন, মহাজীবন অবলম্বনে সাজো প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়।

চাকদহ বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (জেলা—নদীয়া) গত ১০ জানুয়ারি '৯৯ 'উদ্বোধন' পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ ও ডঃ তাপস বসু এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিরঞ্জনকুমার সাহা। ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিনে অর্গানাইজেশন একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পরিচালনা এবং স্থানীয় চাকদহ হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করে।

গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ (জেলা—

উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ জানুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর জন্মতিথিতে সঙ্ঘের নিজস্ব জমিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন লোপামুদ্রা রায়সরস্বতী, কার্তিক গায়েন ও মীরা বিশ্বাস। ধর্মসভায় স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দের পৌরোহিত্যে 'বর্তমান সমাজে স্বামীজীর ভাবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মুক্তানন্দ ও সঙ্ঘের সম্পাদক ভুবন রায়সরস্বতী এবং সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের সহ-সভাপতি হরিপদ দে। সভান্তে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন বলহরি বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ১০ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি ও সৎপ্রসঙ্গের মাধ্যমে দিবসব্যাপী ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরুণকুমার ঘোষ ও সম্প্রদায় এবং প্রধান আলোচক ছিলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সম্মেলনে ৪০০ ভক্ত যোগদান করেন।

পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (জেলা—হাওড়া) গত ১০ ও ১২ জানুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যুব-উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আবৃত্তি, অঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠিত বিষয় ছিল ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা। সভায় 'স্বামীজী ও বর্তমান যুবসমাজ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী অকল্মষানন্দ ও নির্মাল্য বসু এবং সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সুনীল মিত্র। 'ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তমলুকের গৈরিক গোষ্ঠী। দুদিনের অনুষ্ঠানে সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা।

খেপুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি আশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর) গত ১২ জানুয়ারি '৯৯ 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, বেদ ও 'চণ্ডী' পাঠ, পথ-পরিক্রমা, গীতি-আলেখ্য, ভজন, ধর্মসভা এবং অঙ্কন, আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অকল্মষানন্দ, বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী ঈশ্বরানন্দ, খেপুত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শীতলচন্দ্র মিদ্যা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। তাদের সকলকে একটি করে 'যুবনায়ক বিবেকানন্দ' পুস্তিকা এবং সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শীতের পোশাক বিতরণ করা হয়। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আশ্রমের সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশির। এদিন দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে খিচুড়ি-প্রসাদ পান।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ জানুয়ারি '৯৯ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, গল্প লেখা ও গল্প বলা প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এবং ধর্মসভার মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালন করে। অনুষ্ঠানে 'জাতীয় যুবদিবস'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং বৈকালিক ধর্মসভায় ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্ববিদানন্দ। তিনি পাঠচক্রের পাঠাগারটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পাঠচক্র পরিচালিত ফ্রি-কোচিং সেন্টারের ছাত্রদের মধ্যে কিছু শীতের পোশাক বিতরণ করা হয়।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (শক্তিগড়, জেলা—বর্ধমান) গত ১২ জানুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর জন্মদিনে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পরিচালনা করে। এদিন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে খাতা, কলম ও কম্বলাদি বিতরণ করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী **ক্ষীরোদচন্দ্র সান্যাল** গত ৯ ডিসেম্বর '৯৮ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের বহু কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় ৪০ বছর ধরে যুক্ত ছিলেন এবং প্রচুর অর্থসাহায্যও করেছেন। বিশেষত জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন মন্দির নির্মাণে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের পাঠক ও গ্রাহক ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবে তিনি একটি তাম্রপত্র উপহার পেয়েছিলেন। কৃতী ছাত্র ও আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমান-নিবাসিনী **সুজাতা চট্টোপাধ্যায়** গত ১১ ডিসেম্বর '৯৮ ৭৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি স্বামী অভয়ানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের স্নেহ ও আশীর্বাদ-ধন্যা ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ভাবাদর্শে তিনি আজীবন সেবামূলক কাজ করে গেছেন। নিঃস্বার্থপরতা, স্নেহপ্রবণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য পরিচিতজনেরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **কুমুদরঞ্জন নাথ** গত ১৬ ডিসেম্বর '৯৮ বেলা ১.৩০ মিনিটে গৌহাটীস্থ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। গৌহাটী রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহার এবং পরোপকারিতার জন্য পরিচিতজনের কাছে তিনি প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পাঁশকুড়া-নিবাসী **রামপদ মাইতি** গত ২২ ডিসেম্বর '৯৮ রাত ১১টায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। সেবামূলক কাজে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। সৎ, ভদ্র ও বিনয়ী স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্যা, বিরাটী-নিবাসিনী **সুষেণবালা ভৌমিক** গত ২৮ ডিসেম্বর '৯৮ সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ও সরল স্বভাবের ছিলেন। তাঁর পরলোকগত স্বামী সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক শ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, খড়্গপুর-নিবাসিনী **বাসন্তী সাহা** গত ১২ জানুয়ারি '৯৯ ভোর ৫.৩০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তিনি ছিলেন স্নেহশীলা, শিল্পানুরাগী ও ধর্মপ্রাণা। ❑

সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

অনেকেই অবগত আছেন যে, বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে রামহরিপুর গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রটি পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

এই আশ্রমের অনেক কাজের মধ্যে বিশেষ কাজ হলো শিক্ষাবিস্তার এবং এই ব্যাপারে এই অঞ্চলে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে বলে দাবি করতে পারে। আশ্রমের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রচুর সুনাম অর্জন করে চলেছে। প্রতি বছরের কার্যবিবরণী থেকে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণ তা অবগত আছেন।

সেই বিদ্যালয়ের বিশেষ করে চারকক্ষ-বিশিষ্ট একটি ঘর একেবারে ধ্বংসের মুখে। মাটির ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়ছে। ছাদের অবস্থা আরো করুণ। আমরা শঙ্কিত হয়ে আছি, কখন না ছাদের অংশ কিংবা দেওয়ালের কোন অংশে কোন ছাত্র বা শিক্ষকের ওপর ধসে পড়ে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সহৃদয় জনসাধারণের কাছে অর্থভিক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আবেদন রাখছি আপনাদের কাছে, যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করে এই আশ্রমটিকে বিপন্মুক্ত করুন। আমরা অতি সাধারণ একটি পরিকল্পনা করেছি, তাতে মাত্র ১২ লাখ টাকার দরকার।

আশা করছি, সহৃদয় জনসাধারণের আনুকূল্যে আমরা এই আশু বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারব।

চেক/ড্রাফট পাঠালে **'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'**—*এই নামে পাঠাতে হবে।* টাকা বা চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩

রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি বিনীত

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

১৬ মার্চ ১৯৯৯

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তার মৌলিকতা	৩.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য)	৪.০০
বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা	৫.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	৬.০০
এক নতুন মানুষ	৮.৫০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ	৯.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা	১৬.০০
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী	১৮.০০
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ	১৮.০০
শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম	২০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ	২০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ	৩০.০০
আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ	৫০.০০
যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ	৬৫.০০
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা (দু-খণ্ড)	৭০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণ (আলোকচিত্রে জীবনকথা)	১২০.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দু-খণ্ড)	১৫০.০০
বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ	১৯০.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড)	১৮০.০০
(দু-খণ্ড)	১৯৫.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (ছয় খণ্ড)	২৩০.০০

শ্রীমা সারদাদেবী

আমাদের মা	৪.০০
মমতাপ্রতিমা সারদা	৭.৫০
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা	১২.০০
শ্রীরামকৃষ্ণ-সহায়িকা মা সারদা	১৩.০০
শ্রীশ্রীসারদামহিমা	১৫.০০
শান্তিরূপিণী সারদা	১৭.০০
মাতৃসান্নিধ্যে	২০.০০
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা	২২.০০
যুগজননী সারদা	২৫.০০
শ্রীশ্রীমায়ের কথা	৬০.০০
শ্রীমা সারদা দেবী	৭০.০০
শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে (তিন খণ্ড)	৮৫.০০
শ্রীমা সারদাদেবী (আলোকচিত্রে জীবনকথা)	১২০.০০

স্বামী বিবেকানন্দ

সন্ন্যাসীর গীতি	২.০০
স্বামীজীর আহ্বান	৩.৩০
স্বামীজীর শিকাগো ভাষণ	৪.০০
পওহারীবাবা	৪.০০
মদীয় আচার্যদেব	৪.০০
হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা	৪.০০
ভারতের পুনর্গঠন	৫.০০
বেদান্তের আলোকে	৮.০০
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর	৮.০০
ধর্মবিজ্ঞান	৮.৫০
হিন্দুধর্ম	৯.০০
ভক্তিযোগ	৯.৫০
শতবর্ষের আলোয় স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-প্রত্যাবর্তন	১০.০০
স্বামীজীর ভারতপ্রেম	১০.০০
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম	১৫.০০
দেববাণী	১৫.০০
কর্মযোগ	১৭.০০
এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ	১৮.০০
রাজযোগ	২৭.০০
বাণী সঞ্চয়ন	২৮.০০
বেদান্ত : মুক্তির বাণী	৩০.০০
জ্ঞানযোগ	৩০.০০
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ	৩৭.০০
স্মৃতির আলোয় স্বামীজী	৪৭.০০
স্বামী বিবেকানন্দ (প্রমথনাথ বসু) (দুভাগে)	১০০.০০
পত্রাবলী	১৩৫.০০
স্বামী বিবেকানন্দ (আলোকচিত্রে জীবনকথা)	১৬০.০০
বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ	২০০.০০
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা	
সাধারণ বাঁধাই (প্রতি খণ্ড)	৪০.০০
সাধারণ বাঁধাই (সেট)	৪০০.০০
রেক্সিন বাঁধাই (সেট)	৫০০.০০

সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থাবলী

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা	৯.০০
বৈরাগ্যশতকম্	১২.০০
মুণ্ডকোপনিষদ্	২০.০০
কঠোপনিষদ্	৬০.০০
ব্রহ্মসূত্র	৬০.০০
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তিন খণ্ডে)	১৩৫.০০
বেদান্ত দর্শন (চার খণ্ডে)	৪৫০.০০

ধর্মপ্রসঙ্গ ও বিবিধ

ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকণা	১.৭৫
শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়	২.২০
বেদান্তের আলোকে খ্রীস্টের শৈলোপদেশ	৪.০০
দেবলোকের কথা	১৫.০০
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী	১৫.০০
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র	২৫.০০

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা

- রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত
- শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৫১০
- রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
- বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
- গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাঁটুরা
- বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নবব্যারাকপুর
- অলক পাল চৌধুরী, সঙ্কটাপল্লী, ঘোলা, সোদপুর
- ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র, নিমতলা
- ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
- মানিক ঘোষ
  শিবালয়, পোঃ আদিকাশিমপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ২৪৮
- বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম
  বলাই মণ্ডল সরণী, মধ্যমগ্রাম চৌমাথা, সোদপুর রোড
  পোঃ মধ্যমগ্রাম, পিন ঃ ৭৪৩ ২৭৫
- স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন ঃ ৭৪৩ ৪৩৫
- হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা ঃ বীজপুর
- পান্নালাল ব্যানার্জী, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী, পিন ঃ ৭৪৩ ১৬৫
- শ্রীভাস্করাচার্য (ডঃ পরিতোষ মিত্র), 'জীবনদীপ'
  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, পোঃ সোদপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ১৭৮
- কথাশিল্প, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন ঃ ৫৫-৬৯৪/৭২৫
- বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  চাকদহ রোড 'ট' বাজার, বনগ্রাম, পিন ঃ ৭৪৩ ২৩৫

জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড়
- হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৯৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২
- রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির
  গ্রাম ঃ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৮৪
- জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২
- শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন ঃ ৭৪৩ ৩৩০, ফোন ঃ ৯১১৮-৬০৪৫০
- শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল, প্রযত্নে কৃষ্ণগোপাল নস্কর
  গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত
  পিন ঃ ৭৪৩ ৩৭২
- শতদল সাধুখাঁ
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- বিভূতিভূষণ ঘরামি
  প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৬০৩

জেলা ঃ হুগলী

- রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম
  ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন ঃ ৭১২২৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ
  গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন ঃ ৭১২ ৩০৫
- তপন চট্টোপাধ্যায়
  পুরোহিত, হংসেশ্বরী-মন্দির, বাঁশবেড়িয়া, পিন ঃ ৭১২ ৫০২
- মোহিতকুমার বর্মণ
  সম্পাদক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  বিদ্যুৎপল্লী, সিঙ্গুর, পিন ঃ ৭১২ ৪০৯, ফোন ঃ ৬৩০-০৪৩৯
- মনীষা নন্দী, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন ঃ ৭১১ ২২৪
- সুশান্ত মাইতি
  প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (কামাক্ষাতলা),
  মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর
  পিন ঃ ৭১২ ৪০৯, ফোন ঃ ৬৩০-০৭০৯
- হরনারায়ণ বিশ্বাস
  ৫ রাজেন্দ্র অ্যাভেনিউ প্রথম লেন
  উত্তরপাড়া, পিন ঃ ৭১২ ২৫৮
- শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ, প্রযত্নে বরুণ চক্রবর্তী
  গ্রাম ঃ বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী কেন্দ্র, পিন ঃ ৭১২ ৫০২

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

"নিয়মিত তিল তিল
করিলে সঞ্চয়
ভবিষ্যৎ সুখের হবে
জানিবে নিশ্চয়।"

Peerless Group

UDBODHAN
Phone : 554-2248
554-2403

Vol. 101 ◻ No. 3 ◻ MARCH 1999

Licence No.
WB/NC/CL-3

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Reg. No. WB/N(19

উদ্বোধন

১০১তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

◻ উদ্বোধন এবার ১০১তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০০ বছর অতিক্রম এই প্রথম ◻

◻ **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

◻ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

◻ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি পারিবারিক পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

◻ **উদ্বোধন** বাঙলা ভাষায় শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, **উদ্বোধন** সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।

◻ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। **উদ্বোধন** তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র শতবর্ষ ধরে অটুট রেখেছে।

◻ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

◻ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন** শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর।

◻ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে **উদ্বোধন** যেন থাকে। **উদ্বোধন**-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন**-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।

◻ স্বামীজী বলেছেন, **উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা**। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন**-এর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন—এই আশা রাখি।

◻ **উদ্বোধন**-এর শারদীয় সংখ্যাটি আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ এবং বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না। শারদীয়া সংখ্যার জন্য গ্রাহক-পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়ায় গ্রাহকমূল্যের প্রায় আড়াই গুণ। এই ঘাটতির জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাগণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।

◻ **উদ্বোধন** পত্রিকার সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। শেষের দুটি তহবিলের অর্থানুকূল্যে ১০১তম বর্ষ থেকে 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা চিহ্নিত হচ্ছে। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'— এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** চিঠিতে বা M.O. কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি দান পাঠালে 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য' অথবা 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য' পাঠানো হচ্ছে **সেই মর্মে দাতার চিঠি থাকা বাঞ্ছনীয়।**

◻ **'উদ্বোধন'-এর শতাব্দী জয়ন্তী** উপলক্ষ্যে মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষ থেকে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' সম্প্রতি নিবেদিত হয়েছে। **১৯৯৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন স্থানাধিকারী 'উদ্বোধন'-প্রবর্তিত এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।**

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

১৪০৬ □ ৪র্থ সংখ্যা

উদ্বোধন

।। ১০১ ।।

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত

বিবেকানন্দ ইল্লম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

বিবেকানন্দ ইল্লম একটি পবিত্র ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই ভবনটি একটি তীর্থক্ষেত্র। স্বামীজী পূর্ণ নয়দিন এখানে অবস্থান করেছেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, উপদেশ দান করেছেন, ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেছেন। তাঁর অদৃশ্য, দিব্য উপস্থিতিতে স্থানটি এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে, শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী চেন্নাইয়ের এই বাংলোয় উঠেছিলেন। তখন বাড়িটির নাম ছিল 'আইস হাউস' বা 'ক্যাসল কার্নন'। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় ভারতের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে তেজোদীপ্ত বাণী প্রদান করেছিলেন তা ইংরেজীতে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বা বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা, আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে এই বাড়িটিতেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত স্বামীজীর বাণীর ঐতিহাসিক পীঠভূমি।

আমরা এখানে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে চাইছি, যেখানে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত হবে। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্রসমূহ, অন্যান্য সুন্দর চিত্র, মডেল, ভিডিওগ্রাফ, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রাণপ্রদ বাণীর প্রচারকেন্দ্র-রূপে এই বাড়িটিকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করছি।

১৮৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই বাড়িটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই পবিত্র কাজটি শুরু করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে এবং স্বামীজীর সকল অনুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের উদার দাক্ষিণ্যে আমরা এই মহান কাজ সম্পন্ন করার আশা রাখি।

এবাবদ সমস্ত আর্থিক দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে দান পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯
ই. মেল : srkmath@vsnl.com
ওয়েবসাইট : www.sriramakrishnamath.org

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র

একশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে

দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০১তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ ১৪০৬ এপ্রিল ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ১৫৭

❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
তত্ত্ব ও প্রয়োগ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ১৫৮

❑ সঙ্কলন ❑
'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা—শ্রীম ১৬১

❑ ভাষণ ❑
শঙ্করাচার্য : জীবন ও সিদ্ধান্ত—স্বামী ভূতেশানন্দ ১৬২
জাতীয় পুনর্গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা—স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ১৬৭

❑ ধারাবাহিক প্রবন্ধ ❑
অবশেষে বেলুড়ে স্বামী রামকৃষ্ণ মঠ—স্বামী প্রভানন্দ ১৭১

❑ পরিক্রমা ❑
জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথ—স্বামী অচ্যুতানন্দ ১৮২

❑ সাহিত্য ❑
বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—শঙ্কর ঘোষ ১৭৬

❑ বিশেষ নিবন্ধ ❑
আমার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ—
শৈলজারঞ্জন মজুমদার ১৯২

❑ ক্রীড়াজগৎ ❑
বিশ্বকাপের ইতিহাস ও উপমহাদেশের ভূমিকা—
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮

❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ④—কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত ১৯১

❑ বিজ্ঞান ❑
চীনা চিকিৎসাপদ্ধতির বহুল প্রসারে জটিলতা—
রব প্যারি জোন্স ও আমান্ডা ভিনসেন্ট ১৯৯

❑ সুস্বাস্থ্য ❑
স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—সত্যানন্দ চক্রবর্তী ২০০

❑ পরমপদকমলে ❑
শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১৫৭

❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
উত্তেজনাবশত ভ্রম ১৭৯ লেখকের উত্তর ১৭৯
প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন' ১৭৯
'উদ্বোধন' : বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা—সম্পূরক তথ্য ১৮০

❑ কবিতা ❑
অনুভব—সাগরিকা শর্মা ১৮৬ মায়া—নিমাই মুখোপাধ্যায় ১৮৬
আছেন তিনি—শান্তিকুমার ঘোষ ১৮৬
এবার হারিয়ে যেতে চাই—সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায় ১৮৬
মুক্তি নেই—তারাশঙ্কর পাণিগ্রাহী ১৮৭
শুয়ে আছে দেশ—মনোজ খাটুয়া ১৮৭
শব্দের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে—মনোরঞ্জন চন্দ্র ১৮৭
শিকড়ে যাও—সুশান্ত বসু ১৮৭

❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
বিজ্ঞান-সংবাদ • হল্যান্ডের লোকেরা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় ২০১
জীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক-বিরোধিতা এখন ভীতিকর পর্যায়ে ২০১
গ্রন্থ-পরিচয় • মহাভারতের অমর কাহিনী—অমলেন্দু চক্রবর্তী ২০২
প্রাপ্তিস্বীকার ২০৩

❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ২০৪
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ২০৫ বিবিধ সংবাদ ২০৬

❑ অন্যান্য ❑
'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ১৭০
বেলুড় মঠস্থ বিবেকানন্দ বেদবিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি ১৭৫
আবেদন : স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা ১৭৮
'উদ্বোধন'-এ রচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ১৯৬

❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

ব্যবস্থাপক-সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র : অদ্বৈত আশ্রম

বর্তমান বর্ষের (১৪০৫-১৪০৬/১৯৯৯) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

অনুষ্ঠান-সূচী (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) ❑ ১৪০৬ / ১৯৯৯-২০০০

তিথি-কৃত্য

শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	৬ বৈশাখ	মঙ্গলবার	২০ এপ্রিল	১৯৯৯
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	১৬ বৈশাখ	শুক্রবার	৩০ এপ্রিল	„
গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	১১ শ্রাবণ	বুধবার	২৮ জুলাই	„
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২৩ শ্রাবণ	সোমবার	৯ আগস্ট	„
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৯ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	২৬ আগস্ট	„
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৬ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	২ সেপ্টেম্বর	„
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২২ ভাদ্র	বুধবার	৮ সেপ্টেম্বর	„
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১৬ আশ্বিন	রবিবার	৩ অক্টোবর	„
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২২ আশ্বিন	শনিবার	৯ অক্টোবর	„
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৪ অগ্রহায়ণ	শনিবার	২০ নভেম্বর	„
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	২২ নভেম্বর	„
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১ পৌষ	শুক্রবার	১৭ ডিসেম্বর	„
শ্রীযীশুখ্রীস্ট		৮ পৌষ	শুক্রবার	২৪ ডিসেম্বর	„
শ্রীমা সারদাদেবী	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৩ পৌষ	বুধবার	২৯ ডিসেম্বর	„
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১৭ পৌষ	রবিবার	২ জানুয়ারি	২০০০
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২৮ পৌষ	বৃহস্পতিবার	১৩ জানুয়ারি	„
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৬ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২০ জানুয়ারি	„
স্বামী বিবেকানন্দ	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৩ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২৭ জানুয়ারি	„
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২৪ মাঘ	সোমবার	৭ ফেব্রুয়ারি	„
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৬ মাঘ	বুধবার	৯ ফেব্রুয়ারি	„
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	৬ ফাল্গুন	শনিবার	১৯ ফেব্রুয়ারি	„
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২৪ ফাল্গুন	বুধবার	৮ মার্চ	„
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২৮ ফাল্গুন	রবিবার	১২ মার্চ	„
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	৬ চৈত্র	সোমবার	২০ মার্চ	„
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	১০ চৈত্র	শুক্রবার	২৪ মার্চ	„
শ্রীরামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	২৯ চৈত্র	বুধবার	১২ এপ্রিল	„

পূজা-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	৩০ বৈশাখ	শুক্রবার	১৪ মে	১৯৯৯
উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ	জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থী	২ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	১৭ জুন	„
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১৩ আষাঢ়	সোমবার	২৮ জুন	„
রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	২৯ আষাঢ়	বুধবার	১৪ জুলাই	„
মহালয়া	ভাদ্র অমাবস্যা	২২ আশ্বিন	শনিবার	৯ অক্টোবর	„
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২৯ আশ্বিন	শনিবার	১৬ অক্টোবর	„
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২১ কার্তিক	রবিবার	৭ নভেম্বর	„
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্তিক শুক্লা নবমী	১ অগ্রহায়ণ	বুধবার	১৭ নভেম্বর	„
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কার্তিক পূর্ণিমা	৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	২২ নভেম্বর	„
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৭ মাঘ	বৃহস্পতিবার	১০ ফেব্রুয়ারি	২০০০
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২০ ফাল্গুন	শনিবার	৪ মার্চ	„
শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা	চৈত্র শুক্লা অষ্টমী	২৮ চৈত্র	মঙ্গলবার	১১ এপ্রিল	„

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

বৈশাখ—	১২, ২৮ (এপ্রিল ২৬, মে ১২)	কার্তিক—	৪, ১৭ (অক্টোবর ২১, নভেম্বর ৩)
জ্যৈষ্ঠ—	১০, ২৬ (মে ২৫, জুন ১০)	অগ্রহায়ণ—	৩, ১৭ (নভেম্বর ১৯, ডিসেম্বর ৩)
আষাঢ়—	৯, ২৪ (জুন ২৪, জুলাই ৯)	পৌষ—	৩, ১৭ (ডিসেম্বর ১৯, জানুয়ারি ২)
শ্রাবণ—	৭, ২১ (জুলাই ২৪, আগস্ট ৭)	মাঘ—	৩, ১৮ (জানুয়ারি ১৭, ফেব্রুয়ারি ১)
ভাদ্র—	৫, ২০ (আগস্ট ২২, সেপ্টেম্বর ৬)	ফাল্গুন—	৩, ১৮ (ফেব্রুয়ারি ১৬, মার্চ ২)
আশ্বিন—	৪, ১৮ (সেপ্টেম্বর ২১, অক্টোবর ৫)	চৈত্র—	২, ১৭ (মার্চ ১৬, মার্চ ৩১)

বৈশাখ ১৪০৬
এপ্রিল ১৯৯৯

আচার্য শঙ্করের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে নিবেদিত

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ১

আমি মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত নই, কর্ণ ও জিহ্বা নই, নাসিকা ও চক্ষু নই, আকাশ ও ক্ষিতি নই, অগ্নি নই, বায়ুও নই; আমি জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ শিব, আমি শিব। ১

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ২

আমি পঞ্চপ্রাণ নই, পঞ্চবায়ু নই, সপ্তধাতু নই, পঞ্চকোষ নই, বাগিন্দ্রিয় হস্ত ও পাদ নই, জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বার নই; আমি জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ শিব, আমি শিব। ২

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ৩

আমার অনুরাগ ও বিরাগ নেই, আমার লোভ ও মোহ নেই, আমার অহঙ্কার ও মাৎসর্য নেই, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নেই; আমি চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব। ৩

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ৪

(আমার) পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদপাঠ ও যজ্ঞ নেই; আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্তা নই; আমি চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব। ৪

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ৫

আমার মৃত্যু, ভয় ও জাতিভেদ নেই, আমার পিতা, মাতা ও জন্ম নেই, আমার বন্ধু, মিত্র, গুরু ও শিষ্য নেই; আমি চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব। ৫

অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ৬

আমি নির্বিকল্প, নিরাকারস্বরূপ এবং সর্বব্যাপী বলে সর্বত্র বিদ্যমান, আমি ইন্দ্রিয়বর্গের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নই, আমি মুক্তি নই, জ্ঞেয়ও নই; আমি চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব। ৬

শ্রীশঙ্করাচার্য

তত্ত্ব ও প্রয়োগ ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভারতের চিরায়ত তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের কাছে নূতন দিশা দান করিয়াছেন। শুধু ভারতের চিরায়ত তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কেই নয়, সমগ্র জগতের সর্বকালের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কেও তাঁহারা এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। তত্ত্বকে ফলিত রূপদান করিতে হইবে, করা আবশ্যক—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই; কিন্তু প্রসঙ্গত একটি প্রশ্নেরও সম্মুখীন হইতে হয়। তাহা হইল ঃ অতীতে—সে-অতীত শতবর্ষের হউক, সহস্র বর্ষের হউক, কিংবা ততোধিক বর্ষের হউক না কেন—যে-তত্ত্ব বা আদর্শ প্রাসঙ্গিক ছিল, শত-সহস্র বর্ষ পরেও কি একই ভাবে, একই ভঙ্গিতে, একই আকারে তাহার অনুসরণযোগ্যতা বজায় থাকে অথবা থাকা সম্ভব? যুগ পালটায়, রুচি পালটায়, মানসিকতা পালটায়, মত পালটায়, চিন্তা পালটায়, দৃষ্টিভঙ্গি পালটায়, পরিপ্রেক্ষিত পালটায়, সমস্যার চরিত্র ও চেহারা পালটায়। পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন আদর্শকে আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করিতে যাইলে শুধু যে নূতনতর সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহা নয়, উহাতে পদে পদে হাস্যাস্পদ হওয়ারও সম্ভাবনা।

বৈদিক যুগে মানুষের অরণ্যভিত্তিক শান্তরসাস্পদ যে-জীবন ছিল সেই সহজ, সরল, অধ্যাত্ম-প্রধান জীবনকে বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে এবং একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। খোঁজার চেষ্টাও নিছক নির্বুদ্ধিতা। একশ বছর আগে মন্থর গোযান অথবা জলযান ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। বর্তমানে অবিশ্বাস্য দ্রুততার যুগে, এরোপ্লেন, স্যাটেলাইট, কেবল টিভি, ই. মেল, ফ্যাক্স, ইন্টারনেটের যুগে প্রাচীন সবকিছুই যেখানে প্রায়শই প্রশ্ন, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা ও বর্জনের সম্মুখীন, সেখানে কি কেহ প্রাচীন তত্ত্বকে প্রাচীন পন্থায় প্রয়োগের নীতিকে গ্রহণ করিতে আগ্রহী থাকিতে পারে? আমরা কি আবার বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের যুগে ফিরিয়া যাইব? বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিলাম, আমরা কি বিগত একশ বছর, কি দেড়শ বছরের পুরনো ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, তত্ত্ব-আদর্শকে জীবনে প্রয়োগে আগ্রহী? একশ বছর আগে পর্যন্ত যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ ছিল আমাদের সমাজে প্রচলিত আদর্শ। উহার অবশ্যই অনেক সুবিধা ছিল, আবার অসুবিধাও ছিল অনেক। কিন্তু অসুবিধা সত্ত্বেও উহার বাহিরে আসাকে তখন কেহই ভাল চোখে দেখিত না। উপরন্তু কেহ উহার বাহিরে আসিলে একটি অপরাধবোধের গ্লানি তাহাকে ঘিরিয়া রাখিত। কিন্তু এখন যৌথ পরিবারের আদর্শ প্রায় বর্জিতই বলা যায় এবং যৌথ পরিবার হইতে বাহির হইয়া স্বামী-স্ত্রী কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র পরিবারে চলিয়া আসার জন্য এখন আর কেহ কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা কোন অপরাধবোধেও আক্রান্ত হন না। বরং ছোট ছোট পরিবারই এখনকার 'চল'। উহাই এখন স্বাভাবিক। তাছাড়া, বর্তমানের আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষদের যৌথ পরিবারে বাস করা সম্ভবও নয়। আত্মতৃপ্তি ও আত্মসুখের পিছনে উদ্বাহু হইয়া ছুটিবার মানসিকতা এখন এতই প্রবল যে, পূর্বের যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের স্বার্থবিলয়ী আদর্শ আজ অচল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোথাও কোথাও কদাচিৎ দু-একটি যৌথ পরিবার এখনো টিকিয়া থাকিলেও উহা পূর্বের আদর্শের প্রায় কঙ্কালেই পরিণত এবং সেই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়, সেগুলিতে হয়তো-বা কোনক্রমে একই বাড়িতে 'বাস' হইলেও 'হাঁড়ি' বহু হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ উহা শুধু নামেই 'যৌথ', আসলে ভগ্ন। যৌথ পরিবারের প্রকৃত লক্ষ্যই সেখানে অন্তর্হিত। কিন্তু উপায়ই বা কী? যুগের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন শুধু স্বাভাবিকই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্যও।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি যে, তত্ত্বের প্রয়োগের প্রশ্নে আমরা কিছু মৌল সমস্যাকে অস্বীকার করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শকে ভারতের চিরায়ত আদর্শের প্রতিধ্বনি বলিলেও স্বামী বিবেকানন্দ ইহার মধ্যে কিছু সময়োপযোগী পরিবর্তন, সংযোজন, সংবর্জন করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সন্ন্যাসের সনাতন আদর্শ হইতে সরিয়া গিয়াছেন—শুধু এই প্রশ্ন ও অভিযোগ নয়, তিনি রামকৃষ্ণের আদর্শ হইতেও সরিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সম্পর্কে এই অভিযোগও উঠিয়াছে। এমনকি সংশয় উঠিয়াছে তাঁহার কোন কোন সন্ন্যাসী ও গৃহী গুরুভাইয়ের মনেও। শুধু যে মনেই উঠিয়াছিল তাহা নয়, কেহ কেহ এবিষয়ে সরাসরি তাঁহাকে সেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাইয়াও দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্বামী যোগানন্দ এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দের নাম উল্লেখ করিতে পারি। স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মনেও এই প্রশ্ন ও সংশয় ছিল। প্রশ্ন ও সংশয় ছিল কথামৃতকার শ্রীম-র মনেও। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবলীর গণপতি-লিপিকার শ্রীম তাঁহার প্রশ্নকে শুধু মনেই নিবদ্ধ রাখেন নাই, কখনো কখনো প্রকাশ্যে ভক্তদের কাছেও ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্য শোনা যায়, শ্রীশ্রীমায়ের কথায় পরে তাঁহার সংশয় দূর হইয়াছিল। প্রথম জীবনে স্বামীজীর কর্মাদর্শকে সমর্থন করেন নাই বলিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দও পরবর্তী জীবনে অনুশোচনা করিতেন। অন্যান্যরাও উপলব্ধি করিয়াছেন, স্বামীজীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

প্রশ্ন তাহা নয়, প্রশ্ন হইল আদর্শের রূপায়ণের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুসরণ সর্বদা সম্ভব এবং সমর্থনযোগ্য কি না? অথবা যুগপ্রয়োজনে, অবস্থার প্রয়োজনে, পরিস্থিতির দাবিতে

মূল ভাবকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া আদর্শের রূপায়ণে পরিবর্তন, সংযোজন, বর্জনের প্রয়োজন স্বীকার্য কিনা?

এবিষয়ে 'উদ্বোধন'-এর চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যায় (পৃঃ ১১৪) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম প্রবীণ ও বিদগ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী প্রভানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের নিজের কথায় ইহার যুক্তিযুক্ত উত্তর উপস্থাপন করিয়াছেন। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠে বিদ্যাচর্চার কর্মসূচীর মধ্যে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ও আলোকপ্রদ ছিল প্রশ্নোত্তরের আসর। এই আসরে অনেক সময় স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত থাকিতেন এবং প্রশ্নের উত্তর দান করিতেন। একদিন একজনের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, প্রকৃত আচার্যরা বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। তাঁহারা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করেন। ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি পরম্পরার গতিতে কখনো কখনো পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকে। স্বামীজী বলিলেন ঃ "যেমন একটি প্রবল নদীস্রোত প্রবাহিত হতে হতে নতুন এক খাতে বইতে থাকে। ফলে পুরনো স্রোতোধারা ক্রমে শুকিয়ে যায়। পরিণতিতে দেখা যায়, প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়সকল প্রাণহীনপ্রায় হয়ে পড়েছে এবং সে-স্থান পূরণের জন্য নতুন নতুন সম্প্রদায় প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে। স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই ঐ প্রাণবন্ত জীবনস্রোত যেসব সম্প্রদায়ের মাধ্যমে স্ফুরিত হয় তার সেবাতে আত্মনিয়োগ করে থাকেন।"

অর্থাৎ এই পরিবর্তন স্বাগত। দীর্ঘকাল ধরিয়া টিকিয়া থাকার সুবাদে প্রাচীন তত্ত্ব ও আদর্শের গায়ে স্বাভাবিক কারণেই যে-ক্লেদ জমা হইতে থাকে, যে-গ্লানি পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, যে-আবর্জনা জমিতে থাকে, উহার সংস্কার ও অপসারণ যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন উহার বা উহাদের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনের। আবার যে-আদর্শ বা যে-তত্ত্বকে একজন আচার্য যেভাবে তাঁহার জীবনে রূপায়িত করিয়াছেন ঠিক সেইভাবে তাহার অনুসরণ তাঁহার অনুগামীদের পক্ষে নিজেদের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য এবং সমকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নাও হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের কাম-কাঞ্চন ত্যাগের প্রসঙ্গটি আমরা আলোচনা করিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ কামকে নিঃশেষে বর্জন করিয়াছিলেন এবং কাঞ্চনকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেকথা আমরা সকলেই জানি। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া মুদ্রা ও মৃত্তিকাখণ্ডকে তুল্যজ্ঞানে তিনি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে মুদ্রা বা কাঞ্চন স্পর্শ করিতেন না, করিতে পারিতেন না। মুদ্রা বা কাঞ্চনের সংস্পর্শে তাঁহার শরীরে তীব্র প্রতিক্রিয়া হইত। সন্ন্যাসীর পক্ষে কাম-কাঞ্চন সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, তিনি বলিতেন। বস্তুত, উহাই সন্ন্যাসের কঠোর অনুশাসন। গৃহস্থ পুরুষদেরও তিনি কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কে বারংবার সতর্ক করিয়াছেন এবং 'কথামৃত'-পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। কিন্তু একমাত্র নাগমহাশয় ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের অপর কোন গৃহী পুরুষভক্ত কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শকে আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। পারা সম্ভবও ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা চাহেনও নাই। 'কথামৃত'-এ উল্লিখিত 'কামিনী-কাঞ্চন'-এর মূল তাৎপর্য যে 'কাম-কাঞ্চন', তাহা গুরুভাইদের নিকট তাঁহার পত্রে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক স্তবে স্বামীজী সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি যখন সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সমাজ ও মানুষের সেবায় নিয়োজিত হইতে নির্দেশ দান করিলেন তখন তিনি 'কথামৃত'-এ বারংবার উল্লিখিত 'কামিনী-কাঞ্চন' ত্যাগের আদর্শ হইতে এবং সনাতন হিন্দু সন্ন্যাসের ও আচার্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য হইতে সরিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন। একথা সত্য যে, সমাজের সেবায়, মানুষের সেবায় নিয়োজিত হইতে গিয়া পুরুষের সহিত নারীদেরও সংস্রবে এবং জনসাধারণ ও সরকার প্রদত্ত অর্থ ব্যবহার করিতে গিয়া কাঞ্চনের সংস্রবে আসিয়া সন্ন্যাসীরা বস্তুত এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াছেন। স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই 'অনর্থ' সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু স্বামীজীর নিজের কথায়, তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের তাঁহার প্রতি অটুট আনুগত্যে এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দ্ব্যর্থহীন সমর্থনে জগৎ দেখিয়াছে, বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ হইতে এবং সন্ন্যাসের ঐতিহ্য ও লক্ষ্য হইতে বিন্দুমাত্র সরিয়া আসেন নাই, তিনি শুধু উভয় আদর্শকে যুগোপযোগী করিয়াছেন। সন্ন্যাসকে আদ্যন্ত আধ্যাত্মিক 'নবযুগধর্ম'-এর আধুনিক মাধ্যম করিয়াছেন। শতবর্ষ-অতিক্রান্ত রামকৃষ্ণ মিশন কালের কষ্টিপাথরে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে—'নবযুগধর্ম'-প্রবর্তক যুগ-ঋষি বিবেকানন্দ ছিলেন অভ্রান্ত এবং তাঁহার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়ের জন্যই মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

পূর্বে উল্লিখিত প্রশ্নোত্তরের আসরে স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন ঃ "একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমরা কোন কোন পন্থা অবলম্বন করে থাকি। স্থান কাল ও ব্যক্তি-ভেদে পন্থা বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য চিরকালই অপরিবর্তিত থাকে। সন্ন্যাসী মাত্রেরই লক্ষ্য নিজের আত্যন্তিক মুক্তিলাভ ও জগতের কল্যাণসাধন এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে কাম ও কাঞ্চনের ত্যাগ। কিন্তু মনে রেখো, ত্যাগের অর্থ যাবতীয় স্বার্থপর অনুপ্রাণনার সার্বিক ত্যাগ; শুধুমাত্র বিষয়ের সঙ্গে বহির্যোগশূন্যতা নয়।...

" 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষাচর্যা অবলম্বন খুবই হিতকর। কিন্তু প্রব্রজ্যা, মাধুকরী বৃত্তি ইত্যাদি তখনি সহজসাধ্য ছিল যখন গৃহস্থগণ মনু ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকারগণের নির্দেশ সুচারুরূপে অনুশীলন করে প্রতিদিন নিজ নিজ অন্নের একাংশ সাধু-অতিথিদের জন্য ভিন্ন করে রাখত। এখন সমাজে বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছে।

বিশেষত বঙ্গদেশে মাধুকরী প্রায় অপ্রচলিত। বঙ্গদেশে বর্তমানে একজন সন্ন্যাসীর গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে আহার্য সংগ্রহের চেষ্টা অনর্থক শক্তিক্ষয় করা বৈ তো নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ভিক্ষাবৃত্তি ও মুদ্রাস্পর্শত্যাগের ব্রত অবলম্বন করে তোমরা কোন সুফল পাবে না। সন্ন্যাসীর মাধুকরী বৃত্তি সম্বন্ধে যেসব বিধান রয়েছে তা তার জীবনলক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায়মাত্র। বর্তমান অবস্থায় মাধুকরীর বিধিনিষেধ আঁকড়ে ধরে থাকা তোমাদের সন্ন্যাসের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একজন সন্ন্যাসীর প্রয়োজনীয় খাওয়া-পরার সুব্যবস্থা করে দিতে পারলে সে-সন্ন্যাসী তার জীবনলক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যই তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে পারবে। আরো কথা। উপায় বা পন্থার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে আমরা প্রায়ই চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকি। আমাদের সজাগ দৃষ্টি যেন সর্বদাই জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকে।"

তত্ত্ব ও আদর্শকে জীবনে প্রয়োগের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দুটি শাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে—শ্রুতি এবং স্মৃতি। 'শ্রুতি' অর্থাৎ সাধারণভাবে 'বেদ' এবং বিশেষভাবে 'বেদান্ত' —যেখানে হিন্দুদের শাশ্বত ও সনাতন তত্ত্ব বিধৃত, এবং 'স্মৃতি' অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্র—যেগুলিতে শ্রুতির আদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক অনুশাসন বিধৃত। শ্রুতির দ্বারা আমাদের জীবনলক্ষ্য নির্ধারিত আর স্মৃতির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য নিয়ন্ত্রিত। উভয় শাস্ত্রের সঙ্গেই ঋষিরা যুক্ত। শ্রুতি হইল সনাতন ও শাশ্বত জ্ঞান ও সত্যের অনন্ত ভাণ্ডার, যে-জ্ঞান ও সত্য ঋষিদের হৃদয়ে স্বত উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই উদ্ভাসিত সত্য বা জ্ঞানের ওপর সংশ্লিষ্ট ঋষি বা ঋষিবৃন্দ কোন মৌলিকতা বা রচয়িতৃত্ব দাবি করেন নাই। কারণ, উহারা একান্তভাবেই 'উদ্ভাসিত' ('Revealed')। আবার, অধিকাংশ স্থলেই শ্রুতির ঋষিদের নাম অজ্ঞাত। সেজন্য শ্রুতি এবং শ্রুতি-সত্যসমূহ 'অপৌরুষেয়' নামে খ্যাত। শ্রুতি-সত্য অপরিবর্তনীয়, তবে উহার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা স্বাগত। স্মৃতিগুলি শ্রুতি-সত্যের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দান করে। সেজন্য স্মৃতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। স্মৃতিকারগণও ঋষি অথবা ঋষিতুল্য ব্যক্তি, যেমন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রমুখ। কিন্তু স্মৃতি আমাদের সর্বপ্রধান শাস্ত্র নয়। স্মৃতির প্রামাণ্য শ্রুতির অধীন। স্মৃতির কোন অংশ শ্রুতির বিরোধী হইলে উহা পরিত্যাজ্য। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তন ঘটিলে স্মৃতির অনুশাসন পরিবর্তিত হইবে, ইহাই ঋষিদের বিধান। এই পরিবর্তন কখনোই মূল তত্ত্ব বা আদর্শ হইতে বিচ্যুতি নয়, বরং তত্ত্ব বা আদর্শের প্রায়োগিক প্রাসঙ্গিকতার সহায়ক। শ্রুতির সত্যকেই নিয়ম-বিধি-অনুশাসনের মাধ্যমে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন স্মৃতির ঋষিরা। আধুনিক যুগের মানুষের কাছে স্মৃতির বিধান ও অনুশাসনাবলী সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও রক্ষণশীল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু অনেক সময় সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা ও রক্ষণশীলতার বর্মের মধ্যে মূল শ্রুতি-সত্যসমূহ সংরক্ষিত হইয়াছে, ইহাও সত্য। বেদান্তের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি স্থূলভাবে অনেক সময় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পূজা, উপাসনা, বিগ্রহ, ব্রত, উপবাস, তীর্থভ্রমণ, এমনকি খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে রূপকাকারে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। এগুলি সমস্তই বেদান্ত হইতে স্মৃতির মাধ্যমে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রাত্যহিক বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানকে যদি সমাজদর্শন, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্বের আলোকে বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, উহাদের পিছনে যে মৌল ভাবরাশি রহিয়াছে তাহা শ্রুতি বা উপনিষদ্ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। শ্রুতির সত্য অপরিবর্তনীয়, কিন্তু স্মৃতির বিধান পরিবর্তনীয়। ফলে যুগে যুগে স্মৃতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আকার লাভ করিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ "একযুগের যে বিধান, অন্যযুগের তাহা নহে। যখন এযুগের পর অন্যযুগ আসিবে, তখন ঐগুলি আবার অন্য আকার ধারণ করিবে। মহামনা ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া নূতন দেশের ও কালের উপযোগী নূতন নূতন আচার প্রবর্তন করিবেন।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১০)

অর্থাৎ তত্ত্বের প্রয়োগের প্রশ্নে নীতি বা লক্ষ্যে নয়, কিন্তু আঙ্গিকে এবং উপস্থাপনে যুগোপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন, পরিমার্জন ও সংযোজন শুধু আবশ্যকই নয়, প্রত্যাশিতও। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বামীজীর বহু-আলোচিত 'গীতা ও ফুটবল' প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বামীজী মাদ্রাজে প্রদত্ত তাঁহার সুবিখ্যাত 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' ভাষণে বলিয়াছিলেন ঃ "তোতাপাখির মতো কথা বলা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ। দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমত সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরো নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক একথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, পায়ে কোথায় কাঁটা বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে।" (ঐ, পৃঃ ১৩৪)

স্বামীজী তাঁহার এই বক্তব্যে ভারতের সব নারী-পুরুষকে ফুটবল-মাঠে নামাইতে উৎসাহিত করিতেছেন না। বেদান্তের তত্ত্বকে প্রায়োগিক রূপ দিতে হইলে শারীরিক দৌর্বল্য, অলসতা, অসঙ্ঘবদ্ধতা ও আত্মস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে—এই কথাই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। এবং ইহা শ্রুতি-সত্যেরই যুগোপযোগী এক উপস্থাপন। ❑

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

একদিন একটি ছবিওয়ালা এসেছে। বাক্সের ভিতর ছবি। একটি আংটি সুতায় বাঁধা। আংটি ধরে টান দেয় আর বাক্সের ভিতর ছবিগুলি বদলাচ্ছে। ছেলেদের দেখায়। এক পয়সা করে নেয়। বাক্সের গায়ে দু-তিনটি গ্লাসের ডিবা। ছেলেরা এই গ্লাসের ভিতর দিয়ে বাক্সের ভিতরের ছবি দেখে, গ্লাসের গুণে ছবিগুলি বেশ বড় দেখায়। লোকটি বেশ গানের সুরে বলে। বলছেঃ 'এই এল কলকাতা শহর, এবার দেখ বোম্বাই নগর'। প্রত্যেকটি কথার পরে তাল ঠিক রাখার জন্য বলে—'হা'। যেমন বলছেঃ 'এই দেখ এবার এল রাজারানীর দরবার, হা'। এইরূপে নানা ছবি দেখাচ্ছে। হঠাৎ বললেঃ 'এবার কর দরশন বদরী নারায়ণ, হা।' ঠাকুরের বালকের স্বভাব। শুনেই কৌতূহলী হয়ে উঠে গিয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখেই একেবারে বেহুঁশ। ভাবসমাধিতে নিমগ্ন। কে আর দেখে তখন ছবি! ব্যুত্থিত হলে, লোকটিকে পয়সা দিতে বললেন। একজন এক আনা কি ছয় পয়সা দিল। ঠাকুর রেগে বললেনঃ "সে কি, বদরী নারায়ণ দর্শন করালে, তার দাম ছয় পয়সা! টাকা দিতে হয়।"

ঠাকুরের মন ঐতেই (ঈশ্বরে) চড়ে আছে রাতদিন। একটু উদ্দীপন হতেই সমাধি! যেন শুকনো দেশলাই। একটু ঘষলেই জ্বলে ওঠে ফস্ করে। যা দেখছেন, যা শুনছেন তাতেই উদ্দীপন। বাবা, কি মন! এমনটি আর দেখা যায় না। অন্য লোকের মন ভিজে দেশলাই। ঘষ, জ্বলবে না। জোর কর, কাঠি ভেঙে যাবে। ভোগেতে, কামিনীকাঞ্চনে মনকে ভিজিয়ে রাখে। ওটা ত্যাগ হলেই শুকনো হয়ে যায়। এই শুকনো করার উপায় ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ "সর্বদা সাধুসঙ্গ কর।" বলেছিলেনঃ "মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। যত সাধন-ভজন, সবই মন তৈরি করার চেষ্টা। একবার তৈরি হলে তখন বসে বসে আনন্দ কর। তখন বিপদই হোক কি সম্পদ, মনে আনন্দ থাকে। পাণ্ডবদের বনবাসেও আনন্দ ছিল।" (পৃঃ ৮৩)

ঠাকুর একদিন বলেছিলেনঃ "এখানে অন্য কেউ নাই। সব আপনা আপনি। বড় গুহ্য কথা। কারো শোক ভুলতে হলে তার দোষ সর্বদা মনে করবে। দোষ মনে করলে শোক কমে যাবে।" একজনের (শ্রীম-র পত্নীর) পুত্রশোক হয়েছে। শুনেছিলাম ঠাকুর তাকে বোঝাচ্ছেনঃ "ওগো, যে তোমার পুত্র হয়ে এসেছিল সে পূর্বজন্মে ছিল তোমার শত্রু। তাই তোমাকে জব্দ করতে এবার তোমার পেটে জন্ম নিয়েছে। ও তোমার মহাশত্রু।" (পৃঃ ১০৫)

ঠাকুরকে কালীঘরে ঢুকতে দেবে না দারোয়ান। ঠাকুর এক ঘুষি মেরে ঢুকে গেলেন। খাজাঞ্চি লিখল বাবুদের—ছোট ভটচাযমশাই কথা শোনেন না। মথুরবাবু বলে পাঠালেনঃ "ওঁকে কেউ কিছু বলো না।" (পৃঃ ১৫২)

ঠাকুর বলেছিলেন, একরকম শব্দ আছে। সে-শব্দ যোগীরা শোনেন। তার medium air নয়, ether-ও নয় (বাহক বায়ু নয়, সূক্ষ্ম বায়ুও নয়)। সে আবার এ-আকাশে নয়, চিদাকাশে। যোগীদের যোগ-কান, যোগ-চক্ষু হয়। তা দিয়ে যোগীরা ঐ শব্দ শুনতে পান গভীর রজনীতে। ঠাকুর পাগলের মতো দৌড়াতেন গঙ্গার পোস্তার ওপর—রাত তখন দুটো-তিনটে—ঐ শব্দ শুনে। অনাহত শব্দ এর নাম। অন্য পদার্থে আঘাত পেয়ে নয়, তাই অনাহত। এই শব্দ আকাশে আহত হয়ে হচ্ছে। ঐ শব্দ অমনি হচ্ছে। (পৃঃ ১৮৫)

ঠাকুর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতে বড়ই মানা করতেন। বলতেন, শ্রাদ্ধের অন্ন কিছুতেই খাওয়া উচিত নয়—বিশেষত আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন। খেলে মৃতব্যক্তির পাপের ভাগ নিতে হয়। ঐ অন্ন প্রেতকে দেয় কিনা, তাই অশুদ্ধ। যদি ভগবানের নামে নিবেদন করা হয়, তাহলে খাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা হলো অলৌকিক দৃষ্টিতে। আর লৌকিক দৃষ্টিতেও দেখ, কি নিষ্ঠুর কাজ এটা! লোকটা মরে গেছে। কোথায় শোক করবে, তা না করে অতগুলি পেটে দেওয়া! (পৃঃ ১০১)

ঠাকুর হয়তো কোন ভক্তের জন্য প্রসাদ রেখে দিলেন। তিনি আর এলেন না। তখন 'সোঽহম্' করে নিজেই খেয়ে ফেললেন।* (পৃঃ ২৮)

---

* একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীম এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি একদিন ঘরে একাকী বসে আছেন। স্বামী নিত্যাত্মানন্দকে ডেকে বললেনঃ "ঠাকুরবাড়ি থেকে অনেক ফল-মিষ্টি প্রসাদ এসেছে। সকলকেই দেওয়া হয়েছে। বাকি আছেন রজনী ও আপনি। এই ভাগটা আপনি এক্ষুণি মুখে দিয়ে ফেলুন। আর এটা রজনীবাবুকে দেবেন।" রজনীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন শ্রীম বললেনঃ "তাহলে সোঽহম্ করে আপনিই খেয়ে ফেলুন। ঠাকুর করতেন এমন।"

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ৯ম ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলক ❑ জলধিকুমার সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

শঙ্করাচার্য ঃ জীবন ও সিদ্ধান্ত

স্বামী ভূতেশানন্দ

ভগবান শঙ্করাচার্যের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নিবেদিত

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই ভাষণটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শঙ্করাচার্যের কোন বিস্তারিত জীবনী না থাকায় তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর সকল বিবরণ জানা যায় না। 'শঙ্কর-বিজয়' ও 'শঙ্কর-দিগ্বিজয়' নামে দুটি বই আছে। তাতে শঙ্করাচার্য সম্পর্কে কিছু লোকশ্রুতি গল্পের মতো করে বলা আছে, আর আছে নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ। সেগুলি থেকে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা করা যায় তা হলো শঙ্কর শৈশবেই পিতৃহীন হন। বিধবা মা তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর ভিতরে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এরকমও শোনা যায় যে, মাত্র আট বছর বয়সে তিনি তৎকালে প্রচলিত সকল বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। তখন থেকে তিনি বুঝেছিলেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পরমব্রহ্মে লীন হওয়া। এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সন্ন্যাসের পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলা হয়েছে। এই কারণে তাঁর মনে সন্ন্যাসগ্রহণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগে।

পিতৃহীন বালককে পরম যত্নে মা পালন করতেন। তাঁর মনে হতো, শঙ্কর হয়তো অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করবেন। তাই সন্তানের জন্য মা সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতেন। মাত্র আট বছর বয়স থেকে শঙ্কর মাকে বোঝাতেন, সন্ন্যাসগ্রহণই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। সেজন্য তিনি মায়ের অনুমতিও চাইতেন। স্বাভাবিকভাবেই মায়ের প্রাণ কিছুতেই তাতে সায় দিত না। কারণ এই পুত্রটিই যে তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। আট বছর বয়সে তিনি একদিন মায়ের সঙ্গে বাড়ির কাছে পূর্ণা নদীতে স্নান করতে গিয়েছেন। শঙ্করের জন্মস্থান কালাডিতে সেই নদীটি আমরা দেখেছি। ছোট হলেও খরস্রোতা। সেখানে স্নান করবার সময় মা দেখছেন, শঙ্করকে কুমীরে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে বলল ঃ "মা, তুমি এখনো যদি আমায় সন্ন্যাসের অনুমতি দাও তাহলে হয়তো কুমীরের হাত থেকে রক্ষা পাব।" মা বললেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, তোমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিলাম।" আশ্চর্য, কুমীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ছেড়ে দিল! এই ঘটনার সত্যতা যাই হোক, ভাব হচ্ছে—আমাদের মনে যে রিপুগুলি আছে সেগুলি যেন আমাদের সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবার জন্য টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তা থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় হচ্ছে সর্বস্ব ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করা।

যাই হোক, শঙ্কর মায়ের অনুমতি পেয়ে গৃহত্যাগ করবার সময় মাকে বলে গিয়েছিলেন ঃ "মা, তোমার অন্তিমকালে তুমি আমাকে স্মরণ করলেই আমি আসব। তুমি চিন্তা করো না। শেষ সময়ে আমাকে তুমি দেখতে পাবে।"

তারপর তিনি পরিব্রাজক হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নর্মদাতীরে ওঙ্কারনাথে তাঁর অভিলষিত গুরু আচার্য গোবিন্দপাদের সন্ধান পেলেন। কিন্তু আচার্য গোবিন্দপাদ বহু বছর ধরে সমাধিমগ্ন হয়ে রয়েছেন। শঙ্কর সমাধিমগ্ন গুরুর সমাধি-ভঙ্গের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দিনের পর দিন কাটতে লাগল। তাঁর সমাধিভঙ্গের কোনই লক্ষণ নেই। এদিকে জলের স্রোত তাঁর সাধনগুহা ভাসিয়ে দিতে আসছে। শঙ্কর তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের শক্তিতে নদীর স্রোতকে আদেশ করলেন ঃ "আর এগিয়ে এসো না, কোন শব্দ করো না।" আশ্চর্য! জলস্রোত সেই বালকের আদেশ মেনে আর অগ্রসর হলো না।

শঙ্কর মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন যাতে গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ হয়। অবশেষে একদিন তাঁর সমাধি ভঙ্গ হলো। আচার্য গোবিন্দপাদ দেখলেন, তাঁর কাছে আগত বালকটি যেন জ্বলন্ত আগুনের মতো। তাঁর মধ্যে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, মন শুদ্ধ। যাকিছু শুনবে প্রখর বুদ্ধির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করে ফেলবে। তিনি তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন এবং শঙ্করের জীবনব্রত সন্ন্যাসলাভে তাঁকে দীক্ষিত করলেন। তারপর শঙ্কর কঠোর স্বাধ্যায় ও সাধনায় মগ্ন হলেন।

আট বছর কেটে গেল। তাঁর প্রথম আট বছরে ছিল মৃত্যুযোগ। কুমীরের পেটে যেতে যেতে দৈবকৃপায় তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছিল। আবার ষোল বছর বয়সে তাঁর পুনরায় মৃত্যুযোগ। কিন্তু লোককল্যাণ করবেন বলে মহর্ষি বেদব্যাসের আশীর্বাদে তাঁর আয়ু দ্বিগুণ হয়ে বত্রিশ বছর হলো। প্রথমে আট বছর বয়সেই মৃত্যুযোগ ছিল, সন্ন্যাস গ্রহণ করায় আরো

আট বছর বৃদ্ধি হয়েছিল। ষোল বছর বয়সে ব্রহ্মসূত্র, গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতির ভাষ্য রচনা সমাপ্ত হলে বেদব্যাস সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর আরো ষোল বছর পরমায়ু বৃদ্ধি করেন। শুধু শাস্ত্ররচনা নয়, পদব্রজে তিনি আসমুদ্রহিমাচল ঘুরেছেন। উদ্দেশ্য অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত প্রচার করা।

শঙ্করের গীতা, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য 'শাঙ্করভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধ। এত অসাধারণ সেসব রচনা যে, এগুলি একজনের একজীবনের কাজ বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর মতো অসাধারণ প্রতিভাবানের পক্ষে সবই সম্ভব ছিল। ষোল থেকে বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ ঘুরে তিনি সর্বত্র বেদান্তের বাণী প্রচার করেন। জনশ্রুতি আছে, তাঁর তিরোধান ঘটেছিল কেদারনাথের বিগ্রহে অন্তর্ধানের মাধ্যমে।

তাঁর বেদান্ত প্রচারকালে দেশের পরিস্থিতিটি বিশেষ লক্ষণীয়। ভারতবর্ষে তখন কর্মকাণ্ডের বিশেষ প্রভাব। তার আগে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর ধর্ম অনুসরণ করে অনেকে বৌদ্ধ হয়েছেন এবং অনেকে বেদ প্রভৃতি হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। এই অবস্থায় ধর্মের অধঃপতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে দাঁড়িয়েছিলেন মীমাংসক সম্প্রদায়, যাঁদের অন্যতম প্রধান ছিলেন কুমারিল ভট্ট। তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রথা পুনঃপ্রচলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন। অনুরূপ পরিপ্রেক্ষিতে শঙ্করের প্রচারকার্য আরম্ভ হয়েছিল। শঙ্কর বললেন, যাগযজ্ঞাদিতে মানুষের সাময়িক কল্যাণ হলেও কিন্তু তার দ্বারা পরম শ্রেয়োলাভ হয় না। যাগযজ্ঞ করে মানুষ পুণ্য সঞ্চয় করে, সেই পুণ্যের ফলে বিভিন্ন 'লোক' প্রাপ্তি হতে পারে। যেমন এই জগতে কেউ ধন অর্জন করে, তারপর ভোগ করতে করতে সেই ধনের ক্ষয় হয়ে যায়—সেইরকম যাগযজ্ঞাদি কর্মের পুণ্যে যে স্বর্গাদি লাভ হয়, কালে সেই পুণ্যেরও ক্ষয় হয়ে যায়। তখন আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হয়। এইভাবে যাগযজ্ঞের অন্তঃসারশূন্যতা এবং নিঃশ্রেয়সলাভে তার যে কোন সার্থকতা নেই সেকথা তিনি মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

এইভাবে শঙ্কর একদিকে বৌদ্ধ নাস্তিকতা, অন্যদিকে মীমাংসকদের নতুন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভই যে জীবনের চরম উৎকর্ষ ও একমাত্র লক্ষ্য তা প্রচার করতে লাগলেন। আর সেই প্রচারের পরিণামে উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, গীতার সব পূর্বকালীন ব্যাখ্যা লুপ্ত হয়ে গেল। শঙ্করের ব্যাখ্যা এত যুক্তিপূর্ণ, এত হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, অন্য কোন ব্যাখ্যা মানুষকে আর তৃপ্তি দিতে পারল না। শঙ্করের এই আধ্যাত্মিক বিজয় এককথায় অভূতপূর্ব। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীর সঙ্গে বিচার করে তাদের পরাস্ত করে স্বমতে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়গুলিই 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে।

বত্রিশ বছর বয়সে আচার্য শঙ্করের জীবনাবসান হয়। কিন্তু এই বত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁর প্রচারকার্য যেভাবে সফলতা লাভ করেছিল তা বিস্ময়কর। তিনি অদ্বৈতবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর প্রবর্তিত মতবাদ যাতে সব জায়গায় প্রচারিত হয়, এই যুক্তির ধারা যাতে প্রবহমান থাকে তার জন্য একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। সেকালে সন্ন্যাসীদের কোন সম্প্রদায় ছিল না। তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁরা ব্রহ্মবাদ প্রচার করে বেড়িয়েছেন। শঙ্কর দেখলেন, এইভাবে কেবল যুক্তির ওপর নির্ভর করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তা চিরস্থায়ী হবে না, কারণ কেবল যুক্তি নিয়ে মানুষ থাকতে পারে না। তার অবলম্বনের আধার দরকার। সেই অবলম্বনের আধার হিসাবে তিনি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। তাঁর শিষ্যরা 'দশনামী' সম্প্রদায় বলে পরিচিত হলো। ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপনা করে তিনি সেখানকার অধ্যক্ষদের ওপর আপন আপন ক্ষেত্রে সনাতন ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখবার দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। 'মঠাম্নায়' নামে একটি ছোট গ্রন্থে শঙ্কর মঠ-পরিচালনার নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করে দিলেন। তাতে সন্ন্যাসীরা কিভাবে জীবনযাপন ও প্রচারকার্য করবেন তার নির্দেশাদি লিপিবদ্ধ ছিল। প্রচারকে অব্যাহত রাখবার জন্য তিনি এই চারটি প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন, যাকে 'চার ধাম' বলা হয়। মঠগুলি আজও আছে, কিন্তু কালপ্রবাহে যেমন হয়—মঠের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আচার্য-প্রবর্তিত কঠোর নিয়ম পালন এখন কেউ করেন না। আচার্য বলেছিলেন ঃ একজন মঠাধীশ অপর মঠাধীশের এলাকায় যাবেন না। তাঁদের যা করণীয় নিজ নিজ ক্ষেত্রে থেকেই পালন করবেন। আজকাল সকলেই সর্বত্র যাতায়াত করেন। আর আগের কঠোর সন্ন্যাসপ্রথাও অনেকটা শিথিল হয়েছে। অবশ্য কালপ্রবাহে এটা স্বাভাবিক।

শঙ্করের প্রবর্তিত ধর্মমত বা মতবাদকে বলা হয় 'অদ্বৈত মত' বা 'অদ্বৈত সিদ্ধান্ত'। 'অদ্বৈত' অর্থাৎ এই জগতের যে মূল তত্ত্ব তা দুই নয়, এক ব্রহ্মই হচ্ছেন জগতের মূল। তাঁর থেকেই জগতের উৎপত্তি, তাঁতেই স্থিতি এবং অন্তে জগৎ তাঁতেই লীন হবে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার। তাঁকে আমরা এই মনে চিন্তা করতে পারি না, তর্কের দ্বারা তাঁকে প্রতিষ্ঠাও করতে পারি না। আমাদের বুদ্ধির অগম্য সেই তত্ত্বই জগতের আদি কারণ। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে উল্লেখ করে শঙ্করাচার্য এই মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এজন্য উপনিষদ্, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখেছিলেন। এই তিনটি 'প্রস্থানত্রয়' নামে প্রসিদ্ধ। উপনিষদ্‌কে বলে 'শ্রুতিপ্রস্থান', গীতাকে বলে 'স্মৃতিপ্রস্থান' এবং যুক্তিপ্রধান ব্রহ্মসূত্রকে বলে 'ন্যায়প্রস্থান'। এদের ভিতর দিয়ে যে-সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছিল, শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে তাকে একটি দার্শনিক রূপরেখা দান করেছিলেন।

অনেকেরই মনে হবে, শঙ্করের বেদান্ত একেবারে 'কাঠ' বেদান্ত, সাধারণ মানুষের তার কাছাকাছি যাওয়ারও সামর্থ্য নেই। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি অত ভীতিপ্রদ নয়। তিনি স্পষ্ট ও যথার্থ যুক্তির সাহায্যে এবং শুধু অনুমানকে স্বীকার না করে

প্রত্যক্ষের সাহায্যে তত্ত্ববিচার করে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে শাস্ত্রের পূর্ণ সঙ্গতিও আছে। তত্ত্বটি হচ্ছে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। 'অদ্বিতীয়' মানে—ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই। আমরা জগৎকে যেভাবে দেখছি, জগতের প্রকৃত সত্তা তা নয়। প্রকৃত সত্তা হলো অপরিবর্তনশীল ও অপরিণামী। জগৎ পরিবর্তনশীল ও পরিণামী এবং প্রত্যেক পরিণামী বস্তুর নাশ হয়, সুতরাং জগতেরও নাশ হবে।

মানুষ প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে, দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে মনে করছে। এই পরিণামশীল বস্তুগুলির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দেহাভিমানী সত্তারও বিনাশ হবে। কেবল জীবের মধ্যে যে-তত্ত্ব রয়েছে—পরব্রহ্ম তত্ত্ব, যাঁর থেকে এই জগতের উৎপত্তি, তিনিই একমাত্র অবিকৃত থাকবেন। জগতের আর কোন বস্তুই অবিকৃত থাকবে না।

এই হলো এক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিভাবে এর প্রয়োগ করা হবে আচার্য শঙ্কর তা দেখালেন। বললেন, এই সিদ্ধান্ত শুধু মনে রাখলেই চলবে না। মুমুক্ষু সন্ন্যাসীরা কেবল গিরিগুহায় বসে ধ্যান করে সমাধিতে কাটিয়ে দেবেন তা হবে না। সন্ন্যাসের আরেকটি আদর্শ হলো—সন্ন্যাসী যেখানে যাবেন সেখানকার পাপতাপ দূরীভূত হবে, মন্দাকিনীর প্রবাহের মতো জীবকে তিনি শান্তি বর্ষণ করবেন। একটি শ্লোকে তিনি বলছেনঃ "বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ"—বসন্ত ঋতুর মতো সন্ন্যাসী সকলের কল্যাণ করবেন। বসন্ত ঋতু সকলকে আনন্দ দেয়, তার প্রতিদানে কারো কাছে কিছু চায় না। ঠিক সেইরকম সন্ন্যাসী বসন্ত ঋতুর মতো লোককল্যাণ করবেন, মানুষকে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সাহায্য করবেন এবং কোন প্রতিদান আশা করবেন না।

সন্ন্যাসী কেবল সমাধিমগ্ন থাকবেন তা শঙ্কর চাননি। শঙ্কর নিজ জীবনেও তা করেননি এবং তাঁর শিক্ষাতেও তা করতে তিনি নিষেধ করেছেন। বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান পরম কল্যাণজনক —এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে আমরা চুপ করে বসে থাকব তা নয়। ব্রহ্মজ্ঞান যেমন আমার পক্ষে তেমনি জগতের সবার পক্ষেই পরম কল্যাণকর। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়রূপ যে সন্ন্যাস, তাকে যাঁরা অবলম্বন করেছেন তাঁরা কেবল নিজেদের জীবনের সমস্যার সমাধান করেই বিরত হবেন না, পরন্তু বসন্ত ঋতুর মতো জগতের সর্বত্র এই মুক্তির বাণী তিনি ছড়িয়ে দেবেন। তিনি এটি দায়স্বরূপে, উত্তরাধিকার-স্বরূপে সন্ন্যাসীদের দিয়ে গিয়েছেন। আমরা এই ব্যবস্থিত সন্ন্যাসজীবন উত্তরাধিকার-রূপে পেয়েছি। তাঁর আগে সন্ন্যাস ছিল, কিন্তু কোন আশ্রম ছিল না, কোন ধারা ও সুষ্ঠু কর্মসূচীও ছিল না।

শঙ্কর সর্বপ্রথম সন্ন্যাসীদের জন্য লোককল্যাণকর কর্মের এমন একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে গেলেন যে, তাতে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, হৃদয়বত্তা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। যদিও তিনি অদ্বৈতজ্ঞানের প্রচারক ছিলেন, কিন্তু জানতেন অদ্বৈত-জ্ঞানের অধিকারী বিরল। তাই তিনি কোনপ্রকার সাধনপদ্ধতিকেই কখনো উপেক্ষা করেননি। ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও তিনি কত দেবদেবীর ভক্তিমূলক স্তোত্র রচনা করেছেন, কত জায়গায় পূজাপাঠ প্রচলন করেছেন, পঞ্চোপাসনার প্রবর্তন করেছেন। এইভাবে একটি নতুন সুব্যবস্থিত ধর্মসমাজ গঠন করতে শঙ্করের অবদান অতুলনীয়। কি করে মানুষকে বর্তমান স্তর থেকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানে উন্নীত করা যায় তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা তিনি করে গিয়েছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, তিনি জ্ঞানপথের ওপর জোর দিয়েছেন। 'জ্ঞানপথ' মানে বিচারের পথ, জগৎকে বিচার করে দেখা। জগৎ যে অনিত্য—একথা কাউকে বলে দিতে হয় না, কিন্তু অনিত্যতার বোধটা আমাদের মনে থাকে না। আমরা যেটাই ধরছি সেটাই নশ্বর, তবু আরেকটিকে ধরছি চিরকাল থাকবে বলে। শঙ্করের সোজা যুক্তি—যাকিছু পরিবর্তনশীল ও পরিণামী, তাই বিনাশশীল।

শঙ্কর বলছেন, আমি অর্থাৎ আমার এই ব্যক্তিরূপেরও বিনাশ হবে, কারণ সে বদলে বদলে যাচ্ছে—যার ফলে সে পরিণামপ্রাপ্ত হচ্ছে। যা পরিণামী তা অবশ্যই বিনষ্ট হবে। কারণ, আমরা তো দেখছি জগতে যাকিছু পরিণামী তাদের সকলেরই বিনাশ হয়। এই কথাটি যুক্তির সাহায্যে দেখিয়ে তারপর তিনি বললেন, তোমার নিজের স্বরূপকে দেখ, বিচার কর। তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন না বুদ্ধি? তুমি কি? অদ্বৈত-জ্ঞানে নিজেকে বিশ্লেষণ করার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখছি, 'আমি' যাকে বলছি সেই আমি সর্বদা রয়েছে। বাল্যের আমি, যৌবনের আমি, বার্ধক্যে উপনীত হয়েও সেই এক আমি—অপরিবর্তনশীল। যদিও শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে। শঙ্কর বলছেন, তুমি যদি শরীর হতে তাহলে শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে। এই দেহের নানা পরিবর্তনের ভিতরেও তুমি এক-সত্তা, অপরিবর্তিত আত্মারূপে আছ। সুতরাং আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন।

খুব সাধারণ যুক্তি এবং এগুলি শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তি, কিন্তু শঙ্কর সাধারণের পক্ষে এমন মনোগ্রাহী করে তা বর্ণনা করেছেন যাতে মানুষ নতুন আলোকবর্তিকা দেখতে পেল। শঙ্কর বলছেন, দেহ বার্ধক্যে উপনীত হলে দেখবে বাল্যের বা যৌবনের দেহ আর নেই, পরিবর্তন হয়েছে। তা সত্ত্বেও বলছ, আমার বাল্য, আমার যৌবন, আমার বার্ধক্য। তাহলে তুমি এক অপরিবর্তনশীল দ্রষ্টা ও সাক্ষী, আর দৃশ্য জগৎটা বদলে বদলে যাচ্ছে। যেমন ব্যক্তি সম্পর্কে তেমনিই জগৎ সম্বন্ধেও একই কথা।

শঙ্কর এইভাবে বিচার করে করে দেখালেন, জগৎ অনিত্য। আর আমরাও এই অনিত্য জগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেদের অনিত্য মনে করছি। প্রকৃতপক্ষে আত্মা নিত্যবস্তু। কারণ, পরিবর্তনশীলতার মধ্যে যদি অপরিবর্তনশীল কোন তত্ত্ব থাকে তা একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে—নানা ফুল দিয়ে মালা গাঁথা হয়। ফুলগুলি ভিন্ন ভিন্ন,

কিন্তু একই সুতো সব ফুলের ভিতর রয়েছে। যেখানে লাল ফুল আছে সেখানে সাদা ফুল নেই, যেখানে সাদা ফুল আছে সেখানে হলুদ ফুল নেই—এইরকম ফুলগুলি বদলে বদলে যাচ্ছে; কিন্তু তার ভিতরকার সুতোটি অপরিবর্তনশীল। সেটিই লাল সাদা হলুদ সব ফুলকে গেঁথে রেখেছে। এইরকম এই জগতের পিছনে একটি সূত্র আছে—একটি তত্ত্ব অনুস্যূত রয়েছে, যা সমস্ত জগৎকে একসঙ্গে গেঁথে রেখেছে। জগৎ পরিবর্তনশীল, কিন্তু সেই জগতের আধার যে ব্রহ্ম তা অপরিবর্তনশীল। এইভাবে বিচার করে তিনি ব্রহ্মকে জগতের অতীত-রূপে দেখিয়ে দিলেন।

এখন মনে হবে, এ তো পণ্ডিতের কথা, তাতে আমার কি লাভ হলো? লাভ এই হলো যে, আমি চিন্তা করব—আমি যদি দেহ থেকে ভিন্ন হই, তাহলে দেহের পরিণামের জন্য নিজেকে কেন সুখীদুঃখী বলে মনে করি বা জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি মনে করি? আত্মার স্বরূপ এইরকম পরিবর্তনশীল নয়। দেহের ধর্ম আত্মার ওপর আরোপিত হয়েছে। এই আরোপের দৃষ্টান্তও আচার্য শঙ্কর দিয়েছেন। স্ফটিকের কাছে একটা জবাফুল থাকলে স্ফটিকের ওপরে তার রঙ প্রতিফলিত হয়ে স্ফটিককে লাল দেখায়। আবার জবাফুল সরিয়ে হলুদ ফুল দিলে স্ফটিককে হলুদ দেখায়। এইরকম রঙের পরিবর্তন হতে থাকে, কিন্তু স্ফটিক অপরিবর্তনশীল, সে নিত্যই আছে। সেইরকম আমি আত্মা, সাক্ষী, দ্রষ্টা। আমি নিত্য আর আমার দৃশ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ সবই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং আমি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন থেকে ভিন্ন। যাকে অবলম্বন করে এই ধর্মগুলি প্রকাশ পাচ্ছে সেই আমি কিন্তু অপরিবর্তনশীল, নিত্য বর্তমান। এই হলো মূলকথা।

একথা যদি সত্য হয়, তাহলে শরীরের বিনাশ হচ্ছে হোক না, আমার ক্ষতি কি? আমি তো শরীর নই, আমি অবিনাশী আত্মা। শঙ্কর এই শক্তিশালী তত্ত্বের ওপর জোর দিয়ে মানুষকে অদ্বৈত বেদান্তে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন। তবে আগেই বলেছি যে, তিনি জানতেন, অদ্বৈত বেদান্তের অধিকারী সকলে নয়, তাই সকলকে একসঙ্গে অদ্বৈত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বলেননি। বলেছেন, উপাসনা কর। শাস্ত্রে যে দেবদেবীর রূপের উপাসনার কথা আছে তাঁদের উপাসনা করবে। এর মানে হচ্ছে যে, একই পরমতত্ত্ব বিভিন্ন দেবদেবীরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। উপাসনা করতে করতে মন শুদ্ধ হবে, ক্রমশ উচ্চতর তত্ত্ব ধারণা করতে সমর্থ হবে এবং ধীরে ধীরে অদ্বৈত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাবে।

বৌদ্ধদের মতো তিনি জগৎকে অলীক বলে উড়িয়ে দেননি। শূন্যবাদ অর্থাৎ এই জগৎ নেই—এই হলো বৌদ্ধধর্মের সিদ্ধান্ত। শঙ্কর সে-মত গ্রহণ না করে বললেন, বেদান্ত শূন্যবাদ নয়। কারণ, জগৎকে প্রতিনিয়ত দেখছি, তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি আমার হচ্ছে। যার উপলব্ধি হচ্ছে তাকে 'নেই' বলা যায় না।

আমি কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, আমি পিতা, পুত্র, আমি যুবা, বৃদ্ধ—এসবই আত্মার ওপর আরোপিত হচ্ছে। আরোপিত এই ধর্মগুলি কিন্তু আমার নয়। তা যদি হতো তাহলে এগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও পরিবর্তন ঘটত। আমি দ্রষ্টা, সাক্ষী। আমি যদি বদলে যেতাম তাহলে পরিবর্তন দেখত কে? প্রত্যেক পরিবর্তনের পিছনে একটি অপরিবর্তনশীল তত্ত্ব না থাকলে সেই পরিবর্তনের সাক্ষী কেউ থাকে না। কাজেই বুঝতে হবে, এই পরিণামী জগতের পিছনে এক অপরিণামী তত্ত্ব রয়েছে—যে-তত্ত্বটি এই সমস্ত জগতের আধার। আর এই জগৎ-রূপ যে ভ্রান্তি হচ্ছে সেও এই তত্ত্বের ওপরেই হচ্ছে। ভ্রান্তিগুলি অলীক নয়, মিথ্যা। যেমন 'আকাশকুসুম' অলীক। আকাশে কুসুম হয় না। পরিবর্তনশীল জগতের অনুভব আমাদের হচ্ছে, তাই তা অলীক নয়। যে-বস্তু একেবারেই নেই তার কোন ধারণাই হয় না, যেমন আকাশকুসুমকে ধারণা করতে পারি না। আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র—এগুলি সব অলীক বস্তু যা কোনকালে কখনো ছিল না, থাকবে না। জগৎ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, আর আমরা দ্রষ্টা হয়ে তা দেখে যাচ্ছি। সুতরাং জগৎ নেই বলে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তবে যেরূপে তাকে দেখছি সেইরূপে তা নেই—একথা বুঝতে হবে। জগৎকে জড়-রূপে দেখছি, আসলে সেখানে আছে এক চৈতন্য সত্তা।

এখন এই আত্মাকে যদি সমস্ত দেহধর্ম, ইন্দ্রিয়ধর্মের অতীত বলে জানতে পারি তাহলে পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির দ্বারা আর প্রভাবিত হব না। বুঝব, জগৎকে যেরূপে দেখছি তা সত্য নয়—ভ্রান্ত। এর বহুশ্রুত দৃষ্টান্ত হলো—অন্ধকারের মধ্যে একটি দড়ি পড়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে একটি সাপ। ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, তারপর আলো নিয়ে এসে দেখলাম সাপ নেই—একটা দড়ি। সেইরকম জগৎ বলে যেটিকে মনে করছি সেটি জগৎ নয়। তা আসলে আত্মা, ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এবং আত্মা শব্দ একার্থক। সর্বব্যাপী যে-তত্ত্ব, তাকে আমরা এইসব পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত বলে মনে করছি।

একটা কলসীর ভিতরেও আকাশ আছে, বাইরেও আছে। কলসীর আবরণের ভিতরে আকাশ ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। কলসী আকাশকে সীমিত করতে পারে না। তেমনি সর্বব্যাপী আত্মাকে আমাদের খণ্ড অনুভবগুলি দ্বারা সীমিত করা যায় না। এইভাবে শঙ্কর আত্মাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আবার তিনি এও জানতেন যে, যুক্তি আমাদের কতকটা সাহায্য করে, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে না। যুক্তি দ্বারা বিপরীত ধর্মকে নিবৃত্ত করা যায়। আত্মা স্বপ্রকাশ, সর্বদা প্রকাশিত থাকেন, তাঁকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। অন্য সব বস্তু আত্মার প্রকাশের দ্বারা প্রকাশমান।

আমরা দেখি, সূর্য জগৎকে প্রকাশ করছে। কিন্তু জগৎকে প্রকাশ করবার সামর্থ্য সূর্যের নেই। আসলে আত্মাই জগৎকে প্রকাশ করছেন। জগতের প্রকাশক যে সূর্য তাকেও আত্মাই প্রকাশ করছেন। আত্মা আছেন বলেই তো সব বস্তু অনুভূত হচ্ছে। কারণ সৎ-রূপে, চিৎ-রূপে, প্রকাশ-রূপে, আনন্দ-রূপে তিনিই সর্বত্র রয়েছেন। "অস্তি ভাতি প্রিয়"—এই তিন

রূপে দেখা হচ্ছে। "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" (কঠ-উপনিষদ্‌, ২।২।১৫)—তাঁর প্রকাশের দ্বারা সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। এই জগতে যাকিছু অনুভব করছি সবকিছুতে আত্মাকেই অনুভব করছি। কেবল তাঁকে নানারকম পোশাক পরিয়ে অনুভব করছি। যেমন যে-স্ফটিককে কখনো লাল, কখনো হলুদ, কখনো সাদা দেখছি, আসলে তা লাল, হলুদ বা সাদা নয়।

এইরকম যে-ব্রহ্ম আমাদের ভিতরে এবং বাইরেও, তাঁকে যদি জানতে পারি তাহলে পরিবর্তনগুলি আমাদের মনে কোন তরঙ্গ উত্থিত করতে পারবে না, আমরা তার দ্বারা প্রভাবিত হব না। উপনিষদে আছে—

"আত্মানং চেদ্ বিজনীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ।।"

(বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্‌, ৪।৪।১২)

যদি কেউ আত্মাকে 'আমি ইনি'—এইরূপে জানেন এবং দেহাদি থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন তাহলে তিনি সে-দেহের কষ্টে বা কোন বস্তুর কামনায় কিংবা কারো প্রয়োজনে কষ্টবোধ করবেন কেন? এইরকম করে যুক্তির সাহায্যে আচার্য শঙ্কর বুঝিয়েছেন। এই তত্ত্বে পৌঁছানোর জন্য তিনি পঞ্চোপাসনার প্রবর্তন করেন।

ঈশ্বরকে এক জায়গায় নস্যাৎ করে দিয়ে বলা হয়েছে—জগৎটাই নেই তো জগতের নিয়ন্তা আবার কে থাকবে? আচার্য শঙ্কর উত্তরে বলছেন, জগৎ নেই কে বলছে? যতক্ষণ অনুভব করছ ততক্ষণ জগৎকে অস্বীকার করতে পার না। তবে জগতের অতীত কোন তত্ত্বকে যদি উপলব্ধি করতে পার তখন বলতে পার জগৎ মিথ্যা। 'মিথ্যা' মানে তাকে যে পরিণামী জড়রূপে দেখছি সে-রূপে সে সত্য নয়, আসলে তা হচ্ছে ব্রহ্ম—অপরিণামী, অবিকারী নিত্য সত্তা। এই হলো সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে মনের যে মার্জনা ও শুদ্ধি প্রয়োজন তার জন্য উপাসনার প্রবর্তন। আচার্য শঙ্কর নিজেও কবিত্বপূর্ণ সুললিত ভাষায় দেবদেবীর সুন্দর সুন্দর স্তোত্র রচনা করেছেন। এগুলি মনকে শুদ্ধ করে ধীরে ধীরে সেই ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়ার যোগ্য করে। এইভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা করতে সমর্থ হলে দেখব, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।

আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্তকে আমরা এখানে অল্প কথায় বুঝবার চেষ্টা করলাম।* ❑

* কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৩ মে ১৯৮৭ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণের অনুলিপি।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

জাতীয় পুনর্গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

জাতীয় যুবসম্মেলনে আমরা যে সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়েছি, এটি একটি মহৎ উপলক্ষ্য। ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে যুবক-যুবতীরা কলকাতায় এসে রয়েছে, তারা এই দুদিন ধরে আলোচনা করবে আমাদের জাতীয় সমস্যা—আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, আমাদের যুবসমস্যা নিয়ে। সেইসঙ্গে আলোচিত হবে আধুনিক ভারত পৃথিবীকে আজ কী দিতে পারে—সেই প্রসঙ্গও। কেবল ধর্মীয় নয়—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সবরকম জাগতিক সমস্যাই আলোচিত হবে এখানে এবং সে-আলোচনা হবে—আমরা যাকে 'অদ্বৈত বেদান্ত' বলি, তারই আলোকে। হ্যাঁ, অদ্বৈত বেদান্ত। এ সেই মহিমময় বাণী, যা অতীতে উপনিষদ্ ও গীতা-মুখে ধ্বনিত এবং বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে পুনঃপ্রচারিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্ত-দর্শনের বাস্তব উপযোগিতার দিকটিকে অসামান্যভাবে তুলে ধরেছেন।

আমরা এবার দুটি ঘটনার শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছি। প্রথমটি—পাশ্চাত্যে চার বছর প্রচারকার্যের পর স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তন। এইসঙ্গেই স্মরণ করছি কলম্বো থেকে লাহোর হয়ে আলমোড়া পর্যন্ত স্বামীজীর দেওয়া অসাধারণ বক্তৃতাগুলি, যার মধ্যে ধরা রয়েছে আমাদের জাতির প্রতি তাঁর জাগরণ-বাণী। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, এই বক্তৃতামালার শেষে কলকাতায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে স্বামীজীর 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা—যাতে এই জাগরণ-বাণী পৌঁছে যায় ভারত তথা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে। এই শতবর্ষ উৎসবের শেষ অনুষ্ঠানটি আমরা এখন উদ্‌যাপন করছি। এই একশ বছরে বেদান্তের বাণী—যে-বাণীতে রয়েছে প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব এবং সর্বধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের কথা—সে-বাণী প্রসারলাভ করেছে এই ভারতভূমিতে এবং পৃথিবীর বহু দেশে। মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রভাব মানুষকে কেবল নীতিপরায়ণ, শিষ্ট ও মানবিক গুণসমৃদ্ধই করে না, মানুষের মধ্যে অপরকে সেবা করার একটা প্রেরণা জাগ্রত করে। আর সেটাই হলো মানুষে মানুষে দৃঢ়বদ্ধ সম্পর্কের সত্যকার রূপ।

যদিও বেদান্ত চার হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন, কিন্তু আমরা কখনো একে আমাদের অভ্যাসের মধ্যে আনিনি, আমাদের জীবনচর্যায় পরিণত করিনি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের সমাজ বেদান্ত-বিরোধী ও সেইসঙ্গে অসাম্য, জাতিগত প্রাধান্য এবং দুর্বলতর অংশের ওপর অত্যাচারে পরিপূর্ণ। বেদান্ত প্রাধান্য আরোপ করে মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদার ওপর। আর আমাদের সমাজ এর ঠিক বিপরীত। স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ "পৃথিবীতে আর কোন ধর্ম হিন্দুধর্মের মতো এমন উচ্চগ্রামে মানুষের মর্যাদা প্রচার করে না, আর পৃথিবীতে কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের মতো এমন নির্মমভাবে দরিদ্র ও অধঃপতিতদের গলায় পা দিয়ে দলে না।"

অতএব স্বামীজী ভারতবর্ষে তাঁর বাণী প্রচার করলেন এমন এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে, যে-ব্যবস্থার মূলে থাকবে এইসব মানবিক মূল্যবোধ। বেদান্ত প্রত্যেক মানুষের অন্তরে নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দেয়। এই বৈদান্তিক সত্যের আলোকে কেবল যে হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মের মধ্যে সব ভেদরেখাই মুছে যায় তা নয়, এতে আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের ব্যবধানও সম্পূর্ণ মুছে যায়। এই মহান শিক্ষাকে স্বামী বিবেকানন্দ জীবনে প্রয়োগ করতে বলেছিলেন।

বিবর্তনশীল জীবকুলে মানুষ এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তার অনন্যসাধারণতার কথা বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও বলে থাকে। আর বেদান্ত এই অনন্যসাধারণতার কথা বলে এক মহত্তর ভূমি থেকে। মানুষের যে জৈব ক্ষমতা, তা ব্যবহার করে সে যে কেবল বহির্জগৎকে বুঝতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা-ই নয়, তার মধ্যে যে দৈবসত্তা আছে, তাকেও সে উপলব্ধি করতে পারে। রক্তমাংসের নশ্বর দেহের পিছনে সেই দৈবসত্তাই তার আসল অবিনশ্বর অস্তিত্ব। মানব-সম্ভাবনার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ-ই হলো উপনিষদ্ ও গীতার মহান অবদান। উপনিষদ্ ও গীতাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, আরো বেশি করে পড়তে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা এক নতুন ভারতবর্ষকে দেখার, যে-ভারত এইসব বৈদান্তিক শিক্ষাকে জীবনে কাজে লাগাবে। ভারতে প্রদত্ত সব বক্তৃতাতেই তিনি বেদান্ত ও তার বাস্তব প্রয়োগের ওপর এইরকম জোর দিয়েছেন। আসলে বেদান্তের শিক্ষার সৌন্দর্য এখানেই যে, এই শিক্ষা সম্পূর্ণ সদর্থক; এতে নেতিবাচক কিছুই নেই। এতে কেবল সেইসব ভাবই আছে যা মানুষকে মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে, সৌহার্দ্য-সহমত গড়ে তোলে, মানুষকে বিকশিত করে তার অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে সর্বাঙ্গীণভাবে প্রকাশ করার উপযুক্ত করে তোলে। সারা বিশ্বের জন্য আজ এই শিক্ষার প্রয়োজন। স্বামীজীর সময়েও বেদান্তের এই বাণী পাশ্চাত্যের মানুষের কাছ থেকে সোৎসাহ সমাদর লাভ করেছিল। আজো সেই ধারা অব্যাহত। নীরবে,

নিঃশব্দে বেদান্ত সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। যারা একবার শোনে, তারা এসম্বন্ধে আরো জানতে চায়। সেজন্য তারা টাকা খরচ করে। বেদান্ত আজ যেভাবে সর্বস্তরে গৃহীত হয়ে চলেছে, তেমনটি কোন দর্শন, কোন তত্ত্ব বা কোন ধর্মের ক্ষেত্রে হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের যা প্রয়োজন, তা হলো এই বেদান্তকে জীবনচর্যায় পরিণত করা।

কমবয়সী ছেলেমেয়েরা যখন একসঙ্গে মিলে স্বামী বিবেকানন্দকে চর্চা করে, তখন তারা এই সমাজবিপ্লব রূপায়ণের লক্ষ্যে এক প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়। আদর্শ সাম্য, প্রত্যেক মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাভাব, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নারীমুক্তি—স্বামীজীর এইসব চিন্তা পাওয়া যাবে দুটি অসাধারণ বইতে—'ভারতে বিবেকানন্দ' ('Lectures from Colombo to America') এবং 'পত্রাবলী' ('Letters of Swami Vivekananda')।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দিল্লিতে তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন ঃ "প্রত্যেক যুবক-যুবতীর উচিত স্বামী বিবেকানন্দের এই দুটি বই পড়া। তাতে তাদের জীবন ও মানসিক প্রবণতা একটা নির্দিষ্ট রূপ পাবে, তারা আরো নীতিসমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হয়ে উঠবে এবং জাতির কল্যাণে প্রয়োজনীয় এক শক্তিতে পরিণত হবে।"

স্বাধীনতালাভের আগের পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের দেশের মানুষ এইসব বই পড়েছে। তাইতো আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়তে পেরেছি ও স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের যেসব মহান দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগ স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ঃ "খুব যত্ন করে আমি বিবেকানন্দ-সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি এবং তা পড়ে ভারতবর্ষের জন্য আমার ভালবাসা সহস্র গুণ বেড়ে গেছে।" গান্ধীজীর যদি এই অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তাহলে না জানি আরো কত কত লোকেরও এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল! আজকের যুব-সম্প্রদায়ের মনে যেন জেগে ওঠে এইরকম ভালবাসা—দেশের জন্য ভালবাসা, দেশের সাধারণ মানুষদের জন্য ভালবাসা। বিবেকানন্দ-সাহিত্য শিক্ষা দেয়, কিভাবে সেই ভালবাসাকে মানবকল্যাণমুখী সেবায় পরিণত করে তুলতে হয়।

বর্তমানের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনীতিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে নতুন করে পর্যালোচনা করার দরকার আছে। এই সম্মেলনে সারা ভারত থেকে কত শত যুবক-যুবতী অংশ নিয়েছে। তাদের এইসব বিষয় নিয়ে খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে হবে, যাতে এক নতুন শক্তি জন্মলাভ করে। সে-শক্তি চিন্তার শক্তি। বোমা কাকে বলে আমরা তো জানি, আমি এই শক্তিকে বলি বিবেকানন্দের বৈদান্তিক ভাবনার বোমা। এইসব বোমা আমাদের সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় রাজনীতিক-কুল ও আমলাতন্ত্রের মনোজগতে নিক্ষিপ্ত হবে, বিস্ফারিত হবে এবং যাকিছু সঙ্কীর্ণ, অনৈতিক, জাতিভেদদুষ্ট ও সাম্প্রদায়িক, তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। ফলে প্রকৃত গণতন্ত্রের সূচনা হবে এবং এক নতুন, প্রাণবান ভারত স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের যুবসম্প্রদায়কে আজ কাজ করতে হবে, এই স্বপ্নকে সফল করতে হবে। আমাদের যুবসম্প্রদায়ের ওপর স্বামীজীর বিরাট আস্থা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণেরও তাদের ওপর ছিল অগাধ ভরসা। সঠিকভাবে শিক্ষিত হলে যুবসম্প্রদায় অঘটন ঘটাতে পারে। এই যুবসম্মেলনে অনেক যুবক-যুবতী তাদের কথা বলবে। তারা খুব সবল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে, যা কিনা দেশকে তার বর্তমান সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মতো একজন পথপ্রদর্শক পেয়েছি। কোন দেশেই এমন একজন পথপ্রদর্শক নেই, ছিলও না। অন্যদের রাজনৈতিক নেতা আছে। ব্রিটিশ ইতিহাসে আমরা অনেক বড় বড় চিন্তাবিদ্ ও লেখকের নাম পাই, যেমন—হবস, জন স্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম প্রমুখ। তেমনি ফরাসী ইতিহাসেও পাই ভল্টেয়ার, রুশো প্রমুখকে। কিন্তু অন্য সকলের তুলনায় বিবেকানন্দ অনেক এগিয়ে, অনেক উঁচুতে—শীর্ষস্থানে। তিনি তাঁর নিজের মধ্যে ঘটিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক সুন্দর মেলবন্ধন এবং তাঁর হৃদয়কে রেখেছিলেন উন্মুক্ত—নিখিল মানবকে সেখানে তিনি করেছিলেন উষ্ণ আলিঙ্গন।

ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোঁলা তাঁর 'লাইফ অফ বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দকে এই আলোকে উপস্থাপিত করেছেন ঃ "বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের দুই প্রধান স্তম্ভ—সাম্য ও সমন্বয়। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার মানবীয় শক্তির সমন্বিত রূপ।"

আমাদের দেশ যত দ্রুত স্বামীজীর কাছ থেকে পথের দিশা বুঝে নেয়, ততই মঙ্গল। যদি বেশি সংখ্যায় মানুষ তাঁকে বোঝে, তবে আমরা আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ও সঙ্কট দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারব। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর আজ আমরা দেখছি সমাজের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত দুর্নীতি ও হিংসা। সেইসঙ্গে রয়েছে সাধারণ মানুষের প্রতি অবহেলা, যদিও মুখে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হচ্ছে। অন্যের প্রতি ভালবাসাকে ছাপিয়ে উঠেছে নিজের প্রতি ভালবাসা। যতক্ষণ না একজন তার দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসবে, ততক্ষণ সে কী করে তার চরিত্র গড়ে তুলতে পারবে?

আমাদের দেহের অন্তর্গত 'জিন' আমাদের মনের ওপর যখন কর্তৃত্ব করতে আরম্ভ করে, তখনি আসে দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়। জিন বস্তুত স্বার্থপর, তার মধ্যে পরের

জন্য কোন চিন্তা থাকে না। বর্তমানে বহু জীববিজ্ঞানী এ-বিষয়ে বই লিখছেন। কয়েকবছর আগে ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স 'দ্য সেলফিস জিন' নামে একটি চমৎকার বই লিখেছেন। লেখক প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তিনি একজন বস্তুবাদী। তারপর তিনি দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছেন যে, জিন মূল্যবোধের উৎস নয় এবং মানুষকে তার জীবনে মূল্যবোধকে প্রকাশ করতে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। লেখক কিন্তু মূল্যবোধের উৎস কী, সেসম্বন্ধে অবহিত নন কিংবা বইতে তার কোন উল্লেখ করেননি। কারো দেহ যখন তার ওপর কর্তৃত্ব করে, তখন সে-মানুষটা যায় হারিয়ে। এই দেহের ঊর্ধ্বে কিছু আছে। একমাত্র বেদান্তই নৈতিকতার সেই উৎসস্থল আবিষ্কার করেছে। সেই উৎস নিহিত মানুষের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায়, তার নিজের প্রকৃত সত্তায়। সেই প্রকৃত সত্তার নামই আত্মা—এটাই বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি। সেই আত্মাকে প্রকাশিত করতে হবে—তাহলেই সব নৈতিক মূল্যবোধ আপনি চলে আসবে। কাউকে বাইরে কোথাও মূল্যবোধের জন্য হাত পাততে হবে না। মানুষের প্রকৃত স্বভাবে—তার আপন সত্তাতেই সেগুলির অবস্থান। তাই বিবেকানন্দ বেদান্তের এই মূল শিক্ষার ওপর জোর দিলেন—"প্রত্যেক আত্মাই স্বরূপত ব্রহ্ম।" এই শিক্ষা প্রত্যেকের জন্যই সত্য। দুষ্ট লোকের মধ্যেও দেবস্বরূপ বিরাজ করছে। কোন অশুভ শক্তিই সেই স্বরূপকে স্পর্শ করতে পারে না। অতএব আজ আমাদের এই অন্তর্নিহিত দৈবীসত্তাকে প্রকাশিত করতে হবে প্রেম ও সেবার মধ্য দিয়ে এবং গড়ে তুলতে হবে চরিত্রের এক নতুন রূপরেখা। বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছিলেন ভারতের সেই অসাধারণ জাতীয় বাণী—'ত্যাগ ও সেবা'। তিনি বলেছিলেনঃ "ভারতকে এই দুই ধারায় শক্তিশালী কর, বাকি সব আপনিই হয়ে যাবে।" ভারতের যুবসম্প্রদায় যদি আজ এর অনুধ্যান করে এবং সেই আধ্যাত্মিক সত্তার কিছুমাত্রও বিকাশ ঘটায়, তবে তারা সমগ্র জাতির কল্যাণের পথে এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত হবে।

আমাদের দেশের সেবা ও উন্নয়ন আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। অন্য কোন দেশ এব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবে না। যদি আমাদের দেশ পড়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাদেরই তাকে তুলে ধরতে হবে। আমাদের মধ্যে ভাল করার ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা আছে মন্দ করারও। আমাদের বেছে নিতে হবে কেবল ভাল করাটাকেই এবং সেই বেছে নেওয়াটা প্রত্যেককেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে করতে হবে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেই কথাই আছেঃ "উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ।"

গত পঞ্চাশ বছরে আমরা আর্থিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে অগ্রগতি লাভ করেছি। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে আমরা ক্রমশ নেমে গেছি—গভীর থেকে গভীরে এবং এর জন্য আমাদের মানব-উন্নয়ন কর্মসূচীগুলির গতি হয়ে গেছে মন্দীভূত। এটাকে ঠিক করে নিতে হবে। এখন থেকেই আমরা জাতীয় পুনর্গঠন-প্রক্রিয়া শুরু করে দেব। এই সম্মেলনকে সেই অসামান্য পুনর্গঠন-প্রক্রিয়ায় এক সূচনাবিন্দু হয়ে উঠতেই হবে।

অষ্টম শতকের এক মহান বৈদান্তিক পণ্ডিত গৌড়পাদ, যিনি ছিলেন শঙ্করাচার্যের গুরুর আচার্য, তিনি তাঁর মাণ্ডুক্য-কারিকায় এক অসাধারণ শ্লোকে অদ্বৈতদর্শন ও আধ্যাত্মিকতাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্বসত্ত্বসুখো হিতঃ। / অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্।" অর্থাৎ আমি এই সুবিজ্ঞাত অদ্বৈত বা অস্পর্শ-যোগকে প্রণাম করি, যার দ্বারা সকল মানুষের সুখ ও মঙ্গল সুনিশ্চিত হয় এবং যা সকল তর্ক ও বিরোধ থেকে মুক্ত।

আমি এই মহান দর্শনকে প্রণাম করি, প্রণাম করি এই মহান আধ্যাত্মিকতাকে, যার নাম অস্পর্শ-যোগ।—কারণ দ্বিতীয় কিছুই নেই যার দ্বারা একে স্পর্শ করা যায়। আমরা সবাই 'এক'। এখানে অদ্বৈতের নাম দেওয়া হয়েছে 'অস্পর্শ-যোগ'। এর স্বরূপ কি? 'সর্বসত্ত্বসুখো হিতঃ'—এতে সকলের সুখ ও মঙ্গল সুনিশ্চিত হয়। আবার এটি 'অবিবাদঃ অবিরুদ্ধশ্চ'—সকল সঙ্ঘাত ও বিরোধ-মুক্ত। এ সেই অদ্বৈতদর্শন ও আধ্যাত্মিকতা, যা এতকাল গ্রন্থবদ্ধ হয়ে ছিল মঠ-আশ্রমের চার দেওয়ালের মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ একে বন্ধনের মধ্য থেকে বের করে নিয়ে এলেন এবং ভারতবর্ষ তথা বিশ্বজগতের অসীম প্রান্তরে উন্মুক্ত করে দিলেন, জগৎকে এর বাস্তব প্রয়োগের দিকটি পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন। বিজ্ঞানের এই আধুনিক যুগে এ-ই হলো একমাত্র দর্শন যা মানুষকে সাম্য, শান্তি ও আনন্দের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এবং সমগ্র বিশ্বে এক বৈদান্তিক সভ্যতা তৈরি হবে। জার্মানী, হল্যান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে বহু বছর ধরে বক্তৃতা-সফর করে আমি সেখানকার মানুষের মধ্যে এইসব শিক্ষা পাওয়ার ও ধারণা করার যে কী প্রচণ্ড ক্ষুধা তা প্রত্যক্ষ করেছি। এইসব মহান বাণী শুনতে তারা বারেবারে ঘুরেঘুরে আসে। এইরকম যুক্তিবদ্ধ, প্রেরণাদায়ী শিক্ষা তারা আগে কখনো শোনেনি। প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের যে-বাণী, তা পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে দারুণ নতুন এক ভাব; যদিও 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এ যীশুখ্রীস্টের বাণীতে রয়েছে—ঈশ্বরের রাজ্য তোমার ভিতরে আছে। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে মস্কো ইউনিভার্সিটি আমাকে 'বিবেকানন্দঃ তাঁর মানবতাবাদ'-এর ওপর ভাষণ দিতে অনুরোধ করে। সেই ভাষণের পর শ্রোতারা আমাকে বলে যে, তারা মানুষের দেবত্বের এই সত্যের কথা আগে কখনো শোনেনি। বার্লিনে এক যুবকও আমাকে জানায় যে, সে এমন সত্য আগে শোনেনি। এই ভাব

খুব সুন্দর ও মানুষকে উন্নীত করে। সে এসম্বন্ধে আরো জানতে চাইল। এইরকমই হলো অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের মানুষদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং এধরনের মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বহুকাল আগে মানবপ্রকৃতির গভীর অন্তস্তলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বেদান্ত এই সত্যকে আবিষ্কার করেছিল। সেটাকেই হতে হবে আমাদের নতুন উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে-দৈবীসত্তা আছে, তাকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে জাতীয় পুনর্গঠন-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সত্যকে সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ "প্রত্যেক জীবই শিব। জীবের সেবাই শিবের আরাধনা।" ঈশ্বরকে কেবল মন্দিরে, গির্জায় বা মসজিদেই উপাসনা করো না, মানুষকে ভালবাস, মানুষের সেবা কর।

একটা শতক এসে চলে গেল, আরেকটা শুরু হচ্ছে। আসন্ন এই শতক হবে ভারতের পুনর্গঠনের শতক। স্বামী বিবেকানন্দ এক নতুন, সজীব, প্রাণবন্ত ভারতবর্ষ সৃষ্টি করবেন। সেইজন্যই তিনি এসেছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'লাইফ অফ রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে সেই কথাই বলেছেন ঃ "দুহাজার বছর ধরে তিরিশ কোটি মানুষের অধ্যাত্মজীবনের ঘনীভূত রূপ হলেন রামকৃষ্ণ।" তাঁর ভাষায়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হলেন—"জগৎ-আত্মার সুমহান সঙ্গীত-মূর্ছনা—এক অসাধারণ সিম্ফনী।" কী চমৎকার প্রকাশভঙ্গি! কবি রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছেন ঃ "বিবেকানন্দ পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।... গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" রাশিয়ার লিও টলস্টয় বিবেকানন্দের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেকানন্দের কথা বলতেন। সারা বিশ্ব বিবেকানন্দের বাণীর অপেক্ষায় রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীমা সারদাদেবীর সর্বতোমুখী প্রভাব ধীরে, কিন্তু অপ্রতিহত গতিতে প্রসারিত হয়ে চলেছে—কেবল ভারতে নয়, বিশ্বের নানা দেশে, নানা প্রান্তে।

আমি আশা করি, দুদিনব্যাপী এই সম্মেলনে আমাদের যুবসম্প্রদায় এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে এবং এর মধ্য দিয়ে এক নতুন ভাবশক্তির উন্মেষ হবে, যার সহায়ে আমাদের দেশ পুনরায় জাগ্রত হয়ে তার বিধিনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অকম্পিত পদক্ষেপে ও দৃঢ়প্রত্যয়ে অগ্রসর হবে।

ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকে, তথা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে সমাগত যুবক-যুবতীদের আমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই। তাদের সমবেত চিন্তায় ও কর্মে সেই শক্তির উদ্বোধন ঘটুক, তার সুদূরপ্রসারী বিস্তার ঘটুক এবং তার প্রভাবে আমাদের জাতীয় পুনর্গঠন বাস্তবায়িত হয়ে উঠুক—এই আশা করি।

সকলকে আমার ধন্যবাদ।* ❑

* পরম পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের মূল ইংরেজী ভাষণটি বিগত ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে বেলুড় মঠে আয়োজিত যুবসম্মেলনে মূল-ভাষণরূপে প্রদত্ত। ভাষান্তর ঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ এবং শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ

❑ বর্তমান বর্ষের (১০১তম বর্ষ ঃ মাঘ ১৪০৫—পৌষ ১৪০৬/ জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৯) গ্রাহকভুক্তি ও নবীকরণ চলছে। গ্রাহকমূল্য—ভারত ঃ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ সমুদ্রডাক ৩৬০ টাকা, বিমানডাক ৭২০ টাকা; বাংলাদেশ ঃ ১৪০ টাকা।

❑ শতবর্ষে পদার্পণ সংখ্যাটি (মাঘ ১৪০৪) এবং ফাল্গুন ও চৈত্র (১৪০৪) সংখ্যা দুবার মুদ্রণের পরেও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য বর্তমান বছরের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন।

❑ সডাক গ্রাহকরা আগামী শারদীয়া সংখ্যাটি (১৪০৬/ ১৯৯৯) ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির সময় তা জানাতে পারেন।

❑ অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/ আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে।

❑ মানি অর্ডার-এ গ্রাহকমূল্য পাঠালে মানি অর্ডার কুপনে গ্রাহকসংখ্যা, নাম, ঠিকানা ও টাকার পরিমাণ স্পষ্ট করে লেখা বাঞ্ছনীয়। কলকাতা অথবা নিকটবর্তী অঞ্চলের গ্রাহকরা মানি অর্ডার না করে সম্ভব হলে সরাসরি কার্যালয়ে টাকা জমা দিলে টাকা জমা পড়ার দেরি, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। সেইসঙ্গে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার 'উদ্বোধন' হাতে হাতে সংগ্রহ করতে পারেন। এতে ডাকে তিনটি সংখ্যার পাওয়ার দেরি ও অনিশ্চয়তা থেকে অব্যাহতি পাবেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিবেকানন্দ-অগ্নির আলো-উত্তাপে মঠবাসিগণ

বেলুড় গ্রামে নিজস্ব জমি ও বাড়িতে মঠ স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠ হয়েছিল ২ জানুয়ারি ১৮৯৯। ইতিপূর্বে ডাক্তারদের পরামর্শে স্বামীজী বায়ু-পরিবর্তনের জন্য দেওঘর গিয়েছিলেন ১৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের অত্যধিক অবনতি হয়। টেলিগ্রাম পেয়ে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী সদানন্দ সেখানে উপস্থিত হন। স্বামীজী কিছুটা সুস্থ বোধ করলে স্বামী সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় বলরাম ভবনে চলে আসেন ২২ জানুয়ারি ১৮৯৯। শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন ঃ "বৈদ্যনাথে বায়ু-পরিবর্তনে কোন ফল হয়নি। সেখানে আট দিন আট রাত্রি শ্বাসকষ্টে প্রাণ যায় যায়। মৃতকল্প অবস্থায় আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে এসে বেঁচে উঠবার লড়াই শুরু করেছি। ডাঃ সরকার এখন আমার চিকিৎসা করছেন।" এ-চিকিৎসায় স্বামীজী দ্রুত আরোগ্যলাভ করেন এবং বেলুড় মঠে উপস্থিত হন ৩ ফেব্রুয়ারি। নিজস্ব জমিতে মঠ স্থানান্তরের পর এটাই ছিল মঠে স্বামীজীর প্রথম পদার্পণ।[৬৫]

কলকাতায় থাকতেই স্বামীজী 'সারা ভারতে আবার একটা আলোড়ন জাগাবার জন্য'[৬৬] কাজে নেমে পড়েছিলেন। তদনুযায়ী তিনি স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দকে প্রচারকার্যের জন্য পূর্ববঙ্গে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রকাশানন্দ রাজি হন, কিন্তু বিরজানন্দ খুবই দ্বিধাবোধ করেন। অনেক বুঝিয়ে স্বামীজী তাঁকেও রাজি করান। তাঁদের মাথায় হাত রেখে স্বামীজী বলেন ঃ "বিশ্বাস কর, তাঁর (ঠাকুরের) শক্তি তোদের ভিতর সংক্রামিত হয়েছে। জানবি সঙ্ঘই ঠাকুরের সমষ্টি-শরীর। সঙ্ঘকে যথাযথ শ্রদ্ধা দিবি, সঙ্ঘের আদেশ পালন করবি।"[৬৭] স্বামীজীর আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা দুজনে ৪ ফেব্রুয়ারি মঠ থেকে যাত্রা করেন। এ-সময়ে স্বামীজীর পাশ্চাত্যের সন্ন্যাসিনী শিষ্যা অভয়ানন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের কয়েকটি শহরে, বিশেষত কলকাতা ও ঢাকায় বেদান্ত প্রচার করতে থাকেন। এদিকে স্বামীজীর নির্দেশে গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ ৭ ফেব্রুয়ারি রাজস্থান ও গুজরাটের বিভিন্ন শহরে বেদান্ত প্রচারের জন্য যাত্রা করেন। এর আগে স্বামী সারদানন্দ ও নিবেদিতা কলকাতা ও তার আশপাশে কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা করেন। স্বামী সারদানন্দ বলরাম ভবনে মিশন অ্যাসোসিয়েশনের সভায় প্রায় প্রত্যেক রবিবারে, কলকাতার বিভিন্ন স্থানে এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহে বক্তৃতা দিয়ে যুবসমাজকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। অন্যান্য কয়েকজন কিছু কিছু মন্ত্রদীক্ষাদি দিচ্ছিলেন, কিন্তু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন স্বামীজীর শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দ। তিনি পূর্ববঙ্গে গিয়ে ৫০/৬০ জনকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন।[৬৮]

বাঙলা ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচারকার্য সুগম হয়ে উঠেছিল বাঙলা ভাষায় পাক্ষিক 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হওয়ার ফলে। স্বামীজীর নির্দেশ ছিল—"ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নতুন ওজস্বিতা আনতে হবে।" আলমোড়া জেলার মায়াবতী গ্রামে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯ মার্চ ১৮৯৯। উদ্দেশ্য ছিল 'দ্বৈতভাবের দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে অদ্বৈতভাবের প্রচার'। সেখান থেকে মাসিক ইংরেজী পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'[৬৯] প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে স্বামীজীর প্রেরণায় মাদ্রাজের তরুণ ভক্তবৃন্দ ইংরেজীতে 'ব্রহ্মবাদিন' নামে একটি সাময়িকপত্র বের করেছিলেন। এধরনের বিভিন্ন উপায়ে নতুন যুগোপযোগী ভাবধারার প্রচার সার্থক করে তোলার জন্য স্বামীজী গুরুত্ব দিয়েছিলেন ভাব সংশুদ্ধির ওপর। সে-উদ্দেশে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য স্বামীজী তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে থাকেন।

স্বামীজীর কাছে বেলুড় মঠ 'শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মক্ষেত্র', শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারের প্রাণকেন্দ্র। আর শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন "পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ", শ্রীরামকৃষ্ণ হতাশাচ্ছন্ন মানবসমাজের কাছে "জ্যোতিস্তম্ভ-স্বরূপ"। বেলুড় মঠ স্বামীজীর অতি প্রিয় স্থান। কিন্তু বেলুড় মঠে স্বামীজীর স্থূলদেহে অবস্থান সর্বসাকুল্যে ২৭৮ দিনের বেশি নয়। আলোচ্য সময়ের মধ্যে স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ফিরে তিনি মায়াবতীতে দু-সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন, গর্ভধারিণী জননীকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসামে গিয়েছিলেন, তাছাড়াও জাপানী শিল্পী ওকাকুরাকে নিয়ে বৌদ্ধগয়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে কাশীধামে গিয়ে কিছুদিন বাস করেছিলেন। চিকিৎসাদির জন্য তাঁকে কখনো কখনো কলকাতায় যেতে এবং দু-চারদিন থাকতে হয়েছিল। অন্যথায় তিনি বেলুড় মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না।

---

৬৫ দ্রঃ বেলুড় মঠের ডায়েরি।

৬৬ স্বামীজীর ২।২।১৮৯৯ তারিখের চিঠির অংশবিশেষ।

৬৭ অতীতের স্মৃতি, পৃঃ ১০৫

৬৮ স্বামী প্রেমানন্দের ৬।৩।১৮৯৮ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

৬৯ মাদ্রাজে একটি সমিতি গড়ে তুলে তার একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দেওয়ার জন্য স্বামীজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কারণ, এই নাম হিন্দুদের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আকৃষ্ট করবে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' শব্দটির ধ্বনিতেই (প্র+বুদ্ধ) বুদ্ধের অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে ভারত জুড়লে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন বোঝাতে পারবে। (স্বামীজীর ৩১।৮।১৮৯৪ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য।)

বেলুড় মঠে স্বামীজীর উপস্থিতি কাউকে বলে দিতে হতো না। তাঁর ব্যক্তিত্বের দিব্যোজ্জ্বল বিচ্ছুরণ ও অফুরন্ত ভালবাসা মঠবাসিগণকে মাতিয়ে রাখত; এক দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ মঠবাসিগণ জপ-ধ্যান, পঠন-পাঠন, সেবামূলক কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁদের ভাবময় জমাটবাঁধা গোষ্ঠীজীবন মঠের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল।

"ভারতবর্ষের আত্মার অভিব্যক্তি"[৭০] স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বেলুড় মঠে লোকের ভিড় লেগেই থাকত। তাঁকে দেখবার জন্য তখনকার দুর্গম পথঘাট অতিক্রম করে মঠে এসেছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সাধু নাগ মহাশয়, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, ফরাসী পণ্ডিত জুল বোয়া, জাপানী শিল্পী ওকাকুরা, বৌদ্ধনেতা ধর্মপাল প্রমুখ। অপরদিকে বেলুড় মঠে অবস্থানকালে স্বামীজীকে দেখা যেত তিনি বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত। কাজকর্মের মধ্যে মুখ্য ছিল তাঁর গুরুদেবের আরব্ধ কার্যের সম্পাদন। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "I have many other thoughts to think... but they have all to go to the background before the all-absorbing mission—my Master's work."[৭১] প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের 'মিশন' সম্পাদনের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছিলেন, যদিও তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, "তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) আবির্ভাবের ফলে আমরা কিছু করি বা না করি—তথাপি মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী।" এধরনের বিবেক ও বৈরাগ্য সমন্বিত বিশ্বাসের দীপ্তিতে স্বামীজীর নেতৃত্ব বেলুড় মঠে সৃষ্টি করেছিল এক অভূতপূর্ব প্রেরণাময় পরিমণ্ডল।

গঙ্গার তীরে মঠের ভূমিখণ্ডের প্রতিটি অংশই বিদ্যুৎপ্রভ স্বামীজীর স্মৃতির সৌরভে আমোদিত। দক্ষিণপ্রান্তে বেলগাছের নিচে স্বামীজী একদিন গান ধরেছিলেন ঃ

> "গিরি গণেশ আমার শুভকারী,
> পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
> চাঁদের মেলা যেন চাঁদ সারি সারি।
> বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
> গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
> ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
> আসবে কত দণ্ডী জটাজূটধারী।..."

এই বেলগাছের নিচেই ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মঠে অনুষ্ঠিত প্রথম দুর্গাপূজার বোধন ও অধিবাস হয়েছিল।

মঠভূমির উত্তরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'স্বামীজীর আমগাছ'। এ-গাছের তলায় একটা ক্যাম্পখাটের ওপর তিনি প্রায়ই বসতেন। একদিনের ঘটনা। সন্ধ্যার কিছু আগে ভাবোদ্দীপ্ত স্বামীজী উপস্থিত সাধু-ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য করে বলতে থাকেন ঃ "এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা করে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়, ধিক্ তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখতে পাচ্ছিস নে?—এই—এই!" স্বামীজীর হৃদয়স্পর্শী দিব্যবাণী শুনে উপস্থিত সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সহসা যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। স্বামী প্রেমানন্দ গঙ্গাজল হাতে নিয়ে ঠাকুরঘরে উঠছিলেন। স্বামীজীর ঐ কথা শুনে তিনিও কমণ্ডলু হাতে একটা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। প্রায় পনের মিনিট পরে স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করে বললেন ঃ "যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা।" এরপর সকলের মন আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে নেমে এল, প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে চলে গেলেন অত্যাশ্চর্য এক অভিজ্ঞতার স্মৃতি বহন করে।

আরো একটি ঘটনা স্মরণ করা যাক। ঠাকুরের ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ বা নাগ মহাশয় বেলুড় মঠে এসেছেন স্বামীজীকে দেখতে। প্রথম দর্শনেই তিনি বলে উঠলেন ঃ "আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিব-দর্শন হলো।" তাঁদের মধ্যে আলাপচারিতা জমে উঠল। কিছুক্ষণ পরে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ এনে দিলেন। নাগ মহাশয় ও তাঁর সঙ্গিগণ প্রসাদ ধারণ করে বাগানে পায়চারি করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে স্বামীজী মঠের পুকুরের ধারে চলে গিয়েছিলেন, একটি কোদাল নিয়ে পুকুরের পূর্বপারে মাটি কাটছিলেন। নাগ মহাশয়ের চোখে পড়তেই তিনি ছুটে যান, স্বামীজীকে বলেন ঃ "আমরা থাকতে আপনি ওকি করেন?" স্বামীজী কোদাল ছেড়ে মাঠে নাগ মহাশয়ের সঙ্গে বেড়াতে থাকলেন।

ডাক্তার ও সন্ন্যাসিগণের পরামর্শে স্বামীজী পুনরায় ইউরোপ ও আমেরিকায় যাওয়া স্থির করেন। এ-যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। মঠে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ১৯ জুন (১৮৯৯) স্বামীজী ভুবনেশ্বরী দেবী ও কয়েকজন পূর্বাশ্রমের আত্মীয়কে নিয়ে মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। মঠে 'ব্রাদার্স ইউনিয়ন'-এর পক্ষ থেকে স্বামী বিমলানন্দ ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। সেখানে স্বামীজী ও নিবেদিতা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, স্বামী সদানন্দ, মোহিনীমোহন চ্যাটার্জী, মহারাষ্ট্র থেকে আগত অতিথি বামন বিনায়ক আগরবাদ প্রমুখ। অতঃপর সবাই ঠাকুরঘরের বারান্দায় গিয়ে বসেন স্বামীজীর গান শোনবার জন্য। মনে হয় ভুবনেশ্বরী দেবীর অনুরোধে স্বামীজী শিব ও কালী বিষয়ক বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। সন্ধ্যা নাগাদ স্বামীজী তাঁর গর্ভধারিণী জননী ও অন্যান্যদের নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে প্রথমে সিমলায় এবং সেখান থেকে বাগবাজারে বলরাম

৭০ "তিনি ভারতবর্ষের আত্মার অভিব্যক্তি। / যা অভিভূত করেছে সারা বিশ্বকে।"—বনফুল

৭১ স্বামীজীর ২২।৩।১৯০০ তারিখে লেখা চিঠির একাংশ।

ভবনে যান। মঠ থেকে এগার জন সাধু-ব্রহ্মচারী সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। মঠে ছিলেন শুধু স্বামী প্রেমানন্দ ও আশুতোষ। স্বামীজীর বিদেশযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) বলরাম ভবনে[৭২] একটি ভাণ্ডারা দিয়েছিলেন। সেই ভাণ্ডারায় যোগদানের জন্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের সমাবেশ হয়েছিল। এইদিনই স্বামীজী রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ১৯ জুন স্বামীজী দার্জিলিঙের মহেন্দ্র ব্যানার্জীর স্ত্রীকে নিয়ে মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন উপেন্দ্রবাবু, দেবেন্দ্রবাবু প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের একটি গ্রুপ ফটো এবং স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দের একটি ফটো তোলা হয়। সন্ধ্যারতির পর একটি বিদায়-অভিনন্দন সভার আয়োজন করা হয়। স্বামী সারদানন্দের প্রারম্ভিক ভাষণের পর 'ব্রাদার্স ইউনিয়ন'-এর পক্ষ থেকে স্বামীজীকে একটি ও তুরীয়ানন্দজীকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। ভাষণ দেন স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তারপর বলেন মোহিনীমোহন ও বামন বিনায়ক আগরবাদ। প্রত্যুত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি আবেগমথিত ভাষণ দেন। তারপর স্বামীজী সন্ন্যাস ও মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি প্রাণমাতানো ভাষণ দেন। মহিষাদলের রাজার ম্যানেজার প্রত্যক্ষদর্শী শচীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন ঃ "যাওয়ার আগের দিন মঠে স্বামীজীর বক্তৃতা হয়েছিল। শুনে সকলের ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হলো। সকলেরই অন্তত ক্ষণেকের জন্য মনে হলো যে, আমরা মানুষ। স্বামীজীর খুব উৎসাহের ভরে বললেন, 'বাবা সব, তোরা মানুষ হ—এই আমি চাই। এর কিছুমাত্র সফল হলেও আমার জন্ম সার্থক হবে।' "[৭৩] স্বামী নির্মলানন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন মঠবাড়ির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য উপস্থিত সকলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে তিনবার করধ্বনি করে অভিনন্দন জানান। ২০ জুন দুপুরে শ্রীমা স্বামীজী, তুরীয়ানন্দজী ও মঠের অন্যান্য সাধুদের নিজ বাসস্থানে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান। শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে স্বামীজী যাত্রা করলেন। সন্ন্যাসিগণ ও বহু গৃহস্থ ভক্ত প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হয়ে স্বামীজীকে বিদায় অভিনন্দন জানান।

স্বামীজীর বিদেশযাত্রার পরই মঠজীবনে কিছুটা ঢিলেঢালা ভাব এসে গিয়েছিল। ২৬ জুন স্বামী সচ্চিদানন্দ (দীনু)[৭৪], স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ ও ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র মায়াবতীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। ১ জুলাই থেকে মঠে আবার নিয়মিত শাস্ত্রাদির ক্লাস, প্রশ্নোত্তরের আসর ইত্যাদি চালু হয়। কিন্তু নানান অজুহাতে পড়াশুনা মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে। স্বামী সারদানন্দ তরুণ মঠবাসীদের নিয়ে বসেন, তাদের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন, নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মাঝে বেশ কয়েক মাস সারারাত ধরে (রাত্রি ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত) ঠাকুরঘরে পালাক্রমে জপ-ধ্যানের কর্মসূচী চালু হয়। কখনো কখনো রাত্রে ধুনি জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে তাঁরা ধ্যান করতেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে খেলার মাঠ তৈরি হয়ে যায়। ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়, আমগাছতলায় প্যারালাল বার বসানো হয়। নিয়মিত শারীরিক ব্যায়ামের চর্চা হতে থাকে।

স্বামীজীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি মঠজীবনের ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় স্বামী প্রেমানন্দের লেখা দুটি চিঠি থেকে। দুটি চিঠিই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে লেখা চিঠির একাংশ ঃ "শ্রীশ্রীপ্রভুর পূজা আমাকেই করিতে হয়, যদি কোথাও যাই, খোকা করে। আগে যেরূপ ছিল এখন তার চেয়ে কিছু বদলেছে। বিবাদের ভয়ে বেশি টানাটানি করি না। ... রাখালের জ্বর হয়েছিল, এখন ভাল আছে। শরতের রক্ত আমাশয় সারেনি।... সান্ডেল প্রতি শনিবারে আসে, হিসাবপত্র দেখে সব বন্দোবস্ত করে।... আবদুল প্রভৃতি প্রায় আসে না। পূর্বে এখানে লোকে এলে শান্তি পেতো, এখন তার উলটো, কত নিয়মকানুন!... যদি একবার আস সব দেখে যাও। কত ভয়ে যে থাকি, কি বলিব।... আজকাল আলু ছাড়া তরকারি কিনতে হয় না, বরং বিলানো চলে।... পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এখন জয়রামবাটীতে, মধ্যে তাঁর cholera হয়েছিল।... এখন ভাল আছেন।"

স্বামীজীর বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের চারদিন আগে লেখা স্বামী প্রেমানন্দের চিঠির একাংশ ঃ "পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ৫/৭ দিনের মধ্যেই বোধহয় কলিকাতায় আসিবেন।... শ্রীমান স্বামীজী এখন constantinople-এ আছেন।[৭৫]... শ্রীযুক্ত রাখাল ভায়ার শরীরও অসুস্থ। হয় পেট খারাপ, নয় সর্দি—একটা না একটা আছেই। কোথাও যাওয়ার ভারি ইচ্ছা ও দরকার। কিন্তু যাওয়ার যো নেই মকদ্দমার জন্য।... রাখাল এই নিয়ে ব্যস্ত।... তারক-দা ১৩ মাস দার্জিলিঙে কাটিয়ে এখানে মাসাধিক হলো আছেন।... আর এলাহাবাদ নাগপুর ঘুরে হরিপ্রসন্ন পৌঁছেছে।... গোপাল-দা আজ তিনদিন হলো দ্বারকা দর্শনে যাত্রা করেছেন। খোকা গঙ্গার [স্বামী অখণ্ডানন্দ] কাছে ভাবদায়

---

৭২ মাস্টারমশায়ের বাড়িতে স্থানাভাবের জন্যই সম্ভবত বলরাম-ভবনে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা হয়েছিল।

৭৩ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ১৮৬-১৮৭

৭৪ তিনি মায়াবতী থেকে ফিরে আসেন ১৮।২।১৯০১ তারিখে। স্বামী সচ্চিদানন্দকে (মতিকে) স্বামীজী বেলুড় মঠে মন্ত্রদীক্ষা দেন ৫।২।১৯০১ তারিখে। ইনি পরে মায়াবতীতে অন্যতম কর্মিরূপে যোগদান করেন।

৭৫ স্বামীজী কনস্টানটিনোপলে তিনটি বক্তৃতা দেন। ('Indian Mission', 12.12.1900)

আছে।...” আর এদিকে স্বামী সারদানন্দ ২০ নভেম্বর (১৯০০) তাঁর পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট অভিষিক্ত হয়ে কলকাতায় থেকে তন্ত্রমতে সাধনভজনে নিযুক্ত ছিলেন। এইকালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দীর্ঘকাল অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

স্বামীজী বোম্বে এক্সপ্রেসে কলকাতায় এসে মঠে হঠাৎ পৌঁছান রবিবার ৯ ডিসেম্বর (১৯০০)। ইতিমধ্যে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হলেও তাঁর মনোজগতে উপস্থিত হয়েছিল বিরাট পরিবর্তন। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর ১৮ এপ্রিল ১৯০০ তারিখের চিঠির একাংশ ঃ “জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বৈ আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত।... বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদবোধ হচ্ছে।” বেলুড় মঠের সম্পত্তি একটা ট্রাস্ট গঠন করে ব্রিটিশ কনসালের অফিসে সই করার[৭৬] পর তিনি নিবেদিতাকে ২৫ আগস্ট (১৯০০) লেখেন ঃ “এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল।” বলা বাহুল্য, স্বামীজীর মধ্যে নির্বেদের ভাব প্রবল হয়ে উঠলেও মঠবাসিগণ সর্বদাই তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন।

প্রত্যাবৃত্ত স্বামীজী জানতে পারলেন মায়াবতীতে কাপ্তেন সেভিয়ার ২৮ অক্টোবর (১৯০০) মৃত্যুবরণ করেছেন। মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনাদানের জন্য স্বামীজী মায়াবতী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। ২৭ ডিসেম্বর স্বামীজী যাত্রা করার পূর্ব পর্যন্ত দলে দলে ভক্ত—এন্টালির দল, বলেনের দল, বরানগর, বাগবাজার ও বউবাজারের ভক্তগণ এবং অন্যান্য লোক স্বামীজীকে দেখার জন্য মঠে আসেন। স্বামীজী একদিন সকাল সাড়ে এগারটা পর্যন্ত গানের পর গান গেয়ে সবাইকে চমৎকৃত করেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী একদিন স্থানীয় মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ সভায় 'শিক্ষা' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।[৭৭]

মঠে প্রত্যাবৃত্ত স্বামীজী কাজকর্ম থেকে ক্রমেই নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। নতুন ট্রাস্টডীড অনুযায়ী স্বামীজী নিজে সব দায়মুক্ত হয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অধ্যক্ষ ও স্বামী সারদানন্দকে সম্পাদক নির্বাচিত করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণের পর জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করে দেন। আগস্ট মাসে কয়েকদিনের জন্য তিনি দার্জিলিঙে যান। মঠে দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। সাঁওতাল দিনমজুরদের যত্ন করে একদিন খাওয়ান। বুদ্ধগয়া ও কাশী হয়ে স্বামীজী মঠে ফিরে আসেন ৮ মার্চ (১৯০২)। স্বামীজীর মন আরো অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। মিসেস বুলকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ “আমার জীবনে এর চেয়ে স্পষ্টতরভাবে জগতের নিষ্ফলতা কখনো অনুভব করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক—এই আমার চিরপ্রার্থনা।” স্বামীজী লীলাসংবরণের জন্য প্রস্তুত। একদিন ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজী বলেন ঃ “আমার যা দেওয়ার ছিল তা দিয়ে ফেলেছি, এখন আমাকে যেতেই হবে।” নিবেদিতার প্রশ্ন ঃ “যাবেন কেন?” স্বামীজী বলেন ঃ “বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বাড়তে দেয় না; তাদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য আমাকে যেতেই হবে।” তাঁর জীবিতকালের শেষ দিনগুলি সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ “মঠের সমস্ত দেখাশুনা তিনিই করিতেন এবং ছেলেদের পড়াশুনার ভারও তিনিই লইয়াছিলেন।”

৪ জুলাই স্বামীজী তাঁর জীবনলীলায় ছেদ টানলেন। হতাশার অন্ধকার নেমে এল মঠজীবনে। মঠবাসীদের মনে হলো অন্ধকার বুঝি ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। কয়েকদিন পরে ২০ আগস্ট স্বামী প্রেমানন্দ একটি চিঠিতে স্বামী অভেদানন্দকে লিখলেন ঃ “আমরা এখন যেন জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি। সে শক্তি, সে উৎসাহপূর্ণ আদেশ, সে উদার আলোচনা আর নাই।... ঠাকুর যে বলিতেন—'তুই যেদিন স্ব-স্বরূপ জানতে পারবি সেদিন তুই শরীর ছেড়ে দিবি।' তাই হইল!... সারদা শীঘ্রই আমেরিকা যাচ্ছে হরিভায়ার স্থানে, স্বামীজী পূর্বেই ইহা বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমাদের যার যতটুকু সাধ্য সে ততটুকু স্বামীজীর কার্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। এই আমাদের সঙ্কল্প।”

আমরা লক্ষ্য করেছি, স্বামীজীর সাময়িক অনুপস্থিতি মঠজীবনে প্রভাব বিস্তার করত। এখন স্বামীজীর অন্তর্ধানে নেতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনুভব করলেন—“সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল।” মঠে ছুটে এসেছেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। প্রত্যেকেই অনুভব করেছেন এক মহাশূন্যতা। মঠে স্বামীজীর ঘর, বিছানা, আসবাবপত্র সবই আছে, কিন্তু স্বামীজী কোথায়? মঠবাসিগণ শোক সামলাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, সেসময়ে কয়েকটি বিপদ উপস্থিত হলো। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ত্যাগ করে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়লেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অনাগারিক ধর্মপাল, মিস মূলার, স্বামী অভয়ানন্দ প্রমুখ ক্ষুব্ধ ব্যক্তি, ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন গোষ্ঠী, নববৌদ্ধ আন্দোলন, নববৈষ্ণব আন্দোলন, খ্রীস্টান মিশনারিগণ মঠ ও মিশনের বিরুদ্ধে শত্রুতা তীব্রতর করে তুলল। এমনকি অর্বাচীন একদল বিবেকানন্দ-অনুরাগী “বেলুড় মঠ আমাদের গুরুর মঠ” ধ্বনি তুলে অশান্তি সৃষ্টি করল। তখন সন্ন্যাসীদের অনেকেই সঙ্কল্প করলেন নির্জনে জপধ্যান করে বাকি জীবন তাঁরা অতিবাহিত করবেন।

৭৬ এই ট্রাস্টের দলিল চরম রূপ নিয়ে স্বামীজী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৩০।১।১৯০১ তারিখে।

৭৭ এই ভাষণের বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'Vivekananda in Indian Newspapers (1893-1902)'-এ উল্লিখিত 'The Indian Mirror', February 15, 1901 দ্রষ্টব্য।

হতাশায় আচ্ছন্ন ভগ্নোদ্যম সন্ন্যাসীদের স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ অনেক বুঝিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদের স্বস্থ করে তুললেন। ইতিমধ্যে স্বামীজীর অবর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যুবকরা যেন নতুন এক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। স্বামীজীর নামে যুবকগণ নতুন নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে থাকল। 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' নামে বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় তখন। স্বামী সারদানন্দ ৪ অক্টোবর ১৯০২ একটি চিঠিতে মন্তব্য করলেন: "The young specially are showing such eagerness to accept him (Swamiji) as the ideal." যুবকদের আগ্রহ ও উৎসাহে মদত দেওয়ার জন্য স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রমুখ এবং ভগিনী নিবেদিতা কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। কলেজের ছাত্রদের জন্য 'বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির' নামক ছাত্রাবাস যুবকদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। অবশ্য এই স্মৃতিমন্দির একবছর পরেই বন্ধ করে দিতে হয়।

স্বামী সারদানন্দ সেকালে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মঠ থেকে যাত্রা করে কাশী, কনখল, বৃন্দাবন ও এলাহাবাদে মঠ-মিশনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে কিছুদিন বাস করেন এবং নির্জনে জপধ্যান করে ও সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন সেবাকার্যে নানা উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে মঠে ফিরে আসেন। কিন্তু ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুরের জন্মোৎসবের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ টাইফয়েডে দীর্ঘদিন ভোগেন এবং কাজকর্মের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে সরে যান। স্বামী সারদানন্দ ২৭ জুন ১৯০৫ তারিখের চিঠিতে লিখলেন: "... the whole of the Math responsibilities have virtually fallen on me." অবশ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে স্বামী সারদানন্দকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন। [ক্রমশ]

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

শঙ্কর ঘোষ

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ', দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যার রচনাকাল পরিব্যাপ্ত। অতঃপর সুদীর্ঘ দেড়শ বছর বাঙলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন আমরা পাই না। বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি ও বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে সে এক অন্ধকার যুগ। কারণ সেসময় জুড়ে এখানে রাজত্ব করেছিল তুর্কীরা। নির্বিচারে তারা হিন্দু ও বৌদ্ধদের মঠ, মন্দির ভেঙেছে, দলে দলে মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করেছে। লুঠতরাজ, খুনজখম, গুপ্তহত্যা—এসবই ছিল তখন স্বাভাবিক ঘটনা। যেখানে মানুষের জীবনের নিরাপত্তাই নেই, সেখানে সাহিত্যসৃষ্টি কিভাবে সম্ভব? কিন্তু চিরদিন তো একইরকম যায় না। তুর্কী শাসকগণ ক্রমশ ভালবাসতে শুরু করল এদেশের মাটিকে, এদেশের মানুষকে। বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনায় উৎসাহ দিতে লাগল। তুর্কী শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যসৃষ্টিতে প্লাবন এল। সেই পর্বের প্রথম গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এক অসাধারণ দলিল-রূপে গ্রন্থটি চিহ্নিত। কারণ, 'চর্যাপদ' বহু কবির মিলিত সৃষ্টির ফল, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সেদিক থেকে একক কবি রচিত এক গ্রন্থ।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কার-পর্বটিও অভিনব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ থেকে অবৈতনিক পুঁথি সংগ্রহকারক-রূপে বসন্তরঞ্জন রায় যখন গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে ফিরছিলেন, তখন (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) শীতকালের এক সন্ধ্যায় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার কাঁকিল্যা গ্রামের বাসিন্দা দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচার ওপর ধামায় রাখা একরাশি পুঁথির মধ্য থেকে আবিষ্কার করলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। অবহেলিতভাবে পড়ে থাকার ফলে এর প্রথম ও শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেল না। কিন্তু ঐ খণ্ডিত পুঁথিটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে নিজে সম্পাদনা করে যখন বসন্তরঞ্জন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করলেন, তখন মুখবন্ধে লিখলেন, এটিই হলো বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

গ্রন্থটির নামকরণ নিয়ে অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। যেহেতু প্রাপ্ত পুঁথিটির প্রথম ও শেষের কয়েকটি পাতা পাওয়া যায়নি, তাই মূল পুঁথিটির কি নাম ছিল, তা জানা যায় না। তাছাড়া প্রাপ্ত পুঁথির মধ্যে একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটি পাওয়া যাওয়ায় কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' রাখা উচিত ছিল বলে মনে করেছেন। কিন্তু আজ থেকে প্রায় আশি বছর পূর্বে বসন্তরঞ্জন যে-নামটি ব্যবহার করেছেন, সেটি সাধারণের কাছে এমনভাবে প্রচারিত হয়ে খ্যাতি-অখ্যাতির শিরোপা লাভ করেছে যে, এই নামকরণের পরিবর্তনের কোন কথাই ওঠে না। সম্পাদকের এই নব নামকরণ এপর্যন্ত প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং 'শূন্যপুরাণ'-এর মতো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর সম্পাদকের দেওয়া নামই বাঙলা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

চণ্ডীদাস নাম নিয়েও সমস্যা রয়েছে। মধ্যযুগে বহু চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া গেছে—বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রভৃতি। তবু আলোচ্য গ্রন্থের চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাস নামের উল্লেখই করেছেন বারংবার। এছাড়া তিনি নিজেকে বাসুলীদেবীর উপাসক বলেও উল্লেখ করেছেন—

> "বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ
> গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।"

মধ্যযুগে আত্মপরিচয় দেওয়াটা কবিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে পুঁথিটির প্রথমদিকের কিছু পাতা না পাওয়া যাওয়ায় বড়ু চণ্ডীদাসের জীবনকথা কিছুই জানা যায় না। শুধুমাত্র অনুমাননির্ভর কিছু কথা জানা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, কবি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কাব্যে বিভিন্ন রাগ-রাগিনী ও সংস্কৃত শ্লোকের দৃষ্টান্ত থেকে কেউ কেউ অনুমান করেছেন, কবি সংস্কৃতে যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

ঠিক কোন্ সময়ে কাব্যটি রচিত হয়েছিল তা সঠিক জানার উপায় নেই। কারণ, পুঁথির মধ্যে রচনাকালের কোন তথ্য নেই। লিপি-বিশারদ পণ্ডিতরা চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে অভিমত পোষণ করেছেন। ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা চর্যাপদের পরবর্তী স্তরের খ্রীস্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর খাঁটি বাঙলা ভাষা। লিপিতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন বঙ্গলিপির নানা নিদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে বসন্তরঞ্জনের সঙ্গে একযোগে মতপ্রকাশ করলেন যে, এই পুঁথি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই লেখা। পাশাপাশি বিষয়বস্তুর দিক থেকে কাব্যটি যে চৈতন্যপূর্ব যুগের রচনা, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সংস্কৃতে রচিত ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনীকে অনুসরণ করে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর বিশেষ প্রভাব শিরোধার্য করে এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। ডঃ নরেশচন্দ্র জানা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "বড়ু চণ্ডীদাস বাঙলা সাহিত্যের আদি কবি বাল্মীকি। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' খাঁটি বাঙলা ভাষায় বাঙালী

রচিত প্রথম কাব্য।"[১] কাব্যটিতে মোট তেরটি খণ্ড রয়েছে। খণ্ডগুলি হলো যথাক্রমে—জন্ম-খণ্ড, তাম্বুল-খণ্ড, দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড, ভার-খণ্ড, ছত্র-খণ্ড, বৃন্দাবন-খণ্ড, কালিয়দমন-খণ্ড, যমুনা-খণ্ড, হার-খণ্ড, বাণ-খণ্ড, বংশী-খণ্ড ও রাধাবিরহ। সব কটি খণ্ডের নামকরণ 'খণ্ড' দ্বারা চিহ্নিত হলেও ত্রয়োদশ খণ্ডটি 'খণ্ড' চিহ্নিত না হয়ে 'বিরহ' শব্দযুক্ত হওয়ায় বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

ভূভার হরণের জন্য বৈকুণ্ঠ থেকে বিষ্ণু মর্ত্যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে এবং লক্ষ্মী রাধা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন; অতঃপর এঁদের লীলাকথাই এই কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। নারীজন্ম গ্রহণ করে রাধা যে লক্ষ্মী এবং শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁরই স্বামী বিষ্ণু, তা রাধা বিস্মৃত হয়েছিলেন। মর্ত্যজন্মে তাঁর বিয়ে হয় আয়ান ঘোষের ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ ইনি 'আইহন' নামে উল্লিখিত) সঙ্গে। বড়াই বুড়ির মুখে রাধার পরিচয় শুনে শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীর স্বরূপ বুঝতে পারলেন এবং রাধাকে তাঁর পূর্বস্বরূপ মনে করিয়ে দিতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু কুলবধূ রাধা কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের কথায় কর্ণপাত করলেন না। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে রাধার অন্তরে বিশ্বাস ফিরে এল এবং শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেন। উভয়ে মহানন্দে মিলিত হলেন। কিন্তু হরিষে বিষাদের মতো শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ও রাধাকে ছেড়ে কংসবধের জন্য মথুরায় চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনতে বড়াই মথুরায় গিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানালেন—

"মথুরা আইলোহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাশ।।"

শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে রাধার অপরিসীম দুঃখ ও বেদনা নিয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতঃপর কাব্যটিতে কি ছিল তা জানার উপায় নেই। কারণ, শেষের দিকের পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া যায়নি।

কাব্যটিতে প্রধান চরিত্র তিনটি—শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই বুড়ি। এই তিনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাব্যকাহিনী প্রসারিত হয়েছে। ঠিক জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর মতো। রাধা চরিত্রটি কাব্যের সর্বাপেক্ষা সজীব ও জীবন্ত চরিত্র। এই চরিত্র চিত্রণে বড়ু চণ্ডীদাস অসামান্য শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণবিমুখ রাধা কিভাবে ধীরে ধীরে কৃষ্ণগতপ্রাণা হয়ে উঠেছেন তার চূড়ান্ত প্রমাণ মেলে 'বংশী-খণ্ড'-এ—

"কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নঈকূলে।
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রন্ধন।।"

সেই শ্রীকৃষ্ণবিহনে রাধার বিলাপ ও হাহাকার 'রাধাবিরহে' ধ্বনিত হয়েছে। মধ্যযুগের প্রথম আখ্যান-কাব্যে এমন অপূর্ব নারীচরিত্রের ক্রমবিকাশ বড়ু চণ্ডীদাস অপূর্ব নৈপুণ্যে রচনা করেছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের আরেক স্মরণীয় সৃষ্টি বড়াই বুড়ি। সম্পর্কে তিনি রাধার মায়ের পিসিমা। এই চরিত্রের প্রয়োজন হয়েছে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিকাশের জন্য। নায়ক-নায়িকার প্রেমের দৌত্যকার্য তিনি চমৎকারভাবে পালন করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে এই চরিত্রের পরিকল্পনা। রাধা-কৃষ্ণের মিলনের জন্য বড়াইয়ের যে দৌত্যকর্ম, এর পশ্চাতে তাঁর কোন স্বার্থচিন্তা ছিল না। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পরিচয় জেনেই বড়াই বুড়ি এই সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। বড়াই একইসঙ্গে স্নেহশীলা এবং পরিহাসনিপুণা। তাঁর আচরণ, উচ্চারণ সবই চরিত্রগত ও স্বভাবধর্মানুসারী।

তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রাঙ্কণে বড়ু চণ্ডীদাস সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেননি। রাধার চরিত্রের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণচরিত্র দুর্বলভাবে অঙ্কিত। এপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সমালোচক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "সেই স্থূল গ্রাম্যতা কৃষ্ণচরিত্রেই সমধিক ধরা পড়েছে। কবি কৃষ্ণচরিত্রে সুবিচার করতে পারেননি।"[২] কবি ভাগবত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র অঙ্কন করেননি। একমাত্র কংসবধের জন্য মথুরাযাত্রার সময়ে তাঁর আচরণে দৈবভাব কিছুটা পরিলক্ষিত হয়।

বাঙলা সাহিত্যের বহু বিতর্কিত এই কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ "উক্তি প্রত্যুক্তিঘটিত সংঘাতমূলক নাট্যধর্মী সংলাপ রচনায় বড়ু চণ্ডীদাসের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে। এর ওপর আছে গীতিকাব্যের ভাবোচ্ছ্বাস। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' তাই এক অভিনব কাহিনীকাব্যের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। আদি মধ্যযুগে কাব্যটি তুলনাবিহীন।"[৩]

যেখানে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিসমাপ্তি, সেখান থেকেই পদাবলী সাহিত্যের সূচনা বলে উল্লেখ করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ প্রমথনাথ বিশী। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রাধা ও বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকে প্রমথনাথ বৈষ্ণব কাব্যের 'পূর্ব রাধা' ও 'উত্তর রাধা' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর অংশবিশেষের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অবিকল মিলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। যেমন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বিরহদগ্ধা রাধা বলেছেন—

১ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—নরেশচন্দ্র জানা, সন্ধ্যা লাইব্রেরী, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সং, জুলাই ১৯৯২, পৃঃ ১৭
২ বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সংশোধিত ৭ম সং, ১৩৯২, পৃঃ ২৯
৩ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১০ম সং, জুলাই ১৯৮৮, পৃঃ ৩২

"মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়াইবো নানা দেশে।"

চণ্ডীদাসের রাধা বলেছেন—

"আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেথায় নিঠুর হরি।"

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রাধা বলেছেন—

"দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।"

চণ্ডীদাসের রাধা বলেছেন—

"সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী।"

পদাবলী সাহিত্যে যে প্রেমঘন রাধামূর্তিকে দেখি, নিঃসন্দেহে বড়ু চণ্ডীদাসের কবি-বিধাতাই তার আদি নির্মাতা।

কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হলেও কাব্যটির মূল সম্পদ রাধাচরিত্রের বিবর্তনে। সেই রাধার বিবর্তন নিয়ে অধ্যাপিকা সত্যবতী গিরি বলেছেন ঃ "বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ যে রাধাচরিত্র পাই, সেই রাধা বাস্তব জগতের অধিবাসিনী। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আদ্যন্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই রাধা একই সঙ্গে শিরীষ কুসুমের মতো কোমল এবং স্বর্ণপ্রতিমার মতো ধাতব কাঠিন্য ও সৌন্দর্যে উজ্জ্বল।"[৪]

নবজাত বাঙলা ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের লেখনীতে সহজ সাবলীল ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এটি খাঁটি বাঙলাভাষার কাব্য—সংস্কৃত কাব্যাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত। পয়ার, ত্রিপদী ছন্দে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব পাঠকের নজর এড়ায় না। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অলঙ্কারের প্রয়োগও আকর্ষণীয়।

"বন পোড়ে আগ বড়াই জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।।"

মধ্যযুগের এমন অভূতপূর্ব কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "ভাষা-ভঙ্গিমা, চরিত্র-রূপায়ণ, বিচক্ষণতা, কাহিনীর বাঁধুনি ও নাটকীয় চমৎকারিত্বের বিচারে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একটি অনন্যসাধারণ কাব্য। মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশে এই কাব্যই হলো রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রথম কাহিনী-কাব্য। সেদিক থেকে কবি ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য।"[৫] ❑

---

৪ বিষয় ঃ প্রবন্ধ, প্রধান সম্পাদক—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৭, পৃঃ ৫৬-৫৭

৫ বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২৭

> এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্র

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ (১৪০৫) সংখ্যায় প্রকাশিত অমিয়কুমার ভট্টাচার্যের লেখা 'উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্র' প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। সেজন্য লেখককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে এত বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা আগে কখনো চোখে পড়েনি। রোগটি সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম তথ্যে সমৃদ্ধ এই প্রবন্ধটি রচনা করে লেখক আমাদের মতো রোগীদের প্রভূত উপকার করেছেন।

আমি এই রোগের শিকার। অনেকদিন ধরে ভুগছি। অনেক ভুল চিকিৎসা হয়েছে। বয়স ৬৬ বছর। CIZA ও Laxative খেয়ে কোন উপকার পাচ্ছি না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমাকে 'কবজ্‌হার' খেয়ে যেতে বলেছেন, কিন্তু আমি তা সহ্য করতে পারি না। যদিও obstinate constipation, piles আছে। প্রস্টেটের অসুবিধার জন্য সব ওষুধ চলে না। ইসবগুলের ভুসিতে শুধু পেট ভার করে, ক্ষুধামান্দ্য বাড়ায়। Soluble fibre rich diet, vitamin capsules নিয়মিত খাই, যোগাসন ও জোরে ভ্রমণ অনেকদিন ধরে করছি। পেঁয়াজ, ভাজাভুজি, ঝালমশলা খাই না, তবুও পায়খানার বেগ ভাল হয় না। খুবই জোর দিতে হয়, তবুও কিছুতেই পরিষ্কার হয় না। এবিষয়ে ডাঃ ভট্টাচার্যের পরামর্শ প্রার্থনা করি।

আমার Hyperacidity আছে। আমার পক্ষে হাতে-গড়া আটার রুটি ও ঘরে পাতা দই খাওয়া উচিত না অনুচিত? খেয়ে অবশ্য কোন অসুবিধা হয় না। চিনি দিয়ে দই খেলে কি দইয়ের গুণ নষ্ট হয়ে যায়?

আলোচ্য প্রবন্ধটি পড়ে জানলাম, ফলের শর্করা বৃহদন্ত্রে গ্যাস সৃষ্টি করে। কিন্তু ফল খাওয়া এই রোগে অপরিহার্য নয় কি?

যতদূর জানি, মাখন পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকে, কিন্তু প্রবন্ধে মাখন পথ্য হিসাবে খেতে বলা হয়েছে। আমার প্রায় সারাদিনই পেট ভার থাকে, ক্ষুধামান্দ্য, constipation-ও আছে। আমার পক্ষে কি মাখন খাওয়া উচিত হবে?

এইসব জিজ্ঞাসার উত্তরে লেখকের মূল্যবান মতামত জানতে ইচ্ছে করে।

বাদলচন্দ্র ঘোষ
রায়পাড়া বাই লেন, কলকাতা-৭০০ ০৫০

লেখকের উত্তর

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ 'উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্র' প্রসঙ্গে শ্রীবাদলচন্দ্র ঘোষের মন্তব্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রীঘোষের অবগতির জন্য জানাই, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য ইসবগুলের ভুসি এক গ্লাস জলে এক বা দুই চামচ এক ঘণ্টা ভিজিয়ে সন্ধ্যায় খাবেন। সঙ্গে তরল প্যারাফিন (cremaffin অথবা creamaffin pink) দুই চামচ খেতে হবে। সারাদিনে প্রচুর জল পান করবেন। এতেও কোষ্ঠবদ্ধতা না কমলে সেনাযুক্ত ইসবগুল (Naturolax forte) অথবা আলাদাভাবে ইসবগুল ও সেনা (Glaxenna/Pursenid) ট্যাবলেট একটা কি দুটো খেতে পারেন। মলত্যাগের সময় বিশেষ চাপ দেবেন না। কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হলে অর্শ (piles) ভাল হবে। চিকিৎসকের পরামর্শমত মলম ব্যবহার করা যেতে পারে। অম্লের (acidity) জন্য কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছেন এমন রোগীর Milk of magnesia ট্যাবলেট দু-চারটি রোজ খাওয়া ভাল। অন্য সাধারণ অম্ল উপশমকারী ট্যাবলেটও (যেমন Gelusil, Diagene ইত্যাদি) কাজ দেবে। যদি পেটে ব্যথা না করে তাহলে হাতে-গড়া রুটি চলবে। ঘরে পাতা দই উপকারী। ডায়াবেটিস না থাকলে চিনি মেশাতে আপত্তি নেই। ফলের রস বেশি পরিমাণে খেলে গ্যাস হবে, কিন্তু ফল খেলে হবে না। পাকা কলা, পেঁপে, পেয়ারা, আপেল, সফেদা, কালোজাম পরিমাণমত খেতে পারেন। মাখন চলতে পারে, তবে আপনার বয়সে না খাওয়াই উচিত। আপনি অন্য যেসব নিয়ম করেন সেগুলি ভালই।

আমার প্রবন্ধে উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্রের রোগীদের নানা লক্ষণের কথা লিখেছি। সকলের একরকম চিকিৎসা বা খাদ্যতালিকা হয় না। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমত খাদ্যতালিকা, ঔষধ, চিকিৎসা ও জীবনযাত্রা ঠিক করে নিতে হবে।

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য
সুরেন্দ্রনাথ কো-অপারেটিভ হাউসিং এস্টেট
মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ (১৪০৫) সংখ্যার প্রচ্ছদ দেখে অভিভূত হলাম। ১০০ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ এই মহান পত্রিকার সূচনা করেছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সমস্ত দিন অভুক্ত থেকে, গায়ে জ্বর নিয়ে দিনের পর দিন 'উদ্বোধন'-এর কাজ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদপুষ্ট, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অক্লান্ত শ্রমে গঠিত সেই চিরনবীন 'উদ্বোধন' ১০১ বছরে পড়ল। 'উদ্বোধন' আমাদের গর্ব, বাঙালীর গর্ব। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা এবং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কথায় সমৃদ্ধ 'উদ্বোধন'-এর পরমায়ু অযুত বছর হোক। 'উদ্বোধন' আমাদের মনের অন্ধকার দূর করে চলুক। 'উদ্বোধন' পাঠ করে আমরা এবং পরবর্তী কালের মানুষেরা আরো শুদ্ধ হয়ে উঠি।

রমা দাশগুপ্ত
যশোর রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৮

'উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষের সপ্তম (শ্রাবণ ১৪০৫) সংখ্যার সম্পাদকীয় ('কথাপ্রসঙ্গে') গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নিবেদিত 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গুরুবাদ' এবং ঐ সংখ্যায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের বিশেষ নিবন্ধ 'গুরুতত্ত্ব' পড়ে আমি অভিভূত।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, আমি কেমন

মনোভাব নিয়ে গুরুর নিকট উপস্থিত হব, গুরুর নিকট উপদেশ ও নির্দেশ লাভ করার জন্য আমাকে কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হতে হবে, গুরুর কাছে আমি কিভাবে মনের প্রার্থনা ব্যক্ত করব, এইসব নানান জিজ্ঞাসা মনকে সর্বদা ব্যাকুল করত। এই লেখা দুটি আমার ঐসকল জিজ্ঞাসার সদুত্তর দান করেছে এবং মন এক প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছে।

স্বামীজী প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের সোপানস্বরূপ। 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যাই যেন আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞানতার বন্ধ দুয়ারটি একটু একটু করে উন্মুক্ত করে এবং আমাদের মনের সমস্ত কলুষ অপসারিত করে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করছে। অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, দুঃখ থেকে আনন্দে এবং মনের সকল ব্যথা-বেদনাকে জয় করার চাবিকাঠি 'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন' শুধু আমাদের মতো দীক্ষিত ভক্তদেরই নয়, বঙ্গভাষী ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীর মহাসম্পদ।

অঞ্জলি সেনগুপ্ত
দ্বারিক জঙ্গল রোড, ভদ্রকালী
হিন্দমোটর, হুগলী-৭১২ ২৩২

'উদ্বোধন'-এর গত শারদ (১৪০৫) সংখ্যায় আমার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে—এ-সংবাদ আগেই পেয়েছিলাম। অবশেষে 'উদ্বোধন' হাতে এল। 'উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষের এই নবম তথা শারদ সংখ্যায় আমার কবিতা প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমার খুবই ভাল লাগছে। কারণ, 'উদ্বোধন' সত্যিই আমাদের কাছে পরম গৌরবের পত্রিকা এবং বিশেষ করে এই সংখ্যাটি নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য একটি সংখ্যা হয়ে উঠেছে। তাপস বসু ঠিকই লিখেছেন—'উদ্বোধন ঃ বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা'। খুব সুন্দর একটি নতুন 'আবিষ্কার-কাহিনী' লিখেছেন কিষাণচাঁদ ভকত। লেখাটির জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শান্তি সিংহ-র শ্রুতিনাটকটি শ্রুতিনাটক হিসাবে ততটা গ্রাহ্য না হলেও এক ঝলকে স্বামীজীর জীবন-পরিক্রমা সেখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 'বিজ্ঞান' বিভাগে দীপঙ্কর দাশগুপ্তের আলোচনাটি—'পেটেন্ট বায়োপাইরেসি ও নয়া আগ্রাসনবাদ' খুবই প্রাসঙ্গিক। শ্যামলী মহাপাত্রের 'রানী রাসমণি ঃ এক বিস্মৃত মহীয়সী' বেশ ভাল একটি লেখা। তবে তিনি কি সত্যিই বিস্মৃত? ২০০ বছর আগের এই মহীয়সীর জন্য আমরা এখনো গর্ব অনুভব করি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণের মথুর' খুব ভাল লেগেছে।

বস্তুত, আলোচ্য সংখ্যাটির কবিতা এবং অন্যান্য সব লেখাই—সমাজদর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন সবদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। সংখ্যাটি হাতের কাছে থাকলে অনেক উপকারে আসবে বিভিন্ন সময়ে।

নিভা দে
ভাবা রোড, দুর্গাপুর, বর্ধমান-৭১৩ ২০৫

'উদ্বোধন' পত্রিকা দিনে দিনে আমাদের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠছে। প্রতি মাসে উদ্গ্রীব হয়ে দিন গুনি, কবে 'উদ্বোধন' হাতে পাব। কোন্টা ছেড়ে কোন্টা পড়ব ভেবে পাই না। আগে বাছতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তাম। তাই এখন আর সে-পথে না গিয়ে একদম প্রথম থেকে শুরু করি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনটাই বাদ দিতে পারি না। মনে হয় ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে যেন চোখের সামনে দেখছি, তাঁদের আশীর্বাদ যেন ঝরে পড়ছে মাথার ওপর। মাঝে মাঝে তাঁদের সান্নিধ্য অনুভব করে সারা শরীরে শিহরণ জাগে। একটুও বাড়িয়ে লিখছি না।

'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগটি চালু হয়ে পাঠক-পাঠিকাদের আরো উপকার হয়েছে। এত আপন যে 'উদ্বোধন'—তার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় এই বিভাগে নিজের মনের কথা বলে।

'বিজ্ঞান' বিভাগটিতে নানারকম অসুখ ও তার প্রতিকারের কথা থাকে। আমাদের মতো পেনসনভোগীদের কাছে এই বিভাগটি যেন পরম বন্ধুস্বরূপ। এই বৃদ্ধ বয়সে প্রায়ই কোন না কোন উপসর্গ দেখা দেয়। 'বিজ্ঞান' বিভাগে যেন বুঝে বুঝেই সেইসব উপসর্গকে নিয়ে আলোচনা হয়। আমাদের পক্ষে সবসময় বড় বড় ডাক্তার দেখানো তো সম্ভব নয়, কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর বিজ্ঞান বিভাগ আমাদের সেই অভাব মিটিয়ে দেয়। আমার তো মনে হয়, করুণাময়ী মা-ই যেন আমাদের কষ্টে কাতর হয়ে আমাদের কাছে চলে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন বিশাল বটগাছের মতো মানুষকে শান্তির আশ্রয় দিতে। 'উদ্বোধন'-ই যেন স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত সেই বটগাছ, যার ছায়ায় আজ শত শত আর্ত ও জিজ্ঞাসু মানুষ শান্তির আশ্রয় লাভ করে ধন্য হয়ে চলেছে।

সবশেষে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই পূজনীয় 'উদ্বোধন'-সম্পাদক মহারাজকে, যাঁর অক্লান্ত ও সুযোগ্য বারিসিঞ্চনে আজ এই বটগাছ শাখাপ্রশাখায় বিস্তার লাভ করে সহস্র সহস্র মানুষের বন্ধু ও শান্তির আশ্রয় হয়ে উঠেছে।

ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য
স্টেশন রোড, বালীগঞ্জ, কলকাতা-১৯

'উদ্বোধন ঃ বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা'—সম্পূরক তথ্য

উনিশ শতকে বাঙলাভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা সহস্রাধিক। এইসব পত্রিকার অধিকাংশই কালস্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। পরিস্থিতি যখন এইরকম তখন একটি পত্রিকার ১০০ বছর ধরে টিকে থাকাটা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক ব্যাপার। সম্প্রতি এই গৌরবের অধিকারী হয়েছে 'উদ্বোধন' পত্রিকা।

শতবর্ষ পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের প্রচেষ্টায় পাক্ষিক হিসাবে যে-পত্রিকার জন্ম এবং সূচনার এক দশকের মধ্যে মাসিক পত্রিকা-রূপে যার আত্মপ্রকাশ, বিশ শতকের শেষপ্রান্তে এসেও তার জয়যাত্রা অব্যাহত—এটি বাঙলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে মনে রাখার মতো ঘটনা।

এসব কথা নতুন করে মনে পড়ল ১৪০৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ তাপস বসুর 'উদ্বোধন ঃ বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা' লেখাটি পড়ে। নিষ্ঠার সঙ্গে বাঙলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'উদ্বোধন'-এর স্থান নির্ণয় করেছেন তাপস বসু। বিশ্লেষণ করেছেন পত্রিকা প্রকাশের পিছনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা। তাছাড়া 'উদ্বোধন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙলা

গদ্যসাহিত্যের বিবর্তনে সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভূমিকার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করতেও তিনি ভোলেননি। 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং এর রচনাবলী সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন তিনি। 'উদ্বোধন'-এর সাফল্যের পিছনে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকার কথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

'উদ্বোধন' প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিন পরেই সাহিত্যের বাহন হিসাবে স্বামীজী চলিতভাষাকে বরণ করে নেন। তখনকার দিনে সাহিত্যের স্বনিযুক্ত অভিভাবকরা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখেননি। এজন্য পত্রিকাটিকে প্রচুর কটাক্ষও সহ্য করতে হয়। তা সত্ত্বেও 'উদ্বোধন' কিন্তু তার পথ থেকে সরে আসেনি। সাহিত্যচর্চায় চলিতভাষার মূল্য প্রদানে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আমরা উচ্চকণ্ঠ, কিন্তু এবিষয়ে 'উদ্বোধন'-এর ভূমিকা বিষয়ে আমরা নীরব! বিষয়টির দিকে তাপস বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সম্পর্কে আরো কিছু খবর তাপস বসু আমাদের জানাতে পারতেন। কিছুদিন আগে 'উদ্বোধন'-এ অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট লেখা বের হয়। সেটির সাহায্য নিয়ে তাপস বসু আমাদের কৌতূহল পুরোপুরি মেটাতে পারতেন। ভবিষ্যতে 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় তাঁর কাছ থেকে এধরনের আরো লেখা প্রত্যাশা করি।

স্বপন বসু
বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলকাতা-৭০০ ০২৯
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান এবং
অতিথি অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

আমার লেখা 'উদ্বোধন: বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা' প্রবন্ধটি ১৪০৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন অর্থাৎ শারদীয়া সংখ্যার 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্র-পত্রিকার নাম, প্রকাশকাল এবং আয়ুষ্কালের কথা তুলে ধরেছিলাম। সেইসকল সাময়িক পত্র-পত্রিকার কোনটিই 'উদ্বোধন' পত্রিকার মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষ অতিক্রম করতে পারেনি, সেই তথ্যও উল্লেখ করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক পর্যন্ত প্রকাশিত বেশ কয়েকটি বিখ্যাত পত্র-পত্রিকার নাম অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছিল। আমার লেখা সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধের সম্পূরক তথ্য-রূপে অনুল্লিখিত সাময়িকপত্রের নাম ও প্রকাশকাল এখানে উল্লেখ করলাম। তবে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও দৈনিক এইসকল পত্র-পত্রিকার আয়ুষ্কাল ৩ মাস থেকে ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত। আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হলেও সমসাময়িক কালে এই পত্র-পত্রিকাগুলি সাময়িকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল।

সেইসব পত্র-পত্রিকাগুলি হলো—জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১), অবলাবান্ধব (১৮৬৯), বঙ্গবন্ধু (১৮৭০), বঙ্গমহিলা (১৮৭০), বঙ্গদর্শন (১৮৭২), মধ্যস্থ (১৮৭২), জ্ঞানাঙ্কুর (১৮৭২), বান্ধব (ঢাকা থেকে প্রকাশিত, ১৮৭৪), ধর্মপ্রচারক (১৮৭৭), আনন্দবাজার পত্রিকা (১৮৭৮-এ সাপ্তাহিক-রূপে প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরেজী-রূপে প্রকাশ হওয়ায়), তত্ত্বকৌমুদী (১৮৭৮), নববিভাকর (১৮৭৯), মাসিক সমালোচক (১৮৭৯), প্রভাতী (১৮৭৯), বিশ্ববন্ধু (১৮৭৯), হিন্দুদর্শন (১৮৮০), ধর্মবন্ধু (১৮৮১), বঙ্গবাসী (১৮৮১), সখা (১৮৮৩), বঙ্গবাসিনী (১৮৮৩), সুনীতি (১৮৮৩), নব্যভারত (১৮৮৩), সঞ্জীবনী (১৮৮৩), ভারতদর্পণ (১৮৮৩), আহমদী (১৮৮৩), বৌদ্ধবন্ধু (১৮৮৪, মাঝে ১৮৮৭-তে এক বছর বন্ধ থাকলেও ৩১ বছর প্রকাশিত হয়েছিল), জাহ্নবী (১৮৮৪), প্রচার (১৮৮৪), নবজীবন (১৮৮৪), দৈনিক (১৮৮৫), তত্ত্বমঞ্জরী (১৮৮৫, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী পার্ষদ রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ও প্রকাশিত), বিভা (১৮৮৭), মালঞ্চ (১৮৮৮), সুধাকর (১৮৮৯), ভারতভগিনী (১৮৮৯), সম্মিলনী (১৮৮৯), সাহিত্য কল্পদ্রুম (১৮৮৯), মজলিস (১৮৯০), জন্মভূমি (১৮৯০), হিতকরী (১৮৯০), সাহিত্য (১৮৯০), হিতবাদী (১৮৯১) ও সাধনা (১৮৯১)—এই দুটি পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন, মুকুল (১৮৯৫), সৌরভ (১৮৯৫), ব্রহ্মবাদী (১৯০০), শিল্প ও সাহিত্য (১৯০০), বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়, ১৯০১)—এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ভারতমহিলা (১৯০৫), আর্যদর্পণ (১৯০৮), ধর্ম (১৯০৮)—এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন অরবিন্দ, মানসী (১৯০৯), বঙ্গমহিলা (নবপর্যায়, ১৯১৫), মানসী ও মর্মবাণী (১৯১৫), নৈবেদ্য (১৯১৫), শান্তিনিকেতন (১৯১৯), ধর্মপ্রচারক (১৯১৯), মৌচাক (১৯২০), মোসলেম ভারত (১৯২০), ধ্রুবতারা (১৯২২), বঙ্গবাণী (১৯২২), ধূমকেতু (১৯২২)—এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, দেশদর্পণ (১৯২৫), প্রণব (১৯২৭), বেতারজগৎ (১৯২৯), জন্মভূমি (নবপর্যায়, ১৯৩০), উষা (১৯৩০) ইত্যাদি।

তিরিশ-উত্তর জনপ্রিয় সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির নাম আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তাই তাদের উল্লেখ করলাম না।

অধ্যাপক স্বপন বসু তাঁর চিঠিতে 'উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষের ১ম সংখ্যায় (মাঘ ১৪০৪) শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সম্পর্কিত প্রবন্ধটির সাহায্য আমি নিইনি বলে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঐ সংখ্যাতেই আমার সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে প্রবন্ধটি ঐ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়নি। সেজন্য আমার প্রবন্ধটির জন্য শঙ্করীপ্রসাদ বসু রচিত প্রবন্ধটির সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

তাপস বসু
অবন্তিকা সরকারি আবাসন, কলকাতা-৭০০ ০৩৯

ভ্রম সংশোধন

'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন (১৪০৫) সংখ্যায় আমার লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম জ্ঞানের উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধের শেষ পৃষ্ঠার (পৃঃ ৭৯) বাঁদিকের স্তম্ভের ২৩ নং পঙ্‌ক্তিতে 'রামকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যে'র স্থানে 'রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যে' হবে।

ডঃ জলধিকুমার সরকার
গল্ফ ক্লাব রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৩

জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথ

স্বামী অচ্যুতানন্দ

এই প্রবন্ধে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শ্রীবিশ্বনাথ ও জ্যোতির্লিঙ্গের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। ক্রমে অন্যান্য একাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের কোন নির্দিষ্ট ক্রম নেই। স্তোত্রে যদিও সোমনাথ দিয়ে শুরু করা হয়েছে, কিন্তু আমার পরিক্রমা শুরু হয়েছিল বিশ্বনাথকে দর্শন করেই, আর বিশ্বনাথই যেহেতু আদি জ্যোতির্লিঙ্গ, তাই তাঁর কথা দিয়েই শুরু হলো আমাদের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পরিক্রমা।—লেখক

'হর হর গঙ্গে, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে'—সমস্বরে বহু কণ্ঠের আওয়াজ আমার তন্দ্রা ভাঙিয়ে দিল। গমগম শব্দ করতে করতে ট্রেন উঠে পড়েছে মালব্য ব্রিজের ওপর। ট্রেনের বেশির ভাগ যাত্রীই জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে চেষ্টা করছে। অবাঙালী যাত্রীরা চিৎকার করছে 'হর হর গঙ্গে, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে'। আমিও জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম—অর্ধচন্দ্রাকৃতি, বিশ্বনাথের অবিমুক্তপুরী, তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসীকে। উত্তরবাহিনী গঙ্গা বয়ে চলেছে কলকল করে বিখ্যাত ঘাটগুলি স্পর্শ করে। দূরে দূরে অপসৃয়মান কত না মন্দিরের চূড়া। কয়েকটি বিশাল মসজিদের মিনারও দেখতে দেখতে সরে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রেন ব্রিজ পার হয়ে একটি স্টেশনে এসে থামল। নাম তার 'কাশী'। প্ল্যাটফর্মে নামটি দেখেই আমি হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লাম সঙ্গের ঝোলাটি গুছিয়ে নিয়ে। এবার তাহলে নামতে হবে—কাশীতে পৌঁছে গেছি। কিন্তু বাদ সাধলেন পাশে বসে থাকা সাধুবাবাজী। গতকাল রাত্রেই বর্ধমান থেকে ইনি উঠেছেন ট্রেনে, বিহারী শরীর, দশনামী সন্ন্যাসী নাম 'লালগিরি'। এসেছিলেন গঙ্গাসাগর, ফেরার পথে বক্রেশ্বরে তাঁর এক গুরুভাইয়ের কাছে কদিন কাটিয়ে বর্ধমান এসেছিলেন। সেখান থেকে আবার ফিরে যাচ্ছেন হরিদ্বার। তবে কাশীধামে তাঁদের আখড়া আছে শিবালার কাছে—নিরঞ্জনী আখড়া। সেখানে কদিন কাটিয়ে যাবেন। গত রাত্রেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে এসব কথা জেনেছিলাম।

ট্রেন কাশী স্টেশনে থামামাত্র নামতে গিয়েই বাধা পেলাম সাধুজীর কাছে। তিনি ঝোলা টেনে ধরে বললেন : "বেটা কাঁহা যাওগে? ইধার কিঁউ উৎরোগে? তুম বানারস যানেওয়ালা হ্যায় না?" আমি বললাম : "তাই তো যাব। কাশী এসে গিয়েছে, আপনি নামবেন না?" কথা শেষ হওয়ার আগেই দারুণ হেসে সাধুজী বললেন : "তুম পহেলা দফে আতা হ্যায় তো—ইসি লিয়ে এ গড়বড়। ইয়ে তুমহারা স্টেশন নেহি হ্যায়—ইস্‌কা বাদ তুমহারা স্টেশন আয়েগী। থোড়া ঠ্যার যাও।" ব্যাপারটা ঠিক না বুঝলেও দাঁড়িয়ে পড়লাম। গাড়িও ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ল বেশ বড় প্ল্যাটফর্ম। হৈহৈ শব্দ, যাত্রীদের নামার হুড়োহুড়ি। হ্যাঁ, এসে পড়লাম 'বেনারস ক্যান্টনমেন্ট' স্টেশনে। এটিই কাশীযাত্রীদের অবতরণ-স্থান। এবারে সাধুবাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন : "চল বেটা—আব আ গিয়া তুমহারা বারাণসী—চল।"

ভিড়ের ধাক্কায় নেমে পড়লাম আমার বহু-কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যভূমিতে। অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসী, বিশ্বনাথের আনন্দকানন বারাণসী জগৎছাড়া স্থান, শিবের ত্রিশূলের ওপর তার অবস্থান। ছেলেবেলা থেকে কত গল্প শুনেছি, কত ছবি মনে মনে কল্পনা করেছি, বিশ্বনাথের স্তোত্র কত পাঠ করেছি : "বারাণসী-পুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্।" এই সেই স্বর্ণকাশী! দেখি লালগিরিজী দুটি হাত জোড় করে বিড়বিড় করে বলছেন :

"বিশ্বেশং মাধবং ঢুণ্ডিং দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্।
বন্দে কাশীং, গুহাং গঙ্গাং, ভবানী মণিকর্ণিকাম্।।"

লালগিরিজী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন—এই মুক্তিতীর্থের প্রধান দেবতাদের নাম স্মরণ করে কাশীতে পা দিতে হয়। এঁরা

হচ্ছেন—কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর, বিন্দুমাধব নারায়ণ, ঢুণ্ডিরাজ গণেশ, দণ্ডপাণি ভৈরব, কালভৈরব, কাশীদেবী, জৈগী শব্য গুহা, পতিতপাবনী গঙ্গা, ভবানী অর্থাৎ অন্নপূর্ণা, সঙ্কটা ও দুর্গাদেবী এবং মণিকর্ণিকা তীর্থ। এঁদের বন্দনা করে তবেই কাশীধামে প্রবেশ করতে হয়। আমিও মনে মনে তাঁদের স্মরণ করে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এলাম। রিক্সাওয়ালারা ছেঁকে ধরল—কোথায় যাব? আমিও তাই ভাবছি। তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি। যাতায়াত করছি সারগাছি আশ্রমে। সেখানকার পূজ্যপাদ প্রেমেশ মহারাজের (শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দ) ইচ্ছায় মাঝেমধ্যে কাছাকাছি দু-চারটি তীর্থ ও প্রাচীন মন্দিরাদি দর্শন করাও হয়েছে। কিন্তু এবারে এসে গেছি একটু বেশি দূরে। আর একা। সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র ইচ্ছা করেই আনিনি। নিজের মতো করে ঘুরে বেড়াব সেই ইচ্ছায়। তাই কাশীর সেবাশ্রম ও অদ্বৈত আশ্রমে পরিচিত প্রাচীন সন্ন্যাসীরা থাকলেও সেখানে উঠব না স্থির করেই এসেছি।

সাধুজী জানতে চাইলেন—কোথায় যাব? হঠাৎ বলে ফেললাম ঃ "যেখানে ভাল লাগে সেইখানেই।" সাধুজীর কি খেয়াল হলো, বললেন ঃ "চল মেরা সাথ।" আমি নির্দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে হাঁটা দিলাম। সে এখনকার কাশী নয়। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কাশী। হাঁটতে হাঁটতে সিগরা পার হয়ে রথযাত্রার মোড় ছাড়িয়ে, লাক্সা রোড ধরে পূর্বদিকে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার বাঁদিকে কড়ি দিয়ে গাঁথা দেওয়ালের ওপর লেখা আছে 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম'। লাল প্রাচীর, তারপরেই চুনার পাথরের তৈরি একটি মন্দিরের চূড়াও দেখা গেল। ওটি নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। আমার তখন বড় অস্বস্তি। কোন পরিচিত সাধুর চোখে না পড়ে যাই! খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে লাক্সা মোড় পার হয়ে গেলাম। গোধুলিয়া ছাড়িয়ে কিছুদূর নিয়ে যাওয়ার পরে সাধুবাবা আমাকে কালীমন্দিরের কাছে এক পুরনো মঠে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সেখানকার অধ্যক্ষকে জানালেন, এই বাঙালী ছেলেটি একলা এসেছে কাশীদর্শনে, একে কয়েকদিন এখানে থাকতে দিতে হবে। দেখলাম লালগিরিজীর বেশ সম্মান আছে এখানে। তাঁকে সমাদর করে বসতে বলে আশ্রমাধ্যক্ষ আমার পরিচয় নিয়ে তাঁর আশ্রমে থাকতে বললেন। শুনলাম এটি দণ্ডী সন্ন্যাসীদের আশ্রম, নাম কামরূপ মঠ। এখানকার বেশির ভাগই বাঙালী। লালগিরিজী বিকালে আবার আসবেন বলে চলে গেলেন।

কামরূপ মঠ কাশীর পুরনো মঠগুলির অন্যতম। বেশ সমৃদ্ধশালী। স্নানাদির পর দুপুরে মন্দিরে প্রসাদও পেলাম। থাকার জন্য একটি ছোট্ট ঘর, একটি তক্তপোশ ও দুটি কম্বল পাওয়া গেল। শুনলাম এখানে কিছু বিদ্যার্থী থাকে। তারা স্থানীয় সংস্কৃত চতুষ্পাটিতে সংস্কৃত পড়ে। বেশির ভাগই নেপালী ও গাড়োয়ালী গরিব ঘরের ছেলে। আমার থাকার ব্যবস্থা হলো তাদের মাঝেই। সাত-আটজন ছেলে। দুপুরে খাওয়ার পরে তারা তাদের চতুষ্পাটিতে চলে গেলে আমি ঘরে একা হয়ে গেলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি কাটিয়ে আমার ঝুলি থেকে বের করলাম সঙ্গে আনা 'কাশীখণ্ড'। পূজনীয় প্রেমেশ মহারাজ বলেছিলেন ঃ "যখন কোন তীর্থস্থানে যাবে তখন সেখানকার সব কাহিনী ভাল করে জেনেশুনে যাবে। তাতে তীর্থদর্শনের আনন্দ আরো বেশি পাবে।"

সবে দু-এক পাতা পড়েছি, এমন সময় দরজায় শব্দ আর তার সঙ্গে মিষ্টি কণ্ঠস্বর ঃ "কোয় বেটা আভিতক্ শো রহা হ্যায়? চলো আজ শ্রীবিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণামাঈ কো দর্শন করলো?" বলেই লালগিরিজী ঘরে ঢুকে আমাকে পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "উও কোন্‌সা কিতাব?" আমি বললাম ঃ "কাশীখণ্ড।" সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ তাপস হাতজোড় করে প্রণাম করে বললেন ঃ "বহুত বড়িয়া। তব তো তুম সব কুছ জানবুঝ করকে আয়া।" আমি বললাম ঃ "না মহারাজ, এই সবে আরম্ভ করলাম। তবে আপনি এতদিন এদেশে আছেন, আপনি যদি নিজেই বলেন এখানকার তীর্থের কথা তাহলে এখন বই বন্ধ করলাম।" শোনামাত্র ছোট্ট শিশুর মতো হেসে লালগিরিজী বললেন ঃ "ম্যায়নে 'কাশীখণ্ড' স্কন্দপুরাণ সে পাঠ কিয়া মেরা বচ্‌পন মে। উস্‌কে বাদ বহুৎ শুনা বহুৎ সন্তলোগোঁকা পাস। আভি চল—বাদ মে তুম ও কিতাব পাঠ করকে দেখ লেঙ্গে।"

আমি 'কাশীখণ্ড'কে প্রণাম করে পথে বেরিয়ে এলাম লালগিরিজীর সঙ্গে। কামরূপ মঠের বাইরে বাঙালী পুরনো কালীমন্দিরে দেবী দক্ষিণাকালীকে প্রণাম করে দশাশ্বমেধ রোড ধরে একটু পশ্চিমদিকে গিয়ে উত্তরের বিখ্যাত বিশ্বনাথের গলির মধ্যে প্রবেশ করলাম।

এ বড় অদ্ভুত গলি! সাধারণ যাত্রীরা তার পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েই এই গলির রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ অনুভব করতে পারে। গলিতে ঢুকতেই প্রথমে রাবড়ির ঘন দুধ জ্বাল দেওয়ার গন্ধ, নানা ধরনের ধূপ ও মাঝে মাঝে ফুল-মালার গন্ধ, কাশীর বিখ্যাত তবক দেওয়া পানমশলার গন্ধ, কোথাও কোথাও আতরের গন্ধ সারা গলিকে মাতিয়ে রেখেছে। আর শব্দ! তার তুলনা নেই। মাঝে মাঝে যাত্রীদের "হর হর কাশী বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা" ধ্বনি, দুপাশের দোকানীদের নানান পণ্যের পসরার দিকে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হিন্দী ও ভাঙা বাঙলায় বিচিত্র আহ্বানধ্বনি, কোথাও ঘণ্টার আওয়াজ, ষাঁড় তাড়ানোর 'হঠ হঠ' শব্দ, রাবড়ির কড়াইতে হাতা ঘষার বিচিত্র শব্দ, বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রীদের নানান

ভাষায় কলরোল—সে এক অভিনব শব্দতরঙ্গ! রূপ তো অনন্ত—কত দোকানের, কত বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র ও মনোহারী দ্রব্যের শোভা, যাত্রীদের রঙবেরঙের পোশাক, দৃষ্টিনন্দন কত রঙের খেলা সমস্ত গলি জুড়ে। রসের ক্ষেত্রেও কমতি নেই। কত রকমের খোয়া ক্ষীরের প্যাঁড়া, সন্দেশ, রাবড়ি, ল্যাংড়া আম গলির মাঝে মাঝেই রসিকজনের মন ভোলায়। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ স্পর্শের ব্যাপারটি! সঙ্কীর্ণ গলি জুড়ে প্রচণ্ড ঠেলাঠেলির চোটে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় কোন বিশেষ উৎসবের দিন, আর সেটি মারাত্মক হয় যদি সেই ভিড়ে দেবাদিদেব বিশ্বনাথের বাহন নন্দীকেশ্বর মহারাজের আবির্ভাব হয়! তার আদরের স্পর্শলাভ যদি ভাগ্যক্রমে হয়, তবে দু-চারখানা পাঁজর সহজেই গুঁড়িয়ে যেতে পারে। তাই লালগিরিজী আমাকে এই গলির বিশেষত্ব বোঝাতে বোঝাতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন অতি সতর্কভাবে। কত যুগ ধরে এইভাবে কত

কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে স্বামীজীকে প্রশ্নই করে ফেললাম। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি চলতে চলতেই বললেন ঃ "দেখিয়ে বেটা, ইয়ে এক বড়া কহানী হ্যায়—তুমহারা 'কাশীখণ্ড'মেঁই ইয়ে লিখা রহা হ্যায়। শুন্‌না চাহতা তো চলো কিধার বৈঠনেকে বাদ ম্যায় বাতাউঙ্গা।" বিশ্বনাথ দর্শনই আমার প্রথম করণীয়, তাই তার ইতিহাস জানবার তাগিদে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গলির শেষ মাথায় এসে পৌঁছালাম।

গলির পথে ছেড়ে এলাম—বাঁদিকে একটি ছোট্ট প্রকোষ্ঠে অষ্টমবর্ষীয় বালক শঙ্করাচার্যের একটি অপূর্ব সুন্দর শ্বেতপাথরের মূর্তি। তার কিছু পরেই কোটীশ্বর শিবলিঙ্গ। পথের ঐ ডানদিকেই একটু খোলা জায়গায় লোহার গোল রেলিং দিয়ে ঘেরা আড়াই ফুট উঁচু একটি কালোপাথরের শিবলিঙ্গ, যেটির পুরোটাই এক ইঞ্চি মাপের অসংখ্য শিবলিঙ্গের খোদাই করা লিঙ্গ দিয়ে তৈরি। আরো এগিয়ে

যাত্রী দর্শনে এসেছেন পৃথিবীর এই প্রাচীনতম তীর্থ বিশ্বেশ্বরের আনন্দনিকেতন কাশীধামে। এই গলিতেও আছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ও বিগ্রহ, কিন্তু লালগিরিজী এখন আমাকে সেসব দর্শন করালেন না। বললেন, ফেরার সময় সেগুলি দর্শন করাবেন।

যেতে যেতে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল—এই বিশ্বনাথকে 'জ্যোতির্লিঙ্গ' বলা হয়, তার মানে কি? ভারতে তো বহু বিখ্যাত শিবক্ষেত্র আছে। সব শিবলিঙ্গকে তো জ্যোতির্লিঙ্গ বলা হয় না। এঁকে কেন জ্যোতির্লিঙ্গ বলা হচ্ছে। আমার এ-

গিয়ে বাঁদিকে একটি বড় ঘরের মধ্যে বিরাটাকার লাল সিঁদুর মাখানো চতুর্ভুজ সাক্ষী বিনায়কের মূর্তি। বিশ্বনাথ-দর্শনের আগে ও পরে এঁকে প্রণাম করে সাক্ষী রেখে দর্শন করতে হয়। আমরাও সাক্ষী বিনায়ককে প্রণাম করে দ্রুত এগিয়ে চললাম মূল লক্ষ্য বিশ্বনাথ-মন্দিরের দিকে। ক্রমে এসে পড়লাম একটি তেমাথা গলির মুখে। বাঁদিকে গলির নাম 'বাঁশফটক'। এই গলি গিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। সে-গলিও ছাড়িয়ে আমরা কিছুটা এগতেই আরো একটা তেমাথায় এসে পড়লাম। এই গলির মুখেই বাঁদিকে খুব ছোট্ট একটি ঘরের

মধ্যে রয়েছেন বিশ্বনাথের আদরের গণশ্রেষ্ঠ সন্তান 'ঢুণ্ডিরাজ গণেশ'। মাটিতে বসা, চতুর্ভুজ লম্বোদর। একটি হাত বাড়িয়ে আছেন লাড্ডুর জন্য। ভারি সুন্দর বালকমূর্তি। 'কাশীখণ্ড'-এ এই ঢুণ্ডিরাজ গণেশের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—"তস্থাঃ সমস্তাঃ কিলবিঘ্নপুগাঃ"—ইনি কাশীবাসীর সমস্ত বিঘ্ন হরণ করেন। "সর্বান্ কামান্ পুরয়েৎ অত্র ঢুণ্ডিঃ"—এখানে ঢুণ্ডিরাজ সকল কামনা পূর্ণ করেন। ঢুণ্ডিরাজকে প্রণাম করে একটু সামনে এগতেই ডানদিকে লালপাথরের মন্দিরে কাশীপুরাধীশ্বরী মা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান। তার আগেই রাস্তার ওপর ছোট একটি নহবৎ—এখান থেকে বিশেষ দিনে সানাই ইত্যাদি নহবৎ বসানো হয়। এটি কোম্পানীর আমলের। মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের সামনেই একটা ছোট্ট রোয়াকের মতো জায়গায় এক ফুলওয়ালা ফুলের ডালি সাজিয়ে বসে আছে। তার কাছে আট আনায় ফুল, বেলপাতা নিলাম সাধুজীর নির্দেশমতো, সেখানে আমার চপ্পল জোড়া রাখার জায়গাও পাওয়া গেল। ঠিক উলটোদিকে মা অন্নপূর্ণার লালপাথরের মন্দিরের বিরাট পিতলের দরজায় মাথা ঠেকিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। বাঁদিকে পড়ে রইল প্রাচীন তুলসীদাসী রামমন্দির ও ডানদিকে বহুপ্রাচীন কালোপাথরের গ্রহরাজ ও মা কালীর মন্দির। এখানে খুব ভিড়। মেয়েরা সন্ধ্যায় এখানে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যান। শুনলাম, শনিবারে প্রচণ্ড ভিড় হয় এখানে।

এরপরই বাঁদিকে আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘদিনের স্বপ্নলালিত কাশীপুরাধীশ বিশ্বনাথের মন্দিরে এসে হাজির হলাম। দক্ষিণদ্বারী, বিশাল রূপোর পাত দিয়ে মোড়া ও নকসা-করা দরজার শিকলে মাথা ঠেকিয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। ভিতরে চারিপাশেই অনেক ছোট ছোট মন্দিরে অনেক দেববিগ্রহ আছেন। আমি কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা সামনে এগিয়ে গেলাম। তারপর একটা ছোট্ট চত্বর পেরিয়ে বাঁহাতে আরেকটি দরজা দিয়ে মূল গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। বিকেলবেলা বলে ভিড় একটু কম। ছোট্ট গর্ভমন্দির সাদা-কালো মার্বেল পাথরে বাঁধানো, আয়তনে ১০'x১০'। চারদিকেই চারটি দরজা। ছোট গর্ভমন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি হাতদেড়েক গভীর রূপার কুণ্ড হাত দুয়েক লম্বা-চওড়া রূপার রেলিং দিয়ে ঘেরা। তারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আমার দীর্ঘবাঞ্ছিত জ্যোতির্লিঙ্গ—ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ কাশীনাথ শ্রীবিশ্বেশ্বর। কালো কষ্টি-পাথরের লিঙ্গ—প্রায় একহাত উঁচু। তাঁর গৌরপট্টটি সোনা দিয়ে বাঁধানো। তার ওপর একটি সোনার সাপের মূর্তি খোদাই করা। লিঙ্গ ঠিক গোলাকৃতি নয়, নিচের দিক থেকে ওপরের দিকে সামান্য সরু হয়ে এসেছে। লিঙ্গের মাথায় খুব সূক্ষ্ম একটি ফাটলের চিহ্ন। উত্তরমুখী এই লিঙ্গের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি কুলুঙ্গীতে অখণ্ড জ্যোতিপ্রদীপ। বিরাট দীপাধারে জ্বলছে বহুকাল ধরে। মাথার ওপরে গর্ভমন্দিরের ছাদ থেকে ঝোলানো শিকলে একটি রূপার সছিদ্র কলস—তাতে গঙ্গাজল দেওয়া থাকে, ফোঁটা ফোঁটা করে তাই সর্বদা ঝরে পড়ছে বিশ্বেশ্বরের মাথায়। দেওয়ালের শ্বেতপাথরের ওপর খোদাই করা মকরবাহিনী গঙ্গা প্রভৃতি কয়েকটি মূর্তি আছে। উত্তরের আরেকটি ফোকরে পাণ্ডাজী বসে আছেন—বিশ্বেশ্বরের মাথায় নিবেদিত ফুল-মালা মাঝে মাঝেই সরিয়ে দিচ্ছেন, আর কেউ চাইলে বিশ্বনাথের প্রসাদী চন্দন কপালে লাগিয়ে দিচ্ছেন, আমার কপালেও সেই প্রসাদী চন্দন তিনি লাগিয়ে দিলেন।

মন্দিরে ফুল-বেলপাতা-ধূপ-অগুরুর গন্ধে এক দিব্য পরিবেশে মন সত্যিই অন্য জগতে চলে যায়। লালগিরিজীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করলাম—

"সানন্দ-মানন্দবনে বসন্তমানন্দকন্দং হৃতপাপবৃন্দম্।
বারাণসীনাথ-মনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে।।"

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গস্তবের এই অংশটি পাঠ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তারপর বিশ্বনাথকে দু-হাত দিয়ে প্রাণভরে স্পর্শ করলাম। প্রাণ-মন ভরে গেল। কতদিনের আশা আজ পূর্ণ হলো! ছোট থেকেই শুনে এসেছিলাম—

"অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে সর্বেষাং মুক্তিহেতুকে
তারকস্য উপদেশার্থং বিশ্বেশ অধিতিষ্ঠতে।"

—মহাতীর্থ অবিমুক্তপুরীতে সকলের মুক্তিদানের উপায় তারকব্রহ্ম মন্ত্রদান করার জন্য শ্রীবিশ্বনাথ সর্বদা বিরাজ করেন। এই শ্রীবিগ্রহ অতি পবিত্র ও জাগ্রত। অনাদিকাল থেকে কত অবতারপুরুষ সাধক মহাপুরুষ ভক্তেরা এই বিগ্রহ দর্শন করতে এসেছেন! ভক্তির জমাটবাঁধা এই বিগ্রহের তুলনা নেই। শাস্ত্র বারবার এই লিঙ্গের মহিমার কথা স্মরণ করে বলেছেন ঃ

"নাবিমুক্ত সমং ক্ষেত্রং নাবিমুক্ত সমাগতিঃ।
নাবিমুক্ত সমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ।।"

—এই অবিমুক্তক্ষেত্রের তুল্য আর তীর্থ নেই, এই অবিমুক্ত তীর্থ অগতির গতি, এই অবিমুক্ত লিঙ্গের সমান অন্য কোন শিবলিঙ্গ নেই—একথা বারবার সত্য বলা হচ্ছে। "শ্রীবিশ্বনাথস্য সমং ন লিঙ্গং পুরী ন কাশী সদৃশী ত্রৈলোক্যেষু।"—শ্রীবিশ্বনাথের মতো পবিত্র লিঙ্গ আর নেই, আর কাশীর মতো বিখ্যাত তীর্থও ত্রৈলোক্যে নেই। সেই কাশীতে বিশ্বনাথের স্পর্শলাভের পর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম 'কাশীখণ্ড'-এর এই লিঙ্গোৎপত্তির কথা। [ক্রমশ]

অনুভব

সাগরিকা শর্মা

ভোরের আলোয় ঝরা
এক শিশিরবিন্দু আমি পদ্মপাতায়।
স্বচ্ছ ঢলঢলে দীঘি
মায়ের মায়াভরা মন
রাশি রাশি পদ্ম
প্রণাম জানায় তাকে।
কত ছলছলে শিশির
আলোর আভাসে
আনন্দে মিলিয়ে গেল
মাতৃরূপী দীঘির অতলে
বিলীন হলো মায়ের স্নেহধারায়
আমি শুধু পদ্মপাতায় ঝলমল টলমল।
আমি তো ঝরে পড়ছি না
বসুধারার নিতল শীতলতায়।
এখনই হয়তো উত্তপ্ত হাওয়ায়
নিঃশেষ হব।
ভুবনময়ীর সলিল স্নেহে
সিক্ত হব না আমি।
দিতে পারব না সৃষ্টির আশ্বাস
হতে পারব না শ্যামল সজীবতার একটি কণা?

...আচমকা পদ্মপাতায় দোলন
ছোট্ট আমি মায়ের নিবিড় সত্তায় মিশে গেলাম।

মায়া

নিমাই মুখোপাধ্যায়

একটা একটা আবরণ ভেদ করতে করতে
আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।
সামনে অনন্ত সমুদ্র
মাথার ওপরে নীলাকাশ।
মনে হলো কোন আবরণ নেই।
যেই দেখলাম বাতাস আমায় উড়িয়ে নেওয়ার
জন্য পাগল হয়ে গেছে
আকাশের বিদ্যুচ্ছটায় আমি দিশাহারা
হঠাৎ ঝড় উঠে আমার অস্তিত্বকে বিলোপ
করে দিতে চাইছে
আমি আবার আবরণ পরে নিলাম
আমার আবরণহীনতার অনুভূতি কোথায়
হারিয়ে গেল।
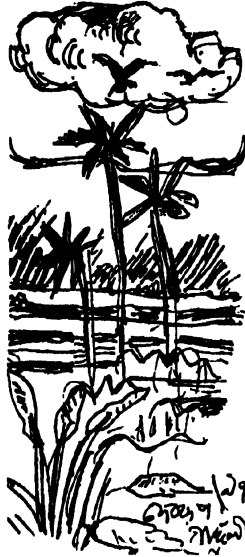
আছেন তিনি

শান্তিকুমার ঘোষ

যেখানেই থাক তুমি
যা প্রাণ চায় কর,
তিনিই চিরসাথী তোমার—
প্রিয় বন্ধু তিনি কক্ষপথে।
পিছনে জাগে অনন্ত...
আর সামনে অমরতা।
যতই হোক সূক্ষ্ম-নীল,
আছেন তিনি অমোঘ।
কাটবে এই বিষাদ-যোগ,
হবেই হবে লক্ষ্যভেদ।
আছেন তিনি সখ্য-ভাবে,
তাঁর কাছে দাও খুলে—
মেলে ধর হৃদয়।
চিরকাল ধূমায়িত না থেকে
ওঠো না জ্বলে এক মুহূর্ত।

এবার হারিয়ে যেতে চাই

সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়

এখন একটাই চিন্তা—কবে মুক্তি পাব
মুক্তি চাই।
সংসারের এই রেষারেষি, হিংসা, কপটতা, ছলনার ভিতর
থাকতে পারি না
পারি না সর্বক্ষণের সঙ্গী করে এদের চলতে।
আজ আমি বড় ক্লান্ত
শরীর, মন দুটোর ভিতরেই ঘণ্টা বাজছে অবিরত
বলছে এবার তৈরি হয়ে নাও
সে জানে না—অনেকদিন আগেই আমি তৈরি হয়ে
বসে আছি।
পা বাড়িয়েই বসে আছি।
এবার ছুটি চাই।
মন বুঝে গেছে আর কিছু পাওয়ার নেই আমার এই পৃথিবীতে
শত মাথা কুটলেও আর পাব না আমার চাওয়াগুলোকে
পারব নাকো গড়তে আমার মনের মতো সুন্দর জগৎকে
তাই আর মন টানতে ভাল লাগে না।
আর পারি না, দাও আমায় মুক্তি এবার।
চাই শান্তি—আরো শান্তি
সেই গভীর জঙ্গলের নির্জনতা, নিস্তব্ধতার মতো শান্তি
যার অতলে ডুবে এবার হারিয়ে যেতে চাই।

মুক্তি নেই

তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী

মুক্তি কোথা? মুক্তি কোথা পাবি?
এ-সংসারে মুক্তি নেই...
মুক্ত শুধু বিহঙ্গের পাখা।
আকাশে নীলের ছোপ,
নীলকণ্ঠ তবুও সে নয়;
বাতাসে বারুদ-গন্ধ, বিনাযুদ্ধে
বিষাক্ত চৌদিক।
এখনো সময় আছে নিসর্গের
রঙ তুলি টানে
বিস্তৃত দিগন্ত আঁকা সবুজের
উজ্জ্বল আভায়।
এখনো সময় আছে ওঠো, জাগো
হে মহাজীবন।
গৈরিক গঙ্গার রঙে মেলে ধর
আপন হৃদয়।
"সর্ব জীবে নারায়ণ"—অমৃতসমান
এই বাণী,
হৃদয়দর্পণে হোক প্রতিভাত
দিবস রজনী।

শুয়ে আছে দেশ

মনোজ খাটুয়া

শবাসনে শুয়ে আছে দেশ
আর আমরা লক্ষ লক্ষ মাছি হয়ে
খুঁটে খাচ্ছি
তার চোখ, কান, নাক,
গলা, মুখ।
দেশ মানে নাকি দেশমাতা
তা মা এখন মাথায় থাকুন;
নিজেদের উদরপূর্তি হলো
পৃথিবীর পরমতম সুখ।
হায়! দেশ মানে নাকি দেশমাতা।
মায়ের বুকের ওপর বসে
খুলেছি অনায়াসে
লাভ-লোকসানের খাতা
হাত বাড়িয়ে বেচে দিয়েছি
স্বদেশের স্বাধীনতা
হায়! দেশ মানে নাকি দেশমাতা!

শব্দের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে

মনোরঞ্জন চন্দ্র

শব্দের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে
চিন্তার ছাঁকনি ভেদ করে
ভাব ভাষা হয়ে ফোটে।

সুখ অথবা দুঃখ
রাগ-অনুরাগ, কামনা-বাসনা
কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষা যতেক—
শব্দের শরীরে শব্দ জুড়ে জুড়ে
ছুঁচ ফোঁড়ে বারেবার
আনন্দের কিংবা বেদনার।

স্মৃতিতে লুকানো সুখ
অথবা কোন ফল্গু-দুঃখ
লুটোপুটি খায় এসে
জীবনের পায়ে।
শ্মশান আর কবরের বুকে
জমে থাকে স্তূপীকৃত
কীর্তি আর অকীর্তির খতিয়ান যত।

শিকড়ে যাও

সুশান্ত বসু

(শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত)

শিকড়ে যাও, শিকড়ে যাও
বললে ডেকে হাওয়া,
ঘূর্ণিবাতাস বললে ডেকে
'কোথায় তোমার যাওয়া'?

শিকড় কই? মত্ত মাতাল
আলোর অন্ধকারে
চোখ-ধাঁধানো প্রদীপ জ্বলে
প্রমত্ত চিৎকারে—

ছুটছে যারা অন্ধচেতন
বাতাস বাড়ির দিকে
শিকড় তুমি তাকিয়ে আছ
অমল অনিমিখে।

ধূসর এই অন্ধ বাঁচার
পাণ্ডুলিপির পাতায়
লিখছ আখর দীপ্ত ভাষার
জীবনপথের খাতায়!

বিশ্বকাপের ইতিহাস ও উপমহাদেশের ভূমিকা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের কি প্রয়োজন?... আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ।... দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যা কি—কাঁটা কোথায় বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনি তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে ১৯৭৫ সাল নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। কারণ, ঐ বছরেই সূচনা হয়েছিল একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের। গতানুগতিক টেস্ট ম্যাচ দেখতে দেখতে দর্শকরা যখন ক্লান্ত, তখন একদিনের সীমিত ওভারের ইনস্ট্যান্ট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। অগণিত ক্রিকেট-প্রেমীদের কাছে এল ধীরেসুস্থে নেতিবাচক বিরক্তিকর ক্রিকেটের বদলে ঘণ্টা ছয়েকের ইতিবাচক ক্রিকেট। ফলাফল তাৎক্ষণিক, ফলে ঘটনা ঘটে দ্রুত এবং দর্শকরাও ক্ষণে ক্ষণে হয় রোমাঞ্চিত, শিহরিত। ১৯৭৫-এ প্রুডেনশিয়াল ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সৌজন্যে শুরু হলো বিশ্বকাপ ক্রিকেট বা 'প্রুডেনশিয়াল কাপ'। এরপর তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরবর্তী কালে শুরু হলো 'বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ', 'রথম্যান্স কাপ', 'অস্ট্রেলেশিয়া কাপ', 'শারজা চ্যাম্পিয়ন্স' ট্রফির মতো উত্তেজক ও অর্থকরী একদিনের প্রতিযোগিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখন দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী টেস্ট সিরিজের সঙ্গে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ কিংবা ত্রিদেশীয় সিরিজও সমানভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সীমিত ওভারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খেলার চিন্তাধারা, পরিকল্পনা ও প্রয়োগরীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ টেস্টে দুটি দলেরই যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকে বা সময় বিশেষে পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলা অমীমাংসিত রাখার জন্য যে টিকে থাকার লড়াই করতে হয়, তা একদিনের ক্রিকেটে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। একদিনের খেলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো—জেতা অথবা হারা।

বিশ্বকাপ বা 'প্রুডেনশিয়াল ইনস্যুরেন্স কাপ' শুরুর আগেই কিন্তু ইংল্যান্ডে চালু ছিল 'জিলেট কাপ'। ১৯৬৫ থেকে জিলেট কাপের খেলা শুরু ইংল্যান্ডে কাউন্টি দলগুলির মধ্যে। তারপর ১৯৭১-এ ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের ম্যাচের সিরিজ—টেস্ট সিরিজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। তারপর অস্ট্রেলিয়াতেও অনুরূপ একদিনের ক্রিকেট প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। এসবই বিশ্বকাপের উদ্ভব ও বৈভবের প্রেক্ষাপট। ১৯৭৫, ১৯৭৯ ও ১৯৮৩-তে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডে, প্রুডেনশিয়াল কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায়। তিনটি বিশ্বকাপেই খেলা ছিল ৬০ ওভারের। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিটি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি ৫০ ওভারের হয়ে আসছে। আর ৮৩-র পর বাইরোটেশন বিশ্বকাপের খেলা হয়েছে দুবার উপমহাদেশে, একবার দক্ষিণ গোলার্ধে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে। তাৎপর্যের ব্যাপার হলো, একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ছাড়া (১৯৮৭) সাদা চামড়ার কোন দেশ বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। অথচ বিশ্ব ক্রিকেটের জন্মলগ্ন থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং সামান্য পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুবার এবং ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা একবার করে বিশ্বকাপ জিতেছে। এর থেকেই প্রতিফলিত হয় ক্রিকেটের 'ব্ল্যাক পাওয়ার'-এর শৌর্য ও মহিমার চিরপরিচিত রূপটি। আরো বিশদভাবে বললে, শেষ চারটি আসরের মধ্যে তিনবারই কাপ এসেছে উপমহাদেশে। অর্থাৎ অ-ইংরেজী ভাষাভাষী রাষ্ট্রের এই যে চমকপ্রদ সাফল্য, তার থেকে একটা ব্যাপারই স্পষ্ট—অন্যান্য ইভেন্টে পিছিয়ে থাকলে কি হবে, ক্রিকেটে এখন উপমহাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাকে উপেক্ষা করার দিন শেষ। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা—এই চার খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী দেশের একচেটিয়া আধিপত্যের দিন শেষ, এখন জাগছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এই বিশ্বকাপেও হয়তো এদেরই মধ্যে যেকেউ কাপ জিততে পারে।

১৯৭৫-র প্রথম বিশ্বকাপের আসরে প্রত্যাশামতোই ওয়ে

হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেসময়ে বিশ্বক্রিকেটে সবচেয়ে শক্তিশালী দল ছিল ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইয়ান চ্যাপেলের অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবৈষম্যের দরুন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বহিষ্কৃত ছিল, না হলে তারাই হয়তো 'প্রুডেনশিয়াল কাপ'-এর প্রথম দাবিদার হতো। গ্রেম পোলক, পিটার পোলক, ব্যারি রিচার্ডস, মাইক প্রোক্টরদের দুর্ভাগ্য—বিশেষ করে তামাম ক্রিকেট-বিশ্বের দুর্ভাগ্য, এইসব বর্ণময় খেলোয়াড়দের শৌর্য, দক্ষতা ও প্রয়োগকৌশল বিশ্বকাপের চালচিত্রে স্থান পেল না। যাই হোক, কি হলে কে থাকলে কি হতো তা নিয়ে হা-হুতাশ না করে বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে সোচ্চার স্বীকৃতি দেওয়া যায় ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের রোমাঞ্চকর, আক্রমণাত্মক ও ইতিবাচক বিশ্বখেতাব অভিযানের।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ম্যাচটি ছিল আয়োজক ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে। ৭ জুন লর্ডসে অনুষ্ঠিত ঐ ম্যাচে নির্ধারিত ৬০ ওভারে ইংল্যান্ড তোলে ৪ উইকেটে ৩৩৪ রান। ডেনিস অ্যামিস চমৎকার ১৩৭ রান করেন। প্রত্যুত্তরে ভারত ৬০ ওভারে মাত্র ১৩২ রান তুলতে সক্ষম হয় তিন উইকেটের বিনিময়ে। ভারতীয়দের খেলা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, এই ধরনের ক্রিকেটের পক্ষে তারা তখনো ততটা সড়গড় হয়ে ওঠেনি। ওপেনার সুনীল গাভাসকার ৬০ ওভার ব্যাট করে ৩৭ রানে নট আউট থাকেন। ভারত এর পরের খেলাটিতে অবশ্য দুর্বল পূর্ব আফ্রিকাকে সহজেই হারায়। ৫৫.৩ ওভারে পূর্ব আফ্রিকার ১২০ রান ভারত কোন উইকেট না খুইয়েই তুলে নেয়। বিষেণ সিং বেদি ১২ ওভার বল করে মাত্র ৬ রানে ১টি উইকেট নেন, বিশ্বকাপের ইতিহাসে যা কৃপণতম বোলিং অ্যাভারেজ। গ্রুপের শেষ খেলায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার স্বীকার করে ভারত। সব মিলিয়ে ভেঙ্কটরাঘবনের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের প্রথম বিশ্বকাপ থেকে প্রাপ্তি বলতে দুর্বল পূর্ব আফ্রিকার বিরুদ্ধে সহজলব্ধ জয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেবার সব ম্যাচেই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বজায় রেখে কাপ জিততে সমর্থ হয়েছিল। ক্লাইভ লয়েড (অধিনায়ক), গর্ডন গ্রীনিজ, রয় ফ্রেডরিক্স, রোহন কানহাই, ভিভ রিচার্ডস, অ্যান্ডি রবার্টস, বার্নাড জুলিয়েনদের নিয়ে গড়া ক্যারিবিয়ান টিম তখন এককথায় একদিনের ক্রিকেটের পক্ষে সুষম ভারসাম্যযুক্ত দল। ফাইনালে অবশ্য তুল্যমূল্য লড়াই চালিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ক্লাইভ লয়েডের দুরন্ত শতরানের সুবাদে ক্যারিবিয়ানরা ৮ উইকেটে ২৯১ রান করে। জবাবে অস্ট্রেলিয়া করে ২৭৪। ঐ বিশ্বকাপের একটি খেলায় নিউজিল্যান্ডের গ্লেন টার্নার পূর্ব আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ১৭১ রান করেছিলেন, যা পরে ভেঙে দেন কপিলদেব, তারও পরে কপিলের রেকর্ড ভাঙেন ভিভ রিচার্ডস। '৯৬-র বিশ্বকাপে রিচার্ডসের রেকর্ড ভাঙেন দক্ষিণ আফ্রিকার গ্যারি কার্স্টেন।

১৯৭৯-র দ্বিতীয় আসরেও খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখে লয়েডের দল। এবারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আরো শক্তিশালী। ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে ডেসমন্ড হেইন্স, ক্লাইভ লয়েড, ভিভ রিচার্ডস, আলভিন কালীচরণ, গর্ডন গ্রীনিজরা তো ছিলেনই, সেইসঙ্গে ছিল ভয়ঙ্কর পেস-ব্যাটারি—অ্যান্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিং, কলিন ক্রফট, জোয়েল গার্নার, প্রতিপক্ষ সব দেশের সামনেই যাঁরা মূর্তিমান বিভীষিকা। ফাইনালে ক্যারিবিয়ান তাণ্ডবের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে সংগঠক ইংল্যান্ড। রিচার্ডসের মারমুখী শতরান এবং কলিস কিংয়ের ৮৬ রান ক্যারিবিয়ান ইনিংসকে টপ গিয়ারে তুলে দেয় (২৮৬/৯)। জবাবে ক্যারিবিয়ান পেস-ব্যাটারির সামনে মাত্র ১৯৪ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। পর পর দুবার ইংল্যান্ডের মাঠ থেকে 'প্রুডেনশিয়াল কাপ' জিতে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট তখন মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। অন্যদিকে ভারত হতাশা ও ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসে। এবারে গ্রুপের সব ম্যাচেই হার স্বীকার করে ভেঙ্কটরাঘবনের ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের অবশ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্বল, অনভিজ্ঞ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও পরাজয়ের কোন ব্যাখ্যাই মেলে না। শ্রীলঙ্কা তখনো পর্যন্ত সরকারি টেস্ট স্ট্যাটাসই পায়নি।

১৯৮৩-তে ইংল্যান্ডে তৃতীয়বার 'প্রুডেনশিয়াল কাপ' জিতে হ্যাটট্রিক করার অভিলাষ ও সঙ্কল্প নিয়ে খেলতে আসে লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু স্বপ্নময় আইভরি টাওয়ারে ওঠা হলো না লয়েড বাহিনীর। প্রথম দুবারের যাবতীয় ব্যর্থতা থেকে যথেষ্ট শিক্ষা ও পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতি নিয়ে কপিলদেবের ভারত তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করে একেবারে শেষ ধাপে ওঠে। বহু ক্রিকেটবোদ্ধা '৮৩-র আসরে ভারতের বিশ্বকাপ জয়কে ক্রিকেটের ব্যতিক্রমী অঘটন বলে চিহ্নিত করলেও ভারতীয়রা যে প্রতিটি ম্যাচেই আত্মলব্ধ প্রত্যয় ও প্রায়োগিক দক্ষতা দেখিয়ে কাপ জিতেছে, সেকথা অনস্বীকার্য। এই বিশ্বকাপে দুটি গ্রুপে চারটি করে দল ডাবল লেগ প্রথায় পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলে, তাই অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কষ্টার্জিত ছিল ভারতের কাপ জেতার প্রেক্ষিতটি। একটি ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে ১৭ থেকে ভারত ম্যাচ জেতে দলপতি কপিলদেবের কৌশলী ও আক্রমণাত্মক ১৭৫ রানের সুবাদে। প্রথম বিশ্বকাপে গ্লেন টার্নারের একটি ম্যাচে সর্বাধিক ১৭১ রানের রেকর্ডটি কপিল ভাঙেন ঐ ম্যাচেই, যদিও পরের বিশ্বকাপেই তা হাতছাড়া হয়ে যায়। যাই হোক, ফাইনালে সব দিক থেকে সেরা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৪৩ রানে হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে ভারত। 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হন মহিন্দর অমরনাথ। তিনি ঐ বিশ্বকাপে তিনবার 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হয়েছিলেন। তিনি ছাড়াও কপিলদেব, রজার বিন্নি ও মদনলালের অলরাউন্ড পারফরমেন্স প্রতিটি ম্যাচেই ভারতকে পরম নির্ভরতা জুগিয়েছে। বলবিন্দর সিং সাঁধুর বোলিংও বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। আর কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত, সুনীল গাভাসকার, দিলীপ বেঙ্গসরকার, যশপাল শর্মা, সন্দীপ

পাটিল, মহিন্দর অমরনাথ ও কপিলদেবের ব্যাটিং দাপটে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের শক্তিশালী বোলিং আক্রমণ। বস্তুত, বিশ্বকাপ জয়ই এদেশে একদিনের ক্রিকেটের নবজাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়। শুধু একদিনের ক্রিকেটেই নয়, সব ধরনের ক্রিকেটেই আসমুদ্রহিমাচল জনমানসে বিপুল উদ্দীপনা ও উন্মাদনার সঞ্চারিত হয়, যা এখনো বজায় রয়েছে ভারতের ধারাবাহিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও।

১৯৮৭-তে এসে বিশ্বকাপ নিজস্ব পরিচিতি হারায়। পরপর তিনবার 'প্রুডেনশিয়াল বিশ্বকাপ' হিসেবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর '৮৭-তে প্রথম ইংল্যান্ডের বাইরে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়। ভারত ও পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে এই বিশ্বকাপ 'রিলায়েন্স বিশ্বকাপ' হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উপমহাদেশের মাটিতে ভারত বা পাকিস্তানের কেউই চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। অ্যালান বর্ডারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া প্রতিটি ম্যাচে চরম পেশাদারী উৎকর্ষতা দেখিয়ে ইডেনের বুক থেকে কাপ তুলে নিয়ে যায়। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল মাইক গ্যাটিংয়ের ইংল্যান্ড। ভারত এই আসরে গ্রুপের কেবল একটিমাত্র ম্যাচ হেরেছিল—অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ডাবল রাউন্ড রবিন ভিত্তিক গ্রুপে ভারতের সঙ্গে ছিল অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে ও নিউজিল্যান্ড। ভারতের চেতন শর্মা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেন। সেমিফাইনালে ভারত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে বিদায় নেয়। এই বিশ্বকাপেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভ রিচার্ডস শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৮১ রান করে কপিলদেবের রেকর্ড (১৭৫) ভেঙে দেন।

১৯৯২-র বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে—বেনসন অ্যান্ড হেজেস কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায়। এই বিশ্বকাপেই প্রথা ভেঙে ৯টি দেশ খেলে। তার কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট সার্কিটে পুনঃপ্রবেশ। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে এসেই তাক লাগিয়ে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। দুর্ভাগ্যবশত জটিল নিয়মের জাঁতাকলের শিকার হয়ে সেমিফাইনালে হেরে যায় ইংল্যান্ডের কাছে। অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডের অপ্রতিহত গতি থামিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতে উপমহাদেশের মর্যাদা ও গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। ইংল্যান্ডের দুর্ভাগ্য, ক্রিকেটের স্রষ্টা দেশ হিসেবে তিনবার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলে একবারও জিততে পারেনি। '৮৩-তে ভারত, '৯২-তে পাকিস্তান—উপমহাদেশের এই দুই শরিকের কাপ জয় এশীয় ক্রিকেটের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গোটা টুর্নামেন্টে ওয়াসিম আক্রমের অলরাউন্ড পারফরমেন্স, ইনজামাম-উল-হকের আবির্ভাবেই স্মরণীয় ব্যাটিং, মিয়াঁদাদের লড়াকু মনোবৃত্তি, সর্বোপরি ইমরান খানের সুনিপুণ অধিনায়কত্ব পাকিস্তানের কাপ জেতার নেপথ্য ভূমিকা নেয়। ভারত এই বিশ্বকাপে শোচনীয় ব্যর্থ হয়। একমাত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই অবিশ্বাস্যভাবে জিতে যায় ভারত। বাদবাকি ৮টি ম্যাচের মধ্যে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ম্যাচটি বৃষ্টিতে পণ্ড হয়ে যায়। জিম্বাবোয়ের কাছে হারার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, এই ম্যাচটিও বৃষ্টিতে মাঝামাঝি অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। এছাড়া ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড প্রত্যেকেই ভারতের বিরুদ্ধে জিতে পয়েন্ট বাড়িয়ে নিয়েছে। এই আসরেই ৯টি দেশ প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে খেলে। নিউজিল্যান্ড তাদের প্রতিটি ম্যাচ খেলে নিজেদের মাঠে এবং গ্রুপের সব খেলায় দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেও সেমিফাইনালে উঠে আটকে যায়।

১৯৯৬ বিশ্বকাপ আয়োজনের দাবিদার ছিল ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। 'পিলকম' নামক ত্রিদেশীয় সংগঠন কমিটি যথেষ্ট কৃতিত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতার সঙ্গে তিন দেশে বিশ্বকাপের খেলাগুলি নিখুঁত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে শেষ করে। শ্রীলঙ্কায় নিরাপত্তা নেই—এই অজুহাতে একসময় অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলতে আসবে না বলে বেঁকে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতির অবসান হয় জগমোহন ডালমিয়ার নেতৃত্বে পিলকমের সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রশাসনিক তৎপরতায় এবং এই প্রথম অন্যতম আয়োজক দেশ কাপ জেতার ব্যতিক্রমী নজির সৃষ্টি করে। অর্জুন রণতুঙ্গার নেতৃত্বে সনৎ জয়সূর্য, রমেশ কালুভিথারনা, অরবিন্দ ডি সিলভা, রোশন মহানামা, মুথাইয়া মুরলীধরণ, চামিন্ডা ব্যাসরা দেখিয়ে দেন, শ্রীলঙ্কা বিশ্বক্রিকেটে আর নাবালক নয়, বরং রীতিমত পরিণত ও সর্বগুণসম্পন্ন একটি দল। কেনিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপের খেলায় শ্রীলঙ্কা দলগত সর্বোচ্চ রানের (৩৯৮/৪) নজির সৃষ্টি করে। এই কেনিয়াই আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে চমকে দেয় সবাইকে। গ্রুপ লিগের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার গ্যারি কার্স্টেন সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর বিরুদ্ধে ১৮৮ রান করে ভিভ রিচার্ডসের আগের রেকর্ড ভেঙে দেন। ভারত গ্রুপ-লিগে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালেও হেরে যায় অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার কাছে। কোয়ার্টার ফাইনালে অবশ্য চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ও গতবারের বিজেতা পাকিস্তানকে অসাধারণ লড়াইয়ের পর হার মানাতে বাধ্য করে ভারত। ঐ ম্যাচটি ঘিরে দুদেশে চরম উত্তেজনা ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যা এযাবৎকাল কোন ম্যাচকে ঘিরে হয়নি। ভারত সেমিফাইনালে তার প্রিয় মাঠ ইডেনে শ্রীলঙ্কার হাতে বিধ্বস্ত হয় এবং দর্শকদের রোষানলে ক্রিকেট কলঙ্কিত হয়। লাহোরে অনুষ্ঠিত ফাইনালে শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দেয়। অস্ট্রেলিয়ার ২৪১/৭-এর জবাবে শ্রীলঙ্কা করে ২৪৫/৩। অরবিন্দ ডি সিলভা শতরান করেন। 'ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট' হন শ্রীলঙ্কার ওপেনার সনৎ জয়সূর্য। শ্রীলঙ্কার এই অসামান্য জয়ের ফলে এই উপমহাদেশের তিনটি টেস্ট-খেলিয়ে দেশই বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করে এবং ক্রিকেট-বিশ্বে আপন ঐতিহ্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। ❑

চিরন্তনী
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ④
❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑
কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত
ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশ অনুসারে দেবতারা ঋষি দধীচির আশ্রমে এলেন। দধীচি তাঁদের সাদর আপ্যায়ন করে বসালেন। কথায় কথায় দেবতারা বৃত্রাসুরের দৌরাত্ম্যের কথা সবিস্তারে দধীচিকে বললেন। বৃত্রাসুর-বধের উপায় ভগবান বিষ্ণু যেমন বলে দিয়েছিলেন সে-কথা ঋষিকে জানিয়ে সসঙ্কোচে তাঁরা ঋষির দেহটি প্রার্থনা করলেন।
উদারমনা স্বার্থবুদ্ধিহীন মহাত্মা দধীচি একথায় কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। কিন্তু পরিহাসের ছলে তিনি দেবতাদের বললেন ঃ "হে দেবগণ, দেহধারী জীবদের দেহত্যাগে যে দুঃসহ কষ্ট হয় তা কি আপনারা জানেন না? সকল প্রাণীই এজগতে বেঁচে থাকতে চায়। স্বয়ং ভগবানও যদি প্রার্থনা করেন তবু প্রাণী মাত্রের একান্ত প্রিয় বস্তু এই দেহ দান করতে কেউ উৎসাহী হতে পারে কি?"
উত্তরে তখন দেবরাজ বললেন ঃ "হে মুনিবর, যাঁরা সর্বজীবে দয়া-পরায়ণ, লোককল্যাণের জন্য তাঁদের অদেয় তো কিছুই থাকতে পারে না। আমরা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে আপনার কাছে এসেছি। স্বার্থশূন্য হে মহাপ্রাণ! আমাদের স্থির বিশ্বাস, আপনি আমাদের বিমুখ করবেন না।"
[ক্রমশ]

আমার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় নেত্রকোনার নিকটবর্তী কংসনদীর পার্শ্বস্থ গ্রাম বাহাম। ১৯০০ সালে বাহাম গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে শৈলজারঞ্জন মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রমণীকিশোর মজুমদার ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী। মাতা সরলাসুন্দরী দেবী।

শৈশবে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আত্মবোধানন্দের (সত্যেন মহারাজ) সংস্পর্শে আসেন। তিনি শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে জামতাড়া স্কুলে ভর্তি করে দেন। সত্যেন মহারাজ তখন ব্রহ্মচারী। শৈলজারঞ্জন তাঁকে 'টোকুকাকা' বলে ডাকতেন। পরবর্তী কালে স্বামী আত্মবোধানন্দ যখন বাগবাজারের শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ, তখন কলেজে পাঠরত শৈলজারঞ্জন তাঁর স্নেহ-সঙ্গ পাওয়ার জন্য প্রায়ই শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আসতেন। শৈলজারঞ্জনের পরিচিত আরেকটি পরিবারের তিনজন ছেলে তাঁর সঙ্গে জামতাড়া স্কুলে পড়তে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁর নাম নীরদ সান্যাল। বয়সে বড় বলে শৈলজারঞ্জন তাঁকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন। নীরদ সান্যাল পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। তখন তাঁর নাম হয় স্বামী অখিলানন্দ।

জামতাড়া স্কুলে পড়াকালীন শৈলজারঞ্জন মাস্টারমশাই সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় যান এবং সাহানা দেবীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন। ১৯১৮ সালে তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে আই. এসসি. পড়তে আসেন, পরে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজ-জীবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এবং ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের টানে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনার সময় শৈলজারঞ্জন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহ লাভ করেন। শৈলজারঞ্জনের জন্মস্থান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পল্লীগীতি-সম্পদ ও প্রাণপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ। আশৈশব তিনি এই আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছেন। তাছাড়া গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতে ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, দবীর খাঁ, শীতল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। শীতল মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি এসরাজ শিক্ষা লাভ করেন। এম. এসসি. পড়ার সময় ছাত্রাবাসে সহপাঠীর নালিশের ভিত্তিতে এসরাজ বাজানোর অভিযোগে ছাত্রাবাস থেকে বহিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাহায্যে শৈলজারঞ্জন রক্ষা পান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শৈলজারঞ্জন রসায়নে এম. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতার নির্দেশে তিনি আইন পড়েন এবং পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্রেম আহ্বানে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের আকর্ষণে পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বভারতীতে রসায়নের অধ্যাপক-পদে শৈলজারঞ্জন যোগদান করেন। পরবর্তী কালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন আচার্য হয়ে ওঠেন এবং রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন।

শিক্ষক-জীবনে শৈলজারঞ্জন একজন সফল ব্যক্তি। বহু কৃতী ছাত্র-

আমি রবীন্দ্রনাথের আলোকে আলোকিত। আমার নিজের কোন আলো নেই। রবির আলোতেই আমার ধার করা আলো। তাঁর কথায় আমি কথা বলি। তাঁর সুরে আমি গান করি। তিনি বলেছিলেন, আমরা যখন কাছাকাছি, পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকি, যখন কোন পরিচয় থাকে না, পরস্পরের মধ্যে তখন একটা অচৈতন্যের সমুদ্র পড়ে থাকে। কিন্তু হঠাৎ যদি একটা ঝাঁকুনি পায়, একটা উপলক্ষ্য হয়, যদি পরিচয় ঘটে—তখন এক মুহূর্তেই সমুদ্র উত্তরণ করে যাই। পার হয়ে যাই। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে আমি অনেকবার এসেছি। পুরনো কথাগুলি আমার মনে পড়ছে—পুরনো দিনের কথা। এখানে আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীতে এসেছি, গান করিয়েছি, কথা বলেছি এবং আজও এসেছি। এক যুগ, প্রায় এক যুগ পরে আর কি।

আমাকে সকলেই জানে, আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র। শেষকালে বিজ্ঞানের মাস্টার হয়েছিলাম। আমার পিতৃ-আদেশে খানিকটা ওকালতিতে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু ধোপে সইল না। এই যে বলে না—যার যা প্রকৃতি, যার যা ধর্ম! সেইটিই রবীন্দ্রনাথ 'নটীর পূজা'য় বলেছেন যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা তাৎপর্য, একটা নিহিতার্থ থাকে, যেটা ক্রমশ পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে চলে নানান অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। আমি ঠাট্টা করে আজ বলছি—আমার পিতৃদেব কিংবা রবীন্দ্রনাথ যে-বয়স পর্যন্ত পৃথিবীটা দেখে গেছেন (একজন গিয়েছেন আশিতে, আরেকজন একাশিতে), বিচরণ করে গেছেন, কথা বলে গেছেন, ভালবেসে গেছেন—আমি তার চেয়েও ওস্তাদ। আমি আরো অনেকদিন পৃথিবীটাকে ভোগ করলাম, দেখলাম, বিচরণ করলাম। কিন্তু একটা কথা, তাঁদের চলা আর আমার চলা—গরিবের ঘোড়ারোগের মতো আর কী! তাঁরা ছিলেন মননশীল, মনই তাঁদের প্রধান ছিল। আমার তো তা নেই তেমন। আমি সাধারণ, আটপৌরে লোক। কাজেই তাঁদের সঙ্গে সেইদিক থেকে তুলনামূলক বলছি না—একটু রসিকতা করে বলি, তাঁদের চেয়ে পৃথিবীটাকে চটকেছি বেশি। এই লম্বা পরিসরের মধ্যে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে যায় যখন আমি জীবনের নিহিতার্থটাকে খুঁজে দেখি। গভীর গোপনে একটা পরিচয় থাকে, মাঝে মাঝে ধরা দেয়। আচমকা কিরকম যেন ছিড়িক-ছিড়িক করে দেখা দিয়ে চলে যায়।

আমি যখন পাড়াগাঁয়ে জন্মেছিলাম, আমার যখন মুখে রা ফুটল—গোঁসাই প্রভুরা তখন আমার বাড়িতে আসতেন। আমার ঠাকুরমা ঘরে 'কথামৃত' পড়তেন। সেই তখনি যেন আমাদের ধর্মীয় সম্বন্ধ এবং ঠাকুরের সেই রেশটা আমাদের ভিতরে কিরকমভাবে বাসা বেঁধেছিল, আমি কিন্তু কিছুই তখন টের পাইনি।

স্বভাব যায় না মলে! পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছি।

ছাত্রীর জীবনে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। প্রফুল্ল দাস, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, অরবিন্দ বিশ্বাস, প্রসাদ সেন, সব্যসাচী গুপ্ত প্রমুখ তাঁর গুণী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, সুচিত্রা মিত্র, ক্ষমা গুপ্ত তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বহু গানের স্বরলিপিকার শৈলজারঞ্জন মজুমদার। রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় বিশুদ্ধতা, অনুভব ও নিষ্ঠাকে তিনি আজীবন সযত্নে রক্ষা করেছেন। গড্ডলিকা প্রবাহের আপাতমধুর স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন যা তাঁর চরিত্রকে আশ্চর্য স্বকীয়তায় উত্তীর্ণ করেছে।

শৈলজারঞ্জন মজুমদারের জীবনে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হয়েছে আরেকটি অন্তরঙ্গ ধারা। শৈলজারঞ্জনের বিশেষ পরিচিত ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষের ব্যবস্থাপনায় শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে শৈলজারঞ্জন মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে তাঁর আজীবন নিবিড় সংযোগ ছিল। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর মনের আনন্দ, প্রাণের আরাম এবং আত্মার শান্তি। বিভিন্ন সময় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি গিয়েছেন। বেলুড় মঠ, বারাণসী, রেঙ্গুন, পুরুলিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্র তিনি পরিদর্শন করেছেন। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রাত্যহিক জমায়েতে ছাত্র-শিক্ষক-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনি সমবেত কণ্ঠে 'বিদ্যাপীঠ-গীতি' পরিবেশন করেছেন। বিদ্যাপীঠ-গীতির রচয়িতা বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, সুরকার শৈলজারঞ্জন মজুমদার। ১৯৮৭ সালে বিদ্যাপীঠের বর্তমান সম্পাদক স্বামী উমানন্দের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে শৈলজারঞ্জন মজুমদার বিদ্যাপীঠের বার্ষিক প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিদ্যাপীঠে আসেন। সেই বছর থেকে ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষের স্মৃতিরক্ষার্থে শৈলজারঞ্জন মজুমদার বিদ্যাপীঠে 'ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার'-এর প্রচলন করেন। বিদ্যাপীঠের সভাগৃহে বহু গুণিজনের উপস্থিতিতে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন স্বামী শিবপ্রদানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী সৈকতেশ)। বর্তমান প্রবন্ধটি টেপ রেকর্ডে গৃহীত সেই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।

১৯৯০ সালে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী উমানন্দের প্রযোজনায় এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় ও স্বকণ্ঠে গীত একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে সমৃদ্ধ 'বিবেকানন্দের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত' শীর্ষক একটি ক্যাসেট কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য গানের সঙ্গে বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতও গেয়েছেন। বিবেকানন্দের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে বারটি গান নির্বাচন করে ক্যাসেটটি প্রস্তুত করা হয়। ক্যাসেটে শৈলজারঞ্জন মজুমদার ছাড়াও তাঁর অন্যান্য কৃতী ছাত্রবৃন্দও কণ্ঠদান করেন। ইনস্টিটিউটের তৎকালীন সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বহু সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও সুধীজনের উপস্থিতিতে ক্যাসেটটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন মঠ-মিশনের তৎকালীন অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ। শরীর অসুস্থ থাকার জন্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর পাঠানো লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর কলকাতার সল্ট লেক অঞ্চলে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে তিনি অতিবাহিত করেন। তাঁর শয্যার মাথার দিকের একটি টেবিলে সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সযত্নে রাখা থাকত। ১৯৯২ সালে শৈলজারঞ্জন মজুমদার পরলোকগমন করেন।

বর্তমান প্রবন্ধটি **শৈলজারঞ্জন মজুমদারের জন্মশতবর্ষে** তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ স্বামী শিবপ্রদানন্দ প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গোঁসাইবাড়িতে ইস্কুল বসে। হৃদয় মাস্টারমশাই আমাদের অ আ ক খ, ধারাপাত পড়ান। তাঁর কাছে পড়া শিখে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে, ধানখেতের আল ধরে, মাঠ পেরিয়ে বাড়িতে আসি। মাঝে মাঝে কান পেতে শুনি, বনের ভিতর বাঁশে বাঁশে যেন সঙ্ঘর্ষণ হচ্ছে, শব্দ হচ্ছে। আমি ঠাকুরমাকে বলি ঃ "তোমার শ্যামবাবুর বাঁশি শুনে এলাম।" তিনি বললেন ঃ "তাই নাকি, তুমি এখনি শুনতে পাচ্ছ শ্যামের বাঁশরী!" আমি বললাম ঃ "আমার তো মনে হলো। তুমি যে গপ্পো করো না, 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'—সেটা আমার ভিতরে দানা বেঁধেছে আর কি!" একদিন মাঠ পেরিয়ে আসছি, বাড়িতে ঢুকছি, খুব ফুর্তি। হাসিমুখে বলছি ঃ "কালায় নিল কুল মান, বাঁশী নিল প্রাণ রে, আমার ঐ কলঙ্কে জগত বা ছিল গো ও বিশাখে।" ঠাকুরমা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ "বাছা, তোমাকে অত বড়দের গান মানায় না, চল তোমাকে অন্য গান শেখাই।" "কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বাঁচে না, পাই কোথা তারে"—আমাকে শিখিয়ে দিলেন। তারপরে তো টাউনে এলাম। তখন আর গান না। কেবল লেখাপড়া, লেখাপড়া। টাউনে থাকি, ইস্কুলে যাই। ইংরেজী কবিতা পড়ি, বাঙলা কবিতা পড়ি, অঙ্ক করি। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সেই যে কৃষ্ণকথা, 'কথামৃত'—সেগুলি তো একেবারে নির্বাসন হয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমার ভিতরে সেই কি আর মরে গিয়েছিল? তা নয়। ঘুমিয়ে ছিল।

তারপর গেলাম জামতাড়া ইস্কুলে পড়তে। এমন একটি ইস্কুল যেখানে মাস্টারমশাইরা থাকেন। ছেলেদের ইস্কুল, কনভেন্টের মতো। ক্লাস সেভেনে গেলাম। আমি নাকি মার আঁচলধরা ছেলে। 'মা মা' বলে কাঁদতাম। মাস্টারমশাইরা পরে ঠাট্টা করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন মাস্টারমশাই সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। তিনি আমার প্রতি খুব স্নেহপ্রবণ ছিলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর এত বাধ্য হয়েছিলাম যে, বড়দিনের ছুটিতে তিনি ঢাকায় তাঁর গ্রামে এলে আমি তাঁর সঙ্গ ধরলাম। কিছুতেই ছাড়লাম না। তাঁকে বাধ্য হয়ে আমাকে নিয়ে আসতে হলো। তিনি আমার পিতার আদেশ নিতে পারেননি, তাই চিঠি লিখলেন পিতাকে ঃ "আপনার ছেলেকে আমি নিয়ে এসেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি পূর্বে আপনার অনুমতি নিতে পারিনি, হঠাৎ হয়েছে।"

আমার পিতা তাঁকে এমন একটা কড়া ভাষায় চিঠি লিখলেন যে, তিনি খুব মর্মাহত হয়ে আমাকে বললেন ঃ "তুই আমার সঙ্গ ধরলি, তোকে ছেড়ে এলাম না। দেখ, তোর বাবা কিরকম অকথ্য ভাষায় চিঠি লিখেছেন!" আমি তাঁকে না জানিয়ে পিতাকে একটা চিঠি লিখলাম ঃ "বাবা, তোমাকে আমি ত্যাজ্য পিতা করিলাম—তোমার ছেলে আমি নই। আমি মাস্টারমশায়ের ছেলে।" এই যে শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ, এ তখনি আমাকে ভিজিয়ে দিল একেবারে। শুধু তাই নয়, তিনি

আমাকে অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ' দিলেন। তিনি আমাকে কত হিতকথা শোনালেন। তিনি আমার আদি গুরু, প্রথম গুরু। কি করে জুটলেন আমি জানি না। যেন একটা অদৃশ্য শক্তি আমার পিছন পিছন ঘুরছিল। আমার জীবনটা লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু একটা আধ্যাত্মিকতার সুর যেন আমার ভিতর দিয়ে চলছিল। তাই বলছিলাম, একটা তাৎপর্য আছে প্রত্যেকের জীবনে যেটা সবসময় ধরা পড়ে না—বিশেষ করে যেখানে জীবনটা রকমারি হিসাবে নানা পথে চলে। 'নটীর পূজা'য় রবীন্দ্রনাথ যেটা লিখেছেন—আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রেরণা অনুসারে পথের মূল্য-গৌরব আলাদা, স্বতন্ত্র। অন্যান্য ভক্তরা বুদ্ধকে তার অন্তরতর সত্তা দিয়ে প্রণাম করেছিল। কিন্তু নটী দিয়েছেন তার অভিব্যক্ত সত্তা—নৃত্য দিয়ে। তিনি নৃত্যকে গ্রহণ করেছিলেন, অর্জন করেছিলেন দেহ, মন, সাধনা দিয়ে। মৃত্যুর বিনিময়ে তিনি নৃত্যকে স্বীকার করেছিলেন।

আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলাম তখন গান আমাকে পাগল করে তুলত। লেখাপড়ার মধ্যে ঢুকলাম, রেজাল্টও ভাল করলাম। কিন্তু চারদিক থেকে খাঁচায় বন্দী হয়ে গেলাম। আমার গান করতে একেবারে বারণ। আমি যখন কলেজে পড়তে বোর্ডিঙে স্বাধীন জীবন নিলাম—তখন কে আমাকে পায়! আমি তখন খালি গান করি আর গান করি। লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে দিয়েছি। এইরকম তছনছ করতে করতে আমার জীবনটা এগিয়েছে। তারপরে তো এসে পড়েছি শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে পরে রবীন্দ্রনাথের গানের টানে পড়েছি। সেখানে সমস্ত কিছু ধুয়েমুছে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতই যেন উঁকি মেরে চায়। বারবার আমাকে এদিক-ওদিক থেকে টেনে আনে। সেজন্য বলছিলাম, প্রত্যেকের জীবনে একটা তাৎপর্য আছে, একটা মূল সুর আছে। মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়, ধরা পড়ে না। কিন্তু মাঝে মাঝে টনক দিয়ে দেখা যায়। আমি ছিলাম বিজ্ঞানের অধ্যাপক, আইন ব্যবসায়ী। কিন্তু যে-গান (কৃষ্ণকথার গান) ছেলেবেলা থেকে শুনেছিলাম সেই গান আমার সমস্ত জীবন জুড়ে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল এবং এখনো আমি গান গান আর গান করে আছি।

আমি তো শান্তিনিকেতনে গানের মাস্টার ছিলাম। সেদিক থেকে আমার অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে।

আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে যাইনি। দীনেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাতি, মানে বড়দার ছেলের ছেলে। আমি শান্তিনিকেতনে চাকরি পাওয়ার আগে তিনি আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন। প্রথম আদি আর কি! শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম অতিথি হিসাবে। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাকে পাগল করে ফেলত। না চিনতেই তাকে ভালবেসেছি। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যেতাম কলকাতায়, অনেক রকম ব্রহ্মসঙ্গীত শুনতাম—নানান রচয়িতার। নানান রকম গান হতো। কিন্তু কেন জানি না, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে না জেনে, না চিনতেই ভালবেসেছি। সকলেই বুঝছে, এ রবিবাবুর গান। সেইজন্য মনে প্রশ্ন জাগত, কে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বাড়ি কোথায়? স্বাভাবিক কৌতূহল হলো। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দলে গিয়ে ভিড়লাম। গান করলাম। দীনেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন থেকে সেখানে আসতেন। তিনি একদিক থেকে যেমন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাতি, তেমনি আরেকদিক থেকে ছিলেন তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী'। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হলো। তিনি আমাকে গান শেখালেন। আমার নিজের বলতে সঙ্কোচ লাগে, তবু বলতেই হচ্ছে, আমাকে তিনি একটু বেশিই ভালবাসতেন। কেন জানি, নিজেই আগ্রহ করে আমাকে গান শেখাতে চাইলেন। দেখলেই 'গান শেখো, গান শেখো' বলতেন। যেন ধরে পিটিয়ে মানুষ করছেন আর কি! শান্তিনিকেতনে দুদিনের টিকিট করে গিয়েছি। তিনি বললেন, টিকিট ক্যান্সেল কর। তুমি এক সপ্তাহ থেকে যাও। সেটা ১৯৩২ সালের মার্চ মাস। আমি শেষবারের মতো দুদিনের জন্য গিয়েছি বেড়াতে, তীর্থভ্রমণের মতো। আমার টিকিট ফেরত করালেন। এক সপ্তাহ থেকে অন্য ক্লাসগুলি বন্ধ করে দিয়ে খুব করে আমাকে ১৪টি গান শেখালেন।

সেই বছর মে মাসে দেশে (নেত্রকোনা) রবীন্দ্রনাথের

জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ পালন করলাম তাঁর শেখানো গান থেকে নির্বাচন করে। তাতে খুশি হয়ে খবর পাঠালাম দিনদার কাছে—"আপনার শেখানো গান দিয়ে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব করেছি, ২৫শে বৈশাখ পালন করেছি।" তিনি তখন খবর পাঠালেন, একটা কেমিস্ট্রির পোস্ট খালি হয়েছে। তুমি যদি আস, তাহলে আমার কাছে তুমি গানও শিখতে পারবে আর পড়াবে। তখন ওকালতিতে মাত্র নাম লিখিয়েছি। আমার পিতার ভীষণ অনিচ্ছা যে, আমি ওকালতি ছেড়ে ওখানে যাই। কিন্তু একবারই আমার বাবাকে আমি অমান্য করেছি, বললাম—ওটা আমার প্রাণের কামড়। আমি তাঁকে অমান্য করে ছেদ টেনে চলে গেছি।

যখন চাকরীতে বহাল হয়েছি তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথ একবার 'পাগলা ঝোরা' নামে একটা পালা করেছিলেন। আমি সেই পালার গানের দলে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছেন। সৌম্যবাবু আবদার করলেন : "রবিদা, আমাদের তুমি কিছু গান শেখাও।" তিনি তো গান শেখাতে পারলে খুব খুশি হতেন। তাঁর মনে খেদ ছিল—"এত গান লিখলাম কেউ ধরলে না গো, কেউ করে না আমার গান!" খুব মান অভিমান করতেন। আমাকে খুব কথা শোনাতেন। গানের তো বেশি প্রচার হলো ১৯৪৬-এর পর থেকে। তার আগে তো ওগুলি "ন্যাকা ন্যাকা গান, রবিঠাকুরের গান।"—এমন কতরকম অপবাদই কপালে জুটেছে! আমরা কত লুকিয়ে চুরিয়ে পার্কে রবীন্দ্রসঙ্গীত করেছি। সকলেই পিছনে লাগত। আমরা তিনটে গান শিখলাম দল বেঁধে। আমি সেই দলে বসে গান করেছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের এমন দৃষ্টি যে, আমার সেই চেহারা মনে রেখেছিলেন। কি জন্যে সেটা পরে বলছি।

চাকরিতে যোগ দিলাম। আমার বিভাগীয় অধ্যক্ষ আমাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গেলেন। সেটা আশ্রমের প্রথা। নতুন কর্মীদের নিয়ে বিভাগীয় অধ্যক্ষ প্রণাম করিয়ে আনলেন। আমি কেমিস্ট্রির অধ্যাপক হিসাবে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন : "আরে, তোমাকে তো দেখেছি! তুমি তো আমার গান করো, না?" আমি প্রণাম করলাম। একেবারে গলে গেলাম। আমি বললাম : "আপনার গান আমার খুব ভাল লাগে।" উনি একটি কথা বলেছিলেন : "ওটাই থাকবে, আর কিছু থাকবে না।" এই যে ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছিলেন, সেইটি আমার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। কথায় কথায় বললেন : "তুমি কী কর?" বললাম : "অধ্যাপনা করি।" "কী বিষয়?" "কেমিস্ট্রি—রসায়ন।" "না না, মিশিয়ে বলবে।" "কার সঙ্গে কি মেশাব? বাড়িয়ে মিথ্যে করে বলব, নাকি ভুল করে মিথ্যে বলব?" "না, কেমিক্যাল মিউজিক বা মিউজিক্যাল কেমিস্ট্রি বলবে।" মানে দুটোই করছ, তারপর আস্তে আস্তে এগতে এগতে বললেন : "ওটা ছেড়ে দাও। ওটা তোমাকে মানায় না। আমার তো মনে হয়, তোমার ক্লাসে কেউ আসবে না।" আমি বললাম : "আমার ক্লাসে সকলেই আসে। আপনি এইরকম আমার পিছনে লাগেন কিজন্য?" "না না, ওটা ভাল নয়। ওটা ছেড়ে দাও। আমার গানটাই তোমাকে মানায়। তুমি গানই কর।" দীনদা দুবছর পরে চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ আমার টানটা বুঝতে পারলেন। বললেন : "তুমি আমার কাছে এস। তোমার গান ছাড়া যে চলবে না সেটা আমি জানি।"

ও যে ধরলে, আর ছাড়লে না গো। বীরভূমে বলে—'ও তাকে ধরলে আর ছেললে না।' সেই যে ধরলাম, তাঁর সঙ্গে আমার জমে গেল। আমি প্রথম গান করলাম—"পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে।" 'মায়ার খেলা'র গান দিয়ে শুরু করলেন। তারপর আস্তে আস্তে কিছুদিন পরে বললেন : "তুমি একটি ক্লাস নেবে?" আমি বললাম : "সে কি! আমার বিদ্যাবুদ্ধি কি এমন আছে যে, ক্লাস নেব! না শিখে শেখাব!" "না না, তুমি এইরকম ভাবছ কেন? আমি তো রয়েছি। ঝরনার জল কিরকম ঝরে দেখনি—ত্যাগরসে উচ্ছলি পড়ে। ওপর থেকে পড়ে মাঝখান থেকে পায় আর নিচে ঢেলে দেয়। তুমি মধ্যম। তুমি আমার থেকে পাবে, নিচে ঢেলে দেবে।" এত সুন্দর করে বললেন যে, আমি মেতে গেলাম। 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' দিয়ে পূজার ছুটির পরে শিশুদের একটা ক্লাস নিলাম। আস্তে আস্তে এই করে 'লায়েক' হয়ে গেলাম। উনি আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করলেন। স্বরলিপি শিখলাম। স্বরলিপি করলাম। তাঁর অনেক গানের স্বরলিপি করেছি। এইজন্য বলছিলাম, আমার নিজের কোন আলো নেই। সব রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সব রবির আলো এবং আমি আগে যেটা বলেছি, আমার ভিতরে ভিতরে একটা অন্য সুর—আদি সুর প্রচ্ছন্ন ছিল।

আমি তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেনারসে এক্সকারশনে আসতাম। মিশনে যেতাম—রামকৃষ্ণ মিশনে—সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থান। ওখানে গিয়ে আমি যেন দল থেকে আলাদা হয়ে যেতাম। ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হতো, কেমন জানি ভাল লাগে গো। কিরকম কিরকম লাগে আর কী! সেই থেকে মেতে গেলাম—যেটা আমার ভিতরের প্রচ্ছন্ন জীবন। সবদিক দিয়ে যেন আশীর্বাদ আমার কপালে পেয়েছি। সেজন্য আমার নিজের জীবন সম্বন্ধে কখনো বলতে গেলে শান্তিনিকেতনের কথার সঙ্গে আবার আশ্রম, মঠ, স্বামীজীর কথা, গুরুদেব, শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা পাশে পাশে আসে। সেইজন্য আমি ঠাকুরের কথায় বলি—"সব শেয়ালের এক রা।" আমি তাই দুই নৌকাতে পা দিয়ে ধন্য। আমি ছাত্রছাত্রীদের সেই কথাই বলি। কোন্‌টা রাখব, কোন্‌টা ফেলব তার প্রশ্ন নয়। আমি দুই হাতে তালি বাজাই। বিশেষ করে আমার বাইরের পরিচয়টা হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ। 'শান্তিনিকেতনের লোক' আমি। কিন্তু যেটা অন্তর, তা অন্তরে আছে। সেটা প্রচ্ছন্নই রেখেছি। তাই আমার জীবনে সবচেয়ে

বেশি প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-সঙ্গীত। আমাকে বিদ্যাপীঠে ডেকেছেন—সেজন্য আমি ধন্য হয়েছি, কারণ আমার আসল জিনিসটা ধরা পড়ে গেছে। একটি গান বারবার মনে আসছিল—"ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে।"

আমি তো ঠাকুরকে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে বাস করেছি এক পরিবারের মতো। তাঁর মন, তাঁর উপাসনা, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন—সবকিছুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু আমার ভিতরে যা নাড়া দিয়েছে—স্পর্শ করেছে—দূর থেকে আঘাত করেছে, তা

আমার গভীর গোপনে প্রচ্ছন্ন জীবন। আগেই বলেছি, "সব শেয়ালের এক রা"। রবীন্দ্রনাথের যত গান শুনি, যত গান করি, গান সম্বন্ধে যত ভাবি, অনুভব করি—তার সঙ্গে 'কথামৃত', স্বামীজীর নির্দেশ, আদেশ, আচরণের মূল্যায়ন করলে মনে হয় সেগুলো মূলত এক। যেগুলি আমরা বিভেদ মনে করি সেগুলি বাইরের খোলস, সেগুলি অবান্তর, সেগুলি ওপরের প্রলেপ মাত্র; কিন্তু ভিতরে গেলে সবই এক। সবই ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, সৎগুণ, সবই মননশীলতা। সে একদিকেই চলে। সেজন্যে বলি, সবাই একই কথা বলেন। Parallel lines meet at infinity. সবই এক! [ক্রমশ]

'উদ্বোধন'-এ রচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

❑ ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়ে সুখপাঠ্য, ইতিবাচক, বিশ্লেষণমূলক এবং তথ্যভিত্তিক বাঙলা রচনা বিবেচিত হয়। রচনাটিকে অবশ্যই 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উপরি উক্ত যেকোন বিষয়ে রচনাটি কমপক্ষে ২৫০০ শব্দের হওয়া প্রয়োজন। ছদ্মনামে পাঠানো রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ আক্রমণাত্মক রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ কবিতা, সংবাদ, চিঠিপত্র নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

❑ শারদীয়া সংখ্যার (আশ্বিন/সেপ্টেম্বর) জন্য রচনা পাঠালে তা ১৫ চৈত্র/৩১ মার্চ-এর মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন।

❑ ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনায় আলোকচিত্র (গ্লসি প্রিন্ট) পাঠানো আবশ্যিক।

❑ যেকোন তথ্যভিত্তিক রচনা এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবি (গ্লসি প্রিন্ট), রেখাচিত্র ইত্যাদি পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিলে বা সাহায্য নিলে যথাযথ সূত্রনির্দেশ (গ্রন্থের/পত্রিকার নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশকাল, সংস্করণ এবং পৃষ্ঠা) আবশ্যিক।

❑ ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে যথেষ্ট মার্জিন দিয়ে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি না পাঠালে বিবেচিত হবে না। বাঙলায় টাইপ করা পাণ্ডুলিপি পাঠানো যেতে পারে।

❑ রচনার কার্বন বা জেরক্স কপি গ্রহণযোগ্য নয়।

❑ অন্যত্র প্রকাশিত কোন রচনা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। এর ব্যতিক্রম হয় শুধু 'মাধুকরী' বিভাগের রচনাগুলির ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রেও রচনাটিকে 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

❑ উপন্যাস বিবেচিত হবে না।

❑ অমনোনীত রচনা ফেরতযোগ্য নয়। রচনার সঙ্গে প্রেরিত নথিপত্র বা ছবি সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং রচনা/ নথিপত্র/ছবির কপি রেখে পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ সাধারণত কোন রচনা পাঠানোর একবছরের মধ্যে এবং কোন গ্রন্থের আলোচনা গ্রন্থ পাঠানোর দুবছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে বুঝতে হবে, সংশ্লিষ্ট রচনাটি অথবা গ্রন্থটি মনোনীত হয়নি।

❑ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য পাঠানো রচনা অন্তত একবছরের মধ্যে যেন অন্যত্র প্রকাশের জন্য প্রেরিত না হয়। একবছরের মধ্যে 'উদ্বোধন'-এ কোন রচনা প্রকাশিত না হলে অন্যত্র প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে পাঠানোর আগে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়।

❑ 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে আলোচনার জন্য 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থই বিবেচ্য। আলোচনার জন্য প্রতি গ্রন্থের দুখানি কপি জমা দেওয়া আবশ্যিক।

❑ পরলোক-সংবাদ ও অনুষ্ঠান-সংবাদ পরলোকপ্রাপ্তি বা অনুষ্ঠানের পনের দিনের মধ্যে অবশ্যই আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন। অন্যথায় সে-সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

❑ লেখক-লেখিকাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আমরা স্বীকার করি। তবে তাঁদের মতামত আমাদের অনুমোদিত—এটা ভাবা ভুল। মতামতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকাদেরই।

❑ রচনাদি নির্বাচন ও প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

❑ পত্রোত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট/পোস্টকার্ড/ইনল্যান্ড/খাম পাঠাতে হবে।

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অস্ত্রভাণ্ডার'

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ধারালো একটি ছুরি, তার নাম 'বিচার'।
শক্তিশালী একটি চিমটে, তার নাম 'বোধ'।

ভয়ঙ্কর একটি অগ্নি আবর্ত, যাতে কাঁচা পুড়ে পাকা হয়।

এইসব অস্ত্র প্রযুক্ত হবে নিজের প্রতি। তৈরি হও। প্রথমে 'আমি'। আমি যাব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। আমি শুনব তাঁর অমৃতবাণী। আমি উপদেশ ধারণ করব, পালন করব। আমার শ্বাসে-প্রশ্বাসে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবাহিত হবেন। আমার 'আমি'র দখলদারি নেবেন তিনি। সেই 'আমি'টা কোন্ আমি! সদাচঞ্চল, পরস্ত্রীকাতর, কামনা-বাসনায় ভরপুর, অবিশ্বাসী, সঙ্কীর্ণ এক 'আমি'। সে তো মাছির মতো। এই মধুতে, তো ঐ বিষ্ঠায়। তিনি তো আমাকে চান, আমি কী তাঁকে চাই! আমি কি এই বিচারে বসি না—শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে কী দিতে পারেন?

এ প্রশ্ন কোন্ 'আমি'র? কাঁচা 'আমি'র—যে-আমিটা একটা দেহ বয়ে বেড়ায়। থমথমে গম্ভীর মুখে আস্ফালন করতে থাকে, বলে—'আমার বাড়ি', 'আমার টাকা', 'আমার বিদ্যা', 'আমার ঐশ্বর্য'!

ঠাকুর বললেন ঃ বুঝলে হে! এটি হলো, 'বজ্জাৎ আমি'। 'বজ্জাৎ আমি' কে? যে-'আমি' বলে, জানে না আমি কে! আমার এত টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে? যদি চোরে দশটাকা চুরি করে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে নেয়, তারপর চোরকে খুব মারে। তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিসে দেয় ও ম্যাদ খাটায়। 'বজ্জাৎ আমি' বলে, আমার দশ টাকা নিয়েছে! এত বড় আস্পর্ধা! তুমি সেই গল্পটা জান?

কোন্‌টা ঠাকুর?

একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা থাকত। একটা হাতি সেই গর্ত ডিঙিয়ে গেছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতিকে লাথি দেখাতে লাগল আর বলল, তোর এত বড় সাধ্য যে, আমায় ডিঙিয়ে যাস! টাকার এত অহঙ্কার!

আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্যাঙ বলেছিল, উঁচকপালী, চিরুনদাঁতী, আমায় যে বড় ডিঙোলি!

'অহঙ্কার' শব্দটাই তো একটা প্রশ্ন। 'অহং' কার? মান করে বসে আছেন শ্রীরাধিকা। বৃন্দে বললেন, এ 'অহং' কার? এ তাঁরই 'অহং'। কৃষ্ণের গরবে গরবিনী।

মানুষের 'আমি', 'আমি' শুনে মহাকাল মুচকি হাসেন। নির্বোধের টঙ্কার। ক্যাঁক করে টিপে ধরব গলা, তিন খাবিতে 'আমি'র লম্ফঝম্প শেষ! মৃত্যুকে স্মরণে রাখ, দেখবে 'বজ্জাত আমি'টা নেতিয়ে পড়বে।

সেদিন কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল। কেশব বললে, আরো বলুন। আমি বললুম, আর বললে দলটল থাকে না। তখন কেশব বললে, তবে আর থাক মশাই। তবু কেশবকে বললুম। তুমিও শোন, যদি ধরতে পার তাহলে তোমার বেঁচে থাকার রঙ পালটাবে। 'ব্যাঙ-মানুষ' থেকে 'বোধ-মানুষ'-এ রূপান্তরিত হবে। 'আমি'র ক্যানেস্তারা বাজিয়ে ঘুরছ, তখন একতারাতে তুঁহু তুঁহু বাজবে। কেশবকে বললুম ঃ "আমি, আমার—এটি অজ্ঞান। আমি কর্তা আর আমার এইসব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম —এ-ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না।" তখন কেশব বললে ঃ "মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না!"

কেশব ঠিকই বলেছিল। বিচার করতে করতে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না। পেঁয়াজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বারবার ছাড়াতে ছাড়াতে ভেতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

তা কেশবকে একটা পথ বাতলালুম। বললুম ঃ "কেশব! তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্তা', 'আমার স্ত্রী-পুত্র', 'আমি গুরু'—এসব অভিমান 'কাঁচা আমি'। এইটি ত্যাগ করে 'পাকা আমি' হয়ে থাক—'আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা।' তবে বাপু তোমাকে সত্য কথাটা বলি, 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ-অভিমান ভাল।'

'আমি'কে তুমি তিনভাবে রাখতে পার—'দাস আমি', 'ভক্তের আমি', 'বালকের আমি'। মনে মনে বলতে থাক, 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আর এসব তোমার জিনিস—বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব,—এসব তোমার জিনিস।'

শোন, বিজয় গোস্বামীকে আমি যা বলেছিলুম তোমাদেরও তাই বলি ঃ "দুই একটি লোকের সমাধি হয়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখ ফেঁকড়ি বেরিয়েছে। একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। 'হে ঈশ্বর। তুমি প্রভু, আমি দাস' এইভাবে থাক। 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত'—এরূপ 'আমি'তে দোষ নাই; মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।"

শুনছ তুমি?

শুনছি ঠাকুর। 'আমি' একটা লেংটি ইঁদুর। চিত্তের কুটীরে

অহঙ্কারের ছোট ছোট ধারালো দাঁতে বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান, শাস্ত্র সব কুড়কুড় করে কাটছে।

তাতে কি হয়েছে! এই অহঙ্কারটুকু রাখলে কি হয়। সতের অহঙ্কার। 'আমি তাঁর সন্তান।' তোমাকে তিনি ধরে রাখবেন, ধরে থাকবেন। তাই বলি, কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নামগুণগান কর, প্রার্থনা কর। ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই। যেমন জলরাশির ওপর বাঁশ না রেখে একটি রেখা কাটা হয়েছে। যেন দুই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। 'দাস আমি', কি 'ভক্তের আমি', কি 'বালকের আমি'—এরা যেন 'আমি'র রেখামাত্র।

'আমি'টাকে ঈশ্বরের কৃপায় ফুরফুরে করা যায়। নাসিকার বাতাসের মতো থাকবে, যেন বোঝা না যায়। সব 'আমি'র সঙ্গে মিলেমিশে যতদিন পৃথিবীতে আছি থাকুক না। রাম নামে যেমন ভূত পালায়, ভগবানের নামে সেইরকম বিষয় পালায়। তাঁর দেওয়া বোধের চিমটে দিয়ে মন থেকে বিষয়ের গিরগিটি, টিকটিকি, আরশোলা সব তুলে ফেলে দাও।

এখন আমার কথা আপনাদের বলি। আসুন, রামকৃষ্ণ-হোমাগ্নিতে কাঁচা 'আমি'কে পুড়িয়ে পাকা করি। সংসারের আগুন ঝলসায়, রামকৃষ্ণ-অগ্নি সোনা করে দেয়।

দূরত্ব যদি মাপতেই হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে দূরত্ব কতটা—বোধের ফিতে ফেলে মাপি। দুহাতে ধরতে গেলে হাতদুটো খালি করতে হবে। দুহাতের তালু থেকে সংসারের লাড্ডুদুটো ফেলতে হবে। সে দুটো হলো—কাম আর কাঞ্চন। সে-রূপ দেখতে হলে খুলতে হবে চশমা। সেই কণ্ঠের অমৃতবাণী শুনতে হলে ভেতরের কোলাহল শান্ত করতে হবে। সেখানে বসে আছে শেয়ার মার্কেট। অজস্র পাটোয়ারের পাটোয়ারি, কলকোলাহল।

ঠাকুর বলেছেন: "আনন্দ তো বাইরে নেই। আছে তোমার অন্তরে। তোমার অন্তরের চেয়ে অন্তরঙ্গ আর কে আছে। আমার যখন পড়ে গিয়ে হাত ভাঙল তখন ভাবলুম, হাত ভেঙেছে সব অহঙ্কার নির্মূল করবার জন্য। এখন আর ভেতরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজতে গিয়ে দেখি, তিনি রয়েছেন। অহঙ্কার একেবারে না গেলে তাঁকে পাওয়ার জো নাই।"

অন্তরে আমার ঠাকুরকে বসাতে হলে আর কিছু নয়, সেই অঞ্চলটিকে পরিষ্কার করতে হবে। কার সঙ্গে চালাকি? ঠাকুরের সঙ্গে? তিনি যে চালাকের চালাক। ভেতরটা দেখেন। পবিত্রতার গন্ধ পেলে, ভক্তির ঘণ্টাধ্বনি শুনলে তবেই প্রবেশ করবেন, নইলে যেমন বলেছিলেন: "ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, 'আমায় উদ্ধার কর! হে ঈশ্বর!' আরেক থাক তারা অন্তরঙ্গ, তারা ওকথা বলে না—তাদের দুটি জিনিস জানলেই হলো। প্রথম, আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে? তারপর, তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?" ❑

চীনা চিকিৎসাপদ্ধতির বহুল প্রসারে জটিলতা

রব প্যারি জোন্স ও আমান্ডা ভিনসেন্ট

ভাষান্তর ঃ জলধিকুমার সরকার

চীনদেশের ঐতিহ্যগত ওষুধ (Traditional Chinese Medicine, T.C.M.—টি.সি.এম.)-এর বহুল ব্যবহারের ফলে বহু গাছগাছড়া বা জন্তুজানোয়ার বিপন্ন প্রজাতির (endangered species) পর্যায়ে এসে যাচ্ছে। এই নিয়ে সংরক্ষণবাদীদের (conservationists) সঙ্গে ঔষধ-ব্যবসায়ী ও ঔষধ-ক্রেতাদের বিবাদ আরম্ভ হয়েছে। হংকং-এর এক ব্যবসায়ী বলেন ঃ "বিপন্ন প্রজাতির জন্তুদের রক্ষা করা কর্তব্য—এটা আমরা জানি, কিন্তু মানুষের জীবনরক্ষা করাও তো আমাদের কর্তব্য। মানুষের জীবন জন্তুজানোয়ারদের জীবনের চেয়েও বেশি দামী।" এই ধরনের জবাব পেয়ে সংরক্ষণবাদীরা যেন খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছে।

গত বছর 'ইউ এন কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেঞ্জার্ড স্পিসিস'-এর প্রস্তাবে যে ১৩৬টি জাতি সই করেছিল তার মধ্যে চীনও ছিল। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ঐতিহ্যগত ওষুধ তৈরিতে বন্যপ্রজাতিকে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করলে তাদের অস্তিত্বই থাকবে না। এর জন্য যে প্রশিক্ষণের দরকার তা মেনে নেওয়া হয়েছিল, তবে সেইসঙ্গে ঐতিহ্যগত ওষুধের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃতিলাভ করেছিল।

টি.সি.এম. চিকিৎসাকে চালু রাখার জন্য উপায় নির্ধারণ করা খুবই প্রয়োজন। কারণ জন্তুজানোয়ার ও গাছগাছড়া ব্যবহার করে যতরকমের ঐতিহ্যগত চিকিৎসাপদ্ধতি পৃথিবীতে চালু আছে, টি.সি.এম. চিকিৎসাপদ্ধতিই সকলের চেয়ে বৃহৎ। বিভিন্ন মহাদেশে চাইনীজ, কোরিয়ান ও জাপানীদের ধরে সারা পৃথিবীর অন্তত এক-চতুর্থাংশ লোক টি.সি.এম. পদ্ধতিগত চিকিৎসার আওতায় পড়ে। ১৯৯৪ সালে এই চিকিৎসার মাধ্যমে ২ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছিল। এই অঙ্ক দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এই চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের ৮৫ শতাংশ আসে গাছগাছড়া থেকে, ১৩ শতাংশ আসে জন্তুজানোয়ার থেকে এবং ২ শতাংশ আসে খনিজ দ্রব্য থেকে। অনেক সময় প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এদের ১-১২টি মিশিয়ে একটি ওষুধ তৈরি হয়।

টি.সি.এম. চিকিৎসা-মতে শরীর হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব। এতে ভারসাম্য নষ্ট হলে অসুখ হয় এবং বিশ্রাম, ওষুধ এবং ব্যায়ামের দ্বারা এর সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার যে সামান্য কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেছে, এই চিকিৎসাপদ্ধতি তাদের অন্যতম। টি.সি.এম. সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ধারণা একটু গোলমেলে। সাধারণত একে 'অন্ধবিশ্বাস' বলে ধরা হয়, যদিও কয়েকটি পাশ্চাত্য ওষুধের সাফল্যের পিছনে এটি রয়েছে। যেমন তারাফুল (daisy) থেকে তৈরি 'আর্টেমিসিন' (artemisin), যা ১৫০০ বছর ধরে চালু আছে এবং বর্তমানে পাশ্চাত্যে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে খুবই আশাপ্রদ ওষুধ। গাছ থেকে তৈরি হাঁপানির ওষুধ 'এফিড্রিন' একটি চীনা ওষুধ, যা হাজার বছর ধরে চলে আসছে। লন্ডনের 'গ্রেট অর্মন্ড স্ট্রীট' হাসপাতালে সাম্প্রতিক এক পরীক্ষায় একটা টি.সি.এম. ওষুধ এত কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি ওষুধ-কোম্পানি তাদের নিজেদের বলে একে পেটেন্ট করে নিয়েছে। খুব আস্তে আস্তে বড় হয় এমন একটি বুনো গাছের মূল থেকে এটি তৈরি হয় এবং সেজন্য এটি অতিশোষিত (over-exploited) হওয়ার সম্ভাবনা।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি যেমন কিছু কিছু টি.সি.এম. ওষুধকে অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে, তেমনি খোদ টি.সি.এম. পদ্ধতিতেও নানাধরনের পরিবর্তন আসছে। চীনে এখন দুরকম পদ্ধতিই সমান্তরালভাবে চলছে। রোগীর স্ট্রোক হলে ডাক্তার যেমন সি.টি. স্ক্যান করে রক্তনালীতে জমাট-বাঁধা রক্ত খুঁজে বের করছে, তেমনি তার পরেই টি.সি.এম. ওষুধ ব্যবহার করে সেই রক্ত সরিয়ে দিচ্ছে। চীনে সবচেয়ে পুরনো (খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর) ফার্মাকোপিয়াতে (Pharmacopocia—ওষুধ তৈরির প্রণালী পুস্তক) পাওয়া যায় ৩৬৫টি গাছগাছড়া, জান্তব ও খনিজ পদার্থ। বর্তমানে ঐ সংখ্যা ১১,৫৫৯। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্তমানে এই চিকিৎসাপদ্ধতির চাহিদা অত্যাশ্চর্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় আরো নতুন নতুন ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

বন্য গাছগাছড়া বা জন্তুর ওপর এর সাঙ্ঘাতিক প্রতিফলন সহজেই অনুমেয়। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য এই বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা (field survey) করে যাকিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা কয়েকটি ওষুধে ব্যবহার্য স্তন্যপায়ী জন্তু সম্বন্ধে মাত্র। উক্ত সমীক্ষাফল খুবই হতাশব্যঞ্জক। বাঘের হাড়ের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হওয়ায় শুধু যে বাঘের স্বাভাবিক বাসস্থান (habitat) বদলে গেছে তা নয়, বাঘের সংখ্যাও অত্যন্ত কমে গেছে। ওষুধে গণ্ডারের শিং ব্যবহৃত হওয়ায় এর সংখ্যাও খুব কমে গেছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণ গণ্ডারের সংখ্যা ৯৫ শতাংশ কমেছে। জাভা ও সুমাত্রায় গণ্ডার প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এদিকে ভালুকের পিত্তের চাহিদা বেড়ে চলায় এর সংখ্যাও খুব কমে গেছে। ওষুধে লাগে এরকম অ-স্তন্যপায়ী প্রজাতির ওপর কিরকম প্রভাব পড়ছে তা জানা নেই; তাদের জীববিদ্যা, তাদের নিয়ে ব্যবসা, তাদের সংখ্যা কিভাবে কমছে—এসম্বন্ধেও কোন তথ্য জানা নেই। যেভাবে চীনা চিকিৎসার প্রসার হচ্ছে, তাতে অনেক সময় কোন্ কোন্

প্রজাতি কোন্ ওষুধে লাগে তা জানার আগেই সেই প্রজাতিগুলির সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। যেমন সি-মথ, যা সি-হর্স বা সামুদ্রিক ছোট ঘোড়ামুখী মাছের মতো দেখতে এবং হাঁপানি, বীর্যহীনতা ও সামান্য শরীর খারাপের ওষুধ হিসাবে মাত্র ৩০ বছর আগে টি.সি.এম.-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর ব্যবসা বর্তমানে চীন, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন্স ও ভিয়েতনামে খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। এই প্রাণী যে কতদিন টিকবে তা বলা যাচ্ছে না, কারণ এদের বাস্তুসংস্থান (ecology) সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের সংখ্যা ৭০ শতাংশ কমে গেছে। ফলে ব্যবসায়ীরা ইকোয়েডর, মোজাম্বিক প্রভৃতি দূর দূর অঞ্চলে এদের ধরতে আরম্ভ করেছে। টি.সি.এম. ওষুধের জন্য গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কচ্ছপও ধরা হচ্ছে।

বেশি চাহিদা ও কম সরবরাহের জন্য দুর্লভ প্রজাতির প্রাণী বা গাছগাছড়ার দাম ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। দূরদূরান্তে গভীর জঙ্গলের মধ্যেও এদের খোঁজ করা হচ্ছে। এর ফলে এগুলি এশিয়া মহাদেশে বহু লোকের জীবনধারণের পণ্য হয়ে উঠেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সামুদ্রিক সি-হর্স বা ছোট ঘোড়ামুখী মাছ।

টি. সি. এম.-এ ব্যবহৃত বিপন্ন প্রজাতির গাছগাছড়া বা প্রাণীর রাসায়নিক বা জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিকল্প খোঁজা হচ্ছে। এদের কম ব্যবহার করার বিষয়ে চীনা দার্শনিক মেনিকাশ খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের মতো এখানকার লোকের সংরক্ষণ বা হিসেব করে খরচ করার মনোবৃত্তি নেই। হংকঙের এক পাইকারী ব্যবসায়ী বলেন ঃ "বিপন্ন প্রজাতিকে কম ব্যবহার করে লাভ কি? এদের দাম বেশি বলে এদের ব্যবসায়ে বেশি লাভ।" অর্থনৈতিক হিসাবও ঐধরনের কথাই বলে—গণ্ডারের শিং এবং বাঘের হাড় চালান করা বন্ধ করে চীনের ওষুধ ব্যবসায়ে ১৯৯৩ সালে ২.৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছিল। এসম্বন্ধে বেশি আলোচনায় ক্রমে আরো জটিলতা এসে যায় এবং পাশ্চাত্যের ভুল ধারণা প্রকাশ পেয়ে যায়।

টি.সি.এম.-এ গণ্ডারের শিং কামোদ্দীপক হিসাবে, এমনকি সাঙ্ঘাতিক জ্বরেও ব্যবহৃত হয় এবং এর জ্বর কমানোর ক্ষমতাও প্রমাণিত হয়েছে। আদি চীনারা (ethnic Chinese) মনে করে যে, টি.সি.এম. চিকিৎসাই একদিন বিপন্ন হবে এবং একে শুধু শুধু আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ সমস্যার মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে। বন্য গাছগাছড়া বা প্রাণীর অন্যান্য নানাধরনের চাহিদাও আছে। গণ্ডারের শিং দিয়ে ইয়েমেনে দামী ছোরার বাঁট তৈরি হয়। হরিণের কস্তুরী পাশ্চাত্যে সুগন্ধীদ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধদের মন্দিরে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কচ্ছপ বিক্রি হয়। সামুদ্রিক ঘোড়া-মুখী মাছ ও গোসাপও অনেকে পোষে। [**New Scientist, 3rd January 1998, pp. 26-29**] ❑

> **শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।**
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

'A Text Book of Homoeopathic Materia Medica Elaborated with Illustrations' গ্রন্থের লেখক, পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে দশ বছর অধ্যাপনা এবং ত্রিশ বছর চিকিৎসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা জানাতে ধারাবাহিক লিখছেন। তাঁর ধারণা, এতে সাধারণ অসুস্থতা ও অসুখ-বিসুখ এড়ানো সম্ভব হবে এবং ফলত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

❑ প্রাতর্ভ্রমণের আগে সযত্নে দাঁত মাজতে হবে। প্রথমে আঙুল দিয়ে দাঁতের মাড়ি 'মাসাজ' করতে হয়। মনে রাখতে হবে, এই মাড়ি 'মাসাজ' খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাসাজের পর ব্রাশ দিয়ে দাঁত ও দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার করতে হবে। সবথেকে ভাল নিমগাছের সরু ডাল থেকে দাঁতন তৈরি করে দাঁত মাজা। দাঁত মাজার জন্য ছাই, মাটি, গুড়াখু, নুন, নুন-তেল ব্যবহার করা কখনো উচিত নয়। চকখড়িকে খুব মিহি করে তা দিয়ে দাঁত মাজা যেতে পারে। রাসায়নিক টুথপেস্ট সম্পর্কে যতই নানা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক না কেন, সেগুলি ব্যবহার করার আগে সুযোগ্য দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। অনেক সময়েই দেখা যায়, বহুবিজ্ঞাপিত টুথপেস্ট ব্যবহারের ফলে নানা নতুন উপসর্গের সূচনা হয়েছে।

❑ বর্তমানে নানা রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার আমাদের জীবনে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেগুলি হলো টুথপেস্ট, শেভিং ক্রীম, সাবান, সোডা, ডিটারজেন্ট, ফিনাইল, ফেস-পাউডার, বডি-পাউডার, ক্রীম, স্নো, শ্যাম্পু, হেয়ার-ডাই, ঠাণ্ডা পানীয় ইত্যাদি। জিনিসগুলি মানুষের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, এগুলি সম্পর্কে সতর্কীকরণ অনেকে হয়তো পছন্দই করবেন না। তবে চিকিৎসক হিসাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এগুলির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে মানুষের শরীরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং নতুন নতুন অসুখের প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

❑ ক্রীম, সাবান, শ্যাম্পু, হেয়ার-ডাই, ঠাণ্ডা পানীয় ইত্যাদি ব্যবহারে খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং এসম্পর্কে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

হল্যান্ডের লোকেরা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায়

হল্যান্ডের (নেদারল্যান্ডের) লোকেরা পৃথিবীর সকল জাতির লোকদের থেকে দীর্ঘকায়। শুধু তাই নয়, এদেশের অধিবাসীদের দৈহিক উচ্চতা বেড়েই চলেছে। ১৯৯৭ সালে এদেশের চতুর্থ অঙ্গবৃদ্ধি সমীক্ষায় (growth study), যাতে ২০,০০০ অনূর্ধ্ব ২১ বছরের যুবকদের পরীক্ষা করা হয়েছিল, তাতে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

১৯৮০ সাল থেকে ছেলেদের উচ্চতা গড়ে ২০ মিলিমিটার (যাদের গড় উচ্চতা ছিল ১.৮৪ মিটার) এবং মেয়েদের উচ্চতা গড়ে ২৩ মিলিমিটার (যাদের গড় উচ্চতা ছিল ১.৭১ মিটার) করে বেড়ে চলেছে। 'লেডেন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার' এবং হল্যান্ডের ফলিত বিজ্ঞান গবেষণার 'টি. এন. ও. প্রিভেনশন অফ হেলথ'-এর যৌথ পরীক্ষায় এই ফল পাওয়া গেছে। এই ধরনের প্রবণতা চলবে অন্তত ২০১২ সাল পর্যন্ত। এবিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে যে, তখন পুরুষের গড় উচ্চতা দাঁড়াবে ১.৮৬ মিটার এবং মেয়েদের উচ্চতা হবে ১.৭২ মিটার। তুলনামূলকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডে যে স্বাস্থ্যসমীক্ষা করা হয়েছিল তাতে ১৬-২৪ বছর বয়স্ক পুরুষদের গড় উচ্চতা পাওয়া গিয়েছিল ১.৭৬ মিটার এবং ঐ বয়সের মহিলাদের উচ্চতা পাওয়া গিয়েছিল ১.৬৩ মিটার।

যদিও কোন কোন দেশে দীর্ঘতর উপদল (taller population groups) আছে—যেমন তানজানিয়া ও কেনিয়াতে 'মাসাইরা', কিন্তু দেশ হিসাবে হল্যান্ডের চেয়ে দীর্ঘকায় অধিবাসী অন্য কোন দেশে নেই। ১৯৮০ সালে 'ডাচ' অর্থাৎ হল্যান্ডের লোকেরা উচ্চতায় 'স্ক্যান্ডিনেভিয়ান'দের (ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন এবং আইসল্যান্ডের লোকদের) ছাড়িয়ে গেছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের উচ্চতা প্রায় ঐ অবস্থাতেই রয়ে গেছে, কিন্তু ডাচদের উচ্চতা বেড়েই চলেছে। গবেষকরা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, কতকগুলি কারণ, যেমন জিন (বংশগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান), খাদ্য, জীবাণু সংক্রমণ, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা প্রভৃতির সংযোগ দৈহিক উচ্চতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। উচ্চতা ব্যাপারে যে জিনসংক্রান্ত কারণ আছে, তা বেশ বোঝা যায় যখন উত্তর নেদারল্যান্ডের লোকদের সঙ্গে দক্ষিণ নেদারল্যান্ডের লোকদের উচ্চতা তুলনা করা হয়। উত্তরাঞ্চলের ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে গড়ে ৫০ মিলিমিটার বেশি লম্বা এবং দক্ষিণের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে গড়ে ২০ মিলিমিটার বেশি লম্বা। লোকসংখ্যা মোটামুটি একই।

'ফ্রিসিয়ান'রা বা হল্যান্ডের উত্তর অংশের দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারীরা বংশগতভাবে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান-ঘেঁষা। আবার দক্ষিণের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ('লিম্বার্জ'রা) বংশগতভাবে দক্ষিণ ইউরোপ-জাত। যদিও তারা তুরস্ক ও মরক্কো থেকে এসেছে এবং তাদের ছেলেরা উচ্চতায় আদি ডাচদের চেয়ে গড়ে ৯৫ মিলিমিটার কম, তবুও তারা তুরস্ক ও মরক্কোর লোকেদের চেয়ে বেশি লম্বা। গবেষকরা বলেন যে, ডাচদের খাদ্যে গত ৩০ বছর প্রোটিনের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে (সারা পৃথিবীতে বর্তমানে ডাচেরাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দুগ্ধজাত খাবার খায়)। গবেষক মিরান্ডা ফ্রেডরিক্স জোর দিয়ে বলেন যে, ডাচদের লম্বা হওয়ার ব্যাপারে খাদ্য ছাড়া অন্য কারণও আছে, যেমন—এদেশের শিশুদের টীকা নেওয়ার হার ৯৫ শতাংশ।

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে প্রকাশ পাচ্ছে যে, ডাচ যুবক-যুবতীরা স্থূলকায় হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮০ সালে তাদের ১০ শতাংশকে উচ্চতা ও ওজন অনুপাতে মাত্রাধিক ওজনের বলা হয়েছিল; ১৯৯৭ সালে এই অনুপাত দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ঐ অনুসন্ধানেই জানা গেছে যে, স্তন্যপালিত শিশুদের অনুপাত অনেক কমে গেছে। ১৯৯২ সালে যেটা ছিল ২৫ শতাংশ, ১৯৯৭ সালে সেই অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশে। **(British Medical Journal, 27 June 1998, pp. 1929)**

জীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক-বিরোধিতা এখন ভীতিকর পর্যায়ে

বিভিন্ন দিক থেকে এখন জীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক-বিরোধিতা (antibiotic resistance) উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমেরিকা কয়েক বছর ধরে এবিষয়ে বলে আসছে। গত এক বছরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পশুপালন বিভাগের এই সমস্যা নিয়ে দুবার আলোচনায় বসেছে। সম্প্রতি হল্যান্ডের চিফ মেডিক্যাল অফিসার আইনার ক্র্যাগ জীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক-বিরোধিতা বন্ধ করা অথবা তাকে সীমিত করার ব্যাপারে কী কৌশল নেওয়া হবে তাই নিয়ে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'-এর সহকর্মীদের আলোচনার জন্য ডেকেছিলেন। হাউস অব লর্ডসের রিপোর্টের ভাষায়—"জীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক-বিরোধিতার ফলে জনস্বাস্থ্য যে একটি বিরাট বিপদের সম্মুখীন—এটা এখন যতটা মেনে নেওয়া হয়, তার চেয়ে আরো বেশি করে সচেতন হতে হবে।"

এই সমস্যার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। গত ৫০ বছর যাবৎ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের লোকেরা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া তাদের অধিকার বলে ধরে নিয়েছে—সামান্য ধরনের জীবাণু-সংক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র (অথবা নিজেদের চিকিৎসা নিজে করার জন্য) কয়েকটি সস্তা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে। এখন আমরা আর অ্যান্টিবায়োটিক-পূর্ব যুগে ফিরে যেতে পারি না, কিন্তু এইসব ওষুধের লাগামছাড়া ব্যবহার আমাদের ঐ পথেই ঠেলে দিচ্ছে।

প্রধানত দুইভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়—মানুষের জন্য এবং চাষে ও পশুদের বৃদ্ধির জন্য তাদের ওষুধ হিসাবে। নিম্নের সারণীতে দেখা যাচ্ছে—

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়	কী ধরনের ব্যাপারে	ব্যবহারের কারণ সন্দেহজনক
মানুষের জন্য (৫০ শতাংশ)	২০ শতাংশ হাসপাতালে ৮০ শতাংশ জনগণের জন্য	২০-৫০ শতাংশ অপ্রয়োজনীয়
কৃষিকাজে (৫০ শতাংশ)	২০ শতাংশ রোগ আরোগ্যে ৮০ শতাংশ সংক্রমণ প্রতিরোধে ও বেড়ে ওঠার জন্য	৪০-৮০ শতাংশ খুবই সন্দেহজনক

কোন কোন দেশে ফলগাছে অনেকদিন ধরে অ্যান্টিবায়োটিক স্প্রে করা হয়, কোথাও বা প্রতি একর মাছ চাষে ৫০-৬০ কেজি অ্যান্টিবায়োটিক যোগ করা হয়। এবিষয়ে আগামীদিনে কিছু পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছে। **(British Medical Journal, 5 September 1998, pp. 609-610)** ❑

মহাভারতের অমর কাহিনী

অমলেন্দু চক্রবর্তী

The Mahabharat (An episodic presentation)—Aditi Kumar Roy. Publisher : S. Roy, 50/47 Santosh Roy Road, Calcutta-700 008. Price : Rs. 65. Pages : 8+447

মহাকবি ব্যাসদেব রচিত 'মহাভারত'-এ ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত। মহাভারত একটি নিছক ধর্মগ্রন্থ নয়, মহাভারত ভারতবর্ষের জীবনবেদ। মহাভারত হিমালয়ের মতোই অত্যুচ্চ ও সুমহান এবং সমুদ্রের মতো বিরাট ও সুগম্ভীর। মহাকবি বলেছেন :

"যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা হি হিমবান্ গিরিঃ।
উভৌ খ্যাতৌ রত্ননিধী তথা ভারতমুচ্যতে।।"

'মহাভারত' যথার্থই তৃতীয় 'রত্ননিধি'। ভারতবর্ষের তিনটি 'রত্ননিধি'। ঋষিকবি বলেছেন, উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে মহাসাগর 'রত্ননিধি' নামে খ্যাত। তেমনি রত্ননিধি 'মহাভারত'। ভৌগোলিক অর্থে একথা ঠিক। কিন্তু 'মহাভারত' এই ভৌগোলিক সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে নানাভাবে নানাদিকে সম্প্রসারিত করেছে।

'মহাভারত'-এর চরিত্রসৃষ্টি ও চরিত্রাঙ্কন ঋষিকবির সৃজনশীল মনের এক অপূর্ব নিদর্শন। 'মহাভারত' যে ইতিহাস, এ-দাবি মহাকবি ব্যাসদেব নিজেই করেছেন। কিন্তু "ঘটে যা, তা সব সত্য নহে"—এই নীতি অনুসারে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর মনের রঙে রঞ্জিত করে 'মহাভারত'-এর চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন। চরিত্রগুলি উঠে এসেছে মহর্ষির মানস-সমুদ্র মন্থনের মধ্য দিয়ে।

রাজশেখর বসুর মহাভারতের গদ্য সংস্করণ ৫০ বছর আগে বাঙালী বিদগ্ধ সমাজে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। সম্প্রতি অদিতিকুমার রায় ইংরেজীতে মহাভারতের একটি সংস্করণ **'The Mahabharat'** প্রকাশ করে 'মহাভারত'-এর ঘটনাবলীকে একটি নান্দনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মহাকাব্যের অসংখ্য ঘটনা তাঁর রচনাশৈলীর দক্ষতায় এক বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে।

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বই শ্রীরায়ের রচনায় উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিটি পর্বের ঘটনাবলীকে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন। মহাভারতীয় নরনারী স্বাভাবিক রূপেই চিত্রিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকটি চরিত্র বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমেই বলতে হয় ভীষ্ম-চরিত্রের কথা। তিনি দ্যূতসভায় দ্রৌপদীকে রক্ষা করেননি —একথা আমরা ভুলতে পারি না; কিন্তু অনুমান করতে পারি যে, তৎকালে তাঁর নিশ্চেষ্টতা, যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান এবং পরিশেষে পাণ্ডবদের হিতার্থে মৃত্যুবরণ—এই সমস্তের কারণ তাঁর প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী কর্তব্যবুদ্ধি। বিদুর-চরিত্র যেন বিগ্রহবান ধর্ম। তিনি প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি। এককথায় বলা যেতে পারে, বিদুর ভারতবর্ষের জাগ্রত বিবেকের বাণীমূর্তি। 'মহাভারত'-এর 'অনুক্রমণিকা'য় বেদব্যাস সর্বাগ্রে গান্ধারী এবং বিদুরের উল্লেখ করেছেন। গান্ধারীর ধর্মশীলতা ও বিদুরের প্রজ্ঞা 'মহাভারত'-এ সর্বোচ্চ সম্মানের আসন পেয়েছে। গান্ধারী মনস্বিনী, ন্যায়ধর্ম পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি পুত্রের দুর্বৃত্ততা ও স্বামীর দুর্বলতা দেখে শঙ্কিত হয়েছেন, ভর্ৎসনা করেছেন, কিন্তু প্রতিকার করতে পারেননি। ক্ষণিকের জন্য গান্ধারী-চরিত্রে দুর্বলতা দেখা গেলেও বিদুর-চরিত্র এককথায় অসাধারণ এবং নিখুঁত। স্বয়ং ধর্মই বিদুর-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জনকল্যাণ ও লোকশিক্ষার জন্য। সমগ্র মহাভারতে বিদুর বারংবার ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর সন্তানদের প্রজ্ঞার কথা বলেছেন এবং সত্যের পথে, কল্যাণের পথে চালিত করবার চেষ্টা করেছেন। কোন লোভ, হর্ষ বা ভয় তাঁকে কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। 'মহাভারত'-এর মহাকবি একটি 'ভারত-সাবিত্রী' দিয়ে গেছেন। সেটি ভারতবর্ষের ধ্যানমন্ত্র—

"ন জাতু কামান্নভয়ান্ন লোভাৎ
ধর্মং ত্যজেৎ জীবিতষ্যাপি হেতোঃ।"

এই 'ভারত-সাবিত্রী' বিদুরের চরিত্রে সর্বদা উজ্জ্বল।

'মহাভারত'-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ দেখিয়েছেন, যুধিষ্ঠিরই মহাভারতের নায়ক ও কেন্দ্রস্থ পুরুষ। কারণ, 'মহাভারত'-এর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। তাঁর অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, আত্মসংযম, ধৈর্য ও হৃদয়বত্তা কিংবদন্তীতুল্য। তিনি সংসারী হয়েও যেন সন্ন্যাসী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বাস্তববুদ্ধির অভাব দেখা যায়। অত্যধিক সরলতাই হয়তো এর কারণ, যার জন্য কৃষ্ণ তাঁকে ভর্ৎসনাও করেছেন। তিনি দৃঢ়চিত্ত, যা সঙ্কল্প করেন তা থেকে কখনো টলেন না। শ্রীরায়ের মতে, যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ব সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে শেষপর্বে। তিনি স্বর্গে এলে ইন্দ্র তাঁকে নরকদর্শন করান। যুধিষ্ঠির দেখেন, তাঁর ভ্রাতারা ও দ্রৌপদী সেখানে যন্ত্রণাভোগ করছেন। তখন তিনি স্বর্গের প্রলোভন ও দেবতাদের অনুরোধ পরম অবজ্ঞায় উপেক্ষা করেছেন। তাঁর অসাধারণ হৃদয়বত্তা ও সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র এবং যম তাঁকে বলেন যে, এই নরক প্রকৃত নরক নয়, তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য মায়াবলে একে সৃষ্টি করা হয়েছে। বস্তুত, তিনিই একমাত্র সশরীরে স্বর্গবাসের অধিকারী হয়েছেন।

যুধিষ্ঠির নায়ক হলে খলনায়ক অবশ্যই দুর্যোধন। খলনায়ক-সুলভ হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ, দাম্ভিকতা, অন্যায় আচরণ তাঁর মধ্যে

পরিলক্ষিত হলেও তাঁর বীরত্ব, সাহস ও পৌরুষকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

অর্জুন-চরিত্র সর্বগুণান্বিত এবং 'মহাভারত'-এর বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি কৃষ্ণের সখা ও ধর্মসংস্থাপনে সহায়ক, প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির অস্ত্রশিক্ষক, নানা বিদ্যায় বিশারদ এবং অতিশয় রূপবান। মহাকাব্যের নায়কোচিত সমস্ত লক্ষণ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত। তিনি ধীরপ্রকৃতির, কিন্তু মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে উঠে অসম্ভব প্রতিজ্ঞাও করে ফেলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বক্ষণে কৃষ্ণ তাঁকে যে 'গীতা'-উপদেশ শুনিয়েছিলেন তা পেয়ে জগতের লোক ধন্য হয়েছে। পাশাপাশি ভীম-চরিত্রের সরলতা, স্পষ্টবাদিতা, বীরত্ব, সৎসাহস ও জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য আমাদের চমকিত করে।

মহাভারতের স্ত্রীচরিত্রদের মধ্যে অনেকেই নিজ গুণে আদরণীয়া হলেও দ্রৌপদীর মতো অন্য কোন নারী এমন জীবন্তরূপে চিত্রিত হননি। দ্রৌপদী তেজস্বিনী ও স্পষ্টবাদিনী। তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বনপর্বের ৫ম অধ্যায়ে, উদ্যোগপর্বের ১০ম অধ্যায়ে এবং শান্তিপর্বের ২য় অধ্যায়ে তাঁর খেদ ও ভর্ৎসনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা যেকোন সাহিত্যেই দুর্লভ। বহু কষ্ট ভোগ করে তাঁর মন তিক্ত হয়ে গেছে, তাই মাঝে মাঝেই তাঁর অগ্নিমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। তিনি পাঁচ স্বামীকেই ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর ভালবাসায় কিছু প্রকারভেদ দেখা যায়। যুধিষ্ঠিরকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, ভীমের ওপর তিনি বেশি ভরসা রাখেন, নকুল-সহদেবকে স্নেহ করেন, কিন্তু অর্জুন তাঁর প্রেম ও অনুরাগের পাত্র। আবার কৃষ্ণের সঙ্গে ছিল তাঁর এক পবিত্র দিব্য সম্বন্ধ। তিনি কৃষ্ণের সখী, আবার সঙ্কটে তিনি কৃষ্ণের শরণাগত। কুন্তী-চরিত্রও অসাধারণ। তিনি আমাদের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনার উদ্রেক করেন।

'মহাভারত'-এ কর্ণ এক উপেক্ষিত নায়কের চরিত্র। তাঁর অনন্যসাধারণ পুরুষকার, ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা সত্যিই মহৎ ও মনোহর। কর্ণের বীরত্ব কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ রাখে না। তবে অধর্মাচারী দুর্যোধনের সঙ্গদোষে কোন কোন সময় তাঁর চরিত্রে বিচ্যুতিও দেখা গেছে।

মহাভারতের সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। ব্যাসদেব তাঁকে ঈশ্বর বলেছেন। তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ, স্থিতপ্রজ্ঞ ও লোকহিতরত। অর্জুন তাঁকে ঈশ্বর-জ্ঞান করলেও সবসময় তা মনে রাখতেন না। তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনে অভিভূত হয়ে অর্জুন বলেছেন, তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ, যাদব ও সখা বলে সম্বোধন করেছি, আমায় তুমি ক্ষমা করো। স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টোফার ঈশারউড তাঁদের 'গীতা'র মুখবন্ধে লিখেছেন: "Arjuna knows this—yet, by a merciful ignorance, he sometimes forgets. Indeed it is Krishna who makes him forget, since no ordinary man could bear the strain of constant companionship with God."

কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বহুবিদিত ছিল না। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনের জামাতা; দুর্যোধন তাঁর বৈবাহিককে ঈশ্বর মনে করতেন না। উদ্যোগপর্বে তিনি পাণ্ডবদূত কৃষ্ণকে বন্দী করবার মতলব করেছিলেন। কৃষ্ণ সভাস্থ সকলকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেও দুর্যোধনের তাতে বিশ্বাস হয়নি। সর্বত্র ঈশ্বররূপে স্বীকৃত না হলেও কৃষ্ণ সমাজে অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির আধার ছিলেন এবং রূপ, শৌর্য, বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন।

'মহাভারত'-এর উপাখ্যানগুলি শ্রীরায় অতি সহজ ইংরেজীতে বর্ণনা করায় পাঠকদের নিকট এগুলির মর্মবাণী পৌঁছাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 'মহাভারত'-এর উপাখ্যানগুলির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, গত তিন হাজার বছর ধরে এদেশের জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব ও কাব্যনাটকের উপাদান যুগিয়েছে এই মহাকাব্য। মহাভারতীয় নরনারীর চরিত্রে কোথায় কী অসঙ্গতি বা ত্রুটি আছে লোক তা গ্রাহ্য করেনি, যাকিছু মহৎ তা-ই আদর্শরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছে। সেকাল ও একালের লোকাচারে অনেক প্রভেদ, তথাপি মহাভারতে বিদুর, কৃষ্ণ, ভীষ্ম ও ঋষিগণ কর্তৃক ধর্মের যে মূল আদর্শ কথিত হয়েছে তা সর্বকালেই সমাদৃত।

'মহাভারত'-এর অমৃতময় কথাকে পাঠকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা গ্রন্থকারকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই। সংক্ষিপ্ত হলেও প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি গ্রন্থটিতে বাদ পড়েনি। গ্রন্থটির অপরূপ এক সারল্য ও সাবলীলতা, ভক্তচিত্তের বিনম্র মানসিকতা আমাদের আবিষ্ট করে রাখে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও সার্বিক অবয়ব উন্নত মানের। ❑
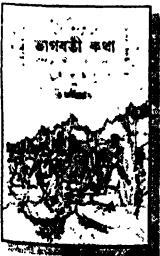
ভাগবতী কথা
ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী
প্রকাশক: উমা বোস
ডব্রিউ. আই. বি. (এম.) ৯/৬,
ফেজ-টু, গলফ গ্রীন, কলকাতা-৯৫
পৃষ্ঠা: ১৪+১০৬।
মূল্য: ৩৫ টাকা।
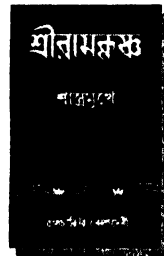
শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রমুখে (১ম খণ্ড)
ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী
প্রকাশক: প্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
পৃষ্ঠা: ৪+১০৪।
মূল্য: ৩০ টাকা।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ বৃহস্পতিবার মহাসমারোহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬৪তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে প্রায় ৩২,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। গত ২১ ফেব্রুয়ারি রবিবার সারাদিনব্যাপী সাধারণ উৎসবে মঠে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। এদিন হাতে হাতে প্রায় ৩৪,০০০ ভক্ত নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ পান।

শিলচর সেবাশ্রমে (আসাম) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গত ১৮-২১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলারতি, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, রামায়ণ-কথা এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী পুরাণানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ২১ ফেব্রুয়ারি আনন্দোৎসবে বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রতিদিন ধর্মসভায় বহু ভক্ত যোগদান করেছিলেন। ধর্মসভায় স্বাগত ভাষণ দান করেন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ক্ষান্ত্যানন্দজী।

তমলুক মঠে (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৮-২১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ভজন, পথপরিক্রমা, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম ও গীতিনাট্যের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় ১৪,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় 'গৈরিক' সংস্থা গীতিনাট্য পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিনের সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সৎপ্রভানন্দ এবং ডঃ তাপস বসু। সভান্তে বাউল-গান ও ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। তৃতীয় দিন সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণানন্দ এবং দীপ্তিকুমার শীল। চতুর্থ দিনে অনুষ্ঠিত হয় মঠ-পরিচালিত বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা এবং ধর্মসভা। পুরস্কার-বিতরণী সভায় স্বামী পূর্ণানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন অধ্যাপক শক্তিপদ ত্রিপাঠী এবং ধর্মসভায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ ও বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। সভায় মঠের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দজী। সভাশেষে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চন্দ্রকান্ত অধিকারী। সান্ধ্যসভায় প্রতিদিন বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (মেঘালয়) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। শিলং-সহ মেঘালয়ের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে বহু ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। মঙ্গলারতি, পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। আলোচনাসভায় ভাষণ দান করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ, স্বামী অজিতাত্মানন্দ এবং আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সদস্য পি. এস. লিংডো। শিলঙের বি. এস. এফ. জওয়ানরা অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করে। এছাড়া গারোয়ালি নৃত্য, খাসি নৃত্যও পরিবেশিত হয়। এদিন প্রায় ৬,০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় শিল্পীরা বাঙলা এবং খাসিতে ভজন পরিবেশন করে।

বিবেকনগর আশ্রমে (পশ্চিম ত্রিপুরা) গত ২১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ আশ্রমের দিবসব্যাপী বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ ও ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ জিতেন্দ্র সরকার যোগদান করেন। আশ্রমের ধলেশ্বর শাখায় মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারে বিনামূল্যে শিশুস্বাস্থ্য শিবির উপলক্ষ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আশ্রমে আয়োজিত পুরস্কার-বিতরণী সভায় শিশুদের পুরস্কার বিতরণ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ১৯৯৮ সালের বি. এসসি. ও এম. এসসি. পরীক্ষায় **চেন্নাই বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের (তামিলনাড়ু)** ছাত্ররা যথাক্রমে রসায়নে প্রথম, পদার্থবিদ্যায় পঞ্চম এবং উদ্ভিদবিদ্যায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় **দেওঘর বিদ্যাপীঠের (বিহার)** দুজন ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

চিকিৎসা শিবির

লিমডি আশ্রম (গুজরাট) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১৭৩ জনের চিকিৎসা ও ১০ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়।

শিলং আশ্রম (মেঘালয়) গত ১৯-২৬ ফেব্রুয়ারি ৫টি শিবির পরিচালনা করে। শিবিরগুলিতে ৩৭৯ জনের অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করা হয়।

বাঁকুড়া মঠ (পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৯ ফেব্রুয়ারি '৯৯ দাঁত ও মুখের চিকিৎসা-সংক্রান্ত একটি স্বাস্থ্যশিবির পরিচালনা করে। শিবিরে শতাধিক রোগীর চিকিৎসা ও ৩০ জনের দাঁত তোলা হয়।

ত্রাণ

অন্ধ্রপ্রদেশ অগ্নিত্রাণ

বিশাখাপত্তনম আশ্রম বিশাখাপত্তনম জেলার অগ্নিকবলিত ১৭৫টি পরিবারের মধ্যে ৩৫০টি শাড়ি, ৩৫০টি ধুতি, ৭০০ সেট শিশু-পোশাক, ৭০০ বিছানার চাদর, ৭০০ তোয়ালে ও ১৭৫ সেট (১১টি বাসনের সেট) স্টীলের বাসন বিতরণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রাণ

বাগবাজার মঠের (কলকাতা-৭০০ ০০৩) মাধ্যমে উত্তর কলকাতার নারকেলডাঙার অগ্নিকবলিত ১১৮০ পরিবারের মধ্যে ১৩০৫টি লুঙ্গি, ২৬৪০টি বিছানার চাদর, ১৯০০ তোয়ালে ও ১৩,২৪৭টি অ্যালুমিনিয়াম ও স্টীলের বাসনপত্র বিতরণ করা হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৯৭টি পরিবারের মধ্যে ১৩৩টি লুঙ্গি, ২০০ বিছানার চাদর, ৫০০ তোয়ালে, ১০০ সেট (১১টি বাসনের সেট) অ্যালুমিনিয়াম ও স্টীলের বাসনপত্র এবং দুঃস্থ শিশুদের জন্য দুধ বিতরিত হয়েছে।

আসাম অগ্নিত্রাণ

শিলচর আশ্রম তারাপুর, নিউ কলোনী অঞ্চলের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ২৪৫টি পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ ও ২৫৩ জনকে ঔষধপত্র দিয়ে চিকিৎসা করেছে।

উত্তর বিহার চিকিৎসাত্রাণ

পাটনা আশ্রম দ্বারভাঙা জেলার ৪৪টি গ্রামের ২,৭৩৮ জন বন্যার্ত মানুষের মধ্যে ওষুধ ও পুরনো কাপড় বিতরণ করেছে।

প্রয়াগ মাঘমেলা চিকিৎসাত্রাণ

এলাহাবাদ আশ্রম বিনাব্যয়ে ১৬,৩২৫ জনের চিকিৎসা করেছে।

রাজস্থান খরাত্রাণ

খেতড়ি আশ্রম যশ্রাপুর, নলপুর ও খেতড়ির ২২৫টি খরাগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ৪ টন গম ও ২১৫টি কম্বল বিতরণ করেছে।

উড়িষ্যা শৈত্যত্রাণ

পুরী মঠ পুরী জেলার পুরী সদর, ব্রহ্মগিরি ও গোপ ব্লকের ১৩টি গ্রামের ৪৯০টি দুঃস্থ পরিবারে ৪৯০টি কম্বল, ৫৩টি চাদর, ৩৪৩টি পোশাক ও ২৩ বান্ডিল পুরনো কাপড় বিতরণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ শৈত্যত্রাণ

কাঁথি আশ্রমের মাধ্যমে শীতকবলিত গরিব মানুষের মধ্যে ৫০০ কম্বল, ১০০০ বিছানার চাদর প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে।

চণ্ডীপুর মঠের মাধ্যমে চণ্ডীপুরের আশপাশের দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ২০০ কম্বল, ৪০০ বিছানার চাদর ও ৫০০ বালিশের ওয়াড় বিতরণ করা হয়েছে।

তমলুক মঠের মাধ্যমে ১২০টি কম্বল, ১,৫০০টি বিছানার চাদর প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ

আগরতলা আশ্রম সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলে কাঞ্চনমালা, গবরদি প্রভৃতি অঞ্চলের গৃহহারা ২০৩৬টি পরিবারের মধ্যে ১,০০৩টি ধুতি, ১,১১৫টি শাড়ি, ৭৪টি কম্বল, ২৪৩টি জামা, ১০,০০০ ব্যবহৃত কাপড়, ৬৭৫ প্যাকেট শিশুখাদ্য ও ৫,৫৭৫টি অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

ঢাকা মঠ (বাংলাদেশ) গত ১৫-১৯ ফেব্রুয়ারি '৯৯ পাঁচদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে বহু ভক্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, পানি-সম্পদ মন্ত্রী জনাব আবদুর রাজ্জাক, তথ্য মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সৈয়দ এবং বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভাটিকান সিটির রাষ্ট্রদূতবৃন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী জীবন্মুক্তানন্দজী (বাসুদেবন মহারাজ) গত ১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ সকাল ৮টায় কনখল সেবাশ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। দেহত্যাগের দু-সপ্তাহ আগে তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়, ফলে সমস্ত দেহ অবশ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩১ সালে তিনি তিরুভাল্লা আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন বিভিন্ন সময়ে কালাডি, চেন্নাই মঠ, ত্রিচুর, রাজমুন্দ্রী, কাশী সেবাশ্রম, ত্রিবান্দ্রম ও কনখলে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর ধরে কনখল সেবাশ্রমে তিনি অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন সদাপ্রফুল্ল, তপস্বী এবং কঠোর পরিশ্রমী।

স্বামী দিগানন্দ (পার্বতী মহারাজ) গত ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৯ রাত ১টা ৪৫ মিনিটে কিডনির অকর্মণ্যতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি দীর্ঘদিন পারকিনসন্স ও মূত্রাশয়ের রোগে ভুগছিলেন। সেজন্য তাঁকে গত ২৯ জানুয়ারি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের পর ১৯৪৮ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠে (বেলুড়) যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। বেলুড় মঠে ১৯৬৬ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সেবাপূজায় নিযুক্ত ছিলেন। তারপর থেকে তিনি মঠের আরোগ্যভবনে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। সরল, পরিশ্রমী ও স্নেহশীল স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

স্বামী বিচারানন্দ (গদাই মহারাজ) পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণের ফলে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টা ১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকা মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়া তিনি কানপুর, বোম্বে, ভুবনেশ্বরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি বেলুড় মঠে সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সাধুনিবাসে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। সদানন্দময় ও স্নেহপ্রবণ স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২ মার্চ '৯৯ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতিথি পালন করা হয়। ৬ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দ। ২৫ মার্চ শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে বিকালে পূজা ও সন্ধ্যায় রামনাম-সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি '৯৯ যথাক্রমে জাতীয় যুবদিবস ও সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। যুবদিবসের দিন স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পথপরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভজনাদি এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক সভায় ভাষণ দেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। সন্ধ্যায় 'সুরপীঠ' গোষ্ঠী গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। পরদিন সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ। দুপুরে প্রায় ২,০০০ নরনারায়ণ সেবা করা হয়। বিকালে 'গোকুল সম্প্রদায়' ভক্তিগীতি এবং সন্ধ্যায় 'দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সঙ্ঘ' গীতিনাট্য পরিবেশন করে।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (কলকাতা-৭০০ ০৩৯) গত ১২, ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি '৯৯ তিনদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১২ তারিখে যুবদিবস পালিত হয়। ১৬ তারিখে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী গোবিন্দানন্দ, ডঃ কমল নন্দী, প্রণবেশ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক হেম ভট্টাচার্য। সভাশেষে নাটক পরিবেশন করে 'সুনীলনগর কালচারাল সেন্টার'। ১৭ জানুয়ারি বৃহত্তর কলিকাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের পরিচালনায় সকালে শোভাযাত্রা এবং বিকালে ভাবপ্রচার পরিষদের ১৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক এবং ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক স্বামী শিবময়ানন্দ। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ঋদ্ধানন্দ, বলরাম-মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দ, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দ ও বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গোপেশানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। সন্ধ্যায় মৌমিতা নস্কর ও শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়ের ভক্তিগীতি পরিবেশনের পর 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা' বিষয়ে আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ। আলোচক ছিলেন প্রেমবল্লভ সেন ও শীলা সেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংসদের সভাপতি অশোককুমার মাইতি।

সাঁকরাইল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ জানুয়ারি '৯৯ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, ভজন, পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 'গীতা', 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অকল্মষানন্দ, স্বামী শিবনাথানন্দ, নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ, স্বপনকুমার পুরকাইত এবং গঙ্গাধরপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রঞ্জিত বাগ। দুপুরে প্রায় ২৫০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ১৮ জানুয়ারি '৯৯ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মঙ্গলারতি, পরিক্রমা, গীতাপাঠ ও আলোচনাদি ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দ। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ গ্রামবাসীকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ১০০ দুঃস্থ ছেলেমেয়ের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হয়।

জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২০ জানুয়ারি '৯৯ একটি ধর্মসভা এবং একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে স্বেচ্ছায় ৩৮ জন রক্তদান করে। বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী কৌশিকানন্দ, স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দ, চন্দ্রকোণা ১নং ব্লকের জয়েন্ট বি.ডি.ও. অলোকময় ঘোষ ও অলোককুমার ঘোষ। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। বিশেষ পূজাদি করেন স্বামী সাংখ্যানন্দ। 'গানে গানে কথামৃত' পরিবেশন করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী দেবদেবানন্দ, স্বামী সাংখ্যানন্দ, সচ্চিদানন্দ ঘোষ ও অলোককুমার ঘোষ।

আগরা সারদামণি পল্লীমঙ্গল সংস্থা (জেলা—মেদিনীপুর) গত ২২-২৪ জানুয়ারি '৯৯ তিনদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করে। প্রথমদিনে বেদপাঠ, ভজন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন বসিরহাট কোর্টের বিচারপতি ডঃ শ্যামল গুপ্ত। সভান্তে পালাকীর্তন পরিবেশন করেন মাধব ব্রহ্মচারী ও সম্প্রদায়। দ্বিতীয়দিনের সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিবেকাত্মানন্দ। তৃতীয়দিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় স্বামীজীর কর্মযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী অমৃতলোকানন্দ। রাত্রে স্থানীয় 'কিশোরবাহিনী' কর্তৃক নাটক পরিবেশিত হয়।

স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি '৯৯ একটি যুবশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে। শিবিরের আলোচ্য বিষয় ছিল চরিত্রগঠন ও মনঃসংযোগ। আলোচক ছিলেন স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ ও রবি ভট্টাচার্য। শিবিরে ৮২ জন যুবপ্রতিনিধি-সহ ১২৫ জন যোগদান করে। এই উপলক্ষ্যে ডঃ অরুণকুমার দাশের পরিচালনায় একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন (কলকাতা-৭০০ ০২৮) গত ২৩, ২৪ ও ২৬ জানুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব ও সেবায়তনের বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করে। ২৩ জানুয়ারি ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন আশুতোষ মণ্ডল এবং 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দ। তিনি কয়েকজন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন। দুপুরে প্রায় ১,৪৫০ জন ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ এবং ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দ ও ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় যুবছাত্র-সম্মেলন। এতে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। সম্মেলন পরিচালনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী সত্যবোধানন্দ ও অধ্যাপক ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল। বিকালে প্রদর্শিত হয় 'বিবেকানন্দ ভারতের পথে পথে' চলচ্চিত্র। সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রীবৃন্দের বেদপাঠান্তে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। ২৬ জানুয়ারি সেবায়তনের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ ও সন্তোষকুমার ঘোষ। সভান্তে স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

উত্তর চব্বিশ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ৬ষ্ঠ ষাণ্মাসিক সম্মেলন গত ২৪ জানুয়ারি '৯৯ অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙা **বিবেকানন্দ সমাজ সেবাকেন্দ্রে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা)**। সম্মেলনে ২৬টি প্রাইভেট আশ্রমের মোট ৮২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভাবপ্রচার পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি স্বামী প্রমেয়ানন্দজী। তিনি তাঁর ভাষণে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে এবং গ্রামে গ্রামে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের কেন্দ্র গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ করেন পরিষদের সহ-সভাপতি স্বামী মুক্তিকামানন্দ। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাকেন্দ্রের সম্পাদক বিপুলকুমার রায়। সভান্তে ভক্তিগীতি পরিবেশনের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের আহ্বায়ক সন্তোষকুমার ঘোষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সঙ্ঘ (উদয়পুর, পোঃ নিমতা, কলকাতা-৭০০ ০৪৯) 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভজন-কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী একব্রতানন্দ, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শিবপদ মুখার্জী প্রমুখ।

সারদা নারী সংগঠন (বালিভাড়া, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২৪ ও ২৬ জানুয়ারি '৯৯ ১০ম বার্ষিক শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করে **মুকুল বসু মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন (কলকাতা-৭০০ ০৪৭)**-এ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু ছাত্রী-সহ ২০৪ জন মহিলা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা। 'শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আদর্শে সামাজিক অবক্ষয়রোধে নারীজাতির ভূমিকা', মনের নিয়ন্ত্রণ, চরিত্রগঠনের ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রভৃতি ছিল শিবিরের আলোচ্য বিষয়। আলোচক ছিলেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা, অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের সর্বভারতীয় সম্পাদক নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, দীপকরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও পূর্বা সেনগুপ্ত। গত ২৬ জানুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী অবলম্বনে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন 'ডানকুনি সারদা সংগঠনে'র সদস্যারা।

কুমরুল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৬ জানুয়ারি '৯৯ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সানাই বাদন, 'বেদ', 'গীতা' ও 'চণ্ডী' থেকে পাঠ, ভক্তিগীতি, নগর-পরিক্রমা, শ্রুতিনাটক ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করে ভদ্রকালীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবকসঙ্ঘ'। দুপুরে প্রায় ১২,০০০ গ্রামবাসীকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবদেবানন্দ এবং ভাষণ দেন আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বরানন্দ।

জোড়হাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (আসাম) গত ২৯-৩১ জানুয়ারি '৯৯ তিনদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমদিন বৈকালিক ধর্মসভায় 'বর্তমান যুগে স্বামীজীর শিক্ষা ও আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী যুগাত্মানন্দ, মৃদুপবন গোস্বামী, বলেন্দ্র বসুমাতারি প্রমুখ। সন্ধ্যায় নৃত্য পরিবেশন করেন নন্দিনী ঘোষাল। দ্বিতীয়দিন বৈকালিক ধর্মসভায় 'অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধনে শ্রীমা সারদাদেবী' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সুমেধানন্দ, চারুদেবী প্রমুখ। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুজিত চন্দ ও সম্প্রদায়। তৃতীয়দিন সকালে স্বামী প্রথমানন্দ, স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দ, স্বামী গিরিজেশানন্দ প্রমুখ বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তের উপস্থিতিতে এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বিকালে পূজনীয় মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুজিত চন্দ ও সম্প্রদায়।

গোয়াবাগান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০ ০০৬) গত ৩০ জানুয়ারি '৯৯ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গোপেশানন্দ এবং ভাষণ দেন ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্ঘের সভাপতি ডঃ কমল নন্দী। সভান্তে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন মদন নন্দী।

খড়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর) গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি '৯৯ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে ভক্তসম্মেলন ও সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন ও বৈদিক স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন স্বামী অকল্মষানন্দ। প্রথম অধিবেশনে 'সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী অকল্মষানন্দ, মেদিনীপুর ভাবপ্রচার পরিষদের সম্পাদক কমলকুমার মান্না এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অধিবেশনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন আলোককুমার ভট্টাচার্য। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা এবং ভক্তদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর

দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সন্ধ্যায় 'রাজলক্ষ্মী' যাত্রাপালা পরিবেশন করেন সেবাশ্রমের সদস্যগণ। সম্মেলনে প্রায় ৫০০ ভক্ত যোগদান করেন। পরদিন অনুষ্ঠিত হয় শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ও ধর্মসভা। সভায় 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী অকল্মষানন্দ। তারপর ভজন পরিবেশনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। দুপুরে প্রায় ৮,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অকল্মষানন্দ, কমলকুমার মান্না ও পরমেশ্বর চক্রবর্তী। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিঙ্গুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—হুগলী) গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। দুদিনেই বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের সভায় ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দ। সভান্তে ৮০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয়দিনের সভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দ এবং দিলীপরতন ভট্টাচার্য। সভান্তে 'বালক গদাধর' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং পরিবেশিত হয় ডাঃ কালোসোনা পাধা কর্তৃক গীতি-আলেখ্য।

বিরুলিয়া স্বামীজী সর্বোদয় সঙ্ঘ (জেলা—মেদিনীপুর) গত ৩০-৩১ জানুয়ারি বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের অনুষ্ঠিত বিষয় ছিল মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভা। সভায় ভাষণ দেন মোঃ মাশরেক আলি, নুর আহম্মদ প্রমুখ। রাত্রে নাটক অভিনীত হয়। দ্বিতীয়দিনে অনুষ্ঠিত হয় শোভাযাত্রা, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন, বিদ্যার্থী সম্মেলন ও ধর্মসভা। বিদ্যার্থী সম্মেলনে 'স্বামীজীর ভাবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শরণ্যানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ১৫০ জন দুঃস্থ ছাত্রের মধ্যে জামা এবং ৪০ জন দরিদ্র মানুষের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। এরপর ধর্মসভায় ভাষণ দেন 'তৎসঙ্গ' আশ্রমের স্বামী নির্মলানন্দ ও ডাঃ টি. পি. মণ্ডল। রাত্রে 'ব্রজের বাঁশরী' যাত্রাপালা পরিবেশন করেন সঙ্ঘের সদস্যরা।

কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৩০-৩১ জানুয়ারি '৯৯ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি নগর-পরিক্রমা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও ডঃ নমিতা দত্ত। পরদিন সকালে বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ৪০ জন দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণের পর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী।

বহির্ভারত

পিরোজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) গত ৯ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, শিশুদের মধ্যে গীতাপাঠ প্রতিযোগিতা, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন নিত্যরঞ্জন মণ্ডল। বৈকালিক ধর্মসভায় 'মানবতাবাদী স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন আশ্রমের সভাপতি অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ। গীতাপাঠ প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ এস. দাস।

দেহত্যাগ

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **স্বামী পরমানন্দজী (দ্বারিক মহারাজ)** গত ১৩ জানুয়ারি '৯৯ বুধবার রাত সাড়ে ১১টায় পশ্চিম ত্রিপুরার রামকৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত আমতলী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ১৯৮৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনকে অর্পণ করেন। ১৯৯০ সালে তিনি রামকৃষ্ণপুরের আশ্রমটি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী। তাঁর কঠোর সাধুজীবন ও স্নেহশীল স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **নটবরচরণ মহান্তী** গত ১ জানুয়ারি '৯৯ সকাল ৮.৫০ মিনিটে ভুবনেশ্বরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। ১৯৫১ সাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ, স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রমুখের তিনি বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। ভুবনেশ্বরে সারদা মঠের শাখাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। উড়িষ্যার প্রথম এবং ভারতের দ্বিতীয় মহিলা পাইলট গিরিবালা মহান্তী তাঁর অন্যতম কন্যা। সরলতা এবং নিষ্ঠা ছিল তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের দুর্লভ অধিকারী **নির্মলনলিনী মিত্র** গত ১৪ জানুয়ারি '৯৯ বিকাল সাড়ে ৩টায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী (খোকা মহারাজ) মহারাজের ভাইঝি। 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তাঁর 'মাতৃস্মৃতি' প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বজবজ নিবাসী **নিশিকান্ত রায়** গত ১৮ জানুয়ারি '৯৯ সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তাঁর এক পুত্র স্বামী প্রাণারামানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী। খড়িবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও বিদ্যাপীঠের নানা সেবাকাজের সঙ্গে তিনি আজীবন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **দানীলাল অগস্তি** পথ-দুর্ঘটনায় গত ১৮ জানুয়ারি '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাদানে দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার জন্য তিনি অনেকের শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **শিশিরকুমার রায়** গত ২০ জানুয়ারি '৯৯ পরলোকগমন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে তাঁর বাড়িতে এনে তিনি সেবা করতেন। ❑

গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ

(রেজিঃ নং—এস/৭৭২০৮/৯৪) ফোন : ৯১১৬-৬৪৬৮৫

পোঃ—খাঁটুরা (রেলস্টেশন—গোবরডাঙ্গা), জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৭৩

বিনম্র আবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুর মথুরবাবুর জমিদারী থেকে দক্ষিণেশ্বর ফেরার পথে সেকালের প্রাচীন জনপদ তথা আজকের গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু পৌরসভা গোবরডাঙ্গায় পদার্পণ করেন। তাঁর পদধূলিধন্য এই গোবরডাঙ্গায় ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচার এবং দুঃস্থ ও আর্তদের সেবার জন্য উপরি উক্ত সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। এই কাজের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতায় একখণ্ড জমি ক্রয় করে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে প্রথম পর্যায়ে সংলগ্ন জমি ক্রয় ও সেবাশ্রম নির্মাণসহ পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকার একটি তহবিল গঠন করার।

এই মহতী কাজের জন্য আমরা সকল স্তরের মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করে এই তহবিলে মুক্তহস্তে দান করতে আহ্বান জানাচ্ছি। যেকোন দান প্রাপ্তিস্বীকার-সহ সাদরে গৃহীত হবে। ন্যূনতম কুড়ি হাজার টাকা দান করলে দাতার ইচ্ছানুযায়ী ফলক স্থাপন করা হবে। টাকা সঙ্ঘের নামে মানি অর্ডার করে অথবা ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, খাঁটুরা শাখায় "GOBARDANGA RAMKRISHNA-VIVEKANANDA BHABANURAGI SANGHA"-এর অনুকূলে ড্রাফট বা চেকে প্রেরণ করা যেতে পারে। সঙ্ঘে প্রদত্ত যেকোন দান ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। বিশদ বিবরণের জন্য ওপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বিনীত

ডাঃ ফণিভূষণ ভট্টাচার্য
সভাপতি

ভুবন রায় সরস্বতী
সম্পাদক

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

এক হাতে কর্ম কর, আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

*

মনে ভাববে—আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্ম এমন একটি ভাব, যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

বড় হইতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ

১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব।
৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

উত্তরবঙ্গ

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
- বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, দিনহাটা, কুচবিহার-৭৩৬১৩৫
- স্বপনকুমার আইচ, প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- অজয়কুমার গাঙ্গুলী, রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং ব্লক—সি-১/৯, কুচবিহার-৭৩৬১০১
- বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো নিউ মার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদা-৭৩২১০১

মেদিনীপুর

- রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১৬৩৬, ফোন ঃ ৬৬০০৫/৬৬৭৬২
- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১৬৫৯, ফোন ঃ ৭২২১৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া-৭২১১৫২
- খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, খড়গপুর-৭২১৩০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১২১২
- কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১৪০১
- কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১২২২
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১২২২
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, কালুয়া আকুব, ঝাড়্গ্রিয়া-৭২১১২৪
- ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ক্ষীরপাই-৭২১২৩২
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, জাড়া-৭২১২৩২
- শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, চন্দ্রকোনা টাউন-৭২১২০১
- জ্ঞানরঞ্জন হোতা, মহাপাল, ভায়া ঃ তপসিয়া পেটবিন্দি-৭২১৫১৭
- খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র, রাধাচন্দনপুর-৭২১১৬০
- হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১৬০৫

নদীয়া

- রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২
- বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪১২২২
- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/৪৫৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- বন্ধুর, মিউনিসিপ্যালিটি মোড়, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট-৭৪১২০১

বর্ধমান

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১
- নরহরি পুস্তকালয়, ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব), বর্ধমান-৭১৩১০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- ডি. পি. এল. পাঠচক্র ডি/২০, গ্রীসন স্ট্রীট, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, এ. বি. এল. টাউনশিপ দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার পিন-৭১৩১২৮
- অঞ্জনকুমার পাল, প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০
- শীতল ব্যানার্জী, প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- উত্তমকুমার রায়, পলাশডিহা, কন্যাপুর-৭১৩৩৪১

বীরভূম

- বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫ পিন-৭৩১২০৪
- আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- মিলন দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, চৈতালী মার্কেট সিউড়ি-৭৩১১০১
- ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪

বাঁকুড়া

- শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন
॥১০১॥
১৪০৬ ◻ ৫ম সংখ্যা

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত

বিবেকানন্দ ইল্লম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

বিবেকানন্দ ইল্লম একটি পবিত্র ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই ভবনটি একটি তীর্থক্ষেত্র। স্বামীজী পূর্ণ নয়দিন এখানে অবস্থান করেছেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, উপদেশ দান করেছেন, ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেছেন। তাঁর অদৃশ্য, দিব্য উপস্থিতিতে স্থানটি এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে, শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী চেন্নাইয়ের এই বাংলোয় উঠেছিলেন। তখন বাড়িটির নাম ছিল 'আইস হাউস' বা 'ক্যাসল কার্নন'। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় ভারতের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে তেজোদীপ্ত বাণী প্রদান করেছিলেন তা ইংরেজীতে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বা বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা, আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে এই বাড়িটিতেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত স্বামীজীর বাণীর ঐতিহাসিক পীঠভূমি।

আমরা এখানে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে চাইছি, যেখানে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত হবে। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্রসমূহ, অন্যান্য সুন্দর চিত্র, মডেল, ভিডিওগ্রাফ, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রাণপ্রদ বাণীর প্রচারকেন্দ্র-রূপে এই বাড়িটিকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করছি।

১৮৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই বাড়িটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই পবিত্র কাজটি শুরু করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে এবং স্বামীজীর সকল অনুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের উদার দাক্ষিণ্যে আমরা এই মহান কাজ সম্পন্ন করার আশা রাখি।

এবাবদ সমস্ত আর্থিক দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে দান পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯
ই. মেল : srkmath@vsnl.com
ওয়েবসাইট : www.sriramakrishnamath.org

☎ ঃ ৬৫৪-৪৬৪৫

বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি

১১, শরৎ চন্দ্র আটা লেন, বেলুড় মঠ, হাওড়া

পিন-৭১১ ২০২

রেজিঃ নং—এস/৫৩৭৮৯

আবেদন

১৯৮২ সালের জুন মাসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের ঐকান্তিক উৎসাহে আমরা 'বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করি। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের দুঃস্থ, অবহেলিত ও নিপীড়িত মহিলাদের স্বাবলম্বী ও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

বিগত আঠার বছর ধরে একটি ছোট ভাড়াবাড়িতে সমিতি তার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন শাখা খুলে তার কাজকর্ম চালাচ্ছে। বর্তমানে সমিতির কাজ প্রচুর বেড়ে যাওয়ায় জায়গার অভাবে কাজ চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই সমিতির নিজস্ব একটি গৃহ নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উক্ত গৃহ নির্মাণের জন্য আনুমানিক সাত লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমরা এই গৃহ নির্মাণের জন্য মুক্তহস্তে দানের আবেদন জানাচ্ছি যাতে পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের অভীপ্সিত পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতির এই প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে।

চেক বা ড্রাফ্‌ট্ দিতে হলে 'বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি'-র নামে হবে। মানি অর্ডার পাঠাতে হলে—**সম্পাদিকা, বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি, ১১ শরৎ চন্দ্র আটা লেন, পোঃ বেলুড় মঠ, পিন-৭১১ ২০২, জেলা ঃ হাওড়া** এবং **সভানেত্রী উষা মজুমদার, ৭৮৫ 'পি' ব্লক, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩**—এই ঠিকানায় পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল দানই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতিতে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

দীপ্তি ভৌমিক

সম্পাদিকা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
একশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

উদ্বোধন ॥১০১॥

সূচীপত্র

১০১তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ মে ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ২০৯
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
তত্ত্ব ও প্রয়োগ ঃ আরো কিছু কথা ২১০
❑ সঙ্কলন ❑
'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা—শ্রীম ২১৩
❑ আলোচনা ❑
অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ—স্বামী নির্বাণানন্দ ২১৫
❑ ভাষণ ❑
রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শ—স্বামী ভূতেশানন্দ ২১৪
জীবন্ত ভগবানের পূজা—স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ২১৭
❑ স্মৃতিকথা ❑
স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সহিত কথোপকথন—স্বামী ধীরেশানন্দ ২৪৭
❑ ধারাবাহিক প্রবন্ধ ❑
অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ—স্বামী প্রভানন্দ ২১৯
❑ বিশেষ নিবন্ধ ❑
আমার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ—
শৈলজারঞ্জন মজুমদার ২২৫
❑ পরিক্রমা ❑
জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথ—স্বামী অচ্যুতানন্দ ২৩০
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ⑤—কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত ২৩৫
❑ ক্রীড়াজগৎ ❑
সম্ভাবনায় দক্ষিণ আফ্রিকা, কালো ঘোড়া পাকিস্তান—
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৬
❑ পরমপদকমলে ❑
গাজীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৪৯
❑ সাক্ষাৎকার ❑
শতবর্ষেও দীপ্তপ্রাণা লাবণ্যপ্রভা দেবী—শান্তি সিংহ ২৪২
❑ সাহিত্য ❑
'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ঃ বাঙলা সাহিত্যে এক
অবিস্মরণীয় সৃষ্টি—চন্দনা সরকার ২৪৪
❑ বিজ্ঞান ❑
অ-সাধারণ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, অদ্ভুত তাঁর মতবাদ—
জলধিকুমার সরকার ২৫২
❑ সুস্বাস্থ্য ❑
স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—সত্যানন্দ চক্রবর্তী ২৫১
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
'শ্রীজগন্নাথ-মন্দির পরিক্রমা' ২৩৯ রোগ আরোগ্যে মশলাপাতি ২৩৯
ছানি নিয়ে কিছু কথা ২৪০ প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণের পট' ২৪০
❑ কবিতা ❑
তোমায় খুঁজি—কৃষ্ণা সেন ২২৮ সময়—মন্দিরা মহাপাত্র ২২৮
একটি অন্তঃস্থিত সত্তার প্রতি—শেখ আবদুল মান্নান ২২৮
কবিতার কল্পতরু—গৌতম দাশগুপ্ত ২২৯
মায়ের হাসি—জীবনকৃষ্ণ দাস ২২৯
শিলাতটে বসে আছ আজও—সুজাতা সেন ২২৯
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
বিজ্ঞান-সংবাদ ● পেঁয়াজ রসুন বহু রোগকে প্রতিরোধ করতে
পারে ২৫৪
গ্রন্থ-পরিচয় ● বামাক্ষেপা বৃত্তান্ত—পরিমল চক্রবর্তী ২৫৫
রোগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য—জলধিকুমার সরকার ২৫৫ প্রাপ্তিস্বীকার ২৫৬
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ২৫৭
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ২৫৭ বিবিধ সংবাদ ২৫৮
❑ অন্যান্য ❑
অনুষ্ঠান-সূচী (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৬) ২২৪
আবেদন ঃ রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম ২১৮
স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা ২৪৬
❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ ঃ ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র ঃ অদ্বৈত আশ্রম
বর্তমান বর্ষের (১৪০৫-১৪০৬/১৯৯৯) সাধারণ গ্রাহকমূল্য ঃ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

'উদ্বোধন' ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৬ সংখ্যা

গ্রাহকদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'**-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **সংখ্যাটির মূল্য ঃ ৪০ টাকা।**
- **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি ডাকযোগে নিলে রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ অতিরিক্ত ১৭ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ থেকে ১৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
- আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ **শারদীয়া সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না পেলে আমাদের পক্ষে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- **ডাকযোগে** (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা ডাকযোগেই (By Post) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।
- যাঁরা আমাদের **গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলির** মাধ্যমে সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি **ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে** সংগ্রহ করতে চাইলে **সংশ্লিষ্ট** গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে।
- অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) **সংগ্রহ করার সংবাদ** কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।** উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।
- **যাঁরা ডাকযোগে** (By Post) **পত্রিকা নেন তাঁরা** চাইলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেজন্য তাঁদের প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ১৭ টাকা পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ১৭ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের **শারদীয়া সংখ্যা** সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) সংগ্রহ করবেন, তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় অনুগ্রহ করে তাঁদের নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রশিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে (যদি ক্যাশমেমো/রসিদ হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে) নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।
- যাঁরা প্রতি মাসে পত্রিকা **ব্যক্তিগতভাবে** সংগ্রহ করেন এবং **যাঁরা শুধুমাত্র শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে** সংগ্রহ করবেন তাঁরা **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত শারদীয়া সংখ্যাটি** কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন **এই সময়ের মধ্যে** তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে **২৬ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বরের ('৯৯) মধ্যে অবশ্যই** সংগ্রহ করতে হবে। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য তার পর সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- কার্যালয় কাজের দিন (সোম-শুক্র) **সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত** এবং **শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ। ৯ অক্টোবর মহালয়া এবং ১৬ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত** দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে **কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২৬ অক্টোবর '৯৯ কার্যালয় খুলবে।**

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬
মে ১৯৯৯

ভগবান বুদ্ধের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি
বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নিবেদিত

কোধং জহে বিপ্‌পজহেয্য মানং, সঞ্‌ঞোজনং সব্‌বমতিক্‌কমেয্য।
তং নামরূপস্‌মিং অসজ্জমানং, অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুক্‌খা।।

ক্রোধ সংবরণ কর, অহঙ্কার পরিত্যাগ কর, সকল বন্ধন অতিক্রম কর। যিনি নাম-রূপে নির্লিপ্ত, অকিঞ্চন ব্যক্তি তাঁকে দুঃখে পড়তে হয় না।

অক্‌কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্‌চেন অলিকবাদিনং।।

মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে আর মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করবে।

সচ্চং ভণে, ন কুজ্‌ঝেয্য, দজ্জাপ্পস্মিম্পি যাচিতো।
এতেহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে।।

সত্য কথা বলবে, ক্রোধ করবে না, অল্প হলেও প্রার্থীকে দান করবে। এই ত্রিবিধ উপায়ে দেবগণের নিকট যেতে পারবে।

সদা জাগরমানানং অহোরত্তানুসিক্‌খিনং।
নিব্‌বানং অধিমুত্তানং অত্থং গচ্ছন্তি আসবা।।

যাঁরা সর্বদা জাগরণশীল, দিবারাত্র জ্ঞানানুশীলনে রত, যাঁরা নির্বাণলাভের প্রয়াস করেন, তাঁদের সকল পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।

বচীপকোপং রক্‌খেয্য বাচায় সংবুতো সিয়া।
বচীদুচ্চরিতং হিত্বা বাচায় সুচরিতং চরে।।

জিহ্বার প্রকোপ বন্ধ করে বাক্‌সংযম করবে। দুর্ব্যবহার না করে বাক্যের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করবে।

মনোপকোপং রক্‌খেয্য মনসা সংবুতো সিয়া।
মনোদুচ্চরিতং হিত্বা মনসা সুচরিতং চরে।।

মানসিক উত্তেজনা পরিত্যাগ করে মনকে সংযত রাখবে। মনকে দুষ্কর্মে নিযুক্ত না করে তার দ্বারা সৎকর্ম সাধন করবে।

কায়েন সংবুতা ধীরা অথো বাচায় সংবুতা।
মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা।।

যেসকল জ্ঞানিপুরুষ সংযতকায়, সংযতবাক্ ও সংযতমনা—তাঁরাই সুসংযত।

শ্রীবুদ্ধ (ধম্মপদ ঃ কোধবগ্গ)

তত্ত্ব ও প্রয়োগ : আরো কিছু কথা

তত্ত্বকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্বের মৌল নীতিতে বা লক্ষ্যে নয়, কিন্তু আঙ্গিকে এবং উপস্থাপনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন, পরিমার্জন এবং সংযোজন যুগের প্রয়োজনে যে অপরিহার্য তাহা স্বীকার্য। কিন্তু এই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি করিবার অধিকারী কে অথবা কাহারা? ইতিহাসের নিরিখে দেখা যায় যে, উহার অধিকারী—ঋষি অথবা ঋষিতুল্য ব্যক্তিরা। তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহ উহা করিলে তাহা সমাজে গৃহীত হয় না। ঋষি অথবা ঋষিতুল্য ব্যক্তিরা চৈতন্যের শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান বলিয়াই তাঁহাদের নির্দেশ সমাজ শুনিতে বাধ্য হয় এবং শুনিলে সমাজের কল্যাণ হয়। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগে যুগে যেমন আমাদের জীবনলক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করিয়াছেন, তেমনি আবার জীবনলক্ষ্যকে প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগের ব্যাপারে উহার যুগোপযোগী উপস্থাপন করিয়াছেন। এই উপস্থাপনের প্রশ্নে তাঁহারা কোন কোন মহল হইতে সমালোচিত হইয়াছেন, প্রতিরোধের সম্মুখীনও হইয়াছেন। কিন্তু যাহা সমাজ ও মানুষের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছেন তাহা তাঁহারা করিয়াছেন অথবা বলিয়াছেন। কোন সমালোচনা অথবা প্রতিরোধ তাঁহাদের সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। দুর্দম সাহস এবং অবিচলিত দৃঢ়তায় তাঁহারা আদর্শ ও তত্ত্বকে কালোপযোগী ভূমিতে স্থাপন করিয়াছেন।

তাঁহারা আসিয়া মানুষকে ধর্ম ও ধর্মাচার সম্পর্কে অবহিত করেন। ধর্ম মূলসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলসত্যগুলিই ধর্মের প্রাণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মূল বা সনাতন সত্যগুলি মানবপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ থাকিবে ততদিন উহারা অপরিবর্তিত থাকিবে। অনন্তকাল ধরিয়া সর্ব দেশে, সর্ব অবস্থায় ঐগুলি ধর্ম—সনাতন ধর্ম। কিন্তু যেগুলি বিশেষ বিশেষ যুগে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ স্থানে অনুষ্ঠেয় কর্তব্য বলিয়া ঋষিরা বা ঋষিতুল্য ব্যক্তিরা মনে করেন এবং সেইভাবে অনুষ্ঠানের বিধান দান করেন, সেইগুলি কালে কালে পরিবর্তিত হয়। সাধারণ মানুষ যাহাকে 'ধর্ম' বলিয়া মনে করে তাহা আসলে ধর্মবিশ্বাস যাহা ধর্মাচারভিত্তিক। ধর্মাচার আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়। দেশাচার প্রায়শই কুসংস্কারপূর্ণ এবং স্থানবিশেষে পরস্পরবিরোধী। সাধারণ মানুষ কিন্তু এই নিজ নিজ অঞ্চলে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানগুলিকেই "ধর্মের সার" বলিয়া মনে করে। সেগুলির বিন্দুমাত্র এদিক-ওদিক হইলে সাধারণ মানুষ মনে করে তাহাদের ধর্ম বুঝি রসাতলে গেল! স্বামীজী বলিয়াছেন—ইহা সাধারণ মানুষের "মহাভুল"।

সেজন্য তিনি বলিয়াছেন : "এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন সামান্য সামাজিক প্রথা বদলাইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল, মনে করিও না। মনে রাখিও, চিরকালই এইসকল প্রথা ও আচারের পরিবর্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল, যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদপাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড়লোক আসিলে ছাগ ও গো-হত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করানোর প্রথা ছিল। ক্রমশ সকলে বুঝিল—আমাদের জাতি প্রধানত কৃষিজীবী, সুতরাং ভাল ভাল ষাঁড়গুলি হত্যা করিলে সমগ্র জাতি বিনষ্ট হইবে। এই কারণেই গোহত্যা-প্রথা রহিত করা হইল—গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রাচীন শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়তো এমন সব আচার প্রচলিত ছিল যেগুলিকে এখন আমরা বীভৎস বলিয়া মনে করি। ক্রমশ সেগুলির পরিবর্তে অন্য সব বিধি প্রবর্তন করিতে হইয়াছে। ঐগুলিও আবার পরিবর্তিত হইবে। তখন নূতন নূতন 'স্মৃতি'র অভ্যুদয় হইবে। এইটিই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপে থাকিবে, কিন্তু কোন স্মৃতির প্রাধান্য যুগ-পরিবর্তনেই শেষ হইয়া যাইবে। সময়স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব পূর্ব স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ পাইবে, আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন। সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না—তাঁহারা আসিয়া সেইসকল কর্তব্য ও পথ সমাজকে দেখাইয়া দিবেন।" ('বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৬৩-৬৪)

এই 'মহাপুরুষগণ' কাহারা? তাঁহারা কি রাষ্ট্রনীতিবিদ্, সমরনায়ক অথবা কোন পরাক্রান্ত নরপতি? রাষ্ট্রনীতিবিদ্, সমরনায়ক বা নরপতিরা সমাজ শাসন করেন ঠিকই, কিন্তু সেই সমাজশাসন কতদিন স্থায়ী থাকে? দশ বছর, বিশ বছর, পঞ্চাশ বছর, বড়জোর একশ বছর। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদের স্থানে আসে অধিকতর শক্তিশালী অথবা দুর্বলতর কোন ব্যক্তি। যাঁহারাই আসুন, পূর্বের শাসনপ্রভাব তখন আর ক্রিয়াশীল থাকে না। প্রাচীন ও পরবর্তী সকলের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান হইলেও মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে তাঁহাদের কচিৎ দু-একজন বাঁচিয়া থাকেন। বাঁচিয়া থাকেন তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি

বা প্রশাসননীতির কুশলতার জন্য নয়, তাঁহাদের মহাপুরুষ বা ঋষি-সুলভ চরিত্রের জন্য। যেমন সম্রাট অশোক। এইচ. জি. ওয়েলসের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে: "Among tens and thousands of monarchs that crowd the columns of history, the name of Ashoka shines and shines almost like a star. From Volga to Japan his name is still honoured." (শত সহস্র সম্রাটের নাম ইতিহাসের স্তম্ভশ্রেণীর চারিপাশে ভিড় করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অশোকের নাম নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করিতেছে। ভলগা হইতে জাপান পর্যন্ত তাঁহার নাম আজো সম্মানিত।) কেন সম্রাট অশোকের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম? কারণ, তিনি ছিলেন 'ধর্মাশোক'। রাজচক্রবর্তী হইয়াও তিনি ছিলেন ঋষি। সহস্র শিলালিপিতে রাজর্ষি অশোকের অনুশাসন আজো শাস্ত্রবাণীর মর্যাদায় ভূষিত। অর্থাৎ সমাজকে যথার্থ পরিচালনা করেন সেইসব ব্যক্তিত্ব যাঁহারা ঋষিত্বের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন, ঋষিত্বের অবস্থায় উন্নীত হইয়াছেন।

বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য, নানক, কবীর, তুলসীদাস, নামদেব, একনাথ, রামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, বিবেকানন্দ প্রমুখ ইতিহাসের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তাঁহাদের স্থান শুধু ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নয়, ইতিহাসের চাহিতেও বহু বিস্তৃত নিখিল মানবের হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহাদের নিত্য অমলিন অধিষ্ঠান। কারণ, তাঁহারা ছিলেন ঋষি অথবা ততোধিক। তাঁহারাই ধর্মের তত্ত্বদ্রষ্টা, ধর্মের নবসংস্থাপক। তাঁহারাই যুগ-পরিচালক। আবার যুগ হইতে যুগান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে তাঁহাদের প্রভাব নির্বাধ গতিতে নিত্য প্রবহমান। সংস্কৃতে 'ঋষি' শব্দটি 'ঋষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঋষ্' ধাতুর মধ্যে 'দৃষ্টি'র ('দৃশ্' ধাতুর) তাৎপর্য নিহিত, এমন 'দৃষ্টি' যাহা অন্ধকারের যবনিকা, কালের যবনিকা ভেদ করিয়া প্রসারিত। সেজন্য 'ঋষি' শব্দের অর্থ 'দ্রষ্টা'—যিনি দেখেন, দেখিতে পান। কি দেখেন, কি দেখিতে পান? ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের দ্রষ্টা তিনি। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায় দেখিতে পান। তিনি ক্রান্তদর্শী, তিনি ত্রিকালদর্শী। 'ঋষ্' ধাতুর আরো দুটি অর্থ আছে—গমন করা ও হত্যা করা। সুতরাং যিনি অজ্ঞান অথবা কালের পারে গমন করিতে সমর্থ অথবা যিনি প্রজ্ঞার আলোয় অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে সমর্থ তিনিই 'ঋষি'। সুতরাং ঋষিদের নির্দেশ, বিধান ও কর্ম যথার্থ হইতে বাধ্য। উহার অনুসরণেই মানুষের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ।

স্বামীজী বলিয়াছেন: "আমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। ঋষি কাহারা? তিনিই ঋষি, যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহার নিকট ধর্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগ্‌বিতণ্ডা বা তর্কযুক্তি নয়—সাক্ষাৎ উপলব্ধি, অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহেন, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা। ইহাই ঋষিত্ব। আর এই ঋষিত্বলাভ কোনরূপ দেশ, কাল, জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না।" (ঐ, পৃঃ ৬৫) ঋষিরা যে-দেশেই জন্মগ্রহণ করুন, যে-যুগেই জন্মগ্রহণ করুন, তাঁহাদের জন্ম মানবকল্যাণের জন্য। মানুষকে, সমাজকে, জগৎকে নূতন দিশা দান করিবার জন্য তাঁহারা দৈবনির্দিষ্ট। জড়ের শক্তি নয়, দেহের শক্তি নয়, ঐহিক সম্পদের শক্তি নয়—ঋষিদের শক্তি চৈতন্যের শক্তি, আত্মার শক্তি, ঈশ্বরের শক্তি। সেই শক্তির জন্যই তাঁহারা ক্রান্তদর্শী, তাঁহারা ত্রিকালদর্শী। সেজন্যই যে-বাণী তাঁহাদের মুখ হইতে নির্গত হয় তাহা অব্যর্থ, অমোঘ ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিসম্পন্ন। যে-কাজ তাঁহারা করেন তাহা মানবের, সমাজের ও জগতের পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর। দুর্ভাগ্য তাহাদের যাহারা তাঁহাদের সমালোচনা করে, তাঁহাদের ব্রতসাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করে। অবশ্য তাহাদের ঠিক দোষও দেওয়া যায় না, কারণ তাহারা অজ্ঞ ও ভ্রান্ত। কেমন করিয়া তাহারা বুঝিবে, কে বা কাহারা তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত! আবার তাহাদের এই প্রতিরোধের একটি অন্যতর তাৎপর্যও আছে। যতই প্রতিরোধ ও সমালোচনার তরঙ্গ প্রবল হয়, ঋষি এবং ঋষিতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও আত্মিক শক্তির ঐশ্বর্য ততই প্রকাশিত হইতে থাকে। রাম ও কৃষ্ণকে তো ঐ অজ্ঞ ভ্রান্তরাই নিন্দা করিয়াছে, বুদ্ধকেও করিয়াছে, মহম্মদকেও করিয়াছে। খ্রীস্টকে তো অজ্ঞ ও ভ্রান্তদের ষড়যন্ত্র ও অসহিষ্ণুতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! যাহারা তাঁহার প্রাণ লইয়াছে তাহারাই পরে তাঁহার বাণী ও ভাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার অলিভার গোল্ডস্মিথের 'ডেজার্টেড ভিলেজ'-এর সেই বিখ্যাত কথাগুলি আমাদের মনে পড়িতেছে: "Fools who came to scoff, remain'd to pray." (নির্বোধেরা নিন্দা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু রহিয়া গেল প্রার্থনা করিবার জন্য।) বস্তুত, জীবিত খ্রীস্টের চাহিতে মৃত খ্রীস্ট দিন দিন হইয়া উঠিয়াছেন আরো, আরো শক্তিশালী। ইহা ঘটিয়াছে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রামকৃষ্ণ, সারদাদেবী এবং বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও। সমালোচনার তীর তাঁহাদের বিদ্ধ করিয়াছে, সমাজ তাঁহাদের রক্তচক্ষু দেখাইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের চোখে কোন বিদ্বেষ কখনো কেহ দেখে নাই। তাঁহাদের ক্ষমা, তাঁহাদের প্রেম প্রতিবাদীদের ঘৃণা, ক্রোধ, নিন্দা ও অসহিষ্ণুতাকে লক্ষ-কোটিগুণ অতিক্রম করিয়া গিয়া জগতের বুকে অনন্তকালের জন্য তাঁহাদের অপরাজেয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রসঙ্গত, সমালোচকদের নিন্দা ও কুৎসায় অবিচলিত বিবেকানন্দের একটি অসাধারণ উক্তি মনে

পড়িতেছে। স্বামীজী তখন দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকায় গিয়াছেন। তাঁহার সাফল্যে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের মহিমায়, তাঁহার জনপ্রিয়তায় বিনিদ্র নিন্দুকদের অপপ্রচার তাঁহার কানে আসিয়াছে। একদিন সকালে গৃহের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে প্রস্তর-প্রত্যয়ের সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ "What I am, is written on my brow. If you can read it, you are blessed. If you cannot, the loss is yours, not mine." (আমি কে তাহা আমার ললাটে লিখিত রহিয়াছে। তোমরা যদি [বিধাতা-লিখিত] আমার সেই ললাটলিপি পাঠ করিতে পার তাহা হইলে তোমরা ধন্য। আর যদি না পার দুর্ভাগ্য তোমাদেরই, আমার নয়। [দ্রঃ The Life of Swami Vivekananda, Vol. II, 1981, p. 505])

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদাদেবীকে, বিশেষ করিয়া সারদাদেবীকে অনেক প্রতিরোধের প্রাচীর চূর্ণ করিতে হইয়াছে। "যত মত তত পথ" সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে করিয়াছেন তাহা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে অভাবনীয় ছিল। নগর-কলিকাতার বাগবাজার এবং গ্রাম-বাংলার জয়রামবাটী অথবা কোয়ালপাড়ায় রক্ষণশীলতার দুর্গের মধ্যে অবস্থান করিয়া সারদাদেবী সেইসব প্রথা, রীতিকে বারবার ভাঙিয়াছেন, যেগুলিকে তিনি মনে করিয়াছেন সমাজ ও মানুষের বাঞ্ছিত বিকাশের পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী তাঁহার ছিল না, ছিল না সামাজিক কোন মান্য অবস্থান। উপরন্তু তিনি ছিলেন একান্তই শান্ত, নীরব, লজ্জাশীলা ও পর্দানশিন এক গৃহবধূ। কিন্তু যে দৃঢ়তা, সংযম, সাহস এবং ঔদার্য তিনি দেখাইয়াছেন, কোন ভাষা বা বর্ণনায় তাহার অনন্যতা বুঝানো অসম্ভব। সেকালের এই ব্রাহ্মণ-বিধবা বাগবাজারে বসিয়া 'ম্লেচ্ছ' বিদেশিনীদের আপন কন্যার মতো বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত একত্রে আহার করিয়াছেন। 'ম্লেচ্ছ' নিবেদিতাকে আপন আবাসে রাখিয়াছেন। নিবেদিতার প্রস্তুত পায়সান্ন ঠাকুরকে দিয়াছেন এবং স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। শূদ্রের প্রস্তুত ব্যঞ্জন সানন্দে খাইয়াছেন, সমাজে উপেক্ষিত বারাঙ্গনাকে সাদরে বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন। জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়ায় ব্রাহ্মণ, শূদ্রকে একত্রে বসাইয়া খাওয়াইয়াছেন। মুসলমানকে স্বয়ং পরিবেশন করিয়া আহার-শেষে তাহার উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত পরিষ্কার করিয়াছেন। দস্যুকে, অন্ত্যজকে, পতিতকে, ভিন্নধর্মাবলম্বীকে সন্তানস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্ত্যজকে দীক্ষাদান করিয়াছেন। সেকালের সমাজের দৃষ্টিতে এগুলি ছিল অভাবনীয়। ছিল গুরুতর অপরাধ। সেজন্য প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইয়াছে। কিন্তু নীরব দৃঢ়তায় এবং অপরিসীম সাহসে সমাজের ভ্রূকুটিকে তিনি বারবার অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সমাজবিধানের নামে সমাজশোষণের নির্লজ্জ মুখোশ আপনা-আপনি খসিয়া পড়িয়াছে। ধর্মের নামে, বর্ণের আড়ালে শোষণ ও নিপীড়নের যে অচলায়তন আমাদের সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার নিজস্ব অনন্য পদ্ধতিতে তিনি তাহাতে কঠোর আঘাত করিয়াছিলেন। ধর্মের নামে, জাতের নামে 'বজ্জাতি'র বিরুদ্ধে তাঁহাকে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে হয় নাই, গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিতে হয় নাই, তথাকথিত বিপ্লবের 'ভাঙিয়া দাও, গুঁড়াইয়া দাও, পুড়াইয়া দাও' স্লোগান তুলিতে হয় নাই। কলিকাতা অথবা জয়রামবাটী অথবা কোয়ালপাড়ায় যখন যেখানে তিনি থাকিয়াছেন, সেখানে তাঁহার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়াই তিনি তাঁহার নীরব সমাজবিপ্লবের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শান্ত ও নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি ভাঙিয়া, গুঁড়াইয়া, পুড়াইয়া দিয়াছেন সেই সঙ্কীর্ণ ও অনুদার মানসিকতাকে—যাহা যুগ যুগ ধরিয়া সমাজের বুকে, মানুষের মনে জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া বসিয়াছিল। প্রতিরোধ হইয়াছিল ঠিকই, রক্ষণশীলরা 'গেল গেল' রবও তুলিয়াছিল। এমনকি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী শুভানুধ্যায়ীও বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অচল অটল। শেষ পর্যন্ত সমাজ তাঁহার সেই আদ্যন্ত সদর্থক পদ্ধতিকে স্বীকার করিয়াছিল। সমাজবিধান লঙ্ঘন করার অপরাধে জয়রামবাটীতে তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইয়াছে। একবার নয়, বারবার। তিনি বারবার জরিমানা দিয়াছেন, কিন্তু আবার সেই অর্থহীন সমাজবিধানকে ভাঙিয়াছেন। আজ জয়রামবাটী, কোয়ালপাড়ায় মায়ের বিধানই বিধান। সমাজশাসকরা বিস্মৃতির অন্ধকারে কোথায় হারাইয়া গিয়াছেন। বাগবাজারেও যাহা তিনি করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনকালেই তাহা সমাজের ঐতিহ্যে পরিণত হইয়াছিল।

কিভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হইল? উত্তর সেই একই—তাঁহার 'ঋষিত্ব'। সারদাদেবী ছিলেন নবযুগের নারী-ঋষি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দও ছিলেন তাহাই। যেমন ছিলেন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য। তাঁহাদের বাণী, তাঁহাদের বিধান, তাঁহাদের জীবন যুগে যুগে নূতন 'স্মৃতি'র মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আমাদের সনাতন 'শ্রুতি'র পরেই তাঁহাদের 'স্মৃতি'র স্থান সনাতন 'শ্রুতি'র প্রামাণিকতাকে যুগে যুগে তাঁহারাই মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কালের নিয়মে যে গ্লানি ও মালিন্য 'শ্রুতি'র গায়ে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহাকে মার্জনা করিয়া, মূল তত্ত্বের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের মাধ্যমে এবং তাঁহাদের নিজেদের চরিত্রকে তত্ত্বের জীবন্ত ভাষ্যরূপে উপস্থাপনের মাধ্যমে 'শ্রুতি'র মূল দীপ্তিকে তাঁহারা আমাদের সামনে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। চরিত্রের ঐশ্বর্যে তাঁহারা এমনি উন্নত ছিলেন যে, "ইঙ্গিতে সমগ্র জগৎকে পরিচালনার অদ্ভুত মহাশক্তি" ছিল তাঁহাদের করায়ত্ত। বাস্তবিক, তাঁহাদের চরিত্র "এত উন্নত যে তাঁহাদের উপদেশাবলীও যেন উহার নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হয়।" (ঐ, পৃঃ ১৪১) ❑

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানতেন না। সর্বদা মুখে 'মা মা'। একটু ঈশ্বরীয় কথা হলো কি গান, অমনি সমাধিস্থ! তাঁর জীবনটা শেষের দিকে ভক্ত-তৈরি কাজে লেগেছিল। আগে তো অন্যরূপ ছিল। একটানা সমাধিভাবে কেটেছে। শেষের দিকে যেন সাততলা থেকে একতলায় নেমে এসে ভক্তি ভক্ত নিয়ে ছিলেন। একটু উদ্দীপন হলো, অমনি একতলা থেকে সাততলায় উঠে পড়লেন। অমন আর দেখা যায়নি। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। অতুলনীয় ব্যক্তি, কিন্তু ভক্তদের সকলকেই কিছু না কিছু করতে হয়েছে। সেই কর্ম প্রত্যাদিষ্ট কর্ম—তাঁর কথা লোককে বলা। স্বামীজীকে যেতে হলো বাইরে—পাশ্চাত্যে। (পৃঃ ৩৩)

বাবুরা পান চিবুতে চিবুতে হেসে হেসে অফিসে যাচ্ছে নৌকাতে। ঠাকুর দেখে বলতেন ঃ "দেখ দেখ, দাসত্ব করতে যাচ্ছে, তাতে কি আনন্দ! বাবা, মহামায়ার কী কাণ্ড! কোথায় জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ করা, তা না করে দাসত্ব করতে যাচ্ছে! এতে আবার কত আনন্দ!"

অবতারের কথা, সিদ্ধ মহাপুরুষের কথা আলাদা। ঠাকুরকে দেখেছি, এই একমাত্র পুরুষ যাঁর সর্বদা আনন্দ। নিজেকে জেনেছিলেন কিনা আনন্দময়ীর সন্তান! একবার যাঁর বোধ হয়—আনন্দময়ীর সন্তান আমি, তিনি সর্বদা আনন্দ করবেন না তো কি? (পৃঃ ৭১)

একদিন অশ্বিনী দত্তের বাবা ব্রজমোহনবাবু ঠাকুরের ঘরে বসে পাঁচমিশেলী সব কথা কইছেন। শুনে ঠাকুরের সহ্য হয়নি ঐসব কথা। একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কিছুকাল পর সমাধি থেকে নেমে এসে বললেন, জোড় হাত করে— "বাবা, ওসব কথা বলো না। এসব আমার সহ্য হয় না। এখানে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কও।" ব্রজবাবু তখন ক্ষমা চেয়ে বললেন ঃ "প্রভো, এখন জানতে পারলেন তো আমাদের রোগ কি। এখন ঔষধ দিন।" (পৃঃ ১৪৭)

ঠাকুর মাঝে মাঝে ভক্তদের দিয়ে চড়ুইভাতি করাতেন। সঙ্গে খাওয়াটি থাকলে মনে দাগ লাগে বেশি। মনটাকে ভগবানের দিকে নেওয়ার জন্য কত উপায় অবলম্বন করতেন ঠাকুর! ভক্তরা এলেই কিছু খেতে দিতেন। এতে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো। একটি—এই খাওয়ার কথা মনে থাকবে, খালি উপদেশ মনে থাকে না। আর দ্বিতীয়—অজ্ঞাতভাবে ঠাকুরের ওপর ভালবাসা হবে। মন বলবে, উনি আমায় ভালবাসেন। নইলে খেতে দেবেন কেন! এই স্মৃতিটি তাকে রক্ষা করবে, সাহস দেবে মনে—সংসারসমুদ্রে যখন হাবুডুবু খাবে। (পৃঃ ১৭৪)

ঠাকুর একবার একজন ভক্তকে দিয়ে বলে পাঠালেন আরেক ভক্তের কাছে কলকাতার হরিতকিবাগানে—"যাও, ওকে বলে এসো—আমার ধ্যান করলেই হবে।" যাকে বললেন তিনি যুক্তিবাদী। তাই তার সামনেই বলছেন ঃ "আচ্ছা মা, আমি কি অন্যায় করলাম একথা বলে? আমি তো দেখছি, এখানকার সব ছেয়ে আছ তুমি—দেহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার চব্বিশ তত্ত্ব, সব।" তাঁর মতো আর কে হয়, বল? অদ্বিতীয় পুরুষ! (পৃঃ ১৭৫)

বকুলতলার ঘাটে ঠাকুরের মা চন্দ্রমণি দেবীর অন্তর্জলি হয়েছিল শরীরত্যাগের পূর্বে। খাটিয়ায় মা শয়ান। খাটিয়ার দুই পা গঙ্গাজলে আর দুই পা ঘাটের ওপর জমিতে। ঠাকুর মায়ের পা ধরে বলেছিলেন ঃ "মা, তুমি কে গো—এ-শরীরটা পেটে ধারণ করেছ!" মানে—সাধারণ মা নও। যেমন কৌশল্যা, দেবকী, যেমন মায়াদেবী, মেরী, যেমন শচীদেবী—তেমনি তুমি। (পৃঃ ১৮৩)

ঠাকুর ভক্তিপথ ধরে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছান। আর তোতাপুরী জ্ঞানপথে যান। তোতাপুরীর প্রথমে লাভ হলো 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এই জ্ঞান। ঠাকুরের হলো 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য'। তারপর তোতাপুরীর হলো 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য'। ঠাকুরের হলো 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। জ্ঞানপথে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিপথে ব্রহ্মজ্ঞান—এ দুটোই ঠাকুরের ছিল। (পৃঃ ২১৪)

ঠাকুর একটি গল্প বলতেন। একজন স্ত্রী lover-এর (প্রেমাস্পদের) সঙ্গে গাছে উঠেছিল। তা ঠাকুরঝি দেখে ফেলেছে। পরে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ "তোর সঙ্গে কে ছিল গাছে?" ও উত্তর করল ঃ "কৈ, কেউ তো ছিল না! আমি একাই ছিলাম।" ঠাকুরঝি বলল ঃ "আমি দেখলাম যে দুজন!" বউ উত্তর করল ঃ "গাছে উঠলে ঐরকম দেখায়।" (পৃঃ ১১৫) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১০ম ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলক ❑ জলধিকুমার সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শ

স্বামী ভূতেশানন্দ

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই ভাষণটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

যে বেলুড় মঠে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই বেলুড় মঠের পুণ্য প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র পদচিহ্ন পড়েছে। সাক্ষাৎ জগজ্জননী কখনো কখনো এখানে বাসও করেছেন। শিবাবতার স্বামীজীও এখানে বাস করেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় সকল সাক্ষাৎ শিষ্য এখানে কঠোর তপস্যা, সাধনভজন করেছেন, বাস করেছেন। সেজন্য স্বভাবতই আমাদের সকলের কাছে এই স্থান মহা পবিত্র তীর্থস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দের স্থাপিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শুধু যে আমাদের দেশের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে তাই নয়, জগতের সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও তা একটি নতুন আন্দোলনের সূচনা করেছে। তাই স্বভাবতই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তথা রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের দেশের তথা সমগ্র বিশ্বের শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের কাছে, ভক্তবৃন্দ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী জনগণের কাছে যুগ-পরিবর্তনের এক বিশেষ প্রতীক।

বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তমণ্ডলীকে কেন্দ্র করেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। কিন্তু 'ভক্ত' শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে আমি ব্যবহার করছি। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী, অনুরাগী ব্যক্তি, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দীক্ষিত শিষ্যগণ সকলেই 'ভক্ত' পদবাচ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য বিভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রায় সবকটি পথেই তিনি নিজে সাধন করেছেন। এইসমস্ত পথের মধ্যে নিষ্কাম কর্মযোগই সর্বশেষ ও সবচেয়ে সহজসাধ্য। এর আগে সাধারণভাবে আমাদের ধারণা ছিল—দীন-দরিদ্রকে দয়া করা ও তাদের সাহায্য করাই ধর্ম। মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ বা প্রতীকের মাধ্যমে ভগবানের পূজা করাই ছিল আমাদের বহুযুগের অভ্যাস ও বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ এই চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন আনলেন। ঈশ্বর বিগ্রহে বর্তমান—এ তো সত্য, কিন্তু মানুষের মধ্যেই তাঁর বিশেষ প্রকাশ, এটা আমাদের জানতে হবে। তাই ঈশ্বরের প্রতীক হিসাবে সকল মানুষকে সেবা করার জন্য আমাদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই সেবাধর্ম ভগবানলাভের এক অতি সুগম পথ। কারণ, পূজানুষ্ঠানের মতো এখানে কোন বিধিনিষেধ পালন করতে হয় না এবং প্রত্যেকেই নিজ ভাবানুযায়ী এই ধর্ম পালন করতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ নির্দেশ করেছেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। ভারতে এবং বিশ্বের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মানুষ এই আদর্শ অনুসরণ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত যাঁরা, তাঁরা শুধু জপধ্যান, প্রার্থনা ও সর্বধর্মকে শ্রদ্ধা করবেন তাই নয়, তাঁরা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারিত ও প্রদর্শিত পথে নিঃস্বার্থভাবে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" করবেন। এতে যাঁদের সেবা করা হবে এবং যাঁরা জীবনের নিয়ামকরূপে এই আদর্শ গ্রহণ করবেন তাঁরা উভয়েই উপকৃত হবেন এবং সব থেকে বড় লাভ—এর ফলে সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে।

নিজের কল্যাণের বিনিময়ে অপরের সেবা করা অতি উচ্চ আদর্শ। শাস্ত্রেও এই আদর্শের কথা আছে। 'ভাগবত'-এ তিন ধরনের ভক্তের উল্লেখ আছে। প্রাকৃত ভক্ত শুধু বিগ্রহের মধ্যেই ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। তাঁরা প্রবর্তক মাত্র। মধ্যম ভক্ত দেবতার উপাসনা করেন। ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিগণ তাঁর বন্ধু, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে তাঁরা কৃপার চোখে দেখেন এবং ধর্মদ্বেষিগণকে তাঁরা উপেক্ষা করেন। উত্তম ভক্ত ভগবানকে ও নিজের আত্মাকে সর্বভূতে দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন ও বাণী এই উত্তম ভক্তের আদর্শেরই সার্থক রূপায়ণ। যদি আমরা তাঁর ছাঁচে ফেলে জীবনকে গড়তে পারি তবেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত ভক্ত হতে পারব।

প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক।* ❑

---

* গত ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সমাপ্তি-পর্বের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত দুদিনের সর্বভারতীয় ভক্তসম্মেলনের উদ্বোধন-অধিবেশনে পাঠ করার জন্য পরম পূজ্যপাদ মহারাজ ইংরেজীতে যে 'আশীর্বচন'টি প্রস্তুত করেছিলেন এটি তার ভাষান্তরিত রূপ। উদ্বোধন-অধিবেশনে এই লিখিত 'আশীর্বচন' পাঠ না করে তিনি তাৎক্ষণিক 'আশীর্বচন' প্রদান করেছিলেন। তার ভাষান্তরিত রূপ গত ভাদ্র ১৪০৫ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ

স্বামী নির্বাণানন্দ

আমাদের দরকার খুব তপস্যা, কিন্তু তপস্যার উপযোগী শরীর-মন আমাদের অনেকেরই নেই। সেজন্য স্বামীজী আমাদের জন্য তপস্যার নতুন পথ করে দিয়েছেন। আমাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম করে যেতে হবে। কর্মে কর্তৃত্ববুদ্ধি—'আমি আমি'—থাকলে চলবে না। ভগবদ্বুদ্ধিতে কর্ম হলে, সকলের মধ্যে ভগবান আছেন—এই বুদ্ধিতে সেবা করলে তবেই চিত্তশুদ্ধি হবে। তখন প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ব্যবহারে ভগবদ্ভাব ফুটে উঠবে। ঠাকুর বারবছর লোকশিক্ষার জন্য কঠোর তপস্যা করে দেখালেন। কাশীপুরেই তো সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হলো। তারপর ঠাকুরের দেহান্তের পর বরানগরের পোড়ো বাড়িতে যখন মঠ, তখন ঠাকুরের সন্তানরা ছবছর কঠোর তপস্যা করলেন নানা জায়গায়। তাঁদের সারাজীবনের উপলব্ধি—ঠাকুর সঙ্ঘে প্রত্যক্ষ রয়েছেন। তাঁর যতদিন ইচ্ছা তিনি সঙ্ঘকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুকাল পরে কৃষ্ণের দেহত্যাগ হলে অর্জুন যাদব-কুলবধূদের হস্তিনাপুরে নিয়ে আসছিলেন। পথে দস্যুরা আক্রমণ করল। কিন্তু অর্জুন তখন গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ তখন জগতে নেই। তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দিয়েছেন।

স্বামীজীকে শুদ্ধানন্দ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আমরা কিরকমভাবে কাজ করব?" তাতে স্বামীজী বলেছিলেন: "চিত্তশুদ্ধির জন্য কাজ করবি তোরা। লোকহিতায় জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও কাজ করেন।" রাজা মহারাজকে সুবোধানন্দ মহারাজ বৃন্দাবনে বলেছিলেন: "আপনি এত ধ্যান-জপ করেন কেন? আপনাকে তো ঠাকুর সবই করে দিয়েছেন। আপনার এত সাধনা তাহলে কিসের জন্য?" মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) উত্তরে বলেছিলেন: "তপস্যা করছি জানবার জন্য। ঠাকুর যে আমাকে কী সম্পদ দিয়ে গেলেন তা দেখে-বুঝে নিতে হবে তো।" মহারাজকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও বৃন্দাবনে ঐ একই প্রশ্ন করেছিলেন। গোঁসাইজীও তখন বৃন্দাবনে সাধন-ভজন করছিলেন। গোঁসাইজী বলেছিলেন: "পরমহংসদেব তো আপনাকে সব সাধন-ভজন করিয়েছেন। তিনি তো আপনাকে দর্শন ও অনুভূতিও করিয়ে দিয়েছেন। তাহলে আপনি কেন আবার এমন কঠোর সাধনা করছেন?" মহারাজ গোঁসাইজীকে বলেছিলেন: "তাঁর কৃপায় যা লাভ হয়েছে সেগুলি এখন আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি।"

কর্ম ও উপাসনা দুটিই একসঙ্গে চলবে। অবশেষে কর্ম আর উপাসনা এক হয়ে যাবে। দুয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকবে না। নিষ্কাম কর্ম খুব কঠিন, কিন্তু চেষ্টা করে যেতে হবে। আমরা 'কথামৃত' পড়ে যাই, কিন্তু বুঝি না। স্বামীজীকে ঠাকুরের কথা বলতে বললে দেখা যেত, তিনি বলতে পারছেন না। কারণ, তাঁর কথা বলতে গেলেই মন-বুদ্ধির অতীত এক প্রদেশে স্বামীজী চলে যেতেন। একবার আমরা রাজা মহারাজকে ধরলাম, বললাম: "মহারাজ, ঠাকুরের কথা কিছু বলুন।" মহারাজ শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি ঠাকুরের কথা কিছু বলতেন না। সেদিন বললেন: "তোরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি কী তা যেন তোদের জানিয়ে দেন, আর আমিও তোদের হয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।"

অভিমান মানেই অবিদ্যামায়া। অভিমান যেখানে, স্বার্থপরতা সেখানে। Choice (পছন্দের ব্যাপার) আছে কিনা। 'ত্যাগ' মানে শুধু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ নয়। সকল অবস্থায় সকল বস্তুর ত্যাগ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস না রাখা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই বিলাস। বাবুরাম মহারাজকে দেখেছি—দুটো জামা, দুটো ধুতি, একটা চাদর। ব্যস, আর কিছুই নেই। ঠাকুর মাস্টারমশায়কে বললেন একটা ফতুয়া এনে দিতে। তিনি দুটো ফতুয়া করিয়ে আনলেন। ঠাকুর বললেন: "আমি তো একটা চেয়েছিলাম।" একটা ফিরিয়ে দিলেন। সর্ব অবস্থায় এমনি alert হতে হবে। কি জন্য সংসার ছেড়ে এসেছি? আমাদের ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস 'কাজ' করবার জন্য নয়—ভগবানলাভের জন্য। 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর প্রথমেই রয়েছেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ। তিনি যুগাবতার। "অবতারবরিষ্ঠ"। স্বয়ং ভগবান। সুতরাং মিশনের কাজ 'কাজ' নয়। সমাজসেবা নয়—'উপাসনা'—'সাধনা'। এটা সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে। কাজ হলো একটা উপায়। নিষ্কাম কর্ম। কর্মের পাশাপাশি কর্মবন্ধন ক্ষয়ের জন্য, কর্মকে perfect (সার্থক) করার জন্য চাই সাধন-ভজন। ঠাকুর বলতেন: "ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখনো না কখনো ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ির কার্নিসের ওপর বীজ রেখে গিয়েছিল। অনেকদিন পর বাড়ি ভূমিসাৎ হয়ে গেল, কিন্তু সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হলো, তার ফলও হলো। ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল পাপ আর নরক—এইসব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করব না, আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।" ঠাকুরই আমাদের সর্বস্ব। তাঁর জীবনই হলো বেদ-বেদান্ত-গীতার সার। তাঁর কথাতেই সর্ব শাস্ত্রের মর্মবাণী বিধৃত। তাঁকে সবসময়, সর্ব অবস্থায় ধরে থাকতে হবে। তাহলে আমাদের কখনো বেচালে পা পড়বে না।

শুভ সংস্কার ছিল বলেই তো আমরা সঙ্ঘে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে স্বাধ্যায়, বিচার, সাধন-ভজন, স্মরণ-মননের দ্বারা সেই শুভ সংস্কারকে প্রবলতর করতে হবে। কায়মনোবাক্যে পবিত্রতার অনুশীলন করতে হবে।

আধ্যাত্মিক জীবনকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে হবে। আলস্যে, গালগল্পে, হালকাভাবে জীবন কাটালে কিছু হবে না। পরনিন্দা, পরচর্চা অন্যায়। ওতে মন মলিন হয়, দূষিত হয়। সুতরাং কখনো যাতে পরনিন্দা, পরচর্চায় মন না যায় তার জন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। কেন সঙ্ঘে এসেছি, কেন সংসার ছেড়েছি, কী আমাদের লক্ষ্য তা সবসময় মনে রাখতে হবে। তখনকার দিনে বড়রা ছোটদের বলতেন ঃ "কি ভাই, মনে আছে তো?"

ভুল তো সকল মানুষেরই হয়। কিন্তু তাই বলে সেটা নিয়ে অত মাথাব্যথার দরকার কি? কাজে অশান্তি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে বুঝতে হবে, ভগবানে ভালবাসা নেই। স্মরণ-মনন, সাধন-ভজন, স্বাধ্যায়, বিচার ঠিক ঠিক হচ্ছে না। রামকৃষ্ণ মিশনে আমরা রয়েছি। যাঁর নামে এই 'মিশন' প্রতিষ্ঠিত তাঁকে দেশের লোক জানে। শুধু দেশের নয়, সমগ্র পৃথিবীর লোক জানে। তাঁর নাম নিয়ে আমরা রয়েছি। আমরা তাঁর অনুগামী। বাইরের লোক বিশ্বাসই করতে পারে না যে, আমাদের মধ্যে খারাপ লোক আছে। ঠাকুরের নামের জোরে আমাদের মান, সম্মান, খাতির জুটছে; সমাদর পাচ্ছি আমরা। নইলে কেউ আমাদের গ্রাহ্যই করবে না। বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন ঃ "ঠাকুরকে যারা একবার দর্শন করেছে, তারা তোমাদের [অর্থাৎ সাধু-ব্রহ্মচারীদের] থেকে বড়।" বেলুড় মঠ একটি মহাপীঠস্থান। মহাপুরুষেরা এখানে বাস করে গেছেন! স্বামীজী, মহারাজরা বাস করেছেন। মা-ঠাকরুন বাস করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর কোথাও এমন জায়গা আর নেই। এমন মহাক্ষেত্রে এসে, তার দিব্য আধ্যাত্মিকতার বলয়ের মধ্যে এসে দুহাত ভরে নিতে হবে। জীবনকে সার্থক করতে হবে। কাজ আমাদের করতে হবে, কিন্তু ঠাকুর-মা-স্বামীজীর spirit-এ (ভাবে) কাজ না করতে পারলে আমরা কাজের নেশায় পড়ে যাব। নাম-যশের মোহে পড়ব। অহং-এর কবলে পড়ব। কাম-কাঞ্চনের দাস হয়ে পড়ব। ধনী লোকের, ক্ষমতাশীল লোকের খোশামুদি করব। আদর্শ থেকে সরে যাব। একদিকে বিচার, স্বাধ্যায়, সাধন-ভজন, স্মরণ-মনন, আর অন্যদিকে কাজ। তাঁর কাজ! একদিকে তিনি, আরেকদিকে তাঁর কাজ। এভাবে চললে আর কোন ভয় থাকবে না।

আমরা যখন মঠে এসেছি তখন তো মঠে প্রাচুর্যের লেশমাত্রও ছিল না। আজ তো অর্থের অভাব নেই। আজ সারা দেশ জুড়ে, জগৎ জুড়ে আমাদের সমাদর। তখনকার দিনে খুব কষ্ট ছিল থাকা-খাওয়া-পরার। তখন মঠে ম্যালেরিয়া লেগেই থাকত। ওষুধ-পথ্য তেমন ছিল না। কিন্তু আনন্দের অভাব ছিল না আমাদের। মন আনন্দে ভরে থাকত। থাকা-খাওয়া-পরার অত কষ্ট কোনই প্রভাব ফেলতে পারত না আমাদের মনে।

প্রকৃত আনন্দের উৎস তো বাইরে নয়। আনন্দের উৎস আমাদের অন্তরে। সেই উৎসের সন্ধান করতে হবে। অনর্থক কথা, আলাপ, আলোচনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাতে শক্তিক্ষয় হয়। নীরবতা সাধনজীবনের অঙ্গ। মহারাজকে দেখেছি, ভাবে তন্ময় হয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। মহাপুরুষ মহারাজকেও দেখতাম তাই। ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদেরও তাই দেখেছি। তাঁদের কাছে গেলে সকলেই তাঁদের ঐ মৌনের spell-এর মধ্যে এসে যেত। সকলের মনে এক গভীর নীরবতার ভাব নেমে আসত। এসব তাঁদের হতো তাঁদের তপস্যা এবং সাধনজীবনের জন্য। এই তপস্যাই ছিল তাঁদের জীবনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। মহারাজ বলতেন ঃ "আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম—সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। দ্বিতীয়—কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয়—বাসনাজয়ী হতে হবে। এই তিনটি পালন করতেই হবে। এইগুলি জীবনে ফলানোই আসল তপস্যা।"* ❑

* ৫ মার্চ ১৯৬৮ বেলুড় মঠের পুরনো মন্দিরে নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কাছে পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ। সেদিনের আলোচনায় উপস্থিত দুজন সন্ন্যাসীর সূত্রে পৃথক ভাবে প্রাপ্ত দুটি বিবরণকে মিলিয়ে বর্তমান আলোচনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

জীবন্ত ভগবানের পূজা

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে স্বামীজী মাদ্রাজে পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে শেষ বক্তৃতা—'ভারতের ভবিষ্যৎ' ('দ্য ফিউচার অফ ইন্ডিয়া')-এ তিনি ভারতবাসীকে আবেগদীপ্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন এই উদ্দীপনাময়ী বাণীতে : "আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হোন। অন্য সব অকেজো দেবতাদের আপাতত ভুললে কোন ক্ষতি নেই। ইনিই একমাত্র জাগ্রত দেবতা—এই তোমার স্বজাতি। সর্বত্র তাঁর হস্ত, সর্বত্র তাঁর কর্ণ, তিনি সর্ববস্তুকে আচ্ছাদন করে রয়েছেন। অন্য সব দেবতা ঘুমোচ্ছেন। কেন তোমরা নিরর্থক অন্য দেবতাদের পিছনে ছুটছ, তোমাদের চারিধারে যাঁকে পরিব্যাপ্ত দেখছ সেই দেবতার পূজা করতে পারছ না?... সেই 'বিরাট'কে? তাঁকে পূজা কর, সেবা নয়। 'সেবা' বললে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বোঝাবে না, 'পূজা' বললেই ভাবটা ঠিক ঠিক বোঝা যাবে। এইসব মানুষ ও পশু—এরাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসীই তোমার প্রথম উপাস্য।"

স্বামীজী এখানে ইংরেজীতে worship শব্দটি বলেছেন, service বলেননি। ইংরেজীতে আমরা যাকে service বলি, তার সঙ্গে যখন ভক্তি ও সম্ভ্রমপূর্ণ শ্রদ্ধা যুক্ত হয়, তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় 'পূজা'। ভক্তেরা মন্দিরে গিয়ে মন্দিরের চারপাশের ঘাস ছেঁটে পরিষ্কার করে দেন। তাকে তাঁরা 'পূজা' বলেন। কেন? কারণ ওর মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে service দেওয়ার ব্যাপারটি আছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশের মানুষকে বিশেষভাবে এই আহ্বান জানালেন যে, অন্য মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে তারা যেন service-এর সঙ্গে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম মিশিয়ে নেয়। তখন সেটা পূজা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শ্রদ্ধার প্রশ্নটা আসছে কেন? আসছে এই কারণে যে, মানুষের মধ্যে রয়েছে এক দৈবী সত্তা। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই উঁকি মারছে সেই দৈবী সত্তার এক-একটা অভ্রান্ত ঝলক।

এইসব শিক্ষা রয়েছে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে। ভাবগুলিকে সেখানে পরিষ্কার করে, অদ্ভুত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর শত শত বছর ধরে আমাদের দেশের মানুষ সেগুলি শুনেও আসছে। সারা দেশ জুড়ে প্রায়ই 'ভাগবৎ সপ্তাহ' পরিচালনা করা হয়। আমাদের দেশের লোক এইসব শিক্ষার কথা সাতদিন ধরে শোনে। বারেবারে। কিন্তু তারা তার গুরুত্ব বোঝেনি, জীবনে তাকে অনুসরণ করেনি।

Service যখন পূজা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার স্বরূপ কী? শ্রীমদ্ভাগবতে এবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে ঈশ্বরের অবতার ঋষি কপিল তাঁর জননী দেবহূতিকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দান করছেন। অসাধারণ সেই আখ্যান থেকে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি :

"অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্।।"

(৩।২৯।২১)

—আমি সকল জীবে আত্মস্বরূপ বিরাজ করি, কিন্তু মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করে মূর্তির মধ্যে আড়ম্বর করে কেবল মন্দিরেই আমাকে পূজা করে।

পরের একটি শ্লোকে বলছেন :

"অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ।।"

(৩।২৯।২৪)

—আমি তাদের পূজা গ্রহণ করি না, যারা সর্বজীবে অধিষ্ঠিত আমাকে অপমান করে অথচ মন্দিরে বহুমূল্য আচার-অনুষ্ঠান করে প্রতিমায় আমার পূজা করে। 'নৈব তুষ্যে'—আমি তাতে মোটেও সন্তুষ্ট হই না।

সবশেষে আসছে দারুণ সদর্থক একটি উক্তি :

"অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা।।"

(৩।২৯।২৭)

—অতএব, সর্বজীবের অন্তরে আমি আমার যে-মন্দির রচনা করেছি, সেখানে আমি সর্বজীবের আপন আত্মস্বরূপ হয়ে যেভাবে বিরাজ করছি, সেভাবে সেখানে আমার পূজা কর।

পূজা কর তাদের দান করে—অর্থাৎ তাদের অনুভূত অভাব দূর করে; পূজা কর তাদের মান দিয়ে—অর্থাৎ সেই দানগ্রহীতাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে; পূজা কর তাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও অভিন্নহৃদয়বত্তার ভাব নিয়ে।

কেমন করে সর্বজীবে ভগবানের পূজা করা যায়? কেমন করে মানুষের মধ্যে ভগবানের উপাসনা করা যায়? রাস্তা দিয়ে যে-লোকটি হেঁটে যাচ্ছে, তাকে ডেকে যদি বলেন—দাঁড়াও, আমি তোমায় আরতি করি, তবে তো তিনি আপনাকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়ে যাবেন। তাই মানুষের মধ্যে ভগবানের পূজা করবার ঠিক ঠিক উপায় বোঝাতে দুটি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে—"দানমানাভ্যাম্"—দান ও মান-এর মাধ্যমে। মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দাও। যদি গরিব মানুষ হয়, তার জন্য খাবার যোগাড় করে দাও, কিংবা একটা কাজ। এবং তা করবার সময় তাকে সম্মান করো এবং তার 'মান' দিও। তুমি তার চেয়ে 'বড়' বলে তাকে অবজ্ঞা করো না।

তারপর আসছে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দুটি। প্রথমটি 'মৈত্র্যা'—অর্থাৎ মৈত্রীভাব। আপনি একটা গ্রামে গেলেন। লোকে আপনাকে সন্দেহ করতে শুরু করল। তাদের চিরকাল বোকা বানিয়ে ঠকানো হয়েছে। তারা ভাবছে, আপনি সেই দলেরই আরেকজন। তাদের অনুভব করতে সাহায্য করুন যে—না, আপনি তাদের বন্ধু। এই প্রসঙ্গে সবশেষে আসছে সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈদান্তিক শিক্ষা—'অভিন্নেন চক্ষুষা'—অর্থাৎ অভিন্নতার ভাব। আমরা সবাই এক—তুমি আর আমি আলাদা নই। সেই একই আত্মা বিরাজ করছেন তোমাতে এবং আমাতে। কী অসাধারণ সব শব্দ! এইসব শব্দ, এই বাণী, এই ভাব আমাদের কাছে বেদান্তের বাস্তব প্রয়োগের দিকটি পৌঁছে দিয়ে যায়।* ❑

* গত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সমাপ্তি-পর্বের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত সর্বভারতীয় ভক্তসম্মেলনে পরম পূজ্যপাদ মহারাজের ইংরেজীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণের বৃহত্তর অংশে। ভাষান্তর : সোমনাথ ভট্টাচার্য।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আবেদন : রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম

অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৪-এর ১৩ মে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে **'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'**-এর উদ্বোধন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বস্ত্র, পাদুকা, পত্রাবলী, তাঁদের লিখিত বা পঠিত গ্রন্থ এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। একটি অত্যাধুনিক সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সংগৃহীত প্রত্যেকটি জিনিসকে সংরক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক সংরক্ষণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে আধুনিক প্রযুক্তিকৌশল-প্রকল্পিত একটি প্রশস্ত মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিকট রক্ষিত উপরি উল্লিখিত স্মৃতিচিহ্নাদি আমাদের অর্পণ করেছেন। আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, উক্ত প্রকারের কোন স্মৃতিচিহ্ন তাঁদের নিকট থাকলে তাঁরা যেন সেইসব স্মৃতিচিহ্ন বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছিগণের নিকট অথবা দাতার পক্ষে যোগাযোগ করা সহজ বেলুড় মঠের এমন কোন শাখাকেন্দ্রে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, যদি এইসব স্মৃতিচিহ্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সেগুলি কালের করালগ্রাসে নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এবিষয়ে দাতাগণের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি এবং সবিনয়ে জানাই যে, তাঁদের নিকট প্রাপ্ত বস্তু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

একটি ১৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ভিডিও ক্যাসেটে (PAL কিন্তু NSTC-তে পরিবর্তনযোগ্য) বর্তমান মিউজিয়াম, প্রস্তাবিত মিউজিয়াম ও সংরক্ষণশালার মডেল এবং বর্তমান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যাসেটটি বেলুড় মঠে **রামকৃষ্ণ মিউজিয়ামে** কিনতে পাওয়া যাবে।

মোটামুটিভাবে স্থির হয়েছে, আগামী ২০০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য আবির্ভাবতিথিতে নতুন মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন হবে। কাজটি সম্পূর্ণ করতে এখনো ৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এবিষয়ে আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও আনুকূল্য কামনা করি। মিউজিয়ামের নির্মাণকল্পে ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান **'Ramakrishna Math'**-এর অনুকূলে চেক/ড্রাফট বা মানি অর্ডার মাধ্যমে **'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম-এর জন্য'** উল্লেখ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

স্বামী স্মরণানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মঠ পরিচালনার জন্য অর্থসংস্থান

স্বামীজীর লেখা ১৬ মার্চ ১৮৯৯ তারিখের চিঠি থেকে জানা যায়, ইংরেজ ও মার্কিন বন্ধুদের সাহায্যে গঙ্গাতীরে বেলুড় গ্রামে জমি সংগৃহীত হয়েছিল এবং মঠের জন্য বাড়িঘর তৈরি হয়েছিল। মঠ পরিচালনার জন্য মিসেস বুল এককালীন কিছু অর্থ দান করেছিলেন। সে-অর্থের পরিমাণ আমরা জানতে পারিনি, কিন্তু সেই অর্থ যে মঠ পরিচালনার পক্ষে যৎসামান্য ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়।

আলমবাজার মঠজীবনের শেষ একবছর ও নীলাম্বরবাবুর বাগানে মঠ থাকাকালীন দশমাসাধিক কাল এবং বেলুড় মঠে প্রথম দিকে কিছু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল, কিন্তু তা ছিল ক্ষণস্থায়ী; কারণ বিদেশী ভক্তদের নিয়ে স্বামীজী অন্যত্র যেতেই এবং মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড ১৮৯৮-এর ডিসেম্বরে স্বদেশে চলে যাওয়ার পর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কর্পূরের আলোর মতো নিভে যায়। অর্থসমস্যা তীব্রভাবে অনুভূত হয় ১৮৯৯-এর জুন মাসে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার ইউরোপ-যাত্রার পর। তখন মিসেস বুল প্রদত্ত এককালীন দানের সুদ পাওয়া যেত। খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ মঠের খরচ নির্বাহের জন্য প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে পাঠাতেন। কিন্তু ১৮ জানুয়ারি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর এই অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিদেশ যাওয়ার আগে স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ বেদান্তপ্রচার ও মঠের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে রাজস্থান ও গুজরাট গিয়েছিলেন। তাঁরা মঠে ফিরে এসেছিলেন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩ মে। আড়াইমাস চেষ্টার ফলে তাঁরা সামান্য অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, অবশ্য কয়েকজন রাজা বা দেওয়ান আরো কিছু অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বিদেশে যাওয়ার পরও মঠের জন্য স্বামীজীর চিন্তাভাবনার শেষ ছিল না। তিনি যখনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তখনি তা মঠে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[৭৮] আবার কখনো অর্থাগম না হওয়াতে হতাশ হয়েছিলেন। যেমন ১৭ জানুয়ারি ১৯০০ তারিখে তিনি মিসেস বুলকে লিখেছেন : "এখানে বা অন্য কোথাও বক্তৃতা দ্বারা বিশেষ কিছু হবে বলে আশা করি না। ওতে আমার খরচই পোষায় না। শুধু তাই নয়, পয়সা খরচের সম্ভাবনা ঘটলেই কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। এদেশে বক্তৃতার ক্ষেত্রটাকে বেশ চষে ফেলা হয়েছে, আর লোকেরা বক্তৃতা শোনার মনোভাব কাটিয়ে উঠেছে।" আবার কখনো-বা স্থানীয় ভক্তদের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি মঠের আর্থিক সমস্যা মেটাতে চেষ্টা করেছেন।[৭৯] এসময়ে মঠের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, মঠে শ্রীঠাকুরের নিত্যপূজার খরচ নির্বাহের জন্য গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রমুখ মহিলা ভক্তগণ প্রতি মাসে ১ টাকা, ২ টাকা করে দিয়েছেন।

কিন্তু স্বামীজীর মহাসমাধির পর মঠের আর্থিক দুরবস্থা চরমে উঠেছিল, অন্তত কিছুকালের জন্য। অবশ্য এই সময়ে ১০ জুন ১৯০৩ মিসেস বুল কলকাতায় একবার এসেছিলেন এবং কিছুদিন থেকে তিনি বম্বে থেকে যাত্রা করেছিলেন ১৪ নভেম্বর ১৯০৩। নির্দ্বিধায় অনুমান করতে পারি, তিনি এসময়েও মঠের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন।

গঙ্গাতীরে পোস্তার কাজ আরম্ভ হয়েছিল ২৯ মার্চ ১৯০২। কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর সে-কাজ অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি 'বেনিফিট নাইট' ('Benefit Night') সংগঠন করে ৮০০ টাকা মঠের হাতে তুলে দেন। পোস্তা বাঁধানোর বাকি কাজ ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের পর শেষ হয়।

মঠের আর্থিক সমস্যা ছাড়াও কোন কোন কেন্দ্রের, বিশেষত শ্রীশ্রীমায়ের ও তাঁর 'সংসারে'র খরচপত্র এবং কলকাতায় নারীশিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহ করতে স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ পরিচালকদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। অবশ্য শ্রীশ্রীমা ও তাঁর 'সংসারে'র জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্কুলান আলোচ্য সময়ের শেষভাগে হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু কলকাতায় নারীশিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য অর্থের সমস্যা অনেক সময়েই পরিচালকদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর স্বামী সারদানন্দ মিসেস বুলকে চিঠিতে লিখেছেন : "The women's work, both of Sister Nivedita and Christina are getting on well, but I have been put to great inconvenience to meet the expenses of the latter's work on account of business failures of Harimohan who promised to help us with Rs.

---

৭৮ স্বামীজীর ২৭।১২।১৮৯৯, ১৫।২।১৯০০ ও ১৪।১০।১৯০০ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

৭৯ স্বামীজীর ২৫।৭।১৯০০ ও ১৩।৮।১৯০০ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

2,000/-. Educational work always means expense and can never be self-supporting. However, I am trying my best to meet it and hope to succeed." যতদূর জানা যায়, তাঁর এই চেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি।

কিন্তু সকল অবস্থাতেই সন্ন্যাসিগণ, বিশেষত প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের অদৃশ্য কল্যাণহস্তের ওপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁরা স্মরণ করতেন বরানগর মঠের দিনগুলির কথা। সেসব কথা শুনে তরুণেরাও অনুপ্রাণিত হতেন এবং বাস্তবের রূঢ়তাকে হাসিমুখে সহ্য করতেন।

সদানন্দ সাতজন ধাঙড়কে নিয়ে বোসপাড়া বস্তিতে সাফাইয়ের কাজ আরম্ভ করেন। সেবাকাজ পরিচালনার জন্য ভগিনী নিবেদিতা সম্পাদক ও স্বামী সদানন্দ কর্মপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৪ এপ্রিল নিকিড়িপাড়া বস্তির আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ শেষ হয়। শিয়ালদহে মুনশিবাজার বস্তি পরিষ্কারের দুঃসাধ্য কাজ ৯ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে শেষ করা হয়। ইতিমধ্যে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী আখণ্ডানন্দ ও স্বামী নিত্যানন্দ সেবাকাজে যোগদান করেছিলেন। ২২ এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে যুবকদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অসুস্থ দেহ নিয়ে স্বামীজী সভাপতিত্ব করেন, নিবেদিতা ভাষণ দেন।

অনাথ বালকদের নিয়ে সেবাব্রতী স্বামী অখণ্ডানন্দ

আর্ত-নারায়ণের সেবা

দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের মধ্যে নরনারায়ণজ্ঞানে সেবা করে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকবৃন্দ ইতিপূর্বেই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আলোচ্য সময়ে ভাগলপুরের ঘোঘাতে স্বামী সদানন্দের সাহায্য নিয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছিলেন। পশ্চিম ভারতের মানুষ, বিশেষত অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষ সর্বনাশা প্লেগরোগের শিকার হয়েছিল। সেই রোগ কলকাতা শহরের বস্তি অঞ্চলে জলপ্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। কাতারে কাতারে মানুষ মরছে, চতুর্দিকে আর্তনাদ। সন্ত্রস্ত মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিতে থাকে। ৩১ মার্চ ১৮৯৯ গুডফ্রাইডের দিন স্বামী

তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পনেরজন যুবক সেবাকাজে যোগদান করেন। তাঁদের কাজের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। এই সেবাকাজ এবং তাতে দেশের শিক্ষিত যুবকদের যোগদানের তাৎপর্য সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার মন্তব্য লক্ষ্য করবার মতো। তিনি মন্তব্য করেন : "Surely one of the great secrets of the weakness of India lies in the fact that the motherland has never in the past found means to voice in any special way her love of the feeble and the outcast and the disinherited amongst her children. Let us pray that we, of this new generation, may live to see the beginning of a

different state of things."[৮০]

পরের বছরও (১৯০০ খ্রীস্টাব্দে) কলকাতায় প্লেগের ভয়ঙ্কর আকার শহরবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।[৮১] স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে মিশনের কর্মিবৃন্দ অসাধারণ সেবাকাজ করেছিলেন। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাঁরা বস্তির ১৩০০টি বাড়ি ও ৪০টি পাকাবাড়ি পরিষ্কার করেছিলেন এবং ১৬০ গাড়ি আবর্জনা সরিয়েছিলেন। এবারেই মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক শরৎচন্দ্র সরকার প্লেগরোগে প্রাণদান করেন। এবারকার সেবাকাজ সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রের 'মরাঠা' ('The Marhatta') পত্রিকা ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখে : "The volunteers of the Mission confined themselves solely to the houses of the poorest classes who are unable to pay for cleansing and disinfecting them. The filthy habitations of the poor were carefully disinfected without causing the least irritation to their ignorant owners or residents at a great cost by the Zealous members of the Mission."[৮২]

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে ভাগলপুরে প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করলে বীরহৃদয় স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে মিশনের সেবকবৃন্দ সেখানকার আর্ত-পীড়িতদের সেবা করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের ধরমশালা ও কাঙরা উপত্যকায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত কুড়িটি গ্রামের মানুষদের সেবা করেছিলেন মিশনের সেবকবৃন্দ।

বিপদে-আপদে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তাৎক্ষণিক বা সাময়িকভাবে সেবার মধ্যে মিশন তার নারায়ণসেবা সীমাবদ্ধ রাখেনি। আলোচ্য কালের মধ্যে দুর্ভিক্ষে সর্বস্বান্ত বালক-বালিকাদের নিয়ে রাজস্থানের কিসেণগড়ে গড়ে উঠেছিল একটি অনাথাশ্রম। রাজস্থানের ফেমিন কমিশনার মেজর ডানলপ স্মিথ অনাথাশ্রম পরিদর্শন করে মন্তব্য লিখেছিলেন : "There are now in the Orphanage 54 boys and 23 girls who are housed in two separate buildings. The children are in excellent condition and appear to receive every attention. They were all happy." এ-সংবাদ পরিবেশন করে 'দ্য সোস্যাল রিফরমার'। ১৫ ডিসেম্বর ১৯০১ এই পত্রিকা মন্তব্য করে

কাশী সেবাশ্রমের প্রথম আউটডোর হাসপাতাল

৮০ 'The Prabuddha Bharat', May 1899, Quoted in "Vivekananda in Indian Newspapers : 1893-1902", p. 625

৮১ এসময়কার দেশের অবস্থা সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ ১১।৪।১৯০০ তারিখের চিঠিতে নিবেদিতাকে লিখেছিলেন : "The plague, the famine, the cholera, the small pox are doing their harvest."

৮২ 'Vivekananda in Indian Newspapers', p. 391

যে, এই অনাথদের মধ্যে ছিল বলৈ, জাঠ, গুজ্জর, মলি, মুসলমান, চামার, রেজার, বারহাই ও ব্রাহ্মণ।[৮৩] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, স্বামী অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে কিভাবে একটি অনাথাশ্রম গড়ে উঠেছিল, যা পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি স্থায়ী কেন্দ্রের রূপ ধারণ করে।

যান অর্থসংগ্রহের আশায়। আবার দীপশিখা জ্বলে ওঠে। নিবেদিতার সঙ্গে ভগিনী ক্রিস্টিন, ভগিনী সুধীরা প্রমুখ যোগদান করেন। বিদ্যালয়ের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, ক্রমে ত্যাগব্রতী মেয়েরা বিদ্যালয়ের কাছে একটি ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় নেন, গড়ে ওঠে মাতৃমন্দির।[৮৪] এসবের অনেক আগে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে পুরস্ত্রী
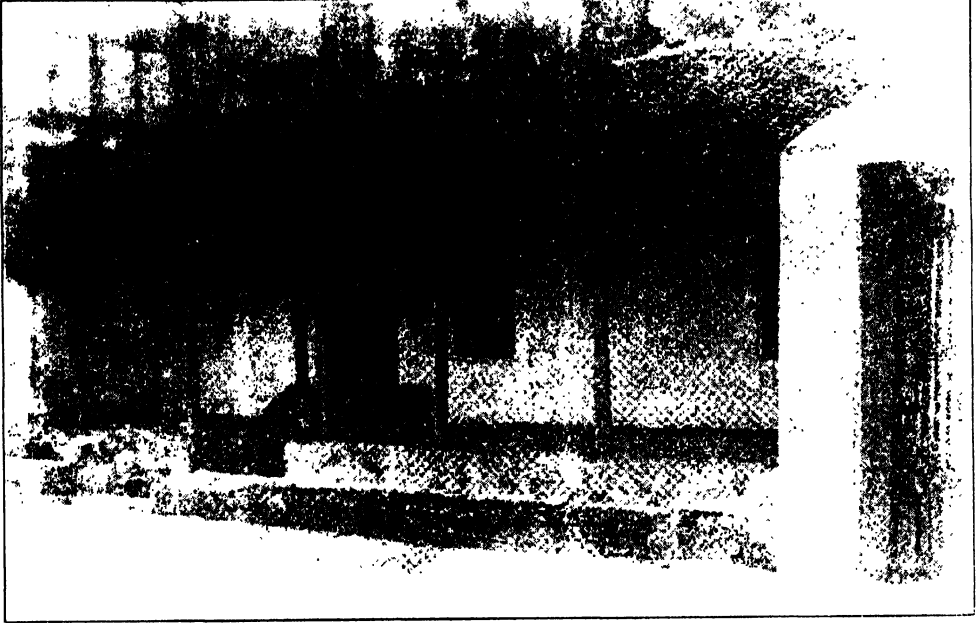
কেশব পেরুমল কোয়েল রাস্তায় এই বাড়িতে মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমের সূচনা হয়

বিভাগের উদ্বোধন হয়েছিল।[৮৫] সপ্তাহে দুদিন পুরস্ত্রী শিক্ষার ক্লাস চলতে থাকে। সেলাই কাজ, মেশিনে মোজা তৈরি করা এবং বাঙলা, ইংরেজী ও গীতা পড়ানো হতো।

শিক্ষাসত্র

ভারতবর্ষের জাগরণের জন্য স্বামীজীর সমাধান ছিল—এদেশের অগণিত অবহেলিত পুরুষ ও নারীদের শিক্ষাদান। তাঁর বোল ছিলঃ "Educate, educate, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

শ্রীশ্রীমা নিজহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করে ১৩ নভেম্বর ১৮৯৮ যে বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি নিবেদিতার কঠোর পরিশ্রমে অনেক বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়ে নিবেদিতা সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকাল পর্যন্ত চার ব্যাচে প্রতিবার দু-ঘণ্টা করে মেয়েদের পড়াচ্ছিলেন। অর্থাভাবে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৯-এর জুন মাসে নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা

ইতিপূর্বে নিউ ইয়র্ক থেকে নিবেদিতা একটি দীর্ঘ রচনার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটির একটি ভবিষ্যদ্রূপ তুলে ধরেছিলেন। 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯০১ সংখ্যায় প্রকাশিত এই পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক অংশঃ "It is obvious that their present education is largely a discipline rather than a development. Yet it has not altogether precluded the appearance of great individuals.... It is undeliable that if we could add to the present lives of Indian women, larger social

৮৩ দ্রঃ 'Vivekananda in Indian Newspapers', p. 462

৮৪ ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রতিবেদনে স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছিলেনঃ "বিদ্যালয়ের সামান্য সূচনায় প্রস্তাবিত স্ত্রী-মঠের ভূমিকা রচিত হয়।" পরবর্তী কালে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রী-মঠ আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়।

৮৫ 'উদ্বোধন', ৫ম বর্ষ, পৃঃ ৬০৫-৬০৬ দ্রষ্টব্য

potentiality and some power of economic redress, without adverse criticism, direct or indirect, of present institutions, we should achieve something of which there is dire necessity.... The question that remains is, how and where can we make a beginning in offering to Indian women an education that shall mean development adapted to the actual needs of their actual lives? It is after careful study and consideration of such facts that the project of the Ramakrishna School for girls has been formed. We intend... to buy a house and piece of land on the banks of Ganges, near Calcutta and there to take in some twenty widows and twenty orphan girls—the whole community to be under the guidance and authority of that Sarada Devi...."[৮৬] নিঃসন্দেহে বলা যায়, নিবেদিতার এই ভাবনা স্বামীজীর ভাবনার প্রতিফলন। এই ভাবনা সর্বাংশে রূপায়িত করা যায়নি, তার কিছু কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু একথাও সত্য যে, এই ভাবনা আশ্রয় করেই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন এবং পরে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়-সংলগ্ন 'মাতৃমন্দির' স্বামীজীর অভীপ্সিত স্ত্রী-মঠ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন এবং তার শিক্ষাপ্রকল্প রূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন।[৮৭] ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিস্টিনের একনিষ্ঠ সেবাকাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাই স্বামী সারদানন্দের ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠি থেকে। তিনি মিসেস বুলকে লিখেছিলেন : "The school of the sisters is getting on as before. The little children have their school everyday and the ladies twice a week, besides a few ladies who are coming almost daily and are getting training so that they might earn something by working at their leisure hours. This is our industrial class."

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষামূলক সেবাকার্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রচেষ্টা। শিবনগরে প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রমে তিনি গুরুকুল পদ্ধতিতে বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। অখণ্ডানন্দজীর অন্যতম সহকর্মী স্বামী সচ্চিদানন্দের চিঠি থেকে জানা যায় যে, অনাথ বালকদের কাছে স্বামী অখণ্ডানন্দ একাধারে ছিলেন "স্নেহময় জননী, করুণাময় পিতা ও জাগ্রত ভগবান।"[৮৮] সেসময়ে আশ্রমে ছিল বারটি অনাথ বালক, তাদের মধ্যে ছিল দুটি মুসলমান, দার্জিলিঙের চারটি গোর্খা ছেলে ও ভাগলপুরের একটি ছেলে। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করে গরম জল ও সাবান দিয়ে ভালভাবে স্নান করিয়ে নবাগত ছাত্রকে বরণ করে নেওয়া হতো। তাদের শিক্ষিতব্য বিষয় ছিল ইংরেজী, মাতৃভাষা, গণিত, বয়ন, সেলাই, কাঠের কাজ ও রেশম শিল্প। সন্ধ্যাবেলায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছেলেরা নিজ নিজ ধর্মমতানুযায়ী উপাসনা করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে। আশ্রম ও বিদ্যালয় সারগাছিতে নিজস্ব জমি ও বাড়িতে স্থায়িভাবে স্থানান্তরিত হয়। অখণ্ডানন্দজী একটি চিঠিতে প্রমদাদাস মিত্রকে জানান : "আমি যেরূপ অনাথাশ্রম করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা যদি সফল হয় তো তাহা ভারতের একটি আদর্শস্থানীয় মহৎ কার্য হইবে।"

মাদ্রাজে স্বামীজীর শিষ্য ডাঃ এম. সি. নাঞ্জুণ্ডা রাওয়ের বাড়িতে[৮৯] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অনুপ্রেরণায় রামস্বামী আয়েঙ্গার ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে অসহায় সাতটি গরিব ছাত্রকে নিয়ে একটি ছাত্রাবাস আরম্ভ করেছিলেন।

বেলুড় মঠে ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে গেলেও ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের জুনে কলকাতার মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে একটি ভাড়াবাড়িতে শিক্ষার্থী যুবকদের জন্য 'বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির' ছাত্রাবাসের সূচনা হয়। স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়োবাবা) তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। বাড়ির মালিক ছাত্রাবাসটি স্থানান্তরিত করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, কিন্তু উপযুক্ত একটি বাড়ি সংগ্রহ করতে না পারায় জনপ্রিয় এই ছাত্রাবাসটি বছরখানেক পরে বন্ধ করে দিতে হয়।

মঠ বা মিশনের যেখানেই কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল—মায়াবতী, কনখল, কাশী, সারগাছি (শিবনগর), মাদ্রাজ—সর্বত্রই ত্যাগব্রতী সেবকগণ অবহেলিত মানুষদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় বা নৈশ বিদ্যালয় চালু করেন।

আরোগ্যনিকেতন

যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে, তেমনি রোগী-নারায়ণদের চিকিৎসার জন্যও আলোচ্য কালে মিশনের সেবকগণের প্রচেষ্টা ছিল লক্ষ্য করবার মতো। স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ প্রেরণালোকে অভিস্নাত চারুচন্দ্র, যামিনীরঞ্জন, কেদারনাথ, হরিনাথ, হরিদাস, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মচারী বিভূতিভূষণ

---

৮৬ দ্রঃ 'Vivekananda in Indian Newspapers', pp. 556-559 ('The Brahmavadin' অংশ)

৮৭ Ibid., pp. 323-324

৮৮ দ্রঃ 'The Vedanta Keshari', Vol. IV, pp. 361-362

৮৯ বর্তমানে এক বৃহৎ অট্টালিকায় একটি আবাসিক বিদ্যালয়-সহ একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হচ্ছে।

কাশীতে গরিব রুগ্ন অবহেলিতদের সেবাকাজ আরম্ভ করেছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল 'পুওর মেন্স রিলিফ অ্যাসোসিয়েশন'। স্বামীজীর প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'হোম অব সার্ভিস'। স্বামীজী তাদের জন্য একটি 'আবেদন' পত্র লিখে দেন। স্বামীজীর বাণী—"Devoted service to God in the form of helpless men is the final goal of human life, equally for the pure-hearted brahmachari, the karmi and the men in general." অবলম্বন করে তাঁরা ক্রমে ক্রমে সেবা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। লাক্সা অঞ্চলে জমি ও ছোট একটা বাড়ি সংগৃহীত হয়।[৯০]

স্বামীজীর আশীর্বাদ নিয়ে স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে পীড়িত ও অসহায় সাধুদের সেবার জন্য হরিদ্বারের কাছে কনখল গ্রামে একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মাসিক তিন টাকা ভাড়ায় দুটি ছোট ঘর-বিশিষ্ট একটি বাড়িতে কাজ আরম্ভ হয়। সেখানে উপস্থিত রোগীদের চিকিৎসা ছাড়াও পনের মাইল হেঁটে হরিদ্বারে গিয়ে কুঠিয়াতে পড়ে থাকা বিপন্ন রোগী-নারায়ণদের সেবা করতে থাকেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ এসে যোগদান করেন। মিশনের সাধুদের এই প্রচেষ্টাকে সে-অঞ্চলের প্রাচীনপন্থী সাধুগণ নিন্দা করতে থাকে, কিন্তু ক্রমে তাঁদের পরিগৃহীত সেবাদর্শ সেখানকার সাধুসমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই সামান্য নিষ্ঠার সেবা থেকে পরিণতিতে সেখানে গড়ে উঠেছে রোগী-নারায়ণদের সুচিকিৎসার একটি বড় প্রতিষ্ঠান।[৯১]

এভাবে বিভিন্ন ধরনের সেবাকাজের মাধ্যমে বেদান্তবাদী রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের এবং তাঁদের বিধৃত আদর্শ সম্বন্ধে জনমানসে একটি নতুন ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। সমকালীন বিভিন্ন জনসভায় এবং পত্র-পত্রিকায় অভিব্যক্ত তথ্য ও অভিমতের প্রতি লক্ষ্য করলেই এবিষয়ে কিছুটা ধারণা করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি পত্রিকার অভিমত এখানে উদ্ধার করা যাচ্ছে। 'নেটিভ ওপিনিয়ন' পত্রিকা ১২ জুলাই ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে: "...the work of the Ramakrishna Mission utterly proves the hallowness of the contention that the Vedantic system of philosophy preaches a gospel of extreme selfishness. The members of the Ramakrishna Mission are Vedantists to the hilt, and in trying to relieve distress in a practical manner, they are simply following the noblest dictates of their creed."[৯২]

কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, কি চিকিৎসা ক্ষেত্রে, কি আকস্মিক বিপদগ্রস্ত মানুষের ক্ষেত্রে যাবতীয় সেবাকাজ ছিল সেবকদের অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গ। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ অনুসরণ করে চলেছিলেন। কিন্তু এই সেবাকাজের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা দেখতে পেয়েছিলেন এক নতুন ঐতিহাসিক তাৎপর্য। তিনি লিখেছিলেন: "For the first time in the history of India an order of monks found themselves banded together with their faces set primarily toward the evolution of new forms of civic duty."[৯৩] [ক্রমশ]

---

৯০ বর্তমানে মিশনের অন্তর্ভুক্ত এই প্রতিষ্ঠান ২৩০ সংখ্যক বেডের একটি হাসপাতাল পরিচালনা করছে।

৯১ এই প্রতিষ্ঠানটি এখন ২৩০টি শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল।

৯২ 'Swami Vivekananda in Indian Newspapers', p. 411

৯৩ Complete Works of Sister Nivedita, Vol. I, p. 40

অনুষ্ঠান-সূচী (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৬)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

পূজাতিথি-কৃত্য

উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ	জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থী	২ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	১৭ জুন	১৯৯৯
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১৩ আষাঢ়	সোমবার	২৮ জুন	১৯৯৯
রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	২৯ আষাঢ়	বুধবার	১৪ জুলাই	১৯৯৯

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

১০, ২৬ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার	২৫ মে, ১০ জুন	১৯৯৯
৯, ২৫ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার, শুক্রবার	২৪ জুন, ৯ জুলাই	১৯৯৯

আমার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই ছিয়াশি বছর পর্যন্ত যেটি অনুভব করেছি সেটিই বলছি। যেটাকে আমরা 'আধ্যাত্মিক' বলি সেই জিনিসটা আমাকে পাগল করেছে। প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। আবার এই পার্থিব জীবন—যাকে বলে 'জীবিকার জীবন'—সেটাও আমাকে চটকাতে হয়েছে। কিন্তু সমস্তগুলি ধুয়েমুছে আমার শেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, সবাই একসুরে কথা বলেন। এক কথাই বলেন। শেষপর্যন্ত একই হয়। একমতই হয়। যেটা মতভেদ বা পার্থক্য মনে হয় সেটা বাইরের কোলাহল মাত্র। তাছাড়া আর কিছুই নয়। অন্তত আমি সেইভাবে নিজে বুঝেছি। আমি সেই ভাবে নিজেকে বিশ্বাস করি, অনুভব করি, জীবনযাপন করি।

আমি কটাক্ষ, কূটকচালির ভিতরে নেই। সোজা সরল মানুষ আমি। আমি গান ভালবাসি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবেসেছি। আমার ঠাকুমা কৃষ্ণকথা বলতেন, 'কথামৃত' পড়াতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই আমি সমান ডান হাত বাঁ হাত করেছি। একটা হাত ছাড়লে অঙ্গহানি হয়ে যায়। আমি বিয়োগ করে কিছু দেখিনি। পরম পাওয়ার মতো যেখানে যা পেয়েছি সেখানে আমি লোভীর মতো হাত বাড়িয়ে তাকে ধরেছি। রেখেছি। গ্রহণ করেছি। রবীন্দ্রনাথ তো আলোকেও ভালবেসেছেন, অন্ধকারকেও ভালবেসেছেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ডান, বাঁ—দুটো হাতই একসঙ্গে চালিয়েছেন। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।"—একথাটা বলা সেদিক দিয়ে মানায়। আমি এর থেকে বিশেষ কিছু ভাবিও না, বুঝিও না। বিশ্বাসও করি না। এইজন্য বলেছি, আলো এবং আঁধার দুটোকেই আমি ভালবেসেছি। যা সত্য তা স্বচ্ছ, তা শুভ্র, খাঁটি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এসমস্তই তাঁর হৃদয়কে দোলা দেয়। শুনেছি বিলিতি ফুল নাকি আমাদের পূজায় লাগে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমার কাছে সবই পূজার ফুল, কেবল শোলার ফুল ছাড়া। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জেনেছি, জগৎও সত্য, ব্রহ্মও সত্য। দুঃখও সত্য, আনন্দও সত্য। দেহও সত্য, আত্মাও সত্য। নিত্যও সত্য, লীলাও সত্য। ব্রহ্মও সত্য, শক্তিও সত্য। আলোও সত্য, অন্ধকারও সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, স্থিতিও সত্য, গতিও সত্য; নিকটও সত্য, দূরও সত্য। বিজ্ঞানে বলে, অণু পরমাণু ইন্দ্রিয়দমনের আশ্রয় থেকে ভ্রষ্ট হতে হতে আকার আয়তনের ঊর্ধ্বে বিলীন হয়ে গিয়ে প্রলয়সাগরের কাছে গিয়ে হাজির হয়। এ আমার কাছে মনোহর বা আশ্চর্য মনে হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। আমি যেখানে রসের সন্ধান পাই, যুক্তিতর্ক সেখানে গা ঢাকা দেয়। যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়, সেদিন আমি চন্দ্রালোকে লাবণ্য বেশি দেখি। সূর্যালোক প্রখর হয় বেশি। এই যে জগৎ নৃত্যে, ছন্দে, সুরে চলেছে—সেদিকে আমার প্রেমের ফোয়ারা জাগে এবং তা যেন একেবারে উজিয়ে ওঠে। পৃথিবীর জল, স্থল, আকাশ সমস্ত আমাকে দোলা দেয়। এক সুরে কথা কয়। আমার জগৎ আমাকে দিয়েই সৃষ্টি। আমার মধ্য দিয়ে আমার সৃষ্টি। আমার সৃষ্টির কোন অতিথিশালায় জন্ম হয় না। কোন রাজপ্রাসাদে জন্ম হয় না। আমার মনেই আমার প্রাণের লীলাক্ষেত্র। প্রেমের লীলাভবন। এই যে কথাগুলি নিজের জগৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেগুলির পরে "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়" কথাগুলি মিলিয়ে দেখলে হয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর নিজের ভাষ্যকার। তিনি এত কথা লিখে গেছেন, বলে গেছেন, এত বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করে গেছেন যে, কোন জিনিস তাঁর অজানা নয়। যদিও কখনো কখনো মনে হয় সেগুলি উলটো-পালটা, তবু সব প্রশ্নের উত্তরই তার মধ্যে পাওয়া যায়।

১৯৯০-এর দশকে রেকর্ডের ওপর বিশ্বভারতীর যে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, সেটির বিলোপ হচ্ছে। কারণ, নিয়ম হচ্ছে (আমি তো উকিলও, সেইজন্য বলছি)—যাঁর রচনা তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে 'কপিরাইট' থাকে না। রবীন্দ্রনাথ দেহ রেখেছেন ১৯৪১ সালে। পঞ্চাশ যোগ করলে ১৯৯১ হয়, তারপর থেকেই কোনরকম বিধিনিষেধ থাকবে না। কপিরাইট থাকবে না। এ-প্রশ্নটা অনেক জায়গায় হয়। আমি যতটুকু বুঝেছি বা জেনেছি, তাই বলছি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন শিক্ষার খপ্পরে পড়েছে। কত স্কুল, কত টিচার চারদিকে। তাছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটা আশার কথা যে, দু-দুটো ইউনিভার্সিটি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি রবীন্দ্রভারতী যা রবীন্দ্রনাথের নামে। সেটিতে এম. মিউজ পর্যন্ত পড়ানো হয়, গবেষণা হয়। আরেকটি বিশ্বভারতী। তাছাড়া ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসাবে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতেও আছে। ইউনিভার্সিটি লেভেলে গানটা একটা শিক্ষার বিষয় হয়েছে। গান শিক্ষাসূচীতে এসেছে। এতে খুশি হওয়ার কথা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পক্ষে আমি একটা কথা বলে থাকি যে, অনেকে মনে করেন আমি জন্ম থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে পুষ্ট এবং বর্ধিত। কিন্তু আমি তো তা নই। আমি বত্রিশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। আগে আমি রবীন্দ্রনাথের পরিবারের ছিলাম না। কাজেই রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলতেন ঃ

"তুমি বাইরে থেকে এসেছ।" আমি বলতামঃ "আমি নিশ্চয়ই বাইরের থেকে এসেছি। এখানে অ, আ, ক, খ পড়িনি, পরীক্ষায় পাশ করিনি। এখানে পড়াতে এসেছি।" তিনি বললেনঃ "তুমি বাইরের!" আমি বললামঃ "হ্যাঁ। আমি বাইরের হয়ে কথা বলি, আমি বাইরের দল।" রবীন্দ্রনাথের 'নীড়ের শিক্ষা' বলে একটি প্রবন্ধ আছে। শিক্ষা মানে দুটি অধ্যায়—একটি হচ্ছে শেখা, আরেকটি হচ্ছে পাওয়া। দুটির মধ্যে কোনটি কম পড়লে অপরটি আঘাত পায়। কিরকম? যেমন মায়ের আঁচল ধরে ধরে শিশুরা কথা বলতে শেখে, নিজেকে প্রকাশ করতে শেখে, ডাকে, মনের ভাব বলে। বাঙালীরা বাঙলায় কথা বলে, সমস্ত ভাব আদান-প্রদান করে। কিন্তু সেটা সাহিত্য নয়, সেটা কথ্য ভাষা। কিন্তু যখন সেটা 'শিক্ষা'র খপ্পরে পড়ে, তখন স্কুলে যেতে হয়। অ, আ, ক, খ শিখতে হয়। হ্যান্ড রাইটিং লিখতে হয়। ব্যাকরণ শিখতে হয়। সমস্ত কিছু নাড়িনক্ষত্র লিখতে হয়। কাজেই একদিকে শেখা স্কুলে মাস্টারের কাছে বসে, আরেকদিকে শেখা মায়ের আঁচল ধরে—আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের মতো। যারা শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়ে, তারা পূর্ণাঙ্গ সুযোগ-সুবিধা পায়। বাড়িতে মা-বাবার কাছে শান্তিনিকেতনের মাটির গান—আশ্রমের গান পায়। তেমনি কলকাতায় আছে 'গীতবিতান' কিংবা 'দক্ষিণী' কিংবা আমার ছাত্ররা একটা স্কুল করেছে—'সুরঙ্গমা'। তার চৌকাঠে ঢুকে রবীন্দ্রসঙ্গীত করে বেরিয়ে গেলেই ফুটপাতে সিনেমার গান কিংবা অন্য গান কানে ঝাঁকুনি মারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নামে যেটা হচ্ছে তা অপভ্রংশ। বিশেষ করে চিত্রতারকার কথা পেলে তো সে একটা ম্যাজিকই হয়ে যায়। লোকে অমুক পালার গান কিনতে চাইবে। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' বলে কিছু চিহ্নিত নেই। কাজেই এই যে ত্যানচ হয়ে যাওয়া, সেটা শান্তিনিকেতনে হয় না।

'শিক্ষা' মানে হচ্ছে পাওয়া এবং শেখা। কিন্তু কলকাতাতে একটা অধ্যায় হয়, আরেকটা বাড়ির জিনিস হয় না। আমি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছি, তালিমটা কী করে হবে? এবং-কে 'এ্যাবং' বলা গানের ক্ষেত্রে কী হবে? উচ্চারণ কী হবে? সাধারণ কথাবার্তায় অস্পষ্ট উচ্চারণ করলে কিছু এসে যায় না, কবিতায় এবং গানে সেটা একেবারে দাঁড়ায় না। অন্যত্র ভুল করলে হয়তো কিছু হয় না, কিন্তু শান্তিনিকেতনে হয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিরাজ করছেন। কলকাতাতে এখনো আমি গান শেখাই, স্কুলে যাই। শান্তিনিকেতনে তো জীবন কাটালাম, আমার হাত দিয়ে কতকগুলি ছেলেমেয়ে বেরুল; কিন্তু আমি বুঝি, ওদের কোন দায়িত্ব নেই। ওরা স্রোতে ভাসা ফুলের মতো হয়ে যায়।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সেন্সার বোর্ড আছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্বরলিপির রূপান্তর হচ্ছে। বিশ্বভারতীর ছাপ পেয়ে যে-রেকর্ড বেরুচ্ছে (বিশ্বভারতীর চিহ্নিত হয়ে), স্বরলিপির সঙ্গে তার সুর মিলছে না। একটার সঙ্গে একটা মিলছে না, বিরুদ্ধতা করছে। একদল লোক জোড়হাত করে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, ভক্তি করে। আমি যেমন করি। এসবের দরকার আছে। কিন্তু এসবে কি কিছু হচ্ছে? আমার তো মনে হয় না। কারণ আমি যেভাবে গান শেখাই, যেমনভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করি, সেইভাবে কিছু হচ্ছে না। রেকর্ডে তো আমার স্বরলিপি করা গান অন্যরকমভাবে বেরুচ্ছে—আমি বেঁচে থাকতেও আমার কোন হাত নেই। আমি তো অনেক সময় দুঃখ করে বলি যে, আমি ছাড়া আরো যেসমস্ত স্বরলিপিকারের নাম চিহ্নিত হয়েছে, সকলেই প্রয়াত হয়েছেন। আমি কেবল বেঁচে আছি ভোগ করবার জন্য! শাস্তি পাওয়ার জন্য! আমি এতে দুঃখ পাই, কষ্ট পাই। যেমন "ডেকো না আমারে ডেকো না" গানটি একজন রেকর্ড করেছেন। কে রেকর্ড করেছেন বলব না। দাদরা তালে দুটি মাত্রাই তিনি বাদ দিয়ে দিয়েছেন। আরেকজন "পেয়েছি আঁধার রাতে" রেকর্ড করেছেন। কে শিখিয়েছেন জানি না। একেবারে আমার করা স্বরলিপি থেকে অন্যরকম। কে আমাকে রক্ষা করেছেন? কে আমার দিকে তাকাচ্ছেন? সেই দিক দিয়ে এখনি কি কোন শাসন আছে? কিচ্ছু নেই। যার যা নিজের ধর্ম নিজের কাছে। কাজেই কপিরাইট থাকুক বা না থাকুক, কিছু আসে যায় না।

আমি ঠাট্টা করে বলি, অনেকে শান্তিনিকেতনকে আশ্রম বলে, মন্দির বলে, কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করে— সেগুলি সব ভক্তিরসাত্মক। না হয় রবিবাবু বা রবিঠাকুর বলো, কিন্তু 'গুরুদেব' বলে এই চণ্ডালপনা করো না। ওঁকে মেনো, ভক্তি করো, অনুসরণ করো। উনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। ১৯৪১ সালে দেহ রেখেছেন। তার একবছর আগে 'গীতালি' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেওয়া উদ্বোধনী ভাষণটা ছাপানো আছে 'সঙ্গীতচিন্তা'তে। তাতে উনি বলেছেনঃ আমার গান আমার মতো করে গেও। যেন চিনে বুঝতে পারি যে, কথা আমার, সুর আমার। এখন আমার মনে হয়, কথাটাই আমার, সুর অন্যের দেওয়া! মেয়েকে অপাত্রে দিয়ে মেয়ের পিতার যেমন অসহ্য যন্ত্রণা হয়, দুর্ভোগ হয়, আমার ঠিক সেরকম হয়। গান নিয়ে আজ দোকানদারি চলছে। অন্য সব গান মাটি করে দাও, কিন্তু দোহাই তোমাদের, আমার গানে যেন একটু দরদ থাকে, একটু মীড় থাকে, একটু কথার ঠিক থাকে। কী না বলেছেন হাত জোড় করে! সকলের পিছনে পিছনে ঘুরেছেন, বলেছেনঃ তোমার যদি মনঃপূত না হয়, তোমার যদি কষ্ট হয়, অনিচ্ছা হয়, তবে আমার গান পরিত্যাগ করে আমাকে ক্ষমা কর। গেও না। গাইলে আমার মতো করে গেও।

তাহলে ভাবুন অবস্থা, যাঁকে নিয়ে আমরা ১২৫তম জন্মোৎসব করছি, এত হৈ হল্লা করছি, তাঁকে হাতজোড়

করতে হয় কেন? আমাদের জাতীয় চরিত্রের স্খলন ঘটেছে। সেইজন্য কপিরাইটের পরের কথা আমি এক্ষুণি বলব। যারা সৎ তারা সৎ কর্ম করবে। যারা অসৎ তারা অসৎ কর্ম করবে। 'সদা সত্য কথা বলিবে' সেটা কে না জানে! কিন্তু আমরা জীবনভর সেটা অনুসরণ করছি কি? আমি নিজের কাছে নিজেই জবাবদিহি করি একসময়। এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" আমরা যেন সৎ হই, আমরা যেন শুদ্ধ, স্বচ্ছ হই। তাহলে সকল জিনিসকে অন্তরে গ্রহণ করব, নিষ্ঠার সঙ্গে করব। দেবতা আমার মধ্যে বিরাজ করবেন। মানুষের মধ্যেই দেবতা আছেন, সেই দেবতাকে আমরা গড়ে তুলব। এর চেয়ে বড় কথা আমার কাছে আর নেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে যেটা সবথেকে বড় আবেদন, তা হলো গানের ভাব। স্বরলিপিগত পরিকাঠামো মেনেও ভাবজগতে বিচরণের ক্ষেত্রে, শিল্পীর স্বাধীনতা পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন হচ্ছে লয়। গানের স্পীড। যেটা আজকাল খুব ধরা পড়ছে। সঙ্গীতজগতে আমরা লয়কে তিনরকমভাবে বলি—বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত। বিশ্বভারতী স্বরলিপি প্রকাশ করেছে। কিন্তু কোন্ গানটি কি লয়ে গাইতে হবে তার পথনির্দেশ স্বরলিপিতে নেই যে, এই গানটি এই রাগরাগিণী, এই তালের; লয়ের কথা নেই—মধ্য লয় না দ্রুত লয়। ভাব অনেকটা কিন্তু লয়ের ওপর নির্ভর করে। আমরা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের দরবারে যেসব গান স্পীডে গেয়েছি, যেরকমভাবে যেরকম ঢঙে গেয়েছি, সেইগুলির এখন কোন পথনির্দেশ নেই। তবে সেইগুলি যিনি গাইছেন তিনি কবিতার (বাণীর) যে মর্মকথা বা মর্ম তাকে যদি মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি সফল। যেমন একটি গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়, আবার কখনো একক কণ্ঠেও গাওয়া হয়। সমবেত কণ্ঠে গাওয়া গানগুলি একসঙ্গে চলমান হওয়ার জন্য একটু দ্রুত, একটু চঞ্চল গতির প্রয়োজন। যেমন সব্যসাচী (গুপ্ত) এখানে গাইলেন—"উদাসে" গানটা ("মম অন্তর উদাসে...")। "উদাসে" কথাটি আমি এইজন্যই বলছি, কারণ কতকগুলি কথা আছে যেগুলি ভাবঘন, ভাবপূর্ণ। যেমন করুণা, যেমন ব্যর্থ, যেমন উদাসী—কথাগুলি হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাদের ভাবরস আছে। যেমন এই গানটা—"কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা...।" কাজেই এই জিনিসগুলি যথাযথ জানা কিংবা অনুভব করা এবং ব্যবহার করা প্রয়োজন। সেগুলি যিনি গাইবেন তার পরিণতির দিকে তাঁকে যেতে হবে, ভাবতে হবে, তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে জানতে হবে, বুঝতে হবে।

বোম্বে ঠেকা একরকম—সেসব আসছে—খুব পপুলার হচ্ছে। সেটি কিন্তু রাবীন্দ্রিক নয়। যেমন আমি একটি লাইন গেয়ে শোনাচ্ছি। আমারই স্বরলিপি। "যে ছিল আমার স্বপনচারিণী"। এই 'স্বপনচারিণী' খুব মিষ্টি কথা। স্বপন। "স্বপনে হয়েছে ভোর।... চারিণী।" এই 'স্বপনচারিণী' কথাটির ভাবে নিমজ্জিত হওয়া চাই, যা কিনা প্রকট নয়। মানে ধরা-ছোঁওয়া দেয় না। যেন একটা ইশারা! "আমার স্বপনচারিণী তারে বুঝিতে পারিনি। দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে।" গান কারো একার নয়। গান হচ্ছে মিলিতভাবে। "গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।" তাই গানের ভবিষ্যৎ, গানের চেহারা সমস্ত কিন্তু গায়কের দায়িত্বের অপেক্ষা রাখে না, শ্রোতাদেরও গায়কের কাছে দাবি করতে হয়, তাকে প্রশংসা করতে হয়, তাকে স্বীকার করতে হয়। গায়ক অর্ধেকটা গাইছে, অর্ধেকটা শ্রোতার কাছ থেকে সমর্থন পাচ্ছে। তারা যদি বিপথে টানে তাহলে তার সম্পূর্ণ দোষ হয় না। একজন এই গানই গাইছেন অনাবশ্যক গলা কাঁপিয়ে, আবার কর্ড দিয়ে, হারমোনিয়াম দিয়ে! গাইতে গিয়ে যেন থাপ্পড় দিয়ে বলছেন—"হট যাও, হট যাও হিঁয়াসে।" বক্স অফিস বাদ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর ভাবা যায় না।

কাজেই আমি এই কথা আরো জোর দিয়ে বলব, শ্রোতাদের দায়িত্ব এখানে অনেক বেশি। তাঁরা যদি গায়কের কাছ থেকে দাবি করেন খাঁটি, ভাল জিনিস, শুদ্ধ জিনিস, তাহলে গায়ক স্বাভাবিকভাবেই তা দেবেন। দায়িত্ব শুধু গায়কের নয়, শ্রোতাদেরও। তাঁরা টিকিট কাটবেন, রেকর্ড কিনবেন, লাখ লাখ টাকা গায়কের পকেটে গুঁজে দেবেন, অথচ গানের শুদ্ধতা দেখবেন না! আত্মঘাতী ব্যাপার তো শ্রোতাদের কাছেই অনেকখানি রয়ে গেছে। তাঁরা যদি ভাল জিনিসকে কলা দেখায় বা ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যায়, তাহলে গান গেয়ে কিছু লাভ আছে? কাজেই আমি এই প্রসঙ্গে এই কথাটাই হাতজোড় করে বলি, উঠুক না কপিরাইট, উঠুক না। তাতে কী হয়েছে! আমরা তো চোর-চোট্টা হইনি। আমরা সৎ হব, ভাল কাজ করব, সৎ কাজ করব। কোন অনুশাসন, পুলিস দারোগার দরকার হবে না, ডুব দিয়ে জল খেতে হবে না। আমার হচ্ছে সোজা কথা—শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : সৎ হও। সৎ কাজ কর। আমার শেষ নিবেদন আপনাদের কাছে, যাঁরা ছেলেমেয়েদের কাছে গান করেন তাঁরা সৎ জিনিসটা খুঁজে বের করুন। যার purpose ভাল, সে পথ পাবেই। আর যে অজুহাত খোঁজে, সে তো পথ পাবেই না। কাজেই কিসের কপিরাইট! কিছু দরকার নেই। গুরুদেবের গান আমরা তাঁর ইচ্ছেমত করব, তাতে নিজেকেই নিজের মতো করে পাব। ধন্য হব।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না।"

আমি জানি না কিছু। সব ঠাকুরের [শ্রীরামকৃষ্ণের] ইচ্ছা। আমি তাঁর কথা মনে করে গান আরম্ভ করি।

"সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।" ❑

[সমাপ্ত]

সময়

মন্দিরা মহাপাত্র

কেউ বলে, তুমি নেই।
আমি দেবতা মানি না, নাস্তিক—কেউ বলে।
আমি বলি ঃ বন্ধু, চেয়ে দেখ দিনরাত,
লতা-পাতা, ফুল-গাছ।
দিন আসে, দিন যায়
চেয়ে দেখ ঋতু বদলায়।
সময় পিছলে যায়,
রাত দিন, ঋতু
ফিরে ফিরে আসে
কিন্তু একই রাত, একই দিন, একই ঋতু কী?

মেনো না, ভগবান মানতে বলছি না--
তুমি রাত্রির রূপ জান?
দিনের রূপ জান?
যদি বলি সময় নেই।
তুমি বলবে ঃ সময় আছে,
ঘড়ি ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে।
আমি বলব ঃ এরই মাঝে তিনি আছেন,
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত ঋতুর মতো,
জন্ম-মৃত্যুর অনুভবের মতো।

তোমায় খুঁজি

কৃষ্ণা সেন

আমি এই খেদে খেদ করি,
যদি তুমি দুঃখহরণ
দুঃখে কেন মরি?
তোমার লীলা খেলার তরে
হাসাও কাঁদাও জীবন ভরে,
খেলা বলে বুঝতে নারি
তাই কি আমি কেঁদে মরি!
সুখ পেতে চাই,
সুখ নাহি পাই,
দুঃখে তোমায় স্মরি।
খেলা ভোলার দিন যে আমার,
আসবে কবে, ঠিক নাহি তার
বিস্মরণের ভেলায় চড়ে,
উজান বেয়ে কোন্ ওপারে,
যাব সে কোন্ পথের শেষে
তোমার নামে নিরুদ্দেশে,
দয়াল তোমার নামটি নিয়ে
সকল দুখে পাশ কাটিয়ে
যাব সে কোন্ প্রাণের টানে
কোন্ সে দেশে কে বা জানে?
আছ তুমি, এই ভরসায়,
জীবন কাটে কোন্ সে নেশায়।
যখন সুখের মুখটি দেখি
তোমায় তখন ভুলে থাকি
দুঃখ দিয়ে বারে বারে
লও যে তুমি আপন করে
তাই যদি হয় তোমার টানে
দুখকে নেব এই জীবনে।

একটি অন্তঃস্থিত সত্তার প্রতি

শেখ আবদুল মান্নান

চেতনার গভীরে রস গন্ধের অনুভূতি
সৌন্দর্যে মুগ্ধ রূপান্তর
যাতায়াত করে প্যারিস থেকে লেনিনগ্রাদ
পুবে সমীকরণ ফেলে পশ্চিমের দ্যুতি
ছুঁয়ে ফেলে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় কম্পনটুকু
স্বপ্ন ও জাগরণ থেকে দেখা যায়
মৌলিক বর্ণমালা...
সময়ের প্রবল প্রতাপের মুখে দাঁড়িয়ে
চরম সিদ্ধির কড়া নাড়ে ডম্বরু সাহস
জীবনের খণ্ডে খণ্ডে অমোঘ আবেদন
পিঠে আলো ফেলে তুলে আনে পরিচয়
কুয়াশা কিংবা শিশিরভেজা মাঠে নগ্ন চাঁদ
অনুভূতি এঁকে গেছে সৃজনী সত্তায়...।

কবিতার কল্পতরু

গৌতম দাশগুপ্ত

কালো মেঘের বুকে হংসবলাকা দেখে
ঘোরের মধ্যে চলে যান একজন মানুষ—
আমার কবিতা লেখার প্রথম ধারাপাত
তাঁর মননের প্রভায়।
উদ্বেল অগ্নিগর্ভ সত্তরের দশকে
ধোঁয়া আর রাইফেলের মাঝখানে
যে-মুহূর্তে অবসন্ন হয়েছি,
কালো মেঘের বুকে হংসবলাকার
অসীম রূপকল্প
আর এক অসামান্য ধ্যানমগ্ন মানুষের পাশে
বিশাল খেতের প্রেক্ষাপট
আমাকে অনাবিল শান্তির সঙ্গে দিয়েছে
আত্মিক সংযম আর বাঁচবার সঞ্জীবনী।
আজও এই জটিল প্রবাসে
তিনিই আমার কবিতার
প্রেম-প্রেরণা-কল্পতরু।

মায়ের হাসি

জীবনকৃষ্ণ দাস

এখন এখানে পৌষের হিমগন্ধ সন্ধ্যা নামে,
অরণ্য আয়েশে দেয় ঘুম।
ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু মানুষ ক্লান্তি শেষে ঘরে ফেরে
খড়ো নীড়ে পাখিরা নিঝুম।
একদিন এইখানে আলো জ্বলেছিল
হরপ্পার সভ্যতার ভগ্নস্তূপ খুঁজে—
হয়তো বা আজো পাওয়া যাবে কিছু নিদর্শন।
মানুষের ব্যর্থতায় যাহা গেছে বুজে।
এখানে শ্মশান শান্তি! মানুষের হৃদয়ের উত্তাপ—
ক্রমশ নিভিয়া গেছে করি অনুভব!
জীবনের চারিদিকে নীরবে ছড়ায়ে আছে যেন—
মিশরের পিরামিডে অগণিত শব।
মৃত নক্ষত্রের মতো বাতাসে সাঁতার কেটে—
নেমে আসে অতলান্ত রাত।
অন্ধকার কুয়াশায় কোন এক স্বর্গীয় নারী—
আমার বেদনায় রাখে হিম হাত!
শ্যামল স্নিগ্ধ হাতে আমার মাথায় ঝরায়
অফুরান স্নেহ রাশি রাশি।
চন্দ্রমল্লিকার গায়ে চাঁদের আলোর মতো,
স্নেহসিক্ত মা সারদার হাসি।

শিলাতটে বসে আছ আজও

সুজাতা সেন

নীলাম্বু লহরী যেথা শুভ্র ফেনিল
উল্লসিছে নৃত্যে ছন্দে আনন্দে বিহ্বল
পশ্চাতে দিগন্তব্যাপী রাজে জলধি সুনীল
তোমারে প্রহরীসম ঘিরি অচঞ্চল।।

অদূরে কন্যাকুমারী দেবী; জন্মভূমি! পবিত্র
বিধৌত পাদপদ্ম, অতৃপ্ত ঊর্মির জল
মুহুর্মুহু করিছে সেবন। অপলক ত্রিনেত্র
কুমারীর, তোমা পানে, স্মিতহাস বদনকমল।।

প্রস্ফুটিত পদ্মসম নয়নযুগল তব নিমীলিত
ধ্যানমগ্ন, গম্ভীর, মৌন, কাতর ব্যথায়
একা বসে আছ, ভারতের শেষ প্রান্তে—
যেথা [illegible] নিস্তব্ধ শিলায়।।

ধ্যানমগ্ন গৈরিক বসনধারী হে মহাজীবন!
কার লাগি গৃহত্যাগী, সিক্ত বসন, উপবাসী?
বোধিসত্ত্ব কি তুমি? অনশনক্লিষ্ট দেহ!
তোমা মাঝে হয়েছে বিলীন।।

শিলাতটে [illegible] ঊর্মিমালা শত-শত
[illegible]যোগিনীর ফণাসম করিছে আঘাত,
নীলকণ্ঠ তুমি! যোগেশ্বর [illegible] সমাহিত
[illegible] অগ্নিশিখা নিষ্কম্প নিবাত।।

কালের প্রবাহ গতি বয়ে যায় ধীরে,
অতন্দ্র প্রহরায় নীলাম্বু রয়েছে তোমারে ঘিরে,
ফেনিল [illegible] উচ্ছ্বাসে তেমনই ছুটিয়া ফেরে,
আজো আছ বসে শিলাতটে তুমি আমাদের তরে।।

জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথ

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

লালগিরিজী আমাকে শ্রীবিশ্বনাথের মন্দির দর্শন শেষ করিয়ে পশ্চিম দ্বার দিয়ে বাইরে এনে প্রথমেই দেখালেন সামনে ছোট্ট নাটমন্দিরের ঠিক মাঝখানে রুপোর গৌরীপট্ট সমেত মধুবর্ণের শিবলিঙ্গ। বললেন, ইনি বৈকুণ্ঠেশ্বর, আর তাঁরই নিচে রয়েছে আঙুলের মতো ক্ষুদ্র একটি অতি প্রাচীন লিঙ্গ। এইটিই আসল বৈকুণ্ঠেশ্বর লিঙ্গ। বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীর দিন এখানে দারুণ ভিড় হয়। বিশেষত মেয়েরা উপবাস করে এখানে দীপ জ্বেলে দিয়ে পূজা করেন। বৈকুণ্ঠেশ্বরের পশ্চিমে ছোট্ট একটি মন্দিরে দুটি বড় শিবলিঙ্গ আছেন—দণ্ডপাণীশ্বর এবং মহাকালেশ্বর। খুব প্রাচীন। ঘরটি অন্ধকার। পশ্চিমের দেওয়ালে রয়েছেন মহাবীর এবং উত্তর-পশ্চিম কোণের ছোট্ট মন্দিরে অষ্টধাতুর পার্বতী, কেউ কেউ বলেন এটি অহল্যাবাঈ-এর মূর্তি, যিনি এই মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই মন্দিরের ঢোকবার পথে মাটির গহ্বরে পাথরের জালি ঢাকা দেওয়া দুটি শিবলিঙ্গ আছেন—কপিলেশ্বর ও নিকুম্ভেশ্বর। যারা জানে না, তারা ঐ জালের ওপর পা দিয়েই চলে যায়। বেশ বোঝাও যায় অন্ধকার গর্তে দুটি শিবলিঙ্গ।

তারপরেই ঢাকা বারান্দা। বিশ্বনাথের ঈশান কোণে দেওয়ালের গায়ে দণ্ডায়মানা এক দেবীর মূর্তি। এঁর নাম 'ভোগ অন্নপূর্ণা'। আগে ইনি জ্ঞানবাপীর কাছে আলাদা মন্দিরে ছিলেন। এখন বিশ্বনাথের ভোগের সময় এঁরও ভোগ হয়। সারা শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। এঁর এক হাতে হাতা, অন্য হাতে অন্নপাত্র। ঠিক অন্নপূর্ণার মূর্তি। এঁকে 'শৃঙ্গার গৌরী'ও বলে। এই মন্দিরেও ঢোকবার পথে বাঁদিকে মাটির তলায় গর্তে আছেন কুবেরেশ্বর। আরেক দেওয়ালে আছেন আনন্দভৈরব। এঁরাও খুব প্রাচীন বিগ্রহ। এবারে দক্ষিণ মুখে বেরিয়ে পূর্বদ্বারকে ডান হাতে রেখে সামনে গেলেই বিশ্বনাথের মন্দিরের অগ্নিকোণে কাশীর সবচেয়ে প্রাচীন শিবলিঙ্গ অবিমুক্তেশ্বর মহাদেব। এই লিঙ্গ স্বয়ং বিশ্বনাথের নিজের প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে আছে—"অবিমুক্তেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যাং তিষ্ঠতি নিত্যশঃ।/ মুক্তিদাতা চ লোকানাং মহাপাতকীনামপি।"—এখানে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ মহাদেবরূপে নিত্যবিরাজিত। তিনি মহাপাতকীকেও মুক্তিদান করেন। 'স্কন্দপুরাণ'-এ আছে, স্বয়ং বিশ্বনাথকেও একবার ব্রহ্মার অনুরোধে বিশেষ প্রয়োজনে কাশী ছেড়ে মন্দার পর্বতে যেতে হয়। কিন্তু বিশ্বনাথ ছাড়া কাশীর অস্তিত্ব অসম্ভব। সেজন্য তিনি স্বয়ং অতি গোপনে নিজের প্রতিনিধি এই অবিমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গকে এখানে প্রতিষ্ঠা করে বাইরে যান। তাই ইনি অবিমুক্তেশ্বর। শিব স্বয়ং কাশীতে ফিরে এসে পরে বলেছেন ঃ "বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষেহহং ন কদাচন।। মহৎক্ষেত্রমিদং তস্মাৎ অবিমুক্তেতি স্মৃতম্।।"—আমি কখনো এই স্থান ছেড়ে থাকতে পারি না। এটি আমার মুক্তিদানের ক্ষেত্র। সেইজন্য এই পবিত্র ক্ষেত্রকে 'অবিমুক্ত' ক্ষেত্র বলা হয়। বিশ্বনাথ দর্শনের পরে মধুবর্ণের এই লিঙ্গ অবশ্যই দর্শনীয় ও পূজ্য। অবিমুক্তেশ্বর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমের ছোট্ট ঢাকা বারান্দায় দেওয়ালের গায়ে শ্বেতপাথরের বেঞ্চি। এটি বর্তমানে বিশ্বনাথের মুক্তি-মণ্ডপ। বিশ্বনাথ দর্শন করে সেখানে বসে একটু ঈশ্বরচিন্তা করার কথা প্রাচীন সাধুদের মুখে শুনেছি। এখনো প্রায় প্রত্যেক যাত্রী ঐ সঙ্কীর্ণ বেঞ্চিতে বসে জপ-ধ্যান করে। তারই সামনে বিশ্বনাথের বাহন নন্দীর (বৃষ) ছোট্ট মূর্তি—উত্তরমুখী হয়ে বিশ্বনাথের দরজার দিকে মুখ করে বসে আছেন। এখন আমরা যেখানে বসে আছি সেই মুক্তিমণ্ডপটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বনাথ-মন্দিরের—যা আওরঙজেবের আমলে আধখানা ভেঙে মসজিদ করা হয়েছিল। ডানদিকে সামনে সেই বিশ্বনাথের মুক্তিমণ্ডপ। আর ডানদিকে বিশাল লাল সিঁদুর মাখানো নন্দী। ওটি নেপালের মহারাজা দ্বিতীয় বিশ্বনাথের আমলে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। আজো সেই বৃষ উত্তরমুখী হয়ে প্রাচীন অর্ধভগ্ন মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রবাদ আছে, সেই ভীষণ অত্যাচারের সময় এই নন্দী নাকি হুঙ্কার দিয়েছিলেন, যার জন্য বিধর্মীরা ভয়ে পুরো মন্দিরটা ভাঙতে পারেনি। আর এই মুক্তিমণ্ডপ সেসময় গোয়ালিয়রের রানী বৈজাবাঈ তৈরি

করে দিয়েছিলেন ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে।

মুক্তিমণ্ডপ থেকে নেমে পশ্চিমদিকে আরেকটি ছোট মন্দিরে আছেন অবিমুক্ত বিনায়ক। গৌরী বা লক্ষ্মী-বিষ্ণুর সুন্দর বিগ্রহ। এখানে বিশ্বনাথের আরতির সময় সাজানোর কিছু রুপোর সাপ-মুখোশ রাখা থাকে। এই মন্দিরের বাঁদিকে একটু নিচে পিতলের জাল দিয়ে ঘেরা আরেকটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁর নাম শনৈশ্চরেশ্বর। শনিবার এখানে দীপ দিয়ে পূজাদির জন্য খুব ভিড় হয়। আমরা বিশ্বনাথের মন্দির থেকে এখানে এই পুরনো মুক্তিমণ্ডপে এসেছি মন্দিরের পশ্চিমদ্বার দিয়ে বেরিয়ে, আসবার পথে ডানদিকে একটি চাতালে অনেক ছোট-বড় শিবলিঙ্গ দেখলাম। এই জায়গাটিকে বলে 'শিবের কাছারি'। তারপরে গলি থেকে বেরিয়ে পথে পড়েছিল বহু প্রাচীন বটগাছ, যার নাম 'অক্ষয়বট'। এখানে অনেকে মানত করেন। এর নিচে পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির ও আরো কিছু শিবলিঙ্গ আছেন। এখান-কার সাধুরা বলেন ঃ "কাশীকা হর কঙ্কর হ্যায় ভোলা শঙ্কর।" অর্থাৎ কাশীর প্রতিটি ধূলিকণাই শিব-সমান পবিত্র। আর এখানে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শিবলিঙ্গ —নানান নামে, নানান আকারে। অক্ষয়বটের পরেই কাশীর আরেকটি প্রাচীন বিখ্যাত তীর্থ 'জ্ঞানবাপী'। তীর্থযাত্রীরা বিশ্বনাথ-দর্শনের পরে এখানে আসেন। প্রবাদ আছে, এই জ্ঞানবাপী কুয়োটি স্বয়ং বিশ্বনাথের ত্রিশূলের আঘাতে খনিত হয়েছিল। বহু প্রাচীনকালে কাশীতে যখন গঙ্গার আবির্ভাব হয়নি, তখন জলের প্রয়োজনে বিশ্বনাথ ত্রিশূল দিয়ে এই জায়গায় আঘাত করে এই কূপটি তৈরি করেন। এর জল অতি পবিত্র বলে মনে করা হয়। একটি দুঃখের ঘটনাও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বনাথের মন্দির যখন বিধর্মীরা ধ্বংস করছে তখন মন্দিরের পাণ্ডারা বিশ্বনাথকে তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্য তুলে এনে এই জ্ঞানবাপীর মধ্যে লুকিয়ে রাখে। পরে আর তোলা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এই কুয়োর জল অত্যন্ত পবিত্র ও জ্ঞানদানকারী বলে বিশ্বাস।

'স্কন্দপুরাণ'-এ আছে, স্বয়ং পার্বতীপুত্র কার্তিক দক্ষিণ ভারতে অগস্ত্যমুনিকে এই শিবতীর্থ কাশীর উৎপত্তির কথা বলেছেন। বলেছেন জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাবের কথাও। সে

বেশ মজার কাহিনী। কোন এক প্রলয়কালে বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন তখন তাঁর নাভিকমল থেকে সৃষ্টি হলো প্রজাপতি ব্রহ্মার। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে দেখে হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ "বৎস পিতামহ, সুখে আগমন করেছ তো?" কথাটা শোনামাত্র ব্রহ্মার রজোগুণ উদ্দীপ্ত হলো। তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বিষ্ণুকে বললেন ঃ "গুরু যেভাবে শিষ্যকে সম্বোধন করে, তুমি মোহবশত আমাকে সেভাবে 'বৎস' কেন বললে? আমিই জগতের কর্তা, প্রকৃতির প্রবর্তক, ধাতা। তাই তুমি আগে উত্তর দাও, কেন ঐকথা বললে?" বিষ্ণু তখন মুচকি হেসে বললেন ঃ "জেনে রেখ, আমিই জগতের কর্তা। আমার অব্যয় অঙ্গ থেকেই তোমার সৃষ্টি, তারপরে তুমি বিশ্বভরণ করছ। তবে তুমি যে আমাকে এই কথা বললে এতে দোষ নেই। কারণ, আমারই মায়াবশে তুমি সমস্ত ভুলেছ। আমিই তোমাকে ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছি।" এই কথা শুনে ব্রহ্মা দারুণ রেগে গিয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। সেইসময় এই দুই আদি দেবতার বিবাদ বন্ধ করবার জন্য ও তাঁদের জ্ঞান ফিরিয়ে দিতে দুজনের মধ্যে এক অদ্ভুত জ্যোতির্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হলেন 'বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি/ জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নং আবয়োঃ মধ্য অদ্ভুতম্।"। তিনি কেমন?—"জ্বালমালা সহস্রাঢ্যং কালানল চয়োপমম্।/ ক্ষয়বৃদ্ধি বিনির্মুক্তং আদিমধ্যান্তবর্জিতম্।।" তিনি সহস্রশিখা-সমুজ্জ্বল, প্রলয়কালগত অনলতুল্য তাঁর আভা, তিনি অদৃষ্টপূর্ব ও ক্ষয়বৃদ্ধিহীন, তাঁর আদি মধ্য ও অন্ত নির্দেশ করা যাচ্ছে না—এত বিশাল। "অনৌপম্যম্ অনির্দিষ্টম্ অব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্।"—বিশ্ববীজ, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত সেই ভাস্বর বিরাট লিঙ্গ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল পরিব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন। এই অদ্ভুত আকৃতির জ্যোতির্বিগ্রহকে দেখে ব্রহ্মা বিষ্ণু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ইনি আবার কোথা থেকে এলেন, কে ইনি? তখন যুদ্ধ বন্ধ করে তাঁরা ঠিক করলেন, ইনি কে জানতে হবে। ব্রহ্মা একটি হংসের মূর্তি ধরে এর ঊর্ধ্বদিকে খুঁজতে চললেন, আর বিষ্ণু বরাহ-মূর্তি ধরে পাতাল ভেদ করে এর শেষ কোথায় খুঁজতে নামলেন। কিন্তু আশ্চর্য! দুজনের কেউই এঁর আদি-অন্ত খুঁজে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে এঁকে প্রণিপাত করে
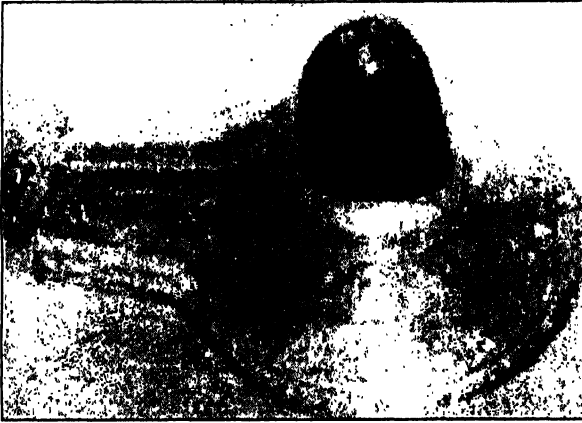
স্নানের আগে বিশ্বনাথ

স্তব করতে লাগলেন। তখন সেই লিঙ্গের ভিতর থেকে তাঁরা ওঁকারধ্বনি শুনতে পেলেন, আর লিঙ্গের দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যভাগে 'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কার জ্যোতির অক্ষরে দেখতে পেলেন। এই বর্ণত্রয়ই 'ওঙ্কার'—আদিবর্ণ সৃষ্টি হলো, আর তার মধ্যে আবির্ভূত হলেন—"পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং কর্পূরগৌরকংমুনেঃ।/ নানাকান্তিসমাযুক্তং নানা-ভরণসংযুতং। মহোদারং মহাবীর্যং মহাপুরুষো লক্ষণম্।"—পঞ্চবদন, দশহস্ত, কর্পূরের মতো শ্বেতবর্ণ, অপূর্ব জ্যোতির্ময়, নানা অলঙ্কারে বিভূষিত বিরাট মহাশক্তিধর দিব্য পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট এক দিব্যমূর্তি সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গের ওপর অবস্থান করতে লাগলেন। দেবতা-দুজন এই অভূতপূর্ব লিঙ্গ-মূর্তিকে বৈদিক মন্ত্রে স্তুতি করলেন—"শিবায় শিবরূপায় ব্যাপিনে ব্যোমরূপিণে/ নমো নিধীনাম-পতয়ে লিঙ্গিনে লিঙ্গ-রূপিণে।।"

এইভাবে প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বজগতে প্রকাশিত হয়ে আদি দেবতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দ্বারা পূজিত হলেন। শাস্ত্র বলছেন ঃ "লিঙ্গ বেদী মহাবেদী লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ।" আর সমস্ত জগৎ তাঁতেই লয় পায়। তাই তিনি লিঙ্গ—"লীনং গময়তি তত্র ইতি লিঙ্গঃ"। শিব বিষ্ণুকে তখন বললেন ঃ "পূজিতো লিঙ্গরূপেঽস্মিন প্রসন্নো বিবিধং ফলং/ দাস্যামি সর্বলোকেভ্যো মনোঽভীষ্টান্যনেকশঃ/ যদাদুঃখ ভবেৎ তত্র পূজিতে সর্বদুঃখনাশনম্।"—আমাকে লিঙ্গরূপে পূজা করলে সর্বলোকবাসীদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমি তাদের নানা ফল দান করি ও তাদের দুঃখ-বিপদে আমিই রক্ষা করি। এইভাবে মর্ত্যে লিঙ্গপূজার প্রচলন হলো। শিব আরো বললেন ঃ 'ইদং লিঙ্গং সদা পূজ্যং ভবদ্ভ্যাং সুখহেতবে।"—তোমাদের সুখের জন্য এই লিঙ্গ সর্বদা পূজা করবে।

বিশ্বনাথ-মন্দির, বারাণসী

এই জ্যোতির্লিঙ্গ উৎপত্তি সম্পর্কে 'পদ্মপুরাণ'-এ আরেকটি কাহিনী আছে, সেটিও সংক্ষেপে বলি: কোন এক সময়ে হিমালয়ে শিব ও পার্বতী যখন একান্তে বিশ্রামরত, তখন একদল ঋষি তাঁদের দর্শনে সেখানে গেলে দ্বারী নন্দী বাধা দিয়ে বলেন, তাঁরা বিশ্রাম করছেন, এখন দর্শন হবে না। মায়ামোহে বিভ্রান্ত ঋষিরা শিবকেই শাপ দিয়ে বসলেন ঃ "তোমার লিঙ্গ স্খলিত হোক।" শিবও ভক্তের মান রাখবার জন্য ও জগতে লিঙ্গপূজার প্রবর্তনের জন্য নিজের লিঙ্গ ত্যাগ করলে সেই দিব্য লিঙ্গ অপূর্ব তেজে জ্বলতে জ্বলতে ত্রিভুবনকে দগ্ধ করার মতো জ্যোতি নিয়ে নিচে পড়তে লাগল। দেবতারা ও ঋষিরা ভয় পেয়ে ভাবলেন, এখন কি উপায়! তাঁরা সকলে মিলে পরামর্শ করলেন: এই মহাবীর্যশালী জ্যোতির্ময় লিঙ্গকে ধারণ করা আর কারো সাধ্য নয়, একমাত্র মা ভগবতী আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রীই এই লিঙ্গধারণে সমর্থা। তাঁরা তখন দেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে অনেক প্রার্থনা করে জানালেন ঃ "মা, তুমি পীঠ হও, যেখানে এই জ্যোতির্লিঙ্গ স্থির হবেন, শান্ত হবেন।"—"যোনিরূপং ভবেৎ চেৎ বৈ তত্র তৎ স্থিরতাং ভবেৎ।/ তং প্রসন্নাং তাং দৃষ্ট্বা তদেব কুরুতে পুনঃ।।" তাঁদের পূজা-প্রার্থনায় প্রসন্না হয়ে ত্রিকোণাকৃতি পীঠরূপে মা অধিষ্ঠিতা হলেন, আর সেই লিঙ্গ ধীরে ধীরে সেই পীঠে অনুপ্রবিষ্ট হলো। এটিই হলো শিবের গৌরীপট্ট বা যোনিপীঠ। শাস্ত্র আরো বলেছেন ঃ "আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।"—আকাশই হচ্ছে লিঙ্গ আর পৃথিবী তার পীঠ বা আধার। এইভাবে আদি জ্যোতির্লিঙ্গ সৃষ্টি হলো। আচার্য শঙ্কর ভারতবর্ষে বারটি স্থানের বারটি স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বিশেষ মাহাত্ম্যের মর্যাদা দিয়ে তাঁদের 'দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ' আখ্যা দিয়েছেন। তার মধ্যে কাশীর বিশ্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম।
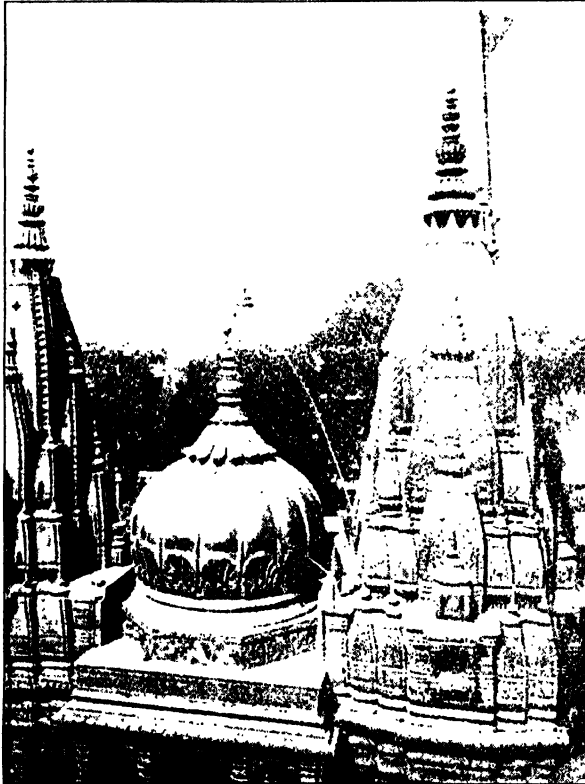
এখানে বিশ্বেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পুরাণের যুগে

আয়ুবংশীয় সুহোত্র-পুত্র কাশ রাজ্যলাভ করেন। তাঁর নাম থেকে 'কাশী' নাম হয়। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে—"কাশ্যতে প্রকাশ্যতে ইতি কাশী।" অর্থাৎ শুদ্ধ ভাব প্রকাশকারী বা উজ্জ্বল স্থান এই কাশী। আর বরুণা ও অসি—এই দুটি ছোট নদীর সঙ্গমস্থল বলে একে 'বারাণসী' বলে। আবার কারো মতে 'বনার' বলে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন, তাঁর নামানুসারে এই নাম হয়েছে। 'কাশী' নামটি বহু পুরাণে আছে। 'বারাণসী' সে-তুলনায় আধুনিকতর। কাশী পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরী। রোম প্রাচীন নগরী, তবে তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাশী কখনো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি। প্রাচীনের ওপর নতুন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। বলা হয়, কাশী শিবের ত্রিশূলের ওপর অধিষ্ঠিত। কেদারঘাট অর্থাৎ কাশীর দক্ষিণ দিক থেকে হাঁটা আরম্ভ করলে বোঝা যায়, সেটি কত উঁচু। তারপর দেবনাথপুরা, বাঙালীটোলা হয়ে রাস্তা ঢালু হয়েছে।

সরিয়ে দিয়ে কাশীতে রাজত্ব করেন। সেই সময় বিশ্বনাথও কাশী ছেড়ে যান। অবিমুক্তেশ্বর তখনি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে ঢুণ্ডিরাজের কৌশলে ও আদি কেশবের পরামর্শে দিবোদাসের রাজ্যে অধর্ম প্রবেশ করলে তিনি রাজ্য হারান আর বিশ্বনাথ, মা ভবাণী ও অন্য দেবতারা আবার কাশীতে ফিরে আসেন। সেই সময় দেবতারা নিজেদের নামে এখানে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। আজও তাঁরা আছেন, যেমন ব্রহ্মেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর, কুবেরেশ্বর, শনৈশ্চরেশ্বর ইত্যাদি।

পুরাণ-কাহিনীর পর এবার একটু ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

ঐতিহাসিক যুগে যখন ফা হিয়েন ভারতে আসেন তখন তিনিও কাশীর মহিমা ও ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হন। তিনি সেসময় ১০০ হাত উঁচু তামার তৈরি বিশ্বনাথ-লিঙ্গ দেখেছিলেন। তিনি তা লিখেও গিয়েছেন। সেই আদি
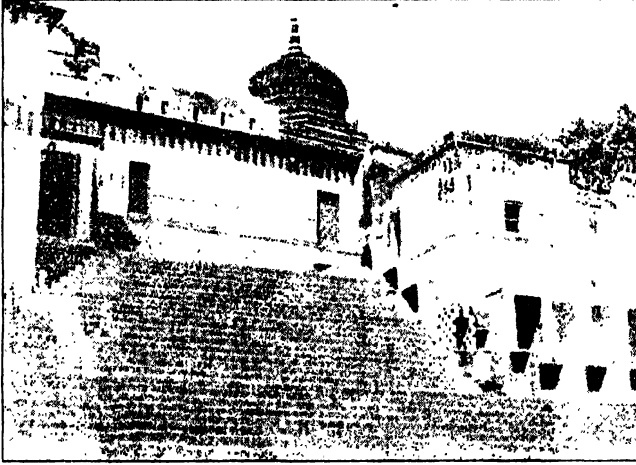
কেদারঘাট, বারাণসী

আবার গোধুলিয়ার কাছ থেকে বাঁশফটকে বিশ্বনাথের গলির কাছে গিয়ে রাস্তা উঁচু হয়ে গিয়েছে। রাস্তা আবার নিচে নেমে উঁচু দিকে উঠেছে কালভৈরবের মন্দিরের দিকে গিয়ে। এটা খুব ভাল করে বোঝা যায় রিক্সা চেপে গেলে। ত্রিশূলের তিনটি ফলার একটি দক্ষিণে কেদারঘাটের কাছে, মধ্যেরটি বিশ্বনাথ-মন্দিরের কাছে আর তৃতীয়টি কালভৈরবের মন্দিরের কাছে। তাই স্কন্দপুরাণে বলা হচ্ছে—"কামারি শূলাগ্রধৃতাং লয়েঽপি।" প্রলয়কালেও কাশীর ধ্বংস হয় না, কারণ, এটি শিবের ত্রিশূলের ওপর ধৃত। শিব-প্রতিষ্ঠিত সেই অনাদিলিঙ্গ কত প্রাচীন তা জানা যায় না। তবে পুরাণ-মতে একবার কাশীতে খুব দুর্যোগ দেখা দিলে ব্রহ্মার আদেশে দিবোদাস নামে এক ধার্মিক রাজা সব দেবতাদের কাশী থেকে

বিশ্বনাথের মন্দির ছিল বর্তমান বাঁশফটকের উলটোদিকে, এখন যেখানে আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি দেখা যায়। ১০১৭-১০১৮ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ গজনী প্রথম কাশী আক্রমণ করে প্রাচীন মন্দির এবং বিগ্রহ ধ্বংস ও লুঠ করে। ঐ যুদ্ধে যেসব সৈন্য মারা যায় তাদের কবরের ধ্বংসাবশেষ মালব্য ব্রিজের উত্তরদিকে এখনো দেখা যায়। এরপরে কনৌজের রাজারা রাজত্ব করেন দ্বাদশ শতাব্দীতে। এর কিছু আগে বা পরে মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন কাশী আক্রমণ করে ১০০ উটের পিঠে করে লুঠের মাল নিয়ে যায়। আর বিশ্বনাথ-মন্দিরের পাথর দিয়ে কাছেই তৈরি হয় রিজিয়া মসজিদ। এরপরে আসে সেকেন্দার লোদী। সেও মন্দির ধ্বংস ও লুঠপাট করে। তার পরে আকবরের আমলে কিছুটা শান্তি

ফিরে আসে। কিছু মন্দির পুনর্নির্মিত হয়। তাঁর রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল্লের সহায়তায় ও কারো মতে নারায়ণ ভট্টের চেষ্টায় চুনাপাথরের তৈরি বিশ্বনাথের বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটি দ্বিতীয় মন্দির। আদি মন্দিরের উলটোদিকের রাস্তা থেকে একটু নিচে নেমে যেতে হয়। প্রাচীরে ঘেরা এই মন্দিরের পাথরের অলঙ্করণ ছিল অনবদ্য। কিন্তু আওরঙ্গজেবের কুদৃষ্টিতে পড়ে এই অপূর্ব মন্দিরটিও ধ্বংস হয় ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে, কেউ বলেন ১৬৬২-তে। তখনই বিশ্বনাথকে জ্ঞানবাপীর মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়—যে-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের অর্ধাংশ আজো সেই অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাকি অর্ধাংশে মসজিদ গড়ে উঠেছে। এরপরে দ্বিতীয় মন্দিরের দক্ষিণে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয় রানী অহল্যাবাঈয়ের অর্থানুকূল্যে। শোনা যায়, ঐ মন্দির ধ্বংস হওয়ার পরে এক মারাঠী ব্রাহ্মণ পাণ্ডাদের সহায়তায় অতি সঙ্গোপনে একটি ছোট্ট ঘরে বর্তমান বিশ্বনাথকে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। বর্তমান ছোট্ট গর্ভগৃহটি দেখেও তাই মনে হয়, বিশেষত দ্বিতীয় মন্দিরের বিশাল আকৃতির পাশে বর্তমান মন্দিরটি নিতান্ত ক্ষুদ্র। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। সব দেবমন্দিরে বিগ্রহ বা লিঙ্গ হয় মাঝখানে নয় দেওয়ালের একপাশে থাকে, কিন্তু এখানে বিশ্বেশ্বর লিঙ্গটি একেবারে এককোণে প্রতিষ্ঠিত—যা স্বাভাবিক নয়। শোনা যায়, সেই ব্রাহ্মণ লিঙ্গটি ঘরের এককোণে বসিয়ে রেখে মাঝখানে প্রতিষ্ঠার জন্য কুণ্ড তৈরি করে পূজাদি করেন। তারপর যখন লিঙ্গটি তুলে এনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে যাবেন, তখন দেখা যায় সেটি আর উঠছে না। ঐস্থানেই বসে গেছে। অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর নিজেই নিজের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তখন মাটির মেঝে ও দেওয়ালও তাই ছিল। মুসলমানদের ভয়ে খুব সাবধানে তখন বিশ্বনাথকে সেবাপূজাদি করা হতো। তারপরে আওরঙ্গজেবের রাজত্ব শেষ হলে ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ বর্তমান মন্দিরটি পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেন ও সাজিয়ে দেন ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের ভাদ্র কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে।

রাত্রে শয়ন-আরতির সময় বিশ্বনাথের শৃঙ্গার বেশ

১৭৮৮-তে ব্রিটিশ শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস মন্দিরে ঢোকবার পথে নহবতখানাটি তৈরি করিয়ে দেন, আর ৫১ ফুট উঁচু এই মূল মন্দিরটির দুটি চূড়া ২২ মণ সোনা দিয়ে মুড়ে দেন পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ। পরে আরো অনেক ধনী ব্যক্তি এই মন্দিরের অলঙ্করণে অনেক কিছু করেছেন।

বিশ্বনাথের মন্দিরে বসে বসে পুরাণ ও ইতিহাসের এইসব ঘটনার কথা ভেবে চলেছি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যারতির সময় হয়ে এল। বিশ্বনাথের আরতি সত্যিই দেখার মতো। প্রচুর ভক্তের ভিড় হয় এইসময়। আমিও আরতি দেখার জন্য উঠে পড়লাম। পুরনো মুক্তিমণ্ডপ থেকে জ্ঞানবাপীতে এসে একটু জল চেয়ে নিয়ে মাথায় মুখে দিয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরে এসে দাঁড়ালাম উত্তরদ্বারের বিরাট ঘণ্টাটির পাশে। এই ঘণ্টাটি নেপালের মহারাজের দেওয়া। এর আগেই বিশ্বনাথের স্নানাদি হয়ে গেছে পঞ্চামৃত ও সুগন্ধি গঙ্গাজলে। স্নানের পর চন্দনাদি দিয়ে অনুলেপনের পর ভস্মবিভূষিত করে এবং ফুলের মালা ও বেলপাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে পঞ্চব্রাহ্মণ আরতি শুরু করলেন কুণ্ডের চারিদিক ঘিরে বসে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাঁজ, ঘণ্টা ও ডমরুর তালে তালে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সেবকেরা যা শব্দ উচ্চারণ করছিল তার একবর্ণও বোঝা গেল না। শুধু 'হা-হা-হাঃ' মনে হচ্ছিল। তবে পরে শুনলাম সেটি বিখ্যাত 'শিবনীরাজনীস্তব'। আরতির শেষে মন্দিরে ঢুকে বিশ্বনাথকে স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। "অবিমুক্তং মহৎ ক্ষেত্রং পঞ্চক্রোশপরিমিতং। জ্যোতির্লিঙ্গং তদেকং হি জ্ঞেয়ং বিশ্বেশ্বরাভিধম্।।"—পঞ্চক্রোশী এই অবিমুক্তক্ষেত্রে এই জ্যোতির্লিঙ্গই বিশ্বেশ্বর নামে খ্যাত। সেই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের শ্রেষ্ঠতম বিশ্বনাথকে প্রণাম করি—

"সানন্দমানন্দবনে বসন্তমানন্দকন্দং হৃতপাপবৃন্দম্।
বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে।।" ❑

[জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথ পর্ব সমাপ্ত]

দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ⑤

❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑

কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত

বিচলিত দেবরাজের কথা শুনে ঋষি দধীচি স্মিত হাসলেন। প্রসন্ন বদনে তিনি বললেন ঃ "স্বয়ং দেবতাদের আমার সামনে উপস্থিত হতে দেখে আমার একটু ধর্মকথা শোনার ইচ্ছা হয়েছিল। তাই আমি একথা বলেছি। কিন্তু আমি জানি, দেহ যতই প্রিয় বস্তু হোক, তা একদিন ত্যাগ করতেই হবে। নশ্বর এই দেহকে পরোপকারে কাজে লাগিয়ে ধর্মলাভের চেষ্টা না করলে পরিণামে তা বড় দুঃখ ও অনুশোচনার কারণ হয়। আমার এই অস্থি-মাংসের দেহটি যদি আপনাদের কোন উপকারে লাগে তবে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আমি এক্ষুণি এই দেহ ত্যাগ করছি।"

ঋষি দধীচি কথাগুলি বলে যোগাসনে বসলেন। করজোড়ে দণ্ডায়মান দেবতারা নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, মুনিবর গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়েছেন। ক্রমে তাঁর আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হলো এবং তাঁর প্রাণহীন দেহখানি পড়ে রইল।
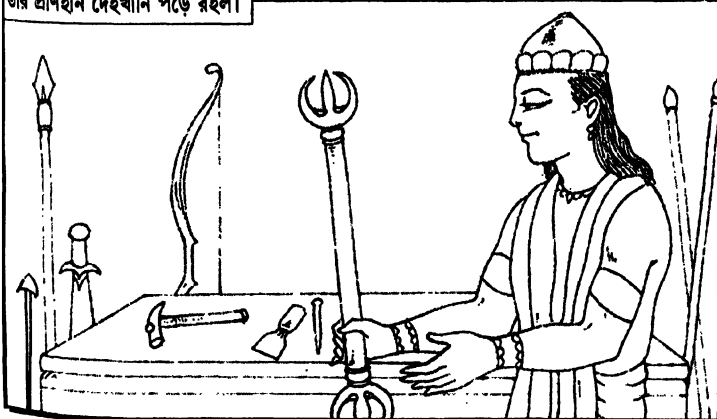
দধীচির দেহ থেকে অস্থি গ্রহণ করে দেবরাজ ইন্দ্র তা নির্মাণশিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মাকে প্রদান করলেন। সেই পুণ্য অস্থি দিয়ে তিনি অমোঘ অস্ত্র বজ্র নির্মাণ করে দিলেন। [ক্রমশ]

সম্ভাবনায় দক্ষিণ আফ্রিকা, কালো ঘোড়া পাকিস্তান

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের কি প্রয়োজন?... আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ।... দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যা কি—কাঁটা কোথায় বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনি তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। সপ্তম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ঘন্টাধ্বনি ভেসে আসছে লন্ডনের বিখ্যাত 'বিগ বেন' থেকে। দিনক্ষণ ও সময়ের জানান দিচ্ছে 'গ্রীনউইচ মিন টাইম' বা 'গ্রীনিচ মানমন্দির'। সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে। কোন্ দেশ কি অবস্থায় আছে, কার সম্ভাবনা কতখানি—এসব নিয়েই এবারের নিবন্ধ।

সপ্তম বিশ্বকাপের আয়োজক এবার ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। তবে এডিনবার্গ, আয়ারল্যান্ড টি. বি. এ. ও আমস্টেলভিনে একটি করে ম্যাচ হবে। বারটি দেশ অর্থাৎ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, ভারত, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা—এই নয়টি আই.সি.সি. পূর্ণ সদস্য দেশ ও যোগ্যতা-নির্ধারণী পর্ব থেকে উঠে আসা তিনটি অ্যাসোসিয়েট দেশ যথাক্রমে বাংলাদেশ, স্কটল্যান্ড ও কেনিয়া—সবমিলিয়ে এই বারটি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। রাউন্ড রবিন লিগ প্রথায় দুই গ্রুপের খেলাগুলি হবে। প্রতি গ্রুপ থেকে সেরা তিন দলকে নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে হবে সুপার সিক্সের খেলা। এই খেলাগুলিও রাউন্ড রবিন ভিত্তিক। এই পর্যায়ের সব খেলাই হবে ইংল্যান্ডে। সুপার সিক্সের সেরা চারটি দল শেষ চার অর্থাৎ সেমিফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তারপর ফাইনাল। দুটি সেমিফাইনাল হবে ১৬ জুন ওল্ড ট্রাফোর্ড ও ১৭ জুন এজবাস্টনে, আর ২০ জুন লর্ডসে ফাইনাল। ১৪ মে—২০ জুন প্রায় একমাসের বেশি সময়কাল ধরে চলবে সপ্তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট। এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম স্পনসর পেপসি। তবে তাৎপর্যের বিষয়, এবারে যে বিশ্বকাপটি তৈরি করা হয়েছে সেটাই চিরস্থায়ী বিশ্বকাপ হিসাবে প্রতিটি আসরে উপস্থাপিত হবে। তবে মূল কাপটি নয়, চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হবে বিশ্বকাপের আদলে তৈরি একটি সুদৃশ্য রেপ্লিকা। অর্থাৎ বিশ্বকাপ ফুটবল এবং হকির মতো ক্রিকেটেরও একটি চিরস্থায়ী সংস্করণ থাকবে এবার থেকে। এবারে সপ্তম বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে কার সম্ভাবনা কতখানি, সেবিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক।

আলোচনা শুরু করা যাক গতবারের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কাকে দিয়ে। '৯৬-র বিশ্বকাপে অর্জুন রণতুঙ্গার শ্রীলঙ্কা অনেকটা ক্লাইভ লয়েডের বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঢঙে খেলে প্রতিপক্ষ দলগুলিকে একপ্রকার গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই শ্রীলঙ্কার সেই বিধ্বংসী রূপটি উধাও। বিগত তিন বছরে দু-একটি টুর্নামেন্টে সাফল্য এলেও মোটের ওপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই '৯৬-র শ্রীলঙ্কাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় সুবিধে - মোটামুটি '৯৬-র সেট টিমটাই এবার খেলবে। আর জয়সূর্য, অরবিন্দ ডি সিলভা, মহানামা ও অধিনায়ক রণতুঙ্গা প্রত্যেকেই 'ম্যান অব বিগ অকেশন'। তাই জীবনের শেষ বিশ্বকাপে কিছু করে দেখানোর তাগিদে এই চার তারকা ঝলসে উঠতে পারে—এই আশঙ্কাই করছে শ্রীলঙ্কার সব প্রতিপক্ষ দলের টিম ম্যানেজমেন্ট। তার ওপর দলে এসেছে মাহেলা জয়বর্ধনের মতো আক্রমণ-রক্ষণের মিশেলে গড়া চমৎকার ব্যাটসম্যান, যিনি শ্রীলঙ্কার ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হিসাবে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত। তাই ব্যাটিং নিয়ে শ্রীলঙ্কার চিন্তার কিছু নেই। ৫-৬ জন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান আছে দলে, প্রত্যেকেই উইকেট ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম। ব্যাটিং নয়, শ্রীলঙ্কার মূল সমস্যা তাদের বোলিং। চামিন্ডা ব্যাস ও মুরলীধরন ছাড়া তাদের সেরকম ভাল জাতের বোলার কৈ? আর ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সীম-সুইংয়ে নিয়ন্ত্রণ রেখে বল করাটাই একজন বোলারের অগ্নিপরীক্ষা। এই শ্রীলঙ্কা দলে সেইধরনের সীমার একা ঐ চামিন্ডা ব্যাস। মুরলীধরন

মে-জুনের স্যাঁতসেতে আবহাওয়া ও কনকনে ঠাণ্ডায় কতটা কার্যকরী হবেন, বলা কঠিন। একই কথা প্রযোজ্য অপর স্পিনার কুমার ধর্মসেনা প্রসঙ্গে। গতবার উপমহাদেশের রুক্ষ আবহাওয়ায়, স্পিন সহায়ক উইকেটে এই দুই স্পিনারই বেঁধে রাখতে পেরেছিলেন প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের, এবার তা হওয়ার নয়। তাই প্রতিটি ম্যাচেই ব্যাটসম্যানদের বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইংল্যান্ডে এবার কাপ জেতার সমূহ সম্ভাবনা দক্ষিণ আফ্রিকার। '৯২-এ আত্মপ্রকাশেই ক্রিকেট দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিল স্প্রিং-বকরা। নেহাতই অভিজ্ঞতার অভাবে তারা সেমিফাইনালেই আটকে গিয়েছিল বা বলা ভাল, জটিল নিয়মের জাঁতাকলে বেঁধে আটকে দেওয়া হয়েছিল। '৯৬-তে তারা গ্রুপের প্রতিটি ম্যাচে চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলছিল, কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে তারা আটকে যায়। দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হারটা গত বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় প্রহসন। ঐ হার থেকে যে দক্ষিণ আফ্রিকা শিক্ষা নিয়েছে তার প্রমাণ পরবর্তী তিন বছরে তাদের পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা ও প্রতিটি ম্যাচের জন্য উদ্ভাবনী পরিকল্পনা ও তার কার্যকর প্রয়োগ। শুধু ভাল খেলাই নয়, টেস্ট সিরিজ কিংবা একদিনের টুর্নামেন্ট জেতার পেশাদারী টেম্পারামেন্ট ও সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে মাঠে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাই সাম্প্রতিক কালে দুধরনের ক্রিকেটেই সবচেয়ে সফল দল দক্ষিণ আফ্রিকা। যে-দল উপমহাদেশের মাটি থেকে মিনি বিশ্বকাপ জিতে নিয়ে যায়, তাদের পক্ষে ইংল্যান্ডের অনুকূল পরিবেশে বিশ্বকাপ জেতা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। দলের প্রধান ব্যাটসম্যানদের প্রত্যেকেই চমৎকার ফর্মে রয়েছেন। গ্যারি কার্স্টেন, ডারিল কুলিনান, অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রোনিয়ে, জ্যাক কালিস যেকোন দলের পক্ষেই সম্পদ। কালিস, ক্রোনিয়ে আবার অলরাউন্ডার, যেটা তাদের বিরাট সুবিধা। এঁরা ছাড়াও থাকবেন মাইক রিন্ডেল, হারশেল গিবস, জন্টি রোডস—প্রয়োজনের সময়ে যাঁদের ব্যাটও ঝলসে উঠতে পারে। কোন ম্যাচে ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হলেও ক্ষতি নেই, ভয়ঙ্কর পেস বোলার অ্যালান ডোনাল্ড, শন পোলক ও তৃতীয় সহযোগী ল্যান্স ক্লুজনাররা মিলে পালটা আঘাত হেনে দাবিয়ে দিতে পারেন প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের। আর দক্ষিণ আফ্রিকার বজ্র আঁটুনির মতো ফিল্ডিং বেষ্টনী ভেদ করে রান করা ক্রিকেটে কঠিনতম কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। তিন বিভাগে এত চমৎকার ভারসাম্য ও বৈচিত্র্য আর কোন্ দলেই বা আছে? তাই বিশেষজ্ঞদের মতে ফেভারিট দক্ষিণ আফ্রিকার কাপ জেতাই হবে বিশ্বকাপের প্রেক্ষাপটে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

দক্ষিণ আফ্রিকার মতোই খেতাবের আরেক দাবিদার অস্ট্রেলিয়া। '৯৬-'৯৯—এই তিন বছরে তাদের ট্রাকরেকর্ডও ঈর্ষণীয়। একমাত্র উপমহাদেশে (ভারতে টেস্ট ও একদিনের সিরিজ এবং ঢাকায় মিনি বিশ্বকাপ) হারাটাই তাদের সাফল্যের টুপিতে একমাত্র কালো দাগ। ভারত, পাকিস্তান কিংবা শারজায় অস্ট্রেলিয়া কোনদিনই ভাল খেলে না, কারণ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান শক্ত, বাউন্সি উইকেটেই স্বচ্ছন্দ। বোলারদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ইংল্যান্ডের উইকেটে ততটা বাউন্স না থাকলেও সজীবতা আছে, বল পড়ে দ্রুত ব্যাটে আসে। ঐধরনের উইকেটে মার্ক ও স্টিভ ওয়াগ, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, রিকি পন্টিংরা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠতে পারেন বিপক্ষ বোলারদের কাছে। মার্ক ওয়াগ গত বিশ্বকাপে অল্পের জন্য 'ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট' হতে পারেননি। সেই দুঃখ ভুলতে এই বিশ্বকাপকে যদি বেছে নেন, তাহলে অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হবে প্রতিপক্ষ বোলারদের। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং বিভাগ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, অ্যাডাম ডেল, গিলেসপির পেস এবং শেন ওয়ার্ন, স্টুয়ার্ট ম্যাকগিলের লেগ স্পিন পরের পর ম্যাচ জেতাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। ম্যাকগ্রাথ ও গিলেসপির সবচেয়ে বড় সমস্যা তাদের চোট-আঘাতের প্রাবল্য। যদি সুস্থ থাকেন, তবে ইংল্যান্ডের ভারী আবহাওয়ায় তাঁদের সীম-সুইংয়ে নাজেহাল হয়ে যেতে পারেন বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানরা। আর দুই পেসারকে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছেন অসাধারণ দুই লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন ও স্টুয়ার্ট ম্যাকগিল। ইংল্যান্ডের আবহাওয়া ও উইকেট হাতের তালুর প্রতিটি রেখার মতো চেনেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা। একবছর আগে থাকতেই বিশ্বকাপের জন্য কুড়ি-পঁচিশজনের একটা স্কোয়াড তৈরি করে দফায় দফায় প্রস্তুতি নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আদ্যন্ত একদিনের ম্যাচের উপযোগী দল তৈরি করেছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তাঁরা খেলোয়াড়দের পরিমিত টুর্নামেন্ট খেলিয়ে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও বাছা বাছা টুর্নামেন্ট খেলিয়ে ম্যাচ প্র্যাকটিশ—দুয়েরই সুষম বন্দোবস্ত করেছেন, যেটা দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আর কোন দেশের ক্ষেত্রেই দেখা যায়নি। শুধুমাত্র এই কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য দেশগুলোর তুলনায় কিছুটা এগিয়ে থেকে শুরু করবে। বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ, দূরদর্শী চিন্তাভাবনা, দলগত শক্তি ও ক্রিকেটীয় উৎকর্ষতা অর্থাৎ টেকনিক্যাল ও ট্যাকটিক্যাল দুদিক থেকে বিচার করলে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ারই সপ্তম বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলা উচিত, অবশ্য আকস্মিক কোন অঘটন না ঘটলে।

এবারের টুর্নামেন্টে 'কালো ঘোড়া' অবশ্যই পাকিস্তান। প্রতিভার সমাবেশ যদি একমাত্র বিচার্য হয়, তাহলে পাকিস্তানের ধারেকাছে কেউ নেই। তবে প্রতিভা নয়, বিশ্বকাপ জিততে গেলে চাই দলীয় সংহতি ও বিগ ম্যাচ টেম্পারামেন্ট। সংহতির ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাচ্ছে। বেটিং, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পাকিস্তান ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ব্যাধি, যে-কারণে '৯৬-র বিশ্বকাপে ব্যর্থ হয়েছে ওয়াসিম আক্রম বাহিনী। এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, পেপসি কাপ ও শারজায় কোকাকোলা কাপ জিতে খানিকটা ধামাচাপা দেওয়া

গেলেও বিশ্বকাপের আগে তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এই ব্যাপারটি খেয়াল রাখতে হবে পাক টিম ম্যানেজমেন্টকে। পাকিস্তান দলের সবচেয়ে বড় সুবিধে এই দলের অন্তত ৫-৬ জন ক্রিকেটার নিয়মিত কাউন্টি ক্রিকেট খেলে। স্বভাবতই আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত থাকার একটা আপেক্ষিক সুবিধে নিয়ে খেলতে নামবে পাকিস্তান। আর ব্যক্তিগত দক্ষতার নিরিখে পাক ব্যাটিং ও বোলিং শক্তির গভীরতা ও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক হিসেব উলটে দিতে পারে। সৈয়দ আনোয়ার, সঈদ আফ্রিদির ঝড় তোলা ওপেনিং জুটি, মিডল অর্ডারে ইনজামাম উল হক, ইজাজ আমেদ, ইউসুফ ইওয়ানা, সেলিম মালিক এককথায় জমাট ব্যাটিংবৈভব। আক্রম, ইউনিসের মতো নতুন বলের মারাত্মক জুটি, গতিময় শোয়েব আখতারের তারুণ্যের তেজ, সাকলাইনের বৈচিত্র্যময় অফ স্পিন, মুস্তাক আমেদের গুগলি, টপ স্পিনের যুগলবন্দী আর কোন্ দলের বোলিংয়ে দেখা যায়! সর্বোপরি অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রমের লড়াকু নেতৃত্ব ও কৌশলী স্ট্র্যাটেজি তাঁর কীর্তিখ্যাত পূর্বসূরী ইমরান খানের কথাই মনে পড়ায়। কাপ জিততে বদ্ধপরিকর আক্রমের নেতৃত্বে সবাই ঠিকঠাক খেললে বিশ্বকাপ উপমহাদেশে ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে না।

'৮৩-র চ্যাম্পিয়ন ভারতকে নিয়ে অবশ্য ততটা আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না—গতবারেও যতটা করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে জিম্বাবোয়ে, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে ও একদিনের ম্যাচে হার ভারতীয় দলের দুর্বল দিকটিকে প্রকট করে দিয়েছে। দলটি পুরোপুরি শচীন তেণ্ডুলকর-নির্ভর, তবে শচীন-সৌরভের ওপেনিং জুটি বেশ কিছু ম্যাচে ভারতকে জয় এনে দিয়েছে এবং ইদানীং কালে সদাগোপান রমেশ আমাদের মনে আশা জাগিয়েছেন। একথা সত্যি, শচীন ভাল খেললেই দলের বাকিরা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। বাকিরা বলতে সৌরভ আর রাহুল দ্রাবিড়। মূলত এই তিনজনের ওপর নির্ভরশীল ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপ। জাদেজা কখনো ভাল, কখনো অতি সাধারণ। ইংল্যান্ডে রান পাওয়া খুব একটা সহজ হবে না জাদেজার, কারণ তাঁর 'অ্যাক্রস দ্য লাইন' খেলার প্রবণতা বেশি। ভাল সুইঙে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। আর অধিনায়ক আজহারউদ্দিন তো এককথায় দলের পর্যটক হিসেবেই ঘুরবেন। আজহারের মধ্যে সেই ইতিবাচক মানসিকতাই দেখা যাচ্ছে না, যা দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে ভাল খেলতে উদ্দীপ্ত করবে। পেপসি কাপের একটি ম্যাচে অময় খুরাশিয়া চোখধাঁধানো ব্যাটিং করলেও বিশ্বকাপের আসরে কতখানি সফল হবেন তা বলা কঠিন। আছেন অভিজ্ঞ রবীন সিংও, যিনি অলরাউন্ডার হিসাবে দলভুক্ত হয়েছেন। তবে বিশ্বকাপে ভারতীয় দলকে চাগিয়ে তুলতে শচীনকেই প্রতিটি ম্যাচে বাড়তি ভূমিকা নিতে হবে। বিশ্বকাপে সৌরভ গাঙ্গুলি কিন্তু '৮৩-র রজার বিন্নি হয়ে উঠতে পারেন। সৌরভের ব্যাটিং তো আছেই, তার সঙ্গে আউট সুইং পেসের চমৎকার বৈচিত্র্য ইংল্যান্ডে কার্যকর হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। উইকেটরক্ষক নয়ন মোঙ্গিয়া ব্যাটিংটা মন্দ করেন না। বোলারদের মধ্যে জাভাগাল শ্রীনাথ, অজিত আগরকর, অনিল কুম্বলে বা নিখিল চোপড়া প্রয়োজনে দলের রান বাড়ানোতে সাহায্য করতে পারেন। সেহিসাবে ভারতীয় দলের ব্যাটিং লাইন আপ শক্তিশালীই বলা যায়, কিন্তু খেলায় তার কতখানি প্রতিফলন হবে তা বলা মুশকিল। ভারতের বোলিং আক্রমণ শুরু করার দায়িত্বে থাকছেন শ্রীনাথ ও বেঙ্কটেশ প্রসাদ। প্রথম চেঞ্জ বোলার অজিত আগরকর প্রতিভাবান হলেও তাঁর অভিজ্ঞতায় ঘাটতি রয়েছে। থাকছেন চতুর্থ পেসার দেবাশিস মোহান্তিও। আর স্পিন আক্রমণের জন্য রয়েছেন অনিল কুম্বলে ও নিখিল চোপড়া। এছাড়া শচীন, সৌরভ, রবিন তো রয়েছেনই। বোলিঙের ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় প্রসাদ, শচীন, সৌরভদের সফল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। সব মিলিয়ে ভারতীয় দলে ঘটেছে তারুণ্য, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার সুষম মেলবন্ধন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রয়োজনে জ্বলে ওঠা ও ধারাবাহিকতার যথেষ্ট অভাব ভারতীয় দলে।

সংগঠক ইংল্যান্ডকে নিয়েও বিশেষ কিছু বলার নেই। নবগঠিত দলটা এখন একটা পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। গ্রেম হিকই একমাত্র একদিনের ম্যাচের বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান, খানিকটা ভরসা দিতে পারেন গ্রাহাম থর্প। বোলিং শক্তিও সাদামাটা। তবে হোমটিম হওয়ার সুবাদে আর দর্শকদের সমর্থন সঙ্গে থাকায় খানিকটা চমক দিলেও দিতে পারে আলেক স্টুয়ার্টের টিম। তবে ঐ সুপার সিক্স পর্যন্ত, তার বেশি এগোতে পারবে বলে মনে করেন না কেউই। একই কথা প্রযোজ্য ব্রায়ান লারার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সম্পর্কেও। আটের দশকের সেই তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, বলীয়ান ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের ছায়ামাত্র এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলটি। টেস্ট, একদিনের ম্যাচ সব জায়গাতেই তাঁদের করুণ দশা বেদনার উদ্রেক করে আ-বিশ্ব ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়ে। মিনি বিশ্বকাপে সবাইকে বিস্মিত করে ফাইনালে খেললেও এবং সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট সিরিজে সফল হলেও বিশ্বকাপে তাঁদের নিয়ে বাজি ধরতে রাজি নন কোন বুকিই। নিউজিল্যান্ড, কেনিয়া বা জিম্বাবোয়ে দল হিসাবে আহামরি না হলেও 'দৈত্য সংহারক' হিসাবে বিশেষ কোন ম্যাচে অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। '৮৩-তে যেমন জিম্বাবোয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারতকে প্রায় হারিয়ে দিচ্ছিল, কিংবা '৯৬-এ কেনিয়ার হাতে ক্যারিবিয়ান নিধন। আর ইংল্যান্ডের মাঠে নিউজিল্যান্ড সবসময়ই ভাল খেলে, কারণ ওখানকার মাঠ, পরিবেশ, উইকেট সবকিছুই প্রায় নিউজিল্যান্ডের মতো। এই তিন দেশ হয়তো শেষ চারে উঠতে পারবে না, কিন্তু এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে হেভিওয়েট দলগুলিকে। ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'
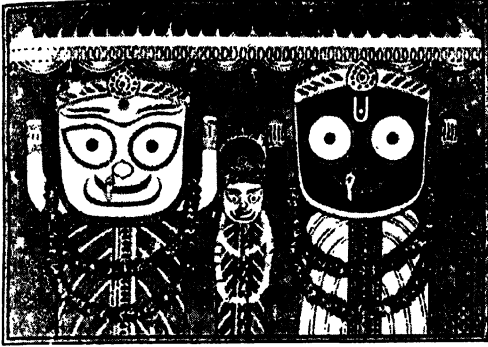
'শ্রীজগন্নাথ-মন্দির পরিক্রমা'

'তীর্থ-পরিক্রমা' পর্যায়ে স্বামী অচ্যুতানন্দ লিখিত 'শ্রীজগন্নাথ-মন্দির পরিক্রমা' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনা যা 'উদ্বোধন'-এর বৈশাখ ১৪০৫ থেকে ভাদ্র ১৪০৫ সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। লেখাগুলি পড়ে এত আনন্দ পেয়েছি যে, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারছি না। এত বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আগে কোথাও পড়িনি বা খোঁজও পাইনি। আমরা অনেকেই পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দির দর্শন করেছি, কিন্তু মন্দির তৈরির আদিপর্ব, তার ইতিহাস, প্রতিটি মূর্তি, গৃহ ইত্যাদির কাহিনী সম্বন্ধে কত জন অবহিত সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। এর প্রাচীনতা বিস্ময়কর। আমরা বিগ্রহ দর্শন করে ভক্তিভরে প্রণাম করি, কিন্তু তার ইতিহাস জানতে চেষ্টা করি না। এই লেখা পড়বার আগে জানতাম না যে, মন্দিরশীর্ষে উড্ডীয়মান ২২ গজী পতাকার নাম 'পতিতপাবন বানা'। শুধু তাই নয়, প্রতিটি রথের সম্যক্ পরিচয় এবং তাদের সারথিদের নামসহ অন্যান্য বিবরণ আমাদের অনেকেরই অজানা ছিল। তাই গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে সমস্তটা পড়ে খুবই ভাল লেগেছে। এমন রচনা প্রকাশের জন্য লেখক স্বামী অচ্যুতানন্দ এবং 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী
আশ্রম রোড
কুচবিহার-৭৩৬১০১

রোগ আরোগ্যে মশলাপাতি

আমাদের দৈনিক খাদ্যতালিকায় কিছু না কিছু মশলা প্রয়োজন। খাদ্যকে সুরুচিকর করতে, আহার্য বস্তুকে তৃপ্তিদায়ক করতে এবং খাদ্যের পরিপাকে বিভিন্ন মশলা বা মশলারূপে কিছু উদ্ভিদ যেমন পেঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এদের সকলের রোগজীবাণু বা কিছু ব্যাধির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে ভারতীয় পুষ্টিবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা এবং ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেতে আমাদের আহার্যে বিভিন্ন মশলা বিশেষ উপকারী। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের জাতীয় পুষ্টি সংস্থার (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন, NIN) বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, আমাদের খুব পরিচিত ব্যাধি ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, রক্তচাপ বৃদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মশলাপাতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ, রক্তশর্করা (blood sugar) কমাতে (ডায়াবেটিস হলে), রক্তে চর্বির পরিমাণ কমাতে (রক্তচাপ বেড়ে গেলে), ক্যান্সার প্রতিরোধে, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাককে আক্রমণ করতে বিভিন্ন মশলা কাজ করে। যেমন, ধনে, লবঙ্গ, মেথি, সরষে ছাড়াও পেঁয়াজ-এর ভূমিকা ব্যাকটেরিয়া দমন করতে, প্রদাহ রোধ করতে বা ক্যান্সার প্রতিরোধে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এই মশলাগুলি সাহায্য করে। খাদ্যকে যেমন বিভিন্ন মশলা সুস্বাদু ও মুখরোচক করে, রসনাকে তৃপ্তি দেয়, তেমনি হজমেও সহায়তা করে।

রোগ-প্রতিরোধ ছাড়াও কাঁচা বা রান্না করা পেঁয়াজ এবং মেথি ও মেথির শাক রক্তে চিনি বা শর্করার পরিমাণ কমাতে পারে বলে NIN জানিয়েছে। তাছাড়া রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রাখতে রসুন ও পেঁয়াজের ভূমিকা আছে। পেঁয়াজ, রসুনের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার জন্য এরা দুপ্রকার ব্যাকটেরিয়া - গ্রাম পজিটিভ (Gram +ve) এবং গ্রাম নেগেটিভ (Gram -ve)-কে ধায়েল করে—যারা খাদ্যে বিষক্রিয়া, ডায়েরিয়া, কলেরা, নিউমোনিয়া এবং টি.বি. অর্থাৎ টিউবারক্যুলোসিসের জন্য দায়ী। পেঁয়াজ ও রসুনের মধ্যে উপস্থিত গন্ধক-ঘটিত যৌগ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

উত্তর ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ইত্যাদি রাজ্যের অধিবাসীদের খাদ্য প্রস্তুত করতে প্রধানত সরষের তেল ব্যবহার করা হয়। সরষের বীজের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে গন্ধক ঘটিত যৌগ থাকে, যেগুলি ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে এবং কলুষিত চীনাবাদামে উপস্থিত ছত্রাকের হাত থেকে যকৃতকে রক্ষা করে। সরষে ছাড়াও আঁশজাতীয় খাদ্য এবং ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদিও ক্যান্সার দমন করতে সাহায্য করে। কিছু কিছু শাক এবং জিরে, ধনে, মৌরি—এই মশলাগুলি এক বিশেষ ধরনের উৎসেচকের মাত্রাকে উদ্দীপিত করে ক্যান্সার আক্রমণের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে। NIN জানিয়েছে, এই বিষক্রিয়া-রোধকারী উৎসেচকের নাম গ্লুটাথায়োন-এস-ট্রান্সফারেজ (GST), যা ঐ মশলাগুলি ছাড়াও সরষে, হলুদ এবং পেঁয়াজে পাওয়া যায়। পোস্ত, হিং, তুলসীপাতা ইত্যাদিরও এমন রক্ষামূলক ক্রিয়া আছে। বায়ু বা গ্যাস থেকে অব্যাহতি পেতে মৌরি, হলুদ ও আদা সহায়ক, আবার বদহজম, বায়ু, বমি এবং আন্ত্রিক গোলযোগ নিরাময়ের জন্য ধনে বিশেষ কার্যকর।

হলুদ একটি প্রয়োজনীয় মশলা, রান্নায় যার ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। এই মশলাটি একটি শক্তিশালী ক্যান্সার-রোধকারী পদার্থ হিসাবে কাজ করে। NIN-এর গবেষণায় জানা গেছে, হলুদের মধ্যে উপস্থিত একটি রাসায়নিক পদার্থ দেহকে ছত্রাক ও

ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে সাহায্য করে। পরীক্ষাধীন প্রাণীদের মধ্যে এই বিজ্ঞানীরা দেখেছেন হলুদ কোলেস্টেরল-এর মাত্রা কমাতে পারে। এই সংস্থার গবেষণার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধূমপায়ীদের প্রত্যহ দেড় গ্রাম করে হলুদ ১৫ দিন থেকে ১ মাস পর্যন্ত দিলে মূত্রে মিউটাজেনের পরিমাণ কমে যায়। হলুদের ন্যায় তিল এবং লবঙ্গের মধ্যেও একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে যারা ক্ষতিকর মিউটাজেন নষ্ট করে দেয়। মিউটাজেন হলো ক্যান্সার সৃষ্টিকারী একপ্রকার জটিল রাসায়নিক পদার্থ।

মশলাগুলির এই নানাবিধ উপকারিতা ছাড়াও চিকিৎসার কাজে ওষুধ প্রস্তুত করতেও এদের ব্যবহার করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

ডঃ অভিজিৎ পানিগ্রাহী
কলেজ পাড়া, বসিরহাট কলেজ
জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা
পিন ঃ ৭৪৩৪১২

ছানি নিয়ে কিছু কথা

অনেককাল আগে থেকেই মানুষ চোখের 'ছানি' বা ইংরেজীতে 'cataract' কিংবা হিন্দিতে 'মোতিয়াবিন' শব্দটির সাথে সুপরিচিত। চোখের লেন্সের কোন অংশে কোন কারণে অস্বচ্ছতা সৃষ্টি হলে তাকে 'ছানি' বা 'cataract' বলে। এই প্রসঙ্গে বলার আগে চোখের বিভিন্ন অংশের গঠন, এদের অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। তাহলে বিষয়বস্তু সহজ হয়ে উঠবে।

চোখের সামনে যে গোলাকার, সাধারণত কালো ও মাঝারি মাপের চাকতির মতো অংশ দেখা যায়, তাকে কর্নিয়া (cornea) বলে। কর্নিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বচ্ছ, রক্তনালীবিহীন, কিন্তু নগ্ন সংজ্ঞাবহ স্নায়ুপূর্ণ ও পাঁচটি স্তর-বিশিষ্ট একটি চকচকে অংশ। যদিও এর পাঁচটি স্তরের কাজ পাঁচরকম, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ আলোক-প্রতিসরণ মাধ্যম (refractive media) হিসাবে কাজ করে। বাকি তিনটি আলোক-প্রতিসরণ মাধ্যম হলো জলীয় তরল (Aqueous humour), লেন্স ও কাচীয় তরল (vitreous humour)। এদের মধ্যে কর্নিয়া, লেন্স এবং অতিসাম্প্রতিক কালে কাচীয় তরল শল্য চিকিৎসার (surgery) সাহায্যে কৃত্রিমভাবে বদলানো যায়। চোখের বাকি অংশ আপাতত বদলানো বা প্রতিস্থাপন করা যায় না। কর্নিয়ার ঠিক মাঝখানে যে ছোট গোলাকার অংশ দেখা যায়, তাকে 'তারারন্ধ্র' বা pupil বলে। এটি আসলে কর্নিয়ার পিছনে অবস্থিত 'আইরিসে'র (iris) গোলাকার অংশ। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কর্নিয়া ও আইরিসের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশে একধরনের তরল পদার্থ পূর্ণ থাকে, তাকে 'অ্যাকুয়াস হিউমার' বলে। আইরিসে উপস্থিত দুই ধরনের পেশী 'স্ফিঙ্কার' ও 'ডাইলেটার' পিউপিলী (Sphineter and Dilator pupillae) থাকার জন্য তারারন্ধ্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেশি আলো ও কম আলোতে যথাক্রমে ছোট ও বড় (constrict & dilate) হয়ে আলোকপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

বিভিন্ন জাতের মানুষের চোখের রঙ বিভিন্ন হওয়ার কারণ আইরিসে বিভিন্ন রঞ্জক কোষ (pigment cell)-এর উপস্থিতি।
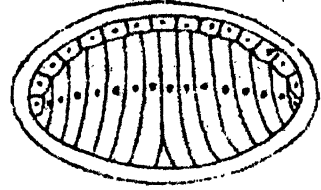
লেন্সের গঠন

এটি 'জিন'-এর মাধ্যমে বংশানুক্রমিকভাবে বাহিত হয়। আইরিসের পিছনে ও ভিট্রিয়াস হিউমারের সামনে দুইপাশে 'নিলম্ব-বন্ধনী' (suspensory ligament) দিয়ে আটকানো অবস্থায় অবস্থান করে 'ক্রিস্টালিন লেন্স'। এটি দ্বি-উত্তল, অত্যন্ত নমনীয়, তাই প্রয়োজনমতো বাঁকতে ও সোজা হতে পারে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এটিকে অর্ধেক কাটা পেঁয়াজের মতো দেখতে লাগে। এর একেবারে ভিতরের স্তরকে 'নিউক্লিয়াস' ও তার ওপরের স্তরকে 'কর্টেক্স' এবং সমগ্র লেন্স ঘিরে যে আবরণ থাকে তাকে 'ক্যাপসুল' বলে।

চোখে ছানি বা লেন্সে অস্বচ্ছতা পড়ার পদ্ধতি এখনো সঠিকভাবে বলা না গেলেও লেন্সের শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক পরিবর্তনজনিত কারণকেই দায়ী করা হয়।

সাধারণভাবে মাঝবয়সী মানুষদের চোখে 'ছানি' পড়তে বেশি দেখা যায়, তবে প্রায় সব বয়সের মানুষেরই ছানি পড়তে পারে। এমনকি, সদ্যজাত শিশুও অনেকসময় চোখে ছানি নিয়ে জন্মায়।

'ছানি' পড়ার কারণকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটি হলো 'জন্মগত ও বৃদ্ধিজনিত ছানি'—যার মধ্যে ছানির রং, অবস্থান, গঠনবৈচিত্র্য প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন নামকরণ করা যায়, যেমন—ব্লু-ডট, করোনারী, জোনালারিফর্ম, ক্রোরিফর্ম, সেন্টাল, ল্যামেলার ছানি প্রভৃতি। এইধরনের ছানির প্রধান কারণ হলো গর্ভাবস্থায় মায়ের অপুষ্টি, যার মধ্যে বিশেষত ভিটামিন A, D ও ক্যালসিয়ামের অভাব, অমরা বা placenta-তে আঘাত, বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ, বিশেষত জার্মান মিজেলস প্রভৃতিতে গর্ভস্থ ভ্রূণের চোখের লেন্স পরিণত হওয়ার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়টি হলো 'অর্জিত' বা 'acquired' ছানি। এই ধরনের ছানির মধ্যে বয়সকালীন ছানি (senile cataract), আঘাতজনিত ছানি, বিভিন্ন রোগে ভোগার ফলে (ডায়াবেটিস, টিটানি ইত্যাদি) ছানি, বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াজনিত ছানি, তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণজনিত ছানি, বিভিন্ন জীবিকায় কাজের মাধ্যমে ছানি, অপুষ্টিজনিত ছানি এবং বৈদ্যুতিক প্রভাবজনিত ছানি প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

এবার বলা যাক, 'ছানি' পড়লে কি করে বুঝবেন? ছানির অপরিণত অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে ঝাপসা হতে থাকে, একটি বস্তুর অসংখ্য প্রতিচ্ছবি দেখা যায় কিংবা রামধনু রঙের আলো চোখের সামনে ভাসছে মনে হয়। ছানি পেকে গেলে অর্থাৎ mature হলে দৃষ্টিশক্তি আধ হাত দূরেও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং তারারন্ধ্র বা pupil-এর সামনে স্পষ্টভাবে ঘিয়ে রঙের ছোট চাকতির মতো লেন্স ভেসে ওঠে।

অপরিণত ছানি থেকে পরিণত ছানিতে রূপান্তরিত হতে নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই, ব্যক্তিবিশেষের ওপর তা নির্ভর করে।

অপরিণত ছানি থাকলে চশমার সাহায্যে যতটা সম্ভব দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ছানি নিরাময় এখনো পর্যন্ত কোন ওষুধ দ্বারা সম্ভব নয়। অস্ত্রোপচার বা operation-ই এর একমাত্র পথ। পরিণত ছানিই শুধুমাত্র অপারেশনের যোগ্য, তবে মানুষের জীবিকা ও কাজের কথাও চিন্তা করা হয়, যেমন পরিবহনচালক, সিগন্যালম্যানদের ক্ষেত্রে অপরিণত ছানিও অপারেশন করে দেওয়া হয়।

অপারেশনের আগে কিছু পরীক্ষা করা হয়। যেমন—(১) খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর রক্ত-শর্করার পরিমাণ পরীক্ষা (PPBS), (২) রক্তচাপ (blood pressure) পরীক্ষা, (৩) চোখের জলের পরীক্ষা (swab test), (৪) অশ্রুনালীর পরীক্ষা (patency test), (৫) মূত্রের সাধারণ পরীক্ষা (routine examination of urine) ইত্যাদি। তাছাড়া মুখের ভিতর বা দাঁতে কোন অসুখ কিংবা প্রচণ্ড কাশি প্রভৃতি আছে কিনা দেখে নেওয়া হয়। এই পরীক্ষাগুলির ফল স্বাভাবিক থাকলে বা চিকিৎসার পর স্বাভাবিক করে তবেই ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

ছানি অপারেশন সাধারণত দুইভাবে করা হয়। প্রথমটিকে বলে 'Extra capsular cataract extraction' (ECCE)। এতে লেন্সের পশ্চাৎ ক্যাপসুলটি রেখে অপারেশন করা হয় এবং দ্বিতীয়টিকে বলে 'Intra capsular cataract extraction' (ICCE)। এতে সমগ্র ছানিই বের করে ফেলা হয়।

সাম্প্রতিককালে কৃত্রিম লেন্স বা ইন্ট্রা অকুল্যার লেন্স (IOL)
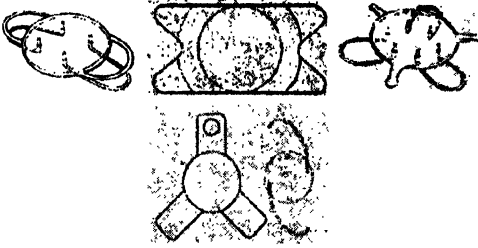
কৃত্রিম লেন্স যা প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়

চোখের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়। এটি 'পলি মিথাইল মিথাইল অ্যাক্রালেট' (PMMA) দ্বারা তৈরি। বাজারে দেশী ও বিদেশী দুই ধরনেরই লেন্স পাওয়া যায়। লেন্স প্রতিস্থাপনের আগে লেন্সের 'পাওয়ার' জানার জন্য 'বায়োমেট্রি' নামে একটি পরীক্ষা করা হয়। লেন্সের অপটিক্যাল ডায়ামিটার সাধারণত 5.5 mm—6.5 mm হয়। এই অপারেশনের সুবিধাগুলি হলো—রোগীকে মোটা, ভারী বা কাছে ও দূরের দেখার জন্য দুটো চশমা ব্যবহার করতে হয় না। একটি চশমাতেই সামান্য পাওয়ার বা পাওয়ার-বিহীন চশমায় 'বাই-ফোকাল' করে দিলেই কাজ চলে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা, বস্তুকে বড় প্রভৃতি দেখার অসুবিধাগুলি পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়েছে। ছানি অপারেশনের পর বিশেষ বিশেষ কিছু সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন। যেমন—পুকুর, ডোবা বা নোংরা জলে স্নান না করা, ভারী জিনিস না তোলা, চোখে অপরিষ্কার হাত, রুমাল প্রভৃতি না দেওয়া কিংবা আঘাত পেলে বা চোখ লাল হলে যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

পরিণত বা mature ছানি সঠিক সময়ে অপারেশন অত্যন্ত জরুরী। কারণ, এই ছানি চোখের মধ্যে পচে গেলে 'গ্লোকোমা' (Glaucoma) নামক উচ্চচাপজনিত চোখের অসুখ সৃষ্টি হয়। এর ফলে মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধও হয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে প্রতি বছর অন্ধ মানুষের সংখ্যা এইভাবেই বেড়ে চলেছে।

তাই পরিশেষে বলি, ছানি নিয়ে কোনপ্রকার কুসংস্কারে কান দেবেন না। কারণ, ছানি সারাবার বহু ভেলকি বা ম্যাজিক কিংবা বিভিন্ন ওষুধের কথা অনেকে বলেন। কিন্তু এর কোনটিই বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকর নয়, বরং ক্ষতিকর। তাই চক্ষু-বিশেষজ্ঞ দ্বারা সঠিক সময়ে ছানি অপারেশন করিয়ে আগামী উজ্জ্বল স্বপ্ন-রঙিন দিনগুলিতে পরিষ্কার ঝলমলে দৃষ্টি নিয়ে 'জগতের আনন্দ-যজ্ঞে' মেতে উঠুন—সবশেষে এই শুভ কামনাই পাঠক-পাঠিকাদের জন্য রইল।

কল্যাণ পাল
রায়পাড়া হাউসিং এস্টেট
পোঃ সিঁথি, কলকাতা-৭০০ ০৫০

প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণের পট'

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে গত মে মাসে 'যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির সঙ্কলন, সম্পাদনা ও পরিকল্পনা করেছেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। গ্রন্থটির শেষ প্রবন্ধটি ('শ্রীরামকৃষ্ণের পট') লিখেছেন পীযূষকান্তি রায়। ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে পোর্সেলিনের প্লেটের ওপর মুদ্রিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোর (পূজিত ফটোর আদলে) কয়েকখানা বিশেষ ধরনের প্রাণবন্ত পট বা ছবি বেলুড় মঠে আনিয়েছিলেন। শ্রীরায় গবেষণা ও অনুসন্ধান করে এযাবৎ মাত্র আটখানা পটের অস্তিত্ব জানতে সক্ষম হয়ে সেগুলির বিশদ বিবরণ তাঁর ঐ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। সম্প্রতি আমরা শুনেছি, আরো দুখানা পটের সন্ধান নাকি পাওয়া গিয়েছে। এই দুখানা পট বর্তমানে কোথায় ও কি অবস্থায় আছে জানবার জন্য আমি কৌতূহলী। অনুগ্রহ করে যদি এসম্পর্কে কেউ আলোকপাত করেন তবে বাধিত হব।

দেবশ্রী রায়
কমলা নেহরু নগর, লখনৌ-২২৬ ০২২

শতবর্ষেও দীপ্তপ্রাণা লাবণ্যপ্রভা দেবী

শান্তি সিংহ

লাবণ্যপ্রভা দেবী শতবর্ষ পরেও মন ও মননে উজ্জীবিতা! আজীবন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম। দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনায় যৌবনের সোনালি দিনগুলিতে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামী স্বামীর পাশে থেকেছেন যথার্থ সহধর্মিণী হিসাবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও প্রাণের প্রিয় বাঙলাভাষার মর্যাদারক্ষায় অভিনব সংগ্রাম করেছেন তিনি। তাঁর জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র প্রান্তিক বাংলার পুরুলিয়ায়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের নানা অনুষ্ঠানে যখন সারা দেশ আনন্দমুখর, তখন তাঁর শিল্পাশ্রমের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে এক দুপুরে আমরা গিয়ে দেখলাম—শতবর্ষের অগ্নিশিখা লাবণ্যপ্রভার হাতে স্বামী বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন' পত্রিকা।

শতায়ুমতীকে প্রণামের পর নানা কুশল কথাবার্তা হলো। তাঁর জন্ম কোন্ সালের কোন্ মাসে জিজ্ঞেস করতেই প্রসন্ন কৌতুকে তিনি বললেন ঃ "নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে-বছর জন্ম, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা যে-বছর, সেই বছর আমারও জন্ম। নেতাজী আর রামকৃষ্ণ মিশনের সমান বয়সী আমি।"

পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে লাবণ্যপ্রভা দেবী

আলোকচিত্র ঃ বিশ্বনাথ লাই

হেসে বললাম ঃ "মাস, তারিখ মনে আছে?"

সপ্রতিভভাবে মধুর কণ্ঠে তিনি বললেন ঃ "তা থাকবে না? ১৮৯৭ সালের ১৪ আগস্ট আমার জন্ম। জন্মস্থান পুরুলিয়ার নডিহায়।"

বিনম্রভাবে বললাম ঃ "বাবা-মা সম্পর্কে কিছু বলুন।"

লাবণ্যপ্রভা দেবী বললেন ঃ "আমার বাবার নাম অঘোরচন্দ্র রায়। মা যোগমায়া দেবী। বাবা অল্পবয়সে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী জীবনেও শিক্ষাব্রতী হিসাবে কাটিয়েছেন। আমি মা-বাবার চতুর্থ সন্তান। বাল্যজীবন আমার পুরুলিয়াতেই কাটে।"

ইতিমধ্যে তাকের কৌটো থেকে বের করেছেন নিজের হাতে তৈরি নারকেল নাড়ু, সন্দেশ। প্লেটে সাজিয়ে আমায় বললেন ঃ "খাও বাবা, এসব আমার বাড়িতেই করা।" একজনকে বললেন জল দিয়ে যেতে।

অপূর্ব স্বাদের নারকেল নাড়ু আর ঘরের তৈরি সন্দেশ খেতে খেতে বললাম ঃ "আপনার বিবাহিত জীবন, স্বামীর কথা কি কিছু মনে আছে মা?" (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরুলিয়াবাসীর কাছে তিনি 'মা' নামেই পরিচিতা।)

প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্না লাবণ্যপ্রভা দেবী বলতে শুরু করলেন—"যে-বছর ক্ষুদিরামের ফাঁসি, সেই ১৯০৮ সালে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামীর নাম অতুলচন্দ্র ঘোষ। ওঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে। শৈশবে মা-বাবা মারা যাওয়ায় ওঁর ছোটমেসো পুরুলিয়ার বরাবাজারে ওঁকে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। নাম—অযোধ্যানাথ ঘোষ। ওকালতি করতেন পুরুলিয়ায়। তাঁর আশ্রয়ে থেকে উনি ১৮৯৯ সালে পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। তারপর কলকাতার মেট্রোপলিটন কলেজ (এখন যার নাম 'বিদ্যাসাগর কলেজ') থেকে ১৯০৫ সালে বি. এ. পাস করেন। কলকাতায় পড়ার সময় তিনি ঝামাপুকুর লেনের একটি মেসবাড়িতে থাকতেন। ঐ মেসে থাকতেন লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মামা উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। সেখানে শরৎচন্দ্র প্রায়ই আসতেন। ওঁদের সঙ্গে পরিচয়ের কথা বিয়ের পর কতবার তিনি আমাকে বলেছেন। ১৯০৮ সালে উনি আইন পরীক্ষায় পাস করেন। ঐ বছরই ওকালতি শুরু আর বিয়ে। বিয়ের পর আমাদের সুখের সংসার। ওঁর পসার আর পয়সা হয়েছে। সংসারে এসেছে অমল আর অরুণ দুই ছেলে, উর্মিলা আর কমলা দুই মেয়ে।

"তারপর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ লাগল পুরুলিয়ায়। ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত পুরুলিয়া জেলা স্কুলের হেডমাস্টারী ছেড়ে দেশের কাজে যোগ দিলেন। আর উনিও ওকালতি ছেড়ে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চারটি শিশু-সন্তানকে নিয়ে আমিও স্বামীর সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হলাম।

"১৯২১ সালে জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ঋষি নিবারণচন্দ্র আর সেক্রেটারি আমার স্বামী। ১৯৩৫ সালে 'মানভূমের গান্ধী' ঋষি নিবারণচন্দ্রের তিরোধানে 'মানভূম কেশরী' অতুলচন্দ্র জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ অবধি তিনি ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য।

"ব্রিটিশ সরকার আমার স্বামীকে বেশ কয়েকবার আইন অমান্যের অপরাধে কারাদণ্ড দিয়েছেন। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার ওঁকে সিকিউরিটি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করে। আমিও পুত্রকন্যাদের নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমাদের কারাদণ্ড হয়। তখন এই শিল্পাশ্রমে বারবার পুলিসী হামলা হয়েছে। তারপর শিল্পাশ্রমকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

"১৯৪৬ সালে আমার স্বামীর নেতৃত্বে আমরা মানভূমের প্রায় তিন হাজার গ্রামে গ্রাম-পঞ্চায়েত গড়ি। তার জন্য আমাদের সংগঠনের কর্মীরা স্বদেশী ভাবনা প্রচারে গ্রামে গ্রামে ঘোরে। মহিলাদের সঙ্গে জনসংযোগে আমার বিশেষ দায়িত্ব ছিল।

"গান্ধীজী যখন পুরুলিয়ায় আসেন তখন তিনি আমাদের শিল্পাশ্রমে ওঠেন। উনি একটি কাগজে স্বাধীনতামন্ত্রের কথা হিন্দিতে লিখে দিয়েছিলেন আমাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যমুনালাল বাজাজ, জি. সি. কুমারাপ্পা প্রমুখ অনেকের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক পরিচয় গড়ে ওঠে। কিছুদিন ওয়ার্ধা ও সেবাগ্রামে যাই স্বামীর সঙ্গে। সেখানে মহাদেব দেশাই, মসরুওয়ালা প্রমুখ অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়।"

একটানা অনেকক্ষণ বলার পর লাবণ্যপ্রভা দেবী থামলেন। একটু উদাস ভঙ্গিতে উঠানের সবজিবাগানের দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম ঃ "এসব স্বদেশী আন্দোলন করার শক্তি আপনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন?"

শান্তগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে, গান্ধীজীর কথাবার্তা থেকে, আর রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে।"

বিনম্রভাবে বললাম ঃ "স্বামীজীর বই এখনো পড়েন?"

হেসে বললেন ঃ "হ্যাঁ বাবা। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বই পড়লে মনে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। মনের জোর বাড়ে। তাই এখনো নিয়মিত আমি 'উদ্বোধন' পড়ি। এই দেখছ না—'উদ্বোধন' পড়ছি।"

এখন সারাদিন আপনার কিভাবে কাটে—এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ "এখনো আমার অনেক কাজ। সকালের দিকে গেরস্থালির সবজি কোটা, সবজিবাগান দেখাশোনা করা। বড়ি দিতে আমার খুব ভাল লাগে। দুপুরে বিশ্রামের সময় পত্রিকা পড়ি। বই পড়ি। দেশের খবর জানার জন্য দৈনিক পত্রিকা পড়ি, 'দেশ' পত্রিকাও পড়ি। বিকালের দিকে দু-চারজন দেখা করতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে গল্পগাছা করি। মনটা হালকা হয়।"

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে প্রশ্ন করি ঃ "বঙ্গ-সত্যাগ্রহ অভিযানের কথা আপনার মনে পড়ে?"

বিদ্যুৎগতিতে তিনি বলেন ঃ "মনে পড়বে না? সেসব দিন কি ভোলা যায়?"

সবিনয়ে বললাম ঃ "বলুন না, সেসব কথা।"

লাবণ্যপ্রভা দেবী বলতে লাগলেন ঃ "দেশ স্বাধীন হলো ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। তারপর আরেক আন্দোলন শুরু হলো। বিহার সরকারের হিন্দিপ্রচার মানভূম পুরুলিয়ায় জোরদার হলো। মানভূম জেলার কোন স্কুলে বাঙলা সাইনবোর্ড টাঙানো যাবে না, তা হবে দেবনাগরী ভাষায় অর্থাৎ হিন্দিতে। যেসব স্কুল সরকারি অনুদান পায় সেখানে বাঙলা নয়, হিন্দিতে শিক্ষা দিতে হবে। তারই প্রতিবাদে এবং বাঙলাভাষার মর্যাদারক্ষার জন্য আমার স্বামী ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে লোকসেবক সঙ্ঘ গঠন করেন। শুরু হয় টুসুগানের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ আন্দোলন। জননেতা ও লোকসভার সদস্য ভজহরি মাহাতো লোকসেবক সঙ্ঘের আন্দোলনকে সমর্থন করে লিখলেন টুসুগান—

'শুন রে বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্গ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাঙলাভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড়
বাংলা-বিহার বুদ্ধিটাই।।...'

"তখন বিহার সরকার জননিরাপত্তা আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধির নানা ধারায় আমাদের গ্রেপ্তার করে। তাতে আমার স্বামী, ভজহরি মাহাতো, সাংবাদিক অশোক চৌধুরী, আমার ছেলে অরুণচন্দ্র এবং আরো অনেকের সঙ্গে আমাকেও গ্রেপ্তার করে। ওঁর বয়স তখন ৭৩ বছর। লো প্রেসার, ব্রঙ্কাইটিস। শরীর ভাল নয়। তবু তাঁকে ট্রাকের ওপর চাপিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীর মতো নিয়ে যাওয়া হয় হাজারিবাগ জেলে। ভজহরি মাহাতোকে সাধারণ অপরাধীর মতো হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে আনা হয়। তাঁরও কারাদণ্ড হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর. বি. সিং আমাকে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অশোক চৌধুরী, অরুণচন্দ্রেরও কারাদণ্ড হয়।

"তবে তাতে আন্দোলন কমলো না। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাকবিড়র্‍্যা গ্রাম থেকে লোকসেবক সঙ্ঘের নেতৃত্বে শুরু হলো ঐতিহাসিক বঙ্গ-সত্যাগ্রহ অভিযান। এক হাজারের বেশি নরনারী পদব্রজে কলকাতা অভিযান শুরু করেন। তাঁদের মুখে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। হাতে উদীয়মান সূর্য ও চরকা চিহ্নের লোকসেবক সঙ্ঘের সাদা পতাকা। মাদল, খোল, করতাল যোগে টুসুগান গাওয়া হয়। মাঝে মাঝে আমরা সবাই গাইতে থাকি 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি।

"গ্রীষ্মকালে পায়ে হেঁটে বাঁকুড়া শহর, বেলেতোড়, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, বর্ধমান শহর, মেমারি, চুঁচুড়া, চন্দননগর, উত্তরপাড়া, হাওড়া পার হয়ে ১৯৫৬ সালের ৬ মে কলকাতা ময়দানে পৌঁছে আমাদের জনসভা হয়। পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে গেলে আমাদের গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ও প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

"এসব আন্দোলনের পর ডঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বাতিল করেন। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পুরুলিয়া সদরের ষোলটি থানা পশ্চিমবাংলায় আসে। গড়ে ওঠে বর্তমান পুরুলিয়া জেলা।"

ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে শতবর্ষের অগ্নিময়ী লাবণ্যপ্রভা দেবীর মনে কি কি ভাবনা জাগছে—এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ "পঞ্চাশ বছর আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, তবু স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বহু স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেছে। দেশের চারদিকে স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িকতা, অশান্তি। তবু আমি আশাবাদী। স্বাধীনতা লাভ করেও গত পঞ্চাশ বছরে আমরা যেসব সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারিনি, সেসব সুযোগ ঠিক ঠিকভাবে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। মানুষের প্রতি চাই ভালবাসা। আর যদি সততা ও ত্যাগের সঙ্গে দেশের কাজ করা যায়, তবেই দেশে জাগবে ঐক্যের সুর, প্রীতির সম্পর্ক। তাহলেই দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আদর্শ আর ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে ভাল শিক্ষা পাবে। দেশবাসীর মনে শুভবোধ আর শুভবুদ্ধি যেন জাগে—ঈশ্বরের কাছে, ভারতমাতার কাছে এই আমার প্রার্থনা।"

আশীর্বাদে উজ্জ্বল, সাহসিনী, অগ্নিময়ী শতায়ুমতীকে প্রণাম করে সেদিনের মতো বিদায় নিলাম। ❑

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ঃ বাঙলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

চন্দনা সরকার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম ঃ ২৩ আগস্ট ১৮৯৮, মৃত্যু ঃ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১) 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বাঙলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় আঞ্চলিক সৃষ্টি। সাহিত্যে 'আঞ্চলিকতা'র যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে তা আমরা জানি। কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবেশ কেবলমাত্র একটা ফ্রেমের কাজ করে, তাকে অলঙ্করণের অতিরিক্ত কিছু বলা যায় না। আবার কখনো কখনো কোন বিশিষ্ট পটভূমি রচনায় বিশেষ ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে খানিকটা সাহায্য করে। তবে এই নির্দিষ্ট বিশেষণটি তখনি কোন শিল্পীর ওপর আরোপ করা সম্ভব, যখন বিশেষভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে, তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেই বিশিষ্ট ভিত্তিক্ষেত্রের স্বাভাবিক শস্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। আর স্থানিক সাহিত্য হয়েও রসাবেদনে তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়। ডিকেন্স আর লন্ডন যেমন এক হয়ে গেছেন। আলফঁস দোদের কথা মনে পড়লেই রৌদ্রোজ্জ্বল বর্ণবিচিত্র প্রভাঁস আমাদের চোখের সামনে ঝলমল করে ওঠে। জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' একান্তভাবেই ডাবলিনকেন্দ্রিক। টমাস হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেলস' তো স্বনামধন্য। টমাস হার্ডি তাঁর জন্মভূমি ওয়েসেক্সকেই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি—'দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ', 'জুড দ্য অবসকিওর', 'টেস অফ দ্য ডারবারভিলস' ইত্যাদিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে লিখলেও টমাস হার্ডির ঐ বিখ্যাত রচনাগুলি সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়, সে-কথা আঞ্চলিক সাহিত্য সম্পর্কে মূলকথা। বলা হয় যে, হার্ডির ওয়েসেক্স আসলে সমস্ত বিশ্ব জীবনেরই প্রতীক। ঐ একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ মানসিকতাসম্পন্ন মানুষকে কেন্দ্র করেই তিনি জগৎ ও জীবনের, মানুষের মনের মানচিত্র রচনা করেছিলেন, দিতে পেরেছিলেন তাঁর উপন্যাসে একটি 'এপিক' ব্যাপ্তি বা বৈভব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই আঞ্চলিক রচনায় একটি বিশেষ অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন হার্ডির পশ্চিম ইংল্যান্ডের মতো। এই জগৎটি হলো বাংলার রাঢ় অঞ্চল এবং প্রধানত বীরভূম জেলা। তিনি যে-অঞ্চলের মানুষ সেই অঞ্চলের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এই বিখ্যাত উপন্যাসে। তাই লেখককে জানবার জন্য তাঁর ভৌগোলিক ও মানবিক জগৎটিকে জানাও একান্ত জরুরী।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় তারাশঙ্কর যে-স্থানটিকে বেছে নিয়েছেন সেটি কোপাই নদীর মাঝামাঝি হাঁসুলী গয়নার মতো দেখতে একটি বিশেষ সীমাবদ্ধ স্থান, সেখানে অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী বাঁক নিয়েছে। চেহারায় ঠিক 'হাঁসুলী গয়নার মতো' নদীর এই বাঁকটিকে বর্ষাকালে দেখে মনে হয় 'শ্যামলা মেয়ের গলার সোনার হাঁসুলী'। আবার কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে যখন জল পরিষ্কার হয়ে আসে, তখন মনে হয় 'রূপোর হাঁসুলী'। এই জন্যই বাঁকটির নাম 'হাঁসুলী বাঁক'। এই বাঁক যেন সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে সেখানকার মানুষগুলিকে। তাদের এই ভৌগোলিক পরিবেশই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষগুলির থেকে তাদের পৃথক করে দিয়েছে।
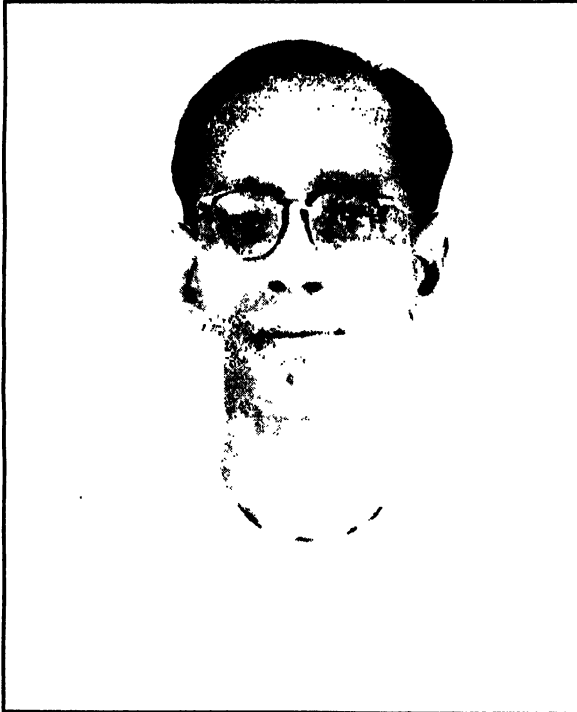
কোপাই নদীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর এদেশের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন : "এদেশ নদীর দেশ।" কোপাই নদীর চেহারা ভয়াবহ। বারটি মাস ভরা নদী বইছে। এর সঙ্গে আছে কোপাইয়ের বন্যার দুর্ভোগ। এই কোপাইয়ে দুই-তিন বছর অন্তর বন্যা আসে, যাকে এরা বলে 'জড়পা বান'। এই নদীর বানবন্যার সঙ্গে প্রতিনিয়তই লড়াই করে বাঁচতে হচ্ছে এই অঞ্চলের মানুষগুলিকে। তাই তারা বলে "নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারমাস।" পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ডাক-পুরুষের বচন সত্যি হয়ে গেছে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদী জঙ্গল গ্রামগুলিকে যেন আড়াল করে দিয়েছে। এই অন্ধকার যেন তাদের আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন মনেরই প্রতীক। এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশটিকে লেখক এভাবে তুলে ধরেছেন।

এদেশের মাটির বৈশিষ্ট্যও তিনি দেখিয়েছেন। হাঁসুলী বাঁকের দেশ আলাদা—"হাঁসুলী বাঁকের দেশ চড়াধাতের মাটির দেশ।" এদেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি। এ-মাটি হার্ডির মৃত্তিকার মতোই জীবন্ত। খরায় অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্মে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়। মাটি তখন হয়ে ওঠে পাষাণ। গাঁইতির কোপে মাটি কাটতে হয়। প্রতি কোপে "আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে"। এই নির্মম মাটির সঙ্গে প্রতিনিয়তই চলেছে এদের সংঘাত। এই মাটি যেন তাদের tragical possibilities-কেই চিহ্নিত করছে।

এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতিও আলাদা। তারা একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে বন্দী। অতীতের বিশ্বাস ও সংস্কারে তারা আচ্ছন্ন। তাদের 'প্রিমিটিভ' জীবনের পরিচয় তারাশঙ্কর খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

এই বাঁশবাঁদী অঞ্চলের লোকেরা জাতিতে কাহার। বন্য শুয়োর মেরে, নৃত্যগীত ও মদ্যপান করে তারা দিন কাটায়। মাঝে মাঝে বড় কুমীর (যাকে তারা বলে 'ঘড়িয়াল') মেরে তারা জীবনে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে আমাদের সভ্য জগতের নীতি-নিয়ন্ত্রণ, বিধি-বিধানের মিল নেই। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এদের জীবনযাত্রার আমূল পার্থক্য।

এই অঞ্চলের মানুষগুলির জীবনের মূলসূত্র গ্রামদেবতার কাছে বাঁধা। এই অভিভাবক দেবতার অলিখিত আইন তাদের মানতে হয়। তাঁর শাসনে ও স্নেহে তারা সুরক্ষিত। গ্রামের মাতব্বর বা মোড়ল হলেন এই গ্রামদেবতা 'কালারুদ্দুরে'র প্রতিনিধি। এদের ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে একধরনের 'ম্যাজিক' টোটেম বা অতিপ্রাকৃতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এক ধরনের অন্ধবিশ্বাস নিয়েই তারা জীবনযাপন করে।

এই বাঁশবাঁদীর কাহারদের জীবনে রয়েছে বৈচিত্র্যের আরো নানা দিক। তা হলো বিভিন্ন ধরনের পালাপার্বণ বা উৎসব, তাদের ধর্মীয় উৎসব বাবাঠাকুরের পূজা। তাদের অনুষ্ঠানের রূপটি লেখক উপন্যাসটিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবিবার, অমাবস্যায় ঠাকুরের পূজা হয়। "মদে-মাংসে, ঢাকে ঢোলে, আতপে চিনিতে, বস্ত্রে সিঁদুরে পূজা"। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি তাদের জীবনে এক বিশিষ্ট অঙ্গ। শিবের গাজনের বর্ণনায়ও তাদের আঞ্চলিক জীবনের ছোঁয়া পাই। গ্রামের প্রতিনিধি বনওয়ারী গাজনের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়। গজালপেটা চড়কপাটায় শুয়ে কে ডাকে—

"শিবোহে কালারুদ্দুহে, বম্ বম্ বম্...
শিব চলেন জল শয়নে, ঢাকে বাজে ড্যাড্যা ড্যাং
ড্যাড্যা ড্যাং, ড্যাং ড্যাং..."

এছাড়া এদের ধুম গাজনে, ধরমপূজায়, 'অমৃতি' অর্থাৎ অম্বুবাচীতে, বিষহরি-পূজায়, ভাদ্রমাসে ভাঁজো পরবে আর পৌষে লক্ষ্মীপূজায়। তাছাড়া মেয়েদের ব্রত তো রয়েছেই। জিতাষ্টমীতে তারা ভাঁজো সুন্দরীর পূজা করে। মদ খেয়ে মেয়ে-পুরুষে নাচে, গান গায়—

"ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো করা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।"

তাদের বিবাহোৎসবের বর্ণনায়ও আঞ্চলিক রূপটি স্পষ্ট। বাঁশবাঁদীতে বাদ্য বেজে ওঠে আর মেয়ে-পুরুষে হাততালি দিয়ে নাচে আর বলে :

"বর আসিলো, বর আসিলো
ও বউ, তুমি অঙ্গ তোল।"

এইভাবে কাহারপাড়ার দিন গেলে রাত্রি নেমে আসে। বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় 'বা-বাউলী' অর্থাৎ অপদেবতা। দপদপ করে জ্বলে বেড়ায় 'পেত্যা' অর্থাৎ আলেয়া। তারই মধ্যে কেরোসিনের ডিবে জ্বলে, কত্তাঠাকুরের নাম নিয়ে বসে তাদের 'সাধারণ মন্থর জীবনের ঠাণ্ডা মজলিশ'। এরই মধ্যে চৈত্রে আবার নতুন করে আসর বসে ঘেঁটুর গানের। সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের বোলানের গানের পালা। ঘেঁটুগান বাঁধে কাহারপাড়া আর আটপৌরে-পাড়া মিলে। এবারের গান নতুন রকমের যুদ্ধের গান :

"সাহেব লোকের লেগেছে লড়াই
ষাঁড়ের লড়াইয়ে মরে উল্খাগোড়াই
ও হায়, মরব মোরাই উল্খাগোড়াই।"

এই সমস্ত মানুষদের প্রকৃতি আছে, চরিত্র নেই। অল্পেই কাঁদে, অল্পেই হাসে। তাদের মধ্যে রয়েছে কত পুরনো গল্প, ছড়া। সেইসঙ্গে রয়েছে কত অনার্য চিন্তা-ভাবনা। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে তারা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করে। মেঘ দেখলে তাই তারা বলে : "জয় বাবা কালারুদ্দু, ত্রিশূলের খোঁচায় ম্যাঘ উড়িয়ে দাও বাবা।" অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস তাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আঞ্চলিকতার একটি প্রত্যক্ষ রূপ যেন আমরা এখানে পেয়ে যাই।

লেখকের মনোযোগ ও দৃষ্টি সবকিছুই কাহারপাড়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বাঁশবাঁদী কাহারদের গ্রামে দুটি কাহারপাড়া—বেহারা কাহার আর আটপৌরে কাহার। বেহারারা পালকি বয় আর আটপৌরেরা নিজেদের বড় বলে

জাহির করে। তারা খেতাব পেয়েছিল 'অষ্টপ্রহরী'। কাহারপাড়ার এই রক্ষণশীল অথচ ঐতিহ্যবোধহীন আটপৌরেদের সঙ্গে ঐতিহ্যবোধযুক্ত এবং কিছুটা আধুনিক কাহারদের দ্বন্দ্ব লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

রচনাটিতে 'ডায়ালেক্ট' ব্যবহারের মধ্য দিয়েও তারাশঙ্কর আঞ্চলিকতার রূপটি স্পষ্ট দেখিয়েছেন। এই 'লোক্যাল' মানুষগুলির জীবনের সজীবতার স্বতঃচাঞ্চল্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বনওয়ারী, করালী, পাখি, সুচাঁদ, নয়ান—সবাইকে মিলে তিনি একটি গোটা সমাজের 'এক্সপ্যানশন'কে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাদের উপকথাগুলি গ্রামজীবনেরই কথা, এগুলি রূপকথা বা অলৌকিক নয়। এদের সব কাহিনীই হয়তো বিশ্বাস উৎপাদন করে না। কেননা অনেক সময়ই অতিপ্রাকৃত ভাব তাদের মোহগ্রস্ত করে তোলে, তবুও তাদের কথাগুলি এমন অনায়াসে উচ্চারিত যে, স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তাদের অর্থনৈতিক পরিবেশ, তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম, চালচলন, শব্দ ব্যবহারের ভঙ্গি—সবকিছুর মধ্যেই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। পালকি চলার ঘোরে তারা যখন কথা বলে তখন তাদের ভাষা হয় উদাস। তাদের সব কথার হয়তো বাস্তব ভিত্তি নেই, কিন্তু এই উপকথাগুলিই লোককথা। একটি লৌকিক সমাজের 'চেহারা' এখানে আমরা পেয়ে যাই। যদিও তাদের অতীত রহস্যাচ্ছন্ন তবুও স্মৃতি আস্বাদনের রোমাঞ্চের মধ্যে ফুটে ওঠে তাদের বহমান জীবনের সহজ, সরল, ঋজু প্রকাশ।

এইভাবে সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে তারাশঙ্কর প্রথম থেকেই একটি আঞ্চলিক ঐতিহ্য রক্ষা করে গেছেন; বহিরঙ্গই এই মানুষগুলির জীবনের চরম রূপ নয়, তাদের প্রাণের নেপথ্যে যে স্নেহ-প্রেমের ফল্গুধারা বইছে—তার পরিচয়েও মানুষগুলি হয়ে উঠেছে যথার্থ। এইসঙ্গে রচনাটির মধ্যে ঘটেছে লেখকের অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যের মিলন। ফলে সব মিলিয়ে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' অনায়াসেই একটি বিশুদ্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে বাঙলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ❑

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সহিত কথোপকথন

স্বামী ধীরেশানন্দ

এলাহাবাদ, ১৬ মে ১৯২৮। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে আমার প্রথম দর্শন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদের দর্শন খুব সৌভাগ্যের কথা, সন্দেহ নেই। তিনি আমায় কত যত্ন করে খাওয়ালেন, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন ঃ "দেখ, বাবুগিরি করো না। খুব সাদাসিধেভাবে, যেটা না হলে নয়, এরকমভাবে চলবে। জুতো, জামা, কাপড় সবই পরবে, কিন্তু খুব সাদাসিধে। যতটা পারলে তাঁর কাজ করলে, বাকি সাধন-ভজন করলে। যদি পার তো কোন লোকের খানিকটা উপকার করলে।"

রাত্রিতে আবার যখন তাঁর সঙ্গে বসার সুযোগ হলো তখন অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন ঃ "আচ্ছা, তোমার কথা কিছু বল। মিশন-এ এসে তোমার কী experience (অভিজ্ঞতা) হলো? কিছু আনন্দ পাচ্ছ?"

আমি বললাম ঃ "আজ্ঞে, রিপুর উত্তেজনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যে একটা শান্তি পাওয়া যায়, তার কিছু তো হলো না। এটার অভাব বোধ করি।"

বিজ্ঞান মহারাজ বললেন ঃ "ওটা বড় শক্ত। ধীরে ধীরে হয়। অনেক চেষ্টার পর অনেক কাঠ-খড় পোড়ালে তারপর হয়। কত জন্মের সংস্কার রয়েছে। চেষ্টা করে করে সাধন-ভজনের দ্বারা সেগুলি ক্রমশ কমে যায়। একেবারে যায় না, তবে সেগুলির আধিপত্য কমে যায়। শরীরের উত্তেজনা একটু হবেই। তবে দেখতে হবে thought (চিন্তা)-এর purification (শুদ্ধি) হচ্ছে কিনা। Thought যেন সর্বদা শুদ্ধ থাকে। সর্বদা সৎচিন্তা করতে হয়। চিন্তার শুদ্ধি না হলে কিছু হবে না। শরীরের ধর্ম তো থাকবেই। ধ্যান-জপাদি কর। ওগুলি ক্রমে ক্রমে চলে যাবে বা কমে যাবে। আচ্ছা, তুমি এসব কথা শিবানন্দ স্বামীকে কেন জিজ্ঞাসা কর না?"

আমি বললাম ঃ "আজ্ঞে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনিও বলেন, 'ঠাকুরকে ডাক, খুব ধ্যান-জপ কর, তাহলেই ওসব কমে যাবে।' "

বিজ্ঞান মহারাজ বললেন ঃ "তাতেও যদি বেড়ে যায়?"

আমি বললাম ঃ "তিনি বলেছেন, 'তাহলে আরো বেশি ঠাকুরকে ডাকবে, ধ্যান-জপ করবে।' " বিজ্ঞান মহারাজ বললেন ঃ "হ্যাঁ, প্রথমটা মনে হয় বেড়ে যায়, কিন্তু পরে কমে যায়। আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে নেই। কত সব সাধু... দ্যাখ না, পাঁচ মিনিট ধ্যান—ব্যস! বেশি করতে বল, পারবে না। দিন-রাত কেবল আড্ডা আর গল্প! সব educated (শিক্ষিত) লোক, তবু কাজে ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়ে না।"

১৭ মে। সকাল ১০.৩০ মিনিট। বিজ্ঞান মহারাজ বললেন ঃ "আচ্ছা, তোমার পূজাতে বিশ্বাস আছে? ইউরোপ, আমেরিকায় মানুষ খুব পূজা করে।"

আমি বললাম ঃ "কিরকম?"

বিজ্ঞান মহারাজ বললেন ঃ "ওরা জীবন্তের পূজা করছে। তাই ওরা জীবন পাচ্ছে। আর আমাদের দ্যাখ না, মৃতের পূজা করছে তাই মৃত হয়ে যাচ্ছে। মৃতের পূজা করলে মৃত হয়ে যায়। ঐ ঘটা করে একটু একটু করে জল ঢালছে। কি হচ্ছে? না, পিতৃপুরুষদের দিচ্ছে! কী ভ্রান্ত! সে-জল হয় নদীতে, না হয় কুয়োয় পড়ে গেল। সে-জল তারা পাবে কি করে? কুসংস্কার! জীবন্তের পূজা করতে হবে। ভারতের লোকদের কথার, কাজের, সময়ের কিছু ঠিক নেই। Time (সময়), space (স্থান) -এর কোন কিছু ঠিক নেই। সব মুক্ত পুরুষ কিনা! তাই time, space, causation (কার্য-কারণ সম্বন্ধ)-এর বাইরে গেছে! একটুও punctuality (নিয়মানুবর্তিতা) নেই। ঠাকুর এটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। একবার একজন লোক এসেছে। ফিরে যাওয়ার সময় ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে, আবার কবে আসছ?' ঠাকুর এরকম জিজ্ঞাসা করতেন। সে বলল, 'আজ্ঞে অমুক দিন আসব।' ঠাকুর সেদিন সেই সময় তাকে expect (আশা) করছেন। একেবারে ছটফট করছেন। কিন্তু লোকটির দেখা নেই। তার কয়েকদিন পর লোকটি এলে ঠাকুর তাকে বললেন, 'কি হে, সেদিন আসবে বলেছিলে। এলে না যে! বৌ কোঁচার খুঁট ধরে টেনেছিল বুঝি?' লোকটি তো একেবারে অবাক। বললে, 'মশাই, আমাদের ঘরের খবর আপনি জানলেন কি করে?'

"আমাদের মধ্যে স্বামীজীর কথা-কাজ ঠিক সাহেবদের মতো ছিল। শরৎ মহারাজ পারতপক্ষে কথার বেঠিক করতেন না। কিন্তু মহারাজের কিছু ঠিক ছিল না। হয়তো কাউকে বললেন যে, অমুকদিন তোমাদের ওখানে যাব। সেদিন সে এসে বসে আছে। তিনি হয়তো বললেন, 'আজ পেটটা কেমন কেমন

করছে।' কেন এরকম করেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'ওর মনটা তত ঠিক নয়।' আমি আগে কথার খুব ঠিক রাখতাম, এখন আর পারি না। কাজেই বলি, 'চেষ্টা করব', 'ঠিক নেই যেতেও পারি' ইত্যাদি।"

১৭ মে ১৯২৮। রাত্রি ১০টা। বিজ্ঞান মহারাজ বললেন: "ধনী মানুষ অনেক খাবার নিয়ে এলে বা কিছু নিয়ে এলে কেউ হয়তো বলবে খুব ভক্ত। কিন্তু যে গরিব, অনেক কষ্টে কয়েকটা টাকা খরচ করে সামান্য কিছু নিয়ে আসে—সেই হলো ঠিক ভক্ত। যে কিছুই নিয়ে আসে না সে ভক্ত নয়। জিহ্বা ও উদরের সংযম নিতান্ত দরকার। কিজন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসা, সাধুদের তা মনে রাখতে হবে। নইলে পরে সেসব কিছুই ঠিক থাকে না। কুঁড়ে হয়ে যায়। কোনরকমে দিনটা আমোদে-আহ্লাদে, খেয়েদেয়ে কেটে যায়। জোয়ান বয়সে কিছু করে না নিলে বুড়ো বয়সে কিছু হওয়ার উপায় নেই। এই ধর ২৫ থেকে ৫০—এই ২৫ বছর যদি সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে নিয়মিতভাবে ভগবানের নাম করে যাও তবেই বাঁচোয়া। বন্ধন থেকে উদ্ধার পেতে হলে খুব চেষ্টার দরকার। This world will always cheat you. This body is greatly antagonistic to the path of realising the Truth. It will always cheat you. Passion (কামনা-বাসনা)-র হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে সময়মত প্রচুর চেষ্টা করা দরকার। নইলে বুড়ো বয়সে খুব কষ্ট হবে। মনে হবে, তাই তো, করলাম কি? বুঝলে? মঠে তোমাদের এসব সম্বন্ধে কেউ কিছু বলে না?" আমি বললাম: "আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাপুরুষজী বলেন যে, 'কাজ ও সাধন-ভজন—দুটোই মিলিয়ে মিশিয়ে করে যাও। ধ্যান-জপ বাদ দিলে কিছুই হবে না।' " বিজ্ঞান মহারাজ বললেন: "কিন্তু কি জান, কাজের চিন্তা থাকলে ধ্যানের সময়েও ঐসব চিন্তা হয়?... বড় শক্ত। কিন্তু বুঝলে, কাজ কিছু কিছু করা ভাল। ২-৪ ঘণ্টা কাজ করলাম, বাকি সময়টা নিজের সাধন-ভজন নিয়ে রইলাম। এ তো বেশ। এতে বেশ সমাজের একটু সেবাও করলাম অথচ নিজের কাজও (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ) করছি। এই বেশ। তুমি একটু একটু [হোমিওপ্যাথিক] ওষুধপত্র দেওয়া শিখে নেবে। বুঝলে? Then you will be a useful member of the society. দু-চারখানা ছোট বই পড়ে ওখানে একটু-আধটু ওষুধ দিতে শিখে নেবে। মঠের যে এখানে আসে তাকেই আমি একথা বলি। বুড়ো বয়সে আমিও শিখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর মনে থাকে না। তোমাদের অল্প বয়স। বুদ্ধি আছে। শিখে নেবে। ওতে লোকের সেবা হবে।"

আমি বললাম: "আজ্ঞে হ্যাঁ, শিখে নেব।" ❑

সৌজন্যে: স্বামী চেতনানন্দ

গাজীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"আর দিনকয়েক বাদে এস্থানে বড় শোভা হইবে—ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী গোলাপফুলের মাঠে ফুল ফুটিবে।" পদ্মফুলের মতো ভাসমান, রবিকিরণের মতো উজ্জ্বল দুটি চোখ, হাতে বিশাল একটি দণ্ড, শক্ত মুঠি, প্রশস্ত বক্ষদেশ, দৃঢ় দুটি চোয়াল, গৈরিকধারী দিব্য এক সন্ন্যাসী গাজীপুরের গোরাবাজারের পথ ধরে ধীর পদে হেঁটে চলেছেন। শীত এবার শেষ হবে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি।

সময় সময়ের নিয়মেই শতাধিক বর্ষের অতীতে সরে গেছে। তা যাক। ভক্তকে সময় বাঁধতে পারে না। স্মরণমাত্রেই স্মরণাতীতের আবির্ভাব।

অনুসরণ করি সেই একলা সিংহকে। সতীশবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলেছেন রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়ের বাড়ির দিকে। সম্মানিত, সাহেবধর্মী মানুষের এই পল্লীতে কে এই সন্ন্যাসী! তা আসেন অমন অনেকে। ১৮৯০-র ভারত। প্রাচীন যোগধর্মের ভূমিতে ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে পাশ্চাত্যের ভোগবাদের দারুমিশ্রিত জল ঢালা হচ্ছে। রাতবিরেতে দিশি ভেকের ডাকাডাকি। তবু এক সাধকের আকর্ষণে ভারতের সাধকরা এখানে আসেন। ঐ তো, শহরের দু-মাইল উত্তরে নদীতীরে তাঁর কুঠিয়া এবং গুহা। শরীরধারণের জন্য তিনি যা আহার করেন, তা অতি অদ্ভুত—এক মুঠো নিমপাতা অথবা গোটা কয়েক লঙ্কা। অর্থাৎ তিনি পবন আহারী। তাই তাঁর স্থানীয় নাম 'পওহারী বাবা'!

সিংহবিক্রম এই রাজসন্ন্যাসী, কয়েক বছর পরেই যিনি হবেন বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি কেন তাঁর বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আলয় ছেড়ে গগনচন্দ্রের বাংলোয় চলেছেন। ডাকবাক্সে একটি চিঠি ফেললেন। দূরে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার হাঁটা শুরু করলেন। ঐ চিঠির মধ্যেই আছে কারণ। কেন তিনি গাজীপুরে! চিঠিটি লিখছেন সেই 'প্রাণাধিকেষু'কে, পরবর্তী কালে যাঁর সন্ন্যাসনাম হবে স্বামী অখণ্ডানন্দ। সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাকে লিখছেন নরেন্দ্রনাথ —"এখানে পওহারীজী নামক যে অদ্ভুত যোগী ও ভক্ত আছেন, এক্ষণে তাঁহারই কাছে রহিয়াছি। ইনি ঘরের বাহির হন না—দ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্তা কহেন। ঘরের মধ্যে এক গর্ত আছে, তন্মধ্যে বাস করেন। শুনিতে পাই, ইনি মাস মাস সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। ইঁহার তিতিক্ষা বড়ই অদ্ভুত। আমাদের বাঙলা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল বদখত দমটানা ইত্যাদি হঠযোগ—তা তো gymnastics (কসরত)। এইজন্য এই অদ্ভুত রাজযোগীর নিকট রহিয়াছি—ইনি কতক আশাও দিয়াছেন।"

চিঠিটি মনে হয় গত রাতে লিখেছেন, নির্জনে বসে। তখন বাতাসে উত্তর ভারতীয় শীতের কামড় না থাকলেও একটা শীত শীত ভাব ছিল। পরিব্রাজকের রিক্ততাই ভূষণ। পরিধানে একটি পুরোহাতা পশমের গেঞ্জি, গৈরিক উত্তরীয়। ছোট একটি টেবিল। মৃদু একটি আলো। সামনের জানলায় উত্তর ভারতের তারাভরা আকাশ। বহুদূরে কলকাতা, বরানগরের জীর্ণ মঠ, সিমুলিয়ার বাড়ি। এদিকে দক্ষিণেশ্বর, ওদিকে গুরুর প্রয়াণভূমি কাশীপুর উদ্যানবাটী। ত্যাগ। সমস্ত ত্যাগ। কলকাতার সমাজ, কলকাতার জীবন, যশ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা। কত মানুষের কতপ্রকারের অন্বেষণ, এমন অন্বেষণ কার আছে—ধন নয়, অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয়, পদমর্যাদা নয়। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী এক সুদর্শন যুবকের যে-পথে চলা উচিত, সে-পথ নরেন্দ্রনাথের নয়। তাঁর পথ সোজা নয়, খাড়া। তিনি উঠতে চান··· আরোহণ। সেই মোহনায় উঠতে চান, যেখানে জীবাত্মা আর পরমাত্মায় মিলন হয়। এই গাজীপুর নরেন্দ্রনাথের সঙ্কল্প-ভূমি, রকেটের লাঞ্চিং-প্যাড। "বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন —'জগতে দুঃখ, দুঃখ, পালাও, পালাও।' সুখ কি একেবারে নাই!" বুদ্ধ আর কপিল বলছেন, কেবলই দুঃখ, আবার ব্রাহ্মরা বলছেন, সব সুখ। দুটোর মধ্যে কোনটাতেই প্রকৃত জগদ্দর্শন নেই। নরেন্দ্রনাথ দুঃখকে ভয় পান না। সুখের ছলনায় বিভ্রান্ত হন না। "সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।" সত্য যা তা হলো—"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী"। মানুষ, ভীরু মানুষ "মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।/প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী।।/মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে।/মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে।।"

গঙ্গাধর ভায়া! "কেহ যদি বলে যে সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে দুঃখকেই সুখ বোধ হইবে? শঙ্কর এদিক দিয়ে যান না, তিনি বলেন, 'সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি'—আছে অথচ নেই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য আমি জানিব। দুঃখ আছে কি কী আছে, জুজুর ভয়ে আমি পালাই না। আমি জানিব, জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ তা তো প্রাণভরে গ্রহণ করিতেছি; আমি কি পশু যে ইন্দ্রিয়জনিত সুখ-দুঃখ, জরা-মরণ ভয় দেখাও?" গুরুদেব আমাকে দর্শন করিয়েছেন কৃপাসিন্ধু হয়ে। চৈতন্যে জরে আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তিনি কণ্টকাকীর্ণ চলার পথকে সহজ করার জন্য পরিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানপাদুকা। "আমি জানিব—জানিবার জন্য জান দিব। এজগতে জানিবার কিছুই নাই, অতএব যদি এই relative-এর (মায়িক জগতের) পর কিছু থাকে—যাকে শ্রীবুদ্ধ 'প্রজ্ঞাপারম্' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—যদি থাকে, তাহাই চাই। তাহাতে দুঃখ আসে বা

সুখ আসে I do not care (আমি গ্রাহ্য করি না)।"

জগতে থেকে, অনিত্য থেকে নিত্যের সন্ধান। সেই শক্তির সন্ধান, যা আর কয়েকদিন পরেই রাশি রাশি গোলাপ হয়ে ফুটবে এবং আবার ঝরবে। মৃত পত্র বৃক্ষে বৃক্ষে নবপত্রোদ্গম সম্ভব করবে। যে-শক্তির মধ্যে বিকাশ, ক্ষয় ও লয় গাণিতিক অভ্রান্তিতে নিহিত।

স্বামীজী যখন তন্ময় হয়ে লিখছেন, তখন যেন নিজের মনকে সামনে টেবিলের ওপর স্বতন্ত্রভাবে দেখতে পাচ্ছেন। গড়ে উঠছে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। বসে আছেন, কিন্তু অনুভব করতে পারছেন কোমরের বাত গত দুমাস ধরে বড় ভোগাচ্ছে। দেহ থাকলেই ভোগাবে, মনে পড়ছে গুরুর শেষ কয়েক মাসের দেহকষ্ট। তিনি বলতেন—'হাড়-মাসের খাঁচা'। প্রাণপাখির তাতে কি যায় আসে!

আর কয়েক ছত্রেই পত্র শেষ হবে। রাত এখন যথেষ্ট গভীর। লিখলেন ঃ "আমার motto (মূলমন্ত্র) এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরানগরের অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐকথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদ্‌গুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।"

কোথায় আছেন স্বামীজী কাকেও জানাতে চান না। একমাত্র গঙ্গাধরভাইকে জানানো যেতে পারে। "তুমি যদি গাজীপুরে আইস, গোরাবাজারের সতীশবাবু অথবা গগনবাবুর নিকট আসিলেই আমার সন্ধান পাইবে। অথবা পওহারী বাবা এত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যে, ইঁহার নামমাত্রেই সকলে বলিবে এবং তাঁহার আশ্রমে যাইয়া পরমহংসজীর খোঁজ করিলেই সকলে বলিয়া দিবে।" আবার সাবধান করছেন—"আমি গাজীপুরে আছি, একথা বরাহনগরে কাহাকেও লিখিও না।"

স্বামীজী চারপাশে তাকাতে তাকাতে ধীরে ধীরে হাঁটছেন। বড় প্রসন্ন সকাল। যেখানে এত গোলাপ, যেখানে তৈরি হয় বিখ্যাত গোলাপজল—সেখানকার শিক্ষিত মানুষদের চরিত্রে কেন সৌরভ নেই! বড়ই স্বধর্মবিমুখ। পাশ্চাত্য জড়বাদে প্রভাবিত। "এস্থানের সকলই ভাল, বাবুরা অতি ভদ্র, কিন্তু বড় westernized (পাশ্চাত্যভাবাপন্ন); আর দুঃখের বিষয় যে, আমি western idea (পাশ্চাত্যভাব) মাত্রেরই উপর খড়্গহস্ত।... কি কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গী আনিয়াছে! কি materialistic (জড়ভাবের) ধাঁধাই লাগাইয়াছে। বিশ্বনাথ এইসকল দুর্বল-হৃদয়কে রক্ষা করুন।... ভগবান শুকের জন্মভূমিতে আজি বৈরাগ্যকে লোকে পাগলামি ও পাপ মনে করে! অহো ভাগ্য!"

তবে "গগনচন্দ্র রায় নামক এক বাবু—আফিম অফিসের head (বড়বাবু), যৎপরোনাস্তি ভদ্র, পরোপকারী ও social (মিশুক)।" বাড়িতে নিয়মিত ধর্মসভা হয়। গগনবাবুই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পওহারী বাবার সঙ্গে। স্বামীজী গগনবাবুর উদ্যানশোভিত বাংলোয় প্রবেশ করলেন। গোলাপের সমারোহ। সাদা, লাল, ক্রিম। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণও উদ্যান ভালবাসতেন। দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে প্রাতে ফুলের সমারোহে দেবশিশুর মতো আনন্দে বিচরণ করতেন। এবছর তাঁর জন্মদিনে প্রচুর গোলাপ পাঠাতে হবে কলকাতায়।

অদূরেই পওহারী বাবার আশ্রম। স্বামীজী এর আগেই একবার দেখেছেন—"অতি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান-সমন্বিত এবং চিমনিদ্বয়-শোভিত", "ইংরেজদের বাংলোর মতো,... বড় বড় ঘর"। এই উদ্যানবাটীর কাছে গঙ্গার ধারে একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গের ভিতর বাবাজী সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। ভেতরে কারো প্রবেশাধিকার নেই।

ঠাকুরের যেমন হৃদয় ছিলেন, "এঁরও একজন 'হৃদে' আছে —সেও বাটিতে ঢুকিতে পায় না। তবে হৃদের মতো নহে।" বাংলোর ধাপে বসে গোলাপের শোভা দেখতে দেখতে স্বামীজী ভাবছেন, দিনের পর দিন যাচ্ছি, অপেক্ষা করে করে খানিক হিম খেয়ে ফিরে আসছি! কিছুতেই দেখা হচ্ছে না। কি করব! ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব! নরেন্দ্রনাথ তো পিছতে শেখেননি। তাঁর মন্ত্র তো onward, onward। অসম্ভব বলে তাঁর কাছে নেই কিছু। অতএব, ছোট্ট বাগানঘেরা এই সুন্দর বাংলোয় কিছুকাল বসবাস। বাবাজীর কুটীর কাছেই: "বাবাজীর একজন দাদা ঐখানে সাধুদের সৎকারের জন্য থাকে, সেই স্থানেই ভিক্ষে করিব।" কিন্তু শরীর! বড় বিদ্রোহী। দুমাস হতে চলল কোমরের ব্যথা আর সারে না, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পেট। কিসের শরীর! আত্মার আবার অসুখ কী!

স্বামীজী আবার উঠে পড়লেন। বাবাজীর কুটীরের দিকে চললেন। চলেছেন যেন সাক্ষাৎ শিব! সেই বহুকাঙ্ক্ষিত মিলন সম্ভব হলো। না, এই অভিজ্ঞতা তো জানাতে হবে সর্বাধিক বোধ্যা কোন প্রিয়জনকে! তিনি প্রমদাবাবু। "পূজ্যপাদেষু,... বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হয়েছে। ইনি অতি মহাপুরুষ... এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না।... ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না।" বলরামবাবুকে এই কথাটি অবশ্যই জানানো দরকার—"অতি আশ্চর্য মহাত্মা! বিনয় ভক্তি এবং যোগমূর্তি। আচারী বৈষ্ণব কিন্তু দ্বেষবুদ্ধিরহিত। মহাপ্রভুতে বড় ভক্তি। পরমহংস মহাশয়কে বলেন 'এক অবতার থে'।... ইনি ২-৬ মাস একাক্রমে সমাধিস্থ থাকেন। বাঙলা পড়িতে পারেন। পরমহংস মশায়ের photograph রাখিয়াছেন। সাক্ষাৎ এখন হয় না। দ্বারের আড়াল থেকে কথা কহেন। এমন মিষ্ট কথা কখনো শুনি নাই।"

সেই সমাধি! পরমহংস মহাশয় চাবি কেড়ে রেখেছেন।

গগনবাবুর নির্জন বাংলো। গভীর রাত। শুয়ে আছেন স্বামীজী একটি ঘরে। চারপাশে গোলাপের বাগান। অদূরে গঙ্গা। পওহারী বাবার অলৌকিক সাধনক্ষেত্র অন্ধকারে থম মেরে আছে। রহস্যময় অদৃশ্য সেই সাধক গুহায় ধ্যানাসীন। স্বামীজী দীক্ষার দিন পেয়ে গেছেন। সেই বহুকাঙ্ক্ষিত যোগমার্গে এইবার নরেন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু। অনন্তের কালহীন অসীমে সত্তার বিসর্জন।

এই সুরে কোথাও একটা বেসুর আছে। একটা অস্বস্তি। কি সেটা! নিশ্চিন্ত আরামের প্রহরে দূরাগত সানাইয়ের বিষণ্ণ সুর। নিশ্ছিদ্র সেই অন্ধকারে হঠাৎ আলোর উদ্ভাস! ঘরের একপ্রান্তে একটি জ্যোতির্বলয়। স্বামীজী বিস্ফারিত চোখে দেখছেন, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সশরীরে উপস্থিত। উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে সেই অলৌকিক স্নেহ, নিষ্পলক দৃষ্টি, অশ্রু ছলছল, কোন কথা নেই, কোন তিরস্কার নেই, শুধু অপলকে তাকিয়ে।

নরেন্দ্রনাথ উঠে বসলেন নিঃশব্দে। সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত, ঘন ঘন কম্পিত। গলা শুষ্ক। কিছু বলতে চান, কিন্তু বাক্‌স্ফূর্তি হচ্ছে না। অবশেষে ঠাকুর অদৃশ্য হলেন। এইবার একা নরেন্দ্রনাথ আত্মসমীক্ষায়। মন আত্মগ্লানিতে পূর্ণ। বিশাল দুটি নয়নে অবিরল অশ্রুধারা।

পেছিয়ে দিলেন দীক্ষার দিন। "কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্বনাশ করিতেছে। একটুকুতেই এলাইয়া যাই...।" না, দীক্ষা আমাকে নিতেই হবে। আবার দিন ঠিক। আবার প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। পর পর একুশ দিন।

"শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছলছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।"

গোলাপ ফুটেছে এবার। সব কুঁড়ি প্রস্ফুটিত। ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী বহুবর্ণের গোলাপ। গোলাপ আর গোলাপ। যেন শত শত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমসুরভিত মুখ। জীবনের সমস্ত সাধন-সৌন্দর্য ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না।" আমার তিনিই সব। আমার জীবনের ধ্রুবতারা। "রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই।"

"দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।"

"দাস তব প্রস্তুত সতত সাধিতে তোমার কাজ।" "হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবান!" বিদায় গাজীপুর। নরেন্দ্রনাথ চলেছেন। Roses—roses all the way. পওহারীজী দুটি তত্ত্ব দিয়েছেন—"যন সাধন তন্ সিদ্ধি।" আর বলেছেন—**"গুরুকে ঘরমে গৌকা মাফিক পড়া রহো"**। গুরু—শ্রীরামকৃষ্ণ! ❑

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
—কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

'A Text Book of Homoeopathic Materia Medica Elaborated with Illustrations' গ্রন্থের লেখক, পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে দশ বছর অধ্যাপনা এবং ত্রিশ বছর চিকিৎসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা জানাতে ধারাবাহিক লিখছেন। তাঁর ধারণা, এতে সাধারণ অসুস্থতা ও অসুখ-বিসুখ এড়ানো সম্ভব হবে এবং ফলত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

❑ প্রাতর্ভ্রমণের পর এক কাপ গরম জল, এক চামচ মধু এবং কয়েক ফোঁটা লেবুর রস সহ পান করলে উপকার পাওয়া যাবে। এতে দেহে-মনে সতেজতা আসে, অতিরিক্ত চর্বি কমায়।

❑ প্রাতর্ভ্রমণের আধঘণ্টা পর প্রাতরাশ করা উচিত। প্রাতরাশের সময় অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ বা চীনেবাদাম খাওয়া উচিত। স্বাদ পালটানোর জন্য মাঝে মাঝে ছোলাসিদ্ধ, মুগসিদ্ধও খাওয়া যেতে পারে। মুড়ি, হাতে-গড়া আটার রুটি, সুসিদ্ধ সবজি, দুধ প্রাতরাশে যেন থাকে। সম্ভব হলে একটি অর্ধসিদ্ধ ডিম প্রাতরাশে খেতে পারলে ভাল। প্রাতরাশে দু-একটি ফল যেন অবশ্যই থাকে, যেমন কলা, সফেদা, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি। সপ্তাহে একদিন বাড়িতে তৈরি আটার লুচি বা পরটা খাওয়া যেতে পারে। যথাসম্ভব পাউরুটি, কেক, চপ, সিঙ্গারা, কচুরি ইত্যাদি বর্জনীয়।

❑ খাওয়ার পরিমাণ পরিমিত হতে হবে। যতটুকু খেলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবে তার বেশি খাওয়া উচিত নয়। খাওয়ার পর যেন শরীরে ভার-বোধ না হয়, খাওয়ার পরেও যেন হালকা বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ থাকে।

❑ প্রাতরাশের আধঘণ্টা পর জল পান করা উচিত। খাওয়ার সময় জল পান করা একটি ক্ষতিকর অভ্যাস।

❑ বারবার চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস মোটেই স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয়। প্রাতরাশের পর এক কাপ হালকা লিকার-চা খেতে পারেন। বারবার চা খেলে লিভার খারাপ হতে পারে। তাছাড়া ক্ষুধামান্দ্য-সহ পাকস্থলীর অন্যান্য ব্যাধিও হওয়ার সম্ভাবনা। কফি না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অ-সাধারণ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, অদ্ভুত তাঁর মতবাদ

জলধিকুমার সরকার

'কথামৃত'-এ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চরিত্র বহু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ তা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে সমাগত অন্যান্যদের থেকে আলাদা। মহেন্দ্রলাল কলকাতা মেডিকেল কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. পাস করার পর একজন দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে সদস্য নির্বাচিত হন। প্রথমদিকে তিনি ঘোর হোমিওপ্যাথি-বিদ্বেষী ছিলেন এবং কঠিন মন্তব্য লিখবেন স্থির করে একটি হোমিওপ্যাথি গ্রন্থের সমালোচনা করার কথা ভাবেন, কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থটি পড়ে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের অনুরাগী হয়ে যান। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ছেড়ে তিনি নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন এবং অল্পদিনেই ঐ চিকিৎসক-শ্রেণীর শীর্ষে ওঠেন। হোমিওচিকিৎসায় রত থেকেও সারা ভারতে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসভা (Indian Association for Cultivation of Science) স্থাপন করেন (উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার' দ্রষ্টব্য)। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করতেন মন-মুখ এক করা মানুষ হিসাবে, অবতার হিসাবে নয়। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তবে অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় কথায় পুরোপুরি সায় না থাকলেও এবং তাঁকে অন্যরা অবতার বলায় বিরক্ত হলেও তাঁর কাছে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে যেতেন। তিনি গম্ভীর স্বভাবের হলেও হাসিঠাট্টা গান উপভোগ করতেন। তাঁর মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় ছিল তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা—নিজে যা ভাল বুঝবেন তা করা এবং আপন মত প্রকাশ্যে বলা। হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হওয়ার পর তিনি নিজে আগে ওষুধ তৈরি করে এবং রোগীদের ওপর তা প্রয়োগ করে তবে ঐ শাস্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন।

সকলেই জানেন, মহেন্দ্রলাল অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ছেড়ে হোমিও-চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা আর করেননি। এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

একটু মূলতত্ত্বে আসা যাক। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এবং এর প্রবর্তক হিসাবে কারো নাম পাওয়া যায় না। চিকিৎসকরা নিজেদের 'অ্যালোপ্যাথ' বলতেন না, কারণ 'অ্যালোপ্যাথি' কথাটি তখনো প্রচলিত ছিল না। পরবর্তী কালে হোমিওপ্যাথরাই নিজেদের আলাদা গোষ্ঠী হিসাবে দেখাবার জন্য কথাটির প্রবর্তন করেন। হ্যানিম্যান ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে হোমিও-চিকিৎসাপদ্ধতি ঘোষণা করেন যার মূলতত্ত্ব হলো—'সমলক্ষণ প্রকাশক দ্রব্য সমলক্ষণযুক্ত অসুখের আরোগ্যকারক' (Similia similibus curuntur), যা তৎকালীন প্রচলিত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতি—'বিপরীত লক্ষণ প্রকাশক দ্রব্য বিপরীত লক্ষণযুক্ত অসুখের আরোগ্যকারক' (Contraria contraris curuntur)-এর বিপরীত। এছাড়া ডোজ বা ওষুধের মাত্রা নিয়ে এবং আরো কয়েকটি বিষয়ে নতুন ও পুরনো চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে (দ্রঃ 'উদ্বোধন', ১০০তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫, পৃঃ ৩৫০-৩৫২)। এগুলির একটি হলো - হোমিও-চিকিৎসায় ওষুধের নিম্নমাত্রায় এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (infinitesimal) মাত্রায় কার্যকারিতা আছে বলা হয়, যা অ্যালোপ্যাথরা স্বীকার করেন না।

মহেন্দ্রলাল হোমিও-চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকে (এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে) বিতাড়িত হওয়ায় 'ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল' এবং 'ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট'-এ তাঁর রচনা প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তিনি নিজ সম্পাদনায় ১৮৬৮ সালের জানুয়ারিতে 'ক্যালকাটা মেডিকেল জার্নাল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। পত্রিকার প্রথম বর্ষের বারটি সংখ্যায় অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে মহেন্দ্রলালের কি মনোভাব ছিল, সেই সম্পর্কিত অংশগুলি তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'আমাদের মতবাদ' (Our creed) শিরোনামায় তিনি লিখেছেন ঃ "চিকিৎসাশাস্ত্র যতটা অজ্ঞতার মেঘে ঢাকা রয়েছে, ততটা আর কোন শাস্ত্র নয়।... যে-শাস্ত্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য সৃষ্ট তারই অনুসরণকারীরা একে অপরকে দোষারোপ করছে।... কিন্তু আমরা যেন ভান করি না যে, জ্ঞানের চাবিকাঠি কেবল আমাদের হাতেই আছে। আমরা যেসব অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না কিংবা যেগুলি আমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না, তাদের আমরা অগ্রাহ্য করব না। তাদের আমরা আরো খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করব যাতে সেগুলি আমাদের গোঁড়ামিকে দূর করে। সেজন্য 'সমলক্ষণ প্রকাশক দ্রব্য সমলক্ষণযুক্ত অসুখের আরোগ্যকারক' মতকে (যেটি হোমিওপ্যাথির ভিত্তি) যদিও ওষুধ নির্বাচনে বর্তমানে সবচেয়ে ভাল উপায় বলে মনে করি, কিন্তু তাকে এবিষয়ে শেষকথা বলে ধরব না।

এবিষয় রোগ আরোগ্যের অন্যান্য যেসব পন্থা আছে, তাদের আমরা অগ্রাহ্য করব না। ওষুধের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (infinitesimal) মাত্রা ব্যবহারে উপকার হয় স্বীকার করলেও বৃহৎ মাত্রায় (যেমন অ্যালোপ্যাথিতে) যে কাজ হয় না বা তাতে কেবল শরীরে ক্ষতিই হয় তা বলব না। আমরা একটিমাত্র ওষুধ ব্যবহারই (যেমন হোমিওপ্যাথি-মতে) বেশি পছন্দ করি, তবে তার পরিবর্তন বা সঙ্গে অন্য ওষুধ দেওয়াতে কোন কোন রোগী যে আরোগ্যলাভ করে না, তাও জোর করে বলি না। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতিতে অদ্ভুত আরোগ্যলাভ হওয়া দেখেছি।... এতে সেক্সপিয়ারের মন্তব্যের—'আমাদের দর্শনশাস্ত্রের কল্পনায় যা পাওয়া যায়, তার চেয়েও বেশি কিছু আছে স্বর্গে ও মর্ত্যে'—সত্যতা প্রমাণ করে।...

"তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ চিকিৎসাপদ্ধতিকে আমরা আঁকড়ে থাকতে পারি না বা পারা উচিত নয়। যদিও ধরে নিই যে, একধরনের চিকিৎসাপ্রণালীই সুস্থ হওয়ার একমাত্র উপায়, কিন্তু যদি সেই প্রণালী অনুযায়ী আরোগ্যলাভের ওষুধ না পাওয়া যায়, তার জন্য রোগীর স্বার্থকে বলি দিতে পারব না। সুস্থ হওয়ার জন্য একটি ওষুধ ব্যবহার সত্যিই ভাল ও বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী (কিংবা আমাদের মেটিরিয়া মেডিকার জ্ঞান অসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য) যদি ঠিক ওষুধ না দিতে পারি, তাহলে কি আমরা কোন অসুখে, কার্যকরী অন্য ধরনের ওষুধ বা ওষুধের মিশ্রণ আছে জেনেও সেগুলি সম্বন্ধে আমরা পরিচিত নই বলে অলস দর্শক হয়ে রোগীর মৃত্যু দেখব?... দৃষ্ট ঘটনা আমাদের মতকে পরিবর্তিত করুক, কিন্তু মত যেন ঘটনাকে বিকৃত করতে না পারে।"

প্রথম বর্ষের মে সংখ্যায় তিনি বলেছেন: "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের মধ্যে অনেক গোঁড়ামি আছে জানি। অনেকে হ্যানিম্যানকে মনে করেন 'প্রত্যাশিত ত্রাতা' (messiah)। তাঁরা তাঁর দেওয়া শিক্ষা থেকে সামান্য পরিবর্তন দেখলে 'দলত্যাগী' (apostasy) বলে মনে করেন। আমাদের পথ হলো পুরনো (অ্যালোপ্যাথি) ও নতুন (হোমিওপ্যাথি)—দুপক্ষেরই গোঁড়ামির প্রতিবাদ করা। সত্যি কথা বলতে কি, যতরকম চিকিৎসাশাস্ত্র আছে সবার গোঁড়ামির বিরুদ্ধতা করা আমাদের উদ্দেশ্য।... প্রভাবশালী চিকিৎসাশাস্ত্রের (অ্যালোপ্যাথির) যেসব পত্রিকা আছে, তারা নতুন চিকিৎসাপ্রণালীর চিকিৎসকদের (হোমিওপ্যাথদের) দৃষ্ট ঘটনাগুলি পর্যন্ত প্রকাশ করতে অস্বীকার করে। পূর্বোক্তদের মধ্যে যাঁরা উদারপন্থী, তাঁরা সমাজচ্যুত (proscribed) অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি পত্রিকায় লেখা দেওয়া সম্মানহানিকর বলে মনে করেন।... আমি 'বেঙ্গল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন'-এর চতুর্থ বার্ষিক সভায় যা বলেছিলাম, তাতে কি আমি অন্যায় করেছিলাম? বলেছিলাম, 'হ্যানিম্যান যেসব প্রমাণ দেখিয়েছেন তাতে অনেক গলদ আছে।... আমি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যে আমার সব রোগীকে ভাল করেছি তা বলছি না, বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে তা করতে অক্ষম হয়ে তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ চিকিৎসায় (অর্থাৎ অ্যালো-প্যাথিতে) ভাল করেছি। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে বেশ কিছু ভাল দিক আছে এবং আমি মনে করি, সেগুলি পরীক্ষা করা দরকার।'...

"হ্যানিম্যান বলেছেন, যখনি রোগ আরোগ্য হোক, তখন তা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত হয়েছে 'সমলক্ষণযুক্ত' নিয়ম অনুযায়ী। আমি তা মনে করি না।... চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস এই বিষয়ে যা বলেছেন, আমি তার সঙ্গে একমত। তিনি বলেছেন, 'আরোগ্যলাভ হয় কখনো সমধর্মী ওষুধ দ্বারা, কখনো বিপরীতধর্মী ওষুধ দ্বারা, আবার কখনো বা অন্য ওষুধে যা এই দুইয়ের পর্যায়ে পড়ে না।' "

ডাক্তার সরকারের এই ধরনের মতবাদ থেকে মনে হয়, তিনি হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসাকালে প্রয়োজনে হয়তো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধও ব্যবহার করেছেন। তাঁকে এও বলতে শোনা গেছে: "ম্যালেরিয়া হলে যখন সরাসরি কুইনাইন দিতে হয় তখন অত 'obedience to Hahnemann' (পুরোপুরি হ্যানিম্যানের মত মেনে চলা) চলে না।" (দ্রঃ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৫)। হয়তো এর ফলেই তিনি হোমিওপ্যাথি চর্চাকালে দ্রুত কৃতিত্বের উচ্চ শিখরে উঠেছিলেন। তাঁর দুই ধরনের চিকিৎসা একসাথে করার মতবাদ নতুন এবং কিছুটা বিভ্রান্তিকর বলে শিরোনামায় 'অদ্ভুত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে চিকিৎসার ব্যাপারে ঘটনাচক্র আমাদের দেশে যেভাবে গড়াচ্ছে (যেমন, একই বাড়িতে কখনো কখনো হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা একসঙ্গে চলা) এবং নাম করা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-পত্রিকা 'ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল'-এ হোমিও-চিকিৎসা সম্বন্ধেও যখন আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে, তখন ডাক্তার সরকারের মতবাদকে 'অদ্ভুত' বললেও, ঐ মতবাদ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন উঠেছে বলে মনে হয়। এটা ঠিক যে, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা খরচসাপেক্ষ। এতে ব্যবহৃত ওষুধের দাম খুব বেশি এবং এই চিকিৎসার আগে রোগনির্ণয়ের জন্য যেসব পরীক্ষা-পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয় তার খরচ বহন করতে রোগী হিমসিম খেয়ে যায়। শুধু তাই নয়, অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ অনেকের শরীরে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে। কিন্তু ডাক্তার সরকারের প্রস্তাব কার্যকরী করতে এমন চিকিৎসক তৈরি করতে হবে যাঁরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে পারবেন। তবে একথা ঠিক, প্রস্তাব কার্যকরী করা খুবই কঠিন। ❑

পেঁয়াজ রসুন বহু রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে

আজকাল খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে ক্যান্সার বা ঐধরনের রোগকে প্রতিরোধ করা যায় কিনা তা নিয়ে অনেক অনুসন্ধান চলছে। গাছগাছড়াতে, বিশেষ করে শাকসবজিতে এবং ফলে এমন কিছু আছে যা শরীরকোষে অন্তর্নিহিত ডি.এন.এ.-এর ক্ষতিসাধন (D.N.A. damage) বন্ধ করতে পারে। ক্যান্সার হওয়ার আগে কোষের এই ক্ষতিসাধন হয়ই। কোন কিছুর মধ্যে এই ক্ষতিসাধন বন্ধ করার ক্ষমতা থাকলে তাকে বলা হয় 'অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট ক্ষমতা' (antioxidant properties)। 'অ্যালিয়াম' নামক উদ্ভিদ-পরিবারে (Allium family) এই ধরনের ক্ষমতা আছে। এই অ্যালিয়াম পরিবারের রসুন ও পেঁয়াজ ভারতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বলে ক্যান্সার প্রতিরোধে এদের ক্ষমতা সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে।

মধ্য ও দূর প্রাচ্য দেশগুলিতে পাঁচহাজার বছর আগে থেকে পেঁয়াজ-রসুনের চাষ চলছে। মিশরে খ্রীস্টপূর্ব ৩২০০ থেকে ২৮০০ সালে নির্মিত কবরেও রসুন ও পেঁয়াজের আঁকা ছবি পাওয়া যায়। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস লিখেছেন যে, ঘাজার বিখ্যাত পিরামিড যেসব শ্রমিক তৈরি করেছিল, তাদের প্রধান খাদ্য ছিল মুলো, পেঁয়াজ ও রসুন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে পেঁয়াজ ও রসুন খাদ্য হিসাবে এবং ব্যবসায়-সামগ্রী হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছিল। মিশরে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ সালের চিকিৎসাবিষয়ক নলখাগড়া পাতার পুঁথিতে (medical papyrus) পাওয়া যায় যে, রসুন থেকে প্রস্তুত কুড়ি রকম ওষুধ গলদেশের জীবাণু সংক্রমণ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হতো। প্রথম শতাব্দীতে রচিত 'চরকসংহিতা'য় পেঁয়াজ ও রসুনের বিভিন্ন রোগ আরোগ্যের কথা আছে, যেমন—প্রস্রাব ও হজমশক্তি বাড়ায়, হৃৎপিণ্ডকে সবল করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় ও বাতরোগে উপকার করে। এখনো আয়ুর্বেদে এবং ইউনানি, টিব্বি (Tibbi) প্রভৃতি অন্যান্য ঐতিহ্যগত চিকিৎসাশাস্ত্রে বহু রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধে—যেমন কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ডিয়োডিনামে ঘা, পাতলা দাস্ত প্রভৃতিতে রসুন ব্যবহৃত হয়। অ্যালিয়াম সবজিগুলিতে সালফারযুক্ত যৌগিক 'অ্যালিনেজ এঞ্জাইম' থাকার জন্য এর বিশেষ গন্ধ সৃষ্টি হয়।

অ্যালিয়াম উদ্ভিদের রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা—

(ক) রক্তে চর্বিজাতীয় 'লাইপিড' কমানোর ব্যাপারে প্রচুর অনুসন্ধান হয়েছে। রক্তে কোলেস্টেরল গবেষণায় কেউ কেউ রসুনের রস ব্যবহার করেছেন, কেউবা রসুনজাত তেল (শরীরের ওজনের প্রতি কেজিতে ০.২৫ মিলিগ্রাম) অথবা অপরিবর্তিত রসুন ব্যবহার করেছেন। এইসব অনুসন্ধানে রক্তে কোলেস্টেরল ১০ শতাংশ কমতে দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, রসুন ব্যবহারে 'হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন' (যাকে 'ভাল কোলেস্টেরল' বা 'good cholesterol' বলা হয়) বাড়ে, যার ফলে রক্তনালীতে 'অ্যাথেরোসক্লেরোসিস' হওয়া প্রতিহত করে। এর জন্য অবশ্য রসুন-জাতীয় খাদ্য দু-তিন মাস খেতে হবে, কারণ রসুন খাওয়া বন্ধ করলে রক্তে লাইপিড আবার বেড়ে যাবে। রসুন খাওয়া শুরু করলে প্রথমদিকে রক্তে লাইপিড সামান্য বাড়তে পারে; এর কারণ এই যে, রসুন শরীরকোষে জমা লাইপিডকে টেনে বের করে আনে। (খ) অ্যাথেরোসক্লেরোসিস এবং হৃৎপিণ্ডের অসুখের একটি কারণ হচ্ছে রক্তের প্লেটলেট কণিকাগুলির পরস্পরের গায়ে লেগে যাওয়া (platelet aggregation)। পেঁয়াজ ও রসুন এটা প্রতিরোধ করতে পারে। ভাজা বা সিদ্ধ করলেও এদের গুণ নষ্ট হয় না। পেঁয়াজের তেল এই কাজে আরো দক্ষ। (গ) বেশি চর্বিযুক্ত খাদ্য খাওয়ার ফলে রক্তে যে 'ফাইব্রিনোজেন' বাড়ে এবং রক্ত জমে যাওয়ার সময়সীমা কমায়, কাঁচা বা রান্না করা পেঁয়াজ খেলে তা প্রতিহত হয়। এর জন্য অবশ্য প্রতিদিন ৫০-১০০ গ্রাম পেঁয়াজ ও ১০ গ্রাম রসুন খেতে হবে। (ঘ) ক্যান্সার-প্রতিরোধ ক্ষমতা— ফল ও শাকসবজিতে এই ক্ষমতা আছে। রোগবিস্তার সংক্রান্ত তথ্য (epidemiological evidence) থেকে মনে হচ্ছে, অ্যালিয়াম খাদ্য বাড়ালে ক্যান্সার হওয়া কমে। এর কারণ আগেই যেমন বলা হয়েছে—শরীরকোষের ডি. এন. এ.-র ক্ষতিসাধন বন্ধ করা। (ঙ) রসুন বার্ধক্যকে পিছিয়ে দেয়, আয়ু ও স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। রসুনে থাকা সালফারযুক্ত যৌগই এই কাজ করে। (চ) রসুন ফাঙ্গাস ও কয়েকপ্রকার ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশনে ইঁদুরের ওপর গবেষণায় দেখা গেছে যে, পেঁয়াজ ও রসুন খাইয়ে (বিশেষ করে রসুন) ক্যান্সার প্রতিহত করা যায়। তাঁরা ইঁদুরকে পৃথক পৃথক ভাবে একমাস পেঁয়াজ ও রসুন খাইয়ে দেখিয়েছেন যে, ঐসব ইঁদুরের পেটে যদি বেঞ্জোপাইরিন (যা 'কারসিনোজেন' অর্থাৎ ক্যান্সার সৃষ্টিকারক বলে পরিচিত) ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তাহলে শরীরকোষে তেমন কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যদি পেঁয়াজ বা রসুন না খাইয়ে (কন্ট্রোল গ্রুপ) ঐ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় তাহলে শরীরকোষে ক্যান্সার সৃষ্টির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ইঁদুরগুলি মেরে তাদের টিস্যু বা শরীরকোষ মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করা ছাড়া ইঁদুরগুলির প্রস্রাব পরীক্ষাতেও ক্যান্সার হওয়া-না-হওয়ার আভাস পাওয়া যায়। খাদ্যে পেঁয়াজ ও রসুন কাঁচা বা রান্না বেশি ব্যবহার করতে তাঁরা নির্দেশ দিচ্ছেন। **[National Institute of Nutrition, Hyderabad, October 1998, pp. 1-8]** ❑

বামাক্ষেপা বৃত্তান্ত

পরিমল চক্রবর্তী

তারাপীঠ ভৈরব—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ রমেন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক, বামদেব সঙ্ঘ, ৮ প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর, কলকাতা-৭০০ ০৩৬। পৃষ্ঠা ঃ ৮+২৪৪। মূল্য ঃ ৫৬ টাকা।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। আধ্যাত্মিকতার আদিস্থান। সাধক-সাধিকাদের পুণ্যভূমি। সেইসব সাধনার ধারা সেই কোন্ আদিকাল থেকে আজো বয়ে চলেছে অগণিত মুনি-ঋষি, যোগী-মহাযোগী, মহামানব, তাপস ও অবতারের আবির্ভাবের পরম্পরায়। সেই পরম্পরার এক সার্থক নাম বীরভূমের সাধক বামাক্ষেপা। তারাপীঠের তন্ময় তাপস বামাক্ষেপার জীবনকথায় তান্ত্রিক ও যোগ সাধনার মূল বিষয়গুলি নিয়ে এক অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতাপ্রসূত আলোচনাই আছে সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'তারাপীঠ ভৈরব'** গ্রন্থে।

বহুকাল আগে বামাক্ষেপা বীরভূমের তারাপীঠে কঠোর সাধনা করেছিলেন। তারাপীঠ বাঙালীর কাছে আজো এক প্রিয় তীর্থক্ষেত্র। তাই 'তারাপীঠ ভৈরব' বামাক্ষেপাও বাঙালীমনে আজ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

লেখক সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **'তারাপীঠ ভৈরব'** গ্রন্থে বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গেই রচনা করেছেন সাধক বামদেব তথা বামাক্ষেপার জীবনকাহিনী। গ্রন্থে বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন শ্লোক-সহ বৈদিক ও তান্ত্রিক তত্ত্বের প্রসঙ্গ এই মহাসাধকের মহাজীবন অনুধ্যানে আমাদের সাহায্য করেছে। সেইসঙ্গে আত্মভোলা এই যোগিপ্রবরের যোগসাধনার ব্যাখ্যার মাঝে মাঝে গানের সমাবেশ গ্রন্থটিকে বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদে পাই দুটি হাতে রাঙাজবার অর্ঘ্যের অপরূপ ছবি, তার পরেই প্রথম পৃষ্ঠাতে মায়ের পদ্মোপরি পদযুগল। তাঁর উদ্দেশেই নিঃসন্দেহে এই অর্ঘ্যের আয়োজন। পরিকল্পনাটি প্রশংসনীয়। তবে প্রচ্ছদটি 'ল্যামিনেটেড' হলে আরো আকর্ষণীয় হতো।

সঙ্গীতসূচীতে রয়েছে ৩৩টি সঙ্গীতের প্রথম কলি। তাছাড়া বন্দনা, বামদেবের বংশপরিচয়, বীরভূমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু কোন সূচীপত্র না থাকায় বিষয়বস্তু বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়।

বংশপরিচয় থেকে জানা যায় যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সর্বানন্দের সন্তান বামাচরণই বামাক্ষেপা। তাঁর মায়ের নাম রাজকুমারী দেবী। স্বামীর মৃত্যুতে রাজকুমারী দেবী অসহায় হয়ে পড়েন। পুত্র বামাচরণকে মাতৃ-আদেশে চাকরির সন্ধানে বেরোতে হয়। কিন্তু কোন কাজে তাঁর মন বসে না। উদাসভাবে কেবল কত কী ভেবে চলেন। রামপ্রসাদের সঙ্গে বামাক্ষেপার বহু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন ঃ "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" আর বামাক্ষেপা বলতেন ঃ "টাকা টং টং, ত্বং ত্বং তারা তারা।"

জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ সাধকের যেসব অলৌকিক আচার-আচরণ আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত ছিল সেসব সর্বসমক্ষে তুলে ধরে লেখক একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করেছেন। বর্তমান বণিকবৃত্তির যুগে সমস্যাজর্জরিত মানুষের মনে পরম প্রশান্তির বারিসিঞ্চনের পক্ষে গ্রন্থটি একান্তই প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নেই। সিদ্ধপুরুষের লীলামাহাত্ম্য পাঠ করে পাঠকমন অবশ্যই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে মহাপুরুষ-সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে। ❑

রোগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

জলধিকুমার সরকার

সুস্বাস্থ্যের জন্য—ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ ও ডাঃ জ্যোতির্ময় সমাজদার। প্রকাশক ঃ ডাঃ পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, সি. ডি. ৩২৭, লবণ হ্রদ, কলকাতা-৭০০ ০৬৪। পৃষ্ঠা ঃ ১৬+১৪৪। মূল্য ঃ ৩৫ টাকা।

'সুস্বাস্থ্যের জন্য' গ্রন্থটির উদ্দেশ্য মহৎ—স্বাস্থ্যকর্মী ও জনসাধারণকে রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান বিতরণ করা। রোগ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর্মী এবং জন-সাধারণের খানিকটা জ্ঞান থাকলে ডাক্তারের চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়, রোগ-প্রতিরোধে সহায়ক হয় এবং অসুখের জন্য অর্থব্যয়ও কম হয়। গ্রন্থের অন্যতর লেখক ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় শহীদ হাসপাতালে সাত বছর কাজ করায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সেগুলির যেভাবে সমাধান করেছিলেন সেকথা এবং ঐ অঞ্চলে খনিকর্মীরা কিভাবে হাতুড়ে ডাক্তারদের শোষণের শিকার হয় তার বিবরণ আছে গ্রন্থটিতে।

গ্রন্থটির চারটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে পেটের অসুখ, কৃমি, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি ২০টি রোগ ও তার প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'মা ও শিশুর পরিচর্যা' শিরোনামায় সিজারিয়ান অপারেশন, শিশুদের টিকা প্রভৃতি দশটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'শরীরবিদ্যা ও স্বাস্থ্যচেতনা' শিরোনামায় খাদ্য, রক্তদান প্রভৃতি ছয়টি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'মন ও তার রোগ' শিরোনামায় কয়েকটি মানসিক রোগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের জটিল বিষয়গুলি সরল কথায় ব্যক্ত হওয়ায় এবং লেখার মাঝে মাঝে লেখকদ্বয়ের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে।

কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রন্থটি পড়লে বিচারগত ও নীতিগত (ethical) অনেকগুলি প্রশ্ন আসে। পৃষ্ঠা ৪ এবং ৫-এ লেখক ডঃ পুণ্যব্রত গুণ তাঁর মাস্টারমশাইয়ের চিকিৎসার যে-সমালোচনা করেছেন তা একতরফা—অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ মাস্টারমশাইয়ের এবিষয়ে কি বক্তব্য তা জানা যাচ্ছে না। এ-অবস্থায় কার ভুল, সেবিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন—"অধিকাংশ ডাক্তার সরবতের (ইলেকট্রল) সঠিক ব্যবহার জানেন না।" (পৃঃ ৬), "কলকাতায় থাকতে আমার সহকর্মীদের দেখেছি জ্বরে অ্যানালজিন ইঞ্জেকশন লাগাতে—বেশি ফি আদায়ের জন্য।" (পৃঃ ১২) এধরনের কথা গ্রন্থে অনেক আছে, যেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই একমত হবেন না। তাঁর অনেক অভিমত, যেমন—"বি. সি. জি. টিকা ফুসফুসের টিবি রোগ সংক্রমণে কার্যকর নয়, এই টিকা আন্ত্রিক ও মিলিয়ারি টিবি রোগ সংক্রমণের প্রতিষেধক।" (পৃঃ ৩৯), "পাকস্থলী যাঁতার মতো খাবারকে পিষতে থাকে।" (পৃঃ ৫০), "জন্ডিস রোগীকে চর্বিযুক্ত খাবারও দেওয়া যেতে পারে, যদি তার পক্ষে রুচিকর হয়।" (পৃঃ ৪৬)—এইসব অভিমত বৈজ্ঞানিক তথ্যের পটভূমিকায় মেনে নেওয়া মুশকিল। চিকিৎসক যেসব ওষুধ লিখবেন, গর্ভবতী রোগিণী সেগুলি সম্বন্ধে যেন জিজ্ঞাসা করে নেন ওষুধগুলির কোনটি ভ্রূণের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা (পৃঃ ৭৬) কিংবা প্রসব শুরু হওয়ার পর ডাক্তার যদি কোন ইঞ্জেকশন দেন, তাঁকে রোগিণী যেন প্রশ্ন করেন—তিনি কি ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন এবং পিটোসিন হলে তার যৌক্তিকতা কি (পৃঃ ৭৯) —লেখকের এধরনের পরামর্শের উপকারিতা চিকিৎসক সম্প্রদায় বা সমাজসেবকরা মেনে নেবেন বলে মনে হয় না।

পৃষ্ঠা ১১৮-তে 'ওষুধের সঠিক ব্যবহার ও সাবধানতা' সম্বন্ধে তাঁর অন্যতম পরামর্শ—"আন্দোলন গড়ে তুলুন—যাতে ক্ষতিকর ওষুধের উৎপাদন বন্ধ হয়, আর উৎপাদন বাড়ে জীবনদায়ী জরুরী ওষুধের।"—প্রথমে অ-সাধারণ (unusual) মনে হলেও এর সঙ্গতি পাওয়া যায় যখন দেখি যে, লেখক জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এই গ্রন্থ লিখেছেন, ঠিক জনস্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নয়।

এছাড়া গ্রন্থটিতে এমন কিছু প্রসঙ্গ আনা হয়েছে যেগুলির আলোচনা চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীদের মধ্যে হলে প্রকৃত মূল্যায়ন হতো। যেমন ক্লোরামফেনিকল, মেপ্টাফর্ম, স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতির কুফল (পৃঃ ৬), পিটোসিন ইঞ্জেকশন (পৃঃ ৭৮, ৭৯), সিজারিয়ান অপারেশনের যৌক্তিকতা (পৃঃ ৮২) প্রভৃতি। জনসাধারণকে, এমনকি জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীদেরও এসব তথ্য সুস্বাদু হলেও সুপাচ্য না হতে পারে। জানি না, হয়তো খনি অঞ্চলে হাতুড়ে ডাক্তারদের প্রভাব থেকে শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য লেখক এই পথ নিতে বাধ্য হয়েছেন।

যাই হোক, গ্রন্থটি পড়ে এইসকল প্রশ্ন মনে জাগলেও এর কয়েকটি প্রশংসনীয় দিক আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। যেমন বেশির ভাগ সাধারণ রোগ (চোখ ব্যথা, কান ব্যথা, চর্মরোগ প্রভৃতি) সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে (ডায়াবেটিস, পরিবার পরিকল্পনা, খাদ্য, প্রাথমিক চিকিৎসা, রক্তদান ইত্যাদি) বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সরলভাবে এবং সহজ ভাষায় এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে, যা সত্যই প্রশংসনীয়। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে লেখক সমালোচিত প্রসঙ্গগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করবেন। এই ধরনের গ্রন্থ বাজারে বেশি আছে বলে মনে হয় না। ❑

প্রাপ্তিস্বীকার

হে রাজা শিবাজি! (৩ খণ্ড)
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক : ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল
২৬, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬।
পৃষ্ঠা : ১ম খণ্ড—১১২,
২য় খণ্ড—১৬২, ৩য় খণ্ড—১৩২।
মূল্য : ১ম খণ্ড—১৬ টাকা,
২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড—২৫ টাকা।

তপোভূমি হিমালয়
ডঃ ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক : ডঃ শক্তি মুখার্জী
সুখচর, উত্তর চব্বিশ পরগনা
পিন-৭৪৩১৭৯।
পৃষ্ঠা : ৬+৬৬।
মূল্য : ৪০ টাকা।

উৎসব-অনুষ্ঠান

হায়দ্রাবাদ মঠে (অন্ধ্রপ্রদেশ) গত ৬ মার্চ '৯৯ সর্বধর্ম সম্পর্কে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ এবং ভাষণ দান করেন বিভিন্ন ধর্মের বিশেষজ্ঞরা। গত ৭ মার্চ স্থানীয় নাগরিক অভ্যর্থনা কমিটি পূজনীয় মহারাজকে এক বিশেষ অভ্যর্থনা প্রদান করে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় ভাষণদান করেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু ও লোকসভার স্পীকার জি. এম. সি. বালযোগী।

পোরবন্দর আশ্রমে (গুজরাট) গত ২৪ মার্চ '৯৯ প্রার্থনাগৃহ ও একটি গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। গত ১৩ মার্চ একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। গত ১৮ মার্চ আশ্রম পরিচালিত চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরে ২৭৯ জনকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয় এবং ২২ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

রামহরিপুর আশ্রম (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৯-২১ মার্চ '৯৯ তিনদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করে। শোভাযাত্রা, বাউলগান, পদাবলী কীর্তন, ভজন, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। উৎসবের প্রথম দিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও বিকালে ধর্মসভা। সভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন স্বামী তদ্‌গতানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ ও দীপককুমার অগ্নিহোত্রী। দ্বিতীয় দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ, স্বামী তদ্‌গতানন্দ ও স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দ। রাত্রে 'মহাবীর কর্ণ' নাটক পরিবেশন করে আশ্রম-ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা। উৎসবের শেষদিন দুপুরে প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত নরনারী বসে প্রসাদ পান। বিকেলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী সর্বলোকানন্দ, স্বামী তদ্‌গতানন্দ ও স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দ। তিনদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। সভান্তে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী তদ্‌গতানন্দ ও অলোক রায়চৌধুরী। এদিন রাত্রে স্থানীয় ইউনাইটেড যুবসঙ্ঘ 'চক্রব্যূহ' পৌরাণিক যাত্রাপালা পরিবেশন করে।

জয়পুর আশ্রম (রাজস্থান) গত ৬ ফেব্রুয়ারি '৯৯ স্বামীজীর জন্মতিথিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণী সভার আয়োজন করে। সভার উদ্বোধন করেন রাজস্থানের রাজ্যপাল অংশুমান সিং এবং অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী কমলা বেনিওয়াল। গত ১০ মার্চ যোধপুরে স্বামীজীর পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি জনসভার আয়োজন করে স্থানীয় 'স্বামী বিবেকানন্দের যোধপুর আগমন শতাব্দী আয়োজক সমিতি'। সভায় সভাপতিত্ব করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পূজ্যানন্দ। এই উপলক্ষ্যে ভারত সরকারের ডাকবিভাগ একটি বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

পুনর্বাসন

গুজরাট ঝঞ্ঝা পুনর্বাসন

বেলুড় মঠ রাজকোট আশ্রমের সহযোগিতায় নন্দনাগ্রামে (বর্তমানে 'বিবেকানন্দ নগর') পাঁচটি নলকূপ, শিশুদের জন্য একটি পার্ক, একটি শিক্ষা-সংস্কৃতি-চিকিৎসা কেন্দ্র, একটি মন্দিরসংলগ্ন প্রার্থনাগৃহ-সহ নব্বইটি পাকাবাড়ি নির্মাণ করেছে। গত ১২ মার্চ উপরি উক্ত বাড়িগুলির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে পরে আয়োজিত জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ভাষণ দেন 'মুম্বাই সমাচার'-এর ডাইরেক্টর মেহলি আর. কামা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বেলুড় মঠের মাধ্যমে জামনগর জেলার বেদাত্রগ্রামে (বর্তমানে 'শ্রীমা সারদা নগর') নলকূপ, শিশুদের জন্য পার্ক, শিক্ষা-সংস্কৃতি-চিকিৎসা কেন্দ্র, মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ এবং তিরিশটি পাকাবাড়ি নির্মিত হয়েছে। গত ১৯ মার্চ বাড়িগুলির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণদান করেন পূজনীয় মহারাজ, জামনগর জেলার কালেক্টর গিরিশ মুর্মু ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি।

দেহত্যাগ

স্বামী মৃর্ত্যানন্দজী (শ্রীকান্ত মহারাজ) মস্তিষ্কের রক্তনালী সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় গত ২০ মার্চ '৯৯ বিকাল ৩.৫০ মিনিটে কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। কয়েক বছর ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগ ও হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪২ সালে তিনি বাঁকুড়া মঠে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, কাটিহার, কাশী সেবাশ্রম ও কানপুর আশ্রমে কর্মী হিসাবে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তপস্বী ও প্রেমিক স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ২০ ও ৩০ এপ্রিল '৯৯ শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাবতিথি পালন করা হয়। সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ এবং স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৪-৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন করে। চারদিনব্যাপী উৎসবে প্রত্যহ সকালে বৈদিক স্তোত্রপাঠ, পূজা, ভজন, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ ছাড়াও বিকালে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। প্রথম দিন বিকালে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন স্থানীয় সারদা সমিতির শিল্পিবৃন্দ এবং 'ভাগবত' পাঠ করেন রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় 'নাগপঞ্চমী' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিন বিকালে ডঃ নমিতা দত্তের 'গীতা' পাঠের পর শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণা। সন্ধ্যায় 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' শ্রুতিনাটক নিবেদন করে স্বস্তিতীর্থ নাট্যসংস্থা। তৃতীয় দিন বিকালে রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন শ্যামসুন্দর দাস। সন্ধ্যায় কয়েকজন দরিদ্র বালক-বালিকার মধ্যে পোশাক বিতরণের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে ভাষণদান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ভাষণান্তে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীতাঞ্জলি'র শিল্পিবৃন্দ। চতুর্থ দিন সকালে শোভাযাত্রা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বলভদ্রানন্দ ও অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমান। সন্ধ্যায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রাবণী চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়।

রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রে (জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব স্মরণে বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন ও সাধারণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। সম্মেলনে প্রায় ২০০ যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'স্বামীজীর দৃষ্টিতে গ্রামোন্নয়ন' ও 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে সেবাধর্ম'। আলোচক ছিলেন স্বামী সগুণানন্দ, স্বামী আত্মপ্রভানন্দ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অসিতকুমার বিশ্বাস। এছাড়া সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি আয়োজিত হয়। পরদিন অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, হোম, 'চণ্ডী' ও 'গীতা' পাঠ, নৃত্যগীত এবং ধর্মসভা। সভায় 'শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনচর্চার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সগুণানন্দ, রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ ও আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গিরিশানন্দ। সভাপতিত্ব করেন জামতাড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দ। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

হুগলী চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) ঃ গত ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ স্থানীয় কর্মকেন্দ্র 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ নিলয়'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মহকুমা শাসক শ্রীকুমার মণ্ডল, মহকুমা পুলিস আধিকারিক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, হুগলী মিলস লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অরিন্দম সিংহরায়, বিশিষ্ট চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ এস. এন. মিশ্র, সমাজসেবী ডাঃ রামগোপাল নন্দী প্রমুখ। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী ও শ্রীঅরবিন্দের অবদান' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দের রচনা থেকে পাঠ করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন হৈমন্তী শুক্লা। তৃতীয় অধিবেশনে 'স্বামীজীর জীবন ও কর্ম' বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। এদিন অ্যাসোসিয়েশন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কিছু কম্বল বিতরণ ও দুটি প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থ প্রদান করে এবং একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গৌরাঙ্গ বিশ্বাস ও অজয় চট্টোপাধ্যায়।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) বার্ষিক উৎসব গত ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন রহড়া বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ এবং 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী হিতকামানন্দ। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দিব্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী হিতকামানন্দ, ডঃ কমল নন্দী ও অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল। সন্ধ্যায় 'ভগিনী নিবেদিতা' ও 'নচিকেতার আত্মজ্ঞানলাভ' নাটক দুটি নিবেদন করে যথাক্রমে সেবাশ্রম-পরিচালিত কোচিং সেন্টার ও কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্রের শিশুরা।

নববারাকপুর শ্রীসারদা সঙ্ঘ (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ একটি আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ১২০ জন মহিলা যোগদান করেন। স্তোত্রপাঠ, জপ-ধ্যান, ভজন, পাঠ ও আলোচনাদি ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত বিষয়। 'গীতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা এবং 'মা সারদা ও ভগিনী নিবেদিতা' বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সঙ্ঘের সদস্যারা ভজন ও ভক্তিগীতি এবং শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বিষয়ে আলোচনা করেন।

খাতড়াবাসিগণের (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ স্থানীয় গুরুসদয় মঞ্চ-এ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব স্মরণে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের পর স্বাগত-ভাষণ দেন উৎসব কমিটির সম্পাদক অসীমকুমার রায়। তারপর স্বামীজী সম্পর্কে ভাষণ দেন আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ের রীডার তারাপদ পাণ্ডা ও রানীবাঁধ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

গুইরাম মল্লিক। 'মানবপ্রেম' বিষয়ে স্থানীয় মসজিদের ইমাম মোঃ কলিমুদ্দিন ইসলাম, 'বাইবেল' থেকে পাঠ ও যীশুখ্রীস্টের বাণীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সাদৃশ্য বিষয়ে রেভারেন্ড সুধীন্দ্রমোহন সোরেন এবং স্বামীজীর শিক্ষা বিষয়ে স্বামী সম্ভবানন্দ ভাষণদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী নির্মোহানন্দ। এরপর ভক্তিগীতি ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উৎসব কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাহাতো। সভায় উপস্থিত প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী ও ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ন-পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বারাসত, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন করে। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ এবং ভাষণ দেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ রায় ও সন্তোষকুমার ঘোষ।

নাওরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ত্রিগুণাতীত সেবাশ্রমে (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি '৯৯ সেবাশ্রমের একাদশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠিত বিষয় ছিল সকালে সানাইবাদন, 'বেদ', 'গীতা', 'পুঁথি' ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম এবং বিকালে নগর-পরিক্রমা ও ধর্মসভা। সভায় স্বামী সত্যাত্মানন্দের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নাওরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মঙ্গলচন্দ্র ঘোষ। সভান্তে প্রায় ২০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় শিশুরা কবিতা আবৃত্তি এবং বালিকারা নৃত্য পরিবেশন করে। রাত্রে দীনবন্ধু গোস্বামী *লীলাকীর্তন* নিবেদন করেন। দ্বিতীয় দিন যুবসম্মেলনে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৮০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সেবাশ্রমের সম্পাদক রামপ্রসাদ চ্যাটার্জীর স্বাগত-ভাষণান্তে শুরু হয় 'স্বামীজীর জীবনের যে-ঘটনাটি আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে' বিষয়ে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এবং স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন যথাক্রমে স্বামী বাসবানন্দ ও সত্যনাথ দাশগুপ্ত এবং স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। রাত্রে অভিনীত হয় 'দেবীপূজা' যাত্রাপালা। দুদিনের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বৈদিক স্তোত্রপাঠ ও উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মৃণালকান্তি মণ্ডল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্রে (শরৎ কলোনী, কলকাতা-৭০০ ০৮১) গত ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৯ দুদিন ধরে পাঠচক্রের সপ্তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ধর্মসভা ছিল প্রথম দিনের অনুষ্ঠিত বিষয়। বৈকালিক সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উৎসবের দ্বিতীয় দিন বৈকালিক ধর্মসভায় 'দেশে ও বিদেশে শ্রীশ্রীমায়ের প্রভাব' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি নিবেদন করেন পাঠচক্রের শিল্পীরা।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৯ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **বিজয়নগর বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা)** উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। এই উপলক্ষ্যে পূজা, স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিপুলকুমার রায় ও ডঃ কমল নন্দী।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, ভক্তিগীতি এবং 'গীতা', '*লীলাপ্রসঙ্গ*' ও 'কথামৃত' পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। '*লীলাপ্রসঙ্গ*' ও 'কথামৃত' থেকে পাঠ করেন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বপনকুমার আইচ।

ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করে। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বনানী নাগ এবং 'পুঁথি' থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত নিবেদন করেন সঙ্ঘের সদস্যরা।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে (জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি ও পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (জেলা—নদীয়া) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, 'গীতা' ও 'কথামৃত' থেকে পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্বেতা মিত্র, পথক্লান্ত বাগচী, অঞ্জলি দাস প্রমুখ। বৈকালিক ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করেন খোকন চক্রবর্তী, নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়।

বোলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, বাউলগান, ভক্তিগীতি, প্রায় ৩,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপন করে। পূর্ণদাস বাউল বাউলগান এবং প্রভাত পাল, মনোজিত বাউরী ও বীরবল হাজরা ভক্তিগীতি পরিবেশন করে। বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন প্রাক্তন অধ্যাপক সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় 'ভাগবতোক্ত ভক্তিযোগ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। গত ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বিষয়ে আলোচনা করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের অধিকর্তা শিবশঙ্কর চক্রবর্তী।

গোসাইগাঁও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (আসাম) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬৪তম জন্মতিথি পালন করে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্রে (জেলা—বীরভূম) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, কীর্তন ও পাঠের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজাদি ও 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন বলরামপুর আশ্রমের স্বামী দেবাত্মানন্দ। এই উপলক্ষ্যে গত ২১ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। সভারম্ভে স্বাগত-ভাষণ দেন পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায় এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ওপর আলোচনা করেন অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। সভায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি সঙ্গীত এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে দীপিকা রায় ও মোহিনীমোহন কুণ্ডু।

মজফ্‌ফরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (বিহার) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে গত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় লঙ্গরসিং কলেজ এবং মোহন্ত দর্শন-দাস গার্লস কলেজে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ, মোরাবাদী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শশাঙ্কানন্দ, এল. এস. কলেজের অধ্যক্ষ আর. পি. শ্রীবাস্তব, অধ্যাপিকা ভুবনেশ্বরী সিনহা ও কমিশনার আদিত্য স্বরূপ। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনীয়ার প্রশান্তকুমার সরকার। অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত ও ছাত্রছাত্রীর সমাগম হয়েছিল।

বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—নদীয়া) গত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি '৯৯ তিনদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রথম দিন মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি ও নরনারায়ণ সেবার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সরোজ দত্ত ও সুনির্মল চৌধুরী। প্রায় ২,০০০ নরনারায়ণকে পূজা ও পঞ্চপ্রদীপে আরতির পর বসিয়ে খাওয়ানো হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় 'ভাগবত' পাঠ করেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে 'প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় দিনের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী ত্যাগরূপানন্দ ও স্বামী সর্ববিদানন্দ। সভান্তে 'ভগিনী নিবেদিতা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ে (জেলা—হাওড়া) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ শ্রীমানী প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কমল সান্যাল।

খেপুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, কীর্তন এবং 'কথামৃত' পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। কীর্তন পরিবেশন করেন অমরেন্দ্রনাথ বেরা ও সম্প্রদায়। সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন আশ্রমের সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশির। এই উপলক্ষ্যে দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে ৫০টি প্যান্ট বিতরণ করা হয়।

দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবা কেন্দ্র (কলকাতা-৭০০ ০৭৫) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ উষাকীর্তন, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করে। দুপুরে প্রায় ২৫০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বৃন্দাবনবিহারীদাস কাঠিয়াবাবা এবং স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী নিত্যবোধানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ, অধ্যাপক তরুণকুমার মজুমদার ও কেন্দ্রের সভাপতি ডাঃ সুকুমার সূত্রধর।

পাঁচগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (জেলা—হাইলাকান্দি, আসাম) গত ১৮-২১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ চারদিন ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করে। উৎসবের সমাপ্তি দিবসে দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান এবং বিকেলে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১০ ডিসেম্বর '৯৮ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে সেবাসমিতির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য, বাগবাজার নিবাসী গৌর নিয়োগী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৩ জানুয়ারি '৯৯ বেলা ১২টায় পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি নিয়মিত 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে প্রণাম করতে আসতেন। মৃত্যুদিন সকালেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **শান্তি চক্রবর্তী** গত ২৯ জানুয়ারি '৯৯ রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **মানিকচাঁদ চট্টোপাধ্যায়** গত ১০ ফেব্রুয়ারি '৯৯ সন্ধ্যা ৬.৩৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আগ্রহী পাঠক ছিলেন। ঈশ্বরনির্ভরতা, পরোপকারিতা ও সহজ-সরল ব্যবহারের জন্য সকলে তাঁকে ভালবাসত।

শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **অতুললাল দাস** গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা কলকাতার সেলিমপুর-নিবাসী **মায়া দাশগুপ্ত** গত ২২ ফেব্রুয়ারি '৯৯ সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে সেঞ্চুরি ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেন্টারে শ্বাসকষ্টজনিত রোগ ও অস্থিমজ্জার স্বল্পতা রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি 'উদ্বোধন' ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠিকা ছিলেন। মাতৃত্বপূর্ণ হৃদয় ও নিঃস্বার্থপরতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

বড় হইতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ

১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব।

৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের গ্রন্থাবলী

মুণ্ডকোপনিষদ্
মূল্য ঃ ২৫.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (ছয় খণ্ড)
মূল্য ঃ ২৫০.০০

কঠোপনিষদ্
মূল্য ঃ ৬৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ
মূল্য ঃ ৩৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম
মূল্য ঃ ২০.০০

মন্ত্রদীক্ষা
মূল্য ঃ ৭.৫০

উপনিষদ্ ও আজকের মানুষ
মূল্য ঃ ৮.০০

শরণাগতি

শরণাগতি
মূল্য ঃ ৭.০০

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

প্রতিটি চুমুকে — কড়া আমেজ!
কুকমী সিলেক্ট
COOKME SELECT
Cookme
Cookme

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।
স্বামী বিবেকানন্দ

ধনসম্পদ ইহকালের সম্পদ, সঙ্গে যাবে না। সাধন-ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।
শ্রীরামকৃষ্ণ

*

দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই, ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।
শ্রীমা সারদাদেবী

*

কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়।
স্বামী বিবেকানন্দ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র (১)

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান) ❑ কাঁকুড়গাছি, ফোন : ৩৩৪-২৯২৮
- রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর, ফোন : ৪৫৫-৪৬৬০
- কথামৃত সঙ্ঘ ❑ ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন ফোন : ৪৭৩-৫১২৭
- সলিলা সরকার ❑ এ-ই ৬৫৫, সল্ট লেক
- বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম ❑ ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক ❑ সেলিমপুর
- বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র ❑ চেতলা
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ❑ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- শোভনা ভৌমিক ❑ ৯ আর. এন. টেগোর রোড নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন : ৪৬৭-১১২২
- রামকৃষ্ণ কুটীর, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাটী
- ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- আঢ্য ব্রাদার্স ❑ ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-৩৯
- মলয় ভৌমিক ❑ ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- আর. ডি. ব্রিগস অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- "সারদা ভবন", জীবনকুমার ভট্টাচার্য ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রীট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- হ্লাদিনী ❑ স্বত্বাধিকারিণী : সুচিত্রা চ্যাটার্জী ৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ কলকাতা-৫ ফোন : ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- স্বপন দাস ❑ ৯ সাউথ কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-১০
- দাসানুদাস সাহা ❑ ১এ কুমারটুলী স্ট্রীট কলকাতা-৫, ফোন : ৫৫৪-৬২৯৯
- ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ❑ ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড কলকাতা-৫০, ফোন : ৫৫৬-৯৫৭২
- রবি হাজরা ❑ ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৩
- সুধাংশু বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭
- বিজনকৃষ্ণ অধিকারী, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণী, গরফা, কলকাতা-৭৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন ২৪/৬১ যশোর রোড, এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা-২৮
- দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ ২নং এয়ার পোর্ট গেট, পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১ ফোন : ৫১১-৮২৪১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ ২৪৯ শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১

জেলা : হাওড়া

- নির্মল ঘোষ ৬ রায় জে. এন. বাহাদুর রোড, বাদামতলা, বালী
- রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম ৪ নম্বর পাড়া লেন, পিন-৭১১ ১০১
- সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন-৭১১ ৩১১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা : শ্যামপুর, পিন-৭১১ ৩১৪
- মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন-৭১১ ৪০৯
- বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া) পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী), পিন-৭১১ ২২৭
- সারদা বুক এজেন্সি ❑ ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন কদমতলা, পিন-৭১১ ১০১
- শুকদেব সাঁতরা ❑ গ্রাম : উত্তর পীরপুর পোঃ বানীবন, ভায়া : উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১ ৩১৬
- পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি গ্রাম+পোঃ পানিত্রাস, পিন-৭১১ ৩২৫
- হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র হাঁটাল, পিন-৭১১ ৪০৪
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ সাঁকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
- ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র প্রযত্নে রবীন ধানুকী, পোঃ দক্ষিণ ঝাপড়দা পিন-৭১১ ৪০৫, ফোন : ৬৭০-০৪০০, ৬৭০-১৩২৪
- শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গুঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্ সঙ্ঘ ❑ ঘোষপাড়া বাজার, বালি

সংগ্রহ-কেন্দ্র

- শ্যামবাজার বুক স্টল ❑ ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- পাতিরাম বুক স্টল ❑ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম ❑ বেলুড় মঠ
- সর্বোদয় বুক স্টল ❑ হাওড়া রেলস্টশন

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

"নিয়মিত তিল তিল
করিলে সঞ্চয়
ভবিষ্য্যৎ সুখের হবে
জানিবে নিশ্চয়।"

UDBODHAN
Phone : 554-2248
554-2403
Vol. 101 ❑ No. 5 ❑ MAY 1999
Licence No.
WB/NC/CL-3
ISSN 0971-431
R.N. 8793/57
Postal Reg. No. WB/N

গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ❑ পঁয়ষট্টি টাকা ❑ সডাক সংগ্রহ ❑ পঁচাত্তর টাকা
পৃথক ভাবে কিনলে ❑ প্রতি সংখ্যা ❑ আট টাকা ❑ শারদীয়া সংখ্যা ❑ চল্লিশ টাকা

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন
॥ ১০১ ॥
১৪০৬ □ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত

বিবেকানন্দ ইল্লম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

বিবেকানন্দ ইল্লম একটি পবিত্র ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই ভবনটি একটি তীর্থক্ষেত্র। স্বামীজী পূর্ণ নয়দিন এখানে অবস্থান করেছেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, উপদেশ দান করেছেন, ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেছেন। তাঁর অদৃশ্য, দিব্য উপস্থিতিতে স্থানটি এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে, শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী চেন্নাইয়ের এই বাংলোয় উঠেছিলেন। তখন বাড়িটির নাম ছিল 'আইস হাউস' বা 'ক্যাসল কার্নন'। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় ভারতের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে তেজোদীপ্ত বাণী প্রদান করেছিলেন তা ইংরেজীতে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বা বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা, আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে এই বাড়িটিতেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত স্বামীজীর বাণীর ঐতিহাসিক পীঠভূমি।

আমরা এখানে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে চাইছি, যেখানে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত হবে। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্রসমূহ, অন্যান্য সুন্দর চিত্র, মডেল, ভিডিওগ্রাফ, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রাণপ্রদ বাণীর প্রচারকেন্দ্র-রূপে এই বাড়িটিকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করছি।

১৮৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই বাড়িটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই পবিত্র কাজটি শুরু করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে এবং স্বামীজীর সকল অনুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের উদার দাক্ষিণ্যে আমরা এই মহান কাজ সম্পন্ন করার আশা রাখি।

এবাবদ সমস্ত আর্থিক দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে দান পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন: ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স: ৪৯৩-৪৫৮৯
ই. মেল: srkmath@vsnl.com
ওয়েবসাইট: www.sriramakrishnamath.org

☎ ঃ ৬৫৪-৪৬৪৫

বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি

১১, শরৎ চন্দ্র আটা লেন, বেলুড় মঠ, হাওড়া
পিন-৭১১ ২০২
রেজিঃ নং—এস/৫৩৭৮৯

আবেদন

১৯৮২ সালের জুন মাসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের ঐকান্তিক উৎসাহে আমরা 'বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করি। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের দুঃস্থ, অবহেলিত ও নিপীড়িত মহিলাদের স্বাবলম্বী ও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

বিগত আঠার বছর ধরে একটি ছোট ভাড়াবাড়িতে সমিতি তার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন শাখা খুলে তার কাজকর্ম চালাচ্ছে। বর্তমানে সমিতির কাজ প্রচুর বেড়ে যাওয়ায় জায়গার অভাবে কাজ চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই সমিতির নিজস্ব একটি গৃহ নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উক্ত গৃহ নির্মাণের জন্য আনুমানিক সাত লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমরা এই গৃহ নির্মাণের জন্য মুক্তহস্তে দানের আবেদন জানাচ্ছি যাতে পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের অভীপ্সিত পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতির এই প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে।

চেক বা ড্রাফট্ দিতে হলে 'বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি'-র নামে হবে। মানি অর্ডার পাঠাতে হলে—**সম্পাদিকা, বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি, ১১ শরৎ চন্দ্র আটা লেন, পোঃ বেলুড় মঠ, পিন-৭১১ ২০২, জেলা ঃ হাওড়া এবং সভানেত্রী ঊষা মজুমদার, ৭৮৫ 'পি' ব্লক, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩**—এই ঠিকানায় পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল দানই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতিতে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

দীপ্তি ভৌমিক
সম্পাদিকা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

উদ্বোধন ॥ ১০১ ॥

সূচীপত্র

১০১তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ় ১৪০৬ জুন ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ২৬১
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
তত্ত্ব ও প্রয়োগ : শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী ২৬২
❑ মাধুকরী ❑
ভূমিকম্প ও তাহার ফলাফল—শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী ২৮২
❑ সঙ্কলন ❑
'কথামৃতে' না-বলা 'কথামৃত'-প্রসঙ্গ—শ্রীম ২৬৫
❑ আলোচনা ❑
অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ—স্বামী নির্বাণানন্দ ২৭২
❑ ভাষণ ❑
রামকৃষ্ণ মিশন : আদর্শ ও অঙ্গীকার—স্বামী ভূতেশানন্দ ২৬৮
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসেতু স্বামী বিবেকানন্দ—
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ২৬৯
❑ ধারাবাহিক প্রবন্ধ ❑
অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ—স্বামী প্রভানন্দ ২৭৪
❑ পরিক্রমা ❑
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মল্লভূমি : বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া—
চিররঞ্জন মজুমদার ২৯০
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ৬—কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত ২৮১
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
নারীজাতি বেদাধ্যয়নবিহীন—কোন্ শাস্ত্রানুসারে? ২৭৮
প্রসঙ্গ 'জল পান' ২৭৯
প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন' ২৭৯
'ব্লাডপ্রেসার ও অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সংঘটনকারী হেতুগুলি' ২৭৯
প্রসঙ্গ 'তত্ত্ব ও প্রয়োগের চিরন্তন সমস্যা' ২৮০
'উদ্বোধন : বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা' ২৮০
শ্রীরামকৃষ্ণ হালিশহর ও হংসেশ্বরী-মন্দিরে কখন এসেছিলেন? ২৮০
❑ পরমপদকমলে ❑
বিদ্রোহী ভগবান—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৯৭
❑ বিজ্ঞান ❑
দূষণমুক্ত কৃষি—একটি দিশা—রঘুপতি মুখোপাধ্যায় ৩০০
❑ সুস্বাস্থ্য ❑
স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—সত্যানন্দ চক্রবর্তী ৩০৪
❑ কবিতা ❑
নীলাচলে মহাপ্রভু—শ্রীপালি রায় ২৮৮
আকাশ হলে—সুনীতি মুখোপাধ্যায় ২৮৮
যত দূরেই যাই—সুদীপ্ত মাজি ২৮৮
লাভা ও লোলেগাও—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৮
অনুভব—স্মৃতি পাল ২৮৯
সিন্ধুর ডাক—সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৯
আঁধার পেরিয়ে—সন্দীপন বিশ্বাস ২৮৯
মুক্ত যেদিন মুক্তি পায়—শ্রীদিলীপকুমার শীল ২৮৯
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
বিজ্ঞান-সংবাদ • শল্যচিকিৎসকরা মুমূর্ষু রোগীদের ওপর অনেক পরিহার্য অস্ত্রোপচার করেন ৩০৫
কৃষ্ণকায় দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের ভগ্নস্বাস্থ্যের একটি কারণ চিকিৎসক সম্প্রদায় ৩০৫
গ্রন্থ-পরিচয় • সুভাষিত-সংগ্রহ—দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল ৩০৬
স্থানীয় ইতিহাস—তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৭
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৩০৮
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৩০৮ বিবিধ সংবাদ ৩০৯
❑ অন্যান্য ❑
অনুষ্ঠান-সূচী (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪০৬) ২৬৭
আবেদন : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মনসাদ্বীপ ২৭৭
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রায়হরিপুর ২৯৯
❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র : অদ্বৈত আশ্রম
বর্তমান বর্ষের (১৪০৫-১৪০৬/১৯৯৯) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

'উদ্বোধন' ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৬ সংখ্যা

গ্রাহকদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- ❑ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'**-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **সংখ্যাটির মূল্য ঃ ৪০ টাকা।**
- ❑ **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি ডাকযোগে নিলে রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ অতিরিক্ত ১৯ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ থেকে ১৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
- ❑ আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ শারদীয়া সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না পেলে আমাদের পক্ষে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।
- ❑ ডাকযোগে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা ডাকযোগেই (By Post) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।
- ❑ যাঁরা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে।
- ❑ অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।
- ❑ যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন তাঁরা চাইলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেজন্য তাঁদের প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ১৯ টাকা পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ১৯ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- ❑ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- ❑ কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করবেন, তাঁদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় অনুগ্রহ করে তাঁদের নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রশিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে (যদি ক্যাশমেমো/রসিদ হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে) নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।
- ❑ যাঁরা প্রতি মাসে পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন এবং যাঁরা শুধুমাত্র শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন তাঁরা ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত শারদীয়া সংখ্যাটি কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই সময়ের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ২৬ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বরের ('৯৯) মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য তার পর সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- ❑ কার্যালয় কাজের দিন (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ। ৯ অক্টোবর মহালয়া এবং ১৬ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২৬ অক্টোবর '৯৯ কার্যালয় খুলবে।

আষাঢ় ১৪০৬
জুন ১৯৯৯

গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নিবেদিত

- মন্ত্রের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়। ভ[illegible] জপ করে মানুষ পবিত্র হয়। এই কাঁচা শরীর দিয়েই পাকা শরীর লাভ করতে হ[illegible] এই শরীরটাকে যত্ন করা চাই।
- জপধ্যান করবে, সৎসঙ্গে [illegible]হঙ্কারকে কিছুতেই মাথা তুলতে দেবে না। আর সর্বদা মনে ভাববে—আমি কার [illegible]র আশ্রিত।
- দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, [illegible]কেও কাটতে হবে। কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বৈ তো নয়—তার আবার [illegible]? যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই!
- ঠাকুর বলতেন ঃ "হরিণের [illegible] কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোথা [illegible] আসছে।" তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে [illegible] ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা।
- বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বারবার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।
- সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি ডোমের মাঝেও তিনি।
- ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক-একজনে এক-একরকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানারকমের পাখি এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকে আমরা পাখির বোল বলি—একটাই পাখির বোল আর অন্যগুলো পাখির বোল নয়, এরূপ বলি না।
- একবার দেখি কি, তা জান? দেখি না, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যেদিকে দেখি, সেইদিকেই ঠাকুর। কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমস্যা জগতের চিরন্তন সমস্যা সন্দেহ নাই, কিন্তু রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহাদের জীবন ও বাণীতে ঐ চিরন্তন সমস্যাটির চিরন্তন সমাধান দিয়াছেন। বস্তুত, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে যে সমান্তরাল ব্যবধান আমরা দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের জীবন ও বাণী উহাকে মুছিয়া দিয়াছে। তবে তাঁহাদের জীবন ও বাণীর অসাধারণত্ব এমনই অলোকসামান্য যে, তাঁহাদের আদর্শকে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবনের আঙিনায় উপস্থাপন ও অনুসরণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম সারদাদেবী। মহিমার মহনীয়তায় তিনি কাহারও অপেক্ষা কম নহেন, কিন্তু আবেদন ও আকর্ষণে তিনি যেন সকলকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও বাণীর নিরাভরণ সৌন্দর্য তাঁহাকে এমন একটি বিশিষ্টতা ও অনন্যতা দিয়াছে যে, তাঁহার অসাধারণত্বের দিকে সহজে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, অথচ তাঁহার সহজ, সরল জীবন ও বাণীর অপ্রতিরোধ্য শক্তি আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের মনকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করে। ক্বচিৎ বিদ্যুৎঝলকের মতো তাঁহার জীবন ও বাণীর অলোকসামান্য দ্যুতি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে, কিন্তু সেই বিস্ময়াবেশও আবার আমাদের অজ্ঞাতসারেই অন্তর্হিত হয়। আমরা পুনরায় তাঁহার জীবন ও বাণীর সহজ ও সাবলীল আকর্ষণে তাঁহাকে দেখিতে থাকি।

এত সহজ বলিয়াই তাঁহার এত দুর্নিবার আকর্ষণ। এত নিরাভরণ বলিয়াই তাঁহার জীবন ও বাণীর এমন অমোঘ প্রাসঙ্গিকতা! বস্তুত, তাঁহার সহজ ও নিরাভরণতাই তাঁহার চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতার মূল রহস্য। আদর্শকে যে এমন সহজ করিয়া জীবনের অঙ্গ করা যায়, তত্ত্বকে যে এমন করিয়া জীবনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে পরিণত করা যায়, বাণীকে যে এমন করিয়া জীবনে রূপান্তরিত করা যায়, ভাবকে যে এমন করিয়া অনায়াসে কর্মে ফলিত রূপ দেওয়া যায়, সারদাদেবীকে না দেখিলে সম্ভবত তাহা বুঝা যাইত না। তিনি কখনো বুঝিতে দিতেন না যে, তিনি কোন আদর্শ বা তত্ত্বকে তাঁহার কর্মে ও কথায় প্রকাশ করিতেছেন। কখনো বুঝা যাইত না যে, তিনি সচেতনভাবে কোন বাণী প্রচার করিতেছেন। অথচ তাঁহার জীবনটি ছিল এমনই যে, তাঁহার প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি আচরণ তাঁহার সকল বাণী, সকল ভাব ও সকল আদর্শের হইয়া কথা বলিত। তিনি কথা বলিতেন, কিন্তু সে-কথা প্রায়শই এতই নিরুচ্চার যে, পাশের মানুষটিও উহা শুনিতে পাইত না। অন্তত পুরুষ শ্রোতাদের অভিজ্ঞতা তাহাই বলে। শ্রীরামকৃষ্ণের দু একজন পার্ষদ ভিন্ন কেহ কখনো তাঁহার কথা শুনিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার কথা যতটুকু শোনা গিয়াছে, তাঁহার যতটুকু ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে—সেই কথা, সেই ইচ্ছাকে পূর্ণভাবে পালন করিতে স্বামী বিবেকানন্দ সহ সমস্ত রামকৃষ্ণ-পার্ষদ ব্যস্ত হইয়াছেন। এই "দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক"কে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ভগিনী নিবেদিতা অভিভূত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এবং রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে সারদাদেবীর এই অসাধারণ অবস্থান ছিল এমনই সহজ, অথচ এমনই অনিবার্য। এমন সহজ মর্যাদার অবস্থান কি আর কেহ কখনো কোন দেশে, কোন কালে লাভ করিয়াছেন? কোন মহাপুরুষ অথবা কোন মহীয়সী?

এই অতুলনীয় অবস্থানের রহস্য কি? আমরা আগেই বলিয়াছি, সেই রহস্য হইল তাঁহার সহজ, স্বচ্ছন্দ, অনায়াস জীবন। রহস্য হইল তাঁহার জীবন ও বাণীতে তত্ত্ব ও প্রয়োগের অপূর্ব সমন্বয়। বাতাস যেমন সহজ, স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস, সারদাদেবীর জীবন ও বাণী ঠিক তেমনই। সহজ, স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস হইলেও বাতাসের গুরুত্ব আমাদের জীবনে যেমন অপরিসীম, সারদাদেবীর জীবন ও বাণীর প্রাসঙ্গিকতাও সেইরূপ। আমাদের জীবনে বাতাসের যেমন কোন বিকল্প নাই, সারদাদেবীর প্রাসঙ্গিকতারও তেমনই কোন বিকল্প নাই। এমন সহজ বলিয়াই তিনি এমন অপরিহার্য আমাদের জীবনে।

সূর্যও আমাদের জীবনে অপরিহার্য। সূর্যের উপস্থিতিও আমাদের জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু সূর্যের সান্নিধ্যের প্রখরতা কি আমরা সহ্য করিতে পারি? পারি না। তেমনই পারি না রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর তীব্র প্রখরতাকে সহ্য করিতে। আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের সুমহান জীবন ও বাণী আমাদের পক্ষে, জগতের পক্ষে অবশ্যই অশেষ কল্যাণপ্রদ, কিন্তু তাঁহাদের ঐ সমুন্নত জীবন ও বাণীর সম্পূর্ণ অনুসরণ আমাদের শুধু যে সাধ্যাতীত তাহা নহে, তাঁহাদের জীবন ও বাণীকে অনুসরণ করিবার কথা আমরা চিন্তাই করিতে পারি না। তবে একথাও ঠিক যে, সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে না পারিলেও সামান্যতম অনুসরণও যদি আমরা করিতে পারি তাহাতেই আমাদের সমূহ কল্যাণ। সারদাদেবীর জীবন ও বাণী আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গভীর এবং সেজন্য উহারও সম্পূর্ণ অনুসরণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বাতাসের স্বভাব ও লক্ষণ-যুক্ত সারদাদেবীর জীবন ও বাণীর সহজতা ও সরলতা আমাদের এমনই অনুপ্রাণিত করে যে, উহার অনুসরণ বা অনুসরণের চিন্তার অসামর্থ্যের কথা আমাদের মনেই আসে না। উপরন্তু আমরা সর্বদাই ভাবি, উহা অনুসরণযোগ্য এবং উহা সহজেই আমরা অনুসরণ করিতে পারি। উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, পাপী-পুণ্যবান, পুরুষ-নারী, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান,

ভারতীয়-অভারতীয় সকলের কাছেই তাঁহার আবেদন আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। এখানেই সারদাদেবীর অনন্যতা। এখানেই নিহিত তাঁহার দুর্নিবার আকর্ষণের রহস্য।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—সারদাদেবীর জীবন ও বাণীতে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমস্যার সমাধান কিভাবে এবং কোথায় আমরা দেখি? উত্তরে আমরা শ্রুতির এই সুপ্রসিদ্ধ বাণীটি প্রথমে স্মরণ করি : "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১)—এই বিশ্বচরাচরে সকলকিছুই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই কোথাও নাই। সমস্ত উপনিষদে ঐ একই কথা বারংবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (২।১৭) বলিতেছেন : "যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।/য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"—যে স্বয়ংজ্যোতি সত্তা অগ্নিতে, জলে, ওষধি ও বনস্পতিসমূহে অধিষ্ঠিত, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট, সেই স্বয়ংজ্যোতি সত্তাকে বারংবার নমস্কার। ঐতরেয় উপনিষদে (৩।১।৩) বলা হইয়াছে : সকল প্রাণীতে, সকল জীবে, সকল মানুষে তাঁহার অধিষ্ঠান। তিনিই সর্বভূতে—সর্বত্র। "ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি, ইতরাণি চেতরাণি চ—অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ—অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্।"—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী হইতে বৃহত্তম প্রাণী পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী—অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ—এবং অশ্ব, গো, মনুষ্য ও অন্য যেসব প্রাণী পায়ে চলে, আকাশে উড়ে অথবা যাহারা অচল—সমস্তই তিনি। অর্থাৎ আমাদের সম্মুখে অথবা পশ্চাতে, উর্ধ্বে অথবা নিম্নে, উত্তরে অথবা দক্ষিণে, পূর্বে অথবা পশ্চিমে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যেখানে যাহা কিছুর অবস্থান সবই তিনি—সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম : "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।/অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।। (মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।১১)

বস্তুত, ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বব্যাপিত্বের এই তত্ত্ব বা আদর্শটি বেদান্তের প্রধান বক্তব্য। এই তত্ত্ব বা আদর্শই বেদান্তের সুবিখ্যাত অদ্বৈততত্ত্বের ভিত্তি। শ্রুতি এই মহাতত্ত্বটি জগতে সর্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন। শ্রুতি তো বলিলেন, ঋষিরা, আচার্যরা তাহা প্রচারও করিলেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে এই তত্ত্বের স্ফূর্তি দেখা গেল। কিন্তু উহাকে তাঁহারা সকলে প্রাসাদ হইতে কুটিরে, গুহা হইতে রান্নাঘরে, মন্দির হইতে স্নানঘরে, ঠাকুরঘর হইতে গোয়ালঘরে, উপাসনাক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে, প্রচার ও উপদেশের ভূমি হইতে হলকর্ষণের ভূমিতে, ধ্যানের আসন হইতে কর্মের কোলাহলে লইয়া যাইতে পারেন নাই। ফলে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যবর্তী সমান্তরাল ব্যবধানটি এক অর্থে থাকিয়াই গিয়াছে।

কিন্তু এখানে আমরা সারদাদেবীকে পাইতেছি এক অভূতপূর্ব ভূমিকায়। বেদ-বেদান্তের জন্মভূমি ভারতবর্ষে তত্ত্ব ও প্রয়োগের দ্বিচারিতায় জন্ম হইয়াছে অস্পৃশ্যতার মতো লজ্জাকর এক সামাজিক ব্যাধির। বাড়ির বাহিরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সাম্যের বার্তা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া বাড়িতে আসিয়াই মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছেন অনেক বিখ্যাত মনীষী। মুখে প্রগতিশীলতার ধ্বনি তুলিয়াছেন, কিন্তু কর্মে সেই প্রগতিশীলতার ধ্বনির প্রায়শই কোন সম্পর্ক দেখা যায় নাই। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে ভেদাভেদের বিরুদ্ধে তাঁহারা খড়্গ তুলিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তানকে অব্রাহ্মণ শিক্ষকের পদধূলি লইতে দেন নাই এবং ব্রাহ্মণ-পরিবার ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের পরিবারে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেন নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করার নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণত্বের সমাজপ্রসিদ্ধ চিহ্ন উপবীতকে আমৃত্যু ধারণ করিয়াছেন এবং পুত্রদের যথারীতি উপনয়ন দান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ত্যাগের পরিবর্তে উহাকেই আজীবন মনের মধ্যে লালন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সারদাদেবী তাঁহার ভাইঝি-ভাইপোদের অব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠদের পদধূলি গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিতেন। পণ্ডিত ও গুণবান ব্যক্তি অব্রাহ্মণ হইলে তাঁহাকে বা তাঁহাদের প্রণাম করিতে বলিতেন। ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই আত্মীয় ও ভক্তমহলে আপত্তি উঠিত, কিন্তু তাঁহার ঐ শিক্ষাদান তাহাতে কখনো ব্যাহত হয় নাই। বহু অন্ত্যজ নরনারীকে তিনি দীক্ষাদান করিয়াছেন এবং তাঁহার উচ্চবর্ণের শিষ্য-শিষ্যাদের মতোই তাহারা তাঁহার কাছে আদর ও স্নেহ পাইয়াছে। একবার এক অন্ত্যজ যুবক নীচ জাত বলিয়া তাঁহার কাছে আসিতে সঙ্কুচিত বোধ করিতেছিল। তাহার সঙ্কোচের পিছনে সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ও ছিল। সারদাদেবী তাহাকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন : "বাবা, ঘরে এসে বসে বল।" যুবকটি বলিলেন : "মা, এখানেই (বারান্দায়) বসি, আমি হীন জাত।" সারদাদেবী বলিলেন : "কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে এসে বস।" শূদ্রের সম্পর্কে গোলাপ-মার অবমাননাকর উক্তি শুনিয়া পরম করুণায় তিনি বলিয়া উঠিয়াছেন : "শুদ্দুর কে গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?"

জয়রামবাটীর মতো আষ্টেপৃষ্ঠে রক্ষণশীলতার বেষ্টনীতে মোড়া পল্লীগ্রামে বসিয়া সারদাদেবী ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সকল ভক্তকে একসঙ্গে বসাইয়া খাওয়াইয়াছেন। নিজে শূদ্রের হাতের ছোঁয়া রান্না পরমানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। 'ম্লেচ্ছ' মার্গারেট, সারা, জোসেফিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই একসঙ্গে আহার করিয়াছেন, তাঁহাদের বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। নিবেদিতার স্বহস্তে প্রস্তুত অন্ন ঠাকুরকে ভোগ দিয়াছেন এবং স্বয়ং সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমান আমজাদকে পাশে বসাইয়া স্বয়ং আহার্য পরিবেশন করিয়াছেন এবং তাহার উচ্ছিষ্টও নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়াছেন। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে দেখিয়া তাঁহার ভাইঝি নলিনী ঘৃণা ও আতঙ্কে বলিয়া উঠিয়াছিলেন : "মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!" সারদাদেবী তাহাতে হাসিয়া বলিয়াছিলেন : "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?" জাতে মুসলমান আবার চুরি-ডাকাতিতে কুখ্যাত এমন লোকের

ভালবাসার দান সরাসরি তাহার হাত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ইচ্ছাকে সম্মান দিয়া তাহার দেওয়া সামান্য কয়েকটি কলা ঠাকুরের ভোগের জন্য সানন্দে রাখিয়াছেন। বিনা বাধায় একাজ তিনি অবশ্য করিতে পারেন নাই। আত্মীয়দের মধ্য হইতে ইহার কঠিন প্রতিবাদ আসিয়াছে : "ও চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?" কঠিনতম কণ্ঠে সারদাদেবী বলিয়াছেন : "কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।" অর্থাৎ মানুষের মধ্যে তিনি মানুষকেই দেখিতেন, মানুষের জাত ও জীবিকা, স্খলন ও পতনকে তিনি দেখিতেন না। তিনি বলিয়াছেন : "কে সাধু, কে চোর, কে হিন্দু, কে মুসলমান—আমি জানি।" বলিয়াছেন : "দোষ তো মানুষের লেগেই আছে, কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে কজনে?" তিনি বলিতেন : "ভাঙতে পারে সবাই, নিন্দা-সমালোচনা করতে পারে সবাই, কিন্তু গড়তে পারে কজন?"

মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কৃত্রিম ভেদরেখা সমাজ টানিয়াছে এবং মানুষের মহিমার যে অমর্যাদা করিয়াছে, সারদাদেবী প্রতিদিন তাহাকে ভাঙিয়াছেন। শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিলে, শূদ্রের ছোঁয়া আহার গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের নাকি জাত যাইত! মুসলমান ও খ্রীস্টানদের স্পর্শ করিলে নাকি হিন্দুর জাত যাইত! সমকালের সেই অমানবিক প্রথাকে তিনি তাঁহার সর্বপ্লাবী মাতৃত্বের শক্তিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই ভাঙা অথবা অস্বীকার নেতিবাচক ছিল না, ছিল একান্তভাবেই ইতিবাচক। কারণ, ঐ ভাঙা এবং অস্বীকারের মধ্যে নিহিত ছিল পুনর্গঠন এবং স্বীকৃতির নূতন মন্ত্রকবচ।

শুধু মানুষের জন্যই নয়, পশু-পাখি, গরু, কুকুর, বিড়াল, পোকা-মাকড়, পিঁপড়া সম্পর্কেও তাঁহার সমদৃষ্টি একইভাবে প্রসারিত ছিল। জয়রামবাটীতে সারদাদেবীর বাড়িতে কয়েকটি বিড়াল ছিল। তাঁহার স্নেহে তাহারা সেখানে সাদরেই পালিত হইত। কিন্তু মায়ের অন্যতম সেবক-সন্তান জ্ঞান মহারাজ বিড়াল পছন্দ করিতেন না। বিড়াল দেখিলেই তিনি বিরক্ত হইতেন এবং মারিতেন। একদিন একটি বিড়ালকে তুলিয়া এমন আছাড় মারিলেন যে, সারদাদেবীর মুখ বেদনায় নীল হইয়া গেল। তিনি বহুবার জ্ঞান মহারাজকে বিড়ালদের মারিতে বারণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। মারধর যথারীতি অব্যাহত ছিল। এদিকে তাঁহার কলকাতা যাওয়ার দিন আগতপ্রায়। তাঁহার দুশ্চিন্তা—তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিড়ালগুলি আহার তো পাইবেই না, উপরন্তু প্রহারের পরিমাণ আরো বাড়িবে। একদিন জ্ঞান মহারাজকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন : "জ্ঞান, বেড়ালগুলোর জন্য চাল নেবে, যেন কারো বাড়ি না যায়—গাল দেবে, বাবা!" তিনি জানিতেন, এমন কথা তিনি আগেও বলিয়াছেন এবং তাহাতে কোন কাজ হয় নাই। তাই সেদিন একটি অসাধারণ কথা বলিলেন তিনি। বলিলেন : "দ্যাখ জ্ঞান, বেড়ালগুলোকে মেরো না। ওদের ভিতরেও তো আমি আছি।" কথাগুলির মধ্যে এমন একটি শক্তি ছিল যে, জ্ঞান মহারাজকে তাহা গভীরভাবে স্পর্শ করিল। ইহার পর আর কোনদিন জ্ঞান মহারাজ বিড়ালের গায়ে হাত দেন নাই। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞান মহারাজ নিজে নিরামিষাশী হইলেও সেদিন হইতে তিনি যেভাবেই হউক বিড়ালগুলির জন্য নিত্য মাছ যোগাড় করিতেন। অন্য মাছ না পাওয়া গেলে স্বয়ং আমোদর নদীতে জাল ফেলিয়া চুনা মাছ ধরিয়া আনিতেন এবং ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে মাখিয়া বিড়ালগুলিকে পরম যত্নে খাওয়াইতেন। শুধু বিড়াল নয়, পিঁপড়াকে কেহ মারিবে তাহাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। নিজেই বলিতেছেন : "একটা ডেয়ো পিঁপড়ে যাচ্ছে—রাধি তাকে মারবে।... দেখলুম, সেটা পিঁপড়ে তো নয়—ঠাকুর! ঠাকুরের সেই হাত, পা, মুখ, চোখ, সব সেই!—রাধিকে আটকালুম!"

এই ব্রহ্মদৃষ্টি সারদাদেবীর সর্বক্ষণের দৃষ্টি। এই দৃষ্টির প্রতিফলন আমরা তাঁহার সমস্ত আচরণ ও কর্মে সর্বদা দেখিতে পাই। একদিন তিনি বলিতেছেন : "ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যেদিকে দেখি, সেইদিকেই ঠাকুর—কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।" আবার বলিয়াছেন : "সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্দী ডোমের মাঝেও তিনি।"

এই একত্বদর্শনই উপলব্ধির সর্বোচ্চ ভূমি। এই ভূমিতে সারদাদেবী নিত্য অবলীলায় অবস্থান করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন : যে-ভূমিতে মনকে উঠানোর জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি, মা সেখানেই মনটা সবসময় অনায়াসে নামাইয়া রাখেন। সাধনার সর্বোচ্চ উপলব্ধি কিভাবে তাঁহার জীবনের অঙ্গ হইয়াছিল তাহা দু-একটি সংলাপে আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহার ভাইঝি নলিনীর শুচিবাই ছিল। তিনি একদিন দু-এক ঘটি জল ঢালিয়া শৌচাগার পরিষ্কার করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসেন। নলিনীর শরীর সুস্থ ছিল না। সেজন্য সারদাদেবী নলিনীকে বলিলেন, বাড়িতে স্নান সারিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেই তো হইত। প্রসঙ্গত, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন : "আমি তো দেশে কত শুকনো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দুবার 'গোবিন্দ, গোবিন্দ' বললুম, ব্যস, সব শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব—মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।" একদিন জয়রামবাটীতে রাধুনী ব্রাহ্মণী রাত নয়টার সময় বলিলেন : "কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।" সারদাদেবী বলিলেন : "এত রাতে স্নান করো না, হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়।" রাঁধুনী বলিলেন : "তাতে কি হয়?" সারদাদেবী বলিলেন : "তবে গঙ্গাজল নাও।" কিন্তু তাহাতে তিনি রাজি নহেন। অত রাত্রে স্নান তাঁহাকে করিতেই হইবে, নতুবা তিনি শুদ্ধ হইবেন না। তখন সারদাদেবী তাঁহাকে বলিলেন : "তবে আমাকে স্পর্শ কর।"

এইভাবে তত্ত্ব ও আদর্শকে তিনি শুধু ফলিত রূপ দান করেন নাই, তত্ত্ব ও আদর্শ তাঁহার মধ্যে জ্বলন্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেকারণেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সারদাদেবীর জীবন ও বাণীর প্রাসঙ্গিকতা ক্রমবর্ধমান। ❑

‘কথামৃতে’ না-বলা ‘কথামৃত’-প্রসঙ্গ

শ্রীম

আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত স্মৃতিতে বহন করে আনতাম এবং বাড়িতে এসে ডায়েরীতে তার সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখতাম। অনেকসময় একদিনের কথার নোট সাতদিন ধরে স্মৃতি থেকে বের করে লিখতাম। তাঁর এক-একটি কথার জন্য আমি চাতকের মতো চেয়ে থাকতাম। ডায়েরীর নোট থেকে পুস্তকাকারে বহু পরে ‘কথামৃত’ লিখিত হয়। এক-একটি scene (দৃশ্য) আমি হাজারবারেরও বেশি ধ্যান করেছি। কাজেই বহুপূর্বে অনুষ্ঠিত সেই লীলাকথা আমার চোখের সামনে ঠাকুরের কৃপায় জীবন্ত হয়ে ভাসত, যেন এইমাত্র দেখে এলাম—সত্তর বছর আগে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হলেও। কাজেই এইভাবে বলা যেতে পারে যে, ঠাকুরের সম্মুখেই লেখা হয়েছে। অনেকসময় ঘটনার বিবৃতিতে মন প্রসন্ন হতো না। তখনি ঠাকুরের ধ্যানে নিমগ্ন হতাম। তখন সঠিক চিত্রটি মনশ্চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল ও জীবন্তভাবে প্রকাশিত হতো। কাজেই লৌকিক জগতে সময়ের এত বড় ব্যবধান থাকলেও আমার চিন্তার জগতে এটা সদ্য অনুষ্ঠিত বলে প্রতিভাত হতো।

অন্য ভক্তরা—যেমন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি—কখনো কখনো ঠাকুরের কথামৃতের নোট রাখতে চেষ্টা করতেন সঙ্গোপনে। ঠাকুর জানতে পেরে তাঁদের ঐরূপ করতে বারণ করলেন। বললেন, এটা রাখবার জন্য লোক আছে। (১৪শ ভাগ, পৃঃ ২৯০)

ঠাকুরের কাছে বসে কখনো লিখিনি। ঘরে এসে লিখতাম। তা কেউ জানত না। কেবল ঠাকুর জানতেন। অনেক পরে ঠাকুরের শরীর গেলে ভক্তরা কেউ কেউ জানতেন। (ঐ, পৃঃ ২৭১)

আমায় ঠাকুর এমন করে দিয়েছিলেন, সাত-আট ঘণ্টা শুনছি তাঁর কথা, তাঁকে watch (পর্যবেক্ষণ) করছি, রাত্রিতে বাড়ি এসে সব লিখছি, সব মনে থাকত। পর পর এসে যেত লিখবার সময়—সব কথা। একদিনে সব হতো না—ক্রমে মনে আসত। এমনি দাগ লাগিয়ে দিতেন। আর পাঁচবছর লিখছি কেউ জানত না। এই পাঁচবছরই লীলাপ্রকাশের সময় ছিল। কালী মহারাজ শেষ বছর তাঁর কাছে এসেছিলেন। এক বছর কম কি। একদিন দেখলেই রক্ষা নেই, তা একবছর থাকা।.(৫ম ভাগ, পৃঃ ১৯)

[২৫ মে, ১৯৩২। ‘কথামৃত’ লেখা হচ্ছে। একজন সাধু শ্রীম-র পিছনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তাঁর নিজের আবিষ্কৃত বাঙলা সর্ট হ্যান্ডে লেখা—‘কামারশালের নোয়া’। এর থেকে শ্রীম লিখলেন—“সংসারে হবে না কেন? মন কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক হয়েছে। মন যেন কামারশালের নোয়া। যতক্ষণ আগুনে ততক্ষণ লাল, টেনে আনলেই যেই নোয়া সেই নোয়া। নিঃসঙ্গ, নয়তো সাধুসঙ্গ। নিঃসঙ্গে মন অনেক শুকিয়ে যায়। যেমন ভাঁড়ের জল শুকিয়ে যায়। তবে যদি গঙ্গাজলের জালায় ভাঁড় থাকে শুকোয় না।” (১৫শ ভাগ, পৃঃ ৩৯৯)]

[কি করে একটা সামান্য ‘স্কেচ’ থেকে ‘কথামৃত’ রচিত হলো—এই প্রশ্ন করলে] তাঁর কৃপায়। লোক দেখে ত্রিশ বছরের ঘটনা। কিন্তু আমি দেখছি আমার চোখের সামনে ঘটছে এই ক্ষণে। সময়ের ব্যবধান দূর হয়ে যায় ধ্যানে। ভক্তিতে সব বর্তমান—অতীত, ভবিষ্যৎ নেই। (১৩শ ভাগ, পৃঃ ৯৭)

কমপক্ষেও হাজারবার এক-একটি দিনের কথাচিত্রের ধ্যান করেছি। চাতক যেমন জলের জন্য উৎকণ্ঠিত, তেমনি হয়েছিল আমাদের অবস্থা—ঠাকুরের এক-একটি কথামৃতের জন্য। সত্য সত্য অমৃত। কবিতার অমৃত নয়। মরুভূমিতে একটি পথিক চলছে—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে। সেইসময় যদি একটি মরূদ্যান মেলে তার প্রাণ যেমন বেঁচে যায়, এও ঠিক তেমনি। বরং তার চাইতে অনন্তগুণ বড়। মরূদ্যানের সুশীতল জল বাঁচিয়ে রাখে পঞ্চভৌতিক দেহ। কিন্তু ভগবানের বাণী, ঠাকুরের কথামৃত বাঁচায় এই দেহ, আবার spiritual body (আত্মিক শরীর)।

এক ভক্ত [শ্রীম নিজে] সংসারের জ্বলন্ত অনলে দগ্ধপ্রাণ হয়ে এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করতে গিয়েছিল। ঠাকুরের সঙ্গে মিলন হওয়ায় তাঁর কথামৃত পান করে সে-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা হলো। তাঁর অমৃতস্পর্শে মৃতপ্রায় প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, এই সংসারের পরপারের চিদানন্দের

আস্বাদ পাইয়ে দিলেন ক্ষণিকের জন্য সুবিজ্ঞ বাজিকরের মতো। যে জীবনধারণ হয়েছিল দুর্বিষহ, তা-ই এখন আনন্দময়। ভক্তের ধাঁধাঁ লেগে গেল—এ কে? দেব কি মানব? এই দৈবী আফিং-এর লোভে ভক্ত তাঁর পায়ে জীবন সমর্পণ করল। তাই গুরু অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

আবার সংসারে ছেড়ে দিল বাজিকর। এখন সংসার কেবল জ্বলন্ত অনল নয়, নিত্যানন্দের বিলাসভূমিও বটে। আনন্দময় স্থানও বটে। এই আনন্দময় ভাবটিকে বাহ্য জগতের সকল ব্যবহারের মধ্যে permanent (স্থায়ী) করার জন্য ভক্ত এখন ব্যাকুল। (১১শ ভাগ, পৃঃ ৭১)

স্বামীজী লিখছেন, কেউ curse (অভিশাপ) দিবে, কেউ reward (পুরস্কার) দিবে—'কথামৃত' পড়ে। যাদের interest-এ (স্বার্থে) হাত পড়বে তারাই curse দিবে। ত্যাগের কথা আছে কিনা এতে! যাদের ভোগে মন আছে তারাই রেগে যাবে। মা হয়তো বলবে—হায়, আমার ছেলেটা সাধু হয়ে বের হয়ে গেল। ঐ লোকটাই তো তার মাথা খারাপ করে দিল বইটা ('কথামৃত') লিখে। কোন স্ত্রী হয়তো বলবে—আমার সাজানো বাগান নষ্ট করে দিল ঐ লোকটা। পতিও বলতে পারে—ঐ বইটা পড়েই আমার স্ত্রী বিগড়ে গেল।

যাদের ভোগ শেষ হয়ে গেছে কিংবা অল্প বাকি আছে, তারা ঠিক এর উলটো কথা বলবে। তারা বলবে—'কথামৃত' অমৃতই বটে—জীবনামৃত। ঐটি আমাদের শান্তি দিল, জ্বলে যাচ্ছিলাম। এরা এখন কেবল ভগবানে মন দিবে। এদের ভোগ শেষ হয়ে গেছে। অন্য কিছুতে রুচি নেই।

স্বামীজীরও ঐ দশা (অভিশাপপ্রাপ্তি) হয়েছে কিনা। তাই পূর্ব থেকেই আমাদের warn (সাবধান) করে দিলেন—তোমারও হবে।

'কথামৃত' বের হওয়ার পর কত চিঠি লিখেছে লোক curse দিয়ে। (৯ম ভাগ, পৃঃ ১৮)

'কথামৃত' যখন বের হয়, অনেকে কত অভিশাপ করেছে। এমন বলেছে, লোকটার মরবারও ভয় নেই, অত ভাল লোকের সঙ্গে থেকেও! তারা ভেবেছে, এসব মিথ্যা কথা, আমাদের বানানো কথা—ঠাকুরের কথা নয়। অনেকের অসুবিধা হয়েছে কিনা এসব কথা প্রকাশ পাওয়ায়। সব তিনি বলে গেছেন আগে থাকতে। (৫ম ভাগ, পৃঃ ৯৬)

আমরা নিজ চক্ষুতে ঠাকুরের যে-কার্য দেখেছি এবং নিজ কর্ণে তাঁর যে-মহাবাক্য শুনেছি, বাড়ি এসে তাই ডাইরীতে লিখেছি সেইদিন। কখনো সমানে কয়দিন ধরে লিখেছি। অত বেশি কথা হতো কোন কোন দিন। আমরা 'কথামৃত'-এ এইসব দেবদৃশ্য ও দেববাণী লিপিবদ্ধ করেছি। মূল গ্রন্থে বিবৃত সমস্ত scene-এ আমরা উপস্থিত ছিলাম।

[অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিকথা, বরানগর মঠের কথা প্রভৃতিও 'কথামৃত'-এ স্থানলাভ করেছে।—এই কথা বলায়]

মূল গ্রন্থে নয়, পরিশিষ্টে লেখা হয়েছে। মূল গ্রন্থে সব direct evidence (যা নিজ চক্ষে দেখেছি, নিজ কানে শুনেছি)। (৯ম ভাগ, পৃঃ ১৪৮)

সন্ন্যাসের আদর্শ বড় কঠিন। ঠাকুরের উপদেশ আগাগোড়া সন্ন্যাসের। 'কথামৃত'-এ আগাগোড়া সন্ন্যাস। তবে কতকগুলিকে direct (সোজাসুজি) বলেছেন, তারা ধরতে পারবে বলে। কতকগুলিকে indirect (ঘুরিয়ে) বলেছেন, তারা ভয় পাবে বলে। এ যেন কলার ভিতর কুইনাইন! তাঁর কথা সব সন্ন্যাসের কথা। কেবল সন্ন্যাস বড় কঠিন—যেন নির্জলা একাদশী। (৭ম ভাগ, পৃঃ ২৯৫)

On the spot (সেই স্থানেই) লিখিনি। সবই memory (স্মৃতি) থেকে লিখেছি বাড়ি এসে—কখনো সারা রাত জেগে। আমরা যা দিয়েছি তা অন্যের নিকট থেকে collection (সংগ্রহ) নয়। যা শুনেছি তাই লিখেছি। Historian (ইতিহাসলেখক)-দের মতো collect (সংগ্রহ) করিনি। অথবা antiquarian-দের (পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের) মতোও লেখা হয়নি। সব নিজ কানে ঠাকুরের মুখ থেকে শোনা, নিজ চোখে দেখা।...

আমরা কখনো একটা sitting (দিনের ঘটনা) সাত দিন ধরে লিখতুম কার পর কি গান, সমাধি—এসব স্মরণ করে।

[একজন 'কথামৃত' আর কি লেখা হবে?—প্রশ্ন করলে]

ইচ্ছা তো কত ছিল—হয় কৈ। আরো কয়েক পার্ট লিখে তারপর ঠাকুরের কথা দিয়ে ঠাকুরের life (জীবনী) লেখা। বুড়ো মানুষের পুরনো যন্ত্র, concentrate (মন একাগ্র) করা চলে না। পাকা আঁব যেমন—কখন পড়ে যায়!... (৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ২৭৯)

'কথামৃত'-এর মতো অমনটি আর পাবেন না কোথাও! লোকে আজকাল কত কথা কয় নিজেদের মনের মতো। কেউ কেউ বলে ক্রাইস্টই ছিল না। কিন্তু ঠাকুর যে দর্শন করলেন তাঁকে! আবার বলেছেন, আমিই ক্রাইস্ট ছিলাম। আমিই চৈতন্য ছিলাম। তার কি হলো? তাঁর কথা কি তাহলে মিথ্যা? কার অত বড় বুকের পাটা তাঁর কথা মিথ্যা বলার? কত evidence (প্রমাণ) যে রয়েছে তাঁর! সব চাইতে বড় evidence মানুষগুলি, যাদের তিনি তৈরি করেছেন। তাদের জীবন, তাদের কাজ দেখে—তিনি ছিলেন না, তাঁর কথা মিথ্যা—কে বলতে পারে? আরেক evidence তাঁর বাণী। তাঁর কাছে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের দ্বারা কথিত। আবার তিথি, নক্ষত্র, বার, তারিখ দিয়ে লিখিত। এই direct message (প্রত্যক্ষ বাণী), এই direct evidence (প্রত্যক্ষ প্রমাণ) আছে বলে ওকথা বলা অত সহজ নয়। ক্রাইস্ট, চৈতন্যদেবের কথার এরূপ records (প্রমাণ) থাকলে ওকথা বলা শক্ত হতো। (৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৯৫-১৯৬)

'Gospel Part I' সান ফ্রান্সিস্কোতে ছাপানো হয়েছিল। ত্রিগুণাতীত (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) বের করেছিলেন। এটার সম্পূর্ণ অনুবাদ আমরা করেছি। মা শক্তি দিয়েছিলেন তাই

হলো। আবার শক্তি দিলে বাকিগুলোও হবে। আমরা বরাবর ঐ করেছি, ভাবটা দিতে চেষ্টা করেছি, যেমন শুনেছিলাম। ঠাকুর কথা বলবার সময় একটা ভাব প্রকাশ করতেন—জীবন্ত ভাব। আমরা সেটা যথাশক্তি দিতে চেষ্টা করেছি—শব্দ যথাসম্ভব রক্ষা করে। ভাবটার primary inportance (প্রাধান্য) দেওয়া হয়েছে। শব্দ বা ভাষা তারপর। আর সোজা কথায় প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। (৩য় ভাগ, পৃঃ ২৯৬)

ঠাকুরের কথা সব বেদবাক্য। নিজে বলেছেন ঃ "ভক্ত-ভাগবত-ভগবান এক।" ভগবানের কথা ভাগবত। 'কথামৃত' তাঁরই কথা, তাই ভাগবত। এই কথায় আরেকটি কথা মনে হলো। ছোট খাটটিতে বসে আছেন ঠাকুর। আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ "দেখ, এই মুখ দিয়ে তিনি কথা কন।"... আহা, তাঁর কথা বেদমন্ত্র! (২য় ভাগ, পৃঃ ১৩৪)

ভগবানের কথাই উপনিষদ্। এর অধিক কিছু নয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ যা আছে তা-ই উপনিষদ্। কেমন করে বলে গেছেন—সহজ করে, সরল করে, সব দেখিয়ে। তেমন আর কোথাও পাবেন না।... 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' উপনিষদ্। (১ম ভাগ, পৃঃ ৩২২)

তপস্যা না করলে শব্দের অর্থই বোঝা যায় না। Fine distinction (মর্মার্থ) বুঝতে হলে তপস্যা চাই। তপস্যার অর্থ ভগবান যা বলেছেন, গুরুমুখে যা সব শোনা গেছে সেসব বোঝবার চেষ্টা। যারা ঠাকুরকে চিন্তা করে তাদের এসব বুঝতে কষ্ট হবে না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ভাল করে পড়লে আর চিন্তা করলে কোন বিষয়ই বুঝতে কষ্ট হবে না। (ঐ, পৃঃ ৩৪৯)

[শ্রীম-র সেবক স্বামী নিত্যাত্মানন্দ মহাপুরুষ মহারাজকে শ্রীম-র দেহত্যাগের খবর দিলে মহাপুরুষ মহারাজ প্রবোধ দিয়ে বললেন ঃ "বাবা, এসব ঠাকুরের শরীর। তাঁর কাজের জন্য এসেছিলেন। কাজ ফুরিয়েছে। তিনি আবার কোলে তুলে নিলেন। তাঁর শরীর গেছে বটে!" আলমারীর ভিতরের 'কথামৃত'গুলির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ "এইগুলি তাঁর অমর কীর্তি ঘোষণা করবে সর্বকাল। যাবৎ চন্দ্র-সূর্য উঠবে, তাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম জীবন্ত থাকবে। আর সেইসঙ্গে থাকবে 'কথামৃত'-এর লেখক শ্রীম-র নাম।... বেদব্যাস ও নারদের ন্যায় একটি উজ্জ্বল মণি অন্তর্হিত হলো।" (১৫শ ভাগ, পৃঃ ৪৫৭)] ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১ম এবং ২য় ভাগের ২য় সংস্করণ এবং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫ ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলক ❑ জলধিকুমার সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

অনুষ্ঠান-সূচী (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪০৬)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	১১ শ্রাবণ	বুধবার	২৮ জুলাই	১৯৯৯
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২৩ শ্রাবণ	সোমবার	৯ আগস্ট	১৯৯৯

পূজাতিথি-কৃত্য

উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ	জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থী	২ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	১৭ জুন	১৯৯৯
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১৩ আষাঢ়	সোমবার	২৮ জুন	১৯৯৯
রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	২৯ আষাঢ়	বুধবার	১৪ জুলাই	১৯৯৯

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

৯, ২৪ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার,	শুক্রবার	২৪ জুন,	৯ জুলাই	১৯৯৯
৭, ২১ শ্রাবণ	শনিবার,	শনিবার	২৪ জুলাই,	৭ আগস্ট	১৯৯৯

রামকৃষ্ণ মিশন ঃ আদর্শ ও অঙ্গীকার

স্বামী ভূতেশানন্দ

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই ভাষণটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রামকৃষ্ণ মিশন একশ বছর অতিক্রম করে এসেছে। মানবতার দীর্ঘ ইতিহাসে এই একশ বছর সমুদ্রে তরঙ্গ মাত্র। জগতে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার সামর্থ্যের জন্য কোন কষ্টিপাথর বা ভবিষ্যতের কোন আদর্শ এখনো প্রস্তুত হয়নি। তবে ভবিষ্যতের দুটি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। প্রথম—প্রাচীন রক্ষণশীল ভাবনাগুলির পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেখানে আধুনিক চিন্তাধারার ক্রমশ অনুপ্রবেশ ঘটছে। জীবনদর্শনে, জীবনের বহুবিধ সমস্যায় তথা ধর্মবিষয়ক ধারণা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এক নতুন উদার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ় ভিত্তির ওপর এই চিন্তা-ভাবনাগুলি প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়—আমরা সকলেই জানি যে, বিজ্ঞান যা সত্য বলে ঘোষণা করে লোকে তা অন্ধভাবেই স্বীকার করে নেয়। বিজ্ঞানই আজ পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু বিজ্ঞান তথা যেকোন ক্ষেত্রেই স্থূল ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য আজ আর নেই। তার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিকেরা আজ দৃষ্টি ফিরিয়েছেন এক চেতন সত্তার সন্ধানে এবং আত্মিক অন্তর্মুখী দৃষ্টির কথাই তাঁরা এখন বলতে আরম্ভ করেছেন। সামগ্রিকভাবে এখন জগতের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, বিবেকানন্দ চিন্তাজগতে যে ভাবী পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিলেন জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তা গ্রহণ করছেন। তিনি বলেছিলেন, একজন পদার্থবিদ্‌ও বুঝবেন যে, তাঁর জ্ঞান পর্যবসিত হবে অধ্যাত্ম-জ্ঞানেই। এক নতুন শতাব্দী আসন্ন। আর তারই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনও তার দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করেছে। জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে, তার পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। আমরা দেখেছি, বিগত একশ বছরে আদর্শগত নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মিশনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি। জাগতিক পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে মিশনকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদগণ ও তাঁদের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত প্রাচীন সন্ন্যাসীরাও আজ দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিশন তাঁদের প্রদর্শিত পথেই কাজ করে চলেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কার্যাবলীর পিছনে রয়েছেন সদাজাগ্রত অনুপ্রেরণার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী। ভবিষ্যতেও এই মহান পথপ্রদর্শকরাই আমাদের পথ-নির্দেশ করবেন। তাঁরা আমাদের যে-কর্মে দীক্ষিত করেছেন আমরা সেই কর্মযজ্ঞই চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা তাঁদের হাতের যন্ত্রমাত্র। তাঁদের প্রতি এই আনুগত্য না থাকলে আমাদের বিপথ-গামী হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। যদিও আমাদের থেকে যোগ্যতর লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি থাকতে পারেন, তবু আমরা যে ঈশ্বরকে সেবা করবার এই অধিকারটুকু পেয়েছি এজন্যই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন ঃ "যদি আমরা তাঁদের কাজ করতে অন্য ভাব নিয়ে অগ্রসর হই এবং তাঁদের কাজ করতে পেরেছি বলে যদি আমরা অহঙ্কারে ফুলে উঠি, তবে অচিরেই দেখব, আমরা সেই কর্মক্ষেত্র থেকে একেবারে অপসারিত হয়েছি এবং আমাদের জায়গায় কাজ করার জন্য অপরে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তা দেখে শীঘ্রই আমাদের শোকাশ্রু বিসর্জন করতে হবে।" সারদানন্দজী এই প্রসঙ্গে আরো বলে-ছিলেন ঃ "প্রভু সামান্য কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড থেকেও তাঁর কাজ করার জন্য লোক গড়ে তুলতে পারেন।" স্বামীজীও বলেছিলেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে এক মুঠো ধুলো থেকে হাজার হাজার বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারেন।" তাই আমাদের কর্তব্য অধিকতর বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা এবং যাতে তাঁর হাতের উপযুক্ত যন্ত্র হতে পারি সেই চেষ্টা করা। যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করতে পারলে তবেই আগামী দিনগুলিতে আমরা অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে পারব।

রামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—সত্যযুগ আসন্ন। সত্যযুগে ঈশ্বরানুরাগী সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছাবে। অশুভ শক্তি হ্রাস পাবে, শুভ শক্তি জগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু এমন একটি অবস্থা তো স্বতই আসতে পারে না। যদি আমরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে এই আদর্শাভিমুখে অগ্রসর হই তবেই ঈশ্বরকৃপা আমাদের মধ্যে কাজ করবে।

একথা সর্বতোভাবে স্মরণীয় যে, রামকৃষ্ণ মিশন সকলের জন্য। এক মুহূর্তের জন্যও যেন কেউ না ভাবেন, এটি কোন বিশেষ সম্প্রদায়। রামকৃষ্ণ মিশন ব্যাপকতায় বিশ্বজনীন। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, মিশন কোন সমাজকল্যাণ-মূলক সংস্থা বিশেষ নয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি সর্বতোভাবে আধ্যাত্মিক।

সুতরাং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা হলো স্বামীজীর স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সত্যযুগের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে সত্যযুগের সূচনা হয়েছে বলে স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই সত্যযুগে প্রবেশের যোগ্যতা যাতে আমরা লাভ করতে পারি সেই আদর্শের জন্যই আজ আমাদের কাজ করতে হবে।

প্রার্থনা করি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ আমাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক।* ❑

*** গত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সমাপ্তি-পর্বের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত দুদিনের সর্বভারতীয় ভক্তসম্মেলনের সমাপ্তি-অধিবেশনে পরম পূজ্যপাদ মহারাজ ইংরেজীতে যে লিখিত 'আশীর্বচন'টি প্রস্তুত করেছিলেন, এটি তার ভাষান্তরিত রূপ। সমাপ্তি-অধিবেশনে পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁর লিখিত 'আশীর্বচন' পাঠ না করে তাৎক্ষণিক 'আশীর্বচন' প্রদান করেছিলেন, যার ভাষান্তরিত রূপ গত কার্তিক ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।**

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসেতু স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ফলেই বৃক্ষের পরিচয়

মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখলেন ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু শক্তিস্বরূপ যে-রামকৃষ্ণ, সর্বহিতকর ও আলোকদানকারী যে-রামকৃষ্ণ—তিনি রইলেন বেঁচে। এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের, তাদের জীবন ও নিয়তি সম্বন্ধে ধারণার মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে লাগলেন। প্রয়াণের আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, যে-সংগঠন মানবসমাজকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে সতত নিযুক্ত থাকবে। তিনি অনুরূপ একটি সংগঠন, একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, যার প্রধান হলেন নরেন্দ্রনাথ। সংগঠনটি যাতে অক্ষত থাকে সেবিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি নরেন্দ্রনাথকে যে বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে। তাঁর তরুণ ভাবশিষ্যরা যাতে একত্র থেকে সমবেতভাবে তাঁরই উপদিষ্ট সাধনপথে ব্রতী থাকে, সেদিকে তিনি নরেন্দ্রনাথকে নজর রাখতে বলেছিলেন। প্রসঙ্গত বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারেঃ "[প্রয়াণের] কিছুদিন আগে গুরুদেব নরেনকে কাছে ডাকলেন। তখন তাঁর অসুস্থতা খুবই সঙ্কটজনক পর্যায়ে, কথা বলতেও প্রায় অসমর্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ এক টুকরো কাগজের ওপর লিখে দিলেন—'নরেন শিক্ষে দিবে'। নরেন ইতস্তত করে বললেন, 'না, আমি পারব না।' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'তোর ঘাড় করবে'।"[১]

এদিকে শেষদিন ঘনিয়ে আসছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আগের চেয়ে আরো বেশি উদ্যমে, শান্ত ও সমাহিত চিত্তে তরুণ শিষ্যমণ্ডলীর, বিশেষভাবে নরেনের আধ্যাত্মিক জীবন ও চেতনাকে ঢেলে সাজাতে লাগলেন। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি নরেনকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠাতেন, একনাগাড়ে দু-তিন ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা দিয়ে যেতেন। কিভাবে গুরুভাইদের একত্রে রাখতে হবে, তাদের শিক্ষা দিতে হবে, তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তারা ত্যাগের জীবন যাপন করতে পারে সেবিষয়ে তিনি নির্দেশ দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজ এবং তার নেতাদের সংস্পর্শে এসে কী লাভ করেছিলেন সেবিষয়ে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেনঃ "It is easy to see what India gained from the meeting of Ramakrishna and the Brahmo Samaj. His own gain is less obvious, but less definite. For the first time, he found himself brought into personal contact with the educated middle class of his country, and through them with the pioneers of progress and Western ideas."[২] ("রামকৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মসমাজের মিলনের ফলে যে ভারতবর্ষ কি পাইয়াছিল, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রামকৃষ্ণ নিজে কি পাইয়াছিলেন, তাহা সুনির্দিষ্ট হইলেও তাহা সেরূপ সহজে লক্ষণীয় নহে। এই মিলনের ফলে রামকৃষ্ণ সর্বপ্রথম তাঁহার দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহাদের মারফত তিনি প্রগতি এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অগ্রদূতদের সহিত পরিচিত হন।")

পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে সংগঠনের উপযোগিতার বিষয়ে যে-সত্য শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করেছিলেন, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রোমাঁ রোলাঁর উক্তিঃ "The ascendancy he exercised over some of the best minds in India revealed the weakness and needs of these intellectuals, their unsatisfied aspirations, the inadequacy of the answers they gained from science, and the necessity for his intervention. The Brahmo Samaj showed him what strength of organization, what beauty existed in a spiritual group uniting young souls round an elder brother, so that they tendered a basket of love as a joint offering to their Beloved, the Mother.

"The immediate result was that his mission, hitherto undefined, became crystallized; it concentrated first in a glowing nucleus of concious thought wherein decision was centred, and then passed into action."[৩] ("ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের অপেক্ষাও তিনি যে অধিকতর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহা হইতেই ঐ সকল মনীষীদের দুর্বলতা, তাঁহাদের উচ্চাশার অপূর্ণতা, তাঁহারা বিজ্ঞান হইতে যেসকল উত্তর লাভ করিয়াছিলেন, সেগুলির অপর্যাপ্ততা এবং রামকৃষ্ণের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা—সমস্তই সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্যে কি শক্তি রহিয়াছে, বা কতকগুলি আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন তরুণ মানুষের একটি দল যখন তাঁহাদের

১ দ্রঃ The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, Vol. I, 5th Edn., Advaita Ashrama, p. 182

২ The Life of Ramakrishna—Romain Rolland, 10th Impr., 1979, Advaita Ashrama, p. 171; বঙ্গানুবাদ—ঋষি দাস (রামকৃষ্ণের জীবন, ৬ষ্ঠ সং, ১৪০০, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃঃ ১৩৩)

৩ Ibid., p. 173; বঙ্গানুবাদ—ঐ, পৃঃ ১৩৪

অগ্রজকে ঘিরিয়া সমবেতভাবে ভগবানের নিকট অর্ঘ্য উৎসর্গ করেন তখন তাহার কি সৌন্দর্য; সেগুলি সমস্তই রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করেন।

"ফলে অবিলম্বে তাঁহার আদর্শ—এপর্যন্ত যাহা অনির্দিষ্ট ছিল—দানা বাঁধিয়া উঠে। উহা একটি স্থির সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করিয়া সচেতন চিন্তার দীপ্ত নীহারিকারূপে প্রথমে সংহত থাকে এবং পরে তাহা কর্মে রূপান্তরিত হয়।")

মানুষ বিবেকানন্দ এবং শক্তিস্বরূপ বিবেকানন্দ

স্বপ্ন এবং কর্ম—উভয় ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দ ছিলেন অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাঁর আচার্যদেবের কাছ থেকে যে দার্শনিক তত্ত্ব তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এবং তাঁর নিজের মধ্যে তিনি মানবের যে মহত্ত্ব ও গৌরব প্রত্যক্ষ করেছিলেন সে-অভিজ্ঞতা তাঁকে ঐ শক্তির অধিকারী করেছিল। কিন্তু তাঁর গুরুদেবের প্রয়াণের কিছুকাল পরেই তিনি ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন যখন তিনি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির পথে-প্রান্তরে পরিব্রাজকের বেশে ঘুরে বেড়িয়ে রাজন্যবর্গ থেকে কৃষকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী থেকে অস্পৃশ্য জাতি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশেছিলেন। তাঁর মহান এবং তুলনারহিত তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "আমি এখন কাশী ছেড়ে চললাম। আবার যখন এখানে ফিরব, তখন সমাজের ওপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব, আর সমাজ আমাকে কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।"[৪]

এই অঙ্গীকারবাক্য উচ্চারণের তিন বছরের মধ্যেই শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি ভাষণের দ্বারা আন্তর্জাতিক বুধমণ্ডলীর সামনে বিস্ফোরণ ঘটালেন। তারপরই আমেরিকায় এবং ব্রিটেনে তাঁর ঝটিকা-সফর। এর চার বছরের মধ্যেই আধুনিক ভারতের দিগন্তে তাঁর বিখ্যাত সব বক্তৃতার মাধ্যমে আবার বিস্ফোরণ—সেইসব ভাষণ যা পরবর্তী কালে 'Lectures from Colombo to Almora' নামে তাঁর রচনাবলীতে সংযোজিত হয়েছে। তাঁর ভাষণ ও উক্তিসমূহের প্রভাব সম্পর্কে রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন: "তাঁহার কথাগুলি ছিল সঙ্গীতের মতো; বীঠোফেনের মতো ছিল সেগুলির বাক্যাংশের বিন্যাস এবং হ্যান্ডেলের মিলিত সঙ্গীতের মতো ছিল সেগুলির প্রাণমাতানো ছন্দ। তাঁহার এইসকল কথা ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লেখা বইগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু তবু যখনি আমি সেগুলিতে হাত দিয়াছি, তখনি চকিতে তড়িৎস্পর্শ অনুভব করিয়াছি। কথাগুলি যখন সেই বীরের মুখ হইতে নিঃসৃত হইত তখন সেগুলি কী তড়িৎস্পর্শ, কী উন্মাদনাই না সৃষ্টি করিত!"[৫]

সমাজবিপ্লবী বিবেকানন্দ

তাঁর নিজের জীবন ও বাণীর মধ্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের উচ্চ স্থান বিবেকানন্দ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবু দেশবাসীর বাস্তব দারিদ্র্য এবং দুরবস্থা দেখে তিনি গভীরভাবে ব্যথিত হন। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "আমি তেমন ধর্মে আদৌ বিশ্বাস করি না যা বিধবার চোখের জল মোছাতে পারে না, অনাথের হাহাকার বন্ধ করতে পারে না।" ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম এমন একজন ধর্মনেতাকে ভারতবর্ষ লাভ করল, যিনি মানবসমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে চাইলেন এবং নিয়ন্ত্রিত বস্তুবাদকে সমর্থন করলেন। কেন এই দুর্গতি? ভারতবর্ষের কেন এত অধঃপতন? বিবেকানন্দ বলছেন, সামাজিক সত্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার বা উপেক্ষা করে জীবনবিমুখ ধর্মধ্বজিতাই এজন্য দায়ী। তাঁর নিজের ভাষায়: "সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটি বিষম ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতে পূর্বে এই ভ্রম কখনো হয় নাই, কিছুদিন যাবৎ সেখানেও এই ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। সেই ভ্রম এই—অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা-প্রদান। প্রকৃতপক্ষে সকলের পথ এক নহে।... তোমরা সকলে জান, সন্ন্যাস-আশ্রমই হিন্দুজীবনের চরম লক্ষ্য। ... যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি, ইহাই হিন্দুর আদর্শ।... কিন্তু কিছু পরিমাণ অভিজ্ঞতা হইলে তবে এই আদর্শ ধরিতে পারা যায়।... আমাদের শাস্ত্রে ইহার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী কালে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সন্ন্যাসীদের নিয়মে বাঁধিবার একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়াছে। ইহা মহা ভুল। ভারতে যে দুঃখ-দারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে।"[৬]

স্বামী বিবেকানন্দ 'ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদী' ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সমাজবিপ্লবী। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-পরিভ্রমণের সময় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথনের মধ্যে তুলে ধরেছেন এক সাক্ষ্য:

"তিনি [স্বামীজী] বললেন, 'যেসব লোক তাদের নিজ নিজ কুসংস্কারগুলি আমার দেশবাসীকে ফিরিয়ে দিচ্ছে আমি তাদের সঙ্গে একেবারেই একমত নই। মিশরের প্রতি মিশরবিদ্যা-বিশারদগণের যেমন আকর্ষণ, তেমনি ভারতবর্ষের প্রতিও এমন আকর্ষণ অনুভব করা সহজ, যা পুরোপুরি স্বার্থপূর্ণ। কেউ ইচ্ছা করতে পারে, গ্রন্থাদিতে, পড়াশুনায় বা কল্পনায় যে-ভারতবর্ষকে সে দেখেছে তাকে আবার প্রত্যক্ষ করতে। আমার কিন্তু ইচ্ছা, সনাতন ভারতবর্ষের উচ্চ আদর্শগুলি আজকের উচ্চ আদর্শের দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক—সহজ ও সাবলীলভাবে। এই নতুন

৪ দ্রঃ The Life of Swami Vivekananda, Vol. I, p. 248

৫ The Life of Vivekananda—Romain Rolland, 9th Impr., 1979, Advaita Ashrama p. 146; বঙ্গানুবাদ—ঋষি দাস (দ্রঃ বিবেকানন্দের জীবন, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৯৯, ওরিয়েন্ট, পৃঃ ১০৪

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ৪২-৪৩

অবস্থাটি বাইরে থেকে নয়, মানুষের ভিতর থেকেই ক্রমশ বিকাশলাভ করবে।

" 'তাই আমি শুধু উপনিষদ্ই প্রচার করি। ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে, আমি উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কিছু উদ্ধৃত করি না। আর উপনিষদের মধ্যে কেবলমাত্র শক্তি অর্জনের ব্যাপারটি। বেদ, বেদান্ত—সবকিছুরই মৌলিক উপাদান বা সারাংশ ঐ একটি শব্দের মধ্যে নিহিত।...

" 'কিন্তু তুমি প্রশ্ন করতে পার, এর মধ্যে রামকৃষ্ণের স্থান কোথায়? তিনি হচ্ছেন পদ্ধতি। সেই আশ্চর্য অসচেতন পদ্ধতি।...

" 'এতদিন পর্যন্ত আমাদের ভারতীয় ধর্মের বড় দোষ ছিল এই যে, সে মাত্র দুটি শব্দ জানত—ত্যাগ এবং মুক্তি। এজগতে শুধু কি মুক্তিই দরকার? গৃহস্থদের জন্য কিছুই চাই না?

" 'কিন্তু আমি তো এই মানুষগুলিকেই সাহায্য করতে চাই। সকল আত্মাই কি স্বরূপত এক নয়? সকলের লক্ষ্যও কি এক নয়?

" 'সুতরাং জাতিকে শক্তি অর্জন করতেই হবে। শক্তি আসবে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে।'

"সেসময় আমার মনে হলো এবং পরেও যত ভেবেছি ততই বেশি করে মনে হয়েছে, আমার আচার্যদেবের শ্রীমুখ থেকে ঐ একটিমাত্র কথোপকথন শোনার জন্য সমস্ত সাগরপথ অতিক্রম করাও সার্থক।"[৭]

বিবেকানন্দ : বাস্তববাদী স্বপ্নদ্রষ্টা

কর্নেলিয়া কংগার-এর সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই বিবেকানন্দের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর ঠাকুরমা শিকাগোর মিসেস জন বি. লায়ন ধর্মমহাসম্মেলনের সময় বিবেকানন্দকে গৃহে থাকতে দিয়েছিলেন। কর্নেলিয়া তাঁর স্মৃতিচারণে এক চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার থেকে পশ্চিমের সংগঠন-প্রতিভা গ্রহণেচ্ছু ভারতীয়দের প্রতি বিবেকানন্দের আন্তরিক টান ও সাহায্য করার বাসনা জানা যায় : "একবার তিনি [স্বামীজী] আমার ঠাকুরমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু তিনি আমেরিকাতে পেয়েছেন। ঠাকুরমা মজা করে বললেন, 'কোন্ মহিলার কথা বলছেন, স্বামীজী?' স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, 'আরে দূর, কোন মহিলার কথা বলছি না, আমি বলছি সংগঠনের কথা।' সংগঠনশক্তির সাহায্যে যে কতকিছু করা যায় তা তিনি আমেরিকায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু ঠিক কোন্ ধরনের সংস্থা ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাবে, সেবিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। আমাদের পাশ্চাত্যে যা তাঁর ভাল লেগেছিল, তা কি করে নিজের দেশের জনগণের কাজে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে তিনি অনেক চিন্তাভাবনা ও পড়াশুনা করেছিলেন।"[৮]

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২০ আগস্ট আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস থেকে স্বামীজী তাঁর এক ভারতীয় শিষ্যকে পত্র লিখেছিলেন। মেয়েদের এক আধুনিক কয়েদখানা দেখে তাঁর মনে পড়েছে ভারতীয় জনগণের অবস্থা এবং দুঃখ-দুর্দশার কথা। তাঁর মনের সেই বেদনা যেন এই পত্রটিতে ঝরে পড়ছে : "এখানে 'কারাগার' বলে না, বলে 'সংশোধনাগার'। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অতি অদ্ভুত জিনিস। কারাগারবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! না দেখিলে তোমাদের বিশ্বাস হইবে না। ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে-আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তর ধর্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছে—জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহু রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ—কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।"[৯]* [ক্রমশ]

---

৭ দ্রঃ The Master as I saw Him, 9th Edn., 1963, Udbodhan Office, pp. 196-198

৮ দ্রঃ Reminiscences of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Admirers, 2nd Edn., 1964, Advaita Ashrama, p. 144

৯ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৬৩-৩৬৪

* ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বাই প্রকাশিত পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর সুপরিচিত 'ইট্যারন্যাল ভ্যালুস ফর এ চেঞ্জিং সোসাইটি' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৪৯-৩৫৩) অন্তর্ভুক্ত 'দ্য মীটিং অফ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক ইংরেজী ভাষণের কিয়দংশের ভাষান্তর।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ

স্বামী নির্বাণানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের direct instruction (প্রত্যক্ষ উপদেশ) আমরা পাইনি। আমাদের সাধুজীবনে কিরকমভাবে চলতে হবে সেবিষয়ে তিনি কি বলেছেন তাও বিস্তারিত জানা যায় না। বরানগর মঠে ও আলমবাজার মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদরা জপধ্যান ও সাধনায় ডুবে থাকতেন। সবদিন খাওয়াই জুটত না। একদিন তো সকলে ভিক্ষায় বেরিয়ে কিছুই পেলেন না। শেষে তাঁরা স্থির করলেন যে, ঈশ্বরের নাম করেই কাটিয়ে দেবেন। সারা দিনরাত তাঁরা নাম, ভজন ও কীর্তনে কাটিয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তাঁদের জীবন কত দুঃখদুর্দশায় কেটেছে! ঠাকুর কি ইচ্ছা করলে পারতেন না তাঁদের ভাল খাওয়া দিতে? কিন্তু তা তিনি করেননি। কেন?—তা আমরা জানি না।

সাধুজীবন গঠনে যারা আগ্রহী তাদের ঠাকুরের সন্তানদের জীবন অনুধ্যান ও আলোচনা করতে হবে। তাঁরা ছিলেন মুক্তপুরুষ—অবতারের লীলাসঙ্গী। তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল অসাধারণ। আমাদের যেমন বিষয়-কামনা ও চিন্তা করা স্বাভাবিক, তাঁদের ঈশ্বরচিন্তা ছিল তেমনি স্বাভাবিক। সাধারণ লোক যারা সাধু হতে আসবে তাদের জন্য স্বামীজী মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করলেন। কারণ, তারা অতটা কষ্টসহিষ্ণু হতে পারবে না। দিনরাত ধ্যানজপ নিয়েও থাকতে পারবে না। আমরা তাঁদের আশ্রয়ে এসেছি যখন তখন একটা শুভসংস্কার নিশ্চয়ই ছিল। আমাদের মনের তো নিম্ন অবস্থা, কিন্তু তাঁরা তাড়িয়ে দেননি। তাঁদের কাছে গেলেই কামনা-বাসনা কোথায় উড়ে চলে যেত! তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ছিল অসাধারণ।

সাধুজীবনে আচার-ব্যবহার, চাল-চলনে প্রায়ই দোষত্রুটি দেখা যায়। ওগুলোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। আমি তখন ব্রহ্মচারী। মঠে সিঁড়ি দিয়ে একদিন খুব জোরে শব্দ করে নামছি। মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) নিচে বেঞ্চির ওপর বসেছিলেন। তিনি তিরস্কারের সুরে বললেন: "এইভাবে নামা ঠিক নয়। চলবার সময় অপরকে বিরক্ত করার কি অধিকার তোমার আছে? খড়ম পায়ে, জুতো পায়ে শব্দ করতে করতে যাওয়া একেবারেই অনুচিত।" একদিন বরফ ভাঙছিলাম। ভাঙার সময় চারদিকে বরফ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন: "ছেনিটা আমায় দাও।" সেসময় মঠে বহুদূর থেকে বরফ আনিয়ে সরবত তৈরি হতো। একজন কুলির মাথায় আসত। সেই বরফের টুকরো নষ্ট হচ্ছিল, এটা তাঁর পছন্দ হয়নি। শ্রীশ্রীঠাকুর জনৈক ভক্তকে একদিন একটি লেবু কাটতে বলেন, সে দুটো লেবু কেটে আনে। এতে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন। কারণ, এটা নিছক অপচয়। ঠাকুর একটা লেবুর অপচয় সহ্য করতে পারেননি, তিনি কি আমাদের চারিদিকে এত অপচয় সহ্য করবেন? ঠাকুরের সন্তানদের সময়ে ভাত বাড়তি হলে কখনো ফেলা হতো না। গরিব-দুঃখী কাউকে দেওয়া হতো। একদিন কোন ভক্ত সন্দেশ দিয়েছিল মঠে। সন্দেশ সেসময় কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যেত না। নারকেল নাড়ু তৈরি হতো। দুদিন পরে সেই সন্দেশ ঠাকুরকে দিতে গেলে দেখা গেল, সন্দেশে সামান্য গন্ধ হয়েছে। একথা শুনে বাবুরাম মহারাজ বললেন: "দাতা কত ভক্তিভরে সন্দেশ দিয়েছিল ঠাকুরের ভোগের জন্য, আর তোমাদের গাফিলতিতে ঠাকুরকে দেওয়া হলো না!" আরেকবার একটি কাঁঠাল পার্সেলে আসে। তাতে সাধুরা কেউ মন্তব্য করেন: "কাঁঠালটি পার্সেলে না পাঠালেই পারত। পচে গিয়েছে। কি বুদ্ধি লোকটার!" বাবুরাম মহারাজ তাতে বিরক্ত হন। কারণ, সেই লোকটি কত ভক্তিভরে তার গাছের প্রথম কাঁঠাল পাঠিয়েছিল, আর সেই কাঁঠালের এইরকম অবস্থা হবে সে চিন্তা না করেই দিয়েছিল ঠাকুরের ভোগের জন্য। কিন্তু সাধুরা তার ভক্তির দিকটি না দেখে তার বোকামির দিকটা দেখেছিলেন। তাঁরা ভাবের দিকটি দেখতেন এবং দেখতে শেখাতেন।

সত্যকথা সাধুদের পক্ষে কঠোরভাবে পালনীয়। রাজা মহারাজ একদিন গল্পচ্ছলে একটি মিথ্যা কথা বলেন, তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দিকে তাকাতে পারেননি। সত্যস্বরূপ তিনি। যেখানে যাব বলেছেন, যা করব বলেছেন—সেখানে গিয়েছেন, তা করেছেন। মিথ্যার লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। নিন্দা-সমালোচনাও দোষনীয়। কারো নিন্দা করলে, দোষ দেখলে মা-ঠাকরুন তার দিকে তাকাতে পারতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং স্বামীজীকে নির্দেশ দিয়ে যান কিভাবে মঠ গঠন করতে হবে। স্বামীজী তাঁর নিয়মাবলীতে নির্দেশ দিয়েছেন কিভাবে সাধুজীবন গঠন করতে হবে। একটি নিয়মে আছে—সাধুরা একজনের সম্বন্ধে অপরের কাছে কিছু বলবেন না, তাতে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হতে পারে। মঠ ও মিশনের ভিত্তি হলো পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সকলকে নিজের মনে করা। স্বামীজী বলেছেন: "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" কর্ম কর। যে নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করে, সে সাধকমাত্র। সাধক জগতের হিতের জন্য কিভাবে কাজ করবে! একমাত্র সিদ্ধ পুরুষেরই জগতের হিতের জন্য কাজ করবার অধিকার। অন্য সকলে তো নিজেদের জন্য কাজ করবে। বর্তমান যুগে আমাদের জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম—এই চারটির সমন্বয়ে অগ্রসর হতে হবে। নিজের tendency (প্রবণতা) অনুযায়ী একটিতে জোর দিতে হবে। তবে ঠাকুরের ভাবানুযায়ী এই চার যোগের সমন্বয়ই আদর্শ। আমরা যে কাজ করি তা চিত্তশুদ্ধির জন্যই। চিত্তশুদ্ধির জন্য ত্যাগ ও তপস্যা চাই। সাধুদের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে অর্থাভাব হতেই পারে, কিন্তু ধার করে কাজ করলে তার পরের লোকদের এই ধার শোধ করতে বেগ পেতে হতে পারে। কারো কাছে কোন জিনিস চেয়ে নেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। সাধুদের অযাচকবৃত্তিই পালনীয়। সাধুদের পক্ষে গৃহস্থদের সহিত মেলামেশা ও ব্যবহারে spirituality (আধ্যাত্মিকতা) থাকা দরকার। গৃহস্থদের দেওয়া অন্ন হজম করা শক্ত। করতে হলে সাধুদের ত্যাগ-তপস্যার শক্তি থাকা দরকার।

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ কঠোর বেদান্তবাদী ছিলেন। দুনিয়াটা যে ভোগ করবার জন্য—একথা তাঁদের মনেই হতো

না। তিনি জীবনে কখনো কারো কাছে পয়সা চাইতেন না। একবার মাত্র ট্রেনভাড়ার জন্য পয়সা চেয়েছিলেন জনৈক শেঠের কাছ থেকে। জীবনে তাঁর self-dependence (আত্মনির্ভরশীলতা)-এর ভাব ছিল। তাঁর যখন খুব অসুখ, তখনো তিনি অপরের সেবাগ্রহণ পছন্দ করতেন না। তিনি কোন জিনিসের অপচয়ও পছন্দ করতেন না।

যার মোহ অন্ত হয়েছে তিনিই 'মোহন্ত' পদের উপযুক্ত। ঠাকুরের পার্ষদদের সঙ্গ করেছি। তাঁদের পদ বা নাম-যশের প্রতি কোন মোহ ছিল না। তাঁদের বালকের মতো স্বভাব ছিল। কখনো মনেও হয়নি যে, মঠের প্রেসিডেন্ট বা শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কোন পার্ষদের সঙ্গে কথা বলছি। এত নিরভিমান তাঁরা ছিলেন। মনে মনেও যদি কেউ অভিমানভরে ভাবে যে, আমি না থাকলে কাজ অচল, তাহলে বুঝতে হবে সে নির্বোধ। অহঙ্কার তিনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না। ঠাকুর শতবার সহস্রবার ক্ষমা করেন, কিন্তু একবার মুখ ঘোরালে সে আর ত্রিভুবনে স্থান পায় না। আমাদের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, তিনিই আমাদের তাঁর আশ্রয়ে স্থান দিয়েছেন। অহঙ্কারী worker will be swept away (কর্মী ভেসে যাবে), সঙ্ঘের তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। নতুন একদল worker আসবে।

একদিন বলরামবাবুর বাড়ি থেকে কিছু লিচু দিয়েছিল মঠে। উদ্দেশ্য ছিল—ঐ লিচু যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগে দেওয়া হয় এবং তারপর সাধুরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। তখন ভাণ্ডারী ছিলেন শ্যামাচরণ মহারাজ। তাঁর আরেকজন সহকারী ছিলেন। ঠাকুরকে লিচু ভোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পঙ্‌ক্তিতে সাধুদের দেওয়া হয়নি। মহাপুরুষ মহারাজের ফল খাওয়ার অভ্যাস কোনদিনই ছিল না। তিনি খাননি। বাবুরাম মহারাজ অপরকে সাধারণত ফল দিয়ে দিতেন। তিনিও খাননি। রাজা মহারাজও খাননি। পরদিন মহারাজ জানতে পারলেন যে, সাধুরা কেউই লিচু পাননি, শুধু ভক্তেরা পেয়েছেন। শুনে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কারণ, ভক্ত-পরিবারের উদ্দেশ্য ছিল ঠাকুরের লিচু-প্রসাদ যেন সাধুরা পান। ভক্তরা পান, কিন্তু সাধুরা যেন অবশ্যই পান। মহারাজ বলেছিলেন ঃ "এটি একটি মিথ্যাচরণ। শাকের কড়ি মাছের খাতে গেলে যেমন অত্যন্ত অন্যায় করা হয়, এও ঠিক তেমনি।"

একবার কোন মঠে surgery (শল্য চিকিৎসা)-র instrument (যন্ত্রপাতি) কেনার জন্য জনৈক হিতৈষী ২৫০ টাকা দান করেন। এই টাকা urgent medicine (জরুরী ওষুধ)-এর খাতে ব্যয় করা হয়—এটা জানতে পেরে মহারাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং স্বামী অমৃতানন্দকে এই কারণে মঠ থেকে বিদায় দেন। মহারাজের চরিত্র কঠোর ও কোমল দুই ভাবের সংমিশ্রণে গঠিত ছিল। তিনি কোন কোন ব্যাপারে ভয়ানক কঠোর ছিলেন। তাঁদের আচরণ দেখে আমাদের জীবন গঠন করতে হবে।

একবার সরোজিনী নাইডু সেবাশ্রম দেখতে এসেছেন। অদ্বৈত আশ্রমে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে খবর দেওয়া হলো। তিনি এলেন না। কারণ তাঁর মনোভাব ছিল এই যে—আমি সাধু, আমার আবার তার সঙ্গে কি দরকার হতে পারে? সেবাশ্রমে তো অধ্যক্ষ আছেন। যদি দরকার হয় সরোজিনী নাইডু নিজে এসে দেখা করে যাবেন। একবার মাদ্রাজে অ্যানি বেসান্ত দেখা করতে এসেছিলেন রাজা মহারাজের সঙ্গে। কিন্তু রাজা মহারাজ দেখাই করলেন না। কারণ, অ্যানি বেসান্ত স্বামীজীর নিন্দা করেছিলেন। মহারাজের একটা principle (নীতি) ছিল, যা ধরে জীবনে চলতেন। (অ্যানি বেসান্ত আমেরিকায় স্বামীজীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছিলেন, পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝেছিলেন।) আমাদের এসব ঘটনা দেখে শিখতে হবে। অদ্বৈত আশ্রমে আগে ভয়ানক দুরবস্থা ছিল। কিন্তু কেউ কখনো গৃহস্থ ভক্তদের কাছে কিছু চাইত না। আমাদের এমনি স্বভাব যে, সামান্য কিছু অসুবিধা হতেই আমরা অপরের কাছে চেয়ে বসি! এইগুলি সাধুদের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত। সাধুদের কাপড়চোপড় বেশি থাকা উচিত নয়। ওসব বিলাসিতা। তা ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে স্বয়ং কঠোর তপস্যা করেছেন। তাঁর অন্তরঙ্গ সন্তানদেরও করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সন্তানেরা কঠোর তপস্যার বিরোধী ছিলেন। আমি একবার কাশীতে তপস্যায় আছি বড় গৈবির কাছে। লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) আমাকে কঠোরতা করতে নিষেধ করেছিলেন। একবেলা দুধ খাওয়ার জন্য পয়সা দিয়েছিলেন এবং বিকালের জন্য রুটি প্রভৃতি সঞ্চয় রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর কথা না শুনে কঠোরতা করি। পরে আমার শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল অত্যধিক কঠোরতার জন্য। মহাপুরুষদের তপস্যা প্রভৃতি সবই স্বাভাবিক—চেষ্টাকৃত নয়। তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ নন।

একবার তপস্যায় বের হওয়ার জন্য মঠে ছুটি চেয়েছিলাম। কিন্তু মঠের সকলে অর্থাৎ বাবুরাম মহারাজ, রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ সকলে নিষেধ করতে লাগলেন, এমনকি শ্রীশ্রীমা স্বয়ং বললেন ঃ "ঠাকুর পছন্দ করতেন না এরূপ ঘোর তপস্যা। যাবে যাও কিন্তু ইচ্ছা করে কোন কঠোরতা করবে না। যেমন ধর, হাতের সামনে খাবার এলে ঠেলে দিও না। ঠাকুর তোমার খাওয়াপরার কষ্ট রাখবেন না।" ফলত হলোও তাই। পথে দুবেলা করে খাবার পেয়েছি।

আজ আমাদের দেখলে সকলে মাথা হেঁট করে। কিন্তু কিজন্যে করে? আমরা কি বিদ্যাবুদ্ধিতে সকলের চেয়ে বড়? আমাদের থেকে বড় কর্মী কি নেই? আমাদের ঠাকুর ত্যাগীর বাদশা। তাঁর অপূর্ব ত্যাগ ও সংযমে লোকে হতবাক হয়। আমরা তাঁর নাম সম্বল করে বাড়ি ছেড়ে এসেছি। তাঁর জন্যই আমাদের এত সম্মান। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শ এবং মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানদের নির্দেশিকা মেনে আমাদের work and worship (কর্ম ও উপাসনা)-এর আদর্শের ভিত্তিতে জীবন গড়তে হবে।* ❑

* ১৯, ২২ ও ২৩ অক্টোবর ১৯৬৪ বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কাছে পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির প্রায় একবছর আগে থেকে তাঁর মহাসমাধির বিশ বছরের মধ্যে সীমিত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কাল। পরমহংসদেবের organizing faculty-র অভাব—ব্রাহ্মনেতাদের এই অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচেষ্টায় কয়েক বছরের মধ্যে 'রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন' নামে একটি প্রবল প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও সম্ভাবনাময় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জনচিত্তে সাধারণ-ভাবে এবং নির্বাচিত ভক্তমণ্ডলীর চিত্তে জমি তৈরি করে শ্রীরামকৃষ্ণ সংগঠনের যে-বীজটি রোপণ করেছিলেন তা আলোচ্য কালের মধ্যে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। উপরি উক্ত ভক্তমণ্ডলীর জন্য নির্বাচিত নেতা নরেন্দ্রনাথ (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনসাধনার মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করে বিরাট এক দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন: "গুরুদেবের কাজই আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য।"[৯৪] শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে 'শ্রীরামকৃষ্ণের ideal' পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে পারে[৯৫] এবং সেই আদর্শ যাতে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে, এটাই ছিল তাঁর গুরুদেবের কাজের মুখ্য অংশ। এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজেকে 'রামকৃষ্ণের গোলাম' বলে মনে করতেন।

বিশ্ববিজয় করে ভারতবর্ষে প্রথম প্রত্যাবর্তনের পর তিনি "ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে" চালিয়ে দিয়েছিলেন। এ-যন্ত্রটি হচ্ছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন'। তিনি ৯ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে লিখেছিলেন: "আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ প্রবলভাবে চালু হয়ে গেছে, আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্তত ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমব।" বছরখানেক পরে স্বামীজী তাঁর পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন: "আমার কেবল ভয় এই যে, এখন তো একরকম খাড়া করা গেল। অতঃপর আমরা চলে গেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায়, তাহাই দিনরাত্র আমার চিন্তা। হাজারই theoretical knowledge থাকুক—হাতে-হেতড়ে না করলে কোন বিষয়ে শেখা যায় না।... একজন মরে গেলে অমনি একজন (দশজন, if necessary) should be ready to take it up।... আমাদের ইন্ডিয়ার ঐটি great defect, we cannot make a permanent organization, and the reason is because we never like to share power with others and never think of what will come after we are gone."[৯৬] সংগঠনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনার অন্য কারণও ছিল। তিনি জানতেন যে, তিনি দীর্ঘায়ু নন। তিনি ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমি বুঝতে পারছি—জোর তিন-চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে।" অবশ্য তাড়াতাড়ি দেহত্যাগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে স্বামীজীর মনে আরেকটি ভাবনা দেখা দিয়েছিল, যেটি সংগঠনের ভবিষ্যতের প্রশ্নে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মিস ম্যাকলাউডের একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন: "বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বাড়তে দেয় না; তাদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য আমাকে যেতেই হবে।"[৯৭]

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পূর্বেই বেলুড় গ্রামে নিজস্ব জমি ও বাড়ির ওপর প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল; মাদ্রাজে, মায়াবতীতে, কাশীতে (অদ্বৈত আশ্রম), শিবনগরে (পরে সারগাছি গ্রামে) কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। আমেরিকাতে নিউ ইয়র্ক ও সান ফ্রান্সিস্কোতে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও ঢাকাতে মিশন কেন্দ্র এবং কাশীতে ও কনখলে সেবাশ্রম সংগঠনের বীজ রোপিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি কর্মকেন্দ্রই ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে, সেইসঙ্গে কর্মের প্রসারও ঘটে। উদাহরণস্বরূপ একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করা যাক। স্বামী অখণ্ডানন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬ মে ১৯০৫ তারিখে যে-চিঠি লেখেন তা থেকে জানা যায় যে, সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৫৬ জন। সরকারি কর্মচারী কাজকর্ম নিরীক্ষণ করে তার প্রশংসা করেছেন এবং সরকারি অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্বদেশে ইংরেজীতে 'ব্রহ্মবাদিন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং বাঙলায় 'উদ্বোধন' নতুন ভাবধারা প্রচার করতে থাকে। সান ফ্রান্সিস্কো থেকে 'Voice of Freedom' বেদান্তসত্য প্রচার করতে থাকে।

স্বামীজীর মহাপ্রস্থানের পর মঠের পরিচালকমণ্ডলী যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা সংক্ষেপে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। স্বামীজীর অপূরণীয় অভাব সম্বন্ধে মঠ-কর্তৃপক্ষ সচেতন ছিলেন।[৯৮] কিন্তু এই অভাববোধের

---

৯৪ মিস মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর ২২।৩।১৯০০ তারিখের চিঠি

৯৫ প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা স্বামীজীর ২৬।৫।১৮৯০ তারিখের চিঠি

৯৬ শ্রীনগর থেকে স্বামীজীর ১।৮।১৮৯৮ তারিখের চিঠি

৯৭ Reminiscences of Swami Vivekananda by Eastern & Western Admirers, 1983, p. 242

৯৮ স্বামী সারদানন্দ ১৭।১২।১৯০৩ তারিখে অর্থাৎ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের প্রায় দেড় বছর পরে লিখেছিলেন: "The passing away of Swami Vivekananda has left a void which will never be fulfilled."

প্রতিক্রিয়া মঠবাসীদের মধ্যে যেভাবে বিস্ফুরিত হয়েছিল তার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন কিনা সন্দেহ। সন্ন্যাসিগণের অধিকাংশ ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন, সেবাকর্মসূচী বর্জন করে তাঁরা নিভৃতে সাধনভজন করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে ওঠবার আগেই স্বামী সারদানন্দ সাধু ও ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে একটি সভাতে মিলিত হন। তিনি আবেগমথিত ভাষায় তাঁদের বলেন যে, স্বামীজী সঙ্ঘের বিভিন্ন কাজকর্মের দায়িত্ব তাঁদের ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারলেই স্বামীজীর প্রীতিলাভ সম্ভব। স্বামী সারদানন্দ অঙ্গীকার করেন যে, তিনি স্বয়ং সঙ্ঘের কাজ অন্তত পাঁচ বছর করবেন। তিনি ছিলেন অছি পরিষদের স্বামীজী-মনোনীত সম্পাদক। তিনি জানতে চান, তাঁকে সাহায্য করতে কে কে প্রস্তুত? তাঁর সাদর আহ্বানে অধিকাংশ সাধু-ব্রহ্মচারী নির্ধারিত কাজকর্মের দায়িত্ব নিজ নিজ স্কন্ধে পুনরায় তুলে নেন। তাতে স্বামী সারদানন্দ কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। নিয়মবদ্ধভাবে সঙ্ঘের কাজকর্ম পরিচালিত হতে থাকে।

একই সময়ে দেশে যুবমানসে স্ফুরিত হয়েছিল এক অপ্রত্যাশিত জাগরণের আভাস। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিবেকানন্দের বাণী-পাঠ ও সেবাকাজ প্রবর্তনের জন্য 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' বা অন্য নামে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এদের অনুপ্রাণিত করার জন্য স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী সদানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রমুখ বিবেকানন্দ-বাহিনীর সেনানীগণ খুবই পরিশ্রম করতে থাকেন। এদিকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করবার দাবিতে অভূতপূর্ব এক আন্দোলন দেখা দিল। দেশবাসীর চাহিদা মেটাবার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হতে থাকল। আলোচ্য সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেইসঙ্গে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল ও পুরস্ত্রীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ টাইফয়েডে ভুগে ওঠবার পর তিনি হাতে-নাতে করার বড় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেননি।[৯৯] এসময়ের মধ্যে ৭ মে ১৯০৩ তারিখে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়োবাবা), স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ অছি পরিষদের নতুন সদস্য নিযুক্ত হন। প্রথম দুজন এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অসম্মত হন।[১০০]

ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন। এসময়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সান ফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে এবং স্বামী অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক ও অন্যান্য অঞ্চলে বেদান্ত প্রচার করছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিছুদিন পর ৩০ জানুয়ারি ১৯০৫ তারিখে তিনি ব্রুকলিনে একটি বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন।[১০১]

আলোচ্য সময়ের শেষভাগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ক্রমে ক্রমে সঙ্ঘাধ্যক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সার্বিক নেতৃত্বাধীনে স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড় মঠের তদারকি করতেন এবং কলকাতায় থেকে স্বামী সারদানন্দ মিশনের শাখাকেন্দ্র-গুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, কলকাতায় শ্রীশ্রীমা থাকাকালীন তাঁর প্রধান সেবকের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। তীক্ষ্ণধী ভগিনী নিবেদিতার মননালোকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের পরস্পরসাপেক্ষ ভূমিকা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "স্বামী ব্রহ্মানন্দ হচ্ছেন অধ্যাত্মকেন্দ্র, সঙ্ঘপ্রধান, আর স্বামী সারদানন্দ হচ্ছেন সংগঠক, দায়িত্ববাহক।"[১০২] এভাবে ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবাগ্নিতে উদ্দীপিত সন্ন্যাসিগণ সঙ্ঘরথের দড়ি টেনে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

এতদিন শ্রীমা সারদাদেবী সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে সঙ্ঘসেবীদের স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে, উৎসাহ জুগিয়ে সাহায্য করছিলেন। অতঃপর সঙ্ঘ পরিচালনার দায়িত্বে তাঁর ভূমিকা ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠল। সঙ্ঘসেবিগণ প্রায় অজ্ঞাতসারে নানা বিষয়ে তাঁর ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর সঙ্ঘের অঙ্গদের সান্ত্বনা দিয়ে, উৎসাহ যুগিয়ে, সর্বোপরি তাঁর অফুরন্ত মাতৃ-স্নেহসুধা দিয়ে শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘের বাঁধনটি দৃঢ়তর করেছিলেন।

যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ যে-দায় তাঁর প্রিয় নরেন্দ্রনাথের স্কন্ধে অর্পণ করেছিলেন, সেই দায় তিনি দীর্ঘ ষোল বছর বহন করেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শের বাস্তবায়ন করেছিলেন বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, স্বয়ং প্রভু তাঁর পশ্চাতে থেকে কাজ করছেন।[১০৩] প্রায় একশ বছর পূর্বেকার রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, সিদ্ধি-ঋদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি।

সন্ন্যাসের প্রাচীন প্রথাবদ্ধ ধ্যানধারণার পরিবর্তন করে, আত্মমোক্ষের প্রচেষ্টায় সীমিত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে

---

৯৯ আলোচ্য কালের প্রান্তে বেলুড় মঠের একটি তথ্যনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায় স্বামী সারদানন্দের ২১।১১।১৯০৫ তারিখে লেখা একটি চিঠি থেকে। তিনি লিখেছেন ঃ "রাজার (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) অসুখ হওয়া অবধি মঠের সকল বিষয়ে গোলযোগ যাইতেছে। অনেক দিনের হিসাবপত্র বাকি ছিল। তাহা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, মঠে আয়ের অধিক খরচ হইয়া দেনা হইয়াছে।... রাজার অসুখের পর থেকে আমার ঘাড়েই সব ঝুঁকি পড়িয়াছে।"

১০০ History of the Ramakrishna Math & Mission, 1957, p. 180   ১০১ Ibid.

১০২ ১৯।২।১৯১০ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি।

১০৩ ৯।৭।১৮৯৭ তারিখে তিনি মেরী হেলকে লিখেছিলেনঃ "যে-শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নয়—তা স্বয়ং প্রভু।"

মানবচিত্তে জগতের হিতের জন্য স্থান করে দিয়েছিলেন স্বামীজী। আত্মমোক্ষ ও জগতের হিতের মধ্যে যে আপাতবিরোধ তা ঘুচিয়ে দিয়ে তিনি নতুন আদর্শের সন্ন্যাসিজীবনের 'মডেল' গড়ে তুলেছিলেন। যে নতুন বিশ্বাসের শিকড় সমষ্টিচেতনার গভীরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল তা হলো—নরনারায়ণের সেবা করে সাধক সন্ন্যাসী সেই পদ লাভ করে যা জ্ঞানী বিচার করে, ভক্তেরা ভজনা করে এবং যোগীরা ধ্যান করে লাভ করে।

তমোভাবে আচ্ছন্ন সেদিনকার ভারতবাসী নরনারায়ণ-সেবার মাধ্যমে জাতিচৈতন্য জাগ্রত ও বিভাসিত হওয়ার জন্য 'জাতের বড়াই' করা গর্বিত শিক্ষিত সমাজকে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন, আর দেশের যুবকদের আহ্বান করেছিলেন পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করে দেওয়ার জন্য। সীমিত কর্মী ও অর্থ নিয়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন এবিষয়ে অগ্রসর হয়েছিল।

দেশে, বিশেষত বিদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ-আন্দোলন প্রচারিত বেদান্ত-ভাবনা ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনে স্বামী

সারগাছি আশ্রমের প্রথম দিকে মূল আশ্রমভবনে আশ্রমের অনাথ বালকদের সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ। ডানদিকে ছবিটির কিছু অংশ খারাপ হয়ে যাওয়ায় ঐ অংশটি বাদ দিতে হয়েছে।

নতুন পথ পেয়েছিল। স্বামীজী-প্রবর্তিত সেবাকাজ সম্বন্ধে ১৩ জুলাই ১৯০২ সংখ্যায় 'সোস্যাল রিফর্মার' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল ঃ "That alone (philanthropic work) is enough to raise him high among those who have laboured to infuse life into the Indian people." পরাধীন জাতিসুলভ ভারতবাসীর হীনম্মন্যতা, নৈষ্কর্ম্য ও হতাশার স্তব্ধতা প্রচণ্ডভাবে নাড়াচাড়া খেয়েছিল।

স্বামীজীর বীক্ষণে সেসময়কার ভারতবর্ষ দুটি মহাপাপে দুষ্ট—"মেয়েদের পায়ে দলানো আর 'জাতি জাতি' করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা।" এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার অখণ্ডানন্দ বলেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কুঠি-বাড়ির ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে যে-ডাক দিয়েছিলেন, সে-ডাক আকাশে-বাতাসে তখনো ধ্বনিত হচ্ছে, যুগ যুগ ধরে ধ্বনিত হবে—"ওরে কে কোথায় আছিস, আয়।" একথার সত্যতা আলোচ্য কালের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নতুন নতুন মানুষেরা এই আন্দোলনের ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছিল, কেউবা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছিল। দেশের মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে এই ভাবধারার প্রভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

নেতা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী "পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও

জানবি একপ্রকারের ঈশ্বরসাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মবিকাশ।"[১০৪]—প্রবীণ নবীন সকল আত্মমোক্ষেচ্ছু ভারতবাসীকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ধর্ম ধরে কর্ম পুনঃপ্রবর্তিত হওয়াতে ভারতবাসী স্বস্থ হয়ে উঠেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার সমগ্র জগদ্বাসীর, বিশেষত ভারতবাসীর জন্য। এর অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ বাস্তবায়নের বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তাঁর ত্যাগী গুরুভাই ও শিষ্যবর্গের ওপর। এই আদর্শ রূপায়ণের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ক্রমবর্ধমান রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রত্যেকটি অঙ্গের ওপর, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সকল শরিকদের ওপর। আমাদের যাত্রাপথের ধ্রুবতারা হবে স্বামীজীর মানস-নয়নে প্রত্যক্ষীভূত উড্ডীয়মান সত্যটি। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের কেন্দ্রভূমি বেলুড় মঠ সম্বন্ধে তাঁর মহাপ্রস্থানের দুদিন আগে তিনি বলেছিলেন: "The spiritual impact that has come here to Belur will last fifteen hundred years—and this will be a great university. Do you think I imagine it, I see it."[১০৫] এবং মহাভাবসমন্বয়-ভূমি বেলুড় মঠ থেকে উত্থিত ভাবপ্লাবনের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন: "ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নতুন স্রোত এসেছে। এখন সব নতুন ছাঁচে গড়তে হবে। নতুন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।... দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিতে হয়।... আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সবদিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে... তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক বাঁচতে পারবে, নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এ দেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।"[১০৬] স্বামীজী স্বপ্ন দেখেছিলেন 'নতুন ঠাকুর, নতুন ধর্ম, নতুন বেদ' আশ্রয় করে নতুন ভারতের উদ্ভব ঘটবে। 'লোকগুরু মহাসমন্বয়াচার্য'[১০৭] শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য ভারতের কল্যাণমাত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্ববাসীর সামগ্রিক কল্যাণে সমর্পিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনা।

স্বামীজীর এই স্বর্ণসম্ভব ধ্যানধারণাকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করতে হবে, আমাদের চেতনার সম্যক্ রূপান্তর ঘটাতে হবে। তাহলেই আমরা স্বামীজীর উত্তরাধিকারলাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারব, তিনি যে দায়-দায়িত্ব আমাদের দিয়ে গিয়েছেন তা সার্থকভাবে পালন করতে পারব। [সমাপ্ত] ❑

১০৪ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৮২
১০৫ Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 243
১০৬ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩-৯৪
১০৭ ১৯।৩।১৮৯৭ তারিখে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সংস্কৃতে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য।

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

নারীজাতি বেদাধ্যয়নবিহীন—কোন্ শাস্ত্রানুসারে?

বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মতে, নারীর বেদ অধ্যয়নে অধিকার নেই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৩২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।"

—হে পার্থ, নিকৃষ্টজন্মা ব্যক্তিগণ এবং স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণও আমাকে আশ্রয় করে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে।

উক্ত শ্লোকের পাদটীকায় বলা হয়েছেঃ "স্ত্রী ও শূদ্র বেদাধ্যয়নবিহীন"—শ্রীধরস্বামী। অর্থাৎ শ্রীধরস্বামীর মতকে প্রামাণিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, যে বেদাধ্যয়ন নিয়ে এই আলোচনা, সেই বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থা কি ছিল? ঋগ্বেদের যুগে দেখা যায় যে, সমাজে নারীজাতির একটা সম্মানজনক স্থান ছিল। নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক কোন পার্থক্য তখন ছিল না। তখন যজ্ঞ ছিল ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বেদে একাধিক সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, নারী ও পুরুষ একসঙ্গে যজ্ঞ করছে। যথা, ঋক্ (১।১৭৩। ২)। উভয়েরই একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করার অর্থাৎ উভয়েরই হোতা হওয়ার অধিকার ছিল। জায়াকে 'পত্নী' বলা হয় সেই অর্থে। পাণিনীর একটি সূত্রে আছে—"পত্যুর্নো যজ্ঞ সংযোগে"। ঋগ্বেদের যুগে পতি এবং পত্নী একসঙ্গে যজ্ঞ করতেন বলেই জায়ার 'পত্নী' নাম। কাজেই যজ্ঞকার্যে নারী-পুরুষের অধিকার যে সমান ছিল তা সুস্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ঋষিরাই ছিলেন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাঁদের স্থান ছিল সমাজে সকলের ওপরে। ঋগ্বেদে অনেক সূক্তে ঋষি হিসেবে নারীদের নাম উল্লিখিত। যথা—১ম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের দেবতা রতি, ঋষি অগস্তের পত্নী লোপামুদ্রা। ৫ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের দেবতা অগ্নি, ঋষি অত্রিকন্যা বিশ্ববারা। ৮ম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র, ঋষি অপালা। ১০ম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়, ঋষি ঘোষা। ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের দেবতা আত্মা, ঋষি বাক্। ১০ম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তের দেবতা সপত্নীবাধন, ঋষি ইন্দ্রাণী।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, নারীদের বেদাধ্যয়ন এবং শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের অধিকার কবে হরণ করা হলো এবং কেন হলো? অনেকের মতে, মনুর বিধান অনুযায়ী সমাজে নারীদের স্বাধীনতা হরণ শুরু এবং নারীদের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। 'মনুস্মৃতি'তে কিন্তু একটি শ্লোকে বলা হয়েছেঃ

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জী বন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।"

এর থেকে বোঝা যায়, পুরাকালে কুমারীরা মৌঞ্জী ধারণ করে যজ্ঞ করতেন। তাদের অধ্যাপনা এবং বেদ ও সাবিত্রীবচন পাঠ করার অধিকার ছিল। এ থেকে বোঝা যায়, মেয়েদের জন্য মৌঞ্জীবন্ধন-এর ব্যবস্থা ছিল। 'মৌঞ্জীবন্ধন' শব্দটি উপনয়নকেই বোঝায়। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ এবং অধ্যাপনায়ও নারীদের অধিকার ছিল।

মনুই সম্ভবত পৃথিবীতে প্রথম পরিজ্ঞাত সমাজবিজ্ঞানী। সেই অর্থে 'মনুসংহিতা' হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান (Social Science)। সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা পরিচালনার জন্যই মনুসংহিতার প্রবর্তন। আদর্শ সমাজগঠনের দিগ্‌দর্শন। সমাজের এমন কোন দিক নেই যা মনুর বিধানে অনুল্লিখিত।

'স্ত্রীজাতির ধর্ম' সম্বন্ধে 'মনুসংহিতা'য় (৫।১৪৭-১৪৮) বলা হয়েছেঃ

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষ্বপি।।
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।।"

—কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা কোন স্ত্রীলোকেরই নিজ গৃহেও স্বাধীনভাবে কোন কার্য করা উচিত নয়। স্ত্রীলোক শৈশবে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামীর দেহান্ত হলে পুত্রদের বশে থাকবেন। স্ত্রীজাতি কখনোই স্বাধীনতা অবলম্বন করবেন না।

অপরদিকে 'নারীর সম্মান' সম্বন্ধে বলা হয়েছে (৩।৫৫-৫৬)ঃ

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।।
যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।"

—কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পতি, কি দেওর সকলেরই অসীম মঙ্গল কামনায় স্ত্রীদের ভোজনাদি দ্বারা পূজা করা এবং বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা ভূষিত করা কর্তব্য। যে-কুলে নারীগণ বস্ত্রালঙ্কারে পূজিতা হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে-কুলে স্ত্রীলোকেরা অনাদর প্রাপ্ত হন, সে-বংশে সকল কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়।

আবার 'কন্যাদান' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (৯।১০১-১০২)ঃ

"অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ।।
তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্।।"

—ভার্যা ও পতি মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে থাকবে। সংক্ষেপে কথিত স্ত্রী-পুরুষের এটাই উৎকৃষ্ট ধর্ম জানবে। বিবাহকার্য সম্পন্ন হলে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর বিযুক্ত হয়ে কোন কার্য করবে না, এবিষয়ে তারা সর্বদা যত্নবান হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীজাতির অবাধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মনু যেমন বিধান দিয়েছেন, তেমনি নারীকে বসিয়েছেন পরিবারের কেন্দ্রস্থলে দেবীর আসনে। সকলের পূজ্যা এবং আদরণীয়া তিনি। আবার এও দেখছি যে, স্বামী-স্ত্রী কখনো বিযুক্ত হয়ে কোন কাজ করবে না। ধর্মাচরণও নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রাধ্যয়ন ধর্মাচরণে নিশ্চয়ই আবশ্যিক। এমন বিধান 'মনুসংহিতা'য় কোথাও নেই যে, নারীগণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারবে না বা বেদাধ্যয়ন তাদের নিষিদ্ধ।

তাহলে, নারীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার নেই—এই

বিধিনিষেধ কোথা থেকে এল এবং কবে থেকে? এই প্রশ্ন থেকেই যায়। এবিষয়ে আলোকপাতের আশায় 'উদ্বোধন'-পাঠকদের কাছে আমার এই জিজ্ঞাসাটি রাখছি।

তথ্যসূত্র : হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত 'ঋগ্বেদসংহিতা', নির্ণয়-সাগর প্রেস প্রকাশিত 'মনুস্মৃতি' এবং রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র'।

সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা
সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

প্রসঙ্গ 'জল পান'

গত চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যায় দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টোটকা' শিরোনামে চিঠিটি পড়ে প্রত্যহ সকালে খালিপেটে ৩/৪ গ্লাস জল পান করা শুরু করেছি এবং দুদিনের মধ্যেই অত্যাশ্চর্য ফললাভ করতে শুরু করেছি। কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলে আমার মতো অনেকেই উপকৃত হবেন। আমি আলোচনার জন্য কিছু প্রশ্ন তুলে ধরছি।

(১) জল পানের পূর্বে না পরে মলত্যাগ করা উচিত? (২) দিনে কতটা জল পান করা দরকার? (৩) যোগব্যায়াম করার অভ্যাস থাকলে জল পানের কতক্ষণ পরে তা করা উচিত? (৪) রাত্রে শোওয়ার আগে জল পান করা উচিত কি? (৫) জল পানের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কি?

প্রসঙ্গক্রমে নিবেদন করি, গত মাঘ ১৪০৪ সংখ্যায় স্বামী বিদ্যানন্দ মহারাজ জল-চিকিৎসা বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। কিন্তু উপরি উক্ত প্রশ্নগুলির সমাধান সেখানে পাইনি। বর্তমানে জল পান শুরু করলেও সংশয় থেকেই যাচ্ছে। তাই জনসাধারণের মঙ্গলার্থে এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য অনুরোধ করছি।

সুনীল ঘোষাল
রামকমল সেন রোড, গরিফা
উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩১৬৬

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

স্বামী প্রভানন্দের ধারাবাহিক রচনা 'পরিবর্তনের মুখে রামকৃষ্ণ মঠ' একটি অপূর্ব, অতুলনীয় রচনা। এই লেখাটি পড়ে আমরা আমাদের প্রিয় সঙ্ঘের অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। আশা করি আগামী দিনে এরকম আরো অনেক অজানা তথ্য জানতে পারব। 'উদ্বোধন'-এর সফল শতায়ুর জন্য অভিনন্দন। 'উদ্বোধন'কে প্রণাম।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য
বরানগর, কলকাতা-৭০০ ০৩৬

'উদ্বোধন'-এর ১০১তম বর্ষে গ্রাহক হয়েছি। এই প্রথম 'উদ্বোধন' পড়ার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। সূক্ষ্ম আহারের কথা ঠাকুর বলেছেন। তার সব ব্যবস্থা 'উদ্বোধন'-এ বর্তমান। ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস—কি নেই 'উদ্বোধন'-এ। একদিকে বিগত শতাব্দীর ইতিহাস, অন্যদিকে আগামী শতাব্দীর ইতিবাচক বার্তা বহনের ইঙ্গিত। 'উদ্বোধন' যেন ঠাকুরেরই নিজস্ব আয়োজন। ধন্য 'উদ্বোধন'! ধন্য আমরা!

মৃণাল মোদক
রাউৎগ্রাম, কাইগ্রাম, বর্ধমান

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী জিতাত্মানন্দের 'নীলকণ্ঠ মহাদেব—বিবেকের আনন্দস্বরূপ' কবিতাটির জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। কবিতাটি একমাস ধরে বারবার পড়েছি। কবিতাটি অমৃতের আস্বাদ আনে। কবিতাটি 'তমসায় ভরা মৃত্যুজরাজীর্ণ মহাদেশে' নবপ্রাণ-সঞ্চারিণী। বর্তমানের অলস নিদ্রা ভাঙানিয়া এক "অভীরভীঃ" মন্ত্র। এ যেন কবিতা নয়, এ কবির অন্তরের দেবত্ব-নিঃসৃত এক নির্ঝরিণী যা চিদানন্দরূপ সত্যসুন্দরের কলতান তোলে আমাদের সমগ্র সত্তায়। বাস্তবিক কবিতাটি "ভোগ মরুদেশে নিত্য মৃত্যুহোম"-এর শান্তিবারিস্বরূপ।

রঘুপতি মুখোপাধ্যায়
রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

'ব্লাডপ্রেসার ও অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সংগঠনকারী হেতুগুলি'

'উদ্বোধন' পত্রিকার গত চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত 'ব্লাডপ্রেসার ও অ্যাথেরোস-ক্লেরোসিস সংগঠনকারী হেতুগুলি' বিজ্ঞান-নিবন্ধটি খুবই তথ্যবহুল এবং আমার মতো হৃদরোগীদের পক্ষে খুব উপকারী। 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে আমার বিশেষ অনুরোধ, 'Blocked Heart' ও 'Dialated Heart' সম্বন্ধে ডাঃ শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরূপ একটি তথ্যবহুল নিবন্ধ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করুন। তাহলে খুবই উপকৃত হব। ডাঃ শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ 'কোলেস্টেরল ও করোনারী : আমাদের করণীয়' প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৯৮তম বর্ষের কার্তিক ১৪০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ঐ নিবন্ধটিও আমাদের খুব উপকারে লেগেছে। আমি বৃদ্ধ (বয়স ৭৬ বছর) ও হৃদ্‌রোগী। সেজন্য আপনার কাছে বিশেষ অনুরোধ, আমার প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রাজা প্যারীমোহন রোড
উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮

ভ্রম সংশোধন

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যায় আমার লেখা 'ব্লাডপ্রেসার ও অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সংগঠনকারী হেতুগুলি' বিজ্ঞান-নিবন্ধের ১৪৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের ৩৩ পঙ্‌ক্তিতে 'মেটোপ্রলল (৫০০-১০০ মিলিগ্রাম দিনে দুবার)' হয়েছে, হবে— 'মেটোপ্রলল (৫০-১০০ মিলিগ্রাম)' এবং ৪২ পঙ্‌ক্তিতে 'লাইসিনোপ্রিল (১০-২০, এমনকি ৪০ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার)'

হয়েছে, হবে—'লাইসিনোপ্রিল (১০-২০, এমনকি ৪০ মিলিগ্রাম দিনে একবার)'।

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়
সিরাকিউস, নিউ ইয়র্ক
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

প্রসঙ্গ 'তত্ত্ব ও প্রয়োগের চিরন্তন সমস্যা'

গত চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'তত্ত্ব ও প্রয়োগের চিরন্তন সমস্যা' নিবন্ধ পড়ে কি অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। দীর্ঘদিন ধরে আমার মানসপটে কতগুলি জিজ্ঞাসা উদিত হয়ে মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আমাকে নিষ্পেষিত করছিল। এই প্রবন্ধটি আমার মনে শান্তিবারি সিঞ্চন করে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাল। আমার মতো লক্ষ লক্ষ অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই অমূল্য রত্ন পেয়ে কত যে আনন্দ উপভোগ করবেন তা চিন্তা করেও আমার মনে অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হচ্ছে।

জ্ঞানরঞ্জন হোতা
পোঃ আড়ংঘাটা, নদীয়া-৭৪১৫০১

'উদ্বোধন ঃ বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা'
লেখকের বক্তব্যে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি

'উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষের শারদীয়া সংখ্যায় (আশ্বিন ১৪০৫) প্রকাশিত বিশেষ নিবন্ধ 'উদ্বোধন ঃ বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা'-র লেখক তাপস বসু জানিয়েছেন, 'প্রবাসী' পত্রিকাটি এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার মনে হয়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লখনৌ থেকে 'প্রবাসী' প্রকাশ করেছিলেন।

মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়
বাঁদা, উত্তরপ্রদেশ

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪০৬ সংখ্যায় প্রাসঙ্গিকী বিভাগে তাপস বসু বেশ কিছু সাময়িকপত্রের নাম দিয়েছেন যেগুলি তিনি তাঁর পূর্বপ্রকাশিত 'উদ্বোধন ঃ বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা' নিবন্ধে উল্লেখ করতে পারেননি। শ্রীবসু প্রসঙ্গত জানিয়েছেন, এই পত্রিকাগুলির আয়ু তিন মাস থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পর্যন্ত। এই তালিকায় সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র উল্লেখ সঠিক হলেও তা অনেকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২২ সালের মার্চ মাসে তা দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে বাঙলায় প্রচারিত দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রচার সর্বাধিক। সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত হওয়ার তথ্যটি সকলের জানা না থাকায় শুধুমাত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র উল্লেখ অনেকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয়ত, এই তালিকায় 'প্রণব' পত্রিকার উল্লেখ ভ্রান্তিপূর্ণ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাঙলা মুখপত্র 'প্রণব' এখনো প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

চন্দ্রিমা বসু
বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৩

'উদ্বোধন'-এর বৈশাখ ১৪০৬ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত "'উদ্বোধন ঃ বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা'—সম্পূরক তথ্য" শীর্ষক নিবন্ধকার তাপস বসুর পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র। শ্রীবসু উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক পর্যন্ত প্রকাশিত যেসব পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীর তালিকা দিয়েছেন এবং এদের তিন মাস থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পর্যন্ত আয়ুষ্কাল জানিয়ে সবাইকে মৃতের তালিকায় তুলে দিয়েছেন (মানে সবগুলিই অধুনালুপ্ত), সেখানে একটি মারাত্মক তথ্যগত ভুল রয়ে গেছে।

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও আশ্রমসমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রবর্তিত 'আর্যদর্পণ' পত্রিকার নামটি ঐ তালিকায় সংযোজন করে দিয়ে এই ভুলটি হয়েছে। বস্তুত, জীবিত 'মৃত' বলে ঘোষিত হয়েছে! সাধারণভাবে পাঠক-পাঠিকাদের এবং বিশেষভাবে পত্রলেখক ও প্রবন্ধকার শ্রীবসুর অবগতির জন্য জানাই যে, ধর্ম, সংস্কৃতি, নীতি ও শিক্ষা বিষয়ক রচনাসমৃদ্ধ 'আর্যদর্পণ' ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ একানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। এহেন একটি সুপ্রাচীন, নিয়মিত প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাটিকে শ্রীবসু কেন মৃতের তালিকায় সংযোজন করলেন তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

রণবীররঞ্জন দাস
প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, লেকগার্ডেন্স
কলকাতা-৭০০ ০৪৫

শ্রীরামকৃষ্ণ হালিশহর ও হংসেশ্বরী-মন্দিরে কখন এসেছিলেন?

বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষের শারদীয়া সংখ্যায় শ্যামলী মহাপাত্রের লেখা 'রানী রাসমণি ঃ বিস্মৃত এক মহীয়সী'-র পরিপ্রেক্ষিতে চৈত্র ১৪০৫-এর সংখ্যায় 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে শিবসৌম্য বিশ্বাসের 'রানী রাসমণির জন্মভূমি হালিশহর' চিঠিটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে জানতে পারলাম ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং নৌকাপথে তীর্থে যাওয়ার সময় হালিশহরে নেমে রাসমণি ও রামপ্রসাদের ভিটা এবং বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী-মন্দির দর্শন করেন।" চিঠিটি পড়ে যেমন আনন্দিত হয়েছি তেমনি কিছুটা সংশয়াপন্নও হয়েছি। পত্রলেখকের কাছে আমার জানতে ইচ্ছে করে, শ্রীরামকৃষ্ণ হালিশহরে এবং বাঁশবেড়িয়ায় কবে এসেছিলেন? এসম্পর্কে তাঁর তথ্যসূত্র অনুগ্রহ করে জানালে বাধিত হব। শ্রীম-কথিত 'কথামৃত' এবং স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ এধরনের কোন উল্লেখ আমাদের চোখে পড়েনি, সেজন্যই এই প্রশ্ন।

ধীরাজকুমার ভট্টাচার্য
মুখার্জীপাড়া, হালিশহর
উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩১৩৪

চিরন্তনী
দধীচির আত্মদান ও
বৃত্রাসুর বধ ৬
ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য
চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত
দধীচির পবিত্র অস্থিতে নির্মিত সেই মহা শক্তিশালী বজ্র হাতে নিয়ে ইন্দ্র তাঁর ডিতবে এক প্রচণ্ড শক্তি অনুভব কবলেন। তিনি বজ্র হাতে ঐরাবতেব পিঠে চড়ে বৃত্রাসুব বধেব উদ্দেশে যাত্রা কবলেন। অন্যান্য দেবতারাও তাঁদেব নিজ নিজ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং এক বিশাল সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রের সাথে সাথে চললেন।
দেববাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদেব দেখে ক্রুদ্ধ বৃত্রাসুব তাব সঙ্গী অসুর-সেনাদেব নিয়ে ভযঙ্কব মূর্তিতে রে রে কবে তেড়ে এল। হাতে তাদেব নানাবকম ভযঙ্কব অস্ত্রশস্ত্র, মুখে ভযানক হুঙ্কার।
যুদ্ধে দেবতারা অসুরদের মুখোমুখি হলেন। শুরু হয়ে গেল দেবাসুবেব ভযানক সংগ্রাম। শোনা যেতে লাগল অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝান শব্দ। চতুর্দিক কাঁপিয়ে দিয়ে অসুরদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি বৃষ্টিধারার মতো দেবতাদের দিকে ধেয়ে চলল।
[ক্রমশ]

ভূমিকম্প ও তাহার ফলাফল

শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী

ভূত্বক বা ভূস্তরে যে তরঙ্গসদৃশ আন্দোলন সঞ্চালিত হয়, তাহাই ভূমিকম্পের কারণ। পৃথিবীর উপরকার স্তরের কম্পনকেই ভূমিকম্প বলা হয়। ইহা অভ্যন্তরস্থ কোন আকস্মিক পরিবর্তনের ফল। পৃথিবীর কম্পন এত সামান্য হইতে পারে যে, ভূমিকম্পের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহের দ্বারাই তাহা অনুভূত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, ইহা এত প্রবল হয় যে অতি শক্ত ইমারতকেও চুরমার করিয়া দেয়, সমৃদ্ধশালী শহরকেও শ্মশানে পরিণত করে এবং শক্ত জমিকেও ভয়ঙ্কররূপে ফাটাইয়া দেয়। সামান্য সামান্য ভূকম্পগুলিকে, হালকা মালমশলায় নির্মিত নিকটস্থ গৃহ হইতে ভারী রেলগাড়ির যাতায়াত যেরূপ প্রতীত হয় অথবা অনেক দূরে অনেক বারুদ জ্বলিয়া উঠিলে বায়ুরাশিতে যেরূপ ঘাত-প্রতিঘাত চালিত হয়, তাহারই সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রবল ভূকম্পগুলি প্রকৃতির অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ইহাদের প্রতি অবজ্ঞার উদ্রেক হওয়া দূরে থাক, বরং ভীতি বাড়িতে থাকে; কেননা যে-সময়ে এই নিরেট পৃথিবীও কাঁপিতে থাকে, তখন কিছুই নিরাপদ মনে হয় না। মনুষ্যশরীরের স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous System) এই অনুভূতির আশ্চর্যতা বিশেষত ইহার বিশ্বাসঘাতকতায় একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া উঠে; কারণ প্রবল বাত্যা আসিবার পূর্বে মানুষকে সতর্ক করিয়া দেয়, কিংবা আগ্নেয়গিরি আসন্ন বিপদের খবর অগ্রে প্রেরণ করে, কিন্তু ভূকম্পের কাণ্ডকারখানা স্বতন্ত্র। এই সমস্ত শান্ত রহিয়াছে, সমস্ত ঐশ্বর্যে ও আনন্দে ভাসিতেছে, পরক্ষণেই সমস্ত দেখ ধ্বংসাবস্থাতে পরিণত এবং আনন্দ নিরানন্দে ডুবিয়া গিয়াছে।

কখনো কখনো পৃথিবীর একটিমাত্র দোলন অনুভূত হয়। ইহা কখনো বা ক্ষণিক একমাত্র দোলন বলিয়া অনুভূত হয়, কখনো-বা বোধ হয় যেন পৃথিবীর অনেকগুলি দোলন একটির পর একটি, কোনটি একটু বেশি, কোনটি বা একটু কম, কয়েক মিনিট ধরিয়া অনুভূত হইতেছে। যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং কখনো কখনো প্রকৃতই জল যেমন উঠে নামে, সেইরকম মাটিও উপরে উঠিতেছে ও নামিতেছে বোধ হয়। কখনো কখনো ইহা কতক দিন ধরিয়া এমনকি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মধ্যে মধ্যে অনুভূত হয়। এই ভূকম্প সামান্য অথবা প্রবল, এক বা ততোধিক—যেমনই হউক না কেন, এটা ঠিক যে, কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন হয় এবং এই কেন্দ্রস্থান ভূপৃষ্ঠ হইতে কিছুদূর নিম্নে অবস্থিত। সেইজন্য এই কেন্দ্রস্থান স্থলের নিচে হইলে এরকম ফল দৃষ্ট হয় এবং সমুদ্রের নিচে হইলে সেই ফলের পার্থক্য হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, পৃথিবীর নিচে বারুদে আগুন লাগিয়া আওয়াজ হওয়ার ন্যায় কোন কারণে যেন ভূমিকম্প হইল। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থান স্থল বা জলের নিচেই হউক, একটা শব্দতরঙ্গ চলিতে শুরু হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ভিতর দিয়া একটি ধাক্কার তরঙ্গও চলিতে লাগিল; কিন্তু স্থলের নিচে ভূকম্পের স্থলে এই শব্দতরঙ্গ এবং ধাক্কার তরঙ্গ পৃথিবীর উপরভাগ পর্যন্ত আসে। কোন কোন জায়গায় শব্দ অগ্রে শুনিতে পাওয়া যায়, পরে কম্পন অনুভূত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দ কম্পনের পরে অনুভূত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটাই একসঙ্গে অনুভূত হয়। এই শব্দটি যেন কানের কাছে 'বোঁ বোঁ' আওয়াজ, কিংবা দূরে বজ্রাঘাতের 'কড় কড়' আওয়াজ, কিংবা বোঝাই রেলগাড়ির 'ঘড় ঘড়' আওয়াজ, কিংবা অনেকগুলো ষাঁড়ের 'গাঁ গাঁ' আওয়াজ বলিয়া অনুভূত হয়।
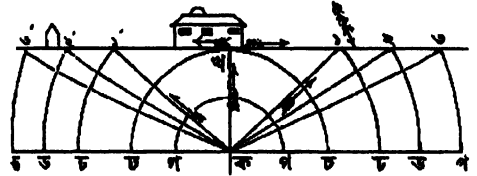
১ম চিত্র

ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইতে গতির প্রসারণের দিঙ্‌নির্দেশক চিত্র
ম্যালেট সাহেবের মতানুযায়ী

ক—ভূকম্প কেন্দ্র; খ—ভূকম্প শীর্ষবিন্দু; ক ১, ক ১', ক ২, ক ২', ক ৩, ক ৩' রেখাগুলি ক কেন্দ্র হইতে কম্পের গতিপথ দেখাইতেছে। যে যে গভীরতায় ধাক্কাটি একই সময়ে অনুভূত হইবে, বৃত্তগুলির অবস্থিতি (position) তাহাই দেখাইতেছে। গগ, চচ, ঢঢ প্রভৃতি বক্ররেখাগুলিতে জড়কণাগুলি সঞ্চালিত হইবে। তরঙ্গটি ভূগর্ভ হইতে প্রথমে খ বিন্দুতে পৌঁছিবে এবং তৎপরে উত্তর দক্ষিণ দিকে গিয়া একই সময়ে ১ ১', ২ ২', ৩ ৩' বিন্দুতে অনুভূত হইবে।

পৃথিবী যদি এই স্থানে সমতল হয়, তাহা হইলে ভূকম্পের এই আঘাতটি কেন্দ্রস্থলের ঠিক উপরটিতেই হইবে। এইখানে ইহার কার্য লম্বভাবে (vertically) অনুভূত হইবে এবং ইমারত, স্তম্ভ, অঙ্গন (মেঝে) কিংবা অন্যান্য জিনিস যাহা পৃথিবীর উপরে আছে তাহারা যেন সহসা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, বোধ হইবে। এইজন্য যদি ইমারতের গাঁথনি নষ্ট হইয়া যায়, ফাটগুলি সমতলভাবে (horizontally) দৃষ্ট হইবে এবং যদিও ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে এবং বড় বড় থামের শ্রেণীগুলি কাঁপিতে পারে, তথাপি তাহাদিগকে উলটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা অতি সামান্যই হয়। যতক্ষণ ভূত্বকের কোন পরিবর্তন না হয়, অর্থাৎ মাটি একইরকম থাকে, ততক্ষণ এই ধাক্কা কেন্দ্রস্থান হইতে বহির্দিকে একরকম গতিতে যাইতে থাকে। সেইহেতু যেসমস্ত স্থান এই কেন্দ্রকে মধ্যবিন্দু করিয়া
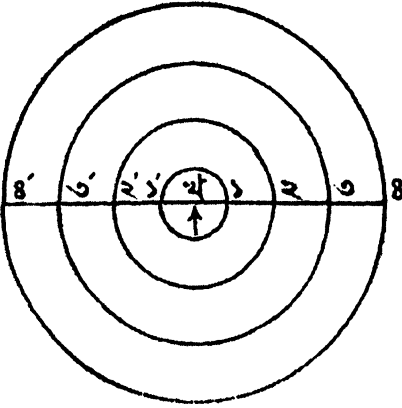
২য় চিত্র
ভূকম্প বৃত্তের চিত্র
খ—ভূকম্প শীর্ষবিন্দু। ১ ১', ২ ২', ৩ ৩', ৪ ৪'—ভূকম্প একসময়ে অনুভূতির বৃত্তস্থ বিন্দুসমূহ।

অঙ্কিত গোলকের পরিধিতে স্থিত, তৎসমুদয়ই একসময়ে একরকমের ধাক্কা অনুভব করিবে। (চিত্র ১, ২ দেখ) সুতরাং যেমন অঙ্কিত চিত্রে দেখানো হইয়াছে, কেন্দ্রের ঠিক উপরিস্থিত যে-বিন্দুতে ধাক্কা প্রথমে অনুভূত হইয়াছে তাহার চতুর্দিকে এই ধাক্কাটি গোলাকারে চলিতে থাকে; যেমন কোন এক স্থির জলাশয়ে একটি পাথর উঁচু হইতে ফেলিলে ঢেউগুলি হইতে থাকে। কিন্তু এই বৃত্ত যেমন চওড়া হইতে থাকে তেমনি ধাক্কাটির দিক বা গতিপথ (direction) পরিবর্তিত হইয়া যাইতে থাকে। (চিত্র ১, ২ দেখ)

প্রথমে ধাক্কাটি জিনিসগুলিকে উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। এক্ষণে উহা তেরচা বা বক্রভাবে জিনিসগুলিকে উলটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। এইজন্য এই ধাক্কা থাম, ধূমনির্গমনের পথ (chimney), গির্জার চূড়া প্রভৃতিকে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধের দিকে, সম্মুখে বা পশ্চাতে উলটাইয়া ফেলে। দেওয়ালের ফাটগুলি এক্ষণে আর সমতলভাবে (horizontal) নাই। কিন্তু গাঁথনির এক থাক হইতে অন্য থাকে তেরচা বা বক্রভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং এই ফাটের রেখা (horizon) ক্ষিতিজের সহিত একটি কোণ উৎপাদন করে। কম্পের উৎপত্তিস্থান হইতে কোন স্থান যত দূরে, তথায় এই কোণটিও তত বড় হইবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই কোণের পরিমাণ করিলে তাহা হইতে ঠিক ঠিক গণনা করিতে পারা যায় যে, কোনখান হইতে এই ভূকম্প উত্থিত হইয়াছে এবং জমির কত নিচে তাহা অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কোন্ কোন্ সময়ে এই ভূকম্প অনুভূত হইয়াছে তাহা যদি দেখা হয়, তাহা হইতে ভূকম্পের বেগও গণনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু যদি কেন্দ্রস্থান সমুদ্রের তলার নিচে হয়, তাহা হইলে ভূকম্পের ব্যাপারটি বেশি জটিল হইয়া উঠে। এখানেও মাটির নিচে যে তোলপাড়টি হইল, উহার প্রকাশ বা আবির্ভাব ঠিক উপরিস্থ মাটিতে অর্থাৎ সমুদ্রতলে হয় এবং ইহা আবার উপরিস্থ জলে পুনঃ ধাক্কা দেয়। ইহাতে সমুদ্রে বড় ঢেউ উঠে; যেমন একটি জলপূর্ণ পাত্রের নিচে আঘাত করিলে পাত্রে জলের তরঙ্গ উঠে। ধাক্কাটি সমুদ্রের তলাতে ভ্রমণ করিতে থাকে, কিন্তু উপরের জল যদি গভীর হয়, এ-ধাক্কাটির এত জোর হয় না যে জলের উপরে স্পষ্ট কোন কার্য করিতে পারে। কিন্তু জলের গভীরতা যদি বেশি না হয়, তাহা হইলে উপরে বড় ঢেউ উঠিতে দেখা যায়। কোন জলাশয়ের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই যে, হয়তো একটা মৎস্য জলের নিচে হইতে লাফাইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল এবং পরে গভীর জলে চলিয়া গেল। যখন মাছটি জলের উপরদিকে উঠিতেছিল, তখন সেই দিকের জলটিও উঁচু হইয়া উঠিতেছিল এবং মৎস্য যখন গভীর জলে চলিয়া গেল জলের উঁচুতে উঠাও কমিয়া গেল। যখন ভূকম্প অগভীর জলের নিচে হয়, তখন এই প্রকারের কিন্তু উলটাভাবের কার্য দেখা যায়। সমুদ্রের ধারে কোন লোক প্রথমে দেখেন যে, অসামান্য বৃহৎ একটি ঢেউ আসিতেছে, ভূকম্পের ধাক্কার উপর যেন আরোহণ করিয়া আসিতেছে। প্রথমে তিনি কম্পন ও 'গড় গড়' আওয়াজ শুনিতে পান এবং যদি তিনি বিচক্ষণ লোক হন এবং সমুদ্রের ধার যদি তত উঁচু না হয়, তৎক্ষণাৎ সে-স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে উচ্চ স্থানে উঠিয়া ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করেন। ধাক্কাটি ভূস্তরের ভিতর দিয়া সমান জোরে চলে না; মাটির প্রকৃতি অনুসারে ইহার বেগেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা প্রায় সর্বদাই সমুদ্রের ঢেউকে পশ্চাতে ফেলিয়া যায়। ধাক্কাটির পর যখন দূরে খোলা সমুদ্রে জাত জলের ঢেউ আসে, তখন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরিয়া আসে। খুব উঁচু এই ভীষণ ঢেউ কিনারাতে আসিয়া জোরে ধাক্কা দেয় এবং কখনো কখনো তট হইতে অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া যায়। তখন বোধ হয় যেন সহসা বন্যা আসিল। সেই ঢেউ যখন সমুদ্রে চলিয়া যায় তখন ইহার সহিত ধ্বংস ও মৃত্যুকেও যাইতে দেখা যায় এবং গো মেষ মনুষ্যের মৃতদেহও সমুদ্রে নীত হয়।

১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে লিসবনের ভূমিকম্পের ফল অতি ভীষণ হইয়াছিল। শহরবাসিগণ পূর্বে কিছুই জানিত না। হঠাৎ মাটির নিচে কামান-গর্জনের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ এক ভয়ঙ্কর ধাক্কা আসিয়া শহরের বেশির ভাগ ঘরবাড়ি উলটাইয়া ফেলিয়া দিল। অসংখ্য লোক চাপা পড়িয়া মরিয়া গেল। যাহারা বাঁচিয়াছিল, সমুদ্রের ধারে বন্দর নিরাপদ ভাবিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সমুদ্রের জল প্রথমে হটিয়া গিয়া ৫০ ফুট উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া আসিয়া লোকগুলিকে কোথায় লইয়া গেল! একটি বন্দর অনেক খরচ করিয়া করা হইয়াছিল। অনেক লোক সেইখানে সমবেত হইল, মনে

করিল এখানে কোন বিপদ হইবে না; কিন্তু হঠাৎ বন্দরটি লোকসমেত নিচে নামিয়া গেল এবং একটিও মৃতদেহ পুনরায় আর ভাসিতে দেখা গেল না। অনেক নৌকা এবং ছোট ছোট জাহাজ এইখানে নোঙর করিয়া রহিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে যেন এক ঘূর্ণি আসিয়া এই সকলকে গিলিয়া ফেলিল। পরে ইহাদের কিছুমাত্রও নিদর্শন আর পাওয়া গেল না। স্যার সি. লায়াল বলেন, নদীর তলাতে এক বৃহৎ ফাট হইয়াছিল এবং জাহাজ নৌকা সব ইহার মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল। পরে ফাটের মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই লিসবনের ভূকম্পটি অনেক স্থান ব্যাপিয়া অনুভূত হইয়াছিল। ফ্রান্সের ছয় গুণ পরিমিত স্থানের উপর ইহার ফল অনুভূত হইয়াছিল।

ইংল্যান্ডে কিন্তু ইহার ফল অনুভূত হয় নাই। সম্ভবত এই লিসবনের ভূকম্পটি পুরনো ও শক্ত মাটির মধ্যে হইয়াছিল এবং এই প্রকার মাটির স্তর দিয়াই ভূকম্পটির বেগ চলিয়াছিল। এই স্তর অনেক নিচে থাকা নিবন্ধন ইংল্যান্ডে ইহার ফল অনুভূত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বড় রকমের দুইটি ভূমিকম্প হইয়াছে, যদ্দ্বারা জমির অস্বাভাবিক এবং বিস্তৃত পরিবর্তন হইয়াছে।

প্রথমটি ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জুন ভারতবর্ষের অন্তর্গত কচ্ছ প্রদেশকে বিশেষরূপে আলোড়িত ও পরিবর্তিত করে—বিশেষত সিন্ধু নদের পূর্ব স্রোতের নিকটবর্তী দেশসমূহকে; কিন্তু ইহার কম্পন কেন্দ্রস্থল হইতে ১০০০ মাইল দূর পর্যন্তও অনুভূত হইয়াছিল। অনেক শহর ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, পর্বতগাত্র হইতে বৃহৎ বৃহৎ শৈলখণ্ড অধঃপাতিত হইয়াছিল; কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা রন অব কচ (Runn of Cutch)-এ হয়। ইহার পশ্চিম পার্শ্বের ভিতর দিয়া সিন্ধু নদের এক শাখা গিয়াছে এবং জোয়ার ও হাওয়ার অবস্থাবিশেষে ইহার উপর সমুদ্রের জল আসিয়া ইহাকে ডুবাইয়া দেয়। ভূমিকম্পের পূর্বে লাখপৎ নামক স্থানে ইহা হাঁটিয়া পার হওয়া যাইত; কারণ ভাঁটার সময় ইহার জলের গভীরতা ১ ফুট ছিল এবং জোয়ারের সময় ৬ ফুটের বেশি হইত না।

ভূমিকম্পের পর, ভাঁটার সময়ও উহার গভীরতা ১৮ ফুট থাকে। এবং এই অন্যান্য আশ্চর্য পরিবর্তন হেতু দেশের মধ্যে নৌকাযোগে বাণিজ্য যাহা অনেক কাল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরায় স্থাপিত হইল। লাখপতের উপরিস্থিত সিন্দ্রী গ্রাম একেবারে ডুবিয়া গেল এবং এখানে যে একটি কেল্লা ছিল তাহার চূড়াটি কেবল দেখা যাইতে লাগিল। সিন্দ্রী গ্রামের লোকেরা এই কেল্লার উপরে আসিয়া প্রাণরক্ষা করিল এবং দূর হইতে দেখিতে পাইল যে, তাহাদিগের গ্রাম হইতে ৫৷৷০ মাইল দূরে যেখানে পূর্বে সমতল প্রান্তর ছিল, তথায় একটি জমি উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। লোকে ইহার নাম "আল্লাবন্দ" অর্থাৎ ঈশ্বরের বাঁধ দিল।

ইহা ৫০ মাইল লম্বা, ১৬ মাইল চওড়া এবং ১০ ফুট উচ্চ। কয়েক বৎসর পরে সিন্ধু নদ তাহার গতি পরিবর্তন করিল এবং বাঁধের অনেক জায়গা কাটিয়া ফেলিল। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পেও এই রন অব কচের জমি আরো নিচে ডুবিয়া গিয়াছিল।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর চিলির ধারে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছিল। অনেক দূর ব্যাপিয়া এই ঘটনা হইয়াছিল। ভালপারিজো, সেন্ট ইয়াগে ও কুইনটেরো নামক স্থানসমূহে ইহা অনেক পূর্বোক্ত রকমের ক্ষতি করে। অতি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, দক্ষিণ আমেরিকার ধার অনেক দূর ব্যাপিয়া ৩/৪ ফুট ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়াছে। ইহা স্থায়িভাবে হইয়াছে। ভূমিকম্পের পর সামুদ্রিক জীবজন্তু ইহার উপর দেখা গিয়াছিল। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ইহা আরো ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। ডারউইন সাহেব বলেন যে, এন্ডিজ পাহাড়ের লাগাও অনেক জমি ক্রমে ক্রমে ৪০০ ফুট ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়াছে।

জাপান প্রদেশে, যাহাকে ভূমিকম্পের দেশ বলিলেও বলা যাইতে পারে, এইসব ব্যাপার আরো বেশি পরিমাণে হইয়া থাকে। এই দেশে ১৮৮৫ হইতে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত ৮৩৩১ বার ভূমিকম্প হয়। তথায় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ৬৩০টি ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং ১৮৯১ সালের ২৮ অক্টোবর ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছিল। কয়েক মিনিট ধরিয়া ভূকম্প ছিল। বাড়ি, কলকারখানা, মন্দির পড়িয়া গিয়াছিল; পুল ভাঙিয়া গিয়াছিল; রাস্তা, রেলরাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছিল। জমি ফাটিয়া গিয়াছিল এবং পাহাড়ের ধার ধসিয়া অধিত্যকা অবরোধ করিয়া দিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ভূমিকম্পের বিষয় রীতিমত শিক্ষা করা এবং ইহার প্রতি জগতের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কাজ প্রথমে জাপানে আরম্ভ হয়। যখন জাপান গভর্নমেন্ট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান জাপানে বিস্তারিত হউক, তখন জাপান পাশ্চাত্য দেশ হইতে কৃতবিদ্য লোকদিগকে দলে দলে তাঁহাদের দেশে শিক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। এইসমস্ত পণ্ডিত লোক যখন প্রথম জাপানে পদার্পণ করেন, তাঁহারা ঐ দেশ প্রায়ই কাঁপিয়া উঠে দেখিয়া উহার বিষয়ে রীতিমত আলোচনা ও শিক্ষা করিতে চেষ্টিত হন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত্রিতে এক ভূকম্পন হইল। প্রায় যেপ্রকার ভূকম্পন হয়, ইহা তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি। ইহার বেগে অনেক চিমনি (ধূমনির্গমের পথ) চুরমার হইয়া গেল বা ঘুরিতে লাগিল। প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, ইয়াকোহামা শহরের দশা, যেন কোন শত্রু ইহাকে গোলাগুলি দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়াছে, সেইপ্রকার হইয়াছে। লোকদিগের এত মানসিক উত্তেজনা হইয়াছিল যে, অবিলম্বে 'জাপান ভূকম্পন শিক্ষার্থ সোসাইটি' স্থাপিত হইল। ভূকম্পন কি প্রকার ও কিরূপ বেগে ভ্রমণ করে, ইহা নিরূপণের জন্য তাঁহাদিগের চেষ্টা হইতে লাগিল। পূর্বে যেসমস্ত যন্ত্রাদি বাহির

হইয়াছিল তাহা অকর্মণ্য বোধে জাপান গভর্নমেন্ট নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে লাগিলেন, ভূকম্পের গতির মাপ হইতে আরম্ভ হইতে লাগিল এবং ইহার সহিত যে নূতন জ্ঞান পাওয়া গেল, তদ্দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভূকম্পের জ্ঞানজাত ধারণা উলটিয়া গেল।

ভূমিকম্প বিষয়ক জ্ঞান অনেক বর্ধিত হইল এবং ইঞ্জিনীয়ার ও শিল্পী লোকসকল ক্রমশ জানিতে পারিলেন কিরকমে গৃহাদি নির্মাণকার্য করিতে হইবে যাহাতে ভূমিকম্পে অতি কম লোকসান হইতে পারে। নিশ্চয় বলিতে হইবে যে, ইহা পরিশ্রমের সামান্য ফললাভ নহে; খাঁটি বিজ্ঞান সম্বন্ধেই ধরুন বা কার্যোপযোগিতা সম্বন্ধেই ধরুন, ইহার স্পষ্ট ফললাভে জাপান গভর্নমেন্ট এতই আনন্দিত হইলেন যে, ভূমিকম্পবিদ্যা সম্বন্ধে জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের পদ স্থাপিত করিলেন। এক সহস্র স্থানে ভূকম্পের ফল নিরীক্ষণার্থ পর্যবেক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানবিৎ ও কাজের লোকদিগের একটি সভা স্থাপিত হইল। ভূকম্পের অনিষ্টফল কিসে খুব কম হয়, তাহাই নির্ধারণ করা এই সভার কার্য। যখন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ভূমিকম্পে ভারতবর্ষের অন্তর্গত আসাম প্রদেশ একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছিল, এই সভা হইতে দুইজন সভ্য সেইসময়ে কি প্রকারে গৃহাদি নির্মাণকার্য করিতে হইবে, তাহাই জানিবার জন্য আসাম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, ভূমিকম্প প্রায়ই হইয়া থাকে এবং অনেক স্থান দেখিয়া ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ৩০ মিনিট অন্তর আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী এক একবার নড়েন চড়েন।

যেসব স্থানে ভূমিকম্প বেশি ও যেসকল কেন্দ্রস্থল হইতে ভূমিকম্প উত্থিত হয়, ইহাদিগের বিষয় এক্ষণে আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এইসব ব্যাপারের কারণ অনেকটা ঠিক ঠিক বলা যায়। যদিও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প পাশাপাশি হয়, ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, দুই-এর মধ্যে সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ আছে। কখনো কখনো আগ্নেয়গিরির উদ্গম প্রথম প্রথম না হওয়াতে অর্থাৎ অবরুদ্ধ হওয়াতে সেই স্থানের কম্পন হইতে পারে, কিন্তু ইহা অতি অল্পস্থানব্যাপী হইয়া থাকে। মধ্য জাপানে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে যখন বান্দেসান আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল, তখন কেবলমাত্র ২৫ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হইয়াছিল। ইহা দ্বারা এই অনুমিত হয় যে, আগ্নেয়গিরি যেখানে—সেখানে কম ভূমিকম্প হইয়া থাকে। বেশির ভাগ ভূমিকম্প সেইখানে হইয়া থাকে যেখানে আগ্নেয়গিরি নাই। বেশির ভাগ ভূমিকম্প প্রশান্ত মহাসাগর হইতে উত্থিত হইয়া পৃথিবীর স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয় এবং যতই বেশি দেশের ভিতরে আসে ততই ভূকম্পের বেগ কমিয়া যায়।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি : পৃথিবীর যেসব স্থান বেশি উঁচু-নিচু অর্থাৎ উপরিভাগের ঢাল বড় বেশি, সেইখানেই বেশি ভূমিকম্প হইয়া থাকে। কিংবা যেখানে, ভূতত্ত্ববিদ্দিগের মতে প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীর উপরের স্তর এখনো তৈরি হইতেছে, সেইখানেও ভূমিকম্প বেশি। জাপান হইতে পূর্বদিকের এবং এন্ডিজ পাহাড় হইতে পশ্চিমদিকের জমির ঢাল ২০ ফুটে ১ ফুট হইতে ৩০ ফুটে ১ ফুটের মধ্যে, এইসব স্থানে ভূমিকম্প বেশি। অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের জমির ঢাল ৭০ ফুটে ১ এবং ২৫০ ফুটে ১ ফুট। এইসব জায়গায় ভূমিকম্প খুব কমই হয়।

হিমাচল ও আল্পস পাহাড়ে ভূমিকম্প বেশি হয়। তাহার কারণ এই যে, এই পাহাড়গুলি আধুনিক এবং এখনো ইহাদের নির্মাণকার্য শেষ হয় নাই। যেসব স্থানে ভূমিকম্প হয় তাহাদিগের উপরভাগের জমির উচ্চতা নিম্নতা এবং পৃথিবীর উৎপত্তিতত্ত্ব অনুসারে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে, পর্বতের কুঞ্চনের সহিত ভূকম্পের বিশেষ সম্পর্ক আছে। সেহেতু পাহাড় ফাটিয়া অনেক সময়ে জাপানে ভূকম্প হইয়াছে এবং এক স্থানে ভূকম্পের নিমিত্ত ৫০ মাইল লম্বা জমির ফাট হইয়াছে এবং অন্যান্য জায়গায় জমির ফাট পূর্বে থাকা নিবন্ধন ভূমিকম্প হইয়াছে।

পৃথিবীর উত্তাপ ক্রমশ কম হইয়া যাইতেছে। এইজন্য ইহার অভ্যন্তর সঙ্কুচিত হইতেছে। পৃথিবীর উপরিভাগ অভ্যন্তরস্থ শক্ত পিণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে চায়। উত্তাপ হ্রাসবশত এই পিণ্ড সঙ্কুচিত হওয়াতেই পৃথিবীর নানাবিধ নড়ন-চড়ন, কোথাও উঁচু হওয়া, কোথাও বসিয়া যাওয়া, কোথাও পার্শ্বে সরিয়া যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেও সময়ে সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। সমুদ্রের নিচের স্থানগুলি উপরকার অর্থাৎ সমুদ্রের তলার বালি ও মাটির ওজন সহ্য করিতে না পারায় ফাটিয়া বা বসিয়া যায় এবং তাহাতে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। এমনও হইতে পারে যে, উচ্চ উচ্চ সমতল ভূমি আপনারই ওজনে আপনিই হঠাৎ বসিয়া যায়।

দুই প্রকার ভূমিকম্পের দৃষ্টান্ত : শতকরা ৯৫টি ভূমিকম্পে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবী এদিক-ওদিক কম বেশি দুলিতে থাকে। আর বাকি শতকরা ৫টি ভূমিকম্পে, বড় বড় ভূমিকম্পগুলি যাহার অন্তর্গত, তাহাতে পূর্বোক্ত ব্যাপার তো হয়ই, অধিকন্তু পৃথিবীর উপরভাগ সত্য সত্য এঁকিয়া-বেঁকিয়া যায়, যাহা হাজার মাইল দূর পর্যন্ত চলিয়া যায় এবং পরে আরো দূরে সমভাবে বিস্তারিত হইয়া পৃথিবীকে ব্যাপিয়া ফেলে। প্রথমকার ভূমিকম্পে জমির ফাট কম বেশি হইতে পারে। কিংবা পুরনো ফাটের সন্নিকটে কম্পন হইতে পারে। কিন্তু জমিকে ধসাইয়া দেওয়া বা উঁচু করা ইহার কার্য নহে। দ্বিতীয় প্রকার ভূমিকম্পে পাহাড়ের

উৎপত্তি বা পাহাড়ের বিলোপ হইয়া থাকে এবং এইসব ব্যাপার হওয়ার পরে কয়েক মিনিট ধরিয়া কম্পন হইতে থাকে। তাহাকে ভূমিকম্পের প্রতিকম্প বলা যাইতে পারে।

জাপানে অনেক নূতন যন্ত্র বাহির করা হইয়াছে যদ্দ্বারা ভূকম্পের গতির বেগ কত এবং উহা এদিক-ওদিক কত স্থান ব্যাপিয়া দোলে তাহার ঠিক ঠিক মাপ হয়। এইসমস্ত যন্ত্রের দ্বারা এক্ষণে ইহা জানা গিয়াছে যে, ৫০ ক্রোশ ব্যবধানে ভূকম্পের জোর অতি সজোরে অনুভূত হইলেও জমি এক ইঞ্চির দশমাংশ অপেক্ষা বেশি এদিক-ওদিক দোলে না। যখন পৃথিবীর নড়ন-চড়ন আধ ইঞ্চি হয় ইহা তখন বিপজ্জনক হইয়া উঠে এবং ১ ইঞ্চি দোলন হইলে প্রলয় ব্যাপার অনুভূত হইয়া থাকে। যে-ভূমিকম্পে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর মধ্য জাপানে ভয়ানক অনিষ্ট উৎপাদন করে, সেসময়ে পৃথিবী ৯ ইঞ্চি এবং ১ ফুট পর্যন্তও এদিক-ওদিক দুলিয়াছিল এবং এই দোলন চক্ষে দেখা গিয়াছিল।

এই যে পৃথিবীর দোদুল্যমান অবস্থা ইহা কোথাও শীঘ্র শীঘ্র হয়, কোথাও আস্তে আস্তে হইয়া থাকে। কোথাও ১ মিনিটে হয়, কোথাও ·২ বা ·০৫ সেকেন্ডের মধ্যে হয়। কোন কোন পশু-পক্ষী অগ্রে ইহার বার্তা পাইয়া চিৎকার করিতে থাকে। ভূমিকম্পের অগ্রে যদি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে উহা সজোরে আসিবে। ছোট ছোট ভূকম্পগুলি কয়েক সেকেন্ড হইতে ১ মিনিট ধরিয়া থাকে আর বড় বড় কম্পগুলি ২/৩ মিনিট হইতে ৬/১২ মিনিট কাল থাকে। ভূমিকম্প যেখানে উত্থিত হয় তাহার কয়েক শত ক্রোশের মধ্যে ভূমিকম্পের বেগ প্রতি সেকেন্ডে ২ কিলোমিটার* হইতে ১.৬ কিলোমিটার হইয়া থাকে। প্রথম বেগ বেশি জোরে ভ্রমণ করে। এই কয়েক শত ক্রোশের অতিরিক্ত স্থানে ভূমিকম্পের বেগ আরো বেশি জোরে ভ্রমণ করে। প্রতি সেকেন্ডে ১০/১২ কিলোমিটার যাইয়া থাকে।

কোন্ সময়ে ভূমিকম্প বেশি হয় ও কোন্ সময়ে ভূমিকম্প কম হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে সাধারণত শীতকালে বেশি ভূমিকম্প হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে কম হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে বিশেষত যেসময় সূর্য চন্দ্র পৃথিবীর অতি সন্নিকটে থাকে সেই সময়েও ভূমিকম্পের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের সহিত চন্দ্রের যে কিছু সম্পর্ক আছে তাহা বলিতে পারা যায় না। সাধারণত ভূমিকম্প প্রায় দিনমানেই বেশি হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ভূমিকম্প রাত্রিতে বেশি হইয়া থাকে এবং অন্ধকারকেই ভালবাসে। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, সূর্যের মধ্যে কালো দাগের (Sun-spot) সহিত ভূমিকম্পের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই মত যতক্ষণ না আরো বেশি পর্যবেক্ষণ হয় ততক্ষণ সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। ভূমিকম্পের সহিত চৌম্বক ধর্মের কোন বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এইটুকু দেখা যায় যে, যে-পাহাড়ের অংশ পৃথক হইয়া পড়িয়া গেল, তাহা হইতে ঘর্ষণজনিত আলোক নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং অল্প সময়ের জন্য তাড়িত স্রোত পৃথিবীর দুই স্থানের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

মানব-মনের উপর ভূকম্পজনিত কোন না কোন ফল লক্ষিত হইয়া থাকে। ইংল্যান্ডের ন্যায় দেশে, যেখানে ভূমিকম্প কদাচ হইয়া থাকে, লোকেদের মনে এই ধারণা যে ভূমিকম্পের সহিত সকল রকমের অপকার ও অনিষ্ট আসিয়া থাকে। ইহা শতকরা একটি ভূমিকম্পের পক্ষে সত্য বটে। তবে ভূমিকম্প যদি জোরে হয় তবে সমস্ত লোককে একবারে হতাশ করিয়া ফেলে। অনেকের বুদ্ধি লোপ হইয়া যায়। অনেকে হিস্টিরিয়ায় ফিট হইয়া যায় এবং অনেকে ভয়বিহ্বলচিত্ত হইয়া বোকা হইয়া যায়।

১৮৯১ সালের কম্পের পর যখন জাপানে ৯৯৬০ জন লোকের জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, অনেক আঘাতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে মেরুদণ্ডে ও অন্যান্য অংশে যাতনা অনুভূত হইয়াছিল। অনেকের মানসিক উত্তেজনা এত হইয়া থাকে যে, কিছুমাত্র এই প্রকার কম্পের অনুভূতি হইলে তাহারা একেবারে বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং পরক্ষণেই হো হো করিয়া হাসিতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে, তাহারা মিথ্যা ভয় পাইয়াছে। এই জাপানীরা বড়ই শান্ত প্রকৃতির লোক ও সদাই প্রফুল্ল। তথাপি এই ভূকম্প তাহাদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলে। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ভূকম্পের দরুন জাপানে যখন ২৯,০০০ লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছিল, জাপানের লোকদের মানসিক ও নৈতিক বিষয়ে যে কোন পরিবর্তন হয় নাই, তাহা বলা যায় না। বৎসর বৎসর অনেক ভূমিকম্পের সময় মন্দিরে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করা হয়। পুরাকালে জাপানের লোকেরা মনে করিত যে, কোন দেবতার ক্রোধ-নিবন্ধন ভূকম্প হয় এবং তজ্জন্য অনেক কঠোর নিয়মসকল রদ করিয়া দেওয়া হইত। কোন কোন দেশে বেশি অধর্মের দরুন ভূমিকম্প হইয়াছে—এই বিশ্বাসে প্রার্থনা করা হয়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে লিসবনের ভূমিকম্পের সময় ইংরেজ পাদ্রীরা মনে করিয়াছিলেন যে, লিসবনে ক্যাথলিক থাকার দরুন এই প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে। আর লিসবনে যাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রটেস্টান্টদের আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়াই এইপ্রকার হইয়াছে। এবং ভবিষ্যতে এপ্রকার যেন না হয় এজন্য জোরজবরদস্তি করিয়া ইহাদিগকে ব্যাপটাইজ করিয়া দেওয়া হইল। ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে নানা দেশে নানাপ্রকার পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। জাপানের সাধারণ লোকদের বিশ্বাস

* প্রায় ১১০০০ গজে ১ কিলোমিটার।

যে, একরকমের মাছ আছে, যাহার মাথা বিড়ালের মতন (cat-fish), উহা যখন অস্থির হয় এবং নড়ে চড়ে, তখনি ভূমিকম্প হয়। কোন কোন দেশে ছুঁচা, শূকর বা হাতি, অনন্ত সর্প—এইপ্রকার জীবজন্তুর কল্পনা করা হয়। কোন কোন স্থানে, পৃথিবীর নিচে দেবতা আছে, সেখানকার লোকেরা এইরূপ বিশ্বাস করে।

বোধহয় গত কয়েক বৎসরে ভূকম্পের যন্ত্রের দ্বারা যে ফলাফল নির্ণয় করা গিয়াছে তাহার দ্বারা যথার্থ উপকার এই পাওয়া গিয়াছে যে, লোকে বুঝিয়াছে যে, শিল্পকার্য ও ইমারতকার্য কি কি প্রণালী ও উপায়ে করিতে হইবে যাহাতে অতি ঈষৎ লোকসান হয়। ইহাতে বাটী তৈরির সব নূতন নূতন নিয়মাবলী বাহির হইয়াছে। আমরা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি যে, পৃথিবীর দোলন এত হইতে পারে। ইহা জানিলে পর এরূপ ইমারত করা তত শক্ত নহে যাহা এই কম্পনের বেগ সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। এই ভূমিকম্পের গতি সচরাচর চক্রবালের সমান্তরালভাবেই (horizontally) আসিয়া থাকে। যে-ভূমিকম্পের গতি একটা থামকে ভাঙিয়া বা চুরমার করিয়া ফেলিবে, তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যক্ত করা যায় ঃ—

$$গ = \frac{১}{৬} \cdot \frac{ম . খ . চ . ট}{ক . ও}$$

গ = প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীর কম্পের গতি (acceleration)।

খ = প্রতি বর্গ স্থানে দুই জিনিসের আটকাইয়া থাকিবার শক্তি (force of cohesion)।

চ = থামের গোড়ায় কতখানি বর্গ স্থান ফাটিয়া গিয়াছে।

ট = থাম কত মোটা হইবে।

ক = থামের ভারকেন্দ্র ভগ্ন তলা হইতে কত উঁচু।

ও = যে-টুকরা ভাঙিয়া গিয়াছে তাহার কত ওজন।

ম = মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ = ১ সেকেন্ডে ৩২ ফুট।

উপরি উক্ত গণনার দ্বারা আমরা দেওয়াল কত উঁচু ও কত চওড়া হইবে তাহা অনায়াসে বলিতে পারি।

ভূমিকম্পে ইহা দেখা গিয়াছে যে, পুলের পিয়ার বা পায়া, দেওয়াল, থাম বা ইমারতের প্রথমে গোড়া বা নিচের অংশ অগ্রে ফাটে। এই নিমিত্ত এগুলিকে বেশি চওড়া ও শক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। যাহা নিচে মোটা ও ক্রমশ সরু হইয়া আসিয়াছে—পুলে এপ্রকার পায়া জাপানে এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে। ওখানে ঢালা লোহার পায়া আর ব্যবহৃত হয় না। এবং ইঁটের গাঁথনির পায়াও পূর্ববৎ করা হয় না; নূতন রকমের সব হইতেছে।

ইমারতেও ছাদ ঢালু করা হইয়া থাকে এবং উহার এড়ো কাষ্ঠগুলিকে প্রায় মেঝে পর্যন্ত লইয়া আসা হয় এবং ছাদকে অতি হালকা করা হয়। লোহা ব্যবহার করা হয় না। পুল, বাটী বা ছাদের নিমিত্ত পাকা গাঁথনির খিলান, অতি ভারী ঢালু ছাদ, ছাদের উপর ভারী ভারী অলঙ্কৃত আলসে, চিমনির ঢাকনি ভূমিকম্পের দেশে করা ঠিক নহে। পুনঃ পুনঃ এসব ভাঙিয়া গিয়াছে। নরম জমিতে বাসস্থান নির্মাণ করা ঠিক নহে। নদীর ধার, পাহাড়ের ধার, ফাটল—এইসব স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। জাপানে ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। রেলরাস্তা ও সমুদ্রের নিচে তারের রাস্তা কিরকম করিয়া করিতে হয় তাহারও নিয়ম কিছু কিছু বাহির হইয়াছে। সমুদ্রের নিচে যেসব স্থলে তার লইয়া গেলে অনিষ্ট হইবে তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। সেইসব স্থান ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থান দিয়া তার বা কেবল লইয়া যাওয়া হয়।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার সহিত যোগাযোগের তার তিন জায়গায় বিপজ্জনক স্থান দিয়া লইয়া যাওয়ার দরুন একেবারে একসময়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল শত্রুপক্ষীরা এইপ্রকার করিয়াছে এবং সৈনিকগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছিল। পরে দেখা গেল যে, ভূমিকম্পের জন্যই এইপ্রকার হইয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষে কাংড়া জেলায় সম্প্রতি ৪ এপ্রিল ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পনের হাজারের উপর লোক মারা গিয়াছে এবং অনেকে আহত হইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের দুর্দশার শেষ নাই।

গত ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দেও ভূমিকম্প জোরে হইয়াছিল। কলিকাতার অনেক বাটী ফাটিয়া গিয়াছিল ও আসাম প্রদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।* ❑

* প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১২, পৃঃ ১৭০-১৭৭। সৌজন্যে ঃ অধ্যাপক সুদীপ বসু।

নীলাচলে মহাপ্রভু

দীপালি রায়

এই তো সমুদ্র নীলাচলে অতলান্ত
থৈথৈ নীল দুধ শায়িত চলিষ্ণু
এ তো বালু চিকচিক গুটি গুটি পা
নীল দুধ সাদা ঢেউ অবিশ্রান্ত
জীবনের কথা—জীবন জীবনাচল।
জীবন জীবনস্মৃতি—জীবন নশ্বর শুধু নয়
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।'
কীর্তনের ধ্বনি বাজে মৃদঙ্গের বোলে
নীলাচলে মহাপ্রভু অনন্তশায়িত।

পাষণ্ডপীড়নে গোরাচাঁদ ধূলায় লুটায়
লেগেছে সোনার অঙ্গে কলসির কানা
তাই বলে বলোনি তো—প্রেম বিলাব না
প্রেমময় এ-ভুবন প্রেমই জীবন।
'প্রেমের ঠাকুর সে যে প্রাণের ঠাকুর'
গম্ভীরার গানে বাজে অনন্তের সুর
আদিগন্ত শস্যখেত প্রাণের সম্ভার
সবুজের সোনা ফলে প্রাণবন্যা স্রোতে
সিদ্ধ বকুলের তলে হরিদাস মৌন সাধনায়
জেরুজালেমের বুকে ক্রুশবিদ্ধ যিশু
নীলাচলে মহাপ্রভু অনন্তশায়িত।

যত দূরেই যাই

সুদীপ্ত মাজি

যত দূরেই যাই
চন্দনকাঠের বন দেখা যায় না
সুগন্ধি ছড়ায় শুধু...

প্রেক্ষাপট যত কালো হয়ে আসে
বুকের ভেতরে—
জ্বলে ওঠে জ্যোতির্ময় আলোকের শিখা।

কে তুমি। কে তুমি জ্বালাও আলো
সুগন্ধ ছড়াও আর গানে গানে গানে...
পালটে দাও, বদলে দাও অন্ধকার জীবনের মানে।

শুধু বেজে উঠতে চাই, বুঝে উঠতে পারি কখনো।

আকাশ হলে

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

স্বভাবে মন আকাশ হলে থাক না আবরণ,
মেঘ ছিঁড়ে ঠিক বেরিয়ে পড়ে নীলকান্তমণি,
থাক না ঐরাবতী মেঘের অবাধ বিচরণ,
আকাশ কিন্তু তার পিছনেই নীল-বিভবে ধনী।

স্বভাবে মন আকাশ হলে নামুক অন্ধকার,
বর্ণ কি তার বদল করে সেই তমসার চাপে,
সূর্যধ্যানে সে ঠিক হবেই রাত্রিসীমা পার,
অন্ধকারই পালিয়ে বাঁচে হতাশা সন্তাপে।

স্বভাবে মন আকাশ হলে উঠুক ধূলি-ঝড়,
বজ্র লিখুক তার শরীরে অগ্নিবর্ণমালা,
হানুক না সে দারুণ রোষে তীক্ষ্ণ খর শর,
আকাশ কিন্তু সেই সনাতন—সুনীল সুধা ঢালা।

আমারও সব ভাবনাগুলোয় তোলা আকাশ করে,
তোমার ছোঁয়ায় তারা সবাই নীলকণ্ঠ হবে,
তখন যতই তাদের চোখে অরূপ থাকুক ভরে,
অপরূপের তন্ময়তায় তদ্গত ঠিক রবে।

লাভা ও লোলেগাঁও*

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

"হারিয়ে যাবার ইচ্ছে হলে
এস—
তোমার রিক্ত বুক ভরে দেব বিশুদ্ধ বাতাসে—
তোমার অন্ধ চোখে ফিরিয়ে দেব দৃষ্টি।
অবাক বিস্ময়ে
তুমি আমাদের দেখবে।
আমরা জাদু জানি।
আসে যারা আমাদের কাছে
যাওয়ার সময় বলে :
'কি মায়া রেখেছ তোমাদের বুকে।
কি স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিয়েছ তোমরা সবুজে সবুজে!
তোমাদের উষ্ণতা নিয়ে ফুটেছে ফুল—
মাথা তুলেছে পাহাড় আর পাহাড়
দিগন্তে উপচে পড়ছে তোমাদের অগণন ভালবাসা—
এত সুন্দর, এত সুন্দরও কি কেউ হতে পারে?'
—নবজন্মের ইচ্ছে হলে এখানে এস।
আমাদের আমন্ত্রণ রইল।"

---

* কালিম্পং শহরের অনতিদূরে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্য লীলাভূমি এই দুটি স্থান।

অনুভব

স্মৃতি পাল

তুমি আছ আমার মনে,
আমার প্রাণে,
তোমার গানে—
আমার গানে।

তুমি আছ স্বপ্নলোকে,
আছ আমার মর্মলোকে—
শিশির-নাওয়া সাত-সকালে,
তারা-ভরা চন্দ্রালোকে।

তুমি আছ বিশ্বজুড়ে,
রৌদ্রস্নানের তপ্তধারায়—
আছ তুমি নদীর বুকে, পাহাড়চূড়ায়
আছ গাছের শীতল ছায়ায়।

তোমার পরশ পাই হে প্রভু
তোমার লেখায়, তোমার গানে,
জীবনতরী বইছে আমার
তোমার নামের জোয়ার বানে।

কোথায় তুমি, থাক কোথায়
খুঁজি তোমায় কোন্‌খানে?
তাকিয়ে দেখি—আছ তুমি
আমার মনের মাঝখানে।

সিন্ধুর ডাক

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

এখানে এসেছি আজ উথলিত বারিধি সমীপে,
মহাব্যস্ত অম্বুনিধি অধিষ্ঠিত হয়ে আছে
সতত উচ্ছলতার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞানে।

কিসের জিজ্ঞাসা তার অবিরাম ব্যাপ্ত কলরোলে।
অজ্ঞেয় অমিত রহস্যের সন্নিহিত হিরণ্যগর্ভে
কার প্রসন্ন প্রস্তুতি অযুত তরঙ্গ হিল্লোলে।

প্রাণের আদিম উন্মীলন নন্দিত করেছে তারে
অনন্য সৃষ্টির অভিষেকে।

ভারতের প্রত্যন্ত কিনারে কুমারী কন্যকার তীর্থে
আরতির পরম প্রহর করেছে রচনা সিন্ধুসঙ্গীতে
স্রষ্টার অনিন্দ্য মহাভাষ্য।
মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনি তাই সমুদ্রের আনন্দ-কল্লোল
প্রাণের প্রথম উৎসব থেকে।

আঁধার পেরিয়ে

সন্দীপন বিশ্বাস

এই তমিস্রা পার কর প্রভু আজ
অসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে কত কাজ
দিনযাপনের অমাবস্যার সুরে
পথ খুঁজে খুঁজে মিছে মরি শুধু ঘুরে
মাঠের সবুজে লেগে রক্তের দাগ
বলে না তো কেউ, ঘুম ফেলে আজ জাগ
ভাইয়ে ভাইয়ে শুধু বিদ্বেষ হানাহানি
বল্লম ঠুকে কারা দেয় উসকানি
বুকের মধ্যে জমে রোজ কত ঘৃণা
তোমাকে চিনতে বল কেন পারছি না
এই তমিস্রা কাটবে কেমন করে
প্রেমকুসুমিত সোনালি আলোর ভোরে।

মুক্ত যেদিন মুক্তি পায়

দীপ্তিকুমার শীল

মুক্ত যেদিন মুক্তি পায়
ঝিনুকের অন্ধকার জঠর হতে,
সেদিন—
অবাক চোখে সে তাকিয়ে দেখে
আলোয় ভরা আকাশেতে
সাতরঙা ঐ রামধনুকে;
ভাবে সে আপন মনে,
এত রূপ এত রঙ
রামধনু পায় কোথা থেকে।।

মুক্ত যেদিন মুক্তি পায়
নীল আকাশের নিচে বালুকাবেলায়,
হঠাৎ আলোর ঝরনাধারায়
নিজেরে দেখে সে কত সুন্দর;
অনন্ত আনন্দে ভরে ওঠে তার অন্তর।
এক নতুন অনুভবে আবিষ্কার করে সে,
এ উজ্জ্বলতা যার আলোর আভায়
সে যে চিরসুন্দর জ্যোতির্ময় ভাস্কর।।

মুক্ত যেদিন মুক্তি পায়
অতীত সময়ের হিসাব মিলাতে চায়,
এত কাল ছিল সে সাগরের অতল গভীরে,
পায় নাই সন্ধান কভু
অপরূপ জ্যোতির্ময় সূর্যের।
মুক্তির আনন্দে মুক্ত বলে ওঠে আজি,
এ-মুহূর্তে বুঝিনু আমি—
দিনমণি ভাস্কর যখন ভাস্বর গগনে,
রামধনু পায় রঙ সেই জনমলগনে।।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মল্লভূমি ঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া

চিররঞ্জন মজুমদার

একদা পূর্ব ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল মল্লভূমির বিষ্ণুপুর। বর্তমান বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাদ্বয়, দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও খড়্গপুর, পূর্বে আরামবাগ হয়ে হাওড়া এবং উত্তরে বর্ধমানের দামোদর পর্যন্ত ভূমিখণ্ড একসময়ে এই মল্লভূমি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দী ধরে মল্লভূমির গৌরবময় ইতিহাস অন্বেষণে রাজাদের শৌর্য, বীর্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে এক অসামান্য বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজারা একদিকে ছিলেন ধর্মপ্রাণ, অন্যদিকে তাঁদের রাজকীয় শক্তি-সামর্থ্য এত বেশি ছিল যে মোগল, পাঠান, মারাঠা—কোন শত্রুই তাঁদের গড়ে ঢুকতে পারেনি। তাঁদের ত্যাগের মহত্ত্বেরও অতুলনীয় নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সতীত্ব ও মহত্ত্বের অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন রাজ-মহিষীরা। মল্লরাজাদের ঐতিহাসিক কীর্তি-কলাপ, ললিতকলা, টেরাকোটা অলঙ্করণে সমৃদ্ধ প্রাচীন বাংলার মন্দিরস্থাপত্যগুলি পর্যটন-মানচিত্রে বিষ্ণুপুরকে আজো অনন্য করে রেখেছে। বস্তুত, সেযুগের শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সঙ্গীত, ধর্মীয় কৃষ্টি এবং আরো বহু দিক দিয়ে বঙ্গসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছে বিষ্ণুপুর।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনাথ মল্লভূমি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রদ্যুম্নপুরের রাজার অনুগৃহীত লাউগ্রামের সামন্তরাজ হিসাবে রঘুনাথ অপরিসীম শক্তির অধিকারী হয়ে ৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে মল্লভূমি রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁর বংশের নাম হয় মল্লবংশ। তিনি 'আদিমল্ল' হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এসময় থেকে মল্লাব্দ গণনা শুরু হয়। আদিমল্ল, জয়মল্ল, কানুমল্ল, শূরমল্ল, খড়্গমল্ল, অর্জুনমল্ল, মাধবমল্ল প্রমুখ রাজারা ৯৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রদ্যুম্নপুরে রাজত্ব করতেন। এঁদের মধ্যে শূরমল্লের অনেক বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ও কীর্তি জানা যায়। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বগড়ী ভূখণ্ডের রাজাকে পরাজিত করে তা মল্লভূমির অন্তর্গত করে নিয়েছিলেন তিনি। খড়্গপুরকে মল্লভূমির অন্তর্গত করেন খড়্গমল্ল।

মল্লরাজবংশের উনিশতম রাজা জগৎমল্ল ৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রদ্যুম্নপুর থেকে রাজধানী বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত করার পর বিষ্ণুপুর রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাস শুরু হয়। কথিত আছে, এক দেবীর স্বপ্নাদেশে প্রথমে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মাঝে তিনি গড়ে তোলেন এক সুন্দর নগর। প্রতিষ্ঠা করেন চৈতন্যস্বরূপা মৃন্ময়ী মায়ের মূর্তি। বৈষ্ণবী শক্তি মৃন্ময়ীদেবীর আদেশমতো নগর গঠিত হয়েছে বলে নগরের নাম 'বিষ্ণুপুর'। তিনি বহু শিল্পী, বণিক, জ্ঞানী, গুণীকে বিষ্ণুপুরে আনিয়ে স্থায়িভাবে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। সুন্দর রাজপ্রাসাদ, উদ্যানবাটী, সেনানিবাস, প্রশস্ত রাজপথ এবং অনেক সুসজ্জিত বিপণি তৈরি করিয়ে তিনি বিষ্ণুপুরকে প্রাচ্যের এক বিশিষ্ট নগরীতে পরিণত করেছিলেন। পরবর্তী কালে শৌর্য, বীর্য, সঙ্গীত, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই বিষ্ণুপুর হয়ে ওঠে অনন্য। জগৎমল্লের পরবর্তী অনন্তমল্ল, রামমল্ল, শিবসিংমল্ল, হাম্বিরমল্ল প্রমুখ রাজারা বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যার প্রচলন করেছিলেন। ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ পৃথ্বিমল্লের সময় বিষ্ণুপুরের ১০ কিলোমিটার উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত ডিহর গ্রামের বিখ্যাত ষণ্ডেশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই শিবের মন্দিরে 'হত্যা' দিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায় বলে মানুষের বিশ্বাস। চৈত্রমাসে এখানে মহাসমারোহে বারুণীর মেলা বসে ও গাজনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবসিংমল্লের রাজত্বকালে (১৩৭১ থেকে ১৪০৭ খ্রীস্টাব্দ) বিষ্ণুপুর বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সাধনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৪৬০ থেকে আরম্ভ হয় মহারাজ চন্দ্রমল্লের রাজত্বকাল। ইনি বাংলার জনপ্রিয় অধিপতি হোসেন শাহ ও প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। পরবর্তী রাজারা ছিলেন বীরমল্ল, ধারিমল্ল, হাম্বিরমল্ল।

বিষ্ণুপুর ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় শুরু হয় বিখ্যাত বার ভুঁইয়ার অন্যতম মহারাজ হাম্বিরমল্ল বা বীর হাম্বিরের সময় (১৫৩৫ থেকে ১৬২০ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি দুর্ধর্ষ মোগল সেনাপতি দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করে 'বীর হাম্বির' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দল-মাদল কামান তাঁরই সৃষ্টি। তিনি অত্যন্ত রণনীতি-বিশারদ ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। বিষ্ণুপুর নগরের চারিদিকে পরিখা খনন, প্রাচীর ও দুর্গ নির্মাণ করে এবং কামান সাজিয়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তিনি বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেন। সুলেমান করনানী ও কুখ্যাত কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলা তাঁর রাজ্যে কিছু ক্ষতি করতে পারেনি। তাঁর মুক্তহস্তে দানধর্মের কাহিনীও অনেক আছে। বীর হাম্বিরের আগে মল্লরাজগণ শাক্ত ও শৈব ধর্মের পোষক ছিলেন। বীর হাম্বিরের আরাধ্যা ছিলেন দেবী মৃন্ময়ী। পরে তাঁর ধর্মজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি প্রেমের মধ্য দিয়ে মানবকল্যাণের স্বপ্ন দেখেন। তিনিই প্রথম মল্লরাজ, যিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং কালাচাঁদ (কৃষ্ণ) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্রাহ্মণকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁর সময়ে বৈষ্ণব

সাধকদের জন্য আখড়া ও সাধুসন্তদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুর খড় বাংলা মহল্লায় স্থায়ী বাসভবন তৈরি করে তিনি রাধারমণ বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় তিনি প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে আনিয়েছিলেন প্রাচীন গোকুলনগর থেকে। তিনি একসময় তাঁর আচার্যের সঙ্গে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গলাভ করে বৈষ্ণব ভাবধারা ও কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হন। এরপর তিনি বিষ্ণুপুরকে বৃন্দাবনের অনুকরণে তৈরি করার ব্রত গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরের বুকে খনন করান যমুনা, কালিন্দী বাঁধ, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কালীদহ প্রভৃতি। বিশাল রাসমঞ্চ তাঁরই সময় ১৫৮৭ সালে নির্মিত হয়েছিল। বাংলার নবাব তাঁকে 'দেব' উপাধি দেন। এরপর থেকে 'দেব' আখ্যায় ভূষিত হন বিষ্ণুপুর রাজবংশ। রাজ্য, ধন, পুত্র, পরিজন সব ছেড়ে দিয়ে দীনতম সেবকের বেশে তিনি মদনমোহনের সেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর সময়ে যুগোলকিশোর, গৌরগোবিন্দ জীউ ও রাধাকান্ত জীউর মন্দিরগুলি নির্মিত
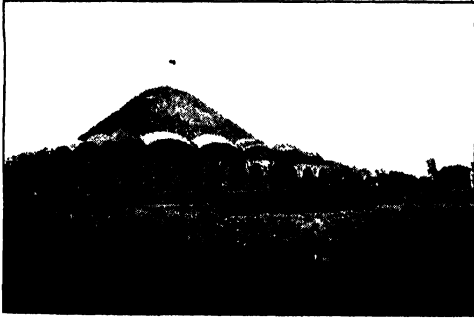
বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ

হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়ার ফলে ঐসমস্ত অঞ্চলে অস্পৃশ্যতা প্রথা শিথিল হয়ে হিন্দুজাতির প্রভূত কল্যাণ হয়েছিল। তিনি ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে অতি সুন্দর বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করে গেছেন। উল্লেখ্য, মহারাজ মানসিংহ তাঁর রাজত্বকালে একসময়ে বিষ্ণুপুরে এসে সেখানকার সবকিছু দেখে তাঁকে প্রশংসা করেছিলেন।

১৬২৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৩০ বছর মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁর শৌর্যের জন্য বাংলার তৎকালীন সুবেদার শাহজাহানপুত্র সুজা তাঁকে 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বিষ্ণুপুরকে চিরকালের জন্য করভার থেকে মুক্ত করে স্বাধীন মিত্ররাজ্যে পরিণত করেন। রঘুনাথ সিংহ কেবলমাত্র স্বাধীনচেতা, বীর ও অপরিসীম শক্তির অধিকারী ছিলেন না, দেবমন্দির, জলাশয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে পঞ্চচূড়া-বিশিষ্ট শ্যামরায়ের মন্দির তাঁরই উজ্জ্বল কীর্তি। পরবর্তী মহারাজ বীরসিংহের সময় বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ছোট ও বড় পাথর-দরজা নির্মিত হয়। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে রাধালাল জীউ বিগ্রহ ও মন্দির এবং আশপাশে অন্যান্য বৈষ্ণব-মন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁরই কীর্তি।
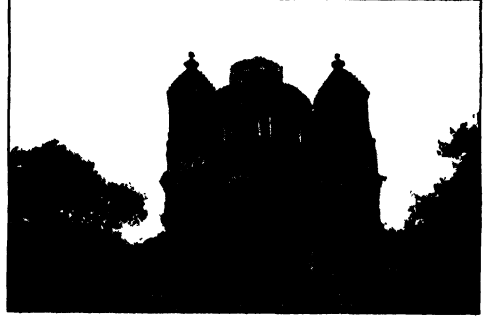
বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়-মন্দির

এরপর ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন মহারাজ দুর্জন সিংহ। তিনি দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক। তিনি ন্যায়বান, সচ্চরিত্র ও ধর্মপ্রাণ নরপতি ছিলেন। ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত মদনমোহনের মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘ ২০ বছর নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে রাজ্যশাসন করেন তিনি। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকাল। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। জীবনের ধর্মরূপে তিনি সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দিল্লী থেকে তানসেনের বংশধর বাহাদুর খাঁকে বিষ্ণুপুরে আনিয়ে সঙ্গীতবিদ্যার প্রচলন করেন। তাঁর সময়ে
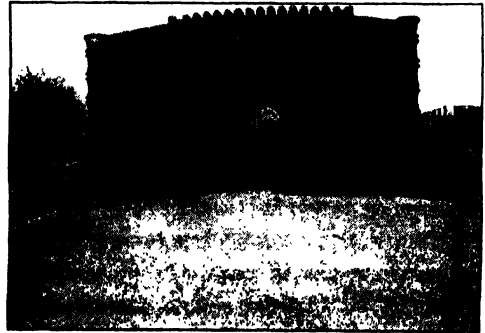
বিষ্ণুপুরের গড়

গদাধর চক্রবর্তী সঙ্গীতাচার্যের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ভারতের সঙ্গীত-গগনে সেই সময়ে বাংলা এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে প্রতিভাত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরী উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের জনক হিসাবে মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের নাম ইতিহাসে

স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর অসাধারণ শৌর্য-বীর্য বিষ্ণুপুরের রাজশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। মেদিনীপুরের চেতুয়া-বরদারাজ শোভাসিংহ ও দুর্ধর্ষ পাঠান রহিম খাঁর মিলিত শক্তিকে তিনি পরাভূত করেছিলেন। শোভাসিংহের ভগিনী চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে রঘুনাথের বিবাহ হয়। রহিম খাঁর শিবির লুণ্ঠন করা ধনরত্নের সাথে সঙ্গীতনিপুণা রূপসী লালবাঈকে শোভাসিংহ রঘুনাথ সিংহকে উপহার-স্বরূপ দান করেন। রঘুনাথ সিংহ লালবাঈয়ের রূপে ও গুণে আসক্ত হয়ে পড়েন। তার জন্য তৈরি করেন নতুন বাসভবন। নাম হয় 'নূতন মহল'। লোকচক্ষুর অন্তরালে বিষ্ণুপুরের বুকে রোপিত হয় সর্বনাশের বিষবৃক্ষ। লালবাঈ মাঝে মাঝে নূতন মহলে সঙ্গীতপ্রিয় রাজাকে নিমন্ত্রণ করে নাচগানে মোহিত করার চেষ্টা করেন। লাস্যময়ী লালবাঈয়ের রূপ ও নৃত্যগীতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন রাজা। দিনের পর দিন তাঁর স্বেচ্ছাচার ও অনাচারে সমস্ত বিষ্ণুপুরে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। লালবাঈয়ের গর্ভে এক পুত্রসন্তানেরও জন্ম হয়। সেই সন্তানকে উপলক্ষ্য করে লালবাঈয়ের মনে এক ক্রূর লালসা জেগে ওঠে। ষড়যন্ত্রের জাল বোনা শুরু হয়ে যায়। এসময়ে মহীয়সী মহারানী চন্দ্রপ্রভা রাজ্যরক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন। ধর্মের জন্য ও দেশের কল্যাণে তিনি সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হন। স্বেচ্ছাচারী ও অনাচারী রাজাকে তিনি স্বহস্তে তীর মেরে হত্যা করেন এবং স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দেন। 'পতিঘাতিনী সতী' নামে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর খ্যাতি। সব অনর্থের মূল লালবাঈয়ের বাসভবন নূতন মহলকে প্রজারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নির্মমভাবে তাঁকে ডুবিয়ে মারে তাঁরই অন্তঃপুর-সংলগ্ন জলাশয় লালবাঁধের দিঘিতে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে জলাশয় সংস্কারের সময় লালবাঈয়ের কঙ্কাল ও বহু মুসলমানী খাদ্যপাত্র পাওয়া গিয়েছে।

অপুত্রক রঘুনাথ সিংহের মৃত্যুর পর ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পরম ভক্তিমান পুরুষ এবং একজন সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন। বিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য তাঁরই রচনা। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' তাঁরই সময়ে রচিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। মল্লভূমিতে শিল্পসঙ্গীতের সঙ্গে এসময় সাহিত্যেরও উন্নতি হয়েছিল। সন্ন্যাসীর মতো জীবনধারণ করতেন বলে তাঁকে 'রাজর্ষি' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত হয়ে থাকত তাঁরই ভক্তি-আপ্লুত সঙ্কীর্তনে। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে রাজর্ষি গোপাল সিংহের পুণ্যময় জীবনের অবসান হয়।

১৭৪৮-১৮০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৩ বছর মহারাজ চৈতন্য সিংহের সময় গৃহবিবাদে ও সর্বত্র চুরি-ডাকাতিতে বিষ্ণুপুরের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মুহুর্মুহু মারাঠা আক্রমণ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্রূর চক্রান্তের ফলে বিষ্ণুপুরের গৌরব-রবি অস্তমিত হতে থাকে। বিদেশী বণিকের অধীনস্থ হয়ে চৈতন্য সিংহ ক্ষুদ্র এক জমিদারে পরিণত হন। মাধব সিংহ ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন। বাঁকুড়া জেলার রাধামোহনপুর গ্রামের শ্যামচাঁদ বিগ্রহ ও মন্দির তাঁর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে কালিপদ সিংহ রাজা হন। তাঁর সময় থেকে সকল মল্লভূমবাসী রাজদরবারের তোপধ্বনি শুনে দেবী দুর্গার সন্ধিপূজা পালন করত। জমিদারী প্রথা বিলোপ হওয়া পর্যন্ত কোনপ্রকারে টিমটিম করে রাজদরবার রক্ষিত হলেও মল্লরাজদের ইতিহাস বাস্তবে এখানেই সমাপ্তি ঘটে।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৯ আগস্ট পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। মৃন্ময়ী মায়ের দর্শনে তিনি ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। কৃষ্ণবাঁধ ও লালবাঁধের কাছেও তাঁর ভাবসমাধি হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে গরুর গাড়ি অথবা পালকিতে চড়ে বহুবার বিষ্ণুপুরে ভক্ত সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে এসেছেন। তিনি এখানে গোঁসাইপুকুরে স্নানাদি করেছেন। সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বহু সাধকও বিষ্ণুপুরে এসেছেন।

বিষ্ণুপুরের নরপতিদের কল্যাণময় অবদান ও অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা যেমন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, তেমনি বহু সাধকের আগমনেও বিষ্ণুপুর ধন্য হয়েছে। রাজ্যপাটের সাথে মল্লরাজদের রাজপ্রাসাদটি বিধ্বস্ত হলেও ১৬ শতকের শেষ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে তৈরি বিষ্ণুপুরের মন্দিররাজি স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে আজো। এগুলির টেরাকোটা কাজ অর্থাৎ পোড়ামাটির অলঙ্করণ অতুলনীয়। ইটের কার্ভিং কাজও মনোহর। প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতা, সঙ্গীতচর্চা, শিল্প-সাহিত্য তথা ধর্মীয় পীঠস্থান হিসাবে মল্লরাজদের বিষ্ণুপুরের নাম অক্ষয় হয়ে রয়েছে।
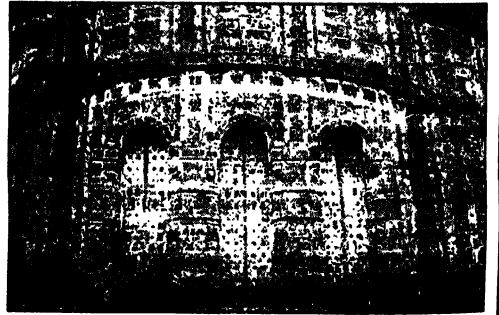
বিষ্ণুপুর জোড় বাংলার টেরাকোটার কাজ

বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের বিশিষ্ট উৎসবের মধ্যে ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রপূজা, রথযাত্রা, দোল, শারদীয়া দুর্গাপূজা উল্লেখযোগ্য। রাবণের কুশপুত্তলিকা দাহ করে বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিজয়োৎসব, মেয়েদের ইতুপূজা এবং তুষু

পর্বে সারা পৌষমাস ধরে আনন্দের মেলা চলে বিষ্ণুপুরে। দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা চলে ১৮ দিন ধরে। তাছাড়া চৈত্রের বারুণী মেলা ও গাজনোৎসবে প্রচুর লোকের আগমন হয়। ২৩ ডিসেম্বর থেকে চারদিনের মেলার আকর্ষণ আজো আছে। এসময় দৈনিক লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে, বিশেষ করে মনসাপূজায় প্রাচীন বটবৃক্ষতলে মাটির হাতি-ঘোড়া দিয়ে পূজার প্রচলন সমস্ত বাঁকুড়া জেলাতেই আছে। পৌষ ও চৈত্রমাসেও মাটির হাতি-ঘোড়া দিয়ে বিশেষ পূজার রীতি আছে। এগুলি বাঁকুড়ার জাতীয় উৎসব বলে গণ্য হয়।

বাঁকুড়া জেলা সম্পর্কিত কিছু তথ্য

উত্তরে বর্ধমান, পশ্চিমে পুরুলিয়া ও মানভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর এবং পূর্বে হুগলীর মধ্যে বাঁকুড়ার অবস্থান। শুশুনিয়া, বিহারীনাথ ও মেজিয়ার ছোট ছোট পাহাড়, বিচ্ছিন্ন বনভূমি, বাকি সব কৃষিযোগ্য সমভূমি নিয়ে এই জেলার ভূপ্রকৃতি। অধিবাসীরা প্রধানত কৃষিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য বনসম্পদ শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশ ও ইউক্যালিপটাসের বনভূমি এই জেলার ২০ শতাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে। বনাঞ্চলের মাটি লালরঙের কাঁকর মিশ্রিত। দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী এই জেলার প্রধান নদ-নদী। বাঁকুড়া জেলার আয়তন ৬৮৮২ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের গণনানুযায়ী লোকসংখ্যা ২৭,৯৯,৪৫৫ জন। লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০৭ জন। এই জেলায় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্বত্রই প্রাচীন শিবমন্দির-গুলি চৈত্রমাসে গাজনের উৎসবে জমজমাট থাকে। বাঁকুড়া সদর ও বিষ্ণুপুর—এই দুটি মহকুমা নিয়ে বাঁকুড়া জেলার প্রশাসন চলছে।

উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান

কলকাতা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে খড়্গপুর-আদ্রা লাইনের বিষ্ণুপুর স্টেশনের দূরত্ব ২১০ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে আরামবাগ-কামারপুকুর-জয়রামবাটী-কোতুলপুর হয়ে বাসপথের দূরত্ব ১৫১ কিলোমিটার। বাসে ৫ ঘণ্টা সময় লাগে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস আছে। বাসপথে বাঁকুড়া-সীমান্তে প্রবেশ করলে প্রথমেই পড়বে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী—বিষ্ণুপুর থেকে যার দূরত্ব ৪৩ কিলোমিটার। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা এখানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের সম্ভবত এপ্রিল-মে মাসে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এখানেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে অক্ষয় তৃতীয়াতে তাঁরই জন্মভিটায় মাতৃমন্দির স্থাপিত হয়েছে। এখানে মায়ের মর্মরমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশেই রয়েছে মায়ের পুরনো ও নতুন বাসগৃহ, মায়ের ব্যবহারপূত পুণ্যিপুকুর, তারই পাড়ে কুলদেবতা 'সুন্দরনারায়ণ'। গ্রামের একপ্রান্তে রয়েছে

জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মর্মরমূর্তি

'মায়ের দিঘি'—বালিকা সারদা এখানে এসে দলঘাস কাটতেন। গ্রামের একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে বিখ্যাত আমোদর নদ—মায়ের কাছে যা ছিল গঙ্গার ন্যায় পবিত্র। আর আছে দক্ষিণপ্রান্তে সিংহবাহিনীর মন্দির। দেবী সিংহবাহিনীর সাথে চণ্ডী ও মহামায়ার অভিনব অষ্টধাতু-নির্মিত ঘটমূর্তি এবং স্বতন্ত্র আসনে দেবী মনসা স্থাপিত। জনশ্রুতি, দেবী খুবই জাগ্রতা। সিংহবাহিনীর মাটি আজো ধন্বন্তরী, সর্পবিষ ও নানান ব্যাধির উপশম ঘটায় বলে মানুষের বিশ্বাস। জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অতিথিনিবাসে থাকার জন্য আগে থেকে 'অধ্যক্ষ মহারাজ, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৬১'—এই ঠিকানায় রিপ্লাই কার্ড-সহ আবেদন করে অনুমতি নিতে হয়। এখান থেকে যাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের শিহড়ের পৈতৃক বাড়ি ও শান্তিনাথ শিবমন্দিরে (এই মন্দিরের সামনেই এক যাত্রার আসরে শিশু সারদা তাঁর ভাবী স্বামীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন।)। এই মন্দিরটি উড়িষ্যার দেব-দেউল রীতিতে প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। জয়রামবাটী থেকে দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। এখানে শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির

গাজনের উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে থাকে। জয়রামবাটী থেকে বিষ্ণুপুরমুখী ৭ কিলোমিটার গিয়ে কোয়ালপাড়ায় যোগাশ্রম বা শ্রীশ্রীমায়ের 'বৈঠকখানা' ও জগদম্বা আশ্রম দর্শন করা যেতে পারে। আবার দক্ষিণ-পূর্বে ৬ কিলোমিটার দূরে হুগলী জেলার প্রান্তসীমায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান ও আশপাশে তাঁর নানান স্মৃতি-বিজড়িত কামারপুকুর ধাম। দেশ-বিদেশের ধর্মপিপাসু নরনারীর কাছে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর আজ মহাতীর্থ।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নতুন বাড়ি

শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজায়, মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবস অক্ষয় তৃতীয়ায়, দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজায় জয়রামবাটীতে প্রতি বছর প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে। বর্তমানে এখানে কয়েকটি হোটেল ও লজ গড়ে উঠেছে।

জয়রামবাটী থেকে ৪৩ কিলোমিটার দূরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর। বাসে জয়রামবাটী থেকে আসতে লাগে ঘণ্টা দেড়েক। বিষ্ণুপুরের মন্দির, অট্টালিকা, দিঘি—যাকিছু দর্শনীয় সবই মল্লরাজাদের কীর্তি। রিক্সায় ৩৫/৪০ টাকার চুক্তিতে বিষ্ণুপুরের দর্শনীয় সবকিছু ৩/৪ ঘণ্টায় সেরে নেওয়া যায়। প্রথমে শাঁখারীবাজারে ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে মল্লরাজ দুর্জন সিংহের তৈরি টেরাকোটার অনবদ্য শিল্পসমৃদ্ধ মদনমোহনের মন্দির দেখে নেওয়া যেতে পারে। রাজপ্রাসাদের প্রাচীর ও অতীতের পরিখা আজ লুপ্ত হলেও ছোট ও বড় পাথরের দরজা পেরিয়ে মল্লরাজাদের গড়ে বা রাজবাড়ির চত্বরে পৌঁছে গেলে ইতিহাস যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। রাজবাড়ি আজ বিধ্বস্ত, পাশেই আড়ম্বরহীন

শিহড়ে শান্তিনাথ শিবমন্দির

মৃন্ময়ীদেবীর মন্দির। বিপরীতে রাধালাল জীউর মন্দির—১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ বীরসিংহের তৈরি। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে রাজা চৈতন্য সিংহ নির্মিত রাধাশ্যাম-মন্দির লালজীর মন্দিরের দক্ষিণেই অবস্থিত। মন্দিরটি উচ্চতায় ৩৫ ফুট এবং স্থাপত্যে সর্বাধুনিক বলা চলে। ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের নির্মিত জোড়বাংলা মন্দিরটি রাধাশ্যাম-মন্দিরের দক্ষিণেই অবস্থিত। মন্দিরটি বাংলার চালাঘরের আদলে নির্মিত। মন্দিরগাত্রের টেরাকোটার কাজ অনবদ্য। রিক্সায় গুমঘরের দিকে যেতেই বামদিকে যুগলকিশোর-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটি পড়বে। এটি বীর হাম্বিরের নির্মিত। প্রাচীন গুমঘরটি বিশাল কূপের আকারে তৈরি। এটি নির্মাণের সঠিক উদ্দেশ্য জানা সম্ভব হয়নি। ঐ রাস্তা ধরে ডানদিকে কিছুটা গিয়ে ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের বাংলার আটচালার ছাঁদে পাঁচটি চূড়াবিশিষ্ট ইটের তৈরি শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন-মন্দিরের টেরাকোটা অলঙ্করণের কাজ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। দেওয়ালগাত্রে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি টেরাকোটার উৎকর্ষতায় অনুপম করে তুলেছে শ্যামরায়ের মন্দিরকে। এছাড়া অতীতের প্রত্নতত্ত্বের নানান সম্ভার নিয়ে 'যোগেশ স্মৃতি ভবনে' পুরাকীর্তির প্রদর্শনীও সমান আকর্ষণীয়। বিষ্ণুপুর সরকারি ট্যুরিস্ট লজের বিপরীতে বিষ্ণুপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ শাখার বাড়ি। এর বিপরীতে ঐতিহাসিক লালবাঁধ। তারই পাড়ে দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির। ট্যুরিস্ট লজের সামনের রাস্তা ধরে সামান্য এগিয়ে এলেই বাঁদিকে পড়বে দল-মাদল কামান। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ গোপাল সিংহ

মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে এই কামান ব্যবহার করেছিলেন। পাশেই রয়েছে দেবী ছিন্নমস্তার মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ এসে এখানে পূজা দিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের নানান সম্ভারে সজ্জিত দোকানগুলি ঘুরে দেখবার মতো। ট্যুরিস্ট লজের কাছেই বাংলা চালাঘর আর মিশরীয় পিরামিডের সমন্বয়ে তৈরি রাসমঞ্চটি দর্শনীয়। বাইরের দেওয়ালে এক-এক দিকে ১০টি করে মোট ৪০টি খিলান আছে। ১৫৮৭-১৬০০ খ্রীস্টাব্দে মল্লভূমির রাজা বীর হাম্বিরের তৈরি এটি। মল্লরাজাদের কালে রাস উৎসবের আসর বসত এই মঞ্চে।
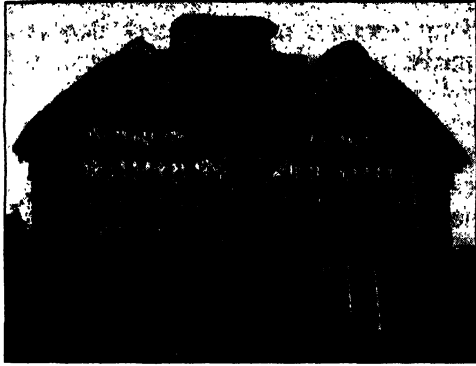
বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা

লালবাঁধের কাছে কালাচাঁদ, রাধাগোবিন্দ, রাধামাধব মন্দিরগুলি স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে আজো সমুজ্জ্বল। রিক্সায় যেতে যেতে বিষ্ণুপুরের বিশাল বিশাল বাঁধগুলি, যথা কৃষ্ণবাঁধ, পোকাবাঁধ দেখে নেওয়া যায়। এখানে থাকার জন্য W.B.T.D.C.-র ট্যুরিস্ট লজে ২৮টি বেডের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া চকবাজারে লালী হোটেল, রেস্ট অ্যান্ড গেস্ট হোটেল, পৌর পর্যটন আবাসন ইত্যাদি বেশ কিছু হোটেল আছে। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর শিবমন্দিরটি এবং ১০ কিলোমিটার দূরে ডিহর গ্রামে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে নির্মিত ষণ্ডেশ্বর ও শৈলেশ্বর মন্দির-দুটিও দর্শনীয়। বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ি, শঙ্খশিল্প, পিতল-কাঁসার শিল্প, সর্বোপরি পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের বিশিষ্টতা সর্বজন-প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকুড়ার দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। বাসে বা ট্রেনে এক ঘণ্টায় চলে আসা যায় বাঁকুড়া শহরে। শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে এক্তেশ্বর শিবমন্দির। মন্দিরটির উচ্চতা ৪৫ ফুট। খুবই প্রাচীন ও নির্মাণ-বৈচিত্র্যে অনন্য। নদের জল এসে এক্তেশ্বর শিবলিঙ্গকে কিছুটা নিমজ্জিত করে রাখে। এক্তেশ্বর শিব খুবই জাগ্রত দেবতা বলে এখানকার লোকেদের বিশ্বাস। শহরের চাঁদমারিতে একটি নবনির্মিত কালীমন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এখানকার ভৈরবস্থান, রক্ষাকালীতলা, রামপুরের বড় কালীতলা, নতুনগঞ্জ মহল্লার নিস্তারিণী কালীমন্দির, শ্মশানকালী, ছিন্নমস্তা-মন্দির, পাঠকপাড়ার গোপাল জীউ, খ্রীস্টান কলেজ ও চার্চ—সবগুলি রিক্সায় ঘুরে দেখার জন্য ২-৩ ঘণ্টা সময় লাগবে। এছাড়া বাঁকুড়া রেল-স্টেশনের বিপরীতে রয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। এখানে অতিথিনিবাসে থাকার ব্যবস্থাও আছে। উৎসাহীরা বাঁকুড়া থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৩ কিমি দূরে ব্রজরাজপুরে বিখ্যাত শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির এবং ওন্দার কাছে গোড়াশোলে রাধারমণ জীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি দেখে নিতে পারেন। বেলিয়াতোড়ের কাছাকাছি রামহরিপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও আশ্রম এবং ১০ কিলোমিটার দূরে ধর্মরাজ ঠাকুর, জগদল্লার পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট রাধামাধব-মন্দির ইত্যাদিও উৎসাহীরা ঘুরে দেখে নিতে পারেন।

বাঁকুড়া থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে খাতরা হয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস আসছে মুকুটমণিপুর হয়ে গোরাবাড়িতে। কলকাতা থেকে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনের বাসে সরাসরি মুকুটমণিপুরে আসা যায়। পাহাড়ী টিলায় থাকার ব্যবস্থা আছে রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট লজে। কংসাবতী ভবনের পাশেই ইয়ুথ হোস্টেলের আবাসনেও থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। কংসাবতীর বাঁধের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সূর্যাস্তের দৃশ্য অপূর্ব। সবুজে ছাওয়া নীল জলে ছোট ছোট ঢেউয়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে কিংবা গেটের জল ছাড়ার শব্দ শুনতে শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। গোরাবাড়ি পেরিয়ে ৪ কিলোমিটার দূরে অম্বিকানগরে জৈন সংস্কৃতির অতীত পীঠভূমি। বিধ্বস্ত এক রাজবাড়িতে অম্বিকা ও সাবিত্রীর মন্দিরও রয়েছে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার প্রান্তসীমায় রয়েছে 'ঝিলিমিলি'। হরিতকী, বহেরা, শাল-পিয়ালের মাঝে মিষ্টি মধুর তানে বয়ে চলেছে কাঁসাই নদী। শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর পরিবেশ। মুকুটমণিপুর থেকে খাতরায় এসে বাস বদল করে রানীবাঁধ পেরিয়ে ঝিলিমিলি। বাঁকুড়া থেকে সরাসরি বাসও আসছে আড়াই ঘণ্টায়।

বাঁকুড়া থেকে ছাতনার দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। বাসে বা ট্রেনে ছাতনায় নেমে আরো ৭ কিলোমিটার উত্তরে গেলে পড়বে ৪৪০ মিটার উঁচু এবং ৩-৪ কিলোমিটার ব্যাপী শুশুনিয়া পাহাড়। নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে গন্ধেশ্বরী নদী। এখানে পাহাড় চড়ার শিক্ষণশিবির আছে। ছাতনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। এখানে সামন্তভূম রাজ্যের রাজা হামীর উত্তর রায়ের সময়কার প্রাচীন বাসুলী-মন্দিরের ভগ্নস্তূপ রয়েছে। একসময়ে কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল এখানে। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরে বাসলীদেবীকে স্থানান্তরিত করে নিত্য পূজা চলছে। মন্দিরে টেরাকোটার কাজ আছে। চৈত্রমাসে গাজনের উৎসবে চার-পাঁচ দিনের

জন্য মেলা বসে। ছাতনার প্যাঁড়া এবং বাঁকুড়ার 'ন্যাচা' সন্দেশ বিখ্যাত।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পূর্বে বিহারীনাথ পাহাড়ে বিখ্যাত শৈবতীর্থ গড়ে উঠেছে। বিহারীনাথ শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি ও লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি আছে। পুরুলিয়ার মধুকুণ্ডা স্টেশন থেকে তিলুড়ির বাস ধরেই বিহারীনাথে যাওয়া যায়।

বাঁকুড়া থেকে বেড়িয়ে যাওয়া যায় পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত ২,০০০ ফুট উঁচু অযোধ্যা পাহাড়ে। বাঁকুড়া থেকে ট্রেন ও বাস যাচ্ছে পুরুলিয়ায়। বাসে ৩১ কিলোমিটার দূরে বলরামপুরে গিয়ে আরো ২৫ কিলোমিটার দূরের বাগমুণ্ডিতে পৌঁছে ৯ কিলোমিটার ট্রেক করে পাহাড়ে চড়ার আনন্দই আলাদা। বাগমুণ্ডি থেকে ১৬ কিলোমিটার গাড়িপথেও অযোধ্যা পাহাড়ে যাওয়া যায়। পাহাড়ে চড়ার প্রশিক্ষণকেন্দ্র এখানেও আছে। সবুজে ছাওয়া ছোট-বড় পাহাড়ী ঝরনা আর মনোরম আরণ্যক পরিবেশে পাহাড়ের ঢালে আদিবাসীদের বসতি দেখতেও ভাল লাগে। অযোধ্যা পাহাড়ের শৃঙ্গ গোরগাবুরুর উচ্চতা ৬৭৭ মিটার।

পুরুলিয়া-রঘুনাথপুরের পথে পুরুলিয়া থেকে ৫ কিলো-মিটার দূরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রায় ৬০ একর জায়গা নিয়ে অবস্থান। প্রায় ১,০০০ ছাত্র এখানে পড়াশুনা করে। হরিতকী, বহেরা ও আরো নানাজাতীয় গাছপালায় সমৃদ্ধ বাগান ও ফুলবাগিচার আকর্ষণও কম নয়। মন্দিরের কারুকার্যও উল্লেখযোগ্য।

বিহারের মানভূমের কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে সীমান্তবর্তী এই পুরুলিয়া জেলার উৎপত্তি হয়েছে। আয়তন ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২,২১,৭৪২ জন এবং লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৫৪ জন। ছোটনাগপুরের মালভূমির ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমিই এর বৈশিষ্ট্য। জেলার ১২% জমি অরণ্যাবৃত এবং অধিকাংশ আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকা। জেলার পূর্বদিকে অযোধ্যা পাহাড়ের অবস্থান। পশ্চিমবঙ্গের ৮০ ভাগ লাক্ষা উৎপন্ন হয় পুরুলিয়া জেলা থেকেই। প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ রঘুনাথপুরে একসময়ে তসর বয়নের মূল কেন্দ্র ছিল। লাক্ষা উৎপন্ন, গুটিপোকা সংগ্রহ ও তসর বস্ত্রবয়নে আজো পুরুলিয়া বিখ্যাত। পিতল-কাঁসার বাসনের শিল্প তথা ডোকড়া শিল্পের কদর আছে এখানে। প্রধান খনিজ দ্রব্য—চুনাপাথর, কয়লা ও চায়না ক্লে। বনাঞ্চলে আর পাথুরে প্রাকৃতিক পরিবেশে সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, বাউড়ি প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীরা বাস করে। আদিবাসী ভূস্বামীরা ক্রমে রাজপুত বনে গিয়ে এক নতুন বংশমর্যাদা লাভ করেছে। মাহাতো সম্প্রদায়ের মধ্যে শিব ও শক্তি পুজার প্রচলন বেশি। ডোম ও বাউড়ি সম্প্রদায়ের গ্রামদেবতা হলেন ধর্মঠাকুর। ভাদ্রমাসে ভাদু পর্ব এবং পৌষমাসে টুসু উৎসবের সময় পুরুলিয়ার প্রায় সর্বত্রই নানা অনুষ্ঠানে মুখরিত থাকে। এই জেলায় 'ছৌ' নাচের প্রচলন বেশি। ছৌ নাচ আসলে যুদ্ধের নাচ। জেলার বেশির ভাগ পুরাকীর্তি জৈন ধর্ম-সংস্কৃতির স্মারক। এগুলি মনে হয় খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর। পাল ও সেন রাজাদের সময় রাঢ়ভূমির অন্তর্ভুক্তিতে পুরুলিয়ায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। ❑

বিদ্রোহী ভগবান

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার সঙ্গে হঠাৎ ভগবানের 'দেখা' হয়ে গেল। তিনি আমাকে বললেনঃ "ভগবানের সঙ্গে দেখা হলে মানুষকে কিছু চাইতে হয়। যুগ যুগ ধরে এইটাই নিয়ম। ভগবানের কাছে চাও।"

আমার খুব রাগ হলো মানুষকে এভাবে 'কাঙাল' বলায়। হঠাৎ ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। ভগবানকে বললামঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ তো আপনার কাছে কিছু চাননি।"

ভগবান হাহা করে হাসলেন। হেসে বললেনঃ "কে বলেছে তোমাকে, রামকৃষ্ণ কিছু চাননি? তাঁর মতো ধুরন্ধর পৃথিবীতে আর একটাও জন্মেছে? তিনি তো ঘটি, বাটি চাননি, চাইলে তো আমার পক্ষে সহজ হতো। ওস্তাদ লোক! তিনি চেয়ে বসলেন আমাকেই! বলেন কিনা, তোমার ঐশ্বর্য-ফৈশ্বর্য চাই না। সে যে চায় চাক, আমি তোমাকে চাই।"

প্রশ্ন করলামঃ "তাই নাকি! এই যে শুনি, তিনি বিবেক-বৈরাগ্য, শুদ্ধাভক্তি চেয়েছিলেন।"

"ঐ তো তোমাকে বললাম, 'মহা ধুরন্ধর'! তুমি যদি আমাকে বল—ভগবান, তোমার কাছে আমি একটা পাঞ্জাবির পকেট চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে?—তোমাকে একটা পাঞ্জাবি দিতে হবে। তুমি যদি কান চাও, আমাকে মাথাটাই দিতে হবে। বিবেক-বৈরাগ্য, শুদ্ধাভক্তি—সে তো আমিই। 'বাঁশবেড়ে' আর 'বংশবাটী' দুটোই তো এক জায়গা। ভোলানাথকে চাইলে বিশ্বনাথকেই চাওয়া হলো। রমলা শেখরের বউ, উমার মা, রমার মেয়ে। রমলাকে চাওয়া মানে একইসঙ্গে কতজনকে চাওয়া! তোমার রামকৃষ্ণকে বিবেক-বৈরাগ্য আর শুদ্ধাভক্তি দিতে গিয়ে আমার কি হাল হলো বলো।"

"কি হলো? আপনি তো সবকিছুর মালিক ভগবান!"

"আরে ধুর্! আমার কাছে হীরে, জহরত, রাজবাড়ি, সিংহাসন, জমি-জিরেত, রাজ্যপাট চাইলে ব্যাপারটা কিছুই নয়। এখন তুমি যদি বল—'দই পেতে দাও', তাহলে?"

"তাহলে আবার কী? দুধও আপনার, সাজাও আপনার।"

"পাত্রটা?"

"কেন, মাটিও আপনার, কুমোরও আপনার, একটা ভাণ্ড যোগাড় করা কি আর এমন কঠিন কাজ আপনার পক্ষে!"

"ওহে, রামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন বিবেক-দধি। সেটি পাততে হবে চিত্ত-পাত্রে। দুধ হলো জীবন। তার জন্য নির্জনতা চাই, অচঞ্চল একটি অবস্থান চাই, উপযুক্ত একটু উত্তাপ চাই। এগুলোই দই বসার শর্ত। সেসবও তো তৈরি করে দিতে হলো তাঁর মনে। সে কি সহজ কাজ!"

"তিনি দই চাইলেন কেন?"

"ঐ যে বললাম, অতিশয় ধুরন্ধর! দই থেকে ঘোল করবেন, তারপর সেই ঘোল মন্থন করে মাখন তুলবেন।"

"তার মানে লক্ষ্য হলো মাখন!"

"হ্যাঁ, তিনি মাখনের মতো সংসার-জলে ভেসে থাকবেন, মিশে যাবেন না। সুখ-দুঃখ, জরা-মৃত্যু, জয়-পরাজয় তাঁর কিছুই করতে পারবে না। তাঁর চাওয়াটা একবার ভেবে দেখ!"

"তিনি তো সেইভাবেই আমাদের সংসারে থাকতে বলে গেছেন।"

"শোন, বলা এক, করা আরেক। বই খুললেই অজস্র বলা পাবে, কিন্তু জীবন খুললে কটা জীবনে সেইসব বলা পাবে? ভড়ভড় করে শাস্ত্র আওড়ালেই কি ভগবান মেলে?"

"আচ্ছা শ্রীভগবান, মনে হচ্ছে আপনার হাতে কিছু সময় আছে, তাহলে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবেন?"

"কেন যাব না, আমার তো এখন 'ভ্যাকেসান' চলছে। স্কুলে যেমন সামার ভ্যাকেসান, সেইরকম পৃথিবীতে এখন 'সিভিলাইজেসান স্যাংসান' চলছে। সভ্যতায় তো সৎ চিৎ আনন্দ—সচ্চিদানন্দ থাকে না। ধর্ম, আদর্শ, ন্যায়, নীতি, সদাচার সব চিৎ হয়ে হাত-পা নাড়ছে অসহায়ের মতো তোমাদের সভ্যতায়। ভাগবত পড়েছ?"

"ঐ সংক্ষিপ্ত আকারে, তাও অনুবাদ।"

"যাক, তুমি তো তবু নামটা শুনেছ! নারদ পৃথিবী ভ্রমণ শেষে বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। জায়গাটার নাম 'বিশালনগরী'। সনকাদি ঋষিকুমারগণ তাঁকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করছেন—'কথং ব্রহ্মণ্ দীনমুখঃ কুতশ্চিন্তাতুরো ভবান্।' (ভাগবত, ১।২৬)—আপনি এমন উদাস কেন, চিন্তাতুর কেন?

'ইদানীং শূন্যচিত্তোঽসি গতবিত্তো যথা জনঃ।
তবেদং মুক্তসঙ্গস্য নোচিতং বদ কারণম্।।'

(ঐ, ১।২৭)

ধরেছে ঠিক। নারদ সমস্ত আসক্তিশূন্য মুক্তপুরুষ, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে হৃতধন ব্যক্তির মতো শূন্যচিত্ত, ব্যাকুল। কারণটা কি? বিমর্ষ নারদ বললেন, শোন বাবারা। আমি পৃথিবীকে সর্বোৎকৃষ্ট লোক ভেবে এখানে এসেছিলাম—

'অহন্তু পৃথিবীং যাতো জ্ঞাত্বা সর্বোত্তমামিতি।
পুষ্করঞ্চ প্রয়াগঞ্চ কাশীং গোদাবরীং তথা।
হরিক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং শ্রীরঙ্গং সেতুবন্ধনম্।।'

(ঐ, ১।২৮-২৯)

এখানে পুষ্কর, প্রয়াগ, কাশী, গোদাবরী, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গ, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর—সর্বত্র ঘুরে এলাম। 'না পশ্যং কুত্রচিচ্ছর্ম মনঃসন্তোষকারকম্।' (ঐ, ১।৩০)—কোথাও আমার মনের সন্তোষপ্রদ শান্তি পেলাম না। কলি সব শেষ করে দিয়েছে।

'সত্যং নাস্তি তপঃ শৌচং দয়া দানং ন বিদ্যতে।
উদরম্ভরিণো জীবা বরাকাঃ কূটভাষিণঃ।।'

(ঐ, ১।৩১)

—সত্য, তপস্যা, শৌচ, দয়া ও দান কিছুই নেই। দীন জীবেরা কেবল পেটের চিন্তায় অস্থির, অসত্যভাষী, নিষ্প্রভ, আলস্যপরায়ণ, মন্দবুদ্ধি, ভাগ্যহীন, উপদ্রবগ্রস্ত। যারা সাধু বলে পরিচিত, তারা পাষণ্ডকর্মকারী। মুখে বলে—আমি বৈরাগ্যবান সাধু, কিন্তু স্ত্রী আর ধন উভয়ই গ্রহণ করে।

'তরুণীপ্রভুতা গেহে শ্যালকো বুদ্ধিদায়কঃ।
কন্যাবিক্রয়িণো লোভাদ্দম্পতীনাঞ্চ কল্কনম্।।'

(ঐ, ১।৩৩)

—ঘরে ঘরে স্ত্রীদের প্রবল প্রতাপ, শ্যালকরা হলো পরামর্শদাতা। মানুষ অর্থের জন্য কন্যা বিক্রয় করছে। আর ঘরে ঘরে দাম্পত্যকলহ। আহা! কি ছিরি হয়েছে এই পৃথিবীর—

'অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলা দ্বিজাতয়ঃ।
কামিন্যঃ কেশশূলিন্যঃ সম্ভবন্তি কলাবিহ।।' (ঐ, ১।৩৬)

—এই কলিযুগে প্রায় সকল মানুষেই বাজারে অন্ন বিক্রি করছে, ব্রাহ্মণরা অর্থের বিনিময়ে বেদের অধ্যাপনা করছে আর প্রায় সকল স্ত্রী বেশ্যাবৃত্তিতে রত হয়েছে।"

"এ আর নতুন কথা কী বলছেন ভগবান! আমার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, কলির মায়া কামিনী-কাঞ্চন। দুটোই তিনি ত্যাগ করেছিলেন। স্বামীজী কামিনীর জায়গায় 'কাম', 'লাস্ট' শব্দটি বসিয়েছিলেন। ব্যাপার তো সেই একই।"

"ত্যাগ করেছিলেন? মুখে ত্যাগ?"

"আজ্ঞে না। প্রকৃত ত্যাগ।"

"কাম জয় করা যায়?"

"এই তো ভগবান! ঐ একটি মানুষ আপনার সব গর্ব খর্ব করে দিয়েছেন। বললেন, কাম জয় করা যায় না জানি, তবে এই নাও মুখটা ঘুরিয়ে দি। সর্ব রোমকূপ দিয়ে প্রেমের ভগবানের সঙ্গে পরম মিলনের আনন্দ আস্বাদ করব।"

"বল কী!"

"ইয়েস, গদাধর চট্টোপাধ্যায় আপনার সব ছলাকলা শেষ করে দিয়েছেন। আপনার নিজের দোষেই আপনি মানুষের প্রেম, পূজা সব হারিয়েছেন। 'কলি, কলি' করছেন, কলির প্রভাব তো নিজেই কাটিয়ে দিতে পারেন প্রভু! আপনিই তো সর্বময়।"

"না হে, সৃষ্টি আমার হলেও যে-শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি কালী, কালকে কলন করছেন। কালের কর্ত্রী তিনি। আমি শব হয়ে পড়ে আছি বুক পেতে। কালই কলিকে এনেছেন, আমি অসহায়।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, তাই মাকে ধরেছিলেন, বাবাকে নয়। গঙ্গার জলে কাঞ্চন বিসর্জন দিয়ে মাকে বললেন, 'মা, আপদ গেছে।' এসব আপনার নাকের ডগায় হচ্ছে। কলি আপনাকে কাবু করলেও আমার ঠাকুরকে কাবু করতে পারেনি। স্বামীজী স্পষ্ট, পরিষ্কার বললেন, 'ঠাকুরের আগমনে সত্যযুগের সূচনা হয়েছে।' "

"বুঝতে পারছ?"

"কেন পারব না! আপনার বহুরূপ তো মন্দির, মসজিদ, গির্জা ছেড়ে মানুষের মধ্যে চলে এসেছে। ওগুলো তো এখন আর্কিটেকচার, ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন, ব্যবসার জায়গা। ঠাকুর আপনাকে ধরার জন্য আমাদের ফাঁদ দিয়ে গেছেন—মনে, বনে, কোণে। আর চুপি চুপি বলে গেছেন—ভগবান ভীষণ লোভী, কেবল ভক্তি চান। ভগবান বড় তৃষিত, চোখের জল চান। এতক্ষণ 'ভাগবত' বলছিলেন তো, এইবার আমি শোনাই—নারদ আপনার পৃথিবীর বেহাল অবস্থা দেখতে দেখতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল যমুনার তীরে এলেন। অপেক্ষা করেছিল অতি আশ্চর্য এক দৃশ্য—'তত্রাশ্চর্যং ময়া দৃষ্টং... একা তু তরুণী তত্র নিষণ্ণা খিন্নমানসা।' (ঐ, ১।৩৮) বসে আছেন এক যুবতী স্ত্রীলোক—অতিশয় দুঃখিত, বিরস বদন। আর তাঁর পাশে পড়ে আছেন অচেতন দুই বৃদ্ধ পুরুষ। মৃত নয়, অচেতন। দীর্ঘস্বরে শ্বাস চলছে। রমণী তাঁদের চেতনা আনার জন্য কখনো সেবা করছেন, আবার কখনো কাঁদছেন। সেই রমণীকে ঘিরে রয়েছেন পরমাত্মা। শত নারী পাখার বাতাস করছেন আর মহিলাকে প্রবোধ দিচ্ছেন। নারদ তখন কৌতূহল নিবারণের জন্য কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'দেবি! তুমি কে? এই দুজন পুরুষই বা কে, আর এইসব নারীরাই বা কারা?' রমণী বললেন—

'অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌমতৌ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যনামানৌ কালযোগেন জর্জরৌ।।'

—আমি ভক্তি। আর এই বৃদ্ধ দুজন আমার পুত্র—একজন জ্ঞান, আরেকজন বৈরাগ্য। সময়ের ফেরে এদের এই অবস্থা! আমার চারপাশের এই রমণীরা—দেবী গঙ্গাদি নদীসমূহ।

"আমার ঠাকুর বললেন, 'চুলোয় যাক জ্ঞানবিচার।' সাধক অবস্থায় রাতের অন্ধকারে দক্ষিণেশ্বরের পথে পথে পাগলের মতো ছুটছেন আর বলছেন, 'মা, আমার জ্ঞানবিচার এক কোপে কেটে দে। আমি চাই বিশ্বাস, বালকের বিশ্বাস। শঙ্কর, রামানুজ, বুদ্ধ—এঁরা সব চেয়েছেন জ্ঞান। আমি চাই প্রেম। মহাপ্রভুর প্রেম। বহির্বৈরাগ্য সন্ন্যাস চাই না। চাই বিবেক-বৈরাগ্য, শুদ্ধাভক্তি। ভক্তিদেবীর দুই পুত্র যেমন আছে থাক। ভক্তি! তুমি এসে আমাকে ভক্ত করে দাও। ভক্তের হৃদয় যে ভগবানের বৈঠকখানা।' "

"সেই রামকৃষ্ণ তোমাদের এমন কি দিলেন যে সংসার-যাতনা দূর হবে? সংসার তো আমার ইঁদুরকল, বিশালাক্ষীর দ, শেঁকুলের কাঁটা। ঢুকবে, কিন্তু বেরবে যখন তখন ঝলসাপোড়া।"

"আমার ঠাকুর তো এক কাণ্ড করে বসে আছেন!"

"কিরকম?"

"আপনাকে তেল বানিয়ে ফেলেছেন! এতকাল মানুষ আপনার উদ্দেশে প্রদীপ জ্বালিয়েছে, সেই প্রদীপে যুগ যুগ ধরে তেল ভরেছে। এইবার আপনি হয়েছেন আমাদের তেল —মহাভৃঙ্গরাজ।"

"কী বলছ পাগলের মতো।"

"আজ্ঞে, ঠাকুর আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন—হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে। সংসার কাঁঠালের আঠা, আপনি হলেন তেল। আর বলেছেন—আপনাকে জাপটে ধরে সংসারে ঢুকতে, বলেছেন সংসারেই থাকবে ভগবানকে পকেটে পুরে। আরেকটা যা বলেছেন, তা আপনার পুরোহিতরা কোনকালে বলেননি, শুনলে আপনার অহঙ্কারে লাগবে। বলেছেন—আমার এই দেহটাকে দিনে একবার অন্তত মানসচক্ষে দেখবে। তোমার সব আছে। 'নেই নেই' করলে সাপের বিষও নেই হয়ে যায়। বল—আছে, আছে। 'পাপ, পাপ' বলে কুঁকড়ে যেও না। তিনবার হেঁকে বল—আমি পুণ্যাত্মা। আর বলেছেন—মার, কাট, লোট।"

"কাকে?"

"আপনাকে।"

"ডাকাতি?"

"ইয়েস, মাই গড।"

"কোথায় রাখবে?"

"আমাদের অন্তরে।"

"কি অবস্থায়?"

"চৈতন্য করে।"

"সর্বনাশ, রামকৃষ্ণ কঠিনকে সহজ করে দিয়েছেন, যোগকে সরল করে দিয়েছেন, তিনি আমার 'ঠিকানা' বলে দিয়েছেন! তিনি তো বিদ্রোহী!"

"ইয়েস, প্রভু! তিনি আমাদের—জনগণের বিদ্রোহী ভগবান! ❑

দূষণমুক্ত কৃষি—একটি দিশা

রঘুপতি মুখোপাধ্যায়

"বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ"—কবির একথা বিজ্ঞান সমানেই প্রমাণ করে চলেছে। বিজ্ঞান মানুষকে বেগবান করেছে। মানুষ 'মুক্তিবেগে' চাঁদে পৌঁছেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তার গতি এসেছে। সকাল থেকে সারাদিন তার নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। বিজ্ঞানের কল্যাণে তার 'life' এখন 'fast'। আবার ক্লেশরূপ বেগ—তাও বিজ্ঞান দিচ্ছে, বিশেষত পরিবেশ-দূষণের মাধ্যমে। সে বায়ুদূষণ, জলদূষণ বা শব্দদূষণই হোক কিংবা 'মনুষ্যত্ব-দূষণ'ই হোক। বিজ্ঞান বর্তমানের যে ভোগসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা মানুষকে দিচ্ছে তা একধরনের দূষণই। সেজন্য মানুষের ক্লেশের অন্ত নেই। এ যেন—"ভোগমরুদেশে চলে নিত্য মৃত্যুহোম।" এ-দূষণকেও পরিবেশ-দূষণের অঙ্গ করে মানুষের এখন থেকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ অচিরে তার দুর্ভোগ আরো বাড়বে। আপাতত সে-প্রসঙ্গ থাক। এ-প্রবন্ধে আমাদের বিবেচ্য বিষয় কীটনাশকজনিত দূষণ এবং তার প্রতিকার।

কীটনাশকের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো—Insecticide, আর চাষবাসের সময় মানুষের ক্ষতি করে যেসমস্ত কীটপতঙ্গ, আগাছা, জীবাণু, ছত্রাক, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, তাদের বলে 'Pest'। Pest-এর বাঙলা প্রতিশব্দ হলো 'আপদ-বালাই'। সেদিক থেকে বিচার করলে ঐসমস্ত কীটপতঙ্গ, জীবাণু, প্রাণী, আগাছা চাষের পক্ষে আপদবালাই তো বটেই, চাষ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও মানুষের আপদবালাই। এই বালাই দূর করতে অর্থাৎ এসমস্ত কীটপতঙ্গ, জীবাণু, প্রাণী ইত্যাদিকে নাশের ব্যবস্থা করতে বিজ্ঞান যেসমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেছে তাদের এককথায় বলে Pesticides[১]। এই Pesticides-এর আওতায় পড়ে—(১) Insecticides (কীটনাশক): মূলত এরা ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ বিনাশ করে। দু-একটি নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হলো—লেড আর্সেনেট, ডি.ডি.টি., পাইরেথ্রাম, ম্যালাথিয়ন ইত্যাদি। (২) Fungicides (ছত্রাকনাশক): ছত্রাকজনিত রোগ গাছে খুব সাধারণ। এসমস্ত ছত্রাক বিনাশ করতে ডোডিন, বেনোমিল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। খুব বিস্তারিত না বলে শুধু শ্রেণীবিভাগগুলি উল্লেখ করা হলো, তাতে পাঠকের এই প্রসঙ্গে একটি সাধারণ ধারণা জন্মাবে। (৩) Bactericides (রোগজীবাণুনাশক)। (৪) Herbicides (আগাছানাশক)। (৫) Larvicides (শূককীট-নাশক)। (৬) Acaricides (রক্তপায়ী কীটনাশক): সাধারণত গবাদি পশু ও গৃহপালিত জন্তুর গায়ে দেখা যায়। (৭) Algicides (কচুরীপানা-নাশক)। (৮) Predacides (শিকারী স্তন্যপায়ী প্রাণী বা শিকারী পাখি নিয়ন্ত্রক)। (৯) Zoocides/Rodenticides (তীক্ষ্ণদন্তী ইঁদুরজাতীয় প্রাণিনাশক)। (১০) Antiseptics (জীবাণু-প্রতিরোধক)।

নামগুলি থেকে পাঠক একটি সাধারণ ধারণা নিশ্চয়ই করতে পারবেন যে, মানুষের চারপাশে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ, প্রাণী, জীবাণু, গাছপালার অন্ত নেই। চাষবাসের তো এরা ক্ষতি করেই, অন্যভাবেও মানুষের ক্ষতি করে; যেমন উকুন, মশা, মাছি, আরশোলা, ছারপোকা, খোস সৃষ্টিকারী কীট—এদের ক্ষতি করার কথা লিখে বোঝাতে হবে না। এদের নিয়ন্ত্রণও ঐ Pesticides-এর আওতায়ই পড়ে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে Pesticides-এর একটি ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এই Pesticides সাধারণের কাছে কীটনাশক হিসাবে পরিচিত। তাই বর্তমান প্রবন্ধে Pesticides অর্থে 'কীটনাশক' শব্দটিই ব্যবহার করা হবে।

পৃথিবীব্যাপী এই কীটনাশকের ব্যবসার পরিমাণ টাকার অঙ্কে সাত বিলিয়ন ডলার। [এক বিলিয়ন মানে এক হাজার মিলিয়ন। এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ ডলার। আর এক ডলার মানে প্রায় চুয়াল্লিশ টাকা। অর্থাৎ সাত বিলিয়ন হলো প্রায় ৩০,৮০০ কোটি ভারতীয় মুদ্রা (টাকা)।]

কৃষিখাতে এই কীটনাশকের ব্যবহার শতকরা ৭৫ ভাগ, আর কৃষি-বহির্ভূত খাতে অর্থাৎ মশা, মাছি নাশ করে গৃহপরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে এর ব্যবহার শতকরা ২৫ ভাগ। আর চাষবাসের জন্য তো সারের ব্যবহার আছেই। এর থেকে কৃষিজনিত পরিবেশ-দূষণের মাত্রা সহজেই অনুমেয়। এই কীটনাশক বাতাসে মিশছে, বায়ু দূষিত হচ্ছে। বৃষ্টিতে ধুয়ে জলে মিশছে, জল দূষিত হচ্ছে। আবার খাদ্যশস্য থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে। এই কীটনাশকজনিত দূষণ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে এবং মানুষকে সজাগ করে তুলেছে।

২০ জানুয়ারি ১৯৯৯ একটি বহুল প্রচলিত বাঙলা দৈনিকের[২] একটি সংবাদস্তম্ভের শিরোনাম ছিল—'ভয়ঙ্কর

১ Remington's Pharmaceutical Sciences, 16th Edition, 1980, p. 1188

২ আজকাল (দৈনিক), ২০.১.৯৯

শকুনও কমছে কীটনাশকে।' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শকুনরা দেশ থেকে নিপাত্তা হয়ে যাচ্ছে জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের জন্য। 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' (C.S.E.) পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, ভরতপুর পক্ষিনিবাসে ১৯৮০ সালে শকুনের সংখ্যা ছিল ২,০০০। এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪-এ। ঐ শকুনদের খাদ্য প্রাণীর গলিত শবদেহের নমুনা সংগ্রহ করে C.S.E. দেখেছে, শকুনদের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে বিষাক্ত খাদ্য। খাদ্যে D.D.T. এবং H.C.H.—এই দুটি কীটনাশকের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশি মাত্রায়। ঐ দুটি কীটনাশকের ব্যবহার মাত্র কয়েক বছর আগে এদেশে নিষিদ্ধ হয়েছে। C.S.E.-র ডিরেক্টরের মতে, যেহেতু শকুনদের খাদ্য গরু মোষ ইত্যাদির শবদেহ এবং মানুষও ঐ একই প্রাণীর থেকে দুধজাত খাদ্য এবং মাংস গ্রহণ করে, ফলে শকুনের মতো মানুষের দেহেও জমছে ঐ বিষাক্ত কীটনাশক। গরু মোষের দেহে ঐ কীটনাশক আসছে তাদের খাদ্য ঘাসপাতা থেকে। ১৯৯৩ সালে I.C.M.R. ('ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ')-এর সমীক্ষা অনুযায়ী সবজি, ফল এবং দুধে D.D.T. এবং H.C.H. বেশি মাত্রায় পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে। C.S.E. এই কারণে সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, শকুনের লুপ্ত হওয়ার কারণটি ভাল করে অনুসন্ধান করা উচিত। কারণ, এই দুটি কীটনাশক মানুষের শরীরে দীর্ঘদিন জমে থাকলে মানুষের প্রজনন-ক্ষমতার মারাত্মক ক্ষতি হবে।

এই সংবাদ যে-চিত্র এঁকেছে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। এ তো মাত্র দুটি কীটনাশকের কথা। বর্তমানে ব্যবহৃত কীটনাশকের সংখ্যা ৯০০। কীটনাশক ব্যবহারের আরো কতকগুলো বিপদ আছে, যেমন শিশুরা খেলার ছলে কীটনাশক খেয়ে ফেলে বা গ্রামগঞ্জে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার ঘটনা তো আকছার। এই বিপদগুলি মানুষ সচেতন থাকলে এড়াতেও সক্ষম হয়, কিন্তু যে সুদূরপ্রসারী কুফলের ইঙ্গিত উপরি উক্ত সংবাদ দিচ্ছে তা কীটনাশক প্রয়োগের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। এরকম সমীক্ষা যে আগেও হয়নি তা নয়, সত্তরের দশকে আমেরিকায় একটি সমীক্ষা হয় কীটনাশক ব্যবহারের সুফল ও কুফল নিয়ে। মুশকিল হলো, কীটনাশক ব্যবহার করলে মানুষের শত্রু ও মিত্র উভয় কীটই বিনষ্ট হয়, ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। এই চিন্তার ওপর ভিত্তি করে সমীক্ষা সিদ্ধান্ত করে—কীটনাশক ব্যবহারের দিন শেষ হয়ে আসছে। কারণস্বরূপ তারা যে-বিষয়গুলির উল্লেখ করে তা হলো—(১) খুব কম মাত্রায় D.D.T. ভাসমান সামুদ্রিক উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে সক্ষম। ফলস্বরূপ পরিবেশে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেবে। (২) খুব স্বল্প মাত্রায় D.D.T. বা H.C.H. (p.p.m. মাত্রায়) চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুকজাতীয় প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটাতে পারে। (৩) কীটনাশক ব্যবহারের ফলে নিহত কীটপতঙ্গকে পাখিরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে তাদের শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয় এবং তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কারণেই বেশ কিছু প্রজাতির পাখির বিলুপ্তি ঘটেছে। আমাদের দেশে শকুনের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে।

আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে দেখা যাচ্ছে, কীটনাশকের দিন শেষ তো হয়নিই, বরঞ্চ কীটনাশকের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার কারণ, মানুষের ওপর কীটনাশকের প্রত্যক্ষ ক্ষতিকারক প্রভাব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। আর দোষ থাকলেও কীটনাশকের অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে মানুষের জীবনে। তাই মানুষই তার ব্যবহারকে টিকিয়ে রেখেছে। টিকিয়ে রাখার কারণ সম্বন্ধে দু-একটি জোরালো তথ্য তুলে ধরা যাক। ১৯৯০ সালের জনগণনা অনুযায়ী পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ৫.৪ বিলিয়ন অর্থাৎ ৫৪০ কোটি। পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ অপুষ্টিতে ভুগছে। এই বিপুল জনসমষ্টির খাদ্যের সংস্থান করে চাষবাস। কীটতত্ত্ববিদ্‌গণ সাড়ে সাত লক্ষ প্রজাতির কীটের সন্ধান পেয়েছেন। এদের মধ্যে মাত্র দশ হাজার প্রজাতির কীট বিভিন্নভাবে মানুষের ক্ষতি করে। শত্রু কীটের দ্বারা বিশ্বে বছরে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২৭,৬০০ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া গাছের রোগের জন্যও ফসল নষ্ট হয়। শুনলে অবাক হতে হয়, জীবাণু, ছত্রাক, ভাইরাস ইত্যাদি জনিত উদ্ভিদ-রোগের সংখ্যা আশি হাজার থেকে এক লাখ। পঞ্চাশ হাজার প্রজাতির ছত্রাকই দেড় হাজার উদ্ভিদ-রোগ সৃষ্টি করে। পৃথিবীব্যাপী চাষবাসকে তিরিশ হাজার প্রজাতির আগাছার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। বেশ কিছু খাদ্যশস্য ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর পেটে যায়। প্রকৃতির খেয়াল অনন্ত। বিপুল তার কর্মকাণ্ড। সর্বত্রই অস্তিত্বের সংগ্রাম। এই টিকে থাকার সংগ্রামে মানুষই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে তার বুদ্ধি দিয়ে। এই টিকে থাকার সংগ্রামেই মানুষকে কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এখনি কীটনাশক বন্ধ করে দিলে পৃথিবীতে এক-তৃতীয়াংশ 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা' ফসল নষ্ট হবে।

আরো কিছু পরিসংখ্যান দেওয়া যাক যা কীটনাশক ব্যবহারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করবে। বর্তমানে আমেরিকার জনসংখ্যার শতকরা তিন ভাগ খেতখামারে কাজ করে। এই সংখ্যা লাফিয়ে শতকরা বার-য় দাঁড়াবে এখনি শুধুমাত্র আগাছানাশকের ব্যবহার বন্ধ করে দিলে। অর্থাৎ শ্রমজনিত খরচ বাড়বে। আগাছানাশক ব্যবহার আরেক দিক দিয়ে লাভজনক। এতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জমি কর্ষণের প্রয়োজন কমে। শক্তির সাশ্রয় হয় শতকরা আশি ভাগ, আর জমির উর্বরতা-শক্তিও সংরক্ষিত হয়। একজন এশীয় কৃষক বছরে ১৯,৯৬৪ কিলো, রাশিয়ার কৃষক বছরে

১৪,৯৭৩ কিলো এবং আমেরিকার কৃষক বছরে ১৭০,১৪৪ কিলো খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে। এই হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীর উৎপাদিত খাদ্যশস্যের শতকরা আটচল্লিশ ভাগই আমেরিকার কৃষকের অবদান। কীটনাশকের ব্যবহারও আমেরিকায় সবথেকে বেশি—জনপ্রতি গড়ে ৪.৩ পাউন্ড। শুধু স্বাস্থ্যের কথা বিচার করলে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ লোক হয় কীটপ্রসূত রোগে (ম্যালেরিয়া, এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি) মারা যায় নয়তো অসুস্থ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বিশ্বে প্রতিবছর কীটপ্রসূত ক্ষতির পরিমাণ নব্বই বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪৫০০০০ কোটি টাকা)।

এইসব বিচার করে প্রধানত তিনটি কারণে কীটনাশককে মানুষের বন্ধুর পর্যায়েই ফেলতে হয়। প্রথমত কীটনাশক ফসলনাশ রোধ করে। দ্বিতীয়ত, কীটপ্রসূত রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। তৃতীয়ত, আরশোলা, ইঁদুর, মশা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে সুস্থ পরিবেশ দান করে। কীটনাশক ব্যবহার-বিরোধীরা নিশ্চয়ই কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করতে বলে পরিশ্রমের ফসল পোকায় খাওয়ার বা ম্যালেরিয়া, এনকেফেলাইটিস মহামারীর বিভীষিকাময় দিনগুলি ফেরত আনার কথা বলবেন না। এককথায় তাঁরা একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞতার পরিচয় দেবেন। অর্থাৎ কীটনাশকের ব্যবহার আজকের দিনে অপরিহার্য। এর কোন বিকল্প এখনি চিন্তা করা যাচ্ছে না। বরঞ্চ যা করা যেতে পারে তা হলো—কীটনাশক ব্যবহারের ঝুঁকি ও সুবিধার অনুপাত (risk-benefit ratio) নির্ণয় করে এর সযত্ন পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ, যাতে কীটজনিত ক্ষতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, আর্থিক ক্ষতি রোধ করে মানুষ নিরাপদে বাঁচতে পারে। তার জন্য চাই নিয়ন্ত্রণ আইন। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গঠিত হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, যা সার ও কীটনাশকের গুণাগুণ, প্রাপ্যতা, ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা ইত্যাদি বিচার করে তালিকা প্রস্তুত করবে, তালিকা অনুযায়ী এগুলি প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তার দিকে কড়া নজর রাখবে, সর্বোপরি খাদ্যশস্যের স্বাদ ও গ্রহণের নিরাপত্তা বজায় থাকছে কিনা তার ওপরও লক্ষ্য রাখবে। গবেষক, প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী, ব্যবহারকারীর দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (W.H.O) এবিষয়ে সজাগ। অবশ্য কীটপ্রসূত রোগগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই সংস্থার আগ্রহ বেশি।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই মূল কথা। দূষণের পরিমাণ কমবে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ কমলে। যদি সুনির্দিষ্ট কীটনাশকের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি শত্রুকীটকে শুধু বিনষ্ট করবে—মিত্রকীটগুলিকে নয়, তাহলে কীটনাশকের পরিমাণ কম লাগবে, মিত্রকীটগুলি বাঁচবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। এধরনের প্রথম প্রযুক্ত কীটনাশকের নাম Imidacloprid (Bayer AG)। ফ্রান্স, স্পেন, জাপান ও দক্ষিণ আমেরিকা এবিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এরকম আরো দুটি সুনির্দিষ্ট কীটনাশকের নাম হলো—Fipronil (Rhone—Poulenc) এবং Pyrrole (American Cynamid)।[৩] দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেক কৃষি-বিশেষজ্ঞই জৈবপ্রথায় চাষবাসে ফেরত যাওয়ার কথা ভাবছেন। ভারত সরকারও নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রথাকে উৎসাহিত করছেন। তাঁদের যুক্তি হলো—কৃত্রিম সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করলে দূষণের মাত্রা কমবে। তাঁরা সার হিসেবে খনিজ ফসফেট, চুনাপাথর ও জৈব পদার্থ ব্যবহারের পক্ষপাতি। নাইট্রোজেনের উৎস ও প্রাকৃতিক কীটনাশকসম্পন্ন শুঁটিজাতীয় উদ্ভিদের (leguminous plant) ব্যবহার এবিষয়ে বিশেষ ফলপ্রসূ। এধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ, এ-পদ্ধতির দক্ষতা কম। ফসলের পরিমাণ ঠিক রাখতে হলে আরো বেশি জমি অর্থাৎ অনুর্বর জমি চাষ করতে হবে। অনুর্বর জমি চাষ করতে ব্যয়ের পরিমাণ আরো অনিয়ন্ত্রিত হবে। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে শুধু পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন একশ সত্তর লক্ষ টন। এত বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য শুধু জৈব সারে ফলানো সম্ভব নয়। রাসায়নিক সারও প্রয়োজন। আর এরকম একটা ধারণা এখন বলবৎ—প্রাকৃতিক পদার্থ মানেই তার কোন পার্শ্ব বিষক্রিয়া (toxic side effect) নেই। তাই ওষুধ এবং বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রেও কৃত্রিম পদার্থের বিকল্প হিসাবে প্রাকৃতিক—বিশেষ করে জৈব পদার্থের অনুসন্ধান চলছে। টিভিতে আজকাল বিজ্ঞাপনের ছয়লাপ—'effect পুরো, side effect জিরো'। যেন সব সমস্যার সমাধান! কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, প্রাকৃতিক পদার্থ রাসায়নিক পদার্থই। আর জৈব পদার্থ প্রাকৃতিক পদার্থ হলেও সব প্রাকৃতিক পদার্থই জৈব পদার্থ নয়। একটি রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়াকলাপ ও পার্শ্ব বিষক্রিয়া একই—তা সে কৃত্রিমই হোক আর প্রাকৃতিকই হোক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে সার ও কীটনাশকের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। উদ্ভিদের পক্ষে তফাত করা মুশকিল—কোন্‌টি কৃত্রিম আর কোন্‌টি প্রাকৃতিক। তার প্রয়োজনীয় পদার্থটি সে গ্রহণ করবেই। 'আশার ফসল'—এই শ্লোগানে এই বিকল্প পদ্ধতির চাষ কীটনাশকজনিত দূষণ শতকরা ২৫-৮০ ভাগ কমাতেও সক্ষম। জৈবপ্রথায় চাষের পন্থী কৃষি-বিশেষজ্ঞরা তাই সরকারের কাছে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সুপারিশ করে চলেছেন। এ-পদ্ধতিতে যে খুব একটা সুরাহা হবে—এমন ভরসা কমই। তবুও নবম পঞ্চবার্ষিকী

৩ Remington : The Science and Practice of Pharmacy, Vol. II, 19th Edition, 1995, p. 1343

পরিকল্পনায় এই প্রথাকে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার চাষীদের ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দিচ্ছেন।

বিজ্ঞান ক্লেশ দিচ্ছে, নিবারণের উপায় বিজ্ঞানই বাতলাবে। কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে কিভাবে দক্ষতার সঙ্গে ফসল ফলানো যায় বা প্রাকৃতিক উপায়ে কিভাবে কীট নিয়ন্ত্রণ সম্ভব—এর একটি দিশা পেতে হলে কীটনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি পর্যালোচনা করতে হবে। কীটনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রাকৃতিক পদ্ধতি, (২) কৃত্রিম পদ্ধতি।

প্রাকৃতিক উপায়ে কীটপতঙ্গ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উপায় হলো কীটপতঙ্গভুক্ পাখি ও কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী—যাদের খাদ্য হলো কীটপতঙ্গ। এরা মানুষের বন্ধু। এরা কীটপতঙ্গের হাত থেকে মানুষের খাদ্যশস্য বাঁচায়। কীটপতঙ্গের ওপর আবহাওয়ার কোন নির্দিষ্ট প্রভাবের কথা বলা না গেলেও গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বাতাসের আর্দ্রতার একটা প্রভাব যে কীট এবং কীটসেবকদের (hosts) ওপর আছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। খুব তীব্র শীত কীটপতঙ্গের পক্ষে সুখকর নয়, কিন্তু গাছের শীতকালীন দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে কীটপতঙ্গ গাছকে বেশি আক্রমণ করতে পারে। আবার গাছও তার কুঁড়ি বিনষ্ট করে ফল ফলানো কমাতে পারে এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। এসব প্রকৃতির খেয়ালে চলতেই পারে। বসন্ত ও প্রাক্-গ্রীষ্ম কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধির পক্ষে প্রশস্ত সময়। এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা মাথায় রেখে মানুষ যা করতে পারে তা হলো এসব ঘটনার সুযোগ নেওয়া। বসন্তের আগে ফসল কেটে ঘরে তুললে কীটনাশকের অতিব্যবহার (over use) রোধ করা সম্ভব বলে মনে হয়। অর্থাৎ ফসল বোনা ও রোয়ার সময়ের রদবদল ঘটালে কীটপতঙ্গের আক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

কৃত্রিম পদ্ধতিগুলির একটি হলো যান্ত্রিক পদ্ধতি। জাল, পতঙ্গধারণ যন্ত্র (fly-catcher)—এগুলি প্রয়োগ করে কীটনাশকের অতিব্যবহার আটকানো সম্ভব। কীট-নিরোধক মোড়কের (insect proof package) সাহায্য নিলে দানাশস্য কীটের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। সর্বোপরি মানুষ তার খাদ্যশস্য, গবাদি পশু এবং অন্য সম্পত্তি রক্ষা করতে কীটনাশকই ব্যবহার করে। এর জন্য সে কীটমারক (insecticide), কীট-বিতাড়ক (insect repellent), ধূমায়ক (fumigant) এবং কীটাকর্ষকের (insect attractants) সাহায্য নেয়।

কীটমারকের কাজ হলো বিষক্রিয়ায় (stomach poison) কীটনিধন। আরেক ধরনের কীটমারক আছে, যাদের স্পর্শে কীট মারা যায় (contact insecticides)। বিবিধ নিয়ন্ত্রণপদ্ধতির মধ্যে কিছু উদ্ভিজ্জ কীট স্নায়ুবিষের (nerve poison) উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—পাইরেথ্রিন, নিকোটিন, রোটেনন ইত্যাদি। এদের মধ্যে পাইরেথ্রিনকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এর ক্ষমতাও দীর্ঘমেয়াদী। তাই সাম্প্রতিককালে এই পাইরেথ্রিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিজ্ঞানীরা থেমে থাকছেন না। দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে তাঁরা মরিয়া। তাঁরা কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে কীটপতঙ্গের মহামারী আকারে রোগসৃষ্টির চেষ্টা করছেন। কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। এপ্রসঙ্গে যে দু-একটি রোগজীবাণু ব্যবহৃত হয়েছে তাদের নাম হলো—*B. thuringiensis* এবং *B. popillae*। এই উপায়ে কীট-নিয়ন্ত্রণ মানুষ ও তার পরিবেশের পক্ষে নিরাপদ। এই ধরনের জৈব কীট নিয়ন্ত্রকের (Bio-insecticide) সংখ্যা অর্ধ সহস্রাধিক।

কীটনাশক ব্যতীত কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের আরেকটি প্রক্রিয়া হলো তাদের 'বন্ধ্যাকরণ' এবং এটির উপায় হলো নির্বীজক (sterilising agent) ব্যবহার করা—যা সাধারণ রাসায়নিক পদার্থও হতে পারে আবার তেজস্ক্রিয় পদার্থও হতে পারে। উদ্ভূত বন্ধ্যাকীট মিলনে সক্ষম হলেও বংশবৃদ্ধিতে বিফল হবে এবং বেশির ভাগ কীটই জীবদ্দশায় একবারই মিলিত হয়। অর্থাৎ একবার নির্বীজক ব্যবহার করলে সাময়িক কিছুটা দূষণ হবে, কিন্তু সুদূরপ্রসারী কীটনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে এবং এ-প্রক্রিয়া পরিবেশ-দূষণ নিয়ন্ত্রণেরও সহায়ক হবে।

সর্বশেষ একটি উৎসাহব্যঞ্জক নিরীক্ষার উল্লেখ করা যাক। ১৯২০ সালে কীটতত্ত্ববিদ্‌গণ কিছু প্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থের হদিস পেয়েছেন। এই পদার্থগুলি কীটবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'কীটবৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক' (Insect Growth Regulator বা I.G.R.)। এধরনের একটি কৃত্রিম কীটবৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক হলো Methoprene। ১৯৭০ সালে এটিকে প্রস্তুত করাও সম্ভব হয়েছে। এই Methoprene প্রয়োগে মূককীট থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মথের নির্গমন আটকায়। এর অর্থ হলো—শূককীটগুলো পরিণত হয়, কিন্তু মূককীট দশায় পৌঁছাতে পারে না এবং বংশবিস্তারক্ষম পূর্ণাঙ্গ কীটদশা প্রাপ্ত হয় না। ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই I.G.R.-গুলি নিরাপদতমও।

কীটনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলি পর্যালোচনা করলে দূষণমুক্ত কৃষির একটি দিশা মিলবে। একটি অতি সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশন করছেন এক সুইস বিজ্ঞানী। Triphenyltin (T.P.T.) চাষে ব্যবহৃত একটি পরিচিত ছত্রাকনাশক, যা আলু ও বীট চাষে মূলত প্রযুক্ত হয়। এই T.P.T. ব্যাঙের জীবনধারণের এক অমঙ্গল সঙ্কেত বহন করে আনছে। (দ্রঃ Environmental Toxicology and Chemistry, 1997, 16, 1940). T.P.T.-এর বিষক্রিয়ার ফলে ব্যাঙের খাদ্যে অনীহা জন্মাচ্ছে, ফলে ওজন কমে যাচ্ছে। রূপান্তর প্রক্রিয়ার (Metamorphosis) সময় বেশি লাগছে। T.P.T.-এর

বিষক্রিয়া ব্যাঙের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ওপর।[8] এই ছত্রাক-নাশক প্রয়োগ করলেও সবসময় ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয় না, কারণ ছত্রাকের বাস মাটিতে। ছত্রাকনাশক মাটি ভেদ করে গাছের শিকড়ে পৌঁছাতে পারে না, তাই গাছের শিকড়ে ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে। এই ছত্রাকজনিত রোগে শুধু ব্রিটেনেই প্রচুর গম বিনষ্ট হয়। তাই ছত্রাকনাশক প্রয়োগের কারণ সহজেই প্রতীয়মান হয়। একটি অতি চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা হলো—নদীর ধারে একধরনের বেগুনি ফুলবিশিষ্ট মনোরম ছোট গাছ দেখা যায়, যার বৈজ্ঞানিক নাম—'*Saponaria officinalis*'। এই গাছের পাতা ও শিকড় ফুটিয়ে দীর্ঘদিন মানুষ কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহার করেছে। এর ভারতীয় নাম 'সাবুনি'। এই গাছে 'Saponin' নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ বর্তমান। এই Saponin-ই ফেনা তৈরি করে এবং পরিষ্কারক ক্রিয়ার (detergent action) জন্য দায়ী। এই গাছে ছত্রাকের আক্রমণ হয় না। বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন, Saponin-ই এর জন্য দায়ী। এ-ধারণা তাঁদের বদ্ধমূল হলো, কারণ ওট (Oat) গাছের (বাঙলা নাম 'জই') ছত্রাকজনিত রোগ হয় না এবং ওট গাছে Saponin বর্তমান। ছত্রাক-রোধে Saponin-এর ভূমিকা প্রমাণ করতে তাঁরা ওট গাছের জিন-এ পরিবর্তন আনলেন, দেখলেন ওট গাছে আর Saponin-এর অস্তিত্ব নেই এবং অতি পরিচিত ছত্রাকজনিত রোগ 'take-all'—প্রতিরোধক ক্ষমতাও ওট গাছের লোপ পেয়েছে। এই নিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা বললেন, গম গাছের ছত্রাকজনিত 'take-all' রোগের কারণ এই গাছে Saponin-এর অনুপস্থিতি। তাঁরা গমের gene-এ পরিবর্তন এনে গম গাছকে Saponin উৎপাদনক্ষম করলেন। দেখলেন, গম গাছ 'Take-all' রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে। এটি একটি যুগান্তকারী নিরীক্ষা। দীর্ঘদিন মানুষ Saponin-সৃষ্টিকারী ওট খেয়েছে। খাদ্য হিসেবে ওট সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুতরাং Saponin-বিশিষ্ট গমও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে কোন বিপদের ভয় নেই। স্বাদের যদি হেরফের ঘটে তাহলে gene-এ D.N.A.-বিন্যাসে পরিবর্তন এনে এ-ব্যবস্থা করা যাবে যাতে গাছের শিকড়ে, কাণ্ডে, পাতায় Saponin উৎপাদিত হয়, কিন্তু গমের দানায় নয়। বিজ্ঞানীরা এ-সম্বন্ধে আশাবাদী। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় গাছের gene-এ পরিবর্তন এনে যদি কীট-বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক, কীট-নির্বীজক বা কীট-তাড়ক উৎপাদন করা যায়—যা মূলে, কাণ্ডে, পাতায় সীমাবদ্ধ থাকবে, কিন্তু শস্যদানায় আসবে না, তাহলে দূষণমুক্ত কৃষির একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে—পরবর্তী প্রজন্মকে কিছুটা নির্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া যাবে। ❑

---

8 Chemistry in Britain, Vol. 34, No. 4, April 1998, pp. 11 & 19

> শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

'A Text Book of Homoeopathic Materia Medica Elaborated with Illustrations' গ্রন্থের লেখক, পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে দশ বছর অধ্যাপনা এবং ত্রিশ বছর চিকিৎসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা জানাতে ধারাবাহিক লিখছেন। তাঁর ধারণা, এতে সাধারণ অসুস্থতা ও অসুখ-বিসুখ এড়ানো সম্ভব হবে এবং ফলত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

❑ আজকাল স্নানের সময় সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি ব্যবহারের বহুল রেওয়াজ। কিন্তু আগেকার দিনে মা-দিদিমা-ঠাকুমারা স্নানের আগে সরষের তেল মাখতে বলতেন। শিশুদের তেল মাখিয়ে রোদে শুইয়ে রাখা হতো। বস্তুত, খাঁটি সরষের তেল দেহের পক্ষে খুব উপকারী। খাঁটি সরষের তেল গায়ে ভাল করে ঘষে ঘষে মাখলে লোমকূপগুলি সতেজ হয় এবং সেইসঙ্গে তৈলাক্ত ও পিচ্ছিল হয়। সতেজ লোমকূপ থেকে দেহাভ্যন্তরের অপ্রয়োজনীয় দূষিত পদার্থ নির্গত হয়ে দেহকে পরিষ্কার রাখে।

❑ আজেবাজে সাবানের রাসায়নিক প্রভাবে লোমকূপগুলি শুকনো হয়ে যায়। চর্মরোগীদের সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়। সাবান ব্যবহার চর্মরোগকে জটিল ও দুরারোগ্য করে তুলতে পারে। এবিষয়ে চর্মচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

❑ স্নানের সময় গামছা বা তোয়ালে ভিজিয়ে দেহকে ভাল করে ঘষে ঘষে স্নান করতে হবে। তাতে যেমন ময়লা দূর হবে তেমনি স্নায়ু-পেশীগুলিও সতেজ থাকবে।

❑ প্রচারমাধ্যমগুলিতে নিত্যনতুন নানা ধরনের সাবানের বিজ্ঞাপন দেখে সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়। অনেক সময় দেহের ঘাম, ময়লা ইত্যাদি ভালভাবে পরিষ্কার করার জন্য সাবানের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না, তবে এমন সাবানই ব্যবহার করা উচিত যাতে ত্বক কোনভাবেই শুকনো না হয়ে যায় অথবা ত্বকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া না হয়। হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই সাবান ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

শল্যচিকিৎসকরা মুমূর্ষু রোগীদের ওপর অনেক পরিহার্য অস্ত্রোপচার করেন

ইংল্যান্ডের 'ন্যাশনাল কনফিডেন্সিয়াল এনকোয়ারি ইন্টু পেরি-অপারেটিভ ডেথ' (অস্ত্রোপচারকালে বা কিছু আগে-পরে মৃত্যু সম্বন্ধে জাতীয় গোপন অনুসন্ধান)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, শল্যচিকিৎসকরা জরাগ্রস্ত অথবা মৃত্যুপথযাত্রী (terminally ill) রোগীদের ওপর অযথোচিত এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে (inappropriate and aggressive) অনেক অস্ত্রোপচার করছেন। কেন্ট-এর শল্যচিকিৎসক এবং উপরি উক্ত 'এনকোয়ারি' অস্ত্রোপচার বিষয়ে প্রধান সমন্বয়কারী রন ময়েল বলেছেন ঃ "অস্ত্রোপচার কখন দুঃসাহসিক, অবিবেচনাপূর্ণ বা অকার্যকর হবে তা শল্যচিকিৎসকের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। অস্ত্রোপচার করার জন্য যা চাপ সৃষ্টি হয়, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া খুব মুশকিল। এ-চাপ আসতে পারে রোগীর কাছ থেকে, তার আত্মীয় কিংবা সহকর্মী ডাক্তারদের কাছ থেকে। তাহলেও মনে রাখতে হবে যে, অস্ত্রোপচার সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না।"

এই অনুসন্ধানে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল ২৫৪১ জনের কাছ থেকে—যারা অস্ত্রোপচারের ৩০ দিনের মধ্যে মারা গিয়েছিল। উদ্দেশ্য—এই থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায় তা জানা। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চের মধ্যে যে ১৯,৪৯৬ জনের অস্ত্রোপচারের পরেই মৃত্যু হয়েছিল, এই ২৫৪১ জন তাদের ১৩ শতাংশ। উক্ত প্রতিবেদনে মৃত্যুপথযাত্রীদের ওপর অস্ত্রোপচার না করায় জোর দেওয়া ছাড়াও আদৌ এর প্রয়োজন আছে কিনা তা জানার জন্য আরো তদন্ত করার কথা বলা হয়েছে। রিপোর্টে আরো যেসব কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—প্রতি অ্যানিস্থেসিয়া (অনুভূতিবিলোপ) বিভাগে রোগ ও রোগ-জনিত মৃত্যুর ওপর যেন নিয়মিত আলোচনাচক্র বসে, বর্তমানে মৃতদের যে ৮ শতাংশের ময়না তদন্ত করা হয়, তার সংখ্যাবৃদ্ধি করার জন্য যেন চেষ্টা করা হয় এবং কেবল বিশেষজ্ঞ-পরিচালিত কেন্দ্রেই অন্ননালী বাদ দেওয়ার (oesophagectomy) শল্যচিকিৎসা করা হয়। তাহলে বর্তমান মৃত্যুহার ১০ শতাংশ কমে যাবে।

প্রতিবেদনে বারবার যা উল্লিখিত হয়েছে তা হলো ঃ শল্যচিকিৎসকদের শল্যচিকিৎসার উদ্দেশ্য কি সেবিষয়ে পরিষ্কার ধারণা হওয়া উচিত। "অস্ত্রোপচার করার অভিমত রোগীর স্বার্থে নাও হতে পারে"—বলা হয়েছে রিপোর্টে।

এইরকম অভিমত যে কেবল শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রেই করা হয় তা নয়, যেমন স্ত্রীরোগ বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ বয়স, শারীরিক অবস্থা, কোন্ ধরনের শল্যচিকিৎসায় জরায়ু বাদ দেওয়া হবে—এসব বিবেচনা না করে যদি অস্ত্রোপচার করা হয়, তাহলে তাতে লাভ বিশেষ হয় না। আরো বলা হয়েছে যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন—যেসব রোগীর মাত্র অল্পদিন বাঁচার সম্ভাবনা তাদের অনেকেরই পেটের চামড়া এবং পাকস্থলী ফুটো করে যন্ত্রের সাহায্যে পাকস্থলীর ভিতর পরীক্ষা (endoscopic gastrostomy) করা হচ্ছে। এইসব রোগীদের অস্ত্রোপচার না করে তাদের রোগযন্ত্রণা নিবারণের দিকে নজর দিলে ভাল হয়। ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াকে অনেক সময় বলা হয় 'বৃদ্ধের বন্ধু'। বর্তমান যুগের চিকিৎসাপদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে এরকম বলা কি উচিত? আবার যেসব রোগীর বাঁচার কোন আশা নেই এবং মৃত্যু আসন্ন, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রম করা হবে?—প্রতিবেদনে এই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। **[British Medical Journal, 7 November 1998, p. 1269]**

কৃষ্ণকায় দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের ভগ্নস্বাস্থ্যের একটি কারণ চিকিৎসক সম্প্রদায়

সম্প্রতি 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েসন কমিশন'-এর যে সাড়ে তিনহাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্ট বের হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, জাতিবিদ্বেষ ও পৃথকীকরণের যুগে (during the apartheid years) দেশের স্বাস্থ্যবিভাগ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, সেখানে কোটি কোটি কৃষ্ণকায় দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর স্বাস্থ্য অবহেলিত হচ্ছিল এবং তা জেনেও স্বাস্থ্যবিভাগ কোন বিরোধিতা করেনি (actively compromised)। কিছু ডাক্তার বিষাক্ত জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে যুদ্ধ (biological and chemical warfare) পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা কৃষ্ণকায়দের পানীয় জলে আনন্দ-উচ্ছসিত (ecstacy) হওয়ার ওষুধ মিশিয়ে দেওয়ার এবং কৃষ্ণকায় নারীদের ওষুধের দ্বারা বন্ধ্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। পুলিস হেপাজতে স্টিভ বিকোর লজ্জাজনকভাবে মৃত্যুর ব্যাপারে মেডিক্যাল বোর্ড রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর ডাক্তার ও নার্সদের অসদ্ব্যবহারের যথাযোগ্য অনুসন্ধান করেনি—এরূপ মন্তব্য কমিশন করেছে। **[British Medical Journal, 7 November 1998, p. 1269]** ❑

সুভাষিত-সংগ্রহ

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

নক্ষত্র-মালা—ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিকা : তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্থক প্রকাশনী, ৪০ মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬০। পৃষ্ঠা : ১৬। মূল্য : ৫ টাকা।

সাতাশটি মুক্তার সংগ্রহে রচিত কণ্ঠহারের নাম 'নক্ষত্র-মালা'। বেদ, উপনিষদ্, মহাভারত, পুরাণ ও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে সাতাশটি সুভাষিত সংগ্রহ করে অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন নক্ষত্র-মালা নামে আলোচ্য পুস্তিকাটি। ভাবের গভীরতায় ও অনবদ্য ব্যাখ্যায় নক্ষত্রের মতোই উজ্জ্বল এই সুভাষিত-সংগ্রহটি।

আজ থেকে একশ বছর আগে জোড়াসাঁকোর এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্ররূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পত্র নিয়ে ক্ষিতীশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ভারতবিশ্রুত বেদাচার্য পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রীর কাছে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ষড়ঙ্গ বেদ ও মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শোনা যায়, পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রবিড়ের কাছেও তিনি প্রাচীন রীতি অনুসারে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র পাঠ গ্রহণ করেন। প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও গভীর বিশ্লেষণের ফলে ক্ষিতীশচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে, বেদ ষড়ঙ্গে সম্পূর্ণ একটা প্রসিদ্ধিমাত্রই নয়, বেদ ও ব্যাকরণের মধ্যে চিন্তাধারার এক মূল ঐক্য বিদ্যমান। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা তুলনামূলক বিচারকে বৈদিক বাঙ্ময়ের অর্থ নিরূপণের প্রধান উৎস বলে মনে করেন। ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের যথোচিত মর্যাদা দিলেও বেদের ব্যাখ্যায় তাঁদের গবেষণাশৈলীকে সর্বোত্তম স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। Theodor Goldstucker তাঁর 'Panini : His place in Sanskrit Literature' শীর্ষক গ্রন্থে পাণিনির প্রক্রিয়াভাগের সঠিক বিশ্লেষণে সমর্থ হননি। 'অষ্টাধ্যায়ী'র অনধিক ৪০০০ সূত্রে কোন্ রীতি আশ্রয় করে সূত্রের বর্গীকরণ, পঞ্জীকরণ ও সংজ্ঞানিরূপণ করা হয়েছে তা বিশদভাবে আলোচনা করে ক্ষিতীশচন্দ্র পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র সম্ভাব্য পুনর্গঠনের কয়েকটি দিকে আলোকপাত করেন। তাঁর অভিমত ছিল যে, জগতের প্রত্যেকটি ভাষাই descriptive, prescriptive ও structural—এই তিনটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে। খ্রীস্ট-জন্মের ৭০০-৮০০ বছর আগেই সংস্কৃত ভাষা তার সংহত শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করেছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণের এই বিশ্লেষণে বৈয়াকরণের রীতি ও ভাষাতাত্ত্বিকের নিরীক্ষণ-পদ্ধতি—এই দুয়ের সংমিশ্রণ সর্বপ্রথম দেখান ক্ষিতীশচন্দ্র। অধ্যাপক বটকৃষ্ণ ঘোষ মূলত পাশ্চাত্য তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত ভাষার বিশ্লেষণ করেন। পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক সম্পূর্ণ রক্ষণশীল দৃষ্টিতে ব্যাকরণশাস্ত্রের উৎপত্তির ধারা বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু আচার্য ক্ষিতীশচন্দ্রের গবেষণায় বৈয়াকরণ, ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক—এই ত্রিমুখী বিশ্লেষণ-ধারার সমন্বয় দেখা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম দেখান যে, বেদ ও ব্যাকরণের মূলীভূত ঐক্যকে ঠিকমত অনুধাবন না করলে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বেদের বিভিন্ন প্রাতিশাখ্যের স্বর অক্ষর বর্ণ মাত্রা—এইগুলির বিশ্লেষণ যে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের শারীরবিজ্ঞানাশ্রিত বিশ্লেষণপদ্ধতির পূর্বসূচক, একথাও ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁর নানা প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar'-এ লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙ্ লৃট্ লুট্ প্রভৃতি দশটি ক্রিয়াভাব ও কালের উৎস বেদের কালতত্ত্বের মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর ব্যাকরণশাস্ত্রের বিশ্লেষণ মৌলিক ও রসগ্রাহী। ব্যাকরণশাস্ত্রের বিবর্তনের নানা দিক বিশ্লেষণের সঙ্গে শাস্ত্রবিধানের কয়েকটি অসঙ্গতির ওপরও (যেমন স্থানিবদ্ভাব) তিনি আলোকপাত করেন। 'মঞ্জুষা'য় (ডিসেম্বর ১৯৫৭) প্রকাশিত 'Was Panini a Communist?'—এই তাত্ত্বিক অসঙ্গতির ওপরে লেখা একটি অসামান্য সরস নিবন্ধ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'Vedic Selections' ক্ষিতীশচন্দ্রকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। বেদব্যাখ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ব্যাখ্যানশৈলীর প্রয়োগ, বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিনিয়োগের সহজ সরল ব্যাখ্যা ও সন্দিগ্ধ পদের বৈয়াকরণসম্মত ও ভাষাগত বিশ্লেষণ—এই ত্রিস্রোতের প্রবাহে তাঁর এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ।

আচার্য ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁর দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে দুইশতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) চান্দ্রব্যাকরণ, (২) আনো ভদ্রীয়ম্ সূক্তম্ (ক্ষুদ্র পুস্তিকা), (৩) মহাভাষ্য প্রথমাহ্নিক, (৪) হোমারের 'ইলিয়াড', BK I, (৫) Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar, (৬) কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি, (৭) শব্দকথা, (৮) ঊষার আলো, (৯) Convocation Address in Ancient India, (১০) স্ত্রীপ্রশংসা (বরাহমিহিরের শ্লোকাংশ), (১১) Popular Etymology, (১২) Greek Proverbs for Students of Sanskrit, (১৩) সিদ্ধান্তকৌমুদী (লীলাবতী-সহিতা), (১৪-১৬) 'রঘুবংশ', ১ম, ২য়, ৫ম সর্গ, (১৭) কিরাতার্জুনীয়ম্, প্রথম সর্গ, (১৮) ভট্টিকাব্য, প্রথম সর্গ, (১৯) ভগবদ্গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়, (২০) মথুরেশ কোশ,

(২১) নানার্থ সংগ্রহ, (২২) শব্দ-রত্নাবলী, (২৩) দেবীসূক্ত, (২৪) 'Vedic Selections', (২৫) Upasarga and other technical terms, (২৬) নক্ষত্র-মালা।

শিক্ষক হিসাবেও ক্ষিতীশচন্দ্র অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা তাঁর পাঠশ্রেণীতে যোগ দিতে আসত। সহস্রাধিক পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে পাঠনিবিষ্ট তাঁর সৌম্য স্নিগ্ধ মূর্তি প্রাচীন ভারতের ঋষিসমাজের স্মৃতি বহন করে আনত।

জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত **নক্ষত্র-মালা** তাঁর প্রতিভার একটি কিরণরেখা মাত্র। ক্ষিতীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ও রচনার একটি অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করা বাঙালীর জাতীয় কর্তব্য।

স্থানীয় ইতিহাস

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
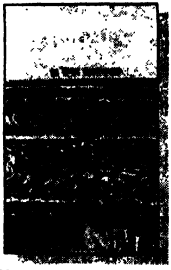
উনিশ শতকের রানাঘাট—তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: তপনকুমার ঘোষ, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা: ৮+১৭৯। মূল্য: ৫৫ টাকা।

ড০ তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **উনিশ শতকের রানাঘাট** স্থানীয় ইতিহাস হিসাবে একটি সার্থক উদ্যোগ। এই গ্রন্থে লেখক গ্রন্থপঞ্জীসহ তেরটি অনুচ্ছেদ রেখেছেন যার মাধ্যমে রানাঘাটের ব্রিটিশ প্রশাসন, দেশীয় জমিদার পরিবারসমূহ, সমকালীন পথঘাট ও যানবাহন, সমাজ-সংস্কৃতি, দৈব-দুর্বিপাক প্রভৃতি নিয়ে এক বিশেষ চালচিত্র তিনি পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। বিবৃত ঘটনার উপস্থাপনায় লেখকের শ্রমনিষ্ঠা প্রশংসার্হ। ঘটনার সজ্জাবিন্যাস ও পারম্পর্য রক্ষাও নজর কাড়ে। উনিশ শতকের রানাঘাট এলাকায় নীলচাষ এবং ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি বিবরণে লেখক বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। নদীয়া জেলার এক ইতিহাস-বিখ্যাত স্থান মহকুমা রানাঘাট। বঙ্গ ইতিহাসেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। রানাঘাট মহকুমার কলাইঘাটা গ্রাম শতবর্ষপূর্বে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানে ছিল রানী রাসমনির কুঠি। এখানে অবতরণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ মন্দির এবং এই গ্রামে এসেছিলেন পার্ষদবর্গ-সহ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। উল্লিখিত গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাসমূহের অনুপস্থিতি গ্রন্থটির এক বিশেষ ঘাটতি। তবে অন্যান্য আবশ্যকীয় বিবরণ সাবলীল ও তথ্যানুগভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ কেবল স্থানীয় ইতিহাসের চালচিত্র নয়, উনিশ শতকের বাংলা বিষয়ে গবেষণার এক সহকারী পুস্তক হিসাবে ব্যবহারের দাবিদারও। উনিশ শতকের ভাব-সঙ্ঘাতপূর্ণ বঙ্গসমাজের আলোচনায় এই গ্রন্থপাঠ জরুরী।

বীরভূমের ইতিহাস প্রসঙ্গে—গীতিকণ্ঠ মজুমদার। প্রকাশক: তপনকুমার ঘোষ, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা: ১০+৬৯। মূল্য: ২৫ টাকা।

বীরভূমের ইতিহাস প্রসঙ্গে গ্রন্থের লেখক গীতিকণ্ঠ মজুমদার বীরভূম অঞ্চলের ইতিহাস তুলে ধরার অভীপ্সা জানিয়েছেন গ্রন্থের ভূমিকায়। স্বল্পায়তন এই গ্রন্থে বীরভূম জেলার বিস্তৃত বিবরণ আশা করা অমূলক। শিরোনামে 'বীরভূমের ইতিহাস'-এর উল্লেখ থাকলেও বিবৃত আলোচনায় ঐতিহাসিক ঘটনার তেমন উপস্থাপনা ঘটেনি। গ্রন্থে অনুচ্ছেদ-বিন্যাস নেই, তবে তিনটি প্রধান বিভাগ চোখে পড়ে। সেগুলি হলো—বীরভূম নামকরণ ও অধিবাসী পরিচিতি, বীরভূমের ধর্ম-সংস্কৃতি এবং বীরভূমের কিছু উল্লেখ্য স্থান। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লেখকের উদ্যোগ স্মরণীয়। বীরভূমের আলকাপ, কবিগান, ভাদুগান, মন্দির, মেলা প্রভৃতির বর্ণনা মনোগ্রাহী। বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তবে ঐ অধ্যায়ে 'ক্ষার কুণ্ড' (পৃঃ ৫৪) বিষয়ে যে তাপমাত্রার উল্লেখ আছে সেটি সম্ভবত মুদ্রণ-প্রমাদ, সেটির সংশোধন জরুরী। লেখকের শ্রমনিষ্ঠা ও তথ্য পরিবেশনের দক্ষতা স্বীকার করেই জানাতে হচ্ছে, বীরভূমের বহু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস এই গ্রন্থে কিন্তু বাদ পড়েছে। বীরভূমের জমিদার পরিবারসমূহ, সমকালীন পথঘাট, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয় কেন গৃহীত হলো না তা অজ্ঞাত। সর্বোপরি অতীত বীরভূমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল 'সাঁওতাল পরগনা' (বর্তমানে যা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত)। লেখক সেপ্রসঙ্গ অবতারণাও করেননি। বীরভূমের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় উনিশ শতকের 'কৃষ্ণযাত্রা'র কিংবদন্তী পালাকার ও অভিনেতা। লোকসংস্কৃতির বিবরণে তাঁকেও বাদ দিয়েছেন লেখক। স্থানীয় ইতিহাস রচনায় এজাতীয় অনুল্লেখ অনুচিত। তবু এই উদ্যোগ স্মরণীয়। বীরভূমের উল্লেখ্য স্থানগুলির বিবরণে লেখক ইতিহাস, পুরাণ ও বিজ্ঞানের যে সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। ভ্রমণপিয়াসী পাঠক গ্রন্থটি থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সন্ধান পাবেন। ❑

ভগিনী নিবেদিতার মর্মরমূর্তি-প্রতিষ্ঠা

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে দার্জিলিঙের যে-শ্মশানে **ভগিনী নিবেদিতার** মরদেহ চিতাগ্নিতে উৎসর্গ করা হয়, সেখানে গত ২০ এপ্রিল '৯৯ তাঁর একটি মর্মরমূর্তির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা শিবির

পুরী মঠ (উড়িষ্যা) তিনটি গ্রামে স্বাস্থ্য-সচেতনতা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে প্রায় ৪,০০০ মানুষ যোগদান করে এবং প্রায় ৮০০ জনের চিকিৎসা করা হয়।

চিকিৎসা-শিবির

আগরতলা আশ্রমের (ত্রিপুরা) ধলেশ্বর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র গত ১৯ ও ২০ এপ্রিল '৯৯ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কিত একটি শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১০০ জনের চিকিৎসা করা হয়।

কানপুর আশ্রমের (উত্তরপ্রদেশ) মাধ্যমে গত ১৪ মার্চ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালিত হয়। শিবিরে ৫৬ জনের চোখ অস্ত্রোপচার করা হয়। পরে বিনামূল্যে সকলকে চশমা দেওয়া হয়।

লিমডি আশ্রম (গুজরাট) গত এপ্রিল মাসে একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৫১ জনের মধ্যে ৪৭ জনের প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা এবং ৪ জনের চোখ অস্ত্রোপচার করা হয়।

গত ২৮ মার্চ **আলসুর আশ্রম (কর্নাটক)** পরিচালিত চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরে ২০০ জনের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। তন্মধ্যে ৬৫ জনকে চশমা দেওয়া হয় এবং ১৩ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ত্রাণ

উত্তরপ্রদেশে ভূমিকম্প-ত্রাণ

বেলুড় মঠ রুদ্রপ্রয়াগ শিবিরের মাধ্যমে গাড়োয়াল অঞ্চলের উখিমঠ ও চামেলির পার্কান্ডি, ধর্সল প্রভৃতি ১৬টি গ্রামের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ৮৭৩টি পরিবারের মধ্যে ৭৫০টি ত্রিপল, ৮০০ কম্বল, ২৬.২ কুইন্টাল চাল, ২৩.৪ কুইন্টাল ময়দা, ২০৪টি লন্ঠন ও ৩৬৭টি মোমবাতি বিতরণ করেছে।

কলকাতা অগ্নিত্রাণ

বাগবাজার মঠের মাধ্যমে টালিগঞ্জ স্টেশনের বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১৬০টি পরিবারের মধ্যে ১৮২টি শাড়ি, ১৯৯টি ধুতি, ৩০০ সেট শিশুপোশাক, ১২৮২টি স্টীলের বাসন, ৬৪০টি অ্যালুমিনিয়াম পাত্র, ১৬০টি প্লাসটিক জলের মগ ও ১৫৭৯টি ব্যবহৃত পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

উড়িষ্যা অগ্নিত্রাণ

পুরী মিশন আশ্রমের মাধ্যমে খুরদা জেলার গদাতারা গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত ১৫টি পরিবারে বিছানার চাদর, কাপড়, রান্নার বাসনপত্র ও বাড়ি তৈরির জিনিসপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ দুঃস্থত্রাণ

ইছাপুর মঠ (হুগলী) ঘোষপুর ও কিশোরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ১১টি গ্রামের ৫০০ দুঃস্থ পরিবারে শিশুদের জন্য দুধ, ১,৫০০টি বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ও তোয়ালে বিতরণ করেছে।

পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গ বন্যা পুনর্বাসন

নরেন্দ্রপুর আশ্রমের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার ৮টি ব্লকের ৩৬টি গ্রামের মানুষের পুনর্বাসনের জন্য ৩৬০টি প্রায় সম্পূর্ণ ও ৩১৬টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি পুনঃসংস্কার, ১১০০টি পায়খানা তৈরি ও ৩১টি হ্যান্ড পাম্প স্থাপনের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

গুজরাট ঝঞ্ঝা পুনর্বাসন

পোরবন্দর আশ্রম জামনগর জেলার কৈলাসহর-সহ ৪টি গ্রামের ৭১টি ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে 'নিজের বাড়ি নিজে কর' প্রকল্প অনুযায়ী ২২,০০০ ঘরছাওয়ার খোলা বিতরণ করেছে। এছাড়া আশ্রম ২০টি বাড়ি, একটি কম্যুনিটি হল এবং একটি বিমান অবতরণক্ষেত্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা, আমেরিকা) ঃ গত মে মাসের প্রতি রবিবার ও দুটি শনিবারে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড (আমেরিকা) ঃ গত মে মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী শান্তরূপানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (আমেরিকা) ঃ গত মে মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে এবং প্রতি বুধবার 'গীতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রপন্নানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস (আমেরিকা) ঃ গত মে মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গে আলোচনা এবং প্রতি মঙ্গলবার বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল, আমেরিকা) ঃ গত মে মাসের তিনটি রবিবার ধর্মপ্রসঙ্গ এবং দুটি মঙ্গলবার 'দ্য গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' পাঠ ও আলোচনা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা ঃ গত ১৪ মে '৯৯ রাত্রে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় শপথ গ্রহণের আগে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল শ্যামলকুমার সেন সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী দর্শন করতে আসেন।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

চাকদহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ বিশেষ পূজা, হোম, এবং ২৭ জন দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করে। এই উপলক্ষ্যে ২১-২৩ ফেব্রুয়ারির প্রথম দুদিন যথাক্রমে সারাদিনব্যাপী রামকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন ও ভোলানাথ স্মৃতি সঙ্ঘ কর্তৃক গীতি-আলেখ্য এবং নিত্যগোপাল গোস্বামীর 'ভাগবত' পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিন বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী শেখরানন্দ ও স্বামী সত্যবোধানন্দ। সভান্তে 'ভগিনী নিবেদিতা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ঝামাপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০০৯) গত ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিদিন সকালে বিশেষ পূজা, হোম, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, দুপুরে প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গোপেশানন্দ ও স্বামী গোকুলেশানন্দ। দ্বিতীয় দিনের সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা, প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা সোমপ্রাণা। শেষদিনে স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন ভবানীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের (গদাধর আশ্রম) অধ্যক্ষ স্বামী ঋদ্ধানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ। এছাড়া প্রত্যহ ভক্তিগীতি, স্তোত্রপাঠাদি পরিবেশিত হয়।

হরিপাল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২০ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব স্মরণে এবং পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শোভাযাত্রা, ঊষাকীর্তন, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ এবং ভক্তিগীতি ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বরানন্দ। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ট্রাস্ট (কলকাতা-৭০০০৭৮) গত ২১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ বিশেষ পূজা, স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালন করে। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বোধাতীতানন্দ, স্বামী অভিজানন্দ ও ডঃ কমল নন্দী। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমের একটি অবৈতনিক কোচিং সেন্টার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সানবাঁধা বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে স্থানীয় সুধাংশু মুখার্জীর গৃহে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, বেদপাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য' বিষয়ে আলোচনা করেন বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিবেকাত্মানন্দ।

বেলডাঙ্গা সারদা-রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ বিশেষ পূজা, হোম ভক্তিগীতি, ভজনাদি এবং ধর্মসভার মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় প্রণব-ভারতী বিদ্যালয়ে। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী কাশীনাথানন্দ। এই উপলক্ষ্যে ৭৫ জন দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে ধুতি, শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়।

সাঁইথিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২১ ফেব্রুয়ারি '৯৯ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, বৈদিক স্তোত্র ও 'গীতা' পাঠ, ভক্তিগীতি এবং 'পুঁথি', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'কথামৃত' থেকে পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন চণ্ডীচরণ মণ্ডল, অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রণব দেবনাথ প্রমুখ এবং পাঠে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক মহাদেব দাস, চঞ্চল চন্দ্র প্রমুখ।

হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (রাউরকেলা, উড়িষ্যা) গত ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি '৯৯ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে 'রামচরিত মানস' পাঠ ও আলোচনা করেন এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলাত্মানন্দ। এদিন তিনি সঙ্ঘের একটি নবনির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয়েরও উদ্বোধন করেন। গত ১৪ মার্চ পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে আরেকটি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে 'কথামৃত', 'মায়ের কথা', স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' এবং 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' থেকে পাঠ করেন সারদা পাঠচক্রের সদস্যরা। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতার বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সঙ্ঘের সভাপতি নরেশচন্দ্র নায়ক ও দেবযানী পাঠক।

নাহারলগন বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল (ইটানগর, আসাম) গত ২১, ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ তিনদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। ২১ ফেব্রুয়ারি বালক-বালিকাদের মধ্যে অঙ্কন ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় শিশুদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সম্পর্কে ভাষণ দেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সভান্তে তিনি সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। তারপর পরিবেশিত হয় তমাল ব্যানার্জী ও সম্প্রদায়ের লীলাগীতি ও গীতি-আলেখ্য। ২৭ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ উৎসবের শেষদিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় স্বামীজী সম্পর্কে

ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ এবং ভজন পরিবেশন করেন ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের সম্পাদক স্বামী প্রথমানন্দ।

বহড়াগোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার এবং সেবা সমিতি (বিহার) গত ২২ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় শ্যামাশ্রী পণ্ডার উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের পর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন মৃত্যুঞ্জয় সাহু ও ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী এবং পৌরোহিত্য করেন সমিতির সভাপতি কালীপদ পণ্ডা।

বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা; পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যুবসম্মেলন, যাত্রাপালা, নাট্যানুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ২৬ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী ছিলেন সম্মেলনের সঞ্চালক। সম্মেলনে প্রায় ৭০০ যুব প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে দুপুরে প্রায় ৭০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং বিকেলে আয়োজিত হয় ধর্মসভা। সভায় সভাপতিত্ব ও একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দ এবং ভাষণ দেন কথাসাহিত্যিক হর্ষ দত্ত। এছাড়া বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বামী সোমাত্মানন্দ, প্রণবেশ চক্রবর্তী, ডঃ তাপস বসু প্রমুখ।

বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা-৭০০০৬৪) গত ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে তিনদিনই মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, স্তোত্রপাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, কালীকীর্তন, 'চণ্ডী' ও 'মায়ের কথা' পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় প্রথম দিনে স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী পুরাণানন্দ ও স্বামী ত্যাগরূপানন্দ এবং সভাপতিত্ব করেন কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দজী। দ্বিতীয় দিনে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণা এবং সভানেতৃত্ব করেন রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। উৎসবের শেষদিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয়ে আলোচনা করেন সারদাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন (বেলুড় মঠ) বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ এবং সভাপতিত্ব করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গোপেশানন্দ।

সারদা মিলন মেলা (কলকাতা-৭০০০২৬) গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ স্থানীয় বেলতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শ্রীশ্রীমায়ের চিত্রপ্রদর্শনী, মহিলাদের হস্তশিল্প প্রদর্শনী, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ছাত্রী-শিক্ষিকা-মহিলা সমাবেশ, ছাত্রীদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এবং আলোচনাসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের আলোচনাসভায় 'সেবাধর্ম ও শ্রীশ্রীমা' এবং 'আধুনিক শিক্ষা ও শ্রীশ্রীমা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা ধৃতিপ্রাণা, জ্যোৎস্না চ্যাটার্জী, অশ্রুকণা কোলে, ডাঃ মীরাতুন নাহার ও রাইকমল দাশগুপ্ত। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন পামেলি চক্রবর্তী। নন্দিতা দত্ত ও কৃষ্ণা সেন দুটি গীতি-আলেখ্য পরিচালনা করেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, হোম, প্রভাতফেরি, কীর্তন, ভজন ও ধর্মসভা। দুদিনের সভায় ভাষণ দেন স্বামী আপ্তকামানন্দ, স্বামী প্রাণদানন্দ, স্বামী সাংখ্যানন্দ, স্বামী অকল্মষানন্দ, স্বামী অমৃতলোকানন্দ ও কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ। উৎসবে প্রায় ৮,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

খড়্গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি (জেলা—মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ '৯৯ পর্যন্ত ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার আয়োজন করে। তিনদিনের সান্ধ্যসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ, স্বামী আত্মপ্রভানন্দ, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু, অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র রায়, ডঃ সুশীলা মণ্ডল এবং অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চুনীলাল ভট্টাচার্য, অলক চক্রবর্তী প্রমুখ এবং গীতি-আলেখ্য নিবেদন করেন সোসাইটির ভক্তবৃন্দ। উল্লেখ্য, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এই সোসাইটি মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, 'কথামৃত' প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কালীকীর্তন সমিতি (কলকাতা-৭০০০০৩) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সঙ্কীর্তন সহকারে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পরিচালনা করে।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির (জেলা—হুগলী) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে স্থানীয় কান্তি ব্যানার্জী বিদ্যালয়ে। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, হোম, গীতিনাট্য ও ধর্মসভা। সভায় 'চির প্রাসঙ্গিক শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দ, স্বামী ত্যাগরূপানন্দ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও অজিত ঘোষাল। উৎসবে প্রায় ১,৫০০ মানুষকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এদিন একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি ও

স্বামীজীর জীবনী আলোচনা এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকেলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ এবং ভাষণ দেন নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ, বারাসত ১নং ব্লকের বি.ডি.ও. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দত্তপুকুর মহেশ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক স্বর্ণকমল বিশ্বাস ও জাতীয় শিক্ষক সুব্রত বসু। অনুষ্ঠানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

কোতুলপুর শ্রীমা সারদা পাঠচক্রের (জেলা—বাঁকুড়া) উদ্যোগে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে বেদপাঠ, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে পাঠ এবং ধর্মসভা ছিল বিশেষ অনুষ্ঠিত বিষয়। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দ এবং বক্তৃতা দেন জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ ও সারদাপীঠের সহকারী সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দ। সভান্তে দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে ১৭টি বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দিরে (জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ বিশেষ পূজা, হোম, 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও স্বামীজীর উপদেশ পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমর পাড়ুই ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

চকপাড়া প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (জেলা—হাওড়া) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ভবতোষ দত্ত। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সত্যাশ্রয়ানন্দ, রণজিৎকুমার সিংহ প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুজাতা দে।

কোন্নগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মননসভা (জেলা—হুগলী) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, স্তোত্রপাঠ, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করেন সুবল চক্রবর্তী এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা শ্রীমানী ও রীমা চট্টোপাধ্যায়। বিকেলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দ, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ও দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। সভাশেষে সকলকে ধন্যবাদ দেন এবং সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

হালিসহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম ও ধর্মসভা। সকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণা ও ডঃ নমিতা দত্ত। বৈকালিক সভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাতনানন্দ ও স্বামী বেদজ্ঞানন্দ। উৎসবে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। উৎসবটি পরিচালনা করেন সঙ্ঘের সভাপতি বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

জামালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত সঙ্ঘ (মুঙ্গের, বিহার) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাটক ও ধর্মসভার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। সভায় ভক্তিগীতি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অতন্দ্রানন্দ ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দ।

পরমহংসে পরিষদ (কলকাতা-৭০০০০৩) গত ২ মার্চ '৯৯ পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও দোল উৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে দোলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন প্রব্রাজিকা জপপ্রাণা। পরে বাগবাজার কল্পতরু গোষ্ঠী কর্তৃক 'দোল উৎসব' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (বিহার) গত ৫-৭ মার্চ '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। উৎসবের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় বালক-বালিকাদের কবিতা, বক্তৃতা, সঙ্গীত, অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ এবং দ্বিতীয় দিনে পরিবেশিত হয় নামসঙ্কীর্তন। তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, নরনারায়ণসেবা ও ধর্মসভা। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে হিন্দি ও বাঙলায় ভাষণ প্রদত্ত হয়।

সাঁকরাইল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘে (জেলা—হাওড়া) গত ৬ মার্চ '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চিন্ময় মিত্র। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ, সুমিত্রা চক্রবর্তী ও স্বপন পুরকায়স্থ। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী অকল্মষানন্দ।

কটক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি (উড়িষ্যা) গত ৭ মার্চ '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে স্থানীয় বিবেকানন্দ আশ্রমে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালের ধর্মসভায় ডঃ চণ্ডী দাসের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ ও অধ্যাপক হৃদানন্দ রায়। দুপুরে উপস্থিত প্রায় ১,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকেলে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দ।

সম্বলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (উড়িষ্যা) গত ৭ মার্চ '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে স্থানীয় কালীবাড়ি-প্রাঙ্গণে। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি এবং 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা ছিল উৎসবের অনুষ্ঠিত বিষয়।

পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্র (গৌহাটী, আসাম) গত ১২-১৫ মার্চ '৯৯ চারদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। ১২ থেকে ১৪ তারিখ প্রতিদিন সান্ধ্য ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী যোগাত্মানন্দ, স্বামী সমচিত্তানন্দ, আশ্রমের সভাপতি প্রিয়াংশুপ্রবাল উপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ বাণীকান্ত শর্মা,

অধ্যাপক সুভাষ দে, অধ্যক্ষ ডঃ মৈত্রেয়ী বরা, অধ্যাপিকা ভারতী চক্রবর্তী প্রমুখ। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সমচিত্তানন্দ, শুভেন্দু ব্যানার্জী প্রমুখ। শেষদিন কামরূপা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ 'মহাতীর্থ কালীঘাট' যাত্রাপালা পরিবেশন করে।

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৩, ১৪ ও ১৫ মার্চ '৯৯ নগর-পরিক্রমা, যুবসম্মেলন, বিশেষ পূজাদি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর স্মরণে বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। ১৩ তারিখ সকালে নগর-পরিক্রমা এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের ওপর ভাষণদান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ১৪ তারিখ সকালে বিশেষ পূজা, হোম এবং সকাল দশটায় স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের পরিচালনায় একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩,৫০০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিবেকাত্মানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। শেষদিন সন্ধ্যায় কথায় ও সুরে 'কথামৃত' পরিবেশন করেন কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ।

কাঁচড়াপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থের (জেলা—নদীয়া) উদ্যোগে গত ১৩ মার্চ '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' ও 'গীতা' পাঠ এবং আলোচনাসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ নমিতা দত্ত ও জয়ানন্দ ভট্টাচার্য এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী অম্বিকেশ্বরানন্দ। সভান্তে স্থানীয় দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাগজ-কলম, পোশাকাদি বিতরণ করা হয়। তারপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

চিত্তরঞ্জন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (আমলাদহি, জেলা—বর্ধমান) গত ১৩ ও ১৪ মার্চ '৯৯ দুদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, রক্তদান-শিবির, যুবসম্মেলন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন জামতাড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দ, আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ এবং ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, ডঃ সুস্মিতা ঘোষ, প্রমীলা চিদাম্বরম, বিশ্বরূপ দে প্রমুখ। এদিন একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। উৎসবে দুদিনে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাঠচক্রের সম্পাদক কমলেন্দু বিশ্বাস।

বহির্ভারত

বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টার (হ্যানবারী স্ট্রীট, লন্ডন) গত ২ মে '৯৯ লন্ডনের কমার্শিয়াল স্ট্রীটস্থ টয়েনবি হল-এ বিকেল ৪টায় 'বিবেকানন্দ ফেস্টিভ্যাল '৯৯'-এর আয়োজন করে। দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত ফেস্টিভ্যাল-এর প্রথম পর্বে ছিল আলোচনাসভা, দ্বিতীয় পর্বে ছিল যুবসম্মেলন। মঙ্গলাচরণ, ভজন, পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনা ছিল প্রথম পর্বের অঙ্গ। এই পর্বের প্রথম চারটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন আরতি ভট্টাচার্য, ইভ রাইট, উমা বসু, সুস্মিতা দাস, দেবলীন মুখার্জী প্রমুখ। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল : 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ফর হিউম্যান এক্সেলেন্স'। আলোচনাসভায় সম্মানিত অতিথি ছিলেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন আমেরিকার বেদান্ত সোসাইটি অফ ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল)-এর অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। মূল আলোচক ছিলেন ইংল্যান্ডের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের (বোর্ন এন্ড) অধ্যক্ষ স্বামী দয়াত্মানন্দ। অন্যান্য আলোচকদের মধ্যে ছিলেন ইংল্যান্ডে ভারতীয় হাইকমিশনের মিনিস্টার অধ্যাপক ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এ. এইচ মাসুদ আলী প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দান করেন ডঃ এস. কে. বসু, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এস. কে. ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন ডঃ চিত্ত সেনগুপ্ত। যুবসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দিলীপ লাখনি। যুবসম্মেলনে ভাষণ দেন সুমন ঘোষ, রাজ ব্যানার্জী, দক্ষ প্যাটেল, প্রিয় জাদেজা, দীপা পারেখ প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ গত ১৪ এপ্রিল থেকে ৩ মে '৯৯ পর্যন্ত প্যারিস, আমস্টারডাম, মালটা, সিসিলি, রোম, ভ্যাটিক্যান সিটি, জেনিভা, লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ প্রভৃতি সফর করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **গীতাঙ্কুর আইচ রায়** গত ১১ মার্চ '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। কর্মজীবনে তিনি কসবা চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বহু বছর ধরে তিনি স্থানীয় পশ্চিম রাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরিচালনা করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য **হৃষিকেশ গাঙ্গুলী** গত ১৫ মার্চ '৯৯ কল্যাণী নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি স্থানীয় হালিসহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘের সভাপতি এবং উত্তর কোটালিপাড়া রামমোহন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতার জন্য তিনি পরিচিতজনের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত, মেদিনীপুর নিবাসী **আশুতোষ দে** গত ৬ এপ্রিল '৯৯ বিকেল ২.৪৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে তিনি ছিলেন একান্ত নিবেদিত-প্রাণ।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বর্ধমান-নিবাসিনী **মাধুরী মজুমদার** গত ৬ এপ্রিল '৯৯ রাত ১১.৩০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। ❑

বড় হইতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ
১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব।
৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ শোক তাপ—এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রকাশিত হয়েছে
প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামীর
২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্'-এর তাৎপর্য্যানুসারে
ডঃ বিজন গোস্বামী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত
সুললিত গদ্যে দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ সচিত্র

শ্রীমদ্ভাগবত ৩০০ টাকা

প্রভুপাদ রাধাবিনোদজীর ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা ও ব্যাখ্যা-সহ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' গ্রন্থটিও পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য ৪,৮৫০ টাকা। এছাড়া পাওয়া যাচ্ছে—

শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত **শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ**
চারখণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ-র মূল্য ১২৫০ টাকা। বর্তমানে ৯৫০ টাকায় পাবেন।
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর **শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ**
১ম খণ্ড ১৩৫, ২য় খণ্ড ১৩৫, অখণ্ড ২৫০
শ্রীরূপ গোস্বামীর **বিদগ্ধমাধব নাটকং** ১৩৫
শ্রীরূপ গোস্বামীর **ললিতমাধব নাটকং** ১৪০
শ্রীরূপ গোস্বামীর **দানকেলিকৌমুদী** ৭৫
শ্রীনিত্যানন্দ দাস প্রণীত **প্রেম-বিলাস** ১৪০
শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত **শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত** ২৫০
অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত **ভক্তিযোগ** ৬০

মহেশ লাইব্রেরী ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীর প্রধান শিষ্য
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের বইগুলি পাওয়া যাচ্ছে—

১। জগতের মধ্যে আমি—
আমার মধ্যে জগৎ
জগৎ ও আমি ১৭৫ টাকা
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিস্তৃত
যৌগিক ব্যাখ্যা সমন্বিত
সুরধুনী গীতা ১৩৫ টাকা
৩। শ্রীমদ্ভগবদগীতার সংক্ষিপ্ত যৌগিক টীকা সমন্বিত
আর্য্যমিশন গীতা ৫০ টাকা

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের শিষ্য শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের
পথহারার পথ ও দ্বাদশবাণী ৪৫ টাকা

শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রথম ব্রহ্মচারী শিষ্য
শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর
সরল যোগ-সাধন ১২০ টাকা

মহেশ লাইব্রেরী ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, ফোন : ২৪১-৭৪৭৯
।। স্থানীয় বইয়ের দোকানে খোঁজ করুন।।

শ্রীসারদা মঠের ত্রৈমাসিক বাঙলা মুখপত্র

নি বো ধ ত

ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করছে আগামী জুলাই '৯৯-এ।

নতুন আঙ্গিক ও বিষয়বৈচিত্র্যে বিন্যস্ত জুলাই সংখ্যাটি যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ হতে চলেছে তাঁদের মধ্যে আছেন :

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	:	*জীবন আমাকে কি শিখিয়েছে*
প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা	:	*আধ্যাত্মিকতা ও ঠাকুর-মা-স্বামীজীর উদার ভাবনা*
প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা	:	*রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ ও শ্রীসারদা মঠ*
অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত	:	*নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাচরিত্র*
প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা	:	*স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা*
অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু	:	*উইম্বলডনের মার্গারেট : কিছু তথ্য ও ভাবনা*

এই সংখ্যার আরো আকর্ষণ : বিজ্ঞাননিবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, পুরাণকথা, বর্তমান সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ষারম্ভ—জুলাই। বছরের চারটি সংখ্যা যথাক্রমে জুলাই, অক্টোবর, জানুয়ারি (বিশেষ সংখ্যা) ও এপ্রিলে প্রকাশিত হয়।

প্রতি সংখ্যার মূল্য : ১২ টাকা ◆ বিশেষ সংখ্যার মূল্য : ১৫ টাকা

গ্রাহক-চাঁদা শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর বা তার যেকোন শাখাকেন্দ্রে ব্যক্তিগতভাবে জমা দিতে পারেন। M.O. অথবা Bank Draft 'Sri Sarada Math'—এই নামে এবং 'কার্যাধ্যক্ষা, নিবোধত পত্রিকা, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০০৭৬'—এই ঠিকানায় পাঠাবেন।

প্রতিটি চুমুকে — কড়া আমেজ!
কুকমী সিলেক্ট
সি টি সি লীফ চা
COOKME SELECT
Cookme
CTC LEAF TEA
নিবেদন করছেন
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০০৭

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

ধনসম্পদ ইহকালের সম্পদ, সঙ্গে যাবে না। সাধন-ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই, ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।

শ্রীমা সারদাদেবী

❋

কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া-৯৪৫১৮, টেলি : ৯২৫-৮২৫৯৪৩৩

দিল্লী

- রামকৃষ্ণ মিশন
  রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লী-১১০০৫৫
- পারমিতা ঘোষাল
  ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী-১১০০১৯
- মঞ্জুলা ঘোষ
  সি-৫৩৬, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী-১১০০১৯

আসাম

- রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর
- রামকৃষ্ণ মঠ, করিমগঞ্জ
- রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বঙ্গাইগাঁও
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি
  মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, জি. এন. বি. রোড
  পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- পরিমলকৃষ্ণ পাল
  প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট
  পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়, পিন-৭৮৩৩৭০
- এম. কে. বুক সেলার্স, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর

ত্রিপুরা

- রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
  পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
  উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম
  পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫

নাগাল্যান্ড

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

অরুণাচল প্রদেশ

- শ্যামল সিনহা রায়
  সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, নাহারলগন, ইটানগর

উড়িষ্যা

- রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রতীর্থ, পুরী
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি
  খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হামিরপুর, রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

বিহার

- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি
  বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
  রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
  ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮
- রীতা ভট্টাচার্য
  'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০

মধ্যপ্রদেশ

- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ
  কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

মহারাষ্ট্র

- রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার
  মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- প্রদীপচন্দ্র পাল
  'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮,
  বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- মহুয়া দাশগুপ্তা
  ৮-এ/১১ বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- সলিলচন্দ্র ঘোষ
  সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- মীরা মিত্র, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র
  ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর
  বরোদা-৩৯১৩২০
- মোহিতরঞ্জন দাস
  ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  পোঃ অঙ্কলেশ্বর, পিন : ৩৯৩০১০

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248
554-2403

Vol. 101 □ No. 6 □ JUNE 1999

Licence No.
WB/NC/CL-3

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Reg. No. WB/NC

গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ❑ পঁয়ষট্টি টাকা ❑ সডাক সংগ্রহ ❑ পঁচাত্তর টাকা
পৃথক ভাবে কিনলে ❑ প্রতি সংখ্যা ❑ আট টাকা ❑ শারদীয়া সংখ্যা ❑ চল্লিশ টাকা

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

১৪০৬ ▫ ৭ম সংখ্যা

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত

বিবেকানন্দ ইল্লম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

বিবেকানন্দ ইল্লম একটি পবিত্র ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই ভবনটি একটি তীর্থক্ষেত্র। স্বামীজী পূর্ণ নয়দিন এখানে অবস্থান করেছেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, উপদেশ দান করেছেন, ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেছেন। তাঁর অদৃশ্য, দিব্য উপস্থিতিতে স্থানটি এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে, শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী চেন্নাইয়ের এই বাংলোয় উঠেছিলেন। তখন বাড়িটির নাম ছিল 'আইস হাউস' বা 'ক্যাসল কার্নন'। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় ভারতের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে তেজোদীপ্ত বাণী প্রদান করেছিলেন তা ইংরেজীতে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বা বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা, আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে এই বাড়িটিতেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত স্বামীজীর বাণীর ঐতিহাসিক পীঠভূমি।

আমরা এখানে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে চাইছি, যেখানে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত হবে। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্রসমূহ, অন্যান্য সুন্দর চিত্র, মডেল, ভিডিওগ্রাফ, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রাণপ্রদ বাণীর প্রচারকেন্দ্র-রূপে এই বাড়িটিকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করছি।

১৮৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই বাড়িটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই পবিত্র কাজটি শুরু করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে এবং স্বামীজীর সকল অনুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের উদার দাক্ষিণ্যে আমরা এই মহান কাজ সম্পন্ন করার আশা রাখি।

এবাবদ সমস্ত আর্থিক দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে দান পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ

অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯

ই. মেল : srkmath@vsnl.com

ওয়েবসাইট : www.sriramakrishnamath.org

☎ ঃ ৬৫৪-৪৬৪৫

বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি

১১, শরৎ চন্দ্র আটা লেন, বেলুড় মঠ, হাওড়া

পিন-৭১১ ২০২

রেজিঃ নং—এস/৫৩৭৮৯

আবেদন

১৯৮২ সালের জুন মাসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের ঐকান্তিক উৎসাহে আমরা 'বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করি। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের দুঃস্থ, অবহেলিত ও নিপীড়িত মহিলাদের স্বাবলম্বী ও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

বিগত আঠার বছর ধরে একটি ছোট ভাড়াবাড়িতে সমিতি তার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন শাখা খুলে তার কাজকর্ম চালাচ্ছে। বর্তমানে সমিতির কাজ প্রচুর বেড়ে যাওয়ায় জায়গার অভাবে কাজ চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই সমিতির নিজস্ব একটি গৃহ নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উক্ত গৃহ নির্মাণের জন্য আনুমানিক সাত লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমরা এই গৃহ নির্মাণের জন্য মুক্তহস্তে দানের আবেদন জানাচ্ছি যাতে পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের অভীপ্সিত পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতির এই প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে।

চেক বা ড্রাফট্ দিতে হলে 'বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি'-র নামে হবে। মানি অর্ডার পাঠাতে হলে—**সম্পাদিকা, বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি, ১১ শরৎ চন্দ্র আটা লেন, পোঃ বেলুড় মঠ, পিন-৭১১ ২০২, জেলা ঃ হাওড়া** এবং **সভানেত্রী উষা মজুমদার, ৭৮৫ 'পি' ব্লক, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩**—এই ঠিকানায় পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল দানই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতিতে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

দীপ্তি ভৌমিক
সম্পাদিকা

উদ্বোধন ॥১০১॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০১তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৪০৬ জুলাই ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ৩১৩
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শ্রীমা সারদাদেবী : নির্বিবাদ (১) ৩১৪
❑ সঙ্কলন ❑
'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা—শ্রীম ৩১৭
❑ ভাষণ ❑
দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি—স্বামী ভূতেশানন্দ ৩১৮
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসেতু স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৩২৩
❑ আলোচনা ❑
অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ—স্বামী নির্বাণানন্দ ৩২৬
❑ পরিক্রমা ❑
জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ—স্বামী অচ্যুতানন্দ ৩৪৪
❑ গবেষণা ❑
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব—সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ৩৩০
নজরুলের 'বিষের বাঁশী' : অক্ষয় দত্তগুপ্ত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য—উদয়ন মিত্র ৩৪০
❑ স্মরণ ❑
বনফুল প্রসঙ্গে—সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৭
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ (৭)—কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত ৩২৯
❑ পরমপদকমলে ❑
ইঁদুর—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩৫১
❑ বিজ্ঞান ❑
খাওয়া নিয়ে সংস্কার—অমিতাভ ভট্টাচার্য ৩৫৬
❑ সুস্বাস্থ্য ❑
স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—সত্যানন্দ চক্রবর্তী ৩৫৮
❑ ক্রীড়াজগৎ ❑
অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ে ক্রিকেটই গৌরবান্বিত—জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৩
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
রানী রাসমণির বাড়ি ৩৪৮
'নীলকণ্ঠ মহাদেব' ৩৪৮
'উদ্বোধন' না 'অক্সিজেন'? ৩৪৮
যোগাসনে রোগমুক্তি ৩৪৮
মেদ ও হোমিওচিকিৎসা ৩৪৯
কিছু সাধারণ টোটকা ৩৫০
ঘরোয়া পদ্ধতি ৩৫০
❑ কবিতা ❑
তোমাকে দেখেছি—অরুণাংশু ঘোষ ৩৩৫
মাটিতে পড়া ফুল—মঞ্জুশ্রী মৈত্র ৩৩৫
কী মহিমা তব—আভা গুহ ৩৩৫
জগদ্গুরুঃ শরণম্—সোনালী মুখার্জী ৩৩৬
হঠাৎ যখন—রেণুকা নাথ ৩৩৬
তোমাকে প্রণাম—বৈদ্যনাথ গুপ্ত ৩৩৬
দেখা—মাধবকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৩৬
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
গ্রন্থ-পরিচয় • গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি উন্নয়ন প্রকল্প—জলধিকুমার সরকার ৩৫৯
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৩৬০
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৩৬০ বিবিধ সংবাদ ৩৬১
❑ অন্যান্য ❑
অনুষ্ঠান-সূচী (ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৬) ৩২২
'উদ্বোধন'-এ রচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ৩৫২
আবেদন : স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা ৩৩৪

❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি টি পি-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র : অদ্বৈত আশ্রম
বর্তমান বর্ষের (১৪০৫-১৪০৬/১৯৯৯) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

'উদ্বোধন' ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৬ সংখ্যা

গ্রাহকদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **সংখ্যাটির মূল্য ঃ ৪০ টাকা।**
- **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা **২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে** অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। **অতিরিক্ত কপি ডাকযোগে নিলে রেজিস্ট্রি ডাকখরচ** বাবদ **অতিরিক্ত ১৯ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে।** কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো দেখিয়ে **২৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ থেকে ১৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
- আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ **শারদীয়া সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না পেলে আমাদের পক্ষে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- ডাকযোগে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ২৪ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা ডাকযোগেই** (By Post) **যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।**
- যাঁরা আমাদের **গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলির** মাধ্যমে **সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির** মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে **সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট '৯৯-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে।**
- অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) **সংগ্রহ করার সংবাদ** কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।**
- **যাঁরা ডাকযোগে** (By Post) **পত্রিকা নেন তাঁরা চাইলে শারদীয়া সংখ্যাটি** রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেজন্য **তাঁদের প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ১৯ টাকা** পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ১৯ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে **এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, **গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।
- **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের **শারদীয়া** সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) সংগ্রহ করবেন, তাঁদের **বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রশিদটি সঙ্গে** নিয়ে **আসতে হবে (যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ২৪ আগস্ট '৯৯-এর** মধ্যে **সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে) নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে **আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- যাঁরা প্রতি মাসে পত্রিকা **ব্যক্তিগতভাবে** সংগ্রহ করেন এবং **যাঁরা শুধুমাত্র শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে** সংগ্রহ **করবেন তাঁরা ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত শারদীয়া সংখ্যাটি** কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন **এই** সময়ের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে **২৬ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বরের ('৯৯) মধ্যে অবশ্যই** সংগ্রহ **করতে হবে। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য তার পর সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।** আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের **সহৃদয় সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।
- **কার্যালয় কাজের দিন (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। ৯ অক্টোবর মহালয়া এবং ১৬ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২৬ অক্টোবর '৯৯ মঙ্গলবার কার্যালয় খুলবে।**
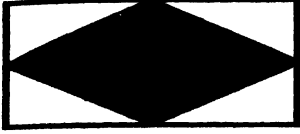
শ্রাবণ ১৪০৬
জুলাই ১৯৯৯

❀ [মনের দুর্বলতা] প্রকৃতির নিয়ম, যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা আছে না! তেমনি মনও কখনো ভাল, কখনো মন্দ হয়।

❀ রাত তিনটের সময় উঠে... বারান্দায় বসে জপ কর না, দেখি কেমন মনে শান্তি না আসে। তা তো করবে না, কেবল অশান্তি অশান্তি...।

❀ জপধ্যান করতে করতে দেখবে—(ঠাকুরকে দেখিয়ে) উনি কথা কবেন, মনে যে-বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কী শান্তি প্রাণে আসবে!

❀ আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস করে কি যায়? এও [ঈশ্বরদর্শন] তো তেমনি।

❀ যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পারে, এক্ষুণি হয়।

❀ সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে নিচুতে। জলকে কি ডেকে বলতে হয়—ওগো সূর্য, তুমি আমাকে ওপরে তুলে নাও? সূর্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প করে ওপরে তুলে নেয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

সারদাদেবীর জীবন ও বাণীর সর্বাধিক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণী, তাঁহার বাণীই তাঁহার জীবন। বস্তুত, জীবন ও বাণীর মধ্যে, প্রচারিত তত্ত্ব বা আদর্শ ও আচরিত কর্মের মধ্যে এই সমন্বয় সর্বযুগের, সর্বদেশের মহাপুরুষ ও আচার্যদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে অবস্থান করিয়া, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকিয়া জীবনের প্রতিটি আচরণে সারদাদেবী যেভাবে ঐ সমন্বয়কে জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তেমনটি আর কখনো কাহারো মধ্যে দেখা যায় নাই।

উপনিষদ্ বলিতেছেন ঃ মানুষের সত্তায় রহিয়াছে ব্রহ্মের নির্যাস, ব্রহ্মের সত্তা। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। উপনিষদের ভাষায়—"রসো বৈ সঃ।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।৭) মানুষের সব 'রস' বা আনন্দের উৎস তিনি। বস্তুত, তাঁহার নিকট হইতে উৎসারিত রসকে লাভ করিয়াই মানুষ আনন্দ পায়। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (ঐ) উপনিষদের সেই বিখ্যাত বাণী এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসিতেছে ঃ "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" (ঐ, ৩।৬)—পিতা বরুণের নিকট ভৃগু জানিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ, আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণীর জন্ম। আনন্দকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত প্রাণী বাঁচিয়া থাকে। [মৃত্যুকালে] আনন্দের অভিমুখেই তাহারা যাত্রা করে এবং অবশেষে আনন্দেই বিলীন হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু কবিতায় মানুষের এই আনন্দস্বরূপতার কথা, বিশ্বের সর্বত্র সর্বক্ষণ প্রবাহিত আনন্দতরঙ্গের সংবাদ নানাভাবে বলিয়াছেন, যেমন বলিয়াছেন এই কবিতা অথবা গানটিতে ঃ

"সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন।

*

আনন্দ চিত্ত-মাঝে আনন্দ সর্বকাজে,
আনন্দ সর্বকালে দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যুবিরহে শোকে—
জয় জয় আনন্দময়।।"

আনন্দই যেহেতু আমাদের সত্তা, আমাদের স্বরূপ, সেজন্য বিধাতার ইচ্ছা—আমরা যেন সবসময় আনন্দেই অবস্থান করি। কিন্তু কর্মক্ষেত্র, সমাজ, সংসার, পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক সময় এমন জটিল হইয়া উঠে, এমন দিকে মোড় লয় যে, আমাদের মনে আনন্দের তরঙ্গকে ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া আমাদের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং যথার্থ প্রাপ্তির মধ্যে অনেক সময়েই এমন ব্যবধান থাকিয়া যায় যে, হতাশা, দুঃখ ও বিষণ্ণতার আগমনকে ঠেকানো কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের অধিকাংশেরই চাহিদার কোন শেষ নাই, আবার কিসে প্রকৃত সুখী হইব সে-সম্বন্ধেও কোন ধারণা নাই। ফলে অধিকাংশ সময়েই আমরা আমাদের সজ্ঞানে অথবা অজান্তে আমাদের জীবনে দুঃখ ও নৈরাশ্যকে বরণ করিয়া আনি। ফলে দুঃখ ও নৈরাশ্য অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া দাঁড়ায় আমাদেরই সৃষ্টি, আমাদেরই গড়া। 'সন্তোষ' নামক মনের যে অবস্থা, উহার প্রাপ্তি প্রায়শই আমাদের নাগালের বাহিরে থাকিয়া যায়। জীবনে দুঃখ, দুর্দৈব, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ব্যাধি, বিপর্যয়, মৃত্যু তো থাকিবেই। এগুলি যেমন সত্য তেমনি সত্য সুখ, আনন্দ, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা, স্বাস্থ্য ও নতুন প্রাণের জন্ম।

বস্তুত, এই দুই অবস্থা 'জীবন' নামক অভিযাত্রার দুই অংশ। উহারা যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ভারতের জীবনদর্শন উভয়কেই স্বীকার করে, উভয়কেই বরণ করিতে শিক্ষা দেয়। এই স্বীকৃতি বা বরণ কিন্তু নিশ্চেষ্ট বা নিরুপায় স্বীকৃতি বা উপায়ান্তরহীন (callous) আত্মসমর্পণ নয়। এই স্বীকৃতি বা বরণ হইবে স্বেচ্ছায়, সানন্দে। এই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অঙ্গীকার হইতেই উঠিয়া আসে আমাদের জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত এবং পরম গুরুত্বপূর্ণ সেই অনুভূতি যাহাকে আমরা বলি 'সন্তোষ'। 'সন্তোষ' শব্দের অর্থ প্রফুল্লতা সদাপ্রফুল্লতা—নির্বিষাদ। বিষাদ বা বিষণ্ণতার লেশমাত্র সেখানে থাকে না। আচার্য রামানুজ মনের এই অবস্থাকে বলিয়াছেন "অনবসাদ"। এই নির্বিষাদ বা অনবসাদ ভারতের সনাতন জীবনদর্শনের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা নেতিবাচক নয়, একান্তভাবেই ইতিবাচক। সর্বতোভাবেই ইহা একটি ধ্রুববাদী অনুভূতি। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁহার জীবনের প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি কর্ম, কথা ও আচরণে ইহাকে জীবন্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

সারদাদেবীর জীবনে দুঃখের কোন কমতি ছিল না। বলা যায়, সাধারণভাবে দেখিলে তাঁহার জীবনের অনেক সময় অভাব-অনটন, পারিবারিক অশান্তি, আত্মীয়-স্বজনদের ঈর্ষা কলহ শত্রুতা অনিষ্টাচরণ, সামাজিক সঙ্ঘর্ষ ও সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। যেভাবে সেই অভাব-অনটন, অশান্তি, কলহ ও সঙ্ঘর্ষে তিনি অবিচল থাকিয়াছেন, মনের প্রশান্তি, স্থৈর্য এবং আনন্দকে অটুট রাখিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত, গীতায় (৬।২২) অর্জুনের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের সেই সুপ্রসিদ্ধ কথাগুলি তাঁহার মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেমন জীবন্ত ছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঃ

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।"

অর্থাৎ, যাহা লাভ করিলে তদপেক্ষা অধিক কিছু লাভ করিবার কথা মনে হয় না এবং যে-অবস্থায় স্থিত হইলে মহাদুঃখও বিচলিত করিতে পারে না। ঐ অবস্থাকে গীতায় শ্রীভগবান 'ব্রাহ্মীস্থিতি' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সারদাদেবী সর্বদা সেই ভূমিতেই অবস্থান করিতেন।

সংসারে আমরা সামান্য দুঃখে অথবা অশান্তিতে ভাঙিয়া পড়ি, অবসাদ ও নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাই। বিশ্বাসভঙ্গের যাতনা, ব্যাধির ক্লেশ, অর্থের অনটন, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, আকাঙ্ক্ষাপূরণে ব্যর্থতা আমাদের ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে। সম্মানহানিতে অথবা সম্মানহানির আশঙ্কায় আমরা বিষাদগ্রস্ত হই। শুধু আমরা কেন, কুরুক্ষেত্রের নায়ক মহাবীর অর্জুনকেও দেখিয়াছি তিনি কতখানি বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই অবস্থা হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। উত্তোলন করিয়াছিলেন সেই ভূমিতে যেখানে অবস্থান করিবার যোগ্যতা অর্জন করিলে বিষাদ কখনো মানুষকে দুর্বল করিতে পারে না, অবসাদ কখনো আচ্ছন্ন করিতে পারে না। আমরা জানি, অর্জুনের সেই নির্বিষাদ অবস্থালাভ শ্রীভগবানের উপদেশে সম্ভব হইয়াছিল।

কাহিনী-কিংবদন্তী এবং ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্তের কথা আমরা জানিতে পারি, যেখানে মহাপুরুষের উপদেশে মানুষ বিষাদের ভূমি হইতে উত্তরণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সারদাদেবীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি, নির্বিষাদ অবস্থা আয়ত্ত করিবার জন্য তাঁহাকে কাহারো কাছে উপদেশলাভ করিতে হয় নাই। ইহা ছিল তাঁহার স্বভাবের অন্তর্গত। জীবনের বিভিন্ন সময় নানা জটিল অবস্থার মধ্যে পড়িলেও তিনি কখনো তাঁহার মনে নৈরাশ্য বা বিষাদকে মাথা তুলিতে দেন নাই। তাঁহার আশেপাশে যাহারা ছিল তাহারাও তাঁহার জীবন হইতে সেই শিক্ষালাভ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ জীবনশিল্প সারদাদেবীর সহজাত নির্বিষাদকে অবশ্যই পরিপুষ্ট করিতে সাহায্য করিয়াছিল। "জগদম্বার বালক" শ্রীরামকৃষ্ণকে সকলেই সবসময় আনন্দে অবস্থান করিতে দেখিতেন। তিনি যেমন নিজে আনন্দে থাকিতেন তেমনি সকলকে আনন্দে ভাসাইতেন। সারদাদেবী তাঁহার সম্পর্কে বলিতেন ঃ "কী সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! ... আমার জ্ঞানে তো আমি কখনো তাঁর অশান্তি দেখিনি।"

সারদাদেবীও তাঁহার জীবনকে একটি অসাধারণ শিল্পে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও কেহ কখনো বিষণ্ণ দেখে নাই। পরবর্তী কালে তিনি বলিতেন ঃ "[লোকে] কেবল [বলে] অশান্তি, অশান্তি—কিসের অশান্তি...? আমি তো, মা, তখন [দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে] অশান্তি কেমন জানতুম না।" অথচ দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে অশান্তি হইবার যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিল। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের একতলায় যে-ঘরে তিনি থাকিতেন তাহা ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অন্ধকার। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ উহার নাম দিয়াছিলেন 'খাঁচা'। ঘরটির সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র একটি বারান্দা সংলগ্ন থাকিলেও সেই বারান্দাটিই ছিল তাঁহার রান্নাঘর। সেখানে একদিকে থাকিত জ্বালানীর কাঠ, ঘুঁটে ইত্যাদি, আর ঐ ক্ষুদ্র ঘরে ছিল তাঁহার যাবতীয় সংসার। সেখানেই থাকা, সেখানেই খাওয়া, সেখানেই বিশ্রাম, আর বারান্দায় রান্না। রান্না শুধু তাঁহার ও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই নয়, রান্না আরো অনেকের জন্য। যখন তখন ভক্তরা আসিতেছেন—পুরুষভক্ত এবং মহিলাভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তখন কাহারো মাধ্যমে নহবতে নির্দেশ পাঠাইতেছেন—অমুক অমুক খাইবে। এক-একজন ভক্তের জন্য আবার এক-একরকমের রান্নার ফরমায়েশ হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও ভক্তদের সেবা ভিন্ন যতদিন শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার সেবাও সারদাদেবীকে করিতে হইত। তিনি শেষ বয়সে নহবতের দোতলায় থাকিতেন। বস্তুত, রাত্রিতে বিশ্রামে যাইবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার হাড়ভাঙা পরিশ্রম চলিত। শুধু রান্না ও ভক্তসেবাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মহিলাভক্তরা আসিলে দিনের বেলা এবং কখনো কখনো রাত্রিতে তাহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হইত ঐ ক্ষুদ্র ঘরটিতেই। সেখানে চাল-ডাল, আনাজ, বিছানা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার পর আর কতটুকুই বা জায়গা থাকিত? কিন্তু উহার মধ্যেই তাঁহাকে সবকিছু লইয়া, সবাইকে লইয়া থাকিতে হইত।

এমন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার মনে অশান্তি আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। ইহা ছাড়া অন্যান্য কারণও ছিল, যাহাতে অশান্তির প্রভূত উপাদান ছিল। ঐ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ঘরে থাকিলে স্বাভাবিকভাবেই মনের গভীরে একঘেয়েমি দানা বাঁধে। তখন বাহিরে মুক্ত আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস লইবার জন্য মন আকুলি-বিকুলি করে। কিন্তু সারদাদেবীর ঐ ঘরের বাহিরে আসার অবকাশ ছিল না। তখনকার সামাজিক পর্দাপ্রথা এমনই কঠোর ছিল যে, মেয়েদের বাহিরে একাকী কোথাও যাওয়া শুধু নিষিদ্ধই ছিল না, ছিল নিন্দিতও। তাহার উপর সারদাদেবী স্বভাবতই ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীলা। ফলে নহবতের ঐ ক্ষুদ্র কক্ষটির বাহিরে আসা তাঁহার প্রায় হইতই না। সারদাদেবী ছিলেন সাধারণ নারীদের তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী। নহবতের ক্ষুদ্র কক্ষটির দরজা ছিল খুবই ছোট। ঘর হইতে বারান্দায় বারবার তাঁহাকে আসা-যাওয়া করিতে হইত। ইহাতে অনেকবার তাঁহার মাথা দরজায় ঠুকিয়া যাইত। রক্তপাতও হইয়াছে কখনো কখনো। তাঁহার নিজের কথাতেই তাঁহার তখনকার জীবনযাত্রার একটি রূপরেখা আমরা পাই ঃ

"রাত চারটেয় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। [নহবতে] নিচের একটুখানি ঘর, তা

আবার জিনিসপত্রে ভরা।... তবু... কোন কষ্ট জানিনি।"

"[নহবতে] কখনো কখনো একা ছিলুম। আমার শাশুড়ি থাকতেন। মধ্যে মধ্যে গোলাপ [গোলাপ-মা], গৌরদাসী [গৌরী-মা]—এরা সব থাকত। ঐটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হতো... অপর সব ভক্তদের রান্না হতো।... দিনরাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রাম দত্ত এল। গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।' আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের ময়দার রুটি হতো। রাখাল থাকত, তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হতো।"

"নরেনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বললেন, 'বেশ করে রাঁধ।' আমি মুগের ডাল, রুটি করলুম। খাবার পর নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরে, কেমন খেলি?' নরেন বললে, 'বেশ খেলুম, যেন রোগীর পথ্য!' ঠাকুর শুনে বললেন, 'ওকে ওসব কী রেঁধে দিয়েছ? ওর জন্য ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি করে দেবে।' "

"দক্ষিণেশ্বরে নহবত দেখেছ? সেইখানে থাকতুম। প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যাস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটাসোটা মেয়েলোকরা দেখতে যেত, আর দরজায় দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা-লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!' "

"একদিন কতকগুলি পাট এনে আমাকে দিয়ে [শ্রীরামকৃষ্ণ] বললেন, 'এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও...।' আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম আর ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলুম। চটের ওপর পটপটে মাদুর পাততুম আর সেই ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনো তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হতো এখন এই সবে (খাট-বিছানা দেখিয়ে) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাত বোধ হয় না... আহা! দক্ষিণেশ্বরে কী সব দিনই গেছে!... কী আনন্দই ছিল!"

কথাগুলিতে কোন ক্ষোভ, হতাশা ও অভিমানের আঁশমাত্র ছিল না। সহজ সারল্যে এবং নির্ভেজাল নির্বিবাদে মাখানো ছিল তাঁহার প্রতিটি কথা। চারপাশে নিরানন্দ ও বিষাদের এত উপকরণ সত্ত্বেও আনন্দে পূর্ণ থাকিতেন তিনি।

নারীর কাছে স্বামীর সান্নিধ্য স্বাভাবিকভাবেই পরম আকাঙ্ক্ষিত। স্বামী সম্পর্কে কোন ধারণা হওয়ার আগেই শৈশবেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনের সূচনায় বিবাহ এবং স্বামী সম্পর্কে যখন তাঁহার ধারণা উন্মেষিত হইতে শুরু করিয়াছিল তখন স্বামী দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর সাধনায় নিমগ্ন। পত্নীর কথা তিনি তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। জগৎ-সংসারে কোনকিছুর কথাই, কাহারো কথাই তাঁহার মনে ছিল না। তাঁহার ঐরূপ অসাধারণ সাধনা দেখিয়া মানুষ তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ ভাবিয়াছে। 'পাগল' বলিয়া দক্ষিণেশ্বরে অনেকেরই কাছে তাঁহার পরিচিতি হইয়াছে। এই সংবাদ পল্লবিত হইয়া জয়রামবাটী এবং কামারপুকুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উহার উপরে অধিকতর রঙ লাগাইয়া পাড়া-প্রতিবেশীরা উহা লইয়া নানা আলোচনা শুরু করিয়াছে। কখনো সারদাদেবীর আড়ালে, কখনো তাঁহার সম্মুখেই। তিনি সব শুনিয়াছেন, স্বামীর জন্য তাঁহার চিন্তা হইয়াছে, স্বামীর কাছে যাইবার জন্য, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সেবা করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু নীরবেই সেই প্রবল অনুভূতিকে তিনি নিজের মধ্যেই রাখিয়াছেন।

অবশেষে একদিন পিতার সঙ্গে তিনি জয়রামবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরের পথে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া স্বামীকে দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। দেখিলেন তাঁহার দেবদুর্লভ স্বামী অসাধারণ প্রেম এবং মমতায় তাঁহাকে সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। প্রথম যৌবনের সেই পরম প্রার্থিত প্রহরের জন্য সব বিবাহিতা নারীর মতোই তিনিও এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামীকে পাইলেন, কিন্তু দেখিলেন তাঁহার দেবতা-স্বামী সাধারণ মানুষের মতো কোন লৌকিক আচরণে লেশমাত্র আগ্রহী নহেন। তাঁহার মন স্ত্রীর প্রতি মমতায় ভরা থাকিলেও জগজ্জননীর চিন্তা তাঁহাকে এমন পূর্ণ করিয়া রাখে যে, বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া দীর্ঘক্ষণের জন্য তিনি বারংবার সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। সমাধির সহিত সারদাদেবীর ইতিপূর্বে কোন পরিচয় ছিল না। ফলে গভীর উদ্বেগের মধ্যে দীর্ঘরাত্রি তাঁহার অনিদ্রায় কাটিত। দিনের পর দিন যখন এরূপ চলিতেছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, ঐভাবে রাত্রি জাগরণের ফলে সারদাদেবী অসুস্থ হইয়া পড়িতেছেন। তিনি নিজেই তখন তাঁহার নহবতে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন হইতেই শুরু হইল স্বামীর নিকট হইতে কয়েক হাত ব্যবধানে থাকিয়াও স্বামীর সহিত দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর্ব। ইহার পর ক্রমে ভক্তদিগের আনাগোনা শুরু হইলে খাওয়ার সময় স্বামীকে দর্শনের যে দুর্লভ সুযোগ তাঁহার সারাদিনে বার দুয়েক মিলিত, তাহা হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন! তখন নিজের ঘর হইতে দরমার আড়ালে দূর হইতে স্বামীকে দেখিয়াই তাঁহাকে স্বামীর 'সান্নিধ্য' লাভ করিতে হইত। যেকোন স্ত্রীর পক্ষেই ইহা অসহনীয় এক অবস্থা সন্দেহ নাই। কিন্তু সারদাদেবীকে কখনোই ইহার জন্য বিষণ্ণ হইতে দেখা যায় নাই। ঐ সামান্য দর্শনেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। পরবর্তী কালে তিনি বলিতেনঃ "তখন কী দিনই গেছে! দিনান্তে হয়তো একবার ঝাউতলায় যেতে ঠাকুরকে দেখতে পেতুম, নয়তো নয়।—তা-ও দূর থেকে। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকতুম।"

এই সন্তোষ ছিল তাঁহার সহজ নির্বিবাদের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি।□

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

ঠাকুর নিজের মুখে বলেছেন একটি ভক্তকে [শ্রীমকে] : "সবটা মন কুড়িয়ে যদি এখানে [ঠাকুরে] এল, তবে তার আর কি বাকি রইল?" সেই ভক্তটি খালি একমনে তাঁর দিকে চেয়ে থাকত।

আবার বলেছিলেন : "আমার চিন্তা করলেই হবে।" তাকেই বলেছিলেন : "মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।" তাঁর ঐশ্বর্য—ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি।

একথা ঈশ্বর ছাড়া কে বলতে পারে? কার অত বড় বুকের পাটা? (১০ম ভাগ, পৃঃ ১৯)

ঠাকুর একসময়ে মুসলমান ভক্ত সেজেছিলেন। তখন পাঁচবার নামাজ পড়তেন, লুঙ্গি পরতেন, আর সানকিতে খেতেন। দেবদেবীর ছবি দেখতেন না। মা কালীর ঘরেও যেতেন না। একটি বাবুর্চি রেঁধে দিত। মথুরবাবু কৌশলে একটি ব্রাহ্মণকে বাবুর্চির পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর মুসলমানদের খুব মান্য করতেন—তাদের নিষ্ঠা ও ভক্তির জন্য। যেখানেই থাকুক, নামাজের সময় এলে তারা নামাজ পড়বেই। তা রাস্তায়ই চলুক, গাড়িই হাঁকাক, কিংবা রাজগদিতেই বসুক—নামাজের সময় সব ছেড়ে নামাজ পড়বেই। (১১শ ভাগ, পৃঃ ৩৪)

ঠাকুরের সারাটা জীবনই মুক্ত অবস্থা—কখনো বিদেহমুক্ত অবস্থাতে অবস্থান, কখনো জীবন্মুক্ত। একই অবস্থা, কথা দুটো। দিবানিশি—জাগরণে, শয়নে, স্বপনে—জগদম্বাকে দেখছেন। নামরূপ জগৎ রয়েছে সামনে, কিন্তু ওতে অভিনিবেশ নেই। মানুষের ভিতর অন্তর্যামী পুরুষকে দেখছেন—স্থূল সূক্ষ্ম কারণে নামমাত্র মন। বাচ খেলা যেন। একটু নিচে এল অমনি আবার হুট করে ওপরে উঠে গেল।

বাইরে থেকে দেখা যায় দুটো অবস্থা, ভিতর থেকে দেখলে একটা। দেহ থাকতে মুক্তি, দেহত্যাগের পর মুক্তি। বেদের সৃষ্টি হয় জীবন্মুক্তাবস্থায়। (ঐ, পৃঃ ৩৬)

(জনৈক ভক্ত ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানমার্গের লোক নেই বলায়) কি করে জানলেন? স্বামীজী কি? ঠাকুর বলতেন, তাঁকে দেখলে মন অখণ্ডের ঘরে লীন হয়ে যায়—সপ্তর্ষির এক ঋষি। ঠাকুরের কৃপায় নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন। জ্ঞানপথের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধির গানটি পড়বেন। ঠাকুর একবার ছয় মাস নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে ছিলেন একটানা। তখন ঘর থেকে দেবদেবীর ছবি বের করে দিয়েছিলেন। তোতাপুরী যা চল্লিশ বছরে লাভ করেন, ঠাকুর তা তিনদিনে লাভ করেন। তোতাপুরী অবাক হয়ে বলতেন : "এ ক্যায়া রে।" তোতাপুরী শেষে চিনেছিলেন 'অবতার' বলে। ঠাকুর মহিম চক্রবর্তীকে একদিন বলেছিলেন এই কথা। বলেছিলেন : "ন্যাংটো জানত এর মধ্যে কে আছে। আমার বাবাও জানতেন, এর মধ্যে কে।"

যুগের প্রয়োজনে method (প্রণালী) বদলে যায়। এক এক অবতার এসে এক একরকম চালান। এখন জগতে সমন্বয়ের দরকার, তাই এখন এর ওপর emphasis (জোর) দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরের কৃপায় তাঁর ভক্তরা অনেকেই সেই নির্বিকল্প অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। বাইরে কেউ ভক্তি নিয়ে আছেন, কেউ লোকশিক্ষার্থ কর্ম—এইসব নিয়ে আছেন। (ঐ, পৃঃ ৩৮)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত অত বড় লোক। উনি আমার একজন 'হিরো' ছিলেন ছেলেবেলায়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারলেন না ঠাকুর। বলছেন : "কে যেন আমার জিভ টেনে ধরেছে।"

তিনি কি মাইকেলকে নিন্দা করলেন? তা নয়। একটা উচ্চ আদর্শ দেখালেন। এঁরা সংসারের সব বুদ্ধি নিয়ে বড়। তাকে ঠাকুর বলতেন 'চিঁড়েভাজা বুদ্ধি'। আর ঠাকুর হলেন ব্রহ্মধনে ধনী। আলোচনার common point (সাধারণ বিষয়) নেই। একজনের জীবনের আদর্শ—কামিনীকাঞ্চন, আর একজনের ঈশ্বর। ঈশ্বরের কথা বললে ও বুঝবে কেন? বিকারের রোগী প্রবোধ মানে না।

(একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন—ঠাকুরই বলেছেন, যাকে দশজনে মানে গণে তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ। মাইকেলের ভিতর তো ঈশ্বরের শক্তি। অত বড় কবি, বাঙলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক। তবে ঠাকুর কেন কথা কইলেন না তাঁর সঙ্গে?)

হ্যাঁ, শক্তিবিশেষ বটে—তবে অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তির কথা বললে ও শুনবে না। নেশা কমলে তখন হিতবচন শোনে। নইলে বলে—বেশ আছি বাবা। তাই তো গীতায় বলেছেন অর্জুনকে—আমার এইসব কথা সকলকে বলবে না। যে ঈশ্বরকে মানে, গুরুসেবা করেছে—সেই শোনার অধিকারী। (ঐ, পৃঃ ৪৪)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১০ম এবং ১১শ ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

পরিমার্জনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি

স্বামী ভূতেশানন্দ

গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নিবেদিত।

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই ভাষণটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

দীক্ষা নেওয়ার আগ্রহ অনেকেরই। প্রবল আগ্রহ। কিন্তু দীক্ষার আগে আমরা যে-আদর্শ আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে চাই তার সঙ্গে একটু পরিচয় না নিয়ে এলে দীক্ষা জীবনে খুব বেশি ফলপ্রসূ হবে না। এইজন্য আমাদের নিয়ম—দীক্ষার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও উপদেশের সঙ্গে অন্তত কিছু পরিচয় থাকা দরকার। দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে এলে তাই প্রস্তুত হতে বলি। প্রস্তুতি নিয়ে না এলে অপেক্ষা করতে বলি। প্রস্তুত হলে তবে দীক্ষা নিতে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই প্রস্তুতি বা পরিচয় থাকলে আমাদের কাজের সুবিধা হয়। আমরা যা বলব তা তাদেরও বুঝতে সুবিধা হবে।

শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে যাঁরা দীক্ষার জন্য গুরুর কাছে যান তাঁদের জীবনে কতকগুলি প্রস্তুতি দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। নারদ গেলেন ভগবান সনৎকুমারের কাছে দীক্ষালাভের জন্য। সনৎকুমার বললেন ঃ "তুমি কি জান আগে বল, তারপর তোমাকে কি উপদেশ দিতে হবে দেখি।" নারদ তখন যা জানতেন, যেসব শাস্ত্র পড়েছিলেন তার একটা লম্বা তালিকা দিলেন। তার ভিতরে প্রধান প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ কিছুই বাদ পড়েনি। সমস্তই পড়া শেষ করে তারপর তিনি সনৎকুমারের কাছে এসেছেন। তিনি বললেন ঃ "ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ষড় বেদাঙ্গ—সব পড়েছি। এছাড়া সমস্ত পুরাণ এবং বিভিন্ন লৌকিকবিদ্যার গ্রন্থাদিও পড়েছি। আমি এত জানি তবুও আমার মনে শান্তি নেই। আমি তৃপ্ত হতে পারছি না। আমার ভিতরে একটা অসন্তোষ সর্বদা থাকছে। একটা দুঃখ থাকছে—যেন কিছু অপূর্ণ থেকে গেছে, যার জন্য জীবনে শান্তি পাচ্ছি না।" সনৎকুমার নারদকে বললেন ঃ "নারদ, তুমি যা জান তা তো বললে। অনেক লম্বা তালিকা তোমার। তবে তুমি যাকিছু জান বলছ সেগুলি শব্দমাত্র। তুমি শব্দবিদ্, কিন্তু তুমি নিজেকে জান না। তুমি আত্মবিদ্ নও। যে আত্মবিদ্ হয় সে-ই শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। তুমি আত্মবিদ্ নও বলেই শোকে তুমি মুহ্যমান হয়েছ।" তারপর নারদ বিনীতভাবে বললেন ঃ "আমি যাতে শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই, ভগবান, আপনি সেই উপদেশ আমাকে দান করুন।"

এ থেকে কি বোঝা যাচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে যে, দীক্ষা নেওয়ার পূর্বে মানুষের মনের জমি তৈরি করতে হয়। বীজবপনের আগে জমি প্রস্তুত না করে বীজবপন করলে তা বৃথা হয়। আগে চাষ করে সার দিয়ে জমিকে প্রস্তুত করতে হয়। তারপর বীজ দিলে তাতে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা যদি চাষ না করেই, জমি প্রস্তুত না করেই, সার না দিয়েই খেতে বীজ ছড়িয়ে দিই, তাহলে তাতে কি ফসল ভাল হবে? হবে না। এইজন্য আমাদের দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি দরকার। এই প্রস্তুতি থাকলে সুফল পাওয়া যাবে। এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

খুব বিনীতভাবে আমি আরেকটি কথা বলছি। প্রস্তুতির কিন্তু শেষ নেই। ভগবানের নাম নেওয়ার আগে, তাঁর নামে দীক্ষা নেওয়ার আগে মন-জমিটি তৈরি করতে হবে। মন শুদ্ধ না হলে তাতে কাজ হবে না। সদাচার, বিনয়, শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ সব মিলিয়ে মনকে প্রস্তুত করতে হবে। ভগবানের নাম নেওয়ার জন্য যদি অন্তরে ঠিক ঠিক আগ্রহ থাকে তাহলে দীক্ষার পরিণাম হবে অপূর্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উপমা আছে। শুক্তি তার খোলা ছড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকে। একবার স্বাতী নক্ষত্রের একফোঁটা জল যদি তাতে পড়ে, সে তখন তার সেই খোলা বন্ধ করে জলের নিচে তলিয়ে যায়। তারপর সে মুক্তো তৈরি করে। ঐ 'একফোঁটা স্বাতী নক্ষত্রের জল' হলো মন্ত্রদীক্ষা। মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ার আগে ঐরকম আগ্রহ নিয়ে, নিজের অন্তরকে ঐ শুক্তির মতো উন্মুক্ত করে তত্ত্বকে গ্রহণ করবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। তাহলেই মন্ত্র জীবনে সফল হয়।

সবসময় আমরা বলি, দীক্ষার সময়েও বলি—শ্রদ্ধা-ভক্তি যদি না থাকে তাহলে দীক্ষার সার্থকতা আসে না। তাই আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ হতে হবে, শ্রদ্ধা সহকারে মন্ত্রকে গ্রহণ করতে হবে, তবেই সেই বীজ ফলে-ফুলে সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হবে। সুতরাং মনে রাখতে হবে, দীক্ষার আগে প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত, প্রস্তুতি ছাড়া কোন কাজই হয় না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দীক্ষার্থী গুরুর কাছ থেকে আদর্শটি নেওয়ার জন্য সেবাপরায়ণ হয়ে, বিনীত হয়ে, অহেতুকী ভক্তি নিয়ে, নিজের জীবনকে শুদ্ধ পবিত্র করে যাবে। শাস্ত্রে প্রস্তুতির কথা কেন এত করে বলা? এইজন্য যে, এটি জীবনের একটি অমূল্য ক্ষণ—যখন ভগবানের নাম আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছে। সেই নামটি আমাদের সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করে, তাতে মন একাগ্র করে সেই শুক্তি বা ঝিনুকের মতো যদি অতল তলে ডুবে যেতে পারি, তাতে মগ্ন হয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের ভিতরে পরম রত্ন তৈরি হবে। এই কথাটুকু বিশেষ করে মনে রাখবার। ঠাকুরের

উপদেশ থেকে এই শিক্ষাই আমরা পাচ্ছি। গীতায় (১৮।৬৭) বলা হয়েছে ঃ

"ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।"

—যে তপশ্চর্যা করেনি তাকে এই তত্ত্ব দেবে না। যে ভক্ত নয় তাকে দেবে না। যে শুশ্রূষু নয়—শুনতে আগ্রহশীল নয় বা সেবাপরায়ণ নয় তাকে দেবে না। আর যে ভগবানের প্রতি দ্বেষ, রাগ মনে পোষণ করছে তাকে দেবে না।

কেন এদের বঞ্চিত করা? বঞ্চিত করা এজন্য যে, তাদের ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। আসলে এগুলি হচ্ছে প্রস্তুতি। ক্ষেত্র তৈরি হলে ভগবানের নামে অনুরাগ আসে। এটি দীক্ষার জন্য আগ্রহী এবং দীক্ষিত সকলকেই বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। শাস্ত্রে এইজন্য বলা হয়েছে—বিনয়ী হতে হবে, সেবাপরায়ণ হতে হবে, জীবনকে যথাসাধ্য শুদ্ধ পবিত্র রাখতে হবে। অনেকের একটি বিপরীত ধারণা আছে। তাঁরা মনে করেন, দীক্ষা নিলে তাঁদের দেহ-মন শুদ্ধ হবে। এটি ভ্রান্ত ধারণা। দীক্ষা নিলে সেই দীক্ষাকে গ্রহণ করবার জন্য আমাদের হৃদয়কে আগেই পরিষ্কার করা দরকার। ভগবানকে যখন প্রতিষ্ঠা করতে হয় তখন ভাল করে মন্দির মার্জনা করে চারিদিক শুদ্ধ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তবে সেখানে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। মন্ত্র গ্রহণ মানে জীবনে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করা। আর তার জন্যই যাকিছু প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির বিষয়টি উপেক্ষা করলে, এই প্রস্তুতি না থাকলে আমাদের অন্তরে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। একথাটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

আমরা ছোট ছেলেমেয়েদের দীক্ষা দিতে চাই না। অনেক সময় ভক্তরা খুব আগ্রহ করে তাঁদের দশ-বার বছরের বা আরো কমবয়সী ছেলেমেয়েদের দীক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। আমরা 'না' বললে তাঁরা দুঃখিত হন। বারবার অনুরোধ করেন। তাঁরা বোঝেন না দীক্ষার উদ্দেশ্য কি। এই ছোট ছোট শিশুরা, তারা কি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত? তাদের মন কি এবিষয়ে ধারণা করবার জন্য তৈরি? সেসব কিছুই নয়। এসব 'দীক্ষা দীক্ষা' ছেলেখেলা করার আবদার। কেউ কেউ হয়তো আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়েই অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা দীক্ষার মাহাত্ম্য, তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত নন বলেই তা করেন। দীক্ষা নেওয়ার একটা অনুকূল সময় আছে। যখন মন দীক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন বোঝা যায় মন্ত্রগ্রহণ করবার সামর্থ্য এসেছে। একথা আগে মনে রাখলে উপকার হয়।

মনে রাখতে হবে যে, দীক্ষা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুতরাং দীক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। একটি কথা বলছি, শুধু দীক্ষিতদের জন্য নয়—সকলকেই বলছি। দীক্ষা যেন আমাদের একটা 'স্ট্যাটাস সীম্বল' না হয়ে যায় বা দীক্ষাকে যেন 'স্ট্যাটাস'-এর মাধ্যম হিসাবে না দেখা হয়। দীক্ষা যে ভগবানলাভেরই মাধ্যম তা যেন মনে থাকে। যাঁরা দীক্ষা নিতে আসেন তাঁদের ভিতরে একটা গাম্ভীর্য থাকা দরকার। দীক্ষা যে জীবনের একটা বিশেষ ক্ষণ, সেটা মনে রাখা দরকার। গুরু হয়তো কোন কথা বলছেন, যে-কথা শোনা দীক্ষার্থীদের খুব প্রয়োজন, কিন্তু তাঁদের সেদিকে মন নেই! তাঁরা অন্য কথা ভাবছেন! এতে বোঝা যায় যে, দীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা তাঁদের মনে জাগেনি। আমি কাউকে সমালোচনা করবার জন্য বলছি না। এসব কথা আমি বলছি এইজন্য যে, দীক্ষা সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রমের ভাব মনে রাখা দরকার। দীক্ষা যে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—একথা মনে রাখতে হবে। তা না হলে এই ঘটনার সার্থকতা আসবে না। অনেক সময় আমরা নানা প্রতিকূল পরিবেশের ভিতর দিয়ে যেতে বাধ্য হই। সেগুলি দূর করতে হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু দূর করার শক্তি ও মানসিকতা কোথা থেকে পাওয়া যাবে? প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে দীক্ষা হলে দীক্ষাই সেই শক্তি দেবে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আচরণ আমাদের দীক্ষার অনুসারী হওয়া দরকার। আমি দীক্ষার সময় পাঁচটি আচরণের কথা বলি। কথাগুলি একেবারেই গোপনীয় নয়। সকলেরই জানা প্রয়োজন। সুতরাং সকলের জন্যই বলছি। আচরণ যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে ভগবানের দিকে কেউ যেতে পারে না। ভগবানের দিকে যেতে হলে শুদ্ধ আচরণ দরকার। আমরা অনেকসময় শুনি যে, শুদ্ধ আহার আমাদের দরকার। 'শুদ্ধ আহার' মানে কি তাতে যথেষ্ট ঘি থাকবে? না, তা নয়। 'শুদ্ধ আহার' মানে সাত্ত্বিক আহার যা শরীরের পক্ষে উপযোগী। শাস্ত্রের নির্দেশ এইরকমই। যা শরীর ও মনের পক্ষে উপযোগী, গঠনের পক্ষে উপযোগী তা পরিমিতরূপে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ যখন আমরা খাব তখন লোভের বশে খাব না। আমরা এই দৃষ্টিতে খাব যে, এই আহার আমাদের শরীর-মনকে পুষ্ট করবে এবং সেই পুষ্ট শরীর-মনকে আমরা ভগবানের চিন্তায় ব্যয়িত করব। এই হিসেব করে খেতে হবে। এই নয় যে, এটা খাব না, ওটা খাব না। এগুলি 'আহারশুদ্ধি'র বিষয় নয়। 'আহারশুদ্ধি' হলো পরিমিত পরিমাণে এমন বস্তু গ্রহণ করা, যা আমাদের দেহ-মনকে পুষ্ট করবে।

সাধারণ আহারশুদ্ধির চেয়ে বড় কথা আচরণের শুদ্ধি। সেই পঞ্চ আচরণের শুদ্ধির কথা আমরা এখানে বলছি। প্রথম হচ্ছে—(১) আমাদের সকলের কল্যাণচিন্তা করতে হবে। সকলের সঙ্গে ব্যবহারে এমন কিছু যেন না করি যাতে কারো কোন অকল্যাণ হয়, কারো মনে আঘাত লাগে। এমন কিছু যেন না করি যাতে কারো অনিষ্ট হয় বা কারো মনে বা শরীরে আঘাত লাগে। শাস্ত্র অহিংসার কথা বলে। 'অহিংসা' মানে শরীরে বা মনে কাউকে আঘাত না করা, কারো অনিষ্ট চিন্তা না করা বা অনিষ্ট না করা। এই আচরণ পালন করতে

হবে কায়মনোবাক্যে—কথায়, চিন্তায় ও কাজে। (২) সত্যকে সর্বদা ধরে থাকতে হবে। সত্যকে এমনভাবে ধরে থাকব যে, কোন কারণেই যেন আমরা সত্য থেকে বিচলিত না হই। কখনো যেন মিথ্যার আশ্রয় না নিই। কথা দিলে যেন সে-কথা রক্ষা করি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "যে সত্যকে ধরে থাকে, সে ভগবানের কোলে শুয়ে থাকে।" আবার বলেছেন ঃ "সত্যকথা কলির তপস্যা।" সত্যকে পালন করা যে খুব সহজ তা বলছি না। সহজ মোটেই নয়। সত্যপালন করতে হলে আমাদের জীবনে অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হবে। কাজেই সত্যপালন সহজ কথা নয়। কিন্তু এটা যে আমাদের আদর্শ, এটা যেন না ভুলি। (৩) আমরা কাউকে যেন কোনরকমে না ঠকাই, প্রবঞ্চনা না করি। যেন কাউকে ঠকিয়ে কিছু না গ্রহণ করি। আমাদের যা ন্যায্য পাওনা, যেন সেটুকুই অপরের কাছ থেকে নিই। এটা হচ্ছে লোকের সঙ্গে ব্যবহারে সততা। এটি সাধনপথের সহায়ক। (৪) সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আমাদের বশে রাখতে হবে। আমরা যেন তাদের দ্বারা চালিত না হই। এক-আধটা ইন্দ্রিয়ের সংযম নয়—সবগুলি ইন্দ্রিয়ের সংযম। এটি সাধনপথে একান্ত প্রয়োজন। (৫) ভগবানকে লাভ করার জন্য, তাঁকে চিন্তা করার জন্যই আমাদের এই জীবন। আমাদের জীবনযাপন হবে সহজ, সরল, স্বাভাবিক। বিলাসিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকবে না। আমি একথা বলছি না যে, সকলে ভিখারির মতো পোশাক পরবে বা দীন-হীন হয়ে থাকবে। আমি বলছি, আমাদের লক্ষ্য হবে—কত কম জিনিস আমরা আমাদের প্রয়োজনের জন্য গ্রহণ করতে পারি। কোথাও যেন আমাদের লোভ না হয়। যার হাজার টাকা আয়, সে ভাবছে পাঁচ হাজার টাকা হলে ভাল হয়। যার পাঁচ হাজার টাকা আয়, সে ভাবছে দশ হাজার টাকা হলে ভাল হয়। দশ হাজার টাকা হলে লক্ষ টাকার কথা বলছে। লক্ষ টাকা যার আয়, সে বলছে এখনো তো কোটি টাকা হয়নি। এভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে সবসময় অস্থির করে রাখে। সেজন্য মনকে সংযত করতে বলা হয়। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য পেয়েও কারো মন শান্ত হয় না। কারণ, মনের স্বভাবই এই। যে যত পায় সে আরো বেশি করে চায়। যেমন আগুনে ঘি দিলে আগুন আরো বেড়ে যায়, তেমনি যত আমরা ভোগের বস্তু যোগাই তত আরো বেশি আমাদের বাসনা বেড়ে যায়। এই বাসনাই মানুষের মনকে অশান্ত, বিভ্রান্ত করার কারণ।

অনেকে বলেন, আমরা শান্তি চাই। আমি বলি, মনে কোন বাসনা রেখো না, তাহলেই শান্তি হবে। বাসনা থাকলেই অশান্তি হবে। কারণ, জগতে এত রকমের বাসনা আমরা পোষণ করি যে, তা পূর্ণ করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই মনে শান্তি আসে না। আমরা শান্তি পাই না কেন? কারণ, আমাদের মনে যে আকাঙ্ক্ষাগুলি রয়েছে সেগুলি পূর্ণ হচ্ছে না। এই আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ হওয়া এত সোজা নয়। একটা আকাঙ্ক্ষা মেটাতে গিয়ে আরো দশটা আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হচ্ছে। যে খেতে-পরতে পায়, সে ভাবছে—এই খাওয়া-পরাই কি কেবল আমি চাই? গাড়ি-ঘোড়া নেই। কি করে আমরা ভোগ করব জীবন? আবার সমস্ত ভোগ্যবস্তু যার আছে, তার হয়তো স্বাস্থ্য নেই। ফলে সব থেকেও সে ভোগ করতে পারছে না। ফলে আকাঙ্ক্ষা মিটছে না। রাজা যযাতি সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করলেন। যৌবন পার হয়ে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন, আর ভোগের সামর্থ্য নেই কিন্তু ভোগের আকাঙ্ক্ষা তখনো অটুট। কি হবে? তিনি প্রার্থনা করলেন ভগবানের কাছে। ভগবান বললেন, তোমার যৌবন তো পেরিয়ে গেছে। এখন দেখ তোমার ছেলেরা যদি তোমাকে তাদের যৌবন দেয়, তখন আবার ভোগ করতে পারবে। ছেলেদের সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তাঁকে তার যৌবন দিতে পারে? কেউ রাজি নয়, কেবল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরু রাজি হলেন। রাজা যযাতি আবার ভোগে প্রবৃত্ত হলেন। নিজের যৌবন তো গেছে, ছেলের যৌবন নিয়ে ভোগ করলেন। তারপর তাঁর মনে হলো—এতদিন ভোগ করলাম, কিন্তু আমার তো বাসনা কমছে না, বরং ক্রমশ বাড়ছে! যেমন আগুনে ঘি দিলে আগুন বেড়েই যায়, সেইরকম ভোগ্যবস্তু আমার আকাঙ্ক্ষাকে কেবল বাড়িয়েই দিচ্ছে। কাজেই অশান্তি শতগুণে বেড়ে যাচ্ছে।

এই হলো মানুষের জীবন। আমরা শান্তি চাই। ভাবছি, ভগবানকে ডেকে শান্তি। আর, ভগবানকে ডাকছি খালি ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য। আর তো অন্য কারণ নেই। ভগবান যদি আমাদের খুব ধন দেন, খুব ঐশ্বর্য দেন, আমরা যদি আত্মীয়-পরিজনকে নিয়ে বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারি তাহলে ভগবান বেশ ভাল। আর যদি আমাদের জীবনে বজ্রাঘাতের মতো একটা পরিস্থিতি আসে, তবে ভগবান খারাপ! পরিবারে কোন যুবক হয়তো মারা গেল বা ঐরকম কোন একটা আঘাত এল, তখন বলে—এই তো ভগবানের কাণ্ড! ভগবান এ কী করলেন! তখন ভগবান আর ভাল থাকলেন না! আমাদের ভগবানকে ডাকার কারণ আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা এবং তা না করতে পারলেই আমাদের ভগবানে ভক্তি উড়ে যায়। এরকম করে ভগবানকে ডেকে শান্তি হয় না। শান্তি আসবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করলে। তিনি সুখে রাখুন, দুঃখে রাখুন, ভাল করুন, মন্দ করুন—সব অবস্থাতে তাঁর ইচ্ছাকেই আমাদের জীবনে কল্যাণকর বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সুখ-দুঃখ যা আসে, তা তাঁরই দান বলে মাথা পেতে নিতে হবে। মৃত্যুকে সহ্য করা নয়, তাকে স্বীকার করে নেওয়া, বরণ করে নেওয়া, তাতে ক্ষুব্ধ না হওয়া—এই ভাব আসবে শরণাগতি থেকে। একথা শাস্ত্র বলেছে। শরণাগতি হলে শান্তি হয়। ভগবানকে যে চায় পৃথিবীর সমস্ত ভোগসুখ বিষয়-আশয় তার কাছে

তুচ্ছ হয়ে যায়। ভগবানকে ডাকতে ডাকতে মন তাঁর প্রতি এমন একাগ্র হয় যে, অন্য সব জিনিসের আকর্ষণ কমে যায়। যেমন একজন যদি একটা অমূল্য স্পর্শমণি পায়, তাহলে ছোটখাট জিনিসের দিকে তার দৃষ্টি থাকে না। কারণ, অন্যান্য ভোগের উপকরণ তো তার কাছে তুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্পর্শমণি' কবিতায় একটা সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিবের আরাধনা করছেন, যাতে তাঁর সম্পদ লাভ হয়। শিব বললেনঃ "বৃন্দাবনে যাও, সেখানে সনাতন গোস্বামী আছেন। তাঁর কাছে জেনে নাও ধনলাভের উপায়।" ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য দূর করার প্রত্যাশা নিয়ে সনাতন গোস্বামীর কাছে উপস্থিত। সনাতন বললেনঃ "নদীতীরে ঐ বালির মধ্যে স্পর্শমণি পোঁতা আছে। সেইটি নিয়ে যাও, তোমার অভাব দূর হবে। অনন্ত সম্পদ হবে তোমার।" ব্রাহ্মণ তো তাড়াতাড়ি বালি খুঁড়ে সেই স্পর্শমণিটি পেলেন। স্পর্শমণিটি স্পর্শ করা মাত্র তাঁর গায়ের লোহার মাদুলি সোনা হয়ে গেল। বিস্মিত ব্রাহ্মণ তখন ভাবছেন, এমন সম্পদ কাছে থাকা সত্ত্বেও সনাতন গোস্বামী কত নির্বিকার! তিনি তখন সনাতনের কাছে এসে বললেনঃ "যে অমূল্য সম্পদে ধনী হয়ে আপনি এই মণিকে 'মণি' জ্ঞান করছেন না—তারই কিছু আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।" এই বলে ব্রাহ্মণ সেই স্পর্শমণিটি নদীতে ফেলে দিলেন। ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।' এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।"

'ভাগবত'-এ (১১।২।৫৩) বলা হয়েছে—

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ।।"

—তাকেই বলা হয় শ্রেষ্ঠ ভক্ত, যার কাছে ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য উপস্থিত থাকলেও ঐশ্বর্যের আকর্ষণে তার মন এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানের চরণ থেকে ভ্রষ্ট হয় না। ভগবানকে পেয়ে সে এত বিভোর হয়ে যায় যে, সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত ধন তার কাছে তুচ্ছ।

মনে রাখতে হবে, এই যে জগতের সমস্ত কিছুর প্রতি তুচ্ছবোধ—এ জ্বলে পুড়ে বিরক্ত হয়ে নয়; ভগবানের প্রতি যে আকর্ষণ তার আনন্দ এমন প্রবল যে, তাতে অন্য সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। ঠাকুর বলেছেন, চুম্বক লোহাকে টানে। লোহা আছে এক জায়গায়, আর দুটো চুম্বক দুদিকে আছে—একটা বড়, অন্যটা ছোট। কোন্ চুম্বকটি লোহাকে টানবে? বড় চুম্বকটিই লোহাকে টানবে। ভগবান হচ্ছেন সবচেয়ে বড় চুম্বক। তাঁর আকর্ষণ দুর্বার। তাঁর আকর্ষণ যখন বোধ হয় তখন সংসারের কোন জিনিস আর মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাঁর পাদপদ্ম থেকে আর কোন জিনিসই আমাদের অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারে না। ভগবানের পথে আমরা যে যাচ্ছি, এইটি হচ্ছে তার পরীক্ষা। যদি ভগবানকে চাই আবার সংসারের সুখ-সমৃদ্ধিও চাই, তাহলে বুঝতে হবে ভগবানকে চাওয়া একটা বিলাসিতা মাত্র।

সাধারণত মানুষ ভগবানকে চায় তিনি ধন দেবেন বলে, সুখ দেবেন বলে, ঐশ্বর্য দেবেন বলে। কিন্তু তাঁর জন্য তাঁকে চায় না। আমাদের আসল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ধন-সম্পত্তি। আর ভগবান হলেন তা পাওয়ার একটি উপায়। যদি সেই উপায় আমাদের এইসব না দিতে পারে তবে সেই উপায়টিকেই আমরা ফেলে দেব! অর্থাৎ ভগবানকেই আমরা ফেলে দেব! মনে রাখতে হবে, ভগবান আমাদের শুধু সুখই দেবেন তা হতে পারে না। দুঃখ, দারিদ্র্য, বিপদ, আপদ—এগুলিও তাঁর কাছ থেকেই আসছে। সুখের সময় মানুষ তাঁকে ভুলে যায়। দুঃখের সময় তাঁর কথা মনে পড়ে। অন্যেরা হয়তো দুঃখে কেবল হাহাকার করে, কিন্তু ভক্ত দুঃখ পেয়ে ভগবানকে আরো জোর করে ধরে। দুঃখের সময় তাঁকে বেশি করে তার মনে পড়ে। কুন্তীর জীবন আমরা জানি। সমস্ত জীবন দুঃখময়। স্বামীর সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছেন। তারপরে স্বামীর মৃত্যু। নাবালক ছেলেদের নিয়ে এলেন হস্তিনাপুরে। রাজ্য পেয়েও আবার কৌরবদের চক্রান্তে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলেন পাণ্ডবরা। ভিখারি হয়ে তারা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাকে নিয়ে। কুন্তীর সারাটা জীবন বিপদের মধ্য দিয়েই চলেছে। তারপর এল পাণ্ডবদের দীর্ঘ বনবাস, অজ্ঞাতবাস। তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। যুদ্ধজয়ের পর কৃষ্ণ বিদায় নিতে এলে কুন্তী তাঁকে বলছেনঃ "যখন সুখে থাকি, হে ভগবান, আমরা তোমাকে ভুলে থাকি। দুঃখের সময়ই তোমাকে মনে পড়ে। সেজন্য আমাকে তুমি দুঃখই দাও। তাতে আমি সর্বদা তোমাকে স্মরণে রাখতে পারব।" কত বড় মন হলে তবে এমন করে ভগবানের কাছে মানুষ দুঃখ চেয়ে নিতে পারে! এমনভাবে ভগবানকে চাওয়া আমাদের মধ্যে বিরল হলেও এমন চাওয়াই যে আদর্শ একথা যেন আমরা না ভুলি।

আমরা মুখে 'ভগবান, ভগবান' বলি, আর পার্থিব সব জিনিস নিয়ে মত্ত হয়ে থাকি! তাঁকে চাইতে হবে, কারণ তিনিই সর্বাবস্থায় আমাদের পরম কল্যাণময়, আমাদের জীবনের সর্বস্ব, আমাদের অন্তরাত্মা, আমাদের পরম স্বরূপ। মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে, অর্থাৎ তার আত্মাকেই ভালবাসে। অন্য জিনিস ভালবাসে তা আত্মার প্রীতিকর বলে। অর্থাৎ মানুষ আসলে আত্মাকেই ভালবাসে। এইজন্য ভগবানকে বলা হয় 'আত্মার আত্মা'। আমরা তাঁকে ভালবাসব অন্য কোন কারণে নয়, তিনিই আমার আত্মা—এইজন্য তাঁকে ভালবাসব। এই ভালবাসার নাম 'অহৈতুকী ভক্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার এই অহৈতুকী ভক্তির কথা বলেছেন। এই ভক্তিতে ভক্ত ভগবানের কাছে কিছু চায় না।

কারণ, তার অন্য কোন কামনা নেই। সে কেবল অন্তর উজাড় করে তার শ্রদ্ধা, ভালবাসা ভগবানকে দিয়েই তৃপ্তিবোধ করে। প্রতিদানে কিছুই চায় না। এই ভক্তির আদর্শই শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ। আমরা এতটা যদি নাও পারি অন্তত একথা যেন মনে রাখি যে, ভোগাকাঙ্ক্ষা, বিষয়তৃষ্ণা আমাদের অন্তরের মুখ্যবিন্দুকে, আমাদের জীবনের কেন্দ্রটিকে যেন ভুলিয়ে না দেয়। একটু-আধটু আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবে। দেহ এবং মন ভোগ করতে চাইবে। থাকুক এবং করুক। কিন্তু তা যেন এমনভাবে আমাদের আচ্ছন্ন করে না দেয় যে, আমরা ভগবানকে ভুলে ভোগকে, পার্থিব ঐশ্বর্যকেই জীবনের সার করে ফেলি।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের একটি মুখ্য কথা হলো—আমরা ভগবানের নাম করব। কত হাজার জপ করব, কতক্ষণ ধ্যান করব—এটি বড় কথা নয়। কেউ হয়তো নিরামিষ খায়, কেউ হয়তো এক বস্ত্রে থেকে ভগবানের জন্য তপস্যা করে। সেসব কিন্তু কিছুই কিছু নয়, যদি না সেগুলিতে আন্তরিকতা থাকে। আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে ভগবানকে ভালবাসতে পারছি কিনা তা দেখতে হবে—যে-ভালবাসায় সংসারের অন্য সমস্ত আকর্ষণ তুচ্ছ হয়ে যাবে। এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

'ভাগবত'-এ বলেছে, তাঁর প্রতি যে অনুরাগ তা জগতের অন্য সব অনুরাগকে ভুলিয়ে দেয়। সুতরাং তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা কতখানি হলো—এই বিচার করে আমাদের সাধনপথে হাঁটতে হবে। আমরা তাঁর নামে মুহুর্মুহুঃ মূর্ছা গেলেও কিছু হবে না বা আমাদের সমস্ত জীবনটা বসে বসে ধ্যান করলেও হবে না, বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ জপ করলেও হবে না। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেও হবে না। হবে তখন, যখন দেখব তিনি আমাদের অন্তরকে সর্বদা পরিপূর্ণ করে রয়েছেন। তিনি ভিন্ন আর কোন চিন্তা বা বস্তু বা ব্যক্তির সেখানে স্থান নেই। আমাদের অন্তরের পূর্ণ অনুরাগ তাঁকে দিতে হবে। তাঁর চরণে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। এটিই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সারকথা। আর তাঁকে যদি আমরা অন্তর দিয়ে ভালবাসতে পারি তাহলে তাঁর সৃষ্ট এই বিশ্বচরাচরে যত জীব আছে, সকলের ভিতর তিনি রয়েছেন—এই বুদ্ধি আসবে। আমরা যেন সেই আদর্শে জীবন কাটাতে পারি—এই প্রার্থনা। এই আদর্শ যেন আমাদের জীবনকে পূর্ণভাবে প্রভাবিত করে, যাতে সমস্ত জগৎ আর তার সব জিনিস তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁর কৃপা হলে সবই সম্ভব। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের সকলের সেইরকম অনুরাগ আসুক।* ❑

* গত ৪ আগস্ট ১৯৮৫ বাংলাদেশের সিলেট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত পরম পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অনুষ্ঠান-সূচী (ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৬)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৯ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	২৬ আগস্ট	১৯৯৯
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৬ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	২ সেপ্টেম্বর	১৯৯৯
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২২ ভাদ্র	বুধবার	৮ সেপ্টেম্বর	১৯৯৯
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১৬ আশ্বিন	রবিবার	৩ অক্টোবর	১৯৯৯
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২২ আশ্বিন	শনিবার	৯ অক্টোবর	১৯৯৯

পূজাতিথি-কৃত্য

মহালয়া	ভাদ্র অমাবস্যা	২২ আশ্বিন	শনিবার	৯ অক্টোবর	১৯৯৯
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২৯ আশ্বিন	শনিবার	১৬ অক্টোবর	১৯৯৯

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

৫, ২০ ভাদ্র	রবিবার,	সোমবার	২২ আগস্ট,	৬ সেপ্টেম্বর	১৯৯৯
৪, ১৮ আশ্বিন	মঙ্গলবার,	মঙ্গলবার	২১ সেপ্টেম্বর,	৫ অক্টোবর	১৯৯৯

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসেতু স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

এই 'বাস্তব প্রয়োগ', এই 'সহানুভূতি', এই 'হৃদয়ের প্রসারতা'র কারণে তিনি ভারতীয় জনগণের জন্য নতুন এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন ধর্মধারণার মধ্য থেকে বাস্তব কর্মপ্রেরণা গ্রহণ করতে, চেয়েছিলেন চরিত্রগঠনের ওপর জোর দিতে এবং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির রহস্যটি বুঝে নিতে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ জুলাই আমেরিকা থেকে ভারতের এক তরুণ শিষ্যকে তিনি চিঠিতে লিখলেন ঃ "বৎসগণ, কাজে লাগ—তোমাদের ভিতর আগুন জ্বলে উঠবে।... সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ভাবটা আমাদের চরিত্রে একেবারে নেই, এটা যাতে আসে—তার চেষ্টা করতে হবে। এটি করবার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্বদাই তোমার ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে—সর্বদাই যাতে মিলেমিশে শান্তভাবে কাজ হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। এটাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সমগ্র রহস্য।"[১০]

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্যদেশ থেকে ফিরে মাদ্রাজে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ "সঙ্ঘই জগতে অমোঘ শক্তি।... একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ—চার কোটি ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে। সংহতিই শক্তির মূল—একথা বলিলে তোমরা হয়তো বলিবে, উহা তো জড়শক্তি-বলেই সাধিত হয়; আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন তবে কোথায় রহিল? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বৈকি। এই চার কোটি ইংরেজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারে এবং উহার দ্বারাই তাহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে; তোমাদের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি—শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন।"[১১]

স্বামীজী জানতেন, সংগঠন ও সংযোগ-শক্তিই পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাফল্যের হেতু এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সহায়তা দ্বারাই তা সম্ভব হয়ে থাকে। তিনি আরো জানতেন, সংগঠন না থাকা যেমন খারাপ, তেমনি অতিরিক্তভাবে সংগঠনের ওপর নির্ভরতাও খারাপ। দ্বিতীয়টি পাশ্চাত্য গ্রহণ করেছে বলে তিনি মনে করতেন। ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে পনের আনা শক্তিই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে 'চার্চ অর্গানাইজেশন'গুলির পিছনে, আর মাত্র এক আনা থাকছে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সংগঠনশক্তির প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২১ মার্চ নিউ ইয়র্ক থেকে স্বামীজী ওলি বুলকে লেখেন ঃ "সঙ্ঘের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ছাড়া কিছু হওয়ারও জো নেই।"[১২] স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে ইংরেজের কাছ থেকে আত্মমর্যাদা এবং আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শিক্ষালাভ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কারণ, এটাই হলো সঙ্ঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার রহস্য। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর লন্ডন থেকে গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে তিনি লিখেছেন ঃ "পাঁচজনে মিলে কোন কাজ করা আমাদের স্বভাব আদতেই নয়। এইজন্যেই আমাদের দুর্দশা। He who knows how to obey, knows how to command. Learn obedience first. (যিনি হুকুম তামিল করতে জানেন, তিনিই হুকুম করতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর।) এইসকল মহা স্বাধীনভাবপূর্ণ পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে obedience-এর (আজ্ঞাবহতার) ভাব সেইপ্রকার বলবান। আমরা সকলেই হামবড়া, তাতে কখনো কাজ হয় না। মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহা বীর্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এইসকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এইসকল গুণ আমাদের আদৌ নাই।"[১৩]

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি মাদ্রাজের তরুণ শিষ্যমণ্ডলীর কাছে প্রেরিত এক পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ "মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করে নাই।... তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম-বিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর

১০ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৬১-৪৬২

১১ ঐ, ৫ম, খণ্ড, পৃঃ ১৯৬-১৯৭

১২ ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫

১৩ ঐ, পৃঃ ১৭৬

হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলেই ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরিব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ।"[১৪]

দেশের উন্নতির জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সমন্বয় করিতেই হবে—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস। সেকথা উল্লেখ করে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন: "তাঁর [স্বামীজীর] চিন্তাধারা একাধারে ছিল ব্যাপক এবং অন্তর্ভেদী। ভারতে যে-উন্নতির প্রবর্তন করতে হবে, তার উপাদানগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন, ভারতকে একটি অভিনব আত্মাবহতার আদর্শ শিক্ষা করতে হবে।...

"পাশ্চাত্যবাসীর কাছে এটি অনায়াসেই প্রতীয়মান হতে পারে যে, স্বামীজীর জীবনে এর মতো প্রশংসার্হ আর কোন কিছুই নেই। বহু পূর্বে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উচ্চতম আদর্শগুলি জীবনে প্রতিফলিত করে সেগুলির পরস্পর বিনিময় সঙ্ঘটন করাকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিশেষ 'মিশন' বলে নির্দেশ করেছিলেন।"[১৫]

মানুষ-তৈরির শিক্ষা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

বিশেষভাবে ভারতীয় জনগণের শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা এবং পরিকল্পনাগুলির মধ্যে বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ দিকগুলির আত্মীয়তাবন্ধন ঘটিয়েছেন। স্বামীজী শিক্ষার যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো—"মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ"—"The manifestation of the perfection already in man." জাতির নানা জ্বলন্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "তোমরা এখন যে-শিক্ষা পাচ্ছ, তার কতকগুলি গুণ আছে বটে, আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে; আর দোষগুলি এত বেশি যে, গুণভাগ নগণ্য হয়ে যায়।... ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরি হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিভাবপূর্ণ। এমন শিক্ষায় অথবা অন্য যেকোন নেতিমূলক শিক্ষায় সব ভেঙেচুরে যায়—মৃত্যু অপেক্ষাও তা ভয়ানক।"[১৬]

"যাতে character form (চরিত্র তৈরি) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই।"[১৭]

"আমাদের কি চাই জানিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।"[১৮]

"যে-বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে-শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের ওপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।"[১৯]

ভারতে ব্রিটিশ অধিকার এবং শাসনকে অতিশয় নিন্দা করা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ তার সৃজনমূলক ভূমিকায় এবং উভয় জাতির এই সংযোগের মধ্যে ভারতের মুক্তির সুযোগ লক্ষ্য করেছেন, যার ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী যে-জড়তা, তার অবসান ঘটবে। এজন্য তিনি প্রয়োজনমত ব্রিটিশ শাসনকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত 'বর্তমান ভারত' শীর্ষক এক বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে: "ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ এই যে, পাটলীপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এপ্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে-চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এইসকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এদেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

"কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘ সুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মের প্রসারতা ও ব্যাপ্তি স্বীকার করেছেন। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণ ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে

১৪ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২-৩৯৩ ১৫ দ্রঃ 'The Master', pp. 42-43 ১৬ 'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০০
১৭ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৬ ১৮ ঐ, পৃঃ ৪০৩ ১৯ ঐ, পৃঃ ১০৭ ২০ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৩-২৪৪

পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।”[২১]

বিবেকানন্দের মূল বার্তা মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব

যাঁরা বিবেকানন্দের রচনাবলী মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবেন কিংবা ভগিনী নিবেদিতার লেখা 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে স্বামীজীর অসাধারণ মূল্যায়ন পড়বেন, তাঁরা তাঁর চিন্তাধারার ব্যাপ্তি এবং প্রত্যয়ের গভীরতা দেখে বিস্ময়ে অবাক না হয়ে পারবেন না। তাঁর নানাবিধ বক্তব্যের একটি মূল বিষয় হলো—মানুষ, তার বিকাশ, তার অভ্যুদয় এবং তার পূর্ণতা। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের পর্যালোচনা করে এই মূলসূত্রটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন ঃ "Each time he repeated with new arguments but with the same force of conviction his thesis of a universal religion without limit of time or space, uniting the whole *Credo* of the human spirit, from the enslaved fetishism of the savage to the most liberal creative affirmations of modern science. He harmonized them into a magnificent synthesis, which, far from extinguishing the hope of a single one, helped all hopes to grow and flourish accoridng to their own proper nature. There was to be no other dogma but the divinity inherent in man and his capacity for indefinite evolution." ("বর্বরদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বস্তুপূজা হইতে আধুনিকতম বিজ্ঞানের উদারপন্থী সৃজনধর্মী মতবাদগুলি পর্যন্ত মানব-মনের সকল প্রকার বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইয়া স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে যে বিশ্বধর্ম রহিয়াছে, সে-সম্পর্কে তাঁহার মতবাদের কথা তিনি বারেবারে বলিলেন। প্রতিবারেই তিনি নূতন নূতন যুক্তি দিলেন; প্রতিবারেই তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তায় কোনরূপ পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি সকল বিশ্বাস ও মতবাদকে মিলিত করিয়া সেগুলির মধ্যে এক অপূর্ব সঙ্গতি আনিলেন; প্রত্যেকটি আশা ও আদর্শ যাহাতে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিতে পারে, তিনি সেবিষয়েই সাহায্য করিলেন। মানুষের মধ্যে ভগবানের শক্তি আছে এবং মানুষের ক্রমবিকাশের ক্ষমতার কোন সীমা নেই, তিনি এই একমাত্র মতবাদ প্রচার করিলেন।")[২২]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের আদর্শ

আমরা আগেই দেখেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ মানবসভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুধাবন করেছিলেন এবং মানবজাতির বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি স্পষ্ট পথ দেখতে পেয়েছিলেন। একটি ধারা প্রাচ্যের, অপরটি পাশ্চাত্যের। জীববিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহার করে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য জোর দিয়েছে 'পরিবেশ'-এর ওপর আর প্রাচ্য জোর দিয়েছে 'জীব'-এর ওপর। গ্রীক-রোমান যুগ থেকেই মানবসমাজের বিকাশ এবং পূর্ণতার জন্য পাশ্চাত্য জোর দিয়ে এসেছে মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকের ওপর।

বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভিন্নধর্মী দুই সংস্কৃতি ও পদ্ধতির মূলসূত্রের সুষম সমন্বয়ের ওপরে। এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি তিনি ভারতে আনতে চেয়েছিলেন। আধুনিক ভারতের অন্যতম স্মরণীয় স্রষ্টা হিসাবে তিনি ভারতবর্ষকে মনে করতেন মানবজাতির এক বৃহৎ গবেষণাগার বা ল্যাবরেটরি, যেখানে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও নানাবিধ পরিকল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। ভারতের নিজস্ব এই পরীক্ষাকে তিনি বলতেন 'আভ্যন্তরীণ নীতি' এবং ভারতের সেই পরীক্ষিত শক্তি সারা বিশ্বের আধ্যাত্মিক সেবাকর্মে নিয়োজিত হওয়াকে তিনি বলতেন 'বৈদেশিক নীতি'। সর্বোপরি তিনি মনে করতেন, মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হতে পারে এক সার্বিক অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনসেতু।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর ভারতবর্ষে যে পুনরুভ্যুত্থান ঘটেছে সেখানে এই মহান শিক্ষকের কৃতির স্বাক্ষর অবিসংবাদিতভাবে বহমান। তাঁর প্রয়াণের তিন বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ জনতার প্রথম সমষ্টিগত প্রতিরোধ রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। রাজনৈতিক মুক্তির জন্য এই সংগ্রাম শীঘ্রই মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক বলিষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ফলে জাতির মধ্যে এক বিস্ময়কর রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল, যা ভারতবর্ষের আধুনিক যুগে প্রবেশের সময়কে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৯৪৭-এ এল রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ১৯৫০-এ ঘোষিত হলো সংবিধান; ভারতবর্ষ হলো সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তারপর থেকে এই বিবর্তন-প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত হয়েছে এবং এখনো হয়ে চলেছে, এর প্রভাব পড়েছে জাতীয় উদ্যোগের প্রতিটি ক্ষেত্রে।* [ক্রমশ]

---

২১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৮৭, পৃঃ ২৬৬

২২ 'The Life of Vivekananda', pp. 38-39; বঙ্গানুবাদ—ঋষি দাস ('বিবেকানন্দের জীবন', পৃঃ ২৬-২৭)

* ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বাই প্রকাশিত পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর সুপরিচিত 'ইট্যারন্যাল ভ্যালুস ফর এ চেঞ্জিং সোসাইটি' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সং, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৫৩-৩৬৮) অন্তর্ভুক্ত 'দ্য মীটিং অফ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক ইংরেজী ভাষণের কিয়দংশের ভাষান্তর।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ

স্বামী নির্বাণানন্দ

।। ১।।

একবার মঠে সাধু-ব্রহ্মচারীরা আলু কুটছেন। কারো কারো আলুর খোসায় আলু থেকে যাচ্ছিল। কেউ কেউ অবশ্য খুব সুন্দরভাবে খোসা বাদ দিয়ে কাটছিলেন। খোসাতে আলু লেগে থাকার জন্য বাবুরাম মহারাজ একজনকে ধমক দিলেন। তাঁর বি. এ. পাশ করা বিদ্যা ছিল, মহারাজ কিন্তু তাঁর কাজে মনঃসংযমের অভাব হয়েছে বলে নির্দেশ করলেন। বললেন ঃ "এইসব ছোট ছোট কাজেও মনঃসংযম থাকা উচিত। এসব কাজে মনঃসংযম ঠিক থাকলে তবেই বোঝা যায় যে, ধ্যান-জপে মনঃসংযম ঠিক ঠিক হয় বা হবে। আসলে আমাদের সমস্ত কাজই ধ্যান-জপ—তা সে তরকারি কাটাই হোক, গঙ্গা থেকে জল তোলাই হোক, নর্দমা-পায়খানা পরিষ্কার করাই হোক, ঠাকুরঘরে ফুল বাছা, চন্দন ঘষা, নৈবেদ্য সাজানো অথবা পূজা করাই হোক। আমাদের সব কাজই তাঁর কাজ অর্থাৎ ভগবানের কাজ। সবজি কাটা, নর্দমা পরিষ্কার করা, ঠাকুরঘরের কাজ এবং ধ্যান-জপের মধ্যে কোন তফাত নেই। স্বামীজী তাই আমাদের শিখিয়েছেন। সেজন্য ভগবদ্ভাবে যুক্ত হয়ে আমাদের কাজকর্ম করা উচিত।" একদিন একজন সাধু ফুল তুলতে গিয়ে গাছে আঁকশি লাগিয়ে ডাল ভেঙে ফেলেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁকেও খুব বকেছিলেন। বলেছিলেন—মনঃসংযোগের অভাবের জন্যই তিনি গাছের ডাল ভেঙেছেন। মনঃসংযোগ থাকলে কখনোই ভাঙত না। আমি একদিন তরকারি কাটতে গিয়ে আঙুল কাটলে বাবুরাম মহারাজ কোন সহানুভূতি না দেখিয়ে বিরক্ত হয়ে বলেন ঃ "তোকে কুটনো কুটতে বলা হয়েছে, হাত কাটতে কে বলেছে? তুই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলি, কাজে মন ছিল না। এটা-ওটা চিন্তা করছিলি, সেজন্যই আঙুল কেটেছিস।"

অন্য একসময় একটি তেলের শিশি ভেঙে ফেলি। তাতে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) খুব রাগ করেন এবং আমাকে বকাবকি করেন। আমি তাঁকে বলি ঃ "মহারাজ, এমন তেলের শিশি তো এক পয়সায় দুটো পাওয়া যায়।" মহারাজ শান্তভাবে বললেন ঃ "আমি তা জানি। কিন্তু শিশিটা ভাঙল কেন? ভাঙল তোর মনের অস্থিরতার জন্য। মন এত অশান্ত হবে কেন? তাছাড়া অতটা তেলও তো নষ্ট হলো।"

স্বামীজী আমাদের মানুষের সেবা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেবার আগে আমাদের আত্মমুক্তির সাধনার কথা বলেছেন। আত্মমুক্তির সাধনা ঠিকমতো করতে পারলে তবেই মানুষের সেবা ঠিক ঠিক হবে। বস্তুত, শুধুমাত্র জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই যথার্থ পরের উপকার করতে পারেন। কারণ, তাঁদের দেহবুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি থাকে না। স্বামীজী বলেছেন ঃ "একজন লোকের মুক্তির জন্য আমি সহস্রবার নরক ভোগ করতে প্রস্তুত।" জীবকল্যাণের জন্য এই আকুতি কি সাধারণ মানুষের হয়, না সাধারণ সাধকের হয়? এই আকুতি হয় জীবন্মুক্ত পুরুষদেরই। নিজেদের দেহসুখের প্রতি জীবন্মুক্ত পুরুষদের কোন আগ্রহ থাকে না। তাঁদের সব আকুতিই অপরের কল্যাণসাধনের নিমিত্ত। আমাদের যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি আছে ততক্ষণ 'আমি করছি'—এই বোধ আছে। ততক্ষণ আমরা নিজেদের জন্যই কাজ করি বুঝতে হবে। সেজন্য আমাদের যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ আমরা নিজেদের চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকি। নিজেদের চিন্তা বাদ না দিলে মানুষের সেবা ঠিক ঠিক করা যায় না। সাধন-ভজনের মাধ্যমে দেহবুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি নাশ হয়। স্বামীজীর আদর্শ শুধু সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্যই নয়, সকলের জন্যই। ভক্ত সংসারীদের কাছেও তাঁর আদর্শ একটি 'মডেল'। এই 'মডেল' অনুসরণ করলে গৃহী ভক্তরাও চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে পরমার্থ লাভ করতে পারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহায়ক ত্যাগী পার্ষদরা দিনরাত জপ-ধ্যান করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। জগতের কল্যাণের জন্য তাঁরা কাজ করেছিলেন। তাঁদের প্রথম জীবনে অনেকে তাঁদের কত গালাগালি দিয়েছে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নিন্দা-সমালোচনা করেছে। কিন্তু তাঁদের এমনই personality (ব্যক্তিত্ব) ছিল যার ফলে নিন্দুকরাই অনেকে আবার তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁদের কাছে এসে দুঃখপ্রকাশ করেছে, ক্ষমা চেয়েছে। তাঁদের সময় মঠে অনটন ছিল, অভাব ছিল; কিন্তু কারো কাছে কোন জিনিস তাঁরা চাইতেন না। লোকেরা বা ভক্তরা নিজের থেকে এসে যা দিত তাই তাঁরা নিতেন। ততটুকুই নিতেন যতটুকু প্রয়োজন। 'প্রয়োজন' এবং 'বিলাসিতা'—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তা তাঁদের দেখে বুঝেছি। সেজন্য ঠাকুরের সন্তানদের জীবন সর্বদা আমাদের সকলের সামনে রাখতে হবে। সবসময় আমাদের একটা উচ্চ আদর্শ নিয়ে চলতে হবে।

মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজ চারজনে একদিন সকালে মঠে গঙ্গার ধারে হাঁটছেন। নৌকা করে যাচ্ছিল উত্তরপাড়া, বালি প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা। ঐ অঞ্চলে তখন গোঁড়া হিন্দুদের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি। নৌকায় যারা ঐ দলের ছিল তারা বেলুড় মঠকে পছন্দ করত না। মহারাজদের দেখে তারা গালি দিতে দিতে যাচ্ছিল। মঠেরও নিন্দা করছিল। বলছিল ঃ "বেশ আছেন এঁরা। ভাল খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, বাগানবাড়িতে আছেন—এখন 'মর্নিং ওয়াক' করছেন।" ওদেরই মধ্যে আবার কেউ কেউ ওদের কথার প্রতিবাদ করল। বলল ঃ "না, না ওকথা বলবে না। ওঁরা আলাদা থাকের সাধু। চেহারা দেখেছ। যেন স্বর্গের দেবতা।"

প্রসাদের ওপর ঠাকুরের পার্ষদদের অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তাঁরা মনে করতেন প্রসাদে ভক্তি হয়। একবার কয়েকজন ভদ্রলোক সম্ভবত প্রথমবার মঠে এসেছেন। তাঁরা জানতেন না যে, মঠে ভক্তরা প্রসাদ পান। সুতরাং তাঁরা প্রসাদ না পেয়ে চলে যাচ্ছেন। পথে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে দেখা। তিনি জিজ্ঞাসাবাদে জানলেন, তাঁরা মঠে প্রসাদ পাননি। মঠে এসে তিনি ঠাকুরঘরের বলাই মহারাজকে পাঠালেন তাঁদের ডেকে আনতে। তাঁরা তখন অনেকটা চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বলাই মহারাজ তাঁদের ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁরা এসে প্রসাদ পেলেন। প্রসাদ হয়তো সামান্য, কিন্তু বাবুরাম মহারাজের ভাবটা ছিল—প্রথমত, মঠে যেই আসুন—ভক্ত হোন বা না হোন—মঠ থেকে কেউ প্রসাদ না পেয়ে যাবেন না। দ্বিতীয়ত, প্রসাদে ভক্তিলাভ হয়। হতোও কিন্তু তাই। মঠের প্রসাদ পেয়ে অনেকের পরিবর্তন হয়েছে দেখেছি। তাতে প্রসাদের প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল, আবার প্রেমানন্দের প্রেমের প্রভাবও ছিল। অনেককে দেখেছি অহঙ্কারী, নাক-উঁচু—হয়তো এমনি মঠে এসেছে। পরে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে কথা বলে, প্রসাদ পেয়ে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। পরে আবার যখন তারা মঠে এসেছে, দেখতাম তাদের চোখে জল।[১]

।। ২।।

ধর্মজীবনের ভিত্তি হলো ত্যাগ ও তপস্যা। বিলাসিতা ধর্মজীবনের প্রবল অন্তরায়। যারা ধর্মজীবন যাপন করতে চায় তাদের এবিষয়ে সতর্ক থাকা খুব দরকার। ঠাকুর তাঁর সন্তানদের সবকিছু করে দিলেন অথচ তাঁদের কঠোর তপস্যাও করতে হলো! কেন? লোকশিক্ষার জন্য। ঠাকুর নিজে লোক-শিক্ষার জন্য কঠোর তপস্যা করে দেখালেন। তাঁর ছেলেরাও তাঁর কাছ থেকে সব পাওয়ার পরেও কঠোর তপস্যা করলেন। এসমস্তই আমাদের শিক্ষার জন্য। সবসময় মনে রাখতে হবে—ঠাকুর সর্বদা বলতেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। কাজ আমরা করব ঠিকই, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, কাজ আমাদের সাধনার অঙ্গ, তাতে আমাদের চিত্তশুদ্ধি হবে এবং তার মাধ্যমে আমরা ভগবানলাভ করব। আমাদের কাজকর্ম ও সাধন-ভজন পাশাপাশি থাকবে।

বর্তমান যুগে সর্বদা তপস্যা ও সাধন-ভজন সকলের পক্ষে সম্ভব হবে না বলে সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম কর্মের প্রবর্তন করলেন স্বামীজী। মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রমুখ সেই ধারার অনুবর্তন করলেন। কাজের সঙ্গে সঙ্গে চলল সাধন-ভজনও। সাধন-ভজন যেন নৌকার হাল। স্বামীজী থাকতে তিনি নিজেই শেষরাত্রে কোন কোন দিন ঘণ্টা বাজিয়ে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন। পরে মহারাজও একসময় ঘণ্টা মেরে সকলকে শেষরাত্রে তুলতেন। ধ্যান-জপ চলত ভোর পর্যন্ত। তার পরেই শুরু হতো ভজন। তাঁরা বলতেন, ধ্যান-জপের পাশাপাশি ভজনও সাধনার একটি বড় অঙ্গ। মঠে সাধু-ব্রহ্মচারীরা সাধন-ভজন করবে বলেই তো স্বামীজীরা মঠ করলেন, কিন্তু গৃহী ভক্তরাও বাড়িতে যে যতটা পারবে সাধন-ভজন করবে, এটা তাঁরা চাইতেন। মঠে এসে সাধুদের কাছে সেই ধারা তারা জেনে যাবে এবং বাড়িতে গিয়ে সাধ্যমত তা অভ্যাস করবে।

এখন ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবের একটা বন্যা আসছে। দেশ-দেশান্তরে সবাই এখন ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব নেওয়ার জন্য ব্যাকুল। তাঁরা বলেছিলেন, ক্রমে তাঁদের ভাব সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে। ঠাকুর-স্বামীজী যা বলে গেছেন তাতে বিশ্বাস করতে হবে। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব আমাদের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় হয় যেন।

শুধু স্বামীজীর বই পড়লে হবে না, প্রাচীন সন্ন্যাসীদের কাছে স্বামীজীর আদর্শ বুঝে নিতে হবে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। নিজের ভিতরে আধ্যাত্মিকতা না বাড়ালে শুধু পড়াশুনায় কোন কাজ হয় না। স্বামীজী যা বলেছেন তার প্রত্যেকটির পিছনে রয়েছে ত্যাগ, তপস্যা ও অনুভূতির ঐশ্বর্য। আমাদের ঐ বৈরাগ্য ও অনুভূতির দিকে নজর দিতে হবে। কাজের তোড়ে ত্যাগ-তপস্যার ভাব যেন না কমে যায়। এই 'ট্রেন্ড' খুব মারাত্মক। মহারাজ এসম্পর্কে আমাদের খুব সাবধান করতেন। বলতেন : "খুব সাধন-ভজন কর নইলে সাধন-ভজনের চেয়ে মান-যশ, কাজের নেশায় পেয়ে বসবে।" মহারাজ বলতেন : "একহাতে কাজ করবে, অন্য হাতে ভগবানকে ধরে থাকবে। কাজ শেষ হলে দুই হাতে ভগবানকে ধরবে।"

মহারাজ আমাদের 'নিশা-জপ' করতে বলতেন। বলতেন : "কাজকর্ম অনেক দেখেছি। কিছু করে দেখাও। সাধন চাই।" আমাদের ধরে ধরে মহারাজ কাজে লাগিয়ে দিতেন। কিন্তু কাজের পিছনে সাধন-ভজনের ভিতটা খুব শক্ত করে দিতেন। সাধন-ভজনের তীব্রতা তত বেশি বাড়াতে না পারলে অন্তত পড়াশুনা নিয়ে থাকতে হবে। উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, কথামৃত এবং মা, স্বামীজী ও ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদদের বই পড়তে হবে। পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হয়। নইলে পড়াশুনো করা যায় না। যখন শরীরে শক্তি থাকবে না, কাজকর্ম করতে পারবে না, জপ-ধ্যান বেশি করতে পারবে না, তখন কি নিয়ে থাকবে?

তোমরা অতি ভাগ্যবান। ঠাকুরের কৃপায় তাঁর ভাবের পরিমণ্ডলে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছ। জগতে কত লোক আছে, যারা ভগবান আছেন—একথাই বিশ্বাস করে না। তোমরা বিশ্বাস কর, সেজন্যই তোমরা এই ভাবের কাছে

১ ২৪ অক্টোবর ১৯৬৪ বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

এসেছ। অনেক লোকেই বলে—ভগবান কথার কথা। কিন্তু তা নয়। ভগবান আছেন—নিশ্চয়ই আছেন। মহাপুরুষগণ, মুনিঋষিগণ তাঁকে দেখেছেন ও বলেছেন যে, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তোমরা তাঁকে ডেকে যাও, নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা লাভ করবে। সবসময় তাঁর নাম, তাঁর কথা চিন্তা করবে। যখন মন বসবে না তখন তাঁর পটের দিকে তাকিয়ে থাকবে। নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ) বলতেন: "তাঁর নাম যেন একটা আংটা। কুয়োতে ২০০ হাত নিচে জল আছে। সেই জল তুলতে হবে। কিভাবে তুলবে? গুরুদেব হাতে আংটা ধরিয়ে দিলেন। সেই আংটায় বালতি লাগিয়ে কুয়োয় নামিয়ে দিলে। এখন যে যত তাড়াতাড়ি আংটা টানতে পারবে তার জল তত তাড়াতাড়ি উঠবে—অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করবে।" তোমরা ভগবানের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করছ। এক জীবনের চেষ্টায় ভগবানলাভ হয়তো হলো না, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? এক জীবন কেন, কত শত জীবন চলে যাবে তাঁকে লাভ করতে! কিন্তু এই যে তাঁকে লাভ করার সাধনা, এই সাধনার কি কোন দাম নেই? যে ছিপ হাতে মাছ ধরতে বসেছে, সে ছিপ ফেললেই হয়তো মাছ পাবে না। কিন্তু ছিপ ফেলে বসে থাকার একটি আনন্দ আছে। সেই আনন্দ হলো মাছধরার সাধনার আনন্দ। যেমন মাছ না ধরলেও ফাতনা নড়ল, মাছের লেজ দেখা গেল বা জল খুব জোরে নড়ে উঠল। তখন মনটাও আনন্দে নেচে উঠল। এইবার বড়শিতে মাছ ঠোক্কর মারছে, এক্ষুণি হয়তো টোপ গিলবে! আর তার পরেই বড়শিতে গেঁথে মাছ ডাঙায় তুলবে। এই যে মাছধরার সাধনার আনন্দ, এমনি আনন্দ ভগবানের সান্নিধ্যলাভের সাধনায়। ভগবানের দর্শন এজন্মে নাইবা হলো, কিন্তু তাঁকে চাইছি, তাঁকে খুঁজছি, তাঁর নাম করছি, তাঁর ধ্যান করছি, তাঁর কীর্তন করছি—এর আনন্দ কি কম?

ভগবানলাভের সাধনায় সবথেকে বড় প্রয়োজন তাঁর প্রতি ভক্তি এবং বিশ্বাস। তা থেকে আসে তাঁর প্রতি শরণাগতি। যখন শরণাগতি হয় তখন বুঝতে হবে, ভগবানলাভের সাধনায় অগ্রগতি অনেকখানি হয়েছে। দুঃখের মধ্যে, সুখের মধ্যে তাঁরই কৃপা আমার জীবনে নেমে আসছে—এমন বোধ যখন আসবে তখন বুঝতে হবে শরণাগতির ভাব মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে বিদায় চাইলেন। বললেন: "এখন তো যুদ্ধজয় হয়েছে, পাণ্ডবরা এখন নিষ্কণ্টক, তারা এখন বিপন্মুক্ত। এখন আমার কাজ শেষ। আমি এবার ফিরে যাব দ্বারকায়।" কুন্তী বললেন: "হে জগৎগুরু, বিপদ থাকলেই তো তোমাকে পাই। বিপদ না থাকলে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। তাই যদি হয়, তবে বিপদ, দুঃখ, বিপর্যয়, দুর্দৈব আমাদের জীবনে শাশ্বত হয়ে থাকুক। আমি সম্পদ চাই না, সুখ চাই না। আমি চাই, তুমি আমাদের সঙ্গে থাক এবং বিপদ, দুঃখ, বিপর্যয় আমাদের চিরসঙ্গী হয়ে থাকুক।" এই হলো পূর্ণ শরণাগতি। এই হলো তাঁর ওপর ভক্তি এবং বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরীক্ষা। শরণাগতির পূর্ণতায় ভগবানলাভ।

স্বামীজী ও মহারাজরা বলতেন: "যারা ঠাকুরকে ভগবান বলে বিশ্বাস করবে, তাদের মুক্তি হবেই।" আমি তোমাদের হয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব, যেন তোমাদের ওপর তাঁর কৃপা বর্ষিত হয়। তাঁর প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তি, বিশ্বাস ও শরণাগতি হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাওয়ার জন্য সাধনার পুরুষকার তোমাদের মধ্যে যেন অটুট থাকে। চুপচাপ বসে থাকলে কিছু হয় না। আমি জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকব আর ভগবানলাভ তিনি করিয়ে দেবেন, তা হয় না। সব নিজেকেই করতে হবে। তবে তাঁর কৃপা পাবে। তাঁর কৃপায় তাঁকে লাভ হয়। যদিও তাঁর কৃপা কোন শর্তাধীন নয়, তবু তিনি চান আমরা সাধন করি। সাধনের জন্য চাই দৃঢ় অধ্যবসায় এবং সঙ্কল্প। এখানে কোন 'প্রক্সি' চলে না।[২] ❑

২ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ নরেন্দ্রপুর আশ্রমে পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

চিরন্তনী
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ⑦
এই চিত্রমালাটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য
কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত
অসুরদের নিক্ষিপ্ত একটি অস্ত্রও দেবতাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারল না। আকাশপথেই দেবতারা অসুরদের অস্ত্রগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে লাগলেন।
দেখতে দেখতে অসুরদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে গেল। এখন উপায় কি? তারা গাছ, পাথর, পাহাড়ের চূড়া যেখানে যা পেল তুলে এনে দেবতাদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল।
অদ্ভুত কাণ্ড! দেবতাদের কোন ক্ষতি হলো না। অসুরেরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বৃত্রাসুরকে যুদ্ধক্ষেত্রে একলা ফেলে রেখেই যে যার মতো পালাতে লাগল। বৃত্রাসুর তাদের কত বোঝানোর চেষ্টা করল, কত ডাকল, কিন্তু সবই বৃথা হলো। তার কথায় কেউ কর্ণপাত করল না, ফিরেও তাকাল না। [ক্রমশ]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি নিরীক্ষা

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এই বিশেষ ধারাবাহিকটি শুরু হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

[১]

প্রস্তাবনা

'গীতা' সমগ্র পৃথিবীর অনন্য সম্পদ, প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এক মহামূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার। 'গীতা' বহুকাল ধরে ধ্রুবতারার মতো বহু মানুষের জীবনে পথপ্রদর্শকের কাজ করে এসেছে। আজো মহত্তম চিন্তার আধার এই মহাগ্রন্থটি দেশে-বিদেশে বহুল সমাদৃত। তার প্রমাণ—এটি পৃথিবীর যাবৎ মুখ্যভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এপর্যন্ত ৩৬টিরও বেশি ভাষায় আড়াই হাজারেরও বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[১] সত্য সমুজ্জ্বল বলে এর কাব্যগুণও অসাধারণ। কিন্তু কেবলমাত্র যে কাব্যগুণের জন্যই গীতার এত সমাদর সকল যুগে, যুগ থেকে যুগান্তরে এবং আজো তা বিন্দুমাত্রও ক্ষীণ হয়নি—তা ঠিক নয়। আজো লক্ষ লক্ষ মানুষ—দেশে-বিদেশে প্রায় সর্বত্র—আগ্রহের সঙ্গে গীতা পাঠ করেন, অনেকে প্রতিদিন। অনেকের জীবনসঙ্গী ও নিত্যসঙ্গী এই গ্রন্থ। কারণ, গীতা হলো জ্ঞানেশ্বরী, সর্বোচ্চ সত্যজ্ঞানের আধার। মনে রাখতে হবে, গীতার বিশ্বব্যাপী পাঠকদের মধ্যে কেবলমাত্র হিন্দুধর্মাবলম্বী নন, আছেন নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ, আছেন আজকের বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনায়ক, বিচিত্র পেশার, বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির দেশ-বিদেশের বহু মানুষ।

মোগল সম্রাট শাজাহানের পুত্র উদারপন্থী দার্শনিক দারাশুকোর মতে—"গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস, সর্বোচ্চ সত্যলাভের সুগম পথ।"[২] ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে গীতার প্রথম ইংরেজী সংস্করণ (অনুবাদক—চার্লস উইলকিন্স) লন্ডনে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস যে-কথাগুলি লেখেন, তা হলো—"প্রাচীনত্ব এবং যে-পূজা গীতা বহু শতাব্দী যাবৎ মনুষ্যজাতির এক বৃহদংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে, তাহার দ্বারা গীতা সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।... গীতাপাঠে কেবল ইংরেজগণ কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতাধর্মের অনুশীলনে মানবজীবন শান্তিধামে পরিণত হইবে।... গীতার উপদেশে খ্রীস্টানধর্মের মূলসূত্রগুলির প্রকৃত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।"[৩] দেখা যাচ্ছে, এইসকল মূল্যায়ন যাঁরা করেছেন তাঁরা গীতার কাব্যগুণের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি তার মূল সম্পদের কথা—শাশ্বত সত্যের আধার এবং মানবজীবনে পথপ্রদর্শক হিসাবে তার ভূমিকার কথাও বলেছেন।

একেবারে হাল আমলের ধর্মের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণের একজন মানুষ প্রখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী ওপেনহাইমার পরমাণু-বিভাজন পরীক্ষার সময় যে মহাশক্তির বিস্ফোরণ ঘটতে দেখেছিলেন, তার তুলনা খুঁজে পেয়েছিলেন গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শন সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির মধ্যে। পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর একটি বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, সেই মহামুহূর্তে তিনি আবৃত্তি করছিলেন গীতার উপরি উক্ত একাদশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকটি—

"দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।" (১২)

—যদি আকাশে হাজার সূর্য একই সঙ্গে উদিত হয় তাহলে সেই দীপ্ত বিশ্বরূপের প্রভাব কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।

এখানে এই শ্লোকটির মধ্যে যে মহাসত্য উদ্ঘাটিত, তাকেই স্বীকৃতি জানিয়েছেন ওপেনহাইমার তাঁর উক্ত বিবৃতিতে। কেবলমাত্র কাব্যরস উপভোগের জন্য তিনি নিশ্চয়ই ঐ মহামুহূর্তে উক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করছিলেন না। সেজন্য একথা বলা চলে না যে, পৃথিবীময় গীতার যে সর্বকালীন সমাদর তা কেবলমাত্র কাব্যরস উপভোগের জন্য। এপ্রসঙ্গে কে. ব্রাউনিং-কৃত গীতার অনুবাদ-গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে মূল্যায়নটি করা হয়েছে তা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—

"Then it was that Sri Krishna, smiling, began his marvellous discourse. So marvellous is it that the greatest minds have studied it and are yet incapable of extracting the full meaning of His gracious words."[৪] (শ্রীকৃষ্ণ তখন ঈষৎ হাস্য করে তাঁর অনন্য বিস্ময়কর উপদেশ আরম্ভ করলেন। এটি এমনই

---

১ এই সংবাদসূত্র উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গীতার পঞ্চম সংস্করণের (১৯৫০-এ প্রকাশিত) ভূমিকা। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে নিশ্চয়ই আরো কিছু ভাষায় গীতার আরো বহু অনুবাদ ও সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

২ ঐ ৩ ঐ, পৃঃ ১৬

৪ সুবোধ চক্রবর্তী কৃত 'গীতার গল্প' গ্রন্থে কে. ব্রাউনিং-এর 'Song Celestial' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৭

অসাধারণ যে, জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এটিকে নিয়ে মনন করেছেন, তথাপি তাঁরাও তাঁর করুণাপূর্ণ বাণীর পূর্ণ মর্ম উদ্ঘাটিত করতে সমর্থ হননি।)

সব মানুষের মনকেই গীতা গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং একথা একান্ত সত্য যে, গীতার আবেদন মানবিক এবং সর্বজনীন। তার কারণ অবশ্যই এই যে, গীতা মানবজীবনের পরমসত্যকে ধারণ করে আছে।

গীতার সমালোচনা

অবশ্য আলোচনা যত হয়েছে সমালোচনাও তত। এত প্রচণ্ড সমালোচনাও আর কোন ধর্মগ্রন্থের হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাতে এর শক্তি ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং বেড়েছে। একমাত্র ধর্মান্ধ ও মতবাদ-অন্ধ যারা, তারা ছাড়া সকলেই অবশ্য গীতাকে সমাদরই করেছেন।

আধুনিক কালে গীতার সমালোচনা শুরু হয় পূর্বোক্ত ওয়ারেন হেস্টিংসের উচ্চ প্রশংসামূলক ভূমিকা-সহ চার্লস উইলকিন্সের ইংরেজীতে অনুবাদ (১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ) এবং ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত এ. ডব্লিউ. শ্লেগেলের ল্যাটিন অনুবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী কালে। এসকল গ্রন্থে গীতার প্রতি এবং তার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত হয়েছিল. তার বিরোধিতা করতে আসরে নেমে পড়লেন সাম্রাজ্যপ্রসারে আগ্রহী ইউরোপীয় শাসকেরা। এবিষয়ে আমাদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করেন বেদ-অনুবাদক ম্যাক্সমূলার তাঁর ভারতে আর্য-অভিযানতত্ত্বটি গঠিত ও প্রচারিত করে। তারপর আলবার্ট ওয়েবার 'Indian Antiquary' নামক গ্রন্থে প্রচার করেন, কৃষ্ণ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন, আর বৈষ্ণবধর্ম খ্রীস্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: "বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তিনি যেখানে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ।"[৫]

এরপর আসরে আরো অনেকে আবির্ভূত হন—যেমন রুডলফ অটো, ই. ডব্লিউ. হপকিন্স, এন. ম্যাকনিকল এবং আরো অনেকে। এঁদের বক্তব্যের সারমর্ম—সাংস্কৃতিক সম্পদ নিয়ে ভারতের গৌরব করবার কিছুই নেই, সবই ইউরোপের অবদান। এসবই ইন্দো-ইউরোপীয়ান আর্যগণ, যাঁরা ইউরোপ থেকে ভারতে অভিযান করে এসেছিলেন, তাঁরাই সৃষ্টি করেন।

এঁদের প্রচারিত এইসকল তত্ত্বের প্রতিবাদ জানান বালগঙ্গাধর তিলক, স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে এঁদের মত যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইউরোপীয়দের প্রচারিত তত্ত্বে আস্থাজ্ঞাপন করেন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এবং এর জন্য তাঁকে 'নাইট' উপাধি দিয়ে পুরস্কৃতও করা হয়।

আরো পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে পুনরায় এঁদের মতের পুনরুজ্জীবন করছেন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকেরা। এটি পরিতাপের বিষয় এজন্য যে, এঁরা মুখে-বাইরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। তবে কেন এঁরা ইউরোপীয়দের বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা খণ্ডিত মতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছেন? তার কারণ, এঁরা ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে চাইছেন একটি ছক অনুসারে। এঁদের সেই ছক অনুসারে ইতিহাসের একমাত্র নিয়ামক হলো অর্থনীতি, উৎপাদন-পদ্ধতি ইত্যাদি এবং ধর্ম হলো শোষণের যন্ত্রমাত্র। এইসকল লেখকদের মধ্যে মুখ্য হলেন ঐতিহাসিক ডি. ডি. কোশাম্বী। কোশাম্বী একসময়ে ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন।[৬] এঁদের মূল বক্তব্য—গীতা রচনার উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা এবং শূদ্রদের শোষণ। পরবর্তী যুগে যখন জাতিভেদ প্রবল হয়ে ওঠে, তখনি শূদ্র-শোষণের ব্যাপারটি প্রমাণ করা সহজ। সেজন্যই এঁরা গীতার কালকে নিয়ে যান বুদ্ধ-পরবর্তী ও খ্রীস্ট-পরবর্তী যুগে। এব্যাপারে এঁদের প্রধান সহায়ক হলেন পূর্বোক্ত ইউরোপীয় সমালোচকরা, যাঁদের মত একদা বঙ্কিমচন্দ্র খণ্ডন করেছিলেন। এঁরা ইউরোপীয় মত গ্রহণ করছেন বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিতর্ককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। এগুলি খণ্ডন করবার কোন প্রয়াসই তাঁরা করেননি।

এখন গীতা শূদ্র-শোষণের উদ্দেশ্যে রচিত—এ-মত স্পষ্টত একদেশদর্শী। ইতিহাসের নিয়ামক একমাত্র অর্থনীতি—এ-মতও ঠিক নয়। এবিষয়ে সংস্কৃতি-বিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের একটি উক্তি বিশেষ স্মরণীয়। "ইতিহাস ব্যাখ্যার মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতির অর্থনৈতিক বাস্তব ভিত্তির ওপর অত্যধিক অসম গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে বলে তা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে—জীবন্ত সত্য হয়ে ওঠে না। যান্ত্রিক বাস্তবতায় সত্যের সামগ্রিকতা প্রতিফলিত হয় না। নানাবিধ পরস্পরবিরোধী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের রথচক্র ঘরঘরিয়ে চলে, তাতে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অস্বীকার্য নয়। সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে তার বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের, বিশেষ করে সংস্কৃতির রূপটি ফুটে ওঠে।"[৭] অর্থনৈতিক চিন্তাধারার দ্বারা গঠিত যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে কোন সমাজ-সংস্কৃতির সঠিক রূপটি ফুটে উঠতে পারে না। এজন্যই কোশাম্বী প্রমুখ তাঁদের বিচারে সত্য থেকে বহুদূরে গিয়ে পড়েছেন। কোশাম্বীর মত—তাঁরা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে মনীষী অতুল গুপ্তের

---

৫ কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, সাহিত্য সংসদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৩

৬ 'Myth and Reality' (1962)

৭ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—ভূমিকা

নিম্নলিখিত উক্তিটি এঁদের মনে রাখা উচিত—"সকল বিজ্ঞানের কোন সাধারণ রীতি নেই। যা সকল বিজ্ঞানে সাধারণ তা হলো সত্যনিষ্ঠা, বিনা প্রমাণে বা অপ্রমাণে কোন কিছু না গ্রহণ করা এবং প্রমাণবিরুদ্ধ হলে চিরপোষিত মত—তা যত প্রিয়ই হোক না কেন—তা পরিত্যাগে দ্বিধাহীনতা। যে-ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ প্রকৃত ইতিহাস, তাতে কল্পনাবিভ্রান্তি নয়—এসকল গুণ থাকবে।"[৮] এপ্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিমতও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "সমাজ একটি সক্রিয় ও সচল প্রতিষ্ঠান, প্রতি মুহূর্তে নব নব রূপ পরিগ্রহ করছে। তাকে কোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব অনেক। তাদের হাতে মানুষের ভবিষ্যৎ, সভ্যতার ভবিষ্যৎ। সে-দায়িত্ব পালন করতে হলে চাই স্বচ্ছ ও মুক্ত দৃষ্টি এবং সত্যদৃষ্টি।"[৯]

এ-দায়িত্বের কথা কোশাম্বী প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা মনে রাখেননি। তাঁরা 'ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা' তত্ত্ব বা মতবাদের প্রতিই দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের খ্যাত-অখ্যাত অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও কি সে-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন? তাঁরাও নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন ম্যাক্সমূলার-প্রণীত ভারতে আর্য-অভিযান তত্ত্ব এবং ইউরোপীয়দের প্রচারিত কৃষ্ণ-তত্ত্ব, যদিও বালগঙ্গাধর তিলক, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষিবৃন্দ এসকল মত খণ্ডিত করেছেন। এইসকল মনীষীদের প্রদর্শিত যুক্তি-তর্ক, প্রমাণ কোন কিছুই আমাদের ঐতিহাসিকরা বিবেচনায় আনেননি। এ বড়ই আশ্চর্যের কথা, দুঃখেরও কথা এবং এ-জাতির পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথাও। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদেরই মতো ভুল ইতিহাস শিখছে। ইতিহাস অনেকাংশে একটি জাতির ভাগ্যের নিয়ামক, সে-কথাই ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন। ভুল ইতিহাস জানলে আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে তা অনুমেয়।

গীতার ধর্মে বিশ্বাস ও সত্য

জীবনের মহাসত্যকে ধারণ করে আছে বলেই গীতা মোক্ষশাস্ত্র, পথপ্রদর্শক ও অনন্য ধর্মগ্রন্থ। আর যা মানুষের জীবনে বিপ্লব ঘটায়, রূপান্তর আনে—তারই নাম ধর্ম। গীতায় সেই ধর্মই বিধৃত হয়ে আছে। গীতা হলো মানবজীবনের রূপান্তরের দর্শন, প্রয়োগধর্মিতা এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দের প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে ধর্ম হলো মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ ("Religion is the manifestation of divinity in man."), ধর্ম হলো 'হওয়া' ("being and becoming"), দিব্যজীবনের বিকাশ ("being divine and becoming divine"), ধর্ম মানুষের স্বরূপ বা সত্য পরিচয়ের উদ্ঘাটন। সুতরাং আজ যাঁরা বলছেন—ধর্ম কেবল বিশ্বাসের বস্তু, সত্যাসত্যের প্রতি উদাসীন; তাঁরা সত্য বলছেন না, তাঁর সত্য থেকে বহুদূরে অবস্থান করছেন। প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। এঁদের বক্তব্য—গীতায় কেবল বিশ্বাসের কথাই বলা হয়েছে, সত্যাসত্যের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই।

কিন্তু সত্য ছাড়া বিশ্বাসের ভিত্তি কোথায়? সত্যের প্রতি উদাসীন থেকে মানুষ কোন কিছুতে বিশ্বাস করতে পারে কি? ধর্মের আরম্ভই হলো সত্যানুসন্ধান থেকে এবং ঋগ্বেদ (যা বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ) থেকে আরম্ভ করে আমাদের সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'সত্য' কথাটি অবিরাম উচ্চারিত। ঋক্-মানবের আদি ধর্মীয় ভাবনা বরুণ, অগ্নি, যম, মিত্র, সাবিত্রী, রুদ্র প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিকট পার্থিব বাসনা পূরণের প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ হলেও সে একসময় জানতে পারে যে—"এ আদিত্যকে মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ বলে থাকেন, ইনি এক ও সত্য (নিত্য)।" (১।১৬৪।৪৬) সৃষ্টির বিষয় সম্পর্কে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—"সৃষ্টির বিষয় যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ তিনি হয়তো জানেন, কিংবা তিনিও হয়তো জানেন না।" (১০।৮২।৭) বিশ্বের এই অধ্যক্ষ কে? সেসম্বন্ধে বলা হয়েছে—"আছেন তিনি, যিনি জীবন ও বলদাতা, সকল প্রাণী ও দেবতাগণ যাঁর শাসনাধীন, জীবন ও মৃত্যু যাঁর ছায়াস্বরূপ।" (১০।১২।২)

এইসকল সত্য যা ঋষিগণ একদা উচ্চারণ করেছিলেন তা তাঁদের অনুমান বা কল্পনামাত্র ছিল না, তাঁদের দাবি—তাঁরা এসকল সত্যকে জেনেছেন। তাই তাঁদের সুস্পষ্ট দ্বিধাহীন ঘোষণা—"তমসার পারে যে আদিত্যবর্ণ পুরুষের অবস্থান, যাঁকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, সেই তাঁকেই জেনেছি। (শুক্লযজুর্বেদ, ৩১।৩৮) আর অথর্ববেদে (যা বেদের অন্তর্ভাগ) বলা হলো—"যজ্ঞের দুই চক্ষু—সত্য ও ঋত।" (৯।৫।২১) সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে আদি অন্ত কাল ধরে মুখ্য প্রসঙ্গ হলো কেবল 'সত্য', আর কিছু নয়।

উপনিষদে 'সত্য' কথাটি তো সর্বত্র দেখা যায়। বস্তুত, উপনিষদের মুখ্য বিষয়ই হলো—"সত্যস্যসত্যম্"। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—"এই সত্যই সর্বভূতের মধু, সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই অমৃত, সত্যই সর্বস্ব।" (২।৫।১৬) ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে—"হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত। হে পূষণ, তুমি তা অপসারিত করে দাও।" (১। ১৫) মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে—"সত্যের জয় হয়, অসত্যের নয়। সত্যের পথই দেবযান।" (৩।১।৬) শুধু মুখ্য উপনিষদ্গুলিতেই নয়, পরবর্তী কালের গৌণ (minor) উপনিষদসমূহেও একই চিন্তাধারা অব্যাহত। যথা,

---

৮ ইতিহাস, পৃঃ ৬১-৬২

৯ 'The Meaning of Race, Tribe and Nation'—Paper at the First Universal Races Congress, 1911. অনুবাদ—লেখিকা।

মহানারায়ণ উপনিষদে বলা হয়েছে—"সত্যে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।" (২২।১) নৃসিংহতাপনীতে বলা হয়েছে—"সত্যমুক্ত নিরঞ্জনঃ।" এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, যা উল্লেখ করা যেতে পারে।

পুরাণ ও ইতিহাসের একই কথা। যেমন, রামায়ণে বর্ণিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে এই কথা প্রতিভাত যে, সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনকিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্যপাট ত্যাগ করে বনগমনের উদ্দেশ্যও তাই। মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ঃ "সত্যই ব্রহ্ম ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃষ্টি ও পালন করে।"[১০] শান্তিপর্বে আরো বলা হয়েছে—"বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই।"[১১]

একি কেবল আর্য ঋষিদেরই কথা? তা কিন্তু নয়। মধ্যযুগের ভক্তিসাধকদেরও এই একই কথা। "সত্যের সমান তপস্যা নেই, মিথ্যাই হলো সেরা পাপ। যাঁর হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাঁর হৃদয়ে তিনি স্বয়ং বিরাজমান।"—এ হলো কবীরের কথা। (কবীর-সাথী, সাঁচ, অঙ্গ ২২) দাদু বললেন ঃ "সত্যের পথই হলো সরল শুদ্ধ পথ, যে হয় সাঁচা সে যায় সেই পথে।" (দাদু, সাঁচ, অঙ্গ ১৫২) পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁর 'ভারতের সংস্কৃতি' শীর্ষক পুস্তিকায় এরূপ আরো বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—"সত্যতে থাকবে, তাহলেই ঈশ্বরলাভ হয়।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "Truth is my only religion, the universe my country." অর্থাৎ "সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম, এই সমগ্র বিশ্বই আমার স্বদেশ।"

সুতরাং একথা একেবারেই ঠিক নয় যে, ধর্ম কেবল বিশ্বাসের ব্যাপার, সত্যাসত্যের প্রতি উদাসীন এবং গীতায় কেবল বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, সত্যের কথা নয়। বস্তুত, আজকের বস্তুবাদীদের এরূপ বিশ্বাসেরই কোন সত্যের ভিত্তি নেই। সত্যকে জানাই ধর্ম। ভারতবর্ষ বাস্তববাদী সত্যকে দর্শন করে কথা বলেছে, দর্শন না করে কোন কিছুতে বিশ্বাস করেনি। সত্যের মুখোমুখি হওয়াই ভারতে ধর্মসাধনার মূল লক্ষ্য। অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ ছাড়া সেখানে কখনো কোন কথা বলা হয়নি। অপরোক্ষ অনুভূতি লাভই ধর্ম। দর্শনশাস্ত্রের নাম সেজন্যই 'দর্শন', কারণ তা সত্যের দর্শনভিত্তিক তত্ত্বের কথাই বলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা সত্যের ওপরে। অবশ্য ধর্মে বিশ্বাসেরও স্থান আছে। কারণ যা সত্য, মানুষ তাতে বিশ্বাস করবে না? তাতেই তো বিশ্বাস করবে। বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি হলো সত্য। সত্য ছাড়া বিশ্বাসের কোন অবস্থান নেই, বিশ্বাস থাকতেই পারে না সত্য ছাড়া। সেজন্য যাঁরা সত্য সাক্ষাৎ করেছেন এরকম সাধক ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মানুষ বিশ্বাস করে। সেটাই তো স্বাভাবিক। মানুষ বৈজ্ঞানিকদেরও একই কারণে বিশ্বাস করে, তাঁরাও সত্য আবিষ্কার করে কথা বলেন।

এখানে অবশ্য একথা বলা হয়ে থাকে যে, বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষিত, কিন্তু, ধর্মীয় সত্যও তো তাই। পরীক্ষা না করে তাঁরা কোন কথা বলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ একে একে বিভিন্ন ধর্মমতে সাধনা করে একই সত্যে পৌঁছে তবেই ঘোষণা করলেন—সব ধর্মই সত্য। "যত মত তত পথ।" পরীক্ষা না করে তিনি কোন কথাই বলেননি।

প্রখ্যাত পরমাণু বৈজ্ঞানিক ওপেনহাইমারের একটি উক্তিতে আমরা এই স্বীকৃতি পাই যে, আমাদের ধর্মীয় সাধকেরা সাধনা করে যা বলেছেন তা সত্য।[১২] তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো ঃ পরমাণু বিভাজনের আবিষ্কারের দ্বারা হিন্দু-বৌদ্ধ চিন্তার যা মূলকথা তারই সমর্থন পাওয়া গিয়েছে, প্রাচীন জ্ঞানেরই সংস্কৃতরূপ এই আবিষ্কারগুলি।

সবচেয়ে স্পষ্ট কথা বলেছেন অপর বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আরউইন শ্রডিঞ্জার তাঁর 'What is Life' গ্রন্থে। সেখানে তিনি চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, চৈতন্য হলো এক অখণ্ড বস্তু, তার বহু হয় না। বহুকে যে আমরা দেখি তা হলো ভারতীয়রা যাকে 'মায়া' বলেন তাই। একটি আয়নার ঘরে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে। একটি বস্তুকে বিভিন্ন দর্পণে বহু দেখায়।[১৩]

এই প্রসঙ্গে তিনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যার সারমর্ম—অন্ততপক্ষে আড়াই হাজার বছর আগে ভারতীয় যোগীদের মধ্যে এই জ্ঞানের উদয় দেখা গিয়েছিল, সুতরাং এই অন্তর্দৃষ্টি নতুন কিছু নয়। ভারতে আদি উপনিষদ্‌গুলি বলেছিল, আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ অর্থাৎ

---

১০ মহাভারত, সারাংশ অনুবাদ—রাজশেখর বসু, পৃঃ ৫৮১ ১১ ঐ, পৃঃ ৫৯৪

১২ "The general nations of human understanding... which are illustrated by discoveries of atomic physics are not in the nature of things wholly unfamiliar, wholly unheard of, or new. Even in our own culture they have a history and in Buddhist or Hindu thought a more considerable and central place. What we shall find is an explification, an encouragement and reinforcement of old wisdom." (Science and Common Understanding, pp. 8-9)

১৩ "... Consciousness is singular of which the plural is unknown, that there is only one thing and that what seems to be a plurality, is merely a series of different aspects of this one thing, produced by a deception (the Indian 'Maya'), the same illusion is produced in a gallaxy of mirror." (Cambridge, 1945, p. 90)

জগতের অন্তরালে কি ঘটছে এবিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে জানার কথা উপনিষদের ঋষিগণই বলেছিলেন।[১৪]

সুতরাং ভারতের ধর্মের ভিত্তিতে যা আছে তা আজকের বিজ্ঞানে বলা যেতে পারে পরীক্ষিত সত্য, ভিত্তিহীন কাল্পনিক বিশ্বাস নয়। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় ঘোষণা করেছিলেন—"...Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language and with further light from the latest conclusions of science."[১৫] অর্থাৎ আজ হিন্দুরা একথা জানতে পেরে আনন্দিত যে, যে-সত্যকে তারা তাদের বুকের মধ্যে ধরে রেখেছে তা আরো শক্তিশালী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে এবং বিজ্ঞানের শেষতম সিদ্ধান্তসমূহের দ্বারা সেগুলি আরো আলোকিত হয়ে উঠবে।

আবার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশ্বাসের একটি মস্ত বড় স্থান আছে। প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এবিষয়ে সুস্পষ্ট বলেছেন: "In physics too, the proposition holds true that man shall not find salvation without faith, at least faith in a certain reality outside ourselves." অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রেও একথা সত্য যে, বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের মুক্তি হয় না। মনে রাখতে হবে, একথা কোন ধর্মবিশ্বাসী বলছেন না, একজন বৈজ্ঞানিক বলছেন—যদিও তাঁর কথা একজন ধর্মবিশ্বাসীর কথার মতোই শোনাচ্ছে। বিশ্বখ্যাত এই বিজ্ঞানী বলছেন, বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের গতি নেই। আমাদের অতিক্রম করে আছে এমন একটি সত্যে বিশ্বাস পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রেও একান্ত প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের একটি নিদর্শন তুলে ধরেছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী চার্লস টাউন্সও। তিনি দেখিয়েছেন যে, আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ তিরিশ বছর gravitational এবং electro-magnetic field-এর মধ্যে এক মহা ঐক্যের সন্ধান করে ফিরেছেন। অনেক পদার্থবিজ্ঞানী তখন তাঁকে বলেছেন যে, তিনি ভুল পথে চলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কথায় নিজ বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্রও টলেননি। সেজন্য চার্লস টাউন্স বলেছেন: "Eienstein had to have a kind of dogged conviction that could have allowed him to say—'With joy, though he slays me, yet will I put trust in Him.' "[১৬] অর্থাৎ আইনস্টাইনের যে গভীর বিশ্বাস ছিল তা একটি মরণপণ বিশ্বাস, যা সাধারণত ঈশ্বরভক্তদের মধ্যেই দেখা যায়।

আমরা ওপরের আলোচনায় দেখলাম, যে-ধর্মের কথা গীতা ও হিন্দুধর্মের অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে বলা হয়েছে, তা কোন কল্পিত বস্তুতে বিশ্বাসনির্ভর নয়, তা হলো প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য জ্ঞান, যাকে বিজ্ঞানীরাও স্বীকৃতি না দিয়ে পারেননি। [ক্রমশ]

---

১৪ "In itself the insight is not new. The earliest record to my knowledge dates back some 2,500 years or more. From the early great Upanishads the recognition of Atman=Brahman (the personal self equals the omnipresent all comprehensive eternal self) was in Indian thought... to represent the quintessence of deepest insight into the happenings of the world. The striving of all the scholars of Vedanta was, after having learnt to pronounce with their lips, really to assimilate in their minds, this grandest of all thought." (Ibid.)

১৫ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 1, p. 15

১৬ 'Confluence of Science and Religion', Prabuddha Bharata, March 1967

তোমাকে দেখেছি

অরুণাংশু ঘোষ

তোমাকে দেখেছি বৈশাখের
রৌদ্রদগ্ধ দিনে,
তোমাকে দেখেছি বেল জুঁই আর
গন্ধরাজের সনে।
তোমাকে দেখেছি ঘন বর্ষায়
শ্রাবণধারার মাঝে,
তোমাকে দেখেছি আমনের খেতে
সিক্তবসন সাজে।
তোমাকে দেখেছি শরৎকালের
শিউলি ঝরার প্রাতে,
তোমাকে দেখেছি জ্যোৎস্না ছড়ানো
পূর্ণিমার সেই রাতে।
তোমাকে দেখেছি ফাল্গুনের সেই
রাঙা পলাশের বাগে,
তোমাকে দেখেছি আবিরখেলায়
রাগে আর অনুরাগে।
তোমাকে দেখেছি নিশিদিন মোর
হৃদয়ের সবখানে,
নিত্য সেথায় যাচিয়াছি তোমা;
চিত্তের আবাহনে।

মাটিতে পড়া ফুল

মঞ্জুশ্রী মৈত্র

আমি মাটিতে পড়ে গেছি
সে-দোষ কি আমার?
তবে কেন তোমার চরণে
ঠাঁই হলো না আমার?

গাছ থেকে তুলতে গিয়ে
ওর হাত থেকে পড়ে গেছি আমি,
এটা ওরও দোষ নয়,
দোষ নয় আমারও।

তবে কেন 'মাটিতে পড়া ফুল' বলে
একপাশে সরিয়ে রেখে দিলে আমায়?

কী মহিমা তব

আভা গুহ

মায়ের নামের কী মহিমা
ভুবনে তার নাইকো সীমা
জননী গো তুমি ছাড়া
আর যে কিছু জানি না।

তুমি মরুৎ, তুমি ক্ষিতি,
অপ্, তেজ, ব্যোমে স্থিতি
তোমার মহিমাগীতি
সদা যেন গাহি মা।

মূলাধারে সহস্রারে
রয়েছ মা চক্রাকারে
তুমি হৃদি সারাৎসারে
বিরাজিছ সদা মা।

নানা রূপে নানা ভাবে
ছড়ায়ে রয়েছ ভবে
জানি কোলে টেনে লবে
শমন যবে আসিবে মা।

ভয় করি না তাই তো কারে
তুমি আছ জগৎ জুড়ে
তোমার স্নেহের কোলের পরে
শরণ যে নিয়েছি মা।

ধন্য জীবন তাই তো মানি
মা যার জগৎ-জননী
সন্তানেরে কোলে টানি
সব দোষ করে ক্ষমা।

দিনের খেলা সাঙ্গ হলে
তব স্নেহের ছায়ায় যাব চলে
ডাকব তোমায় 'মা' 'মা' বলে
কোলে নিয়ে জুড়াবে মা।

সারাটা দিন ধুলো ঘাঁটি
অঙ্গে মাখি কলঙ্ক-মাটি
অবোধ সন্তানেরে এবার
ধুয়ে মুছে কোলে নাও মা।

তোমায় ভুলে ছিলাম মোহের ছলে,
ভাসি তাই আজ নয়নজলে
আমি সবার অধম বলে
ফেলতে তুমি পারবে না মা।

একথা তো সবাই জানে
কু-সন্তান হয় কত জনে
সবাই তারে হেলা করে
তারও একজন আছে যে মা।

জগদ্‌গুরুঃ শরণম্‌

লালী মুখার্জী

[গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নিবেদিত]

মনের গাছে ফুটলে ফুল
দেব সে-ফুল তোমার পায়,
আজ না হয়, ফুটবে তো ফুল
আছি আমি সে-প্রতীক্ষায়।

না-ফোটা ফুল ব্যাকুলতা
প্রস্ফুটনই পূজা,
ফুটলে ফুল ডাকব তোমায়
আমার রাজার রাজা।

হঠাৎ যখন

রেণুকা নাথ

সময় যাচ্ছিল সরে সরে
দিনের পরে দিন লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল
দিগন্তের পারে,
হঠাৎ মস্ত পাহাড় দাঁড়াল উঁচিয়ে
কেমন করে ডিঙাই এখন এই পাহাড়?

পথ যাচ্ছিল সরে সরে
সকাল থেকে সন্ধ্যে কোলাহল থেকে নিস্তব্ধতায়
ঘুমের দেশে
সিংহদরজার সামনে দাঁড়াতেই দেখি
মস্ত একটি তালা ঝুলছে সেখানে
কেমন করে ভাঙি এখন এই তালা?

সকাল বিকেল সন্ধ্যে রাত
এদিক ওদিক অনেক ঘুরে ক্লান্ত যখন
আপন ঘরে
হঠাৎ কখন পর্দা গেছে সরে,
এত আলো কেমন করে সইবে আমার চোখ?

কিসের জন্য তা জানি না
কৃচ্ছ্রসাধন জীবনভর, শুধুই অন্বেষণ
কোথায় ভরসা,
হঠাৎ শুনি বুকের মাঝে কার পদধ্বনি গুরুগুরু
কেমন করে করব বরণ,
কি শুধাব এখন আমি তাকে?

তোমাকে প্রণাম

বৈদ্যনাথ গুপ্ত

আশ্চর্য ঘোষণা এক
এনে দিলে জগতের কাছে—
'টাকা মাটি, মাটি টাকা'
এ দুয়ের তফাৎ না আছে।

ফুটো পাত্রে জল ঢালা,
কেবা বোঝে সে-তত্ত্বের দাম!
টাকা টাকা, মাটি মাটি
মানাপেক্ষা দামী নিজ নাম!

আশ্চর্য ঘোষণা এক
এনে দিলে জগতের কাছে
'যত মত তত পথ'
মতে পথে বিরোধ না আছে।

কে কথা শুনিল কথা
কেবা তার দিল কোন দাম,
অমেয় লাভের লোভে
মতে পথে বেঁধে সংগ্রাম!

তবু জানি তুমি আছ,
এবং আমিও আছি এই বিশ্বাসে—
দুঃখে সুখে বাঁশি বাজে
এই প্রাণে তোমারই নিঃশ্বাসে।

জীবনের জপমাল্যে
জপি যেন তব পুণ্য নাম
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ
তব পায়ে হাজারো প্রণাম।

দেখা

মাধবকুমার চট্টোপাধ্যায়

যোগী বলেন কতই শোভা দেখেন তিনি ধ্যানে
প্রাণে খুশির জোয়ার আসে হৃদয় ভরে গানে।
দেখেন তিনি পাহাড়-নদী, দেখেন ঝরনাধারা
নিকষ-কালো আঁধার মাঝে আকাশভরা তারা।

ধ্যানী যোগী নই কো আমি তাই তো মেলে আঁখি
আকাশজুড়ে কতরকম আলোর খেলা দেখি।
গাছের পাতায় ফুলে ফলে পরশ পড়ে যাঁর
চোখ বুজে কি যায় গো দেখা বাগানখানি তাঁর!

বনফুল প্রসঙ্গে

সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যিক বনফুলের জন্মশতবর্ষ (১৯ জুলাই ১৮৯৯—৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯) উপলক্ষ্যে নিবেদিত।

বনফুল *আলোকচিত্র : মোনা চৌধুরী*

ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম : ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৬) বাঙলা সাহিত্যে 'বনফুল' ছদ্মনামেই পরিচিত। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে বনফুলের অসামান্য অবদান। সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ থাকলেও ছোটগল্প, জীবনীমূলক নাটক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস তিনিই প্রথম বাঙলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেছিলেন। নতুন আঙ্গিক ও বিস্তারে বাঙলা সাহিত্যে বনফুলের ছোটগল্পের কোন পূর্বসুরী নেই, উত্তরসুরীরও এখনো পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' এবং 'বিদ্যাসাগর' বাঙলা ভাষাতে প্রথম সার্থক জীবনভিত্তিক নাটক। বাঙলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার প্রথম কৃতিত্বও বনফুলের। নৃতত্ত্ব নিয়ে লেখা 'স্থাবর' উপন্যাস, পক্ষীতত্ত্ব (অর্নিথোলজী) নিয়ে তিন খণ্ডে 'ডানা' উপন্যাস এবং 'নির্মোক', 'হাটেবাজারে', 'অগ্নীশ্বর' ও আরো কয়েকটি উপন্যাস এবং গল্পের ভিত্তি ডাক্তারী বিদ্যা ও ডাক্তারের জীবন। লেখার বিষয় এবং আঙ্গিকে অসামান্য বৈচিত্র্য থাকলেও বনফুলের সমস্ত লেখার মধ্যে ফল্গুধারার মতো এক সৎ মানবিক সত্তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। একালের কৃতী সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বনফুলের সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন : "বনফুল মানুষ হিসেবে ছিলেন বন্ধুবৎসল, উদারচেতা, ভালবাসাপ্রবণ, অত্যন্ত সৎ—সততা পছন্দ করতেন। জীবনে দাঁড়িয়েছিলেন পরিপূর্ণ মূল্যবোধ নিয়ে এবং আদ্যন্ত মানবতাবাদী। এইরকম মানুষের কাছ থেকে যে-লেখা বেরিয়ে আসে তার মধ্যেও এইসব গুণ থাকবেই।"

এই মানবিক সত্তা বনফুলের আবাল্যলালিত সম্পদ। কোনরকম সংস্কার তাঁর জীবনকে শৃঙ্খলিত করতে পারেনি। তাঁর মানবিকতার ভিত্তি শিশুকাল থেকেই পারিবারিক ও পরিবেশগত কারণে গড়ে উঠেছিল। বনফুলের পিতা ছিলেন বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামের অত্যন্ত জনপ্রিয় ডাক্তার। মানুষ হিসেবে ছিলেন সংস্কারহীন, উদারমনা, পরোপকারী এবং বিদ্যোৎসাহী। খাওয়া-পরা মেলামেশায় তিনি কোন বাছবিচার করতেন না। বনফুলের মা ছিলেন পবিত্র, উজ্জ্বল, শাণিত চরিত্রের মহিলা। আজ থেকে একশ বছর আগের পরিবেশে সামাজিক সংস্কার তাঁকে কর্তব্যবিমুখ করতে পারেনি। শিশু বনফুলকে বাড়ির মুসলমান মজুরের বৌয়ের স্তন্যপান করে বড় হতে হয়েছিল। তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন। কলেজ-জীবনে অসুস্থ বনফুলের পথ্য হিসেবে তিনি মুরগী রেঁধে দিতেন, পরে অবশ্য স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিতেন। বাড়িতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই ইত্যাদি আনাতেন বনফুলের পিতা। বনফুলের বাল্যকাল তাই সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যেই কেটেছিল। এই মুক্ত মানসিকতার পরিবেশে বড় হয়ে উঠলেও তাঁর বাল্যকালে প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন তাঁর কাকা। তিনি ছিলেন একজন প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ মানুষ। কাকার তত্ত্বাবধানে বনফুলের মনে ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃত, ধর্মগ্রন্থ ও প্রাচীন মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সদর্থক ধারণা গড়ে উঠেছিল। এইভাবে দ্বিমুখী সংস্কৃতি ও আদর্শবোধের যুগ্মধারায় বেড়ে ওঠার অনিবার্য পরিণতি তিনি নিজেই লিখে গিয়েছেন আত্মজীবনীমূলক 'পশ্চাৎপট' গ্রন্থে : "তখন আমি কলিকাতা শহরে বাস করিতাম, কিন্তু আসলে আমি বাস করিতাম একটি আদর্শ স্বপ্নলোকে—যে-স্বপ্নলোকে আমার প্রধান সঙ্গী ছিল আনন্দ, আদর্শ এবং নির্ভীকতা।"

এই মানসিকতার অধিকারী আর যাই হোন, ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকতে পারেন না। তিনি জানেন, ধর্ম হচ্ছে তাই যা মানুষকে 'ধারণ' করে রাখে। ধর্ম সমাজকে, মানুষকে ধারণ করে রাখে অবিভাজ্য মানবিকতায়। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, কারণ এই বিশ্বাস তাঁকে মহত্তর জীবনচর্যায় উদ্বুদ্ধ করে। পরিণত বয়সের মন যখন তর্ক-কোলাহলের দ্বন্দ্ব ছেড়ে বিশ্বাসের প্রশান্তিতে বিশ্রাম নিতে চায়। সেই বয়সে যখন কেউ বনফুলের কাছে জানতে চায়, তিনি সরস্বতীপূজা করেন কিনা, স্মিত হেসে তিনি তখন উত্তরে জানান : "করি

তো, রোজই করি। রোজই তো লেখার টেবিলে বসে লিখি, সেটাই তো পুজো।" কর্মজীবনে ভাগলপুরে বসবাসকালীন লক্ষ্মীপূজা করতেন। একবার স্ত্রীর অবর্তমানে জমাদার সেতাবীকে দিয়ে পূজার আয়োজন করিয়ে নিতে কোন দ্বিধা হয়নি বনফুলের। বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে, প্রণতি আছে, কিন্তু আধিক্য নেই, সংস্কার নেই—এমন একটা মুক্তমনের মানুষ যেকোন কালেই ক্বচিৎ পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বনফুলের অতি প্রিয় চরিত্র। তিনি বিবেকানন্দের বাণী শিরোধার্য করেছিলেন—"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" বনফুলের ছোটভাই গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথাতে পাইঃ "দাদার ভগবান কি আধ্যাত্মিক ভাব কি ছিল, ঠিক জানি না। কখনো পুজো করতে দেখিনি। ভাগলপুরের বাড়িতে কয়েক বছর জগদ্ধাত্রীপুজো করেছিল। সরস্বতীপুজো করত, সরস্বতীস্তোত্র পাঠ করতে দেখেছি। উপনিষদের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়েছে সাহেবগঞ্জে স্কুলজীবন থেকেই।... দাদার 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের পাণ্ডুলিপি একবার ভাগলপুরে গিয়ে শুনলাম। দাদা বললে—'ইচ্ছে ছিল স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে নাটক রচনা করি। বইপত্র সংগ্রহ করে পড়ে প্রস্তুত হয়েছিলাম, কারণ ওরকম ড্রামাটিক ক্যারেক্টার আমি কখনো দেখিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হলো না। কি জানি, অজান্তে যদি তাঁকে মসিলিপ্ত করে ফেলি—সেটা ঠিক হবে না। তাই বহুবার লেখবার চেষ্টা করেও পারলাম না। পরে স্বামীজীকে নেপথ্যে রেখে শৃণ্বন্তু বলে ছোট একটা নাটক লিখি।'... লেকটাউনের বাসায় একদিন বললে—'পরমহংসদেবের চোখ দুটো দেখেছিস—অদ্ভুত অবর্ণনীয়, সব দেখছে অথচ দেখছে না—ভাষায় ঠিক ধরতে পারছি না।' মারা যাওয়ার মাস দুই আগে দেখি 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চোখ দুটি' নামে 'উদ্বোধন'-এ একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ('উদ্বোধন', ৮০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)। দাদা প্রায় ছাত্রজীবন থেকেই 'উদ্বোধন'-এর লেখক।"

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ইংরেজী ১৯২৭ সালে বনফুলের বিবাহ হয় লীলাবতী দেবীর সঙ্গে। লীলাবতীর জন্ম ১৯০৭ সালের ১২ জুন। আট-নয় বছর বয়সে লীলা বাগবাজারে নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হন। ঐ স্কুলের তখন হোস্টেল না থাকায় তিনি বাগবাজারে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে দু-তিন বছর থেকে নিবেদিতা স্কুলে পড়তেন। শ্রীমায়ের কাছে থাকার সুযোগে তিনি স্বামী সারদানন্দ বা শরৎ মহারাজ—যাঁকে সবাই 'মায়ের ভারী' বলেই জানত, তাঁকেও খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। লীলাবতী বালিকা বয়সে ছোটখাট চেহারা ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন বলে শরৎ মহারাজ তাঁকে বলতেন—'বেঁটে কটকটি'। তাতে আবার শ্রীমা বলতেনঃ "না না, লীলা স্পষ্টবক্তা ঠিকই, কিন্তু ওর মনটা খুব পরিষ্কার।" ১৯২০ সালে শ্রীমায়ের তিরোধানের পরে নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীদের মতো লীলাও অশৌচ পালন করেছিলেন। বিয়ের পরে লীলা এবং বনফুল বাগবাজারে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতে এসে লীলার বালিকা বয়সের গল্প শুনেছিলেন। লীলা শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁর চুল বেঁধে দিতেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করেছিলেন বলে সন্ন্যাসী মহারাজেরা লীলার প্রণাম নিতেন না। নিবেদিতা স্কুলে তখন ম্যাট্রিক পর্যন্ত ছিল না বলে লীলাবতী বিহারের গিরিডি থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তী কালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে তিনি বি.এ. পাস করেন। সম্ভবত বেথুন কলেজের দ্বিতীয় ব্যাচের গ্র্যাজুয়েট ছাত্রী তিনি।

বনফুল ও তাঁর স্ত্রী লীলাবতী *আলোকচিত্র : পরিমল গোস্বামী*

শ্রীমায়ের আশীর্বাদধন্যা লীলাবতী বনফুলের জীবনে শুধু সহধর্মিণী নন, সহমর্মিণীও ছিলেন। বনফুলের নিজের কথায়ঃ "সমস্ত সংসারের ভারই লীলা বহন করিত। আমি যাহা রোজগার করিতাম তাহা তাহার হাতেই দিয়া দিতাম। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ভার গৃহিণীর উপর ছিল। আমার বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়নের ভার তাহার উপরেই ছিল। আমার বাবা, ভাইয়েরা যে যখন আসিত তাহাদের দেখাশোনার দায়িত্ব লীলা স্বহস্তে গ্রহণ করিত। লীলা সংসারের ঝড়ঝাপটা আমার গায়ে লাগিতে দিত না।" শুধু দৈনন্দিন সংসারজীবন নয়, বনফুলের সাহিত্যজীবনেও তাঁর পত্নীর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বনফুলের নিজের কথাতেঃ "আমার লেখক-জীবনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছেন আমার স্ত্রী লীলাবতী। তিনি আমার অধিকাংশ পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠিকা। তাঁহার মনোমত হইলে আমি লেখা ছাপিতে দিতাম।"

এই লীলাময় সংসারজীবন প্রসঙ্গে বনফুল ভাবতেন—ঈশ্বর তাঁকে মোটের ওপরে বেশ সুখী জীবনই দিয়েছেন। পত্নী, সন্তান, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি-নাতনী, বন্ধু, আর্থিক সচ্ছলতা, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, আয়ু—সবই তিনি পেয়েছেন মনের মতো। দুঃখ-শোকের আঘাত থেকে তাঁর জীবন আপেক্ষিকভাবে মুক্ত। ঈশ্বরের কাছে তাঁর কোন নালিশ নেই। তাই ২৭ জুলাই ১৯৭৬ সালে লীলার মৃত্যু তাঁর কাছে "নিদারুণ বজ্রাঘাত" মনে হয়েছিল। তথাপি তাঁর আস্থা ছিল—"লীলা পুণ্যবতী ছিল। ভগবান তাঁহাকে বেশি কষ্ট দেন নাই। তাঁহার বাল্যকাল শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কাটিয়াছিল। তিনিই সস্নেহে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন।" প্রচণ্ড শোকেও ঈশ্বরের কাছে তিনি কোন অনুযোগ করেননি। তাঁর ভাব ছিল—'যিনি জীবনে এত আনন্দ দিয়েছিলেন, তাঁর দেওয়া একটু দুঃখ সইব না?' নিবিড় বেদনাজাত মহাশূন্যতাকে আশ্রয় করে তিনি নির্মাণ করলেন 'লী'। 'লী' গ্রন্থে লিখেছেনঃ "চারিদিকে তার স্মৃতি —শুধু সে নেই। আমি তাকে সৃষ্টি করব আবার। করব, নিশ্চয় করব।" মৃত্যুর মতো ব্যাপক সর্বগ্রাসী অচেতনতাও বনফুলের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বিভূতিভূষণ তাঁর 'স্মৃতির রেখা' গ্রন্থে লিখেছেনঃ "মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিস নয়, পৃথিবীর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এদের পারে—এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত জীবন।"

বনফুল দৈনিক ডায়েরী লিখতেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ডায়েরীর প্রতিদিনের প্রতি পাতা লেখা হয়েছে 'লীলা'কে সম্বোধন করে। লীলা যেন কাছেই রয়েছেন—পাশের ঘরে, তাঁকে ডেকেই বনফুলের ডায়েরীতে নিত্য কথোপকথন। বিভূতিভূষণের মতো বনফুলও জানতেন—"অনিত্য মৃত্যুর পারে এক অনন্ত জীবন।"

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে মধ্যমগ্রামের এক সাহিত্যসভার অবসরে বনফুলের যে-কথা হয়েছিল তা বেশ কৌতূহলজনক। মুস্তাফা সিরাজ বনফুলকে বলেছিলেনঃ "আপনার লেখা পড়ে আমার কেন যেন ধারণা হয়েছে, আপনি জন্মান্তরবাদী।" ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল বনফুলের, বললেনঃ "তুমি ঠিক ধরেছ। আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি। কেন করি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। বলি শোন, বহু বছর আগে একবার বর্ধমান জেলার গ্রামে সাহিত্যসভায় গিয়েছিলাম। সভা শেষ হলো। রাত্রে জ্যোৎস্না ছিল। আমি সভার জায়গা থেকে অন্যমনস্কভাবে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, এই গ্রামটা তো চিনি। আমার অনেক কিছু মনে পড়ে গেল। সভার উদ্যোক্তাদের একজনকে বললাম, আচ্ছা এই গ্রামে একটা পুকুর এবং তার উত্তরপাড়ে কি কোন বাড়ি আছে? সেই বাড়ির উঠোনে কি প্রাচীন, একটু বাঁকা আর খুব লম্বা তালগাছ আছে? ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, আছে।' আমি নিজেই সেই বাড়ি খুঁজে পেলাম। বাড়ির লোকেদের কথা জিজ্ঞেস করলাম, নামও বললাম। ওরা খুব অবাক হয়ে গেল। সে তো তাদের ঠাকুরদার সময়ের কথা। বাড়ির একটি ছেলে ঐ পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিল।"

আদ্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক, অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী বনফুলের বিশ্বাসের জগতের পরিধিও বেশ বিস্তৃত ছিল। 'দাদামশাই' নামে জনপ্রিয় সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ বলাইচাঁদ প্রসঙ্গে ডায়েরীতে লিখেছিলেনঃ "জানলা দিয়ে দেখলাম বলাই আসছে। উসকো-খুসকো চুল—আকাশের দিকে দৃষ্টি। এ ছেলে বড় হবেই। চোখের ভাবই অন্য—ওপরের দিকে।" আবার আশাপূর্ণাদেবীও ভাগলপুরে গিয়ে 'বনফুলের সঙ্গ' প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ "উনি মাঝে মাঝেই কথা বলতে বলতে বা বেড়াতে বেড়াতেও হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজেকে যেন আশপাশ থেকে সরিয়ে নিতেন।" এই ভঙ্গিতেই বনফুলকে চেনা সম্পূর্ণ হয়। তিনি বিজ্ঞানমনস্ক জীবাণুসন্ধানী চিকিৎসক, কোনরকম সংস্কারের গণ্ডি তাঁকে বাঁধতে পারেনি, সর্ববিষয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে মিশেছিল বহুমুখী পাঠস্পৃহা। আন্তরিকভাবে জীবনের পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণে তিনি ছিলেন অভিলাষী, বর্ণাশ্রমপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার, মেলামেশা ও খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে তাঁর কোন বাছবিচার ছিল না—সেই তিনিই আবার ছিলেন প্রবহমান মূল্যবোধে বিশ্বাসী, জন্মান্তরে আস্থাশীল, জ্যোতিষ মানেন, সরস্বতী-দর্শনের স্বপ্ন দেখেন এবং বিবেকানন্দের ব্যগ্র অনুসারী ও পরমহংসদেবের পরম ভক্ত। এই বিচিত্র ও বহুমুখী বিশ্বাস নিয়ে যিনি আপন আদর্শকে অবলম্বন করে নিরন্তর এগিয়ে চলেছেন, তিনি তো ক্ষণিকের জন্য বাস্তব থেকে সরে আসবেনই। ঊর্ধ্বাকাশে চেয়ে হাঁটবেন। ওপরের অনন্ত দিশারীর কাছ থেকে চিরন্তন পথের সন্ধান নিতে হবে না? ❑

নজরুলের 'বিষের বাঁশী' ঃ অক্ষয় দত্তগুপ্ত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

উদয়ন মিত্র

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের
[২৪ মে (মতান্তরে ২৬ মে) ১৮৯৯—২৯ আগস্ট ১৯৭৬]
জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে নিবেদিত।
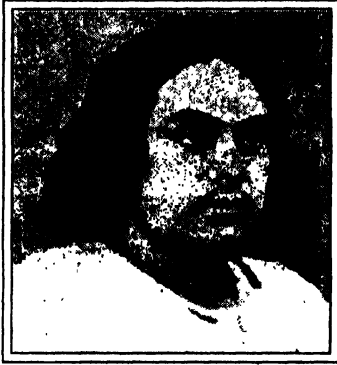
প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে প্যারিসের শান্তিচুক্তির পর স্বাভাবিক কারণে এই যুদ্ধের প্রয়োজনে গঠিত ৪৯নং বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে ফৌজি নজরুল কলকাতায় ফিরলেন। মনে হতে পারে, ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা। করাচীর সৈন্যশিবিরের বিধিনিষেধ তাঁর কাছে অসহনীয় না হলেও এই ফৌজিজীবন তাঁর কাছে খুব পছন্দের ছিল, এমন বলা যায় না। আমরা লিখতে পারি, অর্থের প্রয়োজনে প্রথম যৌবনে ফৌজিশিবিরে যোগ দিলেও নজরুলের মানসলোক অন্য কিছুর সন্ধানে ছিল। সৈন্যশিবিরের গতানুগতিক কাজের অবসরে নজরুল সাহিত্যচর্চা করেছেন এখানে, ছাত্রাবস্থায় শেখা ফারসী নতুনভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে পাঞ্জাবী মৌলবীর সাহায্যে। কবিতা, গল্পের বিশাল আকাশের সঙ্গে কর্কশ ফৌজিজীবনের ছন্দ মেলে না, মেলানো যায় না; কিন্তু নজরুল ছিলেন সবসময়েই একটু ভিন্ন মাপের, ভিন্ন ধাঁচের। তাই তিনি অনায়াসেই গোলাবারুদের স্তূপ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতেন করাচীর 'আরবসাগরের বিজনবেলায়'। এখানে বসেই তিনি রচনা করলেন 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী', 'বাঁধনহারা'। 'বাঁধনহারা'য় নজরুল আমাদের জানালেন ঃ "...আগুন, রোদ, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, আঘাত, বেদনা—এই অষ্ট ধাতু দিয়ে আমার জীবন তৈরি হচ্ছে যা হবে দুর্ভেদ্য, মৃত্যুঞ্জয়, অবিনাশী" ইত্যাদি। আমরা লিখতে পারি, নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী'র বীজ 'বাঁধনহারা'তেই নিহিত ছিল। নজরুলের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা 'মুক্তি' এখানে বসেই লেখা। 'মুক্তি' কিসের দ্যোতক? এক নজরুল-গবেষক লিখেছেন ঃ "যে লোকোত্তর প্রতিভার জন্য তিনি আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী তার প্রকৃত বিকাশ ঘটে করাচীর শিবিরে।"

ফলত, সরকার বাঙালী পল্টন ভেঙে দিলে নজরুলের জীবনে কোন উল্কাপাত ঘটেনি। এটা তাঁর কাছে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা অভিশাপ ছিল না, আর্থিক দিক থেকে আশীর্বাদ না হলেও। সে যাই হোক, করাচীর ঐ সেনা-ছাউনিতেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য। ১৯২০-র মার্চে তাই কলকাতায় ফেরা তাঁর কাছে জরুরী ছিল, জরুরী ছিল নিজেকে মেলে ধরার জন্য। কবিতা, প্রবন্ধ, গানে রাজনীতির পালে মন্দমধুর হাওয়া লাগানো নয়, ঝড়ো বাতাসের ধাক্কা দেওয়াই ছিল নজরুলের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের অনিবার্য উপস্থিতি সত্ত্বেও নজরুল নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হননি। এক নজরুল-গবেষক এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ "আকাশটা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কবিতার আকাশ। অনেক নক্ষত্র ফুটতে চেয়েছে... সে-আকাশে দুখু মিঞা এসে পড়লেন হঠাৎ করেই। হাবিলদার থেকে কবি। বন্দুক ছেড়ে কলম হাতে।... প্রথম আবির্ভাবেই বাজিমাত—লোকপ্রিয়তা।...

"রবীন্দ্রনাথের মতো বিশাল এলাকা না হোক তবু ভাগ করে নিলেন আকাশের কিছু অংশ। দুঃখের, ক্ষোভের বহ্নিশিখা জ্বেলে নিজেকে দাঁড় করালেন।"

কুড়ি বছরের মধ্যে দুখু মিঞা কবি হলেন। দুখু মিঞা ওরফে নজরুলের কিশোরবেলা থেকে যৌবনের এই দিনগুলো বড় বৈচিত্র্যময়। চুরুলিয়া, আসানসোল থেকে ময়মনসিংহের কাজী সিমলা গ্রাম, সেখান থেকে আবার রানীগঞ্জ স্কুলের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে করাচীর সেনাশিবিরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্যে বা এই ভৌগোলিক পথ-পরিক্রমার পাশে কোথাও যেন কাজ করছিল নজরুলের এক চমকপ্রদ অস্থিরতা। কি হতে পারতেন তিনি? মক্তবের শিক্ষক? হয়েছিলেন অতি নগণ্য বাবুর্চি, ক্ষণকালের জন্য হলেও। থাকতে পারতেন চুরুলিয়ায় কাজীর মর্যাদা নিয়ে, পারেননি। গিয়েছিলেন করাচী, হতে পারতেন বন্দুকবাজ কর্কশ ফৌজি, পারেননি। হয়েছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির শিক্ষানবিশ। আবার ব্রিটিশ রাজশক্তির বন্দনা করে রাজখেতাব পেতে পারতেন, হলেন বিদ্রোহী, গেলেন জেলে।

১৯২০-১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের কালে কবি নজরুল নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে ভীতির কারণ

হয়ে ওঠেন। নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভয় পেত না, শুধু বিব্রত হতো মাঝে মাঝে। নজরুলকে ব্রিটিশরাজ ভয় করত এবং এই কারণে নজরুলের রচনা আপত্তিজনক মনে হলেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন ১৯২২ ও ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নজরুলের একটি প্রবন্ধ-পুস্তক ও দুটি কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় ওঠে। ১৯২২-এর ২৩ নভেম্বর নজরুলের 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ হয় এবং এই দিনেই কুমিল্লা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় পূজাসংখ্যা 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' লেখার জন্য। একইদিনে একটি কবিতার জন্য স্রষ্টাকে কারান্তরালে পাঠিয়ে এবং সেইসঙ্গে তাঁর সৃষ্টিসম্ভার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ঔপনিবেশিক সরকার এক বিরল প্রশাসনিক পীড়নের নজির রেখে যায়। ১৯২৪-এ নিষিদ্ধ হয় 'বিষের বাঁশী'। আমাদের আলোচনা এই 'বিষের বাঁশী' নিয়েই।

'বিষের বাঁশী' : প্রাসঙ্গিক বিষয়

'বিষের বাঁশী' প্রকাশিত হয় ১৬ শ্রাবণ ১৩৩১ সালে। নজরুল নিজেই ছিলেন এর প্রকাশক।

'বিষের বাঁশী' প্রকাশ করে স্বয়ং নজরুল আমাদের জানিয়েছেন : " 'বিষের বাঁশী'র বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার। 'অগ্নিবীণা' দ্বিতীয় খণ্ড নাম দিয়ে তাতে যেসব কবিতা ও গান দেব বলে এতকাল ধরে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সেইসব কবিতা ও গান দিয়ে এই 'বিষের বাঁশী' প্রকাশ করলাম। 'অগ্নিবীণা' দ্বিতীয় খণ্ড নাম বদলে 'বিষের বাঁশী' নামকরণ করলাম।"

'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ তৈরি করেন 'কল্লোল'-এর সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস—নজরুলের 'ঝড়ের রাতের বন্ধু'। এই কাব্যগ্রন্থ নজরুল উৎসর্গ করেছিলেন "বাঙলার অগ্নিনাগিণী মেয়ে মুসলিম মহিলা কুলগৌরব আমার জগজ্জননীস্বরূপা মা মিসেস এস. রহমান সাহেবাকে"। উৎসর্গপত্রের শেষে নজরুল নিজেকে বর্ণনা করেন 'নাগশিশু' হিসাবে।

কে ছিলেন ঐ জগজ্জননী মিসেস এম. রহমান সাহেবা? এম. রহমানের যে স্বল্প পরিচয় আমরা পাই সেখান থেকে আমরা জানতে পারি : হুগলীর এক রক্ষণশীল পরিবারে তাঁর জন্ম ১২৯২ সালে, মৃত্যু ৫ পৌষ ১৩৩৩ সালে। শৈশবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নিজেকে গড়ে তুলতে না পারলেও মিসেস রহমান কঠোর অধ্যবসায়ে নিজেকে সঠিক অর্থে শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছিলেন।

উদারপন্থী বেগম রাকেয়ার চিন্তাভাবনায় মিসেস রহমান গভীরভাবে প্রাণিত হন। বিশেষ করে 'নবনূর' পত্রিকায় রাকেয়ার প্রবন্ধ পাঠে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কি বিপজ্জনক হতে পারে। ফলত, রাকেয়ার চিন্তাভাবনায় প্রণোদিত হয়ে এবং রাকেয়ার পথ অনুসরণ করে রহমান বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুসলিম মহিলাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'সহচর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু', 'বিজলী', 'সওগাত' পত্রিকাতেও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর উপন্যাস 'মা ও মেয়ে' ১৩২৯-এ 'সহচর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর 'চানাচুর' গ্রন্থের 'আমাদের দাবী', 'পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা', 'নারীর বন্ধন' প্রভৃতি প্রবন্ধ সে-যুগে পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছিল।

আমরা জানি, নজরুল অসহযোগ আন্দোলনের কবি। স্বাভাবিক কারণে এই আন্দোলনের ব্যর্থতা তাঁর বুকে বেজেছিল। 'বিষের বাঁশী'তে তাঁর সুগভীর দেশপ্রেমের কথা কবিতার আদলে ধরা আছে। এমন কবিতার উদাহরণ 'বিদ্রোহীর বাণী', 'তূর্যনিনাদ', 'বোধন'। আবার যাঁরা দেশপ্রেমের জন্য বন্দী হয়ে জেলে গিয়েছেন এই সময়ে তাঁদের কথাও আছে এই কাব্যে। ফলত, 'বিষের বাঁশী'তে নজরুল বিভ্রান্ত ও বিব্রত করতে চেয়েছিলেন শাসককুলকে। " 'বিষের বাঁশী' থরথর প্রাণস্পন্দন যুগের গান। ইহার আঘাত সরকার সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়াই দীর্ঘকাল ইহার প্রচার রদ করা হইয়াছিল।"—সঠিক মূল্যায়ন।

'বিষের বাঁশী'র প্রচার রদ করার জন্য এই গ্রন্থ নিষিদ্ধ করতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 'বেঙ্গল লাইব্রেরী'র গ্রন্থাগারিক বাবু অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। গ্রন্থাগারিক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী কোন বইপত্র বাঙলায় মুদ্রিত হলে তার সংশ্লিষ্ট অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করে ডি. পি. আই.-এর মাধ্যমে সরকারকে জানানো।

নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনে অক্ষয় দত্তগুপ্তের জুড়ি ছিল না। 'বিষের বাঁশী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই গ্রন্থের 'বিপজ্জনক' অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করে ডি. পি. আই.-কে পাঠান। ডি. পি. আই.-কে তিনি জানিয়েছিলেন : "...The publication is of a most objectionable nature, the writer revelling in revolutionary sentiments and inciting youngmen to rebellion and to law breaking. The ideas, though often extremely vague, have clearly a dangerous intent, as the profusion of such words as 'blood', 'tyranny', 'death', 'fire', 'hell', 'demon' and 'thunder' will show.... I recommend that the attention of Special Branch of Criminal Investigation Department may be drawn to this

publication." এই চিঠির ঠিক আঠাশ দিন পর সরকার 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

'রক্ত', 'অত্যাচার', 'মৃত্যু', 'দানব', 'আগুন' শব্দ হিসেবে মনোমুগ্ধকর না হলেও শুধুমাত্র এই সমস্ত শব্দের ঝঙ্কার এমনই বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল অক্ষয় দত্তগুপ্তের কাছে যে, তিনি ডি. পি. আই.-কে অনুরোধ করেছিলেন পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মতামত নিতে। শেষপর্যন্ত ঐ মতামতও নেওয়া হয়নি এবং এদিক থেকে ব্যাখ্যা করলে আমাদের মনে হতে পারে, 'বিষের বাঁশী'র নিষেধাজ্ঞায় পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল। একজন সাধারণ গ্রন্থাগারিকের মতামতের তুলনায় কোন আইন-বিশারদের পরামর্শ নেওয়াটা এইক্ষেত্রে প্রশাসনিক দিক থেকে জরুরী ও যুক্তিগ্রাহ্য ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সময়, ঠিক একুশ বছর পর, এই প্রশ্নটিই উঠেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, 'বিষের বাঁশী'র নিষেধাজ্ঞা সাধারণ পাঠকসমাজ খুব সহজে মেনে নিতে পারেনি। অনেকে সরাসরি সংবাদপত্রে প্রতিবাদপত্রও পাঠিয়েছিলেন। এমনই একজন কলকাতার মহেন্দ্র সরকার লেনের অবিনাশ ঘোষ। ৩০ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখের 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার পাঠকের কলমে তিনি সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে লেখেন ঃ "The recent proscription of **Visher Banshi** by Kazi Nazrul Islam, the hero poet of Bengal, has come as a surprise to the literary public." কেননা "The book is politically innocent & socially pure." এমন গ্রন্থের নিষেধাজ্ঞা স্বপ্নেও যে ভাবা যায় না তা তাঁর মনে হয়েছিল।

মুজফফর আহমেদ তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন ঃ "নজরুলের নিষিদ্ধ পুস্তক দুখানা ('বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙ্গার গান' গ্রন্থদুটি একই সময়ে নিষিদ্ধ হয়) সংগ্রহের জন্য অনেকের, বিশেষ করে যুবকদের আগ্রহের অন্ত নেই। আমি কত যুবককে এই পুস্তক দুখানার জন্য আবদুল হালীমের নিকট আসতে দেখেছি। নিষিদ্ধ জিনিসের জন্য মানুষের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ হয়।"

'নিষিদ্ধ জিনিসের জন্য মানুষের আকর্ষণ'-এর গূঢ় কারণ খোঁজার তাগিদ আমাদের নেই। আমরা এমন প্রশ্নও করব না যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব করার মতো বিপজ্জনক ক্ষমতা ঐ গ্রন্থাগারিকের ছিল কিনা। আমরা জানি, পুলিস বা আইন বিভাগকে এমন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। সে যাহোক, আমাদের পক্ষে একথা লেখা কঠিন নয় যে, অক্ষয় দত্তগুপ্ত সরকারি গ্রন্থাগারিক হিসেবে 'বিষের বাঁশী'র ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব করে ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে নিজের প্রশ্নাতীত আনুগত্য প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। এই সময়ের অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকই তাই করতেন, বিনিময়ে এঁরা পেতেন রাজ-অনুগ্রহ—যেমন দত্তগুপ্ত পেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে আমরা এক ঝলকে দেখে নিতে পারি, এই অক্ষয় দত্তগুপ্ত কে?

অক্ষয় দত্তগুপ্ত

জন্ম ঢাকায় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে। পিতা দ্বারকানাথ গুপ্ত। ঢাকা জুবিলি স্কুল থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সংস্কৃতে সাম্মানিক নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

তাঁর কর্মজীবনের সূচনা কলকাতার সিটি কলেজে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজেও তিনি কিছুদিন পড়ান। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯-এ তিনি প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। এই সময় থেকে ১৯১২ পর্যন্ত তিনি সদ্য গঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম সরকারের সহকারি অনুবাদকের পদে কাজ করেন। এরপর তিনি আবার শিক্ষকতায় ফিরে যান এবং আগস্ট ১৯১৯ পর্যন্ত ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন। সেপ্টেম্বর ১৯১৯-এ তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর অস্থায়ী গ্রন্থাগারিকের পদে যোগ দেন। পরের বছর ঐ পদে তিনি স্থায়ী হন।

দত্তগুপ্ত ব্রিটিশরাজের একান্ত অনুগত ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন। গ্রন্থাগারিক হিসেবে তাঁর দক্ষতা অবশ্যই উচ্চমানের ছিল। এক বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে তিনি সরকারের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা প্রমাণে কার্পণ্য করেননি। তিনি সরকারের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। সরকারও তাঁর এই আনুগত্যের দাম দিয়েছিল।

'বিষের বাঁশী'র নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দেওয়ার বছরেই শিক্ষা বিভাগ থেকে দত্তগুপ্তকে 'রায় সাহেব' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয় সরকারের কাছে। সেবছর এই সম্মান না পেলেও ১৯২৫-এ তিনি 'রাজ' উপাধি পান।

কেন তাঁর নাম 'রায় সাহেব' উপাধির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল? রাজনৈতিক দপ্তরের প্রতিবেদনে লেখা হয়—"A very competent, devoted and loyal officer of Govt.. His work as Librarian is of great value and marked by ability." দত্তগুপ্ত যখন এই উপাধি পান তখন তিনি কলকাতার বাসিন্দা, সরকারি প্রতিবেদনে তাঁর বাড়ির ঠিকানা দেওয়া আছে—১০বি/৩, নলিন সরকার স্ট্রীট।

দত্তগুপ্তের মূল্যায়নের পরেও প্রশ্ন উঠতে পারে, 'বিষের বাঁশী'তে কি পরিমাণ 'বিষ' বা এই গ্রন্থ কি ধরনের 'বিপজ্জনক' ছিল?

১৯৪৫-এ 'বিষের বাঁশী'র নব মূল্যায়নের সময় বাঙলা

সরকারের আইন-বিশারদ লিগাল রিমেমব্র্যান্সার মনে করেছিলেন : "No direct attempt to incite disaffection towards the Government." অন্যদিকে সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেলের মনে হয়েছিল : "On the whole the impression I get is that it calls upon the young patriots to remedy the existing state of affairs, social & political. Some of the passages seem to be provocative. But taken as a whole it will be a border line case."

ঐ দুই বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারী বলেননি, আইন-শৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে 'বিষের বাঁশী' কোন্ সময়ে খুব বিপজ্জনক ছিল। আসলে পঁচিশ বছরের দুরন্ত যুবক 'নজরুল' নামক শব্দটি সরকারের কাছে এতই ভয়ের ছিল যে, যেকোন অজুহাতে তাঁকে নির্বাসনে ও তাঁর গ্রন্থ নিষিদ্ধ করতে ব্রিটিশরাজকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হতো না। অক্ষয় দত্তগুপ্ত এখানে নিমিত্ত ছিলেন মাত্র। ❑

এই নিবন্ধ রচনায় যেসমস্ত গ্রন্থ ও সরকারি প্রতিবেদনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১। নজরুলের কবিতা—বাজেয়াপ্তির জন্য অনুবাদ সংগ্রহ ও সম্পাদনা, ভুঁইয়া ইকবাল, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, ঢাকা।

২। Presidency College Register, Compiled & Ed. by Subodh Ch. Sengupta & Gulucknath Dhar, Calcutta, 1927.

৩। The Quarterly Civil List for Bengal, 1921, 1st January 1926.

৩। File : Political (Confidential), Political Dept., 1925.

জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ

স্বামী অচ্যুতানন্দ

ইতিপূর্বে জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শ্রীবিশ্বনাথ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবারে দ্বিতীয় পর্বে জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ।—লেখক

কেদারপাহাড় আলোকচিত্র ঃ রবিধন দত্ত

"ঐ যে দেখা যায় কেদারনাথ ধাম—মন্দাকিনীর ওপারে
সেথা শান্ত হইবে চরণযুগল—তৃপ্ত হবে মন প্রাণ।
দীর্ঘ বাসনা পূরণ হইবে—জপ জপ শিব নাম।"

আমার সঙ্গী ছাত্রটি একটি বিখ্যাত গানের সুর নকল করে হঠাৎ এই গানটি গেয়ে উঠতেই সামনে তাকিয়ে দেখি, দূরে সাদা বরফের পাহাড়ের পটভূমিকায় বিখ্যাত কেদারনাথ-মন্দিরের স্বর্ণময় শীর্ষদেশ। সামনে আর বিশেষ উঁচুনিচু জমি নেই। প্রায় সমতল একটা জায়গা থেকে প্রথম মন্দিরচূড়া দেখা যায় বলে এই জায়গাটির নাম 'দেও দেখানি'। পথের ক্লান্তি নিমেষে ভুলে গিয়ে দুহাত জোড় করে হিমালয়ের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শ্রীকেদারনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে দ্রুততর বেগে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

✡

গতকাল আমাদের এই তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছিল সকাল ৬টায় ঋষিকেশের 'মুনি কি রেতি' থেকে। উত্তর প্রদেশ ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা প্যাকেজ ট্যুর প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছিলাম। কথা ছিল, সেই যাত্রায় পাঁচটা বাস একসঙ্গে যাবে। সেইমত টাকা জমা দিয়ে আমরা দুজন সাধু ও আমার একজন ছাত্র জগদীশ—পদার্থবিদ্যায় অনার্সের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র—আমার সঙ্গী হয়েছিল। যাত্রার আধঘণ্টা আগে চারটি বাসই যথারীতি এসে গেল। যাঁরা আগে টিকিট কেটেছিলেন—তাঁরা সবাই বাসে উঠে পড়লেন। যাত্রার সময় এগিয়ে আসছে। কিন্তু কি বিপদ। শেষ বাসটি আর আসে না! শেষে ভগ্নদূতের মতো একজন এসে খবর দিল—বাসটির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। সেটি নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

অগত্যা ট্যুরিস্ট অফিসের সরকারি এক কর্মচারী আমাদের কাছে এসে জানালেন ঃ "আপনারা চিন্তা করবেন না। আমাদের চারটি ট্যাক্সি খালি আছে। তাতেই এই বাসের কুড়িজন যাত্রীকে যাত্রা করিয়ে দেওয়া হবে।" শাপে বর হলো! আমরা পরমানন্দে ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। সামনের সীটে আমরা দুই সাধু এবং পিছনে জগদীশ ও দিল্লী থেকে আগত তিনজন তীর্থযাত্রী।

শুরু হলো আমাদের তীর্থযাত্রা। আগের গাড়িগুলি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এখন একসঙ্গে চারটি বাস ও চারটি ট্যাক্সি রওনা দিল। প্রথম যাব কেদারনাথে। এখান থেকে ২২৬ কিলোমিটার পথ। প্রথম দিন আমাদের শোনপ্রয়াগ পর্যন্ত যাওয়ার কথা—এই গাড়িতেই। তার পরে হাঁটাপথে ১৯ কিলোমিটার যাব কেদার পর্যন্ত। সেইমত ধীরে ধীরে গাড়ির কনভয় চলেছে। কিন্তু ব্যাসী ছাড়ানোর পরেই বিপত্তি দেখা গেল। জগদীশের গা গুলোতে শুরু করল। গাড়ি যত পাহাড়ের গায়ে পাক খেয়ে ওপরে উঠছে, সে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাঝে মাঝেই গাড়ির জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে

বমি করে যাচ্ছে। আমরা রাস্তা থেকে কমলালেবু কিনে তাকে খাওয়ালাম। তাতে কিছুটা উপকার হলো। তবে এসব সত্ত্বেও তার আনন্দ এতটুকুও কমেনি। এর মধ্যেই আমরা একে একে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম দেবপ্রয়াগ ছাড়িয়ে এসেছি। মিশেছে বদরীর চরণ ছুঁয়ে আসা অলকানন্দার সঙ্গে। হারিয়ে গিয়েছে তার পৃথক অস্তিত্ব। সে এখানে অলকানন্দায় রূপান্তরিত। শ্রীনগর থেকে তার দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। উচ্চতা ২,০০০ ফিট। এখানেও খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দুই নদীর
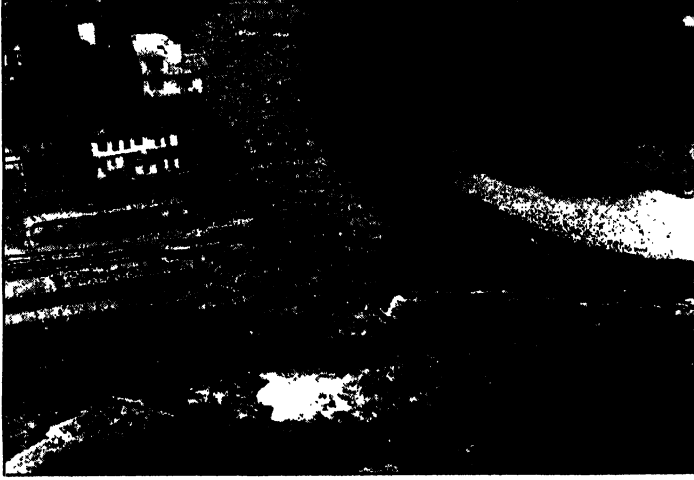
দেবপ্রয়াগ : গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল আলোকচিত্র : রবিধন দত্ত

ঋষিকেশ থেকে এর দূরত্ব ৭১ কিলোমিটার। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সঙ্গমের ধারে প্রাচীন রঘুনাথজীর মন্দির দর্শন করলাম। ডানদিক দিয়ে নীলচে সাদা অলকানন্দা নেমে আসছে আর বাঁদিক দিয়ে নেমে আসছে গৈরিকবর্ণা গঙ্গা। দুই নদীর মিলনস্থলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার রাস্তায় উঠে এসে গাড়িতে যাত্রা শুরু করলাম এবং ৩৬ কিলোমিটার দূরে টিহিরি গাড়োয়ালের রাজাদের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরে এসে নামলাম। আমাদের যাত্রাপথের কখনো ডানদিকে, কখনো বাঁদিকে অলকানন্দা তীব্রস্রোতে নেমে আসছে। তার পাশেই আমাদের চলার পথ।

একদিকে সবুজ গাছপালায় ভরা উত্তুঙ্গ পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলা অলকানন্দা। শ্রীনগরে অলকানন্দার পাড়ে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রাচীন কেশবরায়ের মন্দির, কমলেশ্বর শিব ও বিষ্ণু-মন্দির। গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্রটিও এখানে—পাহাড়ী শহরের মাঝখানে। আমরা শুধু দুটি মন্দির দেখে আবার যাত্রা করলাম। এখানে চা-পানের জন্য যাত্রাবিরতি ছিল।

দুপুর ১২টা নাগাদ আমরা পৌঁছালাম রুদ্রপ্রয়াগে। এখানে মধ্যাহ্ন আহারের বিরতি। রাস্তাটি এখানে দুভাগ হয়ে গিয়েছে। ডানদিক দিয়ে কেদারের পথ, বাঁদিক দিয়ে অলকানন্দার সেতু পেরিয়ে শ্রীবদরীবিশালজীর রাস্তা চলে গিয়েছে। বাসস্ট্যান্ডের ঠিক নিচেই আবার একটি বিখ্যাত নদীসঙ্গম। কেদার থেকে নেমে আসা মন্দাকিনী এখানে সঙ্গমে নেমে রঘুনাথজী ও চামুণ্ডাদেবীর মন্দির দর্শন করতে হয়। এই রুদ্রপ্রয়াগ আরেকটি কারণে ভ্রমণবিলাসী মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। জিম করবেটের 'Man-eaters of Kumaun' গ্রন্থে বর্ণিত শিকারকাহিনীর ঘটনাস্থল এই রুদ্রপ্রয়াগের আশপাশে পাহাড়ী গ্রামেই। এখানে একটি সাইনবোর্ডে সেই কথা লেখাও আছে। সঙ্গে আছে একটি বিরাট বাঘের ছবি। এখানে চটির দোকানে ডাল-ভাত খেয়ে আবার রওনা দিলাম। এরপরে ৪২ কিলোমিটার দূরে একেবারে ৬,০০০ ফুট উঁচুতে গুপ্তকাশীতে এসে নামলাম।
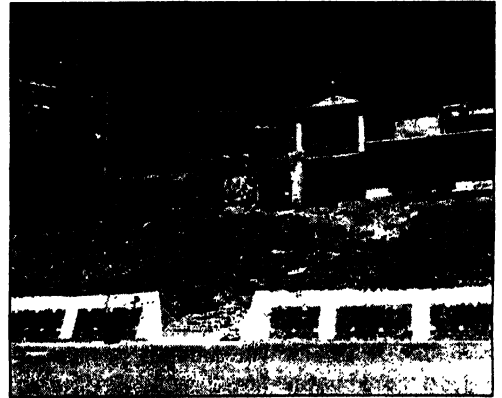
গুপ্তকাশী আলোকচিত্র : রবিধন দত্ত

ট্যাক্সির কনভয় দাঁড়াতেই আমরা তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে কিছুটা বাঁদিকে উঁচু পাহাড়ের গায়ে উঠে এলাম। অল্পক্ষণ দাঁড়াতে অনুরোধ করেছি গাড়ির চালককে। তাই এই তাড়াহুড়ো।

দর্শন করব—সেই আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনপ্রয়াগের সরকারি এজেন্সির মাধ্যমে একজন কুলি যোগাড় করে সাড়ে ৩টার মধ্যেই হাঁটাপথে গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে কেদার-গৌরীকে স্মরণ করে রওনা দিলাম। এ-পথে বিকেলের দিকে প্রায়ই
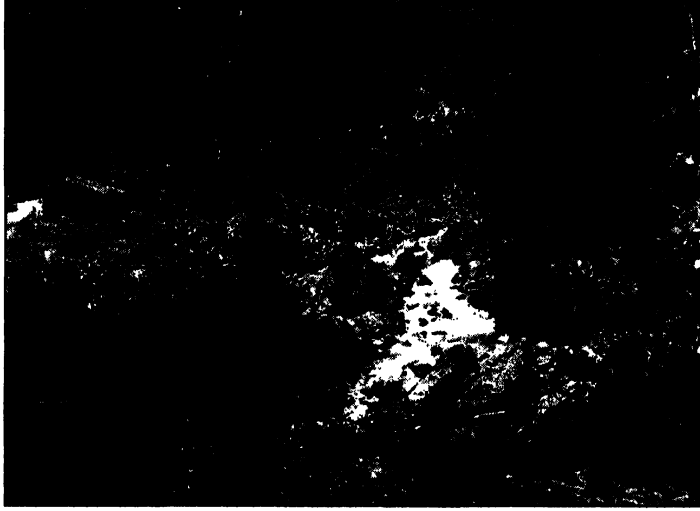
গৌরীকুণ্ডের কাছে আলোকচিত্র : রবিধন দত্ত

এখানে একই মন্দির-চত্বরের মধ্যে অর্ধনারীশ্বর বিশ্বনাথ-মূর্তি ও মণিকর্ণিকা কুণ্ড আছে। শিববাহন নন্দীর (ষাঁড়) পিতলের মুখ দিয়ে ঝরনার ধারা একটি চৌবাচ্চায় পড়ছে। এটি মণিকর্ণিকা। আমরা দেবমন্দির দর্শন ও মণিকর্ণিকার ধারা স্পর্শ করে নেমে এসে আবার যাত্রা শুরু করলাম। গুপ্তকাশী থেকে ১৩ কিলোমিটার কাটা চটি। সেখান থেকে ১১ কিলোমিটার রামপুর ও ১ কিলোমিটার সীতাপুর হয়ে আরো ২ কিলোমিটার দূরে শোনপ্রয়াগ এসে পৌঁছালাম বিকেল ৩টা নাগাদ। পথে গুপ্তকাশী থেকেই ডানদিকে পাহাড়ী চড়াই রাস্তা চলে গিয়েছে উখীমঠ হয়ে মদমহেশ্বর পর্যন্ত। আমাদের ড্রাইভার সেই পথ দেখিয়ে দিল। এখান থেকে দূরত্ব ২৬ কিলোমিটার। দীপান্বিতা অমাবস্যায় যখন কেদারনাথ-মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, সেইসময় থেকে অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দির খোলার আগের দিন পর্যন্ত এই উখীমঠে কেদারনাথের প্রতিভূ-বিগ্রহ নিয়ে এসে তাঁর পূজাদি হয়। এই জায়গাটিকে বাণরাজার মেয়ে উষার তপস্যাস্থল বলা হয়। 'উখী' শব্দটি 'উষা' বা 'উষী' শব্দের অপভ্রংশ।

আমাদের গাড়ির পথ শেষ শোনপ্রয়াগে। অবশ্য গাড়ি গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত যাচ্ছে। যাই হোক, আমরা শোনপ্রয়াগে নেমে ইচ্ছে করলে সরকারি ব্যবস্থামত তাদের অস্থায়ী তাঁবুতেও থাকতে পারতাম, সহযাত্রীরা অনেকেই তাই করল। কিন্তু আমাদের আর তর সইছিল না। কখন কেদারনাথকে

বৃষ্টি হয়। আমরা যাচ্ছি মন্দির খোলার দুদিন পরেই। অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দির খোলে। আমরা পঞ্চমীতেই কেদার দর্শন করব—সেইরকমই ইচ্ছা। সবে যাত্রা শুরু হয়েছে। তখনো বেশি ভিড় শুরু হয়নি। যত দেরি হবে ততই ধর্মশালা, ট্যুরিস্ট লজ, রাস্তাঘাট যাত্রীদের অতি-ব্যবহারে নোংরা হয়ে যাবে। বিছানাপত্র অপরিচ্ছন্ন হবে। জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যাবে। আমরা সেজন্য একেবারে প্রথমদিকেই যাত্রা করেছি।

শোনপ্রয়াগে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়েছি। যাত্রার শুরুতেই এক বিরাট চড়াই। আমাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি—হরিদ্বার থেকে এনেছি গাড়ির মাথায় বেঁধে। ধীরে ধীরে হেঁটে সন্ধ্যার কিছু আগে গৌরীকুণ্ডে (৭,০০০ ফুট) পৌঁছালাম। সঙ্গীরা সব ছুটে গেল গৌরীকুণ্ডের উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে। আমি কুণ্ডের সামনে মা গৌরীর মন্দিরে আধো আলো-আঁধারে দণ্ডায়মানা মা গৌরীকে দর্শন ও প্রণাম করে কুণ্ডের পাশে এসে দেখলাম, স্ত্রী-পুরুষ সবাই একসঙ্গে ঐ ছোট কুণ্ডে স্নান করছে। কুণ্ডের একপাশে পিতলের গোমুখ দিয়ে জল পড়ছে। বেশ গরম জল। আর জলের ওপর হালকা হলুদগুঁড়োর সর পড়ে আছে। আমি স্থানীয় পাণ্ডাদের এর কারণ জিজ্ঞেস করাতে তাঁরা বললেন, এই কুণ্ডে দেবী পার্বতী ঋতুস্নান করেছিলেন। তাই ভক্তেরা আজো এখানে জলে হলুদগুঁড়ো দেয়। প্রবাদ, এখানেই গণেশের জন্ম হয়। আর এখানেই পার্বতীর কাছে আসতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত মহাদেব

ক্রোধে গণেশের মুণ্ড উড়িয়ে দেন। অবশ্য তখন তিনি জানতেন না, গণেশ পার্বতী-পুত্র এবং তাঁরই গণশ্রেষ্ঠ গণেশ। গৌরীকুণ্ডের সামান্য দূরেই পথের বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে মুণ্ডহীন গণেশের মূর্তি সেই দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন মতে এখানে কার্তিকেরও জন্ম হয়। তারপরে দেবী এই কুণ্ডে স্নান করেন। আমি কুণ্ডের পাড়ে বসে একটু জল মাথায় দিয়ে গামছায় করে কিছু জল তুলে হাত-পা মুছে নিলাম। কিন্তু উঠে এসেই বিপদ! আমরা দলছুট হয়ে গেছি! সরকারি ট্যুরিস্ট আবাসে আজ রাত্রে আমাদের কোন ব্যবস্থা নেই। আবার তার মধ্যে বৃষ্টিও আরম্ভ হয়েছে। কি করি! কর্মচারীদের একটু বলার পরে তারা ডর্মিটারির একপাশে আমাদের দুটি খাটের ব্যবস্থা করে দিল। কম্বলও দিল। আমরা দোকানে রুটি ও প্রচণ্ড ঝাল একটা ঝোলজাতীয় আলুর তরকারি খেয়ে পাহাড়ে একটু ঘোরাঘুরি করে অস্থায়ী আবাসে এসে আশ্রয় নিলাম। জগদীশ এর মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

কেদারনাথের পথে আলোকচিত্র : রবিধন দত্ত

ভোর হতেই রওনা হলাম। কিছুটা সাধারণ যাত্রীদের পথে, কিছুটা পাকদণ্ডী ধরে। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে সোজা ওপরে উঠেছে। একে 'পাকদণ্ডী' বলে। পকেটে কিছু শুকনো ফল, কাজুবাদাম, কিশমিশ ও লজেন্স নিয়েছি। সঙ্গে জলের বোতল, হাতে লাঠি। বাকি জিনিসপত্র কুলির পিঠে। সে আগে চলে গিয়েছে। আমরা ধীরে ধীরে উঠছি। প্রথমেই ২ কিলোমিটার পরে জঙ্গলচটি। তারপরে আরো ২ কিলোমিটার পরে চীরবাসা, ভৈরবচটি পার হতেই পথের ওপর সামান্য কাদা কাদা ভাব ও কিছু বরফ পাওয়া যেতে লাগল। তারপরে খাড়া চড়াই। "জয় কেদার, জয় কেদার, হর হর মহাদেব" বলতে বলতে সে-পথ পেরিয়ে রামবাড়াচটিতে এসে আরো বেশি বরফ পেলাম। ঠাণ্ডাও বেশ। এখানকার চটিতে গরম চা ও বিস্কুট খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা আরম্ভ হলো। এরপরে রাস্তায় প্রচুর বরফ, দূরে কেদারশৃঙ্গও সাদা বরফে ঢাকা। আমরা খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চড়াই উঠছিলাম। ক্লান্তিতে শরীর খুব অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। ৫ কিলোমিটার এইভাবে এসে গরুড়চটিতে আবার একটু বিশ্রাম নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপরেই এই 'দেও দেখানি'তে এসেছি। [ক্রমশ]
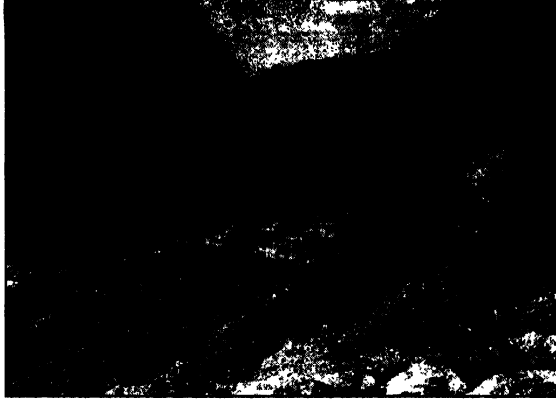
কেদারনাথের মন্দির, পটভূমিতে কেদারপাহাড় আলোকচিত্র : রবিধন দত্ত

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রানী রাসমণির বাড়ি

'উদ্বোধন'-এর গত শারদীয়া সংখ্যায় (১৪০৫) প্রকাশিত শ্যামলী মহাপাত্রের 'রানী রাসমণি : বিস্মৃত এক মহীয়সী' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে কলকাতার জানবাজারে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত রানী রাসমণির প্রাসাদোপম বাড়িটি দেখতে গিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। বাড়িটির নিচের তলায় চারিদিকে নানাবিধ দোকান। ভিতরে নোঙরা পরিবেশ, এমনকি যে-জায়গায় দুর্গাপূজা হতো এবং শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁড়িয়ে মায়ের আরতি দর্শন করতেন সেই স্থানটিও কবুতরের বাসস্থান হয়েছে। বাড়ির উপরতলায় মনে হলো কিছু পরিবার আছে। মনে মনে ভাবলাম, এমন একটি ঐতিহাসিক বাড়ির এমন দুরবস্থা! পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো অনেক ঐতিহাসিক বাড়ি 'Heritage Building' হিসাবে অধিগ্রহণ করেছেন ও করছেন। এই বাড়িটিও ঐ তালিকায় আছে কিনা জানি না, না থাকলে সরকারের উচিত এখনি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া, যাতে এই ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়িটি রক্ষা পায়।

রনজিৎকুমার দত্ত
'আশা ভিলা', গোরালাইন
শিলং-৭৯৩০০৩

'নীলকণ্ঠ মহাদেব'

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী জিতাত্মানন্দের 'নীলকণ্ঠ মহাদেব—বিবেকের আনন্দস্বরূপ' কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি এবং সেই মুগ্ধতার কারণেই এই চিঠির অবতারণা।

মহাকাব্যধর্মী এই উদাত্তমধুর রচনাটি স্বামীজীর মহতো মহীয়ান ও গাম্ভীর্যপূর্ণ চরিত্রের এবং সেইসঙ্গে তাঁর ত্যাগব্রত ও জগৎকল্যাণে নিয়োজিত সত্তাটির নবচিত্রায়ণ করেছে সার্থকভাবে। প্রবহমান ছন্দে গ্রথিত এই অনবদ্য কবিতাটি স্বামীজীর মহিমময় জীবন তথা জীবনাদর্শের এক শ্রবণমঙ্গল নিদর্শন। কাব্যখণ্ডটির ক্লাসিকধর্মী মন্ত্রমাধুর্য মনে করিয়ে দিল বিশ্বকবির গানের একটি অবিস্মরণীয় ছত্র—"ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর মাঝে"।

ভূপেশ দাস
ব্যানার্জীপাড়া রোড
পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৭০০ ০৪১

'উদ্বোধন' না 'অক্সিজেন'?

'উদ্বোধন' যে আমার জীবনে এক শক্তির কাজ করছে তা হয়তো লিখে বোঝানো যাবে না। 'উদ্বোধন' পেয়েই আমি প্রথমে পড়ি 'কথামৃতে না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা', আর তারপরেই পড়ি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য লেখাগুলি। 'উদ্বোধন' যেন আমার কাছে 'অক্সিজেন'। 'উদ্বোধন' ভিন্ন বহু ম্যাগাজিনই আমার কাছে আসে, কিন্তু কি আশ্চর্য! লেটার বক্সে যতক্ষণ না 'উদ্বোধন' দেখি ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন ম্যাগাজিনের পোস্টাল কভারগুলো খুলতেই পারি না! সব পড়ে থাকে। আগে 'উদ্বোধন' পড়ে তবে অন্য সব পত্রিকা পড়ি! মাসের প্রথম হলেই উদ্গ্রীব হয়ে থাকি কখন 'উদ্বোধন' আসবে। একটা তীব্র ব্যাকুলতা যেন ঘিরে ধরে আর লেটার বক্সে 'উদ্বোধন' দেখেই যেন সব শান্ত হয়ে যায়। কি যে আনন্দ হয় তখন সে কী বলব! এক মুহূর্তও দেরি না করে তক্ষুণি সব কাজ ফেলে আগেই উপরি উক্ত দুটি লেখা পড়ি।

আমার এইটুকুই আনন্দ যে, আমি 'উদ্বোধন'-এর কথা অনেককে বলে গ্রাহক করে দিতে পেরেছি। কাউকে কাউকে তো উপহার হিসেবে এক বছরের গ্রাহক করেও দিয়েছি। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় যে কী শক্তি ও অমৃতসুধা আছে তা যারা এই সুধা পান করেছেন তাঁরাই বুঝবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও স্বামীজীর চরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে 'উদ্বোধন' যেন যুগ যুগ ধরে এমনিভাবে জীবিত থাকে—এই প্রার্থনা করি।

সুমিতা ব্যানার্জী
কালিন্দী হাউসিং এস্টেট
কলকাতা-৭০০ ০৮৯

যোগাসনে রোগমুক্তি

আজকাল যেন রোগের প্রকোপ বড় বেশি বেড়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে বেড়ে গিয়েছে চিকিৎসার খরচ এবং যন্ত্রণাও। কিন্তু কিছুটা স্বাস্থ্যসচেতন হলে সহজেই আমরা অনেক রোগের হাত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারি। আজ দেশ জুড়ে, বিশ্ব জুড়ে ভারতের 'যোগাসন'-এর খুব জনপ্রিয়তা। এই সমস্ত যোগাসন আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিদের আবিষ্কার। যোগাসনের নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের সুস্থ রাখতে পারি। যোগাসনের একজন প্রশিক্ষক হিসাবে আমি কয়েকটি সহজ আসনের কথা এখানে আলোচনা করছি। সেগুলির অনুশীলনে সকলেই উপকার পাবেন।

(১) পদ্মাসন : পদ্ধতি—এই আসনপদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা করে, দুই হাঁটু মুড়ে, ডান পা বাঁ পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে ও বাঁ পা ডান পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে। এরপর হাতদুটি সামনে প্রসারিত করে হাঁটুর ওপর রাখতে হবে। এই অবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে হবে। এই আসন সকাল-সন্ধ্যায় করা যায়।

উপকারিতা—এই আসন অভ্যাস করলে মনের শক্তিবৃদ্ধি হয়, একাগ্রতা বাড়ে, মেরুদণ্ড সোজা হয়, সহজে শরীরে জড়তা আসে না, রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে, পায়ে বাত হয় না ইত্যাদি।

(২) গোমুখাসন : পদ্ধতি—প্রথমে একটি পা পিছন দিকে মুড়ে তার ওপর দিয়ে আরেকটি পা যতদূর সম্ভব মুড়ে একটি হাঁটুর

ওপর আরেকটি হাঁটু নিয়ে যেতে হবে। এতে হাঁটু-দুটিকে দেখতে হয় গরুর মুখের মতো। তাই এই আসনের নাম 'গোমুখাসন'। এরপর হাত-দুটিকে পিছনে মুড়ে—একটি ওপরে কাঁধ থেকে নিচে এবং আরেকটি নিচ থেকে ওপরে নিয়ে গিয়ে দুই হাতের আঙুল আঁকশির মতো বেঁকিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাঁ হাঁটু ওপরে থাকলে বাঁ হাত ওপরে যাবে। আবার ডান হাত ওপরে গেলে ডান পা ওপরে যাবে। ঠিক এইভাবে ২ মিনিট বসে থাকার পর এর উলটোটাও করতে হবে আরো ২ মিনিট। অর্থাৎ হাত ও পায়ের অবস্থার পরিবর্তন ২ মিনিট অন্তর করতে হবে। এই আসন দু-তিন বার অভ্যাস করা যায়। প্রধানত রাত্রে শোওয়ার আগে এই আসন অভ্যাস করতে হয়।

উপকারিতা—এই আসন অভ্যাস করলে হাত ও পায়ের গঠন ভাল হয়। ব্রহ্মচর্য রক্ষার্থে এই আসনটি খুবই উপযোগী। মনের মধ্যে কুচিন্তা, কামচিন্তা অযাচিতভাবে উদয় হলে এই আসনটি করলে বিশেষ উপকার হয়। এছাড়া পায়ের বাত, সায়াটিকা বাত, অর্শ, মূত্রপ্রদাহ, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগ উপশমে আসনটি সহায়তা করে।

(৩) **ভদ্রাসন : পদ্ধতি**—প্রথমে দু-পায়ের গোড়ালিদুটি মূত্রথলির নিচে একজায়গায় করে মেরুদণ্ডকে সোজা করে বসতে হবে এবং সেইসঙ্গে হাতদুটিকে হাঁটুর ওপরে সোজা করে রাখতে হবে। প্রথম অবস্থায় সোজা হয়ে বসা যায় না, ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের ফলে সোজা হয়ে বসা যাবে।

উপকারিতা—এই আসনটি অভ্যাস করলে বস্তিপ্রদেশ ও হাঁটুর স্নায়ুগুলিকে প্রসারিত করে সবল রাখে। এটি ব্রহ্মচর্যরক্ষা এবং ধারণাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মেয়েদের পক্ষে এই আসন বিশেষ উপযোগী। মেয়েরা অল্পবয়স থেকে এই আসনটি অভ্যাস করলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বিশেষ কষ্ট অনুভব করে না। পুরুষেরা এই আসন অভ্যাস করলে শুক্র ঊর্ধ্বগামী হয় ও দেহ কান্তিযুক্ত হয়।

(৪) **সর্বাঙ্গাসন : পদ্ধতি**—প্রথমে শবাসনে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। তারপর হাত-দুটিকে কোমরের পিছনের দিকে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে কোমরটিকে পা সমেত ওপরে ওঠাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, মেরুদণ্ড ও পা যেন বেঁকে না যায়। এতে চিবুকটি বুকে স্পর্শ করবে। মাথাটিই শুধু মাটির সাথে লেগে থাকবে। এই আসন ২ থেকে ৫ মিনিট পর্যন্ত করতে হবে।

উপকারিতা—এককথায় বলা যেতে পারে যে, সব রোগ দূরীকরণের ক্ষমতা এই আসনের আছে। সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসে ইন্দ্রগ্রন্থি বা থাইরয়েড, উপেন্দ্রগ্রন্থি বা প্যারাথাইরয়েড, টনসিল, লালাগ্রন্থি ইত্যাদি নার্ভগ্রন্থি সবল হয়। এই গ্রন্থিগুলিই আবার রোগ-প্রতিষেধক গ্রন্থি। এই আসনটি নিয়মিত অভ্যাস করলে শরীরে কোনপ্রকার রোগ বাসা বাঁধে না, যৌবনকে দীর্ঘদিন অটুট রাখা যায় এবং বহুকাল ধরে সুস্থ সবল শরীর ধারণ করা যায়।

(৫) **মৎস্যাসন : পদ্ধতি**—মুক্ত পদ্মাসনের মতো বসে তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। পদ্মাসনে আবদ্ধ অবস্থায় দুটি হাঁটু মাটির সমান্তরালে রাখতে হবে। গলা এবং মুখ উঁচুতে তুলে অর্থাৎ ঘাড়কে যথাসাধ্য পিছন দিকে বেঁকিয়ে, নরম কোন চাদরের ওপর মাথাটি রাখতে হবে। এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ব্রহ্মতালু স্পর্শ করে। এর পরে হাত-দুটি সামনের দিকে প্রসারিত করে বাম হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল এবং ডান হাত দিয়ে বাম পায়ের আঙুল ধরতে হবে। প্রথম প্রথম এই আসন ৩০ সেকেন্ড এবং পরে ১ মিনিট অভ্যাস করতে হয়।

উপকারিতা—এই আসনে অনেক উপকার হয়। শরীরের ভিতরে যেসব গ্রন্থি আছে তাদের মধ্যে প্যারাথাইরয়েড, পিটুইটারী ইত্যাদির ওপর বিশেষ কাজ হয়। বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হর্মোন-এর জন্য এই আসন বিশেষ উপযোগী। সর্বাঙ্গাসনের পরই মৎস্যাসন করা উচিত। এতে পিটুইটারী গ্রন্থির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থিও সুস্থ সবল হবে। মৎস্যাসনে গ্রন্থিগুলি সর্বাঙ্গাসনের বিপরীত দিকে ও পিছনদিকে সম্প্রসারিত হয়। ফলে বেশি বয়স পর্যন্ত যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। তবে মনে রাখা দরকার, সর্বাঙ্গাসনের পরই মৎস্যাসন করা উচিত।

অরূপকুমার দাস
সুকান্ত পল্লী, ঝাণ্ডাবাদ
দুর্গাপুর -৭১৩ ২০৩

মেদ ও হোমিওচিকিৎসা

সুঠাম দেহ মানুষকে আলাদা সৌন্দর্য এনে দেয়। অতিরিক্ত মেদ সেই সৌন্দর্যের হানি ঘটায়। মেদবহুল নারী বা পুরুষ অনেকের হাসির খোরাক হন। অতিভোজন শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। দেহে যেমন ক্যালরির প্রয়োজন আছে, তেমনি আবার অতিরিক্ত ক্যালরি শরীরের ক্ষতি করে, মেদ বাড়ায়। এখন দেখা যাক 'ক্যালরি' কি?

খাদ্য পরিপাকের ফলে দেহে যে-শক্তি উৎপন্ন হয়—যে-শক্তি দেহযন্ত্রকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজন, সেই শক্তির একক হলো 'ক্যালরি'। সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা যায়—১ গ্রাম জলের উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াতে যে-পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে বলে 'ক্যালরি'। এই ক্যালরি কার কতটা প্রয়োজন তা নির্ভর করে দৈনিক পরিশ্রমের পরিমাণ, দৈহিক গঠন, উচ্চতা ও ওজন-সহ নানা 'ফ্যাক্টর'-এর ওপর।

বয়স ও পরিশ্রম অনুযায়ী ক্যালরির প্রয়োজন

গর্ভাবস্থায়	:	প্রায় ২৪০০ ক্যালরি
স্তন্যদায়ী মহিলা	:	প্রায় ২৭০০ ক্যালরি
শিশু	:	প্রায় ৯০০ ক্যালরি
কিশোর	:	প্রায় ২৪০০ ক্যালরি
পূর্ণবয়স্ক পুরুষ	:	অল্প কাজ—২৩০০ ক্যালরি
	:	মাঝারি কাজ—২৮০০ ক্যালরি
	:	ভারী কাজ—৩৯০০ ক্যালরি
পূর্ণবয়স্কা মহিলা	:	অল্প কাজ—১৮৫০ ক্যালরি
	:	মাঝারি কাজ—২২০০ ক্যালরি
	:	ভারী কাজ—৩০০০ ক্যালরি

শুধু বেশি খেলেই শরীরের মেদ জমে, তা নয়। বহু সময় দেহের অভ্যন্তরে প্রোটোস্ট্যান্ট গ্রন্থির গোলমালেও মেদ বৃদ্ধি পায়। সব থেকে বড় কথা, মেদবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এখন আর কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। আর এই মেদবৃদ্ধির ফলে হাঁটাচলা, কাজেকর্মে সমস্যা তো

হয়ই, তার ওপর হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাতের ফলে হৃদ্‌রোগও হয়। অতিরিক্ত মেদকে দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য অ্যালোপ্যাথি ওষুধ আছে, কিন্তু সেইসব ওষুধে মেদ যেমন কমে তেমনি আবার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে সেরকম কোন অসুবিধায় পড়তে হয় না।

মেদ নিবারণের জন্য হোমিও চিকিৎসা: ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস ৫-৬ ফোঁটা করে দিনে দুবার খাওয়ার আগে খেলে উপকার পাওয়া যাবে। এতে কাজ না হলে পর্যায়ক্রমে এমন ব্রোম 3x, ক্যালকেরিয়া কার্ব 6 ও ক্যালকেরিয়া আর্স প্রতিমাত্রায় 2 গ্রেন সাত ঘণ্টা অন্তর খাওয়ার কথা বলেছেন ডাঃ ক্লার্ক। ডাঃ কাউপার থ্রোয়েট লক্ষণানুসারে এগারিকাস 3x, অ্যান্টিম ক্রুড 6x, আর্সেনিক অ্যালব 6x, ব্যারাইটা কার্ব 6x, লাইকোপোডিয়াম 6x, মার্ক সল 3x এবং সালফার 6x ব্যবহার করে ভাল ফল পেয়েছেন। এছাড়া কার্লসবাড ক্যালোট্রপিস এবং ফাইটোলাক্কা বেরী ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কখনো ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
গ্রাম+পোঃ শ্রীনগর (মল্লিকবাজার)
জেলা: মেদিনীপুর, পিন: ৭২১ ২৪২

কিছু সাধারণ টোটকা

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যায় দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টোটকা' শীর্ষক পত্রের সম্প্রসারণ হিসাবে এই পত্রের অবতারণা।

ঈশ্বর যাকিছু সৃষ্টি করেছেন, লতা-পাতা-বৃক্ষ ইত্যাদি সবই কোন না কোনভাবে আমাদের প্রয়োজনে লাগে। তবে মানুষ আজো সবকিছুর প্রয়োগ জানতে পারেনি। ছোটবেলা থেকে আমরা কিছু সাধারণ টোটকার সঙ্গে পরিচিত। অনেকের উপকার হতে পারে মনে করে লিখছি।

টোটকা—১: দাঁতে ব্যথা ছোট-বড় সবারই হয়ে থাকে—চলতি কথায় বলে দাঁতে 'পোকা'। তার থেকে অসহ্য ব্যথা ও যন্ত্রণা হয়ে থাকে। এর অব্যর্থ ঔষধ ফটকিরি। এক গ্লাস হালকা গরম জলে (গরমের দিনে এমনি কলের জলেও হয়) ছোট এক চামচ ফটকিরির গুঁড়ো গুলে ঐ জলে বারবার কুলকুচি করুন। ঐ জল মুখ ভরে নিয়ে বেশ কিছু সময় মুখ বন্ধ করে রাখুন। এমনি কয়েকবার সকাল, বিকাল করুন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন ব্যথা কমে গেছে। কয়েকদিন করুন, ব্যথা আর হবে না। ফটকিরির জলে দাঁতের 'পোকা' মরে যায়। যেকোনরকম দাঁতের ব্যথায় ফটকিরি অব্যর্থ ওষুধ। আমার দাঁতের ব্যথা এতেই সেরে গেছে। বুড়ো বয়সেও দাঁত ফেলতে হয়নি।

শরীরের যেকোন স্থান কেটে রক্ত পড়লে ফটকিরির গুঁড়ো চেপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

টোটকা—২: কোথাও কেটে রক্ত পড়লে গাঁদাফুলের পাতা চটকে রস লাগিয়ে দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

টোটকা—৩: কচুপাতার ডাঁটা টিপে রসটা লাগিয়ে দিলেও রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

টোটকা—৪: কোথাও কেটে গিয়ে পেকে গেছে। গরম ফুটানো সরষের তেলে কাটা পেঁয়াজ ছেড়ে দিয়ে ঐ পেঁয়াজ-তেল পেকে যাওয়া কাটা স্থানে বারবার লাগালে সেরে যায়।

এমনিভাবে তৈরি রসুন-তেলও কাশি, বাতের ব্যথা ইত্যাদিতে খুবই উপকারী।

টোটকা—৫: কোথাও পুড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে হিং গুলে ঐ জল কিছুক্ষণ লাগালে ফোসকা পড়ে না, সঙ্গে সঙ্গে সেরে যায়। দাগও পড়ে না।

টোটকা—৬: হঠাৎ পেটে ব্যথা হলে—ছোট বাচ্চা বা বড় যেকোন কারো—এক চামচ গরম জলে হিং গুলে পেটের নাভিতে ঘষে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা সেরে যায়।

টোটকা—৭: পেট খারাপ ও গ্যাসের যন্ত্রণায় গাঁদালপাতা ১০-১২টা ফুটিয়ে এক কাপ বা এক গ্লাস জল সকালে খালি পেটে খেয়ে নিলে খুব উপকার হয়। যাঁদের সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস তাঁরা গাঁদালপাতা ফুটানো জলে চা-পাতা দিয়ে ঐ জল ছেঁকে একটু লেবুর রস বা গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন। মুখরোচক হয়, উপকারও হয়। ৭-৮টি পাতা দিলেও হয়। পেট খারাপে গাঁদালপাতার ঝোলে খুব উপকার হয়।

টোটকা—৮: ছোট বাচ্চাদের বা বড়দেরও সর্দি-কাশি হলে তুলসীপাতার রস, আদার রস ও মধু খুব উপকার দেয়।

টোটকা—৯: ইনফ্লুয়েঞ্জায় শিউলিপাতার রস একটু হালকা গরম করে দিনে তিনবার করে খেলে জ্বর সেরে যায়।

টোটকা—১০: অনেকেই পেটে গ্যাসের ব্যথায় কষ্ট পান। সকালে খালি পেটে রোজ ৫-৬টা শিউলিপাতা ভাল করে ধুয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিলে ব্যথা সেরে যায়। ৪-৫টা পাতার রস করে খেলেও সেরে যায়। ওষুধ লাগে না।

জ্যোৎস্না রায়চৌধুরী
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়াদিল্লী-১১০ ০১৯

ঘরোয়া পদ্ধতি

প্রায়শই আমরা কিছু না কিছু বিরক্তিকর এবং কষ্টকর সমস্যায় পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু আমরা সহজেই ঘরোয়া এবং অতি সাধারণ জিনিসের মাধ্যমে সেই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে পারি। কিরকম করে পারি? কি সেই পদ্ধতি? তা নিচে দেওয়া হলো—

(১) হঠাৎ দাঁতে যন্ত্রণা। তক্ষুণি ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। তখন যদি একটা লবঙ্গ ছেঁচে দাঁতের ঐ ব্যথার জায়গায় চেপে ধরা হয় তাহলে ব্যথা কমে।

(২) পিঁপড়ের উৎপাত হলে সেখানে হলুদ গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলে পিঁপড়েগুলো চলে যায়।

(৩) হঠাৎ কোথাও পুড়ে গেলে সেখানে কাঁচা সরষের তেল লাগালে জ্বালা কমে।

(৪) ঘামাচিতে বৃষ্টির জল লাগালে ঘামাচির কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মৈত্রেয়ী ও মানসী স্যানাল
রায়পাড়া, কৃষ্ণনগর, জেলা: নদীয়া

ইঁদুর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

'কিরকম হচ্ছে?'

'আজ্ঞে, সাঙ্ঘাতিক হচ্ছে। আপনার আর মা ঠাকরুনের বড় দুটো ছবি দামী ফ্রেমে গোল্ডেন বর্ডার দিয়ে বাঁধিয়ে আই লেভলে ঝুলিয়েছি। তলায় কারুকার্য করা চমৎকার ব্রাকেট। ধূপদানি থেকে ধূপের মিষ্টি ধোঁয়া। দুপাশে দুটো ইলেকট্রিক মোমবাতি। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে কিনেছি। একজন একটা বাঘছালের টুকরো দিয়েছে, সেটাকে ভেলভেটের আসনে ফিট করে তার ওপর সিদ্ধাসনে বসি। আগে পদ্মাসনেই বসতুম, ইদানীং টান ধরে, তাই। তারপর গোলাপের আতর মাখানো জপের মালা ঘুরতে থাকে। মাঝে মাঝে পিটপিট করে আপনাদের দিকে তাকাই। নো রেসপন্স।'

'তারপর?'

'ঐ যে আপনি বলেছেন, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। মালাটাকে ডিবের মধ্যে রেখে ধ্যান।'

'গভীর ধ্যান?'

'আজ্ঞে, আমার ধারণা গভীর ধ্যান, বাড়ির দুষ্ট লোকেরা বলে গভীর ঘুম। মাঝে মাঝে নাকি নাকও ডাকে! কিছুতেই বোঝাতে পারি না, নাক ডাকছে কাকে? তাঁকে। যেমন মেঘ জলকে ডাকে।'

'ধ্যান কোথায় কর?'

'আগে ভুরুর মাঝখানে করতুম।'

'কি করতে?'

'একটা গোল জ্যোতি, ঐ অম্বলের ট্যাবলেটের সাইজে আনার চেষ্টা করতুম। মাসের পর মাস চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলুম। একবার ভাবলুম তোতাপুরী যেমন করেছিলেন, ভাঙা কাঁচের টুকরো দিই বিঁধিয়ে। সাহস হলো না। যদি নির্বিকল্প হয়ে যায়, কে ফিরিয়ে আনবে! ডলপুতুলের মতো বসেই রইলুম!'

'তারপর?'

'প্রবলেম ঠাকুর। লাঠালাঠি!'

'মানে?'

'কাকে কোথায় রাখি? আপনি, মা ঠাকরুন, মা কালী আর আমার গুরু। এই চারজন। ঐটুকু তো জায়গা! পাশাপাশি রাখলে বুক ফুরিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ভাবলুম সহস্রারে গুরুকে বসাই। ভ্রূমধ্যে মা কালী। আর হৃদয়ে আপনি ও মা ঠাকরুন। ধ্যানে বসে দেখি কী, ধ্যান লিফট হয়ে গেছে, গ্রাউন্ড ফ্লোর টপ ফ্লোর, টপ ফ্লোর গ্রাউন্ড ফ্লোর। আমি এক উর্দিপরা লিফট অপারেটর। নানারকম চিন্তা। সব বড়বাবু, মেজবাবু আসছে। গেট খুলছি, বন্ধ করছি, ওপরে উঠছে, ওপর থেকে নামছে। নানা পোশাকের নানা চিন্তা।'

'অবশেষে?'

'অবশেষে ধ্যুৎ তেরিকা!'

'জপটা আছে না গেছে?'

'আজ্ঞে, দীক্ষার পর প্রবল উৎসাহে তিন মালা, চার মালা হতো।'

'অতঃপর?'

'এখন কনসেন্ট্রেটেড জপ, তিনবার।'

'ইংরেজীটা কি বললে?'

'আজ্ঞে, দুধ মেরে যেমন ক্ষীর হয়, সেইরকম জপ মেরে জপের ক্ষীর, মানে ঘন জপ।'

'বাঃ, অতি সুন্দর। তা তোমার এই ধর্ম-বাসনার কারণটা জানতে পারি কী?'

'ঠাকুর, এই প্রশ্ন নিজেকে আমিও বহুবার করেছি। যা পারি না আড়ম্বর করে তা করতে যাই কেন! আবার ছাড়তে চাইলেও ভাল লাগে না।'

'উত্তর পেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে শ্রীরামকৃষ্ণ লেগে গেছে। আঠার মতো। আপনি প্রভু বটপাতার আঠা। যতই ছাড়াতে চাই ততই জড়িয়ে যায়। কেবলই একটা অস্বস্তি—ঠাকুর যা করতে বলেছিলেন, যা হতে বলেছিলেন তা করতে পারিনি, তা হতে পারিনি। সকলের সঙ্গে সবকিছু করেছি, যেই একা হচ্ছি, তখনি মনের আকাশে বিষণ্ণতার মেঘ—কেন আমি পারছি না, কেন আমি পারব না? পঞ্চবটীতে অভিভাবকের মতো স্বামীজী ও তাঁর ব্রাহ্মবন্ধুদের ধ্যান পরিচালনা করতে করতে আপনি বলেছিলেন ঃ "ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। ওপর ওপর ভাসলে কি জলের নিচে রত্ন পাওয়া যায়!" গান গেয়েছিলেন—

"ডুব দে রে মন কালী বলে। হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কুলে!"

ঠাকুর! আপনার সমস্ত উপদেশ আমার মুখস্থ! আপনি মাস্টারমশাইকে বলেছিলেন, হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে, অথবা সহস্রারে। এগুলি আইনের ধ্যান-

শাস্ত্রে আছে। তবে তোমার যেখানে অভিরুচি ধ্যান করতে পার। সব স্থানই তো ব্রহ্মময়; কোথায় তিনি নেই? দুরকম ধ্যানের কথা বলেছিলেন—নিরাকার ধ্যান ও সাকার ধ্যান। বলেছিলেন, নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। সে-ধ্যানে যা কিছু দেখছ শুনছ লীন হয়ে যাবে; কেবল স্ব-স্বরূপ চিন্তা। সেই স্বরূপ চিন্তা করে শিব নাচেন। "আমি কি", "আমি কি" — এই বলে নাচেন। একে বলে "শিবযোগ"। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়। "নেতি", "নেতি" করে জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা। আর এক আছে "বিষ্ণুযোগ"। নাসাগ্রে দৃষ্টি; অর্ধেক জগতে, অর্ধেক অন্তরে। সাকার ধ্যানে এইরূপ হয়। শিব কখনো কখনো সাকার চিন্তা করে নাচেন। "রাম", "রাম" বলে নাচেন।'

'এইসব নির্দেশে তোমার তো কোন লাভই হলো না!'

'একটা লাভ হয়েছে, সেটা হলো—আপনি আমার নিদ্রা কেড়ে নিয়েছেন। সব হওয়ার মধ্যেও কি যেন একটা হলো না —এই অস্বস্তি পুরে দিয়েছেন মনোপুরে।'

'তাহলে আজ তোমাকে আরেকটা আরো সরল কথা বলি। যারা একান্ত পারবে না তারা দুবেলা দুটো করে প্রণাম করবে। তিনি তো অন্তর্যামী—বুঝছেন যে, এরা কি করে। অনেক কাজ করতে হয়। তোমাদের ডাকবার সময় নেই—তাঁকে আমমোক্তারি দাও। কিন্তু তাঁকে লাভ না করলে—তাঁকে দর্শন না করলে কিছুই হলো না।'

'আজ্ঞে, আপনাকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা।'

'ওকথা আর বলো না। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর গঙ্গা নয়। আমি এত বড়লোক, আমি অমুক—এইসব অহঙ্কার না গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না। "আমি" ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফেল।'

'সংসারে কেন তিনি রেখেছেন?'

'সৃষ্টির জন্য রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর মায়া। কাম-কাঞ্চন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন।'

'কেন ভুলিয়ে রেখেছেন? কেন তাঁর ইচ্ছা?'

'তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন তাহলে আর কেউ সংসার করে না, সৃষ্টিও চলে না। তাহলে শোন, চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ইঁদুরগুলো ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই-মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই-মুড়কি মিষ্টি লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়রমড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর করে না। কিন্তু দেখ, এক সের চালে চোদ্দগুণ খই হয়। কাম-কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশি। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা, তিলোত্তমার রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। বুঝলে?'

'আজ্ঞে।' ❑

'উদ্বোধন'-এ রচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

❑ ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়ে সুখপাঠ্য, ইতিবাচক, বিশ্লেষণমূলক এবং তথ্যভিত্তিক বাঙলা রচনা বিবেচিত হয়। রচনাটিকে অবশ্যই 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উপরি উক্ত যেকোন বিষয়ে রচনাটি কমপক্ষে ২৫০০ শব্দের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। ছদ্মনামে পাঠানো রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ আক্রমণাত্মক রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ কবিতা, সংবাদ, চিঠিপত্র নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

❑ শারদীয়া সংখ্যার (আশ্বিন/সেপ্টেম্বর) জন্য রচনা পাঠালে তা ১৫ চৈত্র/৩১ মার্চ-এর মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন।

❑ ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনায় আলোকচিত্র (গ্লসি প্রিন্ট) পাঠানো আবশ্যিক।

❑ যেকোন তথ্যভিত্তিক রচনা এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবি (গ্লসি প্রিন্ট), রেখাচিত্র ইত্যাদি পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিলে বা সাহায্য নিলে যথাযথ সূত্রনির্দেশ (গ্রন্থের/পত্রিকার নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশকাল, সংস্করণ এবং পৃষ্ঠা) আবশ্যিক।

❑ ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে যথেষ্ট মার্জিন দিয়ে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি না পাঠালে বিবেচিত হবে না। বাঙলায় টাইপ করা পাণ্ডুলিপি পাঠানো যেতে পারে।

❑ রচনার কার্বন বা জেরক্স কপি গ্রহণযোগ্য নয়।

❑ অন্যত্র প্রকাশিত কোন রচনা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। এর ব্যতিক্রম হয় শুধু 'মাধুকরী' বিভাগের রচনাগুলির ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রেও রচনাটিকে 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

❑ উপন্যাস বিবেচিত হবে না।

❑ অমনোনীত রচনা ফেরতযোগ্য নয়। রচনার সঙ্গে প্রেরিত নথিপত্র বা ছবি সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং রচনা/ নথিপত্র/ছবির কপি রেখে পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ সাধারণত কোন রচনা পাঠানোর একবছরের মধ্যে এবং কোন গ্রন্থের আলোচনা গ্রন্থ পাঠানোর দুবছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে বুঝতে হবে, সংশ্লিষ্ট রচনাটি অথবা গ্রন্থটি মনোনীত হয়নি।

❑ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য পাঠানো রচনা অন্তত একবছরের মধ্যে যেন অন্যত্র প্রকাশের জন্য প্রেরিত না হয়। 'উদ্বোধন'-এ কোন রচনা এক-বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অন্যত্র প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে পাঠানোর আগে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়।

❑ 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে আলোচনার জন্য 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থই বিবেচ্য। আলোচনার জন্য প্রতি গ্রন্থের দুখানি কপি জমা দেওয়া আবশ্যিক।

❑ পরলোক-সংবাদ ও অনুষ্ঠান-সংবাদ পরলোকপ্রাপ্তি বা অনুষ্ঠানের পনের দিনের মধ্যে অবশ্যই আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন। অন্যথায় সে-সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

❑ লেখক-লেখিকাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আমরা স্বীকার করি। তবে তাঁদের মতামত আমাদের অনুমোদিত—এটা ভাবা ভুল। মতামতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকাদের।

❑ রচনাদি নির্বাচন ও প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

❑ পত্রোত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট/পোস্টকার্ড/'ইনল্যান্ড'/ খাম পাঠাতে হবে।

১৯ জুলাই ১৯৯৯ — সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ে ক্রিকেটই গৌরবান্বিত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

> আমাদের কি প্রয়োজন?... আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল । প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ।... দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যা কি—কাঁটা কোথায় বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনি তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে।
>
> স্বামী বিবেকানন্দ

শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপ ক্রিকেট শেষ হলো। ১৪ মে শুরু হয়ে প্রায় একমাস ধরে চলা এই টুর্নামেন্ট আক্ষরিক অর্থেই 'গ্রেটেস্ট কার্নিভাল অব সেঞ্চুরি' তকমায় ভূষিত হতে পারে। প্রতিযোগী দল অবশ্য গতবারের তুলনায় বাড়েনি, কিন্তু এবারের বিশ্বকাপ টিভির পর্দায় প্রত্যক্ষ করেছে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ। ক্রিকেটের বিশ্বায়নের 'স্টেপিং স্টোন' হিসেবে এবারের বিশ্বকাপ অদূরভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, একথা অনস্বীকার্য।

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ (১৪০৬) সংখ্যায় বিশ্বকাপের প্রাক্-পরাহ্নের পূর্বাভাস ছিল—দক্ষিণ আফ্রিকা কাপ জেতার প্রধান দাবিদার, 'ডার্ক হর্স' পাকিস্তান। দুর্ভাগ্য দক্ষিণ আফ্রিকার, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে তুল্যমূল্য লড়াই চালিয়েও ম্যাচ 'টাই' হয়ে যাওয়ায় অঙ্কের হিসেবে বিদায় নিতে হলো। গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচেই অবশ্য তারা ভারতের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েও পেশাদারী উৎকর্ষে যাবতীয় চাপ কাটিয়ে ম্যাচ বের করে নেয়। ভারতের ২৫৩ রানের জবাবে একসময়ে ১১৪ রানের মধ্যেই তাদের ৪টি উইকেট চলে যায়। শেষপর্যন্ত জ্যাক কালিসের চওড়া ব্যাটের ওপর ভর দিয়ে তারা উতরে যায়। গ্রুপে ভারত, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ডকে হারালেও শেষ ম্যাচে প্রতিবেশী জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তাদের হার নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেছিলেন। এই পরাজয় নিয়ে কদিন ধরে নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছিল। ফলে বিষয়টি বিতর্ক এড়াতে পারেনি।

অন্যদিকে দ্বিতীয় 'ফেভারিট' অস্ট্রেলিয়া প্রাথমিক পর্বে সাদামাঠা খেলে কোনক্রমে সুপার সিক্সে উঠে আসে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছিটকে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ভারতের মতো কোন পয়েন্ট না নিয়ে সুপার সিক্সে খেলায় সুযোগ পায়। গ্রুপ লিগে নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হেরে 'অসিজ'দের ক্রিকেট ঐতিহ্য যখন ধুলোয় লুটোতে চলেছে, তখনি সবুজ টুপির লড়াকু মানসিকতার চূড়ান্ত প্রতিফলন পাওয়া গেল।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ঐতিহ্য হলো চূড়ান্ত পেশাদারিত্ব, শেষ বল পর্যন্ত নাছোড়বান্দা লড়াই ও ন্যূনতম 'চান্স ফ্যাক্টর'কে টেকনিক্যাল ও ট্যাকটিক্যাল প্রয়োগশৈলির মাধ্যমে সাফল্যে পরিণত করা। সুপার সিক্সে প্রথম ম্যাচে ভারতকে স্বচ্ছন্দে হারিয়ে যে-আত্মবিশ্বাস তারা ফিরে পেয়েছিল, তার জোরেই যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ডিঙিয়ে তারা একেবারে কাপ জিতে নিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সুপার সিক্সের শেষ ম্যাচটির কথাই ধরা যাক। দক্ষিণ আফ্রিকার পৌনে তিনশর মতো রান তাড়া করে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ বের করে আনা এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। চমৎকার মেঘলা আবহাওয়া, সীমিং উইকেট, বিপক্ষে ডোনাল্ড, পোলক, ক্লুজনার, এলওয়ার্দির মতো বিশ্বখ্যাত সীমার এবং মাত্র ৪৮ রান উঠতেই পড়ে গেছে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। এমন কঠিন অবস্থা থেকে অধিনায়ক স্টিভ ওয়াগ প্রায় একক প্রচেষ্টায় যেভাবে ম্যাচ বের করলেন তা দূরতম কল্পনাতেও ভাবা সম্ভব নয়। ম্যাচ জেতানো অপরাজিত শতরান করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, যেকোন ম্যাচের যেকোন পরিস্থিতিতে তাঁর ওপর নির্ভর করা যায়। তিনি শচীন, লারা বা অরবিন্দ ডি-সিলভার মতো প্রতিভাবান বা দেখনদার হয়তো নন, কিন্তু চাপ যত কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে, ততই তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যাটিং খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ঐরকম রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়া জেতার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, সেমিফাইনালে হয়তো আবার যখন

প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা তখন অস্ট্রেলিয়া 'চোকড' হয়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে। মাত্র ২১৩ রানে যখন তাদের ইনিংস শেষ হয়ে যায়, তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে স্টেডিয়ামের আনাচে-কানাচে। কিন্তু টিমটার নাম অস্ট্রেলিয়া, মরণপণ লড়াইয়ের নেশা যাদের শিরায় শিরায়। আগের দিন স্টিভ ওয়াগ, আর এদিন লেগ স্পিনের যাদুকর শেন ওয়ার্ন অতিমানব হয়ে উঠে দক্ষিণ আফ্রিকার মেরুদণ্ড ভেঙে দিলেন। যথার্থ সঙ্গত করে গেলেন ম্যাকগ্রাথ, ফ্লেমিংরা। তাসত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিয় 'জুলু'র (ল্যান্স ক্লুজনার) দাপটে একসময় পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচের ভাগ্য অস্ট্রেলিয়ার শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। শেষ ওভারে ফ্লেমিংকে পরপর দুটো চার মেরে ক্লুজনার অস্ট্রেলিয়ার পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছিলেন। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর অনাবশ্যক হঠকারিতাই শেষপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াকে জিতিয়ে দেয়। ম্যাচটি 'টাই' হয়ে যাওয়ায় সুপার সিক্সের ফলাফলের নিরিখে অস্ট্রেলিয়াকে জয়ী ঘোষণা করেন সংগঠকরা। কিন্তু ক্রিকেট ইতিহাসে এবং তামাম ক্রিকেটপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে এই ম্যাচটি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ম্যাচটিই 'শতাব্দীর সেরা ম্যাচ'।

টেস্টে দুটি টাই ম্যাচের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য জড়িয়ে। এবার বিশ্বকাপের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ ও সর্বোত্তম ম্যাচটির সঙ্গেও জড়িয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার নাম। অপরিসীম স্নায়ুর জোর ও দেশাত্মবোধ না থাকলে এইভাবে জেতা যায় না। পরপর দুটি শ্বাসরোধকারী ম্যাচে সঙ্কল্পবদ্ধ জয় ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে শুরু থেকেই চালকের আসনে তুলে দেয়। পাকিস্তান হতে পারে ব্যক্তিপ্রতিভার নিরিখে এক নম্বর দল, কিন্তু সমবেত লড়াই, সৌহৃদ্য মানসিকতা ও লক্ষ্যপূরণে অবিচল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এপর্যন্ত বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে একপেশে ও নিরুত্তেজ ফাইনালটি প্রত্যক্ষ করলেন লর্ডসের দর্শক, তার সঙ্গে টিভির পর্দায় চোখ রাখা কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী। মাত্র ১৩২ রানে পাকিস্তান ইনিংসকে শেষ করে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া ২০.১ ওভারে মাত্র ২টি উইকেট খুইয়ে জয়ের কড়ি জোগাড় করে নেয়। সেমিফাইনালের পর ফাইনালেও 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হয়ে শেন ওয়ার্ন প্রমাণ করে দিলেন, প্রতিভার আগুন কখনো নেভে না, সাময়িক মরচে পড়লেও একটু শান দিলেই তা আগের মতো শাণিত ও কার্যকর হয়ে ওঠে। '৮৭-র বিশ্বজয়ী অধিনায়ক অ্যালান বর্ডারের পদচিহ্ন ধরে উঠে আসা স্টিভ ওয়াগ একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এবং অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে দলের খেলার ধারাটাই পালটে দিয়েছেন, দলকে অনুপ্রাণিত করেছেন প্রতিমুহূর্তে। তার প্রতিফলন দেখা গেছে শেষ সাতটি ম্যাচে।

টানা ৭-৮ মাস দেশে-বিদেশে একের পর এক সিরিজ খেলে আসার যে ক্লান্তি ও মানসিক চাপ থাকার কথা, তা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার খেলায় দেখা যায়নি, যেটা দেখা গেছে পাকিস্তানের খেলায়। একটু চাপের মধ্যে পড়লেই নড়বড়ে দেখিয়েছে পাকিস্তানকে—বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জেতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেও সেই ক্লুজনারের বিক্রমে ম্যাচটি হেরে পাক খেলোয়াড়দের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল। তবে ঠিক সময়ে কাজের কাজটি করে অর্থাৎ অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে জিম্বাবোয়েকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট সংগ্রহ করে নেয় ওয়াসিম আক্রমের টিম। সেমিফাইনালেও নিউজিল্যান্ডকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় পাকিস্তান। কিন্তু ফাইনালে এ কোন্ পাকিস্তানকে দেখলাম আমরা? হারার আগেই তারা যেন হেরে বসেছিল। একমাত্র ইনজামাম-উল-হক ছাড়া নামী-দামী ব্যাটসম্যানরা একপ্রকার উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে চলে এলেন। যে শোয়েব আখতার এবারের বিশ্বকাপে সব ব্যাটসম্যানের কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে শিক্ষানবীশ বোলারের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। তবে ফাইনালে হারলেও গোটা টুর্নামেন্টে আক্রমের নেতৃত্ব প্রশংসিত হয়েছে তাঁর বোলিংয়ের মতোই। আসলে গ্রুপ লিগে আক্রম-বাহিনী যে দাপট দেখিয়েছিল, সুপার সিক্সে তেমনটা আর দেখা গেল না। তারই ফলশ্রুতি ফাইনালে অসহায় আত্মসমর্পণ।

পাকিস্তান তবু চূড়ান্ত লড়াইয়ে থাকতে পেরেছে, কিন্তু ভারতের যে সুপার সিক্সে ওঠাই একসময়ে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। গ্রুপ লিগে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ হেরে বাড়তি চাপ তৈরি করে ভারতীয়রা। তবে ভারতের কৃতিত্ব যে, শেষপর্যন্ত তারা অসাধ্যসাধন করে সুপার সিক্সে যেতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা, আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান—তিন দলকেই ধরাশায়ী করেছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের ৩৭৩ রান বিশ্বকাপ-সহ একদিনের আন্তর্জাতিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং এবারের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান। সৌরভ গাঙ্গুলির ১৮৩ রান শুধু ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চই নয়, এক ইনিংসে এত রান করার কৃতিত্ব এবারে কোন খেলোয়াড়ের ভাগ্যেই জোটেনি। আবার সৌরভ-রাহুল দ্রাবিড়ের জুটিতে ৩১৮ রান যেকোন উইকেটে বিশ্বরেকর্ড। এক ম্যাচে এতগুলো মাইলস্টোন সুদূর প্রবাসে ভারতীয়দের গর্ব করার অনেক খোরাক জুগিয়েছে। আর শেষ ম্যাচে অর্থাৎ সুপার সিক্সে উত্তীর্ণ হওয়ার নির্ধারক লড়াইয়ে ইংল্যান্ডকে সহজে হারিয়ে জাতি হিসেবে ভারতীয়দের আত্মশ্লাঘা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। খোদ ইংল্যান্ডের মাঠে ক্রিকেট ঐতিহ্যের প্রতিভূ ইংল্যান্ডকে তাদের একসময়ের অধীনস্থ দেশের হাতে এভাবে বিধ্বস্ত হওয়া অনেকের কাছে হয়তো উপভোগ্য হয়েছে। ঐ ম্যাচেও যথারীতি নায়কের ভূমিকা পালন করেন সৌরভ গাঙ্গুলি, যথাযথ সঙ্গত করে যান রাহুল দ্রাবিড়ও। ব্যস ঐ পর্যন্তই।

সুপার সিক্সে একমাত্র পাকিস্তানকে হারানো ছাড়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার ভারতীয়দের আশায় জল ঢেলে দেয়। তবে আটটি ম্যাচে চারটি জিত, চারটি হার অবশ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে খুব একটা বেদনাবিধুর নয়। বিশ্বক্রিকেটে সাম্প্রতিক পারফরমেন্স অনুযায়ী ভারতের অবস্থান ঠিক জায়গাতেই আছে। সাফল্য-ব্যর্থতার মিশ্র মেরুকরণে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি শচীন-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসা। শচীন কেনিয়া ম্যাচ ছাড়া মোটামুটি ব্যর্থই, কিন্তু তার জন্য ভারত মুখ থুবড়ে পড়েনি। সৌরভ, রাহুল, জাদেজারা প্রতিটি ম্যাচে ভারতের ইনিংসকে টেনে নিয়ে গেছেন। গ্রুপ লিগে যে মাত্র পাঁচটি শতরান হয়েছে তার সবকয়টির মালিকই ভারতীয়রা। রাহুল দুটি এবং শচীন, সৌরভ ও জাদেজা একটি করে শতরান করেছেন। টানা ৩৬টি ম্যাচ পর্যন্ত শতরানের একক কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন শুধু ভারতীয়রাই। সামগ্রিক বিচারে ভারতের ব্যাটিং এই আসরে যথেষ্ট উজ্জ্বল। রাহুল হয়েছেন সর্বাধিক রান সংগ্রাহক, দুটি সেঞ্চুরি সহ। এমনকি অলরাউন্ডার হিসাবে রবিন সিং ও সৌরভ গাঙ্গুলীর যথেষ্ট অবদান আছে। আসলে ভারতকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে অন্তঃসারশূন্য অধিনায়কত্ব ও প্রয়োজনীয় সময়ে বোলাররা ছন্দ হারিয়ে ফেলায়। ইংল্যান্ড, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শ্রীনাথ, প্রসাদ, মোহান্তিরা যে বোলিং করেছেন, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি।

অস্ট্রেলিয়া দুবার কাপ জিতে ক্যারিবিয়ানদের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্যতা অর্জন করল। '৭৫, '৭৯-র চ্যাম্পিয়ন এবং '৮৩-র রানার আপ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট এখন মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখার মতো। গ্রুপ লিগ থেকেই ব্রায়ান লারার টিম বিদায় নিয়েছে। কোর্টনি ওয়ালস ও কার্টলি অ্যামব্রোজ অসাধারণ বোলিং করেও ক্যারিবিয়ানদের অনুপ্রাণিত করতে পারেননি। লারা নিজে চূড়ান্ত ব্যর্থ, দলকে 'মোটিভেট' করতে পারেননি কোন সময়েই। ইংল্যান্ডের অবস্থাও তথৈবচ। কালেভদ্রে খেলে দিয়েছেন গ্রেম হিক, গ্রাহাম থর্প ও নাসির হুসেনরা। বোলাররা অবশ্য ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় ব্যাটসম্যানরাই ডুবিয়েছেন ইংল্যান্ডকে। আর সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে শ্রীলঙ্কার ছন্নছাড়া পারফরমেন্স। না ছিল তাঁদের বোলিং পরাক্রম, না ছিল সুপরিচিত ব্যাটিং শৌর্য। এই বিশ্বকাপে তাঁদের কখনোই 'দল' হিসেবে মনে হয়নি। তবে দুই আন্ডারডগ জিম্বাবোয়ে ও নিউজিল্যান্ড কিন্তু নতুন শতকের আগমনী বার্তা নিয়ে উঠে এসেছে। দুটি দলই টিম স্পিরিটের জোরে এতদূর এগিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতকে হারিয়েছে জিম্বাবোয়ে আর নিউজিল্যান্ডের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। একটি ম্যাচ কম খেলেও নিউজিল্যান্ডের জিওফ অ্যালট শেন ওয়ার্নের সঙ্গে যুগ্ম সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর গৌরব অর্জন করেছেন। পাশাপাশি ডিয়ন ন্যাশ, ক্রিস কেয়ার্নস ইংল্যান্ডের আবহাওয়াকে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। ব্যাটিং-এ রজার টুজ 'কিউই' মিডল অর্ডারকে পরম নির্ভরতা দিয়েছেন। সহযোগিতা পেয়েছেন অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিং, ম্যাথু হর্নের কাছ থেকেও। আর জিম্বাবোয়ের অলরাউন্ডার নীল জনসন ব্যাটে-বলে ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছেন। ল্যান্স ক্লুজনারের সঙ্গেই তাঁর নাম উচ্চারিত হবে পরবর্তী চারবছর। নীল জনসন ছাড়াও হিথ স্ট্রিক, হেনরি ওলোঙ্গার সীম-স্যুইং নজর টেনেছে বোদ্ধাদের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁদের অসাধারণ ফিল্ডিং আমাদের বহুকাল মনে থাকবে।

মনে থাকবে স্কটল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নবাগত বাংলাদেশের চমকপ্রদ জয়ের কথাও। অনেকে বলেছেন, পাকিস্তান বাংলাদেশকে ম্যাচটা নাকি ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু এভাবে বলা শুধু অনুচিতই নয়, চূড়ান্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচায়কও। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত মানসিকতা, নিজেদের ছাপিয়ে যাওয়ার অদম্য প্রয়াস এবং সর্বোপরি তাদের দলগত সংহতি সব দলের কাছেই এক অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত রেখেছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার পর এশিয়ার চতুর্থ দেশরূপে ক্রিকেট-বিশ্বে বাংলাদেশের এই 'আবির্ভাব' আমাদের সকলের মনেই প্রভূত গর্ব, আনন্দ ও আশা জুগিয়েছে।

তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন ল্যান্স ক্লুজনার ও মঈন খান। দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের যাবতীয় সাফল্যের প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন এই দুজন। তাঁদের শৌর্য, বীর্য ও মহিমামণ্ডিত ব্যাটিং যেকোন বিশ্বকাপেরই সম্পদ। কালিস আর ক্লুজনারই দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিংকে টেনেছেন, ব্যর্থ হয়েছেন কার্স্টেন, ক্রোনিয়ে, কালিনান। বোলিংয়েও ক্লুজনার ডোনাল্ড, পোলকদের পাশে বেমানান নন, বরঞ্চ কোন কোন ম্যাচে একটু বেশিই উজ্জ্বল। সঙ্গতভাবেই তিনি টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। একেবারে শেষ পর্বে ফর্মে ফিরেছেন সৈয়দ আনোয়ার। প্রাথমিক পর্বে, এমনকি সুপার সিক্সেও মঈন খানই পাক ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড হয়ে বিরাজ করেছেন। ইনজামামও পুরোপুরি সফল নন, রান আউট হয়ে দলকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছেন বহু ম্যাচে। তবে ফর্মে থাকা ইউসুফ ইওহানার হঠাৎ চোট পাওয়া পাক দলের ব্যাটিং ছন্দ ও বুনিয়াদটি নড়বড়ে করে দেয়।

সবশেষে বলতে হয় বিশ্বকাপে বহু আলোচিত 'ডাকওয়ার্থ অ্যান্ড লুইস সিস্টেম'-এর কথা। বৃষ্টি হবে ধরে নিয়ে এই সিস্টেমেই অধিকাংশ ম্যাচের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হবে—এমনই ছিল বিশেষজ্ঞদের অভিমত; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ করতে হয়নি। বৃষ্টির জন্য একমাত্র জিম্বাবোয়ে-নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে, বাদবাকি সব ম্যাচের সরাসরি ফয়সালা হয়েছে। ❑

খাওয়া নিয়ে সংস্কার

অমিতাভ ভট্টাচার্য

গোপালের খাওয়া-দাওয়ার ওপর হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। দু-দুবার ক্লাস এইট-এই থমকে দাঁড়িয়েছিল গোপাল। প্রতিবেশীর পরামর্শে গোপালের মা পরীক্ষার কয়েক মাস আগে থেকেই তার ছেলের পাতে ডিম দেওয়া বন্ধ করলেন। কলা খাওয়ার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হলো। এতসব করেও গোপাল ক্লাস এইট-এর গণ্ডি টপকাতে পেরেছিল কিনা জানা নেই, তবে তার প্রিয় খাদ্য ডিম আর কলার শোক ভুলতে দীর্ঘদিন লেগেছিল গোপালের।

ডিম নিয়ে সংস্কার

খাওয়া নিয়ে সংস্কার ও বিধিনিষেধের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। এই নিষেধের পিছনে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানা কারণও রয়েছে। তবে উদ্দেশ্যহীন নিছক কুসংস্কারই অধিকাংশ সংস্কারের নেপথ্য কারণ। যেমন কোথাও যাওয়ার আগে বা পরীক্ষার সময় ডিম না খাওয়ার ব্যাপারে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ডিম একটি সুষম সহজলভ্য সস্তা পুষ্টিকর খাদ্য। পরীক্ষার আগে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য শরীরে পুষ্টির ঘাটতি পড়ে, চটজলদি একটা পুরো সেদ্ধ ডিম এই ঘাটতির অনেকটাই পুষিয়ে দেয়।

কিভাবে পুষিয়ে দেয় দেখা যাক। একটা ডিমের গড় ওজন ৬০ গ্রাম, যাতে প্রোটিন ও ফ্যাট থাকে ৬ গ্রাম করে। এছাড়া ক্যালসিয়াম ৩০ মিলিগ্রাম, লোহা ১.৫ মিলিগ্রাম, অন্যান্য খনিজ পদার্থ ৮ গ্রাম, শক্তি পাওয়া যায় ৭০ ক্যালরি। ডিমের প্রোটিন উচ্চ খাদ্যমূল্যযুক্ত ও সহজপাচ্য। দেহগঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ৮টি অ্যামাইনো অ্যাসিডই ডিমে থাকে। ডিমের সাদা অংশে থাকে ১১ ভাগ প্রোটিন আর কুসুমে ১৫ ভাগ। ইউরিক অ্যাসিড ও কোলেস্টেরল থাকে সুষম পরিমাণে। ডিমে ভিটামিন 'সি' বাদে অন্যান্য সব ভিটামিনই থাকে, বিশেষ করে ভিটামিন 'এ'। কাজেই ডিম অবশ্যই একটি সুপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য।

তবে ডিম সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কতগুলো ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন ডিম খেলে নাকি বাত হয়, প্রেসার বাড়ে এবং অ্যালার্জি হয়। এ-ধারণাগুলো ঠিক নয়। বাত হলে বা প্রেসার বাড়লে ডাক্তারবাবুরা সঙ্গত কারণেই অতিরিক্ত ডিম খেতে বারণ করেন, কারণ রক্তের ইউরিক অ্যাসিড বা কোলেস্টেরলের পরিমাণ যাতে আর না বাড়ে। তাই ডিম খেলেই এসব হবে তার কোন মানে নেই। ঠিক তেমনি অ্যালার্জি হতে পারে নানা কারণে, নানারকম খাবার থেকেই। ডিম তার মধ্যে একটি। যদি অ্যালার্জি টেস্ট করে কারো অ্যালার্জির অন্যতম কারণ দেখা যায় ডিম, সেক্ষেত্রে ডিম খাওয়া বন্ধ করতে হবে, অন্যথায় নয়।

কাঁচা ডিম বেশি পুষ্টিকর—এ-ধারণাটিও ভুল। বরং কাঁচা ডিমে প্রোটিন পরিপাকে বাধাদানকারী ট্রিপসিন ইনহিবিটর ও অ্যাভিডিন নামক দুটি রাসায়নিক পদার্থ থাকার জন্য বদহজম হতে পারে। এছাড়া সালমোনেলা জাতীয় পেটখারাপের জীবাণু থাকতে পারে। মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিলে এসব ক্ষতিকর পদার্থগুলো মরে যায়।

ডিম হাঁসের খাবেন না মুরগির? প্রচলিত ধারণা হলো যে, মুরগির ডিম বেশি পুষ্টিকর। কাজেই মুরগির ডিম খাওয়াই ভাল। অথচ সুসিদ্ধ অবস্থায় দুধরনের ডিমের পুষ্টিমূল্যই প্রায় সমান। বরং হাঁসের ডিম সাইজে বড় হওয়ায় পুষ্টি পাওয়া যায় বেশি।

অনেকেই পোলট্রির ডিম খান না দেহের পক্ষে ক্ষতিকর ভেবে। দেশী ডিমই তাঁদের পছন্দ। কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটা একেবারেই উলটো। পোলট্রিতে হাঁস-মুরগির বিজ্ঞানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণ হয় বলে এদের ডিমের পুষ্টিমূল্য অনেক বেশি দামেও কম। এদের কুসুমের রঙ ফ্যাকাশে, কারণ পোলট্রির হাঁস-মুরগিকে সরাসরি ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো হয়। অপরপক্ষে দেশী হাঁস-মুরগিরা যেসব শস্যদানা ও শাকসবজি খুঁটে খায়, তা থেকে তারা ভিটামিন 'এ'-র প্রাক্ অবস্থা ক্যারোটিন পায়—যার রঙ টকটকে লালাভ হলুদ। এই ক্যারোটিন লিভারে গিয়ে ভিটামিন 'এ'-তে পরিণত হয়। কিন্তু পোলট্রির ডিমে সরাসরি ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। কাজেই দেশী নয়, পোলট্রির ডিমই বেশি পুষ্টিকর।

মাছ নিয়ে সংস্কার

ডিমের পর আসি মাছ নিয়ে নানা সংস্কারে। মাগুরমাছের মাথা খেলে নাকি বউ মরে! সেজন্য পুরুষেরা মাথা বাদ দিয়ে মাগুরমাছের গোটাটা খাবে, আর ঐ ছোট্ট মাথাটা এঁটোকাঁটার সঙ্গে খাবে বাড়ির মেয়েরা! অথচ ইলিশ, রুই বা কাতলা—যাদের মাথা বেশ বড় হয় তাদের বেলায় এসব বিধিনিষেধ নেই। বলা বাহুল্য, এই পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের স্থান একসময় কোথায় ছিল, এই প্রচলিত কুসংস্কারই তার প্রমাণ। ছেলেদের ল্যাটামাছ খেতে নেই—এধরনের আরো একটি কুসংস্কার একসময় প্রচলিত ছিল।

বিজয়া দশমী থেকে সরস্বতীপুজো পর্যন্ত ইলিশ মাছ খাওয়া ঠিক নয়—এই প্রচলিত বিধিনিষেধের পিছনে কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে। আসলে এসময়টা ইলিশমাছের প্রজননকাল। এসময় বাংলার নদনদীর মিষ্টি জলে এরা ডিম

পাড়ে। এসময় এদের ধরে খেলে প্রজনন ব্যাহত হবে, ইলিশমাছের সংখ্যাও ভীষণভাবে কমে যাবে। পুঁটিমাছের মাথা অনেকসময় চিবিয়ে খেতে নিষেধ করা হয়, কারণ বঁড়শি দিয়ে পুঁটিমাছ ধরা হয়। অনেক সময় বঁড়শি ছোট মাছের মাথায় গেঁথে থাকে, খেতে গিয়ে বিপত্তি হতে পারে।

ফল নিয়ে সংস্কার

ফলের মধ্যে কলা নিয়ে বিধিনিষেধ সবথেকে বেশি। জোড়া কলা খেলে নাকি মেয়েদের যমজ সন্তান হয়! বলা বাহুল্য, কলার সঙ্গে গর্ভধারণের কোন সম্পর্ক নেই। আর জোড়া কলার মধ্যে এমন কোন পদার্থ নেই যা যমজ সন্তান সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যাত্রার আগে কলা খেলে নাকি যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটে!

অনেকের ধারণা, কলা খেলে ঠাণ্ডা লাগে, কলা নাকি শ্লেষ্মাবর্ধক। বলাবাহুল্য, এধারণাটিও ভুল। কোন খাদ্যবস্তু ঠাণ্ডা অবস্থায় খেলে তা থেকে ঠাণ্ডা লাগতেই পারে। সেজন্য ঐ খাদ্যবস্তুটি দায়ী নয়, দায়ী তার অত্যধিক কম তাপমাত্রা। শুধু কলা কেন, ভাত, ডাল, জল, দুধ-সহ যেকোন জিনিসই যদি ফ্রিজ থেকে বের করে তক্ষুণি খাওয়া যায়, তবে তো হঠাৎ করে তাপমাত্রার পরিবর্তনে ঠাণ্ডা লাগতেই পারে। কিন্তু ঠাণ্ডায় রাখা নেই এমন কলা খেলে ঠাণ্ডা লাগবে কেন? ৬ মাসের শিশু থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যেকেউ কলা খেতে পারে। কারণ, কলা একটি সহজপাচ্য, সস্তা অথচ খুব পুষ্টিকর ফল। সব কলার পুষ্টিমূল্যই প্রায় সমান। ১০০ গ্রাম কলা থেকে শক্তি মেলে ১৫৩ ক্যালরি। কলায় কার্বোহাইড্রেট থাকে শতকরা ৩৫ ভাগ, খনিজ লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম ১৭ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৩৬ মিলিগ্রাম ও লোহা আধ মিলিগ্রাম। এছাড়া ম্যাগনেসিয়াম, কপার, আয়োডিন, ভিটামিন 'এ', 'সি' ও 'বি' গ্রুপের সব ভিটামিনই কলায় থাকে। এছাড়া দেহের পক্ষে খুবই উপকারী পেকটিন ও ফাইভ. এইচ. টি নামে দুটি রাসায়নিক পদার্থ কলায় থাকে।

দই নিয়ে সংস্কার

দইয়ের বিরুদ্ধেও কলার মতো একই অভিযোগ যে, দই খেলে ঠাণ্ডা লাগে, গলা ধরে যায়। ফ্রিজের ঠাণ্ডা দই খেলে এ-বিপত্তি হতেই পারে। স্বাভাবিক তাপমাত্রার দই থেকে কখনো ঠাণ্ডা লাগে না, গলাও ভাঙে না। দুধ থেকে দই হয় 'সাজা' দিয়ে। অর্থাৎ আগের দিনের 'অম্ল দই' দুধে দিয়ে রেখে দিলে সেই দুধ ধীরে ধীরে দইয়ে পরিণত হয়। এই 'সাজা' বা অম্ল দইয়ের ল্যাকটোব্যাসিলাস জীবাণু দুধের চিনি বা ল্যাকটোজকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এর ফলেই দুধ জমে দই হয়। টক দইয়ের উপকারিতার শেষ নেই। যেমন—(১) কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে, (২) অন্ত্রনালীতে ক্ষতিকর জীবাণু বৃদ্ধি বন্ধ করে, (৩) খাদ্যের পচন রোধ করে, (৪) মাছ-মাংসের জটিল প্রোটিন ভেঙে তাকে হজমে সাহায্য করে, (৫) অন্ত্রনালীতে ভিটামিন 'বি-কমপ্লেক্স' তৈরি করে, (৬) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, (৭) শিশুদের মস্তিষ্ক ও হাড়ের গঠনে সাহায্য করে, (৮) কিডনির গণ্ডগোল, রক্তাল্পতা, পেটের অসুখ, এমনকি ক্যান্সার প্রতিরোধে দইয়ের নানা ভূমিকা আছে। তবে দইয়ের এসব গুণ কিন্তু বাজারের লাল দইয়ে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে একমাত্র বাড়িতে পাতা টক দইয়ে।

বিষম খাওয়া নিয়ে সংস্কার

বিষম খাওয়া নিয়ে সংস্কার হলো, কোন প্রিয়জন খাওয়ার সময় 'নাম' করলে নাকি বিষম লাগে! ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে উলটো। অর্থাৎ খেতে খেতে প্রিয়জনের কথা মনে করে কিংবা অন্য কোন কারণে অন্যমনস্ক হলে তবেই আমরা বিষম খাই। কিভাবে বিষম খাই দেখা যাক। আমরা যে-খাদ্য খাই তা মুখ থেকে ফ্যারিংস হয়ে ইসোফেগাস বা খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে। ফ্যারিংসের শেষে এই খাদ্যনালীর ঠিক সামনেই থাকে ল্যারিংস বা শ্বাসতন্ত্রের প্রবেশদ্বার। ল্যারিংসের ওপর থাকে একটি ঢাকনা, যার নাম 'এপিগ্লটিস'। খাদ্য এই অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময় এই ঢাকনাটি বন্ধ হয়ে যায়, ফলে খাদ্য শ্বাসনালীতে না ঢুকে সহজেই খাদ্যনালীতে নেমে যেতে পারে। অন্যমনস্ক থাকলে, খাওয়ার সময় কথা বলতে গেলে বা দ্রুত খেতে গেলে ঠিক সময়ে এই এপিগ্লটিস বন্ধ হয় না, ফলে খাদ্য ল্যারিংসে ঢোকার চেষ্টা করে। তখন জোর করে কেশে উঠে আমরা চেষ্টা করি খাদ্যকে ল্যারিংস থেকে বের করে দেওয়ার। এই ব্যাপারটাকেই বলে 'বিষম খাওয়া'। এর সঙ্গে 'আমার কথা কেউ ভাবছে বলেই এমনটি হলো'—এমন মনে করার কোন যুক্তি নেই।

অন্যান্য সংস্কার

সরস্বতীপুজোর আগে কুল খেতে নেই, ছোটবেলায় এমনটা সবাই শুনে থাকে। আসলে পুজোর আগে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে কুল পুষ্ট হয় না, এতে নানা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকে, ফলে গলায় প্রদাহ হতে পারে। সম্ভবত এজন্যই এই সঙ্গত নিষেধ।

শোভনতা, শালীনতা এবং স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য কিছু বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে। সেগুলির অধিকাংশই অবশ্য নারীদের নিয়ে। যেমন খোলা চুলে গ্রাস তুলে খায় যে-নারী সে অলক্ষ্মী, 'আধ-খাওয়াতে ছাড়লে পিঁড়ি/অনেকদূরে শ্বশুরবাড়ি', পা ছড়িয়ে খেতে বসলে স্বামী পাগল হয়ে যায়, অন্ধকারে খেলে রাক্ষসী হয়, ভাত খেতে বসে থালার ওপর বাটি তুলে খেলে মেয়েদের সতীন হয়। এই বিধিনিষেধগুলো কেবলমাত্র নারীদের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য কে জানে! প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল যেকোন মানুষের ক্ষেত্রেই। গ্রহণ নিয়ে যেসব বিধিনিষেধ চালু আছে, সেগুলি অবৈজ্ঞানিক। গ্রহণের সময়, আগে বা পরে সব খাবারই খাওয়া যেতে পারে, কোনটাই দূষিত হয় না। তবে মাঘ মাসে মুলো এবং চৈত্র

মাসে শিম খেতে যে নিষেধ করা হয় তার কারণ এসময় এরা খাওয়ার প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ে, শক্ত ছিবড়ে হয়ে যায়, পুষ্টিমূল্যও কমে যায়। বেগুনকে বে-গুণ অর্থাৎ গুণহীন বলা হয়। এটা ঠিক নয়। বেগুন যথেষ্ট পুষ্টিকর সবজি। এতে শতকরা ১.৪ গ্রাম প্রোটিন, ১৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৯ মিলিগ্রাম আয়রন ও নানা ধরনের ভিটামিন থাকে।

চিনি খেলে কৃমি হয়—এটাও একটা কথার কথা। আসলে চিনি একটা কৃত্রিম কার্বোহাইড্রেট, যা অতিরিক্ত খেলে শরীরের নানা ক্ষতি করে! সেজন্যই এই নিষেধাজ্ঞা। কৃমি হলো একধরনের পরজীবী প্রাণী, যা খাদ্য বা জল-বাহিত হয়ে কিংবা পায়ের পাতা ফুটো করে শরীরে ঢোকে। চিনি বেশি বা কম খাওয়ার সঙ্গে কৃমি সংক্রমণের কোন সম্পর্ক নেই।[1]

অনেক মায়ের সংস্কার আছে—পেট খারাপে শিশুকে স্তন্যপান বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অথচ এসময় সেটিই শিশুর অন্যতম পথ্য, কৌটোর দুধ নয়—একথা জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

পঞ্জিকায় নিষিদ্ধ ভক্ষণ

খাদ্য নিয়ে বিভিন্ন কুসংস্কার প্রচলনে পঞ্জিকার বিশেষ ভূমিকা আছে। একটি পঞ্জিকা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে অর্থহানি, দ্বিতীয়াতে বৃহতী ভক্ষণে হরিস্মরণের অযোগ্য, তৃতীয়াতে পটল ভক্ষণে শত্রুবৃদ্ধি, চতুর্থীতে মূলা ভক্ষণে ধনহানি, পঞ্চমীতে বিল্ব ভক্ষণে কলঙ্ক, ষষ্ঠীতে নিম্ব ভক্ষণে পক্ষিযোনি প্রাপ্তি, সপ্তমীতে তাল ভক্ষণে শরীর বিনাশ, অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে মূর্খতা প্রাপ্তি, নবমীতে অলাবু গোমাংস-তুল্য, দশমীতে কলম্বী ভক্ষণে গোবধতুল্য পাপ, একাদশীতে শিম ভক্ষণে পাপ, দ্বাদশীতে পুঁই ভক্ষণে ব্রহ্মহত্যা সদৃশ পাপ, ত্রয়োদশীতে বার্তাকু ভক্ষণে পুত্রহানি, চতুর্দশীতে মাষকলাই ভক্ষণে চিররোগ, পূর্ণিমা অমাবস্যায় মাংস ভক্ষণে মহাপাপ।"

বলা বাহুল্য, সময়ের কষ্টিপাথরে এবং বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করলে বোঝা যায়, খাওয়া নিয়ে এসব বিধি-নিষেধের অনেকগুলোই আজ কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। ❑

যেসব বই বা পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

খাবার নিয়ে আবার—অরূপরতন ভট্টাচার্য
কী খাব না খাব—অরূপরতন ভট্টাচার্য
সুস্থ থাকুন—পল্লব বসু মল্লিক
খাদ্য ও পথ্য—সমর রায়চৌধুরী
খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু—সুধাংশু পাত্র
Principles of Preventive Social Medicine—Park & Park
ICMR Report, 1996.

১ তবে এটি thread worm-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শিশুদের ক্ষেত্রে চিনি খাওয়ার সঙ্গে কৃমির একটি সম্পর্ক থাকে, এরূপ বলা হয়।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

> শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

'A Text Book of Homoeopathic Materia Medica Elaborated with Illustrations' গ্রন্থের লেখক, পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে দশ বছর অধ্যাপনা এবং ত্রিশ বছর চিকিৎসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা জানাতে ধারাবাহিক লিখছেন। তাঁর ধারণা, এতে সাধারণ অসুস্থতা ও অসুখ-বিসুখ এড়ানো সম্ভব হবে এবং ফলত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

❑ স্নানের আগে নাভির নিচে বাঁহাত রেখে তিন-চার মিনিট নাভিতে জল ঢালতে হবে। যখন পেট বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন মাথা নিচু করে মাথাতে জল ঢালতে হবে। মাথা ভালভাবে ধুয়ে নেওয়ার পর গায়ে জল ঢালতে হবে। এই প্রক্রিয়াতে স্নান করলে দেহ-মন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠবে। এই পদ্ধতি হজমশক্তি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে বলে আমাদের অভিজ্ঞতা। যারা পুকুর অথবা নদীতে স্নান করেন তাঁরাও জলে নেমে ঐভাবে স্নান করবেন।

❑ স্নানের জল উত্তপ্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গরম জলে স্নান শীতকালে আরামদায়ক হলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে তা হিতকর নয়। গরম জলে স্নান করলে শরীরের সহনশীলতা, প্রতিরোধ-ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাবে। তখন কিছু কিছু রোগপ্রবণতা সহজেই দেহকে আক্রমণ করে। যেমন বাতবেদনা, হাঁচি, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, গলার গ্ল্যান্ড-স্ফীতি, টনসিল বৃদ্ধি, আলজিহ্বা বৃদ্ধি, স্বরভঙ্গ, জ্বর, বায়ু, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি।

❑ শীতকালে যাঁরা সামান্য কারণে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হন অথবা ঠাণ্ডা জলে স্নান যাঁরা সহ্য করতে পারেন না তাঁদের জন্য একটি সহজ উপায় হচ্ছে—তেল মাখার পর নাভিতে বেশি করে ঠাণ্ডা জল ঢালা। তারপর মাথাতে জল ঢেলে গামছা বা তোয়ালে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে নিংড়ে জল ফেলে দিয়ে শুকনো শুকনো করে ঘষে গা মুছে নেওয়া।

❑ স্নানের পর যদি দেহে শুচি-স্নিগ্ধ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভাব না আসে তাহলে স্নানের সার্থকতা থাকে না।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি উন্নয়ন প্রকল্প

জলধিকুমার সরকার

গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য—ডাঃ পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : শক্তি ভট্টাচার্য, টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ৪৬বি অরবিন্দ সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৫। পৃষ্ঠা : ৭০+১০। মূল্য : ৪০ টাকা।

গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে তাদের কাজ আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে, যাতে দুরপল্লীর দরিদ্রশ্রেণী উপকৃত হয়—সেই উদ্দেশ্যেই **'গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য'** বইটি লেখা। নানা কারণে গ্রামে ডাক্তারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। সেজন্য ডাক্তারের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রামের মানুষদের যতটা সম্ভব চিকিৎসা করতে পারে, সেটিই বইয়ের উদ্দেশ্য। লেখক বিহার ও উড়িষ্যার গ্রামে দেড় দশকের অধিককাল কাজ করে জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তিনি খুব হতাশ। বর্তমানে স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করে তাদের সীমিত শিক্ষার ভিত্তিতে। তাদের চিকিৎসার অধিকারও সীমিত। তাদের অপেক্ষা করতে হয় চিকিৎসকের নির্দেশের অপেক্ষায়। হাতের কাছে ডাক্তার না পাওয়ায় গ্রামবাসীদের চূড়ান্ত ভোগান্তি হয়। এই অবস্থায়, লেখক ডাঃ চট্টোপাধ্যায় চান, স্বাস্থ্যকর্মীরাও চিকিৎসার ভার খানিকটা নিক। বইয়ের ভূমিকা থেকে মনে হয়, এবিষয়ে চীনদেশের 'বেয়ারফুট' ডাক্তাররা যা করে, এখানে সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে লেখক মনে করেন।

উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। আমি চীনদেশের 'বেয়ারফুট' ডাক্তারদের সম্বন্ধে বিশেষ জানি না। তবে মনে হয়, তাদের ডিগ্রী না থাকলেও বেশ খানিকটা ডাক্তারি শিখিয়ে তাদের গ্রামে পাঠানো হয়। এদেশে, লেখক যেমন বলেছেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী। এদের কারো ডাক্তারি জ্ঞান নেই, এমনকি শরীরের অভ্যন্তরের অবস্থা জানার জন্য 'অ্যানাটমি' (শারীরস্থান) ও 'ফিজিওলজি' (শারীরবৃত্ত) তারা ঠিকমত জানে না। লেখক যদিও প্রতি পরিচ্ছেদে রোগ বিষয়ে কিছু কিছু বুঝিয়েছেন, কিন্তু তা চিকিৎসা করার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাথমিক ডাক্তারি শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারেও লেখক কিছু বলেননি। এই অবস্থায় তাদের হাতে চিকিৎসার ভার ছেড়ে দিলে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"যদি ছিল রোগী বসে, বদ্যিতে শোওয়ালে এসে" হয়ে দাঁড়াবে। ডাক্তারি জ্ঞান না থাকলে এই বইয়ের নির্দেশ পালন করা যে কঠিন, তা দেখাবার জন্য কয়েকটি অংশ তুলে ধরছি—

পৃঃ ৮—"সংক্রমণের উৎস আপনাকে খুঁজতে হবে, আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"—ডাক্তারি না পড়ে এ কি সম্ভব?

পৃঃ ২০—"ওষুধটি কিভাবে দেওয়া হবে, ট্যাবলেট হিসাবে, না অন্তঃপেশী ইঞ্জেকশন হিসাবে তা আপনাকে (অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর্মীকে) ঠিক করতে হবে।" "সঠিক মাত্রায় ওষুধ দেবেন।" "মূল্যবান ঔষধ অপচয় না করে সঠিক ব্যাধিতে ব্যবহার করবেন।" "যে-ব্যাধি দুরারোগ্য কিংবা যে-ব্যাধিতে কোন ওষুধ নেই, সেখানে অযথা অন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করবেন না।"—এই উপদেশগুলি একজন সদ্য পাস করা ডাক্তারের (যিনি গ্রামে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছেন) পক্ষে প্রযোজ্য। 'ফার্মাকলজি' (ঔষধসংক্রান্ত বিজ্ঞান) এবং 'মেডিসিন' (চিকিৎসাশাস্ত্র) না পড়া স্বাস্থ্যকর্মীরা এগুলির সঠিক প্রয়োগ করতে পারবে না।

পৃঃ ৫৪—'অস্থানিক গর্ভসঞ্চার' ('এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি'), 'গর্ভফুলের অগ্রে অবস্থান' ('প্লাসেন্টা প্রিভিয়া')—এসব কথাগুলি বুঝতে হলে স্ত্রীরোগবিদ্যা ('অবস্ট্রেটট্রিক্স' ও 'গাইনিকলজি') আগে পড়া দরকার।

এমন আরো অনেক আছে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের শেখার জন্য অনেক মূল্যবান কথা আছে এই বইয়ে—রোগীর ইতিহাস নথিবদ্ধ করা, রক্তচাপ নির্ধারণ, শিশুকে পরীক্ষাকরণ, রোগনির্ণয়ে তথ্যতালিকা, শিশুকে টিকা দেওয়ার নির্ঘণ্ট, সুষম খাদ্য ইত্যাদি। সেজন্য বইটি স্বাস্থ্যকর্মীদের পক্ষে খুবই উপযোগী। তাছাড়া সদ্য পাশ করা যেসব ডাক্তার গ্রামে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছেন—তাঁদের কাছেও বইটি অনেক কাজ দেবে।

বইটি স্বাস্থ্যকর্মীদের পক্ষে খুব উপকারী হবে যদি গ্রামে যাওয়ার আগে তাদের কিছুকাল ডাক্তারি শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তা না হলে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ডাক্তারের ওপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে চিকিৎসার দায়িত্ব যতটা কম দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। বইয়ে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাহায্য নিতে বলা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি হলো চূড়ান্ত অবস্থায়। আমি সাধারণভাবে, ডাক্তারি না শিখে ডাক্তারি করার কথা বলছি; তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবেই। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীমা দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে তিনবার (১৯১২, ১৯১৪ ও ১৯১৬) এসে মঠের লেগেট হাউস-এ বাস করেছিলেন। ভবনটি ক্রমশ জরাজীর্ণ হওয়ায় আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হয়। গত ১৫ এপ্রিল '৯৯ বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিতে মেরামতি ও পুনরুদ্ধারের পর লেগেট হাউস-এর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ।

বহু প্রত্যাশা ও অর্থব্যয়ের পর অবশেষে স্বামীজীর সমগ্র পৈতৃক বসতবাটী গত ২৭ মে '৯৯ বেলুড় মঠের অধীনে আসে। এই উপলক্ষ্যে গত ২৮ মে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দুই সহকারী সচিব স্বামী সুহিতানন্দ, স্বামী শ্রীকরানন্দ সহ বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিতে ও সমস্বরে বেদপাঠের মধ্য দিয়ে স্বামীজীর জন্মস্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। তারপর সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁদের শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

স্বামীজীর মূর্তি-স্থাপন

পাটনা আশ্রম (বিহার) স্থানীয় নাগরিক কমিটির সহযোগিতায় ১৪½ ফুট উচ্চ স্বামীজীর একটি ব্রোঞ্জমূর্তি পাটনা শহরে স্থাপন করে। গত ২৩ মে '৯৯ মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় বহু সাধু ও ভক্ত ছাড়াও বিহারের কার্যকরী রাজ্যপাল বিচারপতি বি. এম. লাল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ীদেবী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব, পৌর উন্নয়নমন্ত্রী নারায়ণ যাদব ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সভায় এবং আশ্রম পরিচালিত দুদিনের যুবসম্মেলনে ভাষণদান করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

হায়দ্রাবাদ মঠ (অন্ধ্রপ্রদেশ) গত ২৩ জুন '৯৯ প্রায় একমাস-ব্যাপী ৮ থেকে ১৫ বছর বয়সের কিশোরদের একটি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে। যোগাসন, ধ্যান, ভজন, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি ছিল শিবিরের বিভিন্ন অঙ্গ। প্রায় পাঁচশ-র অধিক কিশোর শিবিরে যোগদান করেছিল।

গদাধর শিশু-উদ্যান উদ্বোধন

কামারপুকুর মঠে (জেলা—হুগলী) গত ২১ মে '৯৯ 'গদাধর শিশু-উদ্যান' নামে শিশুদের জন্য একটি পার্ক উদ্বোধন করা হয়।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৯৮-৯৯ সালের রাজ্যভিত্তিক জাতীয় মেধা পরীক্ষায় বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (ত্রিপুরা) ছাত্ররা ১ম, ২য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

চক্ষু চিকিৎসা-শিবির

মায়াবতী আশ্রম (জেলা—চম্পাবৎ, উঃ প্রঃ) গত ৩০ এপ্রিল থেকে ৮ মে '৯৯ পর্যন্ত একটি চক্ষু চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৩১ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

ত্রাণ

উত্তরপ্রদেশ ভূমিকম্প-ত্রাণ

বেলুড় মঠ রুদ্রপ্রয়াগ শিবিরের মাধ্যমে রুদ্রপ্রয়াগ ও চামেলি জেলার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য আরো ১,০১০ কিলোগ্রাম চাল, ৯৯০ কিলোগ্রাম ময়দা, ১৮৩টি মোমবাতি, ২৫০টি ত্রিপল ও ২৩৫টি কম্বল বিতরণ করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী ব্যোমরূপানন্দ (সদাশিব মহারাজ) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৯ মে '৯৯ সন্ধ্যা ৭.২০ মিনিটে নাগপুর মঠে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি গত ৯ বছর ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি নাগপুর মঠে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত 'জীবনবিকাশ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। তিনি ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নাগপুর কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। তারপর শারীরিক বিভিন্ন কারণে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা আসতেন সদানন্দময় ও সহজ-সরল মানুষটিকে শ্রদ্ধা না করে, ভাল না বেসে কেউ থাকতে পারতেন না।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ উৎসব : গত ১৭ জুন '৯৯ সারাদিনব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের ৯০তম শুভ পদার্পণ-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কালীকীর্তন, তরজা গান, রামায়ণ গান, সরোদ-বাদন, যাত্রানুষ্ঠান ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় 'সারদানন্দ হল'-এ আয়োজিত সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ এবং সভাপতিত্ব করেন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ। সভায় স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ১০.৩০ মিনিটে আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি কর্তৃক কালীকীর্তন পরিবেশিত হয় এবং দুপুরে মন্মথনাথ ঘোষ ও স্বপন সরকার তরজা গান পরিবেশন করেন। বিকালে রামায়ণ গান পরিবেশন করেন সুবলচন্দ্র দাস এবং শিবপুর রামকৃষ্ণ মন্দির কর্তৃক 'মহাত্মা তুলসীদাস' যাত্রাপালা অভিনীত হয়। সন্ধ্যায় সরোদ-বাদন পরিবেশন করেন অতনু রক্ষিত। ভোর ৪.৩০ থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সারাদিন ধরে হাজার হাজার ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। আগত প্রায় ১০,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে ঐদিন মোট ৮খানি নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে 'উদ্বোধন : শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন'টির কথা দূরদর্শন এবং ইংরেজী ও বাঙলা দৈনিকগুলিতে প্রচারিত হয়। প্রসঙ্গত, গত ১০০ বছরে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় ২৫,০০০ রচনার মধ্য থেকে তিনটি পর্বে মোট ১৬৭টি রচনা নির্বাচন করে ৯২৮ পৃষ্ঠার (১৬ পৃষ্ঠা আলোকচিত্র সহ) এই গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৩ ও ১৪ মার্চ '৯৯ বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন বিকালে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন ভোলানাথ ব্যানার্জী ও সম্প্রদায় এবং সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণা ও প্রতিমা রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় দিন সকালে বিশেষ পূজা করেন স্বামী একান্তানন্দ। দুপুরে প্রায় ১৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম-এর সম্পাদক স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ, সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত ও অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র কমিটি (জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৪ মার্চ '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে জনৈক ভক্তের গৃহে। প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা. হোম, ভক্তিগীতি এবং 'গীতা', 'চণ্ডী', ও 'কথামৃত' পাঠ ছিল উৎসবের অনুষ্ঠিত বিষয়। এদিন দুপুরে প্রায় ২৫০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

জাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—কটক, উড়িষ্যা) গত ২০ ও ২১ মার্চ '৯৯ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে জাজপুর টাউন হল-এ দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দুদিনেই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং সভাপতিত্ব করেন পাঠচক্রের সভাপতি জগবন্ধু নায়েক। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে পাঠচক্রের সম্পাদক শরচ্চন্দ্র জেনা ও প্রতাপচন্দ্র মোহান্তি। প্রথম দিন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে স্থানীয় সরস্বতী শিশুমন্দিরের ছাত্রীরা এবং দ্বিতীয় দিন করেন স্থানীয় সঙ্গীতশিল্পী তপনকুমার সাহু। সভাশেষে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। স্থানীয় ভক্ত ভিন্ন ভুবনেশ্বর থেকেও বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২১ মার্চ '৯৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন স্বামী বিশ্বানন্দ। দুপুরে প্রায় ৪০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শচীকান্ত বেরা, কৃষ্ণকান্ত বেশকারী ও স্থানীয় সারদা সঙ্ঘের সদস্যাবৃন্দ। বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ, স্বামী অকল্মষানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দ। এই উপলক্ষ্যে সেবাশ্রমের একটি সাধু-নিবাসের উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১৪ মার্চ সেবাশ্রম পরিচালিত একটি চক্ষু চিকিৎসা-শিবিরে বিনামূল্যে ৩০০ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ৭০ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

বেহালা শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (কলকাতা-৭০০০৬০) গত ২১-২৪ মার্চ '৯৯ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উৎযাপন করে। উৎসবের প্রথম দিন সকালে বিশেষ পূজা ও সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী দুর্গেশ্বরানন্দ ও ডঃ তাপস বসু এবং সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুধীরকুমার চক্রবর্তী। সভার শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত এবং সমাপ্তিতে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে রমা চক্রবর্তী ও সুসীমা মজুমদার। উৎসবের অন্যান্যদিন অনুষ্ঠিত হয় পূজা, পাঠ ও নামসঙ্কীর্তনাদি।

অরবিন্দ পল্লীবাসিগণের (দুর্গাপুর, জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ২৬ মার্চ '৯৯ বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। বিকেলে 'যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থ থেকে পাঠ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ।

নামখানা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘে (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮ মার্চ '৯৯ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৪৭৫ জন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে 'বর্তমান সমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী হিতকামানন্দ ও প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিনিধিকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর একটি করে ফটো এবং ভগিনী নিবেদিতা পুস্তিকা দেওয়া হয়। সম্মেলনের শেষে জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী হিতকামানন্দ ও প্রণবেশ চক্রবর্তী এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল।

সোনারপুর শ্রীরামকৃষ্ণপল্লী আবাসিক সম্মিলনী ও প্রাক্তন ছাত্র সঙ্ঘের (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বার্ষিক উৎসব আয়োজিত হয়। প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। ভক্তিগীতি নিবেদন করেন দীপালি সেনগুপ্ত। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দ এবং 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গাঁতী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (ক্যানিং, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ২৮ মার্চ '৯৯

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বেদ, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভজন, প্রভাতফেরি, কীর্তন, বাউলগান ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। উৎসবে প্রায় ২০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮ ও ২৯ মার্চ '৯৯ সমিতির প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন ও স্বামীজীর জন্মোৎসবের আয়োজন করে। রামকৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্তন ও বৈদিক স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে এবং স্বামী অমেয়ানন্দ, স্বামী বিশ্বানাথানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও বহু ভক্তের উপস্থিতিতে সমিতির নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ এবং ভাষণ দান করেন স্বামী শিবময়ানন্দ, মণ্টু দত্ত, অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। পরদিন স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সকালে একটি যুবসম্মেলন ও বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ১০০ যুবপ্রতিনিধি-সহ বহু শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বামী অচ্যুতানন্দের সভাপতিত্বে স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী অনঘানন্দ, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, সুশান্ত ব্যানার্জী, স্বপন পান প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা সমাপ্ত হয়।

চন্দ্রকোণা রোড-বাসীর (জেলা—মেদিনীপুর) উদ্যোগে গত ২৯ মার্চ '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'বেদ', 'গীতা', 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, ভক্তিগীতি, জপ-ধ্যান এবং আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিভিন্ন অঙ্গ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ, মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদাত্মানন্দ, স্বামী আত্মপ্রভানন্দ ও স্বামী অমৃতলোকানন্দ।

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৭০০০০৬) গত ২৯-৩১ মার্চ '৯৯ তিনদিন ধরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য আলোচনার আয়োজন করে। প্রথম দিন 'অবতারবরিষ্ঠায়' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অরিন্দম আচার্য। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নির্মাল্য বসু। দ্বিতীয় দিনের সভায় 'শাশ্বত জননী' বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য এবং সভানেতৃত্ব করেন প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সবনা ঘোষচৌধুরী। তৃতীয় দিন নির্মাল্য বসুর সভাপতিত্বে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতাঠাকুরানীর নরেন' বিষয়ে আলোচনা করেন হর্ষ দত্ত এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন মলয়কুমার সাহা।

চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ (কলকাতা-৭০০০২৭) গত ২-৪ এপ্রিল '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, 'চণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি, পদাবলী কীর্তন ও ধর্মসভা ছিল তিনদিনের উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠের (গদাধর আশ্রম) অধ্যক্ষ স্বামী ঋদ্ধানন্দ, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, স্বামী ধ্রুবরূপানন্দ, স্বামী সন্দর্শনানন্দ ও দীপ্তিকুমার শীল।

সীতারামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (জেলা—বর্ধমান) গত ৩ ও ৪ এপ্রিল '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রথম দিন গীতিনাট্য, ভক্তিগীতি এবং দ্বিতীয় দিন প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জামতাড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী গিরিশানন্দ ও তারাপদ চৌধুরী।

ভাঙ্গামোড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৩-৫ এপ্রিল '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালন করে। উৎসবের প্রথম ও শেষ দিন যথাক্রমে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও রামায়ণগান অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠিত বিষয় ছিল মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, 'চণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা। সকালের ধর্মসভায় 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্য' এবং 'রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের কর্তব্য' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী কৌশিকানন্দ ও অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বেদান্তানন্দ। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বামী সত্যবোধানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন ডাঃ ধীমান গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ বিশ্বনাথ দাস প্রমুখ। সভার প্রারম্ভে স্বাগত-ভাষণ এবং সভাশেষে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সেবাশ্রমের সম্পাদক অমিয়কুমার অধিকারী ও সেবাশ্রমের সভাপতি অরবিন্দ কুণ্ডু।

উত্তর কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের উদ্যোগে গত ৪ এপ্রিল '৯৯ **পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ** সেবাশ্রমে **(কলকাতা-৭০০০৪৭)** সারাদিনব্যাপী একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে নবীন প্রজন্মের অনীহার উৎস সন্ধান ও ভাবানুরাগীদের আশু কর্তব্য'। এবিষয়ে সকালের অধিবেশনে স্বামী সর্বলোকানন্দ এবং বিকালের অধিবেশনে স্বামী ঋদ্ধানন্দ সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও স্বামী প্রাণারামানন্দ ভিন্ন ২০ জন যুবপ্রতিনিধি। সম্মেলন পরিচালনা করেন পরিষদের আহ্বায়ক ডঃ কমল নন্দী। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক তারকনাথ দে। সম্মেলনে ২৩৫ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ৪ এপ্রিল '৯৯ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। পূজা, সমবেত অর্ঘ্যপ্রদান, পাঠ ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের বিষয়। সভায় 'রামকৃষ্ণ-ভক্ত ও অনুরাগীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দ, অধ্যাপক শ্যামলকুমার সরদার ও অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুকুমার বাউরি। সম্মেলনে প্রায় ২৫০ ভক্ত যোগদান করেছিল।

পূর্বগোবিন্দপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—হুগলী) গত ৪ এপ্রিল '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব

উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বরানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন অধ্যাপক অতুলচন্দ্র ভৌমিক, শৈলেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৬০০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি রক্তদান-শিবিরে ৪৪ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করে।

ইছাপুর-নবাবগঞ্জ রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ৪-৬ এপ্রিল '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে। উৎসবে প্রথম দিন ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দ, স্বামী অদ্বিতীয়ানন্দ ও সাহিত্যিক সুজয় চন্দ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোবিন্দ মারিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি ও বৈঠকী নাটক পরিবেশন করেন যথাক্রমে গৈরিশ চন্দ, শান্তিময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এবং বিষ্ণুপদ ঘোষ, সঞ্জিত দাস ও সম্প্রদায়। অনুষ্ঠানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল এবং প্রায় ২৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বাগবাজার 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া'-র এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ও রবীন্দ্রনাথ বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট (কলকাতা-৭০০০০৩)-এর উদ্যোগে গত ১০ এপ্রিল '৯৯ উদ্বোধন কার্যালয়ের কাছে ৩০/১ দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটে (হরি সাহার মন্দিরের সন্নিকটে) একটি আকুপ্রেসার পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দেন বাগবাজার ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অশোক গোস্বামী এবং ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, কলকাতা পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, গবেষক হরিপদ ভৌমিক, ডঃ কমল নন্দী ও বাগবাজারের পুরপিতা সলিল চট্টোপাধ্যায়। সভায় ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন শান্তি গাঙ্গুলী।

পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (জেলা—বর্ধমান) গত ১০-১২ এপ্রিল '৯৯ তিনদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবাশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রথম দিনে প্রভাতফেরি, বাস্তুযাগ ও 'চণ্ডী' পাঠ এবং অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। তারপর অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, হোম, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ। দুপুরে প্রায় ৩০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী শিবময়ানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী শেখরানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী শান্তানন্দ এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা ডঃ কৃষ্ণা চক্রবর্তী। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন ভোলানাথ রক্ষিত। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় মেমারী দিশারী সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের সঙ্গীতাঞ্জলি। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় নাটক ও ভজন পরিবেশন করেন যথাক্রমে জৌগ্রাম নাট্যগোষ্ঠী ও বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোন্নগর উত্তরণ (জেলা—হুগলী)-এর উদ্যোগে গত ১০ এপ্রিল '৯৯ একটি যুবশিবির পরিচালিত হয়। আলোচনা, সেতার-বাদন, সঙ্গীত, যোগব্যায়াম, প্রশ্নোত্তর ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত বিষয়। 'শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শে চরিত্রগঠন' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ, ডঃ কমল নন্দী, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত দত্ত। সেতার-বাদন ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঞ্জন বড়াল এবং সায়ন্তন ঘোষ। ব্যায়াম ও প্রশ্নোত্তরের আসন পরিচালনা করেন যথাক্রমে অলোক ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। শিবিরে ৩০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। তাদের সকলকে স্বামীজীর একটি আলোকচিত্র ও দুটি করে পুস্তিকা প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রবীর আদক।

দমদম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সঙ্ঘে (কলকাতা-৭০০০৩০) গত ১১ এপ্রিল '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ এবং আলোচনাসভা। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক ডঃ নির্মলকুমার মুখার্জী। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সত্যবোধানন্দ ও দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অভিনন্দা নাথ, তথাগত মুখার্জী প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অধ্যাপিকা ডঃ নীলিমা ধর ও হরিশ গাঙ্গুলী। সভাশেষে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পশড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর) গত ১৪ এপ্রিল '৯৯ মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। সভায় তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দের লিখিত ভাষণ পাঠের পর 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে বর্তমান ভারত গঠন' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী অকল্মষানন্দ ও নির্মলকুমার মাইতি। সভান্তে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সভাপতি সোমনাথ জানা। এই উপলক্ষ্যে গত ১৫ এপ্রিল সকালে প্রভাতফেরি, দুপুরে প্রায় ৩০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় ভজন, বাউলগান ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়।

বারুইপুর মাঙ্গলিক সংস্থা (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ১৭ এপ্রিল '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও সংস্থার বার্ষিক উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অচিন্ত্য হালদার ও শিক্ষক সন্তোষ দত্ত। সভান্তে 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নেপথ্যচারিণী মা' নাটক অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা)-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১৮ এপ্রিল '৯৯ মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি ও গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে সেবাশ্রমের সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ এবং শিবপদ মুখার্জী ও সম্প্রদায়। বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ ও সন্তোষকুমার ঘোষ।

মুরারিপুকুর বিবেক জ্যোতি (কলকাতা-৭০০০৬৭) গত ১৮ এপ্রিল '৯৯ সপ্তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে ভক্তিগীতি, আবৃত্তি ও আলোচনাসভার মাধ্যমে। সান্ধ্যসভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন তুষার ঘোষ এবং আবৃত্তি ও ভক্তিগীতি নিবেদন করেন যথাক্রমে সপ্তমী রক্ষিত ও মৌমিতা চক্রবর্তী। আলোচনাসভায় স্বামী মহাব্রতানন্দের সভাপতিত্বে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। সভায় স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে বিবেক জ্যোতির সভাপতি ডঃ কমল নন্দী ও সহ-সভাপতি রবীন দাশ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অন্যতর সহ-সভাপতি মঙ্গলকুমার সাহা।

মুকাডাঙ্গী বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্র (জেলা—মেদিনীপুর) গত ১৮ এপ্রিল '৯৯ একটি যুব প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে। স্বামীজীর জীবন ও বাণী, মনঃসংযোগ, চরিত্রগঠন প্রভৃতি ছিল শিবিরের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা করেন সুখেন্দুশেখর জানা ও নিতাই মাইতি। শিবিরে ৭১ জন যুবক যোগদান করে। এছাড়া আরেকটি পৃথক শিবিরে ৯০ জন শিশু যোগদান করে। শিবিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক লীলাগীতি পরিবেশন করেন অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী।

পূর্বসিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০৩০) গত ২০ এপ্রিল '৯৯ নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন উৎসবের আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, বেদপাঠ, ভজন, কীর্তন, 'কথামৃত' ও 'চণ্ডী' পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। বহু সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও ভক্তের উপস্থিতিতে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পায়। সন্ধ্যায় আন্দুলের কালীকীর্তন সমাজ কালীকীর্তন পরিবেশন করে।

উত্তর পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন গত ২৩-২৫ এপ্রিল '৯৯ **তিনসুকিয়া রামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে (আসাম)** অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩১টি আশ্রম থেকে ৬৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করে। প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, যুবসম্মেলন ও আলোচনাসভা ছিল তিনদিনের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। বিভিন্ন দিনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী উদ্গীতানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষ স্বামী প্রমেয়ানন্দ, ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী প্রথমানন্দ, শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী যোগাত্মানন্দ, নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী গিরিজেশানন্দ ও চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা নিকেতন (কলকাতা-৭০০০৩৬) গত ২৪ এপ্রিল '৯৯ একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। সান্ধ্যসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ভাবাদর্শ' বিষয়ে আলোচনা করেন নিকেতনের সম্পাদক দীপ্তিকুমার শীল এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী সারদাত্মানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গোবিন্দ ভট্টাচার্য, দেবযানী রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

রায়গঞ্জ সেবা সঙ্ঘ (জেলা—উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৪ এপ্রিল '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব ও সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা ও দুপুরে ১,৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ এবং বিকেলে ধর্মসভা। সভায় সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দের সঙ্গীত পরিবেশনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন যোগেশচন্দ্র দাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শেখর দাস।

মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (জেলা—হাওড়া) গত ২৪ এপ্রিল '৯৯ একটি আধ্যাত্মিক শিবির পরিচালনা করে। বৈদিক স্তোত্র পাঠ, জপ-ধ্যান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উপদেশাবলী পাঠ ও আলোচনা ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত বিষয়। শিবিরে ৩০ জন ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী) গত ২৫ এপ্রিল '৯৯ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি এবং প্রতিবন্ধী রোগীদের মধ্যে ফল-মিষ্টান্ন বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাপস মুখোপাধ্যায় ও কনক গুহ। বিকেলে স্থানীয় রাধাগোবিন্দ জীউ-র মন্দির-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলেশানন্দ, বিমলেন্দু দত্ত ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন সঙ্ঘের সম্পাদক স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত, বাগবাজারের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের নাতবৌ **সুষমা দত্ত** গত ১৫ এপ্রিল '৯৯ দুপুর ১টায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তাঁর স্বামী প্রয়াত সুধাংশুমোহন (লুডো) দত্ত ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। প্রয়াতা সুষমা দত্ত গোলাপ-মা, যোগীন-মা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী-সহ কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, গড়িয়া-নিবাসী **দিলীপকুমার ভদ্র** মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৩ এপ্রিল '৯৯ রাত ১১.১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতি তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল এবং স্থানীয় গড়িয়া রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

'উদ্বোধন'-এর অনুরাগী গ্রাহক **শঙ্করপ্রসাদ ঘোষ** গত ২৯ এপ্রিল '৯৯ রাত্রে ৬০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। উদ্বোধন কার্যালয়ে তিনি নিয়মিত আসতেন এবং সাপ্তাহিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সকলের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **নীহার চক্রবর্তী** গত ৭ মে '৯৯ সকাল ৮.২৬ মিনিটে আসানসোল হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি আসানসোল সারদা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন এবং আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ❑

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা ওপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন, ওপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি ওপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

বড় হইতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ

১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব।
৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ

সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

অনেকেই অবগত আছেন যে, বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে রামহরিপুর গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রটি পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

এই আশ্রমের অনেক কাজের মধ্যে বিশেষ কাজ হলো শিক্ষাবিস্তার এবং এই ব্যাপারে এই অঞ্চলে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে বলে দাবি করতে পারে। আশ্রমের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রচুর সুনাম অর্জন করে চলেছে। প্রতি বছরের কার্যবিবরণী থেকে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণ তা অবগত আছেন।

সেই বিদ্যালয়ের বিশেষ করে চারকক্ষ-বিশিষ্ট একটি ঘর একেবারে ধ্বংসের মুখে। মাটির ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়ছে। ছাদের অবস্থা আরো করুণ। আমরা শঙ্কিত হয়ে আছি, কখন না ছাদের অংশ কিংবা দেওয়ালের কোন অংশ কোন ছাত্র বা শিক্ষকের ওপর ধসে পড়ে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সহৃদয় জনসাধারণের কাছে অর্থভিক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আবেদন রাখছি আপনাদের কাছে, যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করে এই আশ্রমটিকে বিপন্মুক্ত করুন। আমরা অতি সাধারণ একটি পরিকল্পনা করেছি, তাতে মাত্র ১২ লাখ টাকার দরকার।

আশা করছি, সহৃদয় জনসাধারণের আনুকূল্যে আমরা এই আশু বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারব।

চেক/ড্রাফট পাঠালে **'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'**—এই নামে পাঠাতে হবে। টাকা বা চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩

রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি বিনীত

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

১৯ জুলাই ১৯৯৯

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

প্রতিটি চুমুকে — কড়া আমেজ।
কুকমী সিলেক্ট
সি টি সি লীফ চা
COOKME SELECT
Cookme
CTC LEAF TEA
Cookme

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

ধনসম্পদ ইহকালের সম্পদ, সঙ্গে যাবে না। সাধন-ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

*

দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই, ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা : উত্তর চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, বারাসত
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, পিন : ৭৪৩ ৫১০
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম**, রহড়া
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ**, খাঁটুরা
- **বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ**, নববারাকপুর
- **অলক পাল চৌধুরী**, সন্তোষপল্লী, ঘোলা, সোদপুর
- **ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- **বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র**, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **মানিক ঘোষ**, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র
  শিবালয়, দত্তপুকুর, পোঃ আদিকাশিমপুর, পিন : ৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  বলাই মণ্ডল সরণি, মধ্যমগ্রাম চৌমাথা, সোদপুর রোড
  পোঃ মধ্যমগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৭৫
- **স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন : ৭৪৩ ৪৩৫
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া : হাড়িনগর, থানা : বীজপুর
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী, পিন : ৭৪৩ ১৬৫
- **শ্রীভাস্করাচার্য** (ডঃ পরিতোষ মিত্র), 'জীবনদীপ'
  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, পোঃ সোদপুর, পিন : ৭৪৩ ১৭৮
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন : ৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  চাকদহ রোড 'ট' বাজার, বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন : ৫৬০-১২৩০
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ পাঠচক্র**, ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর, পিন : ৭৪৩ ১২৭

জেলা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, সরিষা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙ্গড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর**, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন : ৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**
  গ্রাম : চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন : ৭৪৩ ৩৮৪
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন : ৭৪৩ ৩৩০, ফোন : ৯১১৮-৬০৪৫০
- **শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল**, প্রযত্নে কৃষ্ণগোপাল নস্কর
  গ্রাম : বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন : ৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুখাঁ**
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি**
  প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন : ৭৪৩ ৬০৩

জেলা : হুগলী

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, আঁটপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম**, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা**
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন : ৭১২২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন : ৭১২ ৩০৫
- **তপন চট্টোপাধ্যায়**
  পুরোহিত, হংসেশ্বরী-মন্দির, বাঁশবেড়িয়া, পিন : ৭১২ ৫০২
- **মোহিতকুমার বর্মণ**
  সম্পাদক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  বিদ্যুৎপল্লী, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২ ৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৪৩৯
- **মনীষা নন্দী**, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১ ২২৪
- **সুশান্ত মাইতি**
  প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (কামাক্ষাতলা),
  মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর
  পিন : ৭১২ ৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৭০৯
- **হরনারায়ণ বিশ্বাস**
  ৫ রাজেন্দ্র অ্যাভেনিউ প্রথম লেন
  উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২ ২৫৮
- **বরুণকুমার চক্রবর্তী**, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী
  পিন : ৭১২ ৫০৩, ফোন : ৮৪৬২৮৪
- **দীপশিখা ঘোষ**, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল
  জনাই, পিন : ৭১২ ৩০৪, ফোন : ৯১১২-৪৪১১৪
- **গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248
554-2403

Vol. 101 ❑ No. 7 ❑ JULY 1999

Licence No.
WB/NC/CL-3

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Reg. No. WB/N...

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র সুপ্রাচীন সাময়িকপত্র।

❑ উদ্বোধন-এর এবছর ১০১তম বর্ষ চলছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০০ বছর অতিক্রম এই প্রথম ❑

❑ **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

❑ **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও **রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি **ধর্মীয়** পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

❑ **উদ্বোধন** বাঙলা ভাষায় শুধু **সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা** নয়, **উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং সর্ব অর্থেই উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ **পারিবারিক পত্রিকা**।

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন **সাম্প্রদায়িক ধর্মীয়** আদর্শের মুখপত্র নয়। **উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন** ও **অসাম্প্রদায়িক** চরিত্র **১০১ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।

❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ উদ্বোধন একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের** ভাব ও বাণী-শরীর।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের **আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন**-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন**-এর গ্রাহকসংখ্যা **এক লক্ষ** হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের**।

❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন**-এর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন—এই আশা রাখি।

❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট শারদীয়া সংখ্যা সহ **গ্রাহক-পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়ায় মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের প্রায় আড়াই গুণ।** শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের** থেকে **আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না।** এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার**।

❑ **উদ্বোধন** পত্রিকার সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। শেষের দুটি তহবিলের অর্থানুকূল্যে ১০১তম বর্ষ থেকে 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা চিহ্নিত হচ্ছে। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের** ৮০জি **ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'— এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** চিঠিতে বা M.O. কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি দান পাঠালে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য'** পাঠানো হচ্ছে **সেই মর্মে দাতার চিঠি থাকা বাঞ্ছনীয়।**

❑ **'উদ্বোধন'-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষ থেকে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য **'উদ্বোধন'-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি**) সম্প্রতি নিবেদিত হয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ **মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন স্থানাধিকারী 'উদ্বোধন'-প্রবর্তিত এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে** অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

১৪০৬ □ ৮ম সংখ্যা

উদ্বোধন

॥ ১০১ ॥

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত
বিবেকানন্দ ইল্লম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

বিবেকানন্দ ইল্লম একটি পবিত্র ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই ভবনটি একটি তীর্থক্ষেত্র। স্বামীজী পূর্ণ নয়দিন এখানে অবস্থান করেছেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, উপদেশ দান করেছেন, ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেছেন। তাঁর অদৃশ্য, দিব্য উপস্থিতিতে স্থানটি এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে, শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী চেন্নাইয়ের এই বাংলোয় উঠেছিলেন। তখন বাড়িটির নাম ছিল 'আইস হাউস' বা 'ক্যাসল কার্নন'। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় ভারতের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে তেজোদীপ্ত বাণী প্রদান করেছিলেন তা ইংরেজীতে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বা বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা, আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে এই বাড়িটিতেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত স্বামীজীর বাণীর ঐতিহাসিক পীঠভূমি।

আমরা এখানে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে চাইছি, যেখানে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত হবে। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্রসমূহ, অন্যান্য সুন্দর চিত্র, মডেল, ভিডিওগ্রাফ, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রাণপ্রদ বাণীর প্রচারকেন্দ্র-রূপে এই বাড়িটিকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করছি।

১৮৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই বাড়িটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই পবিত্র কাজটি শুরু করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে এবং স্বামীজীর সকল অনুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের উদার দাক্ষিণ্যে আমরা এই মহান কাজ সম্পন্ন করার আশা রাখি।

এবাবদ সমস্ত আর্থিক দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে দান পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯
ই. মেল : srkmath@vsnl.com
ওয়েবসাইট : www.sriramakrishnamath.org

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
উদ্বোধন ॥১০১॥
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০১তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ভাদ্র ১৪০৬ আগস্ট ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ৩৬৫
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি ৩৬৬
❑ সঙ্কলন ❑
'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা—শ্রীম ৩৬৯
❑ ভাষণ ❑
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসেতু স্বামী বিবেকানন্দ—
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৩৭১
❑ আলোচনা ❑
অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ—স্বামী নির্বাণানন্দ ৩৭৫
❑ পরিক্রমা ❑
জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ—স্বামী অচ্যুতানন্দ ৩৮৫
❑ বিশেষ নিবন্ধ ❑
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলীলা-কথা—স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ৪০০
❑ গবেষণা ❑
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব—
সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ৩৭৮
❑ ক্রীড়াজগৎ ❑
আধুনিক তীরন্দাজি—জয়ন্ত চক্রবর্তী ৩৯০
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও [illegible]
চিত্র : [illegible]
❑ অনুধ্যান ❑
রাজবিদ্যা ◌ রাজযোগ—কৃষ্ণা সেন ৩৯৪
❑ পরমপদকমলে ❑
শরণাগতি—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩৯৮
❑ বিজ্ঞান ❑
আমাশয়ের একটি কারণ অ্যামিবা—অমিয়কুমার ভট্টাচার্য ৪০৭
❑ স্বাস্থ্য ❑
[illegible] ৩৯২
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
[illegible]
শতাব্দী-উত্তর 'উদ্বোধন' এবং [illegible]
❑ কবিতা ❑
ভর্গো দেবস্য ধীমহি—অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৮৩
শিক্ষা—[illegible] দত্ত ৩৮৩
চির সাথী—[illegible] দাস ৩৮৩
[illegible]—
[illegible] মুখোপাধ্যায় ৩৮৪
[illegible] ৩৮৪
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
বিজ্ঞান-সংবাদ : দেহের ও হাত-পায়ের বৃদ্ধি থামে কেন? ৪১০
গ্রন্থ-পরিচয় : ছত্রপতি শিবাজী—প্রেমবল্লভ সেন ৪১১
[illegible] ৪১২
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৪১৩
শ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৪১৩
বিবিধ সংবাদ ৪১৪
❑ অন্যান্য ❑
অনুষ্ঠান-সূচী (আশ্বিন-কার্তিক ১৪০৬) ৩৮২
বিশেষ-সংবাদ : কাশ্মীর-সীমান্তে সাম্প্রতিক যুদ্ধে শহিদদের
পরিবারের সাহায্যার্থে রামকৃষ্ণ মিশনের দান ৩৯৭
❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি টি পি -তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র : অদ্বৈত আশ্রম
বর্তমান বর্ষের (১৪০৫-১৪০৬/১৯৯৯) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা, সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

ইতিহাসের নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ উপলক্ষ্যে ১০২ বছরের প্রাচীন 'উদ্বোধন'-এর আগামী বর্ষের গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হলো।

'উদ্বোধন' ঃ ১০২তম বর্ষ (২০০০ খ্রীস্টাব্দ) ❑ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ও অন্যান্য

❑ 'উদ্বোধন' পত্রিকার আগামী ১০২তম বর্ষের (মাঘ ১৪০৬—পৌষ ১৪০৭/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০০) গ্রাহকমূল্য বর্তমান বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে ঃ ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৭২০ টাকা (বিমানডাক) ❑ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশ ঃ ১৪০ টাকা।

❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

❑ বর্তমান বছরের (১৯৯৯/১৪০৫-১৪০৬) প্রথম বা মাঘ সংখ্যা প্রথম মুদ্রণের পর নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার তার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। সেজন্য প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে আগামী বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

❑ কলকাতা বা কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তাঁরা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য জমা দিলে সুবিধা হয়। কেননা M. O.-তে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে যদি দেরি হয় এবং ততদিনে যদি প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাহলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও ঐ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে-কারণে সম্ভব হলে M. O. না করে গ্রাহকমূল্য সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়াই ভাল।

❑ সরাসরি জমা দেওয়া সম্ভব না হলে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে/পোস্টাল অর্ডারে গ্রাহকমূল্য 'Udbodhan Office, Calcutta'—এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য চেক গ্রাহ্য। তবে সেই চেক কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হতে হবে।

❑ যাঁদের M. O. করে গ্রাহকমূল্য পাঠাতেই হবে, তাঁদের কাছে অনুরোধ, এখনই M. O. পাঠাতে শুরু করুন। জানুয়ারি থেকে বর্ষ শুরু বলে সকলেই একসঙ্গে ডিসেম্বরে M. O. পাঠাতে শুরু করেন; কিন্তু বাগবাজার ডাকঘর কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন একশ থেকে দেড়শর বেশি M. O. আমাদের কাছে ডেলিভারি দিতে পারেন না। আবার তাও রোজ পেরে ওঠেন না। ফলে ডাকঘরে জমা হাজার হাজার গ্রাহকের M. O. পেতেই আমাদের দুই থেকে তিন মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত লেগে যায়। এছাড়া M. O. কুপনে অনেক নতুন গ্রাহক তাঁদের নাম-ঠিকানা এবং কিজন্য M. O. পাঠাচ্ছেন তা জানান না। পুরনো গ্রাহকরা তাঁদের গ্রাহকসংখ্যা অনেকেই ঠিকমত লেখেন না। ফলে এইসমস্ত M. O. সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। পত্রিকা না পেয়ে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের চিঠি লেখেন তখন সেগুলির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। অনেকের কাছে যে সময়মতো পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হয় না অথবা পাঠাতে দেরি হয়, M. O. সম্পর্কিত অস্পষ্টতাই তার জন্য দায়ী। সেজন্য অনুরোধ, এখনই আগামী বর্ষের গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করে নিন। M. O. কুপনে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা, গ্রাহকসংখ্যা লিখবেন, M. O. কেন পাঠাচ্ছেন তাও জানাবেন।

❑ পত্রোত্তর এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকখরচ পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ প্রতি বাঙলা মাসের ১ তারিখ (ইংরেজী ১৪-১৮) 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়। ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার প্রধান ডাকঘরে (G.P.O.) এবং কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণত ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ঠিকমত পৌঁছায় না বলে গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে। এই বিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে পত্রিকা ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা এক মাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে গ্রাহকদের এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি।

এক মাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট' বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে।

❑ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় (একমাস) অতিক্রান্ত হলে তবেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহক-সংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক।

❑ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ বড় এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। যাঁরা ডাকে পত্রিকা নেন, তাঁরা সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) অথবা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণের সময় অথবা ১লা জুন থেকে ২৪শে আগস্টের মধ্যে কার্যালয়ে জানাতে হয়।

❑ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ সংখ্যায় পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/ M. O. প্রাপ্তি-কুপন/ আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে।

❑ ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নতুন ঠিকানা পিন কোড সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে, যাতে পরবর্তী সংখ্যাটি পুরনো ঠিকানায় না চলে যায়।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হলে 'উদ্বোধন'-এ ব্যক্তির/ কেন্দ্রের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হবে।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদন-পত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বা প্রাইভেট কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ সভাপতিকে আবেদন করতে হবে।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

(জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে নিবেদিত।)

ভাদ্র ১৪০৬
আগস্ট ১৯৯৯

শ্রীশুক উবাচ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।।
নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।।

✿

তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (১০।২৯।১, ৩-৪, ৮)

শ্রীশুকদেব বললেন

ভগবান স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্যময় হয়েও মল্লিকা প্রভৃতি শরৎকালীন ফুল্ল-কুসুমদলশোভিত সেই রাত্রিকে সমাগত দেখে নিজের যোগমায়াকে আশ্রয় করে বিহার করতে ইচ্ছা করলেন।

তাজা কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ, লক্ষ্মীর মুখের আভার মতো আভাযুক্ত পদ্মপ্রস্ফুটনকারী পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা ব্রজমণ্ডলের সমস্ত বনভূমিকে কোমল কিরণে রঞ্জিত দেখে মনোহরনয়না ব্রজনারীদের আহ্বান করে তিনি মধুর বংশীধ্বনি করলেন।

ভগবানের প্রতি প্রেমবর্ধক সেই বংশীধ্বনি শুনে কৃষ্ণে অনুরাগিণী ব্রজাঙ্গনাগণ যেখানে তাঁদের পরম দয়িত বিরাজ করছেন, সেখানে একে অপরকে না জানিয়েই ব্যাকুল পদে দ্রুত চললেন। গতির দ্রুততায় তাঁদের কর্ণকুণ্ডলগুলি দুলছিল।

✿

স্বামী, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ রাত্রিকালে ঐভাবে গৃহের বাইরে যেতে নানাভাবে তাঁদের নিবৃত্ত করলেও তাঁরা আর ফিরলেন না। কারণ, তাঁদের মন-প্রাণ গোবিন্দ কর্তৃক অপহৃত বা আকর্ষিত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্পাদকীয়।

শ্রীকৃষ্ণ কে? ভাগবতে বলা হইয়াছে ঃ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" (১।৩।২৮) ভাগবতকার বলিতেছেন, কৃষ্ণের আগে আবির্ভূত ঈশ্বরাবতারগণ কেহ সেই পরম পুরুষের অংশ, কেহ-বা তাঁহার কলা ঐশ্বর্য ও শক্তির প্রকাশ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ পরম পুরুষের অবতার নহেন, তিনি স্বয়ং তিনিই। অর্থাৎ স্বয়ং পরম পুরুষ নারায়ণই কৃষ্ণ-রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত। কেন তিনি আবির্ভূত? ভাগবতকার বলিতেছেন ঃ পৃথিবীর মানুষকে সুখী করিবার জন্য। পৃথিবীর মানুষকে আনন্দ দান করিবার জন্য। তাহাদের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবার জন্য।

আবির্ভাবের পর শৈশব ও কৈশোরে তাঁহার সেই আবির্ভাব-উদ্দেশ্যকে তিনি বহুলাংশে সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহার বাঁশির মাধ্যমে। সর্বপ্রাণীর মধ্যে যিনি চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন তিনি তাঁহার বাঁশির ধ্বনিতে সেই চৈতন্যের আকর্ষণকে সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিতেন। ভাগবতে (১০।২১।১-১৪) বলা হইতেছে, বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনাতীরে গোষ্ঠে গোষ্ঠে বালক কৃষ্ণ যখন সর্বপ্রাণীর মনোহারী বাঁশিতে ফুঁ দিতেন তখন সেই বাঁশির সুরে গোটা বৃন্দাবন আনন্দে উদ্বেল হইয়া যাইত। গরুগুলি ঘাস খাইতে ভুলিয়া যাইত, গোবৎসগুলি বাঁটে মুখ দিয়া দুধ খাইতে খাইতে এক অবর্ণনীয় হর্ষানুভূতিতে বিবশ হইয়া যাইত। বাঁটের দুধ মুখেই রহিয়া যাইত। গোষ্ঠে যখন কানু বাঁশি বাজাইতেন তখন তাঁহার চারিপাশে ময়ূর, হরিণ ও গরুর দল ভিড় জমাইত। বস্তুত, কৃষ্ণের বাঁশিটি নিছক বাঁশি ছিল না, উহা ছিল তাঁহার লীলাবিলাসের দুর্জয় যন্ত্র। কানুর সেই বাঁশির সুর বৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে, মানুষ ও পশুপাখির হৃদয়ে হৃদয়ে চৈতন্যের বন্যা বহাইয়া দিত। বাঁশির সুরলহরীতে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে চৈতন্যের হাট-বাজার বসাইয়া দিতেন।

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতেও (দ্রঃ বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১১শ সং, ১৯৮৪) শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির কথা অনেক শুনি। কোনটিতে দেখি, মা যশোদাকে প্রণাম করিয়া বালক কৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে গোষ্ঠে চলিয়াছেন, সঙ্গে চলিয়াছে বৃন্দাবনের গোপ-বালকেরা। গরুর খুরের আঘাতে আঘাতে উত্থিত ধূলিরাশিতে আকাশ রাঙিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া বৃন্দাবনের সকলের মন আনন্দে পূর্ণ। মাধবের পদে পাই ঃ

"প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-খুর-রেণু
শুনি সবার হরষিত মন।।"

কোনটিতে আবার গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার কালে বাঁশির ভূমিকার কথা শুনি। কৃষ্ণ বাঁশিতে প্রত্যেক গরুর নাম ধরিয়া ডাক দিয়াছেন। সেই আহ্বানের এমনই আকর্ষণ যে, গরুগুলি যে যেখানে ছিল সবাই পুচ্ছ তুলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে একসঙ্গে আসিয়া জুটিল। বাঁশির সেই সুরে রাখালরাও বুঝিল, এবার বাড়ি ফেরার পালা। তাহারাও সকলে আসিয়া একত্র হইল। এবার সকলে চলিল গোকুল অভিমুখে। বলরাম দাস লিখিয়াছেন—

"চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে।।
অবসান বেণু-রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে।"

কোন পদটিতে আবার রহিয়াছে মা যশোদার শঙ্কাজড়িত কাতরতা। তাঁহার ভয়, তাঁহার প্রাণের প্রাণ নীলকান্তমণি যদি গরুর আগে আগে যান তাহা হইলে তিনি হয়তো পথ হারাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবেন। সেজন্য তিনি পুত্রকে শপথ করিয়া গোষ্ঠে পাঠাইতেছেন। বলিতেছেন, কৃষ্ণ যেন সবসময় গরুগুলির কাছে কাছেই থাকেন এবং থাকিয়া থাকিয়া যেন তাঁহার মোহন-বাঁশিটি বাজান। তিনি সেই বাঁশির সুর বাড়িতে বসিয়া শুনিবেন। বড় মর্মস্পর্শী যাদবেন্দ্রের এই পদটি—

"আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি।।"

তবে বৃন্দাবনের গোপনারীদের কাছে, শ্রীমতীর কাছে কৃষ্ণের বাঁশি যে ঝঙ্কার তুলিত তাহা ভারতের ভক্তিসাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে এক সুগভীর অধ্যাত্মরসের জন্মদান করিয়াছে। উহার মধ্যে কবি, সাধক, ভক্ত সকলেই এক অসাধারণ দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে কবি, সাধক ও ভক্ত মানুষের প্রাণে অনন্তের আহ্বানের প্রতীককে দেখিয়াছেন। দেখিয়াছেন ভক্তের প্রতি ভগবানের চিরন্তন আহ্বানকে। কৃষ্ণের বাঁশির সুরের প্রতি গোপনারীদের দুর্বার আকর্ষণে দেখিয়াছেন ভগবানের প্রতি ভক্তের চিরকালীন আকর্ষণকে। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন ঃ

"মোহন মুরলী-রবে [illegible] শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ।"

গোবিন্দদাস বলিতেছেন, কৃষ্ণের বাঁশির সুর আমার

কর্ণকুহরকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অন্য কোন কথা (পরসঙ্গ = প্রসঙ্গ) সেখানে আর প্রবেশ করিতে পারে না।

রঘুনন্দন লিখিয়াছেন ঃ

"মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া।।"

সাধক-কবি এখানে যেন বাঁশের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত! তিনি বলিতেছেন, বাঁশ কোন্ পুণ্যবলে বাঁশি হইয়াছে, যে-পুণ্যে সে কৃষ্ণের অধরে স্থান পাইয়াছে এবং সর্বদা তাঁহার অধরামৃত পান করিবার ভাগ্য করিয়াছে!

কৃষ্ণের বাঁশির সুর সাধারণ সুর নয়, উহার প্রতিটি অভিঘাতে রহিয়াছে ঐহিকতা হইতে পারত্রিকতায় উত্তরণের অমোঘ আহ্বান। রহিয়াছে সংসারের আকর্ষণকে ধ্বংস করিয়া বৈরাগ্যের অগ্নিতে নিজেকে দহন করিবার দুর্নিবার আহ্বান। যাহার কানে সেই বংশীধ্বনি প্রবেশ করে তাহার পক্ষে গৃহে থাকা অসম্ভব। বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে গোপনারীরা সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া পাগলিনীর মতো গৃহ, কুল, মান, সুখ, দুঃখ, লজ্জাকে অগ্রাহ্য করিয়া যমুনাতীরে কৃষ্ণের কাছে ছুটিয়াছেন। ভাগবতের রাস-লীলা পর্বের সূচনায় (১০ম স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়) দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনামাত্র গোপীরা যে যেখানে ছিলেন সেই অবস্থায় সব কিছু ছাড়িয়া যমুনাপুলিনে ছুটিলেন। ভাগবতের ঐ বর্ণনা বড়ই মর্মস্পর্শী।পরবর্তী কালে গোবিন্দদাসও লিখিয়াছেন ঃ

"তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ হুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস।।"

পদকর্তা গোবিন্দদাস এখানে শ্রীমতীর কথা বলিতেছেন। শ্রীমতী বলিতেছেন, তোমার মুরলী-ধ্বনি যখন আমার কানে প্রবেশ করিয়াছে তখনি আমি গৃহসুখের আশা ত্যাগ করিয়াছি। পথের দুঃখ-কষ্টকে তৃণতুল্যও জ্ঞান করি নাই।

কৃষ্ণের বাঁশির আহ্বান শ্রীমতীকে এমনি অস্থির করিয়াছে যে অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকার, অবিরল বর্ষণ, পায়ের উপর বিষধর ভুজঙ্গ, কর্দমাক্ত ও কন্টকাকীর্ণ পথ—কোন কিছুই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। গোবিন্দদাস মর্মস্পর্শী ভাষায় সেকথা শ্রীমতীর জবানিতে কৃষ্ণকে বলিতেছেন ঃ

"মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ।।
মন্দির তেজি যব পদ চার আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ।।
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর।।
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কন্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চিরদুখ অব দূরে গেল।।"

এই ব্যাকুলতা শুধু শ্রীমতীরই নয়, এই ব্যাকুলতা কৃষ্ণের জন্য বৃন্দাবনের সমস্ত গোপনারীর। এই ব্যাকুলতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, "টান"—স্মরণাতীত কাল হইতে ভগবানের প্রতি সমস্ত ভক্তের। শ্রীমতী এবং গোপনারীরা এখানে হাজার হাজার বছরের লক্ষ কোটি ভক্ত ও সাধকের চিরন্তন প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।" চক্ষুলজ্জা, কুললজ্জা, লোকলজ্জা, সমাজলজ্জা, দেহলজ্জাকে সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছিলেন বৃন্দাবনের গোপনারীরা। পরিবারের ঘৃণা, সমাজের ঘৃণা, লোকের ঘৃণাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারা। কুলভয়, লোকভয়, সমাজভয়, পাপভয়, স্বর্গভয়, নরকভয়কে উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা। ভগবানের কাছে যাইবার জন্য সমস্ত কিছুকে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা শুধু বুঝিতেন কৃষ্ণকে, যিনি ছিলেন তাঁহাদের কাছে মূর্তিমান ভগবান। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেম এমনই একমুখী ছিল যে মথুরার কৃষ্ণকে, কংসমর্দন বীরাগ্রণী কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহারা মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহারা দেখিতে চাহেন নাই। কারণ, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত যে শুধুই বৃন্দাবনের সেই "লীলা-অভিরাম" বালক-কৃষ্ণ। সেই রাখালবালকই তাঁহাদের চিরতরে চিত্তহরণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, কৃষ্ণের মুখে সর্বদা বাঁশিকে থাকিতে দেখিয়া গোপীরা বাঁশির উপরে খুব রুষ্ট হন। কারণ, ঐ বাঁশির জন্যই তো কৃষ্ণ তাঁহাদের দিকে মন দেন না! সেজন্য সকলে মিলিয়া একদিন স্থির করিলেন, বাঁশিটিকে কোনভাবে চুরি করিতে হইবে এবং উহাকে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে কৃষ্ণ আর কোনদিন বাঁশিটি ব্যবহার করিতে না পারেন। কিন্তু বাঁশি চুরি করিবেন কিভাবে? কৃষ্ণ যে সবসময় বাঁশিটিকে তাঁহার সঙ্গে রাখেন। একদিন কৃষ্ণের এক অসতর্ক মুহূর্তে চুপি চুপি বাঁশিটিকে চুরি করিলেন তাঁহারা। বাঁশি গোপীদের বলিল ঃ "এভাবে আমাকে আপনারা কৃষ্ণের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলেন কেন?" গোপীরা বলিলেন ঃ "তোমার এমন কি গুণ আছে যে, তুমি সর্বদা কৃষ্ণের হাতে হাতে ফের আর তাঁর অধর স্পর্শ করে থাক?" বাঁশি বলিল ঃ "গুণের কথা ছেড়ে দিন, আমার তো কোন অস্তিত্বই নেই। কারণ, আমার ভিতরে যে শাঁস ছিল তা বের করে ফেলা হয়েছে। ফলে আমার নিজস্ব কোন সত্তাই এখন আর নেই। আমার গোটা শরীরটাই ফোঁপরা—ফাঁপা। সুতরাং আমার আমিত্ব বলে এখন আর কিছু নেই। আমার যা-কিছু সব তাঁর। আমার নিজের কোন সুরও নেই, তানও নেই। কানাইয়ার সুর, কানাইয়ার তানই আমার সুর, আমার তান। তিনি যেভাবে আমাকে বাজান, আমি সেভাবেই বাজি। শরণাগতকে তিনি কখনো পরিত্যাগ করেন না। আমার সর্বস্ব তাঁকে অর্পণ করে আমি তাঁর আশ্রয় নিয়েছি। তাই তিনি

আমাকে তাঁর হাতে ধারণ করেন, তাঁর অধরে রাখেন। আমি শুধু তাঁর যন্ত্রমাত্র। আমি যে অহংশূন্য।"

গোপীরা বুঝিলেন, যখন কেহ বাঁশির মতো নিজের সর্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অহংশূন্য করিতে পারে, তখনি সে কৃষ্ণের হাতে বাঁশি হইবার যোগ্য হয়। বাঁশির ভিতরের সার পদার্থ যখন বাহির করিয়া দেওয়া হয় তখন নিশ্চয় তাহার ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। অহঙ্কার-অভিমান ত্যাগ করা সত্যিই খুব কঠিন। কিন্তু যদি নির্মমভাবে নিজেকে অহংশূন্য করা যায় তখনি আমরা তাঁহার হাতের যন্ত্র হইতে পারি। তিনি কৃপা করিয়া তখন বাঁশির মতো আমাদেরও তাঁহার অধরে স্থান দিবেন। আমাদের তাঁহার যন্ত্র করিবেন।

ভগবানের প্রতি এই ভক্তির নাম অহৈতুকী ভক্তি। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে অহৈতুকী ভক্তি অত্যন্ত উপভোগ্য ও মাধুর্যময় এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ "মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে অবতার কৃষ্ণের মুখ হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম, প্রলোভনের ধর্ম চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল।... বেদব্যাস উক্ত তত্ত্ব জনসাধারণের কাছে প্রচার করিলেন। মানবভাষায় এইরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনো চিত্রিত হয় নাই।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৫১-১৫৩)

এই প্রেমের মধ্যে কোথাও অশুদ্ধতা নাই, অশালীনতা নাই। ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত জুড়িয়া শুধুই পবিত্রতা। ইহা এত শুদ্ধ যে, সম্পূর্ণ বাসনাত্যাগ না হইলে, হৃদয় সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে এই প্রেমের অধিকারী হওয়া যায় না এবং ইহার তাৎপর্যও বুঝা যায় না। স্বামীজী আরো বলিয়াছেন ঃ "এ-প্রেমের মহিমা কি আর বলিব।... শুধু এইটুকু বলিতে চাই—নিজের মন আগে শুদ্ধ কর। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম [রাজা পরীক্ষিতের নিকট] বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, তিনি সেই চিরপবিত্র ব্যাসতনয় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন ভগবৎপ্রেম অসম্ভব।... যতদিন মাথায় এইসব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের প্রেমজনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে?...

"প্রথমে এই কাঞ্চন, নামযশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড়। তখনি—কেবল তখনি গোপীপ্রেম কী তাহা বুঝিবে। উহা এত শুদ্ধ জিনিস যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টাই করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না চিত্ত সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম-কাঞ্চন ও যশোলিপ্সার বুদবুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে চায় এবং উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমনকি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি 'গীতা' পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, 'গীতা'য় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই বিদ্যমান; এখানে গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছুই মনে থাকে না। ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ—একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের মতো দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণ-বর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা।" (ঐ)

কৃষ্ণের বংশীধ্বনি কৃষ্ণের সেই অপার্থিব প্রেমের প্রতীক। ঐ ধ্বনিতে সর্বমানবের উদ্দেশে চিরকালের জন্য প্রবাহিত তাঁহার অমোঘ আহ্বান। ভৌগোলিক বৃন্দাবন ছিল কি ছিল না, ইতিহাসে গোপীরা ছিলেন কি ছিলেন না—ভক্তের কাছে, সাধকের কাছে সেই প্রশ্ন অবান্তর। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করিবে না, তথাকথিত যুক্তিবাদীরা উপহাস করিবে। কিন্তু ভক্ত, ভাবুক, প্রেমিক, সাধকের তাহাতে কী যায় আসে? তিনি বলিবেন ঃ

"ওরা জানে না, তাই মানে না—
আমি জানি তাই মানি।
আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি
তাই বঁধু আমি মানি!" (দিলীপকুমার রায়)

কৃষ্ণের ঐ বাঁশি চিরকাল ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনে বাজিয়াছে, বাজিতেছে এবং বাজিয়া চলিবে। রাধা-কৃষ্ণের কয়েক সহস্র বছর পরে চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন ঃ "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো/আকুল করিল মোর প্রাণ।" একালের সাধককবিও গাহেন ঃ "এখনো সেই বৃন্দাবনের বাঁশি বাজেরে।" বস্তুত, সেই বংশীধ্বনিতে যে-আহ্বান ভক্ত ও সাধক শোনেন, তিনি তাহা চিরকাল শুনিবেন। ভূগোল এবং ইতিহাস এই শোনার মাঝে কোন প্রাচীর তুলিতে কোনদিনও সমর্থ হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, কৃষ্ণ বাঁশি বাজাইয়াই চলিবেন—চিরকাল। (দ্রঃ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫১) যাহার কান আছে সে শোনে সেই বংশীধ্বনি। নজরুল বলিয়াছেন ঃ "আজও যাহার কদমডালে বেণু বাজে সাঁঝ-সকালে/ নিত্যলীলা করে যেথা মদনমোহন!" মনে পড়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সেই বিখ্যাত গানের ততোধিক বিখ্যাত ছত্রগুলি—"হৃদি-বৃন্দাবনে আমারি কারণে, সর্বনাশা বাঁশি বেজেছে এবার।" গানটি শুনিয়া শ্রীশ্রীমা শিহরিত হইতেন। ঐ শিহরণ নিত্য-রাধার, ঐ বাঁশি নিত্যকালের। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ "ঐ বুঝি বাঁশি বাজে—বনমাঝে কি মনোমাঝে!" যতদিন পৃথিবীতে ভক্তি ও ভক্ত থাকিবে, যতদিন পৃথিবীতে সাকার উপাসনা থাকিবে ততদিন পৃথিবীতে কৃষ্ণ থাকিবেন এবং থাকিবে তাঁহার বাঁশি। কৃষ্ণ এবং তাঁহার বাঁশি মানুষকে চিরকাল পার্থিবতা হইতে অপার্থিবতায়, বস্তুচেতনা হইতে অধ্যাত্ম-চেতনায়, কাম হইতে প্রেমে, নরক হইতে স্বর্গে আহ্বান করিবে। ঐ আহ্বান কোনদিন শেষ হইবে না। যুগের পর যুগ আসিবে, যুগের পর যুগ যাইবে। কিন্তু থাকিবেন কৃষ্ণ, থাকিবে তাঁহার বাঁশি। ভূগোলের বৃন্দাবনে, ইতিহাসের বৃন্দাবনে সে-বাঁশির খোঁজ না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়-বৃন্দাবনে সে-বাঁশির ধ্বনি চিরকাল বাজিতেই থাকিবে। ❑

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

চৈতন্যদেব ও ঠাকুর উভয়েই ভিখারী ভগবান। কিছুই চান না, খালি প্রেম চান। উভয়েই প্রেমের কাঙাল। চৈতন্যদেব গম্ভীরায় পড়ে আছেন মহাভাবে। জগৎ ভুল হয়ে গেছে, দেহজ্ঞান শূন্য। নিচে এলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে পাগল। ঠাকুরের অবস্থাও তাই। গায়ে কাপড়খানা পর্যন্ত রাখতে পারেন না—'মা মা' করে জগৎ ভুল হয়ে গেছে। রাত্রে শুয়েছেন, শ্বাসে-প্রশ্বাসে 'মা মা'। কখনো উচ্চৈঃস্বরে 'মা মা' করে চেঁচিয়ে উঠছেন, যেন শিশু—মা ছাড়া থাকতে পারে না!

কিছুই চাই না, চাই কেবল মাকে। সংসারে যদি এই 'চ্যালেঞ্জ' না থাকত, সংসার হতো পশুস্থান। সকলে পাগল কামিনী-কাঞ্চনে, ঠাকুর পাগল মায়ের প্রেমে। এই দুই টানের মাঝে থাকে ভক্তগণ। ভক্তগণ মিলনসূত্র—সংসার ও ঈশ্বরের। ভক্তরাই সংসারে রসসঞ্চার করে—তবে চলে সংসার, তবে হয় এ-স্থান liveable (বাসযোগ্য)। (পৃঃ ৪৩)

(সূর্য ও আকাশের প্রতি ইঙ্গিত করে) কী কাণ্ড চলেছে! নিত্য দেখছি বলে কিছু মনে হয় না। আর বিষয়ভোগে মন ডুবে আছে বলে এসব দেখবার অবসর নেই, ভাববার শক্তি নেই। মা-ই এসব রচনা করেছেন। ইনিই আবার মানুষের মনকে বিষয়ভোগে ডুবিয়ে রেখেছেন। তাই মানুষ এসবে তাঁর হাত দেখতে পায় না। জগৎ-লীলা চলবে কি করে তা না হলে! সৃষ্টি-ফিষ্টি অচল হয়ে যাবে। তাই জগৎকে খেলনার মতো সামনে ধরে রেখেছে—যেমন মায়েরা শিশুর সামনে ধরে রাখে। শিশু তাই নিয়েই আনন্দ করে। মায়ের অবিদ্যা ডিপার্টমেন্টের কাজই এই—জীবকে দেহসুখে বেঁধে রাখা। যখন এইসব আর ভাল লাগে না—বিয়েটিয়ে, দেহসুখ, নাম-যশ, বিদ্যার্জন, প্রভাব-প্রতিপত্তি, তখনই দৃষ্টি উলটো দিকে যায়—তাঁর বিদ্যাশক্তির দিকে। ঠাকুর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকতেন। তখন বুঝতাম না, কেন। এখন তাঁর কৃপায় একটু বোঝা যাচ্ছে।

কখনো দিগ্বসন হয়ে বিস্ময়ানন্দে নৃত্য করতেন। কখনো গানের একটা পদ গাইতেন আর হাততালি দিয়ে নাচতেন—"রঙ্গময়ী তোর রঙ্গ দেখে অবাক হয়েছি।" কখনো বলতেন ঃ "আমি কি বিচার করব? দেখছি, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন—আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তারা, হাওয়া, জল, অগ্নি, বৃষ্টি, ফুল, ফল, মানুষ, পশুপক্ষী—এইসব।" উঃ! তাই একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) দ্বিতীয় দর্শনেই বলেছিলেন ঃ "তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। জীবজগৎ রক্ষার সব আয়োজন তিনি করে রেখেছেন। তুমি কেবল তাঁকে ডাক।" ভক্তরা তখন এইসব কথা অবাক হয়ে শুনত, বুঝতে পারত না এর মানে। এতদিনে তাঁর কৃপায় একটু বোঝা যাচ্ছে। (পৃঃ ৮২)

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।"

(ঈশ উপনিষদ্, ১৫)

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।"

(কেন উপনিষদ্, ২।৫)

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।"

(কঠ উপনিষদ্, ২।৩।৩)

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।।"

(ঐ, ২।৩।১৭)

—সমগ্র বিশ্ব ছেয়ে আছেন ঈশ্বর। ঋষিরা তা অনুভব করেছিলেন, পরে দর্শন করেছিলেন। ঋগ্বেদে সূর্য অগ্নি পবন ইন্দ্র—এসব দেবতার স্তুতি রয়েছে। এ দেখে কেউ কেউ বলেন, এসব প্রকৃতির উপাসনা। তা নয়। ঠাকুর দেখেছিলেন কাপড়ের টানাপোড়েনের মতো মা এই জগৎ জুড়ে রয়েছেন।

প্রকৃতির, nature-এর প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বেছে নিয়ে তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের স্তব এসব। এইসব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের অন্তর্যামিরূপে ভগবান রয়েছেন। তিনিই তাঁদের চালিত করছেন। তাঁরই ভয়ে অর্থাৎ শাসনে অগ্নি, সূর্য, মেঘ, বায়ু, মৃত্যু সব আপন আপন কাজ করছে। মানে এসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের, কর্মচারিগণের হৃদয়ে বসে তিনি এঁদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন—ঠিক যেমন মনুষ্যলোকে রাজার ভয়ে সকল কর্মচারীরা কাজ করে। এই অনন্ত বিশ্ব চলতে পারে না ঈশ্বরের শাসন ছাড়া। একটা পরিবার চলে না একজন প্রধানের সাহায্য ছাড়া।

ভোগে ডুবে থাকলে এসবে তাঁর হাত দেখা যায় না। তখনি বলে, প্রকৃতির শক্তিতে এইসব হচ্ছে। এ-প্রশ্ন করে না, প্রকৃতি—nature এই শক্তি পেল কোত্থেকে? তাই বেদে এই শ্রেণীর লোককে 'মূঢ়াঃ' 'অন্ধাঃ' বলেছেন। আর যারা এই অন্ধদের পরামর্শে চলে তাদের অবস্থা হয়, এক অন্ধ আরেক অন্ধকে চালিত করলে যেমন উভয়েই বিনাশপ্রাপ্ত হয়—ঠিক ঐরূপ। আর যারা ঋষিদের দৃষ্টি দিয়ে দেখে সংসারে চলে, তাদের অমৃতত্ব লাভ হয়। আর জন্মমরণ হয় না। Law of Causation-এর, মায়ার রচিত জন্মমরণ চক্রের বাইরে অমৃতময় আনন্দময় ধামে অবস্থান করে মৃত্যুর পরে এবং এই জীবনেও। তাদের কর্তাগিরি ঘুচে গেছে। পারাপারের এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন বিনাশের কর্তার কর্তাগিরির সঙ্গে মিশে গেছে। এই 'কর্তা'টাই যত গোল বাধায়। তাই ঋষিরা প্রার্থনা করছেন, সূর্যের ভিতর ঈশ্বরের রূপটি দেখার অভিপ্রায়ে—তোমার মুখের আবরণটি টেনে নাও, দর্শন দাও। ঠাকুর বলেছিলেনঃ "মা, পরদা না সরালে তাঁর দর্শন হয় না।" একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) বলেছিলেনঃ "তোমার আর ভয় নাই। মা টেনে নিয়েছেন।" প্রথমে প্রার্থনা করলেনঃ "এর ভার তোমার ওপর দিলাম। তোমার ইচ্ছা তাকে দর্শন দেওয়া, না দেওয়া।" আরেকবার বলছেনঃ "মা অত করে বললাম, তোর ভুবনমোহিনী রূপটি একবার দেখা। তুই তো ইচ্ছাময়ী, কারো কথা শুনবি না। মা, এ তোর কাছে দীনহীনভাবে বসে থাকে। দেখাও মা।" তারপর দেখালেন। তখন বলছেন ঐ কথাঃ "তোমার আর ভয় নাই। মা টেনে নিয়েছেন।"

ঠাকুর না এলে আমাদের কাছে উপনিষদের কথা কথার কথা হয়ে থাকত। তিনি নিজের জীবনে বেদ, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেছেন এক-আধবার নয়, সর্বদা—চব্বিশ ঘণ্টা। আমরা watch (সজাগ পরীক্ষার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ) করেছিলাম ঠাকুরকে চব্বিশ ঘণ্টা, যদি বা কখনো ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হন। কিন্তু হননি। রাত্রিতে শুয়ে আছেন, আর 'মা মা' করছেন। নিদ্রা তাঁর খুব কমই ছিল। একসঙ্গে পনের মিনিট, খুব জোর আধঘণ্টা। (পৃঃ ৮৪)

বলরাম-মন্দিরে সমাধির পর ঠাকুর বলেছিলেনঃ "তোমাদের সঙ্গে কতকাল বসে আছি, কখন থেকে বসে আছি, কোথায় বসে আছি, তা মনে নেই।" Time আর Space-এর (স্থান-কালের) জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল মায়াতীত অবস্থা। একটু নিচে নেমেছেন, তখনো নামরূপের জগতের জ্ঞান ফিরে আসেনি পূর্ণভাবে। সেই অবস্থায় বলেছিলেন—'ন্যাবা-লাগার অবস্থা।' কখনো একেবারে ডুবে যেতেন। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্রে ডুবে গিয়ে সমুদ্র হয়ে যায়। যেমন জলের বিম্ব জলে মিশায়। (পৃঃ ১৬০)

1886-এ আমরা গিয়েছিলাম কামারপুকুরে সরস্বতীপূজার ছুটিতে। ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের মধ্যে আমরাই প্রথমে যাই ওখানে। ঠাকুর তখন কাশীপুর উদ্যানে অসুস্থ। ফিরে এলে ঠাকুরের কত আনন্দ! বলেছিলেনঃ "দাও, রঘুবীরের প্রসাদ দাও।" হাতে দিলে মাথায় তুলে ঠেকালেন। ... রঘুবীরের প্রসাদ ঠাকুর গ্রহণ করেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ "হ্যাঁ, তুমি বিশালাক্ষী গিয়েছিলে?..." তাঁর যে-কালে বিশালাক্ষীর ওপর মনোযোগ হয়েছে, বুঝতে হবে ওখানে দেবী জাগ্রতা। তিনিই তো ঐরূপে ওখানে রয়েছেন। এই করেই তীর্থ হয়। কালে এইসব মহাতীর্থে পরিণত হবে। (পৃঃ ১৭৫)

আরেকবার বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি বললেনঃ "চেঙ্গিস খাঁর হুকুমে এক লক্ষ লোকের হত্যা হলো।... এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন। কৈ নিবারণের চেষ্টা তো করলেন না?..."

ঠাকুর এই কথা শুনে বলেছিলেনঃ "ঈশ্বরকে ঋষিরা বলেছেন, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন জগতের। কি জন্য বিনাশ করেন তা তিনিই জানেন।" পূর্বাপর সব না জেনে তাঁর সমালোচনা করতে নেই, ঠাকুর বললেন। যাঁরা কতকটা জেনেছিলেন তাঁরা—সেই ঋষিরা বলেছেন, এ তাঁর খেলা। যদি বল তাঁর খেলা, আমার তো প্রাণান্ত! তার উত্তর—এই তুমিও যে তিনি। একমাত্র কর্তা, সত্য বস্তু—জগতে তিনি। তুমি কোত্থেকে এলে নতুন কর্তা? (পৃঃ ১৪৪) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১১শ ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার
পরিমার্জনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসেতু স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই ভাষণটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

এত পরিপূর্ণতা ও সুসামঞ্জস্যের সঙ্গে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বাণী গ্রহণ করেছিলেন যে, যেকোন পশ্চিমী মানুষ তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারেন। কিন্তু একই সঙ্গে বিবেকানন্দ তাঁর নিজের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু ধারণ করতেন। তা হলো—পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ভাল অংশটি নিয়েও তার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত থাকার ক্ষমতা। এই 'অতিরিক্ত কিছু' যে বিবেকানন্দের মধ্যে অন্তর্লীন, এর জন্য তিনি তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঋণী। কারণ, সেটি শ্রীরামকৃষ্ণেরই মূল্যবান দান। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন মনীষী রোমাঁ রোলাঁ। তাঁর ভাষায় ঃ "I shall try to show how closely allied is this aspect of Vivekananda's thought to our own, with our special needs, torments, aspirations, and doubts, urging us ever forward, like a blind mole, by instinct upon the road leading to the light. Naturally I hope to be able to make other Westerners, who resemble me, feel the attraction that I feel for this elder brother, the son of the Ganga, who of all modern men achieved the highest equilibrium between the diverse forces of thought, and was one of the first to sign a treaty of peace between the two forces eternally warring within us, the forces of reason and faith." ("আমাদের চিন্তাধারার সহিত, আমাদের বিশেষ প্রয়োজনের সহিত, দুঃখ-যন্ত্রণার সহিত, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত, সন্দেহ-সংশয়ের সহিত যাহা আমাদিগকে অন্ধ প্রাণীর মতো কেবল অন্তর্নিহিত সহজ অনুভূতির তাড়নায় আলোকের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—তাহার সহিত বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা আমি দেখিতে চেষ্টা করিব। আমাদের এই গাঙ্গেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আধুনিক মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথমে চিন্তার বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ ভারসাম্য ঘটাইতে পারিয়াছিলেন এবং নিরন্তর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত দুই শক্তির—যুক্তির শক্তি এবং বিশ্বাসের শক্তির মধ্যে যাঁহারা প্রথম সন্ধি ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। তাই স্বভাবতই আমি আশা করি যে, আমার সহিত সাদৃশ্য আছে, এমন পাশ্চাত্য কর্মীদিগকে তাঁহার সম্পর্কে আমি আমার মতোই আকর্ষণ অনুভব করাইতে পারিব।")[২৩]

পাশ্চাত্যে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা বিকীর্ণ করার যে-কাজ বিবেকানন্দ শুরু করেছিলেন তাঁর আদর্শ ও তত্ত্বের আন্তর্জাতিক স্তরে উপস্থাপনের দ্বারা, তাঁর প্রয়াণের পরেও সেই কাজ চলছে। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আচার্যদেবের নামে যে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ত্যাগ ও সেবার আদর্শ তুলে ধরা। এই আন্দোলন পল্লবিত ও বর্ধিত হয়ে ভারতে এবং বহির্ভারতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মিলনভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলনের যে প্রেরণাদায়ী নীতিবাক্যটি বিবেকানন্দ ব্যবহার করেছিলেন তার মধ্যেও ঐ ভাব সুপরিস্ফুট ঃ "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—নিজের মুক্তি এবং জগতের হিতসাধন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতের মধ্যে সারা বিশ্ব এখন দেখতে পায় পৃথিবীর অন্যতম সুপ্রাচীন জাতিকে—যা মানবসমাজের প্রায় এক-সপ্তমাংশ জনগণের দ্বারা অধ্যুষিত এবং সেই জাতি দ্বারা এক নতুন যৌবনোচিত শক্তি ও কর্মোদ্যোগ গ্রহণ। ঠিক এখানেই আমরা লক্ষ্য করি বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও দৃষ্টির অন্তর্নিহিত শক্তি।

মাদ্রাজে 'The Work Before Us' শীর্ষক বক্তৃতার প্রারম্ভে বিবেকানন্দ প্রাচীন পৃথিবীর দুটি উন্নত অথচ ভিন্নমার্গীয় সভ্যতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—একদিকে প্রাচীন গ্রীকগণ, যাঁরা পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করেছিলেন বহির্বিশ্ব এবং অপরদিকে প্রাচীন হিন্দুগণ, যাঁরা দৃষ্টি দিয়েছিলেন আভ্যন্তরীণ জগতে। প্রথমটি উত্তরকালে পাশ্চাত্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছিল অনেকাংশে, অপরটি এই কাজ করেছিল প্রাচ্যে।

২৩ 'The Life of Vivekananda', pp. 175-176; বঙ্গানুবাদ—ঋষি দাস ('বিবেকানন্দের জীবন', পৃঃ ১২৪)

আধুনিক ভারতের নবজাগ্রত কর্মপরিধির মধ্যে ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমন্বয়-সম্ভাবনার দিকে তিনি তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যাতে ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যের অসাম্য দূর হতে পারে। তিনি বলেছিলেনঃ "আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এইসব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। মানবজীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে। আমরা উদারভাবে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সহিত মানবজীবনের সমস্যাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শিখিতেছি, আর যদিও আমরা প্রথমে ভ্রান্তিবশত আমাদের ভাবগুলিকে একটু সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, চতুর্দিকে যেসব উদার ভাব দেখা যাইতেছে, সেগুলি এবং জীবনের এই প্রশস্ততর ধারণাগুলি আমাদেরই প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ উপদেশের স্বাভাবিক পরিণতি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি প্রাচীনকালেই যেসকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই ভাবগুলি যদি ঠিক ঠিক কার্যে পরিণত করা যায়, তবে আমরা উদার না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য—নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, পরস্পরে ভাব আদানপ্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া—ক্রমশ সার্বভৌম ভাবে উপনীত হওয়া। কিন্তু আমরা শাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া ক্রমশ নিজেদের সঙ্কীর্ণতর করিয়া ফেলিতেছি, বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছি।"[২৪]

প্রেমের শক্তিতে ভারতের আধ্যাত্মিক বিশ্বজয়

ঐ একই বক্তৃতায় বিবেকানন্দ এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পক্ষে নিঃসন্দেহে জরুরী। বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধৃত করি—"পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি আবির্ভূত হইয়াছে; আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের উপাখ্যান ভারতের মহান সম্রাট অশোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ভারতকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন।... যখনি তোমরা অপরের জন্য কাজ কর, তখনই তোমরা শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়া থাক। যখনি তোমরা অপরের জন্য কাজ করিয়া থাক, বৈদেশিক ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাববিস্তারের চেষ্টা কর, তখনি তোমরা নিজেদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাজ করিতেছ, আর উপস্থিত সভা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে—তোমাদের চিন্তারাশি দ্বারা অপর দেশে জ্ঞানালোক-বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহা কিভাবে তোমাদেরই সাহায্য করিয়া থাকে।... এই দেশেই একথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায়। আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। জড়বাদ ও উহার আনুষঙ্গিক দুঃখগুলিকে জড়বাদ দ্বারা জয় করা যায় না। যখন একদল সৈন্য অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা করে তখন তাহারা মানবজাতিকে পশুতে পরিণত করে এবং ক্রমশ ঐরূপ পশুসংখ্যা বাড়িতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই পাশ্চাত্যদেশ জয় করিবে।"[২৫]

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের শিক্ষিত যুবকদের আধুনিক চেতনা গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তারা যেন সমাজ-পরিবর্তনের সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয় এবং জাতীয় ঐতিহ্যে যেসমস্ত আবর্জনা জমা হয়েছে সেগুলি দূরীভূত করে। একই সঙ্গে, তিনি জাতীয় ঐতিহ্যের অমলিন ও অবিনশ্বর উপাদানগুলির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ হলো স্বাধীন ও সাহসী এক বিজ্ঞানসম্মত ধর্মীয় ঐতিহ্য, যা তাঁর মহান আচার্যদেব নতুনভাবে সম্প্রসারিত করে তার প্রমাণসিদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যার জন্য আধুনিক বিশ্বের প্রবল আকুলতা। বিবেকানন্দ তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যমণ্ডলীকে এক চিঠিতে লিখছেনঃ "এগিয়ে যাও, বৎসগণ। সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উৎসুক নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেবল ভারতেই সে-জ্ঞানালোক আছে—ইন্দ্রজাল, মূক অভিনয় বা বুজরুকিতে নয়, আছে প্রকৃত ধর্মের মর্মকথায়, উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমময় উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্যে দিয়েও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন সময় হয়েছে। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেও না—এমনকি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেও না—খাড়া হয়ে ওঠ, ওঠ, কাজ কর।"[২৬]

বিবেকানন্দের মানবতাবাদ

ভারতবর্ষের প্রতি বিবেকানন্দের অকৃত্রিম ভালবাসা মানবসমাজের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমেরই ফসল। মানুষকে জাগ্রত করা, তার জন্মগত আধ্যাত্মিক চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর ব্রত। ভারতীয় ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি মানবসমাজকে দেখেছেন। তিনি বলতেন, আত্মা সদা পবিত্র, সদা মুক্ত, স্বাধীন ও অনন্ত। মানুষের সেই চেতনার জাগরণের মধ্যেই নিহিত মানবসমাজের সার্বিক বিকাশ, সমৃদ্ধি তথা

২৪ 'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫-১৬৬ ২৫ ঐ, পৃঃ ১৭১-১৭২
২৬ দ্রঃ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৬-৪৭৭

ভবিষ্যৎ। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ আগস্ট নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি মানবজাতির এই মৈত্রী ও ঐক্য বিষয়ে স্পষ্ট জানান : "ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশত লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণে'রই সেবক। যে-ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, সে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই জলসেচন করে না?

"কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে, সেটি—এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক'। সর্বদেশে সর্বজাতির পক্ষেই একথা সমভাবে সত্য। আমি বলিতে চাই, প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যই এ-তত্ত্ব আরো শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে। কারণ, এই চিন্তাসূত্রটির প্রণয়নে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি উৎপন্ন করিয়াই প্রাচ্যের সমুদয় ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত।"[২৭]

এই ঐক্যদৃষ্টি সপ্তম খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় দার্শনিক গৌড়পাদের একটি শ্লোকের মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে তিনি অদ্বৈতদর্শন সম্পর্কে বলেছেন :

"অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্।।"

আমি সেই ঐক্যবিধায়ক সুপরিচিত দর্শনকে প্রণাম করি যা জগতের মধ্যে সমস্ত কিছুর সংহতির শিক্ষা দেয়, যা সর্বভূতের সুখ ও মঙ্গল-সাধনে আগ্রহী এবং বিবাদ-বিসংবাদ ও বিরোধিতা থেকে মুক্ত।[২৮]

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ পৃথিবী

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত 'My Master' শীর্ষক বক্তৃতার এক স্থানে বিবেকানন্দ দুই ধরনের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেছেন। ভিন্নধর্মী দুই সংস্কৃতি—প্রাচ্যের সংস্কৃতি যা ধর্মের প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি যা প্রভাবিত হয়েছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ধ্রুববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। তিনি এই দুই সংস্কৃতির পরিপূরক ভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে, আধুনিক যুগ এক নতুন সংস্কৃতির অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করবে যা প্রাচ্যও নয়, পাশ্চাত্যও নয়—তা মানবসংস্কৃতি। এই নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মধ্যে এক সুস্থ আদানপ্রদান ও সমন্বয়ের মাধ্যমে : "যে-জাতি জড়শক্তিতে বড়, সে ভাবে জড়বস্তুই একমাত্র কাম্য, উন্নতি বা সভ্যতা বলিতে জড়শক্তির অধিকারই বুঝায়; আর যদি এমন কোন জাতি থাকে, যাহাদের ঐ শক্তি নাই বা যাহারা ঐ শক্তি চাহে না, তাহারা নগণ্য—তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার অযোগ্য, তাহাদের সমগ্র অস্তিত্বই নিরর্থক। প্রাচ্যদেশ হইতে উত্থিত বাণী একদা সমগ্র জগৎকে বলিয়াছিল—যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বের সবকিছু অধিকার করে অথচ তাহার আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে তাহাতে কি সার্থকতা? ইহাই প্রাচ্য ভাব, অপরটি পাশ্চাত্য।

"এই উভয় ভাবেরই মহত্ত্ব আছে, উভয় ভাবেরই গৌরব আছে। বর্তমান সমন্বয়ে এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য, উভয় আদর্শের মিলন হইবে।"[২৯]

অল্ডাস হাক্সলি প্রাচীন সভ্যতার মানুষকে বলেছেন 'জ্ঞানী অথচ বোকা' ('wise fools'), আধুনিক সভ্যতার মানুষকে বলেছেন 'বুদ্ধিমান অথচ বোকা' ('intelligent fools') এবং 'বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী নরনারী'র সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। বিবেকানন্দ যে-দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা, তা পরিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ নরনারীর সংখ্যাবৃদ্ধি করার পক্ষে। তিনি নিজেই ছিলেন বহু ভিন্নধর্মী মূল্যবোধের এক উল্লেখযোগ্য ও সুষম সংমিশ্রণ। প্রাচীন ও আধুনিক ভাব তাঁর মধ্যে মিশে গিয়েছিল। জওহরলাল নেহরুর ভাষায় : "যদিও তাঁর শিকড় ছিল অতীতের মধ্যে নিহিত এবং ভারতের ঐতিহ্যে তিনি গভীরভাবে গর্ব অনুভব করতেন, তবু জীবনের সমস্যাবলীর প্রতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিক। তাঁকে ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধনস্বরূপ বলা যায়।"[৩০] স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি রোমাঁ রোলাঁ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন, তার মধ্যে তিনি বিবেকানন্দকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল মিলনকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত করেন। তাঁর ভাষায় : "In the two words equilibrium and synthesis Vivekananda's constructive genius may be summed up. He embraced all the paths of the spirit—the four Yogas in their entirety, renunciation and service, art and science, religion and action from the most spiritual to the most practical. Each of the ways that he taught had its own limits, but he himself had been through them all, and embraced them all. As in a quadriga, he held the reins of all four ways of truth, and he travelled towards Unity along them all

২৭ 'বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫-১৪৬
২৮ মাণ্ডুক্যকারিকা, ৪।২
২৯ 'বাণী ও রচনা', ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭
৩০ দ্রঃ Discovery of India—Jawaharlal Nehru, p. 400

simultaneously. He was the personification of the harmony of all human Energy." ("ভারসাম্য ও সমন্বয়—এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন-প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানস-পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেসকল পথের কথা তিনি বলিয়াছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকটিরই স্ব-স্ব সীমা ছিল, কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটি পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চার ঘোড়ার গাড়ির মতো সত্যের চারিটি পথের বল্গাকে তিনি ধরিয়া থাকিয়া একই সঙ্গে সেই চারিটি পথের ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।")[৩১]

উপসংহার

বলা হয়ে থাকে, এথেন্স ছিল সমগ্র হেলেনিক বা গ্রীক-সভ্যতার মূল পীঠস্থান। আবার সমগ্র ইউরোপে গ্রীস ছিল এই ঘরানার প্রতিনিধি, যেখানে আধুনিক পাশ্চাত্যের সকল আধুনিকতাই ফুটে উঠেছিল। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষ ছিল সেরকম এক ক্ষেত্র, যার মধ্যে প্রাচ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা দিয়েছিল। সহজ ও সুন্দরভাবে নিজের মধ্যে গ্রীস ও ভারতবর্ষকে আত্মস্থ করে এবং সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়েছিলেন সমগ্র মানবসমাজের প্রতিভূ হিসাবে। তিনি আধুনিক মানবসমাজকে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নরনারীকে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতাকে অতিক্রম করে পরিপূর্ণ মানবরূপে বিকশিত হয়ে ওঠার চেতনা লাভ করতে পারে।*[সমাপ্ত] ❑

৩১ 'The Life of Vivekananda', pp. 281; ('বিবেকানন্দের জীবন', পৃঃ ২০০)

*** ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বাই প্রকাশিত পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর সুপরিচিত 'ইট্যারন্যাল ভ্যালুস ফর এ চেঞ্জিং সোসাইটি' গ্রন্থের (২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৬৮-৩৭৪) অন্তর্ভুক্ত 'দ্য মীটিং অফ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক ইংরেজী ভাষণের কিয়দংশের ভাষান্তর।**

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ

স্বামী নির্বাণানন্দ

ধর্মজীবনে সবকিছু নিজেকেই করতে হয়। শঙ্করাচার্য 'বিবেকচূড়ামণি'-তে বলছেন ঃ "ক্ষুধাদিকৃতদুঃখস্তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ।" (৫২) ক্ষুধা-তৃষ্ণার যে কষ্ট তা নিজেকেই খেয়ে বা পান করে দূর করতে হয়, অন্য কেউ খেলে বা পান করলে তা দূর করা যায় না। আমার ক্ষুধা অথবা পিপাসার সময় যদি অন্য কেউ আমার হয়ে খায় অথবা পান করে তাহলে কি আমার ক্ষুধা অথবা পিপাসা মেটে? ধর্মজীবনেও তাই। এখানেও অনুভূতি বা উপলব্ধি যাকিছু সব নিজেকেই লাভ করতে হয়। গুরু পথ দেখিয়ে দেন, শক্তিসঞ্চারও করেন, কিন্তু অনুভূতি বা উপলব্ধি নিজেকেই করতে হবে।

ধর্মজীবনকে সার্থক করতে গেলে ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরে অনুরাগ দরকার। ত্যাগ-বৈরাগ্য না থাকলে ঈশ্বরে অনুরাগ হয় না। সারদানন্দ মহারাজকে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "আপনাদের তো সব হয়ে গেছে, আপনারা আবার জপধ্যান করেন কেন?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "যাকে ভালবাসি তার কথা ভাবব না তো কি করব?" আমাদের একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ভগবানকে ভালবাস?" আমরা ইতস্তত করতে থাকায় বললেন ঃ "এই ভালবাসা অর্জন করতে হবে। স্মরণ-মননের মাধ্যমে সেই ভালবাসা দৃঢ় হয়। অর্জুনকে ভগবান বলেছিলেন, 'মামনুস্মর যুধ্য চ' (গীতা, ৮।৭)। 'যুধ্য চ মামনুস্মর'—এরকম বলেননি। কাজেই সবসময় জপধ্যান করে যেতে হবে।"

দীক্ষার মন্ত্র বা ইষ্টমন্ত্র শুধু পেলেই হলো না, তা ধারণের অধিকারী হতে হবে। নিত্য জপধ্যানের প্রত্যক্ষ লাভ হলো—একটা regular life-এর (নিত্যদিনের) অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়। জীবনটা ভগবানকেন্দ্রিক হয়ে যায়। কাজকর্মও করতে হবে। মাঠাকরুন নিজে করে দেখিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজে কত খাটতেন! ভোর তিনটেয় তাঁর রোজকার জীবন আরম্ভ হতো। তাঁর তো সব হয়ে গিয়েছিল, আবার কেন এত করা? আমাদের শিক্ষার জন্য। ধর্মজীবনে আলস্য এক বিরাট প্রতিবন্ধক। আমরা যদি নিদ্রাকে প্রশ্রয় দিই তাহলে কিছুই হবে না। ভোর চারটে, পৌনে চারটেয় ওঠা ভাল অভ্যাস। এইরকম রোজ উঠতে হবে আলস্য ত্যাগ করে। মাঠাকরুন নিজেই বলেছেন, একদিন দেরি করে ওঠাতে কিরকম আলস্য ধরে গিয়েছিল। স্বামীজী ও মহারাজরা সারা ভারত, পাহাড়-পর্বতে, বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, সাধুরা তপস্যার নামে অনেকে আলস্যে ও বৃথালাপে সময় কাটায়। সেজন্যই তো স্বামীজী এই "ঈশ্বরার্থ" নিষ্কাম কর্মের নতুন সাধনার প্রবর্তন করলেন। তিনি বললেন ঃ "সংসারেই থাক অথবা আশ্রমেই থাক, সব কাজকেই তাঁর কাজ মনে করে করলে ভগবানলাভ হয়। অভিমানাদি সব কোথায় চলে যাবে! জীবন সার্থক হবে।" শরীর থাক বা না থাক, গ্রাহ্য করলে চলবে না। উঠেপড়ে লাগতে হবে। আগে মঠে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দুবেলা থাকলেও সকালে টিফিনের প্রায় কোন বালাই ছিল না। মাঠাকরুনকে সে-কথা একদিন বললে তিনি বললেন ঃ "সাধু হতে এসেছ বাবা! কোথায় পড়ে থাকতে, এখানে দু-বেলা খেতে তো পাচ্ছ। খাওয়ার জন্য তো আর ভাবতে হচ্ছে না। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানকে ডাক।" আগে মঠে অসুস্থ সাধুদের জন্যও দুধের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। কই, তাতে তো কিছু অসুবিধা হয়নি।

ধর্মজীবনের জন্য যাদের আগ্রহ তাদের স্বাধ্যায় একটি বড় সহায়ক। ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা দৃঢ় করবার জন্যই শাস্ত্রাদি বা সৎগ্রন্থাদি পড়া দরকার। আমরা সারাদিন জপধ্যান নিয়ে থাকতে পারি না। কাজকর্ম বাদ দিয়ে বাকি সময়টার কিভাবে সদ্ব্যবহার করব? পড়াশুনা করতে হবে। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগের অধিকারী খুব কম। 'কথামৃত'-এ আছে, স্বামীজী, মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষরা যা করবেন তা আমরা অনুসরণ করতে সমর্থ না হলেও তাঁদের জীবন জগতের আদর্শ। তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য আসেন। স্বামীজীর সবই অসাধারণ ছিল। তাঁর বক্তৃতা নিছক বক্তৃতা ছিল না। তাঁর কণ্ঠে বাণী বসেছিল। স্বয়ং বাগ্‌দেবী তাঁর কণ্ঠে অধিষ্ঠান করতেন। মস্তিষ্কেও করতেন। Encyclopaedia Britanica-র দশ volume (খণ্ড) একবার দেখে নিলেন। সব মাথায় ধরা থাকল! এ কী আর সাধারণ মানুষের কর্ম! তাঁর বা তাঁদের জীবন অনুসরণ আমাদের পক্ষে অসাধ্য হলেও ধর্মজীবন সম্বন্ধে যখনি কোন সংশয় বা প্রশ্ন আসবে তখনি 'কথামৃত', 'মায়ের কথা', স্বামীজীর বই, ঠাকুরের পার্ষদদের জীবন ও বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। তা-ই হবে আমাদের guide (পথ-প্রদর্শক)। সাধন-ভজন ও বিচার না থাকলে বেশি পড়াশুনোয় অহঙ্কার আসার সম্ভাবনা, আবার বিরোধী মতের কেউ এলে তার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হবে। এই বিতণ্ডায় অশান্তি হবে। সেজন্য সাংখ্য, বেদান্ত ইত্যাদি পড়ে বিচার করে নিতে হবে, যেন বিপরীত ভাবের মধ্যে পড়ে নিজের ভাব বা ঠাকুরের ভাবটি গুলিয়ে না যায়। বৈষ্ণবদের তিনটি মত আছে—নিয়মনিষ্ঠা, ইষ্টনিষ্ঠা, আচারনিষ্ঠা। ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক রেখে আমাদের স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রাদি পাঠ ও বিচার করতে হবে।

ধ্যানজপে যে মন স্থির হয় না তার কারণ—(১) কাজকর্ম যে attitude (দৃষ্টিভঙ্গি) নিয়ে করি তাতে ত্রুটি, (২) গুরুবাক্যে অবিশ্বাস, এবং (৩) বাসনা। সৎ চিন্তা ও সৎ প্রসঙ্গ ছাড়া অপর সমস্তই ত্যাজ্য। দমে গেলে চলবে না, struggle (সংগ্রাম) করতে হবে। স্বামীজীর পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী ও কথোপকথনে পরিষ্কার বলা আছে—সেবা করবার সময় ভগবানবুদ্ধিতে করতে হবে। সকলের অন্তরে তিনি আছেন। ঠাকুরের কাজ মনে করে সব কাজ করতে হবে। আধিকারিক পুরুষেরাই সবসময় ধ্যানজপ নিয়ে থাকতে পারেন। সাধারণ মানুষ সদাসর্বদা ধ্যানজপ নিয়ে থাকতে পারে না। সেজন্য কাজ করতে হবে। স্বামীজী তাই

work and worship (কর্ম এবং সাধনা) পাশাপাশি করতে বললেন। সদাসর্বদা মনে রাখতে হবে, ঠাকুর বলেছেন—জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। মফঃস্বল থেকে কলকাতায় যেতে হলে যেমন বিভিন্ন পথে যাওয়া যায়, তেমনি আবার বিভিন্ন উপায়ে--বাস, ট্রেন, স্টীমার ইত্যাদির মাধ্যমে যাওয়া যায়। দেরি হলেও গন্তব্যস্থল ঠিক থাকলে যাওয়া যাবেই যাবে। কিছু লাভ করতে হলে পুরুষকার দরকার। ঠাকুর বলছেন ঃ আমাদের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। পুরুষকার বা সাধনার দ্বারা ভগবানলাভ করতে হবে। তবে কৃপাই হলো সাধনার শেষকথা। ঠাকুর বলছেন ঃ "কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুমি শুধু পাল তুলে দাও।"

মহারাজ আমাদের রাত তিনটের সময় ওঠা অভ্যাস করিয়েছিলেন। এই অভ্যাস বজায় রাখতে হলে দরকার তীব্র পুরুষকার। তিনি একদিন বলছেন ঃ "এখানে যারা আসে তাদের মধ্যে মাত্র এক শতাংশ লোক ধর্ম চায়। তাদের মধ্যে আবার মাত্র একজন কি দুজন ভগবানকে ঠিক ঠিক চায়। অনেকেই আসে হুজুকে পড়ে।" সেজন্য সকলের সঙ্গে মেশা ঠিক নয়। নির্বিচারে মেশার ভয় হলো, আমাদের মধ্যে তাদের ভাব এসে পড়বে। অন্য ভাব এসে গেলে নিজের ভাব তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। তাতে নিজের ভাব সম্পর্কে সংশয়, এমনকি অবিশ্বাসও আসতে পারে। তাতে তো নিজেরই ক্ষতি। সেজন্য 'ভাবের ভাবী'র সঙ্গে মিশতে হবে। আমাদের 'ভাবের ভাবী' কে বা কারা? যারা ঠাকুরকে তাদের আদর্শ বলে মনে করে তারা। অল্পবয়সে ধ্যানজপ করার অভ্যাস করা হলে ভবিষ্যতেও সেই অভ্যাসটা থাকবে। আর যদি আড্ডা দেওয়া অভ্যাস করা যায়, বুড়োবয়সে সেই আড্ডাটাই প্রধান অবলম্বন হয়ে থাকবে। "আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারো ঘরে।" এই অভ্যাসটি চাই। অবশ্য করা বড় শক্ত। আড্ডা দেওয়া বা গল্প করা বা অন্য ভাবের লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা ভাল নয়। তুলসীদাস বলছেন ঃ "হাঁ জী, হাঁ জী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম।" নিজের 'ঠাঁই'টি ঠিক রেখে সকলের সঙ্গে 'হুঁ হুঁ' করতে থাক।

ঠাকুরের ভাব হলো—আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা ঠিক ঠিক যেখানে থাকে সেখানে কোন গোঁড়ামি থাকতে পারে না। সেখানে বিনয় থাকবে, কিন্তু হীনম্মন্যতা থাকবে না। আত্মবিশ্বাস থাকবে, কিন্তু আত্মম্ভরিতা থাকবে না। সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিকতা বাড়াতে হবে। তবে জীবকোটি বড়জোর সমাধি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তারপরে আর ফিরে আসে না। ঠাকুর বলতেন ঃ "আমি লোকশিক্ষা দেব, বক্তৃতা করব—এ অভিমান ভাল নয়। মানুষ কাউকে শেখাতে পারে না।" পেট্রল তৈরি করতে হলে bye product (উপজাত) অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে পেট্রল। আমাদেরও সবসময় স্মরণ রাখতে হবে—আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য—ভগবানলাভ।

রোগের যেমন অব্যর্থ ওষুধ পেনিসিলিন, তেমনি তমোনাশের একমাত্র উপায় ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এগিয়ে যাওয়ার শক্তি তিনিই দেন। খিদে পেলে খেতে যাচ্ছি। যাওয়ার পিছনে চেষ্টা রয়েছে। এই চেষ্টাটা আমাকে করতে হবে, তিনি করে দেবেন—এটা প্রথম থেকে ভেবে নিলে যাওয়াটাই হবে না। যাওয়ার পথে দুঃখ, বাধা, কষ্ট তো থাকবেই। সব তিনি করছেন—এ-ভাব আসবে তাঁর ওপর নির্ভরতা সম্পূর্ণ হলে। দুঃখ, বিপদ জীবনে এলে তাঁর ওপর নির্ভরতা যেন চলে না যায়। দুঃখ-কষ্ট তো জীবনে আসবেই। মানুষের তিনরকম স্বাভাবিক দুঃখ বা কষ্ট। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। কষ্টভোগ করতেই হয়। হরি মহারাজ বলতেন ঃ "দুঃখ জানে আর শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থেকো।" এমন কথা তো 'কথামৃত'-এও রয়েছে। স্বামীজীর লেখা ঠাকুরের আরাত্রিক-ভজনে সব পাওয়া যায়—গভীর তত্ত্ব—ঈশ্বরনির্ভরতা, সাকার, নিরাকার সব কিছু। কিভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে তাও আছে ঐ ভজনের মধ্যে। সেখানে স্বামীজী ঠাকুরকে বলছেন—'নিষ্কারণ'। তিনি কোন কারণ ব্যতিরেকেই আমাদের কৃপা করেন। মানুষ যে কার্য করে তার পিছনে একটা কারণ থাকে। কিন্তু ভগবানের কার্যে কারণ নেই। যদিও গীতায় আছে—যারা আমার শরণাগত তাদের আমি মায়ার রাজ্য থেকে উদ্ধার করি। অর্থাৎ তাঁর আশ্রিতদের তিনি কৃপা করে থাকেন। কিন্তু তাঁর যে আশ্রয় নেবে আশ্রয় নেওয়ার সেই বুদ্ধিটা তো তিনিই দেবেন। কাজেই কার্য ও কারণ বা দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কোন্‌টা বলবান? শেষ বিচারে ঠাকুরের মতে কারণ বা পুরুষকার বলে কোন কথাই নেই। তাঁকে লাভ করবার চেষ্টাটিও তিনি দেবেন। সবটাই তাঁর কৃপা। তাঁর কৃপা ছাড়া, ঠাকুর বলতেন, গাছের পাতাটিও নড়ে না। কারণ, তিনি যে সমস্ত কিছুর নিয়ামক। তাঁকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা, ধ্যানজপের প্রবৃত্তি, সৎসঙ্গ লাভ বা সৎগ্রন্থ পাঠের বাসনা তিনিই দেবেন।

ধ্যানজপের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে ভগবানলাভ হয়। কিন্তু তাঁতে নির্ভরতা এলে ওসব এমনিই হয়ে যায়। ছোট শিশু মা ছাড়া আর কিছু জানে না। মা যদি তাকে কোল থেকে ফেলেও দেয়, সে ডাক ছেড়ে 'মা' 'মা' বলেই কাঁদে। সে জানে যে মা ছাড়া আর গতি নেই। কৃপায় কোন নিয়ম নেই। দেখা ভগবান দেবেন যখন তাঁর খুশি হবে। তিনি তো আর কোন নিয়মের অধীন নন। কৃপায় কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। তাঁকে 'মা' বলি অথবা 'ভগবান' বলি, কৃপা তিনিই করবেন। তিনি আমাদের বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন, শাস্ত্র বলে দিয়েছে তাঁকে পাওয়ার পথ, গুরু বলেন সেই পথে যাওয়ার কৌশল। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। অভিমান যত কমবে, ততই ভগবানের কৃপা অনুভব করতে পারা যাবে। কৃপা তো রয়েছেই, কৃপা ধারণা করতে হবে। আমাদের কাজ হলো—কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার ত্যাগ করে তাঁকে ডাকা। ধ্যানজপ মানে সকালে একঘণ্টা, সন্ধ্যায় একঘণ্টা নয়—সর্বদা স্মরণ-মনন। আসনে বসেই শুধু স্মরণ-মনন নয়—সব কাজের মধ্যে, কাজ করতে করতে, এমনকি

ঘুমোতে ঘুমোতেও স্মরণ-মনন চলবে। একদিনের কি একমাসের অভ্যাসে তা হবে না, কিন্তু হবে। লেগে থাকতে হবে। হবেই হবে।

শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) খুব পরিপাটি থাকতেন। জিনিসপত্র খুবই গোছগাছ করে রাখতেন। কেদারবাবাও (স্বামী অচলানন্দ) সেইরকম থাকতেন। তাঁর জিনিসপত্রও খুব গোছানো থাকত। অবশ্য খুব যে বেশি জিনিসপত্র থাকত তা নয়। তিনি বলতেন ঃ "জপধ্যান মানে সকালে একঘণ্টা, সন্ধ্যায় একঘণ্টা করলাম, তা নয়। কতটা সময় তাঁর ভাবে থাকতে পারছি—সেইটাই হবে জপধ্যানের মাপকাঠি।" অর্থাৎ ঐ যে গোছানো স্বভাব, এটাও জপধ্যানের ফল। জপধ্যানের মাধ্যমে আমাদের আচার-আচরণ সব disciplined (শৃঙ্খলাবদ্ধ) হয়ে যায়। তা থেকে বোঝা যায়, জপধ্যান ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা। অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ ও সব আচরণই যেন আমাদের জপধ্যান। ঠিক ঠিক জপধ্যানের মাধ্যমেই আমাদের জীবন অমনটি হয়।

শাস্ত্র পড়া মানে যেন চিঠি পড়া। চিঠিটি হয়তো খুবই ছোট। কিন্তু তার মধ্যেই থাকে আসল কথাটি। চিঠিটি পড়লে যেমন চিঠির মূল বক্তব্য জানা হয়ে যায়, তেমনি শাস্ত্র পড়লে তাঁর সম্পর্কে মূল তত্ত্বগুলি জানা যায়। কেউ যদি বলে, শাস্ত্র পড়েছি জানবার জন্য, তাহলে সে তো জানবার জন্য পড়ছে, স্বাধ্যায়ের জন্য নয়। 'স্বাধ্যায়' মানে হলো আত্মজ্ঞানের উপায়রূপে শাস্ত্রাদি পাঠ। কথাটা এই—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। তা বুঝবার জন্যই তো স্বাধ্যায় ও সাধনভজন। শাস্ত্রে আছে কি? আছে আত্মোপলব্ধির কথা। কিন্তু আধারবিশেষ। যার যেদিকে ঝোঁক, ঠাকুর তাকে সেইদিকে পথ বলে দিতেন। গুরু ঠিক করে দেন তাঁর শিষ্যরা কে কোন্ শাস্ত্র পড়বে। তিনি জানেন কার কিরকম স্বাধ্যায়, আত্মোপলব্ধি বা ভগবান-দর্শনের জন্য তা কতখানি উপযোগী হবে। স্বামীজীকে ঠাকুর 'অষ্টাবক্রসংহিতা' পড়তে দিয়েছিলেন, কিন্তু মহারাজকে তা শুনতেও মানা করতেন। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা কত মত স্থাপন করেছেন! কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে সব ভাবই রয়েছে। কোন ভাবকেই তিনি ছোট মনে করেননি। তিনি বলেছেন, আধারভেদে, সাধনার স্তরভেদে সবগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাধারণ ভক্ত ও সাধকদের মনে রাখতে হবে যে, বিচারের জন্য পড়াশুনা প্রয়োজন, কিন্তু ধ্যানজপই তাঁকে পাওয়ার প্রশস্ত উপায়।

ধ্যানজপ, সাধনভজন চলবে, কিন্তু মন-প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনার শক্তিতে বিশ্বাস করতে হবে। জ্ঞানমার্গীরা বলবে ঃ 'জ্ঞান দাও'। সাকারবাদীরা বলবে ঃ 'কৃপা কর'। প্রার্থনা যদি অন্তর থেকে হয় তবেই তিনি শুনবেন। যদি শুধু মুখস্থ বলার মতো হয়, তাহলে তাতে কিছুই হবে না, শুধু বলাই সার। প্রার্থনার সময় ভাবতে হবে, সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্তা যিনি, তিনি আমার প্রার্থনা শুনছেন। তিনিই আমার যা দরকার সব যোগাবেন, আমার ভাবনার কিছুই নেই। কর্ম অনুযায়ী, প্রারব্ধ অনুযায়ী আমরা ফলভোগ করি। স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের জীবনী পড়লে দেখি, তাঁদের সবকিছুর মূলে ছিল নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা। জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ, ভজন-কীর্তন, ব্যায়াম, পড়াশুনা, কাজকর্ম ইত্যাদি তো মনটাকে engage (বিজড়িত) করবার জন্য। সাধনভজন করতে করতে দেখব, ভগবান সব অনুকূল করে দিচ্ছেন, তিনিই সব জুগিয়ে দিচ্ছেন। সাধনের জন্য গুরুবাক্যে বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন। গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করতে হবে। ভগবানই গুরুরূপে আসেন ও দীক্ষা দেন। যেকোন কাজ করবার সময় মনে এই ভাব আনতে হবে যে, এর মাধ্যমে ভগবানের সেবা করছি। স্মরণ-মনন করছি। সবসময় বিচার করতে হবে, মনে কি আছে analysis (বিশ্লেষণ) করতে হবে। মন যত শুদ্ধ হবে, তত ভিতরের গোলমালটা ধরা পড়বে। স্বামীজী একবার ক্ষুধার্ত হয়ে গ্রামের মধ্যে এসে এক গাছতলায় বসেছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, আমি লোকালয় অধ্যুষিত জায়গায় এসে বসলাম কেন? লোকে মনে করবে, মস্ত এক মহাত্মা এসেছেন। শেঠরা আসবে, পূজা করবে, এইজন্য? তখনি স্থান ত্যাগ করে স্বামীজী অন্য জায়গায় চলে গেলেন। এই আত্ম-বিশ্লেষণ ধর্মজীবনে একান্ত প্রয়োজন। ❑

---

* গত ১৭ ও ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ নরেন্দ্রপুর আশ্রমে পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি নিরীক্ষা

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

[২]

গীতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল আমেরিকায় 'গীতা'-বিষয়ক বক্তৃতায় বলেছেন: "To understand the Gita requires its historical background."[১৭] অর্থাৎ গীতা বুঝতে হলে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকাটিকেও জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অসামান্য নিবন্ধ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'[১৮]-তে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

গীতা মহাভারতে স্থাপিত, তারই অংশ। সেজন্য গীতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা মহাভারতেরও ঐতিহাসিক পটভূমিকা। অবশ্য পূর্বোক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মত—গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। আজকের ভারতের বস্তুবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যাতাদেরও তাই-ই অভিমত। কিন্তু আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অভিমত অন্যরূপ।

রবীন্দ্রনাথ গীতা সম্বন্ধে তাঁর অতুলনীয় মূল্যায়নে বলেছেন: "আতসকাঁচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আরেক পিঠে যেমন তাহারই দীপ্তরশ্মি, মহাভারতেরও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আরেকদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা।"[১৯] এখানে সুস্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ গীতাকে মহাভারতের সংহত রশ্মি অর্থাৎ অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন। এসম্পর্কে তিনি আরো বলেন: "নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোন সমস্যার মীমাংসা, কোন তত্ত্বের নির্ণয় করিতেছে—ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোন একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে। নিজের এই সন্ধান ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না। অনেকে মনে করেন, পথের ইতিহাসই ইতিহাস, নিজ অভিপ্রায় বা চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের চরম তত্ত্বকে দেখিয়াছিল।"[২০]

ভারতের ইতিহাসের চরম তত্ত্বই গীতা

এই চরম তত্ত্বটি কি? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "মানুষের ইতিহাসে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম অনেক সময় স্বতন্ত্রভাবে, এমনকি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে। সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়া ঘটিয়াছে বলিয়া এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে, মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোটিকে জ্বালাইয়া ধরিয়াছে, তাহাই গীতা।"[২১]

এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রবীন্দ্রনাথ ভগবদ্গীতাকে ভারত-ইতিহাসের চরম তত্ত্ব ও মর্মবাণী বলে অভিহিত করেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি ভারতের ইতিহাসের আরো একটি সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর ভাষায়—"ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার উপনিষদ্, তাহার গীতা, রামায়ণ তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক সমস্ত কিছু—এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী, তাহার শ্রীকৃষ্ণ, তাহার রামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধের অধিনায়ক।"[২২] এখানেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ প্রভৃতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং প্রাচীন ভারতের দুই ধর্মনায়কের ইতিহাসের মহানায়ক হিসাবে যে ভূমিকা তা উদ্ঘাটিত করেছেন। এখানে উপনিষদ্, গীতা ও রামায়ণের ওপর রবীন্দ্রনাথের যে গভীর শ্রদ্ধা তাও উদ্ভাসিত হয়েছে।

গীতার ঐতিহাসিক পটভূমি: প্রাচীন সমাজ-বিপ্লব

আজকের বস্তুবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যাতাদের দৃঢ় মত—গীতা কেবলই একটি কাব্য, কবির কল্পনামাত্র। এই মত

১৭ 'Complete Works', Vol. I, p. 446   ১৮ ইতিহাস, বিশ্বভারতী, ১৩৬২, পৃঃ ১২-৫৫

১৯ ঐ, পৃঃ ৪০   ২০ ঐ   ২১ ঐ   ২২ ঐ

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরও। এঁদের মতে গীতার পশ্চাতে যদি কোন ইতিহাস থেকে থাকে, তা হলো এই যে, একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে অর্থাৎ ভেদ-বৈষম্যমূলক বর্ণাশ্রম প্রথাকে ব্রাহ্মণদের স্বার্থে কায়েম করবার জন্য একে সৃষ্টি করা হয়েছে ব্রাহ্মণদের দ্বারাই; তাদের লক্ষ্য ছিল উচ্চবর্ণের স্বার্থে নিম্নবর্ণের লোকেদের দমন-পীড়ন ও শোষণ করা।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য তিলক, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মনীষিগণ যা বলেছেন তা বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গীতার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এর ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমিকাও ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রাচীন সমাজবিপ্লব, গীতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রশ্ন

স্বামী বিবেকানন্দ ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল 'কৃষ্ণ' সম্বন্ধে একটি অনবদ্য ভাষণে বলেনঃ "Almost the same circumstances which gave birth to Buddhism in India surrounded the rise of Krishna....

"This was the great work of Krishna, to clear our eyes and make us look with broader vision upon humanity in its march upward and onward. His was the first heart that was large enough to see truth in all, his first lips that uttered beautiful words for each and all.

"This Krishna preceded Buddha by some thousand years."[২৩]

অর্থাৎ যে সামাজিক অবস্থায় বুদ্ধের আবির্ভাব, প্রায় অনুরূপ অবস্থায়ই কৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁর মহান কীর্তি সকলের দৃষ্টির বাধা দূর করে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি সহায়ে মানুষকে ঊর্ধ্বে ও সম্মুখে অগ্রগতির লক্ষ্যে স্থাপিত করা। তাঁর মধ্যেই সেই বিশাল হৃদয় সর্বপ্রথম দেখা যায়, যা সত্যকে সমগ্রভাবে ধরতে পেরেছিল। তাঁরই মুখে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল সকল মানুষের জন্য সমান কল্যাণেচ্ছার বাণী। তিনি বুদ্ধের চেয়ে কয়েক সহস্র বছর পূর্বেই আবির্ভূত হন।

গীতার মধ্যে যে একটি সমাজবিপ্লবের বাণী আছে তা স্বামীজীর এই কথাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। সেটি আরো স্পষ্ট হয়েছে গীতা বিষয়ে তাঁর পরবর্তী একটি ভাষণে (সান ফ্রান্সিস্কো, ২৬ মে ১৯০০), যেখানে তিনি বলেছেনঃ "Whenever any religion succeeds it must have an economic value. Thousands of similar sects will be struggling for power, but only those who meet the real economic problem will have it."[২৪] অর্থাৎ যখনি কোন ধর্ম সফল হয় তখন বুঝতে হবে যে, তার একটি অর্থনৈতিক মূল্য আছে। বহু ধর্মসম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্রয়াস করতে পারে, কিন্তু সফল হবে সেই সম্প্রদায় যার কাছে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আছে।

ধর্মের সঙ্গে অর্থনৈতিক শক্তির যে দৃঢ় সম্বন্ধ আছে তারই স্বীকৃতি আছে এখানে। এখানে বিবেকানন্দ যা বলতে চাইছেন তা হলো এই যে, জনসাধারণের অর্থনৈতিক অভাব পূরণ করতে পারে যে-ধর্ম তাই-ই জনগণের হৃদয় জয় করতে পারে। গীতা তা পেরেছিল—এটাই এখানে তাঁর বক্তব্য। না হলে এই প্রসঙ্গটি তিনি গীতা সম্পর্কিত আলোচনায় আনবেন কেন? এপ্রসঙ্গে তিনি আরো যা বলেছেন তা থেকেও একথা স্পষ্ট—"The religion of the Upanishads was a hard task, very little economy is there, but tremendous altruism."[২৫] অর্থাৎ উপনিষদেও উদারতা প্রচুর ছিল, কিন্তু জনসাধারণের অর্থনৈতিক চাহিদার পূরণ তাতে ছিল না। সবটুকু একসঙ্গে পড়লে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উপনিষদ্ জনগণের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনি, কিন্তু গীতা পেরেছিল।

অবশ্য গীতায় অর্থনৈতিক সাম্য বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না। তবে ঈশ্বরের শরণ নিলে উচ্চ-নীচ সকলেরই মুক্তিলাভ হয়—একথা গীতায় আছে (৯।৩২)। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তখন সব অধিকারেরই ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা। যা গীতায় স্পষ্ট করে বলা নেই তা ভাগবতে বলা হয়েছেঃ সর্বজীবে যথাযোগ্যভাবে অন্নাদির সংবিভাগও ধর্ম। (৭।১১।১০)

আবার বলা হয়েছেঃ সকলেই ক্ষুধা ও প্রয়োজনের অনুরূপ অন্ন পেতে পারে। তার বেশি ছলে-বলে যে অধিকার করে সে দণ্ডার্হ। (৭।২৪।৮)

একথা বলা যেতে পারে যে, ভাগবত গীতার অনেক পরে রচিত। কিন্তু একই ভাবধারার অংশীদার এই উভয় গ্রন্থ এবং ঘটনা একই সময়ের; যদিও পরবর্তী সময়ে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে ভাগবতে, এই যা। গীতা ও ভাগবতে প্রবক্তাও একজন—শ্রীকৃষ্ণ। যাই হোক, ভাগবতেও একই সমাজ-বিপ্লবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়।

বেদের কর্মকাণ্ড ও গীতা—সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে

গীতার কালের সমাজবিপ্লবের প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর উপরি উক্ত ভাষণে।

---

২৩ 'Complete Works', Vol. I, pp. 441-442

২৪ Ibid., p. 454 ২৫ Ibid., p. 455

বিবেকানন্দের মতে সঙ্ঘর্ষ শুরু হয়েছিল ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে এবং বেদের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড-বাদীদের মধ্যে। এই সঙ্ঘর্ষে জনগণ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়েছিল, কারণ তারা কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া-আচার তবু বুঝতে পারত, কিন্তু উপনিষদের দার্শনিকতার মর্ম বোঝার সাধ্য তাদের ছিল না। এই ত্রিমুখী সঙ্ঘর্ষ সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করেছিল। এর প্রায় হাজার বছর পরে বৌদ্ধধর্ম প্রাদুর্ভাবের কালে এই সঙ্ঘর্ষ পুনরায় প্রবল আকার ধারণ করে। বৌদ্ধধর্ম জনগণকে কর্মকাণ্ডের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছিল, কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ড পরে বৌদ্ধধর্মকেই গ্রাস করে অন্য আকারে।

যাই হোক, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে কৃষ্ণের আবির্ভাবের কালেও এই সঙ্ঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করেছিল। কৃষ্ণ বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। এসম্পর্কে বিবেকানন্দ বলছেন : "So the great struggle began in India and it comes to one of its culminating points in the Gita. When it was causing fear that all India was going to be broken up... there rose the man Krishna, and in the Gita he tries to reconcile the ceremony and the philosophy of the priests and the people."[২৬]

অর্থাৎ তখন পুরোহিতবর্গের কর্মকাণ্ডে ও উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে এবং জনসাধারণের লোকবিশ্বাসের মধ্যে সেই যে প্রচণ্ড সঙ্ঘাত ঘটেছিল, কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় এগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তার সমাধান করলেন; না হলে সে-সঙ্ঘর্ষের উত্তাল তরঙ্গপ্রবাহে সারা ভারতবর্ষ ভেঙে চুরমার হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

বস্তুত, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদের কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা হয়েছে, বলা হয়েছে—অবিবেকী পুরুষগণ বেদোক্ত কর্মের প্রশংসায় অনুরক্ত। স্বর্গাদিফলপ্রদ কর্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নেই—তাঁরা এমন বিশ্বাসই করেন। তাঁরা কামনাযুক্ত ও স্বর্গকামী এবং তাঁরা এই যে ভোগপ্রাপ্তি এবং ঐশ্বর্যলাভের উপযোগী ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করতে থাকেন এগুলি অনুষ্ঠানের ফলে মানুষকে জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়তে হয়। এসকল বাক্যে যারা আসক্ত হয় তাদের বিবেকপ্রজ্ঞা হয় না। (২।৪২-৪৪)

কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়েই যজ্ঞের প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে-যজ্ঞ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হয় তা বন্ধনের কারণ হয় না (৩।৯) এবং এও বলা হয়েছে যে, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে সংবর্ধনা কর এবং দেবতাগণ বৃষ্টিপাত প্রভৃতির দ্বারা শস্যাদি উৎপাদন করে তোমাদের অনুগৃহীত করবেন (৩।১১)। এছাড়া আরো বলা হয়েছে, যে সদাচারিগণ যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন (৩।১০)।

এখানে মনে হয় যেন, গীতায় স্ব-বিরোধিতা বা আত্মখণ্ডন আছে। কিন্তু আসলে তা নয়। বিষয়টি বিবেকানন্দ তাঁর প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।[২৭] তিনি বলেছেন : "সকলে উচ্চ দার্শনিক চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু যে যে-পথ দিয়েই আসুক না কেন পৌঁছাবে সেই একই লক্ষ্যে।" সেজন্য কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেও কৃষ্ণ লোকবিশ্বাসের যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন একটি শর্তে যে, সবকিছু নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে এবং ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় করতে হবে। নিষ্কাম হয়ে করতে হবে এবং সকাম ভাবনা ছেড়ে দিয়ে করতে হবে। এখানে যজ্ঞাদির অর্থই পালটে গিয়েছে, তা আর পূর্বোক্ত বৈদিক কর্মকাণ্ডে নেই—পরিণত হয়েছে নিষ্কাম কর্মযোগে।

রবীন্দ্রনাথ গীতায় যজ্ঞ প্রসঙ্গে বলছেন : "এমনকি গীতায় যজ্ঞকেও সাধনক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞ ব্যাপার এমন একটা বড় ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যেসকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন, তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ—এইরূপে গীতায় ভূমার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে-চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল, গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখিয়াছেন।"[২৮]

---

২৬ 'Complete Works', p. 457

২৭ "Krishna saw plainly through the vanity of all the mummeries, mockeries and ceremonies of the old priests, and yet he saw some good in them."

"If you are a strong man, very good. But do not curse others who are not strong enough...."

"So the ceremonials, worship of gods, and myths are all right, Krishna says... Why? Because they all lead to the same goal. Blame no view of... religion so far as it is sincere..."

"And he says—'None can go a day out of my path. All have come to me, whoever wants to worship me in whatsoever form, and through that I will meet him.' " ('Complete Works', Vol. I, pp. 439-440)

২৮ ইতিহাস, পৃঃ ৪১

মোটের ওপর গীতায় যে প্রাচীন সমাজবিপ্লবের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা ঐতিহাসিক—এতে কোন সন্দেহ নেই। স্বামীজীর অমূল্য গীতা-ভাষণের মধ্যে তা সুস্পষ্ট।

এই মহাবিপ্লবে কৃষ্ণ ছিলেন সম্পূর্ণরূপে জনগণের পক্ষে। তাদের অধিকার প্রদান, তাদের অভাব পূরণ—এটাই তিনি এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে সম্পন্ন করতে চেয়েছেন। এটি স্বামীজী তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। সেজন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কৃষ্ণ জনগণ-মনে রাজ-অধিকার রূপে পূজা পেয়ে আসছেন। বিবেকানন্দ সে-কথাও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন ঃ "Five thousand years have passed and he has influenced millions and millions... over the whole world."[২৯] অর্থাৎ পাঁচ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, ইতিমধ্যে তিনি সারা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত করেছেন।

রামায়ণ ও মহাভারতে সমাজবিপ্লব

রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছেন। তিনিও বলেছেন, যে-মহাভারতে গীতা সংস্থাপিত, গীতা যার জ্যোতিশ্ছটা তা আসলে এক প্রাচীন সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস। অথচ আজ এই ভ্রান্তমত প্রচার করা হচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতকে শুধুমাত্র সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন, ইতিহাস কিংবা অবতারকাহিনীর স্বীকৃতি দেননি![৩০] কিন্তু প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোক্ত 'ইতিহাস' নামক পুস্তিকায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ "গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যের মূল বিষয় ছিল প্রাচীন সমাজ-বিপ্লব অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। রামায়ণের কালে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট দেখা যায়... বশিষ্ঠের বিরুদ্ধ পক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন।... ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহকচণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে, শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন—এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিয়া... তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে, তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন...। তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতুবন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।"[৩১] তাহলে দেখা যাচ্ছে রামায়ণও ইতিহাস, নিছকই কবিকল্পনাপ্রসূত কাহিনী বা মহাকাব্য মাত্র নয়, আর্য-অনার্যের প্রাক্ মিলন-পর্বের সামাজিক বিপ্লবের ইতিহাস—যে-ইতিহাস অত্যন্ত সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

গীতা ও অবতার প্রসঙ্গ

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ অবতার প্রসঙ্গও বাদ দেননি। উপরি উক্ত রামায়ণ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ঃ "রামচন্দ্র এই যে বানরদিগকে বশ করিয়াছিলেন, তাহা রাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হনুমানের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, যেকোন মহাত্মাই বাহ্যধর্মের স্থলে ভক্তিধর্ম দেখাইয়াছেন তিনি স্বয়ং পূজালাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, খ্রীস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।... রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন নাই।"[৩২]

মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব

রামায়ণের মতোই মহাভারতও যে একটি অসাধারণ সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস সে-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ "প্রাচীনকালের এই মহাবিপ্লবের আর যে একজন প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি একদিন পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। সেই জরাসন্ধ রাজা তখনকার ক্ষত্রিয়দলের শত্রুপক্ষ ছিলেন। তিনি বিস্তর ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়িত করিয়াছিলেন।... এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ইহা একটি খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া দুইদল হইয়াছিলেন। সেই দুইদলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন—পরবর্তী কালের সেই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পুরাকালীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার একদিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ। বিরুদ্ধপক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ ও কৃপ, অশ্বত্থামাও বড় সামান্য ছিলেন না।"[৩৩]

মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ

---

২৯ 'Complete Works', Vol. I. p. 457

৩০ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা—জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাইড পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৪

৩১ ইতিহাস, পৃঃ ২৭-৩০ ৩২ ঐ, পৃঃ ৩১

৩৩ ঐ, পৃঃ ২২-২৩

সিদ্ধান্ত ঃ "আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞানুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্ত।"[৩৪]

রাজশেখর বসু তাঁর মহাভারতের সারাংশ অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে নিজস্ব মতটিও এই সিদ্ধান্তের অনুকূলেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "অল্প বা অধিক যাই হোক, মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে তা সর্বজনস্বীকৃত। আখ্যানমধ্যে বহু বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার সততায় সন্দেহের কারণ নেই। দ্রৌপদীর বহুপতিত্বের দোষ ঢাকবার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছে। তিনি যদি শুধু গল্পই লিখতেন তবে এই লোকাচারবিরুদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করতেন না। তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত জনশ্রুতি বা ইতিহাস মানতে হয়েছে, তাই তিনি এ-ঘটনাটি বাদ দিতে পারেননি। আখ্যানভাগের মধ্যে দ্রোণপত্নী কৃপীর উল্লেখ অতি অল্প, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে 'অল্পকেশী' বলা হয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তাঁর রূপ, বেশ ও গন্ধ কুৎসিত ছিল, ভীম মাকুন্দ ছিলেন, মাহিষ্মতীপুরীর নারীরা স্বৈরিণী ছিল, মদ্র ও বাহ্লীক দেশে স্ত্রী-পুরুষ অত্যন্ত কদাচারী ছিল, যাদবগণ মাতাল ছিলেন, হিমালয়ের উত্তরে বালুকার্ণব ছিল, লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্র নদ) এত বিশাল ছিল যে, তাকে সাগর বলা হতো। দ্বারকাপুরী সাগর-কবলিত হয়েছিল—ইত্যাদি তুচ্ছ ও অতুচ্ছ অনেক বিষয় গ্রন্থ-মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে যা সত্য বলে মানতে বাধা হয় না।"[৩৫]

গীতা চিরন্তন বিপ্লব দর্শন

সুতরাং এ-সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে, রামায়ণ বা মহাভারত পরিকল্পিত উপন্যাস মাত্র নয়, তা ভারতের জনজীবনের, ভারতীয় মহাজাতির প্রকৃত ইতিহাস। জনজীবনের বিন্যাসকে কেন্দ্র করে প্রাচীন সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস। আর এই প্রাচীন সমাজ-বিপ্লবের অগ্নিক্ষরা বাণীগুলি ধৃত হয়ে আছে 'গীতা' নামক জগতের অতুলনীয় মহাগ্রন্থে। গীতা একই সঙ্গে জীবনসত্যের দর্শন, আবার সমাজ-বিপ্লবেরও দর্শন। প্রত্যেক সমাজ-বিপ্লবের মূলে থাকে একটি অগ্নিক্ষরা দর্শন। প্রাচীন সমাজ-বিপ্লবের দর্শন ছিল এই গীতা, তবে গীতা আবার চিরন্তন বিপ্লব-দর্শনও। সকল কালেই সকল প্রকার সমাজ-বিপ্লবের প্রেরণা যোগাতে পারে এই গীতা, এটি এমনই একটি আশ্চর্য সম্পদের আধার। সেজন্যই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনাকালেও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের পথপ্রদর্শক হতে পেরেছিল গীতা, তাদের আত্মবলিদানে প্রেরণাও দিয়েছিল এই গীতা। আবার অধ্যাপক আর্নেস্ট হরউইচ (Earnest Horrwitz)-এর মতে গীতা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরও দর্শন।[৩৬] এই শেষোক্ত বিষয়টি আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। [ক্রমশ]

---

৩৪ ইতিহাস, পৃঃ ৩৯

৩৫ মহাভারত (সারাংশ অনুবাদ), ভূমিকা

৩৬ Prabuddha Bharat, February 1936

অনুষ্ঠান-সূচী (আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৪০৬)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১৬ আশ্বিন	রবিবার	৩ অক্টোবর	১৯৯৯
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২২ আশ্বিন	শনিবার	৯ অক্টোবর	১৯৯৯

পূজাতিথি-কৃত্য

মহালয়া	ভাদ্র অমাবস্যা	২২ আশ্বিন	শনিবার	৯ অক্টোবর	১৯৯৯
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২৯ আশ্বিন	শনিবার	১৬ অক্টোবর	১৯৯৯
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২১ কার্ত্তিক	রবিবার	৭ নভেম্বর	১৯৯৯

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

৪, ১৮ আশ্বিন	মঙ্গলবার,	মঙ্গলবার	২১ সেপ্টেম্বর,	৫ অক্টোবর	১৯৯৯
৪, ১৭ কার্ত্তিক	শুক্রবার,	বৃহস্পতিবার	২১ অক্টোবর,	৩ নভেম্বর	১৯৯৯

অমর ভারত ঃ গঙ্গা আর হিমালয়ের প্রতীকে

স্বয়ম্ভু মুখোপাধ্যায়

কোথায় গিয়েছিলে?

হরিদ্বার হৃষীকেশ।

কি দেখলে?

গঙ্গা।
বিষ্ণুর শ্রীচরণ ধুয়ে
মহাদেবের জটা থেকে বের হয়ে
স্বচ্ছসলিলা বয়ে চলেছেন
পৃথিবীকে কল্মষমুক্ত করতে।
দেখলাম, বেদ মহাভারত পার করে
কত অনাচার আক্রমণ উপেক্ষা করে
নির্মল গঙ্গায় অবগাহন করে
আজো অটুট আছে ভারতের নির্ভর দণ্ড
'এক-সনাতন-ধর্ম' বিচিত্রের মাঝে।
এখনো সে অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে
আশ্রম তপোবনের শান্ত পরিবেশে
ত্যাগ বৈরাগ্যের সাধনমূর্তিতে
আধ্যাত্মিকতার প্রদীপ জ্বালায় মনে।
যুগে যুগে মহাত্মাদের পথ অনুসরণে
কত হাজার বছরের ঘরছাড়া ত্যাগীদের
ঈশ্বরসাধনায়, জগৎসেবায় নৈবেদ্যরূপ জীবনে
সংহতি ও সমন্বয় আজ
বিভেদের আঘাত-চিহ্ন মাঝে জাগায় এক মহাবিস্ময়।
শুদ্ধাচারের বেশে দেখি ধর্মকে এখানে
কত মানুষের ঐকান্তিক নিষ্ঠার মধ্যে দেখি
ধর্ম আছে এখানে
ধৈর্য, ক্ষমা ও তিতিক্ষার মাঝে
সতর্কতা ও সততার মিলনে
অহিংসার প্রচণ্ড শক্তিতে গড়ে ওঠা
অজেয় সনাতন আধ্যাত্মিক দুর্গরূপে।

আর দেখলাম হিমালয়।
কতভাবে কতরূপে
অস্ফুট চেতনা থেকে প্রজ্ঞার শিখরচূড়ায়
সভ্যতার যাত্রাপথের চিহ্নরূপে
মৌন সাক্ষী, অটল আপন মহিমায়।
কখনো সে কিশলয়-আবৃত সবুজ কিশোর
কখনো রসের অভাবে রুক্ষ
তরুহারা পাথুরে প্রৌঢ়
আবার কোথাও জ্যোতির্ময় শুভ্র
"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্"
উচ্চারণের অধিকারী, প্রাজ্ঞ সমাধিস্থ।

কি নিয়ে এলে সেখান থেকে?

মা গঙ্গা এলেন আমার সঙ্গে
ছোট একটি পাত্রে
আমাদের জন্য আমাদের মতো হয়ে।
এই পাত্রে তাঁকে দেখি আর ভাবি—
সহজে এসেছ বলেই সহজলভ্যা নও তুমি।
বামে তোমার নিষ্ঠুরতা দক্ষিণে বরাভয়
সৃষ্টি ভাসিয়ে দেওয়া শক্তি তোমার
তপস্যা-শুদ্ধ ভগীরথকে কৃপা করতে ধরায় নেমেছ
কল্যাণকে স্পর্শ করে হয়েছ ত্রিভুবনতারিণী।
যখন আমরা ধুলোকাদা মাখি
পতিতপাবনী সনাতনী মা, তুমি আপন স্নেহের ধারায়
ধুয়ে দাও সেই মলিনতা.
আমাদের কলুষিত ভারে ব্যথা বাজে তোমার অন্তরে।
ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে যিনি
জলে স্থলে আকাশেও যিনি
তাঁর দৃষ্টিপথে যখন হারিয়ে ফেলি নিজেকে
কোন্ অখণ্ডের রাজ্যে
সপ্তঋষির ধ্যানের মাঝে দৃষ্টিহারা দৃষ্টি গেছে তাঁর
সেখানে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র নেই আমার
তাই মা, আমি তোমায় দেখি
তুমি তো ওষধিতে জলে স্থলে আকাশে
ম্লেচ্ছতে ব্রাহ্মণে পিপীলিকায় মার্জারে দেখ তাঁকে!
মা, তুমি দেখ তোমার জগৎকে
আমি দেখি তোমাকে।

ভরিয়ে দিলে

মায়া করগুপ্তা

হঠাৎ এল আলোর ঝলক
আমার জীবনে,
নীরবে তুমি দাঁড়ালে এসে
আমার বাতায়নে।

আমার নিদ্রা, আমার মোহ
আমার মনের কোণে,
সরালে সব মুছে দিয়ে
ভরালে সেই ক্ষণে।।

আমায় তুমি ভরিয়ে দিলে
তোমার মধু-গন্ধে,
সেই আবেশে বিভোর আমি
সকাল হতে সন্ধে।

জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শ্রীকেদারনাথ সম্পর্কে পরিক্রমার এটি দ্বিতীয় ও সমাপ্তি পর্ব।—লেখক

সঙ্গেই কেদারনাথ-দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। এটি সমুদ্রতল থেকে ১১,৭৫৩ ফুট উঁচু। আর সামনের তুষারমণ্ডিত রজতশুভ্র কেদারপাহাড়ের উচ্চতা ২২,৭০০ ফুট। পাহাড়ের গা বেয়ে কয়েকটি ছোট ছোট ধারা বয়ে চলেছে। পাণ্ডাজী জানালেন, এদের নাম 'দুধগঙ্গা', 'মধুগঙ্গা', 'স্বর্গদ্বারী' আর 'সরস্বতী'। তাদেরই মিলিত ধারা হয়ে ক্রমে মন্দিরের বাঁদিক দিয়ে প্রচণ্ড বেগে স্বর্গের নদী 'মন্দাকিনী' নামে মর্ত্যভূমি স্পর্শ করেছেন, আর সাদা ফেনায় লহর তুলে উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছেন মন্দির-চত্বরের নিচ দিয়ে। আমরা সেই পবিত্রসলিলা মন্দাকিনীর জল স্পর্শ করে এসে মন্দির-চত্বরে উঠলাম।

কেদারনাথের মন্দির, পটভূমিতে কেদারপাহাড়　　আলোকচিত্র : রবিধন দত্ত

দেওদেখনি থেকে কেদারনাথের মন্দির মাত্র দেড় কিলোমিটার। রাস্তা আর বিশেষ উঁচু-নিচু নেই। তবে চারপাশের সবুজে ঢাকা পাহাড় কমে আসছে। তার বদলে বরফে ঢাকা পাহাড় ক্রমশ তিনদিক ঘিরে আসছে। মন্দিরের চূড়া দর্শনমাত্র প্রাণ আনন্দে ভরে উঠল। মনে, শরীরে আবার বল ফিরে এল। আমরা প্রায় ১১টা নাগাদ মন্দাকিনী নদীর ব্রিজের কাছে এসে পৌঁছালাম। তার আগে বাঁদিকে সরকারি ট্যুরিস্ট লজ ও আরো কিছু গেস্ট হাউস আছে দেখলাম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা ঐ সরকারি লজে। কিন্তু আমাদের দল এখনো এসে পৌঁছায়নি। তাই আমরা এখন সেখানে না উঠে মন্দাকিনী পেরিয়ে কেদারক্ষেত্রের মধ্যে এসে প্রথমেই খোঁজ নিয়ে আমাদের মঠের পাণ্ডার বাড়িতে হাজির হলাম। পাণ্ডাজীর বড়ভাই বাড়িতেই ছিলেন। তিনি আমাদের খুব যত্ন করে তাঁর পাথরের বাড়ির বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে গরম জল করে এনে দিলেন হাত-পা ধোওয়ার জন্য। এর মধ্যে পাণ্ডাজী এসে গেলেন। মালপত্র রেখে তাঁর

আগাগোড়া পাথরের মন্দির। নদীর খাত আর তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা একটি ছোট উপত্যকার একেবারে উত্তরপ্রান্তে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের চাতাল থেকে কিছুটা উঁচুতে রেলিং দিয়ে ঘেরা বর্গাকৃতি ক্ষেত্র। তারও উত্তরপ্রান্তে অভিনব এক শৈলীতে নির্মিত মন্দির। এমন শৈলী আর কোথাও দেখা যায় না। মন্দির বহু প্রাচীন—দেখেই বোঝা যায়। নাটমন্দির ছোট, ত্রিকোণাকৃতি শ্লেট পাথরের ছাদ। তার সামনে বেশ বড় দরজা। তার দুপাশে দুটি কুলুঙ্গির মতো। সেখানে পাথরের দুই দ্বারপাল দণ্ড-হাতে দাঁড়িয়ে। মন্দিরে ঢোকবার মুখে উত্তরমুখী বিশাল কালোপাথরের নন্দী। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে মন্দিরের দরজার সামনে এলাম। গর্ভমন্দিরের চূড়া সোজা রেখার দেউলাকৃতি। তার চূড়ার ওপর তিন-চার হাত উঁচু নেপালী বা তিব্বতী ঢঙের ছত্রী। এই ছত্রীর ভিতর চারদিকে পাঁচটি করে মোট কুড়িটি ছোট দ্বার দেখা যায়। তার ছাদ একেবারে সমতল আকারের। তার মাথায় স্বর্ণকলস। তার ওপরে পতাকাদণ্ডে নানা বর্ণের পতাকা। মন্দিরের গায়ে

কোন অলঙ্করণ নেই। তিনটি দ্বার—পশ্চিমে, পূর্বে ও দক্ষিণে। দর্শনার্থীরা দক্ষিণ দ্বার দিয়ে ঢুকে পূর্ব বা পশ্চিম দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে। দরজার মাথায় ঝোলানো ঘণ্টা—ভক্তেরা যাওয়া-আসার পথে তা বাজিয়ে যায়। শোনা যায়, এখানকার আদি মন্দির পঞ্চপাণ্ডবেরা তৈরি করিয়েছিলেন। কালের প্রভাবে সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ১০১৯ খ্রীস্টাব্দে রাজা ভোজ খুব শক্ত ও মজবুত ভাবে গ্রানাইট পাথরে এই মন্দিরটি তৈরি করান। তারপরে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কালক্রমে জীর্ণ সেই মন্দিরের সংস্কার করেন ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ। পাণ্ডাজী মন্দির-চত্বরে দাঁড়িয়ে এইসব কথা বলছিলেন। তখন বেলা প্রায় ১২টা। দুপুরের ভোগ হওয়ার জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ।

কেদারনাথ লিঙ্গ (আঁকা ছবি)

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে যেতে আমরা পাণ্ডাজীর সঙ্গে ভিতরে ঢুকলাম। আধো আলো, আধো আঁধারে নাটমন্দিরে পা দিয়েই দেখলাম, সামনে একটা উঁচু বেদির ওপর দেবতার দিকে মুখ করে পিতলের ছোট নন্দী বসে আছে। তার সামনে কেদারনাথের পঞ্চমুখী শিবমূর্তি—এঁকে 'শৃঙ্গারমূর্তি'ও বলে। এটি চলন্ত বা সচল বিগ্রহ। তাঁকে প্রণাম করে চোখ তুলতেই সামনে দেখতে পেলাম, দেওয়ালের দুইধারে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর পাথরের মূর্তি। একপাশে দেবী পার্বতীর দণ্ডায়মানা মূর্তি, আরেকদিকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। গর্ভমন্দিরের ভিতর বেশ বড় একটি প্রদীপ জ্বলছে। এই প্রদীপ সারাবছর দিনরাত জ্বলে। তাতে অনেক ঘি দেওয়া, সলতেও বিরাট। বরফ পড়া শুরু হলে, রাস্তা ও মন্দির বরফাচ্ছাদিত হতে থাকলে প্রতি বছর কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন যখন মন্দির ছয়মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই প্রদীপে প্রচুর ঘি দিয়ে মন্দির থেকে পাণ্ডারা নিচে নেমে আসেন। আবার যখন বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দির খোলা হয়, দেখা যায়, তখনো প্রদীপ জ্বলছে। এর নাম 'অখণ্ড জ্যোতি'। সেই আলোতেই ঘর আলোকিত। আর তিনদিকের দরজা দিয়েও বাইরের আলো ঘরে আসছে। নাটমন্দির বা 'জগমোহন' বেশ ছোট, তার চেয়েও ছোট গর্ভমন্দির।

ঠিক মাঝখানে পাথরের নিচু রেলিং দিয়ে ঘেরা খানিকটা জায়গায় কালোপাথরের ত্রিকোণাকৃতি এবং একটা দিক ঢালু হয়ে নেমে আসা প্রায় আড়াই হাত উঁচু সেই বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ। প্রথম দর্শনেই আনন্দে মন-প্রাণ ভরে গেল। এত দৈহিক কষ্ট সব নিমেষে দূর হয়ে গেল। আমাদের ভাগ্য ভাল, তখন প্রথম পূজা হয়ে গিয়েছে বলে ভিড় খুব কম। পাণ্ডাজী আমাকে নিয়ে গিয়ে একেবারে কেদারনাথের পশ্চিমদিকে একটা কাঠের আসনের ওপর পূর্বমুখে বসিয়ে দিলেন। মন্দিরের পূজারী রাওয়ালজী পাশে বসে আমাদের পূজা করাতে লাগলেন। প্রথমেই একটু ঘি আমার হাতে দিয়ে বললেন, কেদারনাথের ডানদিকে সেটি মাখিয়ে দিতে। ব্যাপারটা আমি জানতাম, তাই খুব ভাল করে আস্তে আস্তে সেই ঘি মাখিয়ে দেওয়ার পরে সঙ্গে নিয়ে আসা গঙ্গাজল দিয়ে কেদারনাথকে স্নান করালাম। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া বেলপাতা ও পাণ্ডাজীর দেওয়া শুকনো ব্রহ্মকমল ফুল দিয়ে পূজা, কর্পূর ও ধূপ দিয়ে আরতি এবং নকুলদানা, শুকনো নারকেলকুচি দিয়ে ভোগ নিবেদন করলাম। তারপর দুহাত দিয়ে কেদারনাথকে আলিঙ্গন করলাম। খেয়ালই ছিল না যে, সমস্ত জামায় চাদরে ঘি লেগে যেতে পারে। তারপর পাণ্ডা ও পূজারীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্তবপাঠ করে প্রণাম জানালাম ঃ "মহাদ্রিপার্শ্বে চ তটে রমন্তং। / সংপূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ। / সুরাসুরৈ যক্ষ মহোরগাদ্যৈঃ। / কেদারমীশং শিবমেকমীড়ে।।"—হিমালয়ের গায়ে মন্দাকিনী নদীর তীরে যিনি বিরাজিত, সদাসর্বদা যিনি দেবতা ও মুনি, ঋষি, অসুর, যক্ষ, নাগাদিদের দ্বারা সংপূজিত, সেই কেদারনাথকে আমি বন্দনা করি।

তারপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে এককোণে দাঁড়িয়ে শিবস্তোত্র পাঠ ও কিছুক্ষণ জপ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পাণ্ডাজী জানালেন, এখন তাঁর বাড়িতে খাওয়া ও একটু বিশ্রাম নেওয়ার পরে তিনি ঘুরিয়ে দেখাবেন এখানকার অন্যান্য তীর্থগুলি। তাঁর বাড়ি গিয়ে গরমজলে গা মুছে গরম গরম খিচুড়ি খাওয়া হলো। এখানকার পাহাড়ী জলে খিচুড়ি খুব ভাল সেদ্ধ হয়নি। প্রায় ৩টার সময় দলের সহযাত্রীরা এসে পৌঁছালে তাদেরকে আমাদের এখানে উপস্থিতির সংবাদ দিয়ে পাণ্ডাজীর সঙ্গে আবার মন্দিরে ফিরে এলাম।

নাটমন্দিরের আবরণদেবতাদের ও পার্বতীকে প্রণাম জানিয়ে গর্ভমন্দিরে গিয়ে কেদারনাথজীকে আবার স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। এখন মন্দির পরিষ্কার করে সন্ধ্যারতির যোগাড় হচ্ছে। আরতির সময় যারা বেশি টাকার টিকিট কাটে

তাদের ভিতরে ঢুকে বসতে দেয়। আমরা কোন টিকিট কাটিনি, পাণ্ডাজীর সাহায্যে কোনরকমে মন্দিরের দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকে পড়তে পেরেছিলাম। আর ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে একটু ফাঁকের মধ্য দিয়ে আরতি দর্শনেরও সুযোগ পেয়েছিলাম।

মন্দির-পরিক্রমার পথে আমরা মন্দিরের ঠিক পিছনে উত্তর-পূর্ব কোণে দুটি ছোট কুণ্ড দেখলাম। একটির নাম 'হংসকুণ্ড'। অন্যটি 'রেতসকুণ্ড'। এই রেতসকুণ্ডের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে এর জলে তিনবার আচমন করতে হয়। এর পাশেই 'ঈশানেশ্বর' নামে ছোট একটি শিবলিঙ্গ আছে। প্রবাদ, এখানে ব্রহ্মা হংস-রূপ ধরে আসেন। তাঁরই স্মরণে হংস ও রেতসকুণ্ড। খুব পবিত্র স্থান এটি। মন্দিরের পিছনে তিন হাত লম্বা আরেকটি কুণ্ডের নাম 'অমৃতকুণ্ড'। এর মধ্যে দুটি স্ফটিক লিঙ্গ দেখা যায়। ঐ রেতসকুণ্ডের জলের ওপর হাততালি দিলে জলের ওপর বুদবুদ ভেসে ওঠে। মন্দিরের পশ্চিমে আরেকটি কুণ্ড আছে। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি ছোট মন্দিরের মধ্যেও আরো একটি লম্বা চৌবাচ্চার মতো 'উদককুণ্ড' আছে। এখানেও জল স্পর্শ করে আচমন করার বিধি। মূল মন্দিরের ঠিক পিছনে দেওয়ালের গায়ে একটি শ্বেতপাথরের বেশ বড় হাত, তাতে একটি ছোট কুঠার খোদাই করা। এটি আচার্য শঙ্করের স্মৃতিতে তৈরি। কারণ, আদি শঙ্কর এখানেই মহাসমাধি লাভ করেন। মন্দির-চত্বরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ছোট শ্বেতপাথরের বেদির ওপর আদি শঙ্করাচার্যের মর্মরমূর্তি। শোনা যায়, এটিই তাঁর সমাধিস্থল। পরিবেশ খুবই সুন্দর। পশ্চাদপট—খাড়া কেদারপাহাড় সাদা বরফে ঢাকা, আর নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা মন্দাকিনী। তারই মাঝে একান্তে নির্জনে মহাসমাধি-মগ্ন বেদান্তাম্বুজ শঙ্করাচার্য। পর্বতের গাম্ভীর্য অদ্বৈত বেদান্তের উত্তুঙ্গ মহিমায় ভাস্বর, আর সেই বেদান্ত-তত্ত্ব মন্দাকিনীর ধারার মতো প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে মর্ত্যভূমির দিকে—জীবজগতের অজ্ঞানকালিমা ধুয়ে মুছে দিতে। আচার্য শঙ্কর তারই মাঝে অনন্তকালের সাক্ষীর মতো বসে আছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজই ছিল শঙ্করপঞ্চমী—তাঁর আবির্ভাব-তিথি। আমরা সেকথা মনে করেই গিয়েছিলাম। এই শুভদিনটির স্মরণে তাঁর চরণপ্রান্তে বসে স্মরণ করছিলাম তাঁরই রচিত বিখ্যাত 'নির্বাণষটক্' স্তোত্রটি ঃ

"অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।।"

কিছুক্ষণ পর উঠে এলাম মন্দিরে, কারণ আরতির ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ হয়েছে।

নাটমন্দিরে নন্দীর পিছনে দাঁড়াবার একটু জায়গা করে নিয়েছি। কালো জামাকাপড় পরে রাওয়াল পূজারীরা আরতি

কেদারনাথের মন্দির-চত্বরে শঙ্করাচার্যের মর্মর মূর্তি
আলোকচিত্র ঃ রবিধন দত্ত

শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার তালে তালে এক বিচিত্র সুরে স্তব ও পাঠ চলতে লাগল। স্তবটি খুব সুন্দর, আমার জানা ছিল, তাই আমিও তাঁদের সঙ্গে গলা মেলালাম—

"জয় কেদার উদার শঙ্কর। ভব ভয়ঙ্কর দুঃখহরম্।
গৌরী গণপতি স্কন্দ নন্দী শ্রীকেদার নমাম্যহম্।।১
শৈল সুন্দর অতি হিমালয় শুভ্র মন্দির সুন্দরম্।
নিকট মন্দাকিনী সরস্বতী—জয় কেদার নমাম্যহম্।।২
উদককুণ্ড হ্যায় অধমতারণ—রেতঃকুণ্ড মনোহরম্।
হংসকুণ্ড সমীপসুন্দর—জয় কেদার নমাম্যহম্।।৩
অন্নপূর্ণা সহ অপর্ণা—কাল ভৈরব শোভিতম্।
পাঁচ পাণ্ডব দ্রৌপদীসহ—জয় কেদার নমাম্যহম্।।৪"

আরতি শেষ হতে আবার গর্ভমন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলাম। কারণ, এইসময় শৃঙ্গার করানো হয়েছে। সুন্দর বেনারসী কাপড় দিয়ে সমগ্র লিঙ্গটি ঢেকে তার ওপর দামী শাল জড়িয়ে, মাথায় রূপোর মুকুট, তার ওপর সর্পছত্র, গলায় অনেক মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। তাই এখন স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। এরপরে রাত্রের ভোগ দিয়ে শয়ন দেওয়া হবে। আমরা প্রণাম জানিয়ে বাইরে চলে এলাম। রাত্রে পাণ্ডার বাড়িতেই খাওয়ার ব্যবস্থা। খাওয়া সেরে আমি আর জগদীশ মন্দাকিনীর পাড়ে এসে বসলাম। লোকজন খুবই কম। আশপাশের রাস্তায় বরফ এখনো আছে। দোকানগুলির চালেও বরফ জমে আছে। রাস্তায় বরফ

গলতে থাকায় চারিদিকে কাদা। দোকানে পূজার সামগ্রী, ছোটখাটো দরকারি জিনিস ও খেলনা বিক্রি হচ্ছে। আমরা ওসব বিকালেই দেখে নিয়ে এখন এই একান্তে এসে বসেছি।

জগদীশ জানতে চাইল এই কেদার জ্যোতির্লিঙ্গের পুরনো কাহিনী। বলতে শুরু করলাম।

এই কেদারতীর্থই সারা ভারতে একমাত্র মন্দির, যা কখনো কোন বিধর্মীর নিষ্ঠুর ধ্বংসের মুখ দেখেনি। তার কারণ এর দুর্গম অধিষ্ঠানভূমি। বরফের রাজ্যে এত উচ্চতায়

আরতির সময় কেদারনাথের শৃঙ্গার বেশ (আঁকা ছবি)

সেই আমলে কোন নির্দিষ্ট যানবাহনের পথ না থাকায় ও খাদ্য সরবরাহের সুবিধা না থাকার জন্য কোন যাবনিক অত্যাচার এখানে হয়নি। সেদিক থেকে এই জ্যোতির্লিঙ্গ ও মন্দির সেই অনাদি কাল থেকেই অবিকৃত এবং একই আকারের থেকে গিয়েছে। কালের নিয়মে দৈববিপাকে এবং অত্যধিক তুষারপাত ও তুষারঝড়ে মন্দিরের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হলেও তার মূল রূপের সম্ভবত খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। তাই আমরা আজো এখানে আধুনিকতার ছোঁয়া বেশি দেখতে পাই না।

এই পাবনতীর্থ ও তার মাহাত্ম্য সম্পর্কে নানা প্রাচীন পুরাণে এবং মহাভারতের শল্য ও শান্তি পর্বে এখানকার নদী ও কুণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। লিঙ্গপুরাণে এখানে তপস্যার ফল-লাভের কথা আছে। বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণে এই তীর্থের পবিত্রতার কথা বর্ণিত হয়েছে। 'কেদারতীর্থ' নামকরণ সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে—সত্যযুগে 'কেদার' নামে এক রাজা সপ্তদ্বীপে রাজত্ব করতেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে নিজের রাজ্যভার পুত্রকে দিয়ে হিমালয়ের এই দুর্গম অঞ্চলে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে তপস্যায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর নাম থেকেই এই অঞ্চলের নাম 'কেদারখণ্ড'। বিশেষ করে স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ড, শিবপুরাণ ও মহাভারতে এই পবিত্র তীর্থের উদ্ভবের কথা লেখা আছে। প্রধানত কেদারের আবির্ভাব নিয়ে দুটি মত সেখানে আছে। প্রথমটি হচ্ছে—সত্যযুগে ভগবান নারায়ণ লোককল্যাণের জন্য কেদার-বদরী ক্ষেত্রে দুটি রূপ ধরে কঠিন তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের বলা হয় 'নর' ও 'নারায়ণ' ঋষি।

"তপস্তপ্যতি নিত্যং বৈ লোকানাম্ হিতকাম্যয়া।
তত্র কেদার সজ্ঞাকং বৈ শৃঙ্গং হিম সমুদ্ভবম্।।"

তাঁরা সেখানে শিবের ধ্যানে দীর্ঘদিন মগ্ন থেকে জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। যথাকালে তাঁদের পূজা-প্রার্থনা ও কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে কৈলাসপতি মহাদেব সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের বললেন ঃ

"কিং কার্যং বিদ্যতে লোকে ভবতঃ তপসঃ ফলম্।
অবাপ্তং কাসৌ শ্রেষ্ঠৌ চ কিং কার্যং ভবতো পুনঃ।।"

—"তোমরা দুইজন দেবতার অবতার, ঋষিশ্রেষ্ঠ, তোমরা তো পূর্ণকাম। তোমাদের তো পাওয়ার কিছু বাকি নেই। তবুও তোমরা কেন আমার জন্য এই উগ্রতপস্যা করছ?" তাঁর এই কথা শুনে নারায়ণ ঋষি বললেন ঃ "যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে 'স্থীরতাং স্বেন রূপেণ পূজার্থং শঙ্কর স্বয়ম্'—জগতের জীবকে আনন্দ দান করতে, তাদের পূজা গ্রহণ করতে এই দেবভূমি হিমালয়ে আপনি নিজ মূর্তিতে নিত্য বিরাজ করুন।" এই কথায় প্রসন্ন হয়ে আশুতোষ শঙ্কর বললেন ঃ "কেদারে হিমসজ্ঞকে স্বয়ঞ্চ শঙ্করস্তস্থৌ জ্যোতিরূপীমহেশ্বরঃ।" জ্যোতির্ময় রূপ ধরে 'কেদার' নাম নিয়ে মহাদেব সেখানে বিরাজ করতে লাগলেন। আর সেই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে সকলের মুক্তির পথ অনাবৃত হলো। "দৃষ্টা রূপং নরস্যৈব তথা নারায়ণস্য চ. কেদারেশ্বর নাম্নাশ্চ মুক্তিভাজী ন সংশয়ঃ।।" ঐ দুই ঋষির নামানুসারে বদরিকাশ্রমে দুটি পাহাড়ের নাম 'নর' ও 'নারায়ণ'।

দ্বিতীয় কাহিনীটি হলো—মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পঞ্চপাণ্ডবের বড়ভাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনে দারুণ নির্বেদ এল। কিছুকাল রাজ্য চালানোর পরে তাঁর মনে হলো, এতসব আত্মীয়, বন্ধু ও গুরুজনদের যুদ্ধে হত্যা করে মহাপাপ হয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতেও তাঁর আত্যন্তিক মানসিক শান্তি হচ্ছিল না। পাপস্খালন হয়েছে বলেও মনে হচ্ছিল না। তিনি তখন ব্যাসদেবকে স্মরণ করেন। ব্যাসদেব সেখানে আবির্ভূত হয়ে সব শুনে বললেন ঃ "তোমাদের এই গোত্রহত্যা পাপের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। একমাত্র কেদারতীর্থে গিয়ে তপস্যা দ্বারা কপালমোচন দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপালাভই তোমাদের শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। তোমরা সেখানেই যাও।" পঞ্চপাণ্ডব রাজ্যপাট অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎকে দিয়ে দ্রৌপদী সহ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। হরিদ্বার থেকে আরম্ভ করে পঞ্চাশ যোজন লম্বা ও ত্রিশ যোজন চওড়া যে

স্বর্গদ্বারের রাস্তা—তাকে বলে 'কেদারমণ্ডল'। পঞ্চপাণ্ডব তপস্বীর বেশে এই কেদারমণ্ডলে এসে খুঁজতে থাকেন কোথায় কেদারেশ্বর মহাদেব আছেন। নকুল ও সহদেব হঠাৎ এই নির্জন প্রান্তরে একটি বিরাটাকার মহিষকে দেখে দাদাদের সে-কথা জানান। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বুঝতে পারেন, এটি পশুপতি সদাশিবের মায়ার খেলা। তিনি তাঁর ভাইদের সে-কথা জানাতেই মধ্যম পাণ্ডব ভীম গদাহাতে দৌড়াতে শুরু করেন মহিষরূপী শিবকে ধরতে। আজ যেখানে জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করছেন, ঠিক সেখানে ভীম পৌঁছাতেই মহিষটি মাটির মধ্যে ঢুকে পড়েন। ভীম ততক্ষণে গদার আঘাতে তাঁর ভূমিপ্রবেশ কিছুটা স্তব্ধ করে দিয়েছেন। অবশেষে মাটির ওপর ত্রিকোণাকৃতি হয়ে রয়ে গেল শুধু মহিষের পিছনের অংশটি। অন্য ভাইরা ছুটে এসে মহিষরূপী শিবের এই অর্ধপ্রোথিত রূপ দেখে কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন অপরাধ ক্ষমা করবার জন্য। ঋষি এবং পঞ্চপাণ্ডব।

আমরা কত ভাগ্যবান, সেই মহাপুরুষদের পূজিত বিগ্রহ আজ স্পর্শ করে পূজা করবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করলাম! কেদারনাথের মাহাত্ম্য অনুচিন্তন করতে করতে শুনতে পেলাম মন্দিরে শয়নারতির স্তোত্র—

"জয় শিব ওঁকার—হর শিব ওঁকার।/ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সদাশিব অর্ধাঙ্গী ধর।/ চতুরানন-গজানন-পঞ্চানন রাজে।/ হংসাসন-গরুড়াসন বৃষবাহন সাজে।/... শ্বেতাম্বর-পীতাম্বর-বাঘাম্বর অঙ্গে।/ ব্রহ্মাদিক-সনকাদিক-প্রেতাদিক সঙ্গে।/... ব্রহ্মাবিষ্ণু সদাশিব জানত অবিবেকা।/ প্রণব সবকে মধ্যে তি নো হি একা।।"

দূর থেকে এই অপূর্ব সঙ্গীত শুনতে শুনতে কেদারনাথকে প্রণাম জানিয়ে আমরা নদী পেরিয়ে সরকারি নিবাসের নির্দিষ্ট ঘরে ফিরলাম। পথে পাণ্ডাজীর বাড়িতে রাত্রের আহার সম্পন্ন হলো।

কেদারপাহাড় আলোকচিত্র ঃ রবিধন দত্ত

ভক্তের আকুল প্রার্থনায় এবং এই কঠোর তীর্থ-পরিক্রমায় সদাশিব প্রসন্ন হলেন এবং সেই মহিষের অংশবিশেষের পাশে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। তাঁর দর্শনে পঞ্চপাণ্ডবের পাপস্খালন হলো। তাঁদের সংসার-বাসনার নিবৃত্তি হয়ে তাঁদের মনে মোক্ষলাভের ইচ্ছার উদয় হলো। তাঁরা প্রার্থনা করলেন, আগামীকালের মানুষও যেন এই হিমগিরিশিখরে তাঁর দর্শন লাভ করে কৃতকৃতার্থ হতে পারে এবং তিনি যেন কৃপা করে এই লিঙ্গেই জ্যোতির্ঘন মূর্তিতে অনন্তকাল বিরাজ করেন। ভগবান শিব ভক্তদের এই প্রার্থনায় সম্মতি জানিয়ে চিরকালের জন্য এই রাজ্যে 'কেদারেশ্বর' নামে বিরাজিত হলেন। পাণ্ডবেরা সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেবাদিদেব কেদারেশ্বরের পূজা করলেন। কিছুদিন পর সামনের রাস্তা স্বর্গারোহিণী দিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী। সুতরাং এই কেদারের আদি পূজারী হলেন নর ও নারায়ণ দুই

সে-রাত্রি ও পরদিনের রাত্রি কেদারতীর্থেই কাটল। সকালে ও সন্ধ্যায় বারবার কেদারনাথ দর্শন ও যথাসাধ্য পূজা করে অপরিসীম তৃপ্তি নিয়ে আমরা তৃতীয়দিন ভোরে ফেরার আগে শ্রীমন্দিরে গেলাম শেষ দর্শন করতে। আবার তাঁকে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলাম ঃ

"শিব দিগম্বর ভস্মধারী অর্ধচন্দ্র বিভূষিতম্।
শীষ গঙ্গা কণ্ঠ নাগপতি জয় কেদার নমাম্যহম্।।
কর ত্রিশূল বিশাল ডমরু জ্ঞান গান বিশারদম্।
যক্ষ কিন্নর নাচ গাঁবে জয় কেদার নমাম্যহম্।।
নাথ পাবক হে বিশালম্ পুণ্যপ্রদ হরদর্শনম্।
জয় কেদার উদার শঙ্কর পাপ হর নমাম্যহম্।।"

যুগ যুগ ধরে শত শত ভক্ত সাধকের ভক্তি-শ্রদ্ধায় জমাট বিগ্রহ তখন আমার কাছে শুধুমাত্র বিকৃতাকার পাথরের এক লিঙ্গ মাত্র নন, তিনি চিন্ময়—ভক্তিহিমে গড়া জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীকেদারনাথ। [সমাপ্ত] ❑

আধুনিক তীরন্দাজি

জয়ন্ত চক্রবর্তী

খেলাধুলার জগতে ক্রিকেট-ফুটবলই বেশি জনপ্রিয়। কিন্তু এছাড়াও যে অন্যান্য খেলা হয় সে-সম্বন্ধে আমরা জানলেও মনোযোগ সহকারে দেখি কম। যেমন তীরন্দাজি। আন্তর্জাতিক স্তরে এই খেলার একটা জনপ্রিয়তা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের খুব কম মানুষ সে-সম্পর্কে অবহিত। তা বলে এই নয় যে, আমরা ভারতবাসীরা তীরন্দাজি বলতে কিছু জানি না। কারণ, প্রাচীন ইতিহাসে তীরন্দাজি বলতেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে রামায়ণ-মহাভারতের জনপ্রিয় চরিত্র বীরযোদ্ধা রাম, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, কর্ণের বীরত্বের কাহিনী।

বর্তমানে তীর-ধনুক আজ আর যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না।
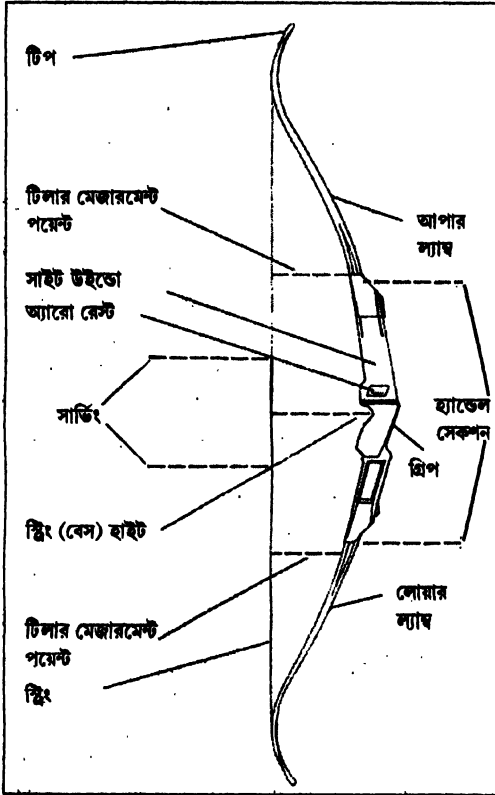
প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত আধুনিক ধনুক

এতে মানুষও মরে না। এটা আজ অন্যান্য আর পাঁচটা খেলার মতোই জনপ্রিয় খেলা। আধুনিক তীরন্দাজিতে ব্যবহৃত তীর-ধনুক স্বাভাবিকভাবেই অত্যাধুনিক মানের। ভারতবর্ষে এই ধরনের ধনুক পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে, বিশেষ করে আমেরিকা, জাপান, কোরিয়া, রাশিয়া থেকে আনতে হয়। এই ধনুক সম্পূর্ণ 'ফোল্ডিং', অর্থাৎ খোলাপড়া করা যায়। এর এক-একটা ভাগের আলাদা আলাদা নাম আছে। চিত্র অনুযায়ী নামগুলো এখানে দেওয়া হলো।

ধনুকের 'হ্যান্ডেল' ধাতু-নির্মিত। এই হ্যান্ডেলের মাঝখানের অল্প বাঁকা অংশকে 'গ্রিপ' বলে। গ্রিপের ওপরের অংশের নাম 'অ্যারো রেস্ট'। এখানে তীর বসানো হয়। হ্যান্ডেলের ওপর-নিচে দুটো 'লিম্ব' লাগানো থাকে। লিম্বটা ফাইবার গ্লাসের। ওপরের লিম্বকে 'আপার লিম্ব' এবং নিচের লিম্বকে 'লোয়ার লিম্ব' বলে। লিম্বের শেষ প্রান্তের নাম 'টিপ'। দুটো টিপে 'স্ট্রিং' বা 'জ্যা' লাগানো থাকে। স্ট্রিঙের মাঝখানে আলাদা সুতো জড়ানো থাকে, যাকে 'সার্ভিং' বলে। সার্ভিং থেকে গ্রিপের যে দূরত্ব, তাকে বলা হয় 'স্ট্রিং হাইট' বা 'ব্রেস হাইট'। হ্যান্ডেলের ওপর এবং নিচের অংশের শেষ থেকে স্ট্রিঙের দূরত্বকে বলে 'টিলার মেজারমেন্ট পয়েন্ট'। এই টিলার মেপে আপার ও লোয়ার লিম্বের দূরত্ব ঠিক করা হয় এবং এই দূরত্ব অনুযায়ী সার্ভিঙের মাঝখানে তীরের 'নকিং পয়েন্ট' স্থির করা হয়। এই নকিং পয়েন্টে তীরের শেষপ্রান্ত সংযুক্ত করে টেনে ধরা হয় এবং তীরের অগ্রভাগ লাগানো থাকে 'অ্যারো রেস্ট'-এ। অ্যারো রেস্টের ওপরে থাকে 'সাইট উইন্ডো'। ধনুকের তিনরকম দৈর্ঘ্য হয়—৬৬ ইঞ্চি, ৬৮ ইঞ্চি এবং ৭০ ইঞ্চি।

যেখানে লক্ষ্যভেদ করা হয় সেটা হলো খড়ের বাঁধানো 'বস'। এই বস কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর বসানো থাকে। বসের ওপর লাগানো থাকে 'টার্গেট ফেস'। এই টার্গেট ফেসে ভিতর দিক থেকে গোলাকারে পাঁচটা রঙ থাকে—হলুদ, লাল, আকাশি, কালো ও সাদা। এই রঙগুলোই হলো নম্বর। যেমন টার্গেট ফেসের মাঝখানে হলুদের মধ্যে যে দুটো গোল থাকে তার মাঝেরটা হলো ১০ নম্বর, তার বাইরেরটা ৯ নম্বর। এইভাবে পর পর লালের মধ্যে ৮ ও ৭ নম্বর, আকাশির মধ্যে ৬ ও ৫ নম্বর, কালোর মধ্যে ৪ ও ৩ নম্বর এবং সাদার মধ্যে ২ ও ১ নম্বর থাকে। এই টার্গেট ফেসের দুরকম মাপ হয়। বড় ফেসের মাপ ১২২ সেন্টিমিটার। ছোট ফেসের মাপ ৮০ সেন্টিমিটার। বড় টার্গেট ফেস লাগানো হয় ৯০ মিটার, ৭০
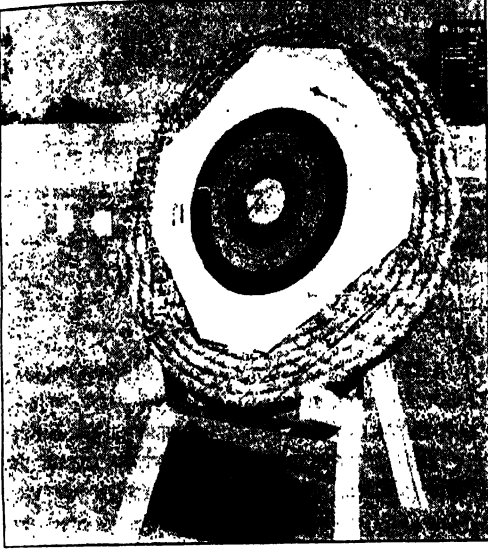
টার্গেট বস আলোকচিত্র ঃ দেবকুমার শ্রীমানী

মিটার ও ৬০ মিটার দূরত্বে। আর ছোট ফেস লাগানো হয় ৫০ মিটার ও ৩০ মিটার দূরত্বে।

এবার আসা যাক প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা প্রতিযোগিতা হয়। উভয়কেই চারটি দূরত্ব থেকে তীর ছুঁড়তে হয়। যেমন পুরুষদের ৯০ মিটার, ৭০ মিটার, ৫০ মিটার ও ৩০ মিটার দূরত্ব থেকে এবং মহিলাদের ৭০ মিটার, ৬০ মিটার, ৫০ মিটার ও ৩০ মিটার দূরত্ব থেকে তীর ছুঁড়তে হয়। চারটি দূরত্বকে একত্রে 'ফিটা রাউন্ড' বলে। চারটি দূরত্ব থেকে ৩৬টা করে তীর ছুঁড়তে হয়। ৩৬টা তীরের মোট নম্বর ৩৬০। এই ৩৬টা করে তীরের মধ্যে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৯০ মিটার, ৭০ মিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৭০ মিটার ও ৬০ মিটার দূরত্বে ৬টা করে তীর ৬বার ছুঁড়তে হয়। এরপর পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই ৫০ মিটার ও ৩০ মিটার দূরত্বে ৩৬টা করে তীরের মধ্যে ৩টি করে তীর ১২ বার ছুঁড়তে হয়। ৩৬০ করে চারটি দূরত্বের মোট নম্বর হয় ১৪৪০।

ফিটা রাউন্ডের পর শুরু হয় 'অলিম্পিক রাউন্ড'। এই অলিম্পিক রাউন্ড হলো নকআউট খেলা। এতে একে অপরের সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফিটা রাউন্ড থেকে প্রথম ৩২ জন অলিম্পিক রাউন্ডে ওঠে। অলিম্পিক রাউন্ডে খেলা হয় ৭০ মিটার দূরত্বে। এখানে ৩৬টা করে তীর ছুঁড়তে হয় না, এখানে প্রথম স্থানাধিকারীর সঙ্গে লড়াই হয় ৩২ নম্বর স্থানাধিকারীর। দ্বিতীয়ের সঙ্গে ৩১ নম্বরের, তৃতীয়ের সঙ্গে ৩০ নম্বরের। এখানে প্রত্যেককে ৬টা করে তীর ৩ রাউন্ডে অর্থাৎ মোট ১৮টা করে তীর ছুঁড়তে হয়। এই ১৮টা তীরের
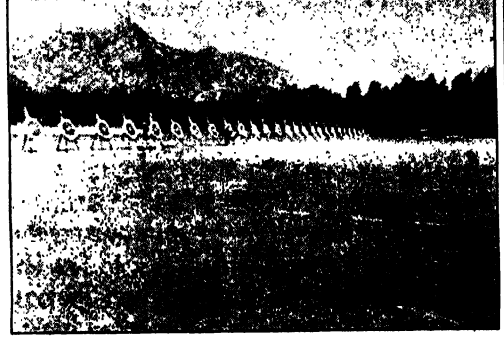
প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্র আলোকচিত্র ঃ অশোক ঘোষ

মিলিত নম্বর ১৮০। এর মধ্যে যে বেশি নম্বর তুলতে পারে সেই দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠে। ৩২ জনের মধ্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই ওঠে ১৬ জন। আবার এই ১৬ জনের মধ্য থেকে একই পদ্ধতিতে ৮ জন তৃতীয় রাউন্ডে এবং ৪ জন চতুর্থ রাউন্ডে ওঠে। চতুর্থ রাউন্ডে আর ১৮টি করে তীর ছুঁড়তে হয় না, এখানে ৩টি করে তীর ৪ বার অর্থাৎ মোট ১২টি তীর ছুঁড়তে হয়। এই ১২টি তীরের মান ১২০। এই রাউন্ডে একে অপরের সাথে খেলা হয়ে যে দুজন জেতে তারা ফাইনালে মুখোমুখি হয়, আর পরাজিত দুজনের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানের জন্য লড়াই হয়। ফাইনালে বিজয়ীকে বলা হয় 'অলিম্পিক রাউন্ড' চ্যাম্পিয়ন।

আধুনিক তীরন্দাজি ভারতবর্ষে প্রথম শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে সাতের দশকে। সেইসময় কতিপয় তীরন্দাজপ্রেমী তাঁদের কঠোর পরিশ্রমে এই খেলাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেন এবং ভারতবর্ষের মান বিশ্বমানে পৌঁছে দেন।

বর্তমানে তীরন্দাজিতে ভারতবর্ষের মান অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব পিছিয়ে নেই, তার প্রমাণ পাই লিম্বারাম, শ্যামলাল, সঞ্জীব সিং-এর মতো প্রতিভাবান তীরন্দাজদের এশিয়ান গেমস ও অলিম্পিকের মতো প্রতিযোগিতায় চমকপ্রদ সাফল্যে। এশিয়ান গেমসে লিম্বারামের ৩০ মিটার দূরত্বে বিশ্বরেকর্ডের অনন্য নজির আছে। অবশ্য আটলান্টা অলিম্পিকে অলিম্পিক রাউন্ডের সেমিফাইনালে উঠে তিনি ব্যর্থ হন। তিনি ছাড়াও আর যারা উঠে আসছে তাদের মধ্যে এশিয়া ও অলিম্পিকে পদক পাওয়ার মতো যথেষ্ট প্রতিভা আছে। তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার মনঃসংযোগ, ধৈর্য্য ও অক্লান্ত কর্মক্ষমতা। যে এগুলিকে আয়ত্তে আনতে পারবে সে অবশ্যই স্থির লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। এর জন্য দরকার কোচ, ক্রীড়াবিজ্ঞানী ও মনোবিদের উপযুক্ত পরামর্শ।

ভারতবর্ষে নানা জায়গায় তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ দেওয়া

হয়, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যেখানে যেখানে হয় তাদের মধ্যে ক্যালকাটা আর্চারি ক্লাব, বরাহনগর আর্চারি ক্লাব, আর্কো আর্চারি ক্লাব (নপাড়া), চন্দননগর আর্চারি ক্লাব, সল্ট লেক সাই সেন্টার, টার্গেট আর্চারি ক্লাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক তীরন্দাজির মূল সমস্যা তার ব্যয়বহুলতা। ফলে ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের প্রতিভা থাকলেও আর্থিক দুর্বলতার জন্য উন্নত মানের ধনুক কিনতে না পারায় তাদের প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটতে পারে না। ফলে তাদের উচ্চ আশা শেষপর্যন্ত হতাশায় পর্যবসিত হয়। যদিও কিছু কিছু সংস্থা তীরন্দাজিদের চাকরির সুযোগ দিচ্ছে, যেমন গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরি, বি. এস. এফ., কোল ইন্ডিয়া, আসাম রাইফেলস, টাটা কোম্পানি, ক্যালকাটা পুলিস প্রভৃতি। এইসব জায়গায় ভাল ভাল তীরন্দাজিদের নেওয়া হয়, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। ফলে অনেক প্রতিভা সুযোগ না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে হারিয়ে যায়। তাই দেশের সমস্ত সরকারি ও বাণিজ্যিক সংস্থার উচিত অন্যান্য খেলার

তীর ছোঁড়ার প্রস্তুতি আলোকচিত্র : দেবকুমার শ্রীমানী

ক্রীড়াবিদদের মতো তীরন্দাজদের জন্যও ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, যাতে ভাবী প্রজন্ম এই খেলায় আরো আকৃষ্ট হয় এবং ভারতবর্ষের তীরন্দাজি আন্তর্জাতিক মানচিত্রে সম্মানজনক স্থান লাভ করে। ❑

> শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

'A Text Book of Homoeopathic Materia Medica Elaborated with Illustrations' গ্রন্থের লেখক, পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে দশ বছর অধ্যাপনা এবং ত্রিশ বছর চিকিৎসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা জানাতে ধারাবাহিক লিখছেন। তাঁর ধারণা, এতে সাধারণ অসুস্থতা ও অসুখ-বিসুখ এড়ানো সম্ভব হবে এবং ফলত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

❑ শীতকালে স্নান করার পর স্নানঘরের মধ্যেই পোশাক পালটে বাইরে আসতে হবে। স্নানান্তে খালি গায়ে বাইরের সামান্য হাওয়াতেও দেহ রোগাক্রান্ত হতে পারে। গ্রীষ্মকালে স্নানের অব্যবহিত পরে পাখার হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।

❑ স্নান সবসময় সকালে করা উচিত। দ্বিপ্রহরে স্নান অলসতা আনে। কর্মক্ষমতারও হ্রাস হতে পারে।

❑ দুপুরের আহারসূচীতে ভাত, হাতে-গড়া আটার রুটি, ডাল, মাছ, সবজি, ঘরে-পাতা দই থাকা বাঞ্ছনীয়।

❑ আহার পরিমিত হতে হবে। কখনো এমনভাবে খাওয়া উচিত নয় যাতে পাকস্থলীতে চাপ পরে, শরীরে ভার বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়।

❑ খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে এক গ্লাস জল খাওয়া প্রয়োজন। খাওয়ার সময় জল খাওয়া উচিত নয়। খাওয়ার আধঘণ্টা পর একটু জল খাওয়া উচিত, দু-ঘণ্টা পর এক বা দু-গ্লাস জল খেতে হবে।

❑ রাত্রের আহার হালকা হবে। আহারসূচী সরল হবে—রুটি, ভাত, সবজি। জল খাওয়ার পদ্ধতি দুপুরের খাওয়ার মতোই। তবে সারা দিনে অন্তত তিন লিটার জল খাওয়া প্রয়োজন।

❑ দুপুর ও রাত্রের আহারের সঙ্গে সঙ্গে শোয়া বা বিশ্রাম করা ঠিক নয়। অন্তত আধঘণ্টা হালকাভাবে পায়চারি করলে বা বজ্রাসন করলে হজমে ও বিশ্রামে সুফল পাওয়া যাবে।

কিশলয়ী
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ৮
❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑
কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত
বৃত্রাসুর ভয়ঙ্কর ক্রোধে জ্বলে উঠল। রণক্ষেত্রে দেবতাদের সামনে একাই সে রুখে দাঁড়াল। তার ভীষণ গর্জনে ত্রিলোক সচকিত হয়ে উঠল। তীব্র বেগে সে গদা হাতে দেবরাজ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে ছুটে এল।
দেবরাজ বৃত্রাসুরকে লক্ষ্য করে গদা নিক্ষেপ করলেন। বৃত্রাসুর সেই গদা বাম হাতে ধরে ফেলল এবং তার বিশাল গদা দিয়ে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মাথায় আঘাত করল। সেই ভীষণ আঘাতে ঐরাবত যেন দিশাহারা হয়ে গেল।
আহত, যন্ত্রণায় কাতর ঐরাবত রণক্ষেত্র থেকে বেশ অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ল। দেবরাজ ইন্দ্র তার পিঠ থেকে নেমে এসে পরম মমতায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সুস্থ করে তুললেন।
[ক্রমশ]
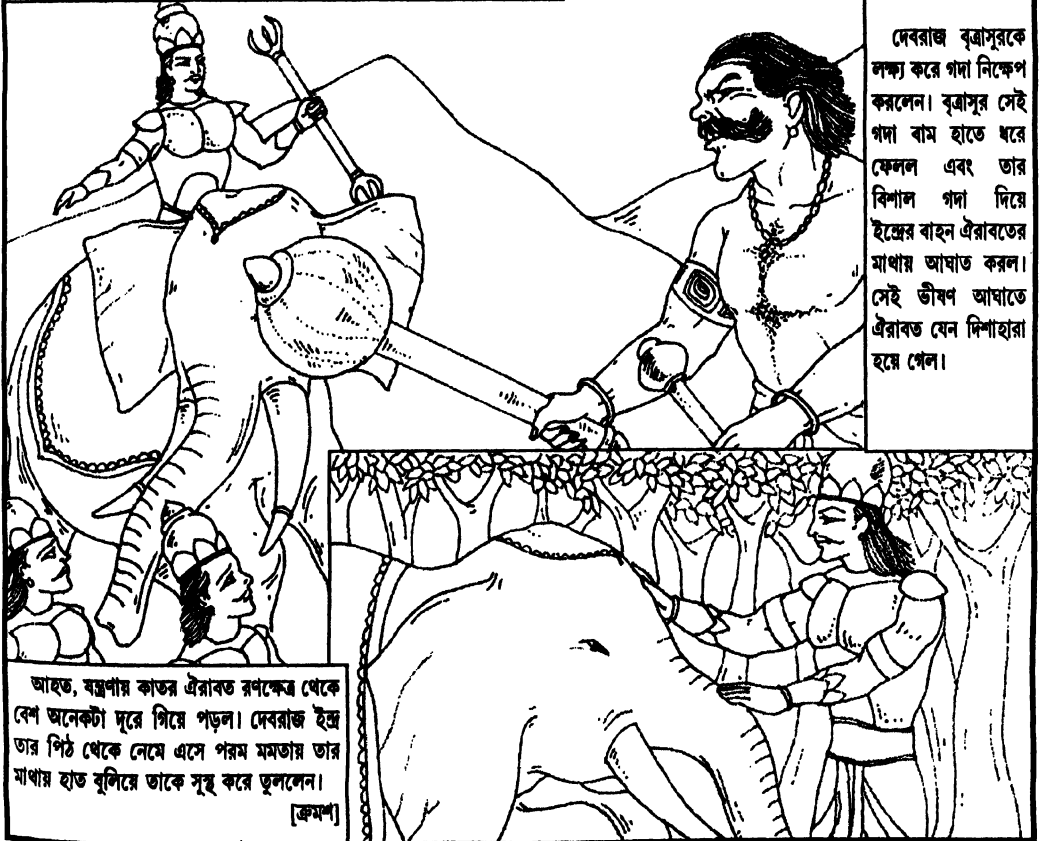
রাজবিদ্যা ☼ রাজগুহ্যযোগ

কৃষ্ণা সেন

শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে নিবেদিত।

গীতার সারকথা অনন্যাভক্তি। এই অনন্যাভক্তিই কর্ম ও জ্ঞানের সেতুস্বরূপ। এই অনন্যাভক্তি বা শুদ্ধাভক্তিই ভক্তের প্রধান সম্বল; তাই শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীর কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলেন ঃ "ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, 'মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।' " ঠাকুর তাঁর সমস্ত পুণ্যফল, জ্ঞান, শুচিতা, ধর্ম—সব ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু শুদ্ধাভক্তি কখনোই নয়।

ঈশ্বরের পরম ভাব বা পরম স্বরূপ জানলে তখনি তো তাঁকে সাধক আপনার করে পেতে চান; চান তাঁকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে দিতে। যে-বিদ্যা সহায় করে ঈশ্বরের পরম ভাব বা পরম স্বরূপ জানা যায়, আর সেই তত্ত্ব জেনে তাঁকে লাভ করবার পথের অনুসন্ধানে মন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ধেয়ে চলে—সেই বিদ্যাই 'রাজবিদ্যা'। "ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে"—তবেই সেই "রাজগুহ্য" অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা গোপনীয় তত্ত্ব আমাদের হৃদয়াকাশে প্রস্ফুটিত হতে থাকবে। যোগ্য শিষ্য পেলে সদ্‌গুরু তাঁকে সব বিদ্যা উজাড় করে দিতে চান, তাই একান্ত ভক্ত সুহৃদ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ শেখান আত্মোন্নতির পথের সহায়ক সেই গোপনীয় বিদ্যা। প্রত্যক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন এই বিদ্যা অন্তরে জাগায় আত্মজ্ঞানের বহ্নিশিখা; সকল কলুষতামস হরণ করে আনে মুক্তিপথের সন্ধান। এই বিদ্যাই রাজবিদ্যা—

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।।" (গীতা, ৯।২)

—সর্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ এই ব্রহ্মবিদ্যা অতি উত্তম, চিত্তশুদ্ধিকর, ধর্মসঙ্গত, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, অনায়াসে অনুষ্ঠেয় এবং অক্ষয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে সাধকের আভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্য কর্মে এই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। সাধক তাঁর সমগ্র জীবন তখন শ্রীহরির পাদপদ্মে উৎসর্গ করেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রদ্ধাহীন মানুষ কিন্তু সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুসঙ্কুল সংসারপথে বারেবারে আসা-যাওয়া করে।

অবাঙ্‌মনসোগোচর এই শ্রেষ্ঠ সত্তা অব্যক্ত। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাইরে তাঁর অবস্থান। বিশ্বজগৎ সেই পরমসত্তায় স্থিত; তিনি কিন্তু এই জগতের ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি জগতের অতীত। যে-বিশ্বভুবনকে আমরা চাক্ষুষ করছি তা সেই বিরাট পুরুষের একপাদস্বরূপ, আর ত্রিপাদ স্বর্গে বিরাজিত। তাঁকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে হলে সর্বদা তাঁর নাম করতে হয়। কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "রামনাম করা বেশ। যে-রাম দশরথের ছেলে; আবার জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আর সর্বভূতে আছেন। আর অতি নিকটে আছেন। অন্তরে বাহিরে।"

"ওহি রাম দশরথকী বেটা, ওহি রাম জগৎ পশেরা।
ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা, ওহি রাম সব সে নিয়ারা।।"

ভগবানের ঐশ্বরিক প্রভাবের সীমা-পরিসীমা করা যায় না। তিনি 'ন ভূতস্থঃ'—জীবগণের মধ্যে অবস্থিত নয়, অথচ তিনি 'ভূতভৃৎ'—সমুদয় জীবকে ধারণ করে আছেন। আবার তিনি 'ভূতভাবনঃ'—তাদের পালন করছেন। এই পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশই ঐশ্বরিক যোগ। বিশ্বাতীত অব্যয় অক্ষর ব্রহ্মসত্তা লীলাবিলাসের জন্য পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত। সচল বাতাস আকাশে নিত্য অবস্থিত। তেমনি অনাসক্ত নির্লিপ্ত এই পরমপুরুষে বিরাট বিশ্বের সর্বভূত বিধৃত হয়ে আছে। ভাগবতে আছে—যেমন নির্মল আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত তেমনি সর্বভূতে আমাকে ব্যাপ্ত দেখবে, অন্তরে বাইরে আমাকে মুক্ত, আত্মার মধ্যে আমাকে অপাবৃত দেখবে। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ যেমন দুন্দুভি বাজালে অন্য শব্দ তাতেই লয় হয়, পৃথক শোনা যায় না; তেমনি জ্ঞানী ব্রহ্ম থেকে জগৎ পৃথক দেখে না, ব্রহ্মের সত্তায় জগতের সত্তা। তাঁতেই ভূতাকাশ প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাকে জানলে অমৃতস্বরূপকে জানা যায়।

কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্বভূত পরমপুরুষের অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার কল্পারম্ভে নতুন সৃষ্টি। ঈশ্বর

মায়ামুক্ত হয়ে সঙ্কল্পমাত্রে জগৎ সৃষ্টি করছেন। তাঁর লীলাখেলায় গতিবিধি একরকমই থাকে, তবু তাতে আনন্দের বাধা হয় না। স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করে, তাতে অবস্থিত হয়ে, প্রাক্তন সংস্কারবশে ভূতগণ জন্মমৃত্যুর আবর্তে, সৃষ্টি ও নাশের চক্রে বারেবারে আবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের ওপর অবশ জীবের কোন হাত নেই। কর্মফলের ওপরেও নেই কোন অধিকার। অজ্ঞানতার তামস অন্ধকার থেকে দিব্য চেতনায় ফিরে এলে তবেই জীবের মুক্তি।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জীবের সৃষ্টি ও লয়। তবে কি কর্মের বন্ধনে সেই পরমপুরুষ আবদ্ধ? না, কখনো নয়। মানুষ তার কামনা-বাসনার জনাই কর্মচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরমেশ্বরের মনে তো কোন বন্ধনকারী বাসনা নেই, তিনি অনাসক্ত ও উদাসীন; তাই তিনি চিরমুক্ত। প্রাক্ সৃষ্টি পর্বেও তিনি ছিলেন, পরেও আছেন। প্রকৃতি তাঁর আদেশবাহিকা—তিনি প্রকৃতির কর্মের দ্রষ্টা ও অনুমন্তা। অধ্যক্ষরূপে তিনি প্রকৃতিকে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসৃষ্টির জন্য চালনা করেন; তাঁর অনুমোদনের ফলেই জগতের এই বিবিধ পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে। যুগাবর্তনের সাথে সাথে চলছে মায়াসৃষ্টির মোহনলীলা। এই মায়াসৃষ্টি থেকে মুক্তির পথ—অহঙ্কার, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন এবং নিস্পৃহভাবে স্বকর্মে আত্মনিয়োগ।

ভক্তিহীন মানুষের আসুরী ভাব ও ভক্তিমান মানুষের দৈবী প্রকৃতি—"বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ"—মানুষী তনুতে লীলাময়ের লীলা বুঝতে না পেরে ভক্তিহীন মূঢ় ব্যক্তি অবতার-তনুকে অবজ্ঞা করে। অজ্ঞানতা থেকেই অবজ্ঞা। জ্ঞানোদয় হলে তবেই পুরুষোত্তমের দিব্যকর্ম, দিব্যদেহ, দিব্যজন্ম উপভোগ করা যায়। সচ্চিদানন্দ শিক্ষক গুরুরূপে আসেন। মানুষের মধ্যে যখন তিনি অবতীর্ণ তখন ধ্যানের খুব সুবিধা। দেহাবরণের মধ্যে—যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। নারদ তখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন আর বললেন, 'আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মতো সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হব?' আবার যখন সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন তখন দেখলেন, রামের বনবাস শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ করে অনেকে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। তা তাঁরা অনেকেই জানেন নাই।" জ্ঞান ও প্রেমের ভেদে ভাবও কিন্তু ভিন্ন রকমের। ঈশ্বরে খুব ভালবাসা হলে তবেই প্রেমাভক্তির উদয়। ঠাকুরের ভাষায়—"তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বললে, 'ভাই! আমরা সব মারা গেলুম!' আরেকজন বললে, 'কেন? মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি।' আরেকজন বললে, 'না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।'

"যে লোকটি বললে, 'আমরা মারা গেলুম'—সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন। যে বললে, 'এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি'—সে জ্ঞানী, তার বোধ আছে যে ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করছেন। আর যে বললে, 'তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি'—তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে সে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটা পর্যন্ত না ফোটে।"

সত্ত্বগুণাশ্রয়ী মাত্রেই চিদ্‌বিগ্রহের পরমস্বরূপ জ্ঞাত হন। আসুরীস্বভাবসম্পন্ন রজোগুণপ্রধান ব্যক্তি ও রাক্ষসীস্বভাব-সম্পন্ন তমোগুণপ্রধান ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত সেই পরমপুরুষকে না চেনায় তাদের সকল জ্ঞান, সকল আশা, সকল কর্ম ব্যর্থ। পরমদেবতাকে অবহেলা করে ফলাশায় অন্য দেবতাদের পূজা তাদের 'মোঘাশা' করে; ঈশ্বর-বিমুখতার জন্য তারা 'মোঘকর্মা', আর কুতর্কাশ্রিত শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে তারা 'মোঘজ্ঞান' হয়। অবিবেকী, মোহজনক, বুদ্ধিভ্রংশকারী, হিংসাপ্রবণ, ইন্দ্রিয়ভোগবিলাসী আসুরী প্রকৃতির মানুষ চোখ থেকেও অন্ধ।

অনন্যমনে কৃষ্ণসেবাকে যাঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলে জানেন, তাঁদের কাম্য একমাত্র ঈশ্বরভজনা। গীতায় (৯।১৩) শ্রীভগবান তাঁদেরই মহাত্মা বলে অভিহিত করেছেন—

"মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।।"

—হে পার্থ, দৈবীপ্রকৃতি-আশ্রিত মহাত্মাগণ অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে সর্বভূতের কারণ এবং নিত্যস্বরূপ জেনে ভজনা করেন। পিতা যাঁর ঈশ্বর, ভ্রাতা যাঁর বিশ্বজীব, সত্তা তাঁর জগৎ-জোড়া—তিনিই মহাত্মা। এঁরাই একনিষ্ঠা ভজনার অধিকারী। ঈশ্বরের সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ নিবিড়; ঈশ্বরের অস্তিত্বে এঁদের বিশ্বাস সুদৃঢ়। এ-বিশ্বাস শোনা কথায় নয়, এ-বিশ্বাস আন্তর উপলব্ধির প্রকাশ; কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে তাকে খণ্ডিত করা যায় না।

অনন্যমনা ভক্তের পাঁচটি কাজের কথা গীতায় আছে—(১) সর্বদা নাম কীর্তন ("সততং কীর্তয়ন্তঃ মাম্"), (২) সর্বদা ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা ("যতন্তঃ"), (৩) সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ("দৃঢ়ব্রতাঃ"), (৪) সতত অবনতশির, নিরহঙ্কার এবং নিজেকে কর্তা মনে না করা ("নমস্যন্তশ্চ মাম্"), (৫) সর্বদা উপাসনায় মনঃসংযোগ ("নিত্যযুক্তা উপাসতে")। কেউ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা বাসুদেবের আরাধনা করেন এবং জানেন "বাসুদেবঃ সর্বম্"। কেউ আবার অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে অভেদজ্ঞানে তাঁকে ভজনা করে। কেউ বা আবার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই ভাবপঞ্চকের এক বা একাধিক ভাব অবলম্বনে, আবার অনেকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি নানা দেবতারূপে পৃথগ্‌ভাবে

সেই বাসুদেবেরই অর্চনা করে থাকে। সকল স্তরের ভক্তের পূজাই ভগবান সাদরে গ্রহণ করে তাদের ধন্য করেন।

শুদ্ধভক্ত নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে ভুলে অনন্যমনে শ্রীহরির গুণগানে তৎপর থাকেন—ভগবদ্‌গুণগান, ভক্তের গুণগান, ভক্তির গুণগান। ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মতো কোন বৈষয়িক প্রসঙ্গ তিনি করেন না। ভাব, মহাভাব, প্রেমভাবের জন্য তিনি সর্বদা আকুল। যাঁদের ভক্তি জ্ঞানসমুদ্রে নিমজ্জমান, তাঁরা বাসুদেবের সঙ্গে একত্ব হওয়ার অনুভবে সদানন্দময়। তাঁরা জানেন জীবনযজ্ঞের একমাত্র কাণ্ডারী হরি—তিনিই মন্ত্র, তিনিই অগ্নি, তিনি ঘৃত, তিনি আহুতি, তিনি পূজার পুষ্প, চন্দন, তিনি নৈবেদ্য, তিনিই দেবতা আবার তিনিই পূজারী। অন্যদিকে যাঁদের জ্ঞান, ভক্তিসমুদ্রে ডুবে গিয়েছে, তাঁরা নিজেদের পৃথগত্ব বজায় রেখেই বাসুদেবের অর্চনায় ব্রতী হন। জীবনের সব সম্বন্ধের আস্বাদ তাঁরা শ্রীহরির মধ্য দিয়েই আস্বাদন করেন। মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু, পতি সবই সেই পুরুষোত্তম। এভাবে চিন্তার ফলে চিত্তের বহুমুখী বৃত্তিগুলি একমুখী প্রবাহে পরিবর্তিত হয়ে, সেই কমললোচন শ্রীহরির পাদপদ্মাভিমুখে ধাবিত হয়। যার যে-ভাব, কৃপাময় তাকে সেই ভাবেই তারণ করেন। কারণ, জগতে "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা" বিদ্যমান।

শ্রীমধুসূদন জীবের কর্মফলদাতা বিধাতা; তিনিই একমাত্র বরেণ্য, শরেণ্য ও আদি কারণ। তিনি গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, আশ্রয়স্থান, রক্ষক, হিতকর্তা, স্রষ্টা, প্রলয়কর্তা। তিনিই একমাত্র আধার, আবার লয়স্থান এবং অবিনাশী কারণস্বরূপ। মৃত্যুও তিনি, অমৃতও তিনি, সৎও তিনি, অসৎও তিনি—"অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ"—তিনিই নিত্যপরিবর্তনশীল চন্দ্র, আবার তিনিই চির অপরিবর্তনীয় সূর্য। সূর্যরূপে উত্তাপ দানের মধ্যে যাঁর লীলার পরিচয়, সেই লীলাই প্রকট হয়ে ওঠে যখন দেখি পৃথিবী থেকে আকর্ষিত জল ধারাবর্ষণে আমাদের সিঞ্চিত করে তুলছে। স্থূল দৃশ্যমান জগতে ও সূক্ষ্ম অদৃশ্যলোকে তাঁর অনন্ত শক্তির ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই জগৎ, যিনি ক্ষর তিনিই আবার অক্ষর।

সাম, যজুঃ এবং ঋক্—এই তিনটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে 'ত্রিবেদী' বলা হয়ে থাকে। এঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং যথেষ্ট সম্মানার্হ। তাঁরাও অনেকসময় ভুলে যান যে, শরণাগতিই হলো বৈদিক জ্ঞানের পরম লক্ষ্য। দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞদানাদি ক্রিয়ারত থেকে, সোমরসপানে নিষ্পাপ হয়ে তাঁরা অর্জিত পুণ্যফলহেতু সুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন; কিন্তু পুণ্যফলের ক্ষয় হলে আবার মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। জ্ঞানলাভ বা ঈশ্বরদর্শন না হওয়া পর্যন্ত এই সংসারে "গতাগতি পুনঃপুনঃ"। তাই ভক্তের প্রার্থনা—"মতি রহু তুয়া পর সঙ্গে"। তবে—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।"
(ঐ, ৯।২২)

—যে ভক্তগণ অনন্যচিত্তে নিরন্তর স্মরণ-মননে আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত, সেসব ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করে থাকি।

অলব্ধ বস্তুকে লাভ করা 'যোগ', আর লব্ধ বস্তুর রক্ষণ হলো 'ক্ষেম'। এই 'যোগক্ষেম' কথাটির তাৎপর্য অনেক। গীতায় শ্রীভগবান জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব অনুভূতিকেই 'যোগ' বলেছেন, আর 'ক্ষেম' শব্দের অর্থ যোগের চরমাবস্থা অর্থাৎ মোক্ষ। মুক্তিলাভ হলে বা আত্মা মুক্ত—এই জ্ঞান হলে তবেই তাদাত্ম্যবোধকে ধরে রাখা যায়। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম, কিন্তু মায়াবশে সে নিজেকে মরণশীল দেহী বলে মনে করে। "অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ" ও "প্রযতাত্মনঃ" ভক্তদের শ্রীভগবান কৃপা করে স্বরূপের জ্ঞান দেন। এই হলো প্রকৃত যোগ। আর যখন তাঁর কৃপায় যোগী আত্মজ্ঞানে সুস্থিত, তখন সেই অবস্থা হলো ক্ষেম। ভক্তের ভক্তি, মুক্তি সবই পরমেশ্বরের হাতে। ভক্ত শুধু শরণাগত হয়ে নিরন্তর তাঁর চিন্তায় কালাতিপাত করবেন।

শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে কিছু কামনায় ভক্ত অন্যান্য দেবতার আরাধনা করলেও তাঁরই ভজনা করা হয় যদিও তা 'অবিধিপূর্বক', কারণ সকাম পূজার অর্ঘ্য বাসুদেব গ্রহণ করেন না। শ্রীভগবান বলছেনঃ আমিই বেদবিহিত ও ধর্মশাস্ত্রবিহিত সকলপ্রকার যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। অন্য দেবতার ভক্তগণ আমাকে যথার্থভাবে জানতে পারেন না, অর্থাৎ আমিই যে সকল দেবতার আত্মস্বরূপ তা জানেন না। সেজন্য তাঁরা উপাসনার সম্যক্ ফল থেকে প্রচ্যুত হয়ে থাকেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। সকাম পূজক গতাগতিশীল হন, আর যাঁরা সর্বদেবতাতেই শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ দেখেন, তাঁদের আর পুনরাবৃত্ত হতে হয় না। ইন্দ্রাদি অপর দেবগণের পূজকেরা দেবলোকপ্রাপ্ত হন। পিতৃব্রতী পূজকেরা দেহান্তে যান পিতৃলোকে। যাঁরা যক্ষরক্ষাদি ভূতগণের পূজা করেন তাঁরা ভূতলোকে যান। আর যাঁরা অনন্যচিত্তে শ্রীমধুসূদনের ভজনা করেন, অর্থাৎ যাঁরা "মদ্‌যাজী", তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে অক্ষয় পরমানন্দ লাভ করেন।

ভগবান চান পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল দান করলে সেই সংযতাত্মা উপাসকের ভক্তি-উপহার পুরুষোত্তম সাদরে গ্রহণ করেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।" (ঐ, ৯।২৬)

শুদ্ধবুদ্ধি-প্রদত্ত সবকিছুই তাঁর বড় আদরের। যাকিছু করণীয়, স্বভাবানুসারে যা আমরা করে থাকি—যেমন ভোজন, হোম, দান, তপস্যা—সবই তাঁকে উৎসর্গ করতে হবে। ভয়ে, আদরে, প্রেমে—যেভাবেই হোক। নিষ্কাম হয়ে মানুষ যা করে, যা দেয়—তাই ধর্মে পরিণত হয়। এই প্রণালীতেই কর্মের বন্ধন তথা সমস্ত শুভ ও অশুভ ফল থেকে মুক্তি। কর্মফল

শ্রীভগবানে অর্পিত হলে সে-ফলের সঙ্গে জীবের কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখন সবকর্মসমর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে 'সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা' কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবনান্তে তাঁকেই প্রাপ্ত হন। আগুন যেমন দূরস্থ লোকের শীত অপহরণ করে না, কিন্তু সমীপাগতদের শীত নাশ করে, তেমনি ভক্তবৎসলও ভক্তের প্রতি সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত করেন। ভক্তিযোগে হৃদিস্থ সব কামনা-বাসনা যখন পুড়ে যায়, তখনি হৃদয়ে পাতা হয় পুরুষোত্তমের আসন। সেই অবস্থায়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।"

(মুণ্ডক-উপনিষদ্, ২।২।৮)

—দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্বসংশয় বিনষ্ট হয় এবং প্রারব্ধ ব্যতীত সব কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ভক্ত অনুভব করে তাঁর সান্নিধ্য, তাঁর কৃপা, তাঁর পালকহস্ত, তাঁর অনাসক্ত প্রেম। সর্বভূতে সমদর্শী বলে তাঁর দ্বেষ্য, প্রিয়, শত্রু, মিত্র নেই। তিনি চিরকাল ভক্তের জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন। যারা তাঁকে সভক্তি ভজনা করে, অনুগ্রহ করে তাঁদের অন্তরে বিশেষরূপে বিরাজিত থেকে তাদের পা তিনি বিপথে ফেলতে দেন না। "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" (গীতা, ৯।২৯)—আমাকে ভক্তিপূর্বক যারা ভজনা করে স্বভাবতই আমাতে তারা থাকে। অতি দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিও যদি অনন্যা ভক্তির সঙ্গে তাঁর ভজনা করে তো সে সাধু, কারণ তার প্রচেষ্টা শুভ। শ্রীভগবানে ভক্তি পরশপাথরের মতো। তাঁকে ভজনা করতে করতে দুরাচারীও ধর্মচিত্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—"যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারী ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ করব না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।"

রামপ্রসাদ বলছেন ঃ

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।"

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—'কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনো পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি?" তাঁর শরণাগত হলে তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার নেবেন। তখন সবরকম বিকার দূর হবে। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। মানুষের কি শক্তি আছে?

পাপজন্মা, বৈশ্য বা শূদ্র অথবা স্ত্রী—তারাও অনন্যা শরণাগতির বলে পরমগতি লাভ করে। কাজেই পুণ্যবান, সদাচারী, সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ যে পরমগতি প্রাপ্ত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। অসীম ভক্তির জোরে দৈত্যকুলে জন্মেও প্রহ্লাদ মোক্ষলাভ করেছিলেন, ভীল রমণী শবরী পেয়েছিলেন শ্রীরামের দর্শন, চর্মকার রুইদাসের মুক্তি পেতে দেরি হয়নি। সেজন্যই ভগবান বলছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।"

(ঐ, ৯।৩৪)

—তুমি সর্বদা মদ্গতচিত্ত হয়ে আমার স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন পরায়ণ হও, আমাকে ভক্তি কর, আমার পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। এভাবে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন নিযুক্ত করলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

পুরুষোত্তমের কাছে তাই আমাদের প্রার্থনা—অনাসক্তি ও সমর্পণ এই দুই তটের মধ্য দিয়ে বয়ে যাক আমাদের কর্মধারা। তোমার ইচ্ছার তরঙ্গ বিচিত্ররূপে আমাদের জীবনে প্রতিভাত; সেই বৈচিত্র্যের স্বাদগ্রহণে তুমি নেমে এসেছ নিচে। তুমি নব নব রূপে এসে দাঁড়াও আমার আঁখির আলোয়, আমার নিত্য কর্মে—যেন আমার সকল কর্মের অবসানে দুটি হাত জোড় করে, একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে তোমার পায়ে এই দেহকে বিকিয়ে দিতে পারি। পরশমণির স্পর্শে আমাদের প্রাণ-মন যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ❑

✦ আকরগ্রন্থ ✦
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—সম্পাদনা ঃ স্বামী অপূর্বানন্দ

বিশেষ সংবাদ

কাশ্মীর-সীমান্তে সাম্প্রতিক যুদ্ধে শহিদদের পরিবারের সাহায্যার্থে রামকৃষ্ণ মিশনের দান

কার্গিল রণাঙ্গনে শহিদদের পরিবারের সাহায্যার্থে রামকৃষ্ণ মিশন প্রধানমন্ত্রীর 'জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল'-এ দশ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। গত ১৫ জুলাই '৯৯ রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব স্বামী গোকুলানন্দ উক্ত অর্থ প্রধানমন্ত্রীর হাতে সমর্পণ করেন। রামকৃষ্ণ মিশন সেইসঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, যুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের পুত্রদের মিশনের স্কুলে বিনা ব্যয়ে পড়াশোনার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠরত উক্ত বীর শহিদদের ছেলেমেয়েদের স্টাইপেন্ড/স্কলারশিপের আবেদন মঞ্জুর করা হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আবেদন পাঠানোর ঠিকানা ঃ

**সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ-৭১১২০২
হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।**

শরণাগতি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

একটিই গতি—শরণাগতি।

যে যেখানে আছ, যা করছ করে যাও, শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমার কাছে আসতেই হবে। কোন হিসেবই মিলবে না, কোন পরিকল্পনাই পুরোপুরি সফল হবে না। সংসার তোমাকে কি দেবে! দেওয়ার ভান করবে। তুমিও কিছু দেবে না, তোমাকেও কিছু দেবে না। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। কাঠে কাঠে হৃদয়হীন, প্রেমহীন জড়াজড়ি। নির্বোধ ঠোকাঠুকি। সব পরিবারই রেশন দোকানের মতো। সবাই কার্ডধারী। নির্দিষ্ট পরিমাণে শর্করা। নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার। আমাদের পরিমিত জীবনচর্যায় অপরিমিতির সংস্কার জন্মাতে পারে না। "স্বখাত সলিলে" ডুবে মরার নিয়তি।

কিন্তু! একটা 'কিন্তু' আছে। মানুষ তো আমরা। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকে একেবারে নিজের মতো করে তৈরি করলেন। 'কে তুমি?'—এই গভীর রহস্যটি তিনি গোপন রাখতে চান। মানুষ যেন জানতে না পারে, এক ভগবান আত্মবিস্মৃত কোটি-ভগবান হয়ে পৃথিবীর মায়ায় ঘুরছে। কোথায় লুকিয়ে রাখা যায় এই জ্ঞানটি। জেনে ফেললে মায়ার খেলা শেষ। রাখবেন কোথায়! দুর্গম পর্বত-কন্দরে অথবা সমুদ্রের অতলে! দেবতারা ভগবানের চেয়েও ধুরন্ধর। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, ওটি মানুষের মধ্যেই রেখে দিন। বাইরে তোলপাড় করবে। ভিতরে খুঁজবে না। আপনি যে-মজাটা খুঁজছেন সেটা মজবে ভাল। ভগবান বললেন ঃ তা বটে, যেমন তোমার টাকা সিন্দুকের চেয়ে চোরের পকেটে নিরাপদ। কিন্তু!

আবার কিন্তু-র কি হলো প্রভু!

দেখ, মানুষ খুব সহজ জীব নয়। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মাত্র তিনটি পাবে—আহার, নিদ্রা, মৈথুন। জন্তুর জান্তব জগৎ। কোন কোন প্রাণীর মধ্যে প্রভুভক্তি আছে, অস্বীকার করছি না। কৃতজ্ঞতার বোধও পাবে, বেশি মাত্রাতেই পাবে, কিন্তু মানুষ বিপজ্জনক প্রাণী। একটা সাঙ্ঘাতিক চরিত্র তার মধ্যে ঢুকে গেছে, তার নাম অতৃপ্তি। সন্ধান, অনুসন্ধান। প্রকৃতিতে যা যা লুকিয়ে রেখেছি কালে সব খুঁজে বের করবে। অবশ্য তাতে আমার আনন্দই হবে। সেটা একটা বেশ মজার খেলা। রোগের আরোগ্য বের করবে। মৃত্তিকার শক্তিকে ফসল ফলাবার কাজে লাগাবে। আমার বিদ্যুতের ঝিলিক দেখে প্রকৃতি থেকে বিদ্যুৎ নিষ্কাশন করবে। দুর্গমকে সুগম করবে। নগ্নতাকে নানা বসনে ঢাকবে। বায়ুমণ্ডলকে ভৃত্যের মতো ব্যবহার করবে।

প্রভু! সে তো সবই ঘটবে মানুষের বাইরে। যে-জ্ঞানকে তারা জ্ঞান বলবে, সে তো বস্তু-জ্ঞান। সে-জ্ঞানে অর্থ থাকবে, পরমার্থ থাকবে না। সব জমিতেই ঘোড়া ছোটাবে, আসমানে কয়েক মাইল সীমায় যন্ত্রের ডানায় উড়বে, তারপর বিজ্ঞানের সাহায্যে মহাকাশে। প্রভু! এতে অনন্তের কতটুকু ধারণা হবে! কিছুই না। সুতরাং কোন ভয় নেই।

আছে আছে। এই মানুষেই এমন মানুষ কালে কালান্তরে আসবে যারা বলে দেবে। গোপন কথাটি বলে দেবে। বলে দেবে—"আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে/যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।"

বিশ্বরচনার মূলে যে মহামায়া—তাঁর সঙ্গে যুক্তি, তর্ক, জ্ঞান, বিজ্ঞানের দ্বৈরথে কিছুই হবে না। চাই সমর্পণ। স্রষ্টা কেন চাইবেন, আমরা দুঃখে কষ্টে জর্জরিত হই? রোগ, শোক, জরা, ব্যাধিতে জীবনের আনন্দ বোঝার আগেই শেষ হয়ে যাই? তিনি চাইবেন কেন? সসীমের ধর্মই এটা। মোটর গাড়ি মানেই দুর্ঘটনা নয়। মূল সূত্র হলো গতি। সেখানে একটি রাজপথ ও একটি মাত্র গাড়িতে কোন সমস্যাই নেই। একটি রাজপথে যখন অনেক গাড়ি তখনি সমস্যা। সে-সমস্যায় স্রষ্টার ভূমিকা শূন্য। গাড়ি তখন চালকের দুনিয়ায়। সেই দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যা সেইখানেই মুহূর্তে মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে।

শক্তি আর আধার। ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্মেরই শক্তি। শক্তির সৃষ্টি হলো মায়া। মায়া বাঘিনী জীব-হরিণকে নিয়ে খেলবে। বেড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে। মায়াতেই জন্ম-মৃত্যু, রত্ন-সিংহাসন, ছেঁড়া কাঁথা। মায়াতেই প্রেম, প্রীতি, ঘৃণা, দ্বেষ-বিদ্বেষ। মায়াতেই মালগাড়ি, গরুর গাড়ি। মায়াতেই যুদ্ধ, কামান, বোমা, সন্ধি, শান্তি। মায়াতেই সানাই বাজিয়ে সাতপাক। মায়াতেই 'বল হরি'। এই দৃষ্টিটি লাভ করতে হলে নিজের মধ্যেই নির্দোষ বুদ্ধি দিয়ে খুঁজতে হবে ভগবানের লুকিয়ে রাখা সেই চাবিটি।

ভগবান যে-আশঙ্কাটি করেছিলেন, ঠিক তাই হলো। কালের কোন এক পাদে তিনি নিজের যে-শক্তিটিকে অবতাররূপে পৃথিবীতে পাঠাবেন, তিনি সেই একটি চাবির অসংখ্য ডুপ্লিকেট তৈরি করে মানুষের হাতে হাতে ছড়িয়ে দিয়ে মুক্তি নয় অথচ এমন একটি পথ দেখিয়ে দেবেন যাতে স্বয়ং ব্রহ্মাই ফাঁদে পড়ে যাবেন। সেই পথটি হলো ভক্তির পথ। "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই গো, আমি ভক্তি দিতে কাতর হই।" তিনি প্রকটিত হলেন কামারপুকুরে। লীলা করলেন দক্ষিণেশ্বরে।

নতুন ওষুধ আবিষ্কারের মতো নতুন জীবনধারণ পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। গুহা, কমণ্ডলু, গেরুয়া, চিমটে, জটা, রুদ্রাক্ষ, আচার-বিচার প্রথা, সংসারত্যাগ, চোখ ওলটানো—কিচ্ছু না. কিচ্ছু না। কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। শরণাগত হও। ভক্ত হও।

পায়রার গলার কাছে মটর গজগজ করে, সেইরকম কামনা-বাসনা, বিষয়ের গজগজি নিয়ে গুহাবাস, কি চারধাম ভ্রমণ, কি ঘণ্টাবাদন ও নৃত্যকরণে কাঁচকলা হবে। পরিণতি সেই এক—কড়ায় খই ভাজা অথবা জাঁতায় গম পেষা।

সংসারের যত সংসারী, আমার ছোট্ট দুটো কথা শোন। সংসারে কেঁচো হয়ে না থেকে বীরের মতো থাক। 'পাপ, পাপ', 'নেই, নেই', 'গেল, গেল' করো না। আগে একটা অচল, অটল ঘাত-সহ মানুষ হও। বিয়ে করেছ বেশ করেছ। প্রায় সকলেই করে। গৃহস্থাশ্রমে থাকতে গেলে সহধর্মিণীর প্রয়োজন। সন্ন্যাসী হলে আলাদা কথা। সে অতি কঠিন ব্যাপার। তোমাদের বলেছি ঃ "সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আমি দেখছি যেখানেই থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎসংসার রামের অযোধ্যা। রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর বললেন, 'আমি সংসার ত্যাগ করব।' দশরথ তাঁকে বোঝাবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন, রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বললেন, 'রাম, আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তারপর সংসার ত্যাগ করো। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয় তুমি ত্যাগ কর।' রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীবজগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্তাতে সমস্ত সত্য বলে বোধ হচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন।' "

তাহলে হলোটা কি? না, বুঝতে হবে, আছি কোথায়? সুখেই থাকি, দুঃখেই থাকি, শান্তই থাকি আর খেপেই থাকি, প্রাচুর্যেই থাকি আর দারিদ্র্যেই থাকি—আছি তাঁর চন্দ্রাতপের তলায়। যিনি ওঝা তিনিই সর্প। যিনি পেরেক তিনিই হাতুড়ি। সংসার একেবারে ত্যাগ করার তো দরকার নেই। কি দরকার? ত্যাগ করে যাবেই বা কোথায় আর করবেই বা কী? গাঁজা খাবে! সংসার সংস্কারের ঘোলাটে চোখে আড়ে আড়ে কামিনীর রূপ দেখবে! দক্ষিণেশ্বরে এমন মর্কট সাধু বিজয়কে আমি দেখিয়েছি। ভেকধারী ভণ্ড! সারাদিন ধ্যান করবে? চেষ্টা করে দেখ, কত ধানে কত চাল! আমার জীবনের একটা ঘটনা শোন। এর মধ্যে দুটো প্রসঙ্গ পাবে। ধ্যানে বসেছি। ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রসকের বাড়ি! রসকে মেথর। মনকে বললুম, থাক শালা ঐখানে থাক।

মনকে ধরবে তুমি? নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা করে রাখবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা! অতই সোজা! ঐ **শরণাগতি**! মা, তুমি দেখাও। তোমার পাদপদ্ম ছেড়ে মন গেছে রসকের বাড়ি। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে **খোল** মাত্র, ভিতরে সেই এক **কুলকুণ্ডলিনী**, এক **ষট্চক্র**। সেই **চিৎ শক্তি**, সেই মহামায়া **চতুর্বিংশতি তত্ত্ব** হয়ে রয়েছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, লিঙ্গ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার।

ভগবানের করুণাঘন মানবদরদী আবির্ভাবই তো **অবতার**। তাঁরা আসবেন। বাজারের দেওয়ালে একালের সংবাদপত্রের মতো লটকে দেবেন ভগবানের সেই গোপন দলিলটি। দেখ, জীব আর শিব এক। একই চিৎ শক্তি—রসিক, তুমি, আমি সব।

ভগবানের নিজেরই মাথা খারাপ! কথায় বলে না 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো'। নিজের তত্ত্ব নিজেই ফাঁস করে দিলেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে পার্থ-সখাকে বললেন—ধ্বংস-যজ্ঞ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ঃ এস সৃষ্টির তত্ত্বটা তোমাকে বলেই দিই—"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।/এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।"—হে অর্জুন, এই ভোগায়তন শরীররূপী দৃশ্যটিকে ক্ষেত্র বলা হয়। যিনি এই শরীরকে জানেন অর্থাৎ স্বাভাবিক বা ঔপদেশিক জ্ঞানের বিষয় করেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্গণ তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। (গীতা, ১৩।২)

ক্ষেত্র দৃশ্য, অনাত্মা আর ক্ষেত্রজ্ঞ দ্রষ্টা আত্মা। অবিদ্যা ও বিদ্যা—এই হলো জ্ঞানের তফাৎ। শরীরকে জানতে হবে। কার শরীর? কিসের শরীর? যিনি এই শরীরকে জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। শরীররূপী এই দৃশ্যক্ষেত্রটি অনাত্মা। ক্ষেত্রজ্ঞ জানেন, আত্মার অধিষ্ঠান এই ক্ষেত্রেই। "ক্ষিণোতি আত্মানম্ অবিদ্যয়া, ত্রায়তে তম্ (আত্মানম্) বিদ্যয়া।"—**অবিদ্যা দ্বারা আত্মাকে নাশ করে আর বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করে।**

সংসারে থাক, কি শ্মশানে, কি গুহায়—বিদ্যামায়ার সাহায্য নাও। ব্রহ্মেরই মায়া। আমি তো বলেছি ঃ "তাঁর ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়, তবে আমোদ হয়। **তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরই নাম 'মহামায়া'**। তাই সেই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হতে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে। এই পাশ ছেদন করতে পারলে তবেই ঈশ্বরদর্শন হতে পারে।"

"যেমন রোগ, তার তেমন ঔষধ। গীতায় তিনি বলছেন, 'হে অর্জুন তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সবরকম পাপ থেকে আমি মুক্ত করব।' তোমরা তাঁর **শরণাগত** হও, তিনি সদ্বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সবরকম **বিকার** দূরে যাবে। এ-বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বোঝা যায়? তাই বলছি, **তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে!**"

স্বয়ং ভগবান দেবতাদের বললেন ঃ "দেবগণ! প্রশ্নপত্র ফাঁস করার মতো ঐ দেখ, তোমাদের শ্রীরামকৃষ্ণাবতার ভক্তির চাবি দিয়ে আমার কাছে আসার অতি সহজ দরজাটি খুলে দিয়েছে। সিক্রেট আউট—বলে দিয়েছে বেজায় কথা—'**কখনো ঈশ্বর চুম্বক হন, ভক্ত ছুঁচ হয়। আবার কখনো ভক্ত চুম্বক হয়, তিনি ছুঁচ হন। ভক্ত তাঁকে টেনে লয়—তিনি, ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন।**'

"অবতারের অবতার—**অবতারী** শ্রীরামকৃষ্ণ। সমস্ত শাস্ত্র শরীরধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রেমশরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, ভক্তিশরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, জ্ঞানশরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দশরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, আহ্বানশরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, আশ্রয়শরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্যশরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, যন্ত্রণাশরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ।

"সে যে কোঠার ভিতর চোরকুঠরি।" ❑

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলীলা-কথা

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে নিবেদিত।

অর্জুনের পৌত্র (অভিমন্যুর পুত্র) পুণ্যাত্মা মহারাজ পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়ায় গিয়ে খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পানের জন্য শমীক মুনির আশ্রমে প্রবেশ করেন। আশ্রমে তখন ধ্যানস্থ শমীক মুনি ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। তাই পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনির নিকটেই জল প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাজার আহ্বানে মুনির ধ্যানভঙ্গ হলো না। মহারাজ তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলেন, মুনি তাঁকে অবজ্ঞা করে কপট ধ্যানে মগ্ন আছেন। এই ভেবে তিনি একটি মৃত সর্পকে ধনুর অগ্রভাগে তুলে ধ্যানস্থ মুনির গলায় জড়িয়ে দিয়ে আশ্রম ত্যাগ করেন। ধ্যানস্থ মুনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর বালক পুত্র শৃঙ্গী পিতার এই অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিলেন, সাতদিনের মধ্যে মহাবিষধর তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে। রাজার নিকট এই অভিশাপের সংবাদ প্রেরণ করা হলে তিনি বিচলিত না হয়ে অদৃষ্টবশত তাঁর কৃতকর্মের স্বাভাবিক ফল হিসাবেই এই অভিশাপকে মেনে নিলেন। মৃত্যু অনিবার্য জেনে তিনি পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে এবং সকল ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশনে বসলেন। তাঁর মনে তখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল। তাঁর তখন এক চিন্তা, কি করে সাতদিনের মধ্যে তিনি শ্রীগোবিন্দের চরণ লাভ করে মুক্ত হবেন।

মহারাজ পরীক্ষিতের শাপগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ শুনে মুনি-ঋষিগণ তাঁর নিকট সমাগত হলেন। কারণ, তিনি অতি সুশাসক ও ভক্তিপরায়ণ নৃপতি ছিলেন। তাঁর সুশাসনে মুনি-ঋষিগণ নিরুপদ্রবে শ্রীহরির চিন্তা করতে পারতেন। তাই তাঁর অন্তিমকালে তাঁর পাশে থাকবেন বলে তাঁরা এসেছেন। পরীক্ষিৎ সকলকেই সমুচিত সম্মান জানিয়ে তাঁদের নিকট ম্রিয়মাণ ব্যক্তির কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখলেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কী তপস্যাদি কর্ম আছে যা করলে তিনি সাতদিনের মধ্যে গোবিন্দ-চরণ লাভ করে মুক্ত হতে পারেন? ঋষিগণ নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী নানাপ্রকার বিধান দিলেও কারো সিদ্ধান্তই সর্বসম্মত হলো না। এমন সময় ঋষিকুল-চূড়ামণি পরমহংসাগ্রণী ব্যাসনন্দন শুকদেব যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মুনি-ঋষিগণ এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন। মুনি-ঋষিদের মাঝে শুকদেব পরীক্ষিতের দেওয়া আসনে উপবেশন করলেন। তখন পরীক্ষিৎ প্রণত হয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ

"অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎ কার্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বথা।"

(ভাগবত, ১।১৯।৩৭)

—হে যোগিগণেরও পরম গুরু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, এই সংসারে সম্যক্ সিদ্ধিলাভের উপায় কী? আসন্নমৃত্যু মানুষের কোন্ কার্য সর্বথা করা উচিত?

পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন শুনে শুকদেব খুব খুশি হয়ে বললেন ঃ "মানুষ সংসারে স্ত্রী-পুত্র, ধনসম্পদ প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী বস্তু নিয়ে এমন প্রমত্ত হয়ে আছে যে, আসল কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের মনে প্রশ্নই জাগে না। তোমার মনে যে এরূপ প্রশ্ন জেগেছে, তা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। সেজন্য তোমাকে বলছি—

"তস্মাদ্ ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্।।"

(ঐ, ২।১।৫)

—হে ভরতবংশীয় পরীক্ষিৎ, যিনি অভয় পরমানন্দরূপ মুক্তি লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁর পক্ষে সকল জীবের পরমাত্মা, সকলের নিয়ন্তা, পরমৈশ্বর্যশালী শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্তনীয় ও স্মরণীয়। এই বলে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী পরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ভাগবত, যা তিনি তাঁর পিতা ব্যাসদেবের নিকট শিক্ষা করেছিলেন, সেই পুরাণ থেকে শ্রীহরির মাহাত্ম্যপূর্ণ কাহিনীসমূহ বলতে লাগলেন। শুকদেবের মুখ থেকে শ্রীহরির বিভিন্ন অবতার ও তাঁর ভক্তদের কাহিনী শোনার পর শ্রীহরির পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী শুনতে পরীক্ষিৎ বিশেষভাবে আগ্রহী হলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হওয়ার স্বাভাবিক কারণও আছে। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর পিতামহ পাণ্ডবদের পরমহিতৈষী ও

নিকট আত্মীয়। তাছাড়া তিনিই তাঁর জীবনদাতা। পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে থাকার সময় অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে যখন নিহত হতে যাচ্ছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী হলেন। তিনি শুকদেবকে প্রশ্ন করলেন :

"অবতীর্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তা নো বদ বিস্তরাৎ।।"

(ঐ, ১০।১।৩)

—প্রাণিগণের পরিপোষক অন্তর্যামী ভগবান যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যেসকল লীলা করেছিলেন সেসকল আমাদের নিকট বলুন। তারপর পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কিছু বিষয় উল্লেখ করেন, যেগুলি তিনি বিস্তৃতভাবে শুনতে আগ্রহী (ঐ, ১০।১।৮-১২)। তখন শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা দিয়েই তাঁর পুণ্যজীবন-কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন।

শুকদেব বলতে লাগলেন—দর্পিত ছলনাকারী দৈত্যরূপী নৃপতিগণের সৈন্যভারে পৃথিবী যখন ভারাক্রান্ত, তখন দেবী বসুমতী গোরূপ ধারণ করে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হলেন। তিনি ব্রহ্মাকে জানালেন : "এই দৈত্যগণের অত্যাচার আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি শীঘ্র তার প্রতিকার করুন।" ব্রহ্মা তখন শঙ্করাদি দেবগণ-সহ ধরিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদ সাগরে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর নিকট গেলেন। সেখানে ব্রহ্মা সমাহিত চিত্তে ঋগ্বেদোক্ত পুরুষসূক্তের দ্বারা বিষ্ণুর বন্দনা করলেন। বিষ্ণু তখন ব্রহ্মাকে তাঁর মর্তে আগমনের বার্তা আকাশবাণীর মাধ্যমে শোনালেন। সেই বার্তা ব্রহ্মা ছাড়া অন্য কেউ শুনতে পেলেন না। ব্রহ্মা সেই বার্তা দেবতাগণকে শোনালেন। তিনি বললেন : "ভগবান বলছেন যে, তিনি ধরার দুঃখ অবগত আছেন। তিনি ধরার সন্তাপ অপনোদন করতে মর্তে অবতরণ করবেন। তোমরা তাঁর লীলার সহায়ক হওয়ার জন্য মথুরা ও বৃন্দাবনাদি স্থানে যদুবংশে ও তদাত্মীয় কুরুবংশে জন্মগ্রহণ কর। যতদিন প্রভু মানবলীলা করবেন ততদিন তোমাদেরও পৃথিবীতে থাকতে হবে। ভগবান স্বয়ং বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর প্রিয়কার্য করার জন্য সুরস্ত্রীগণ ব্রজ প্রভৃতি স্থানে জন্মগ্রহণ করুন। প্রথমে তাঁরই অংশে ভগবান অনন্তদেব অগ্রজ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন এবং ভগবানের অচিন্ত্যনীয় শক্তি মায়াও ভগবানের কার্যসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন।"

ব্রহ্মার মুখ থেকে ভগবানের এই নির্দেশ শোনার পর দেবতারা আশ্বস্ত হলেন এবং ধরিত্রীও সান্ত্বনা লাভ করলেন। তারপর দেবদেবীগণ ভগবানের প্রিয়কার্য করার জন্য তাঁর নির্দেশানুসারে মর্তে মথুরা-বৃন্দাবনাদি স্থানে জন্মগ্রহণ করতে লাগলেন। সেসময় মথুরা নগরীতে উগ্রসেন নামে এক যদুবংশীয় নৃপতি রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র কংস। তিনি ছিলেন অতি বলবান ও খলপ্রকৃতির। ঐসময় মগধের রাজা ছিলেন জরাসন্ধ। জরাসন্ধ অতি প্রবল পরাক্রান্ত, ক্রূর ও অত্যাচারী ছিলেন। সেই জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করে কংস আরো বলবান ও উদ্ধত হয়ে উঠলেন। উগ্রসেন মথুরার রাজা হলেও কার্যত রাজ্যশাসন করতেন কংসই। উগ্রসেনের এক ভ্রাতার নাম দেবক। দেবকের কন্যা দেবকী। ইনিই পরবর্তী কালে শ্রীকৃষ্ণের জননী। দেবকীকে কংস খুব স্নেহ করতেন। দেবকী বিবাহযোগ্যা হলে কংস শূরের পুত্র বসুদেবের সাথে তাঁর বিবাহ ঠিক করেন। বসুদেব ছিলেন অতি সত্যনিষ্ঠ, সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও চরিত্রবান। এসকল গুণাবলীর জন্য কংস তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন। এজন্য বসুদেবের আরো পত্নী থাকা সত্ত্বেও কংস তাঁর সাথে দেবকীর বিবাহ স্থির করেন। খুব জাঁকজমকের সঙ্গেই বসুদেব ও দেবকীর বিবাহ সম্পন্ন হলো। দেবকী শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় তাঁর প্রতি স্নেহবশত কংস নিজেই ভগিনী ও ভগিনীপতির রথের সারথি হলেন। প্রচুর লোকজন ও হাতি-ঘোড়ার শোভাযাত্রা-সহ কংস দেবকী ও বসুদেবকে নিয়ে যাত্রা করলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর—

"পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ।।"

(ঐ, ১০।১।৩৪)

—পথিমধ্যে অশ্বরজ্জুধারী কংসকে লক্ষ্য করে আকাশবাণী ধ্বনিত হলো : "রে অবোধ, যাকে তুমি রথে বহন করে নিয়ে যাচ্ছ, তার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার হন্তা হবে।" একথা শোনামাত্র খল ও পাপমতি কংস অশ্বরজ্জু পরিত্যাগ করে সকল স্নেহ-মমতা বিসর্জন দিয়ে দেবকীর চুলের মুঠি ধরে বসুদেবের সম্মুখেই তাঁকে হত্যা করতে খড়্গ উত্তোলন করলেন। স্বার্থপর অসুর-প্রকৃতির লোকদের স্বভাবই এই যে, কারো থেকে কিছুমাত্র স্বার্থক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, সে যত প্রিয়পাত্রই হোক না কেন, তার চরম সর্বনাশ করতে তারা ইতস্তত করে না; এক্ষেত্রে মাতা-পিতা, ভগিনী-ভ্রাতা, বন্ধুবান্ধব কোন সম্পর্কই তাদের নিকট বড় নয়। কংসও ছিলেন অসুর-প্রকৃতির লোক। অতএব সদ্যপরিণীতা, শ্বশুরগৃহে গমনরতা ভগিনীকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়া গর্হিত হলেও মৃত্যুভয়ে ভীত কংসের পক্ষে এ-কাজ অসম্ভব ছিল না।

কংসের রুদ্রমূর্তি দেখে দেবকী ভয়ে বাক্যহারা হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বসুদেব দেখলেন, মহাবিপদ। কংস যেরূপ খল-প্রকৃতির, সে দেবকীকে অবশ্যই হত্যা করবে। তবে মৃত্যু সন্নিকটে হলেও বুদ্ধিমান লোক বাঁচার চেষ্টা করে—এরূপ চিন্তা করে তিনি কংসকে শান্ত করতে তাঁর গুণকীর্তন করে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু কংস কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না দেখে দেবকীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য বসুদেব কংসের নিকট এক অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। তিনি বললেন :

"ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্বাগাহাশরীরিণী।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্।।"

(ঐ, ১০।১।৫৪)

—হে সৌম্য, দৈববাণী যা বললেন তাতে এই দেবকী থেকে নিশ্চয়ই তোমার কোন ভয় নেই। যার থেকে তোমার ভয়ের উদয় হয়েছে সেই দেবকীর পুত্রগণকে আমি তোমার হাতে

সমর্পণ করব। বসুদেবের এই প্রতিজ্ঞায় কংস ভগিনীবধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। কারণ, কংস জানতেন বসুদেব সত্যবাদী। সে কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সত্যভ্রষ্ট হবে না। সুতরাং প্রকৃত শত্রুকে ভবিষ্যতে নিধন করতে কোন অসুবিধা রইল না।

ক্রমে ক্রমে দেবকীর আটটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়। তার মধ্যে প্রথম ছয়টি পুত্র কংসের হাতে নিহত হয়। সপ্তম পুত্র সঙ্কর্ষণ বা বলরাম, যিনি দেবকীর পুত্র হয়েও রোহিণীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর অষ্টম পুত্রই হলেন কংসারি শ্রীকৃষ্ণ এবং কন্যাটি সুভদ্রা, যিনি পরে অর্জুনের মহিষী হয়েছিলেন। প্রথম পুত্র হওয়া মাত্রই বসুদেব তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী পুত্রকে কংসের হাতে তুলে দিতে গেলেন। যদিও সদ্যোজাত পুত্রকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল, তথাপি সত্যরক্ষার জন্য তিনি এমন অসম্ভব কাজও করলেন। তাঁর এই সত্যনিষ্ঠা দেখে কংসের মন পরিবর্তন হলো। তিনি বসুদেবকে বললেন ঃ "এই কুমারকে নিয়ে বাড়ি যাও। এর থেকে তো আমার কোন ভয় নেই, কারণ তোমার অষ্টম সন্তান আমাকে বধ করবে—এই তো বিধির বিধান।" কংসের কথায় বসুদেব ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কংসের প্রকৃতি চিন্তা করে তাঁর কথায় পুরো বিশ্বাস স্থাপন করে নির্ভয় হতে পারলেন না।

বসুদেবের চরিত্রপ্রভাবে কংসের কিছুটা শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে দেবর্ষি নারদের ভাবনা হলো। তিনি ভাবলেন, কংস যদি শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তবে ভগবানের মর্তে অবতরণ বিলম্বিত হবে। নারদের ইচ্ছা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভগবান অবতীর্ণ হয়ে ধরার ভার হরণ করুন এবং ভগবদ্-ভক্তজনের দুঃখ দূর করুন। আর এজন্য কংসের নিধন আশু প্রয়োজন। কারণ, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কংস অন্যতম। তাঁকে বধ করতে ভগবানের অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং কংস যত বেশি অন্যায় করবে, তাঁর ভক্তদের ওপর যত বেশি অত্যাচার করবে, ভগবানের অবতরণও তত শীঘ্র হবে। তাই বসুদেব ছেলে নিয়ে ফিরে গেলে নারদ কংসের শুভবুদ্ধিকে বিচলিত করতে তার নিকট এসে জানালেন যে, ব্রজবাসী নন্দ প্রমুখ গোপগণ, তাঁদের পত্নীগণ, বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয়গণ, দেবকী প্রমুখ যদুললনাগণ এবং নন্দ ও বসুদেবের জ্ঞাতি, বন্ধুবর্গ ও সুহৃদবর্গ সকলেই দেবতা। এমনকি যারা বাইরে কংসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাদের মধ্যেও অনেকে আছে যাদের দেবাংশে জন্ম। আর কংস নিজে পূর্বজন্মে কালনেমি নামক দুর্দান্ত অসুর ছিল—যে বিষ্ণু-হস্তে নিহত হয়। এখন ভূমির ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়রূপী দৈত্যগণকে বধের উদ্যোগ বিষয়ে দেবতাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। দেবর্ষি নারদের নিকট এই সন্দেশ শুনে কংস আবার তাঁর পূর্বের রূপ ধারণ করলেন। নারদ চলে গেলে যদুবংশীয়গণকে দেবতা মনে করে এবং দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বিষ্ণু তাঁকে হত্যা করবেন মনে করে কংস দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন এবং তাঁদের সন্তান হওয়ামাত্র তাদেরকে বধ করতে লাগলেন। অন্যান্য যাদবগণের সঙ্গেও তিনি শত্রুতা আরম্ভ করলেন। পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তিনি নিজেই সিংহাসনে বসলেন। সিংহাসন অধিকার করে চানূর, মুষ্টিক, প্রলম্ব, বক প্রভৃতি অসুরগণের সাথে মন্ত্রণা করে কংস যাদবগণকে আরো পীড়ন করতে লাগলেন। কংসের অত্যাচারে যদুবংশের অনেকেই নিজভূমি পরিত্যাগ করে অন্য রাজ্যে বাস করতে গেলেন।

কংস একে একে দেবকীর ছয়টি সদ্যোজাত পুত্রকে নিধন করার পর দেবকীর সপ্তম গর্ভ উপস্থিত হলো। এই সপ্তম গর্ভে বিষ্ণুর অংশস্বরূপ ভগবান অনন্তদেব আবির্ভূত হলেন। এই সপ্তম গর্ভ কংসের দ্বারা বিনষ্ট হতে পারে মনে করে ভগবান তাঁর অচিন্ত্যনীয় শক্তি—যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণকেও মোহিত করতে সমর্থ এবং যৎসহায়ে ভগবান নানান লীলাবিগ্রহ ধারণ করে এই জগতে লীলা করেন—সেই যোগমায়াকে আদেশ করলেন, তিনি যেন সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করে বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন। কংসের ভয়ে বসুদেব রোহিণীকে গোকুলে সুহৃদ নন্দের গৃহে রেখে এসেছেন। ভগবান যোগমায়াকে আরো বললেন যে, তিনি স্বয়ং যখন দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন তখন যোগমায়াও যেন তাঁর লীলার সাহায্যার্থে নন্দ-পত্নী যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের আদেশক্রমে যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন। সকলেই ভাবল, দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা কেউ জানতে পারল না।

কালক্রমে দেবকী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গর্ভে ধারণ করলেন। এ হলো তাঁর অষ্টম গর্ভ। ভগবানকে গর্ভে ধারণ করে তিনি অত্যন্ত শ্রীময়ী হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে স্বতই আনন্দধারা বইতে লাগল। দেবকীর এই দৈহিক শোভা ও প্রফুল্লতা কংসের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি ভাবলেন, দেবকী এবার অষ্টম গর্ভ ধারণ করেছে। এবার নিশ্চয়ই আমার হন্তা বিষ্ণু তার গর্ভে এসেছে। কারণ, পূর্বে গর্ভাবস্থায় দেবকীকে কখনো এমন দীপ্তিশালিনী দেখা যায়নি। তিনি মহা চিন্তায় পড়লেন। দেবকীকে হত্যা করার ইচ্ছা মনে জাগলেও অপযশের ভয়ে কংস তা করতে সাহস করলেন না। কিন্তু তীব্র বিদ্বেষভাব পোষণ করে শ্রীহরির জন্মের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষবশত তাঁর চিন্তায় কংস এতই তন্ময় হলেন যে,

> "আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্ মহীম্।
> চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ।।"
>
> (ঐ, ১০।২।২৪)

—উপবেশনে, শয়নে, অবস্থানে, পানে, ভোজনে, পর্যটনে প্রভৃতি সকল সময়ে শত্রুভাবে শ্রীহরিকে চিন্তা করতে করতে সমগ্র জগৎকে বিষ্ণুময় দেখতে লাগলেন।

ভগবান আবির্ভূত হচ্ছেন জানতে পেরে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলের অলক্ষ্যে এসে ভগবানের নানা গুণ ও প্রভাব বর্ণনা করে তাঁর স্তব করলেন। ভগবানের আবির্ভাব-রজনী উপস্থিত হলে গগনে শুভ গ্রহনক্ষত্রাদির উদয় হলো ও প্রকৃতি মনোরম শোভা ধারণ করল। শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট

তা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন (ঐ, ১০।৩।১-৪)ঃ "অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরম শোভনঃ"—সর্বগুণসম্পন্ন অতিরমণীয় কাল উপস্থিত হলো, তখন "অজন-জন্ম-ঋক্ষং শান্ত-ঋক্ষ-গ্রহতারকম্"—রোহিণী নক্ষত্র, গ্রহগণ ও অন্যান্য তারকাগণ শান্তভাব ধারণ করল। "দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোডুগণোদয়ম্"—দিক্‌সমূহ প্রসন্ন, নির্মল আকাশমণ্ডল নক্ষত্রগণে ভূষিত; "মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠ-পুর-গ্রাম-ব্রজাকরা"—পৃথিবীস্থ নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ, আকরসমূহ মঙ্গলময় হলো; "নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ"—নদীসকল স্বচ্ছসলিলপূর্ণ, হ্রদসমূহ পদ্মে সুশোভিত; "দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ"—বনরাজি বিহঙ্গ-ভ্রমরগণের শ্রুতিমধুর নাদপূরিত ও পত্রপুষ্পগুচ্ছে সুরম্য; "ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ"—পুণ্যগন্ধবাহী সুখস্পর্শ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল; "অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত"—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের শান্ত যজ্ঞানল পুনরায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। এমন একটি পরিবেশে জন্মরহিত ভগবান অবতরণে উন্মুখ হলে অসুরদ্বেষী সাধুগণের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল। অর্থাৎ বিনা কারণে সাধু-ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেতে লাগল। স্বর্গে দুন্দুভিসকল বেজে উঠল। কিন্নর ও গন্ধর্বগণ মঙ্গলগান, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব ও বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাগণের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগল। আর দেবতা ও মুনিগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। মেঘসকল সাগরের অনুকরণে মন্দ মন্দ গর্জন করতে লাগল। তমসাবৃত নিশীথকাল সমাগত হলে কংসের কারাগারে—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।।"
(ঐ, ১০।৩।৮)

—পূর্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্বজীবের হৃদয়গুহায় বিরাজমান বিষ্ণু দেবতারূপিণী দেবকীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যাচ্ছে, ভগবান সাধারণ মানবশিশুর আকারে জন্ম নেননি। তিনি চতুর্হস্ত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভমণি, পরিধানে পিতাম্বর বসন, ঘনমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ অর্থাৎ তিনি শ্রীবিষ্ণুরূপেই আবির্ভূত হয়েছেন। এই অদ্ভুত বালককে দেখে বসুদেব ভগবান-বোধে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। দেবকীও বালকের এই রূপ দেখে ভগবানই তাঁর ক্রোড়ে আবির্ভূত হয়েছেন ভেবে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। স্তবশেষে তিনি প্রার্থনা জানালেন—"ত্বং ঘোরাদ্ উগ্রসেনাত্মজান্নস্ত্রাহি" (ঐ, ১০।৩।২৮)—ভীষণ প্রকৃতির উগ্রসেনপুত্র অর্থাৎ কংসের ভয়ে ভীত আমাদের আপনি রক্ষা করুন। এই ভয় কিন্তু দেবকীর নিজের জন্য নয়। কারণ, ভক্তজনের ভয়হারী ভগবান স্বয়ং তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত, তাঁর নিজের আর ভয় কি? দেবকীর ভয় হলো তাঁর পুত্ররূপী ভগবানের জন্য। সন্তান হওয়ামাত্রই কংস তাকে হত্যা করে, এখন শিশুরূপী ভগবানকেও যদি নিষ্ঠুর কংস হত্যা করে—এই ভয়ে তিনি ভীত ও উদ্বিগ্ন। তাই তাঁর প্রার্থনা—

"উপসংহর বিশ্বাত্মন্ অদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্।।" (ঐ, ১০।৩।৩০)

—হে বিশ্বময়, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত এই অলৌকিক রূপ আপনি সংবরণ করুন। তাহলে আপনাকে কংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হব। অন্যথা আপনার অলৌকিক রূপ লুকাব কোথায়? এই হলো দেবকীর মনোভাব। সন্তানকে রক্ষার চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের আকুতিই ফুটে উঠেছে দেবকীর প্রার্থনায়। তাঁর পুত্র যে ভগবান, সকল জীবের রক্ষাকর্তা, তা বুঝতে পেরেও এবং তাঁকে ভগবানরূপে স্তুতি করেও দেবকীর হৃদয়ে বাৎসল্যভাবই প্রাধান্য পেল। এও ঈশ্বরেরই লীলা। দেবকীর মনোভাব বুঝে ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভাব হওয়ার কারণ বললেন। তিনি বললেন ঃ "হে সতি, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্বজন্মে তোমার নাম ছিল পৃশ্নি। আর এই শুদ্ধচিত্ত বসুদেব ছিলেন সুতপা নামে প্রজাপতি। ব্রহ্মার আদেশে তোমরা প্রজাসৃষ্টির জন্য দুষ্কর তপস্যা করেছিলে। তোমাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তোমাদের সম্মুখে আমি এইরূপে আবির্ভূত হয়ে অভীষ্ট বর চাইতে বলায় তোমরা আমার মতো পুত্র প্রার্থনা করেছিলে। আমিও তোমাদের সে-প্রার্থনা অনুমোদন করেছিলাম। এই জন্মে আমি তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছি। তোমাদের পূর্বদৃষ্ট বরদাতা বিষ্ণুই যে অবতীর্ণ হয়েছি, তোমরা যাতে তা বুঝতে পার সেজন্য আমি এই চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছি। তোমরা দুজনে আমাকে নিরন্তর পুত্রভাবে এবং ব্রহ্মভাবে চিন্তা করতে করতে আমার প্রতি অনুরক্ত মদ্‌গতি লাভ করবে।" এই কথা বলে ভগবান শ্রীহরি তাঁর মায়াশক্তি-বলে মানব-শিশুর রূপ ধারণ করলেন। তারপর তাঁর নির্দেশেই বসুদেব শিশুরূপী ভগবানকে গোকুলে নন্দগৃহে যশোদার নিকট রেখে যশোদার গর্ভজাত কন্যারূপিণী যোগমায়াকে কংস-কারাগারে দেবকীর নিকট নিয়ে এলেন।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু জন্মতিথি ও মাসের উল্লেখ নেই। শুকদেব জন্মনক্ষত্রের উল্লেখ করেছেন, তবে সরাসরি নাম উল্লেখ না করে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় নক্ষত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রোহিণী নক্ষত্রে। শুকদেব 'রোহিণী' নাম উল্লেখ না করে সেই স্থলে উল্লেখ করেছেন 'অজনজন্ম-ঋক্ষম্'। 'অজনজন্মা' শব্দের অর্থ 'ব্রহ্মা' (অজন—বিষ্ণু, অজন থেকে জন্ম যাঁর তিনি অজনজন্মা। বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম—একথা পুরাণপ্রসিদ্ধ। এজন্য ব্রহ্মা হলেন 'অজনজন্মা'।) 'ঋক্ষ' শব্দের অর্থ 'নক্ষত্র'। এখানে 'অজনজন্ম-ঋক্ষ' বলতে বোঝানো হয়েছে ব্রহ্মা যে-নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই নক্ষত্রকে। ব্রহ্মা হলেন রোহিণী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুতরাং 'অজনজন্ম-ঋক্ষম্' শব্দের সরলার্থ রোহিণী নক্ষত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে মানুষের অনেক শুভাশুভ নিয়ন্ত্রিত হয় জন্মনক্ষত্রের প্রভাবে। এজন্য অনেকে নিজের কিংবা প্রিয়জনের জন্মনক্ষত্র অপরের নিকট প্রকাশ করেন না। শুকদেবও তাঁর প্রিয় শ্রীগোবিন্দের জন্মনক্ষত্রের নাম না বলে গূঢ়ার্থক পদদ্বারা তা

প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি এবং মাসের নাম ভাগবতে না থাকলেও অন্যান্য পুরাণে এগুলির উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে (শ্লোক ৬৩, ৭২) আছে ঃ

"অর্ধরাত্রে সমুৎপন্নে রোহিণ্যামষ্টমীতিথৌ।
জয়ন্তীযোগযুক্তে চ চার্ধচন্দ্রোদয়ে মুনে।।
তত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণো দিব্যরূপং বিধায় চ।
হৃদ্‌পদ্মকোষাদ্ দেবক্যা হরিরাবির্বভূব হ।।"

—অর্ধরাত্রে, রোহিণী নক্ষত্রে, অষ্টমী তিথিতে জয়ন্তী যোগে অর্ধচন্দ্র উদয় হলে কংসের কারাগারের সূতিকাগৃহে শ্রীহরি কৃষ্ণ দিব্যরূপ ধারণ করে দেবকীর হৃদয় থেকে আবির্ভূত হলেন।

উপরি উক্ত দুটি শ্লোকে জন্মমাসের উল্লেখ না থাকলেও উক্ত পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে জন্মাষ্টমী ব্রতের ফল উল্লেখ প্রসঙ্গে জন্মমাসের উল্লেখ আছে। সেখানে আছে ঃ

"মন্বাদি দিবসে প্রাপ্তে যৎফলং স্নানপূজনৈঃ।
ফলং ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং ভবেৎ কোটিগুণকংবিজ।"

(শ্লোক ৬)

—মনুষ্য মন্বন্তরাদি দিবসে স্নান ও হরিপূজা করে যে-ফল পায়, ভাদ্রপদীয় অষ্টমী তিথিতে স্নান ও পূজা করে তা থেকে কোটিগুণ অধিক ফল লাভ করে। ভাদ্রপদ ও ভাদ্রমাস একই। এখান থেকে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথিতে। তাছাড়া 'খমাণিক্য' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্থিতি, দিন, তিথির উল্লেখ আছে। ভাগবতের অন্যতম টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর টীকায় 'খমাণিক্য' গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে আছে ঃ

"উচ্চস্থাঃ শশিভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভ গো।
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনোরাহবঃ।।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মার্ক্ষমত্রক্ষণে।
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ।।"

—শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি উচ্চস্থানে অবস্থিত হয়েছিল। সেসময় বৃষলগ্ন এবং বৃহস্পতি বৃষরাশিতে, সূর্য সিংহরাশিতে, শুক্র তুলারাশিতে ও রাহু বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থিত ছিল। সেদিন বুধবার, অষ্টমী তিথি ও রোহিণী নক্ষত্রযোগে নিশীথকালে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

শুকদেব পরীক্ষিতের অনুরোধে ও তাঁর কৃষ্ণকথা শোনার আগ্রহাতিশয্যে প্রীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত জীবনকাহিনী তাঁকে শোনাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করার পূর্বে তিনি তাঁর জন্মকাহিনীও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলেন। কিন্তু এই জন্মকাহিনী শুকদেব অতি সংক্ষেপে বললেও পারতেন। কারণ, পরীক্ষিতের জীবনের সীমা মাত্র সাতদিন। তার মধ্যে কয়েকদিন অন্যান্য কাহিনী শুনতে শুনতেই অতিবাহিত হয়েছে। অবশিষ্ট অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অন্যান্য আকর্ষণীয় অলৌকিক কাহিনীসমূহ বলে শেষ করতে হবে। তাছাড়া সপ্তমদিনের পূর্বেও তাঁর যেকোন সময় জীবনাবসান হতে পারে। এবিষয় বিবেচনা করে শুকদেব সংক্ষেপে জন্মবৃত্তান্ত বলতে পারতেন। তাছাড়া পরীক্ষিতের প্রশ্নও ছিল ঃ "ভগবান যদুর বংশে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান যেসকল লীলা করেছিলেন সেসকল আমাদের বিস্তৃত করে বলুন।" প্রশ্ন থেকেও বোঝা যাচ্ছে, জন্মগ্রহণের পরের লীলাগুলিই পরীক্ষিৎ বিস্তৃতভাবে শুনতে চেয়েছেন। তবে কারোর জীবনকাহিনী বলতে গেলে তাঁর জন্মকাহিনী তো বাদ দেওয়া যায় না। তাহলে সেই জীবনকাহিনী অসম্পূর্ণ হয়। তবে এক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা ও শ্রোতার আয়ু বিবেচনা করে জন্মলীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেত। কিন্তু শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা আরম্ভ করলেন। কারণ, তিনি জানেন নিত্যমুক্ত ভগবানের অমৃতধাম থেকে মর্তধামে অবতরণ এক অসাধারণ ঘটনা। ভগবানের এই অপ্রাকৃত আবির্ভাবলীলা ধারণা করতে পারলেই তাঁকে লাভ করা যায়। গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন ঃ

"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।।"

(গীতা, ৪।৯)

—হে অর্জুন, যিনি আমার অলৌকিক জন্ম ও কর্ম তত্ত্বত জানেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন এবং দেহান্তে তিনি পুনর্জন্ম লাভ করেন না। সুতরাং ভগবানের জন্মলীলা মনোযোগ সহকারে শুনতে শুনতেই যদি তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের শরীরত্যাগ হয়, তাহলেও তিনি তাঁর বাঞ্ছিত গতি লাভ করবেন—এই মনে করেই শুকদেব বিস্তৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার ব্যাখ্যান করলেন।

ভগবান যখন মর্তে অবতরণ করেন অর্থাৎ মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন নানারকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সকল অবতারের জন্মের সময়ই কম-বেশি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। সেইসকল ঘটনাবলীর কথা পুরাণসমূহে ও তাঁদের জীবনীগ্রন্থে বিবৃত আছে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ অবতারগণ পৌরাণিক চরিত্র। এই চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলে অনেকে মনে করেন। সুতরাং তাঁদের জন্মকালীন ঘটনা বা জীবনের অন্যান্য অসাধারণ ঘটনাগুলির সত্যতা স্বীকারের প্রশ্নই তো তাদের নিকট আসে না। ঐ চরিত্রগুলি কবির সৃষ্টি এবং তাঁদের জীবনের ঘটনাসমূহ কবির কল্পনা বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত যেসব মহামানব অবতাররূপে ভক্ত-জনগণের নিকট স্বীকৃত, তাঁরা পৌরাণিক চরিত্র নন; ইতিহাস তাঁদের বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারবে না কোনদিন। তাঁদের জন্মের সময়ও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেগুলিকে অলৌকিক বা অপ্রাকৃত বলা যায়। বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতারগণের জন্মের ঘটনাবলীর সত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক অবতারগণের জন্মবিষয়ক ঘটনাবলীর সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। আর অবতারের জন্ম ও জীবনকাহিনী পড়বার বা শোনবার সময় গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাণীটিও আমাদের মনে রাখতে হবে—"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্"—আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত, অলৌকিক। ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আত্মোপলব্ধি

"জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই..."

জীবনরহস্যের সবথেকে বড় আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বোধকরি এটাই। "কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,/কে জানে কেমন কি খেলা হলো"—এই চিরন্তন প্রশ্নে চিরদিনই ভাবিত হতে হয়েছে প্রতিটি আত্মসন্ধানীকে। "সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে" পরিভ্রমণ কতদিন? একদিন তো "নিজ নিকেতনে" ফিরতেই হবে। সেই ফেরাই আত্মবোধনের সোপান। মোহ-অন্তের পরই আত্ম-উপলব্ধির সেই মোক্ষমার্গে যাত্রা শুরু।

"কেউ যে কারে চিনি নাকো সেটা মস্ত বাঁচন"—একথা ঠিকই। তবে বাঁচার মতো বাঁচতে হলে নিজেকে যে সবার আগে বোঝার মতো বোঝা চাই। আমার এ-পথ যে-পথে চলেছে, তাকে যে সবার আগে জানার মতো জানা চাই। নইলে সর্বংসহা বসুন্ধরার ওপর এ সাড়ে তিনহাত শরীরটাই নিজের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। জানি "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।" তবু এ অসীমের অনন্ত যাত্রাপথে নিজেকে জানার প্রায়োগিক প্রয়াসকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কৃতী শিল্পীর মতো দক্ষ হাতে নিজের জীবনকে ঠিকঠাক গড়েপিটে তোলার জন্য একটা পরিমিতিবোধ তো থাকা চাই। আর তার জন্যই চাই নিজেকে জানার অবকাশ। বাণিজ্যে লাভ-ক্ষতির মাঝে হস্তগত সঞ্চয়ের একটা নিখাদ হিসেবের মতো জীবনযাত্রাপথে মধ্যে মধ্যে একটা ছোট্ট হিসাব কষে নিলে হয় না? একটা ছোট জরিপ—নিজস্ব ওজনের? নিজের বিবেকই সেই নিক্তি, কষ্টিপাথর, মাপকাঠি—নিজেকে মাপবার। তার থেকে কড়া পাহারাদার হতে পারে আর কিছু? হতে পারে আর কেউ অন্তরাত্মার মতো শিক্ষক, অভিভাবক? একটিবার অন্তর্দর্শনে জেনে নিলে হয় না, কি চাই আমি? আমার প্রার্থনাটা আমার নিজেরই অজ্ঞাত অগোচরে রয়ে গেল চিরতরে। চর্মচক্ষে চেয়ে নয়, এই চাওয়ার মীমাংসা হয় অন্তর্নয়ন মেলেই। সে 'মেল'-এই আসে পৃথিবীর ডাকঘরে সেই রাজার চিঠি ভবরোগ-শোক-জর্জরিত জীব অমলের কাছে। সেই চিঠি যেন নিজেই নিজেকে লেখা। আপনাকে আরো আপন করে পাওয়ায়। সবটুকু পাওয়ায়। জীবন-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জন করিতে পারে।... সুতরাং আত্মাকে যে দিতে পারিয়াছে আত্মা সর্বতোভাবে তাহারই।" সত্যিই তো, যা সম্পূর্ণ নিজের, তার সবটুকু দেওয়াতেই তো নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত দাতাবৃত্তি! আর তা আত্মোপলব্ধি ছাড়া কিভাবে সম্ভব?

ক্রৌঞ্চ মিথুনের ওপর মৃত্যুবাণের ধ্বংসলীলা দেখে শোকদীর্ণ "মা নিষাদ..." শ্লোক-উচ্চারণে আপন কবিসত্তার সম্যক্ উপলব্ধি হয়েছিল বল্মীকাকীর্ণ সদ্য-কবি দস্যু রত্নাকরের। তুফানী আশমানে বীরদর্পে পৌরুষগর্বে জ্যৈষ্ঠের ঝড় তুলেছিলেন বেদুইন নজরুল। সে তো নিজের 'বিদ্রোহী' সত্তার উপলব্ধির পরেই। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জর্জ বিশপ বার্কলের মতে, অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, পান্নার সবুজ হয়ে ওঠা, চুনির রাঙা রঙ পাওয়া বা গোলাপের সৌন্দর্য—সবই তো আমার, অর্থাৎ প্রত্যক্ষকারীর চেতনার কারণেই। "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে।" আমার স্বরূপের সার্থকতা এখানেই। আর পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে, জ্ঞানবিচারের শেষে সমাধি হলে এই আমি-টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোনমতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে এই সংসারে ফিরে আসতে হয়।

লোকশিক্ষক পরমহংসদেব লৌকিক দৃষ্টান্তে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন—গরু 'হাম্বা হাম্বা' অর্থাৎ 'আমি আমি' করে। তাই এত দুঃখ। গ্রীষ্ম, বর্ষা যাই হোক, তাকে লাঙল টানতে হয়। অথবা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নেই। চর্মকার তার চামড়া দিয়ে জুতা বানায়। সবশেষে নাড়ি-ভুঁড়ি থেকে তাঁত হলে ধুনুরীর হাতে তা যখন 'তুঁহু তুঁহু' অর্থাৎ 'তুমি তুমি' করে বাজে, তখন নিস্তার হয়। কবীর তাঁর দোঁহাতে গেয়েছেন—

"প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা।।"

নিজেকে তাঁর অন্তর্গত, সেই দেওয়ানের দাস বলে জানাই সেই আত্মোপলব্ধি।

আত্মালোকে আত্মানুসন্ধানে আত্মলোকে ভেসে ওঠে মহাকালগর্ভে বিলীন একটি দিনের ছায়াচিত্রের দৃশ্যপট। স্থান—যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের উদ্যান। কাল—১৮৮৩ সালের ১২ জানুয়ারি, দ্বিপ্রহর। সুরধুনী জাহ্নবীতটে ভ্রমণ করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে বসেছেন উদ্যানের বৈঠকখানার ঘরে। সঙ্গে তখন একমাত্র সঙ্গী অন্তরঙ্গ শিষ্য নরেন্দ্রনাথ। সমাধি থেকে বাহ্যাবস্থায় ফিরে তাকে স্পর্শ করলেন ঠাকুর। সেই দিব্যস্পর্শে নরেনের বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল। পরশমণি ঠাকুর তখন হৃত-সংজ্ঞা নরেনকে তার আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। সে কে, কোন্ কাজে, কোথা থেকে এখানে কতদিনের জন্য এসেছে—সবই তখন জেনে নেন অন্তর্দর্শক প্রিয় নরেনের কাছ থেকে। পরবর্তী কালে পরমহংসদেব এই প্রসঙ্গের অনুষঙ্গে বলেছেন: "এ থেকেই কিন্তু জেনেছি, নরেন যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকবে না। দৃঢ়সঙ্কল্পসহায়ে যোগমার্গে সে তার দেহ ত্যাগ করে চলে যাবে। নরেন যে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ!"

বেদান্ত বলে: "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। বেদান্তের মূল সুর—"...জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ"-এর প্রতিধ্বনিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন: "দেহটা খোলমাত্র, সেই অখণ্ড (সচ্চিদানন্দ) বৈ আর কিছু নাই।"

সেদিনের সেই নরেনই ভাবিকালের জগজ্জয়ী বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। স্বরূপ উপলব্ধিতে শুধুমাত্র আত্মমোক্ষই নয়, জগতের হিতকে, শিবজ্ঞানে জীবসেবাকে যিনি জীবনের ব্রত করেছিলেন। তিনি বলেছেন: "যতদিন না জগৎ ঈশ্বরের সহিত একত্ব অনুভব করিতেছে, ততদিন আমি সর্বত্র মানুষের মনে প্রেরণা যোগাইতে থাকিব।" সেই আত্মবিশ্বাস, যা অন্তরের দেবত্বকে জাগ্রত করে, তাকে জাগ্রত করার মন্ত্রই তিনি দিয়ে গেছেন আত্মোপলব্ধির জন্য। ঈশ্বরে নয়, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না—সেই নাস্তিক। আত্মার

পক্ষে কিছু অসম্ভব—এরূপ ভাবাই ভয়ানক নাস্তিকতা। এইসব কথা একমাত্র তাঁর মতো স্বরূপজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্ পুরুষসিংহই বলতে পারেন।

স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মহাবাণী—"যত মত তত পথ।" মানুষ তার অভিরুচি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী বেছে নিতে পারে যে-কোন ধর্মমতের পথকেই। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তার অবলম্বনকারীকে শাশ্বত ধ্রুবস্বরূপ উপলব্ধির জন্য যথার্থ পথে ধ্রুবতারার আলোয় অভ্রান্ত দিঙ্‌নির্দেশ করা। দেবালয়, শাস্ত্রাধ্যয়ন, আচার-অনুষ্ঠান—এসবই ধর্মের বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ আত্মোপলব্ধিই তার অন্তরের কথা। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। সেখানে শূন্যের সঙ্গে পূর্ণের, করোজ্জ্বল উষার সঙ্গে ঘনঘোর অমানিশার স্বরূপগত কোন অন্তর নেই। ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি উপনিষদের মূলকথা সেটাই। পৃথিবীর সবকিছুর সঙ্গে এখানেই ব্যক্তির অনিবার্য একীভবন। বিশ্বসাথে আত্মিক যোগ। শুধু "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে" দাঁড়াতে হবে। তবেই বুকের মাঝে সাড়া মিলবে বিশ্বলোকের।

লোকায়ত চার্বাক তাঁদের চারুবাক্যে বলেন যে, দেহই আত্মা। আমরাও অজ্ঞানতাবশত লৌকিক জ্ঞানে নিজেদের এই স্থূল শরীর-মন-বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হিসাবে ভাবতেই অভ্যস্ত। আত্মোপলব্ধি হলো সেই অবস্থা, যখন জীব নিজেকে শরীর-মন-বুদ্ধি থেকে পৃথক জানে। বাহ্য স্থূলশরীর দেহ ও প্রাণ এবং সূক্ষ্মশরীর মন ও বুদ্ধির সমষ্টিই হলো আমি। 'আত্মানং বিদ্ধি' বা 'know thyself'—সেই আত্মাকে জানাই জীবের চরম সাধন। এটাই বেদান্তের মর্মবাণী। আত্মবিকাশের ফলে প্রস্ফুটিত হৃৎপদ্মে জীব উপলব্ধি করে সেই চিরন্তন সত্য—'সোঽহং'—তিনিই আমি!

আত্মদীপ জ্বেলে সেই অন্তরপ্রদীপের অনিরুদ্ধ আলোয় অন্তর-মহলের অবরুদ্ধ দ্বারের হয় উন্মোচন। আত্মালোকে উদ্ভাসিত হয় স্বরূপ। অমৃতও যাঁর ছায়া, মৃত্যুও যাঁর ছায়া—উপনিষদের ঋষি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন "আবিরাবীর্ম এধি"—হে স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্ম আমার নিকট প্রকাশিত হও।

অয়ন বিশ্বাস
বাদুড়িয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা
পিন-৭৪৩ ৪০১

শতাব্দী-উত্তর 'উদ্বোধন' এবং প্রসঙ্গত

'উদ্বোধন' সত্যিই বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে 'ধ্রুবতারা'। সম্প্রতি ১০১ বছরের 'উদ্বোধন'-এর শতবার্ষিকী নির্বাচিত সঙ্কলনও প্রকাশিত হয়েছে। 'উদ্বোধন'-এর উন্নতশির বিশাল কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শত বছরের ঘটনাপ্রবাহে। সেই ধ্রুপদী বস্তুর সান্নিধ্য সবার কাম্য, তাই তার কথা শুনতে, বারবার বলতে ভাল লাগে।

'উদ্বোধন' স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃস্নেহের ছত্রছায়ায় শৈশবে পথ হেঁটেছে। তারপর ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে অনেক ঝড়, অনেক বাধা অতিক্রম করে সে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে এক বিশাল জাহাজের মতো। জলোচ্ছ্বাসে দুদিকের কূল ভাসিয়ে চলেছে সে। আজ ১০১ বছর ধরে সগৌরবে সে প্রকাশিত হয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সুস্থ, সবল তার দেহ। ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, শিল্প, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ক্রীড়া প্রভৃতি নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অনন্তের পথে তার দৃপ্ত পদক্ষেপ। স্বামীজীর প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' ভারত তথা সারা বিশ্বের প্রাচীনতম সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। আর নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যের নিরিখে দেশীয় ভাষায় ভারতে 'উদ্বোধন'ই সর্বপ্রাচীন। বহু গবেষক, বুদ্ধিজীবী, মনীষীর লেখায় সমৃদ্ধ সে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের পার্ষদদের অপ্রকাশিত কথা ও কাহিনী তার পাতায় পাতায়। সেখানে ভক্তরা খুঁজে পান ঠাকুর, মা ও স্বামীজী প্রমুখের জীবন্ত স্পর্শ। তাই তার সঙ্গে ভক্তদের প্রাণের যোগসূত্র বড়ই নিবিড় ও আন্তরিক। বিগত দুশ বছরে বাংলার বহু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে প্রবল শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে। 'সংবাদ প্রভাকর', 'বঙ্গদর্শন', 'তত্ত্ববোধিনী' 'সংবাদ প্রবাহ', 'ধর্মতত্ত্ব', 'হিতবাদী', 'কল্লোল', 'চতুরঙ্গ', 'প্রবাসী', 'অমৃত', 'দেশ', 'বেতারজগৎ'—কত নাম করব! কিন্তু অধিকাংশই আজ নির্বংশ, নিশ্চিহ্ন ধরাধাম থেকে। যেগুলি চলছে, তাদের শক্তি কি বেড়েছে, অথবা জনপ্রিয়তার নিরিখে আগের জনপ্রিয়তাকে অতিক্রম করতে কি পেরেছে? না—এই উত্তর সকলেরই জানা। অপরদিকে বিশ্বজনীন ভাবাদর্শ, আধ্যাত্মিক দর্শন, অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বামীজীর পরিকল্পনার আদর্শে গড়ে ওঠা 'উদ্বোধন' শতাব্দী অতিক্রম করেছে সগৌরবে। সর্বকালের সকল মানুষের কল্যাণব্রতে নিয়োজিত এই পত্রিকা। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপনের বিপ্লবে পেয়েছি অনেক, হারিয়েছি আরো আরো বেশি। দৈহিক ক্ষুধা বেড়েছে, আত্মিক ক্ষুধার হয়েছে অকালমৃত্যু। মনের দৈন্য, সঙ্কীর্ণতার আধিপত্য সর্বত্র। সেখানে 'উদ্বোধন'-এর ভূমিকা পথ-প্রদর্শকের। জগদ্ধিতায় ভক্ত ও অনুরাগীর কাছে এই পত্রিকা এক অমূল্য সম্পদ। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, শতবর্ষ-অতিক্রান্ত এই পত্রিকার হাজার হাজার বছরের পরমায়ু হোক।

সমসাময়িক কিছু পত্রিকার বর্তমান মূল্য (বার্ষিক) পাঠকের অবগতির জন্য দেওয়া হলো।

	দেশ	সানন্দা	বর্তমান
প্রতি সংখ্যার মূল্য (টাকা)	১২.০০	২০.০০	৫.০০
বছরে প্রকাশিত হয় (সংখ্যা)	২৫টি	২৫টি	৫১টি
বার্ষিক মূল্য (টাকা)	৩০০.০০	৫০০.০০	২৫৫.০০
শারদীয়া সংখ্যার মূল্য (টাকা)	৮৪.০০	৫০.০০	৩২.০০
মোট বার্ষিক মূল্য (টাকা)	৩৮৪.০০	৫৫০.০০	২৮৭.০০

অথচ, মূল্যবৃদ্ধির প্রাবল্য সত্ত্বেও, মাপ ও মানের এতটুকু অঙ্গহানি না করে 'উদ্বোধন'-এর ১১টি সাধারণ সংখ্যা ও সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ আয়তনের শারদীয়া সংখ্যা সহ (আলাদা কিনলে যার মূল্য ৪০ টাকা) আমরা পাচ্ছি অতি সুলভে—বছরে মাত্র ৬৫ টাকায় (মাসে ৫ টাকা ৪২ পয়সা) এবং সেইসঙ্গে পাচ্ছি অতি দুর্লভ আত্মার পরমান্ন।

'উদ্বোধন' রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সাথী, রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের ভগীরথ। 'উদ্বোধন' সমগ্র বাঙালীর গৌরব, ভক্তজনের গর্ব। দীক্ষিত ও অদীক্ষিত সকল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীর অহঙ্কার 'উদ্বোধন'।

ফণীন্দ্রমোহন রায়
বাটা মোড়, দক্ষিণ জগতলা
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পিন-৭৪৩ ৩৫২

আমাশয়ের একটি কারণ অ্যামিবা

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য

দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখে অনেকে কষ্ট পান। নানা কারণে এই অসুখ হতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগনির্ণয় করতে পারেন। বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজনও হতে পারে। কিন্তু প্রায় সব দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখকেই অ্যামিবিয়াসিস মনে করার একটা সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এধরনের একটি অসুখ অনেকসময় উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্রের কারণেও হতে পারে। 'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৫ সংখ্যায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য আমাশয়ের একটি কারণ অ্যামিবা।

নিদান

অ্যামিবা প্রোটোজোয়া (protozoa) শ্রেণীভুক্ত একটি এককোষী প্রাণী, বৈজ্ঞানিক নাম 'Entamoeba histolytica' (এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা)। এই অ্যামিবার সংক্রমণে 'অ্যামিবিয়াসিস' রোগ হয়। এটি চলমান (trophozoite), প্রাক্-কৌষিক (pre-cystic) ও কৌষিক (cystic)—এই তিন অবস্থায় থাকতে পারে। চলমান ও প্রাক্-কৌষিক অ্যামিবা রোগ সংক্রমণ করে না। পাকস্থলীর অম্ল জারকরসে নষ্ট হয়ে যায়। কৌষিক অ্যামিবা-দূষিত খাদ্য ও পানীয় কোন ব্যক্তি গ্রহণ করলে সেটি পাকস্থলীর অম্ল জারকরসে নষ্ট না হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছায়। সেখানে জারকরসে এর আবরণী ঝিল্লির কিছু পরিবর্তন হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষে ও বৃহদন্ত্রের শুরুতে কৌষিক অ্যামিবা থেকে ছোট আকারের চলমান অ্যামিবা বেরিয়ে আসে এবং বিভাজিত হয়ে সংখ্যায় বাড়ে। এটি প্রধানত বৃহদন্ত্র আক্রমণ করে। তবে ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষের অংশও (terminal ileum) আক্রান্ত হতে পারে। অনুকূল অবস্থায় বৃহদন্ত্রের দেওয়ালের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (mucous membrane) ক্ষত সৃষ্টি করে ও বংশবৃদ্ধি করে। বৃহদন্ত্রের দেওয়ালেও প্রদাহ হয়। ফলে সেখানে তন্তুময় স্তরের বৃদ্ধি (fibrosis) হয়। কদাচিৎ ফুটো হয়ে যেতেও পারে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়। মলের সঙ্গে আম-রক্ত নির্গত হয়। এই ক্ষতসৃষ্টিকারী অবস্থায় (trophozoite stage) অ্যামিবা অনুবীক্ষণে চলমান (motile) দেখায়। এ-অবস্থায় এরা একরকম উৎসেচক (enzyme)-এর সাহায্যে তন্তুক্ষয় করে এবং লোহিতকণিকা, তন্তু—এগুলি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। প্রতিকূল অবস্থায় এরা গুটিয়ে আসে ও কিছুটা ছোট হয়ে যায়। এটি অ্যামিবার প্রাক্-কৌষিক অবস্থা। আরো পরে কৌষিক অবস্থা। তখন এরা আরো ছোট হয়ে যায় এবং একটা ঝিল্লির আবরণের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় থেকে যায়। বৃহদন্ত্রের পরিবেশ বিশেষ অনুকূল না হলে অনেক সময়ে অ্যামিবা নালীর মধ্যে জীবাণু, খাদ্যাবশিষ্ট ইত্যাদি খেয়ে বাঁচতে পারে ও বংশবৃদ্ধিও করতে পারে। এগুলিকে বৃহদন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বা luminal amoeba বলা হয়। এরা কিছুটা ক্ষুদ্রাকৃতি হয় ও বৃহদন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রমণের চেষ্টা চালিয়ে যায়। কখনো সাময়িকভাবে আংশিক সফলও হয়। রক্ত-আমাশয় না হলেও উদরাময়, পেটে ব্যথা, গ্যাস ইত্যাদিতে রোগী কষ্ট পান। অথবা আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অসুবিধাই হয় না।

আগেই বলা হয়েছে, অ্যামিবা কৌষিক অবস্থায় পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে অ্যামিবিয়াসিস রোগ সংক্রমণ হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আক্রান্ত ব্যক্তির বৃহদন্ত্রে অ্যামিবা যখন কৌষিক অবস্থায় পরিবর্তিত হয় তখন সেই কৌষিক অ্যামিবা অন্ত্রের মধ্যে আবার চলমান বা ক্ষতসৃষ্টিকারী অ্যামিবায় রূপান্তরিত হতে পারে না। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ কৌষিক অ্যামিবা কোন ক্ষতিকর নয়, যদিও এই ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির রোগ সংক্রমণের কারণ।

ই. হিস্টোলিটিকা (E. Histolytica) সদৃশ আরো কয়েকটি অ্যামিবা আছে যারা ক্ষতসৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না ও কোন ক্ষতি করে না।

অ্যামিবিয়াসিস প্রায় সবদেশেই দেখা যায়, কিন্তু উষ্ণ জলবায়ু প্রধান দেশেই বেশি দেখা যায়। প্রধান কারণ অবশ্য অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও জনগণের নিম্নমানের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি। শিশু ও গর্ভবতী নারীদের রোগলক্ষণ তীব্র হওয়ার বেশি সম্ভাবনা। মদ্যপান ও স্টেরয়েড (steroids) চিকিৎসার সময় আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। দেখা গেছে, শীতপ্রধান দেশের জলবায়ু (এবং সম্ভবত প্রাণিজ প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য) অ্যামিবিয়াসিস রোগ দমনে রাখে। দীর্ঘদিনের অ্যামিবিয়াসিসের ভারতীয় রোগী এরূপ পরিবেশে সুস্থ থাকেন যদিও তাদের মলে ক্ষুদ্রাকৃতি অ্যামিবা দেখা যায়।

পরিণত কৌষিক অবস্থায় অ্যামিবা মলে নির্গত হয়ে প্রায় দশদিন বাঁচে, কিন্তু শুষ্ক ও উত্তপ্ত পরিবেশে আরো আগেই নষ্ট হয়ে যায়। মলের সঙ্গে চলমান প্রাক্-কৌষিক ও কৌষিক অ্যামিবা সবই নির্গত হয়। চলমান ও প্রাক্-কৌষিক অ্যামিবা তাড়াতাড়ি মরে যায় ও রোগ সংক্রমণ করে না। কিন্তু কৌষিক অবস্থায় পানীয় ও খাদ্যের সঙ্গে কোন ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে পাকস্থলীর জারকরসে নষ্ট না হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছায় এবং সেখানকার জারকরসে আবরণী ঝিল্লির সামান্য পরিবর্তন হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষে ও বৃহদন্ত্রের শুরুতে কৌষিক অ্যামিবা থেকে অ্যামিবা বেরিয়ে আসে ও বিভাজিত হয়ে আটটি ছোট অ্যামিবা জন্মায়। এরা বৃহদন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রমণ করে। এই প্রক্রিয়াতে প্রায় দু-সপ্তাহ সময় লাগে। তবে অনেক পরেও রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যামিবিয়াসিস শুধু বৃহদন্ত্র আক্রমণ করলেও অন্য কয়েকটি জটিল উপসর্গ (complication) দেখা দিতে পারে। এগুলির একটি হলো উপাঙ্গের প্রদাহ (appendicitis)। আবার অন্ত্রের রক্তবাহী শিরা দিয়ে যকৃত ও প্লীহাতে প্রবেশ করে প্রদাহ ও ফোড়া সৃষ্টি করতে পারে। যকৃত থেকে ফোড়া ওপরে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের আবরণী থলিতে (pericardium) এবং নিচে পেটে অন্ত্রাবরক ঝিল্লির অভ্যন্তরে (peritoneal cavity) প্রবেশ করতে পারে। যকৃত আক্রান্ত না হলেও ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে। মলত্যাগের পর স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শৌচ না করলে মলদ্বারের পাশে চামড়ায় ও স্ত্রীলিঙ্গের ভিতরে অ্যামিবাজনিত ক্ষত হতে পারে। এভাবে যৌনসংসর্গেও পুরুষাঙ্গে চামড়ার অ্যামিবিয়াসিস হতেও দেখা গিয়েছে। এছাড়া মস্তিষ্কের মধ্যে ফোড়া (amoebic brain abscess) হতে পারে। আরেকটি মারাত্মক অসুখ মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহ (primary meningo-encephalitis)। কিন্তু এটি অনেক ক্ষেত্রে ই. হিস্টোলিটিকা-জনিত নয়। প্রকৃতিতে আরো অনেক রকম অ্যামিবা (free living amoeba) থাকে। এধরনের কয়েকটি অ্যামিবা সাধারণত সাঁতারের জল দূষিত করে ও রোগ সংক্রমণ করে। এই অ্যামিবাগোষ্ঠী (Acanthamoeba)-জনিত চোখের অসুখ (Keratitis) হতে দেখা গিয়েছে।

রোগলক্ষণ

অ্যামিবিয়াসিসের রোগলক্ষণগুলিকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—(১) রক্ত-আমাশয়, (২) উদরাময়, (৩) পেটে ব্যথা, অজীর্ণতা, গ্যাস প্রভৃতি ও (৪) কোন রোগলক্ষণ না থাকা। রক্ত-আমাশয়ে বারবার আম (mucus) ও তাজা রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ হয়, সঙ্গে নিচের পেটে (বিশেষ করে বাঁদিকে) মোচড় দিয়ে ব্যথা হয়। তবে উদরাময় বা ডায়রিয়া এমন বেশি হয় না যে, জল-বিয়োজন (dehydration) সমস্যার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় প্রকারের রোগীরা মধ্যে মধ্যে ডায়রিয়ায় ভোগেন। অন্যসময়ে মোটামুটি ভাল থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীর রোগীরা অজীর্ণতা ও আনুষঙ্গিক অসুবিধায় ভোগেন। এদের রোগলক্ষণ অনেকটা উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্রের রোগীদের মতো। অনিয়মিত মলত্যাগ, কখনো কোষ্ঠবদ্ধতা, কখনো অগঠিত বা ভসকা মল, পেটে ব্যথা, গ্যাসের অনুভূতি, অম্লভাব—এগুলিই সচরাচর ঘটে। আরো কিছু লক্ষণ থাকতে পারে। যেমন ওজন হ্রাস, ক্লান্তি, মনঃসংযোগে অসুবিধা, সামান্য জ্বরবোধ, মাথায় কোমরে বা সারা দেহেই ব্যথাভাব ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি কতটা অ্যামিবিয়াসিসের জন্য আর কতটা অন্য কারণে তা বলা শক্ত। অজীর্ণতা শ্রেণীর রোগীদের মধ্যে এই লক্ষণগুলি বেশি দেখা গেলেও রক্ত-আমাশয় ও উদরাময় রোগীদেরও একরকম অসুবিধা কমবেশি দেখা যায়। ডাক্তারি পরীক্ষায় অ্যামিবিয়াসিস রোগীর বৃহদন্ত্রের ডানদিকে শুরু ও ঊর্ধ্বগামী অংশ (caecum and ascending colon) এবং বামদিকের নিম্নগামী অংশ (decending colon) হাতে মোটা লাগে ও চাপ দিলে রোগী ব্যথা পান। চতুর্থ প্রকার রোগীদের কোন আপাত অসুবিধা না থাকলেও অন্য কোন কারণে মল পরীক্ষার সময় কৌষিক অ্যামিবা দেখা যায়। এরা নিজে না ভুগলেও অবশ্যই অন্যের রোগ সংক্রমণের কারণ। বিশেষ পরীক্ষায় যকৃত, প্লীহা, ফুসফুস, চামড়া ও মস্তিষ্কের অ্যামিবিয়াসিস রোগ নির্ণয় করা যায়।

রোগনির্ণয়

মল পরীক্ষাই রোগনির্ণয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। মলত্যাগের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (আধ ঘণ্টার মধ্যে) পরীক্ষা না করলে অ্যামিবা অনুবীক্ষণে চলমান অবস্থায় দেখা যায় না। ফলে চিনতে অসুবিধা হয়। কৌষিক অ্যামিবা দেরি হলেও দেখা যায়। অল্প মল সাধারণ লবণ-জলে মিশিয়ে (normal saline smear) অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করলে চলমান ও কৌষিক অ্যামিবা চেনা যায়। চেনার জন্য বিশেষ রঙ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। চলমান অ্যামিবা সাধারণত পাতলা বা নরম অথবা আমরক্তযুক্ত মলে দেখা যায়। কৌষিক অ্যামিবা নরম ও শক্ত দুরকমের মলেই দেখা যায় তবে আমরক্তযুক্ত মলে খুবই কম দেখা যায়। মল পরীক্ষায় শিক্ষা, দক্ষতা ও সময়ের প্রয়োজন। বারবার মল পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। অনেকটা মল জলে মিশিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে (concentration method) পরীক্ষা করলে কৌষিক অ্যামিবা বেশি সংখ্যায় সহজেই দেখা যায়। সন্দেহের ক্ষেত্রে বিশেষ জীবাণুচাষ পদ্ধতি (culture method) প্রয়োগে মল পরীক্ষা করলে অ্যামিবা পরীক্ষানলে বংশবৃদ্ধি করে ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সহজেই ধরা পড়ে। অবশ্য সাধারণভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। বৃহদন্ত্রের শেষ অংশে বিশেষ যন্ত্র-সহযোগে (procto-sigmoidoscopy) পরীক্ষা করা হলে রক্ত-আমাশয় রোগীর বৃহদন্ত্রের ক্ষত দেখা যায়। ক্ষত চেঁছে অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করলে চলমান অ্যামিবা দেখা যায়। যকৃতে ফোড়া হলে সেখান থেকে পুঁজ টেনে বের করতে হয়। কিন্তু ঐ পুঁজে সাধারণত অ্যামিবা পাওয়া যায় না। কারণ, তারা ফোড়ার দেওয়ালে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। অ্যামিবিয়াসিস রোগের লক্ষণের সঙ্গে বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার ও ulcerative colitis-এর সাদৃশ্য আছে। বৃহদন্ত্রের এক্স-রে (barium enema) এরূপ ক্ষেত্রে রোগনির্ণয়ে সহায়ক। এই পরীক্ষায় অন্য অসুখের অবস্থান বা সহাবস্থান বোঝা যায়, বিশেষ করে বৃহদন্ত্রের অ্যামিবিয়াসিস-জনিত এক বা একাধিক টিউমার (amoeboma) আছে কিনা জানা যায়। অ্যামিবিয়াসিসের চিকিৎসায় (বিশেষ করে এমিটিন দিয়ে চিকিৎসায়) সেরে গেলে এগুলি ক্যান্সার নয় বলে প্রমাণিত হয়। পেটের টি.বি., পিত্তকোষের অসুখ ইত্যাদির সম্ভাবনা বাতিল করতেও এক্স-রে ও অন্যকিছু পরীক্ষার প্রয়োজন হতে

পারে। আজকাল কয়েকটি পরীক্ষা (immunological test) উদ্ভাবিত হয়েছে। ক্ষতসৃষ্টিকারী অ্যামিবিয়াসিস ও যকৃত আক্রান্ত হলে এগুলি রোগনির্ণয়ে সাহায্য করে। কিন্তু যখন অ্যামিবা বৃহদন্ত্রের নালীতেই রয়ে যায় তখন এগুলি বিশেষ কাজ দেয় না। যকৃতের ফোড়াতে আলট্রাসোনোগ্রাফি (ultra-sonography), বুকের এক্স-রে, রক্তপরীক্ষা ইত্যাদি রোগ-নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে।

চিকিৎসা

অতীতে রক্ত-আমাশয় ও যকৃতের ফোড়ায় ইপিকাকোহানা গাছের শিকড় থেকে তৈরি এমিটিন বিশেষ কার্যকারিতার জন্য ব্যবহৃত হতো। কুরচিমূলের গুঁড়োও ঘরোয়া চিকিৎসা ছিল। পরে অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। উল্লেখযোগ্য নাম—halogenated oxyquinoline, কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক, chloroquine, diloxamine fuorate, metronidazole ও tinidazole। বর্তমানে শেষোক্ত ওষুধ দুটিই চিকিৎসকদের প্রথম পছন্দ। এই দুটি একই রাসায়নিক শ্রেণীর। ঔষধ নির্বাচন অসুখের প্রকারভেদের ওপর নির্ভর করে। বৃহদন্ত্রে ক্ষত হলে এবং যকৃত বা অন্যত্র আক্রমণ হলে এমিটিন (emetine) ও মেট্রোনাইডেজল (metronidazole) কার্যকরী। যকৃত আক্রান্ত হলে chloroquine-ও কাজ দেয়। অ্যামিবা বৃহদন্ত্রের নালীতে থাকলেও কৌষিক অবস্থায় এই ওষুধগুলি কাজ দেয় না। সেক্ষেত্রে diloxamide fuorate অথবা oxyquinoline দরকার হয়। এখন metronidazole খুবই পরিচিত ওষুধ। বিনা ব্যবস্থাপত্রেও পাওয়া যায়। কাজেই অনেকেই যেকোন সম্ভাব্য অ্যামিবিয়াসিস, বিশেষ করে উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্রের রোগে, এই ওষুধ ব্যবহার করেন। কিন্তু সবসময় ওষুধের মাত্রা ও সময়সীমা মেনে চলা হয় না। ফলে অসুখ সম্পূর্ণ সারে না। কৌষিক অ্যামিবা রয়ে যায় ও অন্যের রোগ-সংক্রমণের কারণ হয়। মনে হয়, আজকাল এলোমেলো (random) মলপরীক্ষার জন্যই অ্যামিবা কম দেখা যায়। একটি সমীক্ষায় (১৯৪৪-১৯৫৪) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বহির্বিভাগে মলপরীক্ষায় প্রায় ১০% রোগীর অ্যামিবা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে তা ০.৭%-এ নেমে আসে। যথেচ্ছ ওষুধ ব্যবহার এর একটা কারণ হতে পারে।

প্রতিরোধ

আক্রান্ত ব্যক্তির মলের কৌষিক অ্যামিবা খাদ্য ও পানীয় দূষিত করে ও অন্যের রোগ-সংক্রমণ ঘটায়। মল অনেক সময় সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তা থেকে ফসলে যায়। এই চক্র ভাঙা সহজ নয়। খাদ্য ও পানীয়ে পরিচ্ছন্নতাই রোগ-প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। মলত্যাগ ও তার যথাবিহিত অপসারণ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং খাদ্য ও জল পরিবেশন —এসব প্রায়ই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত হয় না ও অ্যামিবিয়াসিস সংক্রমণে সাহায্য করে। তাই জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসচেতন হতে হবে, পরিচ্ছন্নতা শিখতে হবে। হোটেল-রেস্টুরেন্টের রন্ধনালয় এবং পাচক ও পরিবেশনকারীদের পরিচ্ছন্নতা বিশেষ প্রয়োজন। মাছি বসতে না দেওয়ার জন্য খাবার ঢাকা রাখতে হবে। অপরিচ্ছন্ন কাঁচা ও কাটা সবজি, ফল বা মাছি-বসা মিষ্টদ্রব্য বর্জন করতে হবে। কাঁচা সবজি ও ফল পরিষ্কার জলে ভালভাবে ধুয়ে খেতে হবে। Sodium hypochlorite (ট্যাবলেট ও দ্রবণ) পাওয়া যায়। প্রস্তুতকারকের নির্দেশমত তা জলে মিশিয়ে ঐ জলে সবজি ও ফল ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে নিলে আরো ভাল। বিশুদ্ধ পানীয় জল একটি সমস্যা। সাধারণ অবস্থায় জলে কৌষিক অ্যামিবা প্রায় এক সপ্তাহ বাঁচে। কিন্তু ৫০° সেলসিয়াসে পাঁচ মিনিটেই মারা যায়। জল ফুটিয়ে খেলে অ্যামিবিয়াসিস (ও অন্যান্য অনেক জলবাহিত রোগ) প্রতিরোধ করা যায়। এটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। সাধারণ মাত্রায় ক্লোরিন-যুক্ত জলে কৌষিক অ্যামিবা মরে না। বেশিমাত্রায় ক্লোরিন দিলে (super chlorination) মরে। পরিশ্রুত জল 'ধীর বালি ফিল্টার পদ্ধতি' (slow sand filtration) 'দ্রুত পদ্ধতি'র (rapid sand filtration) অপেক্ষা বেশি কার্যকরী। পরিশ্রুত জল পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ-কালে নিকটস্থ জীর্ণ মলবাহী পাইপের সংস্রবে এলে জল দূষিত হতে পারে। এখন জল-পরিশোধনে ফিল্টারের সঙ্গে অতিবেগুণী রশ্মির (ultraviolet rays) সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জীবাণু (এবং কৌষিক অ্যামিবাও) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার না করার জন্য তা ভালভাবে কাজ করে না এবং জল যখন অতিবেগুণী রশ্মির সংস্পর্শে আসে তখন ঐ রশ্মির কাজ আশাপ্রদ হয় না। জল তাড়াতাড়ি বা মোটা ধারায় গেলেও কাজ হয় না। এইসব কারণে এই ধরনের ফিল্টার যতটা নির্ভরযোগ্য বলে দাবি করা হয় ততটা নয়। আজকাল বোতলে পানীয় জল (mineral water) বিক্রয় হয়। নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকের তৈরি হলে এটা ভ্রমণকালে সুবিধাজনক, কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ।

আজকাল অ্যামিবিয়াসিস রোগের চিকিৎসা সহজ হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন রোগভোগ-জনিত কষ্ট কমেছে অন্যদিকে তেমনি রোগনির্ণয়ে ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসায় শৈথিল্য এসেছে। মলপরীক্ষায় যথাযথ শিক্ষা ও নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। আধাখেচড়া চিকিৎসাতেও মলপরীক্ষায় অ্যামিবা দেখা যায় না। যখন তখন metronidazole না খেয়ে রোগনির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত। মনে রাখা দরকার, রোগটি অ্যামিবিয়াসিস না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে। Metronidazole খেয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করলেও প্রমাণ হয় না যে, রোগটি অ্যামিবিয়াসিস। কারণ, এই ওষুধটি কিছু কিছু অন্য জীবাণুর ওপরেও কাজ করে। সেইসব জীবাণু, যদি রোগের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য আরো ভাল ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। ❑

দেহের ও হাত-পায়ের বৃদ্ধি থামে কেন?

আপনার হাত-পায়ের আঙুলগুলি কত লম্বা হবে তা আঙুলগুলি কি করে জানল? এমনকি জন্মাবার আগে থেকেই আপনার হাতের ও পায়ের কড়ে আঙুল বা কনিষ্ঠা মাঝের আঙুল বা মধ্যমা অপেক্ষা ছোট ছিল। এথেকেই প্রশ্ন উঠছে, কোন প্রাণী বা গাছ কি করে জানে যে, তারা কত লম্বা হওয়ার পর তাদের বৃদ্ধি থামাতে হবে? যদিও জিনসমষ্টি (Gene—বংশগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান) থেকে আমরা বলতে পারি যে, তারা হাতের, মাথার বা পতঙ্গের ডানার বা গাছের ডালের অংশ। কিন্তু হাত, মাথা বা ডানা—এগুলি কী অনুপাতে বাড়লে সেই প্রাণী বা গাছ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে, এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা কিছুই বলতে পারেন না। এ যেন শরীরের প্রতি অঙ্গ একটি নকসা (plan) অনুযায়ী চলছে, কিন্তু সেই নকসা যে শরীরের কোথায় অবস্থিত তা কেউ জানে না।

ওপর ওপর দেখলে সমস্যাটি খুব বড় বলে মনে হয় না। কারণ এটা তো জানা কথা যে, কিছু অতিরিক্ত দেহকোষ মধ্যমায় যোগ হয় বলে সেটি কনিষ্ঠার চেয়ে বড় হয়। আর পতঙ্গের ডানাতে কতগুলি জীবকোষ আছে তা তো গোনাই যায়। কিন্তু আধুনিক গবেষণা বলে দিচ্ছে, গণনাতে সমস্যার সব সমাধান হয় না। সিয়াটলের 'ফ্রেড হাচিসন ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর ব্রুস এডগার এবং সহকর্মীদের গবেষণাগারে কতকগুলি ড্রসোফিলা (Drosophilea—ফলে বসা মাছি) আছে, যাদের ডানা এবং ডানার শিরাগুলি সাধারণ বা স্বাভাবিক, কিন্তু আরো খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, ডানার কোষ-সংখ্যা অস্বাভাবিক।

সাধারণ জীবকোষের নিউক্লিয়াসে বা তার বাইরে জোড়া জোড়া তন্তুসদৃশ ক্রোমোজোম (Chromosome—যাতে জিনগুলি থাকে) থাকে, সেজন্য সাধারণ জীবকোষকে 'ডিপ্লয়েড' (diploid) বলা হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে ক্রোমোজোম-সংখ্যা দ্বিগুণ করা যায়। তখন কোষটিকে বলা হয় 'টেট্রাপ্লয়েড' (tetraploid)। এই কোষগুলি আকারে বড় হয়। আবার যেসব কোষে জোড়া ক্রোমোজোম না হয়ে একটি করে ক্রোমোজোম থাকে (হ্যাপ্লয়েড কোষ), সেই কোষগুলি আকারে টেট্রাপ্লয়েড কোষের সিকি গুণ হয়। অর্ধ শতাব্দী আগে নিউট (newt—টিকটিকির মতো উভচর প্রাণী)-এর ওপর গবেষণা করে দেখানো হয়েছে যে, ভ্রূণ অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে কোষকে টেট্রাপ্লয়েড বা হ্যাপ্লয়েড করলেও বড় হয়ে প্রাণীর আকার সাধারণ হয়। অবশ্য হ্যাপ্লয়েড কোষবিশিষ্ট প্রাণীতে টেট্রাপ্লয়েড প্রাণী অপেক্ষা চারগুণ কোষ থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে, অন্তত উভচর প্রাণীর (amphibians) ক্ষেত্রে প্রাণীর আকার কোষ-সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। আবার ক্রোমোজোমের সংখ্যা (এবং তাদের জিন-সংখ্যা) বিবেচনা করলেও দেখা যাচ্ছে যে, হ্যাপ্লয়েড প্রাণীর ও টেট্রাপ্লয়েড প্রাণীর ক্রোমোজোম-সংখ্যা একই থাকে। সম্প্রতি এডগার ও তাঁর সহকর্মীরা দেখিয়েছেন যে, ড্রসোফিলার একটি ডানার অর্ধেক অংশের দেহকোষে কৃত্রিম উপায়ে জিন-সংখ্যা কমিয়ে-বাড়িয়ে এক অংশের কোষ-সংখ্যা অন্য অংশ অপেক্ষা বাড়ানো বা কমানো যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তা করলেও ডানার উভয় অংশের আয়তন একই থাকে। যদি ডানার আয়তন কোষ-সংখ্যার ওপর নির্ভর করত, তাহলে ডানার উভয় অংশের আয়তন আলাদা হতো। এথেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, বর্ধিষ্ণু ভ্রূণ পূর্ণ আকার লাভ করার জন্য কোষ-সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। এডগার বিশ্বাস করেন যে, প্রাণীর আকার (দৈর্ঘ্য ও ঘণমান) লাভ করার একটা নিজস্ব কৌশল আছে। সে-কৌশল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ একটা অনুমান খাড়া করেছেন। কিন্তু ড্রসোফিলায় যা হয় তা কি মানুষে হয়? মানুষের ক্ষেত্রে তার আকার গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং আমরা পরবর্তী কালে মোটামুটি সেই অনুপাতেই বাড়ি। এমন হতে পারে যে, ভ্রূণের মধ্যম আঙুলে বৃদ্ধিবর্ধক (growth promoting) প্রোটিন শুরুতেই উঁচু হয়ে (steeper gradient) জমা হয়, যা পরবর্তী কালে সমান হয়ে গেলে আঙুলের বৃদ্ধি বন্ধ হবে। কিন্তু তাহলে কি লম্বা হওয়ার ক্ষেত্রে একরকম এবং মোটা হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যরকম ভাবে ঐ প্রোটিন জমা হওয়ার ব্যবস্থা থাকে?

সমস্যার শেষ মীমাংসা নিশ্চয়ই জটিল। ড্রসোফিলা ভ্রূণের কতকগুলি কোষ (disc cells) থেকে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয় বলে জানা গেছে, যা জীবকোষের সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করে। ১৯৯৬ সালে নিউ ইয়র্কের কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়েছেন যে, ঐ প্রাণীর ভ্রূণকে বেশি নাইট্রিক অক্সাইড দিলে কোষের বিভাজন মন্থর হয় এবং প্রাণীর পা ও ডানা ছোট হয়। আবার ভ্রূণের নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি বন্ধ করলে পতঙ্গের বাড়তি পা ও ডানা হয়। কোষের সংখ্যা কোষের আয়তনের ক্ষতিপূরণ করে না—যা এডগারের ল্যাবরেটরিতে পাওয়া গিয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে যে, পতঙ্গের ক্ষেত্রে তার কোষবিভাজনের ক্ষতি করলেও সে তার আয়তনকে কতটা রাখতে পারবে তা নির্ভর করছে সেই গবেষণার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলকে পূর্ণরূপ দিতে সময় লাগবে। তবে এটা ঠিক যে, ক্রমবিকাশের ছকে মানুষ-সৃষ্টির অনেক আগেই আণবিক পর্যায়ে তার স্থান নিরূপিত হয়ে আছে।

[New Scientist, 20 February 1999, pp. 32-34) ❑

ছত্রপতি শিবাজী

প্রেমবল্লভ সেন

হে রাজা শিবাজি! (৩ খণ্ড)— জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল, ২৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬। পৃষ্ঠা ঃ ১ম খণ্ড—১১২, ২য় খণ্ড—১৬২, ৩য় খণ্ড—১৩২। মূল্য ঃ ১ম খণ্ড—১৬ টাকা, ২য় ও ৩য় খণ্ড—২৫ টাকা।

ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি এবং ভারতের স্বাধীনতার ৫২তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই আলোচনাটি নিবেদিত।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত তিন খণ্ডে প্রকাশিত **'হে রাজা শিবাজি!'** একটি অসামান্য গ্রন্থ। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন না, কোন্ সূত্রে তিনি ইহা জানিয়াছেন তাহার পূর্ণ উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। কারণ, আচার্য যদুনাথ সরকার ও ভিনসেন্ট স্মিথ উভয়েই শিবাজীকে নিরক্ষর-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

দীর্ঘকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে' লিখিয়াছিলেন ঃ "ইতিহাস-কীর্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজ-মধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার উপায় হইয়াছিল। একবার মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য মন্ত্রের বলে অজিত-পূর্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক... বিজিত হইল।" (বঙ্কিমচন্দ্রের কালে স্বাধীন মারাঠা রাজ্য ইংরেজ-শাসিত ভারতের বহুলাংশে যেমন উড়িষ্যায় বিস্তৃত ছিল।) "দ্বিতীয়বারের ঐন্দ্রজালিক রনজিৎ সিংহ। শতদ্রু পারে সিংহনাদ শুনিয়া নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল।"

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থে ছত্রপতি শিবাজীর নিন্দাকারী ও আওরঙ্গজেবের পক্ষভুক্ত মুসলমান লেখক কাফি খাঁর কুৎসার উর্ধ্বে শিবাজীর রণকুশলতা ও নবতম যুদ্ধনীতি 'গেরিলা যুদ্ধ' উদ্ভাবনের যে-বিবরণ অমৃত শ্রীপাদ ডাঙ্গের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তুলনাহীন। ইহা ব্যতীত র‍্যালিনসন ভারত-ইতিহাসে শিবাজীর অবদান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাও 'হে রাজা শিবাজি!' গ্রন্থের সম্পদ। তাঁহার উপসংহারের কবিতা অপরূপ। আচার্য যদুনাথ শিবাজীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। আচার্য যদুনাথ সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে, সহায়-সম্বলহীন এক দরিদ্র যুবক আপন ধর্ম ও হিন্দুনারীর সম্মানরক্ষার ব্রত তাঁহার মাতা জিজাবাই ও গুরু রামদাসের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থ সমাপনে রবীন্দ্রকাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই উদ্ধৃতি শিবাজীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্পর্কে এক অসামান্য মূল্যায়ন।

একদিকে আওরঙ্গজেবের হিন্দু-নির্যাতন, অপরদিকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুসলমান সুলতানগণের শত্রুতা—এই প্রবল বিরুদ্ধতাকে উচ্ছেদের যে জীবনপণ সংগ্রাম শিবাজী করিয়াছিলেন, তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ভারত-ইতিহাসে নাই। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁহার 'অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে আচার্য যদুনাথ সরকারের যে শিবাজী-প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৩১) তাহা শিবাজী-মহিমার জীবন্ত স্বীকৃতি। শিবাজী যে রণতরী-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন তাহা ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ ও অন্যান্য রণতরী অপেক্ষা অগ্রগণ্য ছিল। তাঁহারই শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে কান্হোজী আঙরে শ্রেষ্ঠ নৌ সেনাপতির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যে অশ্বারোহী সেনাবাহিনী শিবাজী গঠন করেন, তাহা ছিল অপরাজেয়। তাঁহার তিরোধানের পরে সেই ধারা অনুসরণ করিয়া ধনাজি যাদব ও শান্তাজি ঘোড়পুরে সমগ্র মোগল বাহিনীকে চূর্ণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্য সহ আওরঙ্গজেবের সমাধি রচনা করিয়াছিলেন।

শিবাজীর বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি ছত্রশাল যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজীর ধর্মপ্রাণতা ও স্বদেশের স্বাধীনতাপ্রীতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি মোগল পক্ষ ত্যাগ করিয়া শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। শিবাজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শত শত আওরঙ্গজেবের সাধ্য নাই যে, তাঁহার 'হিন্দবী স্বরাজ' বা স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র গঠনে বাধা দিতে পারে। তিনি ছত্রশালকে বলেন ঃ তুমি তোমার মাতৃভূমি বুন্দেলখণ্ডে ফিরে যাও ও সেখানে স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন কর। ছত্রশাল শিবাজীর অনুপ্রেরণায় স্বাধীন বুন্দেলখণ্ড নামক হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ছত্রশাল হইতে সুরজমল পর্যন্ত স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র বুন্দেলখণ্ড শিবাজীরই অনুপ্রেরণার বাস্তব রূপায়ণ।

গুরু রামদাস শিবাজীকে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুনারীর মর্যাদারক্ষা তোমার রাজধর্ম। সন্ত তুকারাম ও গুরু রামদাসের একনিষ্ঠ ভক্ত শিবাজী সে-কর্তব্য পালন করেন। 'দাসবোধ' গ্রন্থে দেখা যায়, রামদাস শিবাজীকে বলিয়াছিলেন যে, শিবাজী রাজা নহেন—রাজপ্রতিনিধি। রামদাস বৈরাগী উত্তরীয় ছিন্ন করিয়া শিবাজীকে

বলিয়াছিলেন ঃ বৈরাগীর উত্তরীয়কে তুমি তোমার পতাকা করিয়া লইবে। 'প্রতিনিধি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ইহা অপূর্ব ভাষায় বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও 'ভগোয়া ঝাণ্ডা' সম্পর্কে একই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু সেপ্রসঙ্গে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করিয়াছেন।

শিবাজী বারাণসীর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রাচার্য গাগা ভট্টকে পুরোহিত করিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আপনাকে মহারাণা প্রতাপের উত্তরসুরী রূপে 'ছত্রপতি' রূপে শিবাজী সিংহাসনে বসিলেন। ঐতিহাসিকগণ মহারাণা প্রতাপের সার্থক উত্তরসুরী শিবাজীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে একাসনে স্থাপন করিয়াছেন। শিবাজী পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় নৃপতি। আচার্য যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন, শিবাজী আপনার প্রতিভা ও কীর্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দু নিজ প্রতিভা-বলে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে, রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। রনজিৎ সিংহ বা অপর ভারতীয় প্রতিভাশালী নৃপতিদের ন্যায় কোন বিদেশীর সাহায্য তিনি কখনো গ্রহণ করেন নাই। দুর্গ রায়গড় ও প্রতাপগড় তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন কেবল মহারাষ্ট্রের জনগণের সহযোগিতায়।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত **'হে রাজা শিবাজি!'** সত্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইতিহাস এই গ্রন্থে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দৃঢ়মতি শিবাজী হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই রাষ্ট্রে তিনি অহিন্দুদের সুরক্ষা ও সম্মানের উপযুক্ত ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। ইহা ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ছত্রপতি শিবাজীর অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের আদর্শ আমাদের নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করুক। এবিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ❑
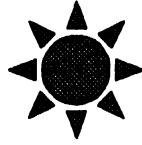
প্রাপ্তিস্বীকার

- **মহাজন সংবাদ**—গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ জে. রায়চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশন্স, ৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস, বাকসাড়া, হাওড়া-৭১১৩০৬। পৃষ্ঠা ঃ ১০+৩১০। মূল্য ঃ ১২০ টাকা।
- **অপরেশ অমনিবাস**—অপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিকা ঃ কানন ভট্টাচার্য। সুধানীড়, রাজারহাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা। পৃষ্ঠা ঃ ২১+৫০১। মূল্য ঃ ১৫০ টাকা।
- **প্রবাদের আলোকে নদীয়া**—শ্যামপদ মণ্ডল। প্রকাশক ঃ দীনবন্ধু বিভূতি সাহিত্য সংসদ, হরিণঘাটা, ডাক—নগরউখড়া, নদীয়া-৭৪১২৫৭। পৃষ্ঠা ঃ ৮+৫৬। মূল্য ঃ ২৫ টাকা।
- **হরিণঘাটার ইতিকথা**—শ্যামপদ মণ্ডল। প্রকাশক ঃ দীনবন্ধু বিভূতি সাহিত্য সংসদ, হরিণঘাটা, ডাক—নগরউখড়া, নদীয়া-৭৪১২৫৭। পৃষ্ঠা ঃ ৫৮। মূল্য ঃ ৩০ টাকা।
- **শকুন্তলা**—কৃষ্ণা সেন। প্রকাশক ঃ সুরজিৎ ঘোষ, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৭। পৃষ্ঠা ঃ ৪৮। মূল্য ঃ ২৫ টাকা।
- **অমৃত সন্ধানে অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী**—স্বস্তি দাশগুপ্ত। প্রকাশক ঃ পীযূষ দাশগুপ্ত, গল্ফ গ্রীন, ফেজ-২, ব্লক-ডবলিউ ২সি, ফ্ল্যাট-৭, কলকাতা-৭০০০৯৫। পৃষ্ঠা ঃ ১২০। মূল্য ঃ ৪০ টাকা।
- **ঐতিহ্য ও কাহিনীতে ভাটপাড়া**—তন্ময় ভট্টাচার্য। প্রকাশক ঃ লেখক, ৮ সদগোপপাড়া, ভাটপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩১২৩। পৃষ্ঠা ঃ ৫৫। মূল্য ঃ ২৫ টাকা।
- **গীতা ও তত্ত্বমালা**—অধ্যাপক ডঃ কামাখ্যাচরণ রায়। প্রকাশক ঃ লেখক, বি ১০/২০১ কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫। পৃষ্ঠা ঃ ১২+৯৯। মূল্য ঃ ১৮ টাকা।

উৎসব-অনুষ্ঠান

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের (জেলা—চম্পাবত, উত্তরপ্রদেশ) পরিচালনায় গত ১৩-২৩ মে '৯৯ আশ্রমের শতবর্ষের প্রাথমিক পর্যায় এবং রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তির শেষ পর্যায়ের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় লোহাঘাট, চম্পাবত এবং মায়াবতীতে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আবৃত্তি, বক্তৃতা, ক্যুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতা, স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের ওপর একটি সম্মেলন এবং জনসভা ও আধ্যাত্মিক শিবির ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্থানীয় অধিবাসী ও সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী যোগদান করেছিলেন।

ইন্দোর আশ্রম (মধ্যপ্রদেশ) রামকৃষ্ণ মিশনে অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষ্যে গত ২৭ ও ২৮ জুন '৯৯ দুটি জনসভার আয়োজন করে। বহু ভক্তের উপস্থিতিতে সভা-দুটিতে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, অন্যতর সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ, মধ্যপ্রদেশের গভর্নর ভাই মহাবীর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাগণ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ১৯৯৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়সমূহের ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। এই পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনের মধ্যে **বরানগর** বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র **১ম স্থান**, রহড়া **বালকাশ্রমের** একটি ছাত্র **৯ম** স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া **নরেন্দ্রপুরের** ১৩২ জন, **রহড়ার** ২২৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। যতজন ছাত্র ৭৫% বা ততোধিক নম্বর সহ 'স্টার' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তার পরিসংখ্যান হলো : **আসানসোল**—১১৭ জনের মধ্যে ৬৫ জন, **বরানগর**—২১০ জনের মধ্যে ১৩৩ জন, **কামারপুকুর**—৯৩ জনের মধ্যে ৩৮ জন, **কাটিহার**—৩৬ জনের মধ্যে ৯ জন, **মালদা**—৯০ জনের মধ্যে ৫৮ জন, **মনসাদ্বীপ**—৫০ জনের মধ্যে ১৬ জন, **মেদিনীপুর**—৯০ জনের মধ্যে ২২ জন, **নরেন্দ্রপুর**—১৩২ জনের মধ্যে ১২৫ জন, **পুরুলিয়া**—৯৩ জনের মধ্যে ৭৩ জন, **রহড়া**—২২৪ জনের মধ্যে ১৭২ জন, **রামহরিপুর**—৬২ জনের মধ্যে ২০ জন, **সারগাছি**—৪০ জনের মধ্যে ১৬ জন, **সরিষা (দুটি বিদ্যালয়)**—২৩৯ জনের মধ্যে ৪৪ জন এবং **টাকি**—৬১ জনের মধ্যে ১৫ জন।

বিশেষ উল্লেখ্য, **নরেন্দ্রপুর অন্ধ বিদ্যালয়ের** ৮ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম বিভাগে এবং তন্মধ্যে ৬ জন ৭৫% এরও অধিক নম্বর পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় **দেওঘর বিদ্যাপীঠের** ৪৯ জন পরিক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই প্রথম বিভাগে এবং **নরোত্তমনগর বিদ্যালয়ের** ২১ জনের মধ্যে ২০ জন প্রথম বিভাগে পাস করেছে। এছাড়া **আলঙের** ৬৬ জনের মধ্যে ৭ জন, **দেওঘরের** ৪৯ জনের মধ্যে ৪৩ জন, **জামশেদপুরের** ৩৫ জনের মধ্যে ১৩ জন, **নরোত্তমনগরের** ২১ জনের মধ্যে ১০ জন ও **বিবেকনগরের (ত্রিপুরা)** ৩৪ জনের মধ্যে ৬ জন পরীক্ষার্থী ৭৫% বা ততোধিক নম্বর সহ 'স্টার' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

চক্ষু চিকিৎসা-শিবির

লিমডি আশ্রম (গুজরাট) গত ১৭ জুন একটি চক্ষু চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৫৯ জনকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয় এবং ৬ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

জলপাইগুড়ি আশ্রম বন্যাকবলিত মালবাজার ব্লকের চাঙ্গমারি, জি.পি., আপালচাঁদ মৌজা প্রভৃতি গ্রামের ২০৬টি পরিবারের মধ্যে ২৯ কুইন্টাল চাল ও ৩.৮৭ কুইন্টাল ডাল বিতরণ করেছে।

মনসাদ্বীপ আশ্রমের (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) মাধ্যমে সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ি গ্রামের বন্যা ও ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে চিকিৎসা-ত্রাণ, ভঙ্গুর বাড়ি মেরামত এবং ১৫টি পুকুরের জল লবণমুক্ত করা হয়েছে।

পুনর্বাসন

গুজরাট ঝঞ্ঝা পুনর্বাসন

পোরবন্দর আশ্রম 'নিজের বাড়ি নিজে তৈরি কর' পরিকল্পনা অনুযায়ী খার, কৈলাসহর, আজমাপাথ প্রভৃতি গ্রামের ৪১টি ঝঞ্ঝা-গ্রস্ত পরিবারকে ১১,২৫০টি ঘর-ছাওয়া খোলা বিতরণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যা পুনর্বাসন

নরেন্দ্রপুর আশ্রমের (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা, জলঙ্গী প্রভৃতি ৮টি গ্রামের বন্যার্ত মানুষের জন্য ৬৭৬টি বাড়ির মধ্যে ১৬৪টি বাড়ি তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৪২টি সমাপ্তির পথে। এছাড়া ১১০০ স্বল্পমূল্যে তৈরি পায়খানা ও ৩১টি হ্যান্ড পাম্প বসানো হয়েছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (আমেরিকা) : গত জুলাই মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রবিবার 'পিলগ্রিমেজ—ইনার অ্যান্ড আউটার' ও 'দে লিভড উইথ গড' বিষয়ে ভাষণ দেন যথাক্রমে সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রপন্নানন্দ ও বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইসের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় বুধবারে 'গীতা' এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শনিবারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী প্রপন্নানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১ মে '৯৯ সঙ্ঘের একটি প্রার্থনাকক্ষের উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ করেন রহড়া বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ ও স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ।

তপন শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘে (জেলা—দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১ মে '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী মঙ্গলানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন সঙ্ঘের সম্পাদক কার্তিকচন্দ্র পাল। সভান্তে পদাবলী-কীর্তন পরিবেশন করেন গৌরী মণ্ডল ও সম্প্রদায়।

চেতলা বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সমন্বয় পরিষদ (কলকাতা-৭০০০২৭) গত ১ মে '৯৯ 'সেবাদিবস' ও কৈলাশ বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস পালন করে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ২৮টি সংগঠন বিভিন্ন সেবামূলক কর্মের মাধ্যমে এই সেবাদিবস পালন করে। এদিন পরিষদের 'নির্ভীক পথিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। গত ২৮-৩০ মে এই পরিষদের পরিচালনায় তিনদিনব্যাপী যুব-কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রে। এতে ১৭টি সংগঠন থেকে প্রায় ৫০-এর বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী বাণেশানন্দ। বিভিন্ন দিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ, স্বামী অচ্যুতানন্দ, স্বামী অজরানন্দ, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ, স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ, স্বামী ত্যাগরূপানন্দ, প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা, জহরলাল চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুধাংশু বিশ্বাস ও ভারতী দত্ত। শিবিরে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি প্রণবেশ চক্রবর্তী এবং স্বাগত-ভাষণ দান করেন সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সোমনাথ মিত্র।

লালবাগ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম (জেলা—মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১ মে '৯৯ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় বিদ্যালয়ে পূজা, ভজনাদি ও ধর্মসভার আয়োজন করে। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১ মে '৯৯ নবনির্মিত কর্মকেন্দ্র 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ নিলয়'-এ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। সান্ধ্য ধর্মসভায় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের পর ভাষণ দান করেন সারদাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী রমানন্দ এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী দিব্যব্রতানন্দ।

নবগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী) গত ১-২ মে '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, স্লাইড শো এবং ধর্মসভার আয়োজন করে। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিউটি ভট্টাচার্য, বাসুদেব কর্মকার প্রমুখ। পরিমল দাসের পরিচালনায় 'কথামৃত' অবলম্বনে স্লাইড-শো প্রদর্শিত হয়। মহাভারত পাঠ ও আলোচনা করেন নিখিল চট্টোপাধ্যায়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক তাপস বসু। সভার শুরুতে স্বাগত-ভাষণ এবং শেষে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন সঙ্ঘ-সম্পাদক সুকুমার ঘোষ। দুদিনের উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পুইনান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী) গত ১ ও ২ মে '৯৯ দুদিনব্যাপী সঙ্ঘের ১৩তম বার্ষিক উৎসবের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা এবং ধর্মসভা। সভায় 'শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা। ভক্তিগীতি নিবেদন করেন অর্চনা ভট্টাচার্য এবং গীতিনাট্য পরিবেশন করেন শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দ ও স্বামী শেখরানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অজয়কুমার চ্যাটার্জী। উৎসবে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২ মে '৯৯ বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করে। এদিন সকালে 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা এবং বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও বুদ্ধদেব সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দান করেন পাঠচক্রের সম্পাদক শঙ্কর মণ্ডল। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সরোজকুমার নাইয়া ও বলরাম পাল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কৃষ্ণগোপাল নস্কর ও অজিতকুমার নস্কর। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

খেজুরি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৩ মে '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে স্বামী অকল্মষানন্দের পরিচালনায় প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় বাউল গান।

জামালপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ৭ ও ৯ মে '৯৯ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন মঙ্গলারতি, পাঠ, বিশেষ পূজা, বাউল গান এবং অশোককুমার মালাকারের ভাগবত পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাউল গান পরিবেশন করেন জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস এবং 'পুঁথি' পাঠ করেন আনন্দমোহন নস্কর। দ্বিতীয় দিন মঙ্গলারতি, পথ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন অনন্তকুমার ঘোষ এবং

ভক্তিগীতি নিবেদন করেন বিশ্বনাথ সিংহ ও কেশবচন্দ্র রায়। অমল সিংহরায়ের পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন নতুনপুকুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের বালিকারা। সুর সহযোগে ভাগবৎ পাঠ ও আলোচনা করেন তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ এবং ভাষণ দেন ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত দত্ত। সভান্তে ভক্তিগীতি এবং বাউলগান ও পল্লীগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে শুভঙ্কর ভট্টাচার্য এবং গৌতম মাইতি ও সম্প্রদায়।

পর্ণশ্রী পল্লী বিবেক শিখা সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০৬০) গত ৮ মে '৯৯ সারাদিনব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, বাউল গান ও আলোচনাসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। সভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দ এবং স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। সভাশেষে হরিনাম-সঙ্কীর্তন পরিবেশিত হয়।

হলদিয়া আই. ও. সি. এমপ্লয়িজ ক্লাবের (জেলা—মেদিনীপুর) উদ্যোগে গত ৯ মে '৯৯ বৈদিক শান্তিমন্ত্র ও গীতা পাঠের মাধ্যমে **শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী সম্মেলনের** সূচনা হয়। প্রথম অধিবেশনে শক্তিপদ ত্রিপাঠীর স্বাগত-ভাষণান্তে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন কাঁথি রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী অকল্মষানন্দ এবং মূল ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দের লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়। তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ ও স্বামী অকল্মষানন্দ। তারপর ভক্তদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তরদান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সম্মেলনের শেষে ভক্তিগীতি পরিবেশনান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জগদীশ চক্রবর্তী।

নারায়ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ১৪ মে '৯৯ নবনির্মিত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে গত ২৩ মে অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, সানাইবাদন, পাঠ, ভক্তিগীতি, পদাবলী কীর্তন ও ধর্মসভা। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী চেতসানন্দ এবং পদাবলী-কীর্তন পরিবেশন করেন কাজল বিশ্বাস ও সম্প্রদায়। ভক্তিগীতি নিবেদন করেন মঙ্গলময় মণ্ডল, কমলপদ মণ্ডল প্রমুখ। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণদান করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী চেতসানন্দ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৪-১৬ মে '৯৯ বার্ষিক উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, ভক্তসম্মেলন ও যুবসম্মেলন, গীতিনাট্য এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মঙ্গলানন্দ, স্বামী রাজীবানন্দ এবং স্বামী আনন্দময়ানন্দ। সভান্তে গীতিনাট্য পরিবেশন করে আলিপুরদুয়ারের শ্রীমা সারদা সঙ্ঘ ও হাওড়ার শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ। প্রায় ৪,০০০ নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ডিব্রুগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (আসাম) গত ১৪-১৬ মে '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, ভক্তসম্মেলন, যুবসম্মেলন ও ধর্মসভা ছিল দিবসত্রয় উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন দিনে ভাষণদান করেন শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী যোগাত্মানন্দ, স্বামী অমরাত্মানন্দ প্রমুখ। উৎসবে উপস্থিত প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। স্থানীয় শিল্পীরা ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

সাঁকতোড়িয়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলী (জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৫ মে '৯৯ ভগিনী নিবেদিতার ভারত-আগমনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ডিসেরগড়ে একটি যুব-সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের সূচনা করেন ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ডস লিমিটেডের অধ্যক্ষ আর. সি. গোয়েল। ভাষণ দান করেন আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, অধ্যাপক হোসেনুর রহমান, ই. সি. এল.-এর পার্সোনেল ডাইরেক্টর ডঃ শশাঙ্কশেখর রায়, টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর এইচ. কে. ঝা, বি. সি. সি. এল.-এর পার্সোনেল ডাইরেক্টর অনুপকৃষ্ণ গুপ্ত প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জামতাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দ। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহামণ্ডলীর যুগ্ম সম্পাদক কালিদাস সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহামণ্ডলীর সম্পাদক নন্দদুলাল আচার্য।

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৫ ও ১৬ মে '৯৯ ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ। ভাষণ দান করেন স্বামী ঋতানন্দ ও স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন তরুণ সরকার, অসীম দত্ত ও অমিত ঘোষ। সভার শুরুতে স্বাগত-ভাষণ দান এবং সমাপ্তিতে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে নিমাইসাধন বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ। দ্বিতীয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা ভাষণ দান করেন। সভার শুরুতে বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা সোমপ্রাণা, প্রব্রাজিকা দেবেশপ্রাণা প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দেন এবং ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে নিমাইসাধন বসু ও আশ্রম-সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ। উল্লেখ্য, একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে গত ২ মে এই আশ্রমের পক্ষ থেকে প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা শিল্পী শানু লাহিড়ীকে 'নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার' প্রদান করেন।

বার্নপুর বিবেকানন্দ লেপ্রসী আশ্রম (জেলা—বর্ধমান) গত ১৮ মে '৯৯ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ১৫ জন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থতার প্রমাণপত্র দিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। রোগমুক্ত কুষ্ঠরোগীদের হাতে প্রমাণপত্র তুলে দেন আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শুভব্রতানন্দ। দীর্ঘ চারবছর ধরে এই আশ্রম ৪৩ জন কুষ্ঠরোগীকে পূর্ণ সুস্থ করতে সমর্থ হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বামী শুভব্রতানন্দ ছাড়া বক্তব্য রাখেন পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় ও আশিস মুখোপাধ্যায়। প্রবীর ধর ও অরুণ মুখোপাধ্যায়কে 'বিবেকানন্দ সেবা' পুরস্কার দেওয়া হয়।

গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২২ ও ২৩ মে '৯৯ রামকৃষ্ণ মিশন

ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় একটি শিক্ষক ও যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ এবং শিক্ষক সম্মেলনের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও সম্মেলনের আহ্বায়ক দুলাল দাঁ। যুবসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ এবং যুবসম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ও স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করেন সঙ্ঘের সম্পাদক ভুবন রায় সরস্বতী ও সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বলহরি বিশ্বাস। সম্মেলন-দুটিতে যথাক্রমে ১৫০ জন শিক্ষক ও প্রায় ৭০০ যুব-প্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

সুন্দরপুর রামকৃষ্ণ শিশু নিকেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (জেলা—উধমসিংনগর, উত্তরপ্রদেশ) গত ২৬ মে '৯৯ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যরূপানন্দ ও এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলাত্মানন্দ। সম্মেলনের শেষে প্রায় ৩০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৩০ মে '৯৯ ভগিনী নিবেদিতার ভারতে আগমনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রথম অধিবেশনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আবৃত্তি, গল্প বলা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ কুইলা, তৃপ্তিকণা দত্ত ও ডঃ নমিতা দত্ত। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দান করেন সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ গৌরগোপাল চক্রবর্তী। এরপর আলোচনা-সভায় 'ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার অবদান' প্রসঙ্গে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন, 'নারী-শিক্ষা ও নারী-জাগরণের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা' বিষয়ে ডঃ নমিতা দত্ত এবং সভার সভাপতি স্বামী বলভদ্রানন্দ 'নিবেদিতার প্রয়াস ও সাফল্য' বিষয়ে আলোচনা করেন। স্বাগত-ভাষণ দান করেন সঙ্ঘের সম্পাদক বিশ্বপতি দে। এদিন সঙ্ঘের একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। তৃতীয় অধিবেশনে 'ভারত-সেবিকা নিবেদিতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন 'স্টেটসম্যান'-এর সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী এবং সভাপতিত্ব করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বিভিন্ন অধিবেশনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রাবণী চক্রবর্তী ও সুপ্রিয়া শিকদার।

খড়্গপুর নিবেদিতা মহিলা মণ্ডল (জেলা—মেদিনীপুর) গত ৩০ মে '৯৯ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় স্থানীয় রুইনান জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক স্বামী আত্মপ্রভানন্দ। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী গোপেশ্বরানন্দ, 'আলোর মেলা' পত্রিকার সম্পাদক নারায়ণ সামাট, রুইনান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বসন্ত মণ্ডল প্রমুখ। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন মহিলা মণ্ডলের সম্পাদিকা দেবযানী মহেশ।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দিরের (জেলা—হুগলী) গত ৩০ মে '৯৯ নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, গীতি-নাট্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণদান করেন স্বামী বন্দনানন্দজী ও স্বামী ধৃতাত্মানন্দ।

বহির্ভারত

লুসাকা (জাম্বিয়া) রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের আমন্ত্রণে দিল্লি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দ গত ১ জুন '৯৯ লুসাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। ২ জুন থেকে ১১ জুন পর্যন্ত লুসাকা বেদান্ত সেন্টারে নানা বিষয়ে তিনি ভাষণ দান করেন। এর মধ্যে ৬, ৮ এবং ১০ জুন তিনি যথাক্রমে লিভিংস্টোন ও নুলার হিন্দু হল-এ এবং লুসাকা রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে ভাষণ দান করেন। এই সফরে জাম্বিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউণ্ডার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ১২ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত তিনি হারারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দেন। ১৬ জুন তিনি বুলাওয়াও হিন্দু-মন্দিরে ভাষণ দান করেন। ভারতে ফেরার পথে তিনি ২০ জুন মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজিত ভক্তসম্মেলনে যোগদান করেন এবং ঐদিন সকাল ও সন্ধ্যায় মোট তিনটি ভাষণ দান করেন। ২১ জুন মরিশাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষণ দান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ডঃ ফাগুনে সভাপতিত্ব করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **মণীন্দ্রচন্দ্র দে** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১০ মে '৯৯ বেলা ১.৩০ মিনিটে জোড়হাটের নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি জোড়হাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **প্রফুল্লকুমার হাজরা** গত ১১ মে '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি খুলনা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পরিচালিত বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। ঢাকা, দিনাজপুর ও বাগেরহাট আশ্রমের অধ্যক্ষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক ছিলেন। পরোপকারিতা ও সহজ-সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি দেবীর মন্ত্রশিষ্যা **উষারানী সাহা** গত ১১ মে '৯৯ রাত ১টায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ ও শ্রীম-র দর্শন ও সঙ্গ লাভে ধন্যা ছিলেন। সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা ও সুমধুর ব্যবহারের জন্য পরিচিতজনেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **নীলিমারানী দাস** গত ১৪ মে '৯৯ সকাল ৯.০৫ মিনিটে ৫৮ বছর বয়সে গুয়াহাটীতে পরলোকগমন করেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন। ❑

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

বড় হইতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ

১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব।
৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ শোক তাপ—এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রতিটি চুমুকে — কড়া আমেজ!
কুকমী সিলেক্ট
সি টি সি লীফ চা
COOKME SELECT
GARDEN FRESH
EXTRA STRONG
Cookme
CTC LEAF TEA
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০০৭

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা ওপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন, ওপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি ওপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

ধনসম্পদ ইহকালের সম্পদ, সঙ্গে যাবে না। সাধন-ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে। শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই, ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে। শ্রীমা সারদাদেবী

❋

কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ④

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
- বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, দিনহাটা, কুচবিহার-৭৩৬১৩৫
- স্বপনকুমার আইচ, প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- অজয়কুমার গাঙ্গুলী, প্রযত্নে, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নিউ টাউন কুচবিহার-৭৩৬১০১
- বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো নিউ মার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদা-৭৩২১০১

মেদিনীপুর

- রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১৬৩৬, ফোন : ৬৬০০৫/৬৬৭৬২
- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১৬৫৯, ফোন : ৭২২১৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া-৭২১১৫২
- খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, খড়গপুর-৭২১৩০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১২১২
- কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১৪০১
- কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১২২২
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১২২২
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, কালুয়া আকুব, ঝাড়্গ্রিয়া-৭২১১২৪
- ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ক্ষীরপাই-৭২১২৩২
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, জাড়া-৭২১২৩২
- শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১২০১
- জ্ঞানরঞ্জন হোতা, মহাপাল, ভায়া : তপসিয়া পেটবিন্দি-৭২১৫১৭
- খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র, রাধাচন্দনপুর-৭২১১৬০
- হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১৬০৫

নদীয়া

- রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২
- বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪১২২২
- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/৪৫৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- বন্ধুর, মিউনিসিপ্যালিটি মোড়, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক ৩৫ বেজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট-৭৪১২০১

বর্ধমান

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১
- নরহরি পুস্তকালয়, ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব), বর্ধমান-৭১৩১০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- ডি. পি. এল. পাঠচক্র, ডি/২০, গ্রীসন স্ট্রীট, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, এ. বি. এল. টাউনশিপ দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার পিন-৭১৩১২৮
- অঞ্জনকুমার পাল, প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০
- শীতল ব্যানার্জী, প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- উত্তমকুমার রায়, পলাশডিহা, কন্যাপুর-৭১৩৩৪১

বীরভূম

- বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫ পিন-৭৩১২০৪
- আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- মিলন দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, চৈতালী মার্কেট সিউড়ি-৭৩১১০১
- ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪

বাঁকুড়া

- শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- ডঃ সুনির্মল বেরা প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

"নিয়মিত তিল তিল
করিলে সঞ্চয়
ভবিষ্যৎ সুখের হবে
জানিবে নিশ্চয়।"
ESTD.—1932
পিয়ারলেস
Peerless Group
আস্থার প্রতীক। কেবল নামই যথেষ্ট।
পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯
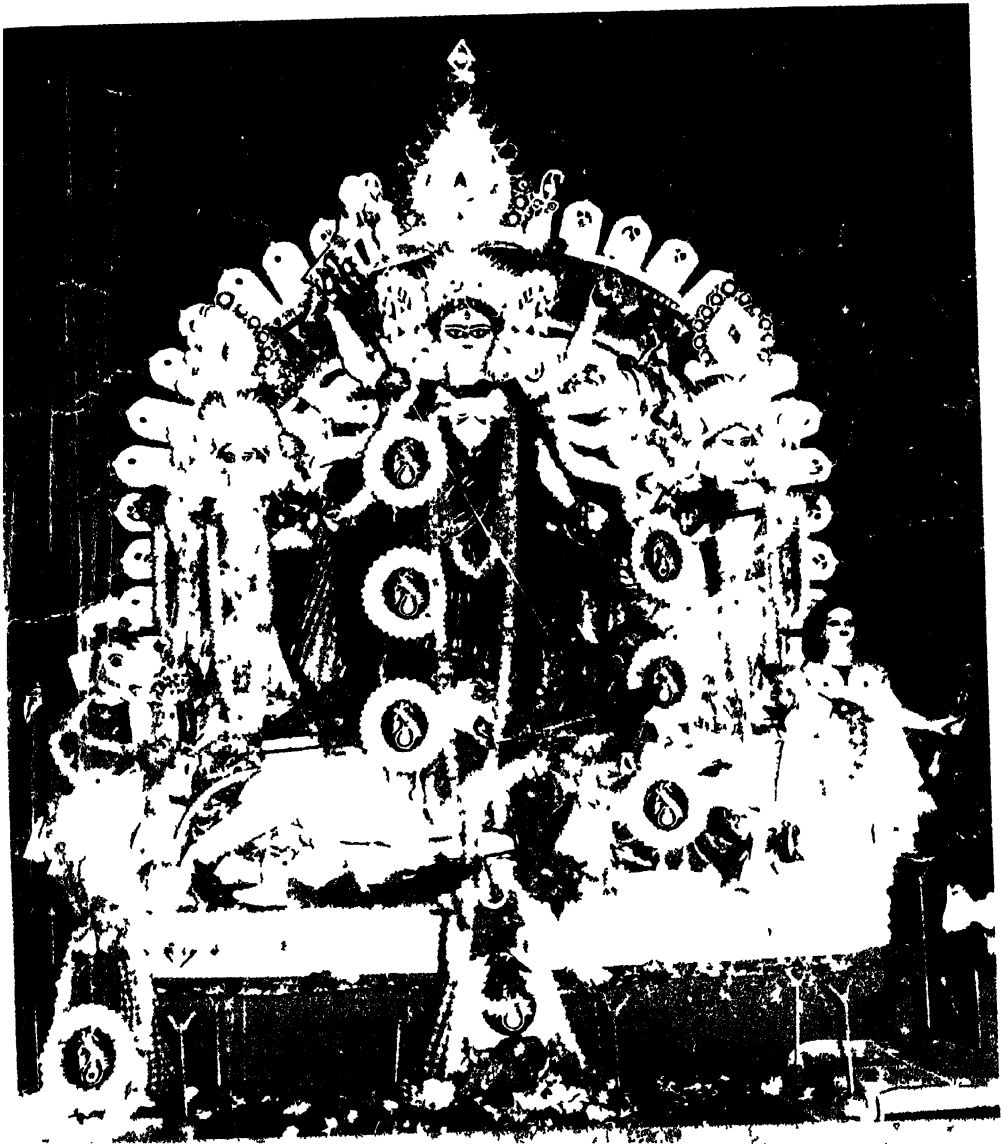
আশ্বিন ১৪০৬ ১০১তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত

বিবেকানন্দ ইল্লম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

বিবেকানন্দ ইল্লম একটি পবিত্র ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই ভবনটি একটি তীর্থক্ষেত্র। স্বামীজী পূর্ণ নয়দিন এখানে অবস্থান করেছেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, উপদেশ দান করেছেন, ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেছেন। তাঁর অদৃশ্য, দিব্য উপস্থিতিতে স্থানটি এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে, শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী চেন্নাইয়ের এই বাংলোয় উঠেছিলেন। তখন বাড়িটির নাম ছিল 'আইস হাউস' বা 'ক্যাসল কার্নন'। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় ভারতের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে তেজোদীপ্ত বাণী প্রদান করেছিলেন তা ইংরেজীতে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বা বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা, আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে এই বাড়িটিতেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত স্বামীজীর বাণীর ঐতিহাসিক পীঠভূমি।

আমরা এখানে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে চাইছি, যেখানে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত হবে। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্রসমূহ, অন্যান্য সুন্দর চিত্র, মডেল, ভিডিওগ্রাফ, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রাণপ্রদ বাণীর প্রচারকেন্দ্র-রূপে এই বাড়িটিকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করছি।

১৮৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই বাড়িটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই পবিত্র কাজটি শুরু করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে এবং স্বামীজীর সকল অনুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের উদার দাক্ষিণ্যে আমরা এই মহান কাজ সম্পন্ন করার আশা রাখি।

এবাবদ সমস্ত আর্থিক দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে দান পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ

অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯
ই. মেল : srkmath@vsnl.com
ওয়েবসাইট : www.sriramakrishnamath.org

ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ—সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী

The Companionship of the holy and the wise is one of the main elements of spiritual progress.

Sri Ramakrishna

সাধুসঙ্গ ও সৎচর্চায় মন খুব উর্ধ্বমুখী হয়; সাধুদের কৃপায় অতি নীচ লোকেরাও মনের গতি ফিরে পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতের
১ নং
সিমেন্ট
ACC
গুণ
এসিসি সুপার
দীর্ঘস্থায়ী শক্তি
কম উত্তাপ
ফাটল ধরে কম
রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতিরোধ
কম তরল নিঃসরণ
জং ধারণ প্রতিরোধ
বংশ পরম্পরায়
বিশ্বাসভাজন
সময় করেছে
পরীক্ষাসাধন
সর্বাধিক শক্তি
সর্বাধিক স্থায়িত্ব
ACC
ORIENT
সর্ব ভারতের জন্য
সর্ব পরিপূরক
সিমেন্ট

সহ্য গুণের চেয়ে বড় গুণ নেই। যে না সয়, সে নাশ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

Arise, Awake and stop not till the goal is reached.

Swami Vivekananda

শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা, মহিম্নঃস্তব হইতে শ্রেষ্ঠ স্তব, অঘোর মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র এবং গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই।

শিবমহিম্নঃস্তোত্র

The mind is like a mad elephant. It rushes with the wind. That is why one must distinguish between good and evil and work hard for the sake of God.

Sri Sri Ma

Material happiness is but a transformation of material sorrow.

Swami Vivekananda

This world is a prison for the faithful, but a paradise for unbelievers.

Muhammad

That knowledge which purifies the mind and heart alone is true knowledge.

Sri Ramakrishna

Blessed is the human birth, even the dwellers in heaven desire this birth, for true wisdom and pure love may be attained only by human beings.

Sri Krishna

The ignorant man thinks that as far as he is concerned, night and day will come and go till eternity. Immersed in sense enjoyments, he does not see the march of time.

Sri Rama

Happiness presents itself before man, wearing the crown of sorrow on its head. He who welcomes it must also welcome sorrow.

Swami Vivekananda

খ্রীস্টাব্দের নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ উপলক্ষ্যে ১০১ বছরের প্রাচীন
'উদ্বোধন'-এর আগামী বর্ষের গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হলো।

'উদ্বোধন' ঃ ১০২তম বর্ষ (২০০০ খ্রীস্টাব্দ) ❑ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ও অন্যান্য

❑ 'উদ্বোধন' পত্রিকার আগামী ১০২তম বর্ষের (মাঘ ১৪০৬—পৌষ ১৪০৭/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০০) গ্রাহকমূল্য বর্তমান বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে ঃ ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৭২০ টাকা (বিমানডাক) ❑ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশ ঃ ১৪০ টাকা।

❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

❑ বর্তমান বছরের (১৯৯৯/১৪০৫-১৪০৬) প্রথম বা মাঘ সংখ্যা প্রথম মুদ্রণের পর নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার তার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। সেজন্য প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে আগামী বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

❑ কলকাতা বা কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তাঁরা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য জমা দিলে সুবিধা হয়। কেননা M. O.-তে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে যদি দেরি হয় এবং ততদিনে যদি প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাহলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও ঐ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে-কারণে সম্ভব হলে M. O. না করে গ্রাহকমূল্য সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়াই ভাল।

❑ সরাসরি জমা দেওয়া সম্ভব না হলে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে/পোস্টাল অর্ডারে গ্রাহকমূল্য 'Udbodhan Office, Calcutta'—এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য চেক গ্রাহ্য। তবে সেই চেক কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হতে হবে।

❑ যাঁদের M. O. করে গ্রাহকমূল্য পাঠাতেই হবে, তাঁদের কাছে অনুরোধ, এখনই M. O. পাঠাতে শুরু করুন। জানুয়ারি থেকে বর্ষ শুরু বলে সকলেই একসঙ্গে ডিসেম্বরে M. O. পাঠাতে শুরু করেন; কিন্তু বাগবাজার ডাকঘর কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন একশ থেকে দেড়শর বেশি M. O. আমাদের কাছে ডেলিভারি দিতে পারেন না। আবার তাও রোজ পেরে ওঠেন না। ফলে ডাকঘরে জমা হাজার হাজার গ্রাহকের M. O. পেতেই আমাদের দুই থেকে তিন মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত লেগে যায়। এছাড়া M. O. কুপনে অনেক নতুন গ্রাহক তাঁদের নাম-ঠিকানা এবং কিজন্য M. O. পাঠাচ্ছেন তা জানান না। পুরনো গ্রাহকরা তাঁদের গ্রাহকসংখ্যা অনেকেই ঠিকমত লেখেন না। ফলে এইসমস্ত M. O. সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। পত্রিকা না পেয়ে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের চিঠি লেখেন তখন সেগুলির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। অনেকের কাছে যে সময়মতো পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হয় না অথবা পাঠাতে দেরি হয়, M. O. সম্পর্কিত অস্পষ্টতাই তার জন্য দায়ী। সেজন্য অনুরোধ, এখনই আগামী বর্ষের গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করে নিন। M. O. কুপনে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা, গ্রাহকসংখ্যা লিখবেন, M. O. কেন পাঠাচ্ছেন তাও জানাবেন।

❑ পত্রোত্তর এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকখরচ পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ প্রতি বাঙলা মাসের ১ তারিখ (ইংরেজী ১৪-১৮) 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়। ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার প্রধান ডাকঘরে (G.P.O.) এবং কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণত ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ঠিকমত পৌঁছায় না বলে গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে। এই বিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে পত্রিকা ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকেরা এক মাস পরেও পত্রিকা পান না বলে খবর পাই। সে-কারণে গ্রাহকদের এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি।

এক মাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট' বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে।

❑ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় (একমাস) অতিক্রান্ত হলে তবেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহক-সংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক।

❑ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ বড় এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। যাঁরা ডাকে পত্রিকা নেন, তাঁরা সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) অথবা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণের সময় অথবা ১লা জুন থেকে ২৪শে আগস্টের মধ্যে কার্যালয়ে জানাতে হয়।

❑ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ সংখ্যায় পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/ M. O. প্রাপ্তি-কুপন/ আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে।

❑ ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নতুন ঠিকানা পিন কোড সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে, যাতে পরবর্তী সংখ্যাটি পুরনো ঠিকানায় না চলে যায়।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হলে 'উদ্বোধন'-এ ব্যক্তির/ কেন্দ্রের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হবে।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদন-পত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বা প্রাইভেট কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ সভাপতিকে আবেদন করতে হবে।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

উদ্বোধন ১০১

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র ১০১তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা আশ্বিন ১৪০৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ৪১৬
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
শক্তিপূজার উৎস সন্ধানে ৪১৭
❑ অপ্রকাশিত পত্র ❑
স্বামী বিবেকানন্দ ৪২১
❑ সঙ্কলন ❑
'কথামৃতে' না-বলা
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা
শ্রীম ৪২৪
❑ ভাষণ ❑
"মন চল নিজ নিকেতনে"
স্বামী ভূতেশানন্দ ৪২৭
❑ আলোচনা ❑
অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ স্বামী নির্বাণানন্দ ৪৩৩
❑ বিশেষ নিবন্ধ ❑
শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন আবেদন
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৪৩০
'চণ্ডী'তে মহামায়ার দুটি রূপ
স্বামী প্রমেয়ানন্দ ৫৩৩
শক্তিসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ
স্বামী প্রভানন্দ ৫৪৯
❑ মাধুকরী ❑
দুর্গোৎসব-তত্ত্ব অশ্বিনীকুমার দত্ত ৪৩৬

❑ দিশা ❑
কোন্ পথে ভারত?
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ৪৫৫
❑ শ্রুতিনাটক ❑
মরুতীর্থে একদিন
বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৫
❑ পরিক্রমা ❑
সবরিমালার আয়াপ্পা স্বামী
স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ ৪৬০
ব্রাজিল ঘুরে এসে শৈবাল গুপ্ত ৫১৪
❑ ইতিহাস ❑
কলকাতা বিক্রির দলিল : এক নতুন তথ্য
তরুণ গোস্বামী ৪৬৭
প্রেসিডেন্সি কলেজ ও এক ঔপনিবেশিক
চক্রান্ত : ১৯০৪-১৯০৭ উদয়ন মিত্র ৪৯৮
❑ নিবন্ধ ❑
'কলমীর দল' স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৫৪৪
সেই ঢেউয়ের অপেক্ষায় সন্দীপন বিশ্বাস ৪৭০
বিবেকানন্দের বাঙলা রচনা : শক্তি ও সৌন্দর্য
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৭৫
গণবিজ্ঞান আন্দোলনে 'উদ্বোধন'
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮২
বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন' তাপস বসু ৫০৯

[পরপৃষ্ঠায়]

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : জয়ন্ত ঘোষ ও স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস ❑ প্রচ্ছদ আলোকচিত্র : দাসানুদাস সাহা
আগামী বর্ষের (১৪০৬-১৪০৭/২০০০) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৪০ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণবেশ চক্রবর্তী ৫৬৪
'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তি : ভারতের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে প্রথম শান্তি সিংহ ৫৬০
❑ দুর্গোৎসব ❑
কাশীর দুর্গা স্বামী অচ্যুতানন্দ ৪৮৬
স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মভূমি ও বংশের দুর্গাপূজার ৩০০ বছর অরুণপ্রকাশ ঘোষ ৪৯১
উনবিংশ শতাব্দীর দুটি দুর্গোৎসব শ্যামলী মহাপাত্র ৪৯৫
শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য একটি প্রাচীন পারিবারিক দুর্গোৎসব সপ্তর্ষি ঘোষ ৪৯৩
❑ পরমপদকমলে ❑
"আমি খাই-দাই আর থাকি, আর আমার মা সব জানেন" সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৫৩০
❑ সাহিত্য ❑
'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি শঙ্কর ঘোষ ৫৪১
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
অকালবোধন কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত ৫৪৫
❑ সমাজবিজ্ঞান ❑
বাংলাদেশ : রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন হোসেনুর রহমান ৫৫৫
❑ বিজ্ঞান ❑
বিনাশের পথে বসন্তরোগের জীবাণু জলধিকুমার সরকার ৫৬৯
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
স্বামীজী-জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর সান্নিধ্যে আমার পিতৃদেবের কয়েকদিন ৫৩৬
প্রসঙ্গ 'সরস্বতী মূর্তি' ৫৩৬
প্রসঙ্গ বাঁশবেড়িয়ার রাজা মহাশয়েরা ৫৩৭
নজরুলের জন্মভিটা চুরুলিয়া গ্রামের কথা ৫৩৭
'ভায়োলেন্স'-সংস্কৃতির প্রভাব ৫৩৮
আমেরিকায় দুর্গাপূজা ৫৩৯
শ্রীরামকৃষ্ণ হালিসহর ও হংসেশ্বরী-মন্দিরে এসেছিলেন ৫৪০
❑ কবিতা ❑
আগমনী কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় ৪৪৭
শরৎ মানেই গীতা সরকার ৪৪৭
জীবন নিমাই মুখোপাধ্যায় ৪৪৭
"আরো আরো আরো দাও প্রাণ" প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ৪৪৭
স্বপ্ন কথা শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪৭
শ্রীকামাখ্যাপ্রশস্তি রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ৪৪৮
আত্মনিবেদন দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৪৮
অদৃশ্য শত্রুর হাতে নচিকেতা ভরদ্বাজ ৪৪৯
সম্পর্ক উমা দে শীল ৪৪৯
দিনাবসান অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৪৯
জননী জন্মভূমি মনোজ খাটুয়া ৪৪৯
বেলাশেষের কবিতা বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫০
এখনো দীপাঞ্জন বসু ৪৫০
চরণে দিও ঠাঁই অনীতা দত্ত ৪৫০
আমরা ধনঞ্জয় লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস ৪৫১
প্রতিমার রূপ সনৎকুমার মিত্র ৪৫১
কুলকুণ্ডলিনী দীপালি রায় ৪৫১
যেদিন ফুটল কমল চিত্তরঞ্জন মাইতি ৪৫১
স্বামী বিবেকানন্দ—রিজলি ম্যানরে, মহান গ্রীষ্মে মঞ্জুভাষ মিত্র ৪৫২
তবু মানুষে মানুষে রমলা বড়াল ৪৫৩
সুন্দরের সন্ধানে নিভা দে ৪৫৩
স্বপন যদি পিনাকীরঞ্জন কর্মকার ৪৫৩
সূর্যোদয়ের আগে শান্তিকুমার ঘোষ ৪৫৩
গতকাল ফুল ছিল গাছে লতিকা ঘোষ ৪৫৪
ভাবনা তারাশঙ্কর রায় ৪৫৪
আলোয় ভরা দিন চলে যায় শেখ সদরউদ্দীন ৪৫৪
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
গ্রন্থ-পরিচয় • বিবেকানন্দ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭৩
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৫৭৬
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৫৭৭
বিবিধ সংবাদ ৫৭৮
❑ অন্যান্য ❑
অনুষ্ঠান-সূচী (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪০৬) ৫৩৫
আবেদন : স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা ৪৭৪
আবেদন : রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম ৫৫৯
❑ প্রচ্ছদ ❑ আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের দুর্গাপ্রতিমা ৫৭৮

পূজাবকাশ

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয়ের সকল বিভাগ ১৬ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কতরা পূর্বা কতরা পরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বি বর্ততে অহনী চক্রিয়েব।।

[দৌ ও পৃথিবী] এঁদের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হয়েছেন, কে পরে উৎপন্ন হয়েছেন, কি নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছেন, হে কবিগণ। একথা কে জানে? এঁরা অন্যের ওপর নির্ভর না করে সমগ্র জগৎ ধারণ করেন এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ পরিবর্তিত হচ্ছেন।

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ।।

পাদরহিত, অবিচল দ্যাবা-পৃথিবী সজল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণিসমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করছেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী। আমাদের মহাপাপ থেকে রক্ষা কর।

ঋগ্বেদ (১।১৮৫।১-২)

বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু।।

এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা, বসুন্ধরা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠাস্থল; এই পৃথিবী সুবর্ণবক্ষ, যাকিছু চলমান তাদের আবাসস্থল; এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করে, ইন্দ্র তার ঋষভ—এই ভূমি আমাদের সম্পদ দান করুক।

অথর্ববেদ (১২।১।৬)

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে।।

হে অলঙ্ঘ্যবীর্যে, আপনি পৃথিবীরূপে বিরাজিতা বলে একাকিনীই জগতের আশ্রয়স্বরূপা। আপনিই জলরূপে অবস্থিতা হয়ে এই সমগ্র জগৎকে পরিপুষ্ট করছেন। অতএব, আপনি সর্বাত্মিকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (১১।৪)

শক্তিপূজার উৎস সম্বন্ধে

বিশ্বপ্রপঞ্চের পিছনে এক সর্বনিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের মনে কখন প্রথম চেতনা জাগিয়াছে আমরা কেহই তাহা জানি না। তবে যখনই জাগিয়া থাকুক, সেই আদিম চেতনাই যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরভাবনার জন্মদান করিয়াছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আদিম মানুষ অরণ্যে বা পর্বতগুহায় অথবা নদী বা সমুদ্রতীরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বাস করিত। হিংস্র জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহারা অস্তিত্ব রক্ষা করিত। কখনো সেই যুদ্ধে তাহারা প্রাণ হারাইত। কখনো তাহারা অপর কোন জনগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হইত, কখনো আবার অপর কোন গোষ্ঠীকে আক্রমণ করিত। অরণ্যের ফল, অরণ্যের পশু-পাখির মাংস, নদী ও সমুদ্রের মাছ এবং নদীর জল তাহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটাইত। এইভাবে তাহাদের জীবন চলিত। ইহার মধ্যে হঠাৎ তাহারা একদিন দেখিল তাহাদের মধ্যে একজন অসুস্থ হইয়া পড়িল, কেহ চিরনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল। কখনো তাহারা দেখিল প্রচণ্ড ঝড় আসিয়া প্রকৃতিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। কখনো আবার প্রবল বর্ষণে সব ভাসিয়া গেল। কখনো-বা আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের ঝলসানি অথবা বজ্রের গর্জন তাহাদের শঙ্কিত করিয়া তুলিল। কখনো-বা কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর আকার ধারণ করিয়া গোষ্ঠীর বহু মানুষের জীবনান্ত ঘটাইল। কখনো-বা রাত্রিতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে সুখস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের মাধ্যমে আনন্দ অথবা আতঙ্কের অনুভূতি লাভ করিল। তাহারা অবাক হইয়া ভাবিতে বসিল—নারীর বুকে কেন স্তন্যক্ষীরধারা প্রবাহিত, নারীর মধ্য হইতেই কেন বাহির হইয়া আসে এক নতুন জীবন—এক নতুন মানুষ! আকাশের নীলিমা, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ, অমাবস্যার অন্ধকার, পূর্ণিমার সর্বপ্লাবী জ্যোৎস্না, গ্রীষ্মের প্রখরতা, শীতের তীব্রতা, তাহাদের মনে জাগাইত বিস্ময়, আনন্দ ও শঙ্কা। ঐ অনুভূতি হইতেই তাহারা এক সর্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান সত্তার মধ্যে আশ্রয় খুঁজিতে শুরু করিল। তখন হইতেই মানুষের ঈশ্বরভাবনার উন্মেষ।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য 'ঋগ্বেদ'-এর মধ্যে আমরা ক্রমপরিণত সেই ঈশ্বরভাবনার সুপ্রাচীন রূপটির পরিচয়লাভ করি। বৈদিক যুগের ব্যাপ্তি একশ-দুশ বছর নয়, অন্তত এক হাজার বছর। এই এক হাজার বছরে ভারতবর্ষের মানুষের পূর্বপুরুষগণের ঈশ্বরভাবনার বিবর্তনের ধারাটিও স্পষ্ট। সেই ধারা আরো পরিণতির দিকে কিভাবে গিয়াছে তাহার পরিচয় রহিয়াছে রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র ও প্রাচীন পুরাণগুলিতে এবং প্রাচীন কাব্য, ব্যাকরণ, নাটক ও স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে। অপরদিকে বৈদিক সভ্যতার পাশাপাশি সিন্ধুসভ্যতার বিকাশের যে-প্রমাণ আমরা পাইয়াছি সেখানেও প্রাচীন মানুষের ঈশ্বরভাবনার রূপরেখা বিদ্যমান। উভয় সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর, কোন্‌টি কতখানি মূলগতভাবে ভারতীয় অথবা অভারতীয়, তাহা লইয়া সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে আসা এখনো সম্ভব হয় নাই। আবার উভয় সভ্যতার মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয়ের তত্ত্ব লইয়াও বাদ-প্রতিবাদ এখনো থামে নাই।

ভয়, বিস্ময় এবং আনন্দ ঈশ্বরভাবনার জন্মদান করিয়া থাকিলেও মানুষের প্রথম ঈশ্বরভাবনা পুরুষকেন্দ্রিক ছিল অথবা নারীকেন্দ্রিক ছিল—সেবিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এখনো জানা যায় নাই। তবে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, মানুষ তখন ঈশ্বরকে যেমন পুরুষ ভাবিয়াছে, তেমনি আবার নারীও ভাবিয়াছে। ইহার প্রমাণ যেমন 'ঋগ্বেদ'-এ আমরা পাইতেছি, তেমনি আবার পাইতেছি সিন্ধুসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতেও। বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। কারণ, মানুষ যখন ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছে তখন সে তাহার নিজের আদলেই তাঁহাকে কল্পনা করিয়াছে। মানুষ তো শুধু পুরুষই নয়, মানুষ নারীও। সুতরাং আদিম মানুষের ঈশ্বরভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল পুরুষ-ঈশ্বর সম্পর্কে পিতৃভাবনা এবং নারী-ঈশ্বর সম্পর্কে মাতৃভাবনা। মজার ব্যাপার এই যে, ভারতেই হউক অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই হউক, 'মা' শব্দটি সুপ্রাচীনকাল হইতে কোন না কোনভাবে জননী সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। শিশু যখন প্রথম পৃথিবীর আলো দেখে তখন তাহার মুখে ভাষা থাকে না, থাকে ক্রন্দনধ্বনি। আশ্চর্য, সেই ধ্বনিটি সবদেশেই 'মা'-এর মতোই শোনায়। প্রকৃতির নিয়মে কিছুকালের মধ্যে শিশুর মুখে ভাষা ফোটে। মানবশিশুর মুখে উচ্চারিত প্রথম শব্দটিই 'মা'। সেজন্য সংস্কৃত, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাতেই হউক, অথবা ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী, বাঙলা, তামিল, মারাঠী যেকোন আধুনিক ভাষাতেই হউক, জননীকে যে-শব্দে আমরা ডাকি তাহার প্রথমে বা শেষে 'মা' বা 'মা'-র কাছাকাছি একটি ধ্বনি আছেই।

সেজন্য পণ্ডিতরা অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরভাবনার উন্মেষলগ্নে মানুষ ঈশ্বরকে নারীরূপেই দেখিয়াছে এবং

শারদ শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা

বাঙালীর পরম আকাঙ্ক্ষিত শারদ উৎসব সমাগত। এবারের উৎসব শতাব্দী তথা সহস্রাব্দের শেষ শারদ উৎসব। এই শুভলগ্নে আমরা 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা—উৎসবের দিনগুলি যেন আমরা শান্তি ও আনন্দে, প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ে অতিবাহিত করিতে পারি। আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের মনুষ্যত্বকে যেন জাগ্রত রাখিতে পারি। মা আমাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

স্বাভাবিকভাবেই সেই নারীরূপের মধ্যে মাতৃরূপটিই ছিল প্রধান। কারণ, আদিম সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তখন মায়ের পরিচয়েই সন্তানের পরিচয় চিহ্নিত হইত। নারী ছিল স্বাধীন। বিবাহ বা দাম্পত্য সম্বন্ধের ভাবনা অনেক পরের ব্যাপার। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, ঋষি উদ্দালকের পুত্র ঋষি শ্বেতকেতু দাম্পত্য-সম্পর্ক তথা বিবাহ-সম্পর্কের 'শৃঙ্খলা' প্রবর্তন করেন। বিবাহ-সম্পর্ক প্রবর্তিত ও স্বীকৃত হওয়ার আগে প্রাচীন সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্য ছিল। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্বীকৃত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে পুরুষপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে শুরু করে। ধনসম্পদ পুরুষের অধিকারে আসে, নারীও পুরুষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইতে থাকে। মানবসমাজের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এ স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ "আদিম অবস্থায় বিবাহ ছিল না। ক্রমে ক্রমে যৌনসম্বন্ধ উপস্থিত হলো। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্বসমাজে মায়ের ওপর ছিল। বাপের বড় ঠিকানা থাকত না। মায়ের নামে ছেলেপুলের নাম হতো। মেয়েদের হাতে সমস্ত ধন থাকত ছেলে মানুষ করবার জন্য। ক্রমে ধন-পত্র পুরুষের হাতে গেল, মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। ... বর্তমান বিবাহের সূত্রপাত হলো।" আদিম সমাজব্যবস্থা প্রসঙ্গে মার্ক্সীয় বর্ণনার সঙ্গেও স্বামীজীর চিন্তার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, কিভাবে নারীর কর্তৃত্ব হইতে সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব আসিল? আমরা দেখিয়াছি, আদিম অবস্থায় মানুষ ছিল প্রকৃতির খেলার বস্তু। আদিম মানুষ প্রকৃতির খেয়াল, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ভয় পাইত। প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া তাহাদের টিকিয়া থাকিতে হইত অথবা মরিতে হইত। তখনকার সেই রুক্ষ, রসহীন, মাধুর্যহীন জীবনে রস ও মাধুর্যের একমাত্র উৎস ছিল নারী। নারীর কাছে তাহারা পাইত স্নেহ, মমতা এবং মানসিক ও শারীরিক আশ্রয় ও আনন্দ। এই আনন্দ ও আশ্রয় তাহাদের কাছে একাধারে ছিল স্বাভাবিক, আবার ছিল বিস্ময়েরও বিষয়। আদিম সমাজ যখন ক্রমে কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িল তখন বীজবপন হইতে শস্য-সংগ্রহ এবং শস্য-সংরক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে নারীরাই ছিল অগ্রণী। ইহাতে নারীই হইয়া উঠিয়াছিল পরিবার তথা গোষ্ঠীর ভরকেন্দ্র। ফলত নারীর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই পুরুষেরা নির্ভর করিতে আরম্ভ করিল। নারীর প্রতি এই নির্ভরতা তাহাদের মাতৃবন্দনায় ব্রতী করিল। এই মাতৃবন্দনাই সমাজকে মাতৃপ্রাধান্য দান করিল। ভগিনী নিবেদিতা মনে করিতেন, মাতৃপ্রাধান্যের বিষয়টি আদিম সমাজের ভাবাবেগ এবং নৈতিক চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। স্বাভাবিকভাবেই মাতৃবন্দনা ও মাতৃনির্ভরতা মানুষের আদিম ঈশ্বরভাবনাকেও প্রভাবিত করিল। মানুষ ঈশ্বরকে নারীরূপে এবং প্রধানত মাতৃরূপে ভাবিতে শুরু করিল। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার 'ফুটফলস অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি'তে লিখিয়াছেন ঃ সমাজে রানী-ভাবনা যেমন রাজা-ভাবনা অপেক্ষা প্রাচীনতর, তেমনি দেবী-ভাবনাও দেব-ভাবনা অপেক্ষা প্রাচীনতর। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত দেবীমূর্তিগুলিতে এবং ঋগ্বেদ-এর 'দেবীসূক্ত', 'রাত্রিসূক্ত' প্রভৃতি আর্যসভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শনগুলিতে ইহার ইঙ্গিত মিলিবে। সমকালীন অথবা কিছু পরবর্তী কালের বহির্ভারতীয় সভ্যতাতেও, বিশেষ করিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বহু দেশে, মাতৃপূজা যে খুব জনপ্রিয় ছিল, সেবিষয়ে বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এবিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ "পৃথিবীর প্রাচীন মাতৃপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বহু দেশে প্রাচীনকালে মাতৃদেবী ও তাঁহার পূজার প্রচলন ছিল। গ্রীসের রুহী দেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলি, ইজিপ্টের ইস্থার, আইসিস প্রভৃতি প্রাচীন মাতৃদেবীর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।... ভূমধ্য-সাগরস্থিত ক্রীট দ্বীপে একসময়ে সিংহবাহিনী এক 'পার্বতী' (পর্বতবাসিনী) দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভূমধ্যসাগরীয় এইসকল অঞ্চলে ভূখননের ফলে বহু প্রাচীন নারীমূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে; এই নারীমূর্তির প্রাধান্যও একটা মাতৃপূজার প্রচলনই সূচিত করে।"

ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত দেবীমূর্তিটি একটি পর্বতের শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান। তাঁহার দুই পাশে দুটি সিংহ যেন তাঁহার বাহন বা রক্ষক। গ্রীসের মাতৃদেবী রুহীর যে-মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে সেখানে দেখা যাইতেছে, তিনিও পর্বতশীর্ষে দণ্ডায়মানা এবং তাঁহার পাশেও রহিয়াছে সিংহ। এশিয়া মাইনরের দেবী সিবিলির মূর্তিতে দেখা যায়, তাঁহার পদপ্রান্তে রহিয়াছে একাধিক সিংহ। প্রাচীন ভারতের সিংহবাহনা এবং পর্বতরাজকন্যা উমা বা পার্বতীর বা দুর্গার কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারত এবং প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পর্বতবাসিনী এবং সিংহবাহনা মাতৃদেবতার এই সংযোগ কি আকস্মিক? আমাদের তাহা মনে হয় না। বরং ইহাই মনে হয় যে, মাতৃপূজার বিষয়টি ছিল প্রাচীন সমাজের একটি সাধারণ (common) বিষয়। পারস্পরিক কোন যোগাযোগের কারণে নয়, প্রাচীন সমাজে মাতৃপ্রাধান্য তথা মাতৃ-উপাসনার স্বাভাবিক উদ্ভবের কারণেই প্রাচীন সভ্যতাগুলির দেবীমূর্তি বা দেবীভাবনার মধ্যে এই সাদৃশ্য। আবার ভারতবর্ষের সুপরিচিত মহিষমর্দিনী দুর্গার মূর্তির সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধপ্রিয়া দেবী ভির্গোর এক অদ্ভুত সাদৃশ্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের এই দেবীও মহিষমর্দিনী। ভারতীয় পুরাণের মতে, দুর্গা মহিষরূপী অসুর ও তাহার অসংখ্য অনুচরকে বধ করিয়াছিলেন। 'মহিষ' আর কিছুই নয়, অসংস্কৃত, নারীলোভী, হিংস্র, বর্বর এক জনগোষ্ঠী এবং 'মহিষাসুর' তাহাদের নেতা। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলেও প্রাচীনকালে 'মনখেম্‌র' নামে আদিম এক মিশ্র জনগোষ্ঠী বাস করিত। তাহাদের 'টোটেম' বা ঈশ্বরের প্রতীক ছিল মহিষ। অর্থাৎ মহিষ ছিল তাহাদের কাছে খুব পবিত্র। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সুসভ্য জনগোষ্ঠী মনখেম্‌রদের পরাভূত করিয়াছিল। যুদ্ধদেবী ভির্গোর মহিষমর্দিনী মূর্তির মাধ্যমে মনখেম্‌রদের উপর তাহাদের ঐ বিজয়ের ঘটনাই রূপায়িত। ভির্গো এবং দুর্গার এই সাদৃশ্যের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের বিষয়টি অবান্তর। কারণ, প্রাক্ ঐতিহাসিক সেই প্রাচীনযুগে পারস্পরিক সংযোগের সম্ভাবনা ছিল না। উভয়
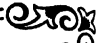
ক্ষেত্রেই প্রাচীন সমাজে মাতৃপূজার ভাবনাটি স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং হইয়াছিল আদিম সমাজের মাতৃপ্রাধান্যের স্বাভাবিক ধারা অনুসারেই।

দেবীকে সিংহবাহনা এবং মহিষমর্দিনীরূপে কল্পনার মধ্যে আদিম সমাজে হিংস্র অরণ্যপশুকে টোটেম-রূপে গ্রহণের মনস্তত্ত্বটি সুপরিস্ফুট। সিংহ এবং মহিষ ঐ দুই টোটেমের মধ্যে শুধু ধর্মভাবনাই নয়, সভ্যতার তারতম্যের দুটি ধারাও নিহিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রুহী, সিবিলি, ভির্গো, দুর্গা ভিন্ন এশিয়া মাইনরের আনাতোলিয়ার ফ্রিজীয় জাতি খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব হইতে পাহাড়ের গুহামন্দিরে এক সিংহবাহনা দেবীর পূজা করিত। ফ্রিজীয়রা এই দেবীকে তাহাদের ভাষায় বলিত 'গদান মা'। ভাষাচার্য সুকুমার সেনের মতে, সংস্কৃত অনুবাদে শব্দটির অর্থ 'ক্ষমা'। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ঐ মূর্তিটি ছিল ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক মাতা পৃথিবীর। পৃথিবীকে দেবীরূপে কল্পনা অতি প্রাচীন। ইহা যেমন বহির্ভারতের, তেমনি ভারতের।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সূচনা সিন্ধুসভ্যতা হইতে ধরা হয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত দেবীমূর্তিগুলির মধ্যে মাতা পৃথিবীর মূর্তি অন্যতম। মূর্তিগুলির মধ্যে একটি মূর্তির অঙ্গ হইতে একটি বৃক্ষকে উদ্গত হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শস্য, প্রাণশক্তি ও প্রজননশক্তির প্রতীকরূপে আদিম মানুষ দেবী পৃথিবীর কল্পনা করিয়াছিল। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র জগতের মধ্যে এই মূর্তিটিই সম্ভবত পৃথিবী-দেবীর প্রাচীনতম মূর্তি। মিশরীয় দেবী মাউত, মেক্সিকান দেবী মায়োএল, জার্মান দেবী নের্থাস, গ্রীক দেবী রুহী, রোমান দেবী সিবিলি, এশিয়া মাইনরের গদান মা ছিলেন পৃথিবী-দেবী।

ভারতের বৈদিক সাহিত্যেও পৃথিবী-দেবী বিশেষ মহিমান্বিতা। ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন: "মাতা পৃথিবী মহীয়ম্"—বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা। (১।১৬৪।৩৩) ঋগ্বেদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'দৌ' বা স্বর্গ বা আকাশ-এর সঙ্গে পৃথিবীর নাম উচ্চারিত। ঋগ্বেদে 'দৌ' জগতের পিতা-রূপে এবং পৃথিবী জগতের মাতা-রূপে কল্পিত। দৌ এবং পৃথিবী মিলিয়া বেদের দ্যাবা-পৃথিবীর কল্পনা। শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন: "এইসকল বর্ণনা দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, পৃথিবীকে যে এই মাতৃরূপে বর্ণনা, ইহা বৈদিক কবিগণের নিছক কবি-কল্পনা মাত্র নহে; ইহার পশ্চাতে বৈদিক কবিগণের একটা ধর্মবোধ প্রচ্ছন্ন ছিল—পৃথিবীর সীমাহীন বিস্তার, তাহার রূপবৈচিত্র্য এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্য, তাহার অন্নদা এবং ধনদা রূপ, সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে লুক্কায়িত অনন্ত প্রাণশক্তি—নিরন্তর অসংখ্য-রূপে তাহার প্রকাশ—এইসকল একত্র হইয়া মুগ্ধ কবিগণের চিত্তে একটা বিস্ময়জনিত শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তায়ই মানুষের ধর্মবোধের উদ্বোধন, এবং সেই ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীর দেবীমূর্তি।"

ঋগ্বেদের মতে, আদি পিতা দৌ বা আকাশের সঙ্গে আদি জননী পৃথিবীর মিলন ঘটে বর্ষণের মাধ্যমে। আকাশ হইতে পতিত বৃষ্টিধারা পৃথিবীকে সন্তানবতী বা শস্যশালিনী করে। মানব-সভ্যতার সূচনালগ্ন হইতেই এমন একটি ধর্মবিশ্বাস বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, বর্ষণের মাধ্যমে আকাশরূপী পিতা-ঈশ্বর পৃথিবীরূপিণী মাতা-ঈশ্বরের গর্ভসঞ্চার করেন এবং উহার ফলেই পৃথিবী বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, ফুল ও শস্যে পূর্ণ হইয়া উঠেন। ঋগ্বেদে 'আদিত্যগণের জননী' দেবী অদিতি ও দেবী পৃথিবী অভিন্না। আদিত্যগণের জননী অদিতি পরবর্তী কালে 'দেবমাতা' হইয়া গিয়াছেন। আরো পরবর্তী কালে তাঁহাকে আমরা প্রজাপতি দক্ষের জননী এবং কন্যা উভয় রূপেই দেখিতে পাই। সেখান হইতেই কি তিনি দক্ষকন্যা সতীতে—যিনি রূপান্তরে উমা, গৌরী, দুর্গারূপে আমাদের মধ্যে পূজিতা হন—পরিণতিলাভ করিয়াছিলেন? এ-প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে উঠিতে পারে। ঋগ্বেদের এই পৃথিবী-অদিতির কল্পনাই হিন্দু-ভারতের শক্তিপূজার আদি উৎসে। 'রাত্রিসূক্ত' ও 'দেবীসূক্ত'তে ঐ কল্পনারই আরেক প্রকাশ ঘটিয়াছে। এই দুই ধারা হইতেই পরবর্তী কালের শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিসাধনার ঐতিহ্য প্রধানত গড়িয়া উঠিয়াছে। ঋগ্বেদের অন্যান্য নারী-দেবতার মধ্যে বিশেষ স্থান উষা ও সরস্বতীর। মানবজননী পৃথিবী, আদিত্যবৃন্দের মাতা অদিতি, সূর্যপ্রেয়সী উষা, জ্যোতিরূপিণী সরস্বতী, দেবীসূক্তের দেবী এবং রাত্রিসূক্তের রাত্রি পরবর্তী কালে পৌরাণিক যুগে একীভূতা হইয়া অসুরনাশিনী, জগদ্ধাত্রী, রুদ্র-শিবজায়া জগন্মাতা দুর্গা ও কালীতে পরিণত হইয়াছেন। এই পরিণতিতে অবশ্য আর্যেতর সংস্কৃতির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্যভাবে মিশ্রিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের দ্যাবা-পৃথিবীর কল্পনার মধ্যে হিন্দুর সুপরিচিত শিব-শক্তির কল্পনা ও তন্ত্রের উৎস নিহিত রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন: "বেদের এই দ্যাবা-পৃথিবী রূপ পিতামাতার পরিকল্পনায়... আমরা একটা গভীর তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে পারি। সৃষ্টির ভিতর এই যে একটি সর্বজনীন পিতামাতার পরিকল্পনা দেখিতে পাইলাম, ইহা পরবর্তী কালে আমাদের নানা প্রকারের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং দার্শনিক সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আমাদের শিব-শক্তির পরিকল্পনাকে জাগাইয়া দিয়াছে।... অস্পষ্টভাবে একটি 'জগতঃ পিতরৌ'র কল্পনা আমরা এখানেই পাইতেছি, একথা অস্বীকার করিতে পারি না।"

বলা বাহুল্য, আদিম মানুষের নারী-দেবতার পূজা পৃথিবীতে সর্বজনীন হইলেও স্বামী সারদানন্দ 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থে দাবি করিয়াছেন: "শক্তিপূজা, বিশেষত মাতৃভাবে শক্তিপূজা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি।" ভারতের বাহিরের প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে যে নারী-দেবতার পূজার নিদর্শন আমরা পাইয়াছি, উহা শুদ্ধভাবে মাতৃপূজায় পর্যবসিত হয় নাই। প্রতীক ও প্রতিমার মাধ্যমে জগন্মাতার পূজা পরম মুক্তিলাভের সহায়ক, একথা ভারতের ঋষি, সাধক ও আচার্যগণ আবহমান কাল হইতে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ভারতের অগণিত শক্তি-সাধকদের সাধনা যুগে যুগে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। অবশেষে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননী এবং সহধর্মিণীকে পূজার মাধ্যমে শক্তিপূজা ও শক্তি-সাধনাকে চরম পরিণতি দান করিয়া জগতের সাধনার ইতিহাসে উহাকে এক অনন্য গৌরবে স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। ❑

স্বামী বিবেকানন্দের দুটি অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী বিবেকানন্দের এই অপ্রকাশিত পত্র-দুটি গত মার্চ মাসে (১৯৯৯) রাজস্থানের খেতড়ি মহকুমা শাসকের 'রেকর্ড রুম'-এ পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। রাজস্থান সরকারের পক্ষ থেকে মূল পত্র-দুটি গত ২৭ মার্চ '৯৯ বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করা হয়। আমরা এখানে পত্র-দুটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলাম। মূল পত্র-দুটি বেলুড় মঠের 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'-এ সংরক্ষিত আছে।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

Madras
the 15th February

Your Highness
Two things I am telling your highness. One a very wonderful phenomenon I have seen in a village called Kumbhakonam and another about myself
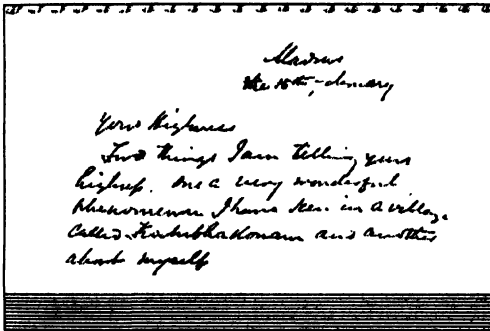
মাদ্রাজ
১৫ ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩]

মহারাজ,

আপনাকে দুটি বিষয়ে লিখছি। প্রথমটি একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ঘটনা যা আমি কুম্ভকোনম গ্রামে প্রত্যক্ষ করেছি; আর দ্বিতীয়টি আমাকে নিয়ে।

পূর্বোক্ত গ্রামটিতে চেট্টী জাতির একটি লোক থাকে যাকে সবাই একজন জ্যোতিষী বলে জানে। দুজন যুবকের সঙ্গে আমি তাকে সেখানে দেখতে গিয়েছিলাম। লোকটির সম্বন্ধে বলা হয় যে, যে-কেউ যাকিছু চিন্তা করে তা সে বলে দিতে পারে। তাই আমি লোকটিকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। দুমাস আগে আমি একটা স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমার মা মারা গেছেন। সেজন্য আমি তাঁর সম্বন্ধে খবর পাওয়ার জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে, আমার গুরুদেব আমার সম্বন্ধে যাকিছু বলেছিলেন তা ঠিক কিনা। আমার তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল তাকে পরীক্ষা করার জন্য তিব্বতী ভাষায় একটি বৌদ্ধমন্ত্রের অংশবিশেষ। গোবিন্দ চেট্টীর কাছে যাওয়ার দিন দুই আগেই আমি এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে ঠিক করে নিয়েছিলাম। একটি যুবকের ভ্রাতৃবধূকে সকলের অজান্তে কেউ বিষ খাইয়ে দিয়েছিল। সে পরে সেরে ওঠে, কিন্তু এই শয়তানীর নায়ক কে তা তার জানার ইচ্ছা ছিল।

আমরা যখন তাকে প্রথম দেখি, লোকটি প্রায় ক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সে বলল, কজন ইউরোপীয় মানুষকে নিয়ে মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান তাকে দেখতে এসেছিলেন আর তখন থেকে তাদের দৃষ্টিদোষের ফলে তার জ্বর হয়েছে। তাই সে তখন আর আমাদের জন্য সূক্ষ্মদেহিগণের সঙ্গে তার সংলাপের অনুষ্ঠান করতে অপারক। তবে দশ টাকা দিলে সে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হতে পারে। আমার সঙ্গী যুবকেরা তার পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিতে তৈরি ছিল, কিন্তু সে তখন তার খাস কামরাটিতে চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে আমাকে বলে যে, যদি আমি তাকে তার জ্বর ভাল করে দেওয়ার জন্য একটু বিভূতি দিই তাহলে সে প্রেতাত্মাদের সঙ্গে তার আলোচনার অনুষ্ঠান দেখাতে রাজি হতে পারে। আমি অবশ্য তাকে বলেছিলাম যে, আমার রোগ ভাল করার ক্ষমতা আছে—এমন কোন অহঙ্কার আমার নেই। কিন্তু সে বলল: "তাতে কিছু ক্ষতি নেই।" আমার ওটা [বিভূতি] দরকার। তখন আমি রাজি হলাম আর তখন সে আমাদের তার খাস কামরায় নিয়ে গেল আর এক টুকরো কাগজ নিয়ে তাতে কিছু লিখে আমাদের একজনকে ওটা ধরিয়ে দিল। তারপর ওটাতে আমাকে সই করিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গীদের একজনের পকেটে ওটি রাখতে বলল। তারপর সে আমাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করল: "আপনি একজন সন্ন্যাসী, আপনি নিজের মায়ের কথা কেন ভাবছেন?" আমি বললাম: "কেন, এমনকি ভগবান শঙ্করাচার্যও তাঁর মায়ের যত্ন করতেন।" তখন সে বলল: "তিনি ভাল আছেন আর আপনার সঙ্গীটির কাছে রাখা কাগজটিতে আমি তাঁর নাম লিখে রেখেছি।" তারপর সে বলতে লাগল: "আপনার গুরু স্থূলশরীর ত্যাগ করেছেন। তিনি আপনাকে যাকিছু বলেছেন আপনি সেসব কথাই সত্য বলে জানবেন, কারণ তিনি একজন বিরাট মহাপুরুষ ছিলেন।" তারপর সে আমার গুরুদেবের এক দারুণ আশ্চর্য রকমের বর্ণনা দিতে লাগল। তারপর সে আমাকে বলল: "আপনি আপনার গুরুদেব সম্বন্ধে আর কি জানতে চান?" আমি তাকে বললাম: "তুমি যদি তাঁর নামটি আমায় বলতে পার, তাহলে আমি খুশি হব।" সে বলল: "কোন্ নামটি? একজন সন্ন্যাসীর তো অনেক রকমের নাম থাকে?" আমি জবাব দিলাম: "তিনি যে-নামে লোকের কাছে পরিচিত ছিলেন।" সে তখন বলল—সেই আশ্চর্য নামটি—"ওটি আমি আগেই লিখে রেখেছি। আর আপনি তিব্বতী ভাষার একটি মন্ত্রের কথা জানতে চেয়েছিলেন—সেটিও ঐ কাগজে লেখা আছে।"

তারপর সে আমাকে যেকোন ভাষায় যাকিছু একটা ভেবে নিয়ে তাকে বলতে বলল। আমি বললাম: "ওঁ নমো

ভগবতে বাসুদেবায়।" আর সে বলল : "এটাও আপনার সঙ্গীর কাছে রাখা কাগজে আগেই লেখা আছে। এখন ওটা বের করে নিয়ে দেখুন।" আর কি আশ্চর্য! সে যেমন বলল, সেসবই তাতে লেখা ছিল—এমনকি আমার মায়ের নামও লেখা ছিল!! লেখাটার আরম্ভ ছিল এরকম—"আপনার মা, যাঁর এই নাম, তিনি ভাল আছেন। তিনি খুব পবিত্র আর ভাল মানুষ। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে থাকার জন্য তিনি যে কষ্ট পাচ্ছেন তা মৃত্যুর সমান। দুবছরের মধ্যে তিনি মারা যাবেন। সুতরাং যদি আপনি তাঁকে দেখতে চান তাহলে দুবছরের মধ্যেই আপনাকে তা করতে হবে।"

এরপর কাগজটাতে লেখা ছিল—"আপনার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু তিনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ অপার্থিব শরীরে বর্তমান আছেন আর আপনাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।" তারপর তিব্বতী ভাষায় লেখা ছিল—"লামা লা কাপসেচুয়া"। তারপর সব শেষে লেখা ছিল—"আমি যা লিখেছি তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আমি আপনার জন্য এই 'ওঁ নমো ভগবতে' ইত্যাদি মন্ত্রটি লিখেছি যা আপনি আমার লেখার একঘণ্টা পরে আমাকে বলবেন।"

এভাবে সে আমার সঙ্গীদের ক্ষেত্রেও একইরকম সাফল্য লাভ করেছিল। তারপর আমি দূর দূর সব গ্রাম থেকে লোকেদের আসতে দেখলাম। আর সে তাদের দেখামাত্রই বলতে লাগল—তোমার নাম এই, তুমি ঐ গ্রাম থেকে এইজন্য এসেছ। এর মধ্যে সে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। সে খুব নরম হয়ে আমাকে বলল : "আমি আপনার কাছ থেকে টাকাপয়সা নেব না, বরং আপনাকে আমার একটু সেবা গ্রহণ করতে হবে।" আমি তার বাড়িতে একটু দুধ খেলাম। সে তার পরিবারের সকলকে আমাকে প্রণাম করাবার জন্য নিয়ে এল। আমি তার নিয়ে আসা বিভূতি স্পর্শ করে দিলাম এবং তাকে তার এই আশ্চর্যজনক শক্তির উৎসের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। প্রথমে সে কিছুই বলে না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে আমার কাছে এসে বলল—এসব দেবীর সহায়তায় মন্ত্রের সিদ্ধির ফল। "সত্যিই হোরেশিও, তোমার বুদ্ধি দিয়ে এযাবৎ তুমি যতকিছু বিষয়ের কল্পনা করেছ, এ ত্রিভুবনে তার চেয়ে অনেক বেশি বিষয় আছে!!"—সেক্সপীয়ার ('হ্যামলেট')

দ্বিতীয় বিষয়টি আমাকে নিয়ে। এখন মাদ্রাজে রামনাদের এক জমিদার রয়েছেন। তিনি আমাকে ইউরোপে পাঠাতে চান। আপনি আগে থেকেই জানেন, আমার ঐসব দেশ দেখার খুব আগ্রহ আছে। তাই আমি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের এই সুযোগটিকে গ্রহণ করব মনস্থ করেছি। কিন্তু আপনাকে না জানিয়ে আমি কোন কিছুই করতে পারি না, কেননা আপনিই 'পৃথিবীতে আমার একমাত্র বন্ধু'।

সুতরাং অনুগ্রহ করে এবিষয়ে আপনার মতামত জানাবেন। ঐস্থানগুলিতে আমি সংক্ষিপ্ত একটা ভ্রমণ করতে চাই। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আমি এক পবিত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির হাতের যন্ত্র।

আমার নিজের শান্তি নেই। আমি সারা দিনরাত সত্যসত্যই জ্বলছি। কিন্তু যেভাবেই হোক, আমি যেখানেই যাই, শত শত লোক—আবার কোথাও কোথাও, যেমন মাদ্রাজে সহস্র সহস্র লোক—রাতদিন আমার কাছে আসে, আর তাদের সংশয় ও অবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু আমি! আমি সর্বক্ষণই বিষণ্ণ!! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!! পালাবার কোন পথ নেই।

আপনাকে আপনার উত্তরাধিকারী ও পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নবজাত রাজকুমার তার মহামনা পিতার মতো শান্তস্বভাব হোক, আর প্রভু তার ও তার মাতাপিতার ওপর সর্বদা তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

to keep the ... private ... by going over to England etc.
Confidential

Pray you be blessed all your life you and yours is the prayer that is day and night offered up by

Sacchidananda

C/o Mr. Bhattacharya Esq.
Assistant Accountant General
St Thomas Mount Madras

আমি তাহলে দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে ইউরোপ যাচ্ছি। আমার শরীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না। শুধু মহারাজের কাছে আমার প্রার্থনা যে, যদি উচিত মনে করেন তাহলে আমার মায়ের একটু যত্ন করবেন যাতে তাঁকে অনাহারে থাকতে না হয়। শীঘ্র পত্রোত্তর পেলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। আর আপনার কাছে প্রার্থনা এই যে, পত্রের শেষের অংশটি অর্থাৎ আমার ইংল্যান্ড প্রভৃতি ভ্রমণের বিষয় সংক্রান্ত অংশটি গোপন রাখবেন।

আপনি ও আপনার পরিবারের সকলে আজীবন সুখে থাকুন—দিবারাত্র আমি এই প্রার্থনা করি।

সচ্চিদানন্দ

প্রযত্নে এম. (মন্মথনাথ) ভট্টাচার্য
সহকারী অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল
মাউন্ট সেন্ট থম, মাদ্রাজ।

বোম্বাই
২২ মে [১৮]৯৩

মহারাজ,

ফেরার পথে সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছিলাম, একথা বলা ছাড়া খেতড়ি ত্যাগের পর উল্লেখ করার মতো কিছুই ঘটেনি। পথে খারারিতে নেমেছিলাম এবং সেখান থেকে নাড়িয়াদে গিয়েছিলাম। হরিদাস ভাই আমার প্রতি যথারীতি খুব সদয় ব্যবহার করেছিলেন, আর আমাদের মধ্যে আপনাকে নিয়ে অনেক অনেক কথা হয়েছিল। এতটাই যে, তিনি আপনাকে দেখার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আগামী শীতকালের উত্তরাঞ্চল সফরের সময় তিনি আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেতে চান। আমি জোর করে বলতে পারি যে, এই বহু অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বৃদ্ধকে দেখে—যিনি বিগত ২৫ বছর ধরে কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলের আচার্যস্থানীয় ছিলেন—আপনি নিজেও অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। এছাড়া অত্যন্ত রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ্‌দের প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন ইনিই শুধু অবশিষ্ট আছেন। ইনি এমন একজন মানুষ যিনি যেকোন শাসনযন্ত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে গুছিয়ে একেবারে নিখুঁত করে দিতে পারেন। কিন্তু তারপর তিনি আর এক পাও এগোবেন না।
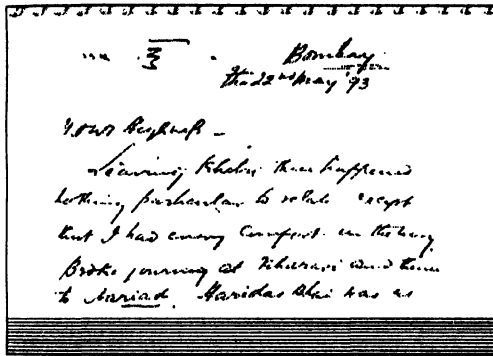
বোম্বাইতে আমি আমার বন্ধু ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল রামদাসকে [ছবিলদাস] দেখতে গিয়েছিলাম। সে একটু আবেগপ্রবণ লোক। আপনার চরিত্রের কথা শুনে সে এমনি মুগ্ধ হয়ে পড়ল যে, আমাকে বলল এখন গরমকালের মাঝামাঝি না হলে এমন এক মহারাজাকে দেখার জন্য সে ছুটেই চলে যেত!

তার বাবা এই ৩১ তারিখে শিকাগো যাওয়ার কথা ভাবছেন। তা যদি হয়, তাহলে যাত্রার সঙ্গী হওয়া যাবে বলে আমরা একসঙ্গে যাব। আজ আমি কয়েকটি স্টীলের ট্রাঙ্ক ইত্যাদি কিনতে যাব। মাদ্রাজের টাকাটা আসার অপেক্ষা করছি। জয়পুর থেকে যদিও ওদের তার পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা কিছুটা সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ে আমার কাছ থেকে আরো খবর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি আবার ওদের তার পাঠিয়েছি আর চিঠিও লিখেছি।

ফেরার পথে জয়পুরের অভিজাত সমাজের বিদ্যালয়ের চারণ হেডমাস্টার রামনাথের সঙ্গ পেয়েছিলাম। খেতড়ি থেকে প্রথমবার যাওয়ার সময় নিরামিষ খাবার নিয়ে ওর সঙ্গে আমার তকরার হয়েছিল। এর মধ্যে সে গোটাকতক আমেরিকান লেখকের বই পেয়ে পড়েছে আর তাই তাদের যুক্তিগুলো নিয়ে সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে বলল যে, তার লেখকেরা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের দাঁত থেকে সম্পূর্ণ পাক-প্রণালী ও গরুর পাক-প্রণালী একেবারেই একরকম। সেজন্য প্রকৃতির কল্পনা অনুসারেই মানুষ এক নিরামিষাশী প্রাণী। লোকটি খুব ভাল ও সজ্জন হওয়ায় আমি আমেরিকান লেখকদের ওপর তার শ্রদ্ধা খর্ব করতে চাইনি, কিন্তু একটা কথা আমার জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল। আমাদের পাকযন্ত্রটি যদি একেবারেই গরুর পাকযন্ত্রের মতো হয় তাহলে আমাদের ঘাস খেতে ও হজম করতে অবশ্যই পারা উচিত। সে-অবস্থায় ভারতের দরিদ্র লোকেরা কত মূর্খ যে, তাদের প্রাকৃতিক আহার ঘাসের সেখানে এত প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের সময় তারা না খেয়ে মরে; আর মহারাজের সেবকরাও মূর্খ যে, তারা আপনার সেবা করে যেখানে আর সকলের সেবা করার জন্য এত কষ্ট করার চেয়ে বরং সবচেয়ে কাছাকাছি পাহাড়টির ওপর উঠলেই তারা পেট-ভর্তি ঘাস খেতে পারে!!! সত্যি, দারুণ এক আমেরিকান আবিষ্কার!!! আমার শুধু আশা এই যে, ঐ আমেরিকান মানব-গরুদের পবিত্র গোময় সেই অদ্ভুত আমেরিকান লেখক আর তার ভারতীয় চেলার মহৎ উপকার করুক। আমেন! গো-মানব তত্ত্ব সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।
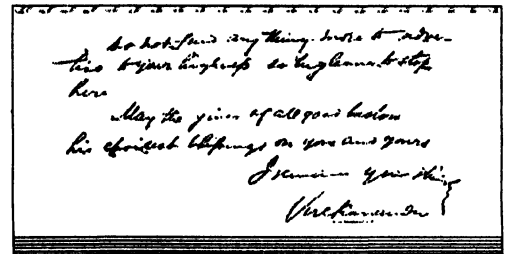
আপনাকে লেখার মতো আর কিছু দেখছি না। তাই শেষ করছি।

সকল মঙ্গলের বিধাতা আপনার ও আপনার স্বজনবর্গের উপর সর্বোত্তম আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। ইতি

প্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

ঠাকুর বলেছিলেনঃ "আমি পাগলের মতো ছুটাছুটি করতাম—কোথায় দেবতা, কোথায় ভাগবত, কোথায় গীতাপাঠ হচ্ছে, সেসব স্থানে।"

প্রথম প্রথম এসব করতে হয়। তাহলে মনের খেদ মেটে। পরে বৃদ্ধবয়সে মনে আর কষ্ট হয় না। মন তখন বলে কিনা, কিছুই করলাম না তাঁর জন্য! এ বড় জ্বালাতন, এই পশ্চাত্তাপ। তাই বয়স থাকতে এসব করে নিতে হয়। তারপর একস্থানে বসে রোমন্থন করা। যা দেখেছি, যা শুনেছি—এসব নিয়ে থাকা। (১০ম ভাগ, পৃঃ ২০)

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলছেনঃ "আমি অবতার।... একদিন দেখি এর (শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের) ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বের হয়ে বলছেন—আমিই যুগে যুগে অবতার হই। এবার সত্ত্বগুণের পূর্ণ আবির্ভাব।"

সন্দিগ্ধ নরেন্দ্রকে বলছেনঃ "গিরিশ যে (অবতার) বলে, তুই কি বলিস?" নরেন্দ্র বললেনঃ "ওঁর বিশ্বাস উনি বলুন। আমি যতক্ষণ না বুঝব নিজে ততক্ষণ বলব না।"

কিছুদিন পরে রোগশয্যায় নিজের বুকে হাত দিয়ে তারপর ঐ হাতের তর্জনী দিয়ে শূন্যে জগৎসূচক গোলাকার বৃত্ত অঙ্কিত করে নরেন্দ্রকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন—এর অর্থ কি? "বুদ্ধিমতাম্ বরিষ্ঠঃ"। নরেন্দ্র উত্তর করলেনঃ "আপনি জগতের সৃষ্টিকর্তা।" শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে ইশারাতেই আনন্দসূচক নেত্রসঞ্চালনের দ্বারা বললেন—এখন বুঝেছে।

অখণ্ডের ঘরের নরেন্দ্রের বুদ্ধি এটা গ্রহণ করেছে, কিন্তু হৃদয় সংশয়মুক্ত নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম রোগশয্যায় মহাসমাধির অব্যবহিত পূর্বে নরেন্দ্র ঠাকুরের বিছানায় বসে মনে মনে ভাবছেন—এখন বললে বুঝব। তৎক্ষণাৎ উত্তর হলোঃ "যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" নরেন্দ্রের বুদ্ধি হার মানল। কিন্তু হৃদয় এখনো সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত নয়।

নরেন্দ্রের বুঝতে দেরি হলো বটে, কিন্তু যখন বুঝলেন, তখন তাঁর লিখিত 'স্তবস্তুতি' কবিতায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন—"দাস তোমা দোঁহাকার।" যে সীতা-রাম, সেই ঠাকুর ও মা। (১১শ ভাগ, পৃঃ ১২৬-১২৭)

('কথামৃত' থেকে 'দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুরের জন্মোৎসব' প্রসঙ্গ পড়া হচ্ছে।)

কেন তিনি তাঁর জন্মোৎসবের অনুমতি দিলেন? লোকে যা ভালবাসে—নিজের পূজা হোক, সে কি তার জন্য? তা নয়। ভক্তরা সব আসবে। ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন হবে, ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ হবে, তাই। মা বৈ যিনি কিছু জানতেন না তাঁর আবার লোকমান্য হওয়ার ইচ্ছা কোথায়? তিনি কখনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে বলতেনঃ "ঝাঁটা মারি লোকমান্যে।"

তাঁতে যে লোকমান্য হওয়ার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, তিনি যে মা বৈ কিছুই জানতেন না—একথা তাঁর নিজের আচরণে সুস্পষ্ট। জন্মোৎসব বাসরে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। ব্যুত্থিত হলে তখনো মন সচ্চিদানন্দে নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান পূর্ণভাবে ফিরে আসেনি। সেই অবস্থায় তিনি আধ আধ স্বরে বলছেনঃ "(মা) জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সবই তুমি। মন বুদ্ধি সবই তুমি।" আবার বলছেনঃ "তুমিই অখণ্ড, তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ।"

যাঁর এই অবস্থা, এই কথা, তাঁর কি লোকমান্য হওয়ার ইচ্ছা থাকে? তিনি তিনবার সমাধিস্থ হলেন, একেবারে বেহুঁশ এই একঘণ্টার মধ্যে—যেন ভূতে পেয়েছে!

ঈশ্বরচিন্তা হবে এই জন্মোৎসবে, তাই অনুমতি দিলেন। আর এইজন্যও অনুমতি দিলেন, পরেও এইরূপ জন্মোৎসব করবে সকলে। তাতে ভক্তদের পরম কল্যাণ হবে।

ভাগবতে আছে, ভক্তগণের ওপর ভগবানের সকলের চাইতে বড় কৃপা, বড় অবদান তাঁর অবতার। ভক্তগণ অবতারের জন্ম, লীলা ও মহাবাণী চিন্তা করে করে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ করে ঈশ্বরপ্রাপ্তির চেষ্টা করবে।

নিরাকারকে সকলে ভাবতে পারে না—নিরাকার নির্গুণকে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে। নিরাকার সগুণকে ভাবাও কঠিন। সাকার সগুণকে ভাবা সহজ। আবার মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে, যখন তিনি আসেন—যেমন ঠাকুর, তখন তাঁকে ভাবা, তাঁকে চিন্তা করা সবচাইতে সহজ।

ঠাকুরের ভালবাসা, তাঁর কাজ, তাঁর গান, তাঁর নৃত্য, তাঁর নিজের হাতে ভক্তদের খাওয়ানো, ঈশ্বরের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ও শিশুর মতো ক্রন্দন, তাঁর মুহুর্মুহুঃ সমাধি—এইসব চিন্তা করবে ভক্তরা। তাই তিনি জন্মোৎসবের অনুমতি দিলেন।

জীবের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর অবতারশরীর ধারণ। সেই সুদুর্লভ পুরুষোত্তমের, অবতারের জন্মোৎসব স্বয়ং অবতারই আরম্ভ করিয়ে দিয়ে গেলেন। ঈশ্বরলাভের সহজ পথ অবতার দেখিয়ে গেলেন। ভক্তরা এখন দাগা বুলোক। (১২শ ভাগ, পৃঃ ১২৫-১২৬)

অবতার নিজের পূজার আয়োজন নিজেই করেন। এই করে তাতে ভক্তদের রুচি জন্মিয়ে দেন। তাঁর মানুষরূপকে যে ভালবাসবে—শরীর মন আত্মা, যাকেই ভালবাসুক তার আর জন্ম হবে না।

কিন্তু অবতারকে চেনা কঠিন। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া এটি হয় না। আমরা যে তাঁকে একটু চিনেছি, একি আর আমাদের শক্তিতে হয়েছে? তিনি কৃপা করে শক্তি দিয়েছিলেন, তাতেই চিনেছি। যাকে যতটুকু শক্তি দেন সে ততটুকুই চিনবে। এই চেনার শেষ নেই—অনন্ত, অনন্ত। অবতার মানে সান্তের ভিতর অনন্ত—সান্তানন্ত। তবে একটু জানলেই কাজ হয়ে গেল। বলেছিলেন ঃ "গঙ্গা একস্থানে ছুঁলেই গঙ্গাস্পর্শ হলো।" তাতেই কাজ হয়ে গেল ভক্তদের। বলেছিলেন ঃ "অবতার যেন গরুর বাঁট।" বাঁট দিয়ে দুধ আসে। সেই দুধে জীবনধারণ হয়। অর্থাৎ অবতারের কথায় বিশ্বাস হলেই হয়ে গেল। আবার বলেছিলেন ঃ "অবতার যেন দেওয়ালের ভিতর বৃহৎ ছিদ্র।" এই ছিদ্র দিয়ে ওপারের, অর্থাৎ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখা যায়। বলেছিলেন ঃ "অবতার অচেনা গাছ।" কেউ চিনতে পারে না, না চেনালে। বলেছিলেন ঃ "অবতার যেন বাউল। দলবল নিয়ে এল, গান গেয়ে চলে গেল।"

কতরকমে নিজেকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু চেনবার যো নেই, না চেনালে। কি করে মানুষ চেনে বল না! শত আবরণে ঢেকে এসেছেন। দরিদ্র, ছয়টাকা মাইনের পূজারী, প্রায় নিরক্ষর, আবার উন্মাদ, কখনো উলঙ্গ। এর ভিতর দিয়ে কার সাধ্য তাঁকে চেনে, তিনি না চেনালে? ভক্তদের এক-একবার স্বরূপ দেখাতেন। তারা স্তম্ভিত হয়ে ভাবত, একি—দেব কি মানব? তাই তো দেবেন মজুমদার মশায় গানে বলেছেন ঃ "কে তোমারে জানতে পারে তুমি না জানালে পরে।"

[তিনি] মানুষ তো একেবারে মানুষ, ষোল আনা মানুষ! শোক, তাপ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভাদি মানুষের সব নিয়ে এসেছেন। অবশ্য পয়েন্ট ওয়ানে (·1-এ) এসব—মানুষ। আর নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন (99·9)—ঈশ্বর।

আবার মানুষের মতো স্নেহ, ভালবাসা, রোগযন্ত্রণা, ক্রন্দন—এসব নিয়ে এসেছেন। কেন এসব নিয়ে আসা? ভক্তরা তাহলে ভয় পাবে না। ভাববে, তিনি আমাদেরই একজন। কি আশ্চর্য। পাঁচবছর তাঁর সঙ্গে রইলাম, কিন্তু একদিনের জন্যও জানতে দেননি তিনি আমাদের গুরু। Equal term-এ (সমভাবে) ব্যবহার করতেন। কেন এরূপ ব্যবহার করতেন? ভয়ে যদি পালিয়ে যায়, তাই এই সমব্যবহার।

এদিকে তো এই মানুষ। আবার মুহুর্মুহুঃ সমাধি, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এ দুটি বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় এক ভগবানেই সম্ভব—মানুষে নয়। তা যেরূপই হোক। এক-আধবার সমাধি হলেই হেউঢেউ হয়ে যায় মানুষ, দেশজুড়ে নাম রটে যায়! আর এ যেন সমাধির তুফান! যত রকমের সমাধির কথা শাস্ত্রে আছে সেসবই ঠাকুরের হয়েছে। সকল বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ অবতারের জীবন।...

ঠাকুরের সব কথা প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা—বইপড়া কথা নয়। সাক্ষাৎ দর্শন। যা দেখলেন তাই বললেন, শোনা কথা নয়। বিচারের কথা নয়। যখন দেখলেন, তখনি বললেন। তাঁর সব অপরোক্ষ। একেই 'বেদ' বলে। (ঐ, পৃঃ ১২৭-১২৯)

গুরুকে চেনা যায় না। তবে অবতারাদি এলে অন্যরকম। অবতার নিজেকে চিনিয়ে দেন তাদের, যাদের দ্বারা তাঁর কাজ করাবেন। ঠাকুর নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছেন আমাদের, যাঁরা তাঁর কাজ করছেন। নইলে মন-প্রাণ-জীবন দিয়ে কাজ করবে কেন?

ঠাকুর আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন ঃ যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—বাক্যমনের অতীত, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মশক্তি। তিনিই মা কালী।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়—বুঝিয়ে দাও বলে। তাহলে তিনিই হয়তো বুঝিয়ে দেবেন। গুরুকে বোঝা যায় না। Superman-কে (অতিমানবকে) কেমন করে বোঝা যাবে? একজন ছাদে আছে। আরেকজন সিঁড়িতে আছে। সিঁড়ির লোক ছাদের লোককে কি করে বুঝবে? গুরুকে চেনা যায় না।

নরেন্দ্রের বিয়ের কথা হচ্ছে আর. মিত্তিরের মেয়ের সঙ্গে। ভক্তরা (শ্রীম) একথা ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর জবাব দিলেন ঃ "হ্যাঁ, ও একটা বড় দলপতি-টতি কিছু হবে।" এই পর্যন্ত। অমনি ওকথা উলটে দিয়ে অন্য কথা পাড়লেন। ওকথা আরো হলে অন্য কথা—বিষয়ের কথার স্রোত বেড়ে যেত। আর. মিত্তির আমাদের প্রতিবেশী, তাঁর টাকাকড়ি, তিনি ব্যারিস্টার—এইসব কত কথা এসে পড়ত! সব চাপা দিলেন।

ভক্তদের, যাঁরা তাঁকে খুব ভালবাসেন, তাঁদের মধ্যে অন্য সব কথা হচ্ছে শুনতে পেলে ঠাকুর মাঝে মাঝে খুব ধমক দিতেন। (সহাস্যে) ঠাকুর চড়টড়ও দিতেন। আমায় একটি চড় দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব আবার লাথি মারতেন। জগদানন্দকে একদিন লাথি মারলেন রাস্তায়। তারপর জগন্নাথ দেখতে গেলেন। বৈষ্ণবেরা একে বলে 'প্রহার-প্রসাদ' (হাস্য)। এ কি লাথি? যে-পা সকলে ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করে তার আঘাত কি লাথি? কৃপা, কৃপা। (১৩শ ভাগ, পৃঃ ৫২-৫৩)

কি আশ্চর্য। একদিনও দেখলাম না (ঠাকুর) কাউকে কিছু করতে বারণ করছেন। যে যা করতে চায় তাই করছে। তাঁকে কোনটাই বারণ করতে দেখলাম না। একদিন গোপাল-দাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ওদের (ছোকরা ভক্তদের) রাঙিয়ে (গেরুয়া পরিয়ে) এনে নমস্কার করালেন। ঠাকুর কিছুই বললেন না। তিনি জানতেন কিনা, এতে আবার একটা উপাধি বাড়বে। এদিকে (বাইরে) যতখানি হবে, ওদিকে (ভিতরের দিকে) ততখানি আসল জিনিস টান পড়ে যাবে। তাই তিনি এমন কিছু ঢুকিয়ে দিতেন, যাতে ভিতর ফাঁক করে দিল। এতে (সংসারে) আর ভাল লাগে না। (ঐ, পৃঃ ৫৬)

অপরের সংস্কার বদলাতে চাও তো আগে নিজের বদলাও। নিজের ভিতর রয়েছে ভোগবাসনা। তোমার কথা শুনবে কে?

মনে করছ নিষ্কাম করছ, কিন্তু হয়ে পড়ছে সকাম। সকাম ভাব যে তোমার ভিতর পাহাড় হয়ে আছে।... ভগবানের আদেশ পেলে তবে নাম শোনাবার অধিকারী হয়। ঠাকুর ভক্তদের আদেশ দিয়েছিলেন, তাই তাদের কথা লোক শোনে। কেউ কেউ সাধু হচ্ছে, কেউ দাসীবৎ গৃহী থাকতে চেষ্টা করছে।

তিনি ইচ্ছা করলে এই প্রকৃতিও বদলে দিতে পারেন। তবে

সচরাচর দেন না। ঠাকুর বলেছিলেন, মা ইচ্ছা করলে আমড়া গাছে বোম্বাই আম ফলাতে পারেন। তবে বেশি করেন না। কেন? না, বোম্বাই আমগাছ যে অনেক রয়েছে!

যদি কেউ প্রকৃতি বদলাতে চায় তবে কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে তাঁর শরণ নিক—শিশুর মতো। তবে হয়। তাঁর ইচ্ছায় সব সম্ভব। (ঐ, পৃঃ ৫৭)

(ঠাকুর) হাজরাকে কত ভালবাসতেন। কত বছর ছিলেন ঠাকুরের কাছে। শেষটায় বেশ গেছেন। "এই তাঁর (ঠাকুরের) রূপ দেখছি"—বলতে বলতে দেহ গেল। লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে, ঠাকুর বলতেন।... কেমন একটা ভাব হয়ে গিয়েছিল ওঁর কাছে এতকাল ছিলেন বলে। বেশ ছিলেন। মাঝে মাঝে এক-একবার গোলমাল করতেন, তর্ক-টর্ক। ঠাকুর তখন বলতেন, হাজরার একটা রোগ আছে। (ঐ, পৃঃ ৭৩)

সাধুদের সেবা করা আর প্রণাম করা—আমরা কি জানতাম এইসব? ঠাকুর জোর করে করিয়ে নিতেন। একদিন বললেন ঃ "ষোলটা কাঁচাগোল্লা আনবে।" আনা হলে নিজে ছুঁয়ে নিবেদন করলেন। তারপর বললেন ঃ "সবাইকে দাও।"

ফলহারিণী পুজোর প্রসাদ চেয়ে নিতেন। দিতে দেরি হলে বলতেন ঃ "কই গো, আমাদের প্রসাদ যে এখনো এল না!" ভক্তরা তাই দেখে বলতেন ঃ "আপনিও দেখছি অন্য বামুনদের মতো চেয়ে আনেন!" ঠাকুর বলতেন ঃ "এর মানে আছে। যারা এখানে আসে তারা ঠিক ঠিক ভক্ত। তারা খেলে, তবে যারা এত টাকা খরচ করে এই দেবালয় করেছে তাদের অর্থের সদ্ব্যবহার হবে।" তাই এইসব তাঁর কাছে শিখেছিলাম। তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। কীট-পতঙ্গ এসবকে খাওয়ালে তাঁকেই খাওয়ানো হয়। তবে সাধুদের ভিতর তাঁর প্রকাশ বেশি। তাই তাঁদের খাওয়ালে তাঁকেই খাওয়ানো হয়। গীতায় (৭।১৮) আছে—"জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্"—জ্ঞানী আমার আত্মা, মানে স্বরূপ।

(একজন ভক্ত—ঠাকুর তো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলেন। সাধুকে তো খাওয়াননি তখন, সাধুর ভিতর নারায়ণ যদি বেশি প্রকাশ হয়?)

সে এক অবস্থায় খাইয়েছিলেন। তখন তিনি সবই ঈশ্বর দেখেছিলেন। কিন্তু জগতের দিকে মন যখন তাঁর নামে, তখন সাধু ভক্তদের খাওয়াতেন। চৌদ্দবছর ধরে সাধুসেবার জন্য স্বতন্ত্র ভাণ্ডার করেছিলেন মথুরবাবুকে বলে।...

আমরা অর্থ দিলাম। সাধুরা আটা, চাল, ঘি ইত্যাদি কিনে এনে রাঁধলেন। ঠাকুরও তাঁদের সঙ্গে বসে খেলেন।

আরেকবার নরেন্দ্রাদি ভক্তরা চাঁদা তুলে পঞ্চবটীতে রান্না করলে ডাল ভাত। সামান্য আয়োজন। সকলেই বসেছে খেতে। ঠাকুরও বসেছেন। তখন একটি সাধুবেশধারী লোকও গিয়ে বসল। কিন্তু ঠাকুর তাকে ঐ পঙ্গতে বসতে দিলেন না। বললেন ঃ "এখানে আঁটবে না।" তাকে আলাদা দেওয়ালেন।

কেন? না, এঁদের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি। এঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ। জগদম্বাকে বিশ-বাইশ বছর ডেকে এঁদের এনেছেন। এঁরা জগদম্বার বিশিষ্ট লোক। শুদ্ধচিত্ত ভক্ত। এঁদের দিয়ে জগতে তাঁর ভাব প্রচার করবেন। (ঐ, পৃঃ ১০০-১০২)

ভাগ্যিস আমরা ঠাকুরকে দেখেছিলাম! তাই একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যাচ্ছে। কি করে তিনি ভক্তদের অত কর্মফল তাঁর দেহে ভোগ করলেন অম্লান বদনে? দেহের তো অত কষ্ট, যাকে যমযন্ত্রণা বলে, তেমনি কষ্ট। কিন্তু এরই ভিতর দেহ ছেড়ে মন ব্রহ্মে বিলীন। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়! দেহে প্রাণ নেই। অত বড় ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার এই দৃশ্য দেখে অবাক। একটু পরই নিচে নেমে এসে ঠাকুর মুচকি হেসে বলছেন ঃ "কি ডাক্তার, তোমার সায়েন্সে বুঝি একথা নেই?"

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ—এই চারটি ভাগ আছে শরীরে। স্থূলেরই অসুখ। মনটি এমনি তৈরি, স্থূল থেকে ফস করে একেবারে মহাকারণে নিয়ে যান। সেখানে পরমানন্দ। ওতে মনটাকে রসিয়ে রঙিয়ে নিচে নিয়ে এলেন। 'উঃ উঃ' করছেন একটু পর, কিন্তু মনে দুঃখের অভিনিবেশ নেই। প্রায় যুগপৎ দুঃখবোধ ও সমাধির আনন্দ। এ মানুষে সম্ভব নয়। তবুও ঐসব ঠাকুরের আচরণ চিন্তা করলে সংসারের দারুণ দুঃখ সহ্য করা সম্ভব হয়। দুটি contradictory (বিরুদ্ধ) ভাব যুগপৎ অবতারেই সম্ভব। চোখে দেখেছি যে—একসঙ্গে আলো ও আঁধার। রোগযন্ত্রণা ও পরমানন্দ! (ঐ, পৃঃ ১৬৫)

ঠাকুর বলতেন, আগে অষ্টম-কষ্টমগুলো কাটুক! যেসব ভক্ত একটু ধ্যানজপ করত, ঠাকুর তাদের প্রশংসা করতেন না। হাবাতে ভক্ত আছে কিনা! তারা এইসব কথা আবার রিপোর্ট করবে। তাহলে সর্বনাশ হবে। প্রশংসায় লোকের সর্বনাশ হয়। ... ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "একটা পাঁঠার বাচ্চা রাসের ফুল খেতে চাইছিল। রাস হয় কার্তিক মাসে। তখন ফুল দিয়ে রাসচক্র খুব সাজায়। পাঁঠাদের মা তখন বললে, দাঁড়াও আগে অষ্টম-কষ্টমগুলি কাটুক! রাসের আগে হয় দুর্গাপূজা, আশ্বিন মাসে। তখন অষ্টমী ও নবমীতে খুব পাঁঠাবলি হয়। এই ফাঁড়াটা আগে পার হোক। খেতে হয় পরে খাবে।" 'অষ্টম-কষ্টম' মানে, অষ্টমী-নবমী আদি তিথি। (ঐ, পৃঃ ১৯৬) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১০ম, ১১শ, ১২শ এবং ১৩শ ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

পরিমার্জনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

"মন চল নিজ নিকেতনে..."—গানটি খুব পুরনো। নরেন্দ্রনাথ, ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণকে এই গান বহুবার শুনিয়েছেন। এই গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ কতবার সমাধিমগ্ন হয়েছেন! সেই দৃশ্যগুলি গানটি শুনতে শুনতে মনে পড়ে যায়। গানটি বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। ঠাকুরের স্বভাবতই বৈরাগ্যপ্রবণ মন—যেন ঠাকুরেরই ভাষায়—শুকনো দেশলাই। একটু কিছু উদ্দীপক এলেই তা দপ করে জ্বলে ওঠে। তেমনি এই গানটি শুনে তাঁর তীব্র বৈরাগ্য জ্বলে উঠত। গানটিতে বলা হচ্ছে—এই সংসারটা বিদেশ। এখানে আমরা এসেছি বিদেশী হিসেবে দু-চার দিনের জন্য। আমাদের স্থায়ী বাসস্থান অন্যত্র। সেই নিজ নিকেতনে, নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য মনকে বোঝানো হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে, এখানে তুমি এই দুদিনের হাসিকান্নার ভিতরে আত্মভোলা হয়ে রয়েছ। নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, সে-কথা মনে কর। সংসার-বিদেশে দুদিনের জন্য এসেছি। আমাদের এখানে স্থায়ী বসবাসের জায়গা নয়। স্থায়ী বসবাস যেখানে সেখানে ফিরে যেতে পারলেই আমাদের শান্তি। যতদিন এই সংসারে থাকব ততদিন এই জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্নার, আসা-যাওয়ার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। স্থায়ী শান্তি এখানে সম্ভব নয়।

কথায় কথায় আমরা শুনি—সকলেই বলে বড় অশান্তি! আশ্চর্য কথা যে, যার সাথে কথা বলছি সেই বলছে বড় অশান্তি! দু-চারদিন হয়তো কেউ এই অশান্তির হাত থেকে রেহাই পায়, কিন্তু তার আগে-পরে এই অশান্তিতেই জ্বলে। তাসত্ত্বেও যে সাময়িক ছিঁটেফোঁটা আনন্দ আমরা সংসারে পাই তাতেই এত ভুলে থাকি যে, আগে-পরে যে দারুণ অশান্তি সেকথা আর মনে পড়ে না। তাই বলছে—এখানে এসে মানুষ আপনজনকে ভুলে থাকছে। কেন? আপনজন কে? সে-ই আপনজন—যাঁর পাদপদ্মের খোঁজে আমরা এখানে এসেছি, আবার যাঁর পাদপদ্মে ফিরে গেলে তবে আমাদের চির বিশ্রাম। এই কথাটি গানেতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি সংসারকে বিদেশ বলে মনে করি? আমরা যারা গানটি গাই বা শুনি, আমরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মনটাকে একটু নাড়াচাড়া করে দেখলে বুঝতে পারব, সংসার যতই নশ্বর হোক, যতই ক্ষণিকের হোক, যতই নানা দুঃখের সংমিশ্রণ এখানে থাকুক, তবু একেই আমরা আমাদের স্থায়ী নিবাসের স্থান বলে ধরে নিয়েছি এবং এর ভিতরেই থাকছি। থাকতে চাই। কেউ এখান থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই না। দুঃখের অনুভূতি হলে তবে নিষ্কৃতির কথা আসে।

ঠাকুর চাররকম জীবের কথা বলেছেন। তার মধ্যে বদ্ধজীব যারা, তারা সংসারের ভিতরে বদ্ধ হয়ে থাকে। এই দুঃখ-কষ্টের ভিতরে থেকে সে মনে করে—আমি বেশ আছি, এখানেই আনন্দ পাব। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, জেলে জাল ফেলেছে। সেই জালের ভিতরে মাছ পড়েছে। মাছটা সেই জাল মুখে করে কাদার ভিতরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ভাবছে, আমি বেশ আছি! জানে না, এক্ষুণি জেলে হৈহৈ করে জাল টেনে তুলবে এবং ডাঙায় উঠে তার প্রাণ যাবে। এই বদ্ধজীবের অবস্থা। বলতে গেলে, আমরা সকলেই অল্পবিস্তর এই বদ্ধজীবের পর্যায়ে পড়ি। অল্পবিস্তর বলছি এজন্য যে, কারো কারো অন্তত বুদ্ধির সাহায্যে এই বোধ হয়েছে—না, এখানে চিরকাল থাকা যায় না। কিন্তু তাসত্ত্বেও বুদ্ধির সাহায্যে বুঝলেও প্রাণ কিন্তু একথায় সাড়া দেয় না। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম প্রশ্ন করেছিলেন, এ-জগতে আশ্চর্য কি? যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন ঃ

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।।"

(বনপর্ব, ২৬৭।৮৩)

—এই যে লোকে মৃত্যুকে বরণ করছে, আর যারা অবশিষ্ট আছে তারা মনে করছে, আমরা চিরকাল স্থায়ী হয়ে বেঁচে থাকব। এর চেয়ে আশ্চর্য কি আছে?

এজগতে কে না জানে, আমাদের এখানে চিরকাল থাকবার জায়গা নয়? আমরা হয়তো হাসিকান্নার ভিতরে দু-চারদিন কাটালাম, তারপর এসব ছেড়ে যেতে হবে। আমাদের প্রত্যেককে এসব ছেড়ে যেতে হবে। অথবা যাদের নিয়ে আমাদের এই ঘোর সংসার, তারাও প্রত্যেকেই এক এক করে আমাদের ছেড়ে যাবে। এ যে অনিবার্য। একথা কেউ বোঝে না। ভাল করে বিচার করে যে বুঝতে হবে তা নয়, এমনিই বুঝতে পারে একথাটি অমোঘ সত্য। কিন্তু কথাটি কি আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে? আমরা কি ভাবি একথাটি? ঠাকুর একটি ঘটনা দিয়ে বিষয়টি বোঝাতেন। হৃদয় একবার একটি এঁড়ে বাছুর এনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ঘাস-টাস খাচ্ছে। ঠাকুর এসে দেখে বললেন ঃ "আরে! তুই এই বাছুরটাকে আবার কোথা থেকে নিয়ে এলি?" হৃদয় বলল ঃ "মামা, এটা বড় হবে, তারপর একে দেশে পাঠিয়ে দেব, চাষ করবে।" ঠাকুর বলছেন ঃ "শুনে আমার মাথায় যেন একটা লাঠির বাড়ি পড়ল! আমি অবাক হলুম, কোথায় দেশ! কতদূরে! এই এতটুকু বাছুর, সেটা বড় হবে, তারপর দেশে যাবে। গিয়ে

চাষ করবে। এতদূর আশা।" কিন্তু এটি আশ্চর্য কথা যে, আমাদের সকলেরই এই অবস্থা। আমরা আকাশকুসুম চিন্তা করে নানারকম কল্পনার জাল বুনছি। কিভাবে আমরা ভবিষ্যৎটাকে সম্পূর্ণ সুখের আবাস করে তুলব—এই কল্পনাতে মশগুল হয়ে আছি। এটি হচ্ছে, ঠাকুরের ভাষায়, বদ্ধজীবের লক্ষণ। জানে না যে, জালের মধ্যে পড়ে আছে, যখন ইচ্ছে হবে জেলে হৈহৈ করে টেনে তুলবে। আর তারপর মৃত্যু। আমরা এ-সত্যকে ভুলে আছি। আপনার জন যে, তাকে আমরা ভুলে আছি! যেটা আপনার স্থান, সেটা ভুলে আছি! এখানে দু-চারদিনের জন্য এসে স্থির হয়ে আছি, আর কল্পনা করছি—সংসারের জাল পেতে আমরা যে আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে আছি, তা চিরকাল এইরকমটাই থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে, একটি ছোট্ট মেয়ে বলছে 'যেতে নাহি দিব'—যেতে দেবে না। কিন্তু কেউ কি আটকাতে পারে?

ভাগবতে একটি বর্ণনা দেওয়া আছে। এই সংসারের অমোঘ পরিণামের কথা। নদীর স্রোতে দুটো শব ভেসে যাচ্ছে। স্রোতে ভাসতে ভাসতে কখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তারপর আর একযোগ হতে পারল না। তেমনি আমরাও আশা করে আছি—আমরা চিরকাল একরকম হয়ে থাকব। শুধু এ-জন্মে নয়, জন্মে জন্মে। মানুষের কল্পনা—জন্মে জন্মে আমরা এমন পরিবেশ নিয়ে এইরকম করেই থাকব। এর চেয়ে শিশুর কল্পনা আর কি হতে পারে? মানুষ বিচার করলে দেখবে যে, এসব কিছুই না। প্রথম কথা হচ্ছে, যাদের আমরা কল্পনা করছি আপনার বলে, যখন এই দেহটা পালটে ফেলা হবে তখন আর তাদের সঙ্গে পরিচয় থাকবে কি? পরিচয় তো এই দেহটা নিয়ে। আজ যদি এই দেহটা প্রাণহীন হয়ে যায় তাহলে তা বিভীষিকার কারণ হবে। আদরের বস্তু হবে না। তবু আমরা দেহটা নিয়েই এত পূজা করি, এত আদর-যত্ন করি। চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে চাই। বিচার করলে তো কিছুই থাকে না। আর যদি বিচার কেউ করতে চায় তাহলে এসব ভাল ভাল কথা বলতে নেই। ছেলেবেলা থেকে আমরা এরকমই শুনেছি। মৃত্যুর কথা অমঙ্গলের কথা! কিন্তু মৃত্যু মহা মঙ্গলময়, কারণ তা বারে বারে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই জগৎটা নিত্য নয়। কিন্তু একথা আমরা ভুলে যাই।

গীতায় (৯।৩৩) আছে—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"—এই জগৎটা অনিত্য এবং দুঃখময়। এখানে এসে আমার ভজনা কর। কিন্তু জগৎকে যদি অনিত্য বা দুঃখময় বলে না বুঝি, তাহলে এই চিন্তা আমাদের মনে কখনো উদিত হবে না। দুঃখ আসে যখন, তখন ভাবি—আরেকটু বুদ্ধি করলে দুঃখদশা এড়ানো যেতে পারে। কৌশল করে দুঃখ যাতে এড়ানো যায় তার নানারকম চেষ্টা করি আর মনে করি, এইভাবে হয়তো আমরা কালকে ফাঁকি দিতে পারব! কিন্তু কালকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমরা যে কালের হাতে খুঁটিবাঁধা রয়েছি। যখনি দরকার হবে টান দেবে এবং চলে যেতে হবে। প্রত্যেকের এই অবস্থা। তাও ভুলে থাকি। এইজন্য যুধিষ্ঠির বলেছেন যে, এর চেয়ে আশ্চর্য কথা কী আছে!

কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা সংসারে এসে এইরকম যদি বৈরাগ্যের কথা ভাবি তাহলে সংসারটা চলবে কি করে? এটা একটা চিন্তার কথা। বৈরাগ্যের কথা হয়তো সত্যি হতে পারে, কিন্তু কথাগুলো এত নাড়াচাড়া করার কি দরকার? ভুলে যখন থাকি, তখন সেটাই ভাল।

বুদ্ধদেবের জীবনের একটি ঘটনা আছে। তিনি চিন্তাশীল ছিলেন। তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর গভীর ধ্যানপরায়ণতা ছিল। তাঁর কোষ্ঠী দেখে কেউ বলেছিলেন, এ-ছেলেটি হয় রাজচক্রবর্তী হবে, আর না হলে সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। পিতা শুদ্ধোধন ভাবলেন, রাজচক্রবর্তী হলেই তো ভাল। রাজার ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তো মুশকিলের কথা। এখন এর কী প্রতিকার আছে? একজন বলেছিলেন, প্রতিকার একটা আছে। এঁর চোখে যেন কখনো জরা, ব্যাধি, মৃত্যু না পড়ে। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু—এই তিনটি থেকে একে সরিয়ে রাখতে হবে। এই তিনটি যদি চোখে পড়ে তাহলে তাঁর বৈরাগ্যপ্রবণ মনে বৈরাগ্য জ্বলে উঠবে। আর এঁকে সংসারে রাখা যাবে না।

রাজা শুদ্ধোধন চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। আনন্দ-নিকেতন তৈরি করলেন, তার ভিতরে ছেলেকে রাখলেন। ছেলে যাতে সবসময় আনন্দে মগ্ন থাকে তার জন্য নাচ, গান, বাজনা আনন্দের নানারকম ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ইনি তো আর সাধারণ মানুষ নন, এঁর মন এসবের ভিতরে থেকেও তাতে মগ্ন হয়ে যায়নি। তিনি বিচার হারাননি। সদাসর্বদা চিন্তা করতেন। একদিন তাঁর মনে হলো, এই যে আমি প্রাসাদের ভিতরে বন্দী হয়ে আছি, প্রাসাদের বাইরের জগৎটা তো কিছুই দেখা হলো না! কাজেই একদিন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—আমি শহরে বেড়াতে যাব। শুদ্ধোধনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বাইরে গেলে এরকম পরিবেশে তো রাখা যাবে না। নানা দৃশ্য তার চোখে পড়বে। তাই রাজা হুকুম দিলেন, ছেলেটি যে-পথে যাবে সে-পথে যেন কোন রোগী না থাকে, কোন জরাজীর্ণ ব্যক্তি না থাকে, কোন মৃত্যুর দৃশ্য যেন সেখানে চোখে না পড়ে। এইভাবে খুব আনন্দ উৎসাহের সঙ্গে ছেলে বেড়াতে যাবে। রাজার ছেলে প্রাসাদে যেমন আনন্দের পরিবেশে থাকেন, তেমনি যখন রাস্তা দিয়ে যাবেন তখনো যেন সেই আনন্দের পরিবেশই থাকে।

এদিকে দেবতারা রাজার সঙ্কল্পকে ব্যর্থ করার জন্য একটি রুগ্ন ব্যক্তিকে বুদ্ধদেবের যাত্রাপথে রেখে দিলেন। সেই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখে বুদ্ধদেব অবাক হয়ে বললেন: "এ কে? এরকম কাতরোক্তি করছে কেন? এর কী হয়েছে?" তখন সারথি বলল: "ওর অসুখ হয়েছে। রোগ হয়েছে।"—"রোগ হয়েছে? ওর একারই হয়েছে না সকলের হয়?"—"সকলেরই হয়।"—"সকলেরই হয়? আমারও হবে?"—"আমার মা, বাবা ওঁদেরও হবে?"—"হ্যাঁ সবারই হবে।" বুদ্ধদেব বললেন: "আর যেতে হবে না, চল ফিরে যাই।" চিন্তামগ্ন হয়ে তিনি ফিরলেন। ভাবতে লাগলেন, এই নাচ, গান, আনন্দ এইসব দেহ

রুগ্ন হলে তো আর আস্বাদন করা যায় না! তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। এভাবে কিছুদিন গেল।

আবার একবার তাঁর ইচ্ছা হলো শহর দেখতে যাবেন। এবার অন্য পথ ঠিক করা হলো। সে-পথেও খুব সাবধানে ব্যবস্থা করা হলো যাতে এরকম দৃশ্য চোখে না পড়ে। যাচ্ছেন রাজকুমার। যেতে যেতে পথে দেখলেন, একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ লাঠি হাতে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে। দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "এ কী?" সারথি বললঃ "এ জরা অবস্থা। এর বয়স হয়েছে, শরীর অসুস্থ হয়েছে।"—"সকলেরই হয়?"—"হ্যাঁ, সকলেরই হয়।"—"তবে আর যেতে হবে না, চল ফিরে যাই।" বুদ্ধদেব আরো চিন্তামগ্ন হলেন।

আবার একদিন যাওয়া ঠিক হলো। সেবারও যাতে এসব কুদৃশ্য রাজকুমারের চোখে না পড়ে তার ব্যবস্থা হলো। সেদিন যেতে যেতে বুদ্ধদেব দেখলেন, রাস্তায় একটি লোক মরে শুয়ে আছে। সারথিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "এই লোকটি নড়ছে না, চড়ছে না। কি হয়েছে?" সারথি বললঃ "মহারাজ এ মরে গেছে।"—"মরে গেছে?"—"হ্যাঁ, দেহ রয়েছে কিন্তু মৃত। এর প্রাণ নেই।"—"সকলেরই এরকম হয়?"—"হ্যাঁ, সকলেরই এরকম হয়।" আর দেখা হলো না। বুদ্ধদেব ফিরে গেলেন। তারপরে আরেকদিন তিনি রাস্তায় গিয়ে দেখতে পেলেন এক সন্ন্যাসীকে। পরিধানে পরিত্যক্ত বস্ত্র, কোন সাজপোশাক নেই, কোন ঐশ্বর্য নেই। নিরাভরণ ব্যক্তি, কিন্তু মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি পরিপূর্ণ। বুদ্ধদেব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ভাবলেন, সংসারকে ত্যাগ করেছেন ইনি, তাই তাঁর মনে আনন্দ। আনন্দেতে বিভোর হয়ে আছে মন। 'আত্মারামো'। নিজের আনন্দেতে পরিপূর্ণ। দেখা হলো। রাজকুমারের মনে সঙ্কল্প স্থির হলো। যে-সংসারে মানুষের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি নেই, সেই সংসারে কি জন্য মানুষ সুখের আশায় থাকে? সন্ন্যাসীর কথা তিনি বারবার মনে করলেন। এইভাবে তিনি সর্বত্যাগী জীবনে সুখের সন্ধান পেলেন। তারপর তিনি সঙ্কল্প করলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে।

আমরা হয়তো ভাবব, বুদ্ধদেব রাজার ছেলে। তিনি এত নির্বোধ নন। লেখাপড়া করেছেন। শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁর কি জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি—এগুলি জানা ছিল না? জানা হয়তো ছিল। কিন্তু কিছু কিছু দৃশ্য যখন আমাদের চোখের সামনে আসে তখন মনটা এমনভাবে অভিভূত হয় যে, একটা নতুন দৃষ্টি যেন খুলে যায়। সেইজন্য তাঁর চিন্তাশীল মনে সেই দৃশ্যগুলি এমন আঘাত করেছিল যে, তাঁর জীবনে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। রাজার ছেলে সর্বস্ব ত্যাগ করে তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে গেলেন। মানুষের এই যে দুঃখ, অপার যে দুঃখ তার হাত থেকে নিষ্কৃতি আছে কিনা! থাকলে তার উপায়টি আবিষ্কার করতে হবে। তাঁর সমস্ত জীবন দুঃখ পরিহারের উপায় অন্বেষণে ব্যয়িত হলো। বের করলেন উপায়।

আমরা কি কখনো এরকমভাবে বিচার করি, মনের ভিতরে কি এই নিয়ে কখনো চিন্তা করি? আমরা এই সংসারটাকে স্থায়ী ধরে নিয়ে নিজের আত্মীয়-পরিজনদের টেনে রাখার চেষ্টা করি। কতরকমে চেষ্টা করি। কিন্তু যখন নির্জনে থাকি তখন মনে হয় বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনটা যেন উদাস হয়ে যাচ্ছে। তখনি তো বাপ-মা বলে—আরে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দে, মনটা ভারী করে দে! সেই যে মনকে 'ভারী' করে দেওয়া হলো, তারপর সারাজীবন সংসারের চিন্তাতেই বিব্রত। এই তো জীবন! এইরকম করে তো আমরা চলেছি। কিন্তু যদি সংসারকে দেখে বিচার করি এবং তারপর তার ভিতরে যা সত্য আছে তা নির্ণয় করতে পারি, তাহলেই আমরা ভগবানের কথা বুঝতে পারব। বুঝতে পারব, জগৎটা অনিত্য এবং দুঃখময়। সুখ ছিঁটেফোঁটা যেগুলি আছে, সেগুলি যেন দুঃখকে আরো বৃহৎ করে পাঠায়! সেই দুঃখ এবং উদ্বেগে আমরা আরো বেশি করে অভিভূত হয়ে যাই। এই তো সংসার! আর এই দুঃখকে চিনে নেওয়া, নির্দ্বিধায় তাকে স্বীকার করে নেওয়া—এটি হচ্ছে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায়। কারণ, দুঃখকে এড়িয়ে যেতে কেউ পারে না।

ঠাকুর বলেছেন, এ-সংসার দুঃখের বটে, কিন্তু সংসারে দুঃখের ভিতরে এসে মানুষকে কেবল হাবুডুবু খেতে হবে—এমন কোন কথা নেই। রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—"এই সংসার ধোঁকার টাটি।" তার বিপরীতে আজু গোঁসাই গেয়েছিলেন—"এ সংসার মজার কুটি।" মজার কুটি ভেবে এখানে বাস করা যায় কি? এক হিসেবে যায়। সেই আনন্দময় যিনি, তাঁকে ধরে থাকলে তখন সংসারের দুঃখের ভিতরেও মানুষ নিবৃত্ত হয়ে থাকতে পারে। তাই ঠাকুরের কথা—এক হাতে ভগবানকে ধরে আরেক হাতে সংসারের কাজ কর। সংসারকে তিনি নস্যাৎ করে দিতে বলেননি। যদি বলতেন তাহলে তাঁর উপদেশ এক-আধজন হয়তো গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু জনগণের অধিকাংশের কাছে সেই উপদেশ বৃথা হতো। ঠাকুর এসেছেন সকলের জন্য। সংসারীদের জন্যও এসেছেন তিনি। তাই সকলকে তিনি সংসার ত্যাগ করবার জন্য প্ররোচিত করেননি। বলেছেন, সংসারে থাকলে দোষ কি? দোষ নেই, যদি ভগবানে ভক্তি অর্জন করে মানুষ সংসারে থাকে। বলেছেনঃ "সংসারে আছ তাতে দোষ কি আছে? এক হাতে তাঁকে ধরে আরেক হাতে সংসার কর।" কথাটি খুব ভাল করে অনুধাবন করার মতো। কথাটি বিপরীত করে বললে হবে না, অর্থাৎ সংসার কর, আরেক হাতে তাঁকে ধর—একথা তিনি বলেননি। বলেছেন—এক হাতে তাঁকে ধর, আরেক হাতে সংসার কর। তখন সংসার তোমাকে আর ভোলাতে পারবে না। কারণ, যাকে তুমি ধরেছ—তিনি আনন্দময়। সেখানে আর সংসারের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অবকাশ নেই। এই একমাত্র পথ—ভগবানকে ধরে থাকা। একথাই ঠাকুর এখানে বলছেন। ভগবানের সান্নিধ্যই আমাদের 'নিজ নিকেতন'। সেখানেই যেতে হবে আমাদের।* ❑

---

* গত ২৫ জুন ১৯৮৩ বাংলাদেশের সিলেট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত পরম পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন আবেদন

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গোড়ার কথা

জগৎ জুড়ে বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদ্‌রা শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেছেন অসাধারণ ভাষায়। তাঁরা সবাই তাঁর মধ্যে এমন কিছু একটা দেখে অভিভূত হয়ে গেছেন যা একেবারে তাঁরই নিজস্ব, অনন্য। ফরাসী জীবনীকার রোমাঁ রোলাঁ তাঁর গ্রন্থে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে এইভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

"বরেণ্য মহানায়কদের (যাঁদের কথা আমরা পরে বিশ্লেষণ করব) এই যে রাজকীয় শোভাযাত্রা, তার মধ্য থেকে আমি বেছে নিয়েছি দুজন মানুষকে, যাঁরা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তার কারণ, অতুলনীয় একটা আকর্ষণী ক্ষমতা ও আত্মশক্তিসম্পন্ন এই দুজন মনেপ্রাণে বিশ্ব-আত্মার এক অনুপম সুরলহরীকে অনুভব করেছেন। বলতে ইচ্ছে করে, এঁরা সেই অনুপম সুরলহরীর যেন মোৎজার্ট ও বেটোভেন। এঁরা হলেন দেবাদিদেব ও বজ্রধারী দেবরাজ—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।"[১]

রোমাঁ রোলাঁ এইরকম লিখেছিলেন ঃ "splendid symphony of the universal soul"—বিশ্ব-আত্মার অনুপম সুরলহরী। কী চমৎকার করে বলা! পঞ্চাশ বছরের সময়কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটা জীবনযাপন করেছিলেন, যাকে আমরা 'সুতীব্র' বলতে পারি। সেই জীবনে তিনি মানুষের সবরকম আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও প্রার্থনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন। জীববিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলি একজায়গায় দাবি করেছিলেন ঃ

"মানুষের চূড়ান্ত বা প্রধান লক্ষ্য যে একটা মহত্তর পরিপূর্ণতা, সেটা যখন আমরা চিনে নিতে পারব, তখনি মানব-সম্ভাবনার একটা বিজ্ঞানের দরকার হয়ে পড়বে। মানুষের মানসিক বিবর্তনের যে সুদীর্ঘ পথ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে, সে-পথে আমাদের হেঁটে চলতে সাহায্য করবে ঐ মানববিজ্ঞান।"[২]

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত হয়ে থাকা সম্ভাবনাগুলো কী? মানব-সম্ভাবনার এই যে 'বিজ্ঞান'—একেই ভারত তার উপনিষদ্‌গুলির মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছিল। তার দীর্ঘ ইতিহাসের পরবর্তী প্রত্যেক পর্যায়ে এর পরিপুষ্টি হয়েছে বিশাল কিছু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের দীপ্ত জীবনের নক্ষত্র-সমাবেশের মধ্য দিয়ে। সেই প্রদীপ্ত পুরুষদের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে অনুসরণ করে আমাদের কালে যিনি উপস্থিত হয়েছেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কলকাতায় তিনি থেকেছেন! এর রাস্তাঘাট, গলিঘুঁজি তাঁর পবিত্র চরণস্পর্শ লাভ করেছে। তাঁর নিজস্বতা এখানেই যে, ভিতর-ভিতর তিনি অ-সাধারণ, কিন্তু বাইরে একেবারে সাধারণ—বরং কখনো সাধারণের চেয়েও সাধারণ। তাঁর বাইরের সেই সাধারণ ভাব ভেদ করে অন্তরের অসাধারণত্বকে ধরতে গেলে লাগে আধ্যাত্মিকতা ও সৃজনশীলতার অন্তর্ভেদী শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের কথা না ধরলে একমাত্র যে-জীবনীকারের পক্ষে এই মর্মভেদ করা সম্ভব হয়েছিল, তিনি রোমাঁ রোলাঁ। একজায়গায় তিনি লিখছেন ঃ

"যে-মানুষটির ভাবমূর্তি আমি এখানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি, তিনি ছিলেন তিরিশ কোটি মানুষের দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের ঘনীভূত রূপ। যদিও চল্লিশ বছর আগে তিনি দেহ রেখেছেন, তাঁর আত্মা কিন্তু আধুনিক ভারতকে প্রাণময় করে রেখেছে। গান্ধীর মতো তিনি কর্মবীর ছিলেন না। ছিলেন না গোথে বা রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্প-সাহিত্যে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত অসামান্য প্রতিভাও। বাংলার এক সামান্য গ্রাম্য ঘরের ব্রাহ্মণসন্তান তিনি। তাঁর বাইরের জীবনটা ছিল সেকালের রাজনৈতিক-সামাজিক গতিবিধির বাইরে একটা ছোট্ট ফ্রেমে সীমাবদ্ধ। সে-জীবনে বলবার মতো কোন ঘটনাও ছিল না। কিন্তু মানুষের বহু বৈচিত্র্য এবং তার ঈশ্বরভাবনার সুবিশাল ব্যাপ্তির সবটাকে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্জীবন নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে রেখেছিল।"[৩]

ঈশ্বরে অনুরাগ যখন মানবপ্রেমরূপে বয়

ওপরের কথাগুলো হলো একজন মহান সাহিত্য-সমালোচক ও জীবনীকারের অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর লিখেছেন এমন অন্য কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্বের এই দিকটি তুলে ধরেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রথম অংশ কেটেছিল মানব-সমাজ থেকে দূরে, বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ অবস্থায় দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশে। সে-জীবনে ছিল একটা তীব্র ঈশ্বরানুরাগ; ছিল 'জীবন্ত' ধর্মের অনুসন্ধানে একমুখী

১ দ্রঃ Life of Ramakrishna, To my Western Readers, p. 8
২ দ্রঃ Evolution after Darwin, Vol. I, p. 21
৩ Ibid., p. 14

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। বার বছর ধরে সেই অসাধারণ কঠোর সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেল তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ এবং তাঁর নিরন্তর অন্তর্মুখ ভাব। কিন্তু তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অংশে দেখা গেল, তাঁর ঈশ্বরমুখী অনুরাগ একটা মানবমুখী প্রেম ও সহমর্মিতার রূপে বইতে আরম্ভ করল। এই দ্বিতীয় দিকটাতে এমন কিছু আছে যা আরো আকর্ষক; সমগ্র মানবতার কাছে আরো প্রয়োজনীয়। তাঁর জীবনের এই দ্বিতীয় অংশে উন্মোচিত হলো মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা এবং মানুষের সঙ্গ করার তীব্র আকুতি। সেই ভাব এতই তীব্র ছিল যে, পরবর্তী কালে যখন বড় বড় চিন্তাবিদ্, ভক্ত ও কমবয়সী ছেলেরা তাঁর কাছে আসতে শুরু করলেন এবং কোন গান বা কথাবার্তায় সামান্য উদ্দীপন হলেই যখন তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন, তখন তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করতেন ঃ মা, যারা সমাধি চায় তাদের সমাধি দে, আমি কিন্তু মানুষের সঙ্গে কথা বলব। আমাকে শুকনো সাধু করিসনে। মানুষের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এই যে গভীর ভালবাসার প্রকাশ দেখালেন, এখনকার এই আধুনিক যুগের মানুষের কাছে তার বিরাট তাৎপর্য আছে। রোমাঁ রোলাঁ এবিষয়টির বিশেষ উল্লেখ করেছেন এবং একে বলেছেন 'সিনাই পর্বত থেকে নেমে আসা'। ঠিক এর পরের অধ্যায়ের নামকরণ তিনি করেছেন—'মানুষের কাছে প্রত্যাবর্তন'। সেখানে তিনি লিখছেন ঃ

"আমার ফরাসী পাঠকরা—যাঁরা কঠিন জমির ওপর চলাফেরা করতে অভ্যস্ত এবং দীর্ঘকাল কোন আধ্যাত্মিক আগুনের ছেঁকা খাননি, তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই সুদীর্ঘকালের উগ্র যোগসাধনার কথা পড়ে হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন কিংবা চটে যাবেন। আমি বলি, আরেকটু ধৈর্য ধরুন! আমরা নেমে আসব সিনাই পর্বত থেকে; নেমে আসব একেবারে মানুষের মধ্যে।"[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ তাঁর আবেদনের বিশ্বজনীনতা

ধর্মীয় আচার্যদের যেটা থাকে না, শ্রীরামকৃষ্ণের সেটা ছিল—সেটা তাঁর আবেদনের বিশ্বজনীনতা। তাঁর কাছে যাঁরা যেতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন সরল ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ, বড় বড় বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তা ও ধর্মজগতের বিরাট নেতারা, যেমন কেশবচন্দ্র সেন। আরো যাঁরা যেতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরা, যেমন, কলকাতার 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। যেতেন স্কুল-কলেজের অনেক ছাত্র, যাঁদের অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ কাউকে ফেরাননি, সবাইকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সবাই তাঁর সঙ্গলাভে আনন্দলাভ করেছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পড়ে দেখবেন, মহান এই গ্রন্থটির পাতায় পাতায় কত বিভিন্ন রকমের মানুষ সমবেত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আকর্ষণ করে এনেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের চৌম্বক ব্যক্তিত্ব। তিনি কাউকে তিরস্কার করে প্রত্যাখ্যান করেননি—সকলকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এখন কথা হলো, এই সর্বাঙ্গীণ বা বিশ্বজনীন 'গ্রহণ'-এর স্বরূপটি কী?

আমাদের দেশের ক্রমবিকাশের ধারা তার হাজার বছরের ইতিহাসের দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়া খাতেই বইতে বাধ্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, প্রত্যেকের স্বাধীন ব্যক্তিত্বই আমাদের আদর্শ। আমরা প্রত্যেক নারীপুরুষকে তার পছন্দের যেকোন ধর্ম আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে এসেছি। এই মহান বিষয়টিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বেছে নিয়েছিলেন; দীর্ঘ বার বছর ধরে সেটি নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং পুনরায় এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। জাতীয় এই প্রজ্ঞাকে তিনি সংক্ষেপে এইভাবে উচ্চারণ করেছিলেন ঃ "যত মত, তত পথ।" আমাদের দেশের পরিচিতি সমন্বয় ও সহনশীলতার দেশ হিসেবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ভাবের স্পর্শ আমরা আমাদের বর্তমান জীবনে খুঁজে পাচ্ছি না। এর কারণ, আমরা একদিকে আমাদের নিজস্ব প্রাচীন প্রজ্ঞার সঙ্গে যোগসূত্র খুইয়ে বসেছি এবং অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মহান শিক্ষার সংস্পর্শেও আসিনি। আসলে আমাদের অস্তিত্বের নোঙরটা যেখানে বাঁধা, সেই জায়গাটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কাছে সমন্বয়ের যে মহান ভাব বহন করে এনেছেন, এখন সময় এসেছে তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার—এমনকি আমাদের রাজনৈতিক জীবনেও। কেন আমাদের গণতন্ত্রে রাজনৈতিক হিংসার স্থান থাকবে? কেন আমরা প্রত্যেকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করব না? কেন আমরা ধৈর্য নিয়ে প্রত্যেকের মতামত শুনব না? প্রত্যেকে নিজের মতামত প্রকাশ করুক, আমরা তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে তাদের কথা শুনব, আবার একইসঙ্গে সেইসব মতামতের ভালমন্দ বিচারের আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারও করব। অন্যকে কেন জোর করে কিছু করতে বাধ্য করব? ভারতের রাজনীতি, ধর্ম এবং জাতীয় জীবনের নানা দিকে, চিন্তায় ও কাজে এখন যে একটা হিংস্র ভাবের ছড়াছড়ি, সেটা যে কতদূর অ-ভারতীয় তা বলার নয়! একইসঙ্গে এটা আমাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিপন্থীও বটে। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে বসে আমরা আমাদের ভারতকে তার দীর্ঘ-পরীক্ষিত স্বকীয় প্রজ্ঞার পথে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ঃ গভীরে ডুব দাও

সমন্বয়ের এই মহান আচার্য চেয়েছেন যে, আধুনিক

৪ দ্রঃ Evolution after Darwin, Vol. I, p. 78

মানুষ তার ব্যক্তিত্বের গভীরে ডুব দিক এবং আবিষ্কার করুক তার মধ্যে সদা-উপস্থিত তার একান্ত নিজস্ব দেব-স্বভাবকে, যা কিনা সকল শান্তি, প্রেম ও ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। ইন্দ্রিয়ের জগতে মানুষ যেসব বস্তু নিয়ে কাজ করে সেসব সত্তা, দুদিনের জিনিস। আরো গভীরে গেলে সে এমন কিছুর সন্ধান পায় যা সত্যিই মূল্যবান। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই এইভাবে বলেছেন যে, সাগরের ওপর সাঁতরালে কেবল খেলো ঝিনুকই পাওয়া যায়; গভীরে ডুব দিলে রত্ন মেলে! তাই তিনি গাইতেন : "ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।" মানবমনের গভীরে ডুব দিয়ে ভারতীয় সাহিত্য অনবদ্য সব মণিমুক্তো আহরণ করে এনেছে। উপনিষদ্ দেখুন, কিংবা বুদ্ধের বাণী অথবা ভগবদ্গীতা—আমাদের দেশের এই উল্লেখযোগ্য ও সমৃদ্ধ প্রজ্ঞার ঐতিহ্যের সন্ধান আপনি পাবেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে...।"

অন্য সব কথা কানে ঢোকে, মনে থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্যে এই শক্তি ছিল। শ্রীকৃষ্ণের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১৯) মহান আধ্যাত্মিক আচার্যদের জীবন ও বাণীর এই মাধুর্যের যে-বর্ণনা রয়েছে, তা আমরা বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারি :

"বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে।।"

—ভগবানের অমর লীলাপ্রসঙ্গ শুনে আমাদের মন ভরে না। রসজ্ঞ যাঁরা, তাঁদের কাছে এই অমৃতকথা 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'।

এমনই হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর বিশ্বজনীন মাধুর্য। তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় জয় করছে এবং এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (বা তার ভাষান্তর)-এর দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট মানুষ আজ সারা বিশ্বজুড়ে। অসাধারণ এই গ্রন্থখানিতে তাঁরা এমন কিছু পান যা একেবারে নতুন, অদ্বিতীয়, অনবদ্য। যেমন, ইরানে আমি অনেক বিদগ্ধ মানুষকে পেয়েছিলাম যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় মুগ্ধ। ১৯৭৬ বা ১৯৭৭-এ আমি যখন ইংল্যান্ডে, তখন ওয়েস্টমিনস্টারের ডিন ও তাঁর স্ত্রী জানিয়েছিলেন যে, তখন তাঁরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পড়ছেন এবং গ্রন্থটি তাঁদের দারুণ লাগছে। গ্রন্থখানি যেভাবে পৃথিবীর সমস্ত জায়গার মানুষের হৃদয় জয় করে চলেছে, তাতে আমরা ভবিষ্যতের এমন একদিনের কথা ভাবতেই পারি, যেদিন সমগ্র পৃথিবী এই একটি মহান গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও সুশিক্ষিত হয়ে বিশ্বজনীন সমদৃষ্টি ও সহমর্মিতা লাভ করবে।

সিদ্ধান্ত

আজ আমাদের দেশে যেসব সমস্যা আছে, তাদের সমাধানে আমরা সবচেয়ে ভাল যা করতে পারি, তা হলো শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর বাস্তব রূপায়ণ। আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হলো, আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের উন্মোচন ঘটাতে হবে ও অন্যদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে, সমন্বয়ের ভাব নিয়ে বাঁচতে হবে। সমগ্র মানবজাতির সাতভাগের একভাগ বাস করে আমাদের এই ভারতবর্ষে। আমাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের আবেদন—এই দেশকে মানব-প্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী 'নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগার' হিসেবে গণ্য করতে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শিখিয়েছেন মানব-সম্ভাবনা-বিকাশের সেই বিজ্ঞান ও পদ্ধতি, সামগ্রিক মানব-উন্নয়ন ও পরিপূর্ণতালাভের সেই কর্মপরিকল্পনা। তাঁদের এই সদর্থক সমুজ্জ্বল বাণী ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ভারতে ও ভারতের বাইরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করবে। এই বাণী অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে, যাঁদের মধ্যে আছেন আমাদের মুসলিম কবি—বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর তাঁর বিখ্যাত গানে তিনি গেয়েছেন :

"সত্য যুগের পুণ্য স্মৃতি
আনিলে কলিতে তুমি তাপস।"

স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে তিনি গেয়েছেন :

"ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ
মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ।"

কবির এই দর্শনকে সত্যে পরিণত করার দায়িত্ব আমাদের এবং আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর। সে-দায়িত্ব পূরণ করা যেতে পারে সামগ্রিক মানব-উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে অনলসভাবে কার্যে রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়েই। মানুষের জীবন, তার সবরকম রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি ও শিক্ষাদর্শের এর থেকে ভাল আর কী লক্ষ্য থাকতে পারে? আগেই বলা হয়েছে, রোমাঁ রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বিশ্ব-আত্মার অনুপম সুরলহরী' বলে বর্ণনা করেছেন। সারা বিশ্ব আজ সেই সুসংবদ্ধ সুরলহরী, সেই 'সিম্ফনী', সেই মহান সমন্বয়ভাবের মুখ চেয়ে বসে আছে। সমাজবদ্ধ মানুষ দেখছে, তার ভিতরের জগৎ আজ বড়ই বিক্ষুব্ধ; বিক্ষুব্ধ তার বাইরের জগৎও। সেই সর্বব্যাপ্ত অস্থির বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে যদি আমরা সামগ্রিক সুস্থির সমন্বয় সৃষ্টি করতে চাই, তবে আমাদের দরকার হবে পথপ্রদর্শকের, দরকার হবে অনুপ্রেরণার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্যে সেই অনুপ্রেরণার এক অমিত ভাণ্ডার আপনারা আবিষ্কার করবেন।* ❑

---

* রচনাটি পরম পূজ্যপাদ বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের 'Sri Ramakrishna : His Universal Appeal' শীর্ষক রচনার ভাষান্তর।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ

স্বামী নির্বাণানন্দ

ধর্মজীবনের গোড়ার কথা জিজ্ঞাসা—অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা। যে-মানুষের মনে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা নেই, সে কি করে ধর্মজীবনে অগ্রসর হবে? জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে চাই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং গুরুর প্রসন্নতা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ঃ "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" (৪।৩৪) ভগবান বলছেন, তাঁকে জানতে গেলে এগুলি চাই—'প্রণিপাত' অর্থাৎ গুরুর প্রতি ভক্তি, 'পরিপ্রশ্ন' অর্থাৎ গুরুকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—বিনীতভাবে প্রশ্ন অবশ্যই, এবং 'সেবা' অর্থাৎ সেবার দ্বারা তাঁর সন্তোষবিধান। এগুলি ঠিক ঠিক করতে পারলে গুরুর সাহায্যে আমরা ভগবানের কাছে যেতে পারব। গুরুই তো ভগবানের কাছে আমাদের পৌঁছে দেবেন। সেজন্য ঠাকুর বলতেন ঃ "গুরু কি জান? যেমন ঘটক। ঘটক যেমন দুটি পরিবারের দুটি হৃদয়কে মিলিয়ে দেন, গুরু তেমনি ভক্ত এবং ভগবানকে মিলিয়ে দেন।" এই মিলিয়ে দেওয়াটা হলো ব্যষ্টিপ্রাণকে সমষ্টিপ্রাণের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া। আমরা এক-একটি ব্যষ্টিপ্রাণ, আর ভগবান হলেন সমষ্টিপ্রাণ।

মহারাজ বলতেন ঃ "বুদ্ধদেব অঙ্গুলিমালের মনের গঠন পালটে দিয়ে তাকে দস্যু থেকে সন্তে পরিবর্তিত করলেন। এতে বুদ্ধদেবের অঙ্গুলিমালের মধ্যে ব্যষ্টিপ্রাণকে শুদ্ধ করে সমষ্টিপ্রাণের সঙ্গে যোগ করে দেওয়ার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যষ্টিপ্রাণকে সমষ্টিপ্রাণের সঙ্গে যোগ করতে পারলে তখন মনের এমন শক্তি জন্মায় যে, ইচ্ছা করলে গ্রহ-নক্ষত্রাদিরও গতি পরিবর্তন করা যায়।" এর মধ্যে অলৌকিকতা কিছু নেই, অবাস্তবতা কিছু নেই। বুদ্ধদেব ও স্বামীজী কখনো অলৌকিক বলে কোন কিছুকে স্বীকার করেননি। কিন্তু স্বামীজীর জীবনে অনেক কিছুই ঘটেছে যেগুলিকে সাধারণ দৃষ্টিতে অলৌকিক বলা যায়। বুদ্ধদেবের জীবনেও অমন ঘটেছে। ঠাকুরের জীবনেও অলৌকিকতা ভুরি ভুরি দেখা যায়। স্বামীজীর বুকে হাত দিলেন, অমনি স্বামীজীর এক অসাধারণ অনুভূতি হলো। তাঁর মনে হলো, বিশ্বচরাচর তাঁর চোখের সামনে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তিনি অনন্তের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছেন। অর্জুনেরও তো এমনই অনুভূতি হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে দিব্যচক্ষু দান করে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা এর কি ব্যাখ্যা দেব? কিন্তু এ তো ঘটনা। এরকম আরো কত ঘটনাই তো ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনে আমরা জানি। কিন্তু ঠাকুর-স্বামীজী কখনো অলৌকিকতার প্রশ্রয় দেননি। তাঁরা এসেছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। শাস্ত্রবিধি ও লোকব্যবহার রক্ষা করে, সেগুলিকে মান্য করে চলাই ছিল তাঁদের আচরণের বৈশিষ্ট্য। কাজেই স্বামীজী যে বলছেন, ঠাকুর হলেন সবচেয়ে 'প্র্যাকটিক্যাল' এবং সবচেয়ে 'পারফেক্ট' অবতার—একথার তাৎপর্য আমরা ঠাকুরের জীবন দেখলেই বুঝতে পারব। বুঝতে পারব স্বামীজীর মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণের সবচেয়ে 'প্র্যাকটিক্যাল' এবং সবচেয়ে 'পারফেক্ট' পার্ষদের অবস্থানকে। তাঁদের জীবন ভাল করে অনুধাবন করলে দেখব, তাঁদেরও খিদে-তেষ্টা ছিল, রাগ-অভিমানও ছিল। এসব দেখে আমরা বুঝি যে, তাঁরাও আমাদের মতোই মানুষ। কিন্তু বাস্তবিক তাঁরা এই সমস্ত মানুষের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান। তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ভাবলে আমরা তাঁদের অনুসরণ করব কি করে? তাঁরা দেখান যে, তাঁদেরও সাধ-আহ্লাদ আছে, দুঃখ-আনন্দ আছে, ক্রোধাদি আছে। মনের সঙ্গে লড়াই করে এইরকমভাবে সেগুলিকে জয় করতে হবে। এই জয়ের জন্য যে-লড়াই তাঁরা করেছেন তা শুধু আমাদের শিক্ষার জন্য, আমাদের মধ্যে থেকে সহজাত দেবত্ব-শক্তিকে বিকশিত করার জন্য।

❋

এই জগতে সবচেয়ে শক্তিশালী বস্তু ভগবানের নাম। সেটিই একমাত্র বিদ্যামায়া। ভগবানের নাম ছাড়া আর যাকিছু আমরা জগতে করি তা সব অবিদ্যামায়ার অন্তর্ভুক্ত। নাম আর নামী অভেদ। আমাদের সমস্ত কর্মের পিছনে কারণ থাকে, কিন্তু ভগবানের কোন কার্য-কারণ ব্যাপার নেই। শুধু তিনিই কার্য-কারণের ঊর্ধ্বে। ঠাকুরকে জগজ্জননী 'ভাবমুখে' থাকতে বলেছিলেন। ঠাকুরের মন সবসময় বিশ্বচৈতন্যে হারিয়ে যেত। এমন অবস্থা থাকলে তাঁকে দিয়ে জগতে মায়ের কাজ কিভাবে হতো? সেজন্যই মা তাঁকে 'ভাবমুখে' থাকতে বলেছিলেন। নির্বিকল্প সমাধির ভূমি থেকে তিনি অবলীলায় নেমে আসতেন এবং ভক্ত, সৎপ্রসঙ্গ, আহার-বিহার ইত্যাদি নিয়ে থাকতেন। একদিকে নির্বিকল্প সমাধির ভূমি আর অন্যদিকে জাগতিক ভূমি—এই দুইয়ের মাঝখানে যে 'বর্ডার-লাইন' এটিই হলো 'ভাবমুখ'। স্বামীজীও তাঁর জীবনে কয়েকবার নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। আবার সেখান থেকে নেমেও এসেছেন। তারপর বক্তৃতা বা কাজকর্ম করেছেন। ঠাকুরের মতো তাঁরও পৃথিবীতে থাকা ঐ 'ভাবমুখে' থাকা। মায়েরও তাই। তাঁদের কথা আমাদের চেয়ে একদিক থেকে আলাদা ঠিকই, আবার আলাদা নয়ও। কারণ, তাঁরা শিখিয়েছিলেন ঐভাবে থাকা যায় এবং ঐভাবে থাকাটাই আদর্শ থাকা। আমরা হয়তো ঐ থাকার শতাংশের একাংশও আমাদের জীবনে থাকতে পারব না, কিন্তু তাঁদের জীবন আমাদের সবসময় প্রেরণা দেয় ঐ আদর্শকে আমাদের জীবনে যতটুকুই হোক না কেন, যেন রূপায়ণের চেষ্টা করি।

ঠাকুর-স্বামীজী আমাদের শিখিয়েছেন—ভবিষ্যৎ নয়,

বর্তমানই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের মধ্য থেকেই ভবিষ্যৎ বেরিয়ে আসে। সেজন্য বর্তমানকেই আমাদের গড়ে তুলতে হবে। যদি আমরা এই গড়াটি ঠিক ঠিক করতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়ে যাবে।

*

বৈরাগ্যের কথা শাস্ত্র বলেন, আচার্যরা বলেন। বলেন, আমাদের জীবনকে বৈরাগ্যের শক্তিতে গঠন করতে হবে। কিন্তু আমাদের বৈরাগ্য আসে না কেন? কারণ, আমরা জগতের নানা জিনিস নিয়ে ভুলে থাকি। ভগবানের স্মরণ-মননে বা তাঁর নাম নিয়ে, তাঁর চিন্তায় থাকতে পারি না। আহার-বিহার, কাজকর্ম আমাদের করতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁকে ভুললে চলবে না। দেহসুখ, লোকমান্য এসব নিয়ে তাঁকে ভুলে থাকলে চলবে না। দেহকে ঠিক রাখার জন্য আমরা দেহকে সাজাই, ব্যায়ামাদি করি। এসব করব নিশ্চয়ই, কিন্তু এগুলিই জীবনের সর্বস্ব হয়ে যাবে, তা যেন না হয়। যদি ভগবানের কথা আমাদের মনে না থাকে তাহলে কাজকর্ম, অর্থ, প্রতিপত্তি ও দেহসুখের পিছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ বৈরাগ্যের আদর্শ থেকে সরে যায়। সাধারণ মানুষ এই জগতের জিনিস নিয়ে এত ব্যস্ত যে, বৈরাগ্য নিয়ে ভাবার তাদের সময় কোথায়?

বৈরাগ্য মানেই সন্ন্যাস নয়। বৈরাগ্য মানে আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করা। সংসারেই থাকি অথবা সন্ন্যাসাশ্রমেই থাকি, আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ না করলে জীবনে সার্থকতা কোনভাবেই আসতে পারে না। জীবনটা তখন শুধু ব্যর্থতার ভারে জর্জরিত হয়ে যায়। বিদ্যাসাগর তাঁর সারা-জীবনটি পরের উপকারেই দিয়েছিলেন। মানুষের কত সেবা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর শেষজীবনে দেখা যায়, চূড়ান্ত হতাশা তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে। মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। কেন এমন হলো? ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন: "অন্তরে সোনা চাপা আছে, কিন্তু খপর নাই।" অর্থাৎ তাঁর কর্মটি খুবই উঁচু দরের, কিন্তু এই কর্মের পিছনে ঈশ্বরভক্তির ভিত্তি ছিল না। তাঁর কর্মটি "ঈশ্বরার্থম্" নিষ্কাম কর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। সেজন্যই মানুষের এত সেবা করেও শেষে মানুষের সম্পর্কেই বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিলেন তিনি। অত বড় মানুষের জীবনে এমন ব্যর্থতা—ভাবা যায় না। পূর্ব পূর্ব জন্মে তাঁর শুভ কর্ম করা ছিল। সেই কর্মের সংস্কার অনুযায়ী এ-জন্মে পরোপকার, দয়া, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা—সব তিনি করলেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে না থাকায় অমন অসাধারণ হৃদয়বত্তা তাঁর জীবনে সার্থক হতে পারল না। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ভিন্ন যথার্থ বৈরাগ্য আসে না। ঠাকুর আমাদের শিখিয়েছেন, আমাদের জীবন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে থাকলে তা সার্থক হবে না। কাজকর্ম করতে করতে বাইরের নানা বিষয়ে মনটা ছড়িয়ে পড়ে, বহির্মুখী হয়ে যায়। ভগবানকে ধরে থাকলে তা হয় না।

*

কেদারবাবা (স্বামী অচলানন্দ) বলতেন: "ঠাকুরের কাছে যারা এসেছে তারা তো মুক্ত। তাদের মুক্তি তো হয়েই গেছে।" স্বামীজী যে নতুন ধর্মাদর্শ সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের সামনে এবার রাখলেন, তা উভয়কেই মুক্তির নতুন পথ দেখিয়েছে। কৃষ্ণলাল মহারাজের (স্বামী ধীরানন্দ) কাছে শুনেছি মাঠাকরুন বলতেন: "কাজকর্ম করবে না তো করবে কি? সারা দিনরাত কি সবাই ধ্যানজপ নিয়ে থাকতে পারে? ঠাকুরের পায়ে মাথা বিকিয়ে দেওয়াই তো আসল কথা। সেজন্যই তো নরেন এই নিষ্কাম সাধনার নতুন পথ করে দিয়েছে। এখানে সাধু হতে যারা আসবে, তাদেরকে ঠাকুরের পায়ে মাথা বিকিয়ে দেওয়ার জন্য আসতে হবে। বুঝতে হবে, সব কাজ তাঁর কাজ। কাজ শুধু কাজ নয়, কাজ তাঁর সেবা। তপস্যা কিসের জন্য? অহঙ্কার-অভিমান নাশের জন্যই তো তপস্যা। 'আমি'কে নাশের জন্যই তো সাধন। সেবার মাধ্যমে নরেন তো তাই করার কথা বলেছে। কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁরই সেবা। একফোঁটা আমিত্ব-বুদ্ধি থাকলে ঠিক ঠিক সেবা করা যায় না। আমিত্ব-বুদ্ধি না রেখে কাজ করলে তা কি তখন কাজ থাকে? কাজ তখন তপস্যার বাড়া হয়ে যায়।"

কাজকর্ম যে করব, কিভাবে করব? অন্তরে মাকে জাগাতে হবে। গানে আছে না—"অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী!" তা না হলে আমাদের কাজ সাধারণ কাজ হয়ে যাবে, তপস্যা হয়ে উঠবে না। মাকে অন্তরে জাগালে অভিমান পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অভিমানটাকে মেরে ফেলতে না পারলে কিছু হবে না। অভিমান বড় সূক্ষ্ম জিনিস। 'আমি সাধনভজন করছি, আমি জপধ্যান করছি, আমি মঠে-মন্দিরে যাচ্ছি, আমি সাধুসঙ্গ করছি'—এই 'আমিত্ব' থাকলে কিছু হবে না। দরকার 'শরণাগতি'—'সারেন্ডার'। হনুমান রামের সামনে সর্বদা হাতজোড় করে রয়েছেন। কখন তাঁর কি আদেশ হবে—সেজন্য। কোন 'চয়েস' নেই। এমনি শরণাগতি চাই। এমন শরণাগতি হলে আপনা-আপনিই চিত্তশুদ্ধি হবে। তখন তাঁর কৃপা অনুভব করা যাবে। দড়ির বিরাট গিঁট যেমন ভেলকিবাজির মতো একটানে খুলে যায়, দেশলাই জ্বালতে যত সময় লাগে দেশলাই জ্বললে তার চেয়েও কম সময়ে হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলোয় আলো হয়ে যায়। তাঁর কৃপায় অহঙ্কার-অভিমান নাশ হলে তাঁর দর্শন ঐরকম তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। স্বামীজীর জীবনে দেখি, স্বামীজী বলছেন—তিনি সবসময় ঠাকুরের শক্তিতে চলছেন। পাশ্চাত্য দেশে সবসময় ঠাকুর তাঁর হাত ধরে রয়েছেন, তা তিনি সর্বদা অনুভব করেছেন। যখন চলে যাওয়ার সময় হয়ে আসছে তখন বাবুরাম মহারাজকে বলছেন: "ঠাকুর আমার হাত ছেড়ে দিয়েছেন।" মহারাজকে বলছেন: "আমার কাজ শেষ হলো। আমি এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে বসে আছি।" হরি মহারাজকে লিখছেন: "আমি খালাস! আমি এখন জিরেন নিতে চললুম।" লিখছেন: "কার্য সম্বন্ধে কোন বিষয়ে আর আমার কোন উপদেশ নাই।" মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন: "এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার কর মেরা নেইয়া'—হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।"

অর্থাৎ, স্বামীজী নিজে কিছু করছেন না। তাঁর ভাব হলো এই—ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সবকিছু করছি। তিনি হাত ধরে করাচ্ছেন। তিনিই সব করছেন। আমি তাঁর যন্ত্রমাত্র। ঠাকুর যেন তাঁকে বলছেন, 'তোমার কাজ এবার শেষ হলো। এবার তুমি আমার কাছে চলে এস।' স্বামীজীর এই 'আমি'তে নিজের অস্তিত্ববোধটুকুও নেই। তাঁর জীবন আমাদের একথাই শিখিয়েছে, আমরা যেন আমাদের আমিত্ব-বুদ্ধিকে তিল তিল করে নাশ করে ঠাকুরের হাতের যন্ত্র হয়ে উঠি। ঠাকুরের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে—প্রভু, আমি জ্ঞানহীন, আমি বুদ্ধিহীন, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও আমি কিভাবে চলব। আমি শক্তিহীন, তুমি আমাকে দিয়ে তোমার কাজ করিয়ে নাও। প্রার্থনার মাধ্যমে যখন আমাদের সেই বুদ্ধি আসবে তখন দেখব আমাদের কাজের মধ্যে, আমাদের সেবার মধ্যে 'সেকিউলার' এবং 'স্পিরিচুয়্যাল'—এই দুইয়ের পার্থক্য মুছে গেছে। কাজ ও সেবায় কাজ ও সেবা-বুদ্ধি নয়, উপাসনা-বুদ্ধি আনতে হবে। ক্রমে দেখব, কর্ম ও উপাসনায় কোন তফাত নেই। বেদান্তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো তা-ই। ভক্তিরও সিদ্ধান্ত ঐ একই। কর্মযোগের পরিণতিও ঐ সিদ্ধান্তেই। স্বামীজী এবার এসে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিকে মিলিয়ে দিয়ে গেছেন। দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, জ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়, ভক্তিও সেখানে নিয়ে যায়, কর্মও সেখানে নিয়ে যায়। পথ আলাদা হতে পারে কিন্তু উপলব্ধিতে কোন পার্থক্য নেই।

এসব কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। মন-মুখ এক করতে হবে। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব হচ্ছে, সব হয়, সব হবে—এই বুদ্ধি দৃঢ় করতে হবে। ঠাকুর তাঁর নিজের জীবনে "ষোল টাং" করে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন, জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। চিত্তশুদ্ধিই বলি, বৈরাগ্যই বলি, আর তপস্যাই বলি—সবই হলো 'বাইপ্রোডাক্ট'। ভগবানলাভ জীবনের উদ্দেশ্য—এই বুদ্ধি যখন পাকা হবে তখন বৈরাগ্য, তপস্যা, চিত্তশুদ্ধি আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হবে। এই সহজ অথচ অমোঘ ভাব ঠাকুর এবার দিয়ে গিয়েছেন। সব মানুষকে এই ভাবের কাছে নিয়ে আসতে হবে। তবে জগৎ উঠবে। শুধু মন-মুখ এক করতে হবে। মুখে ভগবানলাভের কথা বললে হবে না, আমাদের কথায়, কাজে তাকে প্রমাণ করতে হবে। মঠে একবার বাবুরাম মহারাজ মহারাজকে বলেন ঃ "তুমি তো ইচ্ছা করলে যে যা চায়, তা তাকে দিতে পার।" বারকয়েক এভাবে বলায় মহারাজ বললেন ঃ "ডাকো তো দেখি সবাইকে, যে যা চায় তা-ই তাকে দেব।" হাঁক-ডাক করায় সবাই এসে মহারাজের কাছে হাজির হলো। মহারাজ ভাবস্থ হয়ে স্থিরভাবে বসে আছেন, কিন্তু কারো মুখে একটা কথাও বেরল না, চাইবে কি!

⁂

বেশি শাস্ত্র পড়লে কি হয়? ঠিক ঠিক বিচার না থাকলে দেখা যায়, বেশি শাস্ত্র পড়লে ভগবানে মন দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। অহঙ্কার-অভিমান এসে তাঁর করুণার পথ বন্ধ করে দেয়। তাঁতে মন স্থির হয় না। অহঙ্কার-অভিমানই তাঁকে পাওয়ার সবচেয়ে বড় বাধা। ঠাকুর বলতেন ঃ "পেটে একটা ছেলে থাকলে আরেকটা ছেলে হয় না।" অহঙ্কার-অভিমান থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

ঠাকুর বলতেন ঃ "ওপরে ওপরে ভাসলে হবে না। ডুব দাও।" ডুব দিতে হবে। তবে তো রসসমুদ্রের রস আস্বাদ করা যাবে। ভগবান রসের সমুদ্র। এমন রস যে, পৃথিবীর কোন রস, কোন আনন্দ তার ধারেকাছেও আসে না। সেই রসের আস্বাদ একবার পেলে জগতের সব রসই "আলুনী" লাগবে। ঠাকুরের শরীরটা ছিল তুলোর মতো নরম! ফুলকো লুচি ছিঁড়তে গেলেও আঙুল ফেটে রক্ত পড়ত—এমনই নরম ছিল তাঁর শরীর। কিন্তু যখন হাঁটতেন তখন হাঁটতেন বীরপুরুষের মতো। যখন কীর্তন করতেন, তা করতেন মত্ত মাতঙ্গের মতো, পুরুষসিংহের মতো। 'কথামৃত' ভাল করে পড়লে আমরা তাঁর চরিত্রের ধারণা যেমন পাই, তেমনি পাই তাঁর শক্তির ধারণাও। বস্তুত, 'কথামৃত' ঠিক ঠিক পড়লে আমাদের জীবনের সব বিভ্রান্তিই দূর হয়ে যায়। মনের জল্পনা-কল্পনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয় সব কেটে যায়। 'কথামৃত' পড়ে বুঝেছি, তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগ এক জন্মে কেটে যায়। তিনি সবসময় কৃপাময়, কিন্তু তিনি আমাকে কৃপা করতেও পারেন আবার নাও পারেন। কৃপা তাঁর ইচ্ছা। লাল জবাগাছে সাদা জবা তিনি ফোটাতে পারেন, কিন্তু ফোটাবেন কি ফোটাবেন না তা তাঁর ইচ্ছা। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটছে—এটি যদি আমরা আমাদের চিন্তায় সর্বদা রাখতে পারি তাহলে তো অনেকটাই এগিয়ে গেলাম। ঈশ্বরবুদ্ধিহীন কর্ম মনকে বহির্মুখী করে। কর্মের সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে নিলেই মন অন্তর্মুখী হয়ে যায়। মন যত অন্তর্মুখী হবে তত সংশয় ছিন্ন হবে, বুদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠ হবে। একবার মঠে একজনের মনে হয়েছিল, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে। তিনি হরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "মহারাজ, আমার কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে?" হরি মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমার কি সকলের মধ্যে ইষ্টদর্শন হচ্ছে?" তিনি বললেন ঃ "না।" হরি মহারাজ বললেন ঃ "তাহলে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি।" বাবুরাম মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন ঃ "তোমার কি সর্বভূতে প্রীতি হয়েছে? যদি হতো তাহলে আমাকে তুমি ঐকথা জিজ্ঞাসা করতে আসতে না। ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ—কোন সংশয়, সন্দেহ থাকবে না।"

অতীতে কি ভুল করেছি সেসব ভুলে যেতে হবে। বর্তমানকেই গুরুত্ব দিয়ে নিজেকে নতুন করে গড়তে হবে। একথাই ঠাকুর আমাদের শিখিয়েছেন। তাঁর উপদেশের সমস্তটাই 'পজিটিভ', কোথাও 'নেগেটিভ' কিছু নেই।* ❑

* গত ২৫ ও ২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৭ এবং ৩ ও ৯ জানুয়ারি ১৯৬৮ বেলুড় মঠে পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

দুর্গোৎসব-তত্ত্ব

অশ্বিনীকুমার দত্ত

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে,
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকাগতির্দেবি নিস্তারনৌকা,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দণ্ডলীলা-
সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকাগতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতাঽক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।।

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে,
সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।

[শ্রীদুর্গাস্তবরাজ]

আজ কিছুকাল হইল আমার একটি বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ "আজিকার বলিবার বিষয় কি?" আমি বলিলামঃ "দুর্গাপূজা কি—ইহাই বলিতে হইবে।" তিনি বলিলেনঃ "দুর্গাপূজা আর কি? একটি মাটির পুতুল গড়াইয়া কিছু টাকার শ্রাদ্ধ করা, আর খেটেখুটে ব্যারাম আনা।" যদিও তিনি হয়তো কৌতুকচ্ছলে এই কথাটি বলিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক আজকালকার দুর্গাপূজা এই ভাবেই পরিণত হইয়াছে। আজ হিন্দু প্রকৃত দুর্গাপূজা করে কৈ? আমি যতদূর বুঝি, প্রায়ই তো দেখিতে পাই পুতুলেরই পূজা হইয়া থাকে। হিন্দু সত্য সত্যই পৌত্তলিক হইয়াছে; ভগবতীকে, সর্ব্বব্যাপিনীকে, আদ্যাশক্তিকে সামান্য মাটির পুতুলে পরিণত করিয়াছে! তাহা না হইলে তাঁহার সম্মুখে অশ্লীল গান, সুরাপান এবং নানাপ্রকারের কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ করিতে সাহস পায় কে? যিনি শুদ্ধা অপাপবিদ্ধা, তাঁহার পূজা করিতে বসিয়া কে পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারে? তাঁহার সাক্ষাতে পাপ করিতে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? তাই বলি, আজকাল যাহা দেখিতেছি তাহা দুর্গাপূজা নহে, সামান্য মাটির পুতুলের পূজা মাত্র। যিনি সর্ব্বব্যাপিনী তাঁহাকে এতদূর সঙ্কোচ করা হইয়াছে যে, কোন কোন হিন্দু বলিয়া থাকেনঃ "এই পাঁঠাটি পাষাণময়ী কালীবাড়ি দিও, চামারপট্টি কালীবাড়ি দিও না।" যেন কালী পাষাণময়ী কালীবাড়িতে আছেন, চামারপট্টিতে নাই। আমাদের সঙ্কীর্ণতা আরোপ করিতে করিতে ভগবানকে এত খর্ব করা হইয়াছে যে, আপনারা শুনিলে অবাক হইবেন। কোন এক ব্যক্তি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া তামাক সাজাইয়া একটি হুকা লইয়া তাঁহার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহাকে পায়খানায় নিয়া বসাইতেন, পরে তাঁহার মুখ প্রক্ষালন ও অঙ্গার চূর্ণাদি দ্বারা দন্তধাবনাদি করিয়া দিতেন। আবার কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, শীতকালে ঠাকুরের কাপড়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত এবং বলিয়া থাকেন—তাঁহাকে কাপড় না দিলে শীতে কষ্ট পাইবেন! হায়, হায়, যেন একখানি বালাপোষ না দিলে ভগবান যিনি, তিনি আমাদিগের ন্যায় শীতে কষ্ট পান! পরাৎপর পরব্রহ্ম ত্রিভুবনেশ্বর, যাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া শীত গ্রীষ্ম ঋতুচক্র ঘুরিতেছে, দ্বন্দ্বাতীত সেই জগদীশ্বর নাকি শীতে কাঁপিয়া থাকেন! যাঁহার দাসানুদাস কীটাণুকীট একটি সামান্য ভক্ত অনায়াসে শীত গ্রীষ্মকে জয় করিয়া গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি পরিবৃত হইয়া এবং শীতকালে জলে ডুবিয়া থাকিয়া তাঁহার সাধনের বলের পরিচয় দিয়া থাকেন, তিনি কিনা শীতে অভিভূত এবং গ্রীষ্মে উদ্বেজিত হইবেন!!! হায় কি বিড়ম্বনা! ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে? আর্য সন্তানগণ ভগবৎ-পূজা ছাড়িয়া নিতান্ত সঙ্কীর্ণহৃদয় পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন।

এই ধর্মান্দোলনের সময়ে আমাদের একবার অনুসন্ধান করা কর্তব্য হিন্দুশাস্ত্রীয় পূজাবিধির প্রকৃত তাৎপর্য কি? পূজা করিতেছি অথচ মিথ্যাকথা কহিতেছি, পরের অপকার করিতেছি, ইন্দ্রিয়-লালসায় প্রাণ ভাসাইয়া দিতেছি। হিন্দু মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি—এইভাবে পূজা করিলে পূজা হয় কি? শাস্ত্র কখনো ইহার প্রশ্রয় দিতে পারে কি? প্রকৃত পূজা করিলে উপাস্য দেবতার ভাব পূজকে সঞ্চারিত হইবেই হইবে। আমাদের এদেশে তাহা কি হইতেছে? যে শক্তিপূজা হয় লোককে শক্তিমান করিবার জন্য, দেশে সেই শক্তির পূজা করিয়া কোটি কোটি প্রাণী নিতান্ত নির্জীব অবস্থায় মূষিকের ন্যায়, পিপীলিকার ন্যায় কালাতিপাত করিতেছে; ইহার নাম কি পূজা? এখন কেবল বাহিরে ঢাক-ঢোলের বাজনা, বলিদানের ঘটা, ডাকের গয়নার সজ্জা, আর কিছুই নয়। প্রকৃত শক্তিপূজা এদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। আসুন, আমরা একবার দেখি প্রকৃত শক্তিপূজা এদেশে আনিতে পারি কিনা। এখন সময় আসিয়াছে, একবার হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখি, যদি সার পাই আদরে গ্রহণ করিব, নতুবা দূর

করিয়া ফেলিয়া দিব, গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিব। বাস্তবিক এই শাস্ত্রীয় বিধির গূঢ় রহস্য রহিয়াছে, ইহাতে নিরাকারের পূজাই প্রতিপাদন করিতেছে। সেই নিরাকার সাধনের সুবিধার জন্য প্রথম সিঁড়ি বাহ্যপূজার কল্পনা করা হইয়াছে।

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতিজপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা।।"

(মহানির্বাণ তন্ত্র)

তন্ময় ভাব—ব্রহ্মময় ভাব উত্তম, ভগবান এবং জীব এক হইয়া গিয়াছে সেই ভাব উত্তম। ধ্যান ভাব মধ্যম, স্তুতি-জপ অধম, বাহ্যপূজা অধমের অধম। কিন্তু অধমের অধম বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিবেন না, ইহা অনেকের প্রয়োজন। ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছানো যায়। বাহ্যপূজার পরে স্তুতিজপ, পরে ধ্যান, পরে ব্রহ্মসদ্ভাব। অল্পবুদ্ধি লোকদিগের জন্য বাহ্যপূজা, নিরাকার সাকার পূজার আবশ্যক হয়। মহানির্বাণ তন্ত্রে কালীপূজা সম্বন্ধে পার্বতী সদাশিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ

"মহদ্ যোনেরাদিশক্তের্মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্।।
রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা।
এতন্মে সংশয়ং দেব। বিশেষাচ্ছেত্তুমর্হসি।।"

(মহানির্বাণ তন্ত্র)

যিনি মহদ্‌যোনি, আদি শক্তি, মহাকালী, মহাদ্যুতি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, তাঁহার আবার রূপ নিরূপণ কি প্রকারে হয়?

শ্রীসদাশিব উবাচ

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্।।
শ্বেত পীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে।।
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ।।
নিত্যায়াঃ কালরূপায়াঃ অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্।।
শশিসূর্যাগ্নিভির্নেত্রৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্।।
প্রশমাৎ সর্বসত্ত্বানাং কালদণ্ডেন চর্বণাৎ।
তদ্‌বক্তসঙ্ঘা দেবেশ্যাঃ বাসোরূপেণ ভাষিতঃ।।
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতং।
রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্যপরিতিষ্ঠতি।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা।।
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাং।
পশ্যন্তি চিন্ময়ী দেবী সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী।।
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্।।"

উপাসকদিগের কার্যের জন্য তোমাকে তো পূর্বেই বলিয়াছি, গুণক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ যেমন কৃষ্ণ বর্ণে লয় হয়, সেইরূপ হে পার্বতি, সমস্ত ভূতাদি কালীতে লয় প্রাপ্ত হন। অতএব কালশক্তি যে তিনি, নির্গুণা যে তিনি, নিরাকারা যে তিনি, যোগীদিগের মঙ্গলস্বরূপা যে তিনি, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ নিরূপণ করা হইয়াছে। নিত্য কালরূপা, অব্যয়া, শিবাত্মা, তিনি অমৃতস্বরূপা বলিয়া তাঁহার ললাটে শশিচিহ্ন নিরূপণ করা হইয়াছে—কেননা চন্দ্রই সুধার আকর। এই অখিল কালবিদ্রুত জগৎ, তিনি যেন শশী সূর্য এবং অগ্নি—এই তিন নেত্র দ্বারা দর্শন করিতেছেন (শশি, সূর্য এবং অগ্নি দ্বারা এই ত্রিভুবন আলোকিত হইতেছে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার জ্যোতির অনুকরণ করিতেছেন—"ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্।" [কঠ-উপনিষদ্, ২।২।১৫] তাই তাঁহার তিনটি চক্ষু কল্পনা করা হইয়াছে।) সকল জীব সংহার করেন তিনি, কালদণ্ডের দ্বারা চর্বণ করেন তিনি, তাই মুণ্ডমালা আবরণরূপে কল্পিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জীবদিগকে রক্ষা করেন, তাই তাঁহার হাতে অভয় রহিয়াছে। বিপদকালে তিনিই অভয়দায়িনী এবং সমস্ত প্রাণীকে নিজ নিজ কার্যে তিনিই নিযুক্ত করেন, তাই তাঁহার হস্তে বর রহিয়াছে। তিনি জীবদিগকে আপন আপন কার্যে নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দেন—"যাও বাছা, আমার এই কার্য করিয়া জয়ী হইয়া আইস।" এই জগৎ রজোগুণে সৃষ্ট এবং তিনি তাহা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাই রক্তপদ্মাসনস্থিতা (সত্ত্বগুণে শুক্লবর্ণ, রজোগুণে রক্তবর্ণ এবং তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ শাস্ত্রে লিখিত আছে)। মোহময়ী সুরা পান করিয়া কাল ক্রীড়া করিতেছেন, সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী চিন্ময়ী দেবী তাহা দেখিতেছেন। এইরূপ গুণানুসারে অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের জন্য বিবিধরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।।"

[কুলার্ণব তন্ত্র]

চিন্ময়-জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, অশরীরী ব্রহ্মের উপাসকদিগের সুবিধার জন্য রূপকল্পনা হইয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে

"নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ।।"

নির্বিশেষ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ করিতে যাঁহারা সমর্থ নন, সেই মন্দবুদ্ধি লোকেরা নানা গুণ অনুসারে তাঁহার কল্পনা করিয়া থাকেন। যাবতীয় বাহ্যপূজাবিধি এই কল্পনামূলক। মহানির্বাণ তন্ত্রে নানাবিধ পূজাপদ্ধতি বলিয়া শ্রীসদাশিব পার্বতীকে বলিতেছেন ঃ

"অতো বহুবিধং কর্ম কথিতং সাধনান্বিতং।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে।।"

অতএব বহুবিধ সাধনান্বিত কর্ম (বাহ্যপূজাত্মক কর্ম) বলা হইল, অল্পবুদ্ধিদিগের ভগবৎসেবায় প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্য এবং পাপাসক্তি নিবৃত্তির জন্য। বাস্তবিক এই কর্ম কেবল অল্পবুদ্ধি লোকদিগের জন্য; যাঁহাদিগের মন স্থূলের অপেক্ষা না রাখিয়া সূক্ষ্মের ধারণা করিতে পারে তাঁহাদিগের বাহ্য পূজার প্রয়োজন নাই। হরিদ্বারে কামরাজ স্বামী নামে এক পরমহংস আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হঠযোগের প্রয়োজন কি? তিনি গঙ্গার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন ঃ "যাঁহার এই জ্ঞান আছে, ঐ যে গঙ্গার তরঙ্গ উহাতেই উঠিতেছে উহাতেই লয় পাইতেছে, উহা ব্রহ্মের শক্তি; এ-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেতে ঐ প্রকার উঠিতেছে এবং লয় হইতেছে—তাঁহার আবার হঠযোগের প্রয়োজন কি? তাঁহার হৃদয় কোমল, সুতরাং অন্য ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই।" আর যাঁহাকে গঙ্গা দেখাইয়া ঐ কথা বলিলে কিছুই বুঝিতে পারে না, কেবল গঙ্গা গঙ্গাই দেখে, ব্রহ্মশক্তি কাহাকে বলে তাহার আভাস পায় না, তাহার কঠিন হৃদয় কোমল করিবার জন্য হঠযোগ প্রভৃতির ক্রিয়া আবশ্যক হয়। সে গুরুর উপদেশে ঐরূপ ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা করিতে থাকে, এ কি করিতেছি? এইরূপ যত অনুসন্ধান করিতে থাকে ততই জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়, পরে কৃতার্থ হইয়া যায়।" বাহ্য পূজাও এই হঠযোগের ক্রিয়ার ন্যায়, সকলের আবশ্যক হয় না এবং যাঁহাদিগের আবশ্যক হয় তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে থাকেন, ইহা কি করিতেছি, কি উদ্দেশ্য, ইহার অর্থ কি? এবং এই অনুসন্ধানের ফলে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের পদবীতে আরোহণ করেন। এই কর্ম কেবল উপায় মাত্র, ইহাতে মুক্তি হয় না। এই কর্ম করিতে করিতে চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্মনাশ না হইলে কিছুতেই মুক্তি হইবে না।

"যাবন্নক্ষীয়তে কর্ম শুভং বাঽশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি।।"

কি শুভ কি অশুভ, সমস্ত কর্ম যে-পর্যন্ত ক্ষয় না হয়, সে-পর্যন্ত শত শত কল্পতেও মোক্ষ হইতে পারে না। পূজা প্রভৃতি শুভ কর্ম, ইহাও চলিয়া যাইবে। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে এসব কর্ম থাকে না, কর্মের ফলে বন্ধন হইবেই হইবে।

"যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ।।"

অশুভ এবং শুভ কর্ম দুয়েরই দ্বারা জীব বদ্ধ হয়; প্রভেদ এই মাত্র—অশুভ কর্ম যেন লৌহময়, শুভ কর্ম যেন স্বর্ণময় রজ্জু। উভয়েরই ফলভোগ মনুষ্যের বন্ধন। এক বন্ধন জেলখানায়, অপর বন্ধন নন্দনকাননে। মনে করুন, যেমন এখানে একটি জেলখানা আছে, তেমনি জলের ফোয়ারা ও নানাবিধ ফলফুলের দ্বারা সজ্জিত করিয়া গভর্নমেন্ট একটি নন্দনকানন করিয়া দিয়াছেন। একদিকে চুরি প্রভৃতি অন্যায় কাজ করিলে যেমন ছয় মাসের ফাটক হয়, তেমনি অপরদিকে পরের উপকার, দান প্রভৃতি করিলে ছয় মাস নন্দনকাননে অবস্থিতি হইবে। তাহা হইলেই কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের পর যে পতন, তাহার সন্দেহ নাই। মুক্তি হইলে আর পতন কোথায়? তাই স্বর্গ নরক দুইই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। স্বর্গভোগে মুক্তির আশা নাই এবং কর্মের ফলে হয় ভোগ, নয় শোক; অতএব কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ কর্মাসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন ঃ "আমার আবার কর্ম কি! কেবল খাব, শোব আর কি!" অর্থাৎ যে-কর্ম না করিলে দেহ থাকে না, শুধুমাত্র সেই কর্ম থাকে, তাহাও কেবল করি বলে করি, কোনপ্রকারে বিন্দুমাত্রও আসক্তি নাই। আর বাহিরের পূজা তো থাকিবেই না।

সদাশিব বলিতেছেন ঃ

"বালক্রীড়নবৎ সর্বং রূপনামাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।।
মনসা কল্পিতামূর্তিঃ নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা।।"

(মহানির্বাণ তন্ত্র)

রূপ-নামাদি কল্পনা বালকের ক্রীড়ার ন্যায় ত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত; ইহাতে সন্দেহ নাই। তুলসীদাসের একটি দোঁহা আছে, তিনি বলিয়াছেন—বালিকা যতদিন আপন প্রিয়তম স্বামীর দেখা না পায়, ততদিন পুতুল লইয়া খেলা করে।

"যব্ প্রিয়সে সরবর্ হোই তব্ রাখ্ পেটারি মেল।"

আর যেমনি স্বামীর সহিত দেখা হইল, অমনি সব পুতুল পেটারায় বন্ধ হইল। যতদিন তাঁহার সহিত দেখা না হয়, ততদিন রূপ নাম লইয়া খেলা; আর যেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল, খেলাও শেষ। কেবল যে রূপই কল্পনা, তাহা নয়; তাঁহাকে দয়াময় বলুন, হরি বলুন, পতিতপাবন বলুন, ব্রহ্ম বলুন, আল্লা বলুন—আর যা-ই বলুন, সমস্তই কল্পনা। কারণ, তিনি নাম ও রূপ দুয়েরই অতীত। সুতরাং রূপ ও নাম—এই দুয়েরই শেষ হইবে যখন, মুক্তি হবে তখন। নানারূপ পূজা-পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া অবশেষে শিব বলিতেছেন, মনের কল্পিত মূর্তি যদি মোক্ষ দিতে পারে, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্য লইয়াও লোক রাজা হইতে পারে। বাস্তবিক মূর্তিপূজায় মুক্তি হয় না, ইহাতে কেবল মুক্তির উৎকৃষ্ট উপায় খুলিয়া দেয়! স্থূলধ্যান সূক্ষ্মধ্যান শিখিবার জন্যই।

কুলার্ণব তন্ত্রে আছে—

"স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্বতে।
স্থূলার্থে নিশ্চলংচেতোঃ ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলম্।।"

কেহ কেহ মন স্থির করিবার জন্য স্থূল অর্থাৎ মূর্ত্যাদি ধ্যান করিয়া থাকেন। স্থূলে মন নিশ্চল হইলে পরে সূক্ষ্মেও মন নিশ্চল হয়। একটি গল্প প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটি ছাত্র বেদ পড়িতে গিয়া মন স্থির রাখিতে পারে না দেখিয়া গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "তোমার মন এদিক ওদিক যায়

কেন?" সে উত্তর করিল ঃ "আমার একটি প্রিয় মহিষ আছে, আমার মন কেবল সেই দিকেই ধায়।" গুরু তাহাকে আজ্ঞা করিলেন ঃ "তবে তুমি বেদ ছাড়িয়া মহিষই ভাবিতে থাক।" শিষ্য তাহাই করিলেন। ক্রমে মহিষটিকে ভাবিতে ভাবিতে মন নিশ্চল হইল; তখন গুরু তাহাকে পুনরায় বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্য এবার কৃতকার্য হইলেন। বাহ্যপূজা কেবল মনকে সূক্ষ্মের দিকে লইবার জন্য, রূপ হইতে অরূপে যাইবার জন্য, নাম হইতে নামের উপরে উঠিবার জন্য। কেবল মনটাকে বাঁধিবার জন্যই এসব করা হইয়াছে। ব্যাসদেব রূপাদি কল্পনা করিয়া পরে বলিয়াছেন ঃ

"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যাঽনির্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।।"

হে জগদীশ, রূপহীন যে তুমি, ধ্যানে যে তোমার রূপ বর্ণনা করিয়াছি, হে অখিলগুরো! স্তুতি দ্বারা যে তোমার অনির্বচনীয়তা দূর করিয়াছি, তোমার বিষয় কেহ কিছু প্রকাশ করিতে পারে না, আমি তোমার স্তুতি করিয়া তাহা যেন প্রকাশ করিবার ভান করিয়াছি। সর্বব্যাপী যে তুমি, বিশেষ বিশেষ স্থান তীর্থ নির্দেশ করিয়া যে তোমার সর্বব্যাপিত্ব বিনাশ করিয়াছি; আমার বিকলতাঘটিত এই তিন দোষ তুমি ক্ষমা কর। রূপহীনের রূপকল্পনা, অনির্বচনীয় ঈশ্বরের স্তুতিবাদ এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে তীর্থে দর্শন—এ কেবল মনকে তাঁহার দিকে টানিবার জন্য হইয়াছে। তিনি কি কাশীতে আছেন, এখানে নাই? প্যালেস্টাইনে আছেন, ইংল্যান্ডে নাই? ইহা কে বলিবে? তবে যে তীর্থনির্দেশ, সে কেবল প্রাকৃত লোকদিগের মনে বিশেষ বিশেষ স্থূল দর্শনে ভক্তির সঞ্চার হইবে বলিয়া।

"প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা।।"

ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া কিংবা জলের কোন আশ্চর্য তেজ দেখিয়া কিংবা মহাপুরুষের জন্মস্থান বা কার্যক্ষেত্র বলিয়া তীর্থেতে লোকের প্রাণ ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাই তীর্থযাত্রার বিধান। আরম্ভে তীর্থ, কিন্তু কতদূর অগ্রসর হইলে আর তীর্থের প্রয়োজন থাকিবে না? আরম্ভে সাকার, পরে নিরাকার। যাঁহারা এইভাবে সাধন করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রামপ্রসাদ এবং শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টান্ত দেখুন; স্থূল হইতে কিরূপে তাঁহারা সূক্ষ্মের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি গান একবার শুনুন—

রামপ্রসাদী সুর—একতালা

"মন তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে।।
জাঁক জমকে করলে পূজা,
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা,
জানবে না রে জগজ্জনে।।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি,
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি,
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।।
আলো চাল আর পাকা কলা,
কাজ কি রে তোর সে-আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে,
তৃপ্তি কর আপন মনে।।
ঝাড়লণ্ঠন বাতির আলো,
কাজ কি রে তোর সে রোশনাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে,
দেও না জ্বলুক নিশি দিনে।।
মেষ ছাগল মহিষাদি,
কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে,
বলি দেও ষড় রিপুগণে।।
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল,
কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
(তুমি জয়) কালী বলে দেও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে।।"

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ না।।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি
জেনেও কি মন তা জান না?
মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন তাঁর
করতে চাও রে উপাসনা।।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা,
সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা।।
ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে
তাঁর আছে কি পর ভাবনা?
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।।
প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র,
কেবল রে তোর উপাসনা।

তুমি লোক-দেখানো করবে পূজা,
মা তো আমার ঘুষ খাবে না।।"

আরো গাইলেন—

"ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা।"

দেখুন, তিনি কোথা হইতে কোথায় উঠিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই, বৃদ্ধেরাও পাঠশালাতেই রহিয়া গেলেন, উপরে আর উঠিতে পারিলেন না! উঠিবেন কি করিয়া? এই দুর্গাপূজা আসিতেছে, কেহ কি চিন্তা করেন দুর্গাপূজা কি? তাহা অনুসন্ধান করিলে তবে তো উন্নতি হইবে, নতুবা ক খ-তেই আরম্ভ, ক খ-তেই শেষ। তাই একবার আমরা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখি দুর্গাপূজা কি? ইহার রহস্য ভেদ করিতে হইবে।

দুর্গা কে?

"দুর্গোদৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি।।
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা।।"

'দুর্গ' শব্দের অর্থ—দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ; 'আ'-কারের অর্থ নাশক। অতএব 'দুর্গা' শব্দের অর্থ—এই সকল দুর্গতিনাশিনী। তবে ইনি কে? যিনি ভগবান, যিনি মূলাশক্তি—সেই একজন; সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া যে এক শক্তি কাজ করিতেছে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী, জ্ঞানস্বরূপা, অমৃত-স্বরূপা, নিত্যস্বরূপা—সেই এক শক্তি।

"আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।।
দয়া নিদ্রা চ ক্ষুত্তৃপ্তিঃ তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিঃ পুষ্টি স্তথা শান্তির্লজ্জাধিদেবতা হি সা।।
বৈকুণ্ঠে সা মহাসাধ্বী গোলোকে রাধিকা সতী।
মর্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী হি সা।।
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে।।
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা হি ধরাসু সা।।
ব্রহ্মণ্যশক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু চ।
তপস্বিনাং তপস্যা চ গৃহিণাং গৃহদেবতা।।
নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীঃ সা বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধূনাং ত্রয়ী দুস্তর তারিণী।।"

তিনি আদ্যা, নারায়ণীশক্তি, সৃষ্টি-স্থিতি-অন্তকারিণী। দয়া, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, পুষ্টি, শান্তি, লজ্জা—ইহাদিগের অধিদেবতা তিনি। বৈকুণ্ঠে তিনি মহাসাধ্বী, গোলোকে তিনি রাধিকা সতী, ক্ষিরোদে তিনি মর্ত্যলক্ষ্মী, দক্ষকন্যা সতী তিনি। তিনি সরস্বতী, তিনি সাবিত্রী, বিপ্রাধিষ্ঠাত্রি দেবতা। অগ্নিতে তিনি দাহিকাশক্তি, সূর্যে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শৈত্যশক্তি। শস্যে প্রসূতিশক্তি তিনি, ধরায় ধারণাশক্তি তিনি। বিপ্রের ব্রহ্মণ্যশক্তি, দেবতার দেবশক্তি, তপস্বীদিগের তপস্যা, গৃহীদিগের গৃহদেবতা, নৃপদিগের রাজ্যলক্ষ্মী, বণিকদিগের লভ্যরূপিণীও তিনি। সংসারসিন্ধু পার হইতে দুস্তর তারক যে বেদ, তাহাও তিনি। ইহা দ্বারা কি বুঝিলাম? সেই সর্বব্যাপিনী নিত্যচৈতন্যশক্তি (That All-pervading Eternal Intelligent Force) তিনি। শাস্ত্রে তবে হিন্দুগণ এই শক্তি এইভাবে ধারণা করিয়াছেন। 'চণ্ডী' যদি কেহ পাঠ করেন, এই শক্তির লীলা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। চণ্ডীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কী গভীর, কী অপূর্ব, কী সুন্দর! দুর্গাপূজার সময় চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মর্মার্থ কে গ্রহণ করেন? চণ্ডীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিলে এ-জাতি এরূপ নির্জীব থাকিতে পারিত না। আমরা তাহা আলোচনা করিয়া দেখিব। সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন—এক প্রকাণ্ড রাজ্যাধিপতি। তিনি প্রথমে চণ্ডাল, পরে আপন আমত্যগণ কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে গমন করেন এবং সমাধি নামে এক ধনীর পুত্রও আপন স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক উৎপীড়িত ও হৃতসর্বস্ব হইয়া বনে গমন করেন। এই সুরথ রাজা ভোগী জীব। দেখুন, আমাদের মন কী প্রকাণ্ড রাজ্যবিস্তার করিয়া বসিয়া আছে! সুন্দর রথে আরোহণ করিয়া বিষয়ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। এই মন প্রথমে বাহিরের রিপু, পরে ভিতরের শত্রুরূপী কতকগুলি বৃত্তিদ্বারা কুপথে চালিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হয়, পরে বনে গমন করে—অনুতপ্ত হইয়া শান্তির অন্বেষণ করে, কিন্তু তখনো ইহার ভোগবাসনা ভিতর হইতে চলিয়া যায় কৈ? সুরথ রাজা মেধস ঋষির তপোবনে গিয়াও ভাবিতেছেন, তাঁহার রাজভাণ্ডার কী হইল। তাঁহার সঞ্চিত অর্থের কী সর্বনাশই হইতেছে! তাঁহার একটি প্রকাণ্ড হাতি, যে সর্বদা যুদ্ধে বিজয়ী হইত, সে উপযুক্ত আহার পাইতেছে কিনা। হায়! হায়! এমন সুন্দর শান্তিপূর্ণ স্থানে গিয়াও ভাবিতেছেন—হাতি! কিছুতেই মায়ার হাত, বাসনার হাত, এড়ানো যায় না! মানুষের কি দুর্দশা! যে-বন্ধনগুলিতে মানুষ সর্বনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার জ্বালা অনুভব করিয়া দূরে যাইতে, শান্তি আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিয়াও পুনরায় সেই বন্ধনের মূল সাংসারিক বিষয়গুলি চিন্তা করিতে থাকে, তখনো মনের ভিতর সেই বেগুনখেত। ভোগী মন এই সুরথ রাজা কিনা, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। সমাধি নামক ধনীপুত্র প্রকৃতই সমাধি অর্থাৎ যোগি-জীবনের পরিচায়ক। যোগী যদি ধনীর পুত্র না হইবেন তবে আর কে হইবে? যোগিগণ প্রকৃত ধনী, কিন্তু সমাধি অবস্থাতেও মায়া সর্বনাশ ঘটায়, যে-পর্যন্ত মুক্তযোগী না হওয়া যায়, সে-পর্যন্ত মনে শত শত সাংসারিক চিন্তা, পরিবারের চিন্তা উপস্থিত হইয়া বিঘ্ন ঘটায়। লোক যোগী হয় কখন? যখন সে দেখে, তাহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি তাহাকে মায়ায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে, নানাপ্রকারে

যতকিছু ধর্মভাবের নাশ ঘটাইতেছে; কিন্তু যোগ আরম্ভ করিলেও পুনরায় তাহাদিগের সম্বন্ধে চিন্তার উদয় হয়। দেখুন সমাধি কী করিতেছেন? যে স্ত্রী-পুত্রগণ কর্তৃক তিনি হৃতসর্বস্ব হইয়াছেন এবং যাহাদিগের উৎপীড়নে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের কিরূপে দিন চলিতেছে, তাহারা কোন রোগে কষ্ট পাইতেছে না তো—এই চিন্তায় অভিভূত। সুরথ যে ভোগীর পরিচায়ক এবং সমাধি যে যোগীর পরিচায়ক তাহা চণ্ডীর অন্ত্যভাগে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ভগবতীর পূজা করিয়া সুরথ রাজা প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি ভগবতীর শক্তি লইয়া মন্দ বৃত্তিদিগকে জয় করিয়া যেন শুদ্ধভাবে রাজকার্য—সংসারের কার্য নির্বাহ করিতে পারেন। সমাধি চাহিলেন কি? তিনি চাহিলেন জ্ঞান। 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি আসক্তিনাশ-কারক জ্ঞান ভিক্ষা করিলেন। যোগীর যাহা চাওয়া কর্তব্য তাহাই তিনি চাহিলেন। সুরথ এবং সমাধির মন তপোবনে বিকারপ্রাপ্ত হইলে ইহার শান্তির জন্য কাহার নিকট উপস্থিত হইলেন? সেই ঋষির নাম কি? মেধস ঋষি। 'মেধস' শব্দের ব্যুৎপত্তি—মেধ্ ধাতু অসুন্ প্রত্যয়। 'মেধস' অর্থ বুদ্ধি—স্মৃতি—প্রকৃত সত্যানুসন্ধানী বুদ্ধি। যখন বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, প্রকৃত তত্ত্বগুলি বাহির হইতে লাগিল। মেধস ঋষির নিকট তাঁহাদিগের বিকার জানাইলে এবং তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ

"তন্মাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।।"

ইহাতে আশ্চর্য হইও না, জগৎপতি হরির যোগনিদ্রা মহামায়া এই জগৎকে মোহিত করিতেছেন, সেই দেবী ভগবতী জ্ঞানীদিগেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতেছেন। তিনি প্রসন্না হইয়া চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই প্রসন্না হইয়া মানবের মুক্তিবিধান করেন। যাঁহা কর্তৃক বন্ধন তাঁহারই আরাধনা করিলে তিনিই আবার মুক্তি দেন। তিনি কে? তাঁহার উৎপত্তি কোথায়? মেধস বলিতেছেন ঃ

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রয়তাং মম।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।।"

সেই জগন্মূর্তি দেবী নিত্যা, এইসমস্ত তাঁহা দ্বারা ব্যাপ্ত। তথাপি আমার নিকট হইতে নানাভাবে তাঁহার উৎপত্তির বিবরণ শ্রবণ কর। নিত্যা যিনি তাঁহার আবার জন্ম কি? দেবতাদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, প্রকাশমানা হন, তিনি নিত্যা হইলেও তখন তাঁহাকে উৎপন্না বলা হয়। বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য যখন তাঁহার তেজ অনুভূত হয়, তখন বলা হয়—তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেবতাদিগের কার্যসিদ্ধি কি? জগতের সৃষ্টি, পালন, সংহার, পাপদৈত্য বিনাশ—ভগবানের শক্তি এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আবির্ভূতা হন। কি বাহ্য জগতে, কি আমাদিগের অন্তরের মধ্যে ব্যক্তিগত, জাতিগত, বিশ্বগত, ত্রিবিধ উন্নতির জন্য পাপ, সঙ্কট, বিঘ্ন, বিনাশ জন্য তাঁহার শক্তি কার্য করিতেছে, তখন আমরা বুঝিতে পারি, তখনি বলি তিনি উৎপন্না। প্রকৃতপক্ষে সেই শক্তি নিত্যা। মেধস এই শক্তিবিকাশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন। প্রথম সৃষ্টির সময়ে, কল্পান্তে সৃষ্টি লয় হইলে, ভগবান যোগনিদ্রাভিভূত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছেন। তাঁহার শক্তি তখন নিদ্রারূপে অবস্থিতা—শক্তি তখন আছে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এইমাত্র। তখন ভগবানের নাভিকমলে ব্রহ্মার অবস্থিতি। ব্রহ্মা কি? ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা। নাভিকমলে উৎপত্তি কেন? নাভিকমল শরীরের কেন্দ্রস্থল, ঐ স্থল হইতে মাতৃশক্তি প্রসৃত হয়, ইচ্ছা না হইলে শক্তির চালনা হয় না, যাবতীয় শক্তি ইচ্ছাকর্তৃক পরিচালিত হয়, তাই ব্রহ্মার স্থান নাভিকমলে। ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইল; কিন্তু কেবল ইচ্ছায় তো কার্য হয় না—ইচ্ছার বিরুদ্ধে মধু-কৈটভ দুটি অসুর দণ্ডায়মান। ব্রহ্মাকে নাশ করিতে এই দুই অসুর উদ্যত অর্থাৎ ইঁহারা সৃষ্টির বাধক হইলেন। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ তো লয় পাইয়াছে, তবে ইহারা কে? ইহারা সৃষ্ট নহে। হিন্দুশাস্ত্রমতে যে-পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাহা অনাদি। তন্মাত্রা, মূলতত্ত্ব অনাদি নিত্য রহিয়াছে; তাহার যোজনাদ্বারা সৃষ্টি হয় এবং যখন তাহার বিশ্লেষণ হয় তখনি সৃষ্টি লয় পায়। এই মধু-কৈটভ দুই জাতীয় তন্মাত্রা—The Principle of Softness and the Principle of Hardness। ইঁহারা ভগবানের কর্ণমলসম্ভূত —অর্থাৎ তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট নহে। "কর্ণমলাবিব দ্বাবেবাকস্মাজ্জাতৌ"—কর্ণমলের ন্যায় দুই-ই অকস্মাৎ জন্মিয়াছে, কেহ তাহাদিগকে সৃষ্টি করে নাই। যে-পর্যন্ত এই দুই জাতীয় তন্মাত্রা স্বাধীনভাবে থাকে, যে-পর্যন্ত এই দুইটিকে পরাজিত করিয়া একটির সহিত অপরটিকে ইচ্ছাধীন মিলাইয়া লওয়া না যায়—সে-পর্যন্ত সৃষ্টি হইতে পারে না। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, এই দুই তন্মাত্রা পৃথক থাকিয়া সৃষ্টির বাধা দিতেছে—ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে। এখন ইহাদিগকে নাশ করা চাই; ভগবানের নিদ্রাবস্থিতা শক্তিকে জাগরূক না করিলে, নিষ্ক্রিয় শক্তিকে ক্রিয়মাণা না করিলে এই তন্মাত্রাকে জয় করিয়া সৃষ্টি করিবে কে? ব্রহ্মা—সৃষ্টির ইচ্ছা, তাই সেই শক্তিকে জাগরূক করিতে প্রয়াস পাইলেন, তাঁহার আরাধনা আরম্ভ করিলেন ঃ

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।।

অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা।।"

তুমি স্বাহা অর্থাৎ দেবার্চন শক্তি, তুমিই স্বধা—পিতৃপুরুষ অর্চনের শক্তি, তুমিই যজ্ঞাদির মূল শক্তি, হে অক্ষরে, হে নিত্যে, তুমিই অ উ ম—এই তিন মাত্রায় অবস্থিত অর্থাৎ ওঁ, তুমি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী, আবার তুমিই অর্ধমাত্রাস্থিতা—যে মাত্রা অনুচার্যা, কেহ প্রকাশ করিতে পারে না অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত তুরীয় ব্রহ্মও তুমি। তুমিই সাবিত্রী, তুমিই পরাজননী।

"খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা।।"

তুমিই খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা পাপনাশিনী, অসুরমর্দিনী তুমিই।

শ্রুতি বলিতেছেন—"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।" আবার
"সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।।"

সুন্দর, অতি সুন্দর, অশেষ সৌন্দর্য অপেক্ষাও তুমি অত্যন্ত সুন্দর। "রসো বৈ সঃ" অতীব সুমিষ্ট, পরাৎপরা তুমি, তুমিই পরমেশ্বরী।

এইরূপে ব্র... অনেক স্তুতি করিলেন, পরে প্রার্থনা হইল—
(হে দেবি) "মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।"

এই দুই দুরাধর্ষ মধু-কৈটভ অসুরকে তুমি পরাভূত কর। সেই শক্তি জাগরূক হইল, ভগবান ক্রিয়াবান হইলেন; এই শক্তি চালনা করিলেন, মধু-কৈটভ নাশ হইল, তাহাদিগেরই মেদ হইতে মেদিনী হইল। আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন 'মেদিনী' মধু-কৈটভের মেদ হইতে সৃষ্ট; বাস্তবিকই মেদিনীস্থিত যত কিছু পদার্থ—কোমলতা ও কাঠিন্য এই দুই তত্ত্বের সম্মিলনে উৎপন্ন। যাহা কিছু দেখিতে পাই, ঐ বৃক্ষ, এই টেবিল, ঐ পাখা, আমার শরীর, আপনাদিগের শরীর, মেদিনীর যাবতীয় পদার্থ এই দুই প্রকারের তন্মাত্রাত্মক। কোন বস্তুতে হয়তো কাঠিন্য অধিকতর। আবার কোন বস্তুতে কোমলতা অধিকতর। দেখুন, মধু-কৈটভের এই কাহিনীর ভিতরে কি অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে। সৃষ্টির আদিতে ভগবচ্ছক্তির এইরূপ আবির্ভাব সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। পরে আসুন, মহিষাসুর বধ কি একবার আলোচনা করি।

ক্রোধের পরিচায়ক মহিষ; আমরা গোঁয়ার ব্যক্তিকে বলিয়া থাকি 'ওটা যেন মহিষ।' বাস্তবিক, সাধারণত যত জীব দেখিতে পাই তন্মধ্যে মহিষের ন্যায় ক্রোধনস্বভাব প্রাণী প্রায় দেখা যায় না। ক্রোধে কত জীব নষ্ট হইয়াছে, কত রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কত জাতির অধঃপতন হইয়াছে। যখন ক্রোধের উদ্রেক হয়, তখন যাহা কিছু শান্তিকর ও সুখকর সমস্ত দূর হয়। মহিষাসুর সমস্ত দেবতাদের দূর করিয়া দেয়। এইরূপে কোন মানুষ কি কোন জাতি ক্রোধাদি দ্বারা রসাতলে নিক্ষিপ্ত হইলে নানারূপ কষ্ট পায়। অবশেষে চৈতন্য হয়—হায় হায় কি হইল, একেবারে যে নাশ পাইলাম। তখন যে- দোষে নাশ, সেই দোষ দূর করিবার জন্য চেষ্টা জন্মে। যত দেবতাগণ (আমাদিগের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক বৃত্তির স্বভাব—এক একটি দেবতা) সকলে বিষ্ণু ও শিবের নিকট উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পালনী শক্তি এবং সংহারিণী শক্তির স্ফূর্তি করিবার চেষ্টা পান। পালনী শক্তি কি করেন? যাহাতে রাজ্য বজায় থাকে তাহারই চেষ্টা করেন, সর্বনাশ হইতেছিল যে মনোরাজ্য কি বহিঃরাজ্য, তাহা শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। সংহারিণী শক্তি কি করেন? শত্রু সংহার করিবার চেষ্টা করেন। পালনী শক্তির ব্রত রাজ্যরক্ষা, সংহারিণী শক্তির ব্রত শত্রুবিনাশ। এই দুই শক্তিরই সর্বপ্রধান দুইটি শক্তি, তাই অন্যান্য শক্তিগুলি ইহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যখন এই দুই শক্তির স্ফূর্তি হয়, তখন আর ভয় কি? তখন সকল শক্তিরই ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তেজঃস্ফূর্তি হয়।

"ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটিকুটিলাননৌ।।
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈকং সমগচ্ছত।।
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিবপর্বতং।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্।।"

মহিষাসুর কিরূপে দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়াছে, মধুসূদন দেবতাদিগের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়াই ক্রোধান্বিত হইলেন, শম্ভুও কোপাবিষ্ট হইলেন। বিষ্ণুর মুখ হইতে তখন এক মহৎ তেজ আবির্ভূত হইল, শিবের মুখ হইতেও তেমনি তেজ নির্গত হইল, অপর অপর দেবতাদিগের শরীর হইতেও ঐরূপ তেজ বাহির হইল। সমস্ত দেবতাদিগের তেজ একত্র হইল। তখন দেবতারা দেখিলেন, একেবারে দশদিক আলোকিত করিয়া জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় সেই ঘনীভূত তেজ শোভা পাইতে লাগিল। এই তেজই মূলশক্তি, এই তেজই আদ্যাশক্তি, ইনিই ভগবতী। মানুষ যখন পাপের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া ভগবানের পালনী ও সংহারিণী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে তখনি তাঁহার কৃপায় যাবতীয় শক্তির সমষ্টিভূতা তাঁহার অসুরনাশিনী শক্তি আবির্ভূতা হন। সেই শক্তি যখন হুঙ্কার করিয়া ওঠেন তখন আর পাপ থাকিবে কদিন? সেই হুঙ্কারে—

"চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।।"

সেই ব্রহ্মশক্তির বজ্রনির্ঘোষে সপ্তলোক দোদুল্যমান, সমুদ্র কম্পিত, বসুমতী টলমল, পর্বতগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া গেল। এত বড় শক্তির সহিতও যুদ্ধ করিতে মহিষাসুর অগ্রসর হইল! পাপ কি অল্পে ছাড়ে? কত ছল, কত ভাব ধরিয়া যুদ্ধ

করিতে লাগিল। কোন সময় মনে হয়, আমি এই যে ক্রোধ করিয়াছি ইহা তো উত্তম করিয়াছি, ইহা না করিলে আমার কর্তব্য-কার্যের ত্রুটি হইত। এই সময় মহিষাসুর সিংহ সাজিয়া আসিয়াছেন! এইরূপ নানা পশুমূর্তি ধরিয়া দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নানাভাবে ভগবতীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? একবার ব্রহ্মশক্তি সিংহনাদ করিলে কতক্ষণ পাপ টিকিতে পারে? ভগবতীর হস্তের খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, বাণ, ভুশুণ্ডী পরিঘের বিরুদ্ধে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? প্রকাণ্ড মহিষাসুর খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। দেবতাগণ 'জয় জয়' রবে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিলেন; মহাদেবীর স্তব আরম্ভ হইল। এমন অপূর্ব স্তব পৃথিবীতে আর কয়টি আছে জানি না। ক্রোধ ও তদনুচর বলবান রিপুবর্গ জয় করিতে পারিলে সাধকের আনন্দের সীমা থাকে না; উর্ধ্ববাহু হইয়া তখন ভগবানের পাষণ্ডদলনী শক্তির বিজয় ঘোষণা করিতে থাকেন। ভগবতী তখন ভক্তের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া এই বর দেন—ভক্ত ডাকিলে আসিব আমি—বিপদে পড়িলে যখনি ডাকিবে তখনি উপস্থিত হইব।

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের গূঢ় তাৎপর্য কি? শুম্ভ-নিশুম্ভ 'শুভ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইহারা দুই-ই শোভাপ্রিয়—বিলাসপ্রিয়। ইহারা তো পরিষ্কার দেখিতে পাই কাম ও লোভ। ইহারা যে কিরূপ কামুক তাহার তো প্রমাণই রহিয়াছে। ইহারা কিরূপ সর্বনাশ ঘটায় তাহার আর বিস্তর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এই বঙ্গদেশ, আমার বোধ হয়, যেন এখন শুম্ভ-নিশুম্ভের অধিকারে। কোন ভক্ত কি কোন জাতি যখন কাম ও লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিজের দুর্দশার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন আবার সেই আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন। আমরা যদি তাহার আরাধনা করি, অবশ্যই শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ হইবে।

রক্তবীজ মোহ। এক ফোটা রক্ত হইতে এক প্রকাণ্ড অসুরের জন্ম। এক বিন্দু মায়ার ভাব থাকিলেও তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ ভাব ধারণ করে। মোহ একেবারে সমূলে বিনাশ করিতে না পারিলে তাহার হস্ত হইতে মুক্তি নাই। চামুণ্ডা যেমন একবিন্দু রক্ত ভূতলে পতিত হইবে অমনি তাহা নিঃশেষ করিবেন, তবে তো রক্ষা, নতুবা রক্ষা নাই। রক্তবীজের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ঘোর সাধনার প্রয়োজন। চামুণ্ডাও সেই একই শক্তি—এক শক্তিই যখন যেভাবে কার্য করিতে হইবে তাহা তিনিই করিয়া লইবেন। আমরা কেবল তাঁহাকে ডাকিতে থাকিব। তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি উপস্থিত হইবেন। সমস্ত অসুর বিনাশ হইবে। তখন আনন্দে করতালি দিতে থাকিব। দুর্গাপূজায় যে চণ্ডীপাঠ হয় তাহার কি তাৎপর্য, আমরা দেখিলাম।

দুর্গামূর্তি কিভাবে কল্পিত অনেকেই শুনিয়াছেন। শুদ্ধা অপাপবিদ্ধা তেজোরূপা, তাই গৌরী। দশ হস্তে দশদিক রক্ষা করিতেছেন। ভক্ত-সিংহ বাহনে; লক্ষ্মী, সরস্বতী, বীরত্ব, জ্ঞান ইঁহার অন্তর্ভূত ইত্যাদি।

এখন একবার পূজার পদ্ধতির ভিতর কি আছে অনুসন্ধান করিয়া দেখি। পূজা তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী।

"সাত্ত্বিকী জপ যজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্তিতা।।
পাঠস্তস্য জপপ্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তদা।
দেবীসূক্তজপশ্চৈব যজ্ঞোবহ্নিযুতর্পণম্।।"

সাত্ত্বিকী পূজায় জপ যজ্ঞ করিতে হয়, নিরামিষ নৈবেদ্য দিতে হয়, পুরাণাদিতে কীর্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়, দেবীসূক্ত জপ করিতে হয়। যজ্ঞ অর্থ—বহ্নিতে তর্পণ।

"রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যঃ সামিষৈস্তথা।"

রাজসী পূজায় বলিদান আছে এবং সামিষ নৈবেদ্য প্রদান করা হয়।

"সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানাস্তু সম্মতা।।"

তামসী পূজায় সুরা ও মাংস উপহার দেওয়া হয়। জপও নাই, যজ্ঞও নাই, মন্ত্রও নাই। ব্যাধ প্রভৃতি দিগের এই পূজা। সকল প্রকার লোকের জন্যই পূজা বিধান করা হইল। তবে যাঁহারা ভাল মানুষ, তাঁহারা অবশ্য সাত্ত্বিকী পূজা করিবেন। সাত্ত্বিকীই সর্বোৎকৃষ্ট পূজা। যাঁহাদের মন নিতান্তই তমোগুণাক্রান্ত তাঁহাদিগের জন্য তামসী পূজা। যাহাই করুক না কেন, দেবীমূর্তি সম্মুখে করিয়া তাঁহাকে ডাকায় একটু ধর্মের ভাব আসিতে পারে এবং ক্রমে সেই ভাব দীপ্ত হইয়া সাত্ত্বিকী পূজার দিকে লইয়া যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে, নিতান্ত পৈশাচিক প্রবৃত্তির লোকও ক্রমে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজসী পূজা তামসী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠও বটে, কিন্তু তাহাও নিতান্ত নীচ। যাঁহার ভিতরে একটু প্রকৃত ধর্মভাব আসিয়াছে, তিনি সাত্ত্বিকী পূজা ভিন্ন অন্য কোন পূজা করিতে ইচ্ছা করেন না। রাজসী পূজায় যে বলিদান আছে, যাঁহারা প্রকৃত শাক্ত, তাঁহারা এ-বলিদান ইচ্ছা করিবেন না। রামপ্রসাদের ন্যায় শাক্ত আছেন কে? তিনি বলিদান সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শ্রবণ করুন—

"ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে,
তার আছে কি পর ভাবনা,
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা?"

আপনারা শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছেন, সুরথ রাজা যে লক্ষ বলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই পরলোকে এক এক খড়্গ লইয়া উপস্থিত হইল। ইহার তাৎপর্য কি? প্রাচীনবর্হিঃ রাজা অনন্ত-যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কত সহস্র প্রাণী বধ করিয়াছিলেন। যখন নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল, নারদ তাহাকে কি বলিয়াছিলেন?

"ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ।।

এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব।
সংপরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ।।" (ভাগবত)

হে প্রজাপতি, হে রাজন, ঐ দেখ, তুমি নিষ্ঠুরভাবে যে সহস্র সহস্র জীব যজ্ঞে বধ করিয়াছ, তাহারা তোমার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। যেমন তুমি পরলোকে উপস্থিত হইবে, তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া লৌহময় শৃঙ্গদ্বারা অমনি তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। শুকদেব বলিয়াছেন—

"যূপং কৃত্বা পশুং কৃত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমং।
যদি যাতি নরঃ স্বর্গং নরকং কেন গম্যতে।।"
(যোগ উপনিষদ্)

হাড়িকাঠ করিয়া পশু কর্তন করিয়া রক্তের কর্দম করিয়া যদি মানুষ স্বর্গে যায়, তবে নরকে যাবে কিসে? সুরথ রাজার কথা তো শাক্তদিগেরই শাস্ত্রে; তবে শাস্ত্র পড়িয়া তো দেখিতে পাই ছাগাদি বলি দিলে পরকালে তার ফল ভুগিতে হইবে। তবে শাস্ত্রে বলির বিধান হইল কেন? যাহাতে পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা শাস্ত্রে বিধান করিলেন কেন? আমার মনে হয়, কতকগুলি মানুষ রাক্ষসপ্রকৃতির আছে, তাহারা মাংস খাইবেই খাইবে, কিন্তু মাংস ভক্ষণে নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তির উদয় হয়। একেবারে মাংস খাওয়া কিছুতেই বন্ধ করা যাইতে পারিবে না। তবে যে-প্রকারের মাংসে ঐপ্রকার কুপ্রবৃত্তির উদয় কম হয় এবং যাহাতে সেই মাংস কম পরিমাণে খাওয়া হয় তাহার জন্য ছাগাদি পশু বলির বিধান করিয়া, যদি কেহ বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন তাঁহার ঘোরতর পাপ হইবে—এইরূপ বিধান হইল। ইহা ব্যতীত আরো একটি হেতু স্পষ্ট উপলব্ধি হয়ঃ কুপ্রবৃত্তি-উত্তেজক মাংস খাইবার সময়ে যদি মায়ের প্রসাদ খাইতেছি, এইরূপ ভক্তির ভাব মনে কার্য করিতে থাকে—এক ব্যক্তি মায়ের প্রতি ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইয়াছেন, চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে, এমন সময়ে যদি মাংস আহার করেন—ঐ গাঢ়তর সাত্ত্বিক শক্তির বিরুদ্ধে মাংসের তামসী শক্তি ততদূর কার্যকরী হয় না। কিন্তু তাহার একেবারে যে ক্রিয়া হয় না এমন নহে; তবে বীজবপন সময়ে—যখন মাংস উদরে পড়িতেছে সেই সময়ে ভক্তিভাবের প্রবল শক্তি দ্বারা তাহা চাপিয়া রাখিলে অনেকটা দমন থাকে। বোধহয় এইসকল কারণেই এইরূপ বলির বিধান হইয়াছে। ছাগ সম্বন্ধে তো এই যুক্তি। তবে মহিষ বলি দেওয়া হয় কেন? আমার বোধ হয়, শাস্ত্রে 'মহিষাসুর' নামটি আছে বলিয়াই মহিষ বেচারী দোষী হইয়াছে কিংবা ইহাও হইতে পারে যে, এই বলিদানের সৃষ্টি যেখানে এবং যখন, সেইখানেও তখন মহিষ ভক্ষণের নিয়ম ছিল। এতদ্ব্যতীত ছাগ ও মহিষ বলিদান সম্বন্ধে আরেকটি কারণ থাকা বিচিত্র নহে। মহানির্বাণ তন্ত্রে দেখিয়াছি—"কামক্রোধৌ (ছাগ বাহৌ) বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্বা জপং চরেৎ"—কাম ক্রোধ এই দুই বিঘ্নকারীকে বলিদান করিয়া জপ করিবে। ছাগ অত্যন্ত কামুক এবং মহিষ অত্যন্ত ক্রোধী, তাই ছাগ ও মহিষ বলিরূপে নিযুক্ত হইল। তাই বলি, এইরূপ ছাগ এবং মহিষ বলিদান না দিয়া "যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থকর নাশ, বলি দাও ষড়রিপুগণে।" এই ভাবের রাজসী পূজা ত্যাগ করিয়া যখন বুঝিতে পারিতেছেন বলির ফলে কষ্ট ভোগ আছে, বলি তুলিয়া দিয়া সাত্ত্বিকভাবে পূজা করুন। এখন পূজা করিবে কে? যে-শাস্ত্রে পূজার বিধি, সেই শাস্ত্রই বলিতেছেনঃ "স্বয়মসমর্থে ব্রাহ্মণং বৃণুয়াৎ"—নিজে না পারিলে তবে ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিবে। কিন্তু এই নিয়ম অনুসারে কি কেহ কার্য করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতি প্রায় কেহই নিজে পূজা করেন না, ব্রাহ্মণই বা কয়জনে করিয়া থাকেন। ভগবানকে ডাকিতে হইলে কি মোক্তার দ্বারা ডাকিতে হইবে? চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হইতেছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িতেছেন, আমি ততক্ষণ ঘরে বসিয়া প্রজার বাজে জমা আদায় করিতেছি কিংবা কবিগানের বন্দোবস্ত করিতেছি। এইভাবে পূজা করিলে কি ফল হইতে পারে? এদিকে যে-ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি হয়তো 'উষ্ট্র' স্থলে একবার বলিতেছেন 'উষ্ট', আবার বলিতেছেন 'উট্র' এবং সতৃষ্ণ নয়নে এক-একবার নৈবেদ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন! কি অপূর্ব পূজাই হইতেছে!! নিজে যদি না পার, তবে ব্রাহ্মণকে ডাক। যাঁহারা এই পথ দিয়া অগ্রসর হইতে চান, তাঁহারা নিজেরা পূজা করুন, তবে চাউল কলাটা না হয় পুরোহিত ঠাকুরকে বৎসর বৎসর দিবার 'এগ্রিমেন্ট' করিয়া দিন। যিনি নিজে অসমর্থ এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারও ব্রাহ্মণের নিকটে ভাব বুঝিয়া লইয়া ভক্তিসঞ্চার করা প্রয়োজন। যদি আমমোক্তার কি উকিল নিযুক্ত করিতেই হয়, তবে সচ্চরিত্র, শুদ্ধ, শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ যেন নিয়োগ করা হয়। আমরা যে উকিল কি আমমোক্তার দিয়া পূজা করাইয়া থাকি, তাঁহারা প্রায়ই মকদ্দমা নষ্ট ও তহবিল তসরুফ করিয়া থাকেন।

পূজার পূর্বে ভূতশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়; প্রথমত বায়ু-বীজ জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে করিতে হইবে দেহের জড়ভাব বায়ুর সঙ্গে উড়িয়া যাইতেছে। পরে বহ্নি-বীজ জপ করিতে করিতে পুনরায় প্রাণায়াম করিবে এবং মনে করিতে হইবে পাপ-কলঙ্ক সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তৎপর চন্দ্রবীজ জপ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে, চন্দ্রসুধায় সমস্ত শরীর প্লাবিত হইয়াছে। পরে বরুণ-বীজ জপ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে, সমস্ত শরীর জলে স্নিগ্ধ হইয়াছে। অবশেষে পৃথ্বী-বীজ জপ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে, দেহ-মন পৃথিবীর ন্যায় দৃঢ় এবং অটল হইয়াছে। পরে ভগবানের সহিত এক হইয়াছি—ভাবিতে হইবে। ইহারই নাম 'ভূতশুদ্ধি'।

তারপর পূজা আরম্ভ। বাহ্যপূজার পূর্বে মানসপূজা। মানসপূজা কিরূপে করিতে হয় তবে শুনুন—

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।।

তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্।।
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্।।
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চচামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।।
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা।।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকন্তথা।
অমাৎসর্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্তিতম্।।
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়া ক্ষমা জ্ঞানং পুষ্পং পঞ্চপুষ্প ততঃপরম্।।"

হৃৎপদ্ম আসন, সহস্রারচ্যুত অমৃত পাদ্য, মন অর্ঘ্য এবং সেই অমৃত স্নানীয় ও আচমন কল্পনা করিবে; আকাশতত্ত্বকে বসন, গন্ধতত্ত্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প, প্রাণকে ধূপ, তেজতত্ত্ব দীপ এবং সুধাম্বুধি নৈবেদ্য কল্পনা করিবে; অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্ব চামর, ইন্দ্রিয় কর্ম এবং মনের চাঞ্চল্য নৃত্য মনে করিবে। নিজের ভাবসিদ্ধির জন্য নানাপ্রকার পুষ্প দিবে। মায়ারাহিত্য, অনহঙ্কার, অনাসক্তি, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য, অলোভ—এই দশ পুষ্প এবং ইহার উপরে আরো পাঁচটি পুষ্প—অহিংসা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান। জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগের কাহার বাগানে ইহার কটি ফুল ফুটিয়াছে? মায়ের চরণে ইহার কটি ফুল দিতে পারেন?

অভিষেকের কয়েকটি মন্ত্র শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সেই নানকের আরতির গান যেরূপ গম্ভীর উচ্চভাব পরিপূর্ণ, ইহাও সেইরূপ। সমস্ত বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ একপ্রাণ হইয়া রাজরাজেশ্বরীর কি চমৎকার অভিষেক করিতেছে!

"ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যোদ্রুমা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাঙ্গণাঃ।।
অস্ত্রাণি সর্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা হ্রদাঃ।
দেব-দানবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
কীর্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তি স্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।
এতা ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মপালাঃ সুসংযতাঃ।।" ইত্যাদি।

তবে অভিষেক যে কি মহান ব্যাপার সকলেই দেখিলেন। এখন ষোড়শোপচারে পূজার মন্ত্রগুলি একবার দেখি। এই মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিতে আমি কেবল দুর্গাপূজার মন্ত্রে আবদ্ধ রহি নাই। শিবপূজার মন্ত্রও ইহার ভিতর সন্নিবেশ করিয়াছি। দুর্গাপূজা, শিবপূজা প্রভৃতির মূল তাৎপর্য যে এক তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। শিবপূজাপদ্ধতি যে-ভাবের উপরে গঠিত, দুর্গাপূজাপদ্ধতিও সেই ভাবের উপরে গঠিত। ভিত্তি একই, সীমাবদ্ধ জীব সীমাবদ্ধভাবে পূজা করিতেছে; কিন্তু জানিতেছে যাঁহার পূজা করিতেছি তাঁহার নিকটে আমার পূজাসামগ্রী—আমার উপহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; কেননা তিনি অনাদি, অনন্ত, ত্রিভুবনাধিপতি; তাঁহার আমার দত্ত দ্রব্যে কোন প্রয়োজন নাই, বরং আমিই তাঁহার নিকট হইতে এই দ্রব্যগুলি পাইয়াছি। কয়েকটি মন্ত্র তবে শ্রবণ করুন—

"সর্বভূতান্তরস্থায় সর্বভূতান্তরাত্মনে।
কল্পয়াম্যুপবেশার্থমাসনন্তে নমো নমঃ।।"
(মহানির্বাণতন্ত্র)

সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত যে তুমি, সর্বভূতের অন্তরাত্মা যে তুমি, তোমার উপবেশনের জন্য আমি এই আসন কল্পনা করিলাম; তোমাকে নমস্কার। তুমি তো সর্বব্যাপী, কিন্তু আমি কীটাণুকীট তাহা ধারণা করিতে পারি না, তাই এই আসন কল্পনা করিলাম।

"মূলপ্রকৃতিরূপেণ সূয়তে সচরাচরম্।
পূজামহং বিধাস্যামি স্বাগতন্তে মহেশ্বরি।।" (মাৎস্যসূক্ত)

তুমি মূলপ্রকৃতিরূপে এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিতেছ, (আমি তো কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি), সেই আমি তোমার পূজা করিব; কিন্তু মন অত বড় তোমাকে ধারণা করিতে পারে না, অথচ তোমাকে চাই বলিয়াই বলিতেছি—এস, এস।

"যৎপাদজলসংস্পর্শাচ্ছুদ্ধিনাপ জগৎত্রয়ং।
তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়াম্যহম্।।
পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎ প্রসাদতঃ।
তস্মৈ সর্বাত্মভূতায় আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে।।"
(মহানির্বাণতন্ত্র)

যাঁহার পাদজল স্পর্শ করিয়া ত্রিজগৎ পবিত্র হয় তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালনের জন্য আমি পাদ্য কল্পনা করিতেছি। যাঁহার প্রসাদে রাশিকৃত পরমানন্দ সম্ভোগ হয়, সর্বাত্মভূত যে তিনি তাঁহাকে আনন্দার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি।

"উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্বা যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্যৈতে পুনরাচমনীয়কম্।।"
(বৃহন্নন্দিকেশ্বর)

উচ্ছিষ্ট কি অশুচি হইলে, যাঁহাকে স্মরণ করিলেই শুদ্ধ হয়, সেই তোমাকে এই আচমনীয় দিতেছি।

"তাপত্রয়বিনাশার্থমখণ্ডানন্দহেতবঃ।
মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রসীদঃ পরমেশ্বর।।" (মহানির্বাণতন্ত্র)

ত্রিতাপ বিনাশ জন্য যিনি অখণ্ডানন্দহেতু, সেই তোমাকে মধুপর্ক দিতেছি। হে পরমেশ্বর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

"পরমানন্দবোধাব্ধিনিজমগ্নমূর্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়ামীহ দেবি তে।।"
(বৃহন্নন্দিকেশ্বর)

পরমানন্দ বোধরূপ সমুদ্রে যে তুমি ডুবিয়াই আছ,

হে দেবি! সেই তোমার এই সাঙ্গোপাঙ্গ স্নান কল্পনা করিতেছি।

"সর্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে।
বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে।।"
(মহানির্বাণতন্ত্র)

সমস্ত আবরণহীন যে তুমি, মায়ায় লুকাইয়া রাখিয়াছ যে তেজ তুমি, সেই তোমার পরিধানের জন্য এই বস্ত্র কল্পনা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার।

"বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্বশোভৈকযোনয়ে।
মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে।।" (ঐ)

এই বিশ্বের আভরণ যে তুমি, সমস্ত বিশ্বশোভার এক মূলাধার যে তুমি, তোমার এই কল্পনাত্মক মূর্তি ভূষিত করিবার জন্য এই অলঙ্কারগুলি দিতেছি।

"গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যেন গন্ধংধরাধরা।
তস্মৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে।।" (ঐ)

যে তুমি গন্ধতন্মাত্রা দ্বারা এই গন্ধধরা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছ, সেই যে পরমাত্মা তুমি, তোমাকে এই পরম গন্ধ অর্পণ করিতেছি।

"পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্মিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্।।" (ঐ)

এই যে সুন্দর সুগন্ধ মনোহর দেবনির্মিত পুষ্প অর্থাৎ তোমারই নির্মিত পুষ্প, ভক্তিপূর্বক তোমায় নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর।

"পরং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম জগদেকং সনাতনি।
ভূতয়ে মম দেবেশি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।"
(মাৎস্যসূক্ত)

পরমজ্যোতির্ময়ী পরব্রহ্মস্বরূপা যে তুমি সনাতনী, আমি আমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে এই দীপ দিতেছি, গ্রহণ কর।

এক-একটি মন্ত্রের ভিতরে কত উচ্চ উচ্চ ভাব; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রত্ব কোথায় উড়িয়া যাইতেছে! যাঁহারা দুর্গামূর্তি পূজা করেন এইভাবে করুন। সকলের জন্যই যে মূর্তিপূজার আবশ্যক তাহাও নহে, কিন্তু কাহারো কাহারো যে প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার একটি বিশ্বাস আছে, এইরূপ মূর্তি কি সাকার কোন পদার্থের পূজা কোন কোন লোকের মধ্যে আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। খ্রীস্টানদিগের মধ্যে তো মূর্তিপূজার কোন বিধান নাই, তথাপি রোমান ক্যাথলিক দলে খ্রীস্ট ও তাঁহার মাতার মূর্তি পূজা হইয়া থাকে। শিখধর্মে এইরূপ পূজা নিষেধ, তথাপি শিখগণ কি করিয়াছেন? তাহাদিগের ধর্মমন্দিরে গুরু-প্রণীত গ্রন্থের পূজা হইয়া থাকে; স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তো সাকারপূজার বিরোধী ছিলেন, এখন শুনিতে পাই তাঁহার কতকগুলি অনুচর নাকি তাঁহার উত্তরীয় এবং পাদুকা পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। স্থূলবুদ্ধি মনুষ্য একটা কিছু সাকার না পাইলে কিছুই ধারণা করিতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়ও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। এমন অনেক লোক আছেন তাঁহাদিগকে ঈশ্বর নিরাকার, নিরঞ্জন, নির্বিকল্প, চিন্ময় বলিলে তাহাকে শূন্য বলিয়া মনে করে, নাস্তিকতায় গড়াইয়া পড়ে। এইজন্যই বোধহয় পাশ্চাত্য ইতর ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা এই দেশীয় ইতর লোক সুশীল, সচ্চরিত্র ও অপেক্ষাকৃত অধিক ধর্মভীরু।

এতদ্ভিন্ন আরেকটি কথা আছে—হিন্দুশাস্ত্রে মূর্তিপূজার যে বিধান আছে তদনুসারে পূজা করিতে গেলে, একটু ভাব থাকিলে যেমন বাহিরের বস্তুগুলি সংগ্রহ করিতে থাকিবেন, অমনি মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মধ্যে ভগবানের স্বরূপগুলি স্ফুট হইতে থাকিবে; যেমন প্রদীপটি লইয়া উপস্থিত হইবেন অমনি তাঁহার জ্যোতির্ময় স্বরূপ মনে আসিবে; আবার যখন ভূষণ উপস্থিত করিবেন, তখন তিনি যে সকল শোভার আধার—এই ভাবটি জাগরূক হইবে; পুষ্প চরণে দিবার সময়ে তাঁহার পবিত্রতা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রগুলি এইরূপে নানাভাবে ভগবানের স্বরূপটি মনে উদ্দীপন করিয়া দেয়। যাঁহারা বাহ্যপূজা করেন না অথচ মনটি উন্নত হয় নাই, তাহাদিগের বিশেষ আশঙ্কা এই—হয়তো ভগবানের একটি ভাব মনে আসিল অপরগুলি ভুলিয়া গেলেন; বাহিরের উপকরণগুলি সংগ্রহ করিতে হয় না বলিয়া তদনুযায়ী ভাবও হৃদয়ে না আসিতে পারে। একটি পুষ্প সম্মুখে ধরিলে যে-ভাব হয়, যদি ফুলটি সম্মুখে না থাকে, হয়তো সে-ভাবের উদ্রেকই হয় না। তবে সকলের সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না। অনেক লোক আছেন যাঁহাদের বাহ্যপূজার প্রয়োজন হয় না। যাঁহারা বাহ্যপূজা করিবেন, একবার শাস্ত্রের মর্ম গ্রহণ করুন—প্রকৃত পূজা যাহাকে বলে তাহাই করিতে আরম্ভ করুন। দুর্বলপ্রাণ সবল হইবে, মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত হইবে। তেজোময়ীর পূজা করিতে গিয়া যদি অগ্নি সঞ্চয় না হইল, তবে আর কি পূজা হইল? প্রকৃত দুর্গাপূজা করিলে মন, প্রাণ ও শরীর অগ্নিময় হইয়া যাইবে, বাক্য অগ্নিবর্ষণ করিবে, দেশময় অগ্নি ছড়াইয়া পড়িবে, যত পাপ কলঙ্ক ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, এই নির্জীব জাতি আবার দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

"শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং,
মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং,
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ।।"* ❑

---

* সরস্বতী লাইব্রেরী (৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা) থেকে প্রকাশিত 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব' গ্রন্থটি (৫ম সং) এখানে সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সংগ্রহ ঃ স্বামী চেতনানন্দ।

আগমনী

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

তিনি নেমে আসছেন, ভেসে আসছেন
নদীর ওপর দিয়ে...
ওপারে ঐ শ্রান্ত কলকারখানার
আলোর বর্শা বুকে বিঁধে
নদী যখন উথলে উঠেছে,
ছোট ছোট জলের আলো
যখন দীপদীপ করছে;
নাওয়ের মধ্যে
মাঝিমাল্লাদের রাত্রিকালীন রসুইয়ের ব্যস্ততা,
কেউ কেউ ভাসিয়ে দিয়েছে
ভাটিয়ালির ক্ষণজন্মা প্রদীপগুলি
পরপারের দিকে...
চারিদিকের জনশ্রুতি মুছে দিয়ে
নেমে আসছে তাঁর
নরম দুটি চোখের পাতা।

শরৎ মানেই

গীতা সরকার

শরৎ মানেই আকাশে টইটম্বুর মেঘেদের আনাগোনা
খালে-বিলে-জলে তার আলপনা
শরৎ মানেই আঙিনায় শিউলিঝরা
সেইসঙ্গে ঢাকের কাঠি নড়ে ওঠা
শরৎ মানেই সোনা-ঝরানো রোদ
দিগন্তব্যাপী কাশফুলের হিন্দোল
শরৎ মানেই বুকের মধ্যে খুশির বানভাসি
অভিজাত অভাজনের গালভরা হাসি
শরৎ মানেই ঐশ্বর্যময়ী মহামায়ার মধুর আগমন
তারি মাঝে একবছরের চিত্তশুদ্ধির অবগাহন।

জীবন

নিমাই মুখোপাধ্যায়

আমার কেন মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে
উড়তে ইচ্ছে করে।
আমার কেন মাঝে মাঝে সমুদ্রের ওপর
দিয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করে।
কেন আমার ইচ্ছে করে হিমালয়ের চূড়ায় উঠতে।
আসলে এই ইচ্ছেগুলো নিয়েই জীবন।
এই ইচ্ছেগুলো না থাকলে জীবন থেমে যেত।

"আরো আরো আরো দাও প্রাণ"

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বাসনার আগুনে পুড়ছে বুক, পুড়ছে মুখ
রক্তের ফেনিল উচ্ছ্বাসে
শব হয়ে যায় অনায়াসে গোটা মানুষ
চকিতে চলনে বলনে চঞ্চল দুরন্ত দেহে
নেমে আসে হিমবাহ।

এমন তো ছিল না কথা শরতে কিংবা হেমন্তে
বসন্ত হয়েছে বন্দী জল্লাদের হাতে
এরপরেও মা তুমি নীরবে আসবে যাবে!

তোমার খড়্গ একবার নড়ে উঠুক এবং ত্রিশূল
জল্লাদেরা ঝলসে যাক তোমার বহ্নিরোষে
প্রহর জুড়ে শুরু হোক ত্রিতাল
অবুঝ-সবুজ সবার মাঝে ছড়িয়ে দাও তান
প্রার্থনা তাই বারে বারে তোমার কাছে—
"আরো আরো আরো দাও প্রাণ।"

স্বপ্ন কথা

শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিদিন ইথার তরঙ্গে ভেসে আসে
অজস্র ভাঙচুরের শব্দ
অচেনা এক হিংস্র অন্ধকার
ঘিরে ফেলে আমাদের চারপাশ
প্রচণ্ড দাবদাহে পুড়ে যায় পৃথিবীর শরীর
বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের সবুজ
কেড়ে নেয় নিরাপত্তা
স্বপ্নের পাহাড়ে ধস নামে মুহুর্মুহুঃ।
বিষণ্ণ শতাব্দীর সঙ্কটের শীতে
সহস্র ভাঙচুরের মাঝে দাঁড়িয়ে
মনে হয় আরেকটা ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণ
খুব কাছেই।
তবুও অজস্র মৃত্যু আর ধ্বংসের মাঝখানে
আবারও মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় জীবন
আবার স্বপ্নবিলাসী রোদ ওঠে হেসে
স্থাবর জঙ্গম সব প্রাণীদের বুকে।
একটুকরো গোপন সবুজ জমিনে মানুষ
ছড়াতেই থাকে তার স্বপ্নের বীজ
ধ্বংস ও নির্মাণ এইভাবে চিরকাল
গেয়ে যায় তার জন্মমৃত্যুর গান।।

শ্রীকামাখ্যাপ্রশস্তিঃ

রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

জয়তু জয়তু দেবী কামনাম্না প্রসিদ্ধা,
জয়তু জয়তু দেবো ভৈরবঃ সাক্ষিরূপঃ।
জয়তু জয়তু তত্র ব্রহ্মপুত্রো নদঃহসৌ,
জয়তু জয়তু দেশঃ কামরূপাভিধানঃ।।১।।
পিতৃকৃতপতিনিন্দাং শৃণ্বতী যজ্ঞভূমৌ
নহি সহনসমর্থা শূলিনঃ পূর্বপত্নী।
পতিচরণসরোজে চেতসা ধারয়ন্তী
হৃদয়মণিকুটিরে পূতদেহং জহৌ সা।।২।।
পশুপতিঃ রথরুষ্টো জ্ঞাতবার্তঃ কপর্দী
প্রমথপরিবৃতঃ সন্নাগতস্তত্র সদ্যঃ।
শ্বশুরযজনহিংসাং কারয়িত্বা গণৈস্তৈ-
র্নিপতিতশবদেহং সংবহন্ ভ্রাম্যতি স্ম।।৩।।
হরিরপি ধৃতচক্রঃ সৃষ্টিচক্রং রিরক্ষু-
র্দ্রুততরমনুধাবন্ গুপ্তভাবেন তত্র।
শশধর*সমসংখ্যং খণ্ডখণ্ডং চ কৃন্তন্
প্রিয়পতিধৃতকায়ং পাতয়ামাস সত্যাঃ।।৪।।
অচলশিখরমূর্ধ্নি ব্রহ্মপুত্রস্য তীরে
ভুবি পতিতং বরাঙ্গে কুব্জিকাপীঠতীর্থে।
সুরগণনরকাদ্যৈঃ পূজিতা সিদ্ধবিদ্যবঃ
তদবধি বহুকালং জাগ্রতী গ্রাবরূপা।।৫।।
মহতি তপসি মগ্নে ভূতনাথে সকামাং
হিমগিরিতনুজায়াং দৃষ্টিমাক্রষ্টুঃ কামম্।
কুসুমবিশিখমুক্তা-উদ্যতং দৃপ্তকামং
হরনয়নজবহ্নিঃ উষ্মশেষং চকার।।৬।।
রতিপতিরিহ পশ্চাৎ কৃত্তিবাসঃ প্রসাদা-
দনলদহনদীপ্ত্যা প্রাপ্তবান্ পূর্বকায়ম্।
অলতবিষয়োঽয়ং কামরূপাভিধানং
বসতিরিহ গৃহীতা বিশ্বমাত্রা চ পিত্রা।।৭।।
পূর্বতনে মঠে ভগ্নে বিশ্বকর্মবিনির্মিতে।
চক্রে শিলাময়নুত্নং নরনারায়ণো নৃপঃ।।৮।।
নমস্তে দেবি কামাখ্যে নীলপর্বতবাসিনি।
নমস্তে চ মহাদেব হে উমানন্দ ভৈরব।।৯।।
স্মরহরমহিলে স্বকুকৃতি সলিলে
মোহান্ধনয়নং, জননি।
নষ্টবহিত্রং মগ্নং পুত্রং
তারয়াকিঞ্চনতরণি।।১০।।

বঙ্গানুবাদ

কাম নামে প্রসিদ্ধ দেবীর জয় হোক, জয় হোক সাক্ষী ভৈরবদেবের; সেখানে অবস্থিত সেই ব্রহ্মপুত্র নদের জয় হোক। জয় হোক কামরূপ নামক দেশের।।১।। যজ্ঞভূমিতে পিতা দক্ষ-কৃত পতিনিন্দা শুনে শূলধর মহাদেবের প্রথমা পত্নী সতীদেবী সহ্য করতে পারেননি, মনে মনে নিজ হৃদয়ের মণিকুটিরে পতির চরণকমল-যুগল ধারণ করে তিনি পবিত্র দেহ ত্যাগ করেন।।২।। অনন্তর সেই সংবাদ অবগত হয়ে ক্রুদ্ধ কপর্দী[1] পশুপতি প্রমথ[2]গণের সঙ্গে সদ্য সদ্য সেখানে উপস্থিত হলেন এবং অনুচরগণের দ্বারা শ্বশুরের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়ে নিপতিত মৃতদেহ বহন করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করলেন।।৩।। সৃষ্টিচক্র রক্ষায় ইচ্ছুক বিষ্ণুও চক্রধারী হয়ে দ্রুততর গতিতে অলক্ষ্যে সেখানে এসে পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং প্রিয়পতিবাহিত সতীদেবীর দেহকে একান্ন অংশে খণ্ড খণ্ড করে ভূতলে নিক্ষেপ করেন।।৪।। তারপর বহুকাল ধরে ব্রহ্মপুত্র তীরে পর্বতশিখরের শিরোদেশে কুব্জিকা পীঠতীর্থে দেবীর ভূপতিত বরাঙ্গে শিলামূর্তিতে অধিষ্ঠিত জাগরিত সিদ্ধবিদ্যা দেবগণ এবং নরক প্রভৃতির দ্বারা পূজিতা হন।।৫।। ভূতনাথ মহাদেব মহাতপস্যায় মগ্ন হলে হিমগিরি নন্দিনীর ওপর তাঁর সপ্রেম দৃষ্টি আকর্ষণ কামনায় পুষ্পশর নিক্ষেপে উদ্যত বলদৃপ্ত কামকে সংহারমূর্তি দেব তাঁর নয়নজাত অগ্নি দিয়ে ভস্মে পরিণত করে।।৬।। পরে রতিপতি কাম এখানে কৃত্তিবাসের[3] অনুগ্রহে অনলদাহদীপ্তির সঙ্গে পূর্বদেহ ফিরে পেলেন; তাই এই দেশের নাম হলো 'কামরূপ'। বিশ্বের মাতাপিতাও এখানে চিরবসতি গ্রহণ করলেন।।৭।। বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত প্রাচীন মঠ ভগ্ন হলে রাজা নরনারায়ণ দেবীর শিলাময় নতুন মন্দির নির্মাণ করেন।।৮।। হে নীল পর্বতবাসিনী দেবী কামাখ্যা, হে মহাদেব উমানন্দভৈরব আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করি।।৯।। জননী স্মর[4]-হরজায়া, স্বকৃতকুকৃতির সমুদ্রসলিলে উত্তরণের জলযান হারিয়ে মোহান্ধ নেত্রপুচ্ছ মজ্জমান অকিঞ্চনজনের তরণী তাকে পার করুন।।১০।।

---

* 'অঙ্কস্যবামাপতি' রিতিন্যায়াৎ—শশধরঃ=১, শরাঃ=৫; ১৫=৫১।

১ কপর্দ—শিবের জটার নাম; ক্রুদ্ধ শিবের ছিন্ন জটা থেকে উৎপন্ন বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন।

২ প্রমথ—শিবের অনুচরবৃন্দ।

৩ কৃত্তিবাস মহাদেবের নামান্তর। কৃত্তি—চর্ম, চর্ম শিবের বাস বা পরিধেয়। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম বা গজচর্ম পরিধান করেন।

৪ স্মর—কামদেবের নামান্তর, স্মরহর—শিব।

আত্মনিবেদন

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রভাতের বেলা যতটুকু মোর তোমারে সঁপিতে চাই,
সবখানি ফের দ্বিগুণ করিয়া সন্ধ্যায় ফিরে পাই।
যাকিছু আমার মনের কামনা
অস্থির যত ক্ষিপ্ত বাসনা,
যত কিছু মোর দুঃখ-বেদনা, অভিযোগ 'নাই-নাই'
মত্ত পিপাসা, সুপ্ত লালসা, কিছুই রহে না তাই।

আমার 'আমি'রে ভুলিয়া তখন তোমাতে ডোবে এ প্রাণ
তৃপ্তি-সাগর সঙ্গমে হয় চাওয়া-পাওয়া অবসান
ছোট 'আমি' লয়ে কখন যে আমি
তোমার মাঝারে মিশে যাই স্বামি!
ফিরে চেয়ে দেখি সকল পূজার হয়ে গেছে অবসান
পরশমণির ছোঁয়ায় কখন সোনা হয়ে গেছে প্রাণ!

ছড়ায়েছি আমি রেণু রেণু হয়ে তোমার নীলিমা তলে
তোমার লীলায় মোর লীলাখেলা মিশে গেছে পলে পলে
নিঃশ্বাসে মোর তোমারি চেতনা
অনুভূতিময় তোমারি দ্যোতনা
দেহ ধূলিকণা গলে গেছি কোন অমৃত-হ্রদের জলে
আমার 'আমি'টি মালা হয়ে শুধু দুলিছে তোমার গলে।

অদৃশ্য শত্রুর হাতে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

অদৃশ্য শত্রুর হাতে আমরা আজ বন্দী পাতালে
হাত-পা-বাঁধা অন্ধকারে কী নিপুণ যন্ত্রণার জালে
সমর্পিত। অসহায় অস্পষ্ট বিপন্ন আকাশ
মাঝে মাঝে আলো দেয়, অন্যথায় রুদ্ধ তমসায়
জটিল আবর্ত যেন চারিদিকে কেবল রচনা :
ষড়যন্ত্র, ক্লান্তি, ভয়, পদধ্বনি, সমস্ত নিহত বিশ্বাস,
শুভবোধ!—মৃতের স্তূপের মধ্যে মৃতেরই দুঃসহ ভূমিকায়
শুধু দিনযাপনের গ্লানি—ভুলে গেছি সমস্ত শুদ্ধ চেতনা।

কার কাছে নালিশ করব? ঈশ্বর আরো অসহায়।
করুণ করুণাঘন—তাঁরও দুটি দীর্ঘ চোখে প্রেম ভালবাসা,
শয়তানের হাতে বন্দী, অক্ষম অসহ্য বিষাদে
মানুষের দুঃখে তিনি কষ্ট পান, মানুষের কল্যাণের কথা,
মুক্তির সুসমাচার, পৃথিবীর জন্য তার সমস্ত উচ্চাশা,
শিকলে নিষ্পিষ্ট সব। বন্দী ভগবানও বুঝি কাঁদে
একা একা অসহায় কারাগারে। উদ্যানের সরোবর, লতা,
বৃক্ষ, ফুল সমস্ত শুকিয়ে গেছে—গান ভুলে গেছে
পাখিরাও। অব্যক্ত আকুতি শুধু সকলের শৃঙ্খলিত হাতে।

ফুল জমে জমে আজ সমস্ত পাথর হয়ে গেছে।
আমরা নক্ষত্রচ্যুত দেবতার মতো একদিন
হয়তো ছিলাম—কিন্তু আজ পৃথিবী ভীষণ জ্যোতিহীন
দেহে মনে। ক্রমশই কী এক দারুণ জটিলতা
আমাদের চারিদিকে প্রসারিত; নিষ্ক্রমণের
কোন পথ নেই আর। চারিদিকে অদৃশ্য শত্রুর পাহারা।
নানান আবর্তে ক্রমে সঙ্কুল শুদ্ধ মানবতা,
সততার অপমৃত্যু; ব্যক্তি কিংবা জনজীবনের
দাঁড়াবার মতো কোন ভিত্তি নেই। উত্তর আকাশের তারা
তাও আজ কত ম্লান! মুছে গেছে সমস্ত সূর্যের সততা।
অন্ধকারে নিরাশ্রয় আমাদের অশ্রুমগ্ন রক্তাক্ত বর্ম নির্মোক
শক্ত করে হাত-পা-বাঁধা আমাদের ঈশ্বরের
প্রতিকারহীন শুধু শোক।

সম্পর্ক

উমা দে শীল

জীবনের কোন কোন অধ্যায় শেষ হয়ে যায়।
শেষ করে দিতে হয়,
নইলে যে পথচলা হয়ে ওঠে ভারি!
গাছ ছিল নয়নশোভন,
ছায়া দিল, ঠাঁই দিল পাতাছাওয়া কোলে
কেউ আর কুঠারেতে মিলে তুলে নিল পিঠে
পথচলা হয়ে ওঠে ভারি।

দিনাবসান

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

চরণে চিহ্ন ছায়ার মতন কাঁপে
দূর মেঘালয়ে স্বপ্নোত্থিত চাঁদে
কত দূরে ঘর নির্জন ছবি ছবি
সেখানে কেবল একটি মানুষ কাঁদে

কোন চঞ্চল চকিত চাহনি কোথা
একটি বৃক্ষ ফুটে উঠেছিল ফুলে
তার কাছে নীল সরোবর মায়ামৃগ
তবুও তৃষ্ণা মহাসাগরের কূলে

ভাল ছিল ভুলে সকলি ভুলিয়া থাকা
অথবা ছিন্ন কুসুম চরণে ত্বরা
ভাল ছিল ভোরে কুয়াশায় হেঁটে ফেরা
স্মরণে শিশির শস্যগন্ধে ভরা

এইবার ফিরে যাওয়ার সময় হলো
সহজে যাহারা এসেছিল গেছে দূরে
চোখের কোণায় তীক্ষ্ণ জলের ফোঁটা
বিদায়ের বাঁশি বাজিবে করুণ সুরে

যাও যাও প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় এস
শেষ রাত্রিটি জাগিব দুজনে একা
পৃথিবীর মাটি নদীর নরম জলে
ঘুমোবার আগে শেষবার চেয়ে দেখা ...

জননী জন্মভূমি

মনোজ খাটুয়া

জ্বরে কাঁপি
ফুটপাতে শুয়ে
ধুলোয় শরীর ভরে
বৃষ্টিতে ফেরা যায় ধুয়ে।

মাটি হলো 'মা'
তাই শান্ত হয়ে
মাটিতেই শুই
ধন্য মাগো জন্মভূমি তুই
তাই আমি মাটিতেই শুয়ে
তোর কোল যেন রোজ ছুঁই।

বেলাশেষের কবিতা

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের বেলা শেষে
আজ ইচ্ছে করে
গেয়ে যেতে জীবনের গান
দুহাত অঞ্জলি করে
বলে যেতে ইচ্ছে করে—
হে ঈশ্বর করুণা তুমি
এ জীবন তোমারই তো দান!

জীবনের যাত্রাশেষে
হে জীবনদেবতা
তুমি দিয়ে যাও মোরে
জীবনের সেই পরিচয়
যে-পরিচয় পাইনি বলে
জীবনকে ভেবেছি আমি
এ যেন শুধু মায়াময়!

জীবনের সত্যকে
কখনো করিনি অন্বেষণ
এটা ওটা শুধু চেয়ে চেয়ে
কেটে গেল সারাটা জীবন।
যা চেয়েছি
পাইনি বলে যে-ব্যথা—
যে-ব্যথা হে ঈশ্বর
তোমার প্রতি জাগায়েছে ক্ষোভ
যা চাইনি
তা যে পেয়েছি আবার
সে-কথা রাখিনি মনে
তাই তো তোমার প্রতি এত অসন্তোষ।

আজ সত্যেরে জেনেছি আমি
পেয়েছি জীবনের সত্য পরিচয়—
সেই পরিচয় জেনেছি বলে
পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা
আমার কাছে পবিত্র, এত মধুময়।

এখনো

দীপাঞ্জন বসু

একটা অপরিচিত আবহের মধ্য দিয়ে চলেছি
এমন অপ্রাকৃতিক ঝড়, বেসামাল হচ্ছি বারবার
তবু এখনো আমি পায়ের ওপরই দাঁড়িয়ে আছি
হয়তো-বা চলার গতি হয়েছে কিছুটা মন্থর।

একটা অজানা সুড়ঙ্গের পথে চলেছি
চারপাশ নিশ্ছিদ্র তমসাময়
মস্তকে আঘাতও পাচ্ছি বারবার
তবু এখনো মাথা সোজা করেই চলেছি
হয়তো-বা চলার গতি হয়েছে কিছুটা মন্থর।

একটা অদেখা প্রান্তর ধরে চলেছি
সুদূর সীমাহীন অদৃশ্যে
আবক্ষ তৃষ্ণায় ক্লান্তির বাঁধন জড়ায় বারবার
তবু এখনো বুক টান করেই হেঁটে চলেছি
হয়তো-বা চলার গতি হয়েছে কিছুটা মন্থর।

এতদিন একটা বিশ্বাস নিয়ে চলেছি
মাঝে মাঝে তাতে নাড়া লাগে
এতদিন যে সততা নিয়ে চলেছি
মাঝে মাঝে তাতে ধাক্কা লাগে
এতদিন যে প্রেম নিয়ে চলেছি
মাঝে মাঝে আজ তা মরীচিকা মনে হয়
তবু, তবু আমি আমার বিশ্বাস, সততা আর প্রেম
নিয়ে গড়া জীবনটাকে আঁকড়ে আছি
অমাবস্যার আকাশে উদ্ভাসিত ধ্রুবতারার মতো
এখনো।।

চরণে দিও ঠাঁই

অনীতা দত্ত

কত বদলে গেছে পৃথিবী, বদলে গেছে মন
মাগো! তবু তোমার চরণতলে রেখো অনুক্ষণ!
স্নেহ-মহিমা দেখি যত স্মৃতি ঝরে পড়ে তত
দেখি নিজেরই ফেলে আসা অসুর বদন
যতবার তুমি যাকে করেছ হনন
করেছ ইন্দ্রিয়াতীত হৃদয়মন্থন!
এখন এসেছি মানুষ অবয়বে, শ্রদ্ধায় অশ্রুনীরে
বিশ্বজনীন মহৎ আদর্শ নিয়ে বিবেকমন্দিরে
হায়! আবার জড়িয়ে পড়ি মিথ্যা মোহজাল ঘিরে
দুরাচার দুর্বিপাকে নিভে আসে দিন, জ্বলে ওঠে রাত
ঝঞ্ঝায় ধূসর আকাশে শুনি, বিষাদ বজ্রপাত!
দশভুজা মা! এমন করে হারিয়ে দিও না আর দিও না।
ওয়ি রুদ্রশেলে উৎসারণ করো অন্তরের বিষ, অহর্নিশ
একাত্ম চেতনায় মানুষ হতে দাও প্রবুদ্ধ ভালবাসার
তোমার উত্তাল ত্রিনয়ন-সিন্ধুপুটে কখনো পেয়েছি নিস্তার?
আশ্বিন শুক্লপক্ষে শ্রীরামের আরাধ্যা শক্তি মা!
তাঁর পুণ্য বেদিতে উদিত প্রভাতে আবার তোমাকে চাই
অতি অজ্ঞান সন্তান আমি, করুণায় চরণে দিও ঠাঁই।

আমরা ধনঞ্জয়

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

এস মঙ্গলময় এস করুণাধারায়
এস দীপ্ত বেশে এস সূর্য তারায়
এস পূর্বাকাশে
এস দূর্বাঘাসে
প্রত্যাশা নিয়ে মোরা দুহাত বাড়াই।

এই দেশ আমাদের উজ্জ্বল হোক
দারিদ্র্য কর দূর
দূর কর শোক
আমরা ধনঞ্জয়
দুর্বার দুর্জয়
আমরা গাহিব গান
কাড়া-নাকাড়ায়।

অশ্রু মুছাব মোরা মায়ের চোখের
দীপ্তি ছড়াব মোরা সূর্যালোকের
সিন্ধু তুফান তুলি
এই ভারতের
সহস্রধারা আনি মরু-সাহারায়।

প্রতিমার রূপ

সনৎকুমার মিত্র

প্রতিমা তো মায়েরই প্রতীক
যে-মা অসীম স্নেহে
অসীম শক্তিধারী
সকলি করেন সৃষ্টি।

সেই তিনি প্রয়োজনে
চতুর্ভুজা, দশভুজা হন
দুষ্টকে দমন করে
সৃষ্টিকে করেন রক্ষা।

সেই অসীমের প্রতি
কৃতজ্ঞতা, ভক্তিস্রোত
মন থেকে মুক্তি পেয়ে
প্রবাহিত হতে চায়।

ব্যাকুল ভক্তের কাছে
ভক্তের ভাবনা থেকে
আসেন করুণা করে
প্রতিমার রূপ ধরে।

শিল্পী : আরতি দাস

কুলকুণ্ডলিনী

দীপালি রায়

কুলকুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে আছে অচেতনে
দেবীবোধনে তাকে জাগিয়ে তুলি
ইড়া পিঙ্গলার পথে সহস্রার শীর্ষে।

শতদল দল মেলে মহাসুখে
একে একে বর্ণগন্ধ ঢেলে
কুলকুণ্ডলিনী চেতনার দ্বারে।
দেবীবোধন বিল্ববৃক্ষমূলে।

কুলকুণ্ডলিনী জাগ ধীরে—অতি ধীরে
আলস্য বিষাদ দূরে ছুঁড়ে
ঘুমন্ত শিশু, উনআশির মা আমার
একসাথে ভেসে গেছে বানভাসি জলে
বেনো জল দ্রুত ঢোকে ঘরের দেওয়ালে।
দুখী ভাই—উনআশির মা ভাসে জলে
কুলকুণ্ডলিনী জাগ ধীরে
চৈতন্যের অতল গভীরে।

যেদিন ফুটল কমল

চিত্তরঞ্জন মাইতি

শীতের ছোঁয়ালাগা মেঘগুলো
নেমে এল পাহাড়ের গা বেয়ে
নিচের উপত্যকায়।
জ্যোৎস্না কাঁপছে,
উপত্যকার চারদিক ঘিরে শৈল-বলয়,
চোখের ওপর ফুটে উঠল
একটি দুধ-সরোবরের ছবি।

উষার নীলাভ শুভ্র আলোয় চেয়ে দেখি,
একটি শ্বেতপদ্ম জেগে উঠছে
সাদা মেঘের নিটোল পাপড়ি মেলে।
সহসা অরুণের আবির লাগল তার গায়।
শ্বেতপদ্ম রূপ নিল রক্তকমলে।
একি বিস্ময়! কে ছোঁয়াল সোনার কাঠি!
সারা উপত্যকা জুড়ে ফুটে উঠল
একটি স্বর্ণ শতদল।

নাভিপদ্ম, হৃদ্‌পদ্মকে জাগিয়ে
এ কোন্ যাদুকর ফোটাল,
এই ব্রহ্মকমল সহস্রার!

স্বামী বিবেকানন্দ—রিজলি ম্যানরে, মহান গ্রীষ্মে

মঞ্জুভাষ মিত্র

এই কবিতাটি রিজলি ম্যানরে স্বামীজীর পদার্পণের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে রচিত। ১৭ আগস্ট ১৮৯৯। স্বামীজীর প্রিয় জোজো—জোসেফিন ম্যাকলাউড লিখছেন মিসেস ওলি বুলকে ঃ নিউ ইয়র্কে আপনি মিলিত হোন আমার সঙ্গে—আমরা দুজনে যাব আমাদের পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্যে। অ্যালেন লাইন কোম্পানীর নিউ মিডিয়া জাহাজে আসছেন তিনি, সমুদ্রপথে মাত্র দশটি দিন। স্বামীজী পৌঁছেছিলেন সোমবার, ২৮ আগস্ট ১৮৯৯। স্বামীজী বন্দরে নামলেন স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়ে। চিত্রশিল্পী মড স্টাম লিখছেন ঃ স্বামীজীকে দেখাচ্ছিল ক্লান্ত ও অসুস্থ। ট্রেনে করে দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ফ্রান্সিস লেগেটের পল্লীভবন রিজলি ম্যানরে, নিউ ইয়র্ক থেকে ৮০ মাইল দূরে। যাত্রাপথে সঙ্গ দিল হাডসন নদী, বৃক্ষমেখলা নদী-উপত্যকা আর দূরের পাহাড়। ১০ একর জমিতে মূল বাড়িটি ছাড়া আরো আছে 'বৃহৎ কুটির' ও 'ক্ষুদ্র কুটির'। লেগেট দম্পতির আতিথ্যে এইখানে স্বামীজীর তৃতীয় পদার্পণ। সেই মহীয়ান গ্রীষ্মে রিজলি ম্যানরে সঙ্গতি ও আনন্দের মধুস্রোত বয়ে গিয়েছিল।

'ক্ষুদ্রকুটিরে' স্বামীজীর সাথে আছেন স্বামী তুরীয়ানন্দ
এই সুন্দর বাড়িটিতে আছে পাঁচটি শয়নঘর
বাড়িটি ধন্য—ছুঁয়েছিল তাকে স্বামীর জীবনছন্দ
কিছুদিন পরে 'স্বামীর কুটির' নামে হলো পরিচিত।
মিসেস লেগেট একদা দেখেন তুরীয়ানন্দ মেঝেতে শয়ান,
খাটের বিছানা নয় কি তেমন আরামদায়ক? অনুসন্ধান
করলেন তিনি বিস্মিত হয়ে; তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "তা নয়
মানবশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ—তাঁরই সাথে এক উচ্চতায়
শয়ন করতে তিনি অপারক", ভালবাসা তাঁর প্রবল এমনি বহতায়
গুরুভ্রাতা নন, যেন প্রেম-অনুগত শিষ্য তিনি।

স্বামীজীর পদপাতে রিজলি ম্যানর একদিন হয়েছিল ঈশ্বরভবন
আমেরিকান কজন নরনারী তাঁকে ভালবেসে কাছে এসে হয়েছিল জড়ো
সবার প্রথমে মাতৃতুল্যা ওলি বুল, অতঃপর নিবেদিতা মানসকন্যা, প্রিয় শিষ্যা
'শান্তি' নামে কবিতা রচনা করে সন্ন্যাসী প্রকাশ করেছেন স্বকীয় মনন
বালকের মতো তিনি কখনো-বা হয়েছেন হাসিখেলা বাক্যালাপে আনন্দে অধীর
আইসক্রীমের প্রতি আসক্তি তাঁহার ভুবনবিদিত
মেতে উঠতেন কখনো-বা গল্ফ খেলায়, সঙ্গি-সহ উদ্যানভ্রমণে, ধ্যানে
এবং তরুণী চিত্রকর মড স্টামের নিকট শিখতেন ছবি আঁকা—পোর্ট্রেইট, ল্যান্ডস্কেপ
মনে মনে সকলেই ভাবছেন কর্মক্লান্ত স্বামীজী এভাবে আহরণ করছেন শুশ্রূষাপ্রলেপ
পরিমিত সুপাচ্য আহার; নিদ্রা ও বিশ্রামে রাত তাঁর কাটে ধীরভাবে
দিনের বেলায় আশ্চর্য সুন্দর কথাবার্তা কখনো বলেন তিনি
ভাগ্যবান তারা শুভক্ষণে কেউ কেউ যারা হয়েছিল শ্রোতা
"জীবনরহস্য হচ্ছে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ"—একদিন বললেন তিনি, "কিন্তু হায়
যে-মুহূর্তে আমরা প্রথম শিখতে বুঝতে শুরু করি, মৃত্যু এসে আমাদের নিয়ে চলে যায়।"

রিজলি ম্যানর! রিজলি ম্যানর!
তুমি যে ধন্য সন্ন্যাসি-মনে আত্মদীপ্ত সেদিন তুলেছ ঝড় বিশাল
তাঁর জীবনের আয়ু এইখানে বিশ্রামদানে তুমি বাড়িয়েছ তিনটি বছর
আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু যে তাঁর—তাঁর কথা তিনি বলেছেন
মধুর রাজন, ক্ষণে ক্ষণে কত অমৃতমাধুরী সেদিন দিলেন উপহার
এখানেই তিনি কর্মের পথে প্রেরণা দিলেন কন্যা নিবেদিতাকে
তিনি বললেন ঃ "আর কোনদিন তোমাদের কাছে আসব না আমি ফিরে
জ্যোৎস্নার রাতে নীরবভ্রমণে ধ্যানপথে চলে যাব পাহাড়ে গুহায় আমি চলে যাব আবার আগের মতো,
আর কোনদিন আসব না এই স্মৃতির নদীর মতো বহমান সবুজমেখলা নীল পৃথিবীর তীরে।"

তবু মানুষে মানুষে

রমলা বড়াল

তেলে জলে মিশ খায় না, তবু
মানুষে মানুষে কোন এক মিল গড়ে
ভিতরে, ভিতরে।
হৃদয় তো বহুমুখ মৌচাকের মতো
মনমাছি মৌমাছি হলে
উড়ে যাবে দূরে দূরে
নীপবনে মাধবী বিতানে
কুমুদে কমলে কিংবা
ঘাসফুলে, ঝিঙের মাচানে।
সর্বত্র রয়েছে মধু
করতলে, চোখের পাতায়, ওষ্ঠে
বুকে মুখে কোলে;
মনমাছি গভীর গোপনে
মনে মনে অনুভব ভরে নেবে
কর্মে ও ধেয়ানে।
ভরে যাবে মৌচাকের সব কোষ
নানাগন্ধী অনামা মধুতে।
তেলেজলে নাই মিশ খেলো
তবু মানুষে মানুষে মিল হয়
মিশে যায়
অতি গূঢ় গোপন জাদুতে।

সুন্দরের সন্ধানে

নিভা দে

এইসব সুন্দর ভ্রমণ মুহূর্ত-কথা পড়ি
পড়ি আর মনের ডানা মেলে উড়ি
শতেক যোজন পথ—পার হই
এক লহমায়—পৌঁছে যাই—
গহন নদীর তীরে—অরণ্য-কোষে—
অরণ্য-প্রাণীরা সেখানে স্বাধীন সহজ—
লাবণ্যময়—আমার আদিম প্রাণ
তাদের পায়ে পায়ে ফেরে—
জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধরস—খেয়ে
দেখে নিতে চায় অন্য এক চোখে—রাত্রির
গভীরে কারা সব জেগে ওঠে
এইসব সুন্দর পুরে—

আমি ঠিক আছি তোমার সাথে সাথে—যেখানেই যাও—
সব অরণ্যের গভীরে পাতা আছে
আমার ইচ্ছার ঝরাপাতাগুলি—

স্বপন যদি

পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

একটিমাত্র সন্তান যবে মারা গেল কৃষকের—
জ্ঞানী সে কৃষক ফেলিল না আঁখিজল।
পুত্রটি ছিল বড় সুন্দর, প্রিয়জন সকলের
বিয়োগব্যথায় সবে হলো চঞ্চল।
শোকাকুলা মাতা সজল চক্ষে কহিল স্বামীরে তার—
"পাষাণ কী তুমি, ব্যথা কী পাওনি হায়,
নয়ন তোমার শুষ্ক এখনো? বহে না অশ্রুধার?
কঠিন আঘাতে মোর বুক ফেটে যায়।"
কহিল কৃষক সু-ধীর কণ্ঠেঃ "স্বপন দেখেছি রাতে,
রাজা হয়ে গেছি, না জানি কেমন করে।
হয়েছে আমার সাতটি পুত্র—সুখে তাহাদের সাথে,
বাস করি, ঘরে আনন্দ ভরে।।
ঘুম ভেঙে গেল। হারালাম আমি পুত্র সাত জনায়,
দেখি, নেই কেহ উঠিলাম যবে জাগি'
সাতের অভাবে, অথবা একটি পুত্রের বেদনায়,
পাই না তো ভেবে, কাঁদি আমি কার লাগি?"

শেখালেন গুরু গল্পের ছলে—স্বপনে কি জাগরণে
যা দেখি সকলি মিথ্যা, সত্য নয়।
সত্য সে শুধু মানবাত্মা, এইটুকু রেখো মনে
মৃত্যুর কাছে মানে সে পরাজয়।।

সূর্যোদয়ের আগে

শান্তিকুমার ঘোষ

এই রাত্রির অন্ধকার পার হয়ে
পৌঁছাব উষা-প্রত্যূষার দ্বারে।
নিম্নে সরে যাবে দীপালঙ্কৃত উপনিবেশ
সময়ের স্রোতে;
ফিরব চেনা অনুভূতি-দেশে
উর্মিল কাহিনীর লতাপুষ্প বেয়ে।
সোনার কাঠির স্পর্শে উঠবে জেগে
ভালবাসার পৃথিবী।
ফুটবে আদিগন্ত গোলাপী আভা
সূর্যোদয়ের আগে।।

গতকাল ফুল ছিল গাছে

লতিকা ঘোষ

গতরাতে গতদিনে
যে-কথা হয়েছিল তোমার সাথে—
অকাতরে, অকৃপণে—
আজ বেলা হতেই,
বেলা বাড়ার সাথে সাথেই
দেখ কেমন হু হু করে সে পালটে গেল।
কখন কিভাবে,
কি করে পালটাল—নিজেও বুঝলাম না।
যেন মুহুর্মুহুঃ মনের ঘরেও,
শরীরের কোষের রঙ পালটানোর মতো।
ঐকথার শিরার দোলানিতেও
পাক খেল। পালটাল।
ও বলল, বেইজ্জতি।
সে বলল, বেইমানি।
অথচ দেখ—এত নীরব প্রবহমান ঝড়
আড়ালে আবডালে প্রতি মুহূর্তে বইছে—
তোমরা বোঝ না!
জীবনের বাঁকের মতো, কথাতেও বাঁক খায়।
বাঁক খায় বলেই তো এত সংহার।
বিচ্ছিন্নতার ঝড় দুর্যোগ।
প্রতিকূলতার রেশ।
কথায় কথায় ঝড় ওঠে।
কথায় কথায় মোচড় খায়।
তবু কথার ঐ
ওলট-পালটের দিগ্‌পরিবর্তন
তার সাথে ওর, ওর সাথে এর
সু-এর সাথে কু-এর।
বিবেকের সাথে দানবের
এই পথনির্দেশ সে পেল কোথা হতে?
বাঁক! মনের খাঁজ!
যত বাঁকই পড়ুক, খাঁজ, খাদ সৃষ্টি হোক
অবেলায়, নির্জনে, পথিক ঘরে ফিরলে
তিতির পাখির মনটায় সেই খাঁজ—
চিরকালের খাঁজ ভরাটের জায়গা
কেউ করে দেয় না!
গভীর খনিও তো ভরাট হয়
ভরাট করার সঙ্কল্প চলে বালির
ঢাল দিয়ে। তবু এই মানবজমিনের
বাঁক, খাঁজ-এর ভরাটের ইতিবৃত্ত নেই।
সঙ্কল্প নিলেও হয় না!

ভাবনা

তারাশঙ্কর রায়

মাঝেমাঝেই ভাবি
পাশের কাঁঠাল গাছটি কেটে ফেলব
ডালপালার এত বাড়-বাড়ন্ত
জানালা দিয়ে আলো আসা প্রায় বন্ধ
ভাবি, কিন্তু কাটা হয় না
কাটার কথা মনে হলেই
মনে পড়ে কাক-দম্পতির কথা
যারা প্রতিবছর এই গাছের ডালেই
বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে
বাচ্চা ফোটায়, চলে যায়
মনে পড়ে আরো অনেক পাখিদের কথা
যারা আসে, বসে, খেলা করে
আবার চলে যায়।
দেখা যায় কিভাবে
ফুল থেকে গ্রীষ্মে কাঁঠালের জন্ম হয়
ছোট থেকে বড় হয়, পাকে,
দেখা যায়, একই সাথে
ফল এবং পাখির জন্ম থেকে বেড়ে ওঠার
প্রতিটি পদক্ষেপ,
ফলে শুধুই ভাবি আর ভাবি
কিন্তু কাটা আর হয় না।

আলোয় ভরা দিন চলে যায়

শেখ সদরউদ্দীন

আলোয় ভরা দিন চলে যায় করব কি যে বল না—
তোমার স্মরণ-গীতি গাওয়া হলো না হে হলো না!

সারা দিনমানে কত করেছিলাম হট্টগোল—
হাসি-খুশির খেলায় মেতে তুলেছিলাম হর্ষরোল!
লাভক্ষতি আর দেনা-পাওনায় ছিল কত ছলনা—
তোমার স্মরণ-গীতি গাওয়া হলো না আর হলো না!

দিনের শেষে সাঁঝ ঘনাল,
আঁধার নামে নয়নে—
আমার সাজি শূন্য তোমার নামের কুসুম চয়নে।

যাওয়ার বেলায় শঙ্কা জাগে, বিত্তহীন এই অন্তরে—
কোন্ সে অর্ঘ্যে পূজব তোমায়,
কোন্ সে পূত মন্তরে।
তবে 'বান্দা' কাঁদে যখন তুমি কি হে টলো না?
তোমার স্মরণ-গীতি গাওয়া হলো না আর হলো না!

কোন্ পথে ভারত?

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ভূতপূর্ব 'কারমাইকেল অধ্যাপক' ও ভূতপূর্ব প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি এবং বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও গবেষণা-প্রবন্ধের প্রণেতা বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর (৮ এপ্রিল ১৮৯২—৪ মে ১৯৫৭) স্মৃতিতে তাঁর নিকট আত্মীয়বৃন্দ সম্প্রতি 'উদ্বোধন'-এ 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনামালা' প্রকাশের উদ্দেশ্যে ৪৮,০০০ টাকা দান করেছেন। সেই অনুসারে 'উদ্বোধন'-এর মূল্যবান শারদীয়া সংখ্যায় আলোচ্য উল্লেখযোগ্য রচনাটি বর্তমান বছরের 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে চিহ্নিত করা হলো। এই বছরে এটিই ঐবিষয়ে প্রথম ও সর্বশেষ রচনা। আগামী বছর থেকে প্রতি বছর ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনটি করে উল্লেখযোগ্য রচনা অধ্যাপক রায়চৌধুরীর স্মৃতিতে নিবেদিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক ডঃ রায়চৌধুরী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সঙ্গে ছিল তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানী-গুণী মানুষদের বলা হতো 'ঋষি'। ঋষি কথাটির মৌলিক অর্থ হলো—যিনি দেখতে পান—'ঋষির্দর্শনাৎ'। দেখতে তো আমরাও পাই, মানুষ মাত্রেই দেখে থাকে। চোখ দিয়েও দেখে, আবার আপন-আপন মন দিয়েও দেখে। তাহলে আমরা সবই তো সে-হিসাবে ঋষি-পদবি লাভ করার যোগ্য। কিন্তু সে-পদবি আমরা পেতে পারি না এই কারণেই যে, ঋষি যিনি হবেন তাঁর দৃষ্টি হবে সুদূরপ্রসারী। শুধু কাছের টুকুই তিনি দেখেন না, এখনকার তাৎক্ষণিক বস্তুই শুধু তাঁর নজরে আসে না—তিনি সেসব ছাপিয়ে, বর্তমানকে অতিক্রম করে অনেক দূর পর্যন্ত, ভবিষ্যৎ পরিণাম পর্যন্ত দেখে ফেলেন। ঋষি তাই তিনিই, যিনি অতিক্রান্তদর্শী, সুদূরপ্রসারী যাঁর দৃষ্টি।

ভারতবর্ষ তাই ঋষিবাক্যকে সবসময় শিরোধার্য করে মেনে চলার চেষ্টা করেছে। ঋষি যা বলেন, তা দেখে বলেন এবং তাঁর সে-দেখা আমাদের সীমাবদ্ধ সঙ্কুচিত দৃষ্টির চেয়েও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত বলে আমরা ঋষিবাক্যকে মেনে এসেছি অম্লানবদনে, বিনা প্রতিবাদে। কিন্তু এখন মানার যুগ চলে গিয়েছে। এসেছে জানার যুগ। বিজ্ঞানের অভিযানে মানুষ এখন সবকিছু যাচাই করে নিতে চায় আপন বুদ্ধি দিয়ে, তার বুদ্ধির ব্যাপ্তির হিসাব না রেখেই। নইলে তার আত্মাভিমানে ঘা লাগে, মনে হয় বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেওয়া মানে যুক্তি-বিচার সব বিসর্জন দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসের কুসংস্কারে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা। এ তো প্রগতি নয়, পরাগতি—আবার পিছনে ফিরে যাওয়া! progression নয়—regression, এ তো revisionism, এ তো reactionary! তাই আমরা প্রতিবাদে সরব হই, খড়্গহস্ত হই যখন কেউ প্রাচীন বেদবাক্য বা মনুর শ্লোক উদ্ধৃত করে ঋষিবাক্যের দোহাই দিয়ে তা আমাদের মেনে নিতে বলেন।

ঋষিরা জানতেন, মানুষের মূল চাহিদা দুটি ঃ অর্থ ও কাম। মানুষ জগতে এসেছে ভোগ করতে, তার কামনা চরিতার্থ করতে। আজ সমস্ত জগৎ, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশ উন্মাদের মতো ছুটছে অর্থ-উপার্জনের দিকে, তার কামনা চরিতার্থ করার জন্য। ভারতবর্ষেও এখন একমাত্র আলোচনার বিষয় তার অর্থনীতি এবং তার উদারীকরণ। আরো কত সুযোগ-সুবিধা এনে দেওয়া যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে কিংবা লেনদেন, আদান-প্রদান আরো কতটা ব্যাপক বা বিস্তৃত করা যায়, তারই জন্য সব ভাবনা-চিন্তা আজ কেন্দ্রীভূত। কারণ, তবেই না দেশ সমৃদ্ধ হবে, উন্নত হবে, developing country—বিকাশশীল দেশ থেকে developed country-তে—বিকশিত দেশে পরিণত হবে, দ্রুত উন্নতি লাভ করে আমেরিকার সমকক্ষ হয়ে উঠবে! ভারতবর্ষের তরুণ প্রতিভারাও তাই দলে দলে ছুটছেন বিদেশে এবং এদেশে তাঁরা অনাবাসী হয়ে বিদেশে বসবাসই একান্ত কাম্য মনে করছেন। এদেশে বসবাসকারী তাঁদের বৃদ্ধ পিতামাতারা তাঁদের কল্যাণেই কিছুটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখতে পাচ্ছেন। ঘরে রঙিন টিভি, মোবাইল ফোন—এমন অজস্র ভোগোপকরণ অনায়াসে এসে যাচ্ছে তাঁদের হাতের মুঠোয় এবং তাই তাঁরাও নিজ বাসভূমে পরবাসী সেইসব সন্তানদের মুখ চেয়েই বসে আছেন। আবার নাতি-নাতনীরাও যাতে সেই পথেরই অনুগমন করে অনাবাসী ভারতীয় হয়ে অতুল সুখৈশ্বর্যের মুখ দেখতে পারে, সেইভাবে তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রস্তুত করছেন এখন থেকেই।

এসবই একান্ত কাম্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু ঋষিরা এই দুটি মূল চাহিদার সঙ্গে আরো দুটি যোগ করে চতুর্বর্গে জীবনের পরিপূর্ণতার কথা বলে গিয়েছেন। পুরুষার্থ—'পুরুষ' বা মানুষের 'অর্থ' বা প্রয়োজন ঋষিদের দৃষ্টিতে চতুর্বিধ এবং

তাদের নাম যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থ ও কাম —এ-দুটি মাঝের জিনিস এবং তার আদি ও অন্তের সঙ্গে যদি কোন সম্বন্ধ বা সম্পর্ক না থাকে, তবে তা একান্ত মূল্যহীন এবং ক্ষতিকারক বলে তাঁরা ঘোষণা করে গিয়েছেন। এখানেই ঘটেছে মুশকিল এবং আমাদের নির্বাধ ভোগলাম্পট্যে অযথা হস্তক্ষেপ করে যেন তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছেন বলে আমাদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছেন এই ঋষির দল। মনু ফতোয়া দিয়ে বসেছেন ঃ

"পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।"

(মনুসংহিতা, ৪।১৭৬)

ছেড়ে দাও সেই অর্থ ও কাম যা ধর্মহীন, অর্থাৎ অধর্মের পথে কখনো অর্থ উপার্জনের দিকে মন দিও না, অধর্মের পথে কামনা চরিতার্থ করতে যেও না। কোথা থেকে তিনি আবার এই ধর্মের আমদানী করে বসলেন এবং তাকেই আবার চতুর্বর্গের একেবারে গোড়াতে এনে বসিয়ে দিলেন! অর্থ-উপার্জনই তো আমাদের একমাত্র ধর্ম, কামনা-তৃপ্তিই তো মূল ধর্ম আমাদের। এছাড়া আবার ধর্ম বলে আলাদা কোন জিনিস তো আমরা জানি না বা মানি না! ধর্ম মানে তো জানি স্বভাব—nature। যেমন আগুনের ধর্ম বা স্বভাব হলো পোড়ানো, জলের স্বভাব হলো ভেজানো ইত্যাদি। আগুন আছে অথচ তা পোড়াবে না—এ কখনো হয় না, কারণ সেটা তার নিজস্ব স্বভাব বা প্রকৃতি—intrinsic nature। এরই নাম 'ধর্ম', যা তাকে ধরে রাখে, যার ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে। মহাভারতে তাই ধর্মের definition বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেওয়া হয়েছে—

"ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।"

অর্থাৎ ধারণ করে বলেই এর নাম 'ধর্ম' (ধৃ ধাতু থেকে মনিন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন এই শব্দটি) এবং এই ধর্মই প্রজাদের অর্থাৎ জনগণকে ধারণ করে থাকে।

তাই এখন আমাদের বুঝতে হবে, মানুষকে ধরে রেখেছে কে? মানুষকে মানুষ বলে চিনিয়ে দেয় কে? কোন্ জিনিসটি না থাকলে মানুষকে আর 'মানুষ' বলা যায় না? অর্থাৎ তার স্বভাব, তার স্বধর্ম কী? দ্বিপাদবিশিষ্ট দ্বিভুজ একটি জীব, যে খাড়া হয়ে চলতে পারে অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে চলে না, যার চোখ, কান, নাক, মুখ সব আছে—তাকেই কি 'মানুষ' বলে চিহ্নিত করা যাবে? না এছাড়া তার নিজস্ব এমন কোন চিহ্ন বা লক্ষণ আছে, যা তাকে অন্য সব প্রাণী থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়? কী সেই ধর্ম বা স্বভাব, যা শুধু মানুষেরই আছে, অন্য কারো অর্থাৎ প্রাণিজগতে অন্য কোন প্রাণীর নেই? সংস্কৃতে তাকেই লক্ষণ বা characteristic বলে, যা 'ইতরযোগ-ব্যবচ্ছেদক' অর্থাৎ অন্য সবকিছুর যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা একটি বস্তুকে চিনিয়ে দেয়। মানুষের কী লক্ষণ, which is unique only to him and not to any other creature on earth?

তারই নাম 'বিবেক'। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ—এটি বুঝবার সহজাত সামর্থ্য একমাত্র মানুষেরই আছে। তা সে 'পাংশুলপাদ হালিক' অর্থাৎ ধুলোপায়ের চাষাই হোক বা সুসজ্জিত রাজপুরুষই হোক, বালকই হোক বা বৃদ্ধই হোক, নারীই হোক বা পুরুষই হোক, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে সদাজাগ্রত এই বোধ—এটা ঠিক, এটা ঠিক নয়, এটা ন্যায়, এটা অন্যায়। বলছে হয়তো সে মিথ্যাকথা, কিন্তু জানছে এটা বলা ঠিক হলো না। কে তার অন্তরে বসে জানিয়ে দেয় একথা? জার্মান দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন, জগতে দুটিই পরম আশ্চর্য আছে—এক, the starry heavens above এবং দ্বিতীয়, the moral conscience within। মাথার ওপর ঐ তারকাখচিত আকাশ আর অন্তরের আকাশে এই নীতিবোধ বা বিবেকের চিরজাগ্রত দীপ্তি। প্রতি হৃদয়ে জ্বলছে তার অম্লান আলো, যাকে শত চেষ্টা করেও নিভিয়ে ফেলা যায় না বা দাবিয়ে রাখা যায় না। সে তার শিখা উদ্‌গত করে জানিয়ে দেবেই—এটা ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটে গেল, স্বভাবের বিচ্যুতি হয়ে গেল। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ভাল করেই জানেন, তাঁর পুত্র দুর্বৃত্ত দুর্যোধন অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের বঞ্চিত করে রাজসিংহাসনে আসীন হতে চাইছে। পত্নী গান্ধারী তাঁকে সজাগ করছেন যে, পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে তিনি মোহগ্রস্ত, তাই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। ধর্মকে ত্যাগ নয়, অধার্মিক পুত্রকেই তাঁর ত্যাগ করা উচিত। ঠিক তেমনি মোহগ্রস্ত হয়ে আত্মীয়-স্বজন গুরুজনের প্রতি মমতায় আবদ্ধ অর্জুন অন্যায়কারী কৌরবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অস্বীকার করে বসলেন। আপন ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে চললেন এবং ঠিক তখনি 'ধর্মসংমূঢ়চেতা' সেই অর্জুনকে তাঁর মোহ দূর করে আবার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

আপন অন্তরে যে বিবেকের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, মানুষ অনেক সময়েই তাকে উপেক্ষা করতে চায়, তার প্রতি কর্ণপাত করতে চায় না। তখন বাইরের কেউ এসে, তা গান্ধারীর মতো পত্নীরূপেই হোক বা সখা ও সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণই হোক, তাকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন তার স্বভাবে, স্বধর্মে। কখনো তাঁরা সফল হন, কখনো বা নিষ্ফল। তবু ভিতর এবং বাহির উভয় ক্ষেত্র থেকেই বারংবার এই বিবেকের বাণী তার হৃদয়-দুয়ারে করাঘাত করে বলে ঃ 'ও-পথে যেও না, ফিরে এস'।

এই স্বরূপে বা স্বভাবে ফিরে আসার আহ্বানের নামই ধর্ম। সেই স্বভাবের অনুবর্তনই মানুষের একমাত্র ধর্ম। নইলে সে আর মানুষ থাকে না। হতে পারে সে রাজা-মহারাজা,

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী, কিন্তু যথার্থ মনুষ্য-পদবাচ্য সে হয় না। আমরা মনে করি, লেখাপড়ায় কৃতী, ধন-উপার্জনে সার্থক ব্রতী করে তুলতে পারলেই ছেলেমেয়েকে যথার্থ মানুষ করা হলো। কিন্তু সে যে মানুষের স্বরূপই হারিয়ে বসল বিদ্যার অহঙ্কারে বা ধনসম্পদের অলঙ্কারে তা আমরা কখনো চিন্তা করি না। আমরা কৃতী সন্তান তাকেই বলি যে ধনাগমে, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদি নানা উপকরণে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। ঋষিরা বলছেন, এসব বাড়-বাড়ন্ত মানুষ অধর্মের দ্বারাও লাভ করতে পারে এবং অনেক ভাল ভাল জিনিস পেতে পারে। শত্রুদেরও নির্মূল করতে পারে, কিন্তু এদিকে তার মূল উচ্ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ নিজেকেই খুইয়ে বসে! আশ্চর্য! একটি শ্লোকে মনু এই কথা জানিয়ে গিয়েছেন সেই কবে, কোন্ সুদূর অতীতে ঃ

"অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।।" (৪।১৭৪)

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এই শ্লোকটি। শেষের দিকে তাঁর অনেক ভাষণে তিনি এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এই শ্লোকের মর্ম বুঝেছিলেন এবং জেনেছিলেন যে, ঋষির দৃষ্টি সবসময় মূলের দিকে। মূলানুসারী সেই দৃষ্টি জানে যে, বাইরে বিশাল ডালপালা মেলে যে বনস্পতি দাঁড়িয়ে আছে, সকলের চোখ ধাঁধিয়ে তার মূলটি যদি তলায় তলায় অবক্ষয়প্রাপ্ত হয় প্রাণরসের অভাবে, তাহলে একদিন ঐ বিশাল মহীরুহ উৎপাটিত হবে এবং ধূলায় মিশে যাবে। 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন', যেমন গাছকে পরিপুষ্ট করতে হলে গাছের মূলেই জল ঢালতে হয়, শাখাপ্রশাখায় নয়; তারা তো মূল পুষ্ট হলেই নিজেরা সমৃদ্ধ, পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে—ঠিক তেমনি মানুষের মূল যে বিবেক-বিচাররূপ ধর্ম, তার পরিপালনেই তার যথার্থ অস্তিত্ব সুরক্ষিত থাকে, নতুবা তার মহতী বিনষ্টি, মনুষ্যত্বের বিলোপ। ঋষি তাই বলেন যে, ভাল-মন্দের বোধ, যেটি মানুষের সহজাত ধর্ম বা স্বভাব, তাকে বিসর্জন দিয়ে অর্থ-কামের অন্বেষণে কখনো নিজেকে নিযুক্ত করো না। সর্বাগ্রে এই ধর্মকে রেখ এবং তাকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে যেও অর্থ ও কামের চরিতার্থতায়। শুধুই অর্থের জন্য, শুধুই কামনার তর্পণে নিজেকে নিঃশেষ করো না। এমনকি অর্থ ও কামকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু এককভাবে ধর্মের পিছনেও ছুটো না। তিনের সমন্বয় ঘটাও জীবনে। কী ব্যাপক দৃষ্টি ছিল ঋষিদের! কেবল ধর্মধ্বজী হয়ে তাঁরা ধর্মেরই জয়গান করেছেন, ধর্মেরই অনুষ্ঠান করতে বলেছেন—এমন তো নয়। চেয়েছেন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্থ ও কামে সকলে আত্মনিয়োগ করুক। অভ্রান্ত নির্দেশ দিয়েছেন মনু ঃ

"ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ।"

তীব্র নিন্দাও করেছেন সেই মানুষের। তাকে 'জঘন্য' বলে যে একটাতেই আসক্ত হয়, সমানভাবে তিনটিরই সেবা বা অনুশীলন করে না।

সাধারণ মানুষের জন্য বিধান ছিল তাই এই ত্রিবর্গের—ধর্ম-অর্থ-কামের। চতুর্থ মোক্ষটি সকলের জন্য নয়। অথচ এখন আমরা সকলেই মোক্ষের অধিকারী হয়ে তারই জন্য তথাকথিত ধর্মের অনুসরণ করে চলেছি! তাও শাস্ত্রকারেরা জানতেন যে, কলিকালে এমনই অবস্থা হবে কালের প্রভাবে যে, সবাই বেদান্তী হয়ে উঠবে, যেমন ফাগুন মাসে বসন্তকালে সবাই বালক হয়ে ওঠে ও হোলি খেলায় মত্ত হয়—

"কলৌ বেদান্তিনঃ সর্বে ফাল্গুনে বালকা ইব।"

মোক্ষ বা মুক্তি তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট যারা ভাল-মন্দের পারে চলে যান। যতদিন ভাল-মন্দের রাজ্যে আছি, ততদিন আমাদের একমাত্র কর্তব্য বিবেকের নির্দেশে ভালকে অনুসরণ, প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে বরণ। এরই নাম 'ধর্ম'। তাই সাধারণ জীবনে মানুষের একমাত্র অবলম্বন বা আশ্রয় হলো ধর্ম এবং ঋষিদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, ধর্মকে আশ্রয় করে যারা জীবনে অর্থ ও কামের উপভোগে নিজেদের নিয়োজিত করে, তারা স্বাভাবিক ক্রমেই মোক্ষ বা মুক্তির দ্বারে এসে উপনীত হয়। চতুর্থ বা শেষ এই বর্গটি তাদের আপনিই লাভ হয়ে যায় এবং তখন তারা ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। তারই নাম মুক্তি। সংসার মানেই দ্বন্দ্ব। ভাল-মন্দ, রাগ-দ্বেষ, শোক-মোহ, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ—কত না দ্বন্দ্বের তরঙ্গ! সেখানে যতদিন আমরা তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত, ততদিন এই 'ভবার্ণব তরণে' একমাত্র নৌকা হলো ধর্ম। আর তরঙ্গের উর্ধ্বে উঠে গেলে "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্" (গীতা, ২।৪৫) অবস্থা, আত্মা বা নিজেকে স্বরূপে ফিরে পাওয়া। সেখানে "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণম্" (ঐ, ১৮।৬৬)-এর অবস্থা এবং সেখানকার নির্দেশ শুনলে চমকে উঠতে হয়—

"ত্যজ ধর্মমধর্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎত্যজ।।"

ছাড় ধর্ম, ছাড় অধর্ম, ছাড় সত্য মিথ্যা দুইকেই। আবার যা দিয়ে এই দুইকে ছাড়লে, তা-ও ছাড় অর্থাৎ কিছুই আঁকড়ে থেক না। এ হলো সব-ছাড়া। সর্বত্যাগের চরম সর্বনাশা পথ।

ঋষিরা তাই পথের শুরু থেকে শেষ, সবটাই দেখেছিলেন এবং কিভাবে সে-পথে চলতে হবে, যাত্রা কোথায় শেষ হবে সবই দেখে বলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁরা ক্রান্তদর্শী। আমাদের দৃষ্টি শুধু বর্তমানেই নিবদ্ধ, এখনি এবং এখানেই অর্থাৎ এই কালটুকু এবং এই দেশটুকুর মধ্যে যতদূর সুখভোগ, স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করা যায়, তারই দিকে আমাদের

দৃষ্টি। এখানেই তাই এসে পড়ে জীবনের যথার্থ মূল্যায়নের প্রসঙ্গ। জীবন কি এই দুদিনের, না এজীবন অনন্ত, অসীম? একটাকে আমরা বলি বাস্তববাদী দৃষ্টি—এসেছ দুদিনের এই দুনিয়ায়, যেমন খুশি যত খুশি যেকোন উপায়ে সুখ ভোগ করে নাও অর্থাৎ কামনা চরিতার্থ করে নেওয়ার চেষ্টা কর এবং তার জন্য যত বেশি সম্ভব অর্থ উপার্জনে মন দাও। অন্যটা হলো আদর্শবাদী দৃষ্টি, যা বর্তমান যুগে অচল, যা বলে জীবন ভোগের জন্য নয়—ত্যাগের জন্য এবং তাই নাকি ভারতবর্ষের মর্মবাণী—"ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেন অমৃতত্বমানশুঃ" (কৈবল্য উপনিষদ্, ৩), "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" (ঈশ উপনিষদ, ১), "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" (গীতা, ১২। ১২)। ত্যাগ হলো অমৃতত্বের, শান্তির পথ আর ভোগ হলো মৃত্যুর, অশান্তির পথ। ভারতের এক নারী, যে-নারীকে আমরা জানি সংসারের মায়া-মমতায়, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় সর্বদা আবদ্ধ, তাঁরই কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছে এই ত্যাগের বাণীঃ "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।৩) অর্থাৎ যা দিয়ে আমি অমৃত হব না তা দিয়ে কি করব? স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ছেড়ে বনে যাওয়ার সময় পত্নী মৈত্রেয়ীকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ঘর-দুয়ার খাওয়া-পরার সুখস্বাচ্ছন্দ্য, যা সবাই করে যেতে চায় অর্থাৎ তার অবর্তমানে বেঁচে থাকার সবরকম সুব্যবস্থা। অথচ মৈত্রেয়ী তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর জ্ঞানী স্বামী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে চেয়ে বসলেন অমৃতত্বের সন্ধান। আরো আশ্চর্য, ভারতবর্ষের একটি নাবালক কিশোর বলে বসলঃ "ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ" (কঠ উপনিষদ্, ১।১।২৭)—ধন-দৌলতে মানুষের তৃপ্তি হয় না। যমরাজ সেই বালক নচিকেতাকে দিতে চাইলেন অঢেল ঐশ্বর্য, গাড়ি-ঘোড়া, নাচ-গানের অফুরন্ত সম্ভার, এমনকি স্বর্গেরও সব দিব্য ভোগ। কিন্তু সে-বালক বলে কিনা—ওসব তোমারই থাক। নচিকেতা সেই অমর আত্মার সন্ধান ছাড়া অন্য কিছু চায় না—"তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে", (ঐ, ১।১।২৬) "নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে" (ঐ, ১।১।২৯)। কিশোর বালক কি এতে তার মূঢ়তারই পরিচয় দিল না? বুদ্ধি থাকলে, চালাক হলে কেউ কখনো এমন সুযোগ হারায়, এত সব সুখৈশ্বর্যের প্রাপ্তি, অনায়াসে লাভকে প্রত্যাখ্যান করে বসে?

ভারতবর্ষ চিরকাল এই বোকামি করে এসেছে এবং তারই দরুন বঞ্চিত হয়েছে, কোন উন্নতি করতে পারেনি। এখন তবু তার একটু বুদ্ধি খুলেছে, চালাক-চতুর হয়েছে। তাই মনোনিবেশ করেছে জাগতিক উন্নতিতে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখার জন্য। দেখছে চারদিকে সবাই এগিয়ে চলেছে, আর "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়?" তাই গৃহস্থ সংসারী থেকে আরম্ভ করে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী পর্যন্তও সকলেই এখন পরমার্থ ছেড়ে অর্থের আহরণে মনোনিবেশ করেছেন! এতদিন বুদ্ধি ছিল না, বুদ্ধির বিকাশ হয়নি, তাই দেখা যেত রাস্তাঘাটে কেউ টাকাকড়ি জিনিসপত্র ফেলে গেলে পাহাড়ী অশিক্ষিত বুনো লোকেরা ভুলেও সেদিকে ফিরে তাকাত না বা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করত না। কারণ তাদের ছিল সহজাত ধর্মবোধের বোকামি—"মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্" (ঈশ উপনিষদ, ১)—কারুর ধনে লোভ করো না। ধন কার? এ-জগতে কারই বা নিজস্ব বলে কিছু আছে? সবই তো দুদিনের, কারুরই তো কিছু থাকবে না শেষ পর্যন্ত। অতএব লোভ থেকে বিরত হও, গৃধ্নু হয়ো না। তৃষ্ণাকে নিয়ন্ত্রণ কর, তৃষী বা তর্ষী হয়ো না। ভাগবত বলছেন, নিবৃত্ততর্ষ হয়ে গাও ভগবানের গুণানুবাদ। ভারতবর্ষের মানুষকে এসব শেখাতে হতো না, তার ধমনীতে আপনিই প্রবাহিত হতো জাগতিক সব ধনসম্পদের প্রতি একান্ত উপেক্ষা ও বিতৃষ্ণা।

কিন্তু এখন সেই পাহাড়ীদেরও চোখ ফুটেছে, সমতলবাসীর কা কথা? এখন আর সেখানে দুয়ার খুলে নিশ্চিন্তমনে ঘুমানো যায় না, অর্গলবদ্ধ করে সন্ত্রস্ত উদ্বিগ্ন রাত্রিযাপন করতে হয়—কখন কি চুরি যায় এই ভাবনায়। বিগত দুটি মহাযুদ্ধের পরেই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষের সরলতা, ধর্মবোধ, সোজা কথায় 'বোকামি'। এখন সবাই 'চালাক' হয়ে গিয়েছে এবং সেই চালাকি দ্বারা মহৎ কর্ম অর্থাৎ 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা' সাধন করে চলেছে দেশের শীর্ষব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে সমাজের শীর্ষস্থানীয় গণ্যমান্য সকলেই এবং "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎ তদেব ইতরো জনঃ" (গীতা, ৩।২১)—সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের আচরণ নির্বিচারে অনুসরণ করছে জনগণ।

ভারতীয় সংস্কৃতির ওপরও এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক বন্ধন, গীত-বাদ্য, শিল্প-সাহিত্য সবকিছুর রূপ অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বদলে যাচ্ছে। এখন সবাই যে গান গাইছে তা সবই জীবনমুখী গান। এতদিন জীবনবিমুখী গান গেয়ে এসেছে ভারতবর্ষ। "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব"—এই ছিল তার ধুয়া। এখন সে কানোরিয়া জুটমিলের সংগ্রামী মানুষদের কথা তুলে ধরছে তার গানে, যারা ছিল এতদিন উপেক্ষিত, অবহেলিত। এখন 'খুল্লম খুল্লা প্যার করেঙ্গে হম্ দোনো'—খোলাখুলি প্রেম করব আমরা দুজনে—এই হলো উদ্‌ঘোষণ। কোন আবরু থাকবে না, অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা দিয়ে ঢেকে শালীনতারক্ষার অপপ্রয়াস করা চলবে না। যাকিছু চলবে সবই প্রকাশ্য দিবালোকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের দৃষ্টির সম্মুখে। আর তারই অঢেল ব্যবস্থা টি.ভি. বা দূরদর্শনের কল্যাণে নিত্য

নতুন চ্যানেলের উদ্বোধনে, যাতে ঘরে বসেই নিরবচ্ছিন্নভাবে "প্রাতরুত্থায় সায়াহ্ন সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ" বিরামহীন জঘন্য নর্তন-কুর্দন দেখার নির্বাধ সুযোগ। মাঝে মাঝে 'অপসংস্কৃতি'র ধুয়া তুলে একটু লোক-দেখানো মৃদু প্রতিবাদেও প্রগতিপন্থীরা সরব হন, আবার সবই ধুয়ে মুছে যায় 'প্রগতি'র দুর্বার স্রোতে।

এতে দুঃখের কিছু নেই। যুগে যুগেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়, গতির পরিবর্তন হয়। এখন আর্ষদৃষ্টি চলে গিয়েছে, তার জায়গায় এসেছে তর্ষীদৃষ্টি—কামনায় তৃষাতুর মানুষের দৃষ্টি। ঋষি দেখতেন দূর পর্যন্ত, পরিণাম পর্যন্ত; আর তর্ষী দেখেন তাৎকালিক তৃষ্ণা মেটানোটুকু পর্যন্ত। তার পরিণাম কী হবে, সেসব ভাবনার কী প্রয়োজন? "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" এখন তো আর 'অঋণী অপ্রবাসী' হয়ে বোকা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতো জীবন-জলধিতে বারিচর হয়ে সুখী হওয়ার দিন নয়! এখন 'ক্রেডিট কার্ডে'র কল্যাণে যত পার ঋণ করে ভোগের উপকরণ বাড়াও এবং সেইসঙ্গে প্রবাসী, অনাবাসী ভারতীয় হয়ে ভারতকে সমৃদ্ধ কর। সম্প্রতি এক সাংবাদিক—যাঁরা এখন আমাদের জীবনপথ-নিয়ন্তা, জনগণের অভিমতের নিয়ামক স্রষ্টা—বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্রে লিখেছেন ঃ

"কেউই আর আমাদের বোকা বানিয়ে ঠকাতে পারবেন না। বুনো রামনাথের তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে ন্যায়শাস্ত্রের উচ্চচিন্তায় সুখী থাকার গল্প শুনতে আর আমরা রাজি নই। আমরা নতুন যুগের সন্তান, নতুন যুগের সারথি। এই যুগ ভাল থাকার যুগ, সুখে থাকার যুগ। কাকে বলে ভাল থাকা? সুখে থাকা? এ-প্রশ্নের কোন নির্দিষ্ট উত্তর আমরা জানি না। জানতে চাই না। কোন প্রশ্নেরই নির্দিষ্ট উত্তরে আমাদের বিশ্বাস নেই, আমাদের জন্য কেউ কোন 'ধ্রুবপদ' বেঁধে দেয়নি, আমরা বিজ্ঞানের সন্তান। তাই ভাল থাকা মানে আরো ভাল থাকার চেষ্টা করা। সুখী হওয়া মানে আরো সুখী হওয়ার স্বপ্ন দেখা। আমাদের বীজমন্ত্র, আমাদের ওঙ্কার সবই ঐ একটি শব্দ 'আরো'।"

ঋষিদেরও বীজমন্ত্র, তাঁদেরও ওঁকার কিন্তু ঐ একই—'আরো'। তাঁদেরও লক্ষ্য ঐ একই—'সুখ'। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে "ততো ভূয়ঃ"—তার চেয়ে আরো, তার চেয়ে আরো—এই ক্রমে এগিয়ে যেতে যেতে শেষে তাঁরা গিয়ে থেমেছেন 'ভূমা'য়। কারণ তাঁরা জেনেছেন, "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।২৩।১)—অল্পে সুখ নেই, সুখ একমাত্র সেই সর্বব্যাপক সত্তায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি ছোট্ট কবিতায়—যেটি 'কণিকা'র অন্তর্ভুক্ত—এই আরো বড়, আরো ব্যাপক হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন অপরূপভাবে ঃ

"ভাবে শিশু বড়ো হলে শুধু যাবে কেনা,
বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলনা,
বড়ো হলে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজন পানে।
আরও বড় হবে নাকি? যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে চলে?"

এই আরো বড় হওয়ার সাধনা, আরো সুখের সাধনাই মনুষ্যত্বের সাধনা, ভূমার সাধনা। বাইরের সব উপকরণের স্তূপকে ছাপিয়ে ওঠা, ধরার খেলার হাটকে অতিক্রম করে যাওয়ার মধ্যেই মানুষের মহিমা, নিজস্ব গৌরব। তারই প্রতীক এদেশের মৈত্রেয়ী, নচিকেতা। সবকিছুকে 'অবহেলে' অর্থাৎ তুচ্ছ করে তার ওপরে উঠে যাওয়া। আর এখন? ক্রমেই নিচে নামা লোভ-লালসার পঙ্কিল, পিচ্ছিল পথে।

ভারতবর্ষের মানুষ আজ এসে দাঁড়িয়েছে জীবনের এই চতুষ্পথের মোহানায়। এখন নিশ্চিতভাবে দিগ্‌নির্ণয় করে নিতে হবে, সে যাবে কোন্ দিশায়? নিশার পথে, না উষার পথে? অন্ধকার থেকে অন্ধকারে, না আলোক থেকে আলোকে? সে ভোগ করবে স্বাধীনভাবে, না ভোগের পরাধীন হয়ে সেই ভোগকেই ভোগ করতে দেবে তাকে নিঃশেষ করে ফেলতে? "ভোগা ন ভুক্তাঃ বয়মেব ভুক্তাঃ"—ভোগ তো ভোগ করা হলো না। আমরাই ভুক্ত হয়ে গেলাম। ভোগের শিকার হলাম শেষ পর্যন্ত—এমন অবস্থায় যেন না পড়তে হয়।

ঋষিদের কথায় কর্ণপাত না করি, এযুগে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি প্রখর বিচার-বুদ্ধিকে আশ্রয় করেই ধর্ম ও ঈশ্বরকে যাচাই করেছিলেন—তাঁর কথায় যদি একটু সচেতন হই, তাহলে ভেবে দেখার চেষ্টা করব তিনি কোন্ মনুষ্যত্বের জন্য উমানাথ ও জগদম্বার কাছে "আমায় মানুষ কর" বলে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালও একই আবেদন রেখে গিয়েছেন দেশবাসীর প্রতি ঃ

"আবার তোরা মানুষ হ।"

তাদের সচেতন করেছেন এই বলে ঃ

"জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোখ,
পুণ্য সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক
ধর্ম যেথা সেদিকে থাক, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক, আবার তোরা মানুষ হ।"

সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই 'মানুষ' হওয়া। আর সব ডুবে যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু মনুষ্যত্ব হারালে সবই গেল—"সমূলস্তু বিনশ্যতি"। ভারত এখন কোন্ পথে? সমূল বিনাশের পথে, না মূল উদ্ধারের পথে? এইটিই একমাত্র জিজ্ঞাস্য এই যুগসন্ধিক্ষণে।❑

সবরিমালার আয়াপ্পা স্বামী

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে যাঁরা দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যান, তাঁদের একটি জিনিস নজরে পড়বেই। বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, কেরালায় প্রায় সর্বত্র রাস্তাঘাটে, ট্রেনে-বাসে কালো পোশাক পরা একশ্রেণীর মানুষের মুখে শুনবেন সুমধুর ধ্বনি—'আয়াপ্পা শরণম্', 'স্বামী শরণম্'। এঁরা তীর্থযাত্রী। চলেছেন কেরালার সবরিমালা তীর্থে। সবরিমালা কেরালার কোট্টায়াম জেলায় অবস্থিত একটি সুউচ্চ পর্বত। এরই ওপরে আয়াপ্পা স্বামীর
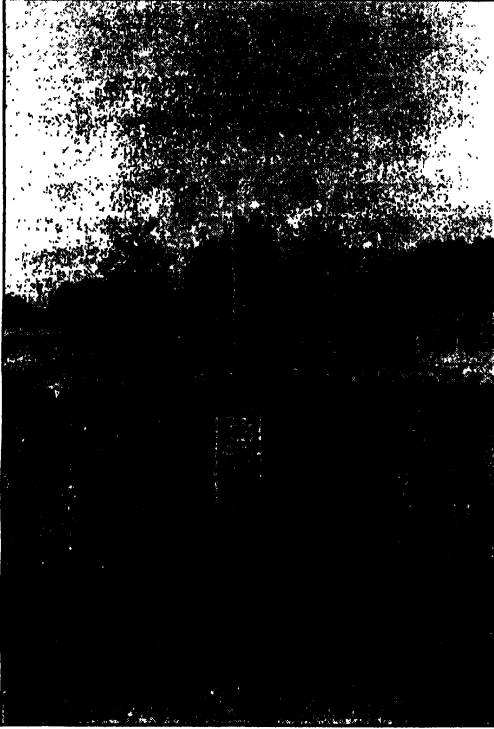
'সন্নিধানম্'—আঠারটি ধাপের ওপরে আয়াপ্পার মন্দির

মন্দির। পশ্চিমবঙ্গে চৈত্র সংক্রান্তিতে তারকেশ্বরে তারকনাথের মাথায় জল দেওয়ার জন্য একশ্রেণীর মানুষ যেমন সন্ন্যাসীর পোশাক পরে এক মাস ধরে নানা ব্রত উদ্‌যাপন করে, সবরিমালায় আয়াপ্পা স্বামীর মন্দিরে গিয়ে পূজা দেওয়ার জন্যও তীর্থযাত্রীদের সেইরকম ব্রত-উপবাস পালন করতে হয়। পুরুষমাত্রেই এই ব্রত-উদ্‌যাপনের অধিকারী। মহিলাদের ক্ষেত্রে বার বছরের অনূর্ধ্বে এবং পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে বয়স হওয়া চাই। সারা দক্ষিণ ভারত থেকে এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন সবরিমালা তীর্থে। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে আয়াপ্পা স্বামীর কথা সবাই জানেন।

আয়াপ্পা স্বামী কে?

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দক্ষিণ ভারতে চোল রাজাদের অভ্যুদয়ের সময়ের কথা। সেই বংশীয় পানডালামের রাজা রাজশেখর একবার শিকারে বেরিয়ে সবরিমালা পাহাড়ের ওপরে পম্পা নদীর তীরে একটি ক্রন্দনরত পরিত্যক্ত শিশুকে দেখতে পান। নিঃসন্তান রাজা পরম যত্নে শিশুটিকে কোলে তুলে নেন এবং শিকারে না গিয়ে তৎক্ষণাৎ রাজ্যে ফিরে আসেন। সুন্দরকান্তি শিশুটিকে পেয়ে রানীও আত্মহারা। রাজাই শিশুটির নামকরণ করেন 'আয়াপ্পা'। রাজা-রানীর স্নেহ-যত্নে আয়াপ্পা বড় হতে থাকে। বিদ্যাশিক্ষাও আরম্ভ হয়। দেখা গেল আয়াপ্পা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বেদাদি শাস্ত্রেও সে অতি সহজেই পারঙ্গম হয়ে ওঠে।

আয়াপ্পাকে নিয়ে রাজা-রানীর সুখেই দিন কাটছিল। এমন সময় তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাতেও আয়াপ্পার স্নেহের কমতি হয়নি। বড় ছেলে হিসাবে রাজা আয়াপ্পাকেই যুবরাজ করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু রাজ্যাভিষেকের আগে রানীকে কুমন্ত্রণা দিলেন এক রাজমন্ত্রী—আয়াপ্পা রাজা হলে রানী তাঁর নিজের ছেলের দুর্গতির কথা ভেবে দেখেছেন কি? কুমন্ত্রণায় কাজ হলো। কিন্তু উপায় কি? রাজা তো আয়াপ্পা-স্নেহে অন্ধ। তাঁকে ভোলাবেন কি করে? উপায় বাৎলালেন মন্ত্রীই। রানীকে অসুখের ভান করতে হবে। রাজবৈদ্যকে মন্ত্রী শিখিয়ে-পড়িয়ে আনবেন। তিনি ঘোষণা করবেন—দুরারোগ্য ব্যাধি। জীবন বিপন্ন মহারানীর। বেঁচে যেতে পারেন একমাত্র বাঘের দুধ পথ্য পেলে। কী সর্বনাশ। কে আনতে যাবে এখন বাঘের দুধ? এ কী মানুষের কর্ম? সে-উপায়ও মন্ত্রীই বের করলেন—অজ্ঞাতকুলশীল আয়াপ্পার জন্ম জঙ্গলে। তার পক্ষেই সম্ভব বাঘের দুধ সংগ্রহ করা। মন্ত্রীমশাই ভাবলেন, তা করতে গিয়ে বাঘের পেটেই হবে তার পরমগতি এবং তাতেই কাজ হাসিল। রাজার কিন্তু এতে ঘোরতর আপত্তি—আয়াপ্পাকে কিছুতেই তিনি বাঘের দুধ আনতে যেতে দেবেন না। কিন্তু সব শুনে স্বয়ং আয়াপ্পা রাজাকে আশ্বস্ত করে সোৎসাহে বললেন—এ অতি সামান্য ব্যাপার তার পক্ষে। কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সে ঠিক বাঘের দুধ সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে।

উৎকণ্ঠিত রাজা ও ষড়যন্ত্রী মন্ত্রীর সামনে দিয়ে আয়াপ্পা

চলে গেল বনে বাঘের দুধ আনতে। কিন্তু একি তাজ্জব ব্যাপার! কিছুক্ষণ পরে আয়াপ্পা ফিরে এল কেবল বাঘের দুধ নিয়েই নয়, এক পাল বাঘই তার সঙ্গে এসে হাজির। ভীতসন্ত্রস্ত সবাই দেখে, আয়াপ্পা ফিরে আসছে দুগ্ধপাত্র হাতে একটি বাঘের পিঠে চড়ে আর তার দুপাশে অনুগত সৈন্যের মতো চলেছে এক পাল বাঘ। ব্যাপার দেখে তো মন্ত্রীমশাই পালিয়ে বাঁচলেন আর রাজা পরম বিস্ময়ে ও আদরে আয়াপ্পাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বুঝলেন, অজ্ঞাতকুল-শীল তাঁর আয়াপ্পা মানুষ নয়—দেবতা। আয়াপ্পাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়ে গিয়ে রানীও খুব লজ্জিত হলেন।

কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও আয়াপ্পা রাজা হতে চাইলেন না। এমনকি তিনি সেখানে আর থাকতেও চাইলেন না। রাজ্যসুখ ছেড়ে, রাজা-রানীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে তিনি পানডালাম রাজ্য থেকে বহুদূরে কায়াকুলাম রাজ্যে চলে গেলেন। সেখানে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন যোদ্ধরূপে—একদল দক্ষ সেনা গঠন করে ঐ রাজ্যকে তিনি বহিরাগত শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

আয়াপ্পার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কাহিনী জানা যায়। একসময় কেরালার এরুমেলি ছিল একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। মন্দিরও ছিল অসংখ্য। মন্দিরগুলিতে রক্ষিত হতো দেবতাদের জন্য উৎসর্গীকৃত বহুমূল্য মণিমাণিক্য। বহিরাগত দস্যুরা এসে সেইসব মন্দির ধ্বংস করে লুঠতরাজ করত। এই দস্যুদের মধ্যে উদয়নয়ন ছিল অন্যতম। সে সবরিমালা পাহাড়েও তার আধিপত্য বিস্তার করে, এমনকি একবার সে রাজধানী পানডালাম আক্রমণ করে রাজপ্রাসাদ থেকে রাজকন্যাকে বলপূর্বক নিয়ে পালায়। পথে রাজকন্যাকে এক ব্যক্তি উদ্ধার করে। সম্ভবত সে মন্দিরের পূজারী-পুত্র এবং পরে তাদের বিয়েও হয়। একমতে, আয়াপ্পা তাদেরই পুত্র এবং মকর-সংক্রান্তির দিনে তার জন্ম।

এইসব প্রচলিত কাহিনী ছাড়া আয়াপ্পার জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় মতে আয়াপ্পা বিষ্ণুর অবতার। হরি ও হরের (বিষ্ণু ও শিবের) মোহিনীমায়ায় আয়াপ্পার জন্ম হয়। কোন কোন পুরাণে আয়াপ্পাকে ধর্মশাস্তার সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে। তারক-ব্রহ্ম নাম ও ধর্মশাস্তা একই অর্থে ব্যবহৃত।

আয়াপ্পা ও ধর্মশাস্তা

আয়াপ্পার মতো ধর্মশাস্তা, সংক্ষেপে 'শাস্তা' আজ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত কেরালায় পূজিত। এক মতে, আয়াপ্পাকে শাস্তারই অবতার বলা হয়। শাস্তার বিগ্রহের অনুকৃতি দেখে বিশেষজ্ঞরা বলেন, শাস্তা আদিম যুগ অর্থাৎ প্রাক্ আর্যযুগের কোন দেবতা। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকে কেরালার ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দেবতা হিসাবে গ্রহণ করেন। অপর মতে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফলেও হয়তো শাস্তা দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি পান।

সবরিমালা যাওয়ার পথে আরেকটি স্থান—
এখানে যুবক আয়াপ্পার মূর্তি আছে

তাঁদের মতে, দ্রাবিড় যুগে এই শাস্তাকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণ ঘটে। ধর্মশাস্তার আবির্ভাব বিষয়ে গবেষকরা আরো একটি তথ্য প্রকাশ করেছেন। একসময় দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মীয় মতাবলম্বীরা নিজ নিজ দেবতাদের প্রাধান্য নিয়ে তুমুল কলহ করত। শৈবেরা যেমন হরিনামসঙ্কীর্তন সহ্য করতে পারত না, বৈষ্ণবদের কাছে শিব-নাম ছিল তেমনি অসহ্য। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ লেগেই থাকত এবং মাঝে মাঝে তা ঘোরতর আকার ধারণ করত। উভয় মতাবলম্বীরা পরস্পরের মন্দিরগুলি ধ্বংস করতেও কুণ্ঠিত হতো না। এবিষয়ে কোট্টায়ামের স্বামী অথুরাদাস একটি পুস্তক ('কেরালা-ভূষণম্') প্রকাশ করেন মালয়ালাম ভাষায়। তাঁর মতে, এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব থেকেই অধর্মের শুরু। শিব ও বিষ্ণু অভিন্ন, একই ঈশ্বরের দুটি ভাব। এই দ্বন্দ্ব-নিরসনের জন্য বিষ্ণু এক সুন্দরী নারীমূর্তি ধারণ করলেন। শিব হলেন তাঁর স্বামী। উভয়ের মিলনের ফলেই আয়াপ্পার জন্ম হয় এবং আয়াপ্পার জন্মের পর শৈব ও বৈষ্ণবদের দ্বন্দ্বেরও অবসান ঘটে।

আয়াপ্পাকে প্রাক্ আর্যযুগের দেবতা হিসাবে উল্লেখ করার সপক্ষে বিশেষজ্ঞরা আরো কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন, যেমন কেরালায় ব্রাহ্মণ ছাড়া সব জাতির মধ্যেই আয়াপ্পা নামটি খুবই প্রচলিত। নায়াদি থেকে নায়ার সব বর্ণ ও সম্প্রদায়ই আয়াপ্পা নামটি গ্রহণ করেছে, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ পদবির সঙ্গে আয়াপ্পা নামটি যুক্ত হয়নি। এতেই বোঝা যায়, দক্ষিণ ভারতে আর্য ব্রাহ্মণেরা আসার বহু আগে থেকেই আয়াপ্পাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধর্ম ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। আয়াপ্পা-ধর্মের প্রাক্ আর্যত্ব দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় মন্দিরগুলি দেখলেও বোঝা যায়। সেসব মন্দিরের কোনটিতেই

আয়াপ্পাকে মুখ্য উপাস্য হিসাবে রাখা হয়নি। সেখানে আয়াপ্পার স্থান দ্বিতীয়। এমনকি কেরালার গুরুভাইয়ুর মন্দিরেও আয়াপ্পা প্রধান উপাস্য নন। এতেই বোঝা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সহজে আয়াপ্পাকে গ্রহণ করেনি। অনেক দ্বন্দ্ব-কলহের পর ব্রাহ্মণেরা প্রতিবেশীদের সন্তুষ্ট করার জন্য আয়াপ্পাকে মেনে নিয়েছে। এখানে স্মরণীয়, দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত কেরালায় একসময় জাতি-দ্বন্দ্ব ও বর্ণবিদ্বেষ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল, যার ফলে মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যাচারে নিম্নবর্ণেরা দলে দলে খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এদিকে আয়াপ্পার ধর্মে কোন বর্ণ-বিদ্বেষ বা সম্প্রদায়-বিদ্বেষ নেই। তাই দক্ষিণ ভারতে আয়াপ্পার ধর্ম ও সংস্কৃতি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনেকের মতে, দক্ষিণ ভারতে বিশেষত কেরালায় শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ প্রচারের পূর্বেও আয়াপ্পা তাঁর উদার ধর্মনীতির জন্য খুবই সমাদৃত ছিলেন এবং সেসময়ও আয়াপ্পার নামে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের একচ্ছত্র প্রভাব সত্ত্বেও প্রাক্ আর্যযুগের দেবতা আয়াপ্পা আর্যধর্ম ও আর্য-সংস্কৃতিতে তথা হিন্দুধর্মে স্থানলাভ করে।

আয়াপ্পা ও বুদ্ধ

কিছু বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত আবার আয়াপ্পার অভ্যুদয়ের পিছনে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব ও যোগসূত্র দেখতে পেয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন কোণঠাসা, তখন ভগবান বুদ্ধই 'আয়াপ্পা' নামে হিন্দু-মানসে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে নানা কাহিনী ও উপাখ্যানও রচিত হয়। এই বিশেষজ্ঞদের মতে, 'আয়াপ্পা' ও 'ধর্মশাস্তা' শব্দদুটিও বৌদ্ধধর্ম থেকেই নেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রত্রয় যেমন—'বুদ্ধং শরণম্', 'সঙ্ঘং শরণম্', 'ধর্মং শরণম্'; আয়াপ্পা-অনুরাগীদের মন্ত্রও সেইরকম 'আয়াপ্পা শরণম্', 'শাস্তা শরণম্', 'ধর্মং শরণম্'। আরো লক্ষণীয়, কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' বুদ্ধকে বিষ্ণুর (হরির) অবতার বলা হয়েছে। আয়াপ্পাও বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত। এমনকি, আয়াপ্পা তথা ধর্মশাস্তা ও বুদ্ধমূর্তির মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধও অহিংস, আয়াপ্পাও অহিংস। বনের বাঘের সঙ্গে তাঁর মিতালি, তাই বনে গিয়ে বাঘের দুধ সংগ্রহ করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়নি। বুদ্ধের মতো আয়াপ্পারও জাতি-বর্ণ বিদ্বেষ নেই, সর্ব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর কাছে সমান। সবরিমালা তীর্থক্ষেত্রে তাই কেউ অপাঙ্ক্তেয় নয়। সবাই এখানে স্বাগত। আগেই বলা হয়েছে, কেবল বার বছরের অনূর্ধ্বে ও পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রীলোকেরা ছাড়া সবাই সবরিমালা তীর্থে গিয়ে আয়াপ্পা স্বামীর মন্দিরে পূজা দেওয়ার অধিকারী।

সবরিমালায় যাওয়ার পথ

যাত্রা শুরু কোট্টায়ামের এরুমেলি থেকে। এরুমেলি থেকে সবরিমালা দীর্ঘ বনপথ। সময় লাগে কয়েকদিন। যাত্রীরা খালি পায়ে এই পথ অতিক্রম করেন তীর্থযাত্রার প্রতিটি নিয়ম-কানুন মেনে। পথে একটি মসজিদ পড়ে, 'ভেভারের মসজিদ' নামে এটি খ্যাত। ভেভার ছিলেন আয়াপ্পার অনুরাগী এক মুসলমান সেনাপতি। ভেভার এরুমেলিতেই থেকে যান এবং ঐ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি হিন্দু-মুসলমানের সংহতির প্রতীক। যোদ্ধা আয়াপ্পা ও ভেভারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এখানে তীর-ধনুক হাতে নিয়ে একধরনের নৃত্য করে তীর্থযাত্রীরা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করেন। এইপ্রকার নাচের নাম 'পেট্টা-মুলাল'। এই নাচের সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের সুমধুর সঙ্গীতও শোনা যায় দক্ষিণী ভাষায়—

"আয়াপ্পান থিনকাথোম্, স্বামী থিনকাথোম্
আয়াপ্পান থিনকাথোম্, স্বামী থিনকাথোম্
থিনকাথোম্, থিনকাথোম্—স্বামী থিনকাথোম্।"
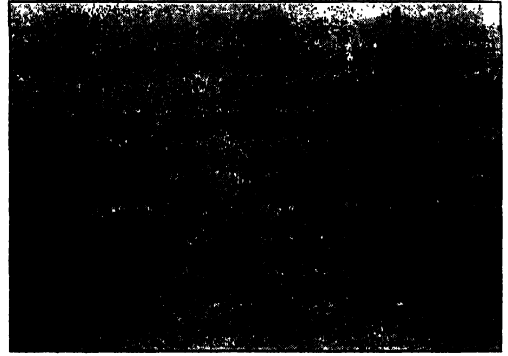
আয়াপ্পা-অনুগামী 'ভেভার'-এর মসজিদ এবং 'শাস্তা'-মন্দির

আবার যাত্রা শুরু। এবার তাঁরা এসে পৌঁছান 'পেরুরথোড়ু'তে—এরুমেলি থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে। এটি আসলে একটি খাল, যার দুপাশে সুন্দর বাগান। যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হন। এই খালের দুপাশে প্রচুর ভিক্ষুক বসে থাকে তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাশায়।

তীর্থযাত্রীদের পরবর্তী বিশ্রামের স্থান প্রায় কুড়ি কিলোমিটার পথ চলার পর 'আজুথা'তে। আজুথা পম্পা নদীরই শাখা। এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী চমৎকার। এখানে তীর্থযাত্রীরা সন্ধ্যাবেলা আগুন জ্বালে ও তার চারপাশে গোল হয়ে নৃত্য করে। তাঁদের বিশ্বাস, এইসময় আয়াপ্পা স্বামীও তাঁদের সঙ্গে নৃত্য করেন। যাই হোক, শীত ও বন্য পশুর উপদ্রবের আশঙ্কাও এতে নিঃসন্দেহে কিছু কমে। এই নদীতে স্নান করাও তীর্থযাত্রীদের কাছে পুণ্যকর্ম। নদী থেকে নুড়ি কুড়িয়ে তাঁরা কাপড়ে বেঁধে নেন।

পরবর্তী পাহাড়ী রাস্তা খুবই বন্ধুর। এবারের গন্তব্যস্থল 'কালিডামকুম্'। এখানে এসে তীর্থযাত্রীরা আজুথা নদী থেকে সংগৃহীত নুড়িগুলি ফেলে দেন। এরও দীর্ঘ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে, অবশ্য তার আলোচনার স্থান স্বতন্ত্র। চড়াই-

উতরাইয়ের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তীর্থযাত্রীরা এসে পৌঁছান 'কাড়িয়ালাম' নামক স্থানে। জায়গাটি 'অজুথামেডু' ও 'কারিমালা' পর্বত-দুটির মধ্যবর্তী স্থান। এখানে তীর্থযাত্রীরা খুবই সাবধানে চলেন। এখানে নাকি একসময় বন্য হাতিরাও বেরিয়ে এসে তীর্থযাত্রীদের আক্রমণ করত। সঙ্কীর্ণ ও কষ্টসাধ্য এই পথে দু-ঘণ্টা চলার পরে অবশেষে তীর্থযাত্রীরা পম্পা নদীর তীরে এসে পৌঁছান। এখানে উল্লেখযোগ্য, আয়াপ্পা সেবাসঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবীরা এই দীর্ঘ যাত্রাপথের স্থানে স্থানে পানীয় জল ও অন্যান্য কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়েও তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করেন।

কিংবদন্তী অনুসারে পম্পা নদীর তীরে ক্রন্দনরত পরিত্যক্ত আয়াপ্পাকে দেখতে পেয়ে বুকে তুলে নিয়েছিলেন পাণ্ডালামের রাজা রাজশেখর। আরো কথিত আছে, এই সেই
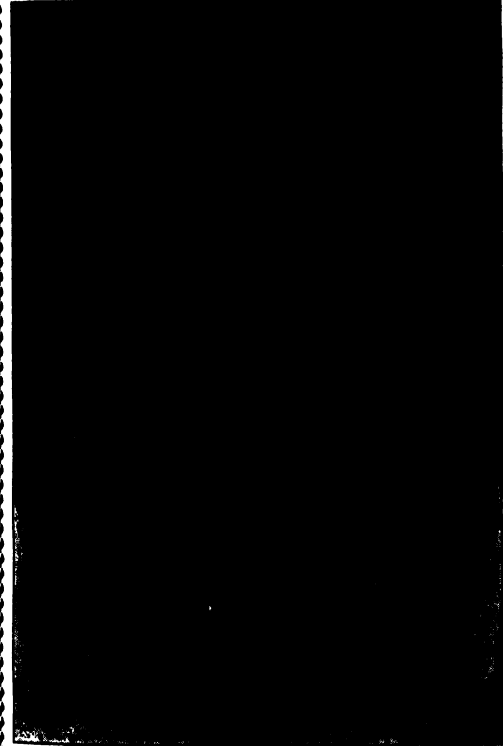
এই আঠারটি ধাপ অতিক্রম করে আয়াপ্পার মন্দিরে উঠতে হয়

পম্পা নদী যেখানে শবরীও একসময় অপেক্ষা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের অপেক্ষায় মুক্তির প্রত্যাশায়। জানি না, সবরিমালা তীর্থের নামের সঙ্গে শবরীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা। দু-কিলোমিটার দীর্ঘ নদীর দুই তীর আয়াপ্পার উৎসব উপলক্ষ্যে অগণিত তীর্থযাত্রীর সমাগমে যেন একটি বড় শহরের রূপ নেয়। প্রার্থনা, গান-বাজনা, আনন্দ-উল্লাস, দোকান-পসরায় নদীর দুই তীর মুখরিত হয়ে ওঠে। এখানে এসে তীর্থযাত্রীরা দু-তিনদিন বিশ্রাম করেন এবং আয়াপ্পা স্বামীর ধ্যান, প্রার্থনা ও ধর্মীয় পুস্তক পাঠে সময় কাটান। প্রতি সন্ধ্যায় তীর্থযাত্রীরা অসংখ্য দীপ জ্বালিয়ে পম্পা নদীতে ভাসিয়ে দেন। সেই ভাসমান দীপাবলীতে সমস্ত এলাকাটাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এমনকি আয়াপ্পার উদ্দেশে নদীতে তাঁরা টাকা-পয়সাও দেন প্রণামী হিসাবে—আয়াপ্পা সমিতি কর্তৃক রক্ষিত কয়েকটি ভাসমান পাত্রে। এই নদীতে অবগাহনও তীর্থযাত্রীদের একটি পুণ্যকর্ম। তাঁদের বিশ্বাস, এই পবিত্র নদীতে স্নান করলে রোগমুক্তি হয়। আরো কিংবদন্তী, শ্রীরামচন্দ্র সীতার অন্বেষণে এই পম্পা নদীর তীর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। এখানে 'রামপাদম্' বলে একটি স্থানে তীর্থযাত্রীরা পূজা দেয় শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে। তাঁদের ধারণা, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। যাহোক, পম্পা নদীর তীরে কয়েকদিন বিশ্রাম করে তীর্থযাত্রীরা সবরিমালার উদ্দেশে রওনা হন মকর-সংক্রান্তির দিনে। সবরিমালা এখান থেকে ১০ কিলোমিটারের পথ।

এবার উতরাই। সবরিমালার অদূরবর্তী 'নীলিমা' পাহাড়টি খুবই খাড়া। এই পথে চলতে অনেক যাত্রীরই দম ফুরিয়ে যায়। তাই তাঁরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেন এবং জল পান করেন। এই পথেই 'সবরিপীঠম্' নামে একটি স্থান আছে। লোকের বিশ্বাস, শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে এখানে পাদস্পর্শে মুক্তি দেন। তীর্থযাত্রীরা এখানে নারকেল ভেঙে ও ধূপ জ্বালিয়ে তাপসী শবরীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরবর্তী স্থান 'সরমকুথ্যালু'। এরুমেলি থেকে তীর্থযাত্রীরা একটি করে তীর-ধনুক সঙ্গে আনেন যোদ্ধা আয়াপ্পার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। এখানে একটি বিশেষ স্থানে এসে সেইসব তীর-ধনুক তাঁরা বিসর্জন দেন। একদা যোদ্ধা আয়াপ্পাও নাকি একটি পিপ্পল গাছের তলাতে এসেই তাঁর তীর-ধনুক বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধযাত্রা সমাপ্ত করেন। অবশ্য এখন আর সেই পিপ্পল গাছটি নেই।

সবশেষে 'সবরিমালাই সন্নিধানম্'-এ তীর্থযাত্রীদের দীর্ঘ পথচলার অবসান হয়। আয়াপ্পার স্মৃতিবিজড়িত মন্দির। অনুপম স্থান। চতুর্দিক নৈসর্গিক শোভামণ্ডিত। মন্দিরে পৌঁছাতে হলে তীর্থযাত্রীদের আঠারটি ধাপ উঠতে হয়। তবে শুধু সবরিমালায় নয়, কেরালা ও তামিলনাড়ুর অধিকাংশ মন্দিরেই প্রবেশ করতে গেলে এইরকম আঠারটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এর পিছনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হলো যে, ভক্তকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা আত্মোপলব্ধি করতে হলে তাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, অষ্ট রাগ (আসক্তি), তিন গুণ এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ প্রকৃতির এই অষ্টাদশ মায়াময় মোহজাল ছিন্ন করতে হবে এবং তখনি দেহাভ্যন্তরের জ্যোতিস্বরূপ আত্মা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন। মন্দিরের এক-একটি কষ্টসাধ্য ধাপও এরই প্রতীক। এগুলি অতিক্রম করেই তীর্থযাত্রীরা দেববিগ্রহ-

দর্শনে ধন্য হন। যাহোক, সবরিমালায় লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী সারিবদ্ধভাবে 'আয়াপ্পা শরণম্', 'স্বামী শরণম্' নামগানে এই আঠারটি ধাপ উঠে আসেন। তাঁরা এই ধাপগুলি ওঠার সময় নারকেলও ভাঙেন। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, আগে তীর্থযাত্রীরা সাধারণত মকর-সংক্রান্তির দিনে (সাধারণত ১৪ জানুয়ারির মধ্যে) এসে মন্দিরে পূজা দিয়ে ঐদিনেই ফিরে যেতেন। কিন্তু এখন ক্রমবর্ধমান তীর্থযাত্রীর জন্য এই নিয়ম রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই তীর্থযাত্রীরা এখন মকর-সংক্রান্তির এক সপ্তাহ আগে ও এক সপ্তাহ পরে পর্যন্ত এখানে এসে পূজাদি সম্পন্ন করে যান। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় হলো একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আগেই বলা হয়েছে, আয়াপ্পা পাণ্ডালামের রাজপ্রাসাদেই বর্ধিত ও লালিত-পালিত হন। এসময় প্রতি বছর সেই রাজার বংশধরেরা তাঁদের 'শাস্তা মন্দির' থেকে শোভাযাত্রা করে

'ধর্মশাস্ত্রা'—আয়াপ্পার অপর এক প্রতিমূর্তি

সবরিমালায় আয়াপ্পা-মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হন। সঙ্গে হাতিও থাকে কখনো, কখনো-বা রাজবংশের সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি চলেন পালকিতে। শোভাযাত্রায় বহন করা হয় কয়েকটি বহুমূল্য পেটিকা, যাতে আয়াপ্পার নামে উৎসর্গীকৃত বহু মূল্যবান রত্নরাজি রক্ষিত। শোভাযাত্রার সবরিমালায় পৌঁছাতে দিন তিনেক সময় লাগে। মাঝে দু-জায়গায় থেমে রাত্রি কাটাতে হয় তীর্থযাত্রীদের। শোভাযাত্রা চলার সময় কখনো-বা আকাশে একটি ঈগল পাখি দেখা যায়। তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস, এও একটি পুণ্য প্রতীক। শোভাযাত্রা সবরিমালায় পৌঁছালে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাজবংশের যে সম্মানীয় ব্যক্তি (থামপুরম্) পালকিতে আসেন তাঁকে যথাবিধি সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে মন্দিরাভ্যন্তরে নিয়ে যান। মন্দিরে একটি চালকুমড়া বলি হয়। এরপর শোভাযাত্রার সঙ্গে আনীত বহুমূল্যবান রত্ন দিয়ে ভগবান আয়াপ্পাকে প্রাণভরে সাজিয়ে সন্ধ্যায় পূজারী দীপারাধনা শুরু করেন। এ এক দর্শনীয় অনুষ্ঠান। এসময় আয়াপ্পার উদ্দেশে সমাগত তীর্থযাত্রীরা সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন নিবেদন করেন, যার মূল্য প্রতি বছর কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। সেই রত্নরাজির ঔজ্জ্বল্য ও লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভাবভক্তির উচ্ছ্বাস চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এইসময় অনেক ভক্ত আকাশে নাকি একটি আশ্চর্য আলোও দেখতে পান (অবশ্য এ তাঁদের ভক্তি-বিশ্বাসেরই ব্যাপার)। এই উপলক্ষ্যে অজস্র বাজিও পোড়ানো হয়।

এইভাবে তিনদিন চলার পর আয়াপ্পার রত্নরাজি খুলে নিয়ে আবার বাক্সবন্দী করা হয়। তীর্থযাত্রীদের এই পরিক্রমায় 'মালিকাপুরথাম্মা'র বিষয়ও উল্লেখ করতে হয়। এটিও একটি দর্শনীয় মন্দির। মালিকাপুরথাম্মা ছিলেন এক নারী, যিনি আয়াপ্পাকে ভালবেসেছিলেন এবং সেই সুবাদে বিয়েও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আয়াপ্পা ছিলেন চিরকুমার অর্থাৎ চির-ব্রহ্মচারী। কিন্তু বছরের পর বছর মালিকাপুরথাম্মা অপেক্ষা করেও আয়াপ্পার সেই ব্রত ভঙ্গ করতে পারেননি। অবশেষে তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যান। তাঁর মন্দিরটি আঠারটি ধাপের নিচে। আঠারটি ধাপ ওপরে অর্থাৎ আয়াপ্পার মন্দির থেকে কিছু দূরে আরো দুটি মন্দির আছে—গণেশ ও কার্ত্তিকের। তীর্থযাত্রীরা এসব মন্দিরেও পূজা দেন ও ধূপ-দীপ জ্বালান। জানা গেল, এইসময় ধূপই পোড়ানো হয় কয়েক লক্ষ টাকার। তীর্থযাত্রীদের আনীত ঘিতে দেবতার অভিষেক হয়। আর নারকেল ভেঙে পূজা দেওয়া তো সমগ্র দক্ষিণ ভারতেরই প্রথা। সবশেষে বেশ কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে এই ঘি ও নারকেলই তীর্থযাত্রীরা প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করেন।

সব মিলিয়ে মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এ এক আশ্চর্য ভ্রমণ ও তীর্থযাত্রা, যার উত্তেজনা, আনন্দ ও কষ্ট পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা দর্শনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। লক্ষণীয়, গঙ্গাসাগর মেলাও মকর-সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত হয়। তবে একটির গন্তব্যস্থল গঙ্গার মোহনায়, অপরটি পর্বতচূড়ায়। যাহোক, সবরিমালার তীর্থযাত্রীদের এভাবে চল্লিশ দিনের ব্রত সমাপ্ত হয়। আবার সেই একশ কিলোমিটার বনপথ দিয়ে তীর্থযাত্রীরা ফিরে চলেন নিজেদের গন্তব্যস্থানে। হৃদয়ে তাঁদের সুমধুর স্মৃতি, আর মুখে মধুর নাম—'আয়াপ্পা শরণম্', 'স্বামী শরণম্'...! ❑

মরুতীর্থে একদিন

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

ভারতের মহাদেবী সতী আর মিশরের প্রাচীন দেবতা ওসিরিস। স্থান-কালের দুস্তর ব্যবধান এই দুই পৌরাণিক চরিত্রের। সতীর স্বামী শিবের আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য ওসিরিসের। প্রধান বৈসাদৃশ্য বর্ণে। শিব তুষারধবল, ওসিরিস ঘন কৃষ্ণবর্ণ। আর সতীর ভাগ্যের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য ওসিরিসের ভাগ্যের। স্থান-কালের ব্যবধান অতিক্রম করে যেন একদিন এই দুই পৌরাণিক চরিত্রের—সতীর ও ওসিরিসের—সাক্ষাৎ হয়েছে মরুতীর্থ হিঙ্গুলা বা হিংলাজের মন্দির-চত্বরে। এই কল্পনার ভিত্তিতে এঁদের সংলাপে আধুনিক পটভূমিকায় রচিত এই শ্রুতিনাটক 'মরুতীর্থে একদিন'।

পুরাণে শিব-সতীর কাহিনী আমাদের সুপরিচিত। ওসিরিস ও তাঁর পত্নী আইসিসের কাহিনী-সূত্র—(১) একান্ন পীঠ—পূর্বা সেনগুপ্ত (৬-৭ পৃষ্ঠা); (২) Ancient Egypt : Myth & History (Geddes & Grosset—1997 edition), Chapter-2, The Tragedy of Osiris, pp. 42-52); (৩) The Story of Osiris and Isis—E. F. Dadd, (1992 edition)। শেষোক্ত বইদুটি সংগ্রহ করে দিয়েছে কল্যাণীয় মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—লেখক

স্থান—মরুতীর্থ হিংলাজ

পাত্র-পাত্রী—সতী এবং ওসিরিস

মৃদুস্বরের স্তোত্রপাঠ ভেসে আসছে—

"ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচন।
কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা দিগম্বরী।।"

সতী। তাহলে তো ঠিক জায়গাতেই এসেছি। এই সেই হিঙ্গুলা বা হিংলাজ—যেখানে আমার ব্রহ্মরন্ধ্রের অবস্থান। এখানেই তো সতী কোট্টরী আর ভৈরব ভীমলোচন। ক্ষীণকণ্ঠে হলেও এখনো পূজামন্ত্র উচ্চারিত—পূজা প্রচলিত।... একি, বৃষভ-বাহন, ভুজঙ্গভূষণ, কৃত্তিবাস, কৃষ্ণকায় পুরুষ! আপনি কে?

ওসিরিস। সদ্য যে মরুঝটিকা বয়ে গেল এই নির্জন স্থানের ওপর দিয়ে, তার ফলে আপনি আমার দৃষ্টির গোচরে আসেননি দেবী। এখন আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আপনার পরিচিতির জন্য আমিও উৎসুক। আপত্তি যদি না থাকে—

সতী। না, আপত্তির কোন কারণ নেই। অপরিচিত পুরুষ। আমার নাম সতী আর আমার স্বামী শিব।

ওসিরিস। এই বিশাল বিশ্বের কোথায় ছিল আপনাদের আবাসস্থল?

সতী। আমাদের আবাসস্থল ছিল পুণ্যভূমি দেবভূমি ভারতবর্ষে। মহাদেব আর মহাদেবী-রূপে সেখানে আমরা যুগ যুগ ধরে পূজিত। মহাদেব শিবও আপনারই মতো বৃষভবাহন। তাঁর মস্তকভূষণও আপনার শিরোভূষণের মতোই কালভুজঙ্গ। আপনার আর আমার স্বামীর পরিধেয়ও একই—ব্যাঘ্রচর্ম। প্রধান বৈসাদৃশ্য বর্ণে। তাঁর বর্ণ রজতগিরির মতো শুভ্র আর আপনার বর্ণ ঘনকৃষ্ণ। এখন আপনি বলুন, আপনার আবাস কোথায়?

ওসিরিস। আমার বসতি ছিল মিশরে। নীল নদ যে-দেশকে ঐশ্বর্যময়ী শস্যশালিনী করে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। আমার নাম ওসিরিস। আমার পিতা আকাশ আর জননী পৃথিবী—আমাদের মিশরে যাঁদের পরিচিতি 'পুট' আর 'জেব' নামে। আমার পত্নীর নাম 'আইসিস'। মিশরে আমরাও বহুকাল ধরে দেবদেবীরূপে পূজিত হতাম। আমি ছিলাম মৃত্যুর দেবতা।

সতী। কি আশ্চর্য। আমার স্বামী শিবও তো সংহারের দেবতা, যার জন্য তাঁর অন্য নাম 'মহাকাল'। আদি দেবতা তিনি। তাঁর পিতৃমাতৃ পরিচয় নেই। স্বয়ংজাত বলে তাঁর প্রসিদ্ধি, তাই তাঁর আরেক নাম 'স্বয়ম্ভূ'। মর্তলোকে আমার পিতা ছিলেন মহারাজ দক্ষ প্রজাপতি। নিয়তির বিধানে তিনি হিংসা করতেন তাঁর জামাতা—আমার স্বামী শিবকে।

ওসিরিস। তাঁর এই হিংসা কি অকারণ ছিল দেবী?

সতী। আমার স্বামী দরিদ্র কিন্তু ত্রিলোকপূজিত। দেবতাদের আদিদেব, তাই তিনি দেবাদিদেব। আমার পিতাও মহাপূজ্য মহারাজা। শাসনদক্ষতা আর প্রজানুরঞ্জনের জন্য তাঁর নাম 'দক্ষ প্রজাপতি'। দারিদ্র্যভূষিত আমার স্বামীর ত্রিলোকপূজ্যতা আর লোকপ্রিয়তাই ছিল আমার পিতার ঈর্ষা আর ক্রোধের প্রধান কারণ।

ওসিরিস। পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে এই ঈর্ষা আর ক্রোধের প্রাবল্য। অসহিষ্ণুতা তার প্রধান ব্যাধি।

সতী। 'যে সয় সে রয়—যে না সয় সে নাশ হয়'—চিরকাল এই আমার অমরবাণী। যা যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে আমি স্মরণ করিয়ে দিই।

ওসিরিস। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মানুষ তা শোনে না। তাই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কোনদিনই মানুষের আয়ত্তে নয়। উচ্ছৃঙ্খল মিশরে আমি নিয়মশৃঙ্খলার প্রবর্তন করেছিলাম। অসভ্য আর অশিক্ষিত মিশরীয়দের আমি সভ্য আর শিক্ষিত করার কাজে ব্রতী ছিলাম। আর মিশরীয়রা আমাকে আর আমার পত্নী আইসিসকে আমাদের ব্রতের জন্য, আমাদের অমলিন দাম্পত্যের জন্য পূজা করত। মিশরের প্রিয়তম দেবদেবী হয়ে উঠলাম আমরা।

সতী। [অর্ধস্বগত] ঈর্ষণীয় ছিল শিব-সতীর দাম্পত্যও।

ওসিরিস। আমাদের খ্যাতি আর প্রতিপত্তি সহ্য হলো না আমার ছোটভাই সেট-এর। তার পরিণামে একদিন সে অতর্কিতে ছলনায় আমাকে নিহত করে পেটিকাবদ্ধ করল এবং সবার অলক্ষ্যে নীলনদের জলে ভাসিয়ে দিল। আমার শোকে আইসিস পাগলের মতো হয়ে গেল।

সতী। তারপর?

ওসিরিস। ভাসতে ভাসতে ওই পেটিকা মহাসমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তারপর বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বহু অনুসন্ধানে আইসিস সেই পেটিকা পায়, আর তার মধ্যে আবিষ্কার করে আমার দেহ। সেই দেহ তুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল আইসিস। হয়তো ভেবেছিল, যেকোন প্রকারে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করবে সেই মৃতদেহে।

সতী। কি অদ্ভুত মিল! আমার স্বামীকে অপমান করার জন্য আমার পিতা এক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমি ও আমার স্বামী নিমন্ত্রণ পাইনি। কিন্তু স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও আমি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম। সেখানে পিতার মুখে আমার পতির অবর্ণনীয় নিন্দায় জর্জরিত হয়ে যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করি আমি। ধ্যানযোগে এ-সংবাদ জানতে পেরে আমার স্বামী অচিরে উপস্থিত হন সেই যজ্ঞস্থলে। আমার মৃত্যুশোকে তাঁর উন্মত্ত তাণ্ডবে বিনষ্ট হয় দক্ষযজ্ঞ; যার ফলে মৃত্যুর পর আমি বিভূষিতা হই 'দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী' বিশেষণে। আমার মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে দেশব্যাপী তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন আমার ভৈরব—উদ্দেশ্য আমার মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার।

ওসিরিস। তারপর?

সতী। তাঁর এই তাণ্ডবনৃত্যে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কায় স্থিতির দেবতা বিষ্ণু তাঁর চক্রে খণ্ড খণ্ড করেন শিবস্কন্ধবাহিত আমার প্রাণহীন দেহকে।

ওসিরিস। যেমন আমার মৃতদেহ আমার স্ত্রীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার ভাই সেট চোদ্দ খণ্ডে ভাগ করে ছড়িয়ে দেয় নীলনদের বিস্তীর্ণ তীরভূমিতে।

সতী। আমার দেহকেও বিষ্ণু একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন।

ওসিরিস। যেখানে যেখানে আমার মৃতদেহের খণ্ডাংশগুলি পতিত হয়, সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় দেবতীর্থের। মিশরের নীলনদের তীরস্থিত সেইসব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ওসিরিসের জন্য শ্রদ্ধাপীঠ।

সতী। আমার দেহের একান্নটি খণ্ডিত অংশ পতিত হয় আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের একান্নটি স্থানে। যেখানে যেখানে পড়ে সেই খণ্ডাংশগুলি—সেইসব স্থান পরিণত হয় মহাতীর্থ মহাপীঠে। ঐ একান্নটি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে আমি প্রতিষ্ঠিতা আর পূজিতা হই, আর ভিন্ন ভিন্ন ভৈরবের নামে আমার সঙ্গী হয়ে থাকেন স্বামী শিব। সতীহীনতায় রুদ্ররূপ ধরে যিনি তাণ্ডবে বিশ্বধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, শিবরূপে তিনিই সেই বিশ্বের মঙ্গল-কামনায় নিয়োজিত আছেন পিঠভূমিগুলিতে। আশুতুষ্ট আশুতোষ বিল্বপত্র আর দুগ্ধস্নানেই পরম পরিতুষ্ট।

ওসিরিস। আপনার ইতিহাস রোমাঞ্চকর এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা—অদ্ভুত সাদৃশ্য আপনাদের আর আমাদের জীবনে। এমনকি দুগ্ধপ্রসঙ্গেও। দুগ্ধস্নানে যদি শিবের তৃপ্তি, দুগ্ধপানে তবে আমার। পার্থক্য এই, আমাদের বেলায় নায়কের আর আপনাদের বেলায় নায়িকার মৃত্যু এবং অঙ্গচ্ছিন্নতা। এই মুহূর্তে আপনার এখানে উপস্থিতির কোন বিশেষ কারণ আছে কি?

সতী। বিশ্বব্যাপী মহাপ্রলয়, মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, অকারণ নররক্তলোলুপতা আমার দেহবিচ্যুত ব্রহ্মরন্ধ্রেও বিস্ফোরণ ঘটায়। আমাকে নিত্য তাড়না করে মিশরীয় দেবতা ওসিরিস। বিষ্ণু-চক্রে খণ্ডিত আমার দেহের ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল এইখানে—এই হিঙ্গুলায়, মুখে মুখে যা আজ পরিচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' নামে। এখানে আমার নাম 'কোট্টরী' আর আমার ভৈরবের নাম 'ভীমলোচন'। ব্রহ্মরন্ধ্র দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ, তাই তার প্রতি অধিক আকর্ষণও স্বাভাবিক। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থল এই পীঠস্থানে কোট্টরী আর ভীমলোচনের পূজামন্ত্রও যেন কম কর্ণগোচর হয় বর্তমানে। তাই কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমি এসেছিলাম এখানে।

ওসিরিস। কারণ কি জানা গেল দেবী?

সতী। জেনেছি। তবে না জানলেই যে ভাল ছিল মিশর-দেবতা। আমাদের অধিষ্ঠানভূমি ভারতবর্ষকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করার গভীর চক্রান্ত চলছে। আর আমার ব্রহ্মরন্ধ্রপীঠ এই হিঙ্গুলা মূল ভারতভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যে-শ্রেণীর, যে-ধর্মের মানুষরা শিব-সতীর পূজক, তাদের অধিকাংশই এখন ভারতে। আর পূর্বতন ভারতের এই খণ্ডিত অংশে তাদের আসার নানা বাধা আর অসুবিধার ফলেই এখানে আমাদের পূজার অনুষ্ঠান আজ আড়ম্বরহীন ম্লান, যদিও তা আজো প্রচলিত। কিন্তু আপনার এখানে আগমন কি একেবারেই অকারণ, দেবতা ওসিরিস?

ওসিরিস। সর্বংসহা পৃথ্বীমাতা নিজ সন্তানদের ভ্রষ্টাচারে, নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্বে আজ জর্জরিতা। তাঁর সহ্যশক্তি আজ চরম সীমায়। ব্যাবিলনে পৃথ্বীমাতার নাম 'নান'। এই দেবী নানই এখানে পূজিতা—এইরকম প্রচার শুনে তাঁর বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে অনুসন্ধানই ছিল আমার আগমনের কারণ। এখানে এসে জেনেছি, এই স্থানের দেবীকে স্থানীয় মানুষেরা 'নানী' বলে ডাকে। তা থেকে সিদ্ধান্তে এসেছি—ঐ 'নান'রূপী পৃথ্বীই 'নানী'তে রূপান্তরিত হয়েছে কালক্রমে। আর আপনার কথায় বুঝলাম, ভারতবর্ষের 'কোট্টরী' নামে পূজিতা সতীদেবীই স্থানীয়দের কাছে 'নানী'—যা ব্যাবিলনের পৃথ্বীমাতা নান। এ থেকে একথাও বোঝা গেল দেবী, এই বিশ্ব যতই বিশাল হোক, মহাবিশ্বের কাছে অতি ক্ষুদ্র এর অস্তিত্ব। আসুন দেবী, আমাদের এই পরিচয়ের ক্ষণটিকে স্মরণীয় করতে সেই মহাবিশ্বনিয়ন্তার কাছে প্রার্থনা জানাই—বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদ দূর হোক, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, জ্ঞাতিদ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লুপ্ত হোক, বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে ফিরে আসুক নিয়মশৃঙ্খলা—জয়যুক্ত হোক যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযান।

সতী। বিশ্বে প্রলয়ের অবসান হোক, রক্তপাত নিবারিত হোক, শক্তিদম্ভের অভিমান দূর হোক, সত্য-শিব-সুন্দরের অধিষ্ঠান হোক—বিশ্বে শান্তির প্রতিষ্ঠা হোক।

উভয়ে। শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ। ❑

কলকাতা বিক্রির দলিল —এক নতুন তথ্য

তরুণ গোস্বামী

গত ২০ এপ্রিল ১৯৯৮, সোমবার ইংরেজী দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান'-এ কলকাতার প্রতিষ্ঠাদিবসকে কেন্দ্র করে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়।

ঐ সংবাদে বলা হয় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা ক্রয় করে ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর। অর্থাৎ জব চার্নকের মৃত্যুর ৬ বছর পরে। চার্নক মারা যান ১৬৯২ সালের ১০ জানুয়ারি। অতএব ২৪ আগস্ট ১৬৯০ চার্নক সুতানুটিতে পদার্পণ করলেও কোনমতেই তিনি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা নন। কারণ, কলকাতা ক্রয়ের দলিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে গ্রহণ করেন চার্নকের বড় জামাই স্যার চার্লস আয়ার। আয়ারই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা এবং এই নগরীর পত্তন হয় ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর।

কলকাতার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটির সূত্র হলো ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ লাইব্রেরী থেকে পাঠানো কলকাতা বিক্রির দলিলের কপি (Sale deed of Calcutta) এবং তার ইংরেজী অনুবাদ। ব্রিটিশ লাইব্রেরী এবছরের গোড়ায় সাবর্ণ রায়চৌধুরীর পরিবারের বর্তমান বংশধর এবং 'সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ'-এর সম্পাদক গোরাচাঁদ রায়চৌধুরীকে এই মূল্যবান কাগজটি পাঠায়। এই প্রথম ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাজ কলকাতা বিক্রির দলিলের কপি পাঠাল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের 'কলকাতা গ্যালারি'তে কলকাতা বিক্রির দলিলের যে-কপিটি রাখা আছে তা অসম্পূর্ণ এবং দলিলের ইংরেজী অনুবাদটি নেই। উল্লেখ্য, কলকাতা বিক্রির দলিলটি ফার্সিতে লেখা। কিভাবে বেহালার রায়চৌধুরী পরিবার এই মূল্যবান নথিটি পেলেন সেবিষয়ে পরে আলোচনা করব।

এখন জব চার্নককে নিয়ে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। চার্নক সুতানুটিতে আসেন ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট। এর আগে ১৬৭৬ এবং ১৬৮৮ সালেও তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। সুতানুটিকে কেন্দ্র করেই ছিল তাঁর জীবন। এখানেই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মারিয়মের বিবাহ দেন চার্লস আয়ারের সঙ্গে। ১৬৯২ সালের ১০ জানুয়ারি চার্নক মারা যান। মারা যাওয়ার ছমাস আগে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার জন্য তিনি বাড়ির বাইরে প্রায় বেরতেনই না। কোম্পানির কাজ দেখতেন চার্লস আয়ার। আয়ারই চার্নকের কবরের ওপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। জব চার্নক ছিলেন রায়চৌধুরীদের ভাড়াটে এবং মাসে মাসে তিনি ভাড়া দিতেন।

কলকাতা বিক্রির দলিল
১৫ জামাদি ১ হিজরী ১১১০ (১০ নভেম্বর ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ)

যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে বিশ্বাস যে, চার্নকই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা। সেইমত ১৯৯০ সালের আগস্টে কলকাতা প্রতিষ্ঠার ৩০০ বছরপূর্তি খুব ধুমধাম করে পালন করা হয়। শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান হয় এবং সেই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও কলকাতার তদানীন্তন মেয়র কমলকুমার বসু খোলা ঘোড়ার গাড়ি চেপে যোগ দিতে আসেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা জব চার্নককেই কলকাতার জনক বলে উল্লেখ করে মহানগরীর ৩০০ বছরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। কলকাতার প্রতিষ্ঠাদিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি যেমন রাজভবন, মহাকরণ, জি.পি.ও. আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। অতএব জব চার্নক

যে কলকাতার জনক—একথা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে এবং এই নিয়ে কেউ কখনো কোন সংশয় প্রকাশ করেননি।

এবার কী পরিস্থিতিতে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার কলকাতা-সহ আর দুটি গ্রাম বিক্রি করতে বাধ্য হলেন সেটি দেখা যাক।

চার্নকের মৃত্যুর পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারকে সুতানুটি, কলকাতা এবং গোবিন্দপুর বিক্রির অনুরোধ জানায়। রায়চৌধুরীরা বিক্রি করতে রাজি হয় না। তারা বলে, যেহেতু তাদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে ১৬০৫ সালে কলকাতা-সহ বেশ কয়েকটি পরগনা লিজ পায় অতএব তারা এই জমি মোঘল সম্রাটের অনুমতি বিনা বিক্রি করতে পারে না। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও যখন রায়চৌধুরীরা জমি বেচল না, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরাসরি দিল্লিতে দরবার শুরু করল। তখন দিল্লির মসনদে ঔরঙ্গজেবের নাতিরা, যাদের বলা হয় 'Later Mughals'। ১৬,০০০ টাকা নজরানা দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোঘল বাদশাহের কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতা কেনার ফরমান (permission) পায়। এই তিনটি পরগনার দাম ঠিক হয় ১৭,৩০০ টাকা। রায়চৌধুরীদের হাতে ১৩,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

এদিকে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লিতে জোর তদ্বির চালাচ্ছে তখন বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ জমিদার বিদ্যাধর রায়চৌধুরীকে একটি গোপন চিঠি লেখেন। তিনি অনুরোধ করেন, যেন কোন অবস্থাতেই জমিদার নিজে বিক্রয় দলিলে সই না করেন। সই যেন করে তাঁর চার বংশধর। এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

ইব্রাহিম খাঁর অনুরোধমত কলকাতা বিক্রির দলিলে সই করেন রামচাঁদ, মোহনদেব, প্রাণ এবং রামভদ্র। রায়চৌধুরীদের বেহালার বাড়িতে যে বংশতালিকা আছে তা থেকে দেখা যায় যে, চারজন স্বাক্ষরকারীর দুজন—মোহনদেব এবং রামভদ্র নাবালক ছিলেন। স্বাক্ষর করার সময় মোহনদেবের বয়স ১৯ বছর এবং রামভদ্রের বয়স ২ বছর।

ইব্রাহিম খাঁ ভেবেছিলেন যে, যদি নাবালকদের দিয়ে সই করানো যায় তবে সেই দলিলটি বেআইনি (illegal sale of deed) হবে। ফলে পরে জমিদার বিদ্যাধর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নজরে এই বেআইনি দলিলটি আনলে হয়তো তিনি তিনটি পরগনা ফেরত পাবেন। ইব্রাহিম খাঁ বা জমিদার বিদ্যাধর কোন অবস্থাতেই চাইতেন না যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমির মালিক হোক। কিন্তু ইব্রাহিমের বুদ্ধিতে কোন কাজ হলো না। মোঘল সম্রাট ইব্রাহিমকে সরিয়ে আজিম-উল-শাহকে বাংলার সুবেদার করলেন। আজিম-উল ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে রায়চৌধুরীদের নির্দেশ দেন সুতানুটি, কলকাতা এবং গোবিন্দপুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিক্রি করার। সেইমত ঐ বছরের ১০ নভেম্বর বিক্রয় দলিলটি সই হয়। জমিদার বিদ্যাধর পরে চেষ্টা করেছিলেন ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ধরে এই তিনটি পরগনা ফেরত পাওয়ার, কিন্তু তাঁর সে-প্রয়াস সফল হয়নি। সুতানুটি, কলকাতা এবং গোবিন্দপুর ক্রয়ের পর থেকেই কোম্পানি মন দেয় তাদের শক্তিকে সুসংগঠিত করতে এবং রাজ্যবিস্তারে।
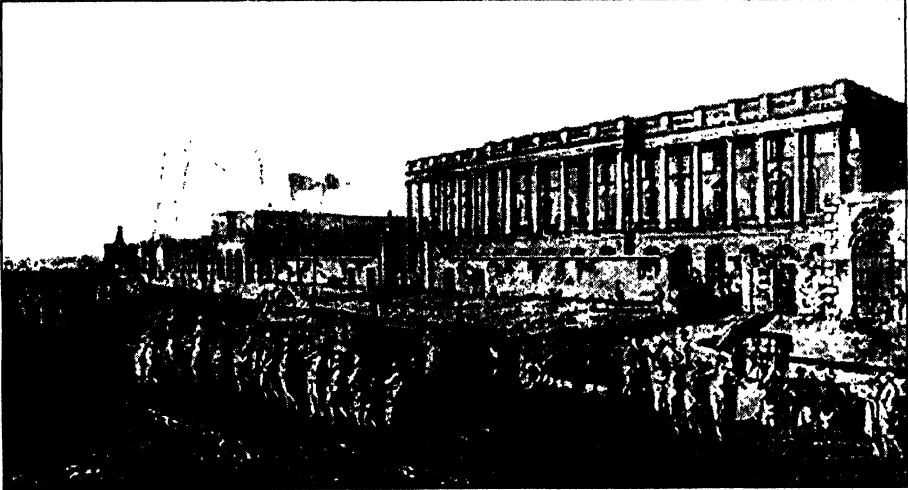
টমাস ডানিয়েলের আঁকা ছবি ঃ নিউ কোর্ট হাউস, ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ (কলকাতা পুরসভার সৌজন্যে)

কলকাতা বিক্রির দলিলের কপি পেতে গোরাচাঁদবাবুকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। বহু চেষ্টা করে দলিলের কপি পাওয়া না গেলে তিনি ১৯৯২ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ

প্রধানমন্ত্রী জন মেজরকে লেখেন এবং এব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। জন মেজরের ঐকান্তিক চেষ্টায় ব্রিটিশ লাইব্রেরী কলকাতা বিক্রির দলিলের কপি এবং তার ইংরেজী অনুবাদ পাঠায়। এই কপি আনতে গোরাচাঁদবাবুকে ১৯ পাউন্ড দিতে হয়েছে। দলিলের কপি রাখা আছে গোরাচাঁদবাবুর বড়িশার বাড়িতে। জনগণের দেখার জন্য দলিলের জেরক্স রাখা হবে আলিপুর কোর্টের নবনির্মিত মিউজিয়ামে। ঐ মিউজিয়ামের চেয়ারম্যান এবং নবম অতিরিক্ত জেলা জজ (আলিপুর) পি. এল. দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উনি বলেন, আগামী ১৫ আগস্ট মিউজিয়ামটির উদ্বোধনের পর থেকে কলকাতা বিক্রির দলিল এবং তার ইংরেজী অনুবাদ মিউজিয়ামে পাশাপাশি রাখা থাকবে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে—এতদিন ধরে কেন কোন ঐতিহাসিক ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে গিয়ে এই নথি পড়ে কলকাতার ইতিহাস লিখলেন না? আমাদের মনে হয়, এর মূলে আছে তিনটি কারণ।
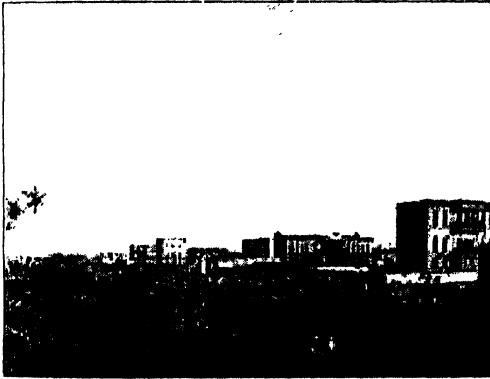
টমাস ডানিয়েলের আঁকা ছবি ঃ চৌরঙ্গী রোড ও পার্শ্ববর্তী অট্টালিকাশ্রেণী, ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ (কলকাতা পুরসভার সৌজন্যে)

প্রথম কারণ হলো, কলকাতার ভিক্টোরিয়ায় সংরক্ষিত দলিলের কপিটি যেহেতু ফার্সিতে লেখা, তাই তার বিষয়বস্তু নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। যদি ঘামাত তবে দেখা যেত যে, দলিলটি অসম্পূর্ণ এবং বিক্রয়কারীদের সই নেই। অতএব এই দলিল কেন অসম্পূর্ণ তা খুঁজতে খুঁজতে মূল দলিল বেরিয়ে আসত এবং তার প্রাপ্তিস্থানও জানা যেত।

দ্বিতীয়ত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে রানী ভারতের শাসনক্ষমতা পান ১৮৫৮ সালে। ঐসময় এই দলিল ইংল্যান্ডে চলে যায় এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে স্থান পায়। ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি চলে যায়। এর পর থেকেই কলকাতা তার গুরুত্ব হারায়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এবং স্বাধীনতার পরেও বিভিন্ন সাহেব ঐতিহাসিক কলকাতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তক লিখলেও কলকাতা বিক্রির দলিল নিয়ে কিছুই লেখেননি। আমাদের মনে হয়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে মোঘল সম্রাটকে নজরানা (ঘুষ) দিয়ে কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর ক্রয়ের অনুমতি পেয়েছিল সেটি পরবর্তী যুগে ইংরেজদের কাছে ছিল অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। আবার বিক্রয় দলিল সই যারা করেছিল তাদের দুজন নাবালক, অতএব এই দলিল বেআইনি। এটিও অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। আমাদের বিশ্বাস, এসব কারণেই কলকাতা বিক্রির দলিল, যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি, তা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে না রেখে ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে রাখা হয়, যাতে বেশি লোকের নজরে না আসে। হয়তো বা এই কারণেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষকে ইচ্ছাকৃতভাবেই দলিলের একটি অংশ স্বাধীনতার পর পাঠানো হয়। দলিলের যে-অংশে বিক্রয়কারীরা সই করেছিলেন তা পাঠানো হয়নি এবং ইংরেজী অনুবাদও পাঠানো হয়নি। নিজেদের ত্রুটি ঢাকতেই সাহেবরা চার্নককে কলকাতার পত্তনকারী হিসেবে চালিয়ে দেয়।

তৃতীয় কারণ হলো—দেশী ঐতিহাসিকদের গবেষণা-মূলক মনোভাবের অভাব। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, সাহেবরা চার্নক সম্বন্ধে যা বলেছে তা aprioni, অভ্রান্ত সত্য। কলকাতার জনক কে?—এই নিয়ে যে নতুন গবেষণা হতে পারে এটা তাঁদের মাথায় কোনদিনই আসেনি। স্বাধীনতার পর থেকে বা স্বাধীনতার আগেও কলকাতার জন্মদিন কখনো সেভাবে পালিত হতো না। ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে একটি বাঙলা দৈনিক এই নিয়ে লেখালিখি শুরু করে এবং ২৪ আগস্ট কলকাতার জন্মদিন পালন করার রেওয়াজ শুরু হয়। এই সংবাদপত্রগোষ্ঠীই জব চার্নককে 'কলকাতার জনক' আখ্যা দেয়। ঐতিহাসিকরা এবিষয়ে কোন প্রশ্ন না তুলেই এটি মেনে নেন।

'সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ'-এর এক মুখপাত্র জানান, এবছর তাঁরা ১০ নভেম্বর কলকাতার ৩০০ বছরের জন্মদিন পালন করবেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন নামকরা ঐতিহাসিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা কে—এই নিয়ে নতুনভাবে গবেষণা আরম্ভ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। মুখপাত্রটি জানান যে, আগামী ১০ নভেম্বর কলকাতার পত্তন বিষয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করবে পরিষদ এবং উক্ত ঐতিহাসিকরা ঐ সভায় তাঁদের প্রবন্ধ পাঠ করবেন বলে রাজি হয়েছেন।

'দ্য স্টেটসম্যান'-এর গত ২০ এপ্রিলের সংবাদ কলকাতার ইতিহাসের নতুন দিক খুলে দিয়েছে। এমনও দিন হয়তো আসবে যেদিন কলকাতার পত্তন নিয়ে এক নতুন ইতিহাস লেখা হবে এবং চার্লস আয়ারকেই আধুনিক কলকাতা নগরীর পত্তনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। ❑

সেই ঢেউয়ের অপেক্ষায়

সন্দীপন বিশ্বাস

বাতাসে এখন এক প্রতিকূল স্রোত। পায়ে বিঁধছে কুশাঙ্কুর। আর গায়ে এসে লাগছে আগুনের হলকা। এর মধ্য দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। এ এক অগ্নিকাল। আমাদের উদ্দেশ্য নেই, দিশা নেই, গন্তব্য নেই। আমাদের প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, চৈতন্য নেই। আছে শুধু এক সঙ্কীর্ণ মন। সেই মনে মাকড়সার মতো জাল বিস্তার করছে লোভ, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঈর্ষা, জিঘাংসা, রিরংসা, কৃতঘ্নতা। সমাজ ও সভ্যতা হারিয়ে ফেলেছে তার দায়বদ্ধতা, কল্যাণভাবনা। কিন্তু পথও তো প্রায় শেষ হয়ে এল। কেননা এ-পথ অন্ধকার, এ-পথের শেষ আছে, এ-পথে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি সম্ভব নয়। দেওয়ালে এখন পিঠ ঠেকে গেছে। হয় তাকে তলিয়ে যেতে হবে পশুত্বের অতল গহ্বরে—যেখানে সভ্যতা ও মানবতার লেশমাত্র নেই, সমস্তটাই এক নগ্ন সভ্যতা। যেখানে দাঁত আর নখের সর্বময় কর্তৃত্ব। আর না হয় তাকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। পিছনদিকে ফিরতে হবে। নখ ও দাঁতের বিরুদ্ধে মানুষের একমাত্র অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করতে হবে প্রেম, মনীষা, প্রজ্ঞা আর মানবতাকে।

বর্তমান মানবসভ্যতার মধ্য দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা মানুষ যেন এক ট্রাজেডির নায়ক। সেই ট্রাজেডি অবশ্য গ্রীক ট্রাজেডির নিয়তিবাদ নয়। সেই ট্রাজেডি যেন শেক্সপীরীয় ট্রাজেডি। সেই ট্রাজেডির উৎস নিহিত রয়েছে মানুষের কৃতকর্মের মধ্যেই। মানুষ তার কৃতকর্মের জন্যই ক্রমে ক্রমে তলিয়ে যাচ্ছে এক চোরাবালির মধ্যে, এক অন্ধকার জগতে। জীবনে অমৃতলাভের পরিবর্তে জুটছে গরল। আর সেই হলাহলের তীব্র জ্বালায় ছটফট করছে মানুষ। আজকের মানুষ তাই শেক্সপীরীয় ট্রাজেডির নায়ক, যে প্রতি মুহূর্তে খুঁড়ে চলেছে নিজেরই মৃত্যুগহ্বর।

সমাজের মূল ভাবনাটাই আজ বিপর্যস্ত। বিপর্যস্ত আমাদের সহিষ্ণুতা আর প্রেমবোধ। সেখানে হিংসা আর ঈর্ষার প্রসার ঘটছে। সেই হিংসা ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে মানুষ নির্বিচারে হত্যালীলা চালাচ্ছে। তুচ্ছ কারণে খুন করছে মা, বাবা, স্বামী, স্ত্রী, ভাই ও বন্ধুকে। এমনকি নিজের জীবনেও পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে সে কুণ্ঠাবোধ করছে না। খুন, রাহাজানি, উন্মত্ততা, নারীর অবমাননা ইত্যাদির পাশাপাশি আত্মহননের হিসেব-নিকেশ করলে বলা যায়, আমাদের হিংসা, লোভ, ঈর্ষার মধ্যে রয়েছে এক হতাশাবোধও। কেন এই হতাশা? উত্তর—ইচ্ছার অপূর্ণতা থেকেই হতাশার জাগরণ। ইচ্ছা বা বাসনাকে আমরা আজ লাগাম পরাতে পারিনি। আকাশচুম্বী লোভ আমাদের ঠেলে দিচ্ছে অতলস্পর্শী খাদে। তাই অল্পেই মন ভরে না। না পেলে মনে হয় জীবনটা বোধহয় তুচ্ছ হয়ে গেল! এ-জীবন মূল্যহীন। বর্তমান সভ্যতায় শিক্ষার যতই হৃদ্দমুদ্দ প্রকাশ ঘটুক না কেন, আসলে আমরা যে ক্রমেই অবিদ্যা আর অজ্ঞানতার পথে হাঁটছি, এসব তারই প্রমাণ।

আমাদের মনে যেভাবে আক্রমণমুখিনতা, হিংসা, স্বজাতিবিরোধ বাড়ছে, তাতে হয়তো একদিন দেখা যাবে মানুষ লুপ্ত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। আসলে এই যে মানুষের মনে আক্রমণের একটা তাগিদ গড়ে ওঠে, এটা তো কেউ জন্মসূত্রে পায় না। সেটা তাকে দান করে পরিবেশ। "It is not innate human nature which is bad, but rather the organisation of people in a bad social structure which produces bad people." (The Failure of Psychoanalysis—H. K. Wells, 1963, pp. 211-212) আমাদের দেশেও এই ধরনের বহু প্রবাদবাক্য প্রচলিত। যেমন "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ"। তাহলে স্পষ্টতই বোঝা যায়, আমাদের সমাজে এক অসৎ ধর্ম চেপে বসেছে। সমাজটা অসৎ আচরণের আখড়া হয়ে উঠেছে।

বিশাল ক্যানভাসটাকে ছোট করে এনে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক ছবিটা যদি বিচার করি, তাহলে তো অনেকটা ধরা সহজ হবে। চেনা ছবির বিচার করলে আগ্রহ যেমন থাকবে, তেমনি নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী বিশ্লেষণটা মিলিয়ে নেওয়াও সম্ভব হবে।

আমাদের শান্ত সুখের জীবনে প্রথম বড় আঘাত এল চল্লিশের দশকে। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে দাঙ্গা, মন্বন্তর ও দেশভাগ। দ্রুত চেনা ছকের সবুজ ছবিটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। জীবন ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সেই প্রথম আমাদের মনে সংশয় গড়ে উঠল। সেই প্রথম ঢালুর দিকে আমাদের গড়িয়ে পড়ার সূচনা। এরই মধ্যে উঠে এল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরা নিচের তলায় নামতে পারে না। চোখে ওপরতলার স্বপ্ন, কিন্তু সেখানে পৌঁছানোও সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বর্ণতৃষ্ণা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। এর ফলে মানসিক সঙ্কীর্ণতা, অবিশ্বাস গড়ে উঠল। অধরাকে ধরার জন্য ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করল না। মূল্যবোধ উড়ে গেল ঝরাপাতার মতো। একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরল। সংসারের আর্থিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে স্ত্রীকে নামতে হলো রোজগারের পথে। আর তাদের সন্তান হলো অমনোযোগের শিকার।

নাগরিক সভ্যতার উজ্জ্বল আলো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। বুঝতে পারিনি, গ্রামের মাটির সোঁদা গন্ধের

ভিতরের আকুল ভালবাসাকে। সব সম্পর্ক চুকিয়ে আমরা শহরের দিকে ক্রমেই ছুটে এসেছি। শহরের রুক্ষতা, ক্লান্তি আমাদের বুকে যত গভীরভাবে চেপে বসেছে, আমরা ততই যেন শহরের টানে জড়িয়ে পড়েছি। আমাদের মনে শিকড়ের সত্তা ততই মিলিয়ে গেছে। আজ আমরা আমাদের অস্তিত্বের শিকড়কে চিনতে চাই না। আমরা অস্বীকার করি আমাদের রক্তের উত্তরাধিকারকে। নিজের ঘরে ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মায়ের গলায় ছুরি বসাতে আমাদের হাত কাঁপেনি। নিজের দেশের মনীষীদের মূর্তি ভেঙে অন্য দেশের মনীষীর পুজো করেছি আমরা। নিজের সমাজ, নিজের পূর্বপুরুষকে অপমানিত করতে আমাদের এতটুকু কুণ্ঠা হয়নি। 'দেশের ঠাকুর' ছেড়ে 'বিদেশের কুকুর' ধরার জন্য আমাদের লালসা তো বহুকাল আগে থেকেই। এখন সেই কুকুর ধরার খেলাটাই আমাদের নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদেরই সংস্কৃতি আর উত্তরাধিকারকে ল্যাজে বেঁধে ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মতো সেজেছি। আমাদের নিজস্ব পরম্পরা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, উত্তরাধিকারের ভিতর যে শিকড়, তা ছিন্ন হয়ে গেল। নিজের দেশ, দেশের সংস্কৃতিতে ঢালাওভাবে আসন পেতে বসল পশ্চিমের উদ্দামতা, তথাকথিত গতিময়তা।

আর্থিক সঙ্কট, ঐতিহ্যের অবলুপ্তি, উত্তরাধিকারের ছিন্ন শিকড়, দিশাহীন সাংস্কৃতিক চেতনা—এর মধ্যে পক্ষবিস্তার করে বসল রাজনীতি। স্বাধীন ভারতের উজ্জ্বল আলোর নিচে জমেছিল অন্ধকার। যত দিন গেছে, আলোর জ্যোতি তত ম্লান হয়েছে, বেড়েছে অন্ধকার। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতপাতের দ্বন্দ্ব, বেকারত্ব, সাম্প্রদায়িক শক্তিবিন্যাস বেড়েছে। পেটে নেই ভাত, অথচ রয়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাস—একেই মূলধন করে রাজনীতিজ্ঞরা নতুন করে ঘুঁটি সাজালেন। রাজনীতি হয়ে উঠল ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার। তার মধ্যে ছিটেফোঁটাও রাষ্ট্রচিন্তা নেই। ক্ষমতা দখলের জন্য বাহুবল প্রয়োজন। ষাটের দশক থেকে ক্রমে ক্রমে রাজনীতিতে সমাজ-বিরোধীদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকল। আর বর্তমান রাজনীতি তো দুর্বৃত্তায়নের আখড়া হয়ে উঠেছে। ফলে রাজনীতিটা শিক্ষিত, ভদ্র, সুজন, সৎ মানুষের হাত থেকে চলে গেছে গুণ্ডা, সমাজবিরোধীদের হাতে। এদের একমাত্র চিন্তা স্বার্থের পোষণ, স্বজনপোষণ।

ভণ্ড রাজনীতিজ্ঞরাই মানুষের মধ্যে হিংসার বীজকে লালন করতে লাগলেন। ভাইয়ের পিছনে ভাইকে লেলিয়ে দিলেন। পাশাপাশি বাস করা দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকলেন। গ্রামের বুকে জাতপাতের দ্বন্দ্ব ঘটিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন অশান্তির আগুন। এসবই তাঁদের রাজনীতির দাবার চালের অঙ্ক। এই অশান্তির ঘোলা জলে বসে তাঁরা সুখে মাছ ধরতে লাগলেন।

রাজনীতি, ভোট—এসবের ওপর আজ মানুষের বিতৃষ্ণা জাগছে। রাজনীতিজ্ঞদের প্রতি ঘৃণা, পুলিস প্রশাসনের প্রতি ক্ষোভ আর সমাজের বুকে কলার তুলে ঘুরে বেড়ানো সমাজবিরোধীদের প্রতি চরম আক্রোশ মানুষের মনে দিন দিন বাড়ছে। অথচ এরাই আজ সমাজের যাবতীয় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এদের অশুভ আঁতাতেই সমাজের রঙিন স্বপ্নগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

একসময় প্রায় সারা বিশ্ব সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিল। ভেবেছিল সমাজকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে সমাজতন্ত্রই একমাত্র পথ। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলিত প্রয়োগে দেখা গেছে সমাজতন্ত্রের মধ্যেও রয়েছে দুরাচার, দুর্নীতি, ভ্রষ্ট চেতনার দগদগে ক্ষত। যুবমানসে গড়ে ওঠেনি কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা। "বিপ্লবকে আর একমাত্রিক পরিবর্তনের মধ্যে আবদ্ধ রাখা চলছে না। মার্কস উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন সমাজ, নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে, কিন্তু নতুন সমাজ, নতুন মানুষ গড়ে উঠছে কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুক্ত সমাজ, মুক্ত মানুষ কোন দেশেই আবির্ভূত হয়নি। আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতাসীন চক্র ভুয়ো সমাজতন্ত্রের নামে ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণ করে তাকে যন্ত্রাংশে পরিণত করেছে। ক্ষমতা দখলের পরই বিপ্লবের স্রোত থেমে গেছে।" (বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৮১, পৃঃ ২৯১)

সমাজে প্রতিটি মন ও মানসিকতার সঙ্গে গড়ে উঠছে বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা 'জেনারেশন গ্যাপ' নয়। এর গভীরতা অনেক বেশি। আজ শিশুমনের বেড়ে ওঠার পথে হাজার রকমের প্রতিবন্ধকতা। তারা যেন বাবা-মার খেলার পুতুল। জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে কেন্দ্র করে চাহিদা তৈরি হচ্ছে বাবা-মায়ের। তাদের সন্তানকে অনেক কিছু হতে হবে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতেই হবে! এই 'প্রতিষ্ঠা'র তাৎপর্য এবং দৃষ্টিকোণও আজ বদলে গেছে। এখন তা ক্রমেই সঙ্কীর্ণতর। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শিশু নেমে পড়ে ইঁদুরদৌড়ের ময়দানে। থামলে চলবে না, ছুটতেই হবে! লাগাম বাবা-মায়ের হাতে। সুতরাং দূরপাল্লার দৌড়ের শেষ সীমায় পৌঁছানোর অনেক আগেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হাঁফ ধরে, বিতৃষ্ণা জাগে সকলের ওপর।

এর পাশাপাশি আছে দাম্পত্য জীবনের ক্রমবর্ধমান অশান্তি। স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থের হিসেব-নিকেশের, তাদের ব্যক্তিগত 'ইগো'র যূপকাষ্ঠে বলি হয় তাদের সন্তানের শৈশব। শৈশবেই জীবনটাকে মনে হয় ঊষর মরুভূমি। শৈশবের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে মুক্তমনে বেড়ে ওঠার সমস্ত দরজা তার কাছে বন্ধ হয়ে যায়। তার সুকোমল মনে প্রচ্ছন্নভাবে জমে ওঠে বিতৃষ্ণা, অশান্তি, আক্রোশ, রাগ, হিংসার মেঘ। বয়স যত বাড়ে সেই মেঘ তত ঘনীভূত হয়।

তাহলে কোন্‌দিকে দৃষ্টি ফেরালে তা নির্মল থাকবে? জীবনকে মনে হবে সুন্দর? মনে হবে, সকলের সঙ্গে পা

মিলিয়ে আমাদের যেতে হবে অনেক দূর? উত্তর মেলে না। চৈতন্যের বিপর্যয় রুখতে কী করব আমরা! দৈনন্দিন হতাশার মধ্যে মুক্তি পেতে মন্দিরে মন্দিরে হত্যে দিলে হবে না, যোগী-তান্ত্রিক প্রদত্ত তাগা, তাবিজ, শিকড়েও কাজ হবে না, কাজ হবে না ভাগ্যাচার্যের দেওয়া গোমেদ, পোখরাজ, পলায়।

তাহলে কোন্ জাদুমন্ত্রে জীবনের সমস্ত হিংসা, বিতৃষ্ণা আর অর্থহীন প্রত্যাশার অঙ্কুরকে বিনষ্ট করা সম্ভব হবে? না, কোন জাদুমন্ত্র নয়, কোন তুকতাক নয়, শিক্ষা দিয়েই নির্মূল করতে হবে মনের কলুষ-জীবাণুকে। শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব। কিন্তু সে-বিপ্লবকে সামাজিক স্তরে ঢুকিয়ে দিলে ব্যর্থ হবে তার উদ্দেশ্য ও বিধেয়। মনে যদি বিপ্লবের ঢেউ তুলে বেনোজলকে বের করে না দেওয়া যায়, তবে সামাজিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা হবে কাউকে না সারিয়ে তাকে অলঙ্কার দিয়ে ঢেকে রাখার মতো।

আমাদের শিক্ষায় শুধু বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিলেই চলবে না। বিজ্ঞান যত শক্তিশালী ততই দুর্বল। মন ও আত্মিক উত্তরণে সে কিছুই দিতে পারে না। তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেই সীমাবদ্ধতা দূর করতে হলে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার কাছে। অনেকেই হাসতে পারেন। যুক্তিবাদী ও গোঁড়া বিজ্ঞানমনস্করা বলবেন, অসম্ভব! এ-জীবনে বিজ্ঞান, জড়, যুক্তি—এসবই একমাত্র সত্য। মন ও আত্মার উত্তরণ আবার কি কথা? যা দেখা যায় না, বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে যা নিয়ে পরীক্ষা করা যায় না তা যুক্তি দিয়েও মানা যায় না। সুতরাং তার আবার উত্তরণ কি! তার জন্য কি ফিরে যেতে হবে সেই প্রাচীন ভারতে! প্রকৃত শিক্ষার কোন যুগ নেই, কাল নেই, সমাজ নেই, বিবর্তন নেই। তাই শিক্ষাকে শুধু যুগের মানদণ্ডে যাচাই করে তাকে বাতিল করে দেওয়াটাও একধরনের মৌলবাদী চিন্তাভাবনা।

আমরা যখন সংস্কৃতকে জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করেছি, তখন পাশ্চাত্য সেই জীর্ণবস্ত্রের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করছে মণিমুক্তোকে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে এক ঐশী শক্তি। সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে রয়েছে নীতিবোধের শিক্ষা, ধর্মবোধের শিক্ষা। এই নীতিবোধ ও ধর্মবোধ সমাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়, মনকে অশুভ ও অসৎ চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এখন আমাদের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে রামায়ণ, মহাভারত, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, গীতার। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে।

সম্প্রতি অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে একটা গৌরব আছে। সেই গৌরবকে আবার ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছেন, আমাদের জীবনে সংস্কৃতশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মিক উন্নতির জন্য সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজন। যে-শিক্ষা নাস্তিক ভাবপূর্ণ, সেই শিক্ষায় 'মানুষ' তৈরি হয় না।

নাস্তিকতার অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নয়, নাস্তিকতা জীবন সম্পর্কেও হতে পারে। স্বামীজী বললেন: "প্রাচীন ধর্ম বলিত যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলিতেছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে-ই নাস্তিক।" ('বাণী ও রচনা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩০) সুতরাং জীবনে নাস্তিকতার প্রভাব ঘটলে তা মনকে সঙ্কীর্ণ করে তোলে, পাওয়া না পাওয়ার হিসেবটাকে বড় করে দেখায়। জীবনে শ্রেয়-চেতনার মৃত্যু ঘটে। শুধু প্রেয়-চেতনার আকাঙ্ক্ষাই বড় হয়ে দেখা দেয়। শ্রেয়ঃ হলো চরম শান্তি, সর্ববন্ধন ও কামনা থেকে মুক্তি। আর প্রেয় হলো মানুষের সেই কাম্যবস্তু, যার থেকে সে সুখের আশা করে। তাই কাম্যবস্তু অধরা হলে হতাশাটা বড় হয়ে ওঠে।

শিক্ষা মানুষকে সেই শ্রেয় চেতনায় অধিষ্ঠিত করে। কারণ শিক্ষার লক্ষ্য হলো মনকে 'অসৎ' থেকে 'সৎ'-এ নিয়ে যাওয়া। 'অজ্ঞান' থেকে 'জ্ঞান'-এ নিয়ে যাওয়া। 'মৃত্যু' থেকে 'অমৃত'-এ নিয়ে যাওয়া। জ্ঞান আর কর্মের যোগেই আসে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ বা salvation। এই মার্গে উত্তরণই জীবনের লক্ষ্য।

আজ জড়বাদীর সাধনা এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে, দর্শন, মন ও শিক্ষায় এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলি বিশেষ আমল পায় না। আমল পায় না জীবনে ধর্মের তাৎপর্য। ধর্ম সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা অত্যন্ত স্থূল। ধর্ম আচরণ বলতে আমরা বুঝি পূজা, উপবাস, ব্রত ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠানসর্বস্বতার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নেই। এসবই ধর্মমত। তাহলে ধর্ম কী? "যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১।৪।১৪) অর্থাৎ যাই ধর্ম তাই সত্য। মহানির্বাণতন্ত্র-এ বলা হয়েছে—"ন হি সত্যাৎ পরো ধর্মঃ।" (৪।৭৫) অর্থাৎ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছু নেই। সুতরাং সত্য এবং ধর্ম সমার্থক। সত্যের পথে থাকাই ধর্মের পথে থাকা। ধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেগুলি থেকেই বোঝা যায় ধর্ম এবং ধর্মমতের পার্থক্য কি। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 'এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ'-এ কথাগুলিকে এইভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন:

(1) "Religion is not in books, nor in theories, nor in dogmas, nor in talking, not even in reasoning. It is being and becoming." ('Complete Works', vol. III, 1973, p. 253)

(2) "Temples or churches, books or forms are simply the kindergarten of religion, to make the spiritual child strong enough to take higher steps; and these first steps are necessary if he wants religion." (Ibid., vol. II, p. 43)

(3) "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this Divinity within by controlling nature, external and internal.... This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details." (Ibid., vol. I, 1972, p. 124)

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের ভাষায়—"সুতরাং ধর্মের লক্ষ্য শেষপর্যন্ত দাঁড়াইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ বা দেবতা হওয়া।... মানুষের যাহা মূল ও প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহাই তাহার ধর্ম। দুটিমাত্র শব্দে যদি ধর্মের অর্থ ব্যক্ত করিতে হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, ধর্মের অর্থ হইল 'মূল বৈশিষ্ট্য'। যেমন বরফের ধর্ম শৈত্য, আগুনের ধর্ম উত্তাপ, লবণের ধর্ম লবণাক্ততা। যদি বরফের শৈত্য না থাকে, আগুনের উত্তাপ না থাকে, লবণের লবণাক্ততা না থাকে তাহা হইলে বরফ আর বরফ থাকে না, আগুন আর আগুন থাকে না, লবণ আর থাকে না লবণ। তেমনই মানুষের ধর্ম হইল মনুষ্যত্ব, যাহা না থাকিলে মানুষও আর মানুষ থাকে না।" (এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ, ১৯৯৩, পৃঃ ১২২-১২৩)।

এই যে মনুষ্যত্ব, এর মূলভাব দুটি—প্রেম ও অহিংসা। মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে এই দুটি সদাচরণের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সবসময় প্রেম, অহিংসা ও সত্যকে অনুসরণ করার কথা বলেছেন। স্বামীজী বলেছেন ঃ "সত্যের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনকিছুর জন্যই সত্যকে বর্জন করা চলে না।" ('বাণী ও রচনা', ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৭১) এই সত্য ও অহিংসাই যে মনুষ্যধর্মের মূল কথা তা যুগে যুগে বলে গেছেন বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেছেন গান্ধীজী, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ সকলেই। এই প্রেম ও অহিংসার বাণীই ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের বেদ, পুরাণ ও উপনিষদে। তাই আমাদের শিক্ষায় প্রাচীন সাহিত্যকেও প্রাধান্য দেওয়া উচিত। প্রাধান্য দেওয়া উচিত মহাপুরুষের জীবন পাঠে।

কিন্তু কালে কালে দেখা গেল ধর্মবিকৃতি। ধর্ম হয়ে গেল পুরোহিততন্ত্রের মৌরুসি পাট্টার হাতিয়ার। এর বাহ্য আচরণগুলিই বড় হয়ে দাঁড়াল। পূজা, হোম, নৈবেদ্য, বলি, উপবাস—এগুলি ধর্মের প্রকৃত পথের মুখে অচলায়তন গড়ে তুলল। পুরোহিততন্ত্রের এই মৌরুসি পাট্টা প্রশ্রয় পেল রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে। প্রকৃত ধর্মের বদলে মানুষ বুঁদ হলো ধর্মের পিটুলি গোলা খেয়ে। এই বিকৃত ধর্মের রমরমার বিষয়টি অনেক আগেই বুঝেছিলেন স্বামীজী। তাই তিনি রামনাদে অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন, ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। রাজনীতি নয়। রাজনীতিকে গৌণ করে ধর্মের চর্চা করতে বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন ঈশ্বরের সাধনা করতে। তাঁর ঈশ্বরের স্বরূপ কিন্তু ভিন্ন। মানুষই ছিল তাঁর কাছে জীবন্ত ঈশ্বর।

জাফনা বক্তৃতায় বেদান্ত সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে যাবতীয় নিষ্ঠুরতা, উৎপাত, দীর্ঘশ্বাস—তা যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয় তবে ঈশ্বর দানবের থেকেও নিষ্ঠুর। তাহলে ঈশ্বর কে? মানুষই ঈশ্বর। মানুষকেই ঈশ্বরে উন্নীত হতে হয়। "From the brute-man to the Buddha-Man." মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়ে এখানে পৌঁছাতে হয়। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'জীবনসাধনা'। তাহলে মনুষ্যত্বের লক্ষ্য হলো, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের ভাষায়—"জৈব রূপ হইতে দৈব রূপে উত্তরণ। জীব হইতে শিবে উত্তরণ। নর হইতে নারায়ণে উত্তরণ।" (এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৩৫)

স্বামীজী বলেছেন ঃ "What makes the difference between God and man, between the saint and the sinner? Only ignorance.... That makes all the difference....We are God Himself though we have forgotten our own nature in thinking of ourselves as little men." ('Complete Works', vol. III, pp. 159-160)। সুতরাং মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা সাধনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেই সাধনা হলো একই সঙ্গে আত্মিক এবং সামাজিক।

আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের কথা। অর্থাৎ শুরুতে ধর্ম এবং শেষে মোক্ষ। তাই বলে জীবনে অর্থ ও কামের কোন ভূমিকা নেই তা নয়। সেই প্রয়োজনীয়তার কথাও স্বীকার করা হয়েছে। তবে তার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ধর্মবুদ্ধি এবং মোক্ষলাভের বাসনা ঐ দুটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের এই উত্তরণ-প্রক্রিয়াকেই স্বামীজী 'বিজ্ঞান' বলেছেন।

এই উত্তরণের পথে যে-ধর্মকে অবলম্বন করা উচিত, আমরা আজ তার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আমাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে ধর্মমত। সেই ধর্মমতের মূল চালিকাশক্তি এখন রাজনীতিজ্ঞদের হাতেই। তাই একইসঙ্গে রাজনীতি ও সমাজে বাড়ছে হানাহানি, রক্তারক্তি, দ্বেষাদ্বেষী। যতদিন না রাজনীতির মধ্য থেকে অশুভ ভাবনা, স্বার্থান্ধতা, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষমতার লোভ দূর হচ্ছে, যতদিন না রাজনীতি মানুষের কল্যাণের বাহক হয়ে উঠছে, ততদিন ধর্ম মতিচ্ছন্নতায় ভুগবে। এই মতিচ্ছন্নতা সমাজে যতদিন থাকবে ততদিন মন্দির মসজিদ নিয়ে লাঠালাঠি চলবে, চলবে জাতপাতের দ্বন্দ্ব, ছুঁৎমার্গ।

এব্যাপারে স্বামীজীর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। মঠের জমি সাফ করতে আসা সাঁওতালদের একদিন স্বামীজী ভূরিভোজন করালেন। তাদের খাইয়ে তৃপ্ত স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের বললেন ঃ "এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হলো? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখনো কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয় মঠফঠ সব বিক্রি করে দিই, এইসব গরিব, দুঃখী দরিদ্র নারায়ণদের

বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না। আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?... আহা! দেশের গরিব দুঃখীদের জন্য কেউ ভাবে না রে? যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের শোকে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেইরে!... দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি!" ('বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫-২৩৬)

এই বিশ্বাস থেকেই স্বামীজী নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে একটা ঢেউ উঠবে, সেই ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতা পূর্ণ হয়ে উঠবে আধ্যাত্মিকতায়। সেই ঢেউয়ের প্রহর গুণছে ভারতবর্ষ।

আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রীড়নক হয়ে আমরা বিচ্যুত হচ্ছি মূল পথ থেকে। এখানে বিজ্ঞান ও মানবতা যেন দুই মেরুর বস্তু! যেন একের সঙ্গে অন্যের খাপ খায় না! কিন্তু একে মেলাতেই হবে। মেলাতে না জানলে জীবন ক্রমশ ধূসর এক প্রত্যাশার শিলাপট হয়ে উঠবে। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "The source of human happiness and social co-operation are not exactly the same as those of scientific inquiry for the proper adjustment of man to the new world, an education of the human spirit is essential. To remake society, we have to remake ourselves. Humanities which cover art and literature, philosophy and religion are as important for human welfare as science and technology. The two are not antagonistic to each other. Both in India and west, science and religion had a common origin.... Science and technology on the one side, ethics and religion on the other, were sundered in later stages thus creating the problem of faith vs. reason, ethics vs. technics. The conflict between the two is a symptom of the split consciousness which is so characteristic of the mental disorder of the day." (Religion and Culture, 1968, pp. 153-154)

'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এর থেকে বড় কথা আর কিছু নেই। তাই মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। মানুষের মধ্যে সুপ্ত আকারে আছে আধ্যাত্মিকতা। সমস্ত প্রতিবন্ধকতার মধ্য থেকে সে একদিন না একদিন জেগে উঠবেই। কোন এক প্রজন্ম ফের পিছু ফিরতে শুরু করবে। সেই প্রজন্ম সেদিন ভেঙে দেবে তাদের পূর্বসূরিদের পাপের অচলায়তন। তার জন্য তাদের অনেক মূল্য দিতে হবে। আবার পিছু ফিরবে তারা শিকড়ের সন্ধানে। অচেনা সুর, অচেনা পথকে লক্ষ্য করে তারা ফিরবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে। মহামনীষীদের বাণী ধ্রুবতারা হয়ে পথ দেখাবে তাদের। সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে আজ বুকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক এই আশাটুকুই। ❑

স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা

আবেদন

একথা অনস্বীকার্য যে, কালের প্রভাবে বিলীয়মান **স্বামীজীর পৈতৃক ভিটার পবিত্রতার পুনরুদ্ধার** এবং সেখানে যথোচিত **স্মৃতিমন্দির নির্মাণপূর্বক স্বামীজীর জন্মস্থান ও বাল্যজীবনের মহান স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন একটি জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক কর্তব্য।** কালক্রমে **স্বামীজীর মূল বসতবাটীটি** নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বহু পরিবারের নিবাসস্থল এবং **বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণদশাপ্রাপ্ত।** সৌভাগ্যক্রমে গত ১৯৬৩ সাল থেকে নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিরূপে ঐ জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রস্তুতি সমাপ্তপ্রায়। অবশ্য **ঐ পবিত্র স্থানে স্বামীজীর নামাঙ্কিত একটি স্মৃতিমন্দির ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার আগে** বর্তমান বাসিন্দাদের অন্যত্র আবাসনের ব্যবস্থা ও জীর্ণপ্রায় বাড়িগুলির আমূল সংস্কার একান্ত জরুরী। এই উদ্দেশ্যে **ইতিমধ্যেই তিন কোটি টাকার বেশি ব্যয় করা হয়েছে,** কিন্তু আরব্ধ কাজের সুষ্ঠু অগ্রগতির জন্য অবিলম্বে আরো অনেক অর্থের প্রয়োজন।

আমরা তাই বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের কাছে অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন দান RAMAKRISHNA MISSION নামাঙ্কিত চেক/ড্রাফট বা মানি অর্ডার মারফত 'স্বামীজীর বাড়ির জন্য' উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করুন। **ভারতীয় আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারানুযায়ী এই অনুদান আয়করমুক্ত।**

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

স্বামী স্মরণানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

বিবেকানন্দের বাঙলা রচনা ঃ শক্তি ও সৌন্দর্য

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

॥১॥

যে মহান বিবেকানন্দকে আমরা তাঁর 'বাণী ও রচনা'র মধ্য দিয়ে জানি এবং বরণ করি, সে-বিবেকানন্দের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে বলা হয়েছে বা লেখা হয়েছে। বাঙলায় তিনি মাত্র চারটি নাতিদীর্ঘ গদ্যগ্রন্থের (যেগুলি প্রথম 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়), চারটি কবিতার এবং কয়েকটি চিঠিপত্রের রচয়িতা। বাঙালীদের প্রত্যেকের কাছেই কিন্তু এগুলির মূল্য অসামান্য। এগুলি বিবেকানন্দের 'বাঁ-হাতে'র লেখা নয়, তিনি হেলাফেলা করে লেখেননি। বরং বলা যেতে পারে, এগুলিতে তাঁর প্রাণের স্পর্শ আছে অতি মাত্রায়, তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করা যায় আরো বেশি। লেখক-পাঠক উভয়ের ক্ষেত্রেই বলা চলে যে, "বিনা স্বদেশী ভাষা, মেটে কি আশা?" যে মননশীল বিবেকানন্দকে আমরা মনীষী ও মুনি-রূপে তাঁর ইংরেজী ও বাঙলা রচনায় সমভাবে পাই, তাঁকে মানুষ-রূপে, নরেন্দ্রনাথ-রূপে কিন্তু তাঁর বাঙলা রচনাতেই বেশি পাই। বিবেকানন্দ তাঁর বাঙালী পাঠকদের কত ভালবাসতেন, সেটা যেন তাদের জন্য বিশেষভাবে বাঙলায় লিখে তাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন। এপ্রসঙ্গে রবার্ট ব্রাউনিঙের কথা মনে পড়ে। তিনি সাধারণত গীতিকবিতা লিখতেন না। কিন্তু একবার বিশিষ্ট একজনের জন্য বিশেষভাবে তা লিখেছিলেন।

লেখকরূপে বিবেকানন্দের সাফল্যের চাবিকাঠি তাঁর সারল্যে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গুরুগম্ভীর রচনার আবেদন অত্যন্ত সীমিত এবং সে-কারণে লেখা হালকা হওয়া উচিত। তাই তিনি রচনার বাহনরূপে 'plain, unvarnished' সহজ ভাষাকেই বেছে নিয়েছিলেন। এতে কিন্তু তাঁর রচনার প্রবল প্রাণশক্তি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণে আসে ঃ "যথার্থ সবলতার মধ্যে একটা সুবিশাল সরলতা থাকে।" তিনি তাঁর 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের যে 'গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার এবং সৃজন করিবার' প্রতিভার কথা লিখেছেন, সে-প্রতিভা যেন বিবেকানন্দের বাঙলা গদ্যরচনায় অনেক বেশি পরিস্ফুট মনে হয়। বিবেকানন্দ জানতেন, কি পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে উপদেশ দেওয়া যায়, সাহিত্য-মীমাংসক হরেস-এর মতো utile (উপযোগিতা) ও dulce (মাধুর্য)-এর সামঞ্জস্য করা যায়। ভারবি 'কিরাতার্জুনীয়ম'-এ লিখেছিলেন ঃ "হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ", অর্থাৎ যেটা যুগপৎ মঙ্গল ও মনোরঞ্জন করে—এমন বাণী দুর্লভ। বিবেকানন্দের বাঙলা গদ্যরচনায় এই দুর্লভ সমন্বয় সম্ভব হয়েছে এবং সেখানেই এর স্বকীয়তা ও অনন্যতা।

॥২॥

'ভাববার কথা' নামে বিবেকানন্দের যে-গ্রন্থটি প্রচলিত, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথমেই এটি মুদ্রিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় যে 'ভাববার কথা' উদ্বোধন কার্যালয় থেকে কিনেছিলাম, সেই সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ সালে।

'ভাববার কথা'র অধিকাংশ রচনা 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এর নয়টি রচনা আমার কেনা গ্রন্থটিতে যেভাবে সাজানো হয়েছে, তা এইরকম ঃ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বাঙ্গালা ভাষা', 'বর্তমান সমস্যা', 'জ্ঞানার্জন', 'পারি-প্রদর্শনী', 'ভাববার কথা', 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি', 'শিবের ভূত' এবং 'ঈশা অনুসরণ'। অষ্টম সংস্করণের (১৩৯৬ বঙ্গাব্দ/১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দ) 'বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে এগুলি অন্যভাবে সাজানো হয়েছে। কালানুক্রম অনুসরণ করা হয়নি, অন্য কোন কারণও দেখানো হয়নি। সাধুভাষায় লেখা এই রচনাগুলির মধ্যে 'শিবের ভূত' একটি ছোটগল্পের ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ।

'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের ৬৫তম জন্মোৎসবের সময় 'হিন্দুধর্ম কি?' নামে পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির প্রথমে বলা হয়েছে যে, সত্য দুইপ্রকার ঃ ইন্দ্রিয়ানুভূত ও অতীন্দ্রিয়। প্রথম সত্যের সাহায্যে আহৃত জ্ঞানকে বিবেকানন্দ বলেছেন 'বিজ্ঞান' এবং দ্বিতীয়টির সাহায্যে আহৃত জ্ঞানকে বলেছেন 'বেদ'। অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারীকে তিনি বলেছেন 'ঋষি'—যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ও বেদের স্রষ্টা। "কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি" আর্য-সন্তানগণ "এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন।" এই নিদারুণ দুঃসময়ে "লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ('বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮ম সং, ১৩৯৬, পৃঃ ৪) এই প্রবন্ধটি বারবার আমাদের 'ভগবদ্গীতা'র 'যদা যদা হি ধর্মস্য' এবং 'পরিত্রাণায় সাধূনাং' (৪।৭-৮) শ্লোক দুইটির কথা স্মরণ করায়। কিন্তু বিবেকানন্দ এগুলির কথা এখানে প্রত্যক্ষভাবে বলেননি। তিনি যে 'যুগাবতার' শব্দটি এখানে ব্যবহার করেছেন সেটি পরবর্তী

কালে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। পরিশেষে তিনি কম্বুকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন ঃ "হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি।... আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলা-সহায়ক—এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।" (ঐ, পৃঃ ৫) অনুপ্রাণিত এই নিবন্ধের ভাষাশৈলী যেমন শক্তিশালী, তেমনি সুন্দর।

'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' ম্যাক্সমূলার-লিখিত ইংরেজী রামকৃষ্ণ-চরিতের (১৮৯৮) 'উদ্বোধন'-এ (১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) প্রকাশিত সমালোচনা। এখানে 'Scholar Extra-ordinary' ম্যাক্সমূলারকে বিবেকানন্দ 'মহাত্মা' আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ "ম্যাক্সমূলারের অপেক্ষা ভারত-হিতৈষী ইওরোপখণ্ডে আছেন কিনা, জানি না।" (ঐ, পৃঃ ৭) একথা অত্যুক্তি নয়, সত্যের স্বীকৃতি। যুগান্তকারী এই রামকৃষ্ণ-জীবনী সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, এ-গ্রন্থ "ভারতগতপ্রাণ মহাত্মার ভারতের ভাবী মঙ্গলের, ভাবী উন্নতির আশালতার মূলে বারিসেচন করিয়া নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল।... ঐশী শক্তির সমক্ষে জীবের শক্তি কি?" (ঐ, পৃঃ ৭, ৯)

এই ঐশী শক্তিরই উপাসনা করা হয়েছে অসম্পূর্ণ 'ঈশা অনুসরণ' গ্রন্থে। এটি পাশ্চাত্য ধর্মসাহিত্যের বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ টমাস আ কেম্পিসের ল্যাটিন ভাষায় রচিত 'De Imitatione Christi'-র অনুবাদ। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টানের কাছে বাইবেলের পরে এটিই সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ। বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয় পুস্তকগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। তিনি ১২৯৬ সালে এর তরজমা আরম্ভ করেছিলেন এবং প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদ 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। খ্রীস্ট সম্বন্ধে বিবেকানন্দের যে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল তার পরিচয় তাঁর বিভিন্ন রচনায় ছড়ানো আছে এবং ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে তার উল্লেখও করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের অনবদ্য 'The Cup' কবিতাটিও স্মর্তব্য। খ্রীস্টের পানপাত্রটি তাঁর ক্রুশের মতোই পবিত্র যন্ত্রণার প্রতীক। কাশীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্রকে ১৮৮৯-এর ৪ জুলাই বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লেখেন ঃ "...We have taken up the Cross. Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen.'—Imitation of Christ." (ঐ, পৃঃ ২২৭)

অনুবাদের 'সূচনা' অংশটি বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা। চারটি অনুচ্ছেদে তিনি 'ভক্ত-সিংহ' রচিত মূল গ্রন্থের গুরুত্ব, উৎকর্ষ ও সৌন্দর্যের সম্যক্ ও সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। গোড়াতেই তিনি লিখেছেন ঃ "এই মহাপুস্তক কোন 'রোমান ক্যাথলিক' সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশা-প্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিতবিন্দুতে মুদ্রিত।" (ঐ, পৃঃ ১৩) বিবেকানন্দ এখানে মিলটনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র একটি উক্তি স্মরণ করেছেন ঃ "A good book is the precious life-blood of a master spirit."

'ঈশা অনুসরণ' বিবেকানন্দের ভাল লাগার আরেকটি কারণ এই যে, এই মর্মস্পর্শী মহাগ্রন্থের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। গ্রন্থে খ্রীস্টের স্থানে যদি কৃষ্ণকে বসানো হয় তাহলে অনেক স্থলেই মনে হবে যে, 'গীতা' বা তার ভাষ্য পড়ছি। বিবেকানন্দের অনুবাদ মূলানুগ এবং যথোপযুক্তভাবে গম্ভীর হওয়া সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দ ও সুখপাঠ্য। দেশে-বিদেশে বিবেকানন্দ 'ঈশা অনুসরণ'-এর কথা সাগ্রহে প্রচার করেছেন। এবিষয়ে কিছু তথ্য ফাদার দ্যতিয়েন তাঁর 'খ্রীস্টানুকরণ' অনুবাদগ্রন্থের 'প্রস্তাবনায়' দিয়েছেন (দ্রঃ প্রভু যীশুর গীর্জা, কলিকাতা, ১৯৮৭)।

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (মাঘ, ১৩০৫) বিবেকানন্দ যে 'প্রস্তাবনা' লিখেছিলেন, পরে তার নামকরণ করা হয় 'বর্তমান সমস্যা'। উত্তুঙ্গ অথচ প্রসাদগুণসমুজ্জ্বল রচনাশৈলীর জন্য এই অনুপ্রাণিত রচনাটি বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ বাঙলা রচনাগুলির মধ্যে পড়ে। কয়েকটি স্মরণীয় এক-পঙ্‌ক্তির অনুচ্ছেদ এখানে রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'। বিবেকানন্দকে যাঁরা 'রিভাইভ্যালিস্ট' বা রক্ষণশীল মনে করতেন, 'বর্তমান সমস্যা' পড়লে তাঁদের সে-ভুল ভেঙে যাবে। বিবেকানন্দ মনে করতেন যে, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য পশ্চিমের যাকিছু ভাল তা গ্রহণ করা প্রয়োজন; তাতেই সমকালীন সমস্যার সমাধান সম্ভব—"আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?" (ঐ, পৃঃ ২৮) তিনি জানতেন, ভারতের সত্ত্বগুণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের রজোগুণের সম্মিলন ও মিশ্রণের প্রয়োজন। "এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধন'-এর জীবনোদ্দেশ্য।" (ঐ, পৃঃ ২৭) পরিশেষে বিবেকানন্দ গীতোক্ত 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' ভেবে লিখেছেন ঃ "কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে।" এর ঠিক পরেই তিনি 'শুক্লযজুর্বেদসংহিতা' (১৯।৯)-এর "তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি" অংশের প্রার্থনার প্রতিধ্বনি করেছেন ঃ "হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।" এ-প্রার্থনা বিশ্বজনীন।

বিবেকানন্দের রসবোধ কত প্রখর ছিল তাঁর বাঙলা রচনায় তার বহু নিদর্শন আছে। এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 'ভাববার কথা' নামে দুইটি অংশে বিভক্ত আটটি অনুচ্ছেদের (যেগুলিতে সরস কাহিনীর সাহায্যে নীতিশিক্ষা

দেওয়া হয়েছে) প্রথমটিতেই আমরা পাই : "দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়া চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন।... সহসা একটি বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল।" (পৃঃ ৩৪) সাধুভাষায় বিবেকানন্দ কি সুন্দর কৌতুক পরিবেশন করেছেন! সংস্কৃত অংশটি 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি'র "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" শ্লোকটি থেকে নেওয়া এবং বলা বাহুল্য, তা সুপ্রযুক্ত। এই ধরনের 'মশা মারতে কামান দেগে' যে-হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয় তাকে ইংরেজী সাহিত্য-মীমাংসায় 'mock-heroic' বা 'ছদ্ম-মহাকাব্যিক' রঙ্গ বলা হয়। এর প্রয়োগে বিবেকানন্দ ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

এক অর্থে 'বাঙ্গালা ভাষা' (১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা থেকে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে লেখা পত্রের অংশ) 'ভাববার কথা' সঙ্কলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এটি আকারে ছোট, কিন্তু এর শক্তি, সৌন্দর্য ও তাৎপর্য কত গভীর! বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিবেকানন্দের এই লেখাটির সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের মাধ্যমরূপে সাধুভাষাকে স্থানচ্যুত করে চলিতভাষার সাম্প্রতিক সর্বব্যাপী প্রসারের পশ্চাতে বিবেকানন্দের এই নিবন্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। চলিতভাষা যে কত উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক হতে পারে বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ দুইটিতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তো রয়েছেই, কিন্তু 'বাঙ্গালা ভাষা'র দুইটি অনুচ্ছেদও কিছু কম যায় না : "স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে-ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?... ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।" (ঐ, পৃঃ ২৯)

বিবেকানন্দের নিজের ভাষা এই 'সাফ ইস্পাতী' ভাষা। যখন তিনি সাধু ভঙ্গিতে অশ্বারোহী তখনো যেমন, যখন চলিত ভঙ্গিতে পদাতিক তখনো তেমন। সবসময়ই বিবেকানন্দের ভাষা সাফ ইস্পাতী—যুগপৎ শক্তিশালী ও নমনীয় এবং কমনীয়ও বটে। এপ্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি মনে পড়ছে, যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন : "উদ্বোধন"-এ যখন তিনি [বিবেকানন্দ] এই আদর্শ অনুযায়ী স্বীয় উদ্ভাসিত নূতন ধরনের চলিতভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করিলেন তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ ও বিরূপ মন্তব্য কম শুনিতে হয় নাই। তাঁহার নূতন চলিত গদ্যরীতিকে সর্বপ্রথম মর্যাদা দেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চলিত বাঙলা কতটা সজীব এবং শক্তিময় হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'এমন ভাব, ভাষা, ও উদার মতবাদের সংমিশ্রণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়সাধনের আদর্শবহনকারী এ-গ্রন্থ প্রত্যেকের কাছেই এক নতুন আবিষ্কার।' " ('আচার্য বিবেকানন্দ', চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, ১৩৯৫, পৃঃ ১১)

॥৩॥

বিবেকানন্দের অসাধারণ ভ্রমণোপাখ্যান 'পরিব্রাজক' 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৫-১৩০৬) পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথমে নাম ছিল 'বিলাতযাত্রীর পত্র', পরে শেষ দুটি কিস্তিতে নতুন নাম হয় 'পরিব্রাজক' (এ-নামের কিছুটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে)। কয়েক বছর পরে স্বামী সারদানন্দের তত্ত্বাবধানে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশের সাল এক্ষেত্রে 'তথ্যপঞ্জী'তে বা অন্যত্র দেওয়া নেই।

'ভূমিকা'র গোড়ার দিকেই বিবেকানন্দ কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের প্রাথমিক ভণিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তার প্যারডি করে তাঁর ভ্রমণকাহিনীর সরস সুরটি বেঁধে দিয়েছেন। এ-গ্রন্থে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে, কিন্তু সেটা বিবেকানন্দের নিজস্ব বৈঠকী ভঙ্গিতে লেখা। গম্ভীর বিষয় নিয়ে এত সহজভাবে বোধহয় বিবেকানন্দের আগে আর কেউ বাঙলা সাহিত্যে লেখেননি (একথা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সম্পর্কেও প্রযোজ্য।)। হনুমানের 'সী-সিকনেস' সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা, 'বাল্মীকি-আল্মীকি', 'টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত' ইত্যাদির তুলনা নেই, কিন্তু এসবকে টেক্কা দিয়েছে 'ট্রামঘড়ঘড়ায়িত'। বিবেকানন্দের 'মেঘনাদবধকাব্য' পড়া সার্থক হয়েছে! সংস্কৃতজ্ঞ বিবেকানন্দের রচনাশৈলীতে হাস্যরস ও মৃদু করুণরসের অদ্ভুত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায় 'ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' অধ্যায়ে—"এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল—লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব একসঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্।" ('বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৪)

'গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ' শীর্ষক অধ্যায়ে বিবেকানন্দকে আমরা 'প্রফেট' বা ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা-রূপে পাচ্ছি, পাচ্ছি পরিবেশ-দূষণ সম্পর্কে সাবধানকারী-রূপেও : "হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে

এসব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইট-খোলার গর্ত্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভুতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!" (ঐ, পৃঃ ৫১)

'সুয়েজখালে হাঙর শিকারে'র এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন বিবেকানন্দ, কিন্তু একই অধ্যায়ে ভারতের শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে যে মর্মস্পর্শী কথাগুলি তিনি লিখেছেন স্বয়ং কার্ল মার্কসও হয়তো তা এভাবে লিখতে পারতেন না (মার্কসের মতো বিবেকানন্দও মনে করতেন যে, উৎপাদক শূদ্রশ্রেণীই হলো সমাজের মুখ্য শ্রেণী, তারাই সমাজের বুনিয়াদ) —"ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ করে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্চে না!... হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে একথা!... তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।" (ঐ, পৃঃ ৮৩)

'ইওরোপী সভ্যতা' অধ্যায় যে-ছত্রগুলি দিয়ে শেষ হয়েছে তা থেকে আমরা সকলেই শিক্ষা ও প্রেরণা পেতে পারি—"বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে-জিনিস যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে-জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই, সিদ্ধিও নাই।" (ঐ, পৃঃ ৯২) এই ভাব আমরা বিবেকানন্দের প্রিয় লেখক ব্রাউনিঙের কবিতায় বারংবার পেয়েছি এবং রবীন্দ্র-রচনায় তার প্রতিধ্বনি শুনেছি—

"Then, welcome each rebuff
That turns earth's smoothness rough,
Each sting that bids nor sit nor stand but go!
Be our joys three parts pain!
Strive, and hold cheap the strain;
Learn, nor account the pang;
dare, never grudge the throe!"

('Rabbi Ben Ezza')

'ইওরোপে' অধ্যায়ের শেষের দিকে বিবেকানন্দ পুরুষ এবং নারীর বিচারভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য নিয়ে এক শতাব্দী আগে যা লিখেছিলেন, এখনকার চিন্তাশীল লেখকেরা অধুনা তা স্বীকার করছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বহুলপ্রচারিত গ্রন্থে সেই কথা সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। এটির তাৎপর্যপূর্ণ নাম হচ্ছে—'Men are from Mars, Women are from Venus' এবং এর লেখক হলেন প্রাক্তন সন্ন্যাসী ও মহাঋষি মহেশ যোগীর ছাত্র ডঃ জন গ্রে।

বিবেকানন্দ মুক্তকণ্ঠে ফরাসী সংস্কৃতির প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে, তৎকালীন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সেই সংস্কৃতি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। জার্মান ও ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের তিনি তুলনা ও প্রতিতুলনা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—"জার্মানির সৈন্য প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ... জার্মান মনুষ্য ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করছে।" (ঐ, পৃঃ ৯৯) প্রকারান্তরে সত্যদ্রষ্টা বিবেকানন্দ পরবর্তী যুগের দুইটি বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় চা-পানকে বিষপানের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বিবেকানন্দ লিখেছেনঃ "দুধ মেশালে চা বা কফি বিষের ন্যায় অপকারক!" (ঐ, পৃঃ ১০০)

বিবেকানন্দের চলিত ভাষাশৈলীর উৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন এই 'পরিব্রাজক'।

॥৪॥

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে (কত পরে তা জানবার উপায় নেই) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা'য় প্রকাশক যখন লেখেনঃ "ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে।" তখন তিনি একেবারেই অত্যুক্তি করেননি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়। 'পরিব্রাজক'-এ যে-ধারণা ছিল বীজাকারে উপ্ত, এখানে তা মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। বিবেকানন্দ প্রাচী ও প্রতীচীর দুই বিপরীত চিন্তাধারার সমন্বয়সাধনে প্রয়াসী এবং তাঁর সে-প্রয়াস সার্থক হয়েছে। অনেক একদেশদর্শী মনে করেন যে, পাশ্চাত্যের সব ভাল এবং প্রাচ্যের সব খারাপ। অন্য মেরুর একদেশদর্শীরা আবার বিশ্বাস করেন যে, প্রাচ্যের সব ভাল এবং পাশ্চাত্যের সব খারাপ, সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে আমাদের কিছু শেখার নেই। প্রকাশক তাই আরো লিখেছেনঃ "এই প্রবল স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, এই আশা করিয়া ইহার পুনর্মুদ্রণ করা গেল।" (ঐ, পৃঃ ১১৫) প্রকাশকের এই আশা কিছুটা অন্তত পূর্ণ হয়েছিল।

গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতাগুলির মতো ভারতবর্ষেরও একটা জীবনাদর্শ আছে। এটাই তাদের 'স্বধর্ম' বা 'জাতিধর্ম'। ভারতবর্ষের 'মিশন' বা মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে

বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এ আলোচনা করেছেন। রূপকথার রাক্ষসীর গল্প মনে করিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন যে, ভারতের প্রাণপাখি তার ধর্মের মধ্যে রয়েছে। "সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনো বেঁচে আছে।" (ঐ, পৃঃ ১২৫) তুলনামূলক বিচার করে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ "অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছা-রূপে বিকাশ হয়েছে।" (ঐ, পৃঃ ১২৬) শুধু জাতিধর্মই নয়, বিবেকানন্দ আমাদের দেশের লোকায়ত জীবনচর্যার বিভিন্ন বিষয়গুলি খুঁটিনাটিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সম্প্রদায়ের পার্থক্যগুলি সতর্কভাবে লক্ষ্য করে। এবিষয়ে তাঁর 'আর্য ও তামিল' অধ্যায়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ভারতবর্ষের অন্তহীন বৈচিত্র্যের কথা ভেবে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন এবং এদেশকে 'এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা' আখ্যা দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রান্তের ভারতীয়দের শরীরের আকার ও গঠন, বেশভূষা ও ফ্যাশান, পরিচ্ছন্নতা, আহার্য ও পানীয় এবং আচারবিচার ও রীতিনীতি—কিছুই বিবেকানন্দের সমীক্ষা থেকে বাদ পড়েনি। ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ ও আবহাওয়ার ভূমিকাও তাঁর সন্ধানী বিজ্ঞানীর চোখ এড়িয়ে যায়নি। বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ব্যাপার আলোচনার সময়ও বিবেকানন্দ তাঁর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেছেন। লোকাচার এবং কুসংস্কার বিচারেও তিনি নির্মোহ থেকেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ধারণার সূক্ষ্মতা, স্বচ্ছতা ও গভীরতা আমাদের মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগায়।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (এবং বিবেকানন্দের অধিকাংশ রচনাই) যে এখনো কত প্রাসঙ্গিক, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অধুনা আমরা ভারতবর্ষে 'ডেমোক্রেসি'র হালচাল দেখে হতচকিত। গণতন্ত্রের নামে যে-প্রহসন এদেশে চলছে তা যেমন দুঃখজনক, তেমনি লজ্জাকর। অনেকেই মনে করছেন যে, এই যদি গণতন্ত্র হয়, তাহলে আমাদের জন্ম জন্ম 'অগণতান্ত্রিক' থাকাই ভাল। পশ্চিমের সবকিছু নকল করতে গিয়ে আমরা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করছি এবং স্বখাত সলিলে ডুবে মরছি। গণতন্ত্রের নামে কিছু হৃদয়হীন স্বার্থান্বেষী জঘন্য লোককে আমরা দেশ লুণ্ঠন করার সুযোগ দিচ্ছি। প্রজারক্ষক প্রজাভক্ষক হয়ে উঠছে। এবিষয়ে একশ বছর আগে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বিবেকানন্দ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তবে তাঁর সময় যা ছিল না, এখন তাও হয়েছে, অর্থাৎ "রাজনীতির নামে...চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে... খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে।" (ঐ, পৃঃ ১২৭) বিবেকানন্দের আরো কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এপ্রসঙ্গে অপরিহার্য ঃ "উপায় তো সব দেশেই এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; বাকিগুলো খালি 'ভেড়িয়া-ধসান' [গড্ডলিকা প্রবাহ] বৈ তো নয়। ও তোমার 'পার্লামেন্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।" (ঐ, পৃঃ ১২৬)

সহজ চলিত ভাষায় লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' যুগপৎ সারগর্ভ এবং সুখপাঠ্য। যেমন সুনিপুণ বিবেকানন্দের বিষয়-বিশ্লেষণ, তেমনি অনবদ্য তাঁর রচনাশৈলী। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ, সেবিষয়ে কোন সংশয় নেই।

॥৫॥

বাঙলা সাহিত্যের আরেকটি অমূল্য রত্ন 'বর্তমান ভারত'। এটি ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'উদ্বোধন'-এ (১৩০৫-১৩০৭) এবং পরে স্বামী সারদানন্দের ভূমিকা-সম্বলিত হয়ে গ্রন্থাকারে বের হয় (১৩১২)। এখানে ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিশ্লেষণে বিবেকানন্দ যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তা অসাধারণ। মার্কসবাদী না হয়েও তিনি তাঁর ভারত-ইতিহাস অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তৎকালীন বৈশ্যশ্রেণীর আধিপত্যের পরে শূদ্রদের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক কিন্তু তাঁর ভাবধারা দার্শনিক-সুলভ, তাই 'বর্তমান ভারত'-এর লেখকের মননের গভীরতা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। কবিতাবিলাসী উপন্যাসপ্রিয় রোমান্টিক স্বভাবের বাঙালী পাঠককে বিবেকানন্দ একটি মহার্ঘ চিন্তামণি উপহার দিয়েছেন এই অসাধারণ প্রবন্ধগ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই পুস্তকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিপ্লবীদের আখড়া অনুসন্ধান করে ইংরেজ শাসককুল সাধারণত যে তিনটি বইয়ের সন্ধান পেত, তাদের মধ্যে 'বর্তমান ভারত' অন্যতম (অন্য দুটি হচ্ছে 'গীতা' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ')।

যুগ যুগ ধরে ভারতে বিদেশী জাতি এসেছে। তাদের চিন্তাধারা ও কর্মধারা আমাদের কিভাবে প্রভাবিত করেছে বিবেকানন্দ তার একটি সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। রাতারাতি বণিকের মানদণ্ড শাসকের (এবং শোষকেরও বটে) রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই বিবেকানন্দের একেবারে ভাল লাগেনি। ইংরেজ-শাসনের নিন্দায় তিনি পঞ্চমুখ। তবু তিনি এর একটা ভাল সৃজনমূলক দিক লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে যে, ইংরেজ ও ভারতীয় জাতির এই সংযোগের ফলে ভারতীয়দের মানসিক বন্ধন-মুক্তির একটা সুযোগ এসেছে। বহু শতাব্দীর অন্ধ জড়তা থেকে ভারতবর্ষ আবার উদ্যমময় নবীন জীবনের আলোয় উত্তীর্ণ হতে পারবে। বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল

যে, ভারতের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। "কিন্তু গুণদোষ-রাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ [লক্ষণ] দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসঙ্ঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য।" (ঐ, পৃঃ ১৯০)

অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের প্রতি উচ্চবর্ণের লোকদের অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়েছেন। যারা 'চলমান শ্মশান', যাদের আমরা 'ভারবাহী পশু'র বেশি কিছু না ভেবে পশ্চাতে রেখেছি, তারা আমাদের পশ্চাতে টানবেই। যে-জীবদের বিবেকানন্দ শিবজ্ঞানে পূজার কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে এই নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত তথাকথিত 'নীচ' জাতি। তিনি মনে করতেন যে, গণদেবতার পূজাই প্রথম ও প্রধান পূজা হওয়া উচিত। সমষ্টি তাঁর কাছে ব্যষ্টির চেয়ে বড়। এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য তিনি 'বর্তমান ভারত'-এ দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছেনঃ "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রম মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।" (ঐ, পৃঃ ১৮৫) বিবেকানন্দের এই উক্তির গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

'বর্তমান ভারত'-এর শেষাংশে বিবেকানন্দ ভারতীয়দের অভিনব রাষ্ট্রীয় গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, যেখানে গভীর স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে মিলিত হয়েছে প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃপ্ত বাগ্মিতাঃ "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য সর্বত্যাগী শঙ্কর... ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত... ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর...।" (ঐ, পৃঃ ১৯৪) প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিরা যখন ঘোষণা করেন—

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের মুটে মজুরের"—

তখন তাঁদের প্রেরণার অন্যতম উৎস বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এই জ্বালাময়ী বাণী, এই অগ্নিগর্ভ স্বদেশমন্ত্র। বিবেকানন্দের প্রয়োজন আমাদের কোনদিনই ফুরোবে না।

সব্যসাচী বিবেকানন্দ বাঙলাভাষার সাধু ও চলিত দুই রীতিতেই সমান দক্ষ ছিলেন। 'বর্তমান ভারত' সাধুভাষায় লেখা হলেও রচনাশৈলীর নৈপুণ্য এখানে প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। বিবেকানন্দের বাগ্মিতা অনেক সময় কবিতার মতো চিত্তহারী হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ মনে করেছেন যে, এ-গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। আমাদের মনে হয় যে, জটিলতা গ্রন্থের কোন কোন অংশে হয়তো কিছু আছে, কিন্তু দুর্বোধ্যতা নেই—অন্তত শিক্ষিত পাঠকদের কাছে। (সব বই তো শুধু সাক্ষর পাঠকদের জন্য লেখা হয় না।) 'বর্তমান ভারত', ভারবির রচনার মতো, নারিকেল ফলের সঙ্গে তুলনীয়—বাইরে কাঠিন্য, ভিতরে সুমিষ্ট তারল্য। কিংবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় যে, বাইরে রয়েছে শুক্তির মতো কঠিন আবরণ, অন্তরে পাঠকদের জন্য একটি মুক্তাধন।

।।৬।।

'পত্রাবলী'র অন্তর্গত বিবেকানন্দের চিঠিপত্রের মধ্যে কিছু চিঠি বাঙলায় লেখা। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে তাঁর চিঠিগুলি স্থান পেয়েছে, কিন্তু কোন্‌গুলি বাঙলায় লেখা এবং কোন্‌গুলি ইংরেজী থেকে অনুবাদ তা একেবারেই জাননো হয়নি। এতে পাঠকের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য চিঠির মূল ভাষা অনুমান করা যেতে পারে; পত্রের প্রাপক বাঙালী হলে বিবেকানন্দ সাধারণত বাঙলায় লিখেছেন এবং প্রাপক অবাঙালী হলে সাধারণত ইংরেজীতে। তবু অন্তত 'তথ্যপঞ্জী'তে কিছু নির্দেশ থাকলে ভাল হতো।

বিবেকানন্দের বাঙলা চিঠির ভাষা ঝরঝরে ও ঘরোয়া। অনেক চিঠি সাধুভাষায় লেখা হলেও ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতার ভাব সেখানে ক্ষুণ্ন হয়নি। যা লেখবার তা তিনি খোলাখুলিভাবে লেখেন। তাঁর মন ও চিন্তাধারার মতো তাঁর চিঠিগুলিও ঋজু ও স্বচ্ছ। এর মধ্যে বেশ কিছু চিঠির সাহিত্যমূল্যও অসামান্য। তার চেয়ে বড় মূল্য এই যে, এগুলি সহজেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পাথেয় হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার। কানাইলাল দত্ত সঙ্কলিত 'বিবেকানন্দ পত্রসম্পুট' (১৯৮৩) একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এতে বিবেকানন্দের চিঠিপত্র থেকে কিছু কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ অংশ চয়ন করা হয়েছে এবং বিষয় অনুসারে বিভিন্ন ভাগে সাজানো হয়েছে। এর ভূমিকায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সুন্দরভাবে ও সংক্ষেপে বিবেকানন্দের চিঠিপত্রের মূল্যনিরূপণ করেছেনঃ "স্বামীজীর চিঠির মধ্যেই স্বামীজীকে ভালভাবে চেনা যায়। তাঁর ভালবাসা, রাগ-অভিমান, দুঃখ-বেদনা, তাঁর উচ্চতম চিন্তা, গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি, আবার হাসিঠাট্টা, ছেলেমানুষি—সব নিয়ে 'মানুষ' বিবেকানন্দকে দেখতে পাই। জানি না কোন্ লোক থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন, কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি যে অনন্য, তা চিঠিগুলি পড়লে বুঝতে পারি।"

মানুষ হিসেবে 'অনন্য' বিবেকানন্দ বাঙলা গদ্যের লেখকরূপেও অনন্য। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই সঙ্গত কারণেই তাঁর অন্য চারটি মৌলিক গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর 'পত্রাবলী'ও আলোচিত হয়। 'পরিব্রাজক'-এর চিঠিগুলি যখন তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখেছিলেন, তখন সচেতন ছিলেন যে, পরে সেগুলি পাঠক-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। 'পত্রাবলী'র চিঠিগুলিতে সেই সচেতনতা নেই, থাকবার কথাও নয়। এখানে আমরা মানুষ বিবেকানন্দের ঋজু, সত্যসন্ধ এবং মহিমান্বিত অথচ স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পাই—যে-ব্যক্তিত্ব লোকোত্তর, কারণ তা বজ্রের চেয়ে কঠোর আবার কুসুমের চেয়ে কোমল। যে-শব্দগুলি বিবেকানন্দ প্রমদাদাস মিত্রকে তাঁর একটি চিঠি সম্বন্ধে লিখেছিলেন (১৯।১১। ১৮৯৬), তা বিবেকানন্দের নিজের অনেক চিঠি সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেগুলি তাঁর "অত্যুদার হৃদয়ের উপযুক্ত পরিচায়ক" এবং "অদ্ভুত স্নেহরসাপ্লুত"। বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে তাঁর গভীর সাহিত্যানুরাগেরও পরিচয় পাই। সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা থেকে অনেক উদ্ধৃতি তাঁর চিঠিপত্রে সহজভাবে এসেছে এবং সেগুলিকে আরো আকর্ষক করেছে। ৪ জুলাই ১৮৮৯ তিনি প্রমদাবাবুকে যে-চিঠি লেখেন তাতে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দুষ্মন্তের "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্" শ্লোকটির শেষাংশ উদ্ধৃত করেছেন। এই উদ্ধৃতিটি বিবেকানন্দের অন্য উদ্ধৃতিগুলির মতোই সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

।।৭।।

ছন্দোবদ্ধ ভাষায় না লিখেও শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কবি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি গ্রন্থই আছে, যার নাম 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ও উত্তরসাধক বিবেকানন্দ সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙলা—এই তিন ভাষাতেই কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর সে-কবিতাগুলি সুপরিচিত। তাঁর একুশটি রসোত্তীর্ণ ইংরেজী কবিতা এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের।

বিবেকানন্দের চারটি বাঙলা কবিতার মধ্যে 'সাগরবক্ষে' ক্ষুদ্রতম। নীলাকাশে মেঘের মেলা ও খেলা বিবেকানন্দের কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলেছে, কিন্তু 'শেষে সব আকাশে মিলায়'। এ যেন সংসারেরই এক প্রতিরূপ, যেখানে মানুষের শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসা। এই বিষণ্ণ সত্য কবি শান্তভাবে গ্রহণ করেছেন। এই শান্ত ভাব ভারতবর্ষের সিন্ধুস্রোতেও রয়েছে, যেখানে রাগিণী আছে, তর্জন নেই।

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে কবির গুরুর জয়জয়কার। 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে!' ('পরিব্রাজক', পৃঃ ৬৫) এখানে সম্ভবত কবির সেই সময়কার মনের অবস্থার বর্ণনা আছে যখন তিনি শারীরিক অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য গাজীপুরের হঠযোগী পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেওয়ার সঙ্কল্প করেন এবং পরে স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেলে সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। এ-কবিতায় বিবেকানন্দ যেভাবে তাঁর গুরুকে সম্বোধন করেছেন, তা 'গীতা'তে বিশ্বরূপদর্শনযোগে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর যে পূর্বের 'প্রসভোক্তি'র উল্লেখ করেছেন, তা স্মরণ করায় ঃ

"পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি—আমি তুমি, তুমি আমি।"

কবিতার শেষাংশে অনেকবার 'আমি' এসেছে ঃ

"আমি বর্তমান...
আমি হই বিকাশ আবার...
আমি আদি কবি...
আমি আদি কবি..."

নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে-'আমি' ছড়িয়ে রয়েছে তা বিবেকানন্দের এই 'আমি'র উত্তরসুরি।

'সখার প্রতি' কবিতার শেষ দুই ছত্র আজ প্রবচনে পরিণত হয়েছে ঃ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই কবিতায় বিবেকানন্দ যে 'মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা'র কথা বলেছেন, 'মাতৃভাবে' যাঁর 'আগমন', তাঁকেই 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় হৃদয়-শ্মশানে স্থান দিয়েছেন। প্রচলিত একটি শ্যামাসঙ্গীতের কথা মনে পড়ে ঃ

"শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি তাহে নিরবধি।"

বিবেকানন্দের বিখ্যাত ইংরেজী কবিতা 'Kali the Mother'-কেই যেন তিনি 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় নতুন রূপ দিয়েছেন। এখানে তাঁকে আমরা জীবনসংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক এবং আমাদের সহযোদ্ধা-রূপে দেখতে পাই এবং শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এই বিবেকানন্দকে 'Divine Warrior' বলতে পারি। 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিপ্লবীদের কাছে এবং সুভাষচন্দ্রের কাছে ছিল পরম প্রেরণার উৎস। নেতাজীকে অনেকসময় কবিতাটির শেষ চার ছত্র শান্ত-গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করতে শোনা যেত—

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে।।
পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।"

✡

বিবেকানন্দের নিজের জীবনে যে লোকোত্তর তেজ, মহিমা ও সুষমা ছিল, তা তাঁর ভাষণে যেমন সঞ্চারিত হয়েছে, তেমনি সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর ইংরেজী ও বাঙলা রচনায়—গদ্যে ও কবিতায়। মিলটনের মতো তিনিও ছিলেন পবিত্র, দৃপ্ত ও স্বতন্ত্র এবং 'himself...a true poem'। ❑

গণবিজ্ঞান আন্দোলনে 'উদ্বোধন'

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ প্রক্রিয়ায় ও সামাজিক পরিবর্তনে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে যেসমস্ত শর্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলিও বিজ্ঞানের ফসল। বর্তমান সমাজে বা সমাজজীবনে বিজ্ঞানের নিত্যসাহচর্য বিশেষ ব্যাখ্যা বা বিবৃতির অপেক্ষা রাখে না। গণমাধ্যম (massmedia), শিল্পায়ন (industrialization), নগরায়ণ (urbanization) ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে (technological development) আজকের সমাজ পরিপুষ্ট। বিজ্ঞান আজ জীবনের অনিবার্য অঙ্গ। জীবন উপভোগে তার যেমন বিরামহীন আনাগোনা, তেমনই তার অবদানে এসেছে নানা বিড়ম্বনাও। পরিবেশ-দূষণ, বৃত্তিগত ব্যাধি, মাদকাসক্তি, মানসিক পরিদূষণ আজ আধুনিক মানুষের নিত্যসঙ্গী। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির যে পথনির্দেশ তাও বিজ্ঞানের সড়ক ধরেই আগুয়ান। সুষ্ঠু জীবনের অন্যতম শর্ত বিজ্ঞানমনস্কতা। বিজ্ঞান—বিজ্ঞানশিক্ষা তাই আজ আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে দেখা দিয়েছে বিশ্বের সব দেশেই। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্স ওয়েবার বলেছেনঃ "Science has shaped modern technology—and will presumably continue to do so in any future socialist society.... The development of science, modern technology and bureaucracy, all are collectively referred as rationalization and that means the organization of social and economic life according to principles of efficiency, on the basis of technical knowledge."

অতীত সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে, নানা কুসংস্কার, লোকাচার, ভ্রান্তবিশ্বাস মানুষকে ক্রমশই সঙ্কুচিত করেছিল; গড়ে তুলেছিল ঘরের মধ্যে ঘর, ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে তুলেছিল অতি আপনজনের মাঝে। এই অন্ধতমিস্রা থেকে বেরিয়ে আসতে বিজ্ঞান মানুষকে সাহায্য করেছিল সবচেয়ে বেশি। যুক্তিবাদ ও বিশ্লেষণ-গুণে মানুষ ক্রমোন্নয়নের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। সভ্য মানুষ যেমন বিজ্ঞানকে তার বাহন করে নিয়েছে তেমনই বিজ্ঞান-সচেতনতা তার নৈতিক শিক্ষার অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

'বিজ্ঞান-সচেতনতা' ও 'প্রযুক্তিগত জ্ঞান' একই বস্তু নয়। 'বিজ্ঞান সচেতনতা' দৈনন্দিনের ব্যবহার্য বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা আর 'প্রযুক্তিগত জ্ঞান' বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশলের অভিজ্ঞান। দ্বিতীয় বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানকর্মীদের দায়িত্ব থাকলেও 'বিজ্ঞান-সচেতনতা' জনমানসের পক্ষে জরুরী। উনিশ শতকের নবজাগরণে এই উদ্যোগের আত্তীকরণ সর্বাংশে অনুভূত হয়েছিল। এদেশের জনমানসে এই বিজ্ঞান-সচেতনতা আনার চেষ্টায় সক্রিয় হয়েছিলেন একাধিক ব্যক্তি এবং কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁদের নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলিকে। এই উদ্যোগকেই 'গণবিজ্ঞান আন্দোলন' নামে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যম, সংগঠন, সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকা এই আন্দোলনের সামিল হয়েছে। এ-নিবন্ধের উদ্দেশ্য গণবিজ্ঞান আন্দোলনে শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী 'উদ্বোধন' পত্রিকার অবদান আলোচনা করা।

বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান ও 'উদ্বোধন' পত্রিকা

উনিশ শতকের নবজাগরণ পর্বে বহু পত্রপত্রিকাই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান' গ্রন্থে বিগত শতকে গণবিজ্ঞান প্রচারে অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান-গ্রন্থ, বিজ্ঞান-পত্রিকা, বিজ্ঞান-নিবন্ধ ও নিবন্ধ-লেখকদের নিয়ে সৃষ্ট পরিমণ্ডলকে তিনটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা উদ্ভব যুগ (ইউরোপীয় লেখকদের আমল), গঠন যুগ (অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব পর্যন্ত) ও আধুনিক যুগ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে আধুনিক কাল)। তিনি উল্লেখ করেছেনঃ "রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'নবজীবন'-এ লেখনী ধারণ করার পর থেকে এই যুগের সূচনা।... রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম রচনা 'মহাশক্তি' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালের 'নবজীবন'-এর পৌষ সংখ্যায়।" সমকালে বহু ধর্ম-পত্রিকা, সাহিত্য-পত্রিকা ও বিজ্ঞান-পত্রিকা বিজ্ঞান-নিবন্ধ প্রকাশ করে জনমানসে বিজ্ঞান-সচেতনতা জাগানোর প্রতি বিশেষ নজর দেয়। এই পর্বেই 'উদ্বোধন'-এর আত্মপ্রকাশ (১৩০৫ সালে)। ঐ উদ্যোগের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ঐসময় বহু পত্রপত্রিকা ও বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও নানা সীমাবদ্ধতায় সে-উদ্যোগ সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। সমকালীন পত্রিকাগুলি বিজ্ঞান-নিবন্ধ প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি

এবং প্রকাশিত নিবন্ধের গুণগত মানও সবসময় যথেষ্ট উৎকৃষ্ট হতো না। বিজ্ঞানের বিষয়গত ব্যাপ্তিও ঐসময় নিবন্ধে গরহাজির ছিল। 'আধুনিক কাল' পর্ব হিসাবে চিহ্নিত সময় যেসমস্ত পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তাদের মধ্যে 'নবজীবন', 'সাহিত্য', 'নবভারত', 'সাধনা' ও 'সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড় পরিতাপের বিষয়, লেখক 'বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান'-এর বিবর্তনগত বিন্যাস বিবৃত করতে গিয়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার নাম বিস্মৃত হয়েছেন; যদিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপর গবেষক বিনয়ভূষণ রায় তাঁর গ্রন্থে ('উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা') 'উদ্বোধন'-এর স্মরণীয় উদ্যোগকে সমর্যাদায় উপস্থাপন করেছেন।

'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধমালার সমীক্ষা

'উদ্বোধন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। তারপর নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। 'উদ্বোধন' কার্যত রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র হলেও এটি কেবল নিছক ধর্মপত্রিকা নয়, এতে ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কবিতা, লোকসংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়মিত রচনা এবং সমকালীন 'বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ' ও 'বিজ্ঞান-সংবাদ' নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশিত হয়ে আসছে। শতবর্ষব্যাপী 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞান-নিবন্ধসমূহকে প্রচলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগে সাজালে নিম্নরূপ পরিসংখ্যান লক্ষ্য করা যায় ঃ

ক) পদার্থবিজ্ঞান—৩.৮৭% খ) রসায়নবিজ্ঞান—১৫.৪৭%, গ) ভূবিজ্ঞান—৪.৯৭%, ঘ) চিকিৎসাবিজ্ঞান—২৮.১৯%, ঙ) পরিবেশবিজ্ঞান—৫.৫২%, চ) শারীরবিজ্ঞান—৫.৫২%, ছ) মনোবিজ্ঞান—৩.৩২%, জ) কৃষিবিজ্ঞান—৩.৮৭%, ঝ) উদ্ভিদবিজ্ঞান—৩.৩২%, ঞ) প্রাণিবিজ্ঞান—৬.৬৩% ট) নৃবিজ্ঞান—৪.৪২% ঠ) জ্যোতির্বিজ্ঞান—২.২২%, ড) কারিগরিবিজ্ঞান—১.১১%, ঢ) বিজ্ঞানীদের জীবনী—৩.৮৭% ও ণ) সামগ্রিক বিজ্ঞান—৭.৭২%।

পরিসংখ্যান সারণী অনুসরণে দেখা যায় যে, প্রায় পনেরটি বিজ্ঞান শাখা অধিকার করে আছে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞান-নিবন্ধগুলি। ঐ তালিকা থেকে আরো জানা যায় যে, চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত নিবন্ধের হার সর্বোচ্চ এবং তারপরই সামগ্রিক বিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধমালার স্থান।

পদার্থবিজ্ঞানের ওপর 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে বহু নিবন্ধ। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য বিষয়গুলি হলো—দুর্গাপদ মিত্রের 'আপেক্ষিক মাধ্যাকর্ষণ', অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাতাল রেল', ধ্রুব মার্জিতের 'টেলিভিশন', তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'কসমিক রশ্মি' প্রভৃতি।

রসায়নবিজ্ঞান সংক্রান্ত নিবন্ধ-সংখ্যা যথেষ্টই। সাধারণ রসায়ন ও জৈবরসায়ন বিষয়ক নিবন্ধগুলি যেমন তথ্যবহুল, তেমনি তাতে আছে সমকালীন ঘটনার বিশ্লেষণ। 'পারমাণবিকতত্ত্ব' (লেখক—সুবর্ণকমল রায়), 'হীরকতত্ত্ব ও কোহিনূর' (অনুকূলচন্দ্র ঘোষ), 'আণবিক শক্তি' (তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়), 'নাইট্রোজেন ও মানুষ' (অভীপ্সর সেন), 'ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ' (শিবদাস), 'সাবানের অনুকম্প' (প্রভাসচন্দ্র কর) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য।

ভূবিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ কম হলেও কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন—ট্রেভর আই. উইলিয়ামসের 'পৃথিবীর খনিজ সম্পদ', ইগার গ্রামবার্গের 'সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত সম্পদ', মাইকেল ডি. লেমোনিকের 'শ্বেত মহাদেশ—আন্টার্কটিকা', পুলকরঞ্জন চক্রবর্তীর 'ভূমিকম্পের পূর্বাভাস' প্রভৃতি।

চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক নিবন্ধের হার সর্বোচ্চ। এই চিত্র 'উদ্বোধন'-এর জনস্বাস্থ্য সচেতনতার ইঙ্গিতবাহী। 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় শশিভূষণ ঘোষের 'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান' নিবন্ধ দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার জনপ্রিয়তা আজো বহমান। বছরের বারটি সংখ্যায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা থাকলেও চিকিৎসাবিদ্যা এবং মানুষের স্বাস্থ্যবিধি ও সতর্কতা বিষয়ক নিবন্ধ-সংখ্যা উল্লেখযোগ্য-মাত্রায় থাকে, যাতে মানুষ স্বাস্থ্য ও ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হতে ও সতর্কতা নিতে পারেন। বর্তমানে তো নিয়মিতভাবে 'সুস্বাস্থ্য' বিভাগে দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। এই শতকের প্রথমার্ধে দেশে যখন ম্যালেরিয়া ভয়ালমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল, 'উদ্বোধন' তখন ঐ ম্যালেরিয়া বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করে জনগণকে সতর্কতার অভয়বাণী শুনিয়েছে এবং ঐ রোগ মোকাবিলার বৈজ্ঞানিক কৌশল আয়ত্তের পরামর্শ দিয়েছে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তেইশতম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখেছেন 'গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া' এবং পঞ্চম সংখ্যায় লিখেছেন 'শিশুর অকালমৃত্যু' প্রসঙ্গে। ঐ লেখকেরই অন্যান্য রচনা হলো—'কলেরা বা ওলাউঠার কারণ ও প্রতিকার', 'দেশীয় ধাত্রী' প্রভৃতি। প্রখ্যাত চিকিৎসক, গবেষক ও ভাইরাস-বিশেষজ্ঞ জলধিকুমার সরকারের বিভিন্ন রোগ-বিষয়ক বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বসন্ত ভাইরাস, ডেঙ্গু ভাইরাস, আন্ত্রিক ব্যাধি, জাপানী এনকেফালাইটিস, পোলিও, প্লেগ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যবহুল নিবন্ধগুলি জনবিজ্ঞান পরিবেবায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। পোলিও, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ডায়াবিটিস, ব্লাড কোলেস্টেরল, হৃৎ-ব্যাধি, চর্মরোগ, ছানি, বধিরতা ইত্যাদি বিষয়ক নিবন্ধের সংখ্যাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধুনা আলোচিত 'থ্যালাসেমিয়া' (লেখক—
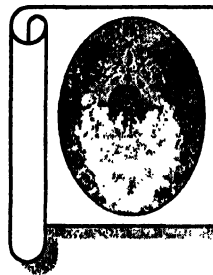
কাশীর দুর্গা

স্বামী অচ্যুতানন্দ

কাশীর আকাশ এখনো কালো, তারাও দেখা যাচ্ছে। আমরা দুজন সাধু শেষরাত্রে মঙ্গলারতির পর রাস্তায় নেমেছি। ভেলুপুরা ছাড়িয়ে দক্ষিণমুখে চলার পথে বাঁদিকে মেনকা-মন্দির। ভূ-কৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষালের শ্রীগুরু-মন্দির ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতেই দূর থেকেই মাইকে স্তব শোনা গেল—"পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্যতি যোঽনুদিনং স শিবে।/ তবপদমেব পরংপদমেবনুশীলয়তো মম কিং ন শিবে।।/ জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী রম্যকপর্দিনী শৈলসুতে।।" আমাদের গতিও বেড়ে চলল। মন্দিরের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। আবছা কালো আকাশের পট-ভূমিকায় দীর্ঘচূড় মন্দির ক্রমশ এগিয়ে এসেছে, গানও দ্রুতলয়ে চলছে—"তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাসি শিবম্।/ জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী রম্যকপর্দিনী শৈলসুতে।।"

আমরা এসে পৌঁছেছি বারাণসীর দক্ষিণপ্রান্তে দেবী দুর্গার মন্দিরদ্বারে। কথিত আছে, বিশ্বেশ্বর যখন বারাণসীতে প্রবেশ করেন তাঁর দীর্ঘ প্রবাসের পরে, তখন তাঁর প্রধান অমাত্য নন্দীকেশ্বরকে বলেন: "তুমি আমার এই কাশীপুর রক্ষার জন্য দেবী পার্বতীর বিশিষ্টা শক্তিদের, আমার ভৈরব, আদিত্য—এঁদের সব ক্রমানুসারে চারদিকে স্থাপন কর।" নন্দীকেশ্বর সেইমত নবদুর্গা, ছাপান্ন গণেশ, নবগৌরী, অষ্টমাতৃকা, অষ্টভৈরব, দশ দিকপাল, দ্বাদশ আদিত্য, চতুঃষষ্ঠি যোগিনী প্রমুখ বহু দেবদেবীকে কাশীতে স্থাপন করে বিশ্বেশ্বরের আনন্দকাননকে স্বর্গের মহিমায় ভূষিত করলেন। আমরা সেই "স্বপ্নেশ্বর্য্যাশ্চ বারুণ্যাং দুর্গাদেবি ব্যবস্থিতা।/ ক্ষেত্রস্য দক্ষিণং ভাগং সা সদৈব অভিরক্ষতি।"—স্বপ্নেশ্বরী দেবীর পশ্চিমদিকে এই দেবী দুর্গা, যিনি বারাণসীক্ষেত্রের দক্ষিণদিক রক্ষা করছেন, তাঁর মন্দির-দরজার সামনে দাঁড়িয়েছি।

আজ শ্রাবণের শেষ শনিবার। গোটা শ্রাবণ মাস শনি-মঙ্গল বার এখানে মেলা বসে। দারুণ ভিড় হয়। এখন শেষরাত, তাই ভিড় বেশি না হলেও মন্দিরের প্রবেশপথের দুপাশে ফুলমালার দোকানগুলি খুলতে আরম্ভ করেছে। তার সঙ্গে নারকেল ও লাল সিল্কের জড়িপাড় কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোও বিক্রি হচ্ছে—মাকে নিবেদন করার জন্য। চৌকাঠে প্রণাম করে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। সামনে ছোট্ট চাতাল, তার মাঝখানে একটি হাড়িকাঠ। বিশেষ বিশেষ পর্বে এখানে ছাগ-মেষ বলিদান হয়। কাশীতে মাত্র দুটি মন্দিরে পশুবলি হয়—একটি এই দুর্গা-মন্দিরে, অন্যটি অন্নপূর্ণা-মন্দিরের পাশে কালকা গলিতে কালরাত্রি বা দেবী কালিকার মন্দিরে। চাতাল পার হয়ে সামনের দরজা দিয়ে মন্দিরের দ্বিতীয় মহল বা চত্বরে ঢুকলাম। দরজার দুপাশের দেওয়ালে

বারাণসীর দুর্গাকুণ্ড এবং দুর্গামন্দির আলোকচিত্র: বিজয় শেঠ

দুটি সুন্দর দেওয়াল-চিত্রে দেবী ভগবতীর অষ্টভুজা ব্যাঘ্রবাহিনী মূর্তি—সিংহবাহিনী নয়। অষ্টভুজা দেবীর দক্ষিণ চার হাতে চক্র, তরোয়াল (অসি), গদা ও অভয়মুদ্রা। বাঁহাতে শঙ্খ, ত্রিশূল, ধনুর্বাণ ও পদ্ম। একটি চিত্রের পাশে একটি শ্বেতপাথরের ওপর নির্দেশলিপি খোদাই করা আছে ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দুতে। ইংরেজীতে লেখা আছে—"Gentlemen not belonging to Hindu religion are requested not to enter the temple." (ভদ্রমহোদয়গণ যাঁরা হিন্দু-ধর্মাবলম্বী নন, তাঁদের মন্দিরে প্রবেশ না করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।)

দুর্গামন্দিরের দেওয়ালে অষ্টভুজা ব্যাঘ্রবাহিনী মূর্তি এবং নিষেধলিপি

দেবীর চিত্র-দুটির নিচে লাল উঁচু দাওয়া। তার মধ্য দিয়ে আমরা দ্বিতীয় চত্বরে প্রবেশ করে কয়েকটি সিঁড়ি পার হয়ে নাটমন্দিরে উঠলাম। নাটমন্দির-সহ গর্ভমন্দির মূল প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় এক-মানুষ উঁচু, যার জন্য বাইরে থেকেও দেবীকে দর্শন করা যায়। নাটমন্দির ও সমগ্র মন্দির লাল পাথরের অপূর্ব খোদাই করা কারুকার্যের আটটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। নাটমন্দির খুব বড় নয়। তিনদিক খোলা, মেঝে সাদা-কালো মার্বেল পাথরের। নাটমন্দিরে ঢোকার মুখেই দুদিকের অলঙ্কৃত স্তম্ভের গা থেকে লোহার শেকল দিয়ে ঝোলানো একটি বড় ঘণ্টা, দর্শনার্থীরা যাওয়ার পথে সেটি বাজিয়ে ঢোকেন। আমরাও সেটি বাজিয়ে আমাদের আগমন দেবীকে জানিয়ে দিলাম। নাটমন্দিরের সিলিং ও থাম সব লাল পাথরের কারুকার্যে ভরা। কিন্তু কোন মানুষ বা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি সেখানে নেই। শুধু ফুল ও নানা আলঙ্কারিক জ্যামিতিক নকসা, ঘণ্টা ইত্যাদি। শুধু ঢোকার মুখে দুটি সিংহমূর্তি দেবীর দিকে মুখ করে বসে আছে। দেবীর বাহন। এটি সব হিন্দুমন্দিরেই থাকে। শিবের মন্দিরে নন্দী বৃষ, বিষ্ণুমন্দিরে গরুড় ও দেবীমন্দিরে সিংহ। নাটমন্দিরের পূর্বপ্রান্তে দেবীর গর্ভমন্দিরটি ছোট। দরজার সামনে একটি বেঞ্চের প্রতিরোধ, সেখানে একটি বড় থালায় ভক্তেরা প্রণামী দেন, আর পাশে বসে থাকা পূজারী ভক্ত-দর্শনার্থীদের পূজার দ্রব্যাদি দেবীকে নিবেদন করে এখানে রেখে দেন প্রসাদ হিসাবে। এখান থেকেই দেবীকে দর্শন করতে হয়।

ভিড় নেই। আমরা দশ-বার হাত দূর থেকেই মাকে দর্শন করলাম। মা পশ্চিমাস্যা। এদেশী রীতি অনুযায়ী মায়ের সর্বাঙ্গ রক্তবস্ত্রে আবৃত, শুধুমাত্র মুখখানি দেখা যাচ্ছে—তাও রূপার একটি মুখোস লাগানো। ত্রিনয়না দেবীর মাথায় সোনার মুকুট। উচ্চতায় তিন ফুটের বেশি নয়। ছাতার মতো রূপার চন্দ্রাতপ মাথার ওপরে। সেদিন বিশেষ দিন বলে বেদি ও সিংহাসন, চন্দ্রাতপ—সবকিছুই ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। মাকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা জানালাম—"ওঁ ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াং।/ প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্।।/ দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্বা-শুভবিনাশিনি।/ ধর্মার্থকামমোক্ষায় নিত্যং মে বরদাভব।"

পাণ্ডাজী চরণামৃত দিলেন। আমরা তা পান করলাম। আমার সঙ্গী সাধুটি পাণ্ডাজীর পরিচিত। তিনি আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে তাঁর সহকারীকে আসনে বসিয়ে বাইরে এলেন এবং আমাদের নাটমন্দিরের বাইরে মন্দিরের উত্তরে কিছুটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটি বিরাট আয়তাকার কুণ্ডের পাশে নিয়ে এলেন। কুণ্ডের জলে আমাদের আচমন করিয়ে সিঁড়িতে বসে তিনি শুরু করলেন দেবীমাহাত্ম্য-কথা। প্রথমেই তিনি করজোড়ে দেবীর স্তুতি করলেনঃ "নমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয়বিনাশিনীম্।/ মহাদুর্গপ্রশমনীং মহাকারুণ্য-রূপিণীম্।।/ যস্যা স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি তস্মাৎ উচ্যতে অজ্ঞেয়া।/ যস্যা অন্তো ন বিদ্যতে তস্মাৎ উচ্যতে অনন্তা।।/ যস্যা গ্রহণং নোপলভ্যতে তস্মাৎ উচ্যতে অলক্ষ্যা।/ যস্যা জননং নোপলভ্যতে তস্মাৎ উচ্যতে অজা।।/ একৈব সর্বত্র বর্ততে তস্মাৎ উচ্যতে একা।/ একৈব বিশ্বরূপিণী তস্মাৎ উচ্যতে অনেকা।।"—সেই মহাদেবীকে প্রণাম করি, যিনি মহাভয় দূর করেন, নিদারুণ দুঃখ থেকে ত্রাণ করেন, যিনি পরমা করুণাময়ী। যাঁর স্বরূপ ব্রহ্মাদি দেবতারা জানেন না, তাই তিনি অজ্ঞেয়া। যাঁর কোন অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই তিনি অনন্তা। যাঁকে নির্দিষ্ট করে লক্ষ্য করে বলা যায় না—তিনি এমনি, তাই তিনি অলক্ষ্যা। যাঁর জন্ম সাধারণ নয়, তাই তিনি জন্মরহিত—অজা। সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে তিনিই আছেন, তাই তিনি অদ্বিতীয়া—একা। আবার বিরাট মূর্তিতে বিশ্বরূপিণী হয়ে তিনিই অনেকা।

"মন্ত্রাণাং মাতৃকা দেবি, শব্দানাং জ্ঞানরূপিণী, জ্ঞানানাং চিন্ময়া অতীতা শূন্যানাং শূন্যসাক্ষিণী।/ যস্যা পরতরং নাস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্তিতা।।"—যিনি সকল মন্ত্রের মাতৃকাশক্তি, সকল জ্ঞানের জ্ঞানস্বরূপা, যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই সেই চিন্ময়ী আদি শক্তি। প্রলয়কালে একমাত্র সাক্ষীস্বরূপা যিনি, তিনি 'দুর্গা' নামে খ্যাতা। তাঁকে প্রণাম করি।

এই মন্ত্র ও তার অর্থ আবৃত্তি করে পাণ্ডাজী একটি কাহিনী শোনালেন—এখানে কিভাবে দেবীর আবির্ভাব হলো। 'চণ্ডী'তে আছে, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর দেবী যখন দেবতাদের বর দিলেন তখন বলেছিলেন ঃ "এলোকে যখনি অসুরেরা কোন উৎপাত করবে তখনি আমি আবির্ভূত হয়ে সেই বিপদ থেকে সকলকে উদ্ধার করব, আর 'দুর্গম' নামে এক অসুরকে বধ করে আমি 'দুর্গা দেবী' নামে খ্যাত হব।" এই সেই স্থান যেখানে দেবী তাঁর কথা রাখার জন্য দুর্গম অসুরকে বধ করেছিলেন এবং এখানেই তাঁর নাম হয়েছিল 'দেবী দুর্গা'।

কাহিনীটি দেবীপুরাণের। প্রাচীনকালে রুরু অসুরের পুত্র দুর্গম অসুর কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে সকলের অজেয়ত্ব ও কোন পুরুষের দ্বারা নিহত না হওয়ার বরলাভ করেন। এই দুর্লভ বরে মত্ত হয়ে অসুর স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের স্বর্গছাড়া করল। মর্তলোকেও নানা অনাচার শুরু করল। দারুণ বিপদগ্রস্ত হয়ে দেবতারা "ভ্রষ্টারাজ্যাঃ বিবুধাঃ মহেশং শরণং গতঃ"—শিবের শরণাগত হলেন। বিশ্বেশ্বর সব শুনে আদ্যাশক্তি দেবী "মাহেশ্বরীং সমাসাদ্যা ভবান্যাজ্ঞাং প্রহৃষ্টবৎ"—মাহেশ্বরী ভবানীকে পুরুষের অবধ্য ঐ অসুর নিধনের জন্য অনুরোধ করলেন। দেবীও অসুর-নিধনে ব্রতী হলেন। তিনি তখন এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে বিন্ধ্যাচল পর্বতে বিন্ধ্যবাসিনী-রূপে অধিষ্ঠিতা। তিনি "অমর্ত্যাভয়ং দত্ত্বা"—দেবতাদের অভয় দিয়ে নিজ শরীর থেকে এক অপরূপা দেবীমূর্তি কালরাত্রিকে সৃষ্টি করে দুর্গমাসুরের কাছে দূত করে পাঠালেন তাকে যুদ্ধে আহ্বান করতে। দেবী কালরাত্রি অসুরের কাছে এসে সেই কথা জানাতে মহাক্রোধে দুর্গমাসুর তার অনুচরদের দেবী কালরাত্রিকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দিল। অসুরেরা যখন দেবীকে ধরতে গেল তখন "সা তান্ ভস্মীচকার হুঙ্কারোজনিতাগ্নিনা"—তিনি এক হুঙ্কারে দৈত্যদের ভস্ম করে দিলেন। তখন অন্যান্য অসুরেরা তাড়া করে এলে দেবীর নিঃশ্বাসের ঝড়ে তারা উড়ে গেল। দেবী কালরাত্রি তখন বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর কাছে এসে সেই সব কথা নিবেদন করলে আদ্যাদেবী "মহাভুজ সহস্রাঢ্যাং মহাতেজোঽভিবৃংহিতাম্। তত্তৎঘোরপ্রহরণাং রণকৌতূকসাদরাম্।।"—সহস্রভুজা, বহু অস্ত্রে সজ্জিতা, উজ্জ্বল দিব্যমূর্তিতে স্বর্গমর্তপাতাল জুড়ে এক বিরাট রূপে দেবী সেই দুর্গমাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এখানে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর ললাটের চন্দ্রকলায়, তাঁর অঙ্গের দিব্য অলঙ্কার ও কান্তিতে চতুর্দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শঙ্কিত দুর্গমাসুর প্রথমে তার প্রধান প্রধান সেনাপতি জম্ভ-কুজম্ভ-মহাজম্ভদের পাঠাল যুদ্ধ করতে। দেবী তখন তাঁর দিব্য প্রভাবে নিজের শরীর থেকে শত শত দৈবীশক্তি সৃষ্টি করে তাঁদের নিয়ে যুদ্ধে রত হলেন।

দুর্গমাসুর মহাবলবান। নানা অস্ত্রে সে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। মায়াবী অসুর একসময় মায়াঝড় সৃষ্টি করে

কাশীর দেবী দুর্গা আলোকচিত্র ঃ বিজয় শেঠ

দেবীর সঙ্গে আকাশপথে যুদ্ধ শুরু করল। দেবী সেখানেই তাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিলে মায়াবী অসুর মায়ায় কখনো হাতি, কখনো মহিষের রূপ ধরে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে সহস্রবাহু দৈত্যের রূপ ধরে এগিয়ে এলে দেবী শূন্য থেকেই "মহাইষুণা অথ বিব্যাধ স্যাতং মহাসুরম্"—তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে অসুরকে সংহার করলেন। অসুরও "ব্যাঘূর্ণমান নয়নঃ ক্ষিতিমাপাতি বিহ্বলঃ" —আকাশ থেকে চোখ উলটে মাটিতে পড়ে গেল। সেই মহাপরাক্রম দুর্গম অসুরকে নিহত হতে দেখে দেবতারা আনন্দে স্তব করতে লাগলেন। দেবীও প্রসন্না হয়ে বললেন ঃ "অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।/ দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাৎ অতি দুর্গমাৎ।।" (স্কন্দপুরাণ, ৭২।৭১)—দুর্গম এই দুর্গ দৈত্যকে দারুণ যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়ার জন্য আজ থেকে আমার নাম 'দুর্গা' বলে খ্যাত হবে। আর যে আমার দুর্গা নাম ও রূপের শরণ নেবে "ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ" (ঐ, ৭২।৭২)—তার কখনো দুর্গতি হবে না।

এই বলে সেই দেবী শ্রান্ত হয়ে বসলেন। ঘোর যুদ্ধ এখানেই হয়েছিল। বিন্ধ্যবাসিনী দেবী যুদ্ধ করতে করতে এতদূর চলে এসেছিলেন। পরিশ্রান্ত দেবীর সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল অবিরল ধারায়। আর সেই দেবীর দেহনিঃসৃত ঘাম থেকে এই কুণ্ড সৃষ্টি হলো। তাই এই পবিত্র

কুণ্ডের নাম 'দুর্গাকুণ্ড'। চতুষ্কোণ এই বিশাল কুণ্ড আজো সেইরকমই অপরিবর্তিত ও অবিকৃত আছে। কাশীর বহু মন্দির, বহু দেববিগ্রহ কালের গ্রাসে ও বিধর্মীর অত্যাচারে ধ্বংস ও পুনর্নির্মিত হয়েছে। কিন্তু শতসহস্র বছরের প্রাচীন এই দুর্গাকুণ্ড তারা ধ্বংস করতে পারেনি। তাই এটি সেই প্রাচীনকালেরই সাক্ষী হয়ে আজো রয়ে গিয়েছে। আর এর সংলগ্ন যে দুর্গামন্দির তা যদিও অনেকবার ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু পূজারীদের লুকিয়ে রাখা সেই প্রাচীন দুর্গামূর্তি সেইরকমই আছে। আর মন্দিরও ঠিক সেই প্রাচীন দুর্গাকুণ্ডের দক্ষিণ পাড়েই রয়ে গিয়েছে, স্থানচ্যুত হয়নি। যদিও মন্দির বহুবার নির্মিত ও সংস্কৃত হয়েছে। আরো একটি প্রাচীন প্রবাদ হচ্ছে, দেবী যুদ্ধ শেষে তাঁর বিশাল তরোয়ালখানি আকাশ থেকেই মাটিতে ফেলে দেন। সেই অসির আঘাতে মাটি দুভাগ হয়ে কেটে সৃষ্টি হয় এক ছোট নদীর। দেবীর অসির আঘাতে সৃষ্ট সেই নদীরই নাম 'অসি', যা বারাণসীর দক্ষিণপ্রান্তের সীমারেখা হয়ে গঙ্গায় পড়েছে। এই মন্দির থেকে সামান্য দক্ষিণেই অসি নদী।

এই কুণ্ড ও দুর্গাতীর্থ সম্পর্কে দেবী আরো বললেন ঃ "অষ্টম্যাং চতুর্দশ্যাং ভৌমবারে বিশেষতঃ।/ সম্পূজ্যা সততং কাশ্যাং দুর্গাদুর্গতিনাশিনি।।/ নবরাত্রং প্রযত্নেন প্রত্যহং সা সমর্চিতা।/ নাশয়িষ্যতি বিঘ্নৌঘান সুমতিঞ্চ প্রদাস্যতি।।"—অষ্টমী ও চতুর্দশীতে বিশেষ করে মঙ্গলবারে যে কাশীতে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করে ও নবরাত্রিতে প্রত্যেক দিন তাঁর দর্শন-পূজাদি করে, আমি তার সমস্ত পাপ হরণ করে তাকে সুমতি প্রদান করি।

"দুর্গাকুণ্ডে নর স্নাত্বা সর্বদুর্গতিহারিণীং দুর্গাং সম্পূজ্য বিধিবৎ নরজন্ম উৎসৃজেৎ।/ সা দুর্গা শক্তিভিঃ সার্ধং কাশীং রক্ষতি সর্বদা।।"—মানুষ দুর্গাকুণ্ডে স্নান করে বিধিমত সর্বদুঃখহারিণী দুর্গার পূজা করলে তার নরজন্মজাত সমস্ত পাপ দূর হয়। এই দুর্গা তাঁর শরীরজাতা সমস্ত শক্তিদের নিয়ে সর্বদা কাশীপুরী রক্ষা করছেন। তাই এখানে যুগ যুগ ধরে বিগ্রহীভূতা হয়ে ভক্তদের রক্ষা করবার জন্য 'দুর্গা' নামে তিনি বিরাজিতা। এই হলো দুর্গাদেবীর নাম ও মন্দিরের পুরাণ-কথা। অবশ্য এটি ছাড়াও দেবীভাগবতে আরো একটি কাহিনী আছে তাঁর কাশীতে অধিষ্ঠান প্রসঙ্গে। খুব সংক্ষেপে সেটিও বলছি—

প্রাচীনকালে কোশল দেশের রাজকুমার সুদর্শন খুব অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পরে বিমাতার চক্রান্তে রাজ্য থেকে মায়ের সঙ্গে বিতাড়িত হয়ে চিত্রকূটের এক বনে চলে আসতে বাধ্য হয়। সেখানে সে মুনিদের আশ্রয়ে বড় হতে থাকে। পাঁচ বছর বয়সে সে দৈবকৃপায় একটি বিশেষ শক্তিবীজ মন্ত্র লাভ করে। অশেষ সৌভাগ্যবান শিশু দেবীর কৃপায় সেই মন্ত্র জপ করতে করতে এগার বছর বয়সে দেবীর দর্শন লাভ করে—"রক্তাম্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্বাঙ্গভূষণং গরুড়বাহনে সংস্থাং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্ভুতাম্।"—রক্তবসনা, রক্তবর্ণা, রক্তবর্ণের অলঙ্কারাদিতে ভূষিতা, গরুড়ের ওপর উপবিষ্টা, অদ্ভুত বৈষ্ণবীশক্তি দেবীর দেখা পায় রাজকুমার। সেই দেবী তাকে দিব্য অস্ত্রাদি দান করেন। কুমার বড় হতে থাকেন। কাশীরাজকন্যা শশিকলা লোকমুখে এই অদ্ভুত শক্তিধর দৈবকৃপাসম্পন্ন যুবকের কথা শুনে তাকে পতিরূপে পাওয়ার ইচ্ছায় দেবী ভগবতীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকে। ভক্তিমতী কন্যার প্রার্থনায় প্রসন্না দেবী তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার বরদান করেন। ইতিমধ্যে এক ব্যাধরাজা এসে সুদর্শনকে রাজকীয় বেশভূষা, রথ, অস্ত্রাদি উপঢৌকন দিল এবং তপোবনের মুনিরা তাকে আশীর্বাদ করে বললেন ঃ "তুমি অচিরেই তোমার হৃত রাজ্য ফিরে পাবে, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কতভাবে দেবী তোমাকে সাহায্য ও কৃপা করছেন।" এরপরে ঐ মন্ত্রজপের প্রভাবে সে মহা পরাক্রমশালী হয়ে উঠল। বহু শত্রু অনায়াসে নাশ করল। কারণ, "সম্প্রাপ্য সদ্গুরোর্বীজং কামরাজাখ্যমদ্ভুতম্ জপেৎ যস্তু শুচিঃ শান্তঃ সর্বান্ কামান্ অবাপ্নুয়াৎ।"—সৎগুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই অদ্ভুত কামরাজাখ্য মন্ত্র শান্ত ও পবিত্র চিত্তে জপ করার ফলে তার অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকবে না। দিব্য অস্ত্র লাভ করে দেবীর দিব্য প্রভাবে সে তখন সকলের অজেয় হয়ে উঠল।

এইসময় কাশীরাজ সুবাহু রাজকন্যা শশিকলার স্বয়ংবর-সভা আয়োজন করলে সুদর্শনও তার মাকে নিয়ে দিব্যরথ ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। শশিকলা দেবীর কাছে এই প্রার্থনাই জানিয়েছিল। অনেক রাজাদের মধ্যে উপস্থিত সুদর্শনকে দেখে শশিকলা তার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষকে চিনতে পেরে তাকেই বরমাল্য দিল। এতে অন্য রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শনকে আক্রমণ করলে স্বয়ং দেবী সেখানে আবির্ভূতা হলেন সুদর্শনকে রক্ষা করতে। "প্রাদুর্বভূব সহসা দেবী সিংহোপরিসংস্থিতা। নানায়ুধধরা রম্যা বরভূষণভূষিতা।/ দিব্যাম্বরপরিধানা মন্দারস্রকসুসজ্জিতা।।"—অপূর্ব অস্ত্রাদি-অলঙ্কারাদি সুসজ্জিতা দেবী এসে শত্রুনিধন করে সুদর্শনকে আশীর্বাদ করলেন। কাশীরাজ সুবাহু পরম ভক্তিভরে দেবীর বন্দনা করলে দেবী প্রসন্না হয়ে বর দিতে চাইলেন। রাজা বললেন ঃ "এই রাজ্য আমার জামাতা সুদর্শনকে দিতে চাই।" আর "নগরে অত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা।/ দুর্গাদেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা।।/ রক্ষাং ত্বয়া চ কর্তব্যা সর্বদা নগরস্য হ।"—হে জননী, এই আমার কাশী নগরীতে তুমি সদাসর্বদা বিরাজিতা থেকে নগর ও নগরবাসীকে রক্ষা করবে—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। দেবীও ভক্ত সুদর্শন ও রাজা সুবাহুর প্রার্থনায় প্রসন্না হয়ে বললেন ঃ "রাজন্ সদা নিবাসো মে মুক্তিপুর্য্যাং ভবিষ্যতি।/ রক্ষার্থং সর্বলোকানাং যাবৎ তিষ্ঠতিমেদিনী।।"—হে রাজন, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন আমি সকল প্রাণীকে রক্ষা

করব এবং স্বয়ং এই মুক্তিক্ষেত্র কাশীতে অবস্থান করব। তারপরে দেবী ভক্ত সুদর্শনকে তাঁর পূজাবিধি বলে দিলেন ঃ "শরৎকালে নবরাত্র বিধানে ভক্তিভাবে আমার পূজা করবে। চৈত্র ও আশ্বিনে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ও অষ্টমীতে বিশেষভাবে পূজা করবে।"

রাজা সুবাহু সুদর্শন ও কন্যাকে নিয়ে কাশীতে এসে "কাশ্যান্তদুর্গায়াঃ প্রতিমাং শুভাং কারয়িত্বা চ প্রাসাদং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ... পূজাং চক্রুঃ বিধানেন যথা বিশ্বেশ্বরস্য হ।"—দেবী দুর্গার প্রতিমা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবীর বিধানমত বিশ্বেশ্বর-সহ পূজার প্রচলন করলেন। আর "বিখ্যাতা সা বভূবাথ দুর্গা দেবী ধরাতলে"—পৃথিবীতে এইভাবে দুর্গাপূজার প্রচলন হলো।

কাশীর দুর্গার শৃঙ্গারবেশ আলোকচিত্র ঃ বিজয় শেঠ

দেবী দুর্গার এই উৎপত্তি ও নাম-কথা শোনানোর পরে আবার দুর্গাকুণ্ডের জলে আচমন করিয়ে পূজারীজী আমাদের দেবীর মন্দির পরিক্রমা করাতে নিয়ে চললেন। দুটি বেশ উঁচু লাল প্রাচীরে ঘেরা এই মন্দির। দুটি চত্বরের মধ্য চত্বরের মাঝখানে দেবী দুর্গার মন্দির। এই মন্দিরে উত্তর ভারতীয় শৈলীর সুন্দর নিদর্শন। মূল এগারটি চূড়া নিয়ে মোট একশ একটি ছোট-বড় চূড়া এই মন্দিরে আছে। এটি ১৭৫৩-১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলার নাটোরের মহারানী ভবানীর অর্থসাহায্যে পুনর্নির্মিত হয়। রাজস্থানী লাল পাথরে নির্মিত অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত এই মন্দির মূলত নদীয়ার ভাস্করদের তৈরি। সেই সময় এই মন্দির তৈরি করতে খরচ হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই মন্দির সম্পর্কে একটি প্রাচীন বাঙলা পুঁথি 'কাশী-পরিক্রমা'য় আছেঃ "কি কহিব রানীর মহিমা অনুপম।/ কাশীক্ষেত্রে খ্যাত অন্নপূর্ণা যাঁর নাম।।/ তাঁর এক কীর্তি দেখি দুর্গার মন্দির।/ একশত এক চূড়া গণনাতে স্থির।।/ পাষাণের খোদকারী কি কহিব সীমা।/ পঞ্চাশ হাজার ব্যয় যাহার গরিমা।।" রানী ভবানী এই দুর্গাকুণ্ড ও দুর্গামন্দির লাল পাথরে নতুন করে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কাশীতে আরো বহু মন্দির, কুণ্ড ও রাস্তা তৈরি করিয়েছিলেন।

দেবীর অগ্নিকোণে বামদিকে একটু উঁচু বেদিতে একটি ছোট ঘরের মধ্যে তিনটি মূর্তি আছে। একজন কাশীর অষ্ট ভৈরবের অন্যতম চণ্ডভৈরব, আরেকজন কাশীর ছাপান্ন বিনায়কের অন্যতম দুর্গা বিনায়ক। আর মন্দিরের নৈর্ঋত কোণে একটি ছোট অন্ধকার ঘরে উর্ধ্বমুখী লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী ভদ্রকালীর মূর্তি আছে। বাঁদিকে চত্বরের বাইরে কিছুটা খোলা জায়গায় আরো কিছু প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও মন্দির আছে।

এই অঞ্চল কাশীর একেবারে দক্ষিণপ্রান্ত। খুব বেশিদিন এদিকে লোকালয় হয়নি। ১৯১৮-তে রাইডার সাহেবের আঁকা ছবি ও ১৯২০-তে কঞ্চম্যান সাহেবের ম্যাপ ও ছবিতে এদিকে জঙ্গল, গাছপালাই বেশি দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে লোকালয় বেড়েছে। কাছেই সঙ্কটমোচন মহাবীরের মন্দির ও আধুনিক তুলসীমানস মন্দির হওয়ায় যাত্রিসমাবেশ বেড়েছে। আর লোকসমাগম বেশি হওয়ায় কাশী পুরসভা এইদিকে লোকালয় বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা পর্যন্ত।

পূজারীজী আমাদের জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। তাঁকে নমস্কার জানিয়ে মন্দির থেকে বেরবার সময় আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পরিব্রাজক জীবনে এই কাশীতে যখন আসেন তখন একদিন এই দুর্গামন্দিরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় এখানকার বিখ্যাত বাঁদরেরা তাঁকে তাড়া করে। ভয় পেয়ে তিনি যখন ছুটতে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ একজন সন্ন্যাসী তাঁর কাছে এসে বলেন ঃ "রুখ যাও, ডরো মৎ।" কথাটা তাঁর কাছে দৈববাণীর মতো মনে হলো। তিনি থেমে ফিরে দাঁড়ানো মাত্র বাঁদরেরা পালিয়ে গেল। পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেন, কোন কারণেই বিপদের মুখে পালিয়ে যেও না—"face the brutes"। বিপদই তাহলে ভয় পেয়ে পিছু হটবে। একথা মনে রেখে পরমাশক্তি দেবী দুর্গার চরণে আবার প্রণাম জানালাম—

"আরাধ্যাপরমাশক্তিঃ সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।/ নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ অধিকং ভুবনত্রয়ে।।/ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।/ পূজনীয়া পরাশক্তিঃ নির্গুণা সগুণাথ বা।।/ দুর্গসঙ্কট হন্ত্রীতি দুর্গেতি প্রথিতাভুবি।/ নমামি ত্বাং মহাদেবীং সৃষ্টস্থিত্যন্তকারিণী।।" ❑

লেখক শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

নিবিড় শ্যামল বনানী, ছায়াঘেরা পথ, শীতের নিথর জলপূর্ণ পুষ্করিণী, সারি সারি নারকেল আর সুপারির গাছ, উঠানভরা সোনার ধান, গাছে গাছে পাখির কলতান। এমনই এক মনোরম পরিবেশে শঙ্খধ্বনি হলো আনন্দমোহন ঘোষের গৃহে কৈলাসকামিনীর কোল আলো করে রাখাল—পরবর্তী কালের স্বামী ব্রহ্মানন্দ—এলেন ধরাধামে। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি। দেশে তখন ইংরেজ শাসন। চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার শিকড়া-কুলীনগ্রাম—ঘোষবংশের জমিদারী। কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র ষাট কিলোমিটার। টাকির জমিদার কালীনাথ মুনশির নামে—'কালীনাথ মুনশি রোড' (বর্তমানে 'টাকি রোড') ধরে মতি শা-র ঘোড়ার গাড়িতে বারাসত পর্যন্ত এসে সেখান থেকে রেলগাড়িতে শিয়ালদহ। এই ছিল সেইসময়ের যাতায়াতের মাধ্যম। অনেক পরে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মার্টিন কোম্পানীর বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে স্থাপিত হয়।

রাখালের পূর্বপুরুষ সদানন্দ ঘোষ আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলার বালীর সন্নিকটবর্তী আকনা থেকে বসিরহাটের নিকটবর্তী ট্যাটবার চৌধুরী পরিবারের জামাতারূপে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ বৃহৎ একটি জমিদারী লাভ করেন এবং ইছামতীর শাখা নদীর তীরে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে সেই জমিদারী তাঁর উত্তরপুরুষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কুলদেবতা শ্রীধর নারায়ণশিলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সদানন্দের সময়েই। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে এই বংশে প্রথম

স্বামী ব্রহ্মানন্দের বংশের দুর্গাপ্রতিমা আলোকচিত্র ঃ অরুণপ্রকাশ ঘোষ

দুর্গাপূজা শুরু হলো মাটির তৈরি আটচালায়। গোলপাতায় ছাওয়া—যা আনা হতো সুন্দরবন থেকে। পরে বংশের স্বনামধন্য জমিদার কালীপ্রসাদ ঘোষ ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে পাঁচখিলানযুক্ত সু-উচ্চ দু-মহলা দুর্গাদালান ও তার পাশে শ্রীধর নারায়ণশিলার পূজার জন্য বাড়ি নির্মাণ করেন। কিংবদন্তী আছে যে, এই দালান নির্মাণের সময় এক টাকায় যোল জন মজুর কাজ করত। দেশে তখন সিমেন্টের প্রচলন হয়নি, সেজন্য সমস্ত কাজ হয় চুন-সুরকি দিয়ে।

বংশের দুর্গাপূজার সেই ধারা আজো ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত আছে। ১৯৯৯ খ্রীস্টাব্দে এই পূজার ৩০০তম বর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। একচালের প্রতিমা। জন্মাষ্টমীতে 'কাঠাম-কাটা', প্রতিপদে ঘটস্থাপনা ও চণ্ডীপাঠ শুরু। দালানেই প্রতিমা নির্মাণ হয়। ৫০ বছর যাবৎ বলিদান প্রথা বন্ধ।

এই দুর্গাদালানের সামনের মাঠে রাখালের জন্য পাঠশালা স্থাপন করলেন আনন্দমোহন। প্রসন্ন সরকার নামে এক ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। বংশের অন্যান্যরাও রাখালের সহপাঠী হলো। সহপাঠীদের অন্যতম হলেন পঞ্চানন ঘোষ (বা পঞ্চানন পণ্ডিতমশাই)—যাঁর লেখা প্রবন্ধ স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহাবসানের পর 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়। দুর্গাদালানের অদূরে বেলগাছের নিচে বোধন-বেদিতে রাখাল 'পূজা' 'পূজা' খেলা করতেন এবং তৎসংলগ্ন করুণাময়ী-মন্দির প্রদক্ষিণ করতেন শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে। "কখনো-বা বালকগণ সহ মাটির কালীমূর্তি স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইসময় কখনো তিনি পুরোহিত হইয়া পূজা করিতেন, কেহ-বা কলার বা কচুর বেলা লইয়া বলি দিত, কখনো-বা তিনি কামার হইয়া বলি দিতেন, সঙ্গীদের মধ্যে কেহ পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিতেন।" দুর্গাপূজার দিনগুলিতে তিনি এই দুর্গাদালানে প্রতিমার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকতেন।

১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে কুলদেবী করুণাময়ীর নতুন মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয় এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী অকুণ্ঠানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ ও স্বামী গহনানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। ১৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে করুণাময়ী-মন্দির সংলগ্ন রাখালের প্রিয় বোধন-বেদিও নবনির্মিত হয়েছে। নিজেদের জমিদারীতে দিগন্ত-বিস্তৃত দক্ষিণ মাঠে পীরের দরগায় বালক রাখাল ফকির শ্রেণীর প্রজাবর্গের নিকট যাতায়াত করতেন।

পাঠশালার পড়াশুনা শেষ হলে রাখালকে কলকাতায় আনা হয় ইংরেজী শিক্ষার জন্য এবং ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ভর্তি করা হয় ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে।

পরবর্তী জীবনে ভুবনেশ্বর মঠ স্থাপনের সময় জ্ঞাতিভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে রাজা মহারাজের যোগাযোগ হয়। উপেন্দ্রনাথ বালেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ছিলেন। মহারাজের নির্দেশে ভুবনেশ্বর মঠের প্রধান ফটকের বিপরীতে বাড়ি তৈরি করলেন উপেন, নাম হলো 'আশিস'। উপেন্দ্রের কাছে তিনি জন্মভূমির দুর্গাপূজা ও দুর্গাদালানের খোঁজ নিয়ে বললেন ঃ "জানিস উপেন, তোদের ঐ দালানে যেখানে দুইশত বছরের উর্ধ্বে দুর্গাপূজা হচ্ছে, সে-স্থান পীঠস্থান।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের দেহাবসানের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী ও স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের শিষ্য বসিরহাটের দ্বিতীয় মুনসেফ পশুপতি মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও আমন্ত্রণে বসিরহাটে এক মহতী সভায় রাজা মহারাজের জন্মস্থানে একটি স্মৃতিমন্দির স্থাপনের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন সভার সভাপতি স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ এবং কলকাতায় ফেরার পথে শিকড়াতে নেমে একটি রূপার টাকা দান করে 'মন্দিরনির্মাণ তহবিল'-এর সূচনা করেন। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে 'ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি মন্দির'-এর ভিত্তিস্থাপনের সময় ঐ টাকা উপযুক্ত আধারে মাটির নিচে প্রোথিত করে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন স্বামী সংশুদ্ধানন্দ মহারাজ। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে সংগঠিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রম'-এর (মন্দিরের) উদ্বোধন করেন স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ। ১৫ জুলাই ১৯৮৮ বেলুড় মঠের হাতে আশ্রম পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে একবার মণি মল্লিককে বলেছিলেন ঃ "দেখ, রাখাল বলছিল ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করিণী কাটাও না কেন? তাহলে কত লোকের উপকার হয়। তোমার তো অনেক টাকা আছে। অত টাকা নিয়ে কি করবে?" সেই পুষ্করিণী অবশ্য কাটা হয়নি। তবে ১১০ বছর পরে ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে একটি গভীর নলকূপ স্থাপিত হয়ে গ্রামের জলকষ্ট দূর হয়েছে।

স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ পরম আগ্রহে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে যে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, তারই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মভূমি আজ পৃথিবীর এক মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। ❑

তথ্যসূত্র ঃ

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম
২। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শিকড়া-কুলীনগ্রাম—অরুণপ্রকাশ ঘোষ
৩। Sri Ramakrishna Brahmananda Ashrama Souvenir. 1991
৪। Census of Bengal, 1881, Vol. III
৫। লেখককে লেখা স্বামী অপূর্বানন্দ মহারাজের পত্র
৬। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ থেকে আশ্বিন (১৩২৯)।
৭। শ্রীশ্রীকরুণাময়ী মন্দিরের ইতিবৃত্ত—সুনীলকুমার ঘোষ ও রণজিৎকুমার ঘোষ।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য একটি প্রাচীন পারিবারিক দুর্গোৎসব

সপ্তর্ষি ঘোষ

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ দুর্গাপূজার চারদিন মহানন্দে অতিবাহিত করতেন। এই কয়দিন তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যেত। তিনি কলকাতায় অনেক গৃহিভক্তের বাড়ির দুর্গাপূজায় উপস্থিত থেকেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য একটি পূজা আজও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। সেটি হলো—উত্তর কলকাতার বেনিয়াটোলা স্ট্রীটে ঠাকুরের অন্যতম গৃহিভক্ত অধরলাল সেনের বাড়ির দুর্গাপূজা। ১৮৬১ সালে পূজার সূচনা করেন অধরলাল সেনের পিতা রামগোপাল সেন। সেই থেকে ১৩৮ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে পূজাটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ সাল—পর পর দুই বছর ঠাকুর অধরের বাড়ির পূজায় উপস্থিত থেকেছেন। সেই বর্ণনায় যাওয়ার আগে অধরলাল সেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেওয়া যাক।

১৮৫৫ সালের ২ মার্চ কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক পরিবারে অধরলাল সেন জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র বার বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অধরলাল সুকবি ও সুলেখক ছিলেন। ইংরেজী

অধরলাল সেনের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা আলোকচিত্র : পরিবারের সৌজন্যে প্রাপ্ত

ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। অধরের বয়স যখন আঠাশ বছর, সেইসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ধর্মপিপাসা এইসময় প্রবল হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর জীবন ধর্মপথে প্রবাহিত হয়। অধরের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবার ভক্তদের সঙ্গে শুভাগমন করেছেন। বাড়ির বৈঠকখানা এবং ঠাকুরদালান বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের কীর্তনে মুখরিত হয়েছে। ঠাকুর অধরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি অধরকে বলেছিলেন ঃ "তুমি আমার আত্মীয়।" ('কথামৃত', ২য় ভাগ, পৃঃ ৪২) ১৮৮৩ সালের ৮ এপ্রিল অধরলাল এক বন্ধুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে যান। এর একুশ মাস পরে ১৮৮৫ সালের ১৪ জানুয়ারি মাত্র ৩০ বছর বয়সে ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হয়ে অধরলাল পরলোকগমন করেন। অধরের মৃত্যুসংবাদ শুনে ঠাকুর অনেকক্ষণ মা ভবতারিণীর কাছে কেঁদেছিলেন।

১৮৮৩ সালের ১০ অক্টোবর। ২৪ আশ্বিন ১২৯২ বঙ্গাব্দ। বুধবার। দুর্গাপূজার মহানবমী। ঠাকুর এসেছেন অধরের বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করতে। সেই দিনের একটা জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় 'কথামৃত'-এ। ঠাকুরের সঙ্গে অনেক ভক্তও এসেছেন। অধরলাল পূজা উপলক্ষ্যে প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁরাও অনেকেই এসেছেন।

সায়ংকাল। দেবী দুর্গার সন্ধ্যারতি হচ্ছে মহাসমারোহে। শাঁখ, ঘণ্টা, ঢাকের প্রাণমাতানো শব্দ, ধূপধুনোর গন্ধ, আলোর সজ্জা—সব মিলিয়ে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে মা দুর্গা যেন চিন্ময়ীমূর্তিতে আবির্ভূতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদালানে দাঁড়িয়ে আরতি দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন। উপস্থিত ভক্তরা একইসঙ্গে মা দুর্গার আরতি এবং দিব্যদর্শন ঠাকুরকে দেখে মুগ্ধ ও বিমোহিত। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর একসময় জগন্মাতার দিকে তাকিয়ে স্বর্গীয় কণ্ঠে গান শুরু করেছেন। অধর গৃহিভক্ত, আবার অনেক গৃহিভক্ত সেখানে উপস্থিত—যারা সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় নিত্য জর্জরিত, তাই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মঙ্গলকামনায় জগজ্জননীর স্তবগান করছেন—

"তারতারিণী। এবার তারো ত্বরিত করিয়ে
তপন-তনয়-ত্রাণে ত্রাসিত, যায় মা প্রাণী।।
জগত অম্বে জন-পালিনী জন-মোহিনী জগত-জননী।।..."

শ্রীরামকৃষ্ণের স্তবগান সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছে। সবাই মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছেন ঠাকুরের দিকে। তিনি যেন ভাবাবেশে জগজ্জননীর সঙ্গে কথা বলছেন! গান শেষ হলে তিনি অধরের বাড়ির দোতলার বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। তাঁকে দেখতে ও প্রণাম করতে অনেক মানুষ সেখানে ভিড় করেছেন। ঠাকুর তখনো বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ "ও বাবুরা, আমি খেয়েছি, এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও।"

কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নিজেই প্রশ্ন করেছেন—অধরের পূজা মা গ্রহণ করেছেন। তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার আবেশে বলছেন ঃ "আমি খেয়েছি, এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও"? ঠাকুর জগন্মাতাকে ভাবাবিষ্ট হয়ে বলছেন ঃ "মা আমি খাব, না তুমি খাবে? মা কারণানন্দরূপিণী।" শ্রীরামকৃষ্ণ কি জগন্মাতা ও নিজেকে এক দেখছেন? যিনি মা তিনিই কি সন্তানরূপে লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন? তাই কি ঠাকুর "আমি খেয়েছি" বলছেন?

এবার ১৮৪৪ সালের দুর্গাপূজার কথা আমরা স্মরণ করব। ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ছিল দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী। সেবার সপ্তমীপূজা দুদিন পড়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় এসেছেন প্রতিমাদর্শন করতে। সঙ্গে অনেক ভক্ত আছেন। সপ্তমীর দিন তিনি অধরলাল সেনের বাড়ি গিয়েছিলেন প্রতিমা দর্শন করতে। এ-বাড়িতে তাঁর তিনদিনই নিমন্ত্রণ। অধর বিশেষভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ির পূজায় ঠাকুরকে তিনদিনই উপস্থিত থাকতে হবে, তবেই তাঁর পূজা সার্থক হবে। ভক্তের এই কাতর প্রার্থনা ঠাকুর উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই ২৮ সেপ্টেম্বর রবিবার মহাষ্টমীর দিন পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-পরিবৃত হয়ে অধরের বাড়িতে গেলেন প্রতিমা দর্শন করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য এই পূজা আজো উত্তর কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে ৯৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রীটের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অধরলাল অপুত্রক ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্ররা বর্তমানে পূজার আয়োজন করেন। ১৯২৫ সাল থেকে পূজাটি দুই শরিকের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি দুই বাড়িতে দুটো পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রথের দিন প্রতিমার 'কাঠাম' পূজা হয়। দেবীর বোধন হয় মহালয়ার পরদিন প্রতিপদে। সেদিন থেকেই পূজা, চণ্ডীপাঠ, আরতি প্রভৃতি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সপ্তমীর দিন সকালে নবপত্রিকার স্নানের পর মাতৃপ্রতিমার সামনে মঙ্গলঘট স্থাপন করে ও চক্ষুদান পর্ব সমাধা করে পূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আগের মতো জাঁকজমকের আধিক্য না থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য এই দুর্গাপূজা আজো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে। ❑

তথ্যসূত্র ঃ

১। কলকাতার দুর্গাপূজায় শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রণবেশ চক্রবর্তী, শারদীয় নবকল্লোল, ১৪০০
২। সুবর্ণবনিক কথা ও কাহিনী—নরেন্দ্রনাথ লাহা, ২য় খণ্ড
৩। চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর দুটি দুর্গোৎসব

শ্যামলী মহাপাত্র

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে নববিকশিত ধনী বাঙালীসমাজ গড়ে উঠেছিল, তারা নানাবিধ পূজা-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসবে বিপুল আয়োজন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও রচনায় বিচ্ছিন্নভাবে সেসব উপকরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'তেও পূজা উপলক্ষ্যে অপরিমিত ব্যয়বহুল বিলাসের কথা উল্লেখ আছে। বস্তুত, পূজাকে কেন্দ্র করে সেইসময় ধনী সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হতো। ব্যয়বহুল বিলাসী পূজা ধনাঢ্যদের মধ্যে একটি 'ফ্যাশন' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূজা-পার্বণে যিনি যত বেশি খরচ করতে পারতেন সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি তত বেশি হতো।

রানী রাসমণির বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা আলোকচিত্র ঃ শ্যামলী মহাপাত্র

সেই সময়কার পারিবারিক পূজাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল—জানবাজারের রানী রাসমণির পূজা, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব-এর পূজা, বড়বাজারের মল্লিকবাড়ির পূজা, বাগবাজারের পশুপতি বোস-এর পূজা, চিৎপুরের মহারাজা ঠাকুরবাড়ির পূজা এবং সুকিয়া স্ট্রীটের কৈলাস বোস-এর পূজা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশেষত দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যেই এইসব ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো।

জানবাজারের রানী রাসমণির পূজা সম্ভবত প্রীতরাম দাসের সময়ই শুরু। প্রবোধ সাঁতরার তথ্যানুযায়ী ১৮১৩ থেকে ১৮২০-র মধ্যেই জানবাজারের প্রাসাদোপম বাড়িটি তৈরি করেছিলেন রাসমণির শ্বশুর প্রীতরাম এবং সেই বাড়িতেই তিনি প্রথম দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। তবে তাঁর পুত্র রাজচন্দ্র দাসের সময় থেকেই পূজার জাঁকজমক বৃদ্ধি পায় এবং রানী রাসমণির আমলে পূজার জলুস বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পায় নামডাকও।

পরবর্তী কালে রানীর বংশধররা দাস, চৌধুরী ও বিশ্বাস (হাজরা)—এই তিন পরিবার আলাদা করে পূজার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অতীতের ৭১নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে (বর্তমানে ১৩নং রাসমণি রোড) মথুরামোহনের প্রপৌত্র ব্রজগোপাল বিশ্বাসের দৌহিত্র হাজরাদের পূজাই রানীকুঠির আদি পূজা। প্রীতরামের সময় থেকে নির্দিষ্ট একই ঠাকুরদালানে একই বেদিতে এই পূজা হয়। রথের দিন কাঠামপূজার পর ঐ ঠাকুরদালানেই প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়ে আসছে প্রীতরামের সময় থেকে। তাঁর সময় থেকেই বর্ধমান জেলার আহমেদপুর থেকে পটুয়ারা রানীকুঠিতে আসে প্রতিমা গড়তে। বর্ধমান থেকে মালাকাররা আসে প্রতিমাকে শোলার সাজে সাজাতে এবং সেই প্রায় দুশ বছর ধরে ঠাকুরদালান, মন্দির-চত্বর ও গোটা উঠান এই দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে রঙ করা ও সাজানো হয়।

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ-মতেই রাসমণির বাড়ির দুর্গাপূজা হয়। মহালয়ার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকেই পূজা শুরু হয়। এই দিন থেকে ষষ্ঠীর আগের দিন পর্যন্ত পূজাকে প্রতিপদাদি কল্প বলা হয়। ষষ্ঠীর দিন অধিবাস ও বোধন হয়। উনিশ শতক থেকেই রাসমণির বাড়ির পূজায় কয়েকটি বিশেষ বিধি চলে আসছে। যেমন, প্রতিদিন বৃহৎ পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা। অর্থাৎ দুর্গামন্ত্র জপের সঙ্গে চলে চণ্ডীপাঠ, মধুসূদন মন্ত্র জপ, পার্থিব শিবপূজা ও ১০৮টি তুলসী দান। আগে পাঁচজন পূজারী ব্রাহ্মণ খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করতেন। এখনো তা যথাসম্ভব বর্তমান।

অতীতে পাঁচ দিনে একটি মোষ ও ছয়টি পাঁঠা বলি দেওয়া হতো। এখন মোট সাতটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। আগে প্রতিদিন কুমারীপূজা হতো। আজো এই নিয়ম অব্যাহত। রাসমণি ব্রতী ব্রাহ্মণদের বেনারসী জোড় ও কুমারীদের বেনারসী শাড়ি দিতেন। বাড়ির সবাইকে নতুন জামা, কাপড়, ধুতি, শাড়ি দেওয়া হতো। তাঁর সময়ে এই দান বাবদ বাইশ-তেইশ হাজার টাকা খরচ হতো। প্রতিমার শাড়ি বাবদ খরচ হতো দশহাজার টাকা। পাঁচশ থেকে সাতশ সধবাকে রানী শাঁখা-সিঁদুর দিতেন। অতীতের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতিমা ঠিক আগের মাপেই হয়। আরতির সময় ঠাকুরদালানের একদিকে পুরুষ এবং অন্যদিকে মহিলাদের বসার রীতি আজো বহাল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মহিলাদের দলেই সখীবেশে প্রতিমাকে চামর দিয়ে হাওয়া করেছিলেন এবং তাঁর ঐ ছদ্মবেশী রূপ মথুরামোহনের চোখেও ধরা পড়েনি।

পূজার কয়দিন উঠান-চত্বর জুড়ে চলত যাত্রা ও পালাগান। দাশু রায় ও গোবিন্দ অধিকারীর মতো রথী-মহারথীরা আসতেন পালাগান গাইতে। কোন কোন বছর এই পালাগান পূজার পরও চলত সাত-আট দিন ধরে। বিজয়া দশমীর দিন বিভিন্ন জায়গা থেকে কুস্তিগীররা আসত কুস্তি লড়তে। বিজয়ী কুস্তিগীরকে দুশ

টাকা ও পরাজিতকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হতো। বিসর্জনের আগে প্রতিমাকে নিয়ে নৌকাবিলাস হতো। কিন্তু ১৯৬৭-তে নৌকাডুবির পর থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়।

রাজচন্দ্রের সময় থেকেই প্রতিমাকে নিয়ে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা বেরত। শোনা যায়, রানীর সময় একবার তদানীন্তন ইংরেজ সরকার এই শোভাযাত্রায় বাদ সাধেন। বন্দুক উঁচিয়ে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল শোভাযাত্রা বন্ধ করতে। কিন্তু রানী হুমকিকে তোয়াক্কা করেননি। তাঁর পেয়াদারা লাঠি দেখিয়ে রানীর নির্দেশমতো আরো জাঁকজমক সহকারে শোভাযাত্রা বহাল রেখেছিল। ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করায় পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়। রানী তার প্রতিবাদস্বরূপ জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত পুরো বাবুরোড বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে ঐ রাস্তা দিয়ে কোন ইংরেজ যেতে না পারে। তাতে ইংরেজরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় এবং জরিমানার পঞ্চাশ টাকাও রানী ফেরত পান।

কুমারীপূজা ছাড়াও রানীর সময় একহাজার থেকে বারশ কুমারীকে রানী শাড়ি ও পারিতোষিক দিতেন। অতিথি-অভ্যাগতদের যথাসম্ভব আদর-আপ্যায়ন করার ব্যবস্থা ছিল এবং নবমীর দিন বড় ভোজের ব্যবস্থা হতো। রানীর সময় এই দুর্গোৎসবের খরচ গিয়ে দাঁড়াত পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা। ঢাক-ঢোল-কাঁসি-শঙ্খ—এইসব বাদ্যবাজনার মধ্য দিয়েই অতীতের মতো এখনো উৎসব অতিবাহিত হয়। কথিত আছে, পূর্ববঙ্গের নাটোরের রানী ভবানীর দুর্গাপূজার মতো সমমর্যাদাপূর্ণ রানী রাসমণির দুর্গাপূজা।

রানী রাসমণির দুর্গাপূজার একটি মাহাত্ম্য ছিল। সেইসময় হাজার ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও বাড়ির কারো কোন ক্ষতি হতো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। সেবার পূজার সময় চার বছরের একটি দুরন্ত ছেলে দোতলার ছাদ থেকে চাতালে পড়ে যায়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়ে থাকায় বাড়ির সবাই যখন তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ধরে নিয়েছিল, তখন হঠাৎ ছেলেটি সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসেছিল। বলেছিল, তার কোথাও কিছু লাগেনি, কে যেন তাকে ধরে নিয়েছিল এবং ডাক্তারও তাকে পরীক্ষা করে দেখেছিল, শরীরের বাইরে বা ভিতরে কোথাও কোন পড়ে যাওয়ার চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না।

✸

উনিশ শতকে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু। পুরনো সুকিয়া স্ট্রীট—বর্তমানের কৈলাস বসু স্ট্রীটে তাঁর বাড়ি 'কৈলাসভবন'-এ ১৮৮০ থেকে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা শুরু করেন। তাঁর বাড়ির প্রতিমার বৈশিষ্ট্য একচালে সর্বসুন্দরী দুর্গাপ্রতিমা এবং কৈলাস বসুই প্রথম কলকাতায় এই প্রতিমাপূজা চালু করেন। এই সর্বসুন্দরী প্রতিমার বৈশিষ্ট্য—সামনে বা পিছনে যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন, সমস্ত দিক থেকেই দুর্গাপ্রতিমা সুন্দরভাবে দৃশ্যমান হয়। তাই প্রতিমার পিছন দিক দরমা দিয়ে ঢাকা থাকে না। সুন্দর করে রঙ করা হয় সামনের মতোই। চালচিত্রটিও একইভাবে সামনে ও পিছনে রঙ করা হয়। কিছুদিন আগেও বারটি থাম, থামের ওপর কার্নিশ এবং বেদি সমস্তই সাইজ করা রঙবেরঙের কাচ দিয়ে ঢাকা হতো সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য। এখনো তার অনেকাংশ বহাল আছে। প্রতিমার সাজসজ্জার সমস্তই সলমা চুমকি আর বুলেনের কাজ। বিশিষ্ট কারিগর দিয়ে সেগুলি তৈরি করানো হতো। দুর্গার মুকুটের কলকাতেও বিশেষত্ব আছে। আগে অঢেল গহনায় দেবীমূর্তিকে সাজানো হতো। এখন বিসর্জনের সময় সমস্যা দেখা দেওয়ায় তার অনেকাংশই কমানো হয়েছে।

কৈলাস বসুর বাড়ির দুর্গাপূজার জাঁকজমক সম্পর্কে তখনকার বিভিন্ন নথিপত্র ও পত্রিকা থেকে নানা তথ্য পাওয়া যায়। কৈলাস বসুর আমলে বাড়ির সাতটি উঠানে সাত রকমের আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা থাকত। কোথাও গহরজান বাঈজীর নাচ, কোথাও নুরজাহান বাঈজীর নাচ, কোথাও চিত্তরঞ্জনের কমিক্স, কোন উঠানে বিল্বমঙ্গল অভিনয়, আবার কোন উঠানে চণ্ডীর গান বা কোন উঠানে শীতলা মায়ের যাত্রাও হতো।

পূজা উপলক্ষ্যে লোক খাওয়ানোরও বিরাম ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে নিমন্ত্রণ করা হতো লোকজনকে। রাত তিনটে-সাড়ে তিনটে পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া চলত। পুরনো খাতা খুঁজে দেখা যায়, তখন লোক খাওয়াতে দৈনিক তিন মন পান্তুয়া, তিন মন দরবেশ, দুই মন গজা ও এক মন রাবড়ি লাগত। এইরকম খাওয়া-দাওয়া শুধু যে পূজার কয়দিন হতো তা নয়, পূজার আগে থেকেই এই ভোজ শুরু হতো।

উত্তর কলকাতার উনবিংশ শতকের পূজার ওপর 'পাইওনিয়ার মেল' ৫ অক্টোবর ১৯০০ তে একটি পর্যালোচনা প্রকাশ করে। তাতে উল্লেখ ছিল এই ধনী পরিবারগুলির দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ব্যয়ের আতিশয্য ও প্রতিযোগিতার কথা। ১৩৮০ সালে প্রকাশিত নীরদ বসুর 'উনবিংশ শতকের পূজার জৌলুস' নিবন্ধে কৈলাস বসুর বাড়ির পূজার বিবরণ থেকে জানা যায় এই এলাহি ব্যবস্থার কথা। ঐ নিবন্ধে উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত আছে, এই পূজার কয়দিন খাওয়া-দাওয়ার জন্য নুনই লাগত এক মন!

পূজার অঙ্গনে বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরির অবশিষ্টাংশ আগের মতো আজো দেখা যায়। দেখা যায় প্রতিমার আশপাশে বহু দেবদেবীর তৈলচিত্রও। কৈলাস বসুর প্রপৌত্র বলাইচাঁদ বসু বর্তমানে যে পূজা করেন তা একরকম ঘরোয়াই বলা যায়। একতলার ঠাকুরদালানে এখন আর পূজা হয় না। দোতলার পাঠঘরের সামনে দুর্গাঘরে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে আগের বিধিনিয়মেই যথাসম্ভব সব ঐতিহ্যকে বজায় রেখে পূজা হয়। মহালয়ার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকেই পূজা শুরু হয়। ষষ্ঠীর দিন বোধন ও অধিবাস। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে অতীতের প্রথানুযায়ী সর্বতীর্থের জলে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খে দেবীর মহাস্নান হয়। সুকুমার রায় ও সহশিল্পিবৃন্দ পূজাপ্রাঙ্গণে পূর্বে ভক্তিগীতি করে গেছেন। এখন চলে নানান পাঠ-আলোচনা।

কৈলাস বসুর পূজা সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি আছে। সারাবছর তেলে মশাল ভেজানো থাকত। কারণ, সেবায়েতদের মতে, ঠিক সন্ধিপূজার মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে সমস্ত

বাতিদান অর্থাৎ গ্যাস আলোগুলো নিভে যেত। সেই নিকষ-কালো অন্ধকারে বাড়ির পাশের বেলগাছ থেকে নাকি এক ব্রহ্মদৈত্য নামতেন ছাদের পাশের সিঁড়ি বেয়ে। তাঁর খড়মের শব্দও নাকি শোনা যেত। কোন অবয়ব চোখে পড়ত না। শুধু লাল গেরুয়া, রুদ্রাক্ষের মালা এবং কমণ্ডলু আবছাভাবে দেখা যেত। তিনি যতক্ষণ ঐখানে থাকতেন, পূজামণ্ডপে ঐ মশালগুলো ততক্ষণ জ্বেলে রাখা হতো। তিনিই প্রথম 'কালী করালবদনা' বলে মন্ত্র শুরু করতেন। পুরোহিত সেই মন্ত্র উচ্চারণ করার পর আচমকা আবার ঝড় তুলে তিনি চলে যেতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্যাস আলোগুলোও সবাইকে অবাক করে জ্বলে উঠত। খড়মের শব্দও সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে মিলিয়ে যেত।

কৈলাসভবনের দুর্গাপ্রতিমা আলোকচিত্র : শ্যামলী মহাপাত্র

এই রোমহর্ষকর ঘটনার যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁদের মতে (বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে জানা যায়), পূজার পুরোহিত নাকি তখন অসম্ভব কাঁপতে কাঁপতে এক ঘোরের মাথায় মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। জ্বলে ওঠা গ্যাস আলোয় দেখা যেত তাঁর ক্লান্ত শরীরটা ঘামে ভিজে গেছে।

এখন সন্ধিপূজার সময় ব্রহ্মদৈত্য আসেন কিনা বলা যায় না, তবে বলাইচাঁদ বসুর মতে—সন্ধিপূজার জন্য দেবীর সামনে যে স্বল্প পরিসরটুকুতে ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয় সেই স্থানটির ওপর দিকটা হঠাৎ কালো কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় ভরে যায় এবং সন্ধিপূজা শেষ হওয়া মাত্র কে যেন সজোরে একটা দ্বারঘট উলটে চলে যান। দ্বারঘট অকারণে অলৌকিকভাবে উলটে যাওয়ার ঘটনা দেখতে এখনো সন্ধিপূজার সময় দর্শকদের ভিড় হয়।

ঢাক-ঢোল-কাঁসি-শঙ্খ ছাড়াও কৈলাসভবনে সন্ধিপূজার সময় চীনা 'গং' বাজানো হয়। পাঁচ ফুট ব্যাসের বিশাল পিতলের কানা-উঁচু থালার মাঝখানে ষোল ইঞ্চি ব্যাসের গম্বুজাকৃতি জায়গায় মোটা লাঠি দিয়ে বাজানো শুরু করেন বাড়ির কর্তা। চার-পাঁচ জন যাঁরা 'গং'টি ধরে থাকেন তাঁরাই তারপর বাজিয়ে চলেন সন্ধিপূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। এই রেওয়াজ চলে আসছে কৈলাসচন্দ্র বসুর সময় থেকেই।

এই 'গং' বাজানো নিয়েও একটা অলৌকিক ঘটনা আছে। প্রত্যক্ষদর্শী বলাইচাঁদ বসুর বাবা চণ্ডীচরণ বসু (গুণ্ডা বোস) তাঁর জ্ঞাতিদের অনুরোধে একবার 'গং' বাজানো বন্ধ রাখেন। 'গং'-এর বিকট আওয়াজে অসুবিধার কথা ভেবেই সন্ধিপূজার সময় 'গং'টি বের করাননি। অথচ সন্ধিপূজা শুরু হওয়া মাত্র যে-ঘরে 'গং'টি ছিল সেই ঘর থেকে 'গং' বাজানোর শব্দ শোনা যায়। ঘরটির সামনে যেতেই সবাই অবাক চোখে দেখে যে, ঘরের জানলার ধারে 'গং'টি আপনা-আপনি দাঁড়িয়ে পড়ে আপনা থেকেই বেজে চলেছে! সেই থেকে কোনদিন আর সন্ধিপূজার সময় 'গং' বাজানো বন্ধ হয়নি।

বিজয়ার দিন আহিরিটোলা ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়। আগে লরিতে প্রতিমা সাজিয়ে পদযাত্রা করে বিভিন্ন পথ ধরে যাওয়া হতো। এখন অত সমারোহ আর হয় না। বিজয়ার পর প্রথম রবিবার বিজয়া সম্মেলন আজো আগের মতো অব্যাহত। আগের হিসেবেই এই ব্যয়বহুল দুর্গোৎসবের খরচ হতো দশ-বার হাজার টাকা। এখন অনেক খরচ কমিয়েও কম করে বিশ হাজারে দাঁড়ায়। পূজার কাজকর্ম করার জন্য কয়দিন বাড়তি বিশজন কাজের লোক রাখা হতো। এখনো প্রায় ঐরকমই বহাল আছে। আসলে কৈলাসভবনের সর্বসুন্দরী দেবীকে এখনো বাড়িতে তৈরি মিষ্টিই ভোগ দেওয়া হয়।

বর্তমানে পারিবারিক পূজাগুলির জলুস অনেকাংশে কমে গেলেও অতীতের ঐতিহ্যকে যথাসম্ভব রক্ষা করার দায় এখনো বোধহয় এড়াতে পারেন না গৃহকর্তারা, এমনকি বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও। যদিও প্রতিযোগিতার মনোভাব বা চেষ্টা পারিবারিক পূজাগুলিতে একদম নেই বললেই চলে। বারোয়ারি পূজাগুলিই এখন নেমেছে শুধু প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে এবং এই লড়াইয়ের ধারাটাও যে অন্যরকম তাও সর্বজনবিদিত।

কাল পেরিয়ে মহাকাল এসেছে। পৃথিবীর অন্য সব জাতির সঙ্গে আমরা বাঙালীরাও এগিয়েছি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সাহিত্য-সৃষ্টি সবেতেই আমাদের অগ্রগতি। তবুও কে বলবে, বাঙালী ভুলেছে তার অতীতকে! আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন বাঙালী আজো তার সংস্কার, বংশমর্যাদা ও বনেদিয়ানাকে নিবিড় করে জড়িয়ে রেখেছে। নানান সমস্যার মধ্যেও অকুণ্ঠ চিত্তে আজো গড়াগড়ি দিচ্ছে দেবদেবীর শ্রীচরণকমলে এবং একই নিয়মে ও ধারায় চলে আসছে দুর্গাপূজার সমারোহ। হয়তো আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক পূজাগুলি ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়ছে বারোয়ারি পূজার থেকে, তবুও বলতে হয় তুলনায় এই পারিবারিক পূজাগুলিই এখনো সত্যিকারের সংস্কার ও ঐতিহ্যকে এবং বাঙালীয়ানাকে বজায় রেখে চলেছে। ❑

প্রেসিডেন্সি কলেজ ও এক ঔপনিবেশিক চক্রান্ত : ১৯০৪-১৯০৭

উদয়ন মিত্র

প্রাক্-কথন

মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ নিয়ে কাজ করার সময় হঠাৎই হাতে আসে প্রেসিডেন্সি ও রাঁচি কলেজ সংক্রান্ত অভিনব কিছু নথিপত্র। প্রাক্ বঙ্গভঙ্গ কালে প্রেসিডেন্সি কলেজকে ঘিরে যে ঔপনিবেশিক চক্রান্ত শুরু হয়েছিল ঐ সমস্ত দলিলপত্রে তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। কার্জন সরকারের এই চক্রান্তের প্রমাণ পাওয়া যায় : (১) প্রেসিডেন্সির বিকল্প হিসেবে সুদূর রাঁচিতে এক আদর্শ কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায়[1] এবং (২) উন্নয়নের প্রশ্নে এই কলেজকে শহর কলকাতার অন্যত্র সরিয়ে এনে এক আবাসিক কলেজে উন্নীত করার প্রচেষ্টায়।[2] তথাকথিত আদর্শ কলেজ আর উন্নয়নের আছিলায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো এই প্রতিষ্ঠানকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা এবং পরে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা থেকে পিছিয়ে এসে শহর কলকাতার আশপাশে কোথাও প্রেসিডেন্সিকে সরিয়ে এনে আবাসিক কলেজে রূপান্তরের নামে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের এক নিখুঁত জাল বোনা হয় বঙ্গভঙ্গের সময়ে। অনায়াসে বলা চলে, বঙ্গভঙ্গের ছক রচনার পাশাপাশি প্রেসিডেন্সির ওপর বড় রকমের আঘাত হেনে কার্জন সরকার বাঙালী সমাজকে অনিবার্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক অহঙ্কারের আধার (ঔপনিবেশিক বদান্যতায় উন্নতি করলেও) প্রেসিডেন্সি কলেজের গুরুত্ব হ্রাস করতে সরকারের কোন চাতুরীর অভাব ছিল না। বলতে বাধা নেই, বড়লাট লর্ড কার্জনের হাতে দায়িত্ব ছিল বঙ্গভঙ্গের, আর প্রেসিডেন্সি ঘিরে চক্রান্ত করেছিলেন ছোটলাট এন্ড্রুজ ফ্রেজার। বস্তুত, উভয়ের হাতে ভার ছিল বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ঐক্য ধ্বংস করা। সাময়িক কালের জন্য হলেও কার্জন সফল হন, ফ্রেজার নন।

আলোচ্য নিবন্ধে প্রস্তাবিত রাঁচি আদর্শ কলেজ এবং প্রেসিডেন্সির স্থান ও চরিত্র বদল নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং দেখা যাবে ধাপে ধাপে সরকার কিভাবে এই কলেজকে ঘিরে এক বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করা হবে। আমরা এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত অর্থাৎ রাঁচি কলেজের প্রস্তাবনা থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থানিক পরিবর্তন সংক্রান্ত সরকারি ঘোষণা পর্যন্ত। ১৯০৭-এর পরেও এই কলেজের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে—যা ঘটনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা এক ঝলক দেখে নেব ১৯০৪-এর সূচনায় প্রেসিডেন্সির হাল-হকিকৎ। এই সময়ের মধ্যে এই কলেজ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। অথচ প্রয়োজনীয় স্থানের অভাবে, শিক্ষকের অভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশেষ করে এর বিজ্ঞান-গবেষণা সেই উচ্চতায় যেতে পারেনি যেখানে যাওয়ার দরকার ছিল। ১৮৯৭-তে লন্ডনের কয়েকজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী খোদ ভারতসচিবের কাছে এবিষয়ে আর্জি রেখেছিলেন। বাংলা সরকারও এবিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিল।[3] কিন্তু সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে সরকারি দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল।

রাঁচিতে আদর্শ কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব : চক্রান্তের সূচনা ?

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ ঘিরে শিক্ষা-বিভাগের চক্রান্তের উৎসমুখে যাওয়ার আগে আমাদের দেখা উচিত এই সময়ে ভাইসরয়ের কার্যকলাপ। ভাইসরয় হিসাবে লর্ড কার্জন ১৮৯৯-এর শুরুতে কলকাতায় আসেন। এই বছরের সেপ্টেম্বরে কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হ্রাস করে এর প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্রিটিশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার হাতে ন্যস্ত করা হয়। এরই সঙ্গে বঙ্গবিভাগের মতন প্রকল্পের উপযোগিতা নিয়েও কার্জন চিন্তাভাবনা শুরু করেন। বাঙালীদের নিয়ে কার্জনের সতত সংশয় ছিল, আর শঙ্কিত কার্জনের সমস্ত কাজের পিছনে ছিল বাঙালী-বিদ্বেষ। ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারিতে কার্জন তাঁর এক চিঠিতে বাঙালীদের সম্বন্ধে একই সঙ্গে তাঁর কঠোর মনোভাব ও ভয়ের কথা লিখেছিলেন। ফলত এই কারণে কার্জন বাঙালীদের চিন্তা ও চেতনা ধ্বংস করতে যেকোন পথেই যেতে চেয়েছিলেন। এই সময় তাঁর পূর্ববাংলা ভ্রমণের দিনগুলি অবশ্য বঙ্গবিভাগের মতন বিপজ্জনক পরিকল্পনার ছক রচনাতেই ব্যয়িত হয়।[4]

সুতরাং কলকাতা পুরসভার পর, বঙ্গীয় সচিবালয়ে বসে বাংলা ভাগের মানচিত্র তৈরি করার সময় কার্জনের নজর পড়েছিল সেই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। শিক্ষার

মানোন্নয়ন নয়, শিক্ষা-সঙ্কোচনই ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা চলে, ১৯০৪-এর শিক্ষা আইনে উচ্চশিক্ষার ওপর সরকারের পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। জাতীয়তাবাদীরা অবশ্যই কার্জনের এই শিক্ষানীতি মানতে পারেননি, যেমন তা সমর্থন করেননি রাজনীতির বাইরে থাকা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন গ্রহণের পরের মাসে অর্থাৎ ৪ এপ্রিল ১৯০৪, বাংলার ছোটলাট স্যার এন্ড্রুজ ফ্রেজার তাঁর সচিবালয়ের খাস কামরায় কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক আলোচনাসভায় মিলিত হন। কারণ? বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সরকারি কর্তৃত্বে কলকাতার দূরবর্তী কোন শান্ত পরিবেশে এক আদর্শ কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুল গড়ে তোলা যায় কিনা তার বাস্তবতা পরীক্ষা করে দেখা।[৫]

এই সভায় ভারতীয়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন : বিচারপতি সৈয়দ আমির আলি, সারদাচরণ মিত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছোটলাটই মূল আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। উপস্থিত সদস্যদের কাছে সরকারি লক্ষ্যের বর্ণনা দিয়ে ফ্রেজার প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রসঙ্গে চলে আসেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ নিয়ে ফ্রেজার যে-বক্তব্য রাখেন তাতে সঠিক অর্থে এই কলেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে-কেউই আতঙ্কিত হতে পারতেন। উপস্থিত সদস্যদের কাছে প্রস্তাবিত আদর্শ কলেজ ও স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রেসিডেন্সির ওপর নজর দেওয়া হয়। প্রশ্ন ছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজ নিয়ে কি করা হবে? উত্তর ফ্রেজারের জানা ছিল : শহর কলকাতার উচ্চ বিদ্যালয়গত শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারি উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিতে হবে, প্রেসিডেন্সি কলেজ-ভবনগুলি স্নাতকোত্তর পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিতে হবে।[৬] ছোটলাটের লক্ষ্য ছিল—প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার পটভূমি তৈরি করা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ঐ কলেজের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস কি এই কলেজের 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠার পক্ষে বাধা ছিল? গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই কলেজের সামাজিক উপযোগিতা কি হ্রাস পেয়েছিল? এর প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা কি সরকারের কাছে ফুরিয়ে এসেছিল? এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমরা দেখব প্রস্তাবিত রাঁচি আদর্শ কলেজের চিত্র কিভাবে ফ্রেজারের আলোচনাসভায় উপস্থিত বুদ্ধিজীবীদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজ আলোকচিত্র : ভাস্কর মুখার্জি

ঐ আলোচনায় অংশ নিয়ে সকলেই সরকারি প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। শুধু মৃদু আপত্তি ছিল রাঁচির দূরত্বের প্রশ্নে। আশুতোষের পছন্দের স্থান ছিল মধুপুর, রাঁচি নয়। বিচারপতি সারদাচরণ প্রস্তাবিত আদর্শ কলেজকে কলকাতার

কাছে রাখতে চেয়েছিলেন, যোগাযোগের জন্য তিনি রাঁচি পছন্দ করেননি। স্যার গুরুদাসের সন্দেহ ছিল এই কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে। তাঁর প্রশ্ন ছিল ঃ এই কলেজে কারা পড়তে আসবে? ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্ররা? তারা প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের মোট কত শতাংশ? গুরুদাস মনে করতেন, কলকাতার অধিবাসীরা তাদের সন্তানদের এখানে পাঠাবেন না।[৭]

ঐসমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন বিচারপতি সৈয়দ আমির আলি এবং ছোটলাট স্বয়ং। অভিভাবকরা কেন এখানে তাঁদের সন্তানদের পাঠাবেন? এর উত্তরে আমির আলি বলেছিলেন ঃ শহর কলকাতার অনৈতিক প্রভাব থেকে সন্তানদের দূরে রাখার জন্যই রাঁচির মতো দূরবর্তী স্থানেও কোন অভিভাবকের আপত্তি থাকবে না।[৮]

অন্যদিকে ছোটলাট ফ্রেজার প্রস্তাবিত রাঁচি কলেজের ছাত্রসংখ্যা সম্বন্ধে স্যার গুরুদাসের সন্দেহের উত্তরে বলেছিলেন—প্রেসিডেন্সির মতো এই কলেজের ছাত্রদের শুধু কলকাতা থেকে সংগ্রহ করা হবে না, সমগ্র বাংলা বিভাগ থেকে এই কলেজের ছাত্ররা আসবে। রাঁচির দূরত্ব স্বীকার করে নিয়েও কার্জন বলেছিলেন, রেলপথ গঠন করে রাঁচির যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হবে।

এপ্রিল ১৯০৪-এর ঐ প্রাথমিক আলোচনায় রাঁচিকেই প্রস্তাবিত আদর্শ কলেজের স্থান হিসেবে পছন্দ করা হয়। প্রস্তাবিত এই কলেজের কাঠামোগত বিন্যাস, ছাত্রদের ধর্মীয় সামাজিক অবস্থান, পাঠ্যসূচী ও তাদের মাসমাহিনা, ছাত্রাবাস, সরকারের বাৎসরিক আনুমানিক ব্যয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। ভাবাবেগে আপ্লুত ছোটলাট ফ্রেজার উপস্থিত সদস্যদের জানিয়েছিলেন ঃ প্রস্তাবিত কলেজ ভবনের নির্মাণশৈলী এমনই হবে যা এখানকার পড়ুয়ারা ছাত্রোত্তর জীবনে গর্বের সঙ্গে স্মরণ করবে।[৯]

চূড়ান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত ঃ রাঁচি আদর্শ কলেজ

প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতার কিছু বিখ্যাত মানুষের মতামত সংগ্রহ করার পর সরকার বাংলা বিভাগের রাজা, মহারাজা, নবাব, জমিদার, ব্যবহারজীবী, বিচারপতি প্রমুখের মতামত যাচাইয়ের চেষ্টা করেন। মূলত এঁরা ঔপনিবেশিক সরকারের এক-একটা স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। বঙ্গ-বিভাগের সময় এঁদের সাহায্য না পাওয়া গেলেও অন্তত নিরপেক্ষ করে রাখা রাজনীতির দিক থেকে খুব জরুরী ছিল।[১০]

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৪-এ বাংলার ছোটলাটের সভাপতিত্বে বেলভেডিয়ারে অনুষ্ঠিত হলো আরেকটি বড় সভা। স্বয়ং ছোটলাট সভার সূচনা করেন উপস্থিত ব্যক্তিদের 'মহারাজা', 'নবাব', 'রাজা' ও 'ভদ্রমহোদয়' হিসেবে সম্বোধন করে।[১১]

প্রাদেশিক শাসনকর্তা ফ্রেজারের অভিভাষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, (১) ঐ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা ফ্রেজারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং (২) প্রেসিডেন্সি কলেজ নিয়ে সাধারণের মনে যে সন্দেহ জমেছিল, ছোটলাট তা দূর করতে চেয়েছিলেন। ফ্রেজার উপস্থিত সদস্যদের জানিয়েছিলেন, সরকার চান না কলকাতা সরকারি কলেজ-শূন্য হয়ে থাকুক। তাঁর ভাষায়—"It is desirable that there would be an institution in Calcutta which will have at least what Govt. thinks to be the necessary equipment of a college as an example to others." ছোটলাটের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, সরকার কলকাতায় সাধারণ কলেজের তুলনায় একটু উন্নত মানের সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছিলেন।[১২]

নিঃসন্দেহে রাঁচি কলেজই সরকারের চিন্তাভাবনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। উপস্থিত সদস্যদের কাছে ফ্রেজার রাঁচি কলেজের যে-চিত্র এঁকেছিলেন তা সঠিক অর্থে ছিল "যৌবনের উপবন"। শহর কলকাতার অনেক দূরে পাহাড়ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর প্রস্তাবিত রাঁচি কলেজের দরজা সরকার তিন শ্রেণীর মানুষের কাছে খুলে রাখতে চেয়েছিলেন। এই তিন শ্রেণী ছিল ঃ (১) ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়, (২) উচ্চবিত্ত মুসলমান সমাজ ও (৩) সকল বণিক গোষ্ঠী। সরকারি পদক্ষেপ যে এই তিন শ্রেণীর মানুষের সমর্থন পাবে—এমন সঠিক ধারণা ফ্রেজারের ছিল। বাংলা বিভাগের বিভিন্ন অংশ ভ্রমণের সময় এই তিন শ্রেণীর মানুষজনের সঙ্গে সরকারের প্রস্তাবিত রাঁচি কলেজ নিয়ে আলোচনার পর ফ্রেজারের মনে হয়েছিল ঃ "...these views of mine are widely shared by them."[১৩]

ফেব্রুয়ারি ১৯০৪-এ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের পূর্ব বাংলা ও ঐ বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে ছোটলাট ফ্রেজারের বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ ভ্রমণের সময় কার্জন যেমন বাংলা ভাগের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার রাজনৈতিক প্রভাব দেখতে চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁর সহকারি ফ্রেজার রাঁচির প্রস্তাবিত আদর্শ কলেজ ও স্কুল সম্পর্কিত সরকারি প্রস্তাবের সামাজিক প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে চেয়েছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের গুরুত্ব হ্রাস করে রাঁচির শান্ত পরিবেশে এক স্বপ্নের আদর্শ কলেজের কল্পনা অবশ্যই সেইসময়ের বাঙালীদের এক মৌলিক সাংস্কৃতিক সঙ্কটের সামনে নিয়ে আসে। এই সঙ্কট সেই সময়ের সামগ্রিক রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।

ফলত প্রস্তাবিত রাঁচি কলেজকে কেন্দ্র করে সরকার এমন এক শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যারা শহর কলকাতার নানান প্রলোভনমুক্ত হয়ে প্রত্যহ ইউরোপীয় অধ্যাপকদের দৃষ্টির মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিত্ব ও চিত্তবৃত্তির অধিকারী হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এমন ব্যক্তিত্বের

মানুষজন যে সরকারের বিরুদ্ধতা করবে না, বরঞ্চ তাদের সমস্ত কাজের নিত্যসঙ্গী হবে—এটাও জানা ছিল। কার্জন জানতেন, এমন পরগাছা শ্রেণীই সরকারের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। সর্বোপরি প্রস্তাবিত ঐ কলেজের পড়ুয়ারা সাধারণভাবেই রাজনীতির টানাপোড়েন থেকে দূরে থাকবে। অথচ প্রেসিডেন্সি কলেজে সতত এক বিপরীত চিত্র সরকারকে বিব্রত করত। কার্জন আর ফ্রেজার উভয়েই জানতেন শহর কলকাতা কখন এবং কোন্ সময় কাদের জন্য অশান্ত হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের দিন কি খুব দূরে ছিল? এই প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্সির ওপর যেকোন আঘাত হানা সরকারের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠছিল। 'আদর্শ' কলেজ হওয়ার পক্ষে সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও (স্থানাভাব স্বীকার করে নিয়েও) শুধু রাজনৈতিক কারণে সরকার প্রেসিডেন্সির গুরুত্ব হ্রাস করতে চেয়েছিলেন।

সমসাময়িক সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া

সেপ্টেম্বর ১৯০৪-এর শেষ থেকে অর্থাৎ ছোটলাটের বেলভেডিয়ারে সভার (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৪) পর কার্জন সরকারের ঐ পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে সমালোচনা শুরু হয়। শুধু রাঁচির 'আর্যাবর্ত' ও 'মুসলমান' পত্রিকা দুটিতে সরকারকে সমর্থন জানানো হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ ঘিরে যে ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছিল সে-সম্বন্ধে এই সমস্ত পত্র-পত্রিকা অতিমাত্রায় সচেতন ছিল। সমস্ত পরিকল্পনাটা যে প্রশাসনের ভ্রান্ত নীতি ও বহুলাংশে বাঙালী-বিদ্বেষের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এমন ভাবনা-চিন্তা এই সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

বেলভেডিয়ারের ১৭ সেপ্টেম্বরের ঐ সভার পর জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'বেঙ্গলী'-তে ২১ সেপ্টেম্বর লেখা হয়ঃ রাঁচি কলেজ প্রতিষ্ঠায় ছোটলাটের যুক্তি বাঙালীদের মধ্যে কোন প্রত্যয় জাগাতে পারেনি। 'আদর্শ' কলেজের স্থান হিসেবে রাঁচি উপযুক্তই বটে, কিন্তু যে বিপুল পরিমাণ অর্থ শুধুমাত্র সমাজের ক্ষুদ্রতম শ্রেণীর কল্যাণে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঠিক নয়। রাঁচি কলেজের বিরোধিতা যেভাবে শক্তিসঞ্চয় করছে তার কারণ প্রেসিডেন্সির ভবিষ্যৎ ভেবে সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠছে। এই আশঙ্কা থেকে বিরোধিতা গড়ে উঠছে।

২২ সেপ্টেম্বর 'সঞ্জীবনী' লিখেছিল ঃ রাঁচি কলেজের কোন প্রয়োজন নেই, প্রেসিডেন্সি কলেজকেই 'মডেল' কলেজে পরিণত করা যেতে পারে। অভিজাতদের ব্যঙ্গ করে 'সঞ্জীবনী' মন্তব্য করেছিল ঃ ছোটলাটকে তুষ্ট করার জন্য এরা সকলেই টাকার থলি খুলে রেখেছেন।

ঐ একই তারিখে সুদূর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'জ্যোতি'-তে সরকারকে প্রশ্ন করা হয় ঃ (১) প্রস্তাবিত ঐ কলেজের জন্য যে বিপুল ব্যয় হবে তার দায়ভার বহন করবে কে? (২) প্রস্তাবিত কলেজের ছাত্ররাই শুধু 'ভদ্রলোক' বলে পরিচিত হবেন কেন? অন্য কলেজের সাধারণ ছেলেদের 'ভদ্রলোক' হতে বাধা কোথায়?

উল্লেখ করা যেতে পারে, ছোটলাট ফ্রেজার উচ্চবিত্তদের 'ভদ্রলোক' বলে মনে করতেন। ছোটলাট মন্তব্য করেছিলেন. এদের সন্তানরা এখানে পড়াশোনা করে বংশপরম্পরায় ভদ্রলোক বলে পরিচিত হবে। ছোটলাটের এই ধারণা 'জ্যোতি' মানতে পারেনি। এই পত্রিকা সঙ্গত কারণেই মনে করেছিল, ভদ্রলোক তৈরির এই পরিকল্পনা শুধুমাত্র জনগণের অর্থ-শোষণের উপায় মাত্র। ফ্রেজারের বিত্তবানরাই দেশটাকে মরুভূমিতে পরিণত করছে—এমন ধারণা 'জ্যোতি'র ছিল।

শুধু চট্টগ্রামের 'জ্যোতি' নয়, ময়মনসিংহের 'চারুমিহির'ও সরকারি প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে ২৭ সেপ্টেম্বর লেখে ঃ জনগণ রাঁচি কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পর্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজের অবসানের সংবাদে ভীত হয়ে উঠছে। ছোটলাটের দেওয়া প্রতিশ্রুতি (প্রেসিডেন্সি কলেজ না উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে) জনমানসে এই ভয় দূর করতে পারেনি। বরঞ্চ "প্রেসিডেন্সি কলেজ উঠিয়ে দেওয়ার সময় আসেনি"—ফ্রেজারের এই ঘোষণা সরকারি মনোভাব সম্পর্কে সাধারণের মনে গভীর সন্দেহ তৈরি করছে। ক্ষুব্ধ 'চারুমিহির' লিখেছিল ঃ রাঁচি কলেজের জন্য এক পয়সা খরচের অর্থই হবে প্রেসিডেন্সির বরাদ্দ কেড়ে নেওয়া। সুতরাং 'চারুমিহির' মন্তব্য করেছিল ঃ "...we view the proposal with grave alarm."

'বর্ধমান সঞ্জীবনী' ঐ একই তারিখে অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং সোজাসুজি লেখে যে, ফ্রেজারের প্রস্তাবের মধ্যে কোথায় যেন গোপন রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে। প্রস্তাবিত কলেজের মধ্য দিয়ে জমিদার ও সাধারণ মানুষজনের পুরনো শ্রেণীগত বিভেদ নতুন করে আত্মপ্রকাশ করবে—এটাই চিরপরিচিত বিভেদের নীতি।

'অমৃতবাজার' পত্রিকায় পর পর দুদিন অর্থাৎ ৩০ ও ৩১ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত সুচতুরভাবে সরকারি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। সরকারের সরাসরি সমালোচনা না করে ৩০ সেপ্টেম্বর এই পত্রিকা লিখেছিল ঃ সাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠছে যে, প্রস্তাবিত রাঁচি কলেজের জন্য যদি প্রেসিডেন্সি কলেজ দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে কোন প্রাদেশিক সরকার এই কলেজ উঠিয়ে দেবেন—এই যুক্তিতে যে, একই কারণে দুটি কলেজ রাখার দরকার নেই। এবং "So long as this contingency exists...", 'অমৃতবাজার' লিখেছিল, "the people of Bengal are not likely to support the present scheme, no matter how noble it may be."

'অমৃতবাজার'-এর উপরি উক্ত বক্তব্যে একটু নরম

মানের সমালোচনার ইঙ্গিত থাকলেও পরের দিন অর্থাৎ ৩১ সেপ্টেম্বর সম্পূর্ণ অন্য ভঙ্গিতে অর্থাৎ ফ্রেজারের প্রশস্তি করে তা পুষিয়ে দিয়ে 'অমৃতবাজার' লিখেছিল : "... Mr Fraser's project shows, in distinct manner, how ardently he loves the people of the Province."

মূলত ১৯০৪-এর শেষের দিকে বাংলা বিভাগের বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদপত্রে রাঁচি কলেজ-বিরোধী মতামত প্রকাশ পেতে থাকে। সংক্ষেপে ঐসমস্ত সমালোচনায় যা বলা হলো—(১) বিশ্ববিদ্যালয় আইনের প্রেক্ষিতে বর্তমান কলেজগুলির নবীকরণ পুনর্গঠনই কাম্য, রাঁচিতে নতুন কলেজ স্থাপন করে প্রেসিডেন্সির অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত করা নয়; (২) এই কলেজ বাস্তবায়িত হলে সমাজে নতুন করে শ্রেণীবিভেদ প্রকট হয়ে উঠবে; (৩) প্রস্তাবিত কলেজের ছাত্ররা বাঙালী, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভুলে সম্পূর্ণভাবেই পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়বে এবং (৪) ঐ কলেজে অর্থসাহায্য করবে কে? সরকার? সরকারি কোষাগার থেকে ঐ অর্থ নেওয়া হলে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ পড়বে বেশি।

সুতরাং ১৭ ডিসেম্বর কালনার অখ্যাত পত্রিকা 'পল্লীবাসী'তে সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হয় : "Would it not be awkard for rulers to go about begging for doing good to the people?"

ঐসমস্ত সমালোচনায় সরকারের খুশি হওয়াব কারণ ছিল না। অবশ্যই সরকারের পক্ষে বোঝা সহজ ছিল যে, উচ্চশিক্ষার বয়স খুব বেশি না হলেও (যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ধরা হয়) হিন্দু কলেজের যুগ থেকে যে মানববিদ্যা ও সংস্কৃতির সূচনা, প্রেসিডেন্সি কলেজে যার উচ্চমার্গে উত্তরণ, তার ওপর যেকোন আঘাত বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ সহজে মেনে নেবে না। 'বেঙ্গলী'র মতো অভিজাত পত্রিকার পাশে কালনার 'পল্লীবাসী' যে সরকারের এই পদক্ষেপ সহজ মনে গ্রহণ করছে না—এটা কার্জন প্রশাসন বুঝতে পেরেছিল।[১৪]

যাহোক, প্রস্তাবিত রাঁচি কলেজ সংক্রান্ত বিষয়টি শুধু সংবাদপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাদেশিক আইন পরিষদে বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুও এই প্রকল্পের গূঢ় অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সতর্কীকরণ

প্রস্তাবিত রাঁচি কলেজের জন্য যে প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন ক্ষতি হবে না বা এই কলেজের জীবনীশক্তি হ্রাসের মতো কোন বিপজ্জনক চিন্তা সরকারের নেই—এমনতর সরকারি প্রতিশ্রুতির ওপর ভূপেন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না। এই আস্থার অভাবেই তিনি ১৯০৫-১৯০৬-এর বাজেট অধিবেশনে সরাসরি মন্তব্য করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে রাঁচি কলেজ প্রতিষ্ঠা হলে প্রেসিডেন্সির শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়বে। ক্ষুব্ধ অথচ কিছুটা ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে ভূপেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সির অতীত ইতিহাস আর হিন্দু কলেজের যুগে তাকিয়ে বলেছিলেন, ঐ দুই কলেজ আমাদের এমন কিছু মানুষ উপহার দিয়েছে যাঁদের জন্য আজো আমরা অহঙ্কারী হতে পারি। ভূপেন্দ্রনাথ সরাসরি বলেছিলেন—রাঁচি কলেজ কখনোই প্রেসিডেন্সির বিকল্প হতে পারবে না। শঙ্কিত ভূপেন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন : "A day may come when the Presidency College may cease to be." প্রেসিডেন্সির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত এই নরমপন্থী নেতা সরকারকে সতর্ক করে বলেছিলেন : "...any action threatens to undermine its foundations are viewed with dismay."[১৫]

যাহোক, ঐসমস্ত আলোচনা ও সমালোচনার প্রেক্ষিতে সরকার আগের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসে। ছোটলাটের গোপন কক্ষের ক্ষুদ্রতম ও পরে বেলভেডিয়ারে বৃহত্তম সভার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় সরকার বুঝেছিলেন, মধুপুর বা রাঁচিতে কলকাতার প্রেসিডেন্সির কোন প্রতিষ্ঠান গড়া হলে বা ছোটলাটের প্রাথমিক প্রস্তাবমতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রেসিডেন্সিকে তুলে দেওয়া হলে ঝুঁকিটা বড় বেশি হয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্সির স্থান ও চরিত্র বদলের পরিকল্পনা : ঔপনিবেশিক চক্রান্তের দ্বিতীয় ভাগ

১৭ মে ১৯০৫ শিক্ষাবিভাগ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্প্রসারণ, শহরতলির কোথাও এর স্থানান্তর, সর্বোপরি এর পরিচিত চরিত্র পালটে একে আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার বিষয়ে কলকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কুড়িজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভিন্ন ধর্ম-বর্ণের একাধিক আর্থ-সামাজিক ও বৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠানের মতামত আহ্বান করা হয়। ঐ কুড়িজনের মধ্যে বারজন ছিলেন ভারতীয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কেন প্রেসিডেন্সির স্থান ও চরিত্র বদলের প্রশ্ন উঠছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত উত্তর বা সমস্ত মতামতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যেহেতু এক ছিল, সেই কারণে এই আলোচনার পৌনঃপুনিকতা এড়াবার জন্য আমরা বিশেষ কয়টি মতামতের ওপর আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।[১৬]

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যার গুরুদাস জানিয়েছিলেন : (১) প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থান বদল করা এর উন্নতির জন্য অপরিহার্য নয়।

শহর কলকাতার কোন অংশই কলেজ স্ট্রীটের তুলনায় স্বাস্থ্যকর নয়, (২) ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে প্রেসিডেন্সির স্থান বদল কাম্য হতে পারে না। স্যার গুরুদাসের যুক্তি ছিল—এই কলেজ শহরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কলকাতার বিখ্যাত মানুষজনের অনেকেই এখানে পড়েছেন, তাঁদের সন্তানরাও এখানে পড়েছেন, ভবিষ্যতেও পড়বেন। ফলত এই কলেজকে কেন্দ্র করে প্রজন্ম পরম্পরায় যে-ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে গুরুদাস তাকে ধ্বংস করা ঠিক হবে না। (৩) প্রেসিডেন্সি কলেজের গত পঞ্চাশ বছরের চরিত্র মুছে দিয়ে একে আবাসিক কলেজে পরিণত করার সরকারি প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকারি প্রস্তাব যুক্তি দিয়ে নাকচ করে স্যার গুরুদাস লিখেছিলেন, আবাসিক কলেজের সুযোগ-সুবিধা ও সরকারের তথাকথিত আশীর্বাদের ধারণা সকলের কাছে স্পষ্ট ও প্রশ্নাতীত নয়। আবাসিক কলেজে যে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক মধুর হবে—এমন ভাবার কোন কারণ নেই। বরঞ্চ এই সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। আবাসিক কলেজের বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের ছেলেদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারণের প্রতি ভিনদেশী শিক্ষকরা যে সবসময়েই সহানুভূতিশীল থাকবেন—এমন ভাবা যায় না।

আসলে জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে স্যার গুরুদাস প্রেসিডেন্সির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ চেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে—সেই হিন্দু কলেজের যুগ থেকে—এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, তিনি তাকে ধ্বংস করতে চাননি।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সুস্থ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মূলোৎপাটন করতে আলেকজান্ডার ডাফের অনুগামী রেভারেন্ড আলেক্স টমরির চেষ্টায় ঘাটতি ছিল না।

রেভারেন্ড আলেক্স টমরি

প্রেসিডেন্সি কলেজের উন্নতির প্রশ্নে রেভারেন্ড আলেক্স টমরি[১৭] সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এই কলেজের বহিরঙ্গগত বিকাশের ওপর। এই বিকাশ সম্ভব ছিল স্থানিকভাবে বা কলেজের স্থানান্তর ঘটিয়ে।

টমরি প্রেসিডেন্সির **স্থানিক বা আঞ্চলিক বিকাশের** যে-প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা এক অর্থে ছিল বিপজ্জনক। প্রেসিডেন্সির সম্প্রসারণের জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার শহর কলকাতার পূর্বদিকের কোন অঞ্চলে সরিয়ে দিয়ে ওখানেই প্রেসিডেন্সির প্রস্তাবিত বিজ্ঞানভবন নির্মাণের প্রস্তাব দেন। টমরির আরো প্রস্তাব ছিল—সংস্কৃত কলেজকে টোলের পর্যায়ে নামিয়ে এনে হিন্দু স্কুলকে এরই 'প্রিপারেটরী' স্কুলে পরিণত করা।

টমরির অভিনব প্রস্তাব ছিল গোলদীঘি বুজিয়ে ফেলা সংক্রান্ত। টমরির মনে হয়েছিল, ঐ বিরাট দীঘি মূলত মশা উৎপাদনের উৎস হিসেবে কাজ করে, যা নাকি সবসময়েই জনস্বাস্থ্যের চিন্তার কারণ। যদিও ভাবাবেগে কিছুটা আপ্লুত হয়ে টমরির মনে হয় ঃ "... the ripple on the surface of the College Square tank on a moonlit night is charming and productive of poetic thoughts."—চাঁদের রাতে গোলদীঘির মোহিনী মায়া বিপদমুক্ত ছিল না, এটা তিনি জানতেন। তাঁর ভাষায় "... that charm will no less thought of than the possible danger...."

টমরির **বিকল্প প্রস্তাব** ছিল কলকাতার আলিপুর অঞ্চলে প্রেসিডেন্সির স্থানান্তর সম্পর্কিত। তিনি উত্তর কলকাতার কাশীপুর অঞ্চলে এই কলেজকে সরিয়ে আনার বিরোধী ছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রেসিডেন্সি কলেজের উন্নয়ন, স্থানান্তর ও পরিশেষে একে আবাসিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা বিষয়ে এই কলেজের শিক্ষকদের মতামত নিয়ে প্রেসিডেন্সির তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ প্রসন্নকুমার রায় ১৯০৪-এর গোড়ায় সরকারকে সর্বপ্রথম প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই কলেজকে কাশীপুর অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে এসে আবাসিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার।

যাহোক, টমরির কাশীপুর অঞ্চলে প্রেসিডেন্সি কলেজকে সরিয়ে আনার বিরোধিতার মূল কারণ ছিল ঃ

(১) এই অঞ্চল ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত, (২) এই অঞ্চল প্রেসিডেন্সির ইউরোপীয় অধ্যাপক ও তাঁদের স্ত্রীদের কাছে গ্রহণীয় হবে না, কেননা এটা তাঁদের সমাজ ও পরিবেশ-বিরোধী। কাশীপুর ছিল টমরির কাছে 'wrong end of Calcutta'।

টমরি চেয়েছিলেন কাশীপুরের পরিবর্তে আলিপুর বা আলিপুর-টালিগঞ্জের মধ্যবর্তী স্থান। কেন? তাঁর যুক্তি ছিল ঃ

(১) কলকাতার প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থাৎ ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া, যাদুঘর, টাউন হল; এমনকি ইউরোপিয়ানদের ছোট বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিও এই অঞ্চলেই অবস্থিত। (২) ঐ অঞ্চলেই খুঁজে পাওয়া যায় পশ্চিমী পরিবেশ। এই অঞ্চলের প্রস্তাবিত কলেজের ছাত্ররা ভবিষ্যতের জন্য সতত অর্জন করবে বিরল অভিজ্ঞতা, তারা পরিচিত হবে পশ্চিমী জীবনধারা ও তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, তারা সঙ্গ পাবে বিখ্যাত সব ইংরেজ অধ্যাপক ও কলকাতার ইংরেজ ব্যক্তিত্বের। এদের উন্নত চরিত্র ছাত্রদের প্রভাবিত করবে। ফলে ভারতীয় ও ইংরেজ—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে উঠবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

অন্যদিকে, কাশীপুর ইউরোপীয় মানুষজনের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; এখানে শুধু দেখতে পাওয়া যায় সাধারণ মানের ইংরেজ কর্মচারীদের। সুতরাং "... On hygienic, on

topographical and on social grounds, I would prefer Alipore to Cossipore as a site for the proposed new Presidency College... Cossipore would, in my opinion, be a very risky experiment...." টমরি ভেবেছিলেন।

এফ. ডব্লিউ. ডিউক : প্রেসিডেন্সী বিভাগের প্রধান

প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রধান (ডিভিশনাল কমিশনার) এফ ডব্লিউ. ডিউক সমগ্র বিষয়টি দেখেছিলেন একজন আমলার চোখে। কাশীপুর অঞ্চলে প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থানান্তরে ডিউকের আপত্তি ছিল না, তবু তিনি সরকারকে প্রশাসনিক দিক থেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ডিউক সরকারকে জানিয়েছিলেন, এই পরিবর্তনের চেষ্টা যদি সাধারণের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, তারা অত্যন্ত সুচতুরভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজের গুরুত্ব হ্রাস করছে তাহলে এই পরিবর্তনের বিরোধিতা স্বাভাবিকভাবে সমাজের সকলের কাছ থেকে আসবে।

ডিউক সরকারকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদি উন্নয়নের প্রয়োজনে প্রেসিডেন্সি কলেজকে শহর কলকাতার উপকণ্ঠে সরিয়ে নিয়ে যেতেই হয় তাহলে তা করতে হবে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে, জনগণকে বোঝাতে হবে কেন বর্তমান অবস্থায় কলেজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সংস্কারের পক্ষে যদি জনমত কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে উন্নয়নের স্বার্থে এই পরিবর্তন স্বীকৃতি পাবে।

ডি. ডব্লিউ. কুচলার : সংবাদদাতা, আবহাওয়া দপ্তর

সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ কুচলার প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থানবদলের প্রশ্নটিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি স্থানান্তরের কারণ হিসেবে কলেজ স্ট্রীটের অনুন্নত পরিবেশের কথা বলেছিলেন।

কুচলার সরাসরি সরকারকে জানিয়েছিলেন, এই কলেজের বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা কোন্ যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য নয়। বিস্তারিতভাবে তিনি লিখেছেন, ঐ কলেজের পরিবেশ যথার্থই অস্বাস্থ্যকর, দূষিত বায়ু আর রাস্তার চারপাশের যানবাহন চলাচলে যে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয় তা সহ্য করা যায় না। সুতরাং কুচলার দক্ষিণ শহরতলীর কোন অভিজাত এলাকায় প্রেসিডেন্সির স্থানান্তরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

সরকারের দুই পদস্থ বাঙালী আধিকারিক

সরকারের দুই পদস্থ কর্মচারী—বাংলা সরকারের মুখ্য রসায়ন পরীক্ষক রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কে. জি. গুপ্ত উভয়েই সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এঁদের মূল বক্তব্য একই ছিল : কলেজ স্ট্রীট থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে এসে একে আবাসিক কলেজে পরিণত করা অবিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে। কে. জি. গুপ্ত সরকারকে জানিয়েছিলেন (পরোক্ষে সতর্ক করেছিলেন), এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে এই কলেজের সুনাম, চরিত্র ও দক্ষতার ওপর সামান্যতম আঘাত লাগতে পারে।

রেভারেন্ড এ. বি. ওয়ান : অধ্যক্ষ, জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ)

প্রেসিডেন্সি কলেজ ঘিরে রেভারেন্ড এ. বি. ওয়ান এই বিতর্কের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি সমগ্র বিষয়টি অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি চাননি শুধুমাত্র এই কলেজটির জন্য বাংলাদেশের আরো পঞ্চাশটি কলেজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হোক বা প্রেসিডেন্সির মাত্র দশ শতাংশ ছাত্রের জন্য সরকারি অর্থের নব্বই শতাংশ বরাদ্দ হোক।

ওয়ান সরকারকে জানিয়েছিলেন, সুবিখ্যাত শিক্ষক, সুগঠিত গবেষণাগার, প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাস ও সুপ্রশস্ত খেলার মাঠ শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের প্রাপ্য হতে পারে না—অন্য কলেজগুলির দরকার, অবশ্যই দরকার। জেনারেল অ্যাসেমব্লীর অধ্যক্ষই লিখতে পারতেন, প্রেসিডেন্সির এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের অর্থই হলো একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের জন্য অন্য কলেজগুলিকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে আনা।

সুতরাং শিক্ষাবিভাগকে রেভারেন্ড ওয়ান পরামর্শ দিয়েছিলেন, বৃহত্তর ছাত্রসমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে কিভাবে সরকারি অর্থ ব্যবহার করা যেতে পারে সেই পথের অনুসন্ধান করা। শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজই বাংলাদেশের শিক্ষাজগতের শেষকথা বলে না—এমন ধারণা বোধকরি অধ্যক্ষ ওয়ান পোষণ করতেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনটি চিঠির বক্তব্য একই

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সরকারকে দেওয়া তিনটি চিঠির বক্তব্য ছিল একই। কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডঃ ই. ডেনিসন, খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সরকারকে দেওয়া পরামর্শের মধ্যে অমিল খুব বেশি ছিল না। এঁরা সকলেই চেয়েছিলেন : (১) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনে প্রেসিডেন্সি কলেজকে শহরের উপকণ্ঠে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া

উচিত, প্রেসিডেন্সির অধ্যক্ষ ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের মতে কাশীপুর হলেও ক্ষতি নেই। (২) আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেসিডেন্সিকে নতুন করে গড়ে তোলা নিয়ে ডেনিসন ও সিরাজুল ইসলামের কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকলেও ভূপেন্দ্রনাথের ছিল না। বরঞ্চ তাঁর মনে হয়েছিল—"... The College in order to maintain its position as the leading educational Institution in the country must be converted into a residential College."

ঐ তিনজনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে আমাদের মনে হবে যে, এক মধ্যপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি আবাসিক কলেজ সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—(১) আবাসিক কলেজে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক মধুর হবে, (২) এর ফলে ছাত্ররাই উপকৃত হবে এবং (৩) শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা শাসিতের অনেক কাছে এসে তাদের জানতে ও বুঝতে পারবে। ফলত আলাপ, আলোচনা, পারস্পরিক সমঝোতা—এই সময়কার মধ্যপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের জীবনদর্শন ছিল, ভূপেন্দ্রনাথ তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

বৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত

সরকার ব্যক্তিবিশেষের মতামত সংগ্রহ করার পর বাংলা বিভাগের ৯টি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতামত আহ্বান করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রশ্নে এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের কোন দ্বিমত ছিল না, কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কলেজ স্ট্রীট থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জাতি-ধর্মের কথা ভুলে এই কলেজকে আবাসিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বিরুদ্ধে ছিল। এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের মতামত নিয়েও আমরা আলোচনা করতে পারি।[১৮]

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অন্যতম দুটি প্রতিষ্ঠান—'ন্যাশনাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন' ও 'মহমেডান ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন' সরকারকে তাদের মতামত জানায়। 'ন্যাশনাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন' প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থান ও চরিত্র বদলের পক্ষপাতী ছিল। অন্যদিকে 'মহমেডান ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক মৌলভী সৈয়দ মহম্মদ করিম আগা সরকারকে জানান : আবাসিক কলেজের ধারণা ভারতীয়দের কাছে স্বচ্ছ নয়, তাঁরা এমন ব্যবস্থাকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্বন্ধে করিম আগা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। স্থান পরিবর্তনও স্বাভাবিক কারণে তাঁর সমর্থন পায়নি। তিনি মনে করতেন, প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থানীয় চাহিদা পূরণ করেছে, অন্যান্য বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে এই কলেজ 'আদর্শ' কলেজের মর্যাদা পেয়েছে। সর্বোপরি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কলকাতার সমস্ত মানুষই চান তাঁদের ছেলেরা এখানে পড়ুক, কেননা এঁরা মনে করতেন—এর ফলে "they will get best possible education there in."

করিম আগা মনে করতেন, এই প্রস্তাবিত পরিবর্তন সরকারের কাছে অনিবার্য হলেও তা ঘটাতে হবে মুসলমান-অধ্যুষিত খিদিরপুর অঞ্চলেই। ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের প্রস্তাবিত কাশীপুর আলেক্স টমরির বর্ণনার তুলনায় অনেক বেশি বীভৎস ছিল করিম আগার কাছে।

অন্যদিকে খিদিরপুর সম্বন্ধে করিম আগা লিখেছেন : এই অঞ্চল মাদ্রাসা এলিয়ট ছাত্রাবাসের কাছে, এখানে ঘিঞ্জি বসতি যাওয়া-আসার পথে পড়ে না, অনৈতিক দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। বরঞ্চ এই খিদিরপুরে যাওয়ার পথে দেখা যায় বিদেশীদের ঘরবাড়ি আর সুপ্রশস্ত ময়দান। ছাত্ররা এখানে খেলতে পারবে, কলকারখানায় ঘেরা কাশীপুরে যা সম্ভব নয়।

বিহারের দুটি ভূম্যধিকারী সংগঠন 'বিহার ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'ভাগলপুর ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' সরকারি প্রস্তাব সমর্থন করেছিল। বিহার সংগঠনের সহ-সম্পাদক মহেশ নারায়ণ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের প্রশ্নে প্রেসিডেন্সির স্থান বদল চেয়েছিলেন। বর্তমানের তাৎক্ষণিক সুযোগ-সুবিধার জন্য যাঁরা এই কলেজের স্থানান্তরের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের সমালোচনা করে মহেশ নারায়ণ সরকারকে জানিয়েছিলেন—এঁরা ভবিষ্যতের কথা ভাবেন না।

উড়িষ্যা ভূম্যধিকারী সংগঠনের প্রধান রামশঙ্কর রায় সরকারকে সরাসরি জানিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্সির উন্নয়নের প্রশ্নে এর স্থান ও চরিত্র বদলের মধ্যে তিনি কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না।

মূলত জাতি-ধর্মের প্রশ্নে রামশঙ্কর প্রেসিডেন্সি কলেজকে আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার বিরোধিতা করেছিলেন। রামশঙ্কর লিখেছিলেন, ঐতিহ্য-আশ্রয়ী ধ্যানধারণা আর পুরনো আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা ভুলে আবাসিক কলেজের ছাত্ররা এক বিদেশী ও ব্যয়বহুল জীবনধারা মেনে নেবে না।

'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স'-এর সভাপতি ঋষিকেশ লাহা সরকারের উন্নয়নের প্রস্তাব সমর্থন করলেও ঐ কলেজের স্থান বদল বা একে আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাননি।

'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি সরকারি প্রয়াসের সম্পূর্ণ বিরোধী। সুরেন্দ্রনাথ মনে করতেন :

(১) জাতি-ধর্মের প্রশ্নে আবাসিক কলেজের পরিকল্পনা

সমর্থনযোগ্য নয়। একই ছাত্রাবাসে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের একসঙ্গে রাখার বিপদ আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে এর ফলে বড় ধরনের বিপত্তি ঘটতে পারে। জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৈচিত্র্য স্বীকার করে নেওয়া উচিত। (২) কলেজের উন্নয়ন জরুরী, স্থান বদল নয়। (৩) কলেজের সম্প্রসারণ বর্তমান অঞ্চলেই সম্ভব ইত্যাদি।

'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক এ. চৌধুরীও সরকারি প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেননি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্য মেনে নিয়েছিলেন।

২৯ এপ্রিল ১৯০৭ 'মহমেডান লিটারারি অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যে-চিঠি দেওয়া হয় সেটাই ছিল এই উত্তরমালার শেষ চিঠি।

ঐ সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারকে জানানো হয়েছিল ঃ (১) এই সংগঠন প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থান বদলের পক্ষে, (২) মুসলমান সম্প্রদায় এই কলেজের উন্নতির প্রশ্নে অতিমাত্রায় সচেতন এবং (৩) সরকার বাহাদুরের মনে রাখা দরকার, এই কলেজ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য গড়ে উঠেছে। সুতরাং প্রস্তাবিত কলেজ ও ছাত্রাবাসে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা উচিত।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক থেকে শুরু করে ভাগলপুরের অখ্যাত ভূম্যধিকারী সংগঠনের সচিব পর্যন্ত সকলেই এই কলেজের উন্নয়নের প্রশ্নে একমত পোষণ করতেন। তাঁরা সকলেই চেয়েছিলেন, এই কলেজ বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে এক আদর্শ কলেজ হিসেবে গড়ে উঠুক। এই কলেজকে ঘিরেই একটা জাতির স্বপ্ন দেখা শুরু।

সুতরাং গত পঞ্চাশ বছরের প্রেসিডেন্সির ঐ দর্পিত ইতিহাস সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল, আরো কঠিন হয়েছিল সেই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে। এই অবস্থায় কলকাতা থেকে অন্যত্র প্রেসিডেন্সি কলেজকে সরিয়ে নিয়ে এসে একে আবাসিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা ভিন্ন সরকারের কাছে অন্য কোন বিকল্প ভাবনাও ছিল। কার্জন এই সময়ের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছিলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের দরজা সকলের কাছে মুক্ত রাখার অর্থই হবে রাজনীতি ও অন্য সমস্ত কিছুরই অবাধ আলোচনার পথ প্রশস্ত করা। কার্জন এটা চাইতেন না। তিনি জানতেন, এই কলেজের ছাত্ররা অনায়াসেই বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করবে।

কার্জনের ভাবনায় ভুল ছিল না, আর ছিল না বলেই স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা ধ্বংস করতে আবাসিক কলেজের প্রশ্ন উঠেছিল। কলেজ উন্নয়নের সঙ্গে আবাসিক কলেজের কোন সম্পর্ক ছিল না। অথচ সরকার ও সরকারের সমর্থকরা এটাই চেয়েছিলেন। কার্জন জানতেন, আবাসিক কলেজের কঠোর বিধিনিষেধের সামনে, আর যা হোক, উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা বোমা বানাতে সাহসী হবে না। এক মার্জিত পরগাছা শ্রেণীর কল্পনায় বোধ করি, কার্জন সেই ১৮৩৫-এর লর্ড মেকলের স্বপ্নের ভারতীয়দের (রক্তে-বর্ণে যাঁরা ভারতীয় অথচ চিন্তা আর রুচিতে ইংরেজ হবেন) কথা ভেবেছিলেন।

সরকারি সিদ্ধান্ত বদল ঃ প্রেসিডেন্সির উন্নয়নের প্রশ্ন

প্রেসিডেন্সি কলেজ ঘিরে কার্জন সরকার সরাসরি দু-ধরনের চক্রান্ত করেছিলেন ঃ (১) রাঁচি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে প্রেসিডেন্সির গুরুত্ব হ্রাস করা এবং (২) শহরতলীর কোথাও এই কলেজকে সরিয়ে নিয়ে তার চরিত্র বদল করে এর ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করা। কার্জন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রেসিডেন্সির ভারও তুলে দিতে চেয়েছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংবাদপত্রের সমালোচনা ও ভূপেন্দ্রনাথের বাজেট ভাষণের পর সরকারের পক্ষে বোঝা সহজ হয় যে, এই কলেজ-সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনাই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ সহজভাবে মেনে নেবে না। কার্জন ও ফ্রেজারের পক্ষে আবার এটা বোঝা কঠিন ছিল না যে, একই সঙ্গে বাংলা আর প্রেসিডেন্সির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানা রাজনৈতিক কারণে ঠিক হবে না।

সরকারি সিদ্ধান্তে ভ্রম ছিল না। বস্তুত, যে-প্রতিষ্ঠান ঘিরে গড়ে ওঠা একটা জাতির দীর্ঘ আত্মপ্রত্যয় আর সাফল্যের কথা-কাহিনী বিশ্বের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই হিন্দু কলেজের যুগ (১৯১৭) থেকে সেখানকার ছাত্ররা হিন্দু ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে অন্ধ হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে আর পরাধীনতার ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে স্বাধীনতার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলছে—সেই কলেজকে নিঃস্ব করে দেওয়া বা চরিত্র বদলের মতন ঔপনিবেশিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে শহর কলকাতা উদাসীন বা নীরব থাকবে না, সেটা বোঝা গিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-জনিত ক্ষোভের গভীরতা লক্ষ্য করে কার্জন বা ফ্রেজার তাতে নতুন মাত্রা যোগ করতে চাননি। প্রেসিডেন্সির এই সময়ের সেরা ছাত্র বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর 'আত্মকথা'য় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এই কলেজের ছাত্রদের ক্ষোভের কথা আমাদের জানিয়েছেন।[১৯] শুধু বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া মোকাবিলা করতে সরকারকে যেভাবে প্রতি মুহূর্তে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে প্রেসিডেন্সি কলেজের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস মুছে দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনার চেষ্টা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারত তা সহজে অনুমেয়।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত বুদ্ধিজীবীদের মতামত ও

সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সামনে সরকার ১৯০৭-এর মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র বিষয়টি নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। সঙ্কোচন নয়, প্রেসিডেন্সির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণই হয়ে ওঠে সরকারের এবারের মূল লক্ষ্য।

সরকারের পশ্চাৎ অপসারণ ঃ প্রেসিডেন্সির স্থিতাবস্থা রক্ষা

স্থিতাবস্থা বজায় রেখে প্রেসিডেন্সির উন্নয়নের শুরু সে ১৯০৭-এ। সেই ইতিহাস অবশ্যই প্রেসিডেন্সি-মুখী ছিল।[২০]

প্রেসিডেন্সির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ৩ জুলাই ১৯০৭-এ ছোটলাটের নেতৃত্বে বেলভিডিয়ারে যে-সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিভাগের পদস্থ আমলা ও কলকাতার বিশিষ্ট কিছু গণ্যমান্য মানুষ। প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁর ভাষণের শুরুতে বলেছিলেন ঃ বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনেক চিন্তাভাবনার পর সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই কলেজকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে সরানো যাবে না। সুতরাং চরিত্র বদলের প্রশ্নও ছিল না। জুলাইয়ের এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে প্রেসিডেন্সি কলেজের চৌহদ্দি থেকে হেয়ার স্কুলকে সরিয়ে নিয়ে ভবানীপুর অঞ্চলে নতুন 'হেয়ার স্কুল' গড়ে তোলা হবে যা শেষপর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের মূল সমস্যা যেহেতু এর স্থানাভাবের সঙ্গে জড়িত ছিল, সুতরাং ঐ সভায় আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এই কলেজেরই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ২২ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। অধিগ্রহণ ও অন্যান্য খরচ ধরা হয় প্রায় এগার লক্ষ টাকা। এই বিরাট পরিমাণ অর্থের জন্য সরকারি সাহায্যের পাশে প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাবও এই সভা নিয়েছিল।[২১]

মূলত ঐ সভার সদস্যরা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সরকারের মৌলিক সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করেছিলেন। প্রেসিডেন্সির সমস্যা যেমন এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সঙ্গে জড়িত ছিল, ঠিক তেমনি সরকারের মূল সমস্যা ছিল অর্থের। অপ্রয়োজনীয় কালক্ষেপে যে প্রস্তাবিত জমির দাম বেড়ে যাবে সেবিষয়ে সচেতন থেকে ঐ সভায় শেষ সিদ্ধান্ত ছিল ঃ "The longer the matter is delayed, the greater of the price that will have to be paid for the land." অবশ্যই রাজস্ব বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দেরি করেনি।

কলেজ-পার্শ্বস্থ অঞ্চল অধিগ্রহণে রাজস্ব বিভাগের ঘোষণা

৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ রাজস্ব বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় ঃ "জনগণের অর্থে ও জনগণের স্বার্থে জেলা চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত শহর কলকাতায় অবস্থিত প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্প্রসারণের প্রয়োজনে দুটি অংশে বিভক্ত ২১ বিঘা ১৬ কাঠা জমি সরকার গ্রহণ করবেন।" এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ১নং ধারা অনুযায়ী। প্রস্তাবিত এই বিশাল পরিমাণ জমির একদিকের সীমানায় ছিল ভবানীচরণ দত্ত লেন, নীলমাধব সেন ও কৃষ্ণবিহারী সেন লেন, অন্যদিকের সীমায় বিস্তৃত ছিল পিয়ারীচরণ সরকার স্ট্রীট পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সীমানার কোন্ কোন্ অংশ অধিগ্রহণ করা হবে তাও ঐ বিজ্ঞপ্তিতে বলা ছিল।[২২]

উপসংহার

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ১৯০৪-১৯০৬-এর মধ্যে প্রেসিডেন্সির চরিত্র ধ্বংস করতে ঔপনিবেশিক সরকারের উৎসাহে ঘাটতি ছিল না। বাংলা ভাগের প্রশাসনিক পরিকল্পনার পাশে প্রেসিডেন্সি কলেজ ঘিরে সরকারের চিন্তাভাবনা একই মৌলিক দর্শনের দুই সমান্তরাল রেখা ছিল মাত্র। বাংলাভাগের পরিকল্পনা, পরে বাংলা ভাগ করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন বিভেদের দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি প্রেসিডেন্সিকে ঘিরে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, ধনী-নির্ধনের মধ্যে অনৈক্যের বীজ ছড়ানো কার্জন সরকারের কাছে অনিবার্য হয়ে পড়ে। উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ঐক্য বজায় রাখা এইসময় একান্ত জরুরী ছিল। আবার বঙ্গবিভাগজনিত ক্ষোভ প্রশমনের জন্য সরকার এক প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাই উন্নয়নের নামে প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে সরকারের নিত্য নতুন প্রকল্প বা অভিসন্ধির উদ্ভব ঘটে।

১৯০৭-র পরবর্তী কাহিনী প্রেসিডেন্সি কলেজের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কিত। বঙ্গবিভাগের প্রতিরোধ লক্ষ্য করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে কূটনৈতিক কারণে এটা জানানো সরকারের দায় ছিল যে, প্রশাসন প্রেসিডেন্সির উন্নতি-বিমুখ নয় বা শাসকগোষ্ঠী এই কলেজ সম্বন্ধে অসূয়া মনোভাব পোষণ করেন না।

তবুও ১৯০৭-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত পালটেছে বারে বারে,

পালটেছে প্রেসিডেন্সির সীমানা। পালটায়নি শুধু ১৯০৭-এর সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ভবানীচরণ দত্ত লেনের পূর্বদিকের মসজিদ আর আজানের ধ্বনি। আজানের আহ্বান প্রত্যহ মিলেমিশে আজো এক হয়ে পড়ে প্রেসিডেন্সির দিন শুরু আর শেষের ঘণ্টাধ্বনিতে। ঐতিহ্যের স্পর্ধিত আওয়াজ বহু দূর থেকে শোনা যায়। ❑

১ জেনারেল (এডুকেশন) ডিপার্টমেন্ট, মে ১৯০৬, ক্রমিক সংখ্যা ৫-২৩

২ ঐ, জানুয়ারি ১৯০৬, ক্রমিক সংখ্যা ৩-২৭

৩ ঐ। এই সংবাদের উল্লেখ আছে ৩১ মে ১৯০৫-এ কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ প্রসন্নকুমার রায়কে লেখা এই কলেজের বিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর এক চিঠিতে।

8 The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908—Prof. Sumit Sarkar

৫ জেনারেল (এডুকেশন) ডিপার্টমেন্ট, এপ্রিল ১৯০৪, ক্রমিক সংখ্যা ৫-৬; ৪ এপ্রিল ১৯০৪ বাংলা সচিবালয়ে ছোটলাট স্যার এন্ড্রু ফ্রেজারের নিজস্ব কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন—বিচারপতি আমির আলি, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. পেডলার, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডব্লিউ. অরেঞ্জ, মৌলভি সামসুল আহমেদ, ডঃ ডেনিসন রস, এ. সি. এডওয়ার্ডস, এ. আর্ল, এইচ. স্যাডেজ প্রমুখ।

৬ ঐ। এই সভার ওপর লিখিত মিঃ আর্লের প্রতিবেদনে আছে : "... College education in Calcutta, might, perhaps be left to private enterprise, subject, possibly, to assistance from Government. In that case, the Presidency College buildings might be made order to the Calcutta University... for post graduate instruction and research work. If this scheme was not considered feasible, part of the Presidency College might perhaps, be maintained as Government College and the rest be made over to the University for the purposes above indicated."

৭ ঐ ৮ ঐ ৯ ঐ

১০ ঐ, ক্রমিক সংখ্যা ৭। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৪-এর ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগের পঁয়ষট্টি জন ধনাঢ্য অভিজাত ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন দ্বারভাঙ্গা, বর্ধমান, ঢাকার মহারাজা ও নবাবরা, তেমনি ছিলেন এই সময়ের বণিক সমাজের হীরালাল জহুরী, মোতিচাঁদ লাভচাঁদ প্রমুখ ব্যক্তিরা। উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকার প্রথম নাম ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের, শেষ নাম বাবু মোতিচাঁদের। ঐ সভায় অনুপস্থিত ছিলেন উনষাট জন, যদিও সরকারের এই পরিকল্পনায় তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। অনুপস্থিতদের তালিকায় প্রথম নাম ছিল বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের, শেষ নাম ফরিদপুরের মৌলভী সৈফুদ্দিন আহমেদের।

১১ ঐ ১২ ঐ ১৩ ঐ

১৪ সংবাদপত্রের সমস্ত আলোচনা ও সমালোচনা সংগ্রহ করা হয়েছে 'রিপোর্ট অফ দ্য নেভিভ নিউজ পেপার্স' (রাজনৈতিক দপ্তর) আগস্ট-ডিসেম্বর ১৯০৪ থেকে।

১৫ ১৯০৫-১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে সরকারের বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রস্তাবিত রাঁচি কলেজের জন্য বরাদ্দ অর্থ মঞ্জুর প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছিলেন। [দ্রঃ জেনারেল (এডুকেশন) ডিপার্টমেন্ট, জানুয়ারি ১৯০৬, ক্রমিক সংখ্যা ৩-৮]

১৬ ঐ, ক্রমিক সংখ্যা ৯-২৫

১৭ আলেক্স টমরি রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফের অনুগামীদের অন্যতম। ১৮৬২ সালের ৫ জুন কনস্তান্তিনোপলে টমরির জন্ম। ১৮৮৭ সালের অক্টোবরে তিনি ভারতে আসেন। সমসাময়িক মিশনারী শিক্ষকদের মধ্যে তাঁর ভূমিকা স্মরণযোগ্য হয়ে আছে। ১৯১০ সালের ১৭ মার্চ টমরি স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ হন। কিন্তু ঐ বছরের ৪ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু ঘটে। (দ্রঃ 'আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন'—অলোক রায়, কলকাতা, ১৩ জুলাই ১৯৮০, পৃঃ ১১১-১১৯)

১৮ জেনারেল (এডুকেশন) ডিপার্টমেন্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯০৬, ক্রমিক সংখ্যা ১৬-২৫

১৯ আত্মকথা—বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রিয়রঞ্জন সেন অনূদিত, সাহিত্য একাদেমী, নিউ দিল্লি, ১৯৬৯, পৃঃ ৫৩-৫৬

২০ জেনারেল (এডুকেশন) ডিপার্টমেন্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯০৬, ক্রমিক সংখ্যা ৩১। বেলভিডিয়ারের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন—অর্থ ও সাধারণ বিভাগের সচিবদ্বয়, শিক্ষা অধিকর্তা, প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ জি. ডব্লিউ. কুচলার, বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, বাংলা বিভাগের কমিশনার, কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায়বাহাদুর সীতানাথ রায়, উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জী, নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমীর হোসেন, মহারাজা কুমার, স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, খানবাহাদুর মৌলভী সিরাজুল ইসলাম।

২১ ঐ। স্বয়ং ছোটলাট উপস্থিত সদস্যদের জানিয়েছিলেন : "...he had just received application from his own old school and from own University, asking for assistance in improving these institutions and that it was a thing to be expected that old students and pupils of the Hare School and Presidency College might be willing to assist in improving them."

২২ ঐ, ক্রমিক সংখ্যা ৩৭। ঐ ঘোষণায় বলা হয়েছিল : "... whereas it appears to the Lt. Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz. for the extension of the Presidency College, in the town of Calcutta, Pargana Calcutta, Zilla 24 Parganas, it is hereby declared that for the above purpose two plots of lands measuring, more or less, 21 bighas 16 cottahs, of standard measurement."
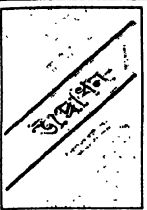
বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন'

তাপস বসু

'উদ্বোধন' তার গৌরবময় শতবর্ষ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। 'গৌরবময়' অবশ্যই, কিন্তু এই গৌরবময় কীর্তির পিছনে রয়েছে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার অনেক বিনিদ্র রজনী। রয়েছে প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অমানুষিক পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ। রয়েছে স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দের দূরদর্শিতা এবং দক্ষতা। রয়েছে পরবর্তী সম্পাদকদের অতন্দ্র প্রয়াস এবং নিষ্ঠা। রয়েছে 'উদ্বোধন'-এর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের একনিষ্ঠ সেবা, গ্রাহকবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা।

'উদ্বোধন'কে পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ভাবাদর্শকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বয়ং স্বামীজী কলম ধরেছিলেন। সে-কথা আমরা পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় (১০০তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, শারদীয়া ১৪০৫) উল্লেখ করেছি। স্বামীজীর সেইসব মৌলিক রচনা শুধু 'উদ্বোধন'-এরই অমূল্য সম্পদ নয়, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। সেগুলি শুধু বিষয়ের উৎকর্ষে নয়, ভাষার সৌকর্যেও নবযুগের সূচক। এপ্রসঙ্গে স্বামীজীর অভিমত ঃ "বাঙলা ভাষা স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম—যেদিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই সেই ভাষাই লোকে কয়।... যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাংলাদেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।" স্বামীজী 'কলকেতার ভাষা' অর্থাৎ কথ্য বা চলিত ভাষাকেই নবযুগের ভাষারূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, যদিও সাধু ও চলিত দুই গদ্যরীতিতে স্বামীজীর ভাষার ওজস্বিতা দেদীপ্যমান। চলিত ভাষায় তিনি যেমন উদাত্ত প্রাণবন্ত ও বৈদ্যুতিক গতিসম্পন্ন তেমনি সাধুভাষার ভাবগাম্ভীর্যের যথার্থ ধারক-বাহক। শেষপর্যন্ত চলিত ভাষাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সমকালীন সাহিত্যের প্রবহমানতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ সাধারণের মধ্যে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার তাগিদে। তাই আমরা তাঁকে বলতে দেখি ঃ "ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নতুন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb-এর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে।" এই সঙ্গে সাধুভাষা, তৎসম শব্দ-বহুল দীর্ঘ বাক্য গঠন ইত্যাদির বিরুদ্ধে স্বামীজী লেখেন ঃ "এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে-ভাষা, সে-শিল্প কোন কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা-শিল্প-সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দুহাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।"

এই পত্রাংশটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশের পর এদেশে চলিত ভাষায় সাহিত্যরচনার প্রয়াস শুরু হয় এবং বিশ বছরের মধ্যে সাধুভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪) -এর যুগ থেকে এই ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর আগে বিবেকানন্দই প্রথম চলিত ভাষাকে সচেতনভাবে সাহিত্যের আদর্শ ভাষার আসনে বসিয়েছিলেন। মননিষ্ঠ চলিত ভাষার মাধ্যমে বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনা করে চলিত ভাষার রাজপথটি উন্মোচন করে দিয়েছেন।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-পরিক্রমায় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসিডোনায় শেক্সপীয়ার সমিতিতে 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'জগতের মহত্তম আচার্যগণ' বিষয়ে যথাক্রমে ৩১ জানুয়ারি ১৯০০, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ এবং ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ইংরেজীতে তার অনুবাদ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল চতুর্দশ বছরের নবম, একাদশ ও দ্বাদশ ও ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দেই লস এঞ্জেলসে 'ঈশদূত যীশুখ্রীস্ট' বিষয়ে তিনি যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ ছাপা হয় পঞ্চদশ বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায়। মধ্যযুগ থেকেই 'অনুবাদ-সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে বাঙলায়। রামায়ণ, মহাভারত,

ভাগবত তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। স্বামীজীর লেখা বা বক্তৃতার অনুবাদ বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্যে নবতর সংযোজন। স্বামীজীর অগ্রন্থিত প্রবন্ধটির শিরোনাম—'অধিকারিবাদের দোষ'। বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহী ভক্ত-শিষ্যদের কাছে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এটি। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ সেটি লিখে রেখেছিল। 'উদ্বোধন'-এর পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় পূর্বোল্লিখিত শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। একসময়ে আমাদের সমাজের স্মার্ত বা স্মৃতির পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের যে অপব্যাখ্যা করেছিলেন সেসম্বন্ধে স্বামীজী যা জানিয়েছেন, বর্তমানের কৌতূহলী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তার নির্বাচিত কিছু অংশ তুলে ধরছি ঃ "প্রাচীন ঋষিগণের উপর আমি অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তিসম্পন্ন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহাদের দোহাই দিয়া যেভাবে লোকশিক্ষা জনসমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই শিক্ষাপ্রণালী আমি বিশেষ আপত্তিকর জ্ঞান করি। ঐসময় হইতে স্মৃতিকারেরা সর্বদাই 'ইহা কর', 'উহা করিও না' ইত্যাদি রূপে লোককে বিধি-নিষেধ দিয়া গিয়াছেন।... বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য বা যুক্তি তাঁহারা কখনোই দেন নাই। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া বড়ই অনিষ্টকর।

।। বাঙলা সাহিত্যের বিবর্তনে 'উদ্বোধন' ।।

'উদ্বোধন' পত্রিকার একশ বছরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে উল্লেখযোগ্য যেসকল লেখকের সন্ধান পাই তাঁরা হলেন—সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ, স্বামী তেজসানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী চেতনানন্দ, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা প্রমুখ এবং সাম্প্রতিককালের কয়েকজন নবীন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) প্রমুখ। বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, শিল্পী, ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, কাজী নজরুল ইসলাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সজনীকান্ত দাশ, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, 'বনফুল', প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দিলীপকুমার রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, কালিদাস রায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, কালিদাস নাগ, বিনয়কুমার সরকার, বিমানবিহারী মজুমদার, মোহিতলাল মজুমদার, এস. ওয়াজেদ আলি, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, কুমুদবন্ধু সেন, সুকুমার সেন, গণেশ ঘোষ প্রমুখ।

সেকালের ও একালের মহিলা কবি ও সাহিতিকদের মধ্যে আছেন—সরলাবালা সরকার, নীহারিকা দেবী, অনুরূপা দেবী, শেফালিকা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, বেগম সুফিয়া কামাল, আশাপূর্ণা দেবী, চিত্রা দেব, কবিতা সিংহ, বেলা দত্তগুপ্ত, রমা চৌধুরী, সান্ত্বনা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

আটত্রিশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' শিরোনামে বিখ্যাত কবিতাটি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ শ্রদ্ধার্ঘ্য। ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে বিশ্ববাসীর প্রণতি পৌঁছাল কেন ও কিভাবে তা অসাধারণ নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। তেতাল্লিশ বর্ষের নবম অর্থাৎ শারদীয়া সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি লেখা প্রকাশিত হয়—একটি কবিতা, অপরটি স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর কয়েকছত্র মন্তব্য। প্রকাশিত হয় পাতা জুড়ে আর্টপ্লেটে রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর চিত্রও। এই বছরের (১৯৪১) ২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি, যা 'উদ্বোধন'-এর জন্যই লেখা তা ব্লক করে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি রবীন্দ্র রচনাবলীতে 'পূজা' পর্যায়ের গানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটি হলো—"পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে/ তোমার পরশ আসে কখন কে জানে...।" স্বামীজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ সেই মন্তব্যটি হলো ঃ "বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি; বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সঙ্কীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে, সে-অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা। বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।" ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে স্বামী অশোকানন্দের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ স্বামীজী সম্পর্কে এই লেখাটি লিখেছিলেন।

একালের বিশিষ্ট লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইসাধন বসু, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নিশীথরঞ্জন রায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রণবরঞ্জন ঘোষ,

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, অনিলেন্দু চক্রবর্তী, শিশির কর, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নীরদবরণ চক্রবর্তী, জীবন মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ চক্রবর্তী, অমলেশ ত্রিপাঠী, হোসেনুর রহমান প্রমুখ।

'উদ্বোধন'-এ একশ বছর ধরে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, জীবনচরিত, ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। একটি উপন্যাস ও কয়েকটি গল্প প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির নাম 'ঝালোয়ার দুহিতা'। মীরাবাঈ-এর জীবন নিয়ে গিরিশচন্দ্রের ধর্ম-ইতিহাসমূলক এই উপন্যাসটি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সূচনাকালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন। গল্পগুলি হলো— 'বাঙ্গাল', 'গোবরা', 'বড় বউ' প্রভৃতি। এছাড়া আরো কয়েকজন লেখকের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে বিভিন্ন ধর্মমতের আলোচনা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে। এছাড়া সক্রেটিস, প্লেটো, হেগেল, মার্কস, ফ্রয়েড, বেন্থাম, মিল, হিউমের দর্শনের বিষয়ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অনূদিত 'শ্রীশ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্' প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দক্ষিণ ভারতে একটি সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে সংস্কৃতে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সংস্কৃত বক্তৃতাটি বাঙলায় অনূদিত হয়ে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী 'রাজযোগ' থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশের পাশাপাশি বিশেষভাবে উল্লেখ্য পণ্ডিত তর্কভূষণ-কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'বিবেকানন্দষ্টকম্'-এর অনুবাদ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ অনূদিত বিশিষ্ট ফরাসী সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁস-এর 'বুদ্ধবাণী' (ফরাসী ভাষা থেকে) শুধু অনুবাদই নয়, দুই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও প্রণতি নিবেদন।

।। বাঙলা ভ্রমণ-সাহিত্য ও 'উদ্বোধন' ।।

বাঙলা সাহিত্যের দুটি বিশিষ্ট শাখা হচ্ছে 'ভ্রমণ-সাহিত্য' ও 'চরিত-সাহিত্য'। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত ভ্রমণ-কাহিনী ও চরিত-সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের এই শাখাদুটিকে শুধু উজ্জ্বলতর করেনি, যুক্ত করেছে স্বতন্ত্র মাত্রাও।

স্বামী শুদ্ধানন্দ একজন দক্ষ অনুবাদকই ছিলেন না, ছিলেন শিল্প-সাহিত্য-সচেতন লেখক। তাঁর বহু কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী কালে তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকও হয়েছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের 'আমার তিব্বত ভ্রমণের একটি পরিচ্ছেদ' প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ-সাহিত্যের আঙিনায় পৌঁছে গেল 'উদ্বোধন'। এরপর দেশ-বিদেশের বহু ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায়। উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী ও লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে আসে স্বামী বিবেকানন্দের নাম। তাঁর 'পরিব্রাজক' রচনাটি শুধু ভ্রমণকাহিনী নয়, ইতিহাস ও সমাজদর্শনের গভীর ও মননঋদ্ধ আলোচনা রয়েছে এর মধ্যে। রচনাটি প্রথমে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' শিরোনামে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। শেষের দুটি কিস্তিতে এবং পরে 'পরিব্রাজক' শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া স্বামী প্রকাশানন্দের 'কাশ্মীরে অমরনাথ', স্বামী দিব্যাত্মানন্দের 'মণিমহেশ', প্রবোধচন্দ্র দে-র 'আসামের কথা', শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'দেরাদুন', স্বামী সুন্দরানন্দের 'ইলোরা ও অজন্তার পথে', স্বামী অপূর্বানন্দের 'কৈলাস ও মানস সরোবর', স্বামী নিরাময়ানন্দের 'চেরাপুঞ্জির চিঠি', স্বামী ধর্মেশানন্দের 'মীনাক্ষী ও কন্যাকুমারী', স্বামী দিব্যাত্মানন্দের 'উডিপি ও মূকাম্বিকায়', স্বামী শ্রদ্ধানন্দের 'কাবেরীর উৎসসন্ধানে', স্বামী আত্মস্থানন্দের 'ত্রিপুরায় কি দেখে এলাম', মুক্তি করের 'ইঙ্কাদের দেশ পেরুতে সাতদিন', সুনন্দা ঘোষের 'মহাভূত মহাতীর্থ' (দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি মন্দির পরিক্রমা), স্বামী চেতনানন্দের 'সাগরপারের এক দেবীতীর্থ', স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 'পাশ্চাত্যদেশে কিছুদিন', সুদীপ্তা সেনগুপ্তের 'আন্টার্কটিকা অভিযান' অজিতকুমার মাইতির 'যুগে যুগে প্রভাস', দিলীপকুমার দত্তের 'দেবীতীর্থ জ্বালামুখীর পথে', স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দের 'কুম্ভযাত্রীর ডায়েরী', স্বামী জিতাত্মানন্দের 'মহাশ্বেতা মায়াবতী', স্বামী অচ্যুতানন্দের 'মধু বৃন্দাবনে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নব্বই বর্ষপূর্তির পর বর্তমান সম্পাদক ভ্রমণকাহিনীগুলি 'পরিক্রমা' শিরোনামে ছবি-সহ প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করছেন। সংশ্লিষ্ট ভ্রমণকাহিনীগুলি পড়তে পড়তে আমাদের মানসভ্রমণও হয়ে যায়।

।। শিল্প-সংস্কৃতির আলোচনা ও 'উদ্বোধন' ।।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শিল্পসচেতন ও নান্দনিক চেতনার অধিকারী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিক্রমায় তাঁর এই চেতনা আরো সমৃদ্ধ হয়েছিল। জীবনের উপান্তে পৌঁছে ভারতীয় শিল্পকলার নব উত্থান-জাগরণ তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। সমকালীন ভারতীয় নানা শিল্পীর সঙ্গে তিনি এবিষয়ে আলোচনাও করেছেন। তাঁর দেহাবসানের পর নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পে নবজাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত পত্রিকা 'উদ্বোধন'-এ শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা থাকবে না, তা কি হয়? হয় না বলেই 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় শিল্পকলা নিয়ে বিশিষ্ট শিল্পী ও ইতিহাসবেত্তার যেসকল রচনা বেরিয়েছে তা বিগত একশ বছর অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বের হয়নি— একথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি। সেই লেখাগুলি এই

প্রজন্মের শিল্পীদের চলার পথের দিশারী। লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ।

।। লোকসংস্কৃতি-সাহিত্য ও 'উদ্বোধন' ।।

শ্রীরামকৃষ্ণের এক বড় পরিচয় তিনি লোকশিল্পী। গ্রামীণ জীবনে লোকসংস্কৃতির নির্যাস তাঁর চালচলন, কথাবার্তায় গভীরভাবে পরিস্ফুট। রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ প্রসারে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা তাই অপরিসীম। 'উদ্বোধন' পত্রিকার নব্বই-এর দশকে বর্তমান সম্পাদক গুরুত্ব দিয়ে 'লোকসংস্কৃতি' শিরোনামে পৃথক বিভাগে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, আগে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মস্থান সংক্রান্ত লৌকিক ছড়া', কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর 'বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী প্রসঙ্গ', সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকসংস্কৃতি' প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে স্বপন রায়ের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক মেলার ওপর বেশ কয়েকটি রচনা।

।। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ও 'উদ্বোধন' ।।

'উদ্বোধন' পত্রিকার সূচনা পর্বে 'সম্পাদকীয়' (যা এখন 'কথাপ্রসঙ্গ'রূপে সর্বজনবিদিত) লেখা হতো না। থাকত স্বামী ব্রহ্মানন্দের লেখা 'পরমহংসের উপদেশ'। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। দশম বর্ষের একাদশ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ'। স্বামীজীর 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় এবং 'বাঙ্গালা ভাষা' নিবন্ধটি দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার লস এঞ্জেলস থেকে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে লেখা পত্রটি সূচনা-প্রবন্ধরূপে ঐ নামে ছাপা হয়। 'প্যারিস প্রদর্শনী' ('ভাববার কথা' সঙ্কলনে 'প্যারি প্রদর্শনী' শিরোনামে প্রকাশিত) প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের কুড়ি সংখ্যায়। 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যায়। 'গাই গীত শোনাতে তোমায়' কবিতাটি প্রকাশিত হয় পঞ্চম বর্ষের নবম সংখ্যায়। স্বামীজীর মৌলিক বাঙলা রচনা ছাড়া স্বামী শুদ্ধানন্দ নানা ইংরেজী রচনার অনুবাদ করে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করেন। অনূদিত রচনাগুলির মধ্যে আছে—'মানুষের যথার্থ স্বরূপ', 'বহুত্ব ও একত্ব', 'কর্মজীবনে বেদান্ত', 'পত্রাবলী', 'জ্ঞানযোগ', 'সন্ন্যাসীর গীতি', 'ভারতীয় রমণী'।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় সংশ্লিষ্ট রচনাগুলির গুরুত্ব অপরিমেয়। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'অবতারবরিষ্ঠ', স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের 'বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ', স্বামী ভূতেশানন্দের 'স্বামী বিবেকানন্দ : বিশ্বশান্তি ও আধুনিক বিজ্ঞান', রেজাউল করিমের 'ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দান', নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্রের নাট্যসঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ', জলধিকুমার সরকারের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি', শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ মন্দির', 'বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ', 'সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ', প্রণয়বল্লভ সেনের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ', সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ', সান্ত্বনা দাশগুপ্তের 'কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ : আধুনিক মননে ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে', প্রণবরঞ্জন ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার', স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের (ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য) 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ই. টি. স্টার্ডি', অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত : ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে', অমিয়কুমার হাটীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধুনিক বিজ্ঞান', ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙলা কাব্যসাহিত্যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ', জ্যোতির্ময় বসুরায়ের 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ', আবুল হাসানতের 'বিবেকানন্দের ইসলাম ভাবনা', শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দ দর্শনে মানবসত্তা ও মানবিকতাবাদ', আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে বাঙলা সাহিত্য', গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চা ও নবজাগরণ', সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গিরিশ সাহিত্যের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ', অনিলকুমার চক্রবর্তীর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে কবিত্ব', তারকনাথ ঘোষের 'যুগধর্ম : শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য', স্বামী আত্মস্থানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ : এক নতুন ধর্মের প্রবক্তা', স্বামী প্রভানন্দের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে কাশীপুর উদ্যানবাটীর তাৎপর্য', অমিয়কুমার মজুমদারের 'সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র', উদয়কুমার চক্রবর্তীর 'বাঙলা ভাষা : বিবেকানন্দের গদ্য', ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষালের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নারীসমাজ', নির্মলকুমার রায়ের 'পুরানো কলকাতার পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ', নিশীথরঞ্জন রায়ের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা', পূর্বা সেনগুপ্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ : এক নতুন অস্তিবাদের প্রবক্তা', বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দের নান্দনিক ভাবনা', হরপ্রসাদ মিত্রের 'বাঙলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যতা', সুকুমার সেনের

'স্বামীজীর বাঙলা রচনা', প্রেমবল্লভ সেনের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে নবযুগের বাণী প্রভৃতি।

এই তালিকায় বিষয়বৈচিত্র্যও নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয়।

।। বাঙলা চরিত বা জীবনীসাহিত্য ও 'উদ্বোধন'।।

চরিত সাহিত্যের মধ্যে নানা বিভাজন আছে—আত্মচরিত, জীবনচরিত, স্মৃতিকথা। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ'কে 'Hagiography' বা সাধু-সন্তের জীবনীরূপে চিহ্নিত করা চলে। 'উদ্বোধন'-এর পাতায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'রামানুজচরিত' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলা জীবনচরিত-রূপে এটি একটি অনবদ্য রচনা। শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের নিয়ে নানা 'স্মৃতিকথা' 'উদ্বোধন'-এর পাতায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো নিয়মিত হচ্ছে।

।। চরৈবেতি।।

নব্বইতম বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটে। প্রচ্ছদপট থেকে অন্তর্পটে পরিবর্তনের শত-সহস্র স্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে তখন নবীন সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। আধুনিক মুদ্রণ বিপ্লবের যুগে 'উদ্বোধন' সমকালীন প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকার জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে গিয়ে লন্ডন থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে যে-চিঠি (১০।৮।১৮৯৯) লিখেছিলেন, তাতে 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক, পাঠক ও লেখকের অভাব এবং আর্থিক সঙ্কটের কথা তুলে ধরে আক্ষেপ প্রকাশ করছিলেন। প্রায় শতবর্ষ পর 'উদ্বোধন' পত্রিকা আজ নতুন যৌবনে সজ্জিত। গ্রাহকসংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হাজার। পাঠকসংখ্যা কম করে দু-লক্ষ। নানা বিষয়ে লেখবার জন্য লেখকেরা 'উদ্বোধন'-এর দপ্তরে হাজির। বিদগ্ধ লেখকদের পাশাপাশি নবীন লেখকদের লেখাও প্রকাশিত হচ্ছে। পাঠকদের কাছে হয়ে উঠছে আকর্ষণীয়। স্বামীজীর আদর্শে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা আরো বেশি খুলে গিয়েছে। অর্থসঙ্কটের সমাধান শুধু হয়নি, আপৎকালীন প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তৈরি হয়েছে বিশেষ তহবিল। বেড়েছে কর্মীর সংখ্যা, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চালু হয়েছে কম্পিউটার। ভারতবর্ষের নানা স্থানে দশটি গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বাংলাদেশ ও আমেরিকাতেও 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্র রয়েছে। পত্রিকার ভাষা, বানানবিধিতে লেগেছে পরিবর্তিত পরিবর্ধিত আধুনিকতার ছোঁয়া। স্বামীজী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে জানিয়েছিলেন ঃ "এই পত্রের ভাব ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।" শতবর্ষে 'উদ্বোধন' ভাব, ভাষা এককথায় বলতে গেলে সবদিক থেকে 'নূতন ছাঁচে' গড়ে হয়ে উঠেছে তিলে তিলে তিলোত্তমা। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, বিনা পয়সায় 'উদ্বোধন' ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন লক্ষাধিক সংখ্যা ছেপে। স্বামীজীর সেই অভীপ্সা পূর্ণ হয়নি ঠিকই, তবে গ্রাহকদের কাছ থেকে যে-অর্থ বর্তমানে নেওয়া হয় তা সাম্প্রতিক কালে চালু প্রথম শ্রেণীর যেকোন সাময়িক পত্র-পত্রিকার তুলনায় যৎসামান্যই। লক্ষাধিক সংখ্যা এখনো ছাপা না হলেও এখন প্রতিটি সংখ্যা প্রায় অর্ধলক্ষ কপি ছাপা হচ্ছে এবং যেভাবে 'উদ্বোধন'-এর জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে তাতে অল্পদিনেই স্বামীজীর আশা বাস্তবায়িত হবে—এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে যে-পত্রিকা গৌরবের সঙ্গে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, সৃষ্টি করেছে অনন্য নজির--সেই পত্রিকার সঙ্গে নানাভাবে, নানা কাজে যুক্ত হয়ে আসুন আমরা সকলে স্বামীজীর কথায় "ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) সেবা" নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করি এবং আগামী দিনে 'উদ্বোধন'-এর শত-সহস্র বছরে উত্তরণের অতিক্রমণের পথটি প্রশস্ত করে তুলি।❑

হোমারের মহাকাব্য 'ওডেসি'র নায়ক ইউলিসিস—গ্রীক ভাষায় ছিল 'ওডিসিয়ুস', রোমান ভাষায় হলো 'ইউলিসিস'। ট্রয়ের যুদ্ধ জয়ের পর ইউলিসিস তার অবশিষ্ট সৈন্য আর নাবিকদের নিয়ে সমুদ্রপথে ফিরছে তার রাজ্য ইথাকার দিকে। পথে অসংখ্য বিপদ জয় করতে করতে তার প্রত্যাবর্তন। ইউলিসিসের চরিত্র, তার শৌর্য, বীরত্ব, বুদ্ধি যুগে যুগে ইউরোপীয় সাহিত্যে অনেক নতুন সৃষ্টির জন্ম দিয়েছে আড়াই হাজার বছর ধরে। তার চরিত্রের এক-একটি দিক তুলে ধরে সমসাময়িক সাহিত্য রচিত হয়েছে। সর্বশেষ হচ্ছে জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস'—যা এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

ট্রয় থেকে ইথাকার পথে ইউলিসিসকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাইরেনদের দ্বীপ। সেই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাবিকরা দেখে, সুন্দরী মেয়েরা দ্বীপের ওপর বসে আছে আর গান করছে। গানগুলির মধ্যে আছে যুগ যুগ ধরে নারীর প্রেমের আকুতি, বেদনা, কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে কাছে পাওয়ার বাসনা। তাদের রূপ এবং গান এমন আকর্ষক যে, কোন পুরুষ সে-ডাককে উপেক্ষা করতে পারে না, সে-ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না। তারা প্রেমে আকুল হয়ে জাহাজ ঘুরিয়ে সেই দ্বীপে গিয়ে ওঠে এবং ঐ মেয়েদের দিকে ছুটে যায়। একেবারে কাছে গিয়ে তারা দেখে, মেয়েগুলির ঊর্ধ্বাঙ্গই খালি সুন্দর, কিন্তু দেহের নিম্নাংশটা পাখির মতন এবং তাদের দুই পায়ে তীক্ষ্ণ নখ। মুহূর্তের মধ্যে সেই নখের আঘাতে নাবিকদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় আর তাদের হাড়গোড়গুলো দ্বীপের ওপর কঙ্কালের স্তূপ বৃদ্ধি করে।

এর আগে সার্সির দ্বীপে যাদুকরী সার্সিকে ইউলিসিস প্রেম দিয়ে জয় করে এবং সার্সি তার অনুরাগিণী হয়ে পড়ে। সার্সি ইউলিসিসকে সাইরেনদের দ্বীপ সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়। বলে যে, গান না শুনলে শুধু চোখের দেখাতে কোন বিপদ নেই। কাজেই সকলের কানের ফুটো মোম দিয়ে বন্ধ করে দিলেই কেউ আর শুনতে পাবে না। দ্বীপটা পার হয়ে

গিয়ে কান থেকে মোম খুলে ফেললেই আর কোন বিপদ থাকবে না। ইউলিসিস তার লোকজনের জন্য এই উপদেশ মেনে নিলেও নিজের কান বন্ধ করতে অস্বীকার করে। কী এমন রূপ, কী এমন গান তা তাকে দেখতেই হবে, শুনতেই হবে, ভয় পেয়ে পাশ কাটিয়ে কেন যাবে! সার্সির বারণ সত্ত্বেও ইউলিসিস তার নাবিকদের বলল ঃ "আমাকে মাস্তুলের সঙ্গে এমন শক্তভাবে বেঁধে রাখ যাতে কিছুতেই না খোলা যায় আর আমি যতই হাত-পা ছুঁড়ি না কেন, পরের গন্তব্যস্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই বাঁধন তোমরা খুলবে না।" এই বলে সে নাবিকদের কানের ফুটো মোম দিয়ে বন্ধ করে দিল আর নাবিকরাও তাকে মাস্তুলের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিল। ইউলিসিস সাইরেনদের গান শুনে প্রচণ্ড

বীরত্ব অথচ নিজের লক্ষ্য ইথাকাতে ফিরে যাওয়া থেকে বিচ্যুত না হওয়ার মানসিকতা অনেককেই ছোটবেলা থেকে প্রভাবিত করেছে। আমাদের সকলের জীবনই তো একটা যাত্রা। তার নানারকম বাধাবিঘ্ন বীরত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করা, লক্ষ্য স্থির করা এবং কিছুতেই সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হওয়া—এই নিয়েই তো জীবন। আর পৃথিবীতে আস্বাদন করার জিনিস কত বিচিত্র, কত বিস্তৃত! এস্কিমোর ইগলু থেকে আরব বেদুইনের তাঁবু, আমাজনের জঙ্গল থেকে সুসভ্য ইউরোপ—জীবনের কী বিরাট বিস্তৃতি! কতরকম সংস্কৃতি, কতরকম সংস্কার! এই বিরাট সম্পদ আস্বাদন করব অথচ কোথাও জড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাব না—এই সংস্কারহীন বীরত্ব এবং একই সঙ্গে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতা কি

রিওর কোপাকাবানা সমুদ্রসৈকত আলোকচিত্র ঃ লেখক

উত্তেজিত হলেও বাঁধন ছিঁড়তে পারল না এবং প্রচণ্ড মনের জোরে সম্বিতও হারাল না। সেই একমাত্র জীবন্ত পুরুষ যে সজ্ঞানে সাইরেনদের গান উপভোগ করে ফিরে গেল এবং ইউলিসিসকে ধরতে না পারার প্রচণ্ড ক্রোধে সাইরেনরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেল।

সব মহাকাব্যের কোন না কোন চরিত্রে মানুষ তার নিজের জীবন ও মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। তাই সেগুলি 'মহাকাব্য' হয়। আবার মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকার মধ্যে মানুষ খোঁজে তার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে। রূপকের মাধ্যমে মহাকাব্যের কাহিনী মানুষকে উপদেশ দেয়, মানুষের চরিত্র গড়ে তার মনের অজান্তে। মানুষ শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক, তার আবেগগুলি মনের গভীরে গেঁথে থাকে। ইউলিসিসের সম্পূর্ণ নির্ভয় দেবতাবিদ্রোহী রূপ, বিপদের মুখে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে চিনে নেওয়ার বাসনা, এই পৃথিবীর যত রূপ রস গন্ধ আছে তা নির্ভয়ে আস্বাদন করার

কোন মানুষে সম্ভব? নিজেকে ক্রমাগত যাচাই করতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে দিগ্বিজয়ে বেরতে, দেখতে যাদুকরী, কুহকিনী। আজও এরা আছে অন্যরূপে। প্রত্যেক ভ্রমণই তো আসলে মনের ভ্রমণ।

বসে আছি ব্রাজিলের প্রধান শহর ও এককালের রাজধানী রিও ডি জেনিরোর—সংক্ষেপে 'রিও'-র বিখ্যাত কোপাকাবানা সমুদ্রসৈকতে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিশাল 'বীচ' প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার লম্বা। বীচের পাশ দিয়ে প্রশস্ত রাজপথ। সমুদ্র ও রাস্তার মাঝখানে চওড়া 'প্রমেনাদ' বা পায়ে হাঁটার রাস্তা। রাস্তার ওপাশে বড় বড় বিলাসবহুল হোটেল। আসলে সমস্ত রিও শহরটাই একটা বিশাল বীচ রিসর্ট, মেজাজটাও সেইরকম। পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝের সমতলভূমিতে স্থাপিত শহরটি অপূর্ব সুন্দর। উঁচু পাহাড়-গুলির তিন দিক ঘিরে সমতল উপত্যকায় সাজানো শহর। সমুদ্রের মাঝেও ইতস্তত উঠে আছে ছোট ছোট পাহাড়ে দ্বীপ।

সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কর্কোভার্দ-এর ওপরে যীশুখ্রীস্টের বিশাল মূর্তি—দুদিকে দুহাত প্রসারিত করে রিও শহরকে আশীর্বাদ করছেন! অনেকগুলো বীচ আছে রিওতে, তার ভিতর কোপাকাবানাই সবচেয়ে বিখ্যাত। সমস্ত রিও শহরটাই সমুদ্রের বীচে আর প্রমেনাদ থেকে সমুদ্র দেখার ভিড় সকাল, সন্ধ্যায় ও ছুটির দিনগুলিতে। ছুটির দিনগুলিতে সমুদ্রের ধারের রাস্তায় গাড়ি চালানো বারণ—সবটা জুড়েই লোকের মেলা আর হৈহুল্লোড়। বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন রকমের চেহারার পুরুষ ও নারী। সকলেই স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর।

রিওর কার্নিভাল বিখ্যাত, কিন্তু দেখে মনে হয় সবসময়ই কার্নিভাল চলছে। কেউ হাঁটছে, কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ বীচের ওপর ভলিবল অথবা বীচ ফুটবল খেলছে, কেউ সমুদ্রে স্নান করছে। কিছু লোক আবার প্রমেনাদের ওপর একশ মিটার অন্তর রাখা ছোট ছোট চালাঘরের মতো দোকান বা কিওস্কের চারপাশে বসে আড্ডা দিচ্ছে। এই দোকানগুলিতে পাওয়া যায় ঠাণ্ডা পানীয়, ডাব ও টুকিটাকি খাবার। পানীয়র ভিতর কোকাকোলা ইত্যাদি ঠাণ্ডা পানীয় যেমন আছে, তেমন আছে ব্রাজিলের প্রিয় পানীয় কাইপেরিয়া। কাইপেরিয়া তৈরি হয় ব্রাজিলের জাতীয় পানীয় কাশাসা থেকে। কাশাসা হয় আখের রস থেকে। কাশাসার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চিনি, পাতিলেবুর রস, টুকরো বরফ ও সোডা মিশিয়ে তৈরি হয় 'কাইপেরিয়া'। খেতে অপূর্ব, কিন্তু দুখানা পরপর খেলেই একেবারে 'ব্রহ্মদর্শন'—চিনি ও আখের রসের কল্যাণে!

'ব্রহ্ম'-এর কথায় মনে পড়ে গেল, ব্রাজিলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত পানীয়ের নাম 'শপ দ্য ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম-এর জল। 'ব্রহ্ম' ব্যাপারটা মোটেই কাকতালীয় নয়। অনেক গাড়ির পিছনের কাচে 'ॐ' স্টিকার লাগানো। এই চিহ্নটি মঙ্গলসূচক চিহ্ন বলে মনে করা হয়। এ যেন একেবারে 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' এই ব্রহ্মকে খুঁজতে খুঁজতেই দেশটার আত্মার খোঁজ পেলাম, সেকথা আরো পরে। ব্রাজিলে সাদা-কালোর বিভেদ ঘুচে গেছে এবং এতটাই গেছে যে, কয়েকশ বছরে আমাদের বাঙালী মানসিকতায় ততটা ঘোচেনি। এদের ভাষা পর্তুগীজ। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী অনেকে বলতে পারে, তবে সবাই নয়। উচ্চশিক্ষিতরা বলতে পারে, তবে উচ্চারণে প্রচুর পরিমাণে পর্তুগীজ টান—আমেরিকান আর পর্তুগীজের মিশ্রণ। অবশ্য উচ্চশিক্ষিত হলেই যে ইংরেজী বলবে, এমন নয়। কাজেই ভাষাতেও এদের কোন প্রভেদ নেই।

বাকি রইল অর্থ। আর্থিক দিক দিয়ে ব্রাজিলের অবস্থা ভারতের থেকে সামান্য ভাল, তবে বিশেষ ভাল নয়। ব্রাজিলীয় ডলারের দাম আমেরিকান ডলারের চেয়ে একটু বেশিই—একশ আমেরিকান ডলারে একশ এক ব্রাজিলীয় ডলার। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম আগুন, সাধারণ লোক অত রোজগার করে না। চাকরির বাজার খারাপ, প্রচুর বেকার ও শিক্ষিত বেকার। ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি পড়া বেকারও অনেক। ম্যানেজমেন্ট-পড়া এক বড়লোকের সন্তান আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ম্যানেজমেন্ট পড়তে যাচ্ছে অনেক খরচ করে। তাকে বললাম ঃ "আর কি, তুমি তো আমেরিকায় বড় চাকরি পেয়ে যাবে।" সে বলল ঃ "ভগবান করুন, তোমার কথা যেন সত্যি হয়! এখানে তো কিছুই নেই।" সাধারণ লোকের রোজগার ও চাকরি পর্যটনকেন্দ্রগুলির বাইরে খুবই কম। রিওর মতো বড় শহরেও প্রচুর বস্তি। সেগুলো বিলাসবহুল শহরের সীমানায় আলাদাভাবে রয়েছে—কোথাও কোথাও পাঁচিল দিয়ে

রিওতে যীশুখ্রীস্টের মূর্তি আলোকচিত্র ঃ লেখক

আলাদা করা। সেখানে গায়ে গায়ে গজিয়ে ওঠা ঘিঞ্জি বাড়িঘর, তবে সবই পাকা। বাড়ির মাথায় মাথায় প্রচুর অ্যান্টেনা। রাস্তায় কখনো-সখনো পুরনো মডেলের গাড়ি। রাজনৈতিক সংঘাত বিশেষ নেই। বড়লোক অঞ্চল থেকেই বস্তি অঞ্চলের ভরণপোষণ চলে। আর আছে পর্যটকের ভিড়। তারা না এলে সকলেরই অসুবিধা। কিন্তু ছিনতাই, রাহাজানি খুব। 'খুব' বলছি অবশ্য আমেরিকানদের দৃষ্টিকোণ থেকে। তারা তো রিও শহরের রাস্তায় পা রাখতেই ভয় পায়। পা রাখলেও পাসপোর্ট, টাকা সব হোটেলের লকারে বন্ধ করে রাখে। সাধারণ লোক আমেরিকানদের বিশেষ পছন্দ করে না, তবে তাদের টাকার দিকে নিশ্চয় নজর আছে।

আমাদের অবশ্য কোন ভয় নেই—ভারতীয় হিসাবে আমরা স্বাগত, সম্মানিত। ভারতীয় কৃষ্টিকে, সংস্কৃতিকে এরা শ্রদ্ধা করে। রিও শহরের মাঝখানে গান্ধীজীর মূর্তি আছে। লেনিনের মূর্তি কোথাও চোখে পড়েনি। আরেকজনের মূর্তি আছে বলে শুনেছিলাম, কিন্তু খুঁজে পেলাম না। তিনি হচ্ছেন বাঙালী বীর কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, যিনি ব্রাজিলের স্বাধীনতা-যুদ্ধে বীরত্ব ও নেতৃত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কজন বাঙালীই বা তাঁর নাম জানে? কিন্তু এখানে নানা জনে নানা কারণে ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করে। যেমন এক ভদ্রমহিলা বললেন ঃ "ভারতকে আমি শ্রদ্ধা করি, কারণ তারা যত গরিবই হোক না কেন, নিজের সন্তানকে কখনো ফেলে দেয় না, অনাথ করে দেয় না।" আমি বললাম ঃ "সেকি! আপনাদের এখানে বাবা-মা বেঁচে থাকতে সন্তান অনাথ হয় নাকি?" তিনি বললেন ঃ "হয় না আবার! ভীষণ হয়, খুব হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের হার আমাদের খুব বেশি, আর বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে অনেক বাবা-মাই সন্তানের দায়িত্ব আর নিতে চায় না। ভরণপোষণ হয়তো কোনরকমে চলে, কিন্তু তারা বাবা-মাকে পায় না, শিক্ষা পায় না।" বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে বাবা-মা নতুন জীবন রচনায় মেতে ওঠে। সেখানে সন্তান হলো পথের কাঁটা—সবদিক দিয়েই, আর্থিক দিক দিয়ে তো বটেই। অবশ্য সবটাই এরকম নয়। কোথাও কোথাও পারিবারিক জীবন সুসংবদ্ধ, বিশেষ করে ছোট শহরে এবং যাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব একটু বেশি তাদের মধ্যে।

অনেকের বাড়ি গেছি। বাড়ির চেহারা সাজানো গোছানো। খুব অতিথিবৎসল এরা। আত্মীয়স্বজন নিয়ে হৈহৈ করে থাকতে ভালবাসে। অনেকটা আমাদের মতো—মনে হয় যেন কলকাতাতেই বসে আছি! একে অন্যের বাড়িতে ছুটির দিনে যখন-তখন আড্ডা দিতে চলে যায়, আমেরিকা ইউরোপের মতো ফোন করে যেতে হয় না। গৃহস্বামী হয়তো খালি গায়ে বসে আছেন, লাফিয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। গিন্নি হয়তো বললেন ঃ "গায়ে একটা কিছু চড়াও।" "আরে হবে হবে, আগে বাড়িতে কি আছে বল, সবাই মিলে একটু রান্নাবান্না করা যাক। কাইপেরিয়া তো তৈরি করাই আছে।" —কর্তার উত্তর। খুব ভাল লাগে। মনে হয় যেন নিজের দেশেই আছি, কিন্তু ভাষার দুস্তর ব্যবধান।

এক ভদ্রলোকের বাড়ি গেছি, ছুটির দিন দুপুরবেলা। ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক। ছেলেরা সবাই খালি গায়ে, মেয়েরা সব আমাদের মেয়েদের মতো ঢোলা ঢোলা ম্যাক্সি পরে রয়েছে। আমি বাঙালী শুনে ভদ্রলোক তাঁর রোমশ বুকে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরে "কে এসেছে দেখ, কে এসেছে দেখ" বলতে বলতে বাইরের ঘর থেকে শোওয়ার ঘর হয়ে একেবারে রান্নাঘরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে মেয়েরা রান্না করছে, অনেকগুলি মেয়ে। হৈহৈ করে পরিচয় করাতে লাগলেন ঃ "এই আমার বৌ, আমার মেয়ে, পাশের বাড়ির মেয়ে, এ মেয়ের বন্ধু, ওরা দুজন আমাদের বাড়িতে কাজ করে।" পরিচারিকা আর মেয়ের মধ্যে তফাৎ করা মুশকিল। একমাত্র শিক্ষার ছাপ ছাড়া। সব কথাই হলো আরেক বন্ধু যে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, তার মাধ্যমে। কারণ, ইতিহাসের অধ্যাপক ভদ্রলোক একবর্ণ ইংরেজী বলতে পারেন না। রাজনৈতিক, সামাজিক আদর্শে বামপন্থী, আমার সঙ্গে আলোচনা করার খুব ইচ্ছা। বারবার 'গ্লোবালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন' বলে আঙুল নেড়ে 'না না' বলছেন আর গলায় হাত লাগিয়ে গলাকাটার ভঙ্গি করছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকিত হাসির হররা। একমুহূর্তে আত্মীয়তা!

ব্রাজিলের বড় বড় শহর ও তৎসংলগ্ন শিল্পাঞ্চলের বাইরে প্রত্যন্ত গ্রামে প্রচণ্ড দারিদ্র্য। টিভিতে দেখছিলাম এক খরাপীড়িত গ্রামাঞ্চলের ছবি। লোকে না খেতে পেয়ে মরছে। যাকিছু রিলিফ দিচ্ছে এন.জি.ও.-রা বা বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি। বহু দূরের জায়গা প্লেন ছাড়া যাওয়া যায় না। একজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী অনাহারে মৃত শরীর দেখে কাঁদছে। সরকারি সাহায্য সামান্যই। গ্রামের অধিবাসীদের চেহারায় রেড ইন্ডিয়ান ছাপ বেশি—দো আঁশলা মতো। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক জায়গার মতো রেড ইন্ডিয়ানরা ব্রাজিলের জনজাতির সঙ্গেও মিশে গেছে, আমেরিকার মতো তাদের আলাদা করে রাখা হয়নি। তবুও প্রধানত ইউরোপীয় লোকজনেরা একটু আলাদাই থাকে। বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া যায় প্রচুর—তারা সবাই প্রায় মিশ্র।

সংস্কৃতিতে এরা দক্ষিণ ইউরোপীয়। মিশ্র জনগোষ্ঠী, সাদা-কালো ও রেড ইন্ডিয়ান সব মিশিয়ে ফেলেছে, কোন বর্ণবিদ্বেষ নেই। ভাষা একটাই—পর্তুগীজ। দেশটার আয়তন ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই গুণ। খনিজ ও বনজ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। লোকসংখ্যা মাত্র ষোল কোটি। যেখানে আমাদের বর্তমানে তিরানব্বই কোটি! আবহাওয়া চমৎকার —অনেকটা আমাদের দেশের মতো, চাষবাসের খুবই অনুকূল। শীতের দেশের ফল যেমন এখানে আছে, তেমন আছে আমাদের দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া আম, মর্তমান কলা, তরমুজ, ফুটি—অসংখ্য রকমের। গাছ পুঁতলেই গজায়,

বিশেষ পরিচর্যা ছাড়াই। আমরা তো জানি, জনসংখ্যার চাপের জন্যই আমরা গরিব। কিন্তু এদের তো জনসংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও দারিদ্র্য। আর বিদেশ থেকে নতুন আগন্তুক নেওয়াই হয় না। সামরিক ব্যয় বিশেষ নেই, কারণ সীমানায় যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা প্রায় কিছুই নেই। এককালে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সম্ভাবনা ছিল, তা এরা নিজেরাই বর্জন করেছে। যে দু-একটি বাঙালী পরিবার ব্রাজিলে এখন বসবাস করে তারা সবাই নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের লোক—অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত।

এখানকার জনসাধারণের শিক্ষা ও সৃজনশীলতাও কিছু কম নয়। অনেক নতুন আবিষ্কার এই দেশ থেকে হয়েছে। ব্রাজিলে প্রচুর আখের চাষ হয়, আর তা থেকে তৈরি হয় অ্যালকোহল। খুবই সস্তা। তাই ব্রাজিলীয়রা মোটরগাড়ির ইঞ্জিন পেট্রলের বদলে অ্যালকোহলে চলার মতো পরিবর্তন করে নেয়। সেই প্রযুক্তি নিয়ে জার্মানির ভোক্সওয়াগেন কোম্পানি প্রথম এখানে মোটরগাড়ির কারখানা বানায়, যাতে পেট্রলের বদলে অ্যালকোহলে গাড়ি চলে। তারপরে অন্যান্য কোম্পানি—যেমন ফোর্ড এখানে অ্যালকোহলে চলা গাড়ির কারখানা বসায়। এখন ব্রাজিলে যেকোন পেট্রল পাম্পে গেলে দুরকম পাম্প দেখা যায়—পেট্রল ও অ্যালকোহল, আমাদের দেশের মতো পেট্রল আর ডিজেল নয়। ফলে ব্রাজিলে খুব সস্তায় গাড়ি রাখা যায়। অ্যালকোহলে চলা গাড়ি বেশ ভাল চলে, বেশ জোরে যায়। আমি তাতে চড়েছি, চালিয়েওছি। পেট্রলের থেকে তফাত করা যায় না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানেও ব্রাজিলের অনেক নতুন আবিষ্কার আছে। কিন্তু নিজেদের আবিষ্কার এরা সব আমেরিকান কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয়। নিজেরা 'মাস প্রোডাকসন' করে না বা আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়ে না। আমার নিজের বিষয় সার্জারি বা শল্যচিকিৎসায় এখানে দুই প্রজন্ম ধরে বড় বড় অধ্যাপক এসেছেন। তাঁদের উদ্ভাবিত অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসা-পদ্ধতি তাঁদের বিশ্ববিখ্যাত করেছে। আমার পরিচিত এক ব্রাজিলীয় শল্যচিকিৎসক হৃৎপিণ্ডের কৃত্রিম ভালভের একটি ডিজাইন আবিষ্কার করে 'পেটেন্ট' করেন এবং এক আমেরিকান কোম্পানিকে তার আন্তর্জাতিক স্বত্ব বিক্রি করেন। তাঁর কয়েক বর্গ কিলোমিটার জমি নিয়ে একটি প্রকাণ্ড খামারবাড়ি আছে। তাতে আখের চাষ হয় এবং অ্যালকোহল তৈরি হয়। খামারের ভিতর একটি 'রানওয়ে' আছে। ভদ্রলোকের একটি ছোট প্লেন আছে যেটা অ্যালকোহলে চলে। নিজের প্লেন নিজের তৈরি অ্যালকোহলে চালিয়ে তিনি শহরে যান ডাক্তারি করতে। তিনি আমাকে একটা গুপ্ত ছুরি উপহার দিয়েছিলেন, যা বাইরে থেকে ছুরি বলে চেনা যায় না। আমাকে সবসময় ওটি সঙ্গে রাখতে বলেছিলেন, কারণ কখন দরকার হয় বলা যায় না!

কর্কোভার্দ পাহাড়ের ওপর থেকে রিওর দৃশ্য আলোকচিত্র ঃ লেখক

এর থেকেই ব্রাজিলীয় সমাজের চেহারা হয়তো কিছুটা বোঝা যাবে। কিন্তু এরকম একটা দেশ দরিদ্র হবে কেন? এদের তো পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশগুলির অন্যতম হওয়া উচিত। প্রশ্ন করলাম একজন উচ্চশিক্ষিত বন্ধুকে। সে বলল ঃ "দুর্নীতি। আমাদের সমাজ ও সরকারের আষ্টেপৃষ্ঠে শুধু দুর্নীতি। এত দুর্নীতি যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমাদের সমস্ত খনিজ সম্পদ কাঁচামাল হিসাবে নিয়ে যায় জাপান ও আমেরিকা, আর এখানে বিশ গুণ দামে আসে বিদেশে প্রস্তুত জিনিস—'ফিনিশড গুডস'। কিরকম দুর্নীতি জান? আমার গ্রামের বাড়ির লাগোয়া জমিতে আমি দু-চারটে ছোট ছোট কটেজ করতে চাইলাম ছুটির সীজনে ভাড়া দেব

বলে, অবসরের পরে যাতে সংসারটা একইরকমভাবে চলে। তার ওপর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ছেলেটা বেকার বসে আছে, আর বিয়েও করেছে। তা শুধু অনুমতি দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকারি মহল কত ঘুষ চাইছে জান? পঞ্চাশ হাজার ডলার। অত টাকা পাব কোথায়, আর পেলেও বাড়িভাড়ায় কি আর তা উঠবে? অথচ জমিটা বিক্রি করার উপায় নেই, কোন ক্রেতা নেই। কারুর হাতে টাকা নেই। সবটা গলায় ঝুলে রয়েছে।" এরকম একটা সৃজনশীল সমাজে এত দুর্নীতি কেন? সমস্তরকম সম্পদ নিজের ঘরেই থাকা সত্ত্বেও এরা কেন আমেরিকা, জাপান, জার্মানির মুখাপেক্ষী, তাদের দ্বারা শোষিত, তাদের প্রমোদের জায়গা?

কোপাকাবানার সমুদ্রসৈকতে একটি কিওস্কে বসে আছি। সামনে বেলাভূমি ও সমুদ্র। জনা দুই ভারতীয় বন্ধু ও জনা চারেক স্থানীয় লোক মিলে গল্প করছি। আগেই বলেছি, ব্রাজিলীয়রা বাঙালীদের মতো আড্ডাবাজ। কাজেকর্মে তেমন মন নেই, জীবনকে উপভোগ করতেই ব্যস্ত। একটি যুবক, নাম রবের্তো। কালো কুচকুচে, সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, পাথরে কোঁদা বলিষ্ঠ চেহারা। লম্বা টিকোলো নাক, সুন্দর মুখশ্রী। শেক্সপীয়রের ওথেলো বা আমাদের কালকেতুর যেরকম ছবি মনের মধ্যে ধরা পড়ে তেমনি। রবের্তো হচ্ছে স্থানীয় মস্তান নেতা, সবাই তার কথা শোনে। কিছুক্ষণের মধ্যে খুব ভাব জমে গেল। সবাইকে বলে দিল ঃ "এ হচ্ছে আমার লোক, কেউ যেন বিরক্ত না করে।" আমাকে বলে দিল ঃ "কেউ কোন অসুবিধা করলে বলবে 'রবের্তো'। ব্যস, আর কিছু হবে না।" ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজ আর ইংরেজীতে জমে উঠল আড্ডা আর হাসির হররা। দুটি মেয়ে এল, বসল আমাদের সঙ্গে। একজন কুচকুচে কালো, থ্যাবড়া নাক, আরেকজন বাদামী, উঁচু নাক। দুজনেই সুন্দরী, স্মার্ট।

সেদিন আর্জেন্তিনা ও ব্রাজিলের মধ্যে কোপা আমেরিকার ফুটবল ফাইনাল। চারিদিকে খুব উত্তেজনা। শুধু শোনা যাচ্ছে 'রোনাল্ডো', 'রোনাল্ডো'! রোনাল্ডোর জার্সি বিক্রি হচ্ছে হাতে হাতে। মেয়ে-দুটি এসেছে টিকিটের খোঁজে। রবের্তোর কাছে অনেক টিকিট আছে। সে টিকিট ব্ল্যাক করছে। এক-একটা টিকিটের দাম ষাট ডলার। মেয়ে-দুটির মধ্যে একজনের টিকিট আছে, আরেকজনের নেই। দুজনেই ঘ্যানঘ্যান করছে ঃ "দে না রবের্তো, একটা টিকিট দে না।" রবের্তো না শোনার ভান করছে, হাসছে। মাঝেমাঝে বলছে ঃ "যা, যাঃ, এক-একটা টিকিটে ষাট ডলার রোজগার। তোকে দিই আর কি!" মেয়েটি কান্নার ভান করছে, খুনসুটি করছে, হাসছে। রবের্তোর পিছনে আলগাভাবে এক আর্জেন্তিনীয় যুবক বসে আছে। সে ষাট ডলারে একটা টিকিট নিয়েছে রবের্তোর কাছ থেকে। তাকে নিয়ে পড়ল মেয়ে-দুটি—"দেখ না, আর্জেন্তিনা দশ গোল খাবে। রোনাল্ডো এক-একটা করে বল পাবে আর দুমদাম করে গোলে বল পাঠাবে। মাঠে গিয়ে কেঁদে মরবে তুমি!" সে ছেলেটা মুচকি মুচকি হাসছে, আর না শোনার ভান করছে। এরই মধ্যে চলছে গল্প, চলছে উচ্চকিত হাসির হররা।

আমার পাশে বসা মেয়েটির নাম ক্লিও। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "তোমার বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কে আছে?" সে একদিকে হাত নেড়ে বলল ঃ "ঐদিকে, এক কিলোমিটার দূরে। মা বলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি ফিরতে। বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে সাজগোজ করে খেলা দেখতে যাব, দেরি হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমার বন্ধুটা টিকিট পায়নি, আর দেখ, রবের্তো ওকে কিছুতেই টিকিট দিচ্ছে না। ও না গেলে কোন মজাই হবে না।" বলে মেয়েটি ঠোঁট ফোলাল। অনেক দেখা টেলিভিশনের ছবি মনে করে বললাম ঃ "মাঠে গিয়ে সাম্বা নাচবে?" ক্লিও হেসে ফেলল, বলল ঃ "নাচব না আবার, খুব নাচব! কিন্তু বন্ধু না গেলে কোন মজাই হবে না।" মেয়েটিকে আস্তে করে বললাম ঃ "আমিই না হয় তোমাকে ষাট ডলার দিয়ে একটা টিকিট কিনে দিচ্ছি।" সুন্দর হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে বলল ঃ "না না, তুমি দেবে কেন? ঐ রবের্তোই দেবে। এই একটু মজা করছি আর কি।"

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হুইসিলের আওয়াজ শোনা গেল আর মাথার ওপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার ফটফট করতে করতে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর গিয়ে স্থির হলো। ঢেউয়ে স্নান করতে গিয়ে একজন হাবুডুবু খাচ্ছে। হেলিকপ্টার থেকে দড়ি দিয়ে একটা ঝুড়ি নামিয়ে দেওয়া হলো, তাতে একজন 'লাইফ সেভার'। যে হাবুডুবু খাচ্ছিল তাকে ঝুড়িতে তুলে পাড়ে এনে বালির ওপর শুইয়ে পেট থেকে জল বের করা হলো এবং চাঙ্গা করে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিল। সমস্ত ব্যাপারটা এত চোখের নিমেষে কোনরকম হৈচৈ ছাড়াই হয়ে গেল যে, অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি, পুরীর সমুদ্রে যদি এইরকম বন্দোবস্ত থাকত তাহলে কত প্রাণ বেঁচে যেত! সিমেন্টের রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আরো অনেকে আমার মতো এই দৃশ্য দেখছিল। হঠাৎ দেখি, যে-মেয়েটি টিকিটের জন্য বায়না করছিল সে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বললাম ঃ "কি, টিকিট পেয়েছ?" উজ্জ্বল হাসি হেসে ঘাড় নাড়িয়ে মেয়েটি বলল ঃ "হ্যাঁ।"

এই মেয়ে-দুটির থেকে আমার বয়স প্রায় তিনগুণ বেশি হবে এবং সেটা বোঝাও যাচ্ছে, কিন্তু বয়সটা এদেশে কোন ব্যাপার না। এই মেয়েটিকে পরে অন্য এক পারিপার্শ্বিকেও দেখেছি। সেখানে সে পোশাকে-আশাকে এবং ব্যবহারে গম্ভীর। চোখাচোখি হতে সহাস্যে এগিয়ে এসে করমর্দন করল। তারপরে আবার তার সঙ্গীসাথীদের কাছে চলে গেল। দুদিনের চেনা কিন্তু যেন কত আপন! সেখানেই আলাপ হলো আরেকটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির নাম ওয়ান্দা। সে নিজেই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ "তুমি কি ভারতীয়?" "হ্যাঁ" বলাতে বলল ঃ "ঠিক বুঝেছি। তাই তো এসে আলাপ

করলাম। ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমার ভীষণ কৌতূহল। কত পড়েছি তোমাদের দেশ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে।" ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম—সাদা মেয়ে। তার চুল কালো, উচ্চতা মাঝারি—যেরকম পর্তুগীজদের দেখতে হয়। বেশ সুন্দরী, বড় বড় চোখ, মার্জিত বেশভূষা। অনেকটা আমাদের মেয়েদের মতো। ইংরেজী বলছে বেশ চোস্ত ইংরেজী অ্যাকসেন্টে, আমেরিকান নয়। অনেক গল্প হলো। বলল ঃ "আমাকে একটা কাইপেরিয়া খাওয়াও।" পুরো নামটা অবশ্য কেউই উচ্চারণ করে না, বলে 'কাইপে'। একথা-সেকথার পর ওয়ান্দা জিজ্ঞাসা করল ঃ "তুমি আর কতদিন এখানে আছ?" "আর তিনদিন।" "তারপরে দেশে ফিরে যাবে?"

হেলিকপ্টার ডুবন্ত লোকটিকে উদ্ধার করছে আলোকচিত্র ঃ লেখক

"না, এদিক-ওদিক ঘুরে যাব।" "তুমি কি বিবাহিত?" আমি অবাক হয়ে বললাম ঃ "হঠাৎ এরকম প্রশ্ন কেন?" নখের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে বলল ঃ "না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। আসলে অনেকদিন ভেবেছি যে, আমার যদি ভারতীয় স্বামী হতো তাহলে বেশ হতো। ভারতীয়রা কত ভাল, কত ভদ্র! কিন্তু সে তো আর হবে না!" ওয়ান্দার গলাটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

ওয়ান্দা আমার সঙ্গে হোটেল পর্যন্ত এল, কিন্তু গাড়ির ভিতর লুকিয়ে বসে রইল, মুখ পর্যন্ত বের করল না। একটু অপ্রস্তুত ভাবলেশহীন মুখে চলে গেল। ওয়ান্দার জন্য মনখারাপ হয়ে গেল। কিন্তু আমি মানুষ দেখতে ভালবাসি। প্রত্যেক মানুষের ভিতর গভীরতার সন্ধান করি। সেজন্য ওয়ান্দার জন্য একটা দুঃখবোধ জাগলেও জানি, সব জিনিসেরই শেষ আছে। তাই সব জিনিস ঠিক জায়গায় শেষ করাটাও একটা শিক্ষা। মানুষকে জেনে, তাকে ভালবেসে যে আনন্দ, তাকে অধিকার করে কি সেই আনন্দ পাওয়া যায়? আনন্দের বদলে তখন গরল ভেসে ওঠে। পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে এই শিক্ষাই পেয়েছি।

এইসব কথাই বলছিলাম দিমিত্রিওর সঙ্গে রিও থেকে দেড়শ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের ধারে একটা ছোট্ট শহরের সমুদ্রসৈকতে বসে। শহর না বলে একে গ্রাম বললেই ভাল হয়। একটা ছোট বাজার, ঠিক গ্রামের বাজারের মতো। কিছু খোলা বাজার টিনের ছাউনির তলায়, কিছু পাকা বাজার, কয়েকটা মুদির দোকান, চা-কফির দোকান। এছাড়া কিছু বাড়ি—কতকগুলো বাজার থেকে প্রধান দু-তিনটি রাস্তার ধারে, কতকগুলো দূরে পাহাড়ের ওপরে। ছুটির দিন। প্রায় সমস্ত শহরবাসী সমুদ্রের ধারে। কিছু দূর থেকে আসা পরিবারও আছে। দিমিত্রিওর বয়স আমারই মতো। তার বাড়ি সমুদ্র থেকে মাইলখানেক দূরে পাহাড়ের গায়ে। সমুদ্রের ধারে বসে ডাব খেতে খেতে তাকে বলছিলাম ঃ "এই যে তোমাদের দেশের মেয়েদের এত স্বল্প সমুদ্রপোশাক—তোমার ছোটবেলায়, ধর বছর ত্রিশেক আগেও কি মেয়েরা এইরকম পোশাক পরত?" "এতটা ছিল না, তবে ছিল। যত দিন যাচ্ছে আমাদের সমাজে মেয়েরা তত আগ্রাসী হচ্ছে। তবে দোষ দেওয়াও যায় না। দু-তিন হাজার বছর ধরে আমরা ওদেরকে যেরকম দাবিয়ে রেখেছি, তাতে ওরা খানিকটা [illegible] over-reaction-এর যুগ। আমাদের সমাজের চেহারাটা এত দ্রুত পালটাচ্ছে যে তাল রাখা যাচ্ছে না। এখানে অনেক চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বছর বয়সের লোকের দেখবে সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সের বৌ। একটা দুটো উদাহরণ শুধু না। অনেক। আর তাল রাখতে না পেরে হরদম বিবাহ-বিচ্ছেদ, তার মাশুল গুনতে হচ্ছে আমাদের।" আমি হেসে ওঠাতে বলল ঃ "হেসো না, অবস্থা সত্যিই

খারাপ। আমারই এক বন্ধু—আমার থেকে কয়েক বছরের বড়, এই সেদিন বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো। আমি তাকে বলেছি, সাবধান হও, আর মেয়ের পাল্লায় পড়ো না, এবার একেবারে ধনেপ্রাণে মারা পড়বে।" ব্রাজিলীয় সমাজের সর্বাঙ্গীণ দুর্নীতির চেহারাটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে সাতাশ বছর বয়সের কনে পেতে গেলে অনেক টাকা থাকতে হবে তাকে আকৃষ্ট করার জন্য, আবার বৌকে সম্পত্তির ভাগও দিতে হবে। এত টাকা তো আর সোজাপথে আসা সম্ভব নয়। আর এইটাই যখন মোটামুটিভাবে জীবনের মোক্ষ, তখন যেন তেন প্রকারেণ টাকা যোগাড় করতেই হবে। কথাটা বললাম দিমিত্রিওকে। ও বলল ঃ "একেবারে ঠিক বলেছ। এমনিতেই আমরা ব্রাজিলীয়রা একটু অন্যধরনের। দেহসুখ, নাচ, গান, মদ আর ফুটবল—এই হচ্ছে আমাদের জীবনের আনন্দ। তার মধ্যে সবার আগে দেহসুখ। তার ওপরে এখন এই আগ্রাসী নারী-স্বাধীনতার ফলে সমাজের দুই-তৃতীয়াংশ বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েগুলো অনাথ হচ্ছে আর দুর্নীতি বাড়ছে।" মেয়েরা এখন পুরুষশাসিত সমাজের প্রতি মারমুখী।

দিমিত্রিওকে ওয়ান্দার কথা বললাম ঃ "আমাকে তো সে আর বিয়ে করে ফাঁসাতে পারত না!" ও বলল ঃ "কি জানি বলতে পারব না, তবে ফাঁসাতেও পারত কোনভাবে। তোমাকে পছন্দ হয়েছিল তাও হতে পারে, এখানকার মেয়েরা সব পারে। তবে এগোওনি ভালই করেছ।" আমি ওর সুপুরুষ, শক্তসমর্থ শরীরের দিকে তাকিয়ে বললাম ঃ "খুব যে লেকচার ছাড়ছ, তোমাকে দেখেও তো মনে হয় মেয়েরা বেশ নজর দেয়।" কথাটাকে মোটেই সে হালকাভাবে নিল না। গম্ভীরভাবে বলল ঃ "দেয় না আবার, খুব দেয়। আমারও মন মাঝেমাঝে আনচান করে। আমার বৌকে তো দেখেছ, ভারী ভাল ও। ঠাকুরকে স্মরণ করি, তিনি রক্ষা করেন।"

বলা হয়নি যে, দিমিত্রিও ব্রাজিলের কয়েক হাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের একজন। আমি বললাম ঃ "এর মধ্যে আবার ঠাকুরকে আনছ কেন? তোমাদের ভক্তদের ঐ বড় দোষ। বৌকে ভালবাস, তাই অন্য কোথাও যাওনি।" ও বলল ঃ "ছাই জান তুমি, ব্রাজিলীয়দের তো চেন না। আমি জাহাজে কাজ করতাম। অনেকদিন জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলাম। যখন কোন জাহাজ বন্দরে পৌঁছায় তখন আমেরিকান নাবিকরা আগে বার ও মদের খোঁজ করে, আর ব্রাজিলিয়ান নাবিক করে মেয়ের খোঁজ। প্রত্যেক বন্দরে বন্দরে নতুন মেয়ে, যত পাওয়া যায় তত। ঐভাবে বাঁচতে বাঁচতে অবশেষে হতাশা ও অবসাদে মন ভরে গেল। ধর্মের ভিতর শান্তি ও তৃপ্তি খোঁজার চেষ্টা করলাম। আমি খ্রীস্টান —রোমান ক্যাথলিক, কিন্তু খ্রীস্টধর্মে মন ভরল না, কিছু খুঁজে পেলাম না। একজন বলল, 'বেদান্ত পড়, কিছু পাবে।' গেলাম বেদান্ত সোসাইটিতে বেদান্ত পড়তে। পেয়ে গেলাম শ্রীরামকৃষ্ণকে—জীবন্ত বেদান্ত! সব অস্থিরতা শান্ত হয়ে গেল। এখন আমি কি চাই জান? টাকা, অনেক টাকা। সব শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে ঢেলে দেব, তাঁর সেবায় লাগবে। আর তাঁর নাম আমি ছড়িয়ে দেব সমস্ত ব্রাজিলীয় সমাজে। আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দেব মিশনের কাজে, আমার বাড়িটা দিয়ে দেব আশ্রম তৈরি করতে। আচ্ছা, খ্রীস্টধর্মের ভিতর আমি কিছু খুঁজে পেলাম না কেন বল তো?"

আমি তখন ভাবছিলাম, এই হচ্ছে ঠাকুরের বিদেশী ভক্ত! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এদের দেখেছি। একটা সম্পূর্ণ আলাদা পশ্চাৎপট, আলাদা সংস্কৃতি থেকে আসে বলে এদের ভক্তিও হয় জ্বলন্ত। আর ডায়নামিক স্বভাবের লোক বলে এরা ভক্তি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে না, তোলপাড় লাগিয়ে দেয়, শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজেদের বুকের মধ্যে ধরে রাখে। আমেরিকায় দেখেছি, দেশী ভক্তমণ্ডলীর থেকে বিদেশী ভক্তমণ্ডলী অনেক বড়। তাছাড়া ঘনিষ্ঠ ভক্ত ছাড়াও জনসাধারণের একটা বড় অংশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা সেখানে বেশ প্রবল। ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে নানা উৎসবে এরা আশ্রমগুলির চারধারে ঘোরাঘুরি করে, অনেকসময় নীরবে ও আত্মপরিচয় না দিয়ে। এইসব ভক্তদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কি করে শ্রীরামকৃষ্ণের খবর পেলেন? তাহলে নানা চমকপ্রদ কাহিনী পাওয়া যায়। সেগুলোর সম্পূর্ণ সঙ্কলন যদি কখনো হয় তবে তা একটা বিরাট সম্পদ হবে। কেউ জীবনের সঙ্কটতম মুহূর্তে হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছে, কেউ অমনি পেয়েছে। তাঁর নাম শোনেনি, ফটোও দেখেনি কোনদিন, অনেকদিন পরে বুঝেছে কাকে দেখেছে। এদের ভিতরে কেউ কেউ সন্ন্যাসীও হয়ে গেছে।

আমেরিকার জঙ্গলের ভিতরে এক নিরালা নিভৃত আশ্রমে এইরকম একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ইংরেজ সৈনিক জাপানী যুদ্ধবন্দী শিবিরের অসহ্য কষ্টের মধ্যে ঠাকুরের দেখা পেয়েছিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। যিনি প্রায় কোন কথাই বলেন না, তিনি একেবারে বকবক করতে লাগলেন, নানা গল্প করতে লাগলেন। আমারও দুষ্টু বুদ্ধি, জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মহারাজ, আপনার কখনো কোন আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়েছে?" প্রশ্নটা শুনে একেবারে শিশুর মতো আঁতকে উঠে বললেন ঃ "ওরে বাবা, সেসব কথা তো একেবারে বলা বারণ!" তারপরে শিশুর মতো অপ্রস্তুতভাবে বললেন ঃ "তোমার কথার উত্তর তো দিতে পারব না। যদি বলি 'না', তাহলে তুমি বলবে—এতদিন ধরে বোকার মতো এখানে তাহলে কি করছ? আর যদি বলি 'হ্যাঁ', তাহলে তুমি তো জানতে চাইবে, কিন্তু আমি বলতে পারব না। তবে যদি হয়েই থাকে তো হয়েছেটা কি, আমার মাথা দিয়ে কি দুটো শিং গজিয়েছে?" এটা শ্রীশ্রীমায়ের কথা। আমেরিকার গভীর জঙ্গলে মায়ের কথা

শোনা একটা আলাদা অনুভূতি। আমিও নাছোড়বান্দা। কিন্তু কিছুতেই তিনি সে-প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রথমে মনে হলো বুঝতে পারছেন না, তারপরে বুঝলাম উত্তরটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। খালি বলছেন ঃ "তোমাকে দেখে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! আজকের দিনটা কী ভাল কাটল!" বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, খুবই অসুস্থ শরীর, সদ্য অপারেশন হয়েছে, নড়াচড়া বারণ। শুধু বিকালে মাপা একটুখানি হাঁটা। সোৎসাহে বলে চলেছেন ঃ "আজ তুমি আছ, আর কোন ভয় নেই, আজ অনেক হাঁটব। তুমি আমার হাতটা ধর আর মাঝে মাঝে নাড়িটা দেখ, আর আমি হাঁটব।" এই বলে যেখানে এক পাক হাঁটার কথা সেখানে দুপাক, তিনপাক পার হয়ে চতুর্থ পাক আরম্ভ করতে চলেছেন। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনছি আর ভাবছি—এই হচ্ছে পৃথিবীখ্যাত ব্রিটিশ রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজর, বর্মার জঙ্গলের ভিতর গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে! ভাবছি, আর হাসি পাচ্ছে। এত মিষ্টি লোক, কিছু বলতেও পারছি না। অন্য সন্ন্যাসীরা এসে পড়াতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তা এঁদের ধ্যানমগ্নতা, এঁদের তপস্যার প্রভাব কি পৃথিবীর বুকে ছায়া ফেলবে না? ফেলবেই তো, ফেলছেও। আমাদের দেশের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কথাই ধরা যাক। অচিন্ত্যবাবুর আগেকার লেখা অনেকেরই পড়া। সেই অচিন্ত্যবাবু একদিন কাজে যাচ্ছেন। হেঁটে উঠান পার হওয়ার সময় হঠাৎ দেখলেন পায়ের কাছে একটা ছবি—শ্রীরামকৃষ্ণের, হয়তো ছেঁড়া ক্যালেন্ডারের ছবি। পা সরিয়ে চলে গেলেন আর তারপর তা ভুলেই গেলেন, কেননা ওরকম তো কতই পড়ে থাকে! অচিন্ত্যবাবুর খুব প্ল্যানচেটের শখ ছিল। একদিন প্ল্যানচেট করছেন, পেনসিল ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে থামল। চোখ খুলে দেখেন, পেনসিলের তলায় সেই ছবি। আবার চেষ্টা করলেন—আবারও তাই, আবারও তাই। অবাক হয়ে ভাবতে বসলেন। সেই হলো 'পরমপুরুষ'-এর সৃষ্টি। গল্পটা অচিন্ত্যবাবুর প্রকাশকের কাছ থেকে শোনা।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে দিমিত্রিওর প্রশ্নটা মনে পড়ে গেল। ও এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বললাম ঃ "খ্রীস্টধর্মে পাওনি, কারণ তুমি তো আর ধর্মের খোঁজে যাওনি, গিয়েছিলে আধ্যাত্মিকতার খোঁজে, নিজের খোঁজে। খ্রীস্টধর্মে গোড়ার দিকে আধ্যাত্মিকতা প্রবল থাকলেও পরে চার্চের প্রসারের প্রয়োজনে রাজনীতির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। ক্রশ আর তরবারির হাতল এক হয়ে যায়। চলতে থাকে ধর্মান্তরকরণ। আচারনিষ্ঠা, গোঁড়ামি আর আইনকানুনের মাঝে আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে যেতে থাকে। তাছাড়া খ্রীস্টধর্মের গোড়ার কথা হলো এই যে, ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি যখন করেছেন তখন তিনি কোথাও না কোথাও আছেন। কাজেই সেই গ্যালিলিওর সময় থেকে বিজ্ঞানীরা তাঁকে হৈহৈ করে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর চার্চও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না। খ্রীস্টধর্মের জন্যই বিজ্ঞানী মন ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে না। আর আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বর নিজেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন। যে বৃহৎ বিশ্বচেতনা ঈশ্বরের শক্তিরূপ, সেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি শক্তি—driving force। সেই আদি অবিভক্ত শক্তিরই খোঁজ করছে বিজ্ঞান তার Grand Unified Theory-র স্বপ্নের মধ্যে। মনুষ্যচেতনা সেই বিশ্বচেতনারই ক্ষুদ্র রূপ, কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও গুণগতভাবে এক। তাই দুইয়ের সংযোগস্থাপন সম্ভব। এটা বিজ্ঞানের দিক থেকে অসম্ভব বলে মনে হলে বলতে হবে যে, সব জড়পদার্থ যে অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি—একথা বিজ্ঞান প্রমাণ করার বহু আগে আমাদের দর্শনে ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে cosmogenesis-এর যে-বর্ণনা আছে তা আশ্চর্যভাবে Big Bang থিয়োরি ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর সঙ্গে মেলে, শুধু ভাষা আর রূপকটা পালটে নিতে হবে, কড়াইশুঁটির দানাকে দুই সমান ও বিপরীতমুখী ভাগের বদলে Particle-Antiparticle বসিয়ে নিতে হবে। 'Anti particle' কথাটিও একটি রূপক। কারণ, শুধু ভাষা দিয়ে তার ধারণা করা যায় না। তাই বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। খ্রীস্টধর্মে 'ঈশ্বরের পুত্র' একজনই, আর আমরা সবাই পাপী-তাপী—কেউ বেশি, কেউ কম। আর বেদান্তধর্মে সবাই ঈশ্বরের সন্তান—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। মায়ার আবরণ রয়েছে বলে দেখতে পাচ্ছি না, অনুভব করতে পারছি না। সেটা খসে পড়লেই দেখতে পাব, কিন্তু তার জন্য নিজের প্রচেষ্টা চাই। খ্রীস্টধর্ম তাই জন্ম দেয় পাপীর মন—sinner's mentality। পাপ যখন করেই ফেলেছি, আরেকটু পাপ-টাপ করে পরে ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে! মধ্যযুগে 'ক্ষমাপত্র' তো বিক্রিও করা হতো চার্চ থেকে! একবার এক ফরাসী রাজা একটা খুন করার আগেই ক্ষমাপত্র কিনে রেখেছিলেন। তবে খ্রীস্টধর্মেও এখন আধ্যাত্মিকতা প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করেছে। আর আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে ধর্মে ধর্মে কোন প্রভেদ থাকে না—এই শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা।"

দিমিত্রিও বলল ঃ "চার্চের মতো এইরকম পরিবর্তন রামকৃষ্ণ মিশনেও তো আসতে পারে!" আমি বললাম ঃ "সুদুর ভবিষ্যতে কি হবে বলতে পারি না, তবে অদূর ভবিষ্যতে কোন সম্ভাবনা নেই। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই সেবিষয়ে সাবধান করে গেছেন। মিশন তো কোন ধর্মপ্রচার করে না। শুধু যেখানে ভক্ত আছে, যেখানে প্রশ্ন আছে—সেখানে উত্তর পৌঁছে দেয়। আর বিদেশে অনেক জায়গায় মিশনের শাখাপ্রশাখাগুলিও তো 'বেদান্ত সোসাইটি' নামে পরিচিত, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে বেদান্তদর্শন প্রচার ও বোঝানোই তাদের কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত নয়, অথচ বেদান্তদর্শনে বিশ্বাসী অনেক লোকই তো ভারতবর্ষের বাইরে ও ভিতরে আছে। তাদের লেখা ও কথা থেকেই তা বোঝা যায়। অনেক বিজ্ঞানীও আছে। মিশন তো তাদের কাছে গিয়ে বলে না—মিশনে নাম লেখাও, চাঁদা

দাও। অথচ দেশে ও বিদেশে ভক্তদের দানই আয়ের একমাত্র উপায়—এক জায়গার টাকা অন্য জায়গায় যায় না।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দুজনে। তারপরে হঠাৎ কথাটা মনে পড়তে দিমিত্রিওকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "ইন্দ্রিয়সুখ জয় করতে তুমি প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলে এবং তারপর মজে গেছ বুঝলাম। কিন্তু কেন? ঠাকুর তো কোন কিছুই বারণ করে যাননি। 'কথামৃত'তেই আছে, কলকাতার বড়লোকদের বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে তাদের বলছেন—ভোগবিলাস করে নাও। পরে ঈশ্বরের দিকে মন যাবে, আস্তে আস্তে ওসব ছেড়ে যাবে। কাউকে জোর করে তো কিছু করতে বলেননি। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যেও অনেকের তো নানারকম অসুবিধা ছিল, তার ইঙ্গিতও 'কথামৃত'তে পাওয়া যায়। সমাজের হালহকিকৎ সবকিছুই ঠাকুরের জানা ছিল, ঈশ্বরভক্তিতে মজে থাকলেও সবদিকে চোখ ছিল।" দিমিত্রিও বলল ঃ "কিন্তু ঠাকুর বড়লোকদের যে-কথা বলেছিলেন সে-জীবনকে তো তিনি সমর্থন করেননি! বলেছিলেন—ওটা জীবনের একটা passing phase; ওতে পরিতৃপ্তি, পরিপূর্ণতা, আনন্দ আসবে না।" আমি বললাম ঃ "তা ঠিক, কিন্তু একথা বলেননি যে, সবাইকে সন্ন্যাসী হতে হবে। বরং বৌদ্ধধর্মে বলেছে, পুনর্জন্ম হতে হতে শেষ জন্মে সন্ন্যাস ও মুক্তি। অর্থাৎ সন্ন্যাস না হলে মুক্তি হবে না। কিন্তু ঠাকুর তো গৃহীদের জন্যও মুক্তির পথ খোলা রেখেছেন, তারাও সাধনার সর্বোচ্চ মার্গে উঠতে পারে—একথা বলে গেছেন। মুক্তি-টুক্তি আমি বুঝি না, কিন্তু সন্ন্যাস না নিয়েও, একেবারে নিষ্কাম নির্লোভ না হলেও খুবই অল্প কাম, অল্প লোভ, বহুজনহিতে সদানন্দে যে থাকা যায় তা তো আমি নিজেও দেখেছি, সকলেই দেখেছে। আর তাছাড়া ঠাকুর নতুন তো কিছু বলেননি। বেদান্ত তো কোন বিশেষ মরালিটি বা নৈতিকতার শিক্ষা দেয় না। শুধু ক্ষুদ্র আমিত্বকে বৃহৎ আমিত্বে নিয়ে যেতে বলে, তার উপায় বাতলায় আর বলে— ব্রহ্ম বা বৃহৎ বিশ্বচেতনার সাথে একক মনুষ্যচেতনার যোগসাধন সম্ভব এবং তার আনন্দ অন্য সব আনন্দকে ছাপিয়ে যায়। সে তখন দেশকালের গণ্ডি পার হয়ে যায়। বেদান্তের অনেক ঋষি তো সংসারী ছিলেন, অনেক রাজাও ছিলেন বেদান্ত-বর্ণিত সাধনার উচ্চমার্গে। তাঁদের অনেক উপলব্ধি, যা বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে অদ্ভুত মিলেও যায়। কাজেই তারা দেশকালের গণ্ডি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—একথা বিশ্বাস না করি কি করে! তবে বেদান্তের সময়কার জীবন আজকের জীবন হতে পারে না। একেই ঠাকুর 'কলিকাল' বলেছেন, আর এই কালে কি জীবন হতে পারে তা নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন।"

দিমিত্রিও তখনো অন্যমনস্ক। বলল ঃ "ঠাকুরের অসীম করুণা যে, কাউকে পাপী বলে চিহ্নিত করেননি, কাউকে প্রত্যাখ্যান করেননি, শুধু পবিত্রতর, অধিকতর আনন্দময় জীবনের পথনির্দেশ করেছেন। হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হতে বলেননি ঠিকই, কিন্তু সংসারে থেকেও পাঁকাল মাছের মতো হতে বলেছেন।" আমি হেসে বললাম ঃ "হ্যাঁ, শুধু পাঁকাল মাছ না, দাঁতে ব্যথাওয়ালা পাঁকাল মাছ। তবে তুমি আর আমি আসছি দুটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে, তাই কথাগুলো বললাম। ধর্ম সংস্কৃতির থেকে বড়। প্রকৃত ধর্ম সব সংস্কৃতিতেই সত্য, কোন একটি বিশেষ সংস্কৃতির দাস সে নয়। বেদান্তদর্শন আমাদের দেশের কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসেছিল কেউ জানে না, ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেই তার সম্পূর্ণ রূপ তৈরি হয়ে গেছে—তাও প্রায় আড়াই-তিনহাজার বছর হলো। তারপরে ভারতে কত বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা এসেছে—বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কালে। হিন্দুসমাজের মূলমন্ত্রগুলি ধরে রাখতে নানারকম অনুশাসন এসেছে ধর্মের নামে, কিন্তু মূল ধর্ম একই আছে। তা না হলে হিন্দু ও হিন্দুধর্মের তো কোন অস্তিত্বই থাকার কথা নয়। যে ধর্মে ধর্মান্তরকরণ হয় না, যাতে প্রবেশ করার কোন আনুষ্ঠানিক পথ নেই অথচ বেরিয়ে যাওয়ার পথ আছে, যে ধর্ম অন্তত হাজার বছর কোন রাজ-অনুগ্রহ পায়নি, যার ভিতরে এতরকম কঠিন অনুশাসন ছিল—তার তো শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। অনেক ধর্মই তো শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম, বেদান্তধর্ম তো আর রাজ-অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল নয়, তা হচ্ছে মানুষের চেতনার রূপ। আজ পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে, উন্মুক্ত হচ্ছে, দেওয়ালগুলো সরে যাচ্ছে, আর বেদান্তধর্ম ততই বিশ্বব্যাপী হচ্ছে, নানাভাবে হচ্ছে। তার জন্য তো আর কোথাও নাম লেখাতে হয় না, হিন্দুও হতে হয় না। সব ধর্মের মানুষের ভিতরেই এই বেদান্তধর্ম ঢুকছে, কিন্তু আমাদের দেশের কথা একটু আলাদা। হাজার বছর ধরে আমাদের মননশীলতা নানারকম অনুশাসন ও বাধানিষেধের পরে সামান্য একটু মুক্তির, একটু স্বাধীনতার হাওয়া পাচ্ছে—তাও স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মানুষের ভিতরে। সেইজন্য এখন সামান্য অনুশাসন দেখলেই তারা বিদ্রোহ করে উঠছে। তারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শে অতি লোভ, অতি কাম, অতি অহঙ্কারের সামান্য বর্জনকেও বন্ধন বলে মনে করে। স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে তাদেরকে কেউ নিবৃত্ত না করলেও তারা নিজেরাই একটা complex-এ ভোগে। এমনকি স্বামীজী-নিবেদিতার সম্পর্ক নিয়েও মন্তব্য করে, সেরকম দু-একটা লেখাও বেরিয়েছে বলে শুনেছি।"

এইবার দিমিত্রিও একেবারে জ্বলে উঠল—"কি বললে, ঠাকুরের দেশের লোক স্বামীজী-নিবেদিতার সম্পর্ক নিয়েও কথা বলে? এ যে দেখছি প্রদীপের তলায় অন্ধকার! নারী-পুরুষ সম্পর্ক সম্বন্ধে কি জানে তোমাদের দেশের এই তথাকথিত শিক্ষিত নারী-পুরুষ? এদেরকে ধরে একবার ব্রাজিলে পাঠিয়ে দাও। এখানে তো আর বাধানিষেধ নেই,

সহজলভ্য জিনিস। বুঝুক কিসে কি হয়। নারী-পুরুষের সম্পর্ক বুঝতে খাটের তলায় গোয়েন্দা-ফটোগ্রাফার লুকিয়ে রাখতে হয় না, তাদের দেখলেই বোঝা যায়—এটুকু শিক্ষা অন্তত এই অশিক্ষিতদের আমরা দিয়ে দেব।" আমি বললাম ঃ "আহা, অত চটছ কেন? এটা বাঙালীদের স্বভাব। যেখানে নিরাপদ, সেখানে দুটো উলটোপালটা কথা বলে আনন্দ পায়, একটু বাহাদুরী নেয়। যেমন দেখ, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মতো দুজন ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে একইসঙ্গে জন্মেছিলেন, এটা আমাদের বিরাট সৌভাগ্য। ওঁরা দুজনে মিলে দেখিয়ে গেছেন জীবনের যে-পথ দিয়েই যাও না কেন গন্তব্যস্থল একই। ওঁরা দুজনে দুজনের সম্বন্ধে তেমন কথা না বললেও আজকের তথাকথিত গবেষকদের কিচিরমিচির এখনো বন্ধ হয়নি। এমন অনেক লোক আছে, যারা রবীন্দ্রনাথকেও যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারী হননি বলে গালি দেয়। তাছাড়া আজকের যুবসমাজ মুক্ত অর্থনীতি, প্রতিযোগিতামূলক জীবন, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য, ইচ্ছামতো স্বাধীন জীবন-যাপনের আগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত যে, এতসব চিন্তা করার সময় তাদের নেই। এদের অনেকের কাছেই রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দও প্রাচীন, আজকের জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না! বাইরের লড়াইটা জিততে গেলে যে ভিতরের লড়াইটাও জিততে হয়—একথা অনেক না ঠেকে মানুষ শেখে না। আমাদের দেশে লড়াইটা নতুন, পাশ্চাত্য সমাজে অনেকদিনের। তবু আমার মনে হচ্ছে, দুদিকেরই নতুন ও পুরাতন মিলে একটা নতুন বিশ্বসংস্কৃতির জন্ম হচ্ছে।"

কোন্ সুদূর ব্রাজিলের সমুদ্রতটে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনসংস্কৃতির পটভূমিকায় দিমিত্রিওর সঙ্গে যে-কথাগুলো বলছিলাম তাতে বেশ মজা লাগছিল। যতটা না ওকে বলছিলাম, তার থেকেও বেশি বলছিলাম নিজেকে। দেশে-বিদেশে এই সমুদ্রতটেই যেন আমার অন্তর্দৃষ্টি বেশি খুলে যায়। দিগন্তবিস্তৃত এবং আকাশভরা পৃথিবীর বিরাট রূপের ভিতরেই যেন আমি দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বচেতনার বিরাট রূপ, যার কাছে অন্য সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়। আর আমার জীবনের আশ্চর্য মানুষগুলি যেন এইখানে এসেই আমার কাছে ধরা দেয়। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়, ব্রাজিলের মুরিকিতে আর ছোটবেলার নির্জন দীঘার সমুদ্রসৈকতে তারাভরা আকাশের নিচে। বিভিন্ন দেশের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে ধ্যানমগ্ন বিদেশীদের দেখি তিন বাঙালীর পটের সামনে, দেখি দেশের আশ্চর্য সব জায়গায়; আর ভাবি, এরা কী পেয়েছে যা আমি এখনো জানি না, এখনো পাইনি?

ব্রাজিলের সমাজ-সংস্কৃতিতে শ্রীরামকৃষ্ণও একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। সে-কাহিনী আমাকে আগে থেকে কেউ বলে দেয়নি, আগে থেকে প্রস্তুত করেনি। সে-কাহিনী আমি আবিষ্কার করেছি ওদেশে গিয়ে। আবিষ্কার করেছি, আর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠেকায় কে! এর প্রথম সূত্র পাই রিওতে হৃদরোগ বিষয়ে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস চলাকালীন, যার জন্য আমার যাওয়া।[১] কংগ্রেসের ভিতরে একটি বিশেষ অধিবেশন ছিল করোনারী বাইপাস অপারেশনের এক নতুন প্রক্রিয়ার ওপরে, যাতে অনেক সস্তায় এই অপারেশন করা যায়। আমাদের দেশে এই প্রক্রিয়া অল্প কয়েকটি করা হয়েছে। এই অধিবেশনে ব্রাজিলের এক নামকরা সার্জন তাঁর নিজস্ব টেকনিকে এই ধরনের যে আড়াই হাজার অপারেশন করেছেন তার ওপর বক্তৃতা দিলেন। অন্য দেশ থেকে আগত বিখ্যাত সার্জনরাও বক্তৃতা দিলেন। তারপরে শুরু হলো আলোচনা, প্রশ্নোত্তর-পর্ব। প্রশ্নোত্তর-পর্বে ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করলেন। অধিবেশনের শেষে আমাকে বললেন ঃ "আপনার কি এখন কোন কাজ আছে, না থাকলে চলুন একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাক।" খেতে খেতে একথা-সেকথার পর হঠাৎ বললেন ঃ "স্বামী পরাৎপরানন্দের কোন খবর আপনার জানা আছে কি?" আমি নামটি শুনে একটু অবাক হলাম। এই সন্ন্যাসীর নাম আমি আগে কখনো শুনিনি। চুপ করে রইলাম। পরে জেনেছি, স্বামী পরাৎপরানন্দ আর্জেন্টিনার বুয়েন্স এয়ার্স রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। স্বামী পরেশানন্দ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ভদ্রলোক নিজেই বলে চললেন ঃ "স্বামী পরাৎপরানন্দের কাছে আমি যে কিভাবে ঋণী তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার জীবনটাই উনি পালটে দিয়েছেন।..." ভদ্রলোকের চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল, গলার স্বর ভারী হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি মধ্যবয়সী, সুদর্শন, গম্ভীর, স্বল্পভাষী ও মিতবাক এই বিখ্যাত সার্জনের দিকে। এটা স্পষ্ট যে, এই কয়েকটা কথা বলতেই তাঁকে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে, তাও একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের কাছে। তারপর তাঁর সঙ্গে হার্ট অপারেশনের কথা হলো। সাও পাওলোতে যেতে বললেন তাঁর পদ্ধতিতে হার্ট অপারেশন দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত গিয়েওছিলাম, দেখেও এসেছি।

রিওতে ফিরে এলাম, প্লেনের টিকিট পালটালাম। দিমিত্রিও সাও পাওলো যাওয়ার বাসের টিকিট কাটল পরের দিনের জন্য। তারপরে সন্ধ্যার সময় গেলাম রিওর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে। মন্দির বলতে একটা ছোট ফ্ল্যাট, তার ভিতরে একটা ছোট্ট ঘরে মন্দির। জনা পনের ভক্ত হাজির। সবাই স্থানীয়। একজন ভক্ত পর্তুগীজ উচ্চারণে বিশুদ্ধ

---

১ লেখক একজন বিখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জন। দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন, তাঁর মন্ত্রশিষ্য। তাঁর স্বাস্থ্য-উপদেষ্টামণ্ডলীর তিনি ছিলেন অন্যতম।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সংস্কৃত মন্ত্রে ঘণ্টা বাজিয়ে ঠাকুরের পুজো করলেন। তারপরে সবাই ধ্যানে বসল। ধ্যান শেষ হলে সামান্য জলযোগ। যিনি পুজো করলেন তিনিও একজন ডাক্তার। আমাকে বললেন ঃ "কিছুদিন এখানে থাক, তোমাকে পুজো করা শিখিয়ে দেব।" বেশ মজা লাগছিল। কিন্তু ভাবছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে কিভাবে আগমন হলো? প্রশ্নটা করলাম, আর তখনি শুনলাম ব্রাজিলে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের অদ্ভুত ইতিহাস।

ত্রিশের দশকে স্বামী বিজয়ানন্দ আর্জেন্তিনা ও ব্রাজিলে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীপ্রচারে। সম্পূর্ণ অজানা দুটি দেশ, অচেনা সমাজ। কিন্তু তারই ভিতর তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্যে দুটি দেশেই গড়ে ওঠে ভক্ত-সম্প্রদায়। আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় আর্জেন্তিনার বুয়েন্স এয়ার্সে এবং ব্রাজিলের তিনটি শহরে—রিও, সাও পাওলো ও কুরিটিবা। আর্জেন্তিনার কেন্দ্রটি বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হলেও ব্রাজিলের কেন্দ্রগুলি হয়নি। ব্রাজিলের রিও আশ্রমে একজন যুবক ভক্ত ব্রহ্মচর্যও নিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য। তাঁকে নিয়ে একবার বেলুড় মঠেও এসেছিলেন স্বামী বিজয়ানন্দ। কিন্তু কোন কারণে তাঁর সন্ন্যাস হয়নি। তিন দশকের ওপর ধর্মপ্রচার করে এবং বহু দীক্ষিত ভক্ত রেখে স্বামী বিজয়ানন্দ দেহত্যাগ করেন। এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। রিওর আশ্রমের সম্পত্তির দলিলে কিছু গণ্ডগোল থাকায় আশ্রমটি ঐ ব্রহ্মচারী দখল করে নেন এবং তিনি রামকৃষ্ণ-ভাবধারা থেকে সরে গিয়ে সেখানে হঠযোগ এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক প্রক্রিয়া, চক্র ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। সেসব স্বভাবতই কিছু লোককে আকর্ষণ করে। কিন্তু পুরনো ভক্তমণ্ডলী বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে রিওর এই ছোট্ট আশ্রমটি করেছে। এটিই এখন রামকৃষ্ণ আশ্রম, পুরনোটি নয়। পুরনোটি এখনো আছে এবং সেই ব্রহ্মচারীও আছেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, সেখানে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর মন্দিরও আছে, কিন্তু সেখানে এখন হঠযোগ ও তান্ত্রিক ধর্ম পালিত হচ্ছে। খুবই কৌতূহল ছিল আশ্রমটি দেখার, কিন্তু তার সুযোগ হলো না। ব্রাজিলে ভক্তরাই তিনটি শহরে আশ্রম, মন্দির, পূজাপাঠ চালু রেখেছেন। আমাকে রিও এবং সাও পাওলোতে সবাই কাতরভাবে অনুরোধ করেছে ঃ "কলকাতায় ফিরে বেলুড় মঠে গিয়ে আমাদের কথা বলবে, বলবে একজন অন্তত সন্ন্যাসী যেন ব্রাজিলে আসেন। আমরা আর কতদিন ধরে রাখব, আমাদের তেমন বল কোথায়? তবু তো আমরা কায়মনোবাক্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে রেখেছি, চলে যেতে দিইনি। এবার অন্তত একজন সন্ন্যাসী এসে হাল ধরুন।"[২] আশ্চর্য এদের আন্তরিকতা! আমিই যেন বেলুড় মঠের প্রতিভূ! কোথায় বেলুড় মঠ, আর কোথায় পৃথিবীর একেবারে উলটোদিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ব্রাজিল! এদের ভক্তি ও আকুলতা আমাকে অবাক করেছে।

চললাম সাও পাওলো। এয়ারকন্ডিশন্ড বাসে খুবই আরামের ভ্রমণ। বাসের ভিতরেই পাওয়া যায় টুকিটাকি খাবার, পানীয়। মাঝে মাঝে ছোট ছোট শহর, কিছু কলকারখানা। ব্রাজিলে আটলান্টিক উপকূলের এই লম্বা অংশটাই দেশের উন্নত জায়গা। এখানেই তিনটি বড় শহর—রিও, সাও পাওলো, কুরিটিবা। রাজধানী ব্রাজিলিয়া একটু ভিতর দিকে। তার পিছনে দেশের বাকি বিরাট অংশের বেশির ভাগটাই অনুন্নত। আর রয়েছে আমাজন নদীর বিশাল অববাহিকা আর তার গভীর জঙ্গল। পাঁচ ঘণ্টার বাসভ্রমণে সাড়ে তিনশ-চারশ কিলোমিটার পেরিয়ে এসে সাও পাওলো শহরে পৌঁছালাম। বিরাট শহর, লোকসংখ্যাও প্রচুর। সমতল শহর, রিও-র মতো কোন সৌন্দর্য নেই। দূরে আবছা নিচু পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। সাও পাওলোকে কলকাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। দুটো শহরেই সরু সরু রাস্তা, ঘিঞ্জি, ট্রাফিক জ্যাম। পরিবেশ-দূষণ খুব বেশি, লোকজন ঢিলেঢালা স্বভাবের। তবে আজকের সাও পাওলো আজকের কলকাতার থেকে অনেক ভাল, অনেক পরিষ্কার। এখানকার হাসপাতালগুলি আমাদের হাসপাতালের থেকে বেশি পরিষ্কার ও অনেক বেশি সুশৃঙ্খল। তবে দুটো শহরের চরিত্রে বেশ কিছু মিল আছে। একটা বড় দোতলা বাড়ি নিয়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম। তার অতিথিশালার একটি ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। একটি ঘরে থাকেন এক বৃদ্ধ। তিনি ব্রাজিলের সবচেয়ে প্রাচীন ভক্ত, বেলুড় মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তাঁরই ঐকান্তিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় কোন সন্ন্যাসী ছাড়াই টিকে রয়েছে সারা দেশের রামকৃষ্ণ-আন্দোলন। তিনি এখন দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে। তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলাম। ব্রাজিলে পাকাপাকিভাবে কোন সন্ন্যাসী না থাকলেও মাঝে মাঝে আর্জেন্তিনায় বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র বুয়েন্স এয়ার্স থেকে আসেন স্বামী পরেশানন্দ। তাছাড়া একাধিকবার এসে বেশ কিছুদিনের জন্য থেকে গেছেন সারদা মঠের দুজন সন্ন্যাসিনী।

আমার সাও পাওলোতে অবশ্য একটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে যে, এই সময়েই স্বামী পরেশানন্দও এখানে আসছেন। আমি পৌঁছালাম দুপুরে, আর ওঁর প্লেন আসার কথা রাত্রে। বুয়েন্স এয়ার্স থেকে সাও পাওলো আসা মানে প্রায় কলকাতা থেকে হংকং। স্বামী পরেশানন্দ আমার বহুদিনের পরিচিত। এদেশে আসার পর আর দেখা হয়নি। তাছাড়াও তিনি আর্জেন্তিনায় একেবারে বিরাট কাণ্ড ঘটিয়েছেন। সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ, বিপ্লব, অর্থনৈতিক মন্দার ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন শুধু টিকেই থাকেনি, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছে। ভক্তমণ্ডলীর বৃদ্ধি

২ সাও পাওলোর আশ্রমটি সম্প্রতি বেলুড় মঠের অধীনে এসেছে। সেখানে বেলুড় মঠ থেকে স্বামী নির্মলাত্মানন্দকে অধ্যক্ষ করে পাঠানো হয়েছে।

হয়েছে, নতুন আশ্রম হয়েছে, আর্জেন্তিনীয় সন্ন্যাসীও হয়েছে। অথচ যখন গিয়েছিলেন তখন তিনি বয়সে মধ্য-চল্লিশ, এখনো বয়স বেশি নয়। ব্রাজিলীয় ভক্তরাও বলছিলঃ "মহারাজ কতদিন বাঙলায় কথা বলেননি, তোমার সঙ্গে কথা বলে তাঁর খুব ভাল লাগবে। আর আমরাও বাঙলা ভাষা শুনব। এমন মিষ্টি ভাষা!" দুপুরবেলা আশ্রমে পৌঁছে মন্দিরে প্রণাম করে খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছি। রাত্রে মহারাজের প্লেন আসবে, তখন ভক্তদের সঙ্গে আমিও এয়ারপোর্টে যাব।

সন্ধ্যার পর রওনা হলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। লম্বা রাস্তা, গাড়ির ভিড়, তার ওপর বৃষ্টি। অনেকক্ষণ সময় লাগল পৌঁছাতে। টার্মিনালের একেবারে একপ্রান্তে মহারাজের প্লেন আসার জায়গা। এদিকটায় খুব একটা যাত্রী আসছে না। Arrival-Departure বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঐ একটা প্লেনই আসছে বুয়েন্স এয়ার্স থেকে। প্রতীক্ষা করার হলঘরটি বেশ বড়—টানা চলে গেছে মূল টার্মিনালের দিকে। হলঘরটিতে অনেক লোকের জটলা। দিমিত্রিওকে জিজ্ঞাসা করলামঃ "এরা কি সবাই মহারাজের জন্য এসেছে?" সে বললঃ "হ্যাঁ, এরা সবাই ভক্ত।" ক্রমে একজন-দুজন করে আরো ভিড় বাড়তে লাগল। কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল দিমিত্রিও। তারা দেখলাম আমার আসার খবর আগে থেকেই জানে। আশ্চর্য ব্যাপার! ক্রমে দু-তিনশ লোক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজনও ভারতীয় নেই। এই কাজের দিনে বৃষ্টির রাত্রে মহারাজকে শুধু অভ্যর্থনা করার জন্য এসেছে! কিসের টানে? মধ্যবয়সী কয়েকজন থাকলেও যুবক-যুবতীর সংখ্যাই বেশি। নানান ধরনের লোক আছে, তবে শ্বেতাঙ্গই বেশি। কিছু কালো বা বাদামী চামড়া, কিছু মঙ্গোলীয় জাপানী ধরনের মুখও রয়েছে। একতলায় সকলের জায়গা হচ্ছে না, কেউ কেউ দোতলায় চলে গেছে, দোকানপাট দেখছে।

অবশেষে ঘোষণা হলো, প্লেন এসেছে। কিছুক্ষণ পর মালভর্তি ট্রলি ঠেলে মহারাজ বেরিয়ে এলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করলাম, সোৎসাহে বললেনঃ "আরে ডাক্তার গুপ্ত যে, কি মজা!" তারপরেই ভক্তদের ভিড়ে হারিয়ে গেলেন। প্রণাম করার হুড়োহুড়ি। মহারাজ নাম ধরে ডেকে ডেকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন, ছোটদের সঙ্গে দু-একটা রসিকতা করছেন। যাদেরকে চেনেন না তাদের পরিচয় নিচ্ছেন। যারা আসেনি তাদের খবর নিচ্ছেন। সবটাই স্প্যানিশ বা পর্তুগীজে। মহারাজকে স্প্যানিশ শিখতে হয়েছে, কারণ আর্জেন্তিনার ভাষা স্প্যানিশ। আর ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগীজ—অবশ্য মূল পর্তুগীজের থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে গেছে। দুটো ভাষা খুবই কাছাকাছি, কাজেই বোঝা যায়। আমি কোনটাই জানি না, তাই কিছুই বুঝছি না। শুধু চেয়ে আছি আনন্দে উজ্জ্বল মুখগুলোর দিকে। যেন কোন পরমাত্মীয় কতদিন পরে এসেছে! গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে। এ যেন আমারই গর্ব! দিমিত্রিও কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বললঃ "অনেকে অনেক দূর দূর থেকে এসেছে। যে কয়দিন মহারাজ থাকবেন তার মধ্যে আর আসতে পারবে না বলে এখানে এসে প্রণাম করে যাচ্ছে। আশ্রমে এদেরকে আর দেখতে পাবে না।" আমার তখন উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নেই, শুধু মাথা নাড়লাম।

এবার সবাই মিলে গাড়িতে চড়ে রওনা হলো। আমাকে আর মহারাজকে উঠিয়ে দেওয়া হলো একটা বড় গাড়ির পিছনের সীটে। গাড়ির মালিক এক ভক্তদম্পতি সামনের সীটে। তারা বললঃ "তোমাদের নিশ্চয় অনেক কথা বলার আছে। তোমরা নিজেদের মধ্যে কথা বল, আমাদের জন্য চিন্তা করো না। আমরা চুপ করে থাকব।"

গাড়িতে যেতে যেতে স্বামী পরেশানন্দের সঙ্গে নানারকম গল্প হচ্ছে, আর মাঝে মাঝে নীরবতা—নীরবতাও ভাষাহীন নয়। কথাবার্তা নানা দিকে মোড় নিচ্ছে। আর্জেন্তিনা কেমন দেশ, লোকজন কেমন—এইসব। আর্জেন্তিনা ব্রাজিলের থেকে বেশি ইউরোপীয় ভাবাপন্ন। লোকজন আরো সিরিয়াস, গম্ভীর প্রকৃতির। ব্রাজিলের মতো এতটা উচ্ছল, ভাবপ্রবণ নয়। মহারাজ কি একটা স্প্যানিশ প্রবাদের উল্লেখ করলেন সামনের চুপ করে বসে থাকা দম্পতি হেসে উঠলেনঃ "এ আবার কিরকম বাঙলা কথা হচ্ছে পিছনের সীটে!" হাসিতে গল্পতে বাকি পথটা কেটে গেল।

সবাই মিলে আশ্রমে এসে পৌঁছালাম। সেখানেও অনেক ভক্ত অপেক্ষা করছে। সবাই মিলে মন্দিরে এসে বসলাম। সেখানে অনেক ভক্ত ধ্যান করছে—সবাই ব্রাজিলীয়। একজন ভক্ত পুজো করছে। সামনে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ফটো। মহারাজ একপাশে বসে আছেন। পুজো, ধ্যান শেষ হলে সবাই মিলে এসে নৈশাহারে বসলাম। পরদিন খুব সকালে তৈরি হয়ে আমি হাসপাতালে চলে গেলাম সেই হার্ট সার্জনের সঙ্গে। সেখানে অপারেশন, বিভিন্ন কঠিন রোগী নিয়ে ক্লিনিক্যাল মিটিং ইত্যাদিতে অংশ নিলাম, বললামও। পৃথিবীতে যেখানেই যাই এগুলো খুবই পরিচিত, ভালও লাগে। দেশে এসব কোনদিন পেলামই না, আমার কপালে জুটল না! দেশে ডাক্তারীটা যেন কিরকম, আর ভাল লাগে না ডাক্তারী করতে—শুধু পেটের দায়ে করা।

দুপুরবেলা আশ্রমে ফিরলাম। তখন দ্বিপ্রাহরিক আহারের আয়োজন চলছে। আরো অনেক নতুন ভক্ত এসেছে। সঙ্গে করে খাবার-দাবার ও তার উপকরণ নিয়ে এসেছে। আগে যারা ছিল কেউ কেউ চলে গেছে। একজন মহিলা রান্নাবান্না করছেন। বিদেশে সব আশ্রমেই এই এক চেহারা। সেখানে তো আর কাজের লোক পাওয়া যায় না। ভক্তরাই কয়েকজন আশ্রমের ঘরকন্নার সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নেয়। একজন মহিলা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছেন, তিনিই একমাত্র কিছুটা

ভারতীয়—মিশ্র ভারতীয়। এখন সাও পাওলোতে থাকেন, মহারাজের খুব ভক্ত। কিছু ভারতীয় রান্না করে এনেছেন। সবার খুব উৎসাহ—মহারাজকে ভারতীয় রান্না খাওয়ানো হবে। খেতে ভালই, ভারতীয় রান্নার একটু সুদূর ছোঁয়া আছে বটে, তবে খুবই সুদূর। মহারাজ খেতে এসে আমার দিকে দেখিয়ে হৈহৈ করে উঠলেন ঃ "আরে, ওকে ভাল করে দেখ। কত বড় সার্জন!"

হাসিঠাট্টার মধ্যে খাওয়া চলতে লাগল। ভক্তদের মধ্যে এক অল্পবয়সী দম্পতি ছিল, আর তাদের বছর ছয়েকের একটি ছেলে। স্বামী স্ত্রী নিজেদের নাম পালটে রেখেছে 'রাধা' আর 'গোবিন্দ'। গোবিন্দ গীটার বাজায়। দুজনে মিলে গান ধরল গীটার বাজিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের নামগান—বাংলা ভাষায়। ভক্তরাও অনেকে গলা মেলাল। আমি পারলাম না, আমি যে জানি না! আমি শুধু দেখতে লাগলাম এদের ভক্তি। অবশ্য

সাও পাওলো আশ্রম। ডানদিকে স্বামী পরেশানন্দ, বাঁদিকে লেখক। আলোকচিত্র ঃ লেখক

চোখে দেখে সবসময় ভক্তির গভীরতা বোঝা যায় না, নৃত্যগীতেও বোঝা যায় না। কিন্তু এদের ভক্তি খাঁটি, কারণ এদের তো কোন দায় নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আর এমনও নয় যে খুব বড়লোক, কিছু করার নেই, তাই খানিকটা ধর্ম করছে! যদি কোনদিন মনের মধ্যে সংশয় দেখা দেয়, সেফ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে; কিন্তু যায়নি। খুব কমই যায়। গোবিন্দও পেশায় ডাক্তার ছিল। ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে দুজনে চলে গেছে সাও পাওলো থেকে দেড়শ কিলোমিটার দূরে। জঙ্গলের মধ্যে আশ্রম বানিয়েছে, সেখানে থাকে। পরিবেশরক্ষার কাজ করে, প্রাকৃতিক ও ভেষজ চিকিৎসার গবেষণা করে নিজেরা। বহু দূর দূর থেকে চিকিৎসার জন্য লোকে আসে। ওতেই ওদের সংসার চলে যায়। সুন্দর দম্পতি, বহুদিন ধরে ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরই জীবন পালটে দিয়েছেন।

স্বামী ভূতেশানন্দজী আমাকে শিখিয়েছেন—জীবনে পবিত্রতা আন, ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে যুক্তি ও জ্ঞান দিয়ে বিচার কর, সবই যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিগ্রাহ্য। একবার এক পরম ভক্ত আমাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। তারপরে নিজের পুজোর ঘরে নিয়ে গিয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন ঃ "আমার পুজোর আসনে একটু বসুন।" আমি অবাক হয়ে গেলাম, বললাম ঃ "কেন, আমি কেন বসব? আমি তো কিছুই জানি না।" তিনি দুহাত জোড় করে অনুরোধ করতে লাগলেন। অগত্যা বসলাম, প্রণাম করলাম। একদিন মহারাজকে বললাম ঃ "আমাকে নিয়ে গিয়ে পুজোর আসনে বসাতে চাইল। আমি পুজো জানি না, মন্ত্র জানি না, জপ-তপ জানি না, আমি কি করব?" মহারাজ হেসে বললেন ঃ "কি আবার করবে, বসবে, প্রণাম করবে। আর কি করার আছে?" এত সহজ! রাধা ও গোবিন্দ জীবনে পবিত্রতা এনেছে, জীবন পালটে নিয়েছে, আমি পারব না?

হঠাৎ চটকা ভাঙল। দেখি গান থেমে গেছে, ভক্তরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পরেশানন্দ মহারাজ বললেন ঃ "কি হলো ডাক্তার গুপ্ত, কোথায় হারিয়ে গেছেন? এবার আপনার গান করার পালা।" আমি বললাম ঃ "আমি গান করব কি? আমি তো এসব গান কিছুই জানি না।" মহারাজ বললেন ঃ "তাতে কি হয়েছে? রবীন্দ্রনাথের গান করুন। নিন ধরুন।" আমি হাতজোড় করে বললাম ঃ "আমাকে ক্ষমা করুন আপনারা। আমার গলায় সুর নেই। কোন গানের পুরো কথা আমি জানি না। এই বিদেশে বসে এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে অপমান করতে বলবেন না।" কিন্তু মহারাজ নাছোড়বান্দা, আর ভক্তরাও বলতে লাগল—একটু করুন না, যেটুকু জানেন করুন। শেষকালে উপায় নেই দেখে বললাম ঃ "বেশ, যেটুকু জানি করছি।" কি যে ছাই গান করলাম,

কতগুলো গান করলাম কিছুই মনে নেই। আমার কথা এবং গান মহারাজ স্প্যানিশে অনুবাদ করছিলেন। ভক্তরা শুনছে। আমি বারবার ভাবছিঃ "এ কি আমার কাজ?" গানে আর কুলোল না, কবিতা ধরলাম। সন্ধ্যা নেমে আসছে। শেষকালে এই অদ্ভুত শ্রোতৃবৃন্দের সামনে যখন দুহাত বাড়িয়ে বলছিঃ "এই নদী সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে, তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।" মহারাজের স্প্যানিশে অনুবাদ শুনে তারা বলছেঃ "বাঃ, কি সুন্দর!" দু-তিনজনের চোখে জল।

তার মানে আমি পেরেছি! সুরে না পারি, ভাষায় না পারি, শিক্ষায় না পারি—আমার সমস্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও ভাব দিয়ে আমি পেরেছি। ইতিমধ্যে আরো অনেক ভক্তসমাগম হয়েছে, গমগম করছে হল। সব লোক আঁটছে না—কিছু লোক সিঁড়ির ওপরে, কিছু বারান্দায়। এসেছে সাও পাওলোর মেয়র, তাঁর ভাই, তিনিও বেশ গণ্যমান্য। বোধহয় জজ। তাঁদের ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি। সারা পরিবার দীক্ষিত ভক্ত। এসেছেন আরো অনেক গণ্যমান্য, আরো অনেক সাধারণ লোক। সকলকে মনে রাখা সম্ভব নয়। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, মন ভরে গেছে। হাসতে হাসতে কথা বলছি সকলের সঙ্গে। দিমিত্রিও কানের কাছে ফিসফিস করে বলল ঃ "এখনো ভেবে দেখ, আর কয়েকটা দিন থেকে গেলে হতো না? এরা এত ভালবাসছে তোমাকে যে, ছাড়তে চাইছে না।" আর দু-তিনঘন্টা পরেই আমার প্লেনে ওঠার কথা, বাক্সপ্যাঁটরা গোছানোই আছে। বললাম ঃ "না ভাই, আমাকে আজকে যেতেই হবে।" দিমিত্রিও বলল ঃ "ভাই বলে ডেকেছ, মনে থাকে যেন। আজ থেকে আমরা ভাই। তোমাকে আবার আসতে হবে।" মাত্র দু-তিনদিন। সত্যি করেই চোখের জলে বিদায় নিলাম। রাধা-গোবিন্দ বলল ঃ "চল, আমরা তোমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব।" আমি বললাম ঃ "সে কি! এত রাত, তোমাদের কত দূর যেতে হবে। তার ওপরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে।" ওরা বলল ঃ "তাতে কি! সেটা কোন সমস্যাই নয়।" যে-সমাজে এমন সুন্দর মানুষ, সে-সমাজের ভেতর জিনিস আছে, সব গরল কেটে যাবে। মহারাজকে প্রণাম করতে গেলাম, বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলাম।

গভীর রাত্রে প্লেন উঠল আকাশে। পিছনে পড়ে রইল ব্রাজিল। জানলার ধারে বসে বসে ভাবছি, স্বামী বিজয়ানন্দ নামের এই বাঙালী ইউলিসিস-ই বা কম কিসে! কুহকিনীর দেশে গিয়েছেন, কুহকিনী দেখেছেন, আর দিয়েছেন অমূল্য সম্পদ, প্রাণভরা ভালবাসা আর এমন এক অন্তর্দৃষ্টি যা এদেশে প্রেরণা যোগাবে অনেকদিন। জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মন চলে গেছে দুহাজার বছর আগে। দুর্গম গিরিপথ দিয়ে হিমালয়, কারাকোরাম পেরিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু চলেছেন "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" পার হয়ে। সম্বল শুধু তথাগত বুদ্ধের নাম। ব্যাকট্রিয়া পার হয়ে আমুদরিয়ার ধারে ধারে, হিসার পর্বতমালার ভিতর লৌহতোরণ, গিরিপ্রণালী পার হয়ে ফারঘানা। তারপরে পূর্বদিকে ইয়ারকন্দ হয়ে ভয়াবহ তাকলামাকান মরুভূমি। তার দক্ষিণে খোটান বা হোটান, আর উত্তরে তিয়েন সান পর্বতমালার পাদদেশ দিয়ে মরুভূমি পার হয়ে গোবী মরুভূমি। তারপরে পার্বত্য কানসু করিডর পার হয়ে চীনের প্রাচীন রাজধানী সিয়ান। শুধু যাত্রা নয়, সভ্যতা, শান্তি ও সাম্যের বীজ বপণ করতে করতে চলেছেন তিনি। গড়ে উঠেছে মঠ, স্তূপ, দেবালয়, নতুন শিল্পসংস্কৃতি, জনপদ, ব্যবসা, বাণিজ্য, সভ্যতা।

এই রুক্ষ, ভীষণ প্রকৃতির মধ্যে মানুষগুলোও ছিল হিংস্র, ভয়ঙ্কর। জীবনে ছিল খালি মারামারি, হানাহানি। বশ হলো মানুষ আর প্রকৃতি। পাহাড়ের বরফগলা নদীর জল মাটির তলার সুড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মরুভূমির মধ্যে—তাকে করা হলো শস্যশ্যামল। বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এসে মিলল তার ছত্রছায়ায়—মধ্যপ্রাচ্য, গ্রীস থেকে আরম্ভ করে চীন ও তিব্বত পর্যন্ত। সেখান থেকে যত বিতাড়িত ধর্ম ও জনগোষ্ঠী আশ্রয় পেল তার ছত্রছায়ায়—ম্যানিকিজম, নেস্টোরিয়ান চার্চ, আরো কত কি? এই সভ্যতা হাজার বছর স্থায়ী হলো। অবশেষে ভেঙে পড়ল ইসলামের আক্রমণে। তারা মঠ, মন্দির, মূর্তি সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। চীন তার দ্বার রুদ্ধ করে দিল, আবার শুরু হলো হানাহানির ইতিহাস।

কিন্তু বিধাতা সেই মহান সভ্যতাকে লুপ্ত হতে দিলেন না। তার চিহ্ন, সম্পদ লুকিয়ে রাখলেন ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য নিজের বুকে, তাকলামাকান মরুভূমির বালি আর কাঁকড়ের তলায়। আরো হাজার বছর পরে মানুষ সেগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে বের করতে লাগল—প্রথমে ধনদৌলতের খোঁজে, পরে প্রত্নতত্ত্বের খোঁজে। পাওয়া গেল কত মঠ-মন্দির আর ঐশ্বর্যমণ্ডিত লোকালয়, কত চমকপ্রদ গল্প, কত অসংখ্য পুরনো প্রাচীন পুঁথি, সংস্কৃত, খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী ও প্রাচীন চীনা হরফে লেখা, কত দৈনন্দিন জীবনযাপনের কাগজের চিরকুট।

এখন যেখানে চীনা পারমাণবিক অস্ত্র ও মিসাইলের পরীক্ষাগার, সেখানে দুহাজার বছর আগে ছিল 'লুলান' নামে এক শহর। এই শহর প্রথমে ছিল এক নাম না জানা ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রান্তিক শহর। কয়েকশ বছর পরে চীনের এক রাজবংশ এটিকে তাদের সাম্রাজ্যের সীমান্ত ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে এবং একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীকে এখানে মোতায়েন করে। ভারতীয় ও চীনারা দেশ থেকে বহুদূরে সম্পূর্ণ সহাবস্থান করে বহুদিন—চীনারা শহরের প্রশাসনে নাক গলাত না, ভারতীয়রা মিলিটারির দেখাশোনা করত। ভারতীয়রা লিখত পোড়ামাটির ফলকে খরোষ্ঠী লিপিতে, চীনারা কাগজে। গোবী মরুভূমির একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে শুধু বৌদ্ধসভ্যতা নয়, প্রোটো-দ্রাবিড়, প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে—গোবী মরুভূমি তখন ছিল শস্য-

শ্যামল। তাকলামাকান মরুভূমির মধ্যে প্রথমে হেদিন ও পরে স্টাইন দানদান-উলিক শহরের ধ্বংসাবশেষ বের করেন। সেই শহরের মূল মন্দির এত প্রাচীন যে, তার দেওয়ালের ফ্রেসকো মুসলিমদের তরবারির আঘাত থেকে বেঁচে গেছে, তারা আসার আগেই বালির তলায় তলিয়ে গেছে।

একশ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে, প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতাও প্রাক্-আর্য ভারতীয় সভ্যতার অংশ ছিল। পণ্ডিতেরা সে-কথায় তখন আমল দেননি। কিন্তু সুমেরীয় শহর 'উর' (Ur)-এর ধ্বংসাবশেষে খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার বছরের পুরনো ভারতীয় সেগুন কাঠ পাওয়া গেছে। আজ দেখা যাচ্ছে যে, খ্রীস্টপূর্ব দু-তিন হাজার বছর আগেও প্রোটো-দ্রাবিড় প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতা মধ্য এশিয়ায়, তিয়েন সান পর্বতমালার তলদেশে এবং পশ্চিমদিকে, হয়তো মেসোপটেমিয়া পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত জায়গা জুড়েই তখন শোনা যেত ঋগ্বেদ-বর্ণিত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ। তারপর অনেক কারণে খ্রীস্টপূর্ব ষোল-সতের শতাব্দীতে এই সভ্যতা সব জায়গাতেই ভেঙে পড়তে থাকে। হয়তো প্রাকৃতিক কারণ, হয়তো যেকোন সভ্যতাই যেমন কালে জীর্ণ হয়ে যায় সেই কারণে। অন্য সব জায়গায় সেই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। একমাত্র ভারতেই তা আর্য সভ্যতার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে এবং এই সংমিশ্রণে তৈরি হয় নতুন সংস্কৃতি—হয়তো তৈরি হয় 'বেদান্ত'! ছয়-সাত হাজার বছর আগের ঋগ্বেদের সমসাময়িক প্রোটো-দ্রাবিড় সভ্যতায় পাওয়া গেছে ধ্যানমগ্ন মানুষের মূর্তি। ঋগ্বেদ যদি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন না হতো তাহলে ইহুদী, ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মের পুরনো গল্পগুলি সেখানে পাওয়া যেত। ইহুদী, ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মে ঐ গল্পগুলি প্রায় এক, চরিত্রগুলিও এক। কারণ, তারা পৃথিবীর একই জায়গা থেকে উৎপন্ন। কিন্তু ঋগ্বেদ আর কোথাও নেই। কাজেই তা প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক বা তার সমসাময়িক প্রোটো-দ্রাবিড় সভ্যতারই অবদান। তারপরে দুহাজার বছর আগে পথ চলেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, হাতে শুধু পুঁথি আর ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মূর্তি—সেই মধ্য এশিয়ার দুর্গম পথে।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার জয়ের ইতিহাস এবং তার সঙ্গে সমাজ, সভ্যতা, কৃষ্টির পরিবর্তন, মানুষের মানসিকতা, অর্থনীতি, এমনকি মিলিটারি ইতিহাসের পরিবর্তন আজো লেখা হয়নি। আমাদের পণ্ডিতেরা আজ পর্যন্ত পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন আর পশ্চিমী পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হেদিন ও স্টাইনের গ্রন্থেও আবিষ্কৃত পুঁথি ও চিত্রকলার যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা আছে তা অনেক সময় হাস্যকর। পশ্চিমী ইতিহাস মিলিটারি ও অর্থনীতির ইতিহাস, কৃষ্টির সঙ্ঘর্ষে কোন্ কৃষ্টি জয়ী হলো তার ইতিহাস। কিন্তু এসবই তো করে মানুষ, তার মানসিক প্রকৃতি। এইসব বাইরের জিনিস। প্রাচ্য যে ইতিহাস তৈরি করে তা পশ্চিমী ধ্যানধারণার বাইরে। জয় শুধু মিলিটারি বা অর্থনীতি দিয়ে নয়, আধ্যাত্মিকতা দিয়েও করা যায়। আর সেই জয় হয় কল্যাণকর, দীর্ঘস্থায়ী।

ভারতের ভিতরে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কতটুকু কদর এখন? অনেকসময় শিক্ষিত সমাজের কাছে তা উপহাসের বিষয়। আজ তাই ভারতের আধ্যাত্মিক জয়ের ইতিহাস লেখার সময় এসেছে। হাজার-দেড়হাজার বছরের অন্ধকারের পরে আবার এসেছে কি সেইদিন? যখন দেখি, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেশের মানুষ ধ্যানমগ্ন বসে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ—এই তিন ভারতীয়র পটের সামনে, পড়ছে বেদান্তের বাণী যা জীবন্ত সেই তিনজন মানুষের জীবনে—তখন মনে হয় আসছে, আসছে সেইদিন! স্বামীজী বলেছেন, এই ধারা পনেরশ বছর স্থায়ী হবে। এখন তো মাত্র একশ বছর হয়েছে। এতেই এত! ইচ্ছা করে টাইম মেশিনে চড়ে আরো দু-তিনশ বছর এগিয়ে দেখি কি হচ্ছে! যুদ্ধ নয়, ধর্মান্তরকরণ নয়, তরবারির আশ্রয় নয়—শুধুই হৃদয় দিয়ে জয়, জ্ঞান দিয়ে জয়, প্রেম দিয়ে জয়! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! জয় মা! জয় স্বামীজী! ❑

"আমি খাই-দাই আর থাকি, আর আমার মা সব জানেন"

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনদর্শন অতি সরল। বিশেষ কোন জটিলতা নেই, জীবন হলো দুঃখ-সুখের অসম বিভাজন। সুখের পৃথিবী, দুঃখের পৃথিবী। জ্ঞানী বলবেন, নির্ভেজাল সুখ বা নির্ভেজাল দুঃখ বলে কিছু নেই। একটা আবর্তন। একটা চাকা যেন। এই সুখে, তো এই দুঃখে। এই আলোয়, তো এই অন্ধকারে। সুখ-দুঃখের অতীত যে সমতট, সেটির প্রাপ্তি সাধন-সাপেক্ষ—যার কথা গীতায় (৭।১৩) শ্রীভগবান বলেছেন ঃ

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।"

ত্রিগুণজাত ভাব। ত্রিগুণ হলো—সুখ, দুঃখ, মোহ। এই গুণত্রয়ই সকল ভ্রান্তির উৎস। ঈশ্বর অথবা স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির নিরূপাধিক স্বরূপ আবৃত করে রাখে। এরই নাম 'মায়া'। আর এই মায়া দুরতিক্রমণীয়। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" (ঐ, ৭।১৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ার এই আবরণী-জগতে প্রবেশ করে প্রধান দুটি গেঁড় তুলে এনেছিলেন, যা এই গুল্ম-জগতের স্রষ্টা, সেই দুটি হলো—কাম আর কাঞ্চন।

মানবজীবন যেন একটি তরঙ্গধারণকারী গ্রাহক-যন্ত্র—'রিসিভার'। আবার চিত্রটি এমনও হতে পারে—একটা মানুষ ফাঁকা মাঠে বৃষ্টিতে অবিরাম ভিজছে। সেই বৃষ্টি কখনো মুষল, কখনো ঝিরিঝিরি। দুঃখ আর সুখের উপমা। মুষলে দুঃখ, ঝিরিঝিরিতে ফুরফুরে আনন্দ। তবে প্রকৃতি সেই এক - বৃষ্টি। বৃষ্টিতেই নিহিত প্লাবনের দুঃখ, ফসলের আনন্দ। আলাদা কিছু নেই। ধারাপাতেরই তারতম্য। তাহলে আছেটা কি? দুঃখ এক, সুখ এক? না! আছে, ইন্দ্রিয় আর প্রাপ্তি। কখনো সুখ হচ্ছে দুঃখেরই নামান্তর, আবার কখনো সুখ নয়, দুঃখই হচ্ছে সুখের নামান্তর। তাহলে এই দুটির জননী কে? তিনি হলেন মায়াদেবী। আর সব মানুষেরই অপর নাম স্বভাব। ঠাকুব বলছেন, উট কাঁটাগাছই খাবে, রক্তক্ষরণ হলেও খাবে। ঠাকুর এই উপমায় উটের স্বভাবযুক্ত মানুষকেই খুঁজে পেয়েছেন। আরো খুঁজলে পাওয়া যাবে সেই অমোঘ সত্য—সংসার দুঃখের আগার। ইন্দ্রিয় মানুষকে কোনভাবেই নির্ভেজাল সুখের আস্বাদন দিতে পারবে না। অসম্ভব। তার জন্য অন্য কোন 'অ্যান্টেনা'র প্রয়োজন! সেটাই হলো 'চৈতন্য'। চৈতন্য হলো সেই 'স্পার্ক', যা 'পরাজ্ঞান'-এর উদ্দীপক। আলো জ্বেলে রাতের পর রাত বই পড়ে মানুষ 'ইঞ্জিনিয়ার' হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজন চৈতন্যের আলো। এই আলোয় অধীত হবে কী? অধ্যয়নের নেই কিছু। পাঁজিতে বিশ আড়া জল, নিঙড়ালে কিছু নেই। জ্ঞানী শকুনি, দৃষ্টি ভাগাড়ে। চৈতন্যের আলোতে বিচার, সেই বিচারের চাবিতে দরজা খোলা এবং দেখা—বসে আছেন তিনি। বলছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (ঐ, ৭।১৪) ঠাকুর বলছেন ঃ 'ঈশ্বরকে জানলে সব জানা হয়ে যায়।"

আবার এক সংশয়—'সব জানা' তাহলে কী? অনেক রকমের জানা আছে। রকম রকম জানা! না। ঠাকুর বলছেন ঃ "ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।" এইটাই হলো জানা। তারপর আরো একটু এগিয়ে জানালেন সেই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ঃ "আমি খাই-দাই আর থাকি, আর আমার মা সব জানেন।" আমার নিজস্ব কোন অনুসন্ধান নেই। তার অর্থ অতি ভয়ঙ্কর—'আমি থাকি'। এই 'থাকা' শব্দটা এক্ষেত্রে পর্বতের চেয়েও ভারী, আবার শোলার চেয়েও হালকা। মা যদি আমার স্থল হন, তাহলে আমি পর্বতের মতো, মহীরুহের মতো স্থাপিত। মা যদি আমার জল হন, তাহলে শোলার মতো আমি ভাসমান। মা যদি আমার বাতাস হন, তাহলে আমি ত্রসরেণু। যখন পর্বত তখন আমি অচল, অটল, সংশয়হীন বিশ্বাস। আমি যখন শোলা তখন আমার নাম সমর্পণ—'টোটাল স্যারেন্ডার'। আমার মা সব জানেন। তখন আমি বিড়ালের ছানা। মা যেখানে রাখেন। মিউমিউ ডাক ছাড়া আমার দ্বিতীয় আর কর্ম নেই। আমার নিজের কোন 'চয়েস' নেই, পছন্দ-অপছন্দ নেই। 'ইগো সেল্ফ', 'কাঁচা আমি'টা পেকে 'পাকা আমি' হয়ে আছে। সে এক অভাবনীয় ভয়ঙ্কর মৃত্যু। আমার 'আমি' 'তুমি' হয়ে গেছে। বলদটার মৃত্যু—"নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু"। এটি সমাধির চেয়েও কঠিন এক অবস্থিতি। "যা করেন কালী সেই সে জানে।" এর মধ্যে আনন্দ নেই, আছে 'পরমানন্দ'। বাঙলায় 'পরম' আর 'পরা' যুক্ত যে-কয়টি শব্দ-ধারণা আছে, তার দাতা এই পৃথিবীর কেউ হতে পারেন না, একমাত্র সেই ঈশ্বরই পারেন দিতে। পরমানন্দই দেবেন পরম আনন্দ, অক্ষয় ধন পরম ধন, পরম জ্ঞান পরাজ্ঞান।

আর আমি যখন ভাসমান ত্রসরেণু, তখন আমি চৈতন্যের কিরণে এক পরম ভক্ত। আমি ভাসতে ভাসতে দিশাহারা হয়ে ছিটকে যাচ্ছি না, আমি চৈতন্যের বৃত্তে নৃত্যপর সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য।

আমরা সবাই আছি, মরার জন্যই আছি। ঠাকুরের এই 'থাকা'-র নামই 'যোগ'। আমি যোগে থাকি। সামান্য মানুষের মতোই খাই-দাই, তবে যোগে থেকে খাই। সে-খাওয়াটা তখন 'অর্পণ'। "আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মাকে।" "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্"। (ঐ, ৪।২৪)

"আমি খাই-দাই আর থাকি" —এ যে কত বড় অর্থবহ এবং উপলব্ধির অতি সরল প্রকাশ, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। পৃথিবী ছেড়ে পালাচ্ছি না, গেরুয়া বা কৌপীন পরে পর্বত-কন্দরে কুম্ভক সহায়ে সমাধিমার্গের অন্বেষণ করছি না। আমি এই দুঃখ-সুখের গলিত, রক্তাক্ত পৃথিবীতে কোটি মানুষেরই একজন—'সাফারার'। আমি 'ক্রাইস্ট'—ক্রুশবিদ্ধ হব জানি। আমার ব্যাধি আছে, এমনকি ক্যান্সারও হবে। মানুষের আঘাত, চক্রান্ত, দেওয়া দুঃখের বৃত্তে আমার অবস্থান। আমি পালাই না, আমি থাকি। যথেষ্ট ভার নিয়েই থাকি—আমি আবার 'ভারী'ও। অন্যের দুঃখ বহন করি, দর্শন করি, নীরবে অশ্রু বিসর্জন করি। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির এই নীরব, নিভৃত নদীর ধারেই আমার কুটীর। আমার জীব-অনুভূতিতে সবই আমি অনুভব করি। কিন্তু আমি পালাই না বুদ্ধদেবের মতো। মহাপ্রভুর মতো মহাভাবে আমি আমার ভাবজগতে অচৈতন্য হয়ে থাকি না। আমি সাধারণের চেয়েও সাধারণ, তাই কি তোমরা আমাকে অসাধারণ বলবে! না! এই 'থাকা'টাই আমাকে দান করছে সেই দেবদুর্লভ ধন, যার নাম 'প্রেম'। জীবন-নদীর দুই পারের মাঝে, ধরে নাও, আমি এক সেতু। প্রেমের সেতু। তলায় প্রবহমান মহাকাল। সেতুর ওপারে লেখা—প্রেম নিয়ে যাও ঐ জীবনতটে। প্রেমসে বেঁচে ফিরে এস মৃত্যুর তটে। আমি এক প্রেমিক মাঝি। আমি পারাপার করাই। জীবন-নদীর ধারে এক জেলে। মাছ-গুলোকে ধরার চেষ্টা করি। ধরতে পারলে মুছে পরিষ্কার করে আবার ঐ প্রবাহেই ছেড়ে দিই।

মায়াকে চিনে মায়ায় থাকা। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙা। শ্রীরামকৃষ্ণ 'টেকনোলজিস্ট'। ধর্মের সারকথা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম। সংসারের বাইরে থেকে সংসারী। "রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলবেনঃ সংসার তার শতসহস্র থাবায় আমাকে ধরতে চায়। আমি পাঁকাল মাছ—পিছলে যাই। আমার মন পড়ে আছে নিজ নিকেতনে, আমি থাকি সংসার-বিদেশে। মুক্তি? সে আমার মা জানেন। বরং যে-জিনিসটি দিতে তিনি বড়ই কাতর, সেই ভক্তির সাধন করি। কলিতে নারদীয় ভক্তি। তুমি ভগবান, আমি তোমার ভক্ত। 'কাঁচা আমি'কে 'পাকা আমি' করা যদি শক্ত হয়, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। ভূতকে চিনতে পারলে ভূতের ভয় আর থাকে না। সংসারকে চিনতে পারলে সংসার-ভীতি আর থাকবে না। সংসার হলো আমড়া—আঁটি আর চামড়া, সারবস্তু কিছু নেই।

এই চেনার মধ্যে দুটি চেনা আছে—নিত্যকে চেনা আর অনিত্যকে চেনা। অনিত্য হলো সংসার, যার কিছুই থাকে না, সঙ্গে যায় না। আর নিত্য হলেন ঈশ্বর, যাঁর এই সৃষ্টি, যে-মায়াপ্রপঞ্চের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি বসে আছেন। যিনি একাধারে লয়, বিলয় ও নিলয়। মাকড়সা ও তার জাল। মাকড়সা বসে আছে সেই জালে। জালের মাকড়সা নয়, মাকড়সার জাল। মায়ার ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মের মায়া। বুদবুদের জল নয়, জলের বুদবুদ। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি বহুরূপী!

আচ্ছা! এসব যদি নিতান্তই কেতাবী ও কঠিন লাগে, যদি এমন প্রশ্ন জাগে—যাদের কিছু আছে তারাই এইসব 'ফ্যাশানেবল' ব্যাপার নিয়ে চোখ উলটে, গদগদভাবে বসে থাকতে পারে। এই উপদেশ শিক্ষিত কিছু বড়লোকের জন্য। যাদের কাল কি করে হাঁড়ি চড়বে জানা নেই, তাদের কি হবে? অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলবেনঃ ঠিক! এইটাই প্রকৃত প্রশ্ন। দারিদ্র্যের মতো দগদগে দুঃখ পৃথিবীতে আর কি আছে? এইটাই তো জীবের 'ক্যাপটিভিটি'। মৃত্যু একটা 'প্রসেস'। 'ছিল' 'নেই' হয়েছে। মিটে গেছে মামলা। কিন্তু দারিদ্র্য হলো 'সাফারিং'। সমস্ত 'নেগেটিভ থটস'-এর উৎস। ধর্মে পাপী-পুণ্যাত্মার বিভাজন নেই। তিলক ধারণ করে তুলসীর মালা পরলেই ধার্মিক—আমি তা বিশ্বাস করি না; বরং আমি গান গেয়ে বলব ঃ "মনে বাসনা থাকিতে কি হবে বল না জপিলে তুলসীমালা!" বরং সেই মানুষটি দেখনদার ধার্মিকের চেয়ে সহস্র গুণ বেশি ধার্মিক, যে খায়-দায় আর থাকে। কুৎসিত, ক্ষতিকারক চিন্তা যার মনে কখনো আসে না। তবে 'বোধ'। বোধকে তো অস্বীকার করা যায় না। 'আমি' বোধ থাকলে 'তুমি' বোধও থাকবে। যেমন যার আলো-জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার-জ্ঞানও আছে; যার পাপ-জ্ঞান আছে তার পুণ্য-জ্ঞানও আছে; যার ভাল-বোধ আছে তার মন্দ-বোধও আছে। কথাটা পাপ-পুণ্যের নয়। সমস্ত সমস্যার উৎস 'আসক্তি'। 'প্রবৃত্তি' আর 'নিবৃত্তি'। বিষয়াসক্ত মানুষ তার যাবতীয় বিষয়-আসয় নিয়ে অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। আবার বিষয়-আসক্তিশূন্য হতদরিদ্র বসে আছে ঈশ্বরের কোলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলবেনঃ আমি উচ্চকণ্ঠে বলেছি তো—খালি পেটে ধর্ম হয় না। ভাত, কাপড়, আশ্রয়, পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ—প্রাথমিক কর্তব্য। সেই অর্থে সংসার অবশ্যই আগে। তবে সেখানে একটাই কথা—একালে যেমন আত্ম-রক্ষার জন্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে, সেখানেও একটা জ্যাকেট পরতে হবে। অবশ্য এখানে 'আত্মা'র অর্থ দেহ। ইংরেজী 'সেল্ফ' 'সোল' নয়, সেইরকম মনটিকে ঘাতসহ, উদ্যমী করার জন্য 'বিশ্বাস' এর জ্যাকেট ধারণ করতে হবে। 'ফেথ'।

এইবার আকাঙ্ক্ষাটা কী হবে? যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই, তার অধিক নয়। অধিকের আকাঙ্ক্ষাই আবার দুঃখের। সেই অর্থে, যার অনেক আছে সে, যার কিছুই নেই তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখী। একালের ভাষায় অনেক বেশি 'ফ্রাসট্রেটেড'—জ্বলন্ত অঙ্গার। ছাই হয়ে যেতে বেশি সময় লাগে না। বিচারই মানুষকে জ্ঞানী করে। আর সেই জ্ঞানই ঈশ্বরের দৌবারিক। গোটাকতক ঘরে—সে যত বিশালই হোক, গোটাকতক ব্যাঙ্কে, হে মানব, তুমি পৃথিবীর অফুরন্ত,

অসীম ঐশ্বর্যের কতটুকুই বা সঞ্চিত করতে পারবে! আকাঙ্ক্ষা তো তোমার মনে! সেখানে অনবরত, অবিরত বিষয়ের অদৃশ্য পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধেই চলেছ! পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজগজ করে, সেইরকম বদ্ধজীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয়-বাসনা তাদের ভিতর গজগজ করছে। দারিদ্র্য দুঃখের, তার চেয়েও দুঃখের এই আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাশূন্য বিশ্বাসী মানুষের দারিদ্র্য-দুঃখ কেন, কোন দুঃখই থাকে না। নিজের কোন অবস্থাই নিজে ফেরানো যায় না। তিনি যা করেন তাই হয়। আর সেটা হাসি মুখে মেনে নিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলবেন ঃ একালে বলবে—আপনি আমাকে ভাগ্যবিশ্বাসী হতে বলছেন? একেবারেই না। আমি কেবলই বলছি—'বিশ্বাসে' বিশ্বাসী হও। সেই থেকে আসবে একটি আধ্যাত্মিক অমূল্য সম্পদ—'রোক'। আমি পাবই। আমি মায়ের সন্তান। তবে কোদাল ধরতেই হবে, আলস্য নামক তামসিকতার আল কেটে জল আনতে হবে খেতে। কাটতে হবে, খুঁড়তে হবে। ভেটকে বসে 'গেলুম', 'গেলুম', 'মলুম', 'মলুম' করলে সর্ব অর্থেই তামসিক মৃত্যু তোমাকে ঘিরে আসবে। তোমার বিশ্বাসই তোমার ইষ্ট, দেহই তোমার মন্দির, পবিত্রতাই তোমার আদর্শ। দানের চেয়ে দাতা বড়। সেই দাতাকেই চাইতে হবে। লোভ নয়, নির্লোভ। পূজা, আরতি, ত্যাগ, বৈরাগ্য সব ভিতরে। 'গীতা' 'গীতা' বারেবারে বললেই বেরিয়ে আসবে গীতার সার—'তাগী' 'তাগী'। ত্যাগীর মনোবৃত্তি নিয়ে আমার অবস্থান। মনে রাখতে হবে—সংসারে থাকতে গেলেই সুখ-দুঃখ আছে, একটু-আধটু অশান্তি আছে। কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে একটু কালি লাগবেই।

ঠাকুর বলবেন ঃ এইবার আমার কথা নয়—আমার জীবন দেখ। গুরু, কর্তা, বাবা—এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি এক সর্বত্যাগী ধার্মিকের সন্তান। নির্ভীক, সত্যবাদী এক পিতা, ধনীর শত্রুতায় ভিটেছাড়া। মানুষ রামকৃষ্ণ গোলাপ-বিছানো পথে পরমহংস হননি। যিনি পাঠিয়েছিলেন তিনিই তা চাননি। এমনকি একালের সবচেয়ে উৎকট ব্যাধি বসিয়ে দিয়েছিলেন গলায়। কেন? উদাহরণ। মানুষ চাইবে মেহনতী সাধু। যিনি মরতে মরতে বলবেন—ঈশ্বরই সব। বলবেন—সন্ন্যাস! সে তো আছেই, গৃহীরা কেন বঞ্চিত হবে পরমানন্দ থেকে।

ঠাকুর বলবেন ঃ "নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসেবশে বেশ আছ। সা-রে-মা-তে। তোমরা বেশ আছ।"

অতএব কেবল জপে যাও সেই রামকৃষ্ণ-মন্ত্র ঃ "আমি খাই-দাই আর থাকি, আর আমার মা সব জানেন।" ❑

'চণ্ডী'তে মহামায়ার দুটি রূপ

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রবাহের দুটি ধারা—একটি বৈদিক এবং অপরটি তান্ত্রিক। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই ধারা-দুটি সমান্তরালভাবে বয়ে আসছে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে। বৈদিক ধারার ভিত্তি বেদ-উপনিষদ্। অপর পক্ষে তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অগণিত তন্ত্রগ্রন্থ। বেদ-মতে এই জগতের অদ্বিতীয় সত্তা নিরতিশয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ অনিত্য, মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত। তা-ই সত্য বলে প্রতীত হয়। আবরণ উন্মোচিত হলেই নিত্যবস্তু ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে প্রতিভাত হন। অন্যদিকে তন্ত্র-মতে এই জগতের মূল সত্তা আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি 'দুর্গা', 'কালী', 'জগদ্ধাত্রী' প্রভৃতি নানা নামে ও নানা রূপে তন্ত্রগ্রন্থে বিবৃত। এই আদ্যাশক্তি মহামায়া ইচ্ছামাত্র চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করছেন, তাঁর সৃষ্ট এই বিশ্ব তিনি ধারণ করে আছেন এবং পালনও করছেন। আবার প্রলয়কালে তিনিই এই বিশ্বকে সংহার করছেন—

"ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।।"[১]

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বেদান্তের মায়া এবং তন্ত্রের মহামায়া সমার্থক নয়। বেদান্তের মায়ার পারমার্থিক সত্তা নেই। অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই তার নিবৃত্তি, তার নাশ। কিন্তু তন্ত্রের মহামায়া ত্রিকালাবাধিত, সত্তারূপিণী ব্রহ্মময়ী। তিনি নিত্যা, নিরাকারা, আবার সাকারাও বটেন। তবে বেদান্তের ব্রহ্ম এবং তন্ত্রের মহামায়া স্বরূপত অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন ঃ "যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয় তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে-দুলচে শক্তি বা কালীর উপমা।"[২] সাধক রামপ্রসাদেরও একটি গানে আছে—"কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বরূপত নিত্যা, নির্গুণা এবং নিরাকারা হলেও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য কখনো কখনো তাঁকে সগুণা সাকারা হয়ে জগতে আবির্ভূতা হতে হয়। 'দেবী-ভাগবত'-এ এর একটি সুন্দর উপমা আছে। সেখানে বলা হয়েছে—"অভিনেতার রূপ এক হলেও লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তাকে যেমন রঙ্গস্থলে নানা বেশে নানা চরিত্রের অভিনয় করতে হয়, সেরূপ দেবী মহামায়া নির্গুণা, নিরাকারা হলেও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য স্বীয় লীলায় তাঁকে নানাবিধ রূপ ধারণ করতে হয়।[৩]

এবার 'চণ্ডী' প্রসঙ্গে আসি। চণ্ডী শক্তি-সাধকদের অতি আদরণীয় এবং অবশ্যপাঠ্য একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ। ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের একটি অংশ, চণ্ডীও সেরূপ মার্কণ্ডেয়-পুরাণের একটি অংশ। চণ্ডীগ্রন্থখানি 'দেবী-মাহাত্ম্য' এবং 'সপ্তশতী' নামেও পরিচিত। তবে 'চণ্ডী'ই গ্রন্থখানির সর্বাধিক পরিচিত নাম। বলা হয়, বৈদিক ধারার পূর্ণতা যেমন 'ভগবদ্গীতা'য়, তেমনি তান্ত্রিক ধারার পরিপূর্ণতা 'চণ্ডী'তে।

।।১।।

দেবতা ও অসুরদের মধ্যে সংগ্রাম চিরকালের। এই সংগ্রাম বোধ হয় সৃষ্টির আদি থেকেই চলছে। পুরাণগ্রন্থের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে এই সংগ্রামের বিচিত্র সব সংবাদ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ তথা চণ্ডীও তার ব্যতিক্রম নয়। চণ্ডীতেও বেশ কয়েকটি দেবাসুর সংগ্রামের চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে পুরাণকারের সুনিপুণ তুলির স্পর্শে। আমাদের মূল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তা থেকে দুটি যুদ্ধের চিত্র এখানে আমরা উপস্থাপন করছি।

প্রথম যুদ্ধটি সঙ্ঘটিত হয়েছিল যখন দেবতাদের অধিপতি ছিলেন ইন্দ্র আর অসুরদের অধিপতি ছিল মহিষাসুর। সে-যুদ্ধ চলেছিল একশ বছর ধরে। দৈত্যাধিপতি মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবলোক বিপর্যস্ত। দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁদের পদ ও অধিকার কেড়ে নিয়ে মহিষাসুর নিজেই দেবগণের 'ইন্দ্র' হয়ে বসল। দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলেন। অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা মানুষের মতো মর্তে বিচরণ করতে লাগলেন। অনন্তর পরাজিত ও লাঞ্ছিত দেবতারা পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে পুরোভাগে করে শিব ও বিষ্ণুর কাছে গিয়ে দৈত্যরাজ মহিষাসুরের অত্যাচারের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন। দেবতাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনতে শুনতে প্রথমে ক্রোধান্বিত বিষ্ণুর এবং পরে ব্রহ্মা ও শিবের মুখমণ্ডল থেকে মহাতেজ নির্গত হলো। তার সঙ্গে মিলিত হলো লাঞ্ছনাক্ষুব্ধ দেবগণের পবিত্র শরীর থেকে নির্গত সমুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ। দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত প্রজ্বলিত অনলসদৃশ সেই তেজঃপুঞ্জ থেকে সহসা অবির্ভূতা হলেন দিব্য লাবণ্যবতী অপরূপা এক জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি। শম্ভুর তেজে সেই মূর্তির মুখ, যমের তেজে তাঁর বাহুসকল উৎপন্ন হলো। এভাবে বিভিন্ন দেবতাদের তেজের দ্বারা দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হলো। তারপর দেবতারা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার উপহার দিয়ে তাঁকে রণসাজে সজ্জিত করলেন। দেবগণ

১ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৭৫ ২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৭৮৩ ৩ দেবীভাগবত, ৫।৮।৫৮-৫৯

কর্তৃক অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রাদিতে বিভূষিতা দেবী অট্টহাস্য সহকারে ভীষণ নিনাদে দশদিক প্রকম্পিত করে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে অসংখ্য দানব ও বহু দানব-সেনাপতি দেবী কর্তৃক নিহত হলো। তারপর দেবী চণ্ডবিক্রমে যুদ্ধ করে শাণিত খড়্গের দ্বারা মহিষাসুরের শির তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। মহিষাসুর নিহত হলো। দেবতারা দেবীর কৃপায় বিপন্মুক্ত হলেন।

লক্ষণীয় যে, দেবীর শক্তিস্বরূপা রূপটি এখানে বিশেষভাবে প্রকটিত। শক্তিরূপে তিনি সকলের মধ্যে বিরাজিতা। বস্তুত, তাঁর শক্তিতেই সকলে শক্তিমান। এজন্য তিনি দেবতাদের সম্মিলিত তেজ বা শক্তি থেকে রূপ পরিগ্রহ করে অসুর-নিধন করলেন। তন্ত্রের শক্তিবাদের রূপটি এখানে অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মহাবীর্য দুরাত্মা মহিষাসুর বধের পর বিপন্মুক্ত দেবতারা কৃতজ্ঞচিত্তে নানাবিধ বাক্য দ্বারা দেবীর স্তব করলেন। এই স্তবই চণ্ডীর বিখ্যাত 'শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি'। ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনাশৈলীর নৈপুণ্যে স্তবটি নিরুপম। ভক্তি-আপ্লুত নত-মস্তক দেবতাদের দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁরা স্তব করলেন—

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।।"[৪]

—নিখিল দেবগণের শক্তিসমূহের পুঞ্জীভূত মূর্তিস্বরূপা যে দেবী স্বীয় শক্তিবলে এই ভুবন ব্যাপ্ত করে রয়েছেন, সমস্ত দেবতা ও ঋষির আরাধ্যা সেই অম্বিকা দেবীকে আমরা ভক্তি-ভাবে প্রণাম করি। তিনি আমাদের সর্ববিধ কল্যাণ করুন।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, স্তবে দেবতারাও মহাশক্তি মহামায়াকে 'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা'—নিখিল দেবগণের শক্তিরাশির ঘনীভূত মূর্তি বলে বিশেষিত করেছেন। স্তবের এই কথা কয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বৈচিত্র্যময় এই বিশাল বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুকে নানা বস্তুরূপে দেখাই ভ্রান্ত দৃষ্টি। সঠিক দৃষ্টিতে, সত্য-দর্শনে বিভিন্ন বস্তুসমূহকে এক অখণ্ড সত্তা বলে বোধ হয়। মানুষের দেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনেক। কিন্তু দেহী একজনই। এটিও সেরকম। এখানে দেহী সেই মহাশক্তি মহামায়া। আর ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তি তাঁরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এপ্রসঙ্গে অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের দৃশ্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুন দেখেছিলেন—ভগবানের দেহের মধ্যেই রয়েছেন সমস্ত দেবতা, চরাচর বিশ্ব, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, বাসুকি প্রভৃতি সর্পসমূহ, পৃথিবী-পদ্মের আসনে অবস্থিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা।[৫] এছাড়া আরো কত কি! আলোচ্য মন্ত্রেও আমরা মহিষাসুর বধের নিমিত্ত সমগ্র দেবগণের শক্তিসমষ্টি দ্বারা বিরচিত বিশেষ এক মূর্তিতে দেবীর আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করলাম। এই রূপটির মধ্যে তন্ত্রের শক্তিবাদের সঙ্গে বৈদিক চিন্তাধারার 'বহুত্বে একত্ব এবং একত্বে বহুত্ব' তত্ত্বটি পরিস্ফুট।

।।২।।

এবার অপর দেবাসুর সংগ্রামের কাহিনী। কালান্তরে প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবলোক কম্পিত। ইন্দ্র, সূর্য, কুবের, যম, বরুণ প্রমুখ দেবতারা নিজ নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত। শুধু তাই নয়। স্বাধিকার-বঞ্চিত ও নির্যাতিত দেবতারা স্বর্গ থেকেও বিতাড়িত। স্বর্গচ্যুত নিপীড়িত দেবতারা তখন অপরাজিতা-রূপিণী মহামায়াকে স্মরণ করলেন। কেননা, দেবী তাঁদের একসময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—বিপদকালে আমাকে স্মরণ করলে আমি সর্ববিধ বিপদ নাশ করে তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করব—

"তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলা।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ।।"[৬]

অনন্তর উৎপীড়িত ও নিপীড়িত দেবতারা তাঁর কাছে গিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন অসুরদের নির্যাতনে তাঁদের চরম দুর্দশার কাহিনী। দেবতাদের দুঃখ দেবীকে বিচলিত করল। শত্রুনাশ করে এই মহা বিপদ থেকে দেবতাদের উদ্ধার করবার জন্য তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে দেবী প্রথমে দৈত্য-সেনাপতি ধূম্রলোচনকে এবং পরে চণ্ড এবং মুণ্ড নামক মহাসুরদ্বয়কে নিধন করলেন। চণ্ড-মুণ্ডকে নিধন করার সময় দেবীর ললাট থেকে 'চামুণ্ডা' নামে খ্যাতা দেবী কালিকা নির্গত হলেন। এই চামুণ্ডাই চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করে তাদের মস্তক দেবীকে উপহার দেন। চণ্ড-মুণ্ড নিহত হলে রক্তবীজাদি বহু অসুর-পরিবৃত হয়ে শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধ করতে আসে। এই যুদ্ধে দেবী প্রথমে বহু সৈন্য-সহ রক্তবীজকে এবং পরে নিশুম্ভকে নিধন করেন। এই যুদ্ধকালে দেবীর দেহ থেকে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী প্রমুখ দেবীগণ ও নানা রূপধারিণী শক্তিমূর্তিসকল নির্গত হয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যবলও বিনষ্টপ্রায় দেখে শুম্ভ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে বলল ঃ ওরে বলদর্পে দর্পিতা অতিমানবতী দুর্গা, অতিগর্বিতা হয়ে তুই অন্য দেবীদের বলের সাহায্যে যুদ্ধ করছিস। তাই অহঙ্কার করা তোর মানায় না—

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী।।"[৭]

উত্তরে দেবী বললেন ঃ ওরে দুষ্ট, অন্য বলের কথা কি বলছিস? একা আমিই তো এই জগতে বিরাজিতা। আমার দ্বিতীয় কেউ নেই। দেখ, এরা আমার ঐশ্বর্য (শক্তি), আবার আমাতেই প্রবিষ্ট হচ্ছে—

---

৪ চণ্ডী, ৪।৩ ৫ দ্রঃ গীতা, ১১।১৫ ৬ চণ্ডী, ৫।৬ ৭ ঐ, ১০।৩

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।।"[৮]

তারপর ব্রহ্মাণী প্রমুখ সমস্ত দেবীই তাঁর দেহে বিলীনা হলেন। দেবী একাই অসুরের সম্মুখে রইলেন এবং বললেন ঃ দেখ, আমি নিজ বিভূতির প্রভাবে যেসকল মূর্তিতে অবস্থান করছিলাম, তা সবই এখন প্রতিসংহার করলাম। এখন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে একাই আছি। তুই স্থির হ—

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।"[৯]

অতঃপর দেবী এবং শুম্ভ ও তার সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। অবশেষে দেবী শূলের দ্বারা শুম্ভের বক্ষ বিদীর্ণ করে তাকে নিহত করলেন।

শুম্ভ-বধ প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, যুদ্ধে ভ্রাতা নিশুম্ভের মৃত্যুতে কাতর শুম্ভ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে। এসে দেখে, প্রতিপক্ষ দেবী দুর্গার হয়ে অগণিত দেবীমূর্তি যুদ্ধ করছেন। তা দেখে শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবীকে অতি কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করলে দেবী গম্ভীরনাদে বললেন ঃ ওরে দুষ্ট, এ-জগতে আমি তো একাই আছি। অনন্ত বিশ্বে আমার দ্বিতীয় তো কেউ নেই। তুই যাদের কথা বলছিস তারা আমারই ঐশ্বর্য, বিভূতি। এই দেখ, এরা সকলেই আমাতে লীন হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর সমস্ত দেবীই দেবী দুর্গার দেহে লীন হয়ে গেলেন। দেবী তখন একাই অসুরের সম্মুখে বিরাজ করছেন। "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"—এ-জগতে আমি একাই তো আছি, আমার দ্বিতীয় কেউ নেই। দেবীকণ্ঠে উচ্চারিত এই কথার মধ্যে আমরা উপনিষদের সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"[১০]—ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়—এই বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনছি। "অদ্বিতীয়া ব্রহ্মরূপিণী চণ্ডিকার বিভূতিসকল তাঁহারই লীলাবিলাস মাত্র। ইঁহাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। আসুরিক বুদ্ধি এই মহাতত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ। মাতাই অপরোক্ষানুভূতিতে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখাইলেন। মাকড়সা যেমন স্বদেহ হইতে সূত্র উৎপাদন করে, আবার তাহা স্বদেহেই লয় করে, এও সেইরূপ। ইচ্ছাশক্তির বিলাসে বিভূতি প্রকাশ, ইচ্ছামাত্রে স্বীয় সত্তার সংহরণ। এই মহাতত্ত্বের মূর্তি দর্শনের অজ্ঞানতা অসুরের মৃত্যু, পরবর্তী যুদ্ধ বহিরঙ্গ খেলা মাত্র।"[১১]

মহাশক্তি মহামায়ার দুটি রূপ—একটি জগদতীত এবং একটি সর্বানুস্যূত। অন্যভাবে, একটি তাঁর আত্মসমাহিত এবং অপরটি তাঁর লীলায়িত রূপ। আত্মসমাহিত বা জগদতীত রূপে তিনি শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্"[১২]—নিরবয়ব, ক্রিয়াহীন, নির্বিকার, নিরবদ্য এবং অঞ্জনহীন। অপরদিকে সর্বানুস্যূত বা লীলায়িতরূপে তিনিই নানারূপধারিণী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী নিত্যা পরমাপ্রকৃতি—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।।"[১৩]

তিনি জগদতীতা গুণাতীতা হয়েও সর্বরূপা গুণময়ী, জগতের সকল বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। 'চণ্ডী'তে মহাশক্তি মহামায়ার এই দুটি নিত্যযুগল রূপের মণি-কাঞ্চনযোগ ঘটেছে। ❑

---

৮ চণ্ডী, ১০।৫ ৯ ঐ, ১০।৮ ১০ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।২।৩
১১ চণ্ডীচিন্তা—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, কলকাতা, পৃঃ ৪৯-৫০ ১২ শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্, ৬।১৯ ১৩ চণ্ডী, ১।৭৬

অনুষ্ঠান-সূচী (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪০৬)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৪ অগ্রহায়ণ	শনিবার	২০ নভেম্বর	১৯৯৯
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	২২ নভেম্বর	,,

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২১ কার্তিক	রবিবার	৭ নভেম্বর	১৯৯৯
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্তিক শুক্লা নবমী	১ অগ্রহায়ণ	বুধবার	১৭ নভেম্বর	,,
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কার্তিক পূর্ণিমা	৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	২২ নভেম্বর	,,

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

৪, ১৭ কার্তিক	শুক্রবার,	বৃহস্পতিবার	২১ অক্টোবর,	৩ নভেম্বর	১৯৯৯
৩, ১৭ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার,	শুক্রবার	১৯ নভেম্বর,	৩ ডিসেম্বর	,,

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

স্বামীজী-জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর সান্নিধ্যে আমার পিতৃদেবের কয়েকদিন

আলমবাজার মঠ থেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম সেবক হওয়ার সুবাদে আমার পিতৃদেব কিরণচন্দ্র দত্ত শুধু যে শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল প্রত্যক্ষ শিষ্যের সেবা করার ও আশীর্বাদ পাওয়ার অনন্য সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন তাই নয়, রত্নপ্রসবিনী মহীয়সী এক দেবীর দুর্লভ সেবাধিকারও কিছুদিনের জন্য তিনি পেয়েছিলেন, যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরম সম্পদরূপে তিনি সশ্রদ্ধ স্মরণে রেখেছিলেন। সেই মহীয়সী স্বামীজীর মাতৃদেবী ভুবনেশ্বরী দেবী।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কিরণচন্দ্র সপরিবারে পুরীতে যান এবং ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর প্রাসাদোপম অট্টালিকা 'শশী নিকেতন'-এর একতলায় বাস করতে থাকেন। ঐসময় জানকীনাথ বসু পরিবার-পরিজন ও পুত্রদ্বয় শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে 'শশী নিকেতন'-এর দোতলায় ছিলেন। মাসখানেক বাদে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ প্রমুখ ঐ অট্টালিকায় বাস করতে আসেন। ইতিমধ্যে জানকীনাথ কটকে ফিরে যান এবং বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর অনুরোধে কিরণচন্দ্র সপরিবারে দোতলায় উঠে যান এবং সপরিকর রাজা মহারাজ একতলায় অধিষ্ঠিত হন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য কেন্দ্র থেকে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। রাজা মহারাজ কিরণচন্দ্রকে নির্দেশ দেন ঃ "গদাই-এর মার (কিরণচন্দ্র-পত্নী চারুবালা দেবী। কিরণচন্দ্রের মধ্যম পুত্রের নাম গদাই।) ওপর সমস্ত ভার রইল—এক হেঁশেলে সকলের রান্না হবে; একসঙ্গে সকলের খাওয়া-দাওয়া হবে।" সেসময় সব মিলিয়ে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি 'শশী নিকেতন'-এ ছিলেন। সে এক মহা উৎসব!

স্বামীজী একসময় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন ঃ "রাজা, আমার মাকে জগন্নাথ দর্শন করিয়ে দিস।" সে-কথা স্মরণে আসাতে রাজা মহারাজ ভুবনেশ্বরী দেবীকে পুরী নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। সেই অনুসারে ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর মধ্যমা কন্যা স্বর্ণময়ী ও শিবু নামে এক দৌহিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পূর্বে পুরী এসে 'শশী-নিকেতন'-এ ওঠেন। রাজা মহারাজ 'গদাই-এর মা'কে ডেকে বলেন ঃ "এঁদের দেখাশোনার ভার সব তোমার ওপর রইল।" এবং কিরণচন্দ্রকে বলেন ঃ "এঁদের তীর্থদর্শন ও বিভিন্ন উৎসবাদি দর্শন করানোর ভার তোমার ওপর রইল।" এই ব্যাপারে কিরণচন্দ্র লিখেছেন ঃ "আমার সৌভাগ্যের বিষয়, স্বামীজীর মাতৃদেবীকে সঙ্গে লইয়া আমি বহু তীর্থস্থান ও বিগ্রহ-মন্দিরাদি দর্শন করাইয়াছিলাম।"

এই প্রসঙ্গে এক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আমি পিতৃদেবের মুখে শুনেছি। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করার পর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ভুবনেশ্বরী দেবী পিতৃদেবকে বলেন ঃ "বাবা কিরণ, আমি এর আগে আরো দুবার জগন্নাথ-দর্শনে এসেছিলাম; কিন্তু রত্নবেদির ওপর জগন্নাথকে দেখতে পাইনি—শুধু নরেনকেই দেখেছিলাম। আজ আমার জগন্নাথ-দর্শন হলো।"

ব্রহ্মগোপাল দত্ত
লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

প্রসঙ্গ 'সরস্বতী মূর্তি'

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে মুদ্রিত সরস্বতী মূর্তি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। 'বেন তেন সামা' শব্দটি হবে এরকম—'বেনতেন-সামা'। জাপানে সরস্বতীর আরো অনেক নাম আছে। সেগুলি হলো—বেনজাই-তেন, বেজাই-তেন, বেনতেন, বেনজামিনি, মিয়ো-ওঙ্গাকুতেন, মিয়োং তেন, মিয়ো' ওন-তেন, দইবেন, দই-বেনজাই-তেন, দই-বেনতেন্নো, বি' ওন-তেন, কু দকু তেন-নিও, মিয়ো-ওন তেন-নিও। (দ্রঃ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon—D. N. Bakshi, p. 109)

শুধু সরস্বতীই নয়, আরো অনেক হিন্দু দেবদেবী ভারত থেকে জাপানে এসেছেন চীন ও কোরিয়া হয়ে। তবে হিন্দু দেবদেবী হিসাবে নয়—তাঁরা জাপানে পৌঁছেছিলেন বৌদ্ধ দেবদেবী হিসাবে। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে যখন বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন থেকে বৌদ্ধধর্মে এইসব দেবদেবীর প্রবেশ। তবে সেখানে বুদ্ধই হলেন প্রধান দেবতা, অন্যরা বুদ্ধের সাহায্যকারী দেবতা। চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে বৌদ্ধধর্মে এক দেবীমূর্তির অন্তর্ভুক্তি ঘটে 'তারা' নামে। জাপানে নারা আমলে ৬৪৫-৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সরস্বতীপূজার সূচনা হয়। বৌদ্ধধর্মে সরস্বতীর পরিচয় হচ্ছে 'সিততারা' হিসাবে। এছাড়া বৌদ্ধধর্মে সরস্বতী হিসাবেও দেবীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

জাপানে 'জেন' মতবাদের প্রবর্তক ভারতীয় বোধিধর্ম। তিনি ৫২৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে চীনে যান। চীনে যা 'ছা আন' বা 'ছা আন্না', তাই জাপানে 'জেন' মতবাদ নামে পরিচিত। 'বেনজাই তেন' বা সরস্বতীর মতো তাঁর মূর্তিও জাপানীরা দোকানে রেখে দেয় সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে। জাপানে সাতজন সৌভাগ্যের দেবতার মধ্যে এঁরা দুজন এবং তার মধ্যে সরস্বতীই একমাত্র নারী। সরস্বতীর সঙ্গে সাপের সম্পর্ক রোমান প্রভাবসম্ভূত নয়। আসলে জাঙ্গুলি ও সরস্বতী এক দেবী। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ১২ ঋক্ দ্রষ্টব্য, যেখানে সরস্বতীকে ৫টি জাতির ভাগ্যবিধাত্রী বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো, সায়ণের মতে, নিষাদ। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা Dr. D. N. Bakshi-র পূর্বে উল্লিখিত বইটি দেখতে পারেন। বইটি কলকাতার Firma K.L.M. বা সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডারে প্রাপ্তব্য। এছাড়া অন্যান্য আকরগ্রন্থ—Gods of Northern Buddhism—Alice Getty, An Introduction to Tantric Buddhism—Shashi Bhushan Dasgupta (Calcutta University), The Sakti Cult and Tara—edited by D. C. Sircar (Calcutta University)।

শঙ্কররঞ্জন মজুমদার
শ্রীনগর, হাবড়া
উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩২৬৩

প্রসঙ্গ বাঁশবেড়িয়ার রাজা মহাশয়েরা

'উদ্বোধন'-এর অগ্রহায়ণ ১৪০৫ সংখ্যায় আমার লেখা 'বাঁশবেড়িয়ার রাজা মহাশয়েরা' প্রবন্ধের কিছু তথ্যগত ত্রুটি হংসেশ্বরী-মন্দিরের পুরোহিত শ্রীতপন চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন গত মাঘ সংখ্যায়, সেজন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত, ধন্যবাদ সম্পাদককেও, মূর্তি-সম্পর্কিত তাঁর মন্তব্যের জন্য (যা লেখার সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছে)। তবে মূর্তি সম্পর্কে মান্যতা দেব প্রাচীন উল্লেখের। বর্তমানের মূর্তিটি পাথরের (ওজনদার) হলেও তা প্রাচীনত্বের বিচারে স্বীকৃত হবে না। এপ্রসঙ্গে প্রাচীন উল্লেখ—"The goddess Hansesvari, a form of Kali, is made of Nim wood painted blue. The god Mahadeva is shown, lying on a trikonjantra (three corner seat) and goddess Hansesvari is placed on a lotus which springs from the navel of Mahadeva." (vide, O' Malley's Hooghly District Gazetter, 1802, p. 252 and A short history of the Bansberia Raj—Shyamlal Dey, 1892)

দেবী হংসেশ্বরী মহাদেবের বক্ষস্থল থেকে নয়, নাভিপদ্ম থেকেই উদ্ভূতা। আমি দূর থেকে দেখেছিলাম, তাই এই ভুল হয়েছে। বাকি থাকে তপনবাবুর তথ্যগুলি। তিনি কোন তথ্যেরই প্রাচীনত্ব উল্লেখ করেননি। আমার প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। ৭৫৬ পৃষ্ঠায় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের উল্লেখ ভ্রমবশত হয়েছে। কিন্তু এই ভ্রমটি সংশোধিত হয়েছে ৭৫৭ পৃষ্ঠার ৩৫ থেকে ৩৭ পঙ্ক্তিতে। এবিষয়ে তপনবাবুর প্রসন্ন দৃষ্টি প্রার্থনা করি।

তপনবাবু লিখেছেন, হংসেশ্বরীর মূর্তি নৃসিংহদেবের 'ধ্যানলব্ধ'। ইতিহাস 'ধ্যানলব্ধ' কিনা তা বিচার করে না। 'পরিকল্পনা' শব্দটির প্রতি অনীহা থাকা উচিত কি? O' Malley-র আরো একটি উক্তি—"Nrishinga Deb Rai was a man of versatality. He built in 1788-89 A.D. a small temple of Godess Kali or Syambhaba, made a map of Bengal ('উড়িষ্যা'র নয়, যা আমি লিখেছিলাম) for Warren Hastings, translated the Uddisa-tantra into Bengali and assisted Rajah Jay Narayan Ghosal of Beneras in 1792, there become initiated in Tantric rites and returned in 1799. He then began to build a large temple in honour of Hansesvari, but died in 1802, before it was finished."

'বংশতালিকা' আমার রচিত নয়। ১৮৯২ সালে কলিকাতা সাহিত্যসভা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায়কে তাঁদের কার্য-বিবরণীতে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, তাঁরা এই 'বংশতালিকা' প্রকাশ করেছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রদেবের অনুমোদন ব্যতিরেকে এটি প্রকাশিত হয়েছিল—এমন মনে করা সঙ্গত হবে না।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী
ময়ূরবিহার
দিল্লী-১১০০৯১

নজরুলের জন্মভিটা চুরুলিয়া গ্রামের কথা

বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অজয় নদের ধারে অবস্থিত চুরুলিয়া গ্রামের সর্বত্র এখনো ছড়িয়ে আছে দুখু মিঞা বা নজরুলের স্মৃতি। গ্রামের অনেক মানুষ জীবিকার তাগিদে ভোর থেকে চলে যায় আসানসোল-রানীগঞ্জের শিল্পাঞ্চলে কাজ করতে। কিন্তু এই গ্রামের সব শ্রেণীর মানুষ আজও গর্ববোধ করে নজরুলকে নিয়ে।

শোনা যায়, একাদশ শতাব্দীতে এই গ্রামে চার আউলিয়া (দরবেশ) বসতি স্থাপন করেন, তাই এই গ্রামের নাম তখন থেকেই 'চুরুলিয়া'। সরকারি রেকর্ড অনুসারে ১৯১০ সাল নাগাদ গ্রামটি অবস্থিত ছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের কাছাকাছি। 'নরোত্তম' নামে এক রাজা এই দুর্গটি তৈরি করেছিলেন বলে কথিত আছে। এজন্যই একদা এর নাম ছিল 'নরোত্তমের গড়'। এই গড়ের দক্ষিণে অবস্থিত 'পীরপুকুর'। শোনা যায়, 'পীর হাজী পালোয়ান' নামে এক ফকির এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই চুরুলিয়াতেই ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ সালের ২৪ মে) জন্মেছিলেন নজরুল। চুরুলিয়া বুকে করে ধরে রেখেছে কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি। যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, সেই বাসগৃহের স্থলেই এখন গড়ে উঠেছে 'নজরুল অ্যাকাডেমি'র দ্বিতল গৃহ। নজরুলের স্মৃতি সংরক্ষণই এর উদ্দেশ্য। নজরুল পরিবারের মানুষেরা তো আছেনই, এছাড়া এলাকার বহু মানুষ বর্তমানে এই অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত। কাজী নজরুলের ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ রেজাউল করিম এই অ্যাকাডেমির সম্পাদক। আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র মযহার হোসেন অ্যাকাডেমির প্রচার ও জনসংযোগ সচিব।

চুরুলিয়া যদিও গ্রাম, তবু এখানে অনেক কিছুই আছে, যা সাধারণত একটি গ্রামে থাকে না। স্কুল, কলেজ, টাউন লাইব্রেরী—সবই আছে চুরুলিয়ায়। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই নজরুলের নামে চিহ্নিত। গ্রামের লোকসংখ্যা সাত হাজারের বেশি। গ্রামের মাঝখানে পঞ্চায়েত অফিস। এখানে যেমন মাটির বাড়ি আছে, তেমনি পাকা বাড়িও আছে। আর আছে টেলিফোন কেন্দ্র। তবু চুরুলিয়ার চেহারাটা এখনো গ্রামের মতোই। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাস এই গ্রামে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি-ভাবনা নজরুল-সাহিত্যে খুব গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। এখনো চুরুলিয়ায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি অটুট। গ্রামে আছে বেশ কয়েকটি কালীমন্দিরও। নজরুল অনেকগুলি শ্যামাসঙ্গীত লিখেছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। তাঁর শ্যামাসঙ্গীত রচনার পিছনে এই গ্রামের যে একটা প্রভাব রয়েছে—একথা বলা যেতেই পারে।

চুরুলিয়ার পীরপুকুরের কাছাকাছি অবস্থিত কবিপত্নী প্রমীলা কাজীর সমাধি। পাশেই কাজী নজরুলের অসম্পূর্ণ স্মৃতিসৌধ। বাংলাদেশে কাজী নজরুলের মৃত্যু হলে সেখান থেকে কবরের মাটি এনে এই প্রস্তাবিত স্মৃতিসৌধের কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু এখনো তা শেষ হয়নি। এই স্থানটি খুব মনোরম। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে এখানে। একটু দূরেই সেই দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। চুরুলিয়ায় প্রমীলা দেবীর সমাধিক্ষেত্র এবং নজরুলের প্রস্তাবিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন না করে কোন অনুষ্ঠানই হয় না।

এই স্মৃতিসৌধের কাছেই প্রমীলা-নজরুল তোরণ। তোরণটিও

চুরুলিয়ায় নজরুল স্মৃতি স্মারক ও প্রমীলা কাজীর সমাধি
আলোকচিত্র : বিজয়কুমার দাস

অসম্পূর্ণ। দুখু মিঞার সেই কুঁড়েঘরটি যেমন ছিল, তোরণের ওপর অংশটি সেইরকম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তোরণের ঠিক পাশেই 'প্রমীলা কাজী মুক্তমঞ্চ'। এই মুক্তমঞ্চ নির্মাণে স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাজ্য সরকার বেশ কিছু অর্থ অনুদান হিসাবে দিয়েছে। এই মঞ্চের পাশেই কাজী নজরুলের নামাঙ্কিত বিদ্যালয়। কবি এই বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন এবং কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছিলেন। ঠিক তার সামনেই রাস্তার অপর প্রান্তে 'কাজী নজরুল শহর গ্রন্থাগার'। গ্রন্থাগার-ভবনটি বেশ সুন্দর। পুস্তকসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। নজরুলের যাবতীয় গ্রন্থ ও রচনা এখানে সযত্নে সংরক্ষিত। গ্রন্থাগারের লাগোয়া বিরাট অনুষ্ঠান-কক্ষ। এই কক্ষের চার দেওয়ালে শিল্পী বিজন চৌধুরীর আঁকা নজরুল-জীবনের সমগ্র ইতিহাস। পাশেই 'নজরুল স্মৃতি সংরক্ষণশালা'। এই সংরক্ষণশালার নামকরণ করা হয়েছে 'কবিকক্ষ'। এখানে নজরুলের ব্যবহৃত ও স্মৃতিবিজড়িত নানা দ্রব্য রাখা আছে। কবির ধুতি, পাঞ্জাবী, উত্তরীয়-সহ গ্রামাফোন, খাট আর বসবার আসন। কবির পাণ্ডুলিপি হিসাবে আছে বেশ কয়েকটি গান-কবিতার খাতা। ১৯৪৫ সালে পাওয়া 'জগৎতারিণী' পদক এবং ১৯৬০ সালে পাওয়া 'পদ্মভূষণ' পদক রাখা আছে এখানে। ১৯৬৯ সালে রাজ্য সরকার নজরুলকে যে সংবর্ধনা দিয়েছিল, তার প্রশস্তিপত্রটিও এখানে সংরক্ষিত। আছে কবির স্বহস্তে লেখা বেশ কিছু চিঠিপত্র। তার মধ্যে একটি চিঠি অত্যন্ত মূল্যবান—যে-চিঠিটি তিনি লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বুলবুল কাজীর জামা আর প্রমীলা কাজীর ব্যবহৃত শাড়িও রাখা আছে এখানে। প্রমীলা কাজীর যে-শাড়িটি আছে, সেটি বালুচরী। সংরক্ষণশালার নিচের তলায় অফিস। সেখানে নজরুল রচিত গ্রন্থাবলী সংরক্ষিত।

চুরুলিয়ায় এখন সবথেকে বড় উৎসব 'নজরুল মেলা'। প্রতি বছর কবির জন্মদিনে চুরুলিয়ায় এই মেলা শুরু হয়। চলে সপ্তাহ-ব্যাপী। বহু গুণি-জ্ঞানী মানুষের ভিড় হয়। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এই উৎসবে আসে কবিতীর্থের মাটি ছুঁতে। 'প্রমীলা মঞ্চে' সারা দিন ও রাত্রিব্যাপী চলে নানা অনুষ্ঠান। ১৯৯৫ সাল থেকে এই মেলায় দেওয়া হচ্ছে 'সব্যসাচী পুরস্কার' ও 'অনিরুদ্ধ পুরস্কার'।

নজরুলের জন্মশতবর্ষে চুরুলিয়ার প্রবেশপথে স্থাপিত হয়েছে কবির আবক্ষ মূর্তি। 'নজরুল অ্যাকাডেমি' এই জন্মশতবর্ষে যেসব কাজগুলি করতে আগ্রহী, সেগুলি হলো : নজরুল স্মারক শতবর্ষ ভবন, অসমাপ্ত নজরুল স্মৃতিসৌধ সম্পূর্ণ করা, প্রমীলাদেবীর সমাধির সংস্কার, কবির রচনাবলী প্রকাশ। এছাড়া একটি নজরুল সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন, নজরুল বিদ্যাপীঠ জুনিয়ার হাইস্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করা এবং শহর গ্রন্থাগারটির সংস্কারসাধনও অ্যাকাডেমির পরিকল্পনায় আছে।

স্বীকার করতেই হয়, 'নজরুল অ্যাকাডেমি' এখানে যে মমতায় নজরুলের স্মৃতিকে ধরে রেখেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বিজয়কুমার দাস
রক্ষাকালীতলা রোড
সাঁইথিয়া, বীরভূম

'ভায়োলেন্স'-সংস্কৃতির প্রভাব

বর্তমানে পৃথিবীতে শক্তি ও ক্ষমতা দেখাবার যে ভয়াবহ রূপ উত্তরোত্তর প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তার প্রভাব বিশ্বের জনজীবনের ওপর পড়েছে এবং আমেরিকার জনজীবনের ওপর সেই প্রভাব অধিকতর। শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি, প্রযুক্তি, ধর্ম—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই প্রকাশ তাবড় তাবড় চিন্তাশীল মানুষের মনকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। গত ৯ মে '৯৯ নন্দিনী বসু 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় আমেরিকায় ভায়োলেন্স-এর যে-পরিচয় আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তাতে সেখানকার জনজীবনের ওপর এর প্রভাব জানতে পারি।

কলম্বাইন হাইস্কুলের ভয়ঙ্কর ঘটনা, জোনেসবোরোর দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে আমেরিকাবাসী আজ চিন্তিত। এখন শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা বাবা-মায়ের সঙ্গ অপেক্ষা টেলিভিশনের সঙ্গ অনেক বেশি পায়। আমেরিকায় একটি বিশেষ সংগঠনের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ৫-১৭ বছরের ছেলেমেয়েরা বছরে ১৫০০ ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে ব্যয় করে, যেখানে স্কুলে ৯০০ ঘণ্টা সময় দেয়। ১-১১ বছরের ছেলেমেয়েরা পিতামাতার সান্নিধ্য পায় সপ্তাহে ৩৯ মিনিট, যেখানে টেলিভিশনের সান্নিধ্যে থাকে ১১৯০ মিনিট। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টেলিভিশনের বিষয়বস্তু তীব্র, জোরালো, উগ্র, হিংসাত্মক ও নৃশংসমূলক। সঙ্গীতের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে এর প্রকাশ। Extreme music যাতে black metal ও death metal-এর তীব্র প্রয়োগ। ইন্টারনেট আজ অনেক কিছুকে সহজ করে দিয়েছে। এই মাধ্যমে শক্তিশালী বোমা তৈরি রপ্ত করা আজ আর অসাধ্য নয়। এর উপায় ও উপকরণ সহজলভ্য। শিশু ও কিশোর মনের চেতনাকে শুভ্রতা ও স্নিগ্ধতা থেকে তমসা ও রিরংসার দিকে ঠেলে দিতেই তা সাহায্য করে। শিশু বা কিশোর মনের চিন্তাভাবনা নিয়ে গবেষণা যত ধাপে ধাপে এগচ্ছে, তাদের মনের ভাবতরঙ্গ থেকে দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পশ্চিমী দেশগুলি দৈনন্দিন জীবনে গতির দিক থেকে যেভাবে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশই সেই গতির দিকে ছুটছে। আমাদের ভারতবর্ষও এর থেকে মুক্ত নয়। চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, ইন্টারনেটের মাধ্যম আমাদের দেশেও এখন অনেক সহজ। এমনকি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও Extreme music-এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কলম্বাইন হাইস্কুল বা জোনেসবোরো না হলেও খবরের কাগজে বা দূরদর্শনে কলকাতা, দিল্লি ও অন্যান্য শহরে এবং প্রায় সারা দেশেই কিশোর ও শিশু-মনে ভায়োলেন্স-এর ভয়ানক প্রকাশ অর্থাৎ এধরনের দুর্ঘটনার

সংবাদ আমরা পাই। এই ভায়োলেন্স-সংস্কৃতি চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ইন্টারনেটের মাধ্যম কি এগিয়ে দিতে সাহায্য করছে না?

ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে যারা আমেরিকায় এসে স্থায়িভাবে আমেরিকান হয়ে রয়েছে, তাদের তীব্র ও জোরালো মনোভাবের জন্য হয়তো আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছেলেখেলারই মতো! সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি আজ বাণিজ্যভাবাপন্ন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন'-এর একটি অংশ ছিল বিশ্বধর্মসম্মেলন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ভারতবর্ষকে বিশ্ববাসীর চোখে নতুন রূপ এনে দেয়। সভ্যতার দুটি স্রোতের একটি পশ্চিমে—শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে সৃষ্টি হয় ভোগবাদের। অপর স্রোত ভারতবর্ষে—স্থায়ী ভিত্তি আধ্যাত্মিকতার দিকে—অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরানোয় নিয়োজিত হয়। আমরা স্বামীজীর কথা সামান্যও যদি উপলব্ধি করতে পারি তাহলে সম্পূর্ণ হতাশ না হওয়াই শ্রেয়। ভারতবর্ষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। রবীন্দ্রনাথ স্বামীজী সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই। তিনি গ্রহণ করবার, মিলন করবার ও সৃজন করবার এক নতুন রূপ দেখিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের অদ্ভুত আচরণে ভয় আসে নিঃসন্দেহে। কিন্তু স্বামীজী-প্রদত্ত উপনিষদের 'অভীঃ' মন্ত্রে বিশ্বাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। দু-চারজনের ভুলের জন্য সকলকে যেমন সেই ভুল পথে ঠেলে দেওয়া যায় না, তেমনি যারা ভুল করেছে তাদেরও ফেলে দেওয়া যায় না। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উন্নতিতে টেলিভিশন, ইন্টারনেট, Extreme music আসবেই। একের পর এক আসতেই থাকবে। জ্ঞান করতে হবে সুন্দর ও শান্তির মাধ্যম। সঙ্গীত সতত‌ই সুন্দর। Extreme হলেও সুরে শান্তি আসবে।

ভারত ত্যাগ, সংযম, বৈরাগ্য, সেবা ও শান্তিকে এখনো শ্রদ্ধা করে। স্বামীজীর কথায়, সভ্যতার যে-আদর্শ 'সুবৃহৎ বিশ্বকোষ' রামায়ণ ও মহাভারতে চিত্রিত হয়েছে তা লাভ করবার জন্য সমগ্র মানবজাতিকে এখনো বহুদিন চেষ্টা করতে হবে। "ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের মতো সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, অথচ পৃথিবীতে সুন্দর ফুল ফুটিয়েছে।"

আমাদের সম্পূর্ণ হতাশ হওয়ার কারণ বোধহয় নেই। যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের দ্বন্দ্ব, ঘরে ও বাইরে তা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। স্বামী তথাগতানন্দ 'মহাভারত কথা'র নিবেদনে লিখেছেন : "বনবাসের পর পাণ্ডবদের বঞ্চিত করার জন্য সে-যুগে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হলো তা আজ সম্ভব হতো না। ইউ. এন. ও.-র মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ হতো। দুর্যোধন আজো আছেন, তবে তাঁকে এ-যুগে সুযোগ দেওয়া হয় না।" (পৃঃ ছ) দুর্যোধনরা এ-যুগে অনেক বেশি বর্বর। ইউ. এন. ও.-র আলোচনাসভায় তারা যে-বক্তব্য রাখে কার্যক্ষেত্রে তার উলটোটা ঘটায়। তবুও শ্রীকৃষ্ণকে ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ওপর সমাজের ভায়োলেন্স-সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে বিচলিত না হয়ে লক্ষ্যটা মূলে রাখাই ভাল। সংস্কৃতি কখনো কি ভায়োলেন্স হতে পারে? জানা নেই। বাণিজ্যিক উন্নতির দিকটাকে লক্ষ্য রাখা অর্থাৎ ধাপে ধাপে যেভাবে বিজ্ঞাপন দ্বারা সংস্কৃতিকে প্রচার করা হচ্ছে তার মধ্যে 'সংস্কৃতি' যেন থাকে।

বন্দনা ভট্টাচার্য

আই. আই. টি. ক্যাম্পাস, খড়গপুর, মেদিনীপুর-৭২১৩০২

আমেরিকায় দুর্গাপূজা

আমি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত ভক্ত এবং 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত পাঠক। 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ' পড়তে আমার মন উৎসুক হয়ে থাকে—এই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ভাব ও বাণী কোথায় কোথায় বিস্তারিত হচ্ছে তা জানার জন্য। স্বামীজী বলেছিলেন : "ঠাকুর দেশে দেশে পূজিত হবেন।" তাঁর এই কথা ব্যর্থ হওয়ার নয়। তারই আভাস পাই 'উদ্বোধন'-এর এই বিভাগে।

এপ্রসঙ্গে ছোট্ট অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটা অভিজ্ঞতা নিবেদন করতে চাই। গত মে মাসে মস্কো শহরে যাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সেখানে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দজী (মস্কো বেদান্ত সেন্টারের অধ্যক্ষ) নীরবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী গত সাত বছর ধরে প্রচারে রত দেখলাম। ঐ দেশের নানা প্রতিকূল আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এগচ্ছেন। অনেক রাশিয়ান পরিবারের সাথে আলাপ হলো। তাঁদের ঘরেও শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা নিয়মিত পূজিত হচ্ছেন দেখলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বই ছাড়াও বেদান্ত, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা (রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত) ওঁরা পড়াশোনা করেন। ওঁদের জীবনের একান্ত ইচ্ছা—একবার অন্তত তীর্থক্ষেত্র বেলুড়ে আসা।

আরো একটু নিবেদন করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে বেদান্ত সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। গ্রেট ওয়াশিংটনে (ডি. সি.) তিন একর জমি ও ছোট্ট বাড়ি কিনে বেদান্ত সেন্টারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ঐ জমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির স্থাপনের সব তোড়জোড় প্রায় সমাপ্ত। উদ্যোক্তা হচ্ছেন স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দ (আমেরিকান শরীর)। ঠাকুরঘরে নিয়মিত সন্ধ্যারতি, ভজন ছাড়াও নানারকমের ক্লাস হয়। গরমের সময় (জুন-সেপ্টেম্বর) এবার স্বামী তথাগতানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ, স্বামী ব্রহ্মরূপানন্দ প্রমুখ বিভিন্ন

ওয়াশিংটন (ডি. সি.) বেদান্ত সেন্টারে দুর্গাপূজা

বিষয়ে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। ১৯৯৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম এই বেদান্ত কেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সুদূর বিদেশে ভারতীয় ছাড়াও কিছু আমেরিকান ও চীনা ভক্ত আছেন, যাঁরা নিয়মিত আসেন। এখানে চারমাস থাকতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 'অহেতুকী কৃপা' অনুভব করেছি।

স্বামীজীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ—তুই কালে বটগাছের মতো হয়ে কত শত আর্তজনকে শান্তিচ্ছায়া দিবি।—এরই প্রকাশ দেখলাম এইসব বেদান্ত কেন্দ্রে। আকণ্ঠ ভোগবিলাসের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে অতৃপ্ত মন ছুটে আসে এইসব বেদান্ত কেন্দ্রে তৃষিত হৃদয় জুড়াবে বলে।

তৃপ্তি শেঠ

ই. সি. টি. পি., ফেজ-১, কলকাতা-৭০০০৭৮

শ্রীরামকৃষ্ণ হালিসহর ও হংসেশ্বরী-মন্দিরে এসেছিলেন

বহুল প্রচারিত ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীরাজকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই বক্তব্য। লেখার সমালোচনা হওয়া লেখকমাত্রেরই কাম্য। তাই শ্রীভট্টাচার্যকে সাধুবাদ জানাই।

আমার পত্রটি 'উদ্বোধন'-এর চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেখানে আমি মন্তব্য করি, শ্রীরামকৃষ্ণ হালিসহরের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। তার সমর্থনে আজ আমি এই বক্তব্য পেশ করছি।

হালিসহর একটি পরম তীর্থভূমি কয়েকটি কারণে। এখানে আছে মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভিটা, শিবানন্দ সেন, পরমানন্দ সেন (কবিকর্ণপুর), চৈতন্যভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মভূমি, শ্রীবাস পণ্ডিতের বসতবাটী, শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বসূরি সাধক-কবি রামপ্রসাদের জন্মভিটা, সিদ্ধপীঠ পঞ্চমুণ্ডীর আসন—যেখানে তিনি কন্যারূপে আদ্যাশক্তির দর্শনলাভ করেন। বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরও এখানে অবস্থিত। এর সামান্য পরবর্তী কালে এখানে জন্মগ্রহণ করেন ভারতবরেণ্যা লোকমাতা রানী রাসমণি, যাঁকে স্বয়ং বিদ্যাসাগর 'পিসি' সম্বোধন করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুণ্যভূমি হালিশহরের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন কিনা, এবিষয়ে আমার মনে প্রথম প্রশ্ন জাগে—হালিসহর থেকে প্রকাশিত ভারতের অন্যতম প্রাচীন পত্রিকা (বর্তমানে ৯২তম বর্ষ চলছে) 'আর্যদর্পণ'-এর ৮১তম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, পৃঃ ২৪৬-র 'আগচ্ছন্তু মহাভাগাঃ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করে। এই প্রবন্ধের লেখক 'ভারতপথিক' অর্থাৎ দুলালচন্দ্র চাকী একজন গবেষক। তিনি এই উপাধি লাভ করেন শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য এবং 'আর্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী তত্ত্ববাচস্পতি মহারাজের কাছ থেকে তাঁর গবেষণামূলক কাজের জন্য। তিনি একজন গ্রন্থকার ও নিয়মিত 'আর্যদর্পণ'-এর লেখক। আমি ঐ প্রবন্ধ পড়ে সরাসরি যোগাযোগ করি তাঁর সঙ্গে এবং তিনি যে যুক্তি-প্রমাণ দেখান তাতে আমি সানন্দে সহমত পোষণ করি।

আমি 'উদ্বোধন'-এ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছিলাম—"শোনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং নৌকাপথে তীর্থে যাওয়ার সময় হালিসহরে নেমে রাসমণি ও রামপ্রসাদের ভিটা এবং বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী-মন্দির দর্শন করেন।" এই বিষয়ে শ্রীচাকী মহাশয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে যে-পত্র লেখেন তার অংশবিশেষ এইরকম—"কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের হালিসহরে পদার্পণ বিষয়ে উল্লেখ নাই, সেটা আমি সবিশেষভাবে অবগত আছি। কথামৃতে তাঁর মহাজীবনের শেষ কয়েক বছরের লীলা লিপিবদ্ধ আছে, তার বাইরে তাঁর কোন লীলা থাকতে পারে না—এমত নয়। গবেষণা যুক্তিভিত্তিক, তাই আমার যুক্তি এই মত। আমি দেখেছি, তিনি ছিলেন প্রেমিক ও সর্বদা অনুসন্ধিৎসু।

"শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, কেশব সেনের কাছে গেছেন দেখা করতে এটা জেনেই যে, বিদ্যাসাগর নাস্তিক হিসাবে পরিচিত, কেশব সেন ব্রাহ্ম আচার্য। তিনি বাংলার নব্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বিপ্লবী চরিত্র মহাপ্রভুর মতোই। তিনি রাসমণিকে জগন্মাতার 'অষ্টসখী'র অন্যতমা বলেন। রাসমণি হালিসহর-দুহিতা হয়েও এখানে মন্দির করতে পারেননি রক্ষণশীল বিরোধিতায়—এটা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তিনি আজীবন রামপ্রসাদের গান গাইতেন। একথাও মাকে বলেন ঃ 'তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি আমাকে দিবি না?' চিরকালই ভাগীরথীর পূর্বকূল নাব্য, তাই নৌকা চলাচল করত ও করে চিরকাল পূর্ব তীর ঘেঁষে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নৌকা থেকে রামপ্রসাদের গান শোনেন, রামপ্রসাদের সঙ্গে শ্যামনগরের কালীমন্দিরের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি হলো—রামপ্রসাদ যখন আপনমনে গান গাইতে গাইতে নৌকাপথে যাচ্ছিলেন, তখন শ্যামনগরে অধিষ্ঠিতা মা কালী তাঁর গানে প্রীত হয়ে তাঁর দিকে ফেরেন। সেই হেতু মায়ের মূর্তি পশ্চিমমুখী। আগে নাকি পূর্বমুখী ছিল। মথুরামোহনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ নৌকায় এই তীর ধরে একাধিকবার যাতায়াত করেন। এটা মথুরামোহনের শাশুড়ি ঠাকরুনের পিত্রালয়-মাতুলালয়, তার ওপরে রামপ্রসাদের জন্মভিটা, পঞ্চমুণ্ডি আসন ও বেড়া বাঁধার স্থান, দেখা দেওয়ার স্থান; এসব দর্শন করতে তিনি নৌকা থেকে নামেননি—এটা অবিশ্বাস্য ও তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। কেশব সেনের বাড়িও নৈহাটার নিকটবর্তী গরিফা (গৌরিভা)। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে পদার্পণ করেছিলেন। তৎকালে পশ্চিমকূলে বিশেষ বড় বাড়ি ছিল না, তাই নৌকা থেকে হংসেশ্বরী-মন্দিরও দেখা যেত। সুতরাং তিনি সেখানেও গিয়ে থাকবেন। তার ওপর গৌরাঙ্গ-ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রভুর গুরুপাট চৈতন্যডোবা দর্শন করতেও নামেননি—এটি অবিশ্বাস্য। তিনি হালিসহরে পদার্পণ করেন—এটি অকাট্য সত্য বলেই আমাদের বিশ্বাস।"

তবে এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের আরো গবেষণার অবকাশ ও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

শিবসৌম্য বিশ্বাস

হালিসহর স্টেশন রোড, শিতলাবাড়ি, পূর্বাচল

পোঃ নবনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি

শঙ্কর ঘোষ

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতার আসনে যিনি অধিষ্ঠিত, যাঁর রচিত পদ স্বয়ং মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়ে আস্বাদন করতেন, তিনি হলেন মধ্যযুগের প্রেম ও সৌন্দর্যের 'কবি সার্বভৌম', মিথিলার অধিবাসী কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি বাঙালী নন, বাঙলা ভাষাতেও পদ রচনা করেননি। অথচ বাঙলা সাহিত্যের আঙিনা থেকে আমরা এই কবিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। কারণ, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ওপর বাংলার বাইরের যেসব কবির প্রভাব পড়েছে, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাপতিই প্রধান। তাঁর পদাবলী বহু বৈষ্ণব কবিকে কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়েছে, তাঁদের ভাব ও ভাষার সন্ধান দিয়েছে। বিদ্যাপতির বহু অসম্পূর্ণ পদ বাংলার নানা কবি পূরণ করে সেই পদগুলিকে নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এসম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বনামখ্যাত কবি ও সমালোচক কালিদাস রায় বলেছেনঃ "বিদ্যাপতি বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের গুরুস্থানীয়। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদি বহু বাঙালী কবি বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা অনুকরণ ও অনুসরণের দ্বারা গুরুর মর্যাদা বাড়াইয়াছেন। ইঁহাদের ব্রজবুলির পদ যে-হিসাবে বাঙলা কবিতা বলিয়া আদৃত, বিদ্যাপতির পদও সেই হিসাবে বাঙালীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য।"[১]

মিথিলার কবি হয়েও বাংলাদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যাপতির যশ ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন কারণে। সেই সময়ে মিথিলা ও বাংলার মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান হতো। বহু বাঙালী ছাত্র মিথিলায় গিয়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, বহু মৈথিলী ছাত্র বাংলায় এসে সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করতেন। এই কারণে বাঙালীরা সহজেই মৈথিলী ভাষা বুঝতে পারত, মিথিলার ছাত্রেরা সহজে বাঙলা ভাষা বুঝতে পারত। ফলে বাংলার কবি জয়দেব মিথিলায় এবং মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বাংলায় জনপ্রিয় হয়েছেন।

মহাপ্রভু যে বিদ্যাপতির পদ শ্রবণ করতে ভালবাসতেন তার উল্লেখ রয়েছে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। মহাপ্রভু ভালবাসতেন বলে তাঁর ভক্তগণের মধ্যে বিদ্যাপতির পদাবলীর খুব প্রচার হয়েছিল। বিখ্যাত সাহিত্যিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এসম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ "তাঁহার গানে যে শুধু মিথিলার লোকই মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন নহে। সমস্ত আর্যাবর্ত তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়াছিল। বেশি হইয়াছিল বাঙ্গালা। চৈতন্যদেব তাঁহার গান বড় ভালবাসিতেন। সুতরাং চৈতন্য সম্প্রদায়ের সব লোকই বিদ্যাপতির গোঁড়া ভক্ত ছিলেন।"[২]

বিদ্যাপতির খ্যাতি রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদের জন্য অবশ্যই, তবে তিনি শিব, গণেশ, কালী, গঙ্গা-সহ বহু দেবদেবীর বন্দনা করে বহু পদ রচনা করেছেন। ফলে হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের কাছে তিনি অনায়াসে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদে বহু ক্ষেত্রে তিনি রাধা বা শ্রীকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। সেইসব পদে সর্বদেশের ও সর্বকালের নরনারীর প্রেমের রূপটি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। এইসব পদে এমন একটি সর্বজনীন আবেদন রয়েছে, যা কবিকে বাঙালীর এত প্রিয় করে তুলেছে।

বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণে বাঙলা ও মৈথিলী ভাষার মিশ্রণে এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়। সেই ভাষার নাম 'ব্রজবুলি'। এই কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষা ব্রজ বা বৃন্দাবনের মৌখিক ভাষা নয়। এ-ভাষা তৎকালীন মৈথিলী ভাষা থেকে উদ্ভূত এবং বাঙলা ভাষার রসসম্ভারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত। গ্রিয়ার্সন স্বীকার করেছেন যে, ব্রজবুলি বাংলারও নয়, মিথিলারও নয়, বাঙলা ও মৈথিলীর মিলিত এক সঙ্কর ভাষা। এ-ভাষার শ্রেষ্ঠ নির্মাতা অবশ্যই বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির অনুকরণে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করে যশস্বী হয়ে উঠেছিলেন গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বলরামদাস প্রমুখ কবিবৃন্দ। আধুনিক কালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলিতে পদ রচনা করতে প্রয়াসী হন। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে রবীন্দ্রনাথ যা লিখলেন, তা ঐ বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণেই।

বিদ্যাপতির জন্ম-মৃত্যুর কালনির্ণয় নিয়ে এপর্যন্ত ঐকমত্য হওয়া যায়নি। অনুমাননির্ভর সূত্র ধরে বলা যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিথিলার অন্তর্গত বিসফী গ্রামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে বিদ্যাপতির জন্ম হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর তিরোধান ঘটে। দীর্ঘজীবী এই কবি কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী রাজার রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। বিদ্যাপতি রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

---

১ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য—কালিদাস রায়, ১ম খণ্ড, দি নিউ প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ১৭

২ বিদ্যাপতি—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, উচ্চ মাধ্যমিক বাঙলা সঞ্চয়ন, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৩৫

হলো—'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা', 'পুরুষপরীক্ষা', 'ভূপরিক্রমা', 'শৈবসর্বস্বহার', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'লিখনাবলী' প্রভৃতি। অলৌকিক মধুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি। সুমিষ্টতার জন্য তাঁর 'কোকিলকণ্ঠ' সর্বজনবিদিত। বিদ্যাপতি সেই কোকিল-কণ্ঠকে অতিক্রম করে গেছেন, তাই তিনি 'মৈথিল কোকিল'। এ-বিশেষণে অতিশয়োক্তি নয়।

বেশ কিছু স্মরণীয় গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা মূলত রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদাবলীর জন্য। জয়দেব রচিত 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কাব্যে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের বসন্তলীলার আদলে বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। জয়দেবকে অনুসরণ করলেও তা প্রকাশ করলেন অভিনব এক ভাষায়, যার নাম 'ব্রজবুলি'। সে-গানে রাজসভার বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হলেন, বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠকেরাও মুগ্ধ হলেন। তাই তাঁর খ্যাতি হলো 'অভিনব জয়দেব' নামেও। এসম্পর্কে প্রসিদ্ধ সমালোচক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "[বিদ্যাপতি] সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন জয়দেবের গীতগোবিন্দের দ্বারা। জয়দেবের আদর্শই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল। তাই তিনি 'অভিনব জয়দেব' আখ্যায় মিথিলায় পরিচিত হয়েছিলেন।"[৩]

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে বিদ্যাপতির নিষ্ঠা ছিল। ঐ অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিত নায়ক-নায়িকা প্রকরণ অনুসারে তিনি রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন লীলাপর্যায়ের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের বিরহ ও মিলনলীলা বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনের পর তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় শ্রীকৃষ্ণই হয়ে উঠেছেন রাধার জীবনসর্বস্ব। তাই 'পূর্বরাগ' পর্যায়ে বিদ্যাপতির রাধা অকপটে স্বীকার করেন—

"হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।।"

বিদ্যাপতি পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধার যে অনবদ্য মূর্তি অঙ্কন করেছেন, তাতে প্রেমঘন চাঞ্চল্য, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের উচ্ছলতা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। আবার 'অভিসারে'র পদে অভিসারিকা রাধা অসমসাহসিকা এবং দৃঢ় সঙ্কল্পে স্থির। তাই সখীকে রাধা বলছেন—

"সখী হে আজ জায়ব মোহী
ঘর গুরুজন ডর না মানব
বচন চুবাব নহী।।"

বিদ্যাপতির 'অভিসার' বিষয়ক পদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সত্যবতী গিরি লিখেছেন ঃ "বিদ্যাপতি রাধার বর্ষাভিসার, দিবাভিসার ও জ্যোৎস্নাভিসার বর্ণনা করেছেন। এই বিচিত্র পর্যায়ের অভিসার বর্ণনায় তিনি পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও প্রেমিকা রাধার যে বিচিত্র, মধুর রূপ তিনি অঙ্কন করেছেন, তা শিল্পী হিসাবে তাঁর শক্তিকেই প্রমাণ করে। জয়দেবের অনুসারী হলেও অভিসারের পদে জয়দেবের তুলনায় বিদ্যাপতির রাধা গরীয়সী।"[৪]

শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেলেন মথুরায়। সমগ্র বৃন্দাবন জুড়ে নেমে এল মর্মভেদী হাহাকার। এক শূন্যতা গ্রাস করেছে শ্রীরাধার অন্তর। কৃষ্ণ-বিরহাতুরা রাধার বিরহার্তি এক নিদারুণ হতাশার বেদনায় ভারাক্রান্ত। বিদ্যাপতির 'মাথুর' বিষয়ক পদগুলিতে সেই বেদনার, সেই হাহাকারের ছবি ফুটে উঠেছে—

"এ সখী হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।"

নিসর্গ-সচেতন বিদ্যাপতির সার্থকতা এই যে, তাঁর মাথুর-বিরহের পদ বর্ষাপ্রকৃতির পটভূমিকায় সংস্থাপিত হয়ে অসাধারণ রূপলাভ করেছেন। 'পূর্বরাগ', 'অভিসার' প্রভৃতি নানা স্তর পেরিয়ে রাধা বিরহে এসে শান্ত, নম্র, মঙ্গলশ্রী রূপলাভ করেছেন। রাধা-চরিত্রের রূপকার হিসাবে এখানেই বিদ্যাপতির উত্তরণ ঘটেছে।

রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে পদকর্তার তাঁদের পদাবলীর সমাপ্তি ঘটাননি। এক অভিনব পন্থায় রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংগঠিত করেছেন। সেই পন্থার নাম 'ভাব-সম্মিলন' বা 'ভাবোল্লাস'। এই মিলন দেহজ নয়, ভাবের মধ্য দিয়ে মিলন। কারুণ্য, গভীরতা ও ব্যাপকতায় 'ভাব-সম্মিলন' 'মাথুরে'র বেদনাকেও ছাড়িয়ে যায়। কৃষ্ণার্তি-ভরা দৃষ্টিতে প্রিয়তমকে দেখে রাধা কলকণ্ঠে বলতে পারেন—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সকল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।।"

৩ বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৯২ সং, পৃঃ ৩৪

৪ শ্রীরাধার বিবর্তন ঃ চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্য-পরবর্তী বাঙলা সাহিত্য, প্রধান সম্পাদক—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃঃ ৫৯

প্রিয়তমকে হৃদয়ের কাছে পেয়ে কী উল্লাসই না অনুভব করেছেন শ্রীরাধিকা! 'ভাব-সম্মিলনে'র পদে যে কাব্যিক উৎকর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে সামগ্রিকভাবে পদাবলী-সাহিত্য রসসমৃদ্ধির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে। এতে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-মিলনাকাঙ্ক্ষার জয়ধ্বনি যদিও উচ্চারিত, তবু এই পর্যায়ের পদের উত্তরণ ঘটেছে শিল্পোৎকর্ষের ভাবলোকে। তীব্র বিরহ-হুতাশনে ভস্মীভূত হয়েছে দেহগত কামনা-বাসনা। সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে জন্মলাভ করেছে পরিশুদ্ধ সমুজ্জ্বল প্রেম। বিদ্যাপতির রাধা তখন নিঃসংশয়ে বলতে পারেন—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল।।"

জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে বিদ্যাপতি তাকিয়েছেন তাঁর সমগ্র জীবনধারার দিকে। বেলা-শেষের আলোয় তিনি পর্যালোচনা করেছেন তাঁর অতীত জীবন, তাঁর কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি। ব্যথাভরা চিত্তে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সহস্র মায়া-মোহ-বন্ধনে বন্দী সংসারজীবনের অর্থহীন অসারতা। সামনে মৃত্যুভয়, পিছনে রয়েছে জীবনের দুঃসহ অপচয়। এ দোটানায় কবিকণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। ভোগ থেকে যোগের পথে যাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। উপলব্ধি করলেন, ঈশ্বরই শুধুমাত্র শাশ্বত—চিরন্তন। দুচোখে দরবিগলিত অনুশোচনা ও গ্লানির অশ্রুধারা নিয়ে তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন পরমারাধ্য করুণাঘন ঈশ্বরের কাছে। বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদগুলিতে কবির আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণের সুরই প্রধান হয়ে উঠেছে।

"তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে।।
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।"

পরিণামে তাই বিদ্যাপতি অপরূপ শান্ত-বিনম্র ভঙ্গিতে নিঃশর্তে আত্মনিবেদন করেছেন ঈশ্বরের পদপ্রান্তে। তাঁর বিশ্বাস, ঈশ্বরের করুণালাভে তিনি বঞ্চিত হবেন না—

"মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।।"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদ আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে 'সুখের কবি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'র পদ বা 'বিরহে'র পদ পাঠ করলে স্বভাবতই মনে হয়, তিনি শুধু সুখের কবি নন—দুঃখেরও কবি। সুখ-দুঃখাতীত যে আনন্দানুভূতি, বিদ্যাপতি সেই আনন্দের কবি। ব্যক্তিগত প্রতিভা ও গভীর কাব্যানুভূতির সাহায্যে তিনি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পথিকৃৎ। কেউ কেউ তাঁকে 'কবি সার্বভৌম' নামে চিহ্নিত করেছেন। বিদ্যাপতির পদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে—"বাক্-বৈদগ্ধ্যে যাঁহার তুলনা নাই, রূপ ও রসের মিলনোল্লাসে যাঁহার কাব্য চমৎকৃতির শেষ স্তরে উঠিয়াছে এবং অন্তত প্রধান কয়েকটি রসপর্যায়ে যাঁহার কবিকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই মহান কবি বিদ্যাপতিকে তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে বোধ করি মিথ্যাচার করা হয় না।"[৫]

বিদ্যাপতির পদাবলী ইন্দ্রিয়লোক থেকে অতীন্দ্রিয়লোকে পৌঁছাবার পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রথম যুগের রূপোচ্ছল মনোধর্মী কবিতায় তিনি যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপলোকের চিত্র অঙ্কন করেছেন, পরবর্তী যুগের প্রাণধর্মী রচনায় তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত রসলোকের নিরলঙ্কার পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করেছেন। সম্ভবত সেই কারণে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন: "বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন-সমীরণের নিঃশ্বাস।"[৬] ❑

---

৫ মধ্যযুগের কবি ও কাব্য—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৮৭, পৃঃ ৪৭

৬ বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৫৮

'কলমীর দল'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গত ১৯ জুলাই ১৯৯৬ দেহত্যাগ করেন। তিনি আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের তিনি সচিব ছিলেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'উদ্বোধন'-এ বহু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন। বর্তমান নিবন্ধটি তাঁর সর্বশেষ বাঙলা রচনা। ওয়াশিংটনের ভক্ত পঙ্কজ ঘোষ শ্রদ্ধানন্দজীর কাগজপত্রের মধ্যে পেয়ে রচনাটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

একজন যোগী চন্দ্রসূর্যাদি ছাপাইয়া কোন এক দিব্য লোকে চোখ বুজিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। এক শিশু কোথা হইতে আসিয়া যোগীর ধ্যান ভাঙিয়া তাহাকে নিচে আসিতে বলিল। কলিকাতায় এবং আশপাশে নানা বালক ও যুবক নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। শিশুটি একে একে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি শক্ত রঙিন সুতা সকলের হাতে জড়াইয়া সকলকে এক করিল। বলিল, আর পালাবার পথ নাই, যেখানে আছ থাক, যা করছ কর কিন্তু যখন টান দিব তখন আসতে হবে। দিন যায়, মাস-বর্ষ যায়। সেই দিব্য শিশুর রঙিন সুতায় শতশত ছেলে চূড়াবাঁধা পড়িতে লাগিল, এমনি করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ রূপ নিল—একটি বৃহৎ 'কলমীর দল'।

কলমীর দলের উপরে নানাপ্রকার জলজন্তুর শিকারান্বেষণ, পরস্পরের কলহ, লুকাচুরি ইত্যাদি চলিতে থাকে—কিন্তু দলটি রঙিন সুতার টানে একটু স্থানান্তরিত হইলে নিচে পরিষ্কার জল দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তপরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী বালক-বালিকা সবাই আছেন। সবাই যে সকলকে খুশি রাখিয়া, কারুর সহিত মতবিরোধ না করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন তা নয়। কেহ চাকরি করিতেছেন, কেহ চাকরি হারাইতেছেন, কেহ ব্যবসা করিতেছেন। লাভ বা লোকসান দুই-ই আছে। কেহ রান্নাবান্না, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করিয়া ছেলেমেয়েদের তদ্বির করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছেন। তবুও কলমীর দলের মতো একটি একতাকে যে সকলে ধরিয়া আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বিপদ-আপদ আসিলে প্রত্যেকে প্রত্যেককে বুঝায়—ভয় কি? ঠাকুর আছেন। কলমীর দলের নিচে পরিষ্কার জল ঠাকুরের শান্তির প্রতীক। ঠাকুর আমাদের ধরিয়া রাখিয়াছেন, শক্তি দিতেছেন।

কলমীর দলে আশ্রয় পাওয়া বহু সৎকর্মের ফলে সম্ভব হয়। কলমীর দলকে লইয়া যিনি খেলা করিতেছেন, তিনি ব্রহ্মগোপাল শ্রীরামকৃষ্ণ। কলমীর দল তাঁর জীবন্ত ক্রীড়াভূমি। একতাতেই অভয়, একতাতেই আনন্দ। ভগবান শুধু একটি মন্দিরে নাই। সকল মন্দিরেই তাঁহার প্রদীপ জ্বলিতেছে। কোন্ দেবালয়ে তুমি মাথা নত করিলে, কোন্ দেবতার গানে তুমি মাতিয়া উঠিলে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। তোমার ভক্তিপ্রণতি একই জায়গায় পৌঁছিবে। তোমার গান ও ভক্তি তিনিই গ্রহণ করিবেন—যাঁহার চোখ সর্বত্র, কান সর্বত্র।

উপনিষদ্ পড়িলে সমস্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডকে এক মহাসত্যে সংগ্রথিত বলিয়া দেখিবার উপদেশ পাই। দূর ও নিকট, উচ্চ ও নিচ, জল ও স্থল, পাহাড় ও মরুভূমি, ছোট ও বড়, নদী ও সাগর—প্রকৃতির এই সকল অভিব্যক্তিই এক নিরংশক অবিভক্ত সত্যের উপর দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। কলমীর দলের কথা মনে পড়ে নাকি?

প্রাণিজগতের ব্যাপার দেখা যাক। আফ্রিকার জঙ্গলে শত শত হস্তিযূথের কথা মনে কর। শত শত হরিণ, জেব্রা ছুটিতেছে। কয়েকটি বাঘ তাহাদিগকে তাড়া করিতেছে। একটি জেব্রা পিছাইয়া পড়িয়াছে। দুটি বাঘ তাহার উপরে ঝাঁপ দিয়া তাহার গলা কামড়াইয়া জঙ্গলের একপাশে টানিয়া তাহার মাংস ছিঁড়িতেছে। উপরে শকুনি উড়িতেছে, বাঘের খাওয়া হইয়া গেলে কিছু প্রসাদ পাইবার আশা। আবার অন্য অঞ্চলে অন্য প্রাণী নানা রঙের, নানা স্বরের। বিভিন্ন পাখির বইতে অসংখ্য পাখির বিবরণ পড়িলে চমৎকৃত হইতে হয়। সমস্ত প্রাণিজগৎ একটি বিরাট কলমীর দল নয় কি? বাহিরের বীভৎসতা সুন্দরের সহিত মিলিয়াছে অন্তরের আধ্যাত্মিক অনুভবে বীভৎসতা ও সুন্দর দুয়ের নিচে এক নির্মল সত্য ঝলমল করিতেছে।

অখিল বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ কলমীর দল। এই দলের পশ্চাতে জন্মহীন মৃত্যুহীন রাগহীন দ্বেষহীন ব্রহ্মগোপাল রঙিন সুতা দিয়া সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কাহারও পালাইবার উপায় নাই। ইহা তাঁহার খেলা—বহুত্বে একত্বের খেলা। ❑

চিরন্তনী
অকালবোধন
❏ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❏
কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত ❏ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত
লঙ্কার অধিপতি দশানন রাবণ রামচন্দ্রের সহধর্মিণী রঘুকুল-বধূ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় এনে অশোক বনে বন্দী করে রেখেছেন। চেড়ীদের কঠোর পাহারায় দেবী সীতা দুঃসহ যন্ত্রণায় দিন যাপন করছেন।
যুদ্ধে রাবণকে পরাস্ত করে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীরামচন্দ্র বানর সৈন্য সংগ্রহ করে অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে লঙ্কায় এসেছেন। সেও অনেকদিন হয়ে গেল। কতদিন ধরে যুদ্ধ চলেছে, দুপক্ষের কত বীর মহাবীর সৈন্য সামন্ত হতাহত হলো, কিন্তু লঙ্কেশ্বরকে কিছুতেই পরাজিত করা গেল না। রামচন্দ্র বিষণ্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর অবস্থা দেখে লক্ষ্মণ, মহাবীর হনুমান, রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ বিভীষণ, বানররাজ সুগ্রীব, ভল্লুকরাজ জাম্ববান সকলেই বিষণ্ন এবং চিন্তাগ্রস্ত।
রামচন্দ্র এবং তাঁর বাহিনীর সেই বিষণ্নতার সময় রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হলেন পিতামহ ব্রহ্মা। তিনি রামচন্দ্রকে বললেন ঃ "রাম, তুমি আদ্যাশক্তি দেবী দশ-ভূজা দুর্গার আরাধনা কর, দেবী দুর্গার প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেই ত্রিলোকবিজয়ী বীর দশানন রাবণকে পরাস্ত করা সম্ভব। এছাড়া আর অন্য উপায় নেই।"
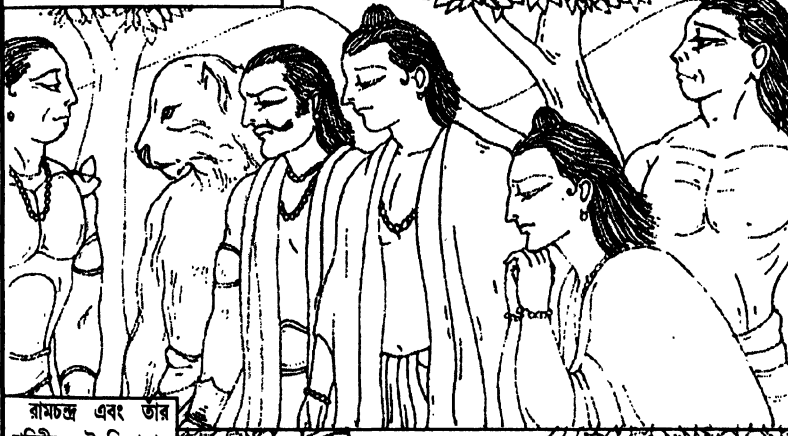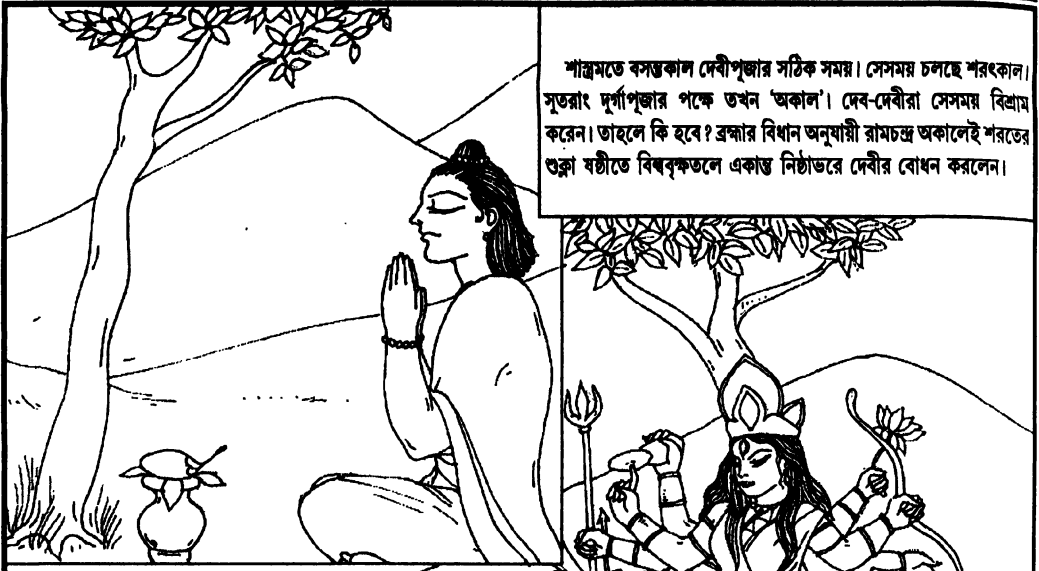
শাস্ত্রমতে বসন্তকাল দেবীপূজার সঠিক সময়। সেসময় চলছে শরৎকাল। সুতরাং দুর্গাপূজার পক্ষে তখন 'অকাল'। দেব-দেবীরা সেসময় বিশ্রাম করেন। তাহলে কি হবে? ব্রহ্মার বিধান অনুযায়ী রামচন্দ্র অকালেই শরতের শুক্লা ষষ্ঠীতে বিল্ববৃক্ষতলে একান্ত নিষ্ঠাভরে দেবীর বোধন করলেন।
রামচন্দ্র নিজের হাতে সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার মূর্তি গড়লেন। মহা উৎসাহ ও আনন্দে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথিতে বিধিসম্মত উপায়ে তিনি দেবীর পূজা করলেন। দেবীর প্রসন্নতালাভের উদ্দেশ্যে নানা স্তব-স্তুতি করে দেবীর আরাধনা করলেন। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে তিনি নিষ্ঠাভরে যথারীতি সন্ধিপূজা করলেন।
পূজা সাঙ্গ হলো। দেবী জগন্মাতা কিন্তু রামচন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন না। তাঁর কাতর প্রার্থনায় দেবীর সাড়া পাওয়া গেল না। রামচন্দ্র হতাশ হয়ে মনে মনে ভাবছেন : আর কি করলে দেবী আমার প্রতি সন্তুষ্টা হবেন? প্রসন্না হবেন? এমন সময় বিভীষণ পরামর্শ দিলেন, দেবীদহ থেকে একশ আটটি নীল পদ্ম এনে দেবীর পূজা করলে তিনি নিশ্চয়ই প্রসন্না হবেন।
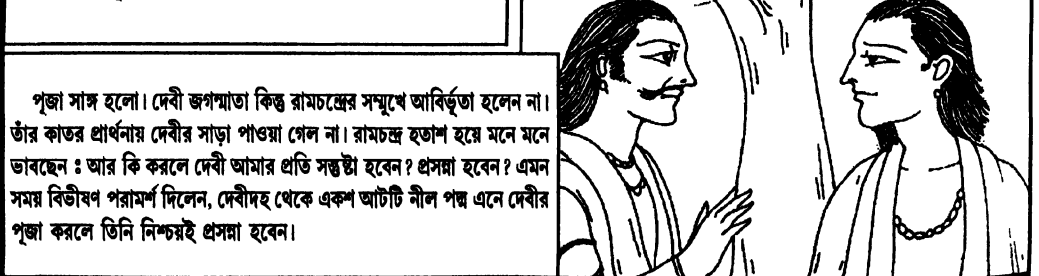
দেবীদহ! সে যে অনেক দূর! কিন্তু রামচন্দ্রের সেবক হনুমানের অসাধ্য নয় সে-পথ পাড়ি দেওয়া। পবনপুত্র হনুমান বাতাসের বেগে সেই পথ পেরিয়ে দেবীদহ থেকে একশ আটটি নীল পদ্ম সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন।
রামচন্দ্র সেই একশ আটটি নীলপদ্ম দিয়ে দেবী দুর্গাকে পূজা করবেন বলে সঙ্কল্প করে পূজায় বসলেন। একটি একটি করে নীলপদ্ম তিনি মায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতে লাগলেন। কিন্তু দেখা গেল, একটি পদ্ম কম। কি অদ্ভুত দৈবী মায়া! দেবী জগন্মাতা কি রামচন্দ্রকে পরীক্ষা করছেন! রামচন্দ্র অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্কল্প যে রক্ষা হলো না! দেবীর কৃপা থেকে বঞ্চিতই রয়ে যেতে হবে! সীতা উদ্ধার আর হবে না!
রামচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে হনুমানকে বললেন : "বৎস, আরেকবার দেবীদহে যাও। আরেকটি নীলপদ্ম আমাকে এনে দাও, নইলে আমার যে সঙ্কল্প রক্ষা হয় না।" "কিন্তু কোথায় পাব আরেকটি নীলপদ্ম? দেবীদহে যে আরেকটিও পদ্ম নেই, দেখে এসেছি।"—বিমর্ষ হয়ে করজোড়ে সে-কথা প্রভু রামচন্দ্রকে জানালেন হনুমান।
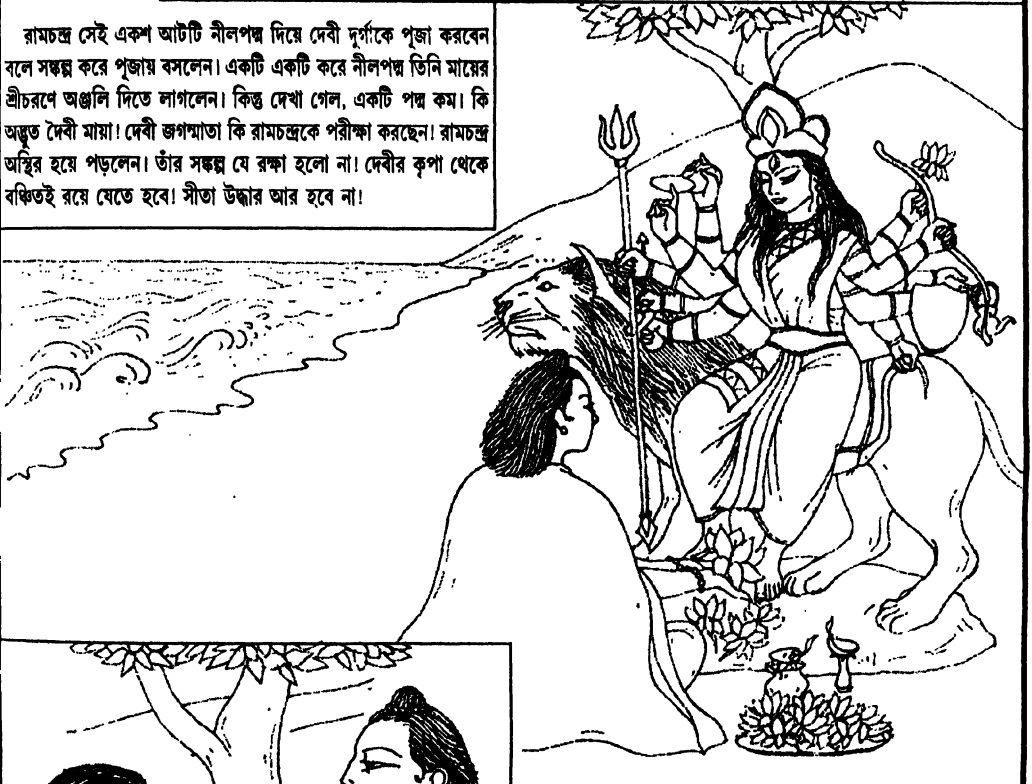
রামচন্দ্র বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর সব আশা শেষ! হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তাঁকে তো সবাই 'নীল কমলাক্ষ' বলে। অতএব তিনি নিজের একটি চক্ষু উৎপাটিত করে দেবীর চরণে অঞ্জলি দিয়ে সঙ্কল্প রক্ষা করবেন। তূণীর থেকে একটি তীর নিয়ে তিনি নিজের একটি চক্ষু উৎপাটিত করতে গেলেন।
সেই মুহূর্তে দেবী দশভুজা দুর্গা শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন। রামচন্দ্রের হাতটি ধরে ফেলে তিনি স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে বললেন : "এ কি করছ তুমি প্রভু! তুমি যে স্বয়ং ভগবান! এই রাক্ষসের দুরাচারের হাত থেকে জগৎকে রক্ষা করার জন্য মায়ায় মানুষের রূপ ধরেছ। পরমাপ্রকৃতি দেবী সীতাকে ধরে রাখে রাবণের সাধ্য কী? অকালবোধনে বিধিমতে পূজা করে এজগতে আমার প্রকাশ করে তুমি আমাকে ধন্য করলে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। রাবণের সাধ্য নেই তোমাকে প্রতিহত করে। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি তার বিনাশ কর।"
অকালবোধনে দেবীর প্রসন্নতা লাভ করে দশমী তিথিতে বিধিমত পূজা সাঙ্গ করলেন রামচন্দ্র। তারপর পূর্ণ উদ্যমে তিনি রাবণবধের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তাঁর হাতের অমোঘ মৃত্যুবাণ রাবণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করল। লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণ বাণবিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হলে সমস্ত বিরোধিতা ভুলে করুণাময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দর্শন করতে করতে রাবণ প্রাণত্যাগ করল। তার রাক্ষস-জীবনের পরিসমাপ্তি হলো। ❑

শক্তিসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

সংস্কৃতে 'শক্তি' শব্দের ভাবৈশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পণ্ডিত উড্রফ যথার্থ বলেছেন ঃ "There is no word of wider content in any language than this Sanskrit term, meaning 'Power'."[১] বিশ্বজগতের মূলে রয়েছেন এক মহাশক্তি। তিনি আপনাকে ব্যক্ত করেন নানানভাবে। কিন্তু বহুত্বের মধ্যে বিকশিত তাঁর একত্বের মহিমাই বিশেষ লক্ষণীয়। তাপ, আলো, বৈদ্যুতিক শক্তি—সব একই শক্তির অভিব্যক্তি। জগতের প্রত্যেকটি বস্তু শক্তির সমবায় বৈ তো নয়। শক্তিভাবনার সঙ্গে বিজড়িত শক্তিসাধনা। সাধারণত দুর্গা, কালী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবীগণের পূজাকে শক্তিপূজা হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু নারায়ণ, শিব, গণেশ ইত্যাদি দেবতার আরাধনাও শক্তিরই উপাসনা। প্রতিমা, প্রতীক বা যন্ত্র—যাতেই এসব দেবদেবীর পূজা-উপাসনা করা হোক না কেন তা শক্তিরই আরাধনা। কারণ, তাতে জগৎ-কারণের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তৃত্বাদি গুণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আরোপিত হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাপকার্থে সব উপাসকই শক্তির উপাসক বলা চলে।

বেদাচার ও তন্ত্রাচার—উভয়েই একসময়ে সমাজে প্রচলিত ছিল, এবিষয়ে মনুস্মৃতির টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলেছেন ঃ "বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিঃ"। কিন্তু বেদ থেকে বা বেদের সময় থেকে স্বতন্ত্রভাবে বা বেদের পরবর্তী কালে তন্ত্র ও তন্ত্রাচারের উদ্ভব, আবার তন্ত্র এদেশে উদ্ভূত না বহিরাগত, বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র দুটির এক না ভিন্ন উৎস, এদের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর—পণ্ডিতসমাজে এসব বিতর্কের অবসান হয়নি। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, জন উড্রফ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, গোপীনাথ কবিরাজ প্রমুখ পণ্ডিতগণ উপরি উক্ত প্রশ্নগুলির সর্বজনগ্রাহ্য বা তর্কাতীত সমাধানে এসে পৌঁছেছেন বলে মনে হয় না। ইতিহাস বলে, শক্তিপূজার অল্পবিস্তর প্রচলন ছিল জগৎ জুড়ে, কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষেই শক্তিপূজা অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিকশিত হয়েছে এবং ভারতবাসীর জীবনকে স্থায়ী ও গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। বেদ-উপনিষদের যুগ, দর্শনের যুগ, পুরাণের যুগ এবং পরবর্তী যুগের ধর্মেতিহাস বিশ্লেষণ করে শাস্ত্রজ্ঞ ও শক্তিসাধনায় সিদ্ধ স্বামী সারদানন্দ সিদ্ধান্ত করেছেন ঃ "শক্তিপূজা, বিশেষত মাতৃভাবে শক্তিপূজা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি।" সুপণ্ডিত ও সিদ্ধ সাধক স্বামী অভেদানন্দেরও সিদ্ধান্ত ঃ "India is in fact the only place in the world where God is worshipped as mother." তাঁদের এই সিদ্ধান্ত অধিকাংশ পণ্ডিত মোটামুটিভাবে মেনে নিয়েছেন। বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু মাতৃভাবে শক্তির সাধনা।

শক্তিসাধনায় আরাধ্যা মহাদেবী আর্য ও আর্যেতর জনসম্প্রদায়ের মধ্যে চালু ছিল। এই মহাশক্তির ভাবরূপ বিকাশে আর্য ও আর্যেতর উপাদান স্থান পেলেও আর্যদের অবদান সমধিক মনে হয়। কেউ কেউ বলেন যে, বাক্‌সূক্ত, রাত্রিসূক্ত ও ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট শ্রী-সূক্তের বাক্ সরস্বতী, রাত্রি ও শ্রীদেবী কালে যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।[২] আবার কিছু পণ্ডিতের বক্তব্য—ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের মধ্যে শক্তি বা দেবীর আরাধনা আলোচ্য বিষয় নয়। অবশ্য যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, কিছু কিছু ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদিতে দেবীর আবির্ভাব অনস্বীকার্য। এটাই বিশেষ যে, দেবী মহাশক্তি হলেও তিনি মা। তাঁর মাতৃস্নেহের উৎসার সহজবোধ্য। তাঁর প্রতি সকলের স্বাভাবিক আকর্ষণ। তাঁকে সহজে আরাধনা করা যায়, তিনি সহজেই সন্তানের আহ্বানে সাড়া দেন বলে অধিকাংশ সাধকের বিশ্বাস। কিন্তু বিশুদ্ধ 'মাতৃভাবে' শক্তিসাধনা প্রকাশিত হতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল।

শক্তিসাধনায় তন্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ—"তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানম্ অনেন ইতি তন্ত্রম্।" তন্ত্র হচ্ছে সেই শাস্ত্র যাকে সাধারণত 'আগম' বলা হয়। শাক্ত আগম, শৈব আগম, বৈষ্ণব আগম বা পঞ্চরাত্র বহু প্রচলিত। শাক্ত আগমশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য শিবশক্তিতত্ত্বরহস্য ও তত্ত্বসাধনা। এই প্রসঙ্গেই আলোচিত হয়েছে যন্ত্র, মন্ত্র, মন্ত্রোক্ত দেবতা, মুদ্রা, ন্যাস, উপাসনা, যোগ, পঞ্চতত্ত্ব সমীক্ষা, ষড়চক্রসাধনা প্রভৃতি। তন্ত্রে সাধনার প্রাধান্য। সাধ্ ধাতু থেকে সাধনা। সাধনা দ্বারা মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের চেষ্টা করে। মহানির্বাণতন্ত্র বলেছেন, কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল সিদ্ধ ও আশু-ফলপ্রদ।[৩] শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন ঃ "এখন কলিযুগে বেদমত চলে না। কলিতে তন্ত্রোক্ত মত।"[৪]

পরবর্তী কালে দর্শনশাস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটলেও প্রধানত সাধনা ও তার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে সাক্ষাৎ ফললাভ

---

১ Sakti and Sakta—John Woodroffe, 5th edition, p. 26
২ তন্ত্র ও তন্ত্রতত্ত্ব—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১২
৩ দ্রঃ মহানির্বাণ তন্ত্র, ২।১৪
৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৩২৬

শক্তিসাধনাকে জনপ্রিয় করেছে। পৃথক দর্শনরূপে শাক্তদর্শন প্রচারের আগে শৈবদর্শনই ছিল শক্তিসাধনার দার্শনিক ভিত্তি। আশ্চর্যের বিষয়, মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' বা অন্য কোন দর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে শাক্তদর্শনের উল্লেখ নেই। সাধকের দৃষ্টিতে সাধনার ক্ষেত্রে তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগই দার্শনিক সিদ্ধান্তের পরম সার্থকতা। শাক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভাস্কর রায় তাঁর 'গুপ্তবতী' টীকায় লিখেছেন, এক অদ্বিতীয় নিরতিশয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদিসিদ্ধ মায়ার আবরণে ধর্ম ও ধর্মী-রূপে প্রতিভাসিত হন। ধর্ম স্বরূপত ধর্মী থেকে অভিন্ন। যেমন, অগ্নি ও তার তাপ। স্বচ্ছ স্ফটিকে লাল জবার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। অর্থাৎ ধর্মের কর্তৃত্বাদি গুণ নিষ্ক্রিয় ধর্মীতে আরোপিত হয়।

শক্তিসাধনা তথা তন্ত্রসাধনার প্রধান উপাস্য দেবী মহাশক্তি কালিকা। তাঁর রূপভেদ—দক্ষিণা, বামা, শ্মশান, রক্ষা প্রভৃতি এবং তারা, ষোড়শী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা। দীর্ঘকাল ধরে বিকশিত হয়ে তান্ত্রিক সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে যে-রূপ ধারণ করেছিল, তার সঙ্গে পরিচয়লাভের জন্য এই সাধনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা লক্ষ্য করব। সেগুলি হচ্ছে ঃ

(ক) এ-সাধনার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। অবশ্য অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রেও একটি বিষয়ে অধিকারবাদের ছায়া পড়েছে। যিনি অদীক্ষিত, তান্ত্রিক সাধনায় তাঁর অধিকার নেই।

(খ) এ-সাধনায় ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লাভ হয়। প্রবৃত্তিকে কিভাবে ঊর্ধ্বমুখী করতে হয় তার পথ দেখিয়েছে তন্ত্রশাস্ত্র। এ-শাস্ত্রেরও লক্ষ্য চরম নিবৃত্তি।

(গ) শক্তিসাধনায় দেহের গৌরব বিশেষভাবে স্বীকৃত। দেহকে ক্লিষ্ট করা এ-সাধনায় নিষিদ্ধ। বিচিত্র শক্তির আধার এই দেহ। এসব শক্তিকে বিকশিত করাই লক্ষ্য।

(ঘ) সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত—"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে"। যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। দেহভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একইভাবে নানা শক্তির খেলা চলেছে। দেহের অন্তর্গত শক্তির উন্মেষ ঘটাতে পারলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিসকল সাধকের অনুকূল হয়।

(ঙ) শক্তিসাধনাকে মুক্তদৃষ্টিতে অদ্বৈত ব্রহ্মের সাধনা বলা চলে। স্বামী সারদানন্দ বলেন ঃ "The enlightened Tantric, like the Advaitin, sees no difference between mud and sandal, friend and foe, a dwelling house and the cremation ground."[৫]

(চ) অদ্বৈত বেদান্ত-মতে পরব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক, এক অদ্বিতীয়; কিন্তু শক্তির ক্রিয়া ছাড়া জগৎ চলতে পারে না। অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ মিথ্যা। 'মিথ্যা' পদে অলীক বোঝাচ্ছে না, সতে অসতের ভান—রজ্জুতে সর্পভ্রম। ব্রহ্মই সদ্বস্তু, আর শক্তি মায়া বৈ তো নয়।

(ছ) বিশ্বের মূল শক্তি এক ও অদ্বিতীয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলে, শক্তি জড়। আর তন্ত্র-বিজ্ঞান বলে, শক্তি জড় নয়, শক্তি চৈতন্যময়ী। শ্রীশ্রীচণ্ডী বলেন ঃ "যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্য-ভিধীয়তে" (৫।১৭)। সর্বভূতে চৈতন্যরূপে বিরাজিতা মহা-শক্তিই মহাদেবী। শক্তিসাধকের আরাধ্য এই মহাদেবী।

(জ) তন্ত্রসাধনার ধারা সমন্বয়মুখী। এই ধারা বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত করেছেন ঃ "The Tantrick method of Sadhana combines elements of yoga, prayer, worship and meditation on the identity of the individual and the Absolute and thus shows evident signs of eclecticism."[৬] উপনিষদের ভাবানুসারী এই তন্ত্রশাস্ত্রে জীব ও শিব বা পরমাত্মার মিলন ঘটেছে। কিন্তু পুরাণ ও ভক্তিশাস্ত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ করেছে।

(ঝ) শক্তিসাধনা প্রধানত গৃহস্থের সাধনা। শাস্ত্রোক্ত আদর্শ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থকে বলে 'গৃহাবধূত'। এবিষয়েও উপনিষদের ঋষিদের ধারা অনুসৃত হয়েছে।

(ঞ) শক্তিসাধনার প্রধান অবলম্বন আচার ও ভাব। আচার প্রধানত সাতটি—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। প্রত্যেক আচার এক-একটি ভাব আশ্রয় করে প্রচলিত। আর ভাব মোটামুটি তিন প্রকার—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বামাচার নিষেধ করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার ভাষণে বামাচারীদের তীব্র নিন্দা করেছেন।

শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে মাতৃভাবের আদি ক্ষীণধারাটি কিভাবে বিকশিত হয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে, তার অনুসন্ধানে তৎপর ব্যক্তি দেখতে পাবেন, সুদূর অতীতে মাতৃদেবী বা শক্তিদেবীর দুটি মুখ্য ধারা ছিল—(১) শস্যপ্রজননী ও ভূতধারিণী পৃথিবীদেবীর ধারা। যথা, "মাতা পৃথিবী মহীয়ম্"[৭], অর্থাৎ বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা। আর (২) পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবীর ধারা। ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় ধারাটি প্রবল হয়ে উঠেছিল। পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবী পরবর্তী কালে পার্বতী, গিরিজা, অদ্রিজা ইত্যাদি নামে খ্যাত হন। ইনিই উমা—কেন-উপনিষদের উমা হৈমবতী। ভিন্ন ভিন্ন যুগে একই সঙ্গে বিভিন্নরূপে এই সনাতনী মহাদেবী পূজা নিচ্ছেন। অগণিত নাম ও রূপ-বিশিষ্ট এই মহাদেবীর পূজা Polytheism বা বহু-ঈশ্বরবাদ সূচিত করছে না, প্রত্যেক দেবীমূর্তি সাধকের চরম উপলব্ধিতে একই তত্ত্বে পৌঁছাচ্ছে। এই অপূর্ব পদ্ধতিটির স্বাতন্ত্র্য বোঝাবার জন্য ভারততত্ত্ববিদ্ ম্যাক্সমূলার একটি নতুন শব্দ চয়ন করেছেন, সেটি হচ্ছে—'Henotheism'। নাম ও রূপ বিভিন্ন হলেও দার্শনিক বলেন, মহাদেবী এক ও অদ্বিতীয়। সাধক বলেন ঃ "একই মায়ের বিচিত্রলীলা।" শাস্ত্রকার দেবীভাগবতে বলছেন ঃ "কলা যাঃ যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে।/ পূজিতা

---

৫ Prabuddha Bharata, November 1913, p 213 ৬ Philosophy of Hindu Sadhana—Nalinikanta Brahma, p. 83
৭ ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৩৩

গ্রাম্যদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুনে।।"[৮] অর্থাৎ ভারতবর্ষের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে যেখানে যত দেবী রয়েছেন তাঁরাও বিধিপূর্বক মহাদেবীরূপেই পূজা পেয়ে থাকেন, কারণ তাঁরা আদ্যাদেবী থেকে পৃথক নন, তাঁরা প্রত্যেকে একই মহাদেবীর বিশেষ বিশেষ কলামাত্র। কি অনুভববেদ্য, কি বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বদৃষ্টি সবকিছুর মধ্য দিয়ে এক কালাতীত তত্ত্ব—একই পরম তত্ত্ব কালের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে। সে-ইতিহাস মহাদেবী বা জগন্মাতার অতুলনীয় মহিমাই খ্যাপন করছে।

কবি কালিদাস পর্বত-দুহিতা উমাকে কন্যারূপে, পত্নীরূপে ভারতবাসীর অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর বর্ণিত এ-উপাখ্যানের উমা সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রেমের উপলব্ধিতে জাতীয় চেতনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছেন, কিন্তু কালক্রমে পুরাণগুলির ভিতর দিয়ে এই প্রাচীন পার্বতী যখন চণ্ডী বা দুর্গার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছেন তখন তাঁর কোমল স্নেহময়ী উমা-মূর্তিটি ক্রমে একটু চাপা পড়ে গিয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয়, 'উমা' নাম দেশ-বিদেশে বহুপ্রচারিত। এস. কে. দীক্ষিত লিখেছেন ঃ "The babylonian word for Mother is Ummu or Umma, the Accadian Ummi, and the Dravidian is Umma. These words can be connected with each other, and with Uma, the Mother-Goddess."[৯] তাছাড়া হুবিষ্কের একটি মুদ্রাতে যে দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে তার নামও 'ওম্মো'।[১০] দেখা যাচ্ছে, আমাদের পার্বতী বা উমা দেবীর সঙ্গে অন্য দেশে প্রচলিত মাতৃদেবীর নাম ও আকৃতি-প্রকৃতিতে সাদৃশ্য রয়েছে। এদেশে উপনিষদে পাই, তিনি দেবতাদের জ্ঞান দিয়েছেন; আবার দেখি, তিনি গিরিরাজের কন্যা, জহ্নু মুনির কন্যা এবং পরে তিনিই রামপ্রসাদের কন্যারূপে বাঙালীর হৃদয় অধিকার করেছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে তিনিই 'দুর্গা' নাম ধারণ করেছেন। তিনি প্রেমময়ী শিবপ্রিয়া এবং তিনিই গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর জননী। প্রতিবছর মা দুর্গা বাঙালী মায়েদের স্নেহ-আদর আস্বাদন করতে মর্তধামে নেমে আসেন। তিনি শুধুমাত্র বাঙালীর জাতীয় দেবতা নন, ভারতভূমিতে প্রত্যেকেই অনুভব করে তাঁর কৃপাকল্যাণাকাঙ্ক্ষার প্রভাব।

মহাদেবী পার্বতী-উমার ধারা থেকে ভিন্ন একটি ধারা অসুর-নাশিনী চণ্ডিকার। মনে হয় পরবর্তী কালে এই দুই ধারা মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এদিকে মহাদেবীর বিবর্তনধারায় এসে মিলিত হয়েছিল আরো একটি ধারা, তা হলো কালিকা বা কালীর ধারা। বাঙালীর শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে মা কালীই সর্বেশ্বরীর আসন অধিকার করে অন্যান্য দেবদেবীকে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন। আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, দুর্গাপূজায় উৎসবের প্রাধান্য, কিন্তু সাধনক্ষেত্রে দুর্গার পরিবর্তে কালিকা ও দশমহাবিদ্যার অন্যান্য দেবীগণ প্রধান হয়ে উঠেছেন।

কেউ কেউ বলেন, বেদের রাত্রিসূক্তের রাত্রিদেবী কালে ভয়ঙ্করী মা কালী হয়েছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এর নির্ঋতি দেবীকে কেউ কেউ মনে করেছেন মা কালীর উৎস। কালীর বিভিন্ন নাম রয়েছে মুণ্ডক উপনিষদে। মহাভারতের কয়েকটি স্থানে 'কালী'র উল্লেখ রয়েছে। পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রসাহিত্যে কালী নামের ছড়াছড়ি।

ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে শাক্তধারায় শোণিতলোলুপা ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদেবী কালীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখা যায় এই সমন্বয় সঙ্ঘটনের পূর্বরূপ। শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক পরাজিত ও স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ বিপত্তারিণী দেবীর স্তব করেছেন। দেবীর শরীরকোষ থেকে কৌশিকী দেবী বের হয়ে গেলে দেবী কৃষ্ণবর্ণা হয়ে গেলেন, হিমাচলবাসিনী কালিকা নামে খ্যাত হলেন—"কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমালয়কৃতাশ্রয়া"। ঐ গ্রন্থে কিছু পরেই রয়েছে আরেক কাহিনী। শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ডদের তাঁর নিকটবর্তী হতে দেখে কোপাবিষ্ট দেবীর বদন মসীবর্ণ হলো। তাঁর ললাট থেকে অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনির্গত হলেন। তিনি অসুরসৈন্য ধ্বংস করলেন। চণ্ডের চুল মুঠি করে ধরে খড়্গ দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করলেন। সেসময়ে মুণ্ড দেবীর প্রতি ছুটে গেল। দেবী তাকে নিপাতিত করলেন। চণ্ড ও মুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড হাতে নিয়ে তিনি চণ্ডিকার নিকট উপহার দিলেন। প্রীতিলাভ করে মহাদেবী বললেন ঃ তুমি 'চামুণ্ডা' নামে খ্যাত হবে—"চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যতি"। (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৭।২৭) আবার রক্তবীজ বধের সময়েও কালীদেবীর বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষণীয়। তিনি রক্তবীজের দেহ থেকে নিপতিত রক্ত মুখ ব্যাদান করে গ্রহণ করলেন। এভাবে চামুণ্ডা রক্তবীজের দেহ থেকে নিপতিত রক্ত পান করলে রক্তবীজ কাবু হয়ে পড়ল, তখন দেবী তাকে হনন করলেন। দেবীকে 'কালী' এবং চণ্ড-মুণ্ড-হন্ত্রীকে 'চামুণ্ডা' করে পুরাণকার তৎকালীন প্রচলিত কালীদেবী ও চামুণ্ডাদেবীকে মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন।

বর্তমানে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে 'কালীতন্ত্র'-ধৃত কালীর রূপ-বর্ণনা কালীর ধ্যানমন্ত্ররূপে গৃহীত এবং মাতৃপূজায় সুপ্রচলিত। এই বিবর্তিত রূপশালিনী মা কালীর পদতলে শিব শায়িত, কালীর এক পদ শিবের বুকে ন্যস্ত। প্রাচীন বর্ণনায় কিন্তু কালিকা শিবারূঢ়া নন, তিনি শবারূঢ়া। অসুরনিধন করে অসুরগণের শব তিনি পদদলিত করেছেন, সে-কারণে তিনি শবারূঢ়া। শবারূঢ়া থেকে শিবারূঢ়া মা কালীর রূপান্তরে কয়েকটি উপাদান সাহায্য করেছিল। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে কারণগুলি হচ্ছে ঃ (ক) সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। (খ) তন্ত্রের 'বিপরীতরতাতুরা' তত্ত্ব এবং (গ) শক্তিদেবীর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা।[১১]

---

৮ দেবীভাগবত, ১।১।১৫৮ ৯ The Mother Goddess—S. K. Dikshit, p. 59

১০ দ্রঃ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃঃ ৪০ ১১ ঐ, পৃঃ ৭০

উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর 'ভারতীয় শক্তিসাধনা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, গুজরাট, রাজপুতানা, মহীশূর, তাঞ্জোর, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং আরো অন্যান্য অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে কালীপূজার প্রচলন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশেই সাধক-পরম্পরার মধ্য দিয়ে মা কালীর উপাসনার ধারা প্রবল হয়ে উঠেছে।

'ব্রহ্মযামল'-এ আদ্যাস্তোত্রে পাই—"কালিকা বঙ্গদেশে চ"। বাংলাদেশে প্রচলিত তন্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান একখানি হলো 'মহানির্বাণতন্ত্র'। তার মধ্যেও দেবীর কালীরূপের প্রাধান্য স্পষ্ট। মা কালীর প্রতি বাঙালীর প্রীতি নতুন কিছু নয়। এর পশ্চাৎপটে দেখি বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণের কালী-ভাবনাগুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কালী ও পার্বতীদেবী অভিন্না। এই প্রচেষ্টা সফল হয়ে ওঠার ফলে কালীদেবী মহাদেবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আরেকটি প্রচেষ্টা ঐ ভাবনাগুলির মধ্যে বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। সেটা হচ্ছে —কালীই মূলদেবী, তিনিই উৎস এবং পার্বতীদেবী তাঁর উমা, গৌরী, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি সর্বপ্রকার রূপেই এই সর্বমূলা কালীদেবী থেকে প্রসৃতা। গৌরী, দুর্গা প্রভৃতি সেই মূলাদেবীরই রূপভেদ মাত্র। আরো কথা। পুরাণে উপপুরাণে স্থান পেয়েছে মা কালীর গৌরীত্বলাভের বিভিন্ন কাহিনী। কালিকাপুরাণে দক্ষসুতা জগন্ময়ী দেবী ছিলেন "সিংহস্থা কালিকা কৃষ্ণা"। তিনি তনু ত্যাগ করে হিমালয়গৃহে জন্ম নেন, 'কালী' নামে পরিচিত হন। পার্বতী-কালীর বিয়ে হয় শিবের সঙ্গে। একদিন কৈলাস পর্বতে তাঁরা বিহার করছিলেন। গৌরাঙ্গী উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাদের সম্মুখে শিব কালীকে "কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে" বলে সম্বোধন করেন। তাঁর গায়ের রঙ নিয়ে শিব কটাক্ষ করেছেন মনে করে কালী অপমানিত বোধ করেন। তিনি তপস্যা করতে চলে যান। শত শত বছর ধরে বৃষভধ্বজের আরাধনা করেন তিনি। তপস্যায় তুষ্ট বৃষভধ্বজের আশীর্বাদে দেবী কালো রূপ পরিত্যাগ করে বিদ্যুৎগৌরী রূপ ধারণ করেন এবং শিবসঙ্গিনী হয়ে বিরাজ করতে থাকেন।[১২]

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ থেকে কালী ও অন্যান্য মহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বাংলার সাধককুলের মধ্যে এক জাগরণ উপস্থিত হয়েছিল। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মাতৃপদ। সে-লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্যই তাঁদের যাবতীয় আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা। কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, সর্বানন্দ ঠাকুর, বামাক্ষেপা, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখের সাধনার ধারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল উনবিংশ শতকে রামকৃষ্ণ পরমহংসে। এই সাধকগোষ্ঠী উপলব্ধির আলোকে রূপকে আশ্রয় করে অরূপে পৌঁছেছেন, মূর্তি আশ্রয় করে জগন্মাতার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। ফলত উদার ও সমন্বয়ী দৃষ্টির আলোকে তাঁরা সাধনপথকে করেছেন মানবাভিমুখীন ও যুগোপযোগী। শ্রীরামকৃষ্ণে কুসুমিত এ-সাধনার পরিপূর্ণতার স্বরূপ আমরা পরে আলোচনা করব।

রামপ্রসাদ তাঁর আবির্ভাবকালে দেখতে পেয়েছিলেন শাক্তসাধনার দুটি ধারা: (ক) গুহ্য সাধনার ধারা ও (খ) জাঁকজমকের সঙ্গে মৃন্ময়ী কালীপ্রতিমার পূজার ধারা। দ্বিতীয় ধারার সাধক গোষ্ঠীর মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ, সম্প্রদায়-চেতনা, বৈষ্ণবধর্ম-বিদ্বেষ লক্ষণীয় ছিল। উভয়ের সমন্বয় করে রামপ্রসাদ কালীসাধনাকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডির উর্ধ্বে তুলে একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিয়েছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্র অন্তঃস্নানের কথা বলেছেন, রামপ্রসাদ ভাবের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।" সর্বপ্রকার ভাবের আধার মা-ই হলেন ভাবী। রামপ্রসাদ গেয়েছেন: "এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।" তিনি শিখেছিলেন ভক্তি আশ্রয় করেই জ্ঞান-সমুদ্রের মধ্যে থেকে শক্তিরূপা মুক্তা আহরণ করতে। শ্যামা মাকে অবলম্বন করে তিনি পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলতেন: "তারা আমার নিরাকারা", কিন্তু হৃৎপদ্ম ফুটে ওঠবার পর দেখলেন—"মা বিরাজেন সর্বঘটে"।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন মা কালীর অপরূপ বিলাসস্থল। শক্তিসাধনার ভাব যেরূপ ব্যাপক, বৈচিত্র্যময় ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণরূপে তাঁর জীবনে বিকশিত হয়েছিল, তেমন অতীতে কোন শক্তিসাধকের জীবনে দেখা যায়নি। কৈশোরে আনুড়ের বিশালাক্ষী দর্শন করতে যাওয়ার পথে তিনি গভীর ভাবস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অদ্ভুত দর্শনলাভ হয়। তখন থেকেই তাঁর জীবনধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে পূজারিরূপে যোগদান করার পর তাঁর মধ্যে শক্তিসাধনার ব্যাপক, তন্ময় ও গভীরতম দিকটি প্রকাশিত হতে থাকে, তিনি শুনেছিলেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর (১।৫৬) কথা—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"। বুঝতে পারেন, মহামায়া দ্বার না ছাড়লে ঈশ্বরদর্শন হয় না। এবং তিনি পবিত্রতা ও তীব্র ব্যাকুলতা আশ্রয় করে জগন্মাতাকে প্রসন্ন করেন, তাঁর দিব্যদর্শন লাভ করেন। শুধুমাত্র জগন্মাতার দর্শনলাভ করে তিনি ক্ষান্ত হতে পারেননি, বিভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করে শক্তিসাধনায় ব্রতী হন, জগন্মাতার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সাধনার বিশাল রাজ্যে অবাধে বিচরণ করতে থাকেন।

যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্য-সময়াচার মতে চৌষট্টিখানি তন্ত্রের সাধনা করেছিলেন, এই চৌষট্টিটি তন্ত্রের মধ্যে ভাবের সূক্ষ্ম পারম্পর্য আছে। ক্রমে তিনি ভাবসাধনার চরমভূমিতে উপনীত হয়েছিলেন। তারপর তিনি তোতাপুরীর পরিচালনাধীনে সর্বভাবাতীত অদ্বৈত বেদান্তের সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি 'বিজ্ঞানী'র ভাব আশ্রয় করে জগন্মাতার সন্তানরূপে লীলাবিলাস করেছেন। নির্বিকল্প সমাধি থেকে নেমে এসে ভক্তি-ভক্ত নিয়ে লীলা আস্বাদন করেছেন। বাগ্মী ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র

---

১২ দ্রঃ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃঃ ৮০-৮৬

মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "He worships Shiva, he worships Kali, he worships Rama, he worships Krishna and is a confirmed advocate of vedantist doctrines. He is an idolator and is yet a faithful and most devoted mediator of the perfections of the One, formless, infinite Deity whom he terms Akhanda Sachchidananda." শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে কালী, কৃষ্ণ ও শিবের মধ্যে পার্থক্য নেই। সম্মোহন তন্ত্র বলেন, যে রাম ও শিবের মধ্যে ভেদ করে সে বাতুল। শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ শক্তিসাধনা ও সাধনার ফসল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় তাৎপর্যবহ ঃ

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাসকল সমন্বয়দৃষ্টিতে অভিন্নাত। আদ্যাশক্তি মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি হিন্দুসাধনার বিভিন্ন মতের এবং হিন্দু-ধর্মাতিরিক্ত অন্যান্য ধর্মমতের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ঐসব মতে ঈশ্বরের উপাসনা কিভাবে হয় তা দেখবার জন্য এবং প্রত্যেকটি মত-পথের সত্যতা যাচাই করবার জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টা। বিশাল হিন্দুধর্মের উপাস্য সম্বন্ধে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত ঃ "বেদে যাঁর কথা, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা।" তিনি বলতেন ঃ "দেশকালপাত্র-ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। যদি কোন মত আশ্রয় করে থাকে, তাতে যদি ভুল থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে-ভুল শুধরিয়ে দেন।"

(খ) কুলার্ণবতন্ত্র বলেন ঃ "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা"। কালী, দুর্গা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি রূপ ধরে ঈশ্বর সাধকের কাছে প্রকাশিত হন। এই রূপকল্পনা সাধকের খেয়ালখুশিমতো হয় না। এর পশ্চাতে রয়েছে সাধকের উপলব্ধি-সম্ভূত রহস্য। বলা বাহুল্য, রহস্য মানে ম্যাজিক নয়। জগন্মাতা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেমন চিন্ময়রূপধারিণী, তেমনি অরূপা শুদ্ধচিৎস্বরূপা। সাকারা, আবার নিরাকারা। সগুণা, আবার নির্গুণা। আরো কত কি! শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী—একই বস্তু। যতক্ষণ সাধকের আমি-বোধ আছে ততক্ষণই কালী, কৃষ্ণ; 'আমি'র লোপ হলে তখনি "সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার চুপে"। স্বসংবেদ্য এই সত্য ঠারেঠোরে বুঝতে হয়।

(গ) তন্ত্র-মতে শক্তির স্থান প্রধান। অদ্বৈত বেদান্ত-মতে শক্তি মায়া। মায়া সদ্বস্তু নয়। ব্রহ্মই সদ্বস্তু। মায়া সৎ ও অসতের মধ্যবর্তী অনির্বচনীয়। এককথায় বেদান্ত-মতে শক্তি উপেক্ষিত। দেবীভাগবত দুই মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে বলেছেন ঃ ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তি সদা সম্মিলিত, তাঁদের মধ্যকার সম্বন্ধ অগ্নি ও দাহিকাশক্তির মতো।[১৩] শ্রীরামকৃষ্ণ আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। তিনি বলতেন ঃ "যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি; যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—এইসব কাজ করেন, তাঁকে 'শক্তি' বলি। স্থির জল—ব্রহ্মের উপমা; জল হেলচে-দুলচে—শক্তির উপমা।" এই ভাবেরই রেশ দেখতে পাই তাঁর দিনচর্যার মধ্যে। তিনি অখণ্ডজ্ঞানে বেহুঁশ হয়ে থাকতে চাইতেন না। বিজ্ঞানীর অবস্থায় দ্বৈতভূমিতে নেমে ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকতেন। "অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্"—এই তাঁর অবস্থা।

(ঘ) নামরূপাত্মক সবকিছুতে শক্তির বিকাশ হলেও নারীমূর্তিতে 'সন্ধিনী' বা সৃজনী ও পালনী এবং 'হ্লাদিনী' শক্তির বিশেষ প্রকাশ। এই বিশিষ্টতার জন্য নারীপ্রতীকে জগৎকারণ বা ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণও করেছিলেন। তাঁর বিবাহিত পত্নীকে ত্রিপুরাসুন্দরী-জ্ঞানে পূজা করে তিনি তাঁর শ্রীচরণে সাধন-ভজনের সমস্ত ফল সমর্পণ করেছিলেন। মেয়েরা ছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে জগন্মাতার এক-একটি রূপ। তিনি বলতেন ঃ "আমার মাতৃভাব, আমার সন্তানভাব। সন্তানভাব খুব শুদ্ধ।" বীরভাবে প্রায়ই সাধকের পতন ঘটে।

(ঙ) সাধনসৌধের সাততলা বাড়ি—তার সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল অবাধ গতিবিধি। তাঁর সাধন-ভজনও লীলাবিলাস বৈ তো নয়। বহু বিচিত্রতার মধ্যে একটির উল্লেখ করা যাক। যদিও তিনি ছিলেন সন্তানভাবের উপাসক। তিনি নিজেই একদিন মা জগদম্বার ভাবে আবিষ্ট হয়ে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনটি ছিল ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের কালীপূজার সন্ধ্যা। প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন ঃ

"কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি মা কালী তাহাতে।।"

সেই সময় তাঁর "দিব্যহাস্যফুল্ল প্রসন্ন আনন ও বরাভয়যুক্ত করদ্বয়" দেখে ভক্তদের মনে হয়েছিল, তারা চিরকাল দেবরক্ষিত। তারা ভয়শূন্য হয়েছিল।

(চ) শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "বেদ-পুরাণে বলেছে শুদ্ধাচার। বেদ-পুরাণে যা বলে গেছে—করো না, অনাচার হবে—তন্ত্রে আবার তাই ভাল বলেছে।"[১৪] সব জেনে-শুনে তিনি ভালটুকু গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বীরভাবের সাধন সম্বন্ধে আপত্তি ছিল। তিনি পবিত্রতার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বীরভাব বর্জন করে সন্তানভাব ও মাতৃভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

(ছ) উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শাক্তধর্ম একটি সর্বজনীন ধর্মরূপে বিবর্তনলাভ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনার সমাপ্তি ঘটেছিল অদ্বৈত বেদান্তের সাধনায়। প্রকৃতপক্ষে কি শাক্তসাধনা, কি বৈষ্ণবসাধনা, কি শৈবসাধনা—যে-সাধনাই শ্রীরামকৃষ্ণ করেছিলেন তা ছিল অদ্বৈত-তত্ত্বাভিমুখীন। লীলাপ্রসঙ্গকার এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এদিকে বিবেকানন্দ দেখতে পেয়েছিলেন, বেদান্তই সকল ধর্মের সর্বজনগ্রাহ্য উৎস-তত্ত্ব, বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক এবং মহামানবের মিলনসূত্র। খাঁটি শাক্ত-মত ও খাঁটি বেদান্ত-মতকে গুরু ও শিষ্য এক ব্যাপক সর্বজনীন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

---

১৩ দ্রঃ দেবীভাগবত, ৯।১।১৪
১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৬৯৪

সেজন্য বিবেকানন্দ প্রচলিত শক্তিসাধনা প্রচার না করে বেদান্ত প্রচার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে বেদান্তকে বুঝতে হবে।

(জ) এবিষয়ে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে মিল থাকলেও সাধন-ঘেঁষা শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্মাতা শান্ত কোমল মধুর, অপরপক্ষে দর্শন-ঘেঁষা বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জগন্মাতা রুদ্র ও মধুরের সমন্বয়। তিনি লিখেছেন ঃ

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী।।
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে।।"[১৫]

উপরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনার মধ্যে—স্ত্রীগুরু গ্রহণ, বিবাহিত পত্নীকে ত্রিপুরাসুন্দরী-জ্ঞানে পূজাকরণ, মাতৃবুদ্ধিতে সব নারীকে দর্শন ইত্যাদির মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক বিকাশের এক বিশেষ তাৎপর্য দেখতে পেয়েছিলেন। এর মধ্যে নারী-জাগরণের বিরাট সম্ভাবনারও ইঙ্গিত দেখেছিলেন। সে-উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাসিনীদের মঠ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন।

(ঝ) অদ্বৈত-অভিমুখীন শক্তিসাধনা শ্রীরামকৃষ্ণকে শেষ পর্যন্ত অদ্বৈত-বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিল। শিষ্য নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প-সুখ আস্বাদন করে ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু অমৃত আস্বাদন করে তাঁরা কেউই মুখ মুছে ফেলেননি। অদ্বৈতামৃত আস্বাদন তাঁদের দুজনের কাউকেই জগৎ-বিমুখী বা মানুষ সম্বন্ধে উদাসীন করে তোলেনি। জগৎ জীব সবই ব্রহ্ম। জীবমাত্রই ব্রহ্ম বলে 'নর'কে তাঁরা 'নারায়ণ' করে তুলে ধরলেন। জীবপ্রেমকে ঈশ্বরপ্রেম, জীবসেবাকে উত্তম ঈশ্বরসেবা বলে প্রচার করলেন বিবেকানন্দ।

(ঞ) শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে ত্রিপুরাসুন্দরী-জ্ঞানে পূজা করে তাঁর শ্রীচরণে নিজের সাধনার ফল সমর্পণ করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে 'জ্যান্ত দুর্গা'জ্ঞানে আরাধনা করেছিলেন—সেই শ্রীমা সারদাদেবীও শক্তির সাধনা করেছিলেন। মাতৃভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ করে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুসৃত শক্তিসাধনাকে পুষ্ট করেছিলেন। স্বয়ং জগন্মাতা নররূপ ধারণ করে জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সব মানুষকে নিজ সন্তান-জ্ঞানে স্নেহ দিয়ে সেবাযত্ন করে মাতৃভাবের এক উত্তুঙ্গ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা-সমগ্রকে অবধারণ করতে হলে তাঁর দুই প্রধান পরিকর শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে, এবিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে জগন্মাতা প্রধানত কল্যাণময়ী আনন্দদায়িনী। স্বামী বিবেকানন্দের মূল্যায়নে জগন্মাতা বা মহাদেবী কল্যাণী ও রুদ্রাণীর সমন্বয়। তিনি দেখেছেন, মায়ের বরাভয়করী রূপের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যে ভয়ঙ্করীর রূপ, তা মানুষ ভাবতেও চায় না; কারণ সে ভয় পায়। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি মুখ্যত দার্শনিকের দৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল তনু-প্রাণ-মন-সমর্পিত সাধকের দৃষ্টি। অতীতে সাধন ও দার্শনিকতার দৃষ্টিপথ থেকে শক্তিসাধনাকে ধারণা করবার অল্পবিস্তর চেষ্টা হয়েছে। এছাড়াও আধুনিক মন চায় আদর্শের সুস্পষ্ট নিশ্ছিদ্র দৃষ্টান্ত, জানতে চায় ঐ আদর্শের উপযোগিতা কতটুকু, কিভাবে সমাজকল্যাণে তার প্রয়োগ করা সম্ভব। শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন-সাধনা এ-অভাবকে পূরণ করেছে। সাক্ষাৎ জগজ্জননী মানবদেহ ধারণ করে মানুষের মাঝে বসবাস করে দুনিয়ার সব মানুষকে আপন সন্তান-জ্ঞানে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সান্নিধ্যে সাধারণ মানুষ ও প্রাগ্রসর সাধক শক্তিসাধনার সামগ্রিক ও সহজ বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছে, প্রেরণালাভ করেছে। ত্রয়ীর যৌথ প্রচেষ্টায় শক্তিসাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, রহস্যাবৃত সাধনাঙ্গ-সকল গ্লানিমুক্ত ও পরিপুষ্ট হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের নেতৃত্বাধীনে এই ত্রয়ীর শক্তিসাধনা যেরূপ উদার, সর্বভাবগ্রাসী ও জগৎকল্যাণাভিমুখীন হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তা শক্তিসাধনার ইতিহাসে অভিনব। শক্তিসাধনার লক্ষ্য পূর্বের মতো ব্যক্তির আত্যন্তিক মুক্তি, কিন্তু যুগ-প্রয়োজনে এই সাধনা বিশ্ববাসীর কল্যাণে প্রসারিত হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন মত ও পথের মানুষের পক্ষে সহজগ্রাহ্য হয়েছে।

শক্তিসাধনার এই সামূহিক ভাবাদর্শকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন। এই আন্দোলনকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয়, দক্ষিণেশ্বর এর গোমুখ, আর বেলুড় মঠ গঙ্গোত্রী। এই ভাবান্দোলনের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য। তিনি তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের লিখেছিলেন ঃ "এখন নতুন ভারত, নতুন ঠাকুর, নতুন ধর্ম, নতুন বেদ।"[১৬] প্রতিমাপূজা থেকে সাকার নিরাকারের অতীত পরম সত্যের আরাধনা, ব্যক্তিমুক্তি থেকে সমষ্টিমুক্তি, কালীসাধনা থেকে অদ্বৈত-বেদান্ত সাধনা—সবই এর সীমাভুক্ত। এসকলের ভরকেন্দ্রে রয়েছেন জগন্মাতার প্রিয়তম সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য আন্দোলনের অঙ্গগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তারা জগজ্জননীর মুখাপেক্ষী সন্তান, তাদের নিয়ত প্রার্থনা—

"ত্বং সর্বরূপিণী দেবী সর্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি, সর্বেষাং তোষণং ভবেৎ।।"[১৭]

—মহাদেবী তুমি সর্বস্বরূপিণী, সকলের পরমা জননী, আমরা জানি মহাদেবী তুমি তুষ্ট হলেই সবাই সন্তুষ্ট।* ❑

১৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭১

১৬ স্বামীজীর ২৭ এপ্রিল ১৮৯৬ তারিখে লেখা চিঠি।

১৭ মহানির্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস, ২৪ শ্লোক।

* গত ২১ নভেম্বর ১৯৯৮ নয়া দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটির রজতজয়ন্তী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে-ভাষায় কথা বলে বাংলাদেশের মানুষও সেই ভাষায় কথা বলে। অর্থাৎ বাঙলা ভাষা আমাদের প্রধান আশ্রয়। হ্যাঁ, এই আটাশ বছরে বাঙলা ভাষা বাংলাদেশে বহুক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে, বহু ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের জাতীয়তা আর স্বাধীনতা তাদের বাঙলাকে ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য, শিল্পকলা বাঙালীকে যথেষ্ট বাঙালিত্বে নিমজ্জিত হতে সাহায্য করেছে। তাদের বলায় এবং লেখায় তারা তাদের মতো হয়ে উঠেছে। একটি নতুন জাতির পক্ষে এ এক দুর্লভ আত্মপ্রকাশ। এই আত্মপ্রকাশ বাঙালীকে নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা দিয়েছে।

বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এই সাংস্কৃতিক চেতনাকে বহুলাংশে বিশেষত্ব দান করেছে। বেশ কয়েক বছর আগে আমি ঢাকার রামকৃষ্ণ মঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই উপলব্ধি অর্জন করি। এবং তারপর যতবার গিয়েছি, ততবারই আমার এই ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছে। মানুষের স্বভাবই হলো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে জগৎ-পারাবারের তীরে বাস করা। ভিন্নতার মধ্যেই অভিন্নতার প্রকাশ। বহুর মধ্যে একত্বের আবির্ভাব।

জানি এসব তত্ত্বকথা। আমি সুশীল পাঠককে ভরসা দিতে পারি যে, আমরা কোন তত্ত্বে মত্ত হব না। আমরা যা দেখছি তাই বুদ্ধি, বিবেক ও বৈজ্ঞানিক কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে বলতে চেষ্টা করব।

এবছরের ঢাকার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬৪তম জন্মতিথি ও বার্ষিক উৎসব দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে। আমার পরম সৌভাগ্য, আমি এই উৎসবের (১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) পূর্ব রাত্রিতে ঢাকা পৌঁছে যাই। এমনই এক উৎসবে কয়েক বছর আগেও আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। এবারের উৎসবেও আনন্দ ও মানুষের সম্মিলন যথাযথ ছিল। হঠাৎ মনে হবে, ঢাকা শহরে রামকৃষ্ণ মিশনে দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়েছে! চারিদিকে শত সহস্র নরনারী ও শিশুর সমাবেশ। পরনে তাদের সত্যি সত্যি ঢাকাই শাড়ি, কোরা ধুতি। মিশনের অনুষ্ঠানে হয় গান নয়তো বক্তৃতা। এমন সমাবেশের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঃ এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান—সবাই শ্রদ্ধায় ও আনন্দে উদ্বুদ্ধ এক বিশাল মানবগোষ্ঠী। এ এক অভিনব উৎসব! এক নব উদ্বোধন! এটাই তো স্বাভাবিক। উৎসবের রঙ এক এক জায়গায় এক এক রকম। বিচিত্রতার স্বাদ মানুষ সবসময় পেতে চায়।

এবার আসল কথায় আসা যাক। ঢাকার এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন রামকৃষ্ণ আশ্রমের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বারবার অনুভব করেছি—আমি যেন এক নতুন 'সব পেয়েছির দেশে' এসেছি! উৎসবে, আলোচনাসভায় হাজার হাজার লোকসমাবেশ দেখে চমৎকৃত হয়েছি। বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন (অর্থাৎ ঢাকা) যথার্থই নব্য সংস্কৃতির প্রাণকে স্পর্শ করতে পেরেছে। এবারকার উৎসবে কি দেখলাম? সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করি। আলোচনার বিষয়—স্বামী বিবেকানন্দ ও মানব-মর্যাদা। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম। আলোচকদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক এস. এম. এ. খোরাসানী, বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক জনাব হোসেন মীর মোশারাফ। উপস্থিত ছিলেন ঢাকার নটরডম কলেজের পদার্থবিজ্ঞানী সুশান্ত সরকার।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ তাঁর বক্তৃতায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তিনি বিবেকানন্দের জীবন-দর্শনকে কতটা সর্বজনীন ধর্মের প্রকাশ বলে জেনেছেন। বললেন, আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে স্বামীজীর মানব-মর্যাদাবোধের কত প্রয়োজন আছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে স্বামী বিবেকানন্দের মানবপ্রেম আসলে সমগ্র মানবজাতির অনুধাবনযোগ্য একটি অত্যাবশ্যক বিষয়—অধ্যাপক সাইয়িদের ঘোষণা। এবার তাঁর কণ্ঠে ক্ষোভের, আক্ষেপের আভাস পাওয়া গেল—বাংলাদেশের বহু জায়গায় আজ শূন্যতা নেমে এসেছে। সদিচ্ছা ও সঙ্কল্প সত্ত্বেও, প্রবল প্রগতিশীল ধারণা থাকা সত্ত্বেও সেই শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু আজ হোক কাল হোক, আমাদের সম্পূর্ণ, অক্ষত বাংলাদেশকে পুনরুদ্ধার করতে হবে—এই আমাদের সঙ্কল্প। অর্থাৎ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণ ফিরিয়ে আনা অবশ্যকর্তব্য। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিজ্ঞা অনুক্ত থাকবে কেন? সরকার, দল এবং জনগণ সবাই ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করবেন। কারণ, সমগ্র বাঙালী জাতিকে মানব-মর্যাদার অধিকার প্রদান করা বাংলাদেশের নৈতিক দায়িত্ব। এই হলো আসল কথা। তিনি

এমন 'সেকিউলার' দৃষ্টিভঙ্গির পরিবেশ ও পরিকল্পনা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে এলেই প্রত্যক্ষ করেন বলে তিনি জানালেন। বললেন, এমন আনন্দ-উৎসবে এসেই মানুষ বিবেকানন্দ-চর্চায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

অধ্যাপক খোরাসানী বিজ্ঞান ও বিবেকানন্দের সংযোগের কথা বললেন। আজ মানবতাবাদের প্রসার ও ব্যাপ্তির জন্য বিবেকানন্দের স্মরণ করা কত দরকার সে-কথা মীর মোশারফ দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। গভীর অনুভূতি ও শ্রদ্ধা নিয়ে বিবেকানন্দকে 'মানবতার প্রতীক' বলে তিনি বর্ণনা করলেন। সমাজে ও সাহিত্যে বিবেকানন্দ-চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করলেন। দার্শনিক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বিবেকানন্দ-দর্শনে মানুষের জায়গাটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেই কথাটাই জোর দিয়ে বললেন। বললেন, ভারতীয় দর্শনে মানুষ কত প্রত্যক্ষ, কত অপরিহার্য।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ সিংহ-হৃদয় স্বামী অক্ষরানন্দজী তাঁর স্বাগত-ভাষণে প্রথমেই এই আলোচনার কাঠামোটি সুদৃঢ়ভাবে নির্মাণ করে দিলেন। অর্থাৎ উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বিবেকানন্দের মানব-মর্যাদা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রথমে আজকের পৃথিবীতে এই মানব-মর্যাদা কত বিপন্ন, সে-কথা জোর দিয়ে বললেন এবং এই বিপন্নতা ঘোচাতে হলে আজ মনুষ্যজাতিকে কি করতে হবে সেটাই বুঝিয়ে বললেন। অর্থাৎ আলোচকরা যেন তাঁদের স্ব স্ব চিন্তার আলোকে এই বিশ্বসমস্যাটিকে স্বামীজীর জীবনসাধনার সামনে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন। আমি যদি তাঁর বক্তব্য বুঝে থাকি তাহলে তা হলো এই যে, মানবজাতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দের "Seeking a new civil rights consensus"। আজকের পৃথিবীতে শিক্ষা ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতরূপেই নতুন 'Civil rights'-এর অন্তর্গত।

এখানেই শেষ নয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি আলোচনাসভার বিষয় ছিল—'শ্রীসারদাদেবী ঃ সর্বজাতির মা'। সভাপতির আসনে ছিলেন বাংলাদেশের সাংসদ চিত্রা ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি—সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার)। বিশেষ অতিথি—গীতা শর্মা (প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়, নেপাল)।

যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই প্রমাণ করলেন সারদাদেবী কি গভীর অর্থে সর্বজনীন সর্বংসহা জননী। আলোচনাসভাটি প্রমাণ করল উৎসবের ধর্ম, প্রকৃতি ও মেজাজ কতটা মানবতাবাদী হতে পারে।

এই প্রমাণ পেতে আমি মাত্র মাসাধিক কাল পরেই যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, কপিলমুনি যাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬৪তম জন্মতিথি এক-একটি আশ্রমে এক-এক দিন পালন করা হয়। সব জায়গায় আমি আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করি। প্রথমে বাগেরহাটের কথা বলি। বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দজী বড় স্নেহময় সাধু। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সেবা দিয়ে সম্পূর্ণ নিটোল একটি মানুষ। তিনি সর্বক্ষণ সর্ব অর্থেই ঢাকার তথা বাংলাদেশের 'বড় মহারাজ' স্বামী অক্ষরানন্দজীর ছায়া হয়ে আছেন। আলোচনাসভার মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে ঝড়ে আর বৃষ্টিতে যেন ভেসে গেল বাগেরহাট। আশঙ্কা হলো, আজ হয়তো আর সভা বসতেই পারবে না! কিন্তু যথাসময় সভা অনুষ্ঠিত হলো। ২৫-২৬ এপ্রিল দুদিনের উৎসব। ২৬ এপ্রিল বসল আলোচনাসভা। সভাপতিত্ব করেন স্বামী অক্ষরানন্দজী। প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব তালুকদার আবদুল খালেক (প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার)। সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জনাব সাখাওয়াৎ আলী দারু (সাংসদ, বাগেরহাট-২), পঞ্চানন বিশ্বাস (সাংসদ, খুলনা-১) এবং জনাব এ. এস. এম. আতাহার হোসেন (চেয়ারম্যান, বাগেরহাট পৌরসভা)। বিশিষ্ট আলোচকদের মধ্যে ছিলেন দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ অমৃতত্ত্বানন্দজী এবং ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্থিরাত্মানন্দজী।

আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি জনাব তালুকদার রামকৃষ্ণ আশ্রম কিভাবে খরা বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার বিশদ আলোচনা করলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আশ্রমের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। জনাব সাখাওয়াৎ আলী দারু আশ্রমের সকলপ্রকার গঠনমূলক কাজের সঙ্গে সবসময় সম্পৃক্ত আছেন—একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবেদন করলেন এবং বললেন, তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশের যে-কয়টি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে অবশ্যই রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখযোগ্যভাবে প্রথম শ্রেণীর। এই আলোচনাসভায় বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ও পুলিস সুপার উপস্থিত ছিলেন।

সাংসদ পঞ্চানন বিশ্বাসের বলিষ্ঠ বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বললেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মভাবনা বাংলাদেশের বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রভূত অর্থে উন্নতমার্গে নিয়ে যেতে পারে। এখানে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সবাই আসেন এবং নতুন এক মানবধর্মের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হন। বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির অবস্থায় এমন বিমিশ্র সংস্কৃতি ব্যাপকতা অর্জন করুক—এই তাঁর একান্ত মনোবাসনা। এরপর তিনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তীব্র নিন্দা করলেন। এও অত্যন্ত জরুরী খবর। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের পরীক্ষা যেমন একদিকে চলছে, তেমন আরেকদিকে কোন কোন দেশে স্বৈরতন্ত্র প্রবল বিক্রমে সচল। কোথাও কোথাও গণতান্ত্রিক সরকার একদিকে গণতন্ত্রের রক্ষা ও প্রসারের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত, অন্যদিকে পরাক্রমশালী মৌলবাদী শক্তি ধর্মতন্ত্র ও মৌলবাদের সম্প্রসারণে বদ্ধপরিকর। ফলে বহু ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির পরিকল্পনা প্রভূত পরিমাণেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে থাকে।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। কেবল ধর্মীয় মৌলবাদকে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকবৃন্দ

(হিন্দু-মুসলমান উভয়ই) বুঝতে পারে এবং কিছুটা লড়াইও করতে ইচ্ছুক। কিন্তু চূড়ান্ত বিপদ অন্য এক জায়গায়। সেই বিপদ হলো সাংস্কৃতিক মৌলবাদ। ইসরাইলের সাম্প্রতিক নির্বাচনে এই সাংস্কৃতিক মৌলবাদের প্রতি দেশের মানুষের অসন্তোষ ফেটে পড়ে। বাংলাদেশে তা আজও দেখা যাচ্ছে না এবং শঙ্কার কথা এই যে, অত্যন্ত সুশিক্ষিত আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানও এই ভয়াবহ ক্রমবর্ধমান সামাজিক ব্যাধির প্রতি যথেষ্ট সজাগ নন। অর্থাৎ অনেকেই সাংস্কৃতিক মৌলবাদ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার দরকার মনে করেন না। আমি ব্যতিক্রমী মানুষদের কথা বলছি না। তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত সামান্য। কবি সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রহমান চলে গেলেন সেদিন, আহমদ শরীফের মতো মানুষ যেকোন সমাজেই বিরল। তাঁরা প্রণম্য। আমি বলছি সাধারণ জনগণের কথা, যাদের আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই, যাদের সঙ্গে গোটা দেশের মানুষ পথে-ঘাটে, ট্রেনে, বাসে, বিমানবন্দরে কোন না কোন অর্থে মিলিত হয়।

সর্বত্র একটা বৈরাগ্যের একতারা যেন বেজে চলেছে। কোথায় যেন বৈচিত্র্য, বহুত্ববাদী সংস্কৃতি আপত্তিকর। আরো ভাল হবে যদি বলি, নিষিদ্ধ। কেউ হয়তো জানেই না, কে এসব করছে, কেউ হয়তো বুঝতেই চায় না যে, সমাজে এমন এক আপত্তির প্রশ্ন কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু আছে। সুতরাং সতর্ক হওয়া দরকার, দরকার নিজেদের আচরণ সঠিক করে তোলার। দেখতে হবে, আপত্তিকর এমন কিছু আমাদের দিয়ে যেন না হয়। বিদ্রোহী কোন যুবক কিংবা কোন যুবতী যদি বলে বসেন ঃ কেন ওদের সমাজে তো আমি দেখেছি অনেকেই নাস্তিক, অনেকেই এমনকি হিন্দু-মুসলমান বিবাহেও আপত্তি করে না। সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতা ও নিরাপত্তার কণ্ঠস্বর বলে ওঠে ঃ যা ওদের মানায় তা আমাদের মানায় না। এই হলো এক দৃঢ় লক্ষ্মণ-রেখা। একে মাড়িয়ে যেতে নেই। একে উপেক্ষা করতে নেই। যা এতদিন ধরে ছিল, যা চলে আসছে তাকে লঙ্ঘন করা কেন? অর্থাৎ 'ক' 'ক' থাকুন, 'খ' 'খ' থাকুন। শান্তিতে বাস করুন। এই শান্তিতে বসবাস মানুষকে শান্তির বশংবদ করে তোলে। মানুষ সৃষ্টির নেশা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশের সমাজের সর্বত্র এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাংস্কৃতিক আচরণ ব্যাপক হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে গেলে তা চোখে পড়বেই। অতি উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মানুষও প্রায় কল্পনাই করতে পারেন না যে, হোসেনুর রহমান ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে এসে দিনের পর দিন বাস করে যাচ্ছে! এমনও হতে পারে! কিন্তু তাঁরা জানেন না, কত শত সহস্র মুসলমান বন্ধু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে এসে উৎসবের অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন এবং ওঠেন। এখানেই বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সভায় দেখেছি, স্বামী অক্ষরানন্দজী ধর্ম সম্বন্ধে যা বলেন তার অর্থ—'Scientific Humanism'। 'Scientific humanism' বলতে বোঝায় 'a form of naturalism'। আর যদি একে ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে বলতে হয় যে, বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদী সম্পূর্ণত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী এবং এহেন মানবতাবাদী বিশ্বাস করেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হবে নৈতিক ও সামাজিক জগৎকে নিয়ে। এবং যেকোন মানবতাবাদীর একান্ত বাসনা একটাই, তা হলো মনুষ্যজাতির সার্থকতম উন্নতি (Completest Development)। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"Harmonious development"। উন্নতি করতে হবে মনের ও দেহের সম পরিমাণে। অর্থাৎ আমার নান্দনিক মূল্যবোধ, সুশীল মানুষের ধারণা এবং সদিচ্ছার শক্তি। 'Civility' এবং গণতন্ত্রকে সমান মূল্য দিয়ে চর্চা করতে হবে—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এই দাবি করছেন নিঃশব্দে। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক বিবেক জাগ্রত হোক—এই তাঁদের একান্ত মনোবাসনা। অধ্যাত্মবাদ এবং আধ্যাত্মিকীকরণ তার পরবর্তী পর্যায়ের কথা। আমার বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বাংলাদেশে 'catalyst' (অনুঘটক)-এর কাজ করছেন। ভবিষ্যতের ইতিহাস এঁদের ধন্য ধন্য করবে।

এবার যা বলা হলো তার পক্ষে কিছু বলা দরকার।

'ধর্ম' বলতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বুঝেছেন "the shared quest of a good life in a good world, made ever more possible by advancing knowledge and now especially, science." Haydon-এর এই বাণী 'The Quest of the Ages' থেকে উদ্ধার করা হলো।

আমার নবতর এই অভিজ্ঞতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খুলনা রামকৃষ্ণ আশ্রমে, পরে কপিলমুনি রামকৃষ্ণ আশ্রমে। যশোর, খুলনা আগে চোখে দেখিনি। যশোরে পা দিয়ে বোঝা গেল, দক্ষিণবঙ্গ পূর্ব-উত্তর বঙ্গ থেকে কতটা ভিন্ন। এই ভিন্নতাই একটি দেশের সংস্কৃতিকে প্রতি মুহূর্তে সঞ্জীবিত করতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি একটি পরম জ্ঞানের চরম মূর্তি গড়ে তুলতে পারে। আর সেই মুহূর্তেই এক মানবগোষ্ঠী আলোকপ্রাপ্ত হয়, তাদের জীবনে নতুন অভিযানের নেশা লাগে। মানুষের জীবনে কেবলই আমি বনাম বিশ্ব আদিমতা বৈ আর কিছু নয়। মানুষকে মানবসংসারে বসেই সোনার তরী ভরতে হয়, জীবনতীর্থ গড়তে হয়। তাইতেই জীবন ধন্য হয়। এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সংস্কৃতির স্বাক্ষর দেখেছি। বুঝেছি, সব কিছু হারিয়ে যাওয়ার নয়।

বাগেরহাটে আছি। বক্তৃতা করতে হবে। নতুন জায়গা। নতুনকে দেখার একটা নেশা আছে। কেমন যেন এক উত্তেজনা পেয়ে বসে। বক্তৃতার পালা শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা সমাপ্তির স্বস্তি। এবার আরেক পর্ব। স্বামী পরদেবানন্দজীর নির্দেশ, ষাট-গম্বুজ মসজিদ দর্শনে যেতে হবে। বাগেরহাটের অনতিদূরে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক মসজিদ। এত বড় মসজিদ নাকি বাংলাদেশে আর নেই।

সত্যিই বিশাল বটে! ষাটের বেশি গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদ। এখানকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো 'খাঞ্জেলী দীঘি' বা 'ঠাকুরদীঘি'। এখানে বিরাট দরগা আছে, মসজিদ আছে। এই দীঘিতে কুমীরের বাস। 'ঠাকুরদীঘি' নামকরণের কারণ—এই দীঘি খননের সময় বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে এই মূর্তি বৌদ্ধরা ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধ মঠে নিয়ে যান। এই দীঘির কুমীরদের নিয়ে অনেক গল্প আছে। সব গল্পের অর্থ একটাই। অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান এই কুমীরদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে এবং স্ব স্ব প্রয়োজনে মানত করে থাকে। স্বচক্ষে দেখেছি, হিন্দু-মুসলমান সকলে মোরগ ও মুরগী নিয়ে চলেছে। সে বিশাল এক শোভাযাত্রা। কুমীররা এসব গ্রহণ করে নাকি মনুষ্যকুলকে ধন্য করবে! বলাই বাহুল্য, এসব দৃশ্য আমাকে চমৎকৃত করে না। কিন্তু বারবার নতুন এক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। এই অভিজ্ঞতা মূল্যবান।

মানুষ দ্রুত বদলায় না। সামান্য পরিবর্তনের জন্য কোন্ পথ তার যথার্থ সহায়ক সেটা বুঝতে পারা চাই। প্রথমে চিরাচরিত পথে তাকে চলতে দেওয়াই সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা। যাঁরা মহাপরিবর্তনবাদী, তাঁরা এই মূল্যবান কথাটি মনে রাখতে পারেন না। আসলে মানুষ পরিবর্তনমুখী নয়। তাকে সময়কে ছাড়িয়ে উঠতে পারার সময় দিতে হয়। শিক্ষা, সহানুভূতি, পরমতসহিষ্ণুতা মানুষকে পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। কেবলমাত্র যথার্থ শিক্ষাই মানুষকে এই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সজাগ করতে পারে। সেই সচেতন মানুষ বুঝতে পারে, এই একটি মনুষ্যজীবনের মূল্য কতখানি। বুঝতে পারে, জীবন কিভাবে শতদলের মতো প্রতিটি দল মেলে দিতে পারে। মানুষ অনন্ত শক্তির অধিকারী। এবার এই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, তাকে বাদ দিয়ে এই বিশ্বসংসার নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। ম্লান হয়ে আসবে এই সুন্দরী বসুন্ধরা। এই মানুষ অমৃতের সন্তান। এই মানুষ দুর্লভ।

আমি দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ ভূমিতে এমন মানুষের মর্যাদার বোধ ও বিস্তৃতি দেখেছি এবং বুঝেছি, পরিবর্তনের ঢেউ এই মানুষের দেহে মনে এসে লেগেছে। ট্রাডিশনের পাশে আধুনিকতা চলেছে হাত ধরে। আবার ট্রাডিশনাল সমাজের সঙ্গে প্রগতিবাদীদের বোঝাপড়ার অভাব, সঙ্ঘাত চিরকেলে ঘটনা। বাংলাদেশে তা নিদারুণভাবে প্রকট। ফিউডাল সমাজের মনস্তত্ত্ব এখানে এখনো সুগভীর এবং আধুনিক জীবনযাত্রার বিশেষত ভোগ্যপণ্যবাদী জীবনের আধিক্য বাংলাদেশের এক নতুন সামাজিক বৈশিষ্ট্য। এরই মাঝে নিত্যবিরাজমান নরনারীর জাগরণ। সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষ মানবাধিকারের বলিষ্ঠ দাবিতে সমুজ্জ্বল। এই জনগোষ্ঠীর জীবনে সামাজিক টেনশন অবিনশ্বর—ধর্ম ও সমাজের দাবি সর্বত্র। ধর্ম আজো মানুষের অস্তিত্বকে সর্বক্ষণ গ্রাস করে চলেছে। আবার তারই মধ্যে ১২ এপ্রিল ১৯৯৯ খুলনা কপিলমুনির রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬৪তম জন্মমহোৎসবের আলোচনাসভায় আলোচিত হলো 'স্বামী বিবেকানন্দ ও মানবতাবাদ'। স্বামী অক্ষরানন্দজী তাঁর আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক চিন্তার কথা প্রাধান্য দিয়ে বললেন। বিশদভাবে আলোচনা করলেন তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির, যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, দেশ-কাল-নির্বিশেষে মানুষ সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে। তার সামাজিক মর্যাদা, তার আত্মশক্তি থেকে আত্মপরিচয় পর্যন্ত এক ব্যাপক অভিযানকেই বিবেকানন্দ মানবতার বিকাশ ও ব্যাপ্তি বলে জেনেছেন।

পঞ্চানন বিশ্বাস মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমসাময়িক চিন্তার প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আমার বক্তৃতায় স্বভাবতই আমি বিস্তীর্ণ সামাজিক পটভূমি বিস্তার করতে চাই এবং এমন পটভূমি নির্মাণের সময় আমি বলি, বাংলাদেশের মানুষের মুক্ত চিন্তার আলোকেই গণতান্ত্রিক মানবিকতা-প্রধান সমাজ গড়ে উঠতে পারে। সেই সমাজে নারী আধুনিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে। এই নতুন সমাজ বাংলাদেশে গড়ে উঠছে, এবিষয়ে আমি সন্দেহশূন্য হতে পেরেছি। স্বামীজীর মানবতাবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমি বারবার বলি—স্বামীজী উন্নত, মুক্ত, স্বাধীন সামাজিক মানুষ চেয়েছেন, যার প্রধান মূলধন হবে "Harmonious development"। তিনি চাননি মানুষের উন্নতির প্রশ্নে কোন একদিকের পাল্লা ভারী হোক। আমরা সবাই এক সুন্দর পৃথিবীর সন্ধান করছি। এমন একটি সমাজ, এমন একটি পৃথিবী যেখানে 'আপনি' এবং 'আমি' থাকবে না, থাকবে শুধু 'আমরা'। এই 'আমরা' একটি "palpably human constituency" নির্মাণ করবে। এই হলো স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন।

আমি মুসলমানের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজনের ওপর জোর দিই এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু মুসলমান দেশের সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখ করি। নতুন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ওপর জোর দিই। হিন্দু-মুসলমানকে তাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করার প্রস্তাব করতে দ্বিধা করিনি। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সবাই আমার আধুনিকীকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

পরের দিন চলে আসার সময় বহু ছেলেমেয়ে এসে আমাকে তাদের মনোবাসনার কথা অকপটে জানাল। তারা পরিবর্তন চায়। তাদের মধ্যে বিশেষ করে জনৈকা কলেজ-ছাত্রী জানাল, আজ আর তাদের সমাজে বর্ণবৈষম্য নেই। কেন এমন হলো এবং কি করে হলো তা জানতে চাইলে সে বলল, এমন এক ঝড় এল যে এসব দূরত্ব, বিভাজন, বৈষম্য কোথায় উবে গেল! আজ আমরা হিন্দুসমাজে বর্ণবৈষম্য-মুক্ত হয়ে মানুষ হিসেবে পাশাপাশি বাস করছি। হ্যাঁ, আমিও এই মুক্ত মানসিকতার পরিবেশ দেখেছি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, হিন্দু-মুসলমান আজো কোন ঐকতান সৃজন করতে

পারেনি। তবে যা পেরেছে তাও কম নয়। অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদ দুই সমাজের মানুষকে অনেক কাছে আনতে পেরেছে। এমন বহু হিন্দুর সঙ্গে কথা বলেছি, যার ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান দেখেছি। কিন্তু তেমন মুসলমানের দেখা পাইনি, যিনি হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন গভীর শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য নিয়ে। বরং বহু শিক্ষিত মুসলমানকেই জানি, যিনি হিন্দুর ধর্ম নিয়ে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাটাকেই শ্রেয় মনে করে থাকেন। এই বিষয়টি আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়েছে, আমি যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে বক্তৃতা করেছি। দেখেছি, অসংখ্য মুসলমান জনগণ অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে আমার কথা শুনেছেন। অনেকে পরে আমার সঙ্গে চরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কথা বলেছেন ঃ "আরে স্বামীজী এরকম ছিলেন?" "এসব কথা বলেছেন?" আবার অভিভূত সুশীল হিন্দু শ্রোতা দেখেছি, যিনি আমার বক্তৃতা প্রথমবার শুনলেন। বললেন ঃ "এমনও হয়!" "একজন মুসলমান ভদ্রলোক..." ইত্যাদি। আসল কথাটা হলো বিশাল 'কমিউনিকেশন গ্যাপ'। সুখের কথা, বাংলাদেশে পরিবর্তনের জোয়ার লক্ষ্য করা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে। এটা সত্যিই বড় ভরসার কথা।

এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে দু-একটি ইঙ্গিত দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করা যেতে পারে। বাঙালী মুসলমান নারী এখন একা বিশ্ব-পরিক্রমা করতে পারেন, কলকাতায় হোটেলে রাত্রিযাপন করে পরের দিন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন, পরের দিন সকালে নিউ মার্কেটে কেনাবেচা সেরে ঢাকার পথে সোজা দমদম চলে যেতে পারেন মনের আনন্দে। এখন তিনি স্বাধীন, মুক্ত এবং ধর্ম ও সমাজ চিন্তায় যথেষ্ট আধুনিক। অর্থাৎ এই নতুন নারী জীবন ও জগতের অর্থ নিজের মতো করে নিজে করতে পারছেন।

আজ বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষিত আধুনিক নরনারী স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করছেন, তাদের সংবিধান কেন পরিবর্তন করা হবে না? কেন সংবিধানে ও মানুষের আচরণে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে আসবে না? কেন ধর্মীয় মৌলবাদ বাতিল করা যাবে না? বাংলাদেশে এখন শিল্পকলা, অ্যাকাডেমি শিল্পচর্চা করতে পারে কেবলমাত্র শিল্পশাস্ত্র অনুসরণ করে। ধর্ম ও ধর্মান্ধতা নিয়ে আধুনিক মানুষের মাথাব্যথার শেষ নেই। এই জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারাই হলো আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা-চর্চা এবং বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্বপথে থেকে স্বকালের দাবি স্বীকার করে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি-চিন্তার সঙ্গে বিশ্বমানবতা ও বিশ্ববিবেকের সম্পর্ক সংস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ❑

আবেদন ঃ রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম

অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৪-এর ১৩ মে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে **'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'**-এর উদ্বোধন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বস্ত্র, পাদুকা, পত্রাবলী, তাঁদের লিখিত বা পঠিত গ্রন্থ এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। একটি অত্যাধুনিক সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সংগৃহীত প্রত্যেকটি জিনিসকে সংরক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক সংরক্ষণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে আধুনিক প্রযুক্তিকৌশল-প্রকল্পিত একটি প্রশস্ত মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিকট রক্ষিত উপরি উল্লিখিত স্মৃতিচিহ্নাদি আমাদের অর্পণ করেছেন। আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, উক্ত প্রকারের কোন স্মৃতিচিহ্ন তাঁদের নিকট থাকলে তাঁরা যেন সেইসব স্মৃতিচিহ্ন বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষগণের নিকট অথবা দাতার পক্ষে যোগাযোগ করা সহজ বেলুড় মঠের এমন কোন শাখাকেন্দ্রে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, যদি এইসব স্মৃতিচিহ্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সেগুলি কালের করালগ্রাসে নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এবিষয়ে দাতাগণের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি এবং সবিনয়ে জানাই যে, তাঁদের নিকট প্রাপ্ত বস্তু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

একটি ১৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ভিডিও ক্যাসেটে (PAL কিন্তু NSTC-তে পরিবর্তনযোগ্য) বর্তমান মিউজিয়াম, প্রস্তাবিত মিউজিয়াম ও সংরক্ষণশালার মডেল এবং বর্তমান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যাসেটটি বেলুড় মঠে **রামকৃষ্ণ মিউজিয়ামে** কিনতে পাওয়া যাবে।

মোটামুটিভাবে স্থির হয়েছে, আগামী ২০০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য আবির্ভাবতিথিতে নতুন মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন হবে। কাজটি সম্পূর্ণ করতে এখনো ৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এবিষয়ে আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও আনুকূল্য কামনা করি। মিউজিয়ামের নির্মাণকল্পে ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান **'Ramakrishna Math'**-এর অনুকূলে চেক/ড্রাফট বা মানি অর্ডার মাধ্যমে **'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম-এর জন্য'** উল্লেখ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

স্বামী স্মরণানন্দ

বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২ — **সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ**

'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তি : ভারতের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে প্রথম

শান্তি সিংহ

শিকাগো ধর্মমহাসভার ঠিক এক বছর পর নিউ ইয়র্ক থেকে ১৮৯৪-এর ২৫ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ বরানগর মঠের গুরুভাইদের উদ্দেশ করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে নির্দেশ দেন : "একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit করতে হবে, আদ্দেক বাঙলা, আদ্দেক হিন্দী—পার তো আরেকটা ইংরেজীতে।"

স্বামীজীর পত্রিকা-সম্পাদনার ভাবনা উদ্দীপিত করেছিল সারদা মহারাজকে (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)। তাঁর চিঠির উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬-এর জানুয়ারি মাসে একটি চিঠিতে লেখেন : "তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে এবং উঠে-পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেব, ভাবনা নাই টাকার জন্য। আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার করে নে।... লেগে যা, যত পারিস। পরে আমি India-য় এসে তোলপাড় করে তুলব। ভয় কি?"

অবশেষে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১ মাঘ (১৮৯৯-এর ১৪ জানুয়ারি) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় উত্তর কলকাতার কম্বুলেটোলার ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন (কলকাতা-৭০০ ০০৪) থেকে 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হলো। 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদের ঘোষণাপত্রটি নিচে দেওয়া হলো।

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৫ মাঘ ১৩০৫) স্বামীজীর বিখ্যাত 'সখার প্রতি' কবিতাটি ছাপা হয়। প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে তাঁর 'বর্তমান ভারত' ধারাবাহিক রচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম যুগে 'উদ্বোধন' পত্রিকার অন্যান্য লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কিরণচন্দ্র দত্ত প্রমুখের সঙ্গে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রমুখ।

'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশে বাংলার বুকে নতুন ভাবতরঙ্গ জেগেছিল ঠিকই, কিন্তু টিপিক্যাল বাঙালী স্বভাবের জন্য গ্রাহকসংখ্যা তেমন বাড়েনি। তাই পত্রিকার আর্থিক সুরাহার জন্য গ্রাহকসংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনায় স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ আগস্ট লন্ডন থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখেন : "সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) বলে, কাগজ চলে না।... আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব advertise করে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি—গড়গড় করে subscriber (গ্রাহক) হবে। খালি ভটচায্যিগিরি [দুর্বোধ্য সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ, শাস্ত্রীয় মীমাংসা, ন্যায় ও স্মৃতি-গ্রন্থের ব্যাখ্যা ইত্যাদি] তিনভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে! ... 'টাকাকড়ি বিদ্যাবুদ্ধি সব দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি!

('উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদের ঘোষণাপত্র)

বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র

১ম বর্ষ । ১ম সংখ্যা । ১লা মাঘ । ১৩০৫ সাল

"তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো।" উদ্বোধন "তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো।"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত—সম্পাদক।

সূচী

১ উদ্বোধনের প্রস্তাবনা—স্বামী বিবেকানন্দ ... পৃঃ ১
২ রাজযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ ... পৃঃ ৮
৩ পরমহংসদেবের উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ ... পৃঃ ১৬
৪ শ্রীশ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেনানুবাদিতম্ ... পৃঃ ১৭
৫ সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ (রামকৃষ্ণ মিশন সভা) ... পৃঃ ২৫
৬ বিবিধ ... পৃঃ ৩২

(প্রচ্ছদের ওপরে আরো লেখা ছিল—)

ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র ও সমালোচন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, ডাক মাশুল সমেত।...

কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে?"

স্বামীজীর 'ভাববার কথা' 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের দশম ও চোদ্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ঐ বর্ষের পনেরশ সংখ্যা (১ ভাদ্র ১৩০৬) থেকে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। স্বামীজীর পরামর্শে 'উদ্বোধন'-এর ধারাবাহিক ভ্রমণকথা সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেন সম্পাদক। তা নিম্নরূপ—

"স্বামী বিবেকানন্দ ইহার ('উদ্বোধন' পত্রিকার) প্রতি সংখ্যায় তাঁহার নিজের 'বিলাতযাত্রা' অতি সরল চলিত বাঙ্গালায় লিখিতেছেন। ভাষার মাধুর্য ও সারল্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইবেন এবং ইহাতে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা।

'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের সূচনায় বিজ্ঞপ্তির কিছু অংশ নিম্নরূপ—

"যাহার মাহাত্ম্যে আজ ইওরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি জড়বাদী দেশ-সমুদয় পর্যন্তও মুগ্ধ, সেই 'মহতো মহীয়ান' সনাতন হিন্দুধর্মের বহুল প্রচার করাই 'উদ্বোধন'-এর মুখ্য উদ্দেশ্য।... আমাদিগকে উৎসাহ প্রদানার্থ যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক নূতন ৫টি গ্রাহক করিয়া দেন, তাঁহার সম্মানার্থ উপহারস্বরূপে বর্তমান বর্ষের সমগ্র 'উদ্বোধন' কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার হস্তে অর্পণ করিব; এবং তিনি ইচ্ছা করিলে 'উদ্বোধন'-এর অবৈতনিক 'এজেন্ট'-এরও পদ গ্রহণ করিতে পারেন।"

স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ কথোপকথনে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভাব-রূপ প্রকাশিত। সময়টা—জানুয়ারি ১৮৯৯।

'উদ্বোধন' পত্রিকার নাম সকৌতুকে বিকৃত উচ্চারণ করে স্বামীজী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেন ঃ " 'উদ্বন্ধন' দেখেছিস?"

শিষ্য উত্তর দিলেন ঃ "আজ্ঞে হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে।"

স্বামীজী—এই পত্রিকার ভাব-ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য—কিরূপ?

স্বামীজী—ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর। আমায় আগে দেখিয়ে তবে 'উদ্বোধন'-এ ছাপতে দিবি।

শিষ্য—মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী—তুই বুঝি মনে করেছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে।... এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেমেছে। একি কম sacrifice (স্বার্থত্যাগ)-এর কথা?...

শিষ্য—...ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কল্য বলিলেন ঃ "তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের প্রথম সংখ্যা বিষয়ে কী অভিমত প্রকাশ করেছেন তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

স্বামীজী—তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশি হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

'উদ্বোধন'-এর তৃতীয় বর্ষ থেকে স্বামীজীর ধারাবাহিক রচনা 'বিলাতযাত্রীর পত্র' 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত হয়। রচনাটি নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়। এই রচনায় অনন্য সুন্দর সাহিত্যগুণে পরিবেশিত হয়েছে হুগলী নদীতে চড়া পড়ার ইতিহাস, গঙ্গার শোভা ও বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, জাহাজশিল্পের ক্রমবিবর্তন, বঙ্গোপসাগর-ভারত মহাসাগর-আরবসাগর-লোহিতসাগর-সুয়েজ খালের কথা, সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম, আরব ও মিশরীয় সভ্যতার ইতিবৃত্ত, ইহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মপ্রসঙ্গ, ইউরোপের নানা দেশের বর্ণনা ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা।

'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এইসব বিচিত্র স্বাদের রচনা পাঠ করে দেশের অগণিত সাহিত্যপ্রিয় নরনারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও প্রভূত প্রশংসা করেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'উদ্বোধন'-কে জনপ্রিয় করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। ১৯০০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার যতীন্দ্রচন্দ্র দাসকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন ঃ "অদ্য ডাকে এক হাজার হ্যান্ডবিল আপনাকে পাঠাইয়াছি। প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।... আপনাদিগের দ্বারাই পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ প্রচারকার্য হওয়া সম্ভব এবং হইতেছেও। আপনার ন্যায় উদ্যোগী ও পরিশ্রমী লোক যদি আমরা সব জেলায় পাইতাম তো আমাদের আজ ভাবনা কি ছিল? যাহা হউক, ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক-একখানি হ্যান্ডবিল দিয়া 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হ্যান্ডবিলে কি আছে তাহা সকলকেই খুব ভালরূপ বুঝাইয়া দিবেন, নচেৎ কেহ হ্যান্ডবিল বুঝিতে পারিবে না। রীতিমত লেকচার দেওয়ার মতো হ্যান্ডবিলে কি কি বিষয় আছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন।..."

স্বামীজী আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে একটি পত্র লেখেন। তা 'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় 'বাঙলা ভাষা' নামে প্রকাশিত হয়। ঐ রচনায় আদর্শ চলিত ভাষা সম্পর্কে স্বামীজীর দূরদৃষ্টি

আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ করে। তাঁর ভাবনা এরূপ—"চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কী হবে? যে-ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?... ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে-মুচড়ে যা ইচ্ছে কর, আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।... যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা ভাষা কয়।"

আমরা জানি, বিবেকানন্দ আদর্শ চলিত ভাষা হিসাবে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে যা লিখিতভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন, প্রায় চোদ্দ বছর পরে প্রমথ চৌধুরী তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় (১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ) তাকে আন্দোলনে রূপদান করেন। সেই ভাষা-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের উপান্তে 'ছন্দ' গ্রন্থে (১৯৩৬) তীক্ষ্ণভাবে বলেছেন ঃ "বাঙলায় হসন্ত-বর্জিত সাধুভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল, চর্বির স্তরে তার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে এবং তার চিক্কণতা যতই থাক, তার জোর অতি অল্পই।"

অথচ গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ কত বছর আগেই তা চাঁচাছোলা ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন!

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'উদ্বোধন'-সম্পাদক হিসেবে সাধুভাষায় লিখতে স্বচ্ছন্দবোধ করতেন। কিন্তু তিনিও স্বামীজীর প্রভাবে চলিত ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছেন। 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের আঠার ও উনিশ সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমন' ও 'বিজয়া' লেখা-দুটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। যথা—"মা আবার আমাদের দেখতে আসছেন।... মা আমাদের কত দয়াময়ী! কত স্নেহময়ী।... বেশিদিন ছেলেকে না দেখে কি থাকতে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন।" অথবা—"মা বাড়ি আলো করে ছিলেন। কত গমগমে ছিল, কত জাঁকজমক ছিল, কতই আনন্দোৎসব হতেছিল। আজ ঘর আঁধার করে, মন আঁধার করে চলে গেলেন!"

আমরা দেখি, বড় বড় প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক বুদ্ধি মাথায় রেখে পত্রিকা প্রকাশ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টভাষায় লিখেছেন ঃ "আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের ('উদ্বোধন'-এর) আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success হয় তো এর income সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে।"

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের পৌষ অবধি 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পরে স্বামী শুদ্ধানন্দ সম্পাদক হন। তাঁর কার্যকাল ১৩০৯ মাঘ থেকে ১৩১৪-এর পৌষ। ১৩১৪-এর মাঘ থেকে স্বামী সারদানন্দ 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক-পদে বৃত হন। সবিশেষ উল্লেখ্য, 'উদ্বোধন' দশম বর্ষে মাসিক পত্রিকায় রূপ নেয়। আয়তনে ডিমাই, ৬৪ পাতা। ঐ বছর একাদশ সংখ্যা থেকে স্বামী সারদানন্দের মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হতে শুরু হয়। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রামাণ্য তথা আকর জীবনীগ্রন্থ হিসাবে তা চিরকালের সাহিত্যসম্পদ। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের পৌষ অবধি তিনি এককভাবে সম্পাদক থাকেন। ১৩১৮-এর মাঘ থেকে ১৩২০-এর পৌষ পর্যন্ত স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সম্পাদনা করেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে ১৩২৬-এর পৌষ অবধি স্বামী সারদানন্দ 'উদ্বোধন' সম্পাদনা করেন। প্রথমদিকে তাঁর সহযোগী সম্পাদক হন স্বামী মাধবানন্দ (তখন তিনি ব্রহ্মচারী নির্মল), তারপর হন স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী গঙ্গেশানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী বিমল ও ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য)। স্বামী বাসুদেবানন্দ ১৩২৬-এর মাঘ থেকে ১৩২৯-এর শ্রাবণ অবধি এককভাবে পত্রিকা-সম্পাদনা করেন। পরে তিনি স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দের সঙ্গে যথাক্রমে ১৩২৯-এর ভাদ্র থেকে ১৩৩৪-এর শ্রাবণ পর্যন্ত এবং ১৩৩৪-এর ভাদ্র থেকে ১৩৪২-এর আশ্বিন অবধি যুগ্মভাবে 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনা করেন। স্বামী সুন্দরানন্দ ১৩৪২-এর কার্তিক থেকে ১৩৪৩-এর আশ্বিন অবধি স্বামী শুদ্ধানন্দের সঙ্গে যুগ্মভাবে এবং ১৩৪৩-এর কার্তিক থেকে ১৩৫৮-এর চৈত্র অবধি এককভাবে 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনা করেন। ১৩৫৯-এর বৈশাখ থেকে ১৩৬৩-এর পৌষ অবধি 'উদ্বোধন'-সম্পাদক ছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এরপর ১৩৬৩-এর মাঘ থেকে ১৩৭১-এর পৌষ অবধি স্বামী নিরাময়ানন্দ, ১৩৭১-এর মাঘ থেকে ১৩৮০-এর পৌষ অবধি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, ১৩৮০-এর মাঘ থেকে ১৩৮৯-এর ভাদ্র অবধি স্বামী ধ্যানানন্দ, ১৩৮৯-এর আশ্বিন থেকে ১৩৯২-এর কার্তিক অবধি স্বামী অব্জজানন্দ এবং ১৩৯২-এর অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৯৪-এর আশ্বিন অবধি 'উদ্বোধন'-সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন স্বামী প্রমেয়ানন্দ। ১৩৯৪-এর কার্তিক থেকে 'উদ্বোধন'-সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে এসে 'উদ্বোধন'-এর প্রচার ও প্রভাব সম্পর্কে বর্তমান সম্পাদককে প্রশ্ন করায় জানতে পারলাম, বেশ কয়েক বছর আগে যখন তিনি 'উদ্বোধন' সম্পাদনার দায়িত্ব পান তখন পত্রিকাটির গ্রাহক-সংখ্যা দশ হাজারও ছিল না। আর্থিক দিক থেকেও 'উদ্বোধন' বেশ দুর্বল ছিল। বর্তমানে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকসংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হাজার, আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যও এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পূর্ণাত্মানন্দজী সেদিন বর্তমান লেখককে বলেছিলেন ঃ " 'উদ্বোধন' শুধুমাত্র একটি পত্রিকা নয়, 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে যেকোনভাবে যুক্ত হওয়ার অর্থ একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। পত্রিকা প্রকাশনায় বাণিজ্য-ভাবনা এখানে কোনদিন

গুরুত্ব পায় না, আমাদের মূল গুরুত্ব সেবাব্রতে। তবে লোকসান করে পত্রিকা বা প্রকাশনা চালানোও যে নির্বুদ্ধিতা, তাও আমরা মনে রাখি। পত্রিকা প্রকাশ করতে গ্রাহকপিছু আমাদের সারা বছরে যা খরচ হয় তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আমরা গ্রাহকমূল্য হিসাবে ধার্য করি। এছাড়াও সাধারণ সংখ্যার চেয়ে তিনগুণ আয়তনের শারদীয়া সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের থেকে কোন অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। অথচ যাঁরা গ্রাহক নন, তাঁরা সংখটি চল্লিশ টাকা মূল্যেই সংগ্রহ করেন। শারদীয় 'উদ্বোধন' অন্যান্য সংখ্যার থেকে বেশি ছাপা হলেও প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই সব নিঃশেষিত হয়ে যায়। দেশে-বিদেশে 'উদ্বোধন'-এর জনপ্রিয়তার পিছনে রয়েছে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর শক্তি এবং সাধু-কর্মী-স্বেচ্ছাসেবী-শুভানুধ্যায়ীদের নিরলস প্রচেষ্টা। ২০০টি গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্র আজ দেশে ও বিদেশে 'উদ্বোধন'-এর প্রচারের ব্রতে ব্যাপৃত।''

কি নেই শতবর্ষ-প্রাচীন এই পত্রিকায়? স্বামীজীর নির্দেশকে সর্বতোভাবে মান্য করেই একের পর এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিল্প, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, ভ্রমণ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয়ে গবেষণালব্ধ, মননঋদ্ধ ও সরস প্রবন্ধ। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান-এর সহাবস্থান প্রথম আবির্ভাব থেকেই 'উদ্বোধন'-এর উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। আর তখন থেকে আজ পর্যন্ত উদার বিশ্ববীক্ষা ও অসাম্প্রদায়িকতা 'উদ্বোধন'-এর এক মহান নীতি ও কীর্তি। একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও পত্রিকাটি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়।

এপ্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বিগত ১০০ বছরে 'উদ্বোধন'-এ অসংখ্য উচ্চমানের কবিতা বেরিয়েছে। তবে বছর দশেক আগে পর্যন্ত কবিতার জন্য পৃথক কোন বিভাগ ছিল না। অনেক সময়ই পাদপূরণ হিসাবে কবিতা ছাপা হতো। এখন কবিতার জন্য রয়েছে আলাদা বিভাগ। বর্ষীয়ান কবি অরুণ মিত্র থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুভাষ মিত্র, কৃষ্ণা বসু, ব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট কবিদের পাশাপাশি বহু নবীন কবিও 'উদ্বোধন'-এ নিয়মিত লিখেছেন এবং লিখছেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কৃতবিদ্য, সুধী সন্ন্যাসীদের পাশে বাঙলা সাহিত্যের বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী এই পত্রিকায় দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, সমাজতত্ত্ব ও নানা ধরনের ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক [field work] প্রবন্ধ লিখে থাকেন। তাই রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের সঙ্গে হীরেন মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, সুদিন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট মার্ক্সিস্ট বুদ্ধিজীবীদের লেখাও 'উদ্বোধন'-এ ছাপা হয়। তাতে পত্রিকার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেও বিশিষ্ট মননের আলোয় বিষয়-বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়। এই পত্রিকার 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগের আলোচনা সাহিত্যের বিশেষ দিগ্‌দর্শনকারী। প্রথম থেকেই বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিরা সানন্দে 'উদ্বোধন'-এ লেখা পাঠিয়ে সহযোগিতা করে আসছেন। এখন পত্রিকার প্রচার ও প্রসার যেমন বেড়েছে, তেমনি পত্রিকা-তহবিলের ঘাটতি মিটে সঞ্চয়ও যথেষ্ট। তাই পত্রিকার কাগজ ও ছাপার মান যেকোন প্রথমশ্রেণীর সাময়িকপত্রের মতো উন্নত ও আধুনিক হয়েছে।

'উদ্বোধন' পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি বাঙলা সাহিত্যে তথা ভারতীয় পত্রিকার ইতিহাসে একটি বিশেষ সংবাদ। কারণ, বিশাল ভারতে দেশীয় ভাষায় লেখা কোন সাহিত্য-পত্রিকা নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে এখনো শতবর্ষে পদার্পণ করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাঙলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র 'দিগ্‌দর্শন' শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে ক্লার্ক মার্সম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি দুবছর প্রকাশিত হয়েছিল।

আমরা জানি, বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত জে. সি. মার্শম্যানের 'সমাচার দর্পণ', রাজা রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্মণসেবধি', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'সংবাদ ভাস্কর', ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'তত্ত্বকৌমুদী', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদর্শন', উমেশচন্দ্র দত্তের 'বামাবোধিনী', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' প্রভৃতি কোন সাহিত্য-পত্রিকারই আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ হয়নি। একই ধারায় 'মানসী', 'ভারতবর্ষ', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা', 'মাসিক বসুমতী', 'শনিবারের চিঠি', 'কবিতা', 'পূর্বাশা', 'কৃত্তিবাস' প্রভৃতি পত্রিকার গতিও রুদ্ধ হয়ে গেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের ইংরেজী মুখপত্র মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত'ও শতবর্ষ পেরিয়েছে। তবে তার প্রকাশ নিরবচ্ছিন্ন হতে পারেনি। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে পত্রিকাটি আকস্মিকভাবে বন্ধ হয় একমাসের জন্য। তারপর থেকে অবশ্য নিয়মিত বেরচ্ছে।

বাঙলা সাহিত্যে এখন প্রচুর পত্রিকা (যার চলতি নাম 'লিটল ম্যাগাজিন') প্রকাশিত হয়। অন্তত ২৫শে বৈশাখ ও শারদীয়া সংখ্যায় তাদের প্রকাশ-সংখ্যা গণনাতীত। এসবই সৃষ্টিশীল প্রাণের লক্ষণ। তবু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এদেশে শিশুমৃত্যুর হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাহিত্য-পত্রিকার অকালমৃত্যু ঘটে। অথচ সেদেশেই 'উদ্বোধন' অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে! আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও প্রাণশক্তির অভাব তার কখনো ঘটেনি। অবশ্য আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যকে এখন 'উদ্বোধন' সগৌরবে কাটিয়ে উঠেছে এবং উঠেছে নীতি, আদর্শ ও ঐতিহ্যকে পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেই। এ বড় কম কথা নয়! শতবর্ষ-উত্তর 'উদ্বোধন' প্রতিদিন আরো তারুণ্যমুখর, প্রাণচঞ্চল ও বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তার প্রধান কারণ—সে যে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দেহহীন কণ্ঠস্বর' স্বামীজীর ভাবতনু। স্বামীজী বলেছিলেন : ''সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্তত ভারতে এমন একটি যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না।'' আমরা তো জানি, 'উদ্বোধন' পত্রিকা স্বামীজীর সেই 'যন্ত্র' রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভাব ও বাণী-রূপ। ❑

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন ঃ

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।" (৪।৮)

প্রকৃতপক্ষে এটা শুধু মহাকাব্যে উচ্চারিত মহাকবির কল্পনা-বিলাস নয়, আমরা যদি পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যুগের গতিধারা সঠিকভাবে এবং মোহমুক্ত দৃষ্টিতে অনুসরণ করি, তাহলেই দেখতে পাব, যখনি সমাজে ধর্মের গ্লানি দেখা দিয়েছে, নৈতিকতার ঘটেছে পতন, মানুষ বিচ্যুত হয়েছে সত্যপথ থেকে, তখনি অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও সৎ মানুষকে রক্ষা করার জন্য এবং অত্যাচারীকে দমন করার প্রয়োজনে ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীতে। তাঁরাই যুগ ও কালের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন বারেবারে। মানুষের দুঃখে ধরাধামে অবতরণ করেন বলেই তাঁরা অবতার-রূপে পূজিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অবতার হচ্ছেন প্রভাতের সূর্য—তাঁর দিকে তাকানো যায়, তাঁকে দেখা যায়। আর সেই সূর্যই যখন মধ্যাহ্নগগনে পৌঁছায়, তখন সেদিকে তাকানো যায় না। একই সূর্য—অথচ দুই রূপ। একটা সহজ রূপ। আরেকটা দৃষ্টির অতীত। প্রভাতের সূর্য যদি অবতার হন, তাহলে মধ্যাহ্নের সূর্য হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং।

আজকের বিশ্বমানব শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে প্রণাম নিবেদন করছে। দেশে এবং বিদেশে তিনি আজ অবতার বলে পূজিত হচ্ছেন। যেমনভাবে পূজিত হয়েছেন বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন ১৮৮৬ সালে। আর ১৮৯৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর পরমভক্ত নবগোপাল ঘোষ হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে তাঁর নতুন বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করান। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা এবং পূজা করেছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। সেদিন পূজার আসনে বসে তিনি মুখে মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র রচনা করেন। প্রণামমন্ত্রটি হলো—"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।/ অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।"

অর্থাৎ যিনি ধর্মস্থাপন করতে এসেছেন, যিনি স্বয়ং সর্বধর্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ অবতার—সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বা শ্রেষ্ঠ অবতার বলা হচ্ছে কেন? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, প্রতি অবতারে ভগবান তাঁর 'আত্মস্বরূপ' আরেকটু বেশি প্রকাশ করেন। প্রতি অবতার তাঁর পূর্ববর্তী অবতারের তুলনায় বেশি শক্তি নিয়ে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব যুগের প্রয়োজনে, যুগের প্রয়োজনেই তাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। ঘটেছে সকল ধর্ম ও মতের অপূর্ব সমন্বয়।

'যুগের প্রয়োজনে' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। যুগ অনুসারেই নরশরীর ধারণের আগে ভগবান মনুষ্যেতর প্রাণীর শরীর ধারণ করেছেন। জীববিজ্ঞানীরা অবতার-বিবর্তনের তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী ছিল জলময়, তাই প্রথম অবতার মৎস্য জলচর প্রাণী। দ্বিতীয় কূর্ম উভচর প্রাণী। তৃতীয় বরাহ স্থলচর প্রাণী। পরবর্তী নৃসিংহ অর্ধেক মানব, অর্ধেক প্রাণী। এরপর ভগবান মনুষ্যরূপ ধারণ করলেন, কিন্তু তিনি বামনাকৃতি। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে প্রথম এল কুঠার—তাই ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের হাতে কুঠার। এরপর আবিষ্কৃত হলো তীর-ধনুক। রামচন্দ্র এলেন তীর-ধনুক নিয়ে। পরবর্তী যুগে কৃষি-সভ্যতার উন্মেষ। তাই বলরামের হাতে লাঙল।

এপর্যন্ত পৌরাণিক যুগ। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব থেকে শুরু হলো ঐতিহাসিক যুগ। বুদ্ধদেবের পর কেউ কেউ শঙ্করাচার্যকে অবতার বলে পূজা করেন। তারপর এলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এবং সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজীর মতে ঃ "শঙ্করাচার্যের জ্ঞান আর শ্রীচৈতন্যের প্রেম, শঙ্করের মস্তিষ্ক আর চৈতন্যের হৃদয়" নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে গ্রামে গাঁথা ভারতের শাশ্বত বিশ্বাসের এক বিস্ময়কর সমন্বয় তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই নিজের সম্পর্কে বলছেন ঃ "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" তবে এবারে পরশুরামের কুঠার নেই, রামচন্দ্রের ধনুর্বাণ নেই, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র নেই, বুদ্ধের রাজ-ঐশ্বর্য নেই, শঙ্করাচার্য বা শ্রীচৈতন্যের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য নেই—শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বর্য পবিত্রতা, ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, অহংশূন্যতা। এটাই ছিল যুগের প্রয়োজন।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয়, ঈশ্বরের অংশরূপে অবতার আসেন। কেউ বিষ্ণুর অংশ, কেউ শিবের অংশ, কেউ শক্তির অংশ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কার অংশ? অথবা তিনি কি সকলের সব অংশ নিয়েই সব অবতারের উজ্জ্বলতম সমন্বিত রূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ যে অবতার—এই সত্য পণ্ডিতেরা বুঝেছিলেন অনেক পরে, শ্রীরামকৃষ্ণও বুঝতে দিয়েছিলেন অনেক দেরিতে। কিন্তু তাঁর সেই শৈশবেই কামারপুকুরের

একজন সাধারণ মানুষ তাঁকে প্রথম চিনেছিলেন। তাঁর নাম চিনু শাঁখারী। শ্রীরামকৃষ্ণ বালক, চিনু শাঁখারী বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করছেন, আর বলছেন ঃ "প্রভু, আমি জানি তুমি কে! তুমি কত লীলা করবে, কিন্তু আমার সময় নেই, আমি দেখতে পাব না। তবে এটা মনে রেখ ঠাকুর, এই চিনু শাঁখারীই তোমাকে প্রথম চিনেছে!"

বস্তুত, সেই বৃদ্ধই সেই বালককে প্রথম চিনেছিলেন। পরে চিনেছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী। চিনেছিলেন ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এবং ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত। এঁরা দুজন গলা উঁচিয়ে সকলের কাছে বলে বেড়াতেন—শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। এই নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মজা করতেন, বলতেন, আমাকে অবতার বলে দুজন—একজন থিয়েটার করে, আরেকজন মড়া-কাটা ডাক্তার! অবশ্য রানী রাসমণি এবং তাঁর জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসও চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু জানতে পেরেছিলেন কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কার অবতার?

এবার আমরা ফিরে তাকাই শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবলগ্নের দিকে, সেই হুগলী জেলার নিতান্তই দূরান্তের গ্রাম কামারপুকুরের দিকে। সেখানকার পবিত্রভূমিতে ১৮৩৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সূর্যোদয়ের কিছু আগে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

তারই বছর খানেক আগেকার ঘটনা। বাড়ির কাছেই যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রামণি দেবী এবং ধাত্রী-মা ধনী কামারনী নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। হঠাৎ সেই সময় চন্দ্রাদেবী দেখতে পেলেন, মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ থেকে একটা দিব্যজ্যোতি বেরিয়ে এসে গোটা মন্দিরকে পূর্ণ করে দিয়েছে। তারপর সেই জ্যোতি বাতাসের মতো তরঙ্গাকারে ছুটে এল চন্দ্রাদেবীর দিকে। তিনি এই ঘটনায় বিস্মিত হয়ে বিষয়টি ধনী কামারনীকে বলতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ সেই আলোর তরঙ্গ এসে চন্দ্রাদেবীকে ঢেকে ফেলল এবং তাঁর দেহে প্রবল বেগে প্রবেশ করতে লাগল।

এমন একটা অভাবনীয় ঘটনায় চন্দ্রাদেবী বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হয়ে একসময় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। পরে ধনী কামারনীর শুশ্রূষায় চেতনা ফিরে এলে তিনি সব কথা তাঁকে বললেন। ধনী বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু চন্দ্রাদেবীর তখন থেকে মনে হচ্ছিল, ঐ জ্যোতি তাঁর উদরে প্রবেশ করে রয়ে গেছে এবং তাঁর যেন গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই দৈব ঘটনার কিছুকাল পরে যথাসময়ে গদাধর অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে শিব-মহিমা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কামারপুকুরে পাইনদের বাড়িতে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শিবমহিমা-বিষয়ক যাত্রাপালা অভিনয় হওয়ার কথা। কিন্তু গোটা অনুষ্ঠানই পণ্ড হতে বসেছে! কারণ যে শিব সাজবে, সে দারুণ অসুস্থ। তাহলে উপায়? গ্রামের সবাই বালক গদাধরকেই ধরে বসল ঃ তোমাকেই শিব সাজতে হবে। শিব সাজলে তাকে মানাবে ভাল, অভিনয়ও হবে ভাল। শিব তো সাজলেন গদাধর, কিন্তু সাজঘরে বসেই তিনি শিবের ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তারপর যখন আসরে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর সেই ভাবাবিষ্ট শিবমূর্তি দেখে দর্শকরা আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। পুরুষেরা দিল হরিধ্বনি, নারীরা দিল উলুধ্বনি, কেউ বাজাল শঙ্খ—যেন আসরে সত্যি শিব আবির্ভূত হয়েছেন! গদাধর সেই যে সমাধিস্থ হলেন, সারারাত আর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল না।

বেশ কয়েক বছর পরের কথা। তখন তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজক। একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশ করে তিনি 'শিবমহিম্নস্তোত্রম্' পাঠ করতে শুরু করলেন, কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই "মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা কেমন করে বলব" বলতে বলতে তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর দুচোখে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরতে থাকে।

তীর্থভ্রমণকালে শ্রীরামকৃষ্ণ দুইবারে কয়েক মাস কাশীধামে বাস করেছিলেন। ঐ সময় তিনি প্রায়ই পালকিতে চেপে বিশ্বনাথ-দর্শনে যেতেন এবং পথে যেতে যেতেই শিবের ভাবে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। মনিকর্ণিকা ঘাটের শ্মশানে তিনি একদিন বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করেছিলেন—পিঙ্গল জটাধারী দীর্ঘকার শ্বেতকায় পুরুষ, যেন জগতের যত গাম্ভীর্য নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন! সেই পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হয়ে যান।

আবার একদিন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নীলকণ্ঠের 'শিব শিব' গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হয়ে নাচতে শুরু করেছিলেন।

এরকম আরো অনেক ঘটনার উপস্থাপনা করা যেতে পারে, যেগুলি থেকে সহজেই মনে হতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম শিব-অংশে এবং তিনি শিবের অবতার।

কিন্তু তাই বা বলি কেমন করে? তাহলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় আরেকটি ঘটনার দিকে।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেই আছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণের এককোণে তিনি যে-ঘরটিতে থাকতেন, সেই ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি লম্বা বারান্দা। বারান্দাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ আপন ভাবে বিভোর হয়ে সেই বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। কোনদিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। ঠিক সেই সময় মথুরবাবু উলটোদিকে কুঠিবাড়ির বৈঠকখানায় বসেছিলেন। তিনি যেখানটায় বসেছিলেন, সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে পায়চারি করছিলেন—তার দূরত্ব খুবই সামান্য। ফলে মথুরবাবু তাঁকে

বেশ ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছিলেন। মথুরবাবু একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁর চলাচল লক্ষ্য করছেন এবং তাঁর বিষয়ে চিন্তা করছেন। আবার পরক্ষণেই নিজের জমিদারি ও বিষয়-চিন্তায় ডুবে যাচ্ছেন।

মথুরবাবু যে কুঠিবাড়িতে বসে মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখছেন এবং তাঁর কথা চিন্তা করছেন, সেটা শ্রীরামকৃষ্ণ আদৌ লক্ষ্য করেননি এবং জানতেনও না।

এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ বলছেন, আর জানা থাকলেই বা কি? দুই জনের সামাজিক, সাংসারিক ও অন্য সকলরকম অবস্থার পার্থক্য এত বেশি যে, জানা থাকলেও কেউ কারোর জন্য বড় বেশি ব্যতিব্যস্ত হওয়ার মতো কোন কারণ ছিল না। বরং বলা যায়, ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় ও অন্যমনা না থাকলে মথুরবাবু তাঁকে দেখছেন, এটা টের পেলে শ্রীরামকৃষ্ণেরই সঙ্কুচিত হয়ে সে-স্থান থেকে সরে যাওয়ার কথা ছিল। কারণ, মথুরবাবু ধনী, মানী, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জমিদার, রানী রাসমণির সমস্ত সম্পত্তির মালিক।

এহেন মথুরবাবুকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণেরই তো বিব্রত হওয়ার কথা। অথচ ঘটনা ঘটল অন্যরূপ। হঠাৎ মথুরবাবুই ছুটে কুঠিবাড়ির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, তারপর তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরে শিশুর মতোই কাঁদতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হতচকিত হয়ে বললেন ঃ এ তুমি কি করছ? তুমি বাবু, রানীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও, ওঠ।

মথুরবাবু সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না। একইভাবে কেঁদে চললেন। কিছুক্ষণ পর একটু শান্ত হয়ে বললেন ঃ বাবা, আজ এক অদ্ভুত দর্শন হলো! তুমি বারান্দায় বেড়াচ্ছ, আর আমি স্পষ্ট দেখলাম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা ভবতারিণী। আর যেই পিছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব!

তাহলে সেদিন মথুরবাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণ কি দেখালেন? দেখালেন, তিনি একই দেহে শক্তি এবং শিব, কালী এবং মহাদেব। তাহলে কি বলতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ একই দেহে শিব ও শক্তির অবতার?

কিন্তু একথা বললেই কি সবটুকু বলা হয়? অথবা আসল সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়? অবতারবরিষ্ঠকে চেনা যায়?

১২৪১ বঙ্গাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধাম দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সময়টা ছিল চৈত্রমাস। তিনি একমাসের মতো গয়ায় ছিলেন এবং যথাবিহিত ক্ষেত্রকার্য সম্পন্ন করে শ্রীশ্রীগদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করেন। পিতৃঋণ শোধ করে তিনি যেন তৃপ্তি ও শান্তি পেলেন। একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এক অলৌকিক দিব্যজ্যোতিতে গদাধরের মন্দির প্লাবিত হয়ে গেছে। তাঁর পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে মন্দিরের সিংহাসনে উপবিষ্ট এক অদ্ভুত পুরুষের উপাসনা করছেন। সেই পুরুষটি নবদুর্বাদলশ্যাম, জ্যোতির্ময়। তিনি ক্ষুদিরামকে ডাকলেন। ক্ষুদিরাম সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছে যেতেই তিনি মধুর কণ্ঠে বললেন ঃ ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হয়েছি, পুত্ররূপে তোমার ঘরে অবতীর্ণ হয়ে আমি তোমার সেবা গ্রহণ করব। একথা শুনে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভয় পেয়ে গেলেন, এমন পুত্রকে তিনি কিভাবে সেবা করবেন? তখন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন ঃ ভয় নেই ক্ষুদিরাম, তুমি যা দেবে, আমি তা-ই তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করব। আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে আপত্তি করো না।

এরপরই শ্রীরামকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। তাহলে বুঝতে হবে, স্বয়ং বিষ্ণুই ক্ষুদিরামের ঘরে নররূপ ধরে এসেছিলেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুরই অবতার।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এল ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি দেখে বললেন ঃ "এসব মহাভাবের বহিঃপ্রকাশ। বৈষ্ণবতন্ত্রে আছে, শ্রীরাধার হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যের হয়েছিল, অবতারকল্প পুরুষের হয়।" তিনিই মথুরবাবুকে বললেন ঃ "পণ্ডিতদের ডাক, আমি শাস্ত্র সহায়ে প্রমাণ করব যে, ইনি অবতার।"

এলেন পরম ভাগবত বৈষ্ণবচরণ—সে-যুগের বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত। আর এলেন বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধক গৌরী পণ্ডিত। এই দুজনকে সামনে রেখে ডাকা হলো পণ্ডিত-সভা। কালী-মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে সভা বসল। সেই সভায় উপস্থিত সকলে একবাক্যে ঘোষণা করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। বৈষ্ণবচরণ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন, ভক্তিশাস্ত্রে যে উনিশটি ভাবকে 'মহাভাব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা শুধু শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, তার সবগুলিই দেখা গেছে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

আমরা জানি, গৌরী-মা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যই এযুগের শ্রীরামকৃষ্ণ। আমরা জানি, শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হতো। তিনি একসময় মধুর-ভাব সাধনও করেছিলেন।

কলকাতার কলুটোলার হরিসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন। তাঁকে দেখে সবাই হলেন উদ্দীপ্ত। শুরু হলো ভাগবত পাঠ। সেই পাঠ শুনতে শুনতে হরিসভায় শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে নিবেদিত আসনটিতে গিয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর তখন জ্যোতির্ময় রূপ। সবাই নির্বাক হয়ে তাঁকে দেখছেন। পাঠকও পাঠ ভুলে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সবাই যেন শ্রীচৈতন্যকেই দেখছেন। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ভগবানদাসজী কালনায় বসে একথা শুনে রেগে গেলেন, চৈতন্যের আসনে অন্য লোক উঠবেন কেন? তারপরই

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ছদ্মবেশে এলেন কালনায় ভগবানদাসজীর আখড়ায়। গোটা আখড়া যেন দিব্যভাবে বিভাসিত হয়ে উঠল। ভগবানদাসজী বুঝলেন, তিনি যে-সে নন, চৈতন্যের ভাবে যিনি চৈতন্যময়—তাঁর মধ্যে স্বয়ং চৈতন্যই এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের নগর-সঙ্কীর্তন দর্শন করেছিলেন, কামারপুকুরের কাছে শিহড় গ্রামে গৌরাঙ্গ-ভাবে ভক্তগণকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্বমুখেই বলেছেন ঃ "আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ—একাধারে তিন।"

এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রমাণ করা যায়, তিনি বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবতার, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সেই একই অংশে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঘোষণা করেছিলেন ঃ "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।" পানিহাটি মহোৎসব এবং বলরাম-মন্দিরে রথযাত্রার অলৌকিক ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের কুল-দেবতা রঘুবীর, তিনি নিজেকে রাম ও কৃষ্ণের সমন্বয়-রূপ বলে ঘোষণা করছেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রামলালাকে নিয়ে কত লীলা করছেন তিনি। আবার রামভক্ত সেজে মানুষকে দেখাচ্ছেন এক ভিন্নরূপ।

তবুও কি নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) সব সংশয় থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন? কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্ত্যলীলার শেষ পর্বে, তখন একদিন নরেন্দ্রনাথ মনে মনে চিন্তা করলেন—"এই ভীষণ দুরারোগ্য ব্যাধির মধ্যেও ঠাকুর যদি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারেন যে, তিনি শ্রীশ্রীভগবানের অবতার, তাহলেই আমি তাঁকে অবতার বলে বিশ্বাস করব, নইলে নয়।" আশ্চর্যের বিষয়, নরেন্দ্রনাথ যখন একথা ভাবছেন, ঠিক তখনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন ঃ "এখনো অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ,—সে-ই রামকৃষ্ণ। তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।" নরেন্দ্রনাথের মন থেকে সমস্ত সংশয় মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—এই এক দেহেই প্রকাশিত।

অবশ্য তাঁর শক্তিসাধনার স্বরূপটিকে বিস্মৃত হলে চলবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে এসেছিলেন ১৮৫৫ সালে। তারপর একটানা বার বছর তিনি মাতৃসাধনায় জীবন-মন সমর্পণ করেছিলেন। তিনি শক্তিপূজা করবেন বলে শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অপূর্ব এবং তুলনারহিত মাতৃসাধনার ইতিবৃত্ত আমরা জানি, জানি তাঁর সেই ব্যাকুল হৃদয়ে কান্নার কথা—"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ কিছুই চাই না, আমায় দেখা দে।" তবু এই বুকফাটা কান্নায় মা জগদম্বা দর্শন দিচ্ছেন না। শেষপর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মা যখন দেখা দেবেনই না, তখন এজীবনের আর প্রয়োজন কি? আত্মহনন করার জন্য তিনি মন্দিরগাত্রে ঝোলানো খড়্গ তুলে নিলেন নিজের হাতে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে মা জগদম্বা তাঁকে দর্শন দিলেন—মন্দিরের ঘর-দ্বার সব যেন কোথায় হারিয়ে গেল, এক অসীম অনন্ত চেতনজ্যোতি চারদিক থেকে ছুটে এসে তাঁকে ভাসিয়ে দিল। তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন।

তারপর জগদম্বার পাষাণমূর্তি বারবার তাঁর কাছে ধরা দিলেন চিন্ময়ীমূর্তিতে। মা ও ছেলের সেই লীলাখেলার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই। তিনি বলতেন ঃ নাসিকায় হাত দিয়ে দেখেছি, মা সত্যসত্যই নিঃশ্বাস ফেলছেন।... রাত্রে প্রদীপের আলোয় মন্দিরে মায়ের দিব্যাঙ্গের ছায়া পড়তে কখনো দেখিনি। নিজের ঘরে বসে দেখেছি, ঠিক বালিকার মতোই মা আনন্দিতা হয়ে মন্দিরের উপরতলায় উঠছেন। দেখেছি, মা দোতলার বারান্দায় এলো-চুলে দাঁড়িয়ে কখনো কলকাতা এবং কখনো গঙ্গা দর্শন করছেন।

এরকম কত কথা, কত ঘটনা, কত সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে—যা দিয়ে স্পষ্টতই বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং মা ভবতারিণী। আবার পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয়েছে, তিনিই স্বয়ং মা কালী। দুইয়ে মিলে এক। তিনি বলেছেন ঃ "কলিকালে বেদ-পুরাণ কানে শুনতে হয়, কিন্তু অনুষ্ঠান করতে হয় তন্ত্র-মতে।" তন্ত্রে শক্তিপূজারই প্রাধান্য। কালী, জগদ্ধাত্রী বা দুর্গাই সেই শক্তি। আবার বলছেন, সকলেই সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীনে, অবতারাদি পর্যন্ত মায়া আশ্রয় করে তবে লীলা করেন, তাই তাঁরা আদ্যাশক্তির পূজা করেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখি, শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিপূজা পুরাণ-প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ রাধা-যন্ত্রের পূজা করেছিলেন, শঙ্করাচার্য শক্তির আরাধনা করেছিলেন, আর চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে এক অভিনয় অনুষ্ঠানে "হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।/ প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি বেশধর।।" (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, ২।১৮)

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ এই জগতে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার জন্যই এসেছিলেন। তাই বুদ্ধদেব বা শ্রীচৈতন্যের মতো তিনি পত্নীকে ত্যাগ করেননি, পত্নীকে সঙ্গে নিয়েই জগতে এক নতুন সাধনার ধারা প্রবর্তন করেছেন, স্বীয় পত্নীকে জগদম্বার আসনে বসিয়ে ষোড়শীপূজা করেছেন। শুধুই কি তাই? তিনি এই জগতে প্রথম অবতার—যিনি একজন নারীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছেন। তাঁর আরাধ্যা দেবীও শক্তি। আর এই সাধনপীঠে তিনি স্বীয় গর্ভধারিণী জননীকে নিয়ে এসে তাঁর সেবা করেছেন। তিনি সমাজের এক অন্ত্যজ নারী ধনী কামারনীর হাত থেকে প্রথম ব্রতভিক্ষা গ্রহণ করে সৃষ্টি

করেছেন নতুন ইতিহাস। গোঁড়া হিন্দুদের মতে যিনি অনধিকারিণী, সেই রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তিনি পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছেন, দিয়েছেন রানীকে শুভ কর্মের অধিকার। গৌরী-মাকে দীক্ষা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নতুন দৃষ্টান্ত। এরকম কত দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়, প্রমাণ করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ এই জগতে এসেছিলেন শক্তির অভ্যুত্থান ঘটাতে, এসেছিলেন মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা করতে।

এবার বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বোঝার জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার একটি ঘটনার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। ১৮৮৫ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁকে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে এক ভাড়াবাড়িতে নিয়ে আসা হলো চিকিৎসার প্রয়োজনে।

সেবার ঠিক কালীপূজার আগের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বললেন ঃ পূজার উপকরণসকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিস—কাল কালীপূজা করতে হবে। কিন্তু ভক্তরা বুঝতে পারলেন না, পূজা ষোড়শোপচারে হবে, না পঞ্চোপচারে হবে। বুঝতে পারলেন না পূজার পুরোহিত কে হবেন। বুঝতে পারলেন না পূজায় অন্নভোগ দেওয়া হবে কি হবে না। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, ফুল, ফল, ধূপ, দীপ, মিষ্টান্ন—এসব সংগ্রহ করে রাখা হোক, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে বলবেন, সেইভাবেই হবে।

পূজার দিন সবকিছু জোগাড় করে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে রেখে দেওয়া হয়েছে। পূজা সম্পর্কে তিনি আর কিছুই বলছেন না। দেখতে দেখতে সেখানে অনেক ভক্ত এসে সমবেত হয়েছেন। ঘরে ধূপ-দীপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে সেখানে এক অপূর্ব ভাবময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ধীরে ধীরে দিনের আলো মিলিয়ে গেল, ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। ভক্তরা নীরবে বসে একমনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন। সকলেই অপেক্ষা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ বা নির্দেশ শোনার জন্য। কেউ কেউ তন্ময় হয়ে মা জগদম্বার কথা চিন্তা করছেন।

রাত সাতটা বেজে গেল। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকল, তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং পূজা করতে উদ্যোগী হলেন না বা অন্য কাউকে পূজা করার আদেশও দিলেন না। তিনি স্থির ও অবিচল হয়ে স্বীয় শয্যাতেই বসে রইলেন। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর মনে এক নতুন ভাবের উদয় হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই যে কালীপূজার রাত্রে পূজার আয়োজন—এসব কার জন্য? তারপর তিনিই সিদ্ধান্ত নিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদেহরূপ চিন্ময় প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করে ভক্তরা ধন্য হবেন বলেই এই পূজার আয়োজন। তারপরই অধীর উল্লাসে ফুল-চন্দন নিয়ে তিনি 'জয় মা, জয় মা' বলতে বলতে ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে উঠল, তিনি গভীর সমাধিতে ডুবে গেলেন, তাঁর জ্যোতির্ময় মুখে দিব্যহাসি ফুটে উঠল এবং দুহাতে দেখা দিল বরাভয় মুদ্রা।

উপস্থিত ভক্তরা রোমাঞ্চিত হলেন। দেখলেন, তাঁদের সামনে জ্যোতির্ময়ী দক্ষিণা মূর্তিতে স্বয়ং দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন। 'জয় মা জয় মা' ধ্বনিতে তাঁরা ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে হলেন ধন্য ও কৃতার্থ।

সেই শেষ দিনটির দিকে তাকাই। ১৮৮৬ সালের ১৫ আগস্ট। রাত দুই প্রহর অতিক্রান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যচেতনায় ফিরে এলেন এবং তিনি একবাটি মণ্ড অক্লেশে পান করলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে ঘুমাতে বললেন। তিনি শেষবারের মতো তিনবার স্পষ্টভাবে কালীনাম উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রাত্রি একটা দুই মিনিটে সকলকে কাঁদিয়ে মায়ের ছেলে ফিরে গেলেন মায়ের কোলে।

শ্রীশ্রীমা সাধারণত ভক্তদের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসতেন না। কিন্তু সেদিন এলেন। সেদিন যে তাঁকে আসতেই হবে—তাঁর জীবনসর্বস্ব সেখানে শায়িত। মা নিষ্কম্প দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দেহের দিকে। তারপর আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না, বুকভাঙা আর্তনাদ ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে ঃ "মা কালী গো, তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো।"

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বিষ্ণুর অবতার, তেমনি শিবের অবতার, তেমনি কালীর অবতার। তবে আমরা যে দশ অবতারের পূজা করে থাকি, তাঁরা সকলেই বিষ্ণুর অংশে আবির্ভূত। সকলেই বিষ্ণুর অবতার। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখে বলেছেন ঃ "যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই এ দেহে রামকৃষ্ণ।" অর্থাৎ বিষ্ণুর দুই অবতার রাম ও কৃষ্ণের মিলনেই নবযুগের বার্তাবহ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কল্পতরুরূপে। সর্বজনের সামনে অবতারের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সেদিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন ঃ "মনুষ্যদেহ ধারণ করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না, প্রয়োজন মেটে না।" তপ্ত-তাপিত মানুষের জন্যই বৈকুণ্ঠের নিশ্চিন্ত আবাস ছেড়ে স্বয়ং বিষ্ণু নেমে আসেন পৃথিবীতে। তারপর নরদেহ ধারণ করে মানুষের যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা-রোগ-শোকের ভাগীদার হন। মানুষ তাঁর দিকে তাকিয়েই আবার নতুন জীবন ফিরে পায়, তাঁরই পুণ্য স্পর্শে নিজের জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলে। আমরাও কি অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমায় অবগাহন করে এক নবজীবনের স্পন্দনে জাগ্রত, উদ্বেলিত ও উন্মোচিত হই না? ❑

বিনাশের পথে বসন্তরোগের জীবাণু

জলধিকুমার সরকার

ডক্টর জলধিকুমার সরকার কলকাতার 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর (এবং সারা ভারতবর্ষের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির) প্রথম 'প্রফেসর অফ ভাইরোলজি'। শুরু থেকেই তিনি গুটিবসন্ত নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং এদেশে তিনিই প্রথমে এই রোগের ভাইরাসকে ল্যাবরেটরিতে কালচার (বংশবৃদ্ধি) করেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গুটিবসন্ত নির্মূলীকরণের (eradication) কাজে তিনি পরামর্শদাতা হিসাবে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রধান গুটিবসন্ত গবেষণাগারে তাঁর গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রকাশিত 'স্মলপক্স' গ্রন্থে (প্রকাশ ১৯৮৮, পৃঃ ১৪৮৮) তাঁর গবেষণার ফলাফল তাঁর ফটো-সহ প্রকাশিত হয়েছে।

আশা করি অধুনাবিস্মৃত বিভীষিকাময় গুটিবসন্ত সম্বন্ধে তথ্যবহুল এই নিবন্ধটি সকলের ভাল লাগবে।

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

এই নিবন্ধে গুটিবসন্ত বা আসল বসন্তের (স্মলপক্স—smallpox) কথা আলোচিত হবে, পানিবসন্ত বা জল-

গুটিবসন্তে আক্রান্ত শিশু
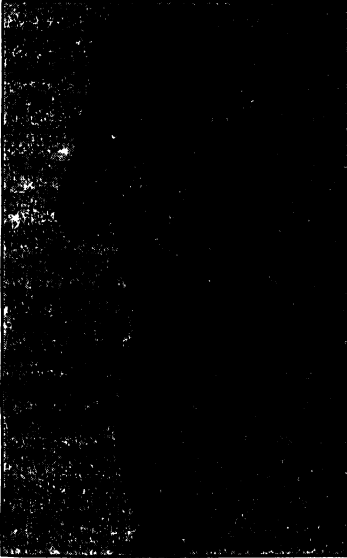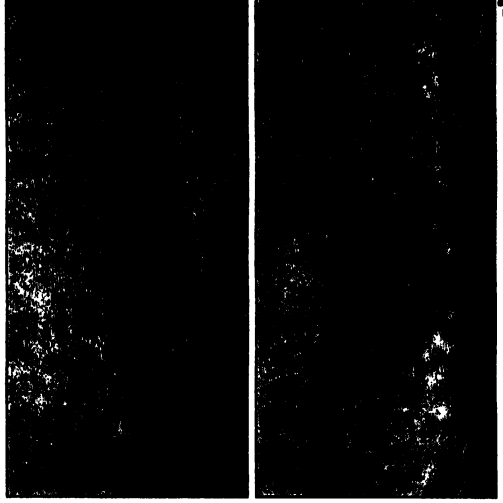
গুটিবসন্ত

বসন্তের (চিকেনপক্স—chickenpox) কথা নয়। ভীষণতার দিক থেকে, মৃত্যুহারে, শরীরে স্থায়ী দাগ হওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে দুটি রোগের মধ্যে অনেক তফাৎ। রোগ-দুটির মধ্যে একমাত্র মিল—দুটিতেই শরীরে ফোস্কার মতো স্ফোটক বা গুটি বের হয়। আবার স্ফোটকের ব্যাপারেও কিছুটা অমিল আছে। গুটিবসন্তের স্ফোটকগুলি কেন্দ্রাতিগ (centrifugal), অর্থাৎ হাতে, পায়ে, মুখে, গলায় বেশি এবং বুকে, পিঠে, পেটে কম বের হয়। পানিবসন্তে ঠিক উলটো। জ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানিবসন্তের গুটি বের হয়, কিন্তু গুটিবসন্তের গুটি দেখা দেয় জ্বর হওয়ার দুদিন পরে। দুটি রোগের হেতু যে-দুটি ভাইরাস (গুটিবসন্তের 'ভেরিয়োলা'—variola এবং পানিবসন্তের 'ভেরিসেলা'—varicella), তাদের মধ্যেও আকাশ-পাতাল তফাৎ। দুটি ভাইরাস সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর এবং তাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমানে পানিবসন্ত সমানে চলছে, গুটিবসন্ত সারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। গুটিবসন্ত আর হবে না, কারণ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে এবং পৃথিবীর সকল দেশের সহযোগিতায় ভেরিয়োলা ভাইরাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। রোগের কারণ যে ভাইরাস, তা যদি কোথাও বর্তমান না থাকে, তাহলে রোগ হবে কি করে? এখানে একটা কথা বলা দরকার, চিকিৎসার ইতিহাসে গুটিবসন্তই প্রথম ও একমাত্র অসুখ, যাকে মানুষের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নির্মূল (eradicated) করা হয়েছে। এপর্যন্ত যা বলা হলো, তাতে বসন্তরোগকে 'নির্মূল করা হয়েছে' এবং প্রবন্ধের শিরোনামে 'বিনাশের পথে' কথা-দুটি পরস্পরবিরোধী মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং এই ব্যাপারটি পরিষ্কার করার জন্যই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

মানুষ ছাড়া গরু, ভেড়া, ঘোড়া, মোষ, উট, পাখি, বানর ও আরো কিছু প্রাণীর বসন্তরোগ হয় এবং তাদের হেতু-ভাইরাসগুলির মধ্যে কিছু কিছু গঠনগত বিভিন্নতা থাকলেও তাদের মধ্যে আকারে-প্রকারে খানিকটা মিল থাকার জন্য সবগুলিই 'পক্সভাইরাস' গোষ্ঠীতে পড়ে (পানিবসন্তের ভাইরাস 'হার্পিসভাইরাস' গোষ্ঠীতে পড়ে)। ভেরিয়োলা ছাড়া পক্সভাইরাস গোষ্ঠীর অন্য কোন ভাইরাস পশুপক্ষীর দেহ থেকে মানুষের শরীরে এসে বসন্তরোগ সৃষ্টি করতে পারে না। একমাত্র ব্যতিক্রম বানর-বসন্ত ভাইরাস (monkeypox virus); এর কথায় পরে আসব।

সৃষ্টির কোন্ সময় থেকে মানুষ গুটিবসন্তে ভুগছে তা বলা মুশকিল। তবে মিশরে খ্রীস্টপূর্ব ১১৫৭ সালে মৃত সম্রাট (ফারাও) পঞ্চম রামেসিসের রক্ষিত দেহ বা মমির (mummy) মুখে যে দাগ দেখা যায়, ১৯৭৯ সালে সেই দাগ

পঞ্চম রামেসিসের 'মমি'র মুখ

থেকে চামড়ার টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা সেই দাগকে গুটিবসন্তের দাগ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ ফারাওয়ের মৃত্যু হয়েছিল গুটিবসন্ত রোগে। প্রায় দুশ বছর আগে বসন্তরোগের টিকা আবিষ্কারের পর থেকে বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোককে সেই টিকা দেওয়া সত্ত্বেও এই রোগ বহু দেশেই সমান দাপটের সঙ্গে বিদ্যমান ছিল এবং রোগমুক্ত দেশগুলিরও ভীতির কারণ হয়েছিল। সরকারি তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অবিভক্ত বাংলায় এবং পশ্চিমবঙ্গে বসন্তরোগে মৃতের সংখ্যা ছিল ঃ ১৯৩৬ সালে ২৮ হাজার, ১৯৪৫ সালে ১৯ হাজার, ১৯৫২ সালে ২৭ হাজার এবং ১৯৫৭ সালে ১০ হাজার। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত সংখ্যা এই সরকারি সংখ্যা থেকে আরো বেশি। ঐসময় এখানে লোককে টিকা দেওয়া হয়েছিল ঃ ১৯৪৭ সালে ৪৮ লক্ষ, ১৯৫৩ সালে ৭৩ লক্ষ এবং ১৯৫৭ সালে ১ কোটি ২৭ লক্ষ। ১৯৬৭ সালেও দেখা গেছে, পৃথিবীর ৩৩টি দেশে বসন্তরোগ চলছে, মোট ১ কোটি লোকের বসন্তরোগ হয়েছে এবং ২০ লক্ষ লোক এই রোগে মারা গেছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৫৮ সালে পৃথিবী থেকে বসন্তরোগ-দূরীকরণের ডাক দিলেও ১৯৬৬ সালে এই রোগ নির্মূলনের কাজ জোরদার হয়। এই কাজে বসন্ত-টিকাই প্রধান হাতিয়ার হয়ে রইল বটে, কিন্তু সেই হাতিয়ার ব্যবহারে নতুন কৌশল অবলম্বন করা হলো। কি সেই কৌশল? আগে টিকা দেওয়া হতো এলোপাতাড়িভাবে—যত বেশি লোককে টিকা দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে। নতুন কৌশলে ভালভাবে তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা (information collection system) করা হলো। যেমন—(ক) রোগ হলেই তার খোঁজ নেওয়া, (খ) রোগীর বাড়িতে এবং সেই এলাকার সকলকে টিকা দেওয়া, (গ) কোথা থেকে সেই সংক্রমণ হলো তা জানার জন্য বিগত দু-সপ্তাহে যেখানে যেখানে রোগী গিয়েছিল সেইসব জায়গায় বসন্তরোগী খোঁজা এবং সেই এলাকায় টিকা দেওয়া, (ঘ) রোগীকে বাড়ি থেকে বের হতে না বলা এবং রোগীর বাড়িতে কেউ এলেই তাকে টিকা দেওয়া; আগন্তুক যদি ইত্যবসরে চলে গিয়ে থাকে তবে তাকে খুঁজে বের করে তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে টিকা দেওয়া। এইভাবে প্রতি রোগী থেকে রোগবিস্তার বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভাইরাস যদি কোন রোগী থেকে কোন সুস্থ লোকের দেহে সংক্রামিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করতে না পারে, তাহলে সে আপনা থেকেই নির্বংশ হবে। মানুষের শরীরে বা রোগীর গুটি থেকে খসে যাওয়া মামড়িতে (scab) ভাইরাস বেশিদিন বাঁচে না।

সব দেশে এইভাবে রোগজীবাণুকে আক্রমণের ফলে বসন্তরোগীর সংখ্যা কমতে কমতে এক-একটি দেশে রোগীর সংখ্যা শূন্য হতে লাগল। নিবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—ভেরিয়োলা ভাইরাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা কিভাবে করা হয়েছে? আগেকার দিনের যুদ্ধতে শত্রুর ঘাঁটি অবরোধ করে শত্রুসৈন্যের খাদ্য-পানীয়ের অভাব সৃষ্টি করে তাদের মেরে ফেলা হতো; এও খানিকটা সেইভাবেই করা হয়েছে। সে যাই হোক, একের পর এক দেশকে বসন্তরোগ-মুক্ত বলে ঘোষণা করা হলো, যেমন—নেপাল ১৯৫৭ সালে, পাকিস্তান ১৯৭৪ সালে, বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে, ভারতবর্ষ ১৯৭৫ সালে এবং সর্বশেষ দেশ আফ্রিকার সোমালিয়া ১৯৭৭ সালে। এই পরিস্থিতি হওয়ার পরে দেখা গেল যে, কোন দেশে বসন্তরোগী না থাকলেও জীবন্ত ভাইরাস রক্ষিত আছে বহু দেশের ল্যাবরেটরিতে, যেখানে আগে বসন্তরোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হতো বা ভেরিয়োলা ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করা হতো। সেইসব ভাইরাস নিয়ে কাজ করার সময় কোন কর্মীর শরীরে দৈবক্রমে যদি তা প্রবেশ করে এবং তার বসন্ত হয়, তাহলে

সেই রোগাক্রান্ত কর্মী থেকে বসন্তরোগ আবার সেই দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইরকমই হয়েছিল বার্মিংহামে ১৯৭৮ সালে, যখন ইংল্যান্ড বসন্তরোগ-মুক্ত ছিল। সেজন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে নির্দেশ দিল, যাতে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে সমস্ত ভাইরাস নষ্ট করা হয়।

কলকাতার 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর ভাইরাস বিভাগ তখন বসন্তরোগ গবেষণায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলির অন্যতম ছিল। সেখানে –৭০° তাপমাত্রায় প্রায় এক হাজারের ওপর টেস্টটিউবে ভেরিয়োলা ভাইরাস বা বসন্তগুটির মামড়ি রাখা ছিল। কর্মীদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমস্ত ভাইরাস নষ্ট করা হলো; কারণ সেগুলি রেখে দেওয়ার বিপদের ঝুঁকি নেবে কে? দিল্লিতে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ'-এর বিশেষজ্ঞ কমিটিতেও এই নিয়ে আলোচনা হলো। আলোচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত হয়েছিল এই জন্য যে, যে কুড়িটি জীবাণু যুদ্ধকালে অস্ত্র (germ warfare) হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, ভেরিয়োলা ভাইরাস তাদের অন্যতম। সেক্ষেত্রে এই ভাইরাস দেশে না রাখা এবং একে নিয়ে আরো গবেষণার পথ বন্ধ করে দেওয়া কতটা বাঞ্ছনীয়—এই নিয়েই বিতর্ক উঠেছিল। যাই হোক, ভাইরাস না রাখাই স্থির হলো, কারণ বসন্তরোগ-মুক্ত দেশে এই ভাইরাস (বা অন্য যেকোন বিপদসঙ্কুল জীবাণু) নিয়ে কাজ করার জন্য যে উচ্চমানের ব্যবস্থাযুক্ত (হাই সিকিয়োরিটি) ল্যাবরেটরির দরকার, তা তখন এদেশে কোথাও ছিল না। সারা পৃথিবীতে তখন ৭টি ল্যাবরেটরি এই ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি পেল এই শর্তে যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ দল মাঝে মাঝে ঐসব ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখবে যে, সেখানে নিরাপত্তাব্যবস্থা ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে কিনা। কয়েক বছরের মধ্যেই নানা কারণে ঐ ল্যাবরেটরির সংখ্যা কমিয়ে চার এবং আরো পরে দুই করা হয়েছে। যে-দুটি বর্তমানে আছে তার একটি আমেরিকায় ও অন্যটি রাশিয়াতে।

সোমালিয়ায় ১৯৭৭ সালের ২৭ অক্টোবর পৃথিবীর শেষ বসন্তরোগী দেখা গেলেও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তখনি 'পৃথিবী বসন্তরোগ-মুক্ত' বলে ঘোষণা করেনি। কারণ সংশয় ছিল, পাহাড়ী বা দুর্গম অঞ্চলে কোন ছোট গোষ্ঠীর লোকের মধ্যে বসন্তরোগ সে-দেশের স্বাস্থ্যদপ্তরের অজান্তে অল্পমাত্রায় থাকতেই পারে, যা পরে প্রকাশ্যে এসে যাবে। তাছাড়া কিছু লোক তখনো বিশ্বাস করেনি, বসন্তরোগ নির্মূল হয়ে গেছে। ১৯৭৭ সালের পরেও খবরের কাগজে প্রায়ই 'গুটিবসন্ত হয়েছে' বলে খবর বের হতে লাগল। সংশ্লিষ্ট দেশের স্বাস্থ্যসংস্থাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরিতে অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দেওয়া হলো। তাছাড়া যথার্থ বসন্তরোগীর সন্ধান দিলে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হলো। যত দিন যেতে লাগল পুরস্কারের অর্থ তত বাড়ানো হতে লাগল। জানুয়ারি ১৯৭৯ থেকে মার্চ ১৯৮২ পর্যন্ত ৫৫টি দেশে ১২৪টি গুটিবসন্ত হওয়ার গুজব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোনটিই 'গুটিবসন্ত' নয় বলে প্রমাণিত হলো। অধিকাংশই ছিল পানিবসন্ত।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও অবান্তর নয় বলে একটি তথ্য উল্লেখ করছি। একই লোকের পানিবসন্ত ও গুটিবসন্ত একসঙ্গে হতে পারে কিনা—এ-প্রশ্নটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল, কিন্তু ভাইরাস পরীক্ষা করে এর নির্দিষ্ট উত্তর মেলেনি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে প্রায় ১ লাখ উদ্বাস্তু কলকাতার আশেপাশে তাঁবুতে বাস করছিল। তখন তাদের মধ্যে বসন্তরোগ দেখা দিলে তা কি

একই রোগীতে গুটিবসন্ত ও পানিবসন্ত ○

গুটিবসন্তের ভাইরাস

পানিবসন্তের ভাইরাস

(ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে)

ধরনের বসন্ত, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরাস বিভাগে ভাইরাস-নিদর্শন সহ প্রথম নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো যে, একই লোক একসঙ্গে পানিবসন্তে ও গুটিবসন্তে আক্রান্ত হতে পারে। ১৯৮০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 'ওয়ার্ল্ড অ্যাসেমব্লি' 'সারা পৃথিবী বসন্তরোগ-মুক্ত' বলে ঘোষণা করল। তা সত্ত্বেও, অপ্রত্যাশিত যদি কিছু ঘটে যায়—এই ভাবনায় ২০ কোটি লোককে দেওয়ার মতো টিকা সেইসময় জেনেভায় ও দিল্লিতে ঠাণ্ডায় মজুত রাখা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বসন্তরোগ-নির্মূলনের বিষয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য

সংস্থার দেওয়া কয়েকটি তথ্য দেওয়া হচ্ছে—(ক) নির্মূলনের খাতে খরচ হয়েছে ১০০০ মিলিয়ন ডলার (তুলনামূলকভাবে চাঁদে মানুষ পাঠাতে খরচ হয়েছে ২৪,০০০ মিলিয়ন ডলার)। (খ) রোগ নির্মূল হওয়ায় পৃথিবীর সব দেশে খরচ বাঁচল ১০০০ মিলিয়ন ডলার। (গ) এই ব্যাপারে ২ লক্ষ কর্মী বিভিন্ন দেশে কাজ করেছে (এক দেশের কর্মী অন্য দেশে গিয়ে কাজ করেছে ৭০০ জন)। নির্মূলনের জন্য কেন গুটিবসন্তকে বেছে নেওয়া হলো, তার উত্তরে বলা যেতে পারে—(১) এই রোগের ক্ষেত্রে রোগনির্ণয় যেমন সহজ, তেমনি পূর্বে হয়ে গেলেও গায়ে দাগ থেকে যাওয়ার জন্য রোগীকে খুঁজে বের করাও সহজ। (২) এই রোগের প্রতিরোধক খুব ভাল টিকা আগেই প্রচলিত ছিল। (৩) এই রোগের বিস্তার মশা বা কোন জন্তুর মাধ্যমে হয় না, মানুষ থেকে মানুষে হয়। (৪) সংক্রমণ ও রোগলক্ষণ প্রকাশের মধ্যে বেশ খানিকটা সময় ('incubation period') পাওয়া

বানর-বসন্তে আক্রান্ত বসন্তরোগী

যায়, যখন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

এখন সংরক্ষিত ভাইরাসের কথায় ফিরে আসি। প্রশ্ন হতে পারে যে, সমস্ত পৃথিবী যখন বসন্তরোগ-মুক্ত, তখন ল্যাবরেটরিতে জীবন্ত ভাইরাস রেখে দেওয়ার কি দরকার? প্রথমে রাখা হয়েছিল এই ভাইরাস সম্বন্ধে কয়েকটি অসমাপ্ত গবেষণা সমাপ্ত করার জন্য, বিশেষত এই ভাইরাসের গঠন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানার জন্য। অন্য কোন পশুপক্ষী থেকে আসা পক্সভাইরাস গোষ্ঠীর ভাইরাস ভবিষ্যতে টিকা না-নেওয়া লোকের দেহে ঢুকে নিজেকে পরিবর্তিত করে যদি গুটিবসন্ত রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তখন সেই রোগীর ভাইরাস ভেরিয়োলা ভাইরাস কিনা, তা দ্রুত নির্ণয়ের জন্য যেসব পরীক্ষার দরকার তার জন্যও এই ভাইরাস সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। এই কথা বিশেষ করে উঠেছে বানর-বসন্ত ভাইরাসের ব্যাপারে। গত সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় খবর পাওয়া গেল, আফ্রিকার জেয়ারি (Zaire) দেশে বানর-বসন্ত ভাইরাস সংক্রামিত হয়ে মানুষের গায়ে গুটি বের হয়েছে। সেখানকার লোকেরা বানরের খুব নিকট সম্পর্কে আসে এবং বানরের মাংস খায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এই সংবাদে খুব বিব্রত হয়ে সে-দেশে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিল এবং আমেরিকা ও রাশিয়ার ল্যাবরেটরিতে এই ব্যাপারে প্রচুর গবেষণা চালিয়েছিল। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানুষের দেহে বানর-বসন্তের ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা খুব কম; সংক্রামিত মানুষ থেকে অন্য মানুষে (সন্তান-সন্ততিতে) সংক্রমণ সামান্য হলেও তৃতীয় পুরুষে সংক্রমণে ভাইরাস মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো, বানর-বসন্ত ভাইরাসের দ্বারা ভবিষ্যতে ভেরিয়োলা ভাইরাসের মতো গুটিবসন্ত রোগসৃষ্টি বা মড়কসৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। এই কারণে ১৯৮৬ সাল থেকেই অনেকে মত দিচ্ছেন যে, দুটি ল্যাবরেটরিতে রাখা ভাইরাস নষ্ট করে ফেলা উচিত। বিশেষজ্ঞ কমিটি এই ব্যাপারে জেনেভাতে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসলেও হচ্ছে-হবে করে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ২২ মার্চ ১৯৯৯-এর 'দ্য স্টেটসম্যান'-এ এবিষয়ে লেখা হয়েছিল ঃ "দুবছর আগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ দিয়েছিল যে, দুটি ল্যাবরেটরিতে যা ভাইরাস রক্ষিত আছে তা আগামী ৩০ জুন (১৯৯৯) পুড়িয়ে (incineration) ফেলা হোক। মে মাসে ১৯০ জন সদস্যবিশিষ্ট যে ওয়ার্লড হেলথ অ্যাসেমব্লি মিটিং হবে, তাতে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। গত জানুয়ারিতে একজিকিউটিভ কমিটির যে মিটিং হয়েছিল তাতে অ্যামেরিকান সদস্যরা ভাইরাস ধ্বংস করার পক্ষে ছিল, কিন্তু রাশিয়ান সদস্যরা ধ্বংস করার বিপক্ষে ছিল। দুদেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এব্যাপারে পরস্পরবিরোধী মত আছে।"

কিন্তু গত ৩০ জুন গবেষণাগারে সংরক্ষিত ভাইরাসকে বিনষ্ট করা (পুড়িয়ে ফেলা) হয়নি। গত ২৮ মে-র 'দ্য টেলিগ্রাফ'-এ লেখা হয় ঃ "বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করেছে যে, রক্ষিত গুটিবসন্তের জীবাণুকে ২০০২ সালের মধ্যে ধ্বংস করা হবে, আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবছর ৩০ জুন নয়। ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেমব্লি জানিয়েছে, ভাইরাস-নাশক ওষুধ বের করার কাজে আরো গবেষণা চালানোর জন্য সংরক্ষিত ভাইরাসগুলিকে বিনষ্ট করার সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া হলো।" অর্থাৎ সারা পৃথিবীর শেষ জীবন্ত গুটিবসন্ত ভাইরাস মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়ে গেল ❑

বিবেকানন্দ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ ঃ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ— নিমাইসাধন বসু। **প্রকাশক ঃ** দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **পৃষ্ঠা ঃ** ১৪+২২৬ **মূল্য ঃ** ৭৫ টাকা।

দেশ-কাল-পাত্রকে নিয়ে ইতিহাস। অবশ্য ঘটনাগ্রন্থনই ইতিহাস নয়। 'রাজতরঙ্গিণী'-র লেখক কলহনের মতে 'ভূতার্থ-কথন'ই (প্রাচীন ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ) প্রকৃত ইতিহাস। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে ইতিহাসের তাৎপর্যও বদলে যেতে পারে, অনেক সময়ে কিছু বিচারভ্রান্তিও ঘটতে পারে। তাই মার্ক টোয়েন ইতিহাসের প্রতি বক্র মন্তব্য হেনে বলেছিলেন ঃ "Lies, damm lies, statistics" অর্থাৎ মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা, আর কিছু হিসাব-নিকাশ—এই নিয়ে ইতিহাসের কারবার। রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসকে "মিথ্যাময়ী" (দ্রঃ 'শিবাজী উৎসব') বলেছেন। সুতরাং যথার্থ ইতিহাস রচনা অতি দুরূহ ব্যাপার। তবে যাঁরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে রাগ-দ্বেষ বর্জন করে তথ্য ও যুক্তির খনিত্র সহযোগে অতীত ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয়ে অগ্রসর হন তাঁরাই সত্যের মুখ অপাবৃত করতে পারেন।

ডঃ নিমাইসাধন বসু তাঁর কয়েকখানি ইতিহাসগ্রন্থে ইতিহাস-দর্শনের দুর্গম পন্থা সহজেই অবলম্বন করতে পেরেছেন, কারণ বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তিমার্গ তাঁর প্রধান হাতিয়ার। সম্প্রতি তার পরিচয় মিলল **'বিবেকানন্দ ঃ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ'** গ্রন্থটিতে। আসলে ইতিহাস ঘটনা নয়, একটি দার্শনিক বোধ। অবশ্য কোন যুগাতিচারী মহাপুরুষের মানসিক মানচিত্র অঙ্কনের পূর্বে যদি নির্বাধ ভক্তি, উচ্ছ্বসিত আবেগ ও নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধাবোধ ঐতিহাসিকের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করতে চায়, তাহলে ঐতিহাসিক দৃষ্টির খর্বতা ঘটে। আনন্দের বিষয়, ডঃ বসু আবেগাপ্লুত নির্বাধ উচ্ছ্বাসকে সুকঠিন তত্ত্বদৃষ্টির গ্রানাইট শিলার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার পরিচয় পাওয়া গেল বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে। স্বামী বিবেকানন্দের ওপর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও প্রধানত যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে তিনি আধুনিক ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা বিচার করেছেন। অতিদৃষ্টি ও ক্ষীণদৃষ্টি—দুই-ই বস্তু বা ব্যক্তির স্বরূপ নির্ধারণে বাধা সৃষ্টি করে; যিনি সেই মায়া-যবনিকা অপসারিত করে ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে পারেন তিনিই যথার্থ প্রাজ্ঞ ও ধীমান। আলোচ্য গ্রন্থটির ১৩টি প্রবন্ধ পড়তে পড়তে সে-কথাই মনে হবে।

ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় ভাষায় স্বামীজীর বক্তৃতা ও ভাষণ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনী ও গীতিরসসিক্ত কাব্য-কবিতা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে। সুধী ব্যক্তিরা মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। কখনো-বা অনুচিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, সমালোচনার কালোমেঘ ও ব্যক্তিগত অহমিকা স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। সেসব আলোচনায় কিছু অনৃতাচারও দুর্লভ নয়। পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের মনের গোপন কোণে কৃষ্ণকায় 'জেন্টু'দের প্রতি নর্ডিক স্বাজাত্যবোধের দম্ভ একালেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সেদিক থেকে ডঃ বসু গভীর ইতিহাসবোধ ও তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে একালের ইতিহাসে স্বামীজীর যথাযথ স্থান কোথায়, সেবিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন।

প্রশ্নমনস্কতা তত্ত্বদৃষ্টিরই ফলশ্রুতি। স্বামীজীর মতো বিচিত্র প্রতিভাধর সাধকের জীবনাদর্শ, চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জেগে উঠতে পারে। সেই সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজতে গেলে ডঃ বসুর এই বইখানি উৎস হিসাবে গৃহীত হতে পারে। বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক স্পর্শ করে এই আলোচনায় যে ১৩টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে অনন্য সম্পর্ক বিদ্যমান। লেখকের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত কার্য-কারণ সূত্রে বিধৃত এবং নৈয়ায়িক পন্থায় বিশ্লেষিত। স্বীকার করতেই হবে তাঁর এই প্রবন্ধগুলি মৌলিক চিন্তায় উদ্ভাসিত—(১) পরিব্রাজক জীবনের তাৎপর্য, (২) সমসাময়িক পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণে ধর্মমহাসম্মেলন ও স্বামীজী, (৩) রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনা, (৪) বিবেকানন্দ ও মৌলবাদ, (৫) স্বামী বিবেকানন্দ ঃ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ, (৬) শতবর্ষ পূর্বে ও পরে স্বামী বিবেকানন্দ। এছাড়াও আছে স্বামীজীর ইতিহাসবোধ, নিবেদিতা ও সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত, কর্মযোগী বিবেকানন্দের অন্তরশায়ী কবিত্ব ও শিল্পচেতনা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ।

সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে স্বামীজীর চেতনায় এদেশের যে-মূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছিল তার পিছনে ছিল ধর্ম, দেশপ্রেম ও মানবসেবাব্রত, যার অনেকটাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবসঞ্জাত। একথা সত্য, "খালি পেটে ধর্ম হয় না", আবার ধর্মকে বাদ দিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম—কোন সাধনাই সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, ধর্মের অর্থ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যাভিমুখী ভারত-আত্মার আবিষ্কার। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য যেমন ভারতের অন্বিষ্ট, তেমনি আবার ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাতন্ত্র্যরক্ষাও এদেশের মানুষের প্রধান অবলম্বন। ভারত-আত্মা আবিষ্কারের জন্য তাই দণ্ডকমণ্ডলুধারী স্বামীজীকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ

করতে হয়েছিল। "যত্র জীব তত্র শিব"—শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী তিনি শুধু কল্পনা বা ধ্যানে সংগুপ্ত রাখেননি, ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ করে, সাধারণ মানুষের স্পন্দমান হৃদয় উপলব্ধি করে লাঞ্ছনা ও পীড়নের মধ্যে তিনি অবহেলিতের মুক্তি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের উদ্যোগীরা যে আকাঙ্ক্ষায় এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন করুন না কেন, তার কোন প্রচ্ছন্ন সীমাবদ্ধতা থাকুক আর নাই থাকুক, একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যেতে পারে, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ভারতীয় চিন্তাজগৎ, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং বৃহত্তরভাবে সমগ্র জাতীয় জীবনে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা এমন এক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল যার নজির ইতিহাসে বিরল।" অবশ্য পাশ্চাত্য জগতের খ্রীস্টান মিশনারীরাই নন, ওদেশের কোন কোন চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীও স্বামীজীর এই বিশাল সত্তার ভূমিকা নির্ধারণে দৃষ্টিক্ষীণতায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদেশেরও কেউ কেউ (এমনকি একালেও) স্বামীজীর চিন্তায় নানা পরস্পরবিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন। দক্ষিণ ও বাম দুপক্ষের বিচারভ্রান্তির মূল কারণ কোথায় ডঃ বসু সেকথা তাঁর একাধিক প্রবন্ধে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করেছেন।

এই সঙ্কলনের আরেকটি তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা—'সমসাময়িক পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন ও স্বামীজী'। এই নিবন্ধে অসাধারণ পরিশ্রম করে পশ্চিম লেখকদের সমালোচনা এবং সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তথ্যসংবাদ বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দের প্রভাব, মনস্বিতা, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও ইতিহাসবোধের তলদেশ পর্যন্ত সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে ডঃ বসু বিবেকানন্দ গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। স্বামীজী-প্রচারিত জীবন্ত ও বাস্তব বেদান্তের মূল তাৎপর্য শুধু ইউরোপ কেন, ভারতবর্ষের একালীন পাণ্ডিত্যাভিমানীরাও কতটা গভীরভাবে এই 'practical বেদান্তে'র স্বরূপ অনুধাবন করেছেন তাতে গভীর সন্দেহ আছে। ব্যারোজের মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও খ্রীস্টধর্মের সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। অবশ্য 'A Chorus of Faith'-এর লেখক জেনকিন লয়েড জোন্সের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কেউ কেউ বিবেকানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝেছিলেন যে, ধনকুবের আমেরিকার ভোগবাদ, কুসংস্কার এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধের ওপর স্বামীজী-প্রদত্ত বজ্রাঘাতের প্রয়োজন ছিল। এই ধর্মমহাসম্মেলনে পাশ্চাত্য জগৎ স্ব-ভাবে ভারতকে আবিষ্কার করল এবং সে-আবিষ্কারের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

পাশ্চাত্য বিশ্বে স্বামীজী 'Hindu Monk' বলে পরিচিত। বস্তুত, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করলেও সারা ভারতের মূর্ছিত আত্মাকে জাগ্রত করে তাকে বিশ্বসভায় যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। খ্রীস্টধর্ম একমাত্র সত্য ধর্ম, বাদ বাকি আর সমস্তই ভূতপ্রেত-পূজকদের মূঢ়তা মাত্র—এই নির্বুদ্ধিতা থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রক্ষার জন্যই তাঁর নিরলস চেষ্টা। কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরে এসে এই হতভাগ্য জাতির দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা-কুশিক্ষার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হলো। গৈরিক আবরণের তলে যে উত্তপ্ত শোণিতধারা বহমান ছিল, সেই উত্তাপ তিনি যুবসমাজে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণাও ডঃ বসু সংক্ষেপে নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ('স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ')। এই প্রসঙ্গে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা সে-সম্পর্কে বিবেকানন্দের এই অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে: "আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারো ধর্ম সম্বন্ধে মতামতকে 'ধর্ম' বলিতেছি না। যে-ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে, তাহাই ধর্ম।... মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান—এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা (Kindergarten)। ধর্ম মত ও মতান্তরে নাই, তর্ক যুক্তিতে নাই।" তাঁর পূর্বে বিদ্যাসাগরও কতকটা এই কথাই ভাষান্তরে বলেছিলেন। Righteousness বা ন্যায়বোধ এবং অসীম সত্তায় বিশ্বাস—এই দুই চেতনাবর্জিত মানুষকে যথার্থ 'মানুষ' বলা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে বিবেকানন্দ মানুষকে মহত্তর সত্তায় প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতলাভ করেছিলেন।

আরেকটি আলোচনায় ডঃ নিমাইসাধন বসু নির্ভেজাল যুক্তিবাদের পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধটি ('বিবেকানন্দ ও মৌলবাদ') একালের পটভূমিকায় লেখা। তিনি জীবন থেকে ধর্মকে বাদ দিতে চাননি। কিন্তু ভারত সরকার শিক্ষাপ্রচারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করতে চাননি। স্কুল কলেজের শিক্ষায় ধর্ম অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তাই নিয়ে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। শিক্ষা থেকে ধর্মকে পৃথক করে রেখে কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রধান নেতৃগণ শিক্ষায় উদার অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ১৮৮২ সালের শিক্ষা-কমিশনের অন্যতম সদস্য তেল্যাঙ (K. T. Telang) কিন্তু তার ঘোরতর প্রতিবাদ করে নিজের অভিমত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন: "At all events on this I am quite clear that our institutions for secular instruction should not be embarrassed by any meddling with religious instruction, for such meddling, among other mischiefs, will yield results which on the religious side will satisfy nobody and on the secular side will be distinctly retrograde." (দ্রঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মুজমদার সম্পাদিত 'The History and Culture of the Indian People', vol. XI, p. 895) ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণতার পক্ষ থেকে দেখা হয়েছিল বলেই কর্তৃপক্ষকে মৌলবাদের ভীতি সংশয়াম্বিত করেছিল। কিন্তু

সঙ্কীর্ণ ধর্মাচার কখনো বিবেকানন্দকে আকৃষ্ট করেনি। আজীবন তিনি 'Hindu Monk'-ই ছিলেন, কিন্তু হিন্দুত্ব বলতে তিনি বেদান্তাশ্রিত এক উদার মানবধর্মকেই বুঝতেন।

ইউরোপ-আমেরিকার অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর নব্য মানবতাবাদ, হিতবাদ, ধ্রুববাদ, প্রয়োগবাদ—সবকটি তত্ত্বের উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণচিন্তা। কিন্তু মানুষ তো শুধু হাতিয়ার বেঁধে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্যই সৃষ্ট হয়নি, তার মধ্যে মহৎ মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলাই হিন্দুধর্মের আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবশিষ্য বিবেকানন্দ সেই সত্যে বিশ্বাস করতেন। মৌলবাদ বা fundamentalism-এর কোলাহল একালের ব্যাপার, যার পিছনে আছে রাজনীতি ও অন্যান্য স্বার্থের প্রচ্ছন্ন ও সুচতুর অনুপ্রবেশ। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকার এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দের যথার্থ ধর্মবোধ উদ্ধৃত করেছেন ঃ "আমি মুসলমানের মসজিদে যাব, আমি খ্রীস্টানদের গির্জায় প্রবেশ করে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সামনে নতজানু হব, বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করে বুদ্ধের শরণ নেব, গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে হিন্দুদের মতো ধ্যানমগ্ন হয়ে দিব্য আলোকের সন্ধান পাব—যা সর্বমানবের হৃদয়কে আলোকিত করে।" যেকোন ধর্মমতের মধ্যেই উদার আদর্শ আছে, সব অভিমতকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। একালে 'মৌলবাদ' ও তার বিপরীত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'—এদুটিই রাজনৈতিক ফাঁকি, শাসকদলের অস্ত্র। ডঃ বসু এই প্রবন্ধে মৌলবাদ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এবং সর্বধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা নয়—শ্রদ্ধা, ধর্মনিরপেক্ষতা নয়—ধর্মের যথার্থ মূল্যের প্রতি সচেতন স্বীকৃতি; তা সে জুলু-বান্টু-হটেনটটই হোক অথবা আদিবাসীদের animism-ই হোক। এইটি শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ"-এর প্রকৃত তাৎপর্য। সেই তত্ত্বকথা বিবেকানন্দ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও কোন কোন সময়ে সংস্কারের চশমার মধ্য দিয়ে ধর্মের স্বরূপ অনুধাবন করতে চান। তা না হলে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনীষী ও শিক্ষাবিদ বিবেকানন্দ-সংবর্ধনাসভার সভাপতিত্ব করতে সম্মত হননি কেন? স্বামীজীর অপরাধ, তিনি সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন! কেনই বা উত্তরপাড়ার কৃতবিদ্য ভূস্বামী রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 'কায়স্থ' বিবেকানন্দকে 'স্বামীজী' বলতে সঙ্কুচিত হয়েছিলেন? এই মনোভাব সঙ্কীর্ণ মৌলবাদের লক্ষণ বলে ধরে নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কথাও বিবেচ্য। এই কেন্দ্র শুধু একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, জ্ঞান-কর্ম-সাধনার ত্রিবেণী-সঙ্গমে এর প্রতিষ্ঠা। সেকালে শাসক সরকার এই মঠ এবং অনুরাগী ভক্তদের সন্দেহের চোখে দেখত, সর্বদা ছদ্মবেশী গোয়েন্দা-পুলিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এর চারিদিকে সজাগ ছিল। বিপ্লবী যুবকেরা এই মঠে যাতায়াত করতেন। বিবেকানন্দের গেরুয়া আবরণের তলায় যে বিস্ফোরক পদার্থ সঞ্চিত হয়েছিল, যা বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছিল, মঠ ও মিশন সরাসরি তার আনুকূল্য না করলেও চরমপন্থীরা "In many cases they belonged to the Mission because they were revolutionaries." (সরকারি মুখ্য সচিবের গোপন মন্তব্য, পৃঃ ১৭৪) পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ এভাবে যুবসমাজকে নব জীবনাদর্শে উদ্দীপিত করতে পারেনি। স্কটের 'Old Mortality' (1816) উপন্যাসে আছে, স্কটল্যান্ডের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ('Covenanter') ইংল্যান্ডের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্কটল্যান্ডের সাধারণ প্রজা, বিশেষত কৃষকসমাজকে সংগঠিত করতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ তাদের দৃষ্টি ছিল একপার্শ্বিকতা-দোষদুষ্ট, জীবনের পূর্ণ স্বরূপ ও সামগ্রিক আদর্শ তাদের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। রামকৃষ্ণ মিশন মানুষের সমগ্র সত্তা, ইহ ও পরত্র—এ দুয়ের বিরোধ ঘোচাতে চেয়েছে, যা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান বাণী। ডঃ বসু নানা তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা মঠ ও মিশনের সেই ভূমিকা পর্যালোচনা করেছেন।

গ্রন্থের শেষের দিকের একটি প্রবন্ধের ('স্বামী বিবেকানন্দ ঃ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ') নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। একালে, এমনকি সে-যুগেও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। একজন অলিভ-পিচ্ছিল কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করবেন, খ্রীস্টানসমাজকে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে নিরুত্তর করবেন—একথা পশ্চিম বিশ্বের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। সুতরাং তাঁকে পর্যুদস্ত করতে গেলে অযুক্তি ও কুযুক্তির আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। এদেশেও তাঁর বহু সমালোচক ছিলেন, এখনো আছেন। তাঁর মূল বক্তব্য কী অথবা কী কী, তার সঙ্গে নৈয়ায়িক যুক্তিবাদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তিনি কি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির মারফতে নিজের মতামত স্থাপন করেছিলেন, তাঁর বক্তব্যে কি স্ববিরোধিতা ছিল—এই ধরনের নানা প্রশ্ন উঠেছে। একালের সমাজতন্ত্রবাদী ঐতিহাসিকেরা জড়বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিষণ্ণ হয়েছেন। কারণ, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের কোন পূর্বসংস্কার নেই। এ অহিফেন বটিকা বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে, কর্মকে জড়ভরত করে রাখে, সুতরাং সমাজ-প্রগতির জন্য ধর্মবিশ্বাস সর্বপ্রকারে পরিহর্তব্য।

নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ (১৮৮৯-১৯৭২) আমাদের বলতেন ঃ "অস্মিন্ দেশে ধর্মশব্দেন তু ভীতিসঞ্চারঃ"। ভীতির কারণ অজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব। আনন্দের বিষয়, এই দুই সীমাবদ্ধতা থেকে ডঃ বসু সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি এই গ্রন্থে যুগোপযোগী নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় নিজ যুক্তি-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করেছেন, যেখানে সংশয় আছে সেখানে প্রজ্ঞার সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করেছেন। স্বামীজী সম্বন্ধে বাঙলাভাষায় বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, কিন্তু সেই বহুর মধ্যে এই গ্রন্থটি একক মহিমায় বিরাজ করবে তা যেকোন পাঠকই স্বীকার করবেন। ❑

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৯ ও ১০ জুলাই '৯৯ **লিমডি আশ্রমের (গুজরাট)** পাঠকক্ষ-সহ শিশুদের একটি গ্রন্থাগার এবং একটি ক্রীড়াক্ষেত্রের উদ্বোধন কবেন যথাক্রমে লিমডির নামদর রাজমাতা এবং গুজরাট সরকারের কৃষি ও মৎস্যমন্ত্রী কিরীটসিনহা রাণা। এই উপলক্ষ্যে ২২৫ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ইউনিফর্ম ও নোটবুক বিতরণ করা হয়।

১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শতাধিকবার পদার্পণধন্য **বলরাম-মন্দিরে (কলকাতা-৭০০ ০০৩)** রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আগমন করেছিলেন। ঐ দুইবারই তিনি কীর্তনাদি সহকারে সপার্ষদ রথরজ্জু আকর্ষণ করেন। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিবছর বলরাম-মন্দিরে **রথযাত্রা উৎসব** অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এবছর গত ১৪ জুলাই '৯৯, বুধবার রথযাত্রা উৎসবে ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৪টায় রথরজ্জু প্রথম আকর্ষণ করে রথযাত্রার সূচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন-পর্ষদের অন্যতম প্রবীণ সদস্য স্বামী গীতানন্দজী। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন ও বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী তাঁর সঙ্গে একযোগে রথরজ্জু আকর্ষণ করেন। এরপর রাত ৯টা পর্যন্ত চলে ভক্তদের রথরজ্জু আকর্ষণ। দীর্ঘক্ষণ ধরে ভক্তরা লাইনে দাঁড়িয়ে রথ টানেন। উৎসবে সমাগত প্রায় ৫-৬ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ২২ জুলাই, বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় **রথের পুনর্যাত্রার** সূচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী। এদিনও বলরাম-মন্দিরে বহু ভক্তের সমাগম হয়। তাঁদের সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ২২ জুলাই '৯৯, সন্ধ্যা ৬টায় **রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের (কলকাতা-৭০০ ০২৯)** 'বিবেকানন্দ হল'-এ 'নিভাননী দেবী স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বিষয় ছিল—'ভারতের শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান'। তিনি বিষয়টিকে দুটি পর্বে আলোচনা করেন। প্রথম পর্বে ছিল ভারতবর্ষের শক্তিসাধনার ধারা এবং দ্বিতীয় পর্বে—ভারতবর্ষের শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন 'শরৎচন্দ্র অধ্যাপক' এবং বিভাগীয় প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সভায় বিপুল লোকসমাগম হয়। হল ও ব্যালকনির সমস্ত আসন পূর্ণ হয়েও ব্যালকনির সিঁড়ি, হল ও ব্যালকনির বাইরের বারান্দা ও সিঁড়ি শ্রোতৃসমাগমে পূর্ণ হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের (কলকাতা-৭০০০২৬) প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষ্যে গত ২৪ ও ২৫ জুলাই '৯৯ দুদিনব্যাপী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের একটি বিজ্ঞান-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন। সম্মেলনে রাজ্যের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেছিলেন।

পোর্টব্লেয়ার আশ্রম (আন্দামান) গত ১৮ জুলাই '৯৯ 'ভারত ও তার সংস্কৃতি'-র ওপর একটি সেমিনার পরিচালনা করে। এতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজ্যপাল ঈশ্বরীপ্রসাদ গুপ্ত এবং ভারতের নৌবিভাগের উপপ্রধান রমণ পুরী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ১৯৯৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় **রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের** একজন ছাত্র ৪র্থ স্থান এবং **নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের** ছয়জন ছাত্র ৮ম, ১২তম, ১৪তম, ১৯তম (২ জন) ও ২০তম স্থান অধিকার করেছে।

কেন্দ্রীয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত 'অল ইন্ডিয়া সিনিয়র সার্টিফিকেট' পরীক্ষায় **আলং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (অরুণাচল প্রদেশ)** একজন ছাত্র ১ম স্থান অধিকার করেছে।

ব্যাঙ্ককে (থাইল্যাণ্ড) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রসায়ন পরীক্ষায় ৫৩টি দেশের ২০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে **চেন্নাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের** একজন ছাত্র রৌপ্য পদক লাভ করেছে।

চিকিৎসা-শিবির

পুরী মঠ (উড়িষ্যা) ভুবনেশ্বর ইউনিসেফের সহযোগিতায় গত ১৪-২২ জুলাই '৯৯ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দুটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে তীর্থযাত্রীদের জন্য পানীয় জল সরবরাহ এবং সাধারণভাবে ১৩০০ জনের চিকিৎসা করা হয়।

পুরী মিশন আশ্রম (উড়িষ্যা) রথযাত্রা উপলক্ষ্যে একটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ৬১জনের চিকিৎসা করা হয়।

চক্ষু চিকিৎসা-শিবির

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) একটি চক্ষু চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে প্রাথমিকভাবে ১১৯ জনের চোখ চিকিৎসা করা হয়। তন্মধ্যে ১৮ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

জলপাইগুড়ি আশ্রম মাল ব্লকের চাঙ্গমারি পঞ্চায়েতের বন্যাকবলিত ২০৬ পরিবারের মধ্যে ২৯ কুইন্টাল চাল ও ৪ কুইন্টাল ডাল বিতরণ করেছে। এছাড়া জলপাইগুড়ি শহরের ২০০ নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে এবং আশু বিতরণের জন্য বেলুড় মঠ থেকে প্রচুর কাপড় ও গুঁড়ো দুধ প্রেরিত হয়েছে।

মনসাদ্বীপ আশ্রম (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) সাগর দ্বীপের ফুলবাড়ি গ্রামের বন্যার্ত শিশু ও মায়েদের মধ্যে গুঁড়ো দুধ বিতরণ করছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে শীঘ্র বিতরণের জন্য বেলুড় মঠ থেকে ১৫০টি ধুতি ও শাড়ি, ৫০টি কম্বল এবং ৩০০ সেট শিশুদের পোশাক প্রেরিত হয়েছে।

পুনর্বাসন

গুজরাট ঝঞ্ঝা পুনর্বাসন

পোরবন্দর আশ্রম 'নিজের বাড়ি নিজে তৈরি কর' প্রকল্প অনুযায়ী শ্রীনগর ও কুছদি গ্রামের ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ৫৫০০ ঘরছাওয়ার-খোলা বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) গত ২৮ জুলাই '৯৯ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক ভক্তসম্মেলনে বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি, জপ-ধ্যান, প্রশ্নোত্তর পর্ব, রামনাম-সঙ্কীর্তন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রয়াত সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ও বর্তমান সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের ভাষণের ভিডিও ক্যাসেট প্রদর্শিত হয়। সম্মেলনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ, স্বামী সন্তভানন্দ, ব্রহ্মচারী সুদীপ্তচৈতন্য ও শৈবালকান্তি চৌধুরী। বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা ও ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ। সম্মেলনে ৪৩৭ জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন। তাঁরা সকলে বসে প্রসাদ পান। সম্মেলন-শেষে সমবেত কণ্ঠে রামনাম-সঙ্কীর্তন পরিবেশিত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল, আমেরিকা) গত আগস্ট মাসের দ্বিতীয় রবিবার 'দ্য লাস্ট ফ্রনটিয়্যার' বিষয়ে স্বামী মনীষানন্দ ও তৃতীয় রবিবার 'বেদান্ত ইন ব্রাজিল' প্রসঙ্গে সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ এবং চতুর্থ রবিবার 'দ্য ওয়ে অফ ডিভাইন লাভ' বিষয়ে স্বামী সর্বাত্মানন্দ আলোচনা করেন। মাসের প্রথম ও পঞ্চম রবিবার স্বামী অশেষানন্দজী ও স্বামী চেতনানন্দের ভাষণের ভিডিও ক্যাসেট প্রদর্শিত হয় এবং দুটি মঙ্গলবার 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী ভাস্করানন্দ। এছাড়া মাসের প্রথম শনিবার একটি আধ্যাত্মিক শিবির পরিচালিত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (আমেরিকা) গত আগস্ট মাসে সোসাইটির অধীনস্থ হলিউড টেম্পল, সন্ত বারবারা টেম্পল, বিবেকানন্দ হাউস-এ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বদেবানন্দ, স্বামী ব্রহ্মবিদ্যানন্দ, স্বামী বেদরূপানন্দ, স্বামী আত্মতত্ত্বানন্দ, স্বামী গণেশানন্দ ও সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দজী। অতিথি বক্তা হিসেবে ভাষণ দান করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আর্বিভাব-তিথি পালন : গত ৯ আগস্ট '৯৯ সোমবার শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ ও গত ২৬ আগস্ট '৯৯ বৃহস্পতিবার শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই তিথি দুটিতে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বিনির্মলানন্দ ও স্বামী সনকানন্দ।

পরিদর্শন : গত ১৭ আগস্ট '৯৯ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন ও তাঁর স্ত্রী শুভ্রা সেন এবং আন্দামানের রাজ্যপাল ঈশ্বরীপ্রসাদ গুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী সুশীলা গুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী দর্শন ও প্রসাদগ্রহণ করেন। ❑
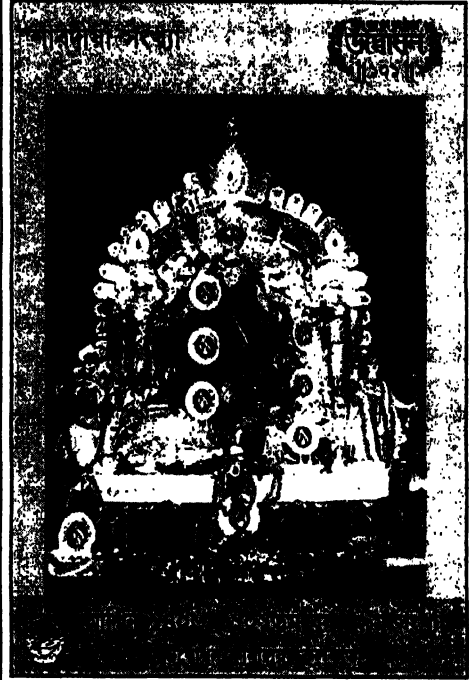
আলোকচিত্র ❑ দাসানুদাস সাহা

আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) শারদোৎসবে পূজিত সপরিবারে মহিষমর্দিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মস্থান সংরক্ষণকল্পে ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে গঠিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ ট্রাস্ট' বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধীনে 'আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর। আঁটপুরের ঘোষ-পরিবারের বড় তরফের সন্তান স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের পৈতৃক ভিটাই আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রধান অংশ। আঁটপুরে ঘোষবংশের বাস প্রায় ৪০০ বছরের। এই বংশের তারাপ্রসাদের অন্যতম পুত্র বাবুরামই পরবর্তী কালের স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ। ১২০৩ বঙ্গাব্দে তারাপ্রসাদের পিতা গোকুলচন্দ্র স্বগৃহে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। তারাপ্রসাদের জীবনের শেষভাগে নানাকারণে এই দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০১ বঙ্গাব্দে বা ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তারাপ্রসাদের বিধবা-পত্নী এবং স্বামী প্রেমানন্দের গর্ভধারিণী মাতঙ্গিনী দেবী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অনুমতি নিয়ে পারিবারিক দুর্গাপূজার পুনরায় প্রবর্তন করেন। সেবার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তিনি শ্রীশ্রীমাকে আঁটপুরের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। তখন থেকে ঘোষবাড়ির বড় তরফের দুর্গাপূজা আর কখনো বন্ধ হয়নি। বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠেই ঐ পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের আগে ঘোষ-পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকের ছিল। গণেশ ও কার্তিকের অবস্থান ছিল যথাক্রমে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর ওপরে। এই আঙ্গিক ও অবস্থান ঘোষবংশের ছোট তরফের প্রতিমায় এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। —স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ (বেলুড় মঠ কর্তৃক অধিগ্রহণের পর ১৯৯৭-এর ২০ এপ্রিল পর্যন্ত স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ আঁটপুর মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন।)

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (পশ্চিম ত্রিপুরা) গত ৪-৬ জুন '৯৯ তিনদিন ধরে পরিষদের ১৭তম বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে স্থানীয় **খয়েরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (আগরতলা)**। সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়ের মধ্যে বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তসম্মেলন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যুবসম্মেলন ও ধর্মসভা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি ও আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সুমেধানন্দ এবং বেলুড় মঠের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বাণেশানন্দ। সম্মেলনে ৩৩টি আশ্রম থেকে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি এবং খয়েরপুর আশ্রমের প্রায় ৩০০ ভক্ত যোগদান করেন।

তেঁতুলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে (জেলা—মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৫-৬ জুন '৯৯ সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন যুবসম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী অমূল্যানন্দ। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, ভজন ও ধর্মসভা। সান্ধ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন আমাইপাড়া উদ্বাস্তু বিদ্যাপীঠের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সমীরকুমার ঘোষ এবং আলোচনা করেন স্বামী ইন্দ্রাত্মানন্দ ও স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির সম্পাদক স্বপনকুমার মজুমদার।

মেদিনীপুর নেতাজী রুর‍্যাল উইমেন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (নন্দীগ্রাম, জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৬ জুন '৯৯ একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সম্মেলনের আয়োজন করে। পতাকা উত্তোলন এবং প্রদীপ জ্বেলে সম্মেলনের সূচনা করেন কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ। এরপর শুরু হয় আলোচনাসভা। সভায় 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে আদর্শ ভারতীয় নারী' প্রসঙ্গে স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ ও কাঁথি পালপাড়া সারদাদেবী মহিলা মণ্ডলের সম্পাদিকা সবিতা পাত্র আলোচনা করেন। 'ভারত গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা' বিষয়ে আকন্দবাড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক অর্ধেন্দুকুমার সাঁতরা, খড়্গপুর নিবেদিতা মহিলা মণ্ডলের সম্পাদিকা দেবযানী মহেশ ও কাঁথি পালপাড়া সারদাদেবী মহিলা মণ্ডলের সভানেত্রী কল্যাণী মাইতি এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় জনসাধারণ ও নারী উন্নয়ন' বিষয়ে অগ্রগামী হ্যান্ডিক্যাপড সমিতির সম্পাদক শ্রীকান্ত মিদ্যা ও হলদিয়া ঝাঙ্গিরানী মহিলা মণ্ডলের সম্পাদিকা শিপ্রা বেরা প্রমুখ আলোচনা করেন। সমগ্র সম্মেলনটি পরিচালনা করেন সোসাইটির সভানেত্রী নমিতা মাইতি।

আকালিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৩-২০ জুন '৯৯ আটদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দ। আলোচনাকালে শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের উপনিষদ্-ব্যাখ্যাসম্বলিত গ্রন্থগুলিও পাঠ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি হোমানুষ্ঠানে বিভিন্ন আশ্রমের সন্ন্যাসিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পাকুড়, চাতরা, প্রভৃতি গ্রাম থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল এবং প্রত্যহ সাধু-ভাণ্ডারার ব্যবস্থাও ছিল।

বোলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—বীরভূম) গত ২৬ ও ২৭ জুন '৯৯ বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয় ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, দুপুরে ৭৫০ জন ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ এবং বিকালে ধর্মসভা। ধর্মসভার শুরুতে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন প্রভাত পাল। তারপর আশ্রমের সভাপতি অরিজিৎ রায়ের স্বাগত-ভাষণের পর শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সভাপতিত্ব করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ। তিনি সন্ধ্যায় 'কথায় ও সুরে কথামৃত' পরিবেশনও করেন। এদিন স্থানীয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন সকালের ধর্মসভায় 'কথায় ও সুরে শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা' কীর্তনের পর শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী দেবদেবানন্দ। দুদিনের অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতন, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, সিউড়ি ও কলকাতা থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৭ জুন '৯৯ একটি আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করে। বৈদিক স্তোত্রপাঠ, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ, ভজন এবং আলোচনাসভা ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দ ও স্বামী অচ্যুতানন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

শিবপুর সারদা সেবা সঙ্ঘের (জেলা—হাওড়া) গত ২৮ জুন '৯৯ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘের একটি হল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং 'কথামৃত' পাঠ করেন রামকৃষ্ণ মঠের (গদাধর আশ্রম) অধ্যক্ষ স্বামী ঋদ্ধানন্দ। দুপুরে প্রায় ৬৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় সভানেতৃত্ব করেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা এবং শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণা। সভান্তে বেদান্ত সোসাইটি অফ টরেন্টোর

(আমেরিকা) অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, খাতা ইত্যাদি বিতরণ এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী শান্তাত্মানন্দ। গত ১৮ জুলাই এই সঙ্ঘের মহিলা সদস্যাদের উদ্যোগে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয় শিবপুর দীনবন্ধু বিদ্যালয়ে। বেদপাঠ, 'গীতা' ও 'রামচরিতমানস' পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তিগীতি এবং আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের বিভিন্ন অঙ্গ। একক ও সমবেতভাবে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী দিব্যব্রতানন্দ। 'রামচরিতমানস' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী পুরাণানন্দ। ভক্তসম্মেলনের তাৎপর্য আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী সনকানন্দ। সঙ্ঘের সদস্যারা ভক্তিমূলক সঙ্গীত নিবেদন করেন। সম্মেলনে ১০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

পশ্চিম রাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০৩২) গত ২৮ জুন '৯৯ বার্ষিক উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'স্নানযাত্রা ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী সৎপ্রভানন্দ। উপস্থিত প্রায় ২০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (জেলা—বীরভূম) গত ২৮ জুন '৯৯ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে পাঠচক্রের নাটমন্দির ও একটি সাধুনিবাসের নির্মাণকার্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের সংস্কারকার্যের শুভারম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম করেন বলরামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবাত্মানন্দ। স্তোত্রাদি-সহ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নমিতা চট্টরাজ, শর্মিলা দাস ও মিতালী চক্রবর্তী। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ভজন পরিবেশন করেন দীপিকা রায়। পাঠচক্রের মহিলা সদস্যাদের উদ্যোগে গত ৮ আগস্ট '৯৯ 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা' স্মারক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভানেতৃত্ব করেন লতিকা মণ্ডল এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। এছাড়া ভাষণ দেন পাঠচক্রের প্রাক্তন সভাপতি শক্তিচরণ চট্টরাজ ভাষণ দেন। সভার শুরুতে স্বাগত-ভাষণ ও সমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়। সভান্তে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপিকা রায়, মিঠু মণ্ডল ও সোমা মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিতালী চক্রবর্তী ও পারুল সিনহা।

কৃষ্ণনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮ জুন '৯৯ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও সন্ত কবীরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, শাস্ত্রাদি পাঠ, ভজন ও কীর্তনের আয়োজন করে। পূজা ও শাস্ত্রাদি পাঠে অংশগ্রহণ করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ, বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চিন্তাহরণ গড়াই। দুপুরে প্রায় শতাধিক ভক্ত প্রসাদ পান।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্রের (জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় গত ৪ জুলাই '৯৯ একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বৈদিক মন্ত্র ও স্বদেশমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাসভা। সভায় 'স্বামী বিবেকানন্দকে আজ আমাদের কেন প্রয়োজন' এবং 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে স্বদেশ ও মানুষ' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ এবং স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। এছাড়া যুব-প্রতিনিধিরা স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করে। সম্মেলনে ৪০৫জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। প্রত্যেক প্রতিনিধিকে একটি করে 'সবার স্বামীজী' বই এবং দ্বিপ্রাহরিক আহার দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ১৯ জুন এই পাঠচক্র একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা'। এতে প্রায় ১২৫জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। এরপর 'স্বামীজী ও নিবেদিতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন 'নিবোধত' পত্রিকার সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা ও সহ-সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১১ জুলাই '৯৯ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সরোজকুমার নাইয়া। বিকেলে 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শান্তিদানন্দ। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সমাগত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাঠচক্রের সভাপতি কৃষ্ণগোপাল নস্কর।

শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের (জেলা—জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ১৭-২০ জুলাই '৯৯ তিনদিন ধরে একটি আঞ্চলিক যুবশিক্ষণ-শিবির অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় **সিস্টার নিবেদিতা ইংরেজী বিদ্যালয়ে (প্রধাননগর)**। শিবিরে প্রায় ২২৫জন যুবক অংশগ্রহণ করে। মনঃসংযোগ, শরীরচর্চা, স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের মাধ্যমে চরিত্রগঠন প্রভৃতি ছিল শিবিরের আলোচ্য বিষয়। বৈদিক মন্ত্রোচারণ ও স্বদেশমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে শিবিরের সূচনা হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন দার্জিলিং রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ। তিনদিনের অনুষ্ঠানে সান্ধ্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের সর্বভারতীয় সম্পাদক নবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও সহ-সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী এবং সমীরকুমার দাশগুপ্ত। সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত-ভাষণ দান করেন অধ্যাপক গৌরাঙ্গ বিশ্বাস। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী আনন্দময়ানন্দ প্রমুখ।

উত্তর চব্বিশ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন গত ২৪ ও ২৫ জুলাই '৯৯ অনুষ্ঠিত হয় **নাটাগড় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে (সোদপুর, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ)** সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে পরিষদের প্রয়োজনীয়তা' এবং 'পরিষদ-এর অন্তর্ভুক্ত আশ্রমসমূহের কর্তব্য'। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে ভাষণ দান করেন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী প্রমেয়ানন্দ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ। এছাড়া ভাষণ দেন পরিষদের সহ-সভাপতিদ্বয় স্বামী মুক্তিকামানন্দ ও স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন নাটাগড় আশ্রমের সম্পাদক গোপালচন্দ্র বসাক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের আহ্বায়ক সন্তোষকুমার ঘোষ।

সাঁকরাইল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (জেলা—হাওড়া) গত ২৮ জুলাই '৯৯ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুচিত্রা চক্রবর্তী। সন্ধ্যায় 'গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য ও সার্থকতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন সঙ্ঘের সভাপতি নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ ও সঙ্ঘের সম্পাদক স্বপনকুমার পুরকাইত। আলোচনাশেষে ভজন, স্তবপাঠ ও গুরুবন্দনা পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শোণিতপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে (আসাম) গত ২৮ জুলাই '৯৯ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন ডাঃ সুশীল দাস ও সম্প্রদায় এবং ভক্তিগীতি নিবেদন করেন বিমল সাহা, শিশির চক্রবর্তী প্রমুখ। আলোচনাসভায় গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য আলোচনা করেন সঙ্ঘের সভাপতি প্রাণকুমার সরকার। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

চন্দননগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮ জুলাই '৯৯ বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি পালন করে। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী দিব্যব্রতানন্দ। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ একটি অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন। তারপর আয়োজিত ধর্মসভায় 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঙ্ঘের সম্পাদক দুলালচন্দ্র নায়েক। এদিন সঙ্ঘের স্মরণিকা 'শাশ্বত' প্রকাশ করা হয়।

উত্তর পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০ জুলাই '৯৯ **খারপেটিয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (আসাম)**। সম্মেলনে ৬টি আশ্রমের ৪১জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। দুটি অধিবেশনে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোচনা করেন পরিষদের সমন্বয়-বিধায়ক দয়াব্রত সাহা। পরিষদের সহ-সভাপতি স্বামী যোগাত্মানন্দ পরিষদের ১০ দফা নিয়মাবলীর ওপর আলোচনা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল হরিজনদের মধ্যে কিভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচার করা যায়। সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আশ্রমের সম্পাদক সুশীল সাহা।

শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ীতে (কথামৃত ভবন, ১৩/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০০০৬) গত ২ আগস্ট '৯৯ নাগপঞ্চমী তিথিতে কথামৃতকার শ্রীম-র ১৪৬তম জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বলরাম-মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দ, 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, আদ্যাপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরালভাই প্রমুখ ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হয়ে শ্রীম-র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে তাঁর অসামান্য ভূমিকার কথা ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দেন। সন্ধ্যায় শ্রীম-র দিব্যজীবন ও 'কথামৃত' বিষয়ে আলোচনা করেন শ্রীম-র প্রপৌত্র দীপক গুপ্ত। সারাদিনে অগণিত ভক্তের সমাগম হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ত্রিপুরার ধর্মনগর-নিবাসী **বিধানচন্দ্র নাথ** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে গত ১৬ মে '৯৯ রাত ৮টায় পরলোকগমন করেন। তিনি প্রথম জীবনে কিছুকাল বেলুড় মঠে আশ্রমিক জীবন যাপন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সাধুর সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, সত্যবাদিতা ও সরলতার জন্য অনেকে তাঁকে ভালবাসতেন। তিনি আজীবন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক এবং দীর্ঘদিন ধর্মনগর রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য রানাঘাট-নিবাসী **ডঃ প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়** গত ২৩ মে '৯৯ সকাল ১১.২০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি রানাঘাট কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ও স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা সঙ্ঘের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন গ্রাহক ও আগ্রহী পাঠক ছিলেন। পরোপকারিতা, সহজ-সরল ব্যবহার ও অদোষদর্শিতার জন্য অনেকেই তাঁকে ভালবাসতেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **শ্যামাপদ রায়** গত ২৫ মে '৯৯ সকাল ১১.৫০ মিনিটে বড়িষা রামকৃষ্ণ মঠে (বৃদ্ধাশ্রমে) শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ১৯৫৬ সালে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা-কর্মে নিযুক্ত হন এবং ১৯৯০ সালে অবসর গ্রহণ করে বড়িষা বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থান করছিলেন। বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নির্দেশমতো তাঁর সঞ্চয় থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকা এই সমিতিতে দান করা হয়। শিক্ষকজীবনে তিনি কয়েক বছর বিদেশে শিক্ষকতা করেছিলেন। অকৃতদার প্রয়াত শ্যামাপদ রায় ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ইটাহার (উত্তর দিনাজপুর)-নিবাসী **যোগজীবন বসু** গত ৪ জুন '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রয়াত শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। সেবা, পরোপকারিতা ও সহজ-সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

বড় হইতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ

১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব।
৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের পূর্বপুরুষগণের রীতিনীতিগুলি মন্দ ছিল বলিয়া যে ভারতের অবনতি হইয়াছে তাহা নহে; এই অবনতির কারণ, ঐ রীতিনীতিগুলির যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে দেওয়া হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা ওপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন, ওপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি ওপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ধনসম্পদ ইহকালের সম্পদ, সঙ্গে যাবে না। সাধন-ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই, ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে। শ্রীমা সারদাদেবী

*

কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ মঠ চণ্ডীপুর
মেদিনীপুর-৭২১৬৫৯

রামকৃষ্ণ মঠ, মঠ চণ্ডীপুর বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্র। ১৯১৬ সালে মেদিনীপুর জেলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের মন্দিরে প্রতিদিন পূজা, পাঠ, সন্ধ্যারতি ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ফ্রি কোচিং সেন্টার, লাইব্রেরী, চিকিৎসা-শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে এই আশ্রম স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সেবাকাজ সম্পন্ন করে থাকে।

বর্তমানে আশ্রমের (১) প্রাচীন মন্দিরটিকে সংস্কার ও প্রশস্ত করা এবং (২) লাইব্রেরী ও কোচিং সেন্টারের জন্য একটি পৃথক বাড়ি নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই দুটি কাজে আনুমানিক নয় লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। সহৃদয় জনসাধারণ এই জরুরী কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য দান করবেন—এই অনুরোধ। চেক বা ড্রাফট **'Ramakrishna Math, Math Chandipur'** —এই নামে পাঠাবেন। **মঠের জন্য দেয় সর্বপ্রকার দান ৮০জি ধারানুসারে আয়কর মুক্ত।**

বিনীত
স্বামী শরণ্যানন্দ
অধ্যক্ষ

If you can but follow one of the Master's teachings, you get everything.

Sri Ma Sarada Devi

Be brave and be sincere; then follow the path with devotion and you must reach the Lord.

Swami Vivekananda

মদীয় আচার্যদেবের [শ্রীরামকৃষ্ণ] জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল, সকল ধর্মের মধ্যে যে মূল ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

The rich should serve God and His devotees with money, and the poor should worship God by repeating His name.

Sri Ma Sarada Devi

ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্তা—এটি সর্বদা মনে রাখবে; এটি ভুল হলে সব ভুল। যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়, অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্তগুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

যে ঠাকুরের ওপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

এক হাতে কর্ম কর, আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবান কল্পতরু—তাঁর কাছে যে যেমন চায় সে তাই পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

No work is secular. All work is adoration and Worship.

Swami Vivekananda

জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশি মূল্যবান।

স্বামী বিবেকানন্দ

আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ

বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই।

শ্রীমা সারদাদেবী

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্টশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্তা—এটি সর্বদা মনে রাখবে; এটি ভুল হলে সব ভুল। যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না। **শ্রীমা সারদাদেবী**

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছ বোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে। যার যা সম্মান তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। মানুষকে ভালবাসলে দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। ভগবানকে যে ভালবাসতে পারে সেই ধন্য হয়। তার দুঃখ-কষ্ট থাকে না।

শ্রীমা সারদাদেবী

রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও; ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা করো। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

উৎসব ও নিত্যপ্রয়োজনে
ব্যবহার করুন

গুরুদেব

সুগন্ধী ধূপকাঠি

পরিবেশক :
ক্যালকাটা সুগন্ধী ধূপ ফ্যাক্টরী
৬৮এ, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭, ফোন : ২৩৯-৮১৩৬

পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য একটি গ্রামের ওপর ঢেলে দিলেও সেই গ্রামের মানুষদের প্রকৃত উন্নতি করা সম্ভব হবে না, যদি না তাদের আত্মবিশ্বাসী করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

কর্মানুষ্ঠান না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না। কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবিবেক না হলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয় না। কামনা ত্যাগ ব্যতীত কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ

তিনি [ভগবান] জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্মফল অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সূর্য এক, কিন্তু জায়গা ও বস্তুভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন।

শ্রীমা সারদাদেবী

সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর। জেনো যে, বাড়িঘর পরিবার আমার নয়, এসব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্বদা প্রার্থনা করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

Hatreds never cease by hatreds in this world. By love alone they cease, this is an ancient law.

Buddha

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।

শ্রীকৃষ্ণ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

The Vedas teach that the soul is divine, only held in the bondage of matter.

Swami Vivekananda

The Lord is never unjust and unmerciful in His creation.

Sankaracharya

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন অর্থাৎ দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে অন্নাদি প্রদান করে অবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁরা সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। যে পাপাত্মারা কেবল আপন উদর পূরণার্থ অন্ন পাক করে, তারা পাপরাশিই ভোজন করে।

শ্রীকৃষ্ণ

God is one, but He has innumerable forms. He is the creator of all and He Himself takes the human form.

Guru Nanak

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ-সাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ি যাওয়ার অনেক পথ আছে; সেইরকম ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে। ঈশ্বরীয় কথার ইতি করা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রিড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ।।

শ্রীমদ্ভাগবত

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

দেবী, আপনি সন্তুষ্টা হলে সকলপ্রকার (দৈহিক ও মানসিক) রোগ বিনাশ করেন। আবার রুষ্টা (অসন্তুষ্টা) হলে অভীষ্ট (কাম্য) বস্তুসমূহ নাশ করেন। আপনার আশ্রিত ব্যক্তিদের বিপদ স্থায়ী হয় না। যাঁরা আপনার চরণাশ্রিত, তাঁরা অন্যেরও আশ্রয়যোগ্য হন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

ভগবানের নামচিন্তা যেরকম করেই কর না কেন, তাতেই কল্যাণ হবে। যেমন মিছরির রুটি সিধে করে খাও আর আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগবেই লাগবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।

কঠোপনিষদ্

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে; তবে এই যুগে কর্মযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

চাঁদামামা যেমন সব শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার। তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

* * * * * *

যার আছে সে মাপ—যার নেই সে জপ।

শ্রীমা সারদাদেবী

Give up jealousy and conceit. Learn to work unitedly for others. This is the great need of our country.

Swami Vivekananda

ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত হন, কিন্তু বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে। মহান ও সুন্দর ঈশ্বরকে উপাসনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত।

স্বামী বিবেকানন্দ

মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

শ্রীমা সারদাদেবী

তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্মফল অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সূর্য এক, কিন্তু জায়গা ও বস্তুভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

শ্রীমা সারদাদেবী

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী
ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা
ক্ষমা ধাত্রী
স্বাহা স্বধা
নমোঽস্তু তে।
স্টেট ব্যাঙ্ক
Indo Aryan/99

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র (১)

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)** ❑ কাঁকুড়গাছি, ফোন ঃ ৩৩৪-২৯২৮
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)** হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর, ফোন ঃ ৪৫৫-৪৬৬০
- **কথামৃত সঙ্ঘ** ❑ ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন ফোন ঃ ৪৭৩-৫১২৭
- **সলিলা সরকার** ❑ এ-ই ৬৫৫, সল্ট লেক
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র** ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম** ❑ ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স** ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক** ❑ সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র** ❑ চেতলা
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** ❑ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- **শোভনা ভৌমিক** ❑ ৯ আর. এন. টেগোর রোড নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ৪৬৭-১১২২
- **রামকৃষ্ণ কুটীর**, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাটী
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র** বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আঢ্য ব্রাদার্স** ❑ ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল** ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-৩৯
- **মলয় ভৌমিক** ❑ ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ভি. ব্রিগস অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ** ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির** ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **"সারদা ভবন", জীবনকুমার ভট্টাচার্য** ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রীট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম** ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **হ্লাদিনী** ❑ স্বত্বাধিকারিণী ঃ সুচিত্রা চ্যাটার্জী ৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ কলকাতা-৫ ফোন ঃ ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- **স্বপন দাস** ❑ ৯ সাউথ কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-১০
- **দাসানুদাস সাহা** ❑ ১এ কুমারটুলী স্ট্রীট কলকাতা-৫, ফোন ঃ ৫৫৪-৬২৯৯
- **ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়** ❑ ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড কলকাতা-৫০, ফোন ঃ ৫৫৬-৯৫৭২
- **রবি হাজরা** ❑ ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৩
- **সুধাংশু বিশ্বাস** শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী**, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণী, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**, ২৪/৬১ যশোর রোড এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা-২৮, ফোন ঃ ৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির** ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ** ২নং এয়ার পোর্ট গেট, পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১ ফোন ঃ ৫১১-৮২৪১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ** ২৪৯ শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**, শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম

জেলা ঃ হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম** ❑ বেলুড় মঠ
- **নির্মল ঘোষ** ৬ রায় জে. এন. বাহাদুর রোড, বাদামতলা, বালী
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম** ৪ নস্কর পাড়া লেন, পিন-৭১১ ১০১
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ** নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন-৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ** গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা ঃ শ্যামপুর, পিন-৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়** গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন-৭১১ ৪০৯
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র** রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া) পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী), পিন-৭১১ ২২৭
- **সারদা বুক এজেন্সি** ❑ ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন কদমতলা, পিন-৭১১ ১০১
- **শুকদেব সাঁতরা** ❑ গ্রাম ঃ উত্তর পীরপুর পোঃ বানীবন, ভায়া ঃ উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১ ৩১৬
- **পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি** গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস, পিন-৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** হাঁটাল, পিন-৭১১ ৪০৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ** সাঁকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
- **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র** প্রযত্নে রবীন ধানুকী, পোঃ দক্ষিণ ঝাপড়দা পিন-৭১১ ৪০৫, ফোন ঃ ৬৭০-০৪০০, ৬৭০-১৩২৪
- **শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** শুঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্ সঙ্ঘ** ❑ ঘোষপাড়া বাজার, বালি
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**, হাওড়া স্টেশন (মেন), নিউ কমপ্লেক্স

সংগ্রহ-কেন্দ্র

- **শ্যামবাজার বুক স্টল** ❑ ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল** ❑ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- **সর্বোদয় বুক স্টল** ❑ হাওড়া রেলস্টশন

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

"নিয়মিত তিল তিল
করিলে সঞ্চয়
ভবিষ্যৎ সুখের ঘরে
জ্বালিবে নিশ্চয়।"

ESTD.—1932

Peerless Group

UDBODHAN · Vol. 101 □ No. 9 □ SEPTEMBER 1999 Licence No. WB/NC/CL 3 ISSN 0971-4316
Phone 554-2248 R N 8793/57
554-2403 Postal Reg No WB/N(19

উদ্বোধন

১০১তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র সুপ্রাচীন সাময়িকপত্র।

❑ উদ্বোধন-এর এবছর ১০১তম বর্ষ চলছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০০ বছর অতিক্রম এই প্রথম ❑

❑ উদ্বোধন একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

❑ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক পত্রিকা। ধর্ম দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান ভ্রমণ, শিল্প সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন এ প্রকাশিত হয়।

❑ উদ্বোধন বাঙলা ভাষায় শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং সর্ব অর্থেই উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ১০১ বছর ধরে অটুট রেখেছে।

❑ উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ উদ্বোধন একটি পত্রিকা মাত্র নয়, উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী শরীর।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ হয়ে যাবে। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করা আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গভীর দায়িত্ব আমাদের সকলের।

❑ স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ উদ্বোধন এর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এই আশা রাখি।

❑ উদ্বোধন এর শারদীয় সংখ্যাটি আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ এবং বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় বেশি। শারদীয় সংখ্যা সহ গ্রাহক পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়ায় মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের প্রায় আড়াই গুণ। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের শারদ উপহার।

❑ উদ্বোধন পত্রিকার সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য দুটি যথাক্রমে 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। শেষের দুটি তহবিলের অর্থানুকূল্যে ১০১তম বর্ষ থেকে 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা চিহ্নিত হচ্ছে। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar' এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা: সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M O কুপনে 'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়' অথবা 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' অথবা 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল' লেখা যেন থাকে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি দান পাঠালে 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য' অথবা 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য' পাঠানো হচ্ছে সেই মর্মে দাতার চিঠি থাকা বাঞ্ছনীয়।

❑ 'উদ্বোধন'-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল ও কণাবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষ থেকে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য 'উদ্বোধন' এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) সম্প্রতি নিবেদিত হয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন স্থানাধিকারী 'উদ্বোধন' প্রবর্তিত এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

১৪০৬ □ ১০ম সংখ্যা
উদ্বোধন
॥ ১০১ ॥

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত

বিবেকানন্দ ইল্লম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

বিবেকানন্দ ইল্লম একটি পবিত্র ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই ভবনটি একটি তীর্থক্ষেত্র। স্বামীজী পূর্ণ নয়দিন এখানে অবস্থান করেছেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, উপদেশ দান করেছেন, ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেছেন। তাঁর অদৃশ্য, দিব্য উপস্থিতিতে স্থানটি এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে, শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী চেন্নাইয়ের এই বাংলোয় উঠেছিলেন। তখন বাড়িটির নাম ছিল 'আইস হাউস' বা 'ক্যাসল কার্নন'। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় ভারতের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে তেজোদীপ্ত বাণী প্রদান করেছিলেন তা ইংরেজীতে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বা বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা, আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে এই বাড়িটিতেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত স্বামীজীর বাণীর ঐতিহাসিক পীঠভূমি।

আমরা এখানে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে চাইছি, যেখানে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত হবে। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্রসমূহ, অন্যান্য সুন্দর চিত্র, মডেল, ভিডিওগ্রাফ, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রাণপ্রদ বাণীর প্রচারকেন্দ্র-রূপে এই বাড়িটিকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করছি।

১৮৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই বাড়িটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই পবিত্র কাজটি শুরু করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে এবং স্বামীজীর সকল অনুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের উদার দাক্ষিণ্যে আমরা এই মহান কাজ সম্পন্ন করার আশা রাখি।

এবাবদ সমস্ত আর্থিক দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে দান পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ

অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯
ই, মেল : srkmath@vsnl.com
ওয়েবসাইট : www.sriramakrishnamath.org

'উদ্বোধন' ঃ ১০২তম বর্ষ (২০০০ খ্রীস্টাব্দ) ❑ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ও অন্যান্য

❑ 'উদ্বোধন' পত্রিকার আগামী ১০২তম বর্ষের (মাঘ ১৪০৬—পৌষ ১৪০৭/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০০) গ্রাহকমূল্য বর্তমান বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে ঃ ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৭২০ টাকা (বিমানডাক) ❑ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশ ঃ ১৪০ টাকা।

❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

❑ বর্তমান বছরের (১৯৯৯/১৪০৫-১৪০৬) প্রথম বা মাঘ সংখ্যা প্রথম মুদ্রণের পর নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার তার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। সেজন্য প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে আগামী বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

❑ কলকাতা বা কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তাঁরা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য জমা দিলে সুবিধা হয়। কেননা M. O.-তে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে যদি দেরি হয় এবং ততদিনে যদি প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাহলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও ঐ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে-কারণে সম্ভব হলে M. O. না করে গ্রাহকমূল্য সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়াই ভাল।

❑ সরাসরি জমা দেওয়া সম্ভব না হলে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে/পোস্টাল অর্ডারে গ্রাহকমূল্য 'Udbodhan Office, Calcutta'—এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য চেক গ্রাহ্য। তবে সেই চেক কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হতে হবে।

❑ যাঁদের M. O. করে গ্রাহকমূল্য পাঠাতেই হবে, তাঁদের কাছে অনুরোধ, এখনই M. O. পাঠাতে শুরু করুন। জানুয়ারি থেকে বর্ষ শুরু বলে সকলেই একসঙ্গে ডিসেম্বরে M. O. পাঠাতে শুরু করেন; কিন্তু বাগবাজার ডাকঘর কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন একশ থেকে দেড়শর বেশি M. O. আমাদের কাছে ডেলিভারি দিতে পারেন না। আবার তাও রোজ পেরে ওঠেন না। ফলে ডাকঘরে জমা হাজার হাজার গ্রাহকের M. O. পেতেই আমাদের দুই থেকে তিন মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত লেগে যায়। এছাড়া M. O. কুপনে অনেক নতুন গ্রাহক তাঁদের নাম-ঠিকানা এবং কিজন্য M. O. পাঠাচ্ছেন তা জানান না। পুরনো গ্রাহকরা তাঁদের গ্রাহকসংখ্যা অনেকেই ঠিকমত লেখেন না। ফলে এইসমস্ত M. O. সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। পত্রিকা না পেয়ে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের চিঠি লেখেন তখন সেগুলির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। অনেকের কাছে যে সময়মতো পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হয় না অথবা পাঠাতে দেরি হয়, M. O. সম্পর্কিত অস্পষ্টতাই তার জন্য দায়ী। সেজন্য অনুরোধ, এখনই আগামী বর্ষের গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করে নিন। M. O. কুপনে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা, গ্রাহকসংখ্যা লিখবেন, M. O. কেন পাঠাচ্ছেন তাও জানাবেন।

❑ পত্রোত্তর এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকখরচ পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ প্রতি বাঙলা মাসের ১ তারিখ (ইংরেজী ১৪-১৮) 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়। ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার প্রধান ডাকঘরে (G.P.O.) এবং কুমারটুলি R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণত ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ঠিকমত পৌঁছায় না বলে গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে। এই বিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে পত্রিকা ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকেরা এক মাস পরেও পত্রিকা পান না বলে খবর পাই। সে-কারণে গ্রাহকদের এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি।

এক মাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট' বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে।

❑ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় (একমাস) অতিক্রান্ত হলে তবেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহক-সংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক।

❑ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ বড় এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। যাঁরা ডাকে পত্রিকা নেন, তাঁরা সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) অথবা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণের সময় অথবা ১লা জুন থেকে ২৪শে আগস্টের মধ্যে কার্যালয়ে জানাতে হয়।

❑ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ সংখ্যায় পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/ M. O. প্রাপ্তি-কুপন/ আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে।

❑ ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নতুন ঠিকানা পিন কোড সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে, যাতে পরবর্তী সংখ্যাটি পুরনো ঠিকানায় না চলে যায়।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হলে 'উদ্বোধন'-এ ব্যক্তির/ কেন্দ্রের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হবে।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদন-পত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বা প্রাইভেট কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ সভাপতিকে আবেদন করতে হবে।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

কার্ত্তিক ১৪০৬
অক্টোবর ১৯৯৯

শ্রীসদাশিব উবাচ

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।।

শ্রীসদাশিব [দেবী পার্বতীকে] বললেন ঃ সর্বপ্রাণীর গ্রাসকর্তাকে 'মহাকাল' আখ্যা দেওয়া হয়। মহাকালকে তুমি 'কলন' বা গ্রাস কর বলে তোমাকে বলে 'কালিকা'—পরাশক্তি বা আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী।

❀

শশিসূর্যাগ্নিভির্নেত্রৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্।।

চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নি-রূপ তিনটি নেত্র দ্বারা দেবী কালিকা কালসম্ভূত সমগ্র বিশ্বচরাচর নিরীক্ষণ করেন। এই হেতু যোগিগণ চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নিকে দেবীর ত্রিনয়ন কল্পনা করেছেন।

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীর্তি রানী রাসমণির বাস ছিল।... রানী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন; এবং তদবধি স্বামী রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিষয়কর্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস, ওজস্বিতা এবং দরিদ্রদিগের প্রতি নিরন্তর সহানুভূতি, তাঁহার অজস্র দান, অকাতর অন্নব্যয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তবিক, নিজ গুণ ও কর্মে এই রমণী তখন আপন 'রানী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণ-ইতর নির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অশেষগুণশালিনী রানী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে খোদিত ছিল—'কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী'। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, তেজস্বিনী রানীর দেবীভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইত।

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি রানীর বহুকালসঞ্চিত ভক্তি সাকার মূর্তিপরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্ন-পরিশোভিত সুবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সন ১২৬২ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে রানী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণি এবং প্রসঙ্গত

রানী রাসমণির জন্মদিন এবং কালীপূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্পাদকীয়।

দিনটি ছিল ১১ আশ্বিন ১৪০৬। বাঙলা তারিখ অনুসারে দিনটি বিশ্রুতকীর্তি মহীয়সী রানী রাসমণির জন্মদিন। ১২০০ বঙ্গাব্দের ১১ আশ্বিন এবং ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর বিখ্যাত কালীসাধক রামপ্রসাদের জন্মস্থান হালিসহরের নিকটবর্তী কোণা গ্রামে রানী রাসমণির জন্ম। 'রানী' নামটি ছিল রাসমণির পিতৃগৃহের ডাকনাম। গর্ভধারিণী কন্যাকে ঐ নামে ডাকিতেন। 'রাসমণি' তাঁহার পোশাকী নাম—যেমন অধিকাংশ বাঙালী পরিবারে থাকে। অনেকের ধারণা, বিশাল ভূসম্পত্তি ও জমিদারীর কর্ত্রী হিসাবেই বুঝি 'রানী' নামে তাঁহার পরিচিতি অথবা 'রানী' খেতাবটি তাঁহাকে ব্রিটিশ সরকার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তাহা ছিল না। তাঁহার অপরিসীম তেজস্বিতা, অতুলনীয় বদান্যতা এবং অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্যই মানুষের কাছে তিনি সমকালে 'রানী রাসমণি' নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। দরিদ্র পরিবারের কন্যাটির জীবনে নামটি যে এমনভাবে সুসার্থক হইয়া উঠিবে তাহা কে জানিত! সরকারের প্রদত্ত খেতাবও কি কখনো এমন সার্থক হইয়াছে? 'রানী' না হইয়াও তিনি অগণিত মানুষের কাছে চির-কালের 'রানী' হইয়া উঠিয়াছেন।

গত ১১ আশ্বিন ১৪০৬ রাসমণির জন্মদিন উপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ও দেবোত্তর এস্টেটের পরিচালকবৃন্দ মন্দির-সংলগ্ন ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত নাটমন্দিরে ঐদিন অপরাহ্নে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সভায় অন্যতম আলোচকরূপে সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর অধিকর্তা ডঃ শিশিরকুমার বসু তাঁহার ভাষণে বলেন: নেতাজী ছিলেন কালীর পরম ভক্ত এবং দক্ষিণেশ্বরের প্রতি ছিল তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী, শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ এবং মাতৃবিগ্রহ দর্শনে আসিতেন। পঞ্চবটীতে অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে অথবা মায়ের মন্দিরে ধ্যানে কাটিত তাঁহার অনেক সময়। তবে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আসা এবং ধ্যানের কথা লোকে জানিত না। কারণ, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন ছিল একান্তই তাঁহার ব্যক্তিগত ও অত্যন্ত গোপনীয়। নেতাজীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত পার্শ্বচর হিসাবে আমি তাঁহার এই গোপন আধ্যাত্মিক জীবনের সংবাদ জানিতাম। সেই সুবাদেই আমি জানিতাম, গভীরভাবে আধ্যাত্মিক মানসিকতার অধিকারী আমার এই জগদ্বিখ্যাত পিতৃব্যের ছিল মা কালীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি, আর তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি। গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় তাঁহার ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের আগের দিন নেতাজী আমার মাধ্যমে দক্ষিণেশ্বর হইতে মা ভবতারিণীর নির্মাল্য ও প্রসাদ আনাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক জরুরী সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ তিনি লইয়াছেন কালীপূজার দিন। রণাঙ্গন হইতেও তিনি অতি গোপনীয় গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছেন কালীপূজার দিন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেরকম কিছু চিঠি তখনকার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও আমাদের মনে পড়িতেছে। সেটি হইল, সিঙ্গাপুরে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কালীপূজার দিন—২১ অক্টোবর ১৯৪৩। সিঙ্গাপুরে অথবা রেঙ্গুনে তিনি গভীর রাত্রিতে সামরিক পরিচ্ছদেই নিজে গাড়ি চালাইয়া প্রায়ই একাকী চলিয়া যাইতেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে। সেখানে যাইয়া সামরিক পরিচ্ছদ খুলিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া লইতেন এবং মন্দিরে গিয়া ধ্যানে বসিতেন। দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া তিনি ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সম্মুখে। আমার মনে সেজন্য একটি জিজ্ঞাসা—রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দির, মা কালী, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং নেতাজী—ইঁহাদের মধ্যে সংযোগ কী সূত্রে? আমার পরবর্তী বক্তা এবিষয়ে আলোকপাত করিবেন, এই প্রত্যাশা রাখিতেছি।

ডঃ শিশিরকুমার বসুর পরবর্তী আলোচক ছিলেন বর্তমান লেখক। সুতরাং সংযোগের সূত্রসন্ধানের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার উপরেই পড়িয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিখ্যাত

'শুভ বিজয়া'র প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা

'শুভ বিজয়া'র পুণ্যলগ্নে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্তরের সকল মালিন্য, কলুষ, দ্বেষ ও ভেদ-বুদ্ধি, স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, লোভ ও হিংসাকে যেন আমরা নির্মূল করতে পারি। এই উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন'-এর সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা 'শুভ বিজয়া'র আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

কালীমন্দির, মা কালী, কালীমন্দিরের প্রাণপুরুষ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার জগদ্বরেণ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংযোগ আকস্মিক নয়। রানী রাসমণি ছিলেন কালীর পরম ভক্ত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে যে অসাধারণ শক্তি, তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার পরিচয় সমকালের মানুষ দেখিয়া অবাক হইয়াছিল, সর্বশক্তির উৎসস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি মহাকালীর শক্তি ভিন্ন তাহা সম্ভব ছিল না। রাসমণির শক্তি, তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার কাহিনী সমকালেই কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনী-পাঠকমাত্রই সেসব অবগত আছেন। প্রত্যেকটি ঘটনায় যে শক্তিময়ী মহীয়সীর রূপটি পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা তদানীন্তন কালের পরিপ্রেক্ষিতে অকল্পনীয় ছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ শাসকবর্গকেও তাঁহার কাছে নতিস্বীকার করিতে হইয়াছে—একবার নয়, বহুবার। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন উঠে—এ-শক্তি তিনি কোথায় পাইলেন? উত্তর পাই—তাঁহার অচলা কালীভক্তি এবং কালীর প্রতি অটল বিশ্বাস তাঁহাকে সেই শক্তি দিয়াছে।

আরেকটি কথা। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের প্রথম সিপাহী-বিদ্রোহ হয় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে। রানীর মন্দির-প্রতিষ্ঠার ঠিক দুবছর পর। সিপাহী-বিদ্রোহকে অনেক ঐতিহাসিক ভারতের 'প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কেহ কেহ সেবিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করিলেও একথা তো অনস্বীকার্য যে, সিপাহী-বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতের নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের প্রথম পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের বহ্নিময় প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। শতাধিক বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশের অত্যাচার, অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের মানুষের মনে যে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছিল, সিপাহী-বিদ্রোহ তাহাকে এক অগ্নিময় আকার দান করিয়াছিল। নানা কারণে সিপাহী-বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সেই ঐতিহাসিক বিদ্রোহে যে শক্তির এক মহা-জাগরণ ঘটিয়াছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমাদের তো মনে হয়, ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কালীমন্দিরে পূজকের পদগ্রহণ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ সাধনায় রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত কালীর প্রস্তরপ্রতিমা জীবন্ত ও জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভারতব্যাপী এক মহাশক্তিক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল। তাহারই ফলশ্রুতি ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ। প্রসঙ্গত মনে পড়ে শক্তির পূজারী মহারাষ্ট্রকেশরী ছত্রপতি শিবাজীর ভবানী-মন্দির ও মা ভবানীর উপাসনার কথা। মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়মধ্যে 'ভবানী-মন্দির' গড়ার সঙ্কল্পের কথা, যে-'মন্দির গড়ার' নির্দেশ শ্রীঅরবিন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কথায়, সূক্ষ্মদেহী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে।

মনে পড়ে রাসমণির জীবনের একটি ঘটনা। সিপাহী-বিদ্রোহের পরের ঘটনা সেটি। উচ্ছৃঙ্খল ও মদ্যপ কিছু ইংরেজ সৈনিক একদিন দ্বিপ্রহরে রানীর জানবাজারের বাড়ি আক্রমণ করে এবং লুটতরাজ শুরু করে। দারোয়ান ও অন্যান্য পুরুষ কর্মীদের জখম করিয়া তাহারা অন্দরমহলে প্রবেশ করিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে শুরু করে। বাড়িতে তখন মথুরানাথ প্রমুখ পুরুষরা কেহ ছিলেন না। বাড়ির মেয়েরা তখন ভীত, সন্ত্রস্ত এবং কম্পিতকলেবর। কিন্তু দোতলায় পা দিবার আগেই সিঁড়ির মুখে অসীম সাহসিনী রানী স্বয়ং তরোয়াল হাতে ইংরেজ সৈন্যদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। শোনা যায়, রানীর সেই রুদ্ররূপ দেখিয়া উচ্ছৃঙ্খল ও মদ্যপ সৈন্যরা স্তম্ভিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করে। এ কোন্ রানী, যাহাকে দেখিয়া ঐ নরপশুর দল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "রানী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন।" অর্থাৎ রানী রাসমণি সাধারণ নারী নহেন, তিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তির লীলাসঙ্গিনী। আধুনিক যুগে ভারতের সনাতন শক্তিসাধনাকে নূতন তাৎপর্য ও মাত্রা দান করিবার পটভূমি প্রস্তুতের জন্য তাঁহার আবির্ভাব।

আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন, তিনি দেহধারী ঈশ্বর। মথুরানাথ তাঁহার মধ্যে দেবাদিদেব শিবকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন কালীকে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও তাঁহার মধ্যে স্বয়ং কালীকে দেখিতেন। দেখিতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দও। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কালীর নিকট উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, কালীর কাজ করিবার জন্যই স্বামীজীর দেহধারণ। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'কালীর কাজ' ছিল আসলে তাঁহারই 'কাজ'। সেজন্য সারদাদেবীর কাছে এবং স্বামী বিবেকানন্দের কাছেও 'কালীর কাজ' এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ ছিল সমার্থক। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ভক্তগণ শ্যামপুকুরবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কালীরূপে পূজা করিয়াছেন। শ্যামপুকুরে সেই ঐতিহাসিক কালীপূজার রাত্রিতে ভক্তদের অনুভূতিকে ছন্দে রূপ দিয়া পুঁথিকার প্রত্যক্ষদর্শী অক্ষয়কুমার সেন লিখিয়াছেন:

"কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি মা কালী তাঁহাতে।।"

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণই সাক্ষাৎ কালী। শক্তিসাধনার ইতিহাসে এই প্রথম উপাস্য এবং উপাসকের একীভবন ঘটিল। শক্তিসাধনার ইতিহাসে ইহা এক অনন্য ঘটনা।

এই অনন্যসাধারণ শক্তিসাধক দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে এবং কালীমন্দিরে তাঁহার অনন্যসাধারণ সাধনার মাধ্যমে ভারতের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। ঐ সাধনপীঠে বসিয়াই তিনি নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দের কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দের শক্তি-জাগরণের মধ্য দিয়া তিনি জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন সমগ্র পৃথিবীর শক্তিকে। সেই মহা-জাগরণের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর ধর্মমহাসভায়। একটি আহ্বানে, একটি সম্ভাষণে, একটি অতি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় সেদিন বিশ্বের মানুষ চমকিত হইয়া পৃথিবীর 'নূতন কলম্বাস'কে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। প্রত্যক্ষ করিয়াছিল নূতন পৃথিবীর নূতন শক্তিদেবতাকে। নবজাগ্রত ভারতবর্ষের শৌর্যময়

কণ্ঠস্বর সেদিন শুধু বিশ্বকেই সচকিত করে নাই, সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদের অভিঘাতে পরাধীন ভারতবর্ষে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। স্তিমিত ভারতের রক্তে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, শিকাগোয় স্বামীজীর ঐতিহাসিক আবির্ভাবের ছয়মাসের মধ্যে যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'এবার ফেরাও মোরে' কবিতায় এই অবিস্মরণীয় ছত্রগুলি লিখিয়াছিলেন—

"ওরে, তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা!
কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ-জনে! ...
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে-মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক। ..."

তখন তিনি বিবেকানন্দের ঐ পার্থসারথিতুল্য আবির্ভাব এবং ভারতে তাহার ব্যাপক প্রতিক্রিয়াকেই বাণীরূপ দিয়াছিলেন।

বস্তুত, সেই প্রতিক্রিয়া ছিল যেন এক 'পারমাণবিক' বিস্ফোরণ। ঐ বিস্ফোরণে প্রাণের নাশ হয় না, বরং মৃত প্রাণ ফিরিয়া পায়। স্তিমিত প্রাণে নূতন চেতনার জন্ম হয়। ঐ বিস্ফোরণের উৎস দক্ষিণেশ্বর। অরবিন্দ তাঁহার 'কারাকাহিনী'তে সেকথা লিখিয়াছেন। উচ্চপদস্থ দুজন ব্রিটিশ পুলিস আধিকারিকের নেতৃত্বে বিরাট পুলিসবাহিনী আলিপুর বোমার ষড়যন্ত্রের মস্তিষ্ক অরবিন্দকে তাঁহার গ্রে স্ট্রীটের (বর্তমানে অরবিন্দ সরণি) বাড়িতে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশির পর সন্দেহজনক 'ভয়ঙ্কর উপাদান' পান এক কৌটা মাটি। কৌটাটি অতি সন্তর্পণে তাঁহারা দেখিতে থাকেন, যেন ওটি ভয়ানক কোন বিস্ফোরক! এসম্পর্কে অরবিন্দ নিজেই 'কারাকাহিনী'তে (পৃঃ ৫-৬) লিখিয়াছেন ঃ "মনে পড়ে ক্ষুদ্র কাডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ! এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না।" শ্রীরামকৃষ্ণের চরণছোঁয়া দক্ষিণেশ্বরের মাটিতেই তো শ্রীরামকৃষ্ণের 'বজ্র' বিবেকানন্দের জন্ম!

বিশ্বজয় করিয়া বিরেকানন্দের ভারতবর্ষে পদার্পণের তিন দিন আগে ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ জন্ম হয় তাঁহার অগ্নিতনয় সুভাষচন্দ্রের। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বামীজীর বিশ্বজয়ের অভিযানকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রূপ দিবার জন্যই যেন সেদিনের নবজাতক সুভাষচন্দ্রের আগমন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, নেতাজী স্বামীজীকে তাঁহার 'গুরু' বলিয়া, তাঁহার জীবনের পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি মনে করিতেন ভারতের নবজাগরণের মহান স্রষ্টা।

স্বামীজী জানিতেন, ভারতের বাহির হইতে ভারতকে তিনি যে-আঘাত দিয়াছিলেন তাহাতেই শুরু হইয়াছিল ভারতের যথার্থ জাগরণ। স্বামীজী তাঁহার ভারতীয় অনুরাগিবৃন্দকে লিখিয়াছিলেন ঃ **"One blow struck outside of India is equal to a hundred thousand struck within."** **(Complete Works, Vol. V, 1985, pp. 117-118)**—ভারতের বাহির হইতে একটি আঘাত ভারতের ভিতর হইতে এক লক্ষ আঘাতের সমান। শিকাগো-যাত্রার আগে স্বামীজী ভারতবর্ষের মানুষের মনে চেতনা সঞ্চারের জন্য আঘাত দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তাহাতে তিনি সফল হন নাই। ভারতের বাহিরে তাঁহার বীর্যময় সংগ্রাম তাঁহার কাঙ্ক্ষিত সেই চেতনা সঞ্চারের কাজটিকে লক্ষ গুণে কার্যকর করিয়াছিল। এইখানেই, ঠিক এইখানেই, ঠিক ইঙ্গিতটি ধরিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র। ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের ভিতর হইতে আঘাত করিতে তিনিও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি সফল হন নাই। সেজন্যই ভারতের বাহিরে গিয়া সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুনের রণাঙ্গন হইতে মোক্ষম আঘাতটি ব্রিটিশকে দিয়াছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক। তিনি জানিতেন, শক্তির মহা বিদ্যুতাধার দক্ষিণেশ্বর। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনভূমি পঞ্চবটী, তাঁহার আবাসকক্ষ এবং রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত তাঁহার উপাসনালয় ভবতারিণী-মন্দির। সেখানেই তাঁহার 'গুরু' বিবেকানন্দের উদ্ভব। সেজন্যই তো শক্তি-সংগ্রহের জন্য সুভাষচন্দ্র যাইতেন দক্ষিণেশ্বরে, ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের আগে আনাইয়াছিলেন মা কালীর প্রসাদ আর নির্মাল্য। সেজন্যই কালীপূজার দিনটি ছিল তাঁহার কাছে এত প্রিয়। সেজন্যই ঐদিন আজাদ হিন্দের প্রতিষ্ঠা। সেজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণরূপী মহাকালীর সামনে ধ্যানে বসিয়া বিবেকানন্দের অগ্নিতনয় সুভাষচন্দ্র নিরত থাকিতেন তাঁহার মধ্যে মহাশক্তির দুর্বার জাগরণের লক্ষ্যে। সেই জাগরণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার রণহুঙ্কারই প্রধানত ব্রিটিশকে ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছিল। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভবতারিণী, রাসমণি, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং নেতাজী—এই সংযোগ এক অনিবার্য স্বর্ণসূত্রে সংগ্রথিত। ❑

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

Cosmic Song (বিশ্বের গীতি) আছে একটা। দিবারাত্রি তা চলছে। যোগীরা শুনতে পান গভীর রজনীতে। ঠাকুর রাত্রি একটা-দুটোর সময় এই সঙ্গীত শুনে প্রায় পাগলের মতো পোস্তাতে দৌড়াদৌড়ি করতেন। শাস্ত্রে একে অনাহত শব্দ-সঙ্গীত বলে।

মানুষ শুনতে পায় না—ইন্দ্রিয়, মন সব বিষয়ে মগ্ন। বিষয় থেকে, রূপরসাদি থেকে যখন মন সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়, তখন ঐ ছন্দ শুনতে পাওয়া যায়। কি আশ্চর্য, ঐ ছন্দ শুনলে অন্য সব আলুনি হয়ে যায়! (১২শ ভাগ, পৃঃ ৫২)

ঠাকুর বলেছিলেন, যেখানে মুড়ি-মিছরির একদর সেখানে থাকতে নেই। তাহলে শূলে যেতে হবে।

ঠাকুর একটি গল্প বলেছিলেন। এক গুরুর এক শিষ্য ছিল। গুরু-শিষ্যে উভয়ে সাধু। গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন, যেখানে দেখবে একসের মুড়ির যা দাম, একসের মিছরিরও সেই দাম, সেখানে থাকবে না।... শিষ্য ভ্রমণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাই একটা স্থানে এসে বসল। সেখানে সব জিনিস সস্তা। একসের মুড়িরও যা দাম একসের মিছরিরও সেই দাম। ইচ্ছা, এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করে আর ভাল করে খাওয়াদাওয়া করে শরীরটা সারিয়ে নেয়। গুরুবাক্য ভুলে গেছে। আছে বেশ, খায় বেড়ায়। শরীর হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে।

ঐদেশের রাজার দেবালয়ে নরবলি হয়। বধ্য নরপশুর সন্ধানে সব লোক বেরিয়ে পড়ল। শিষ্যকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলির সর্বপ্রকারে উপযুক্ত মনে করে ধরে নিয়ে এল। শিষ্য বসে কাঁদছে গুরুবাক্য স্মরণ হওয়ায়। গুরু তো ভগবান, তিনি ডাক শুনেছেন। পর্যটন করতে করতে তিনি সেইখানে উপস্থিত।... এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, তাঁর আপন শিষ্যই নরপশু! গুরুকে দেখে শিষ্য আরো কাঁদছে। গুরু ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। শিষ্যের শরীরে একটা ঘা ছিল, তা তিনি জানতেন। তাই তিনি রাজদরবারে গিয়ে বললেন, এই বলি অশাস্ত্রীয়। এই নরপশুর শরীর শুদ্ধ নয়। তখন ছেড়ে দেয়।

এমনতর কাণ্ড! মুড়ি-মিছরির একদর মানে গুরু-লঘু ভেদহীন। সে হয় ব্রহ্মজ্ঞানে সমাধিস্থ অবস্থায়। নিচে নামলেই ভেদ। জগতের নামই ভেদ—diversity। এতে বড়-ছোট, ভাল-মন্দ ভেদ আছে। মন্দ ছেড়ে ভাল নেওয়া—ঠাকুরের এই কথা।

বেদ-এ আছে, জ্ঞানবৃদ্ধকে মানতে হয়। একজন মানুষ অবতার, আরেকজন মানুষ ডাক্তার—দুইই সমান হয়ে গেল? তবে কেন ঋষিরা অত ভেদ দেখিয়েছেন? বয়োবৃদ্ধ, কুলবৃদ্ধ, বর্ণবৃদ্ধ, আশ্রমবৃদ্ধ, ধনবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ—কত কি! কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ, অর্থাৎ যিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন, তিনি হলেন সকলের শ্রেষ্ঠ। (১৩শ ভাগ, পৃঃ ২৩-২৪)

Untouchability (অস্পৃশ্যতা) দূর করতে অত চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে কৈ? কেন হচ্ছে না?... দয়া করে বা দেশপ্রীতিতে অভিভূত হয়ে একসঙ্গে বসে খেলেই কি হলো? এতেও superiority arrogance (উচ্চাভিমান) থাকে—আমরা উঁচু জাতি, নিচুদের সঙ্গে বসে খাচ্ছি।... ঠাকুর তাই বলেছিলেন, ভক্তিতে তা দূর হতে পারে, যদি ভাবা যায় সকলের হৃদয়ে ভগবান বাস করেন। অতএব সব জীব, সব মানুষ তাঁর পবিত্র মন্দির। তবে ভিতর থেকে ভেদভাব দূর হতে পারে।... ভেদের সঙ্গে অভেদ দৃষ্টি রেখে যে-সমাজ গড়ে ওঠে তারই নাম—ভারতের ভাষায়—'রামরাজ্য', 'স্বর্গ', 'সত্যযুগ'।

খালি মুখে বলে আর আইন করে কাজ হয় না। একেই বলে গায়ের জোরে করা। যদি law-ই rule (আইনই শাসন) করতে পারত তবে রক্ষা ছিল না। ঈশ্বর, অবতার, ঋষি, সাধু—এসবের দরকার হতো না।

Law কেবল বাইরেরটা সংযত করতে পারে। ভিতর সংযত করতে হলে, ভিতরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঈশ্বরের দরকার। তাই ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন এক-একবার।

ঠাকুর রসিক মেথরের বাড়ির নর্দমা চুল দিয়ে মুছেছিলেন। কেন? না, ব্রাহ্মণ-অভিমান দূর করতে। আবার ছোকরা নরেন্দ্রকে দেখে ছুটে চললেন আনতে, কেশব সেনকে বসিয়ে রেখে। এতে নরেন্দ্র পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ঠাকুরকে অনুযোগ করেছিলেন। বলেছিলেন: "আপনি পাগল হয়েছেন আমায় নিয়ে! কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় আমি!" একথা শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন ঠাকুর। বলেছিলেন: "ওরে, আমি কি বলছি একথা? মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন আমার নরেনের আঠারটা গুণ। কেশবের মাত্র একটা!" দেখ, এখানে আবার ভেদদৃষ্টি!

কেদার চাটুয্যে চলে যাচ্ছেন। অধর সেনের বাড়ি খাবেন না। জাত যাবে। ঠাকুর ডেকে নিয়ে গেলেন। আর পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন। এখানে ভেদের ভিতর অভেদ দৃষ্টি। (ঐ, পৃঃ ২৫-২৭)

ঠাকুর ভক্তদের ভিতর একটু গুণ যেই দেখলেন, অমনি ওটা টেনে বের করে ফেলতেন। যেমন আবর্জনার ভিতর যদি একটা gold bar (সোনার পাত) পড়ে থাকে, সেটাকে যেমন লোক বের করে নেয়। ঐ গুণটা ভক্তদের কাছে এত বড় করে ধরতেন যে, ভক্ত শুধু ওটাই চিন্তা করত। আর ওটাকে ধরে ওপরে উঠে পড়ত। তার ফলে প্রতিকূল সংস্কারগুলি নিচে পড়ে যেত। এ-গুণটি অবতারে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়, ঠাকুরের আচরণে দেখেছি। একজন হয়তো একটিমাত্র ভজন জানে। তাকে সেইটি গাইতে বলতেন। এইটি ধরে একটি রাস্তা করে

দিলেন ভক্তকে, ঠাকুরকে চিন্তা করতে। এমন যদি বলতেন—আমাকে চিন্তা কর, তাহলে হয়তো করবে না। তাই ঐ পথে ঠাকুরের সঙ্গে ঐ গানটি যোগ করে ভক্তের দ্বারা ঠাকুরের চিন্তা করিয়ে নিতেন ঠাকুর স্বয়ং। ভক্ত ভাবছে, পরমহংসদেব ঐ গানটি শুনতে ভালবাসেন। গানকে অবলম্বন করে ঈশ্বরকে—নিজেকে চিন্তা করিয়ে নিতেন তিনি।

ঠাকুর একটা গুণ ধরে এমন টান দিতেন যে, মন্দ সংস্কারগুলি আর মাথা তুলতে পারত না। তীব্র প্রতিকূল সংস্কার মাথা তোলে বটে, কিন্তু বারবার আঘাত খেয়ে নিচে পড়ে যায়। অবতারাদি পারেন এটা। এক ছোবলেই খতম—যেমন কেউটের ছোবল।

শশীর (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) সেবার ভাব। তাকে ঐটি ধরে টেনে নিলেন। ঠাকুর তাকে বলতেন, এক পয়সার বরফ আনবি। কোথায় কলকাতা আর কোথায় দক্ষিণেশ্বর—পাঁচ-ছয় মাইল ব্যবধান। ছেলেমানুষ, পয়সা নেই। কোনরকমে দু-চার পয়সা যোগাড় করে বরফ কিনে কাপড়ে জড়িয়ে হেঁটে হেঁটে চলল দক্ষিণেশ্বর। উঃ, কি রৌদ্র গ্রীষ্মের! ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে আনন্দ—ঠাকুর খাবেন। শেষে কি সেবা! মন প্রাণ শরীর অর্পণ করে সেবা করল ঠাকুরের—যেন মহাবীরের মতো সেবা।

লোকে এসব দেখবে না, খালি খুঁত ধরে অপরের! কে একটু বেশি সন্দেশ নিলে, কে দুখানা লুচি বেশি খেলে—এসবে নজর!

ঠাকুরের পার্ষদদের আচরণ তো দেখা উচিত, যারা তাঁর চিন্তা করছেন। তিনি এইসব লোকের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ত্রিশ বছর কাটালেন। সকলের গুণ নিয়ে একটি মধুচক্র রচনা করলেন। তবে শান্তি, তবে সুখ। (১২শ ভাগ, পৃঃ ৯০-৯২)

চৈতন্যদেবের সময়ের একটি লোক পেলে আমরা কি দৌড়ে যাব না দেখতে? তেমনি ঠাকুরের কথা। তা শুনতে তো লোক আসবেই, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘর করেছেন—তাঁদের কাছে। আমরা তাঁর contemporary (সমসাময়িক)। তাই লোক আসে তাঁর সম্বন্ধে evidence (সাক্ষ্য) নিতে, examine (পরীক্ষা) করতে। ছেলেখেলা!

অবতার যখন আসেন তখন সকলে দাঁড়িয়ে যায় পরখ করতে। বিশ্বাসী কয়েকজন মাত্র নেয়। বাকি লোক পরখ করে। তাতে টিকলে তখন নেয়। তারপর তাঁর কথায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাঁকে যারা জীবনের ধ্রুবতারা করে নিয়েছে—তাদের জীবনও দেখে। তাদের কথা শুনে যদি বোঝে ঠিক, তবে নেয়। আমাদের কাছে যে লোক ছুটে আসে, এতে আমাদের বাহাদুরী নেই। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বলে আমাদের দাম। নইলে কিছু নয়।

Contemporary লোক ভাব অনেকটা ঠিক রাখতে পারে। তারপর mixture (মিশ্রণ) হয়ে যায়। Mother tincture (মূল নির্যাসটি) আর পাওয়া যায় না তখন। First-hand evidence (চোখে দেখা, কানে শোনা সাক্ষ্য) চলে যায়। তারপর first-hand evidence and second-hand evidence diluted (মিশ্রিত) হয়ে যায়। আসল জিনিস আর তখন পাওয়া যায় না।

'কথামৃত' পুস্তকাকারে ছাপার পূর্বে স্বামীজী দেখেছিলেন। (১৩শ ভাগ, পৃঃ ৩৫-৩৬)

ঠাকুর যে ভক্তদের টেনেছিলেন, সে কি বুদ্ধি দিয়ে? তা নয়। দরদ দিয়ে, ভাব দিয়ে সকলকে কিনে ফেলেছিলেন। তার ফলে ভক্তরা প্রাণ দিয়ে তাঁর জীবন ও বাণী জনসমাজে প্রচার করল—সকলের কল্যাণের জন্য, সুখ শান্তি আনন্দের জন্য। ভাবাবেগই বড়, হৃদয়ই বড়, বুদ্ধি ছোট। (ঐ, পৃঃ ৮৬)

(জনৈক ব্রহ্মচারীর প্রতি) আপনারা ধন্য! আপনারা সর্বস্ব ছেড়ে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছেন। আর আদিগঙ্গাতটে সাধুসঙ্গে গদাধর আশ্রমে রয়েছেন। আবার মহাতীর্থ কালীক্ষেত্র! ঠাকুর নিজ চক্ষে মা কালীকে দেখেছিলেন, জীবন্ত কুমারীর বেশে ফড়িং নিয়ে খেলা করছেন অপর বালিকাদের সঙ্গে। ফড়িং ধরছেন আর একটি অতি সূক্ষ্ম তৃণ তার পিছনে লগ্ন করে দিচ্ছেন। ফড়িংটা ঐ তৃণটি নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর মা হাততালি দিয়ে আনন্দে নৃত্য করছেন। (ঐ, পৃঃ ১০৭)

ঠাকুর কি কেবল সাধুসঙ্গের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন? তা নয়। উত্তম সব সাধু সৃষ্টি করে গেছেন। এঁদের সঙ্গ করলে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। কারণ, ওঁরা যে সর্বত্যাগী! ঠাকুরের স্পর্শে সব দেবতা হয়ে গেছেন!

সাধুসঙ্গ করলে আরেকটা বিশেষ উপকার। কে সত্যিকার আপন, কে পর তা জানা যায়। যে ভগবানের পথে নিয়ে যায় সে-ই সত্যিকার আপন। আর সব পর। এতে বোঝা যায়, যাদের আমরা আপনার বলছি তারা সত্যিকার পর। আর যে পর, সে যদি ভক্ত হয়—সে সত্যিকার আপন। এতে ঘোরাফেরা, ধোঁকা থেকে বেঁচে যায়। বোঝা যায় যথার্থ বন্ধু সাধু। সাধুর definition (সংজ্ঞা)-ও ঠাকুর দিয়েছেন। বলেছেন, যার কাছে বসলে আপনি মনে ওঠে—ঈশ্বরই কেবল আপনার, সংসার অনিত্য, ঈশ্বর সত্য—তিনিই সাধু। দেখ, কত উদার মত। এইসব সাধু বেলুড় মঠে থাকেন। (ঐ, পৃঃ ১১১) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১২শ এবং ১৩শ ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

পরিমার্জনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

স্বামী ভূতেশানন্দ

ভগবান অবতার-রূপে যখন আবির্ভূত হন তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর লীলা-সহচরেরাও আসেন। একথা অবতারদেরই শ্রীমুখে আমরা শুনতে পাই। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'কলমির দল'—একটিকে টানলেই অন্যগুলো উঠে আসে। তিনি অবতীর্ণ হলে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরাও স্বভাবতই তাঁর লীলাসহচর-রূপে আবির্ভূত হন। সকল অবতারের ক্ষেত্রেই এরকম হয়। 'ভাগবত'-এ আছে, শ্রীকৃষ্ণের দেহধারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীরাও তাঁর লীলাসহচর-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক হয়েও বহু, কাজেই বহু-রূপে আবির্ভূত হন। মনে রাখতে হবে, এই পার্ষদেরা তাঁরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। এঁদের মধ্যে কাউকে 'অঙ্গদেবতা' এবং কাউকে 'আবরণ-দেবতা' বলা হয়।

'চণ্ডী'তে আছে, দৈত্যদলনের সময় অন্যান্যরা দেবীর সহচর ও সহচরী-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অসুর দেবীকে বলছে : তুমি একা নও, অন্যের সাহায্য নিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ। দেবী বলছেন :

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।।" (১০।৫)

—এই জগতে আমি একা, আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? এরা আমার বিভূতি, আমাতেই সমাবিষ্ট হচ্ছে।

ভগবানও এইরূপ বহু সহচর নিয়ে লীলা করেন। কেন করেন? তাঁর ইচ্ছা। এইভাবেই তিনি খেলতে চান, তাই খেলেন। একলা একলা খেলে যেন তাঁর তৃপ্তি হয় না, তাই বহু সহচর নিয়ে তাঁর খেলা। অন্যান্য অবতারেরা দূরের, শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতার আমাদের কাছে নিকটতম প্রকাশ। তাই তাঁর সম্বন্ধে যতটা স্পষ্টভাবে জানা যায়, অন্যান্য অবতারদের সম্পর্কে ততটা নয়।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের সান্নিধ্যলাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তাই আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদরা যত বাস্তব, যত সত্য এবং যত নিকটে, অপরের কাছে তা নয়। এঁদের মাধ্যমেই অবতার সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা সম্ভব তা পাওয়া যায়। অবতার যখন তাঁর গূঢ় স্বরূপকে প্রকট করেন তখন তাঁকে চেনা খুব কঠিন হয়। সেজন্য নিজেকে আরো সহজবোধ্য করতে তিনি যেন তাঁর পার্ষদদের মধ্যে বিরাজিত থাকেন। তাঁদের অপেক্ষাকৃত কাছের বলে মনে হয়, সুতরাং বোঝা একটু সহজ।

শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের অন্যতম স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ নিজেকে এত প্রচ্ছন্ন রেখে এসেছেন যে, তাঁর সম্বন্ধে, বিশেষ করে তাঁর বাল্যকালের ইতিহাস কেউই জানে না। যতটুকু তাঁর কথা থেকে প্রকাশ পেয়েছে তা-ই একত্র করে তাঁর ক্ষুদ্র জীবনীতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সেই জীবনী এত অসম্পূর্ণ যে, তার থেকে তাঁকে স্পষ্টভাবে ধারণা করা সম্ভব নয়। এইটুকু পাই যে, তিনি এক অখ্যাত বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। পড়াশুনা বা কোনপ্রকারের আভিজাত্য তাঁর ছিল না। মান, যশ, অর্থ কিছুই ছিল না। খুব দরিদ্রের ঘরে তাঁর জন্ম। তাঁর দু-চারটি কথা যা শুনেছি তা থেকে মনের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি করতে পারি।

বিহারের ছাপরা জেলার এক গ্রামে তাঁর জন্ম। শৈশবেই অনাথ। প্রতিপালিত হয়েছেন কাকার বাড়িতে। তাঁরও অবস্থা ভাল ছিল না, তবুও সেই অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকেও নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য মেষপালন করতে হতো। পরে কাকার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়লে দেশে আর থাকা সম্ভব হলো না। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁর কাকা কলকাতায় এলেন এবং স্বগ্রামবাসী ফুলচাঁদের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভৃত্যরূপে রাখার ব্যবস্থা করলেন। ছোট ছেলের পক্ষে যতটা করা সম্ভব সেইমতো কাজ তাঁকে দেওয়া হতো। তবে রামচন্দ্রের ভক্ত পরিবার, কাজেই সেখানে তিনি ঠিক ভৃত্যের মতো নয়—বাড়ির ছেলের মতোই ব্যবহার পেতেন। রামবাবুর মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, বাজার করা, ফাইফরমাশ খাটা—এই ছিল তাঁর কাজ। তাঁর নাম ছিল 'রাখতুরাম'। মানে—হে রাম, এই ছেলেকে রক্ষা কর। শৈশবে মাতৃহারা হয়ে তিনি মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। রামচন্দ্র দত্তের স্ত্রীকে তিনি 'মা' বলতেন এবং তাঁর কাছ থেকেই কতকটা মাতৃস্নেহের আস্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু এত বড় নাম তো ব্যবহার করা যায় না, তাই তাঁকে 'লাল্টু' বলা হতো। ঠাকুর তাঁকে 'লাটু', 'লেটো', 'নেটো' ইত্যাদি নামে ডাকতেন।

লাটু রামচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। রামচন্দ্র যে স্বেচ্ছায় ঠাকুরের সঙ্গে লাটুর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তা নয়, দৈবক্রমেই হয়। কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়েই ঠাকুর অবাক হয়ে দেখলেন, ছেলেটির ভিতরে অসাধারণ সব শুভ লক্ষণ। রামচন্দ্রকে বললেন ঃ "তুমি এই ছেলেটিকে কোথায় পেলে? এর ভিতরে যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।" রামচন্দ্র কোন উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে ঠাকুর বুঝলেন, তাঁর পার্ষদদের একজন অখ্যাত, অজ্ঞাত এই বালকরূপে তাঁর কাছে এসেছে। প্রথম দর্শনেই তাই তিনি আকৃষ্ট হলেন। তারপর কখনো রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে, কখনো বা তাঁর দ্বারা প্রেরিত হয়ে লাটু একলা ঠাকুরের কাছে জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন। এইভাবেই তিনি ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। ছোট থেকেই লাটু খুব সৎ স্বভাবের ছিলেন, সাধারণ চাকরের মতো নয়। ঠাকুরকে দেখে তিনি যেন একটা নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। তখন রামচন্দ্রের বাড়িও তাঁর আর ভাল লাগত না। ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠত। রামচন্দ্র ভক্ত, তাই তাঁকে বাধা দিতেন না। বরং ঠাকুর যে লাটুকে আপনার বলে গ্রহণ করেছেন এতে রামচন্দ্র আনন্দই পেতেন।

ভাগনে হৃদয় ঠাকুরের সেবক ছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হলে সেবকের অভাব বোধ হতে লাগল। নিজের ব্যবস্থা নিজে করা ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অধিকাংশ সময়ই তিনি ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। কালীবাড়ি থেকে একজন হিন্দুস্থানী যুবককে তাঁর দেখাশুনা করার জন্য নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু ঠাকুরের তাতে অসুবিধা দূর হলো না। তিনি রামচন্দ্রকে বললেন ঃ "রাম, তুমি ছেলেটিকে এখানে রাখলে আমার কিছু সাহায্য হয়।" বলাবাহুল্য, ঠাকুরকে অদেয় রামচন্দ্রের কিছুই ছিল না। তিনি সানন্দে রাজি হলেন এবং বালক লাটুও অপার আনন্দ লাভ করলেন। এর আগে কোন অজুহাত খুঁজতে হতো ঠাকুরের কাছে আসার জন্য, এখন তার দরকার হবে না।

লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে সেবা করতেন, অবতাররূপে? তিনি বলেন ঃ "বাবা, ভগবান-রূপে দেখলে কি তাঁর কাছে থাকা যায়, না তাঁর সেবা করা যায়? সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছে বলে আনন্দে পূর্ণ হয়ে সেবা করা। অকিঞ্চনভাবে সেবা, আর যদি কিছু চাইতেই হয় তো কেবল ভক্তি, সেবার অধিকার—এইটুকু চাওয়া।" তাঁর মনে কোন প্রশ্নও ছিল না। সরল মন, কোন জটিলতা তাতে আসত না। আগেই বলেছি, তিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। মজার কথা, যে-ঠাকুর নিজে লেখাপড়া তেমন শেখেননি, সেই তিনিই লাটুকে লেখাপড়া শেখাতে বসলেন। অ আ শেখাবার পর ক খ শেখাবার সময় ঠাকুর বললেন ঃ "বল ক।" সে বলে ঃ "কা।" ঠাকুর বললেন ঃ "কা নয় রে, বল ক।" সে আবার বলে ঃ "কা।" ঠাকুর বললেন ঃ "আরে, এখানেই যদি 'কা' বলবি, তবে 'ক'-এ আকারকে কি বলবি?" কিন্তু লাটু মহারাজ হিন্দুস্থানী উচ্চারণে 'ক'-কে 'কা'-ই বললেন। শেষকালে ব্যর্থ হয়ে ঠাকুর বললেন ঃ "যা, আর তোর পড়ে দরকার নেই।"

লেখাপড়া তিনি শেখেননি, কিন্তু যে-বিদ্যা মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে, সেই বিদ্যা ঠাকুরের কাছ থেকে তিনি অফুরন্তভাবে পেয়েছেন। দিবারাত্র ঠাকুরের সঙ্গে থেকে, সেবা করে, তাঁর প্রতি অগাধ ভালবাসার পরিণতিতে যে আত্মবিদ্যায় তিনি মগ্ন হয়েছিলেন তা বিস্ময়কর। ঠাকুর লেখাপড়া না শিখলেও শাস্ত্রাদি শুনেছেন, বহু বিদ্বান লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। বেশি না জানলেও লেখাপড়া কিছু করেছেন। লাটুর কিন্তু বর্ণপরিচয়ের জ্ঞানও ছিল না। মেষপালকের জীবন, পরিবারের মধ্যে তাই বিদ্যার্চর্চার অবকাশ ছিল না। রামবাবুর বাড়িতেও ভৃত্যের কাজ, পড়াশুনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই সরলমতি বালকের ভিতরে ঠাকুর কি করে অগাধ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেছেন তা বিস্ময়ের।

স্বামীজী তাই বলেছেন ঃ "লাটু ভগবানের একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। আমরা সদ্বংশজাত হয়ে, লেখাপড়া করে, সভ্য সমাজের সঙ্গে মিশে একভাবে জীবনকে তৈরি করেছি। তারপর ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর সান্নিধ্যে সাধনভজন করেছি। যখন সাধনভজনে মন লাগেনি তখন পড়াশুনা বা অন্য পাঁচরকম ভাবে মনকে নিবিষ্ট রাখতে শিখেছি। কিন্তু লাটুর ধ্যান-ভজন ছাড়া আর কোন অবলম্বন ছিল না। কেবল ধ্যান-ভজনকে অবলম্বন করে এত সুন্দরভাবে জীবন কাটানো সহজ কথা নয়।" লাটু মহারাজ জীবনের ওপর কখনো বীতশ্রদ্ধ হননি। ঠাকুর যে-আনন্দের স্বাদ তাঁকে দিয়েছেন, তা তাঁকে মগ্ন করে রাখত সবসময়। ঠাকুরের প্রতি ভালবাসায়, ঠাকুরের এক-একটি কথা তাঁর জীবনের সম্বল হয়ে থাকত এবং তার দ্বারাই সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হতো। একেবারে মূর্খ বালকটিকে ঠাকুর কী না শিখিয়েছেন! সাধন-ভজন তো বটেই, তাছাড়া সভ্য সমাজে কি করে চলতে হয়—কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। পরবর্তী কালে ভক্তদের উপদেশচ্ছলে তিনি যা বলতেন, 'সৎকথা' নামক গ্রন্থে তার কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাতে লাটু মহারাজের যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তা সকলকে চমৎকৃত করে। এই মূর্খ, অশিক্ষিত ছেলেটির ভিতরে এত বিদ্যা কে দিল, কি করে এল?

এইসব দেখে স্বামীজী লাটু মহারাজের নামকরণ করেছিলেন 'স্বামী অদ্ভুতানন্দ'। সত্যই তিনি সর্বপ্রকারে অদ্ভুত। তাঁর জীবন আমাদের কাছে শুধু অদ্ভুত নয়, অপূর্বত্বেও ভরা। তাঁর জীবন ছকবাঁধা ছিল না, গোড়া থেকেই ছিল না। ঠাকুর শিখিয়েছিলেন কিভাবে জপধ্যান করতে হবে, কিন্তু কখন করতে হবে তা বলেননি। তাই তাঁর নিয়ম ছিল না কিছু। তাঁর ছিল ধ্যানপ্রবণ মন, জপ এবং ধ্যানে ছিল তাঁর

সহজাত অনুরাগ ও আগ্রহ। এমনই অনুরাগ ও আগ্রহ যে, যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা বসেছেন আর তন্ময় হয়ে গিয়েছেন। অনেক সময় তিনি গঙ্গার ধারে কোথাও বসে কাটিয়ে দিতেন, বৃষ্টি হলে অন্যত্র আশ্রয় নিতেন। এরকম বর্ণনা আছে যে, বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য একবার তিনি গঙ্গার ধারে যে রেললাইন আছে সেখানে এক মালগাড়ির ভিতরে ধ্যানে বসে গিয়েছেন। এমন গভীর ধ্যানস্থ যে, পরে ইঞ্জিন জুড়ে সেই গাড়ি তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাও কিছু জানতে পারেননি। তারপর যেখানে মাল ভর্তি করা হবে সেখানে কুলিরা দেখে, গাড়ির ভিতরে ধ্যানস্থ সাধু! তখন তাঁকে ডেকে সেখান থেকে বের করা হয়। কল্পনা করা যায় না যে, কি করে এত গভীর ধ্যান সম্ভব! বাগবাজারের ঘাটে খড়ের নৌকা থাকত, তিনি তার ওপর বসে ধ্যান করতেন। নৌকার মাল্লাদের একজন দেখে, খড়ের মধ্যে এক সাধু ধ্যানে বসে আছেন। তারা ডাকাডাকি করে ধ্যান ভাঙায়। নামিয়ে দিতে বলায় তারা নামিয়ে দিল। সেখান থেকে হেঁটে ফিরে আসেন।

এমনই ধ্যানতন্ময়তা যে, কোথায় ধ্যান করবেন, কখন ধ্যান করবেন কোন ঠিক নেই। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি নির্জনতা খুঁজে নিতেন। প্রথম জীবনে সন্ধ্যায় ঘুমোচ্ছেন দেখে ঠাকুর বকেছেন, বলেছেন : "এমন সময় কোথায় ভগবানের নাম করবি, না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিস?" তিনি তখনি সঙ্কল্প করলেন, আর রাতে ঘুমোবেন না। তারপর থেকে সমস্ত রাত তিনি ধ্যানজপে কাটাতেন। ঠাকুরের কথা এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা লাটু মহারাজের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এইভাবে দিনের বেলায় তিনি অনেক সময়ই ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। বরানগর মঠে প্রায়শই চাদর মুড়ি দিয়ে থাকতেন। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা বুঝতেন যে, তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। খাওয়ারও হুঁশ থাকত না। ডেকে ডেকে ধ্যান ভাঙিয়ে খাওয়ানো হতো। এমনও হয়েছে, খাবার কাছে রাখা আছে। সমস্ত দিন কেটে সন্ধ্যার সময়ও দেখা গেল, খাবার যেমনি রাখা হয়েছিল তেমনি পড়ে আছে, তিনি ধ্যানস্থ। আবার ডেকে ডেকে ধ্যান ভাঙিয়ে খাওয়ানো হলো। এত গভীর ধ্যানতন্ময় সাধু যে, মঠের নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে তিনি খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফিরে মঠে নিয়মকানুন প্রবর্তন করলেন—ভোর চারটের সময় ঘণ্টা বাজবে, তখন সকলকে উঠে ধ্যান করতে হবে। প্রথম দিনেই স্বামীজী দেখলেন, লাটু মহারাজ তাঁর বিছানা বগলে করে চলে যাচ্ছেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন : "কোথায় যাচ্ছিস?" তিনি উত্তর দিলেন : "ভাই, তোমার মঠে আমি থাকতে পারব না। ঐ ঘণ্টা বাজবে আর ধ্যান করতে হবে, ও পারব না। যখন ভাব মনে আসবে তখন ধ্যান করব। তাই চলে যাচ্ছি।" স্বামীজী কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন : "তাহলে আর কি করবি, যা।" লাটু মহারাজ বাইরে চলে যেতেই স্বামীজী তাঁকে ডেকে বললেন : "এই নিয়মকানুন যা হয়েছে এ তোর জন্য নয়। যারা নতুন ব্রহ্মচারী আসছে তাদের জন্য। তাদের জীবন তো গড়তে হবে। তুই যেমন থাকবি থাক, তোকে এই নিয়মের ভিতর চলতে হবে না।" লাটু মহারাজ ফিরে এলেন, কিন্তু বেশিদিন থাকা হলো না। কোন জায়গায় বেশি দিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যখন যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতেন। কিছুদিন এক জায়গায় থেকে আবার অন্য জায়গায় চলে যেতেন। থাকা-খাওয়া কিছুরই ঠিক ছিল না, কোথাও যদি তাঁকে যত্ন করে রাখা হতো তো বলতেন : "আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে আমি থাকব না।"

একসময় বলরামবাবু নিজের বাড়িতে তাঁকে যত্ন করে রেখেছিলেন, কিন্তু সেখানেও খাওয়ার সমস্যা। কখন খাবেন? বৃহৎ পরিবার, একটা সময় আছে যখন সকলকে খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু লাটু মহারাজ যে ঐসময় খাবেন তার কোন স্থিরতা নেই। তিনি দেখলেন, এতে সকলকে বিরক্ত করা হবে, তাই চলে যাওয়া স্থির করলেন। তখন তাঁকে বোঝানো হলো, তাঁর জন্য কোন নিয়ম নেই। তিনি যখন ইচ্ছা খাবেন, যখন ইচ্ছা শোবেন, কোথাও যেতে হলে যখন ইচ্ছা যাবেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য দিলেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করতেন। কোথাও খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন না। তাই তিনি মঠে কখনো দীর্ঘকাল বাস করতে পারেননি। না পারলেও মঠের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, অনুরাগ, ভালবাসা ছিল অপরিসীম। গুরুভাইদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা, যদিও তাঁর জীবনযাত্রা, ভাবগতিক কারো সাথে মিলত না। তাঁরাও জানতেন, ঠাকুরের এই সন্তানটি অপূর্ব—অদ্ভুত। এইভাবেই তাঁকে সমস্ত জীবন চলতে দিতে হবে। তিনি কাশীতেই শেষ জীবনটা কাটিয়েছেন। তাও এক জায়গায় নয়, জায়গা বদলে বদলে কাটিয়েছেন। সেখানে তবু জীবন কতকটা স্থিত ছিল। তখন গঙ্গার ধারে বা ছাদের ওপরে খাপছাড়াভাবে থাকতেন না, এক জায়গাতেই থাকতেন। কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে অনিয়মটা তাঁর চিরকাল ছিল। ইচ্ছা হবে খাবেন, না হলে পড়ে থাকবে। শেষকালে অনেক সাধ্যসাধনা করে তাঁকে খাওয়াতে হতো। তাঁর মন এমন ধ্যানের গভীরে থাকত যে, বাহ্যজগতে, এমনকি খাওয়ার দিকেও মন দিতে যতটা বাহ্যজ্ঞান দরকার, ততটাও দিতে চাইত না। এইজন্য লাটু মহারাজের জীবন ছিল অদ্ভুত।

তাঁর জীবনের ত্যাগ-বৈরাগ্য অসাধারণ। একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। জগন্মাতার কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন : "আমাকে এমন বর দাও যে, যা খাব তাই হজম হবে।" সবাই শুনে অবাক, এ কি বর চাওয়া! তিনি বললেন : "আমি সাধু, কোথায় কি খাব তার ঠিক নেই। আর শরীর যদি সহ্য করতে না পারে তাহলে তা সাধনের উপযোগী থাকবে না।" পরবর্তী জীবনে দেখি, জগন্মাতা তাঁর সেই প্রার্থনা শুনেছিলেন। কারণ তাঁর যা খাওয়া ছিল, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই খাবার খেয়ে জীবনধারণ অসম্ভব। অনেক সময়

তিনি ছোলাভাজা খেয়ে কাটাতেন অথবা ছোলা জলে ভিজিয়ে খেতেন। আর উপবাস তো আছেই। খাদ্যের অভাবের প্রশ্ন ছিল না, কারণ ঠাকুরের ভক্তদের সকলেরই লাটু মহারাজের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁকে সকলে ভালবাসতেন, কিন্তু খাওয়াটা তাঁর কাছে ছিল গৌণ। এরকম ঘটনাও ঘটেছে যে, তিনি কাপড়ে ছোলা বেঁধে ইঁট চাপা দিয়ে গঙ্গায় ডুবিয়ে রেখে ধ্যান করছেন। তখন ভাটা ছিল। জোয়ার এসে ওটা ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনি বসে রয়েছেন। আরো ধ্যান করবেন। তারপর জোয়ার গিয়ে ভাটা এসেছে, ছোলা দেখা গিয়েছে, সেটি খেয়ে আত্মরক্ষা করলেন। খেয়ালী সাধু, কিন্তু এমন অদ্ভুত খেয়াল ছিল যা কখনো তাঁর সাধন-জীবনের পরিপন্থী হয়নি, সবই অনুকূল হয়েছে। খেয়ালের বশে ঠাকুরের সেবার কোন ত্রুটি কখনো হয়নি। মায়ের কাছে থেকে মায়ের সেবা করেছেন, সেখানেও কোন ত্রুটি ছিল না। রামবাবুর শেষ সময়ে তাঁর সেবা করেছিলেন। কিন্তু নিজের দেহরক্ষার জন্য যাকিছু করতে হতো, সেগুলো সব খেয়ালে পূর্ণ। দেহত্যাগের পূর্বে বলেছিলেন, খাব না। মহাপ্রয়াণের জন্য তখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কাজেই খাওয়া বন্ধ করছেন। সেবক বলত ঃ "আপনি না খেলে আমিও খাব না।" তখন স্নেহপরবশ হয়ে খেতেন। শেষদিনে সেবক যখন ঐকথা বলছে, অমনি বললেন ঃ "মৎ খা।" ভাবটা হলো—খাবি না তো খাবি না। তখন আর ভক্তের প্রতি স্নেহ নেই। মনকে নিচে নামিয়ে আনতে পারছেন না। অদ্ভুত! বস্তুত, ত্যাগ-বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের আচরণে তাঁর এমন অবিচল নিষ্ঠা ছিল যে, সেখানে তাঁর একটুও খেয়ালিপনা ছিল না। সদা সতর্ক থাকতেন।

একটি ঘটনা আছে। মা জয়রামবাটী থেকে এসেছেন। বলরামবাবুর বাড়িতে ঢুকেই ডানদিকে যে-ঘর, সেখানে লাটু মহারাজ থাকতেন। মা এসে বলছেন ঃ "বাবা লাটু, কেমন আছ?" লাটু মহারাজ বলছেন ঃ "তুমি এখানে এসেছ কেন, আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতে! তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে বাইরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ?" বলে মাকে বকছেন। ছেলে যেমন মায়ের ওপর রাগ করে সেইরকম। পূজ্যভাব থাকা সত্ত্বেও মাকে কত আপন মনে করতেন তা তাঁর কথাতেই বোঝা যায়। কিন্তু যখন কাশীতে ছিলেন, মা কাশী এলে সবসময় তিনি মায়ের কাছে যেতেন না। কেউ যদি কখনো বলত ঃ "মহারাজ, আপনি মায়ের কাছে যাবেন না?" বলতেন ঃ "তোর মাঠাকরুন কে আমি জানি না।" তারপর একদিন বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা পূজা করতে যাবেন, পথে বললেন ঃ "চল মার কাছে যাই।" মার চরণেই পূজার উপকরণ সব ঢেলে দিলেন, সেখানেই তাঁর অন্নপূর্ণার পূজা হলো। চিরকাল তিনি মা-ঠাকুরের অদ্ভুত বালকই রয়ে গেলেন।

আমি তাঁকে দেখবার সুযোগ পাইনি। কারণ, তিনি শেষজীবন কাশীতেই কাটিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দর্শন করার সুযোগ হয়নি। কখনো মনে হয়, হয়তো কাশীতে তাঁকে দর্শন করেছি, কিন্তু তার স্মৃতি এতই অস্পষ্ট যে তা মনে পড়ে না। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি চিরকাল উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করেছেন। সত্যিই ঠাকুরের এক 'অদ্ভুত' সৃষ্টি স্বামী অদ্ভুতানন্দ। তাঁর জীবন আমাদের কাছে চিরকাল অদ্ভুত হয়েই থাকবে।

লাটু মহারাজের প্রতি ঠাকুরের অন্য সন্তানদের শ্রদ্ধা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কাশীতে তাঁর দেহান্ত হয়। তুরীয়ানন্দ মহারাজও কাশীতে থাকতেন। তিনি একটি পত্রে লাটু মহারাজের শেষদিনের বর্ণনা করেছেন। পড়লে বিস্ময় লাগে, শাস্ত্রজ্ঞ সাধক মহাপুরুষ স্বামী তুরীয়ানন্দ কি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে লাটু মহারাজকে দেখতেন! লাটু মহারাজের শরীর চলে গেছে খবর পেয়ে তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন! তাঁকে বসিয়ে পূজা করা হচ্ছে। তাঁর মুখ দেখে তুরীয়ানন্দজী বিস্মিত হলেন। তাঁর চোখ আগে স্তিমিত থাকত, ধ্যানস্থ অবস্থায় অর্ধনিমীলিত থাকত। সেই দৃষ্টি এখন স্পষ্ট, চোখ খোলা। আর সেই চোখের দৃষ্টি এমন যে, সকলকে যেন তিনি আশীর্বাদ জানাচ্ছেন, সকলের কল্যাণ কামনা করছেন। ভারি সুন্দর বর্ণনা! মহাপুরুষরাই মহাপুরুষকে চিনতে পারেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। দূর থেকে দেখে, তাঁদের মুখ থেকে শুনে সেইগুলি গ্রথিত করে হয়তো কেউ কেউ তাঁর অসম্পূর্ণ জীবনী রচনা করেছেন। তাতে জীবনের ঘটনার বৈচিত্র্য বেশি নেই। ভক্তরা যারা তাঁর কাছে আসত, তাঁর কাছে যে উপদেশ লাভ করত তা সংগ্রহ করে 'সৎকথা' নামক গ্রন্থে বেরিয়েছে। কিন্তু তাও অসম্পূর্ণ। কারণ, তাঁর জীবন এত আত্মস্থ যে, অন্তরঙ্গ সেবকরাই বা তার পরিচয় কতটুকু পেয়েছে! তিনি অগাধ সমুদ্র, তলদেশ স্পর্শ করে তাঁর ভাবকে বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্য নেই। তাই হরি মহারাজের বর্ণনাটি আমাদের কাছে তাঁর মহত্ত্বকে, তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতাকে, তাঁর জীবনের অপূর্বতাকে পরিস্ফুট করে দেয়।

আমরা লাটু মহারাজের অপূর্ব জীবন যদি ধ্যানের ভিতরে আনতে চেষ্টা করি, তাহলে হয়তো কতকটা অস্পষ্ট ধারণা হতে পারে। তাঁকে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁর সঙ্গে মিশেছেন—এমন লোক আর হয়তো এখন পাব না, সুতরাং তাঁর জীবনীর ওপরই নির্ভর করতে হবে। তাছাড়া বিশেষ করে নির্ভর করতে হবে তাঁর গুরুভাইদের বর্ণনার ওপর। তাঁরা তাঁর মূল্যায়ন করতে সমর্থ এবং সেই মূল্যায়নকে ভিত্তি করে আমরা সেই অপূর্ব জীবনের তাৎপর্য, তার ভাবগম্ভীর রূপ, আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের কতকটা ধারণা করতে পারি। সেই মহাপুরুষের চরণে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করছি।* ❑

---

* স্বামী অদ্ভুতানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (যোগোদ্যান) প্রদত্ত পরম পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণ। সন-তারিখ আমরা জানতে পারিনি।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

জীবন আমাকে যে-শিক্ষা দিয়েছে

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই স্মৃতিনিবন্ধটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আত্মজীবনী লিখতে আমার মোটেই ইচ্ছা নেই, আমি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করার আগে কেউ আমার জীবনী লিখুক, তা-ও আমার পছন্দ নয়। তবে আমার জীবন নিশ্চয়ই আমাকে কিছু শিক্ষা দিয়েছে। সে নিয়েই সংক্ষেপে কিছু বলব।

আমার বয়স যখন বছর বার-তের, তখন একদিন আমি আমার মায়ের সামনে একজন লোককে কিছু খারাপ কথা বলি। মা তক্ষণি সস্নেহ ধমকের সুরে আমাকে বলেছিলেন ঃ "বাবা, তোমার জিহ্বাতে সরস্বতী বা বাণীর অধিষ্ঠান; অপরকে খারাপ কথা বলে সে-স্থান অপবিত্র করো না। সরস্বতী যে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী!" সেদিনের সেই উপদেশ সরাসরি আমার মস্তিষ্কে ও আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল এবং সাত-আট দশক ধরে তা আমাকে প্রভাবিত করে রেখেছে।

আমি জন্মেছি গ্রামে, বড়ও হয়েছি গ্রামে; কিন্তু গ্রাম্য জীবন বলতে তার অনুষঙ্গে যে সঙ্কীর্ণ, অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝায় তা থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছিলাম ঐ গ্রামজীবনেই। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের নিয়মকানুন আমি ভেঙে দিয়েছিলাম। নীচজাতের এক দম্পতি সেখানে ভাড়া থাকত। তাদের হাতে আমি ফলটল খেতাম। আমি যখন বাড়ি ছেড়ে এলাম রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেব বলে, তখন সেই দম্পতি আমার জন্য চোখের জল ফেলেছিল। একবার আমার মায়ের অসুখ হলো। ওষুধ আনতে হবে একজন কবিরাজের কাছ থেকে, যাঁর বাড়ি নদীপথে আমাদের ওখান থেকে এক মাইল দূরে। আমাদের বাড়ি ও চাষের খেত ছিল ঐ নদীর তীরে। যাই হোক, আমাদের বাড়ির রান্নার লোকটি ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে রাজি হলো, যদি বাড়ির বড় ছেলেদের কেউ স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা চালিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি থাকে। বড় ভাইদের কেউ এতে রাজি হলেন না। যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। দুটি কারণে। প্রথমত, মায়ের প্রতি ভালবাসা এবং দ্বিতীয়ত, অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ভালবাসা। আমরা গিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে ওষুধ নিয়ে এলাম। আমার পক্ষে সেই নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ও ফেরত আসার ব্যাপারটা ছিল একটা খেলা, একটা মজার ব্যাপার। সেই থেকে এই অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি, সেইসঙ্গে সহজ জীবনের প্রতি একটা অনীহা এবং জার্মান দার্শনিক নিৎসে যেমন বলেছেন—'বাঁচো, বিপজ্জনকভাবে'—এই ভাব আমার চিরসঙ্গী হয়ে রইল।

আমার বয়স যখন আন্দাজ পনের বছর, ক্লাস এইট-এ পড়ি, তখন একদিন আমার এক বন্ধু ত্রিচুর টাউন লাইব্রেরি থেকে একটি ইংরেজী বই এনে আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "একটা বই পড়বে?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ, পড়ব।" সে আমাকে বইটি দিয়ে চলে গেল। বইটি ছিল 'দ্য গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-এর ইংরেজী অনুবাদ। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত একটি পুরনো সংস্করণ। বইটি পড়তে আরম্ভ করেই আমি তাতে একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেলাম এবং প্রায় একশ পাতা একটানা না পড়ে থামতে পারলাম না। তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব এসে পড়ল প্রচণ্ডভাবে। সে-ই শুরু। সেই প্রভাবে আমার জীবন গভীরতা ও ব্যাপ্তি পেতে আরম্ভ করল। একে একে পড়ে ফেললাম সাতখণ্ডে স্বামীজীর 'কমপ্লীট ওয়ার্কস' (তখন ঐভাবেই পাওয়া যেত), 'গসপেল'-এর দু-খণ্ড, ভগিনী নিবেদিতার 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি'); সেইসঙ্গে মুখস্থ করে ফেললাম শ্রীমা সারদাদেবীর উদ্দেশে রচিত স্বামী অভেদানন্দের অনবদ্য স্তোত্র—'প্রকৃতিং পরমাম্'। এসবের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার জীবনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা—যার মধ্যে ছিল ঈশ্বরকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসা; সেইসঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসা। আমি ঘর ছাড়লাম আরো তিন বছর পরে; যোগ দিলাম মহীশূরের রামকৃষ্ণ আশ্রমে। কেন্দ্রটি তখন সবে শুরু হয়েছে; তার প্রধান তখন পরম পূজ্যপাদ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ। বড় প্রেমিকস্বভাব ছিল তাঁর। পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন গোপাল মারার; ত্রিচুরের কোট্টিল মারার পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন তখনকার কোচিন রাজবংশের দ্বিতীয় যুবরাজ। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী পরে প্যারিসে 'সেন্টার বেদান্তিক রামকৃষ্ণ' গঠন করেছিলেন।

সিদ্ধেশ্বরানন্দজী আর আমি ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে মহীশূরে গান্ধীজীকে দর্শন ও প্রণাম করি। পুনরায় তাঁকে দেখি ব্যাঙ্গালোরে, ১৯৩৬ বা ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে। গান্ধীজী 'ইয়ং ইন্ডিয়া' নামে যে-সাপ্তাহিকটি বের করতেন, সেটি আমাদের মহীশূর আশ্রমে আসত। আমি তার প্রত্যেকটি সংখ্যা পড়তাম। পত্রিকার সর্বাঙ্গে প্রবল উল্লাসের সঙ্গে সত্য ও অহিংসার কথা থাকত। পরে গান্ধীজী এটির প্রকাশনা বন্ধ করে 'হরিজন' নামে আরেকটি সাপ্তাহিকের প্রবর্তন করেছিলেন।

আমরা যখন সকলেই ব্রিটিশের দাস, তখন ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের দূরদর্শী মত ও

দৃষ্টিভঙ্গির কথা পড়ে আমরা প্রচণ্ড উৎসাহ পেতাম। একই রকম উৎসাহের সঞ্চার হতো যখন পড়তে গিয়ে দেখতাম, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, আসন্ন শতকগুলিতে বেদান্তের শক্তিদায়ী, সমন্বয়সাধক ও বিশ্বজনীন সত্যগুলি ভারতে ও বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়ে যাবে। তিনি আমাদের সামনে একটা পরিকল্পনা রেখে গেছেন, যাতে আগামী শতকগুলিতে একটা বৈদান্তিক সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলা যায়—প্রথমে ভারতে ও পরে সারা বিশ্বে। তাঁর মতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব। আসলে, আমাদের দর্শন খুব উচ্চ, কিন্তু আমাদের সমাজে বেদান্তের কোন স্পর্শ নেই। ২০ আগস্ট ১৮৯৩-এর এক চিঠিতে আমেরিকা থেকে স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজী ভক্ত আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন: "পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্মই এমন উচ্চগ্রামে মানুষের মহিমার কথা বলে না; আবার পৃথিবীতে আর কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের মতো এমন নির্মমভাবে দরিদ্র ও পতিতদের গলায় পা দিয়ে দলে না।" পরে লাহোরে প্রদত্ত বেদান্তের ওপর এক বক্তৃতায় স্বামীজী গর্জে উঠে বলেছিলেন: "মুছে ফেল এই কলঙ্ক!" তাঁর মাদ্রাজ-বক্তৃতাগুলির একটিতে ('দ্য ওয়ার্ক বিফোর আস') তিনি তাঁর দেশবাসীর কাছে আবেদন রেখেছিলেন এটি উপলব্ধি করতে যে, আধুনিক ভারতবর্ষ হবে একদিকে গ্রীকো-রোমান ও ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মহান সমন্বয়স্থল। তিনি বলেছিলেন: "আধুনিক ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ প্রাচীন গ্রীক মিলিত হচ্ছেন প্রাচীন হিন্দুর সঙ্গে।"

এখানে আমেরিকা থেকে ২৪ জানুয়ারি ১৮৯৪ মাদ্রাজী শিষ্যকে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে। স্বামীজী লিখেছেন: "আমার সারা জীবনের আশা এমন একটা যন্ত্র চালু করে দিয়ে যাওয়া, যা প্রত্যেক মানুষের কাছে উচ্চ ভাব বহন করে নিয়ে যাবে। তারপর নরনারী তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরা ঠিক করে নেবে। তারা জানুক, জীবনের সবচেয়ে গভীর ও অন্তরঙ্গ প্রশ্নগুলি নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা কী ভেবেছিলেন, অন্যান্য দেশ কী ভেবেছিল। বিশেষ করে তারা দেখুক, আজ অন্যরা কী করছে, তারপর তারা নিজেদের পথ ঠিক করুক। আমাদের কাজ শুধু রাসায়নিক পদার্থগুলিকে একজায়গায় করে দেওয়া; সেগুলো জমাট বেঁধে যা হওয়ার তা প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম মেনে আপনিই হবে।... দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাও, অবিচলিত ও অধ্যবসায়ী হও, প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখ। এখনই হোক, পরেই হোক, আমি আসছি—তোমরা কাজে লেগে যাও। আদর্শটা তোমাদের সামনে রেখ—'ধর্মে আঘাত না দিয়ে জনগণের উন্নয়ন।' আর সেইসঙ্গে মনে রেখ, জাতটা বেঁচে আছে গরিবের কুঁড়েঘরে। আহা, তাদের জন্য কেউ কোনদিন কিছু করল না!... তাদের ওঠাতে পার? তাদের হারানো ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে পার? তবে হ্যাঁ, তাদের একেবারে নিজস্ব যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, সেটা যেন খোয়াতে না হয়। তুমি কি তোমার সমতা, স্বাধীনতা, কর্ম আর শক্তিভাবনার দিক দিয়ে একজন সেরা পাশ্চাত্যবাসী এবং একইসঙ্গে ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মজীবনের দিক দিয়ে একজন আপাদমস্তক হিন্দু হয়ে উঠতে পার? এটাই করতে হবে এবং আমরাই তা করব। তোমরা সকলে তা করতে বাধ্য। নিজেদের ওপর আস্থা রাখ; বীরোচিত প্রত্যয়ই জন্ম দেয় বীরোচিত কর্মের। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। গরিবের জন্য সহানুভূতি, পতিতের জন্য সহানুভূতি—যতদিন দেহে প্রাণ আছে। এ-ই আমার আদর্শ।"

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম'-এ ভারতবর্ষের মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে স্বামীজীর ভাবনাকে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: "মানবতার যে নতুন যুগ আসছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই; এই যুগ বিশেষভাবে তাদের কথা ভাববে যারা খেটে খায়, অথবা ভাববে, স্বামীজীর ভাষায়, শূদ্রদের সমস্যা নিয়ে। স্বামীজী একদিন বলেছিলেন, 'শূদ্রদের সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে, কিন্তু না জানি কত উথালপাতালের মধ্য দিয়ে!' যখন তিনি একথা বলেছিলেন, তখন যেন তিনি ভবিষ্যৎটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন; তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হচ্ছিল এক প্রফেটের পরিষ্কার প্রত্যয়-বাণী।"

বিবেকানন্দের সমগ্র বাণী ও রচনার মধ্য থেকে একটি অসাধারণ বাক্য বাহাত্তর বছর ধরে দেশে ও বিদেশে মানবসেবার মাধ্যমে নিজের জীবন ও চরিত্র গড়ে তুলতে আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। সুমহান সেই বাক্যটি হলো: "তুমি কি বয়স্কের গাম্ভীর্যের সঙ্গে শিশুর সরলতাকে মেলাতে পার?"

১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত মহীশূর আশ্রমে থাকাকালীন আমি তখনকার একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ পড়তে খুব ভালবাসতাম। গ্রন্থটির নাম—'ক্যারেক্টার অ্যান্ড দ্য কনডাক্ট অফ লাইফ', লেখক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর উইলিয়াম ম্যাকডুগাল। গ্রন্থটির একটি কথা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল এবং সেটি আমি পরবর্তী কালে আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছে আমার বক্তৃতায় বহুবার বলেছি। সেটি এই: "অল্পবয়সীরা চায় প্রশংসা পেতে কিন্তু তার চেয়ে ভাল হলো প্রশংসনীয় হয়ে ওঠা।"

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার পর আমি যেসব সেবাকর্মে নিযুক্ত ছিলাম, তাদের মধ্যে একটি ছিল জেলবন্দী আসামীদের কাছে ভাষণ দেওয়া। এটা প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৩৩-৩৪-এ মহীশূর জেলে। সেখানে জনা কুড়ি বন্দী আসত। তারপর শুরু হলো ব্যাঙ্গালোর জেলে। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী সোমানন্দ এই কার্যের সূত্রপাত করেছিলেন অনেক বছর আগে, তখনকার মহীশূর সরকারের

আহ্বানে। জেলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা ছোট মন্দির ছিল এবং পূজার জন্য সামান্য কিছু অর্থও মঞ্জুর করা হয়েছিল।

আমি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে এলাম ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে। সোমানন্দজী দেহত্যাগ করলেন তার পরের বছর। তারপর আমাকে এই কাজের ভার নিতে হলো। সানন্দে আমি প্রত্যেক রবিবার সকালে ঐ কাজ করতাম। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন বন্দী আসত; আমি তাদের কাছে কিছু জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা ও গীতা থেকে কিছু ভাব তুলে ধরতাম—তাদের তা ভাল লাগত। সেই বছরের কোন এক সময়ে আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে কিছু নতুন ধরনের বন্দী—যেমন দুজন কংগ্রেস নেতা—এইচ. সি. দাসাপ্পা, যিনি পরে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং চেঙ্গালারায়া রেড্ডী, যিনি পরে মধ্যপ্রদেশের গভর্নর হয়েছিলেন। তখনকার মহীশূর সরকার মহীশূর জাতীয়তাবাদী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী পালন উৎসব উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্গালোর সেন্ট্রাল জেলে হরিকথা-র আয়োজন করা হয়, পরিবেশন করেন একজন জনপ্রিয় কথক। তারপর সকল বন্দীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টও উপস্থিত ছিলেন। খোলা মাঠের মধ্যে একটা চেয়ারে আমাকে বসতে দেওয়া হলো, বন্দীরা একে একে এসে আমাকে প্রণাম করে একটা করে বড় লাড্ডু নিয়ে গেল। সব মিলিয়ে একহাজার বন্দী ছিল। তাদের কয়েকজন বলল : "আমরা এমন আনন্দ আগে কখনো পাইনি, আমাদের দারুণ ভাল লেগেছে।"

১৯৪০-৪১ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন বর্মায় (বর্তমানে মায়ানমার) রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম, তখন সরকারের আমন্ত্রণে আমি সেখানকার বিখ্যাত বা কুখ্যাত ইনসেন জেল-এ যেতাম, যেখানে তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদেরও পাঠাত।

বিগত এক হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের সৃজনশীলতা বন্ধ হয়ে ছিল। অন্যান্য দেশ এই হাজার বছরে সামরিক আগ্রাসন ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে, আর ভারতবর্ষ কেবলই সেই ইতিহাসের বলি হয়ে থেকেছে। কিন্তু সেই ভারত চলে গেছে চিরতরে। ভারতবর্ষ নিজেই ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে উঠেছে সেই সময় থেকে, যখন মাত্র তিরিশ বছর বয়সে, কোনরকম সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়াই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগোতে উপস্থিত হলেন ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। সেটা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। ঐ বছরেই ৩০ জুলাই যখন তিনি শিকাগো পৌঁছেছিলেন, তখন ধর্মমহাসভার সংগঠকদের তরফ থেকে তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিরূপে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হবে না। কারণ, তাঁর কোন পরিচয়পত্র নেই; কোন হিন্দু সংগঠন তাঁকে আমেরিকায় পাঠায়নি! অগত্যা স্বামীজী শিকাগো ছেড়ে চলে গেলেন। এলেন বস্টনে এক আমেরিকান ভদ্রমহিলার বাড়িতে অতিথি হয়ে। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অধ্যাপক মুগ্ধ হয়ে গেলেন। স্বামীজীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কেন ধর্মমহাসভায় একজন প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত হচ্ছেন না? স্বামীজী বললেন : "আমি সেজন্যই এসেছিলাম, কিন্তু ধর্মমহাসভার লোকজন বললেন, আমার কোন পরিচয়পত্র নেই।" সেকথা শুনে অধ্যাপক বললেন : "স্বামীজী, আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়াও যা, সূর্যের কাছে তার কিরণবর্ষণের অধিকার জানতে চাওয়াও তা।" তিনি তখনই ধর্মমহাসভার আয়োজক কমিটির কাছে স্বামীজীর পরিচয়স্বরূপ একখানি চিঠি লিখে স্বামীজীর হাতে দিলেন, যার মধ্যে ছিল এই অসামান্য কথাটি : "আমাদের সব বিদগ্ধ অধ্যাপকদের একত্রিত করলে তাঁদের যে-জ্ঞান দাঁড়াবে, এঁর পাণ্ডিত্য তার চেয়েও বেশি।" স্বামীজী শিকাগো ফিরে গেলেন এবং ধর্মমহাসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করলেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে। তারপর ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩—বিকাল আন্দাজ চারটের সময় তিনি কলম্বাস হল-এ সমাগত হাজার হাজার প্রতিনিধির সামনে তাঁর পাঁচ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দিলেন। আর তার শুরুতে সেই শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করলেন 'আমার আমেরিকান বোন ও ভাইয়েরা' বলে। বোমা কাকে বলে আমরা জানি। স্বামীজীর সেই সম্বোধন ছিল প্রথম বৈদান্তিক ভাব-বোমা, যা সেই বিশাল আমেরিকান শ্রোতৃ-সমাবেশের মনোজগতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাল এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় শ্রোতারা দু-মিনিট ধরে করতালির শব্দে হল ভরিয়ে দিলেন। এই একটি ঘটনা ভারতবর্ষের নিজের কাছে এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে ঘোষণা করল যে, ভারত জেগে উঠেছে ও ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে উঠেছে। এটা ছিল আমেরিকার মতো একটা শক্তিশালী জাতির হৃদয়-মনের ওপর ভারতবর্ষের সত্যকার বিজয়। এটাই পরে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আমি যখন আমেরিকায়, তখন সেখানে অ্যাটেনবরোর 'গান্ধী' দেখতে দলে দলে লোক ভিড় করেছিল।

আধুনিক ভারতের এই শক্তিশালী সৃজনী প্রেরণাকে আমাদের দেশের নাগরিকদের, বিশেষ করে রাজনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত যুবসম্প্রদায়কে নিজেদের অন্তরে গ্রহণ করতে হবে। এর দ্বারাই তাদের অতিক্রম করতে হবে বর্তমানের স্থাণু অস্তিত্ব ও চাহিদাকে, যথা—চাকরি, মোটা মাইনে, সুখী সংসার এবং বিবাহের সময় একটা বড়সড় পণ! ইংরেজীতে এককথায় বলতে গেলে তিনটে 'P'—pay-prospect-promotion! আমার কোন সন্দেহ নেই যে,

আগামী শতকে ভারতের এই পুনর্গঠন-প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং ক্রমে বিস্তারলাভ করবে।

বিশ্বের ওপর ভারতের প্রভাবের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কী বলেছেন সেটা আমাদের জানতেই হবে। প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে কলম্বোয় স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ "আমরা আমাদের ভাবপ্রচারের জন্য কোথাও আগুন লাগাইনি, কখনো তরবারি ধরিনি। জগতের কাছে ভারতের উপহার কী, সেটা বোঝাতে ইংরেজী ভাষায় কেবল একটা শব্দই আছে; আবার, ভারতীয় সাহিত্য সমগ্র মানবতার ওপর কিরকম প্রভাব বিস্তার করে, সেটা বোঝাতেও ইংরেজীতে সেই একটাই শব্দ আছে; সেটা হলো —'ফ্যাসিনেশন'—একটা অদ্ভুত ভাললাগা। এইরকম ভাললাগার ঠিক উলটোটা হয়, যখন কোন ভাব হঠাৎ আচ্ছন্ন করে ফেলে। এখানে তা হয় না। এখানে যেটা হয়, সেটা এই—নিজের অজান্তেই, ধীরে ধীরে ব্যাপারটাকে ভাল লাগতে আরম্ভ করে। অনেকের কাছে প্রথম পরিচয়ে ভারতীয় ভাবনা, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ভারতীয় রীতিনীতি, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য সবকিছুকেই বিকর্ষক মনে হয়; মনে হয় যেন ওসবের থেকে দূরে থাকাই ভাল। কিন্তু এইসব মানুষ একটু ধৈর্য ধরুক, পড়াশুনা করুক, ভারতীয় ভাব-ভাবনার পিছনে যেসব মহৎ নীতি ও আদর্শ আছে সেসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোক; এবং আমি শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত যে, তখন তাদের সেই অদ্ভুত ভাললাগাটা এসে যাবে; আস্তে আস্তে তারা ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হয়ে যাবে। যেমনভাবে ধীরে, নীরবে মৃদুভাবে শিশিরকণা ভোরবেলায় ঝরে পড়ে—সবার চক্ষুকর্ণের অগোচরে—অথচ অসাধারণ কাজ করে যায় (ফুল ফোটায়), ঠিক তেমনিভাবেই এই শান্ত, ধীরস্থির, সর্বংসহা আধ্যাত্মিক জাতি সমগ্র বিশ্বের ভাবজগতে তার কাজ করে চলেছে—নীরবে, ধীরে।"

দুটি ভারত আছে ঃ একটি সনাতন ভারতবর্ষ—অমর ভারত; অপরটি বর্তমান ভারতবর্ষ—রোগী ভারতবর্ষ।

ভারতীয় চিন্তার প্রতি পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালাভ হয়েছে যখন আমি ১৯৫৮ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত আটাশ বছর ধরে প্রায় পঞ্চাশটি রাষ্ট্রে বক্তৃতা-সফর করেছি, যার অনেকটাই ছিল ভারত সরকার আয়োজিত। বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এইসব সফর থেকে আমার যে-ধরনের অনুভূতি হয়েছে, তার বিবরণ রয়েছে 'ভারতীয় বিদ্যাভবন' (মুম্বই-৭) থেকে প্রকাশিত আমার দুটি সচিত্র গ্রন্থে ঃ 'এ পিলগ্রিম লুকস অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর প্রথম খণ্ড (৬০০ পাতা) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (৮০০ পাতা)। উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে বিবৃত করছি হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কম্যুনিস্ট চেকোস্লোভাকিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ইংল্যান্ডের প্রতিক্রিয়ার কিছু বিবরণ।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার ইউরোপের ১৭টি দেশে আমার একটা চারমাসের বক্তৃতা-সফরের আয়োজন করে, যার প্রথমে ছিল গ্রীস ও শেষে সোভিয়েত রাশিয়া। ঐ সফরের মধ্যে আমি পাঁচটা দিন হল্যান্ডের জন্য রেখেছিলাম।

১৯৭০-এ নিউ ইয়র্কের 'টেম্পল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং'-এর ব্যবস্থাপনায় আমার আমেরিকা-সফরের পথে যখন জেনিভাতে একটা হোটেলে রয়েছি, তখন সেখানে আমার সঙ্গে এসে দেখা করলেন ডক্টর রাম প্রডারম্যান নামে হল্যান্ডের এক ভদ্রলোক। সঙ্গে তাঁর বন্ধুরা। এই ভদ্রলোক একজন বড় ভারতপ্রেমিক; আগে ভারতে আমার সঙ্গে এঁর দেখা হয়েছিল। ওঁরা আমাকে অনুরোধ জানালেন একটা বক্তৃতা-সফরে হল্যান্ড যেতে এবং ওঁদের কাছে 'যোগ' সম্বন্ধে কিছু বলতে। ওঁরা নাকি হল্যান্ডে এর মধ্যেই একটা যোগসমিতি গড়ে তুলেছেন; ডাচ ভাষায় তার নাম—'Stichting Yoga Netherlands'। আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ, যাব, কিন্তু এবছর নয়, পরের বছর" অর্থাৎ ১৯৭১-এ। আমি আরো বললাম ঃ "আপনাদের যে-কাজকর্ম, অর্থাৎ শারীরিক ব্যায়ামরূপে 'যোগ'—সেবিষয়ে আমি কিছু বলব না, আমি 'যোগ'-এর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দিক অর্থাৎ 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বলব।" তাঁরা বললেন ঃ "আমরা ঠিক ওটাই চাই।" তাঁরা চলে গেলেন, আমি আমেরিকা রওনা হলাম।

সেই কথামতো ১৯৭১-এ ওঁরা আমার বিমানভাড়া পাঠিয়ে দিলেন। হল্যান্ডে পৌঁছে প্রথম দুসপ্তাহে আমি বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিলাম। আমস্টারডাম ইউনিভার্সিটিতেও বললাম। তৃতীয় ও শেষ সপ্তাহে ডক্টর প্রডারম্যান ও তাঁর বন্ধুরা মিলে উস্টারবীক গ্রামে আন্দাজ ষাটজনের বাসযোগ্য এক হোটেলে একটা 'বেদান্ত-শিবির'-এর আয়োজন করলেন। গোটা হোটেলটাই শিবিরের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। জায়গাটা ছিল হল্যান্ডের পূর্বে, আর্নেহম শহরের কাছাকাছি। ডাচ ভাষায় 'উস্টার' মানে পূর্ব, 'বীক' মানে নদী। অর্থাৎ, জার্মানীর পশ্চিমে অবস্থিত রাইন নদী।

উপস্থিত প্রায় ষাটজন শ্রোতার মধ্যে ছিলেন বয়স্ক নারী-পুরুষ; ছিল কমবয়সী ছেলেমেয়েরাও। ছিলেন হল্যান্ডের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের মানুষজন ঃ অধ্যাপক, ডাক্তার, যুবক-যুবতী ও গৃহবধূ। আমি রোজ উপনিষদ্ ও গীতার ওপর বক্তৃতা দিতাম—দ্বিপ্রহরের আগে ও পরে। নিত্য পড়াশোনা করতে হতো তাঁদের; প্রত্যেকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বইপত্র থাকত। বক্তৃতার পর একঘণ্টা কিংবা আরো বেশি সময় ধরে উদ্দীপক প্রশ্নোত্তর-পর্ব চলত। সেই এক সপ্তাহ ধরে তাঁরা, এবং আমিও, যে কী আনন্দ পেয়েছিলাম তা বর্ণনার ভাষা নেই। ঐসময়ে সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং বেদান্ত-সাহিত্যের অনেক বইও বিক্রি হয়ে গেল।

সপ্তম দিন সন্ধ্যাবেলায় হলো বিদায়ী অনুষ্ঠানপর্ব। তাঁদের

মধ্য থেকে দুজন আমাকে ধন্যবাদ দিতে উঠে আবেগবিহ্বল হয়ে শেষে বললেন ঃ "যে অমূল্য ভাব ও আদর্শ আপনি আমাদের দিলেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা আমাদের নেই।"

এইভাবে (প্রায় প্রত্যেক বছর) তিন সপ্তাহের জন্য হল্যান্ড গিয়ে নানা জায়গায় বক্তৃতা দেওয়া এবং শেষ সপ্তাহে একটা 'বেদান্ত-শিবির' পরিচালনা করা—এইরকম চলেছিল ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। হল্যান্ডের ভক্তদের একজন আমার 'দ্য মেসেজ অফ দ্য উপনিষদস' গ্রন্থটি ডাচ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন; পরে সেটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের যোগসমিতির নাম বদলে পরে রেখেছিলেন—'Stichting Yoga-Vedanta Netherlands'। ডাচ ভাষায় বেদান্তের ওপর ওঁরা একটা পত্রিকাও প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দেন।

১৯৮৬-র কয়েক বছর পর হল্যান্ডের বেদান্ত-ভক্তদের অনুরোধে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ হল্যান্ডে একজন সন্ন্যাসীকে পাঠান আমস্টারডামের অন্তর্গত আমস্টিলভীনের একটা বাড়িতে স্থায়ী বেদান্তকেন্দ্র পরিচালনা করতে।

একই ঘটনা ঘটেছিল অস্ট্রেলিয়াতেও। সেখানে আমি প্রথম যাই ১৯৬৯-এ আমেরিকা-সফরের একটা অংশ হিসেবে এবং পরে ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত যাই নিয়মিতভাবে। সেখানে যে বেদান্ত আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা দ্রুত দক্ষিণেশ্বরের শ্রীসারদা মঠের এক স্থায়ী শাখাকেন্দ্রের রূপ নেয়। এখন সেখানে তিনজন সন্ন্যাসিনী রয়েছেন, যাঁদের কাজের পরিধি বিশাল অস্ট্রেলিয় মহাদেশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। [ক্রমশ]

* রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীর 'What Life Has Taught Me' শীর্ষক একটি রচনা ভারতীয় বিদ্যাভবন (মুম্বই-৭)-এর মাসিক ইংরেজী মুখপত্র 'Bhavan's Journal'-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজজী-কৃত কিছু সংযোজন-সহ রচনাটির বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় শ্রীসারদা মঠ (দক্ষিণেশ্বর)-এর ত্রৈমাসিক বাঙলা মুখপত্র 'নিবোধত'-র তিনটি সংখ্যায় (১২শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা এবং ১৩শ বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা)। ইতিমধ্যে 'Bhavan's Journal'-এ প্রকাশিত ইংরেজী রচনাটি বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম-সংযুক্ত হয়ে মহারাজজী-কৃত সংযোজন-সহ ঐ একই শিরোনামে ('What Life Has Taught Me') ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (মে ১৯৯৯)। 'উদ্বোধন'-এ বর্তমান অনুবাদটি 'নিবোধত'-র উক্ত বাঙলা অনুবাদ ও ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত পুস্তিকাটি (বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম বাদে) অনুসরণ করে প্রকাশিত হচ্ছে। অনুবাদ করেছেন **অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য**।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অনুষ্ঠান-সূচী (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০৬)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৪ অগ্রহায়ণ	শনিবার	২০ নভেম্বর	১৯৯৯
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	২২ নভেম্বর	১৯৯৯
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১ পৌষ	শুক্রবার	১৭ ডিসেম্বর	১৯৯৯
শ্রীযীশুখ্রীস্ট		৮ পৌষ	শুক্রবার	২৪ ডিসেম্বর	১৯৯৯
শ্রীমা সারদাদেবী	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৩ পৌষ	বুধবার	২৯ ডিসেম্বর	১৯৯৯
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১৭ পৌষ	রবিবার	২ জানুয়ারি	২০০০
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২৮ পৌষ	বৃহস্পতিবার	১৩ জানুয়ারি	২০০০

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্তিক শুক্লা নবমী	১ অগ্রহায়ণ	বুধবার	১৭ নভেম্বর	১৯৯৯
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কার্তিক পূর্ণিমা	৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	২২ নভেম্বর	১৯৯৯

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

৩, ১৭ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার,	শুক্রবার	১৯ নভেম্বর,	৩ ডিসেম্বর	১৯৯৯
৩, ১৭ পৌষ	রবিবার,	রবিবার	১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯,	২ জানুয়ারি	২০০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি নিরীক্ষা

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি : গত ভাদ্র ১৪০৬ সংখ্যার পর]

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

[৩]

গীতা রচনার কাল

গীতা, শঙ্করাচার্য ও বৌদ্ধধর্ম : গীতা কি বুদ্ধ-পরবর্তী কালের?

আধুনিক কালে আমাদের দেশে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস যাঁরা করছেন,[৩৭] তাঁদের মতে ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য বুদ্ধের সাম্যভিত্তিক সদ্ধর্ম বিতাড়িত করে ভেদবৈষম্যমূলক বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং এব্যাপারে তাঁদের প্রধান সহায় হয়েছিল ভগবদ্‌গীতা। এঁদের মতে, গীতা শঙ্করাচার্যের কালে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়নের উদ্দেশ্যে রচিত হয়, পরে তা মহাভারতে সংস্থাপিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটি বক্তৃতায় যা বলেন তার সারমর্ম হলো : বহিরাগত তাতার, বালুচি প্রভৃতি জাতি এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করায় এইসকল আদিম জাতির বীভৎস আচার বুদ্ধের ধর্মে অনুপ্রবেশ করে তার চরম অবনতি ঘটায়। তখন শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হয়ে ভারতকে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন এবং তারপরের ইতিহাস অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের ওপর বেদান্তের পুনর্বিজয়।[৩৮]

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কথাটুকু এইসকল আধুনিক ইতিহাস-ব্যাখ্যাতারা অস্বীকার করে বিবেকানন্দের বক্তব্যের বাকি কথাটুকু গ্রহণ করে প্রমাণ করতে চান যে, ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মকে বিতাড়িত করেন ব্রাহ্মণদের স্বার্থে, কারণ বৌদ্ধধর্ম ছিল (এঁদের মতে) সাম্যমূলক ও নাস্তিক। কিন্তু বিবেকানন্দ তো তা বলতে চাননি। তাঁর কথার অর্ধেক বর্জন করে অর্ধেক গ্রহণ করে তিনি যা বলতে চাননি তা প্রমাণ করার প্রচেষ্টাকে কী বলা যায়? আমরা শুধু বলতে পারি যে, এ অত্যন্ত অন্যায় কাজ। তাছাড়া এর দ্বারা ইতিহাসের প্রকৃত সত্য কি করে নির্ণয় করা সম্ভব?

এঁরা বিবেকানন্দের যে-কথাগুলি অস্বীকার করতে চেয়েছেন, তা ইতিহাস। ইতিহাসকে কি অস্বীকার করা যায়? আবার তা নাকি করা হয়েছে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে![৩৯] কে জানে, সে কেমন সমাজবিজ্ঞান যা ইতিহাসকে অস্বীকার করে! এসময় বৌদ্ধধর্মের যে বীভৎস অধঃপতন ঘটেছিল তা বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ অধঃপতন যে কোন্ অতলে পৌঁছেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে (২য় খণ্ডে) লিপিবদ্ধ আছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'বাংলার ইতিহাস'[৪০] গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে।

এইভাবে তথ্যবিকৃতি ঘটিয়ে যা লেখা হলো তা ইতিহাসের সত্য থেকে বহু দূর। বিকৃত অনৃত উপন্যাস ছাড়া আর কি বলা যায় ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে!

তাছাড়া বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যে 'রণং দেহি' সম্পর্ক ছিল—এধারণাও ঠিক নয়। এমনকি মৌর্যযুগেও—যে-যুগ বৌদ্ধধর্মের মহা গৌরবময় বিস্তারের কাল—তখনো বৈদিক দেবতাগণ পূজা পেয়েছেন এবং অশোকের শিলালিপিতে (গীর্ণার লিপি : ৫, ৮, ৯, ১১) পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং দান করবার

৩৭ এঁদের মধ্যে মুখ্য হলেন ঐতিহাসিক ডি. ডি. কোশাম্বী। এঁর রচিত Myth and Reality, An Introduction to the Study of Indian History প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩৮ "... And the marvellous boy Sankaracharya arose. He wanted to bring back the Indian world to its pristine purity, but think of the task before him.... The Tartars and the Baluches and all the hideous of mankind came to India and became Buddhists, and assimilated with us, and brought their national customs, and the whole of our national life became a huge page of the most horrible bestial customs. That was the inheritance which they got from the Buddhists, and from that time to this, the whole work in India is a reconquest of this Buddhistic degradation by the Vedanta." (Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, p. 269)

৩৯ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা—জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১

৪০ দ্রঃ পৃঃ ১৫৪

নির্দেশ।[৪১] বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যেটুকু পার্থক্য ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে যায় কুষাণ রাজত্বকালে যখন বুদ্ধের মূর্তি প্রথম নির্মিত হয় এবং বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার-রূপে হিন্দুদের নিকট পূজা পেতে থাকেন।[৪২]

স্বামী বিবেকানন্দ এপ্রসঙ্গে একজায়গায় বলেছেন ঃ "You must not imagine that there was ever a religion in India called Buddhism, with temples and priests of its own Order."[৪৩] অর্থাৎ একথা কখনো মনে স্থান দিও না যে, কখনো বৌদ্ধধর্ম বলে পৃথক কোন ধর্ম ছিল—যার নিজ সম্প্রদায়ের মন্দির ও পুরোহিতবর্গ বর্তমান ছিল। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনও এই একই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "বুদ্ধদেবও এসব সত্যের প্রথম দ্রষ্টা নন। বুদ্ধদেবের মধ্যে পূর্ববর্তী উপনিষদের সত্য মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল। উপনিষদের মধ্যে একটা বড় রকমের মুক্ত আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।"[৪৪]

উপনিষদের সঙ্গে বুদ্ধের চিন্তাধারার ঐক্য

উপনিষদের সঙ্গে বুদ্ধের চিন্তাধারার ঐক্য সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা পাওয়া যায় মহেশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'বুদ্ধ-প্রসঙ্গ' পুস্তিকায়। তিনি বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন, একটি এখানে উল্লেখ করছি। 'উদান' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে (১।১০) বলা হয়েছে ঃ "যখন ব্রাহ্মণ মুনি মৌনাবলম্বন করিয়া আত্মাকে অবগত হয়েন (অ ত্ত না বেদি), তখন সে-অবস্থাতে পৃথিবী, তেজ, বায়ু প্রভৃতি স্থানপ্রাপ্ত হয় না।... আদিত্য সে-স্থলে প্রকাশিত হয় না, সে-স্থলে চন্দ্র আলোকবিস্তার করে না এবং অন্ধকারও সে-স্থলে বর্তমান নাই।"[৪৫]

ঠিক একই কথা কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।।" (২।২।১৫)

অর্থাৎ যেখানে সূর্য, চন্দ্র, তারকা কেউই প্রভা বিকিরণ করতে পারে না, যেখানে বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত হয় না, অগ্নি সেখানে কোথায়?

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে এবং এই সকল দৃষ্টান্ত সহায়ে গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করেছেন ঃ "নির্বাণ ও ব্রহ্ম—এ উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য।"[৪৬]

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি অভিব্যক্তি মাত্র—এছাড়া কিছু নয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। অতএব উপনিষদের প্রচারক ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্যের চিন্তা বৌদ্ধভাবনা থেকে যে ভয়ানক পৃথক ছিল, তা আদৌ নয়। বুদ্ধের মৌলিক ভাবনা নয়, বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী কালের ভয়াবহ বিকৃতিকেই বিতাড়িত করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন শঙ্করাচার্য এবং বুদ্ধের মূল ভাবনাকে তিনি আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, যার জন্য তাঁকে কেউ কেউ 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলেছেন। আসলে সত্যকারের ধর্ম তখন দেশ থেকে লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শুধু ছিল তন্ত্র, মন্ত্র, বামাচার—যেগুলিকে শঙ্কর বিতাড়িত করে জাতিকে সর্বনাশ থেকে বাঁচালেন।

রবীন্দ্রনাথও এপ্রসঙ্গে বলছেন ঃ "বর্বর অনার্যদের সামগ্রীও একদিন দ্বার খোলা পাইয়া অসঙ্কোচে আর্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে...। এজন্য এইসময় বেদ যেমন অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্ররূপে সমাজস্থিতির সেতু হইয়া দাঁড়াইল, ব্রাহ্মণও সেইরূপ সমাজে সর্বোচ্চ পূজ্যপদ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের এই চেষ্টাকে কোন একটি সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা মনে করিলে ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ ও মিথ্যা করিয়া দেওয়া হয়।... তখন সমস্ত সমাজের লোকের মনে ব্রাহ্মণের প্রভাবকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে না পারিলে যাহা চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল তাহাকে জুড়িয়া তুলিবার কোন উপায় ছিল না। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের দুইটি কাজ হইল। এক, পূর্ব ধারাকে রক্ষা করা; আর এক, নূতনকে তাহার সহিত মিলাইয়া লওয়া। জীবনী প্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজ অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে এমন অপরিমিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল?"[৪৭] শঙ্করাচার্য এই প্রয়াসেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

গীতার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঈশ উপনিষদের অপব্যাখ্যা

গীতা প্রসঙ্গে ইতিহাসের এইরূপ যান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াসের ফলে ঈশ উপনিষদের বিখ্যাত প্রথম শ্লোকটিরও নিদারুণ অর্থবিকৃতি ঘটানো হয়েছে। উদ্দেশ্য—প্রমাণ করা যে, ধর্ম অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার ছাড়া কিছুই নয়।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাতাদের মতে, ঈশ উপনিষদের কালে অর্থনৈতিক বৈষম্যের যে-প্রশ্ন তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তারই সমাধানের জন্য ঈশ উপনিষদের প্রথম শ্লোকে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে ধনবণ্টনের প্রশ্নটিকে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে ঈশ্বরই যে এই অসম ধনবণ্টন করেছেন তা বোঝা যায় এবং এ-শ্লোকটির সারমর্ম নাকি এই—"ঈশ্বর সর্বব্যাপী হয়ে তোমাদের যে ধন দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাক।" এবং কথাগুলি বলা হয়েছে শূদ্রদের, যাতে তারা আর্যদের ধনে লোভ না করে।[৪৮]

এখানে আমাদের প্রশ্ন, তখন কি শূদ্রগণ গুরুগৃহে এসে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতেন? না হলে উপনিষদের ঋষি তাদের

৪১ উদ্ধৃত ঃ প্রাচীন ভারতে অনুশীলন—স্বামী বাসুদেবানন্দ, পৃঃ ৭৪
৪২ Advanced History of India—R. C. Mazumdar and others, p. 199
৪৩ The Master as I Saw Him, 5th Edn., p. 147
৪৪ ভারতের সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৭
৪৫ ঐ, পৃঃ ৫৬
৪৬ ঐ, পৃঃ ৫৭
৪৭ ইতিহাস, পৃঃ ৪৪-৪৫
৪৮ দ্রঃ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা

একথা বললেন কি করে? সমস্ত উপনিষদ্ই তো ব্রহ্মবিদ্যা-লাভেচ্ছুদের বলা। হঠাৎ একটি শ্লোকের একটি অংশ শূদ্রদের উদ্দেশে বললেন? আর শূদ্রদের উদ্দেশেই যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তার প্রমাণ কি? কি করে সেটা বোঝা গেল? এসব ব্যাপারে যুক্তি-প্রমাণের দায় এইসকল ব্যাখ্যাতারা বহন করেন না। নিজেদের পছন্দমতো যা খুশি তাই বলে দিলেই কি তা প্রমাণিত হলো? ঈশ উপনিষদের (১।১) এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি নিম্নোক্তরূপ ঃ

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।"

এই শ্লোকটির ভাষ্য প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর বলেছেন ঃ "ঈশ ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য বা শাসনক্ষমতা, যিনি এই জগতের শাসনে সমর্থ পরমাত্মা পরমেশ্বর, তিনিই এখানে ঈশা পদের প্রতিপাদ্য। তিনি প্রত্যগ্রূপে (পরমাত্মারূপে) সর্ববস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া জগৎকে যথানিয়মে শাসিত ও পালিত করিতেছেন। সেই সর্বাত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদিত করিবে—সর্বত্র তাঁহার কথা উপলব্ধি করিবে। জগৎতারণ পরমেশ্বরই জীবরূপে সর্বদেহে বর্তমান আছেন এবং তাঁহার সঙ্কল্পপ্রসূত স্থাবরজঙ্গমময় এই জগৎ বস্তুত মিথ্যা হইয়াও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।... সেই পরমাত্মারূপী আমিই এই জগৎ, আমার সত্তাই জগতের সত্তা, তদ্ভিন্ন জগতের আর কোন পৃথক সত্তা নাই—এরূপ যথার্থ সত্যজ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা ঢাকিয়া ফেলিবে অর্থাৎ জগৎ সত্য বলিয়া যে ভ্রম ছিল তাহা বিলুপ্ত করিবে।...

"যে-ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহার আর পুত্র সম্পদ বা স্বার্থাদি লোভ বা লাভের কামনা থাকে না, একমাত্র কামনাত্যাগরূপ সন্ন্যাসেই অধিকার থাকে, তাহার ফলে সেই ব্যক্তি তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে।... তুমিও এইরূপ কামনা পরিত্যাগপূর্বক নিজের কিংবা পরের—কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। অথবা ধন কাহার? ধন তো কাহারও নহে, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারা যায়। তাহা হইলে আত্মাই সমস্ত জগৎ এবং সমগ্র জগৎই আত্মরূপ—এইরূপ পরমেশ্বরের চিন্তার দ্বারা যখন সমস্ত বস্তুই মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ তখন আর সেই মিথ্যা বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বা লোভ করা সঙ্গত হয় না।"

স্পষ্টত কথাগুলি এখানে ধনবণ্টনের প্রসঙ্গে বলা হয়নি, বলা হয়েছে ব্রহ্মবিদ্যালাভেচ্ছুদের সর্বপ্রকার নিজের বা পরের ধনে লোভ ও কামনা পরিত্যাগ করা প্রসঙ্গে। এই ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্লোকটির ব্যাখ্যাকালে (উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন সং) পাদটীকায় বলছেন ঃ "শ্লোকটি সন্ন্যাসজ্ঞাপক", অর্থাৎ মুক্তিকামীদের সন্ন্যাসব্রতে উদ্দীপিত করার জন্য বলা হয়েছে। ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঋগ্বেদ পরিচয়' প্রবন্ধে (বেদ গ্রন্থমালা—১, হরফ প্রকাশনী, মুখবন্ধ) বলেছেন শ্লোকটি অদ্বৈতবাদসূচক।

সুতরাং এই সন্ন্যাসজ্ঞাপক বা অদ্বৈতবাদসূচক শ্লোকটির ধনবণ্টনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে, তা সুদূরার্থেও হয় না। অথচ এই অপব্যাখ্যাই আজ বস্তুবাদীরা দিচ্ছেন এবং অজ্ঞলোকদের বিভ্রান্ত করছেন।

গীতা কি মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আজকের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাতারা প্রমাণ করতে চান যে, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এবং এর রচনা পরবর্তী কালেই শুধু নয়, খ্রীস্ট-পরবর্তী কালে।[৪৯] এসকল মত আগেও ছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের মত খণ্ডন করেছেন তাঁর 'কৃষ্ণ-চরিত্র' গ্রন্থে। আজকের বস্তুবাদীদের এরূপ মত নতুন করে পোষণের কারণ—তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, 'গীতা' ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্যের দ্বারা সাম্যমূলক বৌদ্ধধর্মকে বিতাড়িত করে বর্ণাশ্রমভিত্তিক ভেদবৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য রচিত।[৫০] একথাও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এবিষয়ে এঁরা বিবেকানন্দের একটি উক্তিতে[৫১] সমর্থন খোঁজেন, কিন্তু এই উক্তিতে তিনি ঐতিহাসিকদের মতামত দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু তাঁর 'গীতা' শীর্ষক বক্তৃতামালায় তিনি সুস্পষ্ট বলেছেন ঃ "This Krishna preceded Buddha by some thousand years."[৫২] অর্থাৎ কৃষ্ণ বুদ্ধের কয়েক হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত দিয়েছেন।

বিবেকানন্দ একথাও বলেছেন যে, গীতা উপদেশ যুদ্ধক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে—"Krishna preaches in the midst of the battlefield.... It meant nothing to the man—the flying of the missiles about him. Calm and sedate he goes on discussing the problem of life and death."[৫৩] অর্থাৎ চারিদিকে ছুটন্ত রাশি রাশি অস্ত্রের মধ্যে সেসবকে অগ্রাহ্য করে প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে কৃষ্ণ তাঁর তত্ত্বোপদেশ দিয়েছেন।

এখন অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী গীতা উপদেশ যুদ্ধক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব নয় বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন এবং সেজন্য তাঁর মতে, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত (দ্রঃ 'কৃষ্ণচরিত্র')। কিন্তু বাস্তবে যেকোন যুদ্ধের খুঁটিনাটি বিবরণ পড়লে দেখা যাবে যে, নানা কারণেই যুদ্ধ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকতেই পারে। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গীতার ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে ইতিহাসের একটি ঘটনা। রোমান সম্রাট মার্কাস

৪৯ দ্রঃ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা ৫০ ঐ
৫১ দ্রঃ Complete Works, Vol. IV, pp. 102-103 ৫২ Ibid., Vol. I, p. 438 ৫৩ Ibid., Vol. I, p. 457

অরিলিয়াস যে-যুদ্ধে প্রাণ হারান, তার ঠিক প্রাক্মুহূর্তে তিনি তিনদিন ধরে বিদ্বদ্বর্গকে ডেকে দর্শনালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। যাঁরা বলেন যে, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত তাঁরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দেখিয়েছেন যে, মহাভারতে গোড়ায় যে পর্বসংগ্রহাধ্যায় আছে সেটি হলো আদি মহাভারতের সূচীপত্রস্বরূপ এবং অল্প পরে রচিত অনুক্রমণিকাধ্যায় হলো মহাভারতের সারসঙ্কলন। এ-দুইটি অধ্যায়ে যা আছে তার অল্প অংশ ছাড়া বাকিটা প্রক্ষিপ্ত নয়। কিন্তু যা এ-দুটির কোনটিতেই উল্লেখিত হয়নি, তা নিশ্চিতরূপে প্রক্ষিপ্ত।

এখন কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ'-এ নিম্নলিখিত কথাগুলি পাওয়া যায়—"যখন শুনিলাম, অর্জুন বিষণ্ণ ও মোহাবিষ্ট হইলে কৃষ্ণ তাহাকে সশরীরে চতুর্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।"[৫৪] পর্ব-সংগ্রহাধ্যায়ে 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ'-এ পাওয়া যায় এই কথাগুলি —"মহামতি বাসুদেব মুক্তি প্রতিপাদক বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অর্জুনের মোহজনিত বিষাদ নিরাকরণ করেন।"[৫৫] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত 'অনুগীতা' ও 'ব্রাহ্মণ-গীতা' প্রক্ষিপ্ত বলেছেন উপরি উক্ত দুটি অধ্যায়ে এ-দুটির উল্লেখ না থাকায়। তিনি ভগবদ্গীতাকেও প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী গীতা উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গীতার উপদেশ যে মহাভারতেই দেওয়া হয়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ—উপরি উক্ত অনু-ক্রমণিকাধ্যায় ও পর্বসংগ্রহাধ্যায় 'ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ'-এর মধ্যে তার উল্লেখ। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব'-এ বলেছেনঃ "হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। সেই মূলকথা যুদ্ধে কর্তব্যরূপ কঠিন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদরূপে বোঝানো যায়, সামান্য তত্ত্বের উপলক্ষ্যে তেমন বোঝানো যায় না। তাই গীতার স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে এবং উপলক্ষ্য যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি।"[৫৬] প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রই—যেখানে "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য"—সেখানেই আত্মতত্ত্ব, নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব এবং পূর্ণ শরণাগতি উপদেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। মহাভারতের শান্তিপর্বেও (৩৪৮।৮) একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, সংগ্রামস্থলে স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে এই গীতাধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন তাৎক্ষণিক প্রেরণায় মৌখিকভাবে, এগুলি লিপিবদ্ধ করল কে? যুদ্ধ-ক্ষেত্রে লিপিকার ছিল কি? এর সহজ উত্তর—যিনি আঠার দিনের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনিই লিপিবদ্ধ করেছেন কৃষ্ণের উপদেশসমূহ। পরবর্তী কালে যুদ্ধের বর্ণনায় অনেক অতিশয়োক্তি সংযোজনা হয়েছে বোঝা যায়, কিন্তু গীতায় কি তা হয়েছে? তার একটি কথাও কি অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়? সম্পূর্ণ গীতা এক সুরে এবং অত্যন্ত উচ্চগ্রামে বাঁধা, যেখান থেকে কোন ছন্দপতন পরি-লক্ষিত হয় না। এ এক আশ্চর্য সৃষ্টি—যত বর্ণনাকারের, তত লিপিকারের। এসমস্তই আবার মহাভারতে গ্রথিত করেছেন মহর্ষি বেদব্যাস। একমাত্র তাঁর মত 'বিশাল-বুদ্ধি' মনীষিচিত্তই একাজ সম্পন্ন করতে পারে। ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বহু গবেষণা করে মহর্ষি বেদব্যাসকে কুরু-পাণ্ডবদের সমসাময়িক কালেরই ব্যক্তিত্ব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[৫৭]

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত, অন্ততপক্ষে গীতার মূল উপদেশ যুদ্ধক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে এবং অনতিকাল পরেই তা লিপিবদ্ধ হয়ে মহাভারতে সংস্থাপিত হয়েছে। গীতার অষ্টাদশ পর্বও, যা আমরা এখন পাচ্ছি, তাও বহুকাল পরের রচনা হতে পারে না—সমগ্র গীতার ভাবগত ও ভাষাগত ঐক্যের জন্য। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত কাশীনাথ তেলাঙের মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একটি অষ্টাদশ অধ্যায়ী গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটি গীতা হতে পারে বলে তেলাং মনে করেন।[৫৮]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "Gita is a commentary on the Upanishads.... The Gita takes ideas of Upanishads and in (somes) cases the very words."[৫৯] অর্থাৎ গীতা হলো উপনিষদের ভাষ্য। গীতা উপনিষদের ভাবসমূহ নিয়েছে, আবার কোথাও কোথাও ভাষাও উভয়ের এক। কিন্তু এর দ্বারা একথা প্রমাণ হয় না যে, গীতা পরবর্তী কালে রচিত। স্বামীজী সেকথা বলেনওনি। বরং তিনি মনে করতেন, গীতা উপনিষদের সমসাময়িক। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করতেন গীতা মহাভারতের চেয়েও প্রাচীন।[৬০] সেটাই সম্ভব, কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ সুখতাঙ্কর গীতা ও মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেছেনঃ "Is the Gita an interpolation? The question has no meaning.... The Gita in fact is the heart of the Mahabharata and the Mahabharata is the sort of commentary on the Gita."[৬১] অর্থাৎ গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত কিনা এ-প্রশ্নের কোন অর্থ নেই। কারণ, মহাভারত হলো গীতার ভাষ্য এবং গীতা হলো মহাভারতের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। [ক্রমশ]

---

৫৪ প্রথম অখণ্ড সং, পৃঃ ৪ ৫৫ ঐ, পৃঃ ৮ ৫৬ দ্রঃ ১৩শ অধ্যায়
৫৭ দ্রঃ ভারত সংস্কৃতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৫৮ গীতা, উদ্বোধন সং, ভূমিকা ৫৯ Complete Works, Vol. I, p. 446
৬০ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৫১ ৬১ On the meaning of the Mahabharata—V. S Sukhtankar, p. 119

নীরব প্রতীক্ষা

ইন্দ্রাণী রায়

মানুষের ইতিহাস,
আকাশ কি লিখে রাখে?
মানুষের না-বলা কথা—
না-পাওয়ার জ্বালা
বাতাসে কি ধরা পড়ে?
সেদিন ঘোলাটে চাঁদের আলোয়
কুয়াশার জালে,
ধরা পড়েছিল গাছেদের কান্না।
দুঃখের ভারে নত হয়েছিল
শিমুল-পলাশ,
জানি না কখন উড়ে গেছিল
রৌদ্রোজ্জ্বল হাঁস
তার শ্বেত পাখা মেলে।
ডানায় ডানা মিশিয়ে
তৈরি করেছিল প্রকৃতির কথা।
প্রাচীন কুয়াশা-সমুদ্রে
খুলে দিয়েছিল তার শুভ্রোজ্জ্বল ডানা—
ঝড়ে পড়েছিল একখণ্ড
উজ্জ্বল প্রত্যাশা।
চূর্ণ মেঘের মুঠি থেকে
নীরব আকুতি,
ছড়িয়েছিল মানুষের মাঝে।
রাত্রির ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস
মিশেছিল উজ্জ্বল সকালে।
প্রকৃতি তাকে দিয়েছিল
ঝরাফুলের অঞ্জলি।
আকাশ নীরবে ছুঁয়েছিল তাকে—
বাতাসে দিয়েছিল
এক নতুন সন্দেশ—
চুপেচুপে বলেছিল তাকে—
আজো বসে আছে নীরবে কোথাও
কোন মানুষ—নীরব প্রতীক্ষায়।
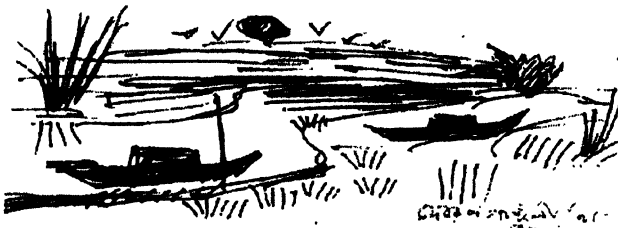
মানুষ কি জানে?

স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ

মানুষ কি জানে
সে মরে আছে
তার জন্মের পূর্বাহ্নেই?

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে
প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে
প্রতি রক্তকণিকায়
প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে?

তিল তিল করে
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মানব কলেবর
প্রতিদিন মেরে ফেলে
মানবের পূর্ব শরীরকে।

শিশু কিশোর যুবা
প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ
যা আমরা দেখছি
সবই সেই প্রত্যহের মৃত্যুর
নতুন ফসল।

পথ হারালে

বিভা বসু

বারবার ছুটে যাই নদীর কাছে
দুহাতে স্পর্শ করি তাকে, বলি—
আমাকে স্রোতস্বিনী কর।

মসৃণ হাওয়ার কাছে পাতি হাত,
বলি—আমাকে লাঘব কর
আমাকে নিরপেক্ষ কর।

অপলকে দেখি সবুজ পাতা,
বলি—মুছে দাও মরুভূমির তাবৎ কুস্বপ্ন

গোপন সঙ্কেত পাঠাই নন্দনকাননে
সংগ্রহে রাখি সৌরভ
নিষিদ্ধ সুখকে করে উপেক্ষা।

জাগ্রত রেখ আমাকে
বাতাসিয়া পথে পথ হারালে।

আমি দেব ভালবাসা

বৈদ্যনাথ গুপ্ত

এই কাঙালপনা
ভাল লাগে না।
পাওয়ার তো আশ্বাসই নেই,
নিশ্চয়তা—দূরস্থান।

রূপবান হওয়ার শখ আছে
ধনবান হওয়ার দরকার আছে
যশস্বী হওয়ার বাসনা আছে
কামনা আছে শত্রুজয়েরও—
কিন্তু
সেই সামর্থ্য অর্জনের জন্য
হতে হচ্ছে অদৃশ্যের ও অদৃষ্টের কৃপাপ্রার্থী।

কিবাশ্চর্য!
মন থেকে হটাতে হবে
হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষ,
তারও জন্য চাই
অনুগ্রহ যাজ্ঞা :
'দ্বিবো জহি'।

এজীবন শুধু
চাওয়াতেই রপ্ত,
পাওয়ার পরিমাণ কতটুকু!

এখন সাজবদলের ইচ্ছে জাগে।
পেতে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত এই মনে
এখন দিতে চেয়ে চেয়ে
মহাজন সাজার শখ।

হরে লবে কেটেকুটে
যেখানে হাতে থাকে শূন্য
সেখানে উত্তমর্ণ সাজার মাঝেও আছে
বলিহারি বাহাদুরি।

কিন্তু অধমর্ণকে টানব কিসের জোরে?
ভাবের ঘরে অভাব ছাড়া
কী আছে পুঁজি?
ধনের ঘরে মানের ঘরে
নিরেট নিটোল শূন্যতা,
ভাঁড়ে মা ভবানী!
অনিকেত অভাজনকে ভালবাসা দেব
সে গুড়ে বালি!
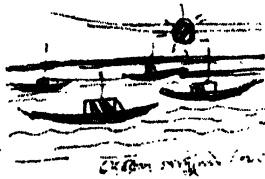
মরুচারী মানুষ যেমন
তৃষ্ণার দাপটে
জলের মর্ম বোঝে
শ্বাপদভীরু বনবাসী বোঝে
জনপদের নিরাপত্তার মর্ম
কম পেয়ে বেশি হারানোর বেদনায়
আমিও তেমনই বুঝি
ভালবাসা কি,
কিবা তার দাম।

হে সুদূরের বন্ধু আমার
এস, কাছে এস।
ঝিনুকের বুকে স্বাতী নক্ষত্রের
জলের মতো
এস, নিয়ে যাও,
আমি দেব ভালবাসা।

ছড়া

অতীন দাশ

এই দেশ ধর্মের
সুপ্রাচীন মর্মের
মানবিক ইতিহাস
গর্বের।

জননী জন্মভূমি
সবে তার পদ চুমি
আস্বাদ লাভ করে
স্বর্গের।

এল যত বর্বর
দস্যু ও তস্কর
লুঠে নেয় স্বাধীনতা
সম্পদ।

স্বজাতীয় বিক্রম
নিঃসাড় নিষ্ক্রম
বিজাতির হাতে যায়
মসনদ।

পরাধীন পরাভব
ক্রমে ক্রমে হৃত সব
জীবনে কেবল জমে
গ্লানি।

ফিরে পেয়ে হৃতধন
তবুও ঘুচে না ভ্রম
কলঙ্কতিলক শোভা
মানি।

প্রকৃতির কোলে ধ্যানমগ্ন পশ্চিম সিকিম

নীলাঞ্জন নন্দী
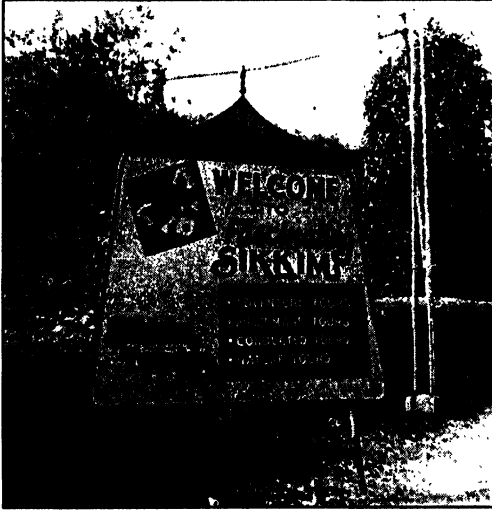
সিকিমের প্রবেশপথ আলোকচিত্র : লেখক

আকাশের আলো প্রায় নিভে এসেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,৮০০ ফিট ওপরে অবস্থিত নৈসর্গিক শোভায় ভরপুর 'জোংরি'র আকাশে দিগন্ত জুড়ে এখন অদ্ভুত বেগুনি আভাময় এক প্রলেপ ছড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতি যেখানে চিত্রকর, সেখানে স্বর্গীয় অনুভূতি জাগে। গগন ঠাকুরের 'ওয়াশ' পদ্ধতির জলরঙের ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয় জোংরির আকাশ। মনে পড়ে শ্রীমা সারদাদেবীর অমৃতবাণী—"দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ ঈশ্বরকে স্মরণ করার প্রকৃষ্ট সময়। এই সময় মন পবিত্র ও শান্ত থাকে।"

সিকিমে আসতে গেলে শিলিগুড়ি হয়েই আসতে হয়। এসে অবধি চোখ এতটুকু বিশ্রামের প্রত্যাশা করেনি। গোটা জগৎ জুড়ে ঈশ্বরের যে কী অসীম সৃষ্টির বৈচিত্র্য, সেটা এই সামান্য কাগজের স্বল্প পরিসরে বর্ণনীয় নয়।

"দু-চোখ মেলে শুধু পৃথিবীটা দেখ, আর বোধকরি অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় পাবে না।"—কথাটি বলে গেছেন সর্বকালের বিখ্যাত পর্যটক হিউয়েন সাঙ। মরুভূমি, গিরিশৃঙ্গ, নদী-নালা, সমুদ্র, ঝরনা বা গভীর অরণ্য এবং তার বুকে রাশি রাশি সপ্তবর্ণের ফুল, পাতা, উদ্ভিদ, পাখি ও পশু—কী অপূর্ব এই সৃষ্টি!

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, নেহাত উন্মাদ না হলে এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে প্রগতির নামে, জাতির নামে কেন এই দূষণ, এত হানাহানি আর অশান্তি? নিজেদের সম্পদকে নিজেরাই ধ্বংস করতে আজ আমরা উদ্যত। জোংরি বিশ্রাম-নিবাসের সম্মুখেই একটি ছোট হোটেল। এক চিলতে ঘর। পিছনেই বনফুলের জঙ্গল। দিগন্তবিস্তৃত গিরিরাজ। হোটেলে এনামেলের সাদা মগে চা-পান করতে করতে চায়ের স্বাদ বোঝার চেষ্টা করি। এই উচ্চতায় ঠাণ্ডাও বাড়ছে। গরম চায়ের স্বাদ ভাল লাগলেও, একটু অদ্ভুতও কিন্তু লাগছে। হোটেলের মালিক সদাহাস্যময় ফিগুরা জানালেন, এ চা তিব্বতী কায়দায় তৈরি। শীতে শরীরকে উষ্ণ রাখে। এই চায়ে দুধ-চিনির বদলে থাকে মাখন ও নুন। চায়ে নুন? শুনে চমকে উঠি! কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করি, শরীরে জমাট বাঁধা ঠাণ্ডা উধাও হয়ে যাচ্ছে। পরে জেনেছিলাম তিব্বত, সিকিম, মায় ভুটান, নেপালেও অনেকেই এভাবেই চা-পান করে।

আকাশের সেই বেগুনি আভা আর নেই। রাত্রির গাঢ় নীল চাদরে চরাচর মুখ লুকিয়েছে। আকাশপানে মাথা তুলে দেখি পরিষ্কার, ঝকঝকে আকাশ! কলকাতার দূষণে ভরা, ধুলো ও ধোঁয়ার কংক্রিটের জঙ্গলে এই আকাশ নেই। এই নির্মল বায়ু, গোটা আকাশ জুড়ে বিস্তৃত ছোট-বড় সব নক্ষত্রের সমাবেশ দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বিশ্রাম-নিবাসের পথে পা বাড়াই।

সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক থেকে পর্যটন দপ্তরের জিপে দুদিন পূর্বে সকালেই রওনা হয়েছিলাম পশ্চিম সিকিমের উদ্দেশে। পেশায় সঙ্গীতজ্ঞ এবং অনায়াসে নেপালী ভজন গাইতে পারি বলেই বোধহয় পর্যটন দপ্তরের মানুষেরা আমায় আরো একটু আপন করে নিয়েছে। সিকিমে পৌঁছাবার পরেই লক্ষ্য করেছি, এখানে প্রধানত নেপালী ভাষারই চল আছে। খাস সিকিমি ভাষা আজ কেবলমাত্র হাতে গোনা কয়েকটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্যাংটক থেকে পশ্চিম সিকিমের ইয়ুকসাম (Yuksom) পর্যন্ত গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন পর্যটন দপ্তরের কর্তারাই। ঘন সবুজ পথ পেরিয়ে সন্ধ্যার মুখে পৌঁছেছিলাম পেমিয়াংসির হোটেল পাণ্ডিম-এ। ওখানেই রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত ছিল। গতকাল খুব ভোরে উঠে রওনা হয়েছিলাম ইয়ুকসামের উদ্দেশে। চলেছি জোংরির টানে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪,০০০ ফিট ওপরে অবস্থিত। ইয়ুকসাম থেকে জোংরি অবধি পুরোটা পথই হেঁটে যেতে হয়। প্রায় দু-তিনদিনের পথ। ট্রেকিঙের সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সঙ্গে মোটা পশমের পোশাক, শুকনো খাবার, মোটা দড়ি, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং স্লিপিং ব্যাগ। শুনেছি পর্যটন দপ্তর এ-পথে ইয়াক সাফারির আয়োজনও করে থাকেন। ইয়াকের পিঠে চেপে ভ্রমণ। নিশ্চয়ই এক দারুণ

ব্যাপার হবে! ইয়াক হলো পাহাড়ি জন্তু—বলশালী ষাঁড়ের মতো তার চেহারা। স্বভাবে কিন্তু একেবারে বাধ্য, শান্ত। সিকিম, ভুটান মায় নেপাল ও তিব্বতে ইয়াক অপরিহার্য। মাল বহন থেকে শুরু করে পাহাড়ের মানুষেরা অনেক কাজেই একে ব্যবহার করে। ইয়াকের চর্বি ও দুধ মিশিয়ে একটা কঠিন সুপারি'জাতীয় পদার্থ তৈরি করে সিকিমের লোকেরা, যার নাম 'চুর্পি'। ভীষণ, হাড়কাঁপানো শীতে এই চুর্পি মুখে রাখলে শরীর পায় বাড়তি উষ্ণতা।

ইয়ুকসামে এসে তিনজন সঙ্গী পেলাম। নেপালের দুজন, আর দিল্লির এক পাঞ্জাবী যুবা। বেশ ভোরেই রওনা দিলাম। বিশ্রামগৃহের বাঁদিক ঘেঁষে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে জোংরির
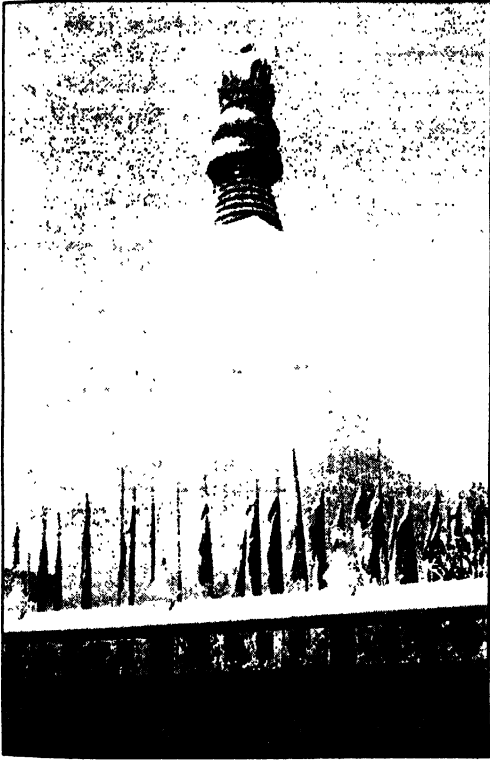
ঞ্রো ড্রুল চোর্তেন আলোকচিত্র : লেখক

পথে। আবহাওয়া চমৎকার। এই ইয়ুকসামেই একদিন সিকিমের ইতিহাসের শুরু হয়েছিল। প্রথম চোগিয়ালের অভিষেক হয় এখানেই—১৬৪২-এ। 'কাথোক হ্রদ' আর 'নোরবু গ্যাং' চোর্তেনের (সমাধিমন্দির) পাশেই সেই অভিষেকস্থলটি অবস্থিত। এই চোর্তেনেরও একটি কাহিনী আছে। এই সমাধিমন্দির দর্শন করলে নাকি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তিলাভ হয়। শত শত বছর পূর্বে এখানেই স্বয়ং বিষ্ণুর বরে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এক তপস্বী। তারপর থেকেই এটি প্রায় তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। ঐটুকু ছোট্ট স্থানে কত যে ফুল ফুটে রয়েছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। হরেক রঙের, আকারের ফুল যেন রঙিন বারুদে দীপাবলীর খেলা খেলছে। আতসবাজির উৎসবে রঙের ছটা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

আধ ঘণ্টা চলার পর বাঁদিকে একটা ছোট ঝরনার দেখা পেলাম। ধীরে ধীরে পরিবেশটা যে বদলে যাচ্ছে বেশ বুঝতে পারছি। গাছগুলো এখন অনেক বেশি লম্বা, Alpine শ্রেণীর। ঠাণ্ডাও বেড়ে গেছে। আমাদের সকলের ব্যাগ থেকেই বেরল আরো কিছু শীতের পোশাক। হেঁটে চলেছি, কারো মুখে কোন কথা নেই। এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো—নিস্তব্ধতা। কয়েকটা নাম-না-জানা পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দই কানে আসছে না। হঠাৎই মনে হলো, যেন সৃষ্টির সেই শুরুতে ফিরে গেছি—যখন বিলাসবহুল গাড়ির কর্ণভেদী হর্ন, বিষাক্ত ডিজেল-পেট্রলের ধোঁয়া অথবা উপগ্রহ টিভির কদর্য মাতামাতি ছিল না।

কিছুটা পথ চলার পরেই এসে গেলাম একটা ছোট্ট জনপদে। অবশ্য পথমধ্যে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে জলখাবার খেয়েছিলাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮,৮০০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত এই জনপদটির নাম 'বাখিম'। তার মানে হিসেব করে দেখলে আমরা প্রায় টানা সাড়ে সাত ঘণ্টা হেঁটেছি। হঠাৎই গোটা আকাশ কালো হয়ে শুরু হয়ে গেল ঝমঝমে বৃষ্টি। স্থানীয় এক হোটেলের মালিক জানালেন—এ-বৃষ্টি ঘণ্টা তিনেক আগে থামার নয়। এ-পথে এমন হামেশাই হয়। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করলাম, বাখিমেই রাতটা কাটাতে হবে। হোটেলের মালিকই রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

পরদিন কাকভোরে রওনা দিলাম। ঘুম ভেঙেছিল ভোর সাড়ে চারটেয়। রাত জেগে জেগে তারাগুলো তখন বুঝি কিছুটা ক্লান্ত। এরই মধ্যে বাকি তিনজনও উঠে পড়েছে। হোটেলের মালিক চা তৈরিতে ব্যস্ত। উলের মোজা পরেই শুয়েছিলাম, এবার জুতোটা গলিয়ে, জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে বাইরে এলাম। বাখিম তখনো ঘুমিয়ে। পথের চারপাশে ফারের ছড়াছড়ি। ছোট ছোট বাঁশের ঝাড়ও রয়েছে। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে—যেদিকেই তাকাই সু-উচ্চ পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছের পাতাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কার যেন ফিসফিসে বার্তালাপ। তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

আকাশভরা শেষরাতের তারা, সামনে পাহাড় তার নিস্তব্ধতা আর গাম্ভীর্য নিয়ে আমাদের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো যেন ঈশ্বরদর্শনে স্বর্গেই পৌঁছে গেছি! প্রকৃতির কাছে মানুষের সমস্ত কীর্তিকাণ্ড আজো পরাজিত। লক্ষ্য করছি, এখানে বেশির ভাগই ওক, চেসনাট ও বার্চ গাছ। মেপল-জাতীয় গাছও দেখলাম। গাছের পাতা

তেকোণা আকারের। এই পাতা কানাডার জাতীয় প্রতীক।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিতেই সমস্ত শরীরে ঐ ধূমায়িত চায়ের উষ্ণতা যেন ছড়িয়ে পড়ল। এবারে আর নুন-মাখনের চা নয়। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে দুধ-চিনি মিশ্রিত চা। তবে চায়ের স্বাদ বা ফ্লেভারটা যেন অচেনা। জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম—চায়ের পাতাটি দার্জিলিং অথবা আসামের নয়। এমনকি দক্ষিণ ভারতের নীলগিরির চাও নয় এটা। এই চা সিকিমের—দক্ষিণ সিকিমের টেমি (Temi) বাগানের চা। সারা বছরে উৎপাদন যতটুকু হয়, তার কিছুটা স্থানীয় বাজারে আসে, আর বেশির ভাগটাই যুক্তরাজ্য ও স্পেনে রপ্তানি হয়। সিকিম থেকে বর্তমানে শুধু চা-ই নয়, অজস্র medicinal plant অর্থাৎ ওষধিগুণসম্পন্ন ফুল-পাতাও রপ্তানি হয় বিভিন্ন দেশে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দেখি সম্মুখের গিরিশৃঙ্গে
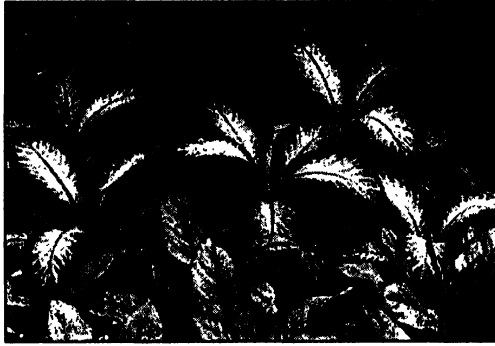
ওষধিগুণসম্পন্ন গাছ আলোকচিত্র : লেখক

হালকা কমলা পরশ। প্রথমে পাহাড়ের চূড়াটুকুতে আলো পড়ল। কমলা হলো গোলাপি। এবারে সেটা ছড়িয়ে পড়ল পুরো পাহাড়ের গায়ে। ধীরে ধীরে আলোটা পীতবর্ণ ধারণ করল। আমাদের পিছনের পাহাড়ের ফাঁকে স্নিগ্ধ কমলা-হলুদ বর্ণের সূর্য যেন একটি গোলক। সেই দীপ্যমান শক্তির উৎসকে প্রণাম করে আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম। হেঁটেই চলেছি। তবু পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। গতকাল সকাল ও দুপুরের হাঁটাহাঁটিতে পা-দুটো এমনিতেই ক্লান্ত ছিল। ক্রমে পথ শুধুই চড়াই। উঠতে বেশ কষ্ট হয়। পা যেন আর চলতে চায় না। তবুও এগিয়ে চলি। মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা—"Purity, patience and perseverance are three essentials to success and above all—love." মনে অসম্ভব জোর পেয়ে যাই। স্বামীজীর বাণী যেন ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আমার দুই সাথীকে বুঝিয়ে বলার পর দেখি, ওরাও যেন আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছে। হনহন করে হেঁটে চলি জোংরির উদ্দেশে। ক্রমে গাছপালা ঘন হয়ে আসছে। পায়ে চলা পথে দীর্ঘ মহীরুহের নীল-সবুজাভ ছায়া। গাছের ডাল ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে কখনো ঝলসে উঠছেন সূর্যদেব। পায়ের ব্যথা ভুলে আমরা হেঁটে চলি। না জানি কবে থেকে এই পর্বত মানুষের মনে ভক্তিসঞ্চার করে আসছে! সিকিমিরা এই 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'কেই তাদের গৃহদেবতা হিসাবে পূজা করে। সিকিমে এই পর্বতের নাম উচ্চারিত হয় অন্যভাবে—'কাং-চেন-জোং-ঘা' (Khang-cheng-dzong-gha)। মাঝে মাঝেই পথমধ্যে চোখে পড়ছে 'প্রার্থনা' লেখা পতাকা। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে মানুষের বসবাস না থাকলেও যাতায়াতের পথে সে তার ভক্তিকে পতাকার রূপে পুঁতে দিয়ে গেছে।

সিকিমিরা যখন পারে, যেভাবে পারে এই শৈলশিখরকে প্রণাম জানায়। লেপচা অর্থাৎ সিকিমের আদি বাসিন্দাদের বিশ্বাস যে, তারা এই কাঞ্চনজঙ্ঘারই সন্তান। নিয়মিত পূজা দেওয়া ছাড়াও 'বলি' ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। 'জোংগু'
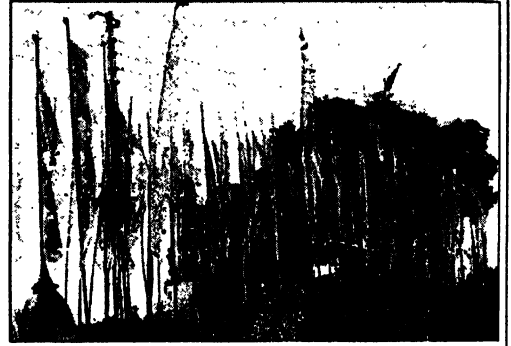
জোংরির পথে প্রার্থনা লেখা পতাকা আলোকচিত্র : লেখক

নামক গ্রামের নিকটে ইয়াক বলি দেওয়ার জন্য 'মুন' রয়েছে কয়েক ঘর। 'মুন' অর্থাৎ যারা এই বলির কাজে বংশানুক্রমে নিযুক্ত। এরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে বলে 'কোংচেন'। সিকিমের বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর সম্মানে বার্ষিক উৎসবের আয়োজনও করে। 'গুরু পদ্মসম্ভব' নাকি তাঁর ধর্মসংক্রান্ত লিপি ঐ পাহাড়েরই কোন একটি গুহায় লুকিয়ে রেখেছেন। তার হদিশ সাধারণ মানুষেরা পাবে না। বিভিন্ন গুম্ফা ও মন্দিরে এমন কিছু লিপি ও মানচিত্র রয়েছে যা পাঠোদ্ধার করে লুকানো লিপি উদ্ধার করতে পারবেন একমাত্র বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মযাজকেরাই। যেদিকে তাকাই, দেখি ছোট ছোট সব চোর্তেন, পাথরের খণ্ড আর সেই প্রার্থনা-লেখা পতাকা। কত লামা, কত তীর্থযাত্রীই না এই পথে এসেছেন, তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল! তাঁরা এসেছেন এই পর্বতকে, এই প্রকৃতিকে এবং ঈশ্বরকে প্রণাম জানাতে।

এইসব সু-উচ্চ গিরি-পর্বত ছাড়া সিকিমকে কল্পনা করা যায় না। এখানকার খামখেয়ালি আবহাওয়া আর হিমবাহের গলে যাওয়া জলেই সব নদ-নদীর বিস্তার। এইসব

কীর্তিকাণ্ডের পিছনে এই বিশাল পর্বতশ্রেণী। নদীগুলির জন্যই সিকিম পায় তার জলবিদ্যুৎ। সিকিমের উজাড় করা বনজ সম্পদ, নানা বর্ণের ফুল দেখে দেখেও যেন মন ভরে না।

ঈশ্বরের অশেষ কৃপা, সিকিমের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রগতি নামক রাক্ষসের নখে ক্ষতবিক্ষত হয়নি এখনো। বিশেষ করে যারা ট্রেকিং করতে ভালবাসে, তাদের জন্য পশ্চিম সিকিমের কোন তুলনা হয় না—যে ট্রেকিং রুটের শুরু ইয়ুকসাম থেকে।

দুটো বাঁক পেরিয়ে আমরা 'সোকা'তে এসে পড়লাম। ঘড়িতে তখন প্রায় বিকেল ৩টে। অর্থাৎ আমরা প্রায় ৮ ঘণ্টা হেঁটেছি। ভাবাই যায় না। ঘড়ি দেখার সাথে সাথেই পেটের খিদেটা চড়চড় করে উঠল। লাঞ্চ সারা হলো। সোকা ছোট্ট একটা গ্রাম। এক নেপালী ছেত্রীসাহেবের বাড়িতেই আশ্রয় নিলাম। এরা অনেকেই ট্রেকারদের রাতটুকু থাকার জায়গা দেয়।

গায়ে আরো একটা সোয়েটার চাপালাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯,০০০ ফিট ওপরে এই গ্রাম। আকাশের আলো খুব

শিক্ষার্থী লামারা আলোকচিত্র ঃ লেখক

দ্রুত মরে এল। অন্ধকার ঘরে আকাশের হলদেটে আলোর কিছুটা রেশ রয়ে গেছে। মোমবাতি জ্বালিয়ে ডায়েরী লিখতে বসলাম। লিখছিলাম 'গোচালা'র কথা। জোংরি থেকে আরো উঁচুতে 'গোচালা' (Gochaela), যার রুট—ত্রেঘচু হয়ে থাংসিঙ, তারপর বরফে আচ্ছাদিত ওংলাথাং উপত্যকা পেরিয়ে গোচালার প্রবেশদ্বারে। ওখানে সরু পায়ে চলা পথ। বলতে গেলে দুধারেই গভীর খাদ। এর দক্ষিণ পূর্বেই হিমালয়শ্রেণীর পর্বত শিখর পাণ্ডিম (Pandim), যার উচ্চতা ২১,৯৫৩ ফিট। এই অঞ্চলেই 'ভরাল' (Bharal) অর্থাৎ নীলবর্ণের ভেড়া দেখতে পাওয়া যায়। 'স্নো-লেপার্ড' বা তুষার-চিতার দেখাও মেলে মাঝে মাঝে। সামনেই রয়েছে 'সমিতি লেক'। এর টলটলে স্বচ্ছ জলের রঙ তুঁতের মতো। ক্যাম্পিং করার আদর্শ স্থান। ধ্যান করার জন্যও উপযুক্ত এই জনবিরল প্রদেশ।

ডায়েরী লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন আমার সহযাত্রীদের ডাকে ঘুম ভাঙল। দেখি, ওরা এর মধ্যেই ইয়াক এনে হাজির করেছে। যে-লোকটি এই পথে ইয়াক ভাড়া দেয়, সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে জোংরি অবধি। তার নাম সোমং লেপচা। বলশালী গড়ন, তবে চোখের দৃষ্টি বড়ই শান্ত। ইয়াকের পিঠে কম্বল বিছিয়ে বেশ আরামে বসা গেল। ইয়াক বেশ হেলেদুলে পথ চলেছে, মাঝে-মধ্যে মাটি থেকে কি যেন তুলে চিবোচ্ছে। প্রায় তিন ঘণ্টা চলার পর হঠাৎই খেয়াল হলো—কী জনবিরল এই স্থান! চারপাশে গাছ ঘন হয়ে আরণ্যক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগই 'রূপালী ফার' (Silver Fir)! দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যেতে লাগল। এরই মধ্যে ইয়াকের পিঠে চেপেই পাউরুটি ও বিস্কুট সহযোগে ভোজনপর্ব সমাধা হয়েছে। হঠাৎই পথের চারধারে দেখি ঝুরঝুরে বরফ। রডোডেনড্রনের ঝোপও চোখে পড়ল। কোথাও হালকা বেগুনি রঙ, আবার কোথাও ফিকে হলুদ। এরই মাঝে দূরে Panoramic view-তে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে পেলাম। সোমং লেপচা ঘাড় নেড়ে হেসে বলল ঃ "সাব, ইয়ে জোংরি হ্যায়।" আমি শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করলাম—'অপূর্ব'!

বেশ কিছুটা পথ উতরাই ভেঙে বিশ্রাম-নিবাসে এলাম। সিকিম সরকারের সুন্দর ব্যবস্থা। পৌঁছাতেই গরম চা আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। ঘড়িতে দুপুর ২টা। আজ দুদিনের মাথায় ১৩,৮০০ ফিট ওপরে জোংরি পৌঁছালাম। বিশ্রাম-নিবাসে বেশ কিছু যাত্রী রয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলে অনেকটা সময় কাটালাম। এখানে বিদ্যুৎ নেই, মোমবাতির শিখা দেওয়ালে কেঁপে কেঁপে চলেছে, তৈরি করছে এক অদ্ভুত পরিবেশ। বিশ্রাম-নিবাসের বাইরে পিন-পড়া নিস্তব্ধতা। এইরকম সন্ধ্যার পরিবেশে শুরু হলো 'ইয়েতি' অর্থাৎ তুষার-মানবের গল্প।

পর্যটক বা যাত্রী, যারাই লাদাখ, নেপাল, ভুটান, তিব্বত বা সিকিমে ভ্রমণ করেছে দুর্গম সব স্থানে, তারা ইয়েতির কথা জানেন। বিশ্রাম-নিবাসের ম্যানেজার গুরুং জানালেন, ইয়েতি নাকি এক অদ্ভুত জানোয়ার। গোরিলার সঙ্গে এর চেহারার সাদৃশ্য আছে। সাত থেকে সাড়ে নয় ফিট লম্বা এই ভীষণ জীবটি দু-পায়ে হাঁটে। একেবারে মানুষের মতো। গায়ে ঘন কালো-খয়েরি লোম। আর শক্তি হাতির চেয়ে কম নয়। এসব কাহিনী প্রচলিত। প্রথমদিকে তো এসবের কেউ আমলই দিত না। তবে যবে থেকে ইয়েতির পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে এবং তার ছবি তোলা হয়েছে নেপালের তুষারাবৃত পর্বতে, সেদিন থেকে খবরের সংস্থাগুলোও একটু নড়েচড়ে বসেছে। নেপালে ইয়েতির পায়ের ছাপ আবিষ্কার করার কথা প্রথমে দাবি করেন বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী এরিক লিপটন এবং লর্ড হান্ট। পশ্চিমী দুনিয়ায় সাড়া পড়ে যায়। তবে আজো ইয়েতিকে চাক্ষুষ দেখার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলেনি। তাই 'ইয়েতি'

শব্দের সাথেই জড়িয়ে রয়েছে রহস্য—"The mystery of the unknown!"

গুরুং আরো বললেন, সিকিমের ধর্মযাজকেরা (লামা) অনেকেই ইয়েতির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবি করেন। যখন এই লামারা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকেন, মাঝে মাঝে ইয়েতির জন্য নানা-ধরনের ফল রেখে যান পথের পাশে। আর তুষার-মানব সেই ফলের বিনিময়ে লামাদের দিয়ে যায় জ্বালানি কাঠ। সিকিমের অনেকেই ইয়েতিকে বলে 'মিগয়ুদ' অর্থাৎ 'আত্মা'। ভূ-তত্ত্ববিদ্ ও পরিবেশবিজ্ঞানীরা কিন্তু নিশ্চিত, সিকিমের এই পাহাড়েই লুকিয়ে রয়েছে ইয়েতির রহস্য।

জানলার বাইরে তখন গভীর রাত। বারান্দায় বের হলাম। শীতল বাতাস শরীরে তিনটে সোয়েটার ভেদ করেও হামলা চালাচ্ছে।

আকাশের রঙ নিকষ কালো নয়। রাতের নিজস্ব একটা রঙ আছে। স্বচ্ছ পরিষ্কার ঐ আকাশের গায়ে অগুনতি তারা। ঐ নক্ষত্রের দিব্য জ্যোতি আমাদের পথকে যুগ যুগ ধরে আলোকিত করবে। মানুষ মিছেই ঈশ্বরকে, ঠাকুরকে খুঁজে পাওয়ার জন্য ছুটে বেড়ায়। আসলে তিনি তো রয়েছেন আমাদের মনের ভিতরেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের কথা এসময়েই আমার মনে পড়ল, আর আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল একটা অদ্ভুত আনন্দ আর প্রশান্তি। ❑

জোংরি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা — আলোকচিত্র : লেখক

● *সিকিমে পৌঁছাতে হলে শিলিগুড়ি হয়েই আসতে হবে। বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে অথবা রেলযোগে নিউ জলপাইগুড়িস্টেশনে এসে শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে অবস্থিত সিকিম বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসযোগে গ্যাংটক যাওয়া যায়। গ্যাংটকের মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত পর্যটন দপ্তরের অফিসে যোগাযোগ করলে সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে যায়। বেড়াবার মরসুম মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর।*

চিরন্তনী
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ৯
❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑
কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত
বাহন ঐরাবতকে সুস্থ করে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের হত্যাকারী ইন্দ্রকে সামনে দেখে বৃত্রাসুর শোকে ও ক্রোধে অস্থির হয়ে গর্জন করে উঠল। বলল ঃ "রে পাপিষ্ঠ, আমার ভ্রাতা সদ্‌ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে তোমরা যজ্ঞের পুরোহিত-রূপে বরণ করেছিলে। তারপর তুমি তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছ। আজ আমার হাতেই তোমার মরণ।"—এই বলে সে প্রবল বেগে ইন্দ্রের দিকে শূল নিক্ষেপ করল।
প্রবল বেগে ধাবিত সেই ভীষণ অস্ত্রটি দেখে দেবরাজ কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি তাঁর হাতের বজ্রের আঘাতে শূলটি দু-টুকরো করে ফেললেন।
মহাশক্তিশালী শূলকে দেবরাজের বজ্রাঘাতে খেলনার মতো দু-টুকরো হতে দেখে বৃত্রাসুর স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার সেই ঘোর কাটতে না কাটতেই দেবরাজ বিশালাকায় বৃত্রাসুরের একটি বাহুতে তাঁর অমোঘ বজ্র নিক্ষেপ করলেন। দিব্যাস্ত্র বজ্রের প্রচণ্ড আঘাতে বৃত্রাসুরের বাঁ-হাতটি তার দেহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। [ক্রমশ]
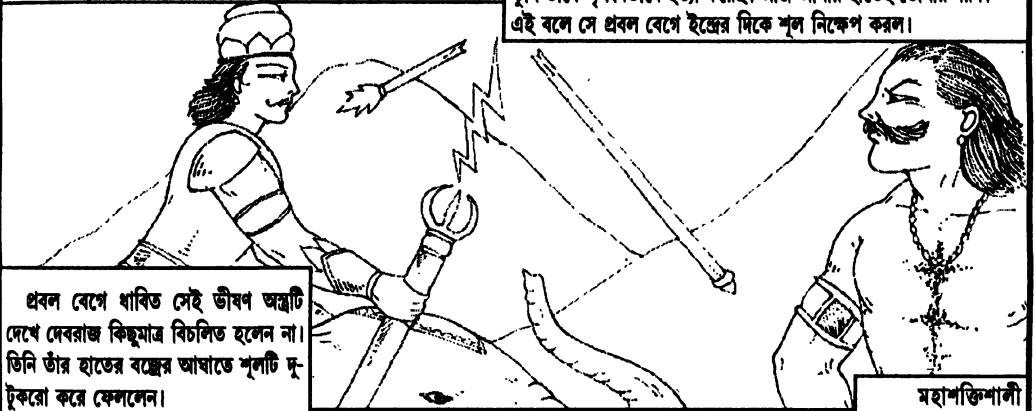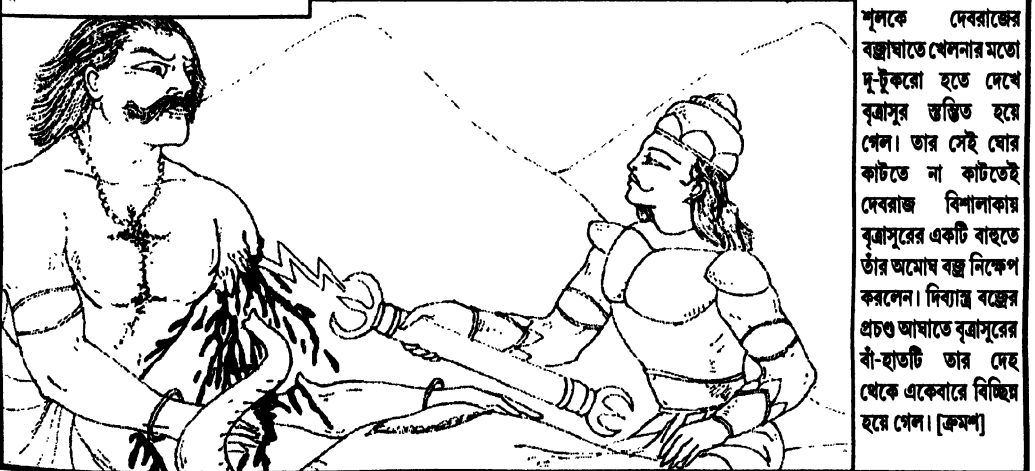
টেনিস-বিশ্বে অত্যুজ্জ্বল ভারতীয় জুটি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

উইম্বলডনের সবুজ ঘাসের মখমল কাউকে রাজা বানায়, কাউকে রানী—অনেকটা আরব্য রজনীর ম্যাজিক কার্পেটের মতো। এ হেন উইম্বলডনের সিংহাসনে অভিষিক্ত ভারতীয় জুটি লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি। টেনিস-দুনিয়ার আদরের 'লি-হেশ'। তার আগে অবশ্য চরিত্র ও কাঠিন্যে অনন্য ফ্রেঞ্চ ওপেন খেতাবও এদের হাত ধরে এসেছে ভারতে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনটিও আসত, ভাগ্য একটু সুপ্রসন্ন থাকলে। ফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা হলো না মহেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ায়। একই কথা প্রযোজ্য. যুক্তরাষ্ট্র ওপেন প্রসঙ্গেও। নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দেখিয়ে পর পর জিতে ফাইনালে গিয়ে মনঃসংযোগ হারিয়ে ফেলে গ্র্যান্ড স্লাম হ্যাটট্রিক হাতছাড়া করেন। কিন্তু এতসব আইভরি কীর্তির মূল্যায়ন করবে কে? এদেশের আমজনতা যে ক্রিকেট ছাড়া কিছুই বোঝে না! ফ্রেঞ্চ ওপেনের ডাবলস খেতাব যেদিন জিতল ভারতীয় জুড়ি, সেদিন ছিল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের এক গুরুত্বপূর্ণ খেলা। তাই সংবাদপত্রে সেভাবে গুরুত্ব পায়নি এই সাফল্য। আর উইম্বলডন চলার সময় চলছিল কার্গিল যুদ্ধ। তাই সেবারেও উপেক্ষিত লি-হেশ।

স্বাধীনতার পর দেখতে দেখতে অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত। শোনা যাচ্ছে নতুন শতকের আগমনী বার্তা। কালের হিসেবে অর্ধশতাব্দী অবশ্যই বিশেষ মাত্রাবহ। এই পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরে ভারতবর্ষের খেলাধূলার সামগ্রিক ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করলে অবশ্য টেনিসের এই 'গ্র্যান্ড স্লাম ডাবল' গুরুত্ব ও ব্যঞ্জনার নিক্তিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। '৪৮, '৫২, '৫৬, '৬৪, '৮০—এই পাঁচটি অলিম্পিকে হকির সোনা-সহ '৭৫-এ বিশ্বকাপ জয় অবশ্যই সেরা কীর্তি, গৌরব গরিমায় অনন্য। তার ঠিক পরেই কিন্তু রাখতে হবে বিশ্বনাথন আনন্দ ও লি-হেশ জুটিকে। আনন্দ হয়তো এখনো সরকারিভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হননি, লি-হেশের মতো নিজের ক্ষেত্রে একনম্বর র‍্যাঙ্কিংও পাননি, কিন্তু দাবার মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ খেলায় দু-দুবার অস্কার খেতাব প্রাপ্তি, বিশ্বের সব কয়টি প্রথম সারির টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক সাফল্য, সর্বোপরি ফিডে এলো রেটিংয়ে ২৮০০ পয়েন্ট সংগ্রহ করার পর তাঁকে নিয়ে অন্যরকম ভাবতেই হয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং দু নম্বর থেকে এক নম্বরে উঠে আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। অন্য অর্থে বলা যেতে পারে, গত ৪-৫ বছরে আনন্দের এইসব আইভরি কীর্তিই লি-হেশের প্রেরণার উৎস। কোনরকম সিস্টেমের সাহায্য ও সুযোগসুবিধা না পেয়ে বিদেশ-বিভূঁয়ে থেকে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টা ও প্রতিভাকে সম্বল করে বিশ্বনাথন আনন্দ যেখানে উঠে এসেছেন, তা দেখে পরোক্ষে কিছুটা হলেও লিয়েন্ডার-মহেশ ফিরে পেয়েছেন আত্মবিশ্বাস, জোগাড় করে নিয়েছেন দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজনীয় উপাদান, খুঁজে নিয়েছেন ভবিষ্যতের অভিজ্ঞান। ঐ প্রেরণার শক্তিকে বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন লিয়েন্ডার-মহেশ জুটি।

রমেশ কৃষ্ণনের অকাল অবসরে হঠাৎ করে অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এসেছিল ভারতীয় টেনিসে। রমেশের মতো 'ফ্রেন্ড, ফিলোজফার ও গাইড' পেয়ে লিয়েন্ডার খুব অল্প সময়েই পরিণত ও পরিশীলিত হয়ে উঠেছিলেন। রমেশের অবসরে গোটা ভারতীয় টেনিসের গুরুদায়িত্ব ও মর্যাদারক্ষার দায়বদ্ধতা এসে পড়ে তরুণ লিয়েন্ডারের ওপর। গৌরব নাটেকরকে নিয়ে ডেভিস কাপে ব্যর্থ হলেও এশিয়াডে দলগত বিভাগে ভারতকে লিয়েন্ডার চ্যাম্পিয়নও করেছেন, কিন্তু গৌরব নাটেকরের সঙ্গে তাঁর ঠিক সুর-তাল-লয় মিলছিল না। সার্কিটেও সেভাবে জায়গা করে নিতে পারছিলেন না তিনি। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো '৯৫-এর ডেভিস কাপে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে পেয়ে গেলেন মহেশ ভূপতিকে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে টেনিস শিখে আসা মহেশকে হঠাৎ করেই নামিয়ে দেন ভারতীয় দলের অক্রীড়ক অধিনায়ক জয়দীপ মুখার্জী। জয়দীপ অবশ্য মহেশের ব্যাপারে যাবতীয় খোঁজখবর জোগাড় করে নিয়েছিলেন। তাই ভারতীয় টেনিস মহলের চরম উৎকণ্ঠা ও অবিশ্বাসও তাঁকে টলাতে পারেনি। গোটা জাতিকে চমকে দিয়ে অনামী, আনকোরা মহেশকে গোরান ইভানিসেভিচ, সাসা হিরজনের মতো জগদ্বিখ্যাত তারকাদের বিরুদ্ধে কোর্টে নামিয়ে যে ফাটকাটা খেলেছিলেন তিনি, সেটাই হয়তো ভারতীয় টেনিসের আজকের এই গৌরবময় অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট।

শুরুর দিকে অবশ্য তাঁদের যাবতীয় সাফল্য শুধুই ডেভিস কাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লিয়েন্ডার তখন এটিপি সার্কিটে নিজের অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত। ডাবলস খেলছেন আজ একে নিয়ে, কাল ওকে নিয়ে। মহেশও শুধু ডেভিস কাপেই আবদ্ধ। '৯৬-এর শতবার্ষিকী অলিম্পিকে সিঙ্গলসে লিয়েন্ডারের ব্রোঞ্জ পদকটাই এই জুটির যাবতীয় সাফল্যের 'স্টেপিং স্টোন'। অলিম্পিকে তাঁরা ডাবলসের শেষ আটে গিয়ে আটকে যান। কিন্তু দেশের জন্য লিয়েন্ডারের লড়াই

অনন্যসাধারণ ভূমিকা, যার ফলশ্রুতি ব্রোঞ্জ পদক, মহেশকেও দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করে, স্বপ্ন দেখায় সোনালী ভবিষ্যতের। লিয়েন্ডারও অনুধাবন করেন, শুধু ডেভিস কাপেই নয়, ঠিকমত পরিকল্পনা নিয়ে চললে এটিপি সার্কিটেও সাফল্য পাওয়া সম্ভব। '৯৭-এর শুরু থেকেই দেখা গেল এই জুটির জয়যাত্রা। দুবাই ওপেন জিতে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁদের। দেশ-বিদেশে তাঁরা ৭-৮টি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন। বছরের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ডফোর্ডে ওয়ার্ল্ড ডাবলস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলে বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁরা লম্বা রেসের ঘোড়া।

'৯৮-এ দেখা গেল লক্ষণীয় অগ্রগতি। সুপার নাইন সিরিজের প্যারিস ওপেন ও ইতালিয়ান ওপেন জিতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিঙে তিন নম্বরে উঠে এলেন এই ভারতীয় জুটি। তাছাড়া বেজিং, সিঙ্গাপুর, দুবাই, চেন্নাই, মন্ট্রিয়ল—সব জায়গাতেই তাঁদের টেনিসশৈলী ও চমৎকার বোঝাপড়ার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য এদেশের টেনিসপ্রেমীদের মনে আশার সঞ্চার করেছে। '৯৮-এ দু-দুবার গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেও তাঁরা আটকে যান আগ্রাসী মানসিকতার অভাবে। পাশাপাশি এসেছে ডেভিস কাপের সাফল্যও। এবছর চেন্নাই ওপেন জিতে হ্যাটট্রিকও হয়ে যায় লি-হেশের। তার আগে অবশ্য মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন এই জুটি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের খেতাব একটুর জন্য হাতছাড়া হলেও ইঙ্গিত রেখে যায়—গ্র্যান্ড স্লাম স্বীকৃতি আর হয়তো অধরা থাকবে না। ফরাসি ওপেন জিততে যেন বদ্ধপরিকর ছিলেন লিয়েন্ডাররা। শুধু ডেভিস কাপের চমকপ্রদ সব সাফল্য আর এটিপি সার্কিটে গ্র্যান্ড স্লাম ব্যতীত আর সব টুর্নামেন্ট যতই জেতা যাক না কেন, বিশ্ব-টেনিসের 'হল অফ ফেম'-এ ঢুকতে গেলে পকেটে অন্তত একটা উইম্বলডন কিংবা ফরাসি, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব থাকা চাই।

অবশেষে ভারতেও এল গ্র্যান্ড স্লাম। একটা নয়, একেবারে দু-দুটো। ঘাউস মহম্মদ, নরেশকুমার, রমানাথন কৃষ্ণন, বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ, রমেশ কৃষ্ণন, জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লালেরা যা করতে পারেননি, তাই করে দেখিয়েছেন লিয়েন্ডার পেজ-মহেশ ভূপতি জুটি। বিজয়-আনন্দ অমৃতরাজ উইম্বলডন ডাবলসে শেষ চারে উঠেছিলেন। বিজয় ও রমেশ কৃষ্ণন সিঙ্গলসে যুক্তরাষ্ট্র ও উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালেও খেলেছিলেন দুবার করে। রমেশের প্রবাদপ্রতিম পিতা রমানাথন কৃষ্ণন '৬০ ও '৬১ পর পর দুবছর উইম্বলডন সেমিফাইনালে খেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এঁদের প্রত্যেকের যাবতীয় দক্ষতা, ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও গ্র্যান্ড স্লাম অধরাই থেকে গেছে। নিখাদ ভারতীয়ত্বের দৃষ্টিকোণে এবছর ফ্রেঞ্চ ওপেনেই প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব। তবে '৯৭-এ ফ্রেঞ্চ ওপেনের মিক্সড ডাবলস খেতাবে ভারতবর্ষের খানিকটা অবদান রয়েছে। সেবার মহেশ জাপানের রিকা হিরাকিকে নিয়ে এই খেতাব জিতেছিলেন। আর এবছর উইম্বলডন ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মিক্সড ডাবলস খেতাব দুটিও ভারতে আসে লিয়েন্ডার ও মহেশের দৌলতে। তাদের সঙ্গীনীরা ছিলেন যথাক্রমে আমেরিকার লিজা রেমন্ড ও জাপানের আই সুগিয়ামা। সব মিলিয়ে পাঁচটি গ্র্যান্ড স্লাম খেতাবের অংশীদার লিয়েন্ডার ও মহেশ।

এই মুহূর্তে ডাবলসের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিয়ে লি-হেশ একনম্বরে। ব্যক্তিগত পয়েন্টের নিরিখেও লিয়েন্ডার এক ও মহেশ দুই নম্বরে রয়েছেন। বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান জুটি 'উডিজ' অর্থাৎ মার্ক উডফোর্ড ও টড উডব্রিজরাও এখন লিয়েন্ডারদের পক্ষে অনতিক্রম্য নয়। ডাবলসে সাফল্য পাওয়ার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, তার সব কিছুই পুরোমাত্রায় বিদ্যমান তাঁদের মধ্যে। কোর্ট ও কোর্টের বাইরে দুজনে যেন দুজনের পরিপূরক। মাঝে সাময়িক মনোমালিন্য দেখা গিয়েছিল বটে। জুটি ভেঙে যাওয়ার উপক্রমও হয়েছিল। কিন্তু দুজনের বাবার বিচক্ষণতা ও অগণিত টেনিসপ্রেমীর ঐকান্তিক ইচ্ছা তা হতে দেয়নি। এখন দুজনে আবার চমৎকার বন্ধু। লিয়েন্ডার ও মহেশ দুজনেই এই সারসত্যটা বুঝে গেছেন যে, সিঙ্গলসে তাঁদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়, তাই ডাবলসে যত বেশি সম্ভব কীর্তিকল্প রেখে যাওয়াই হবে ভাবিকালের প্রতি তাঁদের শ্রেষ্ঠ অবদান। দুজনেই প্রায় সমবয়সী। ২৫-২৬ বছর বয়সটা টেনিস-জগতে একটা মাহেন্দ্রক্ষণ। দুজনেই এখন ফর্মের চূড়ায়। আরো অন্তত ২-৩ বছর এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা সম্ভব, যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে। তাই নিজেদের এবং দেশের স্বার্থে এই জুটির কাছে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" অর্থাৎ যতদিন না পর্যন্ত চূড়ান্ত লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়া যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সাধনা, একাগ্রতা ও লড়াই চলতেই থাকবে। পরবর্তী লক্ষ্য অলিম্পিক সোনা। ২০০০-এর সিডনি অলিম্পিকে সোনা জয় কোন অলীক কল্পনা নয়। এটিপি সুপার নাইন, গ্র্যান্ড স্লাম—সবই করায়ত্ত হয়েছে, বাকি শুধু অলিম্পিক সোনা। আমরা এখন সেই উজ্জ্বল সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। তবে শুধু অলিম্পিক সোনাই নয়, একই সঙ্গে চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতে 'গোল্ডেন স্লাম' করাই তাঁদের লক্ষ্য। সেটা হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়।

একবিংশ শতাব্দীর অভিষেকে লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি, বিশ্বনাথন আনন্দরাই ভারতীয় ক্রীড়াজগতের পথপ্রদর্শক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা এগিয়ে যাবেন, আরো উঁচুতে তুলে ধরবেন ভারতের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের ধ্বজাটি। প্রায় সমবয়সী তিন তরুণ তাঁদের শৌর্য, বীর্য, মহিমামণ্ডিত স্বর্ণসাফল্য দিয়ে গোটা দেশের যুবসমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঠিক করে দিতে পেরেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উঠে আসা এবং অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে ভারতকে সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করাই হবে নতুন শতকের নবপ্রজন্মের প্রধান কর্তব্য। ❑

জাতীয় আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ

নিমাইসাধন বসু

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সাধারণভাবে সমার্থক মনে করা হয়। 'জাতীয়' শব্দটির আভিধানিক অর্থের মধ্যে রয়েছে 'স্বদেশীয়', 'জাতীয় প্রকৃতিগত (জাতীয় ভাব)', 'জাতিগত, জাতি সম্বন্ধীয়' ইত্যাদি। 'জাতীয়' কথাটির সহজ ইংরেজী অনুবাদের অর্থ হলো 'জাতিগত' 'স্বদেশ-ভক্তিমূলক'। অন্যদিকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' বলতেই আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই ধরে নিই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ঐ সীমিত অর্থে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি-আন্দোলনকেই বোঝায়। কিন্তু স্বাধীনতা যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তা বলা বাহুল্যমাত্র। সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয়, চিন্তা, বাক্য (বাক্) ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি জাতির এবং ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতার প্রশ্ন আছে, এর প্রতিটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন এই কারণেই যে, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা-আন্দোলনে কখনো যোগদান করেননি এমন বহু বিশিষ্ট এবং সাধারণ মানুষ আছেন (খ্যাত এবং অখ্যাত) যারা বৃহত্তর অর্থে জাতীয় আন্দোলনে বা স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিরাট অবদান রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এইটি স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা রাজনীতি ছাড়াও জাতীয় আন্দোলন ও জাগরণের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান ছিল। সুতরাং তাঁর ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন করার পক্ষে এই উপলব্ধি ও দৃষ্টির প্রসারতা একান্তই প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনা মুখ্যত রাজনৈতিক স্বাধীনতা-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণে বিচার করলে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম ছিল না। তা ছিল ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে বাইরের ও ভিতরের (external and internal) সমস্ত শৃঙ্খল বা বন্ধন মুক্তির এক অখণ্ড প্রচেষ্টা।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম, তীব্রতা বৃদ্ধি এবং প্রসারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল তাঁর কৈশোর থেকে। পরবর্তী জীবনে সেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনে এক বড় ভূমিকা ছিল রবীন্দ্রনাথের। আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে আসার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে মানসিকভাবে সরিয়ে নিতে পারেননি। তাঁর পরোক্ষ ভূমিকা এবং প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর লেখনী, ভাষণ এবং ব্যক্তিগত মতামতের প্রভাব সকল মতাদর্শের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের মতো সেও একই দীর্ঘ কাহিনী। তার এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা জাতীয় আন্দোলনে কবির অবদান উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, জাতীয়তাবোধ দ্রুত প্রসারলাভ করতে থাকে। এই সময় শিক্ষিত সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অশুভ প্রভাব ও পাশ্চাত্যানুকরণের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের জনসাধারণকে আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে তাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭)। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই হিন্দুমেলা চলেছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের অনেকে হিন্দুমেলায় নিয়মিত যোগ দিতেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চৌদ্দ বছরও পূর্ণ হয়নি তখন তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' ছাপা হয়েছিল তৎকালীন দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)। হিন্দুমেলার একটি সভায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' নামে একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। কবিতাটি সম্বন্ধে 'সাধারণী' পত্রিকা লেখে ঃ "এ পদ্য অতি মনোহর, পাঠ করে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইতেছিল।" (রবীন্দ্র-জীবনকথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১২; রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম পর্যায়—জলি সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৪-১৬)। হিন্দুমেলার যুগের লেখা

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতায় 'যুগোপযোগী স্বাদেশিকতার সুর' সম্পর্কে বহু তথ্য ডঃ জলি সেনগুপ্তের গ্রন্থে রয়েছে। ঐগুলির মধ্যে 'ঢাকো মা মুখ চন্দ্রমা জলদে', 'তোমারি তরে মা সপিনু এদেহ', 'অয়ি বিবাদিনী বীণা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ-শাসন এবং শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান গভীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সুর ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা, গান ও রচনায়। যুবক রবীন্দ্রনাথের লেখনী ও কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর তীব্র হতে থাকে। ১৮৭৭ সালে দারুণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে নতুন বড়লাট লর্ড লিটন ভারতে এসে ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' (Empress of India)-রূপে সাড়ম্বরে ঘোষণা করার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন তিনি। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঐ আড়ম্বরকে তিনি একটি কবিতায় 'শ্মশানদৃশ্যের মধ্যে উৎসব' বলে বর্ণনা করেন। লিটনের শাসনকালে ইংরেজ ও শ্বেতাঙ্গদের ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অবমানকর উক্তি ও আচরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গ কৌতুক করে কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'ভারতী'তে প্রকাশিত (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) 'জুতাব্যবস্থা' রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন ঃ "গভর্নমেন্ট একটি নিয়মজারি করেছেন যে, যেহেতুক বাঙালীদের শরীর অত্যন্ত বে-যুৎ হইয়া গিয়াছে, গভর্মেন্টের অধীনে যেসব বাঙালী কর্মচারী আছে তাহাদের প্রত্যহ কার্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে।" (রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম পর্যায়, পৃঃ ২৪২) বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবীদের গুপ্তসভার প্রতিও রবীন্দ্রনাথ ঐসময় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ 'সঞ্জীবনীসভা' নামে একটি গুপ্তসমিতি ঐসময়ে স্থাপন করেন। সভার সদস্যরা নিজের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করতেন। সাঙ্কেতিক ভাষায় সঞ্জীবনীসভাকে বলা হতো 'হামচুপামহাফু'! ঐ সভা সত্যিকারের কোন গুপ্ত বিপ্লবী কাজকর্মে লিপ্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, সভায় একটা "খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে তাঁরা থাকতেন"। প্রধান কাজ ছিল "উত্তেজনার আগুন পোহানো"। কিন্তু ঐ পরিবেশ ও ইংরেজ-বিরোধী ক্ষোভ তাঁর সমকালীন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

১৮৮৪ সালের ২৬ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রী লাইব্রেরিতে একটি বক্তৃতায় এদেশীয় ইংরেজদের যেভাবে সমালোচনা করেছিলেন তা সে-যুগের রাজনৈতিক পরিবেশে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ছিল। তিনি বলেছিলেন, একজন ইংরেজের কাছে 'ভদ্রলোক' বলতে বোঝায় তাঁকে নিজেকে। আর 'বাবু' হলেন এক গোবেচারা মসিজীবী! সাহেবের দৃষ্টিতে আমরা (ভারতীয়রা) তার খাদ্যবস্তু ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তার বেশি কোন মূল্য তার নেই। গোমাংস, পাঁঠার মাংস, শূকর বা মুরগীর মাংসের মতো! যাঁরা ইংরেজদের কাছে সমমর্যদার (equal status) দাবি করছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ভিক্ষাবৃত্তি' করে সমমর্যাদা পাওয়া যায় না। তা পেতে হলে নিজেকে, নিজের দেশকে, সমাজকে উন্নত ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। দেশের অসম্মানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। বক্তৃতার শেষদিকে কণ্ঠস্বর আরো উচ্চে তুলে তিনি বলেন, সমস্ত বিদেশী সম্মান, পোশাক, জিনিসপত্র বর্জন করতে হবে। নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলেই যাকিছু অর্জন করতে হবে। তার জন্য কোন কষ্ট বা আত্মত্যাগই যথেষ্ট নয়। এই বক্তৃতার গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য স্মরণ রাখতে হবে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল এর প্রায় দু-দশক পরে। ঐ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তার বহু পূর্বেই তাঁর মনে স্বদেশী চিন্তার উদয় হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরিতে ১৯০৪ সালে (৭ জুলাই)। তাঁর ঐ বক্তব্য এত সাড়া জাগিয়েছিল যে, কয়দিন পরেই (১৮ জুলাই) তাঁকে প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এবং ১৮৮৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন (Bengal Provincial Conference) গঠিত হওয়ার পরে প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হলো, ১৮৮৬ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর স্বরচিত গান—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' স্বকণ্ঠে গাওয়া। অন্য ঐতিহাসিক ঘটনাটি ছিল, ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে কবির নিজের দেওয়া সুরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়া।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত, সরকারি ঘোষণা এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন বিরাট আকার ধারণ করে ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই ইতিহাস অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখের গান, নাটক ও কবিতা জনগণের স্বদেশপ্রেম ও ভাবাবেগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনের যুগের গান সেইসময় মানুষের মনকে উদ্বেলিত করেছিল (আজও করে)। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে", "যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা", "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/ পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান" প্রভৃতি গান স্বদেশপ্রেমের বন্যা সৃষ্টি করেছিল সারা বাংলায়। প্রখ্যাত ইংরেজ কবি এজরা পাউন্ড রবীন্দ্রনাথের গানের অভূতপূর্ব প্রভাব প্রসঙ্গে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে একটি জাতিকে গড়ে তুলেছেন।

শুধু গান রচনা ও গান করেই নয়, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার ঘোষিত

দিনটি 'রাখীবন্ধন দিবস'-রূপে পালিত হয়েছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—কোন রাজশক্তি, সে যতই পরাক্রান্ত হোক না কেন, বাঙালী জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করতে পারবে না। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দুটি আদর্শ এবং কর্মসূচী ছিল 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'—একটি অপরটির সম্পূরক। অন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যটি ছিল 'জাতীয় শিক্ষার (National Education) প্রবর্তন'। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথ গভীর আগ্রহী ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কর্মসূচী গ্রহণ করার উদ্দেশে যে জনসভা প্রথম আহূত হয় (৫ নভেম্বর ১৯০৫), সেখানে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও পরিকল্পনায় ইতিপূর্বেই জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব ছিল। তিনি এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়, পরবর্তী কালের বিশ্বভারতীর মুখ্য আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল অভিন্ন।

স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথ তথা ঠাকুর পরিবারের উৎসাহ ও সমর্থন ছিল। 'বয়কট' এবং 'স্বদেশী'—এই দুটি লক্ষ্যকে একই কর্মসূচীর 'নেতিবাচক' (negative) ও 'ইতিবাচক' (positive) দিক বলে ঐতিহাসিকেরা ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মে ইতিবাচক দিকটি সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে। তাই তিনি বিদেশী দ্রব্যের 'বহ্নি-উৎসব' মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। অন্যদিকে ক্রমে ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা ও তার থেকে বিপ্লবী তৎপরতার প্রসার হতে থাকে। সেই যুগে এই কর্মসূচী 'সন্ত্রাসবাদ' (terrorism) নামে পরিচিত ছিল। 'বিপ্লব' ও 'সন্ত্রাসবাদ'-এর মধ্যে পার্থক্য এখন স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের মনে বিপ্লবীদের কর্মসূচী সংশয় সৃষ্টি করে। তাঁর স্পর্শকাতর কবিমন বিচলিত হয়। তিনি নিজেকে সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেন। তাঁর সাহিত্যেও তার প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এখনো তা বহু আলোচিত প্রসঙ্গ।

বিপ্লবী আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের প্রতি দুটি বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুস্পষ্ট। প্রথমটি হলো, 'সন্ত্রাসবাদ' বা 'হিংসাত্মক কর্মতৎপরতা'র প্রতি তাঁর নীতিগত কারণে বিরূপ মনোভাব ও সমালোচনা। অন্যটি হলো—তরুণ বিপ্লবীদের গভীর স্বদেশপ্রেম, আত্মত্যাগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা। যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য নির্ভয়ে প্রাণদানে প্রস্তুত তাঁদের প্রতি ভালবাসা, তাঁদের জন্য উদ্বেগ। এই দুটিকে একত্রে না দেখলে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে 'নরমপন্থী'দের (moderates) আবেদন-নিবেদন নীতির (policy of prayer and petition) কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি। জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব থেকেই 'ভিক্ষাবৃত্তি'র প্রতি তাঁর মনোভাবের উল্লেখ পূর্বেই করেছি। চরমপন্থীদের (extremists) মতাদর্শ ও কর্মসূচীর প্রতি তাঁর সমর্থন ও শ্রদ্ধার বহু প্রমাণ রয়েছে তাঁর সাহিত্যে ও ভাষণে। যেমন, তিনি বলেছিলেন চরমপন্থীরা "দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই।" অরবিন্দ ঘোষের মুক্তির পর তাঁকে শ্রদ্ধা-অভিনন্দন জানিয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা—'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমাদের দেশে জেল খাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয়স্বরূপ হয়ে উঠেছে। জেলখানার ভয় না ঘোচাতে পারলে আমাদের কাপুরুষতা দূর হবে না।"

কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্রের 'সুপ্রভাত' পত্রিকার জন্য তিনি তাঁর সর্বাধিক পরিচিত কবিতাগুলির অন্যতম কবিতাটি লিখেছিলেন :

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।।"

এই কবিতাটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে দারুণ অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিল।

বিপ্লবী আদর্শ ও আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধ ঐসময়ের অন্য অনেক রচনা ও কবিতায় ফুটে উঠেছিল। তার অন্যতম ছিল 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধটি (১৯০৮)। উনিশ শতকের শেষ দশকেই বিপ্লবী তৎপরতার শুরু হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে জনসাধারণের প্রতি দুর্ব্যবহার-কারী দুজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকে হত্যার অপরাধে দেশপ্রেমিক দুই ভাই দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকারের ফাঁসি হয়েছিল। এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সারা দেশে, বিশেষ করে পশ্চিম ও মধ্য ভারতে এবং বাংলাদেশে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠে ও বিপ্লবী তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারি নির্যাতন ও জুলুমবাজিও বাড়তে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সরকারি চণ্ডনীতির প্রতিবাদ করে বলেছিলেন : "কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে সম্পূর্ণ উলটো ফল হয়। রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যদি 'রাজদ্রোহ' হয় তাহলে প্রজার বিরুদ্ধে রাজপুরুষদের অত্যাচারকে 'প্রজাদ্রোহ' বলা যাবে না কেন?" এরকম প্রশ্ন করা সে-যুগে দুঃসাহসিকতার পরিচয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের, বিশেষ করে সহিংস বিপ্লবী কাজকর্মের দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ মানুষ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সরকারি অত্যাচারের নিন্দা করতে তিনি কখনো দ্বিধা করেননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের বিদ্যায়তন, তাঁর সাহিত্য এবং তিনি নিজেও সরকারের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে এক বিপ্লব ঘটাবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিক ও ছাত্রদের নিয়ে 'গদর পার্টি' নামে একটি বিপ্লবী দলের জন্ম হয় (১৯১৩)। তারা ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন

করে 'কোমাগাটামারু' নামে একটি জাহাজে বিদেশ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ঐ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। জাহাজটির যাত্রীদের ওপর চরম পুলিসি নির্যাতন হয়। সেই বর্বর অত্যাচারে ক্ষুব্ধ, মর্মাহত কবি দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজকে বলেছিলেনঃ " 'ক্রমাগত মার' এই নীতি অসহ্য হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকার চাই।" জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলার (১৯১৯) প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি ত্যাগ এবং ঐ সিদ্ধান্তের সঙ্কল্প জানিয়ে তিনি যে-চিঠি ভাইসরয়কে লিখেছিলেন তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে।

তিরিশের দশকের প্রথম দিকের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির মধ্যে ছিল আইন অমান্য আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পেশোয়ার ও শোলাপুরের গণ-অভ্যুত্থান এবং একের পর এক সশস্ত্র বিপ্লবী প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডেন' (Manchester Guardian)-এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেনঃ "Though such actions were called by the high sounding names of law and order, they are themselves the worst breaches of law of humanity which, I feel, is greater than any other law." (যদিও ঐসব নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ 'আইনশৃঙ্খলা' রক্ষার জন্য করা হয়েছে বলে বড়াই করা হচ্ছে, ঐগুলি মানবিক আইনের জঘন্যতম লঙ্ঘন, যে-আইনকে আমি যেকোন আইনের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।)

স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের অবদানের এক উজ্জ্বল দিক ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি এবং আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থন। ভারতের মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিকদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, তাঁদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ, বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে তাঁর ধিক্কার সরকারকে বিচলিত এবং দেশের মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ১৮৯৭ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের অন্তরীণ আদেশ ও সিডিশন বিল-বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল। তার প্রায় দু-দশক পরে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতরক্ষা আইন, অ্যানি বেশান্তের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রাওলাট অ্যাক্ট এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মন্তুদ হত্যার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসীর ধিক্কার, ক্ষোভ, বেদনা ও প্রতিবাদ কেমন করে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ও লেখনীতে ফুটে উঠেছিল তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৯২৪ থেকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করার দাবির সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ "ন্যায়বিচার ও মানবতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, এই আহ্বান উপেক্ষা করলে বিপদ অনিবার্য।" ১৯২৪ সালের ২৪ অক্টোবর সরকারি দমনমূলক অর্ডিনান্সের খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবিতা-পত্রে লেখেনঃ

"শুনছি নাকি বাংলাদেশে গান হাসি সব ঠেলে,
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
দুঃখসহার তপস্যাতে হোক বাঙালীর জয়—
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়,
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয়, বাঁচতে তারাই জানে।"

১৯২৯ সালে লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুবরণের সংবাদ পেয়ে মর্মাহত কবি লিখেছিলেন 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ' গানটি। এই গানটি তিনি তাঁর 'তপতী' নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ১২ মে আন্দামানে বন্দীরা অনশন করছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন—"Your motherland will never forget her full-blown flowers." হিজলী বন্দীশিবিরে পুলিসের গুলি চালনার ফলে (১৯৩১) সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভায় রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করেছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, বিদেশী রাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ।

বিপ্লবী আন্দোলন এবং বিপ্লবী নেতাদের আদর্শ ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু সমালোচনামূলক লেখা কোন কোন সময়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। ঐ কারণে তিনি নিন্দিতও হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান ইংরেজী জীবনীকার কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেনঃ "In this short and powerful novel he returns to the theme he had discussed earlier, in a different setting, in his novel **The Home and the World** (ঘরে বাইরে)—human values and political ideals. The setting is the underground revolutionary movement in Bengal, against its heroism and its terrorism is depicted the frustration of love and the gradual debasement of values. The author's analysis of the motives that inspire and condition political heroism is marked by deep insight into the psychology of the characters in this drama of frustrated idealism and is expressed in language of great vigour and beauty. It is a novel that Turgener might have written." (Rabindranath Tagore : A Biography, p. 402) [ক্রমশ]

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

কোষ্ঠকাঠিন্য

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত বাদলচন্দ্র ঘোষের 'উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্র' শিরোনামে লেখা চিঠি পড়ে তাঁর শারীরিক অসুস্থতায় কিছু সুরাহা হতে পারে ভেবে কয়েকটি কথা শ্রীঘোষ ও 'উদ্বোধন'-এর পাঠকমণ্ডলীর অবগতির জন্য জানাচ্ছি। আশা করি এই পদ্ধতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে আমার মতো তিনি ও অন্যান্যরা উপকৃত হবেন। এই ব্যবস্থায় ওষুধপথ্যের বালাই নেই, ডাক্তারের বাড়িও দৌড়াতে হয় না।

প্রথমত, শ্রীঘোষ যদি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক হয়ে থাকেন তবে ১৪০৪ সালের মাঘ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত 'অত্যাশ্চর্য জল-চিকিৎসা' শীর্ষক পত্রটি (পৃঃ ৮৬) তাঁকে পাঠ করতে অনুরোধ করছি। নিষ্ঠার সঙ্গে পদ্ধতিটি পালন করলে, আমার ধারণা, আমার মতো তিনিও অত্যাশ্চর্য ফল পাবেন। আমার বর্তমান বয়স ৭১ বছর। শ্রীঘোষের মতো আমারও ভয়াবহ কোষ্ঠকাঠিন্য (obstinate constipation) ছিল। পায়খানার কোন বেগই হতো না। কোন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধে ফল পাইনি। তাছাড়া, বিশেষজ্ঞদের মতে, বেশিদিন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেলে অপকার ছাড়া উপকার হয় না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেলে সাময়িক উপশম হতো অবশ্য। ইসবগুলও খেয়ে দেখেছি, তেমন লাভ হয়নি। 'উদ্বোধন'-এ 'অত্যাশ্চর্য জল-চিকিৎসা' পড়ে আমি এই চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুশীলন করতে শুরু করি এবং আজ দুবছর হয়ে গেল, আমি ভালই আছি। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার সপ্তাহকাল মধ্যেই আমি ফল পেতে শুরু করি এবং আজ আমার কোষ্ঠকাঠিন্যের কোন সমস্যা নেই। আশা করি, শ্রীঘোষও আমার মতো অবশ্যই উপকৃত হবেন। অর্শ আমার বংশগত ছিল। অনেক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করেও স্থায়ী কোন ফল না পেয়ে অবশেষে একজন হোমিও চিকিৎসকের চিকিৎসায় (প্রায় ৪৫ বছর আগে) আজো সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। যেহেতু অর্শের সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই আমার মনে হয় কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে রেহাই পেলে অর্শও ভাল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করতে আরো একটি বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাপদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিতেও কোন ওষুধ খেতে হয় না বা ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় না। নিজের ঘরে বসে নিজেই চিকিৎসা করতে পারবেন। তা হলো Acupressure বা Reflexology। এই পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ইংরেজী ও বাঙলায় বই কলকাতাতেও পাওয়া যায়। নাম—'Health is in Your Hands' এবং বাঙলা সংস্করণের নাম—'আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতেই'। লেখক—দেবেন্দ্র ভরা। প্রকাশক—নবনীত পাবলিকেশন্স লিমিটেড, নবনীত হাউস, গুরুকূল রোড, মেমনগর, আহমেদাবাদ-৩৮০০৫২। এবিষয়ে কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে আমি জানাতে চেষ্টা করব।

কুমুদবন্ধু স্বামী
পোঃ আসাম সচিবালয়
গুয়াহাটি-৭৮১০০৬, আসাম

'দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি'

'উদ্বোধন'-এর ১৪০৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'ভাষণ' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের 'দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি' পড়ে আমি তৃপ্ত, অভিভূত। আমি মনে করি এবং বিশ্বাস করি—এই অসাধারণ নির্দেশিকাটি বারবার পড়ে ঠিক ঠিক অনুধাবন করলে বহু মানুষের চোখ খুলে যেতে পারে। আমি আমার সচেতনতার জন্যই উক্ত নির্দেশিকা অবলম্বনে দু-এক কথা বলতে চাই। কাউকে শিক্ষা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।

'দীক্ষাগ্রহণ' বিষয়টি যে সত্যিই পরম কল্যাণময়কে লাভের প্রকৃষ্ট মাধ্যম—তা মহারাজজী কত নিখুঁত যুক্তিতে প্রাঞ্জলভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের সজাগ করতে চেয়েছেন—দীক্ষা নিছক মন্ত্র নয়, দুটো শব্দ নয়, মামুলী আচার নয়। হৃদয়রূপ মন্দিরে মন্ত্ররূপী ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করার আন্তরিক প্রয়াসই হচ্ছে দীক্ষালাভ। সেজন্যই দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে মনকে প্রস্তুত করে নিয়ে আগ্রহ তৈরি করা মানেই হৃদয়মন্দিরকে পরিমার্জন করা। পূজ্যপাদ মহারাজ দীক্ষাকে মনুষ্যজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ তথা ঘটনা বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে, দীক্ষার মাহাত্ম্য, তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হলেই পার্থিব অস্তিত্বের আঙিনা থেকেই শরণাগতির মাধ্যমে পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতার পথে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, সত্যিই তা বাস্তবে সম্ভব।

গদাধর রাণা
উবিদপুর, খানাকুল, হুগলী-৭১২৪০৬

'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি'

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৬ সংখ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি' সম্পাদকীয় পড়লাম। সেই অপার্থিব বাঁশির ধ্বনি শুনতে পাওয়া নিশ্চয়ই কৃপাসাপেক্ষ, কিন্তু তার ধ্বনি-মাধুর্য ভক্তবৃন্দকে আস্বাদন করানোর প্রচেষ্টা সাধনা ও নিবেদনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধন্য লেখক, আমরা ধন্য ততোধিক। সম্পাদকের বহু স্মরণযোগ্য 'কথাপ্রসঙ্গ'-এর মধ্যে নিঃসন্দেহে এটি এক অনবদ্য সংযোজন।

ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়
বন্ডেল রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯

বনফুল-পত্নী লীলাবতী

গত শ্রাবণ ১৪০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বনফুল প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করে জানতে পারলাম, বনফুল-পত্নী লীলাবতী, ছোটবেলায় বাগবাজারে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে থেকে নিবেদিতা স্কুলে পড়েছিলেন। এই সুবাদে তাঁর শ্রীমাকে সেবা করার, এমনকি চুল বেঁধে দেওয়ার সুযোগও ঘটেছিল। এছাড়া মায়ের বাড়ীতে স্বামী সারদানন্দের সান্নিধ্যলাভও তাঁর জীবনে ঘটেছিল। বহু জন্মের সুকৃতির ফলেই এমন দুর্লভ প্রাপ্তি মানুষের জীবনে ঘটে। বনফুলের মতো এক প্রথিতযশা সাহিত্যিকের জীবনে লীলাদেবীর মতো নারীর অবদানের সংবাদ সাধারণের গোচরে আনার জন্য লেখক এবং 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়
শরৎ বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬৫

'ইঁদুর'

শ্রাবণের ধারার মাঝে 'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ সংখ্যাটি হাতে পেয়েই স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের 'দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি' পাঠের পর, 'পরমপদকমলে' বিভাগে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'ইঁদুর' রচনাটি পড়লাম। ওঁর লেখা পড়তে আমাদের খুবই ভাল লাগে। রচনাটির মধ্যে এক জায়গায় নিজের সঙ্গে খুব মিল খুঁজে পেলাম। উনি যে-সমস্যার কথা লিখেছেন, ঐ একই সমস্যায় আমিও পড়েছিলাম। উনি শেষে লিখেছেন: "কাম-কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশি। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা, তিলোত্তমার রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়।" সত্যিই তাই। নিজস্ব অনুভূতি থেকেই নিশ্চয় তিনি ঐ কথাটি লিখেছেন, তাই তো লেখাটি এত আকর্ষণীয় হয়েছে।

শ্যামলিমা মাইতি
দক্ষিণ গোবিন্দপুর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

এই পৃথিবীতে আমি ৭০ বছরের কিছু বেশি দিন ধরে রয়েছি এবং বাঙলা পড়তে শেখা অবধি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে আমার পরিচয়। বর্তমানে 'উদ্বোধন' এত ভাল ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'উদ্বোধন' পড়লে অপূর্ব একটা ভাব সমগ্র প্রাণ-মনকে নাড়া দেয়।

১৪০৬-এর শ্রাবণ সংখ্যায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'ইঁদুর' লেখাটি অপূর্ব। পড়ার পর সমস্ত দেহের মনের প্রতিটি কোষ যেন স্তব্ধ হয়ে রইল। একটা বোবা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে সমস্ত অনুভূতি থেকে যা নিংড়ে মুচড়ে ভেঙে দিচ্ছে সব অহং-এর ঢিবি। 'উদ্বোধন' আমাদের পাথেয় এবং পথপ্রদর্শক দুই-ই।

'উদ্বোধন' হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের সজাগ রাখুক, আমাদের অন্তরের তমসা দূর করুক—এই প্রার্থনা।

পুলককুমার মুখোপাধ্যায়
আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া-৭১১৩০২

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

যে অপূর্ব রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রতি মাসের 'উদ্বোধন' হাতে আসছে তাতে বিস্মিত, চমৎকৃত এবং অভিভূত হয়ে পড়ছি। শতবর্ষপূর্তির পর থেকে যেন স্বামীজীর আশীর্বাদ 'উদ্বোধন'-এর ওপর শতধারে বর্ষিত হচ্ছে এবং ক্রমশ 'উদ্বোধন'কে সফলতার সু-উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিচ্ছে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও ভাষণ তো আছেই, তাছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্যে ভরা 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যা এখন অত্যন্ত আকর্ষণীয়। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের মনোজ্ঞ রচনাগুলি থেকে বহু অজানা তথ্যও আমরা জানতে পারছি। প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার অন্তরালে মাঝে মাঝে যে একটা অজানা জগতের উপলব্ধি তাঁদের মনোজগৎকে চকিত আলোয় উদ্ভাসিত করে দিত, সেটাই তাঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাঁদের সাহিত্য এত মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক।

প্রচ্ছদে বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দিরের আলোকচিত্র থেকে শুরু করে 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় এত বিষয়-বৈচিত্র্য যে, মন ভরে যাচ্ছে। এককথায় বলতে গেলে, স্বামীজীর স্বপ্নের সাকার রূপ 'উদ্বোধন'। অতুলনীয়!

কল্যাণী কর
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়া দিল্লি-১১০০১৯

" 'উদ্বোধন'-এ কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে।"—স্বামীজীর এই নির্দেশ প্রসঙ্গে 'উদ্বোধন' থেকে দুটি আলেখ্য উপস্থাপন করছি। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক বলেছেন: " 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী শরীর।" 'উদ্বোধন' যেমন ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাব ও বাণী শরীর, তেমনি আবার স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ সম্পাদকবৃন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার শ্বাস-প্রশ্বাস 'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন' আমাদের মনকে প্রধানত আধ্যাত্মিক জগৎ তথা অন্তর্জগতে নিয়ে গিয়ে এক 'অবাঙমনসগোচরম্' ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত এমনি ভাব-বিজড়িত একটি আলেখ্য—গুরুর প্রতি শিষ্যার মহান সেবা তথা আত্মোৎসর্গের দৃশ্য। স্বামীজীর তিরোধানের পরদিন। "বেলা ১টা-২টা পর্যন্ত স্বামীজীর শবদেহ একটি কক্ষে শয্যার উপরে সযত্নে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছিল। নিকটে ও দূরে তাঁহার সেই আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেরিত হওয়ায় এবং অন্ত্যেষ্টিকালে সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব সুযোগ দিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতাও সংবাদ পাইলেন। তাঁহার পক্ষে সে কেমন সংবাদ? কে তাহা বুঝিবে? বুঝিবার প্রয়োজনই বা কি? পরে কেবল ইহাই দেখি যে, স্বামীজীর সেই শবদেহের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একখানি পাখা হাতে লইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। সে-মূর্তি ধীর-স্থির, একেবারে নিস্তরঙ্গ, চক্ষে অশ্রু নাই, অধরোষ্ঠও একটু কাঁপিতেছে না। তিনি কেবল একমনে গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন। তখনো সেই সেবার অধিকারটি ত্যাগ করিবেন না।... তাঁহার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারে কোন্ কবি, কোন্ সাধক, তাহা আমি জানি না।" ('নিবেদিতা'—মোহিতলাল মজুমদার, 'উদ্বোধন': শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন, পৃঃ ৬১৬)

পড়তে পড়তে মন চলে যায় দূরে, বহু দূরে, অতীতলোকে—স্বামীজীর শয্যাপার্শ্বে, আর গুরুসেবার মহান জীবন্ত প্রতিমাকে দেখে অশ্রুসিক্ত দুনয়ন থেকে ঝরঝর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে।

গুরুর প্রতি শিষ্যার সেবায় ন্যায় শিষ্যার প্রতি গুরুর স্নেহের আরেকটি অপরূপ আলেখ্য—

"(বেলুড় মঠ, ২ জুলাই ১৯০২, একাদশী তিথি, ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠে গিয়েছেন।)

স্বামীজী—এস নিবেদিতা, এস এস।

(ভক্তিপ্রণত চিত্তে নিবেদিতার স্বামীজীকে প্রণাম, শিষ্যার মাথা স্নেহভরে স্পর্শ করে স্বামীজীর আশীর্বাদ।)

স্বামীজী—আজ তুমি এখানে খাবে। (নিবেদিতা ভক্তিবিহ্বল)

স্বামীজী (জনৈক সেবককে)—ওরে শোন, নিবেদিতা আজ এখানে খাবে। একটু ব্যবস্থা কর।

(ভাত, আলুসিদ্ধ, কাঁঠাল-বিচি সিদ্ধ এবং ঠাণ্ডা দুধের আয়োজন। খেতে বসেছেন নিবেদিতা। স্বামীজীর স্নেহপূর্ণ উপস্থিতি, বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা। নিবেদিতার খাওয়ার শেষে হাত ধোয়ার সময় ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে জলের ঘটি ও তোয়ালে নিয়ে নিলেন স্বয়ং স্বামীজী। কিছুটা ঝুঁকে নিবেদিতার

হাতে ঢেলে দিলেন জল। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলেন জলসিক্ত হাত। নিবেদিতা অশ্রুসজল।)

নিবেদিতা—স্বামীজী, আমারই তো আপনাকে এসব করার কথা। আপনি কেন আমাকে এসব করছেন।

স্বামীজী (সহাস্যে, সস্নেহে)—যীশুও তো তাঁর শিষ্যের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

নিবেদিতা (অস্বস্তিভরা অশ্রুপূর্ণ চোখে)—তা দিয়েছিলেন বটে। কিন্তু সে তো যীশুর শেষের দিন স্বামীজী। ('বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ'—শান্তি সিংহ, উদ্বোধন, আশ্বিন ১৪০৫, পৃঃ ৬৬৩)

দুদিন পর ৪ জুলাই স্বামীজী মহাসমাধি লাভ করেন।

এমনি আরো কত মহান আলেখ্যের লেখচিত্র চিত্রিত হয়ে আছে 'উদ্বোধন'-এর ভাব-দেহে। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, রম্যরচনা ও পরিক্রমা প্রভৃতি বিভাগে বিচিত্র ভাব-সমৃদ্ধ 'উদ্বোধন' তাই সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে মৃত-সঞ্জীবনী সুধাস্বরূপ—"মনুষ্যত্বের দেবত্বে উত্তরণের প্রণবধ্বনি"-স্বরূপ। তাই আমার মনে হয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্যকথা 'উদ্বোধন' সম্পর্কেও প্রযোজ্য ঃ

"সংসারসাগরং ঘোরং তর্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
উদ্বোধনং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ।।"

স্বামীজীর স্বপ্ন সার্থক হোক। সার্থক হোক 'উদ্বোধন'-এর সাধু ও কর্মিবৃন্দের শ্রম ও প্রচেষ্টা। "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" "মিছরির রুটি" 'উদ্বোধন' ঘরে ঘরে সমাদৃত হোক—ঠাকুর ও মায়ের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

প্রদ্যুম্নচন্দ্র প্রধান
সহকারী প্রধান শিক্ষক, দেড়িয়াচক শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামঠ
বাহারপোতা, মেদিনীপুর-৭২১ ১৫১

গত আষাঢ় ১৪০৬ সংখ্যায় 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে 'তত্ত্ব ও প্রয়োগ ঃ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী' একটি অসাধারণ এবং অতি সুন্দর রচনা। এর জন্য 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে আমার অজস্র ধন্যবাদ। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমাকে এমনভাবে উপস্থাপন আগে কখনো চোখে পড়েনি। এমন সুন্দর উপস্থাপনার জন্য শতায়ু 'উদ্বোধন'কে প্রণাম। 'উদ্বোধন' আরো দীর্ঘজীবী হোক।

মৌ দাস
বরানগর, কলকাতা-৭০০ ০৩৬

'উদ্বোধন'-এর 'কথামৃতে না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পরমপদকমলে' আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধের মধ্যে আষাঢ় ১৪০৬ সংখ্যার 'দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি' আমাকে গভীরভাবে মথিত করেছে। 'গবেষণা' বিভাগে এক-একটি বিষয়ের অবতারণা অবশ্যই 'উদ্বোধন'-এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। 'কবিতা' বিভাগে গত আষাঢ় ১৪০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত সুদীপ্ত মাজির 'যত দূরেই যাই' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বিজ্ঞান' বিভাগে 'আমাশয়ের একটি কারণ অ্যামিবা' অত্যন্ত সময়োচিত ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। ঐসময়ে বেশির ভাগ মানুষই এই রোগে আক্রান্ত হয়। মানুষের সেবায় নিয়োজিত 'উদ্বোধন' সহস্র শতাব্দী ধরে এগিয়ে চলুক, এই কামনা করি।

মৃণাল মোদক
রাউৎগ্রাম, কাইগ্রাম
বর্ধমান-৭১৩১৪৫

'উদ্বোধন' পেলেই আমি তা কপালে বুকে স্পর্শ করি। প্রথমেই দেখি শ্রীমা সম্বন্ধে লেখা কিছু আছে কিনা। গত 'আষাঢ়' সংখ্যায় 'তত্ত্ব ও প্রয়োগ ঃ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী' পড়ে মনটা ভরে গেল। প্রত্যেক সংখ্যায় শ্রীমার প্রসঙ্গ না থাকলেও প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পরমপদকমলে' পড়ে প্রতি সংখ্যায় ঠাকুরকে পাই। বারবার পড়েও যেন মন যেন ভরে না। পড়বার পর অন্যকেও পড়াই। আষাঢ় সংখ্যায় 'পরমপদকমলে' বিভাগে 'বিদ্রোহী ভগবান' অনবদ্য। পড়ে যেন আশ মেটে না। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে সঞ্জীববাবুকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ, ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাই।

কাশীনাথ ব্যানার্জি
তারাপীঠ আশ্রম, বীরভূম-৭৩১২৩৩

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৬ সংখ্যায় 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত অয়ন বিশ্বাসের 'আত্মোপলব্ধি' চিঠিটা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের। খুবই উপাদানসমৃদ্ধ লেখা। শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপা ছাড়া এমন উৎকৃষ্ট লেখা সম্ভব নয়। লেখকের তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও জ্ঞানের প্রগাঢ়তায় আমি অভিভূত। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুনীলকুমার রুদ্র
ফিডার রোড, আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০ ০৫৭

পত্রে ভ্রান্তি—বিভ্রান্তি

বিষয়—'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৬-এর প্রাসঙ্গিকী, পৃঃ ৪০৫।

"স্থান—যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের উদ্যান। কাল—১৮৮৩ সালের ১২ জানুয়ারির দ্বিপ্রহর।... সঙ্গে তখন একমাত্র সঙ্গী অন্তরঙ্গ শিষ্য নরেন্দ্রনাথ। সমাধি থেকে বাহ্যাবস্থায় ফিরে তাকে স্পর্শ করলেন ঠাকুর। সেই দিব্যস্পর্শে নরেনের বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল।"

আমরা উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'কথামৃত'-এ (পৃঃ ৫) পাচ্ছি—৪র্থ অনুচ্ছেদ—"১৮৮১-র শেষভাগে ও ১৮৮২-র প্রারম্ভ, এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাস্টার, যোগীন আসিয়া পড়িলেন।"

এখানে প্রথমে নরেন্দ্রের নাম পাচ্ছি—তাতে মনে হয় তিনি হয়তো ১৮৮১-র শেষভাগে, না হয় ১৮৮২-র প্রথমেই এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে। তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর। আমরা বহু প্রাচীন সাধুর মুখে শুনেছি যদু মল্লিকের উদ্যানের ঘটনা—অর্থাৎ ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে নরেনের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাওয়া তাঁর ঠাকুরের কাছে দ্বিতীয়বার আসার দিনে ঘটেছিল।

কিন্তু 'প্রাসঙ্গিকী'র লেখক অয়ন বিশ্বাস যে-কালের নির্দেশ করেছেন—১৮৮৩-র ১২ জানুয়ারি ঐ ঘটনা ঘটেছিল, তাতে নরেনের প্রথম আগমন ও দ্বিতীয় আগমনের এবং ঠাকুরকে দর্শনের মধ্যে এক বছরের ব্যবধান ঘটে যাচ্ছে। তখন নরেনের বয়স ২০ বছর হয়েছে। এতে পত্রলেখক যে-কালের নির্দেশ করেছেন, তাতে সংশয় দেখা দিচ্ছে। কোন্ সূত্র অবলম্বনে পত্রলেখক ঐ বহুপ্রচারিত ঘটনার কালনির্দেশ করেছেন—১৮৮৩-র ১২ জানুয়ারি, তা জানাতে তাঁকে অনুরোধ জানাই।

স্বামী রামানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল, হরিদ্বার-২৪৯৪০৮

"আপনার পূজা আপনি করিলে, এ কেমন লীলা তব!"

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

না, ঠাকুরের কোন অসুখ হয়নি। দেহবোধ থাকলে তবেই সুখ-অসুখ। ঠাকুরকে প্রথমে চিনেছিলেন মথুরবাবু। ঠাকুর কৃপা করে তাঁকে চিনিয়েছিলেন—জমিদার মথুরনাথ, আমাকে চিনে নাও, কে আমি। কার সেবা করছ তুমি, করবে তুমি! হাটে হাঁড়ি ভাঙার আগেই ভেঙে দেওয়া।

মথুরানাথ দেখলেন, রাম আর কৃষ্ণ মিলে রামকৃষ্ণ তো বটেই, আবার শিব এবং কালী, শিবকালীও। কোন্ দুশ্চর, দুরূহ সাধনে মথুরানাথের শ্রীরামকৃষ্ণে ইষ্টদর্শন হলো? সমর্পণে, বিশ্বাসে, সেবায়। মথুরানাথ ভোগী, রাজসিক। যৌবনের সেই কালে নানা এদিক-সেদিক তো ছিলই। সখা পার্থকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণরূপী শ্রীকৃষ্ণ রাখলেন—"মামেকং শরণং ব্রজ"। (গীতা, ১৮।৬৬) "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" এবারে আর বলতে হলো না, কারণ এবারের লীলায় সব ধর্মই এক। ধর্মের সংজ্ঞাও অতি সহজ। সেবারের ধর্ম ছিল ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম। মহাপ্রভু-রূপে প্রেমধর্ম। শঙ্কর-রূপে জ্ঞানধর্ম। গৌতম-রূপে ত্যাগধর্ম, আর রামকৃষ্ণ-রূপে গৃহীর রসেবশে ধর্ম। কিন্তু মূল নির্দেশটি এক ঃ "শরণং ব্রজ"—আমার আশ্রিত হও। আর তখন আমি তোমার জন্য কি করব। আমি তোমার জন্য তোমারই রচনা পাঁকে নেমে পদ্ম ফোটাব। তোমাকে পরিস্রুত করে আমার কৃপালাভের উপযুক্ত করব। আমি কেমন গোয়ালা? না, তোমার পাত্র পরিষ্কার করে কৃপা-দুগ্ধ ঢালব। "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" (ঐ) তোমার অনুশোচনার কিছু নেই। তুমি শুধু বুড়ি ছুঁয়ে থাক। আর অতি সামান্য একটি স্নেহের অনুরোধ—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।" (ঐ, ১৮।৬৫)

গিরিশচন্দ্রকে কৃপা করলেন—কিছুই যখন পারবে না, তখন দাও, আমাকে বকলমা দাও। বললেন ঃ গিরিশ ঘোষ, তোমাকে আমি এমন করে দেব, লোকে অবাক হবে। গিরিশচন্দ্রের দর্শন হলো। একটু ঘুরিয়ে বললেন ঃ "ব্যাস, বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে কি বলব!" গিরিশচন্দ্র বারেবারে বলতেন ঃ "ঠাকুরের মিরাকল যদি দেখতে চাও, তাহলে আমাকে আর লাটুকে (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) দেখ।" আর দেহাবসানের পর শ্রীশ্রীমা একটি মাত্র খেদোক্তিতে সব ব্যক্ত করে দিলেন ঃ "মা কালী গো! তুমি কোথায় গেলে!" কি অদ্ভুত শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবতারলীলা! স্বামীজী বললেন, এমনটি আর কখনো হবে না। মহাকালের কোলে, এমনটি এই একবারই হলো। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলছেন—মন্দিরে যিনি রয়েছেন তুমি তো তাঁরই প্রতিরূপ—মা ভবতারিণী। শ্রীশ্রীমা বলছেন ঃ তুমিই আমার কালী। ভৈরবী বললেন ঃ "নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।" গিরিশচন্দ্র বললেন ঃ "আপনি রাম, আপনি কৃষ্ণ।" দক্ষিণেশ্বরে কে এসেছিলেন গত শতাব্দীতে! কে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ! তুমি দেহ! তুমি জ্ঞান। তুমি চৈতন্য! তুমি প্রেম! তুমি গ্রামের! তুমি শহরের! তুমি সভ্যতার। তুমি প্রাক্-সভ্যতার। তুমি সাধারণের! তুমি অসাধারণের, পাপীর, পুণ্যবানের, গৃহীর, সংসারীর। কে তুমি!

সেদিন যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনেছিলেন উত্তর, হয়তো বোঝেননি, কারণ যা কালে আছে, 'কাল' না এলে উদ্ঘাটিত হবে না। মাস্টারমশাই (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সেদিন ঠাকুরের কাছে এসেছেন। সঙ্গে আছেন বন্ধু কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। মাস্টারমশাই বন্ধুকে বলেছেন ঃ "শুঁড়ির দোকানে যাবে তো আমার সঙ্গে এস; সেখানে এক জালা মদ আছে।" মাস্টারমশাই ঠাকুরকে সেই কথা বলায় তিনি হাসছেন, বলছেন ঃ "ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ—এই আনন্দই সুরা, প্রেমের সুরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম। ঈশ্বরকে ভালবাসা।" তাহলেই জানা যাবে তাঁর স্বরূপ। জানা যাবে তাঁর তত্ত্ব, পাওয়া যাবে পথনির্দেশ। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে দুবার 'প্রিয়' বললেন—তুমি আমার প্রিয় তাই তোমাকে আমি সর্বগোপ্য হতেও অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলছি, তুমি শোন, পুনর্বার শোন—"সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।" (ঐ, ১৮।৬৪) তোমার প্রকৃত কল্যাণকর সার কথা—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।/ মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে।।" ঠাকুর যেমন দিব্য করে বলতেন ঃ "মাইরি বলছি", শ্রীকৃষ্ণও সেইরকম অর্জুনকে বলছেন—"প্রতিজানে"—প্রতিজ্ঞা করে বলছি, যা বলছি তার মধ্যে কোন মিথ্যা নেই—তুমি আমাতে হৃদয় অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজনশীল হও, আমাকেই নমস্কার কর। তাহলে তুমি আমাকেই পাবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়।

ঈশ্বরকে ভালবাস, তাঁর প্রিয় হও। "জ্ঞান বিচার করে ঈশ্বরকে জানা বড় কঠিন।"

ঠাকুর তখন সেই গানটি গাইলেন, তাঁর অতি প্রিয় গীত, যার কথায় তাঁরই তত্ত্ব বিধৃত—

"কে জানে কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন,
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।"

কৃপাময় শ্রীরামকৃষ্ণ। যাকে যে-ভাবে দেখা দিলেন। কারো চোখে অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্রাহ্মণ। কারো দৃষ্টিতে উন্মাদ। কেউ এখনো বিচার শেষ করে উঠতে পারেননি। কারো পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসে তিনি অবতার। স্বামীজীর দৃঢ় জ্বলন্ত বিশ্বাসে—"**নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীর-গ্রহণকারী।**" স্বামীজীর এই বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় যে, তিনি দুবার শপথ করে বলছেন—"নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ।"

দেহধারী ভগবানের বিচিত্র লীলার শেষখণ্ডটিতে আগত আধুনিক যুগের ইঙ্গিত। বুদ্ধদেব পরিণত বয়সে খাদ্যবিষে লীলা সমাপ্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিহত হলেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণলীন হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেছে নিলেন খ্রীস্টের 'সাফারিং'। ক্রুশের মতোই কণ্ঠে ধারণ করলেন ক্যান্সার। ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলীকে সমস্ত উদাহরণই দেখিয়েছিলেন, বাকি ছিল একটি—'**রোগজানুক আর দেহজানুক**'। আত্মারামের আত্মাতেই আরাম, বিরাম, অভিরাম। দেহেরই সব। আত্মার লিঙ্গ নেই, ব্যাধি নেই। স্বামীজী গুরুর শরীরে দেখলেন চল্লিশ বছর যাবৎ কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা, কঠোরতম সাধন, অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বিভূতি। তাঁর আবির্ভাবের কারণ খুঁজে পেলেন—"**পাশ্চাত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধার**"। মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বামীজীকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকি। মনে হয়, তাঁর পায়ের চটি জুতো হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি। একমাত্র স্বামীজীই হাসতে হাসতে ঠাকুরকে বলতে পারেন: "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে!" একথা আমরা পাশ থেকে বলছি। স্বামীজী যা বললেন, তা একমাত্র স্বামীজীই বলতে পারেন—"আমি সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী নই, আমি **রামকৃষ্ণের দাস**। তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম ও সাধন-ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অণুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি।" "For we have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death."

হিসেব করে দেখলেন—"সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" এতদিন বলেছেন: '**আমি খাই দাই** আর থাকি, আর সব আমার মা জানেন।" কে মা! তিনি পুরুষ না প্রকৃতি! শ্যামা অথবা কৃষ্ণ! ছোট ছোট মানুষের সঙ্কীর্ণ ধারণা। প্রকৃত কি?

"কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন,
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মর্ম, অন্য কে বা জানে তেমন।"

সেদিন অমাবস্যা, ৬ নভেম্বর ১৮৮৫, ঠাকুর শ্যামপুকুর-বাটীতে। কণ্ঠক্ষতের চিকিৎসা হচ্ছে, কদিন ধরে বারেবারে যীশুর প্রসঙ্গ হচ্ছে। ছয়দিন আগে শনিবার শ্যামপুকুরবাটীতে প্রভুদয়াল মিশ্র এসেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের মানুষ। ব্রাহ্মণ। খ্রীস্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খ্রীস্টান হয়েছেন। এক ভাইয়ের বিয়ের দিন সেই ভাই ও আরেক ভাইয়ের একসঙ্গে আকস্মিক মৃত্যুতে প্রভুদয়ালের মনে বৈরাগ্য এসেছে। তাঁর বাইরে সাহেবী পোশাক, ভিতরে গেরুয়া। কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত এক সাধু। ঠাকুরকে আগে দেখেছেন। অসুস্থতার সংবাদে প্রাণের টানে ছুটে এসেছিলেন শ্যামপুকুরে। সেই জোড়া মৃত্যুর দিন থেকেই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী। ইউরোপীয়ান পোশাকের তলায় গেরুয়া কৌপীন।

ঠাকুরের জীব-শরীর ক্রমশই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। এক-একদিন এক-একরকম দেহলক্ষণ। পার্ষদদের মধ্যে ব্যাসদেবের মতো কেউ থাকলে উদ্ধবকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন প্রশ্ন করিয়েছিলেন, অনুরূপ প্রশ্ন করাতেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়টি যেন যুগ-সন্ধ্যার সূচনাকারী এক বিমর্ষ অধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতের '**শ্যামপুকুরবাটী**'। সাহসী উদ্ধবের অনুপস্থিতিতে কেউ প্রশ্ন করতে পারছেন না।

"দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সংত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ ন যদীশ্বরঃ।।"

(ভাগবত, ১১।৬।৪২)

সখা উদ্ধব পরপর চারটি বিশেষণ প্রয়োগ করলেন—দেবদেবেশ, যোগেশ, পুণ্যশ্রবণকীর্তন, ঈশ্বর। দেবদেবেশ দুটি বিশেষণের যৌগ। দেবদেব-ঈশ। দেবতা শ্রেষ্ঠেরও নিয়ন্তা। হে দেবদেবেশ, যোগেশ, পুণ্যশ্রবণকীর্তন, সর্বশক্তিমান বা ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও তুমি যে বিপ্রশাপ নিবারণ করলে না, তাতে মনে হয়, তুমি নিশ্চয় এই বংশ নাশ করে ইহলোক ত্যাগ করবে!

শ্রীভগবান অপূর্ব হেসে বললেন: সখা উদ্ধব, তোমার অনুমান অভ্রান্ত। ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং অন্য লোকপালগণের ইচ্ছা যে, আমি নরলীলা শেষ করে বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় প্রশ্ন নেই, অনুমান আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: যে-কাজ করার জন্য অংশাবতার বলরামের সঙ্গে আমি এসেছিলাম সে-কাজ পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের 'বলরাম' নরেন্দ্রনাথ বলছেন: সে-কাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ যা করতে এসেছিলেন, তা এখনো সারা হয়নি। ১৮৯০-এর ২৬ মে, স্বামীজী বাগবাজার থেকে প্রমদাবাবুকে লিখছেন: "সেই মহাপুরুষ যদ্যপি চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতিমান হইয়াও অকৃতকার্য হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা?"

এ যেন অর্জুনের বিষাদযোগ। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির মতো শ্রীরামকৃষ্ণের 'পাওয়ার' এগিয়ে এসে নরেন্দ্র-রথের লাগাম ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সংহার, সৃজন ও পালনের ত্রিশূল শিবকালী শক্তি। **বুকে হাত রেখে নরেন্দ্রনাথকে তখন বিদ্যুৎ-কণ্ঠে বলতে হবে—"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ভরাক তোমা।/ চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।"**

উদ্ধব কয়টি বিশেষণ লাগিয়েছিলেন! নরেন্দ্রনাথ উজাড় করে দিয়ে শান্ত হলেন অবশেষে প্রণামমন্ত্রেঃ "স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।/ অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।"

শ্যামপুকুরবাটীতে পটভূমি প্রস্তুত। সাগর সন্নিকটে নদী। শান্ত, ধীর, গভীর। ভাব অনেক ঘন, কথা অনেক বেশি অর্থবহ। কণ্ঠ কথাপ্রকাশে বিদ্রোহী। সর্বকালের সর্বদর্শনের সমন্বয় ঘটছে। যেসব প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যেত না, সেই সব প্রশ্নের উদার সমাধান হচ্ছে। বিচলিত ধর্ম পাকাপোক্তভাবে সমস্ত রকমের বিশ্বাসে স্থাপিত হচ্ছে।

প্রভুদয়াল বললেনঃ "ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।"

ঠাকুর ছোট নরেনকে মৃদুকণ্ঠে বলছেন—ইচ্ছে যে প্রভুদয়ালও যেন শুনতে পান—"**একরাম তাঁর হাজার নাম।**" একটু বিরতির পর বললেনঃ "খ্রীস্টানরা যাঁকে God বলে, হিন্দুরা তাঁকেই **রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর**—এইসব বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল; **ঈশ্বর**। খ্রীস্টানেরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে ওয়াটার; গড **যীশু**। মুসলমানেরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে পানি; **আল্লা**।"

ভাবস্থ ঠাকুর। কথা কয়টি বলে থামলেন।

প্রভুদয়াল বললেনঃ "মেরির ছেলে Jesus নয়। Jesus স্বয়ং ঈশ্বর।"

এরপর প্রভুদয়াল ভক্তদের তাঁর অদ্ভুত উপলব্ধি ও দর্শনের কথা বললেনঃ 'ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন—আবার এক সময় সাক্ষাৎ **ঈশ্বর**। আপনারা এঁকে চিনতে পারছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম, **একটি বাগান, উনি ওপরে আসনে বসে আছেন**; মেঝের ওপর আরেকজন বসে আছেন, তিনি ততটা advanced নন।" এইবার যে-কথাটি বললেন সেটি ভারি সুন্দর—"**এই দেশে চারজন দ্বারবান আছেন।** বোম্বাই অঞ্চলে **তুকারাম**, কাশ্মীরে **রবার্ট মাইকেল**, এখানে ইনি, আর পূর্বদেশে আরেকজন।"

ঠাকুর শৌচে গেলেন। প্রভুদয়াল পোশাকাদি খুলে গেরুয়া কৌপীনখানি পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। শৌচ থেকে ফেরার পথে ঠাকুর দেখলেন। ঘরে এসেছেন ঠাকুর। প্রভুদয়াল পোশাক পরিধান করে এসেছেন। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন পশ্চিমাস্য। প্রভুদয়ালকে এই কথাটি বলতে বলতেই সমাধিস্থ—"তোমাকে দেখলাম বীরের ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছ।"

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রভুদয়ালকে দেখছেন, হাসছেন, ভাবস্থ অবস্থায় শেক হ্যান্ড করছেন, আবার হাসছেন, ভক্ত প্রভুদয়ালের হাত-দুটি ধরে কৃপা করছেন—"তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে।" উপস্থিত মহেন্দ্রনাথ ভাবছেন, ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হলো। নিজেকেই প্রশ্ন করছেনঃ "**ঠাকুর আর যীশু কি এক?**"

শ্যামপুকুরবাটীতে Jesus Christ!

সেই শনিবার আজ শুক্রবার। অমাবস্যা। কালীপূজা আজ।

মাস্টারমশাই সকালে স্নান সেরে, নগ্নপদে ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দিরে। গুরুর আদেশ! "পুষ্প, ডাব, চিনি, সন্দেশ দিয়ে সকালেই পূজা দেবে।" আরেকটি আদেশ—"ডাক্তার সরকারের জন্য কিনে আনবে রামপ্রসাদের, কমলাকান্তের গানের বই।"

মাস্টারমশাই আদেশ পালন করে শ্যামপুকুরবাটীতে প্রবেশ করছেন। সকাল ৯টা।

দোতলার দক্ষিণের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন ঠাকুর। পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, কপালে চন্দনের ফোঁটা।

মা বোধহয় সাজিয়ে দিয়েছেন!

মাস্টারমশাই ঘরে প্রবেশ করে বললেনঃ "এই যে প্রসাদ, আর এই গানের বই।"

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে পাদুকা খুলে, অতি ভক্তিভরে প্রসাদের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করলেন, কিঞ্চিৎ ধারণ করলেন মস্তকে। মাস্টারমশাইকে বললেনঃ "বেশ প্রসাদ।"

বেলা বাড়ল। ক্রমশই বাড়ল ভক্তসমাগম। বেলা তখন দশটা।

ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বললেনঃ "আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার বলে এস। প্যাঁকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞেস কর দেখি।"

রাত সাতটা। অমাবস্যা-রাতের পিচকালো আকাশ শহরের ওপর উপুড় হয়ে আছে। বাড়িতে বাড়িতে দীপমালা। মা দুর্গা এসেছিলেন শরতের মেঘমালা নিয়ে। তাদেরই কয়েকখণ্ড শেষ যাত্রী হয়ে ভেসে চলেছে হিমালয়ের দিকে।

ওপরের সেই দক্ষিণের ঘরেই পূজার সমস্ত আয়োজন হয়েছে।

ঠাকুর বসে আছেন। তাঁরই সামনে সাজানো হয়েছে নানারকমের ফুল, বেলপাতা, জবা, চন্দন, পায়েস, নানাবিধ

মিষ্টান্ন। ভক্তেরা বসে আছেন ঘিরে। "শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাস্টার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী, আরো অনেকে।"

রাত ক্রমশ ময়রার দোকানের ভিয়েনের মতো জমছে। আকাশের এধারে-ওধারে মাঝে মাঝেই ফুঁসে উঠছে তারাবাজি। ঘরে জ্বলছে দেওয়ালগিরি, বড় বড় প্রদীপ। দেওয়ালে ছায়া কাঁপছে।

ঠাকুরের আদেশ শোনা গেল—"ধুনা আন।"

ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরের পরিবেশ আরো রহস্যময় হলো। দক্ষিণেশ্বরের পরে, পঞ্চবটীতে তন্ত্রসাধনার বহুদিন পরে ঠাকুর আবার পুজারী। প্রতিমা অন্তরে। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে সব নিবেদন করে দিলেন। মাস্টারমশাই একেবারে পাশটিতে বসেছিলেন। ঠাকুর বললেন ঃ "একটু সবাই ধ্যান কর।"

ধুনো, চন্দন, গুগ্গুলের ধোঁয়া মহাদেবের জটাজালের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ফুল বেলপাতার সুবাসের সঙ্গে মিশে অপূর্ব সৌরভ। ধ্যানস্থ ভক্তমণ্ডলী, ধ্যানস্থির প্রদীপশিখা। আসনে নিশ্চল জ্যোতির্ময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে হচ্ছে, সোনার প্রতিমা।

হঠাৎ গিরিশচন্দ্রের হাতদুটি কোল ছেড়ে উঠছে। হাতে ধরা আছে একটি জবার মালা। এগিয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের পাদপদ্মের দিকে। গিরিশের অঞ্জলি। মাস্টারমশাইও ঠাকুরের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। আর কি ঠেকানো যায়! পর পর ভক্তদের অঞ্জলি—'রাখাল, রাম...।' 'নিরঞ্জন' শ্রীপদে ফুল দিয়ে ভাবাবেগে ঘরের নিথর নীরবতা চমকে দিলেন, 'ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মময়ী' বলতে বলতে ভূমিষ্ঠ হয়ে চরণে মাথা রাখলেন। আরতির মতো ভক্তকণ্ঠে সমবেত রব—'জয় মা! জয় মা!'

দেখতে দেখতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। সবাই আশ্চর্যে হতবাক। ঠাকুর ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছেন, মুখমণ্ডলে অলৌকিক দিব্যদ্যুতি, উত্থিত দুই হস্তে বরাভয়, নিস্পন্দ, বাহ্যশূন্য। বসে আছেন উত্তরাস্য। দক্ষিণেশ্বরের মা, চতুর্ভুজা জগন্মাতা শ্যামপুকুরবাটীতে আজ 'দ্বিভুজা বরাভয়া'।

গিরিশচন্দ্র শুরু করলেন স্তব ঃ

"কে রে নিবিড় নীলকাদম্বিনী সুরসমাজে।
কে রে রক্তোৎপল চরণ যুগল হর উরসে বিরাজে।।"

ঘুরে গেল শতাব্দী। আরেকটি শতাব্দীরও অস্তকাল। চরিত্র সব ইতিহাস। ঘটনা। স্মৃতি। শ্যামপুকুরবাটী ঠাকুরের সেই সত্তরদিনের অধিষ্ঠানে আজ এক মহাপীঠস্থান।

সেদিন ছিল চাঁদের আলোর রাত। শ্যামপুকুরবাটীর দোতলার সেই ঘরে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর পাঠ ছিল। বাড়ি, বারান্দা, রাস্তা উপচে পড়া ভক্তসমাগম। প্রসঙ্গ সমাপ্ত। ভক্তমণ্ডলী বিদায় নিলেন। একেবারে নিরালা উঠানে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছি। শেষ ঝাড়টি তখনো নেভেনি। পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীম-র প্রপৌত্র, নীরব কর্মী গৌতম গুপ্ত।

ঐ সেই বারান্দা, ঐখানেই দাঁড়িয়েছিলেন ঠাকুর, পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, কপালে চন্দনের টিপ। শ্রীম আসছেন, হাতে ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরীমাতার প্রসাদ। আজো তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বলেছিলেন, প্রেমের চোখে দেখা যায় তাঁকে। চোখে প্রেম! সে তো অনেক পরে, আগে বিশ্বাস। মনের বিশ্বাস। ❑

পুষ্টিতে খনিজ লবণের গুরুত্ব

সন্দীপকুমার চক্রবর্তী

আবহমান কাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজ নিজ খাদ্যব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী স্থানীয় যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তা থেকেই সেখানকার মানুষের পুষ্টির (nutrition) মোটামুটি চাহিদা মিটে যায়। অবশ্য ভৌগোলিক কারণবশত কোন অঞ্চলে পুষ্টির এক বা একাধিক উপাদানের ঘাটতি হলে পুষ্টিহানির সম্ভাবনা হতে পারে।

খাদ্যের মধ্যে পুষ্টির যে ছয়টি উপাদান আছে, যেমন—প্রোটিন (protein), স্নেহজাতীয় (fat), শ্বেতসার (carbohydrate), খনিজ লবণ (minerals), ভিটামিন (vitamin) ও জল—এদের প্রতিটি পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। পুষ্টির এইসকল উপাদান সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হলেও খনিজ লবণের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তার কারণ, এই লবণগুলির প্রত্যেকটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার ছিল না। পুষ্টিবিজ্ঞানের বিস্তৃত গবেষণার ফলে যে নতুন নতুন তথ্য জানা গিয়েছে তা থেকে খনিজ লবণের যথার্থ ভূমিকা, কোন্ কোন্ খাদ্যে এদের উপস্থিতি, কি কারণে এদের ঘাটতি এবং ঘাটতির ফলে দেহের কি অবস্থা হতে পারে—এসম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানুষের দেহে পঞ্চাশেরও বেশি খনিজ লবণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং মনে হয়, শারীরবৃত্তীয় কাজে এদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ভূমিকা আছে। দেহে খনিজ লবণগুলির উপস্থিতির পরিমাণ অনুযায়ী তাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(১) মুখ্য খনিজ (Major Minerals): যেমন—ক্যালসিয়াম (Calcium), ফসফরাস (Phosphorus), সোডিয়াম (Sodium), পটাসিয়াম (Potassium) ও ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)। এদের দৈনিক চাহিদার পরিমাণ গ্রাম (gram) হিসাবে বলা হয়।

(২) নামমাত্রায় মৌলগুলি (Trace Elements): যেমন—লৌহ (Iron), আয়োডিন (Iodine), ফ্লোরিন (Fluorine), দস্তা (Zinc), তামা (Copper), কোবাল্ট (Cobalt), ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium), ক্রোমিয়াম (Cromium), নিকেল (Nickel), টিন (Tin), সিলিকন (Silicon)। এদের দৈনিক চাহিদা মিলিগ্রাম হিসাবে বা তারও কমমাত্রায় বলা হয়।

(৩) স্পর্শমাত্রায় উপস্থিতি (Trace Contaminant): যেমন—সিসা (Lead), পারদ (Mercury), বেরিয়াম (Barium), বোরন (Boron), অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)। এদের দৈনিক চাহিদা এত কম (স্পর্শমাত্রায়) যে, পরিমাপ করা যায় না।

উপরি উক্ত খনিজ মৌলগুলির প্রত্যেকটির বিস্তৃত আলোচনা এই সীমিত প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভব নয়। পুষ্টি-বিজ্ঞানীরা জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে যেসকল খনিজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, যেমন—ক্যালসিয়াম, লৌহ, আয়োডিন, দস্তা, সোডিয়াম, ফ্লোরিন—সেইগুলির আলোচনাই এখানে করা হচ্ছে।

ক্যালসিয়াম

দেহের কঙ্কাল-কাঠামো (skeleton) গঠনে ক্যালসিয়ামের প্রধান ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া স্নায়ুতন্ত্র ও মাংসপেশী আবরণীর স্বাভাবিক কার্য নিয়ন্ত্রণে এবং রক্তের জমাট বাঁধা (blood clotting) প্রক্রিয়ায় এই খনিজটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে থাকে। দেহস্থ ক্যালসিয়ামের ৯৯ শতাংশ অস্থির মধ্যেই সঞ্চিত থাকে। বার্ধক্যের সঙ্গে দেহস্থ ক্যালসিয়ামের ক্রমঃক্ষয় (Osteoporosis) হওয়ার ফলে এই বয়সে অস্থিভঙ্গের (fracture) প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্য কোন কোন চিকিৎসক বেশি বয়সে আলাদা করে ক্যালসিয়াম খাওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেন। লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, খাদ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও ভিটামিন ডি-এর পরিমাণ ঠিক থাকলে রিকেট (Ricket) বা অস্টিওম্যালেসিয়া (Osteomalacia) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অপরপক্ষে মাত্রাতিরিক্ত ক্যালসিয়াম সেবনে কোন আপাত সমস্যা না হলেও দেহে দস্তা ও লৌহের শোষণকার্য ব্যাহত হতে পারে।

ক্যালসিয়ামের দৈনিক চাহিদা ৪০০ থেকে ৫০০ মিলিগ্রাম। এর অতিরিক্ত চাহিদা হয় শৈশবকালে এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি (lactating) মায়েদের ক্ষেত্রে। খাদ্যে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় প্রধানত দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম ও মাছ (বিশেষ করে ছোট গোটা মাছ অর্থাৎ চুনোপুঁটি ও সামুদ্রিক মাছ) থেকে। সাধারণ মধ্যবিত্তরাও ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারেন শুঁটি-জাতীয় খাদ্য, ডাল ও সবুজ শাকপাতা থেকে। ফলের মধ্যে আতা ক্যালসিয়ামের একটি ভাল উৎস। যেমন ভিটামিন সি, বিভিন্ন ফল ও পটাসিয়াম দেহে ক্যালসিয়াম-শোষণের সহায়ক, তেমনি খাদ্যে অত্যধিক প্রোটিন (বিশেষ করে জান্তব প্রোটিন) এবং খাদ্যে অম্লজাতীয় (acidic) উপাদান এই কার্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

লৌহ

মানুষের পুষ্টিকার্যে লৌহের ভূমিকা অপরিসীম ও বহুমুখী। লৌহঘটিত যৌগ হিমোগ্লোবিন (haemoglobin)

লোহিত কণিকার (R.B.C.) একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রবহমান রক্তের মাধ্যমে দেহের কোষগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহ করে তাদের সজীবতা বজায় রাখে। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পূর্ণতা (development) প্রাপ্তিতে, দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে, মাংসপেশীর কর্মকুশলতা স্বাভাবিক রাখতে লৌহ অপরিহার্য। দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধব্যবস্থা (immune system) অটুট রাখতেও লৌহের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন উৎসেচকের (enzyme) গুরুত্বপূর্ণ কার্যে এই খনিজটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

একজন সাধারণ প্রাপ্তবয়স্কের দেহে ৩ থেকে ৪ গ্রাম লৌহ থাকে, যার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ থাকে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মধ্যে এবং বাকি অংশ যকৃৎ, প্লীহা ও অস্থিমজ্জা সমেত দেহের অন্যান্য অংশে। প্রতি গ্রাম হিমোগ্লোবিনে ৩.৩৪ মিলিগ্রাম লৌহ থাকে। দেহে লৌহের দৈনিক চাহিদা ১২ থেকে ২০ মিলিগ্রাম।

লৌহঘটিত রক্তাল্পতা (iron deficiency anaemia) আজ বিশ্বের একটি বড় সমস্যা। বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, পৃথিবীর বহু দেশে (প্রধানত অর্থনৈতিক অনগ্রসর দেশগুলিতে) দুশ কোটিরও বেশি নরনারী ও শিশুর মধ্যে বিভিন্ন স্তরের রক্তাল্পতা দেখা যায়, যার জন্য এইসকল দেশের নরনারীদের দৈহিক কর্মক্ষমতা উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অনেক কম।

খাদ্যের মধ্যে লৌহের যোগান আসে দুধরনের লৌহযোগ থেকে। একটি 'হিম'যুক্ত লৌহ (hoem iron) ও অপরটি 'হিম'বিহীন লৌহ (non-hoem iron)। হিমযুক্ত লৌহের প্রধান উৎস যকৃত, মাংস ও মাছ। এখানে উল্লেখ্য যে, দুধে লৌহের পরিমাণ অতি সামান্য। তাই শিশুর জন্মের কয়েক মাস পর তার আহার শুধু দুধের ওপর নির্ভর করলে দেহে লৌহের ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। হিমবিহীন লৌহ উদ্ভিদজগৎ থেকে পাওয়া যায়, যথা—ডাল, শুঁটি-জাতীয় খাদ্য, বাদাম, তৈলবীজ, গুড়, শুকনো ফল ও টাটকা সবুজ শাকসবজি। হিমযুক্ত লৌহ উদ্ভিদ খাদ্য থেকে প্রাপ্ত হিমবিহীন লৌহের শোষণে সাহায্য করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিয়মিত লৌহের কড়াইয়ে রান্না করলে খাদ্যে লৌহের চাহিদা আংশিকভাবে পূরণ হতে পারে। ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (ascorbic acid)-যুক্ত শাকসবজি ও ফল (যেমন লেবু, টম্যাটো, পেয়ারা প্রভৃতি) লৌহের শোষণকার্যের সহায়ক, তেমনি ফাইটিক অ্যাসিড (phytic acid)-যুক্ত খাদ্য (যেমন দানা-জাতীয় খাদ্য, আঁশ-জাতীয় সবজি প্রভৃতি) বেশি পরিমাণে গ্রহণ এবং পলিফেনল (polyphenol) ও ট্যানিন (tannin)-জাতীয় বস্তু (চা ও কফিতে বর্তমান) লৌহের শোষণ ব্যাহত করে।

স্বাভাবিকভাবে খাদ্যের মাধ্যমে লৌহের প্রয়োজন মিটলেও বিভিন্ন অবস্থায় এই খনিজটির অতিরিক্ত চাহিদা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুমতী, গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরে এবং বিভিন্ন রোগে—যেমন হুক ওয়ার্ম (hook worm)-জনিত রক্তাল্পতা, পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া, অর্শজনিত, পাকস্থলির ক্ষতজনিত (peptic ulcer) ও দুর্ঘটনাজনিত রক্তক্ষরণে লৌহের অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়।

আয়োডিন

এরপর যে প্রয়োজনীয় খনিজটির উল্লেখ করতে হয়, তার নাম আয়োডিন। এর দৈনিক চাহিদা অতি স্বল্পমাত্রায় (০.০৫ মিলিগ্রাম) হলেও এই উপাদানটি দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। দেহে আয়োডিনের পরিমাণ কম হলে থাইরয়েড (thyroid) গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত থাইরক্সিন (thyroxin) হরমোনের পরিমাণও কমে যায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য থাইরয়েড গ্রন্থিটিকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়, যার ফলে গ্রন্থিটি অস্বাভাবিক স্ফীত হয়। এই অবস্থাকে 'গলগণ্ড' বা goitre বলে। ভ্রূণ অবস্থায় অঙ্গ (organ)-ভিত্তিক কোষ নির্দিষ্টকরণে (cell differentiation) এবং থাইরয়েড হরমোনগুলির সংশ্লেষে আয়োডিনের ভূমিকা অপরিহার্য। শৈশবে এই খনিজটির ঘাটতি হলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বিশেষরূপে ব্যাহত হয়। শিশুটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও খর্বাকৃতি হয়। এই অবস্থাকে 'ক্রেটিনিজম' (Cretinism) বলে। আয়োডিন প্রধানত পাওয়া যায় সামুদ্রিক খাদ্য ও সামুদ্রিক লবণ থেকে। স্থানীয় মাছ, মাংস, দুধ, শাকসবজি ও ডালেও এই খনিজটি পাওয়া যায়। কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে জল পরীক্ষায় আয়োডিনের স্বল্পতায় ঐ স্থানের মৃত্তিকাতেও আয়োডিনের স্বল্পতা প্রতিফলিত হয়, যার ফলে সেই স্থানের উৎপন্ন ফসলেও আয়োডিনের ঘাটতি দেখা যায়। তাই ঐসকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে গলগণ্ডের প্রাদুর্ভাব (endemic goitre) বেশি। অধুনা সাধারণ লবণ আয়োডিনযুক্ত হয়ে বাজারে বিক্রি করার ফলে এই ঘাটতি দূর করা যাচ্ছে।

দস্তা

দস্তা (Zinc) খনিজটি মানবপুষ্টিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের দৈর্ঘ্যিক (linear) বৃদ্ধিতে, দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধব্যবস্থা অটুট রাখতে, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উৎসেচক এবং ইনসুলিন (insulin) হরমোনটির সংশ্লেষে দস্তা অংশগ্রহণ করে থাকে। দেহের প্রতিটি কোষে সামান্য পরিমাণ দস্তার সন্ধান পাওয়ার দরুন মনে হয়, কোষ পর্যায়ে এই খনিজটির কিছু না কিছু ভূমিকা আছে। দস্তার দৈনিক চাহিদা ৫-১০ মিলিগ্রাম। দস্তার ঘাটতিজনিত যেসকল উপসর্গ দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখ্য দেহের দৈর্ঘ্যিক বৃদ্ধির অভাব, স্বাভাবিক স্বাদের (taste) ঘাটতি এবং দেহস্থ কোন ক্ষতের (wound) নিরাময়ে দীর্ঘ সময় লাগা। দস্তার চাহিদা প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ—এই দুই শ্রেণীর খাদ্য মেটায়। প্রথমোক্ত

উৎসগুলির মধ্যে মাছ, মাংস ও দুধই নির্ভরযোগ্য। উদ্ভিজ্জ বস্তুগুলির মধ্যে ডাল, শুঁটি-জাতীয় খাদ্যে পাওয়া গেলেও এদের মধ্যে ফাইটিক অ্যাসিড যৌগ থাকায় তা দস্তার শোষণকার্যে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং দস্তার চাহিদা বেশি থাকলে খাদ্যে ১০ থেকে ২৫ শতাংশ আমিষ উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয়।

সোডিয়াম

সোডিয়াম (Sodium) প্রাণিদেহের অগণিত গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় কার্যে একটি অপরিহার্য খনিজ। সকল দেহরসে এই খনিজটি বর্তমান। অন্তঃকোষ (intracellular) ও বহিঃ-কোষস্থ (extracellular) রসের এটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান এবং এই দুই রসের মধ্যে সমতা রক্ষায় আস্রবণ চাপ (osmotic pressure) বজায় রাখতে সোডিয়াম অগ্রণী। বিভিন্ন দেহকার্যে সোডিয়ামের ভূমিকা অসংখ্য। এই খনিজটি বিভিন্ন ঐচ্ছিক (voluntary) ও হৃৎপেশী-সহ অনৈচ্ছিক (involuntary) পেশীর সঙ্কোচন, স্নায়ুকোষের উদ্দীপনা (nerve excitability) রক্ষা, রক্তের স্বাভাবিক ক্ষারতা (alkalinity) বজায় রাখা, পাকস্থলীর জারক রসের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (hydrochloric acid) নিঃসরণ এবং দেহে জলের সমতা বজায় রাখতে এই খনিজটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। দৈনিক চাহিদা ৫-১০ গ্রাম হলেও বিভিন্ন প্রকারে এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ লবণ দেহে প্রবেশ করে। রান্নার সময়ে বিভিন্ন আহার্য বস্তুর স্বাদ আনতে আলাদা করে যে লবণ ব্যবহার করা হয়, তার সিংহভাগই সোডিয়াম-ঘটিত যৌগ। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বয়স্ক ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই ক্ষেত্রে সোডিয়াম-যুক্ত লবণ গ্রহণের সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের একটি সম্পর্ক পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে খাদ্যে সোডিয়াম-ঘটিত লবণ নিয়ন্ত্রণ করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ফ্লোরিন

ফ্লোরিন (Fluorine) আরেকটি খনিজ লবণ, যা অস্থি ও দাঁতের কাঠিন্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রকৃতিতে মুখ্যত জল এবং বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ ও চা থেকে এই খনিজ পদার্থটি যৌগ হিসাবে পাওয়া যায়। এর কার্যকারিতাকে শাঁখের করাত হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী পানীয় জলের মাধ্যমে অধিক মাত্রায় (স্বাভাবিক মাত্রায় এর প্রয়োজন প্রতি লিটার জলে ০.৫ থেকে ০.৮ মিলিগ্রাম) দেহে প্রবেশ করে দাঁতের বহিরাবরণীর কলাই (enamel) ও দেহকঙ্কালের বিকৃতি (deformity) ঘটিয়ে থাকে, যাকে 'ফ্লুরোসিস' (Flourosis) বলে; আবার ঘাটতিজনিত কারণে দাঁতের ক্ষয় হয়ে 'কেরিজ' (dental caries) রোগ হতে সাহায্য করে।

ফ্রি র‍্যাডিকেল ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট

এ-পর্যায়ের শেষে একটি বিষয়ে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। অধুনা চিকিৎসাশাস্ত্রে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল (free radical) সম্বন্ধে বহু আলোচনা চলছে। ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ও বিশেষ করে কয়েকটি খনিজ লবণের সঙ্গে এর প্রকৃত সম্পর্ক এখানে উল্লেখ করা যায়।

মানবদেহে বিপাকীয় ক্রিয়া (metabolism) থেকে উপজাত উপাদান (by product) হিসাবে এই ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলি দেহে উৎপন্ন হয়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি সক্রিয় রাসায়নিক উপাদান, যা এক বা একাধিক অ-জোড়া (unpaired) ইলেকট্রন নিয়ে গঠিত। এই ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলি সুস্থিত নয় (unstable) বলে একটি ইলেকট্রন অর্জন বা বর্জন করতে এগুলি দেহকোষগুলির দিকে ধাবিত হয় এবং কোষ-আবরণীর গায়ে লেগে যে-বিক্রিয়া করে তার ফলে কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পুনরায় লক্ষ লক্ষ ফ্রি র‍্যাডিক্যাল তৈরি হয়ে নতুন নতুন কোষের প্রতি ধাবিত হয়। এর জন্য কোষ-সমেত বহু দেহাঙ্গের (organ) ক্ষতি হয়ে রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে দেহস্থ প্রতিরোধক কোষগুলি এই ভ্রাম্যমাণ ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলিকে আবদ্ধ করে দেহ থেকে দূর করে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার ফলে এদের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকে। এখানে অ্যান্টি অক্সিডান্ট (anti oxidants)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই শেষোক্ত বস্তুগুলি খাদ্যবস্তু থেকে পাওয়া যায়; এর মধ্যে বিটা-ক্যারোটিন (beta carotin), ভিটামিন সি, ভিটামিন ই ছাড়া কতকগুলি খনিজ লবণ যেমন দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ (Manganese), সেলিনিয়াম (Selenium) ও তামা (Copper) উল্লেখযোগ্য। এই অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলি ভ্রাম্যমাণ ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলিকে দেহ থেকে দূর করতে সাহায্য করে, যার ফলে দেহের অবাঞ্ছিত ক্ষয় রোধ হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, বহু খনিজ লবণ পুষ্টিসাধন ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ নিয়ে থাকে।

পরিশেষে আরেকটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা স্বচ্ছল বা ধনী, তাঁদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পুষ্টির ব্যাপারে আমিষজাতীয় খাদ্যকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁদের ধারণা, আমিষজাতীয় খাদ্যই প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টির উৎস এবং শাকসবজি, ডাল ইত্যাদি দরিদ্র শ্রেণীর খাদ্য। তাই এঁরা উদ্ভিজ্জ খাদ্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই বিভিন্ন খনিজ পদার্থের ঘাটতিজনিত পুষ্টিহীনতার শিকার হয়ে থাকেন। অধিকাংশ সময়েই এঁদের বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারকের বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলে ভর্তি খনিজ উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই আমিষ ও উদ্ভিজ্জ—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সমতা রেখে খাদ্যগ্রহণ করলে খনিজ উপাদানের ঘাটতিজনিত সমস্যা দূর করা যায়। ❑

ধূমপান বন্ধের চেষ্টা বহুমুখী হোক

ব্রিটেনে ১৯৭০ সালের পরে বয়স্ক ধূমপানকারীদের সংখ্যা প্রথম বাড়ল ১৯৯৬ সালে। বিগত ২৫ বছরে ধূমপানকারীর সংখ্যা যে ধীর অথচ স্থিরভাবে নিম্নগামী হতে দেখা গিয়েছিল, তা যে বরাবর এমনই চলবে তা আর বলা যাচ্ছে না। তামাক ব্যবহার কমাতে, ছোটরা যাতে ধূমপান শুরু না করে তা দেখতে এবং ধূমপানকারীদের ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করার চেষ্টাকে সাহায্য করতে আরো জোরালো কর্মপন্থা এখন নিতে হবে। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৯৮) তামাক সম্বন্ধে "ধূমপান মৃত্যু ডেকে আনে" শীর্ষক যে শ্বেতপত্র ব্রিটেনে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সেদেশের জন্য এবিষয়ে বহু সুচিন্তিত সরকারি কর্মপন্থা রয়েছে। ঐ শ্বেতপত্রের উদ্দেশ্য ২০১০ সালের মধ্যে ধূমপানকারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ কম করা এবং তার ফলে বছরে ৩০০০ জীবন রক্ষা করা।

ঐ শ্বেতপত্রের সবচেয়ে অর্থপূর্ণ অংশ হচ্ছে—'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'-এর নির্ধারিত সময়সীমার আগেই ধূমপান বিষয়ে বিজ্ঞাপন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া। এতে ২০০০ সালের মধ্যেই রাস্তার ধারে বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করতে বলা হয়েছে। অবশ্য খেলা বা চিত্র-প্রদর্শনীর খরচ বহন (স্পনসরশিপ) করার ব্যাপারে বর্তমান অবস্থা আরো তিন বছর চলবে এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা ও 'ফর্মুলা ওয়ান' রেসিঙের ক্ষেত্রে তা আস্তে আস্তে কমিয়ে ২০০৬ সালের মধ্যে এর ওপর খরচ কমাতে হবে। অবশ্য কম করার পরিমাণের হার বিষয়ে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। যে-দেশে (গ্রেট ব্রিটেনে) অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা ধূমপানের ফলে স্ত্রীলোকের মৃত্যুহার বেশি (এবং অন্যান্য সব দেশের গড় মৃত্যুহারের তিনগুণ)—সেখানে উপরি উক্ত সময়সীমা নিঃসন্দেহে মন্থর। এই মধ্যবর্তী কালে শিশুরা টেলিভিশনে স্পনসর্ড খেলাগুলিতে সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেখতেই থাকবে। একটা আন্তর্জাতিক খেলায় (grand prix) ৩০ সেকেন্ডের সিগারেট বিজ্ঞাপন তারা প্রায় ৫০ বার দেখে। আরো বিপদ হচ্ছে যে, তামাক ব্যবসায়ীরা হয়তো স্পনসরশিপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়ার আগে সম্মিলিতভাবে তা আরো জোরদার করবে, যেমন তারা নিউজিল্যান্ড এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে করেছিল।

উপরি উক্ত শ্বেতপত্রে ধূমপানকারী ও যারা ধূমপান করে না উভয়পক্ষেরই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার মনে করে যে, হোটেল-রেস্তোঁরাগুলিতে আলো-বাতাস খেলে এমন স্থান ধূমপানকারী ও অধূমপানকারী—উভয়ের জন্যই নির্দিষ্ট থাকা উচিত। শ্বেতপত্রে নিম্নবিত্ত ধূমপানকারীদের ধূমপানের অভ্যাস ছাড়ার জন্য তাঁদের প্রথম সপ্তাহে নিকোটিনের বদলি ওষুধ 'স্টার্টার প্যাক' দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা ভালই। এ দিলে ধূমপান-বন্ধকারীদের সংখ্যা, এ না-দেওয়া (অর্থাৎ শুধু ডাক্তারদের উপদেশ দেওয়া) ধূমপান-বন্ধকারীদের সংখ্যার দ্বিগুণ হয়। ধূমপানকারীদের ২৭ শতাংশ নিম্নবৃত্তের দলে পড়ে।

পরিশেষে শ্বেতপত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে, সিগারেট কেনার ক্ষমতাই ধূমপান বন্ধ করার প্রধান হাতিয়ার; এর জন্য বছরে ৫ শতাংশ ট্যাক্স বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তা করলে সিগারেটের চোরাচালান বাধা পাবে। **[British Medical Journal, 2 January 1999, pp. 1-2]**

সিগারেট কোম্পানির বৃহত্তম জরিমানা—পাঁচ কোটি ডলার

আমেরিকার বৃহত্তম সিগারেট কোম্পানি 'ফিলিপ মরিস'কে গত ফেব্রুয়ারিতে (১৯৯৯) বলা হয়েছে অতীতে ধূমপানকারী এবং বর্তমানে মুমূর্ষু এক ব্যক্তিকে পাঁচ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে। উক্ত সিগারেট কোম্পানির উকিল বলেছে যে, তারা এর বিরুদ্ধে আপিল করবে। এটাই আজ পর্যন্ত ধূমপান ব্যাপারে একজন ব্যক্তির মামলায় সবচেয়ে বড় জরিমানা এবং বাদীর উকিলদের দাবির তিনগুণ অর্থ। এতে ধূমপানের বিরুদ্ধপক্ষ যেমন খুশি হয়েছে, তেমনি তামাক-ব্যবসায়ীদের দিক থেকে এটি খুবই গুরুতর বিপত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সান ফ্রান্সিস্কোর ৫২ বছর বয়স্ক ক্যান্সার-রোগী প্যাট্রিসিয়া হেনলি বলেছেন যে, তিনি এই অর্থ যুবকদের ধূমপান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য দান করবেন। বলেছেন: "এই রক্তমাখা অর্থের কানাকড়িও আমি স্পর্শ করব না। এটা আমি পরবর্তী কালের শিশুদের জয় বলে মনে করি।" চার সপ্তাহব্যাপী বিচারের পর জুরি মাত্র তিন ঘণ্টায় ১০-২ ভোটে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। হেনলির উকিলরা দাবি করে—সিগারেট কোম্পানি ইচ্ছা করে নাবালকদের লক্ষ্য করেই ধূমপানের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এবং ধূমপানে ক্যান্সার হওয়ার সব বৈজ্ঞানিক তথ্য গোপন করেছিল। এই দাবির সঙ্গে জুরিরাও একমত হয়েছিল। হেনলি ৩৫ বছর ধরে 'ম্যালবরোস' এবং 'ম্যালবরো লাইটস' সিগারেট খেয়েছেন।

ডেট্রয়েট-এর 'সেন্টার ফর হেলথ প্রমোশন অ্যান্ড ডিজিজ প্রিভেনশন'-এর ডাইরেক্টর ডোনাল্ড ডেভিস বলেছেন: "জুরিদের এই রায় খুবই উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়াতে, যেখানে ধূমপানের বিরুদ্ধে অনেকেরই অভিমত রয়েছে এবং ফৌজদারি মামলায় রায় দিতে ১২ জন জুরির ৯ জনের অভিমত লাগে। ডাঃ ডেভিস আগে 'টোব্যাকো কন্ট্রোল'-এর সম্পাদক ছিলেন এবং বর্তমানে 'ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল'-এর উত্তর আমেরিকার সম্পাদক। **[British Medical Journal, 20 February 1999, p. 48]** □

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা

অমলেন্দু চক্রবর্তী

দুর্গা রূপে রূপান্তরে—পূর্বা সেনগুপ্ত। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। পৃষ্ঠা : ১৩০+৬। মূল্য : ৪০ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি খুব প্রিয় গান ছিল :

"শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার।
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার।।"

ঠাকুরের নির্দেশে কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ অনেকবার এই গানটি গেয়েছেন। ঠাকুর নিজেও বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন। দুর্গানাম গাইতে গাইতে দুর্গতিনাশিনীকে প্রত্যক্ষ করে সমাধিস্থ হয়েছেন বারবার। সত্যই 'দুর্গা' নামটির মধ্যে রয়েছে অনন্ত শক্তির এক সন্ধান, যা সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ প্রার্থনা করে এসেছে এবং নিজের বুদ্ধিতে এই শক্তি-রহস্যের অর্থ উদ্ধার করতে না পারায় 'ইন্দ্র', 'অগ্নি', 'বরুণ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করে এক-একটি প্রবল শক্তির কাছে মাথা নত করে নানা প্রকার মন্ত্র রচনা করেছে।

মহর্ষি ব্যাসদেব-কৃত মহাভারতের বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, বারবছর বনবাসের পর একবছর অজ্ঞাতবাসের জন্য যখন পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে যাচ্ছেন তখন ঋষিদের পরামর্শে অজ্ঞাতবাসের সাফল্যার্থে তাঁরা দুর্গাদেবীর স্তব করেন। ভীষ্মপর্বের তেইশ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্গাদেবীকে প্রণাম ও প্রসন্ন করতে উপদেশ দিয়েছেন। সত্যই, জগতের সমস্ত দুঃখকে দূর করে যিনি মানবজাতিকে নিত্যানন্দময় করে তোলেন, তিনিই দুর্গা।

ঋগ্বেদই হলো মানবজাতির একমাত্র আদি প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের নিরানব্বই সূক্তের ১ম মন্ত্রে 'দুর্গা' নামটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। তিনি আমাদের সকল দুঃখ থেকে পার করেন। দশম মণ্ডলেও দুর্গাকে সমস্ত দেবতার মাতা ও শক্তিদাত্রী বলা হয়েছে। এই ঋক্ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি দেখা যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও—"অবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।" (আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রুদের ধ্বংস করব।) যদিও উপনিষদের বিষয়বস্তু মূলত ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ—একাধিক উপনিষদে 'দুর্গা'র উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্রঃ মাণ্ডুক্য, কেন, নারায়ণ উপনিষদ্)। "দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে নাশয়তে তমঃ"। সকল দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন বলেই তিনি দুর্গা।

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু হলো পূর্বা সেনগুপ্ত রচিত 'দুর্গা রূপে রূপান্তরে' গ্রন্থটি। দেবী দুর্গার মহিমা আলোচনা করতে গিয়ে লেখিকা শক্তিতত্ত্বের নানা দুরূহ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে একই শক্তি বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাই লেখিকার মতে, কখনো দেবী হয়েছেন দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, কখনো চামুণ্ড-মুণ্ডমালিনী দেবী কালিকা, কখনো বা জগৎপালয়িত্রী দেবী জগদ্ধাত্রী। আবার কখনো অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা। দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপ আলোচনা প্রসঙ্গে লেখিকা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের নাম উল্লেখ করেছেন। এই পুরাণে 'শক্তি' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—'শক্' শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য এবং 'তি' শব্দটির অর্থ পরাক্রম। যিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্যরূপিণী হয়ে মানবকে পরাক্রম ও ঐশ্বর্য দান করেন, তিনি 'শক্তি' বলে কথিত হন। এই পুরাণে প্রকৃতি থেকেই শক্তির উৎপত্তি। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা—এই পাঁচটি হলো মূল প্রকৃতি।

দেবী দুর্গার আরাধনা ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাঙালী জনজীবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পূজা। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনকে দেবী দশভুজ বিস্তার করে রক্ষা করে চলেছেন। তবে বাঙালীর কাছে দুর্গা এখন আর শুধু মাতৃদেবী নন। তিনি এখন আদরের দুলালী হয়ে পুত্রকন্যা নিয়ে বাপের বাড়ি আসেন আর দশমীর দিন সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যান। কাজেই ভক্ত রামপ্রসাদ গান বেঁধেছেন—

"এবার আবার উমা এলে, আর আমি পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।
আমি শুনেছি নারদের মুখে—উমা আমার থাকে দুঃখে।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়।
তবে মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।"

এমন ভাবঘন স্নেহের অভিব্যঞ্জনা বাঙালী ভক্ত ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

তন্ত্র হলো ভাবের খনি। তাই দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্যের বিকাশ আমরা এই তন্ত্রশাস্ত্রে দেখতে পাই। চালচিত্র থেকে শুরু করে নবপত্রিকা পর্যন্ত দশভুজা মূর্তির সর্বত্রই ভাবের দ্যোতনা আছে। আব্রহ্মতৃণস্তর পর্যন্ত যে মা জগৎ জুড়ে বসে আছেন, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিতে যে মা হ্রী, শ্রী, ধী, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মায়া-রূপে বিরাজমানা—সেই মায়ের অভিব্যঞ্জনা দশভুজা রূপে। দুর্গোৎসব ভাবের অশ্বমেধ, রসের রাজসূয়। দুর্গোৎসবে মা মহালক্ষ্মী, মহামেধা, মহাঘোরা, মহামায়া।

তবে বাঙালী ভক্ত ও কবি এই ভাবের খেলায় তত্ত্বহারা

হয়নি। তাই দাশরথি রায় গান গেয়েছেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল!"

তত্ত্বজ্ঞানটা কবির মনে টনটনে রয়েছে। তিনি মৃন্ময়ী রূপশালিনী দেবীকে চিন্ময়ী অরূপিণী বলে জানতেন। দেবীপূজার মাহাত্ম্য এই শুদ্ধ ভাবকে কেন্দ্র করে বিরাজ করছে। এই ভাবটি আমাদের হৃদয়ে আনয়নের চেষ্টা করাই আসল কথা। পরিবর্তে লক্ষ কাঙালী ভোজন করালে বা স্তূপাকার চন্দন, বিল্বদল, ফলমূল, নৈবেদ্য, ভোগরাগাদি দিয়েও তাঁর পূজা সিদ্ধ হবে না। অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য—বেদান্ত বলে। ক্রিয়া দুইপ্রকার—অজ্ঞানপূর্বক ও জ্ঞানপূর্বক। অজ্ঞানপূর্বক ক্রিয়াতেও জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠানে তা পরিবর্তিত হয়। জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে সমগ্র বিশ্বের সহিত ভাবের সেতুবন্ধ রচনাই শক্তি আরাধনার প্রধান তাৎপর্য।

লেখিকা যথার্থই বলেছেন, বাৎসল্য রসের ভিতর দিয়েই এ-শক্তির সাধনা। বিশ্বমাতৃত্বের স্নিগ্ধ রসমূর্তির অভিব্যক্তি ধরা পড়ে বাঙালীর পূজায়। এই পূজা রূপের মাধ্যমে অরূপের পূজা। তাই এই পূজা ভাব ও রসের দিক দিয়ে এত অনুপম, এত স্নিগ্ধ, এত মাধুর্যময়। দুর্গাপূজা আর পাঁচটি পূজার মতো সাধারণ পূজা নয়। দুর্গাপূজা বাঙালীর মহাপূজা। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। দুর্গা জগজ্জননী। এ-পূজা আমাদের পূজা—একান্ত আপনার, দুঃখ ঘোচাতে তাঁর আগমন। দুঃসহ দুঃখকে হরণ করেন, তাই তিনি 'দুর্গা'।

মোট সাতটি পর্বে পূর্বা সেনগুপ্ত মা দুর্গার রূপকল্প পাঠকদের নিকট আন্তরিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার সফল প্রয়াস করেছেন। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত দেবী দুর্গার স্তবগাথা। স্তবগুলির সরল বঙ্গানুবাদ ভক্ত পাঠকের নিকট অবশ্যই আদরণীয় হয়ে উঠবে।

সত্যই, দেবী যুগে যুগে নিজের রূপ পরিবর্তন করেছেন ভক্তের কামনায়। লোকচেতনা, লোকসংস্কৃতি তাঁর বৃহৎ রূপটিকে বারংবার ভেঙেচুরে আপনার করে নিয়েছে। নিজেদের ক্ষুদ্র কামনা নিয়ে নত হয়েছে মাতৃশক্তির পায়ের তলায়। কামনা করেছেঃ হে দেবী, তোমার ভয়ঙ্কর রূপটি লুকিয়ে রেখে প্রসন্ন বদনখানিই আমাদের দেখাও, মাতৃস্নেহে স্নাত কর আমাদের। সকল বিভেদ, দ্বন্দ্ব ভুলে যেন আমরা মায়ের কোলের টানে এক হয়ে যাই। কারণ মা-ই আমাদের মাটির সাথে বেঁধে রেখেছেন। তাই তিনি আমাদের ঘরের মেয়ে। আমাদের লোকজননী দুর্গা। পূর্বা সেনগুপ্ত **'দুর্গা রূপে রূপান্তরে'** গ্রন্থটি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়ে একটি মূল্যবান কাজ করেছেন। লেখিকার সঙ্গে আমরাও প্রার্থনা জানাই শ্রীশ্রীদুর্গার চরণেঃ "হে দেবী। তুমি আমাদের জীবন থেকে ভয়, মোহ ও অজ্ঞানতা দূর কর। অন্ধকার থেকে নিয়ে যাও আলোকের ঝরনাধারায়।" ❑

সহজ সরল ভক্তি অর্ঘ্য

সোমনাথ ভট্টাচার্য

অর্ঘ্য—দেবপ্রসাদ বসু। প্রকাশকঃ দেবপ্রসাদ বসু, সি-১০ শ্রীরামনগর, এস. নাম্বার ১৩৮, পুনে-৪১১ ০০৭। পৃষ্ঠা ঃ ৬+৫৮। মূল্য ঃ ২৫ টাকা।

লেখক একজন প্রযুক্তিবিদ্, কবিতাপ্রেমী ভক্তমানুষ। সরল প্রাণে মনের আবেগে লেখা মূলত ভক্তিরসাশ্রিত কিছু কবিতা নিয়ে তাঁর এই ছোট্ট বইখানি। কবিতাগুলিতে 'কাব্য'প্রচেষ্টা কম, ভাব-ভক্তি অধিক। তবে ভক্তজনের কাছে তারও মূল্য কম কী? লেখক তাঁর বইয়ের প্রথম দিকেই অকপটে জানিয়েছেনঃ "জানি না করিতে গান/ গলে নাই মোর সুর/ হৃদয়ে জপিতে চাই/ তব নাম সুমধুর।" তবে কবির কণ্ঠে আছে একটি স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতিঃ "আমার বীণা বাজরে আজি বাজ/ রুদ্র সাজে সাজরে আজি সাজ/ সপ্তসুরে চড়িয়ে দে তোর সুর/ কোমলতা যাক সে বহুদূর।"

বইয়ের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে নিবেদিত বিশ্বজনক-জননীর উদ্দেশে ভক্তি অর্ঘ্য। রয়েছে ২৬টি কবিতা। কোন কোন কবিতার অংশ কিছু সুপরিচিত পঙ্ক্তি মনে করায়। যথা—"মৃদু মন্দ বায়ু বহে সন্ধ্যা নামিছে ধীরে/ একা আমি বসে আছি জীবন নদীর তীরে।" যাইহোক, কবিতাগুলির মধ্যে এক ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থীর অন্তরের আকুতির হালকা ছোঁয়া অনুভব করা যায়। বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে ৮টি কবিতা। তাদের মধ্যে কোন-কোনটির অংশবিশেষ ছড়ার কাছাকাছি; যেমন—"ঝাপসা যে গাছপালা/ ভরপুর নদীনালা/ অপরূপ সৃষ্টি/ ঝুপঝুপ বৃষ্টি।" তৃতীয় ও শেষভাগে আছে গণেশ, শিব, দুর্গা এবং নিরাকার বন্দনামূলক ১৭টি কবিতা।

বইতে বেশ কিছু বানান ভুল চোখে লাগে। সামগ্রিক পারিপাট্য ও অঙ্গসজ্জা মোটামুটি। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বইটির বিষয় ও বিন্যাস আরো শোভনীয় হবে। ❑
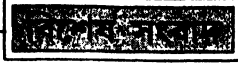
শ্রীসারদা মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজীর মহাপ্রয়াণ

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী গত ৩০ আগস্ট '৯৯ সোমবার রাত্রি ২.২৫ মিনিটে কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহোমে দেহত্যাগ করেছেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর (১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৩ অগ্রহায়ণ) বৃহস্পতিবার কলকাতায় তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রেণুকা বসু। ছাত্রাবস্থায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকারূপে তিনি যোগদান করেন। শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠার পর (১৯৫৪) তিনি মঠে চলে আসেন। ১৯৫৩-র ২২ ডিসেম্বর বেলুড় মঠের পুরনো ঠাকুরঘরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে তিনি ব্রহ্মচর্য এবং ১৯৫৯-এ তাঁর কাছেই সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা মাতাজীর মহাপ্রয়াণের পর ১৯৭৩-এর এপ্রিল মাসে তিনি শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা পদে বৃত হন। সুদীর্ঘ ২৬ বছর ধরে ভারত ও বহির্ভারতের বহু নরনারীকে মন্ত্রদীক্ষা দান করে তিনি ঐ পদের গুরুদায়িত্ব বহন করে এসেছেন। সঙ্ঘের অধ্যক্ষারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলিতে অগণিত অধ্যাত্মপিপাসু নরনারীকে দীক্ষাদান করেন। সকল অনুষ্ঠানেই তাঁর উপস্থিতি ছিল আনন্দময় ও প্রেরণাপ্রদ।

১৯৯৮-এর নভেম্বরে মাতাজীর ক্যান্সার ধরা পড়ে। কিন্তু সেজন্য তাঁকে কোনদিন এতটুকু বিচলিত হতে দেখা যায়নি। শারীরিক যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ভক্তদের দর্শনাদি দিতেন, হাসিমুখে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সংশয়ের সমাধান করতেন। দীক্ষাদানও যথারীতি চলত। শেষ দীক্ষা দিয়েছিলেন ১৮ জুলাই ১৯৯৯। চিকিৎসার জন্য মাঝে মাঝে নব-প্রতিষ্ঠিত সিরিটি মিশন কেন্দ্রে কিছুদিন থেকে আবার দক্ষিণেশ্বরে মঠে ফিরেছেন। অপরিসীম তিতিক্ষা ও সহ্যশক্তি ছিল তাঁর। শরীর সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একান্ত উদাসীন। আদৌ কষ্টের কথা তুলতেন না। প্রশ্ন করলেই বলতেন ঃ "ভাল আছি।"

৯ আগস্ট ১৯৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জন্মতিথির রাতে খাওয়ার পর মাতাজী হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শ্বাসের কষ্ট দেখে স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ নন্দীকে খবর দেওয়া হয়। তখনকার মতো অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করলেও ডাক্তারের নির্দেশে পরদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য ভক্তদের দর্শন দেওয়া বন্ধ থাকে। রাত্রে আবার অসুস্থতার বৃদ্ধি হওয়ায় তার পরদিন ১১ আগস্ট বুধবার চিকিৎসকদের পরামর্শে বেলা ৯টা নাগাদ তাঁকে বেলভিউ নার্সিং হোমে আই. সি. সি. ইউ.-তে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তাঁকে কেবিনে নিয়ে আসা হয়। ২৭ ও ২৮ আগস্ট আবার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। ২৯ আগস্ট তাঁকে অক্সিজেন ও ড্রিপ দেওয়া হয়। ৩০ আগস্ট রাত ১০টার পর থেকে শ্বাসকষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়। পরে অবস্থার সামান্য উন্নতি হলেও আবার খুব দ্রুত অবস্থার অবনতি হতে থাকে। চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে রাত ২টা ২৫ মিনিটে তিনি মহাসমাধিতে লীন হন।

পূজনীয়া মাতাজীর ধীর, মধুর ও নিরভিমান ব্যক্তিত্বে সকলেই মুগ্ধ হতেন। ভক্তদের প্রতি ছিল তাঁর অন্তরের গভীর স্নেহ ও ভালবাসা। বহু আর্ত ও সংসারতপ্ত মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে লাভ করেছেন সান্ত্বনা, শান্তি ও নবজীবন। গত এক বছর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি দীক্ষা ও ভক্তদের দর্শন-দানে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর ত্যাগ-তপস্যা-তিতিক্ষাপূত জীবন, মধুর ব্যবহার ও ভক্তবাৎসল্য সকলের সামনে এক অনন্য এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে বিদ্যমান থাকবে। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) প্রাক্তনী সংসদ গত ১৫ আগস্ট '৯৯ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীর জন্মশতবর্ষ স্মরণে তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধের একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করে বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে। সঙ্কলন-গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এরপর তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন : স্বামী তেজসানন্দ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক এবং আজ আমাদের দেশে তাঁর মতো একজন আদর্শ শিক্ষকেরই প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই রচনাসংগ্রহ বহু শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কাছে শাশ্বত প্রেরণা হয়ে উঠবে। তারপর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী বলেন : ছাত্রদের প্রতি তেজসানন্দজীর অকৃত্রিম ভালবাসাই যেন রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান গ্রন্থের আকার নিয়েছে। তিনি চরিত্রগঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ তেজসানন্দজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দ, বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ এবং প্রাক্তনী সংসদের সহ-সভাপতি বিশ্বনাথ দাস ও সম্পাদক তপনকুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন দুই প্রাক্তন ছাত্র স্বামী সর্বগানন্দ ও গৌতম মুখোপাধ্যায়।

হায়দ্রাবাদ মঠে (অন্ধ্রপ্রদেশ) গত ১৫ আগস্ট '৯৯ যুবক-যুবতীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান এক্সেলেন্স'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

ভারত সরকার ১৯৯৯ সালকে 'সংস্কৃতবর্ষ' ঘোষণা করায় এবং সংস্কৃতশিক্ষার বাস্তব প্রয়োজনের কথা ভেবে **সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ)** গত ২৬ আগস্ট '৯৯ 'সংস্কৃতদিবস' পালন করে। এই উপলক্ষ্যে 'সার্বিক চেতনায় সংস্কৃত' প্রসঙ্গে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৮০০ ছাত্র, শিক্ষক ও সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী শিবনাথানন্দ, রহড়া বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দ, বিবেকানন্দ বেদবিদ্যালয়ের (বেলুড় মঠ) অধ্যক্ষ স্বামী অলোকানন্দ ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ এবং অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, ডঃ বাসুদেব কর্মকার ও ডঃ হরিপদ আচার্য।

কাঁকুড়গাছি (যোগোদ্যান) রামকৃষ্ণ মঠে (কলকাতা-৭০০০৫৪) গত ৩ সেপ্টেম্বর '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, হোম, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, বাউলগান, কালীকীর্তন, লীলাগীতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। ভোরে বৈদিক স্তোত্রপাঠ করেন মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং সকাল ৬টায় স্বামী নাগেশ্বরানন্দের পরিচালনায় ভজন পরিবেশন করে মঠ পরিচালিত বিবেকানন্দ বালক সঙ্ঘের বালকেরা। সকাল ৮টায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী গর্গানন্দ এবং তারপর সুশান্ত দত্ত। সকাল ১০টায় 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী রমানন্দ। ১১টায় কালীকীর্তন পরিবেশন করেন সারদাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ। দুপুর ১২টা থেকে হাতে হাতে প্রায় ১১,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। তারপর বাউলগান পরিবেশন করেন ব্রজগোপাল দাস এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন রসরঙ্গ সম্প্রদায়। এরপর স্বামী সর্বগানন্দের ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন পরিবেশন করেন অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।

ছাত্রকৃতিত্ব

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ১৯৯৯ সালের বি. এসসি. (অনার্স) পরীক্ষায় **সারদাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (বেলুড় মঠ)** ছাত্রেরা রসায়নে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ৯ম ও ১০ম স্থান; গণিতে ১ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১০ম স্থান এবং পদার্থবিদ্যায় ১ম, ২য়, ৫ম (২জন) ও ৯ম স্থান অধিকার করেছে।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা রসায়নে ২য় ও ৩য় স্থান, গণিতে ৩য় ও ৪র্থ স্থান এবং স্ট্যাটিসটিক্স-এ ১ম ও ৯ম স্থান অধিকার করেছে।

রহড়া বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের একজন ছাত্র উদ্ভিদবিদ্যায় ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

মেঘালয় বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ১৯৯৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় **চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের** একজন ছাত্র ৮ম স্থান অধিকার করেছে।

ত্রাণ

বিহার বন্যাত্রাণ

পাটনা আশ্রম (বিহার) গত আগস্ট ('৯৯) মাসে উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গা, হাওয়াঘাট প্রভৃতি ব্লকের ১১টি গ্রামের ৫৬৬টি বন্যাকবলিত পরিবারের মধ্যে ২৮৩০ কিলোঃ আটা ও প্রচুর ব্যবহৃত পোশাক বিতরণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

কাঁথি আশ্রম গত আগস্ট ('৯৯) মাসে নয়পুর ও গোকুলপুর অঞ্চলের ১৪টি গ্রামের ৬০৪টি বন্যার্ত পরিবারের মধ্যে ৪৮০০

কিলোঃ চাল ও ১২৫০ লিটার দুধ বিতরণ করেছে। এছাড়া শীঘ্র বিতরণের জন্য বেলুড় মঠ থেকে প্রচুর পোশাক-পরিচ্ছদ ও ত্রাণসামগ্রী প্রেরিত হয়েছে।

দুঃস্থ ত্রাণ

রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি কেন্দ্র গত কয়েক মাসে দুঃস্থ শিশু ও মায়েদের জন্য দুধ বিতরণ করেছে। তাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ আঁটপুর মঠ ২২ দিনে ১০টি গ্রামের ৪০৮ জনের মধ্যে ২৫০০ লিটার, চণ্ডীপুর মঠ ১২ দিনে ৭টি গ্রামের ৬৫০ জনের মধ্যে ২৫০০ লিটার, ইছাপুর মঠ ১০১ দিনে ৮টি গ্রামের ৪২৪ জনের মধ্যে ৫৫৭৪ লিটার, কামারপুকুর মঠ ২৭ দিনে ৪টি গ্রামের ৩৭০ জনের মধ্যে ২৫০০ লিটার, মালদা মঠ ৫৬ দিনে ৩টি গ্রামের ১৮০ জনের মধ্যে ২৫০০ লিটার, মনসাদ্বীপ আশ্রম ৩০ দিনে ৩টি গ্রামের ৩৩০ জনের মধ্যে ২৫০০ লিটার, মেদিনীপুর আশ্রম ৫২ দিনে ১৮টি গ্রামের ১৯৪ জনের মধ্যে ২৫০০ লিটার, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ৯০ দিনে ৪টি গ্রামের ১৬৩ জনের মধ্যে ২৫০০ লিটার এবং শিকরাকুলীনগ্রাম মঠ ১৮ দিনে ৬টি গ্রামের ৫৮৬ জনের মধ্যে ২৫০০ লিটার বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস (আমেরিকা) ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনটি মঙ্গলবার 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী নিষ্পাপানন্দ এবং একটি মঙ্গলবার বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও একটি বৃহস্পতিবার স্বামীজীর কর্মযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অফ টরন্টো (আমেরিকা) ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম বুধবার স্বামী ত্যাগানন্দ এবং অন্য রবিবারগুলিতে সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, রামনাম-সঙ্কীর্তন ও আধ্যাত্মিক-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী মহেন্দ্রানন্দ (বসন্ত) গত ৬ আগস্ট '৯৯ সকাল ৬.৪০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পারকিনসন্স, ডায়াবিটিস ও মস্তিষ্কের রোগে ভুগছিলেন। সেজন্য তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫২ সালে তিনি জামতাড়া মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে কাটিহার, মনসাদ্বীপ, পুরুলিয়া, সারদাপীঠ, ভুবনেশ্বর ও কাশীপুরে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বেলুড় মঠে প্রায় এক বছর যাবৎ কর্মী হিসেবে ছিলেন। অসুস্থতার কারণে ১৯৭৭ সাল থেকে অবসর গ্রহণ করে বেলুড় মঠে অবস্থান করছিলেন। সহজ-সরল স্বভাব ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দজী (জগদানন্দ) গত ২৪ আগস্ট '৯৯ বেলা প্রায় ১১.৩০ মিনিটে লখনৌ রামকৃষ্ণ মঠে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। সেজন্য তাঁকে মাঝে মাঝে হাসপাতালে ভর্তি করা হতো। দীর্ঘদিন দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভোগা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা আনন্দে থাকতেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯৪৭ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। তিনি বেলুড় মঠ ভিন্ন রেঙ্গুন, আলমোড়া, চণ্ডীগড় ও লখনৌ কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর তপস্বী, অমায়িক ও প্রেমিক স্বভাবের জন্য পরিচিতজনের কাছে তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

স্বামী স্বভাবানন্দ (কানাই) গত ২৫ আগস্ট '৯৯ সকাল ৬টায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি দীর্ঘদিন পারকিনসন্স ও মস্তিষ্কের রোগে ভুগছিলেন। সেজন্য মাস তিনেক আগে তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৯ সালে কাশী সেবাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। দুবছর যাবৎ তিনি স্বামী অতুলানন্দজী মহারাজের সেবক হিসেবে এবং দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে কনখল সেবাশ্রমে বিভিন্ন সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সাল থেকে বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ভাল গান গাইতে পারতেন এবং বহুদিন ধরে বহু রোগে ভোগা সত্ত্বেও তাঁর মুখমণ্ডল সদা হাস্যে পূর্ণ থাকত।

স্বামী ধ্যেয়ানন্দ (গোপাল) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৮ আগস্ট '৯৯ ভোর ৩টায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি দীর্ঘদিন বহুমূত্র ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন। সেজন্য তাঁকে গত ১১ জুন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৯ সালে বাগবাজার মঠে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়া তিনি বলরাম-মন্দির, লখনৌ সেবাশ্রম, রহড়া ও বেলুড় মঠে নানা সময়ে সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন স্নেহপ্রবণ ও প্রফুল্ল স্বভাবের। রন্ধনকার্যে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথি পালন ঃ গত ২ সেপ্টেম্বর '৯৯ বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথি পালন করা হয়। ঐদিন ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত-বিষয়ক শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী সনকানন্দ।

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর '৯৯ বুধবার শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দ। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

দক্ষিণ কলিকাতা বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র (কলকাতা-৭০০০২৭) গত ১ আগস্ট '৯৯ স্থানীয় কৈলাস বিদ্যামন্দিরের সভাকক্ষে সারাদিনব্যাপী একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দ। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং 'দেশাত্মবোধ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে আলোচনাচক্র ছিল সম্মেলনের বিভিন্ন অঙ্গ। সম্মেলনে ১৮৭ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী।

গড়ফা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র (কলকাতা-৭০০০৭৮) গত ১ আগস্ট '৯৯ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘে (রথতলা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৩-২২ আগস্ট '৯৯ সঙ্ঘের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৩ আগস্ট ৫০টি প্রদীপ জ্বেলে উৎসবের সূচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য' সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। ১৪ আগস্ট সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। এতে প্রায় ১০০০ ছাত্রছাত্রী ও ভক্ত অংশগ্রহণ করে। বৈকালিক ধর্মসভাগুলিতে ১৪ আগস্ট 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ১৫ আগস্ট 'স্বামী বিবেকানন্দ ও আজকের ভারতের জাতীয় সমস্যা' প্রসঙ্গে স্বামী সর্বলোকানন্দ ও অধ্যাপক হোসেনুর রহমান, ২০ আগস্ট 'ভগিনী নিবেদিতার ভারত আগমনের শতবর্ষ' বিষয়ে প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা ও অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য, ২১ আগস্ট 'আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের প্রয়োগ' প্রসঙ্গে স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী অচ্যুতানন্দ এবং ২২ আগস্ট 'শ্রীমা ও এযুগের নারী' প্রসঙ্গে প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা, ডঃ সুস্মিতা ঘোষ ও ডঃ বাসন্তী চৌধুরী ভাষণ দেন। ১৬-১৯ আগস্ট চারদিন সঙ্ঘ-পরিচালিত 'বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষামন্দির'-এর ছাত্রছাত্রীরা নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিবেদন করে। উৎসবের বিভিন্ন দিনে ভজন, ভক্তিগীতি, দেশাত্মবোধক গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, হৈমন্তী শুক্লা, সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় এবং 'ত্রিবেণী' সংগঠনের সুমিত্রা সেন ও সম্প্রদায়। 'বৃন্দবাদন' পরিবেশন করেন সুরঞ্জন ও সম্প্রদায় এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটক মঞ্চস্থ করেন শ্রীরামপুর শ্রীমরোজ মিউজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে আলো ও ধ্বনির মাধ্যমে 'বিলে থেকে বিবেকানন্দ' শিরোনামে স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হয়।

ধুচনীখালী শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৫ আগস্ট '৯৯ স্বাধীনতা দিবসে একটি দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ। এই উপলক্ষ্যে স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দের পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ ভক্তের সমাগম হয়। সমাগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

চাকদহ বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৫ আগস্ট '৯৯ চাকদহ মহাবিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবমহামণ্ডলের ২২তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন চাকদহ যুবমহামণ্ডলের সম্পাদক নিমাই কুণ্ডু। 'বর্তমান সমাজে মহামণ্ডলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মধারা' বিষয়ে আলোচনা করেন বালিভাড়া যুবমহামণ্ডলের সম্পাদক রঞ্জিতকুমার ঘোষ এবং 'আদর্শ চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও তার উপায়' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন নিতাই কর্মকার। তারপর অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ও যুবমহা-মণ্ডলের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী 'স্বামীজীর জীবনাদর্শ ও যুবকদের প্রতি তাঁর আহ্বান' বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুরেশানন্দ ও বিষ্ণুপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোতোষ সরকার এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন বঙ্কিমনগর আশ্রমের স্বামী বীরেশানন্দ ও নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৬৪জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্রের (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ১৭ আগস্ট '৯৯ একটি হোমিপ্যাথি চিকিৎসালয় ও একটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন যথাক্রমে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ ও প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক রামকিঙ্কর চক্রবর্তী। এই উপলক্ষ্যে বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবদেবানন্দ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আদর্শে সেবাকার্যের বিষয়ে আলোচনা করেন রামকিঙ্কর চক্রবর্তী, চন্দ্রকোণা ১নং ব্লকের জয়েন্ট বি.ডি.ও. অলোকময় বসু এবং ঘাটালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শক্তিসাধন কয়াল। সভা পরিচালনা করেন প্রবীণ শিক্ষক রোহিণীনাথ মণ্ডল।

বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২২ আগস্ট '৯৯ স্থানীয় শ্যামসুন্দর কমপ্লেক্সে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। পূজা করেন স্বামী দেবেশ্বরানন্দ এবং 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী সংপ্রভানন্দ। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাসভা। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সংপ্রভানন্দ, স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ, শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়, বিমল

পাল ও সন্তোষ দত্ত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সমাগত সকল ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের (জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ২৪ ও ২৫ আগস্ট '৯৯ গ্রন্থাগারের সভাগৃহে শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে গত ২৪ আগস্ট বিকাল ৫টায় সভাগৃহ-সংলগ্ন স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশে শতদীপ জ্বেলে শতবর্ষ উৎসবের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বস্তিবাচন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শান্তি মহারাজ। তারপর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে লালকুঠিপাড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের ছাত্রীবৃন্দ। উদ্বোধনী ভাষণে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বলেন : "কারাগার মানুষের অগৌরবের প্রতীক, আর গ্রন্থাগার মানুষের গৌরবের প্রতীক। কারাগার অন্ধকারের প্রতীক, গ্রন্থাগার আলোর প্রতীক। সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার বিগত ১০০ বছর ধরে বীরভূম জেলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।" সিউড়ী পুরসভার পৌরপিতা জহর মিশ্র গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, সমগ্র বীরভূম জেলার গর্ব এই গ্রন্থাগার। বিশেষ অতিথির ভাষণে ভ্রমণ-সাহিত্যিক শঙ্কু মহারাজ তাঁর লিখিত ভাষণে মানুষের জীবনে গ্রন্থাগারের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা কবেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ রামবহাল তেওয়ারী এই গ্রন্থাগারের ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে জেলাশাসক এবং বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের সভাপতি স্বামী সিং গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দান করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ দাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কাঞ্চন সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন পলাশ চৌধুরী। পরদিন (২৫ আগস্ট) বিকালে গ্রন্থাগারের সভাগৃহে কবিতা ও সঙ্গীত এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শঙ্কু মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, সিউড়ী (জেলা—বীরভূম) গত ২৪ আগস্ট '৯৯ সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিটে বীরভূম কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন হল-এ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলনের আয়োজন করে। সভায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিবাজী পাল। স্বাগত-ভাষণ দান করেন শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে সিউড়ী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সিউড়ীতে এধরনের সম্মেলন এই প্রথম আয়োজিত হলো। সম্মেলন পরিচালনা করেন ডাঃ দীপ্তিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়। ২৫ আগস্ট '৯৯ সকাল ৭টায় স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ প্রচাবপীঠের সম্পাদক ও সদস্যের সঙ্গে প্রচারপীঠের নিজস্ব ভবনের প্রস্তাবিত জমিটি পরিদর্শন করেন।

রাজারহাট-বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২৬ আগস্ট '৯৯ শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের ১৩৭তম জন্মতিথি পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, গীতি-আলেখ্য, 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'পুঁথি' পাঠ এবং দুপুরে প্রসাদ বিতরণ ও বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' এবং 'পুঁথি' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন যথাক্রমে বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ এবং স্বামী ভূপেন্দ্রানন্দ। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দ ও স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমের সম্পাদক জয়দেব বিশ্বাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সভাপতি ডাঃ সুধীরকুমার রাহা। অনুষ্ঠানে বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

ক্ষীরকুণ্ডী প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৬ আগস্ট '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠাদি, দুপুরে প্রসাদ বিতরণ এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দ এবং 'যুগসঙ্কটে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবের তাৎপর্য' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী সর্ববিদানন্দ। তারপর প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ইন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ' বিষয়ে আলোচনা করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে গত ২২ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্পর্কে 'বসে আঁক' প্রতিযোগিতা, স্বামীজীর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা ও যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বহির্ভারত

গত ২৯ আগস্ট '৯৯ রবিবার বিকাল ৪টায় **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা-কেন্দ্রে** 'শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়বাদ : ভারতের চিরন্তন সাধনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মতিউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন গবেষণা-কেন্দ্রের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহদাত আলী। আলোচনা করেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মণ্ডল এবং ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দজী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা-কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম।

বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টার (লণ্ডন) গত ১১ সেপ্টেম্বর '৯৯ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বধর্মসমন্বয় সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের সূচনা হয় স্বামীজীর বাণী আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। আবৃত্তি করেন সুস্মিতা দাস এবং স্বাগত-ভাষণ দান করেন সেন্টারের ডিরেক্টর রামচন্দ্র সাহা। তারপর বেদ ও গীতা, কোরান, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। এরপর 'বিশ্ব সহিষ্ণুতা, শান্তি ও সমন্বয়'-এর ওপর হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে স্বামী দয়াত্মানন্দ, বৌদ্ধধর্ম থেকে ধর্মচারী মৈত্রেয়বন্ধু, খ্রীস্টান ধর্ম থেকে ফাদার জোসেফ এম. কোলেলা এবং রেভারেন্ড

জন ওয়েবার, ইহুদীধর্ম থেকে রাব্বাই লরেন্স রীগাল, মুসলিম ধর্ম থেকে মহম্মদ দিলওয়ার হোসেন, শিখ ধর্ম থেকে গুরিন্দার সিং সাচা এবং ইন্টারফেথ নেটওয়ার্ক থেকে ব্রায়ান পীয়ার্স আলোচনা করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডঃ ফজলু মামুদ, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, গৌরী চৌধুরী, ইভ রাইট, উমা বসু, টনি লিয়ং প্রমুখ এবং সঙ্গতে ছিলেন সন্দীপ চক্রবর্তী। আলোচনা-শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হিউম্যান সেন্টারের চেয়ারম্যান ডঃ চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উদয়শঙ্কর দাস।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **কানাইলাল বণিক** দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ৭ জুন '৯৯ ভোর ৪.১০ মিনিটে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। পশ্চিম ত্রিপুরার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের সঙ্গে তিনি বিশেষ জড়িত ছিলেন। স্বামী সৎপ্রভানন্দের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ছিলেন 'উদ্বোধন'-এর একজন আগ্রহী পাঠক ও গ্রাহক।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য দুর্গাপুর-নিবাসী **জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা** গত ১২ জুন '৯৯ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি স্থানীয় সাধুডাঙ্গা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবিবাহিত জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পিত-প্রাণ।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **ইলা চৌধুরী** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৬ জুন '৯৯ রাত ৯টা ৫ মিনিটে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অল্প বয়স থেকেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বহু সন্ন্যাসীরই তিনি স্নেহধন্যা এবং 'উদ্বোধন'-এর আজীবন গ্রাহিকা ও পাঠিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **গীতা গাঙ্গুলী** গত ১৭ জুন '৯৯ রাত ১২টা ৩০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। সুমিষ্ট ব্যবহার ও মিতভাষিতার জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত।

শ্রীশ্রীমায়ের আদরের 'বড়খুকি' এবং শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্তা ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য 'চন্দু'র (চন্দ্রমোহন দত্ত) জ্যেষ্ঠ কন্যা **ইন্দুবালা ঘোষ** গত ৪ জুলাই '৯৯ মোমিনপুরে নিজ বাসভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম জপরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। প্রয়াতা ইন্দুবালা ঘোষ ছিলেন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। শৈশবে তিনি নিবেদিতাকে দর্শনও করেন। সদালাপী, মিষ্টভাষী ও গুরুগতপ্রাণ ইন্দুবালা দেবীর কাছে ভক্তেরা আসত শ্রীশ্রীমায়ের দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে কথা (যা কোন গ্রন্থে এখনো লিপিবদ্ধ নেই) শুনতে। সেইসব অজানিত কথা শুনে শ্রোতারা আনন্দ পেত। 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তাঁর মাতৃস্মৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **অর্চনা চৌধুরী** গত ৭ জুলাই '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁর যাতায়াত ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা ছিলেন। দানশীলতা ছিল তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য **কানাইলাল সরকার** গত ৮ জুলাই '৯৯ রাত ১০টা ৩০ মিনিটে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ঈশ্বর-নির্ভরতা, সহজ-সরল ব্যবহার ও পরোপকারিতার জন্য তিনি সকলের প্রিয়ভাজন ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **ভুজঙ্গভূষণ ঘোষ** পুরুলিয়ার নীলকুঠিডাঙ্গায় নিজ বাসভবনে গত ১০ জুলাই '৯৯ সকাল ৯টায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। কর্মজীবনে তিনি বি. এন. রেলওয়ের একজন ইন্সপেক্টর ও ট্রেড ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এবং পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হন। তিনি শেষজীবনে কয়েকবছর বিদ্যাপীঠে বাস করেছিলেন। পুরুলিয়া শহরে সাধুদের নিয়মিত 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা শুরুর পিছনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বেলুড় মঠের বহু প্রাচীন ও নবীন সাধুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন দীর্ঘদিনের গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। সদাশয়, সমাজসেবী, অকৃতদার প্রয়াত ভুজঙ্গভূষণ ঘোষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর-নিবাসী **ধনঞ্জয় মাইতি** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১০ জুলাই '৯৯ দুপুর ২.১৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন এবং শেষজীবনে মঠ-চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাগবাজার-নিবাসী **পঞ্চানন নন্দী** গত ১৫ জুলাই '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি কলকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন এবং বিবেকানন্দ রোডে সোসাইটির ভবন নির্মাণে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের পাঠক ও গ্রাহক ছিলেন। তাঁর নিরহঙ্কারী আচরণ, অমায়িক ব্যবহার ও নিঃস্বার্থপরতার জন্য তিনি পরিচিতজনের বিশেষ প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **প্রবোধকুমার মিত্র** গত ২১ জুলাই '৯৯ বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী** গত ২৭ জুলাই '৯৯ ভোর ৩টা ৩০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন নিয়মিত গ্রাহক এবং কলকাতার শরৎকলোনী-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্রের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ❑

Come out into the universe of light. Everything in the universe is yours, stretch out your arms and embrace it with love.

Swami Vivekananda

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ

আবেদন

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য—আমাদের একমাত্র সন্তান অনির্বাণের (বয়স ২৩ বছর) দুটি কিডনীই নষ্ট হওয়ায় কিডনী সংস্থাপনের ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য গুরুভাই, গুরুবোন ও প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহায়তা ও শুভেচ্ছা কামনা করি। যেকোন আর্থিক সহায়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে। নগদ টাকা পাঠাবেন না। A/c Payee Cheque-এ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করছি।

নিরঞ্জন ভট্টাচার্য ও
মীরা ভট্টাচার্য

চেক পাঠানোর ঠিকানা

Parimal Chakravarti
'MAA APARTMENT'
C Road, 1st Lane
P.O. Nona Chandanpukur
Barrackpur-743 102
Phone : 560-0498

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ শোক তাপ—এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

বড় হইতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ

১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব।
৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা ওপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন, ওপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি ওপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

ধনসম্পদ ইহকালের সম্পদ, সঙ্গে যাবে না। সাধন-ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

*

দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই, ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া-৯৪৫১৮, টেলি ঃ ৯২৫-৮২৫৯৪৩৩

দিল্লী

- **রামকৃষ্ণ মিশন**
  রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লী-১১০০৫৫
- **পারমিতা ঘোষাল**
  ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী-১১০০১৯
- **মঞ্জুলা ঘোষ**
  সি-৫৩৬, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী-১১০০১৯

আসাম

- **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**, শিলচর
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, করিমগঞ্জ
- **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বঙ্গাইগাঁও
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, জি. এন. বি. রোড
  পোঃ দুম দুমা, জেলা ঃ তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- **পরিমলকৃষ্ণ পাল**
  প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট
  পোঃ + জেলা ঃ কোকড়াঝাড়, পিন-৭৮৩৩৭০
- **এম. কে. বুক সেলার্স**, পো ঃ বি. চারালী, জেলা ঃ শোণিতপুর

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম**
  পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫

নাগাল্যান্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিনহা রায়**
  সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, নাহারলগন, ইটানগর

উড়িষ্যা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, চক্রতীর্থ, পুরী
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি**
  খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

বিহার

- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮
- **রীতা ভট্টাচার্য**
  'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০

মধ্যপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা ঃ বস্তার

মহারাষ্ট্র

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার
  মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**
  'গুরুধাম', ই ২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮,
  বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**
  ৮-এ/১১ বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**
  সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র
  ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর
  বরোদা-৩৯১৩২০
- **মোহিতরঞ্জন দাস**
  ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  পোঃ অঙ্কলেশ্বর, পিন ঃ ৩৯৩০১০

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248
554-2403

Vol. 101 ❑ No. 10 ❑ OCTOBER 1999

Licence No.
WB/NC/CL-3

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Reg. No. WB/NC

উদ্বোধন

১০১তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র সুপ্রাচীন সাময়িকপত্র।

❑ **উদ্বোধন**-এর এবছর **১০১তম বর্ষ** চলছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০০ বছর অতিক্রম এই প্রথম** ❑

- ❑ **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক
- ❑ **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।
- ❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক পারিবারিক **পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা দিক গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।
- ❑ **উদ্বোধন** বাঙলা ভাষায় শুধু **সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।**
- ❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ১০১ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।
- ❑ **উদ্বোধন-এর গ্রাহক** হওয়ার অর্থ একটি **পত্রিকার গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
- ❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী**-শরীর।
- ❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন**-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক **করলেই এখনি উদ্বোধন** এর গ্রাহকসংখ্যা **এক লক্ষ** হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও **আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা।** স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।**
- ❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন**-এর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন —এই আশা রাখি।
- ❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট শারদীয়া সংখ্যা সহ **গ্রাহক-পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়ায় মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের প্রায় আড়াই গুণ।** শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের** থেকে **আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না।** এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার।**
- ❑ **উদ্বোধন** পত্রিকার সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। শেষের দুটি তহবিলের অর্থানুকূল্যে ১০১তম বর্ষ থেকে 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা চিহ্নিত হচ্ছে। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের** ৮০জি **ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে** অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'— এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন**, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি দান পাঠালে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য'** পাঠানো হচ্ছে **সেই মর্মে দাতার চিঠি থাকা বাঞ্ছনীয়।**
- ❑ **'উদ্বোধন'-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষ থেকে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন **মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য 'উদ্বোধন'-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** সম্প্রতি নিবেদিত হয়েছে। **১৯৯৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন স্থানাধিকারী 'উদ্বোধন'**-প্রবর্তিত **এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মা

১৪০৬ ◻ ১১শ সংখ্যা
উদ্বোধন
॥১০১॥

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত

বিবেকানন্দ ইল্লম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪

বন্ধুগণ,

বিবেকানন্দ ইল্লম একটি পবিত্র ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই ভবনটি একটি তীর্থক্ষেত্র। স্বামীজী পূর্ণ নয়দিন এখানে অবস্থান করেছেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, উপদেশ দান করেছেন, ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেছেন। তাঁর অদৃশ্য, দিব্য উপস্থিতিতে স্থানটি এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

আপনারা সম্ভবত জানেন যে, শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী চেন্নাইয়ের এই বাংলোয় উঠেছিলেন। তখন বাড়িটির নাম ছিল 'আইস হাউস' বা 'ক্যাসল কার্নন'। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় ভারতের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে তেজোদীপ্ত বাণী প্রদান করেছিলেন তা ইংরেজীতে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বা বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা, আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে এই বাড়িটিতেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে প্রচারিত স্বামীজীর বাণীর ঐতিহাসিক পীঠভূমি।

আমরা এখানে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে চাইছি, যেখানে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত হবে। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্রসমূহ, অন্যান্য সুন্দর চিত্র, মডেল, ভিডিওগ্রাফ, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রাণপ্রদ বাণীর প্রচারকেন্দ্র-রূপে এই বাড়িটিকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করছি।

১৮৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই বাড়িটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই পবিত্র কাজটি শুরু করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে এবং স্বামীজীর সকল অনুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের উদার দাক্ষিণ্যে আমরা এই মহান কাজ সম্পন্ন করার আশা রাখি।

এবাবদ সমস্ত আর্থিক দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং তাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে দান পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ সমস্ত দান আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৬০০ ০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯
ই. মেল : srkmath@vsnl.com
ওয়েবসাইট : www.sriramakrishnamath.org

উদ্বোধন ॥১০১॥
স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০১তম বর্ষ ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪০৬ নভেম্বর ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ৬৩৩
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑
আদর্শ সমাজবাদ : সহযোগের স্বপ্ন ৬৩৪
❑ সংকলন ❑
'কথামৃতে' মা-বাবা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা—শ্রীম ৬৩৭
❑ স্মৃতিচারণ ❑
জীবন আমাকে যে-শিক্ষা দিয়েছে—স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৬৩৯
জাতীয় আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ—নিমাইসাধন বসু ৬৫১
❑ গবেষণা ❑
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব—
সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ৬৪৫
❑ সমাজবিজ্ঞান ❑
প্রসঙ্গ বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের সংখ্যাবৃদ্ধি—দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ৬৫৪
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ (১০)—কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত ৬৫৭
❑ সাহিত্য ❑
চণ্ডীদাসের পদাবলী—শঙ্কর ঘোষ ৬৬০
❑ পরিক্রমা ❑
বাংলাদেশ ঘুরে এলাম—স্বামী ঋতানন্দ ৬৬৩
❑ পরমপদকমলে ❑
'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৬৭২
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
কষ্টকল্পনা ও অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট তুলনা ৬৭০
'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি' ৬৭১
প্রসঙ্গ 'শতবর্ষেও দীপ্তপ্রাণা লাবণ্যপ্রভা দেবী' ৬৭১
❑ বিজ্ঞান ❑
ক্যান্সারের বিপদসংকেত—উৎপল সান্যাল ৬৭৪
❑ স্বাস্থ্য ❑
স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—সত্যানন্দ চক্রবর্তী ৬৬২
কনজাংটিভাইটিস ('জয় বাংলা') প্রতিরোধে করণীয় ৬৭৬
❑ কবিতা ❑
'আবিরাবির্ম এধি'—মদনমোহন মুখোপাধ্যায় ৬৬৮
আত্মার কারগিলে—নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬৮
মৃত্যু ও জীবন—নিমাই মুখোপাধ্যায় ৬৬৮
আমি চেয়েছিলাম—যূথী সরকার ৬৬৯
ঐ পাখিটাই তো চাই—এ. কে. রামানুজন ৬৬৯
চিরায়ত—অরুন্ধতী রায় ৬৬৯
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
বিজ্ঞান-সংবাদ • ডেঙ্গুজ্বর নির্মূলনে নতুন কৌশল ৬৭৭
অল্প রক্তচাপবৃদ্ধিতে নতুন নির্দেশাবলী ৬৭৭
গ্রন্থ-পরিচয় • জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে—
ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী ৬৭৮
ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ণ—সীতা চট্টোপাধ্যায় ৬৭৯
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৬৮০
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৬৮১ বিবিধ সংবাদ ৬৮২
❑ অন্যান্য ❑
অনুষ্ঠান-সূচী (পৌষ-মাঘ ১৪০৬) ৬৫৮
আবেদন : রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম ৬৪৪
আবেদন : স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা ৬৬৭
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : শারদীয়া সংখ্যা (২০০০) ৬৮১

❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র : অদ্বৈত আশ্রম
আগামী বর্ষের (১৪০৬-১৪০৭/২০০০) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

ইতিহাসের নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ উপলক্ষে ১০১ বছরের প্রাচীন 'উদ্বোধন'-এর আগামী বর্ষের গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হলো।

'উদ্বোধন' ঃ ১০২তম বর্ষ (২০০০ খ্রীস্টাব্দ) ❑ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ও অন্যান্য

❑ 'উদ্বোধন' পত্রিকার আগামী ১০২তম বর্ষের (মাঘ ১৪০৬—পৌষ ১৪০৭/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০০) গ্রাহকমূল্য বর্তমান বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে ঃ ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৭২০ টাকা (বিমানডাক) ❑ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশে ঃ ১৪০ টাকা।

❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

❑ বর্তমান বছরের (১৯৯৯/১৪০৫-১৪০৬) প্রথম বা মাঘ সংখ্যা প্রথম মুদ্রণের পর নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার তার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। সেজন্য প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে আগামী বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

❑ কলকাতা বা কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তাঁরা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য জমা দিলে সুবিধা হয়। কেননা M. O.-তে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে যদি দেরি হয় এবং ততদিনে যদি প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাহলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও ঐ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে-কারণে সম্ভব হলে M. O. না করে গ্রাহকমূল্য সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়াই ভাল।

❑ সরাসরি জমা দেওয়া সম্ভব না হলে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে/পোস্টাল অর্ডারে গ্রাহকমূল্য 'Udbodhan Office, Calcutta'—এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য চেক গ্রাহ্য। তবে সেই চেক কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হতে হবে।

❑ যাঁদের M. O. করে গ্রাহকমূল্য পাঠাতেই হবে, তাঁদের কাছে অনুরোধ, এখনই M. O. পাঠাতে শুরু করুন। জানুয়ারি থেকে বর্ষ শুরু বলে সকলেই একসঙ্গে ডিসেম্বরে M. O. পাঠাতে শুরু করেন; কিন্তু বাগবাজার ডাকঘর কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন একশ থেকে দেড়শর বেশি M. O. আমাদের কাছে ডেলিভারি দিতে পারেন না। আবার তাও রোজ পেরে ওঠেন না। ফলে ডাকঘরে জমা হাজার হাজার গ্রাহকের M. O. পেতেই আমাদের দুই থেকে তিন মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত লেগে যায়। এছাড়া M. O. কুপনে অনেক নতুন গ্রাহক তাঁদের নাম-ঠিকানা এবং কিজন্য M. O. পাঠাচ্ছেন তা জানান না। পুরনো গ্রাহকরা তাঁদের গ্রাহকসংখ্যা অনেকেই ঠিকমত লেখেন না। ফলে এইসমস্ত M. O. সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। পত্রিকা না পেয়ে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের চিঠি লেখেন তখন সেগুলির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। অনেকের কাছে যে সময়মতো পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হয় না অথবা পাঠাতে দেরি হয়, M. O. সম্পর্কিত অস্পষ্টতাই তার জন্য দায়ী। সেজন্য অনুরোধ, এখনই আগামী বর্ষের গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করে নিন। M. O. কুপনে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা, গ্রাহকসংখ্যা লিখবেন, M. O. কেন পাঠাচ্ছেন তাও জানাবেন।

❑ পত্রোত্তর এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকখরচ পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ প্রতি বাঙলা মাসের ১ তারিখ (ইংরেজী ১৪-১৮) 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়। ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার প্রধান ডাকঘরে (G.P.O.) এবং কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণত ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ঠিকমত পৌঁছায় না বলে গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে। এই বিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে পত্রিকা ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা এক মাস পরেও পত্রিকা পান না বলে খবর পাই। সে-কারণে গ্রাহকদের এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি।

এক মাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট' বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে।

❑ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় (একমাস) অতিক্রান্ত হলে তবেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহক-সংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক।

❑ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ বড় এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। যাঁরা ডাকে পত্রিকা নেন, তাঁরা সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) অথবা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণের সময় অথবা ১লা জুন থেকে ২৪শে আগস্টের মধ্যে কার্যালয়ে জানাতে হয়।

❑ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ সংখ্যায় পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/ M. O. প্রাপ্তি-কুপন/ আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে।

❑ ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নতুন ঠিকানা পিন কোড সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে, যাতে পরবর্তী সংখ্যাটি পুরনো ঠিকানায় না চলে যায়।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হলে 'উদ্বোধন'-এ ব্যক্তির/ কেন্দ্রের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হবে।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদন-পত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বা প্রাইভেট কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ সভাপতিকে আবেদন করতে হবে।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

অগ্রহায়ণ ১৪০৬
নভেম্বর ১৯৯৯

মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে (State) দোষগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সঙ্কীর্ণতা রাজত্ব করে, তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার-রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে—তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারো নেই, বিদ্যাদানেরও অধিকার কারো নেই। এযুগের মাহাত্ম্য এই যে, এসময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়, কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদার নন। এযুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির (culture) চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্য-শাসন যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এযুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরো উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শূদ্র-শাসন যুগের আবির্ভাব হবে। এযুগের সুবিধা হবে এই যে, এসময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?

স্বামী বিবেকানন্দ

আদর্শ সমাজবাদ : সহস্রাব্দের স্বপ্ন

বিদায়ী বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক ভারতবর্ষের এক নূতন অধ্যায় শুরু হইয়াছিল। প্রায় দুশ বছরের পরাধীনতার অবসান হইয়াছিল আজ হইতে কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৫২ বছর আগে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে। স্বাধীন ভারতবর্ষের আদি পরিচালকগণ ভারতবর্ষে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন। ভারতের বর্তমান রাজনীতিতেও সমাজবাদের কথা প্রায়শই শোনা যায়। সমাজবাদ এখন গোটা বিশ্বের একটি সুপরিচিত রাজনৈতিক মতাদর্শ, যদিও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজ প্রায় গোটা বিশ্বেই চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত। 'সমাজবাদ' বলিতে আমরা পাশ্চাত্য হইতে লব্ধ এক বিশেষ সমাজদর্শনকে বুঝিয়া থাকি। সমাজবাদের সুপরিচিত যে-ধারণা কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেলস প্রমুখ সমাজদার্শনিকদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ প্রমুখ সেই ধারণার যে-ব্যাখ্যা দিয়াছেন অথবা যেভাবে তাহাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা এবং শোচনীয় ব্যর্থতা সাম্প্রতিক ইতিহাসের উল্লেখ-যোগ্য অঙ্গ। সমাজবাদ এখন শুধু মার্ক্সীয় নয়, সমাজবাদ এখন বহুবাদীয় এবং এক বাদের সঙ্গে অন্য বাদের পার্থক্যও বিস্তর, এমনকি কোন কোনটির মধ্যে দূরত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। সমাজ-বাদের এহেন পরিণতিতে ইহা এখন সুস্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের মতো একটি উপমহাদেশতুল্য দেশে উহার বৈদেশিক চরিত্র, ধর্ম ও লক্ষণ সহ প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নাই। না, দূর ভবিষ্যতেও নয় এবং কখনোই নয়। উপরন্তু তথাকথিত সমাজবাদীদের যে-চেহারা, সমাজবাদের প্রচারক ও অনুগামীদের আচরণ, কথা ও জীবনের যে নগ্ন দ্বিচারিতা ও ভ্রষ্টাচারিতার সঙ্গে এদেশের মানুষের ইতিমধ্যেই যে-পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহাতে সমাজবাদ সম্পর্কে এদেশের বহু মানুষের শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সমাজবাদ একটি ভ্রান্ত সমাজদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

বিষয়টি দুর্ভাগ্যের। কারণ, সমাজবাদ কোন ভ্রান্তদর্শন নয়। সমাজবাদ একটি সঠিক সমাজদর্শন এবং ইহার জন্ম পাশ্চাত্যে নয়, ইহার সূচনা কার্ল মার্ক্স বা এঙ্গেলসের রচনায় নয়। সমাজবাদ পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি দর্শন এবং ইহার উদ্ভব ভারতবর্ষে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সুস্পষ্ট ভাষায় তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। বেদের ঋষিরা ইহার প্রথম উদ্গাতা। কৃষ্ণ ইহার প্রধান পৌরাণিক প্রবক্তা ও প্রচারক, বুদ্ধ ইহার প্রথম প্রধান ঐতিহাসিক প্রবক্তা ও প্রচারক। শঙ্কর, রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, তুকারাম, নানক, নামদেব, দাদু, চৈতন্য, চণ্ডীদাস, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভারত-দর্শনের যে ধারাবাহিকতা, তাহাতে আমরা সমাজবাদের সমুচ্চ গৌরবঘোষণাই শুনিতে পাই। তবে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে 'সমাজবাদ' নয়, 'সাম্যবাদ' অভিধাটিই সংশ্লিষ্ট দর্শনটির যথার্থ পরিচয়বাহী। সুতরাং 'সাম্যবাদ' শব্দটিই এখানে প্রাসঙ্গিক এবং সুপ্রযুক্ত। তবে 'সমাজবাদ' অভিধাটি বহুল-প্রচারিত বলিয়া আমরা 'সাম্যবাদ' অর্থে 'সমাজবাদ' অভিধাটি বর্তমান আলোচনায় ব্যবহার করিব।

ভারতীয় ঐতিহ্যে সমাজবাদ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনের লক্ষ্য জীবন ও সমাজে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা। এই 'সাম্য' বা 'unity' বা 'equality' যেমন অদ্বৈত বেদান্তের মূল ধ্বনি একত্বদর্শনের লক্ষ্যে অগ্রসর, তেমনই আবার বেদোক্ত 'ইহ' ও 'পরত্র'-এর মধ্যে 'সাম্য' বা 'harmony' বা 'balance' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও উৎসর্গীকৃত। বস্তুত, 'ইহ' ও 'পরত্র'—যাহাকে আধুনিক ভাষায় 'secular' ও 'sacred' বলা হয়—তাহাই বেদে 'কর্মকাণ্ড' ও 'জ্ঞানকাণ্ড' বলিয়া বর্ণিত। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়েরই লক্ষ্য বেদান্ত-বর্ণিত অদ্বৈতদর্শন বা একত্বদর্শন। এই অদ্বৈতদর্শন বা একত্বদর্শন বেদান্তের মূল ধ্বনি হইলেও ইহার উৎস প্রাচীনতম বেদ ঋগ্বেদের সেই অমর বাণী : "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। বস্তুত, এই বাণীই ভারতের চিরায়ত বাণী এবং ভারতের ধর্ম, কর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য, সঙ্গীতের মূল ও একতম প্রেরণা।

ভারতীয় আদর্শে সমাজবাদের চরম কথা মনুষ্যত্বের বিকাশ। মানুষ যদি মানুষ না হয় তাহা হইলে সেই সমাজের কি মূল্য থাকে? তাহাতে তো বাঘ, ভালুক, সিংহের জঙ্গল হইয়া যাইবে আমাদের সমাজ। আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানাইলাম, সুন্দর রাস্তাঘাট বানাইলাম, রাস্তার পাশে সুন্দর বাগান, ফোয়ারা বানাইলাম; আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বাড়ি থাকিল, গাড়ি থাকিল, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা থাকিল, দেশে কোন বেকার থাকিল না। কিন্তু মানুষগুলি? তাহারা যদি একে অন্যকে সহ্য করিতে না পারে, একই ছাদের নিচে পাশাপাশি শুইয়া থাকে কিন্তু কেহ কাহাকেও ভাল না বাসে, কেহ কাহারো বিপদের দিনে তাহার পাশে আগাইয়া না যায়, যদি তাহারা সব অসৎ, হিংস্র, স্বার্থপর মানুষ হয়? তাহা হইলে? আমাদের জীবনযাত্রার মানটা হয়তো খুব উন্নত হইল, কিন্তু জীবনের মান? জীবনের উৎকর্ষ? জীবনের মানটা আমাদের কোথায় নামিয়া গেল! সুতরাং সমাজবাদের গোড়ার কথা হইবে শুধু জীবনযাত্রার মান নয়, জীবনের মানের কথাও ভাবা। জীবনযাত্রার মান আমরা নিশ্চয় উন্নত করিব, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা আমাদের জীবনের মানের দিকেও নজর দিব যাহাতে আমাদের জীবনের সার্বিক মান, জীবনের সার্বিক উৎকর্ষ, আমাদের চরিত্রের উৎকর্ষকেও আমরা সঠিকভাবে বিকাশ করিতে পারি। পুলিস, মিলিটারি অথবা আইনের সাহায্যে মানুষকে সৎ করা যায় না। শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের প্রলোভনে মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা যায় না। পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া অথবা বর্তমান চীনের সমাজবাদী রাষ্ট্র তাহার প্রমাণ। ভারতের সনাতন সমাজবাদ বলে মানুষ সৎ হয়, উদার হয়, পবিত্র হয় অন্তরের প্রেরণায়। সেজন্য ভারতীয় সমাজবাদের মূল বক্তব্য স্বাধীনতা, মনুষ্যত্বের বিকাশ, ব্যক্তিমানসের বিকাশ। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, কবীর, নানক, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সবাই একথাই আমাদের কাছে বলিয়াছেন।

সেই বক্তব্যই বৈদান্তিক সমাজবাদ। ভারতের বাহিরের যাঁহারা প্রফেট, কোটি কোটি মানুষের যাঁহারা চিরকালের আচার্য—যেমন জরথুস্ট্র, লাওৎ-সে, কনফুসিয়াস, খ্রীস্ট, মহম্মদ—তাঁহারাও ঐ একই কথা বলিয়াছেন।

আবার বেদ-উপনিষদের ঋষিদের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় তাঁহাদের চাহিতে বেশি সমাজবাদ এবং গণতন্ত্রের কথা পৃথিবীতে আর কে ভাবিয়াছে? তাঁহাদের ভাবনার চৌহদ্দি বিপুল-বিস্তৃত। তাঁহারা জাতিসত্তাকে বাদ দেন নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সব মানুষের কথাও তাঁহারা স্মরণে রাখিয়াছেন। জাতিসত্তাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে, জাতি তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য লইয়া টিকিয়া থাকিবে। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, জাতিসত্তার বিকাশই আদর্শ সমাজবাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়, আন্তর্জাতিকতার চেতনায় যদি মানুষ নিজেকে প্রাণিত করিতে না পারে তাহা হইলে মনুষ্যত্বের কোন সার্থকতা থাকে না। সেই হাজার হাজার বছর পূর্বে বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে আমরা শুনিয়াছিলাম—"যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ম্" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।১।৩)। সমগ্র পৃথিবী একটা গৃহ হইবে, একটা পরিবার হইবে। কত হাজার বছর পূর্বে আমাদের বৈদিক ঋষিরা এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। হাজার হাজার বছর পরেও সেই স্বপ্নকে আমরা সার্থক করিতে পারি নাই, তাহাকে বাস্তবে রূপদান করিতে পারি নাই। এটি আমাদের অক্ষমতা। হইতে পারে তাহা স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্ন তো আমরা এখনো দেখিতেছি। আজ আমরা 'One world'-এর, 'এক বিশ্ব'-এর কল্পনা করিতেছি। আজকে আমরা বিশ্বায়নের কথা ভাবিতেছি, বলিতেছি। সুতরাং তাঁহাদের স্বপ্নটি যে ভুল ছিল না, ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। স্বপ্নটি ঠিক ছিল। আমরা সেই স্বপ্নকে যে সার্থক করিতে পারি নাই, তাহা আমাদের অপদার্থতা, আমাদের অক্ষমতা, তাঁহাদের দোষ নয়। কৃষ্ণ এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন, বুদ্ধ এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন, চৈতন্য, নানক, কবীর, তুকারাম, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সবাই এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন। লাওৎ-সে, কনফুসিয়াস, জরথুস্ট্র, খ্রীস্ট, মহম্মদ সবাই সেই স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কার্ল মার্ক্স, মাও সে তুংও কি সেই স্বপ্ন দেখেন নাই?

আমাদের বৈদিক ঋষিরা অথবা কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ যে-স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্নের ভিত্তিতে ছিল মনুষ্যত্বের জাগরণ, ব্যক্তিমানুষের চূড়ান্ত বিকাশ। কেমন বিকাশ? বিবেকানন্দ বলিতেছেন ঃ তাকাও বুদ্ধের দিকে, তাকাও খ্রীস্টের দিকে, তাকাও চৈতন্যের দিকে, বুঝিতে পারিবে। দেখ, মনুষ্যত্বের বিকাশ কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। আজকার মানুষ বলিবে—তাকাও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিকে, বুঝিতে পারিবে। বিবেকানন্দ বলিতেছেন, বুদ্ধ শুধুমাত্র একজন মানুষ ছিলেন না, একজন ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না। খ্রীস্ট একজন ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না। তাঁহারা মনুষ্যত্বের বিকাশের সর্বোচ্চ অবস্থার নাম। রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলিয়াছেন। বস্তুত, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রমুখ সকলের জীবনই মানুষের সর্বোচ্চ বিকাশের এক-একটি অবস্থা।

সেই বিকাশের একটি বড় লক্ষণ হৃদয়ের বিস্তার, ভালবাসার বিস্তার। এই বিস্তার হয় অন্তরের প্রেরণায়। সেই আন্তর প্রেরণাকেই ভারতবর্ষ 'ধর্ম' বলে। ধর্মই ভারতবর্ষে সমাজবাদের মূল ভিত্তি। মনুষ্যত্বের বিকাশই ভারতীয় সমাজবাদের চরম কথা। বার্ট্রান্ড রাসেল ধর্মে বিশ্বাস করিতেন না, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেছেন ঃ সবাই জানে আমি ধর্মে বিশ্বাস করি না, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। কিন্তু অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে আমাকে আজ স্বীকার করিতে হইতেছে, যদি মনুষ্যত্বের বিকাশের সার্থকতার দিকে আমাদের যাইতে হয় তাহা হইলে একটা জিনিস আমাদের লাগিবেই, তাহা হইল 'Christian love'। তিনি তো বলিতে পারিতেন শুধু 'love'। বলিতে পারিতেন 'Socialistic love'; কিন্তু তাহা না বলিয়া তিনি বলিলেন—'Christian love'। 'Christian love' মানে? যে-'love', যে-ভালবাসা যীশুখ্রীস্ট বাসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ ভালবাসিবে ভালবাসার জন্য, কোনকিছুর প্রতিদানে নয়, কোনকিছুর প্রত্যাশায় নয়। বিবেকানন্দও বলিয়াছেন ঃ "দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।" কেমন সেই ভালবাসা? খ্রীস্টকে লোকে পেরেক ঠুকিয়া ঠুকিয়া খুন করিল। জীবন্ত মানুষটাকে নৃশংসভাবে যখন তাহারা হত্যা করিতেছে তখন তিনি বলিলেন ঃ "Father, forgive them, for they know not what they are doing."—হে পিতা, তুমি উহাদের ক্ষমা কর। কারণ, উহারা জানে না উহারা কি করিতেছে।

এই তো ভালবাসার চূড়ান্ত বিকাশ। বুদ্ধের দিকে যদি তাকাই সেখানেও দেখিব সেই ভালবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ। চৈতন্যের দিকে যদি তাকাই সেখানেও দেখিব সেই ভালবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ। নানক, কবীর প্রমুখের দিকে তাকাইলেও উহাই দেখিব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিকে যদি তাকাই সেখানেও দেখিব সেই প্রেমের চূড়ান্ত বিকাশ। সকলের প্রতি ভালবাসা, প্রেম, সহমর্মিতা ও মৈত্রীর মন্ত্র আমাদের প্রাচীন ঋষিরা তাঁহাদের প্রার্থনায় উচ্চারণ করিয়াছিলেন ঃ "সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ"—সবাই সুখী হউক। শুধু আমি সুখী হইব তাহা নয়, সবাই সুখী হউক। "সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ"—কাহারো যেন অসুখ-বিসুখ না থাকে, শারীরিক কোন ব্যাধি না থাকে। "সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু"—সকলে যাহা দেখিবে সব যেন মঙ্গলপ্রদ হয়। "মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ।"—এই পৃথিবীর মধ্যে একজন মানুষ, একটি প্রাণী, একটি পশু-পাখি, একটি পতঙ্গও যেন দুঃখে না থাকে; সকলের দুঃখ চিরতরে শেষ হইয়া যাক। কত হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষের ঋষিরা তাহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন ইতিহাস তাহার বিচার করিয়া এখনো তারিখ নির্ণয় করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের ঋষিদের এই প্রার্থনার মধ্যে কী আছে? ভালবাসা, প্রেম, মৈত্রী, সহমর্মিতা ছাড়া তাহাতে আর কিছুই নাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আমাদের কী দিয়াছিলেন? এযুগে বুদ্ধকে আনিয়া হাজির করিয়াছিলেন আমাদের সামনে, খ্রীস্টকে আনিয়াছিলেন, চৈতন্যকে আনিয়াছিলেন, শঙ্করকে আনিয়া-

ছিলেন। পাশাপাশি কার্ল মার্ক্সকেও লইয়া আসিয়াছিলেন। কিভাবে? বিবেকানন্দ বলেন নাই জড়বাদ আমাদের দরকার নাই, বরং বলিয়াছিলেন—উহা আমরা চাই। আধুনিক যুগে সেই প্রথম একজন ভারতীয় সেকথা বলিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন : "I am a socialist."—আমি একজন সমাজবাদী। তাঁহার পূর্বে ভারতবর্ষের কোন মানুষ 'আমি সমাজবাদী'—একথা বলেন নাই। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন : "not because I think it is a perfect system"—আমি মনে করি না ইহা একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা, "but half a loaf is better than no bread."—যখন আমি পুরো খাবারটা পাইতেছি না তখন অন্তত আধপেটা খাইয়া থাকিব। তাহাতে তো আমার কিছুটা ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে। তাই বলিতেছেন : "Half a loaf is better than no bread." অর্থাৎ সমাজবাদকে তিনি একটি 'পূর্ণ' খাবার বলিয়া মনে করেন নাই, তাহাকে তিনি 'অর্ধেক' খাবার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। 'অর্ধেক' খাবার কেন? কারণ, সমাজবাদ বলিতেছে : মানুষের আহার চাই, মানুষের আশ্রয় চাই, মানুষের আচ্ছাদন চাই, মানুষের আরোগ্য চাই। আর? আর কী চাই মানুষের? এখানেই সমাজবাদ থামিয়া যাইতেছে। এখানেই জড়বাদ থামিয়া যাইতেছে। এখানেই মার্ক্সের, মাও সে তুঙের সমাজবাদ থামিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিবেকানন্দ বলিতেছেন : না, যদি শুধু এটুকুই চাই তবে সেটি 'Half a loaf' হইয়া যাইবে, 'অর্ধেক খাবার' হইবে। আরেকটি জিনিস ওখানে না থাকিলে সমাজবাদ ব্যর্থ হইবে, সমাজবাদ সার্থক হইবে না। সেটি কী? স্বামীজী বলিতেছেন—আধ্যাত্মিকতা। পাশ্চাত্যের সমাজবাদ আর ভারতের অধ্যাত্মবাদ—এই দুইয়ের মিলন হইলেই একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা রূপলাভ করিবে। তখনই 'খাবার'টি 'পূর্ণ' হইবে।

সমাজবাদে মূল্যবোধের কথা, নৈতিকতার কথা বলা হয়। কিন্তু নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পিছনে যদি আধ্যাত্মিকতা না থাকে তাহা হইলে নৈতিকতার আদর্শ, মূল্যবোধের আদর্শ কোনদিন সার্থক হইতে পারে না। পাশ্চাত্যের মানুষের ব্যবহারিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা আমাদের চাহিতে অনেক বেশি। পার্কিং এরিয়ায় ফীজ লইবার জন্য কোন লোককে রাখা হয় না সেখানে। গাড়ি পার্কিং-এর পর বাহির হইয়া যাইবার সময় চালক গেটের সামনে গিয়া দাঁড়ায়। সেখানে কোন প্রহরী নাই, শুধু একটি যন্ত্র বসানো আছে। তাহাতে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রা ফেলিয়া দিলে একটি টিকিট বাহির হইয়া আসিবে। সেই টিকিটটি লইয়া প্রত্যেকে গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া যায়। নজরদারি করিবার জন্য কোন লোক না থাকিলেও কেহ সেখানে পয়সা ফাঁকি দেয় না। বিরাট বিরাট সুপারমার্কেট রহিয়াছে পাশ্চাত্যে। অনেক জায়গায় কোন দোকানদারই নাই। যে-কেহ আসিয়া জিনিসপত্র লইবে। যতটুকু লওয়ার ততটুকুই লইবে। বেশি লইবে না। গেটের সামনে বসা ক্যাশিয়ারকে সঠিক দাম দিয়া চলিয়া যাইবে।

ওখানে ধর্ম বাহিরে নাই, কিন্তু কাজে ধর্ম আছে, আচরণে নৈতিক মূল্যবোধ আছে, নৈতিকতা আছে; কিন্তু একটি জিনিস উহাদের নাই। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পিছনে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি নাই। নৈতিকতার পিছনে আধ্যাত্মিকতার বিশ্বাস নাই। নৈতিকতাকে সার্থক করিতে হইলে, মূল্যবোধকে স্থায়িত্ব দিতে চাহিলে তাহার পিছনে একটি সচেতন আধ্যাত্মিক চেতনা থাকা দরকার। একটি সচেতন দর্শনের ভিত্তি থাকা আবশ্যিক। তাই বিবেকানন্দ বলিতেছেন : আমাদের আহার চাই, আশ্রয় চাই, আচ্ছাদন চাই, আরোগ্য চাই। এইগুলি মানুষকে দিবার জন্য পাশ্চাত্যের সমাজবাদ দায়বদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় সমাজবাদ বলে, ঐগুলির সঙ্গে, ঐগুলির পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতাও চাই। তবেই সমাজবাদ সম্পূর্ণ হইবে।

ভারতের বৈদান্তিক সমাজবাদ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। কারণ, বৈদান্তিক সমাজবাদ মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য দায়বদ্ধ। সেই দায়বদ্ধতা তখনই সম্পূর্ণ হইবে, তখনই সার্থক হইবে যখন মানুষের চূড়ান্ত বিবর্তন—চূড়ান্ত রূপান্তর আমরা দেখিতে পাইব। ভিক্টর হুগো এই বিবর্তন সম্পর্কে বলিয়াছেন—'transformation' নয়, 'transfiguration'। একটা মানুষের চেহারা পাল্টাইয়া যাইবে তাহা নয়, তাহার চরিত্র পাল্টাইয়া যাইবে—অন্তরের বিবর্তনে মানুষটিই আমূল পাল্টাইয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, পরশপাথরের ছোঁয়ায় লোহার তরবারি সোনার হইয়া যায়। তরবারির আকারটি একই থাকে, কিন্তু তরবারির কাজ তাহাতে আর হয় না। উহার দ্বারা তখন আর হিংসা বা অনিষ্টের কাজ হয় না। কারণ, উহার চরিত্রের তখন মূলগত পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শের প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের যে-রূপান্তর আমরা দেখিয়াছি তাহা ঐ পরিবর্তন। 'Transformation' নয়, 'transfiguration'!

আমরা স্বপ্ন দেখিতে চাই। স্বপ্ন দেখিতে আমরা ভালবাসি। সেই স্বপ্ন আমরা দেখিতে চাই যেখানে একটি মানুষ সম্পূর্ণ সার্থক হইবে, আপাদমস্তক সম্পূর্ণ হইবে। এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখিতে চাই, এমন একটি পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতে চাই—যেখানে সব মানুষ পূর্ণাঙ্গ হইবে। তখনই সমাজবাদের আদর্শ সার্থক হইবে। স্বপ্ন যেন আমাদের জীবন হইতে কোনদিনও চলিয়া না যায়। তাহা যদি আমাদের জীবন হইতে হারাইয়া যায়, আমাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের থাকিবে কি? সুতরাং স্বপ্ন আমরা দেখিব। স্বপ্ন দেখিব সার্থক মানুষের। সম্পূর্ণ মানুষের। সার্থক এক সমাজের। সার্থক এক পৃথিবীর। স্বপ্ন দেখিব সার্থক সমাজবাদের। এই সমাজবাদের উপাদান হইবে সত্যযুগের ব্রহ্মশক্তি বা জ্ঞান, ত্রেতাযুগের ক্ষাত্রশক্তি বা বীর্য, দ্বাপরযুগের সম্প্রসারণ-শক্তি বা বুদ্ধি এবং কলিযুগের সঙ্ঘশক্তি বা সাম্যের আদর্শ। কিন্তু আমরা একই সঙ্গে এই চেষ্টাও করিব, এই অঙ্গীকারও করিব যে, এই স্বপ্নকে শুধু আমরা লালনই করিব না, স্বপ্ন শুধু আমরা দেখিবই না, স্বপ্নকে আমরা সত্য করিব। স্বপ্নকে স্বপ্নেই সীমাবদ্ধ আমরা রাখিব না, স্বপ্নকে আমরা বাস্তব করিব। স্বপ্নকে আমরা জীবনে, সমাজে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করিব। আগামী শতাব্দী ও সহস্রাব্দে আমাদের সেই স্বপ্নকে আমরা সকলের কাছে আবার নতুন করিয়া তুলিয়া ধরিতে চাই। ❑

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

ঠাকুরের ভাব আশ্চর্য। তাঁতে দেখতাম যেন সাগর, নানা নদী এসে মিশেছে। নানা ভাবের লোক আসত। অপর লোকদের এমন ভাব কোথায়? একজনের সঙ্গে একচুল মতের তফাৎ হলো, আর রক্ষে নাই! মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

কী ঠাকুরের ভাব! সবখানেই যাচ্ছেন, সব মতের লোকদের সঙ্গে মিশছেন। ব্রাহ্মসমাজে যাচ্ছেন, খ্রীস্টান, মুসলমান সকলের সঙ্গে মিশছেন।

মতের মিল না থাকলে পাশের বাড়িতে যাবে না, ভগবানের নাম হচ্ছে, তবুও। অমনি আসুরিক ভাব মানুষের। কিন্তু ঠাকুর বলতেন, ভগবানের জন্য সর্বত্র যাওয়া যায়। (পৃঃ ৮৫-৮৬)

দয়া সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য, ঠাকুর বলতেন। তাই তো নিজেই গিয়েছিলেন তাঁকে [বিদ্যাসাগরকে] দেখতে। তাঁকে বলতে গিয়েছিলেন—এই সব কাজ যা তুমি করছ, ঈশ্বরবুদ্ধিতে যদি কর তাহলে আরো ভাল হবে। তোমার হৃদয়ে যিনি আছেন সেই ঈশ্বরকে জানতে পারবে। সেইটাই মানুষের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি ধরতে পারলেন না। বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাবেন। কিন্তু যাননি। গেলে হয়তো তাঁর শেষ জীবনটা অন্যরূপ হতো।

দয়ালাভ মানুষের কাম্য বটে, কিন্তু চরম উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরলাভই চরম উদ্দেশ্য। তখন জন্মমরণ-চক্রে পড়তে হয় না। পরমানন্দ লাভ হয়। ঈশ্বরদর্শন করতে হলে সাধুসঙ্গ বৈ উপায় নাই। তাই ঠাকুর নিজে নানাভাবে ঈশ্বরদর্শন করে বলেছেন এই কথা: "সাধুসঙ্গ কর, সাধুসেবা কর। তাহলে তুমিও সাধু হবে।" আমরা তাঁরই কথা শুনব। তিনি নিজে বলেছেন: "আমি অবতার।" তাঁর কথা সত্য।

মানুষ বিচার করে। এই বিচারের দৌড় কতটুকু! আমরা revelation (দৈবদর্শন) বিশ্বাস করি। তা-ই বেদ। দয়া থেকে, সেবা থেকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা বড়। সাধুসেবা তার চাইতেও বড়। সাধুর সেরা ঠাকুর। সাধুর স্রষ্টা ঠাকুর! তিনি যখন সাধুসেবা নিজে হাতে ধরে করিয়েছেন আর করতে বলেছেন, তখন তা-ই বেদ। সাধুসেবা করা উচিত। (পৃঃ ১০৪-১০৫)

ভারতের সংস্কৃতির মূর্তিমান বিগ্রহ ঠাকুর। ঠাকুর বলেছেন: "আগে ঈশ্বরকে ধরে ঈশ্বর হও মনে। তারপর বাইরে কাজ কর। তখন অপরের ভিতর ঈশ্বরজ্ঞান সঞ্চারিত হবে তোমার সঙ্গের প্রভাবে। আগে নিজে দেবতা হও, পরে অপরকে দেবতা কর।" এই উপায়ে হিংসা, দ্বেষও দূর হয়ে যায়। ভয়ও দূর হয়। মানুষে মানুষে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়ে।

কেবল আহার-বিহারের শান্তি শান্তি নয়। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের শান্তি প্রতিষ্ঠা কর। তাহলে ধনী বা দরিদ্র, যে-অবস্থায়ই থাক ঈশ্বরকে ভুলবে না। তাহলে সর্বাবস্থায় শান্তি থাকবে। তাই আগে ঈশ্বরজ্ঞান, পরে জগতের জ্ঞান। এটাই ভারতের সংস্কৃতি। ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এটি। নিজে দেবতা হও, অপরকে দেবতা কর। সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিদ্যা—এসব পরে। এসব আত্মনীতির, ব্রহ্মনীতির নিচে।

বর্তমান west-এর (পাশ্চাত্যের) এ-আদর্শ নয়। তাই ঐ দেশ অত বেশি অশান্ত। ভারত মূলত শান্ত চিরকাল। এখন একটু অশান্ত। ভারত শান্ত হলে জগৎও শান্ত হবে। (পৃঃ ১২৩)

(ঠনঠনিয়ার কালী-মন্দির সম্পর্কে) এসব সিদ্ধপীঠ। ঠাকুর এখানে বসে মা কালীকে গান শুনাতেন। তখন তিনি এ-অঞ্চলে পূজা করতেন রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে। বয়স তখন সতের-আঠার। থাকতেন বড়ভাই পণ্ডিত রামকুমারের সঙ্গে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে। এখন যেখানে হেয়ার প্রেস, সেখানে খোলার ঘর ছিল। তাতে থাকতেন। অপরদিকে লাহাদের বাড়ি ঝামাপুকুর লেন ছাড়িয়ে। মোড়ে ছিল দাদার পাঠশালা। এখন সেখানে রাধাকৃষ্ণ-মন্দির।

ঐ সময়েই আমাদের জন্ম হয়, ঐ একটু দূরে শিবনারায়ণ দাসের লেনে। 1854-এ নাগপঞ্চমীর দিন। এই কথা উল্লেখ করে ঠাকুর কখনো আমাকে বলতেন: "ঐসময়ে আমি তোমাদের পাড়ায় থাকতাম।" কি আশ্চর্য! তিনি কি জন্ম থেকেই খবর রেখেছেন? চার বছর বয়সে তিনিই হয়তো আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন দক্ষিণেশ্বর মা কালীর সামনে। আমি কাঁদছিলাম। মা মাহেশের রথের ফেরত ওখানে নেমেছিলেন। এদিক-সেদিক সব দর্শন করছিলেন। আমি একা পড়ে গিয়েছিলাম। ঠিক মনে পড়ছে, একজন যুবক এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আবার একবার আমি ছাদে বসে বৃষ্টিতে ভিজছিলাম আর কাঁদছিলাম। তখন আশ্বিনের সেই বিধ্বংসী ঝড় হচ্ছিল। এই কথা স্মরণ করে পরে আমায় একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "তোমার ঐ আশ্বিনের ঝড়ের কথা কি মনে আছে?" কী আশ্চর্য!

আর কিই বা আশ্চর্য! জন্ম থেকে সব খবর রাখা? যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের খবর রাখেন, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য কি ভক্তদের খবর রাখা! মানুষভাবে দৃষ্টি করলেই আশ্চর্য বলে মনে হয়।

কিন্তু অতি বড় আশ্চর্য এই—যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, বেদ যাঁকে 'পরব্রহ্ম' বলেন, যিনি নিমেষে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করছেন—তাঁকে জীবিকার্জনের জন্য এ-ঘরে সে-ঘরে পূজারীর বেশে ঘুরতে হচ্ছে! কি দুর্জ্ঞেয় আবরণে ঢেকে এসেছেন নিজেকে! দীনহীন বেশ! নিরক্ষরপ্রায়, আবার দরিদ্র। কেন এসব আচরণ, আবরণ?

দুর্দান্ত modernism-কে (আধুনিকতাকে) যে challenge করতে (রুখতে) হবে। আক্রমণের অস্ত্র তো চাই? রাম বা

কৃষ্ণের মতো অস্ত্রধারণ এসময়ে নিষ্ফল। কারণ, সমগ্র জগৎকে west এইসব অস্ত্রে বশীভূত করে রেখেছে। ঐসব মারণাস্ত্র এখন নিষ্ফল।

তাই ঠাকুর নতুন অস্ত্র তৈরি করলেন—ব্রহ্মজ্ঞানের। আজ পর্যন্ত জগতে আচার্যগণ, ঋষিগণ, মহাপুরুষগণ ব্রহ্মজ্ঞানের যত বিভিন্ন রূপ প্রকট করেছেন, যেসব বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে ঢাকা পড়েছিল সেইগুলি ঠাকুর সুদীর্ঘকাল সাধন করে উদ্ধার করলেন। ঐসব গুপ্তজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে পড়েছিল। সেইগুলিকে, সেই সত্যগুলিকে উদ্ধার করে ভক্তদের দিলেন। ভক্তরা তাঁর সেই জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নিজেদের অজ্ঞান অবিদ্যাসুরকে নিধন করলেন প্রথমে তাঁর ইচ্ছায়। তারপর তাঁর ইচ্ছাতেই এখানকার ও পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানে উদ্ধত, বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ড অসুরকে ব্রহ্মজ্ঞানের নানা অস্ত্রে পরাজিত ও পদানত করেছেন সূক্ষ্মে। বাইরে এই বিজয়ের ফল বেরতে একটু দেরি আছে।

এই ব্রহ্মবিজ্ঞানের সঙ্গে west-এর জড়বিজ্ঞান সম্মিলিত হবে। তখন সমগ্র জগতে শান্তিসুখ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ঠাকুর সেই পথ দেখিয়ে গেছেন। ভক্তরা তার বিস্তার করছেন। ভবিষ্যতে ভারতের এক হাতে ব্রহ্মবিজ্ঞান, অপর হাতে জড়বিজ্ঞান থাকবে। তার দ্বারা জগতের শান্তিসুখ বিধান করবে ভারত। অতীতেও ভারত এ-কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। ভারতীয় সভ্যতার মূল নীতি এই—ব্রহ্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের সকলের শান্তিসুখ বিধান করা। (পৃঃ ১৫৮-১৬০)

ভাগ্যিস আমরা ঠাকুরকে দেখেছিলাম। তাই একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যাচ্ছে, কি করে তিনি ভক্তদের অত কর্মফল তাঁর দেহে ভোগ করলেন অম্লান বদনে। দেহের তো অত কষ্ট, যাকে যমযন্ত্রণা বলে, তেমনি কষ্ট! কিন্তু এরই ভিতর দেহ ছেড়ে মন ব্রহ্মে বিলীন। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়। দেহে প্রাণ নাই। অতবড় ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার এই দৃশ্য দেখে অবাক। একটু পরেই নিচে নেমে এসে ঠাকুর মুচকি হেসে বলছেন ঃ "কি ডাক্তার, তোমার সায়েন্সে বুঝি একথা নেই?"

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ—এই চারটি ভাগ আছে শরীরে। স্থূলেরই অসুখ। মনটি এমনি তৈরি, স্থূল থেকে ফস্ করে একেবারে মহাকারণে নিয়ে যান। সেখানে পরমানন্দ। ওতে মনটাকে রসিয়ে রঙ্গিয়ে নিচে নিয়ে এলেন। 'উঃ উঃ' করছেন একটু পর, কিন্তু মনে দুঃখের অভিনিবেশ নেই। প্রায় যুগপৎ দুঃখবোধ ও সমাধির আনন্দ। এ মানুষে সম্ভব নয়। তবুও ঐসব ঠাকুরের আচরণ চিন্তা করলে সংসারের দারুণ দুঃখ সহ্য করা সম্ভব হয়। দুটি contradictory (বিরুদ্ধ) ভাব যুগপৎ অবতারেই সম্ভব। চোখে দেখেছি যে—একসঙ্গে আলো ও আঁধার, রোগযন্ত্রণা ও পরমানন্দ! (পৃঃ ১৬৫)

ঠাকুরের বাড়ির লোকগুলি তাঁকে চিনতে পারেন নাই। কেউ ভাবছে কাকা, কেউ মামা! এইরূপ মনে করত। কেবল হৃদয়ের মা চিনেছিলেন, ঠাকুর বলতেন। বাড়ির লোক বলত, যাকিছু ছিল সব নিজের মাগকে দিয়ে গেল! আমাদের কি করলেন তিনি? যেন তিনি এখানে টাকা রোজগার করতে বসেছেন! মাকে ঠাকুর নিজের অলঙ্কারগুলি দিয়েছিলেন। [মধুরভাবে সাধনার সময় ঠাকুরকে মথুরবাবু কিছু অলঙ্কার গড়িয়ে দিয়েছিলেন।] আর পাঁচশ টাকাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এসব যেন খরচ করো না, রেখো। ভাতের চিন্তা থাকলে কিছু হয় না কিনা! তা তিনি জানতেন।

কাছে থাকলেও চিনতে পারা যায় না। কেবল তিনি চেনালে চেনা যায়। হৃদয় মুখুজ্যে ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ "আমায় আবার নাও মামা।" ঠাকুর উত্তর করলেন ঃ "কেন? তুই না বলেছিলি, তোমার ভাব তোমাতে থাক।" আবার কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলেন ঃ "আমি কি তখন তোমায় জানতুম?" অমনি ঠাকুরের চোখে জল! তাঁকে চিনতে পারা যায় না, তিনি না চেনালে। কাছে যখন ছিলেন, হৃদয় তখন চিনলেন না। Separation (ছাড়াছাড়ি) হলে চিনলেন।...

একবার একটি ভক্ত [শ্রীম] দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনতে গেলেন কেশববাবুর বাড়িতে। ঐ ভক্তটি ঠাকুরের কাছে next meeting-এ (পরবর্তী সাক্ষাতে) খুব উৎসাহের সহিত ঐকথা বললেন। ঠাকুরও প্রথম খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করলেন। ভক্তও আনন্দে ও উৎসাহে খুব বলে যাচ্ছেন। ও মা! যখন সব বলা শেষ হলো তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন ঃ "তুমি কোথাও যাবে না। খালি এইখানেই আসবে।" একেবারে command (আদেশ)। তাঁর রীতি ছিল না command করা। কিন্তু এখানে একেবারে—command।

ভক্তরা [শ্রীম প্রমুখ] তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানত না। তিনি (ঠাকুর) বলেছিলেন মা ঠাকরুনকে এই কথা। [একজন (শ্রীম) সম্বন্ধে] বলেছিলেন ঃ "এ আমা বৈ কিছু জানে না।" মা পরে প্রায়ই বলতেন এই কথা। (পৃঃ ১৯৯-২০০) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১৩শ ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

পরিমার্জনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

জীবন আমাকে যে-শিক্ষা দিয়েছে

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই স্মৃতিনিবন্ধটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সেটা ১৯৬১ সাল। ভারত সরকারের আয়োজনে সতেরটি ইউরোপীয় দেশ জুড়ে চারমাসের বক্তৃতা-সফর করছি। সেসময় চেকোস্লোভাকিয়া স্তালিনের কমিউনিস্ট শাসনাধীন। পোল্যান্ড থেকে আমি প্রাগ পৌঁছালাম ১৯ জুন ১৯৬১। সেখানে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন চেক মন্ত্রিসভার 'চিফ অফ সেকসন' ডঃ কারমিনোভা এভা এবং তাঁর সহকারী মিঃ জরিস জারোস্লাভ। সেইসঙ্গে ছিলেন মিস জারমিলা মাস্তভস্কা, যাঁকে চেক সরকার আমার ঐদেশে থাকার সময়ে দোভাষী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। ইনি তখন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও হিন্দির ছাত্রী ছিলেন এবং তাঁর পছন্দ ছিল 'উর্মিলা'—এই সংস্কৃত নামটি। ঐ নামেই ডাকলে তিনি খুশি হতেন। যদিও আমি চেক সরকারের কাছে সরকারি অতিথি হিসাবেই গিয়েছিলাম, তবু ওখানকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিজয়কুমার আচার্য অনুরোধ করলেন, আমি যতদিন প্রাগে থাকব, ততদিন যেন ওঁর ওখানেই থাকি। ওঁর কথাই রাখলাম। যাহোক, পরের দিন মিস জারমিলা মাস্তভস্কা আমাকে নিয়ে গেলেন চেক সরকারের সচিবালয়ে; সেখানে সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ বিদেশ-সম্পর্ক বিভাগের প্রধান মিঃ হলুবেক-এর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল। মিঃ হলুবেক জানালেন, তাঁর দপ্তর আমার চেকোস্লোভাকিয়ায় থাকার পাঁচদিনের একটা অনুষ্ঠানসূচী তৈরি করে ফেলেছে—তার মধ্যে প্রাগের জন্য তিনদিন ও ব্রাতিস্লাভার জন্য দুদিন ধরা আছে।

স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভায় যাওয়ার ব্যবস্থা হলো সরকারের তরফ থেকেই। গরিমাময় ড্যান্যুব নদের তীরে ব্রাতিস্লাভা শহর। চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ বোহেমিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। আগে এটি একটি অখণ্ড রাজ্য ছিল; এখন ভেঙে দুটি হয়েছে—চেক ও স্লোভাক। আমি জানতে চাইলাম, ইংরেজীতে 'বোহেমিয়ান' শব্দটির অর্থ 'বাস্তববিমুখ, স্বপ্নচারী' ইত্যাদি হলো কী করে? উত্তরে জানলাম, আগে এই অঞ্চলে 'বোজোহেম' নামে এক উপজাতি থাকত; তাদের থেকেই এই অর্থ এসেছে। এয়ারপোর্টে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন 'স্লোভাক অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স'-এর সেক্রেটারি মিঃ হার্মান ক্রাকো। সরকারি গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো হোটেল ডেভিন-এ। সেখানেই চেক সরকারের তরফে আমার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। হোটেলের কয়েক গজ দূর দিয়ে রাজকীয় ঐশ্বর্যে বয়ে যাচ্ছিল দানুয়ুব।

চেকোস্লোভাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০০০-এর ওপরে; তার মধ্যে ষাট শতাংশ ছাত্রী। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দও পড়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বললাম। ভাষণের পর আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। জারমিলা ভাষণটি অনুবাদ করে দিলেন। ভাষণের শেষে ছিল রবীন্দ্রনাথের এই পঙ্‌ক্তিটি : "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির...।" এরপর ছিল প্রশ্নোত্তরপর্ব।

২১ জুন প্রাগে ফেরার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো 'চেক সোসাইটি অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেসন্স'-এ। সেখানে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন প্রাগের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট-এর ডঃ এম. ক্রাসা। ডঃ ক্রাসা আমাকে সেখানে উপস্থিত বেশকিছু সরকারি অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক সংস্কৃত ও হিন্দি জানেন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যও পড়েছেন। ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় চ্যান্সেরীতে ভারতীয় দূতাবাস-কর্মীদের কাছে ভাষণ দিলাম। শ্রোতাদের মধ্যে কিছু চেক ভাষাভাষী মানুষও ছিলেন।

২২ জুন সকালে জারমিলা আমাকে সরকারি গাড়িতে করে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে দু-ঘণ্টা আলোচনার জন্য নিয়ে গেলেন। উপস্থিত অধ্যাপকরা মার্ক্সীয় তত্ত্ব নিয়ে বললেন। বললেন, বিশ্বের সবকিছুরই পিছনে রয়েছে জড়শক্তি এবং কিছু গঠনমূলক সম্পর্ক। মার্ক্সীয় তত্ত্বে যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবে ঐসব শক্তিকে ব্যবহার করে আনতে হবে মানুষের প্রগতি। আমি প্রশ্ন করলাম, কেবল বাহ্য পরিবেশকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রিত করেই কি মানুষকে আরো বেশি নীতিপরায়ণ, আরো বেশি সমাজসচেতন এবং আরো কম স্বার্থকেন্দ্রিক করে তোলা যায়? তাছাড়া, চল্লিশ বছর ধরে অনুরূপ ধ্যানধারণায় পরিচালিত সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতা কি এই মার্ক্সীয় তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যাশাকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছে? উপস্থিত সকলে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, সেই প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়ন হাতে-হাতে পাওয়া যাচ্ছে না এবং রাশিয়ায় আধুনিক কমিউনিস্ট ভাবধারা ক্রমশ আরো বেশি করে উপলব্ধি করছে যে, একনাগাড়ে কেবল বস্তুবাদী মূল্যবোধের ওপর জোর দিলেই মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের কমিউনিস্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না; তার জন্য চাই নৈতিক মূল্যবোধের ওপর আরো বেশি গুরুত্ব আরোপ।

এই সুযোগে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের আলোচনায় চলে এলাম। সেটা এই—মানুষের পক্ষে বাইরের জগতের জ্ঞানের থেকে বেশি প্রয়োজন তার অন্তরের জগৎটিকে চিনে নেওয়া এবং তার বাইরের জীবনটাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার চেয়ে বেশি জরুরী অন্তরের জগতে তাকে শিক্ষিত করে তোলা। এর পরের দেড়ঘণ্টা ধরে অধ্যাপকেরা আমার বৈদান্তিক চিন্তাভাবনার কথা শুনলেন। তার মধ্যে দরকারমত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী থেকে উদ্ধৃতিও দিচ্ছিলাম। বিবেকানন্দের চিন্তার প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় সাম্প্রতিককালে অসামাজিক প্রবণতা এবং অরাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে আইনকানুন যে আরো জোরদার করা হয়েছে, সে-কথা তুললাম। সেইসঙ্গে কিছু প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন এমন রাশিয়ানদের একাংশ যেভাবে আরামপ্রিয়, অলস ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠছেন এবং মোটের ওপর কমিউনিস্ট নৈতিক আদর্শ থেকে যেভাবে বিপথে চলে যাচ্ছেন, তাতে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভের ক্ষোভপ্রকাশের প্রসঙ্গও উত্থাপন করলাম। এসব কথা পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছিল। আমি বললাম, মানুষকে নৈতিক জীবনে শিক্ষিত করে তুলতে হবে—তাকে সচেতন করতে হবে যে, তার অন্তরের গভীরে এমন কিছু মহান সম্পদ আছে যা বস্তুবাদী শক্তি বা পরিবেশের উৎপাদন বা দাসমাত্র নয়; সে-সম্পদ হলো বেদান্তের ভাষায়—দৈবী সত্তার এক-একটি ঝলক বা স্ফুলিঙ্গ। এই সত্তাকে মুক্ত করতে হবে সবরকম বন্ধন থেকে—তা সে বাইরের বা অন্তরের, যা-ই হোক না কেন।

অধ্যাপকেরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এই ব্যাখ্যা শুনছিলেন। আমি আরো বললাম যে, কমিউনিস্ট আদর্শের শক্তি ও সামগ্রিকতা বিচারের সময় এখনো আসেনি; সে-বিচার ইতিহাসের জন্য তুলে রাখা আছে। তবে সুদূর বা সাম্প্রতিক অতীতের ইতিহাস কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সেরকম কোন সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত দেখাচ্ছে না। উপস্থিত বন্ধু ও অধ্যাপকেরা স্বীকার করলেন যে, এইসব মতামত অত্যন্ত প্রগতিশীল, তবে পাশ্চাত্যের মানুষ কেবল খ্রীস্টান বা ইহুদী ধর্মের ভাবধারাকেই জানে, ভারতীয় ভাবের সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। তাঁদের মতে, পাশ্চাত্যের পক্ষে ভারতীয় ভাবধারা জানা আশু প্রয়োজন, যাতে পাশ্চাত্য চিন্তা সংশোধিত ও উন্নত হয়ে উঠতে পারে। একজন অধ্যাপক কিছুটা জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি চেকোস্লো-ভাকিয়ার কমিউনিজমকে একটা অনড়, গোঁড়া ব্যবস্থা বলে মনে করি কিনা। আমি বললামঃ "হ্যাঁ, করি।" এবং লেনিনের সেই উক্তির উল্লেখ করলাম, যেখানে তিনি বলেছেন যে, মার্ক্সবাদকে একটা পবিত্র ফতোয়া-গ্রন্থের মতো করে দেখার প্রবণতাটা কমিউনিস্ট দেশগুলিকে বন্ধ করতেই হবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে আমি 'ইন্ডিয়ান চান্সেরী'তে আয়োজিত এক সভায় ভাষণ দিলাম। প্রায় সত্তর জন লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জনা তিরিশ কূটনীতিক। ছিলেন যুগোস্লাভিয়া, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, ইয়েমেন, গ্রেট ব্রিটেনের সদস্য রাষ্ট্র এবং পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতেরা; ছিলেন বেশ কিছু চেক অফিসারও। বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ আধুনিক মানুষের কাছে বেদান্তের আবেদন। 'হল'-এ ঢোকার মুখে সরকারের তরফ থেকে ভাষণটির 'সাইক্লোস্টাইল' করা ইংরেজী প্রতিলিপি বিতরণ করা হচ্ছিল আমন্ত্রিত শ্রোতাদের মধ্যে। 'ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স'-এর ডঃ জিরি স্টেপানোভস্কি বেদান্তের ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সপ্রশংস উল্লেখ করলেন; তবে বললেন যে, কমিউনিস্ট দেশগুলিতে—যেখানে ইংরেজী 'রিলিজিয়ন' শব্দটির মধ্যে লোকে খারাপ গন্ধ পায় এবং কমিউনিস্ট মানসিকতায় যেখানে ধর্মের প্রতি একরকম অ্যালার্জি আছে—সেখানে 'বেদান্ত' না বলে 'জীবনের দর্শন'—'ফিলসফি অফ লাইফ' বলাই ভাল। আমি ওঁর সঙ্গে একমত হলাম। ঐ সভায় অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত কাউন্ট হেনরিখ ক্যালিস ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম, কারণ ভিয়েনায় থাকার সময় আমি হেনরিখের ভাই রুডল্ফ ক্যালিস ও তাঁর স্ত্রী মিসেস লি ক্যালিসের অতিথি হয়েছিলাম। দুটি পরিবারই বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

২৩ জুন গেলাম জিরি ভ্যাসিলি নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি। সেখানে পাঁচজন চেক ভাষাভাষী বেদান্ত-অনুরাগী জড়ো হয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ভাক্লাভ সেক। এই দলটি নিয়মিত বেদান্ত পাঠ করত এবং প্রতি সপ্তাহে সদস্যদের কারো না কারো বাড়িতে পাঠ ও মনঃসংযোগের জন্য মিলিত হতো। তারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ছিল। আমি তাদের কাছে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কয়েক মিনিট বললাম।

ঐদিনই গেলাম মিস হেলেনা ডোরাকের বাড়ি। এঁর আপন ভাই ছিলেন বিখ্যাত চেক চিত্রশিল্পী স্বর্গত ফ্রাঙ্ক ডোরাক, যাঁর আঁকা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের একেবারে কাছের মানুষ করে দিয়েছে। মিস ডোরাকের বয়স তখন আশির ওপর। তিনি ও তাঁর ছোট বোন মারি রিজাকোভা তাঁদের ভাইয়ের স্টুডিওতেই থাকতেন। তাঁরা আমাকে বললেন তাঁদের ভাইয়ের কথা, বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি তাঁদের ভক্তির কথা। ১৮৯৩-তে যখন ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়, তখন ফ্রাঙ্ক ও হেলেনা শিকাগোতেই ছিলেন। ফ্রাঙ্কের কাছে ধর্মমহাসভার একটা প্রবেশপত্র ছিল, কিন্তু যেদিন স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ছিল, সেদিন হাতে একটা ছবি আঁকার কাজ থাকায় তিনি যেতে পারেননি। এই নিয়ে তাঁর দারুণ

আপসোস হয়, যখন কিনা এর কয়েক বছর পর তাঁর সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের দেখা হয় নিউ ইয়র্কে (ও পরে লন্ডনে) এবং তাঁর কাছ থেকে ফ্রাঙ্ক বিবেকানন্দ ও তাঁর মহান আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানতে পারেন। তবে ইতিমধ্যে ফ্রাঙ্কের এক অলৌকিক দর্শন হয় ও তার ভিত্তিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি আঁকেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ফটো দেখান, তখন ফ্রাঙ্কও তাঁকে নিজের আঁকা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটি দেখান। শ্রীরামকৃষ্ণের যতগুলি প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, তার মধ্যে এটি সেরা। ফ্রাঙ্ক ডোরাক পরে শ্রীমা সারদাদেবীরও অনুরূপ একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন।

হেলেনা আমাকে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহার করা একটি গেরুয়া পোশাক দেখালেন। সেটি তিনি একান্ত ভক্তির সঙ্গে সযত্নে রক্ষা করেছেন। পোশাকটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা তথা বন্ধু মিস ম্যাকলাউড। হেলেনার কাছে আমি তাঁর ভাইকে লেখা অভেদানন্দজীর একটি চিঠি দেখলাম। ফ্রাঙ্ক অভেদানন্দজীকে তাঁর গুরুরূপে দেখতেন। ফ্রাঙ্কের দেহাবসান হয় ১৯২৭-এ। হেলেনার ঘর-ভর্তি বিবেকানন্দ ও সারদাদেবীর ছবি। তিনি আমাকে ১৬ মার্চ ১৯২৮-এ তাঁকে লেখা স্বামী অভেদানন্দের একটি চিঠি দেখালেন, যাতে তাঁর ভাইয়ের আঁকা শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিকৃতিটি পাঠানোর জন্য অভেদানন্দজী তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আমাকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত তখনকার দুটি দৈনিক পত্রিকা—'ফরওয়ার্ড' (১৬ মার্চ ১৯২৮) ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৫ মার্চ ১৯২৮)-র 'কাটিং' দেখালেন। দুটিতেই অর্ধেক স্তম্ভ জুড়ে এই উপহারের প্রসঙ্গ বিবৃত করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ফ্রাঙ্ক ডোরাকের জন্ম প্রাগে; তিনি একজন চেকোস্লোভাক। রামকৃষ্ণ মিশনের বইগুলিতে অনেক জায়গায় তাঁকে ভিয়েনা-জাত একজন অস্ট্রিয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে; এর কারণ যুদ্ধপূর্ব (১৯১৪-১৯১৮) অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্তি। রবীন্দ্রনাথ ফ্রাঙ্ক ডোরাকের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর স্টুডিওতে গিয়েছিলেন ১৯২১-এ এবং পুনরায় ১৯২৬-এ। প্রথমবারে তোলা একটা গ্রুপ ফটো ওঁরা আমাকে দেখালেন; তাতে রয়েছেন ডোরাক, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাগের বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ স্বর্গত অধ্যাপক লেসনি।

ঐ একই দিন সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো 'ন্যাপ্রস্টেক মিউজিয়াম হল'-এ। জনগণের উদ্দেশে প্রাগে আমার প্রধান ভাষণটি ওখানেই দেওয়ার কথা ছিল। ব্যবস্থা করেছিল চেক সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক। ওঁদের নির্বাচিত বিষয়টি ছিল 'ভারতীয় জনসাধারণের অধ্যাত্মজীবন'। রীতিমত আগ্রহী ও উৎসাহী প্রায় ২৫০ জন শ্রোতা হল-ভর্তি করে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের একটা বড় অংশে ছিলেন যুবক-যুবতী এবং সরকারি অফিসার ও অধ্যাপকবৃন্দ। হল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল বলে প্রায় ৫০ জন শ্রোতা বক্তৃতা ও আলোচনা শোনার জন্য প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। গেটে ঢোকার মুখে চেক সরকারের তরফ থেকে আমার বক্তৃতার চেক-অনুবাদ শ্রোতাদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। যাহোক, বক্তৃতা চলল একঘণ্টা। তারপর শ্রোতাদের কাছ থেকে এল রাশি রাশি প্রশ্ন। ভারতের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি প্রাগের মানুষের এই প্রচণ্ড আকর্ষণ আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।

২৪ জুন জারমিলা আমাকে চেক সংস্কৃতি-মন্ত্রকের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সরকারি সচিবালয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী মিঃ মোজমির হুডেসেক এবং মন্ত্রকের আরো কিছু কর্তাব্যক্তি। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের ব্যবস্থাপনায় আমি সন্তুষ্ট কিনা। তাঁরা যা করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম। সেটিই ছিল আমার জুরিখ রওনার দিন।

*

১৯৬০ সালে ভারত সরকার ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য ছয়টি দেশ জুড়ে আমার এক ব্যাপক বক্তৃতা-সফরের আয়োজন করে। ইন্দোনেশীয় ভাষার পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি সংস্কৃত, জনগণের আশি শতাংশেরও বেশি ধর্মে মুসলিম, কিন্তু সংস্কৃতিতে তারা হিন্দু। এমনকি বেশির ভাগ নামই সংস্কৃততে, যেমন—সুকর্নো, অর্জুনাস্ত, পদ্মাবতী, (এয়ার মার্শাল) সূর্যধর্মা প্রভৃতি। শিল্প, নাটকও অনেকাংশে রামায়ণ-মহাভারত-আশ্রিত। একটা ট্রাক দেখলাম, তার গায়ে নাম লেখা—রাবণ। সুদৃশ্য বালী দ্বীপের বেশির ভাগ মানুষ হিন্দু। ইন্দোনেশিয়া এটা দেখিয়ে দেয় যে, আপনি যেকোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃতিকে হতে হবে আপনার নিজস্ব জিনিস। সংস্কৃতি বাইরে থেকে আমদানি করা যায় না, কারণ সেটা স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। এব্যাপারে ভারতবর্ষে আমাদের জানা দুটি দৃষ্টান্ত আছে—স্বর্গত বিচারপতি এম. সি. চাগলা নিজেকে ধর্মে মুসলিম ও সংস্কৃতিতে হিন্দু বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বর্গত অধ্যাপক ভি. এল. ডিসুজা নিজেকে ধর্মে রোমান ক্যাথলিক এবং সংস্কৃতিতে হিন্দু বলে ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৫০ সালে আমি যখন নয়া দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বে ছিলাম, তখন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডঃ সুকর্নো ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করতে নয়া দিল্লি এসেছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আমার খুব কৌতূহল ছিল; তাই ঠিক করলাম, নয়া দিল্লির ইন্দোনেশীয় দূতাবাসে গিয়ে রাষ্ট্রপতি সুকর্নোর সঙ্গে দেখা করব। সেখানে পৌঁছাতে দূতাবাসের একজন কর্মী এসে আমাকে জানালেন, দূতাবাস-কর্মীদের কাছে রাষ্ট্রপতি কিছু বলছেন; তাই অপেক্ষা করতে হবে।

আমি তাঁকে বললাম রাষ্ট্রপতিকে একথা জানাতে যে, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে একজন স্বামীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। খবরটা পেয়ে রাষ্ট্রপতি তৎক্ষণাৎ শ্রোতাদের অপেক্ষা করতে বলেন, যাতে তিনি বেরিয়ে গিয়ে 'ভিজিটর্স রুম'-এ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি সুকর্নো এলেন সামরিক পোশাকে। আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে কথা বলতে বসলাম। আমি তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বই উপহার দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দের 'ইন ডিফেন্স অফ হিন্দুইজম' (হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে কিছু কথা) বইটি কোথায় পাব?" আমি বললাম ঃ "আপনাকে দেওয়া এই বইটির মধ্যে ঐ ভাষণটিও আছে।" পরে তাঁকে বেলুড় মঠের একটি ছবি দেখিয়ে বললাম ঃ "এ-ই হলো বেলুড় মঠ; গঙ্গার তীরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়।" ইংরেজীতে বললাম 'গ্যাঞ্জেস'। উনি তাড়াতাড়ি আমাকে ঠিক করে দিয়ে বললেন ঃ "গ্যাঞ্জেস বলবেন না—বলুন গঙ্গা, গঙ্গা।"

ওঁকে বললাম, আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে খবর দিলেন। রাষ্ট্রপতি সুকর্নোকে আমার লেখা 'আওয়ার উইমেন' বইটি দিলাম। বইটি দেখে তিনি বললেন ঃ "ওঃ! এটা আমার স্ত্রীর জন্য! বিবেকানন্দ চাননি পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য করুক।"

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আপা বি. পন্ত-এর আমন্ত্রণে ভারত সরকার ১৯৬৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ায় আমার একটা আটদিনের বক্তৃতা-সফরের আয়োজন করলেন। এখানে বলে রাখি, 'জাকার্তা' নামটা আসলে সংস্কৃত 'জয়কর্তা' থেকে এসেছে। শ্রীপন্ত আমার বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন জাকার্তায় ছয়টি ও বান্দুং-এ দুটি। তার মধ্যে উভয় জায়গার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বক্তৃতাও ছিল।

জাকার্তার দুটি ইংরেজী দৈনিক—'দ্য ইন্দোনেশিয়ান হেরাল্ড' ও 'দ্য ইন্দোনেশিয়ান অবজার্ভার' আমার ভ্রমণের ও বিভিন্ন কর্মসূচীর একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করল ২৯ নভেম্বর (১৯৬৩) তারিখে। ২ ডিসেম্বর ১৯৬৩ রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। ঠিক হলো, সেখানে রাষ্ট্রপতি সুকর্নো বিবেকানন্দের ওপর লেখা একটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করবেন। বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যেই বইটির প্রকাশ হতে চলেছে। নাম—'সুয়ারা বিবেকানন্দ' (ইন্দোনেশীয় ভাষায় লেখা; ২০,০০০ কপি ছাপানো হয়) বা 'ভয়েস অফ বিবেকানন্দ' (ইংরেজী অনুবাদ; ২,০০০ কপি ছাপানো হয়)। বই-দুটি উৎসর্গ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি সুকার্নোকে এবং তাতে রয়েছে তাঁর লেখা এই মুখবন্ধটি ঃ

'স্বামী বিবেকানন্দ! কী এক নাম! যেসকল মানুষ আমাকে জীবনে প্রভূত প্রেরণা জুগিয়েছেন, ইনি তাঁদের একজন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন সবল হতে, ঈশ্বরের একজন সেবক হতে, আমার দেশের একজন সেবক হতে। তিনি আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন দরিদ্র মানুষের সেবক হতে, সমগ্র মানবতার একজন সেবক হতে।

"তিনিই বলেছিলেন, 'আমরা অনেক কেঁদেছি, আর কান্নাকাটি নয়—এবার নিজের পায়ে দাঁড়াও, মানুষের মতো মানুষ হয়ে দাঁড়াও।' "

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের অনুরোধে আমি বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেম ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য তাঁর আন্তরিক ভাবনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বললাম। সেইসঙ্গে তাঁর বাণীর সার্বজনীনতার দিকটিও বর্ণনা করলাম। তারপর আমি প্রেসিডেন্ট সুকর্নোকে 'কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ'-এর এক সেট উপহার দিলাম। রাষ্ট্রপতি বই-দুটির ('সুয়ারা বিবেকানন্দ' এবং 'ভয়েস অফ বিবেকানন্দ') আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন ও একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন, একসময় যখন তিনি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছিলেন কী করে তাঁর দেশের ও দেশের মানুষের সেবা করতে পারা যায়, তখনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। সেটা ১৯২৭-এর কথা। তখন বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি যে-অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তারই সূত্র ধরে তখন থেকেই তাঁর জীবন ও কর্মকে চালিয়ে নিয়ে গেছে বিবেকানন্দের শক্তিই। ইন্দোনেশীয় জনগণের উন্নয়নে তাঁর কাজের পিছনে ছিল বিবেকানন্দের সেই বাণীর প্রেরণা, যেখানে তিনি বলেছেন, দরিদ্র ও অবহেলিতদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে হবে ও তাদের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবা করতে হবে। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বললেন, জনগণের জন্য গঠিত তাঁর 'পঞ্চশীল' কর্মসূচীর পিছনে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত-ভাবনা। বললেন, বিবেকানন্দ কেবল ভারতের নন, তিনি সারা বিশ্বের। শেষ করার আগে তিনি জানালেন, স্বামীজীর বই তিনি তাঁর শোওয়ার ঘরে রাখেন এবং রোজ রাতে শুতে যাওয়ার আগে সে-বই তিনি পড়েন। তাঁর নিজের সংগ্রহে স্বামীজীর বাণী ও রচনার যে-বইগুলি ছিল, সেগুলি তিনি ডাচ পুলিসি তৎপরতার সময় হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেসময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে তাঁকে এক সেট বই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথমে ঠিক ছিল, সমগ্র অনুষ্ঠান কেবল কুড়ি মিনিটের হবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা পুরো একঘণ্টা চলল। ঐদিনই সন্ধ্যায় টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি দেখানো হলো। একই সন্ধ্যায় গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলে এক জনসভায় ভাষণ দিলাম। বিষয় ছিল ঃ 'বিজ্ঞান ও ধর্ম'। ২০০-র ওপর উচ্চশিক্ষিত মানুষ বিশেষ আগ্রহ নিয়ে বক্তৃতাটি শুনলেন।

জাকার্তা ও বান্দুং-এ সরকারি ও বেসরকারি আয়োজনে

আমি অনেকগুলি বক্তৃতা দিলাম। পশ্চিম জাভার 'ইন্দোনেসিয়ান ন্যাশনাল ইউথ ফ্রন্ট'-এর 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেকশন'-এর ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন রুজিরুচির ৪০০-রও বেশি মানুষের কাছে 'স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক বাণী' বিষয়ে বললাম। পশ্চিম জাভার মিলিটারি গভর্নর কর্নেল মাহমুদি আমাকে বান্দুং-এ আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি এক সেট 'কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ' পেতে আগ্রহী ছিলেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, বইগুলি পাঠিয়ে দেব। কর্নেল মাহমুদি আশা ব্যক্ত করলেন যে, পরের বার আমি যেন সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের কাছে বক্তৃতা দিই এবং বিবেকানন্দের মানবসেবার বাণী তাঁদের কাছে পৌঁছে দিই। এরপর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বক্তৃতা দিলাম 'যুবসম্প্রদায়ের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক বাণী' বিষয়ে। চূড়ান্ত মনোযোগ সহকারে শ্রোতারা বক্তৃতাটি শুনল। পরে আমাকে জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইউনিভার্সিটি লেকচার হল'-এ বক্তৃতা দিতে হলো। বিষয় ছিলঃ 'স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-ধর্ম সমন্বয়'। ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক মিলিয়ে ১০০০-এরও বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন—হল-এ বসার জায়গা না পাওয়ায় অনেককে হল ও বারান্দায় দাঁড়িয়েও বক্তৃতা শুনতে হলো। অনুষ্ঠানের পর ইন্দোনেশীয় টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমার সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আমাকে জানালেন, ইন্দোনেশীয় সরকারের তথ্যমন্ত্রক রেডিও-ইন্দোনেশিয়াকে নির্দেশ দিয়েছে আমার সবকটি বক্তৃতার সম্প্রচার করতে। তাছাড়া জাকার্তা ও বান্দুং-এর দুজায়গাতেই খবরের কাগজগুলো আমার অনেক বক্তৃতার রিপোর্ট বের করত।

জীবন আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য শিখিয়েছে। সেটি এই যে, ভারতের বেদান্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আবেদন পাশ্চাত্যের বহু চিন্তাশীল মানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে বইপত্রের মাধ্যমে—কোন ভারতীয় শিক্ষকের মধ্যস্থতা ছাড়াই। কোন দেশের কোন ব্যক্তি বা সংস্থা 'আমন্ত্রণ জানালেই' বেদান্ত বা শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দেশে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন।

*

১৯৭৬ সালে ব্রিটেনে আমার দ্বিতীয় বক্তৃতা-সফরের সময় সেদেশের (অ্যাংলিক্যান চার্চের) ওয়েস্টমিনস্টারের ডিন ও তাঁর স্ত্রী নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। (ওঁদের দুজনের নাম এখন মনে পড়ছে না।) ওঁদের ওখানে যাওয়ার পর ওঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন 'ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে'তে। ব্রিটিশ ইতিহাসের অনেক স্মৃতি এই স্থানটির সঙ্গে জড়িত। পরে ওঁদের পরামর্শ অনুযায়ী আমি ওয়েস্টমিনস্টার হাইস্কুলের ক্লাস এইট থেকে টেন-এর ছাত্রদের কাছে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে বললাম। ছেলেরা একেবারে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। হেডমাস্টার পরে বললেনঃ "ক্লাসে এদের সামলানো মুশকিল, অথচ এখন কেমন একমনে বক্তৃতা শুনল!" এর অনেক পরে ডিন ও তাঁর স্ত্রী আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা গভীর তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে 'দ্য গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত) পড়ছেন।

বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া থেকে তিনজন বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীর এই চিঠিটি আমি পাই ডিসেম্বর ১৯৯৮-এ—

সোফিয়া, ডিসেম্বর ১৯৯৮

প্রিয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দ,

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁদের বিশ্বজনীন যে-বাণী, তার একদল বুলগেরীয় অনুরাগী ভক্তের তরফ থেকে এই চিঠি লিখছি। আপনাকে এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে, সম্প্রতি মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য। সেইসঙ্গে, আপনার নব্বইতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমাদের উষ্ণ শুভেচ্ছাও গ্রহণ করবেন দয়া করে। এখানকার বেদান্ত-অনুরাগী বন্ধুদের কাছে আপনার নাম সুপরিচিত—আপনার লেখার মাধ্যমে। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর রচনাগুলি থেকে আরম্ভ করে বহু খণ্ডে প্রকাশিত আপনার গ্রন্থগুলি—সবই মনকে আলোকিত করে, আধুনিক মানুষের প্রয়োজন মেটায়। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আশা করতে চাই, বেদান্তের মহান ভাবরাশি পৃথিবীতে আরো আরো ছড়িয়ে পড়বে এবং সমগ্র মানবতার কল্যাণের দিশায় আগামী দিনগুলিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন তার প্রভাবের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করে চলবে।

আমাদের অন্তরতম শুভেচ্ছা-সহ

প্রভুপদাশ্রিত
আপনার
জর্ডান জাসেভ
ল্যুবোমির ভুটভ
আসেন ক্যুলদজিয়েভ

*

যদিও আমার জন্ম কেরালায়, বড়ও হয়েছি সেখানে, কিন্তু আমি আমার আপন সত্তার অনুভূতিকে কেবল ঐ একটা রাজ্যেই বেঁধে রাখিনি—তাকে ছড়িয়ে দিয়েছি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সীমানায়। এদেশের যেকোন রাজ্যেই আমি বক্তৃতা-অনুষ্ঠানে যাই, আমার মনে হয় আমি সেখানকারই। ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক আঙিনায়ও তাই। প্রায় পনের বছর ধরে আমি প্রত্যেক বছর হল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা সিঙ্গাপুর গেছি। সেখানে লোকে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছেন যেন আমি তাঁদেরই একজন। তাঁরা যে কেবল আমার ভ্রমণের আর আনুষঙ্গিক দিকগুলির ব্যয়ভার বহন করেছেন তা-ই নয়, উদারহস্তে প্রণামীও

দিয়েছেন। একসময় এর পরিমাণ প্রায় এক লাখ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। সে-টাকা আমি আমাদের নানা সেবাসংস্থাকে সাহায্য করতে ব্যয় করেছিলাম। আসলে, যখন মানুষের হৃদয়ে ছোঁয়া লাগে, তখন খরচ করতে তার মন চায়। যেকোন নগরে বা শহরে কোন অনুষ্ঠানের শেষে বিদায়মুহূর্তে এই একটি কথাই শুনেছিঃ "দয়া করে আসবেন আবার!" অমর ভারত-এর এক প্রতিনিধির কাছে এ এক পরম আশীর্বাদ।

*

স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিল, রামকৃষ্ণ মিশন নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখবে। সেই অনুসারে আমি কখনো সক্রিয় রাজনীতিতে জড়াইনি; তবে আমার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল এটা দেখবার যে, আধুনিক ভারত যেন আস্তে আস্তে একটা মানবতাধর্মী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে। ১৯৬০-এ আমি যখন বক্তৃতা-সফরে তামিলনাড়ুর কোডাইকানাল-এ, তখন খবর পেলাম, আমি যে-বাড়িতে রয়েছি তার খুব কাছে এক বাংলোতে গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন কাশ্মীরের শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ যখন ভারত ছাড়ল, তখন তারা ভারতের কয়েকশ দেশীয় মহারাজা বা নবাবকে জানিয়ে গেল যে, তাঁদের পক্ষে ভারত বা পাকিস্তান—যেকোন দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা রইল। কাশ্মীরের মহারাজা স্বেচ্ছায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তাঁর পিছনে ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের সংখ্যাগুরু মুসলিম জনসাধারণ, আগেই যাঁদের 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'-এ একত্রিত করেছিলেন শেখ আবদুল্লা। যাহোক, কাশ্মীরের মহারাজার এই সিদ্ধান্তে পাকিস্তান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দলে দলে সশস্ত্র উপজাতীয়দের পাঠিয়ে দিল কাশ্মীর আক্রমণে। যদিও কাশ্মীর উপত্যকা থেকে ভারত তাদের প্রায় বিতাড়িত করেই দিল, উপত্যকার পশ্চিমাংশের একটা পার্বত্য অঞ্চল তারা অধিকার করে রাখল, এখন যার নাম 'পাক-অধিকৃত কাশ্মীর'। [ক্রমশ]

---

* রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীর 'What Life Has Taught Me' শীর্ষক একটি রচনা ভারতীয় বিদ্যাভবন (মুম্বই-৭)-এর মাসিক ইংরেজী মুখপত্র 'Bhavan's Journal'-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজজী-কৃত কিছু সংযোজন-সহ রচনাটির বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় শ্রীসারদা মঠ (দক্ষিণেশ্বর)-এর ত্রৈমাসিক বাঙলা মুখপত্র 'নিবোধত'-র তিনটি সংখ্যায় (১২শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা এবং ১৩শ বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা)। ইতিমধ্যে 'Bhavan's Journal'-এ প্রকাশিত ইংরেজী রচনাটি বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম-সংযুক্ত হয়ে মহারাজজী-কৃত সংযোজন-সহ ঐ একই শিরোনামে ('What Life Has Taught Me') ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (মে ১৯৯৯)। 'উদ্বোধন'-এ বর্তমান অনুবাদটি 'নিবোধত'-র উক্ত বাঙলা অনুবাদ ও ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত পুস্তিকাটি (বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম বাদে) অনুসরণ করে প্রকাশিত হচ্ছে। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি নিরীক্ষা

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গীতা ও মহাভারতের যুদ্ধের কাল

গীতা মহাভারতের কালেরই, কারণ মহাভারতেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো গীতা। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো—মহাভারত কোন্ সময়ের রচনা? মহাভারতের যুদ্ধই বা কবেকার? এপ্রসঙ্গটি এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ গীতার কালের সমাজব্যবস্থা ঠিক কিরূপ ছিল তা নির্ণয়ের জন্য।

মহাভারতের যুদ্ধের কাল সম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তাঁদের 'Advanced History of India' গ্রন্থে তিনটি সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করেছেন—প্রথমটি জ্যোতিষ মত—খ্রীস্টপূর্ব ৩১০২, দ্বিতীয়টি খ্রীস্টপূর্ব ২৪৪৯, তৃতীয়টি একটি পুরাণ মত—১৪১৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। এই শেষোক্তটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। সর্বাধুনিক গবেষকদ্বয় এন. এস. রাজারাম ও ডেভিড ফ্রলে বিপুল বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে দেখিয়েছেন, প্রথম মতটি অর্থাৎ ৩১০২ খ্রীস্টপূর্বাব্দটিই সঠিক।[৬২] এঁদের আরো মত—মহাভারতের যুদ্ধ হরপ্পা সভ্যতা তার শীর্ষে পৌঁছাবার পূর্বেই ঘটেছিল।

রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে ধৃতরাষ্ট্র-বিচিত্রবীর্যের নাম যজুর্বেদের কাঠক সংহিতায় এবং দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাওয়া যায়।[৬৩] যাঁরা গীতা রচনার কালকে একেবারে শঙ্করাচার্যের কালে নিয়ে যেতে চান তাঁদের মতে এই কৃষ্ণ মহর্ষি আঙ্গিরস ঘোরের শিষ্য একজন সূর্য-উপাসক ঋষি মাত্র। আমাদের প্রশ্ন, কৃষ্ণ নাম অনেকের হতে পারে, কিন্তু 'দেবকীপুত্র' কয়জন হতে পারেন? 'কৃষ্ণ' নামধারী সকলেই দেবকীপুত্র? একি হতে পারে?

আমরা ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের গবেষণা[৬৪] থেকে জানতে পারি যে, সূর্য ও বিষ্ণু একসময়ে এক হয়ে যান এবং বিষ্ণু-উপাসক ভাগবত ধর্মের প্রবর্তক দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং সূর্য-উপাসক মহর্ষি আঙ্গিরস ঘোরের শিষ্য দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। মহাভারতেও শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবকে 'দেবকীপুত্র' বলা হয়েছে। (আদিপর্ব দ্রষ্টব্য)

অনেকে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, মহাভারতে কৃষ্ণের বাল্যজীবনের কাহিনী অনুক্ত, যে-কাহিনী বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে বলা হয়েছে। তাছাড়া পুরাণেও মহাভারতের যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না, সুতরাং মহাভারতের কৃষ্ণ ও পুরাণের কৃষ্ণ এক নন। ভাগবতপুরাণে অবশ্য মহাভারতের যুদ্ধের উল্লেখ আছে, তবে এটি অনেক পরবর্তী কালের রচনা বলা হয়। কিন্তু আগের ঘটনা কি পরে উল্লেখ করা যায় না? এপ্রসঙ্গে ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মহাভারত-রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস আদিপুরাণ গ্রন্থেরও রচয়িতা এবং এটি একটি অখণ্ড গ্রন্থ ছিল। পরে তা থেকে বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থ রচিত হয়। যাহোক, যেহেতু ব্যাসদেবই মহাভারত ও আদিপুরাণের রচয়িতা, তাই তিনি একই কাহিনী দুটি গ্রন্থে বিস্তার করেননি। পুরাণে তিনি কৃষ্ণের বাল্যজীবনের এবং মহাভারতে তাঁর উত্তরজীবনের কাহিনী বিবৃত করেছেন।

তাছাড়া ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় আরো দেখিয়েছেন যে, মহাভারতে কৃষ্ণের পূর্বজীবনের কথা যে একেবারেই অনুল্লেখিত, তাও ঠিক নয়। সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে এবং জরাসন্ধ বধের প্রাক্কালে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, গোকুল থেকে আগত কৃষ্ণ, যিনি কংসবধ করেছিলেন, তিনিই পাণ্ডবদের জরাসন্ধ বধ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাছাড়া রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ বরণীয় মানুষ বলে অর্ঘ্য দিলে শিশুপাল প্রতিবাদ করতে উঠে নিন্দাচ্ছলে কৃষ্ণের বাল্যকালের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করেন। উদ্যোগপর্বেও কৃষ্ণ যখন কৌরবসভায় দৌত্যে এসেছিলেন, তখন তিনি নিজেই কংসবধের কাহিনী বিবৃত করেন এবং বলেন, কংস নিজ পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে জোর করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন।

এসব থেকে এধারণা করে নেওয়া অসঙ্গত নয় যে, মহাভারত ও ব্যাসদেব-রচিত আদিপুরাণ সমসাময়িক। ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আরো দেখিয়েছেন যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভারতযুদ্ধের অনতিকাল পরেই মহাভারত রচনা করেন এবং ব্যাসদেব-রচিত আদি কুরুপাণ্ডব কাহিনীর নাম কেবল 'ভারত' ছিল; পরবর্তী কালে বিস্তারিত হলে সেই গ্রন্থের নাম হয় 'মহাভারত'। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এসম্বন্ধে বলেছেন : "যখন মূল 'ভারত' আখ্যান রচিত হয়, তখন সেই উপাখ্যানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব প্রধানতম চরিত্ররূপে

৬২ New Light on Vedic India and Ancient Civilization—N. S. Rajaram, Prabuddha Bharata, Nov. 1996

৬৩ Advanced History of India, pp. 88-89

৬৪ ভারত-সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ, অষ্টম অধ্যায়

আত্মপ্রকাশ করে থাকলেও সেই কাহিনী মূলত কুরুপাণ্ডব কাহিনীরূপেই গড়ে উঠেছিল, সেখানে এই কুরুপাণ্ডব কাহিনী থেকে স্বতন্ত্র যে জীবনকাহিনী (কৃষ্ণের) তা সংযোজনের কোন সুযোগ ছিল না।... পরে কোন উৎসাহী কাহিনীকার বিস্তৃত কৃষ্ণজীবনকে অবলম্বন করে... হরিবংশ পুরাণের সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রয়াসের ফলে হরিবংশ পুরাণ-সহ মহাভারত কাহিনী শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের জীবনের সামগ্রিক রূপের ধারক বলে পরিগণিত হলো। এই সামগ্রিক কাহিনী যে বহু অতীতকাল থেকে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেছিল, তার প্রমাণ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে, পাতঞ্জল যোগদর্শনের মহাভাষ্যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বৌদ্ধ এবং জৈন রচনায় বিবৃত বাসুদেব কৃষ্ণ সম্পর্কে নানা তথ্যে, গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনায় এবং সর্বশেষ হেলিওডোরাস নির্মিত গরুড়স্তম্ভের সাক্ষ্যবিচারে উপলব্ধি করা যায়।"[৬৫]

সুতরাং কৃষ্ণ যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য কর্তৃক পরিকল্পিত—এসকল কথা আদৌ প্রমাণসিদ্ধ নয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রয়াসের ফলে কোশাম্বীর মতো ঐতিহাসিককেও সত্য থেকে বিচ্যুত হতে হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে পাণিনি থেকে শ্লোক উদ্ধৃতি-সহ দেখিয়েছেন যে, পাণিনির সময়েই কৃষ্ণ ও অর্জুন বহু প্রাচীন কালের ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত হন, তখনি তাঁরা দেবতা হিসাবে পূজিত বলে পাণিনী উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন গোল্ডস্টুকারের মত, যে-মতানুসারে পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয় তখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেনি, এমনকি ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ এবং বেদাংশ-সকলও প্রণীত হয়নি। ঋক, যজু ও সাম বেদের সংহিতাভাগ ভিন্ন আর কিছুই রচিত হয়নি। (দ্রঃ 'কৃষ্ণচরিত্র', ৭ম পরিচ্ছেদ)

ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে—"মহাভারতে বিশেষ করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যেভাবে রুদ্র এবং বিষ্ণুকে একই বিশ্বরূপের সঙ্গে সমীকৃত করা হয়েছে, মহাভারত অপেক্ষা কোন প্রাচীনতর গ্রন্থে সেই চেতনার কোন উল্লেখ নেই। সেইসঙ্গে বাসুদেব-কৃষ্ণই যে এই মৌলিক ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে-তথ্যও মহাভারতেই সন্নিবিষ্ট আছে। দুই পরস্পরবিচ্ছিন্ন বিবদমান সংস্কৃতিধারার অন্তর্নিহিত মৌলিক উপলব্ধিকে উন্মোচিত এবং প্রতিষ্ঠিত করে কৃষ্ণ-বাসুদেব যে-পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন, উপনিষদ্-সাহিত্যে সেই প্রয়াসেরই প্রসার এবং পরিপূর্ণতা ঘটেছিল। মহাভারতকে উপনিষদের পূর্বগামী বলে মন্তব্য করায় আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। মহাভারত বর্তমান কলেবর লাভ করবার পূর্বেকার মৌলিক রূপ যে উপনিষদ্ থেকে প্রাচীনতর এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।"[৬৬] এ-মত সঠিক হতেই পারে, কারণ দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ যাঁর শিষ্য সেই মহর্ষি আঙ্গিরস ঘোরের পুত্রদের রচিত বেদের নানা মন্ত্র আছে বলে জানা যায়।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে যজুর্বেদের বাজসনীয় সংহিতায় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে অর্জুনের উল্লেখ আছে।[৬৭] যাঁরা গীতাকে বুদ্ধ-পরবর্তী, এমনকি খ্রীস্ট-পরবর্তী কালে নিয়ে যেতে চান তাঁরা বলেন —ইনি মহাভারতের অর্জুন নন, কারণ এঁর অপর নাম 'ইন্দ্র'। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ এবং ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মত—বেদের সংহিতা বা ব্রাহ্মণ ভাগ রচনার কালেই কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতাররূপে এবং অর্জুন ইন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচিত হয়ে পূজা পাচ্ছিলেন। এঁদের মতে, কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসের ইঙ্গিত ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও একটি শ্রৌতসূত্রে পাওয়া যায়। পাণ্ডুর নাম বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু অর্জুন, পরীক্ষিত ও জনমেজয়ের নাম পাওয়া যায়। 'পাণ্ডু' নামে একটি ঐতিহাসিক উপজাতির উল্লেখ টলেমী রচিত গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৬৮]

গীতার ভাষা ঃ প্রাক্ পাণিনীয়

অতি আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, ভাষা ও রচনাশৈলীর বিচারে গীতা মূল মহাভারতের চেয়েও বিবর্তিত, অতএব গীতা আধুনিক এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।[৬৯] কিন্তু লোকমান্য তিলকের মতে— "গীতার সঙ্গে মহাভারতের ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়, এমনকি পাণিনি-বিরুদ্ধ প্রয়োগ একইরকম, তাই মনে হয় দুই-ই একই হাতের রচনা।[৭০] পণ্ডিতপ্রবর ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তেরও একই মত—"গীতার ভাষা বিস্তরশঃ অপাণিনীয় ও অপ্রচলিত এবং ভাবাভঙ্গীও অত্যন্ত প্রাচীন।"[৭১] তিনি এইরূপ প্রাক্-পাণিনীয় প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষা যা গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি সঙ্কলনও করেছেন।[৭২] পূর্বোক্ত সমালোচকেরা দেশী-বিদেশী বহু খ্যাত-অখ্যাত বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করেন, কিন্তু ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর নাম ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করেন না। অথচ তাঁর মত খণ্ডন না করলে গীতা বুদ্ধ-পরবর্তী কালে রচিত—একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মহাভারতে ও গীতায় একই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সঞ্জয়যানপর্বে (উদ্যোগপর্ব) কৃষ্ণ সঞ্জয়কে বলছেন ঃ "শুচি ও কুটুম্ব পরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়নকরত জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি

---

৬৫ হেলিওডোরাস একজন গ্রীক রাজপুরুষ, যিনি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মধ্যপ্রদেশে বেশনগরে একটি গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন।
৬৬ ভারত-সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ, অষ্টম অধ্যায় ৬৭ Advanced History of India, p. 86
৬৮ Ibid. ৬৯ সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা ৭০ গীতার গল্প—সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২২১
৭১ গীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ভূমিকা ৭২ ঐ

জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্মবশত, কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়—এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যেসমস্ত বিদ্যার দ্বারা কর্ম সংসাধন হইয়া থাকে তাহাই ফলবতী... সুতরাং কর্মই সর্বপ্রধান।" এখানে সুস্পষ্ট কর্মবাদ প্রচার করা হয়েছে, যা গীতাতেও প্রচারিত। কৃষ্ণের এই উক্তিটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন ঃ "কর্মবাদ কৃষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম।... গীতাতেই আমরা দেখি যে, পূর্ব-প্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে; যাহা কর্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা 'ডিউটি' তাহাই কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, আর এইখানে (মহাভারতে পূর্বোক্ত বক্তব্যে) হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে, কিন্তু মর্মার্থ এক। এখানেও যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে।"[৭৩] মহাভারতেও এখানেই নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হয়েছে, যা গীতারও অন্যতম মুখ্য বক্তব্য।

কৃষ্ণ স্বধর্মপালন সম্বন্ধে গীতায় যা বলেছেন সঞ্জয়কেও মূলত তাই বলেছেন ঃ "এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনকে সান্ত্বনাকরত রাজ্যলাভের জন্য অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধনরক্ষা ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রতিপালনপূর্বক স্বকর্ম সংসাধন করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত।"[৭৪]

এরপর কৃষ্ণ সঞ্জয়কে চতুর্বর্ণের পালনীয় ধর্ম সম্বন্ধে বলতে প্রবৃত্ত হলেন। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য ঃ "গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যেরূপ ধর্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ।[৭৫] এইরূপ মহাভারতে অন্যত্রও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম এবং মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম এক। অর্থাৎ এর দ্বারা প্রমাণিত যে, গীতা মহাভারতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং একই সময়ের রচনা।

গীতা ও ধম্মপদে ঐক্য

'নির্বাণ'-সহ আরো কিছু কথা ধম্মপদ ও গীতায় একই হওয়ায় কাশীনাথ তেলাং বলেছেন যে, হয় গীতা বৌদ্ধগ্রন্থ ধম্মপদ থেকে নিয়েছে, নয়তো ধম্মপদ গীতা থেকে নিয়েছে। আজকের বস্তুবাদীরা তেলাঙের এই বক্তব্যের মধ্যে গীতা বুদ্ধ-পরবর্তী কালে রচিত—এই মতের সমর্থন খোঁজেন। কিন্তু উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গীতার ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, তেলাং মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সঙ্গে ভাবসাদৃশ্য ও ভাষাসাদৃশ্য দেখে মনে করেন যে, গীতা মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সমসাময়িক।

'ললিতবিস্তর' অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ। তার মধ্যে কেশবের কুণ্ডলের মাধুরী বর্ণনা আছে। পূর্বোক্ত সমালোচকদের মতে এই 'কৃষ্ণ' একজন অসুর, ইনি মহাভারত-বর্ণিত কৃষ্ণ নন। পরবর্তী কালে হিন্দুরাও বুদ্ধকে 'গয়াসুর' নামে অভিহিত করেছেন বলে শোনা যায়। কিন্তু এগুলি হলো ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের নিন্দাবাক্য। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কোথায়? ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতে মগধ সাম্রাজ্যের আদিযুগে যখন ভগবান বুদ্ধ জীবিত রয়েছেন তখন যেসকল ধর্মীয় ধারণা বিশেষ প্রসারলাভ করেছিল, তার মধ্যে ছিল পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলবাদ। এ-তত্ত্ব প্রচারে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁরা বাসুদেব-উপাসক ভাগবতধর্মের প্রচারক। এঁদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকেরা বলছেন ঃ "This new doctrine is preached among others by the Vasudevakas. They teach Bhakti in Vasudeva also known as Krishna Devakiputra, who is identified in an Aranyaka with Vishnu Narayana. He is represented as preaching the doctrines of Nishkama Karma (deed done without seeking any reward) and loving faith (Bhakti) in a God of grace (Prasada). The religious and philosophical views of his followers are expounded in the Bhagavat Gita which forms part of the sixth book of the Mahabharata. Bhaktas of Vasudeva were known to Panini."[৭৬] অর্থাৎ যাঁরা এই নবীন মতবাদের প্রচারে অগ্রণী ছিলেন তাঁরা হলেন দেবকীপুত্র বাসুদেব-কৃষ্ণের ভক্ত, যাঁর কথা 'বিষ্ণু' ও 'নারায়ণ'-এর অবতার বলে একটি আরণ্যক গ্রন্থে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-ভক্তগণ নিষ্কাম কর্মব্রত ও ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন। এঁরা পাণিনিরও (যিনি বুদ্ধের পূর্ববর্তী) পরিচিত ছিলেন।

ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন ঃ "বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে সংরক্ষিত ঘটপণ্ডিত জাতকের কাহিনীকে কৃষ্ণ-ভিত্তিক আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পালিভাষায় কৃষ্ণকে 'কন্‌হ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।... জাতকের মতে কৃষ্ণ উত্তর মথুরার অধিপতি মহাসাগরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপসাগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উত্তরাপথের অসিতাঞ্জন নগরের অধিপতি মহাকংসের কন্যা দেবগব্ভা ছিলেন উপসাগরের পত্নী কন্‌হের মাতা। দেবগব্ভার 'নন্দগোপা' নামে এক দাসী ছিল। মহাকংসের পুত্র কংস সম্পর্কে দৈববাণী ছিল যে, দেবগব্ভার এক পুত্রের হাতে তার মৃত্যু ঘটবে। দেবগব্ভার পুত্র জন্মানো মাত্র নন্দগোপা সে-সন্তানকে নিজের গৃহে অপসারণ করে নিজের এক কন্যাকে

৭৩ কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৫৩২-৫৩৩
৭৪ ঐ, বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্ন সিংহের আক্ষরিক অনুবাদ অনুসরণ করেছেন বলে গ্রন্থমধ্যে বলেছেন।
৭৫ ঐ ৭৬ Advanced History of India, p. 79

দেবগন্ভার সন্তান-রূপে পালন করতেন।... ঘটনাচক্রে কংস জানতে পারলেন... এরা দেবগন্ভার সন্তান। এই সংবাদ শ্রুতিগোচর হলে কংস ভগিনীর পুত্রদের স্বসমীপে আমন্ত্রণ জানালেন। এই আমন্ত্রণলাভের পর তারা নগরে উপস্থিত হয়। সেখানে তাদের হত্যা করবার জন্য প্রেরিত দুই কুস্তিগীর চানুর ও মুষ্ঠিককে হত্যা করে বাসুদেব শেষ পর্যন্ত চক্রের দ্বারা কংসের মস্তক ছিন্ন করে দেন। এরপর তাঁরা দ্বারাবতীর রাজ্য অধিকার করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

"যদুকুলের পরস্পর হানাহানি ও শ্রীকৃষ্ণের এক ব্যাধের শরাঘাতে মৃত্যুর উল্লেখও এই জাতকে পাওয়া যায়।"[৭৭]

এই জাতকে একথাও আছে যে, বাসুদেব 'জাম্ববতী' নামক এক চণ্ডালকন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁকে প্রধানা মহিষীর মর্যাদা দেন। জাতক গ্রন্থে পিতামাতার নাম ও দু-একটি ঘটনা অন্যরকম হলেও মূল কাহিনী সেই একই পুরাণ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনী। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় সেজন্য সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—"বৌদ্ধসমাজে বাসুদেব কৃষ্ণের সম্পর্কে ব্যাপক পরিচিতি ছিল।"[৭৮] সুতরাং এ-সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, কৃষ্ণ বুদ্ধ-পরবর্তী কালের হতে পারেন না। আগে জাতকে কৃষ্ণের কথা লেখা হলো, তার পরবর্তী কালে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটল—এ তো আর হতে পারে না।

মহাভারতের ঘটনার কাল ও মহাভারত সঙ্কলনের কাল

রবীন্দ্রনাথের মতে, মহাভারতের ঘটনা যখনকার, আদি মহাভারত সেই কালে রচিত হয়। আর জনশ্রুতিবহুল মহাভারত সঙ্কলনের কাল হলো বুদ্ধের পরবর্তী কাল। ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখেছেন যে, আদি মহাভারতের নাম ছিল 'ভারত', যার মধ্যে ভারত-যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত হয়েছিল এবং তা এত বৃহদাকার, এত জনশ্রুতিবহুল ছিল না। এই পরবর্তী কালের 'মহাভারত' সঙ্কলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ "কী বা কোন্ জিনিসটা আমাদের, চারিদিকের বিশিষ্টতার ভিতর হইতে এইটিকে উদ্ধার করিবার এক মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহ্নিত করিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধসমাজের যোগে ভারতবর্ষ দূরদূরান্তরে এমন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, সে আপনার কলেবরটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পারিতেছিল না। এইজন্য আর্য জনশ্রুতিতে প্রচলিত কোন পুরাতন রাজচক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্যসীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সত্তাকে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। তাহার পরে সামাজিক প্রলয় ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলি খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়েই সংগ্রহকর্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে, পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। কোথায় আর্যসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা, ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন।

"সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন।... যাহা আর্যসমাজের পুরাতন বাণী, যাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ও এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।... আসল কথা, যে-জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোন একটি দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্র স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি নির্ণয় করা কঠিন হয়।"[৭৯]

রবীন্দ্রনাথ এসম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ "যেমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন তেমনি একটি ধারাবাহিক পরিধিসূত্রও তো চাই—সেই পরিধিসূত্রই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আরেক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি একত্র করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজের প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এইসঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন 'মহাভারত'। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্যজাতির ইতিহাস আর্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা সুসঙ্গত, কিছু বা পরস্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে। এই মহাভারতের সংহত জ্যোতিই গীতা।"[৮০] অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ একথা বলেননি যে, এই মহাভারত বা গীতা নতুন রচনা। যা ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত—এ তারই সঙ্কলন মাত্র। কিন্তু গীতা যে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়মত পোষণ করেন দেখা যাচ্ছে। তাঁর উদ্ধৃত বক্তব্যের শেষ পঙ্ক্তিটিতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকট।

গীতা, বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম—আরো প্রসঙ্গ

গীতায় প্রথম দুটি অধ্যায়ে অর্জুন বৌদ্ধধর্মের অহিংসা মন্ত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, আর কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের যত প্রত্যয়—যুদ্ধ, স্বর্গ-নরক, আত্মার অস্তিত্ব, অমরত্ব, বর্ণধর্ম প্রভৃতি সবকিছু ঈশ্বরের অবিসংবাদী বাণী বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেগুলি নাকি বৌদ্ধধর্মের ওপর চাপান—এ-মতটি আজকের বস্তুবাদী ঐতিহাসিকদের অত্যন্ত প্রিয়।

অবশ্যই তাঁদের উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, গীতা বৌদ্ধধর্ম-পরবর্তী কালের রচনা এবং বৌদ্ধধর্মকে হটিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রচিত। কৃষ্ণ ঐতিহাসিক চরিত্রই নয়, শঙ্করাচার্য প্রমুখ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, এ তাঁদেরই সৃষ্টি।

বিচার করে দেখা যাক এ-অভিযোগ কতদূর সত্য।

প্রথম কথা, গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন একবারও বুদ্ধের নাম করেননি। অর্জুন বলেছেন, আত্মীয়-মায়ার কথা এবং যুদ্ধের ফলে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হলে কিরূপ সামাজিক

---

৭৭ ভারত-সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ, পৃঃ ২৫৪ ৭৮ ঐ ৭৯ ইতিহাস, পৃঃ ৩৮-৩৯ ৮০ ঐ, পৃঃ ৩৯

সঙ্কট উপস্থিত হবে, সেই কথা। অর্থাৎ যা হলো ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই প্রত্যয়ের কথা, তা নিয়েই দুর্ভাবনা প্রকাশ করেছেন তিনি।

তাছাড়া ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ অর্জুনের মনে অহিংসার কথা মনে হওয়াটা অত্যন্ত তাৎক্ষণিক ব্যাপার। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি শ্লোকে তিনি বলছেন ঃ আমি যুদ্ধকালে কী করে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করব? (৪) কিন্তু তিনিই উদ্যোগপর্বের অন্তর্গত উলুকদূতাগমন-পর্বাধ্যায়ে দুর্যোধন-প্রেরিত দূত শকুনিপুত্র উলুককে বলছেন ঃ "উলুক! দুর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে যুদ্ধে নামিয়ে মনে করছ, আমরা দয়াবশে তাঁকে মারব না। যাঁর ভরসায় তুমি গর্ব করছ সেই ভীষ্মকে আমি প্রথম বধ করব।"[৮১] আবার যুদ্ধযাত্রার প্রাক্ সন্ধ্যায় গুপ্তচরদের মুখে কৌরবপক্ষীয় মহাবীরদের শৌর্যবীর্যের কথা শুনে যুধিষ্ঠির যখন বিষণ্ণ হয়েছেন, তখন অর্জুন তাঁকে বলছেন ঃ "কৌরবপক্ষীয় অস্ত্রবিশারদ যোদ্ধারা নিজেদের সম্পর্কে যা বলেছেন তা সত্য, কিন্তু আপনি মনস্তাপ দূর করুন। আমি বাসুদেবের সহায়তায় একাকী নিমেষমধ্যে ত্রিলোকসংহার করতে পারি।"[৮২] এই উক্তি-দুটির মধ্যে পূজ্য পিতামহ ভীষ্মকে তিনি বধ করতে পারবেন না—এমন মনোভাব বা আত্মীয়-বধে তাঁর কোন অনীহার প্রকাশ তো দেখা যাচ্ছে না। অহিংসা বা করুণার ছিটেফোঁটাও তাঁর এই দুটি উক্তির মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পরও যখন দুর্যোধনের বিশাল সৈন্য-সমাবেশ দেখে যুধিষ্ঠির পুনর্বার বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন, তখনো অর্জুন তাঁকে পুনরায় আশ্বস্ত করে বললেন ঃ "মহারাজ, সত্য অ-নিষ্ঠুরতা ধর্ম ও উদ্যম দ্বারা যে জয়লাভ হয়, বলবীর্য দ্বারা তেমন হয় না। আপনি সর্বপ্রকার অধর্ম ও লোভ ত্যাগ করে, নিরহঙ্কার হয়ে উদ্যম সহকারে যুদ্ধ করুন, যেখানে ধর্ম সেখানে জয় হবেই।"[৮৩]

এখানেও অর্জুনের যুদ্ধের ব্যাপারে কোনরূপ অনীহা দেখা যাচ্ছে না, বরং যথেষ্ট ইচ্ছা ও উদ্যম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তে যেই তাঁর রথ উভয় সেনার মাঝখানে রাখা হলো, তৎক্ষণাৎ তিনি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত বৌদ্ধ হয়ে পড়লেন—এও কি একটা কথা হলো? আসলে অর্জুন সেই মুহূর্তে শত্রুসেনার একেবারে মুখোমুখি হয়ে উপলব্ধি করলেন তাঁকে কি ভয়ানক প্রাণপাত করতে হবে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মনে প্রবল অনীহা জাগল, কারণ পাণ্ডবদের যুদ্ধজয় সম্পূর্ণরূপে তাঁর ওপর নির্ভর করছিল। তিনি সেই মুহূর্তে অনুভব করলেন যে, এই বিশাল সেনামণ্ডলী, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ মহারথিগণের বিনাশ—এসকল তো তাঁকেই সম্পন্ন করতে হবে! এতটা কি পারবেন? এ-মনোভাব যে কাপুরুষোচিত, তা তিনি জানতেন। তাই তাকে আত্মীয়-মায়া, বর্ণসঙ্করের ভয় ইত্যাদি নানা কথার দ্বারা ঢাকতে চাইলেন।

কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণধী শ্রীকৃষ্ণ তা বুঝে ফেললেন এবং সেইজন্য সখা অর্জুনকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন ঃ "অর্জুন, এই সঙ্কটকালে আর্যগণের অযোগ্য, স্বর্গগতির প্রতিবন্ধক ও অযশস্কর এই মোহ তোমার মধ্যে কোথা থেকে এল? হে পার্থ, তুমি ক্লীবত্বপ্রাপ্ত হয়ো না, এই কাপুরুষতা তোমায় শোভা পায় না, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা দূর কর। যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।" (গীতা, ২।২-৩) ততক্ষণ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়া অর্জুন সত্যিই আত্মীয়-মায়ায় মোহগ্রস্ত হয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি কৃষ্ণের উপরি উক্ত তিরস্কার সত্ত্বেও বলতে লাগলেন ঃ "মহানুভব গুরুজনদের বধ করে ইহলোকে রাজ্যলাভ অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। কারণ, গুরুজনদের বধ করে যে অর্থকাম ভোগ করব, তাতো হবে তাঁদের রুধিরলিপ্ত।" (ঐ, ২।৪-৮) কৃষ্ণ তখন কঠোরতর ভাষায় তিরস্কার করে বললেন ঃ "যাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তুমি তাদের জন্য শোক করছ আবার বড় বড় কথা বলছ?" (ঐ, ২।১১)

অর্থাৎ কৃষ্ণ অর্জুনের মনোভাবকে মোহ ও কাপুরুষতা আখ্যা দিলেন। এ নিয়ে কৃষ্ণকে প্রচুর ভুল বোঝা হয়েছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অর্জুনের মনোভাবকে করুণা বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁকে এজন্য উচ্চ প্রশংসা করেছেন। বেশির ভাগ আধুনিক সমালোচক ও অনুবাদক এব্যাপারে কৃষ্ণ-নিন্দায় মুখর। কৃষ্ণ যুদ্ধবাজ, রক্তপাতে আগ্রহী ইত্যাদি তাঁদের কথা। এ-যুদ্ধে কৃষ্ণের কী লাভ? তা কেউ বিচার করে দেখেন না।

এবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আলোকপাত করেছেন। কেন কৃষ্ণ এরূপ করলেন? বিবেকানন্দ নিজেই প্রশ্নটি তুলেছেন ঃ "Why is he (Krishna) goading Arjuna to fight?" নিজেই উত্তর দিচ্ছেন ঃ "Because it was not that the disinclination of Arjuna to fight arose out of the overwhelming predominance of pure Sattva Guna; it was all Tamas that brought on this unwillingness."[৮৪] অর্থাৎ অর্জুন মোহে আবিষ্ট হয়েছেন। আত্মীয়-মায়া আর করুণা এক জিনিস নয়। আত্মীয়-মায়া তমোগুণ-সঞ্জাত দুর্বলতামাত্র, করুণা সত্ত্বগুণ থেকে জাত হয়। আর তমোগুণ কাপুরুষতা আনে, তাই তা মনুষ্যত্বধর্ম-বিরোধী। স্বামীজী আরো প্রাঞ্জল করে বলেছেন ঃ "But Arjuna was afraid, he was overwhelmed with pity. That he had the instinct and the inclination to fight is proved by the simple fact that he came to the battle-field with no other purpose than that."[৮৫] অর্জুন ভয় পেয়েছেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধ করতেই তো এসেছিলেন। না হলে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন কেন? ভয় পাওয়ার লক্ষণগুলি অর্জুন নিজেই ব্যক্ত করছেন ঃ "(হে কৃষ্ণ,) যুদ্ধেচ্ছু এইসকল স্বজনদের সম্মুখে দেখে আমার শরীর কাঁপছে, গাণ্ডীব খসে পড়ছে।" (ঐ, ১।২৮-২৯) এগুলি তো

৮১ মহাভারত—রাজশেখর বসু অনূদিত, পৃঃ ৩৬৪ ৮২ ঐ, উদ্যোগপর্ব ৮৩ ঐ, ভীষ্মপর্ব, পৃঃ ৩৭৮

৮৪ Complete Works, Vol. IV, p. 108 ৮৫ Ibid.

পরিষ্কার ভয় পাওয়ারই লক্ষণ। মহাবীর অর্জুন, তবুও কাপুরুষতা ও ক্লীবত্ব তাঁকে অধিকার করেছে। স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলছেন ঃ "Many a time comes when we want to interpret our weakness and cowardice as forgiveness and renunciation.

"There is a conflict in Arjuna's heart between his emotionalism and his duty.... It is self-hypnotisation. We are under the control of our [emotions] like animals...

"Now Arjuna is under the control of this emotionalism. He is not what he should be—a greater self-controlled, enlightened sage working through the eternal light of reason."[৮৬]

অর্থাৎ আমাদের জীবনে এরকম অনেকসময় আসে যখন আমরা দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ভুল করে ক্ষমা ও ত্যাগ বলে অভিহিত করি। অর্জুনের হৃদয়ে ভাবাবেগ ও কর্তব্যের মধ্যে একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। তিনি এখানে পশুপক্ষীর ন্যায় আবেগে অভিভূত। আত্মসংযমী জ্ঞানবান ঋষি, যিনি যুক্তির শাশ্বত আলোকে আলোকিত হয়ে কাজ করেন, অর্জুন সেরকম আচরণ করছেন না।

সত্যই তো অর্জুন সব বিস্মৃত হয়েছেন। ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁরা সংগ্রাম করছেন, সেখানে ব্যক্তিগত লাভক্ষতি, রাজ্যলাভ—এসবই গৌণ। ভুলে গিয়েছেন দ্রৌপদীর সেই অমানবিক লাঞ্ছনার কথা, পাপমতি দুর্যোধন প্রভৃতির সমস্ত দুষ্কর্ম। তিনি সত্ত্বগুণ-প্রসূত বিশুদ্ধ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে তমোগুণ-জাত ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছেন, ফলে মনুষ্যত্ব-বিরোধী কাপুরুষতা, ভয় ও ক্লীবত্বের বশবর্তী হয়েছেন। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ যুক্তিপরায়ণ কৃষ্ণ এসব বুঝতে পেরেই কঠোর তিরস্কার করে বলেছেন ঃ "ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়ো না অর্জুন।" অর্থাৎ—"ওঠো জাগো, মানুষ হও, মানুষের মতো আচরণ কর।" স্বামীজীর মতে এই একটি শ্লোকের মধ্যেই গীতার মর্মবাণী ধ্বনিত হয়েছে ঃ "In this one sloka lies imbedded the whole Message of the Gita."[৮৭] সুতরাং বৌদ্ধধর্মের ওপর হিন্দুধর্মের চাপানোর প্রশ্নই এখানে অবান্তর। এই আত্মীয়-মায়াকে কি ভগবান বুদ্ধই করুণা বলতেন? তিনি নিজে কী আচরণ করেছেন? পিতামাতা, পত্নী, সদ্যোজাত শিশুপুত্র—কারো প্রতি কি তিনি মায়া দেখিয়েছেন? তিনি গৃহত্যাগ করবার পর তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মহামুনি কাশ্যপের আশ্রমে (যেখানে তিনি তখন অবস্থান করছিলেন) তাঁদের পুরোহিত প্রেরিত হন। এবং এই পুরোহিত তাঁকে যখন পিতামাতা ও পত্নীর শোক আর কাতরতার কথা বলে গৃহে ফিরে আসার জন্য বললেন, বুদ্ধ তখন উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "সূর্য যদি ভূপতিত হয়, পৃথিবী যদি তার কক্ষচ্যুত হয়, হিমাচল যদি তার অটলত্ব ত্যাগ করে তবুও অকৃতার্থ আমি গৃহে ফিরে যাব না।"[৮৮] তিনি জানতেন যে, মৃত্যু অনিবার্য, এই মরজীবনে প্রিয়-বিচ্ছেদ ঘটবেই। সেজন্য আত্মীয়-মায়ায় তিনি অভিভূত হননি, নিকটতম আত্মীয়দেরও তিনি কোন করুণা দেখাননি। ঠিক একই কথা গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে চেয়েছেন ঃ "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।"(ঐ, ২।২৭) মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, জন্মালেই মরতে হবে সকলকেই, সুতরাং ক্ষত্রিয় হিসাবে তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম—ন্যায়ধর্ম রক্ষা থেকে বিচ্যুত হবে কেন?

মহাভারতের যুদ্ধের শেষে শোকে মুহ্যমান ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর একই কথা বলছেন ঃ "মহারাজ, শুয়ে আছেন কেন? উঠুন, সব প্রাণীর গতিই এই। মানুষ শোক করে মৃতজনকে ফিরে পায় না, শোক করে নিজেও মরতে পারে না। সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় হয়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্য স্থানেই চলে যায়, তারা আপনার নয়, আপনিও তাদের নন, তবে কিসের খেদ? সহস্র সহস্র শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিন মূঢ় লোককে অভিভূত করে, কিন্তু জ্ঞানিজনকে করে না। কুরুশ্রেষ্ঠ, কালের কেউ প্রিয় অপ্রিয় নেই, কাল কারো প্রতি উদাসীনও নয়, কাল সকলকেই আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।"[৮৯]

দেখা যায় বুদ্ধও প্রায় একই কথা বুঝিয়েছেন কিশা গোতমীকে। কিসা গৌতমী মৃত পুত্রকে বহন করে এনেছিলেন বুদ্ধের কাছে, প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তাকে প্রাণদান করার জন্য। বুদ্ধ প্রথমে গৌতমীকে এমন কোন গৃহ থেকে এক মুষ্ঠি সরিষা আনতে বলেন যে-গৃহে কখনো মৃত্যু প্রবেশ করেনি। সারাদিন দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরেও যখন এরকম একটিও গৃহ পেলেন না গৌতমী, তখন তিনি উপলব্ধি করলেন মৃত্যু অনিবার্য, তখন পুত্রের মৃতদেহ পরিত্যাগ করে তিনি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ভিক্ষা করলেন। গীতা বা মহাভারতের শিক্ষা এবং বুদ্ধের শিক্ষা এখানেও এক।

তাছাড়া বৌদ্ধধর্মের ওপর চাপানোর আছে কী? আত্মার অমরত্বে ও জন্মান্তরবাদে বৌদ্ধধর্মেও বিশ্বাস আছে। স্বর্গ-নরক, দেব-দেবী—এসবই প্রচুর বৌদ্ধধর্মে আছে। আর 'নির্বাণ' ও 'মুক্তি'—এ-দুটি কথা তো সমার্থক। আর তাহলে চাপানোর কী রইল বৌদ্ধধর্মের ওপর? বৌদ্ধরা ঈশ্বর মানেন না? খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, বুদ্ধই তাঁদের ঈশ্বর, বুদ্ধ ঠিক সেইভাবেই তাঁদের কাছে পূজা পেয়ে থাকেন। আর হিন্দুরা তো তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলেই পূজা করে থাকেন। এই কি মত চাপানোর লক্ষণ, না গ্রহণের? এটাই হিন্দুধর্মের tradition (ঐতিহ্য)—চাপানো নয়, গ্রহণ। শঙ্করাচার্যের কালে যা গ্রহণ করার তা গ্রহণ করা হয়েছিল, যা বর্জন করার তা বর্জন করা হয়েছিল। [ক্রমশ]

৮৬ Complete Works, Vol. I, pp. 459-460 ৮৭ Complete Works, Vol. IV, p. 110

৮৮ বুদ্ধচরিত—অশ্বঘোষ, অনুবাদ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী) ৮৯ মহাভারত, স্ত্রীপর্ব

জাতীয় আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ

নিমাইসাধন বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

কোন কোন সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও অভিমত বিতর্ক সৃষ্টি এবং সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিকদের ক্ষুব্ধ করলেও বিপ্লবী এবং বিপ্লব-আন্দোলনের ওপর তাঁর কবিতা ও গানের সামগ্রিক প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁদের শক্তি ও মনোবলের এক প্রধান উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উল্লাসকর দত্ত, সতীশ দে, প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রমুখ বিপ্লবীরা তাঁর অনুপ্রেরণার উল্লেখ করেছেন। 'মাস্টারদা' রবীন্দ্রনাথের বই হাতে পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন। ভগৎ সিং জেলের 'কনডেমড সেল'-এ ফাঁসির অপেক্ষায় থাকার সময় লেখা 'নোটে' রবীন্দ্রনাথের লেখার উল্লেখ করেছেন। কবির ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রাজবন্দীরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব, তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিপুল অনুপ্রেরণা সম্পর্কিত বহু তথ্য ও মননশীল আলোচনা রয়েছে চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ' গ্রন্থে। বিপ্লবীদের অনেকেই তাঁদের কারাজীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। ঐ কারাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। (দ্রঃ বাংলা কারাসাহিত্য—আদিত্য চৌধুরী)

জাতীয় কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও অনুপ্রেরণার গুরুত্ব ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। মহাত্মা গান্ধী ও 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পারস্পরিক গভীর শ্রদ্ধার (গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রশ্নে মতপার্থক্য সত্ত্বেও) সম্পর্ক সুবিদিত। এই বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যেও ছিল মধুর সম্পর্ক। জওহরলাল নেহরুও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। কবি জওহরলালকে তাঁর তারুণ্য ও প্রাণশক্তির জন্য 'ঋতুরাজ' বলে সম্বোধন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন 'দেশনায়ক' রূপে। গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ যখন দেখা গিয়েছিল (ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময়) তখন জওহরলাল ছিলেন গান্ধীজীর পক্ষে। কংগ্রেসের মধ্যে ঐ চরম সঙ্কটের সময় রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ও আশীর্বাদ ছিল সুভাষচন্দ্রের দিকেই। ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার সময় গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথ-জওহরলাল-সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক, মতামত বিনিময় এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এক পৃথক আলোচনার বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধে ঐ প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। (এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র' ও সমর গুহের 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থ-দুটি দ্রষ্টব্য।)

ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রাম সারা এশিয়া এবং আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। এই ক্ষেত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। নেপালচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাকে কবির 'দেশমানব তথা বিশ্বমানব'-এর দৃষ্টিকোণে দেখেছেন। তাঁর পাঁচ খণ্ডের তথ্যসমৃদ্ধ 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি এই বিষয়ে এক মূল্যবান সংযোজন। পৃথিবীর সব দেশের, সব মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বন্ধনমুক্তি, অন্যায় বৈষম্যের অবসানের জন্য রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ ও নৈতিক সমর্থন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ "সমস্ত পৃথিবীকে আমার দেশ বলে বরণ করে নিয়েছি।" প্রায় দু-দশক পরে বিশ্বভারতীতে 'মানব স্বাধীনতা' বিষয়ে একটি ভাষণে (২০ জানুয়ারি ১৯৩৭) তিনি বলেন ঃ "একমাত্র ভারতবর্ষই যে স্বাধীনতা- লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, তাহা সত্য নহে; স্বাধীনতা-সংগ্রাম এখন সারা জগতেই চলিয়াছে।... আমরা আজ যে-স্বাধীনতার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, সে-স্বাধীনতার স্বরূপ কি হইবে?... যে-স্বাধীনতায় সমগ্র সমাজের কল্যাণকর জটিল সমস্যাসমূহের মীমাংসা না হয় এবং যাহার মধ্যে ঐসকল সমস্যার স্থান না পায় সে-স্বাধীনতাকে প্রকৃত আদর্শ স্বাধীনতা বলিতে পারা যায় না।" তিনি বিশ্বাস করতেন, স্বাধীনতায় সকলের সমান অধিকার। প্রত্যেকেরই উন্নত জীবনযাপন দাবি করার অধিকার আছে। মানবজীবনের এই হলো পরিপূর্ণ আদর্শ।

বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে অন্য একটি ঘটনার কথা মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্কমুক্ত রাখার চেষ্টা করলেও তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না।

বিশ্বভারতীর আদর্শ, লক্ষ্য, পঠন-পাঠন, দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষকদের চিন্তাধারা এবং সর্বোপরি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি, জীবন ও সাহিত্য স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও দেশ-প্রেমিকদের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছিল। পুলিস ও প্রশাসন বিশ্বভারতীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত (যেমন দেখত রামকৃষ্ণ মিশনকে)। ঐ সন্দিগ্ধ দৃষ্টির কারণ বোঝার জন্য ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

"কবির যেদিন কাশী রওনা হওয়ার কথা—৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫—সেদিন বিশ্বভারতী দেখতে এলেন বাংলার লাটসাহেব স্যার জন আন্ডারসন। আন্ডারসন জবরদস্ত লাট, বাংলাদেশের বিপ্লবীদের দমন করেছেন বলে সরকারি মহলে তাঁর খুব খ্যাতি ও প্রতিপত্তি—আয়ারল্যান্ডের সন্ত্রাসবাদীদের তিনি নাকি ইতিপূর্বে শায়েস্তা করে এসেছিলেন। এমন দোর্দণ্ড লাটসাহেব আসছেন বলে শান্তিনিকেতন পুলিস ও গুপ্তচরে ছেয়ে গেল। কদিন পূর্বে জেলার পুলিস বিভাগের কর্তা এসে বলেছিলেন যে, লাটসাহেবের নির্বিঘ্নতার অনুরোধে তাঁরা কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে আটকাতে চান। কবি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তাহলে আপনারা লাটসাহেবের অভ্যর্থনা করুন, আমি এখান থেকে চললাম। শেষপর্যন্ত ব্যবস্থা হলো যে, গভর্নরের আগমনের দিন আশ্রমে কেউ থাকবে না; লাটসাহেব এসে শূন্যপুরী দেখে যান। ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব, ছাত্র অধ্যাপক সকলেই শ্রীনিকেতনের মেলায় চলে গেলেন। বিভাগীয় অধ্যক্ষরা থাকলেন পুলিসের লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ নিজ বিভাগে লাটসাহেবকে অভ্যর্থনা করতে। আন্ডারসন সাহেব আশ্রম দেখে গেলেন। সেদিন অনেকেরই 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তির কথা মনে হয়েছিল।" (রবীন্দ্র-জীবনকথা, পৃঃ ১৬৫-১৬৬)

সারা এশিয়ার জাগরণ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মানব-অধিকার, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন, সর্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার এবং প্রসার—প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এক বড় ভূমিকা ছিল। সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছিলেন। ফ্যাসিস্ট ইতালির আবিসিনিয়া গ্রাস ও তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাগ্রহণে League of Nations-এর ব্যর্থতার বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন তাঁর 'আফ্রিকা' কবিতাটি। ঐ কবিতার একটি ছত্র কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের (Black Americans) ওপর লেখা বিশ্বে সাড়া-জাগানো ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস 'Roots'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

"এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।"

অন্যায়, অত্যাচার ও উগ্র জাতীয়তাবোধে উন্মত্ত হয়ে অন্য দেশের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাতে রবীন্দ্রনাথ কখনো দ্বিধা করেননি। এর ফলে তাঁর ব্যক্তিগত খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও বিদেশে সমাদরের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। গুণগ্রাহী বন্ধুদের তিনি ক্ষুব্ধ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু সেদিকে রবীন্দ্রনাথ ভ্রূক্ষেপ করেননি। "অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে"—তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা শুধুমাত্র তাঁর কবিতায় নয়, নিজের জীবনেও ব্যক্ত হয়েছিল। জাপানের অগ্রগতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। জাপানে তিনি বিশেষ সমাদর ও সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই জাপান যখন চীনের ওপর আক্রমণ করে, তখন রবীন্দ্রনাথ ঐ আগ্রাসী নীতির প্রকাশ্য কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। খোদ টোকিওতে দেওয়া একটি ভাষণে তিনি জাপানীদের উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা ও জাপানকে সতর্ক করে বলেছিলেনঃ তোমরা যদি শান্তি চাও তবে 'নেশন-রাক্ষস'-এর বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াই করতে হবে। জাপানী কবি য়োনে নোগুচি রবীন্দ্রনাথের ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। যে-রবীন্দ্রনাথকে জাপান শ্রদ্ধা করে, সমাদর করে সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ঐরকম কঠোর নিন্দা করায় তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—তিনি জাপানীদের ভালবাসেন। কিন্তু তিনি চীনের বিরুদ্ধে তাদের অন্যায় আক্রমণের জয় কামনা করতে অক্ষম। অনুশোচনার ভিতর দিয়ে তাদের 'প্রায়শ্চিত্ত হোক'—এই কামনা তিনি করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বে কোরিয়ার ওপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও তার বিরুদ্ধে কোরিয়ার মানুষের সংগ্রামকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে কোরিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি বলে দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোরিয়ার সংগ্রামী মানুষদের অভিনন্দন জানিয়ে একটি কবিতায় লিখেছিলেনঃ

"In the golden age of Asia
Korea was one of its lamp-bearers
And that lamp is waiting to be lighted
once again
For the illumination of the East."

('Rabindranath Tagore in Perspective'—Yang-Shik Kim, 125th Commenoration Volume, Visva-Bharati, p. 217)

বর্তমান আলোচনার সূচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রকৃত 'জাতীয় আন্দোলন' শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তির লক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার ব্যাপ্তি একটি দেশ ও জাতির জীবনের সকল ক্ষেত্রে। ঐ আলোচনার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধে না থাকলেও চিন্তা, ভাবা ও চিত্তের যে-স্বাধীনতার কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছিলেন সারা জীবন

ধরে, তার দু-একটির উল্লেখ না করলে মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর চিরকালীন আত্মিক বন্ধনের এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটুকুও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দেওয়ার জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন একটি শর্তে। শর্তটি ছিল—তিনি বাঙলায় ভাষণ দেবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ইতিপূর্বে সমাবর্তনে ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষায় ভাষণ হয়নি। শ্যামাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই সমাবর্তন-ভাষণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের সূচনায় বলেছিলেন ঃ "আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপনার ছাত্রদের মাঙ্গল্যবিধানের শুভকার্যে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চবেদিতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হলো।... ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল।" ভাষণের সমাপ্তিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন ঃ

"দূর কর চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর কর মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদা বিসর্জন,
চূর্ণ কর যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বাতাসে।"

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ ছিল সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক আঘাত, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কয়েক দশক পরে যখন ভাষা-আন্দোলনের শেষ পর্যায় ও চূড়ান্ত সাফল্যের পরিণতি-রূপে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল তখন দুই বাংলার মানুষ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছিল সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞচিত্তে।

রবীন্দ্রনাথ ভরসা করেছিলেন যুবশক্তিকে। সেই যুবশক্তি তরুণদের আহ্বান করেছিলেন তাঁর শেষজীবনের (১ এপ্রিল ১৯৩৯) এক অনন্য কবিতায় ঃ

"তোমরা এস তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ ঘোষণাবাণী জাগাও বীর রবে

*

ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়
অসম্মান নিয়ো না শিরে, ভুলো না আপনায়।
মিথ্যা দিয়ে, চাতুরী দিয়ে রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে করো না পরিহাস।
বাঁচাতে নিজপ্রাণ
বলীর পদে দুর্বলেরে করো না বলিদান।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জন্মদিনের অবিস্মরণীয় ভাষণ 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ ঘোষণা করেছিলেন, বহু আশা নিয়ে "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আজ আমার বিদায়ের দিনে সেই বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দরিদ্র লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।"

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের এই ভাষণ, রচনা ও কবিতাগুলি পড়তে পড়তে একজনের কথা মনে আসে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিবেকানন্দের বাণী "স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ" দেখিয়েছিল। তাই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ "একে বলে বাণী।" স্বামীজীর এই বাণী "সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন"। 'সভ্যতার সঙ্কট' ভাষণের শেষে কবি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, পরিত্রাণকর্তার জন্ম হবে "আমাদের এই দরিদ্রলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে"। বহুদিন পূর্বে স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী (না আশা?) করেছিলেন ঃ "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" জীবনের শেষ প্রহরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে স্বামী বিবেকানন্দ কী বেশি যাতায়াত করেছিলেন? [সমাপ্ত] ❑

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নেপালচন্দ্র মজুমদার, পাঁচ খণ্ড
২ রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ—চিন্মোহন সেহানবীশ
৩ রবীন্দ্র-জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চার খণ্ড
৪ রবীন্দ্রজীবন-কথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৫ জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ—প্রফুল্লকুমার সরকার
৬ রবীন্দ্রনাথ ঃ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব—অরবিন্দ পোদ্দার
৭ বাংলা কারাসাহিত্য—আদিত্য চৌধুরী
৮ Banned Bengal (নিষিদ্ধ বাঙলাসাহিত্য)—শিশির কর
৯ রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম পর্যায়—জলি সেনগুপ্ত
১০ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র—নিমাইসাধন বসু
১১ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র—সমর গুহ
১২ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ (প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিমলকুমার ঘোষ সম্পাদিত)
১৩ Rabindranath Tagore: A Biography—Krishna Kripalani
১৪ Indian Awakening and Bengal—Nemai Sadhan Bose

প্রসঙ্গ বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের সংখ্যাবৃদ্ধি

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

[নিবন্ধটি আন্তর্জাতিক প্রবীণ-বর্ষ (১৯৯৮-১৯৯৯) উপলক্ষ্যে নিবেদিত]

"Grow old along with me!
The best is yet to be,
The last of life, for which the first was made;
Our times are in His hand
Who saith 'A whole I planned,
Youth shows but half; trust God :
See all nor be afraid!' "

—Robert Browning

'আয়ুষ্মান ভব।' একসময় কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের এই ছিল আশীর্বাদ। দীর্ঘজীবন লাভ তখন আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। মনে পড়ে বাইবেলের জেনেসিস-এ সেই মিথিউজিলার কথা—যিনি বেঁচেছিলেন ৯৬৯ বছর, কিংবা জেরেডের কথা—যাঁর আয়ুষ্কাল ছিল ৯৬২ বছর। মহাপ্লাবন পেরিয়ে এসে পৃথিবীতে প্রাণের ধারা বহমান রেখেছিলেন যিনি সেই নোয়াও বেঁচেছিলেন ৯৫০ বছর। আর 'প্রথম আদি' আদমের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৩০ বছর। কিন্তু এঁদের সকলকেই টেক্কা দিয়েছিলেন মহাভারতের সেই পরিচিত চরিত্র চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র যযাতি। হাজার বছর ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষায় পুত্র পুরুর কাছ থেকে অন্যায়ভাবে যৌবন ধার করেছিলেন তিনি। আসলে অনন্ত যৌবনের অন্বেষণে মানুষের চিরন্তন আকুতির সূচনা আবহমানকাল থেকেই। ইংরেজী কোষগ্রন্থ 'এনসাইক্লো-পিডিয়া ব্রিটানিকা'য় কোন কোন মাছ ও সরীসৃপ-সহ এমন কিছু প্রাণীর উল্লেখ রয়েছে যেগুলি আপাতভাবে অমর। কারণ, সেগুলি অনিয়ন্ত্রিত বাড়বৃদ্ধিতে সক্ষম। গ্যালাপাগোস বলে একরকম কচ্ছপের কয়েকশ বছর বা তারো বেশি টিকে থাকা বেশ স্বাভাবিক। গাছদের মধ্যে পাইন এবং রেডউড বাঁচে কয়েক হাজার বছর। আর ঝুরি নামাতে নামাতে বটগাছ সত্যিই 'অক্ষয়'। কিন্তু মানুষ? অমরত্ব অর্জন মানুষের কাছে অধরাই থেকে গেছে। তবু তার বেঁচে থাকার সাধ মেটে না। দার্শনিক সিসেরো (খ্রীস্টপূর্ব ১০৬-৪৩) লিখেছিলেন ঃ "No one is so old as to think he cannot live one more year."

বাইবেল বা মহাভারতের বহুশতবর্ষী চরিত্রের (super-centenarian) মতো না হলেও আশ্চর্যজনকভাবে পৃথিবীর কিছু প্রত্যন্ত প্রান্তে এই আধুনিক কালেও দীর্ঘতর আয়ুসম্পন্ন মানুষের সন্ধান মেলে। ইকুয়েডর ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের কিছু অসাধারণ দীর্ঘায়ু অধিবাসীর কাহিনী সত্তরের দশকে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে দারুণ কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল। ১৯৭৩ সালে সোভিয়েত সরকার জানিয়েছিল, বিশ্বের প্রবীণতম ব্যক্তি আজারবাইজানের শিরালি মিসলিমভ ১৬৮ বছর বয়সে মারা গেছেন। তিনি একাই নন, ঐ প্রদেশে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে ৬৩ জনই ছিলেন শতায়ু (যেখানে আমেরিকায় তখন এই হিসাবটা ছিল এক লাখে তিন)। আরো পরের দিকে জাঁ ক্যালমেন্ট নামে জনৈকা ফরাসী মহিলার কথা জানা যায়, যিনি ১২২ বছর জীবিত ছিলেন।

গত বছর 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকায় 'এজিং—নিউ আনসার টু অ্যান ওল্ড কোয়েশ্চন' শীর্ষক নিবন্ধে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল ঃ আমাদের জীবনের সীমারেখা কী? বার্ধক্যের সংজ্ঞাই বা আমরা স্থির করব কিভাবে? মানুষের আয়ু সর্বাধিক কত হতে পারে? এই সূত্রে জিজ্ঞাসা দেখা দেয় আরো। দীর্ঘ জীবন হলেই কি তা সুখের হবে? একজন মানুষের কতদিন বাঁচা উচিত ঠিক করে দেবে কে? প্রবীণরা—তা তাঁরা যত প্রিয়ই হোন না কেন—যদি বিদায় নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে বিশ্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবস্থা কী দাঁড়াবে? এসব বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও জনসংখ্যা-বিশারদরা রীতিমতো বিভ্রান্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং'-এর ডিরেক্টর রিচার্ড সুজম্যান বলেছেন, কেউ এব্যাপারে দৃঢ়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করলে তিনি হয় মিথ্যাবাদী, না হলে নির্বোধ। কারণ, প্রত্যাশিত আয়ু, স্বাস্থ্য, অক্ষম হয়ে যাওয়া এবং অবসর প্রাপ্তির বয়স সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রয়েছে প্রচুর। জনসংখ্যা সংক্রান্ত গণিতজ্ঞ জার্মানির 'ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট' এর জেমস ভপেলের মতে, চিরদিন কেউ বেঁচে থাকবে না ঠিকই, তবে আয়ুবৃদ্ধির ব্যাপারে জিনগত কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আধুনিক জীববিজ্ঞানী ও আয়ু-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেহকোষ বিভাজনের রহস্য উন্মোচন করা গেলে মানুষের পরমায়ু ১২০ বছর পর্যন্ত প্রলম্বিত করা সম্ভব।

নিবন্ধের গোড়ায় আমরা মূলত ব্যক্তিগত বয়োবৃদ্ধির (individual ageing) কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। তা পুরাণ বা সাহিত্যে আকর্ষণীয় কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। সমাজ বা দেশে তা চমকের সৃষ্টি করেছে। মৃত্যুকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা সেসম্পর্কে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্নও উসকে দিয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি নতুন সহস্রাব্দে যে-ঘটনাটি গোটা দুনিয়ায় সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসছে তা হলো প্রবীণদের সংখ্যাবৃদ্ধি (population ageing)।

বিগত ৫০ বছরে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি জায়গার কথা বাদ দিলে প্রায় সর্বত্র মানুষের গড়

আয়ু বাড়ছে। জাপান, ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়েতে প্রত্যাশিত গড় আয়ু দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮০ বছরে। আমাদের দেশে এই গড় প্রায় ৬২ বছর। তবে শিশু ও প্রসূতি-মৃত্যুর অস্বাভাবিক হার কমানো গেলে ভারতীয়দের গড় আয়ু বেড়ে ৭০ বছর বা তারো বেশি হতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বিষয়টি কিঞ্চিৎ সরল করে বলা যায়, পৃথিবীতে প্রতি মাসে ১০ লাখ নারী-পুরুষ পৌঁছে যাচ্ছে ৬০-এর কোঠায়। এমন চললে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে দাদু-ঠাম্মাদের সংখ্যা নাতি-নাতনিদের সংখ্যার তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কারণ, প্রত্যাশিত আয়ু (expectation of life) বাড়লেও সারা বিশ্বেই ক্রমাগত কমে চলেছে জন্মহার।

তৃতীয় বিশ্বের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ উন্নত দেশে অর্থনৈতিক প্রগতি এবং পুষ্টি, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে প্রচুর অর্থ লগ্নি করার ফলে প্রত্যাশিত আয়ুবৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই। তবু আর বছর দুয়েকের মধ্যে বিশ্বে মোট ৬০ কোটি জ্যেষ্ঠ নাগরিকের (senior citizen) জীবন ও স্বাস্থ্যের পরিচর্যা নিয়ে নীতিনির্ধারকরা দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। জনসংখ্যার চালচিত্র পালটে যাচ্ছে নাটকীয়ভাবে। ১৯৫০ সালেও প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ২০ কোটি। আর আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে তা লাফিয়ে লাফিয়ে ছয় গুণ বেড়ে দাঁড়াবে ১২০ কোটিতে।

আগামী দু-দশকের মধ্যে আমেরিকায় প্রতি চারজনের মধ্যে একজন এবং জাপানে মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশই হবে ষাটোর্ধ্ব। চীন, অস্ট্রেলিয়াতেও এক অবস্থা। আর এই মুহূর্তে বিশ্বের 'জ্যেষ্ঠতমের দেশ'-এর শিরোপা জুটেছে প্রাচীনত্বের গরিমা-ঋদ্ধ ইতালির ললাটে। সেখানে এখন জনসংখ্যার ২৩ শতাংশেরই বয়স ৬০ বছরের বেশি। অন্যদিকে অনধিক ১৫ বছর বয়সীদের সংখ্যা পৃথিবীতে ন্যূনতম—মাত্র ১৪ শতাংশ। ২০৩০ সালে ইতালিতে চাকরিরতদের সংখ্যাকে অনেক ছাপিয়ে যাবে পেনশন-ভোগীদের উপস্থিতি। রোমের স্যাপিয়েঞ্জা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যাবিদ আন্তোনিও গোলিনি মন্তব্য করেছেন, পরিস্থিতি যা আসছে তা সকলকে পাগল করে দেবে। কাজের লোকই তো কমে যাবে! তাহলে এত বয়স্ক মানুষের ভরণপোষণের জন্য পেনশন দেওয়া হবে কোথা থেকে? ২০২৫ সালেই ইতালি ও জাপানে 'সিনিয়র সিটিজেন'দের হার হবে বিশ্বে সর্বাধিক—৩৩ শতাংশ।

ক্রমবর্ধমান জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের চাপে আমাদের দেশেও বয়স্কদের বরাত পালটে যাচ্ছে অতি দ্রুত। স্বাধীনতার সময় প্রবীণ ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ। ৫০ বছর পরে ষাটোর্ধ্বদের সংখ্যা পৌঁছে গেছে ৭ কোটিতে। ২৫ বছর পরে তা ভয়াবহভাবে বেড়ে হবে ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ। মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ। সংখ্যার নিরিখে বিশ্বে তখন সর্বাধিক বয়স্ক মানুষের আস্তানা হবে এই ভারত।

'জনবিস্ফোরণ' (population explosion) শব্দটা বহু-চর্চিত হওয়ার সুবাদে সকলের চেনা। কারণ, পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন ঠেকেছে ৬০০ কোটিতে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে বয়স্কদের এমন উদ্বেগজনক সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে এখনো কেউ তেমন ওয়াকিবহাল নন। সমস্যার গুরুত্ব বোঝাতে বিশেষজ্ঞরা চয়ন করেছেন একটি নতুন শব্দ—'বয়োকম্প' (age quake)। 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর কেয়ারিং কমিউনিটিজ'-এর প্রধান ডায়ান ডেভিস বুড়িয়ে যাওয়া জনসংখ্যাকে তুলনা করেছেন ঘুমন্ত দৈত্যের সঙ্গে। তিনি বলছেন, প্রবীণদের তরফ থেকে বিপুল পরিমাণ সমস্যা ও প্রত্যাশার দুর্বহ চাপ আসবে। একটি টাইমবোমার মতোই তা সামাজিক পরিকাঠামোর ওপর প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়ে প্রচলিত সবকিছু তচনচ করে দেবে।

এই সমস্যা মোকাবিলা করে নতুন সহস্রাব্দে 'সব বয়সের জন্য সমাজ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৯৮ সালের ১ অক্টোবর থেকে ১৯৯৯ সালের ৩ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ-বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেছে। বয়সের ভারে বেসামাল পৃথিবীর প্রতি প্রথম চোখ পড়ে ১৯৮২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) আন্তর্জাতিক ভিয়েনা সম্মেলনে। এরপর বিষয়টি উঠে আসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে। ১৯৯২ সালের ১৬ অক্টোবর বিনা ভোটাভুটিতে সেখানে গৃহীত হয় 'বার্ধক্য সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র'। প্রবীণরা সমাজের বোঝা নন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁদেরও যে কিছু দেওয়ার আছে, তার স্বীকৃতি মেলে ঐ ঘোষণাপত্রে। তাতে যথারীতি আরো ভাল ভাল কথা ছিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল হতে হবে। বুড়োতে থাকার প্রক্রিয়া চলতে থাকে জীবনভর। তাই তার প্রতি তাচ্ছিল্য না করে বয়স্কদেরও দিতে হবে সমান স্বাধীনতা, মর্যাদা, পরিচর্যা, অংশগ্রহণ এবং আত্মতৃপ্তির সুযোগ। তাছাড়া জীবনচক্রের এই পর্যায় মেনে নেওয়া মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়রক্ষার অঙ্গ। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সরকারের টনক নড়াতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৯২ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এক দশক জুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধির বিশদ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

আবিশ্ব বয়োবৃদ্ধির অনিবার্য প্রভাব প্রথমেই দেখা যাচ্ছে সম্পদের ঘাটতির ওপর। বয়স্ক জনসংখ্যা এতই বাড়ছে যে, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আয়ের যোগান এবং পারিবারিক আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপ কিছুতেই তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এরকম আরো একটি সমস্যা এমন সময় উদয় হচ্ছে, যখন তা সামলানোর জন্য দেশ বা সমাজ কারোরই কোন আগাম প্রস্তুতি নেই। আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে পরে আসছি। তার আগে চট করে দেখে নেওয়া যাক রাষ্ট্রসঙ্ঘে যখন এসব সমস্যা নিয়ে প্রথাগত আলোচনা চলছে তখন ধনী দেশ আমেরিকার অন্দরে 'বুড়ো'দের ছবিটা কেমন।

শুনে অবাক হবেন না, গত বছর মে মাসে নিউ ইয়র্কে দুদিনের এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে মিলিত প্রতিনিধিরা প্রথমেই প্রস্তাব দেন, 'রিটায়ারমেন্ট' শব্দটাই মুছে দেওয়া হোক। কারণ, প্রতিদিনের উচ্চারণে 'অবসর' অহেতুক মনে করিয়ে দেয় জরা, দুর্বলতা ও মৃত্যুর অনুষঙ্গ। মার্কিন সমাজে তথাকথিত বয়স্কদের বর্ণনা করতে দরকার হয়ে পড়ে নতুনতর এক শব্দজুটি—'বেবি বুমার্স' (Baby Boomers)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জন্মানো প্রায় ৭ থেকে ৮ কোটি 'বেবি বুমার'রা এখন পঞ্চাশোর্ধ্ব। অথচ প্রবীণত্বের জড়িমা নেই তাঁদের দেহে-মনে। জন্ম, স্কুল, চাকরি ও অবসরের প্রচলিত ছক খাটে না এঁদের বেলা। ষাট ছুঁইছুঁই বা ষাট পেরনোরা নতুন করে কিছু শিখে আবার নতুন কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেই পছন্দ করেন। 'মধ্য বয়স্ক' না বলে এঁরা নিজেদের বলেন 'মধ্য যুবক'। মার্কিন বেবি বুমারদের পরিচয় পেলে শেক্সপীয়র নিশ্চয়ই 'As you like it' নাটকে Jacques-এর মুখে 'The seven ages of man' বর্ণনা করে সেই বিখ্যাত সংলাপ বসাতেন না, যার শেষটা এরকম :

"Last scene of all
That ends this strange eventful story
Is second childishness and mere oblivion
Sans teeth, sans eyes, sans taste,
Sans everything."

আমেরিকার স্বচ্ছলতা সেখানকার দন্তহীনদের 'টুথ ইমপ্ল্যান্ট'-এর সুবাদে এনে দিচ্ছে আধুনিক দন্তরুচিকৌমুদী। দৃষ্টিহীনরা ফিরে পাচ্ছেন নতুন চোখে তাকানোর সুযোগ। শুধু স্বাদগ্রন্থি জিইয়ে তোলাই বোধহয় এখনো সম্ভব হয়নি। তাছাড়া 'আর সব'ও আশ্চর্য বটিকা 'ভায়াগ্রা'র জোরে 'দ্বিতীয় শৈশবে'ও হাতের মুঠোয়। এই বেবি বুমাররা কখনোই যেন বুড়িয়ে যেতে চান না! তাই মানবদেহ বৃদ্ধির হরমোন (Human Growth Hormone বা HGH) নিয়ে গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল চাউর হতে সবার আগে এঁরাই নিজেদের বয়স অর্ধেক করতে হামলে পড়েছেন। বছর কয়েক আগে সংবাদপত্রেও খবর বেরিয়ে গিয়েছিল যে, এ এমন এক চিকিৎসা যা সময়ের চাকাকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই জীবনীশক্তি ও যৌবনশক্তি ফিরে পাওয়ার লোভে অনেকে এর পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক হাজার ডলার ঢালতেও কসুর করেননি।

আমেরিকায় ভোগবাদী সমাজে পারিবারিক বন্ধন বহুকাল আগেই উধাও। তাই সেখানে অন্যান্যদের মতো 'বুড়ো-বুড়ি'রাও নিজেদেরটুকু নিজেরাই আদায় করতে ভাল জানেন। পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সুযোগসুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রবীণদের সংগঠন 'গ্রে প্যান্থার্স অফ আমেরিকা' খুবই সফল। অবশ্য আমেরিকা-সহ উন্নত দেশগুলিতে বয়স্কদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। প্রবীণদের প্রতি গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যাতে সরকারি কোষাগার বিলকুল ফাঁকা হয়ে না যায় সেজন্য এইসব দেশ বহু আগে থেকে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। জরা, স্থবিরতা, বার্ধক্য প্রতিরোধের গবেষণায় ঢালা হচ্ছে বিপুল অর্থ। মানুষের বুড়িয়ে যাওয়ার রহস্য ভেদ করা এবং প্রবীণদের মর্যাদার সঙ্গে সচল রাখতে চিকিৎসাশাস্ত্রে সংযোজিত হয়েছে নতুন শাখা—'জেরিয়াট্রিক্স' (Geriatrics)। গ্রীক শব্দ 'Gerios' মানে বার্ধক্য এবং 'iatros' হলো ওষুধ। ১৯১৪ সালে জনৈক মার্কিন চিকিৎসক (Dr. Nascher) শব্দটি উদ্ভাবন করেন। এই সূত্রে 'বয়স' সংক্রান্ত নানা প্রসঙ্গের চর্চার নাম হয়েছে 'জেরন্টোলজি' (Gerontology)।

চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, 'জেরন্টোলজি' বিগত কয়েক দশকে পাশ্চাত্যে প্রাধান্য পেলেও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের কাছে বিষয়টি নেহাতই অর্বাচীন। আজ থেকে দুহাজার বছরেরও আগে জীবনরহস্যের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র। আয়ুর্বেদ-সহ অন্যান্য ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতি (Indian Systems of Medicine) বুড়িয়ে যাওয়ার (ageing) কারণ অনুসন্ধান করেছে বিশদভাবে। বার্ধক্য, তার প্রতিরোধ, প্রতিকার ও পরিচর্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকে পথ-প্রদর্শন করেছে আয়ুর্বেদেরই একটি স্বতন্ত্র শাখা 'রসায়নতন্ত্র'—'রস' অর্থাৎ পুষ্টি এবং 'আয়ন' মানে সংবহন। এ মামুলি কোন ওষুধ বা দাওয়াই নয়, বরং দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের ভিত্তিতে ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণের বহুমুখী পদ্ধতিই তাতে বাতলে দেওয়া হয়েছে। ফলে এসব নির্দেশ মেনে চলে স্বাস্থ্যবানরা যেমন অতীতে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারতেন, তেমনি রোগগ্রস্তরাও সহজে সেরে উঠতেন। আমাদের প্রাচীন বেদ, উপনিষদ্, ভাগবত, চরকসংহিতায় পুরোপুরি কর্মক্ষমভাবে মানুষের শতায়ু হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক স্তোত্রে পাই —"পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।" আর ছান্দোগ্য উপনিষদ্ আরো একধাপ এগিয়ে বলেছে, একজন খুব ভালভাবেই ১১৬ বছরের পরমায়ু পেতে পারে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা আত্মবিস্মৃত, ইতিহাসবিমুখ জাতি। নিজেদের দেশের শাশ্বত পরম্পরার কথা আমরা মনে রাখিনি। কাজেই বয়সের সমস্যার সমাজতাত্ত্বিক ও চিকিৎসাগত দিকগুলি খতিয়ে দেখতে আমাদের ইদানীং জেরন্টোলজিকে আশ্রয় করার কথা ভাবতে হচ্ছে। হালফিল প্রবণতা অনুযায়ী জেরিয়াট্রিক মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ হয়ে আসতে ডাক্তাররা এখন অহরহ বিদেশে ছুটছেন। ওদিকে বয়সের ভার (ageism) সম্পর্কে প্রচলিত 'মিথ' ভেঙে দিয়ে আধুনিক জেরন্টোলজিস্টরা 'প্রোডাক্টিভ এজিং'-এর ধারণা প্রচার করছেন। তাঁরা বলছেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়—এমন মনে করা ভুল। বরং জেরন্টোলজি ও নিউরোসাইকোলজির গবেষণা প্রমাণ

করেছে, মানসিক সক্রিয়তা মস্তিষ্ক সতেজ রাখে আর অলস মস্তিষ্ক হলেই চিন্তাশক্তি লোপ পেতে থাকে। সুতরাং দেহে-মনে সক্ষম থাকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে বেঁচে থাকার মান বাড়বে। এসব কথা পাশ্চাত্য গবেষণায় নতুন মনে হলেও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে বহুকাল থেকেই নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ বিলেত-আমেরিকা নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল পরিমণ্ডলে দারিদ্র্য, বেকারি, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, কুশিক্ষা, দুর্নীতি, অস্বাস্থ্য ইত্যাদি হাজারো বিড়ম্বনায় কোন কিছু গভীরভাবে খতিয়ে দেখা আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। সবক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের উপরি চটক দেখে আমরা ভুলি। তাই বিদেশী পত্রিকায় যখন খবর পাই, ৮৫ বছরের মার্কিন ক্যারল জনস্টন সাড়ে ৭ ফিট উঁচুতে পোল ভল্ট দিয়ে রেকর্ড করেছেন তখন বাহবা দিতেও ভুলে যাই। ৯৩ বছরের হাল রাইট যখন নিজেই বিমান চালিয়ে বিভিন্ন প্রান্তে খবর কাগজ পৌঁছে দেন এবং সেই কাগজের রিপোর্টার, রাইটার, এডিটর ও অ্যাড-সেলসম্যান একাই তিনি, তখন বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। অথচ আমরা কি একবারও ভেবে দেখি, সেখানকার সমাজই তাঁদেব এমন হয়ে উঠতে উৎসাহ দিয়েছে? আমাদের কি মনে হয়, যে-শক্তিতে আজ এঁরা পাশ্চাত্য সমাজের দাপুটে প্রতিনিধিত্ব করছেন তার চেয়েও উন্নত মেধাসম্পদ (intellectual property), সহজাত জ্ঞান (traditional knowledge) ভারতেরই ছিল? আমরা কত অনায়াসে ভুলেছি অমিত ক্ষমতাসম্পন্ন মুনি-ঋষিদের অবদানের কথা!

কিন্তু আমাদের দেশের যা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি তাতে আমরা জনস্টন বা রাইটদের মতো প্রবীণদের এমন চনমনে মেজাজে দেখার কথা ভাবতেই পারি না। কদাচিৎ অসাধারণ সৃজনশীল কয়েকজন অতি প্রবীণ-প্রবীণার দেখা এদেশে মেলে। যেমন ৭৫ বছর বয়স্ক চিরপরিচিত গায়ক মান্না দে বা 'উদয়শঙ্কর ব্যালে ট্রুপ' ও 'পৃথ্বী থিয়েটার'-খ্যাত ৮৬ বছর বয়স্কা মঞ্চপ্রতিভা জোহরা সেগল কিংবা ৮৬ বছরের 'তরুণ' পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তবে তাঁরা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। রাজনীতির আঙিনায় চুল সাদা না হলে নাকি উত্থানই শুরু হয় না! অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, গভীর পাণ্ডিত্য, সুমহান আধ্যাত্মিক গুণ এবং কিংবদন্তীতুল্য সময়ানুবর্তিতার অধিকারী স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ৯৭ বছর বয়সে মহাসমাধিতে লীন হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় দশ বছর ধরে শতবর্ষ-প্রাচীন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর বর্তমান অধ্যক্ষ মহারাজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাগ্মী স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী সঙ্ঘের হালই ধরেছেন প্রায় ৯০ বছর বয়সে। অবশ্য তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনা চলে না।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ৭ কোটি। তার মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মহিলা এবং তার অর্ধেকই আবার বিধবা। এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ৯০ শতাংশের না আছে কোন পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটি। কারণ, তাঁরা অর্থনীতির অসংগঠিত ক্ষেত্রের বাসিন্দা। এঁদের ৪০ শতাংশ বাস করেন দারিদ্র্যসীমার নিচে, তাঁদের ৮০ শতাংশ নিরক্ষর এবং সব মিলিয়ে অবস্থাটা অত্যন্ত করুণ ও শোচনীয়। সরকারি সহায়তা বা বেসরকারি সংগঠনের (NGO) ন্যূনতম অবলম্বন ছাড়া তাঁদের বেঁচে থাকার পথ নেই।

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় সমাজে বুড়ো মানুষদের দাম ছিল, পরিবারের সদস্যরা এবং অন্যান্য কনিষ্ঠরা তাঁদের কথা শুনত। সংসারে, সমাজে প্রবীণদের সকলে সম্মান করত, মর্যাদা দিত। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাজ্ঞদের অভিমতই ছিল শেষ কথা। কৃষি ও ব্যবসাভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় সুস্থির পারিবারিক বন্ধনের নিয়ন্তা ছিলেন সংশ্লিষ্ট সাংসারিক কর্তা বা কর্ত্রী। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্রুত শিল্পায়ন, জীবন-জীবিকার প্রতিযোগিতা এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মধ্যে উন্নততর রুজির টানে ভিটেমাটি ছেড়ে শহর এবং তারো গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের হাতছানিতে সাড়া দেওয়ার ঝোঁক যৌথ পরিবারকে ভেঙে চুরমার করে দিল। 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'র আধুনিক বাতাবরণে বয়স্করা আর কর্তা নন। তাঁরা অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার জন্যও নির্ভরশীল নিজেরই উপার্জনশীল সন্তান-সন্ততির কাছে। কায়িক সামর্থ্য না থাকলে গ্রামীণ সমাজে জোয়ান ছেলের পরিবারে তিনি ফালতু বোঝা! শহুরে পরিবেশে মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনিই 'টেলিফোন অ্যাটেন্ডেন্ট' বা 'বেবি সিটার'! বয়স্কদের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি থেকে রেহাই পেতে পরবর্তী প্রজন্মের পরিবারের কাছে সমাধানসূত্র বৃদ্ধাবাস! এই প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েছে সম্পর্কের জটিলতা, বিশ্বাসহীনতা, অকৃতজ্ঞতা, অর্থলোলুপতা, আরো নানা পাপ।

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিরাট ফারাককে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক ও ভয়াবহ করে তুলছে আজকের অকৃতজ্ঞ ছেলেমেয়েরা। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি বীভৎস আচরণ, তাঁদের প্রতি সন্তান ও পরিবারের নিষ্ঠুর অত্যাচার কোন্ পর্যায়ে নেমে এসেছে তা নিয়ে বিশদ প্রচ্ছদ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকায় (১৩ জুলাই ১৯৯৮)। ৪০০ বছরেরও আগে সন্তানদের এই অকৃতজ্ঞতাকে (filial ingratitude) উপজীব্য করেই শেক্সপীয়র তাঁর অসামান্য ট্রাজেডি রচনা করেছিলেন—'কিং লিয়ার'।

'এজিং', 'জেরন্টোলজি' প্রভৃতি প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অনেক ভার-ভারিক্কি আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে বয়স্ক মানুষদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে তাঁদের কল্যাণ সম্ভব নয়। সুখের কথা, কিছুদিন হলো কেন্দ্রীয় সরকার প্রবীণদের সম্পর্কে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করেছে। কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি সংগঠনও গড়ে উঠেছে 'বুড়ো বয়স' সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান করে একটা ইতিবাচক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে।

শিশুসন্তান দত্তক নেওয়ার কথা জানা। ঠিক তেমনি চালু হয়েছে অভিনব কর্মসূচী—"Adopt A Granny"। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট অফ জেরন্টোলজির কর্ণধার ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী জানালেন, নামটা এমন হলেও দত্তক নেওয়া যায় 'গ্র্যান্ড পা'কেও। সেক্ষেত্রে দত্তকগ্রহীতার আর্থিক সহায়তায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে বাকি কটা দিন একটু হাসি ফোটানো যাবে। এই সংগঠনটিরও দশ বছর আগে ১৯৭৮ সাল থেকে বয়স্ক কল্যাণে সক্রিয় রয়েছে 'হেল্প এজ ইন্ডিয়া'। এমনই আরো এনজিও গড়ে উঠেছে হায়দরাবাদ, তিরুপতি, দিল্লি, হরিয়ানা, বরোদা, কারনাল ও তিরুবনন্তপুরমে। ইংরেজ কবি ব্রাউনিঙের মতো এরাও সকলে বলছে, বুড়ো হতে ভয় কি? জীবনের পুরোটা উপভোগ কর। যৌবন তো অর্ধেক, ঈশ্বরে ভরসা রেখে বাকি জীবনটুকুও দেখ। সেক্ষেত্রে শুধু চাই একটু সহায়তা ও মানবিক সহানুভূতি।

অবশ্য পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি বা আধুনিক 'জেরন্টোলজি' যাই বলুক, প্রাচ্য দর্শনে কিন্তু জীবনকে অনর্থক দীর্ঘায়িত করার বদলে জীবন্মুক্তির উৎকর্ষের জয়গানই গাওয়া হয়েছে। সকল মানুষের হয়ে রবীন্দ্রনাথের সুরে তাই প্রার্থনা করা যেতেই পারে—

"যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে...
নিত্য যাহার থাকি কোলে
তারেই যেন যাই গো বলে—
এই জীবনে ধন্য হলেম
তোমায় ভালবেসে।" ❑

তথ্য সহায়তা ঃ

- Biology of Ageing—Alfred Worcester (1855-1951), ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।
- নিউ ইয়র্ক থেকে ৭ ও ৮ মে ১৯৯৮ প্রেরিত সংবাদসংস্থা ডি. পি. এ.-র খবর।
- ৮ মে ১৯৯৮ ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত রয়টারের খবর।
- রোম থেকে ২০ জুন ১৯৯৮ প্রেরিত এ. পি.-র খবর।
- The Hindustan Times, Sunday Magazine, 18 October 1998.
- The Hindu Magazine, 18 October 1998.
- The Hindu Folio on Ageing, 18 October 1998.
- Ageing & Society, The Indian Journal of Gerontology, Vol. V, No. I & II, Jan-March 1995, April-June 1995, Published by Calcutta Metropolitan Institute of Gerontology.
- 'উদ্বোধন', ৯৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

অনুষ্ঠান-সূচী (পৌষ-মাঘ ১৪০৬)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১ পৌষ	শুক্রবার	১৭ ডিসেম্বর	১৯৯৯
শ্রীযীশুখ্রীস্ট		৮ পৌষ	শুক্রবার	২৪ ডিসেম্বর	১৯৯৯
শ্রীমা সারদাদেবী	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৩ পৌষ	বুধবার	২৯ ডিসেম্বর	১৯৯৯
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১৭ পৌষ	রবিবার	২ জানুয়ারি	২০০০
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২৮ পৌষ	বৃহস্পতিবার	১৩ জানুয়ারি	২০০০
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৬ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২০ জানুয়ারি	২০০০
স্বামী বিবেকানন্দ	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৩ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২৭ জানুয়ারি	২০০০
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২৪ মাঘ	সোমবার	৭ ফেব্রুয়ারি	২০০০
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৬ মাঘ	বুধবার	৯ ফেব্রুয়ারি	২০০০

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৭ মাঘ	বৃহস্পতিবার	১০ ফেব্রুয়ারি	২০০০

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

৩, ১৭ পৌষ	রবিবার,	রবিবার	১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯,	২ জানুয়ারি	২০০০
৩, ১৮ মাঘ	সোমবার,	মঙ্গলবার	১৭ জানুয়ারি,	১ ফেব্রুয়ারি	২০০০
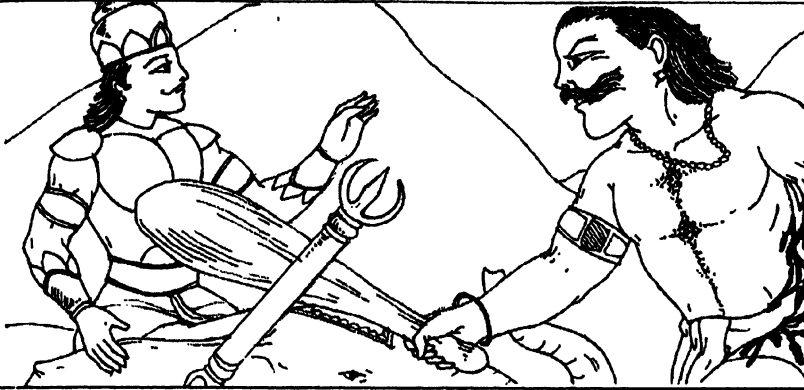
চিরন্তনী
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ ১০
এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য
কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত
দেবরাজ ইন্দ্রের অমোঘ বজ্রের আঘাতে বৃত্রাসুরের একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগল। সেই অবস্থায় সে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে এক হাতেই এক বিশাল মুগুর তুলে নিল এবং দেবরাজকে সজোরে আঘাত করল। সেই আঘাতে দেবরাজের হাত থেকে বজ্র খসে পড়ল।
শত্রুর সামনে হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ায় দেবরাজ লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। বৃত্রাসুর নিরস্ত্র দেবরাজকে আক্রমণ করল না। তাঁকে সম্বোধন করে বলল ঃ "যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। সবই শ্রীভগবানের ইচ্ছা। জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু সব আমার কাছে সমান। তোমার হাতের ঐ পবিত্র বজ্রের আঘাতে আমার মৃত্যু হলে আমি অবশ্যই আমার ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণুর চরণে আশ্রয় লাভ করব। নিঃসঙ্কোচে তুমি বজ্র তুলে নাও এবং যুদ্ধ কর।"
শ্রীবিষ্ণুর প্রতি বৃত্রাসুরের একনিষ্ঠ ভক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে ইন্দ্র মুগ্ধ হয়ে বললেন ঃ "শ্রীভগবানে তোমার এমন ভক্তি, স্বর্গসুখ তো তোমার কাছে তুচ্ছ।" কথা বলতে বলতেই বজ্র তুলে নিয়ে তিনি আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।
[ক্রমশ]
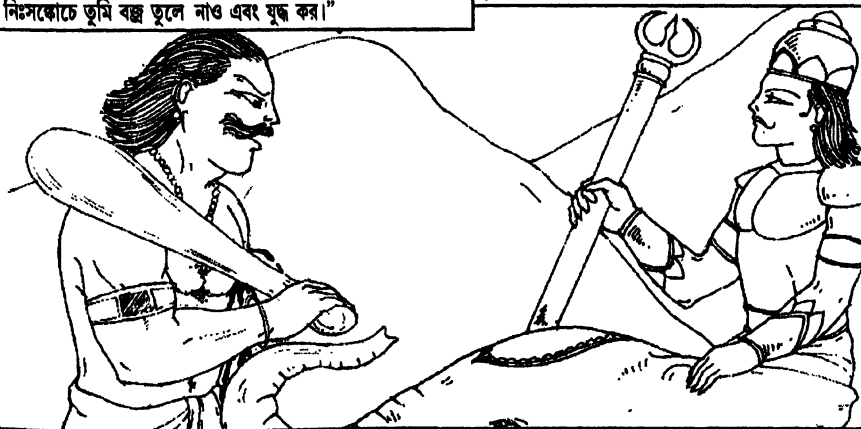
চণ্ডীদাসের পদাবলী

শঙ্কর ঘোষ

বৈষ্ণব পদাবলীর যে-পদকর্তার পদ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালীকে মুগ্ধ করে রেখেছে, যাঁর রচিত পদ কীর্তন করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অফুরন্ত আনন্দলাভ করতেন, তিনি হলেন পদাবলী জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা—চণ্ডীদাস। বাঙলা সাহিত্যের চিরন্তন সমস্যা এই চণ্ডীদাসকে ঘিরেই। কারণ, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস-ভণিতায় একাধিক চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই সমস্যা বা বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে সাধারণভাবে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে নিয়েই আলোচনা করা যাক।

চণ্ডীদাসের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে ইতিহাস আশ্চর্যজনকভাবে মৌন। কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে জানা যায় যে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দুর্গাদাস বাগচীর গৃহে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেটি আনুমানিক ১৪১৭ খ্রীস্টাব্দ। তাঁর ইষ্টদেবী ছিলেন 'বাশুলী'। 'রামী' নামের এক রজককন্যাকে সাধন-সঙ্গিনীরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এসব বিষয়ে লোকশ্রুতি ভিন্ন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে যে-চণ্ডীদাসের পদে মহাপ্রভু মুগ্ধ হয়েছিলেন, যাঁর পদে আজও বাঙালী সমাজ মোহিত হয়ে আছে—তিনি অবশ্যই চৈতন্যদেবের পূর্বে বর্তমান ছিলেন, এর বেশি কোন তথ্য জানা যায় না।

ব্যক্তি-পরিচয় ছাপিয়ে বাঙালী পাঠকের কাছে চণ্ডীদাস অমর হয়ে আছেন অনুপম পদকর্তা হিসাবে, চিরন্তন প্রেমের কবি হিসাবে। তাঁর প্রধান পরিচয় দুঃখের কবি তথা বিরহের কবি হিসাবে। সহজ কথায়, প্রেমের গভীরতর উপলব্ধির তিনি সার্থক বাণীকার। ভাব-গভীরতার জন্য তিনি সর্বজনমনোহর। তাঁর পদাবলীর সহজ সরল সুরে মানবজীবনের দেশকালাতীত আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি মন্ময় কবি, তাই তাঁর পদে শব্দের ঐশ্বর্য অপেক্ষা শব্দের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশি কাজ করে। তাঁর পদ পাঠ করা মাত্র পাঠক নিজের চিত্তে একটি রসমূর্তি গড়ে তুলতে পারে অনায়াসে। তাঁর আবেগ-অনুভূতি পাঠক-চিত্তে অনুরূপ ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে অনির্বচনীয় রসলোকে পৌঁছে দেয়। অপার বেদনার সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত পাওয়া যায়, তারই নাম প্রেম। চণ্ডীদাস সেই প্রেমের কবি, সেই বেদনার কাব্যকার।

বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন রসপর্যায়ে চণ্ডীদাসের অজস্র সাড়া-জাগানো পদের সন্ধান আমরা পাই। পদকর্তা তাঁর অনুভূতিমাখা দৃষ্টি নিয়ে বৃন্দাবনের মহাভাবস্বরূপিণী রাধার দিকে চেয়েছেন, রাধিকার বেদনার সঙ্গে নিজের বেদনাকে মিলিয়ে একাকার করে নিয়েছেন। সেই বেদনাকে বাণীর বন্ধনে পদকর্তা রূপায়িত করেছেন। চণ্ডীদাসের রাধা সত্যই সাধিকা, তিনি কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণগত তনুমনপ্রাণা। উপমা অলঙ্কারে এই রাধাকে তিনি ভূষিত করেননি, ত্যাগের দ্যুতিতে তিনি দেদীপ্যমানা। যৌবনে যোগিনী হয়েছেন রাধা। তাঁর প্রেম দেহজ নয়। জীবনতৃষ্ণা রাধাকে ব্যাকুল করে না। এ এক অপার্থিব কামনা-বাসনা কলুষহীন প্রেম, এ এক দুষ্কর তপস্যার সাধনা, যে-সাধনায় প্রেমাস্পদের কুশল ব্যতীত অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না। তাই যৌবনের শুরুতেই রাধা সন্ন্যাসিনী সেজেছেন। সত্যই তো, যাঁর ঈশ্বরে অনুরাগ জেগেছে, অঙ্গরাগে তাঁর প্রয়োজন কি?

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা।।"

যে-রূপ শ্রীরাধা প্রত্যক্ষ করেননি, চিত্রে দেখেননি, শুধু নামটুকু শুনেছেন, তাতেই চণ্ডীদাসের রাধা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের পদে তারই উল্লেখ রয়েছে—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্য রাধা অতঃপর কী না করেছেন! অভিসারে মিলিত হওয়ার জন্য বর্ষার দুর্যোগকে উপেক্ষা করেছেন। বর্ষার পটভূমিতেই রাধা-হৃদয়ের যুগপৎ বিষাদ ও আনন্দের সৃষ্টি করলেন চণ্ডীদাস। সেখানে বর্ষানিসর্গের দ্বৈত ভূমিকা। ঘোর রজনীর মেঘের ঘনাড়ম্বরে অভিসারী হয়ে প্রবল ধারাপাতে সিক্তপরিষিক্ততনু শ্রীকৃষ্ণ রাধার অঙ্গনবর্তী হয়েছেন। এমন পরিবেশে চণ্ডীদাসের রাধা যে হাহাকার করেছেন, 'অভিসার' বিষয়ক পদে তারই উল্লেখ পাই—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিচে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।।"

এই উক্তিতে বর্ষা-বর্ণনার অবকাশে পদকর্তা চণ্ডীদাস প্রিয়দুঃখদর্শনে যেমন রাধার আর্তি প্রকাশ করেছেন, তেমনি কৃতপুণ্যা তাঁর প্রিয়মিলনের আনন্দও অকপটে স্বীকার করেছেন।

কালিয়া-বঁধুর প্রেমের আকর্ষণে কুলবধূ রাধিকা হয়েছেন কুলত্যাগিনী। কলঙ্কের হার গলায় নিতেও তখন তিনি

প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি ঘর-বার, আপন-পর, দিন-রাত—সব একাকার করে দিয়েছেন। তবু তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধিতে। রাধার এই যন্ত্রণানুভূতি ও দুঃখের নিবিড়তার চিত্র এঁকেছেন চণ্ডীদাস তাঁর 'আক্ষেপানুরাগ'-এর পদগুলির মধ্যে। এই পর্যায়ের পদ সম্পর্কে লেখিকা সত্যবতী গিরি 'শ্রীরাধার বিবর্তন ঃ চৈতন্য পূর্ব ও চৈতন্য পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "চণ্ডীদাসের পদে আক্ষেপানুরাগই প্রধান সুর। তাঁর রাধার আক্ষেপানুরাগে আছে কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিকূল সর্ববিধ অবস্থার বিরুদ্ধে অশ্রুসজল অভিযোগ। বাংলাদেশের গ্রাম্য পরিবারের বধূরূপে সমাজভীতি ও সতীত্ববোধের দৃঢ়মূল সংস্কারে বন্দিনী রাধার বেদনা বড় মর্মস্পর্শী। একদিকে অনিবার্য কৃষ্ণপ্রেমের বহির্মুখী আকর্ষণ, আর অন্যদিক অন্তঃপুরের পরিজনভীতি ও সংস্কার—উভয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রাধার বেদনাই ফুটে উঠেছে চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে।"[১] এই মন্তব্যের সাক্ষ্য দেয় চণ্ডীদাসের এই পর্যায়ের পদ—

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।।
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।।"

'আক্ষেপানুরাগ' পর্যায়ের পর আমরা পাই 'মাথুর'-এর পদ। সমর্পিতপ্রাণা রাধা শুনলেন, শ্রীকৃষ্ণ যাবেন মথুরায়। বিচ্ছেদ-বেদনার হাহাকার ধ্বনিত হলো রাধার কণ্ঠে। রাধার বিশ্বাস—তাঁকে উপেক্ষা করে শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবত মথুরায় যাবেন না। চণ্ডীদাসের 'মাথুর' বিষয়ক পদে তার উল্লেখ পাই—

"তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো
তবে তো শ্যাম মধুপুরে যাবে।"

চণ্ডীদাসের 'মাথুর' বিষয়ক পদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক কালিদাস রায় বলেছেন ঃ "যুগে যুগে দেশে দেশে এমনি করিয়া কত রাসোৎসব ভাঙ্গিয়া যায়—কত স্বপ্নকুঞ্জে আগুন ধরিয়া যায়, কত আনন্দ-নিকেতন শ্মশান হইয়া যায়, কত প্রেমানন্দের মালঞ্চে নৈদাঘ নিঃশ্বাস লাগে—লীলাভুবন ছাড়িয়া কঠোর জীবন-সংগ্রামে কত নরনারী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পিছুপানে তাকাইতে তাকাইতে দূরে দূরে চলিয়া যায়—তাহাদের সকল বেদনা এই মাথুরের শোকঘন সঙ্গীতের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। ইহারই প্রধান কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের কণ্ঠে নিখিলের সকল বৃন্দাবন, সকল লীলাভুবন, সকল স্বপ্ন-মালঞ্চই আর্তনাদ করিয়াছে।"[২]

রাধিকার বেদনায় আর্ত গৌড়জনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণের ভাবলোকে মিলন ঘটিয়েছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ভাব-সম্মিলন'। চণ্ডীদাস 'ভাব-সম্মিলন'-এর পদে শ্রীমতীর মুখে যে-কথাগুলি বসিয়েছেন, প্রেমের আত্মসমর্পণের দিক থেকে তার তুলনা মেলা ভার। সে-বাণী যেমন করুণ, তেমনই মর্মস্পর্শী—

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে।।
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।।"

চণ্ডীদাসের 'ভাব-সম্মিলন'-এর পদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন ঃ "পূর্বরাগ হইতে চণ্ডীদাসের বিরহ শুরু হইয়াছে, আক্ষেপানুরাগে তাহারই বৃদ্ধি, পর্যায়ের পর পর্যায়ে অগ্রসর হইয়া চণ্ডীদাস ভাব-সম্মিলনের আনন্দ-মুহূর্তে বিচ্ছেদের অন্তিমতম বেদনাকে প্রকাশ করিয়া দিলেন। এমনভাবে প্রকাশ করা—এ বোধ করি আর কোন বৈষ্ণব কবির দ্বারা সম্ভব নয়।"[৩]

চণ্ডীদাসের রাধা সকল হৃদয়-চাঞ্চল্যের অবসানে শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে এক সুস্থির আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে তাঁর দেহ-মন সমর্পণ করেছেন। চণ্ডীদাসের 'নিবেদন' বিষয়ক পদগুলিতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের যে হৃদয়-স্পন্দিত সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা তুলনারহিত। এ-পর্যায়ের পদ রচনায় চণ্ডীদাস অদ্বিতীয় কবি। প্রেমের এমন স্নিগ্ধশ্রী, এমন নিবিড়ঘন উপলব্ধি মধ্যযুগের কাব্যে বিরল দৃষ্টান্ত। লৌকিক ব্যঞ্জনার অনির্বচনীয়তা পদগুলিকে দান করেছে চিরন্তন অমরত্ব—

"তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়।।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।"

রাধার এই উক্তির মধ্য দিয়ে কি আমাদের মনে হয় না যে, এ শুধু প্রেমের কবিতা নয়, এ হলো ভগবৎ উপলব্ধিও? প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের প্রেমাশ্রিত ভক্তিসাহিত্যে চণ্ডীদাসের রাধা-চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।

---

১ বিষয় ঃ প্রবন্ধ—প্রধান সম্পাদক ঃ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ৬১

২ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য—কালিদাস রায়, ১ম খণ্ড, দি নিউ প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ১৮২-১৮৩

৩ মধ্যযুগের কবি ও কাব্য—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৮৭, পৃঃ ৩৬

চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "চণ্ডীদাসের ভাষা-ভঙ্গিমা, ছন্দপ্রকরণ, বাক্‌রীতি বড় সাধাসিধে, সামান্য তুলসী-মঞ্জরীর গন্ধবাসিত মাত্র। 'কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়', 'ক্ষুরের ওপর রাধার বসতি নড়িতে কাটিয়ে দেহ', 'বদন থাকিতে না পারে বলিতে তেঁই সে অবলা নাম', 'বণিক জনার করাত যেমন দুদিকে কাটিয়ে যায়' প্রভৃতি উক্তি ক্লাসিক, রোম্যান্টিক, স্বর্গ-মর্ত্য মন্থন করে সংগ্রহ করা হয়নি। এগুলি প্রতিদিনের জীবন থেকেই উত্থিত হয়েছে অথচ এর মধ্য দিয়ে অসাধারণের ব্যঞ্জনা ফুটেছে। চণ্ডীদাসের পদগুলি পড়তে পড়তে পাঠকও কবির বক্তব্যের সঙ্গে সমপ্রাণ হয়ে ওঠেন।"[৪]

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ প্রেম-মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার। প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন চণ্ডীদাস। সাধারণ নরনারী প্রেমের এই গূঢ় তত্ত্ব বোঝেন না। তাঁরা মনে-প্রাণে ভাবেন, প্রেমে বুঝি কেবলই সুখ। তাই প্রেম-পূজারীকে সতর্ক করে দিয়ে চণ্ডীদাস বলেন ঃ

"চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তারি ঠাঁই।।"

চণ্ডীদাস ছিলেন মানবতার একনিষ্ঠ পূজারী, তাই তিনি মানুষকেই দিয়েছেন সবার ওপরে স্থান। জাতি-ধর্ম-বৃত্তি-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষই তাঁর কাছে প্রধান। চণ্ডীদাস সেই মানবতার জয়গান গেয়েছেন মুক্তকণ্ঠে ঃ

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

যে-কবি নিজে এক ছত্র লিখে পাঠকদের দিয়ে দশ ছত্র লিখিয়ে নিতে পারেন, তিনি তো সামান্য নন! কিন্তু তিনি সহজ ভাষা ও সহজ ভাবকেই অবলম্বন করে গিয়েছেন। তাই তিনি বাংলার প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। কালিদাস রায় যথার্থই লিখেছেন ঃ "চণ্ডীদাসের সঙ্গীত তাই বঙ্গের নাটমন্দিরে, আম্রকুঞ্জে, বেণুবনে, ইক্ষুক্ষেত্রে, খেয়াতরীর উপরে একদিনের জন্যও থামে নাই। যদি বা কালধর্মে কখনো মন্দীভূত হইত, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের জন্য তাহা হইতে পায় নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অগ্রদূত—প্রেমসূর্যের শুকতারা চণ্ডীদাস যে রসসম্পদের কবি, শ্রীচৈতন্য তাহারই পরিবেশক, চণ্ডীদাস যে-বাণীর গায়ন, চৈতন্যদেব তাহারই প্রচারক। চণ্ডীদাসের প্রেমস্বপ্ন শ্রীচৈতন্যে পরিমূর্ত হইয়াছে।"[৫] ❑

৪ বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, সংশোধিত ৭ম সং, ১৩৯২; পৃঃ ১০২-১০৩

৫ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, পৃঃ ১৯৯

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
—কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

'A Text Book of Homoeopathic Materia Medica Elaborated with Illustrations' গ্রন্থের লেখক, পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে দশ বছর অধ্যাপনা এবং ত্রিশ বছর চিকিৎসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা জানাতে ধারাবাহিক লিখছেন। তাঁর ধারণা, এতে সাধারণ অসুস্থতা ও অসুখ-বিসুখ এড়ানো সম্ভব হবে এবং ফলত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

❑ দিবানিদ্রা বয়স অনুপাতে প্রয়োজনীয়। দশ বছরের নিচে যাদের বয়স অথবা ৬৫ বছরের অধিক বয়সের বৃদ্ধদের দিবানিদ্রা অনিবার্য। দিবানিদ্রা মোট এক ঘণ্টার অধিক উচিত নয়।

❑ দিবানিদ্রা বেলা একটা থেকে তিনটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। বেলা তিনটার পর ঘুমোবার অভ্যাস অস্বাস্থ্যকর। দেরিতে ঘুমোলে রাত্রে নিদ্রা আসতে বিলম্ব হবে। রাত্রে নিদ্রা আসতে দেরি হলে পরের দিন সকালে উঠতেও বিলম্ব হবে। দিবানিদ্রার পর চোখ ভালভাবে ধুতে হয়। চোখে ভালভাবে জলের ঝাপটা দিতে হয়।

❑ যুবক-যুবতীদের পক্ষে দিবানিদ্রা বর্জনীয়। তাদের পক্ষে দিবানিদ্রার অভ্যাস একেবারেই শরীর-মনের পক্ষে হিতকর নয়, বরং অহিতকরই।

❑ নাসিকার একদিকের ছিদ্র বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চেপে নাসিকার অপর ছিদ্র দিয়ে জল টানতে হবে। জল ভিতরে প্রবেশ করার পর ভিতরকার জল নাসিকাপথ দিয়ে বের করে দিতে হবে।

❑ এইভাবে উভয় নাসিকাছিদ্র দিয়ে বারবার জল টানা ও তা নির্গত করার অভ্যাসে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়, শিরঃপীড়া (সাইনাস সমস্যা) থেকে রেহাই পাওয়া যায়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, ক্লান্তি দূর হয় এবং মানসিক ক্রোধ হ্রাস হয়।

বাংলাদেশ ঘুরে এলাম

স্বামী ঋদ্ধানন্দ

অবশেষে বাংলাদেশ যাওয়ার ভিসা পাওয়া গেল Peerless Travels-এর মাধ্যমে। পরদিন গদাধর আশ্রম থেকে রওনা হয়ে শিয়ালদা, বনগাঁ। অটোরিক্সায় উঠে ভারত-সীমা পেরিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে উপস্থিত হলাম। তারপর কাস্টমস-এর বেড়াজাল পার হয়ে একটি বাস ধরে গেলাম যশোর। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দুপুর ও রাত্রি-বাস। পরদিন সকালে সিরাজগঞ্জের বাসে উঠে সিরাজগঞ্জ রোডে

যশোর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

নেমে বগুড়া-ময়মনসিংহের বাসে কিছুদূর যাওয়ার পর পড়ল ৪.৮ কিলোমিটার লম্বা 'বঙ্গবন্ধু সেতু'। বাঁদিকে রেলব্রীজের কিনারে কিনারে যমুনা পার হয়ে ভুয়াপুর রেলস্টেশন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এখান থেকে টাঙ্গাইল, মীর্জাপুর, গাজীপুর, জয়দেবপুর পর্যন্ত রেল যেতে পারে। আরো যেতে পারে কমলাপুর পর্যন্ত। আমাদের বাস সেতু পার হয়েই বাঁদিকে ঘুরল; মুক্তাগাছা হয়ে ময়মনসিংহ শহর, রিক্সায় রামকৃষ্ণ আশ্রম। পরদিন সকালে দুর্গাবাড়ি; সেখানে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা হয়। পরে গেলাম university campus-এ। ফিরে এলাম ব্রহ্মপুত্রের ধার ধরে। দুপুরে আহারাদির পর বিকালে বাসে নেত্রকোণা হয়ে গেলাম মস্ত বড় বাণিজ্যকেন্দ্র মোহনগঞ্জে। সেখানে রাত্রিবাস।

সকালে রিক্সায় ধরমপাশা। দোতলা একটি লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। ৯.৪০-এ ছেড়ে দিল। বন্যায় নদীর পাড় ভেসে গেছে। বৌলাই নদী বেয়ে লঞ্চ এগোচ্ছে। বাঁদিকে 'শনির হাওর'—
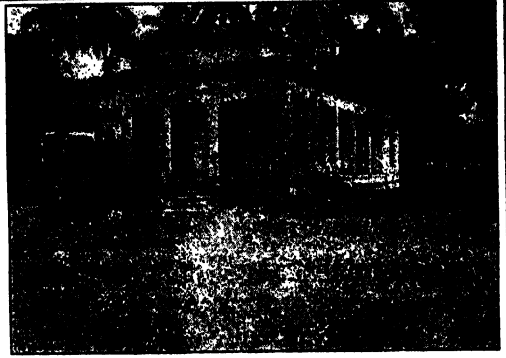
ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

বোধহয় বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়। বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলায়। 'হাওর' মানে জলাভূমি। শব্দটি 'সাগর' থেকে এসেছে। সাগর > সায়র > হাওর। প্রচুর ধান হয় এই জলাভূমিতে—বোরো ধান। অকাল-বর্ষা না হলে দ্বিগুণের কাছাকাছি ফসল হয়। বিকাল ৪টায় গেলাম সাচনা বাজার। এইসব গ্রামের রাস্তাঘাট অনেক ভাল হয়ে গেছে। প্রায় ২।৩ কি.মি. পর্যন্ত রিক্সা চলে। পরে আরো দূর পর্যন্ত যাবে শোনা গেল। এই সব রাস্তা কার্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত ভালই থাকে। ২।৩টি গ্রাম ঘুরে দেখলাম। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ জলের জন্য টিউবওয়েল হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষার হার মনে হয় বেড়েছে। কিরায়ার (ভাড়ার) নৌকা চোখে দেখলাম না। অনেকে নিজেদের নৌকাতে মেশিন লাগিয়ে দূর-দূরান্তর থেকে লোকজন নিয়ে বাজার- হাটে যাচ্ছে। আবার ফিরছে। গহনার (শেয়ারের) নৌকা আর বোধহয় রাত্রে চলে না। ভোর ৪টা।৫টা নাগাদ ছাড়ে এবং গন্তব্য শহরে ১০টা। ১০.৩০-এ পৌঁছে যায়। ভারতে সুন্দরবনের দিকে এগুলিকেই বলে 'ভুটভুটি', বাংলাদেশে বলে 'ট্রলার'। গহনার নৌকা ঠিকই আছে। একজন মেকানিক-ড্রাইভার মেশিনটি চালায় এবং অন্যজন হাল ধরে। বাংলাদেশে ডিজেল-পেট্রলের অভাব নেই।

দুদিন পর সুনামগঞ্জ শহরে পৌঁছে গেলাম। পরদিন রিক্সা করে গেলাম মল্লিকপুর বাসস্ট্যান্ডে, সন্ধ্যা ৬টায় বাস ছেড়ে ৭.৩০-এ সিলেট পৌঁছে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চলে এলাম। স্বামী অক্ষরানন্দজী ও অন্যান্য মহারাজগণ সিলেটেই ছিলেন। পরদিন সকালে তাঁরা ঢাকা রওনা হয়ে গেলেন। রেলস্টেশন থেকে ফিরেই গেলাম মদনমোহন কলেজে। প্রায় ৫৯ বছর আগে ১৯৪০ সালে এই কলেজের সূত্রপাত হয়; আমরাই ছিলাম প্রথম বর্ষের ছাত্র। কলেজটি 'আমাদের' বলাতে বেশ গর্ববোধ হয়। এখন এটি বিশ্ববিদ্যালয়।

পরদিন সকালে সুরমা নদীর দক্ষিণ পাড়ে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে হবিগঞ্জের বাস ধরলাম। সেরপুর, মৌলভিবাজার,

সিলেটে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

শ্রীমঙ্গল, মীরপুর, সায়েস্তাগঞ্জ হয়ে পৌঁছে গেলাম হবিগঞ্জ। সেখানে রাত্রিবাস। পরদিন সকালে 'পাহাড়িকা' এক্সপ্রেসে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হলাম। কুমিল্লা স্টেশনে ট্রেন থামতেই দেখতে পেলাম একজন যাত্রী ৫টি বড় বড় কমলালেবু ২৫

হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

টাকা দিয়ে কিনে আনলেন। ফেরিওয়ালা দূরে চলে গেছে, আর এদিকে আসছে না দেখে আমি নেমে গেলাম ফেরিওয়ালার কাছে। দাম দিয়ে লেবু হাতে নিতেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি দৌড়। কোনক্রমে ট্রেনে উঠে হাঁপাচ্ছি, বুঝতে পারলাম কাজটি ভাল হয়নি। সাধারণত এই ভুল আমি করি না। জলের দরকার হলে ট্রেন থামতেই নেমে পড়ি আর ট্রেনের দিকে চেয়ে থাকি। জল তাড়াতাড়ি নিয়েই চলে আসি। চা-কফি আমার গ্লাসে ঢেলে আগেই দাম দিয়ে দিই। ট্রেনে বসে খাই, বাইরে নয়। এত বড় ভুল যখন হয়ে গেল, তাতে বোঝা যায়, আমার বয়স অনেক হয়েছে। (আমার বয়স এখন ৭৯ বছর।)

কুমিল্লা ছেড়ে পাহাড়িকা এক্সপ্রেস চট্টগ্রামের দিকে চলছে। চট্টগ্রাম প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু অপেক্ষা করছি। একটি ছেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলঃ "আপনি কোত্থেকে এসেছেন?" আমি বললামঃ "তুমি বল কোত্থেকে এসেছ?" "রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে এসেছি।" "আমিই তো এখন হবিগঞ্জ থেকে এসেছি। চল যাই তোমাদের আশ্রমে।" চট্টগ্রাম আশ্রমটি দেখে ভাল লাগল। পরদিন আশ্রমের একটি ছেলে

সীতাকুণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

আমাকে নিয়ে গেল সীতাকুণ্ড; রিক্সা করে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কাছাকাছি গেলাম। পাহাড়ে উঠতে যাইনি। নিচ থেকেই ঘুরে এলাম। সীতাকুণ্ডের রামকৃষ্ণ আশ্রমে কিছুক্ষণ বসে আবার রিক্সায় মেন রোডে এসে অটো ভাড়া করলাম। চলে এলাম চট্টেশ্বরী কালীবাড়িতে। ১৯৯২ সালে মূর্তিটি নতুন করে বসানো হয়। রাস্তায় অবশ্য থেমেছিলাম কৈবল্যধামে—আশ্রমটি নোয়াখালির রাম-ঠাকুরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

ঐদিন বিকালে ৫টায় অটো করে গেলাম 'পতসা'। ভাল রাস্তা, গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা রয়েছে। আমরা বাঁধের কিনারে চলে গেলাম; ওপরে উঠে দেখতে পেলাম দূরে দূরে জাহাজ নোঙর করা রয়েছে। জোয়ারের সময় কিনারে চলে আসে মাল খালাস করতে। চট্টগ্রামের মুজিব রোডের ওপরে

অনেক ব্যাঙ্ক দেখতে পেলাম।

S. Alam কোম্পানীর একটি বাসে চট্টগ্রাম থেকে পরদিন সকালে ঢাকা রওনা হলাম। ৯.৩০-এ চৌদ্দগ্রাম গিয়ে বাস থামল। সাইন-বোর্ডে লেখা আছে 'সুন্দরবন রেস্টুরেন্ট'। এখানে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ দই ও রসমালাই পাওয়া যায়। ভিতরে গিয়ে বসে বললাম, এক গ্লাস দই। এক গ্লাস দইয়ের দাম ১২ টাকা। দই খেয়ে আবার বাসে আমার নির্দিষ্ট জায়গাতে বসে পড়লাম। তারপরেই ময়নামতি, ইলিয়ৎগঞ্জ, গৌরীপুর, মেঘনা-গোমতী ব্রীজ, সোনারগাঁও। এখানে আছে মহিলা ডিগ্রী কলেজ। শীতলক্ষার পুল পার হয়ে বাস থামল ঢাকার কমলাপুর বাসস্ট্যান্ডে বেলা ১২.৩০টায়। আশ্রমে পৌঁছে স্নান ও খাওয়াদাওয়া করে নিলাম। বিকালে বিশ্রাম।

পরদিন সকালে আজানের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলারতি। সকালে স্নান সেরে প্রায় ৯টায় ঢাকা মঠের গাড়িতে রওনা দিলাম

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণ

আমি ও ঢাকা আশ্রমের একজন সাধু। ১০টায় পৌঁছালাম সাভারের শহিদ মিনারে। মিনারের গঠনটি অদ্ভুত—পার্ট বাই পার্ট; মাঝখান দিয়ে রাস্তা আছে ২।৩টি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটি জমাট-বাঁধা স্তম্ভ। আসলে ৩।৪টি খণ্ডে তৈরি। সাভার থেকে একঘণ্টা গেলেই বালিয়াটি আশ্রম। সেদিন অবশ্য আমরা বালিয়াটি গেলাম না। পরদিন যাব। কাছাকাছিই আর্মি ক্যান্টনমেন্ট। ফোর্ট উইলিয়ামের মতো মাটির তলায় নাকি সেনানিবাস আছে। কার সময়ে হয়েছে, খোঁজ-খবর নিইনি। ১টায় ফিরে এলাম নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে, দুপুরে খেয়ে বিশ্রাম। ৩.১৫ মিনিটে নাগ মহাশয়ের বাড়ি দেওভোগের দিকে গাড়ি চলল। রাস্তা সঙ্কীর্ণ। দেওভোগে নাগ মহাশয় ও তাঁর স্ত্রীর সমাধি রয়েছে। অন্যদিকে তাঁর বসতবাটীতে তাঁদের থাকার ঘর ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সুরক্ষিত, ঠাকুরঘরে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছোট ছোট ফটো, নাগ মহাশয়ের বড় ফটো। তারপর শীতলক্ষার পুল পার হয়ে ব্রহ্মপুত্রের রাজঘাটে স্নান করার ইচ্ছা হলো। এটাই লাঙ্গলবন্ধ

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

তীর্থ—যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গর্ভধারিণী মাকে নিয়ে এসে স্নান করেছিলেন। গামছা আনিনি, কিন্তু এমন সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছা হলো না। ঘাটের মাঝখান দিয়ে নামলে পায়ে পাথরকুচি লাগবে না। আমার একজন সঙ্গী নৌকার মাঝিকে নৌকাটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য বললেন। মাঝিটি খুব সুন্দর উত্তর দিল ঃ "তাঁরা এত দূর থেকে কষ্ট করে স্নান করতে এসেছেন, আর আমরা নৌকাটি একটু সরাতে পারব না!" স্নান সেরে আমাদের গাড়ির কাছে গেলাম। দুই মহিলাকে কলসি করে পানীয় জল নিতে দেখে এবং সিঁদুর-পরা দেখে একজনকে জিজ্ঞাসা কবলাম ঃ "আপনারা এখানে কত ঘর হিন্দু আছেন?" তিনি বললেন ঃ "কুমার, ঝালো (জেলে) ও অন্যান্য জাত মিলিয়ে আমরা প্রায় ২০০ ঘর আছি এখানে।" সন্ধ্যায় ফিরে এলাম ঢাকা মঠে।

পরদিন আমরা ২।৩ জন সাভার হয়ে বালিয়াটির দিকে রওনা দিলাম। সকাল ৭.৩০টায় রওনা হয়ে ৯টায় পৌঁছালাম সাভার। রাস্তায় জ্যাম ছিল। তারপর সাটুরিয়া, ধামরাই থানা এলাকার ভিতর দিয়ে চললাম। ৩।৪টি বাজার পার হয়ে গেলাম গৌড়ীয় মঠের কিনারা দিয়ে বালিয়াটি আশ্রমে। স্বামী

বালিয়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

সুন্দরানন্দ মহারাজের পূর্বাশ্রম কাছেই। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বর্তমানে আশ্রমের সম্পাদক। একটি ঝিল, একটি পুকুর ও সবজিখেত বাৎসরিক লীজ দিয়ে যে-আয় হয়, তাতেই আশ্রমের খরচ চলে যায়। সেখান থেকে ১০.৩০-এ রওনা হয়ে দুপুর ১টায় ঢাকা মঠে ফিরে আসি। মঠে প্রসাদ পেয়ে বিকালে মঠের ভিতরের সব কিছু দেখলাম।

আমার ভিসা শেষ হয়ে আসছে। ঢাকার জনৈক স্বামীজী ভিসার মেয়াদ আরো ৭ দিন বাড়াতে নথিপত্র নিয়ে গেলেন। বাংলাদেশ সরকারের দপ্তর শুক্র-শনি বন্ধ থাকাতে রবিবারের আগে পাওয়া যাবে না; কিন্তু ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ স্বরাষ্ট্র দপ্তরে (বাংলাদেশ) যোগাযোগ করে সেই দিনই ভিসার মেয়াদ ৭ দিন বাড়ানোর ব্যবস্থা করলেন। পরদিন 'শ্যামলী' পরিবহনের বাতানুকূল বাসে দুটি সীট ঢাকা-দিনাজপুরের জন্য রিজার্ভেশন করে রাখা হলো। সঙ্গে একজন চলল। গাড়ি উত্তর দিকে চলতে লাগল। গাজীপুর, মীর্জাপুর, টাঙ্গাইল পেরিয়ে গাড়ি চলল 'বঙ্গবন্ধু সেতু' হয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে। দুপুর ১২.৩০-এ গাড়ি থামল অ্যারিস্টোক্যাট হোটেলে। এখানে খাওয়া সেরে বগুড়া, রংপুর হয়ে বাঁদিকে বাঁকল। ঘুরে ঘুরে দিনাজপুরের দিকে বাস এগোচ্ছে। কিছুক্ষণ পর এসে গেল দিনাজপুর। বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা করে আমরা দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ঢুকলাম। সন্ধ্যা ৬টা তখন।
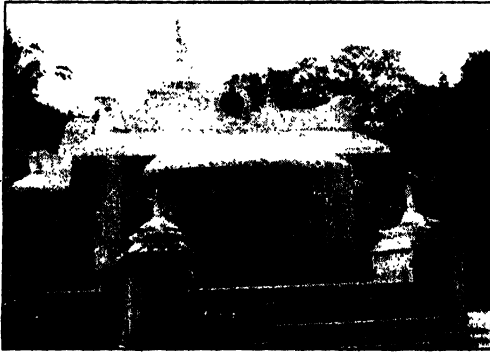
দিনাজপুর আশ্রমের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

সন্ধ্যারতির পর নতুন মন্দিরটি দেখলাম। বেশ ভালই হয়েছে।

পরদিন সকালে ভক্ত গোবিন্দলাল আগরওয়ালার গাড়িতে করে আমরা গেলাম রামসাগর। দর্শনী ৪০ টাকা (বোধ হয় জনপ্রতি ১০ টাকা)। তারপর গেলাম দিনাজপুরের রাজবাটী—বর্তমানে এতিসখানা, অনাথ ছেলেরা থাকে। পাশেই কালিয়াজীর মন্দির। তারপর গেলাম কান্তজীর মন্দিরে। সেখানে তখন মেলা চলছে। এখানে রাসপূর্ণিমাতে মেলা আরম্ভ হয়। মেয়েদের কপালে সিঁদুর এবং বৈষ্ণবদের কপালে চন্দনের বা বৈষ্ণবী ফোঁটা। আশ্রমে ফিরে এলাম বেলা ১টায়।

পরদিন রবিবার সকাল ৬.৩০-এ জীপে ২০ কিমি গিয়ে পার্বতীপুরে এক ভক্তের বাড়িতে চা খেয়ে 'রূপসা' এক্সপ্রেস ধরলাম (খুলনা পর্যন্ত ভাড়া ৩৪৫ টাকা)। সারাটি পথ চোখ খুলে সব দেখছি। চোখে ঘুম নেই, শরীরে আলস্য নেই। সকাল ৮.৩০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল। পার্বতীপুর, তিলকপুর, ছাতিয়াইন গ্রাম, সান্তাহার জংশন, নাটোর, ঈশ্বরদি জংশন, ভেড়ামারা, দৌলতপুর হয়ে খুলনা পৌঁছালাম সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিটে। খুলনাতে একটি ছোট আশ্রম আছে, কয়েকটি ছেলেও থাকে। বাইরে কলেজে পড়াশুনা করে।

পরদিন একজনের সহায়তায় ভৈরব নদী পার হয়ে বাসে উঠলাম। বাস থেকে নেমে রিক্সা ধরে চরকমলাপুরে রামকৃষ্ণ আশ্রমে গেলাম। খেয়ে-দেয়ে বাগেরহাট থেকে বরিশাল রওনা হলাম। সঙ্গে অন্য একজন। দড়াটানা নদীর ফেরী পার হয়ে বরিশালের বাস ধরতে হবে। বি. এম. কলেজ পার হয়ে নতুন বাজারের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সন্ধ্যা ৭টায় পৌঁছালাম।

পরদিন একজন ভক্তের বাড়িতে দুপুরে খেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে দোয়ারিকা নদী পার হয়ে শিকারপুর, বাবুগঞ্জ, বাটাজোর বন্দর হয়ে সন্ধ্যায় এসে পৌঁছালাম ভাঙ্গা ফরিদপুর। বেশ বড় আশ্রম। ৪০।৫০টি ছেলে থাকার জায়গা আছে। এখন ছাত্রাবাসটি বন্ধ।

পরদিন সকালেই রওনা হলাম যশোরের উদ্দেশে।

বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

'হিফাজ পরিবহন'-এর বাস। কানাইপুর বাজার, মধুখালি রেলগেট, মাগুরা হয়ে বেলা ৯টায় যশোর। যশোর আশ্রমে খাওয়াদাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে বাস ধরে এলাম বর্ডারে। কাস্টমস-এর বেড়াজাল ডিঙিয়ে ভারত-সীমানায়। তারপর বনগাঁ। সন্ধ্যা ৬টায় বনগাঁ থেকে ট্রেন ধরে শিয়ালদায় এসে পৌঁছালাম রাত ৮টায়। গদাধর আশ্রমে পৌঁছালাম রাত ৮.৩০ মিনিটে। ২০ দিনে বাংলাদেশ ঘুরে এলাম।

কি দেখলাম? বাংলাদেশে প্রথমেই নজরে পড়ে পরিবহন-ব্যবস্থা, সড়ক ও রাজপথ (Roads and highways)। ভারতে শুধু রাস্তার মধ্যে সাদা দাগ দিয়ে দুভাগ করা থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে রাস্তার পীচের কিনারে হলদে রঙ-এর আরো দুটি লাইন টানা; কারণ এই দাগ ছাড়িয়ে বাঁদিকের চাকা যেন পীচ ছাড়িয়ে না যায়। তাহলে বাস রাস্তা থেকে নিচে পড়ে যাবে। পুল বা কালভার্টে উঠবাব সময় দুটি সমান্তরাল লাইন দিয়ে বোঝানো হয় যে, কোন গাড়ি ডানে এই দাগ পার হবে না; তাহলে বিপরীতগামী গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। দূরগামী পরিবহন কোম্পানীর সুন্দর আরামদায়ক বাতানুকূল বাস আছে। তাদের কন্ডাক্টারের হাতে সেলুলার ফোনও থাকে, কোন খবরাখবর ও সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান, নির্দেশ পেতে পারে। আছে কি ভারতে? আমার জানা নেই।

কিন্তু এর বিপরীত হলো ট্রেন। ট্রেন সার্ভিস নাকি লোকসানে চলছে; বাংলাদেশ সরকার নিশ্চয়ই এবিষয়ে ভাবছেন। ঢাকা এবং শহরে মনে হয় ভোজ্য তেল সয়াবিন তেল। তরকারিতে খাওয়া যায়, শরীরে মাখা চলে না। অবশ্য বাজারে সরষের তেল পাওয়া যায়। গ্রামে সরষের তেলই লোকে ব্যবহার করে। ছয়মাসের ব্যবহারযোগ্য রাস্তা অনেক জায়গায় হয়েছে, আরো হবে। শনির হাওর বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার ধানের ভাণ্ডার—এই হাওরের অনেক লক গেট হয়েছে—ঠিকমত কন্ট্রোল করতে পারলে অনেক ধান পাওয়া যাবে। ভাঙ্গা-ফরিদপুর থেকে লক্ষ্য করলাম, জলা জায়গাতে সারারাত জেলেরা মাছ ধরে। ❑

স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা

আবেদন

একথা অনস্বীকার্য যে, কালের প্রভাবে বিলীয়মান **স্বামীজীর পৈতৃক ভিটার পবিত্রতার পুনরুদ্ধার** এবং সেখানে যথোচিত **স্মৃতিমন্দির নির্মাণপূর্বক স্বামীজীর জন্মস্থান ও বাল্যজীবনের মহান স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন একটি জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক কর্তব্য**। কালক্রমে **স্বামীজীর মূল বসতবাটীটি** নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বহু পরিবারের নিবাসস্থল এবং **বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণদশাপ্রাপ্ত**। সৌভাগ্যক্রমে গত ১৯৬৩ সাল থেকে নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিরূপে ঐ জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রস্তুতি সমাপ্তপ্রায়। অবশ্য **ঐ পবিত্র স্থানে স্বামীজীর নামাঙ্কিত একটি স্মৃতিমন্দির ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার আগে** বর্তমান বাসিন্দাদের অন্যত্র আবাসনের ব্যবস্থা ও জীর্ণপ্রায় বাড়িগুলির আমূল সংস্কার একান্ত জরুরী। এই উদ্দেশ্যে **ইতিমধ্যেই তিন কোটি টাকার বেশি ব্যয় করা হয়েছে,** কিন্তু আরব্ধ কাজের সুষ্ঠু অগ্রগতির জন্য অবিলম্বে আরো অনেক অর্থের প্রয়োজন।

আমরা তাই বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের কাছে অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন দান RAMAKRISHNA MISSION নামাঙ্কিত চেক/ড্রাফট বা মানি অর্ডার মারফত **'স্বামীজীর বাড়ির জন্য'** উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করুন। **ভারতীয় আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারানুযায়ী এই অনুদান আয়করমুক্ত।**

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৭ নভেম্বর ১৯৯৯

স্বামী স্মরণানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

"আবিরাবির্ম এধি"

মদনমোহন মুখোপাধ্যায়

জীবন দিয়েছ, জীবদানী তুমি দাঁড়াও মোদের পাশে
অসৎ আঁধার মৃত্যু কবলে মরি মোরা ভয় ত্রাসে।
অসত্য নিয়ে ঘর করি মোরা অসৎ লইয়া বাঁচি
অসৎ হইতে টেনে নিয়ে যাও সত্যের কাছাকাছি।
সত্যাশ্রয়ী কর আমাদের সত্যের পথ ধরে
হয়ে যাক ক্ষয় মনের কালিমা চিরদিবসের তরে।

হাতড়াই শুধু তোমার ঠিকানা গভীর অন্ধকারে
মায়া-মোহ-জালে পড়িয়াছি ধরা সংসার-কারাগারে।
ধ্রুবজ্যোতি হয়ে দেখাও সে-পথ—কর পথ আলোকিত
হেরিব তোমার পায়ের চিহ্ন হব মোরা পুলকিত।
জীবন মোদের আঁধারে আঁধার ঢাকিয়াছে তটরেখা
কণ্টকে ভরা পদে পদে বাধা পথ নাহি যায় দেখা।

জন্মলগ্নে মৃত্যু ছুটিয়া দাঁড়ায় পিছনে এসে
যত দৌড়াই, পিছনে তাকাই, পরাজয় মানি শেষে।
নিয়ে চল তুমি তোমার ভুবনে যেখানে মৃত্যু নাই
জন্ম-মৃত্যু শেষ করে তুমি চরণেতে দাও ঠাঁই।
লক্ষ লক্ষ জন্ম-মৃত্যু ভাল তো লাগে না আর
শতেক জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরি করি শুধু হাহাকার।

খোল খোল তব রুদ্ধ দুয়ার বন্ধ রেখ না আর
ফিরে যেন আর আসিতে না হয় ছাড়িয়া তোমার দ্বার।
অসৎ আঁধার মৃত্যু হইতে তুমি উদ্ধারকারী
দাও আশ্রয়, তুমি যে মোদের চির পিপাসার বারি।
অকূল আঁধারে মলিন চিত্ত সবই শূন্যময়
কাতরে বিনয়ে মিনতি জানাই এস হে জ্যোতির্ময়।

আবির্ভাবের শুভলগ্নের আশায় বাঁচিয়া আছি
এস এস তুমি দাঁড়াও আসিয়া আমাদের কাছাকাছি
চরণ তোমার দাও গো বাড়িয়ে হাতখানি দাও হাতে
তোমার পায়ের চিহ্ন দেখিয়া চলে যাব সাথে সাথে।
শূন্য পড়িয়া থাক না তোমার ভুবন-আলয় বেদি
সাড়া দাও তুমি জগতের স্বামী "আবিরাবির্ম এধি"।

আত্মার কারগিলে

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সব যুদ্ধই কি লড়া হয় পাহাড়চূড়ায়
যেখানে চারিদিক ঢাকা তুষারের শ্বেত চাদরে,
হিমেল হাওয়ার তীক্ষ্ণ ছুরি
হাড়ে গিয়ে বেঁধে মোটা পশমী পোশাকের
আস্তরণ ভেদ করে।
যেখানে বেঁচে থাকার প্রয়াসে
প্রকৃতির বিরুদ্ধেই নিরন্তর, সর্বক্ষণ
করে যেতে হয় রণ।
ধন্য সেই শেরদিল সেনা
যার অভয় মুকুট পরা উন্নত মস্তক
কভু নিম্নে নামে না।
যে হেসে হেসে মরণকে বাঁধে আলিঙ্গনে,
মাটিকে রাঙিয়ে দেয় শোণিত তর্পণে।
না, না,
আরো যুদ্ধ আছে
যার গুরুত্ব অনেক, অনেক বেশি
মানুষের কাছে।
আছে বীর, আরো কুশল, সাহসী, নির্ভীক
যে সেই অসুরদের চিনে নেয় ঠিক
যারা ওত পেতে বসে থাকে সুযোগসন্ধানে
আত্মার কারগিলে।
যদি অসতর্ক শৈথিল্যের ফলে
মুক্ত দ্বার যায় পাওয়া অকস্মাৎ রুদ্ধের স্থলে।
অতর্কিতে হানা দিয়ে তখনি আত্মাকে আনতে দখলে।
নিরলস সমরে তাই সদা ব্যস্ত সে রয়—
যতদিন দিব্যতার পতাকা না ওড়ে
অন্তরে অসুর-কবলিত চূড়ায়।
ধসে পড়ে গোপন বাঙ্কারের আঁধার গহ্বর
শত্রুমুক্ত রণক্ষেত্রে বিজয়ী সেই বীর;
তার তরে
শ্রদ্ধায় নত হয় সকলের শির।।

মৃত্যু ও জীবন

নিমাই মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু আছে তাই জীবন আছে
মৃত্যু না থাকলে জীবনের মানে থাকত না।
আসলে জীবনও নেই, মৃত্যুও নেই।
অনন্ত সময়ের মধ্যে দুটি বিন্দুর মধ্যে অবস্থানই জীবন।

গ্রন্থি খুলে গেলে আবার সেই অনন্তের পথে যাত্রা
যতক্ষণ না গ্রন্থি পড়ে আবার জীবন শুরু হয়।
অনন্তের পথে হাঁটাই জীবন, অনন্তের পথে হাঁটাই মৃত্যু
তফাত শুধু মধ্যের অবস্থান।

আমি চেয়েছিলাম

জুঁই সরকার

আমি চেয়েছিলাম
তুমি আসবে
আজীবন নীলাকাশের ছবি নিয়ে,
আমি চেয়েছিলাম
তুমি আসবে হিমেল বাতাসে
নাৎসীবাদের ধ্বংস-কাব্য নিয়ে,
স্পর্ধিত বনরাজির
শ্যামল বিভা নিয়ে,
বুকের আগুনের রক্তিম উচ্ছ্বাসকে
লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে
তুমি আসবে ভেবেছিলাম।
কৈশোরের শীতল মাদুরে
অবগাহন করে
তুমি আসবে চেয়েছিলাম।
আমি চেয়েছিলাম
ক্রোধের অঙ্গারে
তুমি পুড়িয়ে দেবে
পৃথকের জ্বলন্ত বল্লমটাকে,
আমি চেয়েছিলাম
তুমি আসবে
হরিৎ পত্রালিতে
কস্তুরীবাস ছড়িয়ে দিয়ে,
চৌচির মাটিতে
রক্ত-সংগ্রামকে স্যালুট করে
তুমি আসবে
আমি চেয়েছিলাম।
আমি চেয়েছিলাম
চৈত্রের খরায়
ক্রোধোন্মত্ত দানবের
মৃত্যুকে লিখে দিয়ে
তুমি আসবে।

তুমি আসবে স্বাধীনতা,
আমি চেয়েছিলাম
কিন্তু খণ্ড খণ্ড রূপে
আমি চাইনি তোমাকে।
তুমি আসবে কেবল
স্বপ্নময় দ্বীপের কাব্যের ঐশ্বর্য নিয়ে,
হে স্বাধীনতা।

ঐ পাখিটাই তো চাই*

এ. কে. রামানুজন

অনুবাদ ঃ হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী

আর জানো কি
মঙ্গোলিয়ায় এক রাজা ছিলেন
আর তিনি এক দেশ জয় করতে চললেন
তিনি এক আশ্চর্য পাখিকে গান গাইতে শুনলেন
আর সেই গানটি তিনি চাইছিলেন
আর গানের জন্য পাখি
আর পাখির জন্য নীড় চাইছিলেন
আর নীড়ের জন্য শাখা
আর শাখার জন্য গাছ
আর গাছের জন্য মূল চাইছিলেন
তার আশপাশে মাটির ঢের
ঐ গ্রাম, জল, সমস্ত জমিন, সারা রাজ্য
সবকিছুই তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছিলেন
এইজন্য তিনি তার সব শক্তি একত্রিত করলেন
নিজের হাতি ঘোড়া রথ সৈন্যবল দিয়ে
ঐ ভূমিটিকে জয় করে নিলেন
তাই আপন ঘরে তার আর ফেরা হলো না।

* মূল কবিতাটি কন্নড় ভাষায় লেখা। কবির নিবাস শিকাগো, আমেরিকা। জন্ম ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে। ভাষা-শাস্ত্রজ্ঞ। কন্নড় এবং ইংরেজী কবিতায় ভারতে খ্যাতিলাভ করেছেন। বিদেশেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছে। কবিতাটির অনুবাদক **হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী**ও কবি হিসেবে খ্যাতিমান, পুরস্কার-প্রাপ্ত।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

চিরায়ত

অরুন্ধতী রায়

আজো তো প্রভাত আসে
বাগানের পুষ্পসজ্জায় খেলা করে
রাত্রিশেষের শিশির।
হেমন্তের শিহরণ আর
সূর্যের কিশোরী আলোয় ছাওয়া
নিঝুম পথে ভেসে আসে তার চলার আমন্ত্রণ।
ফুলের সুরভি আর ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে
আজো তো সন্ধ্যা নামে
চাঁদের চেয়েও সুন্দর পৃথিবী
নিঃশেষিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস শোনে।
তবু আজো রাত নিশুতি হয়।
হাজার কলরোল আর স্মৃতিচারণার মাঝে
অনন্তকাল ধরে জেগে থাকে শুধু
একটি দীপ্যমান সন্ধ্যাতারা।

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

কষ্টকল্পনা ও অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট তুলনা

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৫ সংখ্যার 'সাহিত্য' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীমতী নিভা দে-র 'ফাল্গুনের দুই কবি : শ্রীরামকৃষ্ণ ও জীবনানন্দ' প্রবন্ধটি আদ্যন্ত কষ্টকল্পনা ও অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও কবি জীবনানন্দকে নিয়ে এই তুলনামূলক নিবন্ধটি রচিত, সেগুলির একটিও আপাত বা গভীর কোন অর্থেই এই দুজনের জীবন ও চরিত্রের সাদৃশ্যবাহী নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সবিকল্প এবং পরবর্তী স্তরে নির্বিকল্প ভাবসমাধির সঙ্গে জীবনানন্দের আত্মমগ্ন আচ্ছন্নতা ও কাব্যিক অন্যমনস্কতার সাদৃশ্য কোনভাবেই দাঁড়ায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারাক্ষণ ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন থেকেও ছিলেন অত্যন্ত ব্যবহারকুশল ও সদাজাগ্রত। পক্ষান্তরে কাব্যানুভূতির তন্ময়তায় নিরলস ডুবে থাকা জীবনানন্দ ব্যবহারিক জগৎ থেকে ছিলেন প্রায়-বিচ্ছিন্ন। তাঁর এই অন্তর্লীন [illegible]ন্নতা যেমন একদিকে তাঁর কবিতায় এনেছে অসাধারণ জমাট-বাঁধা মগ্নতা ও গভীরপ্রসারী ব্যঞ্জনা, তেমনি এই আত্মঘাতী অন্যমনস্কতার ফলে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে অতর্কিতে এবং অসময়ে। কবির এই নিদারুণ দুর্ঘটনাজনিত অকালপ্রয়াণে গভীর মর্মবেদনায় ব্যথিত হয়েও এর সঙ্গে কখনোই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধিস্থ হওয়ার ঘটনার তুলনা চলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরসাধনার কথা বলেছেন। সংসারে ও কর্মক্ষেত্রে বিষয়বাসনায় জড়িয়ে থাকা ও ছড়িয়ে পড়া বহুধাবিভক্ত মনটিকে নির্জনে না নিয়ে আসতে পারলে ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্ত হওয়া ও কেন্দ্রীভূত করা অত্যন্ত দুরূহ। জীবনানন্দের নিঃসঙ্গ একাকীত্ব কিন্তু একেবারেই এই সাধন-নির্জনতার সমধর্মী নয়। জীবনানন্দ তাঁর বিরল কবিস্বভাবের জন্য বহুর মধ্যে থেকেও একাকী ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর কাব্যে নানাভাবে তাঁর এই গোপনপ্রিয় নির্জনতা ও একাকীত্ব ধরা পড়েছে। তিনি হয়তো কতকটা সচেতনভাবেও 'নির্জনতার সাধনা' করেছেন। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-অনুসৃত পথ হলো ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে 'সাধনের নির্জনতা', যা তিনি তাঁর ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ আধিকারিক পুরুষ। নর-নারী, জীব-জড়—সবার মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীকে। এছাড়াও তিনি স্বয়ং ছিলেন মাতৃভাবের পূর্ণ আধার। তাই তাঁর দৃষ্টিতে তথাকথিত অসতী নারীও ভগবতীর অংশ। অথচ কবি জীবনানন্দ নারীকে সুমহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা জাত উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনেশাঁর আধুনিক চেতনা ও রোম্যান্টিক বোধ থেকে। নারী সম্পর্কিত এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। একই কথা বলা চলে প্রকৃতি সম্পর্কেও। বিশ্বপ্রকৃতি আর সৃষ্টির অসীম ও অপরূপ সৌন্দর্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল পরমপুরুষ আর ভবতারিণীর লীলাভূমি-রূপে। কিন্তু জীবনানন্দের প্রকৃতিপ্রেম ও নিসর্গচেতনার ভিত্তিভূমিতে আছে রোম্যান্টিক কবির স্বপ্নিল কল্পনা ও লিরিক উচ্ছ্বাস।

মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে উপমার ব্যবহারে চরম উৎকর্ষের পরিচয় রেখেছেন। উপমা ও অন্যান্য বিশিষ্ট কাব্যালঙ্কারের অসামান্য প্রয়োগ ছাড়াও চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কালে জীবনানন্দের শৈল্পিক সৌকর্য প্রায় অতুলনীয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমা! তাঁর উপমা তিনিই। একথা ঠিক যে, উপমার বৈচিত্র্যময় সুবিপুল সম্ভারের প্রাচুর্য তাঁকে 'কবি' অভিধায় ভূষিত করেছে। কিন্তু গভীরে গিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সৃষ্ট উপমা কবির উপমা নয়—লোকশিক্ষকের উপমা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব আচার্যশ্রেষ্ঠ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই উচ্চতার লোকশিক্ষকের আর দ্বিতীয় নজির নেই। লোকশিক্ষা[illegible] মানবজীবনের আর অধ্যাত্মদর্শনের সু[illegible]ভীর তত্ত্বাবলী[illegible] তিনি অসামান্য উপমার আলোকে অতিসাধারণ মানুষের কাছেও অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল করে উপস্থাপিত করেছেন! তাঁর উপমা নিছক উপমা সৃষ্টির জন্যই সৃজিত নয়। 'কথামৃত'-এর পাতায় পাতায় ছড়ানো এই অজস্র উপমাগুলির দ্ব্যর্থবোধহীন একমুখীনতা ও অতি পরিচিত বিষয়-অনুষঙ্গ শতাব্দীর প্রাচীর অতিক্রম করে আজো সর্বস্তরের মানুষের কাছে গূঢ় ও জটিল দর্শনের তাত্ত্বিক কচকচানি ও রহস্যকে একেবারে আটপৌরে সহজ সরলভাবে শুধু যে বোধগম্য করিয়ে চলেছে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করাতেও এক কালজয়ী শক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছে।

লোকশিক্ষক উপমা সৃষ্টি করেন জটিলকে সহজ করার জন্য। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য একেবারেই বিপরীতধর্মী। তিনি উপমা-অলঙ্কার-চিত্রকল্পের সাহায্যে পরিচিত বা অতি সামান্য বিষয় বা ঘটনাকেও কাব্যিক অলৌকিকত্ব ও সুগভীর ব্যঞ্জনা প্রদান করেন, যে-ব্যঞ্জনা কাব্যদেহের অর্থকে অতিক্রম করে এক অর্থাতীত আবহ সৃষ্টি করে। উপমা-চিত্রকল্পের সরণি বেয়ে কাব্যপাঠকের সংবেদনশীলতা যখন কবি-উদ্দিষ্ট সেই রহস্যকে আবিষ্কার করে, তখনি যথার্থ কাব্যরসের আনন্দ অনুভূত হয়। অতএব কবির উপমা জটিলকে সহজ করার বা বোধাতীতকে বোধগম্য করার জন্য নয়; বরং কবির অলঙ্কার ব্যবহারের উদ্দেশ্যই হলো বোধকে কিছুটা দুরধিগম্য করা। যা আপাত-স্পষ্ট, তাকে ছন্দ-অলঙ্কারের আবরণ-আভরণের মোড়ক দিয়ে এক আলোছায়াময় নান্দনিক দ্যোতনা সৃষ্টি করা এবং গহন ব্যক্তিক অনুভূতিকে এক অনির্বচনীয় দ্ব্যর্থবোধক বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা দান করা, যা বিভিন্ন কাব্যপাঠকের কাছে তাদের অনুভূতির সংবেদনশীলতার স্ব-স্ব স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় অনুরণিত হবে। ইলিয়টের কথায়—"A genuine poetry can communicate before it is understood." তাই কবির উপমা বোঝার চেয়ে বাজে বেশি। আর লোকশিক্ষকের উপমার প্রয়োজন যেহেতু বোঝানোর জন্য, তাই তা বাজার চাইতে বোঝায় বেশি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রদত্ত উপমা মূলত উদাহরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, যা আজকের যেকোন আধুনিকতম learning method-কেও

বিস্মিত ও চমকিত করে। ফলে উপমার সাদৃশ্য দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে জীবনানন্দের কেন, পৃথিবীর অন্য যেকোন শ্রেষ্ঠ কবিরই তুলনা চলে না। সরলতম উপমার সাহায্যে সহজতম উদাহরণ সৃষ্টি করার অনায়াস নৈপুণ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জীবনানন্দ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠতার নিরিখে এই সাদৃশ্য টানতে গিয়ে স্বামীজী-রচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণামমন্ত্রটির ব্যবহার একেবারেই বিসদৃশ। এই প্রণামমন্ত্রটির 'অবতারবরিষ্ঠ' শব্দটি তো বটেই। প্রতিটি শব্দবন্ধই সুগভীর তাৎপর্যবাহী ও সাধনলব্ধ উপলব্ধির অনুভূতিসঞ্জাত। "আজ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যজগতে তিনিই (জীবনানন্দ) শ্রেষ্ঠ কবি।"—এই বিবৃতিটির পাশাপাশি অকস্মাৎ প্রণামমন্ত্রটি উদ্ধৃত করে চটজলদি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টার মধ্যে অতিসরলীকরণের প্রবল ঝোঁক পরিলক্ষিত।

প্রবন্ধটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জীবনানন্দের জন্মসময় ও আয়ু ইত্যাদির সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অনেকাংশেই আরোপিত। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনানন্দের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে 'ফাল্গুনের কবি'-রূপে উপস্থাপনও সুচিন্তিত নয়।

পরিশেষে বলি, জীবনানন্দ বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি মানবিক দোষগুণসমন্বিত আদ্যন্ত একজন মানুষ। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরদেহধারী অবতারপুরুষ—একই আধারে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ—"নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব"। অবতারের তুলনা একমাত্র অবতারের সঙ্গেই হতে পারে—একজন মানুষের সঙ্গে নয়, তা তিনি যত বড়ই হোন না কেন।

দেবাশিস ঘোষ
গল্ফ রোড, ইস্ট কলোনী
জামালপুর-৮১১ ২১৪
মুঙ্গের, বিহার

'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি'

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৬ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি' তার মধুর মূর্চ্ছনায় আমাদের বিবশ করেছে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই বিশেষ রচনাটি আমাকে এতটাই মুগ্ধ করে যে, এটি সকলের সঙ্গে ভাগ করে আনন্দ লাভ করতে আমি প্রয়াসী হই।

কোন্নগরে 'শ্রীঅরবিন্দ ভবন'-এর সঙ্গে আমি জড়িত। শ্রীঅরবিন্দের পৈতৃক বাসভূমি কোন্নগর। এই মহাযোগীর পিতৃপুরুষের জন্মভিটাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'শ্রীঅরবিন্দ-ভবন'। এটি শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, পণ্ডিচেরির একটি শাখাকেন্দ্র। এখানে নিয়মিত শ্রীঅরবিন্দের চর্চা, ধ্যান, পাঠ, আলোচনা, উৎসবাদি হয়। জন্মাষ্টমীর (২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯) পূর্ব সন্ধ্যায় ঐ ভবনের সভাঘরে আমাদের পাঠ ছিল। মূলত এখানে অরবিন্দ-সাহিত্য থেকেই পাঠ করা হয়। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য থেকেও পাঠ করে থাকি। ঐদিন আমি 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি' প্রবন্ধটি ওখানে পাঠ করি। প্রত্যেক শ্রোতা রচনাটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনেন। আমার প্রয়াসের সার্থকতায় আমিও বিশেষ আনন্দ লাভ করি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, শ্রীঅরবিন্দ নিজেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। এক জায়গায় তিনি লিখছেন : "প্রথম যে ভারতীয় লেখাগুলি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তা হলো উপনিষদাবলী।... প্রথম জীবনে ভারতবর্ষে আমি যে অন্য প্রগাঢ় বৌদ্ধিক প্রভাব পেয়েছিলাম তা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তৃতা-বলী।" (শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কলকাতা, পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য) অন্যত্র এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন (১০।১। ১৯৩৯) : "বিবেকানন্দের আত্মা থেকেই পেলাম প্রথম অতি-মানসের সন্ধান। আর পেলাম ঋত-চেতনা কিভাবে সর্বত্র কাজ করে তার ইঙ্গিত।... (আলিপুর) জেলে পনের দিন ধরে তিনি আমাকে দেখা দিয়েছেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁর শিক্ষা অনুধাবন করতে পেরেছি ততক্ষণ আমায় ছাড়েননি।" (শ্রীঅরবিন্দের সহিত কথাবার্তা—নীরদবরণ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫৬)

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র সংখ্যার সম্পাদকীয় 'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি' পড়তে পড়তে কথাগুলি এসে গেল। নিবন্ধটি পড়ে যে গভীর আনন্দ পেয়েছি তা পুনরায় জানাই এবং সেকথা নিবেদন করে পরম তৃপ্তি লাভ করলাম।

অজয় মুখোপাধ্যায়
শম্ভু চট্টোপাধ্যায় সরণি
কোন্নগর-৭১২ ২৩৫

প্রসঙ্গ 'শতবর্ষেও দীপ্তপ্রাণা লাবণ্যপ্রভা দেবী'

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ সংখ্যায় শান্তি সিংহের 'শতবর্ষেও দীপ্তপ্রাণা লাবণ্যপ্রভা দেবী' শীর্ষক সাক্ষাৎকারটি অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণার দীপ্তি ছড়াবে, বিকিরিত করবে উৎসাহের প্রভা।

শান্ত-স্নিগ্ধ দুপুরগুলোতে শতায়ুমতী অগ্নিশিখা লাবণ্যপ্রভা দেবীর সাথী স্বামী বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন'। উঃ কী অপূর্ব দৃশ্য! ভাবতেও ভাল লাগে।

যখন প্রসন্ন কৌতুকে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলেন : "নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে-বছর জন্ম, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা যে-বছর, সেই বছর আমারও জন্ম। নেতাজী আর রামকৃষ্ণ মিশনের সমান বয়সী আমি।" তখন আরো ভাল লাগে।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে পাওয়া স্বদেশী আন্দোলন করার শক্তি অর্জনকারী দীপ্তপ্রাণার কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয় : "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বই পড়লে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। মনের জোর বাড়ে। তাই এখনো নিয়মিত আমি 'উদ্বোধন' পড়ি। এই দেখছ না—'উদ্বোধন' পড়ছি।" তখন আমাদের সকলের মন-প্রাণ এক অপূর্ব আনন্দে ভরে ওঠে। শ্রীশান্তি সিংহকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

স্বপনকুমার আইচ
বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ
কোচবিহার-৭৩৬ ১৬০

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মাত্র দুটি সম্বল। সে-দুটি থাকলেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জগতে এখনি প্রবেশ করা যাবে। জিনিস-দুটি কিছুই নয়, আবার ঐদুটিই সব। অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ঐদুটির কাছে কিছুই নয়, সামান্য খড়কুটো। সম্বল দুটি হলো—বিশ্বাস আর ভক্তি।

শঙ্করাচার্য তিনটি দুর্লভ প্রাপ্তির কথা বলেছেন, প্রথম—'তুমি মানুষ'। দুর্লভ প্রাপ্তি। দ্বিতীয়—মানুষ হয়ে তুমি থেমে রইলে না, তুমি মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তিলাভের প্রয়াসী হলে। মুক্তি মানে মৃত্যু নয়। মুক্তির অনেক ব্যাখ্যা। মুক্তিতে 'খেল খতম' নয়, মুক্তিতেই 'শুরু'। শাস্ত্র, বিচার, স্তোত্র, স্তব, যাগ, যজ্ঞ সব থাক, যেমন আছে। আসল অস্ত্র আছে ঠাকুরের 'অস্ত্রাগারে'। মুক্তির সন্ধান। সেখানেও শঙ্করাচার্যের প্রতিধ্বনি—অদ্বৈত, দ্বৈত, 'তুমি' শুধুই 'তুমি', অথবা 'আমিই' 'তুমি', 'তুমিই' 'আমি', কিংবা 'আমি'ও নেই 'তুমি'ও নেই, সবই 'মায়া'। মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম। বেদান্তীদের বিচারের জন্য তোলা থাক ওসব। আসল কথাটি শুনে রাখ—

> "ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা,
> কবিত্বঞ্চ লোকেষু কীর্তিং বিধত্তাম,
> গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্নু লগ্নং
> ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।"

গুরুই বলে দেবেন, মুক্তি কাকে বলে, মুক্তির পথ কি? তাহলে কি প্রয়োজন? মুক্তিমার্গের প্রথম পাঠ কি হবে। গুরুর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস। ঠাকুর বলতেন ঃ আমি কারো গুরু নই, কারো গুরু হওয়ার আমার বাসনা নেই। গুরু, বাবা, কর্তা—এইসব সম্বোধনে আমার গা জ্বলে যায়।

বেশ, তাই হোক। আপনি কারো 'গুরু' নন, আপনি বিপর্যস্ত জীবের বন্ধু এক মহাবিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীর ত্রিবিধ গুণে গুণান্বিত এক অগোচর শক্তি। কেমন? প্রকৃত বিজ্ঞানীদের তিনটি সম্বল—পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত। এঁরা সবাই বস্তু-বিজ্ঞানী। জীবজগৎ পর্যবেক্ষণ করে কেউ আবিষ্কার করবেন ওষুধ, কেউ পোষ মানাবেন প্রাকৃতিক শক্তিকে, কেউ তৈরি করবেন যন্ত্রদানব। এইসব করতে করতে তাঁদের বোধে ঝলসে উঠবে একটি তত্ত্ব, কোথায় বসে আছ তুমি কীটানুকীট মানব। কার অহঙ্কার, কিসের অহঙ্কার! রহস্যের যতটুকু ঢাকনা এই বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত খুলতে পেরেছি, তাতে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়টি খুলে গেছে—

> "তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্
> পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
> দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।" (১১।১৭)

তোমারই তেজ, তোমারই প্রভা, তোমারই শক্তি, তোমারই স্পন্দন, তোমারই তরঙ্গ, তোমারই বিস্তার, তোমারই সৃষ্টি, তোমারই পালন, তোমারই সংহার। **শক্তিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই শক্তি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।**

শঙ্করাচার্য বুঝেছিলেন, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম সকলের উপলব্ধির বিষয় হতে পারে না। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীরা ক্রমশই নিস্তেজ ক্লীবে পরিণত হচ্ছিলেন। ব্রহ্মে যখন কোন কর্ম নেই, আমাদেরই বা কেন কাজ থাকবে! ভারতবর্ষকে কর্মনাশা সর্বনাশ থেকে বাঁচাবার জন্য এলেন শ্রীরামানুজ। নিয়ে এলেন **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ**। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি মেশালেন। নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, সোঽহম্—সে বহু পরে, পথের শেষে, শেষ নিশানা, যার পরে আর কিছু নেই, সেটি হলো **লয়েরই নিলয়**। বেশ কথা। এই উপলব্ধি তাঁর, যাঁর সমাধিলাভের অভিজ্ঞতা হয়েছে। রামানুজ এই চরম **অদ্বৈতবাদ** কেটে দিলেন এই যুক্তিতে—ব্রহ্মকে আমি অস্বীকার করছি না, তবে ব্রহ্মকে আমি সবিশেষ বা সগুণ বলে অভিহিত করছি। কারণ, একটি বিচার—যাতে কোন বিশেষ নেই, যা অদ্বিতীয়, এক রস—বহুর উৎপত্তি তা থেকে কি করে হয়? নামরূপময় বৈচিত্র্য ঘটে কি করে? মূলত যে-সত্তা দ্বৈতহীন তা কি করে দ্বৈতের জনক হয়। এক 'আমি' কেমন করে বহু 'তুমি' হলো। দ্বৈতহীন সত্তা থেকে দ্বৈত উৎপন্ন হলে সিদ্ধান্ত তাহলে এই হবে—কারণ ছাড়াই কাজ হচ্ছে। যুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত টেঁকে না। তাহলে? তাহলে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই—এই জগৎ-প্রপঞ্চের মূলে আছে **অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চময় এক ব্রহ্মস্বরূপ বা কারণ বস্তু**। এই জগৎকারণের কারণ চিদ্ ও অচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম। নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মকে কারণ বললে অসঙ্গত হবে।

রামানুজ বললেন, সার কথা হলো—মুক্তিতে জীব ব্রহ্মে একেবারে মিশে যায় না। জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাস। অতএব মুক্তির পথ কী? শ্রীভগবানের নিত্যদাস্যই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। এই দাস্যে কেবলি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পরমা মুক্তি। জীব স্বরূপতই ভগবানের দাস। বিস্মৃতিই বন্ধন। স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হলেই দুঃখ, যন্ত্রণা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আরো, আরো সহজ। বললেন ঃ ভূতকে জানলে ভূতের ভয় চলে যায়। বন্ধনকে জানলে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি। বদ্ধজীবকে দেখ। একটু সরে এসে দেখ। 'আমি', 'আমি'—'আমি'র টঙ্কার—নীচ অহঙ্কার—কাঁচা আমি। আমার, আমার করতে করতে ভড়ভড় করে সংসার-পাঁকে ডুবে গেল। আর বলতে লাগল, কেয়া বাত, কি তোফা আছি! জালের মাছ। জাল-ফাল নিয়ে অতল পুকুরে, পাঁকে জেবড়ে রইল। বললে, এই বেশ। পরিণতি। মহাকালের কড়ায়

সাংসারিক নির্যাতনের আগুনে অহঙ্কারের তেলে ভাজা ভাজা। বেটা বলদ! ঠাকুর বলছেন ঃ হাম্বা, হাম্বা, যতদিন বেঁচে রইল অসীম নিগ্রহ। হালে জুতল, বেধড়ক পেটাল। অবশেষে মরল, এল কসাই। কাটাকাটি হলো। চামড়ায় জুতো হলো। ঢোল হলো, তখনো পেটাই। খুব পেটে সবাই। তখনো নিস্তার নেই। শেষে নাড়িভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈরি হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়, তখন আর হাম্বা হাম্বা—'আমি', 'আমি' বলে না, তখন বলে 'তুঁহু', 'তুঁহু'—'তুমি', 'তুমি'। যখন 'তুমি', 'তুমি' বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর, আমি দাস তুমি প্রভু, আমি ছেলে তুমি মা।

ঠাকুর কিন্তু ব্রহ্ম থেকে সরলেন না। নির্বিশেষ, নির্গুণ, অনন্ত 'আমি'তে জীবের সবিশেষ ক্ষুদ্র 'আমি'টিকে খুঁজে নিলেন। চিমটে দিয়ে টেনে টেনে তুললেন, আষ্টেপৃষ্ঠে হড়হড়ে শ্যাওলার মতো লেগে আছে কাম-কাঞ্চন। কলির প্রধান দুটি অবিদ্যামায়া। যখন তুলছেন তখন ছটফট করছে, কাতরে প্রার্থনা করছে ঃ ঠাকুর! ছেড়ে দাও, বেশ আছি, বেড়ে আছি! প্রকৃত গুরু, উত্তম বৈদ্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ফণাধারী ফণী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে বললেন ঃ তোমাকে আমার স্বরূপ, বিশ্বরূপ দেখাব, তবে তোমার ঐ মায়িক চোখে সে-রূপ দেখা যাবে না—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।"
(গীতা, ১১।৮)

অঘটনঘটন-যোগশক্তি।

ঠাকুর বললেন ঃ ছটফট করলে কি হবে! ধরেছি যখন ছাড়ছি না। এই নাও হনুমানের দৃষ্টি। রাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ? হনুমান বললে ঃ রাম! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।

জীবশরীরে বোধের রকমফের হবেই, 'আমি' হলো ঝুড়ির কাঁকড়া, দাড়া বের করে খড়বড় করে ঝুড়ির গা বেয়ে উঠতে চাইবে। সদা 'সোঽহং' লক্ষে একজন। 'আমি' তো যাওয়ার নয়। তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।

'আমি' রইল এবং 'ব্রহ্ম'ও রইল। 'ব্রহ্ম' অস্পষ্ট ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। 'আমি' কিন্তু স্পষ্ট, সোচ্চার এক পরম শত্রু, মিত্রের রূপ ধরে বসে আছে। যে সারথি হয়ে বসে আছে, যে কুব্জ হয়ে অনবরত কু বুঝিয়ে যাচ্ছে, তার হাত থেকে নিস্তারের উপায়?

উপায়—"মামেকং শরণং ব্রজ"। শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হও। ভক্তি লাভ করে ভক্ত হও। তাঁর কাছে আছে মুক্তির চাবি, মোক্ষের চাবি। তিনি শ্রীভগবানের কণ্ঠে বলছেন (গীতা, ১৮।৫৫)—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।"

সংসারে থাক, মন ফেলে রাখ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে। ❑

ভ্রম সংশোধন

'উদ্বোধন', শারদীয়া (১৪০৬) সংখ্যা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	আছে	হবে
সূচীপত্র ঃ ২য় পৃষ্ঠা	শেষ পঙ্‌ক্তি	'৫৭৮'	'৫৭৭'
৪১৭	৮	'সজল'	'সচল'
৪২৭	শিরোনামের পাশে	'স্বামী বীরে(শরানন্দ'	'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ'
৪৬৫	ভূমিকার শেষ পঙ্‌ক্তি	'মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—লেখক'	'মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।—লেখক'
৪৯২	২২ (২য় স্তম্ভ)	'১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে'	'১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে'
৪৯৪	১২ (২য় স্তম্ভ)	'১৮৪৪ সালের'	'১৮৮৪ সালের'
৫০৩	৮ (১ম স্তম্ভ)	'করা ঠিক হবে না'	'করতে চাননি'
৫২০	২১ (২য় স্তম্ভ)	'Ã›¶¿îÂËú±ñ ÎîÂ± Îð'	'প্রতিশোধ তো নেবেই। এটা হচ্ছে'

ক্যান্সারের বিপদসঙ্কেত

উৎপল সান্যাল

প্রবন্ধ-লেখক আমাদের জানিয়েছেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে পরিবর্তিত আকারে কিছুদিন আগে একটি বাঙলা দৈনিকে তিনি লিখেছিলেন। লেখক বিশিষ্ট ক্যান্সার-গবেষক। তিনি কলকাতার বিখ্যাত চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কেমোথেরাপি বিভাগের প্রধান। লেখক মনে করেন যে, বিষয়টি জনস্বার্থে আরো প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন এবং উক্ত দৈনিকের পাঠকবর্গ এবং 'উদ্বোধন'-এর পাঠকবর্গ এক নাও হতে পারে। ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বর্তমানে যেভাবে ব্যাপকভাবে ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে তাতে বিশেষজ্ঞ লেখক বিশেষ উদ্বিগ্ন। অনুমান করা হচ্ছে, ২০০০ খ্রীস্টাব্দে সারা পৃথিবীতে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটি। সেজন্য বিষয়টি সম্পর্কে সর্বসাধারণের সবিশেষ অবহিত এবং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। জনস্বার্থের বিষয়টি মাথায় রেখে এবং লেখকের উদ্বেগের সঙ্গে সহমত হয়ে লেখাটি আমরা প্রকাশ করলাম।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

কথিত আছে যে, সন্তানহারা কিসা গৌতমী বুদ্ধদেবের নির্দেশে মৃত্যু প্রবেশ করেনি এরকম বাড়ি থেকে একমুষ্ঠি সরষে আনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন, এরকম বাড়ি নেই। এখন আমাদের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু, পরিচিতদের মধ্যে যে-হারে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে এই কথিকা খানিকটা মনে করায়। নানা কারণে ক্যান্সারে আক্রান্তের হার বেড়েই চলেছে, যার অন্যতম হলো ভয়াবহ পরিবেশ-দূষণ। এছাড়া বিংশ শতাব্দী তথা এই সহস্রাব্দের শেষপ্রান্তে পৌঁছে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি সত্ত্বেও যে-কয়েকটি রোগ এখনো সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয়নি তাদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে ভীতিপ্রদ হিসেবে ক্যান্সার চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। স্বয়ং যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই রোগ নিজদেহে বহন করেছিলেন এবং এটিই তাঁর দেহত্যাগের কারণ হয়েছিল—এই ঘটনা কি কোনকিছুর দ্যোতক?

প্রাচীনত্ব

ক্যান্সার বহু প্রাচীন রোগ। কাঁকড়ার ল্যাটিন নাম 'Cancrum' ইংরেজী 'Cancer' শব্দটির উৎস। সংস্কৃতে একে 'কর্কট রোগ' বলে। খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ৬০০ বছর আগে প্রণীত সুশ্রুত সংহিতায় অনুরূপ রোগলক্ষণ বর্ণিত আছে। মিশরের পিরামিডে প্রাপ্ত মমির হাড়ে (খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ বছর) এর অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছে। এমনকি প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরদের কোন কোন ফসিলে প্রাপ্ত হাড়ের ক্ষয়জাত পরিবর্তন এর জন্য মনে করা হয়।

ধর্ম

ক্যান্সার কিন্তু কয়েকটি নয়, বরং অনেকগুলি (কমবেশি তিনশ) রোগের বৃহৎ পরিবার, যারা নিজ বৈশিষ্ট্য ও উপসর্গে আলাদা হলেও যে-ধর্মগুলিতে অভিন্ন, সেগুলি হলো: (১) রোগাক্রান্ত কোষগুলির বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্রিত, অস্বাভাবিক এবং সুস্থ কোষকে ধ্বংস করতে সক্ষম। (২) কোষগুলি সরাসরি পার্শ্ববর্তী অংশে ছড়াতে পারে আবার রক্ত, লসিকা (lymph) ইত্যাদি সংবহনের মাধ্যমে দূরবর্তী অংশেও ছড়িয়ে পড়ে সেখানে বৃদ্ধি পেতে পারে। (৩) কোষগুলি দেহের কাজে অপ্রয়োজনীয় ও অপরিণত হয় এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে না। কী পরিস্থিতিতে কোন্ সময়ে দেহে সুস্থ স্বাভাবিক কোষ দুষ্ট ক্যান্সার কোষে পরিবর্তিত হবে তা বহুলাংশেই অজানা। তবে পরিবেশ, পেশা, খ্যাদ্যাভ্যাস, দেহের পুষ্টি ও জীবনীশক্তি, আয়োনাইজিং বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয়তা, কয়েকটি রোগ ও ভাইরাসের আক্রমণ, দেহে উপস্থিত ক্যান্সার উৎপন্নকারী oncogene-এর সক্রিয় হওয়া ও প্রতিরোধক টিউমার সাপ্রেসর জিনের নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এছাড়া যান্ত্রিক, রাসায়নিক অথবা ভৌত ধরনের দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনায় ক্যান্সার হতে পারে, যেমন ছুঁচাল দাঁতের ঘষায় অনেক সময় জিভে বা গালে ক্যান্সার হয়।

বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের বৃদ্ধির হার বিভিন্ন হওয়ায় কোন ক্যান্সার রোগী দ্রুত মারা যান, আবার কোন ক্যান্সার রোগী বেশ কিছুদিন বাঁচতে পারেন। আবার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য ঠিক একই ক্যান্সারে আক্রান্ত দুজন রোগীর ক্ষেত্রে একই চিকিৎসা সমান ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। তাই এর চিকিৎসা এত জটিল। ক্যান্সার সংক্রামক বা ছোঁয়াচে নয়, তাই বাড়িতে বা হাসপাতালে রোগীর সংস্পর্শে আসার বা সেবা করার অসুবিধে নেই। মহিলা-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই রোগ হতে পারে যদিও মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা এবং শিশুদের তুলনায় মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধরা অনেক বেশি আক্রান্ত হন। এমনকি সদ্যোজাত শিশুকেও ক্যান্সার নিয়ে জন্মাতে শোনা গেছে। শুধু মানুষই নয়, অন্যান্য অনেক প্রাণীরও ক্যান্সার হয়।

চিকিৎসাপদ্ধতি

সারা বিশ্বে মুখ্যত যে তিনটি স্বীকৃত চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যাপক ব্যবহৃত হয় তা হলো—(১) সার্জারি বা শল্যচিকিৎসা, (২) রেডিওথেরাপি বা রশ্মিচিকিৎসা এবং (৩) কেমোথেরাপি বা ঔষধচিকিৎসা। এছাড়া হর্মোনথেরাপি ও ইমিউনোথেরাপি-সহ অন্যান্য বায়োলজি থেরাপি চালু আছে। এখন চিকিৎসার আগে-পরে একাধিক পদ্ধতি একসঙ্গে প্রযুক্ত হয়, যার ফলে কয়েকটি ক্যান্সার আয়ত্তাধীন হয়েছে। অস্ত্রোপচার সব থেকে পুরনো পদ্ধতি। গত শতাব্দীর শেষে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পরে ১৯৩০ সাল নাগাদ রেডিওথেরাপি চালু হয়। ১৯৪৬ সাল

নাগাদ আধুনিক কেমোথেরাপির সফল সূত্রপাত হয়। পঞ্চাশটির মতো ওষুধ আবিষ্কৃত হলেও সব ধরনের ক্যান্সারে সমান কার্যকর ওষুধ এখনো পাওয়া যায়নি। ওষুধের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে, যেহেতু এগুলি দ্রুত বাড়তে থাকা ক্যান্সার কোষের ওপরে অনেক বেশি ক্রিয়াশীল হলেও সুস্থ কোষের ওপরেও কিছু প্রভাব ফেলে।

রোগলক্ষণ—বিপদসঙ্কেত

শুরুতে ক্যান্সার রোগলক্ষণহীন ও বেদনাহীন। তাই রোগনির্ণয়ে স্বল্প সংখ্যক ক্যান্সার কোষ দেখে রোগনির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। রোগ কিছুটা এগলে তবেই লক্ষণ দেখা যায় এবং তখনি চিকিৎসা আরম্ভ হলে নিরাময়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন ক্যান্সার ধরার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সকলকে সচেতন করতে 'CAUTION'—এই ইংরেজী শব্দটি ব্যবহার করে আসছে, যেটি সাতটি ইংরেজী বাক্যাংশের প্রথম অক্ষরটি নিয়ে গঠিত হয়েছে ঃ (1) Change in usual bowel or bladder habits, (2) A sore that does not heel, (3) Unusual bleeding or discharge, (4) Thickening or lump in breast or elsewhere, (5) Indigestion (persistent) or difficulty in Swallowing, (6) Obvious change in wart or mole, (7) Nagging cough or hoarseness of voice.

একে ভিত্তি করে বাঙলায় বর্তমান লেখক-কৃত 'সাবধানতা স্বাগত' শব্দ-দুটি বিশেষভাবে মনে রাখা যেতে পারে। বিপদসঙ্কেতগুলির জন্য একইভাবে বাঙলা বাক্যাংশগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন ঃ (১) সারতে না চাওয়া ঘা, (২) বক্ষে (স্তনে) দেহের অন্যত্র দলা বা স্ফীতি দেখা দেওয়া, (৩) ধারাবাহিক অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ বা স্রাব যেকোন অংশ থেকে, (৪) নজরকাড়া পরিবর্তন তিলে বা আঁচিলে, (৫) তাড়াতাড়ি ওজন কমতে থাকা বা দীর্ঘস্থায়ী জ্বর অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাত কারণে, (৬) স্বাভাবিক মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন, (৭) গলার স্বর ভাঙতে বা বসে যেতে থাকা বা ঘ্যানঘেনে দীর্ঘস্থায়ী কাশি, (৮) তখনি খাবার গেলার অসুবিধা বা ক্রমাগত বদহজম। এই সঙ্কেতগুলি দেখা দিলেই যে ক্যান্সার হয়েছে, এমন ভাবার বা ভয় পাওয়ার কোন কারণই নেই। এগুলি দীর্ঘস্থায়ী হলে (৩ সপ্তাহ) ও সাধারণ চিকিৎসাব্যবস্থায় না সারলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

প্রাথমিক অবস্থায় মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে রোগনির্ণয়ের জন্য যেসব পরীক্ষাগুলির সুপারিশ বিশ্বে সাধারণভাবে করা হয়, সেগুলি হলো—(১) প্রতি বছর মুখগহ্বর, লিম্ফনোড পরীক্ষা করা, রক্তের সাধারণ পরীক্ষা ও চেস্ট এক্সরে করা (২) মলমূত্রে লুকানো (occult) রক্তপরীক্ষা ৫০ বছর বয়সের পরে প্রতি বছরে। মহিলাদের জন্য—(১) সারভিক্সের প্যাপ টেস্ট ১৮ বছর বয়সের পর প্রতি দুবছরে একবার, (২) ব্রেস্ট নিজে পরীক্ষা প্রতি মাসে—১৮ বছরের পর থেকে এবং ৪০ বছর বয়সের পর প্রতি বছর Mammogram (বিভিন্নভাবে ছবি তুলে পরীক্ষা) করা এবং চিকিৎসক দিয়ে স্তন পরীক্ষা করানো। পুরুষদের জন্য—(১) প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন (P.S.A.) পরীক্ষা ৫০ বছর বয়সের পরে প্রতি বছর।

প্রতিরোধ

ক্যান্সার প্রতিরোধ ও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে বিশ্বস্বীকৃত পন্থাগুলি হলো—(১) ধূমপান-সহ তামাকজাত জর্দা, খৈনি, নস্যি, দোক্তার ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার। সমীক্ষায় জানা গেছে, সমস্তরকম ক্যান্সারের ৩০ শতাংশ তামাক ব্যবহার থেকে হয়। (২) মদ্যপান বর্জন করা, কারণ এর থেকে মুখগহ্বরে খাদ্যনালীর ক্যান্সার হতে পারে। (৩) শিককাবাব জাতীয় আগুনে ঝলসে বা সেঁকে নেওয়া যেকোন মাংস বা মাছ যতদূর সম্ভব না খাওয়া, কারণ এগুলিতে অনেক ক্যান্সার উৎপন্নকারী যৌগ আছে। (৪) ছাতাপড়া বাদাম, গম, ময়দা পরিহার করা উচিত। (৫) নুনে সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্য যেমন নোনা মাছ ইত্যাদি না খাওয়াই ভাল। (৬) অত্যধিক গরম খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা উচিত নয়। (৭) ভিটামিন 'এ' ও 'সি' যুক্ত টাটকা তরি-তরকারি ও ফল যেমন বিনস, গাজর, কুমড়ো, টম্যাটো, রাঙালু, বাঁধাকপি, ফুলকপি বা পালংশাক এবং আম, পাকা পেঁপে, তরমুজ, আমলকি, কমলালেবু প্রভৃতি খাওয়া উচিত। (৮) আঁশযুক্ত তরিতরকারি যেমন কুমড়া, এঁচোড়, ঢ্যাড়স, বিনস, সজনে-ডাঁটা, পুঁই ও অন্যান্য ডাঁটাশাক উপকারী। (৯) হলুদে ক্যান্সার প্রতিরোধক একটি উপকরণ থাকাতে অল্প পরিমাণ কাঁচা হলুদ চিবিয়ে বা বেটে খাওয়া ভাল। (১০) স্বল্প পরিমাণে রসুন খাওয়া দরকার। এটি বিশেষত খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। (১১) ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ যেমন অ্যাসবেস্টস, আর্সেনিক, নিকেল, ক্রোমিয়াম, বেঞ্জিন, আলকাতরা, বিভিন্ন কৃত্রিম রং ইত্যাদির ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া পরিবেশকে যথাসম্ভব দূষণমুক্ত রাখা উচিত।

পরিসংখ্যান

উপযুক্ত পরিসংখ্যানের অভাবে ভারতে প্রতিবছর মোট আক্রান্ত, মৃত ও রোগমুক্তির সংখ্যা অনেকটাই অনুমান-নির্ভর। মনে করা হয়, বর্তমানে বছরে প্রায় ৮ লক্ষ ভারতীয় এতে আক্রান্ত হচ্ছে, ৫ লক্ষ অর্থাৎ প্রতি মিনিটে একজন মারা যাচ্ছে এবং সারা ভারতে রোগীর সংখ্যা কমপক্ষে ২০ লক্ষ। যেহেতু সর্বাধুনিক চিকিৎসার সুবিধা এবং পরিসংখ্যান আমেরিকায় সহজলভ্য মনে করা হয়, তাই সকলের জানার জন্য ওখানকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে কিছু তথ্য দেওয়া হলো—(১) ১৯৯৮ সালে প্রায় ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার আমেরিকান ক্যান্সারে মারা গিয়েছে। সেখানে হার্টের অসুখে মৃত্যুর পরেই এর স্থান দ্বিতীয় এবং প্রতি চারটি মৃত্যুর একটি ক্যান্সারে। (২) ১৯৯৭ সালে আনুমানিক ১৪ লক্ষ নতুন রোগী নথিবদ্ধ হয়েছে এবং এদের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ ৬০ হাজার অর্থাৎ শতকরা ৪০ জন ৫ বছরের বেশি বাঁচবে এবং অনেকেই

রোগমুক্ত হবে। এই ৫ বছরের মধ্যে হার্ট-সহ অন্যান্য বার্ধক্যজনিত অসুখে মৃত্যু ধরলে বর্তমানে প্রকৃত জীবিতের হার প্রায় ৫৮-৬০ শতাংশ হবে। (৩) প্রাথমিক অবস্থায় লক্ষণহীন অগ্ন্যাশয় ও মহিলাদের গর্ভাশয়ের ক্যান্সার ধরা পড়ার সম্ভাবনা এখনো খুব কম এবং অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারে মৃত্যুর হার খুবই বেশি। সৌভাগ্যক্রমে কম মানুষই এতে আক্রান্ত হয়। (৪) ১৯৯৮ সালে আগে আক্রান্ত আনুমানিক ৮২ লক্ষ রোগী বেঁচেছিল, যাদের কিছু রোগমুক্ত ও আরো বেশ কিছু নিরাময়ের পথে। এই তথ্যগুলি থেকে এটা পরিষ্কার যে, 'Cancer, no answer' বা ক্যান্সার মানেই মৃত্যু তা নয়, অন্তত আমেরিকার মতো উন্নত দেশে, যেখানে এখনি বাঁচবার সম্ভাবনা প্রায় ৬০ শতাংশ (সবরকম ক্যান্সার ধরে), যা ক্রমশ বাড়ছে। এই শতাব্দীর গোড়ায় আমেরিকায় রোগমুক্তির হার ছিল আনুমানিক ৫-১০ শতাংশ, যা মধ্যভাগে এসে ২৫ শতাংশ হয়েছিল।

চিকিৎসাকেন্দ্র

অনুমিত হয়েছে যে, ২০০০ সালে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রায় ১ কোটি নতুন রোগী নথিভুক্ত হবে। উন্নত চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়-পদ্ধতি ভারতেও ক্রমশ চালু হওয়ায় রোগীরা আরো উপকৃত হচ্ছে, যদিও রোগীর তুলনায় হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা নেহাতই অপ্রতুল। সারা ভারতে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও সর্ববৃহৎ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়া মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল (ফ্যাক্স নংঃ ০২২-৪১৪৬৯৩৭)। পূর্বভারতে ১৯৫০ সালে যাত্রা শুরু করে সরকারি পরিচালনাধীন কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টার, পরবর্তী কালে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউট চিকিৎসা ও গবেষণা-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে (ফোন নংঃ ৪৭৬-৫১০১)। এছাড়া সাতের দশকের মাঝামাঝি গড়ে ওঠা ঠাকুরপুকুরের ক্যান্সার সেন্টার ও ওয়েলফেয়ার হোম (ফোন নংঃ ৪৬৭-৪৪৩৩) একটি প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রও অনেক সরকারি হাসপাতালে বিশেষ বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও ক্যান্সার রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা হয়ে চলেছে।

ওয়েবসাইট

কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দৌলতে সারা বিশ্ব এখন ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। ক্যান্সারের সর্বাধুনিক তথ্য, বিভিন্ন খবরাখবর, চিকিৎসা ইত্যাদি জানানোর জন্য বিশ্বের বহু সংস্থা ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটে উপস্থিত হয়েছে। আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউট কর্তৃক গড়ে তোলা ইন্টারন্যাশনাল ক্যান্সার ইনফরমেশন সেন্টারের পত্রিকা Cancer Net data পাওয়ার ঠিকানা http://wwwicic.nci.nih.gov. বিশ্বপ্রসিদ্ধ আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির উদ্যোগে http://www.cancer.org. একটি তথ্যবহুল ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ওয়েবসাইট, যেখানে আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন।

ক্যান্সার নিরাময়ের সঙ্গে রোগীর মনের জোর ও দৃঢ়তার যথেষ্ট সম্পর্ক থাকায় সকলের উচিত রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা এবং রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তাকে মানসিকভাবে সাহস দেওয়া ও উৎসাহ জোগানো। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে ক্যান্সার একদিন না একদিন মাথা নোয়াবে—এটাই সবার বিশ্বাস। ❑

তথ্যসূত্র

(১) Principles & Practices of Oncology—ed. by Vincent De Vita and others, 5th edition, 1997; J. B. Lippincott—Raven Press

(২) Global Cancer Statistics—CA : Cancer J. Clin, 1999, pp. 33-64

(৩) Cancer Facts & Figures—1999, American Cancer Society, pp. 1-36

কনজাঙ্কটিভাইটিস ('জয় বাংলা') প্রতিরোধে করণীয়

সম্প্রতি কলকাতা বা আশপাশে চোখ লাল হওয়া বা 'কনজাঙ্কটিভাইটিস' রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে, যার সঙ্গে তিনবছর আগের 'জয় বাংলা' রোগের সাদৃশ্য থাকায় 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪০৩ সংখ্যায় এই রোগের 'প্রতিরোধে করণীয়' বলে যা বের হয়েছিল, জনসাধারণের উপকারের জন্য তা আবার তুলে ধরা হচ্ছে।—**সম্পাদক, 'উদ্বোধন'**

বাড়ির সকলে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় এক গ্লাস গরম জলে সিকি চামচ লবণ ও তিন/চার ফোঁটা স্যাভলন বা ডেটল বা ঐজাতীয় কিছু মিশিয়ে গার্গল করুন। কোন রোগীর কথাবার্তার সময়ে ঘটনাক্রমে কাছে থাকলে যত শীঘ্র সম্ভব আরেকবার গার্গল করা ভাল।

এই রোগের ভাইরাস-জীবাণু হাঁচি, কাশি বা কথা বলার সময় রোগীর থুতুকণার মাধ্যমে বাইরে এসে হাওয়ায় ভাসে; শ্বাস নেওয়ার সময় অন্য লোকের শরীরে প্রবেশ করে এবং অল্পসময়ে গলায় বংশবৃদ্ধি করে চোখে গিয়ে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে রোগসৃষ্টি হয়।

ডাঃ জলধিকুমার সরকার,
পি এইচ. ডি. এফ. এন. এ., ডিপ্লোমা ইন ব্যাকটিরিয়লজি (লন্ডন)
বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ ('উদ্বোধন')
প্রাক্তন প্রফেসর অফ ভাইরোলজি ও ডিরেক্টর
স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলকাতা
এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ভাইরাস-রোগ বিষয়ক
বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা কমিটির প্রাক্তন সদস্য

ডেঙ্গুজ্বর নির্মূলনে নতুন কৌশল

ভিয়েতনামের কয়েকটি অংশে ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার যৌথ কর্মসূচী রূপায়ণের ফলে ডেঙ্গুজ্বরের বিপদ কমে গেছে। একটি সাহায্যকারী সংস্থা 'অস্ট্রেলিয়ান ফাউন্ডেশন ফর দ্য পিপলস অফ এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক' সম্প্রতি একধরনের শক্ত খোলাযুক্ত ছোট জলচর পোকা (Meso-cyclops crustacean) ব্যবহার করার তিন বছরের প্রকল্প শেষ করেছে। এই এক মিলিমিটার আকারের পোকাটি ডেঙ্গুজ্বরের বাহক মশার শূক (larva) খেয়ে ফেলে। এই কাজে নিযুক্ত গবেষকরা বলেন যে, যা ফল পাওয়া গেছে তা খুবই আশাজনক। এই কর্মসূচী রূপায়ণের ফলে উত্তর ভিয়েতনামের 'ফান বয়' প্রদেশ মনে হয় মশকশূক-শূন্য হয়ে গেছে; অন্যান্য প্রদেশগুলিও ৭৫ শতাংশ কৃতকার্যতা লাভ করেছে। বেসরকারি সংস্থা 'কুইন্সল্যান্ড ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল রিসার্চ' এবং 'ভিয়েতনাম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড এপিডিমিয়লজি'—এই দুটি সংস্থা, যেসব জলে মশা ডিম পাড়ে, যেমন কুয়া, জলের ট্যাঙ্ক, বড় জলের পাত্র ইত্যাদিতে উপরি উক্ত পোকা-মিশানো জলের ফোঁটা ঢালার কাজটি করেছিল। জনশিক্ষা ও বাসস্থানগুলি পরিষ্কার রাখার শিক্ষাদানের ভারও তারা নিয়েছিল। অব্যবহৃত বালতি বা অন্যান্য গৃহস্থালী কৌটা যেখানে সেখানে ফেলে রাখলে ঐগুলিতে জমা জলে যে মশা ডিম পাড়তে পারে, সে-শিক্ষাও তারা দিয়েছিল।

কুইন্সল্যান্ড ইনস্টিটিউটের ম্যালেরিয়া ও 'অবোভাইরাস' (যে-ভাইরাসগুলি মশা-মাছির দ্বারা বাহিত হয়ে মানুষের দেহে রাগ সৃষ্টি করে) বিভাগের অধ্যাপক ব্রায়ান কে. বলেছেন যে, ডেঙ্গুজ্বর 'ইডিস ইজিপ্টাই' মশার কামড়ের ফলে হয় এবং প্রতি বছর ১,৭০,০০ ভিয়েতনামী এই রোগে ভোগে। তিনি আরো বলেছেন যে, এর প্রতিরোধব্যবস্থা নেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ এই রোগের ভাল চিকিৎসা নেই। এর প্রতিরোধে এখন যা করা হয়, তা হলো—মশা জন্মানো বন্ধ করা এবং মশা মারার ওষুধ (Insecticide) ছড়ানো। কিন্তু এই ব্যাপারে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন। কারণ, এই রোগের প্রতিরোধক কোন টীকা নেই। তাছাড়া 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ'-এর মুখপত্র, হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের পল এপস্টাইনের মতে, সারা পৃথিবীতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি (global warming) পাওয়ায় রোগপ্রতিরোধের ওপর বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্বন্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জকে দেওয়া ১৯৯৮-এর নভেম্বরে আবহাওয়া পরিবর্তন রিপোর্টে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, পৃথিবীর তাপবৃদ্ধির ফলে ডেঙ্গুজ্বর, ম্যালেরিয়া, কলেরা, পীতজ্বর (yellow fever), মস্তিষ্কপ্রদাহ প্রভৃতি সংক্রামক অসুখগুলি বাড়বে।

বর্তমানে অত্যুষ্ণ ও নাত্যুষ্ণ দেশগুলিতে (tropical and sub-tropical countries) ডেঙ্গুজ্বর হয়। এই দেশগুলির মধ্যে আছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশ (বিশেষ করে ব্রাজিল)। তাছাড়া এই অসুখ উত্তর অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনাতেও দেখা গেছে। **[British Medical Journal, 27 February 1999, p. 555]**

অল্প রক্তচাপবৃদ্ধিতে নতুন নির্দেশাবলী

রক্তচাপ অল্প বৃদ্ধি পেয়েছে এমন রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ হাইপারটেনশন'-এর নতুন নির্দেশাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৯৯৩ সালের নির্দেশাবলীকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এতে আছেঃ রক্তচাপবৃদ্ধি-প্রাপ্ত রোগীর চিকিৎসায় কি কি বিপদ হতে পারে সেগুলির কথা মনে রাখা; ন্যূনতম রক্তচাপ-মাত্রা হওয়া উচিত ১৩০/৮৫ মি. মি. মার্কারি; রক্তচাপবৃদ্ধির ছয় শ্রেণীর ওষুধের মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ ধরনের অসুখে আরম্ভ করা হবে তার নির্দেশ এবং রক্তচাপবৃদ্ধি কমাতে চিকিৎসকদের একসঙ্গে একাধিক ওষুধ (combination of drugs) ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা।

উপরি উক্ত দুটি সংস্থার মতে, অল্প রক্তচাপবৃদ্ধির চিকিৎসায় চিকিৎসকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে বলে নতুন নির্দেশাবলীতে এইসকল রোগীদের চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসার ব্যাপারে চালু ওষুধগুলিতে একটি নতুন ওষুধ 'অ্যানজিয়োটেনসিন-২' (Angiotensin-II) একটি বলিষ্ঠ অবদান। ওষুধটি চালু হওয়ার পরে বহু গবেষণামূলক কাজে প্রমাণিত হয়েছে যে, ওষুধটি কার্যকরী এবং রোগীর শরীরে এটি সহ্য হয়।

নতুন নির্দেশাবলীর প্রধান মতবাদ (philosophy) হচ্ছে যে, জোর দেওয়া উচিত কোন ওষুধের ওপর নয়, রক্তচাপ-মাত্রা কত রাখা হবে তার ওপর। নতুন চিন্তাধারা হচ্ছে, রক্তচাপ কমাতে অন্তত দুটি ওষুধ একসঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন, তিনটিও হতে পারে। শুধু একধরনের ওষুধের ওপর নির্ভর না করে চিকিৎসকদের ভেবেচিন্তে ওষুধ ঠিক করতে হবে। **[British Medical Journal, 27 February 1999, p. 555]** ❑

জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে

ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী

পরলোকতত্ত্ব—শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ। প্রকাশক: এইচ. রায়চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশন্স, ৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস, বাকসাড়া, হাওড়া-৭১১৩০৬। পৃষ্ঠা: ৩২+৫০৬। মূল্য: ২০০ টাকা।

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবননদে?"

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" সংসারে এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। জন্ম যেমন এক সৃজন-প্রক্রিয়ার পরিণত ফল, মৃত্যুও তেমন এক বিনাশ-প্রক্রিয়ার পরিণাম। জীবময় ধরণীর বুকে এই সৃষ্টি ও নাশের দ্বিমুখী অবস্থান জীবনকে যেমন মূল্যবান করেছে, মরণকেও তেমন অমোঘ করেছে। মানবসভ্যতার উষাকাল থেকেই এই বোধ মানবহৃদয়কে জিজ্ঞাসু করেছে, কৌতূহলী করেছে। পৃথিবীর সমস্ত দর্শন, সমস্ত ধর্মতত্ত্ব জীবন ও মৃত্যুর এই সৃষ্টি ও লয়ের বৈচিত্র্য নিয়ে চিন্তা করেছে গভীর ধ্যানসংযোগে। জীবের মধ্যে মানুষ যেহেতু চিন্তাশীল, তাই মানুষের জীবনচিন্তা ও মৃত্যুচিন্তা স্বতই উৎসারিত হয়েছে। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন ভুবনের মধ্যে মানুষের অবস্থান কি পর্যায়ে, এই নিয়ে শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ, দর্শন কোন-না-কোনভাবে ব্যাপৃত থেকেছে। ইহলোকে তো আমরা আছি, ইন্দ্রিয়সংবেদ্য এই ব্যক্ত ভূতজগৎ তো আমাদের দিন ও রাত্রিকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে। আমাদের জীবসংসারখানি দাবি করছে: আমিই সত্য, আমি আছি তোমার চলার পদযুগলে, দেখার নয়নযুগলে, স্পর্শের ত্বকে, রসনার তৃপ্তিতে, আছি আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনের জাগতিক ইন্দ্রিয়জগতে। এই পর্যন্ত যারা বুঝেছে তারা বস্তুবাদী, প্রত্যক্ষবাদী। তাদের কাজকারবার এই বস্তুজগতেই সীমাবদ্ধ। তারা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানী নয়। বিজ্ঞানী প্রচলিত জ্ঞানের বৃত্তের বাইরে পদার্পণ করে বিশেষকে জানে বলেই 'বিজ্ঞানী'। জীবনকে জানাটা তো কম কথা নয়; শাস্ত্র তাই জীবনকে জড়িয়েই জীবনাতীতকে দেখতে চায়। পরলোক ইহলোকের প্রত্যক্ষ নয়, লোকাতীত লোক। পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, দূর, অন্য বা উত্তর। যা লৌকিক বা দৃষ্ট হয় তাই 'লোক'। যা লোকিত বা দৃষ্ট হয় না, যা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, তাই 'পরলোক'। নেতিমুখে এই লোকের ব্যাখ্যা হলো। যা প্রত্যক্ষের অবিষয়, তাকে পরোক্ষ বলে জানা গেল। স্থূল প্রত্যক্ষের বাইরে যা সূক্ষ্ম, যা অব্যক্ত তা হলো 'কারণ'। ইহলোক স্থূল, ব্যক্ত ও কার্য এবং পরলোক সূক্ষ্ম, অব্যক্ত ও কারণ। এই অপ্রত্যক্ষ কারণ নিয়েই পরলোকতত্ত্বের অবতারণা। এই শাস্ত্রদ্বারে ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যন্ত অবগাহন চলে।

প্রত্যক্ষবেদ্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ত এই জীবলোক থেকেই মানব-মনীষা অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মলোকে যাওয়ার সাধনা করেছে। মাটিতে দাঁড়িয়েই মানুষ আকাশ দেখে। যাকে দেখি সেও আমার সঙ্গে আছে, যাঁকে না দেখি, বৃক্ষের মতো আকাশে স্তব্ধ হয়ে আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এসমস্ত জগৎ পূর্ণ। "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।" মানবসভ্যতার এই বোধটিই পরলোকতত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

মহাত্মা শিবরামানন্দ পরমহংসের শিষ্য শশীভূষণ নিজেকে আখ্যাত করেছেন 'শিবরামকিঙ্কর' বলে। 'যোগত্রয়ানন্দ' তাঁর দীক্ষান্তর উপাধি। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগে অসামান্য অধিকার ছিল তাঁর। তাঁর প্রজ্ঞাময় লেখনীতে 'পরলোকতত্ত্ব' গ্রন্থখানি এক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার।

গ্রন্থটি চার খণ্ডে রচিত। প্রথম খণ্ডের বিষয় প্রস্তাবনা, আস্তিক ও নাস্তিক, পরলোক কোন্ পদার্থ, জীবের জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত এবং জীবের জন্ম সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে জীবের জন্ম সম্বন্ধে মন্তব্যের অনুবৃত্তি ও পুনর্জন্মের ব্যাখ্যা। চতুর্থ খণ্ডের বিষয় কর্মতত্ত্ব, লোকান্তর, মরণোত্তর জীবের গতি এবং ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ও লিঙ্গদেহ।

প্রথম প্রস্তাবে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক'—এই শব্দদুটির নিরুক্তি উদ্ধার করে এই শব্দযুগলের প্রসিদ্ধ অর্থের সঙ্গে ব্যুৎপত্তি সঙ্গতি। দ্বিতীয় প্রস্তাবে 'পরলোক' শব্দের ব্যুৎপত্তি। তৃতীয় প্রস্তাবে জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। এরই সূত্র ধরে চতুর্থ প্রস্তাবে জীবের জন্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্য মতগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আধুনিক জীববিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব, কোষবিজ্ঞান, শরীরের উপাদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও পরে সমালোচনা করা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির সমন্যাস করে জীবনসৃষ্টির বহুবিধ কারণ ও উৎসসন্ধান করেছেন প্রাজ্ঞ গ্রন্থকর্তা।

পঞ্চম প্রস্তাবে গ্রন্থকার জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রতিচিন্তন দেখিয়ে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণামবাদ প্রাচ্যের শাস্ত্রানুগ আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদেরই বিকৃত রূপ। ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রস্তাবে জীবের জন্ম সম্বন্ধে সকল দর্শনের তত্ত্বগুলির সারসঙ্কলন করে গ্রন্থকার প্রাচ্যের তত্ত্বকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা অত্যন্ত অধ্যবসায় ও ধ্যানলব্ধ প্রজ্ঞার ফসল।

যোগত্রয়ানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান পাঠককে অভিভূত করে। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, বেদান্তাদি দর্শনে যেমন তাঁর অবাধ সঞ্চরণ, তেমনি পাশ্চাত্যের হেগেল, কোঁত, স্পেনসার, গ্রোড, টেট, স্টুয়ার্ট, উলফ, গ্যেয়টে, বনবেয়ার প্রমুখের তত্ত্ববিষয়ে তিনি সাবলীল। মহাজ্ঞানী যোগত্রয়ানন্দের এই গ্রন্থখানি জ্ঞানপিপাসু ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানুষের কাছে আকরগ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রন্থের প্রুফ দেখার ভ্রান্তি কিছু বেশিই আছে। আর কিছু শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। যেমন—

পৃঃ ২৫, পঙ্ক্তি ২৬ ও পঙ্ক্তি ২৯—'সাতিশয়' (finite), 'নিরতিশয়' (infinite) শব্দ-দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এই দুটি

শব্দই সমার্থক—অত্যন্ত অতিশয়। সাধারণত 'finite' সসীম ও 'infinite' অসীম অর্থবোধক।

পৃঃ ২২০, পঙ্‌ক্তি ১৫—'শক্তি সাতত্য'-কে 'persistence of force' বলা হয়েছে। 'Force'-এর বদলে 'energy' বললে ভাল হতো।

পৃঃ ৩১৬, পঙ্‌ক্তি ৮-১৯—'তাড়িতবিক্ষোভ'-কে 'electric disterbance' বলা হয়েছে। 'তাড়িত' কথাটির প্রতিশব্দ 'electrical', 'electric' নয়।

পৃঃ ৪০২, পঙ্‌ক্তি ১১—'আণবিক আকর্ষণ' 'cohesion' নয়, হওয়া উচিত 'atomic attraction', আর 'cohesion' হলো 'সংসক্তি'।

পৃঃ ৪৫৬, পঙ্‌ক্তি ১০—'ফল ও ব্যাপার' 'action and effect' বলা হয়েছে। হবে 'effect and action'।

প্রাচীন মূল্যবান এই তত্ত্বগর্ভ গ্রন্থখানির সম্পাদনায় অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্যই নজরে পড়ে; তথাপি অন্তর্বস্তুর মাহাত্ম্যে গ্রন্থটি প্রাধান্য পাবার যোগ্য। ❑

ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ণ

সীতা চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতি সংহিতা ● ফিরে দেখা—মনু থেকে পরাশর—সতী চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, কলকাতা-৭০০ ০৩২। পৃষ্ঠা : ৪+৬৮। মূল্য : ১৫ টাকা।
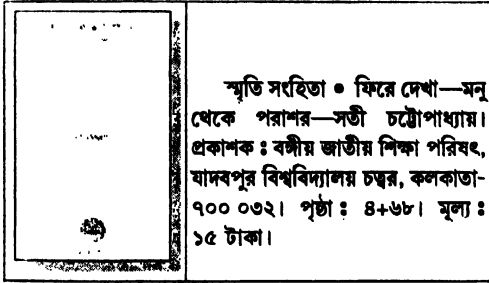
আজকাল অনেকেই মনে করেন, যাকিছু প্রাচীন, সবই খারাপ। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিশাস্ত্রকে বিশেষভাবে অবজ্ঞা করা হয় এই ভেবে যে, স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা শুধু নির্বোধ ছিলেন না, ছিলেন সঙ্কীর্ণমনা এবং দুষ্টও। এই ধারণা যে কত বড় ভুল, আলোচ্য গ্রন্থ **স্মৃতি সংহিতা ● ফিরে দেখা**-র লেখিকা অধ্যাপিকা সতী চট্টোপাধ্যায় তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এর জন্য তিনি রক্ষণশীল ভাবাবেগের দ্বারা প্রভাবিত হননি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়েছেন। তবে লেখিকা কখনো বলেননি যে, স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা সর্বদা অভ্রান্ত। তাঁদের সব সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্যও মনে হয়নি। কিন্তু দৃষ্টান্ত ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে তিনি নিপুণভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, তাঁদের বুদ্ধি বা উদারতা কোনটারই অভাব ছিল না এবং সমকালীন মানদণ্ডে বিচার করলে তাঁদের অনেক সিদ্ধান্তই শুধু অনুমোদনযোগ্য নয়, প্রশংসনীয়ও বটে। সাম্প্রতিক পটভূমিকায় বিচার করলে তাঁদের যে-অনুশাসনগুলি আমাদের সমর্থন পাবে না, সেগুলি সম্ভব হলে আমরা সংশোধন করে নেব, তা না হলে পরিত্যাগ করব, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাদের অবজ্ঞা করব না। যে-অনুশাসনগুলি এখনো প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়, সেগুলি আমরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করব। সেগুলি সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর করবে। ('ধর্ম' কথার অন্যতম অর্থ—'যা ধরে রাখে'।) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বৈদিক সাহিত্য' সম্পর্কিত কয়েকটি ইংরেজী পঙ্‌ক্তির অনবদ্য অনুবাদ লেখিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন : "অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইও না; অতীতের ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে স্থিত হইলে তবেই ভবিষ্যতে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিবে।"

স্মৃতি হিন্দুদের আচার-বিষয়ক গ্রন্থ। তার সামাজিক পটভূমি আছে। স্মৃতির বিধান শ্রুতির বাণীর মতো অপৌরুষেয় নয়, তা মানুষের নির্মিতি। পটের পরিবর্তন হলে সে-বিধানেরও পরিবর্তন হয়। সেই বিধানের ক্রমবিবর্তনের বিবরণ পরাশর পর্যন্ত মনু-পরবর্তী স্মৃতিসংহিতাগুলি অধ্যয়ন করলে পাওয়া যাবে। বর্তমান গ্রন্থটি লেখিকার সযত্ন অধ্যয়নের ফল। তিনি এই বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষক রূপরেখা আমাদের সামনে রেখেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের ও তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করাতে তাঁর আলোচনার গুরুত্ব বেড়েছে। তাই স্মৃতিশাস্ত্র বিশ্লেষণের পরে তিনি যে মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা খণ্ডন করা কঠিন : "প্রাচীন ভারতে মননের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আশ্চর্য গভীর ও নির্মোহ জীবনদৃষ্টি—এমন এক জীবনবোধ যা গভীরতা ও প্রসারগুণেই আধ্যাত্মিক মাত্রা লাভ করেছিল। 'দর্শন' শুধু একটি শাস্ত্র ছিল না, হয়ে উঠেছিল প্রত্যক্ষীকরণ—আদিত্যবর্ণ এক অক্ষয় অব্যয় সত্যের।"

বিদেশে যখন শিকড়ের (roots-এর) সন্ধান চলছে, তখন আমরা অনেকে আমাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে চাইছি! এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে? আশার কথা এই যে, ক্ষীণ হলেও শিকড়ের সঙ্গে যোগ আজও একটু আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করে লেখিকা আমাদের কর্তব্য যথাযথভাবে নির্দেশ করেছেন : "(১) বর্তমান যুগের উপযোগী করে, এযুগের ভাষায় প্রাচীন শাস্ত্রের সদর্থক সারটুকু গ্রহণ করা এবং (২) যাকিছু মৃত, অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক অথবা সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে—সেই অংশকে চিহ্নিত করে তার নির্দ্বিধ নির্মম বর্জন।" এবিষয়ে কারো কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়।

স্মৃতিসংহিতার নিন্দায় যাঁরা পঞ্চমুখ, তাঁরা বলে থাকেন যে, স্মৃতিশাস্ত্রে নারী, অব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং পুরুষ, ব্রাহ্মণ ও ধনীর প্রতি অকারণে ও অন্যায়-ভাবে পক্ষপাত দেখানো হয়েছে। এই ধরনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া, তা প্রমাণ করতে লেখিকার কোন অসুবিধা হয়নি। তবে লেখিকা একথাও ভোলেননি যে, স্মৃতিশাস্ত্রকারেরাও রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, তাঁদের কোন কোন বিষয়ে দুর্বলতা থাকতেই পারে, তাঁদের ভুলত্রুটিও স্বাভাবিক (মুনিদেরও তো 'মতিভ্রম' হয়)। লেখিকা নির্মোহ দৃষ্টিতে সেগুলি বিচার করেছেন। সার্থক হয়েছে তাঁর 'ফিরে দেখা'।

শ্রীমতী সতী চট্টোপাধ্যায়ের মতো আমাদেরও মনে হয় যে, অতীতকে বাদ দিয়ে নয়, তার নবীকরণ করে নিয়ে সেই ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায় প্রাণময় বর্তমান ও স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ। আধুনিক চেতনাকে শুদ্ধ করে নেওয়া যায় ঐতিহ্যের পুণ্যস্পর্শে। যে-শিকড় এখনো মরেনি, তাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে গত ফেব্রুয়ারি (১৯৯৯) মাসে সর্বভারতীয় যুবসম্মেলন ও ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি একটি ৮০ মিনিটের ভিডিও ক্যাসেটে ধরে রাখা হয়। গত ৮ সেপ্টেম্বর '৯৯ উক্ত ক্যাসেটটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৬ সেপ্টেম্বর '৯৯ 'স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ'-এর ওপর একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮০ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ জ্বেলে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরের (বেলুড় মঠ) অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ। স্বাগত-ভাষণে মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ শিক্ষকদের মহান ভূমিকা ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী কৃত্তিবাসানন্দ স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের তাৎপর্য আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষিকারা বলেন : বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে মানবসমাজকে উদ্ধার করতে গেলে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ অত্যন্ত আবশ্যক। বিবেকানন্দ-নির্ধারিত পথই মানুষের জীবনে পরম শান্তি আনতে পারে। তাঁর শিক্ষাদর্শন পুরোটাই ইতিবাচক। এই ইতিবাচক চিন্তাধারা ছাত্রছাত্রীদের মনে সঞ্চারিত করা খুবই জরুরী। সেই দায়িত্ব পালনের গুরুভার পড়েছে সমগ্র শিক্ষক-সমাজের ওপর। সভাপতির ভাষণে স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ বলেন : স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনই বর্তমান সমাজের ব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র ঔষধ। তিনি আশা করেন, ভারতের অর্থনৈতিক ও পারমার্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে এবং ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনই সেই অভিনব ভারত গড়ার মূলমন্ত্র। এরপর অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তর-পর্ব। শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ। তারপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন কয়েকজন শিক্ষক-প্রতিনিধি।

রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমে (বিহার) গত ২৬ সেপ্টেম্বর '৯৯ একটি সাধুনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। ঐদিন তিনি একটি জলাধার প্রকল্প ও একটি কমিউনিটি সেন্টারের উদ্বোধন করেন।

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ (জেলা—পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৬ সেপ্টেম্বর '৯৯ একটি 'জাতীয় সংহতি' সম্মেলন পরিচালনা করে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন।

চিকিৎসা-শিবির

ধলেশ্বর ও আগরতলা চিকিৎসা কেন্দ্র গত ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া বিষয়ে একটি আলোচনা-শিবির পরিচালনা করে। এই উপলক্ষ্যে গত ১৮ সেপ্টেম্বর একটি রক্তদান-শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

চক্ষু-চিকিৎসা শিবির

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৬ সেপ্টেম্বর '৯৯ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১৬৫ জন দুঃস্থ মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। তন্মধ্যে ৮ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

মালদা আশ্রম লক্ষ্মীপুর, বাগমারি ও ইংলিশবাজার ব্লকের প্রায় ২০০০ বন্যার্ত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

সারগাছি আশ্রম (জেলা—মুর্শিদাবাদ) বেলডাঙ্গা ও কান্দি পঞ্চায়েতের ৩০০০ বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে শুকনো চিড়া, গুড় ও রুটি বিতরণের পর খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

বেলুড় মঠ নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ও প্রাচীন মায়াপুরের ২০০০ বন্যাক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে চিড়া, গুড়, খিচুড়ি; শিশু ও মায়েদের জন্য দুধ, বিস্কুট এবং ১৪৭২টি শাড়ি ও ১৫৩৮টি ধুতি বিতরণ করেছে। এছাড়া ১২ দিন ধরে ১৮০৩ জন রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

ইছাপুর মঠ (জেলা—হুগলী) খানাকুল ১নং ব্লকের ঘোষপুর ও ঠাকুরানীচক গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজার হাজার জলবন্দী মানুষের মধ্যে চিড়া ও গুড় বিতরণ করেছে।

আঁটপুর মঠের (জেলা—হুগলী) মাধ্যমে চিংড়া ও আরাণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭টি গ্রামের ১৫০০ বন্যার্ত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ) হুগলী জেলার বেরাবেরি গ্রামের বন্যার্ত মানুষের মধ্যে প্রাথমিকভাবে তিনদিন ধরে ১৩২০ কিলোঃ চিড়া, ৩৭৫ কিলোঃ গুড় এবং জয়মোল্লা, চক-কালিকাবুরি প্রভৃতি ৯টি গ্রামের ৮৩৭০ জন মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া হাওড়া জেলার সুকান্তপল্লী ও অন্যান্য অঞ্চলের ২০০০ জলবন্দী মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরিত হয়েছে।

বাগবাজার মঠের মাধ্যমে উত্তর কলকাতার ২০০০ জলবন্দী মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

অদ্বৈত আশ্রম পূর্ব কলকাতার বন্যাক্লিষ্ট শিশু ও মায়েদের মধ্যে দুধ বিতরণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।

আসানসোল আশ্রম (জেলা—বর্ধমান) বর্ধমান জেলার গুসকরা, মঙ্গলকোট প্রভৃতি ২০টি গ্রামের ৪০০০ বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

মেদিনীপুর আশ্রম মেদিনীপুর শহর ও ঘাটালের ২০০০ বন্যার্ত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

কাঁথি আশ্রম মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ব্লকের বন্যার্ত মানুষের মধ্যে ধুতি, মাদুর প্রভৃতি বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

গত ২৮ আগস্ট '৯৯ **রিজলি বিবেকানন্দ রিট্রীট (আমেরিকা)** রিজলিতে স্বামীজীর পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে স্বামীজীর এক বিশাল প্রতিকৃতি ঘোড়ার গাড়িতে বাহিত হয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে মেনর হাউস প্রভৃতি স্থান ঘুরে সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ভাষণ, প্রার্থনা, প্রসাদ-বিতরণ এবং প্রখ্যাত শিল্পী কর্তৃক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে ৬০০ ভক্ত ও অনুরাগী নরনারী অংশগ্রহণ করে।

বেদান্ত সোসাইটি অফ স্যাক্রামেন্টো (আমেরিকা)ঃ গত অক্টোবর মাসের পাঁচটি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ প্রদত্ত হয়। মাসের তিনটি বুধবার স্বামীজীর 'রাজযোগ' এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রপন্নানন্দ। এছাড়া দুর্গাপূজা ও বিজয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস (আমেরিকা)ঃ অক্টোবর মাসের চারটি রবিবার বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ ও রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির সহাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগানন্দ। এছাড়া তিনটি মঙ্গলবার বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এবং প্রতি বৃহস্পতিবার স্বামীজীর 'কর্মযোগ' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী চেতনানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অফ নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (সান ফ্রান্সিসকো, আমেরিকা)ঃ গত অক্টোবর মাসের প্রতি রবিবার এবং চারটি বুধবার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রপন্নানন্দ। এছাড়া তিনটি শনিবার 'শিবানন্দ বাণী' পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (আমেরিকা)-এর অন্তর্গত হলিউড টেম্পল, সন্ত বারবারা টেম্পল, বিবেকানন্দ হাউস, রামকৃষ্ণ মনাস্ট্রী ও সান ডিয়েগো কেন্দ্রে অক্টোবর মাসের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাগুলি পরিচালনা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ, সহাধ্যক্ষ স্বামী সর্বাত্মানন্দ ও স্বামী সর্বদেবানন্দ এবং স্বামী বেদরূপানন্দ, স্বামী আত্মতত্ত্বানন্দ, স্বামী গণেশানন্দ, স্বামী বিপ্রানন্দ, স্বামী ব্রহ্মবিদ্যানন্দ, স্বামী আত্মবিদ্যানন্দ প্রমুখ।

দেহত্যাগ

স্বামী ধৃত্যানন্দজী (শঙ্কর) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৯ নাগপুর মঠে সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি গত কয়েক বছর ধরে ডায়াবিটিস ও অন্যান্য রোগে ভুগছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি নাগপুর মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসমন্ত্র লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছরের বেশি আশ্রমের হোমিওপ্যাথি কেন্দ্রের মাধ্যমে ইন্দোরা ও নাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষকে সেবা করেছেন। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অবসরজীবন যাপন করেন। সহজ, সরল ব্যবহার ও আত্মপ্রশংসাবিমুখ স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

স্বামী জ্ঞানাতীতানন্দ (গণপতি) গত ১৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ জয়পুর আশ্রমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৭৩ সালে তিনি রায়পুর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৮২ সালে তিনি নিজ গুরুর কাছে সন্ন্যাসমন্ত্র লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি রাজকোট ও জয়পুর আশ্রমে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন শান্ত ও নীরব প্রকৃতির।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালনঃ গত ৩ অক্টোবর ১৯৯৯ রবিবার শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গত ১৮ অক্টোবর ১৯৯৯ সোমবার মহাষ্টমীর দিন ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনে আগত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। মহালয়া থেকে নবমী পর্যন্ত সন্ধ্যারতির পর সমবেত কণ্ঠে মহিষমর্দিনী-স্তোত্রাদি গীত হয়।

শ্রীশ্রীকালীপূজাঃ গত ৭ নভেম্বর ১৯৯৯ রবিবার প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকালে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও ধর্মালোচনা মহালয়া থেকে বন্ধ থাকার পর গত ৫ নভেম্বর ১৯৯৯ শুক্রবার থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তিঃ শারদীয়া সংখ্যা (২০০০)

❑ সডাক গ্রাহকরা আগামী বছরের শারদীয়া সংখ্যাটি (১৪০৭/২০০০) ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির সময় তা জানাতে পারেন। অবশ্য আগামী ২৪ আগস্ট ২০০০ সংবাদটি জানানোর শেষ তারিখ।

❑ অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে। যদি ওটি খুঁজে না পান বা হারিয়ে যায় তাহলে আগামী ২৪ আগস্ট ২০০০-এর মধ্যে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে লিখিত-ভাবে জানিয়ে তাঁর বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ঐ অনুমতি-লিপিটি আপনার আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করার সময় প্রমাণপত্র হিসাবে বিবেচিত হবে।

[এসম্পর্কে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য এবং আগামী বছরের গ্রাহকভুক্তি ও নবীকরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তির জন্য সূচীপত্রের পরের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘে (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২০ আগস্ট '৯৯ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য একটি যোগাসন প্রশিক্ষণের সূচনা হয়। প্রশিক্ষণের সূচনা করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ। অনুষ্ঠানে শ্রাবণী চক্রবর্তীর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের পর স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাসঙ্ঘের সম্পাদক বিশ্বপতি দে। তারপর 'যোগব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা' বিষয়ে ভাষণদান করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষার অধ্যাপকদ্বয় অলোককুমার ব্যানার্জী ও সুদর্শন ভৌমিক এবং যোগাসন প্রদর্শন করেন রেবতী গোস্বামী। এদিন সেবাসঙ্ঘের পরিচালনায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শে জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি 'বিবেকানন্দ পাঠচক্র'-এর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ। অনুষ্ঠান-শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ গৌরগোপাল চক্রবর্তী।

পাঁশকুড়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৬ আগস্ট '৯৯ একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে ১১১ জন যুবক যোগদান করেছিল। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল—স্বামীজীর ভাবাদর্শে চরিত্রগঠন, মনঃসংযম, সরল রাজযোগ শিক্ষা, প্রশ্নোত্তর-পর্ব প্রভৃতি। আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন বালিভাড়া যুবমহামণ্ডলের সম্পাদক রঞ্জিতকুমার ঘোষ ও ভোগপুর যুবমহামণ্ডলের সম্পাদক সুখেন্দুশেখর জানা। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল যুবককে দ্বিপ্রাহরিক আহার এবং একটি করে 'জনগণের অধিকার' ও 'স্বামীজীর আহ্বান' পুস্তক প্রদান করা হয়।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব পরিষদের (কলকাতা-৭০০০৩৩) উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় গত ২৮ ও ২৯ আগস্ট '৯৯ স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় টালিগঞ্জের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৪৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দকে কেন আমার ভাল লাগে', 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম', 'স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয়' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনের কাহিনী'। এতে মোট ১৩জন ছাত্রছাত্রী পুরস্কৃত হয়। পরদিন অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা এবং বক্তব্য রাখেন সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সোমনাথ মিত্র ও অধ্যাপক পিনাকী ভট্টাচার্য। আলোচনার বিষয় ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে স্বদেশ ও মানুষ' এবং 'স্বামীজীকে আজ আমাদের কেন প্রয়োজন'। 'আমার ভারত অমর ভারত' থেকে পাঠ করেন কমল রায় এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল, সুশান্ত দত্ত ও প্রবীর চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে প্রায় ৩৫০ যুব-প্রতিনিধি ও পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পরিষদের সভাপতি প্রণবেশ চক্রবর্তী।

স্থিরপাড়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ২৯ আগস্ট '৯৯ একটি শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সুন্দিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে। সকালের অধিবেশনে মহামণ্ডলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, স্বামীজীর জীবন ও বাণী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন অলোককুমার দাস, অমিতকুমার দত্ত ও রঞ্জিতকুমার ঘোষ। বৈকালিক অধিবেশনে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দানের পর 'জাতীয়তাবোধ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। শিবিরে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে চন্দ্রমোহন নাথ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং আবৃত্তি করেন স্বপন সাঁতরা। শিবিরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বয়সের ১৯৫জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল।

ঘাটাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর) গত ২ সেপ্টেম্বর '৯৯ জন্মাষ্টমীর দিন নিত্যানন্দ, সদানন্দ ও নিমাইচন্দ্র গুঁই ভ্রাতৃত্রয়ের স্মৃতিকল্পে 'সারদা-সেবাসদন' নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ। এই উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, ভজন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, ময়াল-ইছাপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্লিপ্তানন্দ, স্বামী অকল্মষানন্দ ও স্বামী গুড়াকেশানন্দ। দুপুরে প্রায় ১০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকেলে স্বামী নির্লিপ্তানন্দের পরিচালনায় একটি কর্মিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২ সেপ্টেম্বর '৯৯ জন্মাষ্টমী তিথি পালন করে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ও হরিনামসঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন প্রাণবন্ধু মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নবীনচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ৬০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ট্রাস্ট (কলকাতা-৭০০০৭৮) গত ২ সেপ্টেম্বর '৯৯ জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার মাধ্যমে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। বিশেষ পূজা করেন অরবিন্দ রায় এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শুক্লা বসু, অমিতাভ রায় প্রমুখ। আলোচনাসভায় শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পুরাণানন্দ ও ডঃ কমল নন্দী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাঁকরাইল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২ সেপ্টেম্বর '৯৯ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করেন সঙ্ঘের সভাপতি নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন

মুক্তি মিত্র ও সুচিত্রা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানশেষে প্রায় ১০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২০ সেপ্টেম্বর '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শ-পূত ভূমিতে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী প্রমেয়ানন্দ। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী প্রমেয়ানন্দ ও স্বামী শেখরানন্দ। দুপুরে বহু ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর আয়োজিত ধর্মসভায় সঙ্ঘের শিল্পীরা উদ্বোধনী সঙ্গীত এবং স্বামী পরিপূর্ণানন্দ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। এরপর 'শ্রীকৃষ্ণের দিব্যজীবন ও লীলা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ) রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী রমানন্দ। 'ভাগবত' থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ব্যাখ্যা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। গত ৩ সেপ্টেম্বর সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন করেন সুকুমার বাউড়ি। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গৌতম ঘোষাল ও সম্প্রদায়।

ডোমজুড় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (জেলা—হাওড়া) গত ৫ সেপ্টেম্বর '৯৯ আশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর মূর্তি স্থাপন এবং মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী শেখরানন্দ। এই উপলক্ষ্যে ভক্তসহ প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামলী মুখোপাধ্যায়। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী শেখরানন্দ, স্বামী আত্মদীপানন্দ, রায়পুর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সত্যরূপানন্দ, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক অরূপকুমার প্রধান ও ডোমজুড় শ্রীশিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক ডঃ রামচন্দ্র মান্না। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী সত্যরূপানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্যামলী মুখোপাধ্যায় ও অমর পাড়ুই। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে 'মহাবিষ্ণু শান্তি' যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিবেণী কেন্দ্র শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী) গত ৫ সেপ্টেম্বর '৯৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালন করে। প্রথম অধিবেশনে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, বেদমন্ত্র পাঠ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন বিপাশা দাস, কবিতা সেনগুপ্ত ও অর্চনা চক্রবর্তী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী সর্ববিদানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন বরুণ চক্রবর্তী ও ডঃ শ্রীপতিরঞ্জন চৌধুরী। মূল ভাষণ দেন স্বামী সর্ববিদানন্দ। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

জগাদ্দল শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈতানন্দ আশ্রম (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৮ সেপ্টেম্বর '৯৯ বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি, বাউল গান, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপন করে। সকালের অনুষ্ঠানে ভজন ও বাউল গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে অদিতি চ্যাটার্জী ও নন্দ ভট্টাচার্য। বৈকালিক অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরূপ মুখার্জী, রুমা চন্দ্র, স্বপন মুখার্জী প্রমুখ। বৈকালিক ধর্মসভায় 'স্বামী অদ্বৈতানন্দের জীবন ও তার প্রাসঙ্গিকতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী ওঙ্কারাত্মানন্দ এবং 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সভাপতি ডঃ কমল নন্দী। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী সর্বগানন্দ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০০ ভক্ত ও অগণিত গ্রামবাসীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিশেষ উল্লেখ্য, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দের অনুপ্রেরণায় আশ্রমটি এবছরই প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ১২ সেপ্টেম্বর বিকেলে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি, গুরুবন্দনা, 'কথামৃত' ও 'শ্রীমা সারদা দেবী' থেকে পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন আশ্রমের স্বামী ব্রজেশানন্দ। অনুষ্ঠানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহদেব নস্কর ও অমর দাস।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (কলকাতা-৭০০০৩৯) গত ১২ সেপ্টেম্বর '৯৯ 'শিকাগো দিবস' স্মরণে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তিলজলা উচ্চ বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন সুজিতকুমার ভৌমিক এবং 'উপনিষদের গান' পরিবেশন করেন সংসদের সভাপতি নিত্যরঞ্জন মণ্ডল। আয়োজিত আলোচনাসভায় 'শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন বিবেকানন্দ-গবেষক ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ। আলোচনান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নিত্যরঞ্জন মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্রছাত্রীর সমাগম হয়েছিল।

কুমারটুলী মদনমোহন মন্দিরে (৫২০ রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭০০০০৫) গত ১৯ সেপ্টেম্বর '৯৯ সন্ধ্যায় রাধাতত্ত্ব-বিষয়ক এক বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ শাস্ত্র-পুরাণাদি উদ্ধৃত করে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করেন। সভার প্রারম্ভে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন পামেলা চক্রবর্তী, তবলায় সঙ্গত করেন সুমন বাগচী। সভায় বিপুল শ্রোতৃসমাগম হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোকুলচন্দ্র মিত্র ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীরাধামদন-মোহন জিউকে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারটুলী-বাগবাজার অঞ্চলের এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ সহ অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদবৃন্দ। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ঐতিহাসিক সাফল্যের পর কলকাতায় প্রথম স্বামীজীর অভিনন্দন-সভা কিরণচন্দ্র দত্ত প্রমুখের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল এই মন্দিরের নাটমন্দিরে ৩১ আগস্ট ১৮৯৪। টাউন হল-এর ঐতিহাসিক অভিনন্দন-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে (হামিরপুর, রাউরকেলা, ওড়িশা) গত ২ অক্টোবর '৯৯ সঙ্ঘ-প্রাঙ্গণে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের

উদ্বোধন করেন স্বামী সর্বগানন্দ, স্বাগত-ভাষণ দেন সঙ্ঘ-সভাপতি নরেশচন্দ্র নায়েক ও বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক রমেন ঘোষ। প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন ওড়িশার উপ সাধারণ পরিদর্শক (পশ্চিম অঞ্চল) বিনয় বেহেরা। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে 'পায়েল' সংস্থা এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সর্বগানন্দ। এই উৎসবে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। পরদিন ৩ অক্টোবর '৯৯ সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বেদান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজীর বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী সর্বগানন্দ। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও 'দেববাণী' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে বিজনকুমার মজুমদার, দেবযানী পাঠক ও মিতা সান্যাল। ভক্তসম্মেলনের উপযোগিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিজয় উদ্গাতা ও অরুণ রায়চৌধুরী। সম্মেলনে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর)-এর পরিচালনায় গত ৫ অক্টোবর '৯৯ সকাল ১০.৩০ মিনিটে বাঙলা ও ইংরেজী মাধ্যমে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী অকল্মষানন্দ। এই উপলক্ষ্যে সেবাশ্রম-সংলগ্ন সদ্য ক্রয় করা জমিতে তিনি বিদ্যালয়ের শিলান্যাস এবং বৃক্ষরোপণ করেন। সেবাশ্রমের দ্বিতলকক্ষে ৪৭ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে 'বিদ্যানিকেতন' নামে বিদ্যালয়টির শুভারম্ভ হয়। ঐদিন বিকাল ৪টায় বিশেষ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আদর্শে সেবাশ্রমের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন স্বামী অকল্মষানন্দ। অনুষ্ঠান-শেষে শারদ উৎসব উপলক্ষ্যে ১২৫ জন দুঃস্থ ছেলেমেয়ের পোশাক এবং ৫০ জন নরনারীকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বন্যাত্রাণে সাহায্যকল্পে ভক্তগণ মহারাজের হস্তে ১০০১ টাকা তুলে দেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্যা **রেণুকা সেনগুপ্তা** বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগে গত ১ আগস্ট '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। প্রথম জীবনে তিনি উত্তর কলকাতার সারদা আশ্রমে থেকে পড়াশুনা ও আশ্রমজীবন যাপন করেন। 'উদ্বোধন'-এর তিনি নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন। অবিবাহিতা রেণুকা সেনগুপ্তার শ্রীসারদা মঠের সঙ্গে আমৃত্যু যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা উত্তর কলকাতা-নিবাসিনী **বীথিকা বিশ্বাস** মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৬ আগস্ট '৯৯ ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে তাঁর যাতায়াত ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **চারুচন্দ্র মুখটি** গত ৮ আগস্ট '৯৯ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি সল্টলেকের গীতাপাঠ চক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর ভাবাদর্শে তিনি ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। নির্লোভ ও নিরভিমানিতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **গোপালচন্দ্র গুপ্ত** গত ৯ আগস্ট '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন একজন কৃতী ছাত্র। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ছিলেন তাঁর শ্বশুরমশাই। তিনি সৎ, মিষ্টভাষী ও কর্মনিষ্ঠ ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **তৃপ্তি মৈত্র** গত ১০ আগস্ট '৯৯ রাত ১১টায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **মমতা চট্টোপাধ্যায়** গত ১১ আগস্ট '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **তারাপদ বসু** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২০ আগস্ট '৯৯ ভোর ৪টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে তিনি লীলাগীতি, গীতিনাট্য পরিবেশন করতেন। অবিবাহিত তারাপদ বসু তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের জন্য সকলের প্রিয়ভাজন ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **আভা ব্যানার্জী** গত ২২ আগস্ট '৯৯ রাত ১০টায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহিকা ও পাঠিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং বিজয়গড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা **ডাঃ চিত্তরঞ্জন সরকার** গত ২৯ আগস্ট '৯৯ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ১৯০৭ সালে তাঁর জন্ম হয় বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুর থানায়। ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে তিনি কলকাতায় চিকিৎসাবৃত্তিতে নিযুক্ত হন। চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করলেও তিনি আজীবন মানুষের সেবাকেই মহৎ ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রগাঢ় ঈশ্বরবিশ্বাসী ডাঃ সরকার শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শে ১৯৭৭ সাল থেকে বিজয়গড়ের নিজগৃহে সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আন্তরিকতায় ও কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সহযোগিতায় ক্ষুদ্র সেবাশ্রমটি বর্তমানে এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ও উদ্বোধন কার্যালয় এবং ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ডাঃ সরকার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সন্ন্যাসীর স্নেহ ও সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। পরিশ্রমী, কঠোর ও স্নেহশীল স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **কানাইলাল লোধ** গত ৩ সেপ্টেম্বর '৯৯ রাত ৩.১৫ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ডিব্রুগড়ের নালিয়াপুলস্থিত নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি ডিব্রুগড় রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য ও নিরলস কর্মী ছিলেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন গুণগ্রাহী পাঠক ও গ্রাহকও ছিলেন। সহজ-সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ৪০.০০

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বঙ্গ নাট্য-সমাজের নেপথ্য কাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে এসে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপর থেকে পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁকে রঙ্গমঞ্চের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে প্রণাম না করে আজও কোন শিল্পী কোন কাজ করেন না।

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রীশ্রীমা ও ডাকাত বাবা ৩০.০০

তেলো-ভেলোর ভয়ঙ্কর মাঠে ডাকাত-দম্পতির সামনে ঘটেছিল শ্রীমা সারদাদেবীর চিন্ময়ী রূপের আত্মপ্রকাশ। তেলো-ভেলো শ্রীশ্রীমায়ের লীলাপ্রকটভূমি। তারই পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। সঙ্গে সেই মহাতীর্থ দর্শনের পথনির্দেশ।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ধনসম্পদ ইহকালের সম্পদ, সঙ্গে যাবে না। সাধন-ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে। শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই, ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে। শ্রীমা সারদাদেবী

❋

কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়। স্বামী বিবেকানন্দ

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা ওপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন, ওপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি ওপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রতিটি চুমুকে —কড়া আমেজ!
কুকমী সিলেক্ট
সি টি সি লীফ চা
COOKME SELECT
Cookme
Cookme

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা : উত্তর চব্বিশ পরগনা

- রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত
- শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, পিন : ৭৪৩ ৫১০
- রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
- বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
- গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাঁটুরা
- বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নববারাকপুর
- অলক পাল চৌধুরী, সঙ্কটাপল্লী, ঘোলা, সোদপুর
- ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র, নিমতলা
- ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
- মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র
  শিবালয়, দত্তপুকুর, পোঃ আদিকাশিমপুর, পিন : ৭৪৩ ২৪৮
- বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম
  বলাই মণ্ডল সরণি, মধ্যমগ্রাম চৌমাথা, সোদপুর রোড
  পোঃ মধ্যমগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৭৫
- স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন : ৭৪৩ ৪৩৫
- হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া : হাজিনগর, থানা : বীজপুর
- পান্নালাল ব্যানার্জী, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী, পিন : ৭৪৩ ১৬৫
- শ্রীভাস্করাচার্য (ডঃ পরিতোষ মিত্র), 'জীবনদীপ'
  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, পোঃ সোদপুর, পিন : ৭৪৩ ১৭৮
- কথাশিল্প, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন : ৫৫-৬৯৪/৭২৫
- বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  চাকদহ রোড 'ট' বাজার, বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন : ৫৬০-১২৩০
- রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর, পিন : ৭৪৩ ১২৭

জেলা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড়
- হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন : ৭৪৩ ৩৯৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির
  গ্রাম : চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন : ৭৪৩ ৩৮৪
- জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন : ৭৪৩ ৩৩০, ফোন : ৯১১৮-৬০৪৫০
- শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল, প্রযত্নে কৃষ্ণগোপাল নস্কর
  গ্রাম : বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন : ৭৪৩ ৩৭২
- শতদল সাধুখাঁ
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- বিভূতিভূষণ ঘরামি
  প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন : ৭৪৩ ৬০৩

জেলা : হুগলী

- রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন : ৭১২ ২৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ
  গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন : ৭১২ ৩০৫
- তপন চট্টোপাধ্যায়
  পুরোহিত, হংসেশ্বরী-মন্দির, বাঁশবেড়িয়া, পিন : ৭১২ ৫০২
- মোহিতকুমার বর্মণ
  সম্পাদক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  বিদ্যুৎপল্লী, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২ ৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৪৩৯
- মনীষা নন্দী, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১ ২২৪
- সুশান্ত মাইতি
  প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (কামাক্ষাতলা),
  মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর
  পিন : ৭১২ ৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৭০৯
- হরনারায়ণ বিশ্বাস
  ৫ রাজেন্দ্র অ্যাভেনিউ প্রথম লেন
  উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২ ২৫৮
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার
  প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জী
  ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখার্জী স্ট্রীট
  উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২ ২৫৮, ফোন : ৬৬৩-৮৫২৬
- বরুণকুমার চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী
  পিন : ৭১২ ৫০৩, ফোন : ৮৪৬২৮৪
- দীপশিখা ঘোষ, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল
  জনাই, পিন : ৭১২ ৩০৪, ফোন : ৯১১২-৪৪১১৪
- গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র
  গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

“নিয়মিত তিল তিল
করিলে সঞ্চয়
ভবিষ্যৎ সুখের হবে
জানিবে নিশ্চয়।”

ESTD.—1932

Peerless Group

UDBODHAN Vol. 101 ☐ No. 11 ☐ NOVEMBER 1999 Licence No. WB/NC/CL-3 ISSN 0971-4316
Phone : 554-2248 R.N. 8793/57
554-2403 Postal Reg. No. WB/N[illegible]

উদ্বোধন

১০১তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র সুপ্রাচীন সাময়িকপত্র।

❑ **উদ্বোধন** এর এবছর **১০১তম বর্ষ** চলছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০০ বছর অতিক্রম এই প্রথম** ❑

❑ **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক

❑ **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির [illegible] গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

❑ **উদ্বোধন** বাঙলা ভাষায় শুধু **সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং সর্ব অর্থেই উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ **পারিবারিক পত্রিকা**।

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র** নয়। **উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ১০১ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।

❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া

❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী শরীর**।

❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন** এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন [illegible] করলেই এখনি **উদ্বোধন**-এর গ্রাহকসংখ্যা **এক লক্ষ** হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের [illegible] আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের**।

❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা**। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে [illegible] উদ্বোধন-এর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন— এই আশা রাখি।

❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য [illegible] শারদীয়া সংখ্যা সহ **গ্রাহক-পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়ায় মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের প্রায় আড়াই গুণ। শারদীয়া** সংখ্যাটির [illegible] **গ্রাহকদের** থেকে **আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না**। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার**।

❑ **উদ্বোধন** পত্রিকার সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি [illegible] **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। শেষের দুটি তহবিলের [illegible] 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা চিহ্নিত হচ্ছে। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান** আয়কর আইনের [illegible] **ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar' এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা** ৭০০ ০০৩। চিঠিতে [illegible] M.O. [illegible] **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এর [illegible] থাকে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি দান পাঠালে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য'** পাঠানো হচ্ছে **সেই মর্মে দাতার চিঠি থাকা বাঞ্ছনীয়**।

❑ **'উদ্বোধন'-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষ থেকে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' **(একবছরের জন্য 'উদ্বোধন'-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** সম্প্রতি নিবেদিত হয়েছে। **১৯৯৮ সাল থেকে** পশ্চিমবঙ্গ **মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন** স্থানাধিকারী **'উদ্বোধন'**-প্রবর্তিত **এই সম্মানের** যোগ্য বলে [illegible] হবেন। **সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণা[illegible]

ষ ১৪০৬ ▫ ১২শ সংখ্যা
উদ্বোধন
॥ ১০১ ॥

"পিপড়েব মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে বয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান ---পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে বয়েছে। চিদানন্দ বস আব
বিষয বস। হংসেব মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
কববে।
আব পানকৌটিব মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আব পাঁকাল মাছেব মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পবিষ্কাব উজ্জ্বল।
**গোলমালে মাল আছে গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"**

শ্রীবামকৃষ্ণ

উদ্বোধন ১০১

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০১তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা পৌষ ১৪০৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯

❑ দিব্য বাণী ❑ ৬৮৫
❑ কথাপ্রসঙ্গে ❑ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী : নির্বিবাদ (২) ৬৮৬
❑ সঙ্কলন ❑
শ্রীম-কথিত ও শ্রীম-সমীপে মাতৃপ্রসঙ্গ ৬৮৯
❑ ইতিহাস ❑
জীবন আমাকে যে-শিক্ষা দিয়েছে—স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৬৯১
❑ স্মৃতিকথা ❑
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিপ্রসঙ্গে স্বামী অরূপানন্দ—
স্বামী সত্যানন্দ ৭০২
শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা—অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত ৭১৩
❑ নিবন্ধ ❑
চিরন্তনী মা সারদা—চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ ৭০৪
❑ গবেষণা ❑
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব—
সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ৬৯৪
❑ ক্রীড়াজগৎ ❑
ক্রীড়াজগতে উজ্জ্বল ভারতীয় নারী—
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০৯
❑ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ❑
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ (১)—কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত
চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত ৬৯৯
❑ পরমপদকমলে ❑
মা—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৭১৫
❑ বিজ্ঞান ❑
আগামী শতাব্দীতে জল :
কিছু জরুরী ভাবনা—তপোব্রত সান্যাল ৭১৮
❑ সুস্বাস্থ্য ❑ স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—সত্যানন্দ চক্রবর্তী ৭১৭
❑ প্রাসঙ্গিকী ❑
শ্রীমা সারদাদেবীর সান্নিধ্যে বনফুল-পল্লী ৭১১
প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন' ৭১২ কথাগুলি স্বামীজীর নয় ৭১২
বৈদিক কর্মকাণ্ড ও ভগবদ্গীতা ৭১২
❑ কবিতা ❑
কে তুমি তেজস্বিনি!—অনীতা দত্ত ৭০০
সারদা-সরস্বতী—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৭০০
সারদা ষোড়শী—নমিতা দত্ত ৭০০
আঁধারের কপাট দাও গো খুলে—
পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় ৭০১
মায়ের আঁচল—দীপ্তিকুমার শীল ৭০১
প্রাণের উত্তাপ দেয় মাটির প্রদীপ—শান্তি সিংহ ৭০১
❑ নিয়মিত বিভাগ ❑
বিজ্ঞান-সংবাদ • রক্ষিত গুটিবসন্ত-জীবাণু নষ্ট করতে
প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের আপত্তি ৭২১
স্বাস্থ্য-পরিকল্পনায় স্থূলকায়ত্ব-সমস্যার অন্তর্ভুক্তি ৭২১
গ্রন্থ-পরিচয় • সহজ ভাষায় মূল রামায়ণের মনোজ্ঞ
উপস্থাপন—সচ্চিদানন্দ ধর ৭২২
ক্যাসেট-সমালোচনা • শ্রবণমঙ্গলম্—স্বামী দিব্যব্রতানন্দ ৭২২
ক্যাসেটে আগমনী-সঙ্গীত—নন্দলাল অধিকারী ৭২৩
ক্যাসেটে গীতা-সমগ্র—নন্দলাল অধিকারী ৭২৩
❑ সংবাদ ❑
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৭২৪
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৭২৫ বিবিধ সংবাদ ৭২৬
❑ অন্যান্য ❑
বর্ষসূচী ❑ [১] অনুষ্ঠান-সূচী (মাঘ-ফাল্গুন ১৪০৬) ৭০৮
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : সংবাদ ৭২৮
নবীকরণ ও শারদীয়া সংখ্যা (২০০০) ৭১৪
❑ প্রচ্ছদ ❑ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি ❑ আলোকচিত্র : অদ্বৈত আশ্রম
আগামী বর্ষের (১৪০৬-১৪০৭/২০০০) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬৫ টাকা; সডাক—৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য—৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)—
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

ইতিহাসের নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ উপলক্ষে ১০২ বছরের প্রাচীন 'উদ্বোধন' এর আগামী বর্ষের গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হলো।

'উদ্বোধন' ঃ ১০২তম বর্ষ (২০০০ খ্রীস্টাব্দ) ❑ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ও অন্যান্য

❑ 'উদ্বোধন' পত্রিকার আগামী ১০২তম বর্ষের (মাঘ ১৪০৬—পৌষ ১৪০৭/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০০) গ্রাহকমূল্য বর্তমান বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে ঃ ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৭২০ টাকা (বিমানডাক) ❑ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশ ঃ ১৪০ টাকা।

❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

❑ বর্তমান বছরের (১৯৯৯/১৪০৫-১৪০৬) প্রথম বা মাঘ সংখ্যা প্রথম মুদ্রণের পর নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার তার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। সেজন্য প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে আগামী বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

❑ কলকাতা বা কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তাঁরা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য জমা দিলে সুবিধা হয়। কেননা M. O.-তে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে যদি দেরি হয় এবং ততদিনে যদি প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাহলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও ঐ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে-কারণে সম্ভব হলে M. O. না করে গ্রাহকমূল্য সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়াই ভাল।

❑ সরাসরি জমা দেওয়া সম্ভব না হলে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে/পোস্টাল অর্ডারে গ্রাহকমূল্য 'Udbodhan Office, Calcutta'—এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য চেক গ্রাহ্য। তবে সেই চেক কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হতে হবে।

❑ যাঁদের M. O. করে গ্রাহকমূল্য পাঠাতেই হবে, তাঁদের কাছে অনুরোধ, এখনই M. O. পাঠাতে শুরু করুন। জানুয়ারি থেকে বর্ষ শুরু বলে সকলেই একসঙ্গে ডিসেম্বরে M. O. পাঠাতে শুরু করেন; কিন্তু বাগবাজার ডাকঘর কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন একশ থেকে দেড়শর বেশি M. O. আমাদের কাছে ডেলিভারি দিতে পারেন না। আবার তাও রোজ পেরে ওঠেন না। ফলে ডাকঘরে জমা হাজার হাজার গ্রাহকের M. O. পেতেই আমাদের দুই থেকে তিন মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত লেগে যায়। এছাড়া M. O. কুপনে অনেক নতুন গ্রাহক তাঁদের নাম-ঠিকানা এবং কিজন্য M. O. পাঠাচ্ছেন তা জানান না। পুরনো গ্রাহকরা তাঁদের গ্রাহকসংখ্যা অনেকেই ঠিকমত লেখেন না। ফলে এইসমস্ত M. O. সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। পত্রিকা না পেয়ে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের চিঠি লেখেন তখন সেগুলির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। অনেকের কাছে যে সময়মতো পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হয় না অথবা পাঠাতে দেরি হয়, M. O. সম্পর্কিত অস্পষ্টতাই তার জন্য দায়ী। সেজন্য অনুরোধ, এখনই আগামী বর্ষের গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করে নিন। M. O. কুপনে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা, গ্রাহকসংখ্যা লিখবেন, M. O. কেন পাঠাচ্ছেন তাও জানাবেন।

❑ পত্রোত্তর এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকখরচ পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ প্রতি বাঙলা মাসের ১ তারিখ (ইংরেজী ১৪-১৮) 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়। ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার প্রধান ডাকঘরে (G.P.O.) এবং কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণত ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ঠিকমত পৌঁছায় না বলে গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে। এই বিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে পত্রিকা ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা এক মাস পরেও পত্রিকা পান না বলে খবর পাই। সে-কারণে গ্রাহকদের এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি।

এক মাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট' বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে।

❑ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় (একমাস) অতিক্রান্ত হলে তবেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহক-সংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক।

❑ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ বড় এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। যাঁরা ডাকে পত্রিকা নেন, তাঁরা সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) অথবা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণের সময় অথবা ১লা জুন থেকে ২৪শে আগস্টের মধ্যে কার্যালয়ে জানাতে হয়।

❑ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ সংখ্যায় পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/ M.O. প্রাপ্তি-কুপন/ আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে।

❑ ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নতুন ঠিকানা পিন কোড সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে, যাতে পরবর্তী সংখ্যাটি পুরনো ঠিকানায় না চলে যায়।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হলে 'উদ্বোধন'-এ ব্যক্তির/ কেন্দ্রের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হবে।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদন-পত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বা প্রাইভেট কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ সভাপতিকে আবেদন করতে হবে।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

পৌষ ১৪০৬
ডিসেম্বর ১৯৯৯

লোকে আমার কাছে আসে, বলে ঃ "জীবনে বড় অশান্তি... কিসে শান্তি হবে, মা?"—কত কি বলে! আমি তখন তাদের দিকে চাই, আর আমার দিকে চাই, ভাবি—এরা এমন সব কথা কেন বলে! আমার কি তাহলে সবই অ-লৌকিক! আমি অশান্তি বলে তো কখনো কিছু দেখলুম না!

সহ্যের সমান কী গুণ আছে?
"সহ্যের সমান গুণ নাই,
আর সন্তোষের সমান ধন নাই।"

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ঃ নির্বিষাদ ②

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে নিবেদিত।

দক্ষিণেশ্বরের নহবতের অতি ক্ষুদ্র কক্ষে সারদাদেবী বাস্তবিক একদিক দিয়া যেন 'সীতার বনবাস'-পর্বই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কলকাতা হইতে সম্ভ্রান্তবংশের যেসব মহিলা-ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া নহবতে সারদাদেবীকে দেখিতে যাইতেন তাঁহারা বলিতেন ঃ "আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা-লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!" একদিকে তাঁহার সেই বিন্দুবাসিনী নেপথ্যচারিণীর জীবন, অন্যদিকে যখন "দিনান্তে হয়তো একবার ঝাউতলায়" যাইবার সময় স্বামীকে দূর হইতে দর্শন, যখন পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই দর্শনও আবার দুর্লভ হইয়া যাইত, দিনান্তে একবারের জন্যও সেই দর্শন যখন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না, তখন তাঁহার সেই পরম নিঃসঙ্গ দিনগুলি তো বনবাসের সমতুলই ছিল। কিন্তু সারদাদেবীর কাছে উহা সীতার বনবাসের চাহিতেও আরো দুঃখময় ছিল। বনবাসের ক্লেশকর দিনগুলি রাজনন্দিনী, দশরথের পুত্রবধূ, অযোধ্যার ভাবী রাজমহিষী সীতার কাছে দুর্বহ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ, তাঁহার পাশে ছিলেন তাঁহার প্রাণপ্রিয় স্বামী। চৌদ্দ বছর বনবাসের মধ্যে তের বছরের বেশি প্রেমময় স্বামীর আনন্দদায়ক সান্নিধ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সীতা পাইয়াছেন। সেই সান্নিধ্যের সুখ সীতার কাছে অযোধ্যার সুখের দিনগুলির স্মৃতিকে নিঃশেষে মুছিয়া দিয়াছিল। রামচন্দ্রের দিব্য ও প্রেমময় সান্নিধ্য সীতার বনবাসকে কি স্বর্গবাসে পরিণত করিয়া দেয় নাই?

কিন্তু সারদাদেবীর প্রায় চৌদ্দ বছরের (১৮৭২-১৮৮৫) নহবত-বাসকালে কয়দিন তিনি স্বামীর সান্নিধ্য পাইয়াছেন? দক্ষিণেশ্বর-বাসের প্রথম আটমাসের কথা বাদ দিলে স্বামীর সান্নিধ্যলাভ তাঁহার কাছে ক্রমশই দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। সান্নিধ্যের স্থানে শুধু দর্শন—তাহাও দূর হইতে দেববিগ্রহ দর্শনের মতো—একসময় তাহা হইতেও তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। আর ঐ প্রথম আটমাসে রাত্রিতে স্বামীর সান্নিধ্যে থাকিবার সুযোগ তিনি যখন পাইয়াছিলেন, সমাধি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তিনি তখন স্বামীর মুহুর্মুহু সমাধিমগ্নতা দেখিয়া উদ্বেগ ও আশঙ্কায় একের পর এক বিনিদ্র রাত্রি কাটাইয়াছেন। স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর জন্য উদ্বেগ ও আশঙ্কা তাঁহার স্বামি-সান্নিধ্যের আনন্দকে তখন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। তাহার পর স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কায় যখন স্বামী তাঁহার নহবতে বাসের ব্যবস্থা করিলেন বস্তুত তখন হইতেই শুরু হইল স্বামিসান্নিধ্য-বিচ্ছিন্ন তাঁহার সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গতার জীবন। এই নিঃসঙ্গতা যে কত তীব্র ও বেদনাদায়ক তাহা এমন পরিস্থিতিতে নারীরাই শুধু বুঝিতে পারিবেন। আমরা কিছুটা অনুমান করিতে পারি মাত্র। কিন্তু যে অসাধারণ মানসিক স্থৈর্য ও প্রশান্তিতে সারদাদেবী তাঁহার সেই রোদনভরা দিনগুলিকে এবং বেদনভরা রজনীগুলিকে সহজ আনন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা শুধু অবাকই হই না, আমরা বিস্ময়ে শিহরিত হই, আমরা বেদনায় স্তব্ধ হই। তাঁহার প্রতি সমুচ্চ শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা আপনা-আপনিই নত হইয়া আসে।

নহবত-বাস সারদাদেবীর পক্ষে সীতার বনবাসের তুলনায় অধিকতর দুঃসহ হইলেও সারদাদেবী উহাকে তাঁহার সহজাত সন্তোষের রসচেতনায় সঞ্জীবিত করিয়া লইয়াছিলেন। এক মুহূর্তের জন্যও উহা তাঁহার কাছে নিরানন্দের হয় নাই। পরবর্তী কালে তিনি নিজেই তাঁহার নহবত-জীবনের কথাপ্রসঙ্গে বলিতেন, অশান্তি বা অসন্তোষের লেশমাত্র কখনো তাঁহার মনকে পীড়িত করে নাই। কোন অস্বাচ্ছন্দ্য, কোন কষ্ট, অপ্রাপ্তির কোন বেদনা তাঁহার মনের আনন্দের তটভূমিতে কখনো চিড় ধরাইতে পারে নাই। সর্বদা আনন্দে পূর্ণ হইয়া থাকিত তাঁহার অন্তর। নিজের প্রথম জীবনের নির্বিষাদ অবস্থার গভীরতা অনবদ্যভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার একটি অপূর্ব বাক্‌প্রতিমায়। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে... সর্বদা অনুভব করিতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

"আনন্দের পূর্ণঘট!" সন্তোষের এমন কাব্যময় প্রকাশ কি কখনো কোথাও আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি? কোন সাহিত্যে, কোন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী অথবা কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনায়? এই বাক্যবন্ধের পিছনে কবি বা সাহিত্যিকের কল্পনার বিন্দুমাত্র ভূমিকা নাই, ইহা পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পীর প্রত্যক্ষ অনুভূতির নিরাভরণ সত্য-উচ্চারণ।

নহবতে থাকাকালীন সারদাদেবী দেখিতেন, অদূরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে নিত্য আনন্দের হাট বসিয়াছে। ভজন, কীর্তন, সৎপ্রসঙ্গের ফোয়ারা উঠিতেছে সেখানে। যেন পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে বৈকুণ্ঠ—ভগবানের লীলাবিলাসের 'দেওয়ান-ই-খাস'! দূর হইতে সারদাদেবী দেখিতেন আনন্দের সমুদ্রকে। 'প্রাচীরের ওপারে' সেই আনন্দের সমুদ্রে তাঁহারও মন

অভিষ্ণাত হইতে চাহিত স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু তাহা তো হইবার ছিল না! তখনকার সমাজের পর্দানশীলতা, শ্রীরামকৃষ্ণের মর্যাদা রক্ষা এবং তাঁহার নিজের অসাধারণ লজ্জাশীলতার জন্য সারদাদেবীর পক্ষে সেই আনন্দযজ্ঞে অংশগ্রহণ করিবার কোন উপায় ছিল না। দরমাঘেরা অতি ক্ষুদ্র কক্ষে থাকিয়া ঐ আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনি শুনিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। সারদাদেবী নহবত হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে দিব্য আনন্দের দেবদুর্লভ সেই দৃশ্য দেখিতেন আর ভাবিতেন : "আমি যদি ঐ ভক্তদের মতো একজন হতুম তবে বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম!" না-পাওয়ার এই বেদনায় কিন্তু অতৃপ্তিজনিত কোন ক্ষোভ তাঁহার চিত্তে ছায়াপাত ঘটাইতে পারে নাই। উহার মধ্যে ছিল শুধু সেই অপার্থিব আনন্দের মধুময় স্মৃতি। অসুবিধা, অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন উহার কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তী কালে তখনকার দিনের স্মৃতিচারণ করিয়া সারদাদেবী বলিতেন : "কী আনন্দেই ছিলুম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাট-বাজার বসে যেত!" আগ্রহের তীব্রতায় দরমার ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অদূরে আনন্দযজ্ঞের মধ্যমণি দিব্যপুরুষ তাঁহার স্বামীকে নির্নিমেষ নয়নে তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন। দরমার ছিদ্রের ওপাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি কীর্তনের আখর শুনিতেন। দীর্ঘকাল ঐভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার ফলে তাঁহার পায়ে যন্ত্রণা হইত। সেই যন্ত্রণা পরবর্তী কালে স্থায়ী বাতযন্ত্রণায় পর্যবসিত হইয়া যায়।

এদিকে দরমার সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রটি ক্রমে স্বাভাবিকভাবেই একটু একটু করিয়া বড় হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সকৌতুকে ভাইপো রামলালকে বলিয়াছিলেন : "ওরে রামনেলো, তোর খুড়ীর যে পর্দা ফাঁক হয়ে গেল!" শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতেন, গ্রামের মুক্ত, উদার পরিবেশ হইতে আসা সারদাদেবীর পক্ষে ঐ 'খাঁচা'র মধ্যে থাকা কত অসহনীয় হইতে পারে। কখনো কখনো ঐ 'খাঁচা'য় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষ্মীও থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের নাম দিয়াছিলেন 'শুক-সারী'। মন্দিরের ফল-প্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলে কখনো কখনো রামলালকে তিনি রহস্য সহকারে বলিতেন : "ওরে, খাঁচায় শুক-সারী আছে; ফলমূল, ছোলা-টোলা কিছু দিয়ে আয়।" কেউ কেউ ভাবিত, সত্যি সত্যিই বুঝি খাঁচায় পাখি আছে। কথামৃতকার শ্রীমও প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিলেন। রহস্য করিয়া বলিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাগুলির মাধ্যমে সারদাদেবীর নহবত-বাসের চূড়ান্ত অস্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

চূড়ান্ত অস্বাচ্ছন্দ্য শুধু কক্ষের ক্ষুদ্রতা বা বাহ্যিক অজস্র অসুবিধার জন্যই নয়, অস্বাচ্ছন্দ্যের গভীরতর কারণ নিহিত ছিল স্বামিসান্নিধ্যের আনন্দ ক্রমে তাঁহার কাছে অধরা হইয়া যাইবার মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপর অধিকার তাঁহার অপেক্ষা আর কাহারো বেশি ছিল না, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যের দাবিও তাঁহার অপেক্ষা আর কাহারো বেশি ছিল না। কারণ, জাগতিক সম্পর্কের নিরিখে তাঁহাদের পরস্পরের সম্পর্কই তো নিকটতম। কিন্তু সারদাদেবীর কোন আচরণে অথবা কোন কথায় তাঁহার সেই অধিকার বা দাবির অস্ফুট অথবা কণামাত্র স্ফুট প্রকাশ কখনো দেখা যায় নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে আত্মবিলয়ের এমন দৃষ্টান্ত আর একটিও নাই। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার এই অভূতপূর্ব অনুযোগহীন সহজ আত্মবিলয় দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন : "তাঁহাকে জানে না এমন কাহারো পক্ষে তাঁহার কথাবার্তা হইতে কোনভাবেই অনুমান করা সম্ভব নয় যে, চারপাশের অন্য যে-কাহারো অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁহার দাবি অধিকতর বা তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।"

সারদাদেবী দেখিতেন, কলকাতা অথবা অন্যত্র হইতে নিত্য কত মানুষ আসিতেছেন তাঁহার স্বামীর কাছে। আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে সংখ্যায় কম হইলেও মহিলারাও থাকিতেন। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণও সকলের সহিত কথা বলিতেন। সকলের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সময় আছে, শুধু সারদাদেবীর জন্যই যেন তাঁহার কোন সময় নাই! দিনের মধ্যে দুবার অন্তত স্বামীকে দেখিবার সুযোগ তাঁহার হইত। এই সুযোগ ঘটিত শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে তাঁহার খাবার লইয়া আসা এবং তাঁহাকে খাওয়ানোর সুবাদে। মাঝে মাঝে তাঁহার সেই ক্ষণিক সৌভাগ্যেও ভাগ বসাইতেন অতি উৎসাহী কোন কোন মহিলা-ভক্ত। তিনি বা তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের আহারের পাত্রটি তাঁহার ঘরে লইয়া যাইবার জন্য সারদাদেবীর কাছে আবদার করিয়া বসিতেন। সারদাদেবী অক্লেশে এবং নির্দ্বিধায় তাঁহার বা তাঁহাদের হাতে শ্রীরামকৃষ্ণের আহারের পাত্রটি তুলিয়া দিতেন। সারদাদেবী হয়তো তাঁহার বা তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিতেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তখন আর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিরালায় পাওয়ার তাঁহার কোন সুযোগ থাকিত না। অতঃপর পুরুষ ভক্তদের, বিশেষ করিয়া যুবক ভক্তদের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকায় ঐ ক্ষণিক সৌভাগ্য হইতেও তিনি প্রায় স্থায়িভাবেই বঞ্চিত হইলেন। যুবক ভক্তদের মধ্যে কেহ না কেহ তখন শ্রীরামকৃষ্ণের খাবার নহবত হইতে লইয়া আসিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের খাওয়ার সময় তাঁহারাই সেখানে থাকিতেন। সারদাদেবীর তখন বয়স কত হইবে? কম-বেশি তিরিশ বছর। ঐ বয়সে যেকোন বিবাহিত নারীর মনের গভীরে এই বঞ্চনার জন্য তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধা ছিল স্বাভাবিক এবং যাঁহারা তাঁহার এই বঞ্চনার নিমিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের সম্পর্কেও তাঁহার মনে বিরাগ ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হওয়া প্রত্যাশিত ছিল। নিজের স্বামী

সম্পর্কেও তাঁহার মনে অভিমান ও ক্ষোভ জাগাও ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সারদাদেবীর মনে কাহারো সম্পর্কেই কখনো কোন ক্ষোভ, অভিমান, বিরাগ অথবা বিদ্বেষ স্থান পায় নাই। স্বামী সম্পর্কে উদাসীনতার অভিযোগ তাঁহার মনে উঠিতে পারিত। কিন্তু না, তাঁহার সম্পর্কে সারদাদেবীর মনে কোন অনুযোগ, অভিমান বা অভিযোগ কখনো জাগে নাই। অথচ কী নিদারুণ ছিল তাঁহার ঐকালের নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞতা। পরবর্তী কালে তাঁহার নিজের কথাতেই আমরা ইতিপূর্বে শুনিয়াছি (কথাপ্রসঙ্গে, শ্রাবণ ১৪০৬): "তখন কী দিনই গেছে! দিনান্তে হয়তো একবার ঝাউতলায় যেতে ঠাকুরকে দেখতে পেতুম, নয়তো নয়।—তাও দূর থেকে। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকতুম।" কত সহজেই না তিনি কথাগুলি বলিতেন! কী সহজ, স্বাভাবিক ছিল তাঁহার মনের নির্বিষাদ। এই পরম নির্বিষাদের সত্যিই কি কোন তুলনা আছে?

এই অসাধারণ নির্বিষাদের ভূমিতে তাঁহার অবস্থানকে তিনি নিজেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার অতুলনীয় সহজ প্রশান্ত নিরাসক্তিতে। তিনি তাঁহার তখনকার মনোভাবকে কোন্ প্রশান্তির শক্তিতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাই তাঁহার এই অসাধারণ কথাগুলিতে: "কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন তুই এমন কী ভাগ্য করেছিস যে, রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি!' " বস্তুত, এমন স্বাভাবিক ও ইতিবাচক নির্বিষাদের রহস্য শুধু তাঁহারই জ্ঞাত ছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে সারদাদেবী যখন উদ্বোধনে আছেন তখন একদিন একটি অল্পবয়সী বধূর প্রসঙ্গ তাঁহার কাছে উঠে। বধূটির স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি পুত্রবধূর খাওয়া-পরা সম্পর্কে অতিমাত্রায় কঠোরতার পক্ষপাতী। সেসব শুনিয়া সারদাদেবী বলিলেন: "আহা! ছেলেমানুষ বউ, তার একটু পরতে খেতে ইচ্ছে হয় না?... একটু আলতা পরেছে, তা আর কি হয়েছে? আহা! ওরা তো স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তো চোখে দেখেছি, সেবাযত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন কাছে যেতে পেরেছি, যখন বলেননি এমনকি দুমাস পর্যন্ত নহবত থেকে নামিইনি। [তবে] দূর থেকে পেন্নাম [তো] করেছি।"

ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিবার দুর্লভ সুযোগ ভাগ্যক্রমে যদি-বা কখনো আসিত, তাহা লইয়া কোন কোন ভক্ত-মহিলা আবার তাঁহাকে নির্মম কটাক্ষ, সমালোচনা ও শাসন করিতেন! একবার এক ভক্ত-মহিলা সরাসরি তাঁহাকে বলিলেন: "তুমি ঠাকুরের কাছে যাও কেন?" যেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাইয়া তিনি কোন গর্হিত অপরাধ করিয়াছেন, যেন স্বামীর কাছে যাইবার কোন অধিকার তাঁহার নাই! ইহার উত্তর তিনি দিতে পারিতেন এবং দিবার পূর্ণ অধিকার তাঁহারই ছিল। কিন্তু এমন শাসনবাক্যকে তিনি আরেকদিক দিয়া গ্রহণ করিতেন। তিনি ভাবিতেন, সত্যিই তো তাঁহার এমনকিছু করা উচিত নয় যাহাতে কেহ তাঁহার কামকাঞ্চনত্যাগী স্বামী সম্পর্কে আঙুল তুলিতে পারে। সুতরাং ঐ মহিলা সম্পর্কে কোন রাগ বা বিদ্বেষ পোষণ তো দূরের কথা, তিনি তাহার ঐ শাসনবাক্যে নিজেকে আরো সতর্ক রাখিতে প্রয়াস পাইলেন। কোনভাবে তাঁহার ব্যবহারে কেহ যাহাতে ক্ষুব্ধ বা পীড়িত না হয়—সেবিষয়ে তিনি অধিকতর মনোযোগী হইতে চেষ্টা করিতেন।

বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গর্ভধারিণীকে কথা দিয়াছিলেন যে, সারদাদেবীকে তিনি অলঙ্কার গড়াইয়া দিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কথা রাখিয়াছিলেন। একবার সারদাদেবীর অলঙ্কার পরা সম্পর্কে জনৈক ভক্ত-মহিলা অপরের কাছে কটাক্ষ করিয়াছিলেন: "উনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) অত বড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ি-টাকড়ি এত গয়না পরেন, এ ভাল দেখায় কি?" মন্তব্যটি সারদাদেবীর অসাক্ষাতেই মহিলাটি করিয়াছিলেন, কিন্তু যে-মুহূর্তে উহা তাঁহার কানে আসিল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সধবার চিহ্নস্বরূপ মাত্র দুগাছি বালা হাতে রাখিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন। ঘটনাপরম্পরায় উহার পরে সারদাদেবীর আর অলঙ্কার পরা হয় নাই। কারণ, অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং তাহার পর তাঁহার মহাপ্রয়াণ ঘটে। অলঙ্কার-প্রীতি মেয়েদের স্বাভাবিক। সারদাদেবীরও তাহা ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই ঐ মহিলা সম্পর্কে সারদাদেবীর বিরূপতা ছিল প্রত্যাশিত। তাহা ছাড়া, ঐ অলঙ্কার খুলিয়া ফেলার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতা এবং দেহান্তের মধ্যে একটি যোগাযোগ আবিষ্কারও তিনি করিতে পারিতেন। ঐক্ষেত্রে সারদাদেবীর স্থানে অন্য কেহ হইলে মহিলাটিকে কখনোই ক্ষমা করিতে পারিতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘটনা সারদাদেবীর মনে কোন রেখাপাতই করিতে পারে নাই। শুধু উহাতে তিনি আরো সতর্ক হইয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে কেহ তাঁহার জন্য তাঁহার দেবোপম স্বামী সম্পর্কে কোন কটাক্ষ করিতে না পারে।

দক্ষিণেশ্বরের সহস্র অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের স্মৃতি যে সারদাদেবীর জীবনে কোন প্রভাব ফেলিতে সমর্থ হয় নাই, উপরন্তু উহার মধ্যেই তিনি আধ্যাত্মিক ভাবের কোন্ তুঙ্গ শিখরকে স্পর্শ করিয়া থাকিতেন তাহার ইঙ্গিত পাই তাঁহার এই কথা কয়টিতে: "তখন আমার মন এমন ছিল—দক্ষিণেশ্বরে রেতে কে বাঁশি বাজাত; শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত; মনে হতো সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশি বাজাচ্ছেন। অমনি সমাধি হয়ে যেত।"

তাঁহার নির্বিষাদের ভিত্তি ছিল তাঁহার ঐ সহজ ও স্বাভাবিক অধ্যাত্মসত্তা।□

শ্রীম-কথিত ও শ্রীম-সমীপে

মাতৃপ্রসঙ্গ

শ্রীম—একজন ঠাকুরকে বললেন, ওকে (মাকে) মহাভারত পড়িও না। ওতে পঞ্চস্বামীর কথা আছে। স্ত্রীলোকেরা কেউ কেউ পঞ্চস্বামী করতে চায় কিনা! অমনি বন্ধ করে দিলেন মহাভারত। রামায়ণ পড়তে বললেন: "আচ্ছা, তাহলে রামায়ণই পড়। ওটা ছেড়ে দাও।"[১] এর মানে, বই পড়ে কি হবে? ঈশ্বরকে ডাকাই আসল কাজ। (৭ম ভাগ, পৃঃ ৫)

স্বামী অরূপানন্দ—আপনি ঠাকুরের মুখে কিছু শুনেছিলেন কি, ঠাকুর ও মায়ের বাল্যলীলার কথা?

শ্রীম—না, তেমন কৈ মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, ঐ একটি মনে পড়ছে। মাকে কোলে করে বাড়ির লোক কি গান হচ্ছিল তা দেখতে গিয়েছিলেন। যেমন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড়রা আমোদ-আহ্লাদ করে, তখন কে একজন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল: "তুই কাকে বিয়ে করবি?" মা ঠাকুরকে দেখিয়ে বলেছিলেন: "একে।" এই একটি কথা শুনেছিলাম।

হ্যাঁ, আরেকটি কথা আছে। মায়ের বয়স তখন ছ-বছর। ঠাকুর বলেছিলেন: "যা যা, ধামা নিয়ে আম কুড়োগা যা।" (হাস্য) মায়ের চলন ছিল জগদ্ধাত্রীর মতো ধীর গম্ভীর।...

আমরা যেখানে যেখানে personally (স্বয়ং) ছিলাম, সেখানে যা দেখেছি ও শুনেছি তাই বলি। অন্যের মুখে শুনে নয়—নিজ চোখে দেখে আর নিজ কানে শুনে। (ঐ, পৃঃ ১১০-১১১)

(সহাস্যে) একটি কথা মনে পড়ে। একটি boy (বালক ভৃত্য) ছিল। চোদ্দ-পনের বছর বয়স। শ্যামপুকুরে তখন বাসা। তার মাথায় বড় এক পাগড়ি—হিন্দুস্থানী। একবার দোলপূর্ণিমার দিন আমাদের বেলুড়ে নিয়ে গিয়েছিল।... 1890-তে ফেরিতে শালকে (সালকিয়া) গিয়ে, ওখান থেকে বরাবর হেঁটে।... মায়ের বাসা তখন বেলুড়ে...—ভাড়াবাড়িতে। (৫ম ভাগ, পৃঃ ১৭৫-১৭৬)

[১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীম একবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। নহবতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—]

হায়! এ-মহাতীর্থের এই পরিণাম! কী অপরিষ্কার আর নোংরা করে রেখেছে! মা-ঠাকরুন সারাদিন এই সিঁড়িতে (দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে) বসে জপ করতেন। বসে বসে বাত হলো। তা আর সারাজীবন গেল না। এইটুকু ঘর, সব জিনিসে পূর্ণ! স্ত্রীভক্তরাও কেউ কেউ থাকতেন। আবার মাছ জিয়ানো—কলকল শব্দ হচ্ছে। ঠাকুরের জন্য ঝোল হবে। উঃ! কী অমানুষিক ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, কী সংযম, কী ত্যাগ আর সেবা! (৩য় ভাগ, পৃঃ ২৩৬)

[স্বামী অরূপানন্দ দুদিন ধরে তাঁর 'মায়ের কথা'র পাণ্ডুলিপি শ্রীমকে পড়ে শুনিয়েছেন। ভক্তরাও তা শুনেছেন। উপস্থিত ভক্তদের শ্রীম সেই মাতৃস্মৃতির অনুকীর্তন করতে বললেন। সেই অনুকীর্তনে মায়ের অন্যান্য কথার সঙ্গে এই কথাগুলি এল: "পুরীতে ঠাকুরের ছবির কাছে একটি ঘিয়ের টিন ছিল। ঘর-দরজা বন্ধ করে আমরা মন্দিরে যাই। ফিরে এসে ঘর খুলে দেখি ঘিয়ের টিনে পিঁপড়ে উঠেছে, আর ঠাকুরের ছবি মেঝেতে শুয়ে আছে।" শুনে শ্রীম বললেন—]

এতে বলা হচ্ছে, ছবিতেও ঠাকুর আছেন।

[আরো কিছু স্মৃতিকীর্তনের পর সেদিনের মতো তা শেষ হলে শ্রীম বললেন—]

দেখছেন তো কত উপকার হয় পরস্পর তাঁর কথা বললে। (ঐ, পৃঃ ১৩৬-১৩৯)

[পরদিন অন্যান্য প্রসঙ্গের পর আবার শুরু হলো মায়ের স্মৃতিকীর্তন।]

শ্রীম (অমৃতের প্রতি)—হোক না আজো একটু 'মায়ের কথা'র স্মৃতিকীর্তন। [অমৃত আরম্ভ করলেন। উপস্থিত ভক্তরাও তাতে যোগ দিলেন। মায়ের অন্যান্য কথার সঙ্গে এল এই কথাটি: "যে মন্ত্র পেয়েছে, যে ঠাকুরের শরণাপন্ন

---

১ মা যাতে মহাভারত না পড়েন সেই পরামর্শ যিনি ঠাকুরকে দিয়েছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে তৎকালীন রক্ষণশীল ও সঙ্কীর্ণ মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁর পরামর্শ শুনেছিলেন তাঁর সহজাত সরলতায়। বর্তমান কালের নারীবাদীরা যেন এর মধ্যে অন্য কোন তাৎপর্য না খোঁজেন। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পত্নীকে পূজা করে তাঁর প্রতি তিনি সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর নানা আচরণে ও কথাবার্তায় পত্নীর প্রতি তাঁর সমুচ্চ শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া উচ্চ-নীচ, সতী-অসতী নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা বিরল। প্রত্যেক নারীকে তিনি জগজ্জননীর অংশস্বরূপিণী জ্ঞান করতেন। তবে ভগিনী নিবেদিতা ও অন্যান্যদের সূত্রে জানা যায় যে, মা রামায়ণ-পাঠে অনেক সময় কাটাতেন। এর একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে রামায়ণ পড়তে বলেছিলেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

তাকে ব্রহ্মশাপেও কিছু করতে পারে না। শেষ সময় ঠাকুরকে দেখা দিতেই হবে যে তাঁর শরণাগত।"]

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, কি promise (শপথ)! ঠাকুরও বলছেন : "মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।" এত করে বলেছেন, তবুও কি বিশ্বাস হয় লোকের? ভক্তদের জন্য কত স্নেহ মায়ের। একটি ভক্ত জয়রামবাটী থেকে চলে আসছে দীক্ষা লয়ে। মা কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন তাকে বিদায় দিতে, আর যতদূর দৃষ্টি যায় তার পথের পানে চেয়ে রইলেন। দু-একদিনের পরিচয়, কিন্তু গর্ভধারিণী মায়ের অধিক। লৌকিক বুদ্ধিই বা কী প্রখর! একবার বলছেন, জপতপ কিছুই করতে হবে না। আবার বলছেন, জীবনে শান্তি চাইলে করতে হবে। কী সুন্দরভাবে two extremes meet (দুটি বিরুদ্ধভাবের সমন্বয়) করলেন! (ঐ, পৃঃ ১৪৮-১৪৯)

[আরেকদিন শ্রীম একজন ভক্তকে (যোগেন) বললেন : "আপনি এঁকে (শুকলালকে) 'মায়ের কথা' শোনান তাহলে।" আগের দুদিনের মতো সেদিনও স্মৃতিকীর্তন আরম্ভ হলো। ইতিমধ্যে বিনয়, সুধীর ও অন্যান্য ভক্তরা যোগ দিলেন। স্বামী অরূপানন্দের মাতৃস্মৃতির পাণ্ডুলিপির এক জায়গায় আছে—একজন সাধু মাকে জিজ্ঞেস করছেন : "আচ্ছা মা, তুমি কি পিঁপড়েরও মা?" মা বলছেন : "হ্যাঁ বাবা, আমি পিঁপড়েরও মা।" এই অংশটি শুনে শ্রীম বললেন—]

আমরা কখনো কখনো চাকর দিয়ে [মায়ের কাছে] জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিতাম। মা চাকরকে আসনে বসিয়ে ঠাকুরের উৎকৃষ্ট সব প্রসাদ দিয়ে পরিতৃপ্ত করতেন—কাছে বসে থেকে খাওয়াতেন। অন্য লোকদের মতো নয়—চাকরদের জন্য একরকম খাবার, নিজেদের জন্য অন্য রকম। মায়ের কাছে ওসব ছিল না—সব এক রকম।

একবার মঠ থেকে একটি গরু এনে উদ্বোধনে রাখার কথা হয়েছিল। মা ঐ কথা শুনেই বললেন : "না না, ওরা ওখানে গঙ্গাদর্শন করছে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে, আর সাধুসঙ্গ হচ্ছে। এখানে এনে কিনা একটা ঘরে পুরে গলায় দড়ি দিয়ে রাখবে! তা হবে না। অমন দুধ আমি খেতে পারব না।" আনতে আর দিলেন না।

এতেই বোঝা যাচ্ছে, মা পিঁপড়েরও মা।

['মায়ের কথা' থেকে পড়া হচ্ছে। একজায়গায় আছে, উদ্বোধনে থাকাকালীন একদিন নলিনীদি পায়খানা পরিষ্কার করে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলেন। মা শুনে বললেন : "কেন, কলে স্নান করে (গায়ে) গঙ্গাজল দিলেই হতো। আমি যখন ওদেশে (জয়রামবাটী-কামারপুকুরে) ছিলাম, তখন কত শুকনো গু মাড়াতে হতো। হাত-পা ধুয়ে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলতাম, সব শুদ্ধ হয়ে যেত।" প্রসঙ্গটি শুনে শ্রীম বললেন—]

যাদের শুচিবাই আছে, তাদের এটা স্মরণ রাখা উচিত। হাত-পা ধুয়ে মুখে জল দিয়ে তাঁর নাম করলে সব পবিত্র হয়ে যায়।

['মায়ের কথা'য় আছে, মা সকলের ভাল দিকটা দেখতেন। একজনের কথায় তিনি বলেছিলেন : "উপপত্নীর জন্য এর কী সেবা, দেখলে!" গৌরী-মার কথায় বলেছিলেন : "গৌরদাসীর কি কম ত্যাগ! অহঙ্কার কত ছিল ওর—সব দিয়েছে!" শ্রীম শুনে বললেন—]

আহা! সব ভাল দেখছেন—good side (ভাল দিক)-টা দেখছেন।

[দুজন ভক্ত সম্পর্কে—যাঁদের মধ্যে একজন সেদিন শ্রীম-র কাছে মায়ের স্মৃতিকীর্তন করেছিলেন]

তাঁরা মায়ের সেবা করেছিলেন দুধ দিয়ে। রোজ সকালে দুধ নিয়ে উদ্বোধনে যেতেন। এইজন্যই তো... অত কথা মনে আছে। সেবা করলে ভালবাসা জন্মে। আর ভালবাসার জনের কথা হলে মনে থাকে বেশি। গানে আছে—

"আমার ভক্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে নন্দের বাধা মাথায় বই।।"

(ঐ, পৃঃ ১৫৬-১৫৮)

[গিরিশবাবু ঠাকুরকে বলেছিলেন : "আপনারও তো বিয়ে আছে।" একথা শুনে শ্রীম বললেন—]

(সহাস্যে) সংসারের নিন্দা করলেন কিনা! "হাজার সিয়ানা হও গায়ে কাদা লাগবে" বললেন। 'পাঁকাল মাছের মতো' থাকতে বললেন। "কলঙ্কসায়রে সাঁতার দেবে, তবুও কলঙ্ক গায়ে লাগবে না!" গিরিশবাবুর অভিপ্রায়—"আপনার গায়েও কি কলঙ্ক লাগে, আপনি তো বিয়ে করেছেন?" হ্যাঁ, এ একটা interesting point (মজার বিষয়) বটে। তাই ঠাকুর উত্তর দিলেন : "বিয়ে করলেও আমার সংসার করা হয় নাই। কোন দেহসম্পর্ক নাই।" বিয়ে কেবল সংস্কারের জন্য। দেহেতে মন নেই। মন মায়ের পাদ-পদ্মে সর্বদা। তাহলে সংসার কি করে হবে! নজির বললেন—এক মতে, দেবী ভাগবতের মতে আছে, শুকদেবেরও বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্য। (ঐ, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ৩২৫) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ৩য়, ৫ম, ৭ম ও ১৫শ ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

পরিমার্জনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

জীবন আমাকে যে-শিক্ষা দিয়েছে

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই স্মৃতিনিবন্ধটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করার আমার বিশেষ ইচ্ছে হলো। আমার সঙ্গে এর আগে শেখ আবদুল্লার দেখা হয়েছিল ১৯৪৬-এ। আমি করাচি থেকে কাশ্মীর গিয়েছি; গুলমার্গে গিয়ে শুনলাম, আমি যে-বাড়িতে রয়েছি (করাচির এক পরিবারের অতিথি হয়ে), তার ঠিক পাশের বাড়িতেই রয়েছেন জওহরলাল নেহরু, শেখসাহেব, মৌলানা আজাদ, লাহোরের ইফতিকারউদ্দিন, আরো কয়েক-জন জাতীয় নেতা এবং দুই শিশুপুত্র-সহ ইন্দিরা গান্ধী। দিল্লিতে তখন আই. এন. এ.-র বিচার চলছিল—সেই নিয়ে কথাবার্তা বলতেই তাঁরা তখন সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন শেখ আবদুল্লাই।

যাহোক, আমি সেই বাড়িতে জওহরলালজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তাঁর ঘরে আমাকে স্বাগত জানালেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। আমি বললাম, আপনি তো আপনার বইয়ের এক জায়গায় বিবেকানন্দকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন এই কথা লিখে যে, বিবেকানন্দ একধরনের ধর্মভিত্তিক বস্তুতান্ত্রিকতা প্রচার করেছেন! নেহরু বললেন : "তাই করেছি নাকি?" আমি বললাম : "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর মূল্যায়ন বদলে ফেলেছেন। বললেন, আহমেদনগর জেলে বন্দী থাকার সময় বিবেকানন্দের অনেক বাণী ও রচনা পড়ার সুযোগ তাঁর হয়েছিল; সেটাই তাঁর মনোভাব বদলের কারণ। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সেই নতুন মূল্যায়ন প্রকাশিত হবে তাঁর নতুন বই 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'তে, যা তখন কলকাতার এক প্রেসে ছাপা হচ্ছিল। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে বাইরে শেখ আবদুল্লার ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নেতাদের জন্য যে টি-পার্টির আয়োজন হয়েছিল, তাতে যোগ দিলাম। এরপর করাচি ফিরে 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'র এক কপি কিনে সানন্দে আবিষ্কার করলাম, সেখানে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে পাঁচ-পাতা জোড়া সশ্রদ্ধ আলোচনা; এবং অনুরূপ সশ্রদ্ধ প্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ, আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্যদের সম্বন্ধে। জওহরলাল লিখেছেন : "ভারতবর্ষের অতীতে গভীরভাবে সমাহিত এবং তার ঐতিহ্যে সম্পূর্ণভাবে গৌরবান্বিত হয়েও বিবেকানন্দ ছিলেন জীবনসমস্যার সমাধানে আধুনিক মনোভাবাপন্ন। অতীত ও বর্তমান ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি যেন সংযোগরক্ষাকারী এক সেতু।" পরবর্তী কালে ১৯৪৯ সালে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দিল্লিতে এক ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি ভারতীয় যুবকদের কাছে দৃঢ়কণ্ঠে আবেদন জানিয়েছিলেন বিবেকানন্দের অন্তত দুটি বই পড়তে—'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' ('ভারতে বিবেকানন্দ') এবং 'লেটার্স অফ বিবেকানন্দ' ('স্বামীজীর পত্রাবলী')।

এই পটভূমিকায় আমি শেখ আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করার জন্য তামিলনাড়ু সরকারের অনুমতি চাইলাম। অনুমতি পেয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আগেই বলেছি, তিনি তখন গৃহবন্দী। সেটা ১৯৬০ সাল। সিকিউরিটি গার্ডরা আমাকে শেখসাহেবের বাড়ির একতলার হলঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি ওপর থেকে নেমে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন। আমি বললাম : "এটা কিন্তু আপনার উপযুক্ত জায়গা নয়। আপনার স্থান দিল্লির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়।" জবাব এল : "কী করব, দিল্লি-রাজনীতির বদমায়েশগুলো আমাকে এখানে আটকে রেখেছে।" আমি বললাম : "নিশ্চয়ই তার কিছু কারণ আছে। তারা তো আগে আপনার সঙ্গেই ছিল। আর আপনিও তো কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজনৈতিক নেতাদের বন্দী করে রেখেছেন।" তিনি বললেন : "ভারতকে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের সঙ্গে আলোচনায় বসতেই হবে।" আমি বললাম : "সবচেয়ে ভাল হয় কী জানেন, আগে কাশ্মীর আর ভারত এক হয়ে জুড়ে যাক, তারপর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হোক।..." বাধা দিয়ে শেখসাহেব বললেন : "তা হতে পারে না।" আমি বললাম : "খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে যা দেখছি, আপনাকে এখানে সারাজীবন আটকে রাখা হতে পারে। আমি সেটা চাই না।"

কুড়ি মিনিট কথা বলার অনুমতি ছিল। ততক্ষণে সেটা দুঘণ্টায় পৌঁছেছে। তিনি ওপরে তাঁর ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়িই ফিরে এলেন। তারপর আরো দুঘণ্টা আলোচনা চলল। সেই একই ভঙ্গিতে—সোজাসুজি, খোলামেলা। যখন তিনি ওপরে গিয়েছিলেন, তখন সিকিউরিটি অফিসার আমাকে বললেন যে, শেখসাহেবের সঙ্গে তিনি কাউকে এমন অবাধে খোলাখুলি কথা বলতে ও শেখসাহেবকেও ঐভাবে উত্তর দিতে আগে কখনো দেখেননি।

চারঘণ্টা কথা হওয়ার পর খেয়াল করলাম, আমাকে মাদ্রাজের ট্রেন ধরতে হবে—সেখানে ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করার কথা। অতএব উঠে দাঁড়ালাম। শেখসাহেব আমার পিঠে হাত রেখে সিকিউরিটি অফিসারের থেকে

কয়েক ফুট দূরে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করলেন : "দিল্লির ওপরমহল থেকে কি আপনি কোন বার্তা এনেছেন?" আমি বললাম : "না, আমি নিজে থেকে আপনার কাছে এসেছি। আমি আপনাকে ভালবাসি; আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনাকে কাশ্মীরে আটক দেখতে চাই না; আপনাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে দেখতে পেলে খুশি হতাম।" আরো বললাম : "স্বামী বিবেকানন্দের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই কলকাতা থেকে আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। স্বামীজী কাশ্মীর ও তার জনগণকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।" শেখসাহেব বললেন : "আপনি পাঠান, বইগুলি পড়তে পেলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।" আরো বললেন : "ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে যখন আপনার দেখা হবে, ওঁকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাবেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে উনিই একমাত্র বিচারবোধসম্পন্ন মানুষ।" আমি বললাম : "আচ্ছা, তাই হবে।"

মাদ্রাজ ফিরে ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করলাম; শেখসাহেব যা চেয়েছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, সেসব ওঁকে বললাম। পরে আমার প্রতিশ্রুতিমতো কলকাতার 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার'-এর মাধ্যমে স্বামীজীর কয়েকটি বই পাঠিয়েছিলাম। বইগুলি পেয়ে শেখ আবদুল্লা একটা সুন্দর চিঠিতে লিখেছিলেন : "আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। বইগুলি পড়ছি।" এর কয়েক মাস পরে যখন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন দৃশ্যতই তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। সামনেই ছিল নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনী বক্তৃতাগুলিতে তিনি কোন আঞ্চলিক মনোভাব ব্যক্ত না করে একটা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। আজ তাঁর পুত্র ফারুক আবদুল্লা সেই 'জাতীয়' দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যনীতিকেই বহন করে চলেছেন, আরো দৃঢ়ভাবে। আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে একটা উষ্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক।

*

জাতীয় স্তরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল হায়দ্রাবাদে, দু-একবছর আগে। খবরের কাগজে কোন্ডাপল্লি সীতারামাইয়া নামে অন্ধ্রপ্রদেশের জনৈক শক্তিশালী নকশাল নেতার কথা পড়েছিলাম। একদিন রামকৃষ্ণ মঠে আমার ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। আমি উঠে বসে তাঁকে সামনের চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলাম। পরিচয় জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন : "আমি কোন্ডাপল্লি সীতারামাইয়া।" আমি বললাম : "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম।" তার পরের আধঘণ্টা আমরা কথা বললাম। আমি বেশি, তিনি কম। দেখলাম মানুষটি স্বল্পভাষী, ভদ্র। আমি বললাম : "এই যে কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসাত্মক কার্যকলাপ—যেমন কোথাও একজন পুলিস-কর্মী খুন করা, কোথাও বা একটা পোস্ট অফিস ধ্বংস করা—এতে যুক্ত হয়ে আপনারা কী পাবেন? এতে কি আমাদের সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির কিছু উপায় হবে? বহুদিনের সংগ্রামে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন সেটাকে আরো গণতান্ত্রিক করে তুলে এবং তার মধ্যে গেঁড়ে-বসা সামন্ততান্ত্রিক অংশগুলিকে অপসারিত করেই কেবল আমরা আমাদের সাধারণ মানুষকে তুলতে পারব। আচ্ছা, আপনাদের সবার প্রেরণার উৎস তো রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব? ভেবে দেখুন, যখন একজন সরকারি কর্মচারীকে হত্যার জন্য রাশিয়ার সরকার লেনিনের ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দিল, তখন লেনিনের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? এর থেকে আপনারা শিক্ষা নিন। মানুষ-খুনের যে-নীতি তখনো পর্যন্ত অনুসরণ করা হচ্ছিল, লেনিন তাকে অনুমোদন করলেন না। পরিবর্তে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা-দখলের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইউরোপে যে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে কাজে লাগিয়ে লেনিন তাঁর উদ্দেশ্যে সফলও হয়েছিলেন। আমি চাই, এখানে আজ আপনারা সকলে সেই শিক্ষা গ্রহণ করুন। আরো লক্ষ্য করুন, সাম্প্রতিককালে কেমন করে এককালের ক্ষমতাবান সোভিয়েত রাষ্ট্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে চলে গেল।" সীতারামাইয়া চুপ করে সব শুনলেন, মাঝেমধ্যে দু-একটা কথা বললেন; শেষে বিনীতভাবে বিদায় নিয়ে গেলেন। মনে হলো, তাঁর দিক থেকে নকশালপন্থী কার্যকলাপের যে একটা পুনর্বিন্যাস করা দরকার, সেটা তিনি ধরতে পেরেছেন। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল, সেই আন্দোলনের ওপর তাঁর বোধহয় ততটা নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং আন্দোলনকে বোধহয় আক্রমণাত্মক তরুণরাই কব্জা করে ফেলেছিল। আসলে সব হিংসাত্মক বৈপ্লবিক আন্দোলনেই এমনটা হয়; দৃষ্টান্ত : অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রেঞ্চ বিপ্লব, যেখানে ফরাসী বিপ্লবের দুই নেতা—রোবসপীয়র ও দাঁতো—একসময় যাঁরা অপরদের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত তাঁদেরও প্রাণ দিতে হয়।

বিবেকানন্দ-সাহিত্য পড়ে আমরা পরিষ্কার জানতে পারি—ভারতের অতীত গৌরব, তার বর্তমান অসহায়তা ও মহত্তর ভবিষ্যৎ গৌরব-সম্ভাবনার কথা। তাঁর 'লাইফ অফ রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের ভূমিকায় রোমাঁ রোলাঁ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বর্ণনায় লিখেছেন—'বিশ্ব-আত্মার অনুপম সুরলহরী'। 'লাইফ অফ বিবেকানন্দ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তাঁর হৃদয়-মনের ওপর বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রভাবের স্বরূপ তুলে ধরেছেন অসাধারণ ভঙ্গিতে : "বিবেকানন্দ-বাণী এক অসাধারণ সঙ্গীত। বেঠোফেনের শৈলীতে রচিত। হৃদয় আলোড়িত হয়ে যায় তার ছন্দে। সময়ের হিসাবে তাঁর বইগুলির সঙ্গে আমার ব্যবধান তিরিশ বছরের। তবু সে-বাণী স্পর্শ করামাত্র আমার সারা শরীরের মধ্যে খেলে যায় ইলেকট্রিক শকের মতো এক আশ্চর্য শিহরণ। অনুমান করতে

পারি, কী প্রচণ্ড ধাক্কা এবং প্রবল উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছিল তখন, যখন সে-বাণী উৎসারিত হয়েছিল, অগ্নিময় শব্দে, স্বয়ং সেই বীরের মুখ থেকে—নাম যাঁর বিবেকানন্দ!"

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি একটা ঘটনার কথা। ১৯২১-এ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসে মহাত্মা গান্ধী বেলুড় মঠ দর্শনে এসেছেন। সঙ্গে কস্তুরবা গান্ধী ও মৌলানা মহম্মদ আলি। আলিসাহেব ইতস্তত করছিলেন, হিন্দুমন্দিরে ঢোকা উচিত হবে কিনা ভেবে। তাঁর সে-দ্বিধা দূর করলেন মঠের তখনকার সহাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, স্বামীজীর ঘর প্রভৃতি ঘুরে দেখে গান্ধীজী বলেছিলেন : "বিবেকানন্দ-সাহিত্য পড়ে আমার ভারতপ্রেম সহস্র গুণ বেড়ে গেছে।" মহাত্মা গান্ধীর মতো একজন বিরাট সৃজনশীল নেতা একথা বললেন! অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিবেকানন্দকে ভুলে গেলেন; ভুললেন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে এবং হয়ে উঠলেন স্বার্থকেন্দ্রিক, ভোগবাদী ও চূড়ান্ত দুর্নীতিপরায়ণ।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যে দাবি করতে পারে—দেশের অঙ্গে কোন ব্যাধি যদি থেকে থাকে, তবে আমাদের জাতির হাতে তার অব্যর্থ প্রতিকারও আছে। বর্তমানে বহু দেশে প্রতিকারের যেসব ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেগুলো ব্যাধির চেয়েও ভয়ানক। তাই কোন মিথ্যা জাতীয়-দাবি নয়; এই সত্য এবং কেবল এই সত্যই আমাদের অনুভব করতে সাহায্য করবে যে, উচ্চস্তরে এখন আমরা মূল্যবোধের যে সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয় দেখছি, তা একটা সাময়িক পর্বমাত্র—এটা কেটে যাবে। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের আগেও হয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের উপলব্ধি ও বিশ্বাস করতে হবে যে, আমাদের জাতি নিশ্চয়ই বর্তমান ব্যাধির প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে শিখবে এবং আগামী শতকে গড়ে তুলবে এক প্রগতিশীল, মানবমুখী, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ-সংগঠন।

পরিশেষে আমি উদ্ধৃত করব বিবেকানন্দের কুম্ভকোনম বক্তৃতার কিছু অংশ। 'দ্য মিশন অফ দ্য বেদান্ত' শীর্ষক সেই বক্তৃতায় স্বামীজী সংক্ষিপ্ত আকারে ভারতের জনগণের কাছে এই আবেদন সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থিত করেছিলেন : "নিজেদের শেখাও এবং প্রত্যেককে শেখাও—তোমাদের প্রকৃত স্বরূপ কী। ঘুমন্ত আত্মাকে ডেকে তোল, দেখ কিভাবে তিনি জাগেন। শক্তি আসবে, গরিমা আসবে, মঙ্গল আসবে, পবিত্রতা আসবে; যাকিছু শ্রেষ্ঠ সবই আসবে—তখন, যখন এই ঘুমন্ত আত্মা আত্মসচেতন কর্মশীলতায় জাগ্রত হয়ে উঠবেন।"* [সমাপ্ত] ❑

---

* রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীর 'What Life Has Taught Me' শীর্ষক একটি রচনা ভারতীয় বিদ্যাভবন (মুম্বই-৭)-এর মাসিক ইংরেজী মুখপত্র 'Bhavan's Journal'-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজজী-কৃত কিছু সংযোজন-সহ রচনাটির বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় শ্রীসারদা মঠ (দক্ষিণেশ্বর)-এর ত্রৈমাসিক বাঙলা মুখপত্র 'নিবোধত'-র তিনটি সংখ্যায় (১২শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা এবং ১৩শ বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা)। ইতিমধ্যে 'Bhavan's Journal'-এ প্রকাশিত ইংরেজী রচনাটি বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম-সংযুক্ত হয়ে মহারাজজী-কৃত সংযোজন-সহ ঐ একই শিরোনামে ('What Life Has Taught Me') ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (মে ১৯৯৯)। পূজ্যপাদ মহারাজজীর ইচ্ছানুসারে 'উদ্বোধন'-এ বর্তমান অনুবাদটি 'নিবোধত'-র উক্ত বাঙলা অনুবাদ ও ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত পুস্তিকাটি (বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম বাদে) অনুসরণ করে এপর্যন্ত তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। এটিই শেষ কিস্তি। রচনাটি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি নিরীক্ষা

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত গত ২০ নভেম্বর ১৯৯৯ পরলোকগমন করেছেন। প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষিকা, নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা মনস্বিনী লেখিকার পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

॥ ৪ ॥

গীতার সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি : বর্ণাশ্রম প্রথা

গীতার যুগে ভারতের সমাজব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ ছিল বর্ণাশ্রম প্রথা। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ হারাণচন্দ্র চাকলাদার একটি অনন্য আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, ইউরোপীয়দের নিকট দর্শন কেবল মননের বস্তু, কিন্তু বাস্তববাদী ভারতীয়দের নিকট ধর্ম ও দর্শন জীবনের মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য তা বাস্তব অনুশীলনের বস্তু। প্রতিটি মানুষ যাতে ধাপে ধাপে জীবনের পরম লক্ষ্য সত্যানুভূতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্যই চতুরাশ্রম প্রথা ও গুণকর্মানুসারে বর্ণবিভাগের ভিত্তিতে সমাজকে গড়ে তোলা হয়েছিল।[৯০]

আজ যাঁরা আমাদের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন তাঁরা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য (তাঁদের মতে—আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি করে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের শোষণব্যবস্থা কায়েম করা।) ব্যাখ্যা করলেও 'চতুরাশ্রম' কথাটির কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন না। 'বর্ণাশ্রম' কথাটিকে তাঁরা অভিন্ন ধরে নিয়ে 'জাতিভেদ'-এর সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেন। অথচ চতুরাশ্রম ব্যাপারটির সঙ্গে জাতিভেদের কোন সম্পর্কই নেই। এটির অর্থ—মানুষের জীবনকে ধাপে ধাপে ক্রমবিকাশের চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে অবশেষে সত্যানুভূতিতে পৌঁছে দেওয়া। এই চারটি পর্যায় হলো—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

চতুরাশ্রম আর বর্ণবিভাগ দুটি পৃথক প্রথা। বর্ণবিভাগের ভিত্তি গুণকর্মের প্রভেদ। প্রাচীন সমাজে প্রত্যেকের গুণ বা প্রবণতা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-র তারতম্য অনুসারে কর্ম নির্দেশ করা হতো। বর্ণগুলি যে কেবল মানুষের সমাজেই আবদ্ধ তা নয়, ভূমি অথবা মন্দিরের ক্ষেত্রেও এরূপ গুণভেদ করা হতো।[৯১] নির্মলকুমার বসু প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা সেজন্য মনে করেন না যে, বর্ণভেদের সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির কোন সম্পর্ক আছে।

হারাণচন্দ্র চাকলাদারের আরো অভিমত যে, ঋক-মন্ত্রমালা, বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ, কল্প, শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্র প্রভৃতি সম্পর্কে ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদেরা যা বলেন অর্থাৎ এগুলি ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্ট, তা ঠিক নয়। এগুলির মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বহুকাল ধরে সমাজে যা প্রচলিত, সমাজের প্রয়োজনে যা উদ্ভাবিত—এমন সব প্রথা, প্রতিষ্ঠান, বিধি-নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠানসমূহ। সযত্নে, নিখুঁত-ভাবে, কোনকিছুই বাদ না দিয়ে, ঠিক যেমন আছে তেমনটিই পরিপূর্ণ সততার সঙ্গে রক্ষা করে, সমাজতত্ত্বের কোন তত্ত্ব বা theory গঠনের চেষ্টা না করে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৯২] দুঃখের বিষয়, আজকের ভারতের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বস্তাপচা ঐ ইউরোপীয় মতটিই পরম বিশ্বাসের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছেন। হারাণচন্দ্র চাকলাদারের মতো বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের মতো মনীষীদের মত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং এই উপেক্ষা করবার পক্ষে কোনরকম যুক্তিতর্ক না দেখিয়ে তাঁরা ঐ মতটি গ্রহণ করেছেন! এবং একেই এঁরা বলতে চাইছেন—'সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার'!

বর্ণাশ্রমী প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কারণ

অবশ্যই একথা ঠিক যে, ভারতের সমাজে একসময় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ঘটেছিল। সেকথা আমরা পূর্বেও বলেছি। এসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "ব্রাহ্মণের চাতুর্যই যে তাহার কারণ এরূপ অদ্ভুত কথা নেহাতই ইতিহাস-বিরুদ্ধ। তাহার প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যেই রহিয়াছে।... ভারতবর্ষে যে জাতিসঙ্ঘাত ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ জাতির সংগ্রাম। তাহাদের মধ্যে বর্ণের ও আদর্শের ভেদ এত গুরুতর যে, প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষণশক্তিই প্রবল হইয়াছে। এরূপ আত্মসম্প্রসারণের দিকে চলিতে গেলে আপনাকে হারাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সমাজের সতর্কতাবৃত্তি পদে পদে আপনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে।"[৯৩] অর্থাৎ মনুষ্যত্বের এক অত্যুচ্চ আদর্শকে এবং

---

৯০ দ্রঃ 'Social Life In Ancient India', Cultural Heritage of India, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Vol. III, 1st Edn.

৯১ দ্রঃ হিন্দুসমাজের গড়ন—নির্মলকুমার বসু, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৬৬

৯২ দ্রঃ 'Social Life In Ancient India' ৯৩ ইতিহাস, পৃঃ ৩২

অমূল্য এক সংস্কৃতি সম্পদকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ঘটেছিল। ব্রাহ্মণত্বকে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ হিসাবে একদা দেখা হয়েছিল, অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ' কথাটি কোন শ্রেণীজ্ঞাপক বা জাতিজ্ঞাপক ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"Propertyless, selfless, subject to no laws, no king except the moral—such is the ideal man—Brahman."[১৪] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হলেন তিনি—যিনি সম্পূর্ণ বিত্তহীন, স্বার্থলোভহীন, যিনি বিধিনিয়মের বশবর্তী নন। একমাত্র যার শাসনের তিনি অধীন, সেই শাসক হলো ধর্ম। মহাভারতেও পিতামহ ভীষ্ম একথা বলেছেন : "ব্রাহ্মণত্বের সম্পদ হলো একতা, সমতা, সততা, শীল, অহিংসা, সরলতা, তপস্যা ও কর্মফলে অনাসক্তি। এমন সম্পদ ছাড়া ব্রাহ্মণের আর কিছুই নেই।" (শান্তিপর্ব, ১৭৫।৩৭) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদ'-এও এরূপ ব্রাহ্মণকেই আদর্শ মানুষ বলা হয়েছে। ধম্মপদের এই অংশের নাম 'ব্রাহ্মণবগ্গ'। এতে বলা হয়েছে—

"জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্র দ্বারা এবং জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। কিন্তু যে ধার্মিক এবং সত্যবাদী সে শুচি এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ।" (ব্রাহ্মণবগ্গো, ১১)

ব্রাহ্মণত্বের এই উচ্চ আদর্শকে রক্ষা করার প্রয়াসই ভারতীয় সমাজে একসময় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কারণ হয়েছিল। এই উচ্চ আদর্শকে রক্ষা করার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে বিষম সঙ্ঘাতের অবসান যাঁরা ঘটিয়েছেন তাঁরাই আমাদের ধর্মনেতা বা অবতারপুরুষ। এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "দুই পক্ষের চিরন্তন প্রাণান্তিক সংগ্রাম কখনো কোন সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না, হয় একপক্ষকে মারিতে, না হয় দুই পক্ষকে মিলিতে হইবে। ভারতবর্ষে একদা ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মিলনের কাজ শুরু হইয়াছিল। প্রথমে ধর্মেও এই মিলন-নীতি বাধা পাইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ইহাকে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিতেছিল।"[১৫] প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই মিলনকার্য সাধনে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, যার জন্য তাঁরা পূজা পেয়ে আসছেন হাজার হাজার বছর ধরে। শ্রীকৃষ্ণ গোপসমাজে প্রতিপালিত হওয়ায় তাঁর সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল নিম্নবর্ণ ও ব্রাত্যদের প্রতি, আজও কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি ব্রাত্য, কারো মতে অনার্য।[১৬]

বর্ণপ্রথার উৎস : বহিরাগত আর্যজাতি

গীতার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাতাদের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিনটি শ্রেণীবিভাগ নিয়েই আর্যরা এদেশে আসে, তারপর ভূমিপুত্র অনার্যদের পরাজিত করে তাদের 'শূদ্র' নাম দিয়ে অন্য তিনবর্ণের পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হয়। যারা বশ্যতা স্বীকার না করে বনেজঙ্গলে পালিয়ে যায়, তাদের 'দস্যু' ও 'অসুর' আখ্যা দেওয়া হয়। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, এঁদের মতে, গীতার কাল অবধি প্রচলিত ছিল—মধ্যে কিছুসময় ছাড়া যখন বৌদ্ধপ্রভাব সমাজের ওপর বিশেষ বিস্তারলাভ করেছিল।

এসিদ্ধান্ত সম্পর্কে নানাবিধ আপত্তি নানাদিক থেকে উত্থাপিত হয়েছে। আমরা সেগুলি এখানে একে একে দেখে নিয়ে সত্য নির্ণয় করার চেষ্টা করব। চেষ্টা করব গীতা এবং মহাভারতের কালে ভারতের সমাজব্যবস্থা যথার্থ কিরূপ ছিল তা নির্ণয় করতে।

ভারতে আর্য-অভিযান তত্ত্ব

প্রথম কথা, আর্যরা বহিরাগত—এ-তত্ত্বে স্বামী বিবেকানন্দ, তিলক ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণ ঘোর সন্দিহান ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এসম্পর্কে বলছেন : "কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে দেখেছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন?... আর রামায়ণ পড়া তো হয়নি, খামোকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের ওপর কেন বানাচ্ছ?

"রামায়ণ কি? না আর্যদের দক্ষিণী বুনো বিজয়!! বটে! রামচন্দ্র আর্য রাজা সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে? লঙ্কার রাজা রাবণের সঙ্গে।... লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশি ছিল, কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি প্রভৃতি দক্ষিণী লোক বিজিত হলো কোথায়? তারা হলো সব রামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন, তা বল না?"[১৭]

স্বামীজীর সংশয় আজ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত সত্য যে, আর্য-অভিযান তত্ত্ব এক গল্প, বানানো কাহিনী। এটি প্রমাণিত আজকের গবেষক এন. এস. রাজারাম, ডেভিড ফ্রলে প্রমুখের বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা। এপ্রসঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এন. এস. রাজারাম লিখিত এক প্রবন্ধে[১৮] সম্প্রতি যেসকল তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভারত তথা বিশ্ব-ইতিহাসের ওপর নতুন আলোকসম্পাত ঘটেছে এবং

---

১৪ Complete Works, Vol. IV, p. 309   ১৫ ইতিহাস, পৃঃ ৩২

১৬ ঐতিহাসিক ডি. ডি. কোশাম্বী ও রোমিলা থাপার এই মতের সমর্থক।

১৭ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১০

১৮ 'New Light on Vedic India and Ancient Civilizations', Sept., Oct., Nov. 1996

ভারতের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাতাদের সিদ্ধান্তসকল অসিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতার কারণেই আমরা নিচে রাজারাম ও ডেভিড ফ্রলের গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত-সকলের সারমর্ম উদ্ধৃত করছি।

ভারতে আর্য-অভিযান সম্বন্ধে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সারমর্ম ঃ

দু-শতাব্দীর অধিককাল ধরে আমাদের ইতিহাস লিখিত হয়েছে ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। তার কারণ, এসময় ইউরোপীয় জাতিগুলির মুখ্য কাজ হয়েছিল সাম্রাজ্যবিস্তার। তার স্বার্থেই তারা বিশ্ব-ইতিহাস এবং তাদের অধীনস্থ ভারতের মতো দেশগুলির ইতিহাস নতুন করে লিখতে প্রবৃত্ত হয়, যাতে এই দেশগুলির সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য এসকল দেশের অধিবাসিগণ কোন কৃতিত্ব দাবি করতে না পারে বা গর্ব করার মতো কিছু না পায়। এর ফল হয়েছে, যদিও ভারত তার ইতিহাস ও সভ্যতার প্রাচীনতম এবং বিশ্বের সকল দেশের তুলনায় সর্বাপেক্ষা বিপুলায়তন সাক্ষ্যপ্রমাণ ধরে রেখেছে তবুও আজকের ইতিহাসগ্রন্থাদিতে দেখা যায় সেইসকল সাক্ষ্যপ্রমাণের ভয়ানক অপব্যাখ্যা এবং সেগুলির প্রতি যারপরনাই উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন! সুতরাং এখন যা 'ইতিহাস' বলে প্রচারিত তা অনেকাংশে সত্য নয়, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এবং অনেকটা কুসংস্কারের প্রভাবে রচিত মিথ্যা গল্পমাত্র। এর রচয়িতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অজ্ঞ কর্মচারিবৃন্দ এবং ততোধিক অজ্ঞ মিশনারিগণ—বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাদের অজ্ঞতা ছিল পর্বতপ্রমাণ।

আজ পুরাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাচীন গণিতশাস্ত্র এবং স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফির সাহায্যে যা জানা যায় তাতে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে অনেকখানি আবিষ্কার করতে পারা গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাতে জানা গিয়েছে যে, বৈদিক সভ্যতা অন্ততপক্ষে খ্রীস্টজন্মের সাতহাজার বছর পূর্বের। শেষ তুষারযুগের অন্তে তুষারশিখরগুলি বিগলিত হয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এদেশে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তারই পরিমণ্ডলে বৈদিক সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এটাও প্রমাণিত যে, বহির্দেশ থেকে ভারতে আর্যদের ঋগ্বেদ-সহ আগমন-কাহিনী সম্পূর্ণ বানানো।

দুঃখের বিষয়, এই মিথ্যাকাহিনীর স্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহাপণ্ডিত ম্যাক্সমূলার—যাঁর সংস্কৃত সাহিত্যে যত প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, বিজ্ঞান সম্বন্ধে ছিল ঠিক ততখানি অজ্ঞতা। তিনি বাইবেল-প্রচারিত এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্বাস করতেন যে, খ্রীস্টজন্মের ৪০০৪ বছর পূর্বে অক্টোবরের ২৩ তারিখ ঠিক সকাল ৯টায় এই বিশ্ব সৃষ্ট হয়! খ্রীস্টীয় মৌলবাদীদের বিশ্বাস যে, বাইবেল-বর্ণিত বন্যা ঘটে খ্রীস্টজন্মের ২৪৪৮ বছর পূর্বে। বাইবেলের এইসকল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ম্যাক্সমূলার আর্য-অভিযানের তারিখ ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এবং ঋগ্বেদ সাহিত্য (যা পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য) সৃষ্টির তারিখ নির্দিষ্ট করেছেন ১২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে।

ম্যাক্সমূলারের আর্য-অভিযান তত্ত্বের ভিত্তি সংস্কৃত-ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য অবশ্যই সত্য, কিন্তু তা থেকে এ-সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ নয় যে, আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছে। স্বামীজী বলেছেন, এও তো হতে পারে যে ভারত থেকেই আর্যরা অন্যত্র গিয়েছে? পরে আমরা দেখব যে বাস্তব ঘটনা তাই-ই। অর্থাৎ এখানকার অধিবাসিগণই সংস্কৃতভাষা-সহ বহির্দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে, ভাষার সাদৃশ্য সেই কারণেই।

ম্যাক্সমূলার আর্যদের ভারত-অভিযানের তারিখ ধরেছেন খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে, এই আর্যরা এসে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতা হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোকে ধ্বংস করে এবং এব্যাপারে সমস্ত অপরাধ চেপেছে দেবরাজ ইন্দ্রের ঘাড়ে! অবশ্যই ইন্দ্র 'দেবতা' নামক জনগোষ্ঠীর রাজা হিসাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজাদের মতোই কিছু যুদ্ধ জয় করেন (বহু যুদ্ধে পরাজিতও হন), কিছু শত্রুপুরীও ধ্বংস করে 'পুরন্দর' নামে খ্যাত হন। কিন্তু সেই পুরীগুলি যে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কৈ? সমস্তটাই কল্পনা, এবং কষ্টকল্পনা।

হরপ্পা সভ্যতাকে ধরে নেওয়া হয়েছে প্রাক্-আর্য-দ্রাবিড় সভ্যতা বলে। কিন্তু দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত ভাষাগুলির সহায়তায় এখানকার লিপিগুলি পাঠের যে চেষ্টা এতাবৎ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি ভারতে এস. আর. রাও এবং আমেরিকায় সুভাষ কাক যে-গবেষণা করেছেন তার ফলে জানা গিয়েছে, এই লিপিগুলির ভাষা সংস্কৃত-গোষ্ঠীরই এবং এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে এঁরা এই লিপির অধিকাংশ পাঠ করে আরো জানতে পেরেছেন যে, হরপ্পা সভ্যতা বেদের সূত্রযুগের সমকালীন এবং বৈদিক ও হরপ্পা সভ্যতা একই সভ্যতা। এই দুই সভ্যতা একই সঙ্গে অস্তমিত হয় একই কারণে এবং সময়টা হলো ২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। হরপ্পা সভ্যতা সূত্রযুগের অর্থাৎ বৈদিক যুগের শেষের দিকের। এই আবিষ্কারের ফলে এ-সত্য আজ উদ্ঘাটিত যে, আর্য-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেভাবে বিভাজন করা হয়েছিল এবং বৈদিক আর্যদের যে দ্রাবিড়-জনগোষ্ঠীর শত্রুরূপে দাঁড় করানো হয়েছিল তা ছিল সর্বতোভাবে মিথ্যা ভিত্তির ওপর গড়ে তোলা এক ছদ্ম-গবেষণা। এটা করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের স্বার্থে। এরূপ বিভেদ-নীতি অধিকৃত দেশগুলির অধিবাসীদের পদানত করে রাখার ব্যাপারে একটি মহাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। বিভেদ সৃষ্টি করে অধিবাসীদের ঐক্য নষ্ট করাই এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, কারণ তাহলেই নিজেদের শাসন কায়েম রাখা সহজ হবে। এজন্যই এদের এইসকল তত্ত্ব প্রণয়ন।

হরপ্পা সভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতারই একটি পর্যায়, তার প্রমাণ আছে। বর্তমান কালে গঙ্গা সর্বাপেক্ষা পবিত্র নদী। কিন্তু ঋগ্বেদে সর্বাপেক্ষা পবিত্র নদী ছিল সরস্বতী (২।৪১।৪৬)। একেবারে সাম্প্রতিক পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে যে, তথাকথিত সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রস্থল কিন্তু সিন্ধুতটবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল না, অবস্থিত ছিল সরস্বতী নদীর অববাহিকায়। তখন সরস্বতী ছিল বেগবতী ও স্রোতস্বতী। হরপ্পা সভ্যতার এই অবস্থানকেন্দ্রগুলি-সহ একটি মানচিত্র রাজারামের প্রবন্ধের সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৯৯]

বর্তমানে যে সুবিস্তীর্ণ পুরাতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন ভি. এস. ওয়াকানকার তাতে জানা যায় যে, সরস্বতী নদীর তীর ধরে হাজার হাজার বসতি গড়ে উঠেছিল, যা বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। ডঃ ওয়াকানকারের পরিচালনায় বিভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, সরস্বতী নদী কয়েকবার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং খ্রীস্টজন্মের ১৯০০ বছর পূর্বেই শুকিয়ে যায় প্রধানত দুটি মুখ্য শাখানদীর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য (যমুনা গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়, শতদ্রু সিন্ধুনদের সঙ্গে)। ফলে তখন আর্যসভ্যতার কেন্দ্রও পরিবর্তিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাও তখন সরস্বতীতটবর্তী ভরত-বংশীয়দের হাত থেকে স্খলিত হয়ে গঙ্গাতটবর্তী মগধের রাজবংশীয়দের হাতে চলে যায়।

এই যে পরিবর্তন, এসকলই বৈদিক সাহিত্যে 'ব্রাহ্মণ' অংশে এবং পুরাণাদিতেও বর্ণিত হয়েছে। আমেরিকাস্থ Landslat স্যাটেলাইট কেন্দ্র এবং ফ্রান্সের Spot স্যাটেলাইট কেন্দ্র থেকে ভূগর্ভের অভ্যন্তরের চিত্র গ্রহণ করে দেখা গেছে যে, সরস্বতী নদীর একাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। সুতরাং যে-সভ্যতাকে এতদিন ধরে কেবলমাত্র 'সিন্ধুসভ্যতা' বলে বর্ণনা করা হতো তাকে আজ নিশ্চিতরূপে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে 'সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা' বলে।

তবে এই গবেষণার ফলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে-সত্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তা হলো এই যে, খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ নাগাদ ভারতে আর্য-অভিযানের তত্ত্বটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, খ্রীস্ট জন্মের ১৯০০ বছর আগে যে-নদী সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে, বহিরাগত আর্যজাতি তারই তীরে বসতি স্থাপন করেছে আরো ৪০০ বছর পরে—এ কি করে হয়? এবং তাও সিন্ধুনদ ও তার শাখাসমূহের মতো বেগবান পাঁচটি নদীর তীরভূমি পেরিয়ে এসে! তা শুধু নয়, সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হওয়ার ৪০০ বছর পরে সেই নদীকে তারা 'বেগবান স্রোতস্বতী', 'মাতৃস্বরূপা', 'দেবীস্বরূপা', 'পুণ্যসলিলা'—এইসব বলে (ঋগ্বেদে) স্তুতি করছে "অম্বিতমে, নদীতমে, দেবীতমে!" (২।৪০।৪৬) বলে? এ কি হয়?

আরো প্রমাণ আছে। হরপ্পা সভ্যতার যে বিস্তীর্ণ এলাকা ইরাণ-সীমান্ত থেকে পূর্ব-উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, তাতে অগণিত যজ্ঞশালা আবিষ্কৃত হয়েছে। এসকল যজ্ঞবেদি কিভাবে নির্মাণ করা হবে সেবিষয়ে নির্দেশাবলী প্রাচীনতম গণিতশাস্ত্রগ্রন্থ বেদের সুলবা সূত্রসমূহের (Shulba Sutra) মধ্যে পাওয়া যায়। যদি ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য-অভিযান তত্ত্ব মেনে নিতে হয় তাহলে ধরতে হয় যে, হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা যজ্ঞবেদি নির্মাণ করত যে-গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে তা ৪০০ বছর পরে বৈদিক আর্যরা বাইরে থেকে নিয়ে আসে! এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কি গ্রহণযোগ্য?

আরো একটি উল্লেখ্য ঘটনা হলো, ১৯৫৮ সালে দিল্লির কাছে একটি কামারশালায় ডেভিড হিক্স নামে স্যান ফ্রান্সিস্কোবাসী এক ভদ্রলোক একটি ধাতুনির্মিত মানুষের মুণ্ড পান, যেটি তখন কামারশালায় গলানোর উদ্যোগ চলছিল। (এরকম কত ঐতিহাসিক নিদর্শন গলানো হয়ে গিয়েছে কে জানে!) এ-মূর্তিটি পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল, বৈদিক ঋষি বশিষ্ঠের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়, যার জন্য এর নাম হয়েছে 'বশিষ্ঠ মুণ্ড' ('প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সংখ্যায় মূর্তিটির একটি আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।) এটি কোন্ সময়ে নির্মিত তা নির্ণয়ের জন্য আমেরিকার পদার্থবিদ ডঃ রবার্ট এন্ডারসন আমেরিকা এবং সুইজারল্যান্ড—এই দুই জায়গার গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখে বলেছেন যে, এটি অন্ততপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব ৩৭০০ বছর পূর্বেকার। আর্য-অভিযান তত্ত্ব মানতে হলে বলতে হয় যে, বৈদিক আর্য ঋষি বশিষ্ঠের মূর্তিটি এদেশে নির্মিত হওয়ার প্রায় ২০০০ বছর পরে আর্যরা এদেশে এসেছিলেন। অর্থাৎ বশিষ্ঠের মর্তধামে আবির্ভূত হওয়ার ও ভারতে আসার ২০০০ বছর আগেই ভারতে তাঁর মূর্তি নির্মিত হয়ে গিয়েছিল!! এ কি বিশ্বাসযোগ্য?

ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ হলেন রাজা সুদাসের মন্ত্রী। সুদাসের সঙ্গে তদানীন্তন দশজন রাজার যুদ্ধ হয়। এ-যুদ্ধের বর্ণনা ঋগ্বেদে আছে। সেটিও তাহলে অন্ততপক্ষে ৩৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ঘটেছিল। সুতরাং ধরা যেতে পারে যে, বৈদিক আর্যরা খ্রীস্টপূর্ব ৩৭০০ বছর পূর্বেও ভারতে ছিলেন। এবং সন্দেহ নেই যে, এ হলো সিন্ধুসভ্যতার পূর্ববর্তী কালের কথা। বেদে যে জ্যোতির্গণনামূলক তথ্যাদি আছে তার সঙ্গে এ-তারিখ মিলে যাচ্ছে বলে রাজারাম তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছেন।

তাহলে শুধু আমাদের ইতিহাসই নয়, বিশ্ব-ইতিহাসও পুনর্বার নতুন করে লেখা প্রয়োজন। কারণ এখন যা দাঁড়াল তা হলো এই যে, বৈদিক সভ্যতা মিশর ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পূর্ববর্তী। এব্যাপারে আমেরিকার গবেষক জিম

৯৯ Archeological Map of Vedic India ('Prabuddha Bharata', Sept. 1996)

শেফারের অভিমত রাজারাম উদ্ধৃত করেছেন। অভিমতটি হলো—ঐতিহাসিক কালে ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যজাতির অস্তিত্ব ছিল না এবং তাদের দক্ষিণ এশিয়া অভিযানের কোন পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণও পাওয়া যায় না।

রাজারামের অভিযোগ—ভারতীয়দের ইতিহাস-চেতনা নেই। একথা বারবার বলা হয়েছে, কিন্তু তার ইতিহাসকে তো অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, তাদের বেদে ও পুরাণে যা লিপিবদ্ধ আছে তা সাম্প্রতিকতমকালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসমূহের দ্বারা প্রমাণিত। পুরাণ-মতে কলিযুগের আরম্ভ খ্রীস্টপূর্ব ৩১০২-তে। মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারা কলিযুগ সূচিত। রাজারাম প্রমুখের বৈজ্ঞানিক হিসাব অনুযায়ী ঐসময়ই মহাভারতের যুদ্ধের কাল।

হরপ্পা সভ্যতার নগর-নির্মাণ পরিকল্পনা রোমান সাম্রাজ্যের ২০০০ বছর পূর্বের। ভারতীয়দের জ্যামিতির জ্ঞান পিথাগোরাসের ২০০০ বছর পূর্বেকার বোধায়ন-সূত্রে পাওয়া যায়। জ্যামিতির জ্ঞান ব্যতীত নগর-নির্মাণ পরিকল্পনা সম্ভব নয়। হরপ্পা সভ্যতার যজ্ঞবেদিও খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ বছর পূর্বের। বৈদিক সূত্রগ্রন্থগুলি এই জ্যামিতি বিষয়ক।

রাজারাম লিখেছেন যে, সূত্রগ্রন্থে মহাভারতের যুদ্ধকে প্রাচীনকালের যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারেও ৩১০২ খ্রীস্টপূর্বাব্দ মহাভারতের যুদ্ধের কাল। প্রাচীন বংশতালিকা অনুসারে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু রাজা সুদাসের ত্রিশ বা বত্রিশতম বংশধর। সুদাসের পুরোহিত বশিষ্ঠ ৩৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের লোক। এখন ২০ বছর এক-একটি প্রজন্মের কাল বলে ধরা হয়। এতে দেখা যায় যে, ৩৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দেই সুদাসের পৃথিবীতে অবস্থানের কথা। বশিষ্ঠের মৃত্যুর তারিখও তো তাই। সুতরাং ঋগ্বেদের সময় ৩৮০০-৩৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। বশিষ্ঠ আবার রামায়ণ-বর্ণিত রামচন্দ্রেরও গুরু এবং রামের একত্রিশতম বংশধর মহাভারতের যুদ্ধে নিহত হন। তাহলেও ঐ তারিখই সমর্থিত হয় ঋগ্বেদের কাল হিসাবে—রাজারামের মতে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পুরাতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ধাতুতত্ত্ব অনুসারে ঋগ্বেদের সময় ৩৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। রাজারাম জানাচ্ছেন, সরস্বতী নদীর শুষ্ক খাতে প্রাপ্ত রূপার গহনাদির তারিখও ঐ একই সময়ের বলে পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে। সুতরাং নিঃসংশয়ে একথা প্রমাণিত যে, ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ভারতে আর্য-অভিযান তত্ত্ব ও আর্যরা ঋগ্বেদ সঙ্গে নিয়ে আসে—এ-কাহিনী সম্পূর্ণ বানানো।

কিন্তু এ-প্রশ্ন থেকে যায় যে, ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে মধ্য এশিয়া বা ইউরোপের আর্যদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য কোথা থেকে এল? এপ্রসঙ্গে রাজারাম জানাচ্ছেন যে, ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে রাজা মান্ধাতার কাহিনী, যিনি 'দ্রহ্য' নামক জনগোষ্ঠিকে ভারত থেকে বিতাড়িত করেন। এরকম আরো কিছু জনগোষ্ঠির নাম রাজারাম উল্লেখ করেছেন, যারা ভারত থেকে এশিয়া ও ইউরোপে যায়। শ্রীকান্ত তলাগেরির গবেষণা সহায়ে রাজারাম জানিয়েছে যে, মান্ধাতা কর্তৃক বিতাড়িত জনগোষ্ঠি ইউরোপে 'Druid' (Celtic) নামে পরিচিত হয়।[১০০] এইসকল জনগোষ্ঠিই সংস্কৃতভাষাকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপে যায়—এজন্যই ভারতীয় ভাষা এবং ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে অনেক শব্দ এক দেখা যায়।

আবার প্রশ্ন হতে পারে, 'আর্য' কথাটি ভারতে এল কোথা থেকে? এর প্রয়োগ ভারতীয় সাহিত্যে প্রচুর। দেখা যায়, 'আর্য' কথাটি ভারতে একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হতো। 'অমরকোষ' অনুযায়ী 'আর্য' কথাটির অর্থ সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত, আচার-আচরণে শান্ত, মধুর স্বভাব, মর্যাদাপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ। রামায়ণ অনুসারে 'আর্য' কথার অর্থ—যিনি সকলের মধ্যে সাম্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন এবং লোকপ্রিয়। ঋগ্বেদেও ছত্রিশবার 'আর্য' কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু কখনো তা জাতিগত অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি। সঙ্কীর্ণ জাতিগত (race) অর্থে কথাটির প্রয়োগ ঘটে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য।

সুতরাং ডেভিড ফ্রলে ও রাজারাম-কৃত গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, বহুল প্রচারিত ভারতে আর্য-অভিযান তত্ত্ব মিথ্যা ও ঋগ্বেদ বহু প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক সভ্যতারই শেষের দিকে উদ্ভূত এবং বৈদিক সভ্যতারই পরিণত রূপ। মহাভারতের যুদ্ধও বহু প্রাচীন কালে ঘটেছিল—৩১০২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে, হরপ্পা সভ্যতারও পূর্বে। সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার অবক্ষয় সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাওয়ার পরিণতিতে একই সঙ্গে ঘটে।

অতীব দুঃখের বিষয়, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে রচিত এই কল্পিত আর্য-অভিযান কাহিনীর ভিত্তিতেই আজকের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাতারা—যাঁরা সবসময় বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা হলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী—তাঁরা তাঁদের ইতিহাসের তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁদের তত্ত্ব হলো—অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের পক্ষে নিম্নবর্ণের ওপর শোষণ করার জন্য বর্ণবিভাগ ও ঋগ্বেদ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং বর্ণবিভাগ ও ঋগ্বেদ গ্রন্থ বহিরাগত আর্যজাতির আমদানী, যারা ভূমিপুত্রদের মেরে কেটে, তাদের হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস করে তাদের বনে-জঙ্গলে বিতাড়িত করেছিল। এঁদের মতে, এই বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক বর্ণভেদের সমর্থন গীতায় আছে। এই ভূমিপুত্রদেরই একটি অংশকে এরা 'শূদ্র' নাম দিয়ে উচ্চবর্ণের পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছিল। [ক্রমশ]

---

১০০ দ্রহ্য—Druids, পর্শু—Persean, পৃথু-পার্থব—Parthian, এলিনস—Hellenese—শ্রীকান্ত তালাগেরির মতে (রাজারামের প্রবন্ধ দ্রঃ)।

চিরন্তনী
দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ (১১)
এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য
কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত
ইন্দ্রের শক্তিশালী বজ্রের আঘাতে বৃত্রাসুরের একটি হাত কাটা গেছে, অঝোরে রক্ত পড়ছে। কিন্তু সেদিকে তার যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই! আরেকটি হাতে মুগুর তুলে নিয়ে সে দেবরাজের দিকে তেড়ে এল। দেবরাজ তখন বজ্রাঘাতে মুগুর সমেত সেই হাতটিও কেটে ফেললেন।
দুটি হাতই হারিয়ে রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাকাতর বৃত্রাসুর বিশাল হাঁ করে, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো দেবরাজের দিকে তেড়ে এল। বড় বড় দাঁত ও লেলিহান জিহ্বায় তার মুখ ভয়াবহ হয়ে উঠল। দেবরাজকে সে যেন গিলে ফেলবে! কিন্তু বিষ্ণুর প্রভাবে এবং মহামায়ার শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত দেবরাজ ইন্দ্রের কোন ক্ষতিই সে করতে পারল না।
নিঃশঙ্ক চিত্তে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে বজ্রের আঘাত হানলেন। সেই আঘাতে তার দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতিকায় বৃত্রাসুর ভূলুণ্ঠিত হলো। বিনাশ হলো বৃত্রাসুরের। দেবলোকে স্বস্তি ফিরে এল।
[সমাপ্ত]

কে তুমি তেজস্বিনি!

অনীতা দত্ত

এস মা সারদা নিশান্ত কুহরে সুষমা ভরে
ঝরা শেফালীর সুরভি-সিক্ত অন্তরে
হৃদয়গুহায় দুর্জ্ঞেয় রাত ভেঙেছে ক্ষণিক লহমায়
নিগূঢ় নিহিত নিষুপ্ত প্রাণ,
জাগে উষার উজান রোশনায়
শৃঙ্খলমুক্ত মেঘ শুভ্র-মনোরথে
ভেসে যায় দূরান্তর
পলকে মুহ্যমান পৃথিবীর একী রূপান্তর!
দিগন্তবিসারী প্রগাঢ় নীল প্রশান্ত আকাশ
উত্তাল কাশফুলে মাতে উন্মনা হিমেল বাতাস
কে তুমি তেজস্বিনি! প্রকৃতিজননী মাগো?
তোমাতে লুপ্ত বিষাদ-আঁধার, বিশাল অন্তরাল
শ্যাম সমারোহে বিধৃত জ্যোতি
বুঝি স্বর্ণাভ ইন্দ্রজাল!
প্রত্যূষে মিলায় রাত সন্ধ্যায় দিনের শেষ
নিত্য নিসর্গ প্রেমে চেতনার সন্নিবেশ
এই চরমনিষিক্ত সন্ধিক্ষণ শ্রদ্ধার জাগরণ
শরতের অনাবিল অন্তরিক্ষেই পাই অনিমেষ!
প্রতি মানবের আত্মধ্যানে পূর্ণ প্রাণে
সতত উদ্ভাসিতা,
দুঃখ যাতনা প্রেম অনুরাগ সবই তোমার রূপ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নৃত্যে তুমি বিশ্বে ছন্দ অনুষ্টুপ
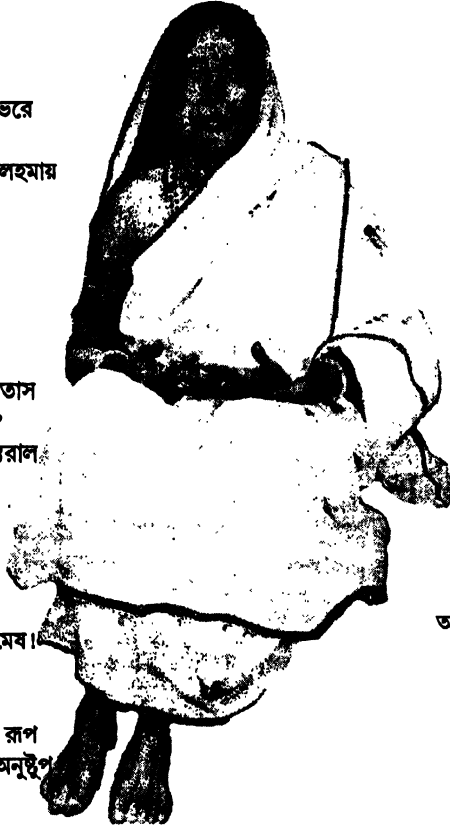
সারদা-সরস্বতী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

শ্বেত শতদল ফোটে
মানসের নীলকান্ত নীরে,
শুভ্র হংস ভেসে আছে
কার চরণের প্রতীক্ষায়?
নামে দেবী সরস্বতী
ত্রিলোকের বাঞ্ছিত প্রতিমা,
জ্ঞানের আলোকস্পর্শে
বিভাসিত দিক দেশ কাল।
চরণ ধারণ করে
জ্যোতির্ময় সম্বুদ্ধ মরাল,
শুদ্ধ হৃদি-শ্বেতপদ্মে
তোমার কাঙ্ক্ষিত অধিষ্ঠান।
কণ্ঠে দোলে জপমালা
মুক্তা গাঁথা অক্ষর লহরী,
মহামন্ত্রধ্বনি বাজে
আকাশে বাতাসে জলে স্থলে।
কী করুণা আঁখিপাতে
সহজ জ্ঞানের প্রস্রবণ,
মুছে দেয় অন্ধকার
কী মধুর জ্যোতি-উদ্ভাসন!

সারদা ষোড়শী

নমিতা দত্ত

ললিতার লাবণ্যে মুগ্ধ চরাচর,
বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বপালিকা যে তুমি যুগনদ্ধ উমা-মহেশ্বর।
সর্বব্যাপিনী জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়ী বিশ্বভূতা বিশ্বাতীতা মাগো,
চৈতন্যের ঊর্ধ্বস্রোতা তুমি নিরন্তর।

কালীরূপে নৃত্যপরা চরণে মহাকাল
তমোনাশী অপরূপা, সৃষ্টিলীলায় বিভোর।
সহস্রকমলদলে বিরাজমানা মাগো
ষোড়শীরূপে কর সৃজন পালন সংহার।
তোমারই অনুগত সর্বদেব, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র ও শঙ্কর।

সারদা-রামকৃষ্ণের লীলার চিত্র চির-চমৎকার।
মানবী তনুতে জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের চিন্ময় আধার।
মাতৃভাব প্রচারিতে রামকৃষ্ণ হন অবতার।
কালী হয়ে কালী পুজে এ-তত্ত্ব বোঝা বড় ভার!

মানবী দেহেতে যিনি শ্রীশ্রীমা সারদা,
তিনি সতী, যশোধরা, সীতা আর রাধা,
কালী, বগলা, সরস্বতী, অভয়া, বরদা।
আজ তিনি লোকাতীতা, ধ্যানগম্যা জগতের পার,
মহাকাশে মহাবিশ্বে মহামাতা আমা সবাকার।

আঁধারের কপাট দাও গো খুলে

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

তখন অপরাহ্ণ...
পশ্চিম দিগ্‌বলয়ে আবির ছড়িয়ে
অস্তাচলগামী সূর্য অসামান্য...
আকাশ আবৃত গেরুয়া বসনে।
তিনি হেঁটে চলেছেন অবগুণ্ঠিত ক্লান্ত দিবাবসানে
তাঁর সর্বাঙ্গে প্রণামের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে গোধূলির
সোনালি আভা...
ধীর পদব্রজে চলেছেন তিনি...
পল্লীর পথ পবিত্র তাঁর পঙ্কজপদরজে।

অনুবর্তী শিবরাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পথমাঝে।
—কী হলো বাছা, সঙ্গী না হলে যেতে পারি না যে!
—আগে প্রশ্নের জবাব দাও, নইলে যাব না সঙ্গে—
কে তুমি? কী তোমার আসল পরিচয়? কোন্ অনুষঙ্গে
কী খেলা খেলিছ সবা সনে মর্তের আলয়ে?
—আমি তোর খুড়িমা... চলে আয়, বেলা যে যায় বয়ে।
—এই যদি তোমার পরিচয়, যাও তবে, ছুই দেখা যায়
জয়রামবাটী—আমি যাব না কিন্তু, শুধাব না আর কিছু,
কাড়ব না রা-টি।
—রোজই তো আমায় দেখিস বাপু! আমি সেই খুড়িমা।
জবাব দিলেন তিনি, করুণার সুধাহাস্য-মধুরিমা!
শিবরাম তথাপি নিশ্চল—ঐ তো জয়রামবাটী...
একটুও নয় দূরে, চেনো সব... চেনা পথ—
ধুলো ওড়ে গোরুর খুরে খুরে।
—আমি সত্যি তোর খুড়িমা... চলে আয় পাগল ছেলে!
—এইটুকু পরিচয়? যাও একা, পৌঁছবে বাড়ি পড়ন্ত বিকেলে।
—উদ্ভট খেয়াল কী যে! শোন্ তবে শিবরাম,
লোকে আমায় বলে 'কালী'!
—লোকে বলে তা আমিও জানি, দেয় তোমা পুজার ডালি...
নিজমুখে বল মোরে কে তুমি! কর তিন সত্যি!
—সড়কের মাঝে কী যে করিস বিপত্তি...
হ্যাঁ রে তাই, সত্যি...সত্যি...সত্যি, আমিই কালী-সারদা!

ধন্য আমি জেনেছি তোমারে বরদা!
বুক ভরে যায় শিবরামের—হৃদয় মন্দ্রিত স্পন্দিত অট্টরোলে
হাজার বছরের অন্ধকার মনে
দেশলাই কাঠি দপ্ করে ওঠে জ্বলে।

মায়ের আঁচল

দীপ্তিকুমার শীল

মাগো, তোমার পানে তাকাই যখন
মুগ্ধ হয়ে শুনি তখন,
বলছ তুমি : মলয় বাতাস বইছে যেথায়
আমার আঁচলখানি উড়ছে সেথায়,
দাঁড়া এসে সেই আঁচলছায়ায়,
আমার বাতাস লাগুক তোর গায়।
ধূলি-ঝড় উড়ছে দেখে
ভয় পাস না বাছা,
আমার আঁচল আঁকড়ে ধর,
মরণ পাবে সাজা।
ব্রহ্মশাপেও ভয় পাবি না,
আমি যে ব্রহ্মময়ী;
আমার আঁচল ধরে যে তুই
হবি জগজ্জয়ী।

প্রাণের উত্তাপ দেয় মাটির প্রদীপ

শান্তি সিংহ

সোনালি ধানশিষের আনম্র শোভায়
লক্ষ্মীরূপিণীরূপে তুমি জাগো
ভোরের শুকতারার হাসি-ঝরানো স্নিগ্ধতায়
তুমি আজো মমতারূপিণী
খরা-জরা-বানভাসির দেশে বরদামূর্তিতে তুমি জাগো—
দুঃখ-জ্বালায় অসহায় নরনারী তোমায় ডাকে—সন্তাপহারিণী!

স্বার্থভাবনা আর ভেদবুদ্ধির বিষে সারা পৃথিবী আজ আবিল
হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর ভোগবাদে
গ্রাম-শহরের মানুষ আজ দিক্‌হারা
সেবা আর প্রচারের নামে এত আলো,
তবু মানুষ ভেসে যায় অতল আঁধারে!

বিশ্বায়নের দ্রুততায় পোকার মতন
কিলবিল করছে অসংখ্য মানুষ
তাদের চেতনায় 'মান' আর 'হুঁশ' ফেরাতে
আলোকরূপিণী হয়ে জাগো
উন্মত্ত আঁধার-স্রোতে বিপন্ন মানুষ ক্রমশ বুঝতেই পারে—
রংমশাল আর বিজলিবাতির চেয়ে
প্রাণের উত্তাপ দেয় মাটির প্রদীপ।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিপ্রসঙ্গে স্বামী অরূপানন্দ

স্বামী সত্তানন্দ

স্বামী অরূপানন্দ (রাসবিহারী) মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সেবকরূপে দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন। সেই সূত্রে গোলাপ-মা ও যোগীন-মা প্রমুখ শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী-সেবিকাদের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বহু কথা তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিজের মুখ থেকে বা গোলাপ-মা এবং যোগীন-মা প্রমুখের মুখ থেকে সাক্ষাৎভাবে শুনেছিলেন। জয়রামবাটী, উদ্বোধন এবং বারাণসীতে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে অন্তরঙ্গ ও মূল্যবান প্রত্যক্ষ সংলাপ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে তাঁর সুদীর্ঘ স্মৃতিনিবন্ধে বিধৃত রয়েছে। তার বাইরেও তাঁর স্মৃতিতে আরো অনেক ঘটনা ও কথা রক্ষিত ছিল। স্থানাভাবে এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের বলে সেগুলি 'মায়ের কথা'য় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বর্তমান নিবন্ধের লেখক স্বামী সত্তানন্দ স্বামী অরূপানন্দের স্নেহভাজন হওয়ার সুবাদে তাঁর মুখে শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে সেই অপ্রকাশিত ঘটনা ও কথার কিছু কিছু শুনেছিলেন। বর্তমান নিবন্ধে তিনি তেমন কয়েকটি অপ্রকাশিত কথা ও ঘটনা উপস্থাপন করেছেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং মঠ-মিশনের প্রবীণ ও বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী মুমুক্ষানন্দের সৌজন্যে আমরা বর্তমান নিবন্ধটি পেয়েছি। এসম্পর্কে সম্পাদককে লেখা মুমুক্ষানন্দজীর পত্রটি পাঠকদের সাহায্য করতে পারে ভেবে তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো। তাছাড়া মুমুক্ষানন্দজীর চিঠি থেকে পাঠক আলোচ্য স্মৃতিপ্রসঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত হবেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

।। শ্রীরামকৃষ্ণঃ ।।

Tel. Office : Lohaghat

Advaita Ashrama

(A branch of the Ramakrishna Math, Belur)
P.O. MAYAVATI, VIA LOHAGHAT
DIST. PITHORAGARH, U.P., PIN 262 524

19-6-1999

প্রিয় পূর্ণাত্মানন্দ,

... পূজনীয় সত্যেন মহারাজ (স্বামী সত্তানন্দজী) কয়েক সপ্তাহ এখানে ছিলেন, আলমোড়া আশ্রম থেকে এসেছিলেন। তিনি স্বামী অরূপানন্দজীর স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর কাছে সত্তানন্দজী কিছু শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি ও প্রসঙ্গ শুনেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি এযাবৎ অপ্রকাশিত কথাও রয়েছে। আমার একাধিকবার পীড়াপীড়ির পর তিনি তা লিপিবদ্ধ করে দেন। তাঁর মূল লেখার একটি fair copy (আমার দ্বারা ঈষৎ সম্পাদিত) পাঠালাম। আমার মনে হয়, এটি 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হলে ভক্তদের তথা রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের কল্যাণে আসবে।

মোটামুটি ভাল আছি। এখানে অন্যান্যদেরও মোটামুটি কুশল।

ভালবাসা শুভেচ্ছা জেনো।

প্রতি :
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক, 'উদ্বোধন'
কলকাতা-৩

ইতি
তোমাদের
মুমুক্ষানন্দ

১৯৪৮-১৯৪৯ সালের কথা। আমি তখন কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ব্রহ্মচারী কর্মিরূপে রয়েছি। একদিন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে গিয়েছি বিকেলের পাঠের সময়। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-র দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বামী অরূপানন্দজীর (রাসবিহারী মহারাজের) স্মৃতিকথা পড়া হচ্ছিল। মাকে তিনি বলছেন : "মা, এই অনন্ত সৃষ্টিতে কোথায় কি হচ্ছে কে জানে? এই যে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র, ওতে কোন জীবের বাস আছে কিনা কে বলবে?" উত্তরে মা বললেন : "মায়ার রাজ্যে সর্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। ওসব গ্রহনক্ষত্রে কোন জীবের বাস নেই।" (১৩৪৩ সং, পৃঃ ৭৮) কথাটা পড়ামাত্র আমার মনে হলো—এ তো সাঙ্ঘাতিক কথা! শ্রীশ্রীমা নিজের ঈশ্বরীয় স্বরূপকে তো প্রকাশ করেই দিলেন!

পাঠের পরে উঠান দিয়ে চলে আসছি। দেখি পূজনীয় রাসবিহারী মহারাজ শ্রীমন্দিরের বিপরীত দিকে, দ্বিতল বাড়ির নিচের বারান্দায় (রান্নাঘরের তরকারি কাটার জায়গায়) মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে আছেন। আমি তাঁর পাশে বসে পড়লাম, বললাম : "মহারাজ, আপনি তো সাঙ্ঘাতিক কথা লিপিবদ্ধ করেছেন আপনার লেখার মধ্যে।" তিনি জানতে চাইলেন আমি কোন্ অংশটার কথা বলছি। আমি তখন বললাম : "মা বলছেন, 'মায়ার রাজ্যে সর্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে।' সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার বলছেন, 'ওসব গ্রহনক্ষত্রে কোন জীবের বাস নেই।' " শুনেই রাসবিহারী মহারাজ বললেন : "তাহলে বোঝ, তিনি কোন্ authority-তে (ক্ষমতাবলে) ওকথা বলতে পারলেন। একথার দ্বারা নিজেকেই (নিজের সর্বজ্ঞত্ব ও ঈশ্বরস্বরূপত্ব) প্রকাশ করে ফেললেন কিনা! এজন্য তোমাকে পূর্বে বলেছি, এখনো বলি, আমার diary-টি খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে, ভাসাভাসা নয়। তাহলে দেখতে পাবে, অনেক স্থলেই আমার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা নিজেকে অতি সহজ উত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করে ফেলেছেন। যেমন একস্থানে বলেছেন : "এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ, হয়তো জগন্মাতা ভেবে এসেছ।" (ঐ, পৃঃ ৪) বাস্তবিক আমি মনে মনে ঠিক ঐভাব নিয়েই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। আরেকস্থলে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'সূক্ষ্মশরীরে আবার আমাদের দেখা হবে', (ঐ, পৃঃ ৬) অর্থাৎ দেহান্তে শ্রীমা ও আমার আবার দেখা হবে।"

সেদিন রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে আরো কয়েকটি কথা হয়। আমি বললাম : "মহারাজ, আপনি কত ভাগ্যবান! মা আপনার সঙ্গে কত সহজে আপনজনের মতো কথা বলেছেন, কাছে টেনে নিয়েছেন; আপনার প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে কত স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে ফেলেছেন। শ্রীশ্রীমা নিজেই বলছেন, 'বাবা, তোমার সঙ্গে আমার যেমন খোলাখুলি কথা হয়েছে, এমন আর কারো সঙ্গে হয়নি।' (ঐ, পৃঃ ১২) ইত্যাদি। তাই আপনি অত 'মা' 'মা' করেন। আমাদের তো তেমন ভাগ্য হয়নি। কত পরে আমরা এসেছি। তাঁকে দর্শনও হয়নি, তাঁর স্নেহও পাইনি। আমাদের কেমন করে তাঁকে নিজের মা বলে মনে হবে?" উত্তরে রাসবিহারী মহারাজ বললেন : "তা তুমি অভিমান করে ওরূপ যাই বল না কেন, আমি কিন্তু কতবার

মাকে বলতে শুনেছি, 'যারা পরে আসবে তারাও আমার সন্তান, দেখা না হলেও।' "

এরপর আমি বললাম : "আচ্ছা মহারাজ, আপনাকে যখনি বলি, কিছু মায়ের কথা বলুন, আপনি কেবলি বলেন, 'আমার কাছে বলবার মতো যাকিছু ছিল আমি আমার স্মৃতিকথায় (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ) লিখে দিয়েছি। তা পড়েই দেখ না, তাহলেই জানতে পারবে।' তা আপনি সবই কি সেখানে লিখেছেন? কিছুই কি আপনার কাছে থেকে যায়নি?" উত্তরে তিনি বললেন : "যা আছে সেসব personal (ব্যক্তিগত), তা বলা ঠিক নয়।" আমি তখন অভিমান করেই বললাম : "বেশ, তাহলে ওসকল গোপনীয় কথা আপনার কাছেই সিন্দুকে চিরকাল বদ্ধ জিনিসের মতো থেকে যাক। আর শরীর তো একদিন যাবেই, তখন আমরা যথানিয়মে ঐ শরীর মণিকর্ণিকায় নিয়ে গিয়ে পাথরে বেঁধে মা গঙ্গার বুকে ডুবিয়ে দিয়ে আসব।[১] আর ফল হবে এই যে, ঐসকম মহামূল্য গোপনীয় তথ্যগুলিও মা গঙ্গার কোলেই চলে যাবে এবং চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে। পৃথিবীর কারো আর জানবার সুযোগ থাকবে না।" আমার কথা শুনে তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে কি জানি কি ভেবে বললেন : "আচ্ছা, একটা ঘটনা বলতে পারি, যদি কথা দাও কারো কাছে বলবে না।" উত্তরে বললাম : "আচ্ছা, আপনার জীবৎকালে কাউকেও বলব না।" এই শুনে তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন : "জয়রামবাটীতে রয়েছি। মায়ের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। মা তখন তাঁর পুরনো বাড়িতে (প্রসন্ন-মামার বাড়িতে) বাস করছেন। আমি ও ব্রহ্মচারী হেমেন্দ্র নতুন বাড়ির কাজের দেখাশোনা করছি। এমন সময়ে একদিন মামাদের মধ্যে একজন (নাম মনে নেই) এসে আমাদের সঙ্গে বৈষয়িক নানা কথা তুলে তর্ক-বিতর্কও ঝগড়া শুরু করে দিলেন। যতটা মনে পড়ছে, তিনি বললেন, 'দিদিকে (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমাকে) তোমরা সবকিছু দিচ্ছ আর আমাদের তোমরা ঠকাচ্ছ।' এজাতীয় কিছু কথা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। প্রায়ই মাঝে মাঝে তাঁরা এজাতীয় কথা বলতেন। সেদিন একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় আমি বেশ বিরক্ত বোধ করলাম এবং একটু উত্তেজিত হয়েই সোজা মার কাছে চলে গেলাম। মা তখন প্রসন্ন-মামার বাড়ির সামনে বারান্দায় উঠানের দিকে মুখ করে বাঁহাতে বারান্দার খুঁটিটি ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি উত্তেজিতভাবে গিয়েই মাকে বললাম, 'এত ঝগড়া-ঝাঁটি, অশান্তির মধ্যে আমি কাজ করতে পারব না।' কথাটুকু বলেই আমি সামনের দিকে উঠানের পাশের ছোট চালাঘরটির দাওয়ায় বসে পড়লাম। মা কিন্তু বারান্দাতেই ঐভাবেই দাঁড়িয়েই থাকলেন এবং আমার কথা শুনে অতি শান্তভাবেই বললেন, 'তা না পার, না পারবে। এখানে কিন্তু এরকম।' কথাটি বলেই মা সামনের দিকে শূন্যদৃষ্টির মতো তাকিয়ে রইলেন। তক্ষুণি আমি দেখলাম, মায়ের দণ্ডায়মান সম্পূর্ণ শরীর হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল এবং শরীরের চারদিকে একটা 'হ্যালো'র (halo) মতো দেখা গেল অতি অল্পক্ষণের জন্য। মা কিন্তু আর কোন কথা বললেন না। এদিকে ঐ দৃশ্য দর্শনের ফলে আমার সেই উত্তেজিতভাব নিমেষে কোথায় চলে গেল এবং আমার ভিতরের ভাবের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় মনে হলো—কার কাজ আমি করতে পারব না বললাম? সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ উদ্যম ও শ্রদ্ধা নিয়ে আবার কাজে যোগ দিলাম।"

এতক্ষণ আমি মহারাজের কথা ও বর্ণনাটি খুব মন দিয়ে অবাক হয়ে শুনছিলাম। কথা শেষ হতেই বললাম : "রাসদা (আমি ঐভাবেই তাঁকে সম্বোধন করতাম), এমন একটি মূল্যবান কথা আপনি নিজের লেখায় উল্লেখ করলেন না? কারো কোনদিন এটি জানবার সুযোগ রইল না।" উত্তরে তিনি বললেন : "তুই পাগল হয়েছিস? এসব কথা কখনো লিখতে আছে? কেউ একথা বিশ্বাস করবে? অথচ আমি তো দিনের বেলাতেই এই চোখ দিয়ে স্পষ্ট দেখেছি। খবরদার! তুই কাউকেই এইটি বলিসনি।" আমি এটি কাউকেও বলিনি যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৯৫৭-তে তাঁর শরীর যাওয়ারও বহু পরে কথাপ্রসঙ্গে দু-তিন স্থানে মাত্র বলেছি।

রাসবিহারী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দুটি ফটো সম্বন্ধেও আমায় কিছু কথা বলেছিলেন। ইতিপূর্বেই আমি তা প্রকাশ করেছি ('নিবোধত', ১২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৪০৫) বলে তার পুনরুল্লেখ করলাম না। ❑

১ ঐভাবে কাশীধামে সাধুদের মৃতদেহের সলিল সমাধি দেওয়া হয়।

চিরন্তনী মা সারদা

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

কথামুখ

মাতৃতীর্থ জয়রামবাটী। ভক্তভৈরব গিরিশ প্রশ্ন করছেন মা সারদাকে : "তুমি কিরকম মা?" মা কিছুমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিলেন : **"আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।"**[১]

সত্যি, মা সারদা বিশ্বজননী। তিনি সকল মায়ের অন্তরে বিরাজমানা সর্বব্যাপিনী মাতৃশক্তি। তিনি 'নিখিলমাতৃহৃদয়-সাগরমন্থনসুধামুরতি'। এই যাঁর পরিচয়, তিনি যে নারীজাতি তথা মাতৃজাতির মুক্তি ও স্বাধিকারের জন্য এবং নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবেন, এতে আর আশ্চর্য কি। তবু শান্তশ্রী, লজ্জাপটাবৃতা মা—যাঁর জীবন নিবেদিতার ভাষায় "একটি দীর্ঘ নীরব প্রার্থনা"—তাঁর এই প্রতিবাদমুখর কঠোরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় নয় কি?

শান্ত সমাহিত শুচিশুভ্র একটি মহাজীবনের অপর নাম—মা সারদা। দারিদ্র্য, অশান্তি, হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-দীর্ণ এই পৃথিবীতে মায়ের অপূর্ব সহনশীলতা ও সংযমপূত জীবনই তাঁর অমর বাণী : **"যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"** সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক রয়েছে, কিন্তু সকলেই মায়ের সন্তান। তাই দেখি, করুণাময়ী তাঁর অশেষ করুণায় আর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে মাতৃস্নেহের অফুরান ধারায় বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় গম্ভীর স্বরে ফুঁসেও উঠেছেন। **"যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন।"**[২] ধৈর্য ও বিবিক্তির পরীক্ষায় মা সসম্মানে সমুত্তীর্ণা। ক্রোধকে জয় করছেন তিনি অক্রোধ দিয়ে, হিংসাকে জয় করছেন অহিংসা দিয়ে, স্বার্থবুদ্ধিকে পরাজিত করছেন নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে। ভাইদের স্বার্থবুদ্ধি, ভাইবৌদের পরস্পর হিংসা, রাধুর আবদার, ছোটমামীর পাগলামি—এর মধ্যেও শান্তভাবে সংসারধর্মে আদর্শরূপিণী মা অবিচল দাঁড়িয়ে থেকেছেন। নহবতের 'খাঁচা'তুল্য ছোট্ট ঘরে, শ্যামপুকুরের বাড়িতে, কাশীপুর বাগানে, জয়রামবাটীর গ্রাম্য পরিবেশে, কলকাতার শহুরে পরিমণ্ডলে—সর্বত্রই মা অগ্রগামী অভিযাত্রীর মহৎ পরাকাষ্ঠায় অধিষ্ঠিতা। আবার সাধু-অসাধু, সৎ-অসৎ সকলেরই মা তিনি। বলেছেন : **"আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।"**[৩]

ধ্যানের ধন এই জগজ্জননীর বিরাটত্ব সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তাই স্বভাবতই বাগবিস্তারে মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। অজ্ঞতাবশত স্থূল চিন্তার স্পর্শ যদি লাগে, যদি এই সামান্য বোধ-উপলব্ধির আলোকে তাঁর অলোকসামান্য জীবনালেখ্য ঠিক ঠিক প্রতিভাত না হয়ে ওঠে। তাই এই ধন্দ, তাই এই সংশয়। ফের মনে আসে মায়ের কথা : **"ফুল নাড়তে চাড়তে যেমন ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।"** মা স্বয়ং ভগবতী। তাই প্রার্থনা, মা যেন কৃপাবর্ষণ করে এই দুরূহ কাজটি সঠিকভাবে করিয়ে নেন।

আধুনিকতা, নারীমুক্তি ও শ্রীশ্রীমা

'আধুনিক' কথাটির এক বৃহত্তর ব্যঞ্জনা আছে। নিজেকে 'আধুনিক' বলে প্রচার করতে আজ আমরা সবাই উৎসুক। কিন্তু 'আধুনিকতা'র নামে ইউরোপীয় বহির্মুখী জীবনযাত্রার আপাত বিলাসবৈভবকে বা তার অন্ধ অনুকরণকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু চেতনার গভীরে শক্তির উদ্বোধনই হলো আধুনিকতার জরুরী শর্ত। শুধু বহিঃপ্রকৃতি নয়, অন্তঃপ্রকৃতির বিজয়ে মানুষের দেবত্ব পরিস্ফুট হয়। আধুনিক মানুষ জেগে ওঠে দেশ-কাল-পাত্রের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে তার মহনীয়তায়, তার পূর্ণতায়। আর মা সারদা এই অর্থে মহত্তমা আধুনিকা নারী। মহৎ মানবতা, বিশ্বৈক্যবোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব, জীবনরসিকতা, বিরুদ্ধ পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা, নারীমুক্তি সম্পর্কে ভাবনা, ব্যক্তিস্বাধিকারের স্বীকৃতি, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কার—আধুনিকতার এই নানা বৈশিষ্ট্য মায়ের জীবনাচরণে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

প্রথমে আমরা মায়ের নারীমুক্তি সম্পর্কে ভাবনার কথাই আলোচনা করব।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, নারীদের অবমাননা ও অমর্যাদাই ভারতের অবনতির একটি বড় কারণ। আর মা এসেছেন সেই নারীশক্তিকে জাগাতে। আবার ভারত শত শত

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ১৭০
২ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ৮ম সং, পৃঃ ২০৩
৩ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪০৪

গার্গী, মৈত্রেয়ীর জন্ম দেবে। মাতৃশক্তির বিকাশেই জাতির সমূহ উন্নতি। তাই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক—সর্ব বিষয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীজাতিকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। আর রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অগ্রণী নেত্রী মা তাঁর কথায় ও কাজে নারীমুক্তির পথই দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যেমন—

(১) মা চাইতেন, লেখাপড়া শিখে মেয়েরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও মেয়েদের প্রয়োজন। তাই এক স্ত্রী-ভক্ত মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলে মা বলছেন: **"বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"**[৪]

(২) বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন মা। নিবেদিতা স্কুলের দুটি মাদ্রাজী বয়স্ক কুমারী মেয়েকে দেখে মা একসঙ্গে খুশি ও দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন: "আহা, তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে! আর আমাদের! **এখানে পোড়া দেশের লোকে আট বছরের হতে না হতেই বলে, 'পর গোত্র করে দাও, পর গোত্র করে দাও!'** আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হতো, তাহলে কি এত দুঃখ-দুর্দশা হতো?"[৫]

(৩) সংযমহীন দাম্পত্যজীবন মা সহ্য করতে পারতেন না। একদিন বলছেন: "অনেকগুলি ছেলেপিলে হয় যার, ঠাকুর তাকে গ্রহণ করতেন না। একটা দেহ হতে পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে, ওরা কি মানুষ! **সংযম নেই, কিছু নেই—যেন পশু!**"[৬]

(৪) জাতপাতের বিরুদ্ধে মায়ের ছিল এক বৈপ্লবিক ভূমিকা। ব্রাহ্মণঘরের বিধবা হয়েও তিনি কতবার অব্রাহ্মণের দেওয়া এবং রান্না করা অন্ন গ্রহণ করেছেন। জন্মগত অর্থে নয়, গুণ ও চরিত্রগত অর্থেই সকলকে 'ব্রাহ্মণত্বে' তোলার সাধনা রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের লক্ষ্য। তাই মা ভাইঝি রাধুকে নির্দেশ করছেন বৈদ্য শ্যামাদাস কবিরাজকে প্রণাম করতে। বলছেন: "তা করবে না? কত বড় বিজ্ঞ! ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য!"[৭] রাধুকে তিনি ভানুপিসি, ক্ষীরোদবালা ও অন্যান্য অব্রাহ্মণ ভক্তদেরও প্রণাম করতে বলতেন। 'যুগী'র ছেলে পীতাম্বর নাথ। সে হীন জাতের লোক। মায়ের কাছে আসতে তাই তার সঙ্কোচ। মা এককথায় তার হীনম্মন্যতা ভেঙে দিয়েছেন। **"কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে এসে বস।"**[৮] মহাষ্টমীর দিন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তাজপুরের এক বাগদী ভক্ত। তাকে ঘরে ডেকে তার অঞ্জলি নিয়েছেন মা। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভক্তকে একসঙ্গে একপাত্রে মুড়ি-জিলিপি খাইয়েছিলেন তিনি, আর এই দৃশ্য দেখে তাঁর মুখ গভীর তৃপ্তি ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

জাতপাত তো দূরের কথা, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তুঁতে ডাকাত আমজাদ। তাকে সযত্নে বসিয়ে খাবার দিয়েছেন মা, এঁটোও পরিষ্কার করেছেন নিজ হাতে। মাতৃত্ব তথা মানবতা-বোধের উত্তুঙ্গ শিখরে অবলীলায় উঠে তিনি উচ্চারণ করেছেন: **"আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।"**

বিদেশিনী খ্রীস্টান মহিলারা মায়ের কাছে আপন মেয়ের মতো ছিলেন। নিবেদিতা প্রমুখের সঙ্গে মা খেতেন একাসনে বসে। একশ বছর আগে এক গ্রাম্য সাধারণ পরিবারের নারীর পক্ষে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা!

জাতিভেদপ্রথার বিধিনিষেধ না মানার জন্য মাকে অর্থদণ্ডও দিতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি নিজ মহৎ জীবনবোধ থেকে বিচ্যুত হননি।

(৫) আজকের দিনে আমাদের দেশে নারীশিক্ষারও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এখনো আমাদের মায়েরা অন্ধ কুসংস্কার, শুচিবাই, যুক্তিহীন প্রথানুগত্যের শিকার হচ্ছেন। অবশ্য পুরুষদেরও সংস্কারমুক্ত মন আশানুরূপ দেখা যায় কি? আমরা মুখে বলি—'বিজ্ঞান', কিন্তু বহু কাজে ও আচরণে আমরা অন্ধ কুসংস্কারকেই মেনে নিই। মাদুলি, কবচ যেমন নির্দ্বিধায় বাঁধি, গ্রহের প্রভাব কাটাতে পান্না-পোখরাজ-চুনীর আঙটি পরি, আবার ছুঁৎমার্গেরও শিকার হই। আর শুচিবাই তো মা-মেয়েদের প্রায়ই লেগে থাকে। কিন্তু মা মনে করতেন, শুচিবাই এক মারাত্মক ব্যাধি। নলিনী-দির কাপড়ে 'কাক প্রস্রাব' করেছে বলে তিনি স্নান করে এলে মা বলছেন: "কাকে প্রস্রাব করে—এমন কথা কখনো শুনিনি। শুচিবাই! মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না।... আর শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে।"[৯] জয়রামবাটীতে রাঁধুনি ব্রাহ্মণী রাতে কুকুর ছুঁয়ে এসে স্নান করতে চাইলে মা নিষেধ করলেন। হাত-পা ধুয়ে গঙ্গাজলে পবিত্র হতে বললেন। তাতেও যখন তার মন উঠল না, তখন মা বললেন: "তবে আমাকে স্পর্শ কর।" এমনি করে হৃদয়ে হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিতেন মা। বলতেন: **"মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।"**

(৬) মায়ের জীবনে অপরের ভাব বুঝবার মতো পরম উদারতা ছিল। তিনি কারো ভাব নষ্ট করতে চাইতেন না। ব্যক্তিস্বাধিকারের স্বীকৃতি আজ পারিবারিক জীবনেও এক জরুরী স্বীকৃতি। ত্যাগের মহিমার সঙ্গে এই ব্যক্তিস্বাধিকারের যথোপযুক্ত সামঞ্জস্যবিধানই দাম্পত্য জীবনে সুখশান্তির নিদান। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে। শ্রীহট্টের ভক্ত ক্ষীরোদবালা রায় এসেছেন আত্মীয়া ডাক্তার প্রমদা দত্তকে নিয়ে। প্রসাদ বিতরণের সময় দেখা গেল, মা সকলকে প্রসাদ

---

৪ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৭ ৫ ঐ, পৃঃ ৫০৭ ৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ৭১-৭২
৭ ঐ, পৃঃ ১১৮ ৮ ঐ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৬৬ ৯ ঐ, পৃঃ ৫০৩

দিলেন, কিন্তু ডাক্তারকে দিলেন না। প্রমদা দেবী কারণ জানতে চাইলে মা বললেন : "তুমি যে ব্রাহ্ম, তুমি ইচ্ছা করে না নিলে কি করে দিই?"[১০]

(৭) জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বালিকার মতো কৌতূহল ছিল মায়ের চরিত্রের আরেকটি দিক। থিয়েটার দেখতে মা খুব ভালবাসতেন। গান শুনতে, যাত্রাগান শুনতে, রসালাপ, রঙ্গরসিকতায়ও মায়ের জুড়ি ছিল না। আধুনিকা নারীর জীবনে এদিকটিও লক্ষণীয়।

(৮) সৌন্দর্যবোধ ছিল মায়ের সহজাত। কোয়ালপাড়ায় ঝড়-বৃষ্টির দিনে চপলা বালিকার মতো তিনি শিল কুড়িয়েছেন। রামেশ্বর দর্শনের পথে মাদ্রাজ মেল থেকে চিল্কা হ্রদ দেখে মা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। ওয়ালটেয়ারের দুপাশে পাহাড়ে অট্টালিকাশ্রেণী দেখে মা বলে ওঠেন : "দেখ দেখ, ঠিক যেন ছবিখানি।" সৌন্দর্যবোধ ও নিসর্গচেতনা জীবনকে মধুময় করে তোলার এক প্রয়োজনীয় উপাদান।

পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকারের দাবি যেমন সমাজকে মেনে নিতে হবে, তেমনি নারীকেও জীবনের অনেক দায়িত্ব সানন্দে স্বীকার করতে হবে। নারী গৃহলক্ষ্মী। "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—গৃহিণীকেই গৃহ বলে। তাই সেবার মনোবৃত্তি নারীর না থাকলে পরিবারের শান্তি-সুখ তথা দেশ ও জাতির সুস্থিতি অসম্ভব। আজকের মা-মেয়েদের আগেকার মতো রান্নাঘরে যেমন আবদ্ধ থাকা চলে না, তেমনি বাইরে কাজ করতে গিয়ে নিজ আদর্শ ভুলে যাওয়াও চলে না। তাই মা দেখালেন একটি আদর্শ গৃহিণীর জীবন। ভারতের চিরন্তন নারী-আদর্শের শেষ প্রতিনিধি তিনি, সেইসঙ্গে নবীন আদর্শের অগ্রদূতের ভূমিকাও তাঁর। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ বলেছেন : "আমাদের মেয়েদের আজ মায়ের জীবনের ছাঁচে জীবন ঢেলে নিতে হবে; আবার সেইসঙ্গে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়েও চলতে হবে।"[১১] মা সেই যুগোপযোগী আদর্শ দেখিয়েছিলেন। সেই আদর্শ শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা জগতের জন্যই প্রয়োজন।

মা প্রাচীন আদর্শগুলির সার্থকতা ও ঐতিহ্যবাহী সুফলতা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি দেখিয়েছেন নতুন প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সামাজিক হিতকারিতা। তাই তিনি সনাতন ভারতীয় আচার-নীতি ও ধর্মজীবনের মূল উপাদানগুলিকে ধরে রেখেও যুগোপযোগী নতুন আদর্শগুলিকে মেনে চলেছিলেন। পুরনো মূল্যবোধের কালসঞ্চিত কুসংস্কার ও গোঁড়ামিকে তিনি বর্জন করেছেন অক্লেশে, আবার নবাগত মূল্যবোধের অন্তঃসারশূন্যতাকেও মেনে নেননি। প্রাচীন এবং নতুন—উভয় আদর্শের যা মঙ্গল-সত্য, তাকেই গ্রহণ করেছেন মা সারদা। প্রাচীন আদর্শের মধ্যে যেগুলি অর্থহীন কুসংস্কার, তাকে যেমন তিনি পরিহার করেছেন, তেমনি আধুনিক নারী-প্রগতির যা অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি তাকেও তিনি বর্জন করে আধুনিক নারীর সামনে নজির দেখিয়েছেন। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

(১) লজ্জা নারীর ভূষণ। পুরচারিণী নারীকে তাই হিন্দুসমাজ চিরদিন লজ্জাশীলা হওয়ার কথা বলেছে। মা সারদা তাঁর জীবনে লজ্জার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তা বলে তিনি গৃহকোণে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেননি। তাঁর সঙ্ঘচালিকার ভূমিকায় তথা বিশ্বমাতৃত্বের ভূমিকায় তিনি তাঁর অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

জয়রামবাটীতে একদিন দুপুরবেলা রাধু, মাকু, নলিনী প্রমুখ নানা কথাবার্তায় খুব হইচই করছেন। লাজলজ্জা বিশেষ মানছেন না। মা বলছেন : "ওকি হচ্ছে তোদের! তোদের একটু লজ্জা-সমীহ নাই? মেয়েদের ওসব বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মেয়েমানুষকে কত সাবধানে চলাফেরা করতে হয়, সম্ভ্রম রেখে চলতে হয়। কথায় বলে—মেয়েদের হাঁটুর কাছে কাপড় উঠলে 'দশ-হাত কাপড়েও ন্যাংটা'। লজ্জা-শরম বজায় রেখে চলতে হয়।" তখন একজন বলছেন : "কেন পিসিমা, ঠাকুর তো বলেছেন, লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়।" মা অমনি বলছেন : "না, না। সে যাঁরা ভগবৎ-প্রেমে পাগল, তাঁদের কথা। আমি বলছি, লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে হয়। যার আছে ভয়, তার হয় জয়—বিশেষ করে মেয়েমানুষের।"[১২]

আরেকটি ঘটনা। সকালবেলা স্বামী ঈশানানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী) বাজার আনার জন্য ফর্দ লিখছেন। মা এক-একটি করে জিনিসের নাম বলছেন। একজন স্ত্রী-ভক্ত পাশ দিয়ে রাধুর ঘরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় অসাবধানতাবশত তাঁর আঁচল মহারাজের পিঠে একটু লেগে যায়। তিনি অবশ্য কিছুই টের পাননি, মা কিন্তু লক্ষ্য করেছিলেন। একটু বিরক্তির সঙ্গে তিনি স্ত্রী-ভক্তটিকে বললেন : "কি গো, ছেলে আমার সামনে বসে লিখছে। ব্যাটাছেলে। তোমার একটু হুঁশ নেই—ওর পিঠে আঁচল লাগিয়ে যাচ্ছ! ওরা ব্রহ্মচারী, তোমরা মেয়েমানুষ, ওদের সমীহ করে চলতে হয়। আঁচলটা মাটিতে ঠেকাও, ওকে প্রণাম কর।" মহারাজ অপ্রস্তুত হলেন, কেননা স্ত্রী-ভক্তটি তাঁর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। মা কথাগুলো গম্ভীরভাবে বললেন, তাতে উপস্থিত মেয়েরা স্তব্ধ হলেন এবং নতুন শিক্ষা লাভ করলেন।[১৩]

উদ্বোধনে রাধু একদিন পায়ে মল বাজিয়ে শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। মা তাঁকে বকেছিলেন।

(২) হিন্দু সধবা নারীর সিঁথিতে সিঁদুর তার চিরন্তন ঐতিহ্য ও পবিত্রতার চিহ্ন। তাই মা এক যুবতী মেয়েকে

---

১০ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০০

১১ ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৯ম সং, পৃঃ ৬৫-৬৬

১২ মাতৃসান্নিধ্যে, পৃঃ ১৬২

১৩ ঐ, পৃঃ ১০৫

সিঁদুর পরতে না দেখে তাকে বকেছিলেন। আরেক স্ত্রী-ভক্ত ঢাকার সুশীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন অনুরূপ একটি প্রসঙ্গ। উদ্বোধনে তিনি প্রসাদ পেতে বসেছেন। মা তাঁকে মাছ দিতে বললেন। সুশীলা দেবী মাছ না খাওয়ার কথা বললে মা অবাক হয়ে বললেন : "সে কি গো, এয়োস্ত্রী মানুষ, মাছ খাবে না! পায়ে আলতা পরনি কেন?" তখন সুশীলা দেবী জানালেন যে, তাঁদের দেশে আলতা পরার চল নেই, শাঁখা-সিঁদুর পরলেই লোকে এয়োস্ত্রী বলে। মা বললেন : "তা হবে, এদেশে শাঁখা, সিঁদুর সখ করে পরে, নোয়া আর আলতাই এয়োস্ত্রীর লক্ষণ।"[১৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীশ্রীমা প্রাচীন ভারতীয় নারী-সংস্কৃতির যাকিছু শিব ও সুন্দর তা এই যুগে তুলে ধরেছেন। আবার পৃথিবীর বর্তমান নারীসমাজের শ্রেষ্ঠ আশা-আকাঙ্ক্ষাও সফল করেছেন। তাই তিনি তৎকালীন রক্ষণশীল প্রথার মধ্যে থেকেও শিক্ষার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছেন, নিজে অনেক বাধা সত্ত্বেও পড়তে শিখেছেন। মেয়েদের সবসময় শিক্ষার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন।

ভারতীয় পরিবারকেন্দ্রিক সমাজধারায় থেকে মা আদর্শ গৃহিণীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। নারীপ্রগতি ও নারীর অধিকারের নামে আত্মিক স্ত্রী-সম্পদ বিসর্জনের অন্ধ-উন্মত্ততা যা অধুনা লক্ষণীয়, মায়ের পূত জীবন তার অতি-প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক। তিনি নারীকে স্বামীর সহধর্মিণীর ভূমিকা পালনে এবং ত্যাগের আদর্শে মহনীয়া হওয়ার পথ দেখিয়েছেন। তার অর্থ এই নয় যে, পুরুষশাসিত সমাজে নারী পুরুষের দ্বারা নিষ্পেষিত হবে, তার অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করবে না! বরং পারিবারিক জীবনে তথা সমাজজীবনে স্ত্রী-পুরুষ দুজন দুজনকেই ভালবাসা তথা আত্মিক বন্ধনে চির-আবদ্ধ রেখে ত্যাগ ও সহ্যের মহিমায় জীবন বাঁধবে। তবেই পরিবার তথা দেশের শান্তি ও মঙ্গল।

নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুক্তমনা শ্রীমা তাই বারংবার প্রতিবাদে ঝলসে উঠেছেন।

নারী-সমস্যা : সামাজিক-পারিবারিক ও শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (১১।৫৪-৫৫) পাই :

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।"

দেবী চণ্ডীরূপিণী মা সারদাও তাই অন্যায়, অপরাধ, অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদ করতে কখনো দ্বিধা করেননি। এপ্রসঙ্গে একটি পারিবারিক নারীনিগ্রহের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। উদ্বোধনে মা সন্ধ্যায় জপে বসেছেন। উলটোদিকে বস্তি। একদিন এই বস্তিতে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ভীষণভাবে প্রহার করছিল। প্রথমে কিল, চড়, পরে লাথি। মারের চোটে মেয়েটি কোলের ছেলেকে নিয়ে উঠানে গড়িয়ে পড়ল। মা আর থাকতে পারলেন না। জপ ফেলে বেরিয়ে এলেন এবং যাঁর কোমল কণ্ঠ একতলা থেকে শোনা যেত না, সেই তিনি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পুরুষটিকে নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করে বললেন : "বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি?" ক্রোধোন্মত্ত লোকটা সেই মাতৃমূর্তি দর্শনমাত্র সাপের মাথায় ধুলোপড়ার মতো মাথা নিচু করে তার স্ত্রীকে ছেড়ে দিল।[১৫]

আরেকটি ঘটনা। মায়ের সেবক ও সান্নিধ্যধন্য ত্যাগী সন্তান স্বামী অপূর্বানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। বাঁকুড়া জেলায় তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে সাধুরা দুর্ভিক্ষ-সেবাকাজ আরম্ভ করেছেন। এই সেবাকার্যে ব্রতী ছিলেন স্বামী অপূর্বানন্দও। মা কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সেবাকাজ কেমন চলছে? তিনি জানালেন, কিভাবে ঘরে ঘরে গিয়ে টিকিট দিয়ে আসা হয়, টিকিট দিয়ে তারা কিভাবে চাল নেয়, মেয়েদের কাপড়-চোপড় দেওয়া হয় ইত্যাদি। তারপর বললেন এক মর্মন্তুদ ঘটনা। একদিন সকালে এক গ্রামে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল, যারা চাল নিচ্ছিল, তারা কেউ বাড়িতে নেই। হয়তো কোথাও কাজে বেরিয়েছে। কাজ পেলে আর চাল দেওয়া হয় না, তাই অপূর্বানন্দজী তাদের খোঁজ করতে বেরলেন। গ্রামের বাইরে এক ধানখেতে ধান রোয়ার কাজ চলছে। সেদিকে এগিয়ে যেতেই দূর থেকে দেখলেন, এক মেয়ে-মুনিষ খেত থেকে উঠে গিয়ে ধানের চারার বোঝার পিছনে হঠাৎ লুকিয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করে জানলেন, গতরাতে ঐ স্ত্রীলোকটির একটি সন্তান হয়েছে। সেই সদ্যপ্রসূত সন্তানকে নিয়ে সে খেতে কাজ করতে এসেছে। সেই সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে ন্যাকড়া জড়িয়ে খেতের ধারে রেখে সে এক-হাঁটু জল-কাদায় ধান রুইছে। খেতের কাজ করছে জানলে মিশন থেকে চাল পাবে না, তাই লুকোবার চেষ্টা করছে। কী নিদারুণ দারিদ্র্যের যন্ত্রণা! কী অবস্থায় পড়লে সদ্যপ্রসূতি মা মাঠে কাজ করতে নামে। অপূর্বানন্দজী তার কাছে গিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন : "না মা, তোমার চাল কাটব না।" সে সাহস পেয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল, বলল : "বাবু, বড় কষ্টে পড়েছি। তাই খেতে কাজ করতে এসেছি।" কাজ করলে সে দু-সের ধান পাবে।

মা ঘটনাটি শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন : "বল কি গো! অমন পোয়াতী মাঠে কাজ করতে এসেছে! অমন অবস্থায় চাল কাটতে আছে? বেশ করেছ বাবা। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করবেন।"

তারপর ঠাকুরের কাছে যেন অভিমান করে মা প্রার্থনা করলেন : "ঠাকুর! তুমি এসব দেখতে পাচ্ছ না?—লোকের

---

১৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), পৃঃ ৩৪১

১৫ ঐ, পৃঃ ৪৫৮

এত দুঃখদুর্দশা! এভাবে মানুষ কি করে! এর একটা বিধান কর।" স্বামী অপূর্বানন্দ লিখছেন : "মায়ের কণ্ঠে কাতর উৎকণ্ঠা এখনো যেন তা কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। মা মূর্তিমতী করুণা—আবেগময়ী প্রার্থনা।"[১৬]

এ হলো দারিদ্র্য-নিপীড়িত সমাজে মাতৃত্বের লাঞ্ছনার চিত্র। মা স্বভাবতই এই লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সোচ্চার। এবার দেখি, একটি রাজনৈতিক নারী-নির্যাতনের কাহিনী শুনে মায়ের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল।

তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে গ্রামবাংলা জুড়ে। স্বদেশী মামলায় যুথবিহার গ্রামের দেবেনবাবুর স্ত্রী ও ভগিনী সিন্ধুবালা দেবীকে (দুজনের নাম এক) গর্ভাবস্থায় বাঁকুড়ার পুলিস কর্তৃপক্ষ বন্দী করে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। মা শুনে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। "বল কি!" বলে তিনি শিউরে উঠেন বললেন : "এটা কি কোম্পানির আদেশ, না পুলিস সাহেবের কেরামতি? নিরাপরাধ স্ত্রীলোকের ওপর এত অত্যাচার মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময় তো কৈ শুনিনি! এ যদি কোম্পানির আদেশ হয়, তবে আর বেশিদিন নয়। এমন কোন ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে দু-চড় দিয়ে মেয়েদুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?" কিছুক্ষণ পরে যখন তাদের ছেড়ে দিয়েছে শুনলেন, তখন অনেকটা শান্ত হয়ে বললেন : "এ-খবর যদি না পেতাম তবে আজ আর ঘুমোতে পারতাম না।"[১৭]

উপসংহার

নারীমুক্তি, নারী-নির্যাতনের সোচ্চার প্রতিবাদ তো শুধু নয়, মা সারদা মানবমুক্তি ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবমনের কাছে এক উজ্জ্বল চন্দ্রমা। তিনি স্বয়ং সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী। স্বামী বিবেকানন্দের আর্ষদৃষ্টি তা সত্যসত্যই প্রত্যক্ষ করেছিল। গুরুভ্রাতাকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন : "মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনো কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। **মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।**"[১৮] আসলে সমন্বয়, সমাহার ও সহযোগিতার বাতাবরণ ব্যষ্টিগত তথা সমষ্টিগত জীবনে গড়ে তুলতে হবে। যথার্থ আধুনিকতার সেখানেই চরিতার্থতা। মায়ের শেষ কথা : **"কারো দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"** ছেলে ধুলোকাদা মাখে, দোষ করে, কিন্তু ধুলোকাদা ঝেড়ে কে তাকে কোলে তুলে নেয়? মা-ই নেন। মা সারদা সেই চিরন্তনী মা। তাঁর মধ্যে একই আধারে মিলিত অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের নিখিলমানব-জননী। ❑

---

১৬ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদিত), ৩য় পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃঃ ৫৪-৫৫
১৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), পৃঃ ২৬৩ ১৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৫৫৬

অনুষ্ঠান-সূচী (মাঘ-ফাল্গুন ১৪০৬)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৬ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২০ জানুয়ারি	২০০০
স্বামী বিবেকানন্দ	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৩ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২৭ জানুয়ারি	২০০০
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২৪ মাঘ	সোমবার	৭ ফেব্রুয়ারি	২০০০
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৬ মাঘ	বুধবার	৯ ফেব্রুয়ারি	২০০০
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	৬ ফাল্গুন	শনিবার	১৯ ফেব্রুয়ারি	২০০০
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২৪ ফাল্গুন	বুধবার	৮ মার্চ	২০০০
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২৮ ফাল্গুন	রবিবার	১২ মার্চ	২০০০

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৭ মাঘ	বৃহস্পতিবার	১০ ফেব্রুয়ারি	২০০০
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২০ ফাল্গুন	শনিবার	৪ মার্চ	২০০০

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

৩, ১৮ মাঘ	সোমবার,	মঙ্গলবার	১৭ জানুয়ারি,	১ ফেব্রুয়ারি	২০০০
৩, ১৮ ফাল্গুন	বুধবার,	বৃহস্পতিবার	১৬ ফেব্রুয়ারি,	২ মার্চ	২০০০

ক্রীড়াজগতে উজ্জ্বল ভারতীয় নারী

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্রের অতলই হোক কিংবা পর্বতচূড়া, একালের নারীর কাছে কোনকিছুই দুর্লঙ্ঘ্য বা, অনতিক্রম্য নয়। সারা বিশ্বের নারীকূলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এদেশের মহিলারাও আজ বড় কিছু করতে, এক উজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করতে দায়বদ্ধ। স্বাধীনতার পর বাহান্ন বছর কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘ কাল পরিক্রমায় ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদরা জাতীয় স্তর থেকে ক্রমশ আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছেন। এরকম সফল ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদের ওপর আলোকপাত করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

একবিংশ শতাব্দীর আসন্ন প্রত্যুষের প্রাক্‌লগ্নে ভারতীয় জনমানসকে আন্দোলিত, আলোড়িত করে দিয়েছেন দুই বঙ্গললনা। '৯৮-এর শেষার্ধে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ এশিয়াডে ট্রাককুইন জ্যোতির্ময়ী সিকদার মহিমান্বিত করেছেন আমাদের ক্রীড়াজগৎকে। ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে দু-দুটি স্বর্ণপদক তুলে নিয়ে তিনি দীর্ঘদিনের অপ্রাপ্তি, হতাশা দূর করেছেন। ৪×৪০০ মিটার রিলে দলের রূপো প্রাপ্তিতেও তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। কমলজিৎ সান্ধু, গীতা জুৎসি, পি. টি. উষা, এম. ডি. ভালসাম্মা, সাইনি আব্রাহামের যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে জ্যোতির্ময়ী আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্সে ভারতের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এবছর জ্যোতির্ময়ীর মতো অসাধারণ কীর্তি তৈরি করেছেন সাঁতারু বুলা চৌধুরী। দীর্ঘ দশ বছর প্রতিযোগিতা-মূলক সাঁতারে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বুলা। একমাত্র সাফ গেমস ছাড়া তিনি বলার মতো পারফরমেন্স কোথাও দেখাতে পারেননি। যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধে পেয়েও অলিম্পিক তো দূর অস্ত, এশিয়াডেও তিনি হতাশ করেছেন। কিন্তু দূরপাল্লার অ্যাডভেঞ্চারমূলক সাঁতারে এই বুলাই হয়ে উঠেছেন জলপরী। '৮৯ আর '৯৯—দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধানে দুবার ইংলিশ চ্যানেল জয় করে বুলা এখন সারা বিশ্বের বিস্ময়। এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসেবে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন তিনি। সামনের বছর যদি চ্যানেল পারাপার করতে পারেন (যে-লক্ষ্যে এবার গিয়েছিলেন), তাহলে বুলা গিনেস বুকে চিরস্থায়ী আসন পেয়ে যাবেন।

এবার ক্রীড়াজগতে গত বাহান্ন বছরে ভারতীয় মহিলাদের সামগ্রিক ভূমিকার পর্যালোচনা করা যাক। এক্ষেত্রে প্রথমেই যাঁর নামটি মনে আসে, তিনি অবশ্যই অদ্বিতীয়া পি. টি. উষা। '৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকে তাঁর আত্মপ্রকাশলগ্নটি অবশ্য মধুর হয়নি। কিন্তু তার পরের ঘটনা তো রূপকথা! '৮৬-তে সিওল এশিয়াডে একাই পাঁচটি সোনা জিতে তিনি এশীয় অ্যাথলেটিক্সে 'মিথ' বনে যান। তাছাড়া এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিট থেকে তিনি অজস্র সোনা জিতেছেন। এই পড়ন্ত বেলায় এখনো এদেশে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাবার কেউ নেই।

কমলজিৎ সান্ধুই প্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি এশিয়াডে প্রথম স্বর্ণবিজয়িনী। '৭০-র ব্যাঙ্কক এশিয়াডে ৪০০ মিটারে তাঁর হাত ধরেই ভিকট্রি পোডিয়ামে ওঠে ভারত। তাঁর আগে অনেকে এশিয়ান গেমসে চমক সৃষ্টি করলেও চূড়ান্ত সাফল্য পাননি। পাঞ্জাবতনয়া কমলজিৎই পরবর্তী ভারতীয় মহিলাদের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ডে সাফল্যের রাস্তা চিনিয়েছেন। গীতা জুৎসি, পি. টি. উষারাও সেকথা স্বীকার করেন। কমলজিতের সাফল্যমণ্ডিত পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা। '৭৮-এর ব্যাঙ্কক এশিয়াডে হরিয়ানার গীতা জুৎসি স্বর্ণমোহিনী হয়ে উঠেছিলেন। উজ্জ্বল ছিলেন অ্যাঞ্জেল মেরি, অনুসূয়া বাঈরাও।

তারপর তো উষার যুগ। তবে উষা ছাড়াও ভালসাম্মা, সাইনি আব্রাহামরা ভারতকে এশিয়াড পদক এনে দিয়েছেন। ভালসাম্মা '৮২-র দিল্লি এশিয়াডে আর সাইনি '৮৬-র সিওল এশিয়াড, দিল্লি ও জাকার্তায় এ. টি. এফ. (এশিয়ান মিট) মিটে মাঝারী পাল্লার দৌড়ে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অনেক দূর। উষা অলিম্পিকে চতুর্থ হয়েছেন, সাইনি সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছেন। আর এবার ব্যাঙ্ককে জ্যোতির পরেই সুনীতা রানী সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। ১৫০০ মিটারে তাঁর অবধারিত সোনা হাতছাড়া হয় ক্ষণিকের অসতর্কতায়।

অ্যাথলেটিক্সের মতো পর্বতারোহণ ও দাবাতেও এদেশের মহিলারা বিশ্বের ক্রীড়া-মানচিত্রে দাগ কাটতে পেরেছেন। বাচেন্দ্রী পাল এদেশের প্রথম মহিলা হিসেবে বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে পা রেখেছিলেন ১৯৮৫-তে। তারপর সন্তোষ যাদব দু-দুবার এভারেস্টে উঠেছেন, যার তুল্য নজির পর্বতারোহণের ইতিহাসে দুর্লভ। এদেশের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে, বিশেষত পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে

বাচেন্দ্রীই পথিকৃত। শুধু এভারেস্টই নয়, হিমালয়ের অসংখ্য সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ এই দুই পাহাড়ী কন্যার শক্তি, সাহস ও উদ্যমের কাছে পদানত। স্যার এডমন্ড হিলারির স্বপ্নের রূপকথা ধরে বাচেন্দ্রী পালও গঙ্গোত্রীর গোমুখ থেকে সাগর অভিযানে নামবেন অদূর ভবিষ্যতে। সেই দলে সন্তোষ যাদবও থাকবেন।

দাবার চৌষট্টি ঘরের কূটনীতির যুদ্ধেও পিছিয়ে নেই এদেশের মেয়েরা। মহারাষ্ট্রের রোহিনী খাদিলকার হয়তো উওম্যান গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারেননি, কিন্তু পরবর্তী কালে ভাগ্যশ্রী থিপসে, অনুপমা গোখলে, বিজয়লক্ষ্মী, সহেলী বড়ুয়াদের এগিয়ে দিয়েছেন, উদ্ভাসিত করেছেন জীবনবোধে। কারণ, দাবা তো জীবনবোধেরই প্রতীক। রোহিনীর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রতিভা। কিন্তু ভাগ্যশ্রী, অনুপমা, বিজয়লক্ষ্মীদের প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদার ভিত গড়ে দিয়েছেন। আজ ভাগ্যশ্রী, অনুপমা দুজনেই উওম্যান গ্র্যান্ডমাস্টার, বিজয়লক্ষ্মী কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন, সহেলীও একসময়ের এশীয় খেতাব ও ব্রিটিশ দাবা বিজেতা। তৈরি পরবর্তী প্রজন্মও। সর্বাগ্রে বলতে হয় কোনেরু হাম্পি, আরতি রামস্বামী এবং নিশা মেহতার নাম। অন্ধ্রপ্রদেশের হাম্পি দুবছর আগে অনূর্ধ্ব-১২ বিশ্বখেতাব এবং তামিলনাড়ুর আরতি রামস্বামী এবছরই স্পেনের ওরোপেসায় অনূর্ধ্ব-১৮ বিশ্বখেতাব জিতে স্বপ্ন দেখিয়েছেন ভারতবাসীকে, আর বাংলার নিশার উন্নতির রেখাচিত্রে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

সাঁতারে অবশ্য বুলা চৌধুরির অনেক আগেই সেই পাঁচের দশকে বাংলার আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে বাঙালী নারীর আত্মলব্ধ তেজ ও দৃঢ়তাকে উস্কে দিয়েছিলেন। তার ফলশ্রুতি বুলা, জ্যোতির্ময়ী, রীতা সেনরা। রীতা সেনও দৌড়ের ট্র্যাকে একসময় পি. টি. উষার জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে এশীয় দলেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। অল্পের জন্য তিনি এশিয়াড সোনা পাননি। রীতা ছাড়াও শটপাটে সুব্রতা দেবনাথ, স্প্রিন্টে শ্রীরূপা চ্যাটার্জী, অসীমা ব্রহ্মরাও ভারত জুড়ে নিজেদের ছায়া প্রলম্বিত করেছিলেন। নাফিসা আলি সাঁতার ও অশ্বারোহণে যুগপৎ ভারতসেরা ছিলেন। ওয়াজেদ আলির দৌহিত্রী জলপরী নাফিসা বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থানও পেয়েছিলেন। শুটিংয়ে বাংলার সোমা দত্তের ওপর অনেক প্রত্যাশা ছিল বাংলা তথা ভারতবাসীর। তবে অলিম্পিক পদক না পেলেও সোমা এশিয়াডে রূপো জিতে অর্পিত আস্থার খানিকটা মর্যাদা দিয়েছেন। রীতা সিংহও যথেষ্ট প্রতিভাবান ছিলেন, তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু করতে পারেননি। এখন অবশ্য রূপা উন্নিকৃষ্ণনের ওপর অনেক আশা ভারতীয় শুটিং-সমাজের। কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতে রূপার টার্গেট এবার অলিম্পিক পদক।

টেবিল টেনিসে ইন্দু পুরী, রূপা মুখার্জীর হাতে কোন না কোন সময়ে পর্যুদস্ত হয়েছেন তৎকালীন বিশ্বসেরারা। ইন্দু পুরী বিশ্বপর্যায়ে প্রথম পঞ্চাশে স্থান করে নিয়েছিলেন। এই দুজন ছাড়া শৈলজা সালোখে, কেটি খোদাইজি, মোনালিসা মেহতা, নিয়তি শাহ, মান্তু ঘোষ এবং বর্তমানে পৌলমী ঘটক, রীতু ভোলা, কস্তুরী চক্রবর্তীর মতো খেলোয়াড় ভারতীয় টেবিল টেনিসে দাগ কাটতে পেরেছেন। ব্যাডমিন্টনে মধুমিতা (গোস্বামী) বিস্ত, অমি ঘিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘিরে উত্তাল হয়ে যেত ব্যাডমিন্টন মহল। মধুমিতা '৯২-র অলিম্পিকে যথেষ্ট আশা জাগিয়ে শুরু করেও আটকে যান রিফ্লেক্সে ঘাটতি থাকায়। এখন অপর্ণা পোপত দুরন্ত ফর্মে আছেন। কমনওয়েলথ গেমসে রূপো পেয়েছেন ইংল্যান্ড, কানাডা, স্কটল্যান্ড, মালয়েশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ডিঙিয়ে। আসন্ন সিডনি অলিম্পিকে ব্যাডমিন্টনে একমাত্র আশার আলো অপর্ণা।

ভারোত্তলনেও পিছিয়ে নেই ভারতীয় মেয়েরা। কে. মালেশ্বরী নিজ বিভাগে বিশ্বখেতাব জিতেছেন, এশিয়ান গেমসের রূপোও তাঁর জিম্মায়। কুঞ্জরানী দেবী, জ্যোৎস্না দত্ত, সুমিতা লাহা, ছায়া আদক, মালতি ঘোষের হাত ধরে আন্তর্জাতিক পদক এসেছে এদেশে। জ্যোৎস্না আবার এশিয়াড অ্যাথলেটিক্সের অঙ্গন থেকেও পদক দিয়েছেন দেশকে। সাঁতারে নিশা মিলেট বিপুল সম্ভাবনার আধার। শুধু সাফ গেমসের সীমাহীন সাফল্যেই থেমে থাকলে চলবে না, এব্যাপারটি নিশ্চয়ই তাঁর বোধগত। একই কথা প্রযোজ্য ডাইভিংয়ে রাজশ্রী ঘোষ সম্পর্কেও।

ব্যক্তিগত ইভেন্ট ছেড়ে এবারে আলোকপাত করা যাক দলগত ইভেন্টের দিকে। ভলিবল ও বাস্কেটবল—এই দুই কোর্ট ক্রাফট খেলায় বলার মতো কোন ভূমিকা নেই ভারতীয়দের। হকিতে একবার '৮২ এশিয়াডে সোনা পেয়েছিল ভারতীয়রা। গত ব্যাঙ্কক এশিয়াডেও রূপো পেয়েছে মেয়েরা। ফুটবলে একবার এশীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে, বিশ্বকাপেও অংশগ্রহণ করেছে, যে-সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছেলেরা। ক্রিকেটেও এদেশের মেয়েরা টেস্ট ও একদিনের ম্যাচে উৎকর্ষের নিদর্শন রেখেছে। টেস্টে হারিয়েছে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে। নিউজিল্যান্ডে ত্রিদেশীয় একদিনের সিরিজও জিতেছে। ডায়না এডুলজি, শান্তা রঙ্গস্বামী, সন্ধ্যা আগরওয়ালরা নিজ যোগ্যতায় বিশ্ব একাদশে স্থান করে নিয়েছিলেন।

নতুন শতকের সূচনাতেই অলিম্পিক। ভারতীয় হকি, কে. ডি. যাদব, লিয়েন্ডার পেজদের মতো কীর্তি ও মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে দীর্ঘদিনের শূন্যতা ও হতাশা দূর করবেন জ্যোতির্ময়ী, মালেশ্বরী, অপর্ণার মতো কেউ—এ আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীমা সারদাদেবীর সান্নিধ্যে বনফুল-পত্নী

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৬ সংখ্যায় সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বনফুল প্রসঙ্গে' পড়ে এই পত্র লিখছি। এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি তথ্য সংযোজন করতে চাই।

বনফুলের পত্নী এবং আমার গর্ভধারিণী লীলাবতী দেবী ১৯২৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ গিরিডি গার্লস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেথুন কলেজ থেকে ১৯২৭ সালে আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেই বছরই পরীক্ষার কিছু পূর্বে ৭ জুন (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) তাঁর বিবাহ হয়। পরে ১৯৩৮ সালে প্রাইভেটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। তখন তিনি তিন সন্তানের জননী।

বাল্যকালে আনুমানিক ১৯১৮ সালে তিনি নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হন। সঠিক সন ও তারিখ এখন নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তখন স্কুলের কোন হোস্টেল না থাকায় তিনি কিছুকাল শ্রীমায়ের পুণ্য আবাস 'উদ্বোধন'-এর বাড়িতেই ছিলেন। সেইসময় তিনি হয়তো কখনো শ্রীমায়ের চুল আঁচড়ে বা বেঁধে দিয়ে থাকতে পারেন, তবে তাঁর মুখে একথা কখনো শুনিনি। সন্ন্যাসীরা তাঁকে প্রণাম করতে দিতেন না—একথাও সঠিক নয়। প্রবীণ সন্ন্যাসীদের তিনি প্রণাম করতেন এবং তাঁরা সে-প্রণাম গ্রহণ করতেন। বয়ঃকনিষ্ঠ সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা হয়তো তাঁর প্রণাম নিতেন না। শ্রীমায়ের স্নেহপ্রবণতার দুটি দৃষ্টান্ত তাঁর কাছে শুনেছি। একদিন শাড়ির পাড় দিয়ে তাঁকে চুল বাঁধতে দেখে শ্রীমা তাঁকে তা খুলে ফেলতে বলেন এবং শরৎ মহারাজকে দিয়ে ফিতে আনিয়ে নিজে অথবা কোন ভক্ত শিষ্যাকে দিয়ে তাঁর চুল বেঁধে বা বাঁধিয়ে দেন। এই তথ্যটি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতি রাত্রিতে শ্রীমা তাঁর প্রসাদ থেকে লুচি ও সন্দেশ আমার মায়ের মাথার কাছে সকালে খাওয়ার জন্য রেখে দিতেন। শ্রীমায়ের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে আমার মা বলতেন যে, অনেক রোগীর প্রিয়জনরা তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এলে তিনি যদি বলতেন : "কোন ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে", তাহলে বোঝা যেত রোগী শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করবে। অন্যদিকে যদি বলতেন : "সবই ঠাকুরের ইচ্ছে, মানুষের আর কতটুকু শক্তি। তাঁকে ডাক।" তাহলে বুঝতে হতো, আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা কম।

আমার মাসিমা ছায়াদেবীও নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর কাছে জানতে পারি, শ্রীমা তাঁকেও বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আরেকটি বিষয়েও জানতে পারি যে, একবার শিবরাত্রির শেষ প্রহরে শিবের মাথায় জল দেওয়ার সময় লীলাবতী দেবী আচ্ছন্নের মতো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ভাব সম্পর্কে সচরাচর নীরব থাকতেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ ছাড়াও বহু দেবদেবীর চিত্র শোভা পেত। তিনি সকাল-সন্ধ্যা পূজা করতেন ও প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করতেন। এছাড়াও ষষ্ঠী ও অন্যান্য বার-ব্রত পালন করতেন। তাঁর শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর একত্রে উপবিষ্ট একটি ছবি এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর একটি করে ছবি ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, আজ প্রায় সত্তর বছর পরেও ছবিগুলি অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। ১৯২৯ সালে ভাগলপুরে বনফুল যেদিন তাঁর ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করেন, সেদিন ঘটনাচক্রে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন পড়ায় তিনি মা লক্ষ্মীর একটি পট কিনে তাঁর ল্যাবরেটরীতে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন। এরপর প্রতি বছরই ল্যাবরেটরীতে বহু সমারোহে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতো। অন্য সময় এই পটটি তাঁর ল্যাবরেটরীতেই থাকত। পরবর্তী কালে অবশ্য এই পূজা বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এই পটটিও এখনো অবিকৃত রয়েছে। কয়েক বছর জগদ্ধাত্রীপূজা ও বহু বছর সরস্বতীপূজাও বাড়িতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই অবসরে লীলাবতী দেবীর পিতৃকুলের কিছু পরিচয় দেওয়া হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তদানীন্তন বর্মায় মিচিনা (Mitkiyana) শহরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ও অ্যাডভোকেট ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতৃব্য। বিখ্যাত মল্লবীর ও সাধক শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ('সোঽহং স্বামী') তাঁর পিতার খুড়তুতো ভাই ছিলেন। তাঁর মাতা কিরণবালা দেবী ফরিদপুরের পাটাভোগ-নিবাসী সিদ্ধ সাধক কালীকুমার ঠাকুরের দৌহিত্রী ছিলেন।

বনফুলের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, তিনি গভীর আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এবিষয়ে তাঁর অনুভব 'শিক্ষার ভিত্তি' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' রচনাদুটিতে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন (রচনাবলী, ১২শ খণ্ড)। প্রথম রচনাটিতে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার আলোচনায় তিনি বলেছেন : "আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মানুসন্ধানই মানবজীবনের একমাত্র শ্রেয়ঃ। 'আত্মানং বিদ্ধি' তাই আর্যশিক্ষার প্রধান উপদেশ।" দ্বিতীয় রচনায় বলেছেন : "সুখের সন্ধানেই তাহার (মানুষের) যাত্রা শুরু হইয়াছিল। সহসা সে আবিষ্কার করিল 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। এই আত্ম-আবিষ্কার, এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানব-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।" এই আত্মানুসন্ধান তথা 'ভূমা'-উপলব্ধিতে তিনি কিভাবে ব্রতী ছিলেন তা অনুমানসাপেক্ষ। তবে সাধারণত নিশীথে ও অতি প্রত্যূষে বা শেষ রাত্রিতে তিনি তাঁর সারস্বত সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। এই সাধনালব্ধ উপলব্ধি তাঁর সাহিত্যে বিপুলভাবে প্রতিভাত। তাঁর অগণন চরিত্র-সৃষ্টিও সেই ভূমা-উপলব্ধিরই প্রক্ষেপণ বা প্রতিবিম্ব। তাঁর কবিতায় তিনি এই অনুভবকেই প্রকাশ করেছেন : "আছে কিনা জানি না তো আমার স্বতন্ত্র পরিচয়/ অসংখ্যের পরিচয়ে আমার আমিরে দেখি আজ/ সকলের দুঃখ-সুখ স্নেহ-দ্বেষ আনন্দ-বিস্ময়/ কভু মোরে করে ভিক্ষু, কখন সাজায় মহারাজ/... স্বাতন্ত্র্য চাহি না বন্ধু, করিয়াছি আত্মসমর্পণ/ ছবি আসে ছবি যায় নির্বিকার মানসদর্পণ।" ('আত্মপরিচয়', সুরসপ্তক) তাঁর ঈশ, কেন ও মুণ্ডক উপনিষদের স্বচ্ছন্দ কবিতার অনুবাদগুলি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

পরিশেষে আরেকটি বিষয়ে উল্লেখ করে এই পত্র সমাপ্ত

করছি। শ্রীমায়ের লীলাসংবরণের পর নিবেদিতা ছাত্রীনিবাসের অন্যান্য আবাসিকদের সঙ্গে লীলাদেবীও শ্রীমায়ের চরণে পুষ্প নিবেদন করেন। পরে তাঁরা অশৌচ পালন করেন ও শ্রাদ্ধবাসরে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর বোন ও আমার মাসিমা ছায়াদেবীর কাছ থেকে সৌভাগ্যক্রমে গানটি আমি পাই। তাঁর আরেক বোন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এই গানটি সংগ্রহ করতে আমায় সাহায্য করেছিলেন। গানটি নিচে দেওয়া হলো—

"কোথায় গো মা জননী আমার
কোথায় মা গো জননী আমার
সাধনার ধন রামকৃষ্ণপ্রাণ
সত্য কি করিলে লীলা অবসান
সত্য কি সবারে গেলে গো ফেলিয়ে
বিষাদে ভাসিছে হৃদয় পরাণ।"

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়
সল্ট লেক, বিধাননগর
কলকাতা-৭০০ ০৯১

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অসাধারণ বাণী—"কালে হবে।" এই মহান বাণীটি যে এমনভাবে আমার জীবনে প্রতিফলিত হবে আমি ভাবতেও পারিনি। ১৯৭৫ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর কল্পতরু উৎসবের সময় আমি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি যাত্রাপালা দেখি। শেষ হলে বাড়ি ফিরে আসি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী যে কে বা কি ব্যাপার কিছুই বুঝতাম না। কোনদিন জানার আগ্রহও হয়নি। কিন্তু কেন জানি না, ১৯৮৫ সালের ১৫ মার্চ হঠাৎ আমার ইচ্ছা হলো আমি দীক্ষা নেব। এব্যাপারে কেউ কিছুই বলেননি বা প্ররোচিত করেননি। আমার নিজের মন থেকেই এ-প্রশ্ন উঠে এল। আমি ঠোঙা তৈরি করে বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করি। ঠোঙা বানাবার জন্য কাগজ কিনতে যেতাম দোকানে। একবার দোকানদার আমায় অনেক বইয়ের মধ্যে একটি বই দিয়েছিল, যদিও তা না জেনেই দিয়েছিল। বইটার মলাটে দেখলাম লেখা রয়েছে 'উদ্বোধন'। বইয়ের ভিতরের একটি লেখা আমায় ভীষণভাবে নাড়া দিল, লেখাটি হলো—স্বামী ভূতেশানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান'। পড়ে আমার এত ভাল লাগল যে, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—আমি দীক্ষা নেব। ঠাকুরের অশেষ কৃপায় আমার দীক্ষা হলো ১৯৯৫ সালের ৪ আগস্ট। আমার এক নিকট আত্মীয় 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক। ইংরেজী মাসের ২৭/২৮ তারিখ সে 'উদ্বোধন' নিয়ে এসে প্রথমে আমাকেই দেয়। আমি পড়ে তাকে দিই। এখন আমার অন্তরে-বাইরে সর্বদা শান্তি, শান্তি, শান্তি। কারণ, আমি মায়ের অশেষ কৃপায় চেষ্টা করি যেন কারো দোষ না দেখি। প্রণাম ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে, প্রণাম মা সারদাদেবীকে, প্রণাম স্বামীজীকে এবং প্রণাম আমার প্রিয় 'উদ্বোধন'কে।

মিনতি দাস
কাশীপুর, কলকাতা-৭০০ ০০২

কথাগুলি স্বামীজীর নয়

বেশ কিছুকাল যাবৎ বিভিন্ন স্থানে ছাপার অক্ষরে এই কথাগুলি আমাদের অনেকেরই চোখে পড়েছে—

"প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। সমাদর করলে খোসামোদ ভাবে। সদুপদেশ দিলে ঘুরে বসে। উপকার করলে অস্বীকার করে। বিশ্বাস করলে ক্ষতি করে। সুখের কথায় হিংসা করে। দুঃখের কথায় সুযোগ খোঁজে। ভালবাসলে আঘাত করে। স্বার্থ ফুরোলে কেটে পড়ে।" রচয়িতা হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের নামোল্লেখ রয়েছে। এসম্পর্কে 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের কাছে আমি কৌতূহল প্রকাশ করলে তিনি এক পত্রে (১৮।৬।১৯৯৮) আমাকে জানান : "ঐ কথাগুলি স্বামীজীর নয়।" মুদ্রিত অক্ষরে রচয়িতা হিসাবে স্বামীজীর নাম দেখে কথাগুলি স্বামীজীর বলে একটি ধারণা প্রচলিত হতে শুরু করেছে। এসম্পর্কে 'উদ্বোধন' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে বিনম্রভাবে নিবেদনটি রাখলাম।

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস
ঝাউতলা, কাটোয়া
বর্ধমান

বৈদিক কর্মকাণ্ড ও ভগবদ্গীতা

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত সান্ত্বনা দাশগুপ্তের "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ" শীর্ষক রচনাটিতে একটি ভ্রান্তিমূলক ধারণা লক্ষ্য করেছি এবং সেই ধারণা অবিলম্বে দূর করা একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

বেদের কর্মকাণ্ড পুরোহিতবর্গের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ডও তাঁদের বিরোধিতাপ্রসূত নয়। যিনি জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী, তাঁর যেমন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা নেই, তেমনি যিনি ভোগবাসনায় আসক্ত তাঁর পক্ষে কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করার উপায় নেই। বিষয়ী ব্যক্তিদের আসক্তি ক্রমে ক্রমে শিথিল করে তাঁদের চিত্তকে জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত করাই বৈদিক কর্মকাণ্ডের একমাত্র অভিপ্রায়। মানুষকে কামনা-বাসনার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার জন্য কর্মকাণ্ডের অবতারণা করা হয়নি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেননি—তিনি বেদবাদের নিন্দা করেছেন মাত্র। বিবেকহীন বেদবাদীরা জ্ঞানকাণ্ডের অপরিহার্যতা অস্বীকার করেন এবং কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য না বুঝে ভোগলালসার চরিতার্থতা অব্যাহত রাখাই বেদের নির্দেশ বলে মনে করেন। এই মত বস্তুত বেদবিরোধী, তাই শ্রীভগবান তাঁর ভক্তদের সাবধান করে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মন্তব্যটিকে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি কটাক্ষ বলে মনে করা অযৌক্তিক।

জগবন্ধু চক্রবর্তী
মে ফেয়ার রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা

অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত

মূলঘর গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশের খুলনা জেলায়) মামার বাড়িতে পড়াশুনা করে ওখান থেকে অল্পবয়সে পোস্ট অফিসের চাকরি পেয়ে বরিশালে আসি ১৯০৩ সালে। মামার বাড়িতে থাকার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কথা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের কথা শুনতাম। শুনতে খুব ভাল লাগত। শ্রীম-কথিত 'কথামৃত' পড়তাম। পড়তে ভালবাসতাম। তখন সবে স্বামীজীর দেহত্যাগ হয়েছে, ঠাকুর তো চলেই গেছেন আগে। তাই ভাবতাম, মায়ের কাছে গিয়ে দীক্ষা নেব, তাঁকে দর্শন করব। ভাবতাম, আমার মনের এই প্রবল ইচ্ছা মা কি পূরণ করবেন?

কয়েকবছর পর ১৯০৯ সালে নানা সূত্রে খোঁজ-খবর নিয়ে আমার অফিসের এক সহকর্মী পুলিনবাবুর সঙ্গে কলকাতায় বিডন স্ট্রীটের কাছে আমার সম্পর্কিত ভাই প্রমদাচরণ সেনগুপ্তের বাসায় উঠি। শুনলাম, মা তখন আছেন বাগবাজারে বর্তমান উদ্বোধন লেনের বাড়িতে। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) মায়ের সেবার তত্ত্বাবধান করেন, দর্শনার্থী ও ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

আমরা কলকাতায় নতুন কাউকে জানি না বা চিনি না। মনে প্রবল ইচ্ছা, মাকে দর্শন করব এবং তাঁর কাছে দীক্ষা নেব। কলকাতায় আসার পরদিন মাকে দর্শন করতে গেলাম। মনের ইচ্ছা শরৎ মহারাজকে জানাতে তাঁর নির্দেশে মায়ের একজন সেবক আমাদের সাথে কথাবার্তা বলেন। সেবক মহারাজ বললেন : "মা এখন বিশ্রাম করছেন। কাল সকালে আসুন, আমি মাকে সব বলে রাখব।" আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় থাকি ইত্যাদি সব জেনে নিলেন। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে 'মায়ের বাড়ী'তে হাজির হলাম। সেবক মহারাজ আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন, দেখলাম মা মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন। মনে খুব ভয় হচ্ছিল যে, যদি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন! মাকে নিঃশব্দে প্রণাম করলাম। তখনো মায়ের মাথায় পুরো ঘোমটা।

সেবক মাকে কি যেন বললেন। তারপর মা আস্তে আস্তে তাঁর মুখের ঘোমটা তুলে আমার দিকে সস্নেহে তাকালেন। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম! কী মধুর সেই দৃষ্টি! মন আনন্দ আর তৃপ্তিতে ভরে গেল।

আমি আবার মাকে প্রণাম করলাম। কিছুক্ষণ পর সেবক এসে আমাকে বললেন : "মা আপনাকে দীক্ষা দিতে সম্মতি দিয়েছেন। গঙ্গাস্নান করে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসুন।" আমি বাড়িতে স্নান করেই গিয়েছিলাম। আবার গঙ্গায় স্নান করে ফুল-মিষ্টি নিয়ে 'মায়ের বাড়ী'তে এলাম। সেইদিনই আমার দীক্ষা হয়ে গেল। শরৎ মহারাজ আমাকে মায়ের একটি ছবি দিলেন এবং কিছু উপদেশ দিলেন। দু-তিন দিন কলকাতায় থেকে আবার আমার কর্মস্থল বরিশালে ফিরে গেলাম।

বরিশালে এসে মনে খুব জোর পেলাম। স্থানীয় কিছু ভক্তকে যোগাড় করে সেখানে 'রামকৃষ্ণ পাঠচক্র' স্থাপন করলাম। সেখানে প্রতি রবিবার বিকালে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা আলোচনা করা হতো, ভজন হতো।

এবার মায়ের অহেতুকী কৃপার একটি ঘটনা বলে আমার স্মৃতিকথার ইতি টানব। মা কল্পতরু। কাতর হয়ে চাইলে তিনি কখনো নিরাশ করেন না, মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। এই প্রসঙ্গে সেই ঘটনাটি বলি। তখন শ্রীশ্রীমায়ের ফটো সহজ-লভ্য ছিল না। শুধুমাত্র মঠ-মিশনের ঘনিষ্ঠ ও মায়ের দীক্ষিত ভক্তরাই একখানি করে তাঁর ফটো পেতেন। দীক্ষার পর আমি মায়ের একখানি ফটো পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। ফটোখানি খুব গোপনভাবে রাখার নির্দেশ ছিল। সেইভাবে রাখার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অতি গোপনে রাখার ফলে দীক্ষার প্রায় ৬।৭ মাস পর ফটোখানি কোথায় যে রেখেছি তা আর মনে পড়ল না। ফলে ফটোটি আর খুঁজে পেলাম না। খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। শেষে পুলিনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, কলকাতায় গিয়ে পুনরায় আরেকখানি ফটো সংগ্রহ করার চেষ্টা করব। সুযোগমতো কলকাতায় যাওয়া হলে একদিন উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজের কাছে সব নিবেদন

করা হলো। পুলিনবাবুই মহারাজের কাছে গেলেন, আমি তফাতেই থাকলাম। অপরাধের কথা ভেবে মহারাজের সামনে যাওয়ার সাহস হলো না আমার। পুলিনবাবু সব কথা মহারাজকে ভয়ে ভয়ে বললেন এবং আমার আর্জিটিও জানালেন। শুনে মহারাজ খুব ধমক দিয়ে বললেন : "একি কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি পেয়েছ যে, বৈঠকখানাঘর সাজাতে হবে! যতসব অসাবধান, বেঁহুশ ছেলে!" আরো কি কি সব বললেন! মহারাজের ধমক খেয়ে পুলিনবাবু এক পা এক পা করে পিছিয়ে এসে সেখান থেকে সরে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও। আমরা বরিশালে ফিরে গেলাম।

এখন কি করা যায়? দুজনে গোপনে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, এখন শ্রীশ্রীমাকে সব জানিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। সেইমতো সমস্ত ঘটনা তাঁকে পত্রে জানিয়ে পরিশেষে প্রার্থনা জানালাম : "মা, আপনি ব্যবস্থা না করলে ছবি পাওয়ার আর কোন আশা দেখছি না।" যথাকালে তাঁর আশীর্বাদী-পত্র এসে পৌঁছাল। তাতে অন্যান্য কথার পর মা লিখেছিলেন : "তোমরা ভাবিত হইও না। উদ্বোধনে আসিয়া শরৎকে এই পত্র দেখাইলে ছবি পাইবে।" পত্র পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হলাম। সুযোগমতো পুনরায় কলকাতা গেলাম। সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের 'অক্ষয় কবচ'—তাঁর আশীর্বাদী-পত্র। এবারও আগেরবারের মতো নিজে তফাতে থেকে পুলিনবাবুকে শরৎ মহারাজের কাছে পাঠালাম। আমার তখন অল্প বয়স—২৪ বছর। শরৎ মহারাজের বিশাল দেহ ও সুগম্ভীর মূর্তির সম্মুখীন হওয়া ঐ অবস্থায় আমার পক্ষে সহজ ছিল না। পুলিনবাবুও ভয়ে ভয়ে মহারাজের কাছে এগোলেন। একেবারে কাছে না গিয়ে কিছুটা দূর থেকে প্রণাম করে শ্রীশ্রীমায়ের চিঠিখানি মহারাজের সামনে রাখলেন। চিঠিখানি পড়ে একটু একটু মাথা দোলাতে দোলাতে মৃদু হেসে মহারাজ বললেন : "হুঁ! একেবারে হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছে—হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছে!" বলে গণেন মহারাজকে (ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ) ডেকে বললেন : "এই ছোকরা মায়ের যে যে ছবি চায়, দিয়ে দাও।" মায়ের একখানার বেশি ছবি পাওয়ার কথা আমার মনেও আসেনি, কারণ একখানা পেলেই তখন মহা সৌভাগ্য মনে করব। সুতরাং গণেন মহারাজের কাছ থেকে মায়ের একটি ফটো নিয়ে আনন্দে ভাসতে ভাসতে কর্মস্থল বরিশালে ফিরে এলাম। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটির গুরুত্ব বোঝা কঠিন। কারণ, এখন মায়ের ছবি অতি সহজলভ্য—সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটি ছিল অভাবনীয় এবং স্বাভাবিক-ভাবেই মহা সৌভাগ্যের। বরিশালে মহানন্দে ফেরার পথে বারংবার একথাই ভাবছিলাম যে, কাতরভাবে আর্জি জানালে মা কারো আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না। অভাবিতভাবে তাঁর কৃপা পেয়েছিলাম। আমার কোন যোগ্যতা না থাকলেও তিনি কৃপা করে আমাকে দীক্ষাদান করেছিলেন। আরো একবার করুণাময়ী মা তাঁর কৃপা দান করে আমাকে কৃতকৃতার্থ করলেন। তাঁর সেই ছবি আজো আমার কাছে রয়েছে। তা-ই আমার আজ সবচেয়ে বড় সম্বল।* ❑

* লেখকের (১৮৮৫-১৯৬০) এই অপ্রকাশিত এবং স্বহস্তে লিখিত স্মৃতিকণিকাটি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জহর সেনগুপ্তের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : নবীকরণ ও শারদীয়া সংখ্যা (২০০০)

❑ 'উদ্বোধন' পত্রিকার আগামী ১০২তম বর্ষের (মাঘ ১৪০৬—পৌষ ১৪০৭/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০০) গ্রাহকভুক্তি ও নবীকরণ চলছে। গ্রাহকমূল্য বর্তমান বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; ডাকযোগে : ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র : ৭২০ টাকা (বিমানডাক) ❑ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশ : ১৪০ টাকা।

❑ সডাক গ্রাহকরা আগামী বছরের শারদীয়া সংখ্যাটি (১৪০৭/২০০০) ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করতে চাইলে নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির সময় তা জানাতে পারেন। অবশ্য আগামী ২৪ আগস্ট ২০০০ সংবাদটি জানানোর শেষ তারিখ।

❑ অনুগ্রহ করে আপনার নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে চাইলে ওটি আপনার গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র হিসাবে দেখাতে হবে। যদি ওটি খুঁজে না পান বা হারিয়ে যায় তাহলে আগামী ২৪ আগস্ট ২০০০-এর মধ্যে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে লিখিতভাবে জানিয়ে তাঁর বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ঐ অনুমতি-লিপিটি আপনার আগামী বর্ষের শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করার সময় প্রমাণপত্র হিসাবে বিবেচিত হবে।

[বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য সূচীপত্রের পরের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ও মা! বেশ আছি মা। যখন যা হচ্ছে—সুখ, দুঃখ, আঘাত, যন্ত্রণা, মানুষের কথার কাটা-ছেঁড়া, ছুটে গিয়ে বলে আসছি আপনাকে। 'মা, এই হয়েছে।'—বলার পর অপার শান্তি। পৃথিবীর জীবনচক্রান্ত! কি করবে আমার? আমার মা আছে। দুঃখ, যন্ত্রণা সহ্য করার অপার শক্তি তাঁর কাছে আছে। আমার মায়ের কাছে আছে। সুখ তো ভোরের শিশির! আর, সুখ কাকে বলে? সঠিক কোন সংজ্ঞা নেই, কারণ সুখে সুখ নেই। সুখ আছে সহ্য করার সাধনায়। সুখ আছে ত্যাগে, সেবায়। মা আমাকে শিখিয়েছেন—"পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে।"

ঠাকুর যে তিনটির ওপর জোর দিয়েছিলেন, মা সেই তিন অস্ত্রকে আরো পালিশ করে আমাদের হাতে দিয়ে গেলেন—সাধনা, প্রেম, ভক্তি।

'সাধনা' কাকে বলে মা? জপ, ধ্যান, পূজা?

আরো এক ধাপ এগোও। চলে যাও দক্ষিণেশ্বরের নবতে। দেখে এসো আমার ঘরখানি। কত বড়? ওরই মধ্যে সবরকম ভাঁড়ারের জিনিস—কাঠ, উনুন, জলের জালা, কাঠের সিন্দুক, পোর্টমেন। সেইখানে আমার বাস। আমার বয়স তখন বাইশ কি তেইশ। সঙ্গে আছে ঠাকুরের ভাইঝি—লক্ষ্মী। তোমাদের 'লক্ষ্মী-দিদি'। তার বয়স তখন চোদ্দ কি পনের। সে ছিল আমার কাজের সহকারী। ঐ সঙ্কীর্ণ আস্তানায় মাঝে মাঝে গোলাপ-মা, যোগীন-মা, মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী, গৌরী-মা, চুনিলালের স্ত্রী—যার যেমন সুবিধে এসে থাকতেন। নবতের সরু বারান্দা দরমা দিয়ে মাথার ওপর পর্যন্ত ঘেরা ছিল। তার মধ্যেই আমাদের বসবাস। ঠাকুর বলতেন, খাঁচার পাখি—শুক-সারি। তাঁর ঘরে কত কীর্তন, কত গান! নবতের দিকের দরজাটা খুলে রাখতে বলতেন। বলতেন: "এখানে কত ভাব-ভক্তি হবে। ওরা সব দেখবে না? শুনবে না। কেমন করে তবে শিখবে!" দরমার চাটাইয়ের মধ্যে আঙুল-প্রমাণ সরু ছেঁদা। সেই ছেঁদা দিয়ে আমরা ঠাকুরের ঘরের ভিতর সব দেখতাম। উত্তরের দরজাটা প্রায় খোলা থাকত। কত গান, কীর্তন, নাচ, সমাধি আর ভক্তদের নিয়ে কী আনন্দ! একদিন সেই ছেঁদা একটু বেড়ে গেছে দেখে ঠাকুর হাসতে হাসতে রামলালকে বললেন: "ওরে রামনেলো, তোর খুড়ীর পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল।" সারাদিন কত রকমের রান্না! ঠাকুরের ছেলেদের জলখাবার, ডাল-ভাত, তরকারি, রাত্রিতে ঘন ডাল ও বড় বড় রুটি। ঠাকুরের জন্য ঝোলভাত। আর আমাদের প্রায়ই ভাতে-ভাত যা-হয় হতো। এর ওপর কোন ভক্ত বেলায় এসে গাড়ি থেকে নামবার সময় হয়তো হেঁকে বললেন: আজ ছোলার ডাল খাব। সঙ্গে সঙ্গে ছোলার ডাল চেপে গেল।

এই তো সাধনা। ধরা থাক, ধরে থাক। মা ভবতারিণী মন্দিরে। শ্রীশ্রীরাধাকান্ত হাসছেন, ঠোটে বাঁশি। দ্বাদশ শিবমন্দিরে ঠাকুরের পূজিত শিব। চাঁদনি। পোস্তা। পঞ্চবটী। বেলতলা। শত শত ভক্তের আসা-যাওয়া। স্নান, নামকীর্তন, নাটমন্দিরে পাঠ, শাস্ত্র আলোচনা। কোথায় মা! মা কি পট্টবস্ত্র পরিধান করে জপের মালা হাতে বসে আছেন সেখানে! তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, সেবা, পূজা সেই জীবন্ত বিগ্রহের—শ্রীরামকৃষ্ণের। তিনিই শিব, তিনিই কালী, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম।

কত যত্নে সারদাকে তৈরি করলেন তিনি! আর একজন শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি থাকব না, তুমি থাকবে, আরো অনেক দিন থাকবে। জেনেছ নিশ্চয়, তোমার গদাধর বড় নিষ্ঠুর। তোমাকে খাঁচায় ভরে ভিতরের আকাশ খুলে দিয়েছি। সমাধির সময় আমার হাতের ভঙ্গি লক্ষ্য করেছ তুমি, সসীম আর অসীমের যোগসেতু শ্রীরামকৃষ্ণ। অনন্তকে গুটিয়ে আন অন্তরে। তোমাকে আমি কতভাবে যোগ-অভ্যাস করিয়েছি! 'অভ্যাসযোগ'। রাতে তো আমার ঘুম ছিল না। শেষ রাতে তিনটের সময় ঝাউতলায় শৌচে যাবার সময় তোমার নবতের পাশে এসে প্রভাতের জাগরণী হাঁক মেরে যেতুম: "ও লক্ষ্মী, ওঠরে ওঠ। তোর খুড়ীকে তোলরে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। গঙ্গাজল মুখে দিয়ে মার নাম কর, ধ্যান-জপ আরম্ভ করে দে।" তুমি কতক্ষণই বা

ঘুমোবার সময় পেতে সারদা! দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার বাতাসে শীতে তোমাদের বিছানাটাই বা কি ছিল। একখানা মাদুর, আর একটা কাঁথা। সেই কাঁথার তলায় ঘুমের আমেজে জড়সড় হয়ে লক্ষ্মীকে তুমি মাঝে মধ্যে বলতে ফিসফিস করে: "সাড়া দিসনি, সাড়া দিসনি। চুপ করে শুয়ে থাক। ওঁর চোখে ঘুম নেই। এখনো ওঠবার সময় হয়নি। কাক কোকিল ডাকেনি। সাড়া দিসনি।" সাড়া না দিলে কি হতো সারদা?

রামকৃষ্ণের দুষ্টুমি! তোমাদের দরজার নিচে জল ঢেলে দিয়ে পালিয়ে আসতুম। তখন সব ভিজে যাওয়ার ভয়ে তোমাদের হুটোপাটি। ওঠ, ওঠ, ওঠ লক্ষ্মী, জল ঢেলে দিয়েছেন! লক্ষ্মী এসে বলত, এই শীতে আমাদের বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছেন! আমি অমনি গান গাইতুম—প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়, শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়। তোমার আমার প্রেম, বলো, কে বুঝবে তায়। তুমি যে আমার সখী। একটি বালক, একটি বালিকা। আবার মা ও সন্তান। আবার মা ভবতারিণী ও তাঁর সেবক। আমি জেগেছি, তুমি শুয়ে থাকবে! তা কি কখনো হয়! দেখ, কামটাকে সরাতে পারলে যে-প্রেম আসে সেটা স্বর্গীয়। এই বার্তা সাধারণ গৃহীদের কাছে রেখে যাবার জন্যই আমার বিবাহ করা। আমি তোমার জন্য এসেছিলুম, তুমি আমার জন্য। শুধু রামকৃষ্ণে কী হতো! দপ্ করে জ্বলা, দপ্ করে নিভে যাওয়া। কয়লা জ্বালালেই কি শক্তি পাওয়া যায়? আধার আর অগ্নি একত্রিত না হলে গতি আসে না। ইঞ্জিন চলে না।

শিব আর শক্তি। শক্তি ছাড়া শিব শব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত শক্তি তাঁর শক্তিতে সঞ্চিত করে গেলেন। আবার সারদার শক্তিতে প্রস্ফুটিত হলেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। মা যদি অকাতরে সেবা না করতেন, সুরে সুর মিলিয়ে যদি প্রেমসে বাজতে না পারতেন, তাহলে কি হতো? স্পষ্ট বলা যেতে পারে, তিনি একজন বড় সন্ন্যাসী হতেন, কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণ' হতেন না। অভিনব এক অবতার! ধর্মের ধারায় দেখা যায় সন্ন্যাসী যোষিৎসঙ্গ বর্জন করবেন। সঙ্গ তো দূরের কথা, চিত্রপট দর্শন করাটাও পাপ। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসের এই কঠিন পথ, ব্রহ্মচর্যের এই সুদৃঢ় বিধান সমর্থন করে গেছেন। কাষ্ঠনির্মিত নারীমূর্তিও সংযমের এই বাঁধ ভেঙে দিয়ে সন্ন্যাসধর্মে ভ্রষ্টাচার আনতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে অবতার! অভূতপূর্ব অবতার! তাঁর কোন কিছুই কোন কিছুর সঙ্গে মেলে না। বাদ্যযন্ত্রের যে-পর্দাতেই হাত দিচ্ছেন প্রকাশিত হচ্ছে সঠিক সুর। সাধনপথের ধারানুযায়ী একের পর এক গুরু আসছেন, সাধন-শেষে তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন শিষ্য হয়ে।

"আমি কিন্তু বিবাহিত।"

তোতাপুরী বললেন: "ভালই তো! তোমার বেদান্ত পরীক্ষা করে নাও। আত্মার কোন লিঙ্গ নেই। কামজয়ীর স্ত্রী-পুরুষ ভেদ থাকে না। তুমি ব্রহ্মাসীন, মায়া তোমার কি করবে!" বেশ। সেই পরীক্ষাই হোক। কামারপুকুরে গেলেন ঠাকুর, মা এলেন জয়রামবাটী থেকে। আট মাস ঠাকুরের সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন। মানুষ কত রাতই তো দেখে! দেখতে দেখতে জীবনের রাত নেমে আসে। এ-রাত যে মহানিশা। শিব-শক্তির চৈতন্যলীলা। বাইরের অন্ধকারে, গাছের পত্রক্রোড়ে জোনাকির নাকছাবি। আকাশের অন্ধকারের আলোয় কক্ষ ভরাট। একটি শয্যা। মুখোমুখি দুই কালী।

এ বড় আশ্চর্য খেলা! শিব খেলেন, কি কালী খেলেন! কেবা শিব, কেবা কালী! ঠাকুর চলে গেছেন ঊর্ধ্বলোকে। যেখানে মায়ার জগৎ মহামায়ায় মিশে গেছে। যেখানে রূপের শেষ, অরূপের লীলা। হাত-দুটি জোড় করে বসে আছেন সারদা ষোড়শী। দেহ-মন-বুদ্ধি, বিচার-পরিবেশ-সংস্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ। সেই মহানিশায় জননীর বিকাশ।

উভয়ের পরীক্ষা। পঞ্চভূতের দেহকে নস্যাৎ করতে পেরেছি কি? "তাদৃশ সমাধির এক বিরামক্ষণে তিনি পার্শ্বে শায়িতা শ্রীমায়ের রূপযৌবনসম্পন্ন শ্রীঅঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন—'মন, এরই নাম স্ত্রীশরীর। লোকে একে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলে জানে এবং ভোগ করবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়। কিন্তু একে গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। ভাবের ঘরে চুরি করো না; পেটে একখানা, মুখে একখানা রেখো না। সত্য বল, তুমি একে গ্রহণ করতে চাও, অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি একেই চাও, তো এই তোমার সুমুখে রয়েছে, নাও।' এইরূপ বিচার-পূর্বক ঐ অঙ্গস্পর্শনের জন্য হস্তপ্রসারণ করিবামাত্র মন সহসা কুণ্ঠিত ও উচ্চ সমাধিপথে ধাবিত হইয়া বিলীন হইয়া গেল, সে-রাত্রে আর সাধারণ ভূমিতে নামিয়া আসিল না। পরদিন বহুক্ষণ ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে ব্যবহারিক জগতে নামাইয়া আনা সম্ভব হইল।" [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ]

অগ্নিপরীক্ষা অবশ্যই। তবে ঠাকুর স্বয়ং স্বীকার করলেন, একার চেষ্টায় পরীক্ষা পাশ করা যেত না হয়তো! "ও যদি এত ভাল না হতো, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা, কে বলতে পারে? বিয়ের পরে মাকে (জগদম্বাকে) ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম, 'মা, আমার পত্নীর ভেতর থেকে কামভাব এককালে দূর করে দে।' ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে এই কালে বুঝেছিলাম, মা সে-কথা সত্যসত্যই শুনেছিলেন।" [ঐ]

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বিশাল এক ঈগল পাখি, পত্নী সারদাকে ঠোঁটে নিয়ে উড়ে চলেছেন জীবনের ঊর্ধ্ব অনুভূতির দিকে। এ এক অদ্ভুত 'ইলংগেসান'। প্রসারিত হও। পা থাক মাটিতে। বাস্তব ভুললে চলবে না। আমরা ব্রহ্মে থাকলেও আমাদের

বসবাস মায়াতে। শ্রীশ্রীঠাকুর কি কারণে অনন্য, কেন স্বামীজী বলছেন, 'অবতারবরিষ্ঠ'? কারণ, একমাত্র তিনিই বলতে পেরেছেন—**ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য**। জগৎ কখন মিথ্যা—যখন তোমার **আমিটা** থাকবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে এসেছিলেন আমাদের এই শেখাতে—অমৃতের পুত্রগণ, কুকুর-বেড়ালের মতো কেঁউ-কেঁউ, মিউমিউ করতে করতে মরে গিয়ে তোমার অমরত্ব ঘোষণা করো না। এ-জায়গাটা অনিত্যের। ঈশ্বর ছাড়া কেউ নিত্য নয়। জগৎ তাঁর ছায়া। একটা জিনিস তোমরা পারতে পার, সেটা হলো 'স্বর্গকোণ' রচনা। শিবের সংসার। নিমেষে যিনি ব্রহ্মলীন হয়ে যান, তিনি পত্নী সারদাকে সংসার শেখাচ্ছেন। প্রথমে ধর্ম। তুমি কে? আমি কে? আবিষ্কার। স্বরূপ উদ্ঘাটন। অতঃপর নিষ্ঠা। ধর্ম এলেই নিষ্ঠা আসবে। গৃহবাসী যখন, গৃহস্থালী কর্মও তোমার পূজার অঙ্গ। গৃহই তো মন্দির। সাধকের আবির্ভাবকেন্দ্র, সাধনদুর্গ। সেখানে নারীর ভূমিকাই তো সব। গৃহ যে গৃহিণী-নির্ভর! তাহলে আদর্শ নারীর কর্তব্য? দেব-দ্বিজ-অতিথির সেবা। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ। এইবার মন্ত্রটা শুনে নাও—**যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন।**

মা সারদা কত কষ্ট করেছিলেন, কত নিগ্রহ, কত যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন—এপ্রসঙ্গ পাশে থাক। ঠাকুর যাঁর দেহ হরণ করে নিয়েছেন তাঁর দেহ, দেহগত মন দুটোই ঘুচে গিয়েছিল। সারদা-শরীরে মা জগদম্বাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। 'রামকৃষ্ণ দর্শন'কে যদি দর্শন করতে চাও সারদাকে দর্শন কর। পৃথিবীতে একটি শব্দই বিশ্বজনীন—'মা'। সতেরও মা, অসতেরও মা। জীবজগতে সমস্ত প্রাণীর একটিই আর্তস্বর—মা! মা সারদা জানতেন ঠাকুরের পরিকল্পনা। মা বলছেন: "বাবা, জান তো ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের ওপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন। আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।"

ঠাকুর সূর্য, মা চন্দ্র। একই আকাশে সূর্য আর চন্দ্র দৃশ্যমান থাকে না। অপ্রাকৃত সমন্বয়। সেই অলৌকিক লীলা—'রামকৃষ্ণ-সারদা'। একই আকাশে রবি শশী হাসে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে বলি, মা! চারটে লাইন তুমি শোন। বড় সুন্দর!

"The bravest battle that ever was fought;
Shall I tell you where and when?
On the maps of the world you will find it not;
It was fought by the mothers of men."

[The Bravest Battle—J. Miller]

তুমি আমাদের সেই মা—জননী সারদা! ❑

> শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্‌।
>
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

'A Text Book of Homoeopathic Materia Medica Elaborated with Illustrations' গ্রন্থের লেখক, পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে দশ বছর অধ্যাপনা এবং ত্রিশ বছর চিকিৎসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা জানাতে ধারাবাহিক লিখছেন। তাঁর ধারণা, এতে সাধারণ অসুস্থতা ও অসুখ-বিসুখ এড়ানো সম্ভব হবে এবং ফলত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

❑ বৈকালিক আহার বিকাল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে গ্রহণ করা উচিত। শিশু, বালক-বালিকাদের বৈকালিক আহারে অতি সাধারণ আহার মঙ্গলদায়ক।

❑ বিকালে দুধ, দুধ-সাবু, সুজি, রুটি, দুধ-রুটি, দুধ-খৈ, মুড়ি, চিঁড়া, ছোলা ভিজা, ছোলা সিদ্ধ, মুগডাল ভিজানো ইত্যাদি খাওয়া ভাল।

❑ ফলাহার বেলা তিনটা-সাড়ে তিনটার পর বর্জন করা উত্তম। যেসময়ে যেরকম ফল পাওয়া যায় তাই গ্রহণ করা উচিত। যেমন আম, কাঁঠাল, জাম, কমলা, মুসাম্বি, নারকেল, ডালিম, আনারস, বেদানা, নাসপাতি, আঙুর, ফলসা, শাঁকালু।

❑ আপেল, আঙুর, কিসমিস, কাজু, কাঠবাদামের ক্রয়মূল্য অধিক; তার বদলে পেয়ারা, কুল, খেজুর, চীনাবাদাম খাওয়া ভাল, যেগুলি সমগুণসম্পন্ন কিন্তু ক্রয়মূল্য কম।

❑ কম বয়সের বালক-বালিকাদের পক্ষে টক ফল উপকারী।

❑ হরলিক্স, কমপ্ল্যান, ভিভা, গ্লুকোজ ইত্যাদি সেব্য। যাদের সহ্য হবে না তারা এই পানীয় পরিহার করবেন। বয়স্ক যাঁরা বিকালে চা, কফি, কোক বারবার সেবন করেন, তাঁরা এই অভ্যাস অবিলম্বে ত্যাগ করুন।

❑ খইনি, জর্দা, কাঁচা ও শুকনো সুপারি খাওয়া অত্যন্ত বাজে নেশা। শরীর ও মন উভয়ের পক্ষেই খুবই ক্ষতিকর। যাঁরা এগুলিতে আসক্ত, অবিলম্বে এগুলি বর্জন করুন।

আগামী শতাব্দীতে জল ঃ কিছু জরুরী ভাবনা

তপোব্রত সান্যাল*

ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়াল। এই বিপুল লোকসমষ্টির জল ও খাদ্যের পর্যাপ্ত সংস্থান এখন প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা গভীরতর হবে আগামী শতাব্দীতে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ২০৫০ সালে ভারতের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১৬৪ কোটিতে। কোথা থেকে আসবে এত লোকের পানীয় ও অন্যান্য কাজের জল, কি করে পাওয়া যাবে বর্ধিত শস্য-উৎপাদন ও শিল্প-উপচারের প্রয়োজনীয় জল—এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে। জলের সহজলভ্যতার ব্যাপারে যে আত্মসন্তুষ্টি আমাদের আছে, তা বহুলাংশে অবাস্তব। তাই প্রয়োজন দূরদর্শী বাস্তব চিন্তার। এ-নিবন্ধে সমস্যার ব্যাপকতার ইঙ্গিত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কটের সম্ভাব্য সমাধানের আভাস দেওয়া হবে।

ভূতল জলের প্রবাহ থেকে দেশে যে-জল বর্তমানে পাওয়া যায়, তার পরিমাণ ১,৮৬,৯০০ কোটি ঘনমিটারের মতো। জল যথাযথ সংরক্ষণ করা গেলে উপযোগ্য জলের যে-পরিমাণ হিসেব করা হয়েছে, সেটা ৬৯,০০০ কোটি ঘনমিটারের কাছাকাছি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাপ্ত জলের পুরোটাই কেন ব্যবহার করা যাবে না? এর কারণ মৌসুমি জলবায়ু এবং সেইসঙ্গে দৈশিক (topographical) ও ভূতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা। আসলে আমাদের দেশে বৃষ্টি সাধারণত কোথাও সারা বছর ধরে হয় না; যা হয় তা মোটামুটি চার মাসের মধ্যে। আবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণও এক এক রাজ্যে এক এক রকম; এমনকি একই রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যেও বৃষ্টিপাতের সামঞ্জস্য নেই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গই এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাই বৃষ্টিপাতের গড় হিসেব ধরে পরিকল্পনা করলে তা অবাস্তব হবে। দেখা গিয়েছে, দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল খরাপ্রবণ। এর কারণ বছরে গড় বৃষ্টিপাতের ন্যূনতা নয়, বছরের বার মাসে ধারাবণ্টনের অসমতা। এর ফলে খরা ও বন্যার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে না।

ভূতল ছাড়া ভূগর্ভেও নেহাত কম জলের সঞ্চয় নেই। ভূগর্ভের এই জল ব্যবহারে সবটা শেষ হয় না, কারণ ভূতল জলের ক্ষরিত ধারায় তা আবার পূর্ণ হয়। এই পুনঃপূর্তিযোগ্য (rechargeable) ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ প্রয় ৪৩,২০০ কোটি ঘনমিটার। তাহলে ২০৫০ সালে মোট প্রাপ্তব্য জলের পরিমাণ (ভূতল ও ভূগর্ভের জল মিলিয়ে) দাঁড়াবে ২,৩০,১০০ কোটি ঘনমিটার। বিশেষজ্ঞদের বিচারে পরিমাণটা সন্তোষজনক নয়। মাথাপিছু প্রাপ্ত জলের পরিমাণ এর ফলে দাঁড়াবে ১,৪০৩ ঘনমিটার। মাথাপিছু ১,৭০০ ঘনমিটার জল পাওয়া গেলে পরিস্থিতি সন্তোষজনক বলা যেত। বলা যায়, আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি আমাদের জলের ভাঁড়ারে টান পড়বে।

আমাদের দেশ নদীমাতৃক বলে আমাদের একধরনের প্রচ্ছন্ন আত্মতৃপ্তি আছে। বাস্তব চিত্র কিন্তু তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। ভারতে প্রধান জলবাহিকা নদী ও নদীগোষ্ঠীর সংখ্যা আঠার। এর মধ্যে জল-বাহুল্যের বিচারে সাতটি নদী ও নদীগোষ্ঠী পড়ে। এগুলি হলো—সিন্ধু (ভারতের অন্তর্গত অংশ), ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, মহানদী, নর্মদা, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী এবং তাপ্তীর দক্ষিণে পশ্চিমবাহিনী নদীগুলি। গঙ্গার জলপ্রাচুর্যের কথা আমরা বলি বটে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। দক্ষিণে গঙ্গার উপনদীগুলিতে জলাভাব। গোদাবরীতে জলসঞ্চার ঘটেছে প্রাণহিতা নদীর সঙ্গমের পর। এর উজানে গোদাবরী জল-ঋদ্ধ নয়। আগামী পঞ্চাশ বছরে লোকসংখ্যা আরো ৬৪ কোটি বেড়ে গেলে ব্রহ্মপুত্র ছাড়া কোন নদীকেই যথার্থ জলসমৃদ্ধ বলা যাবে না।

এবার একটা অন্য হিসাব। মাথাপিছু দিনে গড়ে ৭৫০ গ্রাম খাদ্যের প্রয়োজন ধরে ২০৫০ সালে ১৬৪ কোটি মানুষের ৪৫ কোটি টন খাদ্যের দরকার হবে। এই বিপুল খাদ্য উৎপাদনের জন্য সেচ-সেবিত কৃষিজমির পরিমাণ প্রয়োজনমতো বাড়াতে হবে। শিল্প-আবাসন-পরিসংস্থানাদি বিকাশের জন্য জমি ছেড়ে দিয়ে কৃষিজমির যথেচ্ছ সম্প্রসারণ কতদূর সম্ভব হবে, তা ভেবে দেখতে হবে। মোটকথা, খাদ্য উৎপাদনের জন্য চাই সেচ আর সেচের জন্য চাই জল; সে-জল কি আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি সুলভ হবে?

এর সঙ্গে আছে পানীয় জলের সমস্যা। পঞ্চাশ বছর পরে দেশে গ্রামের 'চরিত্র' বদলে যাবে। অর্থাৎ গ্রামগুলি নগরসুলভ সুবিধা ভোগ করবে। ফলে মাথাপিছু জলের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, একজন নগরবাসী দৈনিক যতটা জল ব্যয় করেন, একজন গ্রামবাসী

---

* পূর্বতন চীফ হাইড্রোলিক ইঞ্জিনীয়ার, ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট।

তুলনায় জল খরচ করেন অনেক কম। জল অপচয়ের পরিমাণও শহরে অনেক বেশি।

সেইসঙ্গে যুক্ত হবে শিল্পবিকাশের জন্য জলের অতিরিক্ত চাহিদা। জনসংখ্যা-বৃদ্ধিজনিত বিঘ্নিত পরিবেশ স্বাভাবিক করতেও লাগবে বেশি জল। এছাড়া আগামী শতাব্দীতে ভূমি-ব্যবহারের ধরন বদলে যাবে, জলের উৎসগুলিতেও টান পড়বে। সব মিলিয়ে জল নিয়ে যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে আসন্ন ভবিষ্যতে, তাকে সামলাতে প্রয়োজন হবে দূরদর্শী ভাবনা ও তার রূপায়ণের।

প্রথমে সেচের ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বর্ণনা করি। স্বাধীনতার পরে কৃষিভূমির পরিমাণ চতুর্গুণ হয়েছে—২.২৬ কোটি হেক্টর থেকে প্রায় ১০ কোটি হেক্টরে। এর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ জমি সেচ-সেবিত। খাদ্য উৎপাদনও ঐসময়ে চতুর্গুণ হয়েছে—৫ কোটি টন থেকে ২০ কোটি টনের ওপর। শস্যের উৎপাদকতা সেচ-সেবিত ভূমিতেই বেশি পাওয়া যাচ্ছে। বছরে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০০ কিলোগ্রামের মতো। কিন্তু আশঙ্কা অন্যত্র। পরপর কয়েকটি মরসুমে ভাল বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গত দশ বছরে খাদ্য উৎপাদনে তারতম্য ঘটেছে। দেখা গিয়েছে, বৃষ্টিনির্ভর জমিতে শস্যের উৎপাদনশীলতা বেশ কম। এর তাৎপর্য—সেচ-সেবিত ভূমির পরিমাণ ভালরকম বাড়াতে না পারলে ২০৫০ সালে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় (৪৫ কোটি টন) পৌঁছানো যাবে না। কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ তাই বাড়াতে হবে এবং যথাসম্ভব কৃষিভূমিকে সেচের আওতায় আনতে হবে। দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের ফলে চাহিদা অনুযায়ী কৃষিজমি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। সেইসঙ্গে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে চা, তুলো, কাজুবাদাম, পাট ইত্যাদির চাষও বাড়বে। এসবই খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, অন্তত ১৫/১৬ কোটি হেক্টর জমিকে কৃষির আওতায় আনতে হবে, না হলে ২০৫০-এ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। কৃষি যত বাড়বে, জলের প্রয়োজনও সেই অনুপাতে বাড়বে। ভূতলও ভূগর্ভ জলের বিচক্ষণ ব্যবহারের মধ্যে এর সমাধান নিহিত আছে। এর জন্য সুষ্ঠু ও বাস্তব সমীক্ষা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন আছে। একাজ এখনি শুরু করা দরকার।

এরপর গৃহকর্মে জলের প্রসঙ্গ। ২০৫০-এ ১৬৪ কোটি মানুষের দরকার হবে ৯০০০ কোটি ঘনমিটার (বা মেট্রিকটন) জলের। এই হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ২০৫০-এ দেশের অর্ধেক মানুষ থাকবেন শহরাঞ্চলে আর বাকি অর্ধেক গ্রামে। আর শহরে জল লাগবে মাথাপিছু দৈনিক ২০০ লিটার এবং গ্রামে ১০০ লিটার। গ্রামে গৃহপালিত পশুদের জন্য যে-জল লাগবে, তা এই মাথাপিছু দৈনিক হিসেবের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। কোথা থেকে এত জল পাওয়া যাবে? দেখা গিয়েছে, শহরের চাহিদার শতকরা ২০ ভাগ পূর্ণভোগ্য (consumptive use) আর বাকি শতকরা ৮০ ভাগ পুনর্ব্যবহারযোগ্য। এই শতকরা ৮০ ভাগ জলের কিন্তু এখন অপচয় হচ্ছে। এই অপচয় বন্ধ করে জল শোধন করে আবার ব্যবহার না করা গেলে উদ্ধারের পথ নেই। এনিয়ে এখনি ভাবতে হবে।

শিল্পের জন্য জলের চাহিদা আগামী পঞ্চাশ বছরে বেশ বাড়বে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, শিল্পে জলের চাহিদা দাঁড়াবে ৬,৪০০ কোটি ঘনমিটারের মতো। এখানেও উপায়—অপচয় বন্ধ করা এবং ব্যবহৃত জলকে শোধন করে তাকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়বে। জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন অবশ্যই করা যেতে পারে, যদিও এধরনের প্রকল্পে পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জলশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা হচ্ছে। এতে উপযোগ্য জলের প্রায় অধিকাংশই আবার কাজে লাগানো যায়। এক্ষেত্রে জলের চাহিদা দাঁড়াবে ১৫,০০০ কোটি ঘনমিটারের মতো (জলের বাষ্পীভবন ও উপযোগিতার পরিমাণ গণ্য করে)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ জলের মোট চাহিদা দাঁড়াবে ১,৩০,৪০০ ঘনমিটার—সেচ-সেবিত কৃষির জন্য ১,০০,০০০ কোটি ঘনমিটার, পানীয় ও বাড়ির অন্যান্য কাজের জন্য ৯,০০০ কোটি ঘনমিটার, শিল্পের জন্য ৬,৪০০ কোটি ঘনমিটার এবং জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১৫,০০০ কোটি ঘনমিটার। সেইসঙ্গে ভাবতে হবে যে, ভূতল জলের যথেচ্ছ ব্যবহারে নদীগুলিতে পরিবেশগত ভারসাম্য যেন বিঘ্নিত না হয়। অর্থাৎ প্রতিটি নদীর প্রবাহের ন্যূনতম অনুমোদনীয় মাত্রা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, নদীর জল জায়গায় জায়গায় সঞ্চয় না করলে প্রবাহের ন্যূনতম মাত্রা বজায় রাখা যাবে না। বর্তমানে দেশে সঞ্চিত নদীর জলের পরিমাণ ১৭,৪০০ কোটি ঘনমিটারের মতো। এই পরিমাণ বাড়িয়ে ২০৫০ সালে অন্তত ৬০,০০০ কোটি ঘনমিটার করতে হবে।

পরিবেশ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা আজ অনেক বেড়েছে। টিহরি গাড়োয়ালে, নর্মদায় সাধারণ মানুষ আন্দোলনে নেমেছে। এর সঙ্গত কারণ আছে। বড় বড় নদী-রোধক প্রকল্প করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আখেরে লাভের চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে বেশি। বিহারে সাম্প্রতিক একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, বন্যারোধক নানা প্রকল্প রূপায়িত হওয়ার আগে যে-পরিমাণ জমি বর্ষায় প্লাবিত হতো, প্রকল্প নির্মাণের পরে নিমজ্জিত ভূমির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে! এর অর্থ, পরিকল্পনাতেই ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। যেকোন বন্যারোধক প্রকল্পের ফলে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়, বনাঞ্চল প্লাবিত হয়, জলাধার থেকে ভূকম্পের প্রবণতা বাড়ে, নদীর পারিবেশিক

সুষমতা বিঘ্নিত হয়, নদী-বাঁধের ভাঁটিতে যারা থাকে, তারা অভ্যস্ত প্রাকৃতিক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাই প্রয়োজন সুষ্ঠু ও সংহত ভূমি ও নদী পরিকল্পনার। বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরতা না কমালে কৃষির প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটবে না। এইজন্য খরাপ্রবণ রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে রাজস্থানে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে ভূগর্ভস্থ জলকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে (rain water harvesting)। খরাপ্রবণ অঞ্চলে ভূগর্ভের জল ছাড়া জলের কোন উৎস বৃষ্টিহীন মাসগুলিতে থাকে না। বাঁধ দিয়ে ভূতলে জল সঞ্চয় করা হলে তা ক্ষরিত হয়ে ভূগর্ভের জলভাণ্ডারকে পূর্ণ করে।

আসলে সুষ্ঠু জল-ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। প্রথম ব্যবস্থা—জলের অপচয় রোধ করা। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যেমন মাশুল ও কর আদায় করা হয়, জলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এসেছে। এতে জলের অপচয় ও অযথা ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা—ভূতল ও ভূগর্ভের জলের সুষম ও যুক্ত ব্যবহার (conjunctive use)। সময় হয়েছে সেচের কাজে ভূতল জল যথাসম্ভব কম ব্যবহার করে আরো বেশি ভূগর্ভের জল কাজে লাগানো। এর জন্য ভূগর্ভে লভ্য জলের পরিমাণ নির্ণয় করা দরকার। অনেক রাজ্যেই এবিষয়ে সমীক্ষা হয়েছে। তৃতীয় ব্যবস্থা—লবণাক্ত জলে চাষ বাড়ানো। লবণ-সহিষ্ণু শস্য ও ফলের চাষ সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে করতে পারলে সেচের জলের সাশ্রয় হবে। চতুর্থ ব্যবস্থা—সেচপদ্ধতির পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন। নিস্যন্দ সেচ (drip irrigation) ও প্রোক্ষণ সেচ (sprinkler irrigation) ব্যবস্থায় অনেক কম জলে যথাযথ সেচ করা সম্ভব—বিশেষত খরাপ্রবণ এলাকায় এবং উচ্চাবচ ভূমিতে। নিস্যন্দ সেচে ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে সেচ করা হয়, আর প্রোক্ষণ সেচে জল ছিটিয়ে সেচ দেওয়া হয়। জমির অধঃস্তরের (sub surface) সেচ করেও ভাল ফল পাওয়া যায়। সুবিধা হলো—জল বাষ্পীভূত হওয়ার সম্ভাবনা এতে অনেক কমে যায়। সবসময়ে না করে যথাসময়ে সেচ করা গেলেও জলের সাশ্রয় হওয়া সম্ভব। পঞ্চম ব্যবস্থা—বর্জ্য জলের শোধন ও পুনর্ব্যবহার। ১৯৯৮ সালের একটা সমীক্ষায় প্রকাশ—দেশের ২১২টি শহরে বর্জ্য জলের পরিমাণ ১,২১৪ কোটি লিটার। এই বর্জ্য জল শোধনের ব্যবস্থা অধিকাংশ শহরে নেই; ফলে ব্যবহৃত অশুদ্ধ জল নদীতে বা অন্যত্র যেখানে পড়ে, সেখানকার জল দূষিত হয়। 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান' গঙ্গার দূষণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে ঠিকই, কিন্তু বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনা এই প্রকল্পে নেই। পানীয় ও গৃহকর্মের জন্য ব্যবহার্য জলের পরিশুদ্ধি নিশ্চিত করাটা আবশ্যিক। বর্জ্য জল পুনর্ব্যবহার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে জলের শুদ্ধির ব্যাপারে চূড়ান্ত সতর্কতা নেওয়া দরকার। ষষ্ঠ ব্যবস্থা—বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সমস্যার উৎসে যেতে হবে। বন্যার কারণ মূলত জলবাহী নদীগুলির ধারণক্ষমতার হ্রাস। নদীর ধারণক্ষমতা হ্রাস পায় নদীগর্ভে পলি-সঞ্চয়ের ফলে। পলিসঞ্চয়ের কারণ—নদীর তীরভূমির ভাঙন এবং সেই-সঙ্গে নদীর জলবিভাজিকার (watershed) মৃৎ-আস্তরণের ক্রমাগত ক্ষয়। ক্ষয়িত মৃৎকণা বর্ষার জলে বাহিত হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। তাই নদী-নিয়ন্ত্রণ মানে শুধু তটবন্ধন নয়, নদীর জলবিভাজিকায় মৃৎস্তরের ক্ষয় নিবারণও। এটা সম্ভব যদি অনুর্বর (barren) মাটিতে উদ্ভিদের হরিৎ আস্তরণ সৃষ্টি করা যায়। এটা ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ কাজ। প্রতিটি বন্যাপ্রবণ নদীতে এককালীন পলি খনন করাও দরকার। সপ্তম ব্যবস্থা—বড় বাঁধ তৈরি করে বন্যানিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা এখন প্রকট হয়েছে। নদীর জল সঞ্চয়ের জন্য ছোট ছোট প্রকল্প হাতে নেওয়াই সমীচীন। অষ্টম ব্যবস্থা—জল-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানো। তথ্যের আদানপ্রদান নির্বাধ ও দ্রুত হলে পরিকল্পনা প্রণয়নে অনেক ত্রুটি এড়ানো যাবে। নবম ব্যবস্থা—খরাপ্রবণ অঞ্চলে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে ভূগর্ভে জলের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা। রাজস্থান অঞ্চলে 'জোহড়' দিয়ে জল ধরে রাখার ঐতিহ্য অনেকদিনের। এই ব্যবস্থাকে উন্নত ও আধুনিক করতে হবে। দশম ও শেষ ব্যবস্থা—জল-চেতনার উন্মেষ ঘটানো। জলবাহিত রোগ, জলশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, জলের অপচয় ও অযথা ব্যবহার বন্ধ করা, পরিবেশের ভারসাম্য ও দূষণ, বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদীসংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষের প্রচলিত ধারণাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের ভিত্তিতে হয় বদলে দিতে হবে, নয়তো পরিমার্জিত করতে হবে। সেইসঙ্গে একথাও ঠিক, যেসব মানুষ 'মাটির কাছাকাছি' থাকেন, তাঁদের মতামতও উপেক্ষণীয় নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাযুক্তিক জ্ঞানের সংযোগেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণীত হতে পারে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিসর বিরাট। একটি নিবন্ধে জলব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের আনুপূর্বিক আলোচনা সম্ভব নয়। বারান্তরে সুযোগ হলে সে-প্রয়াস করা যেতে পারে। তবে একটা কথা স্পষ্ট যে, জল নিয়ে এখন থেকে সর্বস্তরে সচেতনতা না এলে আগামী শতাব্দীতে বিশেষ বিপত্তির সম্ভাবনা। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা নিলে সাময়িক ফল হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু শেষপর্যন্ত বিপর্যয় এড়ানো যায় না—একথা মনে রেখেই সরকারকে সকলকে নিয়ে এগোতে হবে।* ❑

* তথ্যসূত্র—সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের বিভিন্ন প্রতিবেদন।

রক্ষিত গুটিবসন্ত-জীবাণু নষ্ট করতে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের আপত্তি

গত আশ্বিন ১৪০৬ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ ডঃ জলধিকুমার সরকার 'বিনাশের পথে বসন্তরোগের জীবাণু' প্রবন্ধে গুটিবসন্ত-রোগমুক্ত পৃথিবীতে এখনো দুটি ল্যাবরেটরিতে ঐ রোগের জীবন্ত ভাইরাস কেন রেখে দেওয়া আছে সেসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রতিবেদনে এবিষয়ে সম্প্রতি পাওয়া আরো কিছু নতুন তথ্য দেওয়া হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সরকারিভাবে ঘোষিত গুটিবসন্ত (smallpox)-ভাইরাসের দুজায়গার মজুত নষ্ট করার যে-পরিকল্পনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিয়েছিল, তা ভীষণভাবে বাধা পেয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন বলেছেন, আটলান্টার 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনসন'-এ রক্ষিত ভাইরাসকে তাঁরা নষ্ট করতে চান না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করেছিল, ১৯৮০ সালে গুটিবসন্ত রোগ নির্মূল করা হয়েছে। তিনবছর আগে ঐ সংস্থা বসন্তরোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস-জীবাণুর শেষ দুটি মজুতকে ধ্বংস করে ফেলার যে-প্রস্তাব দিয়েছিল, তাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-সহ বেশির ভাগ দেশই সমর্থন জানিয়েছিল। দুটি মজুতের অন্যটি আছে রাশিয়ার নোভাসিবিস্ক-এর 'স্টেট রিসার্চ সেন্টার ফর ভাইরোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ভেক্টর'-এ। ভাইরাস রক্ষিত করার সময় থেকেই কথা উঠেছিল, যেকোন প্রতারক দেশ (rogue countries) বা সন্ত্রাসবাদী সংস্থা গুপ্তভাবে (clandestine) ভাইরাসকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। ওয়াশিংটন ডি. সি.-র কাছে 'ব্যাটেলি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট'-এর কেন অ্যালিবেক, যিনি পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়ার জৈব-অস্ত্র কর্মসূচীর (bio-weapon programme) সহাধ্যক্ষ ছিলেন, বলেছেন: "গুটিবসন্ত চরম অস্ত্রের শেষ আশ্রয় হতে পারে।" তাঁর বিশ্বাস যে, ক্লিন্টন ভাইরাস মজুতকে রেখে দিয়ে ঠিকই করেছেন। "ভাইরাস জীবাণু না থাকলে কি করে এর ওষুধ বা টীকা পরীক্ষা করা হবে?" বলেছেন তিনি।

ক্লিন্টনের এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূলে আছে ওয়াশিংটন ডি. সি.-র 'ইনস্টিটিউট অফ মেডিসিন'-এর ১৯৯৯ সালের ২০ মার্চের একটি রিপোর্ট, যাতে বলা হয়েছে—যদি মজুত ভাইরাসকে নষ্ট করে ফেলা হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানের সুযোগ হারিয়ে যাবে। কিন্তু রোড আইল্যান্ডের প্রভিড্যান্সের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কমিটি এই রিপোর্ট লিখেছিল, তার চেয়ারম্যান চার্লস কার্পেন্টার বলেছেন: "এতদিন পর্যন্ত যে-আমেরিকা ভাইরাস-মজুতকে কাজে লাগিয়ে চোরাগোপ্তাদের আক্রমণ প্রতিহত করবার ওষুধ বের করতে পারেনি, তারা এখন ভাইরাস নষ্ট করার ওষুধ (antivirals) তৈরি করতে উদ্যোগী হবে—এমন মনে করি না।" রাশিয়া তো সবসময় ভাইরাস-মজুত নষ্ট করার বিরোধিতা করে এসেছে; সে-অবস্থায় আমেরিকার এই মজুত রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্তের অর্থ হচ্ছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা।

রাশিয়ার উপরিউক্ত রিসার্চ সেন্টারের ডাইরেক্টর লেভ স্যান্ডাখচিয়েভও ভাইরাস-মজুত নষ্ট করার বিরুদ্ধে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, নষ্ট না করে বরং তাঁর ইনস্টিটিউট-এ গুটিবসন্ত গবেষণার আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হোক। চোরাগোপ্তার আশঙ্কা ছাড়াও তাঁর আরেকটা ভয় আছে যে, ভবিষ্যতে গুটিবসন্ত অথবা ঐধরনের কোন অসুখ ঐ-গোত্রীয় অসুখ বা বানরবসন্ত থেকে উদ্ভূত হতে পারে। স্যান্ডাখচিয়েভ আরো বলেছেন: "গুটিবসন্ত-সদৃশ রোগ উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনাকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল তা আমরা দিইনি (underestimated)। বসন্তরোগ নির্মূল হয়ে যাওয়ায় ঐ ভাইরাসের ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। ঐ ভাইরাস সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান—যা হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে আশাতীতভাবে কম।"

ধরে নেওয়া হয় যে, কোন জন্তুর বসন্ত রোগ থেকে মানুষের গুটিবসন্ত রোগ উদ্ভূত হয়েছে। স্যান্ডাখচিয়েভ বলেন, লোকে এখন আর বসন্ত টিকা নেয় না; তার ওপর এইডস রোগের এইচ. আই. ভি. ভাইরাস শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে গুটিবসন্ত আবার ফিরে আসার সুবর্ণসুযোগ হয়েছে। তিনি মধ্য আফ্রিকাতে মানুষের বানরবসন্ত হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, এথেকে বোঝা যাচ্ছে—বানরবসন্ত ভাইরাস মানুষ থেকে অন্য মানুষে সংক্রমণক্ষমতা লাভ করছে। **[New Scientist, 1 May 1999, p. 12]**

স্বাস্থ্য-পরিকল্পনায় স্থূলকায়ত্ব-সমস্যার অন্তর্ভুক্তি

'দ্য ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ ওবেসিটি'—যার মধ্যে আছেন চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ—তাঁরা ইতালির মিলান শহরে অনুষ্ঠিত অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় সরকারের কর্মসূচীর মধ্যে স্থূলকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছেন। অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জাপ সিডেল বলেছেন: "ইউরোপে মোটা হওয়া নিবারণে এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ মোটা হওয়া প্রতিরোধে গুরুত্ব দেয় না বলে, এর প্রতিরোধে যে খরচ হয়, রোগীরা তার পরিশোধ (reimbursement) পায় না।" **[British Medical Journal, 12 June 1999, p. 1574]** ❑

সহজ ভাষায় মূল রামায়ণের মনোজ্ঞ উপস্থাপন

সচ্চিদানন্দ ধর

রামায়ণ কথা—স্বামী তথাগতানন্দ। প্রকাশক ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩। ৪র্থ সং। পৃষ্ঠা ঃ ১৫৯+১২। মূল্য ঃ ২০ টাকা।

রামায়ণ ভারতবর্ষের অন্যতম জাতীয় মহাকাব্য। "একাধারে ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য এবং ইতিহাস।" বর্ণাশ্রমধর্ম-শাসিত ভারতীয় সমাজের গার্হস্থ্য আশ্রমের আদর্শ জীবনযাত্রার অনুশাসন রামায়ণের চরিত্রগুলির মধ্যে অতি সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। যেরূপ জীবনচর্যা ও লোকব্যবহার দ্বারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সমাজজীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা যায়, তারই দৃষ্টান্ত আছে রামায়ণের প্রতিটি মুখ্য ও গৌণ চরিত্রে। রামায়ণে বর্ণিত 'রামরাজত্ব' এবং রাম-সীতাদি চরিত্রই হচ্ছে ভারতীয় চিন্তার উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা।

মহাকবি বাল্মীকির দৃষ্টিতে 'নরচন্দ্রমা', 'মানুষ' রামচন্দ্রই কাব্যের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর জীবনকথাকে অবলম্বন করেই গ্রথিত হয়েছে একটি পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ। এই গার্হস্থ্য আদর্শই পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভ্রাতা, প্রভু-ভৃত্য, শত্রু-মিত্র, রাজা-প্রজা—সকলের পারস্পরিক কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণের আদর্শ-শাসিত সমাজ এবং পরিবারই হচ্ছে ভারতে গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ।

দুর্ভাগ্যক্রমে রামায়ণ-মহাভারতের ত্যাগ এবং সেবার এই আদর্শটি ভারতবর্ষের জনজীবন থেকে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়ার জন্যই নানা পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি দেখা দিয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকার স্বামী তথাগতানন্দ বর্তমান সমাজজীবনের এই আদর্শবিস্মৃতির দুর্ভাগ্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেই গার্হস্থ্য জীবনে আবার সেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মূল বাল্মীকি-রামায়ণকে অনুসরণ করে, রামায়ণের চরিত্রগুলিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন।

লেখক বলছেন ঃ "আমি ভক্তের মন নিয়ে রামায়ণ পাঠ করেছি।... মূল বাল্মীকি-রামায়ণই এই গ্রন্থের উপজীব্য। বলতে গেলে ইহা বাল্মীকি-রামায়ণেরই অতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা।" চরিত্রগুলির উপস্থাপনা এবং বিশ্লেষণ অনবদ্য। ইহাতে মূল রামায়ণের উদ্ধৃতি থাকায় তা গবেষক এবং জিজ্ঞাসু পাঠকদেরও বহুল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করবে। 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রামলালা', 'স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীতে রামায়ণ-প্রসঙ্গ', 'রবীন্দ্র রচনায় রামায়ণ-প্রসঙ্গ', 'রামায়ণী শক্তি' এবং মূল্যবান 'পরিশিষ্ট' গ্রন্থটির মহিমা এবং উপযোগিতাকে আরো বর্ধিত করেছে।

মূল রামায়ণ-ভিত্তিক, কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের আনন্দদায়ী, সুন্দর ছাপা, কাগজ ও আঙ্গিকে নিবদ্ধ, নামমাত্র মূল্যে বিতরিত এই গ্রন্থখানির জন্য আমরা গ্রন্থকার এবং প্রকাশক উভয়ের নিকটই কৃতজ্ঞ। □

ক্যাসেট সমালোচনা

শ্রবণমঙ্গলম্

স্বামী দিব্যব্রতানন্দ

নামের তরণী বেয়ে
পরিবেশক—চয়েস ইন্টারন্যাশনাল
২৯/১বি চাঁদনী চক স্ট্রীট
কলিকাতা-৭২
গীতিকার—মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী
সুরকার—পরিমল মুখার্জী
কণ্ঠ—বহ্নিশিখা চক্রবর্তী
মূল্য—৩০ টাকা

বর্তমান যুগে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁদের নিয়ে প্রচুর গ্রন্থ, গান, কবিতা, নাটক, গীতিনাট্য, চলচ্চিত্র প্রভৃতি রচিত হয়েছে। ইদানীংকালে গানের ক্যাসেটও খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রচলিত ভক্তিগীতিগুলির জনপ্রিয়তা বরাবরই ছিল। বর্তমানে প্রচলিত ভক্তিগীতিসমূহের পাশাপাশি ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে নিয়ে রচিত গানগুলির জনপ্রিয়তাও ক্রমবর্ধমান। বিগত দেড়-দুই দশক ধরে তাঁদেরকে নিয়ে ভক্তিরসাশ্রিত গীতিনাট্য ও গানের প্রচুর ক্যাসেট বের হয়েছে এবং এই ক্যাসেট প্রকাশ এখনো অব্যাহত আছে। যাঁরা এই ত্রয়ীকে নিয়ে গান, কবিতা প্রভৃতি রচনা করেন তাঁরা সকলেই যে গীতিকার বা কবি হিসাবে সুপরিচিত, এমন নয়; বহু অখ্যাত গ্রাম্য কবি ও গীতিকার এখন ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে নিয়ে গান ও কবিতা রচনা করছেন। এমনই একজন গীতিকার ঠাকুর ও মায়ের ওপর তাঁর স্বরচিত দশটি গান ক্যাসেট-বন্দী করেছেন 'চয়েস ইন্টারন্যাশনাল' থেকে। ভক্তিগীতির ক্যাসেটের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন সংযোজন।

'নামের তরণী বেয়ে' শীর্ষক এই ক্যাসেটটি গায়িকা বহ্নিশিখা চক্রবর্তীর গায়নশৈলীতে সুখশ্রাব্য হয়েছে। সুকণ্ঠের অধিকারিণী গায়িকার কণ্ঠে সুর যথেষ্ট থাকায় গানগুলি প্রাণবন্ত হয়েছে। খাম্বাজ রাগে গাওয়া 'শ্রীমা-পাদপদ্মদলে' গানটিতে ভক্তিভাবের সাথে খাম্বাজ রাগের রূপটি সুন্দর ফুটিয়েছেন গায়িকা বহ্নিশিখা চক্রবর্তী। আহির ভৈরবে গাওয়া 'শ্বাসে-প্রশ্বাসে দাও গো আমায়...' গানটিও অনবদ্য। গানের কথা হিসাবে গীতিকার একটু কঠিন শব্দ চয়ন করলেও শব্দগুলি যথার্থই হয়েছে। বেহাগে গাওয়া 'কত কৃপা বারে বারে' গানটিও শুনতে ভাল লাগে। ভৈরবীতে গাওয়া প্রথম গানটি শুনতে ভাল লাগলেও পরের গানটি 'তুলসী আর বিল্বদলে' শ্রোতাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করবে। গানটির ভাষা ও যন্ত্রানুষঙ্গ ভক্তিগীতির পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ হয়নি। ফলে একটু রসভঙ্গ হয়েছে। মিশ্র হংসধ্বনির সুরে গাওয়া 'তুমি চণ্ডী বেদমূলা' গানটি সর্বাধিক শ্রুতিমধুর। হাম্বিরে গাওয়া 'হৃদয় তোমার পুণ্যতীর্থ মথুরায় মদিনায়' গানটি শুনতে ভাল লাগে। গানগুলি সাজানোর ক্ষেত্রে আরেকটু নজর রাখলে আরো ভাল হতো। গায়িকার সুকণ্ঠের জন্য ক্যাসেটটি আগাগোড়া শুনতে শ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ করবে। ক্যাসেটটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ক্যাসেটে আগমনী-সঙ্গীত

নন্দলাল অধিকারী

আগমনী
পরিবেশক ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ
মুখবন্ধ রচনা—স্বামী অচ্যুতানন্দ
সঙ্গীতায়োজন—রামকৃষ্ণ পাল
কণ্ঠ—স্বামী দিব্যব্রতানন্দ ও বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়
মূল্য—৩০ টাকা

বেলুড় মঠের সারদাপীঠ প্রযোজিত বিখ্যাত ১২টি আগমনী গানের সঙ্কলন সম্প্রতি ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গানগুলি সবার কাছে সমাদৃত হবে আশা রাখি। যদিও ক্যাসেটের বি-সাইডটি প্রথমার্ধে রাখলেই ভাল হতো। স্বামী দিব্যব্রতানন্দজীর গানগুলি সকলের প্রশংসা পাবে নিঃসন্দেহে।

ক্যাসেটে গীতা-সমগ্র

নন্দলাল অধিকারী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চার খণ্ড)
পরিবেশক ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ ❑ সঙ্গীতায়োজন ও কণ্ঠ—স্বামী সর্বগানন্দ
পাঠ—প্রীতম খান্না (হিন্দি) ও দেবাশিস বোস (বাঙলা) ❑ মূল্য—৩০ টাকা (প্রতি খণ্ড)

সনাতন ধর্মের চিরন্তন সুরই হলো আমাদের গীতা ও উপনিষদের বিষয়বস্তু এবং আজ সারা বিশ্বের আকর্ষণীয় অনুধ্যানের বিষয়। সম্প্রতি সারদাপীঠ প্রকাশিত গীতার অমূল্য চারটি ক্যাসেট সেই সনাতন সুরেই ঝঙ্কৃত। গীতার মর্মবাণী সর্বকালের সর্বজনের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয় ও আদরণীয় বস্তু। গীতার শাশ্বত বাণীর শ্লোকগুলি চারটি ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রকাশ করে সর্বসাধারণের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ। তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে গীতার এই মর্মবাণী সবার অন্তরে ধ্বনিত হয়ে আলোর পথ দেখাবে। ক্যাসেটগুলির ভাষা, গ্রন্থনা, সঙ্গীতে এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অমূল্য সম্পদরূপী গীতার ক্যাসেটগুলি সর্বকালের সকল ধর্মের, সকল মানুষের কাছে গ্রহণীয়, আদরণীয় ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ১৬-২০ অক্টোবর '৯৯ মহাসমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার কয়দিন প্রবল বৃষ্টিপাত এবং কুমারীপূজার দিন ঝড়-বৃষ্টির জন্য কমসংখ্যক ভক্তের উপস্থিতি দেখা গেলেও সারা উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। চারদিনে প্রায় ৫০,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

বেলুড় ভিন্ন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলি মহাসমারোহে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন করে : আঁটপুর, আসানসোল, বারাসত, কাঁথি, ধলেশ্বর (আগরতলার অন্তর্ভুক্ত), গুয়াহাটী, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদা, মনসাদ্বীপ, মেদিনীপুর, মুম্বাই, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জির শাখাকেন্দ্র), শিলং, শিলচর ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে (বিহার) গত ৩ অক্টোবর '৯৯ 'শান্তানন্দ কুটির' নামে সাধুদের নির্জনবাসের জন্য একটি কুটিরের পুনরুদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

হিমালয়স্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের (জেলা—চম্পাবত, উত্তরপ্রদেশ) পরিচালনায় গত ৪ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর '৯৯ পর্যন্ত আশ্রমের শতবর্ষপূর্তির কর্মসূচী (দ্বিতীয় পর্যায়) অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'প্রশ্নোত্তরী' অঙ্গসমেত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ' শীর্ষক এক বক্তৃতামালা (হিন্দিতে) ঐ জেলার নির্বাচিত আটটি কলেজে ও পাঁচটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়েছে। মুখ্য বক্তা ছিলেন স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দ। নিকটবর্তী শহর লোহাঘাটে এই উপলক্ষ্যে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। বিশিষ্ট মাননীয় অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নবীনচন্দ্র শর্মা। অদ্বৈত আশ্রম-ভূমিতে দুদিন দুটি আধ্যাত্মিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। একটিতে ১৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী এবং অন্যটিতে ৫২ জন ধর্মপিপাসু ভক্ত নরনারী অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক শিবিরে অংশগ্রহণকারীকে, ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকবর্গকে এবং কলেজগুলিতে বিনামূল্যে প্রেরণাপ্রদ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক পুস্তিকা বিতরিত হয়েছে। কয়েকটি নির্বাচিত কলেজে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ উপহাররূপে প্রদত্ত হয়েছে।

রামহরিপুর মিশন আশ্রম (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২২ অক্টোবর '৯৯ একটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলনের আয়োজন করে। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' এবং স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ, ভাষণ, ভজন ও ভক্তিগীতি ছিল সম্মেলনের আকর্ষণীয় বিষয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ। তিনি সভাপতির ভাষণে বলেন : মানুষের চারটি অবস্থা—অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব। দেবত্বের বিকাশসাধনই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ বলেন : মানুষের মধ্যে শুভ ও অশুভ শক্তি ক্রিয়া করছে। অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে শুভশক্তির উন্মেষ ঘটানোর জন্য আন্তরিকভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এরপর 'যত মত তত পথ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক আব্দুর রওফ। স্বাগত-ভাষণ দান করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। সম্মেলনে কয়েকজন ভক্ত সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন এবং ভজন পরিবেশন করেন। আশ্রমের আশপাশের গ্রাম ও শহর থেকে ২৭১ জন ভক্ত নরনারী সম্মেলনে যোগদান করেন।

সরিষা মিশন আশ্রম (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) সংস্কৃত সাহিত্য প্রসারের জন্য গত ৯ অক্টোবর '৯৯ একটি গীতা-আবৃত্তি প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে। এতে স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১২০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। দুটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক বিভাগের প্রথম তিন স্থানাধিকারীকে বিশেষ পুরস্কার এবং পাঁচজনকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ।

রাজকোট আশ্রম (গুজরাট) দুদিনব্যাপী আধ্যাত্মিক-শিবির পরিচালনা করেন। শিবিরে ভাষণ দান করেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি-সহ গুজরাটের রাজস্বমন্ত্রী বজুভাই বালা। এছাড়া এই আশ্রম দায়ুদ জেলার নিমচ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ করে।

চক্ষু-চিকিৎসা শিবির

পুরী মঠ (ওড়িশা) গত ৪-১২ অক্টোবর '৯৯ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে প্রায় ২৫০ জনকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয় এবং ৩০ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

লিমডি আশ্রম (গুজরাট) গত ২১ অক্টোবর '৯৯ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১৩৬ জনের প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয় এবং ২০ জনের চোখ অস্ত্রোপচার করা হয়।

করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসমিতির (আসাম) ব্যবস্থাপনায় গত ২৯ অক্টোবর '৯৯ থেকে ২ নভেম্বর '৯৯ একটি বিনামূল্যে চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিলচর মেডিকেল কলেজের চক্ষুবিভাগের প্রধান ডাঃ এইচ. কে. চৌধুরীর নেতৃত্বে ও স্থানীয় চক্ষুবিভাগের ডাঃ অরিজিৎ দাসের সহায়তায় ৭০০ রোগীর চক্ষু পরীক্ষা ও ঔষধ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১২৯ জনের চক্ষু-অস্ত্রোপচার করা হয়। গত ১২ ডিসেম্বর রোগীদের চশমা দেওয়া হয়। এবছরে এটি ছিল সেবাসমিতি পরিচালিত দ্বিতীয় চক্ষুচিকিৎসা-শিবির। উল্লেখ্য, এই শিবিরের সমস্ত ব্যয় জনসাধারণের সাহায্য ও দানের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়েছে।

ত্রাণ

ওড়িশা ঝঞ্ঝাত্রাণ

ভুবনেশ্বর আশ্রমের মাধ্যমে ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৫০০ মানুষকে আশ্রমের বিদ্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা করে কয়েকদিন ধরে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া এই আশ্রম খুরদা জেলার অন্ধরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৫০ জন ঝঞ্ঝাকবলিত মানুষের মধ্যে কয়েকদিন ধরে চিঁড়ে ও চিনি বিতরণ করেছে।

পুরী মিশন আশ্রম পুরী সদর ও গপ ব্লকের ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত মানুষের মধ্যে ধুতি, শাড়ি, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ ঘূর্ণিঝড়-ত্রাণ

চণ্ডীপুর মঠ (জেলা—মেদিনীপুর) মঠের আশপাশের ঘূর্ণিবাত্যা-কবলিত মানুষের মধ্যে চিঁড়ে, গুড় বিতরণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

জলপাইগুড়ি আশ্রমের মাধ্যমে দীনহাটা ও পহারপুর মহকুমার ১,৮০০ বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

মালদা আশ্রম ইংলিশবাজার ব্লকের ২,০০০ বন্যার্ত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

সারগাছি আশ্রম মুর্শিদাবাদ জেলার মন্ডলা ও পুরন্দরপুর গ্রামে ১০ দিন ধরে ১,২৬০ জন বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের মধ্যে চিঁড়ে ও গুড় এবং ৭ দিন ধরে ২,৫০০ মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

বেলুড় মঠের মাধ্যমে নদীয়া জেলার নবদ্বীপের ২৫টি গ্রামের ৬,০০০ বন্যার্ত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে এবং দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৩,০৭৩ কিলোঃ চিঁড়ে ও ৭৪৭ কিলোঃ গুড় বিতরিত হয়েছে।

আসানসোল আশ্রম বর্ধমান জেলার গুসকরা, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, কাটোয়া প্রভৃতি গ্রামের ৪১,১৪২ জন বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৯ দিন ধরে খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ) হুগলী জেলার বেরাবেরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪,৮১২ জন বন্যার্ত মানুষের মধ্যে ৮ দিন ধরে খিচুড়ি এবং ২৩৬টি পলিথিন শীট বিতরণ করেছে। এছাড়া এই আশ্রমের মাধ্যমে হাওড়া জেলার আনন্দনগর অঞ্চলের ৮,৭১২ জন বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ২,৩৫০ কিলোঃ চিঁড়ে ও ৯৬৪ কিলোঃ গুড় এবং ডোমজুড়ে ২ দিন ধরে ৬২৬ কিলোঃ চিঁড়ে ও ৩১২ কিলোঃ গুড় বিতরণের পর ৬ দিন ধরে প্রত্যহ ২,৭৪৮ জন মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

ইছাপুর মঠের মাধ্যমে হুগলী জেলার কিশোরপুর, ঘোষপুর, ঠাকুরানীচক ও মনসুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫,৩১২ জন জলবন্দী মানুষের মধ্যে ৮,৫০০ কিলোঃ চিঁড়ে, ২,১০০ কিলোঃ গুড়, ৫০৩ কিলোঃ চাল এবং ৫০০ শাড়ি, ৫০০ ধুতি ও ৫০০ লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

আঁটপুর মঠ হুগলী জেলার চিংড়া ও আরাণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬টি গ্রামের ২,৫০০ বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৮ দিন ধরে খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

বেলুড় মঠ বারাসত মঠের সহযোগিতায় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁও, গোপালনগর ও অশোকনগরে ৪০টি ত্রাণ শিবিরের মাধ্যমে ১,৫০০ বন্যার্ত মানুষকে একটি করে ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, তোয়ালে ও কম্বল দেওয়া হয়েছে।

মেদিনীপুর আশ্রম ঘাটাল মহকুমার ৬,৬৬৩ জন বন্যাক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে ৫,৩৩৯ কিলোঃ চিঁড়ে, ১,৫৮৯ কিলোঃ গুড় ছাড়াও ৫ দিন ধরে খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

কাঁথি আশ্রম মেদিনীপুর জেলার নয়পুর ও গোকুলপুর অঞ্চলের ১৪টি গ্রামের ৭০৮টি বন্যার্ত পরিবারের মধ্যে ১২০৪টি শাড়ি, ৫৬৪টি ধুতি, ৩০০ চাদর, ৬০৪টি লুঙ্গি, ৬০৪টি তোয়ালে ও ৬০৪টি মাদুর বিতরণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ দুঃস্থত্রাণ

রামহরিপুর আশ্রমের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও বর্ষণ-কবলিত দুঃস্থ মানুষের ঘর নির্মাণের জন্য ঘরছাওয়ার খোলা ও বাঁশ বিতরণ করা হয়েছে।

তামিলনাড়ু দুঃস্থত্রাণ

নেত্রামপল্লী আশ্রমের মধ্যে ভেল্লোর জেলার নিলয়ুর, মোল্লাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ১৫টি গ্রামের ৫,৩৭০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৮,৯৯৪টি পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) বাংলাদেশের ২০টি গ্রামের বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৫০০ কিলোঃ চাল এবং ২০৬টি শাড়ি, লুঙ্গি ও ধুতি বিতরণ করেছে। ত্রাণের কাজ এখনো অব্যাহত রয়েছে।

দুর্গাপূজা

বাংলাদেশের বালিয়াটি, বরিশাল, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও সিলেট আশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা মঠে (বাংলাদেশ) চারদিন ধরে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার বিভিন্ন দিনে বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিদেশমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ প্রমুখ মন্ত্রিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

মরিশাস আশ্রমে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজায় মরিশাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এ. ভি. চেত্তায়ার ও মরিশাসে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত মণিলাল ত্রিপাঠি অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা ঃ গত ১৭ নভেম্বর বুধবার পূজা, হোম ও সাধুসেবার মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২০ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের এবং ২২ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই দুই তিথিতে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দ।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা ঃ সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার 'ভাগবত' ও অন্যান্য বৃহস্পতিবার 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন স্বামী সনকানন্দ। প্রথম শুক্রবার 'ভক্তিপ্রসঙ্গ' আলোচনা করছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার 'মাতৃপ্রসঙ্গ' আলোচনা করছেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। প্রথম ও তৃতীয় রবিবার 'গীতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে (১৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬) গত ৮ অক্টোবর '৯৯ সন্ধ্যা ৭টায় 'ইন্দ্রনারায়ণ-বিভাবতী মিত্র স্মারক ভাষণ' দেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ভাষণের বিষয় ছিল: 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনুধ্যান'। গত ১৫ অক্টোবর বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী, স্বামী বিবেকানন্দের মানসপুত্রী ভগিনী নিবেদিতার ১৩৩তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে সোসাইটি-ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নির্মাল্য বসু। উদ্বোধনী-সঙ্গীত পরিবেশন করেন পারমিতা বিশ্বাস।

আকালিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম (জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৯ অক্টোবর '৯৯ মহালয়ার দিন শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি এবং শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণ-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সেবাযজ্ঞ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ এবং পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রাম চ্যাটার্জী, কৃষ্ণা দাস ও স্বপ্না দত্ত। 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' ও স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের 'মন্ত্রদীক্ষা' গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দ ও ব্রহ্মচারী সারদাচৈতন্য। এই উপলক্ষ্যে সাধু ও ভক্ত-সেবা এবং প্রায় ৪০০ দরিদ্র বালক-বালিকার মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হয়।

হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৯ অক্টোবর '৯৯ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বস্ত্র-বিতরণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। বিভিন্ন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে ১০৫টি শাড়ি, ৩৫টি ধুতি ও ৪৫টি জামা বিতরণ করা হয়। এইদিন আশ্রমে বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সম্পাদক দেবব্রত মুখার্জী।

রেটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে (বনগাঁ, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ৯ অক্টোবর '৯৯ মহালয়ার দিন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদা-স্বামী বিবেকানন্দ বন্দনা ও জগন্মাতার আহ্বান' আয়োজিত হয়। সকাল ১০টা থেকে পূজা, পাঠ, সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৯ অক্টোবর '৯৯ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, আগমনী সঙ্গীত ও ভজনের মাধ্যমে মহালয়া তিথি পালন করে। অনুষ্ঠানে মহালয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সেবদেবানন্দ ও গড়বেতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী লোকেশানন্দ। এই উপলক্ষ্যে ৩৫ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি এবং ২৯ জন দরিদ্র ছাত্রের মধ্যে স্কুল-ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়। আলোচনা-শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রমের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেবাশ্রমের সহ-সভাপতি অচিনকুমার মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

অনাথনাথ দেব ট্রাস্ট এস্টেট ও সাধককবি রামপ্রসাদ স্মরণ সমিতির সহযোগিতায় কথামৃত পাঠচক্র আয়োজিত 'ছাতুবাবু-লাটুবাবুর ঐতিহ্যবাহী ঠাকুরবাড়ি'তে (৬৭ই বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬) গত ১০ অক্টোবর '৯৯ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও অনুধ্যান প্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তার আগে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দেবাশিস দত্ত।

বেলডাঙ্গা সারদা-রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ অক্টোবর '৯৯ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ। এই উপলক্ষ্যে ২৮ জন দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ অক্টোবর '৯৯ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা এবং আগমনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহদেব পুরকাইত ও অলোককুমার দাস।

অগ্রণী (৬৬ পূর্বাচল মেন রোড, কলকাতা-৭০০০৭৮) গত ১০ অক্টোবর '৯৯ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমিতে একটি বিবেকানন্দ ছাত্র-যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনটি দুটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বিবেকানন্দ-বন্দনার মাধ্যমে। এরপর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন এবং বক্তব্য রাখেন কয়েকজন শিক্ষক ও যুব-প্রতিনিধি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ। বিরতির পর 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় অধিবেশনের সূচনা হয়। এই অধিবেশনে কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র-প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। এরপর অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তরপর্ব। ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রমেন দে। সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কৌশিক মজুমদার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (খড়ার, জেলা—মেদিনীপুর) গত ১০ অক্টোবর '৯৯ সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে এক বস্ত্র-

বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী অকল্মষানন্দ। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক কমলকুমার মান্না ও পরমানন্দ সাহু। সভায় সভাপতিত্ব করেন শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে ৪৬ জন দুঃস্থ নরনারী ও ৩৫ জন দুঃস্থ বালিকার মধ্যে নতুন বস্ত্র ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

খড়িয়প শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমবিহার আশ্রম (আমতা, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৪-১৯ অক্টোবর '৯৯ শ্রীমা সারদাদেবীর পটে দুর্গাপূজার আয়োজন করে। ১৪ অক্টোবর পঞ্চমীর সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে পূজানুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে অনুভা চ্যাটার্জী, শিখা ব্যানার্জী এবং সুস্মিতা ঘোষ প্রমুখ প্রেমবিহারের কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী যোগদান করেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। বৈদিক স্তোত্রপাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'মায়ের কথা' ও 'কথামৃত' পাঠ প্রভৃতি ছিল পূজানুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। এই উপলক্ষ্যে ৬ দিন ধরে দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ, মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ এবং সর্বসাধারণকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিতরণ করা হয়। ডি. জি. (আই. বি) দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রপাঠ ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ। অনুষ্ঠানে প্রতি সন্ধ্যায় আশ্রমের অনাথ ছাত্ররা মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করে। শ্রীশ্রীমায়ের পূজা দর্শনের জন্য সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে বহু জ্ঞানী-গুণী, শিল্পী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাগম হয়েছিল। প্রার্থনা-মন্দিরের বাইরে সুসজ্জিত একটি মণ্ডপে শ্রীমা সারদাদেবীর একটি বড় পট রাখা হয়েছিল। তার পাশে গ্রামবাসীরা পরিবারসমন্বিতা মহিষাসুরমর্দিনীর প্রতিমাও রেখেছিলেন। সেখানে পাঠ-ভজনাদি পরিবেশিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমেরিকা থেকে স্বামীজী এক পত্রে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজকে লিখেছিলেন: "বাবুরামের মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন; দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম।" যুগাচার্যের সেই মহাবাণীর বাস্তব রূপায়ণের জন্য এবছর (১৯৯৯) থেকে **খড়িয়প শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমবিহার আশ্রম** শ্রীমা সারদাদেবীর পটে দুর্গাপূজার সূচনা করে।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৪ অক্টোবর '৯৯ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা, পোশাক বিতরণ ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির প্রদত্ত পোশাক ১০টি গ্রামের প্রায় ৮০০ দুঃস্থ ছেলেমেয়ের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২ জন প্রতিবন্ধীকে ২টি সাইকেল ও পোশাকাদি দেওয়া হয়। বিতরণ করেন জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ, ক্যালিফোর্নিয়া হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বদেবানন্দ ও বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের সম্পাদক স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ। বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী অমেয়ানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দান করেন স্বামী সর্বদেবানন্দ ও স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ। সভাশেষে সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (শোণিতপুর, আসাম) গত ১৬-২০ অক্টোবর '৯৯ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ৭০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ১০ জন দরিদ্র মানুষকে নতুন কাপড় ও ১ জন ক্যান্সার রোগীকে ১,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর) গত ১৭ অক্টোবর '৯৯ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মহাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের পটে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, মাতৃগীতি, কুমারীপূজা ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' থেকে পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও চণ্ডীপাঠ করেন চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য। 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন সেবাশ্রমের সভাপতি ধরণীমোহন পাল এবং মাতৃগীতি পরিবেশন করেন ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী। পূজাশেষে সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা।

বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (কাঁচড়াপাড়া, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২২ অক্টোবর '৯৯ প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও একটি বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্রছাত্রীকে 'শ্রীমা সারদাদেবী' বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রদান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে (রাউরকেলা, ওড়িশা) গত ২৪ অক্টোবর '৯৯ একটি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা, পাঠ ও ভক্তিগীতি ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। প্রদীপ জ্বেলে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর স্বাগত-ভাষণ দান করেন সঙ্ঘের সভাপতি নরেশচন্দ্র নায়ক। সম্মেলনের তাৎপর্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' এবং স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ করেন বিজনকুমার মজুমদার, দেবযানী পাঠক, মিতা সান্যাল এবং পারমা সান্যাল। সম্মেলনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ছবি দাস, জ্যোতির্ময় আচার্য, মালা দাশগুপ্ত ও সারদা পাঠচক্রের সদস্যারা। এরপর 'উদ্বোধন'-এর জনপ্রিয়তা বিষয়ে আলোচনা করেন অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরুণ রায়চৌধুরী। সম্মেলনে প্রায় শতাধিক ভক্ত যোগদান করেন। সকলকে দ্বিপ্রাহরিক প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অজন্তা ঘোষ।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০৪৫) গত ২৮ অক্টোবর '৯৯ ভগিনী নিবেদিতার জন্মোৎসব পালন করে। সকাল ৮.৩০ মিনিটে ভগিনী নিবেদিতার মূর্তিতে মাল্যদান করে উৎসবের সূচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর অপর একটি অনুষ্ঠানে সকাল ৯টায় বৈদিক মন্ত্রপাঠ, সঙ্ঘমন্ত্র পাঠ, সঙ্গীত এবং 'ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী' থেকে পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। নিবেদিতা ব্রতী

সঙ্ঘ পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। তাদের হাতে নতুন পোশাক ও মিষ্টি তুলে দেন প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা। তারপর তিনি বর্তমান সমাজে নিবেদিতার ভাবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা, 'ভোগে শান্তি নেই, ত্যাগেই শান্তি' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মঞ্জু মুখার্জী প্রমুখ সঙ্ঘসদস্যাবৃন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাধবী ঘোষ।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (জেলা—বীরভূম) গত ৩১ অক্টোবর '৯৯ বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজা, পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অঙ্গ। সম্মেলনে বিজয়ার মহিমা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন পাঠচক্রের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক শক্তিচরণ চট্টরাজ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরুণিমা রায়, রীয়া মণ্ডল, মিঠু মণ্ডল ও দীপিকা রায়। সম্মেলনে স্বামী সেবাত্মানন্দ এবং প্রায় শতাধিক ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন। সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বহির্ভারত

বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টার (৩৭৩ হ্যানবারি স্ট্রীট, লণ্ডন, যুক্তরাজ্য) গত ২৭ নভেম্বর '৯৯ বিকাল সাড়ে ৪টায় এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। বিষয় ছিলঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা'। বক্তব্য রাখেন বোর্ন এন্ড (ইংল্যান্ড) রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার-এর অধ্যক্ষ স্বামী দয়াত্মানন্দ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, আসানসোল-নিবাসী মদনমোহন দাস গত ১১ সেপ্টেম্বর '৯৯ সকাল ৯.২৫ মিনিটে ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে আসানসোল হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠ প্রভৃতি কেন্দ্রে তাঁর যাতায়াত ছিল। অমায়িক ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত রামলোচন মুখোপাধ্যায় গত ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৯ রাত ৮.০৫ মিনিটে ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তিনি ছিলেন অকৃতদার, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সমাজসেবী ও 'অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শে ছিল তাঁর অকুণ্ঠ নিষ্ঠা।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সিঁথি-নিবাসী সুশীতল রায় গত ১৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ সন্ধ্যা ৫.৪৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য মোহিতকুমার ব্যানার্জী মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ বিকাল ৩.২০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। গুয়াহাটী রামকৃষ্ণ মিশনের নানা উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য রতিকান্ত মণ্ডল গত ২৮ সেপ্টেম্বর '৯৯ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ত্রিপুরার ধর্মনগর-নিবাসী ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২০ অক্টোবর '৯৯ রাত ১.৫০ মিনিটে ৭৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'ধর্মনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি'র সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সমিতির জন্য বহু উন্নয়নমূলক কাজও করেছেন। তিনি ছিলেন 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক। অমায়িক ব্যবহার ও সরলতার জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা দীপ্তি মিত্র গত ২৪ অক্টোবর '৯৯ রাত ৯.১০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগ, সদাহাস্যময়তা ও সহজ-সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা মহামায়া সরকার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৬ অক্টোবর '৯৯ বেলা ১.২০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি মুগমা ডিনোবিলি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য প্রমদারঞ্জন দে গত ৬ নভেম্বর '৯৯ রাত ১২.৪৮ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একনিষ্ঠ গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। ১৯৫৯ সাল থেকে স্থানীয় পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী কৈলাসানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য চুঁচুড়া-নিবাসী কাশীনাথ বসু রায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১০ নভেম্বর '৯৯ রাত ১.১৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি চুঁচুড়ার 'প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ'-এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বেলুড় মঠ ও মঠের বিভিন্ন কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেবাদান করেছেন। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ও পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান নিবোধত"

১০১তম বর্ষ

মাঘ ১৪০৫ থেকে পৌষ ১৪০৬
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৯

সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

❑ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : পঁয়ষট্টি টাকা ❑ সডাক : পঁচাত্তর টাকা ❑ প্রতি সংখ্যা : আট টাকা ❑
❑ শারদীয়া সংখ্যা : চল্লিশ টাকা ❑

উদ্বোধন

১০১তম বর্ষ

মাঘ ১৪০৫—পৌষ ১৪০৬ ❑ জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৯

বর্ষসূচী

দিব্য বাণী ❑ ১, ৫৩, ১০৫, ১৫৭, ২০৯, ২৬১, ৩১৩, ৩৬৫, ৪১৭, ৫৮১, ৬৩৩, ৬৮৫

কথাপ্রসঙ্গে ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

ধন্য 'উদ্বোধন'—২, ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ—৫৪, তত্ত্ব ও প্রয়োগের চিরন্তন সমস্যা—১০৬, তত্ত্ব ও প্রয়োগ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা—১৫৮, তত্ত্ব ও প্রয়োগ : আরো কিছু কথা—২১০, তত্ত্ব ও প্রয়োগ : শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী—২৬২, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী : নির্বিবাদ ১—৩১৪, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি—৩৬৬, শক্তিপূজার উৎস সন্ধানে—৪১৮, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণি এবং প্রসঙ্গত—৫৮২, আদর্শ সমাজবাদ : সহস্রাব্দের স্বপ্ন—৬৩৪, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী : নির্বিবাদ ২—৬৮৬

স্বামী অচ্যুতানন্দ	(পরিক্রমা)...	জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথ	১৮২, ২৩০
	(পরিক্রমা)...	জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ	৩৪৪, ৩৮৫
	(দুর্গোৎসব)...	কাশীর দুর্গা	... ৪৮৬
অতীন দাশ	(কবিতা)...	ছড়া	... ৬০১
অনীতা দত্ত	(কবিতা)...	তাঁর নাম রামকৃষ্ণ	... ৮১
	(কবিতা)...	চরণে দিও ঠাঁই	... ৪৫০
	(কবিতা)...	কে তুমি তেজস্বিনি।	... ৭০০
অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত	(স্মৃতিকথা)...	শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা	... ৭১৩
অমিতাভ ভট্টাচার্য	(বিজ্ঞান)...	খাওয়া নিয়ে সংস্কার	... ৩৫৬
অমিয়কুমার ভট্টাচার্য	(বিজ্ঞান)...	আমাশয়ের একটি কারণ অ্যামিবা	... ৪০৭
অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়	(কবিতা)...	দিনাবসান	... ৪৪৯
অরুণপ্রকাশ ঘোষ	(দুর্গোৎসব)...	স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মভূমি ও বংশের দুর্গাপূজার ৩০০ বছর	... ৪৯১
অরুণাংশু ঘোষ	(কবিতা)...	তোমাকে দেখেছি	... ৩৩৫
অরুন্ধতী রায়	(কবিতা)...	চিরায়ত	... ৬৬৯
অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	ভর্গো দেবস্য ধীমহি	... ৩৮৩
আভা গুহ	(কবিতা)...	কী মহিমা তব	... ৩৩৫
আমান্ডা ভিনসেন্ট	(বিজ্ঞান)...	চীনা চিকিৎসাপদ্ধতির বহুল প্রসারে জটিলতা	... ১৯৯
ইন্দ্রাণী রায়	(কবিতা)...	নীরব প্রতীক্ষা	... ৬০০
উৎপল সান্যাল	(বিজ্ঞান)...	ক্যান্সারের বিপদসঙ্কেত	... ৬৭৪
উদয়ন মিত্র	(গবেষণা)...	নজরুলের 'বিষের বাঁশী' : অক্ষয় দত্তগুপ্ত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য	... ৩৪০
	(ইতিহাস)...	প্রেসিডেন্সি কলেজ ও এক ঔপনিবেশিক চক্রান্ত : ১৯০৪-১৯০৭	... ৪৯৮
উমা দে শীল	(কবিতা)...	সম্পর্ক	... ৪৪৯
স্বামী ঋদ্ধানন্দ	(পরিক্রমা)...	বাংলাদেশ ঘুরে এলাম	... ৬৬৩
এ. কে. রামানুজন	(কবিতা)...	ঐ পাখিটাই তো চাই	... ৬৬৯
কল্যাণী দত্ত	(কবিতা)...	শিক্ষা	... ৩৮৩
কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	আগমনী	... ৪৪৭
কৃষ্ণা সেন	(কবিতা)...	তোমায় খুঁজি	... ২২৮
	(অনুধ্যান)...	রাজবিদ্যা : রাজগুহ্যযোগ	... ৩৯৪
গীতা সরকার	(কবিতা)...	শরৎ মানেই	... ৪৪৭

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	(দিশা)...	কোন্ পথে ভারত?	... ৪৫৫
গৌতম দাশগুপ্ত	(কবিতা)...	কবিতায় কল্পতরু	... ২২৯
চন্দনা সরকার	(সাহিত্য)...	'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা': বাঙলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি	... ২৪৪
চিত্তরঞ্জন মাইতি	(কবিতা)...	যেদিন ফুটল কমল	... ৪৫১
	(কবিতা)...	সারদা-সরস্বতী	... ৭০০
চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ	(নিবন্ধ)...	চিরন্তনী মা সারদা	... ৭০৪
চিররঞ্জন মজুমদার	(পরিক্রমা)...	ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মল্লভূমি: বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া	... ২৯০
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	(ক্রীড়াজগৎ)...	ক্রিকেট—ঐতিহ্য ও আধুনিকীকরণ	... ২১
	(ক্রীড়াজগৎ)...	ক্রিকেট ও তার নিয়মকানুন	... ৮২
	(ক্রীড়াজগৎ)...	জাতীয় লিগ—প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও ভবিষ্যৎ	... ১২৬
	(ক্রীড়াজগৎ)...	বিশ্বকাপের ইতিহাস ও উপমহাদেশের ভূমিকা	... ১৮৮
	(ক্রীড়াজগৎ)...	সম্ভাবনায় দক্ষিণ আফ্রিকা, কালো ঘোড়া পাকিস্তান	... ২৩৬
	(ক্রীড়াজগৎ)...	অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ে ক্রিকেটই গৌরবান্বিত	... ৩৫৩
	(ক্রীড়াজগৎ)...	টেনিস-বিশ্বে অত্যুজ্জ্বল ভারতীয় জুটি	... ৬০৮
	(ক্রীড়াজগৎ)...	ক্রীড়াজগতে উজ্জ্বল ভারতীয় নারী	... ৭০৯
জয়ন্ত চক্রবর্তী	(ক্রীড়াজগৎ)...	আধুনিক তীরন্দাজি	... ৩৯০
জলধিকুমার সরকার	(নিবন্ধ)...	১০০ অতিক্রান্ত 'উদ্বোধন': দৃষ্টিপাত	... ১৩
	(নিবন্ধ)...	শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম জ্ঞানের উৎস সন্ধানে	... ৭৭
	(বিজ্ঞান)...	অ-সাধারণ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, অদ্ভুত তাঁর মতবাদ	... ২৫২
	(বিজ্ঞান)...	বিনাশের পথে বসন্তরোগের জীবাণু	... ৫৬৯
স্বামী জিতাত্মানন্দ	(কবিতা)...	নীলকণ্ঠ মহাদেব—বিবেকের আনন্দস্বরূপ	... ১১৮
জীবনকৃষ্ণ দাস	(কবিতা)...	মায়ের হাসি	... ২২৯
জুঁই সরকার	(কবিতা)...	আমি চেয়েছিলাম	... ৬৬৯
স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ	(কবিতা)...	মানুষ কি জানে?	... ৬০০
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(বিজ্ঞান)...	প্রসঙ্গ আঁশযুক্ত খাদ্য	... ৯৩
	(নিবন্ধ)...	গণবিজ্ঞান আন্দোলনে 'উদ্বোধন'	... ৪৮২
তপোব্রত সান্যাল	(বিজ্ঞান)...	আগামী শতাব্দীতে জল: কিছু জরুরী ভাবনা	... ৭১৮
তরুণ গোস্বামী	(ইতিহাস)...	কলকাতা বিক্রির দলিল—এক নতুন তথ্য	... ৪৬৭
তাপস বসু	(নিবন্ধ)...	বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন'	... ৫০৯
তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী	(কবিতা)...	মুক্তি নেই	... ১৮৭
তারাশঙ্কর রায়	(কবিতা)...	ভাবনা	... ৪৫৪
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	(কবিতা)...	আত্মনিবেদন	... ৪৪৮
দীপককুমার দাশ	(কবিতা)...	কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৮০
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত	(সমাজবিজ্ঞান)...	প্রসঙ্গ বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের সংখ্যাবৃদ্ধি	... ৬৫৪
দীপাঞ্জন বসু	(কবিতা)...	এখনো	... ৪৫০
দীপালি রায়	(কবিতা)...	নীলাচলে মহাপ্রভু	... ২৮৮
	(কবিতা)...	কুলকুণ্ডলিনী	... ৪৫১
দীপ্তিকুমার শীল	(কবিতা)...	মুক্ত যেদিন মুক্তি পায়	... ২৮৯
	(কবিতা)...	মায়ের আঁচল	... ৭০১
স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ	(পরিক্রমা)...	সবরিমালার আয়াপ্পা স্বামী	... ৪৬০
স্বামী ধীরেশানন্দ	(স্মৃতিকথা)...	স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সহিত কথোপকথন	... ২৪৭
নচিকেতা ভরদ্বাজ	(কবিতা)...	অদৃশ্য শত্রুর হাতে	... ৪৪৯
নমিতা দত্ত	(কবিতা)...	সারদা ষোড়শী	... ৭০০
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ	... ৮০

লেখক	বিভাগ	রচনা	পৃষ্ঠা
স্বামী নির্বাণানন্দ	(আলোচনা)...	অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ	২১৫, ২৭২, ৩২৬, ৩৭৫, ৪৩৩
নিভা দে	(সাহিত্য)...	ফাল্গুনের দুই কবি : শ্রীরামকৃষ্ণ ও জীবনানন্দ	... ১৩৫
	(কবিতা)...	সুন্দরের সন্ধানে	... ৪৫৩
নিমাই মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	মায়া	... ১৮৬
	(কবিতা)...	জীবন	... ৪৪৭
	(কবিতা)...	মৃত্যু ও জীবন	... ৬৬৮
নিমাইসাধন বসু	(ইতিহাস)...	জাতীয় আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ	৬১০, ৬৫১
নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)...	আত্মার কারগিলে	... ৬৬৮
স্বামী নির্মুক্তানন্দ	(স্মৃতিকথা)...	কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের পুণ্যস্মৃতি	৮৭, ১২০
নীলাঞ্জন নন্দী	(পরিক্রমা)...	প্রকৃতির কোলে ধ্যানমগ্ন পশ্চিম সিকিম	... ৬০২
পিনাকীরঞ্জন কর্মকার	(কবিতা)...	স্বপন যদি	... ৪৫৩
পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়	(কবিতা)...	আঁধারের কপাট দাও গো খুলে	... ৭০১
প্রণবেশ চক্রবর্তী	(নিবন্ধ)...	অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৫৬৪
স্বামী প্রভানন্দ	(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)...	অবশেষে বেলুড়ে স্থায়ী রামকৃষ্ণ মঠ	২৯, ৬৮, ১১৩, ১৭১, ২১৯, ২৭৪
	(বিশেষ নিবন্ধ)...	শক্তিসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৫৪৯
স্বামী প্রমেয়ানন্দ	(বিশেষ নিবন্ধ)...	'চণ্ডী'তে মহামায়ার দুটি রূপ	... ৫৩৩
প্রমোদ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	"আরো আরো আরো দাও প্রাণ"	... ৪৪৭
বিজয়কুমার দাস	(কবিতা)...	তুমি তো তাই প্রাণের ঠাকুর	... ৮১
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)...	লাভা ও লোলেগাঁও	... ২৮৮
	(কবিতা)...	বেলাশেষের কবিতা	... ৪৫০
বিভা বসু	(কবিতা)...	পথ হারালে	... ৬০০
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	(নিবন্ধ)...	বিবেকানন্দের বাঙলা রচনা : শক্তি ও সৌন্দর্য	... ৪৭৫
বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)...	ভারত আবিষ্কার	... ২৬
	(শ্রুতিনাটক)...	মরুতীর্থে একদিন	... ৪৬৫
বৈদ্যনাথ গুপ্ত	(কবিতা)...	তোমাকে প্রণাম	... ৩৩৬
	(কবিতা)...	আমি দেব ভালবাসা	... ৬০১
স্বামী ভূতেশানন্দ	(ভাষণ)...	স্বামী বিবেকানন্দের ভাবমূর্তি	... ৯
	(ভাষণ)...	অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৬১
	(ভাষণ)...	স্বামী যোগানন্দ	... ১১০
	(ভাষণ)...	শঙ্করাচার্য : জীবন ও সিদ্ধান্ত	... ১৬২
	(ভাষণ)...	রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শ	... ২১৪
	(ভাষণ)...	রামকৃষ্ণ মিশন : আদর্শ ও অঙ্গীকার	... ২৬৮
	(ভাষণ)...	দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি	... ৩১৮
	(ভাষণ)...	"মন চল নিজ নিকেতনে"	... ৪২৭
	(ভাষণ)...	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	... ৫৮৭
মঞ্জুভাষ মিত্র	(কবিতা)...	স্বামী বিবেকানন্দ—রিজলি ম্যানরে, মহান গ্রীষ্মে	... ৪৫২
মঞ্জুশ্রী মৈত্র	(কবিতা)...	মাটিতে পড়া ফুল	... ৩৩৫
মঞ্জুষা দাস	(পরিক্রমা)...	মহারাষ্ট্র ও গোয়ায়	৮৯, ১৩৮
মদনমোহন মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	"আবিরাবির্ম এধি"	... ৬৬৮
মনোজ খাটুয়া	(কবিতা)...	শুয়ে আছে দেশ	... ১৮৭
	(কবিতা)...	জননী জন্মভূমি	... ৪৪৯
মনোরঞ্জন চন্দ্র	(কবিতা)...	শব্দের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে	... ১৮৭
মন্দিরা মহাপাত্র	(কবিতা)...	সময়	... ২২৮
মাধবকুমার চট্টোপাধ্যায়	(কবিতা)...	দেখা	... ৩৩৬
মায়া করগুপ্তা	(কবিতা)...	ভরিয়ে দিলে	... ৩৮৪

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ	(বিশেষ নিবন্ধ)...	শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলীলা-কথা	... ৪০০
মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত	(বিজ্ঞান)...	মানুষের কল্যাণে আকুপাংচার	... ৪১
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	(ভাষণ)...	জাতীয় পুনর্গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা	... ১৬৭
	(ভাষণ)...	জীবন্ত ভগবানের পূজা	... ২১৭
	(ভাষণ)...	প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসেতু স্বামী বিবেকানন্দ	২৬৯, ৩২৩, ৩৭১
	(বিশেষ নিবন্ধ)...	শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন আবেদন	... ৪৩০
	(ইতিহাস)...	জীবন আমাকে যে-শিক্ষা দিয়েছে	৫৯১, ৬৩৯, ৬৯১
রঘুপতি মুখোপাধ্যায়	(বিজ্ঞান)...	দূষণমুক্ত কৃষি—একটি দিশা	... ৩০০
রব প্যারি জোন্স	(বিজ্ঞান)...	চীনা চিকিৎসাপদ্ধতির বহুল প্রসারে জটিলতা	... ১৯৯
রমলা বড়াল	(কবিতা)...	তবু মানুষে মানুষে	... ৪৫৩
রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	(পরিক্রমা)...	কিয়োটো আর তপস্বী আজারি সান	... ৩৬
রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	(কবিতা)...	শ্রীকামাখ্যাপ্রশস্তিঃ	... ৪৪৮
রেণুকা নাথ	(কবিতা)...	হঠাৎ যখন	... ৩৩৬
লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস	(কবিতা)...	আমরা ধনঞ্জয়	... ৪৫১
লতিকা ঘোষ	(কবিতা)...	গতকাল ফুল ছিল গাছে	... ৪৫৪
লালী মুখার্জী	(কবিতা)...	জগদ্গুরুঃ শরণম্	... ৩৩৬
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	(নিবন্ধ)...	শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ	... ১১৬
শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়	(বিজ্ঞান)...	ব্লাডপ্রেসার ও অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সংগঠনকারী হেতুগুলি	... ১৪৩
শঙ্কর ঘোষ	(সাহিত্য)...	বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'	... ১৭৬
	(সাহিত্য)...	'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি	... ৫৪১
	(সাহিত্য)...	চণ্ডীদাসের পদাবলী	... ৬৬০
শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী	(কবিতা)...	হে প্রভু! তুমি ছিলে, তুমি থেক	... ৮১
শান্তি সিংহ	(সাক্ষাৎকার)...	শতবর্ষেও দীপ্তপ্রাণা লাবণ্যপ্রভা দেবী	... ২৪২
	(নিবন্ধ)...	'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তি : ভারতের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে প্রথম	... ৫৬০
	(কবিতা)...	প্রাণের উত্তাপ দেয় মাটির প্রদীপ	... ৭০১
শান্তিকুমার ঘোষ	(কবিতা)...	আছেন তিনি	... ১৮৬
	(কবিতা)...	সূর্যোদয়ের আগে	... ৪৫৩
শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)...	স্বপ্ন কথা	... ৪৪৭
শেখ আবদুল মান্নান	(কবিতা)...	একটি অন্তঃস্থিত সত্তার প্রতি	... ২২৮
শেখ সদরউদ্দীন	(কবিতা)...	আলোয় ভরা দিন চলে যায়	... ৪৫৪
শৈবাল গুপ্ত	(পরিক্রমা)...	ব্রাজিল ঘুরে এসে	... ৫১৪
শৈলজারঞ্জন মজুমদার	(বিশেষ নিবন্ধ)...	আমার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ	১৯২, ২২৫
শ্যামলী মহাপাত্র	(দুর্গোৎসব)...	উনবিংশ শতাব্দীর দুটি দুর্গোৎসব	... ৪৯৫
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	(নিবন্ধ)...	'কলমীর দল'	... ৫৪৪
শ্রীম	(সঙ্কলন)...	'কথামৃতে' না-বলা স্বামীজী-প্রসঙ্গ	... ৫
	(সঙ্কলন)...	'কথামৃতে' না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা	৫৮, ১০৯, ১৬১, ২১৩, ৩১৭, ৩৬৯, ৪২৪, ৫৮৫, ৬৩৭
	(সঙ্কলন)..	'কথামৃতে' না-বলা 'কথামৃত'-প্রসঙ্গ	... ২৬৫
	(সঙ্কলন)..	শ্রীম-কথিত ও শ্রীম-সমীপে মাতৃপ্রসঙ্গ	... ৬৮৯
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়			(দ্রঃ 'পরমপদকমলে')
স্বামী সত্যানন্দ	(স্মৃতিকথা)..	শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিপ্রসঙ্গে স্বামী অরূপানন্দ	... ৭০২
সত্যানন্দ চক্রবর্তী	(সুস্বাস্থ্য)..	স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়	১৪৮, ২০০, ২৫১, ৩০৪, ৩৫৮, ৩৯২, ৬৬২, ৭১৭

সনৎকুমার মিত্র	(কবিতা)...	প্রতিমার রূপ	... ৪৫১
সন্তোষকুমার দে	(কবিতা)...	'উদ্বোধন'	... ২৬
সন্দীপকুমার চক্রবর্তী	(বিজ্ঞান)...	পুষ্টিতে খনিজ লবণের গুরুত্ব	... ৬২১
সন্দীপন বিশ্বাস	(কবিতা)...	আঁধার পেরিয়ে	... ২৮৯
	(নিবন্ধ)...	সেই ঢেউয়ের অপেক্ষায়	... ৪৭০
সপ্তর্ষি ঘোষ	(দুর্গোৎসব)...	শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য একটি প্রাচীন পারিবারিক দুর্গোৎসব	... ৪৯৩
সবিতা দাস	(কবিতা)...	চির সাথী	... ৩৮৩
সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)...	সিন্ধুর ডাক	... ২৮৯
সাগরিকা শর্মা	(কবিতা)...	অনুভব	... ১৮৬
সান্ত্বনা দাশগুপ্ত	(গবেষণা)...	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব	৩৩০, ৩৭৮, ৫৯৬, ৬৪৫, ৬৯৪
সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	এবার হারিয়ে যেতে চাই	... ১৮৬
সি. এফ. এন্ড্রুজ	(কবিতা)...	ভগিনী নিবেদিতা	... ২৬
সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়	(স্মরণ)...	বনফুল প্রসঙ্গে	... ৩৩৭
সুজাতা সেন	(কবিতা)...	শিলাতটে বসে আছ আজও	... ২২৯
সুদীপ্ত মাজি	(কবিতা)...	যত দূরেই যাই	... ২৮৮
সুনীতি মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	আকাশ হলে	... ২৮৮
সুশান্ত বসু	(কবিতা)...	শিকড়ে যাও	... ১৮৭
সৌমিত্র সেন	(কবিতা)...	আবির্ভাব	... ৮০
স্নেহময় সিংহ রায়	(ইতিহাস)...	সাম্প্রদায়িকতা ও গ্রামের সাধারণ মানুষ	... ১২৮
স্বয়ম্ভু মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	অমর ভারত : গঙ্গা আর হিমালয়ের প্রতীকে	... ৩৮৪
স্মৃতি পাল	(কবিতা)...	অনুভব	... ২৮৯
হোসেনুর রহমান	(সমাজবিজ্ঞান)...	বাংলাদেশ : রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন	... ৫৫৫

অপ্রকাশিত পত্র ☐ স্বামী সারদানন্দ—৫৭, স্বামী বিবেকানন্দ—৪২১

[illegible]

পরমপদকমলে ☐ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ☐ চির নবীন, চির নূতন, ভাস্বর বৈশাখ—৩৯, "আমি দেখব"—৮৫, কুরুক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ—১৪১, শ্রীরামকৃষ্ণের 'অস্ত্রভাণ্ডার'—১৯৭, গাজীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ—২৪৯, বিদ্রোহী ভগবান—২৯৭, ইঁদুর—৩৫১, শরণাগতি—৩৯৮, "আমি খাই-দাই আর থাকি, আর আমার মা সব জানেন"—৫৩০, "আপনার পূজা আপনি করিলে, এ কেমন লীলা তব!"—৬১৭, 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'—৬৭২, মা—৭১৫

চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ☐ কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত, চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত ☐

দধীচির আত্মদান ও বৃত্রাসুর বধ—২৫, ৭৩, ১২৩, ১৯১, ২৩৫, ২৮১, ৩২৯, ৩৯৩, ৬০৭, ৬৫৯, ৬৯৯

অকালবোধন—৫৪৫

প্রাসঙ্গিকী ☐ প্রসঙ্গ : 'বাঁশবেড়িয়ার রাজা মহাশয়েরা'—৩৩, ৫৩৭; শারদীয় 'উদ্বোধন' : ১৪০৫—৩৪; প্রসঙ্গ : 'ব্রিটিশ রাজরোষে রামকৃষ্ণ মিশন'—৭৪; প্রসঙ্গ : 'নতুন গবেষণা'—৭৫; সংশোধন—৭৬; প্রসঙ্গ : 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব'—৭৬; রানী রাসমণির জন্মভূমি হালিশহর—১২৪; নব 'পঞ্চশীল'—১২৪; উপাধি 'গুপ্ত' নয়, 'গুহ'—১২৫; প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'—১২৫, ১৭৯, ২৭৯, ৬১৫, ৭১২; টোটকা—১২৫; কিছু সাধারণ টোটকা—৩৫০; উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্র—১৭৯; লেখকের উত্তর—১৭৯; 'উদ্বোধন : বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা' : সম্পূরক তথ্য—১৮০; 'উদ্বোধন : বাঙলা সাময়িকপত্রের গগনে ধ্রুবতারা' : লেখকের বক্তব্যে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি—২৮০; 'শ্রীজগন্নাথ-মন্দির পরিক্রমা'—২৩৯; রোগ আরোগ্যে মশলাপাতি—২৩৯; ছানি নিয়ে কিছু কথা—২৪০; প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণের পট'—২৪১; নারীজাতি বেদাধ্যয়নবিহীন—কোন্ শাস্ত্রানুসারে?—২৭৮; প্রসঙ্গ 'জল পান'—২৭৯; 'ব্লাডপ্রেসার ও অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সংগঠনকারী হেতুগুলি'—২৭৯; প্রসঙ্গ 'তত্ত্ব ও প্রয়োগের চিরন্তন সমস্যা'—২৮০; শ্রীরামকৃষ্ণ হালিশহর ও হংসেশ্বরী-মন্দিরে কখন এসেছিলেন?—২৮০; রানী রাসমণির বাড়ি—৩৪৮; 'নীলকণ্ঠ মহাদেব'—৩৪৮; 'উদ্বোধন' না 'অক্সিজেন'?—৩৪৮; যোগাসনে রোগমুক্তি—৩৪৮; মেদ ও হোমিওচিকিৎসা—৩৪৯; ঘরোয়া পদ্ধতি—৩৫০; আত্মোপলব্ধি—৪০৫; শতাব্দী-উত্তর 'উদ্বোধন' এবং প্রসঙ্গত—৪০৬; স্বামীজী-জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর সান্নিধ্যে আমার পিতৃদেবের কয়েকদিন—৫৩৬; প্রসঙ্গ

'সরস্বতী মূর্তি'—৫৩৬; নজরুলের জন্মভিটা চুরুলিয়া গ্রামের কথা—৫৩৭; 'ভায়োলেন্স'-সংস্কৃতির প্রভাব—৫৩৮; আমেরিকায় দুর্গাপূজা—৫৩৯; শ্রীরামকৃষ্ণ হালিসহর ও হংসেশ্বরী-মন্দিরে এসেছিলেন—৫৪০; কোষ্ঠকাঠিন্য—৬১৪; 'দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি'—৬১৪; 'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি'—৬১৪, ৬৭১; বনফুল-পত্নী লীলাবতী—৬১৪; 'ইঁদুর'—৬১৫; পত্রে ভ্রান্তি—বিভ্রান্তি—৬১৬; কষ্টকল্পনা ও অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট তুলনা—৬৭০; প্রসঙ্গ 'শতবর্ষেও দীপ্তপ্রাণা লাবণ্যপ্রভা দেবী'—৬৭১; শ্রীমা সারদাদেবীর সান্নিধ্যে বনফুল-পত্নী—৭১১; কথাগুলি স্বামীজীর নয়—৭১২; বৈদিক কর্মকাণ্ড ও ভগবদ্গীতা—৭১২

বিজ্ঞান ❑ কনজাঙ্কটিভাইটিস ('জয় বাংলা') প্রতিরোধে করণীয়—৬৭৬

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ ❑ নরভুক মানুষ—৪৪, পাশ্চাত্যে মদ্যপান : অতীতে ও বর্তমানে—৯৭

বিজ্ঞান-সংবাদ ❑ হল্যান্ডের লোকেরা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায়—২০১; জীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক-বিরোধিতা এখন ভীতিকর পর্যায়ে—২০১; পেঁয়াজ রসুন বহু রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে—২৫৪; শল্যচিকিৎসকরা মুমূর্ষু রোগীদের ওপর অনেক পরিহার্য অস্ত্রোপচার করেন—৩০৫; কৃষ্ণকায় দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের ভগ্নস্বাস্থ্যের একটি কারণ চিকিৎসক সম্প্রদায়—৩০৫; দেহের ও হাত-পায়ের বৃদ্ধি থামে কেন?—৪১০; ধূমপান বন্ধের চেষ্টা বহুমুখী হোক—৬২৪; সিগারেট কোম্পানির বৃহত্তম জরিমানা : পাঁচ কোটি ডলার—৬২৪; ডেঙ্গুজ্বর নির্মূলনে নতুন কৌশল—৬৭৭; অল্প রক্তচাপবৃদ্ধিতে নতুন নির্দেশাবলী—৬৭৭; রক্ষিত গুটিবসন্ত-জীবাণু নষ্ট করতে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের আপত্তি—৭২১; স্বাস্থ্য-পরিকল্পনায় স্থূলকায়ত্ব-সমস্যার অন্তর্ভুক্তি—৭২১

গ্রন্থ-পরিচয় ❑ অমলেন্দু চক্রবর্তী ❑ মহাভারতের অমর কাহিনী—২০২, দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা—৬২৫; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ বিবেকানন্দ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন—৫৭৩; গৌতম নিয়োগী ❑ বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের আলোকে মনুষ্যত্বের সন্ধান—৪৫; জলধিকুমার সরকার ❑ রোগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য—২৫৫, গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি উন্নয়ন প্রকল্প—৩৫৯; তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ স্থানীয় ইতিহাস—৩০৭; দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল ❑ সুভাষিত-সংগ্রহ—৩০৬; দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ❑ 'কথামৃত' মানুষের শাশ্বত প্রেরণা—৯৮; পরিমল চক্রবর্তী ❑ বামাক্ষেপা বৃত্তান্ত—২৫৫; প্রেমবল্লভ সেন ❑ ছত্রপতি শিবাজী—৪১১; ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী ❑ জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে—৬৭৮; শান্তি সিংহ ❑ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-কথা—১৫০; সচ্চিদানন্দ ধর ❑ সহজ ভাষায় মূল রামায়ণের মনোজ্ঞ উপস্থাপন—৭২২; সীতা চট্টোপাধ্যায় ❑ ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ণ—৬৭৯; সুকান্ত বসু ❑ আমেরিকার গাইড বুক—১৫০, সোমনাথ ভট্টাচার্য ❑ সহজ সরল ভক্তি অর্ঘ্য—৬২৬

ক্যাসেট সমালোচনা ❑ স্বামী দিব্যব্রতানন্দ ❑ শ্রবণমঙ্গলম্—৭২২; নন্দলাল অধিকারী ❑ ক্যাসেটে আগমনী-সঙ্গীত—৭২৩, ক্যাসেটে গীতা-সমগ্র—৭২৩

প্রাপ্তিস্বীকার ❑ ১৫১, ২০৩, ২৫৬, ৪১২

বিশেষ প্রতিবেদন ❑ রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষজয়ন্তী উদ্‌যাপন—২৭
'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান—৯৫
রামকৃষ্ণ মিশনকে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' প্রদান—১৪৯

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ❑ ৪৮, ৯৯, ১৫২, ২০৪, ২৫৭, ৩০৮, ৩৬০, ৪১৩, ৫৭৬, ৬২৮, ৬৮০, ৭২৪

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ❑ ৪৯, ১০১, ১৫৩, ২০৫, ২৫৭, ৩০৮, ৩৬০, ৪১৩, ৫৭৭, ৬২৯, ৬৮১, ৭২৫

বিশেষ সংবাদ ❑ কাশ্মীর-সীমান্তে সাম্প্রতিক যুদ্ধে শহিদদের পরিবারের সাহায্যার্থে রামকৃষ্ণ মিশনের দান—৩৯৭
শ্রীসারদা মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজীর মহাপ্রয়াণ—৬২৭

বিবিধ সংবাদ ❑ ৫০, ১০২, ১৫৪, ২০৬, ২৫৮, ৩০৯, ৩৬১, ৪১৪, ৫৭৮, ৬৩০, ৬৮২, ৭২৬

অনুষ্ঠান-সূচী ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪০৫—৮; ফাল্গুন-চৈত্র ১৪০৫—৬০; চৈত্র ১৪০৫—১২২; তিথি, পূজা এবং একাদশী তিথির বার্ষিক অনুষ্ঠান-সূচী—১৫৬ (খ); জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৬—২২৪; আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪০৬—২৬৭; ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৬—৩২২; আশ্বিন-কার্তিক ১৪০৬—৩৮২; কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪০৬—৫৩৫; অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০৬—৫৯৫; পৌষ-মাঘ ১৪০৬—৬৫৮; মাঘ-ফাল্গুন ১৪০৬—৭০৮

প্রচ্ছদ ❑ ১০১তম বর্ষের প্রচ্ছদ—বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির; শারদীয়া সংখ্যার প্রচ্ছদ—আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের দুর্গাপ্রতিমা (পরিচিতির জন্য দ্রষ্টব্য ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ❑ ৭৯, ১৩৭, ১৭০, ৫৮৪, ৬৮১, ৭১৪, ৭২৮ **বেলুড় মঠস্থ বিবেকানন্দ বেদবিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি** ❑ ১৭৫

'উদ্বোধন'-এ রচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ❑ ৮৬, ১৪২, ১৯৬, ৩৫২

আবেদন ❑ স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা—১৭৮, ২৪৬, ৩৩৪, ৪৭৪, ৬৬৭; রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম—২১৮, ৫৫৯, ৬৪৪; রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মনসাদ্বীপ—২৭৭, ৩৭৪, ৫৩২; রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর—১২, ৭২, ১৬৬, ২৪৮, ২৯৯

চিত্রসূচী ❑ স্বামী বিবেকানন্দ—১, ২, ৫, ১১৮, ২১৭, ২২৯, ৩৭১, ৪৫২, ৬৩৩; ১০১তম বর্ষের প্রচ্ছদ—২; স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ—৪; 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত রচনা সম্পর্কিত রেখচিত্র—১৫, ১৬, ১৭, ১৮; রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নিবেদিতা

বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের ৫টি আলোকচিত্র—২৭, ২৮; বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব—৩৩; শারদীয় 'উদ্বোধন' ঃ ১৪০৫-এর প্রচ্ছদ—৩৪; আরাশিয়ামায় বেন তেন সামা—৩৬; বুক্কাকুজি মঠ—৩৬; পর্বতগাত্রে 'হাইকু'—৩৭; নিন্নাজি পাহাড়ে পাথরের ফলক—৩৮; হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস-এর আকুপাংচার চিকিৎসা—৪১; সাইনুসাইটিস রোগের আকুপাংচার চিকিৎসা—৪২; শ্রীরামকৃষ্ণদেব—৫৩, ৬১, ৮০, ৮১, ১১৭, ১৩৫, ১৯৪, ২২৮, ২৪১, ৩৬৯; স্বামী সারদানন্দ—৫৭; ক্রিকেট মাঠে খেলোয়াড়দের অবস্থান—৮৩; স্বামী শিবানন্দ—৮৭; স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—৮৮, ২৪৭; দৌলতাবাদ ফোর্ট, আওরঙ্গাবাদ—৮৯; কৈলাস-মন্দির, ইলোরা—৮৯; ঘৃষ্ণেশ্বর-মন্দির, আওরঙ্গাবাদ—৮৯; বিবি কা মকবরা, আওরঙ্গাবাদ—৯০; আয়ুধা নাগনাথ—৯০; পারালী বৈজনাথ—৯০; পাণ্ডবগুহা, নাসিক—৯১; কালারামের মন্দির, নাসিক—৯১; ত্র্যম্বকেশ্বর, নাসিক—৯১; সপ্তশৃঙ্গী, নাসিক—৯২; ভীমাশঙ্কর—১৩৮; আগা খাঁ প্যালেস, পুণে—১৩৯; লোনাভেলা উদ্যান—১৩৯; কারলা কেভ, লোনাভেলা—১৩৯; দোনা পাওলা লেক, গোয়া—১৪০; আনজানা বীচ, গোয়া—১৪০; 'উদ্বোধন'-এর ১০১তম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়—৯৫; উৎসব-সন্ধ্যায় উদ্বোধন কার্যালয়ের প্রবেশদ্বার—৯৫; আলোচনাসভায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং তরুণ গোস্বামী—৯৫; আলোচনাসভায় শ্রোতৃবৃন্দের একাংশ—৯৬; শ্রীচৈতন্যদেব—১০৫, ১১৬; স্বামী যোগানন্দ—১১০; মহাদেব—১১৮, ১৮২, ২৩০; স্বামী সুবোধানন্দ—১২০; স্বামী অখণ্ডানন্দ—১২১; জীবনানন্দ দাশ—১৩৬; রামকৃষ্ণ মিশনকে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' প্রদান—১৪৯; আচার্য শঙ্কর—১৫৭, ১৬২; জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথ—১৮৪, ২৩১, ২৩৪; বিশ্বনাথ-মন্দির—২৩২; কেদারঘাট—২৩৩; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৯৬, ৬১০, ৬৫১; বুদ্ধদেব—২০৯; অনাথ বালকদের নিয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ—২২০, ২৭৬; কাশী সেবাশ্রমের প্রথম আউটডোর হাসপাতাল—২২১; মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমের সূচনা-গৃহ—২২২; শ্রীজগন্নাথ—২৩৯; লেন্সের গঠন—২৪০; কৃত্রিম লেন্স—২৪১; লাবণ্যপ্রভা দেবী—২৪২; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪৪; শ্রীমা সারদাদেবী—২২৯, ২৬১, ৩১৩, ৬৮৯, ৭০০, ৭০১, ৭০৪, ৭১৩, ৭১৫; শ্রীম—২৬৫; ভূকম্পের চিত্র—২৮২, ২৮৩; বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ—২৯১; বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়-মন্দির—২৯১; বিষ্ণুপুরের গড়—২৯১; বিষ্ণুপুর জোড় বাংলার টেরাকোটার কাজ—২৯২; জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মর্মরমূর্তি—২৯৩; জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নতুন বাড়ি—২৯৪; শিহড়ে শান্তিনাথ শিবমন্দির—২৯৪; বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা—২৯৫; বনফুল—৩৩৭; বনফুল ও তাঁর স্ত্রী লীলাবতী—৩৩৮; কাজী নজরুল ইসলাম—৩৪০; কেদারপাহাড়—৩৪৪, ৩৮৯; দেবপ্রয়াগ ঃ গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল—৩৪৫; গুপ্তকাশী—৩৪৫; গৌরীকুণ্ডের কাছে—৩৪৬; কেদারনাথের পথে—৩৪৭; কেদারনাথের মন্দির, পটভূমিতে কেদারপাহাড়—৩৪৭, ৩৮৫; কেদারনাথ লিঙ্গ—৩৮৬; কেদারনাথের মন্দির-চত্বরে শঙ্করাচার্যের মর্মরমূর্তি—৩৮৭; আরতির সময় কেদারনাথের শৃঙ্গার বেশ—৩৮৮; শ্রীকৃষ্ণ—৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭৮, ৩৯৪, ৪০০, ৫৯৬, ৬৯৪; প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত আধুনিক ধনুক—৩৯০; টার্গেট বস—৩৯১; প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্র—৩৯১; তীর ছোঁড়ার প্রস্তুতি—৩৯২; স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্রের কিয়দংশের চিত্র—৪২১-৪২৩; 'সন্নিধানম্'—৪৬০; সবরিমালা যাওয়ার পথে একটি স্থান—৪৬১; 'ভেভার'-এর মসজিদ এবং 'শাস্তা'-মন্দির—৪৬২; আয়াপ্পা-মন্দিরে ওঠার আঠার ধাপ—৪৬৩; 'ধর্মশাস্ত্রা'—৪৬৪; কলকাতা বিক্রির দলিল—৪৬৭; টমাস ডানিয়েলের আঁকা ছবি ঃ নিউ কোর্ট হাউস—৪৬৮, চৌরঙ্গী রোড ও পার্শ্ববর্তী অট্টালিকাশ্রেণী—৪৬৯; বারাণসীর দুর্গাকুণ্ড এবং দুর্গামন্দির—৪৮৬; দুর্গামন্দিরের দেওয়ালে অষ্টভুজা ব্যাঘ্রবাহিনী মূর্তি এবং নিষেধলিপি—৪৮৭; কাশীর দেবী দুর্গা—৪৮৮; কাশীর দুর্গার শৃঙ্গারবেশ—৪৯০; স্বামী ব্রহ্মানন্দের বংশের দুর্গাপ্রতিমা—৪৯১; অধরলাল সেনের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা—৪৯৩; রানী রাসমণির বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা—৪৯৫; কৈলাসভবনের দুর্গাপ্রতিমা—৪৯৭; প্রেসিডেন্সি কলেজ—৪৯৯; ব্রাজিলের মানচিত্র—৫১৪; রিওর কোপাকাবানা সমুদ্রসৈকত—৫১৫; রিওতে যীশুখ্রীস্টের মূর্তি—৫১৬; কর্কোভার্দ পাহাড়ের ওপর থেকে রিওর দৃশ্য—৫১৮; হেলিকপ্টার ডুবন্ত লোককে উদ্ধার করছে—৫২০; সাও পাওলো আশ্রম—৫২৭; চুরুলিয়ায় নজরুল স্মৃতি স্মারক ও প্রমীলা কাজীর সমাধি—৫৩৮; ওয়াশিংটন (ডি. সি.) বেদান্ত সেন্টারে দুর্গাপূজা—৫৩৯; গুটিবসন্তে আক্রান্ত শিশু—৫৬৯; গুটিবসন্ত—৫৬৯; পঞ্চম রামেসিসের 'মমি'র মুখ—৫৭০; একই রোগীতে গুটিবসন্ত ও পানিবসন্ত—৫৭১; গুটিবসন্ত ও পানিবসন্তের ভাইরাস—৫৭১; বানর-বসন্তে আক্রান্ত বসন্তরোগী—৫৭২; ভবতারিণী—৫৮১; রানী রাসমণি—৫৮১; স্বামী অদ্ভুতানন্দ—৫৮৭; সিকিমের প্রবেশপথ—৬০২; দ্রো দ্রুল চোর্তেন—৬০৩; ওষধিগুণসম্পন্ন গাছ—৬০৪; জোংরির পথে প্রার্থনা লেখা পতাকা—৬০৪; শিক্ষার্থী লামারা—৬০৫; জোংরি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা—৬০৬; যশোর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—৬৬৩; ময়মনসিং শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—৬৬৩; সিলেট শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—৬৬৪; হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—৬৬৪; সীতাকুণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—৬৬৪; ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণ—৬৬৫; নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—৬৬৫; বালিয়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—৬৬৫; দিনাজপুর আশ্রমের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—৬৬৬; বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—৬৬৬

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

যে ঠাকুরের ওপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ শোক তাপ—এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

বড় হইতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ

১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস ।
২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব ।
৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে ‘পুণ্যভূমি’ নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা ওপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন, ওপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি ওপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

ধনসম্পদ ইহকালের সম্পদ, সঙ্গে যাবে না। সাধন-ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

*

দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই, ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ④

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

উত্তরবঙ্গ

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদা-৭৩২১০১
- বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো নিউ মার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- স্বপনকুমার আইচ, প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- অজয়কুমার গাঙ্গুলী, প্রযত্নে, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নিউ টাউন কুচবিহার-৭৩৬১০১

মেদিনীপুর

- রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১৬৩৬, ফোন : ৬৬০০৫/৬৬৭৬২
- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১৬৫৯, ফোন : ৭২২১৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া-৭২১১৫২
- খড়্গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, খড়্গপুর-৭২১৩০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১২১২
- রামকৃষ্ণ মঠ, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১১২১ ফোন : ৬৫২০০
- কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১৪০১
- কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১২২২
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১২২২
- দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, দাসপুর-৭২১২১১
- ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ক্ষীরপাই-৭২১২৩২
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, জাড়া-৭২১২৩২
- শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১২০১
- জ্ঞানরঞ্জন হোতা, মহাপাল, ভায়া : তপসিয়া পেটবিন্দি-৭২১৫১৭
- খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র, রাধাচন্দনপুর-৭২১১৬০
- হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১৬০৫

নদীয়া

- রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২
- বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪১২২২
- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/৪৫৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- বন্ধুর, মিউনিসিপ্যালিটি মোড়, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট-৭৪১২০১

বর্ধমান

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব), বর্ধমান-৭১৩১০১
- নরহরি পুস্তকালয়, ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- ডি. পি. এল. পাঠচক্র, ডি/২০, গ্রীসন স্ট্রীট, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, এ. বি. এল. টাউনশিপ দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার পিন-৭১৩১২৮
- অঞ্জনকুমার পাল, প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০
- শীতল ব্যানার্জী, প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮

বীরভূম

- বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫ পিন-৭৩১২০৪
- আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- মিলন দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, চৈতালী মার্কেট সিউড়ি-৭৩১১০১
- ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪

বাঁকুড়া

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, পিন-৭২২২০৩
- শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- ডঃ সুনির্মল বেরা প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর (ভগবানের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়! লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে ; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248
554-2403

Vol. 101 ❑ No. 12 ❑ DECEMBER 1999

Licence No.
WB/NC/CL-3

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Reg. No. WB/NC-19

উদ্বোধন

১০১তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০১ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র সুপ্রাচীন সাময়িকপত্র।

❑ **উদ্বোধন**-এর এবছর ১০১তম **বর্ষ** চলছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০০ বছর অতিক্রম এই প্রথম** ❑

❑ **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

❑ **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

❑ **উদ্বোধন** বাঙলা ভাষায় শুধু **সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।**

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র** নয় **উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ১০১ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।

❑ **উদ্বোধন-এর** গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের** ভাব ও বাণী ...

❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে।** উদ্বোধন- ... গ্রাহক একজন করে ... করলেই এখনি **উদ্বোধন**-এর গ্রাহকসংখ্যা **এক লক্ষ** হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহ ... আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব** আ...

ীমা সারদাদেবী

❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ ... অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন-এর** প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন—এই আশা রাখি।

❑ **উদ্বোধন এর শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় তদনুসারেণে জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। শারদীয়া সংখ্যা সহ **গ্রাহক-পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়ায় মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের প্রায় আড়াই গুণ।** শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের** থেকে **আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না।** এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ** উপহার।

❑ উদ্বোধন পত্রিকার সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। শেষের দুটি তহবিলের অর্থানুকূল্যে ১০১তম বর্ষ থেকে 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা চিহ্নিত হচ্ছে। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar' এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** চিঠিতে বা M.O কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি দান পাঠালে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিলের জন্য'** পাঠানো হচ্ছে **সেই মর্মে দাতার চিঠি থাকা বাঞ্ছনীয়।**

❑ **'উদ্বোধন'-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষ থেকে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' **(একবছরের জন্য 'উদ্বোধন'-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** সম্প্রতি নিবেদিত হয়েছে। **১৯৯৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন স্থানাধিকারী 'উদ্বোধন'**-প্রবর্তিত **এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে 'উদ্বোধন'**-সম্পাদকের সঙ্গে **যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক